সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড

প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৬০

৩২শ
বর্ষ

(স্থাপিত ১৩২১)

কথামৃত

আচ্ছা ঈশান, বেলে রেলে ঠোকাঠুকি হয়ে
· বেঁচে গেল, আবার কত লোক মরে গেল।
ক বোঝা গেল, যারা দুর্গা বলে যাত্রা করেছিল
বঁচে গেল। একজনের কপালে লেখা ছিল
ন ফুটে ঢুকে যাবে। সে দুর্গা বলে পথে যাচ্ছে,
য়ে তার পায়ে কুশ ফুটে গেল। এ থেকে
গল যে ঐ দুর্গানামের গুণে অল্পর মধ্যে কেটে
বল ?

ক্ত হ্যাঁ।

ভোগীর নিশ্বাস একভাবে ও যোগীর নিশ্বাস
পড়িয়া থাকে।

পুরুষের চক্ষু পদ্মচক্ষু হইলে অন্তরে সদ্ভাব ও
াকে। পুরুষের চক্ষু বৃষের ন্যায় হইলে কাম
। যোগীর চক্ষু উর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন রক্তিমা ভাব
'বচক্ষু অধিক বড় হয় না, কিন্তু টানা বা আকর্ণ
; কাহারও সহিত কথা কহিতে কহিতে আড
ওয়া, তারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী কারুর অনিষ্ট করতে পারে না;
বালকের মত হয়ে যায়। বাহিরে হয়ত দেখায় রাগ,
অহংকার আছে কিন্তু বস্তুত জ্ঞানীর ওসব কিছু থাকে না।
বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য রয়েছে, সব ফেলে কাশী চলে গেল।
বালকের যেমন আঁট থাকে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সত্ত্বগুণের লোকদের বাড়ী ভাঙ্গা, কোন রকম
ফিটফাট নেই। রজোগুণের লোক ঘড়ি, ঘড়ির চেন,
হাতে আংটী। তমোগুণে নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার
ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। এমন হওয়া চাই যে বলবে, কি জগৎপিতা,
আমি কি জগৎ ছাড়া ? আমায় তুমি দয়া করবে না ?
শালা !

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (রামলালকে)। তোর ফ্যারেনডো (Friend-
বন্ধু) যেমন রসুকে (রসিকলাল), নরেনের ফ্যারেনডো
যেমন হাজরা, আমার ফ্যারেনডো তেমন নরেন হচ্ছে।

উৎসন্ন প্রজা

রজনীকান্ত সেন

[কান্ত কবি রজনীকান্ত বাংলার কান্ত কবি—ঘরের কবি। দারিদ্র্য-নিপীড়িত নিষ্পেষিত কবি দরিদ্রের মরমের মরমী কবি। তাঁর কবিতায় হেঁয়ালী নাই—আভিজাত্যের জড়োয়া চিকনাইও নাই—নিরাপদ-দূরে অবস্থান করে—বচন বিন্যাসের কেরামতী তাতে নাই। স্বদেশীর সে যুগে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই। দীন-দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।' এ ক্রন্দন করতে করতে যে কবি নগ্নপদে নগরবাসীদের নিদ্রামোচন করে ফিরতেন, বর্তমান কাব্যে সেই কবিই নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি হয়ে ঊর্দ্ধে নয়ন-শক্তির সন্ধান করে খেদ করেছেন "হায় রে জগতে ধনী ধনমদে কাঙালের বধে প্রাণ। দুষ্ট রাজার কে করে বিচার বিনা সেই ভগবান।" এই কবিতাটির সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই' কবিতাটি তুলনা করে দেখতে হবে। কবিতাটি এ যাবৎ অন্যত্র কোথাও প্রকাশিত হয়নি।]

বাগানের শাক্ কলা মলো আক্ বেচে আসি গিয়ে হাটে
জমি করি আধি, টিকে ঘর বাঁধি এইরূপে দিন কাটে।
ঝঞ্জাট নাই, পেট্টে দুটো খাই, ধারিনেকো আপ্লাটা
সবে মনে করে সুখে আছে হরে, ধরিয়া বাপের মাটা।
আমি ভাবি হায়, বৃথা দিন যায়, কি হ'ব বাঁধিয়ে টাকা
না করিলে বিয়া, না পুরিলে হিয়া, সংসার সবি ফাঁকা।
দেখে শুনে বুঝে, গাঁয়ে গায়ে খুঁজে, করিলাম এক বিয়ে
নথ বাজু বালা, গোট হেলে মালা, নগদ তিরিশ দিয়ে।
প্রাণপণে খাটি, হয়ে গেনু কাঠি, বুদ্ধির বকুমারী
বউ ঘরে আনি, সবি টানাটানি কুলাইতে নাহি পারি।

ভার হলো চলা সেবার অফলা হইল সকল জমি,
রাজা ন্যায়পর বাড়াইল কর, সেবার না দিয়ে কমি।
দিবস খাটিলে, মজুরী না মেলে দু'জনার উপযুক্ত,
পেট নাহি ভরে, একবেলা করে খাই দোঁহে শাক শুকতো।
আমি বলি ওগো, পাপভোগ ভোগা, ধান হলো না যে ক্ষেতে
হায় রে কপাল, সকাল বিকাল, না পাও দু'মুঠি খেতে।
সজল নয়নে, চাহি মোর পানে, যাতনা হৃদয়ে বাঁধি,
কহিল নীরবে, সবি মোর সবে, তোমারি লাগিয়া কাঁদি।
প্রেমেতে মিষ্ট ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, পূর্ণ যুবতী নারী,
আহা হা সে মুখ, ফেটে যায় বুক স্মরিতে যে নাহি পারি।
রাজা বলে, "হরে, ভাত বিনে মরে বউটা কি করে বসে?
মোরে না শুধায়, মিছে দুখ পায়, শুধু বুঝিবার দোষে,
বল বউটাকে, কেন বসে থাকে, আমার এখানে থাক্
কাজ কাম করে, থালা ভরে ভরে, ভাত নিয়ে বাড়ী যাক্।"
আমি বলি ভাই, কাজে কাজ নাই, থাক বউ ঘরে বসে
রয়েছি যে হালে, ধনীর কপালে, কি হবে কপাল ঘসে।
সে তো বোঝে নাকো, বলে, "তুমি থাক আমিও দু'দিন দেখি
তোমারে খাটাব আমি বসে খাব লোকে শুনে বলিবে কি?"
আমি বলি না না, আছে মোর মানা খাটা কি তোমার সাজে
না শুনি নিষেধ, করি মহা জেদ, লাগিল যে গিয়া কাজে।

যাবে রাজবাড়ী, লাল ডুরে শাড়ি, পাড় তার কাল ফিতে
দেরী নাহি সহে, মহা আগ্রহে, সিন্দুর পরে সীঁতে।

আমি বলি তবে, সাবধানে রবে, চাহিও না কারো দিকে,
রাজা মহাশয়, অতি নীচাশয় টানে যত বৌ ঝিকে।
হেসে বলিল সে, থাক তুমি বসে, আমারে ছুঁইবে কেটা?
মোরে কিছু বলে, নাহি ধরাতলে এমন বাপের বেটা।
দুই ধারে আম, তাল কুল জাম, মাঝ দিয়ে ছোট পথ,
বনদেবী হেন চলে গেল যেন কাঙ্গালের মনোরথ।
বিধি তুমি আছ? স্বর্গে বিরাজ? দুঃখীর কেহ নও?
বিচার করিয়া ধুইয়া মুছিয়া নিলে? স্মৃতিটুকু লও।

হয়ে এল রাত্তি, দিয়ে সাঁজবাতি, বসে রহিলাম পথে,
যে গেল সে গেল, ফিরে নাহি এল রাজদরবার হতে।
পাখী পাখা নাড়ে, বুঝি এইবারে, মনে হয় আসিতেছে
"সে কি মোর কেনা?" আর আসিবে না?
শেষে ভাবি চলে গেছে।
তবু এ পরাণে প্রবোধ না মানে রহিলাম রাত জাগি;
শঙ্কিত হৃদে, যন্ত্রণা বিঁধে, অধীর তাহারি লাগি।
প্রত্যুষে উঠি, তাড়াতাড়ি ছুটি, চলিলাম রাজবাড়ী।
দেখিনু ফটকে, ফিরিছে চটকে, গালপাটা চাপদাড়ী
কেঁদে বলি তায়, "পাঁড়েজি মশায় কেন মোরে দাও বাধা?"
বলে দ্বারবান, "আরে বাপজান জরু তেরা নেহি জাগা।"

শিরে কর হানি, চুল ছিঁড়ি টানি, লুঠে পড়ি তার পায়,
দোহাই ধর্ম্ম, এমন কর্ম্ম, রাজার না শোভা পায়।
রাজা বলে কেঁও, আভি হাঁকা দেও, দ্বারবান ধরে চুলে
ফেলিয়া দুয়ারে, দুই হাতে মারে পায়ের নাগরা খুলে।
হাতে পায়ে গিঁঠে, পেটে বুকে পিঠে,
কোথা মারে দিশা নাই।
শোণিত ছুটিল গেয়ান টুটিল ভূমে গড়াগড়ি যাই।
হায় রে জগতে, ধনী ধনমদে, কাঙ্গালের বধে প্রাণ।
দুষ্ট রাজার কে করে বিচার বিনা সেই ভগবান?
সাত দিন জ্বরে, পড়েছিনু ঘরে, প্রলাপ বকেছি কত।
প্রতিবেশী দলে, দেখে যায় চলে সবাই মর্ম্মাহত।

মহাকবি ইকবাল

জসীমউদ্দীন

পথ ভোলা কবি ! গোলাপ ফুলের পল্লবে বাঁধি' ঘর
গন্ধের গুঁড়া সঞ্চয় করি' সারাটি জনম ভর,
বুলবুলিদের কণ্ঠে পুরিয়া ছড়াইছ দেশে দেশে ;
রামধনুকের সাত-রঙা পথে চলেছে তা' ভেসে' ভেসে' ।

হে রঙিলা কবি ! তোমার সাকীর রঙিন ঠোঁটেতে ঢুকে'
ফুলের বরণ, গজলের গান্ধ ছড়াইছ মিঠে সুখে ।
তারি এতটুকু বাঁশীতে পুরিয়া আমরা দিওয়ানা হয়ে
বিকাই কত না সমরকন্দ বোখারার সুখালয়ে ।
জায়নামাজের পাটি ভিজে' যায় তোমার 'সুরা'র স্রোতে ;
হীরামন-তোতা ডানা মেলে' উড়ে বন্ধ সে খাঁচা হ'তে ।

তোমার কথা তো মেহেদির পাতা, ঘষিতে সে রঙ ধরি'
টুগু টুগু করে ; নতুন বধূরা অধর পেয়ালা করি'
বিলাইয়া দেয় দয়িতের ঠোঁটে সুখ-বাসরের রাতে ।
চাঁদ যে ছড়ায় জ্যোছনা-মদিরা জেগে তাহাদের সাথে ।

ওগো দরবেশ ! চলিয়াছ তুমি খোরমা-খেজুর ছায়ে
মেশ্ক্ হ'তে সে কস্তুরী-বাস ছড়ায়ে মরুর বায়ে ;
ভূত-ভবিষ্য-বর্তমানেরে মুঠার মাঝারে ধরি',
তুমি কারিকর, গড়েছ তাদের মনের মতন করি' ।
মহাকাল তব আজ্ঞাবাহক, নখ-ইঙ্গিতে তব
কত দেশে দেশে ভাঙিছে গড়িছে ইতিহাস অভিনব ।

ইসমে-আজম পড়িয়া চলেছ অন্তরীক্ষ থেকে ;
জীবন-কুসুম ফুটিয়া উঠিছে বেহেশ্ত গায়ে মেখে' ।

আমি কি তোমারে ডাক দিব আজ আমাদের আঙিনায়,
এইখানে এই ভাঙা কুঁড়ে-ঘরে কলাপাতা-ঘেরা ছায় !
ক্ষুধার আহার মেলেনি যাদের, পরের ক্ষুধার লাগি'
রচিতেছে সুধা লাঙল খুঁড়িয়া দিবস রজনী জাগি',
কদাকার এই ধরণীরে যারা করেছে ফসল-বাগ,
তাহাদের পেটে জ্বলিছে চুল্লি দারুণ ক্ষুধার আগ ।
তুমি কি ক্ষণেক দাঁড়াবে হেথায় তাহাদের ভাষা হয়ে,
হানিবে আঘাত অসাম্য ভরা আজিকার লোকালয়ে ?
গরীবের তরে তখত-এ-তাউস্ আজো ত হয়নি গড়া ;
কি ক'রে পড়িবে তোমার নান্দী গোরস্তানের মড়া ?

মিথ্যা তোমারে আহ্বানি' কবি করিলাম অপমান ;
আমরা আজিও প্রস্তুত নহি লইতে তোমার দান ।
মানুষেরে মোরা দিতে পারি নাই মানুষের অধিকার ,
মানুষেরে লয়ে শিখিয়াছি শুধু বিকি-কিনি কারবার ।
আহমিকা ভরে একের কথারে পুরিতে আরের মুখে
ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া ফিরিছি আমরা নকল সুখে ।
হানো হানো কবি, আমাদের 'পরে নিদারুণ অভিশাপ ;
জ্বলে' পুড়ে' যাক্ দাহনে তাহার অতীতের কৃত পাপ ।

(উৎসন্ন প্রজা)

[শেষাংশ]

পুণ্য রুচির শূন্য কুটীর নির্ব্বাসিতের বাটী ;
শৈশব-স্মৃতি, যৌবন-গীতি, মিশ্রিত যার মাটী ।
ছবিটুকু তার, মুছিয়াছি আর, কিছু আছে অবশেষ,
কত কাল পরে, মনে নাহি পড়ে, ফিরিয়াছিলাম দেশ ।
বাস্ত বাগান, সকলি শ্মশান, কত তার গাছপালা ;
শুধু একধারে জঙ্গল পারে, ছোট একখানি চালা ।
কাননচারিণী, এক পাগলিনী, দুই মাস হতে আছে ;
আমি চিনিলাম, হায় ভগবান, দাঁড়ালেম গিয়ে কাছে ।
আমারে দেখিয়া, উঠিল হাসিয়া, বলিল, ও তুমি কে গো ?
তোমার জ্বালায়, ঝি-বউ পালায় কুলনাশা বাজা এ গো ।

বেগে বারিধার বহিল আমার নয়নে না কিছু দেখি,
প্রভু ভগবান, কেন আসিলাম, এসে দেখিলাম এ কি ?
পাগলিনী হেসে হাতে ধরে এসে বলে, কোথা দেখিয়াছি
একজন মোরে ভালবাসিত রে, তারে ভালবাসিয়াছি ।
কে তুমি পথিক বল দেখি ঠিক তাহারে কি তুমি জান ?
সে যে মোর স্বামী, তারি তরে আমি বসে আছি ডেকে আন ।
ছুটে যায় আসে, কাঁদে আর হাসে, বলে কি আবার চুরি ?
যাও সরে যাও, তফাৎ দাঁড়াও, এই দেখ সেই ছুরি ।
নিমেষে ছুটিয়া গেল পলাইয়া আর তো দেখিনি তারে ;
এপারে ইহার হলো না বিচার হয় যদি পরপারে ।

সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

[সামাজিক ইতিহাসের কত মূল্যবান উপকরণ যে সংবাদপত্রের পুরানো ফাইল থেকে পাওয়া যেতে পারে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা।" কিন্তু তিনি শুধু বাঙলা সংবাদপত্রগুলি থেকেই আহরণ করেছেন। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও অসংখ্য কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ছড়িয়ে আছে। ইংরেজী পত্রিকার বিশেষ মূল্য এই যে, এদের মধ্যে বিদেশীর চোখে তদানীন্তন ভারত কেমন লেগেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পুরানো সংবাদপত্রের ফাইলগুলি ক্রমশঃ জীর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। অনেকগুলি একেবারেই হারিয়ে গেছে। এই সব পত্রিকা থেকে কিছু কিছু তথ্য 'মাসিক বসুমতীর' পৃষ্ঠায় ধরে রাখবার চেষ্টা করা হবে। ইংরেজী থেকে আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়নি। মূল তথ্যটুকু বাঙলায় পরিবেশন করা হয়েছে। কোথাও অনাবশ্যক বোধে কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে, কোথাও বা বোঝবার সুবিধার জন্য দু'-এক লাইন যোগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তথ্যের বিকৃতি নেই। যাঁদের এটুকুতে তৃপ্তি হবে না, তাঁরা মূল দেখতে পারবেন।—সম্পাদক]

মুদ্রানীতি

বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আজকের সংখ্যায় আমরা আলোচনা করব। এর উন্নতি-বিধায়ক প্রস্তাব দু'টি: একটি হলো বৃটিশ-ভারতের সর্বত্র একই মুদ্রার প্রচলন; অপরটি রৌপ্যমুদ্রার সহগামী একটি স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন। এই উভয় বিষয়েই আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করব এবং আমাদের নিজস্ব প্রস্তাবও উপস্থাপিত করব।

টাকা কি, প্রথমে তা বোঝা প্রয়োজন। 'টাকা' একটি গণ বা বর্গ (genus) বাচক শব্দ যার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বাস্তব ও অবাস্তব প্রজাতি (species) রয়েছে। কলকাতার সিক্কা এবং ফরাক্কাবাদী, মাদ্রাজী ও বোম্বাই টাকা বাস্তব মুদ্রা; পক্ষান্তরে 'সনৎ' ও 'কারেন্ট' অবাস্তব বা শুধু হিসাবের মুদ্রা। অসামরিক সরকারী হিসাব 'কারেন্ট' অনুসারে এবং সামরিক হিসাব 'সনৎ' অনুযায়ী রাখা হয়। সৈন্যদের বেতন দেওয়া হয় সনতের হিসেবে। বাঙলা দেশে ১০০ 'সনৎ' $১৫\frac{১}{২}$ সিক্কার সমান। এটা পূর্বের হার। পশ্চিম-ভারতে 'সনৎ' ফরাক্কাবাদী টাকার সমান।

১৭৯৩ অব্দে কলকাতার সিক্কা টাকার জন্য মহামান্য সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বের ঊনবিংশতি বৎসরে প্রচলিত 'রূপয়া' গৃহীত হয়। এতে ছিল খাঁটি রূপা ১৭৫·৯২৩ গ্রেণ এবং খাদ মোট ওজনের $\frac{১}{৪৮}$ অংশ।

এতটা খাঁটি রূপা প্রচলনের অনুপযোগী মনে হওয়ায় ১৮১১ সালে খাদের পরিমাণ বাড়িয়ে মোট ওজনের $\frac{১}{১২}$ ভাগ করা হয় (ইংরেজী স্বর্ণমান)। অপর প্রেসিডেন্সি দু'টির স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মানও এরূপ।

নিচে যে তালিকাটি দেওয়া হলো, তা থেকে প্রচলিত মুদ্রা ও হিসাবী (ideal) টাকার আনুপাতিক মূল্য ও ওজন পাওয়া যাবে। সমমূল্য ষ্টার্লিংএর অনুপাতে প্রত্যেক মুদ্রার মানও দেখানো হয়েছে। ভারতের আর্থিক একক (pecuniary unit) কয়েক গ্রেণ খাঁটি রূপা আর ইংলণ্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা। সুতরাং এই দুই দেশের মুদ্রা-বিনিময়ের কোনো অপরিবর্তনীয় সমমান হার (par rate) থাকতে পারে না। সোনার অস্থির দরকে স্থির ধরে নিয়ে রূপার সঙ্গে তুলনায় একটি নামিক (nominal) হার বেঁধে দেওয়া যায় মাত্র। যখন বলা হয় এক সিক্কা ২·০৪৭ শিলিংএর সমান, তখন এই অপ্রকৃত বাঁধা হারের কথাই বুঝায়। কথাটির অর্থ এই যে, কলকাতার এক টাকা এক পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর $\frac{১}{৯·৭৭০}$ অংশ। রূপা যখন আইন চালু (legal tender) ছিল এবং একটি শিলিং ছিল এক ট্রয় পাউণ্ডমান রূপার $\frac{১}{৬২}$ অংশ, সেই আমলে টাকশালের বাঁধা সোনা-রূপার আনুপাতিক মূল্য ১৫·২০১ : ১ ধরে তালিকার সিক্কা ও ষ্টার্লিংএর দর হিসেব করা হয়েছে।

ভারতে চালু মুদ্রার একক হিসেবে কোন্ মুদ্রার উপযোগিতা সর্বাধিক? ফরাক্কাবাদীর কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মতে মাদ্রাজী ও বোম্বাই টাকা ফরাক্কাবাদী টাকা অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। মাদ্রাজীর ওজনে অথবা খাঁটি গ্রেণের সংখ্যায় ভগ্নাংশ নেই। ভগ্নাংশ নেই বোম্বাই টাকার ওজনেও। এ $\frac{১১}{১২}$ ষ্টার্লিং হতে অভিন্ন; অন্ততঃ পরিপূরক ভগ্নাংশ এত ক্ষুদ্র যে, তা অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু এই তিন প্রকার মুদ্রার যে কোনো একটি সাধারণ সর্বভারতীয় মুদ্রারূপে গৃহীত হলে বাঙলা দেশে বড় রকম অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে। বাঙলার সর্বাধিক পরিমাণ সরকারী ও বে-সরকারী চুক্তি সিক্কার হিসেবেই সম্পাদিত হয়েছে। চিরস্থায়ী ভূমি-রাজস্ব ও সাধারণ সরকারী ঋণ নির্ধারিত হয়েছে এই মুদ্রাতেই।

সুতরাং আমরা মনে করি সিক্কা টাকাকেই বৃটিশ ভারতের সাধারণ মুদ্রারূপে নির্বাচিত করা উচিত। ১৮১৫ সালের ন্যায় বৃটেনের মুদ্রার একক যদি এখনও রূপাই থাকত, তাহলে আমরা বিনা দ্বিধায় উভয় দেশের মুদ্রার সম্পূর্ণ একীকরণের সুপারিশ করতাম। ঐ অবস্থায় ভারতীয় মুদ্রার একক দু'শিলিং বা ১/১০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং স্থির করে একীকরণ সম্ভব হতো। বাঙলার মুদ্রা-প্রচলনের ক্ষেত্রে এর ফলে যে সামান্য বিভ্রাট দেখা দিত, বৃটেন ও ভারতের মুদ্রামানের অভিন্নতা সম্পাদনের দ্বারা ঐ ক্ষতিপূরণের পরেও লাভই দাঁড়াত। কিন্তু বৃটেনে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকায় বাঞ্ছিত একীকরণ এখন আর সম্ভবপর নয়। সুতরাং এরূপ কোন ক্ষতিপূরক সুবিধা দেখা যায় না, যার জন্যে সরকারী ঋণ ও রাজস্বের পরিমাপক মুদ্রার প্রচলনে বাধা সৃষ্টির সমর্থন করা যেতে পারে।

ভারতীয় কারেন্সীর প্রস্তাবিত ঐক্যই যদি সাধিত হয়, তাহলে সরকারী ও বে-সরকারী বর্তমান চুক্তিগুলি নির্বিঘ্ন রাখবার ব্যবস্থা সহজ ও সুস্পষ্ট। পুরানো মুদ্রায় মাদ্রাজ অথবা কানপুরের ১০০ গ্রেণ খাঁটি রূপার ঋণ নতুন মুদ্রার ঠিক ১০০ গ্রেণ দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। এতে পাওনাদার কিংবা দেনাদার কারোই লাভ অথবা লোকসান হবে না।

এখন আমরা স্বর্ণমুদ্রাকে রৌপ্য মুদ্রার সহযোগী করবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বিশেষ কোনো চেষ্টা করা হয়নি। ১৭৯৩ সালে ১৮৯.৪৬২৩ গ্রেণ খাঁটি সোনায় ১/১২ খাদ-মেশানো মোহরের বিনিময়-মান আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল ১৬৲ টাকা। এতে সোনা ও রূপার আনুপাতিক মূল্য ধরা হয় ১ : ১৪.৮৬।

চিরকাল যে দেশে সঞ্চয়ের দ্বারা সোনা অচল করে রাখবার প্রথা, সে দেশে সোনার মূল্য এরূপ হ্রাস করা অসঙ্গত। ১৮১৮ সালে ১৮৭.৬৫১ বিশুদ্ধ গ্রেণ ও ১/১২ বিশুদ্ধ অংশ স্বর্ণনির্মিত নতুন মোহর আইনসিদ্ধ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষিত হয়নি। ১.৮১১৩ গ্রেণ হ্রাস করাতে রূপার অনুপাতে সোনার মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি পেল ১ : ১৫ হারে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের মুদ্রা নির্মাণে এই দুই ধাতুর আনুপাতিক মূল্যও এই। কিন্তু এ সময়ে সোনা ও রূপা বিনিময়ের বাজার-প্রচলিত হার ছিল (এবং ১৮৩১ সালেও আছে) ১৬ : ১।

নতুন মোহর সঞ্চয়কারীদের প্রিয় নয় বলে এখন প্রায় অব্যবহার্যের পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। সুতরাং সরকার টাকশালকে পুরানো মোহর প্রস্তুতের সম্মতি দিয়েছেন।

কলকাতার বাজারে পুরাতন মোহরের দর ১৮৶০ এবং নতুনের দর ১৭।০। এই অনুসারে সোনার দর যথাক্রমে দাঁড়ায় ১৬.১৭ ও ১৬.৮৮ : ১। এই অস্বাভাবিক তারতম্যের একমাত্র কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার খেয়াল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে সোনার ব্যবহার কত সামান্য।

সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্য পরিবর্তনশীল এবং এদের একটির মাত্র মান নির্দিষ্ট থাকবে। এজন্য এদের মধ্যে এমন একটি আনুপাতিক হার আগে থেকে বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়, যে হারে জনসাধারণ তাদের ধাতুর আদান-প্রদান করবে নিরাপত্তিতে। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার সহ-প্রচলন স্থায়ী করবার প্রকৃষ্ট উপায় সম্ভবতঃ এই যে, বাজারদরের লক্ষণীয় পরিবর্তন অনুসারে তাদের আপেক্ষিক মূল্যের পরিবর্তিত হার সময় সময় নির্ধারিত করে দিতে হবে।

প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে নতুন একটি স্বর্ণ-মুদ্রা, হয় অবিকল সভারেন (১১৩.০০০ বিশুদ্ধ গ্রেণ) অথবা সোনার বাজারদর অনুযায়ী (যেমন ১৬½ : ১) ১০ টাকার সমমূল্য কোনো মুদ্রা চালু করা যেতে পারে। সভারেন যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে প্রায় ১০½ সিক্কার সহিত উপরোক্ত হারে বিনিময় চলতে পারে। শেষোক্ত মুদ্রা গৃহীত হলে ঐ হারে ১০৬.৭২ বিশুদ্ধ গ্রেণ থাকবে।

এই আনুপাতিক হারের নতুন মুদ্রা সম্ভবতঃ অবাধে চালু হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার হারের হ্রাস-বৃদ্ধি যদি অতি অল্প পাল্লার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এ ঠিক সমতার লক্ষ্যে না পৌঁছলেও অসাম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে না। সরকারী ঘোষণার দ্বারা এর উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধান যে কোনো সময় করা যেতে পারে। যদিও বাজারদরের বিশেষ ওঠা-নামার জন্য রূপার সঙ্গে এর বিনিময়-মূল্যের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তবু নতুন মুদ্রার স্বকীয় মান এই উপায়ে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত থেকে যাবে। আমরা নতুন কোনো মুদ্রা সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেছি, তা অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তবে আমাদের ধারণা, ১৭।০ বা ১৮।০ টাকা মূল্যের মুদ্রা অপেক্ষা ১০ বা ১১ টাকা মূল্যের মুদ্রা ও তাদের আধুলির চালু হবার এবং চালু থাকবার সম্ভাবনা অধিক।

ভারতীয় মুদ্রা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি পরিবর্তনের উত্তম সুযোগ উপস্থিত। বর্তমানে ইংরেজ কর্তৃক ভারত অধিকারের ন্যায্যতার প্রশ্ন চাপা পড়ে গেছে। এখন মুদ্রায় উৎকীর্ণ 'মহামান্য সম্রাট শাহ আলম, ধর্মরক্ষক'এর স্থলে বৃটিশের আধিপত্য-জ্ঞাপক কিছু থাকা উচিত। এক সময় মাননীয় ডিরেক্টর সভা এরূপ পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেছিলেন বলে আমরা শুনেছি। কিন্তু স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত কয়েক জন বর্ষীয়সী মহিলার বিরুদ্ধ অভিমত তাঁদের এই পরিবর্তন সাধন থেকে নিবৃত্ত করে। এরূপ প্রকাশ্য ভাবে সাম্রাজ্যের রাজকীয় বিশেষ অধিকার হস্তগত করলে যদি এ সকল প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে তাদের প্রিয় তৈমুর বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীর প্রতি সুপ্ত সহানুভূতি জেগে ওঠে,—এই আশঙ্কায় মহিলারা ভীত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এ সকল বৃদ্ধা মহিলাদের এক জনও ভয়বিহ্বল হবার জন্য এখন জীবিত নেই। সুতরাং মুদ্রার লিপি পরিবর্তন এখন স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসেবেই সাধিত হতে পারে।

আমরা যে প্রয়োজনীয় বিষয়টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, তার প্রতি আমাদের সুধী লেখকবৃন্দের কেউ কেউ হয়তো অধিকতর সুবিচার করতে সক্ষম। আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন বিষয়টির আলোচনা আরম্ভ করে আমাদের সংশোধন ও সংযোজন করে দেন।

এই প্রসঙ্গে নতুন টাকশাল হতে যে অতীব সুন্দর তাম্রমুদ্রা বের করা হয়েছে, এবং যা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সে সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, এর নির্মাণ-পারিপাট্য উচ্চ প্রশংসা লাভের যোগ্য এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মদক্ষতার বলিষ্ঠ পরিচয় প্রদান করে। আমাদের বিশ্বাস, এই টাকশাল কোনো অংশেই য়ুরোপের প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় হীন নয়।

তালিকা

মুদ্রা	মোট ওজন ট্রয় গ্রেণ	খাদের হার	খাঁটি	শিলিংএর মূল্য
পুরানো ডবল শিলিং	১৮৫.৮০৬৪৪	৩/৪০	১৭১.৮৭০১৬	২.০০০০
কলকাতার সিক্কা	১৯১.৯১৬	১/১২	১৭৫.৯২৩	২.০১৭৫
ফরাক্কাবাদী	১৮০.২৩৪	...	১৬৫.২১৫	১.৯২২৫৪
মাদ্রাজী	১৮০	...	১৬৫	১.৯২৩০৩
বোম্বাই	১৭৯	...	১৬৪.৬৮	১.৯১৮৩
সনৎ } কাল্পনিক	...	...	১৬৮.০০৬	১.৯৫৮৫
কারেন্ট } বা হিসাবী	...	...	১৫১.৬৫৭	১.৭৬৪৭

টীকা: উপরে ষ্টার্লিংমান শিলিং ও শিলিংএর অংশে প্রকাশ করা হলেও প্রচলিত শিলিং অথবা মান রূপার এক ট্রয়পাউণ্ডের ১/৬৬ অংশকে এতে বোঝায় না। যে পুরানো শিলিং এখন নেই তাকে এবং ঐরূপ রূপার ৬২ অংশকে নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব একটি বোম্বাই টাকা ১.৯১৮৩ শিলিংএর সমান বললে ইংরেজী স্বর্ণমুদ্রার দ্বাদশাংশের একাংশের আনুপাতিক মান বোঝায় মাত্র। ঐ দ্বাদশাংশের প্রত্যেক অংশ পুরাতন শিলিংএর সমান ধরে নেওয়া হয়। এতে এক ভাগ বিশুদ্ধ সোনা ১৫.২০১ ভাগ বিশুদ্ধ রূপার মান বলে ধরা হয়েছে। নতুন রৌপ্যমুদ্রা তাম্রমুদ্রার মতোই ইংরেজ সরকারের অধিকারে এবং দুই পাউণ্ড বা তার বেশি ঋণ পরিশোধের জন্য ইহা আইনচালু নয়। যে ভেজাল শিলিংএ ৮০.২ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপা আছে, তার সঙ্গে তুলনা করলে টাকার ইংরেজী মুদ্রামান দৃশ্যতঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে মুদ্রায় সোনার মান রূপার সহিত তুলনায় ১৪.২৮১ : ১ হয়, তা দিয়ে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য নির্ণয় যুক্তিযুক্ত হবে না।

বিভিন্ন প্রদেশের ওজন ও মাপের মধ্যে এর চেয়েও বেশি অনৈক্য আছে। এদের ঐক্যসাধন মুদ্রার ঐক্যের মতোই অত্যাবশ্যক। এই প্রেসিডেন্সির (বাঙলার) বিভিন্ন জেলায় ওজন ও মাপের একক এবং তাদের অংশের নাম অভিন্ন বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের মান প্রায় প্রতি জেলাতেই পৃথক। এক অঞ্চলের বিঘা হয়তো অন্য অঞ্চলের বিঘার এক-তৃতীয়াংশ। মণ, গজ, ক্রোশ সম্বন্ধে ততটা না হলেও অনেক বিভেদ বর্তমান। বহু বিচিত্রতার নিদর্শন প্রদর্শনের অথবা এক মান নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমাদের নিকট নেই। এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমরূপে কাজ করতে পারলে আমরা সুখী হবো। আমাদের সুধী পৃষ্ঠপোষকগণ নিজ নিজ অঞ্চলে প্রচলিত ওজন ও মাপের বিশদ বিবরণ পাঠিয়ে অনুগৃহীত করবেন আশা করি। তাঁদের সহায়তায় আমাদের কাগজ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রচারের এবং সর্বসাধারণের সুবিধাবৃদ্ধির উপায়স্বরূপ হতে পারে। সংবাদদাতাগণ যেন ওজন ট্রয় গ্রেণে এবং রৈখিক ও বর্গের মাপ ফুটে লেখেন।

দ্রষ্টব্য। সৈন্যদের মাইনে দেওয়া হয় 'সনৎ' টাকায়। 'একশ' সনৎ' বাঙলার ৯৫২ সিক্কা টাকার সমান। এটা অবশ্য আগেকার কথা। পশ্চিমাঞ্চলে ফরাক্কাবাদী টাকা ও সনতের মূল্য এক।

(ক্যালকাটা ম্যাগাজিন এণ্ড মান্থলি রেজিষ্টার ১৮৩১ থেকে সংকলিত।)

হিন্দু মন্দির ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র ১৮৩১ সালের ২৮শে মার্চের সংখ্যায় সেকালের হিন্দু মন্দির সম্বন্ধে একটি পত্র প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরকারীর নাম 'জ্ঞান'। এটা নিশ্চয়ই ছদ্মনাম। যাই হোক, পত্রলেখকের বক্তব্য হলো এই যে, ভারতবর্ষের অসংখ্য হিন্দু মন্দিরের মধ্যে ১৮১০ সালের ১৯নং রেগুলেশন অনুসারে যেগুলি কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে, সেগুলি পূর্ব প্রতিষ্ঠা বজায় রেখে চলছে। অন্যগুলির অস্তিত্ব রাখাই দায় হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে। যে মন্দিরগুলি বিদেশী এবং বিধর্মী সরকারের সহায়তা পেয়েছে, জনসাধারণের চোখে তাদের মর্যাদা বড় বেশি। মন্দির ও তথায় প্রতিষ্ঠিত দেবতার মাহাত্ম্য না থাকলে বিদেশীরা কেন পৃষ্ঠপোষকতা করবে—এই ছিল যুক্তির ধারা। এই সব অনুগ্রহপুষ্ট মন্দিরগুলি বিদেশী গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যা পেয়েছে, হিন্দু রাজত্বেও এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করতে পারত না। অপর দিকে প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি সরকারী বৃত্তির অভাবে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। লেখক ১৮১২, ১৮১৮ ও ১৮২২ সালে কাশী গিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, কাশী মন্দিরের মর্যাদা ক্রমশঃ কমতির মুখে।

কোম্পানীর বিদেশী কর্মচারীদের ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলেও অনেক মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বেড়ে যায়। লোকে ভাবে, বিদেশী প্রধান এবং প্রতাপশালী কর্মচারী হয়েও যখন কোন বিশেষ মন্দিরের উপর আসক্ত, তখন নিশ্চয়ই সত্যিকার কিছু কারণ আছে। লেখক ছেলেবেলায় যখন ঢাকায় পড়তেন তখনকার একটা দৃষ্টান্ত এই: রাজা মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী মন্দির সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তখন ঢাকার কালেক্টার হয়ে এলেন জন ব্যাটি। মা ঢাকেশ্বরীর ভক্ত হয়ে পড়লেন তিনি; নিজের টাকায় তৈরি করিয়ে দিলেন মন্দিরের নহবৎখানা। নহবৎখানার উদ্বোধনের দিনে ভক্তবৃন্দ নতুন গান বেঁধে গাইতে লাগল:

> দেখ তোমার ভক্ত বাটি সাহেব দিছে নওবত খানা।
> মা ঢাকেশ্বরী গো, হা ঢাকায় থেকে দয়ার দাবব কর না।

অর্থাৎ, ব্যাটি সাহেব নহবৎখানা নিজের পয়সায় করে দিয়েছে, সুতরাং, হে মা ঢাকেশ্বরী, যতদিন ঢাকায় থাকব ততদিন যেন তোমার করুণালাভে বঞ্চিত না হই।

কালিঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠা অবশ্য অন্য কারণে হয়েছে। কোম্পানীর সহায়তা কালিঘাটের মন্দির পায়নি। কিন্তু ইংরেজদের চেষ্টায় কলকাতা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল; হঠাৎ-বড়লোক হিন্দু নাগরিকদের দেবতার প্রতি ভক্তি জাগল; নিজ নিজ সৌভাগ্যের জন্য দেবতার পুজা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইল তারা। কালিঘাট ছাড়া তেমন দেবস্থান আর কোথায়? তাই কালিঘাটের মর্যাদা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। সমাচার চন্দ্রিকা ও ধর্মসভার প্রচার না থাকলে ইংরেজী শিক্ষা, হিন্দু কলেজ ও রামমোহন রায়ের প্রভাবে

কালিঘাটে পুণ্যার্থীর ভিড় হয়তো একেবারেই ক্ষীণ হয়ে পড়ত। ১৮৩৬ সালে দেবীর অলংকার ছিল প্রায় আটদশ হাজার টাকার, এবং মন্দিরের দৈনিক আয় হতো পঞ্চাশ টাকা। তখন কলকাতা গ্রামের বার্ষিক আয় ছিল হাজার দশেক। মন্দিরে নরবলি ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা (যেমন, বুকের রক্ত দান, ইত্যাদি) তখনো প্রচলিত ছিল। পূর্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের দেবতার কাছে বলি দেওয়া হতো। এই নিষ্ঠুর কার্য বন্ধ করবার জন্য পত্রলেখকের পরামর্শ হলো মন্দিরে শুধু খৃষ্টান এবং মুসলমান প্রহরী রাখা। মফঃস্বলে কালিঘাটের খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষাই কোনো বিশেষ মন্দিরের উপর এই অন্ধ ভক্তি দূর করতে পারে।

* * * *

স্ত্রী-শিক্ষা

গত ১১ই অগাষ্ট (১৮৩১) Ladies' Society for Native Female Education-এর অষ্টম বার্ষিক সভা কলকাতার মাননীয় আর্চ ডীকনের ক্লাইভ ষ্ট্রীট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব বৎসরের কার্য্যবিবরণী থেকে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ জানতে পারি।

বাগবাজারের ফিমেল নেটিভ স্কুলটির কাজ চালিয়ে গেলে সমিতির মূল উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা নেই বলে স্কুলটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় সমিতির কাজ এখন সেন্ট্রাল স্কুলেই সীমাবদ্ধ। এখানে ছাত্রীর সংখ্যা বেশ বেড়েছে; অবশ্য প্রতিদিনই ছাত্রী-সংখ্যা কম-বেশী হয়,—বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। শীতকালে দৈনিক প্রায় ১৮০টি ছাত্রী স্কুলে আসে। কিন্তু গত মাসে (জুলাই) এসেছে গড়ে ২০০ থেকে ২৪০টি ছাত্রী। উচ্চ শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্রীদের প্রতি বৎসর স্কুল হতে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এমন অনেক ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করে যাদের প্রথম পাঠ পড়াও শেষ হয়নি। অনেক বালিকা অবশ্য কিছুকাল স্কুলে থেকে পড়তে ও বানান করতে শেখে এবং খৃষ্টান নীতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারে।

মির্জাপুরে চার্চ মিশনের বাড়ীতে যে স্কুল হয়, সেখানে দৈনিক ৪০।৪৫টি ছাত্রী আসে। গত ডিসেম্বর মাসের বার্ষিক পরীক্ষায় এরা খুব সন্তোষজনক ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বর্ধমানে চারটি বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রীসংখ্যা ১৩৫। গত ফেব্রুয়ারী মাসের পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা ভালো ফল না করলেও খারাপ হয়নি। কালনার বিদ্যালয়ে ৫৩টি ছাত্রী আছে এবং এখানকার পাঠ্যতালিকা অন্যান্য স্কুলের মতোই।

রিপোর্টের শেষে বলা হয়েছে যে, বালিকাদের শিক্ষা প্রাপ্তবয়স্কদের প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। বরং অভিভাবকদের বিপরীত মনোভাবের জন্য শিক্ষার পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। স্কুলে যে ভালোটুকু পায়, তা পারিবারিক পরিবেশে নষ্ট হয়ে যায়।

সমিতির হিসেব বন্ধ হয়েছে ৩০শে এপ্রিল। ঐ বৎসর সমিতির ব্যয় হয়েছে ৭১০৪ টাকা ৬ আনা ৫ পাই এবং উদ্বৃত্ত রয়েছে ১০৮৩০ টাকা ৮ আনা ১ পাই। সমিতিকে সাহায্য করবার জন্য ইংলণ্ড থেকে মহিলারা নানাবিধ সৌখীন সামগ্রী প্রস্তুত করে পাঠিয়েছেন। সেগুলি বিক্রয় করে প্রায় সাত শত টাকা পাওয়া গেছে।

('ইণ্ডিয়া গেজেট' থেকে 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিন এণ্ড মান্থলি রেজিষ্টার'এ ৩য় খণ্ড, ১৮৩১, উদ্‌ধৃত)।

* * * *

চৌরঙ্গীতে হাড়গিলার উপদ্রব

১৮১৫ সালের ৩১শে জুলাই কলকাতা থেকে চমন ধোপার মৃত্যুর যে বিবরণ পাঠানো হয়েছিল, তা লণ্ডনের 'এশিয়াটিক জার্ণালের' মার্চ (১৮১৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিবরণটি এই: কাপড়ের বোঝা মাথায় করে চমন ধোপা যাচ্ছিল চৌরঙ্গীর বাদামতলা রাস্তা দিয়ে। একটা হাড়গিলা পাখী রাস্তা পার হতে গিয়ে চমনের ঘাড়ের ডান দিকে কামড়ে দিল। তৎক্ষণাৎ বসে পড়ল চমন। কিছু দূরে ছিল গণেশ। সে এগিয়ে এসে ক্ষতস্থান চূণ দিয়ে বেঁধে দিল। চমন গণেশের সাহায্যে একটু হাঁটবার চেষ্টা করতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল এবং ক্ষতস্থান থেকে আরম্ভ হলো প্রচুর রক্তপাত। গণেশ তাড়াতাড়ি গেল ওর বাড়ীতে খবর দিতে। ফিরে এসে দেখে চমনের মৃত্যু হয়েছে। পাখীটা তখনো রাস্তার ধারে বসে ছিল; এক দল ছেলে এসে তাড়িয়ে দিল। নেটিভ হাসপাতালের ডাক্তার মিঃ হর্নেট মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলেছেন যে, ঘাড়ের মোটা শিরা ছিন্ন হওয়ায় চমনের মৃত্যু হয়েছে। এর জন্য ছোরা জাতীয় কোনো ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। জুরীরা রায় দিলেন যে কোনো আকস্মিক কারণে চমনের মৃত্যু হয়েছে।

বাঙালী আজকে যা চিন্তা করে

"The Bengali is the maker of New India....An unwritten chapter in the history of Modern India is the record of what has been done for the people by men of Indian race, and in that record a commanding share has fallen to Bengal."

—Report of the 'Daily News' special Commissioners.

সঙ্গীত সমাজ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর-কোশলা।"

সুতরাং "সঙ্গীত সমাজ" প্রতিষ্ঠান যে আর নাই, সে জন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবের প্রভাব রোধ করিতে পারে না। সেই জন্য যে "সঙ্গীত সমাজ" এক দিন কলিকাতায় শিক্ষিত শিষ্ট সমাজের মিলনের ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে বিরাজিত ছিল, সেই "সঙ্গীত সমাজের" বিষয় আলোচনা করিতেছি! "সঙ্গীত সমাজের" বিশেষ সার্থকতাও যে ছিল না, এমন নহে—তাহার বৈশিষ্ট্যই সেই সার্থকতার কারণ। বাঙ্গালার যে সমাজে অর্থের ও অবসরের অভাব ছিল না, জীবন-সংগ্রামের দৈনিক দুশ্চিন্তা যে সমাজকে যদি বা স্পর্শ করিত তথাপি মৃদু ভাবেই স্পর্শ করিত—সেই সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁহারাই "সঙ্গীত সমাজের" প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর সেই জন্য কেবল যে বাঙ্গালার সকল স্থানের সেই সম্প্রদায়ের লোকরা চূতমুকুলগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরের মত "সমাজে" আকৃষ্ট হইতেন তাহাই নহে—বরদার গায়কবাড় মহারাজা শিয়াজি রাও, ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য, কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর প্রভৃতি সামন্ত নৃপতিরা যেমন দ্বারবঙ্গের মহারাজা রামেশ্বর সিং প্রমুখ জমীদাররাও তেমনই "সঙ্গীত সমাজে" আসিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। জনগণের উৎসাহ ও উদ্যম নিম্নস্তর হইতে উদ্গত হয়, কিন্তু শিল্প উচ্চস্তরে আরম্ভ হয়।

সমাজের সেই উচ্চস্তর অর্থে, গুণে, অবসরে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। "সঙ্গীত সমাজে" যে সেই উচ্চস্তরের প্রভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ—

(১) বরদার গায়কবাড় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদিগের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি কখন কখন কলিকাতায় আসিতেন; কারণ, কলিকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী। ভারতবর্ষ তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—ইংরেজ-শাসনাধীন আর রাজোয়াড়া অর্থাৎ সামন্ত নৃপতিদিগের রাজ্য। কিন্তু রাজোয়াড়াও গৌণ ভাবে বৃটিশ শাসনাধীন ছিল এবং সামন্ত রাজ্যের শাসকগণ ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি "রেসিডেন্টের" ভয়ে আতঙ্কিত থাকিতেন। কলিকাতা ইংরেজ সরকারের রাজধানী। গায়কবাড় এক বার কলিকাতায় আসিলে নিমন্ত্রিত হইয়া "সঙ্গীত সমাজে" অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিনেতা কলিকাতার প্রসিদ্ধ পরিবারসমূহের প্রতিনিধিরা; বেশ ও ভূষণ তাঁহাদিগের দ্বারা আনীত—বেনারসী কাপড়, কিংখাব, মকমল, মণি, মুক্তা,—কিছুই নকল বা ঝুঠা নহে; সজ্জাকার কলিকাতার প্রধান য়ুরোপীয় শিল্পী; রঙ্গমঞ্চ কুচবিহারের মহারাজার অর্থে সর্ব্বপ্রধান ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিম্মিত; দৃশ্যপট ত্রিপুরার মহারাজ প্রমুখ ব্যক্তিদিগের ব্যয়ে প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের দ্বারা অঙ্কিত। কোন দিকে ব্যয়ে কার্পণ্য ছিল না—বাহুল্যই ছিল। গায়কবাড় স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিমাণ—অর্থাৎ তাঁহার সম্ভ্রমের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন অর্থ প্রদান করিবেন। কিন্তু সাজ-সজ্জা দেখিয়া তিনি অর্থ প্রদানের কথা মনেও করিতে পারেন নাই। সমাজ যে ঘরে তাঁহাকে বসান হইয়াছিল—তাহার আস্তরণ অর্থাৎ ঘর-জোড়া চাদর বা জাজিম—নিরবচ্ছিন্ন সূচিকার্য্যসুন্দর কাশ্মীরী শাল—দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায় কর্ত্তৃক কাশ্মীরে প্রস্তুত করাইয়া নীত। ঘরের প্রাচীরসজ্জা—শতাধিক মূল্যবান জামিয়ার—বাঙ্গালার ধনীদিগের সম্পত্তি। দেখিয়া গায়কবাড় আর অর্থ-সাহায্য প্রদানের কথা মুখে আনিতে পারেন নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু সেই সম্বর্দ্ধনায় "সঙ্গীত সমাজের" বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল:

কুচবিহারের মহারাজার ও ত্রিপুরার মহারাজার সম্বর্দ্ধনায় প্রাঙ্গণের আবরণ—গাঁদা ফুলের মালায় রচিত চন্দ্রাতপ। দুই বারই স্বাগত-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

"স্বাগত নৃপেন্দ্র মহারাজ
কুচবিহার"—ইত্যাদি

আর

"রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুরপুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা।"
—ইত্যাদি

(২) অভিনেতৃগণের অন্যতম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতবাদ্যের ব্যবস্থা করিতেন রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি; ভারতবর্ষের নানা স্থানের সুরশিল্পী ও বাদকগণ "সঙ্গীত সমাজে" সম্মিলিত হইয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন; ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলাবাদক ও এসরাজী—"সমাজে" শিক্ষা দিতেন। আচার্য্য—রাধামাধব কর, একাধারে অভিনয়ে ও সঙ্গীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। অভিনয়ের জন্য নাটক-প্রহসনাদি নির্ব্বাচন যে সমিতির দ্বারা হইত, তাহার সদস্য—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। সে সমিতির সম্পাদক বর্ত্তমান-প্রবন্ধ-লেখক।

(৩) "সমাজে"র যাঁহারা পরিচালক তাঁহাদিগের অবসর যথেষ্ট ছিল এবং সেই অবসর তাঁহারা "সমাজে"র গৌরববৃদ্ধির জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেন এবং তাঁহারাই গুণের আদর করিয়া যাঁহারা অর্থের ও অবসরের প্রাচুর্য্য সম্ভোগ করিতেন না, তাঁহাদিগকে সাদরে "সমাজে" আনিতেন।

"সঙ্গীত সমাজে" অর্থের, অবসরের ও গুণের অভাব ছিল না বিবেচনা করিয়া প্রখ্যাত অভিনেতা ও সুপণ্ডিত শিশিরকুমার ভাদুড়ী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "সঙ্গীত সমাজ" যাহা করিতে পারিত, তাহা করে নাই। এই উক্তিতে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসে"র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি মনে হয়—"যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—"মুষ্টিভিক্ষা হউক; কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।" কারণ, "সঙ্গীত সমাজ" রঙ্গমঞ্চ গঠনে পুরাতন ব্যবস্থা রাখিলেও তাহাতে কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছিল এবং সাজসজ্জা, চিত্রপট, পুস্তক-নির্ব্বাচন, সঙ্গীত, অভিনয়ভঙ্গী প্রভৃতি সম্বন্ধে যে উন্নতি সাধন করিয়াছিল, তাহার প্রভাব সাধারণ রঙ্গালয়কে প্রভাবিত করিয়াছিল। বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে, "সঙ্গীত সমাজ" পেশাদারী রঙ্গালয় ছিল না—লাভের প্ররোচনা তাহার উন্নতি বিধানে কার্য্যকরী হয় নাই; নারীর অংশ পুরুষের দ্বারা অভিনীত হইত; 'সমাজের' অভিনয়াদির উৎকর্ষ সাধনজন্য অখণ্ড মনোযোগ প্রদানের কেহ ছিলেন না। এ কথা অতি সত্য—"What is not thy trade, make not thy business."—যাহা ব্যবসা নহে, তাহা সখের এবং যাহা সখের তাহাতে মনোযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না—হইতে পারে না।" "সঙ্গীত সমাজের" প্রতিষ্ঠাতারা কতকটা চিত্তবিনোদনের ও অবসরযাপনের জন্য এবং কতকটা আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠানটি গঠিত করিয়াছিলেন। যাহা আপনার চিত্তবিনোদনের জন্য আরম্ভ হয়, তাহাই অপরের প্রশংসা লাভের চেষ্টার কারণ হয়। কোন চিত্রকর আপনার অঙ্কিত চিত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া, কোন ভাস্কর আপনার নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে বেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে থাকিতে পারেন না; শিল্পী মাত্রেরই মনে অপরের প্রশংসা অর্জ্জনের স্পৃহা থাকে। "সঙ্গীত সমাজে"র নাটকাদি অভিনয়ে সেই প্রেরণা যে ছিল না, এমন নহে।

"সঙ্গীত সমাজের" আর একটি দিক—আর একটি উপযোগিতা 'সংস্কৃতি-কেন্দ্র রচনা।' সেই উদ্দেশ্যে লইয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দিন প্রাতে ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লইয়া ১০৭ নম্বর শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে রাধামাধব করের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই গৃহ ডক্টর দুর্গাদাস করের ছিল—তাঁহার পুত্ররা উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা পাইয়াছিলেন। রাধামাধব ভ্রাতৃগণের মধ্যে মধ্যম। তিনি অভিনেতা, গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে যশস্বী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার অগ্রজ রাধাগোবিন্দ কর যৌবনেই রঙ্গালয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের গৃহ বাঙ্গালা সাধারণ রঙ্গালয়ের সূতিকাগার না হইলেও তাহার শিশুশয্যা বলা যায়। অমৃতলাল বসু লিখিয়াছিলেন, যৌবনে

"বসি কর-ঘরে
লিখেছি 'হীরকচূর্ণ' আনন্দ অন্তরে।
যোগী লেখে, মাধি লেখে, ব'লে যায় কবি,
কথা না যুয়ায় যবে সুর ঢালে গোবি।"

এই "যোগী"—যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (ওভারসিয়ার), "মাধি"—রাধামাধব কর ও "গোবি" রাধাগোবিন্দ কর। "হীরকচূর্ণ" নাটক সমসাময়িক ঘটনা—বরদার গায়কবাড় মালহররাও কর্তৃক হীরকচূর্ণ পানীয়ে মিশাইয়া রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা—অবলম্বন করিয়া রচিত নাটক।

রাধামাধব করের সহিত ঠাকুর-পরিবারের পরিচয়ের সূত্র তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা রাধারমণ কর। ইনি ইংরেজী উপন্যাস, 'ইষ্ট লীন' অবলম্বন করিয়া 'সরোজ' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। যখন রাধামাধবের বন্ধু কেদারনাথ চৌধুরী 'এমারেল্ড' থিয়েটার পরিচালিত করিতেছিলেন, তখন তিনি রাধারমণের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের "বৌঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাস নাটকে পরিণত করেন; নাম হয়—"বসন্ত রায়"। নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করেন—রাধামাধব। রাধারমণের ব্যবস্থায় দর্পণের সাহায্যে বসন্ত রায়ের ছিন্নমুণ্ড

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
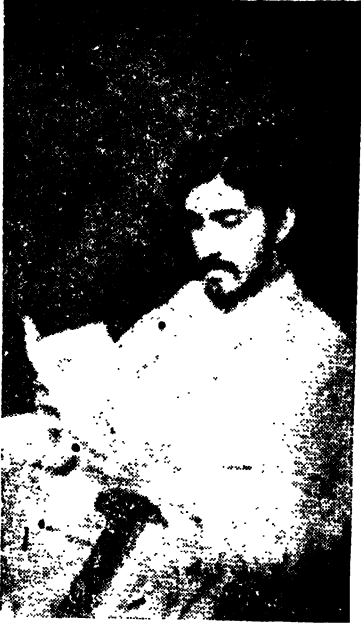
দেখান হয়। বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে সেরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে কখন দেখান হয় নাই। "বৌঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাসে নাটকীয় বস্তুর অভাব কেদার বাবুর রচনা-নৈপুণ্যে পূর্ণ হইয়াছিল এবং পূর্ণ হইয়াছিল রাধামাধবের অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তিনি বসন্ত রায়ের যে চরিত্র কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই, রাধামাধব বাবু অভিনয়ে তাহাই মূর্ত্ত করিয়াছিলেন। রাধামাধব বাবুর দ্বারা গীত হইয়া নাটকের গানগুলি চারি দিকে পরিচিত হইয়াছিল—গিরিশচন্দ্র ঘোষের "চৈতন্যলীলার" গানের মত বা অতুলচন্দ্র মিত্রের—

"আর ত ব্রজে যা'ব না, ভাই, যেতে
প্রাণ আর নাহি চায় ;
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে
তাই এসেছি মথুরায়।"

গানের মত "বৌঠাকুরাণীর হাটে"র গান লোকপ্রিয় হইয়াছিল—পল্লীগ্রামেও গীত হইত।

কর-পরিবারের সহিত ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতার আর এক কারণ ছিল। রাধামাধব বাবুর পত্নী মোক্ষদাসুন্দরীর প্রায় সমবয়সী এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর (প্রেমময়ী) কাশীশ্বর মিত্রের পুত্র শ্রীনাথের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। কাশীশ্বর বাবুর সহিত আদি ব্রাহ্ম সমাজের এবং সেই জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখন মহিলাদিগের মধ্যে "সম্বন্ধ পাতান" প্রচলিত ছিল ; পূর্ব্বের "গঙ্গাজল" "সই" "সাগর" প্রভৃতির স্থানে নূতন নূতন নাম হইতেছিল। মোক্ষদাসুন্দরীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত স্বর্ণকুমারী দেবীর "বকুলফুল" পাতান ছিল এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর গৃহে পরিচয়ফলে মোক্ষদাসুন্দরীর সহিত বলেন্দ্রনাথের মাতা প্রফুল্লময়ীর "মিলন" পাতান ছিল। ঠাকুর-পরিবারের ও কর-পরিবারের মহিলারা পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করিতেন ; ঠাকুর-পরিবারের মহিলারা কর-গৃহে আসিলে রাধামাধব বাবুর গান শুনিতেন। বলেন্দ্রনাথকে মোক্ষদাসুন্দরী স্নেহ করিতেন এবং সেই স্নেহের সুযোগ লইয়া রাধামাধব বাবুকে "সঙ্গীত সমাজে" আচার্য্য ("নাট্যাচার্য্য") করিবার জন্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

রাধামাধব আগন্তুকদিগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই ; কিন্তু কখন "সঙ্গীত সমাজে" অভিনয় করেন নাই—অভিনেতাদিগকে যেমন গায়কদিগকে তেমনই শিক্ষা দিতেন। যাঁহারা অভিনয় করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। "মেঘনাদ বধের" অভিনেতা ছিলেন—

রাম—চারুচন্দ্র মিত্র
বিভীষণ—রায় পশুপতিনাথ বসু
হনুমান—ভূতনাথ মিত্র
মেঘনাদ—নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী
রাবণ—নিবারণচন্দ্র দত্ত
লক্ষ্মণ—মন্মথনাথ মিত্র
মহাদেব—অটলবিহারী সেন
ইন্দ্র—নগেন্দ্রনাথ মল্লিক
দূত—জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পশুপতিনাথ বসু—বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসু-পরিবারের। এই বসুদিগের গৃহের বিরাট প্রাঙ্গণে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে রাখিবন্ধন

স্বর্ণকুমারী দেবী

অনুষ্ঠানে জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিবারণচন্দ্র দত্ত—চোরবাগানের দত্ত পরিবারের, স্বয়ং প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতৃব্যপুত্র। মন্মথনাথ মিত্র রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র। নগেন্দ্রনাথ মল্লিক পটলডাঙ্গার বসু-মল্লিক পরিবারের। জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গার জমীদার—যে কয় জন বাঙ্গালী হস্তীর পৃষ্ঠে না উঠিয়া বা মাচায় না বসিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিতেন, জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। সে-বিষয়ে তাঁহার সহিত নাম করিতে হয়—নলডাঙ্গার রাজা প্রমথনাথ দেব রায়ের ও মুক্তাগাছার মহারাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর। জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবু অসাধারণ বলশালী ছিলেন। রাবণের সভায় বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ বহন করিয়া দূত আসিয়া যখন সে সংবাদ দিয়া বলিল :—

"কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপুপ্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"—

তখন বক্ষে রক্ষিত পতাকা ফেলিয়া দিয়া—ক্ষতচিহ্ন দেখাইয়া পৃষ্ঠ দেখাইবার জন্য তিনি যখন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সেই গৌরবর্ণ ব্যায়ামবীরের পেশী দেখিয়া অনেকেরই বিখ্যাত য়ুরোপীয় ব্যায়ামবীর স্যাণ্ডোর কথা মনে পড়িয়াছিল।

তেমনই যখন নৃমুণ্ডমালিনী দাসীর নিকট প্রমীলার বক্তব্য শুনিয়া রামচন্দ্র (চারুচন্দ্র মিত্র)

"শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে!
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজকুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব কর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সঙ্গী তাঁর যত।
কহ তাঁরে, শতমুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।"

বলিয়া যখন ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন দর্শকদিগের প্রশংসাব্যঞ্জক করতালিতে সমগ্র গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নাটকের শেষ অঙ্কে যখন রক্ষোরাজরূপী (নিবারণচন্দ্র দত্ত) বলিয়াছিলেন—

"হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

তখন দর্শকদিগের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়াছিল।

সত্যই মনে হইত—

"The actor does not leave the stage alone. We, too, are going into retirement The illusion that was once a rapture has become a memory."

রাধামাধব কর

"মেঘনাদ বধ" নাটকাকারে "সঙ্গীত সমাজে" অভিনীত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন আরও কয়খানি নাটক অভিনীত হয়। সে কথা পরে বলিব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হইয়া যখন "সঙ্গীত সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন তাহার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে স্থান লওয়া হইল। সে গৃহ আজ আর নাই। কিন্তু তাহার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী সমাজের কত স্মৃতিই বিজড়িত! কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার সমসাময়িক শিষ্ট সমাজে অন্যতম নেতা ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বিপুল অর্থ তিনি যেমন বিলাসে তেমনই কল্যাণকর-কার্য্যে অকাতরে ব্যয় করিয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পরলোকগত হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকের (মাইকেল মধুসূদন দত্তকৃত) ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় যখন পাদ্রী লং আদালতে অভিযুক্ত হ'ন, তখন—বিচারকালে—কালীপ্রসন্ন আদালতে উপস্থিত ছিলেন—লং-এর অর্থদণ্ডের টাকা তিনি তখনই দেন। কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনার এক দিকে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ—আর এক দিকে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা।" কালীপ্রসন্নের মহাভারতের অনুবাদ অতুলনীয়। আবার তাঁহার "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—"তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়, তুবড়ি ছুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়।" আবার তিনি ভণ্ড ব্রাহ্মণের টিকি কাটিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের গৃহে "সঙ্গীত সমাজ" সংস্থাপনের যে বিশেষ সার্থকতা ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "সঙ্গীত সমাজের" জন্য "পুনর্বসন্ত," "ধ্যানভঙ্গ"

প্রভৃতি গীতবহুল নাটিকা রচনা করিতে থাকেন। ভারতীয় গীতবাদ্যের অনুশীলন করা "সমাজে"র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে সম্বন্ধে একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। তখন কোন কোন অবাঙ্গালী বাঙ্গালী সমাজে মিশিতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন—বাবু রূপমল গোয়েঙ্কা বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন ও বহু বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; পণ্ডিত সুন্দরলাল মিশ্র কংগ্রেসে ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহচর ছিলেন ; বাবু তনুসুলাল মাড়বারী "সঙ্গীত সমাজে" ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। এই তনুসুলাল প্রায়ই বলিতেন, "সমাজ" এস্থেটিক্সের মাধ্যমে যে কাজ করিতেছিল, তাহাই প্রধান কাজ। তিনি aesthetics অর্থাৎ সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্যবোধ ঠিক বুঝিতেন কি না বলা যায় না, কিন্তু কথাটি তিনি এমন গম্ভীর ভাবে বলিতেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে, তাহা যেন অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইত।

ভারতীয় সঙ্গীতের পবিত্রতা রক্ষা ও উন্নতিসাধনকল্পে নানা স্থানের প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করিয়া "সঙ্গীত সমাজে" আনয়ন করা হইত। অভিনয় হইত। আর "সঙ্গীত সমাজ" ক্রমে কলিকাতার শিষ্ট সমাজের মিলন-স্থান ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র হইয়া উঠিতে থাকে। কারণ, বাঙ্গালায় সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল এবং তাহার অভাবও অনুভূত হইতেছিল। য়ুরোপে ক্লাব যেরূপ প্রতিষ্ঠান সেরূপ প্রতিষ্ঠান এ দেশে ছিল না—তবে অনেক ধনীর বৈঠকখানা কতকটা মিলন-কেন্দ্র ছিল। সে স্বতন্ত্র শ্রেণীর—তাহাতে সমাজের এক সম্প্রদায়স্থদিগেরও মিলন—ভাবের আদান-প্রদান হইত না। কলিকাতায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য ক্লাব—"ইণ্ডিয়া ক্লাব"। তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক—কচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর। এই "ইণ্ডিয়া ক্লাব" কিছু দিন বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উকীল, এটর্ণী, ব্যবসায়ী, চাকরীয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কোন কোন লোকের মিলন-কেন্দ্র ছিল বটে, কিন্তু কর্ণওয়ালিসের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" ফলে বাঙ্গালায় যে জমীদার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করিলে যদিও দেখা যায়, এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য চাকরীতে ও ব্যবসায়ে অর্থশালীদিগের জমীদারী লাভ বা ক্রয়, তথাপি এই সম্প্রদায়ের অনেকের মনে অকারণ "আভিজাত্য-গৌরব" ছিল ; কেবল অনেকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যে যেমন, রাজপথ নির্ম্মাণে ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে তেমনই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় আপনারা স্বতন্ত্র ছিলেন—কিন্তু সামাজিক কার্য্যাদি ব্যতীত পরস্পরের সহিত মিলিতও হইতেন না—যে যাহার পরিজন, আশ্রিত-অনুগত, আমোদ প্রভৃতি লইয়া থাকিতেন। কেহ কেহ রাজনীতিচর্চ্চাও করিতেন। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জনগণের নহে মনে করিয়াই পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" বা ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)।

ভূমিসম্পত্তির অধিকারী বাঙ্গালীরা যেমন ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের অক্ষম অনুকরণে এক অভিজাত সম্প্রদায় রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমনই যে দল ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের এক প্রান্তে ছিলেন, তাঁহারা "ইণ্ডিয়া ক্লাবে" মিলিত হইতেন। শুনিয়াছি, কলিকাতার কোন জমীদার (ইঁহার পিতামহ ক্লাইবের খাস দপ্তরে চাকরী করিতেন) আপনার বাতব্যাধির উল্লেখে বলিয়াছিলেন—"লর্ডলি (Lordly) কনষ্টিটিউশনে" উহা হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"পাতুরেঘাটায় রাজাগীজারি
যার মহারাজ নাম—
মুন্সিয়ানা জেঁকে গেছে ছ্যাতলাধরা
থাম।"

তিনিও "কাশল" নির্ম্মাণের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এই জাতিভেদের দেশে সম্প্রদায়ভেদের উদ্ভব অতি সহজেই হ —অন্ততঃ হইত।

"ইণ্ডিয়া ক্লাব" কিন্তু "জমে" নাই—কারণ ক্লাব জিনিষ বাঙ্গালীর ধাতুসহ ছিল না—বিদেশী আমদানী, তখনও দেশের জমীতে শিকড় গাড়ে নাই। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণাদির জন্য কেহ কেহ তথা সমবেত হইতেন ; কিন্তু মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল।

"সঙ্গীত সমাজ" কিন্তু "জমিয়াছিল"—খানাপিনার জন্য নহে—তাহার সদস্য হওয়া "আভিজাত্যের" লক্ষণ বলিয়া বিবেচি হওয়ায়। "সমাজে"—জমীদাররা ছিলেন ; কয়জনের না "মেঘনাদ বধের" অভিনয় সম্পর্কে বলিয়াছি। আরও ছিলেন—পাইকপাড়ার সতীশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীশচন্দ্র সিংহ, শ্যামবাজারে বিপিনবিহারী মিত্র এবং প্রমথনাথ মিত্র ("বলীবাবু") চন্দ্রনাথ মিত্র ("চুনীবাবু"), সরলচাঁদ মিত্র, পাথুরিয়াঘাটা রমানাথ ঘোষ, চুনিয়ালাল শীল, ঝামাপুকুরের নরেন্দ্রনাথ সি

মোক্ষদাসুন্দরী কর

প্রভৃতি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় "সঙ্গীত সমাজে" সমবেত হইতেন। উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি উৎসবের দিন আসিয়া উপস্থিত হইতেন। মহারাজা গিরিজানাথ রায়, মুক্তাগাছার ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি সময় সময় তথায় যাইতেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর বাবু সঙ্গীতানুরাগী ও সুরজ্ঞ ছিলেন।

অভিনয়ের আয়োজনে রাধামাধব করের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার অভিনয়-খ্যাতি "বসন্ত রায়" অভিনয়ের পূর্ব্বে "আনন্দমঠে" ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। "আনন্দমঠ" অভিনয়ে তিনি সত্যানন্দের অংশ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার "হরে মুরারে! হরে মুরারে!"—উচ্চারণে রঙ্গালয় মুখরিত হইয়া উঠিত।

"সঙ্গীত সমাজের" সদস্যগণ রাধামাধব বাবুকে একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত গড়গড়া উপহার দিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা গুণে গুণী ছিলেন এবং স্বভাবতঃ বিনয়ী ছিলেন। যখন নাটক-প্রণেতৃরূপে তাঁহার বিশেষ আদর হইয়াছে এবং তাঁহার রচিত নাটক বাঙ্গালীর রঙ্গালয়ে সাগ্রহে অভিনীত হইতেছে, তখন তিনি কেন নাটক রচনা ত্যাগ করিলেন—অমৃতলাল বসু তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক রচনা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার আর সে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা নিষ্প্রয়োজন। তাহার পরে তিনি বাঙ্গালী পাঠকদিগের জন্য সংস্কৃত বহু নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু "সমাজের" সম্পাদকপদে অমূল্যপ্রসাদ ঘোষকে মনোনীত করেন। তিনি তখন একটি বড় য়ুরোপীয় সওদাগরী অফিসে উচ্চ পদে অবস্থিত ছিলেন।

ইংরেজ কবি বায়রণ, ওয়াটারলুর যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রির বর্ণনায় বলিয়াছেন—"Belgium's capital had gathered then"—তেমনই প্রতি সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় কালীপ্রসন্ন সিংহের বহুস্মৃতিবিজড়িত গৃহে কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি "সঙ্গীত সমাজে" সমবেত হইতেন। তখনও মোটর-গাড়ী হয় নাই। মনে আছে, যখন য়ুরোপে প্রথম মোটর-গাড়ীর চলন হয়, তখন "সঙ্গীত সমাজে" আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সম্বর্দ্ধনায় কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মোটর-গাড়ী নিরাপদ হইবে ত? প্রতি সন্ধ্যায় সিংহ মহাশয়ের গৃহের সম্মুখস্থ রাজপথ নানা অশ্বযুক্ত যানে শোভা পাইত। বড় বড় যুড়ী—ভাল ভাল ঘোড়া—নানারূপ যানে যুক্ত থাকিত—কোচম্যান ও সহিসদিগের বেশে অধিকারীর সম্ভ্রম প্রকাশ পাইত। রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত সম্মিলন চলিত। সমাগতদিগের মধ্যে পাইকপাড়ার সতীশচন্দ্র সিংহের অভ্যাস ছিল, তিনি "সমাজ" হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সমুচ্চ গাড়ীতে (ল্যাণ্ডো) গঙ্গার কূলে স্নিগ্ধ বায়ু সম্ভোগ করিতে যাইতেন—রাত্রি বারটা বাজিলে বলিতেন, "যাই। জ্যেঠাইমা ব'সে আছেন।" তাঁহার এই উক্তিতে সঙ্গী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একদিন বলিয়াছিলেন,—"বুড়ী জ্যেঠাইমা ছেলেকে না খাইয়ে শুতে যা'ন না—ছেলের কি দয়া! বড় বড় সব কুটাই ত বেজে গেল—এখন একটা, দু'টা—সব ছোট ছোট। এখন যা'বার কথা মনে হল!" সতীশচন্দ্র সে কথা পরদিন হাসিতে হাসিতে "সমাজে" বলিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র অভিনয় করিতেন না—প্রম্প্ট করিতেন, সিংহ মহাশয়ের গৃহে কালীপ্রসন্নের পুত্র বিজয়চন্দ্র ("মাখম বাবু") স্বাভাবিক বিনয়স্নিগ্ধ ব্যবহারে সকলকে প্রীত করিতেন। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন।

"সঙ্গীত সমাজ" দিনের পর দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল—কেবল সঙ্গীতে নহে, বাঙ্গালার সংস্কৃতিতে আপনার প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল। নানারূপে সমাজে সৌন্দর্য্যরসের অনুভববোধ আনিতে লাগিল।

এই সময় হেমচন্দ্র বসু-মল্লিক সক্রিয়ভাবে "সমাজে" যোগ দিলেন। হেমচন্দ্র তখন বাঙ্গালার শিষ্ট সমাজের অন্যতম নেতা। কিন্তু—"he could not bear a brother near his throne" তিনি যে স্থানে যাইতেন সেই স্থানের কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং অপরের কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিতেন না। বিজ্ঞের উপদেশ—

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ
মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

তিনি সে উপদেশ গ্রাহ্য করিতেন না; পরন্তু সত্য যে স্থানে অপ্রিয় তথায় অপ্রিয় সত্যের প্রয়োগে অকারণ আনন্দভোগ করিতেন। হেমচন্দ্র "সমাজে" আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে নানা উন্নতিকর পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন—সে সকলের ব্যয়বাহুল্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন না। অমূল্য বাবু তাঁহার কুটুম্ব—পিতৃব্য শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের জামাতা। কিন্তু অমূল্য বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের মতান্তর হইতে লাগিল। অমূল্য বাবু পদত্যাগ করিলেন। হেমচন্দ্রের ব্যবস্থায় "সঙ্গীত সমাজ" কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে (১৩নং বাড়ী) নীত হইল। "সমাজে" যেন—"খুলিল নূতন অঙ্কে দৃশ্য অভিনব"। ও দিকে অমূল্য বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে "সঙ্গীত সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়া—অর্থাৎ "ভাঙ্গা দল" গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা অল্প দিনেই ব্যর্থ হইয়া গেল।

শৈশবে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মাত্র ন'বছর বয়সে যেমন সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের তর্জ্জমা ক'রেছিলেন, তেমনি লর্ড মেকলে সাত বছরের বেলায় পৃথিবীর ইতিহাস লিখেছিলেন; জন রাশ্‌কিন্ সাত বছরের সময়ে প্রথম কবিতা লিখেছিলেন এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিল ছ' বছরে জেনোফন্, হেরোডেটাস্ এবং প্লেটোর গ্রন্থ পাঠ ক'রেছিলেন।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

শার্ঙ্গ—শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনুক, শৃঙ্গময়।
শার্দ্দুল—ব্যাঘ্র, বাঘ, দ্বীপিন্।
শাল—বৃক্ষবিশেষ, শূল, শিল্পাগার, পশমী আলোয়ান।
শালা—গৃহ, আগার, ঘর, শ্যালক।
শালাজ—শ্যালক-পত্নী, শ্যালকের স্ত্রী।
শালি—হৈমন্তিক ধান্যবিশেষ।
শালূক—পদ্ম প্রভৃতির মূল, গন্ধহীন পুষ্পবিশেষ।
শালতী—শালবৃক্ষ-নির্ম্মিত ডোঙ্গা।
শাল্মলী—শিমুল বৃক্ষ, সাঁদার বৃক্ষ।
শাশুড়ী—শ্বশ্রূ, পতির বা পত্নীর মাতা।
শাশ্বত—নিত্য, সদা, সর্ব্বদা, নিরন্তর।
শাসক—শাস্তা, শাসনকর্ত্তা, দণ্ডদায়ক, নিগ্রহকারী।
শাসন—দমন, নিগ্রহ, শাস্তি, দণ্ড, ধমকান, তাড়না, ভয়প্রদর্শন।
শাসনীয়—শাস্য, দমনীয়, দণ্ডনীয়, শাসনযোগ্য, দণ্ডার্হ।
শাসিত—বশীভূত, দমিত, দণ্ডিত।
শাস্তি—নিগ্রহ, দণ্ড, প্রতিফলদান।
শাস্ত্র—পুস্তক, গ্রন্থ, বেদস্মৃত্যাদিবিধান।
শাস্ত্রবহির্মুখ—শাস্ত্রীয় বিধান-লঙ্ঘক।
শাস্ত্রমত—শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ, শাস্ত্রানুসারী।
শাস্ত্রীয়—শাস্ত্রসম্বন্ধীয়, শাস্ত্রসিদ্ধ।
শিঁথী—সীমন্তভূষণ, মাল্য, মুকুট।
শিকড়—বৃক্ষাদির মূল, জড়, গোড়া।
শিকল—শৃঙ্খল, নিগড়, বন্ধন, বেড়ি।
শিকা—শিক্য, বাঁকের রজ্জু, ফিঙ্গা।
শিক্ষক—অধ্যাপক, আচার্য্য, শিক্ষাগুরু।
শিক্ষা—অধ্যাপনা, বেদাঙ্গবিশেষ।
শিক্ষান—অধ্যাপন, পড়ান, শাসন।
শিক্ষিত—অধ্যাপিত, অভ্যস্ত, নিপুণ।
শিখণ্ডী—ময়ূর, ভুজঙ্গভুক্, শিখী।
শিখন—শিক্ষা করণ, অভ্যাস করণ।
শিখর—পর্ব্বতশৃঙ্গ, কূট, বৃক্ষাগ্র, শীর্ষভাগ।
শিখা—অগ্নির অগ্রভাগ, শিষ, টিকী।
শিখাবান—শিখাবিশিষ্ট, শিখী, অগ্নি।
শিখী—চূড়াবিশিষ্ট, কেতু, ময়ূর, অগ্নি।
শিগ্রু—শজিনা বৃক্ষ বা মূল।
শিঙ—শৃঙ্গ, বিষাণ, পর্ব্বতাগ্র।
শিঙ্গা—রক্ত মোক্ষণের যন্ত্রবিশেষ।
শিঙ্গেল—বিষাণযুক্ত, শৃঙ্গবিশিষ্ট।
শিঞ্জন—অলঙ্কারের ধ্বনি, ঝঞ্জন।
শিটা—শিটী, মলা, গাদ, কাইট্, খাদ।

শিড় শিড়—শড় শড়, শিহরা, লোমাঞ্চ।
শিথান—বালিশ, উপাধান, উচ্ছীর্ষক।
শিথিল—ঢীলা, লোলিত, শ্লথ, অলস।
শিব—মহাদেব, মঙ্গল, কল্যাণ, শুভ।
শিবরাত্রি—মাঘী কৃষ্ণার চতুর্দ্দশী।
শিবা—শিবের পত্নী, শিবানী, শৃগাল, শিয়াল, ফেরু, জম্বুক।
শিবালয়—শিবমন্দির, শ্মশান।
শিবিকা—পাল্কী, গোপ্য যান।
শিবির—ছাউনী, সৈন্যের আবাস।
শিম—শিম্বা, শিম্বী, ছিমড়া, শুঁটী।
শিয়র—শয়িত ব্যক্তির মস্তকদিক।
শির—শিরা, ধমনী, রক্তগমনের পথ, নাড়ী, রক্তধমনাড়ী।
শিরঃ—মস্তক, মাথা, উত্তমাঙ্গ, শীর্ষ।
শিরনামা—পত্রের উপরি লিখিত নাম।
শিরস্ত্র—পাগড়ী, মস্তকাবরণ, উষ্ণীষ।
শিরোধার্য্য—মস্তকে ধারণীয়, মান্য।
শিরোমণি—চূড়ামণি, মস্তকভূষণ।
শিরোরুহ—কেশ, কুন্তল, কচ, মস্তকজ।
শিরোলুণ্ঠন—মরণকালীন, মস্তক লুণ্ঠন।
শিলা—পাথর, প্রস্তর, পাষাণ, গোবরাট।
শিলাপুত্র—লোড়া, পেষণী, ডলনা।
শিলাবৃষ্টি—বর্ষোপল, করকাপাত।
শিলীপদ—গোদ, পদস্ফীতি।
শিলোচ্চয়—পর্ব্বত, গিরি, অদ্রি, নগ।
শিলোঞ্ছ—বহুব্যবসায়ী, নানাকর্ম্মকারী।
শিল্প—চিত্রকর্ম্মাদি, ব্যবসায়সমূহ।
শিল্পকর—শিল্পী, কারিকর, কারু, শিল্পকর্ম্মজ্ঞ।
শিশির—হিম, মাঘ-ফাল্গুন, নীহার।
শিশু—বালক, অর্ভক, অপোগণ্ড।
শিশুক—শিশুমার, শুশুক, উদ্রমৎস্য।
শিশুতা—শৈশব, বাল্যাবস্থা, বাল্য।
শিষ—মঞ্জরী, শুঙ্গা, শূয়া, অগ্নিশিখা।
শিষ্ট—নম্র, শাসিত, সাধু-ব্যবহারান্বিত।
শিষ্টতা—সভ্যতা, ভদ্রতা, ভব্যতা, নম্রতা, শিষ্টাচার, সা ব্যবহার, বিনয়।
শিষ্য—ছাত্র, পড়ুয়া, মন্ত্রগ্রহীতা, বিদ্যার্থী।
শিহরণ—রোমহর্ষ, লোমাঞ্চ, লোমোদ্গম।
শীঘ্র—সত্বর, দ্রুত, বেগবান, ত্বরিত।
শীত—হিম, স্নিগ্ধ, জড়, তুষার।
শীতকাল—হেমন্ত, অগ্রহায়ণ-পৌষ।
শীতভী—শীতবস্ত্র, পাছুড়ী প্রভৃতি।
শীতভীরু—শীতভীত, হিমশঙ্কিত।
শীতল—স্নিগ্ধ, হিমকর, হিমবান।
শীতলতা—স্নিগ্ধতা, হিমতা, শৈত্য।
শীতলপাটী—বৃক্ষত্বক্‌নির্ম্মিত পট।
শীতলা—রক্তবটী, বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী।

[ক্রমশঃ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছিয়ানব্বই

ঢং করে ঘণ্টা বাজল। ঢং শব্দটা হল সাকার ভাব। তারপর ঢং-এর অংটি থেকে গেল অনেক-ক্ষণ। ঐ অং-টি হল নিরাকার।

ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন ঠাকুর।

'নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। বাণ শিখতে হলে আগে কলাগাছ তাক করতে হয়, তারপর শরগাছ, তারপর সলতে। তারপর উড়ে যাচ্ছে যে পাখি।'

এক সন্নেসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছে। গিয়ে সন্দেহ হয়েছে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতের দণ্ড ঠেকিয়ে দেখতে গেল তাঁর গায়ে লাগে কিনা। একবার দেখল লাগল, আবার দেখল লাগল না। একবার দেখল মূর্তি, আবার দেখল অমূর্তি। ঘট আর আকাশ। ঢং আর অং। সন্নেসী বুঝল ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার।

কাঠ-মাটি মনে কোরো না সাকার মূর্তিকে। শোলার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে যেমন বাপকে মনে পড়ে; তেমনি। প্রতিমায় সত্যের উদ্দীপনা। রূপের মধ্যেই অরূপরতন।

ভক্তির জন্যে সাকার, মুক্তির জন্যে নিরাকার। মুক্তি দিলেই নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, ঈশ্বরকে ফিরতে হয় না সঙ্গে-সঙ্গে। ভক্তি দেওয়াই কঠিন, ছুটি পায় না ভগবান, লেগে থাকতে হয় সব সময়। তাই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে, ভক্তি দিতে কাতর হই।

এমনি কত কথা বলে যাচ্ছেন ঠাকুর। প্রিয়তন্ময়ের মত শুনছে কেশব সেন।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে- বেঁধে যা ইচ্ছে তাই করো। আনন্দময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেথা ইচ্ছে সেথা যাও।

'দেখনি ময়রার দোকানে ছানা-চিনি মিশিয়ে একটা ঠাশা তৈরি করে। পরে তা থেকেই তৈরি হয় গোল্লা আর বরফি, তালশাঁস আর আতা-সন্দেশ। ছানা-চিনির রূপান্তরে যেমন নানান রকম সন্দেশ তেমনি ভাব-ভক্তির রূপান্তরে নানান রকম বিগ্রহ—শিব দুর্গা কৃষ্ণ বিষ্ণু। পলতা থেকে কলকাতাতে যে জল আসে রাস্তায় আর বাড়িতে, তা একই জল, কিন্তু সে কলের জল কোথাও পড়ছে সিংহের মুখ দিয়ে কোথাও বা মানুষের মুখ দিয়ে। নানা রূপে ঈশ্বরই খেলা করছেন।

যাই বলো, দল চাই নে, চাই উদারবুদ্ধি। গেড়ে ডোবাতেই দাম বাঁধে, যেমন হিঞ্চে-কলমির দল। স্রোতের জলে দল বাঁধে না: গোঁড়ামিতেই দল পাকায়, উদারবুদ্ধির দল নেই।

এত কথা বলছেন, একবারও জিগগেস করছেন না, কেশব তুমি কেমন আছ? কেবল ঈশ্বরের কথা।

'নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনো জিগগেস করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি?'

প্রতিমায় পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে হবে না? তিনিই তো মানুষ হয়ে লীলা করছেন। 'জীবে-জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তাঁর নিত্য লীলা চমৎকার।'

তাঁকে সর্বভূতে দেখতে লাগলুম। বেলপাতা তুলতে গেলুম সে দিন। পাতা ছিঁড়তে গিয়ে খানিকটা আঁস উঠে এল। দেখলুম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হল। ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হল না।

হাসিমুখে তাকালেন কেশবের দিকে। বললেন, 'তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে।'

উৎসুক হয়ে তাকালো কেশব।

'শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গিয়েছে কিনা তাই এই অবস্থা। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেক দিন পর শরীরে এসে আঘাত লাগে। দেখনি সেই গঙ্গার উপরে বড় জাহাজ? বড় জাহাজ যখন গঙ্গা দিয়ে চলে যায়, তখন প্রথম কিছু টের পাওয়া যায় না। শেষে, ও মা, চেয়ে দেখি, পাড়ের গায়ে জল ধপাস ধপাস করছে, আর পাড়ের খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল। কুঁড়ে-ঘরে হাতি ঢুকলেও এমনিই হয়। কুঁড়ে-ঘরে হাতি ঢুকলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙে-চুরে দেয়। তেমনি ভাব-হস্তী তোমার দেহঘরে প্রবেশ করেছে। তোলপাড় করে ভেঙে দেবে না তো কি!'

কেশব চক্ষু নত করল।

'হয় কি জানো? আগুন লাগলে কতগুলো জিনিস পুড়িয়ে-টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হৈ-হৈ কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথম কাম-ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে, পরে অহং-বুদ্ধির উৎখাত হয়। তারপর তোলপাড়!' ঠাকুর থামলেন একটু। বললেন, 'তুমি মনে করছ, সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না হাঁসপাতালে যদি একবার নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নেই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ছেড়ে দেবে না ডাক্তার সাহেব। তুমি নাম লেখালে কেন?'

কেশব হাসতে লাগল। হাঁসপাতালের উপমাটি বড় ভালো লেগেছে।

কত রুগী হাঁসপাতালে ঢোকে এসে জাঁক করে। কিন্তু যখন দেখে ইন-চার্জ ডাক্তার কিছুতে ছাড়ে না তখন একদিন ফাঁক বুঝে চম্পট দেয়। কেউ বা আবার চাদর-বালিশ নিয়ে সরে পড়ে। কোথায় রোগ সারাবে তা নয় চুরি করে। ধর্মপথে এসে আবার জাহান্নমে যায়।

'তখন আমার দারুণ অসুখ। মাথায় যেন দুলাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নেই। নাটাগড়ের রাম কবরেজ দেখতে এল। সে এসে দেখে আমি বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, এ কি পাগল! দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে!'

যে খানদানি চাষা, সে চাষ করবেই চায়, হাজা-শুকো মানে না। আর কিছু জানে না সে চাষ ছাড়া। তেমনি জীবনের দৈন্য-দুর্ভিক্ষেও হরিনাম ছাড়ে না। মা যদি সন্তানকে মারে, সন্তান মা-মা বলেই কাঁদে। গলা ধরে যদি ফেলেও দেয় তবুও তার মা-মা ডাক। সে তো আর যাকে-তাকে মা বলছে না, তার মাকেই মা বলছে।

তাই ছন্দে একটি মন্ত্র বাঁধলেন ঠাকুর। 'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

দুঃখ তো শরীরের ব্যাপার, আর মন, তুমি তো আনন্দের মৌচাক। দুঃখের হুলেই এই মধুকণা সঞ্চিত হচ্ছে। সারা জীবনই তো দুঃখ—রোগ-শোক জ্বালা-যন্ত্রণা। যারা বলে আগে দুঃখ-দারিদ্র্য যাক, পরে ঈশ্বরভজন করা যাবে, তারা সেই সমুদ্রস্নানার্থী তীর্থবাসীর মত। ভাবছে, সমুদ্রের ঢেউ আগে থামুক, পরে স্নান করে নেব। হায়, সমুদ্রের ঢেউ কোনদিন থামবে না, স্নানও হবে না সেই তীর্থঙ্করের। ঢেউয়ের মধ্যেই স্নান করে নিতে হবে। দুঃখের মধ্যেই নিতে হবে সেই আনন্দস্পর্শ। এ তো দুঃখের ঢেউ নয় এ হচ্ছে সুখস্বপ্নসরসীর ঢেউ।

মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়, যেদিন হরিকথামৃতপান হয় না সেদিনই দুর্দিন।

'তোমার শেকড়শুদ্ধু তুলে দিচ্ছে।' কেশবের দিকে আবার তাকালেন ঠাকুর। 'শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শেকড়শুদ্ধু তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভালো করে গজাবে। তাই এই হুলুস্থুল।'

কেশবের মা দাঁড়ালেন এসে দরজার পাশে।

'মা আপনাকে প্রণাম করছেন।'

আনন্দে হাসলেন ঠাকুর।

'মা বলছেন কেশবের অসুখটি যাতে সারে—কে একজন বললে মায়ের হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো। তিনিই দুঃখ দূর করবেন।' পরে লক্ষ্য করলেন কেশবকে: 'বাড়ির ভিতরে অত থেকো না। যেখানে যত বেশি ঈশ্বরীয় কথা সেখানেই তত বেশি আরাম। দেখি, তোমার হাত দেখি।' কেশবের একখানি হাত তুলে নিয়ে ওজন করতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'না তোমার হাত হালকা আছে। যারা খল তাদের হাত ভারী হয়।'

সবাই হেসে উঠল।

কেশবের মা বললেন, 'কেশবকে আশীর্বাদ করুন।'

'আমার কী সাধ্য! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।'

ঈশ্বর দুবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দু ভাই জমি বখরা করে, আর দড়ি মেপে বলে, এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে আমার আমার করছে। আরো একবার হাসেন। ছেলের সঙ্কটাপন্ন অসুখ। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলে, ভয় কি মা, আমি ভালো করব। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।'

কেশবের একটা কাশি উঠল। সে কাশি আর থামে না। কঠিন কষ্টকর কাশি। বুকের মধ্যে ব্যথার ধাক্কা লাগছে সকলের।

বেগটা একটু থামল। থামতেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। দেয়াল ধরে-ধরে চলে গেল আপন ঘরে। তার শেষ শয্যায়।

কেশবের বড় ছেলেটিকে ঠাকুরের পাশে এনে বসাল অমৃত। বললে, 'এইটি কেশবের বড় ছেলে। আপনি আশীর্বাদ করুন। ও কি, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন।'

'আমার আশীর্বাদ করতে নেই।' বলে ছেলেটির সর্বাঙ্গে হাত বুলুতে লাগলেন ঠাকুর।

অমৃত বললে, 'আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলোন।'

সে-হাত মানেই তো অপরিমেয় করুণার পারাবার।

'অসুখ ভালো হোক, ও সব কথা আমি বলতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না। মাকে শুধু বলি, মা, আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দাও।'

কেশবকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'ইনি কি কম লোক গা! যারা টাকা চায় তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে। দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশবের যাবার কথা—কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর-বার করছে, কখন কেশব আসেন!'

মিষ্টিমুখ করলেন ঠাকুর। এইবার উঠবেন গাড়িতে। ব্রাহ্ম ভক্তেরা সঙ্গে এসে তুলে দিচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখলেন, নিচে আলো নেই। বললেন ঠাকুর, 'এ সব জায়গায় ভালো করে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র্য হয়। দেখো এ রকমটি যেন হয় না আর কোনোদিন।'

এলোপ্যাথিতে কিছু হচ্ছে না। ডাকা হল মহেন্দ্রলাল সরকারকে। কিছুতেই কিছু হবার নয়।

তবু তারই মধ্যে বাড়ির এক পাশে দেবালয় তৈরি করাল। প্রতিষ্ঠার দিনে, উত্থানশক্তি নেই, তবু জোর করে নেমে এল নিচে। একটা চেয়ারে বসিয়ে চার-পাঁচ জনে ধরে নামাল অতিকষ্টে। বেদী এখনো শেষ হয়নি, না হোক, যা হয়েছে এই বেদীতে বসেই আমি উপাসনা করব।

'এসেছি মা, তোমার ঘরে। ওরা আসতে বারণ করেছিল, কোনামতে শরীরটা এনে ফেলেছি। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। আমার বড় সাধ ছিল কয়েকখানা ইট কুড়িয়ে এনে তোমাকে এক-খানা ঘর করে দি। তুমি মা নিজেই স্বহস্তে ইট কুড়িয়ে এনে এই প্রশস্ত দেবালয় করিয়ে দিলে। এখন বড় সাধ, ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, আমার কাশী-মক্কা, আমার জেরুশালেম। মা আমার দয়া মা আমার পুণ্যশান্তি, আমার শ্রীসৌন্দর্য, আমার সম্পদস্বাস্থ্য। বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা—'

রোগের তাড়নায় দিন-রাত আর্তনাদ করছে কেশব। সে নিদারুণ বেদনার নিবারণ নেই। শরীরের রক্ত দিলে যদি উপশম হত, শত-শত লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

'মা, আমার মুখ যেন তোমার নিন্দা না করে। তুমি আমাকে ভেঙে-ভেঙে তোমার কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছ মা।'

'বাবা, আমার শাপেই তোমার এত যন্ত্রণা—' সারদাসুন্দরী বললেন কাঁদতে-কাঁদতে।

মায়ের বুকে মাথা রাখল কেশব। বললে, 'এমন কথা তুমি মুখেও এনো না। তোমার মত মা কে পায়? তুমি আমার বড় ভালো মা, তোমার গর্ভে জন্মেই তো আমি এত ভালো হতে পেরেছি—'

কেশবের তিরোভাবের কথা জানানো হল ঠাকুরকে।

ঠাকুরের মনে হল, একটা অঙ্গ যেন পড়ে গেল। এমন কম্প এল যে লেপ চাপা দিয়ে পড়ে রইলেন। তারপর তিন দিন বেহুঁস।

সিঁদুরেপটির মণি মল্লিকের ছেলেটি মারা গেছে। উপযুক্ত ছেলে—এ শোক রাখবার জায়গা নেই। ছেলেকে শ্মশানে পুড়িয়ে রেখে ঠাকুরের কাছে সটান এসে উপস্থিত।

ঘরভরা লোক। সব জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তার দিকে। ঠাকুরেরও চোখ পড়ল, জিগগেস করলেন, 'কি গো, আজ অমন শুকনো দেখছি কেন?'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মণি মল্লিক। বললে, 'আমার ছেলেটি আজ মারা গেল। আসছি সব শেষ করে।'

সহসা সমস্ত ঘর বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে রইল। ক্রমে-ক্রমে নানা জনে নানা রকম সান্ত্বনার কথা আওড়াতে লাগলো। সব মামুলি, বাজে কথা।

কিন্তু ঠাকুর তো কিছু বলছেন না! এই দারুণ-দহন শোকে তাঁর কি একটু মৌখিক সহানুভূতিও পাওয়া যাবে না? ঠাকুর এত হৃদয়হীন!

বুড়ো মণি মল্লিক আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। ঠাকুর দুটো মিষ্টি কথাও বলবেন না এ কঠোরতা যেন পুত্রশোকের চেয়েও দুঃসহ।

কেঁদে-কেঁদে শোকের কলসী খালি করল মণি মল্লিক। তখন সহসা তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত তেজের সঙ্গে গান ধরলেন ঠাকুর :

> 'জীব সাজো সমরে।
> ঐ দ্যাখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
> আরোহণ করি মহা পুণ্যরথে
> ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে
> দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান
> ভক্তিব্রহ্মবাণ সংযোগ করো রে॥'

মণিমোহন স্তব্ধশোক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কে পুত্র? কার পুত্র? কার জন্যে এই শোক?

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর বললেন, 'পুত্রশোকের মত কি আর জ্বালা আছে? তবে কি জানো? যারা ঈশ্বরকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই ফের সামলে নেয়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলোই একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে, তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় ষ্টিমারগুলো গেলে জেলেডিঙিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল, আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উলটেই গেল। আর বড়-বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু চারবার টালমাটাল হয়েই যেমন-তেমনি স্থির হলো। দু চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।'

ঠাকুরের স্বরে বিষাদ-গাম্ভীর্য। 'মানুষ সুখের আশায় সংসার করে। বিয়ে করল ছেলে হল, সেই ছেলে আবার বড় হল, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটার বিসুখ, এটা মলো ওটা হয়ে গেল,—ভাবনায় চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত। যত রস মরে তত একেবারে 'দশ ডাক' ছাড়তে থাকে। দেখনি? ভিয়েনের উনুনে কাঁচা সুঁদরির চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে, কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে—আর চুঁ-চাঁ ফুস-ফাস নানা রকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।'

'এই জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম, এ জ্বালা শান্ত করবার আর লোক নেই।'

ধাত্রী ভুবনমোহিনী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসে। সকলের জিনিস খেতে পারেন না ঠাকুর। বিশেষত ডাক্তার, কবরেজ বা ধাত্রীর। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তারা টাকা নেয় তার জন্যে।

'ভুবন এসেছিল। পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল।' বলছেন অধর সেনকে। 'আমায় বললে, আপনি একটা আঁব খাবে? আমি বললাম, আমার পেট ভার। আর, সত্যিই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হয়ে গেছে।' অন্য কথায় গেলেন তখুনি। 'কেশব সেনের মা-বোন এরা এসেছিল। তাই আবার খানিকটা নাচলাম। কি করি! ভারি শোক পেয়েছে।'

সেদিন আবার বললেন মাষ্টার মশাইকে। 'কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলে। কেশবের মা তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগলো। দেখলাম শোকে কাতর হয়নি। এখানে এসে একাদশী করলে। মালাটি নিয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি—'

[ক্রমশঃ

দ্বিতীয় প্রবাহ

পঞ্চম তরঙ্গ

পুনর্জীবন

বর্ধমান-রাজের এলাকায়. কিরণের কিঞ্চিৎ জমিদারি ছিল। সেকালে ইংরেজ-রাজত্বে সূর্যাস্ত হইত না কিন্তু বর্ধমান-মহারাজের রাজত্বে খাজনা দাখিলের দিন সূর্যাস্ত হইলে অপারগ হতভাগ্য জমিদারের জমি লাটে উঠিত। সামনে চোত্-কিস্তি। কিরণের হাজার পাঁচ-ছয় টাকা খাজনা চৈত্রের শেষ তারিখে জমা দিবার কথা; কোনও রকমে বত্রিশ শো টাকা জোগাড় হইয়াছিল। ১৯শে চৈত্র ২রা এপ্রিল (১৯২৬) গুড্ ফ্রাইডের দিন ওই টাকা লইয়া কিরণ দেশে যাইতেছিল, গুণ্ডা-পকেটমারের আক্রমণ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমি তাহার সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশন পর্যন্ত যাইতেছিলাম হ্যারিসন রোডের ট্রামে। সময় বৈকাল। কলেজ ষ্ট্রীট জংশনে ওয়াই-এম-সি-এর কাছাকাছি একটা হট্টগোল শুনিলাম; দোকান-পাট সশব্দে বন্ধ হইতেছে। হাওড়ার দিক হইতে একখানা ট্রাম আসিতে দেখা গেল, জানালার খড়খড়ি বন্ধ কিন্তু সর্বাঙ্গে ইষ্টকাঘাতের চিহ্ন। সর্বত্র একটা ত্রাস ও আতঙ্কের ভাব। আমাদের ট্রাম হইতে অনেক যাত্রী নিঃশব্দে নামিয়া গেল, জানালার খড়খড়িও তুলিয়া দেওয়া হইল। ট্রাম-চালক ইতস্তত করিতেছিল, মোড়ের পুলিশ তাহাকে আশ্বাস দিয়া অগ্রসর হইতে বলিল, চাহিয়া দেখিলাম—আমরা সাকুল্যে চারজন প্যাসেঞ্জার। একটু আগাইয়া তদানীন্তন হ্যালিডে ষ্ট্রীট অধুনা সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর জংশনে পৌছিয়াই স্থানীয় পরিবেশদৃষ্টে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সুবিখ্যাত দীনু মিঞার মসজিদের সম্মুখে রক্তারক্তি কাণ্ড,—আস্ত, ভাঙা ও গুঁড়া ইষ্টকখণ্ডে চারিদিক আকীর্ণ। মাথাফাটা, নাকভাঙা লোকেদের রিক্শাযোগে অথবা হাঁটাইয়া হাসপাতালে কিংবা ডাক্তারখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। পূর্বদিকে পেল্লায় পেল্লায় জোয়ান মুসলমান, পশ্চিমে ততোধিক ষণ্ডা ভোজপুরীর দল, আহত অবস্থাতেও খাঁচায় বদ্ধ সদ্যধৃত ব্যাঘ্রের মত ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জন করিতেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপর্ব তখন শেষ, স্ত্রীপর্বে ক্রন্দন-আস্ফালন চলিতেছে। পানের দোকান ছাড়া সমস্ত বাড়িঘর রুদ্ধদ্বার, একটা ভয়াবহ থমথমে ভাব আসন্ন নব সংঘর্ষের সূচনা করিতেছে। ব্যাপার কি? এ পারের কুহু এবং ও পারের কেকাধ্বনি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রবণে বেপথু অন্তরে এইটুকু মাত্র বোধ জন্মিল যে, দীনু মিঞার পবিত্র মসজিদে ধার্মিক মুসলমানেরা একান্তে আল্লাভজনা করিতেছিলেন, বাদ্যভাণ্ডসহকারে একটি বিধর্মীদের শোভাযাত্রা তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করাতে নিমেষমধ্যে ধর্মস্থান আল্লার নামে কেল্লায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং অবিশ্রান্ত ইষ্টক-বোমায় শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিয়া ধার্মিকেরা খোদার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদের প্রতিশোধ। প্রবৃত্তি ও প্রতিরোধশক্তি পথে ঘাটে অনর্থের সৃষ্টি করিতে ছাড়ে নাই। ট্রাম অগ্রসর হইয়া অনাবিল বিধর্মী এলাকায় প্রবেশ করিলে আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম; কিন্তু মনে মনে ভয় রহিয়া গেল যে মামলা এখানেই থামিবে না। পোল পার হইয়া ষ্টেশনে পৌছিতেই কিরণ বলিল, দুর্ভাগ্য আমার নিত্যসঙ্গী, পথে কি হইবে বলা যায় না। টাকাগুলা তোর কাছেই থাক্, বাকি টাকা যোগাড় করিয়া আসিয়া আমি এখানকার কাছারিতেই জমা দিব।

কিরণ তো "গুডবাই" করিয়া চলিয়া গেল। আমি সেই পবিত্র গুড্ ফ্রাইডের দিন ট্যাঁকে দুই শতাধিক তিন হাজার টাকা লইয়া ওয়ালফোর্ড কোম্পানীর বিপুলকায় বাসে চাপিয়া ষ্ট্রাণ্ড্ রোড্ ধরিয়া এসপ্লানেডে উপস্থিত হইলাম। সেখানে তখন সাংঘাতিক অবস্থা। চিৎপুর লাইনের একখানা সম্পূর্ণ খালি ট্রাম একজন হিন্দু ড্রাইভার কাঁপিতে কাঁপিতে লইয়া আসিয়াছে, কন্ডাক্টারকে মারিয়া দুমড়াইয়া একটা বেঞ্চের তলায় গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম, ফালতু ভিড় অকারণ জটলা করিতেছে, কেহ বলিতেছে—লোকটা বাঁচিয়া আছে, কেহ বলিতেছে—মরিয়াছে। সম্মুখেই কার-মহলানবিশের দোকান, আমি ছুটিয়া গিয়া বুলা মহলানবিশকে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করিতে বলিলাম। অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া মুমূর্ষু লোকটাকে

হাসপাতালে লইয়া গেল। তাহার পর আর ট্রাম আসিতে দেখিলাম না, কিন্তু রক্তাক্তকলেবর কয়েকজন লোককে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে দেখিলাম। বুঝিলাম নাখোদা মসজিদ অঞ্চলে হাঙ্গামা থামে নাই। ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ মনে কি করি, কোথায় যাই ভাবিতে ভাবিতে ম্যাডান থিয়েটার অ্যাণ্ড প্যালেস অব ভ্যারাইটিজে সন্ধ্যার শোয়ে যীশুখ্রীষ্টের জীবনী দেখিতে ঢুকিলাম; প্রেম ও শান্তির দূতের জীবনালেখ্য দেখিয়া উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে যদি শান্তি পাই! ইন্টারভাল হইয়া গেল, ছবিও প্রায় সমাপ্তির দিকে, অকস্মাৎ বাহিরে অতি নিকটেই "মার্-মার্ কাট্-কাট্ আল্লাহো আকবর" রব উঠিল। বিধর্মীরা সেদিন পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট আওয়াজকে অবলম্বন করিতে পারে নাই। কয়েকটা ঢিলজাতীয় পদার্থ প্যালেস অব ভ্যারাইটিজের টিনের চালে বজ্রপাতের মহড়া দিল, ছবিহীন অন্ধকারে দর্শকেরা সকলেই সভয়ে ও শশব্যস্তে পায়ের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিরুপায় ভাবে "আলো আলো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে অনেক টাকা, আমি প্রায় আধমরা হইয়া গেলাম। হল্লা বেশিদূর অগ্রসর হইল না। ছবি শেষ হইল। আমিও এ-গলি ও-গলি করিয়া কোনক্রমে গা বাঁচাইয়া ইয়োরোপীয়ান এসাইলাম লেনের বাসায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম।

পরদিন প্রাতে সংবাদপত্র খুলিয়া চক্ষুস্থির! বুঝিতে পারিলাম, আগুন নিভে নাই, সারা রাত্রি ধিকিধিকি করিয়া কলিকাতা শহর জুড়িয়া জ্বলিয়াছে, হতাহতের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। দীমু মিঞার মসজিদ যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহাকে গ্যাঁড়াতলা বলে, আমরা নাম দিলাম ব্যাট্‌ল অফ গ্যাঁড়াতলা। তিন দিন চলিয়া ব্যাট্‌ল থামিল; কিন্তু তখন কে জানিত ইহা ব্যাট্‌ল নয়, ওয়ার, এবং দীর্ঘ বিশ বৎসর চলিয়া ভারত-বিভাগে ইহার পরিসমাপ্তি! দুই দিন যাইতে না যাইতে সেকেণ্ড ব্যাট্‌ল অব গ্যাঁড়াতলাও লাগিয়া গেল। এই কালেই বিখ্যাত 'ছোলতানে'র জন্ম হইল।

পথ-ঘাট নির্জন, ট্রাম-বাসও কচিৎ চলে। এই অবস্থায় আমাকে প্রত্যহ ইয়োরোপীয়ান এসাইলাম লেন হইতে সার্কুলার রোড ধরিয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট পার হইয়া ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে 'প্রবাসী'-আপিসে যাইতে হইত। অধিকাংশ দিনই ট্রাম-বাস মিলিত না, পদব্রজে যাইতাম। একদিন মেছুয়াবাজারে চৌরাস্তার ঠিক দক্ষিণে অতর্কিত ভাবে একটা নিদারুণ হল্লার মাঝখানে পড়িয়া গেলাম। সম্মুখেই "শান্তি কুটীরে" মোটর বাসের কারবারী সোভান সাহেব থাকিতেন। তিনি বারান্দা হইতে দেখিয়া আমার বিপদ বুঝিতে পারিলেন এবং ছুটিয়া আসিয়া আমাকে টানিয়া নিজের কম্পাউণ্ডের ভিতর লইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না, সেই দিন পরিচয় হইল। তাঁহাকে আমি এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। মানবীয় সহৃদয়তার বশে তিনি সেদিন আমাকে রক্ষা না করিলে এই আত্ম-কাহিনী লিখিবার অবকাশ আমার মিলিত না। সেদিন পর্যন্ত আমার কোমরে জামার তলায় একটি ভারি লৌহদণ্ড লইয়া চলাফেরা করিতাম। তখনও তাহা কোমরেই ছিল, অধিকন্তু ছিল কাছায় বাঁধা কিরণের বত্রিশ শো টাকা। সোভান সাহেবের ব্যবহারে সাধারণ ভাবে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিল, লৌহদণ্ডটি একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম। টাকাটাও সেদিন অশোক চট্টোপাধ্যায়ের জিম্মায় রাখিয়া দিলাম।

আপিস যাতায়াতের পথে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতেছিল তাহা হইতেই এই দাঙ্গা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য মন উন্মুখ হইয়াছিল। কয়েকটি প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা লিখিয়াও ফেলিলাম। সেগুলি প্রকাশ করিবার কথাও চিন্তা করিতে লাগিলাম। 'প্রবাসী'তে কাজ করি, কিন্তু 'প্রবাসী' সে সব ছাপিবে না। একমাত্র অবলম্বন আমাদের নিজস্ব 'শনিবারের চিঠি' তখন মৃত। তাহাকে পুনর্জীবন দান করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিলাম না। তাহারই আয়োজন করিতেছি, শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমাকে ডাকিলেন, প্রশ্ন করিলেন 'শনিবারের চিঠি'র পুনঃপ্রকাশের কোনও মতলব আমাদের আছে কি না! মনে হইল, তিনি সর্বজ্ঞ, আমাদের মনের কথা টের পাইয়াছেন। হাতে স্বর্গ পাইলাম, বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা দাঙ্গা-সংখ্যা বাহির করিব মনে করিতেছি। তিনি বলিলেন, মারামারি সম্বন্ধে লেখা দিও, কিন্তু সংখ্যাটির নাম দিও—জুবিলী-সংখ্যা। আমি কিছু লেখা দিব।

জুবিলী-সংখ্যা নামের মানে তখন বুঝি নাই তবু খোদ কর্তার সমর্থন, উৎসাহ ভরে লাগিয়া গেলাম। দুই দিন পরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দুটি বেনামী রচনা আমা

হাতে আসিল. আবরণী-চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন, "সজনীকান্ত, অসুস্থ শরীরে এইগুলি লিখিলাম। তোমাদের চলে কি না ভাগ্ করিয়া দেখিয়া তবে ছাপিতে দিবে।" সোল্লাসে ছাপিতে দিলাম। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' বন্ধ হওয়ার ঠিক পনের মাস ছয় দিন পরে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুনর্জীবিত অসাময়িক 'শনিবারের চিঠির' "জুবিলী-সংখ্যা" মহাসমারোহে বাহির হইল। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কারণ এই যে, ইহাই মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করিয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার প্রথমটি দাঙ্গা-সংক্রান্ত; সার্ আবদার রহিম সাহেব তখন ইংরেজের মসনদে প্রধান অমাত্য। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিলেন, "পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের কোকিল-ধ্বংস-ফতোয়া।" এই রচনা কখনই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে না; কিন্তু সংযত সরস ব্যঙ্গাত্মক রচনার নমুনা হিসাবে লেখাটি সর্বসাধারণের দরবারে আর একবার দাখিল করা উচিত বিবেচনায় এখানে খানিকটা পুনর্মুদ্রিত করিলাম—

আরব দেশে মেদিনা নামে একটি শহর আছে। নগরকে ফারসীতে শহর ও সংস্কৃতে পুর বলে। এই জন্য কাফেররা মেদিনা শহরকে বাংলাদেশের মেদিনীপুর মনে করে। পীর তাঁবেদার হালিম ছাহেবের জন্ম হয় বাস্তবিক আরব দেশের মেদিনা শহরে, কিন্তু কাফেররা ভুল করিয়া বলে তিনি পয়দা হন মেদিনীপুরে। আরব-দেশে জন্ম বলিয়া তিনি আকৃছার আরবী জবানেই গুফতগু করেন, কিন্তু কাফেররা বুঝিতে না পারিলে বাংলা লব জ্ গু ইস্তমাল করেন।

তাঁহার বাড়ীর নিকট একটি মসজিদ আছে। তাহার মোল্লা ছাহেব একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনাব, মসজিদের ছাম্‌নে কেহ গাওনা বাজনা গোলমাল আওয়াজ করিলে কি করিব?" পীর হালিম বলিলেন, "তাড়াইয়া দিও।" মোল্লা ছাহেব ফের জিজ্ঞাসা করিলেন, "ট্রাম গাড়ী, মোটর গাড়ী, মোটর ভেঁপুর আওয়াজ হইলে কি করিব?" পীর তাঁবেদার মনের কথা গোপন রাখিয়া বলিলেন, "ও গুলার জান্ নাই, উহারা জানোয়ার নহে। উহাদের আওয়াজ মসজিদে শুনা গেলে গুনাহ হয় না, যাহাকে কাফেররা পাপ বলে।"

মোল্লা ছাহেব ফের পুছিলেন, "মানুষের ত জান্ আছে। মানুষে মসজিদের ছাম্‌নে গোলমাল করিলে মারধর করিয়া তাড়াইব কি?" পীর ছাহেব আবার আসল কারণ ছিপাইয়া বলিলেন, "মানুষের জান্ আছে বটে, কিন্তু মানুষ জানোয়ার নহে। জানোয়ার আওয়াজ করিলে যেমন করিয়া হউক তাড়াইয়া দিও।"

তাহার পরদিন্ মোল্লা ছাহেব ফের হাজির হইয়া বলিলেন, "মসজিদের ছাম্‌নে কাকগুলা বড় আওয়াজ করে, ছামনের বাগানে কোকিলগুলাও কুহু কুহু করে। কি করিব?"

তাঁবেদার হালিম ছাহেব কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কাক ও কোকিল কাফের কি না আগে ঠিক কর। তাহারা কোন্ জবানে কথা বলে?" মোল্লা ছাহেব পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মা হইতে মৌলানা শৌকত আলী পর্য্যন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কাক-কোকিলের ভাষার কোন সন্ধান পাইলেন না। তাহা হালিম ছাহেবকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায় কি?" পীর ছাহেব বলিলেন, "কাক ও কোকিল আমাদের খানা খায় কি?" মোল্লা ছাহেব বলিলেন, "কাককে আমাদের গোস্তের হাড় ও টুকরা ঠোকরাইতে দেখিয়াছি বটে, কোকিলকে দেখি নাই।" তখন পীর ছাহেব আঁধারে আলোক পাইয়া খুসী হইয়া বলিলেন, "কাক কাফের নহে, কোকিল কাফের, কোকিল কুহু কুহু করিলেই মারিবে, কাককে কিছু বলিও না।" মোল্লা ছাহেব বলিলেন, "কোকিলকে ত প্রায় দেখাই যায় না, আওয়াজই শোনা যায়। মারিব কেমন করিয়া?" পীর তাঁবেদার হালিমের তখন হঠাৎ মনে পড়িল কলেজে পড়িয়াছিলেন ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন :—

"O Cuckoo! Shall I call thee Bird
Or but a wandering Voice…"

তিনি বলিলেন, "কোকিল দেখিতে নাই বা পাইলে? ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, কোকিল চিড়িয়া নহে, সেরেফ একটা মুসাফির-আওয়াজ মাত্র। যেদিক হইতে কুহু কুহু ডাক শোনা যাইবে সেই দিকে আল্লার নাম করিয়া টিস ছুঁড়িবে এবং তাহার পর গিয়া দেখিবে কোন জানোয়ার মরিল কি না।"…

রামানন্দবাবুর দ্বিতীয় লেখাটির শিরোনামা "'শনিবারের চিঠির' জুবিলী সংখ্যা।" আরম্ভটি এই: "ঊনপঞ্চাশ বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হইবে। সেইজন্য আমরা উহার এই জুবিলী সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি।"

এই নামকরণের আসল রহস্যটি একটু পরেই আছে এই শিরোনামায়: "প্রবাসী-সম্পাদকের মাসতুতো দিদিমা"—

সর্ব্বসাধারণের বোধ হয় জানা নাই যে, 'ভারতী'র সম্পাদিকা পণ্ডিতানী সরলা দেবী চৌধুরাণী 'প্রবাসী'-সম্পাদকের মাসতুতো দিদিমা হন। সেইজন্যই তিনি 'ভারতী'র ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় উক্ত সম্পাদককে শুধু "রামানন্দ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ষীয়সীদের দুটি সদ্‌গুণ আছে। এক নম্বর, তাঁহারা নিজেদের বয়স বাড়াইয়া বলেন, এই জন্য 'ভারতী'র পুনঃ পুনঃ পুনর্জ্জন্মের মোট সময় যোগ করিলেও যদিচ ঊনপঞ্চাশ বৎসর হয়, তথাপি পঞ্চাশ পূর্ণ হইলে যে জুবিলী লোকে করে, তাহা 'ভারতী'র সম্পাদিকা প্রাপ্তে তু ঊনপঞ্চাশ বর্ষেই করিয়াছেন, এবং তাহাও ঊনপঞ্চাশের মধ্যে অনেক মাস বাদ পড়া সত্ত্বেও। বস্তুতঃ ঊনপঞ্চাশ সংখ্যাটার নানা সুপ্রভাব আছে।

দুনম্বর, বর্ষীয়সীরা নাতি-প্রনাতিদের বয়স কমাইয়া বলেন। যথা 'ভারতী'র সম্পাদিকা দেবী-চৌধুরাণী মহোদয়া কেবল যে তাঁহার মাসতুতো নাতি 'প্রবাসী' সম্পাদককে বালকের প্রাপ্য ডাকনাম দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন, তাহা নহে, প্রনাতি 'প্রবাসী'র বয়স

পূর্বা পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা অল্প বেশী হইলেও তাহা চব্বিশ বৎসর বলিয়াছেন।

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ইহা তাহার একটি সদ্দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, উহার ফলে 'শনিবারের চিঠি' অসাময়িক ভাবে হইলেও পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল। শুধু তাই নয়, এই বিচ্ছিন্ন সংখ্যাটিতেই বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রথম সাহিত্যিক রূপ দিল 'শনিবারের চিঠি'। এই সকল রচনার অনেকগুলি কালের প্রবাহে হারাইয়া গেলেও ইহাদের কাজ নিঃশেষে ফুরাইয়া যায় নাই। "মুসলমান" নামক আমার একটি পুস্তকাকারে অপুনর্মুদ্রিত দীর্ঘ কবিতা হইতে দুইটি স্তবক উদ্‌ধৃত করিতেছি:

…মসজেদে নামাজ পাঠে ভেবেছ তুষিবে ভগবান
স্তুতগর্ব নত মুসলমান ?
প্রীতি নাই, প্রেম নাই, ধর্ম শুধু নররক্তপাতে ?
যা বলে বলুক মোল্লা আল্লা তব খুশি নন তাতে।
মোল্লার রচিত শাস্ত্রে আপন বুদ্ধিরে বলি দিয়া
ধর্মেরে জবাই করা—নররক্তে প্লাবিয়া দুনিয়া
আল্লা নাম নিয়া—
এই শিক্ষা দিতে নবী অবতীর্ণ হলেন ভূতলে,
শাস্ত্র এই বলে ?

পরধর্ম হিংসা করি নিজধর্ম কোরো না সন্ধান,
পর-অসহিষ্ণু মুসলমান !
দেখ বিশ্ব ছুটিয়াছে জ্ঞানের বর্তিকা উচ্চে ধরি,
ধর্মভাণে অতীতেরে কেহ নাই একান্ত আঁকড়ি;
যে দেশে জন্মেছ সেই দেশের কল্যাণে মুক্তি তব,
যে ভাষা মায়ের ভাষা আনিবে তা জ্ঞান নব নব
অতুল বৈভব।
যে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে ফিরো না তাহারে স্কন্ধে টানি
প্রীতি-সূত্র মানি।…

দাঙ্গা-বা-জুবিলী সংখ্যা কলিকাতার সদ্য-সাঙ্গিত মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইল, এই প্রথম কিঞ্চিৎ অর্থাগমও হইল। সুতরাং এক মাসের মধ্যেই পরবর্তী আষাঢ় (১৩৩৩) মাসেই আর একটি বিশেষ সংখ্যা—"বিরহ সংখ্যা' বাহির করিয়া ফেলিলাম। অতি-আধুনিক সাহিত্যের ন্যাকামি ও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ যৌন আবেদনের বিরুদ্ধে আমাদের সেই প্রথম সর্বোদয়-অভিযান, শুধু আমাদের নয়—প্রকাশ্যে সেই সর্বপ্রথম অভিযান। ইহারও ছয় মাস পরে পৌষ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীঅমল হোম "অতি-আধুনিক কথাসাহিত্য" নামক নিবন্ধ পাঠ করেন।

'কল্লোল' তখনও উদগ্র হইয়া উঠে নাই, ১৩৩২ সালের শেষ পর্যন্ত তাহার কলধ্বনিই কানে বাজিতেছিল। তখন বাংলাসাহিত্যে ক্রিমিনলজি-সাইকলজির নামে বিবিধ নূতনত্বের সম্পাদন করিয়া আসর মাত করিয়া রাখিয়াছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; সেনগুপ্ত মহাশয়ই প্রধান। নূতন বৎসরের গোড়া হইতে জল-'কল্লোল' হঠাৎ যৌন-কল্লোল হইবার সাধনায় মাতিল। আমি "Orion বা কাল-পুরুষ" নামক একটি দীর্ঘ নীহারিকা-নাটক রচনা করিয়া বিরহ-সংখ্যায় শ্রীকেবলরাম গাজনদারের বেনামীতে প্রকাশ করিলাম। "অবতরণিকায়" লিখিলাম :—

…আমরা নূতন যুগের প্রবর্তন করিতে চাই। পুরাতনের দিন চলিয়া গিয়াছে, ক্রিমিনলজি ও সাইকো-এনালিসিসের শুষ্ক পাতায় যৌন সম্বন্ধীয় আধুনিক থিওরিগুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমরা সরস গল্প-নাটকে সেগুলি সজীব ভাবে জগতের সম্মুখে ধরিতে চাই।… শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ও ঢাকা-প্রবাসের পর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার গুরু এবং কলিকাতার 'কল্লোল'-সম্প্রদায় আমার পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'শুভা', 'শাস্তি', 'পাপের ছাপ', 'ব্যবধান', 'দত্তগৃহিণী' ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নষ্টচন্দ্র', 'হাইফেন' ও কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত ফোটো-চিত্র সম্বলিত 'রূপের কাঁদ' প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্যে আমার সূক্ষ্ম প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছে এবং 'কল্লোলে'র নব নব রূপ আমাকে নব নব ভাবের আহার্য্য জোগাইতেছে। ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে পাপ হইবে।

মানব যন্ত্রবিশেষ মাত্র নহে; দম দিয়া তৈলরূপ আহার্য্য জোগাইয়া গেলেই যন্ত্র নির্বিবাদে চলিতে পারে কিন্তু মানুষের হৃদয় বলিয়া আর একটি সূক্ষ্ম জগৎ আছে। সেখানে সে রচনা করে, সে গ্রহণ করে, সে বিলাইয়া দেয়। সে ভালবাসে, সে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়—সে বাঁচিতে চায়—নিঃশেষে মরিতে চায় না। সে ডোবে, সে ওঠে, সে কাঁদে, সে কাঁদায়; এখানে সে চিরবুভুক্ষু। আর এক বা একাধিক হৃদয়কে সে গ্রাস করিতে চায় এবং একাধিক দেহকে সে ভোগ করিতে চায়। কিন্তু সে তাহা পারে না, সমাজ শাস্ত্র লোকাচার ও লোকলজ্জা সঙীন উঁচা করিয়া বসিয়া আছে। হৃদয়কে পীড়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। কখনো কখনো এই বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিয়া মানব-হৃদয় মহাসাগরের কল্লোল শুনিতে পায়—আমরা সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকি। আমরা এই বাঁধ-ভাঙার কাহিনী লিপিবদ্ধ করি।

তথাকথিত অতি-আধুনিকতার বিরুদ্ধে ইহাই আমাদের প্রথম ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ।

১৩৩৩ সালের বৈশাখ হইতে 'কালি-কলম' বাহির হইতেছিল। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র 'কল্লোলে'র দল ভাঙিয়া শ্রীমুরলীধর বসুর সঙ্গে যোগ দিয়া

'কালি-কলম' প্রকাশ করিয়াছিলেন, বরদা এজেন্সীর শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী হন পরিবেশক। শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র এই দুই জনই ছিলেন 'কল্লোল'-দলে সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টা ও শিল্পী, 'কল্লোলে'র হালচাল ও পরিবেশ তাঁহাদের শিল্প-সাধনার আর অনুকূল ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সরিয়া পড়িলেন। বাকি যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা প্রধানত ঘষিতে-ঘষিতে-প্রস্তর-ক্ষয়-করার দল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের অনেকেই ঘষিতে ঘষিতে নিজেরাই ক্ষয় হইয়া গিয়াছেন। যে দুই-একজন টিঁকিয়া আছেন তাঁহারা খুব সময়ে বুদ্ধি করিয়া ধর্মের ধাতুতে তলা বাঁধাইয়া ব্যক্তিগত দৌর্বল্য সারিয়া লইয়াছেন।

'কালি-কলম' শুরু হইতেই 'কল্লোল' অপেক্ষা মার্জিত ও ভদ্র রুচির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু প্রথম সংখ্যাতেই হাবিলদারী "কামকণ্টকব্রণ" দুষ্টতার জন্য আমাদের আক্রমণের বিষয় হইয়াছিল। রাধিকা যেমন সারা বৃন্দাবন কৃষ্ণময় দেখিতেন হাবিলদার কবি তেমনি সারা বনভূমি "সুরত-কেলি"ময় দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া "প্রলাপ" বকিয়াছিলেন—

> করে বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি
> পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি! ··
> আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা
> হ'ল অশোক শিমুলে বন পুষ্পরজা।

এতটা আমরা বরদাস্ত করিতে পারি নাই, 'কালি-কলমে'র সহিত আমাদের মোহিতলাল ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও। বিরহ-সংখ্যাতেই 'কালি-কলম'কেও শত্রু করিয়া ফেলিলাম।

অসাময়িক হইলেও আমি মনে মনে নিয়মিত মাসিকের মহড়া দিয়া চলিয়াছিলাম। জ্যৈষ্ঠের পর আষাঢ় বাহির করিলাম বটে কিন্তু পরবর্তী প্রকাশ হইতে আরও চার মাস লাগিল—কার্তিকে "ভোট-সংখ্যা"। বাংলা দেশে নূতন ইলেকশনের দামামা বাজিতেছে, চারিদিকে শুনিতেছি, "সবার উপরে ভোটই সত্য তাহার উপরে নাই।" চিত্তরঞ্জন গত, কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির তখন প্রবল প্রতাপ। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ভোট-ব্যাপারটাকেই নস্যাৎ করিয়া ভোট-সংখ্যা বাহির করিলাম, ছাপিলাম চার হাজার। দলে দলে দলাদলির জন্য চার হাজার কপিই গরম চানাচুরের মত বিকাইয়া গেল। আরও কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইল। অর্থাৎ ফণ্ডে টাকা জমিল। নিয়মিত মাসে মাসে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে আরও দশ মাস সময় লাগিল। মাঝখানে আমি নিশ্চেষ্ট রহিলাম না। রবি মৈত্র তখন কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনিই আমাকে সঙ্গে করিয়া গোলদীঘির পাশে অবস্থিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আফিসে লইয়া গেলেন। 'আনন্দবাজারে'র সহিত 'শনিবারের চিঠি'র একটা যোগ স্থাপিত হইল এবং ঘটনাচক্রে শরৎচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইয়া গেলাম। সে কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বক্তব্য।

অতি-আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লইয়া একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম "কচি ও কাঁচা"; নিদারুণ ব্যঙ্গাত্মক আঘাত ইহাতে ছিল। বন্ধু ও পরিচিত সাহিত্যিক মহলে নাটকটি পড়া হইল। মোহিতলাল প্রমুখ অনেকেই খুব তারিফ করিলেন। খ্যাতি শত্রুশিবিরেও পৌঁছিল। একদিন স্বয়ং 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন মনীশ ঘটক-(যুবনাশ্ব)-সমভিব্যাহারে আমার বাসায় দর্শন দিলেন এবং একথা সেকথার পর নাটকটি শুনিতে চাহিলেন। আমি সোৎসাহে পড়িয়া শুনাইলাম। দীনেশরঞ্জন অতিশয় ভদ্র পয়োমুখ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মনে যাহাই থাকুক, মুখে লেখাটির বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং 'কল্লোলে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশার্থ প্রার্থনা করিলেন। প্রস্তাবের অসম্ভবতা বুঝিয়াও আমি অনুগৃহীত হইলাম। আমার বাল্যবন্ধু 'কল্লোলে'র একাধিক গল্প-লেখক দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় মনীশ ঘটকের সহিত আলাপ ছিল। মনীশ শক্ত জোরালো মানুষ, ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড়ের দলে নয়, সে অকুণ্ঠচিত্তে 'কচি ও কাঁচা'র ব্যঙ্গকে অতিশয় সক্ষম রচনা বলিয়া স্বীকার করিল। পরে মাসিকের প্রথম সংখ্যা হইতে "কচি ও কাঁচা" প্রকাশিত হইয়া বিষম কোলাহল ও হট্টগোলের সৃষ্টি করে; মামলা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পৌঁছায়। তাঁহারই অনুরোধে চতুর্থ অঙ্কের পরবর্তী অংশ আর প্রকাশ করা হয় না। সে বৃত্তান্ত পরে বলিব।

ইতিমধ্যে নানা কারণে ইয়োরোপীয়ান এসাইলাম লেনের একাধারে সন্ন্যাস-আতুরাশ্রমটি ভাঙিয়া গেল। রতন আইন পাস করিয়া বিদায় লইল, কিরণের সেই

শিবপুরেই বিবাহ হইয়া গেল। এবার সত্যকার সংসার পাতিতে হইবে। বন্ধু সুবলচন্দ্রের আগ্রহ ও চেষ্টায় ঘোষ লেনে তাঁহার বাড়ির পাশে একটি বাড়ি ভাড়া করা হইল, কিরণ ও আমি সপরিবারে সেখানে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে এই বাড়িটি সত্যসত্যই পয়া। এখানেই এক প্রভাতে চা-পান করিতে করিতে যোগানন্দদা ও আমি—সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক—'শনিবারের চিঠি' নিয়মিত পুনঃপ্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম।

তৎপূর্বে আর দুইটি কাজ করিয়াছিলাম। সমসাময়িক বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

গত ২৪শে মাঘ [১৩৩৩] আমার শ্রদ্ধাভাজন কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সহিত আমি শরৎবাবুর রূপনারায়ণ নদীতীরস্থ গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা কথাবার্তার পর মোহিতবাবু বাংলাসাহিত্যে বর্তমান দুর্নীতিবিষয়ক একটি চমৎকার প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেন। শরৎবাবু প্রবন্ধটি অবিলম্বে কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বলিয়া বলেন, বাংলাসাহিত্যে যে জঘন্যতা প্রকাশ পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন আবশ্যক। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কথা হয়। শরৎবাবু এই সকল পত্রিকার ও লেখকদের রুচি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি এ বিষয়ে নিজেই লিখিতেন। তিনি বলিলেন, শিক্ষাদীক্ষাহীন অর্বাচীন ছেলেরা সাহিত্যের আবহাওয়া দূষিত করিলে সহ্য করা যায়, নজরুল ইসলামের অশিক্ষিতপটুত্ব তাঁহাকে কোনো বন্ধনের মধ্যে রাখিতে পারে না। কিন্তু নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মত পণ্ডিত জন যখন এই পঙ্কিলতার সৃষ্টি করেন তখনই তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে সাধারণের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তিনি ভুঁইফোঁড় লেখক, কোনো দিন কোনো বিষয়ে পড়াশুনা করেন নাই, এমন কি তিনি ইংরেজী পর্যন্ত ভাল জানেন না। সেই জন্য এই সকল স্বভাব-সাহিত্যিক দল তাঁহাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া থাকে। তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষা না থাকিলেও রেঙ্গুনে অবস্থানকালে সেখানকার লাইব্রেরিতে এমন কোনো ইংরেজী বাংলা পুস্তক ছিল না যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। পতিত ও পতিতাদের সম্বন্ধে তিনি তাঁহার লেখায় যে সহৃদয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়াই এই অভিনব-দুর্নীতিসমর্থক সাহিত্যিকমণ্ডলী তাঁহাকে নিজেদের দলে টানিয়া থাকে। "কিন্তু," তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন, "আমি আজ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি, তার প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে লিখেছি, আমি কখনো ফাঁকি দিয়ে লিখি না, আমার কোনো লেখায় একটি কথাও আমি অযথা লিখি না—একটি কথাও বদলাতে পারি না। আমি জোর করে বলতে পারি যে আমি পাপের বিকৃত জঘন্য রূপ দেখাবার জন্যেই পাপচিত্র এঁকেছি, সাহিত্যের রুচির বা নীতির কোনো আইন কখনো অমান্য করিনি।" ...অন্যান্য আরো অনেক কথাবার্তা শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হয় যে, আগাছাক্লিষ্ট বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের দুর্দশায় শরৎচন্দ্র নিতান্তই ব্যথিত আছেন। সাহিত্য সাধনার সামগ্রী, সেই সাহিত্যকে লইয়া এ ভাবে নাস্তানাবুদ করাকে তিনি দেশের পক্ষে অত্যন্ত কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার মতে, কলঙ্কিত বিষাক্ত সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্য একেবারে লুপ্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়।

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে মোহিতলালের প্রবন্ধটি মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, শরৎচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ। আমি রবীন্দ্রনাথকেও টলাইতে চাহিলাম। :১ ইয়োরোপীয়ান এসাইলাম লেন হইতেই ২৩শে ফাল্গুন ১৩৩৩ তারিখে শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে এক দীর্ঘ পত্রাঘাত করিলাম। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার 'কল্লোল-যুগে' আমার পত্র ও রবীন্দ্রনাথের জবাব উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি আর তাহা করিব না। তখনকার বাংলাসাহিত্যে আমার মতে যে সকল অনাচার চলিতেছিল আমি সেই সকলের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দ্বারাই প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই আগেকার সাহিত্য-সমালোচনা হইতে নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া আমি তাঁহাকে সচেতন ও সক্রিয় হইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম :

"পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।...কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা ?...যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে ?"

ঠিক দুই দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জবাব পাইয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল ক'রে না। কেন করি নে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হ'তেও পারে।...সুসময় যদি আসে আমার যা বল্‌বার বল্‌ব।"
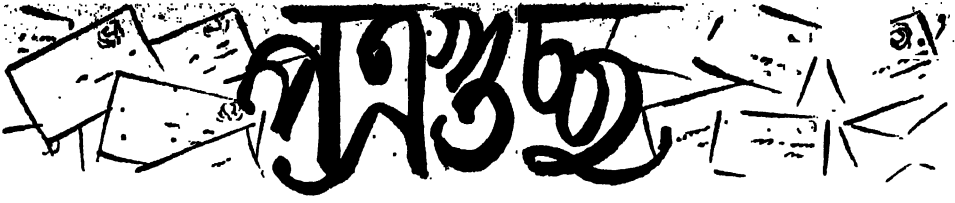
মাসিক বসুমতীর সম্পাদককে লেখা বিভিন্ন সাহিত্যিকের পত্রাবলী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর চিঠি

ওঁ

আসানসোল

৬. ৩. ৫২

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। সেই "শতবার্ষিকী সংখ্যা"র একটা কপি আমাকে পাঠাতে পারেন না?

আপনি লিখেছেন, "এখন যা ভাল বিবেচনা করেন করবেন।" আমি আর কী করতে পারি? ঠাকুরকে শুধু বলতে পারি, তোমার ভক্ত সাহিত্যিকের এ কী দীনতা! তোমাকে নিজে নাম দিয়ে ডাকতে পারে না! পরের নামটিই গ্রহণ করতে হবে!

যদি ও-বইর সমালোচনা করেন তবে আমার বা তাঁর কারু খাতিরে নয়, স্বয়ং সত্যের খাতিরে ব্যাপারটার একটু উল্লেখ করবেন। একটা "ভালো বিবেচনা" সম্পাদকেরও তো থাকা দরকার।

এবার কিস্তি পাঠাতে কিছু দেরি হয়ে গেল। সিগনেট প্রেসকে বিজ্ঞাপন বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছি। পাঠকদের বিভ্রান্ত হবার ভয় নেই। এ কাহিনী তো ধারাবাহিক ভাবে চলছেই মাসিক বসুমতীতে। বই যদি সম্পূর্ণাঙ্গ হত, তবে কি আর কিস্তি বেরুত কাগজে? যাক গে, আমি বলে দিয়েছি।

সকলের মঙ্গল চাই ইতি—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ওঁ

আসানসোল

২১. ২. ৫২.

প্রীতিভাজনেষু

ঠাকুরের জীবনী নিয়ে শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি একখানা বই বেরিয়েছে। প্রকাশক প্রসিদ্ধ চক্রবর্তী চ্যাটার্জি য়্যাণ্ড কোং। বইখানির নাম দেওয়া হয়েছে "পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।" মাসিক বসুমতীতে তার বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছে। বইখানি আপনি দেখেছেন? ভূমিকাতে আছে, বহু বছর আগে (১৩৪৩ সালে কি?) ঐ লেখাটা বসুমতীর কোনো এক বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। বইটা হাতের কাছে নেই তাই ঠিক উদ্ধৃতি দিতে পারছি না। অনুসন্ধান করে আপনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন কবে ও কোন সংখ্যায় বা কি ভাবে ওটা বেরিয়েছিল। সেই বিশেষ সংখ্যার একটা কপি আমার দরকার। আপনি সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? অন্তত এটুকু খবর নিশ্চয়ই দিতে পারবেন—মণিলালবাবুর ঐ লেখাটার শিরোনামা "পরম পুরুষ"-ই ছিল কিনা।

আশা করি এ বিষয়ে আমাকে একটু সাহায্য করতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। প্রীতি-নমস্কার গ্রহণ করুন ইতি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগের চিঠি

589, Simpson Street
Saint Paul
Minnesota, U. S. A.

১লা বৈশাখ

প্রীতিভাজনেষু—

ভাই প্রাণতোষ! নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি নমস্কার তোমাকে ও সহকর্মী বন্ধুদের পাঠালাম। পিতৃদেবকে আমার প্রণাম দিও।

শান্তা দেবীর "রোম" (২ পর্ব) এই সঙ্গে যাচ্ছে 'বসুমতী'র জন্য। আমিও পরে কিছু পাঠাব, একটু হাঁফ ফেলার অবসর মেলা চাই! মে-মাসের শেষে কাজ শেষ করে দেশ-মুখো হবো; হয়ত লণ্ডন হয়ে ফিরতে হবে কারণ New York থেকে সোজা দেশে যাবার জাহাজ পেলাম না অথচ লণ্ডনে ছুটেছে অভিবেক-যাত্রীদের ভিড়!

যাক্ দেশে ফিরে তোমাদের সবাইকে দেখবো ভাবতেও মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠ্ছে!

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছ।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের চিঠি

১১. ১২. ৫১

প্রিয়তম প্রাণতোষ,

এখনো শয্যা আমাকে ত্যাগ করেনি, কিংবা আমি করতে পারিনি শয্যাকে ত্যাগ। তবে অনেকটা সুস্থ হয়েছি বটে। তোমাদের জালাবার জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলুম।

অমল হোম "যাঁদের দেখছি" প'ড়ে একখানি চিঠি লিখেছেন, পাঠ ক'রে ফেরৎ পাঠিও, কারণ জবাব দিতে হবে।

আমরা কেবল সাহিত্য, শিল্প ও রাজনীতি নিয়েই আবিষ্ট হয়ে আছি, কিন্তু এই দুর্বলের দেশে যে শক্তিসাধকের স্থান যে-কোন বড় সাহিত্যিক, শিল্পী ও রাজনীতিবিদের চেয়ে কম নয়, সে সত্য আমরা বুঝেও মানতে চাই না। গোবরবাবু যে বাংলার জন্যে কতখানি করেছেন, সে খবর রাখে খুব কম লোকেই। তাই তাঁর কথা একটু বেশী ক'রেই দিচ্ছি। এবং আমার বিশ্বাস, সাধারণ পাঠকের কাছে এই শ্রেণীর আলোচনাই অধিকতর উপভোগ্য হয়। গত দুই রবিবারের আরো দুইখানি কাগজ পেলে বাধিত হব, গোবরবাবুর কাছে পাঠাব।

এ বৎসরের ছবি মেলা সম্বন্ধে কিছু লিখব কি? তাহ'লে দেখতে যাই। "নিজস্ব শিল্প-সমালোচক" লিখিত ব'লে প্রকাশ করলেই চলবে। মতামত জানতে পারলে সুখী হব। ইতি—

হেমেনদা

30. 1. 53

স্নেহাস্পদেষু

ভাই প্রাণতোষ, মাসাধিক কালের দারুণ রোগযন্ত্রণায় উপন্যাসের প্লট হারিয়ে গিয়েছে কোন্ তেপান্তরের কোথায় কে জানে! ভেবেছিলুম বাঁচব না, তাই তা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি।

এখন আবার ছেঁড়া সুতোর খেই ধরবার চেষ্টা করছি—যদিচ কাজটা সুসাধ্য নয়, দেরী হচ্ছে। আজ লেখা দেব বলেছিলুম, কিন্তু হয়ে উঠল না, কাল পাঠাব। এ যাত্রা বিলম্বের জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো।

এখন আমি আরোগ্যের পথে—অবশ্য বিছানায় শুয়ে শুয়েই। ইতি

হেমেনদা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর চিঠি

বহরমপুর ২৬।১।৫৩

শ্রীতিভাজনেষু,

গত ২৪।৬।৫২ তারিখে আপনি আমায় অনুরোধ করেন আমার ম্যাকবেথ অনুবাদের পাণ্ডুলিপি যেন পত্রপাঠ পাঠাই। তদনুযায়ী আমি পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তার প্রাপ্তিসংবাদ না পাওয়ায় আমি ১১।৭ ও ১৮।৮ তারিখে আপনাকে ২খানি চিঠি দিই। তার উত্তরে আপনি ২০।৮ তারিখে জানান যে লেখাটি "আগামী আশ্বিন থেকে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ছাপা হবে।" আজ পৌষ মাসের বসুমতী পেলাম। আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ কোন সংখ্যাতেই ঐ লেখাটি আরম্ভ করা হয়নি। আপনারই নির্দেশে লেখাটি ৭ মাস পাঠিয়েছি। কোন প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর নির্দেশ ঐ পত্রিকায় প্রতিপালিত হয় না, ইহা পত্রিকাটির গৌরবজনক নহে, লেখকের দুর্ভাগ্য ত বটেই। একমাত্র পাণ্ডুলিপির জন্য উদ্বেগও খুব স্বাভাবিক, কারণ উহার পশ্চাতে ৬।৭ মাসের পরিশ্রম র'য়েছে।

কি ব্যবস্থা করছেন বা করবেন পত্রপাঠ জানালে বাধিত হব। আপনাকে পত্র দেওয়া ছাড়া আমার ত আর কিছু করবারও নেই। নমস্কার গ্রহণ করুন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রীহরিহর শেঠের চিঠি

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

চন্দননগর
২১।১২।৫২

স্নেহাস্পদেষু,—

তোমার ২৭শে তারিখের পত্র পাইলাম। প্রবন্ধটি "আমার পাঠ্য জীবনের স্মৃতি" নাম দিয়া পাঠাইলাম। লেখাটি যেমন আছে, অর্থাৎ ভাষণের আকারেই ছাপান দরকার। স্থানে স্থানে কাটাকুটি যাহা আছে তাহা একটু দেখিয়া যেন ছাপা হয়। যদি সম্ভব হয় শেষ প্রুফ ও কপিখানি একবার আমার দেখিবার জন্য পাঠাইতেও পার।

আজ যখন তোমার পত্রখানি পাই, সেই সময়েই হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রবন্ধটি অন্যত্র প্রকাশার্থ লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহাকে তোমার পত্রখানি দেখাইলাম।

প্রবন্ধটির কোন কপি নাই, যদিই মনোনীত না হয় তাহা হইলে যেন অবিলম্বে ফেরৎ পাই। ১৮৪১ সালের কলেজের ছাত্র বেতনের একখানি বিল পাঠাইলাম উহা খুব দামি document তাহা প্রবন্ধটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। কার্য্য শেষে উহা আমায় ফেরৎ পাঠাইয়া দিও।

মাসিক বসুমতী কেমন লাগচে জানতে চেয়েছ। দ্বিধাশূন্য ভাবে বলিতে পারি ইহা উত্তরোত্তর সকল দিক হতেই সুন্দর হইতে সুন্দর হইতেছে। প্রচ্ছদপটে যে মূল্যবান ছবিগুলি প্রকাশিত হয় তাহা বর্ষশেষে বাঁধাইবার সময় বাদ পড়ে এই জন্য দুঃখ হয়।

আমার শরীর আর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। আশা করি তোমাদের সব ভাল।

প্রবন্ধটি কোন সংখ্যায় প্রকাশ হওয়া সম্ভব পত্রোত্তরে জানাইলে সুখী হইব। ইতি

ভবদীয়
শ্রীহরিহর শেঠ

পুনশ্চ—প্রবন্ধটি যদি প্রকাশিত হয় off print অন্ততঃ ১০।১২ খানি দিলে ভাল হয়। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীহরিহর শেঠ

অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর চিঠি

প্রেসিডেন্সী কলেজ
কলিকাতা
১৪. ৩. ৫২

স্নেহাস্পদেষু,

তুমি একাধিকবার আমার কাছে প্রবন্ধ চাহিয়াছ। তোমাকে একটা লেখা দিতে পারি; তোমাদের মনোনীত হইলে ছাপিতে পার।

এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলিতে চাই। তুমি একদিন আসিবে? শনিবার ছাড়া যে কোন দিন আসিলেই আমাকে পাইবে।

ভরসা করি কুশলে আছ। ইতি

শুভার্থী
শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সৈয়দ মুজতবা আলীর চিঠি

১০৪ কনস্টিটুশন হৌস,
নিউ দিল্লী—১
২৫।৪।৫২

প্রিয়বরেষু,

আপনি যে আমাকে স্মরণ করেছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন কিন্তু উত্তরে কি লিখব ঠিক করে উঠতে পারছি নে।

আপনি আশা করি লক্ষ্য করেছেন যে আমি কলকাতা ছেড়েছি অবধি কোনো বড় লেখা লিখিনি—একটি ছোট গল্পও লিখিনি।

যা সব লিখি—পঞ্চতন্ত্র,' 'দেহলি-প্রান্তে' ইত্যাদি, এগুলো চুটকি লেখা। আপিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিম্বা সাঁঝসকালে সময় চুরি করে এগুলো সাঙ্গ করি! কিন্তু মাসিক বসুমতীর জন্য লিখতে হলে, এই ধরুন 'নর্তকী' শেষ করতে হলে, কিম্বা ছোট গল্প লিখতে হলে যে অবকাশের প্রয়োজন তা তো আমার আদপেই নেই।

দিল্লীতে আমার মন টিকছে না, এবং একথাও অতি অবশ্য জানি যে এখানে থাকলে আমা-দ্বারা বড় কাজ কিছুই হবে না। 'নর্তকী' ছাড়াও তিনপুরুষের বর্ণনা দিয়ে একখানা বিরাট কলেবর দু'হাজার পাতার নভেল লেখার ইচ্ছা ছিল, আপনার কাছে কথা দিয়েছিলুম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রামাণিক বই লিখব (অচিন্ত্যবাবু লিখেছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো অফুরন্ত)—এসব স্বপ্নে পরিণত হবে। তাই দিল্লী থেকে পালিয়ে কলকাতা আসতে চাই এবং তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি কিন্তু কোনো দিক থেকে কোনো ভরসা পাচ্ছি নে।

তাই 'দেহলি-প্রান্তে' 'ডিলি-ডেলি' শত কাজ সত্ত্বেও লিখি এই ভরসায় যে যদি কলকাতায় কিছুই না পাই তবে ঐ দুটো লেখার উপর ভরসা করে চাকরী ছেড়ে কলকাতা চলে আসব। কিন্তু ও দুটো লেখার দর্শনীতে তো চলবে না—কি করি বলুন তো?

অবশ্য 'বসুমতী' এ-মাসিক সে-মাসিকে লিখতে পারি কিন্তু তাতে করে আর কটি টাকা হয়?

কলকাতা আসবার অরেকটা কারণ আছে। আমার গৃহিণী দিল্লীতে থাকতে চান না। তিনি সংস্কৃতে বি. এ.; শিক্ষাদান তাঁর ব্রত। তিনি বলেন, বাঙলা দেশ ছাড়া অন্য কোথাও তিনি কাজ করতে পারবেন না। আমারও বাসনা তিনি যেন তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারেন, এবং আমার সে ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। কলকাতায় আমাদের অন্ন-সংস্থান হলে তিনি অনেক কিছু করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমার দুঃখটা আপনি বুঝতে পারছেন কি? মা-সরস্বতীর সেবা করে এতদিনে বাঙলা ভাষার উপর অতিশয় নগণ্য একটুখানি অধিকার হয়েছে অথচ সে অধিকারটুকু কাজে লাগাবার সুযোগ পাচ্ছি নে। আপনি এবং আরো দু'একজন আমার লেখা পছন্দ করেন, আমাকে ভালো করে লিখতে বলেন সেও কি কম কথা?

উল্টে আমাকে বাকি জীবন এখানে ঘাঁটতে হবে ফাইল! তার জন্য তো আরো মেলা লোক রয়েছেন, এবং তাঁরা ও কাজে আমার চেয়ে অনেক বেশী তালেবর।

তবে কেন তাঁদেরই একজন এ কর্ম করেন না? আর আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। পাঁচ নম্বর পার্ল রোডে আবার সেই কর্ম শুরু করি পূর্বে যা করেছিলুম। আমজদিয়ায় খানা খাব, হাতীবাগানে দাওয়াত মারব, 'বসন্ত-রেষ্টুরেন্টে' ডবল ডিমের মামলেট খেতে খেতে উজীর-নাজির কতল করব, রকে বসে বিড়ি টেনে, আড্ডা জমিয়ে গুষ্টিসুখ অনুভব করব।

আমার পক্ষে দিল্লীর দোস্ত অপেক্ষা কলকাতার দুশমন ভালো।

নমস্কারান্তে
মুজতবা আলী

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি

২৫।১২।৫২

সবিনয় নিবেদন

বসুমতী সংস্করণ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের চতুর্থ খণ্ডটি, কী ক'রে জানি না, আমার বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে। এতে আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছি, কেননা মহাভারত আমার সদাসর্বদাই কাজে লাগে। বইটি শুনলুম ছাপাও নেই, কিন্তু আপনাদের আপিস থেকে কোনো রকমে এক কপি চতুর্থ খণ্ড যদি আমাকে পাঠাতে পারেন তাহ'লে অত্যন্ত বাধিত হই। ময়লা বা পুরোনো হ'লেও আপত্তি নেই, পড়া গেলেই হলো। আমি জানুয়ারির তিন তারিখে আবার দিল্লী রওনা হচ্ছি, অতএব যথাসম্ভব সত্বর এ বিষয়ে আপনার উত্তর পাবার আশায় থাকলাম। আশা করি আপনার কুশল। ধন্যবাদ।

বুদ্ধদেব বসু।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

আলমবাজার
৮. ১. ৫৩

প্রিয়বরেষু,

অনেকটা এগিয়েছি। অন্য কাজের চাপ পড়ল। যতটা লিখেছি অনায়াসে আরম্ভ করা যায়—ভেবেচিন্তে আরম্ভ এগিয়ে আপনাকে দেওয়া ঠিক করলাম। সেটাই নিরাপদ। আগে দু'বার উপন্যাস সুরু করে সম্পূর্ণ করি নি। তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে!

মাঘ-ফাল্গুন দু'মাসে যেন সবটা বেরিয়ে যায়, এই অনুরোধ। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাস্থবিরের চিঠি

2, Raghunath Chatterjee Street
Calcutta—6
26. 2. 53

প্রিয়বরেষু—

প্রাণতোষ, এবারেও আমার লেখাটা বেরোয়নি দেখছি। ওটা প্রকাশ করতে কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? তা হোলে তর্জমা করা কি বন্ধ ক'রে দেব। বেরুচ্ছে না দেখে আমিও কাজ বন্ধ রেখেছি।

আশা করি ভাল আছ। আমি একপ্রকার। ইতি

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

অন্নদাশঙ্কর রায়ের চিঠি

শান্তিনিকেতন, বীরভূম
২৩।৪।৫৩

প্রীতিভাজনেষু,

আমাদের এখানে যে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার পূর্ণ বিবরণী এখন পর্যন্ত কোনোখানে প্রকাশিত না হওয়ায় উদ্যোক্তারা নিজেরাই একটি বিবৃতি লিখে প্রকাশ করতে দিচ্ছেন। এটি যদি দৈনিক ও মাসিক বসুমতীতে দয়া করে ছাপেন তা হলে সাধারণের মনে যেসব ভুলভ্রান্তি জন্মেছে তার নিরসন হবে। এটি আরো আগে পাঠানো উচিত ছিল, কিন্তু উদ্যোক্তারা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় বিলম্ব হলো। এর জন্যে তাঁরা দুঃখিত। নমস্কারান্তে। ইতি

ভবদীয়
অন্নদাশঙ্কর রায়

সুধীরচন্দ্র করের চিঠি

শান্তিনিকেতন, ৭. ৫. ৫২.

সবিনয় নিবেদন,

২৬শে জানুয়ারি তারিখে প্রেরিত আমার লেখা 'স্বাধীনতা ও রবীন্দ্র' নামক প্রবন্ধটি একবার যদি দয়া ক'রে আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন তো ভালো হয়। আমি ঐ লেখাটিতে আরো-কিছু উপাদান যোগ ক'রে দেব। আগামী আষাঢ়ের 'মাসিক বসুমতী' ১০, ১২ শ্রাবণ নাগাদ বোধ হয় বেরুবার কথা। আর ২২শে শ্রাবণ কবির তিরোধান-তিথি। আষাঢ় সংখ্যায় না হয়তো 'শ্রাবণ' সংখ্যায়ও ঐ লেখাটি যেতে পারে। ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানদিবস কাছাকাছি রয়েছে।

এবারের "লোকসেবক রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটি যেখানে বসে তার কাছাকাছি কবির হাতের লেখার ব্লক দুটি পিঠাপিঠি ছাপালে অনেকটা প্রাসঙ্গিক হবে। লোক সাধারণের নানা হিতকর উদ্যোগে —ও সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগে কবির যে কিরূপ যোগ ছিল,— ব্লক দুটি থেকে তা আরো পরিস্ফুট হবে।

১ম ব্লকখানি, যার আরম্ভে আছে "মাতৃভূমির যথার্থ স্বর গ্রামের মধ্যেই।…" তার নিচে পরিচায়ক কথাগুলি বসবে:

"১৯২১ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত বর্ধমান বিভাগীয় সমবায়-সম্মেলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী।"

আর, ২য় ব্লকখানি, যার আরম্ভে আছে—"যে সময়ে দাত অভাব ছিল না ব'লে বাংলাদেশের গ্রামে জলের অভাব ছিল না…" তার নিচে বসাবার কথাগুলি এই:—

"শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত গ্রাম ভুবনডাঙার বাঁধ সংস্কার কার্যের উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের লিখিত আবেদনপত্র।"

ব্লকের নিচে মন্তব্য ছাড়াও, পৃথক্ ভাবে ওরি এক দিকে আশেপাশে একটু অতিরিক্ত মন্তব্য থাকবে যে,—

"বাঁধগড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত নন্দলাল চন্দের সৌজন্যে সমবায় সম্মেলনের আশীর্বাণীর পাণ্ডুলিপি; এবং ভুবনডাঙা গ্রামের জনাব রোস্তম শেখের সৌজন্যে বাঁধ-সংস্কারের আবেদনপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত। দ্র: মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৫৭, "প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ —শ্রীসুধীরচন্দ্র কর পৃঃ ৬৩৬-৩৭।"

'কবি-কথা'-বইখানির সম্বন্ধে শীঘ্রই যদি দৈনিকে ও মাসিকে একটু অভিমত প্রকাশ করেন তো উপকৃত হই।

আশা করি, কুশলে আছেন। নমস্কারান্তে, ইতি—

নিবেদক
শ্রীসুধীরচন্দ্র কর।

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

মধুময়

—নির্মল দত্ত
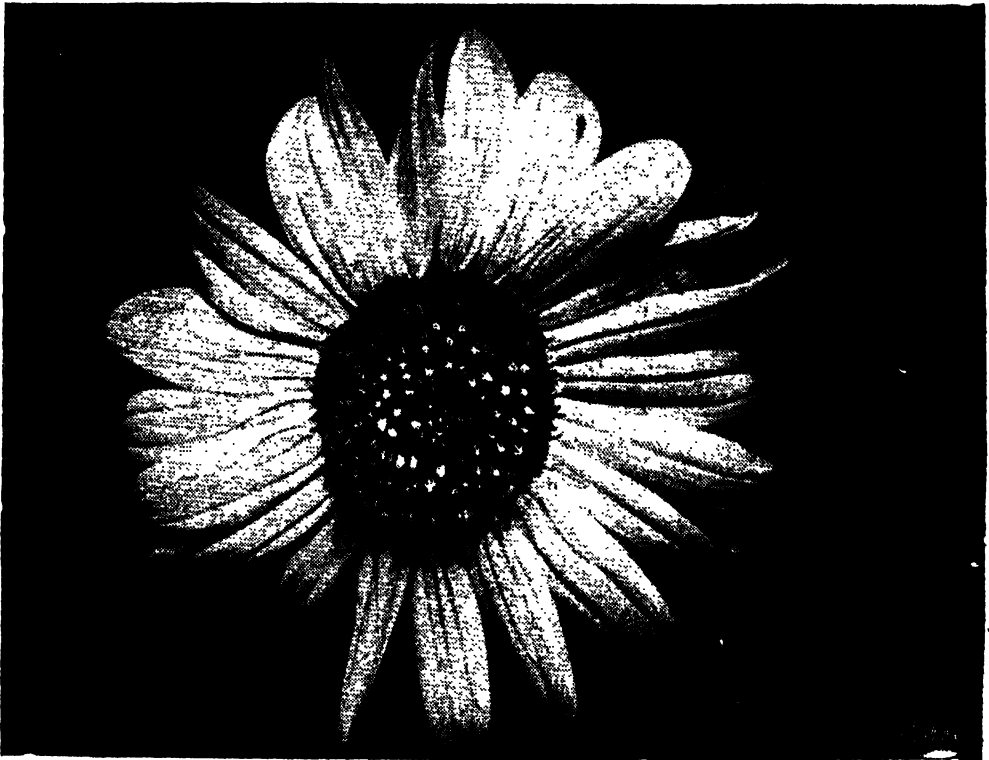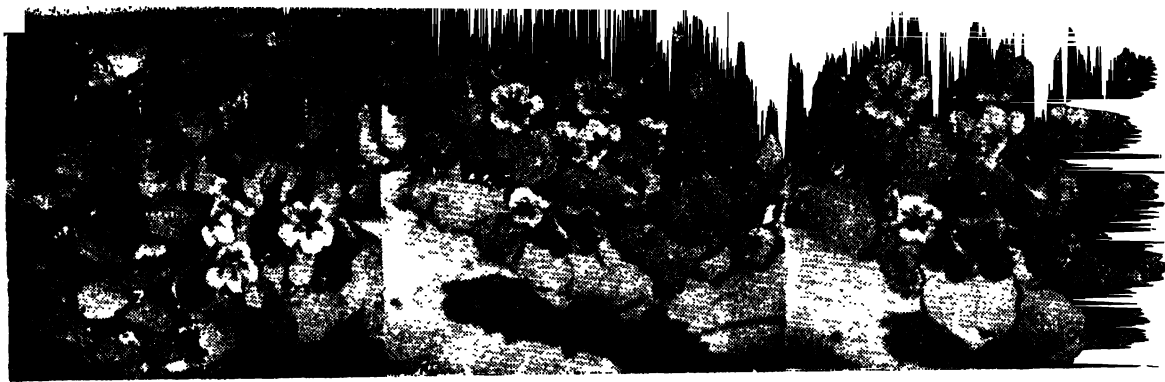
প্রজাপতি —শি, সু বসু

ঝড়ের পরে —অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

(তৃতীয় পুরস্কার)

পদ্মবন

—মীনাবাণী দাস

পদ্মদীঘি
—দেবেন্দু রায়চৌধুরী
(প্রথম পুরস্কার)

—প্রতিযোগিতা—

বৈশাখ সংখ্যার জন্য অসংখ্য ফুলের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হওয়ায় আগামী সংখ্যাতেও পুষ্পদস্তার উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। ফুলের ছবি হয় তো আরও অনেকের সংগ্রহে আছে, ২২শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে পাঠাতে পারেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্র ব্যতীত প্রকাশযোগ্য ছবিও মুদ্রিত হবে।

চাঁদ দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

দোতলায় লিফটের সামনাসামনি একটা ঘরে ভারতীয় দলের অফিস। দরজার সামনে নোটিশবোর্ড। হরেক রকম নোটিশ বেরুচ্ছে দিনের মধ্যে অমন বিশবার। উঠা-নামার মুখে বোর্ডে অতি নিশ্চয় উঁকি দিয়ে যাবেন—কি আপনার করণীয় অতঃপর। সেক্রেটারি বিস্তর—লেখাজোখারও সেজন্য অবধি নেই। বহু সন্ন্যাসীর কর্মতৎপরতায় দরকারি জিনিষটাই অবশ্য বাদ পড়ে থাকে কখনো কখনো।

সোভিয়েট-ডেলিগেটরা নিমন্ত্রণ করেছেন, ব্যাঙ্কুয়েট-হলে সন্ধ্যার সময় খাওয়া—ফিরে এসে নোটিশবোর্ড থেকে অবগত হওয়া গেল। আর কুমুদিনী মেহতা মুখে বললেন, জনকয়েক সাহিত্যিকের মধ্যে মোলাকাতের চেষ্টা করা যাচ্ছে। হয়তো বা এখনই। ঘরে থাকবেন, বেরিয়ে পড়বেন না।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই—অমন আপন জন বিদেশ-বিভূঁয়ে আর কে? চোখ ঠেরে কুশলাদি সুধাবো, খবর কি ভায়ারা? লেখনী-পেষণের কারবার চলে কেমন ওদিকে? খাতির পাও, সভায় ডাকে, বই-টই কিনে পড়ে তো সবাই—না মুফত বাগাবার চেষ্টা?

চারতলার ঘরখানায় কবি-সাহিত্যিক গিজগিজ করছে। অর্থাৎ ডাকসাইটে কতকগুলো মিথ্যুক আর অকর্মা জুটেছে এক জায়গায়। কথার সঙ্গে কথা জুড়ে বাজে কাজে বসে বসে তারা দিন কাটায়। শাস্ত্রের বচন—একশ'বার মিথ্যে কথা বলবে, কিন্তু মা লিখ, মা লিখ। আর এই দুর্বৃত্তেরা (আমি, আর আমার মতন যারা গল্প উপন্যাস লেখে) মিথ্যে কথা হরদম লিখে দেশ-বিদেশে বুক ফুলিয়ে প্রচার করে।

জন ত্রিশেক হবো আমরা গুণতিতে। ধুরন্ধর রাজনীতিকদের স্থান নেই। অথবা তাঁরাই আসবেন না এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে। আলোচনা বিশেষ ভাবে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের সঙ্গে। তার মধ্যে আছেন তুর্কি-কবি নাজিম হিকমৎও। ভদ্রলোকের কবিতার গুঁতোয় তুর্কি-সরকার তেড়েফুড়ে শুধু মাত্র কবিতা নয়—কবিকেও বের করে দিয়েছেন দেশ থেকে। অগতির গতি রাশিয়ার আশ্রয়ে তিনি আছেন। মস্কোয় বসতি।

কি সব তাগড়া জোয়ান! কলমবাজিতে উদরপূর্তি করে এমনধারা চেহারা বাগিয়েছে—আমাদের কালোবাজারিরাও যে হার মেনে যায়। নাজিম হিকমতের অনেক কবিতা বাংলায় পড়েছি—ভারি ঔৎসুক্য কবিকে দেখবার। এত বড় কবি—অতএব কিঞ্চিৎ ললনা-মোহন আহা-মরি গোছের ভাব থাকা উচিত। সে-সব একেবারে কিচ্ছু নয়, মুসড়ে গেলাম—ইয়া দশাসই জোয়ান, টকটকে ফর্শা রং। একটা পা খোঁড়া, লাঠি নিয়ে চলতে হয় সর্বদা।

ছোট ছোট দল হয়ে গেল তুরশুন, কোজেভনিকভ, হিকমৎ—এমনি এক একজনকে নিয়ে। আমরা দলের নেতা খোদ অ্যানিসিমভকে নিয়ে পড়লাম। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার! সাহিত্যিক ও সাহিত্যের অধ্যাপক, তার উপরে সোভিয়েট লিটারেচার সম্পাদনা করেন। দেহ-গৌরবেও হিমালয় পর্বতের বড় বেশি কম যান না। (সকলের হিংসা করে মরছি, এ অধমও অবশ্য হেলাফেলার বস্তু নন আয়তনের দিক দিয়ে)

ব্যবস্থাপনা কুমুদিনী মেহতার—তিনি পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দীর্ঘকাল বিলাতে ছিলেন, জলের মতো ইংরেজি বলেন। রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, রুশ ভাষাতেও দিব্যি দখল। আসল দোভাষী হলেন পোপোভ—ইংরেজিনবিশ, কাগজের সম্পাদক ইনিও। কথাবার্তার মধ্যে কুমুদিনী ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে, দুর্বোধ্য এক একটা জিনিষ সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

গোড়ায় আমি একাই শুরু করেছিলাম। একটা সোফার এপাশে আমি, মাঝে অ্যানিসিমভ, ওপাশে পোপোভ। ইণ্ডিয়ার উপন্যাসকার শুনে গভীর আন্তরিকতায় হাত জড়িয়ে ধরলেন আমার। আহা, টেগোরের দেশের লেখক তুমি, টেগোরের উত্তরাধিকারী!

মনে মনে প্রণতি জানাই গুরুদেবের উদ্দেশে। দেশে দেশে কত সম্মান ছড়িয়ে গেছ তুমি আমাদের জন্মে! আজ কতকাল পরে পিকিন হোটেলের চারতলার ঘরে মানুষগুলো ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে রইল—তোমার রেখে-আসা ইজ্জত সগৌরবে মাথায় তুলে নিলাম। তাই তো বলি, বাইরে না এলে দৃষ্টি খোলে না, বোঝা যায় না নিজেদের যথার্থ মূল্য। সঙ্কীর্ণ দেয়ালে মাথা খুঁড়ে বেড়াই, কূপের ভেকের মতো ভ্রান্ত অহমিকায় স্ফীতোদর হই। তোমার বিশ্বজনীনতা একদা সমালোচকের উপহাসের বস্তু হয়েছিল: বিশ্ব যে ক্রমে ঘরের মধ্যে এসে যাচ্ছে, উঁচু হয়ে দেয়ালের বাইরে নজর তুলে দেখে নি তারা একটিবার। বাইরে এসে উপলব্ধি হয় টেগোর-নেহরু-নেতাজির মহিমা।

ইতিমধ্যে আরও অনেকেই ঝুঁকেছেন এই দিকে। সোফায় জুত হয় না—তখন নিচের কার্পেটে গোল হয়ে বসি।

অ্যানিসিমভ বললেন, আমাদের সম্বন্ধে ধারণা কি তোমাদের দেশে? বিশেষ করে তোমাদের সাহিত্যিক মহলে? অনেক রকম ভুল ধারণা জন্মাবার চেষ্টা হয়—কি বলো?···আচ্ছা, এই কিছুদিন আগে এক দল গিয়েছিলেন আমাদের দেশে। কেউ কিছু লিখলেন, খবর রাখো?

নজর বন্ধ রেখে চলি, অনেকেই অবশ্য আমরা। কতক অভ্যাসের বশে, কতক বা স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু ওখানে তা কাঁস

করতে যাই কেন? বললাম, (আর তা মিথ্যাও বড় নয়) তোমাদের সম্পর্কে বড় আগ্রহ ভারতের মানুষের। রবীন্দ্রনাথ সেই যে 'রাশিয়ার চিঠি' লিখলেন, আগ্রহ সেই থেকে সর্বব্যাপ্ত হয়েছে। বলেছ ঠিকই—নরকের কীট বলে ঢাক বাজাবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু সমস্ত বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তোমরা যে মানব-সমাজ নিয়ে অতি আশ্চর্য এক্সপেরিমেণ্ট করছ এবং বিস্ময়কর সাফল্যও পেয়েছ—শত চেষ্টাতেও এ সত্য লুকানো যাবে না। চিরাচরিত ভাবনার মূল ধরে নাড়া দিয়েছ তোমরা। শুধুমাত্র থিয়োরি নয়—হাতে কলমে তা রূপায়িত করে দেখিয়েছ। আরো দেখাবে।

রাশিয়া থেকে ফিরে হালে যা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে সত্যেন-দা'র বইটার কথা মনে ছিল। দরাজ ভাষায় তার পরিচয় দিলাম। অ্যানিসিমভ বললেন, কে লিখেছে বললে—মজুমদার?

মজুমদার, মজুমদার···বার কয়েক বলে লেখককে মনে আনবার চেষ্টা করছেন।

বললাম, রাশিয়া আর চীনের কথা লোকে বড় শুনতে চায়। ছেলেপুলের রূপকথায় যেমন কৌতূহল, তেমনি যেন কতকটা। সত্যেন বাবুর বইটা যে মাসিকপত্রে বেরিয়েছিল, তার সম্পাদক আমাকেও অনুরোধ করেছেন। ফিরে গিয়ে চীনের কথা ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।

অ্যানিসিমভ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, লিখবে তুমি? মানুষে মানুষে সত্য পরিচয় হোক, সব চেয়ে বড় কাম্য এটা। বিশ্বশান্তি এতেই আসবে। আর, রাজনৈতিক নয়—সাহিত্যিকেরই এ কাজ প্রধানত।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলি, আমিও ঠিক এমনি ভাবছি। মানুষই আসল। চীনের কথা যা লিখব তাতে থাকবে না সংখ্যাতত্ত্ব বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। ও সব বুঝিও নে। মানুষেরা থাকবে আমার কাহিনী জুড়ে। সামান্য আর মহৎ যত মানুষ দেখতে পাচ্ছি। তাদের এই সুবিপুল উল্লাস আর কঠিনতম সাধনা।

জমে উঠেছে আমাদেরই সব দলের চেয়ে বেশি। উমাশঙ্কর যোশী আর অধ্যাপক শুকলা এলেন এই দিকে। এলেন কেরালার লেখক জোসেফ মুণ্ডেশেরি। আর যাঁরা ছিলেন, মনে করতে পারছি নে।

সোভিয়েট সাহিত্য পড়ো তোমরা? কোন কোন লেখক তোমাদের প্রিয়, জানতে ইচ্ছে হয়।

শুধু ঘাড় নেড়ে এবার নিস্তার নেই। তা আমরাও পিছুপাও কিসে? গড়-গড় করে কতকগুলো নাম বলা গেল। এ কালের শুধু নয়, সেকালেরও। আর উমাশঙ্করের, সত্যি, প্রচুর পড়াশোনা। কোন একটা ভাল বইয়ের পাতা ধরে যদি একজামিন করতে বসে, তা-ও বোধ করি তিনি হার মানবেন না।

টলষ্টয়ের সম্বন্ধে বললাম, কৈশোর থেকে তাঁর লেখায় অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছি। মহাত্মা গান্ধী আমাদের হৃদয়ের মানুষ—টলষ্টয়ের আসনও দূরবর্তী নয়।

অ্যানিসিমভ উল্লসিত হলেন।

দেখ, আগামী বছর টলষ্টয়ের একশ' পঁচিশ জন্মবার্ষিকী। জাঁকিয়ে উৎসব করতে চাই এই উপলক্ষে। আর বুঝতে পারছ—এ হল আসলে সাহিত্যিকদেরই অনুষ্ঠান, তাঁরা জমায়েত হবেন সব চেয়ে বেশি। ভারত থেকে অনেক সাহিত্যিককে আমরা চাই, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাঁরা জীবন্ত পরিচয় স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে, আশা করি, পুরোপুরি সহযোগিতা পাবো তোমাদের—

নিশ্চয়, নিশ্চয়—

ওরে পাগলা ভাত খাবি, না—হাত ধোব কোথায়? আমাদের হল সেই বৃত্তান্ত। এক পায়ে খাড়া সেই আশ্চর্য দেশের নিমন্ত্রণ নিয়ে সহযোগিতার প্রমাণ দিতে। কিন্তু চেপেচুপে মনোভাব প্রকাশ করতে হয়—হ্যাংলামি বেরিয়ে না পড়ে।

তার পর এক মোক্ষম প্রশ্ন উমাশঙ্করের। যে সন্দেহ অনেক মানুষের মনে।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নেই নাকি সোভিয়েট-রাষ্ট্রে? চিন্তার প্রকাশ যথেচ্ছ করা চলে না। সাহিত্য ফরমাস মতন তৈরি হয়, চিত্তের স্বতস্ফূর্ততায় গড়ে ওঠে না। দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপনি—আপনার মুখ থেকে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ভাবে জানতে চাই।

হাঁ, এমনি রটনা হয় বটে! ভাল হল আপনাদের প্রশ্নটা পেয়ে।

ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন আমাদের দিকে চেয়ে। মুখে মৃদু হাসি। বললেন, সত্য আমাদের দিকে। কিছু লুকোবার নেই কারো কাছে। পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকা সম্ভব শুধুমাত্র সেইখানে, যেখানে যথার্থ গণতন্ত্র বর্তমান। সে আমাদের দেশেই।

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, সোভিয়েটের পঁয়ত্রিশ বর্ষব্যাপী অস্তিত্বের মূলনীতি হল, যা-কিছু ভাল সমস্ত সর্বসাধারণের সম্পত্তি। লোক আর লেখকের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। লেখকের চিন্তা-চেষ্টাই সাহিত্যের বাণী। সাহিত্য নিতান্তই জনমনের প্রতিধ্বনি। মায়ের যেমন সন্তান সম্পর্কে প্রত্যাশা—জনগণও ঠিক তেমনি আশা করে, লেখক কর্তব্যপর হবেন—লেখার ইষ্টানিষ্ট অনুধাবন করবেন।

অ্যানিসিমভের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা। এক গণ্ডা কলম উদ্যত হয়ে আছে, চলছে একটি মাত্র—পোপোভের কলমটা! তিনি নোট নিচ্ছেন। বক্তা থামলে ঐ নোট দেখে তিনি ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেবেন। তখন ছুটবে আমাদের কলমের পাল্লা। একটি কথা বাদ না পড়ে, এতটুকু হেরফের না হয়।

একটি কথা অ্যানিসিমভ বারম্বার উচ্চারণ করছেন—'নারোডা' ঝগড়া বাধাতে হলে আমরা 'নারদ, নারদ'—বলে কলহ-দেবতার আবাহন করি—সেই নামটা অবিকল। হাসি পায়, মজা লাগে। পোপোভের অনুবাদের সময় টের পাওয়া গেল, রুশীয় 'নারোডা' হলে জনগণ। ওটা কিন্তু আমাদের দেশের হলেই ঠিক হত। এ ঝগড়াঝাটি ও লাঠালাঠি পরস্পরের মধ্যে—তাঁরা যে নির্ভেজাল নারদ অত্র সন্দেহ নাস্তি।

অ্যানিসিমভ বলছিলেন, জীবন বৈচিত্র্যময়। সাহিত্যে জীবন সত্য রূপায়িত হয়, অতএব আলো-অন্ধকার নিশ্চয় থাকবে। লেখকের কর্তব্য হল সত্যের উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে সোভিয়েট-লেখকদের চেয়ে বেশি বিমুক্ত কে?

জোর দিয়ে বললেন, সর্বাধিক মুক্ত আমাদের লেখকেরা। সোভিয়েট-কাঠামোর ফল এটা। কেউ যখন মিথ্যা রটায়, সোভিয়েট লেখকের স্বাধীনতা নেই—আমরা হাসি। এসে বরঞ্চ নিজের চোখে দেখ, দেখে নিঃসংশয় হও।
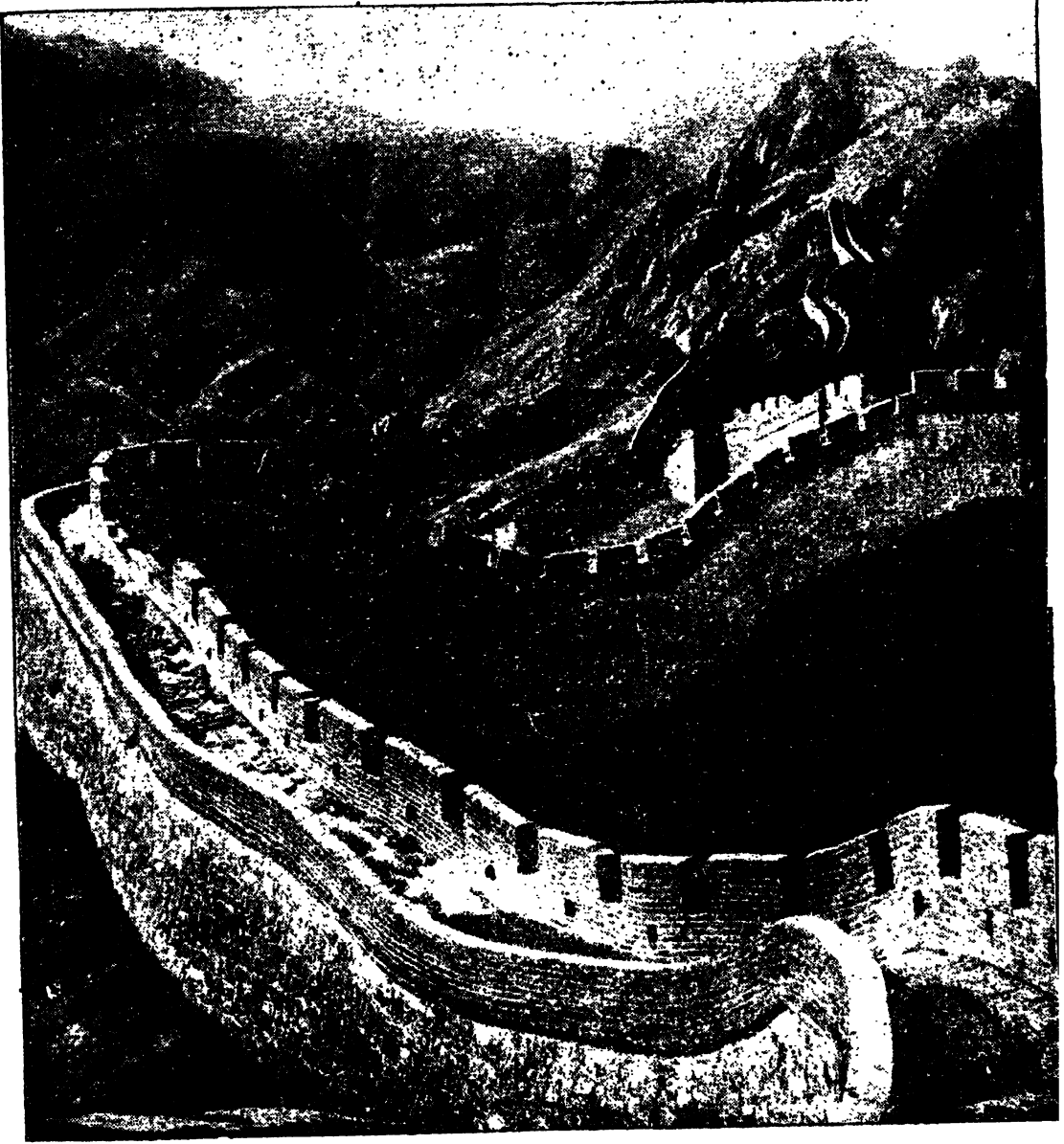
চীনের বিখ্যাত প্রাচীর

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রশ্নটা জনগণের দাবির সঙ্গে বিজড়িত। গণতান্ত্রিক সমাজে সব চেয়ে বড় শক্তি গণদাবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহিমময় লেখক (রবীন্দ্রনাথের নাম একাধিকবার উচ্চারণ করলেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। নাম করছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আলাপনের গোড়ার দিকে বুক চিতিয়ে বলেছিলাম—বাংলার লেখক আমি, বাংলা ভাষায় লিখি—যে ভাষায় টেগোর লিখেছেন। অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য বলতে আপাতত দু'জনকে ওঁরা জেনে রাখলেন—টেগোর এবং এই অধম) নিশ্চয় অবাধ সুযোগ পাবেন খুশিমতো লিখবার। কারণ তিনি জনগণের কাছাকাছি—লোকের শুভাশুভ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি প্রখর ও আবিলতা-শূন্য। কিন্তু ব্যক্তিসর্বস্ব নৈরাশ্যবাদী লেখক—যিনি মানুষ চেনেন না, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই যাঁর—তাঁর খেয়ালখুশি বাধা পাবে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের বই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি—ভারতের আত্মার সন্ধান পাই সেখানে, ভারতের চিরকালের মানুষদের দেখি। তা বলে টি. এস. এলিয়টের সম্পর্কে এ কথা খাটবে না। রবীন্দ্রনাথ একেবারে পৃথক মনোভঙ্গি নিয়ে লিখলেও সে রচনা আমাদের আদরণীয়...

আর নয়, গা তুলুন এবার। ঘোর হয়ে এলো। ভোজের

আসর এখনই। এঁরা খাওয়াবেন আজ আমাদের। খাওয়া এবং বক্তৃতা আছে, কিন্তু সব চেয়ে বড়ো জিনিষ হাসি-রহস্য, গা এলিয়ে বসে আজেবাজে গল্পগুজব। কে বলবে, বিশ্বের এ-পাড়ায় আমাদের ঘর—আর ওরা হল ও-পাড়ার? সব বিভেদ ভুলে মেরেছি। একটা ঘরের মধ্যে এখন আমরা এক পরিবারের লোক।

না, খাওয়ার ফিরিস্তি আর নয়। বুঝতে পারছি, পাঠকবর্গের প্রতি নিষ্ঠুরতা হচ্ছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপমা দিতেন, পাঁজিতে দশ আড়া জল লেখে, পাঁজি নিংড়ে এক ফোঁটাও মেলে না। পিকিন-ডাকের (স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে ঐ বস্তুর নাকি জুড়ি নেই) আধখানা ঠ্যাং-ও খাওয়াতে পারব না, কেন মিছে রসনা লালায়িত করা?

একদিন এক বিষম কাণ্ড হয়েছিল, তবে শুনুন।

খাওয়ার টেবিলে গল্পগুজবের মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে আমাদের একজন বললেন, জল—

গেলাস ভরতি জল (খোটান জল অর্থাৎ) দেখে চমক ভাঙল, অ্যাঁ?

জলই তো চাইলেন—

ভুল করে চেয়ে বসেছি। জল বদলে লেমনেড বা অরেঞ্জস্কোয়াশ দাও ভাই,—

চল্লিশ দিন চলেছে এই রকম। আদরের অতিথি—জল খাবো কেন—হ্যাঁ? আর যাই হোক, আমাদের দেশঘরে ও-বস্তুর অভাব নেই।

ঘুরে ফিরে আবার ঐ খাওয়ার কথা। যাক গে, মোটামুটি একটা বিধি জেনে রাখুন শুধু। সকালে খাওয়া, দুপুরে খাওয়া, রাত্রে খাওয়া। আলোচনায় বসলে খাওয়া, ট্রেনের মধ্যে প্লেনের মধ্যে খাওয়া, যেখানে যাচ্ছি এবং যা-কিছু করছি সর্বক্ষেত্রেই সুবিধামতো খাওয়ার আয়োজন। খাওয়ার প্রসঙ্গ পারতপক্ষে আমি আর তুলবো না—কমা-সেমিকোলন দাঁড়ির মতো আপনারা জায়গা বুঝে ঐ ব্যাপার মনে মনে বসিয়ে নেবেন।

রাত্রে ঘরে ঢুকবার সময় নোটিশ-বোর্ড দেখে লাফিয়ে উঠলাম, সকালবেলা স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে বেরুনো হবে মহাপ্রাচীর দেখতে।

মন উড়ল কত দিন-মাস-বছর পিছিয়ে, কত দেশদেশান্তর পার হয়ে। কোথায় এই পিকিন শহর, কোথায় বা সে-কালের নিতান্ত সাধারণ জনবিরল একটি গ্রাম ডোঙাঘাটা? মধ্য-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় ঘিরে বসেছি প্রহ্লাদ মাষ্টার মশাইকে। জগতের সপ্ত আশ্চর্যের গল্প বলছেন। শিশুদলের চোখে মুখে আনন্দ-কৌতুক। কোন দেশে বিশালাকার রাক্ষুসে ঘণ্টা বাজছে ঢং-ঢং করে। সুনীল সমুদ্রে-ঘেরা সাইপ্রাস দ্বীপে পিত্তল মূর্তি দুই গিরি-চূড়ে দুই পা রেখে অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে আছে, নৌকো-জাহাজ চলাচল করে নিচে দিয়ে। ব্যাবিলনের আকাশব্যাপ্ত সুবিশাল উদ্যান। আর ঐ মহাপ্রাচীর—'দ্বাদশটি অশ্বারোহী প্রাচীরের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে পারে—'? খটাখট খটাখট ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে—গিরি-নদী-কান্তার অতিক্রম করে ছুটেছে—গ্রামশিশুর দৃষ্টির উপর ঝিলিক দিয়ে যায় তারা, কানে বাজে অশ্বখুরের ধ্বনি।

সেই মহাপ্রাচীর চোখে দেখতে যাচ্ছি। মিলিয়ে দেখব, আমার শিশুকল্পনার সঙ্গে কতখানি মেলে আসল বস্তু। তাই তো ভাবি, স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি—এমনি কত কি পেলাম এই জীবনে! সত্য বলে ভাবতে ভরসা পাইনে, প্রাপ্তির এমন দু'কূলব্যাপী প্রবাহ। ভাল করে চোখ কচলে সুস্পষ্ট চিত্তে দেখতে ভয়-ভয় করে, স্বপ্ন হয়ে মুছে যাবে বুঝি এ সমস্ত!

সকাল পৌনে ন'টায় পিকিন ষ্টেশনে। বাইরে ভিতরে অপরূপ সাজিয়েছে। শান্তির কপোত, পতাকা, ফুল। আর টাঙিয়ে দিয়েছে—লাল সিল্কের কাপড়ে তৈরি একরকম উৎসব-মাঙ্গল্য—নাম জেনে এসেছি সা-তেং (sa-teng)। লাউড-স্পীকারে গান হচ্ছে। ছেলেমেয়ের দল, সৈন্য ও মাতব্বরেরা বিদায় দিতে এসেছেন। হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, হাততালি দিচ্ছেন একতালে। সারা ষ্টেশন গমগম করছে।

শহর ঘিরে যে দৃঢ় অত্যুচ্চ পাঁচিল আছে, ষ্টেশন তার বাইরে একেবারে পাঁচিলের লাগোয়া। প্লাটফরমের পশ্চিম দিক হচ্ছে পাঁচিল। পাঁচিল থেকে কতকটা দূর অবধি বাগান, রংবেরঙের ফুল ফুটে আছে সেখানে।

স্পেশাল ট্রেন কিনা—নতুন রং-দেওয়া ঝকঝকে গাড়ি, চেয়ারে টেবিলে ধবধবে চাদর পাতা। প্রতি কামরার দরজার কাছে মাতব্বরদের এক একজন দাঁড়িয়ে। সেকহ্যাণ্ড করে সমাদরে গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন।

আলোয় চীনা অক্ষর ফুটে আছে ল্যাভেটরির সামনে। তার মানে, খালি আছে—এখন ব্যবহার করতে পারো। মানুষ ঢুকলে আলোর লেখা আর থাকবে না।

পাঁচিলের ধারে ধারে ট্রেন চলেছে। কঠিন বিশাল পাঁচিল—গিয়েছেও কতদূর! এ বস্তুও কম আশ্চর্য নয়। লাইনের ওদিকে গড়খাই—তার ওপাশে ঘরবাড়ি। রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে গড়খাইর জলে। একটা বিড়াল বসে আছে চুপচাপ। গরু-ছাগলের পাল। ছেলেমেয়ে কোলে গ্রাম-বৃদ্ধেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। দুটো ষ্টেশন ছাড়িয়ে এলাম, একটানা পাঁচিল তবু চলেছে আমাদের বাঁদিকে।

চেয়ারের হাতলের পাশে বোতাম টিপলে আংটির মতো জিনিষ বেরিয়ে আসে। ঐখানে কাচের গেলাস বসিয়ে চা দিয়ে গেল। দুধ-চিনিবিহীন সোনার বর্ণ চা—খুব সুগন্ধ, ফুলের রেণু মেশায় ওরা চায়ের সঙ্গে।

আর একরকম আছে—সবুজ চা। জলে পাতা ফেললেই সবুজ রং হয়ে যায়। এই জাতীয় চায়ের—বিশেষ করে হ্যাংচাউ অঞ্চলে যা উৎপন্ন হয়—ভারি নামডাক।

চীনারা হল বনেদি চা-খোর। সময় অসময় নেই, জায়গার বাছবিচার নেই—সর্বক্ষেত্রে চা। 'চা' কথাটাও খাঁটি চীনা। আমরা দুধ-চিনি মিশিয়ে খাই শুনে ওরা হেসে খুন। ওতে স্বাদ-গন্ধ থাকে কিছু? চায়ের কয়েকটা পাতা না ফেলে শুধু দুধ-চিনি খেলেই তো পারো। ওদের ঐ চা-ভেজানো জলে গোড়ায় তেমন মউজ হত না আমাদের। পরে মজা পেয়ে গেলাম। অবোধ অতিথিজন বলে করুণাপরবশ হয়ে যদি দুধ-চিনি দিতে আসত, আমরাই তখন হাঁ-হাঁ করে উঠতাম।

দেখ, দেখ—কত পাতিহাঁস একটা পুকুরে! যেন এক রাশ

শ্বেতকুসুম ফুটে আছে। পাখি নেই—কাল যে বলাবলি হচ্ছিল? কিচমিচ করে আমাদের জানালা দিয়ে এক ঝাঁক উড়তে উড়তে সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

লাউড-স্পীকারে বারবার মার্জনা চাইছে। সামনের ষ্টেশনে গাড়ি পাঁচ মিনিট থেমে থাকবে ইঞ্জিন বদলানোর জন্ত। পাহাড় অঞ্চলের শুরু—গাড়ির গতি কমবে এবার থেকে।

বিনামূল্যে যদিচ—টিকিট দিয়েছিল আমাদের প্রত্যেককে, সেই টিকিট চেক করতে এলো। গটমট করে কাজ করে বেড়াচ্ছে—বাপরে বাপ, পোষাক-পরা যত সব জাঁদরেল কর্মচারী। কাছে এলে সন্দেহ হয়, ঠাহর করে দেখি। কে বট হে তুমি? অত লাবণ্য চাপা দেওয়া আছে রেলের টুপি ও কোটপ্যাণ্টে। হাসলেই তখন ধরা পড়ে যায়। নতুন-চীনের কর্মচঞ্চলা মেয়েরা। রূপালি দাঁতের ঝিকমিকে সরল হাসি—অমন হাসতে ওরাই শুধু জানে। ড্রাইভার ছাড়া এ গাড়ির প্রতিটি কর্মচারী মেয়ে। মেয়ে-ড্রাইভারের গাড়িতেও চড়েছি এর পরে। এই বিপুল শক্তি ও মাধুর্য অন্ধকারে গুহায়িত হয়ে ছিল—এবারে ছাড়া পেয়েছে। তিন বছরের নতুন-চীনের তাই এমনতরো শক্তিমত্তা।

পাঁচ মিনিট তো অঢেল সময়—ট্রেন থামতে না থামতে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল প্রায় সকলে। আমার দরজার সামনে দেখি, হাত বাড়িয়ে আছে কটা-চুল ঘোলা-চোখ লালমুখো এক সাহেব। আকারে বর্ণে পুরোপুরি সেই বস্তু—দেশে ঘরে এই সেদিন অবধি যাদের এক শ' হাত এড়িয়ে চলতাম। হাত জড়িয়ে ধরল সাহেবটা, কি-একটা নাম বলল, বাড়ি নিউজিল্যাণ্ড। সাগর থেকে নতুন-ওঠা ভূমি—তাই নিউ সি-ল্যাণ্ড বা নিউজিল্যাণ্ড। এই ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললাম, নবীনতম আর প্রাচীনতম সুদূরবর্তী দু'টি ভূমিও বুঝি আজ ভালবাসায় বাঁধা পড়ল আমাদের নব সৌহার্দ্যের মধ্যে!

শুধু কি ঐ একজন? সবাই ঘুরছে ভাব করবার জন্ত, যে যাকে পারছে পাকড়াও করছে। সে এক অভিনব ব্যাপার! সাদা আর কালো, এশিয়া আর ইউরোপ-আমেরিকা সেই ষ্টেশনের প্লাটফরমে প্রাণ খুলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে।

নতুন রেল বসাচ্ছে। মহা ব্যস্ততা সেদিকটায়। সময় নেই—দুর্যোগে অনেক পিছিয়ে রয়েছি, তাড়াতাড়ি সমস্ত শুধরে নিতে হবে—এমনি একটা ভাব সর্বত্র। যন্ত্রশক্তির তেমন তোড়জোড় নেই তো লাগাও মানুষ। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে মানুষ হাতে কাজ করছে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলায়। এতটুকু হৈ-চৈ নেই। কি করে হতে পারে, এ-ও এক দেখে নেওয়ার জিনিষ। রেলপথের ধারে টেলিগ্রাফ-লাইন—লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি পুঁতে পোষ্ট বানিয়েছে। সিকি পয়সা ওরা অকারণ ব্যয় করবে না, অপব্যয়ের দিন এখন নয়—যা আছে তাতেই কাজ চালিয়ে নেবে।

ষ্টেশনের এই গ্রামটা বেশ বড়। খোলার বাড়ি বেশির ভাগ। আর দেখছি—খড় নয়, খোলাও নয়, বাঁশের বাখারির ছাউনি। ঘরবাড়ির ধাঁচ একেবারে আলাদা, যেমন ছবিতে দেখে থাকেন। আমাদের দেশের সঙ্গে মেলে না।

পাহাড় দেখা যায়, বিস্তর পাহাড়। দূরের পাহাড় কাছাকাছি আসছে। পাহাড় একেবারে ঘিরে ফেলেছে আমাদের। ঐ—ঐ যে মহাপ্রাচীর!

গাড়ি ভরতি চলেছি আমরা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রায় সমস্ত দেশ ও জাতের মানুষ। মুহূর্তে সকলে শিশু হয়ে গেলাম। কৌতূহল-ঝলকিত চোখের দৃষ্টি। জানলার ধারে ভিড়, জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়েছি।

একেবারে কাছে এসে গেছি। এমন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। অতিকায় এক অজগর সাপ এঁকে বেঁকে ত্রিভুবন জুড়ে পড়ে রয়েছে যেন। উত্তুঙ্গ শিখরদেশে উঠেছে, নিচে নামতে নামতে চোখের আড়াল হয়ে গেছে আবার। ট্রেন কখনো প্রাচীরের পাশ দিয়ে, কখনো বা অতিক্রম করে চলেছে। চলতে চলতে কত টানেল, কত প্রস্রবণ, কত বাঁকাচোরা গিরিপথ পার হয়ে ষ্টেশনে নামলাম। ষ্টেশনের নাম ছিং-লুঙ-ছাও।

প্লাটফরমের ওদিকটা পাহাড়ের ছায়ায় পূর্ণাবয়ব এক বিশাল মূর্তি। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি, নাম—সেঙ-টিন-ইউ। এই দুর্গম অঞ্চলে তাঁরই কৃতিত্বে রেলগাড়ি এসেছে, রেলওয়ে সম্পর্কে বিস্তর উন্নতি বিধান করেছেন তিনি। মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী মহাপ্রাচীরের দিকে একবার নজর করে দেখে নিলাম। বিস্ময় লাগে। ভাবতে পেরেছি, কোন একদিন প্রাচীরের পদতলে এসে দাঁড়াবো চূড়ায় উঠবার আয়োজনে?

জন দশেকে এক একটি দল, সঙ্গে দোভাষি এক চীনা বন্ধু। চলে বেড়ানোরই ব্যাপার—চড়াই ভাঙতে ভাঙতে খুশ মেজাজে কথাবার্তা চলে না, সেজন্ত আজকে দোভাষি বেশি নেই। তবু মেয়েরা আছে দলের মধ্যে। পাহাড়ে ওঠা-নামা চাট্টিখানি কথা নয়—ভয় দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল। তা শুনছে তারা! ছেলেরা পারে তো মেয়েরাই বা কম কিসে!

বীরত্ব দেখাবার প্রয়াসে আগে আগে পথ দেখিয়ে তারা ছুটেছে। তার ছুটেছেন আমাদের দলের রোহিনী ভাটে। মারাঠি মেয়ে, নাচেন অতি চমৎকার। পিকিনে খুব জমিয়েছিলেন ভারতীয় নাচ দেখিয়ে। লঘু শরীর—নাচতে নাচতেই যেন পাহাড়ে উঠছেন। অথবা পাখীর পাখার মতো বাতাসে আঁচল ফুলিয়ে উড়তে উড়তে যাচ্ছেন। কঠিন পাথরে পা ছোঁয় না ছোঁয়, ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গল গায়ে ঠেকে না, আলগোছে কেমন যেন আকাশে উঠে যাচ্ছেন।

চলেছেন গান্ধি টুপি মাথায় রবিশঙ্কর মহারাজ। খালি পায়ে এসেছিলেন প্রচণ্ড এই শীতরাজ্যে। পশমের মোজা ও জুতোর আবরণেও আমাদের পা কনকন করে—মহারাজ এক জোড়া স্যাণ্ডেল ধারণ করেছেন শেষ পর্যন্ত। পলিত-কেশগুম্ফ উনআশি বছরের যুবাব্যক্তিটি—পিছনে তাকাবার অভ্যাস নেই, ধীর পায়ে চলেছেন। হেসে ছাড়া কথা বলেন না, গুজরাটি এবং সামান্ত হিন্দি মাত্র বলতে পারেন। সামনে-পিছে সর্বক্ষণের দুই অনুচর—অধ্যাপক শুকলা ও উমাশঙ্কর যোশী। আমাদের কথা শুনে নিয়ে এঁরা মহারাজকে বুঝিয়ে দেন, কথা বুঝে স্মিতহাস্তে মহারাজ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

চলেছেন সর্দার পৃথী সিং। গান্ধিজী সর্দার বলে আহ্বান করেছিলেন; আর নামের সঙ্গে আজাদ জুড়ে জন্মভূমি পাঞ্জাব

তাঁর বীর্যবত্তার পরিচয় দিত। গান্ধিজীর উপাধিটা নিয়েছেন তিনি, কিন্তু আজাদ নাম বাতিল। দীর্ঘ দেহ—বয়স হয়েছে, তা তিনি মানেন না। মানেন কি-ই বা! অমিত-শক্তি ইংরেজের প্রতাপ মেনেছেন কোন দিন? মেনেছেন সিপাহিসান্ত্রী-ঘেরা কারাগারের কঠিন শাসন? ডিটেকটিভ উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয় এই মানুষটির জীবন। আন্দামানে চির-নির্বাসনে ছিলেন—বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যো প্রমুখ পুরানো বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা। একদিন অকস্মাৎ উধাও আন্দামান থেকে। বৃটিশ-সরকারের হুলিয়া ছুটল দেশ-দেশান্তরে—পুলিশের মুঠো থেকে পৃথ্বী সিং পিছলে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্থিতি হল রাশিয়ায় গিয়ে। অনেক দিন পরে ফিরলেন আবার দেশে—ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন, পুলিশ পাত্তা পায় না। গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন আত্মসমর্পণ করতে। তার পরে—ঠিক মনে পড়ছে না—জেল হয়েছিল বোধ করি কিছু দিন। বেরিয়ে এসে গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে রইলেন। কিন্তু চলে গেলেন বছর কয়েক পরে—আশ্রমচর্যা মনের সঙ্গে নিতে পারলেন না। গান্ধিজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রইল তবু।

সেকালের এই বীরদের নিয়ে আমি উপন্যাস লিখেছি, তাঁদের প্রতি বড় অনুরাগ আমার। এ সব খবর আমিই বলি, কিম্বা আর-কেউ বলে থাকবেন। কেমন একটু বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে। খাওয়ার সময়টা প্রায়ই এক টেবিলে বসতাম গল্পগুজবের জন্য। শান্তি সম্মেলনের মধ্যেই একদিন খাতা এগিয়ে দিলেন, নাম-ঠিকানা লিখে দাও। খাতা ফেরত পেয়ে হাতে গুঁজে দিলেন আবার। কিছু লিখে দাও ঐ নামের সঙ্গে। লিখলাম—মহাবিপ্লবীকে প্রণাম।

পৃথ্বী সিংকে দেখতে পাচ্ছি অদূরে। শালগাছের মতো সরল সমুন্নত। খাড়া হয়ে চলেছেন। একটা জিনিষ শেখেন নি জীবনে—মাথা নিচু করা। তা ঐ পাহাড়ে উঠছেন, সে অবস্থায়ও নয়।

এমনি চলেছি ট্রেনের জঠর থেকে বেরিয়ে আসা আগন্তুক দল। পথ সংক্ষেপ করতে পাকদণ্ডীর পথ ধরেছি। দুর্গম পথ—বসে পড়ে জিরোচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে। চারি দিক নজর করি। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বিসর্পিল গতিতে উঠছে ঐ দলের পর দল। কতক আমাদের আগে চলে গেছে; কতক বা উঠে আসছে নিচে থেকে। পুরুষ আছে, মেয়ে আছে—একটা বাচ্চাও দেখতে পাচ্ছি সাত-আট বছরের। নানান জাতের মানুষ—পৃথিবীর কোন দেশের যে নেই, ঠিক করা শক্ত। পোশাক তাই বহু বিচিত্র রকমের। ঝোপঝাপ ও শিলাখণ্ডের আড়ালে এই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল; বেরিয়ে আসছে আবার পরক্ষণে।

অনেক কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে প্রাচীরের উপর ওঠা গেল। সপ্ত আশ্চর্যের সেরা বস্তুটি এই আমার পায়ের তলায়। চলো, এগিয়ে চলো—উঁচুর দিকে ক্রমশ। প্রাচীর ঐ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে উঠেছে। তার পরে ঢালু হয়ে নেমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে। প্রহ্লাদ গুরুমশায় বলতেন, দ্বাদশটি অশ্বারোহী—আমার তো মনে হল, বাড়তি আরও দু-পাঁচটি সহ ঘোড়দৌড় হতে পারে এখান দিয়ে। ছাতের আলসের মতো বেশ-খানিকটা উঁচু পাঁচিল দু'দিকে—উত্তম ব্যবস্থা, নিচে পড়বার আশঙ্কা নেই। পাথরের উপর পাথর গেঁথে করেছে এই কাণ্ড; উপরের দিকে সেই পাথর কেটে ইটের মতো পাতলা করে বসিয়েছে—মানুষের চলাচলে কষ্ট যাতে না হয়। এমনি টানা চলেছে—কত দূর আন্দাজ করুন দিকি? পনের শ' মাইল। কখনো পর্বত-শীর্ষ, কখনো বা নিম্নতম অধিত্যকার অন্ধি-সন্ধি অতিক্রম করে। এ মহাপ্রাচীর তৈরি শুরু হয় খৃষ্টের তিনশ' বছর আগে—সম্রাট অশোকের সমকালে। পঞ্চাশ বছর লাগে শেষ করতে। সে কি আজকের কথা! কি করে সে আমলে অত উঁচুতে তুলল এত পাথর! আর কি তাজ্জব দেখুন—পাঁচিল গেঁথে দেশের গোটা সীমানা ঘিরে ফেলে দিল মোঙ্গলদের রুখবার জন্য। আমরা গরু-ছাগল ঠেকাবার জন্য বাগানের বেড়া দিই—সেই গোছের ব্যাপার আর কি!

আলিগড়ের অধ্যাপক ডক্টর আলিম—চাপদাড়ি, সুন্দর সুগৌর চেহারা। আলসেয় ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে পুরানো ইতিহাস বলছিলেন তিনি। এত উদ্যম আর অধ্যবসায়ের মহাপ্রাচীর কি কাজে এলো শেষ পর্যন্ত? মোঙ্গলদের ঠেকানো যায় নি, কুবলাই খাঁ এসে দখল গাড়লেন। আর এখনকার যুগে পাঁচিল তুলে শত্রু আটকাবো—হেন প্রস্তাব ভাবতে যাওয়াই হাস্যকর। মানুষের পাখনা হয়েছে, আকাশে উড়ে উড়ে লড়াই। মেঘের চোরাগোপ্তা পথে যাতায়াত। মহাপ্রাচীর কত নিচে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে—সে কিছু ধর্তব্যের বস্তু নাকি? এত মানুষ মিলে এত বড় কাণ্ড করেছিল, কিছু মুনাফা হল না কোন কালে। শুধুই সপ্ত আশ্চর্যের একতম হয়ে রইল—স্থাপত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। দেশ-বিদেশের মানুষ এসে দেখে যায়—প্রত্নতাত্ত্বিকের গর্বের জিনিষ। প্রাচীরের উপর কতকগুলো ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল, দেখলাম, গত লড়াইয়ের সময়—আকাশমুখী কামান বসানো হয়েছিল। দুশমনি প্লেন ঘায়েল করা হত। এখন সীমাহীন প্রশান্তি চারিদিকে—শুধু প্রাচীরের উপর ভাঙাচোরা পাথরের গাঁথনিতে সেই ভয়ঙ্কর দিনের সামান্য কিছু দাগ লেগে আছে।

দেশে থাকতে শুনেছিলাম, জড়বাদী নতুন-চীন মহাপ্রাচীর ভেঙে তছনছ করছে। পাথর খুলে খুলে দশ রকম কাজে লাগাচ্ছে। আরে সর্বনাশ, বাটালি মেরে একটি টুকরা-পাথর খসাতে যাও দেখি! দশ রকম কৈফিয়তের তালে পড়বে। পুরানো জিনিষ নিয়ে এত দেমাক তামাম দুনিয়ায় আর কোন জাতের নেই। বাঘিনী শাবক আগলে থাকে—প্রায় সেই অবস্থা। ধর্মকর্মের বড় ধার ধারে না, তা সত্ত্বেও দেখে আসুন গিয়ে—এই নতুন আমলে হাজারো রকম কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে বেমেরামতি বৌদ্ধমন্দিরগুলো ভারা বেঁধে রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে ঠিকঠাক করছে, অস্পষ্ট প্রাচীন দেয়ালচিত্রে নতুন করে রং ধরাচ্ছে।

দেড় হাজার মাইল-জোড়া পাঁচিল, একটুখানি বস্তু নয়। তার উপর বয়সেও কত বুড়ো হল বিবেচনা করে দেখুন—প্রায় বাইশ শ' বছর। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে কত শত বার, জনপদের উত্থান-পতন ঘটেছে। অতএব দশ-বিশ জায়গায় আপনি ভেঙে পড়তে পারে, সেটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। ইচ্ছে করে ভাঙা হয়েছে কয়েকটি জায়গায় নতুন রেল-লাইন বসাবার প্রয়োজনে। মহাপ্রাচীর এখন আর চীনের সীমান্ত নয়। প্রাচীর পার হয়েও অনেক দূর অবধি

ীনদেশ। নব জীবনের বার্তা ছুটেছে দেশের সর্ব অঞ্চলে—প্রাচীর গড়ে তারই পথ হয়েছে…

দলে দলে উপরে উঠে যাচ্ছে—আমরা দু'জনে বসে পড়েছি এই তূপের উপর। আমি আর বর্ধমানের সন্তোষ খাঁ। সান্ত্বনাও আছে অবশ্য—আমাদের নিচে ঐ কত জন বসে বসে হাঁপাচ্ছে। অনেক দূর উঠেছি—যত উপরেই যাই, একই ব্যাপার—কি হবে মিছামিছি পরিশ্রমটা খাটিয়ে? দিব্যি বসে বসে দিগ্ব্যাপ্ত মহাচীনের শোভা দেখা যাচ্ছে। ঘর-বাড়ি উঁকি দিচ্ছে গাছপালার ভেতর থেকে। রেল-লাইন এক সুদীর্ঘ সরীসৃপের মতো পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর এঁকেবেঁকে শুয়ে রয়েছে। শীতল গিরিবায়ু সর্ব শরীর জুড়িয়ে দিয়ে গেল।

উচ্ছল কলহাস্য এক টুকরো। এক তরুণী লাফাতে লাফাতে উঠে এলো। ভারি সুন্দরী। অলকগুচ্ছ কপালের উপর এসে পড়েছে। এক রাশ বনফুল তুলে এনেছে পথের ধার থেকে। কি কৌতুকে পেয়ে বসেছে—ঝুঁকে পড়ে ফুলের থোলো ঘোরাল সে আমাদের দু'জনের মুখের সামনে। আরতির সময় যেমন পঞ্চপ্রদীপ ঘোরায়। কোন্ দেশের মানুষ, কি বৃত্তান্ত, কিছু জানি নে—এর আগে চোখেই দেখিনি মেয়েটাকে। বার কয়েক ফুল নেড়ে ডান দিক ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে ধুপধাপ ছুটে বেরুল। সঙ্কোচের বালাই নেই—এ কেমনধারা উল্লাসিনী গো! ছুটতে ছুটতে নাচতে নাচতে চলে গেল। প্রাচীরের চূড়ায় চূড়ায় সঞ্চারিণী অপরূপ এক বিদ্যুল্লতা।

পরে আরও দেখেছি তাকে। কনফারেন্সের মধ্যে দেখতাম শান্ত অচপল মূর্তি। এক মনে বক্তৃতা শুনছে, কদাচিৎ নোট নিচ্ছে কপোত-আঁকা সবুজ পকেট বই খুলে। সাংস্কৃতিক কমিশনেও দেখেছি—রাত তিনটে বেজে গেছে, সদস্যেরা উসখুস করছেন আসর ভেঙে ঘরে যাবার জন্য। কিন্তু বিতর্ক শেষ হবার আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা দু'টি আঙুলে আঙুরের থোলো থেকে ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলগোছে গালে ফেলছে, আর পাশের লোকটির সঙ্গে চাপা গলায় কি আলোচনা করছে। লোকটি তার স্বামী—খবরের কাগজ চালান এবং কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করেন। পরে এক সাহিত্যিক কনফারেন্সে খুব ভাবসাব হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। স্বামি-স্ত্রী জোড়ে এসেছেন। পিকিন ছাড়বার আগের দিন ক্ষিতীশ আর আমি বাজার চুড়ছি—ঐ দম্পতির সঙ্গে দৈবাৎ দেখা। ভদ্রলোক নিয়মমাফিক স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটা নিঃসংশয়ে ভুলে গেছে মহাপ্রাচীরের উপর আর একদিনের ক্ষণ-চাপল্য। পিকিন থেকে ওঁরা দেশে ঘরে ফিরছেন না, জোড় বেঁধে এখন ইউরোপে চললেন। এদেশ-সেদেশ ঘুরে ঢুঁ মারবেন অবশেষে ভিয়েনা কনফারেন্সে।

দেখাশুনোর পাট চুকল, আর নয়—নিচে নেমে সবাই এবার ষ্টেশনে গিয়ে জুটবে। আপন মনে ফিরে চলেছি আমি। প্রখর রোদ, বেশ কষ্ট হচ্ছে। পথ সংক্ষেপ হবে বলে জঙ্গলে ভরা শুঁড়িপথে এসে পড়েছি। একলা। এদিক-ওদিক তাকাই। উপরে ও নিচের দিকে সঙ্গীদের দেখা যাচ্ছে। কোন একটা দলে গিয়ে জোটা কঠিন নয়। কিন্তু প্রয়োজনই বা কি? পথের আন্দাজ হয়ে গেছে—ষ্টেশনে ঠিক গিয়ে পৌঁছব, হয়তো বা ঘুর-পথ হবে একটু-আধটু। সে এমন কিছু নয়। কিন্তু তৃষ্ণা পেয়ে গেল যে! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। এক ঢোক শীতল জল—পথ চলা নইলে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

আঃ, মিলে গেছে! বাঁক ঘুরেই দেখি কলস্বনা ঝরণা। কপোত-চক্ষুর মতো নির্মল জল বনান্তরাল হতে বেরিয়ে উপল-বিছানো খাতে লাফিয়ে পড়ছে, তার পরে ধীর বেগে বয়ে চলেছে সঙ্কীর্ণ ধারায়।

কোন অলক্ষ্য-দেবতা অবস্থা বুঝে মিলিয়ে দিলেন। নেমে যাচ্ছি ঝরণার দিকে। দৌড়ানো বলা যেতে পারে। আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করে ঈপ্সিত জলের ধারে এসে পড়েছি, অঞ্জলি ভরে জলও তুলেছি—

চিৎকার এলো, কে যেন হুমকি দিয়ে উঠল কোথা থেকে। চমক লাগে। হাত কেঁপে অঞ্জলির ফাঁকে জল পড়ে যায়। না, মনের ভুল নয়—ছুটে আসে একটি লোক—চেঁচাচ্ছে, কথা বুঝতে পারি না তাই প্রবল বেগে হাত-মুখ নেড়ে মানা করছে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ—দোভাষি কিম্বা আমাদের চেনা-জানা কোন প্রাণী নয়।

অবাক হয়ে আছি। কেন এমন করে? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা—রীতপ্রকৃতি কিছু বুঝি না এদের। লোকটা একেবারে গায়ের কাছে এসে ইসারা করছে তাকে অনুসরণ করতে। কি মতলব কে জানে! হতভম্ব হয়ে পিছু পিছু চলি। রেললাইন অবধি নিয়ে এলো সঙ্গে করে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ষ্টেশনটা। সহসা হাত বাড়াল বন্ধুত্বের ভাবে, সেকহ্যাণ্ড করে ফিরল বনপথ বেয়ে। ভারি রহস্য তো! হাঁ করে চেয়ে আছি যতক্ষণ না সে নজরের আড়ালে গেল।

ষ্টেশনে সকলে কলরব করে ওঠেন, একা কোন দিকে কেটে পড়েছিলেন? ট্রেন ছাড়বার সময় হল।

তৃষ্ণা মেটাই তো সকলের আগে! সাদামাঠা জল চাইলাম, দিল এনে বোতলের মিনারল ওয়াটার। মন্দ কি! ঢক-ঢক করে পুরো গ্লাস গলায় ঢেলে সুস্থ হয়ে বৃত্তান্ত নিবেদন করলাম।

পাগল বোধ হয় লোকটা!

দোভাষি বলে, কি সর্বনাশ!—ঝরণার জল খেতে গিয়েছিলে—জলে হয়তো বিষ।

মুখে এক ধরনের হাসি, ঘৃণা উপচে পড়েছে সেই হাসিতে। বলে, এক ফোঁটা তেষ্টার জল—তা-ও নির্ভয়ে মুখে দেওয়া যায় না শয়তানির ঠেলায়।

জল না ফুটিয়ে খায় না এ তল্লাটে। স্বাস্থ্য ব্যাপারে কড়া নজর—এটা কিন্তু ঠিক সেইজন্যে নয়। আমেরিকান সৈন্য কোরিয়ায় জীবাণু-বোমা ফেলে গেছে। কিছু কিছু এ দিকেও না পড়েছে এমন নয়। এখানে ওখানে যে-কয়েকটার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বাইরেও থাকতে পারে। পদে পদে তাই এত সতর্কতা। বিদেশি মানুষ—অত শত জানিনে, চাষী লোক চাষ ফেলে সামাল করতে এসেছিল তাই।

স্পেশ্যাল গাড়ি চলল আবার পিকিনমুখো। খাবার পরিবেশন করে গেল টেবিলে টেবিলে—পরিবেশকদের হাতে দস্তানা, নাকে মুখে কাপড়ের ঢাকনি। (মোটর-ড্রাইভারদের এমনি দেখেছি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরছে—ধুলোর ভয়ে তাদেরও নাম-মুখ ঢাকা।) অপারেশনের সময় ডাক্তার-নার্সদের যেমন দেখে থাকি।

কামরা ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে কিছু সময় অন্তর। একবার লাউড-স্পীকারে বলল, কাচের জানলাগুলো খুলে দাও—বাইরের বাতাস চলাচল করুক। কর্মচারী মেয়েগুলো জানলা খুলতে লাগল, আমরা সাহায্য করি। আবার এসে তারের কবাট ফেলে দেয়, মাছি আর ধুলো যাতে না ঢোকে। বীজাণু-যুদ্ধের ব্যাপার বাদ দিয়েও তামাম জাত অতিমাত্রায় স্বাস্থ্যসজাগ হয়ে উঠেছে। প্রায় ছুঁৎমার্গীয় অবস্থা।

একজন প্রশ্ন করলেন, ছিং-লুং-ছাও ষ্টেশন কত মাইল পিকিন থেকে?

জানি নে তো—

তবে এই সমস্তটা দিন ধরে কি লিখলেন মশায়? ট্রেনে আর ষ্টেশনে লিখলেন, পাঁচিলের উপর বসে বসে লিখলেন—এই সামান্য কথাটার খোঁজ নিলেন না কারো কাছ থেকে?

ভুল হয়ে গেছে দেখছি। তা না-ই বা থাকল আমার লেখায় হিসাবপত্রের ফিরিস্তি।

শৈলেন পাল ওদিকে ধমকাচ্ছেন। এ কি হল! সিগারেটে পুড়িয়ে ফেললেন চেয়ারের চাদর!

লজ্জার কথা সত্যি। সামান্য সিগারেটটাও কায়দামাফিক ধরিয়ে টানতে পারি নে। তার উপরে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি এত দেশের মানুষের দিবসব্যাপী সান্নিধ্যে। বহু তীর্থ-নদীর বিচিত্র সঙ্গমে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছি, অত শত হুঁশ থাকে না।

মতামত চাইতে এলো রেলগাড়ির পরিচালনা সম্পর্কে। আরো কি রকম উন্নতি হতে পারে, সেই পরামর্শ যদি দিতে পারি। লিখতে দিচ্ছে একটা করে ছবি-আঁকা মনোরম কাগজ। না লিখে পকেটে পুরতে লোভ হয়। কিন্তু এতগুলো চোখ।

লিখলাম, তোমাদের সঙ্গে আজকের এই মধুর ভ্রমণ চিরকাল আমার মনে থাকবে।

[ক্রমশঃ।

নববর্ষের প্রথমেই অপ্রত্যাশিত ভাবে নানা সূত্রে শান্তি প্রচেষ্টার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

দেশে দেশে

"বিক্রমাদিত্য"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(শেষাংশ)

চব্বিশে ডিসেম্বর। ডুন ক্যাম্পবেল, রয়টারের সংবাদদাতা আমাদের কয়েক জনকে নেমন্তন্ন করলো তার হোটেলে। ডুন পাকা রিপোর্টার। একটা হাত হারিয়েছে বার্লিনের এয়ার রেডে। যুদ্ধের শেষ ভাগটা কাটিয়েছে বর্মা ইন্দো-চীনে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগে ডুন ভারতবর্ষে আবার ফিরে এলো। ডাক পড়লো তার জিন্না সাহেবের কাছ থেকে। বহু দিন ধরে জিন্না ভাবছিলেন 'পাকিস্থানের করিডরের' দাবীর সংবাদ কাগজে প্রকাশ করার জন্যে। বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি এর একটা আভাসও দিয়েছিলেন কিন্তু কেউই জিন্নার কাছ থেকে এ সংবাদ গ্রহণ করতে রাজী হ'ননি।

যখন জিন্না ডুন ক্যাম্পবেলকে ডেকে পাঠালেন তখন সে ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে অতি কাঁচা। কাজেই তার এক ভারতীয় বন্ধুকে দিয়ে গোটা কতক প্রশ্ন লিখে নিয়ে জিন্নার সঙ্গে দেখা করলো। সেই সুযোগে জিন্না দাবী করলেন পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে করিডরের।

করিডরের খবর যেদিন খবরের কাগজে বেরলো সেদিন কংগ্রেস মহলে হৈ চৈ পড়ে গেলো। কংগ্রেসের নেতারা একটু বিচলিত হলেন, তাঁরা সন্দেহ করলেন রয়টারকে। বলা হলো, রয়টার বিদেশী, তাই ইচ্ছে করে এই সব কারসাজী করা হচ্ছে। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে দু'-এক জন ডুন ক্যাম্পবেলকে নিমন্ত্রণ করে আচ্ছা করে ধমকে দিলেন।

হোটেল সিসিলে ডুন থাকে। সন্ধ্যার একটু পরে উপস্থিত হ'লাম সেইখানে। বন্ধু বান্ধবেরা আগেই আসর জমিয়ে বসেছিলেন। সভা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন দূর থেকে এক ভদ্রমহিলা আমাদের টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের উপর কিন্তু বয়সের ছাপকে ঢেকে রাখা হয়েছে সাজ সজ্জায়। উঠে দাঁড়ালেন জ্যোতিদা'। বললেন, মিসেস্ বোস দেখছি যে, আপনি যে দিল্লীতে আছেন এ তো আমার জানা ছিলো না।

জবাব দেন মিসেস্ বোস। সঙ্গে থাকে একটু হাল্কা হাসি। বলেন, 'কী করবো ভাই। না এসে আর পারলুম কই? উনি তো সিলেকসন গ্রেডে প্রমোশন পেয়েছেন। তাই ডাক পড়েছে দিল্লীতে। যাক্, তোমার কথাই আজ মনে পড়েছিলো। হঠাৎ দূর থেকে দেখতে পেয়ে নিজেই চলে এলুম।'

জ্যোতিদা' আলাপ করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে মিসেস্ বোসের। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর স্ত্রী। জ্যোতিদা'র সঙ্গে পরিচয় তাঁর নোয়াখালীতে কাজিরখিল ক্যাম্পে। দুঃস্থা নারীর উদ্ধারে তিনি গিয়েছিলেন সেইখানে কোন এক নারী সেবা-সঙ্ঘের হয়ে।

মিসেস্ বোসের দল একটু দূরেই বসেছিলেন। তিনি আমাদের অনুরোধ জানালেন সেই পার্টিতে যোগ দেবার জন্য। বিশেষ করে জ্যোতিদা' ও আমাকে।

ওঁরা দলে ছিলেন জনা-সাতেক। অধিকাংশই মধ্যমবয়সী। এর মধ্যে প্রৌঢ়স্থানীয়া ছিলেন এক জন। পরিচয়ে প্রকাশ পেলো, এঁরা দিল্লীর 'এলিট' গোষ্ঠীর অন্যতমা। আজকের পার্টির আয়োজন পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু নারীদের জন্য। যে জনসমুদ্র পানিপথে ও কুরুক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে তাদের জন্য চাই সাহায্য। অসংখ্য নারীর সেবার জন্যে তাই এঁরা অগ্রসর হয়েছেন।

প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা মাসীমা বলে পরিচিতা। পরিচয় করে দিয়ে মিসেস্ বোস বলেন, মাসীমা, এঁরা হচ্ছেন প্রেসের রিপোর্টার। আমার বিশেষ বন্ধু। আমাদের এঁদের সাহায্যের দরকার হবে।'

মাসীমা জবাব দেন, 'ঠিক বলেছো। আমাদের সেবা-সঙ্ঘের বয়স অল্প। একে জিইয়ে রাখতে হলে আমাদের হামেশাই পাব্লিসিটির প্রয়োজন।'

'আজকের মিটিং-এর রিপোর্টে আমাদের সবার নামই দিয়ে দেবেন তো?'—টেবিলের এক প্রান্ত থেকে মিসেস্ জানা প্রশ্ন করেন।

ধমক্ দেন মাসীমা, 'কি বাজে বকছো বাসন্তী? কাগজে শুধু মাত্র নাম বের করলেই আমাদের কাজ শেষ হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য মহান। কাগজের মারফতে আমরা জানাতে চাই দুঃস্থা নারীদের যে, তাদের সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা বলতে চাই দেশবাসীকে যে, তারা দলে-দলে এ কাজে এসে আমাদের সাহায্য করুক। তা তোমরা কি খাবে ভাই? হুইস্কি না জিন?'

শেষের কথাগুলোকে আমাদের উদ্দেশ্য করে বলা।

সেদিনটা ছিলো ক্রীসমাস ইভ। তাই এই পুণ্য দিনে মাসীমা'র দল এই মহান্ কাজে ব্রতী হয়েছেন। পার্টির নাম না করলে কর্ম্মীদের একসঙ্গে যোগাড় করা যায় না।

বেয়ারাকে ডাকলেন মিসেস্ বোস। তাঁর কণ্ঠস্বর শোনালো অনেকটা নাইন্থ সিম্ফনির মতো। উঁচু থেকে নীচে সে স্বর নেমে এলো। হুকুম হলো পানীয়ের।

এদিকে অনর্গল বলতে লাগলেন মাসীমা। 'জানো ভাই, এতো বড়ো কাজের দায়িত্ব নিয়েছি, তাই সব ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়। রিলিফের কাজে আমি হাত পাকিয়েছি যথেষ্ট। ছত্রিশ সালে আমরা তখন বর্দ্ধমানে পোষ্টেড। দামোদরে বন্যা এলো, সমস্ত রিলিফ কাজের দায়িত্ব এলো আমার উপর।'

জানা-গিন্নী কথায় বাধা দেন। বলেন, 'মাসীমা, রাত হয়ে যাচ্ছে, মিটিং সুরু করে দেওয়া যাক।'

'আরম্ভ করি কি করে? সবি যে এখনও এলো না! বার বার

আমায় বলে দিয়েছে, মাসীমা, আমি না আসতে কাজ সুরু করো না। রিলিফ কাজে ওর কতো ইণ্টারেষ্ট, জানো ত?'

আধ ঘণ্টাখানেক বাদে শ্রীমতী সবি এলেন। দেখে মনে হলো এঁকে যেন কোথায় দেখেছি। হঠাৎ মনে হলো, এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। তখন নোয়াখালীতে দাঙ্গা শেষ হয়েছে। এডিটরের আদেশে গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। স্যোশাল ওয়ার্কার বলে তিনি জনসমাজে বিশেষ পরিচিতা। কাজেই বাড়ী খুঁজে নিতে কষ্ট হলো না। ড্রেসিং গাউন পরে তিনি নীচে নেমে এলেন দেখা করতে। অফার করলেন সিগারেট। ধূমপানের অভ্যাস ছিলো কিন্তু ওর পরিবেশন কখনই নারী-হস্তে হয়নি, তাই একটু দ্বিধাবোধ করলাম। হেসে তিনি বললেন, তা হলে কিছু ড্রিঙ্কস্‌এর বন্দোবস্ত করি। আপত্তি করলাম না ভয় ও হয়েছিলাম। তাই ভাবলাম যে, লিমন স্কোয়াস দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু এলো জিনের বোতল। সঙ্গে লিমন ও সোডা। একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। তাই সবি দেবীকে জানালাম আমার অসুবিধার কথা।

'ওঃ, আপনি দেখছি বড্ডো ছেলেমানুষ। কি রকম প্রেস্ রিপোর্টার আপনি, ড্রিংকস করেন না?' একটু ভর্ৎসনার সুরেই সবি দেবী বলেন। এর পরে কাজ সুরু হলো। সবি দেবী বলে গেলেন, নোয়াখালীর দুঃস্থদের জন্যে দেশবাসীর কি কর্ত্তব্য। হাজার হাজার মেয়ে হারিয়েছে তাদের ইজ্জত। তাদের রক্ষা করা সব চাইতে বড়ো কর্ত্তব্য। তাই তিনি দিলেন এক 'ক্লারিয়ন কল' দেশের মা-বোনদের। 'এগিয়ে আসুন আপনারা দেশের মেয়েদের মান রক্ষা করতে।' এর পরে তিনি রুটী ধরলেন দেশের সংবাদের।

বিবৃতি দেওয়া শেষ হয়ে গেলে পর সবি দেবীকে পড়ে শোনানো হলো।

'ওঃ, অনেক সিডিশাস কথা বলে ফেলেছি। আচ্ছা, একবার সৌরীনকে পড়ে শোনালে হয় না।' বলা বাহুল্য, সৌরীন সবি দেবীর স্বামী। টেলিফোনে পড়ে শোনানো হলো সৌরীনকে। কাট ছাঁট হলো একটু।

বেরিয়ে আসার সময় সবি দেবী প্রশ্ন করলেন, 'আমার বিবৃতিটা কি আপনারা আজই 'সার্কুলেট' করছেন?'

আশ্বাস দিলাম তাঁকে। বললাম, 'আজই যাবে।'

'না, সে জন্য বলছি না। তবে কি জানেন, আমি এখনও নোয়াখালী যাইনি। কাল ভোরে চাটগাঁ মেলে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, আমি পরশু দিন নোয়াখালী পৌছলে পর যদি এটা সার্কুলেট করেন তবে বড়ো 'এফেক্টিভ' হবে, তাই নয় কি?'

* * * *

সবি দেবী সেদিনও আমায় চিনতে পারলেন। আমাদের বললেন: 'মাসীমা কি গোছানো লোক। প্রেসদেরও ভোলেননি। তা বাপু দেখবেন রিপোর্ট যেন ঠিক মতো বেরোয়। কই ফটোগ্রাফার কাউকে আনেননি?'

সভার কাজ আরম্ভ হলো। সবি দেবী আর মাসীমাই বেশী বললেন। বুঝিয়ে দিলেন সংক্ষেপে যে এই সঙ্কটে তাঁদের কি কর্ত্তব্য। 'ইংরেজ এই দেশের কি সর্ব্বনাশ করে দিয়েছে, এনে দিয়েছে দুঃখ। আজ দেশ হয়েছে স্বাধীন, তাই তাদের কর্ত্তব্য দেশের সেবা করা।'

বলতে বলতে সবি দেবীর গলা ধরে এলো। রুমাল বের করে মিসেস্ জানা চোখ মুছে নিলেন। পাশেই দে-গিন্নী বসেছিলেন মৃদু স্বরে বললেন, 'এই সব শরণার্থীদের দেখলে আমার কান্না পায় আচ্ছা, কি করে যে এরা দিন কাটায় আমি ভাবতেই পারি না।'

এক ছোট সাব-কমিটি তৈরী হলো। ঠিক হলো কমিটি মেম্বাররা পানিপথে যাবেন রিলিফ কাজ করতে। উদ্যোক্তা হলেন মাসীমা ও সবি দেবী।

সভা শেষে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেলো ডুন ক্যাম্পবেল রাস্তায় জিজ্ঞেস করলে, কি বললে তোমার দেশের 'হাগেরা'?

'দুঃস্থা নারীদের উদ্ধার করবে বলেছে,' আমি জবাব দিই 'কিন্তু ওদের উদ্ধার করবে কে? প্রেসওয়ালারা বুঝি?' ডু হেসেই জবাব দেয়।

* * * *

বাড়ীতে এসে দেখি আচার্য্য বসে আছে। চুল তার এলোমেলো চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল; ঘরে ঢোকা মাত্রই বললেন 'অতি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আপনার জন্যে। অজয় ইজ ডেড।'

কথাটা আমার প্রতি শিরা-উপশিরায় বিদ্যুতের ঝলক খে দিয়ে গেলো। বিশ্বাস করতে পারলাম না, প্রথমে মনে হলো যে স্বপ্ন দেখছি।

আচার্য্য বলতে লাগলো, 'আমরা দু'জনে গিয়েছিলাম বেড়াতে বারামুলায়। জায়গাটা ফরোয়ার্ড এরিয়া, সবে মাত্র শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে দু'জনে জীপে চলে গিয়েছিল শত্রুর আওতার মধ্যে। জীপ থেকে নেমে আমি একটু এগি গেলাম, অজয় জীপে বসে রইলো। অনেকটা দূরে এগিয়ে যাব পর হঠাৎ অজয়ের চীৎকার শুনতে পেলাম। দু'জন আফ্রিদী আম দিকে ছুটে আসছে। বাঁচবার কোন আশাই ছিলো না কিন্তু র করলে অজয়, টপ স্পীডে গাড়ী চালিয়ে দিলো আফ্রিদীদের দ করে। ও ব্যাটা দুটো মরলো বটে কিন্তু ব্যালান্স হারিয়ে ফেললে অজয়। গাড়ী উল্টে গেলো তার সেই সঙ্গে, অজয় ছিটকে পড়লো আমার চীৎকার-হল্লা শুনে আমাদের ফৌজের কয়েক জন সেপা এগিয়ে এলো। অচৈতন্য অবস্থায় ওকে নিয়ে গেলাম বারামুল হসপিট্যালে। দুর্ঘটনা হবার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অজ বেঁচেছিলো। মরবার আগে আমার হাত ধরে বললে, আচার্য যদি কখনো অলোকার সঙ্গে দেখা হয় তবে বলবেন আমি ওকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভালোবেসেছি। তার পর নিজে ঘড়ির ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ছোট ছবি বের ক দিলে। বললে, এটা রেখে দিন আচার্য্য সাহেব। কখনো য ওর দেখা পান তবে এটা ওকে দিয়ে দেবেন।'

বলতে বলতে আচার্য্যের চোখে জল এলো। বললে, 'আ ভাবতে পারি না অজয় কেন আমার জন্যে প্রাণ দিলো। আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই নয়। নিজের জীবনকে কখনো পরো করিনি। কখনো ভাবিনি বেঁচে থাকার কোন অর্থ আছে। কি অজয় আমায় শিখিয়ে দিয়েছে যে শুধু মাত্র জীবনকে ভোগ ক আমাদের কামনা নয়, নিজেকে পরের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া চাইতেও মহান্।'

* * * *

কিছু দিন পরে তলব এলো বোম্বাই হেড অফিস থেকে। সেখানে ডেস্কে লোকের অভাব, তাই আদেশ হলো যে পত্রপাঠ হাজিরা দিতে হবে সেখানে।

যাবার দুদিন আগে দেখা করতে গিয়েছিলাম মাসীমা'র সঙ্গে। সেদিন ছিলো মাসীমা'র রিলিফ কমিটির মিটিং। কাজেই জলাহারের আয়োজনটা বেশ জমকালোই হয়েছিলো। আলোচনা চলছিলো পানিপথের রিলিফ কমিটির কাজ সম্বন্ধে। ঠিক হয়েছে ছোট একটা দল রিলিফের কাজে যাবে। অনেকেই উৎসাহিত হলেন। বিশেষ করে দে-গিন্নী। বললেন, 'দিল্লীতে একটানা থাকতে থাকতে একটা ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো। যাক্, তবু কিছু দিনের জন্তে চেঞ্জে যাওয়া যাবে।'

প্রস্তাব করলেন মিসেস্ জানার মেয়ে: 'আচ্ছা মাসীমা, মোটরে গেলে হয় না? আমার বাপু ট্রেণে যেতে ভালো লাগে না, কি বিশ্রী জার্নি।'

মিস্ জানার প্রস্তাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন উপস্থিত তরুণ দল। মিস্ জানা সদ্য মোটর-ড্রাইভিং শিখেছেন, কাজেই তাঁরা বিপদের আশংকা করলেন। অবশ্য আপত্তিটা এলো মাসীমা'র কাছ থেকে।

'বাজে বকো না ডলি। এই সব গরীবদের মাঝে মোটর হাঁকিয়ে গেলে ওরা ভাববে কি বলো তো?'

সায় দেন ভবতেন্দু চক্রবর্ত্তী। তিনি সদ্য বিলেত প্রত্যাগত। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের ছাত্র। গরীব ও ধনীর মাঝে বর্ডার লাইন কোনটা তা তিনি চোখ বুঝে বলে দিতে পারেন। ডলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। কারণটা অবশ্য অহেতুক নয়। তিনি চাইছেন যে তাদের দু'জনের ভবিষ্যৎ এক হয়ে যাওয়া দরকার। তাই একটু ভর্ৎসনার সুরেই বলেন, 'সত্যি ডলি, তুমি নিশ্চয় পানিপথে যাচ্ছো না? আই কাণ্ট ড্রীম্ অফ ইট।'

দু'জনের ধমক খেয়ে ডলি জানা একটু নিরাশ হ'ন। তবু বলেন, 'কলেজের ম্যাগাজিনে যে আমার এই সব উদ্বাস্তুর সম্বন্ধে একটা 'আর্টিকেল' লিখতে হবে। নিজের চোখে না দেখলে লিখবো কি করে?'

অনেকক্ষণ ধরে ডলির সঙ্গে কথা বলার প্রতীক্ষায় ছিলেন অমল রায়। তাঁর গায়ে আছে পিটস্‌বার্গ ইউনিভার্সিটির ছাপ। 'আপনি যাবেন মিস্ জানা? দেন, আই শুড অলসো গো। ক্যামেরাটা নিয়ে যাবো, ছবি তোলা যাবে।'—অমল রায় বলেন।

এবার মাসীমা রেগে যান। বলেন, 'তোমরা কেন হট্টগোল করছো? এমনি করে কোন রিলিফ কাজ হয় না।'

ঠিক হলো, পরদিন ভোরে এঁরা কয়েক জন ট্রেণে যাবেন পানিপথে।

* * * *

বোম্বে যাবার আগের দিন মিসেস্ বোস টেলিফোনে ওঁদের পানিপথে যাবার বিভ্রাটের কাহিনী বললেন।

সকালেই মাসীমা সদলবলে ষ্টেশনে এসে হাজির হয়েছিলেন। বাড়ী থেকে রওনা হতে দেরী হয়ে গিয়েছিলো। উদ্বাস্তুদের দিতে হবে খাবার, মিল্ক-পাউডার। খাবারটা কি হবে সেই নিয়ে একটু তর্ক উঠেছিলো। মিসেস্ বোস প্রস্তাব করেছিলেন নেহাৎ মামুলী ধরণের মেনু। কিন্তু এতে মাসীমা রাজী হলেন না। কেক বিস্কুটের টিন নেওয়া হয়েছে অপর্য্যাপ্ত। চা-কফিও এসেছে আর আছে ছেলেদের জন্তে টফি ও চকোলেট। শেষ পর্য্যন্ত এর সঙ্গে নেওয়া হলো স্যাণ্ডউইচ।

গাড়ী ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। মাসীমা'র দল তাড়াহুড়ো করে, যে কম্পার্টমেণ্ট প্রথমে পেলেন তাতেই চড়ে বসলেন। গাড়ী ছেড়ে দিলো।

আধ ঘণ্টা গাড়ী চলার পর অমল রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'মাসীমা, দেখতে পাচ্ছেন এটা পানিপথের গাড়ী নয়। আমরা ভুলে আগ্রার গাড়ীতে চড়ে বসেছি। ঐ দেখুন ফরিদাবাদের কলোনী।'

একটা আর্তনাদ উঠলো গাড়ীর মধ্যে। চার দিক থেকে উঠলো কলরব। ও মা, তাই তো কি হবে। শেকল টান, গাড়ী থামাও।' বিপদের মাঝেও মাসীমা শান্ত থাকেন। তিনি বলেন, 'গাড়ী থামিয়ে কি লাভ হবে? পানিপথে আর আমাদের যাওয়া হবে না। আমরা ভুল ট্রেণে উঠেছি। পানিপথের আর আগ্রার গাড়ী বোধ হয় একই প্ল্যাটফর্মে ছিলো। ভবতেন্দু, তোমায় না বলেছিলুম, চেকারের কাছে খোঁজ নিতে? তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

ডলি জানা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ভবতেন্দুর নির্বুদ্ধিতা দেখে বলে, 'সত্যি ভবতেন্দু, হাউ কুড ইউ ডু ইট।' অমল রায় এই ভর্ৎসনায় একটু খুশী হন। বলেন, 'ভাগ্যিস আমি লক্ষ্য করেছিলুম নইলে কি কাণ্ডটা না হয়ে যেতো!' জবাব দেন মিসেস্ বোস,—'কিছুই হতো না। পানিপথে যাবার আমাদের কোন উপায়ই নাই। এই ট্রেণ সোজা একদম থামবে মথুরায়।'

বাকী সবাই প্রায় একসঙ্গেই বলে ওঠেন—'তা হ'লে কী হবে?'

মাসীমা বলেন, 'যাক্, এ যাত্রায় আমাদের পানিপথে যাওয়া স্থগিত রাখতে হলো। ট্রেণে যখন চড়ে বসেছি তখন চলো যাই আগ্রায়। সঙ্গে খাবার দাবার প্রচুর আছে—ওখানেই পিক্‌নিকের মতো একটা করা যাবে।'

প্রস্তাবটা জুৎসই হলো সবার।

এর পরে মাসীমা'র নারীসঙ্ঘ আর কোন রিলিফ কাজ করেছিলেন কি না আমার জানা নেই।

* * * *

বোম্বে যাবার দিন ষ্টেশনে বন্ধু-বান্ধবেরা অনেক এসেছিলেন দেখা করতে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাংবাদিক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অতি অল্প দিনের মধ্যে এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়েছিলো। পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা এঁদের আছে, এঁদের সহানুভূতির মধ্যে আছে আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতাই আমার দিল্লীর দিনগুলোকে মধুর করে তুলেছিলো। সময়ে-অসময়ে এঁদের সঙ্গে বসে চর্চ্চা করেছি রাজনীতির।

দেশের শাসনতন্ত্রের অদল-বদল দিল্লীর সমাজে এনে দিয়েছিলো এক পরিবর্ত্তন। মনে হলো যেন বহু দিনের ইংরেজ-বিদ্বেষ হাল্কা হয়ে গেছে। হোটেল, পার্টি ও ক্লাবে তখন উজান এসেছে দেশ-প্রীতির। মেয়েদের ব্লাউজের ও ছেলেদের বুশ সার্টে এর প্রতীক রয়েছে আঁটা—তিরঙ্গা ঝাণ্ডা। মোটরের বনেটে, দরজায় লেখা আছে 'জয় হিন্দ'। গৃহিণীরা ধরেছেন খদ্দরের শাড়ী, কর্ত্তা পরছেন খদ্দরের স্যুট। কোটে আঁটা আছে একখানা গান্ধীজির ছোট ছবি।

দেশের রাজনীতি-চর্চ্চায় এঁরা মেতে উঠলেন। কর্ত্তা কংগ্রেসবাদী, গৃহিণী বামপন্থী, সোস্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, কন্যা, পুত্র অবশ্য প্রেমিক, প্রেমের সোস্যালিজমে তাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এঁরা মাঝে মাঝে হানা দিতেন আমাদের সভায়। কনষ্টিট্যুশন হাউসে প্রায়ই মোটর হাঁকিয়ে, ঠোঁট রাঙ্গিয়ে আসতেন সমাজের ভ্রমরাব দল। আসর যখন জম উঠতো তখন হয়তো আসতো এঁদের কারু কারু বাড়ী থেকে টেলিফোন। আয়া ডাকছে, ছোট ছেলেটা কাঁদছে। অবশ্য এর প্রেসক্রিপশন দেওয়া হতো টেলিফোনেই। সভা যখন ভাঙ্গতো তখন রাত্রি হয়ে যেতো গভীর।

আমরা সাংবাদিক, তাই এই সভায় আমাদের আদর ছিলো প্রচুর। কচুরী, সিঙ্গাড়া সমাপ্তির শেষে আসতো মিষ্টি সুরে অনুরোধ। এই "সিম্পোসিয়ামে" একটা ছোট রিপোর্ট কাগজে বের করে দেয়ার জন্যে। অবশ্য এতে বক্তাদের নামের চাই প্রাধান্য "

এমনি ভাবে হৈ হল্লায় কেটে গেছে দিনগুলো। আজ যাবার দিন মনে হতে লাগলো এ কথাগুলো বার বার। ট্রেণ ছাড়ার একটু আগে এলো একটি ছোট পরিবার—স্বামী, স্ত্রী ও একটা ছোট মেয়ে। কর্ত্তা আর চাপরাসীর তত্ত্বাবধানে মাল উঠে ও লাগানো, গৃহিণী, হোল্ড খুলে বানিয়ে নিলেন একটি বিছানা। গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়লো, গার্ড সাহেব বাজালেন তাঁর হুইসেল। এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠলো আমাদের কামরায় একটি বৃদ্ধ বয়স তার ষাট পেরিয়ে গেছে। কাকুতি মিনতি করলে সে, যাবে সে মাধেপুরায়। ট্রেণের কোথাও ঠাই নেই অথচ যাওয়া তার প্রায়োজন। মেয়ের অসুখ করেছে। বাঁচবার কোন আশাই নেই সেই মর্ম্মে 'তার' এসেছে বাড়ী থেকে। বৃদ্ধ আশ্বাস দিলো যে মথুরায় সে নেমে যাবে শুধু, মাত্র এই দেড়টি ঘণ্টা চাই আশ্রয়।

কর্ত্তার বিশেষ আপত্তি দেখা গেলো না কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন গৃহিণী। 'পাগল, আর কী? যত সব চোর ডাকাতকে এলাউ করি আমার কম্পার্টমেন্টে তার পর মাঝ রাস্তায় খুন করে বসুক। 'নেমে যাও।' রাশভারী কণ্ঠে তিনি বৃদ্ধকে আদেশ দেন।

বৃদ্ধ কাকুতি-মিনতি করে কিন্তু গৃহিণীর মেজাজ তখন সপ্তমে উঠেছে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। গাড়ী তখন আস্তে আস্তে চলতে সুরু করেছে। গৃহিণী এবার সাহস করে এগিয়ে গেলেন, ধাক্কা দিলেন দু' চার বার। কিন্তু বৃদ্ধ হাতল ধরে রইলো। গৃহিণী এবার বের করলেন একটা টেনিস র‍্যাকেট। ওটা দিয়ে দু'ঘা লাগালেন, তার পর আবার দিলেন ধাক্কা। বৃদ্ধের হাত খসে গেলো, ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হুমড়ী খেয়ে পড়লো। চার দিকে উঠলো সোরগোল, কিন্তু গাড়ী তখন জোরে চলতে সুরু করেছে। গৃহিণী হাঁপাতে লাগলেন, বোঝা গেলো তিনি এই যুদ্ধে বেশ ক্লান্ত হয়েছেন। এবার তাঁর রাগ পড়লো কর্ত্তার প্রতি। তাঁর অকর্ম্মণ্যতায় দোষারোপ দিলেন। শাসিয়ে দিলেন, 'দিল্লী ফিরেই চাই এর একটা বিহিত উই মাষ্ট টল রেলোয়ে চীফ কমিশনার। এর একটা 'বিহিত হওয়া দরকার। স্বাধীন হয়েছে বলে লোকগুলোর আর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। আর বিশেষ করে এই রিফিউজীগুলো। ফার্ষ্ট ক্লাস বলে এরা মানতেই চায় না। তোর যদি এতোই যাবারই দরকার তা তুই প্লেনে গেলেই পারতিস, এখানে জ্বালাতে এলি কেন?'

অনেকগুলো কথা বলে গৃহিণীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে। ছোট আয়না, পাউডার বের করে নিজের প্রসাধনটা ঠিক করে নিলেন। তার পর দেহটা এলিয়ে দিলেন শয্যায়। হাতে রইলো একটা ছ'পেনীর ডিটেকটিভ থ্রিলার।

* * * *

বোম্বাইতে প্রবাদ ছিলো যে, সে প্রদেশের গভর্ণর দু'জন। মালাবার হিলে সরকারী ভাবে ছিলেন মহারাজ সিং। বেসরকারী ভাবে দাদারে শিবাজীর পার্কের এক প্রান্তে ছিলেন বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যান।

ভারতীয় সাংবাদিক ক্ষেত্রে হর্নিম্যান ছিলেন পুরোস্থানে। জাতে ছিলেন খাঁটী ইংরেজ, কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে তিনি তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিলেন ভারতবাসীদের সঙ্গে বসবাস করবার জন্যে। সংবাদপত্রে তিনি শিক্ষানবীশি করেছিলেন লর্ড নর্থক্লিফের কাছে। লর্ড নর্থক্লিফের একটা কাগজে তিনি হয়েছিলেন সম্পাদক।

তখনো এদেশে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়নি, হর্নিম্যান চাকুরী নিয়ে এলেন কলকাতার 'ষ্টেটসম্যানে'। কাজ হলো তাঁর নিউজ এডিটারের। অল্প দিনের মধ্যে তিনি কাগজের চেহারা পাল্টে দিলেন। এর পরে যখন বাংলা দেশে এলো স্বদেশী আন্দোলন, তখন এতে হর্নিম্যান যোগ দিলেন। কিছু দিন বাদে 'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র কর্তৃপক্ষ নাইট ব্রাদার্সের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য সুরু হলো। হর্নিম্যান চাকুরী ছেড়ে দিলেন।

বোম্বাইতে স্যর ফিরোজশাহ মেটা তাঁর নতুন কাগজ 'বোম্বে ক্রনিকেলের জন্য সম্পাদক খুঁজছিলেন। বন্ধু বান্ধবেরা অনুরোধ করলেন হর্নিম্যানকে এ কাজে বহাল করতে।

বোম্বাইতে হর্নিম্যান এক নতুন যুগ এনে দিলেন। তাঁর লেখনীর ঝাঁঝ সরকারকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। মহাত্মা গান্ধী তখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেছেন। হর্নিম্যান গান্ধীজির সঙ্গে যোগ দিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। কংগ্রেসের তিনি অন্যতম নেতা হয়ে উঠলেন।

বেগতিক দেখে ইংরেজ সরকার হর্নিম্যানকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন লণ্ডনে। কিন্তু হর্নিম্যান নাছোড়বান্দা, তিনি লুকিয়ে আবার এদেশে চলে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতিতে 'বোম্বে ক্রনিকেলে'র অনেক অদল বদল হয়ে গেছে। কাগজের সম্পাদক হয়েছেন সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী, হর্নিম্যানের শিষ্য। যেদিন হর্নিম্যান ফিরে এলেন তার কিছু দিন বাদে, ব্রেলভী হলেন গ্রেপ্তার তাই হর্নিম্যান আবার 'বোম্বে ক্রনিকেলে'র সম্পাদক হলেন।

কিন্তু গোল বাধলো ব্রেলভীর মুক্তির পর। প্রস্তাব হলো যে হর্নিম্যান ও ব্রেলভী দু'জনেই হবেন সম্পাদক। কিন্তু ব্রেলভী হলেন অরাজী। হর্নিম্যান 'বোম্বে ক্রনিকেল' ছেড়ে দিলেন। সুরু করে দিলেন 'বোম্বে সেন্টিন্যাল'। কাগজ বেরুতে সুরু করলো রোজ বিকেল বেলা।

ইতিমধ্যে 'ক্রনিকেলে'রও হাতবদল হলো। দেনার দায়ে কাগজ বিক্রী করে দেয়া হয়েছে কাগজের ব্যবসাদার কামার বলে এক পার্শী ধনকুবেরের কাছে। 'সেন্টিন্যাল' রইলো 'ক্রনিকেলে'রই এক অংশ হিসাবে।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ভাগে জিন্না ছিলেন হর্নিম্যানের

বিশেষ বন্ধু। কিন্তু এ বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী রইলো না। জিন্নার রাজনীতি ক্ষেত্রে ডিগবাজী খাবার পর হর্নিম্যান তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে দিল্লীতে 'ডন' কাগজ প্রতিষ্ঠা করার সময় জিন্না একদিন হর্নিম্যানকে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন। কথাবার্ত্তা হলো নানান্ বিষয়ে। হঠাৎ জিন্না প্রস্তাব করলেন হর্নিম্যানকে 'ডন' কাগজের দায়িত্ব নেবার জন্যে। হর্নিম্যান এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, 'কাগজের দায়িত্ব নিতে রাজী আছি, এক সর্ত্তে। যদি এ কাগজকে লীগের মুখপত্র না করা হয়। আমি কোন সাম্প্রদায়িক কাগজের এডিটার হতে চাই নে।'

এর পরে জিন্না আর কখনো হর্নিম্যানের সঙ্গে দেখা করেননি।

* * * *

ভারতের আজ-কাল যাঁরা নাম করা সাংবাদিক, তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন হর্নিম্যানের শিষ্য। এঁরা তাঁদের হাতেখড়ি নিয়েছে 'বোম্বে ক্রনিকেল' কাগজে। এঁদের মধ্যে হর্নিম্যানের সব চাইতে প্রিয় ছিলেন পোথান যোসেফ ও সৈয়াদ হাসান। ইতিমধ্যে দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি বোম্বাইএর জনগণের মধ্যে প্রিয় হয়ে দাঁড়ালেন। সাংবাদিক মহল তাঁর নাম দিলো গভর্ণর।

[ক্রমশঃ।

চরৈবেতি

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে)

শিশিরকুমার দাশ

শ্রান্তিবিহীন চলেছে যে পথে : এ জীবন তা'র সফল হ'ল।
নাই চলে যদি বরণীয় জন জরা ক'রে নেবে তাদের গ্রাস ;
সুরপতি হয় পথসাথী তা'র : দিগন্তলীন এ মহাকাশ
জানায় আশীষ যে চলেছে পথে : জীবনেতে তাই শুধুই চল।

পুষ্পিত তা'র যুগল জঙ্ঘা : এ জীবন তা'র সফল হ'ল।
আসে যৌবন সারা দেহ-মনে নামে শক্তির বিপুল ঢল ;
সরে যায় দূরে পুঞ্জিত পাপ আঁধার জড়তা প্রেতের দল
এ জীবন চায় তাই প্রতি পলে : জীবনেতে তাই শুধুই চল।

যে রয়েছে বসে এ জীবন তা'র চিরদিন ধরে বসেই র'ল।
যে উঠে দাঁড়ায় জীবনেতে তা'র উদিত রবির কিরণ লাগে ;
যে রয় শয়নে স্বপন নয়নে জড়িত জীবন কভু না জাগে
শুধু সে সফল যে চলেছে আজ : জীবনেতে তাই শুধুই চল।

ঘুমায়ে কাটায় যে জীবন সেই জীবনেরে কালো কলিযুগ বলো।
যে শুধু জেগেছে দ্বাপর এসেছে সেই জীবনের নবীন স্রোতে ;
যে উঠেছে সেই ত্রেতার আলোকে : সে পথিক চলে দীর্ঘপথে
সত্যযুগেতে সে চলেছে আজ : জীবনেতে তাই শুধুই চল।

যে চলেছে পথে মধু ঝরে আসে, পায় মধুময় অমৃত ফলও।
ঐ যে আকাশে সূর্য চলেছে কত সম্পদ আলোর ধূম ;
তন্দ্রা আসেনি তা'র দেহে আজো : তা'র চোখে কেউ দেখেনি ঘুম
কত তেজ আর আলোতে সে ভরা : জীবনেতে তাই শুধুই চল।

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আট

অতর্কিতে সেই কোন একটা ভারী বস্তু পতনের ও ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গেই কাচভাঙার ঝন্‌ঝন্ শব্দটা ঘরের মধ্যে আমাদের সকলকেই সচকিত করে দিয়ে গেল। কথা বললে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথমে আমাদের মধ্যে কিরীটিই: 'কাচের কোন জিনিষ ভাঙার শব্দ।'

'তাই ত' শব্দটা উপরের তলা থেকেই এলো বলে মনে হলো। যাই দেখে আসি কি ভাঙল আবার—' শতদল ঘর হ'তে বের হ'য়ে যেতেই কিরীটিও তাকে অনুসরণ করে আর আমি করি কিরীটিকে। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে যে ওয়াল ল্যাম্পটা টিম্‌-টিম্ করে জ্বলছে তাতে করে সিঁড়ি-পথের অন্ধকার দূরীভূত হওয়া ত দূরের কথা, দু'পাশের দেওয়ালের চাপে পড়ে আরো যেন ঘন হওয়ায় এবং তার মধ্যে আলোর স্বল্পতায় যেন একটা কেমন ছমছমে ভাবের সৃষ্টি করেছে।

সর্বাগ্রে শতদল বাবু, তার পশ্চাতে কিরীটি ও সবার শেষে আমি সিঁড়ি-পথ অতিক্রম করে উপরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই একটা সাদা কাপড়ে ঢাকা ছায়ামূর্তি যেন সোঁ করে আমাদের চোখের সামনে দিয়েই বারান্দার শেষ প্রান্তের দরজা-পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ব্যাপারটা এত চকিত যেন মনে হলো একটা স্বপ্নের মতই ছায়ামূর্তিটা অন্ধকারে বারান্দার ওদিকে মিশিয়ে গেল।

কিরীটি কিন্তু মুহূর্তের জন্যও সময় নষ্ট করেনি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যেন একপ্রকার দৌড়েই বারান্দার শেষ প্রান্তে যেদিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে ক্ষণপূর্বে সেই ছায়ামূর্তি, সেই দিকে এগিয়ে গেল।

আমিও কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতই কিরীটিকে অনুসরণ করলাম।

দরজাটা পার হলেই একটা স্বল্পপরিসর ছাতের মত, তিন দিকে তার এক বুক সমান প্রায় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কিরীটি দেখি সেই প্রাচীরের উপর দিয়ে ঝুঁকে অন্ধকারে নীচে তাকিয়ে আছে। আমি ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

নীচে অন্ধকারে বাগানের মধ্যে গাছপালাগুলো নিঃশব্দে ছায়ার মত গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দোতলার ছাত থেকে নীচের বাগানে চট্ করে কারো পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভবপর না হলেও প্রাণের দায়ে যে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে না, এমন কোন কথা নেই। এবং বেকায়দায় নীচে পড়লে গুরুতররূপে জখম বা আহত হওয়াও এমন কিছু আশ্চর্য নয়।

ছায়ামূর্তিটা এই ছাতের দিকেই যখন এসেছে এবং স্পষ্ট আমরা যখন সকলেই চোখে দেখেছি এবং এই ছাত থেকে অন্য কোথায়ও যাওয়া যখন সম্ভবপর নয় তখন একমাত্র নীচের ঐ বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মগোপন করা ছাড়া ছায়ামূর্তিটা আর অন্য কোথায় যেতে পারে?

'সু, তোর সঙ্গে টর্চ আছে?—' কিরীটি হঠাৎ প্রশ্ন করে।

'না ত—' জবাব দিই।

হঠাৎ এমন সময় আমাদের ঠিক পশ্চাতেই শতদল বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'আমার ঘরে টর্চ আছে মিঃ রায়, এনে দেবো?'

'না! প্রয়োজন নেই—চলুন দেখা যাক কিসের শব্দ হয়েছিল'!—বলতে বলতে কিরীটিই আবার বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

সকলে ভিতরে এসে প্রথমে বারান্দা অতিক্রম করে শতদল বাবুর শয়ন-ঘরের ঠিক পাশের ঘরটির দরজা হাঁ করে খোলা দেখে প্রথমে শতদল বাবুই থেমে বললে: 'এ কি! এ ঘরের দরজাটা খোলা কেন?'

'দরজাটা বন্ধ ছিল সেদিনও দেখেছি, যত দূর আমার মনে পড়ছে তালা বন্ধই ছিল, না শতদল বাবু?—' কথাটা বললে কিরীটি।

'হাঁ! দাদুর ষ্টুডিও-ঘর। এটা ত সর্বদা বন্ধই থাকে আমি এখানে আসা পর্যন্ত' —মৃদু কণ্ঠে শতদল জবাব দেয়: 'আশ্চর্য! এ দরজায় একটা হবস্‌এর ভারী তালা লাগান ছিল—তালাটাই বা কোথায় গেল?' পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে অল্প একটু এগিয়ে গিয়ে শতদল উচ্চ কণ্ঠে ডাকল: 'অবিনাশ! অবিনাশ!'

'অমনি অবিনাশকে একটা আলো নিয়ে আসতে বলুন ত।—' কিরীটি কথাটা বললে।

কিন্তু অবিনাশের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

শতদল সিঁড়ির দু'-চারটে ধাপ এগিয়ে গিয়ে আবার উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিল: 'অবিনাশ! ভুখণা—'

এবারেও অবিনাশের বা ভুখণার কারোরই কোন সাড়া পাওয়া গেল না নীচের তলা হ'তে।

'উপরে একটা বাতি নিয়ে আয় ভুখণা!—' তথাপি শতদল চেঁচিয়ে বললে।

কিছুক্ষণ পরেই সিঁড়িতে ক্ষীণ পদশব্দ পাওয়া গেল এবং দেখা গেল, শতদল বাবুর সেই বিচিত্র চেহারার রাঁধুনী বামুন একটা হ্যারিকেন হাতে উপরে উঠে আসছে।

হ্যারিকেন বাতিটা হাতে নিতে নিতে শতদল ভুখণার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে: 'অবিনাশ কোথায়?'

নিঃশব্দে ভূখণা মাথাটা একবার দোলাল মাত্র, সে জানে না।

'যা, দেখ অবিনাশ কোথায় আছে, তাকে একবার ডেকে দে—'

ভূখণা চলে গেল।

সর্বাগ্রে হ্যারিকেন হাতে শতদল এবং পশ্চাতে আমি ও কিরীটি ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

হ্যারিকেন বাতির অনুজ্জ্বল আলোয় অকস্মাৎ যেন ঘরের মধ্যে চারি দিক হ'তে অনেকগুলো চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে আমাদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একসঙ্গে যেন অনেকগুলো চোখের দৃষ্টি আমাদের চারি দিকে হঠাৎ সজীব হ'য়ে জিজ্ঞাসায় প্রখর হ'য়ে উঠেছে: কে তোমরা? কি চাও?

ঘরের চারি দিকে দেওয়ালে বিরাট বিরাট সব প্রমাণ সাইজের কলার ও অয়েল পেনটিং, নানা আকারের পাথর, প্লাষ্টার ও ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি। মনে হয় একটু আগেও বুঝি ওদের প্রাণ ছিল, হঠাৎ কেউ মন্ত্রোচ্চারণে ওদের বোবা করে দিয়ে গিয়েছে। অনুজ্জ্বল আলোর অপর্যাপ্ত আভা চারি দিককার ছবি ও মূর্তিগুলোর 'পরে প্রতিফলিত হ'য়ে যেন সৃষ্টি করেছে কি এক ঘনীভূত রহস্যের!

কিরীটি শতদল বাবুর হাত হ'তে হ্যারিকেনটা নিয়ে উঁচু করে চারি দিক ঘুরিয়ে একবার দেখতেই সকলেরই আমাদের যুগপৎ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ঘরের পুব কোণে মেঝেতে একটা ভারী কারুকার্য খচিত চওড়া ব্রোঞ্জের ফ্রেমে বাঁধান ছবি মেঝেতে পড়ে আছে এবং তাঁর চার পাশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কাচের টুকরো। বোঝা গেল, ক্ষণপূর্বে আমরা ঐ ভারী ছবিটারই পড়ে গিয়ে ভাঙ্গার শব্দে নীচে থেকে সচকিত হ'য়ে উঠেছিলাম। কিরীটি নিঃশব্দে বাতিটা হাতে সর্বাগ্রে সেই দিকে এগিয়ে গেল।

ছবিটা উবুড় হ'য়ে পড়ে আছে।

একটা মোটা তার দিয়ে দেওয়ালের গায়ে বড় একটা পেরেকের সাহায্যে ছবিটা দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল। দেখা গেল ছবির সঙ্গে ছবির তারটাও অক্ষত আছেই, দেওয়ালের গায়ে পেরেকটাও ঠিক আছে। তবে ছবিটা এই ভাবে মাটিতে খ'সে পড়লো কি করে।

কিরীটি হ্যারিকেনটা মেঝেতে এক পাশে নামিয়ে রেখে নিচু হ'য়ে মাটি হ'তে ছবিটা তুলে সোজা করে দাঁড় করালো।

চোগা-চাপকান পরিহিত মাথায় পাগড়ী-আঁটা বিরাট এক পুরুষের প্রতিকৃতি অয়েল কলারে অঙ্কিত। প্রশান্ত ললাট, উন্নত খড়গের মত নাসিকা, দীর্ঘ আয়ত চক্ষু এবং সেই চক্ষুর দৃষ্টি যেন মনে হয় সজীব এবং অন্তর্ভেদী।

ছবিখানা দু'হাতের সাহায্যে একবার মাটি থেকে উঁচু করে কিরীটি বোধ হয় ছবিটার ওজনটা পরীক্ষা করে আবার নামিয়ে রাখল: 'বেশ ভারী ছবিখানা। ওজনে-অন্তত পনের-ষোল সের হবে।'

মৃদু আত্মগত ভাবেই যেন কথাগুলো কতকটা উচ্চারণ করল কিরীটি। তার পরই শতদলের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, 'চেনেন শতদল বাবু এ ছবিটা কার?—'

'না! এখানে আসবার পর এক দিন মাত্র এ-ঘরে ঢুকেছিলাম। এর আগে দু'-এক বার যা এখানে এসেছি এই ষ্টুডিও-ঘরে কখনো প্রবেশ করিনি। দাদু কখনো কাউকে এ ঘরে ঢুকতে দিতেন না।—'

কেন?—' প্রশ্নটা করলাম এবারে আমিই।

তিনি ঠিক কারো এই ষ্টুডিও-ঘরে প্রবেশ করাটা পছন্দ করতেন না। বরাবরই লক্ষ্য করেছি, এই ষ্টুডিও-ঘর সম্পর্কে তাঁর কেমন যেন একটা sentiment ছিল। দিবা-রাত্র এই ঘরের মধ্যেই প্রায় রং-তুলি, ইজেল অথবা ছেনী বাটালী নিয়ে মগ্ন হ'য়ে থাকতেন। দীর্ঘকাল ধরে এক বেলাই আহার করতেন শুনেছি রাত্রে। এও শুনেছি, অনেক রাত্রে নাকি তিনি খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন, এই ঘরের মধ্যে তাঁর রাত কেটে যেত—'

শিল্পীর সাধনা-ক্ষেত্রই বটে। শিল্পী রণধীর চৌধুরী যেন এখনো এই মূর্তি ও ছবিগুলোর মধ্যেই বেঁচে আছেন। নিভৃত এই কক্ষখানির মধ্যে তিনি আপনাকে যে একান্ত ভাবে সমর্পণ করেছিলেন এবং যে সমর্পণের ভিতর দিয়ে এই বিস্ময় তিল তিল করে গড়ে উঠেছে তারই সাক্ষ্য যেন কক্ষের চতুর্দিকে।

'এই ঘরের চাবিটা?—'

'সেটা ত আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরেরই একটা আলমারীর ড্রয়ারের মধ্যে থাকত একটা রিংয়ে অন্যান্য চাবীর সঙ্গে!—'

'দেখুন ত সে রিংয়ে চাবিটা আছে কি না?—' কিরীটি শতদল বাবুকে অনুরোধ জানায়।

'দেখছি—' শতদল বাবু ঘর হ'তে বের হ'য়ে যাবার আগেই আবার কিরীটি বললে: 'শতদল বাবু, Just a minute। ঐ সঙ্গে kindly একটা টর্চ'ও নিয়ে আসবেন।—'

শতদল ঘর হতে অতঃপর নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল। ঘরের মধ্যে এখন আমরা দু'জনই: কিরীটি ও আমি। হারিকেন বাতির স্বল্প আলোয় কিরীটির মুখের দিকে তাকালাম।

মুখের রেখায় রেখায় কোন কিছু একটা চিন্তার সুস্পষ্ট আভাষ। তার ইতিপূর্বের ধীর মৃদু সংযত কণ্ঠস্বর ও নিষ্ক্রিয়তা থেকেই বুঝেছিলাম, ঐ মুহূর্তে গভীর ভাবেই কোন একটা চিন্তা কিরীটির মাথার মধ্যে পাক খেয়ে চলেছে। এবং ঐ সময়ে যে নিজে হ'তে স্বেচ্ছায় মুখ না খুললে কারো সাধ্য নেই তাকে কথা বলায়। বুঝতে পারছিলাম ছবিটা অমনি আকস্মিক ভাবে মাটিতে পড়ে গিয়ে ভাঙ্গার ব্যাপারটা সে খুব সহজ ভাবে নেয়নি। শতদলের ক্ষণপূর্বের জবানীতে জানা গিয়েছে ঘরটা বন্ধ ছিল এবং এ ঘরের চাবিটাও তারই ঘরে ছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে ঘরের দরজায় কোন তালা নেই—দরজা খোলা এবং ঘরের মধ্যে ঐ ছবিটা ভগ্ন কাচের টুকরোর মধ্যে পড়ে আছে। আরো ভাঙ্গার শব্দটাও কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা নীচের তলা থেকেই শুনেছি। ছবিটা আপনা হতেই পড়ে গিয়ে যে ভাঙেনি তারও প্রমাণ পাচ্ছি।

সব কিছু পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এ কথাটা স্বতঃই মনে হচ্ছে, কেউ নিশ্চয়ই এ-ঘরে এসেছিল। এবং ছবিটা পাড়তে গিয়ে বা নামাতে গিয়ে দেওয়াল থেকে আচমকা অসাবধানতা বশতঃ তার হাত থেকে হয়ত মাটিতে পড়ে গিয়ে তার কাচটা ভেঙ্গেছে। খুব সম্ভব সেই কারণেই হয়ত তাকে আচমকা ঘটনা-বিপর্যয়ে স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে তাহলে বক্তব্য হচ্ছে: কেউ না কেউ কিছুক্ষণ আগে এ ছবিটার জন্য এ-ঘরে এসেছিল। যেই আসুক—কিন্তু কেন?

এ ছবিটার প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল তার। কিন্তু কেন? কি প্রয়োজন ছিল তার?

ওজনে অত ভারী এবং আকারে অত বড় ছবিটা চট্ করে

কোথায়ও নিয়ে যাওয়া বা লুকানও ত সহজ নয়! কিন্তু এমনও ত হতে পারে, তার ছবিটা সরাবার বা কোথায়ও নিয়ে যাওয়ার ঠিক প্রয়োজন ছিল না কেবল হয়ত ছবিটা দেওয়াল হ'তে নামিয়ে দেখতেই চেয়েছিল সে। কিন্তু ছবিটা দেখবারই যদি শুধু প্রয়োজন ছিল তার দেওয়ালে টাঙ্গানো অবস্থাতেও ত দেখতে পারত? দেওয়াল হতে নামাবার কি প্রয়োজন ছিল?

বাইরে এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। বুঝলাম শতদল বাবু চাবির রিং ও টর্চ নিয়ে এই ঘরেই আসছে।

অনুমান মিথ্যা নয়। শতদল বাবুই ঘরে এসে প্রবেশ করল এবং নিঃশব্দে চাবির রিংটা ও পাঁচ সেলের একটা হান্টিং টর্চ কিরীটির দিকে এগিয়ে দিল।

ডান হাতে চাবির রিংটা ধরে বাম হাতে টর্চটা নিল কিরীটি।

'এই রিংয়ের মধ্যেই এই ঘরের তালার চাবিটা ছিল?—' কিরীটি শতদলকে প্রশ্ন করে।

'হাঁ!—'

'দেখুন ত সে চাবিটা আছে কি না?—সু, বাতিটা একটু তুলে ধর।—'

কিরীটির নির্দেশ মত বাতিটা আমি তুলে ধরলাম।

চাবির গোছাটা কিছুক্ষণ নেড়ে-চেড়ে দেখে শতদল মৃদু কণ্ঠে বললে: 'এই ত চাবিটা রিংয়ের মধ্যেই ত আছে দেখছি।'

একটা বড় আকারের চাবি গোছার ভিতর থেকে আলাদা করে কিরীটির সামনে ধরল শতদল।

'চাবির রিংটা আপনার ঘরে যে আলমারীর ড্রয়ারে ছিল বলছিলেন, সেটা কি চাবি দেওয়াই থাকত শতদল বাবু?—'

'হাঁ! চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলেই ত রিংটা নিয়ে এলাম।—'

'ড্রয়ারের চাবিটা কোথায় ছিল?—'

'আমার পকেটেই ছিল। সর্বদা পকেটেই রাখি।—'

'আপনার ঘরটা কি সাধারণত যখন আপনি থাকেন না তালা দেওয়া থাকে?—'

'না।—'

কিরীটি অতঃপর টর্চের আলো ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে কি যেন দেখল এবং ফিরে এসে বললে: 'তালাটা নেই দেখছি। ভাল কথা আজ কখন আপনি বাইরে বের হয়েছিলেন? কতক্ষণই বা বাইরে ছিলেন শতদল বাবু?'

'প্রায় পোটা চারেকের সময় বাইরে গিয়েছি—'

'যাবার সময়ও এই ঘরের দরজার সামনে দিয়েই আপনি গিয়েছিলেন, তখন লক্ষ্য করেছিলেন কি এই ঘরের দরজায় তালাটা ছিল কি না?—'

'না, লক্ষ্য করিনি!—'

'কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?—'

'থানায় গিয়েছিলাম দারোগা বাবুকে গত রাত্রের ব্যাপারটা জানাতে!—'

'দারোগা বাবুর সঙ্গে দেখা হলো?—'

'হয়েছে!—'

'হোটেলে কখন গিয়েছিলেন?—'

'থানায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম, বোধ করি সাড়ে ছয়টা নাগাদ হোটেলে পৌঁছাই। সেখানে আপনাদের না পেয়ে বরাবর এখানে ফিরে আসি—'

'হুঁ! আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারেন শতদল বাবু, হিরণ্ময়ী দেবীরা এখন নীচের মহলে যে ঘরটায় আছেন সেই ঘরের দেওয়ালে পাশাপাশি যে দু'টি মহিলার ছবি টাঙ্গানো আছে, তারা কারা?'

'আমি লক্ষ্য করে দেখিনি ত?'—বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে শতদল জবাব দেয়।

'দেখেননি! কাল একবার দিনের বেলা ছবি দু'টো ভাল করে দেখে আমাকে বলবেন ত চিনতে পারেন কি না ছবি দু'টো কার?—' কতকটা যেন নির্দেশের সুরেই কথাগুলো বললে কিরীটি।

কিরীটির প্রস্তাবে শতদল কেমন যেন একটু ইতস্তত করে বলে, 'উনি, মানে আপনার ঐ হিরণ্ময়ী দেবী আমাকে ঠিক যেন পছন্দ করেন বলে আমার মনে হয় না মিঃ রায়! কাজেই তাঁর ঘরে যাওয়া—'

'অবিশ্যি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার ও-রকম মনে হওয়ার কোন কারণ আছে কি?'

'থাকলেও অন্তত আমি জানি না মিঃ রায়, কারণ এবারে এখানে আসবার পূর্ব পর্যন্ত ওদের সঙ্গে আমার কোন চেনা-পরিচয়ই ছিল না!'

'হরবিলাস বাবু, হিরণ্ময়ী দেবী ও ওঁদের মেয়ে ঐ সীতা এদের কারও সঙ্গেই পূর্বে আপনার আদৌ কোন পরিচয়ই ছিল না আপনি বলতে চান শতদল বাবু?' প্রশ্নটার মধ্যে যেন কোন গুরুত্বই নেই, কথার পিঠে কথা প্রসঙ্গে এসে গিয়েছে এমনি ভাবেই অত্যন্ত শান্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলতে বলতে ইতিমধ্যে হাতের টর্চটা জেলে তার আলোয় কিরীটি ঘরের চতুর্দিকে দেওয়ালে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। শতদল মুহূর্ত কাল চুপ করে থেকে মৃদু সংযত কণ্ঠে জবাব দিল: 'না'।

আচমকা কিরীটি ঘুরে দাঁড়াল শতদলের মুখোমুখি হয়ে এবং তার স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধানী চাপা অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলো: 'ছিল না?'

'না—'

মুহূর্তের জন্য কিরীটির কণ্ঠে যে অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠেছিল তার পরবর্তী প্রশ্নে যেন তার আর লেশ মাত্রও অবশিষ্ট রইলো না: 'আপনার সঙ্গে ওঁদের পূর্ব-পরিচয় যদি কিছু না-ই থেকে থাকে তাহলে হঠাৎই বা হিরণ্ময়ী দেবী আপনাকে অপছন্দ করতে যাবেন কেন?'

'তাহলে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি মিঃ রায়, যদিচ কারণটা আমার কাছে একান্তই হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়—হিরণ্ময়ী দেবী দাদুর মৃত্যুর পর আমার এ ভাবে এখানে আসাটাই যেন পছন্দ করেননি! আমি না এলে দাদুর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ত তিনিই হতেন, যদিচ দাদুর সম্পত্তির মধ্যে ত এই বাড়িখানা ও একগাদা ছবি ও মূর্তি! আমার কাছে ত এর কোন মূল্যই নেই আর দাবীও করবো না। একা মানুষ, বিয়ে-থাও করিনি, যা মাইনা পাই প্রফেসারী করে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এ কথা এখানে আসবার পরই ওদের আমি বলেছিলাম, কিন্তু—'

'কিন্তু কি?—'

'কিন্তু উনি জবাব দিলেন যতটুকু তাঁর প্রাপ্য তার এক কপর্দ্দকও উনি বেশী চান না এই সম্পত্তির।'

'হুঁ! মনে কিছু করবেন না শতদল বাবু, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল এবং না বলেও পারছি না।—'

'নিশ্চয়ই, বলুন না ?—'

'প্রথম যেদিন সৈকতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয় মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার, আপনি কথায়-কথায় বলেছিলেন, যত দূর আমার মনে পড়ে যে, শিল্পী রণধীর চৌধুরীর বিরাট সম্পত্তির শেষ ও একমাত্র অবশিষ্ট তাঁর এই 'নিরালা'র ওয়ারিশন আপনি। তাই নয় কি ?—'

কিরীটির অমন সোজা ও স্পষ্ট অভিযোগে শতদল প্রথমটায় কেমন যেন একটু বিহ্বল হ'য়েই পড়ে, কিন্তু মুহূর্তে সে বিহ্বলতাটুকু কাটিয়ে হাস্যতরল কণ্ঠে বলে ওঠে, 'হাঁ, বলেছিলামই'ত এবং এখনও তাই বলবো, কিন্তু ওঁরা সে কথা মানতে চান না।—'

'মানতে চান না কেন ? রণধীর বাবুর কোন উইল নেই ?—'

'উইল, সেটাকে উইলই বলা চলে, মানে দাদুর লেখা একখানা চিঠি আমার কাছে আছে যেটা অনায়াসে আইনের চোখে উইলেরই সমপর্য্যায়ে পড়ে !—'

—'ওঃ, তবে সেটা ঠিক উইল নয় ?—'

'না ! ঠিক উইলের খসড়ায় ফেলে রেজিস্ট্রী করবার বা কোন আইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করবারও হয়ত তিনি সময় পাননি, কারণ সেটাকে চিঠিই বলুন বা উইলই বলুন তাঁর মৃত্যুর মাত্র দিন সাতেক আগে লেখা !—'

'সে উইলে কি আছে ?—'

'চলুন না আমার ঘরে—ঐ ঘরের দেওয়াল-সিন্দুকেই উইলটা আছে।'

'দেখবো'খন, তবু বলুন না আপনি কি লেখা আছে সেই চিঠিতে ?—'

'বিশেষ কিছুই না, লেখা আছে এই 'নিরালা' ও এ বাড়ির যাবতীয় সব কিছু আমাকেই তিনি দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর মৃত্যুর পরে।—'

বাইরের দালানে এমন সময় অস্পষ্ট পদশব্দ পাওয়া গেল। এবং ঘরের মধ্যস্থিত একমাত্র হ্যারিকেন বাতিটা হঠাৎ মনে হলো কেমন যেন তার আলোর শিখাটা নিস্তেজ হয়ে আসছে।

আলোটার দিকে দৃষ্টি আমারই প্রথম পড়ল : 'আলোটায় তেল নেই বলে যেন মনে হচ্ছে শতদল বাবু !'

আমার কথায় আকৃষ্ট হ'য়ে কিরীটি ও শতদল দু'জনাই আলোটার দিকে তাকাল।

আলোটা আরো নিস্তেজ হ'য়ে এসেছে।

পদশব্দটা ঠিক দরজার গোড়ায় এসে থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ বারের মত বার দুই দপ্ দপ্ করে আলোর শিখাটা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল হঠাৎ।

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই যেন আলোর শিখাটা নিবে গেল।

অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার মুহূর্তে যেন আমাদের সমস্ত দৃষ্টিকে গ্রাস করল।

অন্ধকারে কিরীটির গলা শোনা গেল : 'কে ? কে ওখানে ?'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটির হস্তধৃত পাঁচ সেলের হান্টিং টর্চের সুতীব্র অনুসন্ধানী আলোর রশ্মিটা উন্মুক্ত দ্বার-পথে গিয়ে পড়ল।

'কে ?—'

চিনতে কষ্ট হলো না টর্চের আলোয়। দরজার ঠিক উপরেই দাঁড়িয়ে আছে এ-বাড়ির পুরাতন ভৃত্য অবিনাশ।

'আজ্ঞে, আমি অবিনাশ !—' অবিনাশ জবাব দিল : 'আমায় ডাকছিলেন দাদাবাবু ?'

'হাঁ। কোথায় থাক তোমরা ? আলোগুলোতে তেল থাকে কি না থাকে সেদিকেও তোমাদের এতটুকু নজর নেই, কি কর যে সব সারাদিন বসে বাড়িতে ?—' ঝাঁঝালো বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো শতদল বাবু।

'কেন ? আজ দুপুরেও ত সব বাতিতে তেল ভরে দিয়েছি !—'

'তেল ভরেছো ত বাতি নিবে যায় কি করে ? যাও আর একটা বাতি নিয়ে এসো শীগ্‌গির করে !—'

'যাই।—' অবিনাশ নিঃশব্দে চলে গেল।

কিরীটি হস্তধৃত টর্চের আলো ফেলে ঘরের মেঝেটা আবার দেখতে লাগল। যে জায়গায় দেওয়াল থেকে ছবিটা মেঝেতে পড়েছিল তারা চারি দিকে কাচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত।

দেওয়ালের গায়ে যেখানে ছবিটা টাঙানো ছিল কিরীটি সেখানে আলো ফেলল, তারপর আবার ঘরের চারি দিকে অনুসন্ধানী আলো ফেলে মৃদু কণ্ঠে বললে কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই : 'আশ্চর্য। টুলটা দেখছি না, গেল কোথায় ?'

'কি বললেন মিঃ রায় ?—' প্রশ্নটা করল শতদল বাবুই।

'একটা টুল।—'

'টুল ?—' বিস্মিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে শতদল।

'হাঁ, টুল ! বা ঐ জাতীয় একটা কিছু !—হাঁ, ভাল কথা, আপনার কাছে মজবুত তালা আছে শতদল বাবু ?—'

'তালা ! তা আছে বোধ হয়—'

'নিয়ে আসুন। ঘরটা তালা দিয়ে রাখতে হবে !—'

শতদল বাবু ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

কিরীটি হাতের আলোটা ততক্ষণ ভূপতিত ছবিটার উপরে ফেলেছে এবং আমাকে এবারে লক্ষ্য করে বললে : 'ছবির ফ্রেমটা কিসের তৈরী বলে মনে হয় সু ?'

'ছবির। মানে ঐ ছবির ফ্রেমটা ?—'

'হাঁ ! চেয়ে দেখ ছবির ফ্রেমটা একটু যেন peculiar ! ব্রোঞ্জ জাতীয় কোন মেটালের তৈরী। এবং যেমন মজবুত তেমনি ভারী। ওয়াটার-কলার একটা ছবি ও তার কাচের ওজন এত বেশী হ'তে পারে না। ছবিটার যা-কিছু ওজন ওই ফ্রেমটার [illegible]' কথাগুলো বলে সহসা যেন অতঃপর কতকটা স্বগতোক্তির মতই আস্তে আস্তে বললে : 'কিন্তু কেন ?'

'কি বললি ?—' প্রশ্নটা করলাম আমিই কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে।

'ভাবছি ছবির ফ্রেমটার কথাই !—বিনা প্রয়োজনে এ জগতে কিছুই তৈরী হয় না সু ! ছবির ফ্রেমটারও নিশ্চয়ই ঐ ভাবে তৈরী করাবার আর্টিষ্টের কোন একটা উদ্দেশ্য ছিল !—'

'হয়ত ছবিটাকে মজবুত ও টেকসই করবার জন্যই—'

'There you are ; you are cent per cent right সু !'

বাইরে এমন সময় পদশব্দ শোনা গেল।

অবিনাশ একটা আলো হাতে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

হঠাৎ কিরীটি অবিনাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল : 'গায়ে তোমার বুঝি চোট লেগেছে অবিনাশ ?' [ক্রমশঃ।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

নিশ্চয়ই ভাবছেন আপনারা, এর পরই গোরা সেনাদলের সর্দ্দার স্বদেশের অবোধ্য কথ্য ভাষায় বিশ্রম্ভালাপ ত্যাগ করে অকস্মাৎ জলদগম্ভীর স্বরে সামরিক আদেশ উচ্চারণ করলো :

Aim your—guns
Safety catch—forward
One round—fire

এবং তার পরই বারোটি সামরিক রাইফেলের বারোটি তপ্ত সীসে এসে বিঁধলো আমার শরীরে, শরীর একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল। কিন্তু তথাপি বেঁচে গেলাম রবার্ট ব্লেকের মতো অথবা মোহনের মতো। নইলে কে লিখবে রহস্য-লহরী সিরিজ কিংবা মোহন-সিরিজ? তাই নয় কি?

কিন্তু শুনে বিস্মিত হবেন আপনারা যে, আমার ন্যায় এক জন সাধারণ যুবকের একটি মাত্র ঘুসি, তা সে যতই প্রচণ্ড হোক না কেন, তার ফলেই এমনি বিরাটকায় পুরুষটিকে একেবারে ধরাশায়ী হতে দেখে প্রথমটা ওরা চমকে উঠলো, তার পর চোখে-মুখে ওদের ফুটে উঠলো সহাস্য কৌতুক, তার পর অকস্মাৎ ওদের দলপতি আমার কাছে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে অবোধ্য কথ্য ভাষায় একখানা গানই ধরে ফেললো, ট্রা-লা-লা-লা, ট্রা-লা-লা-লু...

দারোগা বাবুর তখন জ্ঞান ফিরে এসেছে। প্যাণ্টের ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি একখানা রুমাল বার করে মুখমণ্ডল সম্মার্জ্জনা করছেন। আড়চোখে একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আমার প্রতি চকিতে নিক্ষিপ্ত রবীন হুডের তীরের মতো, কিন্তু নীলকণ্ঠের মতো আমার মনে সে তীরের বিষ শুধু একটা রংয়ের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলো মাত্র, বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।

নিশ্চিত ছিলাম যে, লেবং ঘটনার পরদিনই যখন হানা দিয়েছে পুলিশ, গ্রেপ্তার তখন আমায় করবেই। কিন্তু কত আশা ও কত রঙীন্ পরিকল্পনা নিয়ে শোভাযাত্রা করে যেমন এসেছিল দারোগা, আই-বি, পুলিশ ও গোরা সেনার দল, তেমনি শোভাযাত্রা করেই বিদায় নিয়ে চলে গেল তারা গভীর হতাশ্বাসে ভাঙা বুক নিয়ে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই দক্ষিণের ঘরের ঢেউ-তোলা টিনের বেড়ার ওপর খবরের কাগজ সেঁটে আমি যে পুরু কাগজের দ্বিতীয় দেয়াল তৈরী করে রেখেছিলাম, তার নির্দ্দিষ্ট একটি স্থানে ব্লেড চালিয়ে খানিকটে ফাঁক করে দিতেই ভেতরে একটি ক্ষুদ্র খোপর দেখা গেল। সাবধানে রিভলভারটি বার করে রঙ্গলালের হাতে দিয়ে বলে দিলাম ওটা সুহাসিনীর কাছে গোপনে দিয়ে আসতে।

রঙ্গলাল বেরিয়ে গেল। মনে হলো, ঢাকার আই-বি কর্ত্তাদের কাছে এরা তীব্র তিরস্কার পেয়ে হয়তো আবার একদিন এসে আমায় নিয়ে যাবে। কে জানে, ওদের সে প্রত্যাগমন পরদিনও সম্ভব হতে পারে, তাই নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার জন্য কালবিলম্ব করা সমীচীন মনে হলো না।

সুহাসিনীর প্রসঙ্গ যখন্ এসেই পড়েছে, তখন তার পরিচয়টা দেয়া নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পাড়ার জ্ঞাতি-কাকাদের অন্যতম মণিমোহন চক্রবর্ত্তী। ঢাকা সহরে ওকালতী করেন। অর্থাগম তাতে যে কী পরিমাণ হয়ে থাকে, সঠিক তা না জানতে পারলেও কাকীমা ও তাঁর ডজন খানেক বাচ্চা-কাচ্চার জীবনধারণের মান ও প্রণালী দেখেই তার শোচনীয়তা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যেত। আইনের অবোধ্য জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর শ্লেষ্মাজড়িত উচ্চকণ্ঠের ধারাবাহিক বক্তৃতায় মণি কাকার সান্ধ্য মজলিস সরগরম হয়ে উঠলেও আমার অজানিত ছিল না যে, প্রায়ই তাঁর ভাতের হাঁড়ীর মধ্যে চলতো ইঁদুরের সমস্ত রাত্রি জলসা—সঙ্গীত ও নৃত্য। ঢাকা সহরে বাস করতেন তিনি কোন্ দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার বাড়ীতে এবং প্রায়—বার বারই এড়ে কাটিয়ে যেতেন পারিবারিক পরিবেশে।

এঁরই বড় মেয়ে সুহাসিনী। বছর খানেক হলো মাণিকগঞ্জে বিয়ে হয়েছে কোন এক যুবক মুহুরীর সঙ্গে। তাকে সুহাসিনীর মনে ধরেনি। ডিংসাই শ্রোত্রীয় কুলমর্য্যাদা এক তিলও ক্ষুণ্ণ না করে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঅমুকচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ন্যায়রত্ন, তর্কচঞ্চু, বেদান্তশাস্ত্রী, সার্ব্বভৌমের প্রপৌত্র-এর সঙ্গে কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করে তিনি যে ধরাধামে কী অমর কীর্ত্তি রেখে গেলেন, সালঙ্কারে ও সবিস্তারে সেই পরম সত্য বর্ণনায় মণি কাকার শ্লেষ্মাবিজড়িত কণ্ঠ যখন গমকে-গমকে সপ্তমে উঠছিল, ঠিক সেই সময়ই আমাদের নিরালা ছাদের এক কোণে বসে সুহাসিনী নিজের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা বলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিলো আর ফুলবৌদি চেষ্টা করেছিলেন তাকে সান্ত্বনা দিতে। গ্রামের মেয়ে হলেও সুহাসিনী বহু বার ঢাকা শহরে গেছে ও বাবার কাছে বাস করেছে। গ্রামের মেয়ে-স্কুলে কিছু লেখাপড়াও করেছে। চুল কাঁপিয়ে তোলবার বিশেষ কৌশলটি এবং শরীর জড়িয়ে সাড়ী পরবার বিশেষ ধরণটি সে শহর থেকে আহরণ করে এনেছে। বয়সও হয়েছে তার দুরন্ত আঠারো! এমনি সময় যখন তার মনের সরোবরে কল্পনার বেলোয়ারী তরঙ্গ ময়ূরের মতো পেখম তুলে নৃত্য সুরু করেছে, ঠিক সেই সময় এলো তার জীবনে মাণিকগঞ্জ শহরের এক অখ্যাত মোক্তারের তেইশ বৎসর বয়স্ক মহুরী, নোট-বই হাতে করে ও পেন্সিল কানে গুঁজে যে শিকারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় আদালতের চারি দিকে গাছের তলায়-তলায়। ফুলবৌদি বলেন, ওর স্বামী জুতো পায়ে দিতে পারে না'ফোস্কা পড়ে বলে, সিনেমা দেখতে পারে না অশ্লীল বলে আর দন্তধাবন করতে পারে না সময়াভাবে। এই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য কর্ম্মবীর মহা-পুরুষটি কিশোরী স্ত্রীর নিদ্রিত শয্যার সন্নিধানে এসেও চমকে উঠে থমকে দাঁড়ান, বড্ড বেশী স্পষ্ট মনে হয় সুহাসিনীকে, যেন অশ্লীলতার ইলেকট্রিক স্পার্ক ওর সর্ব্ব অবয়বে, ডি-সি কারেন্ট! ছুঁলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে।......

নড়বড়ে হারমোনিয়ামে যেমন সুর তোলা যায় না প্রাণপণে হাওয়া দিয়েও, চাবুকের আঘাতে আঘাতে রক্ত ঝরিয়ে দিলেও যেমন নিদ্রিত অশ্বের নিদ্রা আর ভাঙা যায় না, ঠিক তেমনি উপর্য্যুপরি ব্যর্থকাম হয়ে নারী-জীবনের সর্ব্বসুখ ও সর্ব্বশান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে এসেছে সুহাসিনী অবশেষে গর্ব্বিত পিতার আলয়ে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহে বিদ্যাহীনের মতো যে ছেলেটি গ্রামের বারোয়ারী তলায় মামময়ী গার্লস স্কুলে মানসরূপে দেখা দিত পাদ-প্রদীপের সম্মুখে, খেলার মাঠে যার পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত বল গিয়ে

ঠেক্তো যেন একেবারে আকাশের নীলে, বিসূচিকা রোগাক্রান্তকে অনর্থক সারা রাত নার্স করে ভোর বেলা আবার তাকে বহন করে গ্রামের শ্মশানে নিয়ে যেতে যে অগ্রগামী, সেই প্রিয় দেবরটি এসে স্থান করে নিল সুহাসিনীর মানস-মরুতে! প্রতিদিনকার অন্তঃশূন্যতায় সেই মরুতেই ফুটে উঠলো একটি সুন্দর ওয়েসিস।

বুভুক্ষু কিরণময়ীর সম্মুখে থরে-থরে সাজানো সুস্বাদু দিবাকরের অমৃত ব্যঞ্জন। অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ভোজ্য দর্শনে লকলক করে জ্বলে উঠলো সুহাসিনীর অন্তরের আগুন।······

এখনও আসে গোপাল মাঝে মাঝে। দু'-এক দিন থেকেও যায়। কাকীমা যে একেবারে টের পান না তা নয়, কিন্তু কন্যার ব্যর্থ জীবনের দুঃখের কথা স্মরণ করে নলচে আড়াল দিয়ে অজ্ঞতার ভাণ করেন। এই সাইকোলজি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। দিনের আলোর মত সত্য!······ফ্রয়েডি মনোবিকলন মনোবিকার বলে কে উড়িয়ে দিতে পারে?

এ সবই সুহাসিনী অকপটে বলেছে ফুলবৌদিকে, আর ফুলবৌদি সবই বলেছেন আমায়। আরও বলেছেন যে, গোপালও নাকি কোন্ স্বদেশী দলে কাজ করে। গোপনে সুহাসিনীর কাছে কখনো-কখনো পিস্তল রেখে যায়, ছোরা রেখে যায়—আবার নিয়েও যায় এসে। আরও একদিন বললেন যে, কিছু দিন হলো গোপাল এসে একটা ছোট্ট সুটকেস রেখে গেছে। সুহাসিনী বলে তার মধ্যে নাকি গোটা দুই পিস্তল, অনেকগুলো কার্ত্তুজ ও খান চারেক ছোরা আছে।

এর পর আরও একটা কথা ফুলবৌদি গোপনে বলেছেন আমায় যে, আমার নাকি খুব ভালো লেগেছে সুহাসিনীর। কিন্তু এগোতে সাহস পাচ্ছে না, কি জানি কিসের ভয়ে।······

সুতরাং স্থির করলাম, ভয় ওর ভাঙিয়ে দিতে হবে। সহজেই যে এগিয়ে আসা যায় আমার কাছে, কিছুক্ষণ বেশ হাসি-ঠাট্টাও করা যায়, আবার ফিরে আসবার সহাস্য অনুরোধও যে শোনা যেতে পারে আমার তরফ থেকে, এ সব আপাত সত্য সমঝিয়ে দিতে হবে ওকে। অবশ্য এই সত্যের অভিনয়ে নিতে হবে আমায় প্রাণান্তকর ঝুঁকি তা জানতাম, তবুও সেই ছোট্ট সুটকেসের ভিতরকার দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যগুলি দুর্নিবার বেগে আমায় আকর্ষণ করতে লাগলো।······

সত্যি, আকর্ষণ সুহাসিনী নয়, আকর্ষণ সেই সুটকেস। লক্ষ্য সুহাসিনীর প্রেম নয়, লক্ষ্য সেই সুটকেসের পিস্তল, কার্ত্তুজ ও ছোরা। কার্য্যোদ্ধারের জন্য চরম পন্থা পারবো না গ্রহণ করতে?···

এ-যুগে খুব সহজ হলেও সে-যুগে এমনি ঝুঁকি নেবার কথা কিন্তু খুব কম কর্ম্মীই স্থান দিতেন মনে এবং দিলেও তা কার্য্যে রূপান্তরিত করবার দুঃসাহসিক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে সীমাহীন দ্বিধা বোধ করতেন। আমার মতো ব্যতিক্রম সে-যুগে খুব বেশী ছিলেন বলে আমার জানা নেই।

সুহাসিনীর সঙ্গে আমার সহাস্য আলোচনা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস মধ্যাহ্নে বসে একেবারে বাজে বিষয় নিয়ে কথা-কাটাকাটি, হাসি-পরিহাস, কাজে ও অ-কাজে দিনের মধ্যে অসংখ্য বার তার আমাদের বাড়ীতে আমারই ঘরে আগমন, এমনি সব রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের দ্রুতগতির মধ্য দিয়ে আমাদের দু'জনকার সম্পর্ক এমনি ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়ে পড়লো যে, একদিন আমি একেবারে দুই আর দু'য়ে চারের মতো বেশ উপলব্ধি করলাম, সুহাসিনী আমার প্রেমে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, সত্যিই প্রেমে পড়ে গেছে! প্রেম বলতে কী স্থূল সম্পর্ক বুঝতো সে, তাও টের পেতে দেরী হলো না আমার। কিন্তু আমার মধ্যে তখন অভিনেতা দ্বিজেন গাঙ্গুলী জন্মলাভ করেছে এবং নিখুঁত অভিনয়ের পুরস্কার যে পাওয়া যাবে গোপালের সেই সুটকেসটি, এই সম্ভাবনাও সত্য হয়ে মনে গেঁথে গেছে। তাই অভিনেতা দ্বিজেন গাঙ্গুলী ধাপে-ধাপে এগিয়ে চললো জীবনের চরম সাফল্যের দিকে।······

যে রাত্রে সুহাসিনী সেই অমূল্য দ্রব্যগুলি বয়ে এনে আমার ঘরে এসে দিয়ে গিয়েছিল, আজও তা ভুলিনি। সেদিন ছিল হয় অমাবস্যা, কিংবা তার কাছাকাছি কোনো তিথি। আকাশ সমাচ্ছন্ন ছিল ধূসর মেঘে। না ছিল বিদ্যুতের কোনো একটি চমক, না ছিল হাওয়ার মাতামাতি। কিন্তু আসন্ন ঝড়ের ভয়াবহতা সেই গুমোটের মধ্য দিয়েই যে প্রকট হয়ে উঠেছিল, দক্ষিণের ঘরের জানালার পাশে বসে বেশ উপলব্ধি করছিলাম তা। বোধ হয় লিখতে চেষ্টা করছিলাম একটি কবিতা। কী কবিতা, তার একটি লাইনও আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত ফুলবৌদির দুষ্টুমির ফলে যে কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারছিলাম না রাইটিং প্যাডের কাগজে, তা আজও ভুলিনি।

রাত বারোটার পর আবার এলেন ফুলবৌদি।

কি গো কবি, আর কত পেন্সিল কামড়াবে? ঘড়ির কাঁটা তো আর তোমার মৃত পেন্সিলের অপেক্ষা রাখে না। চেয়ে দেখ একবার।

প্রায় সাড়ে বারোটা। কিছু যায়-আসে না তাতে। একটা সুন্দর কাব্যময় লাইন মাথায় এসেও পেন্সিলের সিসেয় কেন আসছে না? এখনই যদি সেটিকে জোর-জবরদস্তি করে প্যাডের পাতার ওপর না সাজিয়ে দেয়া যায়, তাহলে কে জানে কাল হয়তো সে পালিয়ে যাবে কোথায়, কোন্ আকাশের নীলে! সুতরাং—

বললাম: তা জানি। কিন্তু এটি শেষ না করে উঠতেও পারছি না। তুমি বার বার এসে বিরক্ত করছো কেন বল তো? তুমি ঘুমোচ্ছ না কেন?

সেটা আমার খুশী।—স্পষ্ট ভাবে জবাব দিলেন ফুলবৌদি।

আমি বললাম: আমারও খুশী আমি সারা রাত জেগে লিখবো।

তবুও বৌদি বসে পড়লেন একেবারে টেবিলের ওপর আমার রাইটিং প্যাড চেপে। সিরিয়াস হয়ে বললেন: সারা দিন ছিলে না, সুহাসিনী অন্ততঃ দশ বার এসেছিল তোমার খোঁজে।

কেন?

মুচকি হেসে বৌদি বললেন: কেন, তা তুমিই জান। কী দিয়ে যে যাদু করেছ, সারা দিন বেচারী পড়ে থাকে আমাদের এখানে আর তুমি না থাকলে একেবারে তোমার ঘরে। তোমার লেখা সুন্দর, তোমার কথা মিষ্টি, তোমার ঘরখানা কী সুন্দর গোছানো, তোমার সবই সুন্দর আর তুমি মানুষটি এত ভালো যে তার নাকি তুলনা নেই।

হেসে বললাম: তোমার তুলনা তুমি শ্যাম।

বৌদি বললেন: সত্যিই তাই। অন্ততঃ সুহাসিনী তাই মনে করে।—তার পর একটু থেমে নিম্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন: কিন্তু ওদিকে কদ্দূর? হলো কিছু ব্যবস্থা?

আমার প্রেমের অভিনয় কতখানি সাফল্য লাভ করেছে,

জানালার বৌদিকে। খুব শীগগিরই যে তার ক্লাইমেক্স আসছে, তাও জানাতে দ্বিধা করলাম না। কিন্তু তার পর যেই বললাম যে, ক্লাইমেক্সের পরই কালো ভারী যবনিকা ঝপ করে নেমে আসবে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে, তখনই বাধা দিলেন ফুলবৌদি: পারা কঠিন। জোঁকের মত ও তোমায় ধরেছে। পেট পুরে রক্ত না খেয়ে ছাড়বে বলে ভরসা করো না। আর দোষই বা কী দোষ ওকে। বিয়ে দেবার সময় কাকার কি উচিত ছিল না ওর উপযুক্ত ছেলে খুঁজে বার করা? তুমিই বল—

বাধা দিলাম: জাখ বৌদি, এমনি বে-মানান বিয়ে আশে-পাশে বহু আছে। অভিভাবক বিয়ে দেবার সময় আর সবই দেখেন, দেখেন না শুধু যার বিয়ে দিচ্ছেন, তাকে। ফলে, সারাটি জীবন ভুগতে হয় ঐ বে-মানান বিয়ের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, তাদেরকে। কিন্তু, এ ব্যাপারে সে সব কথা কেন বৌদি? শ্রেফ কার্য্যোদ্ধারের জন্যই তো এই অভিনয়, তাই সেই অভিনয়টি কেমন হচ্ছে, তাই বল!

হেসে বললেন বৌদি: চমৎকার!

এবার ধমক দিলাম: শীগগির যাবে কি না বল! আমার কবিতাটি একেবারে বরবাদ করে দিলে।

হেসে চলে গেলেন বৌদি আবারও আসবার ভয় দেখিয়ে। চেয়ে দেখলাম, রাত একটা বেজে গেছে। সেই মোলায়েম লাইনটি কোথায় পালিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। পেন্সিলের সীসেয় দূরের কথা, মগজের কোণেও আর উঁকি-ঝুঁকি মারছে না।…বাইরে চেয়ে দেখলাম, নিবিড় অন্ধকার। দক্ষিণের জানালা দিয়ে এবার ঝিরঝিরে হাওয়া ছেড়েছে। দূরে কোন নৌকার মাঝি দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইছে। ভাষা ঠিক বুঝতে না পারলেও মেঠো সুরটি ভারী মিষ্টি লাগছে। নিস্তব্ধ আমাদের বাড়ী, পাড়াটাও সুষুপ্ত।…কিন্তু সেই লাইনের একটি শব্দও কি মনে আসবে না?

—অকস্মাৎ মনে হলো কে যেন পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছে ছায়ার মত। সহকর্মীরা কেউ হতে পারে!…বিপদভঞ্জন? খগেন? সুবোধ?…না, কোনো স্পাই? শালা বোধ হয় দেখতে এসেছে আমায়!…না কোনো চোর?…কিন্তু ঘরে জ্বলছে আলো, জলজ্যান্ত বসে রয়েছি আমি জানালার পাশে—এমনি অবস্থায় চোর? এ কি সম্ভব?

কিন্তু একটু পরেই সকল সন্দেহের নিরসন করে দিয়ে জানালার পাশে সহাস্য মুখে ছায়া এসে দাঁড়ালো—আমার প্রেমিকা সুহাসিনী। দরজা খুলে দিতে হলো। নিঃশব্দে ভেতরে এসে দাঁড়ালো শ্রীমতী। চেয়ে দেখলাম। সমস্ত শরীর সিক্ত, সিক্ত সাড়ী গায়ে লেপটে গেছে। মাথার সঙ্গে পাগড়ীর মত করে বাঁধা একখানা শুকনো সাড়ী, হাতে একটি বড় পিতলের কলসী। কলসী মেঝেতে রেখে পাগড়ী খুলে তার ভেতর থেকে বার করলো দুটো রিভলভার ও এক বাক্স কার্ত্তুজ। টেবিলের ওপর রেখে বিজয়িনীর হাসিতে মুখখানা ভরে তুলে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো সুহাসিনী: কেমন, পারবো না দিতে? এইবার হলো তো?—দাও পুরস্কার।

একেবারে ঝুঁকে পড়লাম রিভলভার ও কার্ত্তুজগুলির ওপর। সত্যিই রিভলভার এবং যত দূর বোঝা গেল তাজা রিভলভার। কার্ত্তুজগুলি ঠিক ফিট্ করে।—যাক্, এত দিনে সত্যিকার সাফল্যলাভ সম্ভব হলো। প্রেমের অভিনয়ে এবার অনায়াসেই ছেদ টেনে দেওয়া যেতে পারে!…সরিয়ে ফেলতে হবে কাল সকালেই, যাতে এর গন্ধ গোপালের তাগাদায় মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করে ফেললেও এই অমূল্য দ্রব্যগুলির আর ও সন্ধান না পায়। সত্যিই বলেছেন ফুলবৌদি, ও ছিনে জোঁক।

কিন্তু ছিনে জোঁক ইতিমধ্যেই তার সিক্ত সাড়ীখানা পরিবর্ত্তন করে শুকনো সাড়ী ও ব্লাউজ পরে ফেলেছে এবং দেখলাম, নিঃশব্দ হাসিতে সারা মুখখানা প্রদীপ্ত করে তুলে আলগোছে এসে বসে পড়লো আমার সম্মুখে টেবিলের ওপর, ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে ফুলবৌদি যেখানে বসে কিছুক্ষণ জ্বালাতন করে গেছেন।

কী বলে যে সুরু করবো, সেটা আমায় আর ভাবতে হলো না। সুহাসিনী নিজেই বলে উঠলো: এত রাত অবধি বসে বসে কার কথা ভাবা হচ্ছিলো? সে সৌভাগ্যবতী কে জানতে পারি কি?

কাল হলে হয়তো অনায়াসে গদগদ স্বরে বলে দিতাম: সে তুমি গো, তুমি! আজ অতটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও বুঝতে পারলাম, একেবারে এখনই সবটা ওলট-পালট করে দেয়া সঙ্গত হবে না। রিভলভার যখন এসে পড়েছে হাতের মুঠোয়, তখন আর তা ফস্কে যাবার আশঙ্কা নেই। এবার অনায়াসে এই মেয়েটাকে একেবারে কুইক মার্চ্চ না করালেও এ্যাবাউট টার্ণ তো করিয়ে দিতে পারি। তাই স্বাভাবিক মিষ্টি সুরেই বললাম: কে যে নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করে, তা আমি কি করে জানবো বল? কিন্তু যে ভাবে এসেছ তুমি, তোমার প্রশংসা না করে পারি না সু। তুমি যে এত ভালোবাসো আমায় সত্যিই তা এত দিন এমনি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝতে পারিনি। কিন্তু কাকীমা যদি জেগে গিয়ে থাকেন, তাহলে? আর আমাদের বাড়ীতেও তো বৌদিরা বা মা-বাবা জাগতে পারেন, তাহলে?

দুষ্টু হাসিতে ভরে উঠলো সুহাসিনীর মুখ। তাহলে কী হবে শুনি?

তাহলে আমাদের দু'জনের ফাঁসী হবে, আর কী হবে। বোকা মেয়ে, রাত দুপুরে নিরালায় বসে তোমার ও আমার মত দু'জনের মাঝে কী হতে পারে, তা সবাই বোঝেন। আরো আলো জ্বালিয়ে—

আলো?—বলে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো সুহাসিনী। ফুঁ দিয়ে আলোটি নিবিয়ে দিল এবং পর-মুহূর্ত্তেই অনুভব করলাম তার অনাবৃত ঠাণ্ডা শরীর নিয়ে সে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলছে আমায় সাপের মতো। আর ফিসফিস করে কী সব প্রেমের ভাষা উচ্চারণ করতে লাগলো, আজ আর তা মনে পড়ে না।

বুঝতে পারলাম, আজ আর নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছিলাম পুরস্কার আহরণের আশা নিয়ে। তা তো পেয়ে গেছি আজ। কিন্তু এ থেকে বেরিয়ে যাবার পথ কোথায়? অভিমন্যুর মতো কি মৃত্যু অনিবার্য্য?…ইলেকট্রিক শক্ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তাই স্মরণ করলাম নাট্যাচার্য্য, নটসূর্য্য ও নটশেখরদের! বললাম মিহি সুরে: তুমি একটি বোকা মেয়ে। অন্ধকারে কিছুই না দেখে ভালো লাগে কিছু? যেন খুঁজেই পাচ্ছি না তোমায়, যেন কতদূরে—এ কি ভালো লাগে?

আমারও লাগে না। কিন্তু তুমিই তো বললে আলো থাকলে

সবাই দেখতে পাবে। থাক গে, আলোর আর দরকার নেই। এই তো, তোমায় বেশ অনুভব করছি আমি—

বাধা দিতে চেষ্টা করলাম: শোন সু। তোমায় সত্যিই আমি ভালবেসে ফেলেছি। এই বর্ষা কালের জল সাঁতরে যে ভাবে এসেছ তুমি, এতে তুমিও যে কতখানি ভালবাসো আমায়, তাও বুঝতে পেরেছি। স্ত্রী-বিল্বমঙ্গলের মতো মড়া না হলেও কলসী বুকে চেপে পুকুর পাড়ি দিয়ে চলে এসেছ তুমি পুরুষ-চিন্তামণির ঘরে। তোমার এ প্রেম তুলনাহীন। কিন্তু এবার মরিয়া হয়ে বলতে লাগলাম: জানোই তো ভাই, সারাটি দিন আজ বাড়ীতে ছিলাম না। ভীষণ খাটুনি গেছে। তার পর লিখতে বসেছি জরুরী একখানা চিঠি। লিখতেই হবে আজ। রাত সাড়ে চারটেতে একটি ছেলে এসে নিয়ে যাবে চিঠিখানা। তাই—

সুহাসিনী তৎক্ষণাৎ অসম্মতি প্রকাশ করলো এবং সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিল যে, সুবর্ণ সুযোগ জীবনে অনেক বার আসে না। হাল আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু নাট্যাচার্য্য ও নটশেখরদের কৃপায় ক্রমেই যেন আবার পানি পেতে লাগলাম। তার পর এক সময় ধীরে ধীরে অত্যন্ত আদর করে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে এলাম সুহাসিনীকে আগামী রাত্রির গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বললাম: কাল না এলে কিন্তু আড়ি, আড়ি, আড়ি!

কলসীটা উল্টে দিয়ে বুকের নীচে চেপে সোলার মতো ভেসে রইলো সুহাসিনী। বললাম: কাল পরবে তুমি সেই গোলাপী সাড়ীখানি, খোঁপায় গুঁজে আসবে ফুলের মালা, সুন্দরতর করে তুলবে তোমার সুন্দর দেহখানি, তার পর চলবে আমাদের উৎসব সারাটি রজনী···

কিন্তু সেই আরব্যোপন্যাসের সহস্র রজনীর একটিও আর এলো না আমার জীবনে!

৪১

সে যুগে গুপ্ত সমিতির সদস্য সংগ্রহের প্রথম পন্থা ছিল বই পড়ানো। সিনেমার প্রকোপ সে যুগে তত তীব্র না হলেও উপন্যাসের ভিড় কম ছিল না। চুরি করে, লুকিয়ে উপন্যাস পাঠ, তার প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের ভাষা কণ্ঠস্থ করা এবং প্রেম আদান-প্রদানের রীতি অনুকরণ, সে যুগের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও এই বদভ্যাস এসে গিয়েছিল। তাই সর্ব্বপ্রথম আমরা এই বদভ্যাসটি পাল্টাবার দিকে মনোনিবেশ করতাম। ভালো ভালো বই দেয়া হতো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, বিবেকানন্দ বাণী, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ও অর্জ্জনের লোমহর্ষণ কাহিনী, ভারতবর্ষের অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী, আনন্দমঠ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, দেশবিদেশের প্রাতঃস্মরণীয় শহীদদের অমর জীবনী—এমনি ধরণের বই পড়তে দেয়া হতো। শুধু পড়া নয়, রীতিমত অধ্যয়ন এবং শুধু অধ্যয়ন নয়, তা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক ও তা ভিত্তি করে প্রবন্ধ রচনা চলতো। গীতার ক্লাশ হতো। ফলে, উপন্যাসের পঙ্কিল পরিণামের পাষাণ চত্বরে বাটল দেখা দিত। পাঠকের মনে জাগতো আলোড়ন ও প্রশ্ন: কোন্‌টা ভালো? পথ কী? কে বড়? কর্ত্তব্য কি?···এই সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হতো না। জবাব সে নিজেই সংগ্রহ করবে অনুসন্ধান করে।

এই ধরণের গ্রন্থপাঠের ফলে পাঠকের মনে জাগতো আলোড়ন, ক্রমে সে আলোড়ন সেখানে ঝড় তুলতো, ঘূর্ণি ঝড়—নীচের ধুলাবালি, খড়কুটো সব উড়িয়ে নিয়ে যেত আকাশের নীলে, নীচে দেখা দিত ঝকঝকে তকতকে নিষ্পাপ মন। এমনি ভাবে পাঠকের মনে জন্মলাভ করতো আর-একটি বিপ্লবী। মন আগে তৈরী করা হতো, মজবুত মন। মন তৈরী হয়ে গেলে পাঠানো হতো তাকে হয়তো কোনো কাজে—ডাক-লুঠনে, ডাকাতিতে বা কারুর ওপর চরম শাস্তি হানবার ব্যাপারে। একেবারে আসরে তাকে নামতে দেয়া হতো না প্রথম প্রথম, একটু দূরে রাখা হতো, প্ল্যান করেই অথচ তাকে বুঝতে না দিয়ে। তার পর কাজের ধারা সে তার স্থান করে নিত। হয়তো অতি দ্রুত সে পরিচালকের সমকক্ষ হয়ে উঠতো কিংবা হয়তো নেমে যেতো নীচে, আরও নীচে!—এর পর একবার আই-বি বা এস-বি অফিসে দিন পনেরো হাজতবাস করে এলেই সে হয়ে পড়তো একেবারে বয়লার-প্রুফ!···

আর একটা পন্থা অবলম্বন করা হতো সে যুগে সদস্য সংগ্রহের জন্য। দলের চতুর কোনো একটি ছেলেকে স্থানান্তর সার্টিফিকেট নিয়ে বার বার স্কুল পরিবর্ত্তন করানো হতো আর কোনো বৎসরই তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া হতো না। স্কুল থেকে স্কুলে সে বিপ্লব মন্ত্র ছড়িয়ে যেত আর পরীক্ষা না-দেবার ফলে প্রতি বৎসরই তার ক্লাসে এসে পড়তো নতুন নতুন ছাত্র!

আমাদের সুবোধ চক্রবর্ত্তীকেও এমনি ভাবে বার বার স্কুল পরিবর্ত্তন করানো হয়েছিল এবং বার বারই বাৎসরিক পরীক্ষার সময় তার অসুখ হতো!

কিছু দিন ধরেই আমি অভাব অনুভব করছিলাম বইয়ের, জাতীয়তামূলক বা আমাদের প্রয়োজন মত গ্রন্থের। এই বইয়ের অভাবে বহু স্থানে আমাদের কাজে বাধা পড়তে লাগলো। যেগুলো ছিল, তাই বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়েও চাহিদা মেটানো সম্ভব হলো না। অনেকগুলো কেন্দ্র থেকেই সংবাদ আসতে লাগলো, বইয়ের অভাবে তাদের কাজে অসুবিধে হচ্ছে। বই পড়তে নেবার ব্যাপারে অনেকগুলো নিয়ম করা হলো, কড়া নিয়ম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এক সময় মনে হতে লাগলো, এই বইয়ের প্রয়োজন অবিলম্বে না মেটাবার ব্যবস্থা করলে সংগঠনের সমগ্র কাঠামোটাই বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং—

এক অন্ধকার রজনীতে যাত্রা করলো আমাদের অভিযানকারী ক্ষুদ্র দলটি। রাত তখন অনেক। কারুরই জেগে থাকবার কথা নয়। অন্ধকার রাত্রি গাছপালা ও ঝোপ-ঝাপের জঙ্গলে আরো অন্ধকার মনে হয়। আমাদের গ্রামের মুসলমান চাষীরাও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। চারি দিকে নিস্তব্ধতা।

পূব পাড়া ছাড়িয়ে আমরা রওনা হলাম ডান দিকে বীরভাষা অভিমুখে। সামরিক আদব-কায়দা আমি প্রবর্ত্তন করে চলতাম প্রায় প্রতি কাজেই। তাই চলেছি আমরা ফাইলে—একের পশ্চাতে অপরে। পুরোভাগে চলেছে দীর্ঘদেহ খগেন হাতে নিয়ে একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ড। তার পশ্চাতেই রঙ্গলাল। সাপের মতো অন্ধকারে সে দেখতে পায়। চারি দিকের নিবিড় অন্ধকারে তার দৃষ্টি

ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনভিপ্রেত কিছু দেখতে পেলেই সে স্পর্শ করবে সম্মুখের খগেনকে আর পশ্চাতের অনাথকে। অনাথ স্পর্শ করবে নেপালকে, নেপাল স্পর্শ করবে সুবোধকে। এমনি করে স্পর্শের মধ্য দিয়ে ঐ সঙ্কেত এসে পৌঁছোবে লাইনের একেবারে পশ্চাতে আমার কাছে। ততক্ষণে থেমে গেছে সবাই। অপেক্ষা করছে দলপতির আদেশের। আমি তৎক্ষণাৎ ত্রস্তপদে বেরিয়ে আসবো রঙ্গলালের কাছে। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে নোব সংক্ষেপে, তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো নিজের মনে এবং তার পরই অনুচ্চ স্বরে জানিয়ে দোব আমার আদেশ রঙ্গলালকে।··· মুহূর্ত পরে দেখা যাবে আমাদের দলটি পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে বা পাট-ক্ষেতের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রণক্ষেত্রে সৈন্যদলের অধিনায়কের মতোই আমার স্থান দলের পুরোভাগে নয়, পশ্চাতে। ওয়্যারলেসে সংবাদ আদান-প্রদানের মতোই সহকর্মীরা প্রয়োজন বোধে সংবাদ পাঠাতো আমার কাছে এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নিয়ে যেতো আমার সিদ্ধান্ত। রণক্ষেত্রে সৈন্যদলের অধিনায়কের মতোই বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করবার রীতি ছিল না।

রাত প্রায় একটার সময় আমরা এসে পৌঁছলাম সিংপাড়া বাজারের পশ্চিম দিকের বড় কাঠের পোলটার নীচে। শ্রীনগর থেকে মুন্সীগঞ্জগামী উঁচু সড়কের ওপর এই পোলটি। নীচে তখন আর জল নেই। তাই নীচের অন্ধকারে আমরা নিশ্চিন্তে জড়ো হলাম।

এইবার আমাদের এই অভিযানের লক্ষ্যস্থল ব্যক্ত করা হবে। যারা এসেছে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে চুপি-চুপি, তাদের মধ্যে এক জনও জানে না কোথায় আমাদের যেতে হবে, কী আমাদের করতে হবে, সে কাজের ঝুঁকি কতখানি এবং এ কথাটিও জানে না তারা যে, কাজের শেষে আবার তারা সুস্থদেহে চুপি-চুপি বাড়ীতে ফিরে আসতে পারবে কি না! একেবারে অনিশ্চিত ভাবে তারা যাত্রা করে। ঠিক যে সময় তাদেরকে কাজের খবরটি জানানো দরকার, ঠিক সেই সময় তা হয়।···এমনিই ছিল গুপ্ত সমিতির গোপনতা।

কাজের হদিস পেলো সবাই। কী ভাবে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে, তাও দ্রুত স্থির করা হলো। তার পর সাবধানে এগিয়ে ~~চললাম~~ আমরা পূব দিকে বাজারের পশ্চাতে বেলতলা হাই স্কুল-ভবনের দিকে।

লাইব্রেরী চিনে নিতে দেরী হলো না। যাকে যেখানে পোষ্ট করা দরকার, তেমনি ভাবে ব্যবস্থা করে রঙ্গলাল এসে জানালো আমায়, সব রেডি। সুবোধ পূর্ব্বেই লাইব্রেরী-ঘরের নম্বরী তালার চাবিটি সংগ্রহ করে এনেছিল। বেশ মোটা ও মজবুত তালা একেবারে সুবোধ বালকের মতো খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করলাম বিপদভঞ্জন, সুবোধ, খগেন ও আমি। ঠিক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো রঙ্গলাল।

টর্চ্চ জ্বালিয়ে দেখা গেল, অনেকগুলো কাচের আলমারী-ভর্ত্তি থরে থরে সাজানো গ্রন্থ। এক ঘুষিতেই কাচ ভেঙ্গে ফেলা যায়, কিন্তু শব্দ করা সঙ্গত হবে না। তাই আবার চাবীর সাহায্য নিতে হলো এবং এবারও আশ্চর্য্য, প্রত্যেকটি আলমারী অনায়াসে খুলে গেল। প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর বইগুলো ছড়িয়ে ফেলে বাছাই শুরু হলো, এবং বাছাই-করা বইগুলো বিভিন্ন থলিতে পুরে ফেলা হলো।

একেবারে যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। নিশ্চিন্তে, কারণ বাইরে সতর্ক প্রহরা আছে। সময় মত সংকেত পাবোই!

ক্যাশবাক্সের মতো কালো টিনের একটা বাক্স দেখা যাচ্ছে একটি আলমারীতে। কোনো চাবীতেই কাজ হলো না দেখে যেই আমি বাটালি দিয়ে ওর ডালার নীচে চাড় দিতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়লো: ঠক্ ঠক্ ঠক্!

অর্থাৎ বিপদের সংকেত! টর্চ্চ তৎক্ষণাৎ নিবিয়ে দিয়ে রুদ্ধ-শ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম পরবর্ত্তী সংকেতের।

বাইরের সতর্কতামূলক ব্যবস্থাটি এমনি নিখুঁত যে, কখনও কোনো সময়েই বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ দেখা দেবার উপায় নেই। বাজার থেকে এসে যে রাস্তাটি লাইব্রেরী-গৃহের পশ্চিম ও উত্তর ঘুরে দূরে গ্রামের ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই রাস্তার পাশে পাশে ঝোপ-ঝাপের আড়ালে কালো রংয়ের চাদর জড়িয়ে একেবারে ঘাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে এক জন এখানে আর-এক জন একটু তফাতে। কালো মজবুত স'রু দড়ি তাদের পরস্পরকে সংযোজন করে এসে পৌঁছেছে লাইব্রেরী-গৃহের কিছু দূরে লুক্কায়িত অনাথের হাতে। আবার তার কাছ থেকে এমনি একটি সরু দড়ি এসে পৌঁছেছে একেবারে রঙ্গলালের হাতে। এই দড়ির সাহায্যে সেই একশো গজ দূরে পথের বাঁক থেকে সংবাদ এসে পৌঁছোচ্ছে অনাথের কাছে, অনাথ আবার তা পাঠিয়ে দিচ্ছে রঙ্গলালের কাছে আর রঙ্গলাল দরজায় টোকা দিয়ে বাইরের অবস্থা জানিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে ঘরের মধ্যে আমাদেরকে।

এমনি ভাবে বাজারের দিকেও পাহারায় রত আছে এক জন এবং আর এক জন আছে দূরে দরওয়ানের ঘরের কাছে। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আমরা জাল ছড়িয়ে বসেছি নিপুণ ভাবে। রুই-কাতলা তো দূরের কথা, সামান্য পুঁটি-ট্যাংরারও সাধ্য নেই সে জালের ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশের।

একটু পরই আবার শব্দ শোনা গেল। এবারের আঘাত দু'বার, খানিকটে নীরব থেকে আবার দু'বার। অর্থাৎ অল্ ক্লিয়ার। আবার কাজ শুরু হয়ে গেল। কালো বাক্সটা খুলে ফেললাম। পাওয়া গেল ওর মধ্যে কিছু স্বর্ণালঙ্কার, কিছু রূপোর টাকা ও একতাড়া নোট।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ সুসম্পন্ন করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। সতর্ক পদক্ষেপে এসে আবার জমায়েৎ হলাম সেই কাঠের সেতুর নীচে। সামরিক কায়দায় এবার সবাই ফল্ ইন করে দাঁড়ালো। অনেকগুলো বই গোটা কয়েক পুঁটলী করে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। তথাপি—

কমাণ্ডার আদেশ করলেন: ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কেউ কিছু নিয়ে এসেছ কি?

মুহূর্ত্ত কাল সবাই নীরব। একটু পর সহসা ফল্ আউট করে বাইরে এসে দাঁড়ালো খগেন।

কি এনেছ?

অপরাধীর মতো জবাব দিল খগেন: কতকগুলো নিব আর খানকতক পোষ্টকার্ড।

That's dangerous! আমাদের এই অভিযানের পশ্চাতে

আছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য—দেশসেবা। বিপ্লব মন্ত্র প্রচারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, জীবন-পণেও তা করতে এগিয়ে যাবো। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ বা সুবিধার জন্য যদি আমরা লালায়িত হয়ে উঠি, তাহলে সাধারণ চোর-ডাকাতের সঙ্গে তফাৎ কোথায় আমাদের? Why did you steal away those things? Answer why?

এগিয়ে এল আমার অর্ডারলি—নেপাল। মাত্র পনেরো বছর বয়সের নেপাল। অত্যন্ত কচি মুখখানি, দেখলে মায়া হয়! আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো এ্যাটেনশন হয়ে।

হাঁক দিলাম যথাসম্ভব নিম্ন স্বরে: Speak out—I give you one minute's time.

সার্টের নীচে আমার যে রিভলভার আছে, এরা সবাই জানে এবং এ-ও জানে যে, যে কোনো সময় তা ব্যবহারে দ্বিধা করবো না আমি এতটুকুও!···আর নিজের হাতে তার প্রয়োজনও হবে না! নেপাল এগিয়ে এসেছে হুকুম তামিল করতে।

খগেনের কণ্ঠ শোনা গেল মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামীর মতো: আমার অপরাধ হয়ে গেছে, সে জন্য ক্ষমা চাইছি দাদা—

Search his person and search everybody—হুকুম উচ্চারিত হলো। নেপাল প্রত্যেকের দেহ তল্লাসী করলো। দেখা গেল, শুধু খগেনই খানকতক পোষ্ট কার্ড ও কয়েক বাক্স রেড ইংক নিব নিয়ে এসেছিল। ওগুলো এখানেই ফেলে দিলে হতো। কিন্তু যেখানে আমরা এসেছিলাম, দাঁড়িয়েছিলাম, কথা বলেছিলাম, সেখানকার সন্ধান দেবার কী প্রয়োজন আছে?···তাই নেপাল ওগুলো নিয়ে দ্রুত অথচ সতর্ক পদক্ষেপে চলে গেল স্কুলের পশ্চিম দিকের খেলার মাঠে।

সে ফিরে এলে আবার যাত্রা করলো অভিযানকারী আমাদের ক্ষুদ্র দলটি বিজয়ীর গর্ব্ব নিয়ে।

এমনি করে মালখানগর, রুসদী, বোলোঘর, হাঁসাড়া প্রভৃতি গ্রামের স্কুল-লাইব্রেরীতে হানা দিয়ে অসংখ্য জাতীয়তা-প্রচারক গ্রন্থ সংগ্রহ করা হলো। সাবধানে ভেতরকার রবার-ষ্ট্যাম্পগুলো ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলে দিয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সেগুলো বণ্টন করে দেয়া হলো। কাজ চলতে লাগলো অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে।···

[ক্রমশঃ।

যে কাহিনী হয়নি বলা

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

যে কাহিনী হয়নি বলা ছিল নির্বাক্
অকথিত সব সুর জেগে ওঠে তাই
এ জীবন ঢের বাকী—শুধু রাত জাগা
স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি যদি কিছু পাই।

স্তব্ধ কণ্ঠ আমি এক স্বপ্নমাখা জীব
বেদনার অশ্রুজলে কাঁদি নিরন্তর
কঠিন এ চলার পথে উদার গগন
স্বপ্নের কুয়াশায় রচি কাব্য অতঃপর।

এ কাহিনীর নেই সুর—শুধু বেদনার
বিস্মৃতির তলে রচি নব কিশলয়
যে বাণী হারিয়ে গেছে নেই প্রয়োজন
নোতুন গানের রেশ জাগে চিত্তময়।

স্বপ্নের কুয়াশা-তীরে নবজন্ম জানি
একদা শোনাব যত অলিখিত বাণী।

সাহিত্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

রজনীপাম দত্ত—রাজনীতিবিদ। জন্ম—১৮৯৬ খৃঃ। শিক্ষা—অক্সফোর্ড। ইংলণ্ডের কমিউনিষ্ট পার্টির সহ সভাপতি। গ্রন্থ—Labour Internationl Handbook, Modern India, World Politics. সম্পাদক—Workers Weekly (১৯২১-২৬), Labour Monthly (১৯২১—)।

রজনীরঞ্জন সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভ্রমণ স্মৃতি, Holy City Beneras.

রঞ্জন—ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম—নিরঞ্জন মজুমদার। 'ক্যাপিট্যাল' পত্রের পরিচালন সম্পাদক। গ্রন্থ—মীং টেপেন্ক্লি না, অন্নপূর্ণা।

রঞ্জনকুমার দত্ত—কংগ্রেসকর্মী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৯২০ বঙ্গ ১১ই পৌষ যশোহর জেলায় সাকটিয়া গ্রামে। শিক্ষা—আই. এ। দেশ ও সমাজসেবী। গ্রন্থ—গ্রাম চলো (১৯৪৫), বিপদের মুখে ভারতীয় আদর্শবাদ (১৩৫৬), ইকতলমের সমবায় আন্দোলন (১৯৫১), সোনার মায়া (১৯৫১), বাংলা ভাষার বানান সমস্যা ও সংস্কার (১৯৫২), যেখানে প্রেম সেইখানে ভগবান (১৯৫২), একজন মানুষের কতখানি জমি চাই, বাপুর বিচার ও জীবন দর্শনের মূলনীতি, স্বাধীনতার পুরস্কার, আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন, প্রহ্লাদ চরিত্র (নাটিকা, ১৯৫২)।

রতিদেব, দ্বিজ (ভট্টাচার্য) কবি। জন্ম—১৭শ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে সুচক্রদণ্ডী চক্রশালায় (অধুনা পটিয়া থানা)। পিতা—গোপীনাথ। মাতা—বসুমতী। গ্রন্থ-মৃগলুব্ধ।

রত্নেশ্বর দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সারশতক (১৮৭৪)।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিল্পব্রতী। জন্ম— ১৯৫ বঙ্গ ১৩ই অগ্রহায়ণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। পিতা—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা—মৃণালিনী দেবী। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন ও আমেরিকা। বি. এস (আমেরিকা, ১৯০৯)। ইনি বিধবা বিবাহ করেন—পত্নী প্রতিমা দেবী। ইনি শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ। গ্রন্থ—প্রাণতত্ত্ব, অভিব্যক্তি, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত (অনুবাদ)। সম্পাদক—বিশ্বভারতী।

রফিউদ্দিন—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯১৭ খৃঃ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত পঞ্চক্রোশী গ্রামে। শিক্ষা—বি-এস। আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—মানবতার প্রাণশক্তি (১৯৫২)।

রবি দত্ত—কবি। জন্ম—কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর 'কাশীপুর হাউসে'। গ্রন্থ—কৌশোরক, Peoms, Picture & Songs, Stories in Blank verse, Echoes East & West, Sakuntala & her Keepsake, Prosody & Rhetoric.

রবীন্দ্রকুমার বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আমাদের বাপুজী, সোনার আলোকে গান্ধিজী, মুক্তিসংগ্রাম, অবরুনা, অপলাসিকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বকবি। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গ ২৫এ বৈশাখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবংশে। মৃত্যু—১৩৪৮ বঙ্গ ২২এ শ্রাবণ। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা—সারদাসুন্দরী দেবী। শিক্ষা—নর্মাল স্কুলে, গৃহে, বোলপুরে পিতার নিকট, আমেদাবাদে ভ্রাতার নিকট, লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে। কিশোর বয়স হইতেই অত্যাশ্চর্য কাব্যশক্তির পরিচয়। এইরূপ বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন কবি এ যুগে কেন, সারা পৃথিবীতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। গদ্যে, পদ্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, উপন্যাসে, ছোট গল্পে, প্রবন্ধ সাহিত্যে, ধর্মে ও রাজনৈতিক রচনায় বাংলা সাহিত্যকে চির উজ্জ্বল ও চির দীপ্তিময় করিয়াছেন। প্রথম বিলাত যাত্রা (১২৭১)। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিয়া সারা পৃথিবী মুগ্ধ হইয়া যায়। 'নোবেল প্রাইজ' পুরস্কার লাভ (১৯১৩), এবং জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মানিত হন। 'ডক্টর' উপাধি লাভ (কলি: বিশ্ব: ১৯১৪), ডি. লিট (কাশী বিশ্ব ১৯৩৫), ডি লিট (অক্সফোর্ড, ১৯৪০), কে. টি (১৯১৫), কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঐ উপাধি পরিত্যাগ (১৯২০), বোলপুরে শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতী স্থাপনা। হিবার্ট বক্তৃতা (১৯৩১)। প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (বারাণসী, ১৯২২)। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে অশীতিবর্ষ পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে সাহিত্যসেবা। সাহিত্যের সর্ববিধ শাখায় ইহার দান অনন্যসাধারণ। বহু বার ইউরোপ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ—দেশী ও বিদেশী ভাষায় ইহার বহু গ্রন্থ অনূদিত হয়। জীবদ্দশায় এত সম্মান ও প্রতিষ্ঠা জগতের কোন সাহিত্যিক বা মহাপুরুষ কখনও লাভ করেন নাই। জগতের বহু বিদ্বৎসমাজ হইতে বহু উপাধি লাভ। গদ্যে ও পদ্যে বহু গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—কবিকাহিনী (উপাখ্যান কাব্য, ১৮৭৮), বনফুল (কাব্য, ১৮৮০), বাল্মীকি-প্রতিভা (গীতিনাট্য, ১৮৮১), ভগ্নহৃদয় (কাব্যনাট্য, ঐ), রুদ্রচণ্ড (ঐ) ইউরোপ প্রবাসীর পত্র (ভ্রমণ, ১৮৮১), সন্ধ্যাসঙ্গীত (ক ১৮৮২), কালমৃগয়া (গীতিনাট্য, ১৮৮২), বৌঠাকুরাণীর হাট (উপ, ১৮৮৩), প্রভাত-সঙ্গীত (ক, ঐ), বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ ঐ), ছবি ও গান (ক, ১৮৮৭), প্রকৃতির প্রতিশোধ (কাব্যনাট্য, ১৮৮৪), নলিনী (গদ্যনাট্য, ঐ), শৈশব সঙ্গীত (ক, ঐ), ভানুসিংহের পদাবলী (ক, ঐ), রাজা রামমোহন রায় (জী, ১৮৮৫), আলোচনা (প্র, ঐ), রবিচ্ছায়া (গান, ঐ), কড়ি ও কোমল (ক, ১৮৮৬), রাজর্ষি (উ, ১৮৮৭), চিঠিপত্র (প্র, ঐ) সমালোচনা (প্র, ১৮৮৮), মায়ার খেলা (গীতিনাট্য, ঐ), রাজা ও রাণী (কাব্যনাট্য, (১৮৮৮,), বিসর্জন (না, ১৮৯০), মন্ত্রী অভিষেক (পুস্তিকা, ঐ), মানসী (ক, ঐ), ইউরোপযাত্রীর ডায়েরী, ১ম (ভ্রমণ, ১৮৯১), ২য় (১৮৯৩), চিত্রাঙ্গদা (নাট্যকাব্য, ১৮৯২), গোড়ায় গলদ (প্রহসন, ঐ), গানের বহি (গানসংগ্রহ, ১৮৯৩), সোনার তরী (ক, ১৮৯৪), ছোট গল্প (ঐ), বিদায় অভিশাপ (নাট্য-কবিতা, ঐ), বিচিত্র গল্প, ১ম ও ২য় (ঐ), কথা চতুষ্টয় (ঐ), গল্পদশক (১৮৯৫), নদী (কাব্য, ১৮৯৬), চিত্রা (কবিতা, ঐ), সংস্কৃত শিক্ষা, ১ম ও ২য় (১৮৯৬), কাব্য গ্রন্থাবলী (ঐ), বৈকুণ্ঠের খাতা (প্রহ, ১৮৯৭), পঞ্চভূত (প্রবন্ধ, ঐ), কণিকা (নীতি-কবিতা, ১৮৯৯), কথা (কবিতা, ১৯০০), কাহিনী (ঐ), কল্পনা (ঐ), ক্ষণিকা (ঐ), গল্পগুচ্ছ, ১ম ও ২য় (গল্প, ঐ), নৈবেদ্য (ক, ১৯০১), বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা (ভাষাতত্ত্ব, ঐ), চোখের বালি (উপ, ১৯০৩), কর্মফল (গল্প, ঐ), কাব্যগ্রন্থ ১ম-৯ম (ঐ),

ইংরাজি-সোপান (পাঠ্য, ১৯০৪), স্বদেশী সমাজ (ঐ), রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (ঐ), শিবাজী-উৎসব (ক, ঐ), স্বদেশ (ক, ১৯০৫), বাউল (ঐ), বিজয়া সম্মিলন (ঐ), আত্মশক্তি (পুস্তিকা, ১৯০৬), ভারতবর্ষ (ঐ), রাজভক্তি (ঐ), দেশনায়ক (ঐ), খেয়া (ক, ১৯০৬), নৌকাডুবি (উপ, ঐ), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭) চারিত্র-পূজা (জী, ঐ), প্রাচীন সাহিত্য (ঐ), লোকসাহিত্য (ঐ), আধুনিক সাহিত্য (ঐ), হাস্য-কৌতুক (নাটিকা, ঐ), ব্যঙ্গকৌতুক (ঐ), প্রজাপতির নির্বন্ধ (উপ, ১৯০৮), প্রহসন (১৯০৮), রাজা ও প্রজা (ঐ), সমূহ (ঐ), স্বদেশ (ঐ), সমাজ (ঐ) কথা ও কাহিনীকে, ঐ), শারদোৎসব (না, ঐ), গান (ঐ), সভাপতির অভিভাষণ বক্তৃতা (ঐ, পাবনা) শিক্ষা (ঐ), মুকুট (শিশুনাট্য, ঐ), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), ধর্ম (ঐ), শান্তিনিকেতন, ১ম-৮ম (ঐ), ৯ম-১১শ (১৯১০), ১২শ (১৯১১), ১৩শ (১৯১২), ইংরাজী পাঠ (১৯০৯), ছুটির পড়া (ঐ), শিশু (ক, ঐ), চয়নিকা (ঐ), প্রায়শ্চিত্ত (নাটক, ঐ), রাজা (না, ১৯১০), গোরা (উপ, ১৯১০), গীতিলিপি ১ম-৩য়, ৪র্থ-৬ষ্ঠ (১৯১১), গীতাঞ্জলি (ঐ), ডাকঘর (১২৯২), ধর্মশিক্ষা (ঐ), ধর্মের অধিকার (১৯১২), আত্ম-স্মৃতি (১৯১২), ছিন্নপত্র (ঐ), অচলায়তন (ঐ), আটটি গল্প (ঐ), গল্প চারিটি (ঐ), পাঠসঞ্চয় (ঐ), উৎসর্গ (ক, ১৯১৪), গীতিমাল্য (গান, ঐ), গীতালি (ঐ), কাব্যগ্রন্থ, ১০ খণ্ড (১৯১৫), গল্পসপ্তক (ঐ), চতুরঙ্গ (উপ, ১৯১৬), ফাল্গুনী (নাট্য, ঐ), ঘরে বাইরে (উপ, ঐ), বলাকা (ক, ঐ), পরিচয় (প্র, ঐ), সঞ্চয় (প্র, ঐ), কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (প্র, ১৯১৭), গান (ঐ), ধর্মসঙ্গীত (ঐ), গীতলেখা (১ম, ঐ), ২য় (১৯১৮), গুরু (নাট্য, ১৯১৮), পলাতকা (ক, ১৯১৮), গীতপঞ্চাশিকা (ঐ), অনুবাদচর্চা (ঐ), বৈতালিক (গান ও স্বরলিপি, ১৯১৯), গীতিবীথিকা (ঐ), কেতকী (ঐ), কাব্যগীতি (ঐ), জাপানযাত্রী (ভ্রমণ, ঐ), শেফালি (ঐ); অরূপ রতন (১৯২০), পয়লা নম্বর (ঐ), ঋণশোধ (না, ১৯২১), শিশু ভোলানাথ (ঐ), শিক্ষার মিলন (ঐ), সত্যের আহ্বান (প্র, ঐ), মুক্তধারা (নাটক, ১৯২২), বর্ষামঙ্গল (গান, ঐ), লিপিকা (গদ্য কবিতা, ঐ), বসন্ত (গীতিনাট্য, ১৯২৩), নবগীতিকা (ঐ), পূরবী (ক, ১৯২৫), সঙ্কলন (প্র, ঐ) গৃহপ্রবেশ (না, ঐ), প্রবাহিনী (গান, ঐ), শেষ বর্ষণ (ঐ), দেশের কাজ (ঐ), গীতচর্চা (গান, ঐ), শোধবোধ (না, ১৯২৬), রক্তকরবী (রূপকনাট্য, ঐ), নটীর পূজা (না, ঐ), ঋতু উৎসব (গীতিনাট্য, ঐ), গীতমালিকা, ১ম (১৯২৬), ২য় (১৯৩০), লেখন (১৯২৭), ঋতুরঙ্গ (গীতিনাট্য, ঐ), শেষ রক্ষা (১৯৩৮), পল্লীপ্রকৃতি (ঐ), সমবায় নীতি (১৯২৯), পরিত্রাণ (নাটক, ঐ), যাত্রী (ভ্রমণ, ঐ), যোগাযোগ (উপ, ঐ), শেষের কবিতা (উপ, ঐ), তপতী (গদ্যনাটক, ঐ), মহুয়া (ক, ঐ), ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৯৩০), নবীন (গীতিনাট্য, ১৯৩১), পাঠপ্রচয়, ২য়, ৩য়, ৪র্থ (পাঠ্য, ১৯৩১), সহজ পাঠ, ১ম, ২য় (ঐ), রাশিয়ার চিঠি (ভ্রমণ, ঐ), গীতবিতান, ১ম ও ২য় (১৯৩১), ৩য় (১৯৩২), বনবাণী (ক, ১৯৩১), সঞ্চয়িতা (ঐ), শাপমোচন (গীতিনাট্য, ১৯৩১), পরিশেষ (ক, ১৯৩২), কালের যাত্রা (নাটিকা, ঐ), পুনশ্চ (গদ্য কবিতা, ঐ), দুই বোন (উপ, ১৯৩৩), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (প্র, ঐ), শিক্ষার বিকীরণ (ঐ), মানুষের ধর্ম (বক্তৃতা, ঐ), চণ্ডালিকা (নাটিকা, ঐ), তাসের দেশ (ঐ), বাঁশরী (না, ঐ), বিচিত্রা (ক, ঐ), ভারতপথিক রামমোহন (জী, ঐ), মালঞ্চ (উ, ১৯৩৪), শ্রাবণ-গাথা (ঐ), চার অধ্যায় (উপ, ঐ), শেষ সপ্তক (গদ্য কবিতা, ১৯৩৫), বীথিকা (ক, ১৯৩৫), স্বরবিতান, ১ম (১৯৩৫), ২য় (১৯৩৬), ৩য় (১৯৩৮), ৪র্থ (১৯৪০), শিক্ষা স্বাঙ্গীকরণ (১৯৩৬), চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য, ঐ), প্রান্তিকী (বক্তৃতা, ১৯৩৬), পত্রপুট (গদ্য কবিতা, ঐ), ছন্দ (ঐ), শ্যামলী (গদ্য কবিতা, ঐ), সাহিত্যের পথে (প্র, ঐ), পাশ্চাত্য ভ্রমণ (ঐ), খাপছাড়া (১৯৩৭), সে (গল্প, ঐ), জাপানে ও পারস্যে (ভ্রমণ, ঐ), কালান্তর (প্র, ঐ), বিশ্বপরিচয় (ঐ), ছড়ার ছবি (ঐ), প্রান্তিক (ক, ঐ), পথের প্রান্তে (চিঠি, ১৯৩৮), সেঁজুতি (ক, ঐ), বাংলা ভাষা পরিচয় (ঐ), প্রহাসিনী (ঐ), চণ্ডালিকা (১৯৩৯), আকাশ প্রদীপ (ক, ঐ), শ্যামা (নৃত্যনাট্য, ঐ), পথের সঞ্চয় (চিঠি, ঐ), বাংলা কাব্য পরিচয় (ঐ), নবজাতক (ক, ১৯৪০), সানাই (ক, ঐ), চিত্রলিপি (ছবিসংগ্রহ, ঐ), ছেলেবেলা (ঐ), তিন সঙ্গী (গল্প, ঐ), আরোগ্য (ক, ১৯৪১), জন্মদিনে (ঐ), গল্পসল্প (ঐ), সভ্যতার সঙ্কট (বক্তৃতা, ঐ), Gitanjali (১৯১২), Gardener (১৯১৩), Crescent moon (ঐ), Chitra (ঐ), Sadhana (হার্ভার্ড বিশ্বঃ বক্তৃতা, ১৯১৪), Poems of Kavir (Underhill-এর সহ—ঐ), Maharani of Arakan ('ডালিয়ার' অনুবাদ, ১৯১৫), Fruit-gathering (১৯১৬), Hungry stones & other Stories (১৯১৬), Stray Birds (ঐ), Sacrifice & other Plays (১৯১৭), Cycle of Spring (ঐ), Personality (বক্তৃতা, ১৯১৭), Nationalism (বক্তৃতা, ঐ), Lovers Gift & Crossing (১৯১৮), Mashi & other Stories (ঐ), Stories from Tagore (ঐ), Parrot's Training (ব্যঙ্গ রচনা, ঐ), Centre of Indian Culture (বক্তৃতা, ১৯১৯), The Wreck (নৌকাডুবির অনুবাদ, ১৯২১), The Fugitive (ঐ), Poems from Tagore (ঐ), Thought-Relics (বক্তৃতা, ১৯২২), Creative Unity (ঐ), Red Oleanders (রক্ত-করবীর অনুবাদ, ১৯২৫), Broken Ties & other Stories (চতুরঙ্গ এবং অন্য গল্পের অনুবাদ, ১৯২৫), The Child (১৯৩১), Religion of Man (হিবার্ট বক্তৃতা, ১৯৩১), Collected Poems & Plays (১৯৩৭), The king of the Dark Chamber ('রাজার' অনুবাদ—অনুবাদক K. C. Sen—১৯১৪), Post office (ডাকঘরের অনুবাদ—অনুবাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়—১৯১৪), My Reminiscences (জীবনস্মৃতি অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৭), The Home and the World (ঘরে বাইরের অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর), Greater India (অনুবাদক—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২১), Glimpses of Bengal

(ছিন্নপত্রের অনুবাদ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১১), Gora (অনুবাদক—W. Pearson, ১৯২৫)। সম্পাদক—বালক (১২৯২), সাধনা (১৩০১, অগ্রহায়ণ—১৩০২, কার্ত্তিক), ভারতী (১৩০৫), বঙ্গদর্শন (১৩০৮—১৩১২), সমালোচনী (১৩০১), ভাণ্ডার (১৩১২—১৩), তত্ত্ববোধিনী (১৩১৮—১৩১৯), শান্তিনিকেতন পত্রিকা (১৩২৬)।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—কথা-সাহিত্যিক। ছদ্মনাম—দিবাকর শর্ম্মা। জন্ম—১৩০৩ বঙ্গ রঙ্গপুরে। মৃত্যু—১৩৩৯ বঙ্গ। পৈতৃক নিবাস—ফরিদপুর জেলার নাহুরিয়া গ্রামে। ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—থার্ড ক্লাশ, মায়াজাল দিবাকরী, ত্রিলোচন কবিরাজ, পরাজয়, উদাসীর মাঠ, বাস্তবিকা, মডার্ণ গৌরী, মানময়ী গার্লস স্কুল।

রবীন্দ্রলাল রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—এসি ত হাসবো না, রাগনির্ণয়।

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—সামুদ্রিক শিক্ষা, সামুদ্রিক-বিজ্ঞান, সামুদ্রিক রেখাদি বিচার। সম্পাদক—অদৃষ্ট (মাসিক, ১৩০৩)।

রমণী দেবী—মহিলা কবি। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণলীলা (কাব্য, ১৩১১)।

রমণীমোহন ঘোষ—কবি। বি. এ। ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল। কাব্যগ্রন্থ—মুকুর (১৩০৬), মঞ্জরী (১৩১৪), উর্মিকা। সম্পাদক—সুস্বর (মাসিক, ১৩০১)।

রমণীমোহন ভট্টাচার্য—কবি। গ্রন্থ—মহাজনগাথা (১৩১২)।

রমণীমোহন মল্লিক—গ্রন্থকার। জন্ম—মেহেরপুর গ্রামে। ইনি বহু বৈষ্ণব পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। গ্রন্থ—চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, প্রাচীনা কবি, বলরাম দাস, মুসলমান বৈষ্ণব কবি শশিশেখর, নরোত্তম দাস।

রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত—কবি। কাব্যগ্রন্থ—ভাব ও গাথা (১৩১৮)।

রমা চৌধুরী—কবি ও দার্শনিক। এম. এ, ডি. ফিল (অক্সন)। স্বামী—ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। গ্রন্থ—নিম্বার্ক দর্শন, বেদান্ত ও সুফীদর্শন সংস্কৃতান্তঃ রোগ ও তাহার প্রতিকার, ব্রহ্মসূত্রের ভাস্কর-ভাষ্য (অনুবাদ), বেদান্ত দর্শন (১৩৫১), কবিতাবলী: প্রাচীন নারী কবিদের রচিত (অনুবাদ)। যুগ্ম সম্পাদিকা—প্রাচ্যবাণী (ত্রৈমাসিক)।

রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—(শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সহ) Dictionnaire Francais in Bengali (অভিধান)।

রমানাথ শিরোমণি—সংস্কৃত পণ্ডিত ও নাট্যকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায় তুঁতরাঙ্গা। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। সংস্কৃত গ্রন্থ—পারিজাতহরণ নাটক (১৮২৬ শকাব্দ)।

রমানাথ লাহা—কবি। কাব্যগ্রন্থ—অনাথের বিলাপ (১২৮০)।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়—সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-রচয়িতা। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণা গ্রামে। মৃত্যু—১২৭৯ বঙ্গ ২১এ ভাদ্র। পিতা—গঙ্গাবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ম—বর্দ্ধমান মহারাজের সভাগায়ক। গ্রন্থ—মূল সঙ্গীতাদর্শ (১২৬১)।

রমাপতি বসু—সাহিত্যিক ও কবি। জন্ম—১৯২২ খৃঃ কলিকাতা। ইনি বিভিন্ন সাময়িকপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। রাজনৈতিক কারণে (১৯৩৯) ও আগষ্ট আন্দোলনে নিরাপত্তা বন্দী (১৯৪২)। চিত্র-সমালোচক ও বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের অবসান, চিরন্তন বিপ্লব, ইরান, দুটি গল্প (গর্কি), বিসর্গ (ঐ), কালপুরুষ, (ক), আগামী কালের কবিতা, খণ্ডিত বাঙ্গালা। সম্পাদিত গ্রন্থ—১৩৪৫এর শ্রেষ্ঠ কবিতা। সহ-সম্পাদক—নবশক্তি (সাপ্তা), স্বদেশ (ঐ), নতুন পত্র (মাসিক ১৩৪৭ ও ত্রৈমাসিক, ১৩৪৭), সম্পাদক—অধিনায়ক (সাপ্তাহিক, ১৯৪৯—৫০), নয়া সমাজ (সাপ্তাহিক)।

রমাপ্রসাদ চন্দ—ঐতিহাসিক ও গবেষক। জন্ম—রাজসাহী জেলার ঘোড়ামারায়। বি. এ। গ্রন্থ—গৌড়রাজমালা।

রমেন চৌধুরী—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৯১৯ খৃঃ কলিকাতা—বাগবাজারে। পিতা—ডাক্তার বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। শিক্ষা—কলিকাতা। কর্ম—সাংবাদিকতা, সাহিত্যসেবা ও চিত্র-ব্যবসায়। গ্রন্থ—গোধূলি, বনগাঁয়ী অপরিচিতা, অসংলগ্ন, কাজীদহের ধনরত্ন, তুমি আর আমি, ভীমরুলের হুল, রকমারি, কবিতায় ঈশপ, সবার সংগে। সম্পাদক—চলন্তিকা, মাছরাঙা (১৩৪৬—৪৮); সহ-সম্পাদক—সন্ধ্যা।

রমেশচন্দ্র গুপ্ত—কবি। কবিতাগ্রন্থ—জীবন সমস্যা।

রমেশচন্দ্র জোয়ারদার—কবি। কাব্যগ্রন্থ—কবিতাকোরক (১৩১০)।

রমেশচন্দ্র দত্ত—ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৪৮ খৃঃ ১৩ই আগষ্ট কলিকাতার রামবাগানের দত্ত-বংশে। মৃত্যু—১৯০৯ খৃঃ ৩০এ নভেম্বর, বরোদা। পিতা—ঈশানচন্দ্র দত্ত (প্রথম ডেপুটি কালেক্টরদের অন্যতম)। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় খুল্লতাত শশিচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (প্রথম স্থান অধিকার, হেয়ার স্কুল, ১৮৬৪), এফ. এ (২য় স্থান, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৬৬), সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত গমন (১৮৬৮—উত্তীর্ণ ৩য় স্থান, ১৮৬৯), ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন (মিডল টেম্পল, ১৮৬৯), জ্ঞানলাভার্থ স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জর্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি ভ্রমণ। কর্ম—বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৭১-১৮৮৫); বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার (১৮৯৪-৯৭)। ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৯৮), কারেন্সী কমিটিতে সাক্ষ্যদান (১৮৯৮), সি. আই. ই (১৮৯২), বরোদার প্রধান মন্ত্রী (১৯০৯)। আজীবন সাহিত্যসাধনা, প্রথমে ইংরেজিতে রচনা পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ। দাদাভাই নৌরজি ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান (১৮৯৮), ডিসেন্ট্রালিজেসন কমিশনের সদস্য (১৯০৭), ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি (লক্ষ্ণৌ, ১৮৯৯), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি (১৩০০), রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, ইম্পিরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউটের ফেলো। গ্রন্থ—বঙ্গবিজেতা (উপ, ১২৮১), মাধবীকঙ্কণ (উপ, ১২৮৪), জীবন-প্রভাত (উপ, ১২৮৫), জীবন-সন্ধ্যা (উপ, ১২৮৬), শতবর্ষ (১২৮৬), ঋগ্বেদ সংহিতা (১৮৮৫-৮৭), হিন্দুশাস্ত্র (সঙ্কলিত ও পণ্ডিতগণের দ্বারা অনূদিত, ১৩০০-১৩০৩), সংসার (উপ, ১৮৮৬), সমাজ

(ঐ, ১৩০১), সংসার-কথা (উপ, ১৯১০), Three years in Europe, The Literature of Bengal, Peasantry of Bengal, The Slave Girl of Agra (১৯০১, পরবর্তী কালে 'মাধবীকঙ্কণ' নামে বাংলায়), A History of Civilisation in Ancient India (১৮৮৮-৯০), A Brief History of Ancient & Modern India (১৮৯৯), Lays of Ancient India (১৮৯৩), Economic History of British India, ২ খণ্ড (১৯০০), Ramayan and Mahabharat in English Verse, Open letters to Lord Curzan on Famines & Land Assessments in India (পুস্তিকা)।

রমেশচন্দ্র দাস—শিশু সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১০ বঙ্গ ৩১এ জ্যৈষ্ঠ। মৃত্যু—১৩৫০ বঙ্গ ১০ই মাঘ। এম. এ, বি. এল। আইন-ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—সাগরিকা ২ ভাগ, চম্পাদ্বীপ, পরীরাণী, রতনচুড়, কাজললতা, যম-মানুষে, লাইট-হাউস রহস্য, অজ্ঞাত দেশ, আফ্রিকার জঙ্গলে, পাতাল রহস্য, নিরুদ্দিষ্টের দল, প্রেম ও প্রতিমা (কাব্য), মাদার ইণ্ডিয়া (পুস্তিকা)।

রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—জনশিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৯০৭ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর, ব্যারাকপুরে। মৃত্যু—১৯৫০ খৃঃ ১৯এ ডিসেম্বর, কলিকাতা। পিতা—রায় বাহাদুর রাজেশ্বর দাশগুপ্ত (বৃত্তিতত্ত্ববিদ্)। মাতা—অমিয়বালা দেবী। শিক্ষা—সেণ্ট জন ডায়াসিসেন, প্রবেশিকা (ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউসন), আই. এস-সি (সাউথ সুবারবন কলেজ), মেডিক্যাল কলেজ (৩য় বর্ষ পর্যন্ত)। কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ রচনা। কর্ম—রেজিষ্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্টে। প্রতিষ্ঠাতা—হাওড়া বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা। সম্পাদিত গ্রন্থ—কৃষি বিজ্ঞান, Cattle Wealth of India.

রমেশচন্দ্র মজুমদার—ইতিহাসজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৮৮ খৃঃ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলায়। শিক্ষা—বি. এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯১১), এম. এ (১৯১৩), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ, পি. এইচ-ডি। কর্ম—অধ্যাপক, ঢাকা গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজ (১৯১৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৪—২১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১—৩৬), ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৭—৪২), অধ্যক্ষ, বারাণসী কলেজ। ভারতের বহু স্থান, ইউরোপ, মিশর, জাভা, শ্যাম, মালয়, ব্রহ্মদেশ, প্রভৃতি বহু দেশ পর্যটন। বহু ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশ। গ্রন্থ—বাঙ্গালার ইতিহাস, Corporate Life in Ancient India, Early History of Bengal, Outline of Ancient Indian History & Civilisation, Ancient Indian Colonies in the Far East, ৩ খণ্ড। সম্পাদিত গ্রন্থ—History of Bengal, ১ম খণ্ড (ঢাকা), অন্যতম সম্পাদক—Comprehensive History of India, ১০ খণ্ড. রামচরিত (সংস্কৃত), রাজাবিজয় নাটক (ঐ)।

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চিত্তবিনোদ(১২৬৪)।

রমেশচন্দ্র সেন—সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০১ বঙ্গ কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পিঞ্জরী কোটালিপাড়া। শিক্ষা—বি.এ। আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—শতাব্দী, কুরপালা, চক্রবাক, কাজল, মৃত ও অমৃত (গ), কয়েকটি গল্প। সম্পাদক—দেশ (সাপ্তাহিক)।

রসময় লাহা—কবি। জন্ম—১২৭৮ বঙ্গ ৭ই আষাঢ় কলিকাতা। মৃত্যু—১৩৩৫ বঙ্গ ২০এ অগ্রহায়ণ। পিতা—সীতানাথ লাহা ব্যবসায়ী। কাব্যগ্রন্থ—আরাম, ছাইভস্ম (১৩০৭), পুষ্পাঞ্জলি, (১৩০৪), আমোদ, ঋতুলীলা, পরিহাস মণিমুক্তা।

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। জন্ম—ঢাকা। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। গ্রন্থ—পবনবিজয় স্বরোদয় (১৩১৭), বিদগ্ধতোষিণী (১৩১৮), সিদ্ধান্তরহস্য (১৩২১), সিদ্ধান্ত-শিরোমণি (ঐ), সূর্যসিদ্ধান্ত (ঐ), জ্যোতিষ-রত্নমালা (ঐ), নারদ-সংহিতা (ঐ), নরপতিজয়চর্যা-স্বরোদয়, পারিজাতপঞ্চপক্ষী (১৩২১), শিরোক্ত পঞ্চপক্ষী (ঐ); সম্পাদিত গ্রন্থ—জাতকপদ্ধতি (১৩১৮), জাতকাভরণম্ (১২৯২), লঘুজাতকম্ (১২৯১), লঘুপারাশরী (১২৯১), জ্যোতিষকল্পদ্রুম (১২৯৪), সর্বার্থচিন্তামণি (১২৯২), জাতকালঙ্কার, জৈমিনীসূত্রম্, নীলকণ্ঠোক্তৃতাজিকম্, বৃহৎপারাশরঃ, বেড়াজাতকম, পঞ্চস্বরা, হিল্লাজদীপিকা, Extracts from works on Astrology, ১ম (১৮৮০), ২য় (১৮৮৩)।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক—শিক্ষাব্রতী ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—১৮১০ খৃঃ কলিকাতা সিন্দুরপটীতে। মৃত্যু—১৮৫৮ খৃঃ ৮ই জানুয়ারী কামারহাটি। পিতা—নবকিশোর মল্লিক। মাতা—মনোমোহিনী দাসী। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ, ডিরোজিওর ছাত্র। ফাইভ ক্লাওয়ারস ও হিন্দু কলেজের অন্যতম। স্থাপনা—হিন্দু ফ্রি স্কুল (সিমুলিয়াতে—১৮৩১); অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। কর্ম—প্রধান শিক্ষক, হেয়ার স্কুল (১৮৩৫-৩৭), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৩৭-১৮৫৭)। প্রতিষ্ঠাতা—(দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সহ) জ্ঞানান্বেষণ (দ্বিভাষী সাপ্তাহিক, ১৮৩১)। নির্ভীক সমালোচনার জন্য 'Thunderer' নামে অভিহিত। অন্যতম সমাজ-সংস্কারক ও চিন্তাশীল বক্তা। সম্পাদক—জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১-১৮৩৭, জুলাই), জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ (১৮৪০, জানুয়ারি) সহ-সম্পাদক—Bengal Spectetor (দ্বিভাষী সাময়িকপত্র)।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—বৈষ্ণবাচার্য ও চিকিৎসক। জন্ম—১২৪৫ বঙ্গ বীরভূম জেলায় একচক্রা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৪ বঙ্গ ১ই অগ্রহায়ণ (১০৯ বৎসর বয়সে)। পিতা—গৌরমোহন চট্টরাজ সার্বভৌম। মাতা—ভবসুন্দরী দেবী। ইনি একাধারে অনন্য সাধারণ পণ্ডিত, বহুশাস্ত্রবিদ্ ও সাংবাদিক। 'সেবারাম' ছদ্মনামে বহু কবিতা রচনা ও সমালোচনা। গ্রন্থ—রূপ সনাতন, শিক্ষামৃত, গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ, সর্বসংবাদিনী (মূল ও টীকা), সাধন-সঙ্কেত, শ্রীচরণ তুলসী, অদ্বৈতবাদ, শ্রীনববৃন্দাবন, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, জগন্নাথবল্লভ নাটক (বঙ্গানুবাদ সহ), নিত্যানন্দ চরিত, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীমৎদাস গোস্বামী, শ্রীমৎ স্বরূপদামোদর, আনন্দমীমাংসা, ব্রহ্মহরিদাস, আত্মনিবেদন, অমৃতময়ী, নীলাচলে ব্রজমাধুরী, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (সটীক), শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ (নারায়ণ দাস কবিরাজকৃত)। সম্পাদক—আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া, পারিজাত, শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক, প্রেমপুষ্প (সাপ্তাহিক, ৪৩২ চৈতন্যাব্দ) আনন্দমন্দির, শ্রীবিশ্বরূপ।

[ক্রমশঃ।

মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র রচিত

ম্যাকবেথ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত

৫ম দৃশ্য

ইনভার্নেস্‌। ম্যাকবেথের দুর্গমধ্যস্থ একটি কক্ষ।

(একখানি পত্র পাঠ করিতে করিতে লেডি ম্যাকবেথের প্রবেশ)

লেডি ম্যাক। (পড়িতেছেন) যুদ্ধজয়ের দিনেই তাহাদের সহিত আমার দেখা, এবং আমি নিঃসন্দেহে জানিলাম যে তাহাদের জ্ঞান সকল পার্থিব জ্ঞানের অতীত। সমস্ত বিষয় আরও স্পষ্টভাবে জানিবার আগ্রহে আমি যখন প্রশ্ন করিলাম, তখন তাহারা অদৃশ্য হইয়া বাতাসে মিশাইয়া গেল। বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে দাঁড়াইয়া আছি, সহসা রাজার নিকট হইতে দূত আসিয়া 'জয় কডোর-সর্দার!' বলিয়া আমায় অভিবাদন জানাইল। ভাগ্যবিধায়িনী ভগিনীত্রয়ীও পূর্বে আমায় এই নামেই সম্বোধন করিয়াছিল এবং 'ভাবী রাজার জয় হোক!' বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছিল। তুমিই আমার প্রিয়তমা সৌভাগ্যসঙ্গিনী; তোমার ভাগ্যোন্নতি সম্পর্কে যে দৈববাণী উচ্চারিত হইল তাহার আনন্দ হইতে তুমি বঞ্চিত না হও সেই উদ্দেশ্যে এই সংবাদ তোমায় পত্রে জানাইতেছি। এ বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিবে। এখন বিদায়।

গ্লামিসের, কডোরের সর্দার হয়েছ তুমি আজ,
প্রতিশ্রুত যা রয়েছে বাকি, তাও তুমি হবে।
তবু আমি ভয় করি তব প্রকৃতিরে।
করুণাপয়ঃপূর্ণ স্বভাব তোমার
ঋজুপথে কাম্যলাভ চাহে না করিতে।
বড় তুমি হোতে চাও, দুরাকাঙ্ক্ষাহীন নহ,
দুষ্ট বুদ্ধি নাই। পূরণ করিতে চাহ
শুদ্ধ সদুপায়ে দুর্লভ দুরাশা তব।
না হ'য়ে বিশ্বাসহন্তা, অন্যায় বিজয়লাভে
নাহিক অরুচি; তুমি যারে চাহিতেছ
গ্লামিসের পতি, সে যে উচ্চে কহিছে ফুকারি'
'আমারে লভিতে তব নাই নাই অন্য পথ নাই'।
সে-কাজ করিতে তুমি ভয় পাও মনে মনে,
চাহ তবু না থাকে অকৃত তাহা।
এস, শীঘ্র এস হেথা, মোর তেজ
সঞ্চারিব শ্রবণে তোমার, রসনার বলিষ্ঠ
বাণীতে দূর করি দিব সর্ব দ্বিধা;
অদৃষ্ট ও দিব্যদৃষ্টি মিলে যে স্বর্ণমুকুটে তব
মণ্ডিল মস্তক, হবে তা তোমারি।

(একজন দূতের প্রবেশ)

কি তব সংবাদ?

দূত। আজ রাত্রে রাজা আসিছেন হেথা।

লেডি ম্যাক। উন্মাদের মত কথা কহ!
সঙ্গে তার নাহি কি তোমার প্রভু? সত্য
যদি রাজ-আগমন, প্রভু তব দিতেন নির্দেশ
যথাযোগ্য আয়োজন তরে।

দূত। দেবি! সত্য ইহা; আর আসিছেন প্রভুও মোদের।
দ্রুতগামী দূত এক প্রভুরে পশ্চাৎ করি
হ'ল অগ্রসর; অতিশ্রমে রুদ্ধশ্বাসে
বার্তাটুকু দিয়া হয়েছে সে মৃতপ্রায়।

লেডি ম্যাক। শুশ্রূষার কর আয়োজন।
এনেছে সে মহাবার্তা।

[দূতের প্রস্থান।

বায়স-কর্কশ কণ্ঠে ঘোষিল সংবাদ,—
মরণ-উন্মুখ ড্যানকান প্রবেশে আমার দুর্গে।
এস, এস অপদেবতারা, মারণ-মন্ত্রের মন্ত্রী যত,
কাড়ি লও নারীত্ব আমার; নিদারুণ
নৃশংসতা ঢালি ভরি দাও পূর্ণ কর
আপাদমস্তক। গাঢ় করি তোল মোর
বক্ষের শোণিত। রুদ্ধ কর করুণার পথ,
স্বভাবের কোমলতা যাহে কোন মতে
না পারে টলাতে মোর সংকল্প নিষ্ঠুর;
সাধন ও সিদ্ধি মাঝে না জাগে শান্তির অন্তরায়।
ওগো মারণের মন্ত্রী, অদৃশ্য যত না
অপচ্ছায়া, পৈশাচী প্রকৃতিরূপে পশি এ হৃদয়ে
বিষাপ্লিত কর স্তন্য মোর। এস এস
ঘনান্ধ রজনী আবরিয়া দেহ তব
নরকের ঘন ঘৃণ্য ধূমে; খরশান ছুরি সম
না পায় দেখিতে যেন নিজ কৃত ক্ষত;
গাঢ় কৃষ্ণ যবনিকা তুলি, দেবতা না
উঠে যেন সহসা চিৎকারি',—
'ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও নারি!'

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

মহান্‌ গ্লামিস! মহীয়ান্‌ কডোর-সর্দার!
শুভংকর ভবিষ্যতে ওগো মহত্তর!
তব লিপিপাঠে উল্লসিত আত্মহারা
অতিক্রমি গেছি আমি মূঢ় বর্তমান,
অনুভূত হতেছে অন্তরে, এই এক মুহূর্তের মাঝে
সুমহৎ সর্ব ভবিষ্যৎ।

ম্যাক। প্রিয়তমে, আজই রাত্রে ড্যানকান
আসিতেছে হেথা।

লেডি ম্যাক। ফিরিবে কখন?

ম্যাক। ইচ্ছা তার ফিরে পরদিন।

লেডি ম্যাক। সূর্য্য দেখিবে না আর সেদিনের মুখ।
কিন্তু স্বামী, তব মুখে চাহি এ যে
যে কেহ পড়িতে পারে গোপন মর্মকথা!
কালেরে করিতে প্রতারণা ধরহ কালের রূপ।
চোখে মুখে রসনায় ফুটুক সাদর সম্ভাষণ।
নিষ্কলুষ পুষ্প-অন্তরালে লুক্কায়িত রহ সর্পসম।

অতিথির তরে হেথা রহিবে সকল আয়োজন,
অন্ধকার রজনীর মহাকার্য্য-ভার
দাও তুমি মোরে, সমুজ্জ্বল হবে আমাদের
সকল দিবস আর সকল রজনী
অসামান্য প্রভুত্ব-গৌরবে।

ম্যাক। আরও পরামর্শ হবে পরে।

লেডি ম্যাক। শুধু তুমি প্রকৃতিস্থ হও,
মুখের বিকার সে যে ভয়েরই স্বরূপ।
বাকি ভার দাও মোর 'পরে।

[প্রস্থান।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

ম্যাকবেথের দুর্গসম্মুখে।

(ডানকান ম্যালকম, ডোনালবেন, ব্যাংকো, লেনক্স, ম্যাকডফ, রস এ্যাংগস ও অপরাপর অনুচরগণ)

ডান্। এই দুর্গ আনন্দ-মন্দির। সকল ইন্দ্রিয় হেথা
হয় প্রসারিত সুশান্ত স্নিগ্ধ চঞ্চল সমীরে।

ব্যাংকো। মন্দিরের চূড়াশ্রয়ী বাসন্তী অতিথি
যত পারাবত দল সমুন্নত সৌধশীর্ষে,
অংসে, অগ্রে, অলিন্দ-আশ্রয়ে
বলভির অঙ্গে অঙ্গ, যেথা সেথা বাঁধি
প্রেমনীড়, পালিছে শাবক আর করিছে কূজন।
জানি আমি—এরা যেথা বাঁধে বাসা
বায়ু সেথা বড় কমনীয়।

(লেডি ম্যাকবেথের প্রবেশ)

ডান্। এস এস নমস্যা অতিথিবৎসলা গৃহরমা।
মাঝে মাঝে আত্মীয়ের প্রীতি বিরক্তির হেতু হয়;
তবু প্রীতি প্রীত করে মন। তাই বলি
যে কষ্ট দিতেছি তোমা তারি তরে
কর পুরস্কৃত অন্তরের ধন্যবাদে।

লেডি ম্যাক। মোদের আতিথ্য যদি দ্বিগুণিত হইত দ্বিগুণ,
তবু গণিতাম তারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎ,
আপনার দানে দানে, যে সম্মানে
ভরি গেল এ দীন ভবন, তাহার
তুলনা কোথা পাই? কি পুরানো কি নূতন
মর্য্যাদার ঋণ মোদের হবে না পরিশোধ,
যতদিন রব বেঁচে শুধুই জপিব তব অশেষ কল্যাণ।

ডান্। কডোর-সর্দার কোথা? দ্রুত আসিতেছি মোরা
তাঁহারি পশ্চাৎ; ইচ্ছা ছিল পথিমাঝে
অতিক্রমি যাবে। কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ সওয়ার;
বেগবান অশ্ব আর সমুৎসুক সেবার আগ্রহ
বহিয়া আনিল তাঁরে আমাদের আগে।
হে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী, আজিকার রাত্রি
মোরা অতিথি তোমার।

লেডি ম্যাক। ভৃত্য মোরা, মোদের সর্বস্ব সে ত
প্রভুপাশে চির-নিবেদিত। রাজদত্ত ধনে মোরা
করি রাজসেবা।

ডান্। হাতে হাত দাও, ল'য়ে চল গৃহকর্তা যেথা।
তাঁর 'পরে অতিপ্রীত মোরা, সে প্রীতি
বাড়িবে নিতি যত দিন যাবে।
যদি কিছু মনে নাহি কর।

[প্রস্থান।

৭ম দৃশ্য

(মশালধারী ও অপরাপর ভৃত্যগণের এবং পরিবেশনকারী পরিচারকগণের মঞ্চোপরি যাতায়াত। পরে—ম্যাকবেথের প্রবেশ)

ম্যাক। করিলেই হ'ত যদি কর্মের সমাপ্তি
দ্রুত করে ফেলা হ'ত ভাল।
এই হত্যা যদি জাল ফেলে তুলিতে পারিত টানি'
সর্ব পরিণতি তার নিরাপৎ সাফল্যের তীরে;
একটি আঘাতই যদি হ'ত শেষ কথা, এই পারে,
জীবনের ক্ষুদ্র এই বালুর চরায়, ওপারের অসীমে
যা হ'বার তা হ'ত। কিন্তু, এই সব পাপে
এপারেও আছে যে বিচার; রক্তপাত
যে শিক্ষা ছড়ায় চারিদিকে, তা হ'তে ত
শিক্ষকেরও পরিত্রাণ নাই। যে বিষ
মিশাই মোরা অপরের তরে, অতিসূক্ষ্ম
ন্যায়ের বিচারে সেই বিষ তুলে ধরে মোদের অধরে।
আজ তার মো'র পরে দ্বিগুণ বিশ্বাস।
একে আমি আত্মীয় ও প্রজা, উভয়েই
প্রবল অন্তরায়, তাহে সে যে অতিথি আমার,
ঘাতকের অস্ত্র হ'তে রাখিব কোথায়,
তা নয় আপনি ধরি ছুরি! আরও এই
রাজা ডানকান রাজধর্ম করেন পালন
পরম কারুণ্যভরা স্নিগ্ধ বীরতায়।
তাঁরে যদি অপসৃত করা ধরা হ'তে, পুণ্য তাঁর
রুদ্ররূপ ধরি' তখনি চিৎকার তুলি
ঝঞ্ঝার ঝংকারে জানাইবে তীব্র প্রতিবাদ
গভীর সে মহাপাতকের, অনুকম্পা যত,
সদ্যজাত নগ্ন শিশুদল, ছুটিবে
অদৃশ্য অশ্বে আকাশ ছাইয়া, ছড়াইবে
চারিদিকে এ পাপ-কাহিনী, অশ্রুজলে
ডুবাইবে ঝড়ের বিক্ষোভ। কার
কশাঘাতে তবে ছুটিবে প্রবৃত্তি মম?
এক দুরাকাঙ্ক্ষা, সে ত স্ফেঁস সওয়ার
চড়িতে উলটি পড়ে অতিব্যগ্রতায়।

(লেডি ম্যাকবেথের প্রবেশ).

কি হোল, কি সংবাদ এখন?

লেডি ম্যাক। আহার হয়েছে প্রায় শেষ। কক্ষ ছাড়ি
কেন এলে তুমি?

ম্যাক। তিনি কি আমার কথা শুধালেন কিছু?
লেডি ম্যাক। সে কথা কি নাহি বুঝ?
ম্যাক। আর অগ্রসর মোরা হ'ব না এ কাজে।
সেদিন আমারে তিনি দিলেন সম্মান,
অকুণ্ঠ প্রশংসা মোরে করে সর্বজন;
এই সব সুদুর্লভ নূতন ভূষণ, না ত্যজিয়া
এত শীঘ্র, কিছু দিন করি না সম্ভোগ।
লেডি ম্যাক। যে আশায় বেঁধেছিলে বুক, সে আশা কি
ছিল ভোর মদের নেশায়? নিদ্রাশেষে ছুটিল
কি নেশা? জাগিয়া বসিয়া সে কি
পাংশু-পাণ্ডু মুখে আপনারে করে অস্বীকার?
তোমার প্রকৃত মূল্য বুঝিনু এখন।
অন্তরে যা হ'তে চাহ, বীরাঙ্গনে বাহ্যতঃ তা হ'তে
এত ভীত তুমি? মনে মনে রাখি বাঞ্ছা
স্বর্ণ মুকুটের, জীবন যাপিবে চিরদিন,
আপনি আপন চক্ষে হেয় কাপুরুষ;
গল্পের মার্জার প্রায় ভাবিবে নিয়ত—
'ধরি মাছ না ছুঁইব পানি'।
ম্যাক। ক্ষমা দাও, শান্ত হও নারী!
মানুষ যা পারে আমি পারি,
তার বেশী যে পারে সে নয়কো মানুষ।
লেডি ম্যাক। কোন্ পশু তবে, তব মুখে শুনাইল মোরে
অন্তরের সংকল্প তোমার? যখন ভাবিয়াছিলে
পারিবে এ কাজ, তখনই মানুষ ছিলে।
তার চেয়ে আরও বড় হ'তে
করিতে হইবে বড় সাহসের কাজ।
স্থান কাল ছিল না সহায় যবে
ভেবেছিলে নিজ হাতে গড়িবে সুযোগ,
আজ যবে সে সুযোগ করতলগত,
পিছাইছ তুমি। শিশুরে দিয়েছি আমি স্তন,
বেশ জানি কত সোহাগের বুকের সে ধন;
তবু পারিতাম আমি বুক হতে ছিনাইয়া
সহাস্য নিদন্ত মুখখানি, আছাড়ি চূর্ণিতে মাথা,
যদি কথা দিতাম তেমন, যেমন
দিয়েছ তুমি।
ম্যাক। আমরা বিফল যদি হই?
লেডি ম্যাক। আমরা বিফল হব!
সাহসে টানিয়া বাঁধ স্নায়ুতন্ত্রী যত,
কখনো বিফল নাহি হব। পথশ্রমে
ক্লান্ত ডান্কান ঘুমাবে অঘোরে,
আমি ঘুম পাড়াইব রক্ষক দুজনে
সুরা-মহোৎসবে, সে ঘুমের ধূমে
জ্ঞানের দুয়ারী আর বুদ্ধির ভাণ্ডারী স্মৃতি
হইবে আচ্ছন্ন। মাতোয়ারা তারা
শূকরের মত ররে প'ড়ে মৃতবৎ।
রক্ষীহীন ডান্কানে ল'য়ে তুমি আমি
কি না পারি করিবারে? এই মহা হত্যা-অপরাধে
কেন না হইবে অপরাধী
ওই মত্ত রাজভৃত্যদ্বয়?
ম্যাক। শুধু নর সন্তানের জন্ম দিয়ে যাও,
যে কঠিন ধাতুতে নির্মিত তুমি নারী
নর ভিন্ন অন্য কিছু হবে না নির্মাণ।
রাজকক্ষ মাঝে সুপ্ত ওদেরি ছুরিকা
কারি যদি ব্যবহার, শোণিতে চিহ্নিত করি
অঙ্গ উহাদের, সকলে কি ভাবিবে না—
এ কাজ ওদেরি?
লেডি ম্যাক। সাধ্য কি অন্যথা ভাবে কেহ?
বিশেষতঃ মোরা যবে শোকে হাহাকারে
দেঁহে মুহ্যমান হ'ব রাজার মরণে?
ম্যাক। করিলাম মনস্থির, সকল দেহের শক্তি
করিনু সংহত এই ভয়ংকর কাজে।
যাও, ছলনায় ভুলাও সবায়,
মুখে তা গোপন রবে বুক যাহা জানে। [প্রস্থান।

[ক্রমশঃ।

দুটি গ্রীক কবিতা

আসক্লিপিআদিস [মৃত্যু : ২৯০ খৃঃ পূঃ]

সেই তো শেষে সব মাটিতে খোয়া

মোহিনী, যদি আজ ঘোমটা খোলো।
সেই তো শেষে ধুলো মাটিতে মেশা:
সেখানে থাকবে কি প্রেমিক কোনো।
এসো না এখানেই বিছানা পাবো।

এখানে বিছানার কোমল নীড়ে
দুজনে চোখাচোখি, দুজনে ঘুম।
মোহিনী, খোলো আজ ঘোমটা খোলো:
সেই তো শেষে সব মাটিতে খোয়া।

সমুদ্রতটের একটি সমাধি

আমার বিশ হাত দূরে অস্থির সমুদ্দুর
কী দারুণ গর্জন ক'রছে, ভাখো (এমনিটিই তুমি চেয়েছিলে)।
বিদীর্ণ ক'রো না আমাকে: এই পাথর-নুড়িদের নিচে
কোনো কণ্ঠধ্বনি নেই,—শুধু ধুলো হাড়ের একটি দলা মাটিতে
মিলিয়ে আছে।

অনুবাদ: পৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে অনেককে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কবি বিদেশে পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অজিতচন্দ্র চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার মজুমদার, কালীমোহন ঘোষ, গৌরগোপাল ঘোষ, মুকুন্দচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রমোহন সেন ইত্যাদির কথা তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যেও অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। এঁরা প্রত্যেকেই সুদক্ষ হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। শান্তিনিকেতনের কর্মে এঁরা সহায়তা করেছেন এবং এঁদের মধ্যে কেহ কেহ বাহিরেও অন্নবিস্তর প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছেন। আশ্রমে তো অনেক ছাত্রকে গুরুদেব সাহায্য করতেনই, এমন কি, আশ্রমের বাইরেও কবি অধ্যাপকদের সংশ্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত ছাত্রদের পড়াশুনায় নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন, তারও উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অধ্যাপকদের কথার মূল্য এবং ছাত্র-সমাজের প্রতি দরদ কবির কাছে এতই ছিল। একখানি পত্রে তিনি এক অধ্যাপককে লিখছেন :

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

কল্যাণীয়েষু

সেই ছাত্রটিকে কতদিন সাহায্য করিতে হইবে লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব। আগামী মার্চ্চ মাসে বোধ হয় পরীক্ষার সময়। ইতি ১১শে মাঘ ১৩১২

(স্বা:) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী সোম মঙ্গলবারে কলিকাতায় যাইব।

আশ্রমের কর্মীদের মধ্যে যাঁরা স্বভাবতঃই প্রতিভাবান, তাঁরা কবির সহায়তা ও পরিচালনা লাভে নানাদিকেই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু যে-সব কর্মী কোনো এক সময়ে এসে কর্মনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা নিয়ে আশ্রমের জীবনের এক-এক কোণে স্থান লাভ করেছিলেন, কবির অন্তরের স্পর্শ তাঁদেরও নানা উপলক্ষে ধন্য করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে মহৎ জীবনের সাধনায়। দীপের শিখা নিভে যেতে যেতে যজ্ঞাগ্নির জোগান পেয়ে জ্বলে উঠেছে বারেবারে। একখানি পত্রে কবি এরূপ একজন সাধারণ কর্মীকে লিখছেন :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমাদের নববর্ষের উৎসব শেষ হইল। তুমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম। যাহা হউক আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি এ বৎসর তোমার জীবনে কল্যাণ বহন করিয়া আনুক। তুমি ভক্তি লাভ কর, শক্তি লাভ কর, আনন্দ লাভ কর। রুদ্রদেবের প্রসন্নতার জ্যোতি সাধনার দুর্গম পথে তোমাকে নিত্যনিয়ত রক্ষা করুক। তুমি ভ্রমণে বাহির হইবে লিখিয়াছ তোমার ভ্রমণ সফল হউক। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
(স্বা:) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখা যাচ্ছে, কাছে বা দূরে যেখানেই যিনি যখন থাকুন, গুরুদেবের কাছে সকলেরই জীবনের যোগ ছিল নাড়ির মতো অবিচ্ছিন্ন। যেতে-আসতে তাঁরাও তাঁকে না জানিয়ে থাকতে পারেননি, তিনিও তাঁদের সর্বত্র আচ্ছাদিত করেছিলেন আশীর্বাদের মঙ্গলচ্ছায়াবিস্তারে। উৎসবে আনন্দে সামান্য কাউকেও বাদ দিয়ে তাঁর মন ভরত না। সকলের কথাই তিনি মনে রাখতেন। এঁদের কোনো উদ্যোগে তাঁর মহানুভবতা কিরূপ উদ্দীপ্ত ছিল, তার বিষয়ে ধারণা করা যাবে নিম্নের এই পত্রখানা থেকে :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার চিঠিতে আমি তোমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছি, তোমার চিঠিতেও তুমি আমার নিকট সেই একই প্রস্তাব করাতে আমি আনন্দিত হইলাম। তুমি পড়াশুনা করিয়া প্রস্তুত হইতে থাক এবং তোমার জীবনকে চিরদিনের জন্য নিঃস্বার্থ মঙ্গলব্রতে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হও এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

তোমার পকেট খরচার স্বরূপ প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া ভূপেন বাবু তোমাকে দিবেন। যদি পার তবে ১ ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা বিদ্যালয়ের কাজ করিয়ো। কারণ, কার্য হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিলে তুমি ক্রমশ পিছাইয়া পড়িবে। ঈশ্বর তোমার অন্তঃকরণকে মঙ্গলে সুদৃঢ় করিয়া তোমার জীবনকে সার্থক করুন। ইতি ৪ঠা পৌষ। ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী
(স্বা:) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ—ভূপেন বাবুকে বলিয়ো কলিকাতা হইতে ধর্ম্মপালের পত্র না পাইলে যেন তিনি কাশী না যান। কাজের অসুবিধা করিয়া তাড়াতাড়ি যাইবারও প্রয়োজন নাই। অবসর বুঝিয়া যাইবেন।

ইতিপূর্বে অনেক ছাত্রের এবং কবির পুত্র শমীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি ও আরো যে ক'খানি কবির লেখা চিঠি এ প্রবন্ধে সংকলিত হল, এ সবই এক ব্যক্তিকে নানা সময়ে লিখিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন অধ্যাপক, সে কথা পূর্বেই উক্ত হয়েছে। অধ্যাপকটি ছাত্রদের মধ্যে বাস করতেন। অত্যন্ত আর্থিক অভাবগ্রস্ত ছিলেন এবং স্বাস্থ্যে ছিলেন একটু দুর্বল। এক সময়ে তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত কাজের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে পড়াশুনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর দিক থেকে এতে কিছু শৃঙ্খলারও ত্রুটি ঘটে কবি তাঁকে জানতেন। তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থা মমতার সঙ্গে লক্ষ্য করেন। ত্রুটিবিচ্যুতি উপেক্ষা করে কর্মী যাতে স্বস্তি পান ও দুদিন পরে নবোদ্যমে শান্ত স্বচ্ছচিত্তে কাজে লাগতে পারেন, তার জন্য অচিরেই আবশ্যকীয় অবসরের ব্যবস্থা তো করলেনই, উপরন্তু বিনা বেতনের স্থলে পাঁচ টাকা করে "পকেট খরচার স্বরূপ" মাসিক সাহায্যেরও নির্দেশ দেন। তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলেন না কাজের যোগ রক্ষা হবে যে তাঁরই কল্যাণের কারণ, তাও তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

অধ্যাপক ব্যক্তিটি সংসারে প্রতিষ্ঠা না পেয়ে থাকুন, কিন্তু স্বীয় কর্মবৈশিষ্ট্যে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের এক স্থলে এমন একটি উদাহরণ রেখেছেন, যার তুলনা কমই মিলে। হোক সে ইতিহাস আজ বিস্মৃতিলীন, তবু একদিন যখন সকল কিছুর খোঁজ পড়বে তখন লোকের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগিয়ে তা নীরব মহিমায় উদ্ভাসিত হবে একটি সুদূর প্রাণজ্যোতিষ্কের পুণ্যজ্যোতিরূপে।

শান্তিনিকেতনের দৈন্য অবস্থা তো লেগেই ছিল। কবিও তা নিয়ে দায়গ্রস্ত রয়েছেন বরাবরই। মধ্যে মধ্যে আশ্রমেও কর্মীদের মধ্যে আশ্রমের দুরবস্থা প্রকাশ করে দুঃখ না করতেন এমন নয়। অধ্যাপকের হাত-খরচা ছিল তখন কুড়িটি টাকা। তিনি তার থেকেই পোষ্টাফিসের খাতায় জমিয়েছিলেন শ' খানেক টাকা। একদিন কবির কাছে গেলেন। অতি সংকোচে সেই একশ'টি টাকা তাঁকে আশ্রমের সেবার কাজে লাগাতে নিবেদন করলেন। আর বললেন, মাসিক কুড়িটি টাকা থেকে দশ টাকা করে বাদ দিয়ে তাঁকে হাত-খরচা এখন থেকে দেওয়া হোক দশ টাকা। তাতেই তাঁর চলবে। পরবর্তী জীবনে তাঁর নিদারুণ অর্থাভাব ও পরিবার প্রতিপালনের দুর্বিষহ কৃচ্ছতা দেখে ধারণা করা কঠিন ছিল যে এই ব্যক্তি একদিন এমন মহানুভবতাও দেখাতে পেরেছিলেন। আজকের বিশ্বভারতী সরকারী সাহায্যে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, মনে রাখতে হবে,—এই অধ্যাপকের অনুরাগ ও আত্মত্যাগের মতো ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মধ্যেই রয়েছে প্রতিষ্ঠানের জীবন।

যতদিন নিজের ভিতর থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই আকর্ষণ শান্তিনিকেতন-সংশ্লিষ্ট সকলে দেশেবিদেশে অনুভব করবেন, ততদিন এর জন্য ভাবনার কারণ নেই। সামান্য কর্মীর প্রাণেও কবি দুর্লভ এই আদর্শনিষ্ঠা জাগাতে পেরেছিলেন।

আশ্রমের বাইরেও কবি আশ্রমের আদর্শের প্রতি অনুরূপ প্রীতি সাধারণের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত করে তুলছিলেন। এ সঙ্গে আরেকটি দানের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। সেটিকে বিদ্যালয়ের কাজে সর্বপ্রথম অযাচিত দান ব'লে কবি নিজেই বিশেষিত করেছেন। ভাষণে বল্‌ছেন,—"মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা—এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই ব'লে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম…সহানুভূতি।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১০৬)

"রবীন্দ্রজীবনী"-কার এ প্রসঙ্গে লিখছেন,—"এই দান অত্যন্ত অভাবের সময় কবির হস্তগত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে মোহিতচন্দ্রকে লিখিলেন, (২৬ ফাল্গুন ১৩০৯) "ধনীর দানে আমাদের বাহ্য অভাব মোচন হইত মাত্র, কিন্তু আপনার দানে আমাদের বল এবং নিষ্ঠা বাড়িয়া গেছে। আপনি আমাকে সুসময়ে হঠাৎ সচেতন করিয়া অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।" [রবীন্দ্রজীবনী ২য় সং ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৫) আমাদের উল্লিখিত আশ্রম-অধ্যাপকটির দানের কথার এরূপ কোথাও উল্লেখ নাই,—কিন্তু "রবীন্দ্রজীবনী"-কার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটেই প্রসঙ্গত আমরা সর্বপ্রথম এই নীরব দানের কথা শুনতে পাই, পরে সবিশেষ জানি।

এব'রে কবির সাধনাপর্বের একটি কার্যক্রম নির্গলিত হয়ে আসছে। প্রথমত দেখা যায় সৃষ্টিতপস্যার প্রতি খাঁটি অনুরক্তির মধ্যে কবি তাঁর পাথেয়-লাভের বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন; বাইরের উপকরণকে প্রয়োজন মনে করেছেন কিন্তু প্রাধান্য দেননি। দ্বিতীয়ত, তাঁর একাগ্রতা ছিল বাধা-না মানা অভিযানের দিকে। তৃতীয়ত তাঁর কর্মকৌশলের মধ্যে মিলে, কাজের প্রসার ও তদনুযায়ী-সহানুভূতির সঙ্গে উপযুক্তরূপে কর্মী গঠন করা। সেই কর্মীদের মধ্যে কার্যরীতির উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের প্রতি কর্মীদের অন্তরপ্রকৃতিরও অনুরাগ উপ্ত করা। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিল অনেকেই। তার মধ্যে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীটিও ছিল একজন। তার সাধ্য সে করেছে। ভিতরকার এই আত্মনিবেদনের শক্তি-জোগানটুকু দিয়েই কাজের মান সৃষ্টি হয়। পিছনে এই শক্তি অন্তঃসলিল না থাকলে, আকারে কাজ স্ফীত হলেও প্রকারের যাচাইয়ে তা কালের সভায় অনাদৃত হয়ে থাকে। বিরাট সেতুবন্ধের ইতিহাসে কাঠবিড়ালী হয়তো ছিল ঐ একটিই। কিন্তু তারই দানের গৌরবেই আজো ঘটনাটি মানব-মনে অঙ্কিত হয়ে আছে শ্রদ্ধার উজ্জ্বল রেখায়। সুতরাং সাহায্যের আবেদন বাহিরে যতই প্রচারিত হোক, যত সাহায্যই তাতে মিলুক, ভিতরের এই কবির কর্মকৌশলগুলির কথাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাইনে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৮)

শান্তিনিকেতনের সাধনার পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়। সামান্য কিছু বলতে হয়। কবির কথাতেই তা বলা যাক। "আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানা ঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এই সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণতঃ মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র;…ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দেয়, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার

অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব···যে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৪৮-৪৯)

এখানে এটুকু বলা আবশ্যক,—বিদ্যা এবং চরিত্রের সুষ্ঠু সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে; শান্তিনিকেতনে কবির সাধনায় মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ করাই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কারণ একস্থলে কবি বলছেন,—"কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক ব'লে জানি।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৫২)

বিদ্যা না হোক, শুধু চরিত্রে মহানুভব হলেও তার মূল্য অপরিসীম। পূর্বোক্ত সামান্য অধ্যাপকের ঘটনাটি বিদ্যার জৌলুষের চেয়ে বেশি করে চরিত্রের এক একটি বিশেষ প্রকাশে সমুজ্জ্বল। প্রতিভায় যদি বা খাটো থাকি, পণ্ডিত না হই, গুণী না হই,—আমরা সাধারণ লোকেদের মধ্যে অনেকে চেষ্টা করলে চরিত্রের নানাদিক দিয়ে ঔজ্জ্বল্য সাধনে সফল হলেও হতে পারি। মহৎ আদর্শের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পরাকাষ্ঠা। জীবনের ব্যবহারে রূপায়িত সেই আদর্শই রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সেই তাঁর আমাদের জন্য রেখে-যাওয়া উত্তরাধিকারের পরম সম্পদ ও শক্তিসঞ্চয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দানের মহত্ত্ব ও গভীরতা পরিমাপ করবার সর্বোচ্চ মানদণ্ড যদি দেখতে চাই তবে এ-সব কথাও বাহ্য হয়ে পড়ে। তিনি যে প্রতিষ্ঠানকে এত ভালোবেসেছেন, যাকে আত্মজের মতোই সযত্নে এমন সাধনায় গড়ে তুলেছেন, তার স্বাধীন বিকাশ কামনা করে তার ভাবী প্রগতির পথ নির্মুক্ত রাখবার জন্য তিনি নিজের সেই ভালোবাসার ছাপমারা সর্বপ্রকার স্বত্বাধিকারের আবরণটুকুও শেষ অবধি যেন সরিয়ে নিয়েছেন অতি সন্তর্পণে। তাকে তুলে দিয়েছেন নির্মোহচিত্তে চিরকালের হিতৈষীদের হাতে। বহু আগে থেকেই তাঁর এ সংকল্প অন্তরে নিবদ্ধ থেকে তাঁকে এই সংপে দেওয়ার পরিণতিতে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। তিনি বলেছেন,—"নিজেকে দিয়ে-ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৪৯) এই অধিকার-ত্যাগ তাঁর সকল ত্যাগকে ছাপিয়ে গেছে। সকল লাভের মধ্যে বড়ো লাভের অধিকারী হয়েছেন তিনি এই ত্যাগের ঔদার্যে। কালের কাছে, বিশ্বমানবসমাজের দরবারে তাঁর স্বত্বত্যাগের দলিলে তিনি তাঁর অপূর্বভাষায় পরিষ্কার বলছেন:—"যখন একলা ছোটো কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা—সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে; নানা ভুল-ত্রুটি ঘটে নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে—এ সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্‌ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়। * * * *

নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না—তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি—সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। * * *

আমি এমন কথা কখনও বলিনি, আজও বলি নে যে, আমি যে কথা বলব তাই বেদবাক্য—সে রকম অভিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্ভাবন করিনি; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক্। তারপরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। * * *

আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান, যাঁরা মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। * * * অন্য সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়—তা করব না ব'লেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপর প্রাণ যেন সত্য হয়।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ১৩৮—৪০)।

শান্তিনিকেতনকে রবীন্দ্রনাথ কোনো এক জায়গাতেই আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাঁর কার্যপদ্ধতির মধ্যে সেই ব্যবস্থারও সমাবেশ রয়েছে, যাতে সর্বত্র শান্তিনিকেতনকে সকলে কিছু-না-কিছু কাছে পায় আপন করে। এই বৃহত্তর শান্তিনিকেতনের প্রসারের জন্য তিনি "বিশ্বভারতী সম্মিলনী"র সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বলেছেন,—"বিশ্বভারতীকে দুই ভাবে দেখা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শ পোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয় সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রয়েছে।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ৩৮) এ ছাড়া, যাঁরা কোনো মতভেদের জন্য একটু দূরে থেকে শান্তিনিকেতনের সহিত যোগেচ্ছু,—তাঁদের জন্য যোগের পথ দেখিয়ে কবি বলছেন,—"তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও

কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারও আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ ক'রে আনি তবে তাঁরা যে তা শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিম্বা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন—এই যেমন ক্ষিতিমোহন বাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, যা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সংবর্ধনা করা হল। * * *

দেশবিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যসাধনার যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে—বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ গৌরব সাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।" (বিশ্বভারতী পৃঃ ৩৮-৪১)

সেদিন কবি যে সংকল্প ব্যক্ত করে গেছেন, সে সংকল্পের মর্মোপলব্ধি করে আমরা সকলেই আশা করি, বিশ্বভারতীকে কালে-কালে আপনাদের ব'লে গ্রহণ করব এবং "যুগগত একটি গভীর তত্ত্বকে" অক্ষুণ্ণ রেখে, যন্ত্রের সাহায্য নিয়েও "সবার উপরে প্রাণ"কে সত্য করে, "তাকে সকল আঘাত থেকে" বাঁচিয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ-গৌরব সাধনে যখন যা করবার দরকার হয় তাই সকলে মিলে করব।

শেষ

জ্যোতির্ময়ী

রঘুনাথ ঘোষ

নতুন বছরে কাল-বোশেখীর বাণী
স্মরণ করাল' তোমাকে পাবার দিন,
সেদিন জীবনে পরম লগ্ন জানি
অমের আশায় বাজিল বক্ষবীণ।

মনে আছে আজো সেদিন শুক্লা-রাতে
গগন-ভুবন জ্যোৎস্না-সুরভি মাখা,
বলয়-শোভিত স্নিগ্ধ দুখানি হাতে
আশ্বাস ছিল—ইঙ্গিত ছিল আঁকা।

কত দুর্যোগ কেটে গেছে তার পরে
পার হয়ে গেছে পৌষ-ফাগুন রাত,
দুর্গম দিনে দুঃসহতম ঝড়ে
বাড়ায়ে দিয়েছো দৃপ্ত দুখানি হাত।

জীবন যখন ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে
আঁধারে যখনি হারায়ে গিয়েছে পথ,
মধুর কণ্ঠ শুনেছি তখনি পাশে
নয়নে তোমার দেখেছি ভবিষ্যৎ।

অঙ্গুলি তুলি দেখালে জ্যোতির্ময়ী
আলোক-দীপ্ত নির্ভুল পথ-রেখা,
ভ্রান্ত কবিরে চকিতে দেখালে অগ্নি
অনল-আঁখিতে অগ্নি-আলোক লেখা।

আবার এসেছে দারুণ দগ্ধ রাতি
দ্বিধা-সংশয়ে নিত্য ক্ষুব্ধ মন,
বন্ধুর পথে বল কে আমার সাথী?
আলোকের লাগি করেছি জীবন পণ।

তখনি শুনিনু তোমার মা ভৈঃ বাণী
পুণ্য পরশে ধন্য করিলে হিয়া,
কল্যাণময়ী শান্ত মূরতিখানি
মুগ্ধ আবেশে আবার দেখিনু প্রিয়া।

নব ইতিহাস ঝলিছে তোমার চোখে
অমিয় অধরে প্রসন্ন হাসি মাখা,
সংকেতে শুধু দেখালে বিশ্বলোকে
আঁধারের বুকে আলোকের হাসি আঁকা।

নব বর্ষের কাল-বোশেখীর বাণী
ভীম গর্জ্জনে আনিছে ঝঞ্ঝাবাত,
নির্ভয়ে তাও পার হয়ে যাব জানি
জাগ্রত জানি তোমার দুখানি হাত।

১৬

সেদিন সূর্যাস্তের সোনায় সোনায় ভরে ছিল আকাশ। প্রথম রাতের চাঁদ অতন্দ্র জেগেছিল নগরীর শিয়রে। জেগেছিল দুটি অসমবয়সী বাপ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে। আর আপন আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে দু'জনে নিঃশব্দে বসেছিল প্রাঙ্গণের জাফরি-কাটা আলো-ছায়ার দিকে চেয়ে।

কাল তার বিয়ে। তাই আজকের দিনটি লুসি বাপের সঙ্গ ছাড়া হতে চায়নি। অন্ততঃ এই একটি দিন সে পরিপূর্ণ নিজেদের জন্তে রেখেছিল।

চাঁদের আলোয় বৃদ্ধের শান্ত মুখে কোমল-পাণ্ডুর আভা লেগেছে। এই অসহায় মানুষটিকে মুহূর্ত'ও ছেড়ে যেতে চায় না লুসি। এইবার নিয়ে তাই সে সহস্র বার পিতাকে প্রশ্ন করলে—'তুমি সুখী হয়েছ তো বাবা?'

—'হ্যাঁ মা! এমন সুখী আমি জীবনে কখনো হইনি এর আগে। বিয়ে হয়ে আমার মেয়ে সুখের ঘর বাঁধবে আর আমি সুখী হবো না মা? এ আমার কত বড় আনন্দ—'

—'কিন্তু বাবা—'

—'তুমি কণা মাত্র দুঃখ রেখো না মা! তুমি যবে থেকে মাতৃস্নেহে আমার বুকে তুলে নিয়েছ, সেদিন থেকে নিয়ত আমার এই দুর্ভাবনা ছিল যে, আমার ব্যর্থ জীবনের মমতায় তোমার জীবন-কুসুম না ভ্রষ্ট হয়—'

বাবার ঠোঁটের উপর হাত রেখে লুসি তাঁকে নিবৃত্ত করতে গেল, কিন্তু পিতা তার হাত সরিয়ে দিয়ে তেমনি আবেগ ভরে বলতে লাগলেন—'তুমি জান না মা, আমার কারণে আমার মেয়ের জীবন অপূর্ণ থেকে যাবে এ আমার কত বড় দুর্ভাবনা ছিল! তুমি নিষ্ফল হলে আমি কি করে সুখী হতাম মা?'

—'চার্লস যদি আমার জীবনে না আসত, আমি তোমাকে নিয়ে দিব্যি আরামে কাল কাটাতাম বাবা।'

মেয়ের এই সহজ আত্মপ্রকাশে বৃদ্ধ খুশীই হলেন। পুলকিত কণ্ঠে বললেন—'হতেই হবে মা। চার্লসকে যে আসতেই হবে। আর চার্লস কেন, সে না এলে অন্য কোন রূপবান ভাল ছেলে আসতই তোমার জীবনে। কিন্তু এ আমি সহ্য করতে পারতাম না মা যে, আমার অতীতের অন্ধকার বর্তমান পার হয়ে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন অবধি আঁধার করে দেবে। সে আমি কি করে সহ্য করতাম মা?'

অতীত রোমন্থন করতে করতে পিতার সারা মুখে-চোখে একটা বিষণ্ণ বিস্মরণ আসা-যাওয়া করতে লাগল। তার আত্মমগ্নতা দেখে লুসি নিঃশব্দে বসে রইল।

—'কত দিন জান মা, ঐ চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে আমি কাটিয়েছি। জেলের গরাদ দেওয়া একমুঠো ঘরে বন্দী আমি ঐ চাঁদ দেখেছি আর পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটেছি। বাইরের যে অবাধ বিশ্বভুবন অজস্র জ্যোৎস্নালোকে অবগাহন করছে তার থেকে আমি বঞ্চিত, এ চিন্তা কি দুর্বিবহ তুমি ভেবে পাবে না মা! সেই চাঁদের আলোয় জেলখানার মেঝেতে গরাদের ছায়া গুণে-গুণে আমি কাল কাটাতুম।'

এই মানুষটির সঙ্গে সেদিনের বন্দীর হুতাশ মর্মবেদনার কোন মিল না পেলেও, লুসি আত্মচেতন ভাবে তার কথা শুনতে লাগল।

চার্লস ডিকেন্স

তেমনি আত্মমগ্ন হয়ে তিনি বলতে লাগলেন—'চাঁদের দিকে চেয়ে আমি এক জনের কথা নিশি-দিন ভাবতাম। জেলের ঐ ক'টি লৌহ-গরাদ আকাশের চাঁদের চেয়ে মধুর আর এক জনকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মাতৃগর্ভে অপ্রত্যক্ষ যাকে আমি বাইরে রেখে এসেছিলাম, এত দিনে সে কি এসেছে পৃথিবীতে? হয়ত মরেই গেছে! যদি সে বালক হয়, বড় হয়ে সে কি পিতার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে না? তার বাবা স্ব-ইচ্ছায় এমন আত্মনির্বাসন নিতে পারেন কি না, সে বিচার কি একদিন করতে বসবে না সে? তুমি বুঝতে পারবে না মা, তখন প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় আমি কেমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম আবার কখনো কল্পনা-নয়নে দেখতাম একটি মেয়ে হয়েছে আমার সেই মেয়ে দিনে দিনে বড়ো হয়ে শ্বশুর-ঘর করতে চলে গেল বছরের গোলমাল হয়ে যেত। দেখতাম, সুখে ঘরকন্না করছে সে নিষ্ঠুর নিয়তি তার বাবাকে কোন্ অন্ধকারের গর্ভে নিক্ষেপ করেছে সে কথা ঘুণাক্ষরেও সে জানে না।

'—এ সব কথা তুমি কেমন করে ভাবতে বাবা? সত্যিই আমি তোমার কিছু জানতাম না!'

—'কত দিন ভেবেছি আমার সেই মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আম জানলার বাইরে। আমায় মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছে সে চাঁদের আলোয় তা.ক কত দিন আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখো আমার ঘরের বাইরে। ঠিক এমনি ধারা—ঠিক এমনি ধারা, মা শুধু সেদিন এমন করে তাকে বুকে আঁকড়ে ধরতে পারিনি লোহার গরাদগুলো আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকত। কিছুতেই তাকে এমনি করে বুকে জড়িয়ে নিতে পারতাম না মা! কিছুতে পারতাম না। সে যে কি কষ্ট—তবু মা, সে তো আমায় ভোলেনি। স্বপনে জাগরণে সে তো আমার কথা ভাবে। তার প্রার্থনায় সে তো দেবতার কাছে আমার কথা নিবেদন করে। এ কথা ভাবতে মন হাল্কা হয়ে যেত। মনের অন্ধকার কুটুরীতে জানু পেতে বসে আমিও তার প্রার্থনায় যোগ দিতাম। শত বার মাথা ঠুকে বলতাম, তাকে ভালো রেখো ঠাকুর! সে যেন আমায় সুখী হয়!'

গভীর ভাবাবেগে বৃদ্ধ মেয়ের কাঁধে মাথা রেখে অস্ফুট কি যেন উচ্চারণ করতে লাগলেন।

তাঁকে নিয়ে লুসি ঘরে ফিরে এল।

সেদিন গভীর রাত্রে লুসি প্রদীপ হাতে নীচে নেমে এল ঘুমন্ত পিতার মাথার শিয়রে বসে তার তরুণ নারীহৃদয় সেদিঃ মমতায় বিগলিত হয়ে গেল।

১৭

শুভ বিবাহের দিনটি ভোরের প্রসন্ন আলোয় স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিয়ের কনে, লরি ও মিস্ প্রস ডাক্তারের কক্ষের বা

প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার ভিতরে কথা বলছেন চার্লস ডার্ণের সঙ্গে।

'মা',—বললেন লরী—'এই শুভ লগ্নটির জন্যই বুঝি তোমায় আমি চ্যানেলের ওপার থেকে এনেছিলাম। ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন!'

দরজা খুলে ভাবী বর চার্লস ডার্ণেকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার ম্যানেট এলেন। একটু আগে বৃদ্ধ যখন ঘরে গিয়েছিলেন, তখন মুখের যে ভাব ছিল তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মুখ হয়েছে ফ্যাকাশে বিবর্ণ। শুধু বাহ্যিক আচরণে প্রশান্ত গাম্ভীর্যটুকু বজায় রেখেছেন কোন-ক্রমে—সুচতুর লরির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন অলক্ষিত রইল না।

ডাক্তার মেয়েকে হাত ধরে নীচে নামিয়ে এনে এই বিশেষ দিন উপলক্ষে ভাড়া-করা গাড়ীতে তুলে বসালেন। বাকী সকলে আর একটি গাড়ীতে অনুগমন করল তাদের। তার পর নিকটবর্তী একটি গীর্জায় পরিচিতের স্নিগ্ধ পরিবেশে নিতান্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে লুসি ম্যানেট আর চার্লস ডার্ণের শুভ পরিণয় সমাধা হোল।

বাড়ী ফিরে সামান্য জলযোগের পর বিদায় দেওয়া-নেওয়ার পালা এল। বড় কষ্ট হোল দেখতে সে দৃশ্য। মেয়েকে নানা ভাবে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ। শেষে তার দুটি বাহুর আকুল বেষ্টনী থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ডাক্তার কান্না-ভেজা ভারী গলায় বললেন—'চার্লস, তুমি একে নাও। আজ থেকে ও তোমার।'

গাড়ীর জানলা থেকে দুটি হাত নেড়ে বিদায় জানাল লুসি। তার পর এক সময় মেয়ে-জামাইকে নিয়ে গাড়ী দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

পিছনে পড়ে রইলেন ডাক্তার, লরি আর মিস্ প্রস। পুরানো পরিচিত কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করে লরী প্রথম লক্ষ্য করলেন ডাক্তারের চেহারায় এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে! যে কোমল বাহু দুটি এতক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি, যাবার বেলায় সেই হাত বুঝি বিষাক্ত তীর মেরে গেছে তাঁকে।

হৃদয়ের যে আবেগকে দমন করে রেখেছিলেন এতক্ষণ, এবার তার বাঁধন শিথিল হয়ে গেল। আবার ফিরে এল মুখে সেই আত্মহারা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টিকেই ভয় করেন লরি। অন্যমনস্ক ভাবে ডাক্তার দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে ক্লান্ত দেহটাকে সিঁড়ি ভেঙ্গে টেনে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। তাঁকে দেখে লরির মনে পড়ে গেল মদের দোকানের ডিফার্জের কথা।

লরি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিস্ প্রসকে বললেন—'আমার মনে হয়, এখন ওঁর সঙ্গে কথা বলা বা ওঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। আমাকে এখুনি একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে—শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। তার পর ওঁকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া যাবে কোন গ্রামে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হবে! তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ব্যাঙ্কে ঘণ্টা দু'য়েক দেরী হোল লরীর। ফিরে এসে পুরোনো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন একেবারে ডাক্তারের কক্ষে। চাপা ঠুক-ঠুক শব্দে গতি রুদ্ধ হোল তাঁর। চমকে উঠলেন তিনি।

—'এ কি? কিসের শব্দ?'

ভয়ার্ত মুখে মিস্ প্রস হাত কচলাতে-কচলাতে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল—'সর্বনাশ হয়ে গেছে। লুসিকে আমি কি বলব? ডাক্তার আমায় চিনতে পারছেন না। আবার জুতো তৈরী করতে বসেছেন।'

যা হোক, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে লরি নিজে ডাক্তারের ঘরে ঢুকলেন। বেঞ্চিটাকে আলোর ধারে টেনে নিয়ে মাথা নীচু করে ডাক্তার কাজে মগ্ন হয়ে আছেন।

—'ডাক্তার ম্যানেট! প্রিয় বন্ধু, ডাক্তার ম্যানেট!'

মুহূর্তের জন্য ডাক্তার মুখ তুলে তাকালেন। একটি পুরোনো জুতো ডাক্তারের হাতে। পাশের আর এক পাটি জুতো হাতে তুলে নিয়ে লরি জিজ্ঞেসা করলেন—'এটি কার?'

—'একটি মেয়ের? বাইরে পরবার জুতো।' মুখ না তুলেই বিড়-বিড় করে বলে গেলেন ডাক্তার—'অনেক আগেই এটি তৈরী শেষ হওয়া উচিত ছিল।'

—'ডাক্তার ম্যানেট, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখুন?'

কাজ না থামিয়ে ডাক্তার যন্ত্র-চালিতের মতই মুখ তুলে তাকালেন।

—'ভাল করে চেয়ে দেখুন। আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন না? আপনার উপযুক্ত কাজ এ নয়। ভাল করে ভেবে দেখুন।'

কিন্তু কোন মতেই আর তাঁকে দিয়ে কথা বলান গেল না। অনুরোধে মুখ তুলে তাকালেও তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বার করতে পারলেন না লরি। হাজার অনুরোধেও না। ডাক্তার নিঃশব্দে কাজ করে যেতে লাগলেন।

একটি মাত্র আশার আলো দেখতে পেলেন লরি। ডাক্তার মাঝে-মাঝে বিনা প্রশ্নেই মুখ তুলে তাকাচ্ছিলেন আর সে মুখে কেমন একটা হতবুদ্ধি কৌতূহলের ক্ষীণ আলোক ঝিকমিক করছিল। যেন কি একটা বোঝাপড়া চলছে মনের সঙ্গে।

দুটো জিনিস এখন লরির নিকট প্রধান হয়ে দেখা দিল। প্রথমতঃ, এ ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে লুসির কাছ থেকে আর দ্বিতীয়তঃ, ডাক্তারকে যারা জানে তাদেরও জানতে দেওয়া হবে না। মিস্ প্রসকে সাবধান করে দিলেন, কেউ দেখা করতে এলে যেন বলে দেওয়া হয় ডাক্তার অসুস্থ। কয়েক দিন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার তাঁর। লুসিকে লেখা হোল ডাক্তার রুগী দেখতে বাইরে গেছেন। নিজের হাতেই ডাক্তারের লেখা তাড়াতাড়ি দু'-তিন ছত্র সেই রকম লিখে মিস্ প্রসের হাতে দিলেন। ডাক্তার হয়ত ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হবেন সেই আশায় এই সাবধানতাটুকু অবলম্বন করলেন লরি!

এই ভাবে চারি দিকে আঁটঘাট বেঁধে লরি যত দূর সম্ভব নিজেকে অন্তরালে রেখে ডাক্তারের আচার-আচরণের উপর সতর্ক নজর রাখতে লাগলেন। জীবনে এই প্রথম টেলসন ব্যাঙ্ক থেকে ছুটি নিলেন তিনি।

ডাক্তারের সঙ্গে একই ঘরে জানলার ধারে আসন নিয়ে বসে লরি নিজের লেখাপড়া করে যেতে লাগলেন আর লক্ষ্য করতে লাগলেন ডাক্তারের আচার-আচরণ। ক্রমশঃ তিনি বুঝতে পারলেন, ডাক্তারকে কথা বলতে পীড়াপীড়ি করা নিরর্থক—তাতে তাঁর বিরক্তির মাত্রাই বাড়ানো হবে শুধু। প্রথম দিনই সে-চেষ্টা থেকে বিরত হলেন তিনি। নির্বাক্ প্রহরীর মত তিনি কেবল নিজেকে তাঁর সামনে

মোতায়েন রাখার সংকল্প করলেন। যে মিথ্যা বিড়ম্বনায় পড়েছেন তিনি এ যেন তার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

যা খেতে দেওয়া হয় তাই মুখে তোলেন ডাক্তার। প্রথম দিন তিনি কাজ করলেন যতক্ষণ না অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। তার পর যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

—'বাইরে যাবেন?'

ডাক্তার পুরোনো দিনের মত মেঝেতে চারি পাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন—পুরোনো দিনের মতই নীচু-গলায় বললেন—'বাইরে?'

—'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবেন? কেন নয়?' এর আর কোন উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন না ডাক্তার। এমন কি একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে হাঁটুতে কনুই রেখে, হাতের মধ্যে মাথাটা চেপে ধরে নিঃশব্দে বসে রইলেন ডাক্তার। তাঁর এই মোহাচ্ছন্ন আচরণে লরির মনে হোল ডাক্তার যেন নিজেকে প্রশ্ন করছেন—'কেন নয়?'

মিস্ প্রস আর লরি দু'জনে ভাগাভাগি করে রাত জেগে পাশের ঘর থেকে তার উপর নজর রাখবেন ঠিক করলেন। ঘুমোনোর আগে অনেকক্ষণ ঘরেতে পায়চারী করলেন ডাক্তার। কিন্তু শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার কাজ নিয়ে বসলেন নিজের।

দ্বিতীয় দিন লরি স্মিত হাস্যে নমস্কার করে পরিচিত বিষয়ে আলাপের সূত্রপাত করতে চেষ্টা করলেন। ডাক্তার কোনই উত্তর দিলেন না। কিন্তু কথাগুলি যে তাঁর কানে গিয়েছে, মনের মধ্যে এলোমেলো ভাবে তা নিয়ে যে তোলপাড় চলছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হোল। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লরি মিস্ প্রসকে অনেক বার ঘরে ডেকে এনে গল্প করলেন—মাঝে-মাঝে লুসিকে, লুসির বাবাকে নিয়েও নানা কথা হোল। সেই কথার টুকরো মাঝে-মাঝে ডাক্তারের ধ্যান ভগ্ন করছিল—সচকিত হয়ে ডাক্তার তাকাচ্ছিলেন তাদের দিকে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে লরি আবার তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেন—'বাইরে যাবেন?'

—'বাইরে?' পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার।

—'হ্যাঁ। বাইরে বেড়াতে। কেন নয়?'

এইবার লরি কোন উত্তর না পেয়ে বাইরে যাবার ভাণ করলেন, এবং কয়েক ঘণ্টা বাইরে কাটিয়েও ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে ডাক্তার কখন জানলার ধারে সরে এসেছেন—তাকিয়ে দেখছিলেন বাইরের গাছপালার দিকে। লরি ঘরে ঢুকতেই চকিত হয়েই যেন সরে এলেন নিজের আসনে।

সময়ের চাকা যেন অতি শ্লথ পায়ে এগিয়ে চলেছে। তৃতীয় দিনও এল—চলে গেল। দিনে দিনে ন'দিন পার হোল।

দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটতে লাগল লরির। লুসির নিকট হতে সকল ঘটনা এখনো লুকিয়ে রাখা হয়েছে। লুসি সুখেই আছে। এদিকে ডাক্তারের জুতো তৈরীর হাত ক্রমশঃ নিপুণ হয়ে উঠছে। এত নিপুণতা, এত নিবিষ্টতা এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

১৮

সতর্ক সৈনিকের মত অতন্দ্র প্রহরায় এ ক'দিন কাটাচ্ছিলেন লরি। উদ্বিগ্ন রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত শরীরে আজ ভোরের দিকে কখন লরির দুটি চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল দেখলেন সারা ঘর রোদে ভরে গিয়েছে।

চোখ মুছে উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু চোখ চেয়ে যা দেখলেন স্বপ্নের চেয়ে তা অবিশ্বাস্য কম নয়। ডাক্তারের ঘরে গিয়ে দেখলেন জুতো তৈরীর জিনিষপত্তর সব সরান, জানলার কাছে চেয়ারে বসে ডাক্তার অভ্যাস মত বই পড়ছেন। অলক্ষিত থেকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করলেন লরি, দেখলেন ডাক্তারের মুখে-চোখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। সারা চেহারায় আর খুঁত নেই।

এতক্ষণে লরির নিজের বিভ্রম জন্মাল। তবে কি এ ক'দিনের অভিজ্ঞতা সমস্ত দুঃস্বপ্ন? এই তো কিছুক্ষণ মাত্র আগে লরি সতর্ক প্রহরায় বসেছিলেন, যেমন বসে এসেছেন গত কয়েক দিন।

দুঃস্বপ্নই বা হবে কি করে? দুঃস্বপ্ন হলে ডাক্তারের শয়ন-কক্ষের বাইরে সোফায় রাত্রিযাপন করতে যাবেন কেন লরি?

নানা কথা ভাবছেন এমন সময় মিস্ প্রস কাছে এসে দাঁড়াল। সেও ডাক্তারের এই অচিন্ত্য পরিবর্তনের কথা জানাল বিস্মিত কণ্ঠে। শুনে লরির মনের সকল দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটল। কিন্তু ডাক্তারকে এখনও সযত্নে তদারক করতে হবে। আহারের টেবিলে বসার আগে তাঁকে বিরক্ত করবেন না মনস্থ করলেন লরি।

খেতে বসে লরি খুব স্বাভাবিক ভাবেই লুসির বিয়ের কথা পাড়লেন। এমন ভাবে বললেন যেন মাত্র গতকাল বিয়ে হয়েছে। ডাক্তার সে কথায় যোগ দিলেন পরম আগ্রহে, কেবল দিনের গোলমাল নিয়ে তিনি যেন কিছুটা দ্বিধায় পড়েছেন সেটুকু গোপন রইল না লরির কাছে।

তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে পেয়ে লরি ধীরে বললেন—'ডাক্তার ম্যানেট, আমি আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের জন্য অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। আপনি ডাক্তার, সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, আপনিই হয়ত তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লরি বিবৃত করলেন তাঁর কাহিনী ধীরে ধীরে অতি সাবধানে। গত কয়েক দিন ধরে একটা অন্ধকার অতীত যে ভাবে ডাক্তারকে রাহুগ্রস্ত করেছিল, সে কথা লরি উপস্থাপিত করলেন ডাক্তারের কাছেই। শুধু কল্পনা দিয়ে নাম ও বিশ্বাসে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিলেন। বললেন যে, রোগীর একটি কন্যা আছে, সেও নববিবাহিতা। পিতার অসুস্থতায় সে মেয়ে কত বড় দুঃখ পাবে, সে কথাও বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রতিপন্ন করতে কসুর করলেন না।

শুনে কতক্ষণ মৌন-মুখে বসে রইলেন ডাক্তার। তার পর বললেন—'তার একটি মেয়ে আছে বলছিলেন না? সে কি জানে এ সব কথা?'

—'না, সে কথা সম্পূর্ণ গোপন করা হয়েছে মেয়ের কাছ থেকে। এ সংসারে আমি ভিন্ন আর এক জন মাত্র এ কথা জানে, সেও বিশ্বাসী লোক। প্রয়োজন হলে তাঁর মেয়ে সারা জীবনেও সে কথা জানতে পারবে না।'

লরির দুটি করতল সাগ্রহে টেনে নিয়ে ডাক্তার বিগলিত

কণ্ঠে বললেন—'কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো? ভগবান আপনার মঙ্গল করুন মিঃ লরি।'

লরি এইখানেই আলোচনার শেষ করতে চাইলেন না। বললেন—'ডাক্তার, আমি ব্যাঙ্কের মানুষ। টাকা-কড়ির হিসেব-নিকেশ বুঝি। মানুষের মন আমার বুদ্ধির অগোচর। আপনি আমায় উপদেশ দিন। এবার সুস্থ হয়ে ওঠার পর এ রোগের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকবে কি? মানুষটির ভাল-মন্দের জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্ত ভাবিত হয়ে আছি।

ডাক্তার বললেন—'জানেন মিঃ লরি, মানুষের অবচেতন মনের রহস্য মন্থন করা সহজ নয়। বিশেষ করে অতীতের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা যে মানুষের মনের গোপনে নিরন্তর একটা জগদ্দল পাথরের মত ভার হয়ে আছে, সামান্য মাত্র অসাবধানেই তা মনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, মেয়ের মুখ চেয়ে মানুষটি অতীতকে ভুলে গিয়েছিলেন। আবার সেই মেয়ের আসন্ন বিরহে কত দিন ধরে একটা নিঃসঙ্গতার ভীতি তাঁর মনের উপর প্রেতের মত চেপে বসেছিল। সেই প্রেতটার সঙ্গেই লড়াই করছিলেন কিন্তু শেষ অবধি তাকে হার মানতে হোল। জানেন মিঃ লরি, কি দিয়ে যে ভগবান আমাদের মনকে তৈরী করেছেন তা তিনিই জানেন। নইলে এত কষ্ট সহ্য করেও মানুষ বাঁচে! অথচ সুখের দিনে মন কিছুতেই ভুলতে চায় না সে সব পুরোনো কথা। এমন করে বেঁচে থাকার যে কি কষ্ট!'

লরি অনেকক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন—'কিন্তু ভবিষ্যতের কথা আপনি কিছু বললেন না ডাক্তার?'

—'আমি তো খুবই আশাবাদী ডাক্তার। মেঘ যখন ঘন হয়েই কেটে গেছে করুণার বাতাসে, তখন আশা করতে দোষ কি, করুণাময় যখন এত সহজেই তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন?'

—'কিন্তু অতীতের নিদর্শনগুলো কি আর সামনে রাখা ভাল?'

—'না রাখাই বোধ হয় মঙ্গল। ঐগুলোই অতীতের প্রেত।' আরো অনেকক্ষণ দু'জনে গল্প করলেন। আর সেই গল্পে লুসির আলোচনার বিরাম রইল না।

১৭

ক'দিন পরে স্বামীকে নিয়ে লুসি এল বাবার কাছে। সিডনী কার্টন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন তাদের আসার পথ চেয়ে। তারা আসতেই বর-বধূকে তিনি শুভেচ্ছা জানালেন। লুসি দেখলে আচার-আচরণে-চেহারায় মানুষটির কোথাও বদল হয়নি।

একান্ত হওয়া মাত্র ডার্ণেকে কিছু বলতে জানলার ধারে টেনে নিয়ে গেলেন কার্টন, যাতে না কেউ শুনতে পায় তাদের কথা। বললেন—'ডার্ণে, আশা করি আমাদের সম্পর্ক হবে বন্ধুর।'

—'বন্ধুই তো আছি আমরা।'

—'ভদ্রতার খাতিরে এ রকম বলা উচিত মানি, কিন্তু আমি শুধু ভদ্রতার কথাই বলছি না। আমি যখন বন্ধুত্বের কথা বলি, কদাচিৎ সে কথা বোঝাই।'

—'কি বোঝাতে চান তবে?'—স্বাভাবিক স্নিগ্ধতার সঙ্গে প্রশ্ন করে ডার্ণে।

—'যা চাই মনে এলেও মুখে বলা সহজ নয়'—হেসে উত্তর দিলেন কার্টন—'তবুও চেষ্টা করে দেখা যাক। একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ে কি যেদিন আমি একটু অস্বাভাবিক রকম মাতাল হয়ে পড়েছিলাম।'

—'হ্যাঁ, একটি বিশেষ ঘটনার দিন আপনি অত্যধিক সুরা পান করেছিলেন সে কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি।'

—'আমারও মনে আছে। সেই ঘটনার অভিশাপ আমার জীবনে জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে। সব সময় কাঁটার মত খচ্‌খচ করে বেঁধে। যেদিন বাঁচার মেয়াদ আমার ফুরিয়ে আসবে জীবনে একদিন তার হিসেব-নিকেশ শেষ করতেই হবে। ভয় পেয়ো না। আমি উপদেশ দিতে সুরু করব না।'

—'একটুও ভয় পায়নি আমি। আপনার আন্তরিকতা আর যাই করুক, ভীত করে না আমায়।'

কার্টন হাতটাকে উদাসীন ভাবে সরিয়ে নিয়ে বললেন—'সেদিনের সেই মাতাল মুহূর্তে তোমাকে একটুও পছন্দ হয়নি আমার। বরং অসহ্যই মনে হয়েছিল। আশা করি, ভুলে যাবে সেদিনের কথা।'

—'কবে ভুলে গেছি।'

—'আবার সেই মুখের ভদ্রতা! ভুলে যাওয়া অত সহজ নয় আমার কাছে যত, তোমার কাছে। আমি একটুও ভুলিনি সেদিনের কথা। তুমি হাল্কা করে দিতে চাইলেই আমি ভুলে যাব না।'

—'আমার উত্তর যদি হাল্কা মনে হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন আমায়। এই তুচ্ছ ঘটনা যা আপনাকে এত বিব্রত করছে আমি হেসে উড়িয়ে না দিয়ে পারছি না। আমি শপথ করে বলছি, বহু দিন আগেই এ ঘটনা মুছে ফেলেছি মন থেকে। সেদিন আপনি আমার যে মহা উপকার করেছিলেন তার তুলনায় এ কি অতি তুচ্ছ ঘটনা নয়?'

—'তুমি যেটাকে মহা উপকার বলছ, আমি সেটাকে ব্যবসায়ে নিছক হাততালি পাওয়ার কৌশল ছাড়া কিছু মনে করিনি। যাক্, সে সব অতীতের ঘটনা।'

—'সেদিন আপনি আমায় যে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করেছেন আজ এখন হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেও আমি তা নিয়ে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব না।'

—'বেশ ত! আমি আমার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। কি বলছিলাম যেন—বন্ধু হওয়া। জান তো, আমি মানুষের কাম্য সব রকম ভাল ও উচ্চ পদের অযোগ্য। বিশ্বাস না হয় স্ট্রাইভারকে জিজ্ঞেসা করতে পার।'

—'তার সাহায্য ছাড়াই আমি নিজের মতামত গঠন করতে চাই।'

—'যাই হোক, জান তো আমার একটুও নীতিবোধের বালাই নেই। কোন ভাল কাজ আমি করিনি—করবও না।'

—'করবেন না কি না কে বলতে পারে?'

—'এ বিষয়ে আমার কথা চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে পার। যদি এই রকম এক জন সুনামহীন, নির্গুণ লোকের সময় নেই অসময় নেই বাড়ীতে আসা-যাওয়া বরদাস্ত করতে পার, তাহলে আমি এখানে আসা-যাওয়ার বিশেষ অনুমতি চাইব। জীর্ণ অপ্রয়োজনের আসবাবের মত মনে করো আমায়। যাকে অতীতের কাজের

স্বীকৃতি হিসেবেই ঘরে স্থান দেওয়া হয়েছে মাত্র। আশা করি, ঐ সুযোগের অপব্যবহার করব না আমি। করলেও হয়ত বা দু'-এক দিন।

—'চেষ্টা করে দেখবেন নাকি?'

—'অর্থাৎ আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে ধরে নিতে পারি। ধন্যবাদ, ডার্ণে। তোমার নাম নিয়ে কি আমি এ স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারি?'

—'আমার আপত্তি নেই।'

তারা করমর্দন করল। সরে এল জানলার কাছ থেকে। আর এক মুহূর্ত পরে সিডনী কার্টন বাহ্যতঃ নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিলেন।

সিডনী কার্টন চলে যাওয়ার পর মিস্ প্রস, ডাক্তার আর লরির সঙ্গে একটি সান্ধ্য-সম্মিলনীতে ডার্ণে কথা-প্রসঙ্গে কার্টনের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করল। আলোচনা হোল তার উচ্ছৃঙ্খলতা অবিমৃশ্যকারিতা নিয়ে। কার্টনকে অবশ্য নিন্দিত করার কোন অভিপ্রায় ছিল না ডার্ণের।

কিন্তু কার্টন সম্বন্ধে এই রূঢ় সমালোচনা, তার সুন্দরী তরুণী বধূর মনে যে কোন রেখাপাত করতে পারে এ কথা একবারও মনে উদয় হয়নি ডার্ণের। সবাই চলে গেলে ডার্ণে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখল লুসি অপেক্ষা করছে তার জন্য। তার কপালে চিন্তার কুঞ্চন-রেখা।

—'আজ কি ভাবনার রাত নাকি?'

—'তাই বটে।'

—'কি ব্যাপার?'

—'যদি কথা দাও যা জানবে তার অতিরিক্ত কিছু প্রশ্ন করবে না, তো বলি।'

—'আমার প্রিয়াকে কথা দিতে পারব না, এমন কি থাকতে পারে আমার?'

ডার্ণে হাত দিয়ে লুসির কপোল থেকে সোনালী চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিল।

—'আজ কার্টন সম্বন্ধে যা-যা বলেছ তার চেয়ে ঢের বেশী শ্রদ্ধা প্রাপ্য তার।'

—'তাই নাকি?'

—'কেন বল ত?'

—'কেন, সেই কথাটিই জানতে চাইবে না। কিন্তু আমার মনে হয় আমি জানি কেন সে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।'

—'তুমি যদি জেনে থাক তাহলেই যথেষ্ট। তবে আমায় কি করতে বল?'

—'আমার একমাত্র অনুরোধ, তার প্রতি যেন ঔদার্যের অভাব না হয় কখনো! তার অবর্তমানে তার দোষ-অপরাধ লঘু করে দেখবে। আমি বলছি তার মত এত বড় মহৎ অন্তঃকরণ বিরল—সে-অন্তঃকরণের পরিচয় কদাচিৎ পাওয়া যায়। তার হৃদয়ের কোথাও গভীর ব্যথা লুকান আছে। সেই ব্যথার স্থান থেকে রক্ত ঝরতে দেখেছি আমি।'

—'তাকে কোন মতে দুঃখ দেব এ চিন্তা বেদনাদায়ক আমার কাছে'—বিস্ময়াহত কণ্ঠে বললে ডার্ণে—'তার সম্বন্ধে এ-রকম কোন চিন্তা কখনো আসেনি আমার মনে।'

—'ওকে হয়ত আর ফেরান যাবে না। ওর চরিত্র সংশোধন বা ওর ভাগ্যের মোড় ফেরানোর আশা হয়ত সুদূরপরাহত। কিন্তু ঐ মানুষই একদিন সুন্দর কিছু, সত্যিকার মহৎ কিছু করতে পারেন।'

এই হতভাগ্য লোকটির প্রতি বিশ্বাসের পবিত্রতায় এত সুন্দর দেখাচ্ছিল লুসিকে যে, তার দিকে চেয়ে ডার্ণের মনে হোল সে যেন স্বর্গীয় কিছু দেখছে। দেখে আর তৃপ্তি মিটছে না।

স্বামীর আরো কাছে সরে এল লুসি। স্বামীর বুকে হাত রেখে বলল—'আমাদের কত সুখ আর তার কত দুঃখ!'

স্ত্রীর এই মমতা ডার্ণের হৃদয় স্পর্শ করল। বললে—'এ কথা আমি চিরদিন মনে রাখব—মনে রাখব যত দিন বেঁচে থাকব।'

স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিল ডার্ণে।

২০

জীবনে বিধাতার আশীর্বাদ ক্লান্তিহীন ঝরতে থাকে। তার স্বামী, তার বাবা, সে নিজে, মিস্ প্রস সকলকে নিয়ে লুসির জীবন যেন স্বর্ণ-সূত্রে গাঁথা একখানি মণিহার। যখন হাতের কাজ সারা হয়ে যায়, নিঃসঙ্গ সময় পায় লুসি, অতীত-ভবিষ্যৎ তার মনকে দোলা দেয়। কালের পদধ্বনি শুনতে পায় লুসি।

দিন যায়। নতুন অভিজ্ঞতা আসে জীবনে। শরীর ভারী হয়ে মন্থর হয়ে আসে। অল্প পরিশ্রমে আজ-কাল লুসি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক অজানা জগতের আশা-আনন্দ হাতছানি দেয় তাকে। কখনো ভয় হয় যদি সে মরে যায়। ভাবতেই দুটি ডাগর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সে না থাকলে কে দেখবে শিশুর মত অসহায় তার বাবাকে। কে সেবা করবে অমন দেবতার মত স্বামীকে।

তার পর একদিন তার মাতৃস্নেহ একটি কুসুম-কোমল শিশুকন্যাকে ঘিরে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। কন্যা হয় বধূ। বধূ হয় জননী।

লুসি মা হয়।

ছোট ছোট কচি পায়ের ধ্বনি ওঠে সারা বাড়ীতে। শিশুর কল-কল বকুনিতে মুখর হয় লুসির ভুবন।

তার পর বোনের কোলে আর একটি ভাই হয়। লুসির জীবনে মাধুরী কানায় কানায় ভরে উঠতে থাকে। স্বামীর কল্যাণে সংসারের কোথাও অভাব নেই। বাবার শরীর ভাল। আর কি চাইবার রইল লুসির?

কিন্তু ভগবানের ইংগিত বোঝা ভার! একদিন যে স্বর্ণ কুচিটি ভগবান লুসির কোলে দিয়েছিলেন সেই ছেলেটিকে তিনিই একদিন ডাকলেন তাঁর স্বর্ণকুটীতে। মৃত্যুর পাণ্ডুর আলো-লাগা সেই ফুলের মত মুখখানির দিকে চেয়ে লুসি তবু বিধাতার প্রতি অপ্রসন্নচিত্ত হতে পারল না। মনোহর মৃত্যুর রূপে লুসির মাতৃ-হৃদয় একান্ত ভাবে দেবতার চরণে বিলুণ্ঠিত হোল। লুসি দেবতাকেই সমর্পণ করল দেবতার ধন।

আর সেই দিন থেকে লুসির জীবনের শত শব্দ-ঝঙ্কারের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে উঠল তার বাগানের একটি ছোট মৃত্তিকা-স্তূপের নৈঃশব্দ। মায়ের কোলের কাছে বসে মেয়ে যখন আবোল-তাবোল বকুনি বকে যখন পুতুল সাজায়, মায়ের সঙ্গে কথা হয় দুই নগরের ডঙ মিশিয়ে তখনও মা তাকে ভোলে না। ভুলতে পারে না সেই সোনা-

মুখখানি, মাটি যাকে চিরদিনের মত ছিনিয়ে নিয়েছে মায়ের কোল থেকে।

আর বছরে বার ছয়েক এ বাড়ীতে পা দেন সিডনী কার্টন। আসেন নিমন্ত্রণের কোন বালাই না রেখেই। সন্ধ্যা বেলাটুকু এদের পারিবারিক সাহচর্যে কাটিয়ে যান পুরোনো দিনের মতই। আজকাল যখন তাকে দেখতে পায় লুসি, কার্টনের মুখে মদের গন্ধ বা তপ্ততা থাকে না। তিনি এলেই অতীতের থর-থর ভূমিকায় একটা অস্ফুট স্মৃতি লুসির মনকে রোমাঞ্চিত করে। এই মানুষটির জন্ম একদিন তার কুমারী-চিত্ত মমতায় বিগলিত হয়েছিল, তা ভোলেনি লুসি। ভুলতে পারে না। কেমন করে জানে না, সিডনী কার্টন এলেই ছোট মেয়েটি অবধি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। ছেলেটিও কম ভালবাসত না তাকে।

এ সংসারে স্বর্ণ-সূত্রে সিডনী কার্টনও যেন অলক্ষ্যে গ্রথিত হয়ে গেছেন একাত্ম হয়ে।

এমনি করে দিন কাটে। হাসি আনন্দে কলরবে স্মৃতি-বিস্মৃতির দোলায় দোলা-লাগা সংসারে লুসির মেয়ে বছর ছয়েকের ডাগর হয়ে ওঠে।

বাবার মুখের প্রসন্নতাই লুসির যথেষ্ট পুরস্কার। বিবাহিত মেয়ের কাছে এতখানি যত্ন পাবেন এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। সে কথা একদিন নয় অনেক দিন বলেছেন তিনি নিজের মুখে। আর স্বামী! তিনি বলেন—'একলা তুমি আমাদের সকলকে ঘিরে রয়েছ, তুমি কি যাদু জান লুসি?'

সে কথার আর উত্তর দেয় না লুসি।

এমনি সময়ে লুসির অশান্তির কারণ ঘটল। নিজের নিভৃত শান্ত সংসারের শত কলরবের মধ্যে লুসি যেন বাইরের জগতের এক গম্ভীর নির্ঘোষের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। এক রুষ্ট সমুদ্রের গভীর ক্ষোভ যেন গোঁঙাচ্ছে। যেন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে আগ্নেয়গিরির অবরুদ্ধ আক্ষেপ গর্জন করছে ফেটে পড়ার ।

সতেরশ' উননব্বই সালের জুলাই মাসের এক গুমোট সন্ধ্যায় লরি ব্যাঙ্ক থেকে সোজা এলেন এদের বাড়ী। বাইরে ঝড়ের সংকেত। লুসি ও ডার্ণের মাঝখানে বসে লরিও স্বামি-স্ত্রীর সঙ্গে বাইরে তাকিয়ে রইলেন অন্ধকারের দিকে। মনে পড়ল আর একদিন এমনি ঝড়ো হাওয়ার রাতে তিন জনে এমনি করে' বসেছিলেন জানলার ধারে।

—'আজ সারা দিন ব্যাঙ্কে এমন কাজের ভীড় পড়েছিল যে, ভেবেছিলাম হয়ত বা আজ আর কারুর বাড়ী ফেরা হবে না।' বললেন লরি—'প্যারিসে বড় গোলমালের সম্ভাবনা। বহু লোক ভয়ে সব কিছু ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে সরিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছে। টেলসন ব্যাঙ্কের ভাগ্য ভাল। দেশ-বিদেশে তার সুনামের অভাব নেই। ডাক্তার কোথায়?'

—'এই তাঁর আবির্ভাব হোল'—বলে ডাক্তার স্বয়ং হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন।

—'বাড়ীতেই আছেন দেখে স্বস্তি পেলাম। আজ সারা দিন এমন উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে যে, বিনা কারণেই মনটা মদির হয়ে আছে। বাইরে যাচ্ছেন?'

—'না, না, গল্প করব আপনার সঙ্গে।'

—'সেই ভাল'—বললেন লরি—'কি জানি কেন আজ সারা দিন মন উতলা হয়ে আছে। বাড়ীতে কোন ঝঞ্ঝাট নেই তো মা লুসি?'

—'না'—

—'মেয়ে বুঝি ঘুমুচ্ছে।'

—'হ্যাঁ। অকাতরে ঘুমুচ্ছে।'

—সেই ভাল। সব নিরাপদ। সব অকাতর। এই রকমই ভাল। নাই বা হবে কেন বল? চা নিয়ে এসেছ, দাও মা। বসো এইখানে আমাদের সঙ্গে। দু'দণ্ড গল্প করি।'

লণ্ডনের ঝোড়ো আকাশের শব্দময় প্রতিধ্বনির মধ্যে প্যারিসের শত পদধ্বনি উদ্দাম বাজতে থাকে। দুই নগরের ঐক্যতান সুরু হয়।

কোথা দিয়ে কি হয় কেউ বলতে পারে না। একটা অন্ধকার অরণ্যে দাবানল জ্বলে ওঠে। তার পর রিক্ত শাখারা যেন শাণিত তরবারির মত আকাশ বিদ্ধ করতে চায়।

কে এত অস্ত্র জোগাচ্ছে জনতার হাতে? এত বোমা বারুদ, এত ছুরি কৃপাণ বর্শা? এত কাঠের লোহার ডাণ্ডা? যে অস্ত্র পেল না সেও রক্ত-মাখা হাতে দেয়াল ভেঙে ইট-পাথর খসিয়ে নিলে।

হত্যার নেশায় উন্মত্ত জনতা আচম্বিত ঝড়ের মত ফেটে পড়ল সারা প্যারিসে। কোন পথ আর অবারণ রইল না। মাটির গর্জন আছড়ে পড়তে লাগল আকাশে। মৃত্যুর খেলায় দান ফেলতে গিয়ে প্রাণবলি দিতে কেউ নারাজ রইল না।

ঢেউ যেমন একটি জলবিন্দুকে ঘিরে ঘুরতে থাকে ফেনিল আবর্তে, তেমনি ডফর্জের মদের দোকানে একটি লোককে ঘিরে এই জন-ঘূর্ণি পাক খেতে লাগল অবিরত। তার সারা গায়ে বারুদের গন্ধ! ঘামে-ভেজা শরীর। কাউকে ঠেলে, কারুর হাতে হাতিয়ার দিয়ে, কাউকে হুকুম করে, বকে, চেঁচিয়ে মানুষটা যেন একাই সর্বময়।

—'তোমরা দু'জন এগিয়ে যাও। এক-একটা দল নিয়ে এগোও। মাদাম কোথায়?'

—'আমি ঠিক আছি।' স্ত্রীর গলা পেয়ে ডফর্জ ফিরে তাকালে। আজ আর সে নিঃশব্দ রমণীর হাতে বোনার কাঠি নেই। একটি ভারী কুঠার তার দৃঢ় হাতে, কোমরে পিস্তল আর ছোরা।

—'তুমি কোথায় যাবে?'

—'যাবো। এখন যাব তোমাদের সঙ্গে।' তার পর মেয়েরা বেরোলে তাদের আগে আগে।

—'তবে আর বিলম্ব কেন?' সিংহের মত গর্জন করে ওঠে ডফর্জ—'বন্ধুগণ, তবে আর বিলম্ব কিসের। চলো ব্যাস্টিল—'

ঐ একটি কুখ্যাত কথার উচ্চারণ মাত্রেই সারা ফ্রান্স যেন গর্জন করে উঠল—'ভাঙো ব্যাস্টিল।'

কেল্লা-কারাগার ব্যাস্টিল। তার চার পাশে গভীর গড়। দুটো টানা সাঁকো। পাথরের মোটা দেয়াল, আটটা বিরাট টাওয়ার। আর সেই দুর্গের অন্তরাল থেকে গোলা-বারুদের অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

তবু গড় পেরিয়ে গোলা-বারুদের ধূম্রজাল বিদীর্ণ করে গর্জনে

গর্জনে এগিয়ে চলল জনস্রোত। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অবলীলাক্রমে মাড়িয়ে দিয়ে গেল মৃত্যুকে।

কোথা দিয়ে কি হচ্ছে কে জানে? শুধু এক তরঙ্গ আছড়ে পড়ার পর আর এক তরঙ্গ দ্বিগুণ বেগে আছড়ে পড়ছে। অবিশ্রান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে এক সময় পাথর ফাটল। ভিতরের কারা যেন শাদা পতাকা তুলে কি সংকেত করলে।

—'বন্ধুগণ—ব্যাষ্টিল।' তার পর আর কিছু শোনা গেল না। কেবল প্রলয়-পয়োধি জলে দিগ্‌দিগন্ত আলোড়িত হতে লাগল।

টানা সাঁকো পেরিয়ে গুফর্ত যখন দুর্গের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল তার বুকে হাঁফ লেগে গেছে। নিঃশব্দে একবার তাকিয়ে দেখলে সে চারি পাশে। শত-সহস্র হাতিয়ার তাকে ঘিরে জমায়েত হয়েছে ইতিমধ্যে। মাদামও আছে সে দলে।

ব্যাষ্টিল দখল করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করা সুরু হোল। বিদ্রোহীদের ভয়ে ত্রস্ত প্রহরীরা সমস্ত দরজা দরাজ করে খুলে দিলে। আর সেই বিরাট প্রাসাদের শত শাখা পল্লবিত ছোট ছোট অন্ধকার গলিপথ বেয়ে জনতা জলস্রোতের মত চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মুক্ত কয়েদীদের জয়োল্লাসের সঙ্গে জনতার হুঙ্কার বজ্রনাদের মত বাজতে লাগল আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে, অত্যাচারীদের বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে।

ব্যাষ্টিলের গভর্ণরকে ধরে নিয়ে এল এক দল। এই শয়তানটার হুকুমে কত দিন ধরে, অসহ্য নির্যাতন সয়েছে হাজার হাজার লোক। এই একটু আগেই এর আদেশে হাজার হাজার লোক গোলা-বারুদের মুখে প্রাণ দিয়েছে। তাদের মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে বাইরে। মানুষটার হাতে অনেক দিন ধরে নিরীহ অনাহারী লোকের খুন লেগেছিল। এখনও তার হাত সদ্য খুনে রাঙা। তবুও এই মানুষটার প্রাণের দাম তোল এত দিনে। একে না মারতে পারলে সারা ফ্রান্সের ক্ষুধা আর নির্যাতন শান্তি পাবে না। গুফর্তের নেতৃত্বে এক দল লোক গভর্ণরকে হোটেল অবধি নিয়ে এল। সেখানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সামনে পিছনে চারি দিক থেকে শয়তানটার সর্বাঙ্গে ঘা পড়তে লাগল। লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত দেহে।

অত্যাচারের প্রথম জয়ধ্বজা মাটিতে পড়তেই জনতা পৈশাচিক উল্লাসে নাচতে লাগল। সেই মরা মানুষটার গলায় পা দিয়ে মাদাম তার মাথাটা কেটে নিলে শান্ত ভাবে।

তার পর সারা প্যারিসে ছড়িয়ে পড়ল তারা।

মদের দোকানের সামনে একদিন যে তরল রক্তস্রোত বইল, তার রঙ লাগল যাদের হাতে, রঙ লাগল যাদের মনে, মদের রঙের মত আর তা ধুয়ে-মুছে নিলে না তারা। বিদ্রোহের পদপাতে ফ্রান্সের মাটি প্রতিধ্বনি পাঠাল আকাশে।

সমুদ্রের ওপারে আর একটি নগরে চারটি প্রাণীর নিভৃত শান্ত সংসারের সুখে কোথাও ছেদ ছিল না। তবু অজানা ভয়ে লুসির বুক কাঁপে। দূর এক নগরের অশান্ত কলরব তার বুকে প্রতিধ্বনি পাঠায়। প্রিয় মানুষগুলিকে আঁকড়ে ধরে লুসি আরো নিবিড় মমতায়।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

অজন্তা গুহায় বাঙালীর চিত্র?

অজন্তা গুহার প্রাচীর-গাত্রে বাঙালীর চিত্র আছে।

কথাটি হয়তো অনেক বাঙালীর কানেই অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু বিশ্বাস না হয় অজন্তা গুহায় যে কেউ দেখতে পারেন। ঐ চিত্রের প্রতিলিপিও প্রকাশিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র দেশের পূর্ব্ব-প্রান্তে অবস্থিত অজন্তার গিরিগহ্বরে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী বা তৎপরে অঙ্কিত সিংহলবিজয় চিত্র আজও পৃথিবীর মানুষের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। চিত্রটি দেখলেই দেখা যায়, বৃহৎ শ্বেতহস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে ধনুর্ব্বাণসহ সিংহলের রাজা বা প্রধান সেনাপতি যুদ্ধে আসছেন। দু'জন বীর দু'টি হস্তীতে, যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের মাথায় ছত্র শোভা পাচ্ছে। কতকগুলি পদাতিক—কেউ মুক্ত তরবারি, কেউ বা উন্নত ভল্ল নিয়ে বীরদর্পে সিংহদ্বারের বাইরে আসছে। হস্তিপকগণ অচল, স্থির; অঙ্কুশ তাড়নে হস্তিসমূহকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালিত করছে। হাওদার পাশে সুতীক্ষ্ণ তীরগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে সুসজ্জিত। সৈনিকগণ সুদীর্ঘ অঙ্গরক্ষায় সুশোভিত। অঙ্গরক্ষা বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত নয়, স্কন্ধদেশ পর্য্যন্তই আবৃত করেছে। কটিতটের কোমরবন্ধ তরঙ্গে তরঙ্গে অধোদিকে বিলম্বিত। চার জন অশ্বারোহী তেজোদৃপ্ত অশ্বের ওপর বীরের মত অধিষ্ঠিত।

চিত্রের দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি রণহস্তী সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। একটি সুবৃহৎ তরণীতে যোদ্ধগণ সহ কয়েকটি হস্তী যুদ্ধে ব্যাপৃত রয়েছে এবং সোল্লাসে শুঁড় আস্ফালন করছে। তাদের গলঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাণে বাণে গগন আচ্ছন্ন হয়েছে—উৎক্ষিপ্ত বর্শাফলক বাঙালী সৈন্যের রক্ত-পানের জন্য লঙ্কা-সৈন্যের হাতে কম্পমান।

এই চিত্র বীর বাঙালীর বাহুবলের চিত্র। মরণ-যজ্ঞের মুক্তবেদীর ওপর জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠার আলেখ্য।

ভলগা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(প্রবাহন উপাখ্যানের শেষাংশ)

লোপা জবাবে বলল—"পুরাতন দেবদেবীরাই ত যথেষ্ট ছিলেন, নবরূপে তোমার এই দেবতা সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল ?"

প্রবাহন বলল—"বহু পুরুষ গত হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ ইন্দ্র, বরুণ বা ব্রহ্মা কোন্ দেবতাকেই চোখে দেখেনি, তাই মানুষের মনে সন্দেহের শিকড় জন্মাতে সুরু করেছে।"

"তারা কি তোমার এই দেবতাকেও সন্দেহ করবে না ?"

"আমি তাঁকে এমন ভাবে বর্ণনা করেছি যাতে করে তাঁকে দৃশ্যমান হবার কথা কেউ কল্পনাও করবে না। স্বর্গলোক ভিন্ন যাঁর শারীরিক কোন অস্তিত্ব থাকবে না—যিনি সর্বভূতে বিরাজমান তাঁকে চোখে দেখার প্রশ্নই বা মানুষের মনে উঠবে কি করে ? পৌরাণিক অর্দ্ধমানব দেবতাদের সম্পর্কেই শুধু ঐ ধরণের প্রশ্ন উঠতে পারে।"

"স্বর্গ সম্পর্কে তোমার এই সব প্রচারণা শুধু প্রজাবর্গকেই বিভ্রান্ত করেনি—উদ্দালক বা আরুণির মত ব্রাহ্মণদেরও করেছে। মানুষের চোখে ধুলো দেবার জন্যেই কি শুধু তুমি এ সবের সৃষ্টি করেছ ?"

"তুমি ত আমাকে চেনো লোপা, তোমার কাছে আমি কোন কিছু লুকোতে পারি না। আমাদের হাতে ক্ষমতা রাখবার জন্য আজ তাদের সেই ন্যায়দর্শনকে রুখতে হবে যারা সন্দেহ সৃষ্টি করছে, কারণ আজ আমাদের সব থেকে ভয়ানক শত্রু হচ্ছে তারাই যারা দেবতা বা তাদের পূজা সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করছে।"

"কিন্তু তুমি যখন প্রচার করছ তখন তোমার দেবতারও আকৃতি বা প্রকাশ সম্পর্কেও ত তুমি বলছ।"

"আকৃতি থাকলেই ত তাকে অনুভব করবার প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতির কথা আমি বলব না, কারণ তাহলে ত অবিশ্বাসীরা আবার তাঁকে দেখতে চাইবে। যা আমি তাদের বলছি তা হচ্ছে এই যে—অন্য আর একটি নিগূঢ় অনুভূতি আছে—যার সাহায্যেই মাত্র এই দেবতার অস্তিত্ব অনুধাবন করা যায় এবং সেই অনুভূতি সৃষ্টির এমন কতকগুলো সর্ত ও সূত্র আমি নির্দ্ধারণ করে দিচ্ছি যার অনুসন্ধানে বহু পুরুষ ধরে মানুষকে অন্ধের মত ঘুরতে হবে—কোন দিন এই ভগবৎ-বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে তারা পারবে না। আমি এই সূক্ষ্ম অস্ত্র সৃষ্টি করেছি—কারণ পুরোহিতদের স্থূল অস্ত্র আজ ক্রমশঃ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। বন্য মানুষেরা পূর্বে পাথর বা তামার অস্ত্র ব্যবহার করত—তুমি ত দেখেছো, লোপা।"

"হ্যাঁ, আমরা দক্ষিণারণ্যে যখন যুগলে ভ্রমণ করেছিলাম তখন দেখেছি।"

"হ্যাঁ, যমুনার ওপারেই আমরা দেখেছি। আচ্ছা, সেই পাথর বা তামার হাতিয়ার আমাদের বিশুদ্ধ লোহার তৈরী হাতিয়ারের কাছে টিকতে পারে ?"

"না।"

"ঠিক তেমনি, অতীতে যে সমস্ত দেবতা বা পূজার কথা বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্র শিখিয়েছিলেন, তা ঐ বন্য মানুষদেরই সন্তুষ্ট রাখতে পারত —কিন্তু আজকের দিনের বুদ্ধিমান সংশয়বাদীদের তীক্ষ্ণ যুক্তিজালের সামনে সেগুলো অকেজো হয়ে গেছে।"

"তোমার এই দেবতাও একই ভাবে অকেজো প্রমাণিত হবে। তুমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাচ্ছ এবং তাদের তোমার মতবাদ শেখাতে যাচ্ছ, আর আমি তোমার এই আশ্রয়ে থেকেই বুঝতে পারছি যে তোমার সমস্ত যুক্তিই মিথ্যা ও জুয়াচুরী।"

"সে ঠিক, কারণ তুমি এর পেছনের গূঢ় তথ্যটা সব জানো।"

"ব্রাহ্মণরা যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তারা কি গূঢ় অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করবে না ?"

"তাও তুমি বুঝতে পারছ। তাদের কেউ কেউ হয়ত গোপন মতলবটা ধরতে পারছে—কিন্তু তারা এ-ও জানে যে, আমার এই অস্ত্র তাদের খুবই উপকারে আসবে। তাদের পৌরোহিত্যে এবং তাদের দীক্ষায় মানুষ ক্রমেই আস্থা হারিয়ে ফেলছিল—যার পরিণতি হত এই যে, যে সব দান-ধ্যানের মাধ্যমে তারা আরোহণের জন্য অশ্ব, [illegible] সুখাদ্য বা বাসের জন্য সুন্দর গৃহ অথবা উপভোগের জন্য সুন্দর দাস-দাসী পেত সে সমস্তই বন্ধ হয়ে যেত।"

"তাহলে এর সবটাই হচ্ছে অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবসায় ?"

"হ্যাঁ, এবং অর্থোপার্জ্জনের এ এমন একটি পথ যেখানে লোকসানের ভয় নেই। তার জন্যেই উদ্দালকের মত চতুর ব্রাহ্মণের আমার নিকট আসছেন শিষ্যত্বের জন্য—তাঁদের পুণ্য সমিধ আহরণ করে নিয়ে, আর আমিও ব্রাহ্মণদের প্রতি অগাধ ভক্তি দেখাচ্ছি এবং উপবীত ধারণ বা উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে কোন শিক্ষা না দিয়ে তাঁদের আমার ঈশ্বরতত্ত্ব আমি দান করছি।"

"এটা ত একটা কুটিল চক্রান্ত, প্রবাহন !"

"স্বীকার করছি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে এতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়েছে। যে যান বশিষ্ঠ বা বিশ্বমিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তা হাজার বছরও টেকেনি, কিন্তু যে যান আমি তৈরী করছি তাতে করে রাজা-মহারাজারা বা যাঁরা অন্যের উপার্জ্জনের উপরেই জীবন গড়ে তোলেন তাঁরা আরও দু'হাজার বছর নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারবেন। আমি বুঝেছিলাম যে, পূজা বা বলিদান পদ্ধতির এই পুরাতন যান দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার জন্যেই এই শক্তিশালী ও নবযান তার স্থানে আমি সৃষ্টি করেছি। এই যানে বুদ্ধিমানের মত চলতে পারলে পুরোহিত বা ক্ষত্রিয়রা সমভাবেই ক্ষমতা ও ধনোপভোগ করতে পারবে। কিন্তু আমার এই নূতন স্বর্গ, দেবতা ছাড়াও আরও একটি প্রত্যাদেশ আমি দিয়ে যাবো।"

"কি সেটি ?"

"মৃত্যুর পরেও পুনরাগমন—পুনর্জন্ম।"

"সব থেকে বড় প্রতারণা।"

"কিন্তু সব থেকে বেশী কার্য্যকরী। যে পরিমাণে আমরা রাজা মহারাজা পুরোহিত ও বণিকেরা সীমাহীন স্ফূর্তির উপকরণ জমিয়ে তুলেছি—ঠিক সেই পরিমাণে সাধারণ মানুষেরা দীন থেকে দীনতর হয়েছে। কিছু কিছু লোক ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে যারা গরীব মানুষদের অর্থাৎ কারিগর, কৃষক, দাস প্রভৃতিদের এই বলে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছে যে—'তোমাদের উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পদ তোমরা অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছ—সমস্ত ভার তোমরা নিজেরা বহন করে চলছ। তোমাদের চোখে ধূলো দিয়ে অন্যেরা এই মিথ্যা আশা তোমাদের দেখায় যে—তোমাদের দুঃখ, বলিদান ও এই সব অবদানের পরিবর্তে মৃত্যুর পর তোমরা স্বর্গে যেতে পারবে। মৃতাত্মাদের সেই স্বর্গ কিন্তু কেউ চোখে দেখেনি।'—তাদের এই প্রচারণার জবাবে আমি বলছি যে, এই পৃথিবীতে উচ্চ-নীচ, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণে, ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য তা সবই মানুষের পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল। এই পূর্বজন্মের সৎ-অসৎ কার্য্যের ফলই আমরা ভোগ করি।"

"তাহলে একজন চোর চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা ধন আহরণ করে একথাও বলতে পারে যে, এই ধনও তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের পুরস্কার ?"

"না, তার সম্পর্কে ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যেই ঈশ্বর, মুনি ঋষি এবং রাজাদের দোহাই আমরা দিতে পারি, যাতে কারো চুরির ধন পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের পুরস্কার বলে চালানো চলবে না। আমাদের পিতামহের ধন উপভোগের ব্যাখ্যা আমরা করতাম ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে, কিন্তু এখন যখন ঈশ্বর বা তাঁর অনুগ্রহ সম্পর্কেই সন্দেহ সৃষ্টি হতে সুরু করেছে, তখন অন্য কোন সুযুক্তির সন্ধান আমাদের করতে হবে। আমাদের ব্রাহ্মণরা কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছে না, জীবনের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর তারা কাটায় স্তোত্র পাঠ মন্ত্রজপ কথা মুখস্থ করতে করতেই—নূতন বা মূল্যবান কোন মতবাদ তারা আবিষ্কার করবে কি করে ?"

"শুনেছি প্রবাহন ! একই ধরণের বিদ্যাভ্যাসে অনেক কাল কাটিয়ে এসেছ।"

"মাত্র ষোল বছর। চব্বিশ বছর বয়সে পুরোহিতদের শিক্ষায়তন ছেড়ে আমি বাইরের জগতে বেরিয়ে এসেছি। বাইরে এসে আমাকে অনেক বেশী কিছু শিখতে হয়েছে। শাসন-কার্য্যের জটিলতার মধ্যে ঢুকে আমি দেখলাম যে, যে যান পুরোহিতেরা সৃষ্টি করেছিল তা আর বর্তমান সময়-সমুদ্রের ঘাতসহ নয়।"

"তাই তুমি তোমার স্বকীয় শক্ত জল যান তৈরী করেছ ?"

"সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই—আমার ভাবনা হচ্ছে প্রয়োজন মেটাবার পন্থা আবিষ্কারে। পুনর্জন্মবাদ আজ নূতন বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু এর পিছনে যে স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। কিন্তু আমার ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা ইতিমধ্যেই এটা পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ব্যাপক প্রচারও সুরু করেছে। ঈশ্বর বা দৈবশক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য লোকে এখনও বারো বছর ধরেও বিদ্যাভ্যাস করতে এবং গুরুদের গরু চরাতে প্রস্তুত। লোপা, তুমি কিংবা আমি হয়ত দেখতে পাবো না—কিন্তু এমন দিন আসবে যখন গরীব ও দুঃখী সমস্ত মানুষ জীবনের সমস্ত গ্লানি, বেদনা ও অবিচার সহ্য করতে রাজী হবে শুধু মাত্র পুনর্জন্মের আশায়। তাহলে লোপা, আমি কি স্বর্গ-নরকের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ততম সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হইনি ?"

"কিন্তু তোমার নিজের পেট ভরাবার জন্য তুমি যে শত শত মানুষকে জাহান্নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করছ ?"

"পেটের জন্যেই ত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদ রচনা করেছিলেন। উত্তর-পাঞ্চালের রাজা দিবোদাস যখন অনার্য্যদের কয়েকটা ঘাঁটি দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখন তাঁর প্রশংসায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র গাথার পর গাথা রচনা করেছিলেন। নিজের পেটের চিন্তা করা কিছু অন্যায় কথা নয়, আর যখন আমরা শুধু নিজের জন্যে নয়—পুত্র-পৌত্রাদি ভাই-বন্ধুদের জন্য সে কাজ করি তখন আমরা অবিনশ্বর গৌরব অর্জন করি। (ঋক্‌বেদ) ৬।১৬।৫, প্রবাহন আজ যে কাজ করছে তা পুরাকালের মুনি-ঋষিদের বা যে সমস্ত পুরোহিত ধর্ম কর্মে সারাজীবন কাটায় তাদের ক্ষমতায় কুলায়নি।"

"তুমি এত নির্মম প্রবাহন ?"

"আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি মাত্র।"

৩

প্রবাহন গত হয়েছিল—কিন্তু ঈশ্বর, পুনর্জন্ম এবং আত্মার সদ্‌গতি সম্পর্কে তার মতবাদ ছড়িয়ে পড়ছিল সিন্ধুনদ থেকে সুরু করে গঙ্গার ওপার পর্য্যন্ত। বলিদান প্রথা তখনও অপ্রচলিত হয়নি—পুরোহিতেরা এই সব নিষ্পন্ন করতে বিশেষ উৎসাহই পোষণ করত। তবু পুরোহিতেরা প্রবাহন-প্রবর্তিত মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুশীলন করছিল—যদিও প্রবাহন ছিল ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত। কুরুবংশের যাজ্ঞবল্ক্য এই মতবাদ সম্বন্ধে থেকে সুনামের সাথে বপন করেছিলেন। যে কুরু-পাঞ্চাল দেশ এক সময়ে ঋষিদের জন্ম দিয়েছিল, যে ঋষিরা পবিত্র শ্লোক এবং পুরাকালীন রীতি-নীতি রচনা করেছিলেন, সেই দেশ এখন যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁর শিষ্যদের সুনামে ভরে গিয়েছিল। এই সব নূতন পণ্ডিতদের সভা ডেকেই এখন বলিদান প্রভৃতি থেকে বেশী সুনাম অর্জন করা যেত—তাই রাজারা তাদের রাজকীয় উৎসবের সাথে কিংবা অন্য সময়েও এই ধরণের সাড়ম্বর অনুষ্ঠান করত এবং সেখানে সব থেকে শক্তিশালী বক্তাদের হাজার হাজার গরু-ঘোড়া প্রভৃতি এবং দাসকন্যা ধর্ম-কর্মের ফল দান করা হত। সর্বোপরি তরুণী দান, কারণ এই সব পণ্ডিতদিগকে রাজ-অন্তঃপুর শোভিত করাদের উপভোগ করতে সব থেকে বেশী আগ্রহী দেখা যেত।

যাজ্ঞবল্ক্য এই ধরণের বহু সভাতে ও তর্কের আসরে জয় অর্জন করেছিলেন। সত্য সেই সময় বিদেহের জনক রাজার দ্বারা আয়োজিত এক তর্ক-সভায় তিনি জয়লাভ করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্য সোমশ্রবা সহস্র গাভী পুরস্কার নিয়ে হাজির হলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মূল্যবান সময় এই গোরুর পাল তিরহুত থেকে কুরুপ্রদেশের দীর্ঘপথ তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যয় করা সম্ভব ছিল না। তার জন্যে তিনি এই গোরুর পাল স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন, ফলে তাদের মধ্যে তাঁর সুনাম আরও ব্যাপক

হয়ে উঠল। আর সোনা-রূপা, দাসবাহিনী এবং অশ্বেতর শকট-সমূহ তিনি বজরায় ভর্ত্তি করে দেশে নিয়ে গেলেন।

প্রবাহনের মৃত্যুর পর ৬০ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের জন্মের পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছিল। শত বর্ষেরও বেশী বয়সী লোপা তখনও পাঞ্চাল-রাজপুরীর উদ্যানে বাস করত। সেই উদ্যানের আম, কলা ও ডুমুর গাছের ছায়ায় বাস করতে তার খুব ভালো লাগত। প্রবাহনের জীবনকালেই সে তার মতবাদের বিরোধিতা করতে সুরু করেছিল। আর তার পর দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে সে তার দোষগুলো ভুলে গিয়েছিল আর স্মরণে রেখেছিল তার আজীবনের প্রেম। এই বৃদ্ধ বয়সেও লোপার চোখের দৃষ্টি প্রখর ছিল, চিন্তাশক্তিও তার খুব কমই অপরিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্র-প্রচারকদের সম্পর্কে তার বীতশ্রদ্ধা ছিল এখনও প্রবল।

একদিন তর্কশাস্ত্রে পারদর্শিনী গার্গী নামে এক মহিলা এলো ঐ নগরে। রাজকীয় প্রমোদ উদ্যানের পাশে এক আবাসে তাকে সসম্মানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। রাজা জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য যে অসৎ উপায়ে তাকে বিপর্য্যস্ত করেছিল সেই চিন্তা সে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছিল না। "আরও যদি তুমি তর্ক করো তাহলে তোমার মাথা ধূলায় গড়াগড়ি যাবে"—এই কি তর্কের পদ্ধতি? ঘাতকেরাই ত শুধু এই ভাবে কথা বলতে পারে, ভাবল গার্গী।

পিতৃবংশের দিক দিয়ে লোপা ছিল গার্গীর স্বজন এবং গার্গীর তার সাথে যথেষ্ট পরিচয়ও ছিল, যদিও ধর্ম বিষয়ে তাদের তীব্র মত-পার্থক্য ছিল। যে অসৎ পন্থা তার বিরুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্য প্রয়োগ করেছিল সেই কথা ভেবে বিক্ষোভে সে জ্বলে যাচ্ছিল। তাই এখন এক পরিবর্তিত মনোভাব নিয়ে এই বৃদ্ধ প্রপিতামহীর সাথে সে সাক্ষাৎ করতে গেল। সে পৌছুলেই লোপা তার ললাট ও চক্ষু চুম্বন করে তাকে আলিঙ্গন করে তার কুশল প্রশ্ন করে তাকে অভ্যর্থনা করল।

গার্গী জবাবে বলল—"আমি ঠাকুরমা, এখন তিরহুত থেকে আসছি।"

"তুমি বাছা সেখানে গিয়েছিলে তর্কযুদ্ধ করতে?"

"তুমি তাকে যুদ্ধ বলতে পারো। এই ধর্মীয় তর্ক-সভা যুদ্ধ থেকে পৃথক কিছু নয়। কুস্তিগীরদের মত সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীরা নানা কূট-কৌশল খুঁজতে থাকে কি ভাবে অন্যকে পরাস্ত করা যায়।"

"সেই তর্কযুদ্ধে কুরু-পাঞ্চালের অনেক নৈয়ায়িক কি অংশ নিয়েছিলেন?"

"কুরু-পাঞ্চাল আজ-কাল তাঁদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।"

"আমার চোখের সামনেই আমার স্বামী প্রবাহন এই নব্য মতবাদের স্ফুলিঙ্গ জ্বেলেছিলেন—কোন সৎ মতলবও তাঁর ছিল না—দাবানলের মত সেই মতবাদ আজ সারা কুরু-পাঞ্চালে ছড়িয়ে পড়েছে, তিরহুত পর্য্যন্ত গিয়েও এখন তা পৌচেছে।"

"হ্যা ঠাকুরমা, তুমি যা বলতে তার সত্যতা সম্পর্কে কিছুটা বিশ্বাস করতে সুরু করেছি। এ কথা ঠিক যে, ধর্ম হচ্ছে সম্পদ-সংগ্রহের এক সুন্দর পন্থা। যাজ্ঞবল্ক্য তিরহুতে প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেছে, অন্যান্য ব্রাহ্মণরাও যথেষ্ট লাভবান হয়েছে।"

"অতীত কালের বলিদান-প্রথার থেকেও এই নয়া পথ ভাল লাভজনক ব্যবসায়। আমার স্বামী বলতেন যে—এটি হচ্ছে খুব মজবুত যান—এতে করে রাজা এবং পুরোহিতেরা অনেক ধন-সম্পদ লাভ করবেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাহলে জনক রাজার তর্ক-সভায় জয়ী হয়েছে? তুমি সেখানে তর্কে যোগ দিয়েছিলে?"

"আমি তর্কে যোগ না দিলে গঙ্গা নদী বেয়ে অত দূরে আমি যাবো কি করতে?"

"কোন দস্যু তোমার নৌকা আক্রমণ করেনি ত?"

"না ঠাকুরমা; বণিকেরা দলবদ্ধ ভাবে যাতায়াত করে—সংগে ফৌজের পাহারাও থাকে। আমরা ধর্ম্মপ্রচারকেরা এত বোকা নই যে, একা বা দু'জনে যাতায়াত করে জীবন বিপন্ন করব।"

"যাজ্ঞবল্ক্য তাহলে তোমাদের সবাইকেই পরাজিত করেছে?"

"শুধু পরাজিত করেছে? তার থেকে বেশী কিছুও করেছে!"

"তার মানে কি?"

"যাঁরাই প্রশ্ন করেছিলেন তাঁরাই তার জবাব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছেন।"

"তুমিও?"

"হ্যাঁ, আমিও। তার পাণ্ডিত্যে নয়, তার মূর্খতায় আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি।"

"মূর্খতায়?"

"আমি দেবতা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করছিলাম এবং তাকে আমি এমন বেকায়দায় ফেলেছিলাম যে, তার বেরোবার পথ ছিল না। তখন সে এমন জবাব দিল যা কি না আমি কোন দিন ধারণাই করিনি।"

"কি সে জবাব, বাছা?"

"সে এমন কথা যে, তা শুনে আমার প্রশ্নের জবাব জিজ্ঞাসা করতে আমি পারলাম না—তা হচ্ছে এই যে—"গার্গী, আর যদি তুমি তর্ক করো তাহলে তোমার মাথা ধূলোতে গড়াগড়ি যাবে।"

"এই রকম জবাব তুমি কোন দিন প্রত্যাশা করোনি? আমি কিন্তু গার্গী এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত মনে করতাম না। যাজ্ঞবল্ক্য প্রবাহনের খাঁটি শিষ্য হয়ে উঠেছে। প্রবাহনের মিথ্যাবাদিতাকে সে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে। এটা ভালো হয়েছে যে তুমি তর্ক বাড়াওনি।"

"তুমি কি করে জানলে ঠাকুরমা যে, আমি তর্ক বাড়াইনি।"

"বুঝলাম এই দেখে যে, তোমার কাঁধের উপর মাথাটা আস্ত আছে।"

"তাহলে তুমি বিশ্বাস করো যে, আমি আর অগ্রসর হলে আমার জীবনহানি ঘটত?"

"নিশ্চয়ই। যাজ্ঞবল্ক্যর ঈশ্বরের শক্তিতে নয়—সাধারণ যে ভাবে অন্যদের জীবনহানি হতে আমরা দেখি, সেই ভাবেই।"

"সত্যি বলছ ঠাকুরমা? না, না।"

"তুমি আজও বালিকা, গার্গী! তুমি বোধ হয় ভাবো যে, এই ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ জ্ঞানচর্চা বা কথার মারপ্যাচ ভিন্ন কিছু নয়। না গার্গী, রাজা এবং পুরোহিতের গোপন স্বার্থপরতা এর মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে। এই মতবাদ যখন তৈরী হয় তখন এর সৃষ্টিকর্তা আমারই বাহু-আলিঙ্গনে নিদ্রা যেতেন। রাজা এবং পুরোহিতদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার এটি একটি হাতিয়ার মাত্র, ইস্পাতের ধারালো তরবারির মত হাতিয়ার, রক্তলোভী সেনাবাহিনীর মত এই হাতিয়ার।"

"এমন কথা আমি কখনও ভাবিনি ঠাকুরমা!"

"অনেকেই এটা বোঝে না। আমিও বুঝিনি, তিরহুতের রাজা জনকও বোঝেননি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ঠিকই বোঝে যেমন বুঝতেন আমার স্বামী প্রবাহন। কোন ঈশ্বর, স্বর্গ, দৈবশক্তি বা উপদেবতায় প্রবাহনের বিশ্বাস ছিল না। তিনি শুধু বুঝতেন স্ফূর্তি—তাঁর জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি স্ফূর্তির জন্ত ব্যয় করেছেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন আগে বিশ্বমিত্রের বংশের এক পুরোহিত-কন্যা এক স্বর্ণকেশিনী যুবতীকে তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে আসেন—তাঁর জীবনের কোন আশাই ছিল না, তবু তিনি এক বিংশবর্ষীয়া যুবতীর সাথে প্রেমের মোহড়া দিচ্ছিলেন।"

"যাজ্ঞবল্ক্য তার গোরুগুলোকে বিলিয়ে দিয়ে এসেছে, কিন্তু রাজা জনক তাকে যে দাসকন্যাগুলি উপহার দিয়েছিলেন তা সে সংগে করে এনেছে।"

"আমি তোমাকে বলিনি যে, সে প্রবাহনের উপযুক্ত শিষ্য? কি দেখনি তার ধর্ম কি? তবু ত তুমি তার আভাস মাত্র পেয়েছ। যদি ঘনিষ্ঠ ভাবে কোন দিন তা দেখার তুমি সুযোগ পাও, তাহলেই বুঝবে কি সে বস্তু!"

"তাহলে তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো যে, যদি আমি আর তর্ক করতাম, তাহলে আমার জীবন হারাতে হত?"

"নিশ্চয়ই এবং তা কোন অলৌকিক পন্থায় নয়। এই দুনিয়ায় বহু জীবনই ত নিঃশব্দে নিহত হয়।"

"আমার মাথা ঘুরছে ঠাকুরমা।"

"আজ তা হল? আর যেদিন থেকে আমি এ সব বুঝতে পেরেছি সেদিন থেকেই আমার মাথা ঘুরছে! সবই হচ্ছে শঠতা, শয়তানী। রাজা, পুরোহিত এবং পুজা-পার্বণের সমস্ত কথার মানেই হচ্ছে—অন্যে পরিশ্রম করে যা উৎপাদন করে তা বিনামূল্যে সংগ্রহ করা। মানুষ যত দিন নিজে না বুঝতে শিখবে এই সর্বনাশের মধ্যে থেকে মুক্তির পথ, তত দিন কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না; এবং এই স্বার্থপর চক্রান্ত মানুষকে সেই কথাই বুঝতে দিতে চায় না।"

"মানুষের বিবেক কি কোন দিন এই শঠতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তাকে শেখাবে না?"

"হ্যাঁ বাছা, শেখাবে। সেটাই

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

ফেলে আসা একটি নিশীথে

বন্দে আলী মিয়া

আমার আকাশ আজ মেঘমুক্ত নিকষ উজ্জ্বল
অনন্ত অরণ্য ভেদি আসে ক্ষীণ আনন্দ কিরণ—
শ্যামল সুন্দর ধরা—কপোতের কূজন গুঞ্জন;
অসীম শূন্যতা ভরি নাচে মোর মনের ময়ূর।

মাধবী প্রহর জাগে—নিদ্রাহীন নিশীথ প্রান্তর
জীবনে বসন্ত আজি যাত্রা-পথ ধূলায় রঙিন,—
যে পথে কালের চক্র চলে যায় বিরামবিহীন
বেদনা-বন্ধন মাঝে দেখা হলো দু'জনে সেথায়।

দক্ষিণ বাতাস আসে পাতালের অন্ধ কারা হতে
মঙ্গল গ্রহেতে শুনি বাজে কার সকরুণ বেণু,
একটি স্বপন জাগে—চোখে তার সোনালি কাজল
জীবন প্রদীপশিখা চেয়ে আছে চির অনির্বাণ।

স্মৃতির সঞ্চয় আজ রাখিলাম পথপ্রান্ত 'পরে
হবে সে মনের কাঁটা—ফুল হয়ে ফুটিবে না আর,
একদা উষর মরু মেলেছিল মরীচিকা ডানা—
থেমে গেছে বীণা-ধ্বনি—ফুরায়েছে কুসুমের মাস।

মালিকার গ্রন্থি হায় বারে বারে টুটেছে জীবনে
কুড়ায়ে মেখেছি রেণু—ধুয়ে গেছে অশ্রুর ধারায়।
এসেছে আজিকে তবু ফেলে-আসা একটি নিশীথ
শতেক বসন্তে তার পথ চাওয়া পরম বিস্ময়।

নিবেদিতা কলকাতায় এলেন একা। ষ্টেশন থেকে একলাই সোজা চলে এলেন বাগবাজারে সারদেশ্বরীর বাড়িতে। কাজে নামবার আগে এই মায়ের কাছে একটু আশ্রয় চান, যিনি অমন করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন নিবেদিতাকে, তাঁর উপর নির্ভর করতে চান। 'ফল আর ছায়া দুই-ই দিতে পারে এমন বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় নিতে হয়। ভাগ্যে যদি ফল নাই জোটে, আমাদের ছায়া পাবার আনন্দ কেড়ে নেবে কে?'* নিবেদিতা এই শান্তিছায়ায় নিশ্চিন্তে বসে মনকে গুটিয়ে আনতেই চান, আর কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

মেয়ে যেমন মাকে দেখতে আসে, নিবেদিতা তেমনি বিনা আমন্ত্রণে উপস্থিত হলেন সারদা দেবীর কাছে। কাজটা এমন কিছুই নয়। কিন্তু এর অসঙ্গতির দিকটা নিবেদিতা তেমন হিসাব করে দেখেননি। তিনি জাতি-বর্ণের সব বিধান লঙ্ঘন করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যে সব ব্রাহ্মণের বিধবা থাকেন, নিবেদিতাকে নিয়ে তাঁরা মহাবিপদেই পড়লেন। আশী বছরের বৃদ্ধা গোপালের মা তো তাঁকে ঢুকতেই দিতে চান না। বিবেকানন্দ ছিলেন বলরাম বাবুর বাড়িতে। সারাটা দিন তিনি নানান কৌশলে একটা রফার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, বাড়ির এক অংশ খালি করে সেখানে ওঁকে আলাদা ভাবে রাখা হবে। কিন্তু সমাজের এই সব খুঁতখুঁতি বা সন্ত্রস্ত ভাবের তিক্ততা শ্রীশ্রীমায়ের মুখোমুখি হতেই নিবেদিতা ভুলে গেলেন।

শ্রীমতী লিজেল্ [illegible]

ষোড়শ অধ্যায়

সারদেশ্বরীর পদমূলে

এখানে কি ভাবে তাঁকে থাকতে হবে সে-সম্বন্ধে নিবেদিতার কোনও ধারণা ছিল না। কিন্তু মানুষ যত রকম দুঃখ পায় সব দুঃখই সারদা দেবী পেয়েছেন, আবার তা কাটিয়েও উঠেছেন,—সেই সঙ্গে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন অভীপ্সার রূপটিও তিনি চেনেন। তাই স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধিতে নিবেদিতাকে তিনি ঠিকই বুঝলেন। তাঁর চেষ্টায় নিবেদিতা বাড়িতে তাঁর যোগ্য মর্যাদা পেলেন। তিনি আসায় ওখানকার দিনচর্যার কোনও পরিবর্তন হল না। অন্যান্য মেয়েরা যেখানে শোয়, রাত্রে তাদেরই কাছে মাটিতে আর-একটা মাদুরে একখানি ছোট তোশক, একটা বালিশ আর কম্বল পড়ল। সমস্তটা দিন নিবেদিতা একটা ধ্যানতন্ময় শান্তিরসে ডুবে থাকেন। এইটিই তিনি চেয়েছিলেন। সারদা দেবীর পায়ের তলায় কৃচ্ছ্রতপস্যা আর সাধনায় অন্তর্মুখ হয়ে নিবেদিতার দিন কাটতে লাগল।

শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এলেই বাড়িভাড়া করা হত। যখন যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন, সে-বাড়িই সত্যিকার একটা আশ্রম হয়ে উঠত। সরল সংযমের জীবন—তাঁর আশে-পাশে যে-সব মেয়েরা থাকতেন তাঁরা সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে সব-কিছু মেনে চলতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের 'পরে শ্রীশ্রীমায়ের প্রাণ ঢালা ভক্তি। সারা দিন ধরেই ঠাকুরের সেবা-পরিচর্যা করে চলেছেন। তিনি তো শুধু এক জনের সহধর্মিণী বা ব্রাহ্মণের বিধবা মাত্র নন; যে-দেবমানব গুরুরূপে তাঁকে আলোক-তীর্থের পথ দেখিয়েছেন, সারদা তাঁর প্রিয় শিষ্যা। আর সব-কিছু আড়াল করে তাঁর এই রূপটিই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকত। তাঁর ইষ্টনিষ্ঠার মূলে অকৈতব প্রেম, তাঁর ভগবানকে তিনি হাতের মুঠোয় পেয়েছেন, অন্তর তাঁর আপনাতে আপনি পূর্ণ। আর তাঁর সঙ্গিনীরা চলেছেন বৈধমার্গে, তাঁদের নিয়ম-সংযম অটুট। একদিন সারদা দেবী হেসে বলেছিলেন, 'অল্প বয়সে আমার এক জন শাশুড়ী ছিলেন, এখন জন দুই-তিন শাশুড়ীর নজরবন্দী হয়েছি।' যাই হ'ক, তাঁর কুশলী বুদ্ধি আর সহজ কৌতুক-প্রিয়তায় বাড়ির রুক্ষ পরিবেশও লঘু হয়ে উঠত, সঙ্গিনীদের মধ্যে কোন রকম মন-কষাকষি বা বিবাদের সম্ভাবনাটা হালকা হয়ে যেত।

এই মেয়েদের সাংসারিক সম্পদ বলতে খান দুই শাড়ী, হয়তো একখানা ধর্মপুস্তক আর একটা চিরুনি—এর বেশী কিছু না। দালানে সার দিয়ে সাজানো সব ছোট ষ্টীলের ট্রাঙ্ক, তারই মধ্যে প্রত্যেকের এ-জিনিস ক'টা গোছানো থাকত। সেদিন বিকালে এই প্রথম নিবেদিতা সাদা শাড়ী প'রে মাথায় ঘোমটা দিলেন। প্রথম দিন সারা রাত জেগে থাকতে হল, শক্ত মেঝেয় গা পাততে পারেন না। কম্বলের নীচেও শীত করছিল। অন্য মেয়েরা আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে তখন।

রাতটা যেন আর পোয়ায় না। নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য কান পেতে নানা রকম শব্দ শোনেন নিবেদিতা—টিকটিকি খুটখাট করছে, প্রহরে-প্রহরে চৌকিদার হেঁকে যাচ্ছে, কখনও ভজন গাইছে। সঙ্গিনীদের নিঃশ্বাসের তালে-তালে নিঃশ্বাস ফেলেন নিবেদিতা। মনে পড়ে, হ্যালিফ্যাক্সের স্কুলেও এমনি সারি সারি বিছানা পড়ত, কিন্তু তার সঙ্গে এ-শয্যার কত তফাৎ। চারটা বাজবার একটু আগেই একে-একে মেয়েরা উঠে পড়লেন, ঘোমটা টেনে দেয়ালের দিকে ফিরে বিছানায় বসেই মালা জপতে লাগলেন তাঁরা। এতটুকু নড়াচড়া নাই। পুরো দু'ঘণ্টা এমনি চুপচাপ কেটে গেল। যখন ভোর হল, একজন হাত-পা টান করে আড়ামোড়া দিলেন, কাজ শুরু হবে এবার। বিছানা-মাদুর সব গুটিয়ে তুলে মেঝে ঝাঁট দিয়ে মোছা হল। বাসনপত্রের ঝনঝনানি কানে আসছে, উনুনে আঁচ পড়েছে, ধোঁয়ার কটু গন্ধে বাড়ি ভরে উঠেছে। প্রাতরাশের ব্যবস্থা হচ্ছে বোঝা যায়। যাঁদের স্নান হয়ে গেছে তাঁরা ধোয়া শাড়ী প'রে এলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মত কয়েক জনের

---

* স্বামীজি একথা মিষ্টার ষ্টার্ডিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন।

পিঠে লম্বা চুলের গোছা এলানো রয়েছে শুকোবার জন্য, যাঁরা বিধবা তাঁদের মাথা একেবারে নেড়া। সবাই মিলে বালিকার মত হাসছেন, কত কী গল্প হচ্ছে।

প্রাতরাশের পালা তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করে একজন এলেন মায়ের পায়ে মালিশ করে দিতে। অন্যেরা মৌচাকের কর্মী-মৌমাছির মত সারা বাড়ি মেজে-ঘসে ঝকঝকে করে তুললেন। কিন্তু একটি মেয়ে সাজি-ভরা ফুল নিয়ে আসতেই কাজ-কর্মে ছেদ পড়ল, গুনগুন্ কথা বন্ধ হয়ে গেল। এক-একখানা ছোট কুশাসন নিয়ে যে-যার জায়গায় মেয়েরা বসে পড়লেন। পূজার সময় হয়েছে।

সারা সকাল যে-ঘরে বসে এঁরা পূজার্চনা করেন, তার দেয়ালের চুন-বালি নোনা লেগে খসে-খসে পড়ছে। পাশের একটি খোলা দরজা দিয়ে আর একখানা কামরা চোখে পড়ে। সেখানে তাকের উপর দুটি বেদিতে শ্রীরামকৃষ্ণের একই রকম দুখানা ফটো। যে-বেদিটা একটু বড়, তার উপরে সোনালী মঞ্চ, অজস্র ফুলের মালায় সাজানো। মিটমিট করে বাতি জ্বলছে। সামনে একখানা চৌকির উপরে মেয়েদের গৃহদেবতারা সারি সারি সাজানো রয়েছেন—কালো পাথরের শিবলিঙ্গ, বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ছোট্ট মূর্তি, আধফোটা পদ্মের উপরে সরস্বতী, কেশর-ফোলানো সিংহের উপরে মা দুর্গা। একখানি জগদ্ধাত্রী প্রতিমাও আছে, বালিকা সারদা দেবীর আরাধ্যা দেবী উনি।

পূজার অনুষ্ঠান চলতে থাকে। মেয়েদের মধ্যে একজন পূজা করেন, ঐ সঙ্গে ভোগ আর অঞ্জলি দেওয়াও হয়। তেলের বাতি জ্বলছে, ধূপ-ধুনার গন্ধ। কেউ-কেউ ধ্যানে ডুবে আছেন মনে হচ্ছে, অন্যেরা ধর্মগ্রন্থ পড়তে-পড়তে থেকে-থেকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন। ঘরের এক পাশে এক রাশ নোড়ানুড়ি, আমপাতা আর কোশাকুশিতে জল নিয়ে দু'জন কি জানি বিশেষ অনুষ্ঠান করছেন। পূজার আগাগোড়া ঘণ্টার বেতালা ঠনঠনানি।

পূজার শেষে পূজারিণী প্রত্যেকের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন। একে-একে বেদির সামনে প্রণাম করে সবাই এসে সারদা দেবীর পায়ে মাথা নোয়ালেন। তিনিও কারও চিবুক ধরে, কারও গালে হাত বুলিয়ে কি পিঠে হাত দিয়ে আদর করে প্রত্যেককে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিটি ভঙ্গিতে মাতৃস্নেহ ফুটে উঠছে। ত্যাগের পথ 'ক্ষুরস্য ধারা'—মায়ের স্নেহ সবার অন্তরে জাগায় সে-পথে যাওয়ার উদ্দীপনা।

অন্যান্য মেয়েদের মত নিবেদিতাও মায়ের পাশে বসেছিলেন। মেয়েরা যে-যার মালা নিয়ে জপ করছেন, সব মিলে একটা স্তব্ধ প্রশান্তির ভাব ঘনিয়ে উঠছে। চার পাশের এই নৈঃশব্দ্যের অতলে ডুব দিতে চাইছেন নিবেদিতা। প্রথমে এই শান্ত আবহাওয়ায় মনটাকে ছড়িয়ে দিলেন, মন তার মধ্যে ধারণার বস্তু বা রূপ খুঁজতে লাগল। কতক্ষণ বেশ সোয়াস্তিতে কাটল, তারপর একাসনে স্থির হয়ে থাকার দরুণ শরীর আড়ষ্ট হয়ে কষ্ট হতে লাগল। নড়ে-চড়ে অন্য ভাবে বসলেন নিবেদিতা।

তখন থেকে নড়াচড়া আর কথা কওয়ার ইচ্ছা এমন পাগলের মত পেয়ে বসল তাঁকে যে, এখানকার সর্বব্যাপ্ত শান্তির ভাবটা নিবেদিতার পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠল। মন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে, অসংযত ইচ্ছা যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। বাঁদরের লেজে কাঁকড়া বিছা কামড়ালে যেমন হয়, তেমনি করে তাঁর ভিতরটা। এই যে অবিচ্ছেদ নিস্তব্ধতা, এ-জিনিস সহ্য করতে গিয়ে তাঁর নাড়ীতন্ত্রের 'পরে এমন চাপ পড়তে লাগল যে, নিজের টানটান মুখভাব লুকুতে নিবেদিতাকে মুখের উপরে ঘোমটা টেনে দিতে হল। যা-কিছু জঞ্জাল জমা ছিল, আজ খাঁটি আগুনের ছোঁয়ায় সবই কি জ্বলে ছাই হয়ে যাবে? হঠাৎ একটি মেয়ে তাঁর সামনে এক পাত্র জল এনে রাখল। ও কি তাঁর অস্বস্তি লক্ষ্য করেছে? নিবেদিতা তাড়াতাড়ি ঢক-ঢক করে জলটা খেয়ে ফেললেন।...'এই স্তব্ধ নৈঃশব্দ্য কখন দেবতার আশীর্বাদ হয়ে উঠবে আমার কাছে?' নিবেদিতা প্রার্থনা করেন, 'মাগো, তোমার শরণ নিলাম, আমায় দয়া কর।'...মাঝে-মাঝে কোন-না-কোনও কাজে এক-এক জন ওঠেন, আবার নিঃশব্দে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়েন। দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত এই একাগ্রচিন্ততার সাধনা চলতে থাকে।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ভোগ দিলেন। সেই প্রসাদ সকলকে পরিবেশন করা হল। কাঁসার থালায় ভাত, তরকারী আর মাছ এই হল উপকরণ। তখন বেলা প্রায় এগারটা হবে। দিনের মধ্যে এই সময়টা নিবেদিতার পক্ষে বড় আরামের—এতক্ষণে যেন ছাড়া পেয়েছে দেহ-মন। সঙ্গিনীদের নানা কথা জিজ্ঞাসা করবার সাধ হয়, কিন্তু ভাষায় আটকায়। মেয়েরা তাঁদের নিপাট ভাল-মানুষি লুকুতে গিয়ে হাসাহাসি করেন, তাঁরা নিতান্তই অন্তঃপুরিকা। এই বিদেশিনী যে সবটাতেই 'কেন' এ-প্রশ্ন করে চলেছেন, সেটা বুঝতে পেরে ওঁরা অস্বস্তি বোধ করেন। আত্মসংবৃত চিত্ত মায়ার পারে যখন স্থিতিলাভ করে, আর কি সে কোনও প্রশ্ন করতে পারে? একদিন একটি মেয়ে নিবেদিতাকে বলেন, 'মাকে সাক্ষাৎ দেখেও তোমার সব-তাতেই এত সংশয় আসে কেন?'

দুপুরের বিশ্রামের পর, অভ্যাগতদের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের দুয়ার অবারিত থাকে। শহর থেকে মেয়েরা তাঁকে দর্শন করতে আসে। মাদুরের উপর বসে মা তাদের অভ্যর্থনা করেন। কোনও সন্তানের গায়ে হাতখানি রাখেন, কোনও তরুণী বধূকে হয়তো তিরস্কার করেন, সকলকেই কত শিক্ষা কত উপদেশ দেন। ক্ষুব্ধ চিত্তকে স্তব্ধ করবার অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর, একটা শান্তির হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে তাঁর চার পাশে, তাঁর ঘরখানি যথার্থই যেন পুণ্যপীঠ। জিজ্ঞেস করেন, 'সারা দিনে ক'বার ভগবানের নাম কর? সব সময় তাঁকে ডাকবে, তাঁর নাম করবে। অনবরত জপ করবে। ভগবানের নাম করতে করতে মন স্থির হয়। দিনে পনের কি বিশ হাজার করে নাম নেবে, তাহলেই শান্তি পাবে। হাঁ, সত্যি...আমি নিজে দেখেছি যে! কত সহজেই না ভগবানকে লোকে ভুলে যায়!' (১৭ই মার্চ, ১৮৯৮এ লেখা চিঠি)

'সপ্তাহে দুদিন সারদা দেবী ছেলেদের দর্শন দেন। এঁরা বেশির ভাগই শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। যে-সব ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী তাঁকে প্রণাম করতে আসেন, তাঁরা অনেকেই মায়ের কাছে দীক্ষিত। তিনি স্নেহভরে তাঁদের আশীর্বাদ করেন। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যে-শক্তি যে-দিব্যভাব লাভ করেছেন, তারই কিছুটা কেন সঞ্চারিত করেন তাঁদের অন্তরে। আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা হয়ে তাদের সঙ্গে বসে ধ্যান করেন। যদি কেউ উপদেশ চান, ঘোমটার আড়াল থেকে মা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। ফিসফিস করে কোনও প্রাচীনকে

উত্তরটা বলে দেন, সে আবার সে-কথা শুনিয়ে দেয় জিজ্ঞাসুকে। মায়ের মত আশ্বাস দেন তিনি, করুণাভরে সবার যত দুঃখ যত উদ্বেগের দায় নেন নিজের 'পরে। তাঁরা আনন্দে ভরপুর হয়ে চলে যান।' (২২শে মে, ১৮৯৮এ লেখা চিঠি)

সমস্যা যেখানে নিতান্ত জটিল, সেখানেও সহজজ্ঞানে তার মূলসূত্রটি তিনি খুঁজে বার করেন। শিষ্যদের প্রাণের ভাব ধরতে পারেন অনায়াসে। কিন্তু বাড়াবাড়ি রকম ভাবালুতা দেখলে একটু বিদ্রূপ না করে পারেন না। নিবেদিতা একখানা চিঠিতে নেল হ্যামণ্ডকে লিখেছিলেন, 'শুনতে এ সব কেমন লাগবে হয়তো, কিন্তু সবাই বলে এই মেয়েটি ব্যবহারিক জ্ঞান আর সাধারণ বুদ্ধিতে সবাইকে হার মানাতে পারেন। সত্যিই, যারা তাঁকে সামান্যই চেনে তারাও তাঁর মধ্যে এর নিদর্শন পেয়েছে। কোন-কিছু করতে হলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ওঁর পরামর্শ নিতেন, তাঁর শিষ্যেরাও সব সময় তাঁর উপদেশ মেনে চলেন।'

যখন কোনও দর্শক থাকে না বা অভ্যাগতেরা সব চলে যায়, সারদা দেবীর ঘরে একটা লম্ মজলিসী হাওয়া বইতে থাকে। ঘরের মধ্যে কী কলকাকলি! মেয়েদের মধ্যে যোগীন-মা সব চাইতে শিক্ষিতা। তিনি পুরাণের গল্প বলেন। পরে সেগুলো অভিনয় করা হয়। বিধবা লক্ষ্মী দিদি নিতান্ত বালিকা, তিনিই অভিনয় করে দেখান। সবার পছন্দ রাধাকৃষ্ণের কাহিনী, সেইগুলোরই অভিনয় বেশী হয়। এক জন সেতার বাজিয়ে গান করেন। চাকর যতক্ষণ ঘরে আলো দিয়ে না যায় ততক্ষণ এই সব আমোদ-কৌতুক চলতে থাকে। তারপর দূরে শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। সন্ধ্যাপূজার সময় হল।

নিবেদিতা চিরদিন এই সন্ধ্যাবন্দনার সময়টিকে বলতেন 'শান্তির লগ্ন'। তাঁর সব বইতে এই সময়টার বর্ণনা করে গেছেন তিনি। দেব-দেবীর প্রত্যেকটি পটের সামনে পঞ্চপ্রদীপ দেখান হল, স্তোত্রপাঠ হল, প্রার্থনা হল। গোধূলির আলো মিলিয়ে যেতেই তাল গাছের মাথায় হাওয়া উঠল, পাখিরা সুর ধরল একতানে। মায়ের নির্দেশ মত এই সময় মেয়েরা গভীর ধ্যানে ডুবে যান। তখন যে-যার ইষ্টদেবতার সঙ্গে আলাপ করেন যেন, তাঁরই মুখপানে চেয়ে একটু আনন্দের হাসি, পরিপূর্ণ আকুল আত্মনিবেদন—এই তাঁর পূজা। অনেকে উপরে গিয়ে ছাদে বসেন, উত্তরমুখী হয়ে বহুক্ষণ উপাসনা করেন। নিবেদিতাকে আশ্বস্ত করবার জন্য সারদা দেবী তাঁকে নিজের কাছেই রাখেন। মায়ের হৃদয় হতে আলো জ্বলে ওঠে কন্যার অন্তরে, দীপ হতে দীপান্তরের মত। মায়ের নীরব তপস্যায় দুহিতার অন্তরে শক্তি সঞ্চারিত হয়। পরে নিবেদিতা বলেছেন, 'যখন সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে থাকতেন তিনি, একটা প্রচণ্ড শক্তি-স্পন্দন বিচ্ছুরিত হত তাঁর সর্বাঙ্গ হতে। প্রাণের মর্মমূলে যেন তিনি নাড়া দিতেন।' এই সব বিশেষ মুহূর্তে, অমরনাথের পথে গুরু যে-রহস্যানুভূতির সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন, তারই কিছু-কিছু নিবেদিতা উপলব্ধি করতেন। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ খেয়াল হল, আনন্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে, অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে চিত্ত নিস্পন্দ নিথর......

এই সময় অন্যান্য মেয়েদের মত ধ্যান করতে গিয়ে তিনিও মুখের উপর শাড়ীর আঁচল টেনে দিতেন। যে-আলোতে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গোপনে তা বুকের মাঝেই ঢেকে রাখতে চান, নির্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে আস্বাদন করেন দেবতার প্রসাদ।...'আমার অন্তর বলে ওঠে, মহতো মহীয়ান তিনি, আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে উপভোগ করি সর্বপাবন আমার দেবতাকে...'। সমস্ত দেহে একটা প্রযত্নশৈথিল্যের অনুভব আর সমাহিতচিত্ততা নিয়ে এমন এক নিবিড় আনন্দের সন্ধান পান তিনি, যা তাঁর সুদূরতম কল্পনারও অগোচর।

আলমোড়ায় স্বামী স্বরূপানন্দ যে-শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর অমরনাথের পথে প্রাচীন সন্ন্যাসীরা যা উপদেশ দিতেন, সে-সব যেন নিবেদিতার নতুন করে মনে পড়ে। নিরোধের সাধনায় মন যখন ঘুমিয়ে পড়ে, দেহের বোধ চলে যায়, সেই স্নিগ্ধ শান্তির মুহূর্তগুলিকে চিরস্থায়ী করতে চান নিবেদিতা। কোনও বিশেষ বস্তুতে চিত্ত একাগ্র করবার চেষ্টা আর কথার কথা নয়, আজ নিবেদিতার কাছে ধ্যানযোগ সত্য হয়ে উঠেছে।

এমনি ভাবে এক পক্ষ কাল মায়ের কাছে কাটল। মায়ের সঙ্গে এক-তনু একপ্রাণ যেন হয়ে গেছেন, তাঁর প্রতি ভাব-ভঙ্গিতে মায়ের কাছে আত্মনিবেদনের আকৃতিটি ফুটে উঠত। এইখানকার প্রশান্তি আর স্নিগ্ধ মাধুরীই হল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলবার অমূল্য উপাদান।

একদিন সন্ধ্যা বেলা শ্রীমা আসন থেকে উঠতে যাচ্ছেন, নিবেদিতা এসে তাঁর পায়ের উপর মাথাটি রাখলেন। দৃঢ় সঙ্কল্পের আভা নিবেদিতার ললাটে, মা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। 'এবার তোমার কাজে নামবার সময় হয়েছে...'

বাড়ি ছেড়ে সারদা দেবী কদাচিৎ বাইরে যেতেন, কিন্তু পাড়ার সব খবরই তাঁর জানা ছিল। বলতে গেলে এ-বাড়ির গায়েই এক-খান বাড়ি বহু দিন খালি পড়ে আছে। ওখানাই নিবেদিতার নতুন বাসা হবে। রাস্তার আর-সব বাড়ির মত এখানাও সাদামাটা সাধারণ একখানা বাড়ি, তবে দেয়াল বেশ পুরু, ছাদটাও শক্ত-পোক্ত—ঝড় ঝাপটা আটকাবার পক্ষে ভালই। ভাড়া কিছুই নয় বলতে গেলে। বিবেকানন্দ স্বয়ং সব কথাবার্তা ঠিক করবার দায় নিলেন।

নিবেদিতা গোপালের মায়ের সঙ্গে নতুন বাড়ি দেখতে গিয়ে দেখেন, আশপাশের সব বাড়ির মেয়েরা যে-যার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বামুনের মেয়ে গোপালের মা সবাইকে দেখিয়ে নিবেদিতার হাত ধরে পড়শীদের বললেন, 'এই দেখ মায়ের এক মেয়ে, ও আমাদের সঙ্গে থাকবে ঠিক করেছে। ঠাকুর ওর মঙ্গল করুন!' অত বয়স হওয়া সত্ত্বেও গোপালের মা বেশ শক্ত-সমর্থ। গুটি গুটি ঘুরে মহানন্দে নিবেদিতাকে ও-পাড়ার সব-কিছু দেখিয়ে-শুনিয়ে তাদেরই এক জন করে দিলেন।

বোসপাড়া লেনের ষোল নম্বর বাড়ি। ভিতরটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে। দুটো ছোকরা চাকর ঘর ঝেড়ে-মুছে, টালির ছাদের উপর বালতি-বালতি জল ঢালতে লাগল।

বাড়ি ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত আরও কিছু দিন নিবেদিতা মায়ের কাছেই শুলেন। পড়ার ঘর সাজানো হল সাদা কাঠের দুটো প্রকাণ্ড টেবিল, একটা চেয়ার আর একটা টুল দিয়ে। দেয়ালের গায়ে একটা তাক, শাস্ত্রগ্রন্থের পাশে নিবেদিতা সাজিয়ে রাখেন তাঁর বাইবেল, বাউডেনের 'বুদ্ধচর্যা', 'এপিকটেটাস', রেনাঁর 'চয়নিকা'। এ ছাড়া এমার্সন, থরো, জোয়ান অব আর্ক, সেন্ট লুইস্, আলেক-জাণ্ডার পেরিক্লিস আর সালাদিনের জীবনী। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে নিবেদিতার হাতীর দাঁতের ক্রস্ আর একখানি মাত্র ছবি—নালভাঙা লিলির অর্ঘ্য নিয়ে বিবশা মেরী এলিয়ে পড়ছেন দেবদূতের বার্তা শুনে।

রান্নাঘরের ভার এক বুড়ী ঝিয়ের 'পরে। সে গোটাকতক টাকা নিয়ে একটা ষ্টোভের খোঁজে বের হল। ফিরে এল তিনখানা টালি, তিনটা সিক আর খানিকটা কাদামাটি নিয়ে, চিরকেলে কয়লার উনন তৈরী করল তাই দিয়ে। জল গরমের আর ভাত রাঁধার দুখানা মাটির পাত্র সে-ই কিনে আনল। নিবেদিতার বয়স ওর অর্ধেক, তবুও তিনি ওকে ডাকেন ঝি' কিনা মেয়ে, আর বুড়ী ওঁকে ডাকে 'মা'। এই ডাক দুটিতে নিবেদিতার নতুন ঘরকন্নার সূচনা হল।

কিছু দিন পরে বন্ধুদের কাছে নিবেদিতা লিখলেন, 'আমার বাসাটি আমার চোখে—চমৎকার! সেকেলে ধাঁচের হিন্দুবাড়ি যেমন হয়, এ-বাড়িটি তারই একটা বেয়াড়া নমুনা। বাড়ির মধ্যে মস্ত উঠান—দিনে ঠাণ্ডা, রাত্রে দিব্যি হাওয়া খেলে। দোতলায় বেশী ঘর নাই, ছাদ নেমে এসেছে পঁচ থাকে—বড় মজার দেখতে, আর অমন-একখানা আঙিনা; এ-বাড়ি পছন্দ না করবে কে? সন্ধ্যায় সকালে জোছনা রাত্রে মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে আমি একেবারে একা। গলিটা পরিষ্কার আছে, আর আপন-খুশিতে এঁকে-বেঁকে গেছে, এখানে-ওখানে কেবল মোড় ভেঙেছে বাঁক নিয়েছে ছোট্ট এক চৌমাথার মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, সেখান দিয়ে চলা শক্ত আশে-পাশে বাড়িগুলো ঠেসাঠেসি হয়ে মাথা তুলেছে, নীচু ঘরের চালা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে রাস্তার 'পরে। সকালের আলোয় ছোট-ছোট বাচ্চারা খুশির হাসি হাসছে, রোদে মেলে-দেওয়া সদ্য-ধোয়া কাপড় উড়ছে পত-পত করে, দু'-একটা গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। গরমের দিনে গলিটা যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, দেয়ালগুলো তেতে আগুন হয়ে ওঠে। চূন-বালির থেকে যে-ভাপ উঠছে অস্ত-সূর্যের রক্তরশ্মিতে তা শুষে যাচ্ছে, টিকটিকিরা বাসা বাঁধছে মহানন্দে।'

বাড়ির মধ্যে সৌখিনতার চিহ্ন বলতে দুয়ারের কাছে পালিশ-করা মাটির পাত্রে একটি তুলসীর চারা।

সপ্তদশ অধ্যায়

অন্তঃপুরবাসিনী

মায়ের কাছে ছিলেন যখন, নিবেদিতা মাঝে মাঝে গুরুর দেখা পেতেন। ঘোমটা থাকলেও নিবেদিতাকে নিশ্চয় তিনি চিনতে পারতেন, কিন্তু হিন্দু-প্রথামত কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন না বা তাঁর দিকে তাকাতেন না। এখন খবর পাঠালেন, তিনি দেখা করতে আসছেন।

এক নজরেই বিবেকানন্দ লক্ষ্য করলেন, নিবেদিতা কতখানি বদলে গেছেন। দরজার কাছে নয়, নিজের ঘরে বসে নিবেদিতা স্বামীজির অপেক্ষা করছিলেন। এই প্রথম সাদা কাশ্মীরী পশমের পুরো মাপের পোশাক পরেছেন,—কোমরে একটা বন্ধনী দেওয়া সাদাসিধা এ-পোশাক সন্ন্যাসিনীরই উপযুক্ত বটে। যখন এদেশে থাকতেন, এই ছিল তাঁর সাজ।...দৃষ্টি তাঁর স্বচ্ছ, স্থির। ব্রহ্মচারিণীর জীবনে তিনি অভ্যস্ত হয়েছেন। বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেন, সাদা দেয়াল খাঁ-খাঁ করছে, ঘরে আসবাবপত্র নাই বললেই চলে, ধ্যান-ঘরে একখানা ছবিও নাই। শোবার ঘরের সাদাসিধে তক্তপোশ আর টেবিলটাও তাঁর নজর এড়াল না। ট্রের উপর একটা চা-দানি আর গুটিকয় টুনকো চীনামাটির পেয়ালা—এই সামান্য বিলাসিতাটুকু দেখে স্বামীজির মুখে একটু হাসি ফুটল।

হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরের নিয়ম মত নিবেদিতার বাড়িতেও সকলের অবাধ যাওয়া-আসা চলবে না—এটা তাঁর মেনে চলা উচিত। এই কথাই বলতে স্বামীজি এসেছিলেন। এ-নিয়ম চালু করবার ফলটা কত দূর গড়াতে পারে সে-বিষয়ে নিবেদিতা একেবারে অজ্ঞ। এই প্রথম স্বামীজি নিবেদিতাকে একটা নির্দেশ দিলেন। এ-বিধানের পিছনে কী মনোভাব ক্রিয়া করছে তা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজিকে বেগ পেতে হল বই কি। হিন্দু মেয়েদের পর্দা-প্রথা মানতেই হবে, তারা অন্তঃপুরচারিণী হতে বাধ্য।

নীচের তলায় স্কুল বসবে, তা ছাড়া সমস্ত বাড়িট সাধারণের অগম্য—বাইরের দিক থেকে এ-বিধানের অর্থ এই। সদর দরজার পরে যে বৈঠকখানা, কোনও পুরুষ বা কোনও বিদেশিনী তার চৌকাঠ ডিঙাতে পারবেন না। এমন-কি তাঁর গুরু বা বান্ধবীরাও নয়।* অন্তঃপুরে সহজ বৈরাগ্যের যে-ধূসর স্তব্ধতা, বাইরের কোনও কোলাহলে তাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া চলবে না।

সাধনকালে যোগীও অন্তরে অন্তরে নিঃসঙ্গ হ'য়ে আত্মার মহিমাকে অনুভব করেন তার সঙ্গে এই শুদ্ধ স্বল্পাশী ব্রতপূত জীবনের মিল আছে। তাছাড়া স্বামীজি সাধারণের সঙ্গে নিবেদিতার মেলামেশার ব্যাপারে কোন রকম বিধি-নিষেধ আরোপ করেননি তো, বরং তাঁকে ঘিরে সাধারণের মনে যেন সহানুভূতি উদ্বেল হয়ে ওঠে সে-ব্যবস্থাই করলেন—অনেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর উপরে বিশেষ নজর রাখলেন বিবেকানন্দ। আরও কয়েক মাস পরে তাঁর মনে হল, নিবেদিতাকে এর চাইতেও কড়া শাসনে রাখা দরকার। বললেন, 'এখন তুমি সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ছেড়ে দিয়ে এ বার অবরোধবাসিনী হও।'

আপাতত স্বামীজি গোঁড়াঘরের হিন্দু বিধবার মত জীবন কাটানোর পরিবর্তে খৃষ্টান সম্প্রদায়ে নবীন মঠবাসীর যে-সব নিয়ম-কানুন আছে, নিবেদিতার জন্য সেইগুলোই নির্দিষ্ট করে দিলেন। উপদেশ তিনি অল্পই দিতেন; কিন্তু যা দিতেন তার এক চুল এদিক-ওদিক করা চলত না। এমনি করে নিবেদিতার বাইরের জীবনটাকে তিনি পরিচালিত করতেন, বাকীটুকুর জন্য নিজের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে নিবেদিতাকে।... 'নিরাসক্ত দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে চেষ্টা কর, মনের সব রকম চাঞ্চল্য দমন কর, মুখের ভাব হ'ক নির্বিকার।' তরুণ বয়সে স্বামীজি Imitation of Christ পড়ে মুগ্ধ হয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার প্রেরণার মূলে তার প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। নিবেদিতাকেও বইখানা পড়তে বললেন।

এই সব অনুশাসনে অভ্যস্ত হবার জন্য নিবেদিতা দীর্ঘ সময় তাঁর সেই নির্জন কুঠরিতে উপাসনা-ধ্যান-ধারণাদিতে কাটাতেন। সেখানে শান্তিভঙ্গ করবে না কেউ। দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করে কখনও আনন্দে বুক ভরে যায়, কখনও-বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা উদ্বেগ আর নৈরাশ্যে মন ছেয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন সময় এল যখন ধ্যান-চিত্তের বিরোধী সব চিন্তাকে নির্জিত করতে পারলেন নিবেদিতা।... 'নিজেকে নিয়ে নির্জনে মৌনী থাকা যায় যদি, আত্মার অপৌরুষেয় মহিমার উপলব্ধি খুব গভীর হয়। ভিতর থেকে

* দু'মাসের মধ্যে দু'বার এই নিয়ম ভেঙে নিবেদিতা স্বামীজির কাছে বকুনি খেয়েছিলেন।

আপনা-আপনি ব্যক্তিগত যত-কিছু সঙ্কীর্ণতা আর বক্রতা, সবই যেন সরল হয়ে মিলিয়ে যায়।'

নিবেদিতা আশ্রম-বিধি পালন করে চলায় এটাও স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তাঁর বাড়ি বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। এক জন সন্ন্যাসী তাঁর তত্ত্বাবধান করবেন ঠিক হল। স্বামী যোগানন্দ যেমন সারদা দেবীর মহল আগলান, তেমনি এক জনের এখানে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করা দরকার।

স্বামীজি নির্বাচন করলেন সদানন্দকে। উনি তাঁর প্রথম শিষ্য, একান্ত বিশ্বাসী, অন্ত সবার চাইতে নিবেদিতার সহযোগিতা করবার যোগ্যতা তাঁর বেশী। নিবেদিতা তাঁর কাজের জন্ত যে-ধরণের পারস্পরিক সাহায্য আর নিয়মানুবর্তিতা চান, সুফী মতবাদের সঙ্গে পরিচয় থাকাতে আর যৌবনে সামরিক শিক্ষায় অভ্যস্ত হওয়াতে সদানন্দের কাছ থেকে তা পাওয়া সহজ হবে।

কঠোর সংযমী এই সন্ন্যাসীর সাহচর্যে নিবেদিতার অনেক উপকার হল। সদর দরজার কাছে আঙিনার ধারে একখানি ঘরে তিনি থাকেন, ঐখানেই তাঁর কাজ-কর্ম খাওয়া-ঘুম সব চলে। একটা প্রাণস্পর্শী উদ্দীপনা আছে তাঁর অন্তরে, সারা দিন ধরে চলে তাঁর অক্লান্ত সেবাব্রত। জীবনযাত্রা অতি সাধারণ। উঠান ঝাঁটপাট দেওয়া, গাছপালাগুলি দেখা এই তাঁর কাজ। প্রিয়তমের সেবানন্দে মুখে তাঁর গানের কলি গুনগুনিয়ে ফোটে, 'প্রভো ম্যয় গোলাম ম্যয় গোলাম ম্যয় গোলাম তেরা।' গলাটি চমৎকার। নিবেদিতা অবাক হয়ে ভাবেন, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সাধু নরেন্দ্রই কি দেবতার মান বাড়াতে আবার মর্ত্যে নেমে এসেছেন?···সন্ধ্যা বেলায় সদানন্দ জিদ ধরেন, এবার আর কাজ নয়, নিবেদিতা নিচে নেমে আসুন।

উঠানে বসে সদানন্দ তাঁকে রামায়ণের গল্প শোনান। পিসীর মুখে এ-সব গল্প ছেলেবেলায় তাঁর শোনা—পিসী ছিলেন নিরক্ষর, গ্রামের মন্দিরে কথকতা শুনে এগুলো শেখেন। যেমনটি শুনেছেন ঠিক তেমনি ঢঙে খুঁটিয়ে সব বলে যান সদানন্দ,···'তাঁরা সবাই বেরিয়ে পড়লেন। বিশ্বামিত্র মুনি রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে চললেন জনককে দেখাতে। জনকের একটা আশ্চর্য ধনুক ছিল। যে সে-ধনুকে গুণ দিতে পারবে, সে-ই তাঁর মেয়ে সীতাকে বিয়ে করবে। যজ্ঞের জায়গা চষতে গিয়ে লাঙ্গলের ফালের মুখে এই মেয়েটিকে তিনি পেয়েছিলেন, সীতা মা বসুন্ধরার মেয়ে। সেই আশ্চর্য ধনুক রয়েছে একখানা গাড়ির 'পরে, পাঁচ হাজার লোকও টানাটানি করে সেটা নাড়াতে পারে না। রামচন্দ্র কিন্তু তাকে বাঁ হাতে আলগোছে তুলে ধরে এমনই গুণ চড়ালেন যে, হরধনু ভেঙে দু'খান হয়ে গেল। তার পর ব্রাহ্মণদের আর যে এল তাকেই ভারে-ভারে ধন-রত্ন বিলানো হল। হোমের আগুনের চার দিকে সাত পাক ঘুরে রাম-সীতার বিয়ে হয়ে গেল। যেন নারায়ণের সঙ্গে মিলন হল লক্ষ্মীর···'

এর পর আবার মহাভারতের গল্প আছে। কত বড়-বড় মুনি-ঋষি রাজা-রাণী অসুর-অপসরাদের চমৎকার সব কাহিনী। ভীষ্ম যেন ভারতের 'কিং আর্থার'—এই পুণ্যশ্লোক পুরুষের তুলনা নাই, তাঁর শৌর্যগাথার শেষ নাই। রাজা যুধিষ্ঠির যেন 'স্যামসুলট্', শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহচর। শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের বিশুখৃষ্ট, ক্ষত্রিয় লোকপালও।···নিবেদিতা বালিকার মত কত প্রশ্ন যে করেন। গল্পগুলি তাঁর কাছে যেন সত্যি হয়ে ওঠে, তিনিও একদিন এ-সব গল্প লোককে শোনাবেন। সামান্য খুঁটিনাটি কথারও দাম আছে তাঁর কাছে। 'বেদিতে ঘি ঢেলে দেয় কেন? দেবতাদের কপালে সিঁদুর মাখায় কেন?'···

এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে সদানন্দের ক্লান্তি নাই। অধ্যাত্ম-জীবনে প্রবেশাধিকার পাবার সঙ্গে-সঙ্গে নিবেদিতা এদেশের ধর্মানুষ্ঠান আর আচার-ব্যবহারও শিখুন। সদানন্দের ধর্ম হল সেবা। তাই, নিবেদিতা যে প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছেন, কেমন করে তার চাপকে লঘু করতে হবে তা তিনি বুঝতেন। তেমন ক্ষেত্রে নিবেদিতার উপর কর্তৃত্ব করতে তাঁর বাধত না। নিবেদিতার কাছে ভারতবর্ষের পুণ্য ইতিহাস সুকৌশলে বিবৃত করতেন সদানন্দ। উদ্দেশ্য ছিল, নিবেদিতা যেন রাজরাণীর মত নিজের জীবন নিজেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। নইলে দেবতার দেখা পাবেন কেমন করে?

বাগবাজারের জীবন-স্রোত হঠাৎ কলকল্লোলে নিবেদিতার দুয়ারে আছড়ে পড়ল। মায়ের শিষ্যাদের কাছ থেকে পাড়ার সব মেয়ের নাম ইদানীং তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। সদানন্দকে সবাই পালা করে যে-যার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করত, তাঁর কাছ থেকে তাদের হাঁড়ির খবরও নিবেদিতা পেতেন। পাড়ার যত ছেলেপুলে মুদী ভিখারী কি গঙ্গার ধারে যত জেলে আর অকর্মা কুঁড়ের দল, সবাইকে সদানন্দ চেনেন। শ্বেতদ্বীপের 'দিদিটি' যে তাদেরই এক জন এ তিনি সবাইকে বলতেন। ফলে, তাঁর সঙ্গে রাস্তায় বেরুলেই নিবেদিতাকে দেখে পাড়ার মেয়েরা বলত, 'ওদের দেশের ও বোধ হয় ব্রাহ্মণ।'

বাগবাজারে এমন-কিছু ছিল না যা দেখে নিবেদিতার স্বদেশকে মনে পড়তে পারে। শহরের বুক থেকে মাত্র মাইলখানেক দূর হবে পাড়াটা, কিন্তু একটি ইউরোপীয়ান কখনও নিবেদিতার চোখে পড়েনি। চিৎপুর রোড ধরেই শহরের কেন্দ্রে পৌঁছন যায়। এ-রাস্তাটা মহানগরীর একটা জনবহুল বড় রাস্তা—যত ভিড় তত হট্টগোল, ঘোড়ায়-টানা ডবল-ডেকার ট্রাম চলেছে রাস্তায়। রাস্তাটা প্রথমে গিয়ে পড়েছে চীনা-পট্টির গোলকধাঁধায়। সেখানে ছোকরা আর জোয়ানের দল ফুটপাথের উপর চামড়া নিয়ে-নিয়ে আছড়াচ্ছে। গলিগুলোতেও তাই চলছে, রাস্তায়-রাস্তায় চর্বি-ভাসা দুর্গন্ধ জলের স্রোত। খুপরির মত সব দোকান, উপরে গাদা-গাদা চটি ঝুলছে, নিচে বসে মুচিরা ঠুকঠাক হাতুড়ি ঠুকছে। আরও কিছু দূর এগিয়ে রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেছে, একটা মসজিদ সেখানে। তার আশে পাশে ঝুড়িভর্তি লোহার জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছে দোকানীরা, আইসক্রীম আর মিঠাই বিক্রি চলছে ধারে-কাছে। এছাড়া বিক্রি হচ্ছে কাটা তরমুজ, তার কাঁড়ি আর ডাব স্তূপাকার হয়ে আছে। ডাব খেয়ে লোকে খোলটা ফেলে দিচ্ছে পাশের খানায়, ওগুলো গরু-ছাগলের খবরা। বোরখা-পরা মুসলমানীরা দেয়াল ঘেঁষে চলেছে চুপিসাড়ে; তাদের মরদেরা ডোরাকাটা লুঙ্গি প'রে স্ফটিকের মালা জপতে-জপতে বুক চিতিয়ে পা ফেলছে। আরও কিছু দূর এগিয়ে চিৎপুর রোডে পার্সী আর কাবুলীদের বস্তি, সে-অঞ্চলে বড়-বড়

তালপাতার ছাতার নিচে বাট্টাওয়ালারা বসেছে। আদত হিন্দুস্থানের দেখা মেলে বেহালা-সেতারওয়ালাদের পাড়ায়। পথের দু'পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার সব দোকান, তার ভিতরে সাদা চাদর ঝোলানো। তার মধ্যে সারি সারি সাজানো রয়েছে তানপুরা সেতার করতাল। এর পরে লেস আর শাড়ীর, সেই সঙ্গে পিতল-কাঁসার দোকান। সে-সব ছাড়িয়ে মিঠাইওয়ালাদের এলাকা; কাচের আলমারিতে রকমারি মিষ্টির রাশ নিয়ে তারা বসেছে। তার পর ফুলওয়ালারা—রজনীগন্ধা, গোলাপ আর কর্পূরের মালা গাঁথছে।

অবসর সময়ে নিবেদিতা এই চিৎপুরের অলিগলিতে ঘুরে-ফিরে খুব মজা পেতেন—ফুল কিনতেন, সবজি কিনতেন। এখানকার প্রতিটি চৌমাথার মোড় এক-একটি পাড়াবিশেষ, একটি করে নিজস্ব মন্দিরকে কেন্দ্র করে ঠেকো-দেওয়া খড়ের কুঁড়ের মানুষের জীবন-স্রোত পাক খেয়ে চলেছে। গলির উপরে শুকোবার জন্য কাপড় মেলে দেওয়া হয়েছে, মেয়েরা চেঁচামেচি করছে, ছেলেরা চেল্লাচ্ছে। জড়িবুটিওয়ালা বেদের খুপরির পাশেই আফিমের আর পানের দোকান। বেদের দোকানে ঝুড়িতে আছে ব্যাং গিরগিটি গোখরো, দেয়ালের গায়ে অদ্ভুত ধরণের ঢাল মাছের আর কুমিরের চামড়া, গাঁটওয়ালা ছড়ি, কাঁচি, শুকনো গাছগাছড়া।

ঝাঁক বেঁধে মানুষ চলেছে। একটা উঁচু গাছতলা পরদা দিয়ে ঘেরা, সেখানে এসে এদের গতি থেমে যাচ্ছে মুহূর্তের জন্য। রাহী লোকেরা সেখানে সিঁদুর-মাখানো বিরাট গজানন গণেশের পূজা করছে। গাছের ডাল থেকে একটা ঘণ্টা ঝুলছে, তিন ধাপ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে লোকে সেটা একবার বাজিয়ে আসছে। মেয়েরা কদমা কি বাতাসা ভোগ দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করছে, ছেলেপুলেদের দিয়ে দেবতার পায়ে হাত বুলিয়ে নিচ্ছে।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিবেদিতা সমস্তটা চিৎপুর রোড টহল দিয়ে এলেন। জনশূন্য রাস্তা যেন তন্দ্রাতুর, কেবল ধর্মের ষাঁড়গুলো মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে এধারে-ওধারে ঘুরছে। জঞ্জালের স্তূপের চার পাশে ছাগলের পাল খুঁটে-খুঁটে খাবার খাচ্ছে। দোকানীরা ফুটপাথে পড়ে ঘুমুচ্ছে, যারা সঙ্গতিপন্ন তারা শুয়েছে দড়ির খাটিয়ায়। জন কয়েক প্রাচীনা বয়সের ভারে নুয়ে পথ চলেছেন—আলোর মাঝে কয়েকটি ছায়ামূর্তি যেন। নিবেদিতা সরে পড়লেন সে-রাস্তা থেকে, তবে সেটা ঐ ঝিম-ধরানো গরমের ভয়ে, আর-কিছুর জন্য নয়। যাদের তিনি আপন বলে গ্রহণ করেছেন সেই ভারতীয় জনতার সংসর্গে তাঁর অন্তরে জাগত একটা গভীর উচ্ছ্বাস। ওরা যে তাঁরই এক জন এমন স্পষ্টভাবে তা অনুভব করতেন যে, তাঁর ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছা করত, 'ওগো পথিক, আমিও তোমাদের সবার আত্মীয়। যে-ধূলায় তোমরা ধূসর, আমারও দেহ দগ্ধ করছে সেই ধূলার তাত, তোমাদের মত কঠিন শ্রমে আমারও আঙুল ফেটে রক্ত ঝরছে! ভিস্তিওয়ালা যে জল নিয়ে চলেছে তার ভারে আমারও পিঠ নুয়ে পড়ছে। তবু আমি তোমাদের মাঝে থেকেই আনন্দে আছি। দেবতার মুখ চেয়ে জীবন যাপন কর তোমরা, ওগো পথিক, আমাকেও অমনি করে ইষ্টের মুখপানে চেয়ে হাসতে শেখাও।'

মরণের ডাকে সাড়া দিয়ে নিবেদিতা সবার হৃদয় জয় করলেন। হিন্দু বোনদের অন্তরঙ্গতা পেলেন তিনি মৃত্যুর মাধ্যমে।

একদিন সন্ধ্যায় শোকার্ত একটি মেয়ে এসে নিবেদিতাকে বলল, 'শীগগির এস গো, আমাদের ছোট মেয়েটি মারা যাচ্ছে।' রাস্তার ওপারে এক মাটির কুঁড়েতে মেয়েটি পড়ে ছিল। যম আর নিবেদিতা একই সঙ্গে সে-কুটীরে পা দিলেন। অর্ধোন্মাদিনী মা কান্নায় ভেঙে গতপ্রাণ ক্ষুদ্র দেহটি জড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। মুখে কিছু না বলে ধীরে ধীরে নিচু হয়ে হতভাগিনীর মাথাটি নিবেদিতা কোলে তুলে নিলেন—অনেকখানি সান্ত্বনা ছিল এইটুকুতেই। মেয়েটি নেহাৎ ছেলেমানুষ, অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করে নিজের মাকে সে মিনতি ভরে শুধোয়, 'বাছা আমার এখন কোথায় আছে বল না গো!' ওর মা ঘরের এক কোণে বিলাপ করছিল। নিবেদিতা শোকার্ত জননীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'শান্ত হও, তোমার মেয়ে এখন মায়ের কোলে। যিনি আমাদের সবার মা, সেই মা-কালীর বুকে সে। স্থির হও, নইলে তার আরামের ঘুম ভেঙে যাবে। তোমার মেয়ে মায়ের কোলে ঘুমুচ্ছে, তাকে দোল দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।' তার অশ্রুকলঙ্কিত মুখের 'পরে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেন নিবেদিতা। মৃদু গুঞ্জনে উচ্চারণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর মায়ের নাম, 'জয়, জয় মা-কালী।'···ঘণ্টা দুই ধরে এই চলল। তার পর মা শান্ত হয়ে মৃত সন্তানকে ছেড়ে দিল।

নিবেদিতা এদেশে মরণকে এই প্রথম মুখোমুখি দেখলেন। গুরুকে সব বলবার জন্য পরদিন খুব ভোরে তিনি বেলুড় রওনা হলেন।···'যে-আশ্বাস আমরা পেতে চাই, এই দীন-দরিদ্রেরাও সেই আশ্বাসটুকুর কাঙাল। শুধু এইটুকু তারা জানতে চায় তাদের সন্তান সোয়াস্তিতে আছে কি না, মায়ের স্নেহদৃষ্টির তলেই আছে কি না—দুঃখ ক্ষণিক, আর আনন্দই যে নিত্য সম্পদ এইটুকুই তারা বুঝতে চায়। সবাই একসঙ্গে একই দুঃখ ভোগ করছি, তাই একই আশ্বাসে একই নির্ভরতায় আমরা আরাম পাই। তবে তো আমাদের মধ্যে কোনও তফাত নাই, আদর্শ বা আকাঙ্খারও কোনও ভেদ নাই। ভোরের দিকে যখন বেরিয়ে আসি, মেয়েটি আমায় কিছু খাবার দিল···'

স্বামী বিবেকানন্দ খুব মন দিয়ে শুনছিলেন।···'এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছিলেন। তিনিই জোর করে বলে গেছেন, সকলের অন্তরের ভাষায় সবার সঙ্গে কথা কইতে হবে।···মার্গট, মরণকে ভালবাসতে শেখ, ভয়ঙ্করকে পূজা কর। দেবতা যেন বৃত্তের মত—সব আধারেই তাঁর কেন্দ্র, কিন্তু পরিধি কোথাও নাই। মৃত্যু আর কিছুই নয়, কেন্দ্র হতে কেন্দ্রান্তরে স্থিতি মাত্র। জীবনে মরণ আর মরণে জীবনকে দেখতে শেখ। রুদ্রের অর্চনা কর, মার্গট।'

নৌকা করে নিবেদিতা বাগবাজারে ফিরে এলেন। মনে হল, মাঝির সামনে নৌকার গলুইতে মৃত্যুপতি যমকে দেখছেন তিনি—সাতরঙা দিনের সুতোয় বোনা তার রাজবেশ, ঐ তো বসে তিনি! রূপের জগতে এই যে নিবেদিতার আশে-পাশে অগণ্য জীবের মেলা, সবাই কি ওঁর প্রজা? এই বিশ্বপ্রকৃতি, চন্দ্র সূর্য মানুষ পশুপাখি তরুলতা পৃথিবী সবই স্পন্দিত হচ্ছে এক প্রাণের স্পন্দনে, এরা যেন মৃত্যুকে ডেকে বলছে, 'হে যম, শুধু তুমিই পার আমাদের বাঁধন কাটতে।' আলো ঠিকরে পড়ছে নদীর জলে, কল্লোলে ঢেউয়েরা যেন গুরুর বাণীই আউড়ে চলছে, 'মৃত্যুকে বন্দনা কর, মার্গট, রুদ্রের অর্চনা কর।'

কয়েক দিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে নিবেদিতা দেখলেন—লোকের ভিড়, কীর্তন চলছে।···তখনই ভিতরে গেলেন। স্বামীজির কথাগুলো রুদ্রতালে তাঁর কানে বাজতে লাগল। জানতেন স্বামী যোগানন্দ মুমূর্ষু, কিন্তু এত তাড়াতাড়িই কি সব শেষ হয়ে গেল? অনেক দিন আগে ইংরেজ ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন নিবেদিতা, তিনি দেখে-শুনে বলে যান, 'আমাদের আর কিছু করবার নাই, একবিন্দুও প্রাণশক্তি নাই ওঁর দেহে।' শুনে কী মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল সন্ন্যাসীর মুখে। শ্রীশ্রীমায়ের করুণাদৃষ্টি ছাড়া আর কিছুরই প্রত্যাশা রাখেন না তিনি। প্রাণ ঢেলে সারদা দেবীর সেবা করেছেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর কর্তব্য করে গেছেন।

মুমূর্ষুর শয্যা ঘিরে বেলুড় মঠের অধিকাংশ সন্ন্যাসীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। উপরতলায় মেয়েরা শোকে আকুল, তাঁদের দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। মুমূর্ষুর শ্বাসকষ্টের শব্দ সহজেই কানে আসে। নিবেদিতা এখান থেকে ওখানে ঘোরেন। সারদা দেবী কাঁদছেন।

শান্ত স্বরে এক জন সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করেন, 'কি রকম লাগছে ভাই? কোনও কষ্ট হচ্ছে কি?'

'নির্গুণের ধারণা করতে চাইছি, কিন্তু মন আমার আঁকড়ে ধরছে সগুণকে। গীতা পড়ে শোনাও আমায়···'

গীতার শ্লোকে ঘর গম-গম করতে লাগল। মৃত্যুপথিক সন্ন্যাসী বললেন, 'তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি···আর কোনও যন্ত্রণা নাই। সব মিলিয়ে যাচ্ছে। নির্গুণের আভাস পাচ্ছি—ওম্ ওম্ রামকৃষ্ণ ওম্···'

যোগানন্দ দেহ ছেড়ে দিলেন।

মেয়েদের দীর্ঘ বিলাপধ্বনির সঙ্গে মৃত্যুকে স্বাগত জানিয়ে হঠাৎ এক হৃদয়ভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, 'হরি ওম্! হরি ওম্!' ক্ষণকাল চলল চোখের জল আর ফুঁপিয়ে কান্নার জের। শোনা গেল মায়ের ক্ষুব্ধ কণ্ঠ, 'জানি যোগীন আমার ঠাকুরের কাছে গেছে, কিন্তু আমার ছেলেকে তো ছিনিয়ে নিলে আমার কাছ থেকে!' (২৭শে মার্চ ও ২৬শে এপ্রিলের চিঠি, ১৮৯৯)

রাজপথে রোদের মাঝে জনতা নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে, তারা গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাট পর্যন্ত স্বামী যোগানন্দের অনুগমন করবে। অন্তিম মন্ত্র তাদের কানে আসছে। ওখানকার শেষকৃত্য হলে পর ধীরে-ধীরে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সন্তানদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দই প্রথম মরণের রাজ্যে পা বাড়ালেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ শেষ-কৃত্য করতে গিয়ে বহুক্ষণ গতপ্রাণ যোগানন্দের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর মশাল নিয়ে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন—'শিব! শিব!'

সন্ন্যাসীদের পিছনে-পিছনে নিবেদিতাও এসেছিলেন স্বামী সদানন্দের সঙ্গে। মৃত্যু আবার এ কী কঠোর শিক্ষা দিয়ে গেল! সমস্ত ব্যাপারটা এত শীগগির ঘটল! লেলিহান চিতাবহ্নির দিকে চেয়ে নিবেদিতার বুকের মাঝে কান্না গুমরে ওঠে।···'ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ'। মৃত্যু সেই মহামহেশ্বরের ধ্বংসলীলা। বীরের মত মরণকে স্বীকার করে নেওয়াই উচিত, কিন্তু আমি তো এখনও প্রাণ-খোলা স্বাগত জানাতে পারছি না তাকে। এখনও যে মৃত্যুর সান্নিধ্যে আমার দেহ-মন শিউরে ওঠে। শান্তিঃ শান্তিঃ।· (১ই এপ্রিল, ১৮৯৯এর চিঠি)

অমনি গুরুর কথা মনে পড়ে যায়। স্বামীজি তখন হাঁপানিতে ভয়ানক ভুগছেন, আছেন বেলুড়েই। তাঁর দেহও কি একদিন আগুনে তুলে দেওয়া হবে? ভাবতে গিয়ে নিবেদিতা কেঁপে ওঠেন। চিতার কাঠ হু-হু করে পুড়ছে, ফাটছে। নিবেদিতা দু'আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করেন।

সন্ন্যাসীরা দল বেঁধে চলে যাচ্ছেন সবাই। দেখে-দেখে কেমন একটা বিদ্রোহ ফুঁসে ওঠে পলকের জন্য। কেন তিনি একা কষ্ট পাবেন? ওঁরা কেমন একই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংহত হয়েছেন। একসঙ্গে থেকেও ওঁরা নিঃসঙ্গ হবার সাধনা করছেন, এতে কতখানি জোর পাওয়া যায় মনে। সন্ধ্যা অবধি নিজের মনের সঙ্গে নিবেদিতা যোঝেন, এক-এক বার নৈরাশ্যের ভাবটা ঝেড়ে ফেলেন। কাতর হয়ে বলে ওঠেন, 'নাঃ, সব রকমেই হেরে যাচ্ছি, আদর্শচ্যুত হচ্ছি। মুক্তির কথা আমার মনে পড়ে না। কিন্তু আমি কে যে আমার ইচ্ছা মত সব ঘটবে? যদি একটা ঘটনাতেও স্বামীজির কাছে আমার আনুগত্যের প্রমাণ দিতে পারি, তাহলেই আর কিছু চাইব না···আমি ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করতে চাই, দূরে থাকতে চাই না···'

স্বচ্ছ হয়েও বেদনার্ত শিশুর মত মন তাঁর সান্ত্বনা খোঁজে। নিবেদিতা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে চললেন। মায়ের ঘরে গিয়ে নীরবে তাঁর কাছে বসলেন, মুখের উপর ঘোমটা টেনে। শোকার্ত সারদা দেবীও কেঁদে-কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। নিবেদিতার বেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন তিনি, কারণটাও অনুমান করলেন। মেয়ের হাত দুখানা কোলে টেনে নিয়ে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। যেন নিবেদিতাকে বলতে চাইছেন, 'আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম। ঠাকুর একবার গাঁয়ে এসে ছ'মাস কাটিয়েছিলেন। তখন তিনি অসুস্থ। আমি চৌদ্দ বছরের মেয়ে। এই সময়টায় প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতাম। দরিদ্রের সংসারে অভাবের মধ্যেও তাঁর স্বভাবের দ্যুতি ঠিকরে পড়ত। কী মিষ্টি ব্যবহারই না করতেন আমার সঙ্গে? বিকাল বেলা আমতলায় বসে আমায় পড়তে শেখাতেন। সংসারের সব-কিছু তিনিই আমায় শিখিয়েছিলেন। তাঁর মুখ চেয়েই বেঁচে ছিলাম। কিন্তু যখন সময় হল, তিনি বললেন, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে তোমায়···'

চলে যাওয়ার আগে মায়ের কোলে একবার মাথাটি রাখলেন নিবেদিতা। মা স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'গুরুকে ভালবেসো, তোমার ভালবাসা হ'ক অফুরন্ত। সাধু পুরুষকে ভালবাসলে আত্মার নবজন্ম লাভ হয়, এই তো ভক্ত-ভগবানের ভালবাসা। শুদ্ধ ভালবাসাই আত্মার আলো···চুপ, যা বলি মুখ বুজে শোন···আমার গুরুকে আমি যেমন ভালবাসতাম তুমিও স্বামীজিকে তেমনি ভালবেসো···'

শান্তচিত্তে নিবেদিতা ঘরে ফিরে এলেন। আবার প্রাণে বিশ্বাস এসেছে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী
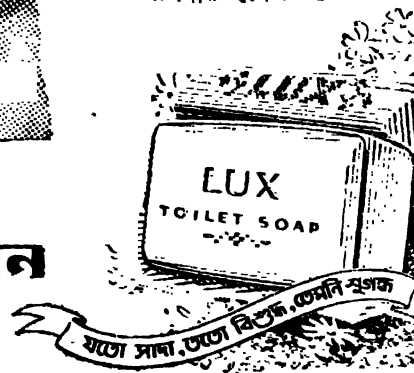
শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

২১

বিচিত্র ঘটনার প্রবাহে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে "১৯০৮" খৃঃ অব্দ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মানিকতলার বোমার মামলা ছাড়াও এই বর্ষে কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি, গোয়েন্দা ও বিশ্বাসঘাতক বিপ্লবী সদস্যদের হত্যা করা হয়। কিন্তু এই বৎসরের অন্যতম ঘটনা মর্লে-মিন্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের ঘোষণা।

বৎসরের শেষ ভাগে ২রা নভেম্বর ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্পর্কে এক রাজকীয় ঘোষণা হয়। উক্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, নূতন শাসন-সংস্কারের বলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কার্য্যকরী পরিষদে এক জন ভারতবাসী নিযুক্ত হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য-সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ১৬ জন, এখন হইল ৬০ জন। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যাই হয় বেশী। মনোনীত ও নির্ব্বাচিত হইবেন ৫২ জন আর ৮ জন নিযুক্ত হইবেন পদাধিকার বলে—৬ জন কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য, এক জন সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি, এক জন প্রদেশবিশেষের শাসনকর্ত্তা।

কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে কেবল বোম্বাই ও মাদ্রাজের কার্য্যকরী পরিষদের সভ্য ছিল, এখন বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে একটি করিয়া কার্য্যকরী পরিষদ হইল। সভ্য নির্দ্ধারিত হয় চার জন, তন্মধ্যে এক জন হইবেন ভারতবাসী।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশের সংখ্যা ৫০, আর পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের ৩০ জন। তাহার মধ্যে কতক হইল মনোনীত বেসরকারী আর কতক হইল নির্ব্বাচিত।

নূতন শাসন-সংস্কারের বিধান অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতি (Seperate Electorate) সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই নির্ব্বাচন পদ্ধতির ফলে সমগ্র জাতির কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী করিল। এই সংস্কারের ফলে কেবল আলোচনা ও মতামত প্রকাশেরই সুবিধা হইল, কিন্তু কোন সুফল হইল না।

কংগ্রেস-নেতারা এই শাসন-সংস্কারকে নিজেদের চেষ্টার ফল মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ আরও অধিকার করায়ত্ত হইবে—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ণোদ্যমে কংগ্রেস অধিকার করিয়া রাখিলেন।

শাসন-সম্পর্কিত ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নভেম্বর মাসেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রনাথ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ভূপেশচন্দ্র নাগ প্রভৃতি ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুযায়ী বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইলেন। উক্ত আইনের বলে পূর্ব্বে ইংরাজ রাজপুরুষগণ ঠগীদের দমন করিতেন।

এই শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত ঘোষণার প্রায় এক মাস পরে ১১ই ডিসেম্বর "Criminal Law Amendment Act" নামে নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনের সাহায্যে কোন বিশেষ অপরাধের জন্য কোন প্রকার 'Assessor' অথবা 'জুরী' ব্যতীত তিন জন হাইকোর্ট-জজ কর্ত্তৃক বিচারকার্য্য চলিতে পারিবে।

উক্ত আইনের সাহায্যে ১৯০৯ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি ও সাধনা সমিতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

পুলিন বাবুর নির্ব্বাসনের পর দলের একটি শাখার কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজা বাবু; কিন্তু বৃহত্তর অংশের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাখনলাল সেন। উত্তর কালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'ভারত' নামক দৈনিক সংবাদপত্রদ্বয় অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়া ইনি সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছেন। তিনি সোনারংয়ের কার্য্য-পরিচালক হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ঢাকা জেলার রাজনগর ডাকাইতিতে যে আটাশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর ডাকাইতিতে যে ষোল হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়, তাহা সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের বিপ্লবীদের কীর্ত্তি বলিয়া রাউলাট রিপোর্টে কথিত হইয়াছে। পুলিন বাবু তাঁহার স্মৃতি-কথায়ও রাউলাট রিপোর্টে মাখন বাবুর নেতৃত্বের যে কথা আছে, তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

মাখন বাবু কলিকাতায় আসিয়া সোনারং বিদ্যালয়ের কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া কলেজ স্কোয়ারে আস্তানা স্থাপন করিয়া বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন এবং বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি গ্রেপ্তার হইয়া চট্টগ্রামের টেকনাফে অন্তরীণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ স্থান হইতেই দল পরিচালনা করিতেন। তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক অমৃল্যচরণ সেনগুপ্ত ও প্রসিদ্ধ নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রধান ছিলেন।

এই সময় পূর্ব্ব-বাংলার চতুর্দ্দিকেই ঢাকা সমিতির শাখা বিস্তার লাভ করে। আশুতোষ দাশগুপ্তের সহায়তায় মুন্সিগঞ্জের গ্রামে-গ্রামে শাখা স্থাপিত হইল। বজ্রযোগিনী, কলমা, ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রামে শক্তিশালী কেন্দ্র স্থাপিত হইল।

ঢাকায় সমিতির কার্য্যের বিশেষ প্রসার হওয়ায় বৈপ্লবিক কর্ম্মিগণের জন্য একটি বাসস্থানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় বারদির নাগ-পরিবারের সুরেন্দ্র নাগ ও উপেন্দ্র নাগ সমিতির সদস্য হন। সুরেন্দ্র বাবুদের বাড়ীর চালাঘরে সমিতির প্রথম নিবাস স্থাপিত হয়; তাহার পর 'ভূতের বাড়ী' নামক প্রসিদ্ধ একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া এই নিবাস আরও বড় করা হয়। জন কয়েক নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এই বাড়ীটিতে দুষ্কর্ম্মের আস্তানা করিয়াছিল এবং সেই জন্য কোনও লোক আসিলে তাহারা গোপনে নানারূপ

উৎপাত করিত বলিয়া এই বাড়ীর নাম 'ভূতের বাড়ী' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই বাড়ীতে তল্লাসী করিয়া পুলিশ অনেক কাগজ-পত্র আবিষ্কার করে। তন্মধ্যে আদ্য, অন্ত, প্রথম বিশেষ ও দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞার কাগজ-পত্রও ছিল।

অনুশীলন সমিতি এই সময় বাখরগঞ্জ জেলায় একটি বড় ঘাঁটি স্থাপন করে। প্রথমে যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এই শাখার নেতা নির্বাচিত হন। তাহার পর রমেশচন্দ্র আচার্য্য দলপতি হইয়া দলকে বিশেষ কর্ম্মতৎপর করিয়া তুলেন। তিনি দলপতির নির্দ্দেশে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে যান। সেখানে মাখনলাল সেনের নিকট হইতে বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। রমেশচন্দ্র সোনারং থাকা কালীন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতচর, গোদাদিয়া, ও সুকাইর ডাকাতি সোনারং দল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সূত্রে রমেশচন্দ্র ডাকাতির পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। সুকাইর ডাকাতির পর সরকারী আদেশে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হয়।

অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর ইহার ভবিষৎ কার্য্য-প্রণালী সম্পর্কে সতীশচন্দ্র বসু বলেন, "১৯০৮ খৃঃ অব্দে "অনুশীলন সমিতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইলে সব শাখা পৃথক্ হইয়া যায়; ইহার পর এই সমিতির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া আমরা "Bengal Youngmen's Zamindary Co-operative Society" নামকরণ করি। মিত্র মহাশয় জজ সারদাচরণ মিত্রকে এই নূতন সমিতির সভাপতি করিয়া দেন। ঢাকার অনুশীলন সমিতি পরে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। আলীপুর মামলার পর "আত্মোন্নতি সমিতি" ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

"আমাদের নূতন সমিতির কার্য্য দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট খুশী হয় এবং বলে, C. I. D. মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছে। Imperial Government তোমাদের সম্পর্কে এক জন Ruasian detective নিযুক্ত করিয়া সন্তুষ্ট হয় যে, পুলিশের অভিযোগ মিথ্যা।"

১৯০৮ খৃঃ অব্দে কয়েকটি ডাকাতি ছাড়া কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়। ২রা মে মানিকতলা মুরারিপুকুরের বাগান পুলিশ কর্ত্তৃক আবিষ্কারের পর কলিকাতায় যে-সমস্ত বিপ্লবী ছিল, তাহারা 'যুগান্তর', 'সোনার ভারত' প্রভৃতি গোপন পত্রিকা প্রকাশ ভিন্নও—বৈপ্লবিক কর্ম্মধারা যে এখনও চলিতেছে তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি স্থানে বোমা নিক্ষেপ করে। ১৫ই মে তারিখে, গ্রে ষ্ট্রীটে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

তাহার পর ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে চলন্ত ট্রেণের উপর কলিকাতার উপকণ্ঠের কয়েকটি স্থান হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই পর্য্যায়ে প্রথম বোমা ফেলা হয়—কাঁকিনাড়ায় ২১শে জুন তারিখে। কলিকাতার সরকারী ফৌজদারী উকিল (পাব্লিক প্রসিকিউটর) হিউম সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু বোমা অপর একটি গাড়ীতে পড়ে ও এক জন ইউরোপীয় যাত্রীকে বেশ জখম করে। ১২ই আগষ্ট তারিখে শ্যামনগরে, ২৪শে নভেম্বর তারিখে বেলঘরিয়া ও আগরপাড়ার মধ্যে এবং ২১শে ডিসেম্বর খড়দহ ও সোদপুরের মধ্যে ট্রেণ লক্ষ্য করিয়া বোমা ফেলা হয়।

এই বোমাগুলি সমস্তই নারিকেল খোলের মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ ও পেরেক, লোহার টুকরা প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত ছিল।

এদিকে রাজসাক্ষী ও গোয়েন্দাদের হত্যা করিয়া, যাহাতে এই দুই কাজে আর কেহ ভয়ে অগ্রসর না হয় তাহার জন্য বিপ্লবী দল চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ বিষয়ে প্রথম সাফল্যজনক অভিযান হইতেছে বাঁকুড়ার রজনীকে হত্যা করা। রজনী বোমার দলে ছিল, কিন্তু পূর্ব্বেই সে পুলিশের গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে এবং তাহার নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া পুলিশ অবিনাশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েক জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এই রজনীকে জানিতেন। জেল হইতে রজনীর বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ জ্যোতিষ বাবুকে জানাইলে, জ্যোতিষচন্দ্র জেলে খবর পাঠান যে, রজনীকে ইহলোক হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সে আর বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ পাইবে না। এই বিষয়টি এত দিন পর্য্যন্ত কোন সরকারী বিবরণে পাওয়া যায় নাই। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বোমার যুগের এক অধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয় সর্ব্বপ্রথমে সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যার পর ৯ই নভেম্বর শিয়ালদহের নিকটবর্ত্তী সারপেনটাইন লেনে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টার জন্য দায়ী গোয়েন্দা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুণেন দাশগুপ্ত গুলী মারিয়া হত্যা করেন।

ঢাকার অনুশীলন সমিতিও এই সময় কয়েকটি গুপ্তহত্যায় লিপ্ত হয়। সমিতির নিয়ম অনুসারে বিশ্বাসঘাতকদের হত্যাসাধনই একমাত্র শাস্তি ছিল। এই কারণে সুকুমার চক্রবর্ত্তীকে ১৯০৮ খৃঃ অব্দের ১৪ই নভেম্বর রমনার কালী দেখিবার ছল করিয়া লইয়া যাইয়া তাহাকে হত্যা করা হয়। কর্ত্তিত হস্তের এক স্থানে 'সুকুমার' শব্দটি লেখা থাকায় লাস সনাক্ত হয়। সুকুমার একটি ছেলেকে ভুলাইয়া অনুশীলন দলে লইয়া যাওয়ার দায়ে ধরা পড়িয়া এক স্বীকারোক্তি করে এবং জামিনে খালাস হয়। একই অপরাধে ঢাকার অন্নদা ঘোষ এবং হাওড়ার কেশব দেকে হত্যা করা হয়।

১৯০৯ খৃঃ অব্দে মোট ১০টি ডাকাতি, একটি অস্ত্র চুরী এবং দুইটি রাজনৈতিক হত্যা হয়। এই বর্ষের প্রথম ভাগে ১০ই ফেব্রুয়ারী আলীপুর আদালত-প্রাঙ্গণে নরেন গোঁসাই হত্যা মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলীর আঘাতে হত্যা করা হয়। তাহার হত্যাকারী চারুচন্দ্র বসুর দক্ষিণ হস্তটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল। হাতে রিভলবার বাঁধিয়া দুই হাতের সাহায্যে গুলী চালাইয়া সে হত্যা করে। চারুচন্দ্র যশোহরের উকিল কেশবচন্দ্র বসুর পুত্র। এই অপরাধের বিচারে চারুচন্দ্রের ফাঁসির হুকুম হয়।

এই বৎসরে ৩রা জুন তারিখে ফরিদপুর জেলায় অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ একটি হত্যায় লিপ্ত হয়। গবেশ চট্টোপাধ্যায় নামে দলত্যাগী এক ব্যক্তি পুলিশের নিকট দলের সন্ধান দেয়। গবেশকে হত্যা করার সঙ্কল্প লইয়া কয়েক জন সশস্ত্র যুবক ফরিদপুর জেলাস্থ তাহার ফতেজঙ্গপুর গ্রামের বাড়ীতে হানা দেয়। দুই ভ্রাতার আকারের সাদৃশ্য থাকায় গবেশের ভ্রাতা প্রিয়নাথকে গবেশ ভ্রমে তাহার মাতার সম্মুখেই বিপ্লবিগণ হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের পুলিশ আজও সন্ধান করিতে পারে নাই।

১৯০৯ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী কুমিল্লায় ঢাকার নবাবের তিনটি রাইফেল চুরি যায়। এই সম্পর্কে এক জন গ্রেপ্তার হয়। এই বৎসরে ১০ই ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই এপ্রিল বেলঘরিয়া এবং আগরপাড়া অঞ্চলে দুই জন নারিকেল-বোমার আঘাতে আহত হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী হরিপাল থানার অন্তর্গত মামুদপুর গ্রামে ১০।১২ জন যুবক এক ডাকাতি করিয়া ৫০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। ২৩শে এপ্রিল ডায়মণ্ডহারবার থানার অন্তর্গত নেত্রা গ্রামে রামতারণ মিত্রের বাড়ীতে কয়েকটি মুখোস-পরা যুবক রিভলবারের সাহায্যে ডাকাতি করিয়া অলঙ্কার ও অর্থে ২,৪০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। যুবকগণ গৃহস্বামীকে বলে যে, তাহারা ইংরাজদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করার জন্য কর্জ হিসাবে ইহা গ্রহণ করিতেছে।

পিস্তল, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ৮।৯ জন মুখোস-পরিহিত যুবক ১৬ই আগষ্ট খুলনা জেলার অন্তর্গত নাংলা গ্রামে মথুর পোদ্দারের বাড়ীতে এক ডাকাতি করে। ডাকাতগণ গহনা ও নগদে ১,০৭০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। এই সম্পর্কে কয়েক স্থানে খানাতল্লাসীর ফলে পুলিশ কিছু রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা হস্তগত করে। এই ডাকাতি সম্পর্কে অবনীভূষণ চক্রবর্ত্তীর সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ইহার পর পুলিশ কয়েকটি ডাকাতি যুক্ত করিয়া নাংলা ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করে। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ৩০শে আগষ্ট ছয় জন আসামী সাত বৎসরের জন্য, তিন জনের পাঁচ বৎসর এবং দুই জনের তিন বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর খুলনা জেলার অন্তর্গত হোগলবুনিয়া গ্রামে এক ডাকাতির ফলে মাত্র ৫০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ডাকাতগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। উক্ত ঘটনায় এক জন আহত হয়।

১৯০৯ খৃঃ অব্দের ১১ই অক্টোবর একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। একটি যাত্রিগাড়ীতে সাতটি থলিতে ২০,০০০৲ হাজার টাকা পাঠান হইতেছিল। ৭।৮টি যুবক ঢাকা ষ্টেশন হইতে উক্ত ট্রেণে চড়ে। ট্রেণটি রাজেন্দ্রনগর ছাড়িবার পরেই যুবকগণ উক্ত অর্থের রক্ষী তিন জনের মধ্যে দুই জনকে গুলী করে এবং এক জনকে ছুরিকাঘাত করে। গুলীতে আহত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয়। যুবকগণ তখন ট্রেণের জানলা হইতে টাকার থলিয়াগুলি বাহিরে ফেলিয়া দেয় এবং নিজেরাও লম্ফ প্রদান করে। পুলিশ এই অর্থের প্রায় অর্দ্ধেক উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে সুরেশ সেন নামক এক যুবক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এই বৎসর ১০ই অক্টোবর রিভলবার, মশাল ও মুখোসে সজ্জিত হইয়া কয়েকটি যুবক ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত দরিয়াপুর গ্রামে এক ডাকাতি করে। এই ডাকাতির ফলে ২,৬০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

এই মাসের ২৮শে অক্টোবর নদীয়া জেলার অন্তর্গত হলুদবাড়ীতে এক ডাকাতির ফলে ১,৪০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই ডাকাতি সম্পর্কে পাঁচ জনের আট বৎসর করিয়া জেল হয়; এক জনের হয় সাত বৎসর এবং আর এক জনের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এই বৎসরের শেষ ভাগে ১০ই নভেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে ২৫।৩০ জন সশস্ত্র যুবক হানা দিয়া ২৮,০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে।

এই ঘটনার পর-দিবস অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর, ২৫।৩০ জন যুবক বোমা ও বন্দুকে সজ্জিত হইয়া ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামে হানা দেয় এবং চারিটি দোকান লুণ্ঠন করিয়া নগদে এবং অলঙ্কারে ১৬,০০০৲ টাকা হস্তগত করে। উক্ত ঘটনায় এক জন আহত হয়।

এই মাসের শেষ ভাগে ২৪শে নভেম্বর পূর্ববঙ্গের গভর্ণর আগরতলা ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা পরিদর্শন কালে দুই জন যুবককে সন্দেহজনক ভাবে চলাফেরা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেন। পরে অন্য মামলায় ইহাদের কারাদণ্ড হয়।

এই বৎসরের শেষ ডাকাতি হয় ২৭শে ডিসেম্বর যশোহরের অন্তর্গত বিকারা গ্রামে। ৮।৯ জন যুবক রিভলবার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহস্বামীকে আক্রমণ করে। এই ঘটনায় মাত্র ৮১৪৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

[ক্রমশঃ।

স্মরণে

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির—দক্ষিণ দরোজা

পুরীর দক্ষিণ দরোজা ঢুকতেই বড় বড় লাল পাথরের সিঁড়ি। উপর চাতাল শ্বেত পাথর দিয়ে কতক কতক স্থানে বাঁধান। মনে হয়, যাত্রীরাই নিজেদের বাপ-মায়ের নাম স্থায়ী ক'রবার জন্য বসিয়েছেন এই সব স্মারক। দর্শনপ্রার্থী বহু যাত্রী ব'সে র'য়েছেন সেখানে। জানলাম মন্দির খুলতে এখনও বিলম্ব আছে। কারণ জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম মধ্যাহ্ন-ভোগ এখনও সরে নাই। আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলাম—"কারণ? এখন ত বেলা পাঁচটা, মধ্যাহ্ন-ভোগ হয়নি?"

পাণ্ডা মহারাজ হেসে ব'ললেন পান চিবুতে চিবুতে—"ভোগ স'রতে রাত বারোটা বাজে খপর রাখেন?"

অত খপর রাখার সার্থকতা না বুঝে ব'সে প'ড়লাম ভদ্রলোকদের কাছেই। নজরে প'ড়লো এক বৃদ্ধকে মোগলাই আস্তিন জামা পরনে; পাকা গোঁফে 'তা' দিয়ে উর্দ্ধমুখী ক'রে রাখা। দেখে মনে হ'লো এই বয়সেও ভারি সুখী।

জিজ্ঞেস ক'রলাম—"বাবু সাহেব, আপনি ত খুব খুশী জিউ মানুষ।"

চমকে উঠে ব'ললেন শুধু—"আমাকে জিজ্ঞেস ক'রছেন ?"

সম্মতিসূচক উত্তর শুনে হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে ব'ললেন গম্ভীর স্বরে—"আপনি ত দেবদর্শন না ক'রে নিশ্চয়ই যাবেন না। আমার কথা একটু শুনতে হবে। কী বলেন, আরম্ভ ক'রবো ?"

আমি ব'ললাম—"বেশ ত, শোনা যাক, বলুন।"

স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ভদ্রলোক আরম্ভ ক'রলেন—"আমার এক ছেলে বিলেতে পড়ে, তা'র এবার একজামিনের বছর। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সেই ছেলে আমাকে চিঠি দিয়েছে—বাবা, আপনার বৌমা আমাকে চিঠি দেয় না কেন ? আমি শক্তি সঞ্চয় ক'রে লিখলুম, আমিই নিষেধ করেছি বৌমাকে, তোমার পরীক্ষার বছর কি না। পরীক্ষার আর কিছু বেশী দিন সময় থাকলে জানিয়ে দিতুম, তোমার স্ত্রী নাই। আমার বৌমা এখন পরপারে। এই হলো আমার গৌরচন্দ্রিকা বুঝলেন ?

"তার পর শুনুন, বড় কন্যা আমার বিধবা, সে আমার বাড়ীতেই র'য়েছে। বড়লোকের বাড়ীতে বে দিয়েছিলুম। বড়লোক মশায়রা বিধবার হেঁসেল বাড়াতে রাজি হ'লেন না। অনুগ্রহ ক'রে ব'লে পাঠালেন আমার বৈবাহিক—পঁচিশ টাকা মাসোহারা দিব। আমি রাগের উপর ব'লে পাঠালুম—অতো অনুগ্রহের দরকার হবে না। এ আর এক পর্ব্ব হ'লো ; কেমন বলুন, ঠিক কি না ? কোথায় রাজ্য ক'রবে আমার মেয়ে ; না এলো ভিখারী হ'য়ে আমারই বাড়ীতে। কন্যা এসে এককালে পুত্র-কন্যা-বন্ধু সব পেলো। আমিই তা'র সব। রাত-দিন কথা হয় দু'জনে ঘুম না আসা পর্য্যন্ত ; সে শোয় আমার খাটেই। ওর মা মারা যাওয়ার এক বছর পরে আমি কথা বলার এক জনকে পেলুম যা'হোকণ হারানো স্মৃতি মুছে গেল তা'র ব্যবহারে।—বাবা, তুমি ব'ললেই আমার ঘুম আসবে ভেবেছো, খুট করলেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। কী দরকার লাগে কখন !—হেসে বলতাম, আমি কী তোর দুগ্ধপোষ্য ছেলে ? চোখের জল আর মুখের হাসি দিয়ে সে বলে—তার চেয়ে বড়ো যে তুমি আমার ! বড় বৌমার সঙ্গে কিছু কথা হ'লেই জানায় আমাকে। আমি যদি বলি ব'লবো বড় বৌমাকে ? মুখ চেপে ধ'রে বলে—ছি ! বলতে নেই, এক সাথে থাকতে গেলে অমন কত হয়।—তবে তুমি আমাকে জানাও কেন মা ?—টপ-টপ ক'রে চোখ দিয়ে জল-পড়া মুখে বলে—বাবা, তুমি ছাড়া যে কেউ নেই আমার জানাবার।—আমি বলি, প্রতিকার ক'রতেও দিবি না আমাকে, আমার কষ্ট হয় না বুঝি এ সব শুনে ?—বাঃ, তুমি পুরুষ মানুষ, একটু শুনবেও না ?—লুকিয়ে যদি বড় বৌমাকে ব'লতুম কোন দিন, উত্তর দিতো বড় বৌমাই, দিদি বড় অভিমানী, যে কথায় কেউ কান দেয় না, সেই কথা বড় ক'রে দেখে ভেঙে পড়েন। বাবা, পাঁচটার বাড়ী, কী হবে শেষে বলা যায় না, আপনি কিছু টাকা ওঁর নামে লিখে দিয়ে যান ! —আমি শুনেই গেলাম মাত্র, দেখতে লাগলাম দু'জনের খুঁটিনাটি লেগেই র'য়েছে ; এ যদি বলে—হাঁ, ও তখন বলে—না। কারণ কী জিজ্ঞেস ক'রে জানতে পারি না।

"একদিন বৌমা কাঁচুমাচু ক'রে এসে দাঁড়াল আমার কাছে। আমি জিজ্ঞেস ক'রলুম—বৌমা, দাঁড়িয়ে কেন মা ? সে উত্তর দিতে চায় না। আমি বললুম, বল না বৌমা, কী ব'লবে। নেতিয়ে প'ড়ে দুঃখের সঙ্গে জানালো—মায়ের সেই গলার হারগাছটা পাচ্ছি নে বাবা !—চমকে উঠে আমি তখন ব'ললুম—সেই লক্ষণের হার ? এই হারের ইতিহাস আছে, শুনুন,—যখনই কোন ঠেকায় প'ড়েছি এই হার বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় করতেই কোথা হ'তে হাতে টাকা এসে যেত। যত বাড়ী করার মূলে এই হার ! ব'ললুম, —বৌমা, তোমার কাছে ত আয়রণ-সেফের চাবি থাকে, ভাল ক'রে একবার দেখো না। বৌমা ব'ললেন—আমি চা'ল চা'ল ক'রে দেখেই আপনাকে জানিয়েছি বাবা, নইলে এ খপর আপনাকে দিতুম না বাবা !—আর কারো কাছে তুমি চাবি দাও ?—বাইরের লোকের হাতে চাবি দিই নে বাবা।—ঘরের লোক কে নেয় ? ব'লতে চান না বৌমা। আমি শুধালুম—মায়ার হাতে চাবি দাও না কি ? মাথা নামিয়ে জানালেন—দিদির হাতেই দিই বাবা ! তাকে জিজ্ঞেস ক'রেছো কোথাও রাখেনি ত ? উত্তর দিলেন বৌমা, —তিনি ব'লেছেন, জানেন না।

"দুঃখে ভেঙে প'ড়ে ব'ললুম—বৌমা, আমি জানি আর তোমরা পাবে না ও হার। এ সব আমার সুদিনের বন্ধু, আর থাকবে কেন ? তোমার মায়ের কত সাধের হার ছিল, বন্ধক থেকে ফিরে এলে কত আহ্লাদ ক'রে ব'লতেন—'ধন আমার, মাণিক আমার, আর তোমাকে কোত্থাও পাঠাবো না।' এখন গেছে যমের দরজায়।

"মায়া সামনে এসে দাঁড়াতেই ব'ললুম—তোর মায়ের গলার হারটা দেখেছিস্ ? মুখটা ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল মায়ার, ব'ললে—আমি ত ব'লেছি বৌদিকে, জানি না। সেই তালেই ব'ললুম—তুমি জান না, বৌমা জানে না, চাবি তোমাদের কাছে র'য়েছে, জানবে বাইরের লোকে ? সে দাঁড়িয়ে রইলো একখানা পাথরের ছবি।

"রাত্রে হারের শোকে আমার নিদ্রা এলো না। রাত্রি শেষে একটু তন্দ্রা এলো, তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমার স্ত্রী এসে নাড়া দিয়ে ব'লছেন—বাড়ীতে কী হচ্ছে দেখছো ? আমার ধোওয়া কাপড়ে গাঁট দিয়ে যে রেখেছি, বাইরের আলমারিতে। তুমি ত জানো।

"ঘুম ভেঙে গেল, মনে হ'লো এ স্বপ্ন যেন সত্য হয়। চেয়ে দেখলুম, আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল ক'রে চেয়ে আছে আমার দিকে। ছুটে গিয়ে বাইরের ঘরের আলমারি খুলে দেখলুম, সত্যই সেখানে কাপড়ে বাঁধা র'য়েছে সেই সোনার হার। আনন্দে জ্ঞানহারা আমি ছুটলুম মায়ার ঘরের দিকে। ধাক্কা দিয়ে দেখি, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। চীৎকার ক'রে ডেকে সাড়া পেলুম না মায়ার। জোর ক'রে দরজা ভাঙলুম—নীল বর্ণের ঠোঁট-মুখ দেখে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো, গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, শক্ত হিম একখান পাথর !

"শুনলেন, কেমন আমি আনন্দে আছি।"

শ্রোতাদের চোখ তখন সজল। চমকে উঠলাম শিকলের ঝন্-ঝন্ আওয়াজ শুনে।

খুলে গেলো ভগবানের দক্ষিণ দরোজা।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

৬

পারস্যের রাষ্ট্রদূত ও মোল্লাজীকে নিয়ে যখন এইসব ব্যাপার চলছে তখন গণৎকারদের নিয়ে হঠাৎ একটা গণ্ডগোল বেধে গেল। আমার কাছে ঘটনাটা বেশ উপভোগ্যই মনে হয়েছিল! এশিয়ার অধিকাংশ লোকই স্বর্গরাজ্যের সঙ্কেত ও নির্দেশ সম্বন্ধে এত বেশী আস্থাবান যে পৃথিবীর কোন ঘটনা যে ঊর্ধলোকের ইসারা ছাড়া ঘটতে পারে, এ তারা কল্পনাই করতে পারে না। তাই পদে পদে তারা গণৎকারের শরণাপন্ন হয়। গণৎকারের পরামর্শ ছাড়া জীবনে এক-পাও তারা চলতে চায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে দুইপক্ষের সেনাবাহিনী হয়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু যতক্ষণ না 'সাহেৎ' অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ শুভমুহূর্ত বিজ্ঞাপিত হয়, ততক্ষণ সেনাধ্যক্ষরা যুদ্ধ আরম্ভ করার হুকুম দেন না। শুধু যুদ্ধবিগ্রহ নয়, জীবনের কোন কাজই জ্যোতিষীর পরামর্শ ও আদেশ ছাড়া করা হয় না। সেনাপতি নিয়োগ করতে হবে, গণৎকারের পরামর্শ চাই; বিবাহ করতে হবে বা দিতে হবে, তাও গণৎকারের অনুমতি চাই; কোন স্থানে যাত্রা করতে হবে, গণৎকার যাত্রার শুভক্ষণ ব'লে দেবেন। সর্বদা ও সর্বত্র এশিয়ে গণৎকার হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ও বন্ধু। জীবনের অতি তুচ্ছ প্রাত্যহিক ঘটনাও গণৎকার নিয়ন্ত্রণ করেন। কেউ হয়ত একটি ক্রীতদাস কিনবেন, তাও গণৎকারকে জিজ্ঞাসা করা চাই। কেউ হয়ত বৎসরান্তে নতুন পোশাক পরবেন, তাও পরা উচিত কি না গণৎকার ব'লে দেবেন।

এই জাতীয় জঘন্য কুসংস্কার, কথায় কথায় গণৎকার, পদে পদে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হওয়া—এ আমি কোথাও দেখিনি। মনে হয়, এদেশের লোক জন্ম থেকে জীবনটাকে যেন জ্যোতিষীর কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে। জ্যোতিষীর এই অখণ্ড প্রতিপত্তির ফলে অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যথেষ্ট। দেশের ও সমাজের, ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্ম, নীতি ও পরিকল্পনার সঙ্গে জ্যোতিষীদের সবাগ্রে পরিচয় হয়। যা হয়ত একান্তভাবে জনকল্যাণের স্বার্থে বা বৃহত্তর সমষ্টিগত স্বার্থে গোপন রাখা প্রয়োজন, তাও গণৎকাররা পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন। জানার ফলে স্বভাবতঃই অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, ঘটতে বাধ্য।

এইবার ঘটনাটা বলি। ঘটনাটি চমকপ্রদ। প্রধান রাজজ্যোতিষী যিনি তিনি হঠাৎ একদিন পুষ্করিণীর জলের মধ্যে প'ড়ে গেলেন এবং এমন পড়া পড়লেন যে আর উঠলেন না। অর্থাৎ জলে ডুবে রাজজ্যোতিষী ভবলীলা সংবরণ করলেন। সংবাদটি বাইরে প্রকাশ হওয়া মাত্র চারিদিকে হুলস্থূল প'ড়ে গেল, রাজদরবারেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। গণৎকাররা রীতিমত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। অন্য কোন কারণে নয়, তাঁদের জ্যোতিষী পেশার কথা ভেবে। রাজজ্যোতিষী যিনি জলে ডুবে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন, তিনি সম্রাট ও তাঁর আমীর ওমরাহদেরই ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। সুতরাং বাইরের সাধারণ লোক তাঁকে খুব জবরদস্ত জ্যোতিষী মনে করত। তারা ভাবল, যিনি রাজারাজড়া ও আমীর ওমরাহদের জীবনের প্রত্যেক ছোটবড় ঘটনা সম্বন্ধে এত দিন ধ'রে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে এসেছেন, ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি ঘটনা যিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পান, তিনি নিজে তাঁর মর্মান্তিক ভবিষ্যৎটি দেখতে পেলেন না কেন? কেন তিনি বুঝতে পারলেন না যে জলে নামলেই তিনি প'ড়ে যাবেন এবং প'ড়ে গেলে আর গাত্রোত্থান করবেন না? সকলের ভাগ্যবিধাতা ও ভবিষ্যদ্বক্তা যিনি, তিনি কেন নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন না? এ-প্রশ্ন সকলের মনেই উঁকি দিতে লাগল, কেউ তার কোন সন্তোষজনক জবাব পেলেন না। অনেকের মনে ফিরিঙ্গিস্থানের "বিজ্ঞান" ও হিন্দুস্থানের "জ্যোতিষ" সম্বন্ধে নানারকমের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

জ্যোতিষীরা সকলে এই ধরনের কথাবার্তায় ও আলাপ আলোচনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের পেশা সম্বন্ধে এইসব বিরূপ মন্তব্য তাঁদের আদৌ মনঃপুত হত না। নানারকমের ঠাট্টাবিদ্রূপ জ্যোতিষীসম্বন্ধে যখন বাইরে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হ'ল, তখন তাঁরা রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠলেন। জ্যোতিষীদের সম্বন্ধে নানারকমের কাহিনীও রটনা হতে লাগল। তার মধ্যে একটি কাহিনীর খুব বেশী প্রচার হয়েছিল এইসময়। কাহিনীটি পারস্যের সম্রাট সাহ আব্বাস সম্বন্ধে। কাহিনীটি এই:

পারস্যের সম্রাট সাহ আব্বাস একবার তাঁর জেনানামহলের মধ্যে একটি ছোট সুন্দর বাগিচা করার বাসনা প্রকাশ করেন। সম্রাটের বাসনা বাস্তবে রূপ দেবার জন্য উদ্যানপালক উদ্যোগী হলেন এবং কয়েকটি ফলের বৃক্ষ রোপণের দিনও তিনি ঠিক করলেন। সংবাদ শুনে রাজজ্যোতিষী সম্রাটকে জানালেন যে শুভদিন দেখে যদি বৃক্ষরোপণ না করা হয়, তাহ'লে সেই বৃক্ষে ফল ধরার কোন সম্ভাবনা নেই। সম্রাট সাহ আব্বাস রাজজ্যোতিষীর কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। জ্যোতিষী মশাই তাঁর পুঁথিপত্র

নিয়ে দিন স্থির করতে বসলেন। পুথি দেখে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন যে আর একঘণ্টার মধ্যে যদি বৃক্ষগুলি রোপণ করা না হয় তাহ'লে গ্রহনক্ষত্রের যোগাযোগের শুভ মুহূর্তটি কেটে যাবে এবং বৃক্ষে ফল ফলবে না। রাজজ্যোতিষীর এই সিদ্ধান্তের সময় উদ্যানপালক উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং অন্য লোকজন ডেকে তাড়াতাড়ি বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা হ'ল। মাটিতে গর্ত খোঁড়া হ'ল, সম্রাট নিজের হাতে চারাগাছগুলি রোপণ করলেন। সমস্ত কাজ এইভাবে শেষ হয়ে যাবার পর, উদ্যানপালক ফিরে এসে দেখল তার করণীয় কর্ম কে যেন শেষ ক'রে রেখেছে। গাছগুলি সব উল্টোপাল্টা ক'রে রোপণ করা হয়েছে। আমের জায়গায় জাম, খেজুরের জায়গায় ডালিম, আতার জায়গায় নোনা, নোনার জায়গায় আপেল লাগানো হয়েছে। এরকম বিসদৃশ কাণ্ডটা কে করেছে এবং কেন করেছে তা ভেবে দেখবার সময় হ'ল না তার। রীতিমত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্যানপালক সমস্ত গাছ উপড়ে ফেলে দিল। তারপর চারাগাছগুলি সারারাত মাটিতে ফেলে রাখা হ'ল, সকালে যথাসময়ে রোপণ করার জন্য। খবরটি রাজজ্যোতিষীর কাণে পৌঁছল এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্রাটের কাণে সেটি পৌঁছে দিলেন। সম্রাট উদ্যানপালককে ডেকে পাঠালেন। উদ্যানপালক হাজির হ'ল। সাহ আব্বাস ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: "আমার নিজের হাতে লাগানো গাছ কে তোমাকে উপড়ে ফেলার আদেশ দিলে? দিনক্ষণ দেখে গাছ লাগানো হয়েছে, আর তুমি সেই গাছ কাউকে জিজ্ঞাসা না ক'রে উপড়ে ফেললে কেন? এখন আর গাছের কোন ভবিষ্যৎ নেই, গাছ লাগালেও কিছু হবে না।" উদ্যানপালক কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে সকলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল: "হায় আল্লা! এই কি সাহেব? দ্বিপ্রহরে বৃক্ষ রোপণ করলে সন্ধ্যার সময় তা উপড়ে ফেলাই ভাল!" সম্রাট সাহ আব্বাস গ্রাম্য উদ্যানপালকের কথায় হো হো ক'রে হেসে ফেললেন এবং রাজজ্যোতিষীর দিকে পিছন ফিরে চুপ ক'রে চলে গেলেন।

এখানে আমি আরও দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করব যা থেকে হিন্দুস্থানের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হবে। ঘটনা দু'টি সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে ঘটেছিল। ঘটনা দু'টি বিবৃত করা প্রয়োজন, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে মোগলযুগেও হিন্দুস্থানে যে কি রকম বর্বর প্রথা চালু ছিল, তা এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন পবিত্রতা রক্ষা করা হ'ত না, নিরাপত্তাও ছিল না। সম্পত্তি সব হ'ল সম্রাটের। রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির মালিক সম্রাট। (১) সম্রাটের অধীনে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন অধিকারই স্বীকৃত হয় না। তাঁদের মৃত্যুর পর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হন সম্রাট নিজে। এইবার ঘটনা দু'টি বলছি।

নায়েক নামখাঁ নামে মোগল দরবারের একজন প্রবীণ আমীর ছিলেন। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর রাজ-দরবারে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি নিযুক্ত থেকে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি যে সম্রাটের করতলগত হবে তা তিনি জানতেন। তিনি জানতেন, এই বর্বর প্রথার জন্য কিভাবে ওমরাহদের মৃত্যুর পর তাঁদের বিধবা পত্নীরা দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হন এবং সামান্য ভাতার জন্য সম্রাটের দ্বারস্থ হ'তে বাধ্য হন। তিনি জানতেন, কিভাবে মৃত ওমরাহদের পুত্ররা সামান্য জীবিকার জন্য অন্যান্য ওমরাহদের ব্যক্তিগত সেনাদলে নাম লেখাতে রাজী হন। নায়েক খাঁ যখন দেখলেন যে তাঁর অন্তিমকাল আসন্ন, তখন তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজন ও কর্মচারীদের ডেকে তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বিলিয়ে দিলেন এবং সিন্দুকের মধ্যে মোহর ও টাকার বদলে লোহা ও হাড়ের টুকরো, পুরনো ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি ভর্তি ক'রে রেখে দিলেন। এইভাবে সিন্দুক ভর্তি ক'রে, শীল-মোহর ক'রে দিয়ে তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন যে সিন্দুকে যেন কেউ হাত না দেন, কারণ তাঁর মৃত্যুর পর এই সিন্দুকের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ সম্রাট শাজাহানের প্রাপ্য। নায়েক খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কথানুযায়ী সেই সিন্দুক সম্রাট শাজাহানের কাছে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সম্রাট তখন রাজদরবারে আমলা-অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে ব'সে আছেন। এমন সময় আমীর নায়েক খাঁর সিন্দুক সেখানে বহন ক'রে আনা হ'ল। আনা মাত্রই সম্রাট সকলের সামনে তাদের সিন্দুক খোলার অনুমতি দিলেন। তারপর সিন্দুকের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত দ্রব্যাদি দেখে তাঁর কি অবস্থা হ'ল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সম্রাট শাজাহান তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে দরবার ছেড়ে চ'লে গেছেন। এই হ'ল প্রথম ঘটনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একটি স্ত্রীলোকের উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচায়ক। একজন বিখ্যাত বেনিয়ানের(২) মৃত্যুর পর ঘটনাটি ঘটে। বেনিয়ান ভদ্রলোক দীর্ঘদিন সম্রাটের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন এবং মহাজনী কারবার ক'রে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পিতার সঞ্চিত অর্থের ভাগ চায়, কিন্তু বেনিয়ানের বিধবা পত্নী তা দিতে রাজী হন না। কারণ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী এবং কাঁচা পয়সা হাতে পেলে দু'দিনে যে সে ফুঁকে দেবে তা তিনি জানতেন। টাকা না পেয়ে পুত্র মায়ের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য পিতার সঞ্চিত অর্থের সংবাদ সম্রাটকে জানিয়ে দেয়। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হ'ল দু'লক্ষ টাকা। সংবাদ পেয়ে সম্রাট বেনিয়ানের বিধবা পত্নীকে ডেকে পাঠালেন। ওমরাহদের সামনে তাঁকে বললেন যে অবিলম্বে যেন তিনি এক লক্ষ টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দেন এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে দেন। এইকথা ব'লে তিনি বিধবা স্ত্রীলোকটিকে হলঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

স্ত্রীলোকটি কিন্তু সম্রাটের এই রূঢ় ব্যবহারে আদৌ বিচলিত হলেন না। জমাদাররা যখন তাঁকে হলঘর থেকে বাইরে বিতাড়িত করার জন্য উদ্যত, তখন তিনি বললেন যে তিনি সম্রাটকে আরও দু'-একটি

---

(১) বার্নিয়েরের এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাস আলোচনায় বার্নিয়েরের এই মন্তব্য প্রত্যেক অনুসন্ধানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির রীতিমত চিন্তার খোরাক যোগাবে। ভারতবর্ষে মোগল-যুগে পর্যন্ত ক্রীতদাসপ্রথা কি রকম চালু ছিল, সে সম্বন্ধেও বার্নিয়ের প্রচুর মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বিবৃত করেছেন। "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" সম্বন্ধেও বার্নিয়েরের এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ।

(২) "বেনিয়ান" কথাটি বার্নিয়েরের আমলে হিন্দু ব্যবসায়ীদের বলা হ'ত। পরে বৃটিশ আমলে বাংলাদেশে বাঙালী ব্যবসায়ী ও দালালদেরও 'বেনিয়ান' বলা হ'ত।

কথা জানাতে চান। শাজাহান শুনে বললেন: "বলতে দাও, কি বলতে চান উনি, শুনি।" স্ত্রীলোকটি বললেন: "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! আমার কনিষ্ঠপুত্র টাকা দাবী করেছে পুত্র হিসাবে। তার অধিকার আছে, সে চাইতে পারে। আপনিও দেখছি, টাকা চাইছেন। জানি না, আপনার সঙ্গে আমার মৃত স্বামীর সম্পর্ক কি? অনুগ্রহ ক'রে যদি বলেন, আপনার সঙ্গে আমার স্বামীর আত্মীয়তার সম্পর্ক কি, তাহ'লে আমি আনন্দিত হবো।" সরল স্ত্রীলোকের এই সহজ উক্তি শুনে সম্রাট শাজাহান খুব প্রীত হলেন, এবং সামান্য একজন সুদখোর ব্যবসায়ী বেনিয়ানের সঙ্গে হিন্দুস্থানের সম্রাটের আত্মীয়তার প্রশ্নে বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন: "টাকা আপনার চাই না, আপনিই নিশ্চিন্তে ভোগ করুন।"

১৬৬০ সালে, হিন্দুস্থানের ঘরোয়া যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হবার পর থেকে ১৬৬৬ সালে আমার হিন্দুস্থান থেকে বিদায় নেবার সময় পর্যন্ত, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে আমার বিবৃত করার ইচ্ছা নেই। করতে পারলে অবশ্য ভালই হ'ত। আপাততঃ কয়েকজন ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু আমি বলতে চাই। যাঁদের সান্নিধ্যে আমি এসেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার আমার আছে—এরকম কয়েকজন সম্বন্ধে এবারে কিছু আমি বলব। যাঁদের কথা বলব, তাঁরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে শাজাহানের কথা বলি। যদিও ঔরঙ্গজীব তাঁর পিতাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত কড়া পাহারার মধ্যে তাঁকে রাখতেন, তাহলেও বৃদ্ধ পিতাকে তিনি যথেষ্ট উদারতা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শাজাহানকে তিনি খুশী অনুযায়ী থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর বেগমসাহেবা, জেনানা ও নর্তকীদেরও তাঁর সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত বিলাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৃদ্ধ শাজাহান যখন যা চেয়েছেন, তখন তা-ই তাঁকে মঞ্জুর করা হয়েছে। যখন ধর্মকর্ম করার ঝোঁক হ'ল তাঁর, তখন মোল্লা-মৌলবীদেরও তাঁর কাছে কোরাণপাঠের জন্য নিয়মিত যাবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। তাছাড়া, নানারকমের জীবজন্তু—ভাল ভাল ঘোড়া, বাজপাখী, হরিণ প্রভৃতি—যখন যা তিনি তলপ করতেন, সব তাঁকে পাঠানো হ'ত। শাজাহান জানোয়ারের ও পাখীর লড়াই দেখতে ভালবাসতেন। বাস্তবিকই, ঔরঙ্গজীব বরাবর তাঁর পিতার প্রতি যথেষ্ট উদার আচরণ করেছেন, এবং কোনদিন তাঁর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেননি বা অশ্রদ্ধা দেখাননি। তিনি প্রায়ই তাঁর পিতাকে নানারকমের উপহার পাঠাতেন, গুরুতর ব্যাপারে পরামর্শও করতেন এবং অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র ভাষায় চিঠিপত্রও লিখতেন। এই আচরণের জন্যই শাজাহানের ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত স্বভাব শেষ পর্যন্ত শান্ত ও নম্র হয়েছিল। এমনকি, ঔরঙ্গজীবের প্রতি বিরূপ মনোভাবও তাঁর আর ছিল না। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি ঔরঙ্গজীবকে চিঠি লিখতেন, দারার কন্যাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং যে মূল্যবান মণিরত্ন একদিন তিনি চূর্ণ ক'রে ফেলবেন বলেছিলেন, তাও তাঁকে উপহার দিয়ে খুশী হয়েছিলেন। বিদ্রোহী পুত্রকে তিনি শেষে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছিলেন এবং আশীর্বাদও জানিয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত যা বললাম তাতে মনে হয় যে ঔরঙ্গজীব বোধ হয় সব সময় তাঁর পিতাকে খুশী করবার চেষ্টা করতেন এবং তাঁর জন্য কখন কঠোর ব্যবহার করতেন না। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। পিতাকে খুশী করার জন্য তিনি অকারণে কখন মাথা হেঁট করতেন না। বৃদ্ধ শাজাহানকে লেখা ঔরঙ্গজীবের এমন একখানা চিঠির কথা অন্তত আমি জানি যার মধ্যে তিনি তাঁর পিতার কোন উদ্ধত উক্তির প্রতিবাদে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন। এই চিঠির কিছুটা অংশ আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। এখানে তা উদ্ধৃত করছি:

"আপনার ইচ্ছা যে আমি সনাতন প্রথা আঁকড়ে ধ'রে থাকি এবং আমার অধীন যে কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার যাবতীয় ধনসম্পত্তি নিজে গ্রাস ক'রে বসি। যখন কোন আমীর বা কোন ধনী ব্যবসায়ী মারা যান, এমন কি তাঁদের মৃত্যুর আগেই, আমরা তাঁর ধনসম্পত্তি সব গ্রাস করি, তাঁদের অধীন কর্মচারী ও ভৃত্যদের পদচ্যুত ক'রে দূর ক'রে দিই। সামান্য একটুকরো সোনাদানাও আমরা ফেলে দিই না। এইভাবে অপরের সঞ্চিত ধনরত্ন আত্মসাৎ করার হয়ত একটা অস্বাভাবিক আনন্দ থাকতে পারে, কিন্তু এর মতন নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ আর নেই। আমীর নায়েক খাঁ অথবা হিন্দু বেনিয়ানের সেই বিধবা পত্নী আপনার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন এবং এই অন্যায় প্রথার যে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, তা হয়ত অবাঞ্ছনীয় বা অপ্রীতিকর হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নয় কি?

"সুতরাং আপনার অভিযোগ ও আদেশ আমি মান্য করতে পারলাম না এবং আপনি আমার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন, তাও আমি স্বীকার ক'রে নিতে অক্ষম। আজ আমি রাজতক্তে বসেছি ব'লে আপনি ভুলেও মনে করবেন না যে আমি অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গেছি। প্রায় চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালভাবে জানেন যে রাজমুকুট মাথায় ধারণ করার দায়িত্ব, অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট কতখানি। * * * * * * *

"আপনার ইচ্ছা, রাজ্যের শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সুখসমৃদ্ধির জন্য আমি বিশেষ মনোযোগ না দিই এবং তার পরিবর্তে রাজ্যের সীমানাবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধবিগ্রহের পরিকল্পনা বেশী ক'রে রচনা করি। অবশ্য একথা আমি স্বীকার করি যে প্রত্যেক শক্তিশালী সম্রাটের উচিত যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ ক'রে রাজ্যের সীমানা বাড়ানো। আমার যদি সে ইচ্ছা না থাকে তাহ'লে বুঝতে হবে যে আমি তৈমুরের বংশধর নই। সব স্বীকার করলেও আপনি আমাকে নিষ্ক্রিয় বলতে পারেন না। আমার সেনাবাহিনী যে কোন যুদ্ধই করেনি এবং রাজ্যও জয় করেনি, এমন অভিযোগও করা যায় না। দাক্ষিণাত্যে ও বাংলাদেশে আমার সৈন্যরা এদিক দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আপনাকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে শুধু রাজ্য জয় করাই শ্রেষ্ঠ রাজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়। পৃথিবীর বহু দেশ ও বহু জাতি অসভ্য বর্বরদের পদানত হয়েছে এবং অনেক দিগ্বিজয়ী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য পথের ধূলায় গুঁড়িয়ে গেছে। সুতরাং সাম্রাজ্য জয় করাই সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য নয়। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য, ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজ্য পরিচালনা করাই প্রত্যেক সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য।*

* * * *

বাংলাদেশের সুবাদার হয়ে এসে সায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিলেন। কাজটি হ'ল, বাংলাদেশকে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা। একাজের দায়িত্ব তাঁর পূর্বগামী শাসনকর্তা বিখ্যাত মীর জুমলা কেন গ্রহণ করেননি, তা তিনিই জানেন। সায়েস্তা খাঁ যে কি বিরাট দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন তা বুঝতে হ'লে তখনকার বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজ্যে বা মগদের দেশে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে তারা এখানে আশ্রয় নিত। এমন কোন অপকর্ম ছিল না যা তারা করতে পারত না। তারা নামেই শুধু খৃষ্টান ছিল, কিন্তু তাদের মতন জঘন্য পিশাচপ্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যেত না। খুনজখম, ধর্ষণ, লুণ্ঠতরাজ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। আরাকানের রাজা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের স্বার্থে। মোগলদের ভয়ে সব সময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ আশঙ্কা ক'রে এই ফিরিঙ্গী দস্যুদের তিনি নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই পর্তুগীজ দস্যুরা মগদের প্রশ্রয় ও উস্কানি পেয়ে রীতিমত যথেচ্ছাচার করতে আরম্ভ করল। বাংলার উপকূল অঞ্চলে জলপথে তারা লুণ্ঠতরাজ অত্যাচার ক'রে বেড়াতে লাগল। এইসময় গঙ্গার অসংখ্য শাখানদী দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে লুণ্ঠতরাজ করতে আরম্ভ করল। হাটবাজারের দিন গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামের লোকদের তারা ক্রীতদাস করার জন্য বন্দী ক'রে নিয়ে যেত। উৎসবপার্বণের দিনও তারা এইভাবে গ্রামাঞ্চলে হানা দিত। অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। নিম্নবঙ্গের কত শত গ্রাম এইভাবে যে তারা লুণ্ঠন করেছে এবং অত্যাচার ক'রে জনশূন্য করেছে, তার হিসেব নেই। এই ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের অনেক জনবহুল গ্রাম লোকালয়শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছে।(৩)

* * * *

এইখানেই আমার ইতিহাস শেষ হ'ল।(৪) পাঠকরা নিশ্চয় ঔরঙ্গজীবের সিংহাসন দখলের নিষ্ঠুর পদ্ধতি অনুমোদন করবেন না। আমিও করি না। না করাই স্বাভাবিক। যে কৌশলে ঔরঙ্গজীব তাঁর পিতার সিংহাসন দখল করেছিলেন, তা নিশ্চয় নিষ্ঠুর ও অন্যায় কৌশল। কিন্তু যেমন ইয়োরোপের রাজাদের আমরা বিচার ক'রে থাকি, সেইভাবে বোধ হয় ঔরঙ্গজীবকে বিচার করা উচিত হবে না। ইয়োরোপে রাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হন উত্তরাধিকার সূত্রে। জ্যেষ্ঠপুত্রের এই অধিকার সেখানে বিধিবদ্ধ। হিন্দুস্থানে সেরকম কোন আইন বা বিধান নেই। রাজার মৃত্যুর পর তাই রাজপুত্ররা সিংহাসন নিয়ে কলহ করেন, যুদ্ধবিগ্রহও করেন, কারণ তাঁরা জানেন যে যিনি সিংহাসন এইভাবে দখল করতে পারবেন তিনিই ভাগ্যবান, বাকি সকলকে সেই ভাগ্যবানের অধীনে হতভাগ্যের মতন জীবনযাপন করতে হবে। তা সত্ত্বেও যাঁরা সম্রাট ঔরঙ্গজীবকে নিন্দাবাদ করবেন, তাঁদের অন্ততঃ এইটুকু স্বীকার করা উচিত যে সমস্ত দোষত্রুটি নিয়েও তাঁর মতন একজন প্রতিভাবান, শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও মহান্ সম্রাট হিন্দুস্থানে খুব কমই জন্মেছিলেন।

* এর পর বার্নিয়েরের মীর জুমলার বাংলা ও আসাম অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মীর জুমলার পর সায়েস্তা খাঁ, ঔরঙ্গজীবের দুই পুত্র সুলতান মামুদ ও সুলতান মাজুম, কাবুলের শাসনকর্তা মহবৎ খাঁ, যশোবন্ত সিং, শিবাজী প্রভৃতির ঐতিহাসিক ভূমিকা ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই অংশের অনুবাদ এখানে করা হ'ল না, কারণ নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ ছাড়া এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। সায়েস্তা খাঁ প্রসঙ্গে মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচার সম্বন্ধে যে মূল্যবান বিবরণ বার্নিয়ের দিয়েছেন, তার সারানুবাদ করা হ'ল।—অনুবাদক।

(৩) ১৭৮০ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্র "Map of the Sunderbund and Baliagot Passages"-এর মধ্যে দেখা যায়, নিম্নবঙ্গের একটি অঞ্চল "Country depopulated by the Muggs" ব'লে উল্লেখ করা রয়েছে। বার্নিয়েরের এই বিবরণের সঙ্গে রেনেলের মানচিত্রের এই উল্লেখ আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য গঙ্গার ধারা পরিবর্তনের জন্যও প্রাচীন ভাগীরথীর তীরবর্তী অনেক জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়।

(৪) এর পর বার্নিয়েরের বিখ্যাত চিঠিপত্রগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হবে। ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে বার্নিয়েরের এই চিঠিগুলির মূল্য সবচেয়ে বেশী।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

চিত্রিতা দেবী

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥১

ব্রহ্মবাদীরা আলোচনা করেন—

এই জগতের কোন সে কারণ,
সেই কি পরম ব্রহ্ম ?
কোথা হ'তে হোল জন্ম মোদের,
কার দ্বারা বেঁচে আছি ?
কাহার মাঝারে রয়েছে মোদের প্রতিষ্ঠা ?
কার নিয়মের পরিচালনায়,
দুঃখ-সুখের পথে,
ভোগ হতে ভোগে ফিরিয়া ফিরিয়া চলি ॥১

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা ।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ
সুখদুঃখহেতোঃ ॥২

এই জগতের কোন সে কারণ,
স্বভাব, নিয়তি, কিম্বা আকস্মিক ?
সে কি মহাকাল—সেই কি পঞ্চভূত ?
—নহে, নহে, এরা নয়কো কারণ ।
—এরাও কার্য্য সবে ।
—আত্মার ফলে, ইহাদেরও সংহতি ।
—আত্মা আবার দুঃখে ও সুখে,
কর্মের ফলে বন্দী ॥২

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৩

(তর্ক বিচারে না পেয়ে তাঁহারে
ধ্যানে বসলেন তাঁরা)
ধ্যান-সাধনায় যুক্ত চিত্তে,
দেখলেন, এই কাল ও আত্মা, আর
যত সব নিখিল কারণরাশি,
যাঁহার নিয়মে চলে,
তাঁহারি স্বভাবে নিগূঢ় রয়েছে,
সেই যে ত্রিগুণা শক্তি ।
তাঁহারি কারণে হয়েছে বিশ্বসৃষ্টি ॥৩

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্ধারং বিংশতি প্রত্যরাভিঃ ।
অষ্টকৈঃ ষড়্‌ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥৪

নিখিল কারণ পরমাত্মার চক্রপ্রান্তভাগে,
রয়েছে মায়ার শক্তি ।
সে চাকা আবার ত্রিগুণের দ্বারা ঢাকা,
ষোড়শ দ্রব্যে যাহার সুবিস্তার,
অর্দ্ধশতক চক্রশলাকা, বিংশটি চক্রখিল ।
ছ'টি অষ্টক সাথে যিনি র'ন যুক্ত ।
তিনিই আবার, বিচিত্র এক
কামনার পাশে বদ্ধ ।
জ্ঞান ও ধর্ম, আর অধর্ম
যাঁহার চারণ-ক্ষেত্র ।
পুণ্য ও পাপ ভোগ হেতু যাঁর,
মুগ্ধ অহংবুদ্ধি ।
নিখিল কারণ, সেই তো
ব্রহ্মচক্র(১) ॥৪

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্ ।
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥৫

(চাকারূপে যাঁকে দেখেছেন, তাঁরে নদীরূপে করি
কল্পনা, ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিছে মন্ত্র)
—পাঁচ ইন্দ্রিয়(২) বহিয়া নদীর পাঁচটি নেমেছে ধারা,
পঞ্চভূতের বাধায় সে ধারা উগ্র ও বঙ্কিম ।

১। স্বরূপতঃ এক হলেও অনেক রূপে প্রতিভাত হ'ন বলে পরমাত্মাকে ব্রহ্মচক্ররূপে কল্পনা করেছেন। চক্র কিন্তু চলছে তার ভিতরের মায়াশক্তির দ্বারা। আর সেই চক্রে রয়েছে ত্রিবৃত, অর্থাৎ ত্রিগুণ (সত্ত্ব, রজ, তম)। পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই মোট ষোলো কলা হচ্ছে সে চাকার পরিধি। সে চাকা আবার ৫০টি শলাকা, অর্থাৎ পঞ্চাশ প্রকার বিভিন্ন জ্ঞান দ্বারা বিদ্ধ। দশ ইন্দ্রিয় ও তাহার দশটি বিষয় যেন চাকার বিংশটি খিল।—এমন যে বিশ্বরূপ বিশ্বমূল অথচ পরমদ্বৈতরূপ, তিনিই আবার পুণ্য-পাপ ভোগের জন্য এক বিচিত্র কামনা-মাখা অহংবুদ্ধির চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়েছেন।

২। চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যেন এ নদীর জলধারা—(অর্থাৎ, জলধারার মত জ্ঞান বয়ে চলে এই পঞ্চমুখে)।

পঞ্চপ্রাণের আঘাতে কঠিন তরঙ্গসঙ্কুল।
পঞ্চজ্ঞানের(৩) আদি মন যার মূল,
শব্দ, দৃশ্য ইত্যাদি সব বিষয় যাহার আবর্ত।
পঞ্চ দুঃখ(৪) যাহার তীব্র স্রোত,
পঞ্চ ভাবনা(৫) যাহার সোপান।
পঞ্চাশ রূপে ভিন্ন সে নদী।
স্মরণ করছি মোরা ॥৫

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা,
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥৬

যে মনে করেছে নিজেরে ভিন্ন পরমেশ্বর হতে,
সর্বজীবের জীবন-মরণ বিপুল ব্রহ্মচক্রে।
ভ্রান্ত সে জন, ঘুরে ঘুরে যায় আসে।
যদি কোন দিন, সেই মূঢ় তার ছিঁড়ে ফেলে,
তমোঘোর।
আপনার মাঝে করে দরশন,
সেই পরমাত্মার,
এ মর জগতে, লভে সে তখন,
পরমামৃতরস ॥৬

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥৭

বেদান্তে গাঁথা পরম ব্রহ্ম
ত্রিরূপের(৬) আশ্রয়।
অক্ষর সেই পরম সত্য চির নিজে
অধিকারী।
সাধক যাহারা, এই প্রপঞ্চ, জেনেছে,
ব্রহ্মময়।
মহাসাধনায় জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবিলীন তারা ॥৭

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥৮

অক্ষরে ক্ষর, কার্য্যকারণে, সতত যুক্ত বিশ্ব,
ধারণ করেন তিনি বিশ্বেশ্বর।
তিনিই আবার ভোগ কামনায়,
জীবরূপে হ'ন বদ্ধ।
তিনিই আবার তাঁহারে চিনিয়া লয়ে,
সংসার-পাশ হতে বিমুক্ত হ'ন ॥৮

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥৯

তিনিই অজ্ঞ, তিনিই সর্বজ্ঞানী,
অনীশ অথচ তিনিই পরমপ্রভু।
অজা(৭) প্রকৃতিই সৃজিছে নিরন্তর,
ভোগী ও ভোগ্য আর তার যত ভোগ;
বিশ্বস্বরূপ, অকর্তা আর অনন্ত সেই আত্মা,
সাধক যখন জানে, এই তিন
সেই সে পরমব্রহ্ম।
তখনই সে জন মুক্ত মৃত্যু হতে ॥৯

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ,
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ
তত্ত্বভাবাদ্—
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১০

মরণশালিনী প্রকৃতি এবং অবিদ্যাহারী হর।(৮)
দুয়েরই শাসন সেই ব্রহ্মের মাঝে।
তাঁর সাথে যোগ বার বার,
যদি ধ্যানে লাভ করে ধীর।
তবেই কেবল তাহার চিত্ত ফলিবে,
তত্ত্বভাবে।
সুখ-দুঃখময় বিশ্বমায়ার হবে
নিবৃত্তি তবে ॥১০

৩। ইন্দ্রিয়বাহিতা সকল প্রকার জ্ঞানই সংঘটিত হয় মনে। জ্ঞানাদিকারণ সেই মনই হচ্ছে এই নদীর মূল উৎস।

৪। গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু এই পঞ্চ দুঃখ যেন তার স্রোতোবেগ অথবা স্রোতের টান।

৫। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ মানস-ভাবনার দ্বারা যেন এ নদীকে ঘাটে ঘাটে বাঁধা হয়েছে।

৬। ত্রিরূপ—ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তা। সগুণ ব্রহ্মই পরমাবস্থায় গুণাতীত, অবিকারী, অবিনাশী। যাঁরা এই গুণময় জগৎ-প্রপঞ্চকে সেই গুণাতীত পরমব্রহ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত পরিবিষ্ট জেনেছেন, তাঁরাই জীবন্মুক্ত।

৭। অজা—জন্মরহিত। যার জন্ম নাই।

৮। হর—যিনি হরণ করেন, তিনিই হর।—অবিদ্যাদি হরণ করেন যিনি, তিনিই হর অথবা পরমেশ্বর।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥১১

তাঁহারে জানিলে, বাসনার পাশ,
আপনি ছিঁড়িয়া যায়।
বাসনার ক্ষয়ে ক্ষীণ হয় যত ক্লেশ।(১)
জন্মমৃত্যু প্রভৃতি তাহার সকল
দুঃখমূল।
বিনষ্ট চিরতরে।
তাঁর ধ্যানযোগে, দেহপরপারে,
চির সম্পদ লভি, পূর্ণানন্দে
সার্থক জীব রয়, ব্রহ্মের মাঝে ॥১১

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥১২

ভোক্তা, ভোগ্য এবং তাদের প্রেরণা যে ঈশ্বর।
—এ তিনই ব্রহ্মময়।
এই কথা জেনে,
আত্মস্বরূপে,
তাঁহারে লভিও ধীর।
তার পরে, আর জানিবার তরে,
কিছুই রবে না বাকী ॥১২

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধন যোনি গৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥১৩

কাঠের ভিতরে যে আগুন আছে,
তাহারে তো দেখা যায় না।
তবু তো তাহার নাহিকো বিনাশ,
অদেখা রূপেই সে রয়
কাষ্ঠ জুড়ে।

বার বার যদি ইন্ধন যোগে
ঘর্ষিত হয় কাঠ।
তবেতো আগুন, চোখেই
দেখিতে পাবে।
এই দেহময়, আত্মার রূপ,
তেমনি অদেখা জেনো,
ওঁকার ধ্যান ইন্ধন যোগে,
জ্বলে ওঠে তাহা চিত্তে ॥১৩

স্বদেহমরণিং কৃত্বা
প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্
দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥১৪

দেহরে করিও 'অরণি' কাষ্ঠ,
প্রণব উত্তরারণি।
ধ্যানমন্থনঅভ্যাস যোগে,
নিগূঢ় তাঁহার রূপ,
জ্বলিয়া উঠিবে, তবেই চিত্ত-মাঝে ॥১৪

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥১৫

সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে,
সর্পিরিবার্পিতম্
আত্মবিদ্যাতপোমূলং
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্ ॥১৬

দুধের মধ্যে মাখনের মত,
অণুতে অণুতে লিপ্ত,
আত্মা রয়েছে, সর্বব্যাপী
বিশ্বে অনুস্যূত।
সত্যসহায়ে তপোসংযোগে,
আপন আত্ম-মাঝে,
যে দেখেছে তারে, বিশ্বের সার,
অবিচ্ছিন্ন রূপে,
আত্মবিদ্যাসাধনার দ্বারা,
সে পরমশ্রেয়, চরম মোক্ষধন,
যোগীর চিত্তে গৃহীত হয়েছে,
—তেমনি পূর্ণভাবে,
যেমন পূর্ণ,
দধি মাঝে ঘৃত,
তিলের মাঝারে তৈল;
অরণি কাষ্ঠে অগ্নি,
নদীতে যেমন বহিছে জল ॥১৫—১৬।

১। ক্লেশ—পাঁচ প্রকার (পাতঞ্জলের মতে)।—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ।—অবিদ্যা—অনাত্মাদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। অস্মিতা—বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করা। রাগ—(জাগতিক) সুখাভিলাষ। দ্বেষ—দুঃখে অনিচ্ছা অথবা দুঃখভীতি। অভিনিবেশ—মৃত্যুত্রাস।

মনস্তাত্ত্বিকের চিঠি

অখিলমোহন পট্টনায়ক

কাফে ডি বলভেডির ২৪ নভেম্বর।

অন্তরের সুজাতা,

বাইরে প্রচণ্ড শীত, হিমালয়ের তুহিন-শয্যা যেন বাষ্প হয়ে বাতাসের প্রতি রেণু সিক্ত করে তুলছে। এস্কিমোর মত প্রায় সমস্ত দেহ লোম-আবৃত করে আমি রেস্তোরাঁর এক কোণে অপেক্ষা করে বসে আছি। কা'র অপেক্ষায় আছি? আমি জানি না—এ অপেক্ষা বুঝি কেবল অপেক্ষা করার জন্যই।

আজ সারা দিন আমি বাইরে ছিলাম। রেস্তোরাঁর এই স্বল্প-আলোকিত নিভৃত কোণে আমাকে হঠাৎ আবিষ্কার করে 'মোদি' আজকের চিঠি দিয়ে গেল। প্রতিদিনের চিঠি সামনে ছড়িয়ে আমি ভাবি—তুমি চিঠি দিয়েছ। কিন্তু আমি জানি তুমি চিঠি দেবে না। তোমার চিঠিগুলো সত্যি আমি এত ভালবাসতাম! কত উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষায় থাকতাম!…থাকবোও।

না, তুমি চিঠি দাওনি। আমার অনুমান নির্ভুল। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ আর একটি চিঠি পেয়েছি। বহু দূরাগত।

চিঠির মর্ম লেখার পূর্বে তোমাকে প্রথমে লিপি-রচয়িত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

বান্ধবী বললে ভুল বলবো—তিনি আমার এক জন হিতাকাঙ্ক্ষিণী। যেহেতু তিনি আমার অলক্ষ্যে—আমার মত এক জন লোকের মঙ্গল কামনা নিঃস্বার্থপর ভাবে প্রায়ই করে থাকেন। তাই আমি তাঁকে উদারহৃদয়া বলে বলি।

উদারহৃদয়া হওয়াটা যে চরম নির্বোধতা এ বিষয়ে আমি তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছি। কিন্তু যে নির্বোধ, সে কি তার নির্বোধতা বুঝতে পারে?

তার নাম মঞ্জুলা।

সব চেয়ে ভালো লাগে মঞ্জুলার বড় বড় গোল গোল চোখ। ঠিক বলদের চোখের মত বিশাল, শান্ত আর নিরীহ। মঞ্জুলার দুই প্রশান্ত চোখের দিকে তাকালে আমার সর্বদা মনে হয়, এ চোখ যেন কেবল অভিমান করার জন্য স্বতন্ত্র তৈরী। সত্যি, সুজাতা, চমৎকার অভিমান করা যায় মঞ্জুলার চোখে।

মঞ্জুলা আসন্নযৌবনা; সে যার সামনে বিরহিণী—অভিমানিনীর চোখ নিয়ে দাঁড়াবে, সে আমি নই।

সেদিন কিন্তু যেন আনন্দে ভেঙে পড়ছিল তার চাহনি। ছন্ন হরিণীর চঞ্চল চোখ নিয়ে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হালকা ভাবে জিজ্ঞাসা করল—'আমি জীবনে কি করতে পারি? অথবা কি করলে ভাল হয়, এমন কিছু বলতে পারেন?'

আমি যে কি উত্তর দেব—সে জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটা খেয়ালের বশে হঠাৎ বলে ফেললাম—আমি খুব নিকটে টুপীর মস্ত ব্যবসা খুলছি। তুমি আমার শো-কেসে 'ডমি' হয়ে দাঁড়াবে—আর তোমার মাথার উপরে একটার পর একটা ফেল্ট ক্যাপ রেখে আমি বিক্রী করবো। প্রচুর বিক্রী হবে কিন্তু।

মঞ্জুলা বুদ্ধিমতী। সে কথায় শ্লেষ মিশিয়ে বললে—চমৎকার পরিকল্পনা আপনার। আমি প্রস্তুত আছি। জুতোর দোকান করলে কিন্তু আমায় ভুলবেন না যেন। টুপীর জন্যে যেমন মাথা, জুতোর জন্যে তেমনি আমার পা কাজে লাগতে পারে। কথাটা বলে দিয়েই দৌড়ে যেতে যেতে খিলখিল্ করে হেসে ওঠে মঞ্জুলা। আমাকে সে একটা ঠিক মতো জবাব দিতে পেরেছে বলে। মঞ্জুলাকে কাছে ডেকে তার কানে কানে চুপি চুপি বললাম—'যেদিন তোমার চরণযুগলকে পুঁজি করে আমি জুতোর দোকান আরম্ভ করবো, সেদিন সে দোকানের কি নামকরণ করবো জান মঞ্জুলা?'

মঞ্জুলা চোখে প্রশ্নবাচক দৃষ্টি তৈরী করে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

আমি বললাম—পাদুকালয়। এত হাসতে আর কখনও দেখিনি মঞ্জুলাকে।

এই মঞ্জুলা আজ বহু দিন পরে বহু দূর হতে চিঠি লিখেছে। সে লিখেছে—তার যেমন একটি বই আছে, একটি কলম আছে—আর একটি বিড়াল আছে, ঠিক সেই রকম তার নিতান্ত নিজস্ব ফরমাস-করা একটি গল্প সে আমার কাছ থেকে চায়। যে গল্প সে তার বন্ধু-মহলে দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে বলতে পারবে—এ আমার গল্প।

ঠিক এই কথা এত দূর-দেশে আজ অনেক দিন পরেও তোমার কথা মনে করিয়ে দিল। তুমি আমার লেখা ভালবাস—আর ঠিক এই নিরীহ মঞ্জুলার মত তুমিও একদিন আমার কাছে গল্পের দাবী করেছিলে। তোমায় দিইনি। মঞ্জুলাকেও দিতে পারবো না। সে আমার চেয়ে আমার গল্প বেশী ভালবাসে তাকে আমি কি করে ক্ষমা করতে পারি?

মঞ্জুলা আরও আন্তরিক শুভ কামনা জানিয়েছে। 'আপনার কলমের জয় হোক্। আপনার যেন সোনার দোয়াত-কলম হয়।' নির্বোধ মঞ্জুলা কি জানে, এই ধনহীনের জীবনে যদি কখনও তার দোয়াত-কলম অকস্মাৎ সোনার হয়ে যায়, তবে সে সর্বপ্রথমে সোনার দর কমে যাওয়ার পূর্বে সেগুলো বিক্রী করে তার জন্যে আরও কিছু শীতের কাপড় তৈরী করিয়ে নেবে।

* * * *

এখানকার কথা বলি।

আজ সন্ধ্যায় হ্রদের ধারে বসে রয়েছিলাম। আমার মত অসংখ্য নর-নারীও বসে আছে। বিভিন্ন পরিধানে—বিভিন্ন পরিবেশের মাঝে। উলার হ্রদের কূলে এ সন্ধ্যা শুধু আমার নয়—সকলের।

মুহূর্তের জন্য সকলে যেন স্থির হয়ে রইল। কি এক বিরাট ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় বেলা-বিহারী সমস্ত জনতা যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। সূর্য্য অস্তাচল স্পর্শ করেছে। অস্তাচল! নয় পৃথিবী নয় আকাশ। এ যেন ক্যানভাসের উপরে কোন অপরিপক্ব শিল্প-আর্টিষ্টের অযথা রঙের বাহুল্য। প্রচুর রঙ! সেই উজ্জ্বল লাল রঙ এসে পড়েছে শায়িতা হ্রদ-নায়িকার কৃষ্ণ-নীল কবরীর উপরে। কিন্তু যেন সুষুপ্তির কোলে মূর্চ্ছিতা হয়ে এলিয়ে পড়েছে তন্দ্রাতুরা নায়িকা। সূর্য্যের আরক্ত চুম্বনেও তার স্বপ্নভঙ্গ হয় না। মোহমুগ্ধা কামিনীর ন্যায় তবুও ঘুমিয়ে থাকে উলার হ্রদ—স্থির—নিশ্চেষ্ট।

কিন্তু এ কি হ'ল! আরক্ত রঙ! চোখের সামনে চোখের নিমেষেই যেন অসংখ্য মেঘ হোরি খেলে লাল হয়ে গেল। কত দূরে—মাঝের আকাশে দিশেহারা নিরালা শ্বেত মেঘমালার পক্ষেও রঙ লেগেছে। কপোতযূথের ন্যায় একসঙ্গে অসংখ্য সুবর্ণপরী যেন আকাশের কোণে কোণে লঘুপক্ষে ভেসে যাচ্ছে।

হায় রে, দুর্বল লেখনী! ক্ষমা করো সুজাতা। কি করে আমি বর্ণনা করবো আজকের এই বর্ণ-উৎসব!

আমার নিকটের সোনার রেখায় চিত্রিত ক্ষুদ্র তরীটির অন্য ধারে দুটি বিদেশী তরুণ-তরুণী বসে আছে। তরুণীটির খোলা পায়ের ধারে ধারে কে যেন সোনার-আলতা মাখিয়ে দিয়েছে। কি আশ্চর্য্য! দেখ—সামনে চেয়ে দেখ! হিমালয়ের শুভ্র তুষার-মুকুটেও দাউ-দাউ আগুন লেগে গেছে। না—আগুন নয়—সুবর্ণ—সুবর্ণ-কিরিটী হিমালয়। আজ বুঝি হিমালয়-কন্যার জন্ম-উৎসব।

চারি দিকে শুধু সোনা আর সোনা! আমার হাত, আমার পরিধেয় সব যেন সোনা হয়ে গেছে। কেউ জিজ্ঞাসা করছে না? কেউ কৌতূহলী নয়? কোথা হতে এল এত সুবর্ণ? কিং মিডাসের অক্ষয় স্বর্ণভাণ্ডার কারা যেন লুঠে নিচ্ছে। আজ যদি আমার কাছে বসে থাকত কৃপণ কিং মিডাস, তবে তার সুবর্ণের অপব্যয় করা হচ্ছে বলে সে কি বলতো না?

ক্ষমা করবে। সামান্য কবিত্ব করলাম। আমি কবি নই, মুহূর্তবার সুইজরল্যাণ্ড-সূর্য্যাস্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এতগুলো লিখে ফেলেছি।

ক্ষণিকের ন্যায় ফুরিয়ে গেল এ বর্ণ-উৎসব। তার পর অন্ধকার। আকাশে কয়টি শঙ্কিত তারা উদয় হয়ে আসছিল।

আমি ভাবছিলাম তোমার কথা। সেই মুহূর্ত্তে তুমি যদি থাকতে আমার পাশটিতে, তবে তোমার সেই স্বর্ণ কেশগুচ্ছকে আমি কি তৃপ্তি···কি আনন্দে আঘ্রাণ করতাম!

ঠিক আমার পাশের ডিঙির অন্য ধারে সেই দুইটি ভিনদেশী তরুণ-তরুণী বসে আছে। ইস্! কত অল্প পরিচ্ছদ তাদের পরিধানে। কিন্তু স্বাস্থ্যবতী যুবতীটির বিস্তারিত দুই নগ্ন বাহু সুন্দর লাগছে দেখতে। তারা বোধ হয় আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি সংগ্রহের জন্য বসে আছে।

আরও অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারা দু'জন ডিঙির ভিতরে চলে গিয়ে নিজেদের আমার দৃষ্টিসীমা থেকে নিরাপদ করে নিয়েছে।

তারা কথা কইছে। মাঝে মাঝে তরুণীটির অকুণ্ঠিত হাসির হিল্লোল ভেসে আসছে। তাদের ভাষা আমি বুঝি না। কিন্তু তবুও আমি জানি তারা পরস্পরকে আদর করছে। তাদের অস্ফুট গুঞ্জন থেকে আমি বুঝতে পারছি একে অপরের সান্নিধ্যে মুগ্ধ।

তুমি ত শুনেছ পারাবত-দম্পতীর প্রেমগুঞ্জন? তুমি ত শুনেছ বিরহিণী কপোতীর বৃক্ষশাখায় কাতর বিলাপ? কি ভাষা বলে তারা? ভালোবাসার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন হয় না। সে ভাষা দেশ-কালের সীমা লঙ্ঘন করে মুক্ত, বন্ধনহীন; সহজ আর সার্ব্বজনীন।

হ্রদের কূলে বসে বসে একা আর দর্শন-চর্চায় প্রীতি এল না। অল্প সময়ের পরে এই রেস্তোরাঁয় ফিরে এসেছি।

কাফে ডি বলভেডির। আজব জায়গা এই রেস্তোরাঁ—আর এখানে পাওয়া যায় অনেক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ার।

আমি সর্বদা এই নিরালা কোণটিতে বসতে অভ্যস্ত। এখানকার Frequenters-রাও আমাকে এখানে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। প্রায় দশটা বাজবে। এখনও কেন শেখ মনসুর এল না! আজ পুরা একটা দিন সে নিয়েছে তার চাল ভাবতে—আমার ঘোড়ার

জন্ম একটা চমৎকার স্কোয়ার খালি ছিল। ওঃ, সে যদি সেটা গার্ড করে না থাকে তবে আজ আর রক্ষা নেই মনসুরজী—কিস্তিমাৎ। আর তার পরে মনসুরের হাতে তৈরী একটি ককটেল···আর একখানা বিভারিআন সিগার।

মনসুর চমৎকার ককটেল তৈরী করে। আর আমি যখন উর্দ্ধবাহুতে পাত্রটি তুলে ধরে অতি গম্ভীর স্বরে তোমার দীর্ঘ—দীর্ঘজীবন কামনা করি, তখন মনসুরও ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে। সে তার দাড়ির ঝোপের ভিতর থেকে দুটো কালো কালো ঠোঁট মেলে বলে—আমেন!

মনসুর সমঝদার। মনসুর আমার দাবা খেলার দোস্ত। আমরা দু'জন এক বোতলেরই ইয়ার। অন্য চিঠিতে লিখবো মনসুরের কথা, বিস্তৃত করে।

মনসুর এল না।

দুটো পেগ খেয়েও শরীরের সাধারণ উত্তাপ ফিরোস বলে মনে হয় না। খেতে যাওয়ার আগে হয়ত আরও একটি পেগ খেতে হবে। (তুমি থাকলে আমাকে এ পেগের জন্যে অনুমতি দিতে কি না সন্দেহ।)

রেস্তোরাঁ জমে আসছে। নৈশ আমোদ-সন্ধানীর দল ধীরে ধীরে এসে আসর জমিয়ে নিতে আরম্ভ করেছে। এই নেলী আসছে তার দুই সুনীল চোখে তার অতিথিবৃন্দকে সমীক্ষা করে করে।

তুমি নেলীকে চেনো না, না সুজাতা? আসছে বারে পরিচয় করিয়ে দেব।

ধীরে ধীরে রেস্তোরাঁর বায়ুমণ্ডল বদলে যাচ্ছে। এক দল নিচ্ছে বিদায়—অপর দল আসছে নতুন পোষাকে নতুন নেশা নিয়ে। অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমাকে শীঘ্রই শেষ করতে হবে চিঠিটা।

নেলী আমার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে তার ইংরিজীতে ফরাসী টান দিয়ে আমাকে বিব্রত করছে, বলছে—মঁসিয়ে, আপনার প্রেয়সীর জন্য ডাকবাহী উড়োজাহাজ আর অপেক্ষা করতে পারবে না। .

ষ্টুপিড!

আপাততঃ সুরাত্রি সুজাতা!

তোমার
মনস্তাত্ত্বিক।
অনুবাদিকা—গীতা দাস মহাপাত্র।

চীনা ফেরিওয়ালা

মহাদেবী বর্মা

চীনাদের মধ্যে স্মরণ করে রাখার মত চেহারার তফাৎ আমার চোখে কমই পড়ে। সব মুখেরই প্রায় এক রকম গড়ন—সবই এক ছাঁচে ঢালা মনে হয়। আর সে সব মুখের ওপর কাপড়ের কুঞ্চনের মত যে নাকটি রয়েছে, তার গড়নেও বিশেষ তফাৎ নেই। তারছা, আধ-খোলা চোখের তরল রেখাকৃতি দেখে এই ভ্রম হয় যে সবই এক মাপে ধারালো কিছু দিয়ে চিরে তৈরী করা হয়েছে। স্বাভাবিক পীতবর্ণ রোদে পুড়ে আর ধুলোর আবরণে কিছুটা লালচে রঙের শুকনো পাতার মত দেখতে হয়েছে। আকার-প্রকার, বেশ-ভূষা—সব মিলে এই দূরদেশীয়দের যন্ত্রচালিত পুতুলের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দেয়। সেই জন্য অনেক বার দেখার পরও এক জন চীনা ফেরিওয়ালাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে মনে রাখা কঠিন।

কিন্তু আজ এই একরূপ মুখের সমষ্টি থেকে একখানি মুখ আর্দ্র নীল চক্ষুর সংগে স্মরণে আসছে। তার মৌন ভংগিমা যেন বলতে চায়—আমি কার্বনের কপি নই। আমারও কিছু বলার আছে। যদি জীবনের বর্ণমালা সম্বন্ধে তোমার দৃষ্টি নিরক্ষর না থাকে তবে পড়ে দেখো।

· কয়েক বছর আগেকার কথা। আমি টাংগা থেকে নেবে ভিতরে আসছিলাম আর ধূসর রঙের কাপড়ের গাঁট বাঁ-কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে ডান হাতে লোহার গজ ঘোরাতে ঘোরাতে চীনা ফেরিওয়ালা ফটক থেকে বেরোচ্ছিল। সম্ভবতঃ আমার ঘর বন্ধ দেখে ও ফিরে যাচ্ছিল। "কিছু নেবেন মেমসাব?"—হতভাগাটা বলে উঠল। ও কি জানে ঐ সম্বোধন আমার মনে রোষের কি প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলে দেয়? মাইয়া, মাতা, জীজী, দিদিয়া, বিটিয়া ইত্যাদি কত সম্বোধনের সংগে আমার পরিচয় আছে আর এর সবগুলিই আমার পক্ষে প্রিয়, কিন্তু এই বিজাতীয় সম্বোধন আমার সমস্ত পরিচয় ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে যেন গাউনের মধ্যে খাড়া করে দিল। তাই এই সম্বোধনের পরে আমার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে যাওয়াই তখন ওর পক্ষে এক রকম স্বাভাবিক ছিল। আমি অবজ্ঞা ভরে উত্তর দিলাম—"আমি ফরেন (বিদেশী জিনিস) কখনো কিনি না।" "আমি কি ফরেন? আমি তো চীন থেকে আসছি"—বক্তার কণ্ঠস্বরে সরল বিস্ময়ের সঙ্গে উপেক্ষাজনিত আঘাতের রেশও পাওয়া গেল। এবার একটু থেমে উত্তরদাতাকে ভালো করে দেখার ইচ্ছা হ'ল। ধুলো ভরতি সাদা ক্যানভাসের জুতোয় ছোট পা দু'টি ঢেকে, পাৎলুন আর পায়জামার সমন্বয়ে তৈরী এক অদ্ভুত পায়জামা আর কুর্তাতে কোটেতে মেলানো এক অভিনব পোষাক পরে, ছেঁড়া হ্যাটে অর্দ্ধেক মাথা ঢেকে গুম্ফশ্মশ্রুহীন রোগা বেঁটে যে মূর্তি সামনে এসে দাঁড়াল—এ তো শাশ্বত চীনার মূর্তি। অন্য সকলের থেকে আলাদা করে তাকে দেখার প্রশ্ন জীবনে এই প্রথম এল।

সে বিদেশী, আমার উপেক্ষায় হয়ত আহত হয়েছে ভেবে আমার 'না'টাকে একটু মোলায়েম করার চেষ্টা করতে হ'ল। "আমার কিছুই চাই না ভাই"—বলতেই চীনাও সংগে সংগে বলে উঠল, "ভাই যখন বলেছ, তখন নিশ্চয়ই নেবে, নিশ্চয়ই নেবে—হ্যাঁ?" হোম করতে গিয়ে হাত পুড়ে যাবার যে প্রবাদ আছে তাই ঘটল। নিরুপায় হয়ে বলতেই হ'ল—"কি আছে দেখি তোমার?" চীনা বারান্দায় কাপড়ের গাঁট নামাতে নামাতে বলে চলল—"খুব ভালো সিল্ক এনেছি সিস্তর, চায়না সিল্ক, ক্রেপ।" অনেক দরাদরির পর দু'খানা টেবলক্লথ কিনতেই হ'ল। ভাবলাম—যাক্, বাঁচা গেল। এত কম বিক্রী হবার পর চীনা কখনো এদিকে আসার মত ভুল আর করবে না।

কিন্তু দিন পনের পরই আবার ওকে দেখা গেল—বারান্দায় সিঁড়ির গাঁটের ওপর বসে গজটাকে মেজের ওপর ঠুকে-ঠুকে গুন্‌গুন্ করছে। ওকে কিছু বলার অবসর না দিয়েই ব্যস্ত ভাবে বললাম—"এখন তো কিছু নেব না, বুঝেছ?" চীনা উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কি একটা বার করতে করতে খুশী হয়ে বলে উঠল—"সিস্তরের জন্য স্বাস্কী নিয়ে এসেছি, খুব ভালো জিনিস, সব বিক্রী হয়ে গেছে। আমি কয়েকখানা পকেটে করে লুকিয়ে নিয়ে এসেছি।"

দেখলাম কয়েকখানা রুমাল। বেগ্‌নি রঙের সুতোয় প্রত্যেকটি ধারে কাজ করা আর কোণায় ঐ রঙেরই তৈরী ছোট্ট ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়ি যেন চীনদেশীয় নারীর কোমল অঙ্গুলির কলা-নৈপুণ্যই শুধু নয়—তাদের জীবনে যে অভাববোধ রয়েছে তারও করুণ কাহিনী ব্যক্ত করছে। আমার মুখের নিষেধাত্মক ভাব লক্ষ্য করে নিজের নীল রেখাকৃতি চোখ দুটি তাড়াতাড়ি বুজে ফেলে আবার চট্ করে খুলতে খুলতে এক নিশ্বাসে বার বার করে বলতে লাগল—"সিস্তরকা ওয়াস্তে—সিস্তরকা ওয়াস্তে।"

মনে মনে ভাবলাম—বাঃ, আচ্ছা ভাই পাওয়া গেল! শৈশবে সবাই আমাকে চীনা বলে ক্ষ্যাপাত। সন্দেহ হতে লাগল ঐ ঠাট্টার মধ্যে হয়তো সত্যও কিছু ছিল, তা নয় তো আজ এই সত্যিকারের চীনা সারা এলাহাবাদে আমার সংগেই বোন সম্বন্ধ পাতাতে এলো কেন? তবে সেই দিন থেকে আমার বাড়ীতে যখন-তখন আসার বিশেষ অধিকার ও পেয়ে গেল। চীনের সাধারণ লোকও যে কলা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখে, চীনের রুচিবোধ থেকে এ ধারণাও আমার প্রথম হ'ল।

নীল রঙের দেয়ালে কোন্ রঙের ছবি সুন্দর দেখাবে, সবুজ কুশনের ওপর কি রকম পাখী ভালো মানায়, সাদা পর্দার কোণায় কি ধরণের ফুলপাতা বেশী খুলবে—ইত্যাদি বিষয়ে যে কোনো উৎকৃষ্ট কলাবিদের মত জ্ঞান ওরও ছিল। রঙের সম্বন্ধে ওর অতি-পরিচয় এই বিশ্বাসই জন্মিয়ে দিত যে, চোখ বেঁধে দিলে ও কেবল মাত্র স্পর্শের সাহায্যেই রং চিনতে পারে।

চীনের বস্ত্র, চীনের চিত্র আদির বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখে ভ্রম হয় যে, হয়তো ওখানকার মাটির প্রতিটি কণাও নানা রঙে রঙিন। চীন দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই—'সিস্তরকে নিয়ে আমি যাব'—বলতে বলতে ওর চোখের নীল রেখা প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিজের কথা শোনাবার জন্যে ও খুবই উৎসুক, কিন্তু বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ভাষার ব্যবধান যে খুবই গভীর। চীনা আর বর্মী ভাষাই ও জানত, কিন্তু ঐ দুটো ভাষাতেই আমার জ্ঞান বিন্দুমাত্রও ছিল না। ইংরিজির ক্রিয়াহীন বিশেষ্য আর হিন্দুস্থানীর বিশেষ্যহীন ক্রিয়ার সম্মিশ্রণে যে বিচিত্র ভাষার সৃষ্টি হ'ত, তাতে সবটুকু কথার মর্ম বোঝা যেত না। কিন্তু যে কথাগুলি হৃদয়ের বাঁধ খুলে ছুটে বেরিয়ে আসে, সেগুলি প্রায়ই করুণ হয়, আর করুণার ভাষা শব্দহীন হয়েও ভাব ব্যক্ত করতে পারে। চীনা ফেরিওয়ালার জীবন-কাহিনীতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

ওর মা-বাবা যখন ম্যাণ্ডেলেতে এসে চায়ের ছোট দোকান খুলল, তখন ওর জন্ম হয়নি। ওকে জন্ম দিয়েই সাত বছরের দিদির সংরক্ষণে ছেড়ে যিনি পরলোকে চলে গেলেন—সেই অদেখা মায়ের প্রতি চীনার শ্রদ্ধা ছিল অটুট। সম্ভবতঃ মা এমনি জিনিস যাকে কখনো না দেখেও মানুষ এ ভাবে স্মরণ করতে পারে যেন তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে বাকী নেই। এটা স্বাভাবিকও বটে।

বাপ যখন আরেকটি বর্মীচীনা স্ত্রীকে গৃহিণী পদে অভিষিক্ত করলেন তখন থেকেই এ দুটি মাতৃহীন শিশুর জীবনে দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল। দুর্ভাগ্য ওদের, কিন্তু এটুকুতেই কেবল সন্তুষ্ট হতে পারল না, কেন না ও পাঁচ বছরে পড়তেই এক দুর্ঘটনায় ওর পিতাও প্রাণ হারালেন।

অন্যান্য অবোধ বালকের মত ও সহজেই নিজের নতুন অবস্থার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিল। কিন্তু দিদি ও সংমার মধ্যে কোনো এক ব্যাপারে মনোমালিন্য বাড়তে থাকায় ওর জীবন ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে উঠল। কিশোরী বালিকার অবজ্ঞার প্রতিশোধ নেওয়া হ'ত ওকে নয়, ওর অবোধ ভাইকে কষ্ট দিয়ে! অনেক বার ও দিদির সঙ্কুচিত কম্পমান আঙুলের মধ্যে নিজের হাত রেখে, দিদির ময়লা কাপড়ে নিজের অশ্রুধৌত মুখখানি লুকিয়ে সেই ছোট্ট কোণটিতে বসে খিদের কষ্ট ভুলেছে। কখনো আবার ভোর বেলা দিদির ভেজা চুলের মধ্যে নিজের কুঁকড়ে-যাওয়া আঙুলগুলি গরম করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বাবার কাছে যাবার রাস্তা কোন্ দিকে তাই জানতে চেয়েছে। উত্তরে দিদির পাণ্ডুর গাল বেয়ে বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়তে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠেছে যে, ও তো কাহোয়া (চায়ের মত জিনিস) খেতে চায়নি, কেবল বাবাকে একবারটি দেখতে চেয়েছে।

কত বার পাড়া-পড়শীদের ঘরে বাসন মেজে কি অন্য কোনো কাজ করে ভাত চেয়ে এনে বোন ভাইকে খাইয়েছে। ব্যথা কোন্ অন্তিম মাত্রায় পৌঁছে যে বোন তার ছোট হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে ফেলেছিল—এ অবোধ বালক তার কি জানে! এক রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিদির প্রতীক্ষা করতে করতে সে অর্ধেক চোখ খুলে দেখতে পেল—কুশল বাজীকরের মত বিমাতা তার দিদির চেহারা বদলে দিচ্ছে। ওর শুকনো ঠোঁটে মোটা মোটা আঙুল দিয়ে লাল রঙ মেখে দিল, চওড়া হাতের চেটোয় লাল ও গোলাপী রঙ মাখিয়ে বোনের ফিকে গাল দুটিতে ঘষিয়ে-ঘষিয়ে মাখাল, ওর রুক্ষ চুলগুলো কর্কশ হাতে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধল, তার পর নতুন রঙীন কাপড় সাজিয়ে সেই মূর্তিটিকে নিয়ে যেন ঠেলতে ঠেলতে বিমাতা রাতের অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিতা হ'ল।

বালকের বিস্ময় প্রথম ভয়ে পরিণত হ'ল। আর শেষে কান্নার শরণ নিল। এ ভাবে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি—হঠাৎ যখন সে কারো স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠল তখন দেখল যে বোন ভাইয়ের মাথায় মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কান্না থামাচ্ছে। সেদিন ও ভালো খেতে পেল, পরের দিন পেল কাপড়, তার পরের দিন এল খেলনা। কিন্তু বোনের গায়ের রঙ দিন দিন বিবর্ণ হয়ে যাওয়াতে ওর ঠোঁটে আরো গাঢ় রঙের প্রলেপ দেওয়া দরকার হ'ল, গালের পাণ্ডুরতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় অনেক পর্যন্ত পাউডার ঘষা হ'তে লাগল।

বোনের শরীর যে দিন দিন ক্ষীণ হচ্ছে, শক্তিও ক্রমশঃ ক্ষয় পাচ্ছে—বালক সেটা অনুভব করল। কিন্তু কাকে বলবে, কি করবে, এ তো ওর বুদ্ধির অগোচর। বার বার ভাবত, বাবার দেখা পে

সব ঠিক হয়ে যায়। ওর স্মৃতিপটে মায়ের কোনো চিহ্নই নেই, কিন্তু পিতার যে অস্পষ্ট চিত্র অংকিত ছিল তার থেকে তাঁর স্নেহশীল হওয়া সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিল না। প্রতিদিন ভাবত—দোকানে যারা আসে তাদের প্রত্যেককে বাবার কথা জিজ্ঞেস করবে, তার পর একদিন চুপচাপ ওঁর কাছে গিয়ে ওঁকে ধরে নিয়ে আসবে। তখন সংমা কত ভয় পেয়ে যাবে আর বোন যে কী খুশীই না হবে!

চায়ের দোকানের মালিক ছিল তখন অন্য লোক, কিন্তু পুরানো মালিকের পুত্রের সঙ্গে তার ব্যবহার কম সহৃদয় ছিল না। সেই কারণেই বালক সংকুচিত ভাবে দোকানের একটি কোণায় দাঁড়িয়ে রইল, আর যারা দোকানে এল তাদের প্রত্যেককে তোৎলাতে তোৎলাতে বাবার ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে লাগল। শুনে কেউ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল, কেউ বা মুচকে হেসে চলে গেল, আবার দু'-এক জন দোকানের মালিককে এমন সব কথা বলল যার ফলে সে বালকটিকে হাত ধরে টেনে বাইরে এনে খুব বকে দিল। এ ভাবে ওর পিতার খোঁজেরও অন্ত হ'ল।

বোনের সেই সন্ধ্যা হতেই বেশ পরিবর্তন, আবার অর্দ্ধেক রাত কেটে গেলে ফিরে আসা, বিপুল দেহ নিয়েও সংমায়ের সেই বুনো বেড়ালের মত হাল্কা পায়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আসা, বোনের শিথিল হাত থেকে বটুয়া ছিনিয়ে নেওয়া আর ভাইয়ের মাথার ওপর মুখ রেখে বোনের স্তব্ধ ভাবে পড়ে থাকা—এ সবই যেমন ছিল তেমন চলতে লাগল।

কিন্তু একদিন দিদি আর ফিরে এল না। সকালে সংমাকে চিন্তিত ভাবে তাকে খুঁজতে দেখে বালক কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিউরে উঠল। বোন—ওর একমাত্র আশ্রয় বোন! বাবাকে তো খুঁজেই পেল না—এখন বোনও হারিয়ে গেল। তখন ও যে অবস্থায় ছিল সে ভাবেই বোনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। রাত্তির বেলাও দিদি যে রূপে পরিবর্তিত হয়ে যেত, দিনের বেলা সে ভাবে তাকে দেখলে চিনতে পারা কঠিন হবে—এই ভেবে যাকেই ভালো কাপড় পরে যেতে দেখছে তার কাছে এগোবার জন্যে রাস্তার এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত অনবরত দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। কখনো কারোর গায়ে ধাক্কা লেগে পড়তে পড়তে বেঁচে যেত, আবার কারোর কাছে গালাগাল খেত খুব—কেউ বা সদয় ভাবে প্রশ্ন করে বসত—কি কাণ্ড—এত্তোটুকুন ছেলে পাগল হ'ল কি?

এ ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ও পকেটমারের হাতে পড়ল আর তখন ওর এক আলাদা ধরণের শিক্ষা শুরু হ'ল। লোকে যেমন কুকুরকে দু'পায়ে বসা, ঘাড় উঁচু করে দাঁড়ানো, মুখের ওপর থাবা রেখে সেলাম করা ইত্যাদি শেখায় সেভাবে ওকেও সেই তামাকের ধোঁয়ায় দুর্গন্ধ ঘরে, ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা বাসন আর নোংরা লোকদের সঙ্গে বদ্ধ থেকে বিশেষ সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে হাসি-কান্নার অভিনয়ে নৈপুণ্য লাভ করতে হ'ল।

কুকুরছানার মত করেই ও হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়াত আর হাসি-কান্নার নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী অভ্যাস করত। হাসির স্রোত ওর ভিতর থেকে এভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল যে, অভিনয়েও ওর বার বার ভুল হ'ত আর মার খেত। কিন্তু কান্না ওর ভিতরে এভাবে গুমরে থাকত যে একটু মুখ বিকৃত করতেই দুই চোখ বেয়ে দুটি বড় বড় জলের ফোঁটা নাকের দু'ধার বেয়ে নেবে আসত আর সমান্তরাল রেখায় মুখের দুই ধার ছুঁয়ে চিবুকের নীচ পর্যন্ত চলে যেত। এ ব্যাপারটিকে নিজের দুর্লভ শিক্ষার ফল মনে করে শিক্ষক মশায় খুশীতে লাফিয়ে উঠে ওকে পুরস্কার দিতেন একটি লাথি।

সেই দল বর্মা, চীন, শ্যাম ইত্যাদি নানাদেশীয় লোকের সংমিশ্রণে তৈরী ছিল। কারোর কোনো জিনিস হারালেই ওর ওপর এভাবে সন্দেহের বৃষ্টি শুরু হ'ত যে, না চুরি করেই ও চোরের মত কাঁপতে থাকত। তার পরে ওর যে শাস্তি হ'ত তা স্মরণ করে আজও চীনার চোখ দুটি ব্যথা ও অপমানের আগুনে ধ্বক্-ধ্বক্ করে জ্বলতে থাকে।

সকলের খাওয়া হয়ে গেলে উচ্ছিষ্টটুকু একটি কলাই-করা তোমড়ানো পাত্রে রেখে—সিগারেটের আগুনে জায়গায় জায়গায় পুড়ে যাওয়া এক টুকরো কাগজে ঢেকে রেখে দেওয়া হ'ত আর সবুজ চোখওয়ালা কালো বেড়ালটির সঙ্গে বসে ও সেগুলি খেত।

অনেক রাত পর্যন্ত ওর সেই নরকের সাথীরা একের পর একে ফিরত আর ও যেখানে আগুনের হাঁড়ির পাশে কুঁকড়ে শুয়ে থাকত সে পথ দিয়ে যাবার সময় ওকে মাড়িয়ে দিয়ে যেত। ওদের পায়ের শব্দ শুনে লোক চেনার অভ্যাস ওর খুব ভালো ভাবেই হয়ে গিয়েছিল। যে হালকা পায়ে তাড়াতাড়ি আসে ওর সেদিন অনেক কিছু লাভ হয়েছে, আর যে শিথিল পা দুটি টেনে-টেনে ঘরে ঢোকে সে খালি হাতে এসেছে বুঝতে হবে। যে দেয়াল হাৎড়ে হাৎড়ে পা বাড়ায়, সে সেদিনকার সব উপার্জন মদেই শেষ করে বেহুঁশ হয়ে এসেছে, যে দরজায় ঠোকর খেয়ে ধুপধাপ পা ফেলে ঘরে ঢোকে সে নিশ্চয় কারোর সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে—ইত্যাদি জ্ঞান অজ্ঞাতেই ওর আয়ত্তে এসে গেল।

সেই সময় পিতার পরিচিত এক চীনা ব্যবসায়ীর সংগে সাক্ষাৎ না হ'লে সেই বহু সাধনায় প্রাপ্ত বিদ্যার ফল কি দাঁড়াত বলা যায় না। কিন্তু ভাগ্য ওর জীবনের দিক পরিবর্তিত করে দিল। এখন থেকে কাপড়ের দোকানে সে কাজ শিখতে লেগে গেল।

খুব প্রশংসা করতে করতে অনেক বছরের পুরনো কাপড়ই সকলের আগে উঠিয়ে এনে দেখানো, গজ দিয়ে মাপতে গিয়ে একটুও যেন বেশী না হয়ে যায়, বরং এক আঙুল পিছিয়ে রাখা ভালো, প্রতিটি পয়সা পর্যন্ত খুব ভালো ভাবে বাজিয়ে নেওয়া আর ফেরাবার সময় অচল টাকাটাই বার বার বাজিয়ে গছিয়ে দেওয়া—এ-সব বিদ্যা ওর পক্ষে কম রহস্যময় ছিল না। কিন্তু এখন মালিকের কাছে খাওয়া জুটে যাওয়াতে বেড়ালের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট ভোজনের আর দরকার রইল না। দোকানে শোবার ব্যবস্থা হয়ে যাওয়াতে আগুনের হাঁড়ির পাশে শুয়ে লোকের পা মাড়িয়ে যাবার কষ্টও আর সইতে হয় না। খুব অল্প বয়সেই চীনার এ জ্ঞান জন্মেছিল যে ধনসঞ্চয়ের সংগে সম্বন্ধ আছে এমন সব বিদ্যাই এক ধরণের। কিন্তু তবুও মানুষ কোনোটার প্রয়োগ করতে পারে প্রতিষ্ঠাপূর্বক, কোনোটা করতে হয় গোপনে।

একটু বড় হবার পর ও সেই অভাগী বোনের খোঁজ করেছে খুব কিন্তু কোথাও সন্ধান পায়নি। এরই মধ্যে মনিবের কাজে চীনা রেঙ্গুনে এল। তার পর দু'বছর কলকাতাতেই রইল। তখনই অন্য সাথীদের সঙ্গে এদিকে আসার আদেশ পেল। এখানে শহরে এক চীনা জুতাওয়ালার ঘরে ও থাকে, সকাল আটটা থেকে বারটা আর দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত ফেরী করে কাপড় বিক্রী করে।

চীনার মনে কেবল দুটি ইচ্ছা আছে—প্রথমটি হ'ল সৎ হবার ইচ্ছা, আর দ্বিতীয়টি হ'ল বোনকে খুঁজে বার করার। তার মধ্যে একটি পূরণের উপায় তো ওর নিজের হাতেই আছে, আর দ্বিতীয়টির জন্ম ও ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানায়।

মাঝে মাঝে মাস কয়েকের জন্ম ও বাইরে চলে যেত, আবার ফিরে এসেই 'সিস্তরকা ওয়াস্তে' বলে কিছু জিনিস এনে উপস্থিত করত। এভাবে ওকে দেখে-দেখে আমি এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে একদিন যখন ও এসে 'সিস্তরকা ওয়াস্তে' বলে আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি ওর অপ্রস্তুত-ভাবের কারণ কি না বুঝেই হেসে ফেলেছিলাম। ধীরে ধীরে জানতে পারলাম, ওর দেশে ফিরে যাবার ডাক এসেছে। যুদ্ধ করতে ও চীন যাবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত কাপড় কোথায় বিক্রী করবে তাই ভাবছে। আর না বিক্রী ক'রে মালিকের ক্ষতি করে বেইমানি করেই বা কি ক'রে? আমি যদি টাকাটা দিয়ে সব কাপড়গুলো রেখে দিই তবে ও মালিকের হিসাব চুকিয়ে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে পারে।

একদিন বাপের খোঁজ করতে গিয়ে ওর মুখে কথা বেধে যাচ্ছিল—আজও সংকোচে তাই হচ্ছে। আমি একটুখানি চিন্তার অবকাশ পাবার জন্য বললাম—"তোমার তো কেউ-ই নেই তবে ডাক পাঠালো কে?" এবার বিস্ময়ে ওর চোখ দুটো যেন সম্পূর্ণ খুলে গেল—"আমি কবে আবার বলেছি যে আমার চায়না নেই —কখন তোমাকে এ কথা বলেছি, সিস্তর?" নিজের প্রশ্নে নিজেই লজ্জা পেলাম। সত্যিই তো ওর এত বড় চীন থাকতে ও কেনই বা পৃথিবীতে একা হতে যাবে?

আমার কাছে মোটে টাকাই থাকে না—তার আবার বেশী টাকা। সে জন্য অনেক খুঁজে-পেতে কিছুটা নিজের বাকীটা অন্যদের কাছ থেকে ধার করে দিয়ে চীনার যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম। আমাকে শেষ বার অভিবাদন করে ও যখন চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে বললাম—'এই গজটা নিয়ে যাও।' চীনা সহজ স্মিতহাস্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে শুধু 'সিস্তরকা ওয়াস্তে'টুকুই বলতে পারল।

তার পরে কত বছর কেটে গেল—ওকে যে আর কখনো দেখব এমন সম্ভাবনা নেই, ওর বোনের সংগেও আমার কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু কেন জানি না, ঐ দুটি ভাই-বোনের ছবি যেন আমার স্মৃতিপট থেকে কিছুতেই সরে না।

চীনার গাঁট থেকে কয়েক থান কাপড় নিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের কুর্তা করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখনো তিন থান কাপড় আমার আলমারীতে রয়েছে। আর লোহার গজটি দেয়ালের কোণায় খাড়া করা আছে। একবার এই থানগুলি দেখে আমার একটি খাদি-ভক্ত বোন আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"যে লোক বাইরে থেকে বিশুদ্ধ খদ্দরধারিণী, তিনিও বিদেশী রেশমের থান কিনে রাখেন—এ'সব কারণেই তো এ দেশের কোনো উন্নতি হয় না—।" শুনে আমি অতি কষ্টে হাসি সম্বরণ করেছিলাম।

সেই জন্মদুঃখী, মাতৃপিতৃহীন, বোনের বিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর চীনা ভাই আমার—জানি না সে সত্যিই চীনে পৌছতে পারল কি না। কিন্তু আমার মন বলছে যে, হ্যাঁ, নিজের স্নেহের একমাত্র আধার তার সেই যে দেশ—সেখানে পৌছবার আত্মতৃপ্তি অবশ্যই তার মিলেছে।

বিধাতাপুরুষ

শক্তিপদ রাজগুরু

দুপুরের তীব্র রোদের মধ্যে দিয়ে জন কয়েক লোক চলেছে বাদশাহী শড়কটা ধরে, কত দিনের পুরোনো আমলের পথ, দু'পাশের জমি ক্রমশঃ গ্রাস করেও বাকী যেটুকু রয়েছে তাও সংস্কারাভাবে ধুলোয় আচ্ছন্ন। পাশের দীঘির ধারে বটতলায় তারা থামল, মাথা থেকে ধরাধরি করে টিনের রংচটা দুটো তোরঙ্গ, লড়বড়ে কাঠের একটা বাক্স, একটা ঢোল-কাঁসি-সানাই নামিয়ে রেখে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে নোটন বলে ওঠে:

—"লাও সিনান-ভাত সেরে লাও চটকু, লাগাত সন্ধে দইদে বৈরাগীতলার মিলায় হাজির হতে হবেক কিন্তু।"

ঢোলওয়ালা লেগে যায় বটতলাতে কয়েকটা এড়ো ইট ঠাড়ো করে উনুন বানাতে, কাঁসিদার ছেলেটা খিদেতে দাঁড়াতে পারছে না, আঁত-কাকাল এক হয়ে গেছে! সেই সাত সকালে বার হয়েছে দু'গাল মুড়ি চিবিয়ে, বাবার বকুনি খেয়ে কোন রকমে আশ-পাশের গাছতলা থেকে শুকনো পাতা জমা করতে থাকে। কারিগর জাতে ছুতোর, দলের মধ্যে সেই বর্ণশ্রেষ্ঠ, সুতরাং তেলকালি-লাগা একটা এনামেলের হাঁড়ি বার করে রান্নার আয়োজন করতে থাকে।

শীতের শেষ, পশ্চিম-বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে ধান উঠে গেছে, চাষীবাসীদের ঘরে এই সময়েই থাকে স্বাচ্ছল্য, তাই আশপাশের সমস্ত অঞ্চলের মাঠের মধ্যে সম্বৎসর-পরিত্যক্ত শিবমূর্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তাদের পুজো আচ্ছাকে কেন্দ্র করে মেলা, গাজন সুরু হয়। নোটনের এইটাই মরসুম। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে সে এই বৃত্তিই নিয়েছে।

ছুতোরের ছেলে নেহাৎ খেয়াল বশেই কাঠের পুতুল গড়ত, তাতে দড়ি লাগিয়ে হাত-পা নাড়াত—তাদিকে হাঁটাত নেহাৎ কৌতূহল বশেই; পাঠশালের বিদ্যে ছেড়ে কয়েক বৎসর ইস্কুলে গিয়ে সে রাতারাতি শিল্পী বনে গেল। তার নিজের তৈরী-করা পুতুল দিয়ে গান বেঁধে সে প্রথম যেদিন ইস্কুলে পুতুল নাচ দেখাল, সেই দিন থেকেই তার মাথাতে ওই পুতুল-নাচই বাসা বাঁধল! সারা দিন রাতই আপন মনে কাঠ কেটে র‍্যাঁদা বুলিয়ে—পুতুল তৈরী শেষ করে, তুরপুণ লাগিয়ে ছাঁদা করে সুতো পরায়, রংবেরংএর কাপড় পরিয়ে নানা রকম মূর্তি তৈরী করে। পাড়ার প্রবীণাদের কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারত চেয়ে নিয়ে এসে আপন মনে কি যে করে

সেই জানে! তার বাবা শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—"ব্যাটা রত্নাকর আমার বাল্মীকি হবে কি না তাই তপিস্তে করছে! মরগা শালা—"

রেগে গেলে বুড়োর মাত্রাজ্ঞান থাকত না।

সে আজ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। নোটন জাতব্যবসা ছেড়ে পেশাদার পুতুল-নাচিয়ে হয়ে উঠেছে। মেলা-খেলায় গ্রাম-গ্রামান্তরে সে ঘুরে বেড়ায় তার দল-বল নিয়ে।

শীতের কুহেলী-ঢাকা কত রাতে, কত বসন্ত-সন্ধ্যার মধুগন্ধময় বনপথ দিয়ে সে যাত্রা করেছে গ্রাম-গ্রামান্তরের মেলায় তার শিল্পপ্রদর্শনী নিয়ে।

ভাত ফুটে এসেছে, খানিকটা জল দিয়ে বেশী ফেন করে কষে হাতা দিয়ে নাড়তে থাকে, ডাল নাই, ফেন-গলা ভাত, নুণ আর সামান্য আলুসিদ্ধ—ব্যস, এই খেয়েই একটু জিরিয়ে নিয়ে তাদিকে পাক্কা পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটতে হবে, তবে পৌঁছবে মেলাতে।

পয়সা-কড়ি বেশী নাই, আজই গিয়ে বাঁশ-দড়ি খাটিয়ে চালা তুলে—নাগাৎ দুপুর রাতেও দু'-একটা আসর বসাতে পারলে তবে কালকের খাওয়া জুটবে, তাই নোটনেরই তাড়া বেশী!

"বসে পড় রে তুরা! ঝপ করে খেয়ে-দেয়ে মোটঘাট লিয়ে রওনা দে—"

কুড়োরাম দলের দোহারকি করে, পুতুল টানে, আর মোট বয়,—একাধারে যাকে বলে স্ত্রী, সখা ও সচিব, সে খেঁাৎ-খেঁাৎ করে ওঠে—"মানুষ ত লই, তুমার পুতুল কিনা, নাকে দড়ি দিয়ে টানলেই হলো! দিবা ত ফ্যানশুদ্ধ দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর করতে হবেক রাত্তির কাম, দিন গেলে কাঁই কাঁহা মুলুক পায়ে হেঁটে মারতে হবেক—পারব নাই কিনা? সটান ঘর উজাঁই দিব ইবার!"

নিজের ভাগ থেকে বড় বড় দুটো আলু কুড়োরামকে দিয়ে তখনকার মত ক্ষান্ত করে তাকে। ঢোলওয়ালা কুঁই-কাঁই করে, কুড়োরামের অসাক্ষাতে তার হাতে একটা আধুলি দিয়ে কোন মতে তাকে বৈরাগীতলার মেলা পর্য্যন্ত যাবার মত করায়!

দল-বল আবার চলতে শুরু করল, শীতের হিমেল রোদ হলদে আভা বিস্তার করেছে জনহীন মাঠটার বুকে বট গাছের পাতায় পাতায়, দীঘির গহন-কালো জলে নিশ্চিন্ত মনে ডাহুক-দম্পতী আবার বিশ্রম্ভালাপ শুরু করে।

লোকে লোকারণ্য, মাঠের মধ্যে আম বাগানটায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটা মঠ, বৎসরের সব ক'টা মাসই রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে মানুষের সংস্পর্শ বঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকে! এই কটা দিনে শত-সহস্র লোক আসে, সারা বাগানটার আশ-পাশ পর্য্যন্ত ছেয়ে যায় টিনের ছাউনি-দেওয়া চটের বেড়া-লাগান মণিহারী—সন্দেশ—লোহার হাতা-খুন্তি—পাথরবাটি—কাটাপোষাকের দোকানে, আজকাল আবার চায়ের দোকানও বসে, ওপাশে বড় তাঁবু খাটিয়ে বসেছে 'জয় হিন্দ সার্কাস', আরও বিরাট একটা তাঁবু চারি পাশে তার বিজলী বাতি জ্বলছে, কাতারে কাতারে কেবল মাথা দেখা যায়, সারা মেলার লোক ভিড় জমিয়েছে ওইখানেই। কি যেন গান শোনা যায়, অনেক দূর থেকে।

রাত্রি নেমে আসে! নোটনের সারা দেহে অসহ্য ব্যথা, দীর্ঘ দশ ক্রোশ পথ এই বয়সে তার হাঁটা উচিত হয়নি! কুড়োরাম নিতাই ঢুলি কয়েক জনে মিলে কোন রকমে বাঁশ-চট খাটিয়ে একটা তাঁবুর মত খাড়া করে মালপত্র রেখে রাতের আস্তানা গড়েছে, এক পাশে একটা কম্বল পেতে শুয়ে রয়েছে নোটন! মাথায় অসহ্য বেদনা, ওদিকে রাতের বেলাতে পুতুল-নাচের আসর করবার কথা বলতেই ক্ষেপে উঠেছিল ওরা:

"পারব নাই, দশ কোশ রাস্তা হেঁটে মুখে গেঁজলা উঠছে, এর পর আবার তুমার পুতুলের লাচ? ভ্যালা মন ভাই রে!"

কুড়োরামের জিবের ধার দেখে চুপ করে থাকে নোটন! ট্যাঁক হাতড়ে কয়েক আনা পয়সা দিয়ে নিজে চুপ করে শুয়ে পড়ে।

কাল কি খাবে জানে না! সারা জীবন এই বৃত্তি করে কি পেয়েছে জানে না, পয়সার আশায় আসেনি, কি যেন নেশার ঘোরেই এসেছিল এই জীবনে। নিজের সৃষ্ট কাঠের পুতুলগুলো তার হাতে সজীব হয়ে ওঠে, ঢোলের তালে-তালে নেচে-নেচে রামায়ণ-মহাভারতের পালা গায়···কত লোককে আনন্দ দিয়ে এসেছে, দেখেছে কত দেশ, কত জেলায় জেলায় ঘুরেছে। যাযাবর মন আর খেয়ালী শিল্পীর সাধনা আজ তাকে নিশ্চিত অনাহার আর উপবাসের পথেই নিয়ে এসেছে জীবনের শেষ দিকে।

বিয়ে-থাও করেনি, সময় কখন তার? কারুর ভালোবাসা তার মনের অতলের জ্বালা শান্ত করে দেয়নি কোন দিন। হঠাৎ থেমে যায় তার চিন্তার গতি! হ্যাঁ, মনে পড়ে এক জনকে, কি যেন নাম···? ললিতা···!

সে বার গুপীবাগানের মেলাতে এক সন্ধ্যার স্মৃতি মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, নোটন তখন ভরযোয়ান মরদ। যেমন সুরেলা গলা তেমনি নাম-ডাক, ফি বছরে নোতুন পুতুল বানাত কত রকমারি ঘটনার উপর।

মেলা-কর্তৃপক্ষ তাকে আগাম বায়না দিয়ে নিয়ে যেত মেলার অন্যতম আকর্ষণ করে তুলতে তার পুতুল-নাচ! গুপীবাগানের মেলাতে সে বার গিয়েছিল।

মেলা ভেঙ্গে আসছে। জাঁক-জমক কমে গেছে। অনেক দোকান চলে গেছে চালা-বাঁশ তুলে, পড়ে আছে মিষ্টির দোকানের উনুন-ভাঙ্গা কালচে মাটি আর ছাইএর স্তূপ—দু'-একটা ঘিয়ে-ভাজা কুকুর ল্যাজে-মাথায় এক হয়ে ছাইএর গাদায় ঘুমোবার আয়োজন করছে, মেলার বাইরে তালপাতার ছাউনি-ঘেরা রূপোপজীবিনীদের ঘরগুলোতে তখনও অধিক রাত্রে লোকজনের আগমন হয়। আসছে নোটন, হঠাৎ অন্ধকার আম গাছতলা থেকে কার ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল, অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসে একটি মেয়ে, পরনে নীল সাড়ী, কপালে কাচপোকার টিপ, ঠোঁট দুটোতে পানের লালচে দাগ!

"শোন না একটু!"

দেখেই চিনতে পারে নোটন, ওই ঝুমরী দলের কেউ হবে। মুখ ফিরিয়ে চলে আসবে, মেয়েটি এগিয়ে এসে বাধা দেয়—"দাঁড়াও না ছাই, কাঠের পুতুলের চেয়ে আমি কি দেখতে ভালো লই? দেখই না মুখ তুলে।"

নেহাৎ কৌতূহল ভরেই তার দিকে চেয়েছিল নোটন। নির্জন বাগানটায় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, আকাশে তারার ঝিকিমিকি

ওর চোখ দুটোতে কোন আকাশের তারার মতই সুদূরপ্রসারী ভাব, একটু সলজ্জ হেসে মুখ নামিয়ে নেয় মেয়েটি।

—"হাঁ করে চাইছ কি, মেয়েলোক কখনও দেখোনি?"

সে রাত্রে ভাঙ্গা মেলাতেই পুতুল-নাচের আসর জমিয়েছিল নোটন, এক জন সমঝদার দর্শককে দেখাবার জন্যই। বিস্ময়ে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে ললিতা: "প্যাটে প্যাটে তুমার এতো? তুমি ত নোক সুবিধের লও ভাই!"

গুপীবাগানের মেলা থেকে ললিতাদের দল গিয়েছিল কপিলেশ্বরের মেলায়, অজ্ঞাত দুর্বার আকর্ষণে নোটনও হাজির হয় বাজারসহ শক্তিপুরের নদীতীরে ঝাঁকড়া বটগাছের প্রহরা-ঘেরা কপিলেশ্বর শিবের গাজনতলায়।

শীতের শেষ বসন্তের প্রারম্ভ, বিস্তীর্ণ গঙ্গার দেওয়ারের বুকে সবুজ ছোলা-মটর গাছের আস্তরণ, ভেলভেট রং-এর ফুলগুলো সবুজের মেলা আলো করে রেখেছে! কোলাহলমুখর মেলা থেকে দূরে আশে-পাশে কাকে খুঁজে বেড়ায় নোটনের সন্ধানী চোখ, কিন্তু দু'-তিন দিন ঘোরাঘুরি করেও সেই জনসমুদ্র থেকে খুঁজে বার করতে পারে না ললিতাকে।

পুতুল-নাচের আসরে কত লোক আসে-যায়, ঢোলের তালে-তালে ফুলুটওয়ালা কনসার্টএর গৎ ধরে, পর্দার ফাঁক দিয়ে নোটন কার যেন আগমন-আশায় চেয়ে থাকে, পর্দাওয়ালা মনে করিয়ে দেয়—"নাচ সুরু হবে কখন গো?"

হুঁস ফেরে নোটনের, পুতুলের দড়িপত্র ঠিক করে নিয়ে তৈরী হয়ে নেয়, দলের লোকজন গেয়ে চলেছে: "বারি রে বারি রে ছাঁয়া, বারি রে ছাঁয়া—বারি রে!"

"কালই চলে যাবে নোটন কপিলেশ্বরের মেলা ছেড়ে, যার জন্য আসা তার দেখাই পেল না, শিবের মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, ভিড়ের মধ্যে নাটমন্দির থেকে নেমে আসছে একটি মেয়ে, প্রথমে চিনতেই পারে না, গরদের শাড়ী পরে, হাতে পুজোর থালা বাঁ হাতে একটা ছোট কাঁসার ঘটী!

—"ললিতা!"

চমকে ওঠে ললিতা, সামনেই তার নোটন!

—"তুমি! তোমার না বীরচন্দ্রপুরের মেলায় বায়না আছে বলেছিলে?"

ললিতার কথার জবাব দেয় নোটন: "ভালো লাগল না, উদের বায়না ফেরৎ দিয়ে এইখানেই চলে এলাম! তিন দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি!"

আশে-পাশের দু'-চার জন লোক তাদের দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে রয়েছে, নোটন সব কথা শেষ না করে যেন থামবে না, ললিতা তার হাত ধরে ভিড় থেকে টেনে বাইরে আনে।

রাত্রি হয়ে গেছে, গঙ্গার এই দিকটা বেশ নির্জন, একটা ভাঙ্গা ঘাটলায় বসে নোটন আর ললিতা। ললিতা নীরবে বসে রয়েছে—কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবনা তার মনে! মেলার মরসুম শেষ হয়ে আসছে, গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে দেহোপজীবিনীদের দল কোন ছোটখাট সহরে কয়েক মাসের জন্য বাসা নেবে। কোন আশ্রয় নেই, সমাজ নেই বিপদে-আপদে দেখবার কেউ নাই, এই জীবন যেন আজ তার কাছে দুর্বিষহ বলে মনে হয়। কিন্তু কোন পথ সামনে তার খোলা নাই!

—"আমার বাড়ীতে যাবে?"

—"কি বলবে লোককে?"

—"ঘর-সংসার কি করতে নাই আমাকে, পরিবার এত দিন ছিল না বলে কোন দিনই কি হবে না?"

চমকে ওঠে ললিতা:—"না না, তা হয় না!"

—"কেনে?" ললিতার জবাব দেবার মত ক্ষমতা নাই নোটনের এই ছোট 'কেনে'র! নোটন কি জানে না তার পরিচয়? কি ঘৃণ্য নরকের কীটের মত জীবন-যাপন করতে হয় তাদিকে! তাদের অধিকার নাই কোন সুস্থ সবল সম্ভাবনাময় জীবনকে নষ্ট করে দেবার!

—"ললিতা!" উঠতে যাবে ললিতা, সে চলে যেতে চায় নোটনের সামনে থেকে! নোটনের মনে ঝড় তুলতে, তার শিল্পি-জীবনে কোন বিক্ষোভ আনতে কোন দিনই চায়নি, পথ-চলতি জীবনে মানুষটিকে ক্ষণিকের জন্য ভালোবেসে ফেলেছিল, বেশী কিছু প্রত্যাশা সে ত করেনি।

নোটন আজ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে! ললিতাকে যেতে দেবে না কোন দিকে। কি হয়ে যায় বুঝতে পারে না ললিতা। প্রবল শক্তিতে নোটন যেন পিষে ফেলতে চায় তাকে, সারা মুখে ওর উষ্ণ নিশ্বাস, নিজেকে প্রাণপণে মুক্ত করে নিয়ে বেগে চলে গেল ললিতা!—না—না—এমনি করে নিঃশেষে যে আপনাকে সঁপে দিতে চায় তেমনি একটি নিষ্পাপ মনকে নষ্ট করতে পারে না ললিতা। দূরে গঙ্গার দেওয়ারে কোথায় সমস্বরে এক পাল শিয়াল ডাক দিয়ে ওঠে। রাত্রি প্রথম প্রহর বোধ হয় পার হয়ে গেল।

নোটনের মনে সেই প্রথম নারী, যাযাবর মন ক্ষণিকের জন্য পথের বাঁকে কা'কে ভালোবেসেছিল—পথের মাঝেই আবার তারা দু'জন দু'দিক হয়ে গেল। সারা মনে একটা স্মৃতির রোমন্থন! সেই রাত্রির পরই নোটন নিজে গিয়েছিল ওই দেহোপজীবিনীদের বস্তিতে ললিতার খোঁজে, কিন্তু দেখা তার পায়নি, ভোরের ট্রেণেই ললিতাদের দল যাত্রা করেছে অন্য কোন মেলায়।

হতাশ হয়ে পুতুল-নাচের দল নিয়ে নোটন পাড়ি জমায় বাঁকাবায় বীরচন্দ্রপুরের মেলার দিকে তার নিজের পথে। একটি সন্ধ্যার স্মৃতি···গুপীবাগানের স্বল্পান্ধকার আম বাগানের মাঝে কার ডাগর চোখের চাহনি···গঙ্গার ধারে কপিলেশ্বর শিবের গাজনতলা···সবুজ শস্যসমাকীর্ণ দিগন্তপ্রসারী দেওয়ারে বাবলা ফুলের উদাস গন্ধভরা বাতাসের আনাগোনা···একটা উষ্ণ পরশ···কার চোখের জল··· নোটনের সারা মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল কয়েকটা মাস···ক্রমশঃ বিস্মৃতির আবরণে অস্পষ্ট হয়ে আসে তার সৌরভ!

কোলাহলে তন্দ্রার ঘোর ছুটে যায়! ঢোলওয়ালা কুড়োরাম ওরা ফিরে এসেছে। কাঁসিদার ছেলেটা কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে চীৎকার সুরু করেছে—"বানতারাস রে—এত এত তরকারী, ইয়া বড় সাঁয়া এক বাঁধান খালের এক খাল ডাল,···ভাতের পাহাড়, মচ্ছব হচ্ছে গো! সবাইকে খেতে দিবে তিন দিন তিন রাত ভোর!"

যখনই হোক... যেখানেই হোক...
ব্রুক বণ্ড চা
বাগান থেকে সদ্য আসে
তাই এত তাজা
88/116

কুড়োরামের মনে অন্য চিন্তা, সে ধমক দিয়ে ওঠে—"চুপ কর, কেবল খাবার চিন্তা!"

ঢুলিদারের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি: "বুঝলা কি—শালা যা কল করেছে, ছবিতে কথা কইছে! ইসব আর ভালো লাগবেক কেনে? কত তাজ্জব ব্যাপার দেখবেক উখানে, পুতুল-নাচ কি হবেক!"

কুড়োরামের মনে আজ বিকৃতি এসেছে, কি হবে এই কাঠের পুতুল নাচিয়ে, তার চেয়ে অন্য কিছু করা ভালো। এক রাতের দেখা ওই ছায়াবাজি তার এত দিনের বিক্ষোভকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

নোটন উঠে আসে ওদের অসাক্ষাতে। বিছানা থেকে শুয়ে শুয়ে শুনছে সব, ওই বড় তাঁবুটা থেকে গানের শব্দ আসছে, শত শত লোকজনের ভিড়! ছবিতে কথা কয়—নাচে, গান গায়! তার পুতুল-নাচের চেয়ে অনেক ভালো—অনেক জীবন্ত!···রুগ্ন বৃদ্ধ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

পরদিন খেলা না দেখাতে পারলে আহার জুটবে না। এই নিয়ে সকাল বেলাতেই কুড়োরামের সঙ্গে একচোট হয়ে গেছে, টাকা-পয়সা নিশ্চয়ই পুঁজি করছে নোটন, না হলে তাদিকে জলপানি খেতে দেবার পয়সা থাকবে না কেন? এত কাল চুরি করেছে ভাগের পয়সা, এখনও করছে নোটন!

এত বড় অপবাদটা নোটন চুপ করে শুনে যায়। আগে তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলবার মত সাহস কারুর ছিল না, আজ তার বয়স হয়েছে, সে প্রতিভাও নাই, গলার জোর কমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অকৃতজ্ঞ দর্শকও ভুলে যেতে বসেছে তাকে! এ বছর দু'-তিনটা মেলায় যা সামান্য সে রোজকার করেছে তাতে আর দল পোষা যায় না। এত দিনের নেশা এবং পেশা তাকে ছেড়ে দিতে হবে। কুড়োরামকে বোঝাবার চেষ্টা করে—"এ মেলাটা দেখি কুড়ো, তার পর হয়ত খেলা ছেড়েই দোব।"

—"তার পর কেনে? তার আগেই ছেড়ে দাও আমাদিকে, না হয় অন্য কুনখানে চলে যাই।"

সানাইওয়ালাও বলে—"আমার পাওনা কড়ি ফেলে দাও, ইবো থাকবো নাই।"

ঢোলওয়ালা নীরবে সম্মতি দেয় সেও চলে যেতে প্রস্তুত।

নোটন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সামনে যেন মৃত্যুদণ্ড শোনান হচ্ছে তাকে!

সারা দিন বাইরে ও আসে না, কম্বলখানার উপর পড়ে থাকে। কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। কাঁসিদার ছেলেটা একটা ধুকুড়ি এনে ঢাকা দিয়ে নোটনের প্রকম্পমান দেহটাকে চেপে ধরে রয়েছে। মাঝে-মাঝে প্রবল কাঁপুনির বেগে ছেলেটার সমস্ত শরীরও কেঁপে ওঠে।

কুড়োরাম আর ঢুলিটা গজ-গজ করছে আর বাইরে সাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ছে, আজ খেলার আসর না করলেই নয়। মাঝে-মাঝে গর্জন শোনা যায় তার—"শালা মরেও না, ভালুকের মত কাঁপছে দেখ না কোঁ-কোঁ করে!"

দিনের বেলায় মেলায় বহিরাগত লোকজন থাকে না, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, দোকানগুলোর কোন চাকচিক্য নাই, বাঁশ-বাধা টিনের কঙ্কালগুলো খাড়া হয়ে রয়েছে। ঝুপি গাছের নীচে লোকজন রান্না করে, সব কিছুতেই একটা রূঢ় কঠোর বাস্তবতার ছাপ। জ্বরের বেগ খানিকটা কমে এসেছে, পুরোনো ম্যালেরিয়া—এ-বেলায় আসে ও-বেলায় ছাড়ে। পোষা কুকুরের মতই বশ-মানা হয়ে গেছে।

বেলা দুপুর, কুড়োরাম আর বাকী দু'জন চলে গেছে মচ্ছবতলায়, নিজেদের রান্না করবার পয়সা নাই···যদি দুপুরের খাওয়াটা সেখানে জোটে। কাঁসিদার ছেলেটাও বেপাত্তা! একা-একা ধুঁকছে নোটন। কাল থেকে খাওয়া হয়নি, অসুস্থ শরীরে দশ ক্রোশ রাস্তা হাঁটার পর আবার শয্যা নিয়েছে। আজ রাত্রের কথা ভাবতে থাকে। কিছু খেতে পারলে হয়ত জোর করেও খেলা দেখাতে পারত।

বাক্স-বন্ধ কাঠের পুতুল, কত রাজা-মন্ত্রী দেব-দেবী—ওরই আঙুলের টানে-টানে নাচে, কথা কয়, যুদ্ধ করে—নিজেই ওদের বিধাতাপুরুষ; কিন্তু তাদের বিধাতাপুরুষের জঠরদেবতা আজ বিশ্বব্যাপী হুতাশনের জ্বালা নিয়ে শুকিয়ে মরছে!

হঠাৎ কাঁসিদার ছেলেটাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল; চারি দিক দেখে সন্তর্পণে কোঁচড় থেকে বার করে কয়েকটা চিনির মেঠাই!

—"একটু জল লিয়ে আসব উস্তাদ!"

—"কোথায় পেলি?"

—"আমার কাছে পয়সা ছিল, লাও, খেয়ে লাও খপ্‌ করে।"

ছেলেটার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বুড়ো। কুড়োরাম ঢুলিদার ওকে ত্যাগ করে যেতে চায়, ছেলেটা যেন ওকে নিবিড় বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। হঠাৎ বাইরে একটা কোলাহল শুনে চমকে ওঠে ছেলেটা—তার মুখ-চোখের ভাব কেমন পাংশু পাণ্ডুর হয়ে যায়। কয়েকটা লোক ঢুকে পড়েই বামালশুদ্ধ ছেলেটাকে ধরে ফেলেই চুলের মুঠি টেনে ঘা-কতক বসিয়ে দেয়।

—"শালা চোর কোথাকার!"

স্তম্ভিত হয়ে যায় নোটন। অসুস্থ শরীরে কোন রকমে উঠে ওদিকে বোঝাবার চেষ্টা করে, লোকগুলো নোটনকে গাল দিতে ছাড়ে না।

"বুড়োর আক্কেল দেখ না, ছেলেটাকে চুরি করতে পাঠিয়ে নিজে মিষ্টি-জল করছে!"

মার খেয়ে ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওস্তাদের জন্য আজ চুরি করতে গিইছিল, লোকগুলোকে দাম দিতে হবে? পয়সা একটাও নাই, নোটন ভাবতে থাকে।

কে যেন বলে: "লে শালার তাঁবুর চট খুলে!"

অনুনয় করে তাদিকে ছোট একটা চট দিয়ে নিস্তার পায় নোটন। ছেলেটা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চোখের কোল ফুলে উঠেছে, কপালটা আমড়ার আঁটির আকার ধারণ করেছে ওদের মারের চোটে!

"হ্যাঁ রে, লেগেছে তোর?"

ঘাড় নাড়ে ছেলেটা, ওকে বকবার সাহস নাই নোটনের! আজ নিজের উপরই ধিক্কার আসে। নিজের দলের লোকদিকে পয়সা দেওয়া ত দূরের কথা, খাওয়াতেই পারে না! তার নিজের খাবার যোগাতে গিয়ে একটা শিশুকে সে চোর তৈরী করছে!

এমনি করে এই পথে থাকার আজ কোন সার্থকতা সে খুঁজে পায় না. কিন্তু কি-ই বা আর করতে পারে?

—"উস্তাদ!" ছেলেটা তখনও কোঁপাচ্ছে—"আর কখনও ই কাষ করব নাই, সামনে ছিল, দেখে থাকতে পারি নাই, ক'টা লিয়ে এসেছিলাম।"

—"যা, মজুবতলায় খেয়ে আয় গা, পাতা পাড়লেই সবাইকে পেসাদ দিছে!"

ছেলেটা চোখ মুছতে মুছতে বার হয়ে গেল।

ঘুমন্ত মেলাটা আবার জেগে উঠেছে। দিনের পাণ্ডুর শীর্ণ রূপ রাতের আলোয় দূর হয়ে যায়, আবার ঝকঝকে সুন্দর হয়ে ওঠে! লোকজনের আগমনে সজীব হয়ে ওঠে। নীরব বাগানটা আলোময় কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে।

নীল-লাল কাপড়ের পরদা-ঘেরা ছোট আটচালাটা সানাই আর ঢোলের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। কয়েকটা গ্যাসের আলো জ্বলছে। কাঁসিদার ছেলেটা একটা পোষাকী জামা পরে কাঁসিটাকে কায়দা করে চেপে-চেপে ঢোলের তালে কাঠি দিচ্ছে। কুড়োরাম পুতুলগুলো সাজাতে ব্যস্ত। নোটন অসুস্থ শরীর নিয়ে তৈরী হচ্ছে আজ সব চেয়ে জমাটি খেলা দেখাবে সে।

রাত্রি বেড়ে চলে, কোলাহলমুখর জনতা চলেছে জলস্রোতের মত ওই বায়স্কোপের তাঁবুর দিকে, কাতারে-কাতারে লোক দূর-দূরান্তর থেকে এসেছে। গরুর গাড়ীতে করে মেয়ে-ছেলে বুড়ো-বুড়ী সকলেই ভিড় জমিয়েছে। প্রাণপণে ঢোল বাজিয়ে ঢুলিটা থেমে যায়।

"ধ্যাৎ শালা, ই কেউ আসবে না ইখানে! উয়ার চেয়ে বায়স্কোপ, না হয় ঝুমরী নাচ ঢের ভালো!"

চটে ওঠে নোটন। সন্ধ্যা থেকে মাত্র রোজকার হয়েছে কয়েক জন বাগদী-বাউরী ছেলেমেয়েকে পুতুল-নাচ দেখিয়ে মাত্র আনা বারো। কোন লোকই দাঁড়াচ্ছে না এখানে! কেউ কেউ চলেছে বায়স্কোপের দিকে, না হয় অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন ওই আমতলায় ঝুমরী নাচের ওইখানে।

শীর্ণ অসুস্থ শরীরে দাঁড়াতে পারে না, পা দুটো কাঁপছে, কুড়োরাম গর্জাচ্ছে: "দাও আমার পয়সা মিটিয়ে, দু'দিন খেতে দাওনি, ও-সব রংচালাকী চলবেক নাই!"

ঢোলওয়ালা সেই যে থেমেছে আর বাজায়নি, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সানাইদারও নাই। জল-কারবাইড অভাবে এক-এক করে সমস্ত আলোগুলো নিবে আসছে। গর্জন করে কুড়োরাম: —"দিবা কি বল, লইলে—"

ট্যাঁক থেকে বার আনা পয়সাই ফেলে দিয়ে বলে ওঠে নোটন: "যা ছিল ওই, লিয়ে দূর হয়ে যা, কুন দিন আর আসিস না!"

মেলার চারি দিকে আলো; সব আলো নিবে গেছে নোটনের এখানে। ময়লা-ছেঁড়া চট-সতরঞ্চির উপর পড়ে আছে দড়ি-ছেঁড়া পুতুলগুলো, মাঝখানে বসে রয়েছে নোটন, হাত-পা দুর্বলতায় কাঁপছে, চোখ ঠেলে আজ জল বার হয়ে আসে। হাতে এক পয়সাও নাই, দু'দিন অনাহার, দশ কোশ রাস্তা হেঁটে বাড়ী যাবার ক্ষমতা তার নাই। পঁচিশ বৎসরের সঞ্চয় মাত্র ওই ভাঙ্গা পুতুলের স্তূপ আর চিরজীবন দারিদ্র্য! কি সে পেল এই জীবনে!

হঠাৎ একটা শব্দে মুখ তুলে চাইল, কাঁসিদার ছেলেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুড়োরাম, সানাইদার, ঢুলি সবাই চলে গেছে, ভেবেছিল ছেলেটাও গেছে, কিন্তু সেই একা রয়েছে।

—"তুই যাস্‌নি? চলে যা, যেখানে পারিস, দল আমি তুলে দিলাম।"

কথাটা বলতে নোটনের বুক দীর্ণ হয়ে যায়। পঁচিশ বছরের জীবন আজ এক রাত্রেই সে শেষ করে দিল। ছেলেটা কাঁদছে! বিস্মিত হয়ে যায় নোটন, তার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আর এক জন কেউ কাঁদবে এ যে তার কল্পনারও অতীত! ধীরে-ধীরে উঠে এসে ছেলেটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে, যাবার সময় ওকে মজুরি বাবদ একটা পয়সাও দিতে পারে না। এমনি করে সকলকে বঞ্চিত করার চেয়ে, চোর প্রতিপন্ন করার চেয়ে নিজের ব্যর্থ জীবনের বোঝা একাই বইবে সে।

ভোর বেলাতেই বার হয়ে পড়ে, যেমন করে হোক বাড়ী তাকে পৌঁছতেই হবে, পরে লোক পাঠিয়ে বাক্স ক'টা নিয়ে যাবে। কোন রকমে একাই চলেছে পথে। এ ভাবে কোন দিনই কোন মেলা থেকে বিদায় নিতে হয়নি। জয়মাল্য—কত আনন্দ, কত খ্যাতি নিয়ে এসেছে সে। আজ আনন্দমুখর মেলা পিছনে রেখে পলাতকের মত চলেছে।

সর্বাঙ্গে ক্লান্তির বোঝা, ধূলিধূসর পথ বেয়ে চলেছে সে, ছোট লাইনের ইষ্টিশানের কাছে বট গাছের নীচে বসে হাঁপাতে থাকে। মেলার যাত্রীর ভিড়ে জায়গাটা ভরে গেছে! দেশ-দেশান্তর থেকে গানের দল, লোকজন নামছে। হঠাৎ কা'কে দেখে চমকে ওঠে নোটন, সরে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তার আগেই দেখে ফেলেছে মেয়েটি। তেমনি উচ্ছল-যৌবনা কলহাস্যমুখরা হয়ে আছে ললিতা।

"উস্তাদ! তুমি ইখানে?"

কথা বলতে পারে না নোটন, সেদিন বিজয়ীর বেশে যার সামনে জয়মাল্য গলায় দাঁড়িয়েছিল, আজ পরাজিত শীর্ণ পঙ্গু চেহারায় তার সামনে দাঁড়াতে শিউরে ওঠে সে। নীরবে ললিতাকে দেখতে থাকে! অতীতের ললিতা আজও বেঁচে আছে। সেই গুপীবাগানের প্রায়ান্ধকার তারকিনী সন্ধ্যা বেলার ললিতা···কপিলেশ্বর শিবের গাজনতলার সেই শান্ত-সমাহিত মূর্ত্তি, নির্জন রাত্রে গঙ্গায় কলতরঙ্গমুখরা ঘাটের ধারে আত্মনিবেদনময়ী সেই উচ্ছল-যৌবনা নারী আজও প্রাণ-সম্পদে জীবনের খাতায় দেউলিয়া হয়ে যায়নি তার মত!

—"দেখার আশা এখনও মিটল না উস্তাদ?"

এখনও ললিতার ঠোঁটের প্রান্তে সেই মন-ভুলানো হাসির ঝিলিক লেগে আছে।

আজ আর বলবার কোন কথাই নাই নোটনের, সব কথাই তাকে নিঃশেষ করে বলেছিল সেই রাত্রে, যদি আসত ললিতা, হয়ত আজও অমনি করে বেঁচে থাকত পারত নোটন।

লোকজনের কোলাহল—গাড়ীর শব্দ—মুহূর্ত্তের মধ্যে ছোট ইষ্টিশানটা চীৎকারে মুখর হয়ে ওঠে। ললিতাকে কারা ডাকছে।

"আসি উস্তাদ—আবার পথেই হয়ত কুন দিন দেখা হবে!"

ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল ললিতা, গাড়ীখানা চলে গেল।

শীতের রোদ হলদে হয়ে আসছে প্রান্তরের উপর। জনহীন ইষ্টিশনটার বাইরে বটতলায় চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে একটা লোক! মাঝে-মাঝে কেঁপে ওঠে তার সারা দেহ থর-থর বিকম্পিত হয়ে।

নোটনের মনে কি যেন অজানা আনন্দের শিহরণ, তালীবন-সমাকীর্ণ জল্পেশ্বর শিবের মেলা, রাঢ় দেশের শীতের সন্ধ্যার রক্তরাগ-রঞ্জিত প্রান্তরের বুক চিরে সে চলেছে,···বেণু-বন-সমাকীর্ণ দ্বারকা নদীর কাকের চোখের কালো জল পার হয়ে তারাপীঠের মন্দির-প্রাঙ্গণের সেই সকাল বেলা, নদীতীরের শ্যামল বনভূমির মাথায়-মাথায় শিমূল তুলোর আস্তরণ—প্রকৃতির এ কোন্ বৃন্দার বেশ!···কপিলেশ্বর শিবের গাজনতলার সেই সৌম্য-মূর্তি! কার উষ্ণ স্পর্শ···আলো-ঝলমল মেলার আসরে জীবন্ত পুতুলের কত আলাপন···প্রাণহীন কাঠের পুতুল···আবেগ-রঞ্জিত হাতে প্রিয়ার কম্পিত তনুলতায় বিলম্বিত করেছে তার দুটো হাত···

ধূলি-ধূসর পথের প্রান্তে শ্যামছায়াঘন কত বাগানের পরিক্রমা ···কত লোকজন···কাঁসিদার ছেলেটার ডাগর জল-ভরা দুটো চোখ···কত বাঁশীর সুর···ললিতার কলহাস্যমুখর নিটোল তনুলতা···তার চোখের কামনা-মদির চাহনি! এত প্রাচুর্য্য···এ পৃথিবী যেন কত ভালো-লাগা এক ছোট্ট খেলাঘর···হীরাকস্ রং মেঘ···দিনের শেষ সূর্য্যাভায় জাফরাণী রংএর নেশা জাগায়। আলো···কত আলোর সীমানা পার হয়ে দু'হাতে জীবনের সঞ্চয় কুড়িয়ে-কুড়িয়ে চলেছে নোটন কোন্ মহা পাওয়ার দিকে!···

বটতলায় লোক জমে গেছে! লোকটার নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহটার দিকে চেয়ে রয়েছে অনেকেই, কেউ বড় একটা চেনে না তাকে। যবনিকা-অন্তরালে থেকে মানুষের চোখে পুতুল-নাচ দেখিয়েছে—আজ তার জীবন-নাট্যে যবনিকাপাত হয়ে গেল!

ইষ্টিশানের পাশেই ধানকলওয়ালা আর মিষ্টির দোকানদার নোটনের মৃতদেহটা সৎকার করবার জন্য নগদ পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছিল!

গী দ্য মোপাসাঁ

আপিসে তাদের দপ্তরের মেজ কর্তার বাড়িতে এক সম্বর্ধনার আসরে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম আলাপ হল মঁশিয়ে লাঁত্যাঁর এবং সেই থেকে মেয়েটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন তিনি। মফঃস্বলের এক তহশিলদারের কন্যা মেয়েটি, তহশিলদার মারা গিয়েছে কয়েক বছর। মেয়েটিকে নিয়ে তার মা এসেছিল প্যারিতে বাস করতে, এসে আলাপ জমিয়েছিল পাড়া-পড়শীর সঙ্গে মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দেবার আশায়।

অবস্থা তাদের অতি সাধারণ, কিন্তু মানুষ তারা খুবই ভদ্র, শিষ্ট এবং শান্ত।

বিশেষ করে মেয়েটি। সুন্দর, শান্তির সংসার পাততে ঠিক যে-ধরণের ভালো স্বভাব-চরিত্রের মেয়ের স্বপ্ন যুবকেরা দেখে থাকে, মেয়েটি যেন মূর্তিমতী তাই। তার নিরাভরণ রূপে যেন স্বর্গীয় নিষ্কলঙ্কতার মাধুর্য মাখানো, তার অজান্তে ঠোঁটে লেগে থাকা সর্বক্ষণের মিষ্টি হাসি যেন প্রকাশ করত অন্তরের পবিত্রতা। প্রশংসা ফিরত তার সকলের মুখে-মুখে, ক্লান্তি বোধ করত না একথা বলতে: এ মেয়েটির ভালবাসা যে পাবে সত্যি করে সুখী হবে সে! এর চেয়ে ভালো পাত্রী জুটবে না কারো কখনো!

মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের বড়বাবু, অল্পের মধ্যে ভালোই মাইনে পান তিনি—সাড়ে তিন হাজার ফ্রাঁক। মেয়েটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন তিনি এবং সফল হলেন প্রস্তাবে।

মেয়েটিকে বিয়ে করে অবর্ণনীয় সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন লাঁত্যাঁ। এমন সাশ্রয় করে সংসার করতে লাগল মেয়েটি যে, মনে হত রীতিমত বিলাসে বাস করছে তারা। স্বামীকে আদর করে, সোহাগ করে, তার সুখ-সুবিধের প্রতিটি খুঁটিনাটির জন্য পর্যন্ত যত্নের অবধি রইল না মেয়েটির। তার ব্যবহারের মাধুর্যে বিয়ের ছ'বছর বাদে একদিন মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ আবিষ্কার করলেন মধুযামিনীর প্রথম দিনগুলির চেয়ে বৌকে তিনি এখন অনেক বেশি ভালবাসেন।

বৌয়ের স্বভাব বা রুচিতে দু'টি মাত্র দোষ পেয়েছিলেন তিনি। এক, থিয়েটার-প্রীতি; দ্বিতীয়টি, ঝুটো গয়নার শখ। বৌয়ের সখীরা (কর্মচারীদের বৌয়েরা) প্রায়ই তাকে বক্স যোগাড় করে দিত থিয়েটারে এবং কখনো কখনো নতুন নাটক প্রথম অভিনয়-আসরেও। ইচ্ছে থাকুক বা না থাকুক, মঁশিয়ে লাঁত্যাঁকে বৌয়ের সঙ্গে যেতে হত সেই সব দেখতে এবং সমস্ত দিন আপিসে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর খারাপ লাগত, বিরক্তিকর মনে হত ভয়ানক।

কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই, তার সঙ্গে থিয়েটারে যাবার জন্য, থিয়েটার-ফেরৎ তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য তার সখীদেরই কারুকে যাতে বৌ অনুরোধ করে এমন প্রস্তাব করতে লাগলেন মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ। প্রথমে ত কিছুতেই রাজী হয় না বৌ, শেষে অনেক খোশামোদের পর রাজী করানো গেল তাকে এবং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ।

থিয়েটার-প্রীতি থেকেই গয়না পত্রের শখ বৌয়ের। পোষাক কিন্তু তার আগের মতই, সাদাসিধে ও সুরুচিসম্মত এবং কখনো কোনো চালের বালাই নেই তাতে। অল্প দিনের মধ্যেই আসল হীরের মতই উজ্জ্বল ও ঝকমকে একটা পাথরের টুকরো কানে ঝোলাতে লাগল সে। গলায় পরতে লাগল কয়েক নরী ঝুটো মুক্তোর হার, হাতে নকল সোনার তাবিজ, মাথা ঝাড়তে লাগল রঙীন ও কাচের টুকরো-মারা একটি চিরুণী দিয়ে।

মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ প্রায়ই বোঝাতে চেষ্টা করতেন বৌকে, বলতেন: "ওগো, যখন সত্যিকার হীরে-জহরৎ কেনবার সামর্থ্য তোমার নেই, তখন নিরাভরণ রূপ ও অন্তরের সৌন্দর্য নিয়েই সমাজে বের হওয়া উচিত তোমার। জেনো, ও দুটোর চেয়ে বড় অলঙ্কার কোনো মেয়ের হয় না।"

উত্তরে মিষ্টি হেসে জবাব দিত বৌ, বলত: "কি করব বলো, গয়নাগাটির বড্ড শখ আমার। আমার স্বভাবে এটি একমাত্র দোষ কেবল। আর স্বভাব কখনো কেউ বদলাতে পারে?"—বলে মুক্তোর হারটা হাতে করে ঘুরিয়ে দেখতে থাকবে মেয়েটি স্ফটিকের মত মুক্তোগুলির বিচ্ছুরিত ঝিকমিক আর বলবে হাসতে হাসতে: "দেখো, সুন্দর দেখতে নয় এগুলি? এগুলি আসল বলে শপথ করবে যে-কেউ!"

মঁশিয়ে লাঁত্যাঁও হেসেই তখন জবাব দেবেন: "তোমার রুচি বড় উদ্ভট, কিন্তু!"

কোনো রাতে যখন স্বামি-স্ত্রী নিরিবিলি আগুনের ধারে বসে রয়েছেন, তখন কোনো সময় চায়ের টেবিলের উপর মেয়েটি জঞ্জাল-ভর্ত্তি (ঝুটো গয়না বা হীরে-জহরৎগুলিকে ঐ বলেই উল্লেখ করতেন মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ) মরক্কো লেদারের বাক্সটি এনে খুলত। তারপর সতৃষ্ণ নয়নে ঝুটো গয়নাগুলি এমন ভাবে নেড়ে-চেড়ে দেখত মেয়েটি যে, মনে হত মনের গভীর অন্তস্তলে কোথায় যেন গুপ্ত এক সুখ অনুভব করছে সে। মাঝে-মাঝে জোর করে স্বামীর গলায় একটা হার পরিয়ে দিত মেয়েটি, দিয়ে বলত: "ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমায়!" তার পর ঝাঁপিয়ে পড়ত মেয়েটি স্বামীর বুকে, সোহাগ করে চুমু খেত তাকে।

শীতকালে এক রাত্রে অপেরা দেখতে গিয়ে ভীষণ ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফিরে এল বৌ। পরের দিন সকালে কাশতে সুরু করল ভীষণ এবং আট দিন বাদে ফুসফুস ফুলে উঠে মারা গেল সে।

মঁশিয়ে লাঁত্যাঁর শোক এত প্রবল হল যে, এক মাসের মধ্যে মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেল তাঁর। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি; মৃত বৌয়ের হাসি, কণ্ঠস্বর, এক-একটি মধুর স্মৃতি স্মরণ করতে বুক ভেঙ্গে যেতে লাগল তাঁর।

সময় কাটতে লাগল, কিন্তু তার সঙ্গে এক ফোঁটা শোক বুঝি কমল না মঁশিয়ে লাঁত্যাঁর। অনেক দিন আপিসের কাযের মধ্যে, সে সময় তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা হয়ত প্রাত্যহিক আলোচনায় ব্যস্ত, তখন হয়ত হঠাৎ চোখ জলে ভরে যাবে লাঁত্যাঁর, শোক প্রকাশ করবেন তিনি আপিসের কাযের সময়ের মধ্যেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে। তাঁর বৌয়ের জীবিত কালে যেখানে যা-কিছু ছিল তার ঘরে, ঠিকমত সেই রকমই রেখে দেওয়া ছিল। আসবাবপত্র, এমন কি বৌয়ের জামা-কাপড়ও যেমন ছিল, তেমনি রেখে দিলেন তিনি। প্রত্যহ সেই সবের মধ্যে বসে একলা তাঁর প্রিয়তমা, তাঁর জীবনের পরম আনন্দের ধ্যান করতেন তিনি।

কিন্তু শীগগিরই সংসারে ঝঞ্ঝাট সুরু হল ভীষণ। তাঁর যে রোজগারে আগে তাঁর বৌয়ের হাতে কুলিয়ে যেত সংসারের সকল খরচ এখন তা দিয়ে একার অভাবই মেটানো দায় হয়ে উঠল মঁশিয়ে লাঁত্যাঁর। যা দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন চালানো কষ্টকর হচ্ছে তাঁর পক্ষে, তা দিয়ে সংসারে পানাহারে অত বিলাস কি করে সম্ভবপর হত বৌয়ের পক্ষে, ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ধার হয়ে গেল এবং শীগগিরই চরম দুরবস্থা সুরু হয়ে গেল। একদিন সকালে কপর্দকহীন অবস্থায় ঘরের কিছু-একটা বেচতে

গিয়ে বৌয়ের ঝুটো গয়নাগুলির কথা মনে পড়ল তাঁর। ঐ জঞ্জালগুলির উপর চিরকালই কেমন বিদ্বেষ ছিল মঁশিয়ে লাঁতোঁর এবং বৌয়ের সম্বন্ধে ঐ নিয়েই যেটুকু অশান্তি ছিল তাঁর অতীতে এবং বৌয়ের মৃত্যুর পর ঐগুলিই যেন চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর, যখন-তখন চোখে পড়ে বিষাক্ত করে তুলত তাঁর বৌয়ের স্মৃতি।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বৌ কিনে গিয়েছে ঐ ঝুটো গয়নাগুলি এবং তাঁর প্রচুর আপত্তি সত্ত্বেও প্রতি সন্ধ্যায় একটা-কিছু ঝুটো গয়না কিনে ফিরেছে বাড়িতে। সেগুলি অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করলেন লাঁতোঁ, ভাবতে লাগলেন এর মধ্যে কোনটা বেচলে পাওয়া যেতে পারবে দু'-চার ফ্রাঁক এবং শেষ পর্যন্ত বৌয়ের সব চেয়ে শখের হারটাই তুলে নিলেন তিনি সাত ফ্রাঁক পাবার আশায়। ঝুটো হলেও হারটার কারুকার্য ছিল সুন্দর।

হারটা পকেটে পুরে নির্ভরযোগ্য এক মণিকারের দোকানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন মঁশিয়ে লাঁতোঁ। শেষে সে-রকম একটা দোকান খুঁজে বের করে ঢুকলেন গিয়ে ভিতরে। নিজের দুরবস্থা প্রকাশ করতে এবং ঝুটো গয়নার বেচবার কথা বলতে রীতিমত লজ্জিত হলেন তিনি।

"দেখুন—" মালিককে বললেন তিনি, "এই জিনিষটায় কত পাওয়া যাবে বলতে পারেন?"

দোকানের মালিক হাতে নিলেন হারটা, পরীক্ষা করলেন এবং তার কর্মচারীকে ডেকে নিম্নকণ্ঠে বললেন যেন কি সব। তার পর হারটা কাউণ্টারের উপর রেখে দূরে সরে গিয়ে তাকিয়ে বিচার করতে লাগলেন মূল্য।

দেখে বিব্রত বিরক্ত হয়ে উঠলেন মঁশিয়ে লাঁতোঁ। হারটা যে ঝুটো এবং বেচতে গেলে সাত ফ্রাঁকের বেশি হবে না, সে কথা যে ভালো করেই তিনি জানেন, লজ্জিত হয়ে বলতে গেলেন তিনি দোকানের মালিককে। কিন্তু তিনি মুখ খোলবার আগেই কথা বলে উঠল দোকানের মালিক।

"আজ্ঞে বারো থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে দাম হবে এই হারটার! কিন্তু ঠিক কোথা থেকে এবং কি ভাবে এটা আপনি পেয়েছেন, না জানালে কিনতে পারব না আমি!"

টাকার অঙ্ক শুনে বিস্ফারিত হয়ে গেল লাঁতোঁর চোখ, হাঁ হয়ে গেল মুখ—দোকানের মালিকের কথার মানে ঠিক মত বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। কোনো মতে তোৎলাতে তোৎলাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "ঠিক, ঠিক বলছেন ত?"

"অন্য যায়গায় গিয়ে দেখতে পারেন আপনি, কেউ বেশি দেয় কিনা! পনেরো হাজার পর্যন্ত দিতে পারি আমি। ওর চেয়ে বেশি যদি না পান ত আমার দোকানেই ফিরে আসবেন অনুগ্রহ করে।"

শুধু অবাক নয়, রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন মঁশিয়ে লাঁতোঁ। হারটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন তিনি দোকান থেকে, বেরিয়ে গিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা।

বেরিয়ে এসে কিন্তু বেদম হাসি পেল তাঁর, নিজের মনেই বলে উঠলেন তিনি: "মূর্খ! হতভাগ্য মূর্খ! যদি ওর কথার উপর বেচে দিতাম ত' মরত হতভাগা! আসল-নকল চিনতে শেখেনি এখনো, মণিকার হয়েছে ছ্যাখো!"

কয়েক মিনিট বাদে অন্য রাস্তায় আরেকটি দোকানে গিয়ে ঢুকলেন মঁশিয়ে লাঁতোঁ। হারটা দেখা মাত্র দোকানের মালিক চেঁচিয়ে উঠল উল্লাসে: "হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়! এ হার আমার চেনা, এই দোকানেই বেচা হয়েছিল এটা!"

থতমত খেয়ে মঁশিয়ে লাঁতোঁ জিজ্ঞাসা করলেন: "কত দাম হবে এটার?"

"বিশ হাজার ফ্রাঁকে বেচেছিলাম, আঠারো হাজার ফ্রাঁকে ফেরৎ নিতে রাজী আছি আমি। অবিশ্যি তার আগে, আমাদের যেমন নিয়ম, এ হার আপনি কোত্থেকে পেলেন জানাতে হবে আপনাকে।"

শুনে মুখে আর কথা সরল না মঁশিয়ে লাঁতোঁর। অনেক চেষ্টা করে তবেই প্রশ্ন করলেন তিনি আবার: "কিন্তু, ভালো করে, ভালো করে পরীক্ষা করেছেন কি আপনি হারটা? আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল হারটা ঝুটো।"

চিন্তিত হয়ে উঠল দোকানের মালিক। বললে: "আপনার নাম?"

"লাঁতোঁ। স্বরাষ্ট্র-দপ্তরে চাকরি করি আমি। 'শহীদ রাস্তা'র ১৬ নং বাড়িতে বাস করি আমি।"

দোকানের মালিক পুরনো খাতাপত্তর বের করলেন দোকানের, খুঁজে বের করলেন বিক্রির খবর। বললেন: "হাঁ। ১৬ নং 'শহীদ রাস্তায়' মাদাম লাঁতোঁকে পাঠানো হয়েছিল হারটা। বিশে জুলাই, ১৮৭৬ সালে।"

তার পর স্তব্ধ হয়ে চুপচাপ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দু'জনেই। পরম বিস্ময়ে হতবাক্ মঁশিয়ে লাঁতোঁ এবং দোকানের মালিক ঘ্রাণ পেলেন যেন চৌর্যবৃত্তির এবং সেই জন্যই বোধ হয় প্রথম কথা বললেন তিনিই।

"হারটা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য রেখে যাবেন আপনি?" বললেন দোকানের মালিক, "অবিশ্যি রসিদ দিয়ে দেব আমি তার জন্য—"

"হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই—" শশব্যস্তে উত্তর করে উঠলেন মঁশিয়ে লাঁতোঁ এবং তার পর পকেটে রসিদ পুরে বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে পথে-পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন মঁশিয়ে লাঁতোঁ। মনের মধ্যে তখন ঝড় বইছে তাঁর। বার বার বুঝতে, নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি ব্যাপারটা। দামী, আসল মুক্তোর হার কোত্থেকে কিনবে তাঁর বৌ? কক্ষণো কিনে থাকতে পারে না সে। তাহলে তাহলে—নিশ্চয়ই হারটা কারো উপহার দেওয়া! উপহার! কিন্তু উপহার কার কাছ থেকে? কেন? ভাবতে গিয়ে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন মঁশিয়ে লাঁতোঁ। ভীষণ মর্মান্তিক এক সন্দেহ উদয় হল তাঁর মনে। তাহলে কি তাঁর বৌ—? তাহলে অন্যান্য গয়নাগুলিও কি এই ভাবে উপহার পাওয়া বৌয়ের?

পায়ের নীচে মাটি যেন সরে গেল মঁশিয়ে লাঁতোঁর, সামনের গাছগুলি যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগল তাঁর মাথায়; হাত তুলে কি যেন ধরতে গেলেন তিনি, তার পর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

জ্ঞান হল তাঁর এক ডাক্তারখানায়, রাস্তার লোক ধরাধরি করে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে সেখানে। বাড়ি ফিরতে চাইলেন এবং বাড়ি ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাত পর্যন্ত

অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি। তার পর শেষে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গিয়ে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

পরের দিন সকালে রোদ উঠলে ঘুম ভাঙল তাঁর। আপিস যাবার জন্য ধীরে ধীরে পোষাক পরতে সুরু করলেন তিনি। ঐ রকম ধাক্কার পর কাযে যাওয়া সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। ছুটি চেয়ে আপিসে চিঠি লিখে দিলেন তিনি। তার পর মণিকারের দোকানে যাবার কথা মনে পড়ল তাঁর। যাবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু হারটা ফেলে রাখতেও ইচ্ছে হল না দোকানে। পোষাক পরে বেরিয়ে পড়লেন লাঁত্যাঁ।

বাইরে সুন্দর দিন করেছিল, পরিষ্কার নীল আকাশ যেন হাসছিল ব্যস্ত শহরের দিকে চোখ মেলে। আয়েসী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা রোদে বেড়াচ্ছিল পকেটে হাত পূরে।

তাদের দেখে মনে-মনে আক্ষেপ করে উঠলেন মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ: "পয়সাওয়ালা লোকেরা সত্যিই জীবনে সুখী! টাকা থাকলে গভীরতম দুঃখও বুঝি ভোলা যায়! যেখানে খুশি বেড়াতে পারে মানুষ, বেড়াতে পারে পৃথিবী এবং ভুলতে পারে মনের গভীরতম ব্যথা! পয়সা—যদি পয়সা থাকত আমার!"

ভীষণ খিদে পেয়েছে খেয়াল হল মঁশিয়ে লাঁত্যাঁর, কিন্তু পকেটে একটা কানা কপর্দকও নেই তাঁর। হারের কথাটা আবার মনে পড়ল তাঁর। আঠারো হাজার ফ্রাঁ! আঠারো হাজার! সে যে অনেক টাকা!

মণিকার-দোকানের কাছে অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন তিনি। আঠারো হাজার টাকার কথা ভেবে বিশ বারের বেশি তিনি চেষ্টা করলেন দোকানে ঢোকবার কিন্তু লজ্জায় পারলেন না গিয়ে ঢুকতে। অনাহারে রয়েছেন তিনি, ভয়ানক খিদে পেয়েছে তাঁর এবং পকেট একেবারে শূন্য! হঠাৎ মন স্থির করে রাস্তার এ-পার থেকে দৌড়ে গিয়ে ও-পারের দোকানে ঢুকে পড়লেন তিনি, এক মুহূর্ত সময় দিলেন না নিজেকে পিছু হঠবার।

দোকানের মালিক সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল তাঁর কাছে, খাতির করে চেয়ার এগিয়ে দিল বসতে। দোকানের কর্মচারীরা মুখ টিপে হাসতে লাগল তাঁকে দেখে।

"খোঁজ যা করবার, করে নিয়েছি আমি, মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ—" মালিক নিবেদন করলেন, "যদি এখনো বেচবার ইচ্ছে থাকে আপনার ত যে দাম বলেছি, এখুনি তা দিতে রাজী আছি আমি!"

"দিন—" তোৎলাতে তোৎলাতে কোনো মতে কথাটা উচ্চারণ করলেন লাঁত্যাঁ।

টেবিলের দেরাজ থেকে ভালো করে গুণে, দেখে আঠারোটা নোট বের করলেন দোকানের মালিক এবং হাতে তুলে দিলেন মঁশিয়ে লাঁত্যাঁর। কম্পিত হস্তে রসিদ সই করে টাকাটা পকেটে পুরলেন লাঁত্যাঁ।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার আগে আবার মালিকের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন লাঁত্যাঁ। মালিকের মুখে সব-কিছু জানার হাসি তখনো লেগে রয়েছে। চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করলেন লাঁত্যাঁ মৃদু কণ্ঠে:

আরো কিছু এ রকম গয়না—একই সূত্রে পাওয়া—রয়েছে আমার কাছে। সেগুলি কিনবেন কি আপনি?"

প্রায় কুর্নিশ করে মালিক বললেন, "নিশ্চয়ই!"

গম্ভীর হয়ে লাঁত্যাঁ বললেন, "এখুনি সেগুলি নিয়ে আসছি আমি!"

এক ঘণ্টা বাদে গয়নার বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ। বড় হীরের ফুল দু'টোর দাম পেলেন বিশ হাজার ফ্রাঁক; ব্রেসলেট পঁয়ত্রিশ হাজার ফ্রাঁক; আংটি ষোলো হাজার; পান্না ও নীলকান্ত মণির একটি সেট চোদ্দ হাজার; হীরের পেণ্ডেণ্ট দেওয়া একগাছি সোনার হার চল্লিশ হাজার—সর্বসাকুল্যে এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ফ্রাঁক।

দোকানের মালিক রসিকতা করে বলে উঠলেন এক সময়: "এক জনের সারা জীবনের রোজগার এই পাথরগুলিতে খরচা করা হয়েছে!"

মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ গম্ভীর ভাবে উত্তর করলেন: "খরচা কেন? এও ত এক ধরণের টাকা লাগানো!"

সেদিন এক মস্ত দোকানে গিয়ে আহার করলেন মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ, বিশ ফ্রাঁক বোতলের সুরা পান করলেন প্রচুর। তার পর গাড়ি ভাড়া করে বেড়াতে বের হলেন শহর। চার ধারের অন্যান্য গাড়িগুলি হেয়-চক্ষে দেখতে লাগলেন তিনি এবং প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইলেন সেই সব গাড়ির আরোহীদের উদ্দেশ্যে: "আমি,—আমিও এক জন পয়সাওয়ালা লোক। দু'—দু'লক্ষ ফ্রাঁক রয়েছে আমার!"

হঠাৎ আপিসের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। গাড়ি ঘুরিয়ে আপিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি, লঘুচিত্তে দপ্তরে ঢুকে উপরওয়ালাকে বললেন: "স্যর, চাকরিতে ইস্তফা দিতে এসেছি আমি। উত্তরাধিকারসূত্রে তিন লক্ষ ফ্রাঁক পেয়েছি আমি!"

পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে করমর্দন সেরে এবং ঘনিষ্ঠ ক'জনকে তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাৎলে সন্ধ্যের আহার করবার জন্য 'কাফে আংলে'তে গেলেন লাঁত্যাঁ।

সম্ভ্রান্ত চেহারার এক ভদ্রলোকের ধারে বসে খাওয়ার মধ্যেই তাঁকে গোপনে জানিয়ে দিলেন যে, আজই চার লক্ষ ফ্রাঁক লাভ হয়েছে তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে। জীবনে এই প্রথম থিয়েটারে গিয়ে বিরক্ত হলেন না মঁশিয়ে লাঁত্যাঁ, বাকি রাতটাও কাটালেন ফূর্তি ও উপভোগে।

ছ'মাস বাদে আবার বিয়ে করলেন লাঁত্যাঁ। তাঁর দ্বিতীয় বৌয়ের সত্যিকার ভালো ছিল স্বভাব-চরিত্র কিন্তু মেজাজ ছিল ভয়ানক খারাপ। সে বৌকে নিয়ে বড় কষ্ট পেতে হয়েছিল মঁশিয়ে লাঁত্যাঁকে!

অনুবাদ—ঊষা দেবী।

মুক্তি

শ্রীবাণি দেবী

ঢং-ঢং শব্দে রাত্রি দু'টো বেজে গেলো। আর চার ঘণ্টা বাকি। তার পরেই আসবে সেই প্রলয়-মুহূর্ত্ত—যা নিবিয়ে দিয়ে যাবে পৃথিবীর সমস্ত আলো। হরণ করে নেবে আমার আনন্দময় আত্মাকে। বিলোপ করবে আমার সকল সত্তা। পরিণত করবে আমার জীবনকে একটা শুষ্ক, রুক্ষ, তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে।

বিভীষিকাময়ী কালরাত্রি ছন্দিত চরণে এগিয়ে চলেছে নিজের কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে। উঃ, থামাও, থামাও, ঘড়িটাকে! জন্মের মত দাও বিকল করে! এই মুহূর্ত্তে এমন কোনো অলৌকিক শক্তি কি লাভ করা যায় না—যার বলে পৃথিবীর সমস্ত ঘড়িগুলোকে বিকল করে দিতে পারি? তাহলে? তাহলে ঐ দু'টো বেজেই থাকবে। ছ'টা আর বাজবে না। কেতনলালের ফাঁসিও বন্ধ থাকবে ঐ ছ'টা বাজবার অপেক্ষায়! ভগবান! ভগবান! তোমার দয়া ভিক্ষার প্রয়োজন কোনো দিন অনুভব করিনি, অযাচিত করুণা তোমার পূর্ণ করেছিলো আমার জীবন-পাত্রখানি, কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিলো না তার। এক ফোঁটা বেদনার অশ্রুও ঝরেনি কোনো দিন—দাদার মৃত্যুর আগে। সামান্য আঘাতেও হৃদয় স্পন্দিত হয়নি কোনো দিন। তার পর নিদারুণ আঘাতে ভেঙে দিলে বুক। সহ্য তাকে করে নিলাম; আবার! আবার কি নির্ম্মম দান এনেছো আজ? আমায় মুক্তি দাও, তোমার এ নির্ম্মম নিষ্ঠুর বেদনার দান গ্রহণ করতে পারবো না আমি—উঃ, কি জ্বালা শিরায়-শিরায়! উত্তপ্ত গলিত শিসা কে যেন ঢেলে দিচ্ছে! হৃৎপিণ্ডটা সবলে কে ছিঁড়ে নিতে চাইছে? সারা শরীরে যেন প্রবল ভূমিকম্পের দোলা!

কই, ঘড়িটাকেও আর দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে ওটা কি একটা কালো যবনিকা? ঐ যে সেটা ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে? ভেতরে ওরা কারা? ঐ রক্তবসনা, চূর্ণকুন্তলে রক্ত গোলাপ, হাস্যময়ী সুন্দরী তরুণীটি কে? এ কি! এ যে আমি? আমার পাঁচ বছর আগেকার প্রতিচ্ছায়া! হায়, ঐ আমিই কি আজকের আমি? কৈ, ওর কোথাও তো বেদনার চিহ্নমাত্র নেই! ঐ যে দাদার ঘরে গিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ছে।······

হা! হা! হা! শিখা হেসে লুটিয়ে পড়লো সোফার ওপর। কালো ঝল লম্বা চুল লোকটা কে দাদা?

প্রবীর চৌধুরী গম্ভীর ভাবে বললো,—ছি! শিখা, তুমি বড় অহঙ্কৃতা হয়ে উঠেছো। যার সম্বন্ধে তুমি ঐ কথাগুলো প্রয়োগ করলে সে অত অবজ্ঞার পাত্র নয়। জেনে রাখো, ভারতমাতার কৃতী সন্তান "কেতনলালের"র পায়ের ধুলোয় আজ আমাদের বাড়ী পবিত্র হয়ে গেলো। ওপরের রূপ দেখে কারুর বিচার করতে যাওয়া শুধু ধৃষ্টতা নয়, রীতিমত নৈতিক অপরাধ! বিচার কোরো তার ব্যক্তিত্ব ও হৃদয় দেখে।

মুহূর্ত্তে শিখার হাসি থেমে গেলো। এলো সজল চাউনি, দাদার কাছে বকুনি তার জীবনে এই প্রথম। মৃদু স্বরে শিখা বলে,—আমি

ওঁর কোনো পরিচয় ত জানি না দাদা! না জেনে যা বলেছি ক্ষমা কোরো তার জন্ম। শিখা ধীর পদক্ষেপে চলে যায়।

সন্ধ্যা বেলায় নিজের ঘরে বসে ভাবছে শিখা, কেতনলালের কথা, দেশের কাজ ও কারাবরণের কথা কাগজে পড়েছে সে। দাদা তার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে। শিখারও একটা ভারি কৌতূহল ছিলো কেতনলালের সম্বন্ধে! কিন্তু ও কী চেহারা? বড় বড় রুক্ষ চুল ঝুলছে। পরনে খদ্দরের ধুতি ও চাদর। রং কালো ঝল। কিন্তু কালো মেঘের বুকেই থাকে বজ্রের আগুন। দাদার ডাকে সে চমকে ওঠে। দাদা বলে,—কি রে, মনে বড় আঘাত লেগেছে না?

শিখা বলে, কই না তো!

দাদা বললে,—শিখা, কেতনলালের হৃদয়ের পরিচয় একটু চাস? তবে আয়, এখন কেউ নেই আলাপ করিয়ে দিই তোর সঙ্গে। মন্ত্রমুগ্ধার মত শিখা যায়। যেন আগুনের আকর্ষণে পতঙ্গ ছুটে চলেছে!······

অদ্ভুত চোখে, অপরূপ চাহনি কেতনলালের। শিখা ভাবে, একাধারে বজ্রের আগুন ও সজল মেঘের শ্যামল ছায়ার এ কী অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!

কয়েক দিন পরে। সেতারে শিখা বাজাচ্ছিলো জয়জয়ন্তী রাগিণী। নিঃশব্দে পেছনে এসেছিলো কেতনলাল। সুগভীর স্বরে বলেছিল,—যন্ত্রের বুকে আপনি সৃষ্টি করেছেন করুণ ক্রন্দনধ্বনি। কিন্তু প্রাণহীন যন্ত্র কতটুকু কান্না শোনাবে আপনাকে? মানুষের হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন শুনেছেন কোনো দিন?

শিখা সেতার নামিয়ে রাখে, বলে,—না, সে সুযোগ জীবনে আসেনি।

রায় বাহাদুর অবিনাশ চৌধুরীর একমাত্র আদরের মেয়ে শিখা—রূপে, গুণে, বিদ্যায়, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় ষোলকলা পূর্ণ তার মাধুর্য্য। বাবা-মা'র চোখের তারা সে, কলেজের বান্ধবীদের ঈর্ষার পাত্রী, পার্টিতে, জলসায়, অনেক তরুণের মনোহারিণী। এ-হেন শিখা দেবী কেমন করে জানবে বেদনাহত হৃদয়ের আর্ত্তস্বর কাকে বলে!

শিখা দেখতে চায় মানব-সমাজের সেই অদেখা রূপটি। কেতনলাল সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখায়। শ্রমিক-বস্তিতে, চাষি-মজদুরদের জীর্ণ কুটীরে! শিখা দেখলে সর্ব্বহারা, বঞ্চিত, ক্ষুধিত, পীড়িত, অশিক্ষিত, অবহেলিত, বিরাট একটি জনসমুদ্র। শুনলে সেই বিক্ষুব্ধ সাগরের নিষ্ফল ক্রন্দনধ্বনি! তার বিস্মিত, শোকাহত হৃদয় বার বার প্রশ্ন করে,—কেন? কেতনলাল! এ কেন হোলো? কেউ খেয়ে-পরে-ছড়িয়ে ভোগ করে ফুরোতে পারছে না, আর কেউ তা থেকে একেবারে বঞ্চিত! কেন সবাই সুখ-দুঃখকে সমান ভাবে ভাগ করে নিলো না?

শিখা দেখলো কেতনলাল ও তার পার্টির ছেলেদের অসীম আত্মত্যাগ ও জনসেবা। ঐ নিরক্ষরদের শিক্ষাদানে তাদের জাগিয়ে তোলার কি ধৈর্য্যপূর্ণ বিপুল প্রচেষ্টা!

মুগ্ধ হয়ে শিখাও চাইলো কেতনলালের কাজের ভাগ নিতে। কেতনলাল বলে—শিখা! আগে কিছু শিখে নাও কাজ। আর, আর ভালো করে ভেবে নাও, এ পথে চলতে পারবে কি না।

শিখার শিক্ষা চলেছে কেতনলালের কাছে। অন্তরে তার জেগে উঠেছে এক মহীয়সী নারী, কর্ম্ম-চাঞ্চল্য নিয়ে; পূর্ব্বের শিখা, সভয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই হোমানল-শিখাকে!

অশোক ব্যানার্জ্জী সদ্য বিলেত ফেরৎ তরুণ ব্যারিষ্টার। এ বাড়ীতে তার অবারিত দ্বার। রায় বাহাদুরের ভাবী জামাতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেন তার চাল-চলনে! সে কিছু দিন বিদেশ ভ্রমণের পর ফিরে এসে শিখার এই পরিবর্ত্তন দেখে রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে বলে,—শিখা, এ সব কি? ঐ কালো লোকটা তোমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করলো নাকি?

শিখা বলে,—না, মন্ত্রমুগ্ধ করেনি। ক্ষুদ্র প্রদীপ-শিখাকে শুধু পরিবর্ত্তিত করেছে হোমানল-শিখায়।

প্রবল বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠে অশোকের অন্তরে। সে রায় বাহাদুর-পত্নী মায়া দেবীকে বলে,—মাসীমা! ঐ সর্ব্বনেশে দলের পাণ্ডাকে এ-বাড়ীতে আমদানী করলে কে? আর শিখাকেই বা ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে দিচ্ছেন কেন? এতে ওর বিপদ ঘটতে পারে!

মায়া দেবী বললেন,—অনেক বারণ করেছি বাবা! ও ছেলেটিকে দেখলে আমার কেমন ভয় করে যেন। কিন্তু শুধু ওঁর প্রশ্রয় পেয়ে ছেলে-মেয়ে কেউ আমার কথা গ্রাহ্য করে না। কি যে হবে, আমি বড় ভাবনায় পড়েছি!

কেতনলাল শিখাকে বলে,—শিখা! তুমিই আমার মূর্ত্তিমতী প্রেরণা, তুমি পাশে থাকলে আমি শত গুণ কর্ম্মশক্তি পাই!

শিখা মৃদু হেসে বলে,—এ তোমারই দান কেতনলাল। তোমাকে বাদ দিলে আমার সত্তা কিছুই থাকে না যে!

শিখা তার বহুমূল্য গহনাগুলোও পার্টির কাজে দান করে!

রায় বাহাদুরের আনন্দ ও বিলাসপূর্ণ ভবনে এই ঘোর পরিবর্ত্তন একটি নীরব ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে মা আর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে।

অবিনাশ বাবু ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ব্যবহার করতেন ঠিক বন্ধুর মতো। তাদের দিয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা। কিছু দিন আগেও শিখার বাবাই ছিলেন শিখার সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু! বাবার সঙ্গে বেড়ানো, টেনিশ খেলা, লাইব্রেরীতে বসে পৃথিবীর মনীষীদের জীবনী আলোচনা করা, শেলি, বায়রণ, কীটস্, মিল্টন, প্রভৃতি মহাকবিদের কবিতা আবৃত্তি করে বাবাকে শোনানো, সেতার বাজিয়ে গান গেয়ে বাবার মনে আনন্দ জাগানো,—এই ছিলো তার নিত্যকার প্রিয় কর্ম্ম। কেতনলাল আসবার পর থেকেই এর ব্যতিক্রম ঘটতে লাগলো। অবিনাশ বাবু মনে কিছু আঘাত পেলেন। কিন্তু শিখাকে কিছু বললেন না। যখন তাঁর স্ত্রী এ বিষয়ে অভিযোগ জানাতেন, তিনি হেসে বলতেন—ইচ্ছে হয়েছে, কিছু দিন থাক না ও-পথে, ওরা যা কাজ করে সেগুলো ভালোই। মানুষের উপকারও করা হয়।

তিন বছর কেটে গেছে। হঠাৎ রামকিষণ মিলে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। মিলের হাজার হাজার মজদুর কাজ বন্ধ করে বিরাট মিছিল বের করে। চিৎকার করে তাদের দাবী জানাতে থাকে।

মিছিলের পুরোভাগে ছিলো প্রবীর এবং পার্টির অনেক ছেলে-মেয়ে। কেতনলাল তখন গিয়েছিলো ইউ পি-তে অন্য জরুরী কাজের জন্য। শিখার শরীর অসুস্থ ছিলো, সে জন্য সে মিছিলে যোগ দিতে পারেনি। মিলের কর্তারা পুলিশের সাহায্য নিলেন। প্রথমে লাঠিচালনা, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ এবং পরে গুলী চললো! মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। অনেকে আহত হোলো। আর কয়েক জন ছেলে বহু দিনের পুঞ্জীকৃত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালো বুকের তাজা রক্ত ও প্রাণ বলি দিয়ে। প্রবীর তাদের এক জন, সহীদের রক্তে লাল হয়ে উঠলো মিলের সামনের রাস্তার ধূলো! প্রবীর ও আরো দু'টি সহীদের মৃতদেহ রাশি রাশি ফুলে সাজিয়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে, কলেজের ছাত্র ও শ্রমিকরা নিয়ে এলো রায় বাহাদুরের প্রাসাদের ভেতর। মৃতদেহগুলি প্রথমে পুলিশ ছাড়তে চায়নি। শিখার সহকর্মীরা টেলিফোনে রায় বাহাদুরকে খবরটা জানায়, এবং তাঁর সাহায্যে শোভাযাত্রা করে মৃতদেহগুলি নিয়ে আসা হয়! আহতদের হাসপাতালে দেওয়া হয়!

মায়া দেবী পুত্রের মৃতদেহের ওপর হাহাকার করে লুটিয়ে পড়লেন, অবিনাশ বাবু ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে নীরব আশীর্ব্বাদ জানালেন। শিখা এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। বজ্রাহতের মত চেয়ে রইলো দাদার প্রাণহীন দেহটার পানে! আজ তার দেশপ্রেম, কর্ম্মশক্তি, পরাধীনতার জ্বালা সব নিবে গেছে। তার আবাল্য সাথী প্রিয় দাদাকে হারিয়ে সে আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে! সমবেত কণ্ঠের মিলিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির সঙ্গে সে একবারও নিজের সুর মেলাতে পারলো না। একবারও পারলো না সহীদদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে।

আরো ছ' মাস কেটে গেছে। শোকার্ত্ত পিতা-মাতার অনুরোধে শিখা আর পার্টির কাজে যায় না। সর্ব্বদা সে উন্মনা। একটা কোন্ অব্যক্ত অনুভূতি তাকে গ্রাস করছিলো তিলে-তিলে! তার গান, কবিতা, খেলা, তার সজীব চঞ্চলতা, তার কর্ম্মপ্রেরণা সব যেন সে আজ হারিয়ে ফেলেছে। অসহ, দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা আজ তার মনকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

কেতনলাল ফিরে এসেছে। শিখার সামনে এসে দাঁড়ায় কেতনলাল। বলে,—শিখা, নির্ম্মম বেদনাকে বুক পেতে নেওয়াই ত আমাদের ব্রত। প্রবীর বীরের মত জীবন দান করেছে। সে সহীদের সম্মান গৌরব লাভ করে অমর জীবন লাভ করলো। এসো শিখা, আমরাও চেষ্টা করি ঐ গৌরব লাভের!

কেতনলালের ডাকে শিখা চমকে ওঠে। তার অন্তরে আবার বিজলী চম্‌ক ওঠে, হারানো জীবন যেন আবার ফিরে আসতে চায়। কিন্তু না! না! তা তো আর হতে পারে না। মা! বাবা—

শিখা কাতর স্বরে বলে—কেতনলাল, তুমি কেন আমার পাশে ছিলে না? আমি আমার সকল সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছি। তুমি আবার আমাকে জাগিয়ে তোল!

মায়া দেবী শিখাকে কঠোর স্বরে তিরস্কার করেন,—তুমি আবার ঐ কেতনলালের সঙ্গ নেবে এ আমি আশা করিনি। শিখা, ওর জন্তে আমার প্রবীরকে হারিয়েছি, আমার সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে। মা-বাবাকে ভালো না বাসো, তাদের প্রতি একটু কৃতজ্ঞতাও কি তোমার নেই? জানো, ঐ কেতনলালের দল গভর্ণমেণ্টের শত্রুপক্ষ? তোমার বাবা গভর্ণমেণ্টের লোক; তুমি মেয়ে হয়ে তাঁর বিপক্ষে যোগ দেবে? ওরা আমাদের পরম শত্রু; দরকার হলে ওরা তোমার বাবাকে খুন করতে কোনো সংকোচ বোধ করবে না!

শিখা শিউরে উঠে চোখ বোজে! উঃ, কি নির্ম্মম বাক্য! সে তার—ঐ স্নেহময় পিতার শত্রুপক্ষীয়? দরকার হলে তারা বাবাকে খুনও করতে পারে?

কয়েক দিন পরে ভীষণ চাঞ্চল্যকর একটি ঘটনা শিখার জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে তুললো! রামকিষণ মিলের মালিক ও সাহেব ম্যানেজারকে কারা খুন করেছে। কিষণলালের পার্টির অনেক কর্ম্মীদের সন্দেহ বশতঃ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের আড্ডার জায়গাটি খানাতল্লাসী করে নিষিদ্ধ অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। কেতনলাল নিরুদ্দেশ। তাকে ধরবার জন্য অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। অশোক উত্তেজিত ভাবে রায় বাহাদুরের ড্রয়িং-রুমে বসে খবরগুলো পড়ছিলো, অবিনাশ বাবু স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছিলেন। ভীত কণ্ঠে মায়া দেবী বললেন,—এ আমি আগেই জানি। সর্ব্বনেশে খুনে লোকটা এখন আমাদের কোনো ক্ষতি না করে! প্রথমেই আমি বারণ করেছিলাম তাকে বাড়ীতে আনতে, তখন আমার কথাটা উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, এখন তার গুরুত্বটা বুঝতে পারবে!

অশোক বক্র দৃষ্টিতে শিখার পানে চাইলো, রক্তশূন্য ভাবলেশহীন মৃতের মত মুখ শিখার। শ্লেষ কণ্ঠে অশোক বলে,—শিখা, তুমি ঠিক পথে চললেই বিপদের সম্ভাবনা কম থাকবে! তা না হলে শেষ পর্য্যন্ত কি যে ঘটবে, বলা যায় না।

ঝড়-বৃষ্টিপূর্ণ দুর্য্যোগময়ী রাত্রি। দু'টো বেজে গেছে। শিখার চোখে ঘুম আসেনি। জানলার দিকে চেয়ে সে বসেছিলো। তার বুকেও বুঝি ঐ রকম ঝড় বয়ে চলেছিলো। হঠাৎ বাগানের গাছে শাদা মত কি যেন নড়ে উঠলো! শিখা বাগানের জানলার দিকে দাঁড়ায়। কি আশ্চর্য্য! গাছের ওপরে যেন এক জন লোক বলে বোধ হলো। হাঁ্যা, লোকটি একটি শাদা রুমাল নেড়ে জানালো, শত্রু নই বন্ধু। তার পর লোকটি নিঃশব্দে উঠে এলো জানলার কার্ণিশের ওপর দিয়ে একেবারে ঘরের ভেতর।

কে? শিখা ভীত আর্ত্ত স্বরে প্রশ্ন করে,—কে? কেতনলাল?

—হাঁ্যা শিখা, আমি। আমি পলাতক, আজ রাত্রের মত একটু আশ্রয় দেবে? সঙ্গে দুটি রিভালবার ও মূল্যবান কাগজপত্র আছে। শেষ রাত্রে আমি চলে যাবো। এখন আমি বড় ক্লান্ত শিখা!

শিখা ভূতাবিষ্টের মত নির্ব্বাক্ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিলো কেতনলালের দিকে। বারে বারে মনে পড়ছিলো মা'র সেই নিষ্ঠুর কথাগুলো। বিপক্ষ দল, তোমার বাবাকে খুন করতে পারে!...

কেতনলাল শিখার একটি হাত চেপে ধরে মৃদু স্বরে ডাকলে,—শিখা, কথা বলছ না কেন? আমাকে দেখে কি ভয় পেয়েছ? কিন্তু
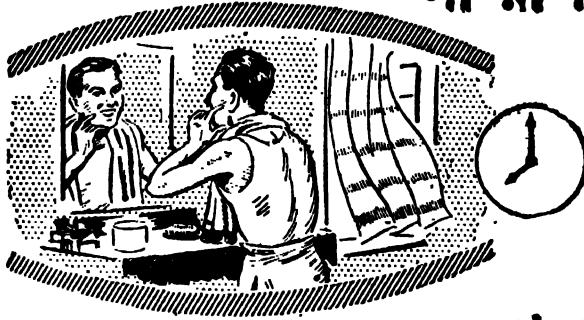
বিশ্বাস কর শিখা, ওদের খুন আমি করিনি। অত্যাচারীরা নিহত হয়েছে অত্যাচারিতদের হাতে। আমি এ [illegible] আগে খবর পেয়ে মালিককে সাবধান হবার জন্য চিঠি দিয়েছিলাম। সেই জন্যই খুনের অপরাধ এখন আমার ওপর পড়ছে! আমি নিজেই ধরা দেব, তা না হলে ওদের প্রাণ যাবে। তবে এই জিনিষগুলি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে যাবো।

শিখার কানে বোধ হয় কোনো কথা পৌঁছোয়নি। মস্তিষ্ক তার পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সে আর্ত্ত স্বরে কেঁদে উঠলো,—তুমি যাও কেতনলাল, আমাকে মুক্তি দাও!

কেতনলাল পরম বিস্ময়ে চেয়ে রইলো তার মুখের পানে, তার পর তীব্র স্বরে বললে,—শিখা, মুক্তি তোমাকে দিলাম, তবে যাবার বেলায় জেনে যাই তোমার কোন্ রূপটা সত্য? বল শিখা, উত্তর দাও! আমার সমস্ত সাধনায়, প্রেরণায়, অনুভূতিতে আমার সকল সত্তায় তোমার যে রূপটি মিশে আছে, সে কি এত বড় মিথ্যে, সে কি শুধু আমার নির্ব্বোধ কল্পনা মাত্র? না, না, একবার বল তোমার আজকের রূপ মিথ্যা! আমি এইটুকু তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি শিখা!

ঘন ঘন দরজায় করাঘাত পড়তে থাকে—শিখা, শিখা, দরজা খোলো। মায়ের কণ্ঠস্বর। শিখা দু'হাতে ঠেলে কেতনলালকে জানলার কাছে সরিয়ে দিলে। যাও, যাও, পালাও কেতনলাল! সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে—থর-থর করে কাঁপছিলো শিখার দেহ! কেতনলাল হাসলো। অবিচল ভাবে সে দাঁড়িয়ে রইলো। শিখা মূর্চ্ছিতা হয়ে লুটিয়ে পড়লো তার পায়ের কাছে! কেতনলাল ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলো।

সামনে মায়া দেবী, তার পর অশোক ব্যানার্জ্জী, পিছনে সশস্ত্র পুলিশ!

* * * *

কেতনলাল সমস্ত অপরাধ নিজের বলে স্বীকার করেছে। কয়েক জন দীন মজদুর ও সহকর্ম্মীদের জীবন রক্ষা করলে আপনার জীবন উৎসর্গ করে। বিচারে কেতনলালের ফাঁসীর আদেশ হয়েছে কাল। এপ্রিলের দু'তারিখে ভোর ছ'টায় আসবে [illegible] চরম মুহূর্ত!

ও কী! ছায়ার মত সব কোথায় মিলিয়ে গেল? [illegible] দৃশ্য দেখিয়ে কালো যবনিকা ধীরে-ধীরে নেমে এলো! [illegible], ঘড়িটা যে আবার দেখা যাচ্ছে, ছ'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি! না—না, ছ'টা বাজতে দেব না শিখা চিৎকার করে ছুটে যেতে চায় ঘড়ির দিকে। কিন্তু পা এত ভারি কেন? কে যেন স্ক্রু দিয়ে মাটির সঙ্গে পা দু'টো এঁটে দিয়েছে। উঃ, বুকে এত শব্দ কিসের? চোখের সব আলো নিবে গেছে কেন? অবসন্ন দেহ তার মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং! ছ'টা বেজে গেলো! মাথার কাছে কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা, মা, তুমি কাঁদছো কেন? বাবা! বাবা! তোমার চোখে জল কেন? উঃ, বড় কষ্ট হচ্ছে বুকে বাবা! কি অন্ধকার মা?

ও কিসের আলো? ঐ উজ্জ্বল মূর্ত্তিটি কার মা? কেতনলাল, তুমি এসেছো?

সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে লেখা ছিলো—গত কাল ২রা এপ্রিল বিখ্যাত……পার্টির নেতা কেতনলালের আলিপুর জেলে ভোর ৬টায় ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। সংবাদের ওপর ছিলো কেতনলালের ফটো ও তলায় তার অগ্নিময় জীবনী।

ঐ কাগজের অপর পৃষ্ঠায় ছিলো আরেকটি শোক-সংবাদ।

একটি সুন্দরী তরুণীর ফটো। তলায় লেখা ছিলো—রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশ চৌধুরীর বিদুষী কন্যা শিখাদেবী ২রা এপ্রিল ভোর ৬টায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। আমরা শোক-সন্তপ্ত রায় বাহাদুর ও তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি!

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

ষোল

ঠিক এর ক'দিন পরেই জলকর আন্দোলন বন্যার জোয়ারের মত চারদিক ছাপিয়ে এলো অমিত বিক্রমে। দিবাকরের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভাসিয়ে নিয়ে গেল রুদ্রতেজে। দেখতে দেখতে সে জড়িয়ে পড়ল দেশব্যাপী ঐ আলোড়নের পাকে। এখন আর তার চিন্তা করার অবসর রইল না কনক কিম্বা মুক্তার কথা।

মাঝিরা দিবাকরের সংগেই দেশে এসেছিল ক'দিনের জন্য। এসেছিল ঘর-সংসার স্ত্রী-পুত্রের টানে। আবার তারা চলে গিয়েছিল দশ-বিশ ক্রোশ দূরে, হাটে-গঞ্জে—নয় তো মাছের চালান খরিদ করতে।

সচরাচর তারা দলবদ্ধ হয়ে চলাচলতি করে—দেশে এসে নাও রাখে তিংগুলতলীর কাছে। যতদিন এরা বিদেশে থাকে, খাটে প্রয়োজন মাফিক—দিন-রাত্রির হিসাব নেই, ঘড়ির ঘণ্টা মেপে এরা দাঁড় মারে না। আর তা মারলেও এদের চলে না। কখনও গায়ের ওপর দিয়ে যায় পৌষের সুদীর্ঘ রাত্রির কন্‌কনে হিম, কখনও বা চৈত্রের চড়া রদ্দুর। চামড়া এদের বার বার ঝলসে গেছে, প্রতিটি মুখে পড়েছে কঠিন জীবন-সংগ্রামের কালির পোঁচ। প্রায় প্রত্যেকের চোখ দুটো রক্তবর্ণ,—হাতে-পায়ে হাজা। তবু এরা কেন জানি তাজা, সজীব এদের অংগ-প্রত্যংগ। লাবণ্য এদের বড় একটা কারুর নেই—না থাক, তবু এদের দেখলে তুমি-আমি চোখ ফেরাতে পারব না। এরা জল-ঝড়ের যোদ্ধা—বাঙলা দেশের বিলাঞ্চলের

নেয়ে মাঝি। সংখ্যা এদের কম নয়, এই বিলগাঁ এবং এর আশ-পাশেই আছে প্রায় হাজার দশেক গৃহস্থ।

সারা জীবন এরা হয়ত নিয়ম মত পেট ভরে ভাত খেতে পায় না। এদের স্ত্রী-পুত্র পায় না ঠিক মত পরনের কাপড়। দুর্বার রোগে চিকিৎসা হয় না সময় মত। তবু এরা বন্য ঝাড়-জংগলের মত বাড়ে সতেজে।

সভ্যতা এদের পোষণ না করে বরঞ্চ নানা ভাবে শোষণ করে। তবু আশ্চর্য, এরা মরে না—দিন-দিন বাড়ে, গড়ে দরিদ্রের সংহতি। গড়ে কুঠার ক্ষুরধার—যার এক আঘাতেই ভূমিসাৎ হবে রক্ত-চোষা পরগাছা। ওরা হয়ত সব সময় বুঝে-সুজে কিছু গড়ে না—ওদের হয়ে গড়ে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, মংগলময় শুভ এক ভবিষ্যৎ। আসবে, খানা-পিনা আনন্দের দিন ওদের আসবে।

কেষ্ট কৈবর্ত বেশ সংগতিপন্ন। হিংগুলতলী খালপারে তার একখানা বড় মুদী ও মনোহারী দোকান আছে। পাঁচ ক্রোশ চৌহদ্দির ভিতর এত বড় দোকান আর নেই। জেলেদের প্রয়োজনীয় জালের কাঠি, নোঙর, সুতা, লোহা থেকে বিয়ের কনের সজ্জা অবধি পাওয়া যায়। ছেলে-মেয়ে জন্মালেও জেলেরা এখানে আসে মধু কিনতে, আবার বাপ-মার শ্রাদ্ধ উপলক্ষেও আসে থান কাপড় ও নানা সামগ্রী খরিদ করতে। কেষ্ট কৈবর্ত বিলেরও একটা মোটা অংশীদার। তার যাতায়াত আছে সর্বত্র; তাকে খাতির না করে হেন লোক নেই।

কেষ্টর চেহারাটা কৃশ, রংটাও একেবারে পোড়া কয়লার মত কালো। তবে অবস্থার দরুণ বেশ একটা তেলকুচকুচে ভাব আছে। সে হচ্ছে জেলেদের মধ্যে সেরা জেলে। সবাই যখন জীবিকার জন্য জাল পাতে জলে ও তখন জাল পাতে কূলে। আর সকলে যখন মাছ ধরে, ও তখন মানুষ গাঁথে ফাঁসে—ধার-বকেয়া-নগদ দিয়ে। বাপেরা বৃক্ষ ছিল বুদ্ধিমান—চালিয়ে গেছে ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদনীতি; আর বিলগাঁয়ের কলিযুগের কেষ্ট ধরেছে নতুন পদ্ধতি। চালিয়ে যাচ্ছে তোষণ-নীতি, মূল উদ্দেশ্য তার শোষণ—সুদে-বাটায়-লাভে মুনাফায়। সোনা-রূপো কেনে, কাঁসা-পিতলও সে বন্ধক রাখে। ঠেকার সময়, ঠেকিয়ে সে কিছু সুদ বেশি নিলেও, দায় উদ্ধার করে প্রত্যেকের। তাই তার সদাশয় খ্যাতি আছে চতুর্দিকে। নিজেও কেষ্ট উপলব্ধি করে যে সে একজন মহৎ ব্যক্তি। সদা সত্য কাজ করে, সৎ পথে চলে এসেছে বলে তার আজ এ সংগতি। সে ফোঁটা-তিলক কাটে, কৈবর্তের ছেলে হয়েও খায় নিরামিষ।

জেলেরা আবার ক্ষেপ দিয়ে ঘরে এসেছে। যে-যার বাড়ী যাওয়ার পূর্বে সওদাপাতি কিনবে বলে দোকানে এসে উঠেছে। সময়টা ঘোর সন্ধ্যা। চারদিক ঘন বাগানগুলো লেপটে যাচ্ছে যেন কালিতে। মাঝে মাঝে মাছের লেজের নাড়ায় বিলের জল শুধু চিকিমিকি করছে অদূরে।

একটা মশালের মত তেলের প্রদীপ জ্বলছে কেষ্টর হিসাবের খাতার সুমুখে। আগন্তুক জেলেরা ব্যস্ত, কিন্তু কেষ্ট কৈবর্তের প্রেমধ্বনি থামে না, ধূপতির ধোঁয়াও কমে না।

ওরা বলল, 'কি মহাজন?'

'সিদ্ধিদাতা গোণেশরাজকে পেন্নাম করো—সিদ্ধি-ঋদ্ধি দুই পাইবে—জয় লক্ষ্মীনারায়ণ গোণেশজীউর জয়।' প্রায় পনের মিনিট মাথা নুইয়ে থাকে কেষ্ট কৈবর্ত।

দিনমানের পরিশ্রান্ত লোকগুলো এবার খুবই বিরক্ত হয়। তবু কয়েকজন গামছা কিংবা কাপড়-জড়ান মাথা ভয়ে নত করে। ওরা হাজারও ক্লান্ত হলেও রাজী নয় দেবতাকে উপেক্ষা করতে। জীবন যাক তবু গণেশজীউ সন্তুষ্ট থাক।

চার পয়সা, ছ' পয়সা, দু' আনা, দশ পয়সার সওদা মেপে দেয় গোমস্তা নসু দাস, হিসাব লেখে কেষ্ট নিজে, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মুনাফা চড়িয়ে। বকেয়ার জন্য বছরের মাঝখানে তেমন তাগাদা করে না। একেবারে হঠাৎ উসুল করবে চৈত্র মাসে পৌঁছে। তখন সোনা-দানা তামা-কাঁসায় ভরে যাবে তার ঘর।

কেষ্ট দৈবজ্ঞর মত মাঝে মাঝে মানুষের মনের গোপন বাঞ্ছা ধরতে পারে। সে বৈষ্ণবীয় প্রীতিরসে মুখখানা উদ্ভাসিত করে বলে, 'যা লাগাব তা লাগব হলধর—লজ্জা না কইর‍্যা নেও,—দে তো নসু আর আড়াই পোয়া লবণ খুড়াকে। মাইপ্যা দিস্ ক্যায় ভাইংগ্যা।'

নসু ই গিতটা বোঝে।

হলধর যখন কেষ্টর পোড়া মুখখানার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, নসু তখন চট করে নুন মাপে। ত্বরায় ঠোংগাটা এগিয়ে দেয়।

হলধর বলে, 'আশীর্বাদ করি তোমার আরও ছিরিবিদ্ধি হউক—' ঐ লবণই আমার টান মানে না প্রতি ক্ষেপ, তুমি বোঝলা ক্যামনে? তুমি কি কেষ্ট কাক-বচন জান?'

এবার কেষ্ট সখা হাসি হাসে। উপস্থিত অন্যান্য সকলেও খুসী হয় ওর দরদ দেখে।

'তোমরা তো এবার যে-যার বাড়ী চলছ—তোমাগো দিবাকর গোঁসাই কই? সময়ের মনে সময় যে যায়—আর কত দেরী করবা? একটা কিছু স্থির করো। খালি আমার উপর ভরসা করে লাভ নাই।'

সেই রাত্রেই দিবাকরকে ধরে নিয়ে সবাই আবার হিংগুলতলী এসে জমা হয়। এত দিন একটানা পরিশ্রমের পর অতি প্রলোভনের বিশ্রামটুকুর কথাও সকলে ভুলে যায়। বিলের স্বত্বের সংগে যে তাদের জীবনের সকল স্বার্থ সংলগ্ন!

'গোঁসাই, এ কয়দিন ছিলা কই? আমরা যে মরি।' কেষ্ট আগ্রহ করে নমস্কার করে, বসতে দেয় সযত্নে।

গৌতম বলে, 'প্রভুর ঘাড় থিকা বাউণ্ডুল্যা ভূত এখনও ত্তর ছাড়ে নাই। বলি, তাশে আইস্যা রইলা ক্যামনে পরদেশী হইয়া?'

দিবাকর অত্যন্ত লজ্জা বোধ করে। সত্যই তার দেশে এসে উচিত ছিল দশের সংগে মেশা, দশের খোঁজ লওয়া। সে ভাল করেনি ক্ষুদ্র চৌহদ্দির পরিবেষ্টনে সময় কাটিয়ে। যাক, যে ভুল-ত্রুটি তার হয়েছে সে তা সামলে নেবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে উত্তাল তরংগে—কিছুতেই 'বলন' দেবে না।

'গোঁসাই, তুমি মুখপত্তনে পইড়্যা আন্দোলন চালাও—আহি আছি পিছনে।' কেষ্ট বলে, 'ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় যাও মাঝিদের বুঝাও, বিনা দোষে ক্যান্ দেবা বলন?'

'বাবা তুমি দুধ খইয়া ওলান খাইতে চাও—আমাগো পাইছ

কী ?' গল্পটা পুনরাবৃত্তি করে দিবাকর। একটা তুমুল উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। গুঞ্জন শোনা যায় জনান্তিকে।

কেষ্ট কৈবর্ত প্রশ্ন করে, 'যদি নায়েব-নাজির আসে সংগিন-পুলিশ নিয়া ?'

'আসুক হালায়...'

'যদি ঘর কাইট্যা নামাইয়া দেয় পথে ?'

'দিউক না আগে...'

'আইনে আছে কিন্তু নায়েব-নাজিরের সে ক্ষ্যামতা।'

এবার সকলে দিবাকরের মুখের দিকে রুদ্ধশ্বাসে তাকায়।

দিবাকর জবাব দেয়, 'সে আইন আমরা মানি না।'

'কিসের জোরে ?' সানন্দে কেষ্ট জিজ্ঞাসা করে। সেও যেন কতকটা উত্তেজনা বোধ করছে। মনে ভাবছে, ওদের সংগেই বুঝি তার স্বার্থও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সে মহাজন নয়, বুঝি বা ওদের মতই সাধারণ। 'কিসের জোরে গোঁসাই ?'

'প্রথম বাধা দিমু বুকের জোরে, শ্যাষে ভাসাইয়া নিমু যুক্তির তোড়ে (স্রোতে)।'

আজ কেষ্টই প্রথম শপথ গ্রহণ করে, 'গোঁসাই, তোমাগো সংগ যার ছাড়ে কোন শালায় ? মরুম তবু খাজনা বলন দিমু না।'

গৌতম গিয়ে তাকে কোলে জড়িয়ে ধরে। 'এই তো চাই মহাজন !'

সতের

নিষ্কর্মা দিবাকর এখন আর সময় পায় না। বাড়ী থাকে না একটি দিন। হয়ত কখনও বা গাছতলায়, হাটে-বন্দরে দিনান্তে দুটি চিড়া-মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দেয়, কখনও বা ওঠে গিয়ে নিকটস্থ এক গৃহস্থ বাড়ী। সন্ধ্যার পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একত্র হয়। কোনও পাড়ায় বৈঠক বসে ভাঙা ইস্কুলের চত্তরে, কোনও পাড়ায় অপেক্ষাকৃত সংগতিপন্ন জেলে বাড়ী, আবার কোথাও বা নিরন্ন ভাগ-শিকারীর উঠানে। ছোট-বড় উত্তম-মধ্যম সকলকে দিবাকর বোঝায়, ক্ষেপায় কথার খোঁচা মেরে। জ্বালায় আগুন।

সে বসে বসে কথার শায়ক ছাড়ে, তারপর সোজা হয়ে খাড়া হয়, অবশেষে কাঁপতে থাকে।

'তোমরা কোথায় বসত করো, কইতে পার কোথায় ?'

'ক্যান বিলগাঁয়ে—মহারাণীর রাজত্বে।'

'মহারাণী আর জীবিত নাই, তা কি জানো মশয়রা ?'

'জানি।'

'তা জাইন্না-শুইন্না ঠাণ্ডা হইয়া রইছ, আর কিছুদিন বাদে যে হালে পাইবা না পানি।'

'কও কি !'

'কই তো ভাল। নিলাম হইছে তোমাগো স্বত্ব। এই শুকনার আরামে খাস করবে সরকার তোমাগো পিতা-পিতামহের যত জলকর বিত্ত।' দিবাকর একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'ঐ যে জাল-দড়ি-জল, বাপ-দাদার শ্মশানে দেছ যে দুই-একটি মঠ, তার কোন চিনা (চিহ্ন) থাকবে না। নারকেলের আচি (মালা) হাতে যাইতে হইবে জাশ ছাইড়্যা—ইস্তিরি-পুত্তুর, বুড়া মা-বাপ লইয়া। না হইলে দিতে হইবে খাজনা বৃদ্ধি, কর্বা কবলিয়ত, যার ভরসা নাই মোটে। কি মশয়রা, তোমরা কি তাতে রাজি ?'

'না, না, না...' মাথা নাড়ায় সভাস্থ জনতা।

তারপর দিবাকর বোঝায় যে মহারাণীর দোহাই এখন দুনিয়ায় অচল। তার চেয়েও অনেক মানী রাজা-গজা ছিল মহাভারত ও রামায়ণের যুগে। তারা কেউ শত চেষ্টা করেও গরীবের দুঃখ ঘোচাতে পারেনি। এমন যে রামচন্দ্র সেও। শুধু দিয়েছে গোবর-মাটি মিশিয়ে প্রলেপ—যা একটু দুঃখের রৌদ্রে আবার ফেটে হয়েছে চৌচির।

কোথা থেকে যেন গংগার সুমংগল ধারার মত অফুরন্ত কথার ধারা দিবাকরের মুখে এসে জোগায়। সে এক-একটা ধাক্কায় এক একটা সুবৃহৎ সংস্কারের পাহাড় নিশ্চিহ্ন করে দেয় উপস্থিত জনতার মন থেকে। খসিয়ে ফেলে ভুয়া নিরাপত্তার ঠুলি।

'প্রবাদ আছে, পরের মাথায় দিয়া হাত, সেয়ান মশায় কিরা (প্রতিজ্ঞা) করেন নির্ঘাত। রাম কাঁদছে রমণীর লাইগ্যা, কিন্তু দোষ দেছে তোমাগো—রাইওত প্রজা-রঞ্জন ! ফল তার কি হইছে ? সেই আদিকাল থিক্যা, কি কারও বিত্ত পসার তালুক মুলুক নতুন কিছু গজাইছে ?' চিরদিনই দিবাকরের পৌরাণিক গ্রন্থ-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার জন্ম একটা দরদ ছিল, অন্তরে ছিল দুর্বলতা-সঞ্জাত মমতা, তা হঠাৎ এক-এক দিন শরতের লঘু মেঘের মত অপসারিত হত, দেখা দিত বিদ্রোহী সূর্যকিরণ। সে অকুণ্ঠ চিত্তে বলে যেত, 'রাম কাঁদছে রমণীর লাইগ্যা, যুধিষ্ঠির কাঁদছে ভাই-বেরাদার সত্যের লাইগ্যা—কিন্তু সব চাইয়া যে বড় সত্য, তোমার-আমার লাইগ্যা তো কান্দে নাই কেও—এই হাইল্যা জাইল্যা অভদ্দরের লাইগ্যা, যার গো হাতে হাজা, পায় কাদা, বুকে দুঃখের শেল।' একটু দম নেয় দিবাকর। 'তাই তো রাম-রাজত্ব স্থায়ী হয় নাই, কুরু-পাণ্ডবের বংশ হইছে ধ্বংস। ঐ মহারাণীর নামের মোহে আর পা দিও না কাঁন্দে।'

বলতে বলতে দিবাকর কাঁদে...

'আমাগো বাপ-দাদা পুষি পোনার ভোগের বিত্ত বিলের জল, যা আমাগো স্বভাব-স্বত্ব, তা উঠাবে কচু পাতায়, করবে টলমল, এ কি সহ্য হইবে কক্ষনো ?'

চাপা গুমরানী শোনা যায়—'না, এ নিতান্ত অসহ্য।'

কোন কোন দিন কেষ্ট মহাজন সংগে আসে, সে ভাবে গদগদ হয়ে বলে, 'দিব্যি কইছ।'

দেখতে দেখতে সংহতি গড়ে, পাড়ায় পাড়ায় জোট হয় লেটেল। বয়স্করাও ভুলে-যাওয়া ক্ষিপ্র আঘাতের সন্ধান আরম্ভ করে। দেখা যায় ঢাল-সরকি-ল্যাজা নিয়ে জনগণের প্রস্তুতি।

দিবাকর এখন আর এতটুকু সময় একা কাটাতে পারে না। ছেলে-বুড়োর দল তাকে ঘিরে থাকে সর্বক্ষণ।

তবু এক-এক দিন অধিক রাত্রে সহসা ঘুম ভেঙে যায়।

মুক্তা রাগ করে চলে গেছে, বলে গেছে দিবাকর তার অযোগ্য। এখন সে দেখলে বুঝতে পারত কত যোগ্যতা আছে দিবাকরের। তার কথায়, একটি মাত্র অংগুলি হেলনে, ওঠে-বসে একটা রাজ্য। সামান্ত স্ত্রীলোক হয়ে সে বুঝবে কি করে দিবাকরের প্রতিভা ? মুক্তার জন্ম একটা সহানুভূতি জন্মে দিবাকরের চিত্তে—জন্মে একটা বন্ধুজনোচিত করুণা। মুক্তা তো করুণার পাত্রী নয়। সামান্তাও নয় অন্তের তুলনায়। সে প্রতিভার জন্ম আকৃষ্টা হয়নি, সে

ভালবেসে ছিল অতি সাধারণ প্রতিবেশী দিবাকরকে। গৌরব-খ্যাতি-গর্ব সে চায়নি, চেয়েছিল শুধু একটুখানি প্রেম; নিষ্কলংক কামনা—যে যাকে চায়, সে'তাকে কেন পাবে না? ভুলের বিয়ে কি ভোলা যায় না, মোছা যায় না অসত্য সিঁদূরের রক্তটিকা?···

সবই পারা যায়। দিবাকর মহীরুহের মত শক্ত হলেও, উদ্বাস্তু হলেও তার শীর্ষ, সে অস্বীকার করে না জংলি লতার মধুময়ী পুষ্পার্ঘ। কণ্টক বৃক্ষকে আশ্রয় করে সে লতা বাধ্য হয়ে বেড়েছে, বাড়ুক না—তাতে হয়েছে কি?

দিবাকর সত্য সত্যই মুক্তাকে চায়। কৌস্তুভের মত সে তার বুকে লগ্ন হয়ে রইবে, তার জন্ত দিবাকর দুঃখ সইবে, কষ্ট সইবে, সইবে সকল ঝঞ্ঝা ও তাড়না।

কিন্তু তা তো হলো না। এত লোককে এত কথা বোঝাতে পারে, অথচ সহজ কথাটা, জানা বিষয়টা দিবাকর বোঝাতে পারল না মুক্তাকে।

ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হয়ে গেল। সে একটা অহেতুক গ্লানি নিয়ে শয্যা ত্যাগ করল।

গুটি তিনেক চাষী ও জেলের ছেলে এসে উপস্থিত হলো লগি-বৈঠা নিয়ে। এই ভোর বেলাই তারা এক-এক থাবা তেল মেখে স্নান সেরে এসেছে। সংগে করে এনেছে পান্তা ভাত ও মাছ-পাত রা। যাবে অনেক দূর এক বিয়ে-বাড়ী। কিছু চাঁদা আদায় করবে, আর ছড়িয়ে আসবে বিয়ের হাওয়া—তোমরা আর যা ই কর, খাস মণ্ডলের কথায় ভুসে খাজনা 'বলন' দিও না। আদিকালের স্বার্থে তোমাদের পড়েছে শ্যেনের দৃষ্টি—এবার তোমরা এক হও, এক হও, গরীব-গরবা জেলের দল সব সাবধান!

একজন প্রশ্ন করে, 'গোঁসাই, আর কত দেরী তোমার?'

'যাইবা কই?'

'বেশ কইছ!' সকলে হেসে ফেলে। 'যার বিয়া সে'ই জানে না। যামু তো ব্রজ মাঝির বাড়ীর পাশে।'

'ও!' বলে দিবাকর এমন ভাবে চেয়ে থাকে, যেন সে ঠিক কিছু উপলব্ধি করতে পারছে না।

'তোমাগো মুক্তামালার ত্মাশে। কাইল যে কইলা।'

'চল তবে।'

সকলে গিয়ে নায়ে ওঠে। দিবাকর চুপ করে থাকে। উৎসাহী ছেলেদের মন আঁধার হয়ে আসে। কাল না দিবাকরই বলেছিল, মুক্তাদের বাড়ী গেলে দেখবে তারা হৈ-হল্লা খাওয়া-দাওয়ার সে কি ধুম!

আঠার

কুন্তলা ও দীনেশ সেন দু'খানা পাশাপাশি ইজিচেয়ারে বসে। দীনেশের একটা চোখ কাছারী-বাড়ী নিবদ্ধ। ওতেই কাজ হচ্ছে, কর্মচারীরা সন্ত্রস্ত। তবু তারা ফাঁকি দিচ্ছে, দু'-একটা খোস গল্পও করছে, কিন্তু তা খুব সাবধানে।

কুন্তলার গায়ে একটা অল্পদামী হালকা অরগ্যাণ্ডির ব্লাউজ। পরনের শাড়ীখানায় সামান্য একটা উজ্জ্বল রুপালী পাড়। দামী গয়না তেমন কিছু গায় নেই। কিন্তু একটা মিহি গন্ধ ভাসছে চারদিকে।

দীনেশ সেন বলল, 'মা, তোমার হলো কি? দিন-দিন দেখি নিস্পৃহ হয়ে উঠলে বেশ-ভূষার প্রতি। এসেছ কলকাতা থেকে কাছারী বাড়ী···.'

একখানা বিদেশী নভেলে মুখ ডুবান ছিল কুন্তলার, সে ক্ষীণ হেসে জবাব দিল, 'যে দরিদ্রের দেশ বাবা, লজ্জা করে ও-সব পরতে।' একখানি ছোট্ট রুমাল দিয়ে কুন্তলা মুখ মুছল। অমনি একটা দামী সুবাস ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। 'সত্যি কথা বললে তুমি হয়ত দুঃখিত হবে, আমার আর তেমন স্পৃহা নেই সাজ-গোজে।' কুন্তলার কনিষ্ঠ আংগুলের আংটির ভেল্ব্যাটা ক্ষণিকের জন্ত চমকাল।

'তোমার মা কিন্তু ছিলেন স্বতন্ত্র। তিনি এসেছিলেন রাণীর মত, আবার চলেও গেছেন ইন্দ্রাণীর মতই। তাঁর কত পারিপাট্য ছিল বেশ-ভূষায়। দেশে পূজোর সময় তিনি যখন সেজে-গুজে প্রসাদ বিতরণ করতে বের হতেন, তখন প্রজা-পাইকরা বলত যে স্বয়ং মা-অন্নপূর্ণা এসেছেন।'

'মানুষ এখন যৌথ ভাবে সবাই পূর্ণ হতে চলেছে—বিশেষ কাউকে অন্নপূর্ণা বলে মানতে রাজি নয়, তাই প্রয়োজনও ফুরিয়েছে পারিপাট্যের।'

দীনেশ সেন একটু আহত হলেন। মৃতা-স্ত্রীর সেই মহীয়সী রূপ তাঁর মনে পড়ল। হায় রে একাল, হায় রে পাশ্চাত্য শিক্ষা! মায়ের জন্তও এতটুকু সমীহ নেই কন্তার। 'তোমার মা যা করেছেন তা ভুল করেননি। হিন্দু শাস্ত্রের আদর্শ ও কল্পনা মৌলিক। যখন ক্ষুধিতেরা

নিরুপায় হয়ে কাঁদছে, তখন কিনা মা এলেন স্বর্ণথালে অন্ন নিয়ে। এর মাধুর্য কি তোমার মনে রেখাপাত করে না কুন্তলা ?'

'তোমার ঘরের কুন্তলার কাছে এ সব আদর্শবাদ মৌলিক এবং মধুর লাগা আশ্চর্য নয় কিছু। তবে এ কথাও সত্য যে ঐ চাষীর মেয়ে কুন্তলা এ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।'

'কই তেমন তো গ্রাম-গাঁয়ে দেখছি নে। তোমরাই, অর্থাৎ তোমাদের মতের লোকেরাই, যারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়, তারা ঘুণ ধরাচ্ছে ওদের মগজে।'

'এ অপবাদ আশীর্বাদ তুল্য হলেও আংশিক সত্য। সব চাইতে বড় সত্য ওরা এখন নিজেরাই সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস পরোক্ষে মহা প্লাবন এনেছে জন-সমুদ্রে।'

'কি করে বুঝলে ?'

'নজির দেখে—প্রত্যহ দিবাকরের সংবাদ শুনে। কী অপূর্ব প্রতিবাদ, 'বসন' (বৃদ্ধি) দিমু না।' কথাগুলো বলে কুন্তলা নিজের মনেই একটু লজ্জিত হয়ে উঠল। পিতার সুমুখে বসে এতটা উত্তেজনা দেখান নিতান্ত অশোভন হয়েছে।

'দেখছি সভা করার হুকুমটা দিয়ে নিতান্ত অন্যায় করেছি।'

'না স্যার।' উদয় হলো যতীন দাস হেডমাষ্টার। 'নমস্কার দেবী।' তারপর সে হাত জোড় করে রইল দীনেশ সেনের দিকে চেয়ে। দীনেশ সেন রাজপুরুষ, বলতে গেলে স্বয়ং রাজাই এ তল্লাটের—প্রসাদলোভী যতীন দাসের তার সুমুখে হাত জোড় করে থাকার কি সময়ের কোনও পরিমাপ আছে! 'না স্যার, অন্যায় হয়নি মোটে। ওদের দাবীটা শোনাও রাজধর্ম। গ্রহণ করা, না করা তা তো আশু কর্তব্য নয়। উত্তেজনা উদ্গার করুক, হয়ত সুস্থ হবে রোগ।'

'বলুন, মাষ্টার মশাই বলুন!' দীনেশ সেন বলে, 'যা বলেছেন, রোগই বটে, তবে দুরারোগ্য বিসূচিকা।'

কানের কাছে এগিয়ে এসে যতীন দাস সোৎসাহে বলে, 'মরুক— আমরা তো তাই চাই। আমার আদর্শ ইস্কুলটি···'

সকলের অলক্ষ্যে উঠে কুন্তলা চলে গেল।

'ভয় নেই মাষ্টার মশাই, দেখুন না আর ক'টা মাস!'

'ওদের জন্যই আমি আমার জীবনের Best periodটা কাটালাম এই জংলা জন্মভূমিতে। পড়ালাম কত ইংরেজী বাঙলা। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের সামান্য একটা নীতিকথাই ওরা আজ পর্যন্ত হৃদয়ংগম করতে পারল না—রাজা ঈশ্বর তুল্য; প্রজারা তাঁহাকে নির্বিচারে ভক্তি করিবে।'

'দুঃখ তো সেইটাই মাষ্টার মশাই! তাই শাস্ত্রে আছে মূর্খের জন্য লাঠি প্রয়োগ বিধি। দেখুন Armed force এলো বলে।'

'বলেন কি! একেবারে যে লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে সব। আমার আদর্শ ইস্কুলটি।'···

'আপনি কি মনে করেন এই গাধা-গরুর বংশে জন্মাবে কোনও মানুষ? এদের প্রয়োজন আছে কোনও শিক্ষার ?'

'কিন্তু বহু আয়োজন করে আমি তো গড়েছিলাম আমার আদর্শ ইস্কুলটি। এ আমার Noble enterprise, দোহাই হুজুর, ভাঙবেন না।'

'দেখুন, কোন একটা মীমাংসায় পৌঁছুতে পারেন কি না।'

'আমি তো জান কবুল করেছি সে জন্যে। আগামী সপ্তাহে ইস্কুল-চত্বরে সভা।'

পরদিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরী হলো দীনেশ সেনের। রাত্রে সে ভেবে দেখল একটা কিছু মীমাংসা হলে মন্দ হয় না। এ সংগ্রাম ক্ষুদ্র নয়। এক দলের যখন জীবন-মরণ সমস্যা, অপর কতিপয়ের তখন মাত্র মান-সম্ভ্রম জাঁক-জমক টিঁকিয়ে রাখার বাতুলতা। বলল কি দীনেশ সেন, বাতুলতা! ইংলণ্ডের অধীশ্বর মহামান্য সম্রাট—যাঁর রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, তিনি কি বাতুল? বাতুল কি তাঁর প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল? জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটেরও কি মাথা-খারাপ? বিকৃত মস্তিষ্ক কি প্রধান সেনাপতি, আর যত পুলিশ-সান্ত্রীর দল? তবে দীনেশ সেনই বা রেহাই পাবে কী করে? সেও তো একই সিঁড়ির নীচের অংশ—কুন্তলা বলে দালাল, সমাজের উপদংশ।

ঘুমের মধ্যে হাসে দীনেশ সেন। স্নেহ তার মনে উথলে ওঠে। অপরিণত-বুদ্ধি কন্যার পরিপক্ক কথা! আর একটু বড় হক, ঘা খাক আরও দু'-চারটা, তখন বুঝবে, ফিরবে ওর মনটা।

তারা বাতুল নয়—পাগল নয় দীনেশ সেনের কর্তা-গোষ্ঠী। তারা পাকা শিকারী, ওস্তাদ জেলে। জালের দড়ি রয়েছে বিলেতে, কিন্তু মাছ কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিলগাঁয়ের। দীনেশ সেন প্রসাদ পাচ্ছে, ভাল মজুরী পাচ্ছে, বাস করছে রাজার হালে, সে কেন আনবে না ঘেঁটিয়ে যত মৎস্যকুল? আর পরোক্ষে কতগুলো মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার একটা মোহও কি কম! দীনেশ সেন যাদুদণ্ডের মত কলমটা শুধু একটু ঘুরচ্ছে, অমনি কতগুলো প্রাণবন্ত জীব 'দোহাই হুজুর, দোহাই হুজুর' বলে খাবি খাচ্ছে! যমালয়ের পটের কথা মনে পড়ে দীনেশ সেনের—সে-বার এক হাটে গিয়ে দেখেছিল সে। যমদূতগুলোর মাথায় শিং, হাতে লৌহমুদ্গর। দীনেশ সেন নিজের মাথায় হাত বুলায় আর হাসে।

কুন্তলা উঠে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে দীনেশ সেনের কাছে আসে। 'তুমি স্বপ্ন দেখছ বাবা ?'

'না মা, স্বপ্ন নয়, এ সকলই প্রত্যক্ষ সত্য আমার কাছে।' জড়িত কণ্ঠে জবাব দেয় দীনেশ।

'বালিশটা একটু নাড়িয়ে ঘুমাও।'

তারপর দীনেশ সেন মনের আনন্দে ঘুমিয়েছিল। তাই দেরী হলো আজ উঠতে।

উনিশ

কাছারী-বাড়ী ঢুকে দীনেশ সেন একজন পেয়াদা পাঠায় কেষ্ট কৈবর্তের কাছে। সে সর্বদা আসে-যায় দেবনগর গঞ্জে। অবস্থা তার ভাল, বিবেচনাও তার ভিন্ন। একটা কিছু রফা হলে তার সংগেই হওয়া সম্ভব। দিবাকরকে নিয়ে হৈ-চৈ করা, অর্থাৎ ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করে তোলা—তাতে লাভ হবে না ভবিষ্যতে। তবু ওরা দেখতে চায়, দেখুক।

শোনা যায়, দিবাকর ও কেষ্ট এক হাত, এক প্রাণ। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করে না পাকা হিসেবী এই দীনেশ। বড়-ছোটর মিতালি, ও-সব কথার হেঁয়ালী মাত্র। তেলে-জলে কি মিশ খায় এক বাটিতে ফেনিয়ে দিলেও ?

সন্ধ্যার পর নিভৃতে এসে দেখা করল কেষ্ট।

'কি, তটস্থ হয়ে রইলে যে?'

'হুজুর মা-বাপ—রাখলেও রাখতে পারেন আর মারলেও মারতে পারেন।···হুজুরের ডরে কিন্তু এখন আর তটস্থ হই নাই, ভাবি ওরা কেও আবার টের না পায়।'

'টের পেলে হবে কি?'

'নিষেধ আছে একা কোন কথা চালাতে।'

'তোমার স্বার্থ ও ওদের স্বার্থ তো এক নয়—ভুল কর কেন?'

'ভুল করি না, ভয় করি।'

'সরকারকে সাহায্য করলে এমন যে পুলিশ সাহেব তাকেও তুমি রাখতে পারবে দোরে বসিয়ে। ছুটো-দশটা গুণ্ডা-গুণ্ডায় করবে কি? জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আমি তো রয়েছি তোমার স্বপক্ষে। নেও না তুমি বিলের অর্দ্ধেকটা পত্তন।'

'বলেন কি, অর্দ্ধেক! একটা সাম্রাজ্য!'

'চা দাও কেষ্টকে।'

চা এলো। ধীরে ধীরে খেতে লাগল কেষ্ট। এ তার পক্ষে অচিন্ত্যনীয় আপ্যায়ন।

'সবই তো এখন আইনত সরকারের খাসে···'

দীনেশ সেন হ্যারিকেন লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতে লক্ষ্য করে কেষ্টর লোভাতুর মুখমণ্ডল। 'হুঁ।'

'কোনও আইনের ঘরে তো দোষ নাই নিলামী সম্পত্তি পত্তন নিতে?···'

'না···'

'ঈশ্বরের কাছে?'

'তাও না। রাজাও যা ঈশ্বরও তা। দিচ্ছে রাজা, নিচ্ছ তুমি।'

'ইংরাজ তো ন্যায্য ভূস্বামী।' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে কেষ্ট। একটু একটু করে চা-ও ফুরায়, কেষ্টও ভুলে যায় আত্মীয়-বন্ধু গরীব পাড়া-প্রতিবেশীর কথা। 'আচ্ছা আইজ উঠি, শীগগিরই একদিন আসুন হুজুর।' ঘর থেকে নেমে কেষ্ট অন্ধকারে সরীসৃপের মত চলতে থাকে।

কত দূর এসেই তার হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস করে ওঠে। মাথার ওপর কই? না, না—একটা বাঁকা বাঁশের ছায়া। সে আশ্বস্ত হয়ে আবার চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে ওপর থেকে একটা তাগিদ এসেছিল। রাত্রে দীনেশ সেন সাজিয়ে-গুজিয়ে আশা ও উৎসাহের ইংগিত দিয়ে একটা মনোরম কৈফিয়ৎ লেখে।

পরদিন সকাল আটটা।

কাছারী-ঘরে দীনেশ উপস্থিত হয়ে এক চোখের একটা তীব্র দৃষ্টি হানল। অমনি পেয়াদা পাইক বরকন্দাজ মায় খাস মুন্সী অস্থির হয়ে উঠল। তাদের ভুল-চুকগুলো অদৃশ্য স্থান থেকে যেন মূর্তিমন্ত হয়ে খাজনা বকেয়া-পড়া গরীব প্রজার মত দীনেশ সেনের সম্মুখে এসে আত্মসমর্পণ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কিছু মুখে বলছে না, অন্তর খাবি খাচ্ছে প্রত্যেকের।

'ডাক?'

'এই তো সমস্তই জোগাড়।' খাস মুন্সী জবাব দিল, 'রওনা করিয়ে দেব এক্ষুনি।'

'এক্ষুনি! এখনও তো ডেসপ্যাচে এনটি করা বাকী। যদি রাণার চলে যায়।'

দীনেশ সেনের জন্যই দেরী হচ্ছিল, কিন্তু সাধ্য কি কেরাণীর তা বুঝিয়ে বলে।

'কে ডাক নিয়ে পোষ্টাফিসে যাবে?'

'রহমৎ।'

'কৈ সে?'

'হুজুর।' সেলাম ঠুকে রহমৎ সামনে এসে দাঁড়াল।

সহসা অন্য এক প্রসংগে চলে গেল দীনেশ সেন। 'ক'দিন জুতো পালিশ করনি রহমৎ?'

সকলেই বুঝল এ কোন জুতো। খাস মুন্সী ছুটল তেলের সন্ধানে। রহমৎ ছুটল নেকড়া আনতে। নায়েব তার মান-মর্যাদা ভুলে এগিয়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে। তার কোঁচার সংগে দোয়াত এলো কালি ছড়াতে ছড়াতে। সে এসে নাগরাই পয়জার নামাল সসম্ভ্রমে। এঃ, সত্যিই তো ধুলো-বালি জমেছে জুতোর কার্নিশে। সে রহমতের জন্য অপেক্ষা না করে কোঁচা খুলল।

একটা কেমন জানি হৈ-চৈ পড়ে গেল।

ডেকে উঠল কাছারীর কুকুর ভেলু।

বনওয়ারী তেওয়ারী এলো গাদা বন্দুকটা নিয়ে।···

অন্নদা আমিন জনান্তিকে বলল, 'হুজুরের চোখ একটি কিন্তু দৃষ্টি সহস্রটির। সাধে উপাধি পেন!'

রহমৎ নায়েবের হাত থেকে জুতো জোড়া কেড়ে নিয়ে যায়। নায়েব কি সহজে ছাড়তে চায়।

জুতো পালিশ করতে করতে রহমতের মনে পড়ে, এই জুতো একদিন উঠেছিল তার বাপের পিঠে। জমিদারেরা তখন এ মুল্লুকের মালিক ছিল। আজও সে নকরীর লোভে লজ্জার মাথা খেয়ে সেই জুতোই সাফ করেছে। সামান্য নকরী, কিন্তু সংসারটি তার সামান্য নয়। বিসমিল্লা! এর কি কোনও বিহিত নেই? জুতোতে তেল মাখে আর রহমতের জান চচ্চড় করে। এ তেলে যে ওর বাড়ীর সব ক'টা রুক্ষ মাথা তৈলসিক্ত হয়েও অবশিষ্ট থাকত, সাত দিনের সালুনের আন্দাজ।

জুতো দেখে রহমতের ওপর খুসি হয় দীনেশ। 'এই তো চাই। লেখাপড়া শিখেই আমরা শ্রদ্ধা হারাই স্মৃতির ওপর। তোরা বকলম হয়ে আছিস বেশ।'

রহমৎ আন্দাজে সব বোঝে। হুজুরের দিকে চেয়ে সে মূর্খের মত হাসে বটে কিন্তু বুকটা তার পুড়ে যায়।

ডাক যায় নিয়ম মত।

জবাব আসে দীনেশ সেনকে দেখা করতে হবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সংগে খুব তাড়াতাড়ি। একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কাছারীতে। কে কে সংগে যাবে, কি কি কাগজ নেবে—সাহেব কোনটা রেখে কোনটা দেখতে চায়। দীনেশ সেন গলদঘর্ম হওয়ার জোগাড়।

কুন্তলা বলে, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাবা?'

'ব্যস্ত নয়—খুবই বিরক্ত হয়েছি ওঁদের ব্যবহারে। তুমি মাত্র ক'দিনের জন্য এসেছ, এর ভিতর দৌড়াদৌড়ি। এ ঝামেলা আর ভাল লাগে না।'

'চল না ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এক দিকে।'

'পরীক্ষা করছ মা?' দীনেশ সেন মৃদু হাসে, সংগে সংগে ভর্ৎসনা করে অধীনস্থ কর্মচারীদের। 'তোমরা হাঁ করে শুনছ কি? যে যার কাগজপত্র গুছিয়ে দাও।' চাকরী ছেড়ে অন্যত্র গেলে দীনেশ সেনকে পুঁছবে কে? একে সে বিগতদার, দ্বিতীয়ত সে আয়েসী। ওপরওয়ালারা জুতো মারলেও মারে তা গোপনে। কিন্তু বাইরে তার কত সম্মান! সে একজন হাকিম। জলে গ্রীণ. বোট, স্থলে পাল্কী বেহারা, দরকার হলে হাতী পর্যন্ত চলে তার হুকুমে। আর খাদ্য-খাদক, ইচ্ছা মত সে খাবে, ভোগ করবে, নয় ত করবে অপচয়। এখানে তার ওপর কেউ বলার নেই, সে-ই বলছে সকলকে। এ সব ফেলে দীনেশ সেন যাবে কোথায়? এখনই তো সে মাঝে-মাঝে ভাবে পেন্‌সন্ নিয়ে সে আর বেশি দিন বাঁচবে না। স্ত্রী না থাকলেও সে একজন আদর্শ চরিত্রবান পুরুষ—একটা পুত্রসন্তানও নেই তার, ঐ যে মেয়ে, সে আজ হক কাল হক যাবে পরের ঘরে চলে—এমতাবস্থায় তবু সে আছে একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে। সে শুধু হুজুর নয়, এগেরদের বাপ-মা।

দীনেশের কানা চোখটা যেন একটু বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে যাত্রার প্রাক্কালে। [ক্রমশঃ।

নির্বাচনী পর্ব

শ্রীঅমিতা চট্টোপাধ্যায়

রাধিকার জীবনের ওপর দিয়ে একবিংশতি শরতের সোনালী আকাশ হাসের মালা দুলিয়ে চলে গেছে, হেমন্তের শিশির-কণা বার বার ঝরে পড়েছে, বসন্তও বিভিন্ন কুসুমের ডালা সাজিয়ে বৃথাই ফিরে গেছে তার যৌবনের দুয়ার থেকে। পলাশপুরের গোয়ালাপাড়ায় বৃন্দাবনের গোপিনীর মতই যে রূপে-রসে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বেড়ে চলেছে রাধিকা, সেদিকে কারো লক্ষ্যই পড়েনি। এমন কি, রাধিকার মা ক্ষান্ত গোয়ালিনী যখন কয়েক বছর ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে-ভুগে মরল সেবার, তখনও কেউ এসে দাঁড়ায়নি একবার রাধিকার পাশে। কৃষ্ণপক্ষের আঁধার রাতে মায়ের শীর্ণ মৃতদেহটার ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদেছিল কিশোরী রাধিকা। কি বুক-ফাটা সে কান্না! সেই কান্না যখন সারা গোয়ালাপাড়া পেরিয়ে আশপাশের বাগদী ও মুচিপাড়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, তখন আচম্‌কা ঘুম ভেঙে সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল, আহা, ক্ষান্ত গোয়ালিনী বুঝি মরল। কেউ বললে, মরিনি গো, বাঁচি গেল ক্ষান্ত পিসি। জ্বরে জ্বরে ভুগি দেহখানির আর কিছু ছিলনি গো।

কেউ বা দরদী মনের আরও একটু বেশী পরিচয় দিয়ে বলেছিল, থাকবার মধ্যি ছিল তো ওই এক রুগ্নি মা। সেটাও গেল। মেয়েটাকে দেখবার আর কেউ আর রইলনি।

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। এর বেশী কিছু যে করবার থাকতে পারে সে প্রশ্নই জাগেনি কারো মনে। পাশ ফিরে বাকী রাতটা নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছিল সবাই। এরা সব রাধিকারই প্রতিবেশী।

মা মারা যাবার পর রাধিকা যখন নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন তার পরিচিত ক্ষুদ্র পৃথিবীটার দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখল যে সংসারে সে নিতান্তই একা। থাকবার মধ্যে আছে টিনের চালা-দেওয়া একটা দোমেটে ঘর আর এক ফালি উঠোনের কোণে বাঁধা দুটো গাই। কিশোরী রাধিকার জগৎ-সংসার ক্ষান্ত গোয়ালিনী যেন কালি দিয়ে লেপে দিয়ে গেছে। কিন্তু তবুও রাধিকার দিন গেল। তার পূর্বপুরুষের কোথায় যেন চাষ-আবাদের কিছুটা জমি ছিল। নানান্ শরিকের ভাগাভাগি। ক্ষান্ত গোয়ালিনী গণ্ডগোলের মধ্যে না গিয়ে এক সহজ ব্যবস্থা করেছিল। নিজের ভাগের অংশটা এক শরিককে ছেড়ে দিয়ে তার বিনিময়ে বছরে কয়েক বস্তা ধান বরাদ্দ করে নিয়েছিল। সেই ধান আর

রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফবয়ের
ফেনার আবরণে
যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার রোগবীজাণ্ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।
লাইফ্‌বয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার বীজাণ্‌কে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।
LIFEBUOY SOAP
লাইফ্‌বয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
L. 229-50 BG

গাই দুটোর দুধ বেচে রাধিকার দিন কোন রকমে চলে যাচ্ছিল। ময়লা শতছিন্ন কাপড়ের এখানে-সেখানে গেরো দেওয়া আর মাথায় রুক্ষ চুলের বোঝা—এতেই রাধিকা সন্তুষ্ট ছিল। এটাই যেন সহজ আর স্বাভাবিক তার নিয়মে। এর বেশী কোন-কিছু আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগেনি কোন দিন। আকাঙ্ক্ষা তো মনেরই অতৃপ্ততা। যেখানে অতৃপ্তি সেখানেই আকাঙ্ক্ষা। রাধিকা যেন এক বনকুসুম। গোময়লিপ্ত একফালি মাটির বুকে সে জন্মেছে—ওখানেই হয়ত তাকে ঝরে যেতে হবে। জগতের কোন কোলাহল, কোন সংবাদ তার কাছে আসে না, জীবন-ধারণের জন্ম সংগ্রাম, জীবন-যাত্রার মান বাড়ানোর দাবী, স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা এ সবের কোন অর্থ নেই রাধিকার কাছে। আকাঙ্ক্ষা যার নেই দাবীর প্রশ্ন তো অর্থহীন তার কাছে। আর বেঁচে থাকাটাই তো সংগ্রাম—স্বাভাবিক নিয়মে এটুকুই শুধু বোঝে রাধিকা।

পলাশপুর আর তাকে ঘিরে চার পাশের ওই কতকগুলো গ্রাম আর সহর এই হচ্ছে রাধিকার পৃথিবী। দাওয়ার প'রে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে যখন সে তার দৃষ্টি পাঁচিলের ওপারে বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর আর বনানীর মাঝে ছড়িয়ে দেয়, তখন কল্পনায় রাধিকার পৃথিবী হয়ত আরও কিছুটা প্রসার লাভ করে। দূরে—বহু দূরে আকাশ আর মাটি, সবুজ আর নীলিমা যেখানে এক দিগন্ত-রেখায় মিশে গেছে ওখানেই কি পৃথিবীর শেষ? রাধিকার প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে যে আরও কত দূরে এই অসীম পৃথিবী তার দু'বাহু মেলে ছড়িয়ে আছে; কত নদ-নদী, কত সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে দেশ-মহাদেশ—ইংলণ্ড, এমেরিকা, রাশিয়া—কল্পনায় রাধিকার কাছে ও সব ধরা দেয় না। কোথাকার কি আইন-সভা, কোথাকার কংগ্রেস কি সাম্যবাদ এ সব কথা সে কোন দিনও শোনেনি। কবে কোন ছোট বেলায় ঠাকুমা'র বুকের কাছে শুয়ে শুনেছিল 'এক যে ছিল রাজার' গল্প, ওর ধারণা সেই রাজাই বুঝি আজও রাজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

দীনতা যে ছিল না এমন নয়, কিন্তু তার জন্তে রাধিকার কোন অভিযোগ ছিল না। মা'র কাছে কবে শুনেছিল আকাল পড়ার কথা, সে আকাল আর ঘুচল না। যেদিন পরতে পায়নি পরনে, কোন দিন বা থাকতে হয়েছে উপোস করে, ভগবানের ইচ্ছে বলেই মনে নিয়েছে তার মন। মানুষের প্রবঞ্চনা বলে কোন দিন ভাবতে শেখেনি তার মন। সে যে বঞ্চিত, এই স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে পর্য্যাপ্ত ভাত-কাপড়ের দাবী করবার যে সেও এক জন অধিকারী, এ কথা স্বপ্নেও কোন দিন জাগেনি তার মনে। প্রতিবেশীরা তাকে করেছে বঞ্চিত, বঞ্চিত করেছে এই রাষ্ট্রের গণনায়করা। প্রকৃতিই শুধু বঞ্চিত করেনি রাধিকাকে। তাই শরতের সোনালী আকাশের হংস-বলাকার মালা পরে, হেমন্তের হিমেল শিশিরে গা ধুয়ে, বসন্তের নবীন মঞ্জরীতে কবরী শোভিত করে একবিংশ বছরের যৌবন-দ্বারে আজ সে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক রাধিকা!

দরজায় কে যেন আঘাত করল।

কাটা বিচুলি আর খইল মিশিয়ে জাবর মাখছিল রাধিকা। উঠোনের কোণে গরু দুটো চঞ্চল চোখ মেলে দাঁড়িয়ে, মাঝে-মাঝে গলার দড়িটা টেনে এধার-ওধার করছে। সামনেই তৈরী খাবার দেখে দড়ি খোলার জন্ম তর সইছে না ওদের। সর্বাংগ দিয়ে যেন ক্ষুধা ঝরে পড়ছে।

ঠক্ ঠক্—ঝন্-ঝন্। বাইরে থেকে কারা যেন দরজার শিকল ঠুকছে। থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল রাধিকা, তার পর সাড়া নিল, কে?

খস্ খস্, ঠুং-ঠাং অস্পষ্ট একটা আওয়াজ। কোন কিছু জবাব এল না।

প্রথমে রাধিকা গরুর সামনে ডাব্বায় জাবরগুলো ঢেলে দিলে। পাশের গামলাটা ভর্তি করে দিল জলে। তার পর কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

আশ্চর্য্য! অবাক হয়ে গেল রাধিকা। দুটি ভদ্রলোকের মেয়ে তার দ্বারে। কিন্তু কেন? সে তো কোন দিন কারো দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ায়নি। বিস্ময়ে এক পা পিছিয়ে এল রাধিকা। দরজাটার এক পাশে সরে দাঁড়াল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কয়েক মাস আগেকার কথা। এমনি পর-পর দুটি মেয়ে ও পুরুষ তার নাম, বাবা আর মা'র নাম, তার বয়েস ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে লিখে নিয়ে গিয়েছিল। রাধিকা তাদের জিজ্ঞেস করেছিল,—কেন? উত্তরে তারা কি যে সব লেখাপড়ার কথা বললে তার কিছু বুঝতে পারেনি রাধিকা।

আজও তাই মেয়ে দুটিকে দেখে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল! কিন্তু কি যে সে করবে তার কিছুই ঠিক করতে না পেরে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইল।

তোমার নাম রাধিকাবালা দাসী? একটি মেয়ে প্রশ্ন করল ওকে। রাধিকা নীরবে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল।

—তোমার বয়স কি একুশ?—এই মানে, এক কুড়ি এক?

রাধিকা এবারও মাথা নেড়ে জানাল, হাঁ।

—বেশ, তোমাকে ভোট দিতে হবে।

—কেন গা? সে আবার কি? বিস্ময়ে এতক্ষণে ওর মুখে কথা ফোটে।

চকিতে রাধিকা আরও একটু পিছিয়ে এল। ব্যাকুল চোখ দুটো চার পাশে ঘুরিয়ে অজানা-অচেনা কোন এক বস্তুর প্রত্যাশায় বৃথাই অনুসন্ধান করল সে।

মেয়ে দুটি ততক্ষণে উঠোন পার হয়ে দাওয়ার ওপর বসবার চেষ্টা করছে। এতক্ষণে হুঁস হয় রাধিকার। সে তাড়াতাড়ি একখানা ছেঁড়া মাদুর ঘর থেকে এনে ওদের সামনে পেতে দিল।

পা দুটো পিছন দিকে ঈষৎ বাঁকিয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে সুন্দর তির্য্যক্ ভংগীতে বসল মেয়ে দুটি, কাপড়ও পরেছে ওরা কেমন বিচিত্র ছাঁদে। সামনে কোলের ওপর কুঁচিগুলো ছড়ান, আঁচলটা বুকের ওপর দিয়ে ঘুরে কাঁধের ওপারে পিঠের দিকে দুলছে। ডান হাতে একগাছা সরু সোনালী চুড়ী, অপর হাতে কালো ফিতের বাঁধা বিচিত্র এক গহনা। নিজেরই অলক্ষ্যে রাধিকার দৃষ্টি কখন নিজের হাতের ওপর এসে পড়েছে। সোনার পাতে বাঁধানো দুগাছি মাত্র কালো শাঁখা চুড়ী। মেয়ে দুটি নিজেদের মধ্যে কি সব কথা বলাবলি করছে। সেই ফাঁকে রাধিকা চঞ্চল চোখ দিয়ে ওদের আপাদমস্তক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে সুরু করে দেয়।

চুলই বা বেঁধেছে কেমন করে। পিঠের ওপরে আলগা কালো বিনুনী কালো সাপের মত পড়ে আছে। একেবারে শেষ প্রান্তে গরুর লেজের মত ঝালর দোলানো। তাই দেখে রাধিকা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খুক্‌খুক্‌ শব্দে হেসে উঠল। ওর হাসির শব্দে মেয়ে দুটির খেয়াল হয় রাধিকা তেমনি চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে। ওরা বসতে বলল তাকে।

রাধিকা তার কাপড়ের ছেঁড়া অংশটা একটু ঢেকে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওদের সামনে বসে পড়ল।

দু'-এক মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যায়। কি ভাবে কথাটা সুরু করা যায় মেয়ে দুটি যেন তাই ভেবে পাচ্ছে না। তখন একটি মেয়ে তার সংগিনীকে ঠেলা দিয়ে বললে, নে ভাই সীতা, কি বলবি এবার আরম্ভ কর। আর দেরী করিস্‌ নে। এখনও কত বাড়ী ঘুরতে হবে বল্‌ ত!

সীতা তার গলাটা একটু কেশে ঝেড়ে তার পর সুরু করে দিল বাঁধা বক্তৃতা। প্রথমে সে শোনাল দেশ স্বাধীন হবার কথা। তার পর এল কংগ্রেসী মতবাদে। ভারতের আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কথাও সে বললে। দেশে কত অব্যবস্থা। লোকের ভাত কাপড়ের কত দুঃখ। সে দুঃখ তো রাধিকা নিজেও ভোগ করছে। নির্বাচনে যদি তাদের প্রতিনিধি জয়যুক্ত হয় তখন এর অনেক প্রতিবিধান হবে। তার পর ভোট গ্রহণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিল তারা। রাধিকা কিন্তু একটা কথাও বললে না। চুপচাপ হাঁ করে গিলে গেল তাদের কথা। কথার শেষে মেয়েটি ব্যাগ খুলে একটা ছবি-আঁকা ছোট কাগজ দিল রাধিকার হাতে। তাদের প্রতীক চিহ্ন ঘোড়া। মেয়েটি বললে, এই রকম ছবি-আঁকা বাক্সে ভোট দিও।

রাধিকা একবার জিজ্ঞেস করলে, কবে, কখন—কোথায়?

ওরা বললে, সে সং তোমাকে ভাবতে হবে না, সে ব্যবস্থা আমরাই করব এখন। তোমাকে যা বললাম তাই শুধু মনে রেখ। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েও সীতা আবার বললে, হাঁ, আর এক কথা তোমাকে বলে রাখি। আমাদের মত আরও অনেকে আসবে তোমার কাছে। বলবে ভোট দিতে। তুমি কিন্তু তাদের কথায় ভুলে যেও না।

নিজেদের ঘোড়া-চিহ্নটি আবার দেখিয়ে ও বললে, মনে রেখ, একমাত্র এতেই ভোট দিতে হবে।

রাধিকা হেসে বললে, জানি গো জানি, দিদিমণিরা!

পর-পর ভোট-ভিক্ষা করতে আরও অনেকেই রাধিকার দুয়ারে ধর্ণা দিতে এল। শোনালো অনেক ভেজা-ভেজা মিষ্টি বুলি। সীতারা চলে যেতে না যেতেই এল কতকগুলো লোক। দরজা খোলাই ছিল। ওরা কারা গেল, ঘোড়ার দল বুঝি। রাধিকা শুনলে ওরা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করছে। রাধিকার হাতে তখনও রয়েছে ঘোড়া-মার্কা কাগজটা। তাই দেখে একটা লোক বললে, আরে, ঘোড়াদের যুগ কি আর আছে, এখন এসেছে রকেটের যুগ। ওদের চেয়ে আমাদের মত ঢের বলিষ্ঠ আর অগ্রগামী।

রাধিকার হাতে রকেট-মার্কা একটা কাগজ দিয়ে লোকটি বললে, ওদের ও-সব বাজে কথায় ভুলো না। এই রকম রকেট-মার্কা বাক্সে তোমার ভোট দিও। আমাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচনে যদি তোমরা সাহায্য কর, দেখবে চালের দাম অনেক কমে যাবে। আর কাপড়ের দাম হবে তিন টাকার অনেক নীচে।

চালের দর কারা বাড়ায়। কেমন করেই বা কমবে কাপড়ের দাম সে কথা জানবার কোন প্রয়োজন হয় না রাধিকার। কানে যা আসে শুধুই শুনে যেতে থাকে। তার পর মাথা নেড়ে সায় দেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

আপন-মনে ভেবে কেমন একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে সে। না জানি এই ভোট জিনিষটা কেমন, যার জন্যে তার কাছে এত লোকের সাধাসাধি। সে ভাবে, অনেকেই তো তাকে একই আবেদন জানিয়ে গেল। কিন্তু কার কথা ও রাখবে? অনেক দিন পর মায়ের অভাব নতুন করে অনুভব করল রাধিকা। মা থাকলে একটা পরামর্শ নিশ্চয়ই দিত।

ছবি-আঁকা সমস্ত কাগজগুলোই সযত্নে কুলুঙ্গীতে তুলে রেখে দিয়ে বিশেষ দিনটির প্রতীক্ষায় দিন গুণতে সুরু করে দেয় সে।

একটি-একটি করে পার হয়ে যেতে থাকে দিনগুলো। ক্রমে নির্বাচনীর দিনটি এসে পড়ে।

ভোর বেলা। ছোটলোকদের খোলা ঘরের আনাচে-কানাচে ভদ্রলোকের ছেলে-ছোকরাদের ভীড় জমে ওঠে। বিভিন্ন মতবাদের স্বেচ্ছাসেবকের দল। কে আগে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারে অপর দলের চেয়ে বেশী সংখ্যক ভোটার শ্রেণী, তারই আয়োজন সুরু হয়ে যায়। সুযোগ-সুবিধা পেলে অপর জনের ভোট ভাঙিয়ে
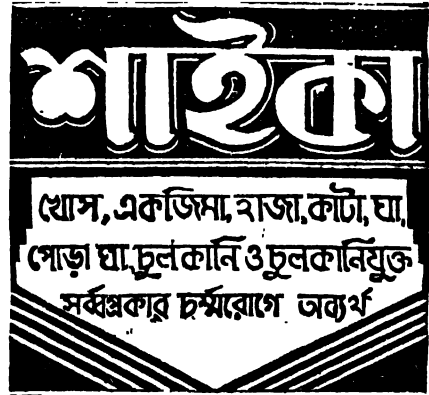
নিতেও কসুর করে না! ওরা জানে, এ অঞ্চলেই ভোট পাবার সম্ভাবনা বেশী। অজ্ঞ, অশিক্ষিত লোকেরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অধিকার পেলেও মন এখনও ওদের তৈরী হয়নি। ভাল-মন্দ, যোগ্যতা-অযোগ্যতা বোঝবার শক্তি ওদের নেই, নেই কোন নিজস্ব মতামত। ওদের যা বোঝানো যাবে সরল মনে তাই মেনে নেবে ওরা।

কেমন একটা অভূতপূর্ব উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে চারি দিকে। এমন আর কখনও হয়নি।

একটু-একটু করে রোদ বেড়ে ওঠে। নতুন আশা আর আনন্দ বুকে নিয়ে দলে দলে ভোটদাতারা বেরিয়ে আসে ভাঙা বস্তী আর কুঁড়ে ঘরের ভেতর থেকে। এক-একটি স্বেচ্ছাসেবক এক-একটি ভোটারের দল জড়ো করে নির্বাচনী-কেন্দ্রের দিকে রওনা দিল। রাধিকাও অমনি একটি দলের সংগে নির্বাচনী-কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছাল। একের পর এক সকলে ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে। বাঁশ ও ছেঁচা বেড়া দিয়ে ঘেরার বাইরে দাঁড় করিয়ে শেষ বারের মত পাখীপড়া করে ওকে ভোট দেবার রীতি-নীতি মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হল।

কালী আর দুর্গার নাম স্মরণ করে রাধিকা ভেতরে প্রবেশ করল। নাম, বয়স ও পিতার নাম বলার পর যে কাগজটি ওকে দেওয়া হল কাঁপা-হাতে সেটি নিয়ে রাধিকা প্রদর্শিত আড়াল দেওয়া জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। অনেকগুলো বাক্সে বিভিন্ন ছবি ঝাঁটা, পর-পর সাজান রয়েছে। রঙিন ভোটপত্রখানা ছুঁই-করে কপালে ঠেকিয়ে নিল রাধিকা। একে-একে অনেকগুলো মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেদিনের সেই মেয়ে দুটির মুখই বুঝি সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। না না, সে ভোলেনি তাদের কথা। তাদের দেওয়া সেই কাগজটা তো বুকে করে নিয়ে এসেছে। সেই ঘোড়া-আঁকা ছবি—আরও সব নানা প্রতীক চিহ্ন, সবগুলোই। একের কথা রাখতে অপরকে কি ভাবে করবে সে প্রবঞ্চিত! তার চেয়ে সবগুলোই একে-একে বাক্সে ফেলে দেওয়া যাক না কেন? কে বা জানতে পারবে, কে আর দেখতে আসছে এখানে?

বুকের থেকে বার করল সব কাগজগুলো রাধিকা। তার পর প্রতীক চিহ্নগুলো মিলিয়ে একে একে সব বাক্সে ফেলে দিল। তার পর রঙিন ভোটপত্রটা বুকের মধ্যে পুরে বেরিয়ে এল সে।

বাইরে জনতার ভীড়। তারই মাঝে এক পাশে উজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে রইল রাধিকা। ভাল ভাবে বাঁচবে, পেট পুরে খেতে-পরতে পারবে সে। দেশে সুদিন ফিরবে, আকাল ঘুচবে—আরও—আরও ভবিষ্যতের কত রঙিন স্বপ্ন তার সুমুখে। যেন তারই প্রতিজ্ঞা-পত্রের স্বাক্ষর অনুভব করে রাধিকা বুকের মধ্যে সেই লালচে রঙীন কাগজের উত্তাপে।

স্বাধীন সে, নাগরিক সে, প্রতিনিধি নির্বাচনের যোগ্য অধিকারী!

চারিটা টাকা

(রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'র অনুকরণে)

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য

শুধু গোটা দুই ছিল পাকা রুই, আর সব গেছে চুরি;
কহিলেন বাবু—"ধ'রে দাও হাবু, দুটো নিয়ে যাই পুরী।"
আদেশ শুনিয়া কাঁপে মোর হিয়া, কাঁপে বুক দুরু দুরু—
গোটা বছরের জমা হুকুমের এই বুঝি হয় শুরু!
পুকুরে জঞ্জাল তাহে শীতকাল মাছ ধরা হবে ভার,
কহিল পড়শী ফেলিতে বঁড়শী দিয়া সুগন্ধি চার!
সুযোগ বুঝিয়া বাবু উপজিয়া কহিলেন হেসে হেসে—
"চলে যা বাজার, নিয়ে আয় চার, দাম দিয়ে দেবো শেষে।"
দোকানী ব্যাজার নাহি দেয় চার নগদ না পেলে হাতে,
আজকাল ধার যে দেয় তাহার ঘাটতি মুনাফা খাতে।
চাহিতে পয়সা না পারি সহসা বাবুর মেজাজ বুঝে,
দেখিলে আমায় কটমট চায়—কারণ পাই না খুঁজে।
গেঁজের ভিতর ছিল বহুতর আধুলি, সিকি ও টাকা;
চারের কারণ দিনু সেই ধন গেঁজেটা করিয়া ফাঁকা।
এ জগতে হায়, চাকরের দায় মালিকের চেয়ে বেশী;
মজুরের ধন করেন হরণ হুজুর ভদ্রবেশী।
চার টাকা দিয়ে চার কিনে নিয়ে দিলাম বাবুর করে;
কহিলেন বাবু—"থ্যাঙ্ক ইউ হাবু, চলো আনি মাছ ধ'রে।"
সারা দিনমান ভুলি' অন্নপান রহিনু বাবুর পাশে,
প্রভুর ভোজন হ'লে সমাপন একটু প্রসাদ আশে।

*　　*　　*　　*

পরদিন রাতে মাছ নিয়ে হাতে বাবু ফিরিলেন পুরী,
রেলের ষ্টেশনে বাবুর চরণে প্রণমি' দাঁড়ানু ঘুরি'।
করি ইতস্ততঃ ভূমে আঁখি নত চাহিনু চারের টাকা,
বাবু রীতিমত হইয়া বিব্রত আঁখি করিলেন বাঁকা।
ক্ষণেক ভাবিয়া পকেট খুঁজিয়া কহিলেন মিঠা সুরে—
"কেন এতক্ষণে কহিসনি মনে? কেবল বেড়াবি ঘুরে!"
খুচরো তো নাই চেঞ্জ কোথা পাই; একশো টাকার নোট,
তুই দিয়ে দিস্ আমি এলে নিস্—চারটে টাকা তো মোট!

*　　*　　*　　*

ছাড়ি' দিল গাড়ী ফিরিলাম বাড়ী; বাবুর জবাব শুনে,
জোড় করি হাত শিরে হানি ঘাত দশ বার গুণে গুণে।
টাকার কুমীর ধর্ম্মের পীর বাবু দিলেন গা' ঢাকা,
আজো নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে আমার চারিটা টাকা।

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

সপ্তম উচ্ছ্বাস

(মন্ত্রগুপ্ত চরিত)*

রাজাধিরাজ-নন্দন,

নগ-রন্ধ্রে ত রাস্তা হারালে।—কী করি! সন্ধান করে চলতে থাকি।—চলি কলিঙ্গে। কলিঙ্গনগরের নিকটে যে জনদাহস্থান ছিল, তার নিকটেই কান্তারে দেখি, দেখন্-হেন একটি গাছ। তারি সরস-কিসলয়-সংস্তর তলদেশে নিদ্রালীঢ়-দৃষ্টি শয়ন করি। চারিদিকে কালরাত্রির কেশজাল-হেন ছড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার, চরে বেড়াচ্ছে রাক্ষস, ক্ষরিত হচ্ছে নীহার, নিতান্তশীত নিশীথ, ঘরে ঘরে নিঃশেষে নিলীন হয়ে এসেছে নগরের জনতা—হেনকালে নেত্রনিংসিনী (নেত্রচুম্বী) নিদ্রাটিকে নিগৃহীত করে কারা যেন ঝটৃ এল। ঘনতর সালগাছের শাখান্তরাল থেকে কর্ণগত হল এক কিংকর আর এক কিংকরীর অতিকাতর রটনার ঘটা,—"রিরংসাকালে ঐ খল, ঐ দগ্ধ সিদ্ধ, ঐ ঐন্দ্রজালিক নির্দেশ দান করতে করতে অনর্গল রাগে নর-টাকে একেবারে খিল করে দিয়েছে লড়াইয়ে। এখন যদি অনন্তশক্তি কেউ ঐ নীচ অণক-নরেন্দ্রটার (ঐন্দ্রজালিক) সিদ্ধির অন্তরায় ঘটায়।"

"কে এই সিদ্ধ, কিসের সিদ্ধি, কি করতে চায় কিংকরটি,—"? তদ্দর্শনের ইচ্ছায় আক্রান্ত হল হৃদয়। কিংকর যে দিকে চলল সেই দিকে হাই-অন্তর গিয়েই দেখি,—একটি জন,—গাত্রে তাঁর নরাস্থির চঞ্চল অলংকার, দগ্ধকাষ্ঠের ছাই দিয়ে অঙ্গরাগের করেছেন রচনা, শিরে তরল তড়িল্লতাকার জটা,—অগ্নির অন্দরে দক্ষিণেতর কর দিয়ে তিলসিদ্ধার্থক ইত্যাদি নিরন্তর ঢালছেন। চটৃচটৃ করে হাটছে সেগুলি; যেন অরণ্যচক্রের অন্ধকার রাক্ষসেরা ক্ষণে ক্ষণে খেতে আসছে গরাসে গরাসে ইন্ধন, আর চঞ্চল হয়ে নড়ছে হিরণ্যরেতার অর্চ্চিস্।

তাঁর নয়নাগ্রে আসন গ্রহণ করে অঞ্জলিহস্ত কিংকর;—কয়,—"করণীয় কি রয়েছে নির্দেশ দিন।"

অতি নিকৃষ্টাশয় সেই সিদ্ধ আদেশ দেন—

"যা, নিয়ে আয়; কলিঙ্গরাজ কর্দনের কন্যা 'কনকলেখাকে' কন্যাগৃহ থেকে নিয়ে আয় এখানে।"

কিংকর তাই করল।

"হা তাত, হা জননী"—

কণ্টাক্ষর নিঃসরণ করতে লাগল কন্যকাটির ত্রাস-তীক্ষ্ণ অস্র-জর্জর কণ্ঠ; হৃদয়টিকে গ্রহণ করল রণরণিকা। শেষে, সেই ঐন্দ্রজালিক কন্যকার শীর্ণনহর কীর্ণগ্লান স্রকৃদিগ্ধ কেশসঞ্চয় গ্রহণ করলেন হস্তে। শিলায় শানিয়ে নিয়ে অসি দিয়ে কাটতে গেলেন শির।

তখন আর কি করি, রাজনন্দন,—

শস্ত্রিকাটি তার হাত থেকে ঝটিতি ছিনিয়ে নিয়ে কটাৎ কাটলাং তার জটাল শির। নিকটেই ছিল এক জীর্ণসাল। তারি কোটরে রেখে দিলাং সেই শির। ক্ষীণচিন্তা রাক্ষস তখন হৃষ্টতর হল। কইল "আর্য্য, এই কদর্য্যটার যন্ত্রণায়, এত দিন নিদ্রা হারিয়েছিল নয়ন। তর্জ্জন করত, ত্রস্ত করত, নিত্য আদেশ দিত,—অকৃত্য সাধনের আজ্ঞা। এখন সেই নর-কাকটা কৃতান্তের অগ্নিদহন নগরে গিয়ে নারকী কারণগুলির রস খাক্, নিদ্রা যাক্। এখন দয়ানিধি, কী আদেশ দ্যান—দিন।—ঝটৃ সাধন করি।"

"সখে, সজ্জনদের সঙ্গত সরণি নিয়েছেন। নীচ কার্য্যে অনাদর দর্শন সঙ্গত। তা না হলে এ ইচ্ছা আসে না। নতদেহা কন্যকাটি, সত্যিই সহ্য করেছে অনেক কষ্ট, অনেক যাতনা। নিয়ে যান্ এঁকে এঁর ঘরে। এ ছাড়া এঁর চিত্তের আরাধনের অন্য সদ্‌গতি দেখি না।"

কন্যকাটি কর্ণগ্রহণ করল এই কথা। অধরকিসলয় লঙ্ঘন করে হর্ষাস্র ক্লিন্ন করল স্তনতটের চন্দন। নীল-নীরজ-হেন দীর্ঘ নয়নের ধীর কটাক্ষে দেখলাং কৃতজ্ঞতা আর সংরাগের সঞ্চয়। আনন-নর্ত্তকী চিল্লিকা-লতিকা (ভ্রূলতা) লীলার অলসতায়

* ওষ্ঠ্যবর্ণ—উ, ঊ, ও, ঔ, প, ফ, ব, ভ, ম, ব—বর্জ্জিত মূল সংস্কৃতের, তথা বঙ্গানুবাদের ভাষা।—(লেখক)

নৃত্যচঞ্চল হোলো ললাটিকার রঙ্গস্থলে, যেন নক্রকেতনের নতশ্রী শরাসন। কণ্টকিত হোলো রক্ত-গণ্ডের রেখা। রাগ আর লজ্জা—বিচরণ করতে লাগল চরণের ধরণী-লিখন নখরে। হস্তের নখর-চন্দ্রিকা কী যেন লিখতে লাগল সাচীকৃত আনন-সরসিজে। হৃদয়ের লক্ষ্যস্থলকে দলিত করে যেন ধেয়ে এল নিঃশ্বাস-অনিল, যেন রতি-সহচরের সায়ক। শেষে দশন-দীধিতিকে তরঙ্গিত করে কলকণ্ঠে স্পষ্ট হল কয়েকটি অক্ষর ;—

"আর্য্য, কালের করাল হস্ত থেকে সংগ্রহ করেছেন এই দাসীজনের ক্লান্ত অঙ্গ, এখন কেন সেটিকে কীর্ণ করছেন অনঙ্গসাগরের আতঙ্কে? শ্রীচরণের রজঃকণিকা এই দাসী। যদি দয়া হয় কন্যাগৃহে অধিষ্ঠান-শেষে চরণ আরাধনের অধিকার তাকে দিন। "অনর্থ ঘটায় রহস্যের রটনা"—এই যদি আশঙ্কা করেন—দরকার নেই সে চিন্তার। সেখানে রয়েছে সংরাগিণী—সখীরা আর চেটীরা। জিজ্ঞাসা যাতে না জাগে, তারা তার যত্নসাক্ষী।"

দর্দ্দর-গিরির তটদেশ থেকে আচার্য্য অনিল নানান্ তালে নৃত্য শিক্ষা দেন যেখানে লতিকাদের আর চন্দনের গন্ধ নাচে আকাশে—।

সেই হেন কালে কলিঙ্গরাজ কর্দ্দন কয়েক দিনের জন্য নিজের রাজরাণী, নগরজন আর তনয়াকে সঙ্গে নিয়ে সাগরতীরের কাননে এলেন ক্রীড়ারস গ্রহণের উদ্দেশ্যে। তরলতরঙ্গের শীকরজালে শীতল ছিল সেই তীর। অলিসজ্ঞগুঞ্জিত নতলতিকাদের অগ্রকিসলয়ে আলীঢ় ছিল সৈকততট। কাননের অন্দরে দিনকরের রুদ্ধ ছিল গতি। সারা দিন সেখানে চলল সঙ্গীত, চলল সঙ্গত, অঙ্গনাদের সহস্র শৃঙ্গার, হেলাহতি, অনর্গল অনঙ্গের সংঘর্ষ।

—হঠাৎ ছন্দ-চারী অন্ধ্রনাথ জয়সিংহ এই সকল করেন দর্শন। হর্ষিত হন, একতন্ত্র হন রাগতৃষ্ণায়। শেষে একদা—অসংখ্য তরণীতে অগণিত সৈন্য সংগ্রহ করে, হঠাৎ কলিঙ্গরাজকে আঘাত করলেন জয়সিংহ; আটক করলেন সকলত্র। ত্রাসচঞ্চলাক্ষী দয়িতা কনকলেখাকে সখীজনদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন রাজধানীতে।

রাজাধিরাজনন্দন,

এই দীন তখন অনঙ্গের শরে নির্দ্দয় আহত হয়েছে চেতনায়। কটাক্ষের কৃষ্ণ শৃঙ্খল গাঢ়সংযত করেছে দেহ। কিংকরের দিকে দৃষ্টি রেখে কইলাং, "এই রথাঙ্গজঘনার আশা যদি সার্থক না করি, তা হলে নিশ্চয়ই নক্রকেতনের আশীষে সহ্য করতে হয় অকীর্ত্তনীয় দশা। হরিণনয়নার সঙ্গে এই দীনহীনকেও কন্যার গৃহসাৎ করা এখন করণীয়।"

নিশাচর কিংকর কার্য্য করল যথা-কথা। চন্দ্রাননার নির্দ্দেশে কন্যানিকেতনের সজল-জলধরকান্তি চন্দ্রশালার একদেশে মিলাং স্থান। কালের একটি কলা কাটাতে না কাটাতেই দর্শনের জন্য চিত্ত যেন হারাতে লাগল ধৈর্য্য। কন্যাকটি ততক্ষণে নিঃসাড় এগিয়ে গিয়ে, হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে কতকগুলি সখীকে। রহস্যকথা জেনে তারা কাঁদতে লাগল। এগিয়ে এল। এই চরণে স্থাপন করল শির। শেষে শেখরের কেশর-সংলগ্ন ষট্‌চরণের রণন-হেন কলকণ্ঠে ধীরে ধীরে কইল—"নাথ, কৃতান্ত যখন দেখল, অত্যাদিত্য এক তেজের লক্ষ্য হয়েছে এই কন্যা, তখনই সে শঙ্কায় সরে গেছে। রাগাগ্নিকে সাক্ষী রেখে তখনি এই কন্যাকে দান করে দিয়েছেন অনঙ্গ। রত্নশৈলের শিলাতলের মত স্থির, আর্য্যের ঐ হৃদয়খানিতে, রাগতরল এই আশ্চর্য্য রত্নটিকে ধারণ করা এখন সঙ্গত। গাঢ় আলিঙ্গনদানে হৃদয়ের সহচর ঐ স্তনতটটিকে চরিতার্থ করা যত্ন-সঙ্গত।" সখীদের অতি দাক্ষিণ্যে দৃঢ়তর হয় স্নেহের নিগড়, দেহের অংশগত হয় সন্নতাঙ্গী।

রাজাধিরাজনন্দন, অনঙ্গাগ্নির দাহে এই দীনজনের আকাশবাসে তখন অন্তর্হিত হল আহার-চিন্তা, গলিত হল গাত্রকান্তি। চিন্তা এল—"জনক-জননীর সঙ্গে এখন অরিহস্তসাৎ হয়েছে কনকলেখা। অধীর অন্ধ্ররাজ নিশ্চিতনিয়তিতে যদি তাকে গ্রহণ করান রতি? অসহ্য যন্ত্রণায় যদি গরল খায় সতী! তারি যখন এই দশা তখন এই দগ্ধ শরীরটাকে জীইয়ে রাখার দরকার কি?"

কয়েক দিন গত হয়েছে।—একদিন দেখি অন্ধ্রনগর থেকে দ্বিজ (অগ্রজ) এসেছেন। তাঁর কাছেই জ্ঞাত হই সেখানকার ঘটনা—"জয়সিংহ কনকলেখার আকৃতি দেখে রাগান্ধ হয়েছেন, এ কথা সত্য; এদিকে কনকলেখার ঘটেছে সঙ্কট। জনৈক যক্ষ অধিষ্ঠান করেছে কনকলেখাকে। নরেন্দ্র আর নরান্তরের অগ্রে সেই কন্যা এক দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়ায় না। ঐন্দ্রজালিকদের ডাকিয়ে যক্ষ-নিরাকরণের অনেক যত্ন চলেছে। সিদ্ধি নেই।" তাঁর কথায় যেন একটা আশার দৃষ্টিগ্রহ হলো। শকুন-নাচা সেই সংকার-স্থানের 'জীর্ণশালগাছের স্কন্ধ-রন্ধ্র থেকে জটাটাকে নিয়ে এসে জটাধারী হলাং, ছেঁড়া কাঁথা আর চীর দিয়ে ঢাকলাং গা, সংগ্রহ করলাং কয়েক জন শিষ্য। নানান্ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়ে, ঠকিয়ে-আদায়-করা চাল আর কাপড় দিয়ে তাদের হৃষ্ট করলাং। কয়েক দিনের অভ্যন্তরে সশিষ্য আসলাং অন্ধ্রনগরে। নগরের নাতি নিকটে একটি সায়র। তাতে সারসের শ্রেণী। জলতল সাদা হয়ে আছে নলিনসংহতির গলিতকিঞ্জল্কে। নিকেতন গড়লাং তারি তীরকাননে। শিষ্যদের কথায় আর বিচিত্র চেষ্টায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে জটলা করতে লাগল নাগরিকেরা। সন্ধানদক্ষ এক যতিশ্রেষ্ঠের কীর্ত্তিকথা ছড়িয়ে পড়ল নগরের অলিতে গলিতে। যথা:—

দেখতে দেখতে আসন্ন হোল সেই কাল, যে কালে—

জায়ার রাহিত্য আর্ত্ত করে চিত্ত; লালসা-চঞ্চল অলির গুঞ্জনে গ্লানমন হয় নাগ-কেশর; অরণ্যস্থলীর ললাটে দর্শন দিতে থাকে লীলাঙ্কিত তিলক; অনঙ্গরাজের অঙ্গশিয়রে কাঞ্চনছত্র ধরে থাকে নিদ্রাহীন কর্ণিকার; দক্ষিণানিলের আঘাতে সহকারের অঙ্গে সংলগ্ন হয় চঞ্চরীকের কলিকা; কালান্তজের কণ্ঠরাগে আরঞ্জিত হয়ে রতিরণে অগ্রসর হন রক্তাধরা কিন্নরীরা;

লজ্জাকে লঙ্ঘন করে রাগ;

"এই যতিশ্রেষ্ঠ জীর্ণারণ্যে সায়রের জলে শয়ন করে থাকেন; এঁর রসনাগ্রে নিহিত রয়েছে সরহস্য ষড়ঙ্গ ছন্দ, সংখ্যাতীত শাস্ত্র। অর্থনির্ণয় করে সন্দেহ নিরসন করেন সকলের। এঁর আস্যে নৃত্য করে সত্যের জ্ঞান। শরীরধারী যেন দয়ারাশি। এঁর সংস্তুতির শাসনে অচিরেই চরিতার্থ হয় দীক্ষা। এঁর চরণের রজঃকণা শিরঃকীর্ণ হলে চিকিৎসা হয় অনেক আতঙ্কের। ঐন্দ্রজালিকদের

সহস্র যত্ন যেখানে অক্ষম হয়, সেখানে নিয়ে এস এঁর চরণক্ষালন সলিল, নষ্ট হবে অতিচণ্ড গ্রহকলঙ্ক। কত যে শক্তি ধরেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না। অদৃশ্য এখানে অহঙ্কারের কণিকা।"

এই ভেন আত্মসঞ্চারিণী রটনা ধীরে ধীরে আকর্ষণ করল ক্ষত্রিয় জয়সিংহকে। কনকলেখার ঘাড় থেকে যক্ষ-তাড়না,—এই একটি চিন্তাই অধিকার করে রইল জয়সিংহকে। আসতে লাগলেন সায়রের নিকেতনে, অহরহঃ। অর্থগরীয়ান্ অর্চনায় হৃষ্ট করলেন শিষ্যদের; আর যথাকালে যাচঞা করলেন আকাঙ্ক্ষিত ইষ্ট সাধন। ধ্যানধীরশরীরে তখন জ্ঞানের লীলা দেখিয়ে কইলাং;—

"তাত, এই কন্যারত্নটি কল্যাণলক্ষণা। এই সাগর-রশনা গঙ্গাদিসহস্রধারা ধরিত্রী তাঁর, যাঁর ইনি করায়ত্তা। এক যক্ষ অধিষ্ঠান করে রয়েছেন এই কন্যাকে। এক নরেন্দ্রও লীলাঙ্কিতা এই নীরজাননাকে আকাঙ্ক্ষা করেন! যক্ষের সেটি অসহ্য। এই সাধনায় তিন দিন সহনশীল এবং যত্নশীল থাকা দরকার।"

কথায় হৃষ্টতর হয়ে চলে গেলেন অঙ্কনাথ।

নিশায় নির্গত হলাং। চাঁদের কিরণ নেই আকাশে। দশটি দিককে যেন গিলে খাচ্ছে নিরন্ধ্র অন্ধকার। নিদ্রার আগল লেগেছে নিখিলের নয়নে। একটা খন্তা হাতে নিয়ে সায়রের তটে তীর্থশিলার এক ধারে অতিকষ্টে খনন করলাং গর্ত্ত। সেই গর্ত্তের ঘাঁটিটি শিলা আর ইষ্টক দিয়ে ঘন করে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করি। যাক্ নিঃসন্দেহ দেখা যায় না আর গর্ত্ত। জলের মধ্যে ছিদ্রটি রইল জেগে।

সকাল হোলো। স্নানান্তে নির্ণিক্ত গাত্রে সঞ্চয় করলাং রক্ত নীরজ। দীনজনের ন্যায় আরাধনা করলাং দিননাথ কার্য্যাকার্য্যসাক্ষী সহস্রার্চ্চিকে,—কনকশৈলের শৃঙ্গে যিনি রঙ্গলাস্যের লীলানট, গগন-সাগরের তরঙ্গলঙ্ঘী যিনি একচক্র, নক্ষত্রহারযষ্টির যিনি অগ্রগ্রথিত রক্তরত্ন. আহা, যাঁর কিরণজাল নিত্য রাগান্বিত হয় ঐন্দ্রী দিগঙ্গনাদের অঙ্গরাগের রক্তচন্দনে। আরাধনশেষে আশ্রয় নিলাং নিজের নিকেতনে।

তিনটি দিন কেটে গেল। সেদিন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শঙ্কর-শরীর আকাশে অশেষ দর্শনীয় হয়েছে সন্ধ্যাঙ্গনার রক্তচন্দনচর্চ্চিত স্তনকলস-সংকাশ সহস্রার্চ্চির অস্তচিত্র, অচলরাজকন্যকার চিত্তে জেগেছে কদর্থনা-নিন্দা; হেনকালে ধীরে ধীরে এই দীনের সায়র-নিকেতনে আগত হলেন, অঙ্কনাথ জয়সিংহ। ধরণী-ন্যস্ত চরণনখরের কিরণে কিরীটখানিকে আচ্ছাদিত করে হলেন আসীন। আদেশ নিলেন কর্ণে—

"কল্যাণীয়, দৃষ্টিগত এখন ইষ্টসিদ্ধি। এই জগতে দেখা যায়—নিরীহ দেহধারীকে আশ্রয় করেন না শ্রী। নিরলস হস্তেই লক্ষ্মীর নিত্যসান্নিধ্য। তাই, যাতে কলঙ্কের দাগ না লাগে, অর্চ্চনায় আশঙ্কা না ঘটে, সেই আশায় অত্যন্ত আদরে সংস্কৃত করা হয়েছে এই সায়রটিকে। সিদ্ধি সন্নিকট। কাজেই, অদ্য অর্দ্ধনিশীথে এই সায়রে গাহনকৃত্য করণীয়। গাহন শেষে এক নিঃশ্বাসে সায়রের তলদেশে নিজেকে নিধান করা দরকার। জলতলে নিজেকে শায়িত করা অগ্র-কার্য্য। জলসংঘাতের অভ্যন্তরে অচিরাৎ যদি কর্ণগত হয় খলিতের ন্যায়, ঘূর্ণিতের ন্যায়, চলিতের ন্যায়, ত্রস্ত রাজহংসের জর্জ্জরিত-রসিতের ন্যায় এক চিত্রধ্বনি, আর ক্ষণান্তেই যদি শান্ত হয়ে যায় সেই সলিল-রটনা—তাহলে তখনি ক্লিন্নগাত্র আর আরক্ত-দৃষ্টি নিয়ে সলিল-নির্গতি সাধনীয়। সেই নয়নানন্দকর দেহৈশ্বর্য্যের ছটাটিকে স্থির-স্বচ্ছ করার শক্তি যক্ষ-সঙ্ঘের নেই। স্নেহের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে নিগড়িত করেছেন যে কন্যারত্নটিকে এক দণ্ডেই তাহলে হস্তগ্রাহ্য হয় সেই কন্যা। শেষ হয় তখন দর্শনের অসহ্য অন্তরায়, নিঃসন্দেহে নিঃশেষ হতে আর কতক্ষণ? এই যদি ইচ্ছা করেন, ধীরধীষণা শাস্ত্রজ্ঞানী হিতৈষীদের সঙ্গে শলা করে এক শত জালিক দিয়ে সায়রটিকে নিঃশঙ্ক করা তখন দরকার। ত্রিংশ দণ্ড অন্তরে অন্তরে সৈনিক খাড়া করে দেহরক্ষা করা সঙ্গত। কে জানে, কোথায় থাকে ছিদ্র-সন্ধানী অরি!"

অঙ্কনাথের হৃদয় হরণ করল এই আদেশ। রাজার নিতান্ত নিশ্চলতা লক্ষ্য করে, রাজাশয় দৃঢ়তর করণের চেষ্টায় কইলাং:

"রাজন্, অনেক দিন গেল, এই জনান্তে রয়েছি। যাঁর রাষ্ট্রে আতিথ্য নিয়েছি তাঁর জন্য ঈষৎ কাজ না করে অন্যত্র-গতি আর্য্য-গর্হিত। এত দিন এখানে থাকার ঐ কারণ। অদ্য কার্য্য সিদ্ধ হোলো। এখন গৃহে যান। যথার্হ সলিলে গন্ধস্নান, স্রক্‌চন্দনে অঙ্গরাগ, আর যথাশক্তি দান-আরাধনার অন্তে ধরণীর তৈতিক্ষদের তিলস্নেহে আসেচন করণীয়, তদন্তে নৈশান্ধকারনাশী সহস্রবর্ত্তিকা অগ্নিশিখার আলোকে এই সাধনক্ষেত্রে নরেন্দ্রের আগতি—দীনজনের আকাঙ্ক্ষা।"

কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে জয়সিংহ কইলেন—

"আর্য্যের সান্নিধ্য না থাকলে অসিদ্ধ রইত সিদ্ধি। নিঃসঙ্গতা কষ্টদায়ক।"—স্নানে চলে গেলেন গৃহে।

নিকেতন থেকে নির্গত হলাং। নির্জ্জন নিশীথ। সায়রের তীরে রন্ধ্রের অন্তরে নিলীন হয়ে ছিদ্রটিতে কান লাগিয়ে রইলাং। দেখতে দেখতে অর্দ্ধরাত্রি এল। যথাদিষ্ট ক্রিয়া-শেষে রাজা এলেন। স্থানে স্থানে খাড়া করা হোলো রক্ষী। জালিকেরা নিরাকরণ করল সায়রের অন্তরের যত কণ্টকশল্য। শঙ্কাহীনচিত্তে গাহন করলেন রাজা। হাতী তলিয়ে যায়—এত জল। কীর্ণ হোলো রাজার কেশ; নাক, কান সংহৃত করে, সায়রের তলদেশে তিনি চলে গেলেন। এই দীন তখন নক্রলীলায় নীরের অন্দরে নিলীন হয়ে তথাশয়ান রাজার কন্ধরটিকে কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে ধরল। খরতর কালদণ্ডের ঘট্টনের ন্যায় করচরণের অতিচণ্ড আঘাত, আর নির্দ্দয় নিগ্রহ,—ক্ষণিকের অন্দরেই নিশ্চেষ্ট করে দিল রাজাকে। রাজশরীরটাকে আকর্ষণ করতে করতে নিয়ে এলাং তীরস্থ সেই গর্ত্তে,—রাখলাং,—শেষে নির্গত হলাং সায়র থেকে। তাদের নরনাথের হঠাৎ এই দেহান্তর-গ্রহণ আশ্চর্য্য করে দিল আসন্ন সৈনিকদের। সিতচ্ছত্রাদি রাজচিহ্নে রাজিত হয়ে, গজস্কন্ধে আসীন এই দীন, তখন রাজরথ্যা দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল; দণ্ডিদের চণ্ডদণ্ডের তাড়নায় অন্তর্হিত হল ত্রস্ত জনতা; নয়ন-জলে নিরস্ত হোলো নৈশনিদ্রার আরতি। সকাল এল। দেখা দিলেন অর্কচক্র;—লাক্ষায় রঞ্জিত যেন দিক্-শিরঃ, ঐন্দ্রী দিগঙ্গনার যেন রত্নরচিত আদর্শ।

যে সকল কৃত্য রাজার করণীয়, সে সকল সাঙ্গ করে আসীন

লাং রাজাসনে। শঙ্কাশিথিল নিকটস্থ আচারদর্শী সহায়দের কইলাং :

"দেখেছেন, ঋষিদের কী শক্তি! অজেয় সেই যতিশ্রেষ্ঠ সিদ্ধাইয়ের দ্বারা নীরজা করে দিয়ে দান করেছেন আকারান্তর-সিদ্ধি, দেহে সংশ্লিষ্ট করেছেন নীরজদলের চেয়ে অধিকতর দর্শনীয় শ্রী। আজ লজ্জায় নত হয়ে গেল নাস্তিকসঙ্ঘের শিরঃ। ইদানীং চন্দ্রশেখর, নরকশাসন (বিষ্ণু), সরসিজাসন (ব্রহ্মা) ইত্যাদি ত্রিদশস্বামীদের আয়তনে আয়তনে নৃত্যগীতাদির সাদর অর্চনা করণীয়। ক্লেশনিরসনের জন্য দরিদ্রদের দান কর ধন।"

রাজাধিরাজনন্দন, আশ্চর্য্যরসের আতিশয্যে হৃষ্ট হয় সকলেই। "জয় জয় জগদীশ" ধ্বনিতে দশ দিক নন্দিত করে, সকলেই আচরণ করল যথাদিষ্ট ক্রিয়া।

এদিকে এই দীন নরেন্দ্রের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল শশাঙ্কসেনার। সে ছিল দয়িতার হৃদয়স্থানীয়া। কী যেন কাজে এসেছিল সে। রহসি কইলাং—"এই দীনহীন জনকে কখন কি দেখেছেন?" হর্ষের আকর্ষে স্থিরনেত্রে সে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ; নয়নে সলিলের ঝর্ণা, অধরে হাস্যের লাস্য। হাস্যটিকে কিঞ্চিৎ আড়াল করে হস্তে রচনা করল অঞ্জলি। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কইল "দেখেছি, নির্ঘাৎ! যদি না দেখে থাকি, তাহলে এখন দেখছি ঐন্দ্রজালিকের খেলা। এ ইন্দ্রজাল শেখালে কে?"

কুশলকথায় এখন আখ্যান করি ঘটনা। সজ্জনা জানাল তার সহচরীকে। চেতনায় এল আহ্লাদ, হৃদয়ে এল দয়িতা—কনকের যেন লেখা। কলিঙ্গনাথ তখন সকল কথা জেনে নিয়ে শেষে দান করলেন তাঁর কন্যকা কনকলেখাকে। এক-শাসনের অধীন হয়ে গেল কলিঙ্গ আর অন্ধ্র।

হেন কালে অঙ্গরাজের সাহায্যের জন্যে ত্বরিত গতিতে সেনা নিয়ে এখানে এলাং। এসেই অকস্মাৎ দেখলাং আনন্দসদনকে, রাজাধিরাজনন্দনকে।

মন্ত্রগুপ্তের বচনশৈলীর কৌশলে চমৎকৃত হয়ে গেলেন রাজবাহন; সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরাও। মন্ত্রগুপ্তের ওষ্ঠের বিচিত্র ভঙ্গিমা দেখে হাস্য-জ্যোৎস্নায় অভিষিক্ত হয়ে গেল সকলের দাঁত-ঢাকা ঠোঁট। অভিনন্দন জানিয়ে রাজবাহন বল্লেন—

"বলতেই হবে, মহামুনিটির এই বৃত্তান্ত বড় বিচিত্র। উঃ, কী কঠোর কষ্টকর তপস্যাই না করতে হয়েছিল মহামুনিকে। তোমার ওষ্ঠকৃতির রসিকতা এখন রাখো। তুমি যে প্রাজ্ঞ, কিসের স্পর্শে যে তোমার এত হয়েছে উন্নতি, তার স্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।"

এই বলে বহুশ্রুত 'বিশ্রুতে'র দিকে পদ্ম আঁখি নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন ক্ষিতিশপুত্র—

"আখ্যানের রঙ্গমঞ্চে এবার তবে অবতরণ করুন আপনি।"*

ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমার-চরিতে মন্ত্রগুপ্তচরিতং
নাম সপ্তম উচ্ছ্বাসঃ ॥

[ক্রমশঃ।

* ওষ্ঠ্যবর্ণ বাদ দিয়ে উচ্চারণ করে পাঠ করলে মজা দেবে অনুবাদ। (লেখক)

শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রেমিক ই. বি. ইলিয়ট

রয়াল এয়ার ফোর্স ফ্লাইট লেফট্ন্যান্ট ইলিয়টকে বিখ্যাত ক'রেছে। ইলিয়টের পুরা নাম মিঃ ই. বি. ইলিয়ট। তখন ইং ১৯২১ অব্দ, যখন এই ইলিয়ট নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং তাঁর সম্প্রদায়কে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ইং ১৯২৮ অব্দের এক সন্ধ্যায় ইলিয়ট কলকাতার নাট্য-মন্দিরে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অবশ্য তাঁর আগে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে আরও কয়েক জন খ্যাতিমান ইংরাজ এসেছিলেন, যাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় বিচারক লর্ড উইলিয়ামের আর প্যারিস অপেরা হাউসের শিল্প-নির্দ্দেশকের। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হ'লে ইলিয়ট শিশিরকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করায় শিশিরকুমার অনুমতি দেন সাক্ষাতের। প্রথম দর্শনেই ইলিয়ট বলেছিলেন,—"আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমি এখন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মুখে।"

তখন "সীতা" নাটক অভিনয় হচ্ছে। অভিনয় দেখার কিছু-দিনের মধ্যে ইলিয়ট চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের দর্শন পাওয়ার জন্য। যদিও শান্তিনিকেতনে যাত্রার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ইলিয়ট শিশিরকুমারের "সীতা" ব্যতীত অন্যান্য নাটকও দেখে নিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে চ'লে গেলেন ইন্দো-চীনে। কিন্তু এক বছর যেতে-না-যেতেই ইলিয়ট পুনরায় ভারতবর্ষে এলেন। পুনরায় নাট্য-মন্দিরে গিয়ে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখলেন। আবার চ'লে গেলেন ইংলণ্ডে।

ইং ১৯২৯ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ইলিয়টের কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। এই বছরে হঠাৎ শিশিরকুমার পেলেন নিউ ইয়র্ক থেকে এক আমন্ত্রণ-লিপি। যেতে হবে আমেরিকায়। সেখানে বাঙলায় অভিনয় দেখাতে হবে।

আমেরিকায় যাওয়ার চুক্তি হ'ল শিশিরকুমার স্বয়ং দক্ষিণা পাবেন প্রতি মাসে ১৩,৩১২ টাকা, মোট আয় থেকে শতকরা তিন টাকা এবং অন্যান্য চব্বিশ জন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জন্য আরও ২৬,৬২৪ টাকা। চুক্তি ক'রেছিল আমেরিকার বিখ্যাত ব্রডওয়ে থিয়েটার।

আমন্ত্রণ-লিপি প্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ইলিয়টের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইলিয়টই জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন শিশির-সম্প্রদায়ের।

১৯৪৩ সালে ইলিয়ট পুনরায় বাঙলায় এসেছিলেন। দেখে গেছেন কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, পাবনা জেলা।

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

পরের দিন।
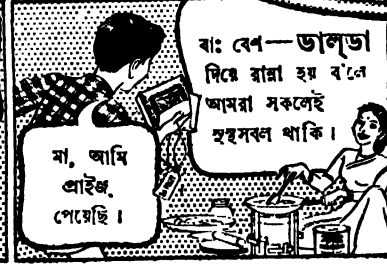
আরাম-কেদারায় শুয়ে বই পড়ছিল শমিত। গায়ের উপর টানা রয়েছে ভারী শালখানা। শীতের উত্তরের বাতাসে অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলের দু'-একগাছা উড়ছে এদিক-ওদিক। ওর এ ঘরটির মতো নিঃসাড় নিঃশব্দ জায়গা এ বাড়ীতে আর দ্বিতীয় নেই। বাড়ীর পাঁচ-মেশালো হট্টগোলের ভগ্নাংশও পারে না এসে এখানকার শান্তিভঙ্গ করে যেতে। আসবাবে-পত্রে, রংএ-নীরবতায় আলস্য-মাখা এ ঘর উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একা। ধারে-পাশের কোন বাড়ী বা গাছ পর্যন্ত ছায়া হয়ে এসে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি তার একাকীত্বে।

হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে বিস্মিত হয় শমিত! সকাল বেলার ধোয়া-পরিচ্ছন্ন এসট্রেটাতে আর এক টুকরো সিগারেটের স্থানও যে সংকুলানো অসম্ভব! সমস্ত দিনে কত সিগারেট খেয়েছে সে? চিন্তা করে ভ্রূ কুঁচকে। নূতন কৌটোটা খুলেছিলো কখন? দুপুরের পরে তো। ক'টা আছে আর! হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো কৌটোটা। ঝকঝকে টিনটার ভেতর শরীরের দীর্ঘ পাতলা ছায়াটি ফেলে তেলে রয়েছে মাত্র একটি সিগারেট। —যেন তন্মনা তন্বী নিঃসঙ্গতার বেদনায় মুহূর্ত গুণে চলেছে পুড়ে ছাই হবার।...তা একটি টিন—একখানা প্রায় দু'শ পাতার বই—রসদ খুব বেশী লাগিয়েছে কি? এখন শেষ অধ্যায়টির জন্য ধরানো যাক এটিকেও। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলে শমিত। কিন্তু অসমাপ্ত বইটাকে আর ইচ্ছে করে না হাতে তুলে নিতে। জানালা দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় দূরের কৃষ্ণচূড়া ফুলগাছের সারির দিকে। বাইরের আলো এখনও মিলোয়নি। কিন্তু আঁধার হয়ে উঠেছে ঘরের অভ্যন্তরটি। যেন ওর অন্তর-বাইরের প্রতিবিম্বন। কেন যে একটা ভালো-না-লাগা ভাব ওকে পেয়ে বসেছে—তাই ভাবে আর অলস গতিতে ধোঁয়া ছেড়ে চলে। বেরুতেও ইচ্ছে করছে না, মন বসতে চাচ্ছে না বইতে, এ সময় কমলাটা এলে মন্দ হতো না। উঠে গিয়ে ডেকে আনবে নাকি? কিংবা এখানে বসেই দেবে জোর-গলায় হাঁক। না, নিথর ঘরটাই বুঝি তবে থরথরিয়ে কেঁপে উঠবে এই আচমকা শব্দে।

—'আরে, এই যে! কি আশ্চর্য্য, তোর কথাই যে ভাবছিলাম রে! বোস্ দেখি, গল্প-সল্প করা যাক!'

—'ভয়ঙ্কর ঘাবড়ে যাচ্ছি শমি মামা! ব্যাপারখানা কি? তোমার ঘরে এমন অচিন্ত্যনীয় আপ্যায়ন জুটছে দু'দিন ধরে—এমন সৌভাগ্য তো সচরাচর ঘটে না কারু।'

—'শুধু এ-ঘটে না, ও-ঘটে না, সে-ঘটে না—এই জানিস। নূতন কিছু কি ঘটতে নেই?'

—'তাই যদি না থাকবে তো ঘটছে কি করে? চায়ের প্রয়োজন ছাড়া কমলাকে খোঁজা, কমলাকে ভাবা! ঘটনা সহজ নয়।' কুশন-আঁটা চেয়ারটা টেনে বসল কমলা।

শমিত বললো—'ভীষণতম গুরুতর। কথা বল, গুরু ভার লাঘব করি।'

—'নেশায় মৌতাত দেব। বেশ। আনন্দই হচ্ছে বাড়ীতেও সময় কাটানোর মতো মাঝে মাঝে কিছু মিলে যায় দেখে।'

—'তা যায়, তবেই দেখ, মেলে না বলেই থাকি না। থাকি না তোরা ভালো লাগাতে পারিস না।'

—'যাতে তোমার চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ীখানা রমণীয় মনে হয়, তার ব্যবস্থার জন্য তো জ্যাঠাইমা অস্থিরই হয়ে উঠেছেন। বিয়েটি করে ফেললেই পার। ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।'

—'মস্ত একটা সত্য কথা বলেছিস, ঐ লেঠা চুকিয়ে ফেলবার জন্যই বিয়েটা করে ফেলি?'

—'হ্যাঁ, তাই ফেল! আমরাও দেখে চক্ষু সার্থক করি তোমার কবিতা-কল্পনা-লতাকে। অবিশ্যি আমার অদৃষ্ট দুঃখ-দুর্ভোগ বাড়বে ছাড়া কমবে না। তা না হয়, তখন একবার শ্বশ্রুমাতার জন্য মন কেমন করে, তাঁকে দেখে আসতে চলে যাওয়া যাবে।'

—'বিয়ে করব আমি, তোর দুর্ভোগ হবে কি রে?'

—'বাঃ, হবে না? আমি ছাড়া তোমার তখনকার 'পেচাল' শুনবে কে বসে?—বুঝলি কমলা, তোর মামী এতো ইন্টেলিজেন্ট—সত্যি, বুদ্ধি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। মনটা তো চমৎকার উদার। এটাই চাচ্ছিলাম রে। নিজেকে মনে হচ্ছে একদম হাল্কা। কোন ভার নেই, নেই কোন বোঝা, সব ভার ওর উপর দিয়ে আমি বেঁচে গেছি রে কমলা!—কিন্তু কিসের বোঝা ছিল মাথায়, কিই বা স্ত্রীর মাথায় তুলে দিয়ে পাতলা হলে—একটা উদার মনেরই বা এতো কি বিশেষ প্রয়োজন তোমার, কি তুমি তার হাত দিয়ে বিলিয়ে দেবার জন্য বসে আছ—জানেন ভগবান! কিন্তু আমায় হাই তুলে, চোখ রগড়ে হলেও শুনে যেতেই হবে। অব্যাহতি নেই।'

ওর মুখের নকল অসহায়ত্বের ভঙ্গিতে হেসে উঠলো শমিত।—'তুই জানলি কি করে?'

—'এ আবার জানতে লাগে নাকি। বাঁধা গৎ তো।'

—'অসিতও বলেছিলো তবে?'

—'বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সবে মুখ খুলবেন—'নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে হচ্ছে কমলা তোমার বুদ্ধি আর মনের পরিচয়ে।'

বিষম বিস্ময়ে চোখ বড় করে বললাম—'তা ও-দুটো বস্তু কি প্রয়োজনে আসবে তোমার?'

হকচকিয়ে উঠলেন—'বাঃ, দরকারে লাগবে না!'

বললাম—'না, লাগবে না! একদম না! আমি যদি এখন

বলি, বিয়ের এতো এতো শাড়ী, জামা, কাপড় শুধু শুধু এক জনের ব্যবহারের মুখ চেয়ে বাক্সে পচিয়ে লাভ কি! এ যে প্রয়োজনাতিরিক্ত। দেবো কিছু সবাইকে বিলিয়ে? এই বোধ আর উদার বিচক্ষণতার পরিচয়ে কি তোমার নিজেকে বড় বেশী ভাগ্যবান মনে হবে, না, তাতে করে তোমার ঘরের শান্তিই বাড়বে? তাই ও-কথা নয়। বলো, বড্ড বেঁচে গেছি, বুদ্ধি আর মনের বালাইটি সঙ্গে নিয়ে আসনি—আশা হচ্ছে তোমায় নিয়ে সুখে-শান্তিতেই ঘর করা চলবে।' বুঝলে শমি মামা, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে বড় বাড়তি জিনিষ ঐ বুদ্ধি আর মন।'

সাহেবি কেতায় হাত বাড়িয়ে 'হেণ্ডসেক' করলো শমিত কমলার সঙ্গে। বললো—'নূতন বৌ, বলিসনি নিশ্চয়ই সেদিন এ সব কথা। এ অভিজ্ঞতা তোর—হালের। তবু দূরদৃষ্টিশক্তি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের প্রশংসা করি।'

হেসে উঠলো কমলা।—'ঠিকই ধরেছ। একেবারে হালের। দেখছ তো বুদ্ধি-বিবেচনার ধারটিও ধারেন না, সুখে আছেন জয়ন্তী দেবী। রাণী দেবীর বুদ্ধি আর মন নয় তো, যেন গলায় ঝুলছে দু'খণ্ড পাথর। আর মিত্রা দেবীর ও দুটো এতো বেশী, শানিয়ে নিতে পারলে কেটে বেরিয়ে যাবেন। নয় তো—'

—'থামলি যে? নয় তো কি?' দস্তুর মতো ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলো শমিত।

—'নয়তো ও দুটিই পিষে মারবে ওকে তিলে তিলে।'

এমনি সময় থম্‌থমে মুখ করে ঘরে ঢুকলেন শৈলনন্দিনী। দিদির থমথমে চেহারাখানার মতো নিজের মুখখানাও ঠিক তেমনি করে, হাতের ইঙ্গিতে চেয়ারটা দেখিয়ে দিলো শমিত দিদিকে বসতে।

—'তবু ভালো। হাত দিয়ে দরজা না দেখিয়ে যে বসতে বলছ! মৌনব্রত নিয়েছ নাকি?'

—'না তো—অনুকরণ করছিলাম তোমার। নিজের মুখ তো আর নিজে দেখতে পাচ্ছ না। আমারটা দেখে বুঝবে কেমন হেতো চেহারা করে ঘরে ঢুকেছ। এ কারু মিষ্টি লাগতে পারে কি না। আচ্ছা, এতোটা মেজাজ খারাপ করে রয়েছ কেন কাল থেকে? পড়াতে পারব না বলেছি, ডেকে বল পারতে হবে। চুকে গেলো। জোর খাটাতে জান না, জান না আদেশ করতে, করতে জান শুধু অভো রাগ আর অভিমান। না, তুমি জমিদার শশীকান্ত রায়ের স্ত্রী হবার যোগ্য নও।' হাসলো শমিত।

—'তিন কাল গিয়ে মরণ কালে আর তোমাদের যোগ্য হবার শক্তি নেই, সাধও নেই। আমি বলে ঘর করলাম তোমাদের নিয়ে। আর কেউ হলে যেতো বিবাগী হয়ে।'

—'তাই ভালো দিদি। এসো আমরা পথেই বেরিয়ে পড়ি। হাতে থাকবে কেবল মাত্র একটি দোতারা—আর কণ্ঠে থাকবে গান। চমৎকার। কি বলিস কমলা? সঙ্গী হবি নাকি?'

—'ইস্, আমার যে এক্ষুনি তাই ইচ্ছে করছে!'

দিদি উঠলেন উগ্র হয়ে। 'ফাজলামোই করবে, না যে কথা বলতে এসেছি তা শুনবে? না শোন তো, চলে যাই।'

—'না না, তুমি বল।' শমিত ব্যস্ত হবার ভাব করে।

দু'খানা ফটো বাড়িয়ে ধরে দিদি বললেন—'এ মেয়ে দুটির মা বড্ড ধরেছেন। দেখ, তোমার পছন্দ হয় তো কথা বলি।'

—'দুটো!'

—'তোমাকেই তো আর দু'জনকে বিয়ে করতে বলা হচ্ছে না—' তিক্ততা প্রকাশ করেন দিদি। একটু সময় নেন ভ্রূ কুচকে বিরক্তি দমন করতে। কিন্তু গরজ বড় বালাই তাই বলতেই হয়—'ওরা যমজ বোন। দু'জনেই বি, এ। গান গাইতে জানে। দেখতে অপূর্ব সুন্দর। দেখো, তোমার কাকে পছন্দ হয়। সত্যি, চমৎকার মেয়ে দুটি!'

—'কি ভয়ঙ্কর কথা বল তো কমলা! গুণ শুণ সব দু'জনার এক। চেহারা অপূর্ব, স্বভাব চমৎকার। ফটো দুটোকে দেখে এক জনের ভাবাটা কিছু অন্যায়ই নয়। এ অবস্থায় যাকে অপছন্দ করব, বিয়ের রাতে যদি সেই অপরিচিতা এসে কৈফিয়ৎ তলব করে বসে—তাকে অমনোনয়নে অসম্মানিত করার যুক্তিসঙ্গত কারণটা কি—তখন উপায়?'

—'এসো, ফটো দুটোতে 'হেড এণ্ড টেল' লিখে 'টস্' করি।' উৎসাহে উঠে দাঁড়ালো কমলা।

ততক্ষণে ছবি টেনে নিয়ে, জোর পা ফেলে ঘর ছেড়ে গেছেন দিদি।

—'এবার সঙ্গীত।' গা ছেড়ে হেলান দিয়ে বললো শমিত।

—'মেরেই ফেলবেন মা-জ্যাঠাইমা। এমনিতেই তো যে চটানোটা চটিয়ে দিয়েছ! বৃহস্পতিবার—পড়া হবে লক্ষ্মীপুজোর পুঁথি—এঁয়ো স্ত্রী হয়ে ফুল-দূর্বা হাতে, লালপাড় শাড়ীর ঘোমটা মাথায় দিয়ে বসতে হবে সে পুঁথিপড়া শুনতে। বিলম্বে কুরুক্ষেত্র বেধে উঠবার সম্ভাবনা আছে। চললাম।' দু'পা এগিয়ে হঠাৎ ফিরে এলো কমলা। কাছে এগিয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সুরে জিজ্ঞাসা করলো—'আচ্ছা, সত্যি করে একটা কথার জবাব দেবে শমি মামা? যদি সত্যি বল তো জিজ্ঞাসা করি, নয় তো নয়।'

কমলার আকস্মিক এই ভাবাত্মক প্রশ্নে আশ্চর্য্য হয়ে শমিত সম্মতি জানালো—'বলব।'

—'বিয়েতে তোমার সত্যি মন নেই?'

—'ভাবিয়ে তুললি কমলা, মন নেই বলি কি করে? আর মন আছে শোনা মাত্র এগিয়ে আসবি তো মেয়েলি কৌতূহলে। কিন্তু পরিচ্ছন্ন চিন্তায় এর জবাব যে আমার কাছেও একেবারেই স্পষ্ট নয়।'

—'অপরিচ্ছন্ন চিন্তাটাই বল শুনি। ঝেড়ে-পুঁছে তৈরী করে নেব।'

—'কুলো-ঝাড়া করাটাও খুব সহজ কাজ নয়, কমলা! দিদিদের দেখি, ঝাড়তে ঝাড়তে মাঝে মাঝেই আঙুলের টোকা দেন কুলোর নীচে। ঐ টোকা মারতে জানাটাই আসল কৌশল ঝাড়-পোঁছের। অর্থাৎ অসংলগ্নকে সংলগ্ন করা।'

কমলা মা'র আহ্বানে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 'যাচ্ছি' বলে সাড়া দিয়ে বললো—'বেঁচে গেলে তুমি—'অসংলগ্নকে সংলগ্ন' করবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু এখন না গেলে রক্ষে থাকবে না।' হেসে কমলা বেরিয়ে গেলো।

যেন হঠাৎ কথাটা খেয়ালে এলো এমনি ভাবে ডেকে শমিত জানতে চাইলো—'আচ্ছা, কমলা, তোদের পড়তে আসবার কি হলো রে?'

—'ওরে বাবা, মিত্রা দেবী বর্তমানে সর্বারি তেজপাতা হয়ে আছেন। ও-কথা বলতে যাবে কে তাকে!'

—সর্বারি তেজপাতা! সেটা আবার কি বস্তু রে?'

কিন্তু কমলার গান তখন দোতলার বারান্দা পার হচ্ছে, 'কে গো তুমি বিরহিণী আমারে সম্ভাষিলে।'

—'হাওয়ায় উড়ে নেমে গেলো নাকি মেয়েটা।' আবার গা ছেড়ে বসতে গিয়েও আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো শমিত। সমস্ত দিন বসে থেকে ব্যথা ধরে গেছে শরীরে। একটু ঘুরে আসা যাক। তৈরী হয়ে বের হবার মুখে দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ যেন কি চিন্তা করলো দাঁড়িয়ে। আবার ফিরে এসে দেরাজটার উপর থেকে টেনে নিলো—গুটি কয়েক বই। যে বই ক'খানা ভোরের দিকে ও নিজেই সংগ্রহ করে এনেছিলো।

—'কে গো তুমি বিরহিণী আমারে সম্ভাষিলে—' কমলার গাওয়া গানের সুরটা অতি অস্ফুট শব্দে গুন-গুন করতে করতে নেমে এসে শমিত থামলো গিয়ে একেবারে মিত্রার ঘরের দরজায়। ডেকে বললো—'আসতে পারি?'

মেঝেয় বসে সুটকেস গুছাচ্ছিলো মিত্রা। একটু আশ্চর্য্য হয়েই চোখ তুলে তাকালো দরজার দিকে। আবার পর-মুহূর্তেই মনোনিবেশ করলো হাতের কাজে। কথা বলার অতি অনিচ্ছায় ঠোঁট দুটো যেন পরস্পর এঁটে থাকতে চাইলো।

—'মিত্রা ঘরে নেই?'

—'আছি, এসো।' ঠোঁট খুললো না তো মিত্রা যেন মুহূর্ত পূর্বে আঁটা এনভেলাপের মুখ টেনে খুললো।

ভারি সাদা পর্দাটা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলো শমিত। জিজ্ঞাসা করলো—'কি করছ? খুব ব্যস্ত নাকি?'

—'তুমি কি মনে কর?'

—'আমি—' হাসলো শমিত। 'এই এমনি এলাম।'

—'ভালো, সৌভাগ্য আমার!'

—'বাঃ, সৌভাগ্যের প্রসন্নতা মুখে ফুটিয়ে কথা বলছো তুমি! রং-এ রেখায় খুসির সামান্য ক্রটি ধরে সাধ্য কার!—বসতেও বলতে পারছ না সৌজন্যবোধটুকু দেখিয়ে।

—'সৌজন্যবোধটা' 'টুকু' নয়। ওটা মানুষের একটা মস্ত পরিচয়। যাক্, সামনের কৌচটা বসবার জন্য।'

—'তবু তোমার ঘর, তুমি না বললে বসি কি করে।'

অপ্রীত মনোভাবের একটি কঠিন টোল ভুরুতে বাঁকিয়ে তুলে মিত্রা বললো—'বেশ বললাম, বোস, আর এ ছাড়া কি বা বলতে পারি?'

—'পারলে বলতে?'

—'বলতাম।'

—'তাড়িয়ে দিতে?'

—'কেন, তার চাইতে অনেক উদার পদ্ধতি তো শিখে এসেছি। নিজেই ঘর ছেড়ে চলে যেতাম।'

—'তাই ইচ্ছে করছে?'

—'এ সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনেক উর্দ্ধে আমার রুচি—'

কালকের সেই অনভিপ্রেত অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা চেয়ে ফেলবে নাকি ঝট্ করে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া—এ যে নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যের মতো নাটকীয় কাণ্ড! মুখে কথা নিয়ে ইতস্ততঃ করে শমিত। কিন্তু কিছুতেই বলে উঠতে পারে না। কিছু বলা উচিত বলেই অবান্তর ভাবে জিজ্ঞাসা করে—'বাড়ী শুদ্ধ সবাই আজ পুজোর ঘরে। কিন্তু তুমি যাওনি যে?'

—'আমার যাওয়াটা বাধ্যতামূলক নয়।'

—'ওঃ', শমিতের চোখ গিয়ে পড়লো মিত্রার সীঁথির উপর। যেন চিকণ এক টুকরো ইস্পাতের পাত বেঁকে পড়ে আছে।

হঠাৎ অত্যন্ত সহজ ভাবে কৌচে বসে পড়লো শমিত। স্বল্প ঝুঁকে এগিয়ে এলো মিত্রার দিকে। বললো—'ক্ষমা চাই যদি কালকের ব্যবহারের?'

—'খেয়াল হয়ে থাকলে চাইবে। কিন্তু এমন ভীষণ ভাগ্যকে তুলে রাখব আমি কোথায়?' মিত্রার কণ্ঠ উপচানো বিদ্রূপ যেন ওর পাতলা ঠোঁট দুটি আয়ত্ত করে উঠতে পারে না—ঝরে পড়ে মেঝেতে।

শমিতের মনে হলো, ইচ্ছে করলে বুঝি সে বিদ্রূপ মুঠো ভরে তুলে দেখানো যায়—'দেখো কত।'

এই উপহাস, প্রতিটি কথার উত্তর এই অসহিষ্ণু অনিচ্ছুক জবাবে ইতি টেনে দেওয়া—তবু যে মিত্রার ছোট্ট সাদা মখমলের হাত-ব্যাগটার দিকে চোখ রেখে ও বসে থাকে তার কারণ, কালকের অপ্রীতিকর ঘটনাটা যেখানে ছিল—ঠিক সেইখানটায়ই সেটা থিতানো রেখে শমিত উঠে যেতে চায় না। একটু সময় চুপ করে থেকে বলে—'এত গোছগাছ চলছে কিসের? ছড়িয়ে বসেছ তো কম জিনিষপত্র নয়।'

—'মা'র ওখানে যাচ্ছি।'

—'মা'র কাছে! এই তো সেদিন এলে। আবার হঠাৎ?'

—'সময় কাটাতে। তোমাদের মূল্যবান সময়ে তো হাত বাড়ানোর উপায় নেই। আমার সময়েই মূল্য দিয়ে আনতে তাই মাঝে মাঝে ওখানে যেতে হয়।···আর কিছু জিজ্ঞাসার আছে?'

যেন চাবুক কষলো মিত্রা।

নিষ্পলক দৃষ্টি মিত্রার মুখের উপর স্থির রেখে উঠে দাঁড়ালো শমিত, তার পর সনম্র ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নুইয়ে বললো—'না, এবার তোমার অনুমতি পেলে যেতে পারি আমি।'

—'মিত্রা ঘরে আছো তো?'

—'আরে মামী যে! এসো এসো।' সুটকেসটা হাত দিয়ে ঠেলে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াতেই আঁচলে টান পড়ে মিত্রার শরীর থেকে খসে পড়ে গেলো শাড়ীটা। মিত্রা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অসংবৃত আঁচলটা টেনে নিলো।

কিন্তু আশ্চর্য্য! সামান্য সঙ্কোচ বা ভব্যতাবোধেও শমিত ওর সেই নির্ভীক পলকহীন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো না। শুধু ওর দৃষ্টিটা মুখ থেকে নেমে এলো বুকে—মিত্রার কপালে চুলের পাশে এতক্ষণে ফুটে বেরুলো ঘাম—এই শীতের রাতে।

নিজেকে মুহূর্তে সহজ করে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল ও সৌমীর।—'এসো, ঘরে এসো।'

সৌমী ঘরে ঢুকে বললো—'দুপুরে চিঠি পেলাম। কিন্তু তোমার মামাদের ফিরতে তো সেই রাত দশটা। তাই আমিই এলাম। তৈরী তো?'

—'হ্যাঁ, এই হয়ে গেল। সব ভরে উঠতে পারিনি ভাই এখ নও। যাদের বলেছ আমায় নিয়ে যাবার কথা ?'

—'না ভাই। ওঁরা সবাই পূজোয় বসেছেন। দেখা দিয়ে এসেছি। তুমি বোসো না পূজোর কাছে ?'

—'না, আমি থাকলে, ঐ সিঁদুর-টিদুর পরবার সময় মা'র কষ্ট হয়—তাই আমি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

—'বড্ড ভালো তোমার শাশুড়ী—' হঠাৎ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শমিতের দিকে চোখ পড়ে লজ্জিত হয়ে ওঠে সৌমী।'—'আপনি এখানে! নমস্কার। মাপ করবেন, দেখতে পাইনি।'

—'ঠিক আছে। একেবারে না দেখতে পেলেও আপত্তি ছিল না।' শমিত হাসল একটু। 'আচ্ছা, নমস্কার!' হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এসে একেবারে ঢুকলো গিয়ে ওর নির্জন ঘরটিতে। বাতি জ্বালাতে গিয়েও আনলো হাত নামিয়ে।···মনের সঙ্গে চোখের কি আশ্চর্য্য মিতালি—মনটি আঁধার হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে চোখও দেয় আলো ফিরিয়ে। বালিশের উপর হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো টান হয়ে। উত্তরের খোলা জানালাটা দিয়ে হিমালয়ের হিমপ্রবাহ যেন সোজা চলে এসে ওর বিছানায়, বালিশে, লেপে বরফের কুচি ছিটিয়ে রেখে গেছে। একেবারে তুষার-শয্যা—অপূর্ব।

এতটা বৈপরীত্য ছাড়া বুঝি ওর ঠাণ্ডা হওয়ার উপায় ছিলো না।

[ক্রমশঃ।

শাজাহান

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্রাট্ শাজাহান
প্রিয়ারে হারায়ে হইল সে বুঝি শোকেতে মুহ্যমান
জীবনের আলো নিবে গেল ভবে
আকুলিছে প্রাণ শুধু হাহারবে
দেহ আছে তবু মনে হয় হায় নাই বুঝি তার প্রাণ।

কত নিশিদিন ভবে
প্রিয়ার কণ্ঠে কত না আলাপ জেগেছে মধুর রবে
সেদিনের স্মৃতি বাজে কোন্ তারে
মিলাইল রেশ কোন্ দূর পারে
জানিত কি কভু মিলনের ক্ষণে বিরহই সার হবে ?

কত সোহাগের কাহিনী
নব নব প্রাতে নব নব সাঁঝে জেগেছে কত না রাগিণী
যমুনার তীরে প্রেমের লীলায়
কত গান, আজ কোথায় মিলায়
কোথা চ'লে গেল পরাণের সাথী, কোথা সেই অভিমানিনী।

বিচিত্র এই ধরা
কখনো জীবনে কত না শান্তি কত না দুঃখ-হরা
আজ সে শান্তি কোথায় মিলাল
নিবিল যে মন-মহালের আলো
চারিভিতে জাগে জীবনের রূপ শোক-বিচ্ছেদে ভরা।

ছোটদের আসর
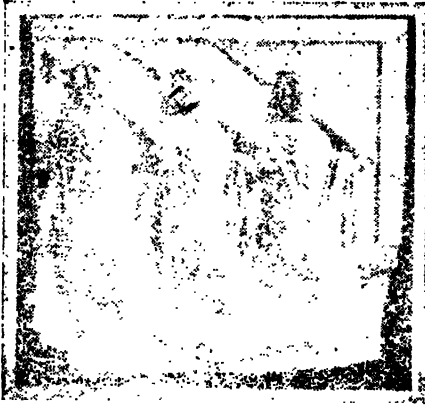
ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর দত্তক পুত্র দামোদর রাওয়ের পরিণাম-কাহিনী

[সিপাহী-বিদ্রোহ অবসানের প্রায় দু'বছর পর ইংরেজ রাণীর পালক পুত্র দামোদর রাওএর সন্ধান পায়। মাতৃবিয়োগের পর এই বালকের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে ইতিহাসে কোন পরিচয় নেই। দামোদর রাও নিজেই তাঁর নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ের এক কাহিনী মহারাষ্ট্র ভাষায় লিপিবদ্ধ করে ঐতিহাসিকদের কর্তব্যের পথ সহজ করে দিয়েছেন। সেই কাহিনী খুব সংক্ষেপে পরিশিষ্টে বিবৃত হলো।—লেখক।]

রাণী লক্ষ্মীবাঈএর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র দামোদর রাও অসহায় হয়ে পড়লেন। রাণীর দলের অনেকে ইংরাজদের ভয়ে আত্মসমর্পণ করলেও তাঁর কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর দামোদর রাওয়ের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। রাণীর পূতাস্থি সংগ্রহ করে সর্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ, রঘুনাথ সিংহ, গণপত রাও মারাঠা, হুনে খাঁ রিসালদার প্রভৃতি কয়েক জন একান্ত অনুগত অনুচর দামোদর রাওকে নিয়ে গোয়ালিয়র ত্যাগ করলেন, তাঁদের সঙ্গে ছিল ৬০ জন সৈনিক, ২২টি ঘোড়া ও ৬টি উট।

দামোদর রাওএর গন্তব্যস্থল ছিল চন্দেরী। কিন্তু সহজ পথে গেলে পাছে তাঁরা ইংরেজদের হাতে পড়েন, সেই জন্য তাঁরা দুর্গম বনের মধ্য দিয়ে চললেন। ইংরাজদের ভয়ে গ্রামবাসীরা তাঁদের আশ্রয় দিতে সাহস করত না। কখনও অনাহারে কখনও অর্দ্ধাহারে তাঁরা দিন যাপন করতে লাগলেন। ভাগ্যহীন দামোদর রাওএর কষ্টের তখন আরও অনেক বাকী ছিল।

দু'মাস অবর্ণনীয় কষ্টের পর তাঁরা চন্দেরী ললিতপুর পরগনার তালবেট কোঠরা নামক গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হলেন। গ্রামের ঠাকুর দেওয়ান শঙ্করসিংহ ও গম্ভীরসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁরা কিছু দিনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। কিন্তু ঠাকুর সাহেবরা ইংরাজদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে রাণীর অনুগত লোকজনদের গ্রামের মধ্যে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হলেন বটে, তবে সংগোপনে জানিয়ে দিলেন যে দামোদর রাও সানুচর যদি নিকটের বনের মধ্যে গোপনে থাকেন, তবে তাঁরা কিছু সাহায্য করতে পারেন। এই ব্যবস্থা খুব সমীচীন বোধ না হলেও বাধ্য হয়ে তাঁদের রাজী হতে হল। তালবেট কোঠরার জঙ্গলেই দামোদর রাওএর বসতির ব্যবস্থা হল।

ইংরেজদের দৃষ্টিপথে পড়বার সম্ভাবনা যাতে না থাকে, সেই জন্য তাঁরা ৬টি দলে বিভক্ত হয়ে থাকবার বন্দোবস্ত করলেন। রাণীর পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথ সিংহ দামোদর রাওএর সঙ্গে তালবেট কোঠরায় রয়ে গেলেন। ঠাকুর সাহেবরা মাসিক ৫০০৲ টাকার বিনিময়ে ১২ জন লোকের উপযোগী খাদ্য-সামগ্রী বনের মধ্যে পাঠাতে লাগলেন। ঠাকুর সাহেবরা ৪টি উট ও ৯টি ঘোড়াও আপনাদের কাছে পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁদের কাছ থেকে ইংরেজ-সৈন্যের গতিবিধিরও খবর পাওয়া যেতে লাগল।

তালবেট কোটকার গহন অরণ্যে, কখনও গুহামধ্যে, কখনও বা গাছের উপর মঞ্চে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার প্রকোপ সহ্য করে দামোদর রাও দু'বৎসর কাটালেন। কিন্তু বালক দামোদর রাওএর এত কষ্ট সহ্য করবার শক্তি ছিল না—তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বনের মধ্যে চিকিৎসক পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু দামোদর রাও চিকিৎসার অভাবে পাছে মারা যান, সেই জন্য তাঁর অনুচররা শঙ্করসিংহ ঠাকুরকে অনেক অনুরোধ করে তাঁর মাতুলালয়ে নিয়ে এলেন, তাঁর চিকিৎসায় দামোদর রাও আরোগ্যলাভ করলেন।

দামোদর রাওএর কাছে রাণীর মৃত্যুর সময় নগদ ও সোনা-রূপায় প্রায় ৭০ হাজার টাকা ছিল। ঠাকুর সাহেবদের প্রতি মাসে টাকা দিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সব নগদ টাকা শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি মণিমুক্তা, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করতে লাগলেন। কিন্তু সেই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলির ন্যায্য মূল্য না পেয়ে শুধু ওজন দরে তার মূল্য পেলেন। দামোদর রাওএর অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন ঠাকুর সাহেবরা। যখন তাঁরা বেশ ভাল ভাবে বুঝতে পারলেন যে, দামোদর রাও কপর্দ্দকশূন্য, তখন তাঁরা দামোদর রাওকে স্থানত্যাগ করবার আদেশ দিলেন। তাঁদের কাছে গচ্ছিত ৯টি ঘোড়া ও ৪টি উঠের মধ্যে মাত্র ৩টি ঘোড়া তাঁরা ফিরিয়ে দিয়ে জানালেন যে, বাকীগুলি মারা গেছে।

দশ-বার জন অনুচর সমেত দামোদর রাও আবার অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ালেন। প্রথমে তাঁরা সিন্ধিয়া সরকারের রাজ্যমধ্যে 'সিপ্রি কোল্লারম' নামে এক স্থানে উপস্থিত হলেন। পথে আরও ১০।১২ জন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এইখানে তাঁরা একটি উদ্যানে অবস্থান করছিলেন। এইখানের কমাওয়েসদার বা কর-সংগ্রাহক তাঁদের ঝাঁসীর রাণীর দলের লোক বলে সন্দেহ করে এবং তাঁদের সকলকে বন্দী করবার চেষ্টা করে। রঘুনাথ সিংহ তখন তাঁকে দামোদর রাওএর প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে কিছু অর্থ দিলে তিনি তুষ্ট হয়ে দামোদর রাওকে ছেড়ে দেন। এর পর তাঁরা পাটন জিলার অন্তর্গত 'ছীপা বড়োদে' উপস্থিত হলেন। এই স্থানের কমাওয়েসদার তাঁদের আসার খবর পাওয়া মাত্রই তাঁদের গ্রামের মধ্যে বন্দী করে নিয়ে গেল। তিন দিন তাঁরা একটি গড়ের মধ্যে বন্দী হয়ে রইলেন। চতুর্থ দিনে ২৫ জন সৈন্যের দ্বারা রক্ষিত হয়ে তাঁরা পাটনের এজেণ্ট সাহেবের নিকট প্রেরিত হলেন। কমাওয়েসাদার দামোদর রাওএর ঘোড়া ৩টি ও সমুদয় আসবাব-পত্র আত্মসাৎ করলেন। রাণী

লক্ষ্মীবাঈএর বিশ্বস্ত অনুচরেরা পাছে দামোদর রাও পথশ্রম সহ্য করতে না পারেন, সেই জন্য তাঁকে পিঠে তুলে নিলেন।

ছীপা বড়োদের তিন মাইল দূরে এক নদীর তীরে সকলে উপস্থিত হলে দামোদর রাও শৌচাদি করবার জন্য অবতরণ করলেন, এই সময় হতে তাঁর জীবন এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হল। নদীতীরে হঠাৎ দু'জন ইংরেজ সৈন্যকে দেখা গেল এবং তাদের সঙ্গে ছিল রাণী লক্ষ্মীবাঈএর এক বিশ্বস্ত অনুচর গণপত রাও। গণপত রাও সেই ইংরেজ সৈন্যদের দামোদর রাওএর পরিচয় দিলে তারা কমাণ্ডেয়েসদারের রক্ষীদের সানুচর দামোদর রাওকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে বলায় তারা কমাণ্ডেয়েসদারকে এই ঘটনা জানালে। সে তৎক্ষণাৎ দামোদর রাওকে অপহৃত তিনটি ঘোড়া ও আসবাবপত্র সমেত ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করল। দামোদর রাও সানুচর ইংরেজদের হস্তগত হলেন।

দামোদর রাও যখন গোয়ালিয়র ত্যাগ করে তালবেট কোটরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁর অনুচরেরা ৬টি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এরূপ এক দলে গণপত রাও মারাঠা ও হনে খাঁ রিসালদার পাটন অঞ্চলে গমন করেন এবং সেখানকার রাজা পৃথ্বী সিংহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পাটনের কিছু দূরে আগর নামক স্থানে ইংরেজদের এক সেনানিবাস ছিল। মেজর ফ্লীক নামে এক সদাশয় ইংরেজ সেখানকার পোলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন। হনে খাঁর সঙ্গে মেজর ফ্লীকএর বিশেষ হৃদ্যতা হওয়ায় হনে খাঁ তাঁকে দামোদর রাওএর দুরবস্থার কথা জানান। মেজর ফ্লীক দামোদর রাওএর দুরবস্থার কথা জানতে পেরে তাঁকে আশ্রয় দিতে সানন্দে রাজী হন। এই সময় মধ্যভারতের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন কর্ণেল সেক্সপীয়র। তাঁর কর্মস্থান হচ্ছে ইন্দোর। মেজর ফ্লীক হনে খাঁর প্রার্থনার বিষয় জানালে তিনিও তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। মেজর ফ্লীকএর আদেশে হনে খাঁ পাটনে 'সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া হর্স' নামক সৈন্যদলের দু'জন ঘোড়সওয়ারএর সঙ্গে দামোদর রাওকে নিয়ে যাবার জন্য পাটনে গেলেন। পাটনে এসে হনে খাঁ গণপত রাও মারাঠাকে দামোদর রাওকে আনবার জন্য প্রেরণ করেন। দামোদর রাওএর গতিবিধি কিছুই হনে খাঁ বা গণপত রাও মারাঠার অগোচর ছিল না। দামোদর রাওএর দুর্দশা দেখে গণপত রাও অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। এই দিন হতে দামোদর রাওএর কায়িক কষ্টের কিছু লাঘব হল।

পাটনের রাজা পৃথ্বী সিংহ দামোদর রাওকে বিশেষ সমাদর করলেন। রাজা প্রত্যহ দামোদর রাওকে ১০৲ টাকা করে তাঁর নিজের ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য দিতেন। তিনি দামোদর রাওকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আজমীরের রেসিডেণ্ট সাহেবকে দিয়ে তাঁর ভাল বন্দোবস্ত করে দেবেন। কিন্তু মন্দ ভাগ্য দামোদর রাওকে সর্বদা অনুসরণ করছিল। তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না! ইংরেজদের প্রতিশ্রুতির উপরই তাঁর অধিক আস্থা ছিল। রাজা পৃথ্বীসিংহ অত্যন্ত বিরস হয়ে দামোদর রাওকে পাটনের ২ মাইল দূরে 'মেঘজীন' নামে এক স্থানে বাস করবার আদেশ দিলেন। রাজা দামোদর রাওএর আহারাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য পূর্বাবস্থার কোন ব্যতিক্রম করেননি। প্রায় তিন মাস দামোদর রাওকে পাটনে থাকতে হল।

পাটনের রাজা দামোদর রাওএর রক্ষী দু'জন ইংরেজ সৈন্যকেও বন্দী করেছিলেন। অনেক লেখালেখির পর আজমীরের রেসিডেণ্টের আদেশে রাজা দামোদর রাওকে ছেড়ে দিলেন। দামোদর রাও যখন রাজার নিকট বিদায় নিতে যান তখন তিনি পাথেয়-স্বরূপ ৬০০৲ টাকা দিলেন। দুটি উট ও দুটি গাড়ীও তাঁকে রাজা উপহার দিলেন।

কয়েক দিন পরে তাঁরা আগরের ছাউনীতে উপস্থিত হলেন। মেজর ফ্লীক দামোদর রাওকে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সাহেবকে উপঢৌকন দিতে দামোদর রাওএর শেষ সম্বল ৩২ তোলা ওজনের সোনার বালা দু'টি বিক্রয় করতে হল। দামোদর একেবারে কপর্দক-শূন্য হয়ে পড়লেন।

দামোদর পাটনে এসেছেন সংবাদ পেয়ে তাঁর প্রাণরক্ষক রাণীজীর বিশ্বস্ত সর্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ ৭।৮টি ঘোড়া ও ৯।১০ জন অনুচর সহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অন্যান্য অনুচরেরাও সকলে মিলিত হল। রামচন্দ্র রাও দেশমুখ, গণপত রাও ও রঘুনাথ সিংহ মেজর ফ্লীককে দামোদর রাওএর সুব্যবস্থা করবার জন্য সমবেত ভাবে অনুরোধ করলেন। মেজর ফ্লীক মহৎ প্রকৃতির লোক হলেও দামোদর রাওএর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। মধ্য-ভারতের রেসিডেণ্টই ছিলেন এই ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সেই জন্য মেজর ফ্লীক দামোদর রাওকে ইন্দোরে পাঠালেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে দামোদর ইন্দোরের সেনানিবাসে উপস্থিত হলেন।

ইন্দোরের রেসিডেণ্ট স্যার রিচমণ্ড সেক্সপীয়র তাঁর মুন্সী ধরম-নারায়ণ নামে এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের উপর দামোদর রাওএর লালন-পালনের ভার দিলেন। দামোদর রাওএর অনুচরদের মধ্য হতে ৪।৫ জন ছাড়া আর সকলকে ধরমনারায়ণ বিদায় দিলেন। ভারত সরকার দামোদর রাওএর জন্য মাসিক ১০০৲ বৃত্তির বন্দোবস্ত করলেন। বার্ষিক ৫০'৭৫ লক্ষ টাকা আয়ের ঝাঁসী রাজ্যের অধীশ্বর ইংরাজ সরকারের আশ্রয়ে সামান্য বৃত্তিভোগী হয়ে ইন্দোরে বাস করতে লাগলেন।

সমাপ্ত

গল্প হ'লেও সত্যি

শ্রীঅমিয়কান্তি বন্দোপাধ্যায়

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের হোষ্টেলে এফ. এ. পরীক্ষা হচ্ছে। ছাত্রের দল ঘাড় নীচু করে লিখে চলেছে একমনে। এই হোষ্টেলেরই একটি ঘরে কয়েক জন ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে।

একেবারে শেষের বেঞ্চের এক কোণে বসে একটি ছেলে লিখে চলেছে। পাশে তার গড়গড়া। মাঝে মাঝে ছেলেটি তাতে টান দিচ্ছে। হাঁটুর উপর খোলা রয়েছে একটা বই। বেশ ধীরে ধীরে ছেলেটি তার থেকে নকল করছে। সামনের ঘরে আরো কয়েকটি ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের মধ্যে এক জনের পা দোলাবার অভ্যেস ছিল। অভ্যাস বশে পা দোলাতে গিয়ে কোল থেকে সশব্দে অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে একখানা মোটা বই মেঝের উপর পড়ে গেল।

যে ভদ্রলোক গার্ড দিচ্ছিলেন তাঁর বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। ধড়মড় করে উঠে পড়লেন তিনি।

—কি হচ্ছে ওখানে? এ্যাঁ?

—কপি স্যর। নিরীহ ভালমানুষের মত ছেলেটি উত্তর দেয়।

—কেন?

—না করে উপায় কি? আর আমি ত' কি করছি স্যর? ও-ঘরে গিয়ে দেখুন না ওরা কি কাণ্ড করছে! গার্ড ছেলেটিকে সাবধান করে দিয়ে দৌড়লেন পাশের ঘরে।...ধূমপানরত ছেলেটি তখন বিভোর হয়ে লিখছে। গার্ড নিজের সম্মান রাখবার জন্মেই বোধ হয় আর ঘরে ঢুকলেন না।

ঘটনাটা পড়ে তোমরা খুব কৌতুক বোধ করছ, না! এঁদের নাম শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবে। প্রথম ছেলেটির নাম উপীন্দ্র সান্যাল, গার্ডটির নাম সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য আর ধূমপানরত ছেলেটির নাম কি জান?

বাংলা সাহিত্যের মরমী লেখক শরৎচন্দ্র।

মান্ধাতার মুলুকে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চতুর্থ পর্ব্ব

রামহরির আশা

রোলাঁর কাহিনী শুনে সকলেই চুপ ক'রে ব'সে রইল কিছুক্ষণ। কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অদ্ভুত মানুষ নয়, এই কাহিনীর মধ্যে ছিল আরো এমন সব বিচিত্র কথা এবং অ্যাডভেঞ্চারের ইঙ্গিত, যা মনকে অভিভূত না ক'রে পারে না।

দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে রামহরিও গল্প শুনতে ছাড়েনি। তার আগ্রহ হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। বিমল ও কুমারের চড়ুকে পিঠ যে কত সহজে সড়্ সড়্ ক'রে ওঠে, এটা তার কাছে মোটেই অজানা ছিল না। কে একটা উটকো সাহেব কোথা থেকে হঠাৎ এসে আবার যখন তাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়, তখন এই ক্ষ্যাপামির দৌড় কত দূর, সেটা জানবার জন্যে তার কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

রোলাঁর কাহিনীর কতক কতক সে বুঝতে পারলে বটে, আবার তার কাছে অস্পষ্ট থেকে গেল অনেক কথাই। কিন্তু একটা কারণে তারও উৎসাহ জেগে উঠতে বিলম্ব হ'ল না।

রোলাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরের ভিতরে আত্মপ্রকাশ ক'রে সাগ্রহে ব'লে উঠল, "ও সায়েব, তুমি কি বললে? সেই বনমানুষটার হাতে ছিল মস্ত একখানা হীরে?"

তার রকম-সকম দেখে মুখ টিপে হাসতে হাসতে রোলাঁ বললেন, "হ্যাঁ।"

—"এ যে অবাক কথা বাবু! হীরে থাকে তো হীরের খনিতে, জহুরীর দোকানে আর রাজা-রাজড়ার লোহার সিন্দুকে! বনমানুষ আবার হীরে পেলে কোত্থেকে?"

রোলাঁ বললেন, "আমরা যে জায়গায় গিয়েছিলুম, নিশ্চয়ই তার কাছাকাছি কোথাও হীরার খনি আছে।"

কমল বললে, "আপনি যে জীবটার কথা বললেন, তাকে দেখলেই নাকি গরিলা ব'লে মনে হয়! এমন কোন জীব কি হীরার খোঁজে খনি কাটতে পারে?"

রোলাঁ সুধলেন, "আপনি হীরার খনি দেখেছেন?"

—"না।"

—"যে অঞ্চলে হীরার খনি আছে, সেখানে খনির বাইরেও এখানে-ওখানে হীরা কুড়িয়ে পাওয়া যায়।"

—"ব্যাপারটা বুঝলুম না।"

—"শুনুন। হীরকের জন্যে আগে প্রাচ্য দেশ—বিশেষ ক'রে আপনাদের ভারতবর্ষই ছিল বিখ্যাত। গোলকুণ্ডায় এখন বোধ হয় হীরা পাওয়া যায় না, কিন্তু আগে দুনিয়ার সবাই গোলকুণ্ডা বললেই বুঝতো, হীরকের দেশ। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্যের এই গৌরব অটুট ছিল। তারপর পৃথিবীর আরো নানা দেশে হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়। আজকাল তো দক্ষিণ-আফ্রিকা হীরকের ব্যবসায় প্রায় একচেটে ক'রে ফেলেছে। সেখানে অনেক সময়ে হীরক আবিষ্কার করবার জন্যে মাটি খুঁড়তে হয় না, কখনো কখনো কাঁকরের সঙ্গে এখানে-ওখানে এমন হীরকও কুড়িয়ে পাওয়া যায়, যা সত্য সত্যই সাত রাজার ধন মানিকের মত মূল্যবান। আমার কি বিশ্বাস জানেন? ঐ রকম কোন হীরকের খনির কাছেই আছে মান্ধাতার মানুষদের আধুনিক বসতি। খুব সম্ভব তারা হীরকের খনির কোন ধারই ধারে না, হীরক যে দুর্লভ বস্তু এ খবরও রাখে না, কেবল তার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে এইটুকুই অনুমান করতে পেরেছে যে, এ হচ্ছে কোন অসামান্য স্ফটিক, একে অলঙ্কারের মতন অঙ্গে ধারণ করা উচিত।"

কুমার বললে, "আপনি যে হীরাখানা পেয়েছেন তার ওজন কত?"

—"[illegible] শো ক্যারেট।"

—"তার কত দাম হ'তে পারে?"

—"বলেছি তো, সেখানা হচ্ছে আকাটা হীরা, আদিম অসভ্য মানুষরা হীরা কাটবার আর্ট জানে না। ঠিক ভাবে কাটতে পারলে তার রং, রূপ, চাকচিক্য আর দাম যথেষ্ট বেড়ে যাবে ব'লেই মনে করি। তবে বর্ত্তমান অবস্থাতেই একজন পাকা জহুরী সেখানা আমার কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকায় কিনে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি।"

রামহরি দুই চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত ক'রে বললে, "বল কি সায়েব, তোমার ঐ মান্ধাতার মুলুকে গেলে আমাদের কি পদে পদে হীরে-মানিক মাড়িয়ে চলতে হবে?"

রোলাঁ হেসে উঠে বললেন, "হীরা-মানিক পথের ধুলো নয় বন্ধু, তা এত সস্তা ভেবো না। দু'-একখানা মহার্ঘ স্ফটিক আমরাও হয়তো কুড়িয়ে পেতে পারি, কিন্তু সে হচ্ছে দৈবাতের ব্যাপার। আসল খনি আবিষ্কার করতে গেলে প্রচুর কাঠ-খড় না পোড়ালে চলে না।

এতক্ষণ পরে বিমল মুখ খুলে বললে, "মসিয়ে রোলাঁ, তাহ'লে আপনার এই নতুন অভিযানের আসল উদ্দেশ্য কি? আপনি কি ধনকুবের হবার জন্যে হীরার খনি আবিষ্কার করতে চান?"

কিঞ্চিৎ বিস্মিত স্বরে রোলাঁ বললেন, "হঠাৎ আপনি এমন প্রশ্ন করলেন কেন?"

বিমল বললে, "ইংরেজীতে যাকে বলে 'রত্ন-শিকার', আমার আর কুমারের পক্ষে সেটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। ভগবান আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দিয়েছেন, তাকে আরো অসামান্ত ক'রে তোলবার জন্যে আমরা আর পৃথিবীময় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে রাজি নই। রাশি রাশি হীরকের মোহে আপনি যদি মুগ্ধ হয়ে থাকেন, তাহ'লে আমাদের আশা ছেড়ে দিয়ে আপনাকে একলাই যাত্রা করতে হবে, কারণ লক্ষ্মীলাভের লোভে আমরা আর সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে পারব না।"

রোলাঁ বললেন, "না, না বিমল বাবু, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। এই বিংশ শতাব্দীতেও মান্ধাতার মানুষদের জীবনযাত্রা দেখবার সুযোগ পাওয়া যে অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা, এটা আর কষ্ট ক'রে না বললেও চলবে। তাই দেখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য আর বিনয় বাবুও আমার পক্ষে। আপনারাও আমাদের সহযাত্রী হবেন, সেই ভরসাতেই এখানে এসেছি। যদি হীরার খনির লোভই আমাকে পেয়ে বসত, তাহ'লে প্রথম বারেই আমি সে চেষ্টা করতে ছাড়তুম না। তবে ঐ হীরক-ঘটিত ব্যাপারটা যে এই অভিযানের আনুসঙ্গিক আকর্ষণ, এ কথা অস্বীকার করবার চেষ্টা আমি করব না।"

কুমার বললে, "মসিয়ে রোলাঁ, আপনার ঐ মান্ধাতার মানুষ ফরাসী দেশে আত্মপ্রকাশ ক'রে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তার গুপ্তকথা জানবার জন্যে ফরাসী পুলিশও কোন পাথর ওল্টাতেও বাকি রাখেনি। হয়তো অনেক কথাই তারা জানতে পেরেছে—এমন কি ঐ একশো ক্যারেট হীরকের কথাও।"

মস্তকান্দোলন ক'রে রোলাঁ বললেন, "না, কেউ কিছু জানতে পারলে এত দিনে আমিও সেটা জানতে পারতুম। পেটের কথা আমি ঘৃণাক্ষরেও কারুর কাছে প্রকাশ করিনি।"

বিনয় বাবু বললেন, "মান্ধাতার মানুষের কথা প্রকাশ করলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হ'ত না। তা নিয়ে আমাদের মত দুই-এক জন পাগল ছাড়া আর কেউ মাথা ঘামাতে চাইবে না। কিন্তু গোল বাধবার সম্ভাবনা ঐ হীরার খনি সংক্রান্ত ব্যাপারটা নিয়ে। অর্থলোভ হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল লোভ।"

রোলাঁ বললেন, "তার গুপ্তকথাও আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।"

—"কিন্তু আমি বরাবরই দেখে আসছি, ও-সব কথা লুকিয়ে রাখা যায় না। মসিয়ে রোলাঁ, আপনি বললেন না, হীরাখানার জন্যে একজন জহুরী দেড় লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল?"

—"হাঁ। হীরাখানা কোন্ জাতের তা পরীক্ষা করবার জন্যে আমি তার কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম।"

—"তাহ'লেই বুঝুন, আর একজন বাইরের লোকও আপনার হীরার কথা জানে।"

—"কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! হীরার ঠিকানা বা কার কাছ থেকে তা পেয়েছি, এ-সব কিছুই সে জানে না।"

—"কিন্তু আপনার মত অব্যবসায়ীর কাছে এত দামী একখানা আকাটা হীরা দেখে সহজেই কি তার কৌতূহল জাগ্রত হবে না?"

—"জাগ্রত হলেই বা ক্ষতি কিসের?"

বিমল বললে, "ক্ষতি কিসের, শুনুন। তাহ'লে তার মুখে আরো কোন কোন লোক এ কথা শুনতে পেয়ে ঐ হীরাখানা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে।"

—"মাথা ঘামালেও আমি কেয়ার করব না। কারণ, আমাদের এই অভিযান তো হীরার খনি আবিষ্কার করবার জন্যে নয়!"

কুমার বললে, "তা নয় বটে, তবু উদোর বিপদ যে বুধোর ঘাড়ে এসে পড়বে না, এমন কথাও জোর ক'রে বলা যায় না।"

—"কিন্তু বিপদের কথা কি বলছেন? একটা কথা সত্য বটে, এ-রকম অভিযান সর্বদাই বিপদজনক—আমরা যাচ্ছি পদে পদে বিপদের দেশে। এর জন্যে আমরাও অপ্রস্তুত নই। কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা তো আমি দেখছি না!"

বিমল বললে, "দেখছেন না? যদি ভাসা-ভাসা খবর পেয়ে এক দল রত্নসন্ধানী আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে?"

—"আমাদের উদ্দেশ্য তাদের বুঝিয়ে দেব।"

—"যদি তারা আমাদের কথায় তত সহজে বিশ্বাস না করে?"

—"তাহ'লে তাদের আমি সোজা জাহান্নমে যেতে বলব।"

—"বেশ, তাই বলবেন। ফলেন পরিচীয়তে। এখন কোন্ পথে, কোন্ দিক দিয়ে আমাদের যাত্রা সুরু করতে হবে তাই বলুন দেখি।"

—"প্রথমে সমুদ্রপথ। সরাসরি উঠব গিয়ে আফ্রিকার কেনিয়া কলোনির মোম্বাসা বন্দরে। সেখান থেকে রেলপথে নাইরোবি সহরে। তারপর উগাণ্ডা প্রদেশের ভিতর দিয়ে আমাদের গন্তব্য স্থান কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে। এই হ'ল মোটামুটি পথের বিবরণ।"

বিমল বললে, "মসিয়ে রোলাঁ, কঙ্গোর গহন বনে প্রবেশ করতে হ'লে আমাদের তো রীতিমত তোড়জোড় করতে হবে।"

—"তা তো হবেই।"

—"যথা—"

—"সেজন্যে আপনাদের কোন চিন্তাই করতে হবে না, আপনাদের ব্যবস্থাপক হব আমি নিজেই। আপনাদের সঙ্গিরূপে পেলেই আমি আর কিছু চাই না।"

—"ক্ষমা করবেন মসিয়ে রোলাঁ, আফ্রিকায় আমরাও এই প্রথম যাচ্ছি না, ওখানকার পথ-ঘাট আছে আমাদের নখদর্পণে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, এ-রকম অভিযানের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ের দরকার হয়।"

—"কিছু ভাববেন না, সমস্ত অর্থব্যয়ের ভার গ্রহণ করব আমিই।"

—"ক্ষমা করবেন মহাশয়, এইখানেই আমার আপত্তি।"

—"আপনি কি করতে চান?"

—"খরচের অর্দ্ধেক দায় আমাদেরও।"

—"উত্তম, আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।"

—"ধন্যবাদ! তাহ'লে পরের দৃশ্যে আমাদের অভিনয় সুরু হবে একেবারে আফ্রিকার বুকে।"

রামহরি বললে, "চুলোয় যাক্ তোমাদের মান্ধাতার মানুষ! ও-সব বাজে ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা খারাপ করতে রাজি নই, আমি দেখব খালি হীরের খনি! এক কোঁচড় হীরে পেলেই আমাদের চলবে, কি বলিস্ রে বাঘা?"

বাঘা কুকুর কি বুঝলে জানি না, সে বললে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!"

[ক্রমশঃ।

দৈত্যের দেশে

(টিউতানিক রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

ডিটরিচ রওনা হয়ে গেল গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের পথ ধরে। অরণ্য-সঙ্কুল এই পথ যেতে যেতে যেখানে গিয়ে থেমেছে সেইখানে যে সুবৃহৎ পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে থাকে তিনটি অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকন্যা—সেই রাজকন্যা তিনটিকে বন্দী করে রেখেছে তিনটি দৈত্য, তারা হলো ঐ পর্ব্বতের অধিবাসী।

ডিটরিচ শুধু রাজা তাই নয়, প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন যোদ্ধা, যার বাহুবলের কাছে অনেক বীরদেরই মাথা নত করতে হয়েছে। বহু দেশের বহু যোদ্ধাই পরাজিত হয়েছে এই অদ্ভুত শক্তিধরের কাছে।

দৈত্যরা ছিল তিন ভাই। তাদের নাম হলো—ফেসল্ড, এবেনরট আর সব চেয়ে ছোট যে তার বয়স হলো মোটে আঠারো বছর—নাম ইক—Ecke কথার অর্থ হলো 'ভয়ঙ্কর'। যোদ্ধা বলে তারও কম প্রসিদ্ধি ছিল না, তাদের মহলে তার নাম শুনলে সব ভয়ে কাঁপতে সুরু করতো—যদিও বয়সের দিক থেকে সে অনেক ছোট। দ্বন্দ্বযুদ্ধে বহু নাম-করা যোদ্ধা তার কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে।

ডিটরিচ আর ইক দু'জনেই দু'জনের নাম শুনেছে—দু'জনের শক্তির পরীক্ষার কথাও তারা অনেক দিন মনে মনে ভেবেছে। কিন্তু সে সুবিধা তাদের আর কোনো দিন হয়নি—যাতে তারা সম্মুখ-যুদ্ধের অবকাশ পাবে।

ডিটরিচ অবশেষে বেরিয়ে পড়লো—দৈত্যের বিনাশ করে রাজকন্যাদের উদ্ধার সে করবেই।

তিনটি রাজকন্যাই রূপবতী কিন্তু ছোট রাজকন্যার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যেমন রং, তেমনি চোখ-মুখ, তেমনি মাথায় কালো কোঁকড়ান রাশিকৃত চুল। মিষ্টি মেয়ে ছোট রাজকুমারী, তার নাম হলো সেবার্গ। ইক আর সেবার্গ দু'জনের খুব বন্ধুত্ব ছিল, দু'জনেই ছোট কি না, তাছাড়া সেবার্গ ইকএর মত শক্তিশালী যোদ্ধা আর এর আগে দেখেনি। তাই সে ইককে খুব ভালোবাসতো।

খবর এলো ডিটরিচ আসছে, শুধু আসছে না—তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজকন্যাদের উদ্ধার করবে।

ডিটরিচএর অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা দৈত্যরা শুনেছে বৈ কি। অত নাম, অত খ্যাতি-প্রতিপত্তি আর সে খবর কে না রাখে! তাই দৈত্যদের মধ্যে একটু সাড়া পড়ে গেল—ডিটরিচকে পরাজিত করে বিনাশ করতেই হবে।

ইক বললে: আমি যাবো, ডিটরিচকে পরাজিত করে তার উপযুক্ত শাস্তি দেবো।—নিজের দেহের প্রতি একবার দৃষ্টি দিয়ে ইক তার সবল পেশীগুলিতে জোর দিয়ে উঠলো।

ইকএর ভাইরাও ভাবলে, সত্যি কথাই, ইকএর সঙ্গে লড়াই করে তাকে হারাবে এমন আর দ্বিতীয় নেই, চোদ্দ দিন চোদ্দ রাত না খেয়ে সে পথ হাঁটতে পারে—কোনো ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই ইকই হচ্ছে ডিটরিচএর সঙ্গে লড়াইএর উপযুক্ত।

অবশেষে তাই ঠিক হলো। ইকএর মনে আনন্দ ধরে না, এত দিন তার বীরত্বের নিদর্শন ছিল সীমাবদ্ধ—এবার সে আর এক ক্ষমতাসম্পন্ন বীরের কাছে তার শক্তির পরীক্ষা দিতে পারবে, সে জয়ী হবে এ তো সুনিশ্চিত।

ইকএর আনন্দে সেবার্গও খুশী। সত্যি তো, এবার ইকএর শক্তিপরীক্ষা হবে, বিজয়ী হয়ে ইক ফিরে আসবে। মনের আনন্দে সেবার্গ তাই ইককে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিতে লাগলো!

ইক যাত্রা করলো—সূর্য্যের আলোয় তার বুকের বর্ম্ম ঝকঝক করে উঠলো, মাথার শিরস্ত্রাণ তার জয় ঘোষণা করলো। খোলা তরোয়াল হাতে বলিষ্ঠ উন্নত দেহে ইক যখন বিদায়-সম্ভাষণ জানালো, তখন সকলেই স্থির জানলো বিজয়ী হয়ে ইক ফিরে আসবেই।

সেবার্গএর চোখে মুক্তার মত অশ্রু টলমল করছে। সেবার্গএর এ হলো আনন্দাশ্রু, হাত তুলে সে তার মনের শুভেচ্ছা জানালো ইককে।

ইক যাত্রা করলো।

অরণ্যের ভীষণ পথ ইককে দেখে যেন ভীত হয়ে উঠলো। যে পথ দিয়ে ইক যায় তার আশে-পাশে বহু দূর পর্য্যন্ত পথ যেন কেঁপে ওঠে—মনে হয়, তার পায়ের চাপ বুঝি সহ্য করতে পারবে না। বৃহৎ বৃহৎ গাছের ডাল থেকে ঝুরি নেমে যে সব পথের সীমানা বন্ধ করে দিয়েছে—দু'হাতে তুচ্ছ ভাবে ইক তাদের মড়মড় করে ভেঙ্গে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। অরণ্যের গাছপালা পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত যেন ভীত হয়ে উঠলো।

ইকএর যাত্রা এই ভাবে সুরু হলো। মনে তার সঙ্কল্প—বার্ণের ডিটরিচকে সে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেই। কি ভাবে তাকে পরাজিত করবে সেই চিন্তা করতে করতে ইক সদর্পে পথ, অরণ্য, গভীর জঙ্গল, নদ-নদী সব অতিক্রম করতে লাগলো।

রাত্রি নেমেছে, গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। কিছুই দেখা যায় না। ইকএর পথ-চলা থেমে এসেছে, গতি মন্থর হয়েছে। একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে এসে ইক থামলো, সকাল হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

সেই গভীর ঘন অন্ধকারের দিকে ইক তাকিয়ে রইল—হঠাৎ তার কানে এলো—ঘোড়ার পায়ের শব্দ, মনে হলো এই দিকেই এগিয়ে আসছে। ভালো করে শুনে ইক চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কে যায়?

গম্ভীর অথচ সদর্প কণ্ঠে উত্তর এলো—বার্ণের ডিটরিচ।

ইকএর সারা শরীরে যেন আনন্দ আর উল্লাসের স্রোত বয়ে গেল। ডিটরিচএর জন্যই তার এবারের যাত্রা, এত শীঘ্র এত কাছে তাকে পাবে—এ কথা সে ভাবতেই পারেনি। তাই ইক চীৎকার করে বললে: আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে এখান থেকে যেতে পাবে। কিন্তু এই ঘন অন্ধকারে কোনো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে ডিটরিচ রাজী হলো না।

ডিটরিচএর অসম্মতি দেখে ইক তাকে নানা ভাবে ভুলিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগলো: আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি আমি হেরে যাই তুমি অনায়াসে সেই পর্ব্বতে চলে যেতে পারবে। সেখানে তিন জন রাজকন্যা আছে—কত ঐশ্বর্য্য আছে—সব তোমার হবে, কাজেই এসো আমরা প্রস্তুত হই।

ডিটরিচ কিন্তু কিছুতেই রাজী হয় না। বলে: সকাল হোক, তখন দেখা যাবে কার কত ক্ষমতা আছে।

ইক রেগে গিয়ে বললে: আমি জানি, তুমি কিছুতেই যুদ্ধ করতে চাইবে না। আসলে তুমি তো বীর নও, যোদ্ধা নও, কিছুই নও—তুমি হলে কাপুরুষ, তাই যুদ্ধে ভয় পাচ্ছ।

—তুমি যাই বল, এই অন্ধকারে দু'জন দু'জনকে ভালো করে দেখতে পাবো না, আর লড়াই করবো—অত বোকা আমি নই। সকাল হোক—তখন শক্তির পরীক্ষা হবে।

ইক তখন ভাবলে কিছুতেই তো রাজী হয় না—তখন সে পর্ব্বতের সব ঐশ্বর্য্যের গল্প, রাজকন্যা, বিশেষ করে সেবার্গের গল্প করতে লাগলো। বললে, তুমি না গেলে কিছুতেই তাদের উদ্ধার হবে না—দৈত্যের দেশে থেকে থেকে রাজকন্যাগুলো মরে যাবে।

ডিটরিচ লাফিয়ে উঠলো, বললে: ধনরত্ন আমি কিছুই চাই নে কিন্তু রাজকন্যাদের উদ্ধার করতেই হবে—এসো, আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

সেই গভীর অন্ধকারে ভীষণ অরণ্যের দু'জনের তরোয়াল ঝকমক্ করে জ্বলে উঠলো। অস্ত্রের ঝনঝন্ শব্দে সারা বন কেঁপে উঠলো, মনে হলো আকাশে বজ্রপাত হচ্ছে। বুকের বর্ম্মে অস্ত্র লেগে যে ভয়ানক শব্দ হতে লাগলো—সেই শব্দে পশু-পাখী সব নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধের ভীষণতা এক ভয়ঙ্কর রাত্রি সৃষ্টি করলো।

বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ইক পরাজিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ডিটরিচ এসে ইকএর পাশে বসলো।

ইক বললে: আমি পরাজিত হলাম, আর বেশীক্ষণ বেঁচেও থাকবো না। কিন্তু সেবার্গের কথা মনে হচ্ছে, আসার সময় সে বলেছিল তুমি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরবে। তার সঙ্গে দেখাও হলো না।

ডিটরিচ শান্ত স্বরে বললে: পরাজিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো—যে কোনও যোদ্ধার কাছে—নয় কি?

ইক কোনও উত্তর দিল না।

ডিটরিচ বললে: এখন আমরা দু'জন বন্ধু। যুদ্ধের শত্রুতা কেটে গেছে, বলো আমি তোমার জন্য কি করবো?

ইক বললে: আমার জন্য কিছুই করতে হবে না, আমি তোমাকে সব বলে দিচ্ছি, কেমন করে তুমি অগ্রসর হবে, সেই ভয়ানক পর্ব্বতে পৌঁছে কি ভাবে তুমি কাজ করবে, সেবার্গকে উদ্ধার করবে। আমার এই তরোয়াল তুমি রেখে দাও—এই বলে ইক ডিটরিচকে সব বলে দিলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইক মারা গেল। সারা অরণ্য আকাশ বাতাস যেন ভয়ঙ্কর আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ইকএর মাথাটা তরোয়ালের আঘাতে ছিন্ন করে নিয়ে ডিটরিচ এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ চলার পর ডিটরিচ একটি চমৎকার দীঘি দেখতে পেলো। ক্লান্তি, পরিশ্রম ও পিপাসায় ডিটরিচ আর পথ চলতে পারছিল না। দীঘির ঘাটের কাছে এসে দেখলো এক অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে সেখানে বসে আছে। ডিটরিচকে দেখে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে: এসো তোমার জন্য আমি বসে আছি।

তার পর সে ডিটরিচএর ক্ষতস্থান ধুয়ে দিল—গাছের পাতার রস বার করে তাতে ওষুধের মত লাগিয়ে দিল।

ক্ষুধা তৃষ্ণা, ও ক্লান্তি দূর হওয়ার পর মেয়েটি বললে, এই পথ ধরে সোজা চলে যাও।

কৃতজ্ঞতার সুরে ডিটরিচ বললে: তুমি আমার জন্য এত করলে—কে তুমি তাই বলো।

মেয়েটি হেসে বললে: কি হবে জেনে? আমি জলপরী। বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

কি আশ্চর্য্য! ডিটরিচ ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগলো। বনের ভিতর ঢুকবার পথটির কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলো একটি সুন্দরী মেয়ে ভয়ানক ভীত হয়ে তার কাছে দৌড়ে এলো, মুখ তার বিবর্ণ হয়ে গেছে, সারা দেহ ভয়ে কাঁপছে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললে: আমায় বাঁচাও—ইকএর ভাই ফেসলভ আমায় ধরতে আসছে।

ডিটরিচ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে: তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি আমার কাছে থাকো।

সারা বন কাঁপিয়ে দৈত্য ফেসলভ এলো ডিটরিচএর কাছে—কে তুমি—আমার ভাই ইক?

—কে তোমার ভাই, ইক যদি তোমার ভাই হয়, তা'হলে জেনে রাখো সে পরাজিত হয়েছে—আর আমি তাকে মেরে ফেলেছি।

—মেরে ফেলেছ—অসম্ভব? হুঙ্কার দিয়ে উঠলো দৈত্য, বললে: যদি মেরেই থাকো তাহ'লে নিশ্চয়ই তখন সে ঘুমোচ্ছিল, না হ'লে তাকে পরাজিত করতে পারে আর মারতে পারে এমন কেউ নেই।

—আমি মিথ্যে কথা বলি না, তোমার ভাই অন্ধকারেই আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করবে বলে আহ্বান জানিয়েছিল। কাজেই তার মৃত্যু হয়েছে।

—কি বললে? হুঙ্কার দিয়ে আক্রমণ করলো দৈত্য। তার একটা ঘুষিতে ডিটরিচএর মাথা ঘুরে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেলো।

দৈত্য ভাবলে ডিটরিচকে শেষ করে দিয়েছে—তাই সে তাদের দুর্গের দিকে চলে গেলো।

ডিটরিচ অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে দৈত্যের যাওয়ার পথটি ধরে এগিয়ে গেলো।

দৈত্যটা দেখতে পেয়েছে ডিটরিচকে। যেই না দেখা অমনি আবার হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে এসেছে—তিনবার তাকে আঘাত করলো। চারবারের বার ডিটরিচ ইকএর তরোয়াল দিয়ে দৈত্যের মাথায় ভীষণ ভাবে মারলো!

চীৎকার করে উঠলো দৈত্য, বললে: এ তরোয়াল তুমি কোথায় পেলে? এ দিয়ে মারলে বাঁচবো না, রক্ষা কর।

ডিটরিচ বললে: আজ আর রক্ষা নেই তোমার। কিন্তু দৈত্য যখন অনেক অনুনয়-বিনয় করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলে তখন ডিটরিচও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো—তার পর দু'জনে সেই বৃহৎ পর্ব্বতের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলো।

যেতে যেতে কত ভীষণাকার দৈত্য, কত বড়-বড় জানোয়ারকে তারা দেখতে পেলো, তার ঠিক নেই। ফেসলভএর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই, কিন্তু ডিটরিচ ভয় পাচ্ছে বৈ কি! একটা ভীষণাকার

ড্রাগন উড়ে এলো—তার মুখে বলছে এক জন যোদ্ধা। এখুনি যদি টিবিয়ে দেয় তাহ'লে গুঁড়ো হয়ে যাবে যে।

ডিটরিচকে দেখে সে আর্তনাদ করে বললে: আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

ইকএর তরোয়ালে যে ক্ষমতা ছিল সে কথা ডিটরিচ ভোলেনি, তাই একটুও দেরী না করে তখনই ড্রাগনকে আঘাত করলো আর ড্রাগন মাটিতে পড়ে গেল।

তিন জনে আবার যেতে সুরু করলো।

ফেসলভ তার সঙ্গে মুখে বন্ধুত্ব করলেও মনে মনে চায়নি। ড্রাগন যখন আক্রমণ করতে এলো, তখন সে বাধা দেয়নি আর দুর্গের সেই প্রকাণ্ড দরজার কাছাকাছি এসে যেই ঢুকতে যাবে—অমনি দু'দিকে যে দুটো পাথরের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছিল, তার একটা হাত হঠাৎ নেমে এলো তার মাথার উপর। খুব কৌশলে ডিটরিচ তা যদি এড়িয়ে না যেতো—তখনি তার মৃত্যু ঘটতো। এ সব বিপদ যে আসবে তা ফেসলভ জেনেও ডিটরিচকে সাবধান করেনি।

ডিটরিচ সব বুঝতে পারলো। দুর্গের ভিতর ঢুকে অনেক দৈত্যর সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হলো।

তার পর?—তার পর বহু ধন ও ঐশ্বর্য্য আর রাজকন্যাদের নিয়ে ডিটরিচ দেশে ফিরলো।

সুন্দরী মেয়ে ফুটফুটে মেয়ে সেবার্গের সঙ্গে ডিটরিচএর বিয়ে হলো। রাজকন্যা রাণী হয়ে গেল।

বন্দে মাতরম্

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

পৃথিবীর আকার

প্রাচীনেরা আগে পৃথিবীর সাথে অণ্ডের দিত তুল,
অধুনা বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলেন সে কথা ভুল।
তাঁহারা বলেন পৃথিবী দেখিতে কমলা লেবুর মত,
উহারি মতন দেখো চেয়ে তার দুই দিক চাপা, নত।

উত্তরাখণ্ড ও দক্ষিণাখণ্ড

মাঝখানে দাগ কেটে দিলে হবে দুইটি খণ্ড ভিন্ন;
খণ্ড দু'টির বিশেষণ দাও উত্তর দক্ষিণ।
দু'য়ের গড়ন দুই রূপ আর প্রকৃতিও বিপরীত,
প্রথম খণ্ডে গ্রীষ্ম যখন দ্বিতীয় খণ্ডে শীত;
দক্ষিণে আছে যতখানি মাটি দুই গুণ তার চেয়ে
উত্তরে মাটি আকার ধরেছে উত্তরসীমা ছেয়ে।
এর ফলে তাই প্রভেদ ঘটায় জলবায়ু উভ ভাগে,
একের প্রকৃতি অপরের কাছে বিস্ময় বলি লাগে।

উত্তরাখণ্ডে ইউরেশিয়া

পৃথিবীর এই উত্তর ভাগে ইউরেশিয়ার সারা
অংশটি পড়ে আছে দেখো চেয়ে নিশ্চল শিব পারা।
অপর পক্ষে আফ্রিকা আর আমেরিকা মিলি ছু'য়ে
পৃথিবীর দু'টি খণ্ড ধরিয়া দুই দেশ আছে ছুঁয়ে।

আদি সভ্যতার ভূমি

ফলে সভ্যতা বলি মোরা যারে হলো তার উৎসার
ইউরেশিয়াতে প্রথম, তা' পরে প্রসারিত ধারা তার।
ইতিহাস যদি কোনও দেশের জানিবারে সব চাও
প্রথমে তা হলে সেই সে-দেশের ভূমি-পরিচয় নাও।

ভারতবর্ষের অবস্থান

ভারতবর্ষ কেমন এদেশ, কোথায় অবস্থান
ইতিহাস তার জানিতে প্রথম তা-ই করো সন্ধান।
সৌরমণ্ডলের সাথে যোগ আমাদের পৃথিবীর,
তারি শৃঙ্খলে বাঁধা তাই এর গতি দিবা-রাত্রির;
তার পরে ধরো এর উত্তরে ইউরেশিয়ার স্থান,
তার মাঝখানে যেটুকু এশিয়া তাহাতে লম্বমান
আমাদের এই ভারতবর্ষ তাহারি ভূভাগ বলি
অতীব প্রাচীন কাল থেকে আজো খ্যাতনামে যায় চলি।
ইউরোপ আর এশিয়ার মাঝে নাহি কোন ব্যবধান,
মাঝখানে নাহি পর্বত, কোন বারিধি প্রবহমান।
যদিও এদের হয়নি বিভাগ পাহাড়ে, সাগরজলে,
লৌকিক মতে তবু দুই ভাগ দুই মহাদেশ বলে।
ধরা যাক তাই, এশিয়া তা হলে ভূভাগ স্বতন্তর,
তার কোলে হাসে ভারতবর্ষ নিত্য নিরন্তর।

[ক্রমশঃ।

গল্প হ'লেও সত্যি

শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। রাত প্রায় তিনটে। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে একটি ঘরে শাঁখ বেজে উঠলো। এল মহাজন্মের লগ্ন। ফুটফুটে ছোট একটি শিশু। চাঁদের আলোর মত তার রূপ। ধন্য হলেন মা, ধন্য হোল বাঙলা তথা ভারত।

দিনে দিনে বাড়তে লাগলো শিশুটি। শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছোঁড়ে—হাত চোষে—আধ-আধ কথা বলে। আপন-মনে শিশু বলতে থাকে—তা, বা, মা—কত কি! সামনে ফুটফুটে দাঁত বেরুল। ক্রমে শিশু দাঁড়াতে শিখলো—হাঁটতে শিখলো।

চাকরদের পরিচর্য্যায় মানুষ হ'তে লাগলো শিশু। রাত্রে ব্রজ চাকর যখন রামায়ণ পড়ে তখন শিশু তার কাছে গিয়ে বসে—আপন-মনে শোনে। শ্যামা চাকর দুপুরে শিশুটিকে বসিয়ে তার চার ধারে খড়ি দিয়ে গণ্ডি এঁকে দেয়। এর বাইরে গেলেই বিপদ। সীতার মতো অবস্থা হবে আর কি! শিশু শ্যামার মুখের দিকে ভয়ে ও বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে ভুলে যায় গণ্ডির কথা। মুখে একটা শব্দ ক'রে চলে আসে জানালায়। জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। ভুলে যায় বাস্তব জগতের কথা। মন ছোটে তার তেপান্তরে।

বিচিত্র কল্পনায় শিশুর মন রঙিন হ'য়ে ওঠে। শিশু গর্ত ক'রতে দেখে ভাবে—বেশ বড় গর্ত করলে পাতালে যাওয়া যাবেই যাবে। তার মনে দুঃখু হয় বড়রা তা করে না কেন।

দুপুর বেলায়—যখন চাকরেরা ঘুমিয়ে পড়ে তখন। শিশুর ঠাকুরমার বড়ো একটা ভাঙা পাল্কী ছিল। শিশু তাতে চ'ড়ে বস্‌তো। সে রবিন্‌সন্ ক্রুশো। সে যেন সীমাহীন সমুদ্রে ডিঙায় ক'রে শিকারে বেরিয়েছে। যদি ঝড় আসে? ঝড়কে তোয়াক্কা করে কে? সে? ইস্। বাঘ-বাচ্ছা দিয়ে নৌকা টানিয়ে নেবে সে।

আবদুল মাঝি—সেই আবদুল মাঝি যে ইলিশ মাছ দিয়ে যায় তাদের—তার কাছে না সে একটা গল্প শুনেছিল! তার মতো কিন্তু বীর নেই, যাই বলো।

মাষ্টার-ছাত্র খেল্‌লে কি হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। রেলিংগুলো সব ছাত্র, শিশু স্বয়ং মাষ্টার। অতগুলো রেলিং সব ভয়ে চুপ। শিশু বকে আর ছপাং-ছপাং ক'রে মারে তাদের। কোন দিনই পড়া করবে না তারা।

পুজো···হাঁ পুজো···বলি দেবে কি? কেন সিঙ্গিমামা আছে। বড়রা সব খাসি বলি দেয় সে সিঙ্গি বলি দেবে। পুজো আরম্ভ হোল।

সিঙ্গিমামা কাটুম্
আন্দি বোসের বাটুম্
উলু কুট চুলু কুট কুট কুট
আখরোট বাখরোট খট্ খট্ খটাস্
পট্ পট্ পটাস্।

তার পর সিঙ্গি বলি। দিনভোর চলে শিশুর এসব বীরত্ব অভিযান।

রাত্রে মাষ্টার মশায়ের কাছে প্যারী সরকারের ফার্ষ্ট বুক পড়া। পড়া কি যায়? পড়তে বস্‌লেই যতো রাজ্যের ঘুম এসে জড় হয় শিশুর চোখে। পড়া গেল—

শিশুর মতে রাত না থাকলেই ভালো। রাত হোলে ভূত-প্রেতেরা হাত বাড়ায়।

একদিন দাদার সংগে স্কুল যাবার জন্যে বায়না ধ'রে বস্‌লো শিশু। নাছোড়বান্দা। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী নামক স্কুলে শিশু ভর্তি হোল। স্কুল নয় কুইনিন।

সমস্ত দিনটাই শিশুর রুটিন বাঁধা। কুস্তির পর পড়তে বস্‌লেই শিশুর যেন সব গোলমাল বেধে যায়। শ্লেটে মুখ আড়াল করে বুড়ো দর্জি কি সেলাই করছে দেখতো। দারোয়ানের দিকে তাকাতো। আহা কি আরামের কাজ ওদের! আঁক কষতে হয় না! নীলকমল মাষ্টার তাকে দর্জিও হ'তে দেবে না—দারোয়ানও না! মানুষ হ'তে হবে! ওরাও তো মানুষ!

এই শিশুটি, যার কথা এতক্ষণ ধ'রে বললাম, কে জান?

—বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চৈনিক প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রীর নিকট ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রীর শিশু হস্তী 'আশা' উপঢৌকন

শিশু হস্তী 'আশা' ১নং কিং জর্জ্জ ডকে উপস্থিত। হস্তি-পৃষ্ঠে মাহুত শের আলি।

'ইষ্টার্ণ কুইন' জাহাজে উঠাইবার তোড়জোড়

জাহাজে ক্রেন দ্বারা হাতীর খাদ্য উঠান হইতেছে

'আশা'কে ইষ্টার্ণ কুইন জাহাজে ক্রেন সাহায্যে উঠান হইতেছে

'আশার' দেহে স্লিং খাটান হইতেছে

আলোক চিত্র—শ্রীরামকৃষ্ণ লাহিড়ী

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌ সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP

হয়তো ভাবলে যে ডাক্তার তো আচ্ছা পেটুক আর স্বার্থপর! কথার মাত্রা হারিয়ে ফেলেন তাই :

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কোথায় কি জুটবে কিছুই তো বলা যায় না, বুঝলে কি না···সোবোল 'ঠিকই করছে···ঠিক···"

ট্রেন

ভেরা পানোভা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রসদ-পরিচালক সোবোলের হোলো সব চেয়ে বিপদ—বেচারা বুঝেই উঠতে পারছিলো না যে, কি করা উচিত। সমস্ত ব্যাপারটা কমাণ্ডান্টকে বলে দেবে, না, সময়মত আপনিই সব প্রকাশ পাবে। দানিলভই যে সবার মূলে সেকথাও জানবে সবাই—সোবোল আর কি করতে পারে?

ট্রেনের লোকেদের যে দিনের পর দিন ঐ জোয়ারীর পরিজ আর যক্ষ্মারোগীর পথ্যের মত জোলো সুপ খেতে হচ্ছে, তার জন্যে সোবোলের একটুও দোষ নেই—দানিলভই তাকে ঐ রকম নির্দেশ দিয়েছিলো : "—শোনো সোবোল, স্রেফ ভুলে যাবার চেষ্টা কর যে আমাদের সঙ্গে মাংস, মাখন, কোকো ইত্যাদি সৌখীন, মুখরোচক খাদ্য কিছু আছে। বুঝতে পারছো?"

—"একেবারেই ভুলে যাবো"—সোবোল তা সত্ত্বেও প্রশ্ন করেছিলো—"না, মাঝে মাঝে মনে করতে পারি?"

—"সময় হোলে আমিই মনে করিয়ে দেবো—"দানিলভ কথা দিয়েছিলো।

ট্রেন ছাড়বার পর থেকে চতুর্থ দিনে ডাক্তার বেলভ একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে একটু অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতেই দানিলভকে জিজ্ঞাসা করলেন :—"খাওয়া-দাওয়া নিয়ে একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে, বুঝলে কিনা—সবাই এই নিয়ে অভিযোগ করছে। তা' আমি বলছি কি, আমাদের রসদ-পরিচালক ঐ সোবোলকে একটু সমঝে দিলে হয় না?"

—"সোবোল যা' করছে, ঠিকই করছে"—দানিলভ উত্তর করলে—"বলা যায় না তো ভবিষ্যতে কি অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। কোথাও কিছু খাবার মিলবে কি না, কি ধরণের জিনিষই বা পাবো, কতটা পাবো, কিছুই তো বলা যায় না। আর তাছাড়া আহতদের জন্য আমাদের সব আগে খাবার মজুত রাখতে হবে। তাই আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।"

চকচকে পালিস-করা বুটের গোড়ালীটা ঠুকতে ঠুকতে দানিলভ ওর 'কথা' শেষ করে।

—"আমার মনে হয় সোবোল যা করছে ঠিকই করছে—"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই"—ডাক্তার তক্ষুনি সায় দিলেন। মনে কিন্তু ভারী অসোয়াস্তি হতে লাগলো, কে জানে দানিলভ

কিন্তু এদিকে সোবোলের বিরুদ্ধে সবার অসন্তোষ বেড়েই চললো। সুরু হোলো এমন কি সোবোলের সহকারী, যাকে সোবোল রোজ ওজন করে জোয়ারী বের করে দেয়, সে থেকে ক্রাভটসভ অবধি। ক্রাভটসভ এই সব ব্যাপারে অত কথার ধার ধারে না, সে সোজা বলে পাঠালে সোবোলকে যে, যদি এই রকম বাঁদরামি এখনি না বন্ধ করে তবে এক ঘুসিতে ও সোবোলের মুখ ভোঁতা করে দেবে।

এইতেই সোবোল সত্যিই ভয় পেলো, একবার ভাবলে ডাক্তার বেলভের কাছে সব ব্যাপারটা খুলে বলাই ভালো। ও জানতো ক্রাভটসভ লোকটা এমন যে, ওর সঙ্গে চালাকী চলবে না। তাই এখন থেকে ও সব সময় ডাক্তারের পিছনে লেগে রইলো, ভাবলে ডাক্তারের আড়ালে থাকাই সব চেয়ে নিরাপদ। ডাক্তার বেলভ বুঝেছিলেন মজাটা, তাই সব সময় সোবোলের ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখে হাসতেন।

কিন্তু সোবোল ভয় পেতো ডাক্তারকে বলতে, কে জানে কমিশার দানিলভ আবার কি ভাবে নেবে ব্যাপারটা। কমিশারের ঐ স্থির গম্ভীর দৃষ্টি আর পাতলা চাপা ঠোঁটের দিকে চাইলেই তো ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। অবশ্য কমিশার কারো মুখে ঘুসি কখনোই মারেন না বটে, কিন্তু কে চায় বাবা অমন লোককে চটাতে?

অনেক ভেবে শেষে একটা উপায় বার হোলো। যখন অফিসররা সবাই খাওয়াতে ব্যস্ত, সেই সময়টাতে এক টিন মাংসের কিমা, খানিকটা মাখন আর একরাশ চিনি বের করে নিয়ে এলো। তার পর চিনির টুকরোগুলো গুণতে গুণতে সোবোল আপন মনে বিড়বিড় করে বকতে সুরু করলে···'এ ছাড়া আর কীই বা করি? ···ইস্, অনেকগুলো চিনির টুকরো নেওয়া হোয়ে গেছে তো··· বিয়াল্লিশটা···এত খেলে যে লোকটা বলের মত মোটা হোয়ে যাবে···' গোটা বারো টুকরো আবার রেখে দিয়ে এসে, সাবধানে বাকী জিনিষগুলি পকেটে পুরে সোজা গিয়ে হাজির হোলো ক্রাভটসভের কাছে।

ক্রাভটসভ তখন উপরের বার্থে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। একটা খবরের কাগজে মুখটা ঢাকা, শুধু দাড়িটা দেখা যাচ্ছিল কাগজের তলা থেকে···নিচের বার্থে সুখোয়দভ ঘুমে অচেতন।

সোবোল আস্তে আস্তে ক্রাভটসভকে ধাক্কা দিতে লাগলো, আর ফিশ-ফিশ করে ডাকতে লাগলো, "কমরেড ক্রাভটসভ···কমরেড··· শুনছো···"

ক্রাভটসভ মুখ থেকে কাগজটা সরিয়ে ঘুম-জড়ানো চোখে ওর দিকে চাইলে।

—"আমার উপর রাগ করা তোমার অন্যায় কমরেড, আমার কোনো দোষ নেই—"

—"কি বলছো বলো তো?"—বার্থের উপর উঠে বসলো ক্রাভটসভ, বসেই ওর পায়ের কাছে সোবোলের রাখা জিনিষগুলির দিকে চেয়ে বলে উঠলো,—"হা ভগবান, লোকটা ভেবেছে কি, আমি কি কচি খোকা যে, চিনির ডেলা চুষবো?"...

কিন্তু শেষ অবধি সোবোলের অনুনয়ে-বিনয়ে গলে গিয়ে ক্রাভটসভ ওকে ক্ষমা করলে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সোবোল। বাপ্পাঃ, ক্রাভটসভের খুসি! যাক, রসদ-পরিচালনার ভার এত দিন মাথার উপর বোঝা হোয়ে চেপে বসেছিলো। আজ এত দিন পর রসদ-পরিচালকের পদ-মর্য্যাদাটা একটু স্বস্তি হোয়ে ভোগ করার সময় হোলো। হ্যাঁ, বেশ একটু গর্ব্বও হচ্ছে বৈ কি? আনন্দের চোটে সোবোল প্রথম সেদিন মেয়েদের সঙ্গে হাসি-মস্করাও জুড়ে দিলে।

প্রধানা সিষ্টারের সঙ্গে পথে দেখা হতেই সুর করে বলে উঠলো:

—"ওগো বীর, জানো কি তার নাম ছিলো ফাইনা—"

দানিলভের কানে গেলো, প্রশ্ন করলে—"এর মানে কি?"...

সদ্য বিজয়ের আনন্দে দুই হাত উঁচু করে সোবোল বলে উঠলো,

—"আমার কি দোষ? স্বয়ং পুশকিনই তো লিখে গেছেন"—

এই সময় যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হোয়ে উঠেছিলো। শত্রুপক্ষ প্রায় দেশের কেন্দ্রস্থলে হানা দিচ্ছে—তাদের সামরিক যান-বাহন রাশিয়ার বুকের উপর দিয়ে চলেছে আর মাথার উপর হানা দিচ্ছে তাদের বোমারু বিমান।

—"একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো"—ডাক্তার বেলভ দানিলভকে ডেকে বললেন—"আমাদের লোকেরা এখনও হাসছে, গল্প করছে, যেন কোথাও কিছু হয়নি, এমন একটা ভাব।"...

—"হ্যাঁ, খুব ভালো, খুব ভালো"—দানিলভ মাথা নেড়ে সায় দিলে—"ওরা যে হাসি-গল্প করতে পারছে এ তো ভালোই—তবে খারাপটা হচ্ছে যে ওদের কোনো ধারণাই নেই যে, কি সর্ব্বনাশটাই না হতে চলেছে। স্তালিন অবশ্য বলেছেন এ বিষয়ে, কিন্তু ওরা ঠিক ধারণায় আনতে পারছে না। এখানে এই ট্রেনের মধ্যে আমরা যেন জেলখানার বন্দী, শুধু নাগরিক অধিকারটুকুই যেন বজায় আছে, এ অবস্থায় হাসি-গল্প করতে পারা তো ভালোই।"

ডাক্তারের মনে পড়লো সোনেচ্‌কার কথা, মনে পড়লো তার চোখের জল।

—"আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়—ওরা অসহ, অমানুষিক অত্যাচার করছে?"

অট্টহাস্য করে ওঠে দানিলভ—"মনে হবার কি আছে—এ তো জানা কথাই"—বলার পর আস্তে আস্তে ঠোঁট কামড়াতে থাকে, নিজের কথাগুলিই যেন আঘাত করলো ওকে। থেমে থেমে বলে—"অনেক দেরী...শেষ হোতে অনেক দেরী...কিছুই বলা যায় না... এই তো সবে সুরু"...

—"আমাদের লোকেরা...বুঝলে কি না,...ওরা কিন্তু দেশের জন্যে যে কোনো রকম ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত..."

—"ত্যাগ-স্বীকার কাকে বলছেন? ত্যাগ-স্বীকার করে কোনো কিছুর জন্যে, নয় কী? নিজের জন্যে নিজের কাছে কেউ ত্যাগ-স্বীকার করে না। যাকে ত্যাগ-স্বীকার বলছেন সে হোলো মানুষের সহজ প্রবৃত্তি—আপনার, আমার এই সব মেয়েদের, প্রত্যেকেরই। বীরত্বের কাণ্ডটা আমাদের দেশের লোকদের কাছে দৈনন্দিন কাজের মতই। আমরা হলাম সোভিয়েটের অধিবাসী—আমাদের মধ্যে কয়েক জনকে হয়তো আজই মরতে হতে পারে। ধরুন ওরা আপনাকে, আমাকে, ইভানকে, পেট্রভকে হত্যা করলো—সেটাই কি আমাদের ত্যাগ-স্বীকারের পরাকাষ্ঠা দেখানো হোলো? কার কাছে?...নিজেদের কাছেই? ক্ষমা করুন, আমি হয়ত ঠিক যা বলতে চাই পারছি না..."

"না, না, আমি ঠিকই বুঝেছি,"—ডাক্তার বলেন—"আমি তোমার কথা সব স্বীকার করতে রাজী, শুধু ঐ বীরত্ব কথাটা বাদ দিয়ে। কোনো বীরত্বই নেই এতে—এটা হোলো মনের স্বাভাবিক সহজ প্রতিক্রিয়া। বীরত্ব!—বুঝলে কি না, সেটা হোলো মানুষের আত্মার একটা মহৎ সংগ্রাম—সবার মধ্যেই কি সেটা থাকা সম্ভব? এর জন্যে চাই বিশেষ বিশেষ গুণের সমাবেশ।"

—"গুণের বিকাশ? সে তো মানুষের হাতেই, আমাদের হাতে"—দানিলভ বলে—"আর আজকের এই যুদ্ধে সারা জগৎ রুদ্ধশ্বাসে তাদের বিকাশের দিকে চেয়ে থাকবে অবাক হোয়ে। এ সব 'গুণ' ভগবান হাতে করে তুলে দেননি—এরা তৈরী হোচ্ছে শিক্ষায়, আর বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতায়—"

ডাক্তার মাথা নাড়লেন। নাঃ, মতে মিলবে না। দানিলভ জিনিষটাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাহ'লে তো সোভিয়েটের প্রত্যেকটা মানুষই এক-এক জন প্রকৃত বীর। তাই কি হয়?

কিন্তু দানিলভ ঠিক সেই সময় বলে ওঠে:—"আমাদের দেশে যে কোনো লোকই প্রকৃত বীর হোয়ে দাঁড়াতে পারে—"

—"কে জানে বাপু, আমাদের দেশে তো দু'শো লক্ষ অধিবাসী, বলতে চাও সবাই চেষ্টা করলে প্রকৃত বীর হোয়ে উঠবে?"

—"খুব সম্ভব, খুব স্বাভাবিক—"

—"তাহলে দু'শো লক্ষ সংখ্যা থেকে একটিকে অন্ততঃ বাদ। আমার মত বুড়ো-হাবড়া লোককে তুমি নিশ্চয়ই বীরের পর্য্যায়ে ফেলবে না—"

—"দু'শো লক্ষ থেকে এক জন বাদ নিশ্চয়ই"—দানিলভ বলে ওঠে—"দু'শো লক্ষ থেকে বাদ সুপ্রাগভ—"

দু'জনেই হেসে ওঠেন। গম্ভীর আবহাওয়াটা কেটে যায় হালকা হাসিতে।

[ক্রমশঃ

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

জলযাত্রা

শান্তা দেবী

রোম (২)

আমরা যে সময় রোমে গিয়েছিলাম সে সময় কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে সব Museum প্রভৃতি বন্ধ ছিল। কাজেই সারা পৃথিবী পার হয়ে এসেও যা যা দেখব মনে করেছিলাম তা দেখা হল না। বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যায় তাই দেখেই সন্তুষ্ট হতে হল।

রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ পোপ বাস করেন রোমের ভ্যাটিক্যানে। এটা একটা ধর্ম্মরাজ্য বলা চলে। পুরাকালের পোপদের Vaticanএর বাইরে কোথাও যাওয়া বারণ ছিল। তাঁদের রাজ্যের এই রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় রাজধানীর মত সব ব্যবস্থাই আছে।

আমরা ১৪ই সকালে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ভ্যাটিক্যান দর্শনে চললাম। গির্জ্জা কোন দিন বন্ধ থাকে না, তাই গির্জ্জা অন্ততঃ দেখা যাবে ভেবে কিছু আনন্দ হল। Vatican সহরের বাইরে। তার বিরাট প্রবেশ-পথ, পথের ধারে দালানের মাথার উপর অসংখ্য মূর্ত্তি এবং ভিতরে সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা আমরা দেখতে পেলাম। প্রবেশ-পথটি অনেক দূর থেকেই দেখা যায়। এই গির্জ্জার কারুকার্য্য এবং খিলান প্রভৃতি ইউরোপীয় ধরণের মনে হয় না। দেখেই তাজমহলের কথা ক্রমাগত মনে হয়। শ্বেত পাথরের চৌকা-চৌকা মোটা থাম, উপরে গোল ডোম এবং ভিতরে প্রচুর সোনার কাজ। গির্জ্জার ভিতরে অনেক পোপদের সমাধি। এক জন সন্ন্যাসিনী আমাদের টেনে নিয়ে গিয়ে শেষ সমাধিটি দেখালেন। সমাধির উপর পোপের মর্ম্মর-মূর্ত্তি শায়িত থাকে। রোমের গির্জ্জা প্রভৃতি দেখলে বোঝা যায় কেন লোকে বলে যে, তাজমহল সম্ভবতঃ ইটালীয়ান শিল্পীর তৈরী। আমার কিন্তু মনে হয় তাজমহলের শিল্পীদেরই অনুকরণ ইটালীয়ানরা করেছে বললে কথাটা ঠিক শোনায়। কারণ তাজমহলের সৌন্দর্য্যই মনকে বেশী নাড়া দেয়। তাছাড়া প্রতি কোণে-কোণে মেরী বা কোন সেণ্ট বা পোপের মূর্ত্তিতে সমাকীর্ণ হওয়াতে গির্জ্জাগুলির স্থাপত্য একটু ক্ষুণ্ণ হয়। তাজমহলে আর কিছু নেই বলে তার গাম্ভীর্য্য ও মহিমা আরও অটুট। সত্যই "কালের কপোলতলে এক বিন্দু জল শুভ্র সমুজ্জ্বল!" যাই হোক, গির্জ্জার ভিতরের এই মূর্ত্তিগুলির নিজস্ব সৌন্দর্য্যই অনেক সময় তাদের অমর করেছে। এখানে একটি কোণে মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মেরী মাতার মর্ম্মর-মূর্ত্তি আহত যিশুকে কোলে নিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছেন। ভারি মিষ্টি মুখখানি। নববধূর মত স্নিগ্ধ মুখে করুণা ও ভালবাসা যেন উছলে পড়ছে। দেশে-দেশান্তরে এর ছবি দেখা যায়। জেরুজালেমের ভাঙা একটি স্তম্ভ এক কোণে রয়েছে। পাকিয়ে পাকিয়ে উপর দিকে উঠেছে। সেই ছাঁচে তৈরী আরও চারটি থাম করে এক একটি বেদী সাজিয়েছে। খুব মোটা পাকানো শিকড়ের মত। গির্জ্জাটি সব জড়িয়ে অপূর্ব্ব এবং বৃহৎ। ধর্ম্মের নামেই ঐশ্বর্য্য যেন ঝল্-মল্ করে জ্বলে উঠেছে।

এখানেও নানা লোকে মেয়েদের ছবি তুলবার অনুমতি চাইল। কেউ বা না বলেই তুলে নিল। সর্ব্বত্র আমেরিকানরা ভ্রাম্যমান। ভারতীয় পোষাক তাদের চোখে নূতন এবং অদ্ভুত একটা জিনিষ। বিকেল বেলা একটু জিনিষপত্র কিনতে হেঁটে বেরোলাম। সেদিন শুক্রবার, শনি-রবিতে হয়ত খাবার দোকান ছাড়া আর সবই বন্ধ হয়ে যাবে, তাই যা পাওয়া যায় এই বেলা কেনা ভাল। দেশে থাকতে শুনতাম ইটালীতে জিনিষ সস্তা। কিন্তু দেখছি অসম্ভব দাম। আমাদের ভারতবর্ষই ভাল।

রাস্তায় গ্রাম্য ধরণের ইটালীয়ান মেয়েরা মাথার উপর ঝুড়ি বা পুঁটলি নিয়ে চলেছে। অনেকের গায়ের রং তামাভ। ফরাসীদের মত পাতলা ঠোঁট আর সরু চাঁছা বড় নাক এদের নয়। কিন্তু যারা সুন্দর তারা ফরাসীদের চেয়ে অনেক সুন্দর। ভারী মোলায়েম মুখ অনেক মেয়ের। ভারতীয় সুন্দরীদের সঙ্গে একটু মেলে।

পরদিন সহরের বাইরে আর এক দিকে সেণ্ট পলের গির্জ্জা দেখতে গেলাম। অনেক দূর যেতে হয়, প্রায় মাঠের ভিতর দিয়ে। পথে একটি বিখ্যাত সমাধি-ক্ষেত্র আছে। সেখানে ইংরেজ কবি শেলী ও কীট্সের সমাধি দেখতে বহু লোক আসে। গেটের বাইরে নেমে আমরা সেখানে টাঙানো ঘণ্টা বাজালাম। রক্ষক বেরিয়ে এল। শেলীর সমাধি দেখতে চাইলাম। লোকটি সরু পথ দিয়ে অনেকটা উঁচুতে এক জায়গায় নিয়ে গেল। অতি সাধারণ সমাধি, শুধু একটি পাথরের উপর মহাকবি শেক্সপীয়রের দু'লাইন কবিতা উদ্ধৃত করা আছে। আমরা সমাধির উপর দুটি ঘাসের ফুল রেখে একটা ফোটো তুলে নিলাম। এই সমাধি-ক্ষেত্রে অনেক ইংরেজের সমাধি আছে। ভারতবর্ষের Elphinstone কলেজের এক অধ্যাপকের সমাধিও দেখলাম। নাম বোধ হয় Wordsworth। কীটসের সমাধি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আবার রক্ষকের শরণ নিতে হল। সে এই এলাকা ছাড়িয়ে বেড়ার ওপারে খুব সাদাসিধা একটা নির্জ্জন বাগানের মত জায়গায় নিয়ে গেল। কীট্স এবং তাঁর এক বন্ধুর সমাধি পাশাপাশি। কীট্সের সমাধিতে নাম নেই, শুধু কবির পরিচয় আছে। কত বাল্য বয়স থেকে এই সব কবির নাম শুনেছি, কবিতা মুখস্থ করেছি, আজ পায়ের তলায় তাঁদের দেহ পড়ে রয়েছে মনে করে তাঁরাও যে মর-জগতের মানুষ, তা নূতন করে অনুভব করলাম। দূরে দেখলাম এক রাজা নিজেকে অমর করবার জন্য একটা পিরামিড সমাধি করিয়েছেন। কে তাঁর নাম জানে?

কবিদের স্মরণ করে আবার গাড়ী চড়ে দীর্ঘ পথ চললাম পথের ধারে বড় বড় গাছ, মাঝে মাঝে ঠেলা-গাড়ীতে শিশুকে নিয়ে মায়েরা চলেছে। ঘাসের উঁচু পাড়ে ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। অবশেষে সেণ্ট পলের গির্জ্জায় পৌঁছলাম। এই গির্জ্জাটি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় সব পুড়ে গিয়েছিল। আবার নূতন করে সব করা হয়েছে। গির্জ্জার সামনে বড় চক-মিলানো দালান, এমন অল্প কোথাও দেখিনি। গির্জ্জার মাথায় পল, পিটার যিশু প্রভৃতির ছবি সোনালি জমির উপর আঁকা। তারও উপরে মেষপালের ছবি।

ভিতরে খুব ভীড়। আজ এখানে পর্ব্ব উপলক্ষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এসেছে। মেয়েদের মাথায় ওড়না বা রুমাল চাপা দেওয়া, উপাসনায় এই ভাবেই আসতে হয়। সুন্দর সুরে অর্গান বেজে উঠল। গান গাইতে গাইতে পাদ্রীরা মিছিল করে বিশপকে নিয়ে বেদীর কাছে এলেন। বিশপের সাজ জরি-জড়োয়ায় মোড়া, যেন রাজার পোষাক। ধূপ-ধুনা-আলো দিয়ে দেবমন্দিরের মত আরতি হল। তার পর মন্ত্রপাঠ ও গান হল। মনে পড়ে গেল ফ্লরেন্সের মিউজিয়মে বিশপের মুকুট দেখেছিলাম—সমস্তটা অসংখ্য মুক্তা ও মণি বসানো। কত হাজার টাকা দাম কি জানি!

ফ্রান্স ও ইটালীতে বিখ্যাত গির্জ্জায় কাচের জানালায় রঙীন কাচ দিয়ে সুন্দর ছবি আঁকা থাকে। এই গির্জ্জায় সে রকম ছবি নেই। কাঠ ও পাথরের গায়ে যে স্বাভাবিক রেখার নক্সা প্রকৃতি এঁকে

রাখেন, তারই অনুকরণে জানালার কাচ রং করা। গির্জ্জার ছাদ চেপ্টা, তাতে সোনালি ফুল ও চৌখুপির কাজ। কতকগুলি পাথরের থামে ঠিক গাছের ভিতরের কাঠের গায়ের রেখাঙ্কনের ভঙ্গীতে রঙের রেখা চলে গিয়েছে। মনে হল স্বাভাবিক মার্বেল পাথরেই রং আপনা হতে এই রকম ছিল। ঠিক যেন গাছ জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। সেণ্ট পলের একটি মূর্ত্তি ভারী সুন্দর।

দেয়ালের গায়ে বড় বড় ছবিগুলি উজ্জ্বল রঙে আঁকা, ঝক্‌ঝক্ করছে, যেন কাল এঁকেছে। এখানে কার্ড বিক্রীর বেশী ঘটা নেই। তবে গির্জ্জা থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, কয়েক জন লোক ছোটখাট জিনিষ ও কিছু ছবি বিক্রী করছে।

বিকালে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত প্রেমকিষণের বাড়ী চা খেতে গেলাম। রোমের চার দিকে নানা রকম দেয়াল ও গেট আছে। পথে একটা পুরানো গেট পার হয়ে বেশ বাগানওয়ালা বড়মানুষী পাড়ার ভিতর দিয়ে চললাম। বাগানটা পুরানো, বড় বড় অন্ধকার-করা গাছ, দেখতে বেশ লাগে। নাম ভিলা বোর্ঘেসে (Borghese)। যাঁদের বাড়ী গেলাম তাঁদের তিনটি সুন্দর সুন্দর ছেলে-মেয়ে। ইউরোপ-আমেরিকায় ভারতীয় লোকেরা কালো বলে পরিচিত। কিন্তু অনেক Embassyতেই ভারতীয়দের রং ইউরোপীয়দের মত সাদা দেখা যায়। অবশ্য শাদা না হলে যে কিছু ছোট ভাবতে হবে নিজেদের, তা মোটেই বলছি না। তবে আমাদের দেশে সব রকম রংই মানুষের আছে, এটা পশ্চিমের লোকেরা জানলে ক্ষতি নেই।

১৬ই আগষ্ট ভোর বেলা আমরা রোমের কাছে বিদায় নিয়ে চললাম। ষ্টেশনে গাড়ী পেতে অনেক হাঙ্গাম হল। অনেক কষ্টে একটু জায়গা পেলাম, যদিও অনেক দিন আগেই আমেরিকান এক্সপ্রেসকে টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। তবু দেশের চেয়ে কম কষ্ট কিছু হল না।

রোম ছাড়বার পর দু'ধারে বহু দূর পর্য্যন্ত কেবল প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ! লম্বা লম্বা প্রাচীর, বড় বড় খিলান, ভাঙাচোরা প্রাসাদ, জলের পরিখা ইত্যাদি। প্রাচীন রোম কত দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়েছিল, অনেক দূর পথ পর্য্যন্ত তার নিদর্শন চোখে পড়ে।

ঘণ্টা দুই ট্রেণে কাটিয়ে আমরা নেপল্‌সের এলাকায় এসে পড়লাম। নেপল্‌স্ থেকে আমাদের আবার জাহাজ ধরতে হবে। জাহাজ ধরার আগে কত গোলযোগ বাধল পরের বারে জানাব।

[ক্রমশঃ।

মা হওয়ার আগে ও পরে

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ডাঃ গুপ্ত

বিবাহের দু'টি কি একটি বৎসরের মধ্যেই একটি বা দু'টি সন্তানের পর-পর জন্ম দিয়েই স্বপ্নালসা ঐ কিশোরীটির মৃত্যু হয়।

যান্ত্রিক মায়ে হয় মেয়েটি রূপান্তরিত। মেসিনের মতই একটি পর একটি সন্তান সে প্রসব করে যায়। সংসারে আসে অশান্তি। সর্ব্বদা খিটিমিটি বকাবকি। জীবনের সুধার পাত্র শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়।

কিন্তু অপরাধ কার? মা তুমিও অপরাধী।

তারও কি এমনি হবে? শর্ম্মিলার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল মায়ের ডাকে, 'ও টুনী, এদিকে একবার আয় মা!—'

টুনী রন্ধনশালার দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু কয়েক বছর আগেও কি টুনী অমনি ছিল?

তার পুতুল খেলার দিনগুলো! মনে পড়ে বই কি।

'ও টুনী, কি করছিস্ মা?—'

রান্নাঘর হ'তে মায়ের আহ্বান শোনা গেল।

পাঁচ বছরের মেয়ে টুনী তার খেলাঘরে পুতুল খেলায় মত্ত পরম বিজ্ঞের মতই, যেন কত পাকা গিন্নী, নিরন্তর সংসারের দশ রকম ঝামেলায় একেবারে তিতি-বিরক্ত হ'য়ে আছে। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়: 'দেখো না মা, মেয়েটার চোখে কি ঘুম আছে? ঘুমাবেও না, আমাকেও একটু রেহাই দেবে না।'

খেলাঘরের পুতুল খেলা।

যে মেয়েটিকে আজ দেখতে পাচ্ছি একটি মাটির, কাঠের বা ন্যাকড়ার পুতুলকে বুকের মধ্যে নিবিড় স্নেহে আঁকড়ে ধরে নাওয়ায়-খাওয়ায়, দোল দিয়ে দিয়ে আধো-আধো বুলিতে মায়ের মুখেই শোনা ঘুমপাড়ানী ছড়া আউড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, আপন-মনে অনর্গল কত কথাই না বলে চলেছে, সেটা কি কেবল খেলাঘরেরই খেলা?

না, আগামী দিনের এক স্নেহময়ী জননী ঐ মেয়েটির বুকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঐ পুতুল খেলার মধ্যে দিয়েই রূপ নিচ্ছে ওর অজ্ঞাতেই।

মা।

মা হওয়া ত সহজ কথা নয়!

একাক্ষরে ঐ যে মধুর চিরপরিচিত শব্দটি ব্যথা-বেদনা, স্নেহ-আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য ও লালিত্যে চিরপুরাতন, চিরনতুন—সত্যিই যেন ওর আদি-অন্ত পাওয়া যায় না।

তাই ত মেয়েদের মধ্যে মা হওয়ার সাধনা চলে শিশুকালের ঐ খেলাঘরের ভাঙ্গা-গড়া খেলার মধ্য দিয়েই। মা হবার আগের ইতিহাস একদিনেরও ইতিহাস নয়। একটি মেয়ের শৈশব ও কৈশোরের প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত্রির মুহূর্ত্ত ঘিরে যে গড়ে ওঠে এক মধুর ব্যথা-বেদনার অনবদ্য ইতিহাস!

শুধু মনেই নয়, ঐ সঙ্গে সঙ্গেই চলে দেহের মধ্যেও অনাগত মাতৃত্বের গঠন বিপ্লব মেয়েদের দেহের কোষে কোষে, আভ্যন্তরীণ কোষ-মুক্তিকায় জারক রসে।

মাতৃ-জঠরের নিভৃত নিরালায় যেখানে একটি শুক্রকীট ডিম্বকোষকে (Ovary) নিবিড় করে পরস্পরের মধ্যে লীন করে নিয়ে সৃষ্টি-রহস্যের পরম বিস্ময়কর বিপর্যয় ঘটায়, প্রকৃত পক্ষে নারীদেহের গঠন-বিশেষত্বের শুরু যে সেইখান থেকেই।

সেই আকারহীন রক্তপিণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন কোষের আধিক্যেই পরবর্তী মেয়ে বা পুরুষ-শিশুর সম্ভাবনার শুরুও ঐ মাতৃ-জঠরেই।

অনাগত মায়ের দেহের গঠন চলে ঐ মাতৃ-জঠর হতেই সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকেই। তার পর একটু একটু করে শিশু-বালিকা বয়োবৃদ্ধির দিকে যেমন এগিয়ে চলতে থাকে দেহের কোষে কোষে চলে পরিবর্ত্তন ও পরবর্ত্তী মায়ের দৈহিক সম্ভাবনার প্রস্তুতি। জননীর জন্ম-পরিক্রমা।

ঐ প্রস্তুতির পথে প্রধান ও অন্যতম যে নলীহীন গ্রন্থি দেহের গঠনে বিপ্লব ঘটায় তাকে বলি ডিম্বাশয় ওভারি।

কিন্তু এ তো গেল বিজ্ঞান। তাছাড়া মা হবার আগের কথা ত ঐ সব নয়।

শুধু মা হলেই ত হবে না। মায়ের মত মা যে হতে হবে। মায়ের মত মা না হলে সন্তান ধারণের সার্থকতা কোথায়? তৃপ্তি বা গৌরব কোথায় মাতৃত্বের? রুগ্ন ও ব্যর্থ সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজেকে মাতৃত্বের কলঙ্কে ব্যর্থ করে দেওয়ার চাইতে মা না হওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ।

দৈহিক ও মানসিক গঠনের দিক দিয়ে এবং সুখ ও সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি ভাবে জীবনকে ভোগ করতে হলে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর দেহগত বৈচিত্র্যগুলি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকাটা একান্তই যে বাঞ্ছনীয়।

যুগ পরিবর্তিত হয়েছে। প্রসারিত হয়েছে মানুষের জ্ঞানের পরিধি, বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আলোর ক্রমে অজ্ঞতার অন্ধকার ফিকে হ'য়ে আসছে। এটা বিজ্ঞানের যুগ। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার আজ তাই সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

ফ্রয়েড-ও ও যাই বলুক না কেন, শিশুর যৌন-লিপ্সা অতি শিশু অবস্থায় দেখা দেয় না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে যে যৌন-লিপ্সা বা আচরণ দেখা যায়, সেটাকে স্বাভাবিক বললে ভুল করাই হবে। বরং অকালপক্কতা বলাই উচিত।

বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, সাধারণত শিশুরা তাদের যৌনাঙ্গ হতে শরীরের অন্যান্য অংশ সম্পর্কেই বেশী উৎসুক বা কুতূহলী। কিন্তু কথা হচ্ছে, সাধারণ শিশুর যৌন অনুসন্ধিৎসাকে আমরা কি ভাবে কোন্ দৃষ্টিতে গ্রহণ করবো? অর্থাৎ শিশুদের যৌন অনুসন্ধিৎসাকে আমরা অনুমোদন করবো কি না?

উচিত-অনুচিতের কথা বিচারসাপেক্ষ ত বটেই, মতভেদেরও অন্ত থাকবে না। নানা মুনির নানা মত। ঐ সম্পর্কে যাঁরা বহু দিন ধরে নানা ভাবে গবেষণা করেছেন তাঁদের মত: শিশুরা খুব অল্প বয়সেই তাদের যৌনাঙ্গ সম্পর্কে পরিচিত হয়ে ওঠে সাধারণ শিশু-মনের কৌতূহল হতেই। যৌনাঙ্গ নিয়ে ক্রীড়াসক্ত হয় যার ফলে হয়ত তারা সামান্য যৌনানন্দ পায়। সাধারণত তিন থেকে চার বছরের বয়সের মধ্যেই তারা যৌনাঙ্গ সম্পর্কে কিছুটা উৎসুক হতে পারে, অসম্ভব বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই তাতে।

হ্যামিলটনের মতে শতকরা ১৫টি শিশু যৌনাঙ্গ ক্রীড়াসক্ত হয়েই সর্বপ্রথম যৌনানন্দের আস্বাদন পায় ছয় থেকে সাত বৎসর বয়সের মধ্যে।

ক্যাথারিণ ডেভিসের মত, শতকরা ২০টি বালক ও শতকরা ৫০টি বালিকা সাধারণত বার বৎসর বয়সের মধ্যেই স্বয়ংরতিতে (masturbation) লিপ্ত বা আসক্ত হয়ে থাকে।

তাহলেও বলবো, কম বয়েসের যে যৌন-চেতনা আমরা বালক ও বালিকাদের মধ্যে দেখি, সেটা প্রধানত যৌন ব্যাপার সম্পর্কে একটা অহেতুক লজ্জা ও নিন্দার ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকাঢাকি করবার প্রয়াস থেকেই বালক ও বালিকার মনে যে কৌতূহলকে উদ্রিক্ত করে, কতকটা তারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ঐ লুকোচুরি থেকেই তারা আরো কৌতূহলী হয়ে ওঠে নিজ নিজ যৌনাঙ্গ সম্পর্কে—লুকিয়ে-চুরিয়ে অভিভাবকের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের মানসিক তৃপ্তিকে লাভ করে। একে যৌনলিপ্সা বললে ভুল হবে, বরং বলা চলে নিছক অপরিণত বয়সের কৌতূহল। শিশুকে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে একটু সচেতন দেখলেই মা-বাপের দল চোখ রাঙিয়ে ধমকি দিয়ে উঠবে: 'সাবধান! ছিঃ, ও সব ভয়ানক খারাপ ব্যাপার। খবরদার আর যেন ও সব না দেখি।'

কিন্তু তোমরা আজকালকার মায়েরা তোমাদের অমন হলে ত চলবে না।

টুনীরও মনে পড়ে, কতই বা আর তখন তার বয়স হবে: ছয় কি সাত। স্পষ্ট কিন্তু তবু মনে আছে। হঠাৎ যেদিন নাইতে গিয়ে ছোট ভাইটির যৌনাঙ্গ ও নিজের যৌনাঙ্গের পার্থক্যটা নিয়ে তার মাকে ও প্রশ্ন করেছিল। কেন এমন হয়?

মা ধমকে উঠেছিলেন।

বাবাকেও জিজ্ঞাসা করেছিল, প্রকাশ বাবু গম্ভীর হ'য়ে বলেছিলেন: 'ও সব অসভ্য কথা। বলতে নেই।'

বলতে নেই, কিন্তু কেন বলতে নেই? আর অসভ্য কথাই বা কেন?

তার পর বড় হয়ে গিয়েছে, মা-বাবার সঙ্গে সে শোয় না তখন শোয় দিদি প্রমীলার সঙ্গে। দিদি তার চাইতে বয়সে ১০।১১ বছরের বড়। মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। ডাক্তার হবে সে বছর খানেকের মধ্যেই।

দিদিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন এমন দিদি? ভাইটির আর আমার দেখতে ত এক নয়।—'

দিদি কিন্তু ধমকায়নি। বুঝিয়ে দিয়েছিল: 'ও পুরুষ, তুমি মেয়ে। মেয়ে আর পুরুষের দৈহিক পার্থক্য অনেকখানি। কেবল যৌনাঙ্গই পৃথক্ নয়। দেহের আরো অনেক কিছুর গঠনের ব্যাপারেও অনেক তারতম্য পার্থক্য আছে ছেলে ও মেয়েদের দেহে।

'কেন দিদি?—'

'তার কারণ, জীবনে মেয়ে আর পুরুষের কতকগুলো কাজ ও কর্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।—মেয়েদের দেহের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি হচ্ছে একদিন তাকে গর্ভে সন্তান ধারণ করতে হবে। মা হ'তে হবে।—'

টুনী কিন্তু কথাটা শুনে অবাক মোটেই হয়নি, কেবল বোদ্ধার মত মাথা হেলিয়ে বলেছিল: 'তাও, জানি। মেয়েরা সবাই ত জানে একদিন তাদের বিয়ে হবে এবং তারা মা হবে।'

প্রমীলা ব্যাপারটা অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করেছিল তাই জবাব দেয়, 'হাঁ! কিন্তু মা হলেই ত হয় না টুনু রাণী। মা হবার জন্য যে নিজেকে তৈরী করতে হয়।—'

'তৈরী করতে হয়!—'

'হাঁ। মা হবার জন্য আমাদের একটা কাল, মা হবার পরে আমাদের আর একটা কাল।—'

দিদি প্রমীলা বোঝেনি যে, ঐ কথাটা টুনীর বোধগম্য ঠিক হয়নি।

আরো বয়স যখন তার বেড়েছে এই এগার থেকে বার হবে, লক্ষ্য করেছে ও দেহের মধ্যেও কেমন সব ওলোট-পালোট হ'তে শুরু করেছে। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তার দেহের একটা পার্থক্য—

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস্‌ কলিকাতা ১২

সর্বপ্রথম বুকের দুই পাশে গুটি বাঁধতে শুরু হয়েছে—ব্যথায় টন্‌টন্ করে। আকার নিচ্ছে অনাগত তার সন্তানের সুধাভাণ্ড—দুটি স্তন। ই সংগে সংগেই এসেছে ব্রীড়া। ব্যবহারে, চাল-চলনে একটা সংকোচ। নারীর প্রথম আত্ম-সচেতনতার স্পর্শ।

এ যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা।

টুনীর মনে পড়ে তার সহপাঠিনী সবিতা, রেবা, মঞ্জুলা, নীলা, কত্তকীদের।

ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলা। অকারণ হাসা। আড় চোখে তাকানো চারি দিকে। ফ্রক ছেড়ে সবে তখন ওরা সাড়ী ধরেছে। হাট-নর হাতি সাড়ি দিয়েও যেন দেহটাকে ঢাকা যাচ্ছে না। এক দিক টানতে গিয়ে অন্য দিক আলগা হ'য়ে যায়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকলের অগোচরে দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বার বার দেখতে সাধ জাগে। একটা কৌতূহলের পীড়নে সর্বদা যেন একটা অস্বোয়াস্তি।

দিদি প্রমীলা যে বলেছিল মা হবার আগে মেয়েদের একটা কাল। এ সেই কাল—একটু একটু করে তখন ও সবে বুঝতে পারছে।

ঐ কালটাই হচ্ছে যৌন-চেতনার ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে যৌন-বোধের দিকে এগিয়ে যাওয়া। চিরন্তন জৈবিক আত্মোপলব্ধি।

নিজের যৌনাঙ্গগুলি সম্পর্কেও তখন তার কিছু কিছু জ্ঞান হয়েছে। দিদিই ডাক্তারী শাস্ত্রের কতকগুলো বই ঘেঁটে ঘেঁটে ছবির পর ছবি দেখিয়ে ওর শরীরের কোথায় কোন রহস্য আছে বুঝিয়ে দিয়েছে।

স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গগুলি বলতে বোঝায় উদরের মধ্যে দু'টি ডিম্বাশয়; জন্ম-থলি (uterus) ও জননেন্দ্রিয়। ঐ ডিম্বাশয়েরই সমগোত্রীয় হচ্ছে পুরুষের শুক্রাধার বা টেষ্টিকল।

আর হাইমেন বা সতীচ্ছদ বা সতীপর্দা। জননেন্দ্রিয়ের বহির্মুখের শেষ প্রান্তে ভিতরের প্রবেশ-পথটিকে প্রায় ঢেকে রাখে যে পর্দাটি, তাকেই বলা হয় সতীচ্ছদ (hymen)। সাধারণত স্ত্রী-পুরুষের প্রথম মিলন কালেই স্ত্রীলোকের সতীচ্ছদ ছিন্ন হয়ে যায়।

আগেকার দিনে ঐ সতীচ্ছদের পূর্ণাংগতার উপরেই নারীর সতীত্ব আরোপিত হতো। অর্থাৎ সতীচ্ছদ অক্ষুণ্ণ থাকলেই সে যে পূর্বে কোন দিন কোন পুরুষের সাথে যৌন-সঙ্গম করেনি, তাই অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হতো। ঐটাই যেন ছিল কুমারীত্বের কষ্টিপাথর। কিন্তু পরবর্তী কালের ক্রমবর্দ্ধমান যৌন-জ্ঞান ঐ ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছে।

অনেক কারণেই সতীচ্ছদ বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে বা যাওয়া সম্ভব, পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম না করা সত্ত্বেও। যেমন ডাক্তার কর্তৃক জননেন্দ্রিয়ের পরীক্ষার কালে, বালিকা বয়েসে নানাবিধ উপায়ে আত্ম-রতির প্রক্রিয়ায়।

আবার এ-ও দেখা গিয়েছে, পুরুষ-সঙ্গমের পরেও বহু দিন পর্যন্ত কোন কোন নারীর সতীচ্ছদ অক্ষুণ্ণই রয়েছে। তার কারণ সতীচ্ছদের স্থিতিস্থাপকতা। কোন কোন বারনারীর সতীচ্ছদ আজীবন অটুট থাকতেও দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করা সত্ত্বেও। সঙ্গমকালে সতীচ্ছদ অটুট থাকলে পূর্ণ সঙ্গমসুখের ব্যাঘাত ঘটায়। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে পুরুষাঙ্গ সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার পায় না, ফলে ব্যথা ও নানাবিধ স্ত্রীরোগ এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর মনে এমন ভীতির উৎপত্তি হয় যাতে করে পুরুষ-সঙ্গমের কল্পনাতেই সে শিউরে উঠে। এবং দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিও আনে।

ঐ সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন অবিলম্বে হওয়া কর্তব্য।

জননেন্দ্রিয়ের অন্তঃত্বক্‌ হ'তে ল্যাকটিক এ্যাসিড জাতীয় এক প্রকার রসের ক্ষরণ হয়। বিভিন্ন নারীর ক্ষেত্রে তার পরিমাণও বিভিন্ন—অর্থাৎ কম-বেশী হয়। দুইটি ঋতুকালীন মধ্যবর্তী সময়েই ক্ষরিত ল্যাকটিক এ্যাসিডের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। শতকরা ·৫ ভাগ থেকে ·১ ভাগ থাকে। ওর চাইতে বেশী ভাগ এ্যাসিডে শুক্রকীট বেঁচে থাকতে পারে না জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে। গর্ভাবস্থায় ও যে সময়টা শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে, ল্যাকটিক এ্যাসিডের পরিমাণ খুব বেশীই থাকে যতদিন না আবার ঋতু দর্শন হয়।

জন্মশাসন ব্যাপারে আজকাল যে সব বহুল-প্রচলিত জেলি ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যেও ল্যাকটিক এ্যাসিড থাকে এবং সেই কারণেই শুক্রকীটকে ধ্বংস করে জন্মনিরোধে সহায়তা করে। এবং আমাদের দেশে যে একটা চলতি বিশ্বাস আছে, সন্তান যত দিন পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ পান করে, তত দিন সহজে গর্ভধারণের ভয় থাকে না, তারও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ঐ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপরিউক্ত দু'টির একটিও নির্ভরযোগ্য নয়।

এই সঙ্গে একটা কথা সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন। আমি বলছি সমস্ত মেয়েদেরই। জননেন্দ্রিয়ের অন্তঃত্বকের শোষণ ক্ষমতা খুব বেশী। কোন প্রকার জলীয় পদার্থকে সহজেই শুষে নিতে পারে। ঐ কারণেই বাজারে আজকাল যে সব বহুল-প্রচারিত পেষ্ট, জেলি, সাপোসিটারী ইত্যাদি জন্মনিরোধের সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, নির্বিচারে সুচিকিৎসকের বিনা পরামর্শে সেগুলি ব্যবহার করা মোটেই কর্তব্য নয়, কারণ ঐ সব জিনিষের মধ্যে নানা জাতীয় ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকতে পারে।

[ক্রমশঃ।

সন্ধ্যা নামে ওই

মনীষা দেবী

সন্ধ্যা নামে ওই মুখে অবগুণ্ঠন টানি,
গগনের ছায়া-পথে কাজল-রেখা আনি।
পরেছে কপালে তারকার টীপ,
হাতে নিয়ে ওই সাঁঝের দীপ,
চলে ধীরে ধীরে, নীরব নদীর তীরে
ফুলের আঙিনায় সুরভিত প্রেম দানি'।
সন্ধ্যা নামে ওই, মুখে অবগুণ্ঠন টানি'
দূর বাতায়নে, কুটীর-প্রাংগণে, মাটীর প্রদীপ জ্বালি,
তুলসীতলে আঁচল গলে লয়ে অর্ঘ্যের থালি।
হাতে আছে তার বলয় কাঁকন
পায়ে মধুর কিঙ্কিণী,
চলিতে চরণে, কতো সুরে গানে
বাজে কতো রিনিঝিনি।
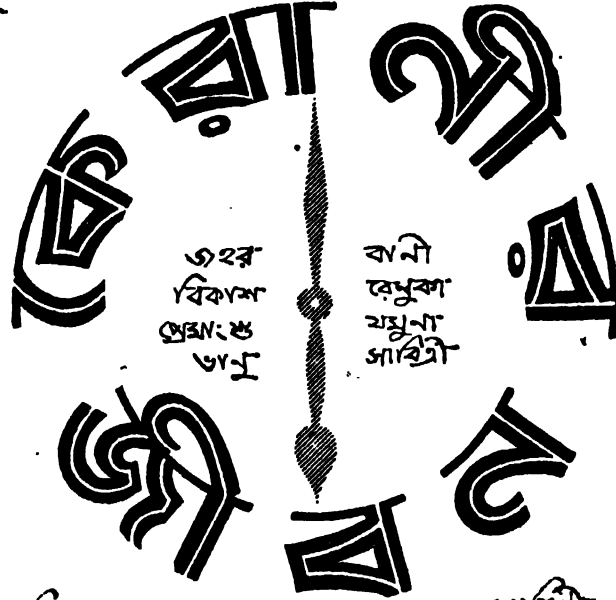
শ্রীরমেন চৌধুরী

টকির টুকিটাকি

মধ্যবিত্ত সমাজের
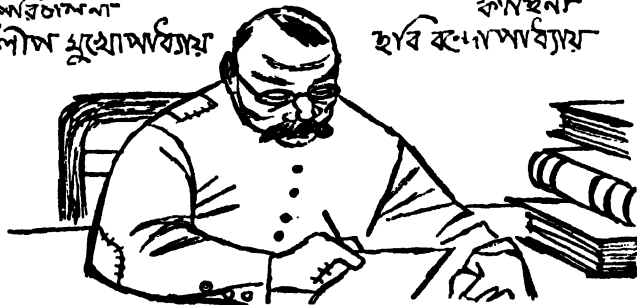
আমরা সকলেই তো লেখনিক বা মসিজীবী—নগ্ন ভাষায় যার অর্থ 'কেরাণী'! অবিশ্যি সবাই উচ্চারণ করে থাকেন আবো তাচ্ছিল্য-ভরা ভংগিতে—ক্যারাণী। এই যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, এ ব্যবহার চলে আসছে কিন্তু সুদীর্ঘ দিন ধরে, বোধ হয় কেরাণী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই আমাদের সমাজের তথা জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ যে কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী, রাসায়নিক, ব্যবহারজীবী, রাজনীতিবেত্তা—এঁরা প্রায় অধিকাংশই এসেছেন এই কেরাণীর ঘর থেকে। কেরাণী মানেই কোনো কৃপার জীব নয়—সুস্থ-সবল মানুষ, অসুস্থ সমাজ-ব্যবস্থায় ততোধিক অসুস্থ জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন যাঁরা। দেশ স্বাধীন হবার পর এই বিরাট সম্প্রদায় সম্বন্ধে সবিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাহলে কোনো কেরাণী নিজেকে কেরাণী বলে স্বীকার করতে লজ্জা পাবেন না মুভি টেকনিক সোসাইটি এই কেরাণীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংখার বিষয়কেই ছায়াছবিতে রূপায়িত করেছেন। আশা করা যায়, বস্তু নির্বাচনে তাঁরা যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, প্রয়োগে তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হবে। ছবিটি বসুশ্রী বীণা-প্রাচী ও শহরতলীর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে গত মে দিবস থেকে। পরিবেশনায় আছেন উদয়ন ডিস্ট্রিবিউটার্স।

দুর্লভ জনম

বৈ কি মানুষ হয়ে পৃথিবীর আলো প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু আজকের এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সে কথা এদেশের ক'জন স্বীকার করবে! বরং বহু মানুষই দুঃখে-দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়ে বলছে উল্টো কথা। আনন্দ পিকচার্সের 'দুর্লভ জনম' চিত্র এই সমস্তার

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওর অভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠতম শিল্পিসহ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। এখনকার ছবি নয়, কিছু কাল পূর্ব্বের ছবি। (বাম থেকে দক্ষিণে) নীতিন বসু, ৺দিনেশ দাস, সুবোধ মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, ৺কুন্দনলাল সায়গল, মুকুল বসু, পি, এন, সিংহ, জাম লাহা, ই এইচ মাসুজী, তিমিরবরণ, হেমচন্দ্র চন্দ্র, ৺প্রমথেশ বড়ুয়া, রাইচাঁদ বড়াল, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, এ ডি মল্লিক, জে এন মিত্র, বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং প্রফুল্ল রায়।

রূঢ় ইংগিত করবে বলে জানা গেছে। মহরতের শুভ মুহূর্তে বহু গণ্যমান্য অভ্যাগতের মাঝে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মা প্রোডাক্শন

বিমানচারীর কথা বলেছেন তাঁদের মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'বৈমানিক' ছবিটিতে। অভিনব প্রচেষ্টা। বোমার কাহিনী ইতিপূর্বে একাধিক চিত্রায়িত হয়েছে কিন্তু ব্যোম-পথ আর তার পথিকদের অদ্যাবধি বাঙলা চিত্রে নায়কের পদ অলংকৃত করতে দেখা যায়নি। সেদিক থেকে এ ছবির আকর্ষণ আছে বলেই মনে হয়। 'বৈমানিক'-এর পরিচালনায় আছেন শ্যাম চক্রবর্তী, পরিবেশনায় গোল্ডেন মুভি কর্পোরেশন, বিভিন্ন চরিত্রে বিকাশ রায়, অসিতবরণ, মঞ্জু দে প্রভৃতি।

বৌঠাকুরাণীর হাট

সাড়ম্বরে উন্মুক্ত হবার পথে। পরিচালক নরেশ মিত্রের এই প্রথম জাঁক-জমক ভরা ছবি—সবাই সাগ্রহে অপেক্ষারত মুক্তি-দিবসের। এমার প্রোডাক্শন বিশেষ তৎপরতার সংগে সমুদয় ব্যবস্থা করে চলেছেন। জনসমাদর-ধন্যা বম্বের নেপথ্য-গীত-গায়িকা লতা মুঙ্গেসকর এ ছবিতে দুখানি রবীন্দ্র-গীতি পরিবেশন করছেন—শ্রীমতী লতারও বাঙলা প্রচেষ্টা এই প্রথম।

নবগঠিত

মীরা প্রোডাক্শনের 'পিতা-পুত্র' একযোগে সবাইকে দেখা দেবার অপেক্ষায় রয়েছে। বিশ্ববাণী ফিল্ম এক্সচেঞ্জ পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন।

'সেবা'-র সেবায়

বিজলী পিক্চার্স উদয়াস্ত ব্যস্ত। চিত্রনাট্য-রচনায় পরিচালক মশাই আত্মসমাহিত, সুর-সংযোজনায় সংগীত-পরিচালক ব্যস্ত, অন্যতম প্রযোজকও চিন্তাকুল—কি করে প্রথম প্রয়াস সুসার্থক করে তুলবেন। আমাদের মত 'বিনা কাজের সেবা'য় ব্যস্ত না থেকে এঁরা যে কাজের সেবায় মগ্ন, এ তো আশার কথা।

গুরুদেবের জীবন-কথার

চিত্রায়ণ অতি গুরু দায়িত্ব। ফিল্ম ট্রেডার্স অভ ইণ্ডিয়াকে সেই জন্য অভিনন্দন জানানোর ফাঁকে দুরূহ এই বিষয়টি সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হতে অনুরোধ জানাই। শিব গড়তে শ্রীরামের অনুচর গড়া আমাদের অভ্যাস, তাই এ সন্দেহ সকলেরই হবে। প্রতিটি জিনিসকে আমরা দিনের পর দিন বিকৃত করে উপস্থিত করছি জনসাধারণের সামনে অথচ তার সংশোধনের আর কোনো পথ নেই। একবার চিত্রায়িত হয়ে গেলে অন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সে পথে হাঁটাও সম্ভব নয়। তাই শুরুতেই আমরা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলি। রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দেখাতে গিয়ে ঘটা করে তার বিপরীত কিছু না করা হয়।

শেষ কথা

কিন্তু সামান্য নয়। আজ বাঙলা ছবির নামকরণে ও বিষয়-বস্তুতে যে রকম রুচিহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে শংকিত হবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। আগে গল্পটা না জেনে কোনো ছবিই

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' চিত্রগ্রহণের সময়ে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং ষ্টুডিওর অন্যান্য কর্মিবৃন্দ।

আর জ্যেষ্ঠ কিংবা কনিষ্ঠের সংগে বসে দেখা চলে না। অধঃপতন কি আমাদের এক দিকে—সহস্র হাতে সর্বনাশ জড়িয়ে ধরেছে পাকে পাকে। আর পরম আশ্চর্যের বিষয়, সেন্সার বোর্ড অবলীলায় এই রকম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে 'u' মার্কা মেরে অর্থাৎ সর্বসাধারণের পাতে পরিবেশন করতে ঢালাও অনুমতি দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। Nepotism ও Favouritism-এর কলংক যে জাতটাকে ধ্বংসের অন্ধকারে ঠেলে দিলো—এ রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি কবে?

কলা-কুশলী

শব্দযন্ত্রী নৃপেন পাল

টালিগঞ্জে shooting? সে কী, খুব বন-জংগল আছে নাকি? ভারি জন্তু টন্তু পাওয়া যায়?

চোখ বিস্ফারিত করে প্রশ্ন করলেন একটি সদ্য M. Sc. পাশ করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কলকাতায় এসেছেন ইনি চাকরির সন্ধানে বেতার অফিসে। হ্যাঁ, বেতারে—অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর বর্তমান কেন্দ্রে। Station Engineer-এর পদ যদি পাওয়া যায় তো মন্দ কি। তৎকালীন সুযোগ্য প্রোগ্রাম-পরিচালক নৃপেন মজুমদার মশাই (বর্তমানে পরলোকগত) সহসা প্রস্তাব করে বসলেন ষ্টুডিয়োয় যোগদানের জন্যে। ষ্টুডিয়োয় হবে shooting। ফলে কর্মপ্রার্থী তরুণটির মুখে ওপরের কথাই আকস্মিক ভাবে ধ্বনিত হয়েছিলো। এই তরুণই আজকের দিনের সফল শব্দযন্ত্রী নৃপেন্দ্রনাথ পাল।

ছায়াছবির ম'ঙ্গায় ধরা দেবার আগের দিন পর্যন্ত শ্রীযুক্ত পাল বায়োস্কোপকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। ছাত্রজীবনের তখনো জের চলছিলো বলে কি না জানি না, তবে সে সময়ের মধ্যে ছবি দেখা তাঁর ঘটে ওঠেনি তেমন। কাজেই shooting যে ছবির রাজ্যে নিত্য-প্রচলিত, এ খবর না রাখায় অপরাধ নেই কিছু।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বর্গত নৃপেন মজুমদার মশায়ের সহায়তায় শব্দযন্ত্রী তথা শব্দবিজ্ঞানী নৃপেন পাল বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার সংগে সংগেই যোগ দিলেন অভাবিত ভাবে চিত্র-জগতে। যে প্রতিষ্ঠানে এলেন তার নাম রাধা ফিল্ম। সেটা ছিলো সোনায় মোড়া দিন—আজকের তুলনায় তো বটেই! রাধার জন্মদিন থেকে আজ পর্যন্ত নানা ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে শ্রীযুক্ত পাল শব্দযন্ত্রের হাল ধরে আছেন সুনিপুণ দক্ষতায়। মুখে সেই প্রসন্ন হাসি, অমায়িক ব্যবহার, নির্ভরযোগ্য আচরণ। কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বৈ কি, এঁর সহায়তায় যন্ত্রের যন্ত্রণা থেকেও অব্যাহতি মেলে। কারণ? কারণ ইনি শব্দ-বিজ্ঞানীও বটেন।

যাই হোক, পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম-এস-সি পাশ করে সহজে কেউ চিত্রশিল্পে আসবে, এ আশা সে যুগে কবি-কল্পনায় সামিল ছিলো। তবু নৃপেন বাবু সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এলেন রাধা ফিল্মে। যন্ত্রপাতির সংগে পরিচয় না থাকলেও নিজে নিজেই সব-কিছু fit করে ফেললেন, শুরু করে দিলেন গভীর বন-জংগলবিহীন টালিগঞ্জে shooting—জন্তু-জানোয়ার নয়, ছায়াছবি। প্রথম শিকার হোলো তাঁর 'শ্রীগৌরাংগ'।

প্রথম ছবি পর্দায় প্রতিফলিত হোলো—অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো 'শ্রীগৌরাংগ'। উৎসাহিত হয়ে উঠলেন শ্রীযুক্ত পাল। যেটুকু অনিশ্চয়তা ছিলো এ লাইনে স্থায়ী হবার, তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। হোক না ভিন্ন মার্গ, তবু তো এ সাধনা—বিজ্ঞানেরই।

ক্রমে অসংখ্য ছবি রাধা ফিল্মে নির্মিত হোলো—বাঙলা, উর্দু, হিন্দি, তামিল প্রভৃতি। বহুক্ষণ প্রচেষ্টার পর নৃপেন বাবু অতীতের কথা যৎসামান্য স্মরণ করতে সক্ষম হলেন, বললেন ছবিগুলির নাম। যেমন, 'চার দরবেশ', 'প্রভাস মিলন', 'কৃষ্ণ সুদামা', 'নর-নারায়ণ', 'ওয়ামক্ এজরা', 'বামন-অবতার', 'জনক নন্দিনী' ও 'রাজা অশোক'। সে সময় রাধার যাবতীয় ছবির শব্দধারণ শ্রীযুক্ত পালই করেছিলেন। অবিশ্যি বছর খানেকের জন্যে ইনিই বিজ্ঞানী-বন্ধু শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ রক্ষিত মশাইকে (বর্তমানে ডক্টর) রাধায় নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ইত্যাদি কয়েকটি ছবি গৃহীত হয়েছিলো।

এই ভাবে বিশেষ যোগ্যতার সংগে কাজ করার মাঝপথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাধা ষ্টুডিয়ো রিকুইজিসান্‌ড হলে বাধ্য হয়ে এঁকে অন্যত্র যোগ দিতে হয়। তবে এবারে আর ষ্টুডিয়োয় নয়—গভর্ণমেণ্ট সায়েণ্টিফিক ষ্টোরে ওয়্যারলেশ সেক্‌শনে। সেখানেও কর্মদক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে শ্রীযুক্ত পালের। যে কাজই হোক না কেন, যোগ্য জনের যোগ্যতা পরিস্ফুট হবেই।

হয়তো নব পরিবেশের মাঝেই নৃপেন বাবু আজ পর্যন্ত আবদ্ধ থাকতেন, সাধারণ্যে আর রূপায়িত হোতো না নাম। সহসা ১৩৪৫ সালে নব ব্যবস্থাপনায় রাধার দ্বারোদ্‌ঘাটন হোলো। সাদরে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত হলেন শব্দযন্ত্রী। হারানো কাজের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে প্রকৃতই ইনি সেদিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

চীফ রেকর্ডিষ্ট হিসাবে বহু ছবিতে নাম সংযুক্ত থাকলেও এঁর ইদানিংকার প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে উল্লেখনীয় হচ্ছে 'রত্নদীপ', 'কবি', 'সাব শংকরনাথ', 'মন্দির', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'ধ্রুব' ও 'কেরাণীর জীবন'; আগতপ্রায় চিত্র 'অভিশাপ', 'নিষ্কৃতি', 'ষোড়শী', 'বিল্বমংগল', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি।

কিছু দিন আগে শ্রীযুক্ত পাল একটি রেকর্ডিং মেসিন প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে কোনো একটি চিত্রের শব্দগ্রহণও করা হয়েছিলো কিন্তু যন্ত্রপাতির অভাবে পরিকল্পনা মত সেটা চালু করতে পারা যায়নি। এখানে অবশ্য স্বীকার্য যে, শব্দযন্ত্রের যাবতীয় ত্রুটি ইনিই স্বয়ং সংশোধন করে নেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ নৃপেন পাল মশাই একাধারে শব্দযন্ত্রী ও শব্দবিজ্ঞানী।

জেনে রাখা ভাল

সে যুগে মালদহ, হুগলী, মেদিনীপুরের নাম যথাক্রমে ছিল
গোদাগিরি, কৌশিকীগুচ্ছ ও সুহ্ম।
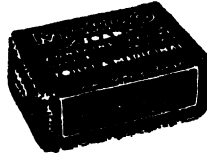
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আইসেনহাওয়ারী শান্তি—

সোভিয়েট রাশিয়ার শান্তির প্রস্তাবের পাল্টা জবাবে মার্কিণ-প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেনহাওয়ার গত ১৬ই এপ্রিল (১৯৫৩) মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় রাশিয়ার নিকট শান্তির জন্ম যে-সকল সর্ত্ত দাবী করিয়াছেন এবং রুশ সংবাদপত্র 'প্রাভদা' এবং 'ইজভেস্তিয়া' এই সকল দাবীর যে-উত্তর দিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই বর্ত্তমান ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মিঃ ওয়াল্টার লিপম্যান বিংশ শতাব্দীতে মার্কিণ বৈদেশিক সম্পর্কের ইতিহাসকে ব্যর্থতার ইতিহাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসামর্থ্যের ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যেদিন মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তৃতা দেন, সেই দিন প্রাতেও মিঃ ওয়াল্টার লিপম্যান নূতন মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এখনও দেশের আশা অনুযায়ী এবং সময়ের উপযোগী নেতৃত্ব, নির্দ্দেশ এবং উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া ওয়াশিংটনে যে-ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের এই বক্তৃতায় মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসামর্থ্যের যুগ শেষ হইয়াছে বলিয়া বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন যে, এই বক্তৃতায় যে-সকল কর্ম্মসূচীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের কাছে নূতন কিছু নয়। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার 'Crusade in Europe' নামক পুস্তকের শেষের কয়েক পাতায় এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 'Crusade in Europe' পুস্তকের উল্লেখে আমাদের আরও একটি কথা মনে পড়িতেছে। জেনারেল আইসেনহাওয়ার এই পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালের শরৎকালের প্রথম ভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠিয়াছিল। অতঃপর এই সৌহার্দ্দ্য আর রহিল না কেন, তাহা ভাবিয়া তিনি এই পুস্তকে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেও খুব বেশী বোধ হয় বিলম্ব নাই। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৌহার্দ্দ্য না টিকিবার কারণ যে তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় যেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তেমনি মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তাঁহার ১৬ই এপ্রিলের বক্তৃতাতেও তাহা সপ্রকাশ।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে শান্তির অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্পর্কে একটা মতভেদ অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতেও দেখা যায়। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় শান্তির জন্ম সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট কতগুলি সর্ত্ত দাবী করিয়াছেন। এই সর্ত্তগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য লইয়াই মতভেদ। এই সর্ত্তগুলির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য্য সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার বক্তৃতায় কতকটা অস্পষ্টতা যে রাখিয়াছেন, তাহা অনস্বীকার্য্য। মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডুলেস ১৮ই এপ্রিল (১৯৫৩) মার্কিণ সংবাদপত্র সম্পাদক সমিতির বৈঠকে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাকে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতার ভাষ্য মনে করিলে ভুল হইবে না। তিনি যাহা অস্পষ্ট, উহ্য এবং অকথিত রাখিয়াছেন মিঃ ডুলেস তাহাকেই সুস্পষ্ট রূপ দিয়াছেন। মিঃ ডুলেস বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "Soviet leadership is now confronted by the Eisenhower tests. Will it meet, one by one the issues with which President Eisenhower has challenged it?" অর্থাৎ 'সোভিয়েট নেতৃত্ব এখন আইসেনহাওয়ার-পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার যে-সকল সর্ত্ত লইয়া সোভিয়েট-নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, সেগুলিকে তাঁহারা একটির পর একটি করিয়া পূরণ করিবেন।' প্রেঃ আইসেনহাওয়ার কতকগুলি সর্ত্ত উপস্থিত করিয়া সোভিয়েট রাশিয়াকে যে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, এ কথাটা অনেকের কাছে ভাল লাগে নাই। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল গত ২০শে এপ্রিল (১৯৫৩) কমন্স সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতাকে আমার চ্যালেঞ্জ বলিয়া মনে হয় না।" 'টাইমস' পত্রিকা ২১শে এপ্রিলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মিঃ চার্চ্চিলের মতই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রেঃ আইসেনহাওয়ার যে-সকল সর্ত্ত দাবী করিয়াছেন সেগুলি সম্পর্কে উত্তর দিবার জন্ম রাশিয়াকে যথেষ্ট সময় দিলেই কি চ্যালেঞ্জ আর চ্যালেঞ্জ থাকে না? এই সকল সর্ত্ত সম্পর্কে উত্তর দিবার জন্ম যদি যথেষ্ট সময় দেওয়াও হয়, তাহা হইলেও একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃত পক্ষে এই সকল সর্ত্তের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম শেষ হওয়ার পর হইতে রাশিয়ার সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্ম যে-সকল সর্ত্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গ দাবী করিয়া আসিতেছে সেগুলির সহিত প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সর্ত্তের মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। তাহা হইলে নূতন করিয়া এই সকল সর্ত্ত দাবী করার সার্থকতা কি? সার্থকতা অনুমান করাও খুব কঠিন নয়। সর্ত্তগুলি আলোচনা করিলে এবং চীন সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের নীরবতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য অনুমান করা কঠিন হয় না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলিতেছে তাহার জন্ম রাশিয়ার আক্রমণাত্মক নীতিকেই দায়ী করা হইয়া থাকে। ষ্ট্যালিন জীবিত থাকা পর্য্যন্ত শান্তির জন্ম রুশ গভর্ণমেণ্টের

আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কোন আন্তরিকতা দেখিতে পান নাই। উহাকে রাশিয়ার কূটকৌশলপূর্ণ প্রচার-কার্য্য বলিয়াই অভিহিত করা হইত। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে রাশিয়ায় অলৌকিক কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন প্রধান মন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভও শান্তির প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কোন সমস্যা নাই যাহার মীমাংসা আলাপ-আলোচনা দ্বারা না হইতে পারে। তাঁহার এই শান্তি-প্রস্তাবের উত্তরেই যে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার গত ১৬ই এপ্রিল তাঁহার বক্তৃতায় শান্তির জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। সোভিয়েট রাশিয়া যে সত্যই শান্তি চায় তাহা পরখ করিবার জন্য তিনি কতগুলি প্রাথমিক দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি যে-সকল কার্য্য দ্বারা শান্তির আকাঙ্ক্ষার আন্তরিকতা প্রমাণ করিতে রাশিয়াকে অনুরোধ করিয়াছেন, বস্তুতঃ সেইগুলিই শান্তির জন্য প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের প্রাথমিক দাবী। 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়া' প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া শান্তির জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহাতে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের উপর কোন প্রাথমিক সর্ত্ত আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু প্রেঃ আইসেনহাওয়ার রাশিয়ার সহযোগিতার জন্য তাঁহার আবেদনে শান্তির প্রস্তাবের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট কতগুলি প্রাথমিক সর্ত্ত দাবী করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। শান্তির জন্য রাশিয়ার আকাঙ্ক্ষা যে আন্তরিক ও অকৃত্রিম, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য রাশিয়াকে শুধু সঙ্গত যুদ্ধবিরতির জন্যই নয়, সমগ্র এশিয়ায় প্রকৃত শান্তি স্থাপনের জন্য কম্যুনিষ্ট-জগতের উপর অস্ত্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ সহ কার্য্যকরী প্রভাব প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রাথমিক সর্ত্তগুলির মধ্যে ইহা একটি সর্ত্ত। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার এই সর্ত্তের যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, কোরিয়ায় সম্মানজনক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন হইবে শান্তির পথে প্রথম বৃহৎ পাদক্ষেপ। 'সম্মানজনক' বলিতে তিনি যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই সম্মানজনক যুদ্ধবিরতি চাহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু এইটুকু চাহিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ইন্দোচীন ও মালয়ের নিরাপত্তার উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আক্রমণ বন্ধ করিবার দাবী করিয়াছেন। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে, আক্রমণাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র যদি অন্যত্র নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি একটা ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই হইবে না। তাঁহার প্রাথমিক সর্ত্তাবলীর প্রথম সর্ত্তে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ইন্দোচীনে ও মালয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা ইন্দোচীন ও মালয়ের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পরোক্ষ আক্রমণ মাত্র। শুধু কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হইলেই চলিবে না, ইন্দোচীন ও মালয়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামকেও কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। এশিয়াবাসীর কাছে এই সর্ত্ত কিরূপ শ্রুতি-সুখকর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার দ্বিতীয় সর্ত্তে দাবী করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলি সহ অন্যান্য সমস্ত দেশকে তাহাদের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে এবং পৃথিবীব্যাপী আইনসঙ্গত ব্যবস্থার অন্তর্গত অন্যান্য দেশের সহিত স্বাধীন ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দিতে হইবে। এই সর্ত্ত সম্পর্কে 'প্রাভদা' এবং 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাই আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই যে, পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বাহির হইতে জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাই প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা উহার বিপরীত। প্রকৃত ঘটনাবলী হইতে দেখা যায়, পূর্ব্ব-ইউরোপের জনগণ তাহাদের অধিকার অর্জ্জনের জন্য দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করিয়াই জনগণের গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছে এবং এই নূতন অবস্থার মধ্যেই তাহারা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতঃপর উক্ত পত্রিকাদ্বয় বলিয়াছেন যে, ঐ দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্ট পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করিবে, ইহা আশা করা বিস্ময়কর ব্যাপার! উক্ত পত্রিকাদ্বয় প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের দ্বিতীয় সর্ত্তের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা খুবই সুস্পষ্ট। এই দ্বিতীয় সর্ত্তের উদ্দেশ্য যে-সকল দেশে জনগণের গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে, সেই সকল দেশে আবার পুঁজিপতিদের গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য রাশিয়াকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার তৃতীয় সর্ত্তে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীনে নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব সম্পর্কে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য রাশিয়াকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস ও পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত রাশিয়ার মতভেদ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে বহু বার আলোচিত হইয়াছে। পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ-কৌশল একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই একচেটিয়া থাকিবে, কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্র পরমাণু বোমা নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতে পারিবে না এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৈরী পরমাণু বোমাগুলি তো অটুট রাখিবেই, অধিকন্তু তাহার নূতন পরমাণু বোমা তৈয়ারীর কাজও অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে। রাশিয়াও এখন পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে পারিয়াছে। কাজেই পরমাণু বোমা শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই একচেটিয়া, এ কথা এখন আর বলা চলে না। কিন্তু রাশিয়ার তুলনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমার সংখ্যা অনেক বেশী। এই জন্যই নিরস্ত্রীকরণের সমস্যার কোন সমাধান হইতেছে না। পরমাণু বোমার উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভরসা যে অনেকখানি, প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার বক্তৃতায় তাহা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "গত আট বৎসর যাবৎ যে-ধারা চলিয়া আসিতেছে, তাহার মোড় ঘুরাইবার কোন ব্যবস্থা যদি না হয় তাহা হইলে তাহার আরো মন্দের দিক দিয়া পরমাণু বোমার সংগ্রাহে গভীরতম আতঙ্ক এবং বড় জোর চিরদিনই আশঙ্কা ও উত্তেজনার মধ্যে কালাতিপাতের আশা করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।" তাঁহার এই উক্তির মধ্যে পরমাণু বোমার যে হুমকী রহিয়াছে তাহা 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়ার' দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে উক্ত পত্রিকা দুইটিতে বলা হইয়াছে, "মিঃ আইসেনহাওয়ারের বিবৃতিতে যাহারা শান্তি প্রতিষ্ঠা

প্রকৃত অভিপ্রায় দেখিতে চাহেন, তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বিবৃতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া পরমাণু বোমা যুদ্ধের হুমকী দেন কেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিবেন না।” এই ধরণের হুমকী রাশিয়াকে অনুপ্রাণিত করিবে, প্রেঃ আইসেনহাওয়ার যদি এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে উহার মত ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। এই হুমকীর প্রতিক্রিয়া রুশ গবর্ণমেণ্টের উপর কিরূপ হওয়া সম্ভব, তাহার ইঙ্গিতও উক্ত পত্রিকা দুইটি দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে এ সম্পর্কে বলিতে পারা যায় যে, এই ধরণের হুমকীতে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতিতে একটা যুগের অবসান হইয়াছে এবং আরম্ভ হইয়াছে নূতন যুগের, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই যে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার পরমাণু যুদ্ধের হুমকী দিয়াছেন ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার বিবৃতিতে রুশ পররাষ্ট্র নীতিতে একটা যুগ শেষ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে 'প্রাভদা' পত্রিকা বলিয়াছেন যে, কোন গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা নূতন এক ব্যক্তি হইলেই যদি এক যুগের শেষ বা নূতন যুগের আরম্ভ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আইসেনহাওয়ারের গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় মার্কিণ নীতিতেও একটা যুগের শেষ হইয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু নূতন প্রেসিডেণ্ট তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর নীতিই অনুসরণ করিতেছেন। বস্তুতঃ রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে যেমন একটা যুগের শেষ হয় নাই, তেমনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় নূতন যুগ আরম্ভ হয় নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার বিবৃতিতে হিটলারের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর ভিন্ন পথে চলার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে ঠিক, উক্ত সোভিয়েট পত্রিকাদ্বয় সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, মিঃ আইসেনহাওয়ার এই ঘটনাটির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাপারটা প্রকৃত পক্ষে কি, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। তবু উক্ত পত্রিকাদ্বয় উহার উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পূর্ব্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের সম্বন্ধটা বন্ধুত্বপূর্ণ, এ কথা বলা চলে না। যুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের মৈত্রী গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক তাহাদের প্রাক্-যুদ্ধপথে চলিতে আরম্ভ করে। পত্রিকাদ্বয়ের এই উক্তি অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এমন কি হিটলারকে পরাজিত করিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের যে-কৃত্রিম মৈত্রী গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাও ছিল অত্যন্ত শিথিল। এখানে সে কাহিনী উল্লেখ করিবার স্থান আমরা পাইব না, শুধু একটি কথা এখানে আমরা উল্লেখ করিব। ১৯৪৮ সালের ১২ই জুলাই একটি মার্কিণ পত্রিকা এক সংবাদ প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার ডেপুটী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ ভিসিনস্কী বৈদেশিক সংবাদপত্র সমিতিকে সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করার দুই দিন পরে এক জন বিশিষ্ট মার্কিণ রাজনীতিক বলিয়াছিলেন, "If we see that Germany is winning we ought to help Russia, and if Russia is winning we ought to help Germany and that way let them kill as many as passible." অর্থাৎ 'যদি আমরা দেখিতে পাই যে, জার্ম্মাণী জয়লাভ করিতেছে, তাহা হইলে আমাদের রাশিয়াকে সাহায্য করা উচিত এবং রাশিয়া জয়লাভ করিতে থাকিলে আমাদের উচিত হইবে জার্ম্মাণীকে সাহায্য করা এবং তাহারা তাহাদিগকে যত পারে হত্যা করিতে দিতে হইবে।' 'নিউইয়র্ক টাইম' পত্রিকার ফাইল ঘাঁটিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪১ সালের ২৪শে জুন এক জন বিশিষ্ট মার্কিণ রাজনীতিক ঐ কথা বলিয়াছেন। তিনি হইতেছেন সিনেটার হেরি এস টুম্যান। ইনি রুজভেল্টের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। এই উক্তির মধ্যেই কি রাশিয়া সম্পর্কে মার্কিণ মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যায় না? শেরউডের লিখিত 'Roosevelt and Hopkins' নাম পুস্তকেও অনেক তথ্যাদি পাওয়া যায়। হেনরী ওয়ালেস 'নিউ রিপাবলিকে'র ১৯৪৮ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন যে, যে-সকল ব্যবসায়ী রাশিয়াকে পরবর্ত্তী শত্রু মনে করেন এবং সেই জন্য পরবর্ত্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সামরিক বিভাগের একটি শক্তিশালী দল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহাদের সহিত একযোগে কাজ করিতেছিলেন। সুতরাং রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ মার্কিণ ব্লকের প্রকৃত মৈত্রী যুদ্ধের সময়েও হয় নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার সুদীর্ঘ বিবৃতিতে চীন সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, ইহা কাহারও দৃষ্টিই এড়াইতে পারে না। এই নীরবতা যে খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ, সে কথা অনস্বীকার্য্য। এই নীরবতার তাৎপর্য্য কি, তাহা সোভিয়েট পত্রিকা 'প্রাভদা' এবং 'ইজভেস্তিয়া' উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, চীনের প্রশ্ন উল্লেখ না করার অর্থ হইতেছে, চীনের যে-সকল ঘটনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিতেছে সেগুলির গতি পশ্চাদ্বর্ত্তী করিবার নীতি দৃঢ়তার সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে। চীনের যে ঘটনাবলীর অগ্রগতির কথা উক্ত পত্রিকাদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির কথা আমরা সকলেই জানি। চীনা কম্যুনিষ্টরা চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত করিয়া চীনে জনগণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং চীনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে চীনে আবার চিয়াং কাইশেকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহাও জানা কথা। চীন সম্পর্কে এই মার্কিণ নীতি প্রেঃ আইসেনহাওয়ার দৃঢ়তার সহিতই অনুসরণ করিবেন বলিয়াই চীন সম্পর্কে কোন কথা তাঁহার বিবৃতিতে স্থান পায় নাই। আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর মধ্যে চীনের সমস্যাই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যাকে বাদ দিয়া শান্তি স্থাপনের কোন চেষ্টাই সাফল্যলাভ করিতে পারে না। প্রজাতন্ত্রী চীনকে যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন দেওয়া না হয়, চীন আক্রমণের জন্য ফরমোসায় চিয়াং গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য দেওয়া যদি বন্ধ করা না হয়, তাহা হইলে শান্তি স্থাপিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রেঃ আইসেনহাওয়ার এই দুইটি কাজ করিতে রাজী নহেন অর্থাৎ চীনে চিয়াং কাইশেকের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজ অব্যাহত ভাবেই চলিতে

থাকিবে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের অভিপ্রায় আন্তরিক, এ কথা স্বীকার করা অসম্ভব। তবু বিশ্ব সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করিতে রাশিয়ার আন্তরিক আগ্রহ 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকা সুস্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রেঃ আইসেনহাওয়ার এক হাতে শান্তির শ্বেত পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন, তাঁহার আর এক হাতে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুতির খড়গ উদ্যত রহিয়াছে। তাঁহার ১৬ই এপ্রিলের বিবৃতির কয়েক দিন পরে প্যারীতে আটলান্টিক চুক্তি পরিষদের যে-অধিবেশন হয়, তাহাতে বাণী প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বশান্তির জন্ম আটলান্টিক চুক্তিপরিষদের কর্মসূচীর সাফল্য একান্ত প্রয়োজন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। মিঃ ডালসের নেতৃত্বে আটলান্টিক চুক্তি পরিষদের ১৪ জন সদস্যও এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, রাশিয়া তাহার কৌশলের পরিবর্তন করিয়াছে, কিন্তু তাহার নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই উক্ত পরিষদের মিলিটারী কমিটিতে রাশিয়া সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ার সামরিক শক্তি এখনও পশ্চিম-ইউরোপের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, গত বৎসর রাশিয়া উল্লেখযোগ্যরূপে তাহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে নাই এবং লৌহ-যবনিকার অন্তরালে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইহা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধের জন্ম ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতেছে। এই প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিতেছে না শুধু দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্ম। মালয়ে বৃটেনের ৩০ হাজার সৈন্য রহিয়াছে, কোরিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে দুই ব্রিগেড সৈন্য। তাছাড়া হংকংয়ে, কেনিয়ায়, সুয়েজ ক্যানেলে এবং অন্যান্য স্থানেও অল্পবিস্তর সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইতেছে। ইন্দোচীনে ফ্রান্সকে বড় রকমেরই লড়াই চালাইতে হইতেছে। কোরিয়া, ইন্দোচীন এবং মালয়ে শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম-ইউরোপের সামরিক শক্তি সুদৃঢ় ও বর্দ্ধিত করিবার কোন উপায় নাই। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দৃষ্টিতে অধীন দেশগুলির স্বাধীনতা-দাবী এবং কম্যুনিজমের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। মালয়ে কম্যুনিষ্ট দমনের ব্যবস্থাকে বৃটেন রাশিয়ার সহিত পরোক্ষ সংগ্রাম বলিয়াই মনে করে। ফ্রান্স মনে করে, ইন্দোচীনে রাশিয়াই প্রক্সী দ্বারা যুদ্ধ চালাইতেছে। কাজেই যুদ্ধাশঙ্কা দূর করিতে হইলে রাশিয়ার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক, ইহাই তাহাদের ধারণা। ইহাই ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের শান্তির আদর্শ।

লাওসের মুক্তি-সংগ্রাম—

গত ১০ই এপ্রিল (১৯৫৩) হইতে ইন্দোচীনের লাওস রাজ্যে ভিয়েটমিন বাহিনীর যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম একটি দিক মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। এই আক্রমণ অতর্কিত ভাবে আরম্ভ হইয়াছে এ কথাও ঠিক নয়। কোরিয়া যুদ্ধবিরতির বর্তমান পর্য্যায় আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই, আবার যুদ্ধবিরতি আরম্ভ হইবে এইরূপ সম্ভাবনাও যখন ছিল না তখনই লাওস অভিযানের আশঙ্কা সম্পর্কে কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ক্লার্ক তাঁহার ইন্দোচীন পরিদর্শনের সময় ফ্রান্সকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ফরাসী সামরিক কর্ত্তারাও প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন যে, ত্রিশ হাজার নিয়মিত সেনাবাহিনী লইয়া হো-চি-মিন নূতন অভিযানের জন্ম তৈয়ারী হইতেছেন। সুতরাং আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ম ফরাসী সামরিক কর্ত্তারা সময় পান নাই, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মার্শাল পরিকল্পনায় ফ্রান্স যে অর্থ পাইতেছে, তাহা সমস্তই এবং উহা ব্যতীত উহার সমপরিমাণ আরও অর্থ ফ্রান্স ইন্দোচীনের যুদ্ধে ব্যয় করিতেছে। ইহা ছাড়াও ১৯৫০ সাল হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনের জন্ম স্বতন্ত্র ভাবে দরাজ হস্তে সামরিক সাহায্য দিতেছে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্ম ইন্দোচীনে মার্কিণ সামরিক উপদেষ্টারা রহিয়াছেন। তা সত্ত্বেও গত ছয় বৎসরের যুদ্ধে ফ্রান্স কতগুলি সহর এবং সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী কতক অংশ ছাড়া আর কিছুই দখলে রাখিতে পারে নাই। লাওসে অভিযান আরম্ভ হওয়ার প্রায় দশ দিনের মধ্যেই রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ভিয়েট-মিনদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। গত ২১শে এপ্রিল (১৯৫৩) ভিয়েটমিন রেডিও হইতে স্বাধীন লাওস গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার এবং সমগ্র সাম নিউয়া প্রদেশ মুক্ত করার সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে লাওসে যুদ্ধের অবস্থা কি, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না। ইন্দোচীনে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ এমন কঠোর ও ব্যাপক ভাবে সেন্সর করেন যে, গোটা সংবাদটাই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। গত গ্রীষ্মকালে কম্যুনিষ্টরা ভিয়েটনামী সৈন্যের দুইটি কোম্পানীকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে। যাহা ঘটিয়াছে ঠিক সেই ভাবেই সংবাদদাতারা সংবাদ রচনা করেন। কিন্তু সেন্সর বিভাগ কর্ত্তৃক এই সংবাদ যখন নূতন করিয়া লিখিত হইল, তখন দেখা গেল, তাহাতে বলা হইয়াছে বহুসংখ্যক ভিয়েটনামী সৈন্য ভিয়েটমিনদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কম্যুনিষ্ট চীন ভিয়েটমিনকে সামরিক সাহায্য দিয়া থাকে বলিয়া ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার করিয়া থাকেন। যদি এই সাহায্য দেওয়ার কথা সত্যই হয়, তাহা হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনের জন্ম ফ্রান্সকে যে সাহায্য দিয়া থাকে, সে তুলনায় ভিয়েটমিনকে কম্যুনিষ্ট চীন যে সাহায্য দেয় তাহা অতি নগণ্য। ভিয়েটমিনদের অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র যাহাই থাকুক, তাহাদের বিমানও নাই, ট্যাঙ্কও নাই, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কম্যুনিষ্ট চীন ভিয়েটমিনকে সাহায্য করুক আর না-ই করুক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনে ফ্রান্সকে যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র দিতেছে, তাহার বেশীর ভাগই ভিয়েটমিনদের হাতে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ। তাছাড়া মার্কিণ সাহায্য হইতে বাও দাই এবং তাঁহার দল-বল প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতেছে বলিয়াও শোনা যায়। বস্তুতঃ ইন্দোচীনেও চীনের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সর্ব্বোপরি ভিয়েটনামীরা ফরাসী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ম জীবন দিতে রাজী নয়। বাও দাইকে তাহারা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল বলিয়া মনে করে। সমগ্র ইন্দোচীনের জনসাধারণই ফ্রান্সের বিরোধী। ভিয়েটনামী সৈন্যের ৫৫টি ব্যাটেলিয়ন গঠনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই সকল

সৈন্য যে ফ্রান্সের অনুগত থাকিবে, ভিয়েটমিনদের পক্ষে যোগদান করিবে না, সে-সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নাই।

লাওসে ভিয়েটমিনদের যে অভিযান চলিতেছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন। গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৫৩) ভিয়েটমিন রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, লাওসে একটিও ভিয়েটমিন সৈন্য নাই, লাওটিয়রাই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। এই ঘোষণাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বলিতে হয়, লাওসে বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। হো-চি-মিনের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ৫০ হাজার সৈন্য সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এই ৫০ হাজার সৈন্যকে এ পর্য্যন্ত দুইবার মাত্র অভিযানে নিয়োগ করা হইয়াছে। কাজেই লাওসে লাওটিয়রাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? লাওস ও কাম্বোডিয়াকে ফ্রান্স স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিলেও কার্য্যতঃ উহাদের কোন স্বাধীনতাই নাই। ভিয়েটনাম, কাম্বোডিয়া এবং লাওস এই তিনটিকে বলা হয় ফরাসী ইউনিয়নে 'এসোসিয়েটেড' রাষ্ট্র। এই 'এসোসিয়েটেড' রাষ্ট্র যে প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য বা উপনিবেশেরই নূতন নামকরণ, তাহা ইন্দোচীনের অধিবাসীরা ভাল করিয়াই বুঝিতেছে। কাম্বোডিয়ার রাজা সুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভিয়েটমিনরা ইন্দোচীনের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিতেছে, জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে। বিশিষ্ট লাওটিয় নেতারাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইন্দোচীনে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক শক্তির সহিত জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। কিন্তু এ সব কথা ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের কাছে ভাল লাগিবে কেন? তাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অতিদ্রুত ইন্দোচীনে সমর-সম্ভার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু শুধু অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়াই কোন ফল হইবে না, তাহাও মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কগণ ভাল করিয়াই বুঝিতেছেন। ভিয়েটমিন কর্ত্তৃক লাওস আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদন করিবার জন্য ফ্রান্সকে রাজী করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। ফ্রান্স যদি রাজী হয়, তাহা হইলে ইন্দোচীন যে দ্বিতীয় কোরিয়ায় পরিণত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোরিয়ায়, ইন্দোচীনে এবং মালয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম দমনের জন্য যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাকে যদি রুশ কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে কেনিয়ায় মাউ মাউ আন্দোলন দমন এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষ নীতিকেও রুশ কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিতেও বিলম্ব হইবে না।

কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণ করিতে হইলে ইন্দোচীন হইবে প্রধান ঘাঁটি। মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন যে, ইন্দোচীনকে হারাইলে সমগ্র সুদূর-প্রাচ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলতার একটা লহর গড়িয়া উঠিবে। সুতরাং ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে বিধ্বস্ত করিতেই হইবে। আর কি করিতে হইবে? মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন, "ফরমোসাস্থিত চীনা সৈন্যবাহিনীর কার্য্যকরী শক্তিকে আরও শক্তিশালী করিতে হইবে। ফরমোসা যদি সামরিক দিক হইতে শক্তিশালী হয় এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত হয়, তাহা হইলে এশিয়ার নিপীড়িত লোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করা সহজ হইবে।" এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটে ৫৮০ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্যের বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪০০ কোটি ডলারই বরাদ্দ করা হইয়াছে সামরিক সাহায্যের জন্য। উহার অর্দ্ধেকের বেশী পাইবে ইউরোপ। ইন্দোচীনে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ৪০ কোটি ডলার সামরিক সাহায্য দেওয়া হইবে। এশিয়ায় যত দিন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র ও ডলার ব্যয়িত হইবে, পৃথিবীতে তত দিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব—

কেনিয়ার জাতীয় আন্দোলনের নেতা জোমো কেনিয়াট্টা এবং তাঁহার পাঁচ জন সহকর্ম্মীর সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও কেনিয়ার কিকুয়ুদের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধাবস্থা, দক্ষিণ রোডেশিয়ায় বৃটিশ কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন গঠনের জন্য ভোট গ্রহণ এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় সাম্প্রতিক সাধারণ নির্ব্বাচনে ডাঃ মালান এবং তাঁহার ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা-লাভ আফ্রিকার অধিবাসী কাফ্রিদের প্রকৃত সমস্যা এবং শ্বেতকায়দের ঔপনিবেশিক বর্ব্বরতার যথার্থ স্বরূপ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা অবশ্য কাহারও অজানা নয়। 'স্বাধীন বিশ্ব', 'মানবিক অধিকার' প্রভৃতি গালভরা কথার আবরণে সাম্রাজ্যবাদীদের নৃশংসতা কিরূপ নির্লজ্জতায় অভ্রভেদী হইয়া উঠে তাহা মালয়ে যেমন আমরা দেখিতেছি, তেমনি দেখিতে পাইতেছি আফ্রিকায়। আফ্রিকায় শ্বেতকায়দের অপ্রতিহত প্রভুত্বকে আরও ব্যাপক ও চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থার পরিচয় উপরে উল্লিখিত ঘটনাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায়।

ডাঃ মালানের জয়

সাধারণ নির্ব্বাচনে ডাঃ মালান ও তাঁহার দল জয়লাভ করায় বর্ণবিদ্বেষের বিজয়-গৌরবই সূচিত হইতেছে। ইউনাইটেড পার্টি জয়লাভ করিলেই যে ইহার অন্যথা হইত তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্বেতকায়রাই এই নির্ব্বাচনে ভোটার। এই নির্ব্বাচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অশ্বেতকায়দের উপর শ্বেতকায়দের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ডাঃ মালানের উপরেই এই সকল ভোটারের অধিকতর আস্থা রহিয়াছে। 'কৃষ্ণকায়দের বিপদ হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকাকে রক্ষা করুন' (save South Africa from Black peril) এই ধ্বনি তুলিয়াই ডাঃ মালান জয়লাভ করিয়াছেন। অশ্বেতকায়দিগকে কিরূপ চরম নিষ্ঠুরতার সহিত দমন করা আবশ্যক, তাহা বুঝাইবার জন্য ভোটারদের কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে কেনিয়ার দৃষ্টান্ত। নির্ব্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করায় ডাঃ মালান এবার দ্বিগুণ উৎসাহে অশ্বেতকায়দের নির্য্যাতনে আত্মনিয়োগ করিবেন। বিরোধী দল ইউনাইটেড পার্টির সমর্থন হইতেও যে তিনি বঞ্চিত হইবেন না, ইহাও নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়।

কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন

দক্ষিণ রোডেশিয়া, উত্তর-রোডেশিয়া এবং ন্যাসাল্যাণ্ড লইয়া বৃটিশ কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন গঠনের জন্ত গত এপ্রিল মাসের (১৯৫৩) প্রথম দিকে দক্ষিণ-রোডেশিয়ায় যে ভোট গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য কাফ্রিদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। দক্ষিণ-রোডেশিয়ায় ৪৯ হাজার ভোটারের মধ্যে ৪৭ হাজার ভোটারই ইউরোপীয়। কাফ্রি ভোটার ৪২১ জন, বর্ণসঙ্কর ভোটার ৫৩৫ জন এবং ৫৩৫ জন এশীয় ভোটার। উল্লিখিত তিনটি দেশে কাফ্রীদের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ, এশীয়দের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৫ হাজার, এবং ইউরোপীয়দের সংখ্যা ২ লক্ষ। দক্ষিণ-রোডেশিয়ায় যে ভোট গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ২৫,৫৭০ জন ভোটার ফেডারেশনের পক্ষে এবং ফেডারেশনের বিপক্ষ ১৪,৭২৯ জন্ত ভোটার। ৬৪ লক্ষ কাফ্রির ভাগ্য যদি দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের উপর নির্ভর করে, তবে ইহার মত বিপজ্জনক আর কিছুই হইতে পারে না। এই ফেডারেশন দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিণত হইবে।

কেনিযায বৃটিশ নির্য্যাতন

কেনিয়ায় জোমো কেনিয়াট্টার বিচারের প্রহসন বালগঙ্গাধর-তিলকের বিচারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কেনিয়াটা তাঁহার স্বজাতিদেরই আস্থাভাজন নেতাই শুধু নহেন, কিকুয়ু ছাড়া অন্যান্য উপজাতীয় কাফ্রিরাও তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিয়া থাকে। কেনিয়াটা এবং তাঁহার পাঁচ জন সহকর্ম্মীর বিরুদ্ধে কি অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে? তাঁহারা মাউমাউ আন্দোলনের সদস্য এবং এই আন্দোলন তাঁহারাই পরিচালন করিয়া থাকেন, এই অভিযোগের একটি মাত্র প্রমাণ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ র‍্যান্সলে থ্যাকার তাঁহার রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। গত অক্টোবর মাসে (১৯৫২) কেনিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পরও কেনিয়াটা মাউ মাউ শপথ গ্রহণ করাইয়াছেন এবং অন্যান্য আসামীরা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রমাণটি যেরূপ তাহাতে উহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াও মনে হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ থ্যাকারের রাজনৈতিক উক্তিগুলি স্মরণ করিলে বলিতে হয়, তাঁহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে হইবে বলিয়াই এই প্রমাণ তিনি আগ্রহের সহিত বিশ্বাস করিয়াছেন। বৃটিশ ন্যায়-বিচারের অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্টই আছে। কেহ অবশ্য বলিতে পারেন যে, ইহা অপেক্ষাও কঠোর শাস্তি যে তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই, ইহাই তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য। কথাটা বোধ হয় ঠিকই। কারণ, তাঁহাদের প্রকৃত অপরাধ—তাঁহারা কেনিয়া হইতে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার এবং শ্বেতাঙ্গ-রাজত্ব বিলোপ করিতে চান।

মাউ মাউদের অত্যাচার-কাহিনী বেশ ফলাও করিয়াই প্রচার করা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কিকুয়ু জাতির উপর কিরূপ জঘন্য নৃশংস অত্যাচার চালাইয়া থাকে, কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী জোসেফ মুরুম্বি কিছু দিন পূর্ব্বে নয়া দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাহা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। হাজার হাজার লোককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইতেছে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছে। কাফ্রি নারীদের উপর ব্যাপক-ভাবে বলাৎকার পর্য্যন্ত করা হইতেছে। কিকুয়ুদের গ্রামে উপর হইতে বোমা বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করা হয় নাই। বস্তুতঃ মালয়ে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেমন যুদ্ধ চালাইতেছেন, কেনিয়ার মাউ মাউদের বিরুদ্ধে অনুরূপ যুদ্ধই চলিতেছে।

ব্রহ্মের অভিযোগের ভাগ্য—

ব্রহ্মদেশে অবস্থিত কুয়োমিণ্টাং সৈন্য সংক্রান্ত ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অভিযোগ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা শুধু ডন'কুইজোটের কার্য্যকলাপই স্মরণ করাইয়া দিতে সমর্থ। এই প্রস্তাবে কি ফরমোসা গবর্ণমেণ্ট, কি কুয়োমিণ্টাং সৈন্য কাহারও কোন নাম-গন্ধও নাই। ব্রহ্মদেশে যে-বিদেশী সৈন্য আছে তাহাদিগকে অবিলম্বে নিরস্ত্র, বন্দী বা ব্রহ্মত্যাগ করিতে বাধ্য করার কথাই শুধু প্রস্তাবে আছে। ইহারা যে কুয়োমিণ্টাং সৈন্য, এ কথা স্বীকার করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি আছে বলিয়াই ইহাদিগকে বিদেশী সৈন্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ফরমোসা গবর্ণমেণ্টকে পররাজ্য আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিবার দাবী লইয়া ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয় তাঁবেদার চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করার সামান্য সৎসাহসটুকুও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রদর্শন করিতে পারে নাই। সুতরাং গোদা পায়ের লাথির মত এই প্রস্তাবের কোন মূল্য আছে বলিয়াই স্বীকার করা যায় না।

ফরমোসা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশস্থ কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদের উপর ফরমোসা গবর্ণমেণ্টের প্রভাব আছে বটে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ নাই। প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য লইয়া দার্শনিক আলোচনা করিবার জন্যই যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতাম না। কিন্তু ব্রহ্মদেশস্থ কুয়োমিণ্টাং সৈন্যরা তাহাদের নূতন উর্দ্দী, নূতন অস্ত্র-শস্ত্র কোথায় হইতে পাইতেছে? যাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না তাহাদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ দিয়া কেহ সাহায্য করে কি? চীন জয়ের জন্য চিয়াং কাইশেক এই সকল সৈন্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছেন। অথচ তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ফরমোসা গবর্ণমেণ্টের নাই, এ কথাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? ফরমোসা যে এই সকল সৈন্যকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছে, তাহাই বা ফরমোসা কোথায় পাইল? এই সকল প্রশ্ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কেহই অনুভব করেন নাই। কাজেই গৃহীত প্রস্তাব কার্য্যকরী হওয়া সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

-আগামী সংখ্যায়-

আপনার ছেলে কি করবে?

যে-সকল ছাত্র পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাচ্ছে, তারা কি কি পড়তে পারে এবং শিখতে পারে এবং জীবন-পথে উন্নতি করতে পারে তারই ফিরিস্তি।
অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ছাত্রদের অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের জন্য লেখা।
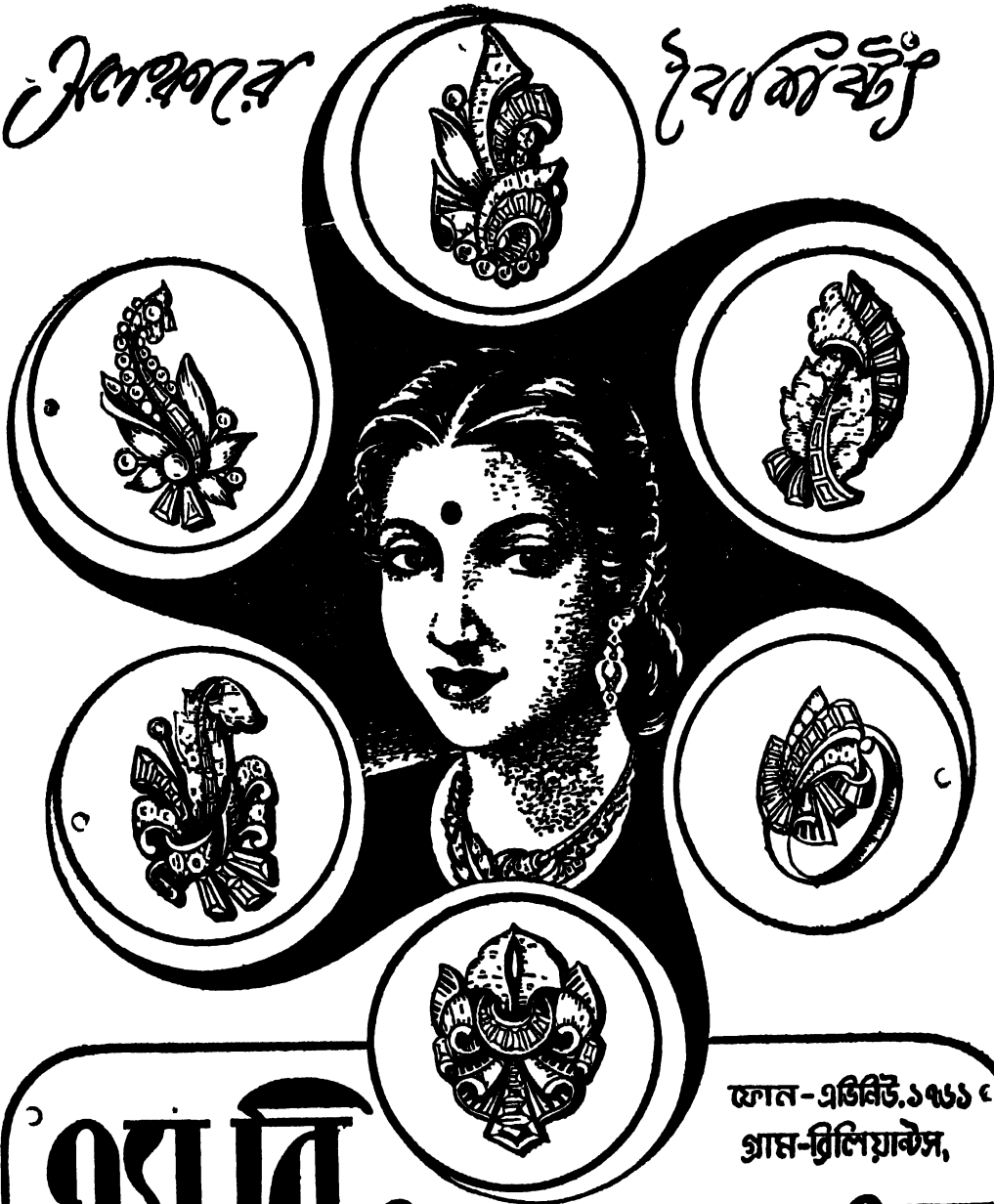
অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য
ফোন-এভিনিউ.১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল) আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীত দিকে
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ: ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা : ফোন পি,কে, ৪৪৬৬

আকাশ-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সূর্য্য যেন আজ ভোর থেকেই মাতলামি শুরু ক'রেছে। শরৎ-আকাশের পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের রাশি কোথা থেকে ভেসে আসছে নীরব স্বচ্ছন্দ গতিতে। রাশি রাশি মেঘে গলিত রৌপ্যের শুভ্রতা। সূর্য্য কখনও হাস্যময়, কখনও স্তব্ধ গম্ভীর। কখনও তার আত্মপ্রকাশ আর কখনও আত্মগোপন। আলো-ছায়ার খেলা চ'লেছে শহর কলকাতায়। উড়ু-উড়ু বাতাস বইছে। সূর্য্যরশ্মিজালে নেই তেমন প্রাখর্য্য। আজকের আবহাওয়া যেন সকল মানুষকে করেছে অন্যমনা। কর্ম্মক্ষম মানুষও আলস্যমগ্ন হয়ে আছে যেন! বাতাসে কি ঝঞ্ঝার ইঙ্গিত! মাটির ধূলা বৃত্তাকারে পাক খেতে-খেতে আকাশমুখী হয়ে উড়ছে ঊর্দ্ধগতিতে। শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি শোনা যায়। দূর-দূরান্তর থেকে উড়ে-আসা শ্বেতপক্ষীর ঝাঁক, কলকাতার আকাশ-পথে উড়ে চ'লেছে দূরে, বহু দূরে। বলাকার সারি একেকটি, উড়ছে দল বেঁধে। মৎস্যলোভী বক অসংখ্য। চিৎপুরের মসজিদের মিনারের ফাঁকে সূর্য্যের খেলা দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে যায় গহরজান। একটা ভজন গানের একটা কলি গুন-গুন করে গাইতে গাইতে আর সূর্য্যের খেলা দেখতে দেখতে গহরজান ভাবছিল আকাশ-পাতাল। আজকের মত সুখের দিন কবে এসেছে! ঘরের কোলের অলিন্দে রেলিং ধ'রে-দাঁড়িয়েছিল গহরজান। ঘুম-ভাঙা চোখে।

মুখে-চোখে জল দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছিল গহরজান। পরনের পোষাক পরিবর্ত্তন ক'রে পরেছিল ধৌত-বস্ত্র। বদলে ফেলেছিল গায়ের জামা দু'টো। আতরের শিশি থেকে হেনা আতরের এক বিন্দু লেপন ক'রেছিল হয়তো দুই ভুরুতে। হাস্নুহানা'র সুগন্ধে নেশা-নেশা লাগছিল গহরজানের। কাছাকাছি কোন' ঘরে কেউ এই সাত্ সকালে তালিম নিতে বসেছে। একটা ফাটা হারমনিয়নের সঙ্গে গলা সাধছে। ওস্তাদে হয়তো তবলায় চাঁটি মারছে। হারমনিয়মের সজোর সুরের সঙ্গে সঙ্গে তবলার মৃদু-মৃদু বোল ফুটছে। কালোয়াতের হাত, কলাবৎ কথা বলায় যেন বাদ্যযন্ত্রে। বাঁয়া-তবলার বুকে।

—আয় গহর, খাবি আয়!

ঘরের মধ্যে থেকে ডাকলো সৌদামিনী। গহরজান ঘুম-ঘুম চোখে ফিরে তাকালো।

আবার ডাকলো সৌদামিনী।—আয়, ঘরে আয়! মুখ-হাত ধুয়েছিস, কিছু মুখে দে।

গহরজান দেখলো মাসীর হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা। বেশ বড় একটা ঠোঙা। গহরজান বললে,—ঠোঙাতে কি আছে মাসী?

দন্তহীন মুখে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হাসলো সৌদামিনী। বললে,—গঙ্গায় চান করতে গিয়ে ফিরতি পথে মতিলালের দোকান থেকে কিনে ফেললাম। ছাখ্, গহর, চার গণ্ডা পয়সায় কত, ছাখ্!

সত্যিই ঠোঙায় ছিল এক-ঠোঙা বেগুনী, পটলি আর ঝাল-ঝাল আলুর চপ।

চাঁপার কলির মত হাতের আঙুলে কপোল স্পর্শ করলো গহরজান। বললে,—ইস্!

সৌদামিনী আনন্দের হাসি হেসে বললে,—গরম, হাতটা আমার পুড়ে গেছে ঠোঙা বইতে-বইতে। তুই খা, দেখে আমার চক্ষু জুড়োক্।

সৌদামিনীর চোখ দু'টো এখনও লাল টক-টক করছে।

গঙ্গায় অবগাহনে আরো লাল হয়েছে। নগদানগদি কিছু টাকা গতকাল পেয়ে সৌদামিনী পরমানন্দে একটা সবুজ রঙের বোতল খুলে ব'সেছিল। অনেক দিন পরে খেয়েছিল সৌদামিনী। কাঁচা পেঁয়াজে কামড় দিতে দিতে খেয়েছিল জলসোডাহীন দু'-চার পাত্র। সৌদামিনীর পানের পাত্রটা ছিল বোহেমিয়ান কাট্-গ্লাশের। রথের মেলা থেকে পছন্দ ক'রে কিনেছিল সৌদামিনী। একটা নয়, দু'টো।

জলসোডাহীন রঙীন পানীয়কে ভয় করে না সৌদামিনী। প্রথম প্রথম বেশ ডরাতো, ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে পরিণত ক'রে নিয়েছিল। তারপর যৌবন যেদিন থেকে সত্যিকার গত হয়েছে সেদিন থেকে রাশ টেনে ধ'রেছে। কিন্তু গতকাল হাতে টাকা পেয়ে স্ফূর্ত্তির আতিশয্যে লোভ সামলাতে পারেনি সৌদামিনী। গহন রাতে ঘরের অর্গল তুলে দিয়ে একা-একা সাবাড় ক'রেছিল সবুজ বোতলটা। বেশ ভাল লেগেছিল সৌদামিনীর, বোতলের জল বেশ মিষ্টি-মিষ্টি লেগেছিল। প্রায় সরবতের মতই সবুজ বোতলটায় ছিল বিলাতী জিন। ড্রাই নয়, সুইট্।

তাই ভাঁটার মত হলুদ বরণ চোখ দু'টো সৌদামিনীর এখনও আজ রক্তিম হয়ে আছে।

ফিরে দাঁড়ালো গহরজান। এক নাচের ভঙ্গীতে। জরি-জড়ানো বিনুনীটা সপাং ক'রে পেছন থেকে বুকে পড়লো। চললো দরজামুখে।

সৌদামিনী বললে,—খাবি না? চললি কোথা?

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে যেতে যেতে বললে গহরজান,—আমি কি রাক্ষুসী? খেতে পারি কখনও! ডেকে নে আসি আমার দোস্ত, ক'জনকে।

—বেশ কথা। তাই যা। সকলে মিলে-মিশে খা।

দেখে আমার চোখ জুড়োক। কথা বলতে বলতে তেলে-ভাজার ঠোঙা ঘরের কোণে নামিয়ে রাখলো সোদামিনী। পথশ্রমে ক্লান্ত মুখখানা মুছলো ভিজে আর ময়লা গামছাটায়। বাহুতে ঝুলছিল গামছাটা।

কাদের ডাকতে গেল গহরজান! খুশীর উচ্ছ্বাসে তরঙ্গের মত নাচতে নাচতে?

সহযাত্রী গহরজানের। একই ব্যবসায়ে সমান অংশীদার যারা। এই বারোয়ারী ইমারতে আর আর যারা আছে আপন আপন অংশে।

এক দল সখী। গহরজানের সুখ-দুঃখের সমব্যথী। এক দল হিন্দু আর মুসলমান নারী। কেউ ভাগ্যদোষে, কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে, আবার কোন' কোন' লালসাময়ী স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রেছে এই পাঁকের পৃথিবী।

যে-পাঁকে আছে গহরজানের মত গোলাপী পদ্ম দু'-একটা।

গহরজান দেখতে পায়নি তার পিছু পিছু অনুসরণ ক'রেছিল তার পোষা ডালিম বিল্লীটা। গহরজান দেখতে পেয়ে বুকে তুলে নেয় ডালিমকে। চেপে ধরে কোমল বুকে, যেখানে আছে সবুজ পাতলা ভেলভেটের পুরোনো কাঁচলী। রঙীন পুঁতির কাজ জামাটায়। গহরজান সোল্লাসে বললে,—তোর যে সাধ হবে ডালিম! চার ঘোড়ার গাড়ীতে যাবি সাধ করতে?

ডালিম কোন' প্রত্যুত্তর দেয় না। শুধু মিটি-মিটি তাকায়; লেজটা দোলায় স্নেহাতিশয্যে। গহরজানের বুকে চেপে ধরে মুখটা। একে-তাকে খোঁজে গহরজান। এ-ঘরে সে-ঘরে। কেউ আছে, কেউ নেই। গেছে পুণ্য অর্জ্জন করতে, গঙ্গাস্নানে।

একটি ঘরের দরজার সম্মুখে পৌঁছে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো গহরজান।

ভৌতিক ব্যাপার না কি? অদ্ভুত এক গোঙানির শব্দ আসছে কোথা থেকে? কান্নার শব্দের মত। কে কাকে কি অত্যাচার করলো! যে কাঁদছে, তার কি এমন ব্যথা লাগলো! আর অতিরিক্ত কষ্টভোগ না করলে কেউ এমন কাঁদে না। খুব স্পষ্ট হয়ে প্রায় গহরজানের কানের কাছে ফুঁপিয়ে বেজে উঠলো কান্নার সুর, ঘরের ভেতর থেকে।

ঘরখানা চামেলী বিবির; কণ্ঠস্বরও কি তার?

চামেলী বিবির কি এমন দুঃখ যে এমন অসময়ে, যখন ঘরে কোন' মানুষ থাকে না তখন এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? আর থাকতে পারলো না গহরজান। দরজাটা মৃদু করাঘাতে খুলে ফেললো। ঘরটা প্রায়ান্ধকার। জানলাগুলো পর্য্যন্ত খুলতে ফুরসৎ পায়নি চামেলী

একটা বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিল চামেলী।

দরজা খুলতে যতটুকু আলো ঘরে প্রবেশ করলো তাতেই দেখলো গহরজান। চামেলীর ধবধবে ফর্সা দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে আছে। আর চামেলী কাঁদছে ফুলে-ফুলে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। গোঙানির মত ক্রন্দনধ্বনিতে মুখর হয়ে আছে ঘরটা।

—কি হয়েছে দিদি?

ডালিমকে নামিয়ে দিয়ে কাছে গিয়ে চামেলীর পিঠে হাত বুলিয়ে শুধোয় গহরজান! সহানুভূতির স্নেহসিক্ত কণ্ঠে।

কোন' উত্তর মেলে না। চামেলীর সকরুণ ক্রন্দন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতে থাকে যেন। একবারে যখন উত্তর পাওয়া যায় না, তখন আরও কয়েক বার জিজ্ঞেস করলো গহরজান। অনেকক্ষণ পরে অশ্রুভারাক্রান্ত মুখ ফেরালো চামেলী। গহরজানের একটি হাত ধ'রে তাকিয়ে থাকলো কয়েক মুহূর্ত্ত। গহরজান বললে,—কাঁদো কেন ভাই?

—কে, গহর?

—হাঁ, আমি। তোমার চোখে জল কেন? কি হ'ল কি?

চামেলীর আঁখিদ্বয়ে বুঝি বন্যার ধারা নামলো তৎক্ষণাৎ। কেঁদে-কেঁদে চামেলীর চোখ দু'টি ফুলে উঠেছে। মাথার একরাশ রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। অবিন্যস্ত দেহাবরণ। কোন' দিকে যেন খেয়াল নেই চামেলীর।

—কি হয়েছে কি? আবার জিজ্ঞেস করলো গহরজান। শাড়ীর আঁচলে চামেলীর চোখ মুছিয়ে দিয়ে।

—উনি আর নেই। কাল রাত্তিরে মারা গেছে।

অনেক কষ্টে মুখে কথা ফোটায় যেন চামেলী। তার বক্ষ মথিত ক'রে কণ্ঠে কথা ফোটে যেন।

—কে দিদি? অবুঝের মত বললে গহরজান।

—আমার স্বোয়ামী। পক্ষাঘাতে ভুগছিলো এত দিন। কত টাকা খরচা করেছি চিকিৎসে করাতে! কোন' কাজে লাগলো না? কাঁদতে কাঁদতেই বললে চামেলী।

বিস্ময়ে স্তব্ধ ও হতবাক্ হয়ে যায় গহরজান। এ কি বলছে চামেলী! স্বামী কোথা থেকে পাবে চামেলী! নেশার ঘোরে মাতলামি করছে না তো! কত রূপশ্রী চামেলীর, কিন্তু এখন তাকে দেখাচ্ছে কত ভয়াবহ! একরাশ এলোমেলো চুল। রক্তাভ চোখ দু'টো বুঝি বা কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। লজ্জা ভুলে গেছে যেন চামেলী। খেয়ালই নেই পরনের শাড়ীটা লুটিয়ে পড়েছে দেহ থেকে। নেহাৎ একটা ছোট জামা ছিল উর্দ্ধাঙ্গে!

কিছু বুঝতে পারে না গহরজান। দেখে-শুনে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

গহরজানের সহযাত্রীদের কারও বিবাহিত স্বামী থাকতে পারে, তা যেন কল্পনাতীত তার কাছে। উঠে পড়লো গহরজান। ভাবলো, ঘরে ফিরে গিয়ে পাঠিয়ে দেবে মাসীকে। সৌদামিনীকে। মাসী যদি সামলাতে পারে চামেলী দিদিকে। বুঝতে পারে কোথায় তার ব্যথা। কোথায় দুঃখ।

স্বোয়ামী! স্বামী! স্বামী মারা গেছে গতরাত্রে! চামেলী দিদির আবার স্বামী আছে না কি? না, নেশার ঘোরে মত্ততা প্রকাশ করছে! ঐ তো চামেলীর বিছানার এ-পাশে রয়েছে গতরাত্রির পানপাত্র। শূন্য বোতল। এখনও বোধ হয় একটা পাত্রে প'ড়ে আছে সামান্য মদিরা। যেন রক্তের মত।

চামেলী বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে থেকেই তার কান্নার কারণটা ব্যক্ত করে। গহরজান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্তর্পণে ত্যাগ করলো চামেলীর ঘর। যেতে যেতে ভাবলো, মাসীকে পাঠিয়ে দেবে। মাসী যদি সামলাতে পারে, বুঝতে পারে কান্নার উৎস কোথায়, কোথায় আসল দুঃখ। চামেলীর চোখের জলের ছোঁয়াচ লাগে যেন গহরজানের চোখে। ছল-ছল করে গহরজানের চোখ দু'টি, সহানুভূতির ব্যথায়। তাড়াতাড়ি পা চালায় গহরজান।

সৌদামিনী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে শুনলো গহরজানের কথা। চামেলীর ক্রন্দনের ইতিবৃত্ত।

গহরজান ভেবেছিল, মাসী শুনে কি বলবে না বলবে। কিন্তু সৌদামিনী বক্তব্যের শেষটুকু শুনে হাসলো আপন মনে। দুঃখের হাসি কি না বুঝলো না গহরজান। সৌদামিনী বললে, —যাক্, ভালই হয়েছে। এ্যাদ্দিনে হাড় জুড়োবে চামেলীর। শ'য়ে শ'য়ে টাকা খরচা ক'রেছে স্বোয়ামীটার জন্যে। স্বোয়ামী পক্ষাঘাতে ভুগছে আজ থেকে নাকি? চামেলী বা ওজগার ক'রেছে, দিয়েছে ঐ স্বোয়ামীর জন্যে। কখনও ভালো ক'রে পেটে খায়নি, একটা ভাল শাড়ী অঙ্গে চড়ায়নি। নেহাৎ অপ্সরীর মত রূপটা ছেলো, তাই রক্ষে। কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে সৌদামিনী। বলে,—তা তোর চোখে জল কেন? বেঁচে গেলো তো চামেলী। অমন স্বোয়ামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। আয়, আয় তুই খাবি আয়।

গহরজান দুঃখ-কাতর কণ্ঠে বললে,—বড্ড কাঁদছে চামেলী দিদি। তুমি একবার যাও না মাসী!

সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে আবার হাসলো সৌদামিনী। হাসতে হাসতেই বললে,—তোর তাতে ভাবনা কি? কাঁদতে দে, কাঁদতে দে। না কেঁদে বুকে শোক পুষে রাখলে আরও কষ্ট। গুমরে গুমরে মরার চেয়ে ডাক ছেড়ে কান্না ভাল। আর কাঁদবে কতক্ষণ? আপনিই চুপ ক'রে যাবে। তুই এখন খা দেখি!

ঠোঙা থেকে আহার্য্য তুলে নেয় গহরজান। দাঁতে কামড়ায় গরম গরম তেলেভাজা খাবার।

এমন সময়ে কার কণ্ঠস্বর!—মাসী আছস্ নাকি?

সৌদামিনী বললে,—হ্যাঁ আছি। তুমি কে?

—আমি গো আমি। কত দিন দেখাশুনা নাই। তোমার কাছে বিকিকিনি করতে আইছি।

—অ, তুমি ত্রিলোচন না? সৌদামিনী জিজ্ঞেস করলো। কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গীতে।

—হাঁ গো হাঁ। ভুলে তো যাও নাই ভাখ্‌সি!

সৌদামিনী খিল-খিল হাসলো। হাসতে হাসতে বললে,— ত্রিলোচন, তোমারই ভীমরতি হয়েছে, চোখের দিষ্টি গেছে, মানুষ চিনতে পারো না তুমি! আমি ঠিকই আছি। বয়েসটা তোমার কত হ'ল শুনি?

ত্রিলোচন প্রায় অশীতিপর। লোলচর্ম্মা। চোখে ঠুলী। স্যুতোয় বাঁধা চশমা। ত্রিলোচন সহাস্যে বললে,—বেশী হয় নাই। এই চুরাশী।

সৌদামিনী ফাজলামির হাসি হাসলো। বললে,—মোটে চুরাশী! তা ভাল। সওদা করবে নাকি? মাল কোথায় তোমার? শুধু দর্শন?

ত্রিলোচন বললে,—না গো মাসী, না। মাল সাথে না থাকলে আইমু ক্যান্? আছে, মাল আছে, কুলীর মাথায়। আমি কি আর বুড়া বয়েসে বইতে পারি? যখন পারতাম তখন পারতাম। বল' তো প্যাঁটরা খুলে দেহাই দু'-চারখান।

আবার হাসলো সৌদামিনী। মস্করার হাসি। বললে,— তা দেখাও। নয় তো তোমার মত বুড়ো মানুষকে দেখে আমাদের কি লাভ বল'?

কুলীর মাথা থেকে প্যাঁটরা নামায় ত্রিলোচন। বলে,— বটেই তো। বুড়া দিয়ে কোন কাম হয়? যা ঢাকাই শাড়ী দেখাবো মাসী, দেখে তোমাগোর চক্ষু ঠিকরয়া যাবা। একেবারে হাল্ ফ্যাশনের। যেমন খোল, তেমন আঁচলা, তেমনি পাড়!

ব্যাধি জরা বুদ্ধের ঠাঁই নেই এখানে।

বার্দ্ধক্যের লজ্জায় ত্রিলোচন কথা বলে না আর। কথা থামায়। সওদা খুলে বসে। প্যাটরা থেকে একেক শাড়ী বের করে আর দেখায়। সৌদামিনী দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। দেখে এমন ভঙ্গীতে যে যেন এমন এমন অনেক দেখেছে সে।

গহরজান ভাবছিল ঘরের কোলের অলিন্দে দাঁড়িয়ে, ভৌতিক ব্যাপার নয় তো! বাতাসের দাপাদাপিতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কোন দিক থেকে আসছে আওয়াজ। চামেলী বিবির কান্নাটা যেন চার দিকে দৌড়দৌড়ি করছে। তেলেভাজা দাঁতে কামড়াতে ভাল লাগছে না গহরজানের। তার চেয়ে ঢের ভাল লাগছে জরি-জড়ানো সাপের মত বেণীটা হাতে ধ'রে খেলা করতে।

কিন্তু বাম চোখটা কেন এমন বার বার নর্ত্তন করলো!

গহরজান বিস্ময় মানে। বিশ্বাস করতে মন চায় না। ছুটে যায় মাসীর কাছে। আবদারের সুরে বলে,—মাসী, মাসী, হামার বাম-চোখ দু'টো নাচলো।

স্থূলকায় সৌদামিনী। মেদবহুল শরীরটা নড়তে-চড়তেই কত ঘণ্টা। মাসী ঘাড় বেঁকিয়ে বকুনির ঢঙে বললে,— চুপ, চুপ, চুপ,—বলিস নে কাকেও। বলতে নেই। ভালই তো। আয় তোকে সাজিয়ে দিই। মুখে পেন্ট্ করে দি।

—বলতে নেই বুঝি মাসী? শুধোয় গহরজান।

—না। বললে আর কাজ হয় না। তা, আমাকে যখন বলেছিস তখন দোষ নেই। আমি তো তোর মায়ের মত। কথাগুলো সৌদামিনীর কেমন যেন মাতৃত্বের স্নেহে

গহরজান। দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বললে,—হামি জানি না।

সৌদামিনী বললে,—তুই আবার জানবি কি? চিরকাল আমিই তো যা-কিছু পচন্দ করেছি। তুই কি জানতে যাবি?

সত্যিই দু'খানা জবর শাড়ী মাসী পছন্দ ক'রে ফেলেছে। একসঙ্গে দু'খানা শাড়ী। একটা সূতী আর একটা জরির ঢাকাই। একটা আকাশী, আর একটা ধূপছায়া রঙের। একটার দাম আটারো সিকে, আরেকটার সাড়ে দশ টাকা। ঢাকাই শাড়ীর জরি মানুষের করস্পর্শে ঝলমল ক'রে উঠলো। ঠিক যেন একরাশ স্বর্ণালঙ্কার।

নারী জাতির বাম অঙ্গ কম্পিত হওয়া নাকি শুভ লক্ষণ।

গহরজান অনেক ভেবেও কিছু ভেবে পায় না, কি তার ভাল হতে পারে। কি লাভ হবে। সহসা গহরজানের মনে পড়ে, আজকে গহরজান বেশ মোটা টাকা পাবে ডালিমের বিয়ে বাবদ। পাবে হাতে-হাতে, পাবে নগদানগদি। পাবে একটা রৌপ্যস্তূপ। কুইন ভিক্টোরিয়ার আবক্ষ মূর্ত্তির ছাপ-মারা রাশি-রাশি টাকা। তার মধ্যে দু'-পাঁচ গণ্ডা আকবরী মোহরও যে না থাকতে পারে এমন নয়। ডালিমের বিয়ে হবে কত জাঁকজমকের সঙ্গে, কত বাদ্যি বাজবে, কত আতসবাজী পুড়বে—ভাবতে ভাবতে বুঝি পুলকের জোয়ার ওঠে গহরজানের দেহ-মনে। দিল্ খুশ হয়ে যায় তার। মনে মনে কত জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে সে। গুন-গুন শব্দে একটা দাদ্রা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কত কথা ভাবতে থাকে। ভাবে, কতক্ষণে দেখা পাবে। কতক্ষণে টাকা পাবে।

চমকে ওঠে যেন গহরজান।

গহরজান ভীষণ ডরায় মাসীকে। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদকে অত্যন্ত ভয় করে গহরজান। মাসী কিছু চায় না, শুধু টাকা চায়। শুধু টাকা। মাসীর গুণকীর্ত্তনের কথা ভেবে শিউরে শিউরে ওঠে গহরজান। পাশবিক অত্যাচার, যাকে সচরাচর বরদাস্ত করতে পারে না গহরজান, সেই অত্যাচারের যত মূল ঐ মাসী। ঐ সৌদামিনী।

সৌদামিনী গভীর জলের মাছ।

গহরজান যার কাছে শিশু। গহরজান জানে কিছু কিছু, মাসীর টাকা দিয়ে কি কাম। সৌদামিনী আবার শেষ বয়সে ফিরে যাবে পুণ্যতীর্থ কাশীধামে—যে উদ্দেশ্য বুকে গোপন রেখে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা চ'লেছে। সৌদামিনী স্থির ক'রেছে, শেষ কালে কাশীবাসী হবে। কাশীতে মরবে।

কাশীতে তাই একটা জমি কিনতে বদ্ধপরিকর হয়েছে সৌদামিনী। খান কয়েক ঘর তুলে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনটা কাশীতেই। জীবনের যত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে সৌদামিনী। কে জানে বরাতে কি আছে শেষটায়!

—ভাখ্, গহর, তোর জন্যে এই দু'খানা রাখছি। বললে সৌদামিনী।

পথ জনবহুল। যেদিকে ফিরাও আঁখি শুধু জনপ্রবাহ।

বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠতম পর্ব্ব দুর্গোৎসব আসন্ন। রাজা-রাজড়া আর বনেদী বাবুদের গৃহে মা দুর্গার পূজা হবে। দশপ্রহরণধারিণীর পূজা। প্রতিমা গঠনের কাজ চলেছে দালানে দালানে। গহরজান লক্ষ্য করে, কেমন যেন একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের ঢেউ বইছে এ তল্লাটে। কৃষ্ণনগরের কারিগরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসেছে। ঠেল মেরেছে এই গরাণহাটা পর্য্যন্ত। গহরজানের চোখে পড়ে জায়গায় জায়গায় রঙ-করা পাটের চুল; তবলকীর মালা; টীন ও পেতলের অসুরের ঢাল-তরোয়াল আর নানা রঙের চোবানো প্রতিমার পরনের কাপড় ঝুলছে। ফেরীওয়ালার দল বেরিয়েছে! কেউ বলছে,—"মধু চাই! খাঁটি মধু নেবে? সুন্দরবনের মধু!" কেউ হাঁকছে,—"শাঁকা নেবে গো!" ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার-নিদ্রে ত্যাগ করেছে। আদেখলারা যত পারছে আর্সি, ঘুনসি, গিল্টির গয়না ও বিলেতী মুক্তো একচেটেয় কিনছে। সেই সঙ্গে বেলোয়ারী চুড়ী, আঙ্গিয়া, বিলেতী সোনার শীল আংটি ও চুলের গার্ডচেনেরও অসম্ভব খরিদ্দার।

পুজোর দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাজারের কেনা-বেচার হৈ-হল্লা সপ্তমে উঠছে। কলকাতা তত গরম হয়ে উঠছে। পথের অদূরে একটা কোলাহল। একটা ছোট-খাটো জনারণ্য। পুজোর মরশুমে খুনে, দাঙ্গাবাজ, সিঁধেল-চোর আর বাটপাড়ের কারবার ফলাও হয়েছে। একটি মহিলার নাক থেকে সোনার নথ ছিঁড়ে নিয়ে পালাতে যেয়ে একজন গাঁটকাটা ধরা পড়ে বেদম মার খাচ্ছে আর পরিত্রাহি চীৎকার করছে। চোখ বড় করে দেখছে গহরজান। মহিলা রক্তাক্ত নাক চেপে ধ'রে চোরের চৌদ্দপুরুষান্ত করছে।

দেহে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বইতে থাকে থেকে-থেকে।

একটা দাদ্‌রা সুরের গান গুন-গুন গাইতে গাইতে গহরজান ভাবছিল ডালিমের বিয়ের কথা। কত আয়োজন হবে, কত বাজনা বাজবে, কত বাজী পুড়বে। গ্যাসবাতির গেট আর রেলিঙের আলোয় আলোকময় হয়ে উঠবে গরাণহাটা পল্লী। চারি দিকে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। মেঠাই, মাংস আর মোগলাই পরোটার মেলা বসবে গহরজানের ঘরে। সেই সঙ্গে মদ। মদের বন্যায় ভাসবে গহরের পরিচিত জন-মানুষেরা।

কিন্তু টাকা সমেত দেনেওয়ালার পাত্তা নেই কেন?

ভাবছিল গহরজান, আর কত দেরী। টাকার ঘড়া হাতে পৌঁছতে আর কতক্ষণ?

অলিন্দের নীচে একতলায় সাপল পথ। এক জন পানওলা পানরাঙা দাঁত দেখিয়ে সহাস্যে জিজ্ঞেস করে,—পান পাঠাবো বিবিজান? তবক দেওয়া পান।

মুখখানা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়ে নেয় গহরজান।

পোড়ামুখো পানওলাকে দেখে বিরক্তির পূর্ণমাত্রায় ঘরে ঢুকে পড়ে মুখ ঘুরিয়ে। আক্রোশের সঙ্গে বলে,—বেয়াদপ!

ঘরে গিয়ে একটা ফাটা আয়নার সামনে চলে যায় গহরজান। আয়নায় দেখে মুখটা। মাসী কতক্ষণে পেট্‌ ক'রে দেবে? ইতিমধ্যে পৌঁছে যায় যদি টাকার ঘড়া আর—

কৃষ্ণকিশোর কাছারীতে বসেছিল।

হেড-নায়েবের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। হেড-নায়েব বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে কাজকর্ম্ম মিটিয়ে ফেলছেন। অঙ্ক কষে দেখছিলেন, ক'ঘর প্রজা আর কতটা জমি। অত্যন্ত জরুরী কাজ, হেড-নায়েব তাই ক'খানা খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। প্রজারা জলের দেশের মানুষ, জলের মতই মানুষ। স্বচ্ছ মন, মুক্ত চিন্তা প্রজাদের। স্পষ্ট কথার মানুষ। ঘোর-প্যাঁচ জানে না।

হেড-নায়েব কানে কলম গুঁজে বললেন,—হুজুর, কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আজকেই হুজুরের প্রজারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। কাজটা চুকিয়ে না ফেললে ওদের আসাই বৃথা হবে। কৃষ্ণকিশোর শুনছিল হেড-নায়েব আর প্রজাবৃন্দের বাক্য-বিনিময়। কাজের কথা। বললে,—আপনি কাজ চুকিয়ে ফেলুন। কথা পরে হবে।

স্বয়ং হুজুর সম্মুখে ব'সে আছেন, প্রজারা আর গমস্তা-নায়েবের দল ভয়ে সিঁটিয়ে তটস্থ হয়ে আছে যেন। প্রজারা কথা কচ্ছে আর হুজুরের পানে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে। আমলারা তাকাচ্ছে না মুখ তুলে, যন্ত্রের মত কাগজের বুকে কালির আঁচড় তুলছে। নাম, গোত্র আর টাকার সংখ্যা। হেড-নায়েবের হাতে অনেক কাজ।

জমিজমার কাজ। জমি আর জমার কাজ।

হেড-নায়েব লিখছিলেন। শূন্য, ফাঁক পূর্ণ করছিলেন।

জমাবন্দি বা কড়চার নম্বর লিখছিলেন। প্রজার নাম আর জমির পরিমাণ লিখছিলেন। খাজনা, সেস্‌, একুন লিখছিলেন। খতিয়ান নম্বর। দখলিকার প্রজার নাম লিখছিলেন। লিখছিলেন মূল জমিদারের নাম। যথা—ভারত-সম্রাট, জমিদার অমুক, পত্তনিদার কৃপানাথ মণ্ডল, দরপত্তনিদার লক্ষ্মণ হাজরা, গাঁতিদার যুধিষ্ঠির বরাট, প্রজা দাশরথি ঝা।

যত সব জলের দেশের মানুষ। জলের মত মানুষ। শুধু মহামান্য ভারত-সম্রাট আর অমুক জমিদার মানুষ কেমন, জানে শুধু প্রজাবৃন্দ। প্রজা শুধু প্রজা, সম্রাট শুধু নয় প্রজানুরঞ্জক। যেমন শাসন তেমনি শোষণ। গায়ের রক্ত পর্য্যন্ত জল হয়ে যাচ্ছে প্রজাদের। খাজনা দিতে দিতে।

মানুষগুলো যে অব বেঙ্গলের। গঙ্গা আর সাগরের।

আলে চাষ করে। আলেই বাস করে। জমিতে ধান আর সরষে ফলায়। ঘরে হাঁস আর মুরগী পোষে। ডায়মণ্ড হারবারের রক্ষী-সৈন্যদের ডিম যোগায়। ইংরাজ সৈন্যদের ডিম আর নারী আর দেশী মদ যোগায়। কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে চাষ করে আর জলে মাছ ধরে। বজরার দাঁড় টানে। দূর-দূর দেশে বাঙলার মাল-মশলা সরবরাহ করে। ঝঞ্ঝা, দুর্য্যোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে। টাইফুন্‌ সামলায় বছরের পর বছর। ঘর ভাঙে ঝড়ে, আবার মাটির ঘর করে। তালপাতার ছাউনী দেওয়া ঘর।

প্রজার জাতটায় ঘুণ ধ'রে গেছে তাই যত দুঃখু।

খ্রীশ্চান মিশনারীর সৎকাজে আত্মোৎসর্গ করেছে ক'দল জাতভাই। ভিন্নধর্ম্মী হ'য়েছে। কালো মানুষ সাদা হতে চেষ্টা ক'রেছে। খ্রীশ্চান মিশনারীদের শ্যেনদৃষ্টি প'ড়েছে বাঙলার গ্রামাঞ্চলে। দুঃস্থ অভাবীদের অভাব ঘুচে যাচ্ছে খ্রীষ্টস্মরণে। গ্রামে গ্রামে গির্জ্জা আর পাঠশালা গ'ড়ে উঠছে রাতারাতি। ইতিমধ্যে দুটো বিদ্যালয় গ'ড়ে উঠেছে গাঁয়ে। একটি, "সাধ্বী ইলিসাবেত্‌ বিদ্যালয়" আর অন্যটি "সাধ্বী ম্যাসারেৎ বিদ্যালয়"। পাদরীরা পড়ায়। পাখী পড়ায়। ধর্ম্মকথা শোনায়। যীশুর বাণী শোনায়।

খ্রীশ্চান-হয়ে-যাওয়া দেশোয়ালী ভাইদের অপকর্ম্মের লজ্জায় সমগ্র জাতটা যেন ভেঙে প'ড়েছে। একটা শুধু সান্ত্বনা, ঐ বিধর্ম্মীদের কৃত-কার্য্যের জন্য নাকি ভবিষ্যতে প্রায়শ্চিত্ত

করতে হবে। শীতলা, কালী, কেষ্টকে ছেড়ে খ্রীষ্টকে? পোর্ট ক্যানিঙের জনমানুষ কি এক ধর্ম্মমোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। মন্দিরে ঘণ্টা বাজে না সেখানে, মসজিদে মানুষ নেই, শেয়াল; গির্জ্জায় কিন্তু ঘণ্টা বাজে। গ্রামকে জাগিয়ে রাখে যেন গির্জ্জার ঘণ্টা।

সুবর্ণরেখা, দামোদর আর গঙ্গানদীর মিলন অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে।

সাগর সঙ্গমে অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে পথ চিনে এসেছে সপ্তসাগরপারের মানুষ। সাদা মানুষ। ধর্ম্মের বীজ ছড়াচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। পুরোহিত কল্কে পায় না, মোল্লার মুলুক ব'লে কোন কিছু নেই, পাদরীদেরই জয়জয়কার। শুধু ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্ছে না, ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছে পাদরীরা। জীবনপথে চলার শিক্ষা দিচ্ছে। কথার ছলে শিক্ষা দিচ্ছে।

গহরজানকে টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত যেন কোন শান্তি পাওয়া যাচ্ছে না।

অস্বস্তি বোধ করছে কৃষ্ণকিশোর। টাকাটা গহরের হেফাজতে গেলে যেন রেহাই পাওয়া যায়। ঐ একটা চিন্তার সুরাহা না হওয়া পর্য্যন্ত এমন কি গহরজানকেও মনে পড়ছে না ভাল ক'রে। গহরজানের দেহে কত আকর্ষণ! কত সম্মোহন! কত লোভানির স্পষ্ট চিহ্ন!

গহরজানের অঙ্গবরণ ঠিক শুভ্র নয়। হলুদ-শুভ্র।

মুখের মধ্যে অধর আর কপোল শুধু রক্তাভ, নয় তো আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গহরজান যেন রক্তহীনা। পাংশু। দুর্ব্বল। হাওয়ায় পড়ে যাবে। বৃক্ষ নয়, নারী বৃক্ষলতা। গহরজান নারী। তাই বৃক্ষ চায়, আশ্রয় চায় একটা চিরকালের মত। লতার মত জড়িয়ে থাকতে চায়। ঝড়ের আগের এঁটো পাতার মত যেথায়-সেথায় উড়তে চায় না। বহু নয়, এক চায়। এক আশ্রয়। একটা মাত্র ঠাঁই। থাকা-খাওয়ার।

কোথা থেকে ঘুরে আসে অনন্ত। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে।

আকাশে সূর্য্যের প্রথম চিকন খেলতেই শয্যা ত্যাগ করেছিলেন রাজেশ্বরীর পিতামহী। পৌত্রীর শ্বশুরালয়ে উপরোধে একটি রাত্রি অতিবাহিত করেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হ'তেই খোঁজ করেছেন পাল্কী কিংবা অশ্বযানের। নাতনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেননি। তখন যেমন আকাশে সূর্য্যালোকের প্রথম শুভ্রতা ছিল তেমনি ছিল অন্ত দিগ্বলয়ে রাত্রির অন্ধকারের ক্ষীণ কালিমা। পাখীরা পর্য্যন্ত গাছসত্তরে বাসা ত্যাগ করেনি। শুধু মাত্র ঐককলস্বর পাখীদের। ঘর থেকে বেরিয়ে দাসী-ভৃত্যদের ডাকাডাকি করতে প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অনন্তরামের। বৃদ্ধা কাকুতি-মিনতি করেছিলেন অনন্তরামকে। বলেছিলেন,—অনন্ত, তাদের জন্যে অপেক্ষা করলে আজকে আর আমার জপ-আহ্নিক হবে না!

অনন্তরাম মনিবের দিকে টেনে কথা কয়েছিল। বলেছিল, —আপনার নাতনীর ঘরেও ঠাকুরদালান আছে। সেখানে জপ-তপ ক'রে নাও না।

বৃদ্ধা বেজায় আপত্তি জানিয়েছিলেন।—না অনন্ত, সেখানে আমার জপের মালা প'ড়ে আছে। তসর কাপড়, তাও সঙ্গে নেই। আমার যে অনেক হাঙ্গামা। তুমি আমাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও অনন্ত!

সাত-সকালে জুড়ী মেলেনি। তাই অগত্যা একটা পাল্কী বের করিয়ে পাইক-পেয়াদা সমেত পৌঁছে দিয়ে আসে অনন্তরাম। যাওয়া-আসার পথক্লান্তিতে অনন্তরামের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

কৃষ্ণকিশোর প্রশ্ন করলে,—কোথায় গিয়েছিলে অনন্তদা?

অনন্তরাম গামছা পাকিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললে,—কোথায় আবার, তোমার বুড়ী দিদিশাউড়ীকে পৌঁছে এলাম। ভোর থেকে উঠে বুড়ী নাছোড়বান্দা। তবু যুবতী হ'লে না হয় কথা ছিল। বুড়ীকে যে কত বুঝিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কিছুতেই শুনলে না। গাড়ী অত ভোরে পাওয়া গেল না, তা পাল্কী বের করিয়ে গেল। সঙ্গে গেলাম। যতই হোক আমাদের হুজুরের দিদিশাউড়ী। সঙ্গে না গেলে—

কৃষ্ণকিশোর বৃদ্ধার কীর্ত্তি শুনে হাসলো মৃদু-মৃদু। বললে, —হ্যাঁ, ঠাকুমাটি যেন এক ধরণের! জপ-তপ নিয়েই থাকেন।

অনন্তরাম গামছায় মুখখানা মুছতে মুছতে বললে,—ধরণের ব'লে ধরণের? পাল্কীর পাল্লা একবার খুলে দেন আবার বন্ধ ক'রে দেন।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—কেন?

অনন্তরাম উত্তর দেয়,—আমার সঙ্গে তো দু'চোখ বন্ধ ক'রে কথা বললেন। চোখই খুললেন না। পাল্কীর পাল্লা টেনে দিতে হচ্ছে শূদ্রদের জন্যে। কিছুতেই মুখদর্শন করবেন না জপের আগে। পাল্কীর পাশ দিয়ে মানুষ গেলেই চেঁচাচ্ছেন, অনন্ত, অনন্ত! ভ্যালা ফ্যাসাদে পড়েছিনু বুড়ীকে নিয়ে।

অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—অনন্তদা, ভারীকে বল' স্নানের ঘরে জল তুলে দেবে। আমি সকাল সকাল বেরুবো। কাছারীর কাজে আদালতে যেতে হবে। বামুনদিকে বল' খেয়ে যাবো আমি। তাড়াতাড়ি খাবার চাই। বৌ জানে, তবুও তুমি বৌকে ব'লে দাও।

—যো হুকুম হুজুরের। অনন্তরাম কথা বলে ব্যঙ্গের সুরে। কথা বলে আর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। শব্দহীন পদক্ষেপে।

হেড-নায়েবের কথা ব্যতীত অন্য কারও মৌখিক শব্দ নেই কাছারীতে।

নায়েব মশাই জমিজমার কাজ করছিলেন। জমাজমির কাজ। লিখছিলেন আর লিখছিলেন। জলের মত জলের দেশের মানুষগুলি চুপ মেরেছিল। কপালের ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জিত টাকা দিয়ে দিতে হচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে। বুকের পাঁজরা-ভাঙা টাকা।

একটা নতুন চর মাথা তুলেছে জমিদারীর চৌহদ্দীতে।

সাড়ে তিন হাজার বিঘের চর। কালো মাটি। জল-কাদায় পা চলে না। কিন্তু ফসলী জমি। আবাদ করা চলে। চাষী-প্রজাদের মধ্যে জমি জমা নেওয়ার দর-কষাকষি চলে। জমির মত জমি। শুধু বীজ বপনের অপেক্ষা। জমা-দেওয়া টাকার চতুর্গুণ ফিরে আসবে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় মরাই উপচে পড়বে। বলা যায় না, পোর্ট কোম্পানীর ফেরী-জাহাজ যদি যাত্রী ওঠা-নামার ঘাট বানায়, তা হ'লে আরেক মোটা অঙ্কের আয়।

কিন্তু চরকে কেন্দ্র করে যদি জমিদারে জমিদারে, জমিদারে প্রজায় কিংবা প্রজায় প্রজায় বিবাদ লেগে যায়? যদি রক্তারক্তি হয়? যদি বাধে দাঙ্গা? মানুষ কাটাকাটি?

হেড-নায়েব জানতেন সাগরের গর্ভজাত এই চরের দখলিদার সত্যি সত্যিই হুজুরের এষ্টেট্। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদারদের জমি যখন গভর্ণমেণ্ট থাকবস্ত জরিপ আর রেভেনিউ সার্ভে করলেন, তখন সরকারী পিঠা ভাগে হুজুরের পূর্ব্বপুরুষ পেয়েছিলেন ঐ চর।

ঐ চর, চরবসন্তপুর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম মাথা চাড়া দিয়েছিল। তখন জরিপ বা সার্ভে কিছুই হয়নি। চরবসন্তপুরে সেবার খুনোখুনি মারামারি হয়েছিল। বল্লম, তীর আর লাঙলের ফলা চলেছিল। গুলীও চলেছিল শেষে। দখল পেয়েছিলেন হুজুরের পূর্ব্বপুরুষ। দুই পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল হাজার খানেক। কয়েক শত মানুষের কোন হদিসই মেলেনি। কেটে টুকরো-টুকরো করে সাগরের জলে খোলামকুচির মত ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সাগরের স্বচ্ছ জলে কারা যেন সেদিন হোলী খেলেছিল মানুষের উষ্ণ রক্তে। ঝড়ো হাওয়ায় মানুষের আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষু মানুষের শেষ ডাক কারও কানে যায়নি। মৃত্যুভয়ে কত মানুষ ঝাঁপ দিয়েছিল বে অব্ বেঙ্গলে। দাঙ্গার অব্যবহিত পরে কত গলিত শবদেহ চড়ায় ভিড়েছিল। শকুনদের মোচ্ছব লেগেছিল সেদিন। নরমাংস। দুর্লভ।

কি করবে, কেমন পথে যাবে, কোথা দিয়ে যাবে স্থির ক'রে ফেলেছিলেন হুজুর

মনটা তেনার অনচান করে যত, ফুলবাবুটি সেজে কতক্ষণে গৃহত্যাগ করা যায় এই চিন্তায় মন তাঁর যত বিব্রত এবং ব্যস্ত হয় ততই সেই জটিলতম সমস্যাটা জলের মত জল হয়ে যায়। মিথ্যাকে আশ্রয় করলে আর দু'-দশ টাকা খরচা করলে মানুষের মুখে কুলুপ এঁটে দিতে কতক্ষণ?

ঘড়ার টাকা ঘড়াতেই থাক।

যা থাকে তাই। তাই দিয়ে দেবে বিবির পায়ে ছড়িয়ে। সোনার গিনি, রূপোর টাকা যা থাকবে। মণি-মাণিক্য থাকলে তাও। আর একবার দিয়ে দিলে চিরটি দিনের মত নিশ্চিন্তি। বিবি হয়ে থাকবে পায়ের গোলাম। ঘুরবে পায়ে-পায়ে। জড়িয়ে থাকবে পায়ে-পায়ে। কৃষ্ণকিশোর শুধু মনে মনে এঁচে নেয় ব্যাপারটা। কোথা থেকে কি করা যায়।

কিছুই করা হবে না।

ঘড়াটা শুধু জুড়ীগাড়ীর ভেতরে বসিয়ে দিলেই হবে। তারপর জুড়ীর পদশব্দে কোন' শালা কাছে ঘেঁষতে সাহসী হবে না। জুড়ী ছুটবে তো ছুটবে। হুজুর পরমানন্দে রুমালের গন্ধ শুঁকবেন।

পথ সামান্য। চিৎপুর বরাবর।

দু' কদম গেলেই গহরজান। জলজ্যান্ত গহরজান। হুজুরের মনের নোলায় জল ঝরে। এখন তো আর ভয়-ভাবনা নেই। কা'কেই বা ভয়? যাকে ভয় করতেন করতেন, আর আর সকলকে তো থোড়াই কেয়ার।

শুধু পিসীমা। হেমনলিনী।

কবে যেন দেখা হ'তে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন আড়ালে। যেখানে কেউ ছিল না এমনি এক ঘরে কৃষ্ণকিশোরকে ডেকে বলেছিলেন হেমনলিনী। কখনও গম্ভীর হয়ে কথা বলেন না, সেদিন কথা বলতে বলতে অসাধারণ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেছিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণকিশোর সেদিন হেমনলিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে শুধু আনত চোখে দেখেছিল পিসীকে। পিসীর রূপ দেখেছিল। কী অসামান্য রূপ এখনও। এই বয়সে।

হেমনলিনী বললেন,—দেখো কিশোর, তুমি অন্যায় করবে

আর আমাদের বাবা-কাকার মাথা হেঁট করবে তেমন কাজ ক'রো না। চোখে দেখতে পাচ্ছো না? তোমার পিশে মশাই আর তাঁর ছেলেদের দেখছো না!

—পিশীমা!

হেমনলিনী কোন' কথা শুনতে চান না।

বলেন,—কেলেঙ্কারী করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তুমি সমাজছাড়া হও। সাহস দেখাও। বুক ফুলিয়ে লাম্পট্য কর। ভয় পেয়ে লুকিয়ে চোরের মত—

—পিশীমা!

—না কিশোর, আমি তোমাকে এই শেষ বারের মত বলছি, তুমি যদি চালিয়ে যাও, পয়সার শ্রাদ্ধ কর, আমার সঙ্গে কোন' সম্পর্ক রেখো না। তুমি জানবে তোমার পিশীমা আর নেই।

—পিশীমা!

কৃষ্ণকিশোরের কণ্ঠের আতঙ্ক বাতাসে লীন হয়ে যায়।

হেমনলিনীও কথা থামিয়ে দেখতে থাকেন। অপলক চোখে, সামান্য জলের আভা-ভরা চোখে চেয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত্ত।

—পিশীমা!

হেমনলিনী দেখলেন কৃষ্ণকিশোরের কত পরিবর্ত্তন! দেহে যৌবন। দেখতে দেখতে কেন কে জানে অসাধারণ লজ্জা পেয়েছিলেন। অন্য কোন' বাক্যব্যয় না ক'রে গম্ভীর বদনে ও ধীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে সেই নির্জ্জন স্থান ত্যাগ করেছিলেন। হেমনলিনীর মনোভাব অন্য। লোককে না-হাসিয়ে না-জানিয়ে যা-খুশী কর। সংযম চাই, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চলবে না। হেমনলিনী মনে করেন, বাসনাকে অতৃপ্ত রাখতে নেই। অতৃপ্ত থাকলে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। হেমনলিনীর এই জীবন-দর্শন তাঁর নিজের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে। হেমনলিনী মনের মত স্বামী না পেয়ে—

রূপ আর যৌবনকে বৃথা যেতে দেওয়া উচিত নয়।

সহসা দেখলে বোঝা দায়, হেমনলিনী সুখে আছেন, না দুঃখ পাচ্ছেন জীবনভোর। কিন্তু একটা যেন পথ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। স্বস্তি আর শান্তির পথ। অবিচলিতের মত থাকতে হবে। কারও কোন অপকর্ম্মে রোষ প্রকাশ চলবে না। হেমনলিনী এমনি ধারার জীবন-ধারায় ভেসে চলেছেন। সাহিত্য আর সঙ্গীতের রসোপলব্ধি ক'রে চলেছেন। যা ভাল বই পান পড়েন। ভাল গানের সুর তোলেন বাদ্যযন্ত্রে। হেমনলিনী দেখতে দেখতে ভক্ত হয়ে পড়েছেন রবিবাবুর গানের।

কে যেন অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধানে সৎগ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে দেয় তাঁকে। রবিবাবুর গানের স্বরলিপি জোগাড় ক'রে দেয়। হেমনলিনীর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায় না। বই পাঠে আর গান গেয়ে দিন বেশ কেটে যায় তাঁর। হেমনলিনীর প্রিয়তম গানটির সুর প্রায়ই শোনা যায় গুঞ্জনের মত ভেসে আসে হেমনলিনীর খাস-কামরা থেকে। গানটি এই :

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান—

রবিবাবুর গান। তাঁর কবি-জীবনের অন্যতম প্রাথমিক রচনা। ভানুসিংহের পদাবলীর একটি পদ। কে যেন আছে, যে বোঝে হেমনলিনীর মনের ভাষা—যে তাঁকে বই আর গান উপহার দেয়। বাছাই-করা বই আর বাছা-বাছা গান।

এমন হেমনলিনীকেও আর যেন তেমন পূর্ব্বের মত ভয় করে না কৃষ্ণকিশোর। তেমন ভক্তিও বোধ করি করে না। কৃষ্ণকিশোরের চোখে এখন কেউ নয়, শুধু সে। শুধু গহরজান বিবি। মনেও কারও ঠাঁই নেই। শুধু ঐ বিবিজান অধিকার ক'রে আছে সকল কিছু।

কাছারীর তক্তাপোষ থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। চললো হয়তো স্নানাহার শেষ করতে। অন্দরে রাজেশ্বরীর কাছে।

রাজেশ্বরী একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয্যা ত্যাগ ক'রেছে কিয়ৎক্ষণ আগে।

বাসি শাড়ী আর জামা ছেড়ে পরিধান ক'রেছে ধৌত বাস। কি চমৎকার মানিয়েছে রাজেশ্বরীকে! টিয়াপাখী রঙের শাড়ীতে। যেন বৃক্ষসবুজতার মধ্যে থেকে উঁকি মারছে সদ্যপ্রস্ফুটিত একটি স্থলপদ্ম। মলয় বাতাসে থরো-থরো দুলছে সশাখ ফুলটি।

—বৌ! একটা জরুরী কথা আছে।

—ডাকছো আমাকে?

—হ্যাঁ। তুমি বোধ হয় জানো না, ঠাকুমা ভোর হ'তে না হ'তেই রওনা হয়ে গেছেন পাল্কীতে?

—শুনেছি এই মাত্র। একবার দেখা হোক না, বুড়ীকে যদি না কামড়ে দিই—

কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করলো রাজেশ্বরীর মুখাকৃতি। দেখলো উপহাস নয়, রাজেশ্বরী সত্যিই ক্রোধের সুরে কথা বলছে। বললে,—ছিঃ, বলতে নেই এমন কথা। কামড়ে দেবে, সে কি কথা?

—দেখো না তুমি! না ব'লে-ক'য়ে চলে যায় কেন? বললে রাজেশ্বরী। সক্রোধে।

হেসে ফেললো কৃষ্ণকিশোর। বৌয়ের কথার ধরণ শুনে। বলে,—বৌ, একটা জরুরী কথা আছে।

রাজেশ্বরী বসেছিল গালচের মধ্যিখানে। ভেলভেটের গালচে। উঠে পড়লো রাজেশ্বরী। বললে,—জরুরী কথা? কি আবার জরুরী কথা?

—বলছিলাম যে, তোমার একদিন পিশীমার ওখানে যাওয়া দরকার। বেড়িয়ে আসা দরকার। বললে কৃষ্ণকিশোর। গম্ভীর হয়ে বললে,—না গেলে ভাল দেখায় না। আজকে যাও না বৌ, বেড়িয়ে এসো না!

আহ্লাদে গদগদ হয়ে যায় রাজেশ্বরী।

তার মিষ্টিমুখে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি ফুটে ওঠে। খুশীর প্রাবল্যে বললে,—বেশ তো, আজই যাই। সেই ভাল কথা। হ্যাঁ, না গেলে কথা উঠতে পারে। আজই যাই। খেয়ে-দেয়ে যাবো?

—আমার পিসীমা এমনই গরীব তোমাকে এক পাত খাওয়াতে পারবে না? কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর কথা বলতে বলতে।

—তাই বুঝি বলেছি? শুধোয় রাজেশ্বরী। খুশীর সুরে বলে,—তবে এখনই যাই। কি বল? সেজে-গুজে নিই?

—হাঁ। তাড়াতাড়ি নাও। পিসীমাকে বলবে যে আপনার জন্যে মন কেমন করছিল তাই এসে পড়েছি। কৃষ্ণকিশোর কথা শিখিয়ে দেয় বৌকে। সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেয়। বলতে যায় আর কিছু হয়তো।

কিন্তু রাজেশ্বরীর উচ্ছ্বসিত কথায় বলা হয় না। রাজেশ্বরী বললে,—সে তোমাকে শেখাতে হবে না। যা বলবার আমি বলবো। এখন বল', কি কি গয়না পরি? কোন্ শাড়ীটা পরি?

কথা শুনে হকচকিয়ে যায় যেন কৃষ্ণকিশোর। অলঙ্কার ও আভরণের সে কি বোঝে! কয়েক মুহূর্ত ভেবে নেয় সে! বলে,—পর' না যা মন চায়। আমি কি বুঝি?

—সোনা পরব', না জড়োয়া পরব'? পান্নার সেটটা যদি পরি?

—হ্যাঁ, খুব ভাল হয়।

—সেই সঙ্গে সবুজ রঙের বেনারসীটা? যেটা তোমাদের এখান থেকে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু দেরী করলে চলবে না। তুমি গিয়ে জুড়ী পাঠালে তবে আমি আদালতে যেতে পারবো।

—না, না, দেরী হবে না। এক্ষুনি তৈরী হয়ে নেবো। বলে রাজেশ্বরী। চাবি-ঝুলানো আঁচলটা খোঁজে। আলমারী আর দেরাজের চাবি। গয়না আর কাপড়ের দেরাজ আর আলমারী। তোরঙ্গ আর ক্যাশবাক্সর চাবি। রূপোর চেন আর রূপোর রিং। একগুচ্ছ চাবি।

শাড়ী আর অলঙ্কার প'রে সাজাগোজা করতে খুব ভালবাসে রাজেশ্বরী।

কোন শাড়ীতে কেমন মানায় তাই দেখে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কোন গয়নায় কেমন। আর কোন' কিছুর প্রতি তেমন নয়, পোষাক-পরিচ্ছদ আর অলঙ্কারের প্রতি এক প্রবল তৃষা আছে যেন রাজেশ্বরীর। পৃথিবীর আর আর মেয়ের মত রাজেশ্বরীও বিলাসিনী। বসন-ভূষণের প্রতি অদমনীয় লোভ। পান্নার সেট আর সবুজ শাড়ী কোন' দিন অঙ্গে চাপায়নি রাজেশ্বরী। আজকে মনের সুখে দেখবে আয়নায়। দেখবে, কেমন দেখিয়েছে তাকে। সুর্মা আর সিঁদূর টিপে কেমন মানিয়েছে। ওষ্ঠের রক্তিম বর্ণটা বেশী মাত্রায় হয়নি তো?

—তুমি তবে তৈরী হয়ে নাও। আমি গাড়ীতে ঘোড়া জুততে বলছি।

কৃষ্ণকিশোর কথার শেষে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। যাই হোক্, টাকা পাচার করার প্রথম ধাপটা নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হ'লেই মঙ্গল। রাজেশ্বরীই যদি না থাকে, কে দেখলো না দেখলো কি যায়-আসে! কি পোষাক পরলো কে দেখছে? গাড়ীতে কে এবং কি উঠলো কে দেখছে? জুড়ী কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে কে দেখছে? কার প্রয়োজন?

কাছারীতে চলেছিল কৃষ্ণকিশোর।

হেড-নায়েব মশাইকে শুধু একটা কথা বলবে। আর পাইক পাঠাবে আস্তাবলে। জুড়ী বের করতে বলবে। বেশ প্রফুল্ল চিত্তে চলেছিল কৃষ্ণকিশোর। অন্দর থেকে সদরে। তালতলার ভটচাযি্য মার্কা চটি জুতোর শব্দ করতে করতে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চলেছিল।

প্রজাবৃন্দ যেমনকার তেমনি বসে আছে এখনও?

দূর থেকে দেখে কৃষ্ণকিশোর। কালো-কালো মানুষ আর মানুষের মাথা। হেড-নায়েবকে এখন ডাক দেওয়া চলে না। তিনি জমাজমির কাজ করতে করতে ঘর্মাক্ত হয়ে প'ড়েছেন!

মুহূর্ত কয়েক অতিবাহিত হয়েছে কি হয়নি।

অনন্তরাম বললে,—বৌ তৈরী! আমাকে কি পৌঁছে আসতে হবে?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—নিশ্চয়ই। তোমাকে সেখানে থাকতে হবে আজ সারাদিন। বৌ যতক্ষণ না ফিরছে।

—বাঃ, বেশ কথা। তার মানে দিনটাই বেবাক—

অনন্তরাম জানে মিথ্যা বাক্য অপচয়ে কোন লাভ নেই। যেতেই হবে তাকে। নয় তো বংশের ইজ্জত থাকবে না। লোকে বলবে, লোক-জন নেই নাকি শ্বশুর-বাড়ীর? পাইক-বরকন্দাজ? দাস কিংবা ভৃত্য?

বিদায়কালে রাজেশ্বরী দেখা দিয়ে যায় অন্দরের দরজার মুখে।

জুড়ীতে ওঠবার আগে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। দেখায়, ঠিকঠাক হয়েছে, না কোন' ত্রুটি থেকে গেল।

লজ্জানত পরী যেন, উড়ে এসেছে ফুলের বন থেকে।

ফুলের মতই দেখাচ্ছে রাজেশ্বরীকে। পান্নার অলঙ্কার আর সবুজ শাড়ীর ফাঁক থেকে রাজেশ্বরীর ফুলের মত মুখ— শ্যামল পদ্মবনে যেন একটি সদ্য-ফোটা গোলাপী পদ্ম। পায়ের অলঙ্কারের ঝম ঝম্ শব্দ হয় শুধু। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। দেখায় নিজেকে।

—গাড়ীটা যেন পাঠাতে দেরী ক'র না। আমি ফিরে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো। তুমি ফিরে আসবে।

অনন্তরাম উঠে কোচবাক্সে ব'সলো। রাজেশ্বরী বসলো ভেতরে। আর ব'সলো এলোকেশী। সইস গাড়ীর দরজা ফস্ ক'রে টেনে দেয়। অন্ধকার হয়ে যায় গাড়ীর অভ্যন্তর। একটা উগ্র গন্ধ বইতে থাকে গাড়ীর ভেতরে। রাজেশ্বরী সেই গন্ধটা ছড়ায়। ৪৭১১-মার্কা কি একটা বিদেশী সুগন্ধ। যূঁই না বেলের বোঝা যায় না। কিন্তু গন্ধে মাতাল-করা আমেজ।

তাড়াতাড়ি জুড়ী চাই আজ। হুজুর যাবেন যেন কোথায়। রঙমহলে? [ক্রমশঃ]

লবকুমার বসু

ক্রিকেট

পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দলের প্রথম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরও শেষ হয়েছে। শেষ খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে সম্পন্ন হওয়ায়, দ্বিতীয় টেষ্টে জয়লাভ করে টেষ্ট পর্যায়ে ১—০ খেলায় অগ্রগামী থাকার ফলে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলটি শেষ পর্য্যন্ত "রাবার" জয়ের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। এই খেলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, ভারতীয় দলের পক্ষে উম্রিগড়, পঙ্কজ রায় ও মঞ্জরেকার এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ওরেল, উইকস ও ওয়ালকটের সেঞ্চুরী এবং মানকড়, গুপ্তে ও ভ্যালেন্টাইনের সাফল্যের সঙ্গে বোলিং। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকার ও পঙ্কজ রায় জুটির ব্যাটিং এবং গুপ্তের এই সফরে ৫০টি উইকেট লাভও উল্লেখযোগ্য।

অধিনায়ক হাজারে উপর্য্যুপরি তৃতীয় বার টসে জয়লাভ করে স্বীয় দলকে ব্যাট করতে পাঠান। মাত্র ৮০ রাণে ভারতীয় দল তিনটি উইকেট হারালে, উম্রিগড় চতুর্থ উইকেটে পঙ্কজ রায়ের সহায়তায় ১৫০ রাণ তুলতে সক্ষম হন এবং ভারতীয় দলের রাণ-সংখ্যা বেশ ভাল হবে বলেই সকলে আশা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষের দিকের ব্যাটসম্যানদের ভ্যালেন্টাইনের দুর্দ্ধর্ষ বোলিংএর বিরুদ্ধে অকৃতকার্য্যতার ফলে, শেষের পাঁচটি উইকেট মাত্র ৪৫ রাণে পতন হয়। এর পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলা শুরু হলে "দি থ্রী ডবলুজ"—উইকস, ওরেল ও ওয়ালকট প্রত্যেকে শতাধিক রাণ ক'রে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলে তাঁদের স্থান যে অপরিহার্য্য পুনরায় তা প্রতিপন্ন করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের রাণ-সংখ্যা—৫৭৬এর মধ্যে, তাঁদের ব্যক্তিগত রাণ-সংখ্যার সমষ্টি হল ৪৭৪। এঁদের মধ্যে কেবল ওরেলই দ্বিশতাধিক রাণ করেন। তাঁদের ঐরূপ সাফল্য সত্ত্বেও অন্যান্য ব্যাটসম্যানদের কিন্তু মানকড় ও গুপ্তের বোলিংএর নিকট বিপর্য্যস্ত হতে হয়েছিল। মাত্র ২৭ রাণে শেষের ৬টি উইকেটের পতন হয়। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে পঙ্কজ রায় ও মঞ্জরেকার নিখুঁত ভাবে খেলে দ্বিতীয় উইকেটে ২৩৭ রাণ তোলেন এবং প্রত্যেকে তাঁরা শতাধিক রাণ করতে সক্ষম হন। এটিই টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে যে কোন উইকেটের জুটির মধ্যে সর্ব্বাধিক রাণ-সংখ্যা। কিন্তু এরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখালেও শেষের ৭টি উইকেটের পতন হয় মাত্র ১১৭ রাণে এবং ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৪৪৪ রাণে শেষ হয়। খেলার ষষ্ঠ ও শেষ দিনে তখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে জিততে হলে প্রায় ১৫০ মিনিটে ১৮১ রাণ করা প্রয়োজন। তাঁরা ঐ সময়ে কিন্তু চার উইকেটে মাত্র ১২ রাণ করেন ও খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে সম্পন্ন হয়। ফলাফল :—

ভ্যালেন্টাইন ৬৪ রাণে ৫টি); এবং ৪৪৪ (পঙ্কজ রায় ১৫০, মঞ্জরেকার ১১৮, আপ্তে ৩৩, রামচাঁদ ৩৩; গোমেজ ৭২ রাণে ৪টি, ভ্যালেণ্টাইন ১৪১ রাণে ৪টি)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—৫৭৬ (ওরেল ২৩৭, উইকস ১০৯, ওয়ালকট ১১৮, পেয়েরো ৫৮; মানকড় ২২৮ রাণে ৫টি, গুপ্তে ১৮০ রাণে ৫টি); এবং ৪ উইকেটে ১২ (উইকস ৩৬)

• • • •

ভারতীয় দলের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর শেষ হয়ে গেছে। তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত এই দলটির সফর যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। গত বছর যে দুর্ন্নাম বহন করে তাঁরা ইংলণ্ড সফর থেকে ফিরেছিলেন, তার অনেকাংশই এই সফরে তাঁরা মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে তাঁদের মাত্র একটি খেলায় দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হতে হয়; অপর টেষ্ট খেলাগুলি অমীমাংসিত ভাবে সম্পন্ন হয়। টেষ্ট খেলাগুলি ছাড়া, কলোনীগুলির বিরুদ্ধে চারটি খেলার মধ্যে একটিতে তাঁরা জয়লাভ করেন; বাকীগুলির মীমাংসা হয়নি।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন বোম্বাইর তরুণ স্পিন বোলার সুভাস গুপ্তে। সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি ৫০টি উইকেট নিয়ে, বোলিংএর গড়পড়তায় সর্ব্বোচ্চ স্থান দখল করেন। ইতিপূর্ব্বে বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর করলেও ৫০টি উইকেট লাভ করতে কেহই সক্ষম হননি। উদীয়মান খেলোয়াড় গুপ্তের পক্ষে এই কৃতিত্ব অর্জ্জন কম গৌরবের নয়। ব্যাটিংএ সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করেন চৌকস খেলোয়াড় পলি উম্রিগড়। গত ইংলণ্ড সফরে দ্রুত (ফাষ্ট) বলের বিরুদ্ধে তাঁর যে ভীতি দেখা গিয়েছিল সেটা যে এই সফরে তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তা খুবই আনন্দের বিষয়। এই সফরে তিনি ভারতীয় দলের ব্যাটিংএর মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিলেন এবং অনেক খেলায় ভারতীয় দলকে বহু উদ্বেগজনক অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। ব্যাটিংএর গড়পড়তায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান দখল করেন। উম্রিগড় ছাড়া ব্যাটিংএ সাফল্য লাভ করেন আপ্তে, মঞ্জরেকার, পঙ্কজ রায় প্রভৃতি। বিজয় মার্চেন্টের অবসর গ্রহণের পর আপ্তের ন্যায় এক জন নির্ভরশীল ওপনিং ব্যাটসম্যান পাওয়া ভারতীয় দলের পক্ষে খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে; কুশলী খেলোয়াড় মঞ্জরেকারও সফরে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। আর পঙ্কজ রায় যদি গোড়ার দিকে সাফল্য লাভ করতেন, তা হলে ভারতীয় দলের পক্ষে তা বিশেষ লাভজনক হত। এই সফরে সব থেকে নিরাশ করে অধিনায়ক হাজারের ব্যাটিং। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি ভারতীয় দলের sheet anchor ছিলেন। অধিনায়কের গুরু দায়িত্বই সম্ভবতঃ তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করতে বাধা সৃষ্টি করছে। আশা করা যায়, তাঁর এই অকৃতকার্য্যতা সাময়িক হবে। সহ-অধিনায়ক মানকড়ও এ সফরে তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলা দেখাতে পারেননি।

এবার ভারতীয় দলের ফিল্ডিংএর বিষয় কিছু বলব। তরুণ খেলোয়াড়গণ যেরূপ নিপুণতা ও একাগ্রতার সঙ্গে ফিল্ডিং করেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। বহুদিন ধরে ভারতীয় দলের ফিল্ডিংএ একটা দুর্ণাম ছিল এবং ভাল ফিল্ডিংএর অভাবেই তাঁদেরকে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে তরুণ খেলোয়াড়গণ ভারতের সে গ্লানি দূর করতে পেরেছেন। গায়েকওয়াড়, গাডকারী [illegible] সুনাম অর্জ্জন করে ফিরে এসেছেন।

এ সফরে টেষ্টে জয়লাভ করার পথে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণের অসুস্থতা ও আহত হওয়া অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মাঁকা, গায়েকওয়াড় ও ফাদকার আহত হন এবং সেই জন্যে কয়েকটি খেলায় যোগদান করতে পারেননি। শোধন পঞ্চম টেষ্টে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় খেলতে অক্ষম হন। এই সকল নানা কারণে জয়লাভ করে ফিরতে পারলেও, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর থেকে ভারতীয় দল যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জ্জন করে ফিরেছে। এ খুবই আনন্দের কথা।

• • • •

এই গ্রীষ্মে লিণ্ডসে হ্যাসেটের নেতৃত্বে অষ্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ড সফরে গেছে। টেষ্ট খেলার ইতিহাসে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ সকলের কাছেই সুপরিচিত; ১৮৭৭ সাল থেকে এর আরম্ভ হয়। এ পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে ৪০টি টেষ্ট পর্যায়ে ১৫৮টি ম্যাচ খেলা হয়। এর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট পর্যায়ে জয়লাভ করে ১১টি ও ইংলণ্ড ১৮টি এবং অবশিষ্ট তিনটির কোন মীমাংসা হয়নি। আর টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৬৮টি ম্যাচে জয়লাভ করে ও ইংলণ্ড ৫৬টি। বাকী ৩৪টি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে জার্ডিনের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দলের জয়লাভের পর টেষ্ট পর্যায়ে আর তাঁরা জয়লাভ করতে পারেননি। তাই এবারের সফরে নতুন পেশাদারী অধিনায়ক হাটনের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল পুনরায় "এ্যাসেস্" লাভ করতে পারবে কি না, সেটি আজ প্রধান আলোচনার বিষয়। যুদ্ধের পর অষ্ট্রেলিয়ার ফাষ্ট বোলার লিণ্ডওয়াল ও মিলারের প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডের সে রকম কোন ফাষ্ট বোলার না থাকায় তাদের খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে; কিন্তু এ বছরে তারা টুম্যানের সাহায্য পাবে। তার ওপর আবার এবারে ফাষ্ট বোলারদের মারণাস্ত্র "বাম্প বল" তুলে দেওয়ার কথা হচ্ছে; তাতে যে লিণ্ডওয়াল ও মিলারের কার্য্যকারিতা অনেকাংশে কমে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং নবগঠিত ইংলণ্ড দল ও অষ্ট্রেলিয়া দলের মধ্যে কোন্ দলটি শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করবে, তা খুবই কৌতূহলের বিষয়। ইংলণ্ড-সফরকারী অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের নাম নিয়ে উদ্ধৃত করা হল—

এল· হ্যাসেট (অধিনায়ক), মরিস (সহ-অধিনায়ক), লিণ্ডওয়াল, মিলার, ল্যাঙ্গলে (উইকেট কীপার), ডন ট্যালন (উইকেট-কীপার), আয়ান ক্রেগ, ডি, রিং, হিল্, উকোর্সি, জনষ্টন, ডেভিডসন, হার্ভে, বেনড, ম্যাকডোনাল্ড, হোল এবং আর্চার।

হকি

ভারত আজ গত পঁচিশ বছর ধরে হকি খেলায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফুটবল খেলার তুলনায় কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের কাছে এ খেলাটি তেমন সমাদর লাভ করেনি। তবে গত কয়েক বছর ধরে মোহন-বাগান, ইষ্টবেঙ্গল, ভবানীপুর প্রভৃতি জনপ্রিয় ক্লাবগুলি এই খেলাটির প্রতি মনোযোগ দেওয়ায়, জনসাধারণের মধ্যে এটির প্রতি বেশ উৎসাহ দেখা দিয়েছে। এটি খুবই আনন্দের বিষয়।

বেশ উত্তেজনার মধ্যে দিয়েই কলকাতার সিনিয়র ডিভিশন হকি লীগ খেলার সেদিন সমাপ্তি হয়েছে। ভবানীপুর দলটি তাতে বিজয়ীর গৌরব লাভ করেছে এবং রানার্স আপের স্থান দখল করেছে, যুগ্ম ভাবে কাষ্টমস্, রাজস্থান ও ইষ্টবেঙ্গল দল। দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে, নিম্নস্থান অধিকারী কয়েকটি দলের মধ্যেও, এ বছরের লীগ বিজয়ের মতনই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। সকলেই জানেন, লীগের সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকারকারী দুটি দলকে পর বৎসর দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে হয়। তাই সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকারকারী সেন্ট জোসেফ দলের সঙ্গে আর কোন দলটি দ্বিতীয় ডিভিশনে নামবে তা একটি আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়; কারণ, বি· জি· প্রেস, পোর্ট কমিশনর ও কালীঘাট দল সমান সংখ্যক পয়েন্ট লাভ করে। সেই জন্য তাদের মধ্যে একটি লীগ খেলার ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্য্যন্ত কালীঘাট দল তাতে সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করায় সেন্ট জোসেফ দলের সঙ্গে পর-বৎসর তাদের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে হবে। এ বছরে দ্বিতীয় ডিভিশনে যথাক্রমে বিজয়ী ও রানার্স আপের স্থান দখল করে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব এবং আদিবাসী দল পর-বৎসর প্রথম ডিভিশনে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

লীগ খেলার সমাপ্তির পর কলকাতার যে বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, তাও শেষ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এ বছরের মত কলকাতার হকি মরসুমের উপরও যবনিকা পড়েছে। সেদিনের বৃটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ এক কর্ম্মচারী টি· ডি· বাইটনের নামানুসারে নামাঙ্কিত এই কাপটির খেলা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৯৫ সালে। এ বছরে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই প্রতিযোগিতাটিতে বিজয়ীর গৌরব লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে বোম্বাইর টাটা স্পোর্টস ক্লাব। ফাইনালে, এই প্রতিযোগিতার নবাগত নাগপুর ইউনাইটেড দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে, টাটা দল এই গৌরব লাভ করতে সক্ষম হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত আগা খাঁ কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে এ বছর এই টাটা দল লুসটেনিয়ানসের নিকট পরাজিত হয়। সুতরাং বাইটন কাপ জয় করে আগা খাঁ কাপের পরাজয়ের গ্লানি তারা মোচন করেছে।

এ বছরে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট, খালসা ব্লুজ, মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং প্রমুখ কয়েকটি শক্তিশালী দল শেষ মুহূর্ত্তে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে অক্ষমতা প্রকাশ করায়, স্থানীয় ক্রীড়ামোদীরা যে খুবই মর্ম্মাহত হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহ। যাই হোক, মোট ৩৪টি দল এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ বছরে স্থানীয় দলগুলির অকৃতকার্য্যতায় এখানকার ক্রীড়ামোদীরা খুবই নিরাশ হন। একমাত্র মোহনবাগান ব্যতীত কোন দলই সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। যদিও অনেক ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ভাগ্য-বিড়ম্বনার জন্যই তাদের বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে; ইষ্টবেঙ্গল তার মধ্যে একটি। মীরাটের শিখ রেজিমেন্টাল দলের সঙ্গে খেলায় আম্পায়ারের ত্রুটি হেতু জয়লাভ করেও তাদের পুনর্বার খেলতে হয় এবং পুনরানুষ্ঠিত খেলায় শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়। সেমি ফাইনালে মোহনবাগান দল ভাল

খেলেও টাটা স্পোর্টসের নিকট পরাজিত হয়। এ বছরে বাইটন কাপের খেলায় যে সকল বাধা সৃষ্টি হয়, তা কর্ত্তৃপক্ষকে বেশ চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। এতগুলি খেলা ড্র হওয়া বা বৃষ্টি প্রভৃতি অন্যান্য কারণের জন্য খেলা অমীমাংসিত থাকা বোধ হয় আর কোন বছরে হয়নি। এর ফলে মে মাসের পূর্ব্বেই এই প্রতিযোগিতাটি শেষ হওয়ার কথা হলেও, শেষ পর্য্যন্ত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালোরে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা (ন্যাশানাল হকি চ্যাম্পিয়ানশিপ) শুরু হয়ে গেছে। এ বছরে অলিম্পিকে বা বাইরে আর কোন স্থানে ভারতীয় দলের যাবার কথা নেই বলে এর আকর্ষণ যদিও এবার কম, কিন্তু আমাদের প্রাদেশিক বাংলা দল তাদের বিজয়ীর গৌরব রক্ষা করতে সক্ষম হবে কি না তা লক্ষ্য করবার বিষয়; কারণ, গত বছর বাংলা দল এই প্রতিযোগিতাতে জয়লাভ করে। এবারে আবার বিগত অলিম্পিকে বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক এবং ভারতের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় বাবুর যোগদানে বাংলা দলটি যে খুবই শক্তিশালী হয়েছে, তা নিঃসন্দেহ। কাষ্টমস্ দলের ক্লডিয়াস এ বছরের বাংলা দলের অধিনায়ক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

কলকাতার প্রথম ডিভিশন হকি লীগ খেলার ফলাফলের নির্ঘণ্ট নিয়ে উদ্ধৃত করা হল—

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ভবানীপুর	১৯	১৬	৩	০	৪৯	৯	৩৫
কাষ্টমস্	১৯	১৫	৩	১	৪৭	৫	৩৩
রাজস্থান	১৯	১৬	১	২	৫৬	১২	৩৩
ইষ্টবেঙ্গল	১৯	১৫	৩	১	৪৭	১১	৩৩
মোহনবাগান	১৯	১১	৬	২	৪৫	১৪	২৮
মহঃ স্পোর্টিং	১৯	১১	৩	৫	৩১	৮	২৫
পাঃ স্পোর্টস	১৯	৮	৩	৮	২৬	১৯	১৯
আঃ পুলিশ	১৯	৭	৪	৮	২৪	২৯	১৮
পুলিশ	১৯	৮	২	৯	৩২	৩৩	১৮
গ্রীয়ার	১৯	৭	৩	৯	২১	২৩	১৭
রেঞ্জার্স	১৯	৭	৩	৯	১৬	২৬	১৭
ডালহাউসী	১৯	৭	৩	৯	২০	২২	১৭
এরিয়ান্স	১৯	৬	৫	৮	২০	২৭	১৭
আর্মেনিয়ান্স	১৯	৪	৭	৮	১৫	২২	১৫
টোপা	১৯	২	৭	১০	৮	৩০	১১
মেসেরার্স	১৯	৩	৫	১১	১৯	৩৮	১১
বি জি প্রেস	১৯	৪	২	১৩	৮	৩৮	১০
পোর্ট কমিঃ	১৯	৩	৪	১২	৯	৪৫	১০
কালীঘাট	১৯	৩	৪	১২	৮	৪৮	১০
সেণ্ট জোসেফ	১৯	১	১	১৭	১৪	৫৫	৩

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

আকাশ-পাতাল (১ম পর্ব্ব)—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

ময়ূরকণ্ঠী—সৈয়দ মুজতবা আলী। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

দামোদর গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ)—দামোদর মুখোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৩১বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীঅখিলচন্দ্র নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)। সাহিত্য চয়নিকা, ৫১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।

সুশীল রায়ের গল্প সঞ্চয়ন—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

এই দেশ আমাদেরই—শ্রীজীবানন্দ ঘোষ। সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোনারপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

গুলজার ফিল্ম কোম্পানী (রঙ্গনাটিকা)—শ্রীজীবানন্দ ঘোষ। চিত্রিতা প্রকাশিকা, ৪পি, নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫। মূল্য আট আনা।

প্রেয়সীকে—শ্রীসুজিত সেন। বেঙ্গল বুক হাউস, পি ১৩৬, রসা রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য বারো আনা।

চতুর্ব্বর্গ প্রতিষ্ঠা—শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। শ্রীশচীন্দ্রকুমার বসু,৪০সি, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৬। মূল্য এক টাকা।

সমাজ ও শিশুশিক্ষা—শ্রীপ্রতিভা গুপ্ত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

অতীত স্বপন—প্রমোদকুমার। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্জিকা (১৩৬০ সাল)—স্বামী শ্যামানন্দ। ১, উমেশ দত্ত লেন, কলিকাতা—৬।

গোল পথ—শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য। রেমকো প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ১৬, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।

অতিকান্তা—শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য্য। আগমনী প্রকাশনা ভবন, ৮এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য বারো আনা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিহারের গাত্রদাহ

"বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় বিহারের যে কিরূপ গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিহার বিধান সভায় এ সম্পর্কে আলোচনার সময় কয়েক জন সদস্যের স্পর্দ্ধিত ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে। বিহারের শাসকশ্রেণী যে সকল বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলের উপর আধিপত্য করিবার সুযোগ বৃটিশ শাসকের কৃপায় পাইয়াছেন, তাহা তাঁহারা সহজে ছাড়িতে চাহিবেন, ইহা আশা করা অবশ্যই সম্ভব নয়। কিন্তু এই আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য বিহার বিধান সভায় সত্যের যে অপলাপ করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার সম্মুখে বৃটিশ শাসকের নির্লজ্জতাও লজ্জায় মুখ লুকাইবে। পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিহার বিধান সভায় মতামত জানিতে চাওয়ায় গত মঙ্গলবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডা: শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ঐ সম্পর্কে বিহার বিধান সভার বিবেচনার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যাইয়া তিনি অবশ্য খুব সংযত এবং কূটকৌশলপূর্ণ ভাষায় এই দাবীকে সময়োপযোগী নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার বিভেদ এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিরোধ করার জন্য বাঙ্গালা ও বিহারের সীমানা লইয়া বিরোধ বন্ধ করা আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবী বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চল বিহারের উদরস্থ না থাকিলেই বিভেদ সৃষ্টি হইবে ও প্রতিক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাইবে, ইহা অতি চমৎকার যুক্তি!"

—দৈনিক বসুমতী।

দাবীর উত্তরে দাবী

"পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, বিহার বিধান সভা তাহার 'জবাব' দিয়াছেন। তিন দিন ধরিয়া বিতর্কের পর বিহার বিধান সভা পশ্চিমবঙ্গের দাবীর মূলে যে কোন যুক্তি নাই, শুধু তাহাই বলেন নাই, বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সভাপতির প্রস্তাবে পাল্টা দাবী করা হইয়াছে যে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলার যোল আনাই বিহার রাজ্যের জন্য চাই, আর বীরভূম, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরের অংশও শাসনতান্ত্রিক ও ভাষাগত প্রয়োজনে বিহারের চাই। পশ্চিমবঙ্গের দাবীর উত্তরে বিহারকে এই ধরণের পাল্টা দাবী করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই। কারণ বিহারের কংগ্রেসী দলের কোন কোন সদস্যের মুখে এইরূপ উক্তিই শোনা গিয়াছে। দুইটি প্রদেশের সীমানা নির্ধারণের প্রশ্ন দীর্ঘদিন জিয়াইয়া রাখিলে এই ধরণের মতিগতিই যে দেখা দিবে, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এইবার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রদেশ গঠনের মূলনীতির মর্যাদা রক্ষার জন্য কি করিতে পারেন, তাহাই লক্ষ্য করিবার।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

আশঙ্কা নাই

"রাজনীতিক্ষেত্রে একটা কৌশল হইল: যেটুকু দাবী আদায় করা অভিপ্রেত সে তুলনায় দাবীর বহর অনেক বাড়াইয়া তোলা। পরলোকগত কায়েদে আজম এই কৌশলের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত পাকিস্থান কায়েম করিয়াছিলেন। স্পষ্টভাবে দাবী পেশ করার বদভ্যাস তাঁহার ছিল না; কংগ্রেস দল বা তৎকালীন বৃটিশ সরকার খানিকটা দাবী মানিয়া লইলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাবীর বহর বাড়াইয়া তুলিতেন। পশ্চিম-বাঙ্গলার আয়তন বৃদ্ধির দাবী কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে বিহার বিধান সভায় অনুরূপ একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। একজন কংগ্রেসী সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে—বিহারের কোন কোন অঞ্চল পশ্চিম-বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত করার দাবী উঠিতেই পারে না। "বরঞ্চ ভাষাগত ঐক্যের দিক দিয়া ও শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং বীরভূম বাঁকুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর জেলার কতকগুলি অংশ বিহারের সহিত জুড়িয়া দেওয়ার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করার জন্য এই সভা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।" এই সঙ্গে কলিকাতা বন্দর জুড়িয়া দেওয়ার দাবী তাঁহারা উত্থাপন করিলেন না কেন, কিংবা প্রস্তাবিত ধারায় পুনর্বিন্যাসের পরে আরও সঙ্কুচিত পশ্চিম-বাঙ্গলায় শাসনসৌকর্য বজায় থাকিবে কি উপায়ে—তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই, অবশ্য এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর সহ সামঞ্জস্যমূলক ব্যবস্থা করাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। পশ্চিম-বাঙ্গলা যদি বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের দাবী ত্যাগ করে, তাহা হইলে বিহারের নেতারাও দাবী আদায়ের জন্য মামলা চালাইবেন না। অতএব, উল্লিখিত স্থানগুলি বাস্তবিকই হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা নাই।"

—যুগান্তর।

প্রমোশন তদন্ত

"মামার খাতিরে অযোগ্য লোককে প্রমোশন দিয়া গবর্ণমেণ্ট চালানো যায় না পাকিস্থান এই সত্য কথাটা আমাদের আগে বুঝিয়াছে। তাহারা একটি এডমিনিষ্ট্রেটিভ এনকোয়ারী কমিটি বসাইয়াছে। ১৯৫০ সাল হইতে যত প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে সব তাঁহারা বিচার করিবেন। লোকে চাহিতেছে, ১৯৫০ কেন,

পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যত প্রমোশন হইয়াছে সবগুলি অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যাহারা তৈলমর্দ্দনের পিচ্ছিল পথে উপরে চড়িয়াছে, তাঁহাদের তেমনি দ্রুতবেগে যথাস্থানে নামাইয়া দিতে হইবে। আমাদের দেশে যে যত পুরানো পাপী এবং যে যত অপদার্থ তার তত উন্নতি হইয়াছে। গোড়ওয়ালা মহাশয় প্ল্যানিং কমিশনের নির্দ্দেশে শাসনযন্ত্রের গলদ তদন্ত করিয়াছিলেন। তাঁর রিপোর্ট শিকায় উঠিয়াছে। এবার আমেরিকা হইতে অ্যাপ্‌লবি সাহেবকে আনিয়া রিপোর্ট লেখানো হইয়াছে। এই রিপোর্টও ইঁদুরের পেটে যায় কি না দ্রষ্টব্য।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

পানীয় জল

"এই দারুণ নিদাঘে পল্লী অঞ্চলের জলের অবস্থা সঙ্গীন আকার ধারণ করিয়াছে। পুকুরের জল শুকাইয়া গিয়াছে; ফলে হইয়াছে গো-মহিষের পানীয় জলের অভাব; জমিদার ও ধনিক আজকাল পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে বিশেষ ব্যস্ত নহেন; অনেক ভাল পুকুরও সংস্কার অভাবে মজিয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পুষ্করিণী 'ভাগের মা'। কৃষি মৎস্য ও পুষ্করিণী উন্নয়ন তিনটি বিভাগ সংস্কারে রত; কিন্তু পুকুর সংস্কার কার্পণ্য দোষে ও পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট। ভরসা নলকূপের। সেখানেও মালিক ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড ও সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ। তিন পক্ষ চলেন তিন দিকে। অর্থাভাব প্রত্যেকেরই অভিযোগ। জলাভাবগ্রস্ত জনসাধারণ 'বাবুদের' দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হায়রাণ হয়। যদি কখনও কোন "বাবুদের" টাকা থাকে তখন হয়ত নলকূপের নল থাকে না; নল থাকে ত তালিকার গোল বাধে। কোথায় সংস্কার করিতে হইবে, কোথায় পুনরায় বসাইতে হইবে, বার বার তালিকা প্রস্তুত করিয়াও হয়ত চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। সব ঠিক হইল, দেখা গেল কষিবার লোকের অভাব। জলাশয়, নলকূপ ও ইন্দারা যেখানে আছে, সেখানে মানুষ ও গো-মহিষের ভিড় দেখিলে দারুণ নিদাঘে জলাভাবের তীব্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসুবিধা হয় না। যাহাদের শক্তি লইয়া 'বাবুদের' শক্তি, যাহাদের অর্থ লইয়া 'বাবুদের' অর্থ, তাহাদের অত্যাবশ্যকীয় পানীয় জল ব্যবস্থাপনা লইয়াই এই ছিনিমিনি! দারুণ নিদাঘ! আর্দ্রতার লেশমাত্র নাই। পাষাণ গলিতেছে; কর্ত্তৃপক্ষের মন গলিবে কি?" —দৃষ্টি (বর্দ্ধমান)।

নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি দৃষ্টি দিন

"সাকচীর বাস ষ্ট্যাণ্ড হইতে মাত্র দুই-তিন মিনিটের পথ হইতেছে নূতন রিফিউজী মার্কেট। সহরের প্রাণকেন্দ্রের ভিতরে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে নোটীফায়েড এরিয়া কমিটীর গাফলতির জন্ত যে কিরূপ একটি ক্ষুদ্রায়তন নরক রহিয়াছে, তাহা হঠাৎ ধারণা করা যায় না। যদিচ নগরীর বহু জনবসতিপূর্ণ এলাকা হইতে গরু মহিষের খাটাল জনস্বাস্থ্যের জন্ত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি এখানে এখনও কয়েক জন গোয়ালা মনের আনন্দে খাটাল চালাইতেছে। ফলে গো-মহিষাদির মল-মূত্রে সারা এলাকাটি সর্ব্বদা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ থাকে এবং এই এলাকাতে রোগও লাগিয়া আছে। ইহা ছাড়া এখানকার নালী এবং পয়ঃপ্রণালীগুলি এই সব গো-মহিষাদির উৎপাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এজন্তও টাটার টাউন বিভাগের যথেষ্ট অর্থ নষ্ট হইয়াছে। টাউন বিভাগ এবং নোটীফায়েড এরিয়া কমিটী অবিলম্বে এই নরকগুলি সহর হইতে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিয়া জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং নাগরিকদের ট্যাক্সের অর্থের সদ্ব্যয় করিবেন কি?"

—নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

কঙ্কালের পূজা?

"একটা বিষয়ে বাঙ্গালী জাতির ভাবপ্রবণতার প্রাচুর্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইব, না দুঃখিত হইব ভাবিয়া পাইতেছি না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মের দিবস যতই পুরাতন হইতেছে ততই জয়ন্তী উৎসবের আতিশয্যও যেন সমান তালে বাড়িয়া চলিয়াছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও উৎসব হইতে সুরু হইয়াছে। গুণীর পূজা করা, জাতির নায়কের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নিশ্চয়ই ভাল কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কিছুর বাড়াবাড়ি দেখিলে মনে হয় আমরা সত্য ছাড়িয়া বুঝি কঙ্কালেরই পূজা করিতে ছুটিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রূপায়িত করিতে তো কাহাকে দেখিলাম না!"

—রাঢ় দীপিকা (রামপুরহাট)।

চাকরী করবো

"প্রতিটি ছাত্র স্কুলে প্রবেশ করবার আগে "চাকরী করবো" এই চিরন্তন পুরাতন মনোভাব নিয়ে স্কুলে যেন না যায়। আজ "চাকরী করবো" এই মনোভাবটির মোড় ফেরাতে হবে। এ মোড় না ফেরালে আজ অন্যায় হবে। স্বাধীন জীবিকার শত শত পথ পড়ে আছে, স্বাধীন দেশের যুবকদের স্বাধীন বৃত্তি নির্ব্বাচন করে, শিক্ষিতের আত্ম-অভিমান ও আত্ম-অহংকার ত্যাগ করে সকল প্রকার বৃত্তি গ্রহণ করবার মনোভাব তৈরী করতে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষিতের সঙ্গে যদি আমরা সমতা রক্ষা করতে চাই, তবে তথাকথিত "ছোট বৃত্তি" বলিয়া কোন বৃত্তিই ছোট নয় এই মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। চাকরী স্বাধীন বৃত্তি মোটেই নয়, চাকরী দাস-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। সকল স্বাধীন বৃত্তি ছোট ও হেয় বলে মনে হলে ও স্বাধীনতার সম্মানে যে তাকে উজ্জ্বল করে রাখে এ কথাটি আজ ভাববার সময় এসেছে। —হাওড়া বার্ত্তা।

চৌর্য্য সাংবাদিকতা

"আমরা পরিকল্পনা রাজ্যের লোক। চীনাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া অবাক হইতেছি। মাত্র দুই বৎসরে চীন ও তিব্বতের মধ্যে ৬০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা আবার বড় সাধের ম্যাকমোহন লাইন ভেদ করিয়া আসামের মাথায় ঠেকিয়াছে আসামের মাথায় রীমা সহর পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিমান অবতরণের স্থানও প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতের গায়ে উপজাতীয় দল মজুর হিসাবে কাজ করিয়াছে। তিব্বতে শস্তপ্রধান জাইউল জেলার মধ্য দিয়া এই রাস্তা গিয়াছে তাহাতে খাদ্য-চলাচলের সুবিধা হইয়াছে। এদিকে কালিম্পোঙের সংবাদ যে, তিব্বতে বার্লির দাম মণ-প্রতি ১০৲ টাকায় উঠিয়াছে সংবাদ পরিবেশনের রকমওয়ারী মন্দ নয়।"

—জনমত পত্রিকা (কলিকাতা)।

চাউল গেল কোথায় ?

এবার দেশে আশাতীত ভাবে চাউল উৎপাদিত হইয়াছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বেও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব কিদোয়াই সাহেব বর্ম্মা গমনের প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, "দেশে চাউলের অভাব নাই; তবে কোন বিশেষ অবস্থার প্রয়োজনের জন্যই তিনি বর্ম্মা হইতে দ্রব্য-বিনিময়ের চুক্তিতে কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। এবার দেশে প্রচুর ধান্য হইয়াছিল একথা যদি সত্য হয় এবং জনাব কিদোয়াই সাহেবের কয়েক দিন পূর্ব্বের উচ্চারিত কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা প্রশ্ন করিব "সে চাউল গেল কোথায় ?" নিশ্চয়ই উহা দেশের মুনাফাখোরী কালোবাজারী কুমীরদিগের পেটে ঢুকিয়াছে।" —বঙ্গবাণী (আসানসোল)।

দুর্ব্বৃত্তদের উপদ্রব

"আজকাল মফঃস্বল পল্লীর চারিদিক হইতেই চুরি-ডাকাতি আদির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও ইহা ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে। মফঃস্বল পল্লীতে রাত্রিকালে গৃহস্থের নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইবার উপায় নাই। দুর্ব্বৃত্তের দল যেন মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন গ্রামে একই রাত্রে একাধিক চুরি হওয়ার সংবাদও প্রচারিত হইতেছে। দুর্ব্বৃত্তেরা এখন শুধু ঘরচুরি, সিঁদ-চুরি প্রভৃতি ছোটখাট চুরিতেই ক্ষান্ত হইতেছে না; উপরের দিকে নজর দিয়াছে। অর্থের লোভে নৃশংস মারধর, এমন কি মানুষের প্রাণনাশ করিতেও বিরত হইতেছে না।" —নীহার (কাঁথি)।

অবিলম্বে তদন্ত চাই

"স্থানীয় বাজারে সম্প্রতি চাউলের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই সেদিনও চাউল প্রতি মণ ১৪৲।১৫৲ টাকায় পাওয়া যাইতেছিল কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দর ২০৲।২১৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে চাউলের বাজার এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কর্ডন-প্রথা রহিত হওয়ার ফলে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হইতে চাউল আমদানী হওয়ারও এখন আর কোন অসুবিধা নাই। সরকারী রিপোর্টেও খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আশাপ্রদ ও সন্তোষজনক। এ অবস্থায় এই মূল্যবৃদ্ধির সহিত চাউল-ব্যবসায়িগণের কোন কারসাজি আছে কি না, অবিলম্বে ইহার তদন্ত ও প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের এখন হইতেই সজাগ হওয়া উচিত।" —ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)

হায় বাঙলা !!

এই যে অবস্থা ইহার জন্য অন্যের দোষ অপেক্ষা নিজেদের দোষ কিছুমাত্র কম নয়। নিজেদের স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, সর্ব্বোপরি নিজের নিজের সুখ-সুবিধা ষোল আনার উপর আদায় করিয়া লইবার মতলবে পড়িয়া বাঙ্গালা দেশের আজ এই অবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ নীচতা ও হীনতায় মৃত মনে করিয়াই বাঙ্গালা দেশকে বাঁটিয়া লইবার মত ধৃষ্ট উক্তি প্রকাশ্যে হইতে পারে। নীচতা ও হীনতায় একটা দেশ দুর্দশার চরম সীমায় আসে সত্য, কিন্তু নীচতা ও হীনতা চিরকাল থাকে না। অভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রে একটা দেশের সাময়িক ক্ষতি করা যায় কিন্তু এই ক্ষতিকে স্থায়ী ও অটুট করা যায় না। বাঙ্গালীর আত্মোপলব্ধির সময় আসিয়াছে। দেশের প্রতি আজও যদি তাহারা দৃষ্টি না দেয়, আজও যদি স্রোতের জলে ভাসিয়া চলে, আজও যদি দেশবাসীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি না করিতে পারে, আজও যদি নিজ স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহ ত্যাগ না করে তবে আরও নিদারুণ বাণী শুনিতে হইবে এবং আরও কঠিন দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হইবে। একমাত্র বাঙ্গালা দেশ ছাড়া অন্য কয়েকটি প্রদেশের প্রাদেশিকতা ভয়াবহ। এই প্রাদেশিকতার নির্লজ্জ অভিব্যক্তি আজ আর কাহারও নিকট গোপন নাই। এই প্রাদেশিকতার দম্ভেই যদি বাঙ্গালা দেশের আরও ক্ষতির মতলব কেহ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে মারাত্মক ভুল হইবে। ইহা কাহারও পক্ষে সুখের বা কল্যাণকর হইবে না। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া বাঙ্গালীর যে দুর্দশা আজ হইয়াছে তাহা চিরকাল থাকিবে না। নিজেদের প্রকৃত অবস্থা তাহারা উপলব্ধি করিতে শিখিলে তাহাদের এই দুরবস্থার অবসান হইতে দেরী হইবে না। আজ যাহা হইতেছে না, আগামী কাল যে তাহা হইবে না ইহা কে বলিতে পারে ?" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

বঙ্কিম-স্মৃতি-মেলা

"কাঁথি থানার রসুলপুর নদী মোহনায় অবস্থিত দারিয়াপুর ও দৌলতপুর গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য-সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী হইতে "কপালকুণ্ডলার" উদ্ভব হইয়াছে। তদনুসারে কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা-ক্ষেত্র ঘনবনরাজি সমন্বিত ও তটভূমি বঙ্গোপসাগরের উচ্ছল-জলধি-তরঙ্গাভিঘাতে বিধৌত দারিয়াপুর গ্রামে বঙ্কিম-স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ষে বর্ষে তাঁহার অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতি-পূজার আয়োজন হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরও গত ২৬শে চৈত্র বৃহস্পতিবার হইতে 'বঙ্কিমস্মৃতি মেলা ও প্রদর্শনীর' উদ্বোধন হইয়াছে। উদ্বোধন দিবসে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধরঞ্জন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক স্মৃতি-সভার আয়োজন হইয়াছিল। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে সরকারী কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগে নানা প্রকারের পুতুল, চার্ট আদির সমাবেশ হইয়াছে। বিভিন্ন দিবসের অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীগণের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া-কৌতুক আদি, সমাজ উন্নয়ন ও কৃষি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচার এবং সমুদ্রতীরে দৌড়, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয় রহিয়াছে। স্মৃতি-মেলা ও প্রদর্শনীর কার্য্য আগামী ৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত চলিবে। অবশেষে 'কপালকুণ্ডলা' যাত্রাভিনয়ের দ্বারা ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে।" —নীহার (কাঁথি)।

বর্ত্তমানের কংগ্রেস

"প্রচলিত-রীতি-নীতির 'পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া নূতনত্বের প্রতিষ্ঠাই হইল বিপ্লব। সে বিপ্লব অহিংস উপায়েই আসুক; আর হিংসার পথেই আসুক। দেশবাসীকে সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক বিপ্লবের সম্মুখীন করিতে হইলে তাহার জন্য চাই বিরাট নেতৃত্ব। এক সময় ভারতবাসীকে বিপ্লবের কথা শুনাইয়া কংগ্রেস নেতৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের দ্বারা দেশকে সংগঠনের সুযোগও কংগ্রেস এখন পাইয়াছে। কিন্তু সকলকে খুশী রাখিতে গিয়া কংগ্রেস দেশবাসীর আস্থা হারাইতে বসিয়াছে। এই অবস্থায়

দেশবাসীর মনের পরিবর্ত্তন আনিয়া সমাজ উন্নয়নের কাজ সার্থক করিয়া তোলা কষ্টসাধ্য হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাতে বড় গাছের আওতায় ছোট গাছ সব সময়েই ম্লান হইয়া যায়। দুটি গাছকে একই সঙ্গে বাড়িতে দেওয়া ক্বচিৎ সম্ভব হইয়া থাকে। হয় বড় গাছটিকে কাটিয়া ফেলিয়া ছোট গাছটিকে বাঁচাইতে হয়, আর না হয় ছোট গাছটিকে ধীরে ধীরে মরিতে দিতে হয়। এখানেও সেরূপ ধনীর স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দরিদ্রের উন্নয়ন সাধন সম্ভবপর হইবে না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করিতেছি। দরিদ্রের উন্নয়নের বিষয় যাঁহারা চিন্তা করিবেন ধনীর স্বার্থ সম্পর্কে তাঁহাদের উদাসীন হইতেই হইবে। সকলের স্বার্থ বজায় রাখিয়া সমাজের অর্থনৈতিক বিপ্লবের কথা আজও যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, তাঁহাদের আমরা প্রকৃতির এই নিয়মকে অনুধাবন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

—বর্দ্ধমানের কথা (বর্দ্ধমান)।

চোখে ধূলো!

"জেলার রাজধানী সহর বর্দ্ধমানের রাস্তায় আজকাল ধূলো দেখতে পাওয়া যায় না। পৌরসভার তৎপরতায় সব ধূলো অন্যত্র জমা হয়েছে। কথাটা শুনতে আশ্চর্য্য লাগে বই কি! কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য্যের কথা নয়। ২১টি প্রধান পথ, পৌরপতি এবং কয়েকজন পৌরসভা সদস্যদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গলি-পথ ছাড়া কোন রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। পৌর কর্ত্তৃপক্ষের কৃপা-দৃষ্টি-বঞ্চিত সহরের বাকী সব পথের দু'ধারের দোকানদার এবং বাসগৃহের মালিকদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়েছে। কাল বোশেখী হলে তো কথাই নেই, সামান্য ঝড়েও রাস্তার ধূলো আর রাস্তায় থাকে না, সব জড় হয় দোকানে আর বাসগৃহে। ধূলো নিশ্চয়ই পৌরপতি এবং পৌরসভার সদস্যদের চোখে ধূলো দিয়ে দোকানঘরে, বাসগৃহে গিয়ে জড় হচ্ছে, তারা দেখতে পেলে কি আর একটা ব্যবস্থা করতেন না! পৌরপতি ও পৌরকর্ত্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি-বঞ্চিত বি. বি. ঘোষ রোডের জনৈক দোকানদার সেদিন বললেন, "মশায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও কোন গতি হচ্ছে না।" কি করে হবে? তাঁদের চোখে কয়েক পর্দা ধূলো জমে আছে, শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে কি হয়?"

—নূতন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)।

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়

"তবে স্থান নির্ব্বাচন কালে নবদ্বীপের কথা ভুলিলে চলিবে না। নবদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্পূর্ণ অনুকূল। এতদ্ভিন্ন নবদ্বীপ ছিল একদিন ভারতবর্ষের জ্ঞানতীর্থ, নবদ্বীপের টোল ছিল ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙ্গালার সংস্কৃতি ভাণ্ডারে নবদ্বীপের দানের তুলনা নাই। ইহা ইতিহাসের কথা। আজও নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের গোময়লিপ্ত কুটীর-প্রাঙ্গণে জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বালিয়া রাখিয়াছেন। কাব্য, ব্যাকরণ, নব্য ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন-পাঠন চলিতেছে এখনো নবদ্বীপে। নবদ্বীপে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় আছে। অল্প অর্থ ব্যয়ে এই মহাবিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ সম্ভব। বঙ্গবিভাগের পরে বঙ্গদেশের খ্যাতিমান্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর অধিকাংশই নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। এই অনুকূল পরিবেশে প্রস্তাবিত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়টি নবদ্বীপেই স্থাপিত হইবে—ইহাই আমরা কামনা করি।"

—নদীয়ার কথা (কৃষ্ণনগর)।

প্রকৃত গণতন্ত্র চাই

"দুইটি মিউনিসিপ্যালিটিতেই দেখা যাইতেছে চেয়ারম্যানের উপর অধিকাংশ সদস্যের আস্থা নাই। কিন্তু আইনের প্যাঁচে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অনাস্থা না দেখাইলে চেয়ারম্যানকে অপসারণ করা চলে না বা নূতন চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করা চলে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সত্যই সম্মানহানিকর। লোকসভা, বিধানসভায় একটি সদস্যের সংখ্যাধিক্যে যখন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীসভার পতন ও পরিবর্ত্তন হইতে পারে, স্বায়ত্তশাসনের নিম্নতম প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন বোর্ডেও যখন একই ব্যবস্থা, তখন মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডে কেন এই অগণতান্ত্রিক রক্ষা কবচ থাকিবে? এক্ষেত্রে দেখিতেছি জেলার দুইটি অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য পৌরপ্রধান পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া চিরাচরিত প্রথামত জেলা শাসকের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিতে" উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহাদের কাজে যখন অধিকাংশ সদস্য অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে তখন গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যদি তাঁহারা পদত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধিই পাইত। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের মত যাঁহারা দীর্ঘকাল গদী আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের মোহ সহজে যাইবার নহে। আমরা এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীজালানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অবিলম্বে এই রক্ষাকবচের বিলোপ সাধন করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিধানসভার বর্ত্তমান অধিবেশনেই তিনি একটি বিল আনয়ন করেন।"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

শোক-সংবাদ

ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থ-মন্ত্রী শ্রী আর. কে. সম্মুখম্ চেট্টী গত ৫ই মে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা ও দুইটি ভাই রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সম্মুখম চেট্টীর মৃত্যুতে তামিলবাসীরা এক প্রবীণ প্রতিভাশালী নেতাকে হারাইল।

—

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা, বসুমতীর প্রাক্তন সম্পাদক ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা নলিনীবালা দেবী গত ৩রা মে রবিবার তাঁহার দমদম সাউথ সিঁথি রোডস্থ ভবনে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ পুত্র, নাতি-নাতনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগণেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দৈনিক বসুমতীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক। স্বর্গতা নলিনীবালা দেবী পরোপকারিণী ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সার্কাস

(লিনোকাট)

মহারাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ
১৩৬০

৩২শ
বর্ষ

(স্থাপিত ১৩২১)

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। গুরু এক জন, কিন্তু উপগুরু অনেক হইতে পারেন, যাঁহার নিকটে যে জন কিছু শিক্ষা লাভ করে তিনিই তাঁহার উপগুরু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। যখন লুচি ভাজা যায় তখন প্রথমতঃ টগবগ করিয়া উঠে, ক্রমে অধিক জাল পাইলে আর শব্দ বাহির হয় না, এরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। বেশভূষায় ভাবান্তর হইয়া থাকে। কালাপেড়ে ধুতি পরিলেই মনে বিলাসের ভাব আইসে, এবং গোঁপে চাড়া দিবার ইচ্ছা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। মানুষ অর্থে মান্ হুষ, অর্থাৎ যাহার হুষ আছে সেই মানুষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। প্রেম তিন প্রকার। সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী। সমর্থাকে উত্তম প্রেম বলে, তোমার সুখ হইলেই হইল, আমার দুঃখ হয় ক্ষতি নাই, এই সমর্থা প্রেমের ভাব। সমঞ্জসাকে মধ্যম প্রেম বলে। তোমার সুখ হউক, আমারও সুখ হউক, সমঞ্জসা প্রেমের এই ভাব। সাধারণীকে অধম প্রেম বলে। তুমি কষ্ট পাও, পাইলেই বা, কিন্তু আমাকে সুখে রাখিতে হইবে, সাধারণী প্রেমের এই ভাব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। কোথাও যাইতে হইলে মা আনন্দময়ীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও। তাহা হইলে পাপে পতিত হইবে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। বাজিকরের বাজি তাহাদের নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা দেখে না, দূরের লোকেরা অবাক্ হয়ে দেখে। বজ্র-বাঁটুলের বীজ গাছের তলায় পড়ে না, উড়িয়া যাইয়া দূরে পড়ে ও তথায় গাছ হয়। সেইরূপ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রচার দূরেতেই কার্য্যকর হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। ঘরে যে পাঠ মুখস্থ করে সেই হাই-কোর্টের জজ হয়, নতুবা অনাহরী ম্যাজিষ্টর। একেবারে কেউ হাইকোর্টের জজ হয় না, অনেক পরিশ্রমে দ্বারিক মিত্র হওয়া যায়।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বিতীয় প্রবাহ

ষষ্ঠ তরঙ্গ

পুনর্জীবন (২) *

সুসময় আসিতে বিলম্ব হয় নাই। ১৩৩৪ সনের আষাঢ় মাসে বাংলা-সাহিত্য-সরোবর তোলপাড় করিয়া মহাসমারোহে ষড়ঋতুর কানামাছি খেলার নৃত্যচ্ছন্দে 'বিচিত্রা' আবির্ভূত হইল। কান্তি-চন্দ্র ঘোষ তবলা ও শ্রীঅমল হোম বাঁয়া সঙ্গত করিয়া এবং সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সানাইয়ের পোঁ ধরিয়া এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন যে, মনে হইল দীনবন্ধুর "দীনাহীনা-পিঁচুটি-নয়না" বঙ্গবাণী অকস্মাৎ পাটরাণীর পদে বৃতা হইলেন এবং রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকি রকমে এই কানামাছি খেলার বুড়ি হইয়া বসিলেন! কলিকাতার পথঘাট, প্রাচীর ও প্রান্তর 'বিচিত্রা'র বিচিত্র বিজ্ঞাপনী-কলরবে মুখর হইয়া উঠিল। সাহিত্যে "অভিজাত" কথাটা সেই প্রথম শুনিলাম। বস্তুত, বাংলা মাসিকপত্রের এক বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত 'বিচিত্রা' আনিয়া দিল।

দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম্ম" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক এই কারণে যে, ইহা লইয়া বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপক ও গুরুতর আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ইহার ফলে এমন বহু শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি বাংলা-সাহিত্যের উপর পতিত হয় যাঁহারা এতাবৎকাল মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষাই করিয়া আসিতেছিলেন। নানা দিকের মতবিরোধ স্পষ্ট ও মুখর হইয়া আবর্ত ও কোলাহলের সৃষ্টি করে, এবং 'শনিবারের চিঠি'কেই কেন্দ্র করিয়া শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও কৃতী ব্যক্তির এই কলহের আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

আমার ব্যাকুল পত্র-আবেদনের ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধে "আধুনিক সাহিত্যে"র বিরুদ্ধে কি লেখেন তাহা আজ নূতন করিয়া জানিবার প্রয়োজন আছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য, তাঁহাদেরই মধ্যে অতি-সেয়ানা কেহ কেহ শাসনকে সম্মানভাগে গায়ে মাখিয়া আজকাল সোল্লাসে নৃত্য করিতেছেন দেখিতেছি। দুই যুগেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, আসল খবর এ যুগের পাঠকেরা বড় একটা রাখেন না। তাঁহা-দিগকে ভুল বোঝানো হইতেছে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং বাধ্য হইয়া আসলের খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা [আমার নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য] এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করচেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলচে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।
>
> এই ল্যাঙট্-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই,—পিচ্‌কারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেচে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্য-কারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দ-প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এক্ষেত্রে অসঙ্গত বলেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।
>
> সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ-সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি? এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাৎলামির

---

* আমাদের অর্থাৎ আমাদের যুগের সাহিত্যিকদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের অভিভাবক ও মুরুব্বি শ্রেণীর দুই-একজনের শ্যেন-চক্ষু এখনও আমাদের ভালমন্দ ভুলভ্রান্তি দেখিবার ও আমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য জাগ্রত আছে। প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় গত সংখ্যায় কিরণের খাজনা দাখিল-প্রসঙ্গে আমার একটি মারাত্মক ভুল ধরাইয়া দিয়াছেন। আমি নিছক রসিকতা করিবার লোভে ভুল করিয়া বসিয়াছিলাম। কিরণ আসলে "অষ্টমে"র খাজনা দাখিল করিতে যাইতেছিল, "লাটে"র খাজনা নয়।

ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচো-খচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্তব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সঙ্গীত কি না! মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়। কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মান্‌তে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরী দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্য-কলার নয়।

…যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে? ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায়, "তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন?" উত্তর পাই, "হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে!" ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, "হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী!"

ইহার জের দীর্ঘকাল চলিয়াছিল এবং সম্ভবত এখনও চলিতেছে। যাঁহারা সেদিন প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই যথাসময়ে মত পরিবর্তনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্মকে মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু নূতনেরা আসিয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নজির খাটিবে না, অন্য নজির দিতে হইবে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কাহিনী গত সংখ্যায় বাদ পড়িয়াছে। সে কাহিনী বিচিত্র এবং "জড়"কেন্দ্রিক। ১৩৩১ সালের ফাল্গুনে যখন সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' সদ্য বন্ধ হইয়া যায় তখন বড়ই দমিয়া গিয়াছিলাম। দমনেরই রূপান্তর বিদ্রোহ বা বিপ্লব। আমিও বিদ্রোহ করিলাম—ভগবানের বিরুদ্ধে। কোয়ান্টাম থিয়োরি, রিলেটিভিটি ও রেডিও-অ্যাক্টিভিটি তখনও মাথায় গজগজ করিতেছে, অধিকন্তু কাগজ-পরিচালনায় মার খাইয়াছি। সুতরাং তারস্বরে চ্যাঁচাইয়া উঠিলাম, কেহ নাই, কিছু নাই, নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, চাপিয়া পিষিয়া মারিতেছে, আমরা বৃথা ঈশ্বর ঈশ্বর করিতেছি। চীৎকারটি স্বভাবতই একটি দীর্ঘ কবিতার রূপ লইল —"জড়"। লিখিলাম—

প্রকৃতির নিয়ন্তা সে জড় মূক প্রকৃতি আপনি,
ঈশ্বরের খেলা ইহা অক্ষমের ভ্রমান্ধ কল্পনা,
কেহ জাগরূক নাই ন্যায়-অন্যায় পাপপুণ্য গণি,
দণ্ডহাতে এতদিন বিশ্বে কেহ করেনি চালনা।

আপনি চলেছে সৃষ্টি বীজ হতে হতেছে অঙ্কুর,
কদর্য্যতা বীভৎসতা পাপপুণ্য কোথা কিছু নাই,
অন্ধ কবি ভাবে—শোনে কত মধু অন্তহীন সুর,
ধূলিরে ভাবে না ধূলি ভাবে ছাই নহে শুধু ছাই।

আছে সুর উঠে তাহা নিখিলের গতির প্রবাহে,
জন্ম আর মৃত্যু আছে এইমাত্র নিয়ম অনাদি;
প্রেমিক ধূলির সনে আপন যোগের গান গাহে,
অস্তিত্ব নাহিক যার, পায়ে তার চিত্ত রাখে বাঁধি।

কভু কি দেখেছ তুমি আর্ত্ত রবে পীড়িত ধরণী
মানুষের হাহাকারে মেঘ হতে ঝরিয়াছে জল,
তোমার হৃদয়ে যবে উঠে ব্যর্থ ক্রন্দনের ধ্বনি
থেমেছে কি ক্ষণতরে প্রকৃতির নিত্য কোলাহল?

দেখেছ কখনো তুমি নীলাকাশ হয়েছে মেদুর
রৌদ্রতাপে দগ্ধ যবে শস্যভরা শ্যাম বসুন্ধরা,
রোগ-যন্ত্রণায় রোগী শোনে কভু তারকার সুর,
ব্যথায় ব্যথিত হয়ে রজনী কি পলায় সত্বরা?

প্রাণহীন জড়ে লয়ে কল্পনার নাহিক অবধি,
ছন্দ গান কবিত্বের প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত!
যে কাঁদে সে কাঁদে, আর যে হাসে সে হাসে নিরবধি,
জর্জর যে বেদনায় সে হতেছে নিত্য জর্জরিত!

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে প্রচণ্ড রাগ-অভিমানের বশে পদ্যটি রচিত, "ভিট্রিয়লিক ভল্‌টেয়ার" আমার অজ্ঞাতসারে কাঁধে চাপিয়াছিলেন। তখন বাদুড়-বাগান মেসেই আমার অবস্থান। শ্রীযতীশচন্দ্র সেন ও জীবনদা পদ্যটির তারিফ করিলেন। যতীশচন্দ্রের ঘরে তখন প্রভাসচন্দ্র ঘোষের নিত্য যাতায়াত। তিনিই তখন 'নব্যভারত' পরিচালনা করিতেছেন। আদি-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী নাই, তৎপুত্র প্রভাতকুসুমও গত। প্রভাতকুসুমের সহধর্মিণী ফুল্লনলিনী দেবী মৃত 'নব্যভারত'কে পুনরুজ্জীবিত করিলেন, প্রভাস ঘোষ প্রধান সহায়—যতীশ সেন, জীবনময়ও সঙ্গে আছেন। ১৩৩১-এর বৈশাখ হইতে 'নব্যভারত' বেশ সজীব ভাবেই বাহির হইতেছিল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি প্রভাসদা আমার 'জড়'-পদ্যটি কাড়িয়া লইয়া গিয়া চৈত্র-সংখ্যায় শেষ রচনা হিসাবে বেনামী ["শ্রী—"] ছাপাইয়া দিলেন। এই "জড়"-বিকারই 'নব্যভারতে'র কাল হইল। সমাজে তুমুল সোরগোল উঠিল। সম্পাদিকা বিরক্ত হইলেন। কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

'নব্যভারতে'র যাহাই হউক, আমার লাভ হইল। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' তখন ধারাবাহিক ভাবে ইহাতে বাহির হইতেছিল। শরৎচন্দ্র নিজে একজন উপন্যাসের আসামী, তিনি আগ্রহের সঙ্গে 'নব্যভারত' পাঠ করিতেছিলেন। যে কোনও কারণে তাঁহার তৎকালীন জড়ীভূত দৃষ্টি আমার "জড়ে"র উপর পড়িল। তিনি এত খুশি হইলেন যে বিশেষ অনুসন্ধানে শিবপুরের প্রতিবেশী শ্রীকালিদাস নাগ মারফৎ লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করিলেন। কালিদাসদা পরিচয়-পত্রসহ আমাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। বাজে-শিবপুরের বাড়িতে গেলাম। ভেলিকে দেখিলাম এবং শরৎচন্দ্রের পিঠ-চাপড়ানি খাইয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ফিরিয়া আসিলাম। প্রথম পরিচয় এই পর্যন্ত।

তাহার পর, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র পাকাপাকি অবস্থানের জন্য রংপুর মাহিগঞ্জ হইতে কলিকাতায় আসিলেন। পত্রযোগে নিবিড় পরিচয় জন্মিয়াছিল, কলিকাতায় আসিতেই আমরা একাত্ম হইয়া গেলাম। তাঁহার মত আশাবাদী সাহিত্যিক আমি আর দেখি নাই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ঢিলাঢালা—হচ্ছে-হবে-গোছের মানুষ, সুচিরকাল অপেক্ষা করার স্থৈর্য তাঁহার ছিল। রবি ছিলেন অস্থিরপ্রকৃতি সক্রিয় আশাবাদী। 'শনিবারের চিঠি'র অভাবে আমাকে মনমরা দেখিয়া তিনি আমার পিঠে সজোরে থাবা মারিয়া সোৎসাহে বলিলেন, কুছ পরোয়া নেহি, চলো 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আপিসে, সেখানেই ব্যবস্থা হবে। গোলদীঘির পূর্বপারে এখন যেখানে বিশ্বভারতী পুস্তকালয় সেই বাড়িতে কিম্বা তাহারই আশেপাশে কোনও একটা বাড়িতে তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র আপিস। রবি 'আনন্দবাজারে' নামে বেনামে লিখিতেন। প্রথম দিনেই টের পাইলাম শ্রীমাখনলাল সেন, প্রফুল্লকুমার সরকার ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রবিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাঁহার পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আমিও সেই দিন হইতেই স্নেহাশ্রিত হইলাম। ব্যবস্থা হইল শনিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা 'শনিবারের চিঠি'র জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে; তাহাতে আমরা শনিমণ্ডলী যাহা খুশি লিখিব। ঠিক কয় সপ্তাহ 'শনিবারের চিঠি' এইভাবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ক্রোড়স্থ হইয়া বাহির হইয়াছিল আজ সঠিক বলিতে পারিব না, পুরাতন ফাইল ঘাঁটিয়া বাহির করাও আজ দুর্ঘট, তবে এইটুকু বেশ মনে আছে, মাসাধিক কাল তো বটেই। এইভাবে ক্ষেত্রান্তরে উপ্ত হইয়া 'শনিবারের চিঠি'র আর একটু প্রসার বাড়িল, আমার লাভ হইল বেশ কয়েকজন নূতন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত এইখানেই পরিচিত হইয়াছিলাম। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই স্নেহ আমি আজ পর্যন্ত সমানে পাইয়া আসিতেছি। প্রফুল্লবাবু গত হইয়াছেন কিন্তু বাকি তিনজন আজও আমাকে সহোদরবৎ স্নেহ করিয়া থাকেন। আমার জীবনে রবির ইহাই প্রথম "অবদান"।

যাহা হউক, যে কাহিনী বলিতেছিলাম। ১৩৩২এর চৈত্রে কলিকাতায় যে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত শুরু হয় তাহার জের টানিয়া আমরা ১৩৩৩এর জ্যৈষ্ঠে জুবিলী বা দাঙ্গা সংখ্যা বাহির করিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেই জের মিটে নাই। "শুদ্ধি-আন্দোলন" নাম দিয়া আমি তখনই একটা দুর্দান্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উক্ত 'শনিবারের চিঠি'তে পত্রস্থ করিতে দেন নাই। লেখাটি আমার এতই প্রিয় ছিল যে প্রায় সর্বদা তাহা পকেটে পকেটে ফিরিত। লোক পাইলেই পড়িয়া শুনাইতাম। 'আনন্দবাজার'-আপিসে ভাদ্র মাসের কোনও একদিনে রবির আগ্রহাতিশয্যে প্রবন্ধটি খুব হৃদয়গ্রাহী করিয়া পড়িলাম। সত্যেনদা ও প্রফুল্লবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন; রবি তো ওই কাজেরই কাজী ছিল, সুতরাং তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। সেখানে আর একটি আমার অজ্ঞাত-পরিচয় যুবক বসিয়া ছিলেন; প্রবন্ধ পাঠ সাঙ্গ হইলে তিনি বিনীত ভাবে আমার নিকটে প্রবন্ধটি প্রার্থনা করিলেন। সত্যেনদা পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি 'হিন্দু-সঙ্ঘ' সাপ্তাহিকের সম্পাদক অনুজাচরণ সেনগুপ্ত। তিনি বলিলেন, পূজার বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি ছাপিবেন। আমি সানন্দে দীর্ঘকাল পরে প্রবন্ধটির ভারমুক্ত হইলাম। ১৯শে আশ্বিন, বুধবার ১৩৩৩ (৬ অক্টোবর ১৯২৬) 'হিন্দু-সঙ্ঘে'র পূজা-সংখ্যা বাহির হইল। এক খণ্ড হাতেও আসিল। আনন্দের সঙ্গে দেখিলাম আমার "শুদ্ধি আন্দোলন" বাহির হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিলাম

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা" নামক একটি প্রবন্ধ "শুদ্ধি আন্দোলনে"র পাশাপাশি ছাপা হইয়াছে। সপ্তাহ অতিক্রান্ত না হইতেই আমার উল্লাস বাধাগ্রস্ত হইল। সংবাদপত্রে দেখিলাম, শরৎচন্দ্র ও আমার প্রবন্ধের জন্য অনুজাচরণ ধৃত হইয়াছেন, 'হিন্দু-সঙ্ঘে'র পূজা-সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, বিচারেও বিলম্ব হইল না। অনুজাচরণের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইল। অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। এই অবস্থায় কালিদাসদা সংবাদ আনিলেন, শরৎচন্দ্র আমার সাক্ষাৎকামী। সেই দিনই হাওড়া টাউন হলে কোনও সভায় সায়াহ্নে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করিবেন, আমাকে সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইবে। অনুজাচরণের কঠোর শাস্তি এই আহ্বানের আনন্দ অনেকখানি খণ্ডিত করিয়া দিল। তবুও গেলাম।

উত্তর দ্বার দিয়া ঢুকিয়া সিঁড়িপথে দোতলায় উঠিলেই চওড়া বারান্দা এবং তাহারই সংলগ্ন প্রকাণ্ড হল। লোকে লোকারণ্য। শরৎচন্দ্র সভা আলো করিয়া সভাপতির আসনে বসিয়া আছেন। আমি বারান্দা ও হলের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছি, তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সভার শালীনতা ভঙ্গ করিয়া আমাকে বেশ জোরেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া চৌকি হইতে নামিয়া পাশের (উত্তরপূর্ব কোণের) বিশ্রামঘরে গিয়া ঢুকিলেন। সভায় বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, শরৎচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পরে বুঝিয়াছিলাম, সভাপতির আসনে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত অস্বস্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন, আমাকে উপলক্ষ্য পাইয়া তিনি বাঁচিয়া গেলেন। তাঁহার এই সভাভীতি বরাবরই ছিল।

আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে বিশ্রামকক্ষে উপনীত হইলাম। একটা আরাম-কেদারায় তিনি ততক্ষণে বসিয়াছেন এবং ভক্তবৃন্দ গড়গড়ায় সাজা কলিকা বসাইয়া তাঁহার হাতে সটকা তুলিয়া দিয়াছে। আমি আসিতেই তিনি আমাকে প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া পাশের চৌকিতে বসিতে আদেশ করিলেন। হলের গুঞ্জন অনুযোগের আকারে সভার উদ্যোক্তাদের মুখে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন, আর কাউকে বসিয়ে দাও গে, সজনীর সঙ্গে আমার জরুরি কাজ আছে। আমি তাঁহার নিকট ঘণ্টাখানেক ছিলাম, ইহার মধ্যে তিনি আর সভামঞ্চে প্রবেশ করিলেন না। সকলকে বিশ্রামকক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলেম, শুধু আমি আর তিনি রহিলাম। একান্তে পাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমাদেরও ধরবে নাকি হে? দেখ তো কি কাণ্ড! মনে হইল, তিনি সত্যসত্যই ভয় পাইয়াছেন। তিনি আমার লেখার অন্তর্নিহিত যুক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন। নানা কথাবার্তার মধ্যে এই দ্বিতীয় দিনেই আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে তাঁহার সামতাবেড়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আসলে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই মোহিতলালকে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের ২৪ তারিখ তাঁহার রূপনারায়ণাবাসে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম এবং আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে আলাপ হইয়াছিল।

প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনুজাচরণ সেনগুপ্ত কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে লালদীঘির ধারে তদানীন্তন কলিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া স্বদলীয় বোমার আঘাতে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার নাম রহিল না বটে, কিন্তু আমার মনোমন্দিরে তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে।

শরৎচন্দ্রের রচনাটি ("বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা") 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু আমার "শুদ্ধি আন্দোলনের" প্রয়োজন আমাদের বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একেবারেই শেষ হইয়াছে। তাই অতীত ইতিহাসের টুকরা হিসাবে তাহার কিঞ্চিৎ এই 'আত্ম-স্মৃতি'তে ধরিয়া রাখিলাম :—

..."ভারতবর্ষে মুসলমান প্রভাব আরম্ভ হইবার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু উৎপীড়িত হইয়াছে, উৎপীড়ন করে নাই। মুসলমানধর্ম্ম রাজধর্ম্ম বলিয়া, উৎপীড়ক ধর্ম্ম বলিয়া ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইয়া মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। হিন্দুর এই সংখ্যাহ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ হিন্দুর সামাজিক অত্যাচার ও অবিবেচনা। সম্প্রতি সেগুলি দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে, এইটাই ভারতবর্ষের পরম শুভ লক্ষণ। শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন এই সামাজিক দুর্নীতি দূর করিবার প্রচেষ্টা মাত্র।

অবশ্য এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে, শুদ্ধি আন্দোলন নিছক সামাজিক দুর্নীতি উচ্ছেদের প্রচেষ্টা; ইহার অন্য একটি দিকও আছে; ইহা শুধু আত্মরক্ষা করিবার উপায় নহে, আক্রান্ত

ব্যক্তির উদ্ধার সাধনও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। মুসলমানের সহিত বিরোধ বাধিতেছে শুদ্ধি আন্দোলনের এই দিকটি লইয়া।···

জয়চাঁদের সময় হইতে জে. এম. সেনগুপ্ত মহাশয় পর্য্যন্ত সকল তথাকথিত হিন্দুই আপনার পায়ে আপনি কুঠার হনন করিয়া আসিতেছেন—জ্ঞানোন্মেষ কবে হইবে ব্যথিত হইয়া তাহাই ভাবিতেছি। দেখিলাম মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকল মহাপুরুষই ভয়ে হউক বিশ্বাসে হউক মুসলমানের অন্যায় আবদার সহিয়া আসিতেছেন। চিত্তরঞ্জন মরিয়া বাঁচিয়াছেন, নতুবা আজ তাঁহার প্যাক্টের দুর্দ্দশা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেন। গান্ধীজী খিলাফতের জন্য প্রাণপাত করিলেন তবুও সোহাগিনী মুসলমানের মন রাখিতে পারিলেন না দেখিয়া "দূত্তোর" বলিয়া কোণা নিলেন। আর আজিও এত দেখিয়া শুনিয়াও ইঁহারা সেই প্রাচীন ভুল করিতেছেন দেখিয়া চোখে জল আসে।···

বাংলা দেশে দেখিতেছি স্বরাজ্য দলের মত আর একটি দল প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহারা নিজেদের কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়া থাকেন। কম্যুনিষ্ট বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন জানি না, কিন্তু আমরা তাঁহাদের পরিচালিত পত্রিকা পড়িয়াও দু এক স্থলে তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিয়াছি যে মধ্যবিত্ত লোকের ধ্বংসসাধন করিয়া সমাজের তথাকথিত নিপীড়িত জাতিকেই দেশের পরিচালনার ভার দেওয়াই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। আশ্চর্য্য এই যে এই মতবাদ তাঁহারা যাহাদের কাছে প্রচার করিতেছেন তাহারা মধ্যবিত্ত।···

গত এপ্রিল মাস হইতে পরপর যে কয়েকটি দাঙ্গা বাংলার উপর হইয়া গেল তাহাতে হিন্দু এই বুঝিয়াছে যে, ক্ষমা ও প্রেম, নিরীহের মহত্ত্ব নহে, দুর্ব্বলতা মাত্র; হিন্দু যদি সবল হইত, ঠেঙ্গানির উত্তর যদি সে ঠেঙ্গানি দিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে প্রীতি-মৈত্রীর কথা অপ্রাসঙ্গিক হইত না বটে, কিন্তু এখন যখন মার খাইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই তখন প্রীতির বার্ত্তা প্রচণ্ড উপহাস ছাড়া কিছুই নয়।···

ভারতের হিন্দুর অবমাননা ও লোক-ক্ষয় রোগের একমাত্র প্রতিকার শুদ্ধি-আন্দোলন ও সংগঠন। হিন্দু দলবদ্ধ হউক। প্রাণ দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুক। যদি বীরের মত মরিতে প্রস্তুত না থাকে, অলক্ষ্যে ছুরি খাইয়া মরিতে হইবে। যদি মৃতপ্রায় এই হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা তুমি আমি প্রত্যেকেই না করি তাহা হইলে সকলের মুসলমান হইয়া মুসলমান সাম্যবাদের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া হাসানহুসেন বলিয়া বুকে করাঘাত করত: পরের মাথায় লোষ্ট্র নিক্ষেপ করাই চরম পথ বলিয়া মানিয়া লওয়া ভাল।

অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার মন্ত্র জানিত, বাহিরে আসিবার মন্ত্র শিখে নাই বলিয়া প্রাণ হারাইল। হিন্দু-সমাজ বাহিরে যাইবার মন্ত্র জানে, ভিতরে প্রবেশ করিতে জানে না বলিয়াই এমন লাঞ্ছিত ও হীনবল হইতেছে। বহির্গত হিন্দুকে সমাজ-গোষ্ঠীতে ফিরাইয়া আনিবার শুদ্ধিই একমাত্র উপায়। এই শুদ্ধি আন্দোলনকে মূর্খের মত নিন্দা করিয়া আমরা যেন আত্মহত্যার পাতকী না হই। ('হিন্দু-সঙ্ঘ,' ১১ আশ্বিন ১৩৩৩)

স্মরণ রাখিতে হইবে ইহা সাতাশ বৎসর পূর্বের রচনা; হিন্দু যদি সত্যই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহা হইলে আজ ভারত-বিভাগের সর্বনাশা অবস্থার উদ্ভব হইত না।

যাহা হউক, একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতি এবং অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের সুচিন্তিত অভিমত সংগ্রহ করিয়া 'শনিবারের চিঠি'র মাসিকরূপে পুনর্জন্মের তোড়জোড় করিতে লাগিলাম। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে (শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন এবং তাহার পরও দীর্ঘকাল আধুনিক সাহিত্যে বাহির হইতে আমদানি-করা নকল "কারি-পাউডারে"র বিরুদ্ধে শক্ত শক্ত প্রবন্ধ লিখিলেন। তাঁহার 'সাহিত্যের পথে' পুস্তকে সেগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আবাল্য সাধনার দ্বারা তাঁহার জন্মার্জিত সংস্কার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং সাহিত্যধর্মে তিনি দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, কখনও তাঁহার মতের নড়চড় হয় নাই।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের হইয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি।

১৯৩৪ সালের ৯ ভাদ্র তারিখে আমার জন্মদিনে মাসিক 'শনিবারের চিঠি' বিবিধ শঙ্কা ও সংশয়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক পূর্ববৎ শ্রীযোগানন্দ দাস, আমি তাঁহার সহকারী। প্রথম প্রবন্ধ আমার সেই রবীন্দ্রনাথের নিকট আবেদন, তাঁহার আশ্বাস ও শরৎচন্দ্রের সহিত "ইন্টারভিউ"-প্রসঙ্গ লইয়া—নাম "আধুনিক বাঙলা সাহিত্য।" স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় লিখিলেন "নব যুগান্তর" কবিতা এবং "পুরুষসিংহম্" প্রবন্ধ। তাহার পর, পর পর আমার দীর্ঘ ব্যঙ্গকবিতা "অঙ্গুষ্ঠ," শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গল্পের প্যারডি "সব শেয়ালের এক—", সম্পাদক মহাশয়ের চুটকি কবিতা "বাদলাতে"—যাহার প্রথম দুই পংক্তি প্রবাদ-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

> "বাদলাতে যদি মন ভারী
> মুড়িতে মেখে নে লঙ্কা নুন—"

তাহার পর আমার সেই "কচি ও কাঁচা" নাটকের ভূমিকা ও প্রথম অঙ্ক, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা "তোমাদের প্রতি", "সংবাদ-সাহিত্য" (আমার), 'প্রবাসী'র বেতালের "বৈঠক"কে ঠাট্টা করিয়া হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের "চাতালের বৈঠক," অশোক চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প "আজি হ'তে কিছু বর্ষ পরে" এবং সর্বশেষে মোহিতলাল মজুমদারের "পত্র"। মাসিকের প্রথম সংখ্যার ইহাই সূচী। বলা বাহুল্য

"আধুনিক বাংলা সাহিত্য" ও "পুরুষসিংহম্" ছাড়া বাকি সবগুলিই বেনামী রচনা। মোট ৬৪ পাতা, মূল্য দুই আনা। কর্মাধ্যক্ষ শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ঠিকানা—৯১ আপার সার্কুলার রোড [প্রবাসী আপিসের ঠিকানা]। প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞাপন ছিল, ৪ পাতা, ৩ পাতা মলাটের এবং এক পাতা ভিতরের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, বেঙ্গল কেমিক্যাল, দি ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং কোং, বুক কোম্পানী ও এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। এই সংখ্যার মলাটেই ত্রিবর্ণ মুরগির প্রথম আবির্ভাব, মুরগির সঙ্গে মলাটে শনিগ্রহ যুক্ত হন আরও অনেক পরে। গত পঁচিশ বৎসর বহু লোকে বহুবার মুরগির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে মুখে ও পত্রযোগে প্রশ্ন করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রতীক, দীর্ঘ নিশাবসানে প্রত্যূষের আভাস ইত্যাদি নানা গুরুগম্ভীর ও মুখরোচক ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার কোনটিই সত্য হইত না। আসল অর্থ হইতেছে স্বরাজ্য পার্টি ও তদানীন্তন বাঙালী প্রেমিক সম্প্রদায়ের 'যাও পাখি বোলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে" বয়েৎ মুদ্রিত চিঠির কাগজের প্রতি ব্যঙ্গমিশ্রিত আমাদের নিছক ছেলেমানুষী খেয়াল। বাজার-প্রচলিত চিঠির কাগজে ছাপা থাকিত পারাবতের মুখে চিঠি—আমাদের পত্রিকার নাম যখন 'শনিবারের চিঠি' তখন তাহারও বাহক দরকার, মুরগির চাইতে ভাল বাহন তখন আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। মুরগির গলায় স্বরাজ্য মেলব্যাগ ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, এবং আধুনিক সাহিত্যিক প্রেমিকের হস্তধৃত চিঠিতে লেখা হইল "যাও পাখি বোল তারে।" চিত্রকর তখনকার বিখ্যাত কার্টুনিষ্ট বিনয়কৃষ্ণ বসু। ভিতরের প্রথম পাতায় 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের আঁকা সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র সেই চাবুক-মার্কা ছবি। ইহাই মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধটি ছিল নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ লক্ষ্য অলক্ষ্য কাহারও নাম ছিল না, ছিল নিত্য সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বের কথা। তাহাতেই শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিচলিত হইয়া ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় গুরুতর প্রতিবাদ জানাইলেন "(সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা") কিন্তু ভাদ্রের 'শনিবারের চিঠি'তে আমার প্রবন্ধে অনেকগুলি নাম একসঙ্গে কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভীরু শরৎচন্দ্র প্রমাদ গণিলেন, বিশেষ করিয়া নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমত আমি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলাম দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন। তাড়াতাড়ি সামলাইবার জন্য আশ্বিনের 'বঙ্গবাণী'তে (১৩৩৪) "সাহিত্যের রীতি ও নীতি" নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া বসিলেন। ফাঁদাই বটে, কারণ প্রবন্ধটি "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"-প্রবাদের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহা তাঁহার 'স্বদেশ ও সাহিত্য' পুস্তকে তাঁহার জীবৎকালে মুদ্রিত হইয়াছে, যে কেহ পড়িয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারেন; গোড়ার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

> শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রস-রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।
>
> উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানত: আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।
>
> ইতিমধ্যে বিনা দোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধ দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।
>
> এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই চারি জন ভক্ত জুটিয়াছেন; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাও না তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।
>
> আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা' ছাড়া ওদিকে নরেশ বাবু আছেন যে! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল।

ইহা শরৎচন্দ্রের নিছক ব্যঙ্গোক্তি নহে, সকল সাধু ব্যক্তির ন্যায় তিনিও উকিলের জেরাকে অতিশয় ভয় করিতেন, মস্ত উকিলের তো কথাই নাই। হাওড়া টাউন হলেরও সেই "আমাদেরও ধরবে নাকি হে?" সেই ভয়েরই প্রকাশ। তাঁহার ব্যাঘ্রভীতি যতই থাকুক, সত্য কথা এই যে আমি তাঁহাকে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিই নাই। তিনি নরেশচন্দ্রের রচনাকে কখনই অনবদ্য জ্ঞান করিতেন না, তর্কের ঝোঁকে হঠাৎ বিড়ালকে বাঘ কল্পনা করিয়া বসিলেন।

ফলে কোলাহল জমিয়া উঠিল। আমার বয়স তখন অল্প, এই বিবদমান সম্প্রদায়ের সর্বকনিষ্ঠ আমি। আমার স্বভাবত গরম রক্ত আরও গরম হইয়া উঠিল, আমি প্রবল বেগে তাঁহাকেই আক্রমণ করিলাম। দুঃখের বিষয়, আমাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা তখন খুবই বাড়িয়াছে; আমরা অর্থাৎ অশোক চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ ও আমি ঘন ঘন ট্রেনযোগে ও পদব্রজে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্রের সামতাবেড় পানিত্রাস-ভবনে যাতায়াত করিতেছি এবং যে শরৎচন্দ্রের মূল বাংলা রচনা নৈতিক কারণে একদা 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই, তাঁহারই রচনার অশোক চট্টোপাধ্যায়-কৃত ইংরেজী অনুবাদ সাদরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় মুদ্রিত করিতেছি। পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পুত্র করিতেছেন। ঠিক এই গভীর মিলনাত্মক দৃশ্যে বিচ্ছেদের ছায়াপাত হইল। সমালোচনার নামে আমি শরৎচন্দ্রকে মর্মান্তিক আঘাত দিলাম। সে আঘাতের কথা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্ভবত ভুলিতে পারেন নাই, পারিলেও আমি তাহা জানিতে পারি নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি তাঁহার মৃত্যুর পর একাধিক বার।

শুধু আর একবার তাঁহার স্নেহস্পর্শ পাইয়াছিলাম। ঘটনাটি আকস্মিক। আমার মনের মণিকোঠায় সেদিনের স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাঁকুড়া শহরে মায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আমি মায়ের শ্রাদ্ধে বাঁকুড়া যাইতেছিলাম। কাছা গলায় খালি পায়ে হাওড়া ষ্টেশনে বাঁকুড়াগামী ট্রেনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার একজন। আগাইয়া গিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলাম—স্বয়ং শরৎচন্দ্র। প্রশ্ন করিলেন, কোথায় চলেছ? আমার সেই বেশ নিশ্চয়ই তাঁহার স্নেহের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিল। সমস্ত নিবেদন করিলাম। তিনি সস্নেহে আমাকে তাঁহার কামরায় আহ্বান করিলেন। আমি সবিনয়ে আমার নিম্নশ্রেণীর টিকিটের কথা জ্ঞাপন করাতে তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, বেশী ভাড়া দেওয়া যাবে, তুমি এসো। আমার সঙ্গে বন্ধু সুবলচন্দ্র ও অজিতনারায়ণ শ্রাদ্ধে যোগদানের জন্য বাঁকুড়া যাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে জানাইয়া আমি ঘণ্টা দুয়েকের জন্য শরৎচন্দ্রের সহযাত্রী হইলাম—দেউলটি পর্যন্ত।

সেই শ্রাবণ শেষের বর্ষণমুখর একটি রাত্রি। সশব্দে ট্রেন চলিতেছে—বি. এন. আরের ট্রেন! শরৎচন্দ্র কথা বলিতেছেন, আমি নির্বাক শ্রোতা হইয়া বসিয়া আছি। বাংলা দেশের কোথায় সদ্য একটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর বেদনার উত্তেজনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার একটা কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, আমি না বলিলে এ কথা আর কাহারও জানা সম্ভব নয়। তিনি কম্পিত গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, দেখ ধর্মটা বড় নয়, বড় হইতেছে মনুষ্যত্ব, ধর্ম রাখিতে গিয়া আমরা অমানুষ হইয়া পড়িয়াছি। যদি বাংলা দেশের সমস্ত হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াও মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে পারে তাহাতেও আমার আপত্তি নাই কিন্তু তাহাদের প্রতিদিনকার এই হীনতাবরণ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তিনি এই প্রসঙ্গে যে সকল অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণে আছে কিন্তু প্রকাশ করিবার উপায় নাই। সেদিন সাহিত্য সম্পর্কে একটিও কথা হয় নাই। বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে এই জটিল সমস্যাই দেউলটি পর্যন্ত তাঁহার ভাবপ্রধান চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। ইহার পর তিনি দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার সহিত আর কোনও উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। [ক্রমশঃ।

গল্প হ'লেও সত্যি

প্রথম চাষী। তোমার জমির ফসল হয় চমৎকার। তুমি কি কাগজের আবহাওয়ার পূর্বাভাস প'ড়ে ফসলের কাজ কর?

দ্বিতীয় চাষী। হ্যাঁ, কাগজে দেখে বপন রোপণ করি। খুব কাজ হয়। তবে, কাগজে যা লেখে তার উল্টোটা ধ'রে কিন্তু কাজ করি।

শীতার্ত—হিমকাতর, শীতপীড়িত।
শীতাশ্ম—স্নিগ্ধ প্রস্তর, চন্দ্রকান্ত মণি।
শীৎকার—ভয় বা হর্ষজন্য গাত্রস্পন্দন।
শীধু—গুড়নির্ম্মিত মদিরা, গৌড়ীসুরা।
শীর্ণ—কৃশ, ক্ষীণ, ম্লান, শুষ্ক, ক্লিষ্ট।
শীর্ষ—মস্তক, শিরঃ, মাথা, উত্তমাঙ্গ।
শীল—ভাব, গুণ, স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি।
শীলতা—স্বভাব, গুণ, চরিত্র, ব্যবহার।
শীশ—মুখাদির শব্দবিশেষ।
শুঁটী—শিম, শিম্বা, শিম্বী, ছিমড়া।
শুঁট—শুণ্ঠী, শুষ্ক আর্দ্রক, মূলবিশেষ।
শুঁড়—শুণ্ড, হস্তীর কর।
শুঁড়ী—শৌণ্ডিক, স্যন্দক, মদ্যবিক্রেতা, শুণ্ডিক।
শুক—টিয়াপক্ষী, তোতা, কাজ্‌লা।
শুকন—শোষণ, তোবড়ন, ভাপন, বিগড়ন।
শুকনা—ম্লান, শুষ্ক, বিক্লিম, রসহীন।
শুকা—শুষ্ক, ক্ষীণ, অনাবৃষ্টি, অবগ্রাহ।
শুক্ত—তিক্তরস ব্যঞ্জন, অম্লরস।
শুক্তি—শুক্তা, মুক্তাগার, ঝিনুক।
শুক্তিকা—মুক্তাগার, চুকাশাক।
শুক্র—রেতঃ, বীর্য্য, ষষ্ঠ গ্রহ।
শুক্রবার—সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস।
শুক্ল—শুভ্রবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, ধবল, নির্ম্মল।
শুক্লপক্ষ—চন্দ্রের বৃদ্ধিপক্ষ।
শুঙ্গ—শূক, শুঁয়া, শুচ্‌লা, সূক্ষ্ম অগ্রভাগ।
শুচনা—শুদ্ধি, শুদ্ধিপত্র, সংশোধন।
শুচি—শুদ্ধ, পবিত্র, পরিষ্কার, নির্ম্মল, পূত।
শুদ্ধ—পবিত্র, শুচি, নির্দোষ, পরিষ্কৃত।
শুদ্ধমতি—পূতমনা, পবিত্র মানস।
শুদ্ধসত্ব—পবিত্র, ধার্ম্মিক।
শুদ্ধি—পবিত্রতা, শুচিতা, যথার্থভাব।
শুধরাণ—শুদ্ধকরণ, সারাণ, মার্জ্জন।
শুনন—শ্রবণ, মানন, গ্রাহ্য করণ।
শুনান—শুনানি, শ্রবণ করান, শ্রাবণ।
শুভ—হিত, মঙ্গল, ভদ্র, উত্তম, কল্যাণ।
শুভকর্ম্ম—বিবাহাদি মঙ্গল কর্ম্ম।
শুভক্ষণ—গমনাদির উত্তম সময়।
শুভঙ্কর—মঙ্গলকারী, অঙ্কবিদ্যার পণ্ডিত।
শুভদৃষ্টি—বর-বধূর পরস্পর দর্শন।
শুভলগ্ন—সুসময়, সুযোগিতা, সুসঙ্গতি।
শুভানুধ্যায়ী—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, হিতৈষী।
শুভান্বিত—শুভযুক্ত, ভাগ্যবান, কল্যাণী।
শুভিতা—সৌভাগ্য, সুখাবস্থা, প্রসন্নতা।
শুভ্র—শুক্লবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, দীপ্তিবিশিষ্ট।
শুভ্রাংশু—চন্দ্র।
শুল্ক—বিবাহার্থে দত্ত পণ, মূল্য, কর।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

শুশুক—শিশুমার, জলজন্তুবিশেষ।
শুশ্রূষা—সেবা, উপাসনা, পরিচর্য্যা।
শূক—শস্যের শুঙ্গা, শূয়া, সূক্ষ্মাগ্র।
শূককীট—কণ্টকি কীট, শূয়াপোকা।
শূকর—বরাহ, বরা, শূয়ার, কোল।
শূদ্র—চতুর্থ জাতি, শেষবর্ণ, বৃষল।
শূদ্রা—শূদ্রাণী, বৃষলী, শূদ্রপত্নী।
শূন্য—নির্জ্জন, রিক্ত, রহিত, আকাশ।
শূন্যবাদী—নাস্তিক, দেহাত্মবাদী।
শূম—কৃপণ, অদাতা, ব্যয়কুণ্ঠ।
শূর—বীর, যোদ্ধা, বলবান, সাহসী।
শূল—শলাকা, শেল, ভেলা, রোগবিশেষ।
শূলন—বিঁধন, পীড়ন, অতিব্যথা করণ।
শূলকী—শল্য, বড়শা।
শৃগাল—(শিবা দেখ)
শৃঙ্খল—শিকলী, বেড়ী, লৌহময় বন্ধনী।
শৃঙ্খলা—রীতি, নিয়ম, ধারা, শিকলী।
শৃঙ্গ—শিঙ্গ, বিষাণ, শিখর, কূট, পর্ব্বতাগ্র।
শৃঙ্গার—আদ্যরস, ভাব, কাম, মৈথুন।
শৃঙ্গী—বিষাণযুক্ত, শৃঙ্গবিশিষ্ট, শিখরী।
শেয়ান—শয়তান, ধূর্ত্ত, চতুর, শঠ।
শেয়ালা—শৈবাল, শ্যাওলা, জলজ তৃণবিশেষ।
শেল—রায়বাঁশ।
শেষ—অবশিষ্ট, অন্ত, সমাপ্তি, সীমা।
শেষকাল—অন্ত্যসময়, মরণকাল।
শেষাবস্থা—শেষদশা, বৃদ্ধকাল, জরাবস্থা।
শৈত্য—শীতগুণ, হিমতা, শীতলতা।
শৈথিল্য—শ্লথভাব, শিথিলতা।
শৈব—শিবমন্ত্রোপাসক, শিবপরায়ণ।
শৈল—(পর্ব্বত দেখ)
শৈলী—কৌশল, উপায়, কল্প, যুক্তি।
শৈল্য—কাঠিন্য, পাষাণত্ব, প্রস্তরময়।
শৈশব—বাল্যাবস্থা, শিশুকাল, বাল্য।
শোক—বিয়োগ জন্য দুঃখ, খেদ।
শোচনা—ভাবনা, দুঃখ, অনুতাপন, অনুশোচন।
শোণ—অতসী, তৃণবিশেষ, নদবিশেষ।
শোণা—শোনামুখী, ভেদক বৃক্ষবিশেষ।
শোণিত—(রক্ত দেখ)
শোধ—ঋণের অপনয়ন, প্রতিফল।
শোধন—শুদ্ধ করণ, ঋণাপনোদন।
শোধনীয়—শুধিবার যোগ্য, দেয়।

[ক্রমশঃ]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সাতানব্বই

সমরসজ্জায় সেজে শোক তাড়ালেন ঠাকুর। বীরবিক্রমে হুঙ্কার দিয়ে। পরাস্ত, পরাভূত করে। কিন্তু মা, শ্রীশ্রীমা কি করে তাড়ালেন?

'মাঝি-বউ অনেক দিন আসে না। তার খবর কেউ জানো তোমরা?' মা যখন জয়রামবাটিতে, জিগগেস করলেন একদিন।

কোয়ালপাড়ার মজুরনী। চিনতে পেরেছে সবাই। কিন্তু খবর রাখে না কেউ। সংসারে এত খবর থাকতে কোন এক মজুরনীর খবর!

বলতে-বলতেই মজুরনী এসে হাজির। কোয়ালপাড়ার হাটে মস্ত বাজার করে কে এক ভক্ত তার মাথায় মোট চাপিয়ে দিয়েছে। তাই বয়ে নিয়ে এসেছে ধুঁকতে-ধুঁকতে।

এ কেমন চেহারা! রাতারাতি যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছে মজুরনী। ধুলোমাখা রুক্ষ চুল, গভীর গর্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে চোখ, কেমন সর্বশূন্য চাউনি। হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, যেন হাতের লাঠি কেউ কেড়ে নিয়েছে জোর করে।

'এ তোমার কী হয়েছে মাঝি-বউ?'

'মা গো, আমার জোয়ান রোজগারী ছেলেটি মারা গেছে।

'বলো কি মাঝি-বউ?' এক মুহূর্তও স্তব্ধ থাকলেন না শ্রীমা, ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। আকুল, অন্ধ আর্তনাদ। উপরে আকাশ, সামনে দিগন্ত পর্যন্ত রেখা টানা সে আর্তনাদের। কখনো লুটিয়ে পড়ছেন মাটিতে, কখনো বা কাঁদছেন বারান্দার খুঁটিতে মাথা রেখে। জগতের সমস্ত মৃতপুত্রা জননীর শোক নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে ধুয়ে দিচ্ছেন নিরর্গল অশ্রুজলে।

মাঝি-বউ তো অবাক। যেন তার ছেলে মরেনি, মা'র ছেলে মরেছে! কোথায় মা তাকে সান্ত্বনা দেবেন, উলটে এখন তাকেই মাকে সান্ত্বনা দিতে হয়।

যেমন বুদ্ধদেব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন উব্বিরীকে।

কোশলের রাণী উব্বিরী। অচিরাবতীর তীরে কাঁদছে অঝোরে।

'এখানে বসে কে কাঁদছ?' জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'এ যে শ্মশান—'

'এই শ্মশানেই আমার মেয়েটিকে ছাই করে দিয়েছি।'

'কোন মেয়ে?'

জলভরা চোখে তাকালো একবার উব্বিরী। কোন মেয়ে! একটি বই আমার আর মেয়ে কোথায়!

'চুরাশি হাজার মেয়ে এই চিতার ভস্মে ঘুমিয়ে রয়েছে! তুমি চিরন্তনী জননী, তুমি কার জন্যে, তোমার কোন মেয়েটির জন্যে কাঁদছ? কত তো কাঁদলে জন্ম-জন্ম ধরে, কেউ ফিরে এল, চিনতে পারলে কাউকে? যদি চুরাশি হাজার মেয়ে চিতাশয্যা ছেড়ে জেগে ওঠে চোখের সামনে, চিনতে পারবে মেয়ে বলে?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল উব্বিরী।

'পথিক যেমন চলতে-চলতে তরুতলে আশ্রয় নেয় তেমনি তারা তোমার অঙ্কছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলো। ক্ষণমুগ্ধা, ভেবেছিলে ওদের উপর তোমার বুঝি শাশ্বত অধিকার। কিন্তু চেয়ে দেখ, সবই অচিরস্থায়ী, শ্মশান-নদীর নামটিও অচিরাবতী। সংসারে শুধু এক বস্তু সার জেনো। সে হচ্ছে যাত্রা, অনন্তযাত্রা। তুমিও চলেছ অনন্ত পথে, তোমার মেয়েরাও তেমনি। শুধু এগিয়ে যাওয়া, নিবতে-নিবতে শেষ জ্বলে ওঠা।'

চোখের জল মুছল উব্বিরী। কিন্তু শ্রীমার কান্নার বিরাম নেই।

উর্বিরী কেঁদেছিল নিজের কন্যার শোকে। শ্রীমা কাঁদছেন পুত্রহারা মজুরনী মাঝি-বউ হয়ে।

শ্রীমাই চিরন্তনী মা।

শোকের বেগ কমে এলে নবাসনের বউকে নারকেল তেল আনতে বললেন। তেল এনে ঢেলে দিলেন মাঝি-বউয়ের মাথায়। হাত চাপড়ে-চাপড়ে মাখিয়ে দিলেন ভালো করে। আঁচলে বেঁধে দিলেন মুড়ি-গুড়। যাবার সময় বললেন, 'আবার আসিস মাঝি-বউ।'

মাঝি-বউ মৃদু-হাসির ঝিলিক দিল। তার আর শোক নেই।

ঠাকুর শোক তাড়িয়ে দেন। আর মা শোক শুষে নেন।

আরেক ভাবে বলি। ঠাকুর দুঃখকে ঠেলে দেন। মা নেন টেনে।

কিন্তু ও আমার কে?

রামলালের বিয়ে, সারদা চলেছে কামারপুকুর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন ঠাকুর। যতদূর চোখ যায়। ভাবলেন ও আমার কে!

খেতে বসেছেন ঠাকুর। বলরাম কাছে ব'সে। আরো হয়তো কেউ-কেউ।

'আচ্ছা আবার বিয়ে কেন হল বলো দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই, তার আবার স্ত্রী কেন?'

বলরাম হাসল একটু মুখ টিপে।

'ও, বুঝেছি।' থালা থেকে এক গ্রাস ভাত তুললেন ঠাকুর। বলরামের দিকে ইসারা করলেন। 'এই, এর জন্যে হয়েছে। নইলে কে আর অমন রেঁধে দিত বলো! কে আর অমন করে খাওয়াটা দেখত! ওরা সব আজ চলে গেল—'

কে চলে গেল!

'রামলালের খুড়ী গো! রামলালের বিয়ে হবে—তাই সব গেল কামারপুকুর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলুম। কিছুই মনে হল না। সত্যি বলছি, যেন কে তো কে গেল! কিন্তু তারপর ভাবনা হল কে এখন রেঁধে দেয়।' আবার বললেন আপন মনে: 'সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁসও থাকে না। ও বোঝে কি রকমটি ঠিক সয়। এটা ওটা করে দেয়। তাই মনে হল, কে করে দেবে!'

অপূর্ব মমতা। সর্বঢালা নির্ভরতা।

শিখিয়ে দিয়েছিলেন সারদাকে: 'গাড়িতে বা নৌকোয় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনো জিনিষটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখে-শুনে সকলের শেষে নামবে।'

ভাবে আছি বলে বাস্তব ভুলব কেন?

বলরাম বোসের বাড়ি যাচ্ছেন, সঙ্গে রামলাল আর যোগীন। সকাল বেলা। যাচ্ছেন ঘোড়ার গাড়িতে। গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের ফটক পর্যন্ত এসেছে, জিগ্‌গেস করলেন যোগীনকে, 'কি রে, নাইবার কাপড়-গামছা এনেছিস তো?'

'গামছা এনেছি। কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে।' কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল যোগীন। 'তা, বলরামবাবুরা আপনার জন্যে একখানা নতুন কাপড় দেখে-শুনে দেবে খন।'

'সে কি কথা? সবাই বলবে কোত্থেকে একটা হাবাতে এসেছে। কে জানে, তাদের কষ্ট হবে, হয়তো আতান্তরে পড়বে—যা, গাড়ি থামিয়ে নেমে নিয়ে আয় গে।'

যেমন কথা তেমন কাজ। যোগীন ছুটল ফের কাপড় আনতে।

'ভালো লোক লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়িতে এলে সব বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়, কাউকে কিছুতে বেগ পেতে হয় না।' বললেন ঠাকুর, 'আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগুলো এলে সব বিষয়ে বেগ পেতে হয়। যে দিন ঘরে কিছু নেই সে দিনই এসে হাজির হয় হতচ্ছাড়ারা।'

ঠাকুরের সঙ্গে হাজরাও মাঝে মাঝে আসে কলকাতায়। কিন্তু সেবার সেও ফেলে গিয়েছিল গামছা। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে হুঁশ হল।

'কই আমি তো নিজের গামছা বা বেটুয়া একবারও ভুলে ফেলে আসি না! ভগবানের নামে কাপড় থাকে না পরনে, কিন্তু ভাবমুখ ছেড়ে বাস্তবমুখে এসে কড়াক্রান্তির ভুলচুক নেই। আর তোর একটু জপ করেই এত ভুল!'

ভক্ত হয়েছিস বলে ভুলো হবি কেন? বোকা হবি কেন?

কে কাকে ভক্তি করে!

'ভক্ত আপনাকেই আপনি ডাকে।' বললে প্রতাপ হাজরা।

'এ তো খুব উঁচু কথা। আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে তো সবই হয়ে গেল। ঐটি দেখতে পাবার জন্যেই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যেই শরীর।' সার্থক উপমা দিলেন ঠাকুর: 'যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয় ততক্ষণ ছাঁচের দরকার। হয়ে গেলে ফেলে দাও মাটির ছাঁচ। ঈশ্বরদর্শন হলে কি হবে আর শরীর দিয়ে?'

তিনি শুধু অন্তরে নন, অন্তরে-বাহিরে। নয়নের সমুখে শুধু নন, নয়নের মাঝখানে।

লক্ষ্মী এসেছে এবার। রামেশ্বরের মেয়ে, রামলালের আপন বোন।

এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে ধনকৃষ্ণ ঘটকের সঙ্গে। সেবার রামেশ্বরের অস্থি নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে রামলাল, ঠাকুর জিগগেস করলেন, কেমন আছে লক্ষ্মী?

'তার বিয়ে হয়েছে।' বললে রামলাল।

'বিয়ে হয়েছে? সে বিধবা হবে।' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ঠাকুরের।

হৃদয় কাছে বসে ছিল, ফোঁস করে উঠল। 'তাকে আপনি এত ভালোবাসেন, তার বিয়ে হয়েছে শুনে কোথায় তাকে আশীর্বাদ করবেন, তা নয়, কি একটা ছাইভস্ম কথা বলে ফেললেন।'

'কি বললাম বল তো!' ঠাকুর তাকালেন শূন্য-চোখে।'

'কি মাথামুণ্ডু বললেন! শুনে আর কাজ নেই।'

'কি করবো! মা বলালেন যে!' ঠাকুর বললেন গম্ভীর কণ্ঠে: 'লক্ষ্মী মা-শীতলার অংশ। ভারি রোখা দেবী, আর যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সে সামান্য জীব। সে পুড়ে যাবে। সামান্য জীবের ভোগে আসতে পারে না লক্ষ্মী।'

ধনকৃষ্ণ নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোথায় কি কাজের সন্ধানে যাচ্ছে বলে বেরুল আর ফিরল না। বারো বছর কেটে গেল। কুশপুত্তলিকা দাহন করে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে খোলসা হল লক্ষ্মী।

শ্বশুরবাড়ির কিছু সম্পত্তি তার ভাগে পড়েছে। তাই শুনে ঠাকুর বললেন, 'কোনো সম্পত্তি জোটাস নি, আঁটকুড়ের আবার সম্পত্তি কি!'

সরিকদের নামে লিখে দিল অংশ।

'ধর্মকর্ম যা সব ঘরে বসে করবি। বাইরে তীর্থে-তীর্থে একলাটি ঘুরে বেড়াবিনে। কার পাল্লায় পড়বি কে জানে। আর ঐ খুড়ির সঙ্গে থাকবি। বাইরে বড় ভয়।'

বললেন সারদাকে, 'লজ্জাই নারীর ভূষণ। বল্ না লক্ষ্মী সেই পদটি—অবলার অবলায় বৃদ্ধি, অবলার অবলায় সিদ্ধি।'

নহবৎখানায় প্রতিষ্ঠা হল সারদার। লজ্জা-রূপেন সংস্থিতা।

দরমার-বেড়ায় আঙুল-প্রমাণ ছেঁদা হয়েছে একটা। তারই উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে সারদা। পাশ থেকে কখনো বা লক্ষ্মী। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এত সব নাম-নৃত্য এত সব ভাব-ভক্তি, একটু দেখবে না ওরা?

সেই ছেঁদা ক্রমে-ক্রমে একটু বড় হয়েছে বুঝি। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন রামলালকে, 'ওরে রামনেলো, তোর খুড়ির পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল।'

নবতকে বলেন খাঁচা। সারদা আর লক্ষ্মীকে, শুকসারী। নিজের ঘরে ফলমূল মিষ্টি নামলে রামলালকে বলেন, 'ওরে খাঁচায় শুকসারী আছে, ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'

ঠাকুর শুয়ে আছেন খাটের উপর। চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সন্ধে হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। খাবার রাখতে সারদা ঘরে ঢুকেছে আগেগোছে।

বেরিয়ে যাচ্ছে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস।' ভেবেছেন লক্ষ্মী এসেছে বুঝি।

'দিচ্ছি।'

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে করোনি।'

দিয়ে যাস? তুই? না, না, তুমি, তুমি। দিয়ে যেও। বন্ধ করে দিয়ে যেও দরজা।

সারা রাত ঠাকুরের আর ঘুম হল না। সকাল বেলা নবতে এসে হাজির। বললেন অপরাধীর মত, 'দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে। কেন অমন রুক্ষ কথা বলে ফেললুম।'

বাপ নেই, মা পাগল, নাম রাধু। শ্রীমার ভাইঝি।

কি অসুখ করেছে, তাই তার মা শ্রীমাকে গালাগাল দিচ্ছে। 'তুমিই ওষুধ খাইয়ে-খাইয়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেললে।'

ক্রমেই গলা চড়তে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে গালাগাল।

শ্রীমার অসহ্য মনে হল। বলে উঠলেন পাগলীকে লক্ষ্য করে, 'তোকে আজই মেরে ফেলব। আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই পুণ্যও নেই।' পরে বলছেন আপন মনে: 'আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম কখনো আমাকে তুই পর্যন্ত বলেননি। সরুচাকলি আর সুজির পায়েস তৈরি করে একদিন সন্ধের পর গেছি ঠাকুরের ঘরে। রেখে চলে আসছি, লক্ষ্মী মনে করে বলছেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস। বললুম, হ্যাঁ, রাখলুম ভেজিয়ে। গলার স্বর টের পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন, বললেন, আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরো না। পর দিন নবতের সামনে গিয়ে কত অনুনয়। 'দেখ গো, সারা রাত ঘুম হয়নি ভেবে ভেবে।' আর রাধুর মা কিনা আমাকে দিন রাত গাল দিচ্ছে। কি পাপে যে আমার এমন হচ্ছে জানি না। হয়তো শিবের মাথায় কাঁটাশুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।'

কিন্তু তোর মাথায় যে আমি ফুল দিয়েছি তাতে কি কোন কণ্টক আছে? কাঁটা না থাকবে তো কাঁদাস কেন এমন করে?

'কেন এত উতলা হন নরেনের জন্যে?' টিপ্পনি কাটে রামলাল।

'ওরে তোর ফেরেনডো যেমন রসিকলাল, নরেনের ফেরেনডো যেমন হাজরা, আমার ফেরেনডো তেমনি নরেন। বলে গেল বুধবার আসবে, ফিরে বুধবার এল তো সে এখনো এল না। তুই একবার গিয়ে খবর নিয়ে আয়, কেমন আছে?'

শেয়ারের গাড়ী না নিয়ে হেঁটেই চলে গেল কলকাতা। পাকড়ালো নরেনকে। বললে, 'কি গো, ঠাকুরকে বলে এলে বুধবারে যাবে, কত বুধবার চলে গেল, তবুও তোমার দেখা নেই।'

'যাব বলে তো ঠিক করি, কিন্তু সংসারের ঝামেলায় হয়ে ওঠে না, দাদা—'

'আজই চলো।'

টেড়ি কেটে ওরই মধ্যে ফিটফাট হয়ে বাবু সাজল নরেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

তার কপালের ধুলো হাত দিয়ে মুছে দিলেন ঠাকুর। মাথার টেড়ি উস্কো-খুসকো করে দিলেন। বললেন, 'তোর আবার এ সব কেন?' পরে তাকালেন মুখের দিকে। 'আজ এখানে থাকবি তো?'

না বলতে যেন কান্না পায়। বললে, 'থাকব।'

'ওরে রামলাল, নরেন আজ থাকবে।' উল্লাসে অধীর হলেন ঠাকুর। 'তোর খুড়িকে খবর দে। ভালো করে খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। হিন্দুস্থানী রুটি আর ছোলার ডাল।'

শুধু এখানেই খাওয়ান না, নিজের হাতে খাবার বয়ে নিয়ে যান কলকাতায়।

একেবারে তার টঙে।

তিন বন্ধুতে মিলে পড়ছে। নরেন, দাশরথি আর হরিদাস। বাইরে হঠাৎ ডাক শোনা গেল: নরেন, ও নরেন!

নরেন ব্যস্ত হয়ে নামতে লাগল। কিন্তু ব্যস্ততর যিনি তিনি উঠে পড়েছেন। বন্ধুরা দেখল, সিঁড়ির মাঝপথে দু'জনের সাক্ষাৎকার।

'এত দিন যাসনি কেন? যাসনি কেন এত দিন?' অনুযোগ করছেন ঠাকুর, আর গামছায় বাঁধা সন্দেশ বের করে খাইয়ে দিচ্ছেন নিজ হাতে।

'চল কত দিন গান শুনিনি তোর।'

টঙে উঠে তানপুরা নিয়ে বসল নরেন। কান মলে-মলে সুর বাঁধল। তার পর গাইল গলা ছেড়ে:

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী,
তুমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপিনী,
তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিনী
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নরেনের বন্ধুরা ভাবল হঠাৎ কোনো অসুখ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন বুঝি। জল নিয়ে এল ছুটে। ছিটে দিতে যাবে, বাধা দিল নরেন! বললে, 'দরকার নেই। ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে-শুনতেই প্রকৃতিস্থ হবেন।'

যেমন বলা তেমনি। চলল গানের নির্ঝরস্রোত। ঠাকুর চলে এলেন সহজাবস্থায়। বললেন, 'যাবি, আমার সঙ্গে যাবি দক্ষিণেশ্বর? কত দিন যাস নি। চল না আজ। বেশিক্ষণ না হয় নাই থাকলি। আবার না হয় ফিরে আসবি এখুনি। যাবি?'

যাব। ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নরেন। পড়ে রইল বই। পড়ে রইল তানপুরা। [ক্রমশঃ।

আকাশ-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

হেমনলিনী তখন পেছনে দু'টি হাতে ভাঁড়ার-ঘর তদারক করছিলেন।

তাঁর অনুগ্রহের দাসীরা ক'জন তোলা-পাড়ার কাজে লেগেছিল। হেমনলিনী তাম্বূলরাগে অধর রাঙিয়ে শুধু পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন দাসীদের কাজকর্ম্ম! পেছনে দু'টি হাত হেমনলিনীর। হাতে একটা পানের ডিপে। বই-ডিপে। কাশীর ডিপের অনুকরণে রূপোয় তৈরী। নক্সা-কাটা। হেমনলিনীর নামটি খোদিত আছে ফুল আর লতাপাতার নক্সায়—লেখা আছে 'হেম'।

—আয় বৌ আয়। আমার কি ভাগ্যি?

হেমনলিনী তাঁর গৃহের প্রবেশ-দ্বারে এসে নামিয়ে নেন রাজেশ্বরীকে। বলেন,—আয় বৌ, আয়। কথা বলতে বলতে খুশীর উচ্ছ্বাসে বৌকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। গালে চুমা খান। মুখে যেন তাঁর কথা আসে না। রাজেশ্বরীকে হঠাৎ এমন বেশে চোখের সমুখে দেখতে পেয়ে বিশ্বাস হয় না যেন নিজের চোখকে। লজ্জানত বধূ রাজেশ্বরী। তার মুখেও সাড়া নেই। অবগুণ্ঠনের ফাঁক থেকে চোখ মেলে দেখে পিশীমাকে। দেখে পিশীমার ঘর-দোর। দেখে স্বচ্ছ দিবালোকে পিশীমার দর-দালান। সাদা আর কালো চতুষ্কোণ চুনারী পাথরের দালান।

হেমনলিনীর বাহুবেষ্টন শিথিল হ'লে রাজেশ্বরী পদধূলি নেয় পিশীমার। অত্যন্ত সন্তর্পণে। ধীরে ধীরে। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে বৌ। এক গা গয়না আর জংলা শাড়ীর কণ্টক বিঁধছে যে সর্ব্বাঙ্গে!

—বৌ, তুই যে হঠাৎ চলে আসবি, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কেন এলি বল্ তো? হেমনলিনী কথা বলতে বলতে হাসেন। পরম পরিতৃপ্তির হাসি। হাতের ডিপেটা খুলে একটা কি ছোটো পান মুখে পুরে ফেললেন। আরও রাঙা হয়ে উঠতে থাকে হেমনলিনীর অধর। যেন রক্ত পান করেছেন।

রাজেশ্বরীও মৃদু হাসির সঙ্গে কথা বলে।—পিশীমা, বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে মনটা কেমন—

—এ্যাঁ! পিশীমার কণ্ঠে সহসা বিস্ময়।—বলিস কি বৌ? এই তো ক'দিন আগেও দেখা হয়েছে। তা, আমার বাপের বাড়ীর সকলে ভাল আছে তো? চল্ চল্, আমার ঘরে বসবি চল্।

রাজেশ্বরী ত্রস্তপদে অনুসরণ করলো হেমনলিনীকে।

অন্দরে ঢুকতে ঢুকতে মাথার ঘোমটা খুলে ফেললেন পিশীমা। এখানে আর কাকে লজ্জা। তাঁরই সংসার। রাজেশ্বরী পিছন থেকে লক্ষ্য করছিল পিশীমার বদ্ধকবরী। কি চমৎকার খোপা! সোনার কাঁটায় পরিপূর্ণ। দেখছিল হেমনলিনীর অঙ্গের বাস। ফরাসডাঙ্গার জরদপাড় ধোয়া শাড়ী পরনে। ব্যস, আর কিছু নেই। যা আছে তা হ'ল কেবল হেমনলিনীর অঙ্গের বরণ। শুভ্র-লোহিত রঙ। তেমনি গঠন আঁটসাঁট। দু'হাতে গোছা-গোছা চুড়ি, শাঁখা। গলায় ভারী ওজনের মটরমালা। কানে টাপ। হীরে আর চুনীর টাপ।

—ভাল আছে সকলে। শুধু—

চলতে চলতে আর বলতে বলতে থেমে যায় সহসা কথার মধ্যপথে। আর কিছু বলে না। নীরব হয়ে যায় রাজেশ্বরী।

—থামলি কেন বৌ? বললেন হেমনলিনী।

রাজেশ্বরী আমতা আমতা করে। বলে,—জমিদারীর খাজনা বাকী পড়ায় আদালতে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে ক'দিন ধরে।

পেছন ফিরলেন হেমনলিনী। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বললেন, —সে কি কথা বৌ? তুই ঠিক জানিস? জমিদারীর খাজনা বাকী পড়তে যাবে কেন! বালাই ষাট!

—হ্যাঁ পিশীমা, টাকার ঘড়ায় হাত প'ড়েছে। অনেক টাকা যে। বললে রাজেশ্বরী অকপট কণ্ঠে।

কিন্তু পিশীমা হেমনলিনী বিশ্বাস করতে চাইছেন না কেন? তবে কি মিথ্যা! কথাটি ভাবতেও রাজেশ্বরীর রক্ত যেন জল হয়ে যায়। হাত আর পা অবশ হয়ে পড়ে।

—বলিস কি বৌ? আমার ভায়েদের জমিদারীর খাজনা যে কখনও বাকী পড়েনি! সাত পুরুষ ব'সে ব'সে খেলেও যে তাদের টাকা শেষ হবে না! কি কথা শোনালি বৌ? কেমন দুঃখকাতর কথার সুর হেমনলিনীর। তিনি যেন ভেঙ্গে পড়লেন বিষয়টা শুনে। মুহূর্ত্তের মধ্যে কত কি ভাবলেন। কত ভাল-মন্দ কথা। কপাল পুড়ে যাওয়ার কত পরিচিত ঘটনা মনে পড়লো হেমনলিনীর। লাখো-লাখো টাকার সম্পত্তি কত কত জনের, উড়ে-পুড়ে তছনছ হয়ে যাওয়া য স্বচক্ষে দেখেছেন তিনি।

বৌ আর কথা কয় না। সে যেন শুধু ব'লেই খালাস।

রাজেশ্বরী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে পিশীমার ঘর-দোর। দর-দালান। ঘরে ঘরে সৌখীন আসবাবপত্র মেহগনির। দেওয়ালে দেওয়ালে বিরাট বিরাট আয়না আর ছবি। দালানের কোণগুলিতে তেপায়ায় পাম্ গাছের বাহার। দ্বারে দ্বারে রঙীন নেটের পর্দা।

—এত টাকা করলে কি! ঘড়া-ঘড়া টাকা ছিল যে দাদাদের। খাজনা বাকী পড়লো শেষে! কথাগুলি আপন মনেই স্বগত করে যান হেমনলিনী। দোতলার সিঁড়ির

কাছ বরাবর পৌঁছে বলেন,—চল্ বৌ, তুই ওপরে চল্, আমি আসছি এখনই।

শ্বেত-প্রস্তরের সিঁড়ি। ছুঁচ প'ড়ে থাকলে দেখা যায়, এমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। রাজেশ্বরী সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। পায়ের অলঙ্কারের শব্দ শোনা যায় ঝম্‌ঝম্। সিঁড়ির দালানে মেহগনির হ্যাট্-ষ্ট্যাণ্ড, আর ইটালীয়ান পাথরের মূর্ত্তি। নগ্ন পরী কয়েক জোড়া, উড়ে যাচ্ছে আকাশে।

সিঁড়ির মুখ থেকে অন্যত্র চলে গেলেন হেমনলিনী।

চিন্তাকুল দৃষ্টি তাঁর চোখে। চললেন দ্রুতপদে।

—দাসী, ও দাসী। ডাকলেন রান্না-বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে।—গেলে কোথায় তোমরা?

কেউ কোথাও যায়নি। সবাই আছে। হেমনলিনীর অনুগ্রহের পাত্রীরা আছে সকলেই যে যার কাজে। কিন্তু বৌ এসেছে যে বাড়ীতে। নতুন বৌ একটি। প্রতিমার মত। হঠাৎ নেমেছেন স্বর্গলোক থেকে। লক্ষ্মী না সরস্বতী কে জানে!

দাসীর দল গেছে বৌ দেখতে।

হুজুরণীর ভেয়ের পুত্রবধুকে দেখতে। কোন' খানদানি ঘরের মেয়ে হয়তো, ডাকসাইটে সুন্দরী। সচরাচর নাকি দেখা যায় না এমনটি। এমন একটি।

বালিকা-বধূ রাজেশ্বরী।

জানে না পৃথিবীর কোন' কিছু। শুধু হাসতে জানে। উল্লাস আর উচ্ছ্বাস তার সকল কিছুতে। জ্ঞান নেই কোন', অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন রাজেশ্বরী।

দাসীদের ভিড় দেখে রাজেশ্বরী হাসলো মিটিমিটি। দোতলার দালানে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি-ভাঙার ক্লান্তিতে হাঁফাতে হাঁফাতে হাসলো রাজেশ্বরী।

—ইদিকে এসো, ইদিকে হুজুরণীর খাস্-কামরা।

বললে দাসীদের একজন, যে হয়তো পুরানো। বললে,—বৌয়ের মতন বৌ হয়েছে। যেন লক্ষ্মীপ্রিতিমে!

অন্যান্য দাসী চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়েছিল।

যেন জন্মে কখনও দেখেনি! কেউ কেউ মন্তব্য করলো যে কেবল মাত্র বৌ গেঁয়ো মেয়ে নয় এবং শহরের মেয়ে বলেই নাকি বৌয়ের এত রূপ। এত সৌন্দর্য্য। শহরের মেয়ে তো মেয়ে নয়, মেম।

রাজেশ্বরীকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে পুরানো দাসীটি পুনরায় কথা বললে,—হুজুরণী এলেন ব'লে। তুমি বৌ ব'স না ঐ কেদারায়।

হুজুরণী অর্থাৎ হেমনলিনী ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেন ব্রাহ্মণীকে। কথা বলেন নাতিউচ্চ কণ্ঠে। বলেন কি কি রন্ধন হবে তারই ফর্দ্দ। বৌ এসেছে, বৌকে পাত সাজিয়ে খাওয়াতে হবে। খাক, না খাক, দিতে হবে সাজিয়ে।

হেমনলিনীর ঘর দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে যায় রাজেশ্বরী।

ঘরে কি এক ফুলের সুবাস। ঐ তো চীনা ফুলদানিতে রয়েছে এক রাশ ফুল, ঘরের এক কোণে। রাজেশ্বরী চোখ ফিরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। ছত্রী দেওয়া ডবল বিছানার বিলাতী খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। আলপাকার বালিশ। লেসের ঝালর গোলাপী নেটের মশারিতে। আবলুস আর মেহগনির আলমারী, কেদারা, দেরাজ, ডেভানপোর্ট আর পিয়ানো। আয়না দেওয়া শো-কেশে কত পুতুল, কত খেলনা। ঘরের মেঝেয় জাজিম বিচিত্র বর্ণের। কড়িকাঠে রঙীন বেলোয়ারী কাচের ঝাড়-লণ্ঠন। দেওয়ালে পৌরাণিক দেবদেবীর ছবি, হেমনলিনী স্বয়ং তাঁদের পোষাক পরিয়েছেন। ছবির মূর্ত্তিকে জীবন্ত করে তুলেছেন যেন। একটা বুক-কেশে ঠাসা-ঠাসা বই। বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির রচনাবলী। কিন্তু পিসীমা গেলেন কোথায়?

হেমনলিনী বুঝিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

ব্রাহ্মণী আর দাসীদের বলছিলেন রান্নার জোগাড়ের কথা। মাছ আর মিষ্টান্ন আনাতে হবে। আর আর যেন কি কি আনাতে হবে বাজার থেকে। রূপোর বাসনে খাওয়াতে হবে। আদব-কায়দার যেন কোন ত্রুটি না হয়। আদর-আপ্যায়নের যেন অভাব না হয়।

—আহা, একলাটি বসে আছিস বৌ!

বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলেন হেমনলিনী। হাতের পানের ডিপেটা রাখলেন খাটের 'পরে।

রাজেশ্বরী বসেছিল আড়ষ্ট হয়ে। পিসীমাকে দেখে মনে স্বস্তি পায় যেন। হাসি-হাসি মুখ করে। বলে,—কি চমৎকার আপনার বাড়ী পিসীমা!

—পছন্দ হয়েছে বৌ তোর? আমি যে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছি এই ঘর-দোর। এমনটি তো ছিল না। ছিল নাম মাত্র ক'খানা ঘর আর দালান। খুশীভরা কথা বলেন হেমনলিনী। শাড়ীর আঁচলে মুছে ফেলেন কপাল আর গণ্ডদেশ। চলাফেরায় ঘাম ঝরেছে যে। বলেন,—তা এখন কি খাবি বল্ বৌ? জল-খাবার?

—কিচ্ছু না পিসীমা! জল খেয়েই আসছি। রাজেশ্বরী বললে ভয়ে-ভয়ে। খাওয়ার ভয়ে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই এখন জিরো। সে কথা পরে হবে। এক মুহূর্ত্ত থামলেন হেমনলিনী। বললেন,—আয় তোর গয়না-পোষাক ছাড়িয়ে দিই। দাঁড়া, একখানা শাড়ী তোকে দিই। পরনের শাড়ীটা ছেড়ে ফ্যাল্। এত গয়না আর ঐ জংলা প'রে কষ্ট হবে তোর।

—হ্যাঁ, বড্ড কষ্ট হচ্ছে। সেই ভাল, একটা শাড়ী দিন। আমি ছেড়ে ফেলি এই শাড়ীটা।

আঁচলে ছিল রূপোর চেন। চাবির রিং সমেত।

একটা আলমারী খুলে ফেললেন হেমনলিনী। বিরাট একটা আলমারী।

দেখে চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হয় রাজেশ্বরীর। আলমারীতে শুধু শাড়ী আর শাড়ী। কিংখাব, বেনারসী,

ঢাকাই আর তাঁতের শাড়ী। সোনা আর রূপোর সুতোর জামা। সত্যিই চোখ ঝলসে যায় রাজেশ্বরীর। একটি শাড়ী বের করে বললেন হেমনলিনী,—এইটে পর্ বৌ। তোকে যা মানাবে! কথার শেষে বন্ধ করলেন আলমারী।

রাজেশ্বরী দেখলো কাপড়টা। মিহি সুতোর তাঁতের শাড়ী একটা।

খুনখারাপি রঙের। এমন দু'-একখানা শাড়ী আগে প'রেছে রাজেশ্বরী। প'রে দেখেছে আয়নায়। দেখেছে, কি সুন্দর দেখায় নিজেকে। বেশীক্ষণ দেখা যায় না যেন। চোখ দুটো ঝলসে ওঠে।

—পেন্নাম হই মামী।

হঠাৎ কথা শুনে চমকে ওঠে যেন রাজেশ্বরী। গুণ্ঠনটা টেনে দেয় সে সঙ্গে সঙ্গে। কে না কে কথা বলছে কে জানে। কিন্তু দু'জন কথা বললে না একই সঙ্গে? মামী ডাকে সম্বোধন করলে যে!

জহর আর পান্না। হেমনলিনীর দুই অবাধ্য পুত্র।

হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছে গৃহে কৃষ্ণকিশোরের স্ত্রী এসেছে শুনে। ঘরে ঢুকে দু'জনেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বললে,—পেন্নাম হই বৌঠান।

রাজেশ্বরী গেছে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে। কিন্তু দেবরদ্বয়ের অতি ভক্তিতে না হেসেও পারে না। গুণ্ঠনের আড়ালে হাসে মুখ টিপে-টিপে। হেমনলিনীও ছেলেদের কীর্ত্তি দেখে হেসে ফেললেন। বললেন,—থাক্, থাক্, ঢের হয়েছে। এখন যা দেখি ঘর থেকে, তোদের বৌঠান কাপড় ছাড়বে।

—ও বাবা! কাপড় ছাড়বে?

চোখ বড় করে বললে জহর। ফাজলামি মাখানো ঢঙে। বললে,—চল ভাই এখান থেকে।

পান্না বললে,—এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়।

দু'জনে গমনোদ্যত হয়। জহর ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে বলে,—কিন্তু বৌঠান, হ্যাঁ, কাপড়-চোপড় ছেড়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে হবে।

পান্না বললে,—জানো তো বৌঠান, দেওর মানে দ্বিতীয় বর। আমরা তোমার—

ধমকে উঠলেন হেমনলিনী,—যা, যা, দূর হ এখান থেকে। বিদেয় হ। নজরছাড়া হ!

জহর বললে,—কিন্তু বৌঠান, গল্প না করলে যেতে দেবো না। অবিশ্যি আমরা এখন যাত্রা করছি। অর্থাৎ তোমার গিয়ে বেরুচ্ছি।

দৃপ্ত কণ্ঠে শুধোলেন হেমনলিনী,—কোন্ চুলোয় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

জহর বললে বিরক্তির সুরে,—এ কি! তোমাকে তা হ'লে কাল এত ক'রে কি বোঝালুম? আমরা মল্লিকদের বাগানবাড়ীতে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে চড়ুইভাতি করছি, থাকছি সারাটা দিন, মনে নেই তোমার?

—না, মনে নেই। হেমনলিনী আলমারী সশব্দে বন্ধ করে বললেন—যাও, যাও, যেখানে খুশী যাও। জাহান্নমে যাও।

পান্না সক্রোধে বললে,—তুমি আলমারী বন্ধ করলে যে?

হেমনলিনী কোন প্রত্যুত্তর দেন না। তাঁর মুখাকৃতিতে নেমেছে ভীষণ গাম্ভীর্য্যের ছায়া। বৌ সম্মুখে নেহাৎ তাই, অন্য সময় হ'লে গর্ভজাতদের বক্তব্য শুনে হয়তো নিরুপায় হয়ে অশ্রুপাত করতেন ঐ হেমনলিনী। রাজেশ্বরীর অবস্থিতি এবং উপস্থিতিতে এখন অত্যন্ত অপমান বোধ করেন, পুত্রদের অসভ্যতায় লজ্জানুভব করেন। মনে মনে গুমরে মরেন। মহাদুঃখে।

জহর ছাড়বার পাত্র নয়। বললে,—আলমারীটা বন্ধ করলে কেন? আবার তো খুলতে হবে।

হেমনলিনী প্রায় ক্রন্দনের সুরে মিনতি করলেন,—তোমরা এখান থেকে বিদেয় হবে কি না বল? আমাকে রেহাই দাও, দোহাই তোমাদের!

জহর বললে,—আমাদের মিটিয়ে দিলেই রেহাই পাবে। অতি সহজ কথা।

পান্না বললে,—এতক্ষণ দিয়ে দিলে এতক্ষণে আমরা পৌঁছে যেতুম। তুমি মা অহেতুক দেরী করিয়ে দিচ্ছো। ফুর্ত্তিটা মাঠে মারা যাবে।

হেমনলিনী বললেন,—কি চাই তোমাদের?

জহর বললে,—শুধু হাতে যাবো নাকি আমরা! দাও, কিছু টাকা দাও।

হেমনলিনী শুধু বললেন,—কত?

রাজেশ্বরী মাতা-পুত্রের বাক্য-বিনিময় শুনতে শুনতে তটস্থ হয়ে যায় যেন। ভয়ে কাঁপে হয়তো। বুকটা ধুক্-পুক্ সুরু করে। ঘাম ঝরে ঘোমটা-ঢাকা কপালে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে এক পাশে। দুঃখ হয় পিসীমাকে দেখে। হেমনলিনীর আঁখি দু'টি কি জলসিক্ত হয়েছে!

পান্না বলল,—দু'খানা ফুল গিনি দিয়ে দাও, ল্যাটা চুকে যাক্। আমরাও বিদেয় হয়ে যাই তোমাকে পেন্নাম ঠুকে।

একটা দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হেমনলিনী। তাঁর বক্ষদেশ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে ধীরে ধীরে যথাকার ধারণ ক'রলো শ্বাসপতনের সঙ্গে সঙ্গে। ভূমিতে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে আলমারীর চাবি খুললেন। কোথায় আছে গিনি। খুঁজলেন এখান-সেখান। হাতড়ালেন।

ঐ তো হাতীর দাঁতের ক্যাসকেটটা।

তাতেই আছে ক'খানা গিনি। তা থেকেই দিলেন দু'টি গিনি।

গিনি দু'খানা হস্তগত হওয়া মাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দুই ভাই। হেমনলিনীর মুখাবয়ব দেখে কেউ আর কোন বাক্যব্যয় করতে সাহসী হয় না। রাজেশ্বরী কম্পমান বক্ষে দাঁড়িয়ে দেখে পিসীমাকে। হেমনলিনীর মুখে যেন গভীর

দুঃখের ছায়া নেমেছে। চোখে হতাশা। কিছুতেই তিনি যেন এঁটে উঠতে পারছেন না অবাধ্য সন্তানদের। ছেলেরা তাঁকে মানে না, ফিরেও তাকায় না। শুধু যখন তাদের অর্থের প্রয়োজন তখন দুই ভাই আসে গর্ভধারিণীর কাছে। টাকা চাই। টাকা চায়। না দিলে নানা ভীতিপ্রদর্শন করে। আত্মহত্যার ভয় দেখায়। গৃহের ছাদ থেকে লম্ফ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

অনেকক্ষণ পরে হেমনলিনী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,—দেখলি তো বৌ ? আমার ছেলেদের কীর্ত্তি দেখলি ? মরেও না ছাই !

—আহা, অমন কথা বলবেন না পিশীমা! বললে রাজেশ্বরী। দেবর দু'জন চলে যাওয়ায় স্বস্তির শ্বাস ফেলে। বলে,—পয়সা হাতে দেন কেন ? শাসন করতে পারেন না ? গিনি দু'খানা দিয়ে দিলেন ?

অন্যের ঘরের নবাগতা বধূ রাজেশ্বরী। অধিক কথা বলা তার সাজে না। চুপ মেরে যায় সে।

হেমনলিনী বললেন,—কি করি বল্ বৌ! আমি যে পারি না বাগ মানাতে। বাপও কিচ্ছু দেখে না। নেশার খেয়ালে যেদিন ধরেন সেদিন কি আর আস্ত রাখেন ছেলেদের! রক্তগঙ্গা করে ছাড়েন। আমি চোখে দেখতে পারি না মারা-ধরা। ঘরে গিয়ে দুয়োর বন্ধ ক'রে বসে থাকি তখন। কথা বলতে বলতে ক্ষণেক থামেন। আবার বলেন,—মরুক গে, যা খুশী করুক গে। নে, তুই শাড়ীটা বদ্‌লে নে। আমি গয়না ক'টা খুলে দিই।

—আপনার ছেলেদের বিয়ে দেবেন না পিশীমা? শুধোয় রাজেশ্বরী। পরনের শাড়ী খুলতে খুলতে বলে। কিঞ্চিৎ সঙ্কোচের সঙ্গে বলে।

—বিয়ে! বললেন হেমনলিনী।—আমি বিয়ে দেবো না এখন। ছেলেদের মতি-গতি ভাল না হ'লে বিয়ে দেবো না। দু'টো মেয়েকে কি ঘরে এনে তাদের সব্বনাশ ক'রবো ? আমার ছেলেদের আমি তো চিনি। যেমন আছে থাক। অমন ছেলেরা থাকার চেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল।

—আহা, মা হয়ে আপনি এমন কথা বলবেন না। বিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। বললে রাজেশ্বরী। বললে পাকা গিন্নীর মত।

—ভুল, ভুল, মস্ত ভুল ধারণা তোমাদের। বিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যায় না। আরও বিগড়ে যায়। পরের ঘরের মেয়েদের কপাল পুড়িয়ে কি হবে ? মানুষ কি সকলে হ'তে পারে বৌ ? সামান্য ভদ্রতা, আচার-ব্যবহার শিখলো না! সকল তাতেই ইতরামি ?

রাজেশ্বরীর পান্নার অলঙ্কার খুলতে খুলতে কথা বলেন হেমনলিনী।

চোখ দু'টি তাঁর কখন জলে ভ'রে গেছে লক্ষ্য করেনি রাজেশ্বরী। পিশীমার মুখখানি যেন শ্রাবণের মেঘ। দুঃখে আর অপমানে কেমন যেন থম-থম করছে। তাম্বুলরাগরক্ত অধর কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে।

—পিশে মশাই কোথায় পিশীমা ? তাঁকে দেখছি না ? শুধোয় রাজেশ্বরী।

—কাজে গেছেন তিনি। জরুরী কাজ প'ড়েছে, ভোরে উঠেই বেরিয়েছেন। বললেন হেমনলিনী। পান্নার নেকলেসটা খুলতে খুলতে বললেন।—ছেলে দু'টো যদি আমার তবু মানুষের মত হ'ত! ওঁকে কাজে-কম্মে সাহায্য করতে পারতো। উনি তো খেটে-খেটে সারা হয়ে গেলেন। কাজের মানুষ, ব'সে থাকতে পারেন না মোটে। কেবল কাজ আর কাজ। টাকা আর টাকা।

সত্যিই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন হেমনলিনীর স্বামী। শিবচন্দ্র বাবু।

যত সব জাঁদরেল সাহেব-সুবোদের মদ্যপান করিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। কৃতজ্ঞতায় বেঁধে ফেলেন। কাজ পান, টাকা পান। লাভ করেন মোটা-মোটা টাকা। কাঁচা টাকা। ভেট পাঠান কত জনাকে। বড়দিন, গুড্-ফ্রাই-ডে'র সময়ে কেশ্-কেশ্ স্কচ্ হুইস্কি, হরেক রকমের ফল আর ফুল পাঠিয়ে দেন সাহেবদের। নগদ টাকা ঘুষ দিতে পারেন না, প্রকারান্তরে দেন তাই। তারই ফলে অর্থোপার্জ্জনের পথটা তাঁর সুগম হয়।

আর মাসে মাসে, বছরে বছরে, ভারী ভারী ওজনের নতুন নতুন গহনা ওঠে হেমনলিনীর অঙ্গে। পুরানো মামুলী প্যাটার্ন যায় বাতিল হয়ে, আসে আনকোরা নতুন ফ্যাশনের অলঙ্কার। হেমনলিনী নিজেই প্যাটার্ন এঁকে দেন। নাকচ ক'রে দেন ব্যবহৃতদের।

লোহার সিন্দুক উপচে পড়ে হেমনলিনীর।

নীল ভেলভেটের বাক্সে পরিপূর্ণ হয়ে যায় একেকটা সিন্দুক। হেমনলিনীর সর্ব্বসমেত কত গহনা আছে হেমনলিনীই জানেন না। জড়োয়া অলঙ্কার নয়, খাঁটি সোনার। হীরা-জহরতের কোন' মূল্য দেন না শিবচন্দ্র বাবু। যত মূল্য সোনার। হীরায় দাগ পাওয়া যায়, মুক্তো গলিত হয়ে যায়, রঙীন কাচের মূল্য কি—কিন্তু সোনা ? সোনার কোন' দাম নেই। সোনা অমূল্য। সোনা সর্ব্বদেশের। চিরকালের।

ছেড়ে-ফেলা কাপড় জড় ক'রে রেখে দেয় রাজেশ্বরী।

একটা দেওয়াল-আলনায় ঝুলিয়ে রেখে দেয়। একটি একটি অলঙ্কার অতি সাবধানে খুলে রাখেন হেমনলিনী। হাতীর দাঁতের ঐ ব্যাস্কেটে রেখে দেন। বলেন,—বৌ, কাপড়টা ওমনি ক'রে রাখলি, নাট হয়ে যাবে না? দে, আমাকে দে, দাসীদের দিই, পাট ক'রে দিক।

মহামূল্য শাড়ীটা হেমনলিনীর হস্তে সমর্পণ ক'রে রাজেশ্বরী ব'সলো জাজিমে।

আঁচল চেপে-চেপে মুছলো মুখটা। ঘেমে নেয়ে উঠেছে যেন রাজেশ্বরী। ভেতরের জামাটা বোধ হয় তার ভিজেই গেছে।

—দাসী! দাসীরা গেলো কোথায়? ডাকলেন হেমনলিনী।

—আছি গো আছি। যাবো আবার কমনে? হুজুরণীর হুকুম তামিল করতে তো হরবকৎ দাঁড়িয়েই আছি। হুকুম হোক হুজুরণীর!

—ও! কে, আয়েষা?

—হাঁ, হুজুরণী! বললে আয়েষা! হুকুম হোক্।

হেমনলিনী দাসীর কথার ধরণ শুনে মৃদু হেসে বললেন,—এই নে, বৌয়ের শাড়ীটা ভাল ক'রে পাট করে রাখ্।

শাড়ীটা আয়েষা লুফেই নেয়। বলে,—যো হুকুম। আমি এসেছি বৌদিদিকে দেখতে। দেখি নাই তাকে। তোমার ভাইয়ের ছেলে-বৌকে। শুনেছি খুপসুরুৎ বৌ হয়েছে।

—ত্যাখ না ঘরে ঢুকে। দেখে তোর চোখ কপালে উঠবে। বললেন হেমনলিনী। গর্ব্বিত কণ্ঠে।

আয়েষা দরজার মুখে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যস্থিত অপরিচিতাকে দেখে। বলে,—বাঃ, বেশ মেয়ে পেয়েছে হুজুরণীর বৌঠাকরুণ। অমন চাঁনপানা মুখ, দুধের মত রঙ, মোমের মত গড়ন, আর কি চাই? এমনি মেয়ে না পেলে তোমার ছেলেদের বিয়ে দিও না।

আয়েষার কথা শুনে ক্ষীণ হাসলেন হেমনলিনী। হতাশ-হাসি।

অন্য কেউ এই ধরণের অনধিকার-চর্চ্চা করলে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন গৃহকর্ত্রী। কিন্তু সে যে আয়েষা। হেমনলিনী যখন বধূরূপে এই গৃহে এসেছিলেন সেই তখনকার মানুষ আয়েষা। কে বলবে যে জাতে মুসলমান! শুধু যা ঐ সর্ব্বাঙ্গে উল্কীর বৈচিত্র্য। বৌ দেখতে এসে নিজেই প্রায় বৌ সেজে এসেছে আয়েষা। হোক না বয়স, চুলগুলোয় না হয় পাক ধ'রেছে, দাঁতগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে—তবুও বুড়ী আয়েষা গায়ে গয়না চড়িয়েছে। কানে মাকড়ি, গলায় হাঁসুলী, হাতে বালা আর কাচের চুড়ি। রৌপ্যালঙ্কার। হুজুরণীর খাস বাঁদী, যেমন-তেমন বেশে দেখা দিতে পারে কখনও! একটা ফেঁসে-যাওয়া নীলাম্বরী পরতেও ভোলেনি আয়েষা। কেবল যা বার্দ্ধক্যের অভিশাপ-চিহ্ন ফুটেছে শরীরে। ঈষৎ কুঁজো হয়ে গেছে আয়েষা। শরীরে তেমন আর শক্তি নেই। পক্ক কেশ, চর্ম্ম লোল হয়ে গেছে। তথাপি সাজ-সজ্জার লোভ সম্বরণ করতে পারেনি আয়েষা। হুজুরণীর খাস বাঁদী যে আয়েষা! একেবারে খাসমহলের।

—আমার ছেলেদের বিয়ে আমি দেবো না। হেমনলিনীর প্রদীপ্ত কণ্ঠ।

আয়েষা তো হতবাক্ হয়ে থাকে কিয়ৎক্ষণ। কানের মাকড়ির রাশি দুলিয়ে বলে, সাদি দেবে না, সে কেমন বাত! সাদি দেবে না কেন?

—যা, তুই যা দেখি। নিজের কাজে যা। হুকুম করলেন গৃহকর্ত্রী।

গেল না আয়েষা। পিঙ্গল চোখ দু'টিতে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে বললে,—বৌ, তোমার নামটা কি বললে না?

—রাজেশ্বরী। বললে রাজেশ্বরী।

হুঁকো-খাওয়া কালো ঠোঁটের ফাঁকে হাস্যরেখা দেখা দেয় আয়েষার। বলে,—রাজরাজেশ্বরী? বাঃ, বেশ নাম তো!

কথার শেষে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বহির্গত হয় আয়েষা। কোন' রকমে দরজাটা ধরে, টাল সামলে নেয়। তার পর দেওয়াল ধ'রে ধ'রে চলে। দালানে।

হেমনলিনী কখন যে খাটে উঠে প'ড়েছেন তিন-খাপের সিঁড়ি বেয়ে, দেখতেই পায়নি রাজেশ্বরী। দেওয়ালে সত্যিকার পোষাক-পরানো ছবি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সে। দুর্ব্বাসার অভিশাপ, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ, যম এবং সাবিত্রী, বনবাসিনী সীতার সঙ্গে যুদ্ধনিপুণ লব-কুশ প্রভৃতির রঙীন ছবির মানুষদের পোষাক পরিয়েছেন হেমনলিনী নিজেই।

একটা নরম তাকিয়ায় এলিয়ে পড়েছেন হেমনলিনী। কাছেই ছিল পালখের হাত-পাখা। তুলে নিয়েছেন পাখাটি। বাতাস খাচ্ছেন। আয়েষা চ'লে যেতেই ডাকলেন,—আয় বৌ, খাটে আয়। জাজিমে বসবি তুই?

রাজেশ্বরী উঠলো পায়ের অলঙ্কার বাজিয়ে।

শুভ্র দু'টি পা, অলক্তক-শোভিত। বসলো উঠে খাটে। সলজ্জায় বসলো খাটের কিনারা ঘেঁসে।

—বৌ, তোর গান ভাল লাগে না? পাখা করতে করতে একটু হেসে বলেন হেমনলিনী।

—গান?

—হ্যাঁ রে।

রাজেশ্বরী চোখ বড়-বড় করে। বলে,—হ্যাঁ। খু-উ-ব ভাল লাগে। বিশেষতঃ আপনি যখন গান।

চুপ মেরে যান হেমনলিনী। মুখে তাঁর মৃদু হাস্য। পাখাটা রেখে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হ'লে বললেন,—তুই বৌ মন-রাখা কথা বলছিস! আমি কি গাইতে পারি?

—খু-উ-ব ভাল গাইতে পারেন। আমি বাজে কথা বলি না। ঘরের অন্যান্য ছবি চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললে রাজেশ্বরী।

ফটোগ্রাফ। সিপিয়া রঙের আলোকচিত্র।

রাজেশ্বরী লক্ষ্য করে ঐ তো পিশে মশাই, পাশে পিশীমা। আর ওঁরা কারা? হয়তো হেমনলিনীর শ্বশুরকুলের কেউ কেউ। দেওয়ালের আলোকচিত্র সমূহ কোন্ বিলেতী আলোকচিত্রীর দোকানের। চৌরঙ্গী অঞ্চলে নাকি সেই দোকান। শিবচন্দ্র বাবুর সখেই তোলানো হয়েছিল।

কিন্তু উনি কে?

কে ঐ পুরুষ, যে বাঙ্গালী হিন্দু, কিন্তু যার আকৃতিতে নবাবী কেতা! স্কন্ধলম্বিত কেশ মাথায়, দীর্ঘ আঁখি। বিস্তৃত ললাট। খাঁড়ার মত নাক। ওষ্ঠে অদ্ভুত হাসির আভাষ।

—উনি কে পিশীমা? কার ছবি? শিশুর মত প্রশ্ন ক'রে ব'সলো রাজেশ্বরী। কৌতূহলী কণ্ঠে।

—কে বল্ তো? কোন্ ছবিটায় আবার তোর চোখ প'ড়লো? চোখ ফিরিয়ে তাকালেন হেমনলিনী। যা ভেবেছিলেন তাই?

দেখে-দেখে এত ছবি ঘরে থাকতে চোখ প'ড়লো ঐ ছবিতেই। তবুও একটা আলমারীর প্রায় আড়ালে রেখেছেন হেমনলিনী—যাতে কারও নজরে না পড়ে। ইচ্ছা হ'লে দেখতে পান শুধু হেমনলিনী।

—অ! উনি আমার এক দ্যাওর। বললেন হেমনলিনী।

রাজেশ্বরীর চোখ কিন্তু ফেরে না। সে তাকিয়ে আছে তো আছেই।

বিষয়টা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যই বোধ করি পিসীমা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। বললেন,—তোর বুঝি বৌ গান-টান আসে না?

—আঁজ্ঞে না। বললে রাজেশ্বরী। সলজ্জ কণ্ঠে।—গান শুনতে খুব ভাল লাগে। আমি গাইতে জানি না। ঠাগ্‌মা যে শেখায়নি। যেন ঠাগ্‌মারই যত'দোষ, এমনি কথার সুর রাজেশ্বরীর।

এমন সময়ে এক দাসীর প্রবেশ। হাতে জল-খাবারের রেকাবী। জলের পাত্র।

—কিছু মুখে দে বৌ। দাসীকে দেখে বললেন হেমনলিনী।

দাসীর রঙ কষ্টিকালো। হাতের পাত্র ছু'টি রৌপ্যাধার—দাসীর অবয়বের কৃষ্ণতায় চাকচিক্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে থাকে ঐ পাত্র ছু'টির।

—এখন কিছু খাবো না পিসীমা। বললে রাজেশ্বরী। অনিচ্ছার সুরে। এতক্ষণ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে ব'সেছিল, বেশ গুছিয়ে ব'সলো। খাটের কিনারায় রইল আলতা-রাঙা পা ছু'টি।

—তাই কি হয়? উঠে বললেন হেমনলিনী।—কিছু খা বৌ। দাসী অত কষ্ট ক'রে আনলে!

মুখ ব্যাজার ক'রলো রাজেশ্বরী। বললে,—না পিসীমা, খাওয়ার নামে যেন আমার গা গুলোয়। বমি আসে।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না হেমনলিনী। শুধু বললেন,—তাই নাকি রে? কবে থেকে এমনটি হয়েছে বল্ তো?

লজ্জানত হয়ে যায় রাজেশ্বরীর ঢলো-ঢলো মুখ। আনত দৃষ্টিতে শাড়ীর আঁচলের সুতো টানাটানি করতে থাকে।

—আচ্ছা, বেশ কথা। আমিই তবে আয় খাইয়ে দিই। দাও তো দাসী রেকাবটা।

সত্যি সত্যিই খাওয়াতে উদ্যোগী হ'লেন হেমনলিনী। রেকাবী থেকে একটা মিষ্টান্ন তুলে দাসীকে বললেন,—যা, এই একটাই ও খাক্। মুগ তোল্ বৌ!

মুখ তুললো রাজেশ্বরী। চোখ তুললো।

মুখের কাছে মিষ্টান্ন ধ'রে আছেন হেমনলিনী। বললেন,—খেয়ে নে বৌ। খেতে কত বেলা হয় ছাখ, এখন। আমার রাঁধুনী আমার বাপের বাড়ীরটির মত নয়। বড্ড বলাবলি করতে হয়, দেখিয়ে দিতে হয়। তোর জন্যে বৌ আজ আমি নিজে মাংস রাঁধবো। দেখিস্ খেয়ে।

কিন্তু খায় কে? খাওয়ার নামে যে তার বমনের উদ্রেক করে।

রাজেশ্বরী বললে,—কেন পিসীমা আপনি উনুনের তাতে যাবেন? না, মাংস অন্য একদিন হবে। আমি আপনাকে যেতে দেবো না।

—আমি যে বৌ মাংস আনাতে বাজারে লোক পাঠিয়েছি। আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন। বললেন হেমনলিনী।—নে তুই খেয়ে নে মিষ্টিটা।

একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিষ্টান্নটা মুখে পুরলো রাজেশ্বরী।

ঘরের তৈরী নরম পাকের গরম একটা 'তাল-শাঁস' সন্দেশ। দাসীর হাত থেকে জলপাত্র নিয়ে জলপান ক'রলো। খায় না রাজেশ্বরী, গলাধঃকরণ করে যেন জোর ক'রে। বমনের বেগ সামলায়। কি হয়েছে রাজেশ্বরীর, কে জানে! শরীরটা ক'দিন যাবৎ ঠিক নেই। বসলে উঠতে চায় না, আলস্য লাগে। মাথাটা সময়ে সময়ে ঘুরতে থাকে। এমন কত সময়ে রাজেশ্বরী তাদের স্নানের ঘরের অর্গল তুলে দিয়ে বমি করেছে। কি হয়েছে তার কে জানে!

জলের পাত্রটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে আবার খাটের কিনারা ঘেঁসে বসলো রাজেশ্বরী।

হেমনলিনী কেমন যেন চিন্তিত হয়ে আছেন। বৌয়ের হ'ল কি? হেমনলিনীর খুশীতে হাসি এবং দুঃখে কান্না পায় যেন। বৌয়ের কথা কানে পৌঁছানো থেকে তিনি বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছেন বৌকে। কৈ, দেহের তো কোন' পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে না? শুধু কেমন একটু ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছে যেন বৌটা। চোখের দৃষ্টিতে শ্রান্তির ছায়া।

—পিসীমা, নতুন কি গান তুললেন? শুধোলে রাজেশ্বরী।

ডিপে খুলে তখন পান মুখে পুরছিলেন হেমনলিনী। বললেন,—হ্যাঁ। বৈষ্ণব পদাবলী তুলেছি একটা।

বৈষ্ণব পদাবলী?

সে আবার কি! অত-শত বোঝে না রাজেশ্বরী। জানে শুধু গান শুনতে।

গানকে গান বলেই জানে। কে বৈষ্ণব আর'কে রবিবাবু, চেনে না বৌ। তার কি দোষ! ঠাগ্‌মা যে শেখায়নি তাকে। রাজেশ্বরী বললে,—বৈষ্ণব পদাবলী কাকে বলে পিসীমা? আপনি উঠুন, গানটা আমাকে শোনান।

সামান্য স্ফূর্ত্তি মুখে ফেলে বললেন হেমনলিনী,—গাইতে যে লজ্জা করে! লোকে শুনলে কি বলবে! বলবে যে, মরবার বয়েস হয়েছে তবুও সখ এখনও মিটলো না।

—না না, কেউ কিচ্ছু বলবে না। বললে রাজেশ্বরী।—আপনি উঠে বাজনায় গিয়ে বসুন।

—আচ্ছা একটু বাদে গাইবো'খন। তুই বৌ একটু জিরো। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন হেমনলিনী।

—বেশ তাই গাইবেন। বলে রাজেশ্বরী।

মুখে একমুখ পান হেমনলিনীর। ঘরের হাওয়ায় স্ফূর্তির সুগন্ধ।

পান চিবোতে চিবোতে বললেন হেমনলিনী,—হ্যাঁ রে, তুই যা বললি আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না বৌ।

—কোন্ কথা পিসীমা? রাজেশ্বরী জিজ্ঞেস করলো।

—ঐ যে বললি, জমিদারীর খাজনা ফেল্ প'ড়েছে! হেমনলিনীর কণ্ঠে বিস্ময় সেই পূর্ব্বের মতই। বললেন,—এত টাকা গেল কোথায়! তুই বৌ ঠিক জানিস তো?

—হ্যাঁ পিসীমা। আপনাকে মিথ্যা বলবো আমি? রাজেশ্বরী কথা বলে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে।

—ঐ দুধের ছেলে এত টাকা কখনও দেখতে না দেখতে উড়িয়ে দিতে পারে! বললেন হেমনলিনী।—তুই ঠিক জানিস না বৌ। তুই ধান শুনতে কান শুনেছিস।

—হ্যাঁ পিসীমা, সত্যি কথা। কালকে উকিল-বাড়ী গেছলো, আজ আদালতে যাবে। খাজনার টাকা দিয়ে আসবে। এক ঘড়া টাকা বের করেছে সেই জন্যে।

হেমনলিনী বললেন,—ঘড়ার টাকায় হাত প'ড়েছে? সে কি কথা বৌ? তুই কি বলছিস? ক'ঘড়া টাকা বেরিয়েছে বললি?

—এক ঘড়া।

—আর যে সব ঘড়া ছিল, সেগুলো? হেমনলিনার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

'এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলো রাজেশ্বরী। ঘরের কড়ি-কাঠে চোখ তুললো। বললে,—সেগুলো ঠিক আছে।

—তবে? সহাস্যে বললেন হেমনলিনী।—তবে বৌ? তুই কিচ্ছু জানিস্ না। খাজনা দেওয়ার জন্যে নয়, অন্য কোন দরকারে হয়তো টাকা নিয়েছে। তুই জানিস্ না। ওঃ, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'লুম।

—আচ্ছা পিসীমা, আপনার ঐ যে দেওর, উনি আপনার বাড়ীতে থাকেন? রাজেশ্বরীর কৌতূহল মিটতে চায় না যেন।

পান চিবোতে চিবোতে বললেন হেমনলিনী,—না, না, এখানে থাকেন না। মধ্যে মধ্যে আসে, থাকে দু'-চার দিন!

রাজেশ্বরী বালিকা বধূ। তার চোখে পড়ে না। সে দেখতে পায় না। দেখবার মত চোখ আর অভিজ্ঞতা তার নেই। নয় তো দেখে বুঝতো, কথা বলতে বলতে কেমন এক লজ্জার অদৃশ্য রেখা ফুটে ওঠে হেমনলিনীর মুখাকৃতিতে। কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে। স্পষ্ট কথা বলতে পারেন না, কথা জড়িয়ে যায়। ঘরে কেউ থাকলে, দেওয়ালের ঐ ছবিটির প্রতি চোখ পর্য্যন্ত ফেরাতে পারেন না। লজ্জায় বাধা দেয় হয়তো।

—উনি কি করেন? বোকার মত আবার তারই কথা শুধোলে রাজেশ্বরী।

হেমনলিনীর কণ্ঠ নত হয়ে যায় সহসা। বললেন,—অন্য কিছু করেন না, সাহিত্য করেন। আমাকে কত বই পড়িয়েছেন। গানের সুর যোগাড় করে দিয়েছেন। উনি বেশ ভাল লোক। যেমনি শিক্ষিত তেমনি ব্যবহার। এখন আছেন আমার বাড়ীতে, ক'দিন হ'ল এসেছেন।

'সাহিত্য' কথাটি শুনে চোখ কপালে ওঠে রাজেশ্বরীর। সাহিত্য আবার কোন্ বস্তু!

মানুষটির প্রতিকৃতিতে মানুষটিকে দেখলে কিন্তু চট্ করে চোখ ফেরানো যায় না। ঘরের মধ্যে আছে এত মহার্ঘ দ্রব্যাদি, কিন্তু অন্যান্যকে ছাপিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ ছবিখানি। এ-কথা সে-কথার ফাঁকে ফাঁকে তাই রাজেশ্বরীও বোধ করি দেখে ঐ ছবি। ঐ সুপুরুষাকৃতি।

—বৌ, আমার ভাইপোটিকে তোর মনে ধ'রেছে তো?

অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন হেমনলিনী। কথাগুলি বললেন সহজ হাসির সঙ্গে। আরও একটা পান পুরলেন মুখে। অধর তাঁর রক্তিম হয়ে উঠেছে। স্ফূর্তির সুমিষ্ট গন্ধ বইছে ঘরের বাতাসে। লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় এলিয়ে পড়লেন হেমনলিনী। মুখে তাঁর হাসাহাসির হাসি।

রাজেশ্বরী প্রশ্নটা শুনে স্বাভাবিক সঙ্কোচে দৃষ্টি আনত ক'রলো।

ক্ষীণ হাসলো যেন। উত্তর দিলো না কথার। থামতে লাগলো।

হেমনলিনী ঠাট্টার সুরে বললেন,—জানিস তো বৌ, চুপ ক'রে থাকলে হ্যাঁ বোঝায়। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

না, এতটা বোঝে না রাজেশ্বরী।

বুঝলে অন্তত চুপ ক'রে থাকতো না। রাজেশ্বরী হঠাৎ কথা বলে,—ভাল, তবে শিক্ষিত নয় মোটে এই যা।

হেসে ফেললেন হেমনলিনী। খিল-খিল শব্দে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়। হাসতে হাসতেই বললেন,—কি, কি বললি বৌ, আর একবার বল্ তো কথাটা। কথা শেষ হ'তে পুনরায় হাসি।

রাজেশ্বরী আর পুনরুক্তি করে না সে কথার। ব'সে থাকে চুপচাপ। হাসির বেগ সামলে বললেন হেমনলিনী,—লেখাপড়াটা যে শিখলো না। আর অসময়ে দাদারা চ'লে গেলেন যে! দেখবার মত কেউ আর রইলো না তো। বৌঠানও কি ঐ অবাধ্য ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে কম চেষ্টা ক'রেছে! শেষকালে বায়না ধ'রেছিল টোলে পড়বো না, পণ্ডিতের কাছে পড়বো না, ইংরিজী স্কুলে পড়বো।

রাজেশ্বরীর নিদ্রার স্বপ্ন ছিল হয়তো অন্য। মনের সঙ্গোপনে সে রচনা ক'রেছিল বোধ করি অন্য এক পৃথিবী। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে সেই যে কেমন এক রঙীন দুনিয়া গড়ে তুলেছিল, শুভ-বিবাহের ধাক্কায় সেটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। রাজেশ্বরী ভেবেছিল,

সে রাজেশ্বরী। সে বিত্তশালিনী। সেও ঐশ্বর্য্যালঙ্কারে ভূষিতা।

হয়তো মন থেকে কামনা করেছিল এমন একজনকে, যার শিক্ষা আছে, দীক্ষা আছে। জ্ঞান আর বুদ্ধি আছে।

তার রূপটা যে রাজেশ্বরীর কল্পনায় কেমনটি ছিল কে জানে! হয়তো অপরূপ।

হুজুরনী, মাংস এনেছে। বামুন পিসী ডাকতেছে আপনাকে।

দরজায় না জানলায় কোথায় এক দাসী কথা বললো। হুজুরনী বললেন,—বল' আমি আসছি।

—না পিসীমা, আমি আপনাকে যেতে দেবো না উনুন তাতে। বললো রাজেশ্বরী। সত্যিকার শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে।

—যাবো আর আসবো। বললেন হেমনলিনী।—নইলে মাংসটা অখাদ্য করবে। মুখে তুলতে পারবি না।

—তাই কি হয়? বললে রাজেশ্বরী।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় মাথার ঘোমটা উড়ে যায়। গাছের শাখা-দোলানো হঠাৎ হাওয়া কোথা থেকে উড়ে আসে ঘরে। খোলা জানলা অতিক্রম ক'রে আসে। রাজেশ্বরী আর টানে না ঘোমটা। কে আর আছে এখানে?

—আমিও তবে যাই আপনার সঙ্গে। দেখি আপনার রান্না।

বায়নার সুরে কথা বললো রাজেশ্বরী। মুখে মিনতি ফুটিয়ে!

কি যেন ভাবলেন হেমনলিনী।

পান চিবোতে-চিবোতে ভাবলেন কিয়ৎক্ষণ। হাসতে হাসতে বললেন,—একেবারে আমার গেরস্থালী দেখে তুই ছাড়বি? বেশ তাই চল'। তোমাকে একটি পিঁড়ি দেবো। ব'সে থাকবে তুমি।

উঠে প'ড়লো রাজেশ্বরী! তৎক্ষণাৎ।

যেন বেঁচে গেল। পায়ের অলঙ্কারে ঝঙ্কার তুলে এক লাফে নামলো খাট থেকে। শাড়ীর আড়াল থেকে ক্ষণেকের মুক্তি পাওয়া অলক্তকশোভিত পদযুগল দেখে পিসীমা বললেন,—আলতা দিয়েছে কে পায়ে?

রাজো বললে,—এলোকেশী। আমার ঝি।

সহসা মনে প'ড়ে যায় যেন হেমনলিনীর।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মুহূর্ত্ত মধ্যে। বলেন,—ঐ দেখো, কুটুমবাড়ীর লোকটিকে জলখাবার খাওয়াতে বলতে ভুলেছি আমি! চল্ বৌ চল্, পা চালিয়ে বল্। আমি না বললে বাড়ীতে হবে না কিছুটি।

পা চালালো রাজো। ঝম-ঝম শব্দ তুললো।

হেমনলিনীর পিছন-পিছন চললো তিনি যে দিকে চললেন।

কুটুমবাড়ীর লোক!

কথাটা শুনে হাসি পায় রাজেশ্বরীর। হয়তো দুঃখের হাসিই হাসে বৌটা। সেই কুটুমবাড়ীতে কে যে কুটুম আছে সেই কথা চিন্তা ক'রেই হাসে রাজো। সাতকুলে কে আছে তার? ঐ বুড়ী ঠাগ্‌মা'টা?

সেই বৃদ্ধাও মরণের কোলে।

মৃত্যুক্রোড়ের মানুষ আছে আজ, কাল সে কোথায়! তারপর, তারপর আর কে রইলো রাজেশ্বরীর পিত্রালয়ে?

তবুও পতি পরম গুরুজনটি যদি যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ হ'তে পারতেন! একটা যেন কাঁটা আছে রাজেশ্বরীর বুকের কোথায়। সেই কাঁটা থেকে থেকে বিদ্ধ করে তার বুকটা। কী ভয়ঙ্কর অস্বস্তি-বোধ তখন!

মানুষটির অবস্থা তখন সঙ্গীন হয়ে প'ড়েছে।

সত্যিই, কত লোক ঘিরে বসেছে! কত ধরণের লোক। কত জাতের।

কে জানে, কে জানালো তাদের! সময় বুঝে ঠিক এসেছে কিন্তু তারা। মানুষটিকে কেন্দ্র ক'রে ব্যূহ রচনা করেছে।

কৃষ্ণকিশোর ব'সেছিলেন ফরাসে।

একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন আর থেকে থেকে পানপাত্র মুখে তুলছিলেন। মুখ বিকৃত করছিলেন।

একটি পর্দ্দা-ঢাকা জানলার ফাঁক থেকে মধ্যে মধ্যে মৃদু হাসি মুখে মাখিয়ে সুসজ্জিতা কে একজন উঁকি মারছিলেন। ঘরের দেওয়াল-গিরির জোরালো আলোকে মহিলাটির স্ফুটন্ত যৌবনের মতই তাঁর নাসিকার সূক্ষ্ম অলঙ্কারটি চিক-চিক করছিলো।

ঘরের মানুষের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হ'লে নেপথ্যের ঐ নারীর মুখে হাসির উদ্রেক হয় অধিক। তাঁর আলতা-রাঙা অধর কী যেন আবেদন জানায়। কিসের আবেদন কে জানে!

রমণীর বক্ষে ফিরোজা কাঁচুলী। আঁটসাঁট।

একটা রেশমী কাপড়ের টুকরোকে টানটান বেঁধেছেন বক্ষে। স্কন্ধ থেকে জানু পর্য্যন্ত ঝুলছে দোপাট্টার দুই অঞ্চল। পবনাঘাতে উড়ছিল যেন।

চোখে মুসলমানী সুর্ম্মা না হিন্দুর ঘরের কাজল?

একটা কিছুর অতিরিক্ত স্পর্শ আছে যেন চোখে। দুই চোখের মধ্যস্থলে একটি কৃষ্ণবিন্দু। কাচপোকার টিপ।

যারা ঘিরে ধ'রে আছে তারা এসেছে টাকা লুটতে।

কাঁচা কাঁচা টাকা রাশি রাশি লুটতে আর চোখে ধুলো দিতে। আর যার চোখে ধুলি পড়বে তিনি পানপাত্রে চুম্বন করছিলেন আর আড়-নয়নে দেখবার চেষ্টা করছিলেন ঐ কৌতুকময়ীকে। যিনি ঐ বাতায়নের আড়ালে। সস্তা নেটের পর্দ্দার অন্তরালে। গোলাপী নেট।

ঘরে আছে ব্যাণ্ডপার্টির লোক। কলকাতার গ্যাড়া-তলার মুছলমান। অমৃতসরের আতরওলা। চিৎপুরের ডেকরেটর। গ্যাসবাতির আড়ৎদার। আতস-বাজী বানানোর ওস্তাদ। মদের দোকানের প্রোপাইটর! হালুইকরের দালাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৃষ্ণকিশোর তসরের একটি বুটিদার বেনিয়ান পরিধান করেছিলেন।

কালাপেড়ে কাঁচির মিহি-কোঁচান ধূতি। মাথায় ঘন-লাল ভেলভেটের নবাবী টুপী। জরির কারুকাজ আছে।

দেওয়াল-গিরির জোরালো আলোর ছায়ায় হঠাৎ হঠাৎ স্বর্ণাভা বিকিরণ করে। জরির কারুকাজে সূক্ষ্ম শিল্পীর করস্পর্শ আছে অতি অবশ্য।

ঘরে আতরের উগ্র মিষ্ট গন্ধ। হেনার গন্ধ।

আকাশে তখনও ছিল অস্তগামী সূর্য্যরশ্মিরেখা।

দিগন্তে লীন হয়ে যাচ্ছে দিনের শুভ্রতা।

গরাণহাটার অলিগলিতে দোকানে আলো জ্বালা হচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রঙ-বেরঙের বেলোয়ারী কাচের আলো। নানা ঢঙের, নানা রঙের।

দেখে দেখে অন্ধকারের আভাষ পেয়ে জোনাকী এলো নাকি! একবার আলো একবার কালো হচ্ছে কেন? কৃষ্ণকিশোরের চোখের দৃষ্টি সেই খদ্যোতের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ঐ নারীর নাসিকায় হীরকখণ্ড আছে কি! অধরোষ্ঠে কি তিনি লোহিত রক্ত মাখিয়েছেন। তাঁর মুখে কেমন বক্র হাসি। কখনও বা রমণীর অঙ্গ সঞ্চালনে কানের ঝুমকো আনত ফুলের মত দুলছে।

ঘড়ার টাকা যথায় পৌঁছে দিয়ে আরাম ক'রে, পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে কৃষ্ণকিশোর চুম্বন করছিলেন পানপাত্রকে। পাত্রে কে যেন রক্ত মিশ্রিত ক'রেছে! প্রায় অর্দ্ধেক পান ক'রেছেন তৃষ্ণার্ত্ত মানুষটি।

যারা ব'সেছিল তারা যে যার বক্তব্য পেশ করছে।

দর বলছে। বলছে, এক দর। প্রতিদ্বন্দ্বীদের দরাদরিতে আবার বলছে এক দর।

মজা দেখছে গহরজান জানলার আড়ালে দাঁড়িয়ে।

ঘরের আতরদানে হেনা। হাওয়ায় হেনার নেশা। বেশ লাগে লাল-জল পান করতে। তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় না এফেক্ট্, কিছুক্ষণ অতীত না হ'লে কাজ করে না এই রক্ত-জল। আর যখন কাজ করে তখন যা-তা নেশা নয়। আমীরী নেশা।

প্রথমে কয়েক মুহূর্ত্ত যা ঝলসে যায় আকণ্ঠ, যখন এই মদিরার ঝর্ণা অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় অন্তর্দেহে।

দিন বুঝে পাত্র পূর্ণ ক'রে দিয়েছে সৌদামিনী নিজে।

বাবুকে আজ ঘায়েল করতে হবে যে! মুরগী যে আজ জবাই হবে। সৌদামিনীর হাতে বধ হবেন নেশায় চুর মানুষটি।

ঝপ ক'রে কোপ বসাবার পাত্রী সৌদামিনী নয়।

অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে, মদের নেশায় চুর ক'রে দিয়ে ছুরি শানাতে ব'সবে। সেই কারণেই তো আজ আর অন্য কিছু দেয়নি। পাত্র ভ'রে দিয়েছে ইটালীয়ান ওয়াইনে—যার রঙ রক্তকেও হার মানায়। মানুষটির চাঞ্চল্যে পূর্ণপাত্রটি চলকে-চলকে ওঠে।

গহরজান জানলায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল আর হাসছিল তির্য্যক্ হাসি।

সৌদামিনী টাকা সমেত ঘড়াটি এক ঘরে রেখে দরজায় বেশ ভারী ওজনের একটা কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

টাকার মালিক টাকা হস্তান্তরের সময় বলেছেন,—ঘড়া থেকে হাজার পাঁচেক টাকা আমাকে দিয়ে দিতে হবে। বাদবাকী টাকা খরচা হবে ডালিমের বিয়েতে। গহর যেমন খুশী খরচ করবে।

কথাগুলো শুনে ভাল লাগেনি সৌদামিনীর। মুখটা তার গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে হেসেছিল শুধু।

পাত্র হাতে ফরাস থেকে উঠে পড়েন কৃষ্ণকিশোর।

জানলার কাছে গিয়ে বললেন,—এদের কি ব'লবো? তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলবে না?

গহরজান হাসলো। সেই মনমাতানো শব্দহীন হাসি।

মুক্তার মত দাঁতের সারি দেখা গেল। গহরজান আঁখি নিমীলিত ক'রে বললে,—আমি কি বলবো! আমি কি কথা বলতে জানি!

—আমিও যে বুঝি না দরাদরি। বললেন কৃষ্ণকিশোর।

গহরজান ফর্সা গাল দু'টিতে টোল ফুটিয়ে হাসলো আবার। বললে,—ছেড়ে দাও না ওদের। মাসী বোঝে দরাদরি, মাসী বুঝবে।

—সেই ভাল। বললেন কৃষ্ণকিশোর। এক চুমুকে পাত্রের অবশিষ্টটুকু নিঃশেষ ক'রে ফেললেন।—সেই ভাল, আমি ওদের কাল-পরশু আসতে ব'লে দিই।

সোনালী জরি-জড়ানো বেণীটা ধ'রে খেলা করতে করতে গহরজান বললে,—হাঁ, তাই দাও। ঘর খালি করিয়ে দাও। ওদের ভাগাও।

যারা ঘরে ব'সেছিল চোখে লোভ ফুটিয়ে তারা একে একে কখন বিদায় হয়ে যায় হুজুরের আদেশে। সেলাম ঠুকতে ঠুকতে যায় কেউ-কেউ।

চমকে উঠে গহরজান। কার পদশব্দ হঠাৎ?

—কেঃ! ক্যোন্ হ্যায়? হাওয়ার সঙ্গে যেন কথা বলে গহরজান।

কোথায় কে? আড়-নয়নে চেয়ে থাকে সিঁড়ির মুখে। ডালিম নয় তো! খুনী ডাকাতও হ'তে পারে। হ'তে পারে কোন' মাতাল বদমাস। হ'তে পারে কোন' ঠগ, জোচ্চোর।

—ফুল লিবি না?

অনেক দিনের ফুলওয়ালা। কত দিন দেখছে তাকে গহরজান।

হাতে ফুলের ডালি তার। তার বৌ গেঁথে দেয়। ফুলওয়ালা ঘরে-ঘরে ঘুরে ঘুরে টাটকা ফুল বিকিকিনি করে।

ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি

নিত্য বসু

ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি ঘুমের দেশেই যাও
আজকে তোমায় বসতে দেব নেইকো এমন ঠাঁই
দিন-কাল কী পড়েছে আজ—বোঝোও নাকি তাও?
নানান জ্বালায় জ্বলে পুড়ে হলাম শুধু ছাই!

ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি বলবো কি আর আজ
পথের ধারে ফুল-বাগিচার আটচালা সেই ঘর
কী যে হল!
বুকের মাঝে ব্যথায় হানে বাজ
শাওন-রাতের মেঘ-বিজুলি-বৃষ্টি-বাদল-ঝড়।

গোলায় ভরা সোনালী ধান গোয়াল-ভরা গাই
উড়কি ধানের মুড়কি আর পুকুর-ভরা মাছ
কোথায় যে আজ!
হারিয়ে গেছে কিছুই তো আর নাই
নেওয়াপাতি ডাবের সে শাঁস সিঁদুরে আম গাছ!

সাতপুরুষের বাস্তুভিটে, সবুজ-সোনা ভুঁই
সব হারিয়ে আজকে শুধু পথের ফকির হয়ে
পিচের কালো পথের ধারে গাছের নিচে শুই
হন্যে হয়ে বেড়াই ঘুরে প্রাণের বোঝা বয়ে!

ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি সইবো কত আর
দু'চোখ ভরা কান্না দেখে সূর্য ঢাকে মুখ
মেঘের বুকে, আকাশ-কালি মুখটা ক'রে ভার
হায় রে জীবন, আর কত সয়, কোথায় রাখি দুখ!

ঘুমপাড়ানী মাসীপিসি আবার এসো তুমি
আম-কাঁটালের পিঁড়ি দেব, বাটায় ভরা পান
আবার যেদিন গড়বো নতুন সুখের সে বাসভূমি
লতায় ঘেরা কুটিরে ফের শুনবো তোমার গান।

বাহুতে ঝুলতে থাকে ফুলের মালা—হাতে ধ'রে থাকে ফুলের গয়না—চুড়ি, মুকুট আর ফুলের পাখা। আর ফুলের ছোট ছোট তোড়া।

ফুলওয়ালাকে ইশারা করে গহরজান। চোখের ইশারা। দেখিয়ে দেয় ঘরের মানুষকে। ফুলের গয়না আর মালা বিক্রী হয়ে যায় এক কথায়।

টাটকা ফুল। ঘরের বাতাসে হেনার সুগন্ধকে কিন্তু ছাপাতে পারে না। গহরজান ঘরে প্রবেশ করে দোপাট্টার আঁচল লুটোতে লুটোতে। আলতা-মাখা হাতে তার আরেক পাত্র।

ইটালীয়ান ওয়াইন্। চ'লকে-চ'লকে উঠছে গাঢ় লাল জল। যেন তাজা রক্ত অর্দ্ধপাত্র!

চোখে নেশা ফুটিয়ে আবার হাসলো গহর। কপাল থেকে তাচ্ছিল্যে সরিয়ে দেয় কয়েকটা চূর্ণ কুন্তল। ঝলমল করছে গহরজান। আর তার ফিরোজা রঙের কাঁচুলীটা। জানলাভেদী খটখটে দিবালোকে।

[ক্রমশঃ।

কাম-কাঞ্চন

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

কথাটা কিছু আমার নিজের নয়। উপদেশ শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন আমার অধ্যাপক মশাই—শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী। আমি সেটা লিখে জানাচ্ছি, তার কারণ ঐ ব্যাখ্যা থেকে আমার ব্যক্তিগত সংশয় দূর হয়েছিল, আশা করা যায় অন্ত কারো হতে পারে, কারণ সংশয় স্বাভাবিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলেছেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করো। কথামৃতের পাতায় পাতায় তাঁর সেই নির্দ্দেশ ছড়িয়ে আছে। কথাটা অনেকের কাছে শ্রুতিসুখকর ঠেকেনি! কামিনী ত্যাগ—সেটা অসম্ভব; কাঞ্চন ত্যাগ—পারা যায় কি? আর এই কথাটা এত জোর দিয়ে বলা কেন? বলতে পারেন, ধর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজন। উত্তরে বলি, ঐ উপদেশে এমন কি মৌলিকতা, যার জন্য রামকৃষ্ণকে এ যুগের 'মেসায়া' বলে মানতে হয়? অনেক স্বামীজী বাবাজি অবধূতে মিলে কথাটাকে নিরতিশয় পুরোনো ক'রে ফেলেছেন, ওটা নেহাৎই মালা-ফেরানো জপ।

তা ঠিক। যে কথা নিত্য শুনি, তাকে নতুন ক'রে শোনালেই অপূর্ব্বত্বের সঞ্চার হয় না। আর যদি অপূর্ব্ব কিছু না হোল, তাহলে পূর্ব্বের লোকেরাই ভালো। 'নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো'—সব যুগের মানুষের ন্যূনতম দাবী।

এ হেন সন্দেহ—আধুনিক কালের মানুষ আমরা—আমাদের ছিল, আশা করছি, আধুনিক কালের মানুষ আপনারা, আপনাদেরও আছে।

অধ্যাপক মশায়েরও সেই কথা—'এ সন্দেহ সকলের, তোমার-আমার-এর-তার!' সন্দেহ আছে, নিরসন কি নেই? কামিনী-কাঞ্চন অর্থাৎ কাম-কাঞ্চন ত্যাগের কথাটা জোর দিয়ে বলবার কি বিশেষ প্রয়োজন হয়নি? সেই প্রয়োজন কি বিশেষ ক'রে এ যুগের নয়? সেই প্রয়োজনের সমাধান ক'রে কি রামকৃষ্ণ যুগাবতার নন?

থাক। বুঝতে পারছি, সমাধান না ক'রে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে ন্যায়নিষ্ঠ পাঠক চটছেন। তাঁরা স্থির হোন, কথাটা বলে ফেলি।

এ যুগের সর্ব্বপ্রধান দুই আচার্য্য হচ্ছেন দুই প্রতীচ্য দেশবাসী মহামনীষী—মার্কস্ ও ফ্রয়েড। দু'জনেই উনিশ শতকের মানুষ। তাঁরা মানব-জীবন ও মানব-ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিলেন। মানব-জীবনের রহস্যভেদ কে-ই বা করতে পেরেছে, আর ইতিহাসকে বুঝেছি বলা বাতুলতার তুল্য। কিন্তু মার্কস্ ও ফ্রয়েড নতুন আলোক আনলেন, আনলেন মজবুত মাপকাঠি। অনেক ধারণা গেল বদলে, অনেক সংস্কারের হোল অবসান, অনেকেরই "বদলে গেল মতটা, ছেড়েই দিলেম পথটা", কারণ "এমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।" এ হেন অবস্থায় মূঢ় মানুষকে পথ দেখিয়ে এনে ফেলেছেন এ যুগের দুই মহাপুরুষ মার্কস্ ও ফ্রয়েড।

বাস্তবিক। মার্কসের ইতিহাস-ব্যাখ্যা আজকের দিনে জগতের এক বৃহৎ অংশ মেনে নিয়েছে। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির মূলে অর্থ ছাড়া আর কোনো প্রবর্ত্তনা নেই—জগতের যা সার নীতি তা অর্থ-নীতি—নারায়ণ যদি মানতে হয় সব চেয়ে প্রত্যক্ষ নারায়ণ যা, তাকেই মানবো—উদর নারায়ণ। আর মানুষের ব্যক্তিগত জীবন? আহার ছাড়া যা অবশিষ্ট থাকে—বিহার। এগিয়ে এলেন ফ্রয়েড,—ঐ বিহার তুমি করতে পার আর না পার, তাকে তুমি চাও বা না চাও—সে তোমাকে চেয়েছে তাই যথেষ্ট, সে তো চালাচ্ছে তাই সত্য। বড় জোর সতী সাধ্বী হলে তুমি চোখ-কান বুজে দম বন্ধ ক'রে চলবে, "আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ"; কিন্তু মনে রেখো, যাই তুমি করো, হরিনাম থেকে তুড়িলাফ—সবই কামতাড়িত হয়ে করছ, একবার যদি মনোবিকলন কর, মন তোমার বিকল হয়ে যাবে নিজের কাণ্ডকারখানা দেখে,—উদ্দাম কামনা তো নিশ্চয়ই, অবদমিত কামনার নেপথ্য-নৃত্যের তুমি যে কত বড় পাটনার তা মুহূর্ত্তে মালুম হবে!

ক'রে দিলেন এই দুই আচার্য্য, মেনে নিল জগদ্ব্যাপী তাঁদের শিষ্য-সম্প্রদায়। রাজনীতি-সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাস সর্ব্বত্র তাঁদের জয় ঘোষণা চলতে লাগল। এত দিনে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ঘটল।

কিন্তু একটি লোক মেনে নিতে পারেন নি। সমযুগের একটি অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ, তাও আবার প্রতীচ্যের নয়, প্রাচ্যের। তাঁর পড়াশোনা ছিল না, ফ্রয়েডের কামতত্ত্ব (ফ্রয়েড তাঁর অনেক পরে), মার্কসের অর্থতত্ত্ব তিনি বুঝতেন না, কিন্তু কোন্ এক আশ্চর্য্য শক্তিবলে বুঝেছিলেন, বর্ত্তমান জগতে ঐ দু'টি জিনিষের প্রাধান্য ঘটবে। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব-জীবনকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হবে নিছক ঐ তত্ত্ব দু'টি দিয়ে—মনুষ্যত্বের অতিবড় অসম্মান আসন্ন হয়েছে পৃথিবীতে। বুঝলেন—বুঝে রুখে দাঁড়ালেন। বই লিখলেন না, থিয়োরী খাড়া করলেন না, খালি দু'টি নির্দ্দেশ জানিয়ে গেলেন—কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করো; কঠিন করো সাধন নির্দ্দেশ, ত্যাগ করো কাঞ্চন আর কাম।

সেই মিষ্টি মানুষটি, সেই সৌম্যসহাস মানুষটি, তাঁর অমৃতময় কথাগুলি—সব যেন দূরে সরে যাচ্ছে,—বামন অবতার বৃহৎ হয়ে উঠছেন—প্রকাণ্ড প্রচণ্ড হয়ে উঠছেন—সমস্ত প্রতীচ্য ভূমিকে প্লাবিত ক'রে মহা বৈষয়িকতার তরঙ্গ উঠেছে, পৃথিবীকে গ্রাস করে বুঝি,—প্রাচ্যের অঙ্ক থেকে উত্থিত হয়েছেন তরঙ্গ-শাসন, সমুদ্রকে তিনি বাঁধবেন, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন, স্বর্ণলঙ্কার কাঞ্চন আর কামকে তিনি বিদ্ধ করবেন, বিনষ্ট করবেন।

যুগকে যিনি ধারণ করেন তিনি যুগন্ধর, ধারণ করতে যাঁর অবতরণ তিনি যুগাবতার—রামকৃষ্ণ কি যুগাবতার?
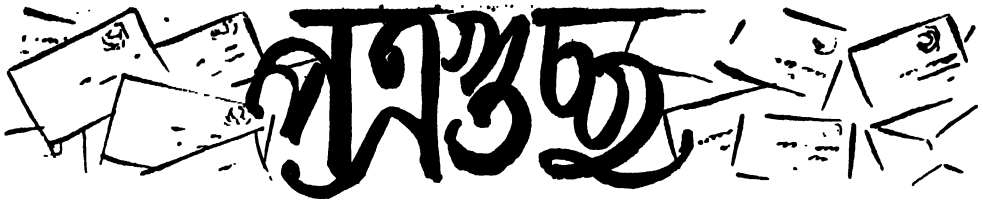
মাসিক বসুমতীর সম্পাদককে লেখা বিভিন্ন সুধী ও সাহিত্যিকের চিঠি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের চিঠি

ডি· ও· নং ২০১৫ পি· এস্·

কলিকাতা

৫।৭।৫১

মহাশয়,

আপনার ২।৭।৫১ তারিখের চিঠি পাইলাম। আমার 'আত্ম-স্মৃতি' লিখিবার সময় কোথায় ?

আমার কথা লোকে জানবে কাজের ভিতর দিয়ে। ইতি—

বিধানচন্দ্র।

শ্রীকালিদাস রায়ের চিঠি

'সন্ধ্যার কুলায়'

৪১।১৩, রসা রোড, টালিগঞ্জ

২৮।৩।৫২

পরম স্নেহাস্পদেষু,

প্রাণতোষ, সেদিন Cultural Conferenceএ তোমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর আজ বহু কাল পরে তোমার বসুমতীর জন্য এই কবিতাটি পাঠাইলাম।

আমি নিয়মিত কবিতা পাঠাইব। বলা বাহুল্য, যেগুলি আমার সবচেয়ে ভালো মনে হইবে তোমার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় সেইগুলোই পাঠাইব।

বসুমতী আগামী মাস হইতে পাইলে সুখী হইব। অভিজাত-জনোচিত তোমার বিনয়ে আমার ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে।

ভবতোষ বাবুকে আমার নমস্কার জানাইবে। তিনি আমার সুপরিচিত। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকালিদাস রায়।

মহাস্থবিরের চিঠি

প্রিয় প্রাণতোষ,

গত পাঁচই শ্রাবণ তারিখে তোমাকে লিখেছিলুম যে বসুমতী পূজার দরুণ গল্প লেখা হ'য়ে গিয়েছে। তুমি লোক পাঠিয়ে দিয়ে নিয়ে যেও। কারণ আমি শয্যাশায়ী—নড়বার ক্ষমতা নেই। আশা করেছিলুম যে তোমার লোক আসবে কিন্তু মনে হচ্ছে যে আমার চিঠিখানা তো তোমার কাছে নাও পৌঁছতে পারে—এই সব নানা চিন্তায় আমি লোক মারফত গল্পটাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। দয়া ক'রে প্রাপ্তি সংবাদ দিও। আশা করি ভাল আছ। ইতি

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগের চিঠি

24. 4. 52.

প্রীতিভাজনেষু,

ভাই প্রাণতোষ, বন্ধুবর শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাবকে আমরা নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তিনি ২১শে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অতিথি হতে রাজী হয়েছেন। স্থানকালাদি পরে জানাব—তোমার যোগ দেওয়া চাই—ঐ দিন খালি রেখো। Democratic Club উদ্বোধন হবে। একটা বিবৃতি পাঠালাম। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীকালিদাস নাগ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠি

(১)

প্রিয়বরেষু,

কবিতা একটা লিখে পাঠাচ্ছি। যে বিষয় নিয়ে কবিতাটা লেখা তার আবেগ এত উত্তপ্ত ও দুরন্ত যে এখনো ভাষায় পরিবেশন করা যায় না। তবু লিখে দিলাম। একদিন দেখা হবে ইতিমধ্যে? নমস্কার জানবেন। উপেনদাকে জানাবেন যে তাঁর আদেশ রেখেছি।

শুভার্থী

প্রেমেন্দ্র মিত্র।

(২)

প্রিয়বরেষু,

আপনাদের কাগজে লেখা দিতে না পেরে আমিও আন্তরিক ভাবে দুঃখিত জানবেন। কিন্তু এবারে কিছুতেই লেখা এল না। গল্প ত' নয়ই, কবিতাও দু'এক দিনের মধ্যে হবে বলে ভরসা নেই। কোন রকম আশা রাখবেন না, তবে, যদি আপনাদের দু'-তিন দিন দেরী থাকে, এবং যদি কোন রকমে কোন লেখা আসে তাহ'লে নিজেই আপনাকে ফোন করে জানাব। তবে সত্যিই লিখতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। এবার সত্যিই তাই আগে থাকতে মাপ চাচ্ছি। প্রীতি-নমস্কার জানবেন। ইতি—

শুভার্থী

প্রেমেন্দ্র মিত্র।

৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

(১)

৫৫, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭

২।১২

প্রাণতোষ,

দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রায় শেষ করিয়াছি। 'মাসিক বসুমতী'র জন্য রাখিব কি ? তোমাদের কাগজের পাতা-তিনেক স্থান অধিকার করিবে।

আরও একটা বড় প্রবন্ধে হাত দিয়াছি; উহা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সময় (ইং ১৮৬৮) হইতে 'বসুমতী' পর্য্যন্ত সকল সাময়িক পত্রের নাম-ধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ইহা '৩৪ কিস্তিতে শেষ হইবে। ছাপিতে প্রস্তুত থাকিলে আমাকে একটু জানাইও।

তোমার বৌদিকে পুনরায় হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে; মাত্র ৫।৬ মাস ভাল ছিলেন। বিশেষ করিয়া এই কারণে কিছু কিছু না লিখিলে চলিবে না।

আশা করি কুশলে আছ।

ভবদীয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২)

২৭।৮

প্রাণতোষ,

তোমার বউদির অবস্থা ক্রমশ: গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে; কবে কখন হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হয় তাহার স্থিরতা নাই! এরূপ অবস্থায় আশ্বিন-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'র লেখার কড়া তাগিদ পৌঁছিল। তোমার ফরমাস যে কোন রকমে তামিল করিতে পারিলাম, ইহাতে আনন্দ অনুভব করিতেছি।

এবার পত্রিকার বিবরণ ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে; বাকী তিন বৎসর—অর্থাৎ 'বসুমতী'র কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আরও এক কিস্তি লাগিবে; উহা কার্ত্তিক কিম্বা অগ্রহায়ণে দিব।

ভবদীয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীসজনীকান্ত দাসের চিঠি

৭।১১।৪৮

ভাই প্রাণতোষ,

৺রবীন্দ্র মৈত্রের দাদা শ্রীযুক্ত প্রবোধ মৈত্র মশাইকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, বসুমতীর জুবিলি সংখ্যা এঁকে একখানি দেবে। রবির লেখা ও ছবি ছাপা হয়েছে। তিনি একটা কপি রাখতে চান। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। কিছু কথাও আছে। একবার এসো না! ইতি

সজনীদা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর চিঠি

বহরমপুর, ২৮।৭ ৫০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত ও আশান্বিত হলাম। আপনার ইচ্ছানুযায়ী আমার সঙ্কলনের একাংশ পাঠাচ্ছি। আপনি 'রামায়ণ' লিখেছেন; আমি রামায়ণের কোন সঙ্কলন করিনি, কাশীরাম দাস কৃত মহাভারতের সঙ্কলন করিছি ও সেই কথাই লিখেছিলাম। বোধ হয় অনবধানতা জন্য আপনি 'রামায়ণ' লিখেছেন।

মহাভারতের 'অর্জ্জুন-উর্বশী' incident অতিশয় উন্নত ও শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু কতকগুলি সম্পূর্ণ সংস্করণেও (যেমন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কৃত) এই অপূর্ব অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে—অশ্লীল বোলে। আমি অশ্লীলতা পরিহার করবার যে কৌশল অবলম্বন করিছি, মূল কাশীদাসের মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে বুঝতে পারবেন। এ অংশ বাদ দিলে মহাভারতের সব চেয়ে মহৎ অংশ বাদ দেওয়া হয়।

শারদীয়া সংখ্যায় এটি প্রকাশিত করায় আমার কোন আপত্তি নেই। 'ক্যাকটাস্' মাসিকেই প্রকাশ করবেন। অতিশয় শ্রদ্ধা ও পরিশ্রমের সঙ্গে আমি মহাভারতের সঙ্কলন কোরিছি। সুতরাং আশা করি 'অর্জ্জুন-উর্বশী' শ্রদ্ধার সঙ্গেই শারদীয়া সংখ্যায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে। 'ক্যাকটাসে'র স্থান মাসিকে হলেই চলবে।

আশা করি কুশলে আছেন। চিঠির উত্তর পেলে খুশি হব।

নমস্কার।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের চিঠি

(১)

প্রাণতোষ,

Text (ঋগ্বেদ) ও অনুবাদে এবার পৃথক্ করে পাঠালুম যেমন সুবিধা বোঝো ছাপিও। কিন্তু সেদিন যে কথাটুকু বলেছিলুম—সেইটি স্মরণ করে, কোরো।

আশা এবং ভালবাসা। ইতি

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

(২)

৩৫, দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট

ভাই প্রাণতোষ, 29 1 50

বিলম্বিত নিমন্ত্রণ পেলুম। আজ ক্লান্ত। সকাল থেকে খেটেছি, রবিবারে বন্ধু-সম্মেলনী। ক্ষমা কোরো। জয়তু ইতি

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর।

মনোজ বসুর চিঠি

10—1W, Swinhoe St. Calcutta-19

14. 8. 50

সবিনয় নিবেদন,

প্রাণতোষ বাবু, শারদীয়া বসুমতীর গল্প পাঠালাম। খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

প্রুফ নিশ্চয় পাঠাবেন। কতকগুলো স্থানীয় শব্দ আছে, অন্যে হয়তো বুঝবেন না। প্রুফের দুটো কপি পাঠাবেন অনুগ্রহ করে। একটা আমি রেখে দেব।

বিনীত নমস্কার গ্রহণ করুন। নিবেদন ইতি— ভবদী

মনোজ বসু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর চিঠি

(১) কান্দি (মুর্শিদাবাদ)

৬ ৮. ৪০

সবিনয় নিবেদন,

কাল আপনাকে একটা কার্ড লিখেছি। একটা বিষয়ে আপনার ন্যায়বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে চাই। আমার গল্পটি যে শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাতে আমি সম্মতি দিয়েছি। কেননা ভেবে দেখলাম গল্পটি একসঙ্গে পড়তে না পারলে রসবোধে ব্যাঘাত হবে। কিন্তু গল্পটি শারদীয় সংখ্যার পক্ষে একটি ছোট নভেলের পর্য্যায়ে গিয়ে পড়বে না? একটা ছোট নভেলের পক্ষে দাম কি কিঞ্চিৎ কম হচ্ছে না? দেখবেন একটু বিবেচনা করে। আপনার রায়ই মেনে নেব। লিখবেন।

গল্পটি পড়লেন? কেমন লাগল? আমার তো লিখতে লিখতে—বেশ ভাল লেগেছে। আপনাদের ভাল লাগলেই সার্থক।

নমস্কার ইতি। বিনীত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(২)

আসানসোল
ওঁ
৩০।১।৫১

নয় নিবেদন,

মাঘের কিস্তি পাঠালাম। ভ্রম সংশোধনের তালিকা ছাপিয়ে ... নেই, কেন না অনেক সময় সেই তালিকা আবার সংশোধন ...তে লাগে। যাতে আরেকটু সাবধানতা নেওয়া যায় সেই দিকে ... দিলেই হবে। বড় অক্ষরে ছাপার মধ্যে এত ভুল থাকাটা ...জন নয়। ভুলগুলোও বড়-বড় দেখায়।

পৌষের ফাইল ও টাকা যথাশীঘ্র পাঠিয়ে দেবেন। আশা করি, ...কুশল। নমস্কার ইতি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের চিঠি

(১)

Judje's House, SURI,
3. 11. 45.

...স্পদেষু,

...বিজয়ার প্রীতি-নমস্কার গ্রহণ করবেন। চিঠি পেয়ে সুখী ...ছি। "শারদীয়া বসুমতী" ভালোই লেগেছে। কেবল আমার ...টির এক জায়গায় কি দু' জায়গায় "অণুমান" না হয়ে "অণূমান" ...য়েছে—আমার সংশোধন করা সত্ত্বেও। পাঠকেরা ভাববেন ভুলটা ...মারই।

আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে দশ বছর আগে কেউ আমার ...ছে ছোট গল্প চাইতেন না। পাঠালে নিতেন, কিন্তু ধন্যবাদ ...ন্ত দিতেন না। তার পরে আমার ছোট গল্পের আস্তে আস্তে ...হিদা হয়। ইদানীং একজন আমাকে ৫০৲ দিয়েছেন, আর একজন ...৲, এবং আরো একজন ১০০৲ দিতে চেয়েছেন। আমি অবশ্য ...কার জন্যে লিখিনে, কিন্তু যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁদের কাছে যাঁর ...ন ক্ষমতা সেই অনুপাতে প্রত্যাশা করি। ছড়ার জন্যেও আমি ... কিছু পেয়ে থাকি—সকলের কাছ থেকে নয়, যাঁরা বার্ষিকী ...করেন তাঁদের কাছ থেকে।

এখন আমি যে-সব প্রবন্ধ লিখছি সে-সব "আর্ট" সম্বন্ধে। বুদ্ধদেব কাছে সেগুলি প্রতিশ্রুত। আপনাকে দেবার মতো প্রবন্ধ ...তত লিখতে পারব না। হাতে অন্য কাজ আছে। পুরোনো ...লি revise করতে যাচ্ছি প্রকাশকের তাগিদে। নতুন গল্প ...নটি লিখতে হবে যাঁদের আগে কথা দিয়েছি তাঁদের জন্যে। ...পরে আপনার পালা। যত দূর দেখতে পাচ্ছি Februaryর ...হয়ে উঠবে না। কারণ শরীর এখনো সবল হয়নি। কৃষ্ণ...এর ম্যালেরিয়া আমাকে কাবু করে রেখেছে। সিউড়ীর ...রান"ও অল্প নয়। যা হোক, গল্প আপনাকে নিশ্চয়ই দেব এবং ...লো গল্পই দেব যাতে আপনার দীর্ঘকালীন প্রতীক্ষা সার্থক

ইতি—

বিনীত
অন্নদাশঙ্কর রায়।

(২)

...রেষু,

শান্তিনিকেতন, ২৪. ৭. ৫১.

আপনার অনুরোধ এড়াতে পারলুম না। "আত্মস্মৃতি" ...ই ফেললুম। লেখাটা আলাদা বুক-পোষ্টে পাঠাচ্ছি। যদি পাই তো ভালো করে শুধরে দেব। নমস্কারান্তে। ইতি।

বিনীত
অন্নদাশঙ্কর রায়।

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি

(১)

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ।
৪।৮

সবিনয় নিবেদন

গল্প অসম্ভব। কবিতা চেষ্টা করতে পারি, যদি আলাদা পুরো পাতায় ছাপেন। দক্ষিণা পঞ্চাশ। নমস্কার।

বুদ্ধদেব বসু।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

২ কার্তিক ১৩৫২

মাসিক বসুমতীর জন্য প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হতে পারে, তবে এ-বিষয়ে দু'একটি কথা ছিলো—আপনি ফিরে এসে একদিন দেখা করেন তো ভালো হয়। পূজা-সংখ্যার ফাইল এখনো পৌঁছয়নি, আশ্বিনের মাসিকও না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো যে আপনাদের আপিশ থেকে আমার নামে মাসিক বসুমতীর শুধু সেই-সেই সংখ্যাই আসে যাতে আমার লেখা থাকে—কিন্তু লেখকদের নিয়মিত পত্রিকা পাঠানোই তো রীতি?

আমাদের দু'জনের বিজয়ার প্রীতি ও নমস্কার আপনি গ্রহণ করুন। বুদ্ধদেব বসু।

যাযাবরের চিঠি

৮ এসপ্লেনেড ইষ্ট,
ফোন, পি, কে, ২১১

প্রীতিনিলয়েষু,

অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা নেই। আশা করি কুশলে আছেন। শীগগির একদিন কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে জানাবেন।

আপনার বাবা মশায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে গভর্ণমেণ্ট কমিটিতে দেখা হয়। তিনি উদ্যোগ করে একখণ্ড জয়ন্তী বসুমতী ও শারদীয়া বসুমতী পাঠিয়েছিলেন। দুটিই একবার চোখ বুলিয়ে গেছি। জয়ন্তী বসুমতীটির মধ্যে সম্পাদনার যে উৎকর্ষ চোখে পড়ল তার জন্যে আপনার প্রভূত সাধুবাদ প্রাপ্য। বন্ধু হিসেবে নয়—একজন পাঠক হিসেবেই, সে-জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নমস্কারান্তে,

কলকাতা
১৮ ১১।৪৮

ভবদীয়,
বিনয় মুখোপাধ্যায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর চিঠি

(১)

প্রীতিভাজনেষু,

১২।১।৪৯

আশা করি, গাঁধী-ঘাটের একটা ছবি রহমানের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছেন। যদি না করে থাকেন তবে লোক পাঠাবার সময় শ্রীযুত রহমানকে ফোন করে বলতে পারেন (Writers Bldgsএ ফোন করে Chief Architect Mr. Rahman বললে ঠিক-ঠিক জুড়ে দেবে) যে, ডঃ আলীর সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল সেই সম্পর্কে আপনি লোক পাঠাচ্ছেন। তাহলে লোকটিকে রাইটার্স বিল্ডিঙে ঢোকার জন্য পাসের হাঙ্গামা অন্ততঃ পোয়াতে হবে। লোকটি যদি ছবি বাবদে গুণী হন তবেই ভালো হয়। রহমানের কাছ থেকে পছন্দমাফিক ছবি বেছে নিয়ে আসতে পারবেন।

আমার মনে হয়, ঘাটের ছবিখানা কাগজের মধ্যিখানে ছাপালে ভালো হবে। প্রবন্ধটা আশে-পাশে। বিবেচনা করে দেখবেন।

পলডি অজরামর। তাকে যে কোনো দিন খাড়া করে দিতে পারবেন। যদি আপনার ভয়ঙ্কর ভালো লেগে গিয়ে থাকে, এবং রীতি যদি থাকে, তবে মাসিক সাপ্তাহিক উভয়েই ছাপাতে পারেন—আপনার খুশী। আমি রান্না করেই খালাস। আপনি যদি দুই কিস্তিতে খেতে চান খাবেন। তবে কিনা একদম্ না খেলে একটু দুঃখ হবে বৈকি!

বায়োস্কোয়ানের শেষ প্রুফ আমাকে দেখানো যেতে পারে এই রকম ধারা একটা ভাসা-ভাসা প্রস্তাব হয়েছিল মনে পড়ছে।

যে-সংখ্যায় গাঁধী-ঘাট বেরুবে তার একখানা যদি রহমানকে পাঠান তবে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন। আমরাও ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে ছবি দিয়ে পেতে পারি। এ-সংখ্যার 'শ্রীমতী'তে তাঁর একটা বাড়ীর প্ল্যান বেরিয়েছে যদিও খুব ভালো হয়নি। রহমানের বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে পাঠাব। আশা করি কুশলে আছেন। মুজতবা আলী

২৩ তারিখের জন্য সুভাস বাবু সম্বন্ধেই লিখিব।

(২) ১১।১।৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

বসুমতী নিরাময় হয়েছেন দেখে আনন্দিত হলুম। সোমবারে তিনি 'গাঁধীঘাটে' গঙ্গাস্নান করে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন!

পৌষের ফসল চাষারা ঘরে তুলে ফেলেছে—আমরা এখনো 'বসুমতী' ঘরাইয়ে তুলতে পারিনি—জমিদার তথা কর্তৃপক্ষের উষ্ণ হওয়ারই কথা। গর্দিশ, গর্দিশ সবই গর্দিশ।

রহমানকে আমি একখণ্ড কাগজ সোমবার দিন ভোরবেলাই পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। নগদ চার পয়সায় আমাদের পাড়ার কিয়োস্ক থেকে (সেখানে বসুমতী সাড়ম্বর বিক্রী হয় এবং রববারে যে মেশিন গোসা করে গুম্ হয়েছিলেন সে খবরটাও তাদের অজানা ছিল না) কিনে। নিজের বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে আপন পিঠ চাপড়াতে গিয়ে হাতটা ডিস্‌লোকেট করে ফেলেছি।

'নেতাজী' লেখাটি আশা করি পছন্দ করবেন। আপনাকে পুনরায় করজোড় অনুরোধ কোনো লেখা পছন্দ না হলে "থাক্, এটা না হয় চলেই যাক্" বলে চালিয়ে দেবেন না। তবে এখনো কিছুদিন ঈষৎ অনুকম্পার সঙ্গে লেখাগুলো পড়বেন! আমার ষ্টাইলটা জমতে একটু সময় লাগছে।

পৌষের বসুমতী হস্তগত হলেই বায়োস্কোয়ান নিয়ে বসব। এবারে লম্বা একখানা ছাড়বার বাসনা রাখি।

মুজতবা আলী

কাল য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে বক্তৃতা দিতে গেলে আজ আমাকে গোবরা যেতে হত!

(৩) ২১ ৪ ৪৯

প্রিয়বরেষু

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লেখা আজকের ডাকে এই সঙ্গে অন্য খামে ডাকে ছাড়লুম। সময়মত পৌঁছানো আল্লার হাতে—পোষ্টাপিস হাত গুটিয়ে আছেন।

মুজতবা আলী

(৪)

প্রীতিভাজনেষু,

পলডি রসিকতাগুলো আশা করি পছন্দ হবে। এক কিস্তির জন্য আটটাই প্রশস্ত। এক লাইনে দুটো বা চারটে করে ছাপালে বোধ করি ভালো হবে—তা সে নিশ্চয়ই ব্লক বানানো ইত্যাদি আপনি বোঝেন বেশী। তাড়াতাড়িতে, আপনার

মুজতবা আলী।

প্রতিভা বসুর চিঠি

কবিতা ভবন।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পড়ে মনে হ'লো ঈষৎ দুঃখিত হ'য়েছেন সাহিত্যব্যাপারে আপনার উৎসাহ ও আন্তরিকতা উল্লেখযোগ্য এবং একথা না বললেও সত্যের অপলাপ হবে যে সেই কারণেই আপনার কাছে দাবী করতে আমাদের কুণ্ঠা নেই।

নমস্কার গ্রহণ করুন।

বিনীতা প্রতিভা বসু

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২

আশাপূর্ণা দেবীর চিঠি

সবিনয় নিবেদন, ২১।৬ ৫১

পত্র পেলাম। 'শারদীয়া বসুমতীর' জন্য গল্প যথাসময়ে দেবার ইচ্ছে রইলো। তবে ২৬শে আষাঢ়ের মধ্যে নেহাৎ যদি হয়ে না ওঠে—শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহেই দিতে পারবো আশা করছি এটুকু দেরীর জন্য বিশেষ অসুবিধে হবে না বোধ হয়?

গ্রন্থাবলী প্রকাশের কতো দূর? আপনাদের তাগাদা না দেখে—'অনির্বাণ'খানা পাঠিয়ে দেবার জন্যে আমারও তাড়া হচ্ছে না দু'-এক দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবো।

আশা করি কুশল। নমস্কার জানবেন। ইতি—

বিনীতা

আশাপূর্ণা দেবী

সন্তোষকুমার ঘোষের চিঠি

প্রীতিভাজনেষু,

আজ ১৪ দিন হ'ল টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়ী হয়ে আছি। ক্লোরোমাইসেটিন নামক একটি নতুন ওষুধ সেবন করছি, এখন আরোগ্যের পথে। গতিক দেখে মনে হচ্ছে আরো বেশ কিছুকাল বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

শারদীয়া বসুমতীর জন্যে "কোজাগরী" নামে যে গল্পটি দিয়েছিলাম, সেটি মনোনীত হয়েছে তো? যদি হয়ে থাকে, তবে আমার সামান্য একটু অনুরোধ আছে। গল্পটির প্রুফ পড়বার ক্ষমতা আমার নেই, তবে শেষ প্যারাটির সামান্য—দু'-একটা কথার মাত্র—পরিবর্তন করতে চাই। যদি কোন অসুবিধে না হয়, তবে প্রুফের শেষ পাতা, কিম্বা কম্পোজ না হয়ে থাকলে পাণ্ডুলিপির শেষ পাতা পত্রবাহকের হাতে দিয়ে দেবেন। এ আমার ভাগিনেয়; একদিন পরেই আবার ফেরৎ পেয়ে যাবেন। যদি অসুবিধা বোধ করেন তবে এত হাঙ্গামা করে কাজ নেই, যেমন আছে, তেমনি থাকুক।

রোগমুক্তির পরে দেখা হবে আশা করছি। নমস্কারান্তে ইতি।

সন্তোষকুমার ঘোষ

উপর থেকে নীচে, প্রথম সারির আলোকচিত্রী সমীর ভাদুড়ী, বিমল বন্দ্যো. বসন্তকুমার আঢ্য (দ্বিতীয় পুরস্কার)। দ্বিতীয় সারির অনিল ঘোষ, বিশ্বনাথ মিত্র।

উপর থেকে নীচে, প্রথম সারির আলোকচিত্রী বলাই রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী। দ্বিতীয় সারির দিব্যেন্দু
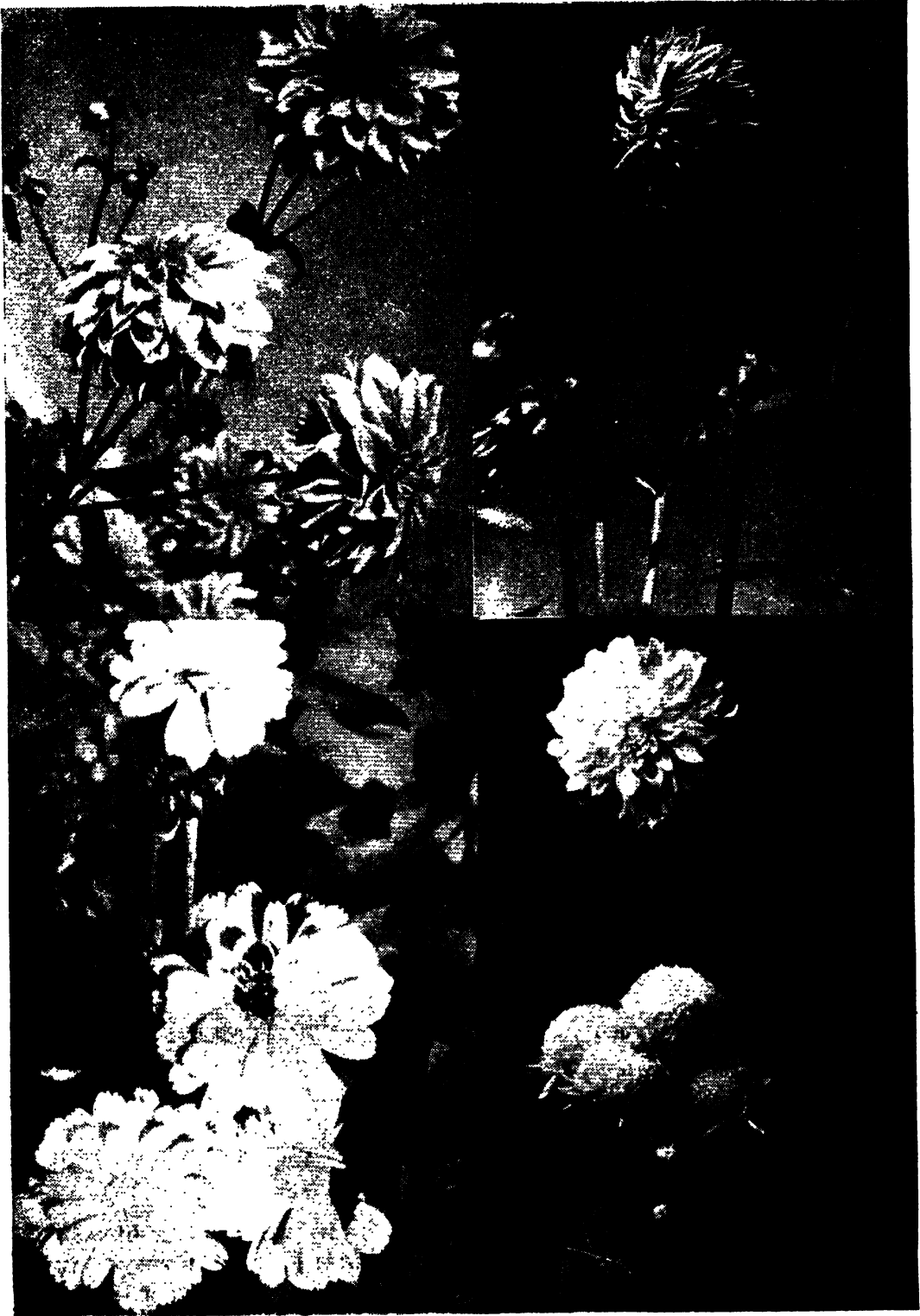
উপর থেকে নীচে, প্রথম সারির আলোকচিত্রী শীতলকুমার চট্টোপাধ্যায়, নিমাই গুহ (তৃতীয় পুরস্কার)। দ্বিতীয় সারির দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী

-প্রতিযোগিতা-

বিষয়

ফল

প্রথম পুরস্কার—১৫৲

দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৲ তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

(ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২২শে আষাঢ়)

চুম্বন

—জহর ঘোষ (প্রথম পুরস্কার)

ভাস-নাটকচক্র

শ্রীসুশীলকুমার দে

ইং ১৯১২ সালের পূর্ব্বে প্রাচীন নাট্যকার ভাসের নাম অজ্ঞাত না থাকিলেও তাঁহার রচনাগুলি লুপ্ত বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল। কালিদাস তাঁহাকে পূর্ব্বগামী বলিয়া ও বাণভট্ট তাঁহার নাটকচক্রের উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এরূপ ইতস্ততঃ নির্দ্দেশ ও প্রশস্তি ছাড়া, ভাস সম্বন্ধে আমাদের কোন তথ্যই জানা ছিল না। ১৯১২ হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত পণ্ডিত টি· গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দ্রম্ হইতে তেরখানি নাটক প্রকাশিত করিয়া এগুলি ভাসেরই লুপ্ত রচনা বলিয়া আবিষ্কারের দাবী করেন। কিন্তু এ কথা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, তেরখানি নাটকের কোনটির কোনও পুঁথিতে নাট্যকারের নাম পাওয়া যায় না, যেমন অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা বা পুষ্পিকায় পাওয়া যায়। তবুও কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া গণপতি শাস্ত্রী সবগুলিই ভাসের নাটক বলিয়া প্রচার করেন। সব নাটকগুলির আকার ও নাটকীয় মূল্য সমান নয়। অধিকাংশই প্রাচীন ইতিকথা অবলম্বনে রচিত, কিন্তু কতকগুলির বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ ভাবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে গৃহীত। যথা, প্রতিমা ও অভিষেক নাটকে প্রতিপাদ্য বিষয় আসিয়াছে রামায়ণ হইতে; মধ্যম-ব্যায়োগ দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ ও পঞ্চরাত্রের উপজীব্য মহাভারত, এবং বালচরিতের বস্তু পৌরাণিক ও কৃষ্ণকথা। কেবল প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্ন-নাটক, অবিমারক, চারুদত্তের মূলে রহিয়াছে কবিকল্পনা বা প্রচলিত লৌকিক উপাখ্যান।

নূতনত্বের প্রথম চমকে বিদ্বৎসমাজ এই নাটকগুলিকে ভাসেরই চিরলুপ্ত রচনা বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন; কিন্তু শীঘ্রই এই অবিচারিত উৎসাহ ডুবিয়া গেল বিচার-বিতর্কের বহুকালস্থায়ী ঝঞ্ঝাবর্ত্তে। তার পর আসিল নাটকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক নূতন তথ্যের আবিষ্কার, যাহাতে এই সমস্যার বিচারে এখন আর কেবল ব্যক্তিগত রুচি, বিশ্বাস বা কল্পনার অবকাশ রহিল না। এ কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ভাসের উপর নাটকগুলির আরোপ একেবারে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। উভয় পক্ষের তর্ক প্রবল ও জটিল হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন পক্ষের এমন কোন যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপিত হইল না, যাহা অপর পক্ষের যুক্তি বা প্রমাণের বিরুদ্ধে নিশ্চিত বা অবিসংবাদিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই অমীমাংসিত বাদযুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিবার অবসর এখানে নাই; শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে, ভাসের সপক্ষে যথেষ্ট বলিবার কথা থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত এমত কিছু অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহার দ্বারা এই সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে (১)।

সুতরাং, ভাস সম্বন্ধে আলোচনায়, পক্ষপাতিত্ব ছাড়িয়া দিয়া, এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ত্রিবান্দ্রমে প্রকাশিত নাটকগুলি সত্যই ভাসের রচিত কি না সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে। সবগুলি বা কোনটিই ভাসের না হইতে পারে; এবং যে ভাবে এগুলি কেরলদেশীয় কোন যাযাবর নট-সম্প্রদায়ের সংগ্রহে পাওয়া যায়, যাহাতে ভাসের হইলেও কতটা অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। হয়ত অভিনয়ের খাতিরে অনেকাংশ বর্জ্জিত বা পুনর্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহাদের বর্ত্তমান আকার ও প্রকার কতটা মূলের অনুগত, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ভাসের রচনা হউক বা না হউক, এই নাটকগুলির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, যাহার জন্য সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে ইহাদের স্থান অস্বীকার করা যায় না।

অন্য কোনও কারণ থাক্ বা না থাক্, কেবল নাট্যকলার উৎকর্ষের জন্য প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্ন-বাসবদত্তা (মূল পুঁথিতে স্বপ্ন-নাটক বলিয়া উল্লিখিত) এই দুইটি নাটককে অনেকে ভাসেরই রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না হইলেও এই দুইটি পরস্পর-সংবদ্ধ রচনা যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহির্গত সাদৃশ্য ও অন্তর্গত কথাবস্তুর জন্য ইহারা পরস্পরের পরিপূরক। কালিদাসের সময়ে অবন্তীর গ্রামবৃদ্ধেরা যে-কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, প্রাচীন কথা-সাহিত্যের আদর্শ দক্ষিণনায়ক কৌশাম্বীরাজ উদয়নের সেই বিচিত্র প্রেমের কাহিনীই হইতেছে উভয় নাটকের উপজীব্য। চতুরঙ্ক প্রতিজ্ঞা-নাটকে বর্ণিত হইয়াছে উদয়নের কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের চক্রান্তে উজ্জয়িনীর রাজা মহাসেন প্রদ্যোতের কারাগার হইতে তৎকন্যা বাসবদত্তার সহিত উদয়নের পলায়ন ও মিলন। মুদ্রারাক্ষসের চাণক্যের মত এখানে যৌগন্ধরায়ণই কেন্দ্রস্থিত চরিত্র এবং নাটকটির প্রতিপাদ্য হইতেছে কূটনীতির চাতুর্য্য; কিন্তু কেবল তাহাতেই ইহার বৈচিত্র্য নয়। যদিও নাটকে কোথাও উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব নাই, তথাপি নাট্যকারের কৌশলে ইহাদের মনোজ্ঞ প্রেমের কাহিনী মূল ঘটনার সঙ্গে অন্তর্লীন ভাবে জড়িত হইয়া নীরস চক্রান্তকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। এই গল্পের অনুবৃত্তি হইয়াছে ষড়ঙ্ক স্বপ্ন-নাটকে। এখানেও যৌগন্ধরায়ণের চক্রান্ত বলবান্, কিন্তু তিনি রহিয়াছেন পশ্চাৎপটে, নায়ক-নায়িকার প্রত্যক্ষ প্রেমিক-জীবনের পিছনে। হর্ষের দুইটি নাটিকার নায়কের মত উদয়নকে এখানে প্রেম-ব্যবসায়ী চপলচিত্ত নায়কের বিলাস-লীলার প্রতীকরূপে অঙ্কিত করা হয় নাই। বাসবদত্তাকে হারাইবার দুঃখ তিনি ভুলিতে পারেন নাই, কিন্তু পদ্মাবতীকে বিবাহ করা যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল তখন তিনি বলিতেছেন—

> প্রাণে দৃঢ়মূল অনুরাগ নাহি ঘুচে;
> স্মরিয়া স্মরিয়া দুঃখ নবীন হবে;
> এই ত জীবন!—চক্ষের জলে মুছে'
> দুঃখের ঋণ, চিত্ত প্রসাদ লভে।

বাসবদত্তার প্রতি তাঁহার প্রেম সত্য ও গভীর হইলেও, এক দিকে যৌগন্ধরায়ণের অনুপ্রেরিত রাজনৈতিক ঘটনাচক্র, অন্য দিকে মগধরাজপুত্রী পদ্মাবতীর নূতন স্নেহের আকর্ষণ তাঁহাকে বিড়ম্বিত ও অসহায় অবস্থায় ফেলিয়াছে। বাসবদত্তার আত্মত্যাগ অনিচ্ছাকৃত হইলেও সহিষ্ণু নারীহৃদয়ের অবিচল প্রেমের দুঃখকে আরও অশরণ করিয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে কেন্দ্রগত স্বপ্নের পরিকল্পনায় তাঁহাদের অতর্কিত ক্ষণিক মিলন এই চিত্রটিকে অপূর্ব্ব কারুণ্যে উদ্ভাসিত করিয়াছে। নাটকটি সুকুমার রসের পরিমিত ও উৎকৃষ্ট প্রকাশ; কোথাও ভাবের আতিশয্যে বা কবিত্বের বাহুল্যে ঘটনা ও চরিত্রের সংহত-গভীর গতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মাত্র চার অঙ্কে অসমাপ্ত চারুদত্ত নাটককে অনেকে পূর্ণাঙ্গ

(১) এই সমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মৎপ্রণীত History of Sanskrit Literature (Calcutta University 1947) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মৃচ্ছকটিকের মূল বলিয়া ধরিয়াছেন। গল্পাংশে উভয় নাটকের পার্থক্য নাই, এবং শব্দগত সাদৃশ্য খুবই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু চারুদত্ত নাটকটি কেন যে এরূপ খণ্ডিত ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায় না। লৌকিক বা কল্পিত কাহিনী লইয়া রচিত অন্যতম ষড়ঙ্ক অবি-মারক নাটকটির কথাবস্তুতে বৈচিত্র্য থাকিলেও উদয়ন-বাসবদত্তা সংক্রান্ত নাটক দুইটির সমকক্ষ বলিয়া ধরা যায় না। নাটকের নায়ক হইতেছেন সৌবীররাজের পুত্র বিষ্ণুষেণ; কিন্তু তিনি কোনও সময়ে মেষরূপী কোনও দৈত্যকে হত্যা করিয়া এখন অবি-মারক বা মেষহন্তা নামে পরিচিত এবং ঋষিশাপে জাতিভ্রষ্ট ও নষ্টপরিচয়। তাঁহার সহিত কুন্তিভোজ রাজার কন্যা কুরঙ্গীর প্রণয় ও মিলনের কাহিনী হইতেছে এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা ও অনর্থক ভাবালুতার প্রবেশে রচনাটি সর্ব্বত্র স্বাভাবিক হয় নাই; এবং ইহার বিষয়বস্তু নাটকের নহে, উপকথারই অধিকতর যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

কংসবধ পর্য্যন্ত কৃষ্ণকথা অবলম্বন করিয়া পঞ্চাঙ্ক বালচরিত রচিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর চরিত্রের মাধুর্য্য অপেক্ষা উগ্রতার দিকটাই বিশেষ করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। অলৌকিক ঘটনাগুলি ছাড়িয়া দিলেও, রচনাটি কেবল কতকগুলি চমকপ্রদ বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমাবেশে সার্থক নাটকে বিবর্ত্তিত হইয়া উঠে নাই।

রামায়ণ অবলম্বনে যে দুইটি নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাতেও অল্প-বিস্তর এই দোষ রহিয়াছে; কিন্তু এগুলিতে নাট্যোচিত ঘটনা ও চরিত্রের খাতিরে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের যথেষ্ট সাহস দেখা যায়। প্রতিমা-নাটকে লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সমগ্র রামায়ণের গল্প সংক্ষেপে চিত্রিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু ইহার মৌলিকতা হইতেছে ইহার প্রতিমা-কক্ষের, কৈকেয়ী-চরিত্রের, ও স্বর্ণমৃগ-ঘটনার অভূতবিধ উদ্দেশ্যের অভিনব পরিকল্পনায়। আনুষঙ্গিক অভিষেক নাটকের ছয়টি অঙ্কে চিত্রিত হইয়াছে বালিবধ ও সুগ্রীবের অভিষেক হইতে রাবণবধ ও রামের অভিষেক পর্য্যন্ত রামায়ণের কাহিনী। চরিত্রাঙ্কনে বা ঘটনার সমাবেশে এমন কোনও বৈচিত্র্য দেখা যায় না, যাহাতে নিছক নাটক হিসাবে রচনাটি সার্থক হইয়াছে বলা যায়।

যে পাঁচটি মহাভারতীয় নাটক পাওয়া গিয়াছে, তাহা আয়তনে বিস্তৃত নয়। পঞ্চরাত্র তিন অঙ্কে রচিত, কিন্তু অন্যগুলি প্রত্যেকটি একাঙ্কে সমাপ্ত। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে যাহাকে সমবকার বা ব্যায়োগ শ্রেণীর রূপক বলা হইয়াছে, এগুলি সেই ধরণের রচনা; যুদ্ধবিগ্রহ বা বিক্রান্ত চরিত্র হইতেছে ইহাদের বর্ণনীয় বিষয়। এগুলিকে ঠিক পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা যায় না, বিচ্ছিন্ন নাটকীয় দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র। তাই অনেকে অনুমান করেন, এই ছোট-ছোট রচনাগুলি স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর-সংশ্লিষ্ট, এবং হয়ত একটি বৃহৎ মহাভারতীয় নাটকের অবশিষ্ট খণ্ডাংশ; কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে কোন প্রত্যয়জনক প্রমাণ নাই। তথাপি রচনাগুলির পরিকল্পনায় যথেষ্ট মৌলিকতা দেখা যায়। মধ্যম-ব্যায়োগে ভীম ও তৎপুত্র ঘটোৎকচের যে বিগ্রহের কথা রহিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র মহাভারতে নাই; কিন্তু এরূপ পরস্পরের অপরিচিত পিতাপুত্রের সংঘর্ষ লৌকিক কাহিনীতে বিরল নয়। ধৃতরাষ্ট্র যে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, অথবা অভ্যায়রূপে অভিমন্যুবধের পর অর্জ্জুনের কুরুধ্বংস-প্রতিজ্ঞার সংবাদ বহন করিয়া তাঁহার নিকট যে ঘটোৎকচ আগমন করিয়াছিলেন, এরূপ ঘটনা মহাভারতে নাই; কিন্তু ইহাই দূতঘটোৎকচের প্রতিপাদ্য বিষয়। ধৃতরাষ্ট্রের সভায় শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য বিস্তৃত ভাবে উদ্যোগপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু দূতবাক্যের একাঙ্কে দেখা যায় কেবল দুর্য্যোধন ও বাসুদেবেরই সংঘর্ষ। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের চিত্র দেখাইয়া দূতের অপমান, বৈষ্ণব অস্ত্রের আবির্ভাব প্রভৃতি নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনা।

উৎপীড়িত ও অধঃপতিতের প্রতি নাট্যকারের যে সমবেদনা বালচরিতে কংসের ও অভিষেক-নাটকে কৈকেয়ীর চিত্রে দেখা যায়, তাহা আরও স্পষ্ট হইয়াছে কর্ণভারে কর্ণের ও ঊরুভঙ্গে দুর্য্যোধনের অন্তিম চিত্রের কারুণ্যে। পঞ্চরাত্রের তিন অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে, অজ্ঞাতবাসে স্থিত পাণ্ডবেরা যে ভাবে কুরুদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এখানেও নাটকের খাতিরে মহাভারতের মূল গল্প যথাযথ অনুসরণ করা হয় নাই, এবং দুর্য্যোধন ও কর্ণকে যথেষ্ট উদার ও উন্নত ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। দুর্য্যোধনের যজ্ঞ ও দ্রোণের প্রতিজ্ঞার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাটিও নাট্যকারের নিজস্ব।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, তেরখানি ভাস-নাটকের সবগুলি শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন না হইলেও সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে ইহাদের উপেক্ষা করা যায় না। হয়ত শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি ও বিশাখদত্তের নাটকের গঠন-নৈপুণ্য বা কবিত্ব-শক্তি ইহাদের নাই, কিন্তু ইহাদের বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না। অধিকাংশ নাটকগুলির ভাব রুক্ষ ও কঠোর হইতে পারে, এবং হয়ত ভাষায় সুমার্জ্জিত লালিত্যের অভাব আছে; কিন্তু ভাবে ও ভাষায় যে স্বচ্ছতা ও ওজস্বিতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সাধারণ সংস্কৃত নাটকে দুর্লভ। নাট্যকলার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাকে আদিম যুগের নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার মধ্যে নূতনত্বের যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। নাটকগুলির পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা-বাহুল্য সম্বন্ধে নাট্যকারের কোনও উদ্বেগ নাই; বাসবদত্তায় ইহাদের সংখ্যা ১৬, অবি-মারকে ২২, প্রতিমা ও অভিষেক প্রত্যেকটি ২৪, পঞ্চরাত্রে ২৬ এবং বালচরিতে ৪১। কিন্তু কোথাও রঙ্গমঞ্চ অত্যধিক ভাবে জনাকীর্ণ হয় নাই। প্রধান চরিত্রগুলি প্রায়ই সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ও নিরীক্ষণের দ্বারা অঙ্কিত, কিন্তু অপ্রধান চরিত্রগুলিও উপেক্ষিত হয় নাই। নাটকের গঠন বা ঘটনা-সংস্থান হয়ত সর্ব্বত্র নিখুঁত নয়, কিন্তু ইতিবৃত্ত বা উপকথাকে নাটকে পরিণত করিবার কৌশল অথবা নবনির্ম্মাণের সাহস ও শক্তি রহিয়াছে যথেষ্ট। নাটকগুলির মধ্যে যাহা সব চেয়ে আধুনিক রুচিকে আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে এই যে, ইহাদের মধ্যে শ্লোকের ছড়াছড়ি বা রস ও অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি নাই। দক্ষিণ-ভারতের যে নট-সম্প্রদায় এগুলি রক্ষা করিয়াছে হয়ত তাহাদেরই নাট্যোচিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের ফলে নাটকগুলি এরূপ সুসংহত রূপ লাভ করিয়াছে; কিন্তু যে আকারে রচনাগুলিকে আমরা পাইয়াছি, তাহাতে রহিয়াছে ক্ষিপ্র গতিবেগ, চরিত্রাঙ্কনের সজীব স্পষ্টতা ও বচোবিন্যাসের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য, যাহা কেবল নট-সম্প্রদায়ের পরিমার্জ্জনের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। ভাসের রচনা হউক বা না হউক, নাটকগুলি কালের সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছে, এবং সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে ইহাদের যে যথেষ্ট মূল্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপনার ছেলে কি করবে?

(মাসিক বসুমতীর বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত)

আর কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী নানা পরীক্ষায় পাশ করে বেরুবেন। কিন্তু পাশ করার পর তাঁরা যে কি করবেন সে এক মস্ত সমস্যা। ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এত বেশী যে, আগামী ৫।১০ বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটাও ছেলে না পাশ করলেও এখানকার অফিস-আদালতে লোকের অভাব হবে না। এই ভয়াবহ বেকার-সমস্যার যুগে সদ্যঃপাশ করা ছেলে-মেয়েরা যে কর্মসংস্থান করতে বিশেষ বেগ পাবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। যত দিন দেশে কৃষি-সংস্কার এবং শিল্প-সম্প্রসারণ না হচ্ছে এবং যত দিন না দেশের সরকার সমস্ত নর-নারীর কর্মসংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন, তত দিন এই বেকার-সমস্যার কোন সমাধান হতে পারে না। অবশ্য বেকার-সমস্যা আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। সে প্রশ্ন এড়িয়ে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে এদেশের ছেলে-মেয়েরা জীবিকা অর্জনের পথে অগ্রসর হতে পারেন, সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

কাজ নেই অথচ কাজ করার লোকের অভাব নেই। ফলে চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে আজকাল জোর প্রতিযোগিতা। কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাঙালী ছেলে-মেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অন্য প্রদেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে পেছু হটছেন। গতবার আই-এ-এস এবং আই-পি-এস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্ররা একেবারে দাঁড়াতেই পারেননি অথচ অন্য প্রদেশের মেয়েরা পর্যন্ত ভাল ফল করেছেন। এছাড়া ইদানিং যাঁরা কলকাতার বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে গেছেন, তাঁরাই জানেন যে, সেখানেও আজকাল বাঙালীর চেয়ে অবাঙালীর দিকেই ঝোঁক বেশী। এ কথার মধ্য দিয়ে কোন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কাজের সুবিধার জন্যও অনেক ফার্ম অবাঙালী নিয়োগ করেন, কারণ তাঁদের ধারণা কেরাণীগিরিতে বাঙালীর চেয়ে মাদ্রাজীদের দক্ষতা বেশী। এছাড়া অন্যান্য অবাঙালী ফার্মে অবাঙালী কর্মচারীর প্রাধান্যের কারণ আত্মীয়পোষণও হতে পারে।

যাই হোক, চিত্রটা খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু হতাশার সহস্র কারণ থাকলেও একেবারে নিরুৎসাহ হলে চলবে না। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সকল প্রকার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে।

আই-এ-এস

প্রথমেই ধরুন বড় বড় সরকারী চাকরীর কথা। ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতি বছর ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস, ফরেন সার্ভিস, অডিট এ্যাণ্ড একাউণ্টস্ সার্ভিস প্রভৃতির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। যাঁরা এই পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারেন, তাঁরা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারে প্রথম শ্রেণীর চাকরী পান। চাকরীর বেতন মাসিক চার হাজার টাকা পর্য্যন্ত উঠতে পারে। এই পরীক্ষা সম্বন্ধে বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের মনে একটা অকারণ ভীতি আছে। তাঁরা মনে করেন, এটা বোধ হয় কোন অলৌকিক শক্তি ছাড়া পাশ করা যায় না। তাই অনুপাতে বাঙলা দেশ থেকে প্রতিযোগীর সংখ্যা যায় কমে। কিন্তু তাঁদের এই ধারণাটা ভুল। ছ'মাস এক বছর খাটলে কলকাতার যে কোন গ্রাজুয়েটই এই পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারেন। অঙ্ক এবং ইংরাজিতে যাঁরা কৃতী তাঁদের সাফল্য অবধারিত। মাদ্রাজে যে ছেলে গ্রাজুয়েট হয়, সে-ই দু'এক বার আই-এ-এস বা অনুরূপ পরীক্ষায় বসে। বাঙলা দেশের প্রত্যেক গ্রাজুয়েটের উচিত, খেটেখুটে এই পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া। তাতে আর যাই হোক লোকসান নেই। ইংরাজি বলা এবং লেখাটা ভাল করে রপ্ত করতে হবে। সারা ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হলে ইংরেজি অপরিহার্য্য। কিন্তু ইংরাজি সম্বন্ধেও অকারণ ভীতি পোষণ করবেন না। ইংরাজি যদি আপনি লিখতে পারেন, তাহলে বলতেও পারবেন। বলবার সময় হোঁচট খাবেন না, অনর্গল বলে যাবেন। সামান্য দোষ-ত্রুটি ঘটলে কোন ক্ষতি হবে না। মৌখিক পরীক্ষায়ও ঘাবড়াবার কারণ নেই। যে প্রশ্নের জবাব আপনার যতটুকু জানা আছে, ততটুকু বলবেন। প্রশ্ন শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে চটপট একটা মন-খুশী-করা উত্তর দিয়ে দিলেই পরীক্ষক আপনার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। জেনে রাখবেন, আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিই পরীক্ষার বিষয়, অন্য কিছু নয়। এ সব পরীক্ষায় অঙ্কেই সব চেয়ে বেশী নম্বর ওঠে। কাজেই যাঁরা অঙ্কের ছাত্র-ছাত্রী তাঁরা সকলেই যদি এই পরীক্ষা না দেন, তাহলে মস্ত ভুল করবেন। আশা করি, এবার যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বি-এ, বি এস-সি এবং বি-কম পাশ করলেন, তাঁরা সকলেই আই-এ-এস পরীক্ষায় বসবেন। এ সম্বন্ধে সমস্ত রকমের খোঁজ-খবর পাবেন ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারীর কাছে (নয়াদিল্লী)। একখানা পোষ্টকার্ড লিখলেই কাজ হবে।

মিলিটারী অফিসার

ভারতে মিলিটারী অফিসারের সংখ্যা সিভিল অফিসারের চেয়ে কম নয়। কমিশনপ্রাপ্ত মিলিটারী অফিসারদের বেতন আই-এ-এসদের সমান তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে বেশী। চাকরীও খুব আরামের। প্রতি বছর ভারতের নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর জন্য কয়েক শ' অফিসার সংগ্রহ করা হয়। সর্বনিম্ন ম্যাট্রিক পাশ হলেও মিলিটারী অফিসার হতে বাধা নেই। এত সুবিধা সত্ত্বেও বাঙলা দেশের ছেলেরা এই চাকরীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন না—এটা বড়ই দুঃখের কথা। মিলিটারী অফিসার সংগ্রহের জন্য যে পরীক্ষা হয়, তা খুবই মামুলী। অন্ততঃ গ্রাজুয়েটদের পক্ষে সে পরীক্ষায় খুব ভাল ফল দেখানো মোটেই কষ্টকর নয়। আবার বলব, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা শুনে অকারণে আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না।

বি-সি-এস

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মাঝারী অফিসার সংগ্রহ করেন বি-সি-এস পরীক্ষার মাধ্যমে। মাঝারী অফিসাররা পরে অনেকেই প্রমোশন পেয়ে আই-এ-এস হয়ে যান। আর তা না হলেও বি-সি-এস অফিসারদের বেতন হাজারের উপর উঠতে পারে। যারা চাকরী করে জীবিকা নির্বাহ করতে চান, তাঁরা সকলেই বি-সি-এস পরীক্ষায় বসতে পারেন। এই পরীক্ষা আরও সহজ।

উপরে যে চাকরীর কথা বলা হল তার প্রত্যেকটি মহিলারাও পেতে পারেন। গত বছর শ্রীমতী পাল চৌধুরী নামে এক জন ছাত্রী বি-সি-এস পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়েছিলেন। তিনি এখন মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায়ের সেক্রেটারী হিসাবে মোটা বেতনে বাঙলা সরকারের কাজে নিযুক্ত আছেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। অদূর ভবিষ্যতেই তাঁর পদোন্নতি অবধারিত। আজকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরাই বেশী কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। তাঁরা যদি চাকরীই করতে চান তাহলে তাঁদের উচিত এই সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা। সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, চটপটে ভাবভঙ্গি এবং চটপটে কথাবার্তা—এই সবই হল এ সব পরীক্ষায় সাফল্যের মূল সূত্র। যাঁরা ভয়েই ও-পথ মাড়াতে চান না, তাঁরা বরং দু'-এক জন আই-সি-এস, বি-সি-এসের সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখবেন। আই-সি-এস বি-সি-এসরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ নন। তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি আপনার চেয়েও "অনেক বেশী"—এমন মনে করবার কোন হেতু নেই।

কিন্তু এ সব পরীক্ষায় ফাঁকি চলে না। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। আমার মনে হয়, যাঁরা আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছেন, তাঁরা সকলেই বি-এর প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হলে উপকৃত হবেন। আমাদের বাঙলা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান গলদ হচ্ছে এই যে, পরীক্ষা পাশের পর তাঁরা যে কি করবেন, সে-সম্বন্ধে তাঁদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোলেই অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকেন এবং হাতের কাছে যা পান, তাই নিয়েই দিনগত পাপক্ষয় করেন। চাকরী করেই যদি খেতে হয় তাহলে বড় বড় চাকরীর দিকে যেন নজর থাকে। নজর যত ছোট করবেন, আপনার পরিসরও তত সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে। এ সব বড় বড় চাকরী প্রধানত গ্রাজুয়েটদের জন্য। যাঁরা গ্রাজুয়েট নন, তাঁদের পক্ষে চাকরী সংগ্রহ করা আজকাল আরও মুস্কিল। কারণ অল্প বেতনে গ্রাজুয়েট পেলে কেউ আর কম গুণসম্পন্ন কোন লোককে সেই পদে নিয়োগ করবে না।

ম্যাট্রিক বা অনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী কর্মসংস্থানের চেষ্টা করবেন, তাঁরা যদি কিছুটা কারিগরি বিদ্যা শিখে রাখেন তাহলে চাকরীর ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে। যাঁরা কেরাণীগিরি বা ঐ জাতীয় কাজ খুঁজবেন, তাঁরা টাইপরাইটিং, শর্টহ্যাণ্ড, বুক কিপিং, টেলিগ্রাফী, একাউণ্ট্যান্সি ইত্যাদি শিখে নিতে পারেন। কলকাতায় এবং আশে-পাশে এই সমস্ত শিক্ষালাভের অসংখ্য শিক্ষায়তন আছে। আরও কি শিক্ষা লাভ করলে চাকরীর ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হল।

বেতার-বিজ্ঞান

আজকাল বেতারের আদান-প্রদান খুব বেড়েছে, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, ট্রেণ এবং অন্যান্য যান-বাহন বেতারে নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন কি, পুলিস বিভাগেও বেতারের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। কাজেই বেতার-যন্ত্র মেরামত এবং বেতারে বাণী আদান-প্রদান সম্পর্কে যাঁরা শিক্ষা লাভ করবেন, তারা হয়ত চাকরী পেতে খুব বেগ পাবেন না। কলকাতায় এই বিদ্যাশিক্ষার বিদ্যালয় আছে।

ওভারশিয়ার ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান ডিসাইনার

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি ভাল কি মন্দ, সে কথা বাদ দিলেও এ কথা ঠিক যে, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বাঁধ ইত্যাদি নির্মিত হচ্ছে। বড় বড় নির্মাণ-কার্য্যে ওভারশিয়ার, ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান এবং ডিসাইনারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। বড় বড় কল-কারখানায়ও তার যথেষ্ট প্রয়োজন।

মেকানিক

আমাদের দেশ মধ্যযুগীয় পশ্চাদ্‌পদতা কাটিয়ে যন্ত্রযুগে প্রবেশের চেষ্টা করছে। যতই আমরা এই পথে অগ্রসর হব ততই জীবনের সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং যন্ত্রবিদ্‌রা সমাজে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করবেন। যন্ত্রশক্তির উৎস হচ্ছে ইঞ্জিন। ইঞ্জিন আছে নানা রকমের—ডিসেল ইঞ্জিন, পেট্রল ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক ইঞ্জিন, ষ্টীম ইঞ্জিন, ক্রুড অয়েল ইঞ্জিন প্রভৃতি। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এ্যাটম ইঞ্জিনও তৈরী হবে। যাঁরা এই সব ইঞ্জিনের কাজ ভাল ভাবে শিক্ষা করেন, তাঁদের পক্ষে চাকরী সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়।

নাবিকবৃত্তি

কলকাতার বন্দর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বন্দরগুলির অন্যতম। সারেঙ, সিপ মাষ্টার, পাইলট জাতীয় বহু মাঝারী রকমের পদ এখানে আছে। আগে চাটগাঁর অধিবাসীরাই এই সমস্ত কাজ করতেন কিন্তু পাসপোর্টের অসুবিধার ফলে আজকাল তাঁদের পক্ষে এখানে এসে চাকরী করার অনেক অসুবিধা। বাঙালী ছেলেরা যদি এই সব কাজ শিখতে আরম্ভ করেন, তাহলে কিছুটা সুবিধা তাঁরা নিশ্চয়ই পাবেন। তাছাড়া ভারতীয় নৌবহরেও জাহাজের নানা রকম কাজের জন্য ভালো ভালো বেতনে বহু শিক্ষানবীশ নিয়োগ করা হয়। এ বিষয়ে গোখেল রোডে অবস্থিত রিক্রুটিং সেণ্টারে সমস্ত খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে। সমুদ্রের একেবারে গা-ঘেঁষে-ওঠা বাঙলা দেশের ছেলেরা নাবিক-বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট নন—এটা ভারী আশ্চর্য্যের কথা। এবার যাঁরা ম্যাট্রিক পাশ করবেন অথবা পাশ করে বসে আছেন, তাঁরা সকলেই একবার খোঁজ-খবর করে দেখুন ও-পথে আপনারা কত দূর এগোতে পারেন।

বিমান বিদ্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সারা পৃথিবীতে বিমান চলাচল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের

-কি কি কাজে নিযুক্ত হওয়া যায় ?-

[পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষালাভ ক'রে উপার্জনক্ষম হতে পারেন]

কলা-শিল্প

বিজ্ঞাপনের চিত্রাঙ্কণ, সাময়িকপত্র ও পুস্তক নক্সা, ব্যঙ্গচিত্র, পোষ্টকার্ড ও সাইনবোর্ড লেখা, ফ্যাশনের ছবি।

মোটর গাড়ী

মোটর গাড়ীর মেকানিক, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, মোটর গাড়ীর কাঠামো পুনর্নির্ম্মাণ ও রং করা, ডিজেল গ্যাস এঞ্জিন।

বিমান

বিমান-সংক্রান্ত এঞ্জিনীয়ারিং, বিমানের এঞ্জিনের মেকানিক, বিমানের নক্সা তৈরী।

নির্ম্মাণকার্য্য

স্থাপত্য, গৃহনির্ম্মাণের নক্সা, গৃহনির্ম্মাণের কন্ট্রাক্টর, হিসাব পরিকল্পনা, ছুতোরের কাজ, নক্সার ব্যাখ্যা, গৃহ পরিকল্পনা, কল, পাইপ প্রভৃতি বসান, তাপ ও বাষ্প উৎপাদনের ব্যবস্থা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী।

ব্যবসায়

ব্যবসায় পরিচালন, হিসাব করা, হিসাবের খাতা লেখা, শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপিং, কেরাণীগিরি, ব্যবসায়ের চিঠিপত্র লেখা, কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক, বিজ্ঞাপন দেওয়া, খুচরা ব্যবসায় পরিচালন, ছোট ব্যবসায় পরিচালন। বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন, বিক্রয়-বিধি শিক্ষা, যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ।

রসায়ন

কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং, রসায়ন, কাগজের মণ্ড ও কাগজ তৈরী, প্লাষ্টিক।

এঞ্জিনিয়ারিং

সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং, গৃহাদির কাঠামো নির্ম্মাণ, জরিপ ও নক্সা তৈরী, কাঠামোর নক্সা তৈরী, পথ নির্ম্মাণ, কংক্রীটের গাঁথনি, স্যানিটারী এঞ্জিনীয়ারিং।

নক্সা তৈরী

বিমানের নক্সা, স্থাপত্য নক্সা, বিদ্যুৎ ও যন্ত্রপাতির নক্সা, ঘর-বাড়ীর কাঠামোর নক্সা, খনি জরিপ ও তার নক্সা।

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত বিষয়

বিদ্যুৎ সংক্রান্ত এঞ্জিনীয়ারিং, বিদ্যুতের মিস্ত্রী, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদ্যুতিক শক্তি ও আলো, লাইনম্যান

মেকানিক্যাল ও শপ

যন্ত্রপাতির এঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প-সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প তত্ত্বাবধান, ফোরম্যানশিপ, যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরী, যন্ত্রপাতির ডিজাইন, মেসিন শপ পরীক্ষা, নক্সার ব্যাখ্যা, যন্ত্র নির্ম্মাণ, গ্যাস—বিদ্যুৎ-ঝালাই, তাপ প্রদান—খনিজ বিদ্যা, শীট মেটালের কাজ, শীট মেটালের প্যাটার্ণ তৈরী, শীতলকরণ।

পাওয়ার (শক্তি)

কম্বাসান্ (দাহ) এঞ্জিনীয়ারিং, ডিজেল ইলেকট্রিক, বৈদ্যুতিক আলো ও শক্তি, ষ্টেশনারী ষ্টীম এঞ্জিনীয়ারিং, ষ্টেশনারী ফায়ারম্যান, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

সাধারণ বেতার, টেলিফোন, বেতার পরিচালন, বেতার সার্ভিসিং ইলেকট্রোনিক্স্।

রেল রোড

রেল এঞ্জিনের এঞ্জিনীয়ার, ডিজেল এঞ্জিন, এয়ার ব্রেক—গাড়ী পরীক্ষক, রেল রোড পরিচালন।

টেক্সটাইল

টেক্সটাইল এঞ্জিনীয়ারিং, তুলা উৎপাদন, রেয়ন উৎপাদন, পশমের দ্রব্য উৎপাদন, তাঁত বসান, রং করা ও ফিনিশিং, ডিজাইন।

গৃহশিল্প

পোষাক তৈরী ও ডিজাইন, রন্ধন, চা-কক্ষ পরিচালন।

ভারতবর্ষেই কয়েক ডজন বিমান কোম্পানী আছে। এছাড়া এ দেশে বহু বিদেশী কোম্পানীরও বড় বড় অফিস আছে। প্রতিদিন ভারতের বিভিন্ন লাইনে যাত্রী ও মালবাহী কয়েক শত বিমান আসা-যাওয়া করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই সব বিমানের পাইলট অধিকাংশই বিদেশী। তারা মোটা বেতন এবং নানা রকম সুবিধা তো পায়ই, এ ছাড়া বহু ক্ষেত্রে তারা গুপ্তচর বৃত্তি, গোপন আমদানী-রপ্তানি ইত্যাদি করেও ভারতের স্বার্থহানি করে। শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা যদি দলে দলে পাইলটের কাজ শিখতে পারেন, তাহলে ২।৩ হাজার টাকা মাইনের চাকরী তাঁদের কাছে অনায়াসলভ্য হয়ে উঠবে। শুধু পাইলট নয়, বিমানের ব্যাপারে রেডিও অপারেটার, মেকানিক, এয়ার হোষ্টেস ইত্যাদি নানা রকমের ভাল ভাল পদ আছে। আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা সকলেই এদিকে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

কলকাতা এবং তার আশে-পাশে কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার অনেক শিক্ষায়তন আছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যাদবপুর এবং শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। ভারতে কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে যত রকমের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তত আর কোথাও হয় না। এ ছাড়া রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে সর্ববিধ তথ্য জানতে হলে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রচার দপ্তরে পত্র লিখবেন অথবা নিজেরা গিয়ে দেখা করবেন। কারিগরি বিদ্যার অসংখ্য শাখা। এখানে তার সব নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই বাড়ছে, ততই তার কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নিত্য-নূতন জীবিকার দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। ইংরাজ শাসকদের কল্যাণে আজও আমাদের দেশ মধ্যযুগের নারকীয় পাপচক্রে ঘূরপাক খাচ্ছে। তাই আমাদের জীবিকার ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত। তবুও এ কথা ঠিকই যে, যে সুযোগ আমাদের আছে, বাঙালী ছেলে-মেয়েরা নানা কারণেই তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। বাঙালীর মধ্যে বহু কাল ধরে উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই উদ্যোগের অভাব জাতির অপমৃত্যু ডেকে আনে। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে Survival of the fittest. প্রবল প্রতিযোগিতার মুখেও যাঁরা টিঁকে থাকতে পারবেন, তাঁরাই বাঁচবেন। আমাদের সেই প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। এক দিকে যেমন আমরা এই সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টাবার জন্য চেষ্টা করব অন্য দিকে তেমনি চেষ্টা করব প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকবার। কোথাও পেছু হটলে চলবে না। সমগ্র ভারত হচ্ছে সেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। সে কথাটা সব সময় স্মরণে রাখতে হবে।

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

অষ্টাদশ অধ্যায়

পথ নির্বাচন

বেলুড়ে দুর্গোৎসব করবার জন্য অক্টোবরে স্বামীজি কাশ্মীর থেকে ফিরে এলেন। যাওয়ার আগে যেমন ছিল, তার চাইতে স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়েছে, বার বার হাঁপানির আক্রমণে তাঁর ঘুম গেছে, শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন। কিন্তু বিপুল উদ্যমে যে বিরাট কাজ তিনি শুরু করেছেন তাতে তো বিলম্ব সইবে না, কাজেই সমস্ত শক্তি সংহত করে প্রাণান্ত চেষ্টায় তা তিনি শেষ করতে চান। যখন দৈহিক সামর্থ্যে কুলাত না, মুহূর্তের জন্য গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। নড়াইলের জনকয়েক জমিদার শিষ্য গঙ্গার বুকে একখানা নৌকা মোতায়েন রাখলেন, রাত্রে নৌকায় থেকে নদীর হাওয়ায় যদি স্বামীজি একটু ভাল থাকেন এই আশায়। শহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তারদের ব্যবস্থা নেওয়া হল।

গৃহস্থ-ভক্ত বাদ দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে তখন প্রায় পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী আছেন। বাড়ি-ঘর তোলা শেষ হয়ে বেলুড়ে সবাই যখন স্থায়িভাবে বাস করতে লাগলেন, মঠের দানপত্র করা হল, তখন স্বামীজি তাড়াতাড়ি সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের জন্য নিয়মাবলী তৈরী করতে লাগলেন। অধ্যাত্ম-সাধনা, খাদ্যাখাদ্য, পড়াশোনা, কাজ-কর্ম সব-কিছুর খুঁটিনাটি বিধান রইল তাতে। ভারতের সমাজ-জীবন পুনর্গঠিত করা, সহজ নিয়ম মেনে একই সঙ্গে শৈব শাক্ত রামাইৎ বৈষ্ণব খৃষ্টান ও সুফীদের স্থান দেওয়া বেজায় গোলমালের ব্যাপার। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছিলেন 'যত মত তত পথ'। যে-পথেই যাও সত্য লাভ হবেই। সঙ্ঘের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূলে যদি থাকে পরমহংসদেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, তা হলে এটা সহজেই চোখে পড়বে যে মঠের দিনচর্যাতে জীবনের সনাতন নীতিগুলিকেই স্বামীজি রূপ দিয়েছেন। স্বামীজি চেয়েছিলেন পাকা-পোক্ত কাজ করতে, দুর্বলচেতাদের মুখ চেয়ে কোনও-কিছু রেয়াৎ করে চলা তাঁর স্বভাব ছিল না।

মঠের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্যে নিবেদিতা স্বামীজির সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বললেন, 'মার্গট, এক সময়ে দিনের পর দিন ভেবেছি কী ভাবে কাজ করলে সব চেয়ে কম বাধা পাব। এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। আমি অন্ততঃ এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। বিশ্বের ইতিহাস আসলে জনকয়েক উত্তোগী পুরুষের ইতিহাস, তাঁরাই সভ্যতার ধারক। এক জন যদি সত্যকে আশ্রয় করে কাজে হাত দেয়, দুনিয়া তার পদানত হতে বাধ্য। আমার আদর্শকে খাটো করতে পারি না; ঠিক করেছি আমার সর্তগুলো যাতে বলবৎ থাকে সেই রকম ব্যবস্থা করব'...। (১১ই মার্চ, ১৮৯৯এর চিঠি)

টাকা-পয়সায় টানাটানি চলছে, কিন্তু এর চাইতেও দুর্দিন তাঁর গেছে। চিকাগোতে একদিন ক্ষুধায় আর উদ্বেগে অর্ধমৃত হয়েছেন, এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেলেন, দেখলেন ঠাকুর ঘরে ঢুকে তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছেন, 'এই ছোঁড়া ওঠ্। লোক না পোক' (১৬ই মার্চ, ১৮৯৯এর চিঠি)। মন্ত্রের মত কাজ হল ঐ তিনটি কথায়—'লোক না পোক, একটুও না থেমে এগিয়ে চল্।' এই হুকুমের জোরেই স্বামীজি কখনও দমে যাননি। আজ মঠ সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন তাঁকে সন্ন্যাসীদের গড়ে তুলতে হবে, একটা ধারার সৃষ্টি করতে হবে। যখনই মনে হয়েছে তাঁর ছেলেরা এবার প্রেমধর্ম প্রচারের যোগ্য হয়েছে, স্বামীজি সমস্ত সঙ্ঘকে একত্র করে সবার সামনে তাঁদের নানা উপদেশ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। তাঁরা জীবসেবার ব্রত গ্রহণ করবে। তিনি বলতেন, 'তোমরা মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করবে। কাজই তোমাদের দেবার্চনা। পরের জন্য কাজ করতে করতে তোরা সবাই যদি নরকে যাস তাতেই বা কী! আত্মমুক্তির জন্য তপস্যা করে স্বর্গরাজ্য জয় করার চাইতে একে আমি ঢের বড় মনে করি।'

সন্ন্যাসীদের যে-কয়জন ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাবার জন্যই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন স্বামীজির হুকুম শুনে তাঁরা দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেলেন। স্বামীজির কাছে তাঁরা আরও কিছু সময় চাইলেন, নির্জনে আরও কিছুকাল নিজেদের নিখুঁত করে গড়তে চান তাঁরা। কিন্তু স্বামীজিকে নরম করা গেল না। তাঁর হুকুমের উপর জবাব করা চলবে না, 'যাও, এখনই বেরিয়ে পড়। কোন কাজই ছোট নয়। বলছ যে তোমরা কিছুই জান না, সুতরাং প্রচার করবে কী! বেশ তো, ঐ কথাই লোককে বল গিয়ে! এও তো একটা বলবার মত কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অসঙ্কোচে জীবন্ত করে তোল সবার সামনে!'

১৮৯৯এর মার্চে স্বামী সারদানন্দ আর স্বামী তুরীয়ানন্দ গুজরাটে গেলেন। কালীকৃষ্ণ আর স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকায়। যাদের বেশ নির্ভরযোগ্য মনে হত, এমন সব সন্ন্যাসীদের স্বামীজি নবযুগের বার্তা প্রচার করতে পাঠাতেন। আর ব্রহ্মচারীদের রাখতেন নিজের কাছে কড়া নজরে, তাদের অধ্যাত্ম-শিক্ষার ভার বিশ্বাস করে কেবল স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'পরে দিতেন। সব কাজ নিজে দেখাশোনা করতেন, কিছুই তাঁর নজর এড়াত না। ছেলেরা শক্ত-সমর্থ আর সাহসী হবে, সেই সঙ্গে ওদের স্বভাব হবে বাধ্য আর গ্রহিষ্ণু এই তিনি চাইতেন। নিষ্কাম কর্মযোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে ওরা—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

বিবেকানন্দ মঠে যে-কাজ করতেন তার কোনও বাঁধা-ধরা হিসাব করা চলে না। সে কাজের ক্ষেত্র দূরপ্রসারী। সব রকম বিরুদ্ধতা ভেঙে ফেলা, রাগ-দ্বেষ নির্জিত করা, প্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটানো—

এই সব কাজেই তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করতেন। তাঁর হাতে যে-সব ছেলে শাণিত হয়ে উঠত, তাদের দৃষ্টিতে ফুটত আশ্চর্য পবিত্রতা। কখনও এদের এক জনকে ডেকে নিয়ে নিজের কাছে সারা দিন-রাত রেখে দিতেন। সব সময় তাঁর কাছে হাজির থাকা চাই সে-ছেলের। ফলে স্বামীজির সঙ্গে তার নিবিড় অন্তরঙ্গতা ঘটত—তাঁর অন্তরের আলো ছড়িয়ে পড়ত সহচরেরও মনে।

নিবেদিতার সম্বন্ধেও স্বামীজির এমনি মনোযোগ ছিল, আর তাঁর কাছ থেকেও অমনিতর বশ্যতাই চাইতেন। নিবেদিতার মনের খবর তিনি রাখতেন। তাঁর অনুশাসনে অন্তরের নিঃসঙ্গতায় নিবেদিতা যতই অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন, ততই তিনিও তাঁর মাথায় কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে লাগলেন। বুঝেছিলেন, নিবেদিতা এবার যোগ্য হয়েছেন। তিনি চাইতেন, দেবতার সামনে অর্ঘ্য সাজিয়ে দেওয়ার মত নিরাসক্ত, অনায়াস ও নির্দ্বন্দ্ব হয়ে যেন নিবেদিতা কাজ করেন। এ-সম্বন্ধে তাঁকে একটি কথাও তিনি বলতে দিতেন না, কিংবা তাঁর চাউনিতে এতটুকু আত্মপ্রসাদ বা গর্বের ভাব ফুটে উঠতে দিতেন না। এই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব আয়ত্ত করাই নিবেদিতার পক্ষে সব চেয়ে শক্ত কাজ। ব্রহ্মচর্য দীক্ষা পাওয়ার পর ১৮৯৮এর অক্টোবর থেকে ৯৯এর মার্চ এই পাঁচ মাস এ নিয়ে নিবেদিতাকে বার বার ভুগতে হয়েছে। *

সপ্তাহে দুদিন নিবেদিতা সন্ন্যাসীদের পাঠ দিতে আসতেন। তাঁর ছাত্ররা গোল হয়ে তাঁকে ঘিরে বসেন—যেন পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতে বসেছেন সবাই। শারীর বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা, আর শিক্ষা-বিজ্ঞান নিয়ে নিবেদিতা আলোচনা করেন। খানিকক্ষণ বাদে সন্ন্যাসীদের সেলাইএর কাজে সাহায্য করেন—ও কাজটা তাঁদের পক্ষে বেশী কঠিন। সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ছোট-বড়র কথা আভাসে তুললেও স্বামীজি বিরক্ত হতেন—তিনি চান তুচ্ছতম কাজটাও নিজেরা করে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হবেন। ভারতবর্ষে কর্মের বিভাগ জাতিগত। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দিয়ে একটা অভিনব আদর্শ স্থাপন করলেন। খুব সম্ভব টমাস-আ-কেম্পিস্ থেকে বিবেকানন্দ এ-প্রেরণা পান। চাকর রাখা যে-কোনও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এমন কি কাপড় কাচা কি সেলাই করাও যে-যারটা নিজেই করবেন।

পাঁচটা বাজলে নিবেদিতা উপর তলায় ছাদে যান—সেখানে স্বামীজির ঘর। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে তিনি কাজ করছেন। নীচু ডেস্ক সামনে রেখে জনকয়েক ব্রহ্মচারী তাঁর চার পাশে বসে—তিনি মুখে মুখে বলে যাচ্ছেন, ওঁরা লিখছেন। নিবেদিতা অপেক্ষা করতে থাকেন—ইউরোপের ডাকের কাজটা তাঁর ভাগে পড়েছে। মিস্ ম্যাকলয়েড বা মিসেস্ বুলের সম্প্রতি লেখা চিঠিগুলো পড়ে শোনান। এঁরা দু'জনে ১৮৯৯এর জানুয়ারিতে ভারত ছেড়ে গেছেন। খবরাখবরের পর জরুরী কথাবার্তা হয়। কাজের কথা নিয়ে আলোচনা চলে। স্বামীজি নিজে শয্যাশায়ী, বেশী নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নাই, কিন্তু নিবেদিতাকে কাজের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। শুনতে কেমন ব্যথা বাজে বুকে। তিনি বলেন, 'সাধনার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছি না—এ-নালিশ মনে আনবে না। তোমার কাজই তোমার সাধনা, তোমার সিদ্ধি। সেই পথেই তোমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ব্যবহারিক বুদ্ধির সঙ্গে আদর্শ নাগরিকের যা-কিছু গুণ, অনাড়ম্বর দীন জীবন যাপনের স্পৃহা, শুচিতা আর পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন, এই তোমার মাঝে ফুটে উঠুক। নিজেকে এমনি করে গড়ে তুলতে পারলেই তোমার অন্তরের ধর্ম ফুল হয়ে ফুটে উঠবে। কায়মনোবাক্যে বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হও, তোমার অসীম শক্তিকে প্রকাশিত কর। যতক্ষণ এ না পারছ, শক্তিলাভের জন্য নিজেকে ঘর্ষণ কর, কঠোর তপস্যায় নিজেকে সংযত কর। কিন্তু দেরি করলে চলবে না! আমার অনুসরণ কর। আমার সঙ্গে তাল রেখে চল। শ্রীরামকৃষ্ণ বা বেদান্ত কি আর-কিছুই প্রচার করা আমার দায় নয়, আমার দায় শুধু এদেশের লোককে মানুষ করে তোল'।'

—'আমি আপনাকে সাহায্য করব, স্বামীজি!'

—'আমি জানি···' (১৮৯৯এর ১২ই মার্চের চিঠি)

একদিন স্বামীজি বললেন, 'আমার দেশবাসীকে অন্য সবার চাইতে তুমিই বোধ হয় ভাল বুঝবে। আইরিশ আর বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ধরণটা একই রকম। এদের কেবল কথা আর কথা,—বড়-বড় কথা বলে বাকচাতুরী দেখাবে। এ দু' জাতই বাকপটুত্বে সবাইকে হার মানায়, কিন্তু আসল কাজের বেলায় কিছুই করতে পারে না। তা ছাড়া এ ওর পেছনে ঘেউ ঘেউ করে আর পরস্পরের মুণ্ডপাত করেই এরা সমস্তটা সময় নষ্ট করে। ইংরেজরা আমাদের ঠিকই সমালোচনা করে। আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ত্রুটি, দেশ-জোড়া অজ্ঞতা, নোংরামি আর স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অভাব—এতেই আমরা ভুগছি—এ-অক্ষমতাগুলো অস্বীকার করবার নয়। কেন ইংরেজরা এত সহজে ভারত জয় করল? কারণ, তারা একটা ন্যাশন—আমরা এখনও তা হইনি। এক জন মহামানব দেহত্যাগ করলে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতীক্ষায় থাকি, কখন আর এক জন আবির্ভূত হবেন; কিন্তু যে চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে তার স্থান পূরণ করবার শক্তি ইংরেজদের আছে···আমাদের দেশে মানুষের মত মানুষ নাই। কেন? তার কারণ যে-সম্প্রদায় থেকে মানুষের মত মানুষ সৃষ্টি হবে পশ্চিমের চেয়ে এদেশে তার গণ্ডি অনেক ছোট। এই ত্রিশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে যে ক'টি আদর্শ-পুরুষ আছেন, তিন-চার দু' কোটি লোক-সংখ্যা যাদের সে সব জাতের মধ্যে তার চাইতে ঢের বেশী মানুষের মত মানুষ দেখা যায়। তার কারণ তাদের দেশে শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত অনেক বেশী।···জনসাধারণের আদর্শের মান উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষার ভার নিতে হবে আমাদের। শুধু এই করেই একটা জাতি গড়ে তোলা যাবে। আমাদের কাজ হচ্ছে প্রাথমিক উপকরণগুলো সংগ্রহ করা; তার পর বিধাতার নিয়মে আপনিই তা সংহত হয়ে দানা বাঁধবে। লোকের মাথায় এই সব ধারণাগুলো আমাদের ঢুকিয়ে দিতে হবে; বাকীটা তারা নিজেরা করবে। গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ নয়। দারিদ্র্য-পীড়িত রাজশক্তি সামান্যই করতে পারে, সেদিক থেকে আমাদের কোনও আশা নাই। আমাদের নিজেদের খাটতে হবে। সাহস চাই, সাহস! মুষ্টিমেয় শক্তিমান লোক দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলতে পারে।

* নবেম্বরে নিবেদিতা স্কুল খুলেছিলেন; মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম গড়বার যে-পরিকল্পনা স্বামীজির ছিল এটি তারই একটা অঙ্গ।

'মেয়েদের মধ্যে তুমি যে কাজ করবে সেও জরুরী কাজ। তাদের উদ্‌বুদ্ধ কর। ইউরোপীয়ান নারী কাপুরুষকে ঘৃণা করে, তারাই ওদেশের পৌরুষকে জাগিয়ে রেখেছে। বাঙালী মেয়েরা কবে তাদের মত পুরুষের দুর্বলতাকে নির্মম বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করবে? (১ই এপ্রিল ১৮৯৯ এর চিঠি)

এই সব বিস্ফারণের মুহূর্তে স্বামীজির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি খুলে যেত। নিজের রুগ্ন দেহের কথা ভুলে সব-কিছু বাধা ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিতে চাইতেন তিনি। তিনি যে কত অসুস্থ তা বুঝতে পেরে নিবেদিতা মিনতি করতেন আমেরিকায় যাবার জন্য, মিস্ ম্যাকলয়েডের আমন্ত্রণ স্বামীজি স্বীকার করুন। সব ডাক্তারেরা একমত হয়ে বলেছেন দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজির স্বাস্থ্য ফিরে যাবে। বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব স্বামীজি গ্রহণ করেন, কিন্তু যেমনি একটু জোর পান আরও কাজ নিয়ে পড়েন, যেতে চান না। (২৩শে মার্চ, '১৮৯৯ এর চিঠি)

তা ছাড়া দৈব তাঁর প্রতিকূল, এমন সব ঘটনা ঘটে! প্লেগ আবার দেখা দিল। এবার স্বামীজি তৈরী ছিলেন; সেবার জন্য জনকয়েক সন্ন্যাসীকে প্রস্তুত রেখেছেন। টাকা পাওয়া যাবে না, কিন্তু বাগবাজারের লোকেরা সব রকমে তাঁকে বিশ্বাস করে। তারা আগের বছর দেখেছে, সন্ন্যাসীরা কোয়ার‍্যান্টিন্ খুলেছেন, রোগীর সেবা করছেন। গভর্ণমেন্ট-প্রবর্তিত স্বাস্থ্য-বিধিগুলি জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রতিকূল, কাজেই সাধারণে ক্ষেপে ওঠে তার কথাতে। কিন্তু স্বামীজির চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি হল।

সাহায্য-সমিতি গড়বার জন্য এবার তিনি নির্ভর করলেন নিবেদিতা আর দু'জন স্বামীজির 'পরে। নিবেদিতাকে বললেন, 'পাড়াটা আমরা বাঁচাব। সে ভার তোমার উপর রইল। অনেক ঝাড়ুদার দরকার, সেজন্য লোক চাই। টাউন হলে বিশেষ সভার বন্দোবস্ত করছি, লোকের এ গা-ছেড়ে-দেওয়া ভাবটা ঝাড়িয়ে দিতে হবে। আমি সভাপতি হব, তুমি বলবে। আমি চাই কলকাতার ছাত্ররা এক জোট হয়ে নিজের হাতে বাগবাজার জঞ্জাল পরিষ্কার করবে। আমি বলি ওদের মরণের বাতিক ধরুক, সেটা কী তা জান? কাল সারাদিন আমার ছেলেদের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছি—তারা ঠিক হচ্ছে কুকুরের মত হয়ে আছে•••।'

বিধাতার এই রোষ সমস্ত নগরীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। নিবেদিতা অদম্য উৎসাহে তার সঙ্গে লড়তে লাগলেন। মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ে। প্রতিদিন এক জন করে মরছে না কি! টিকা, ওষুধ, শুশ্রূষাকারী—সব-কিছুরই অভাব। মারী-পীড়িত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে খোঁজ-খবর করেন নিবেদিতা, কাঠের ছাদ-দেওয়া একটা চালায় অস্থায়ী চিকিৎসালয় খোলেন, ক'টা বিছানা খালি হল তার হিসাব রাখেন, স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকের দল গড়েন।

এমন উদ্যমের সঙ্গে নিবেদিতা বুঝতে লাগলেন যে, পরিদর্শকদের নিয়ে গবর্ণমেন্টের হেলথ অফিসার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন, কোনও এক কমিটি তাঁর অভ্যর্থনা করবে। এসে দেখলেন, কাগজপত্র-ছড়ানো ডেস্কের সামনে একটি ব্যতিব্যস্ত মেয়ে বসে কাজ করছে। ঘরে ছোট ছোট হিন্দুর ছেলেপিলে খেলে বেড়াচ্ছে। হেলথ অফিসারকে নিবেদিতা বললেন, 'বাগবাজারটা আমরা বাঁচাব ঠিকই। সাধারণের জন্য সাধারণই এখানে খাটছে। রাস্তা থেকে প্রথম দফাতেই দু'শ পঁয়ত্রিশ টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে। আমার সহকারীরা সন্ন্যাসী—তাঁরা রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করছেন, মেথর খাটছেন। দিনে আঠারো ঘণ্টা তাঁরা খাটেন, কাজকে মনে করেন দেবসেবা'।

ছাত্ররা নিজেরা দল গড়ল। তারা চাঁদা আদায় করে, বাড়ি বাড়ি বীজস্ন বিলি করে। দেশের জন্য এই যে তাদের সেবাব্রতে হাতে-খড়ি হচ্ছে, এর বৈশিষ্ট্য কি তারা বুঝছে? এই আত্মত্যাগের মধ্যে নাগরিক জীবনের যে নব আদর্শ রয়েছে, নিবেদিতা তা তাদের বুঝিয়ে দেন। বলেন, 'একটা আদর্শের প্রেরণায় যদি ঝাড়ুদারের কাজও করা যায়; তা হলেই বৃহত্তর আদর্শের জন্য প্রস্তুতি হয়ে গেল। সে-আদর্শ কী? সেটা ঠিক করে নেওয়া তোমাদের দায়। বাগবাজারকে রক্ষা করে আমরা নতুন প্রাণ দিয়ে ভারতের ইতিহাস রচনা করলাম; এ-ইতিহাস আগে কখনও লেখা হয়নি। এই আমাদের রামায়ণ।' ভারতের কথা বলতে গিয়ে তখন 'আমরা' কথাটা আপনিই তাঁর মুখে আসত।

বোসপাড়া লেনের আশে-পাশে যে-সব রাস্তা, তাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখবার দায়টা সরাসরি নিবেদিতার উপরেই পড়েছিল। মেয়েদের এক-একটা ঝুড়ি দিয়ে বলেছেন, সব আবর্জনা এতে ফেলবে। নর্দমা অবধি রাস্তার ধার-পাশ তারা পরিষ্কার করে রেখেছে কি না খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে নিবেদিতা বাইরে যেতেন। এই ব্যবস্থাটুকু মানাতে কি কম কষ্ট করতে হয়েছে! কত বার মেয়েদের বুঝিয়েছেন, এ-সব ব্যবস্থার সঙ্গে রোগের কী সম্বন্ধ, তা তারা ধরতে পারে না। হাসতে হাসতে ওঁর কথা শুনে গেছে—ঐ পর্য্যন্তই। নিবেদিতা দু'দিন ধরে তাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে হাল ছেড়েছিলেন। তিন দিনের দিন খুব ভোরে ঝাড়ু নিয়ে নুয়ে পড়ে নিজেই ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলেন। মেয়েরা যারা এ-দৃশ্য দেখল তারা লজ্জায় বাড়ির মধ্যে লুকোল। বিকালের দিকে পাড়ায় এ-খবর ছড়িয়ে পড়ল। 'আমরা যদি রাস্তা ঝাঁটপাট না দিই, সিষ্টার নিজে দেবেন।' ব্যস, কাজ শুরু হয়ে গেল।

ত্রিশটি দিন ধরে অসহ্য গরমের মধ্যে এমনি করে যমে মানুষে লড়াই চলল। মারী বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত নিবেদিতা লেগে রইলেন। তার পর শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ে, গুরুর পায়ের কাছে ঠাঁই নিলেন।

কী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যে বিবেকানন্দ চাইলেন তাঁর দিকে! নিবেদিতার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে নিজে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার তদারক করতে লাগলেন, কবে তিনি শীগগির সুস্থ হয়ে ওঠেন। বেলুড়ের অতিথিশালায় ঝাড়া তিন দিন স্রেফ টান হয়ে শুয়ে রইলেন নিবেদিতা। এত দিন কেটেছে উত্তেজনার মধ্যে, আজ মরণের দৃশ্যগুলো মনে পড়ে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে তাঁকে। বিবেকানন্দ সান্ত্বনা দেন, উৎসাহ দেন। আস্তে আস্তে নিবেদিতার মনের দুর্বলতা কাটিয়ে দেন তিনি, তার কারণগুলো নিরুদ্ধ করতে বলেন। শুনেছেন আট বছরের একটি ছেলের কাছ থেকে স্বামী সদানন্দ নিবেদিতাকে এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। ছেলেটি নিবেদিতার কাপড় আঁকড়ে ধরে 'মা, মা, মাতাজী, মাগো' বলতে বলতে মারা যায়। সেই আর্তনাদ এখনও নিবেদিতার কানে

যাচ্ছে। কেন তিনি ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলেন না? তাঁর ভালবাসা মরণের মুখ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, কেন পারল না?

ব্যাধিগ্রস্তের যন্ত্রণা লাঘব করবার অদম্য বাসনা কেন তিনি ছাড়তে পারেন না? মরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগেছে তাঁর মনে, এতেই তিনি ফাঁদে পড়েছেন। গুরু এ-কথা বুঝিয়ে দিতেই নিবেদিতার চোখ খুলল।

মানুষকে ভালবেসে এই মাত্র নিবেদিতা বিরাট ত্যাগের অগ্নি-পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। এখনও চিত্তের পূর্ব সবলতা ফিরে পাননি, সুতরাং নরম মনের প্রতিক্রিয়া এখন প্রবল। সুযোগ বুঝে স্বামিজি এবার নতুন এক ত্যাগের মন্ত্র দিলেন তাঁকে, বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন কর্মের কোন্ আদর্শ নিবেদিতাকে গ্রহণ করতে হবে। 'ভালবাসাকে ছাপিয়ে ওঠে যে-কর্ম তাকে চিনে নাও। সৃষ্টির আনন্দে নির্ঝরিত স্রষ্টার যে-প্রেম, তাই তাঁর কর্ম।'

গুরুর কথা যখন শেষ হল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অনেকেই এসে তাঁদের চার পাশে বসেছেন।

হঠাৎ মৌন ভেঙে পরিষ্কার ভাষায় নিবেদিতা বলে উঠলেন, 'স্বামীজি, আমি শেষের ব্রত দীক্ষা নিতে চাই।' কথার ধরণটা একেবারে নৈর্ব্যক্তিক।

স্বামীজি উত্তর দিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার প্রতীক্ষায় আছেন।' নিতান্ত সাদা কথা!

সেই দিনই রাতে বন্ধুকে নিবেদিতা লেখেন '……২৫শে, শনিবার। যখন আমাকে "চিরদিনের মত সঙ্ঘের এক জন" করে নিতে বললাম, আমার রাজা তাতে সায় দিলেন। বললেন, "কাল সকালে দু'টি তরুণকে এ-অধিকার দিয়েছি।" আমার সাধ ছিল ঠিক সময়ে তোমরা যেন কোনও রকমে জানতে পার। প্রথম দীক্ষার পর্ব এক বছর পার হয়েছে।' (১২ই মার্চ, ১৮৯৯ এর চিঠি।)

ঊনবিংশ অধ্যায়

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী

নির্দিষ্ট দিনে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার পেলেন।

শিক্ষানবিশীর পর্বটা খুব অল্প দিনেই কেটে গেল। এই সময় সন্ন্যাস-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য যে 'শৈক্ষ্য' ও 'বৈরাগ্য'—এই দু'টি বৃত্তি তাঁর আরও প্রখর হয়ে উঠছিল। নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্য, খৃষ্টান মঠের সন্ন্যাসীরা যে ভাবে জীবন কাটান সেই ভাবে নিবেদিতা সংযম অভ্যাস করতেন। ভোরের আগেই ওঠা, রাত্রে ধ্যান করা, দিনে একবার মাত্র খাওয়া, নিয়মিত উপবাস-ব্রত রক্ষা করা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হতেন। নিয়মগুলো নিরবচ্ছেদে মেনে চলাই হল কঠিন কাজ। কঠোর আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা চিন্তাগুলোকে শাসন করা বা চিত্তকে একাগ্র রাখবার অবিচল প্রয়াস নিবেদিতার পক্ষে কঠিন হয়নি। পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করার কৌশলটাও আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই মানস-তপস্যার অঙ্গ শুধু।

এখন যে-ভূমিতে নিবেদিতা এসেছেন, সেখান থেকে আগে যা একেবারে নিশ্চিন্ত বলে মনে হত তা নিতান্তই আবছা ঠেকে—যেন ওগুলো প্রথম পাঠ। আজ আরও কঠোর বৈরাগ্যের ভূমিতে আরূঢ় হতে চলেছেন, বাইরের সাহায্য এখন আর কোনও কাজেই লাগবে না। আত্মসচেতন হয়ে যতই পরম গুরুর সন্ধান পাচ্ছেন ততই তাঁর বন্ধু তাঁর দিশারী যে-গুরু, তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন। নিয়ম-সংযমে যে-শক্তি তিনি অর্জন করেছেন, জীবসেবার উদ্দেশে তা ব্যয় করতে হবে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'এ-সব কর্মী "ধর্মসেনাদের" চলার পথে কুলি-মজুরের কাজ করে যায়।' একদিন নিবেদিতাকেই বললেন, 'মনে রেখ, উপাসনা হল উন্নততর অধ্যাত্ম-জীবনের প্রস্তুতি।'

বুদ্ধির দিক দিয়ে এ-সব বিষয়ে সচেতন থাকলেও দীন হতে শিখেছেন নিবেদিতা। গুরুর হাতে তিনি খেলার পুতুল, তাঁর প্রত্যেকটি কথা মেনে চলাই নিবেদিতার কাজ।

তাঁর শেষ দীক্ষার নিতান্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটি নিবেদিতা স্বয়ং এই ভাবে বর্ণনা করেছেন:

"…কাল, প্রথম দীক্ষার ঠিক এক বছর পরে আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হলাম।'

"আটটার সময় মঠে পৌঁছে ভজন-ঘরে গেলাম। সেখানে পূজার ফুল না আসা পর্যন্ত, মেঝেতে বসে রইলাম আমরা। রাজা বুদ্ধের কথা বলতে লাগলেন আমাকে। খুব সময়োপযোগী আর সুন্দর আলোচনা। চিরন্তন আদর্শের কথা বার বার বলতে লাগলেন স্বামীজি—মুক্তি নয়, ত্যাগ—আত্মোপলব্ধি নয়, আত্মাবসর্জন।

"তার পর সব উপকরণ এসে গেলে তিনি আমায় পূজো করতে শিখিয়ে দিলেন। এত দিনে, আমার চির সাধের শিবপূজা করবার শিক্ষা পেলাম তাঁর কাছে। দু'জনে মিলে পূজা করলাম। মা যেমন আদর করে ছেলেকে শেখায়, সারাক্ষণ তেমনি মিষ্টি সুরে মন্ত্র পাঠ করে আমায় পূজো করতে শেখালেন। দশাবতার স্তোত্র পাঠ করে পূজা শেষ হল।

"যখন ফুল দিয়ে বেদী সাজিয়ে দিয়েছি, স্বামিজী বললেন, 'এবার আমার বুদ্ধকে কিছু ফুল দাও, আমি ছাড়া এখানে আর কেউ তাঁকে পছন্দ করে না।'—যারা তাঁর কাছে পথের দিশা খুঁজতে এসেছে আজ যেন তাঁদের সবাইকে সম্বোধন করে কথা কইলেন স্বামীজি, অথচ আশীর্বাদ করছেন আমাকে, 'যাও, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পাঁচশ' বার পরার্থে জীবন দান করেছেন তাঁকে অনুসরণ করে চল!'

"পূজা শেষ হলে হোম করবার জন্য নীচে নেমে এলাম।" (নিবেদিতার ২৫শে ও ২৬শে মার্চের (১৮৯৯) চিঠি আর 'মাই মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম' হতে সঙ্কলিত।)

এবার সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের সম্মুখে নিবেদিতাকে অপরিগ্রহ, শৌচ আর ব্রতনিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করতে হবে, আজীবন সে ব্রত রক্ষা করবে। হোমের আগুনে তাঁর সর্বস্ব তিনি আহুতি দেবেন। হোমাগ্নিতে ঘি, ফুল-ফল, দুধ, বেলপাতা আর সব ইত্যাদি আহুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সন্ন্যাসীরা সমস্বরে মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। নিবেদিতার জন্য এই মন্ত্র হল, 'যিনি সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছেন, যিনি বীতক্রোধ, অদ্বেষ্টা, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী, দান, শৌচ, সত্য আর অহিংসাই যাঁর জীবন, তিনিই ধন্য। তিনি ঈশ্বরে লগ্নচিত্ত, তাঁর সমস্তই ভগবানে অর্পিত…'

গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি নিবেদিতার এবং সমবেত সন্ন্যাসীদের কপালে ভস্মতিলক পরিয়ে দিলেন। সে-ভস্ম অগ্নিশুদ্ধ নিবেদিতার নিজেরই জীবনের দগ্ধাবশেষ।

এক জন সাধু গেয়ে উঠলেন, 'হে অগ্নি, হে পাবক, হে অমৃত, হে বনস্পতি, হে প্রাণ, নৈঃশব্দের সাক্ষী হে দ্যুলোক, হে গুরু, এই দেখ, আমার পার্থিব যা-কিছু এই অগ্নিতে আহুতি দিলাম, আহুতি দিলাম আমার অহংকে। হে অগ্নি, আমায় গ্রাস কর, আমার কিছুই যেন অবশিষ্ট না থাকে। হরি ওম্ তৎসৎ হরি ওম্ তৎসৎ।'

একে একে সবাই চলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে বয়সে প্রাচীন এক জন নিবন্ত আগুনের দিকে একবার চেয়ে অপেক্ষমানা ব্রহ্মচারিণীর দিকে চাইলেন, কাছ ঘেঁষে যাবার সময় নিবেদিতার পা ছুঁয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

সে দিন নিবেদিতা মঠেই রইলেন। দুপুরে খাওয়ার পর তাঁকে ডেকে পাঠালেন স্বামীজি, দু'ঘণ্টা কাছে রাখলেন। সাদা পোষাকের উপরে নিবেদিতা রুদ্রাক্ষের মালা পরেছেন। যে-ভাস্বর শান্তির সন্ধান গুরু তাঁকে দিয়েছেন তার জন্য নিবেদিতার অন্তর কৃতজ্ঞতায় উছলে উঠছে। মনে হয় সব যন্ত্রণার অবসান হল এবার। গোলামী না করে ভালবাসতে পারবেন তিনি। ভয়ের সাগর পাড়ি দিয়ে আলোকতীর্থে পৌঁছেছেন আজ।

মনে মনে ভাবেন, 'স্বামীজি যদি হঠাৎ একটা হতভাগা মাতাল হয়ে পড়েন, অসহায়ের মত অধঃপাতে তলিয়ে যান, কার ভালবাসা তাঁকে ঘিরে থাকবে? তিনি যে দেবতাকে জীবন থেকে বিসর্জন দিয়েছেন এ জেনেও ক'জন শিষ্য তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে না? কেবল তাঁর ক'জন গুরুভাই তাঁর বিরাট চিত্তের ঔদার্যকে একই চোখে দেখবেন। তিনি নব যুগের বাণী প্রচার করেছেন দিকে দিকে, সবার পুরোধা হয়ে ঘোষণা করেছেন, "এস তোমরা, যারা আজও সংসারের দোলায় দুলছ, এস তারা—আমরা আলোর সন্ধান পেয়েছি।"

সম্ভবতঃ এই গুরুভাইরাই কেবল তাঁর দিব্য ভাবকে মানুষ ভাবের থেকে আলাদা করতে পারবেন, হীরার গায়ে যে মাটি-ময়লা তা উপেক্ষা করতে পারবেন···।

বিবেকানন্দ তাঁর মনের ভাবটা অনুমানে বুঝলেন।···'মার্গট, মনে রেখ, আধ ডজন লোকও যদি এই রকম ভালবাসতে শেখে তা হলেই একটা নতুন ধর্মের উদ্ভব হয়···তার আগে হয় না। আমার সব সময় মনে পড়ে সেই মেয়েটির কথা—ভোর বেলা মহাসমাধির প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, একটা গলার স্বর শুনতে পেয়ে ভাবল বুঝি মালীর। তখন যিশু এসে তাঁকে স্পর্শ করলেন। "ঠাকুর! আমার ঠাকুর।" ···এ ছাড়া আর-কিছুই সে বলতে পারল না। তিনি তখন চলে গেছেন।···অমন গোটা-ছয়েক শিষ্য আমায় দাও, আমি জগৎ জয় করব···

সেদিন সন্ধ্যায় শুতে যাওয়ার আগে নিবেদিতা বন্ধু 'য়ুমের' (মিস্ ম্যাকলয়েড) কাছে অন্তরের আকৃতিকে রূপ দিলেন······

'হে তেজস্বরূপ! আমায় তেজ দাও—
তুমি শক্তিস্বরূপ, আমায় শক্তি দাও—
বজ্র-বীর্যে উদ্বোধিত কর আমায়—
জীবন-ব্রত পালন করবার শক্তি দাও!'

তার পর লিখলেন—'মনে হয় দুই কারণে উনি আমায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী করলেন। প্রথমত, প্রাচীন প্রথাটা আবার চালু করতে চান, দ্বিতীয়ত, স্বামীজির দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় আর-কিছু পাওয়ার জন্য প্রস্তুত নই আমি। এটা সত্যি কথা। কখনও যদি এর পরের স্তরে যেতে হয় তার জন্য পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে চাই।'

চিঠিতে তারিখ দিলেন, 'এ্যানানসিয়েশান উৎসব, ২৫শে মার্চ'। দেবতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য ঐ দিনটিই নিবেদিতা বেছে নিয়েছিলেন। দিব্য আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দে গান গেয়ে উঠল তাঁর অন্তর: 'দেবতার মহিমাই প্রকাশিত হবে আমার মাঝে······তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

আপনি কি জানেন?

১। "আমি আমার জন্মভূমি "মণ্টুয়া" নগরে ফিরে গিয়ে একটি মর্মর-মন্দির তৈরী ক'রবো এবং মন্দিরের তোরণশীর্ষে হেম ও গজদন্তে গঙ্গারাঢ়ীদের বীরত্বকাহিনী লিখে রাখবো।"—বাঙালীর এই বীরত্বের গাথা লিখতে চেয়েছিলেন কে?

২। ভারতের নেপোলিয়ন কে ছিলেন?

৩। বীরত্বের জন্য "গৌর-ভুজঙ্গ" উপাধি কে পেয়েছিলেন?

৪। বাঙলার বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন?

৫। এক জন বিখ্যাত হিন্দু, মুসলিম ধর্ম গ্রহণের সময় থেকে "মহম্মদ ফর্মুলি" নাম গ্রহণ করেছিলেন, কে তিনি?

(উত্তর ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহাকবি সেক্‌সপিয়র রচিত

ম্যাকবেথ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত

২য় অংক

১ম দৃশ্য

(ম্যাকবেথের দুর্গপ্রাসাদের বহিরঙ্গন ;
মশাল হস্তে ফ্লিয়েন্স ও ব্যাংকোর প্রবেশ)

ব্যাংকো। রাত্রি কত ?
ফ্লিয়েন্স। চাঁদ অস্ত গেছে, শুনিনি ঘণ্টার ধ্বনি।
ব্যাংকো। চাঁদ ডুবিবার কথা রাত বারোটায়।
ফ্লি। আরও কিছু বেশী হ'তে পারে।
ব্যাংকো। ধর তরবারি মোর,—
সব বাতি নিবায়েছে কৃপণ আকাশ,—
এও ধর। তন্দ্রাভারে ভারী দেহ
পাথরের মতো ; তবু ঘুমাব না। দয়া কর
হে দেবতা, যে সব বিষাক্ত চিন্তা
ভরি তুলে তন্দ্রাতুর মন, রক্ষা কর
সে সকল হ'তে।
(মশাল হস্তে পরিচারক ও ম্যাকবেথের প্রবেশ)
—দাও তরবারি, কে ওখানে ?
ম্যাক্। বন্ধু।
ব্যাংকো। সে কি বন্ধু, এখনও বিশ্রাম নাই তব ?
শয্যায় শায়িত রাজা, আনন্দ ধরে না
আজ হৃদয়ে তাঁহার ; তব ভৃত্যগণে
পাঠালেন বহুমূল্য উপহার। এই
হীরকাঙ্গুরীয় দিয়াছেন তিনি
পুণ্যবতী গৃহস্বামিনীরে।
ম্যাক্। প্রস্তুতির পাইনি সময়, তাই মোর
বহু ত্রুটি ঘটে গেছে আজ,
সাধ্য-অনুযায়ী সাধ পারিনি মিটাতে।
ব্যাংকো। হ'য়েছে ত সর্বাঙ্গসুন্দর।
কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম পুনঃ সেই
ভাগ্যবিধায়িনী ভগ্নীত্রয়ে। যা বলিল
তারা, তোমাতে কিছুটা তার হ'য়েছে সফল।
ম্যাক্। ছেড়েছি তাদের চিন্তা। তবু অবসর
হ'লে সে বিষয়ে তব সাথে হবে আলোচনা।
ব্যাংকো। বেশ, যত শীঘ্র অবসর হয় তত ভাল।
ম্যাক্। আমার সম্মতি সাথে যদি তব মত
পার মিলাইতে, অবশ্য বাড়িবে তাহে
তোমার সম্মান।
ব্যাংকো। আপত্তি কিছুই নাই,
যদি তাহে এ অন্তর অকলংক রহে,
প্রজার কর্তব্য যদি ক্ষুণ্ণ নাহি হয়।
ম্যাক্। বিদায়, নির্বিঘ্ন হোক্ রাত্রির বিশ্রাম।
ব্যাংকো। ধন্যবাদ, আমারও কামনা তাই।
[ব্যাংকো ও ফ্লিয়েন্সের প্রস্থান।
ম্যাক্। (ভৃত্যকে) যাও, কহ গিয়া গৃহস্বামিনীরে
পানীয় প্রস্তুত হ'লে করে ঘণ্টাধ্বনি।
ঘুমাইতে যেতে পার তুমি।
[ভৃত্যের প্রস্থান।

এ কি দেখি সম্মুখে আমার ? ছোরা নয় ?
আমার হাতের পানে বাড়ায় হাতল ?
বেশ, এই তোরে ধরিনু মুঠায়। কোথা ?
মুঠায় ত কিছু নাই, অথচ সম্মুখে দেখি তোরে !
মারাত্মক মায়া-দৃশ্য, তুই কি রে তবে
স্পর্শে নাই, আছিস দর্শনে ? কিম্বা মোর
মানসী ছুরিকা উত্তপ্ত মস্তিষ্কজাত
ভ্রান্তির সৃজন। এখনও ত দেখি তোরে,
কটি হ'তে যে ছুরিকা করিনু বাহির
তারি মতো ধরা-ছোঁয়া যায় মনে হয়।
বুঝিলাম, যে পথে চ'লেছি আজি, তুই
সেই পথের দিশারী, তুই আজ
এ হাতের হবি প্রহরণ।
হাতের স্পর্শন আর চোখের দর্শন
কে সত্য কে মিছে ? কে কারে
করিছে প্রতারণা ? এখনো দেখি যে তোরে ;
ফলকে মুষ্টিতে তোর বিন্দু বিন্দু
জমাট শোণিত, আগে ত ছিল না ওরা।
বুঝিয়াছি, কিছু নয় রক্তের আকাঙ্ক্ষা মোর
সৃজিতেছে চোখের বিভ্রম।
মৃতপ্রায় অর্দ্ধেক ধরণী, ঘরে ঘরে
সুখসুপ্তি দুঃস্বপ্নসংকুল, পিশাচেরা
অর্ঘ্য দেয় চামুণ্ডা-চরণে, দিকে দিকে
সতর্ক শার্দ্দূল প্রহর জানায় হুহুংকারে ;
তারি মাঝে চলিয়াছে রুদ্ধশ্বাস
নিঃশব্দ-চরণ প্রেতসম বিশীর্ণ ঘাতক
হরিতে সুষুপ্তিময় নিষ্কলংক প্রাণ।
অয়ি স্থিরা কঠিনা ধরণি,
শুনো না এ পদধ্বনি গোপন সঞ্চারপথে,
কি জানি মর্মরি উঠি তোমারি পাষাণ
ভেঙে দেয় যদি এই নিশীথের বীভৎস স্তব্ধতা,
ব্যর্থ করে এ মহা সুযোগ।
আমার বিলম্বে বাড়ে তারই পরমায়ু,
কর্মে জুড়াইয়ে দেয় বৃথা বাক্য-বায়ু।

(ঘণ্টাধ্বনি)

যাই, আসিয়াছে ঘণ্টার আহ্বান ;
এ ধ্বনি শুনো না ডান্‌কান্‌,
কে বা জানে স্বর্গে না নরকে
কোথায় মিলিবে তব স্থান।

[প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

(পূর্ব্বোক্ত স্থান : লেডি ম্যাকবেথের প্রবেশ)

লেডি ম্যাক্। যে পানীয় পানে ওরা নেশায় বিবশ
আমারে তা দিল দুঃসাহস ; ওদের নিবা'ল যাহা
জ্বালিল আমায়। চুপ। ওকি শব্দ!
পেচকের ধ্বনি, মৃত্যুদূত শুভরাত্রি
করিল জ্ঞাপন মহানিদ্রাপথে। এতক্ষণ গিয়াছে
সে ঠিক ; সব দ্বার রাখিয়াছি খোলা,
সুরামত্ত রক্ষিগণ ঘোর নাসারবে
রক্ষিতেরে করিছে বিদ্রূপ। বিষমিশ্র
পানপাত্র দিলাম ওদের, অচেতন দেহ ল'য়ে
জীবনে মরণে যেন হয় টানাটানি।

ম্যাক্। (ভিতর হইতে) কে রে ? কে ওখানে ?

লেডি ম্যাক্। হায় হায় জাগে বুঝি ওরা অসমাপ্ত
কার্য্যমাঝে। প্রয়াস হইল, কার্য্য হ'ল না সাধিত
তা হ'লে ঘটিবে সর্বনাশ। চুপ! ওদের ছুরিকাগুলি
যথাস্থানে কোরেছি স্থাপন, নিশ্চয়
পড়িবে তাঁর চোখে। যদি নাহি হেরিতাম
নিদ্রিতের মুখে আপন পিতার মুখ
নিজে করিতাম আমি সে কার্য্যসাধন।
কে ? তুমি!

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

ম্যাক্। কার্য্য শেষ। কি একটা শব্দ শোন নাই!

লেডি ম্যাক্। ঝিঁঝির কান্না আর প্যাঁচার চ্যাঁচানি।
তুমি কথা কয়েছিলে ?

ম্যাক্। কখন্!

লেডি ম্যাক্। এখনি।

ম্যাক্। যখন নামিয়া এনু ?

লেডি ম্যাক্। হ্যাঁ!

ম্যাক্। ওই শোন! কে ঘুমায় পাশের ও ঘরে ?

লেডি ম্যাক্। ডে'ন্যালবেন্।

ম্যাক্। (নিজ হাতের দিকে চাহিয়া) কী করুণ দৃশ্য!

লেডি ম্যাক্। এ কি পাগলামি ? কারুণ্যের কি রয়েছে ?

ম্যাক্। ঘুমাতে ঘুমাতে এক জন উঠিল হাসিয়া,
আর জন করিল চীৎকার—"খুন! খুন!!"
এ উহারে দিল জাগাইয়া। দাঁড়াইয়া
শুনিলাম সব। কিন্তু তারা দেবতারে—
করিয়া স্মরণ, পুনরায় পড়িল ঘুমায়ে।

লেডি ম্যাক্। দুই জনই আছে ওই ঘরে।

ম্যাক্। এক জন কহিল কাতরে—'ভগবান্ রক্ষা কর!'
আর জন উচ্চারিল 'ভগবান্!'
যদি তারা দেখে থাকে মোরে
ঘাতকের বেশে পাশে রয়েছি দাঁড়ায়ে!
দু'জনে কহিল যবে 'ভগবান রক্ষা কর!'
মোর মুখে এল না সে নাম।

লেডি ম্যাক্। অতটা গভীর ভাবে ভেব না এ সব।

ম্যাক্। কিন্তু, কেন ? কেন নাহি পারিলাম
ডাকিতে তাঁহারে ? যে নামে আমারই ছিল
সব হ'তে বেশী প্রয়োজন, সে নাম
এল না কণ্ঠে মোর।

লেডি ম্যাক্। এ সব কাজের চিন্তা এ পথে করিলে—
উন্মাদ হইতে পারি মোরা।

ম্যাক্। মনে হ'ল, কে যেন কহিল—
'আর ঘুমায়ো না,
ঘুমেরে করিল হত্যা ম্যাক্‌বেথ আজ।'
ঘুম, নিষ্কলংক ঘুম,
যে দেয় খুলিয়া যত দুশ্চিন্তার জট,
দৈনন্দিন জীবনের নিশ্চিন্ত মরণ,
সকল শ্রান্তির সুখস্নান,
ক্ষতচিত্তে সুস্নিগ্ধ প্রলেপ,
পরমা এ প্রকৃতির অদ্বিতীয় দান,
শ্রেষ্ঠ হবি প্রাণযজ্ঞে,—

লেডি ম্যাক্। কী সব কহিছ কথা ?

ম্যাক্। তবুও সে, পুরীমাঝে সবারে ডাকিয়া
কহিল চীৎকারি,—"ঘুমায়ো না আর ;
ঘুমেরে করিল হত্যা গ্লামিস-সর্দার,
কডোর সর্দার কভু ঘুমাবে না আর,
আর ঘুমাবে না ম্যাক্‌বেথ।"

লেডি ম্যাক্। কে সে, কহিল যে ঐ সব কথা ?
শোন স্বামী, কেন বৃথা ক্ষয় কর আপন শক্তিরে
যত সব উন্মাদ চিন্তায় ?
যাও, জল নিয়ে ধুয়ে ফেল পাপ-নিদর্শন
আপনার হাত হতে।
ছোরাগুলো কেন নিয়ে এলে ?
ওগুলো যে এখানে থাকিবার কথা।
যাও, রেখে এস, আর
রক্তে মাখাইয়ে এস ঘুমন্ত রক্ষীরে।

ম্যাক্। সেখানে যাব না আমি ;
যা কোরেছি, ভাবিতেও ভয়,
চোখে দেখা,—নয় আর নয়।

লেডি ম্যাক্। কী দুর্বল মন তব!
ছোরা ক'টা দাও মোরে।
মানুষ ঘুমন্ত মৃত,—চিত্রে আঁকা ছবি ;
বালকেই ভয় করে পটের পিশাচে।
যদি দেখি তখনও ক্ষরিছে রক্ত,
সে রক্তে রঞ্জিয়া দিব রক্ষীর বদন,
হত্যাকারী সাজাব তাদের।

[প্রস্থান, ভিতরে শব্দ।

ম্যাক্। কোথা হতে শব্দ আসে! কি হল আমার ?
প্রতি শব্দে উঠি চমকিয়া।

ঢেঁকি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে ঢেঁকি, তুমি কি ভানিবেই শুধু ধান ?
পাবে নাকো সুর-শিল্পীর সম্মান ?
সুরও রয়েছে রয়েছে নৃত্য,
রমণীর পদাঘাত,
তোমার বুকেতে অশোক ফোটেই
সে আঘাতে নির্ঘাত।
শব্দ তোমার আঁকে মোর মনে
সারি সারি শুধু ছবি।
তবুও নহ কি কবি ?

নিশিশেষে তব শব্দেতে রূপ লভি'
জাগে কি কেবলি পৌষ-পার্ব্বণ ছবি ?
আমি তাতে পাই আইসেনহাওয়ার
চার্চ্চ হলের রব,
চক্ষেতে ভাসে টিটো মোসাদেক
ড্যালাস্ ম্যালেনকফ।
স্মৃতিতে জাগায় 'পানমুনজন'
ডিয়েংবিয়েনের লাও,
কেনিয়ার মাও মাও।

তোমার মতন কর্ম্মী সহিছে ক্লেশ,
দুর্ভাগা জাতি অতি দুর্ভাগা দেশ।
নারদ মুনির বাহন তুমি যে,
সংসারীদের প্রিয়,
রাষ্ট্রে সমাজে মাঝে মাঝে তব
পরিচয়টুকু দিয়ো।
'আমড়া কাঠে'র ঢেঁকি নহ তুমি
'হেয়ো ঢেঁকি' তুমি নহ,
কেন এত ব্যথা সহ ?

ধান চিঁড়া কুটি সেবিতেছ এই ভূমি,
কূটনীতিবিদ্ হবে নাকো কেন তুমি ?
বুদ্ধির ঢেঁকি, তোমাকে আবার
উপরোধে গেলা যায়,
দেবর্ষির যে শাশ্বত পেশা
তোমাতেই শোভা পায়।
'আশানন্দ'কে শক্তি দিয়াছ
তব জয়গান গাই
সম্মান তব চাই।

মৌনের যুগ জানো এটা নহে হায়—
বিশ্ব এখন বাণী—শুধু বাণী চায়।
প্রতিষ্ঠা তুমি অচিরে লভিবে
বুঝেছ ধরার রীত,
ধান ভানিতেই যা-কিছু সুযোগ—
গাহিতে শিবের গীত।
ঘরের ঢেঁকি যে তোমার রয়েছে
অনেক সুবিধা আরও
কুমীর হতেও পারো।

স্বর্গে গেলেও ভানিতে হইবে ধান,
যে বলে তোমাকে উঠাতে দিও না কান।
দীন জনগণ-দরদী যে তুমি
কর বটে দুখভোগ,
আছে নারদের বীণার সঙ্গে
তোমার গীতের যোগ।
সমানধর্ম্মা যাঁরা তব গানে
এত ভাব খুঁজে পান,
তাঁরাও ভাগ্যবান।

এ কেমন হাত ?
উঃ, উথারিয়া আনে চক্ষু মোর !
হাতের এ রক্ত, এ কি
নিঃশেষে ধুইতে পারে সপ্ত সিন্ধুজল ?
নাঃ, এ হাতই রাঙিয়া দিবে ক্ষুব্ধ মহার্ণব,
লালে লাল হয়ে যাবে শ্যাম অঙ্গ তার।

(লেডি ম্যাকবেথের প্রবেশ)

লেডি ম্যাক্। তোমার আমার হাত একই রক্তে রাঙা।
কিন্তু আমি লজ্জা পাই, স্বামী,
বহিবারে পাংশু হৃদি তোমার মতন।

[ভিতরে শব্দ]

শব্দ শুনি দক্ষিণের দ্বারে;
চল মোরা নিজ কক্ষে করি গে শয়ন।
সামান্য কিছুটা জলে সারা হবে কাজ,
এ ত অতি সহজ ব্যাপার।
স্থৈর্য্যহারা হইয়াছ তুমি।

[ভিতরে শব্দ]

ওই শোন, পুনঃ শব্দ হয়, পর শীঘ্র শোবার পোষাক,
পাছে কেহ আমাদের দেখে এই ভাবে।
আপন চিন্তার মাঝে
অমন যেয়ো না ডুবে অসহায় সম।

ম্যাক্। যে কাজ কোরেছি তাহা জানিতে হইলে
আপনারে না জানাই ভাল।

[ভিতরে শব্দ]

শব্দ কোরে জাগাবে ডানকানে !
পার যদি ভাল।

[প্রস্থান।

[ক্রমশঃ

Interesting Historical Events, Relative to Provinces of Bengal, And the Empire of Indostan. With a Seasonable Hint and Perswasive to the Honourable The Court of Directors of the East India Company. As Also the Mythology and Cosmogony, Fasts and Festivals of the Gentoos, Followers of the Sastah. And a Dissertation on the Metempsychosis, Commonly, though erronously, called the Pythagorean Doctrine.

হলওয়েল বর্ণিত ভারতের কথা

অনুবাদক—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

[ভারতবর্ষ চিরদিনই বিশ্বের বিস্ময় হোয়ে আছে। এ দেশের দর্শন, বিজ্ঞান, ভাস্কর্য—এখানকার সঙ্গীত, সাহিত্য ও কারুশিল্প বিশ্বের বিদগ্ধ জনকে আকর্ষণ করেছে চিরকাল ধরে। এই আর্য্যাবর্ত্তে অতি প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পর্যটক এসেছেন নানা আকর্ষণে। কেউ বা এখানকার ধর্ম গ্রহণ ক'রে পুরোপুরি ভারতীয় বনে গিয়েছেন, কেউ কেউ বা দীর্ঘ দিন এখানে বাস ক'রে এ দেশ সম্বন্ধে তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন স্ব স্ব মাতৃভাষায়। ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত বিদেশীদের দ্বারাই লিখিত হয়েছে বলা চলতে পারে।

ইংরেজরা এদেশে আসার পর, সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে আরম্ভ ক'রে কিছু কাল আগে পর্যন্তও এদেশের ইতিহাস, কথা, কাহিনী, কিংবদন্তী প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইংরেজরা এদেশে আসার—সেই প্রথম যুগের একখানা তথাকথিত ঐতিহাসিক বই নিয়ে আমরা এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এই সঙ্গে বইখানার অনুবাদও দেওয়া হচ্ছে। বইখানার লেখক হচ্ছেন—জে. জেড. হলওয়েল। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে সামান্য চাকরী নিয়ে এখানে এসে কলকাতার গবর্ণর পর্যন্ত হয়েছিলেন। ইনিই সেই ইতিহাস-কুখ্যাত হলওয়েল, যাঁর বর্ণিত কলকাতায় অন্ধকূপ হত্যার অলীক কাহিনী প্রায় দেড়শো বছর ধরে ভারতের ইতিহাসের বুকে চেপে বসেছিল। তাঁর বইখানির নামও চমকপ্রদ। নামটি অনুবাদ করবার পূর্বে পাঠকসমাজের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মূল ইংরেজীটি উপরে উদ্ধৃত করা গেল।

এত বড় নামের এক কথায় কোনো প্রতিশব্দ হওয়া সম্ভব নয়। আমরা সুবিধার জন্য বইখানির একটি সংক্ষিপ্ত নামকরণ করলুন—"হলওয়েল বর্ণিত ভারতের কথা।"

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যখন মোগল-সূর্য ঢলে পড়েছে এবং অন্য দিকে বৃটিশসূর্য উঠে পড়বার ফাঁক খুঁজছে—এই গুরুতর সময়ে বইখানা লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া লেখক প্রকৃত পক্ষে ঠিক ঐতিহাসিক না হোলেও তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। সে দিক দিয়েও তাঁর বর্ণিত এই কাহিনীগুলির কিছু মূল্য আছে। প্রায় দুশো বছর আগের লেখা এই রচনার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের ইংরেজী রচনাভঙ্গীর অনেক প্রভেদ আছে। আমরা অনুবাদেও সেই রচনা-ভঙ্গীটি বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি।—অনুবাদক]

হলওয়েল কে ছিলেন?

হলওয়েলের পুরো নাম হচ্ছে—জন জেফানিয়া হলওয়েল (১৭১১—১৭১৮)। তাঁর পিতার নাম ছিল জেফানিয়া হলওয়েল, ইনি কাঠের কারবার করতেন। জন ১৭১১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। রট্যারডামের নিকটবর্ত্তী রিচমণ্ড ও আইসেলমণ্ড নামক স্থানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে গাইয়ের হাসপাতালে (Guy's Hospital) চিকিৎসা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষগামী একখানি জাহাজের প্রধান চিকিৎসকের সহকারীরূপে তিনি কলকাতায় আগমন করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনাস্থিত ফ্যাক্টরিতে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এখান থেকে ঢাকায় বদলী হোয়ে সেখানে কিছু কাল কাটিয়ে কলকাতায় আসেন। হলওয়েল কাজের লোক ছিলেন—ক্রমে পদোন্নতি হওয়ায় তিনি কোম্পানীর প্রধান চিকিৎসক হন। তিনি দু'বার মেয়র হয়েছিলেন এবং তাঁর কাজের পুরস্কারস্বরূপ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার জমিদারী তাঁকে দেওয়া হয় সারা জীবন ভোগ করবার জন্য।

সতেরশ' ছাপ্পান্ন খৃষ্টাব্দের আঠারই জুন তারিখে সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতার কোর্ট আক্রমণ করেন। পরের দিন অর্থাৎ উনিশে জুন তারিখে গভর্ণর ড্রেক ও অন্যান্য আরো অনেক ইংরেজ জাহাজে চ'ড়ে যখন সমুদ্রের দিকে লম্বা দেন, সেই সময় হলওয়েলকে দুর্গরক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল।

তথাকথিত অন্ধকূপের একশ' ছেচল্লিশ জন বন্দীর মধ্যে যে তেইশ জন জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হলওয়েল অন্যতম। বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে নীত হবার পর সতেরই জুলাই তারিখে মুক্তিলাভ ক'রে তিনি ফলতায় পলাতক ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

সতেরশ' সাতান্ন খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হলওয়েল ইংলণ্ড যাত্রা

করেন এবং ক্লাইভের স্থলে বাংলা দেশের অস্থায়ী গভর্ণরের কাজ নিয়ে আবার এ দেশে ফিরে আসেন, পরে ভ্যানসিটার্ট এসে তাঁকে এই কার্য থেকে অব্যাহতি দেন।

হলওয়েল এবং কোম্পানির আরো কয়েক জন কর্মচারী মিলে ভ্যানসিটার্টের গভর্ণর পদ প্রাপ্তির বিরুদ্ধে একটি ডেসপ্যাচে সই করার দরুণ কোর্ট অফ ডিরেক্টরেরা তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছিলেন। পরে তিনি নিজেই চাকরিতে ইস্তফা দেন।

এই অবসর কালে তিনি ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বই লিখতে থাকেন। এ সব ছাড়া অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী, বাংলা ও ভারতবর্ষের চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক চিত্র এবং আরো অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অন্ধকূপে মৃতদের স্মরণার্থ ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে তিনি একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সেটা সরিয়ে ফেলা হয়। পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আবার এই স্মৃতিস্তম্ভ পুনর্নির্মিত হয়েছিল। এই স্তম্ভটি কে বা কারা তদানীন্তন গভর্মেণ্টকে সরিয়ে ফেলতে বাধ্য করেছিল তা সকলেরই জানা আছে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর তারিখে ইংল্যাণ্ডের পিনার নামক স্থানে হলওয়েলের মৃত্যু হয়।

অভিজ্ঞাপত্র

ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের
এবং
বঙ্গদেশীয় প্রদেশসমূহের
কৌতূহলোদ্দীপক
ঐতিহাসিক ঘটনাবলী।
পূর্ব-ভারত পরিষদের
সম্মানীয়
পরিচালকবর্গসভার
উপযোগী ইঙ্গিতসহকৃত ও প্রবৃত্তিজনক
এবং তদুপরি
পুরাণ ও দেবতত্ত্ব, পুনর্জন্মবাদ
শাস্ত্রানুগামী হিন্দুগণের
উপবাস ও উৎসবাদি
এবং
দেহান্তরবাদের উপর বিস্তৃত আলোচনা—সাধারণ ভাবে—যদিও ভ্রমবশতঃ—যাহাকে বলা হয় পাইথাগোরাস মতবাদ।
জে. জেড, হলওয়েল কর্তৃক রচিত
প্রথম খণ্ড
দ্বিতীয় সংস্করণ—সংশোধিত ও ক্রোড়পত্রসমন্বিত
লণ্ডন
ষ্ট্র্যাণ্ড,—সারে ষ্ট্রীটের নিকটে, টি বেকেট ও পি. এ. হনড্‌ট-এর জন্য ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

রাইট অনারেবল
চার্লস্‌ টাউনসেণ্ড মহাশয়েষু
মহাশয়,

গত বৎসর আপনি আমাকে মোগলসাম্রাজ্য ও পূর্বভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু আখ্যান বর্ণনা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তৎকালে সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে আপনার যে প্রকৃত অবধারণা ও গভীর তাৎপর্যবোধ অনুভব করেছিলাম তাতে আমি এ আশা পোষণ না ক'রে থাকতে পারিনি যে, এই সব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের ওপর আমার পরিশ্রমের ফল আপনার নামেই উৎসর্গ ক'রে সাধারণের কাছে প্রকাশ করব। বর্তমানে অবসর কালে সম্পাদিত এই কাজের কিয়দংশ আপনাকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা ও সংকল্প জ্ঞাপন করায় আপনি পরম সৌজন্য ও ভদ্রতার সঙ্গে আনুকূল্য প্রকাশ ক'রে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। এই অধিকারের সম্মান আমি যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে, যথার্থ সম্মানের সঙ্গে, আপনার অনুমতি নিয়ে আপনাকেই এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলুম। ইতি

মাউণ্ট ফেলিক্স — মহাশয়
সারে — আপনার কৃতজ্ঞ ও বশংবদ
২১শে আগষ্ট — দীন ভৃত্য
১৭৬৫ — জে. জেড্‌. হলওয়েল।

সর্বসাধারণের প্রতি

স্বদেশের মঙ্গলের জন্য দুর্নিবার ও প্রশংসনীয় ভাবাবেগে উদ্দীপিত কোনো ব্যক্তি যখন বিরাট এক জনসভার সম্মুখীন হোয়ে বাগ্মিতার পরিচয় দেন, তখন তিনি যে আশঙ্কা, ভক্তিজড়িত ভীতি ও হৃৎকম্পন অনুভব করেন তা দমন করা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। যাঁরা কখনো সাধারণ্যে সম্মুখভাবণে অভ্যস্ত হননি অথবা স্বভাবতই যাঁরা কিঞ্চিৎ বিনম্রভাবান্বিত, তাঁদের সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য।

আমার মনে হয়, কোনো মহতী সভায় প্রথম আত্মপ্রকাশ কালে প্রত্যেক চিন্তাশীল গ্রন্থকারই এই রকম অনুভব ক'রে থাকেন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আমিও ঠিক এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলুম। যে ভীতি ও দুরবস্থার ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল—তার তুলনা হয় না। কিন্তু আমাদের বর্ণিতব্য বিষয়ের মধ্যে এই সময়কার ঘটনাবলীরও একটি বিশেষ স্থান আছে। সময়োচিত বিবেচনা এবং প্রয়োজনবোধই পুনর্বার আমাকে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য করেছে এবং আহত আত্মমর্যাদা ও চারিত্র্যাভিমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই আবার আমাকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে। কিন্তু এবার আমি অভ্যাস এবং আত্মবিশ্বাসে অধিকতর নির্ভয় হয়ে—সাধারণত যেমন হ'য়ে থাকে—স্বেচ্ছায় আপনাদের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করছি।

অনন্যপরতন্ত্রতা ও সানন্দ অবকাশ যতই প্রীতিপ্রদ হোক না কেন, সময়ে সময়ে তাতেও শূন্যতা ও কর্মহীন আকার উপস্থিত হয়। কিন্তু ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি সেই অভাব ও শূন্যতার উৎকর্ষ সাধন ক'রে মানব-সাধারণকে সাহিত্যের আনন্দ পর্যন্ত বিতরণ করেন

ঠিক এই অবস্থায় এবং এই উদ্দেশ্যেই আমি পুনরায় লেখনী গ্রহণ করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে আমার এই উদ্দেশ্য সমর্থনযোগ্য ব'লে পাঠকগণ অপক্ষপাতিত্ব ও ঔদার্যবশত আমার সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করবেন।

ইষ্ট ইনডিজ—বিশেষ ক'রে বাংলা দেশ এখন গ্রেটব্রিটেনের পক্ষে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ব্যাপার হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে ঘটনাগুলির বাস্তবতা, যথার্থ সমীক্ষা ও সেগুলি সম্বন্ধে যে কোনো সঠিক বিবরণই গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে।

বাংলা দেশে আমার ত্রিশ বৎসর কেটেছে। এই অসাধার

দেশের সমস্ত ব্যাপার, বিগ্রহ ও অন্যান্য ঘটনাবলীর তত্ত্ব সংগ্রহেই আমার সমস্ত অবসর কাল অতিবাহিত হয়েছে। এই হিন্দুস্থানের স্থানীয় অধিবাসীদের—যাদের এক জন বলে নিজেকে মনে করতে গৌরব বোধ করছি—এদের ধর্মমতগুলি সংক্ষিপ্ত ও সুসম্বদ্ধরূপে উপস্থাপিত হ'লে সত্যই আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরী বিজিত হবার হাঙ্গামার সময় আমার লেখা এদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয়ক বিচিত্র পাণ্ডুলিপি খোয়া গিয়েছিল, এবং সেই সব হারানো পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে এদেশের দু'টি অভ্রান্ত ও মূল্যবান্ শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল। এগুলি সংগ্রহ করতে আমাকে এত কষ্ট পোহাতে ও অর্থব্যয় করতে হয়েছিল যে, ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করবার জন্যে যে সব রাজপুরুষ নিযুক্ত হয়েছিলেন —তাঁরা যদিও আমার প্রতি কোনো আনুকূল্য প্রকাশ করেননি—তথাপি আমার এই ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে দুই হাজার মাদ্রাজি টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। আমি একটি শাস্ত্রের অনেকটা অনুবাদ করেছিলুম। সেইটি হারানোতে আমি সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলুম। ঐটুকু অনুবাদ করতে আমাকে আঠারো মাস কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই কাজ করবার সময় আমার স্পষ্টই মনে হ'ল যে, ঐ গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের মতগুলি থেকেই মিশর, গ্রীস ও রোম দেশের পুরাকথা ও সৃষ্টিতত্ত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি, পূজার ক্রিয়াপদ্ধতি ও দেবতাদের শ্রেণী বিভাগ পর্যন্ত ঐ গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয়েছে। অবশ্য কালক্রমে তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ঢুকেছে যেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বা বিকৃত বলা যেতে পারে। যা হোক, এ-সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলবার ইচ্ছা রইল। দস্তুরমত লেগে থাকলে আমি হয়তো এক বছরের মধ্যেই সেই শাস্ত্রটির সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে পারতুম। যদি এ কাজ ক'রে উঠতে পারতাম তাহ'লে সেটি সত্যই বিদ্বৎসমাজে এক অমূল্য রত্ন ব'লে পরিগৃহীত হ'ত। কিন্তু ৫৬ খৃষ্টাব্দের সেই দুর্ঘটনা আমার কর্মশক্তিকে এমন পঙ্গু করেছিল যে, এ কাজে হাত দেওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই ব্যাপারের পর থেকে আমার সমস্ত সময় ও শক্তি এক নূতন ধরণের কাজে ডুবে গেল। ফলে পড়াশোনায় আর ইচ্ছামত মনোনিবেশ করতে পারলাম না। যাই হোক, বাংলা দেশে অবস্থান-কালের শেষ আট মাস রাজকার্যের নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করায় (আমার পরম সম্মানার্হ প্রভুদের এ জন্য অনেক ধন্যবাদ)—আমি কিছু পরিমাণে পূর্বেকার গবেষণাকার্য আরম্ভ করতে সমর্থ হলাম। এবং অভূতপূর্ব এবং অসাধারণ ভাবে কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হওয়ায় (কি ক'রে সেটা হয়তো পরে বলব) আমি আবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছি।

এ কথা সত্য যে, আমি আমার পাঠকদের আরো মহৎ আনন্দ দেব ব'লে আশা করেছিলাম। কিন্তু সে আশা এখন সুদূরপরাহত হোয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্তত আর একবার দেশ ঘুরে না এলে (যা করবার বাসনা এখন মোটেই নেই)। কিন্তু যা আমাদের আয়ত্তাধীন তাই নিয়েই এখন সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যাদের সঙ্গে আমাদের নানান প্রয়োজনীয় ব্যবহারের সম্পর্ক অথচ যাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ব'লে মনে করি।*

আমি যে ভাবে অধ্যবসায়ের সঙ্গে এদের সম্বন্ধে তথ্যানুশীলন করেছি তাতে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, এ পর্যন্ত অতীত বা বর্তমানের হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যা-কিছু লিখিত হয়েছে (Arrian থেকে Abbe' de Guyon অবধি) যে গ্রন্থকারই হিন্দুদের বিষয়ে ও ব্রাহ্মণদের ধর্মমত সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ ক'রে রেখে গিয়েছেন—সে সবই দোষযুক্ত, মিথ্যা এবং সত্যসন্ধ ব্যক্তির পক্ষে অপর্যাপ্ত—অপর্যাপ্ত এবং ক্ষতিকর এই জন্যে যে, পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে কোনো জাতিকে যদি মনুষ্যজাতির অলঙ্কারস্বরূপ বলতে হয় তাহ'লে আজ পর্যন্ত এদের সম্বন্ধেই সে কথা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

আধুনিক সমস্ত লেখকই হিন্দুদের মূঢ় এবং স্থূল পৌত্তলিক ব'লে উল্লেখ করেছেন। বরঞ্চ প্রাচীন লেখকেরা এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সদ্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু এঁরাও হিন্দুদের ধর্মতত্ত্বের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনে সমান অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

হিন্দুদের ধর্মতত্ত্ব ও পূজাপদ্ধতির উপর যে-সব আধুনিকেরা গ্রন্থ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রোম্যান চার্চ সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রধান। এই রোম্যান যাজকেরা অসম্ভব গোঁড়া, কাজেই এঁরা বেদের কতকগুলি নগণ্য অংশের আক্ষরিক অনুবাদের ওপর ভিত্তি ক'রে যে অতীতের সমস্ত ব্রাহ্মণদের পুরাকথাগুলি সম্বন্ধে নিন্দা বা অসূয়া প্রদর্শন করবেন, তা আর আশ্চর্য কি?

এঁরা যে সব বিষয় নাড়াচাড়া করেছেন সেগুলিই যে সাক্ষাৎ বেদ থেকে নেওয়া তা নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে বেদ সম্বন্ধে তাঁদের মতনই সমান অজ্ঞ হিন্দুদের কাছ থেকে সেগুলি গালগল্পের মতনই টুকরো-টুকরো ভাবে শোনা।

[ক্রমশঃ।

---

* এখানে বুঝতে হবে আমি কেবল হিন্দুদের (Gentoos) কথাই বলছি। এরা এখন মুসলমান অত্যাচারের (Mahometan Tyranny) চাপে ছটফট করছে—আশা করি তারা শীগগিরই ব্রিটিশ শাসনের সুখভোগ করবে।

উত্তর

১। সম্রাট আগষ্টাসের মহাকবি ভার্জিল খৃঃ-পূঃ প্রথম শতাব্দে তাঁর "জর্জিক্‌স্" কাব্যে।
২। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র যুবরাজ সমুদ্রগুপ্ত।
৩। শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক।
৪। সুকবি লক্ষ্মণসেন।
৫। দস্যু কালাপাহাড়।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

বাইরের অভাব মিটে গেলেও যে অভাবটি বার বার কাঁটার মতো খচ খচ করে আমার মনে বিঁধতো, সে হচ্ছে টাকার অভাব। যাকে বলা যায় সত্যিকার ধনী, তেমনি এক জনও ছিল না আমাদের দলে। শুধু মধ্যবিত্ত নয়, এদের সবাইকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বলা যায়। দু'এক জন ছিল, যাদের অবস্থা স্বচ্ছল হলেও নগদ অর্থের প্রতিটি পাই আগলে রাখতেন যখের মতো তাদের অভিভাবক। ছেলের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মনোরম ব্যবস্থা করে দিয়ে অভিভাবক শ্যেনদৃষ্টি সর্ব্বদাই খুলে রাখতেন পাছে বাড়ীর তৃণগাছটি সে টেনে নিয়ে যায় গাঙ্গুলী বাড়ীতে দ্বিজেন গাঙ্গুলীর কাছে। নেপাল ছিল এমনি অভিভাবকের অধীনে। অত্যন্ত স্মার্ট যেমন, তেমনি কর্ত্তব্যপরায়ণ। কার্য্যোদ্ধার করবার জন্য সে যে কোনো ঝুঁকি নেবার জন্য এগিয়ে আসতো। সত্যি, এক এক সময় আমার মনে হয়েছে, অবোধ বালক বুঝি উপলব্ধিই করতে পারে না বিপ্লবী দলের কর্ম্মপন্থা কতখানি ভয়াবহ। মায়া-মমতার সকরুণ আবেদন মাঝে-মাঝে অন্তরাকাশে চিন্তার বাষ্প সৃষ্টি করলেও শরতের মেঘের মতোই তা মুহূর্ত্ত পরে কোথায় মিলিয়ে যেত।

কিন্তু টাকা? টাকা কোথায় পাই? সহকর্ম্মীরা যা সংগ্রহ করে এনে দিত ভিক্ষে করে বা ধার করে বা চুরী করে, খুব সামান্য না হলেও সমগ্র বিক্রমপুরের সংগঠনী কাজ চালাবার পক্ষে তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। কী করা যায়? কী করা যেতে পারে?

বেশ ভালো করে ভেবে দেখলাম ডাকাতি করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। ছেলেরা একবাক্যে সায় দিয়ে ফেললো। কোনো গৃহে চড়াও হয়ে লুণ্ঠন করবার মতো যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মী ও প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও সে সময় চারি দিক বিবেচনা করে তা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো না। হ্যাঁ, ডাকাতি করতে হবে কিন্তু তার মধ্যেও থাকবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা। কেউ কিছু টের পাবার পূর্ব্বেই কাজ হাসিল করতে হলে যে কূটবুদ্ধি ও পরিকল্পনা প্রয়োজন, তাই প্রয়োগ করতে হবে। একটা-কিছু করবার অধীর আগ্রহে সহকর্ম্মীরা যেন টগ বগ করে ফুটছে। শুধু ঝুঁকি নয়, আত্মবলিদানের প্রতিশ্রুতি দিতেও তারা পশ্চাৎপদ নয়। তা জানি। জানলেও দলপতি হিসেবে আমার নিশ্চয়ই নীতি হবে যথাসম্ভব কম বিপদের পথে এদের এগিয়ে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করা।

মশাল জ্বালিয়ে তরবারি, বল্লম ও গাদা বন্দুক নিয়ে বা খানকতক রামদা কাঁধে করে 'কালী মাইকি জয়' ধ্বনি করতে করতে দিক প্রতিধ্বনিত করে তুলে গৃহস্থের বাড়ীতে হানা দিয়ে, প্রহার করে, হত্যা করে, গুলী চালিয়ে, বোমা ফাটিয়ে, সিন্দুক ভেঙে ও মহিলাদের অঙ্গ থেকে টাকা ও গহনা সংগ্রহ করে আবার সদম্ভে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ার কাহিনী পাঠ করেছিলাম। শহরে ডাকাতির বিবরণীও অজানা ছিল না। হুস্ করে এসে একখানা জিপ থামলো বাড়ীর সম্মুখে, ষ্টেনগান হাতে ঝপাঝপ, নেমে পড়লো ক'জন, chemical solution ঢেলে মুহূর্ত্তে খুলে ফেললো প্রকাণ্ড সিন্দুকের তালা, তার পর ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললো সব, তার পর যেমন হুস্ করে এসেছিল তেমনি হুস্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল জিপ, যা বাঁকে, যার number plate-এ লেখা একটি সংখ যা ঐ গাড়ীর নয়।

কিন্তু আমার পরিকল্পনা একেবারে অভি সে যুগে একে একেবারে যুগান্তকারী বলা আয়োজনটি একেবারে শান্ত ও স্বাভাবিক, কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করবে না। যেমন নিঃ শুরু হবে কাজ, তেমনি সহজ ভাবেই তা শেষ যাবে। তথাপি রিজার্ভ ফোর্সের মতো না মধ্যেই থাকবে একটি সশস্ত্র দল, শুধু জরুরী যাদের আহ্বান জানানো হবে। ওৎ পেতে থা এবং নেকড়ে বাঘের মতো কিন্তু লম্ফ দেবে তখনই যখনই আসবে ইঙ্গিত।... শ্রীনগরের কাছাকাছি দেলভোগ ম একটি গ্রাম আছে, সে গ্রামে আছে একটি গণিকাপাড়া। গণিক সবাইকে পুলিশ চেনে, কারণ থানার খাতায় তাদের নামের তালিক আছে। এই গণিকাদের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য করে থা মেরি এ্যান্টিয়োনেট-এর মতো যিনি, তাঁর নাম চাঁপা। চাঁপার এরা হাড়েও বিদ্যুৎ চমকিয়ে ওঠে। নৃত্যে, সঙ্গীতে, আপ্যায়নে ও অতিথি-সেবায় চাঁপা অতুলনীয়। শুধু গ্রামের ঘরে বা টিনের চালে তার খ্যাতির দ্যুতি প্রদীপের মতো টিম-টিম করে না, শহরের অনেক অট্টালিকার চার পাঁচ তলাতেই চাঁপার মোহ পোর্ট্রেট কার্ব্বন লাইট জ্বালিয়ে রাখে এবং সে শুধ ঢাকা শহর নয় কলকাতাতেও।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কৌশলে সংগ্রহ করে আনলো রঙ্গলা আর তাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করলো বিপদভঞ্জন। দালা মারফৎ রঙ্গলাল একেবারে গিয়ে হাজির হলো চাঁপার প্রকাণ্ড টিনে ঘরে, মেঝেয় বিছানো পুরু গদির ওপর বসে চাঁপার সঙ্গে দু'-চার খোসগল্পও সে করে এল। সঙ্গে চা ও মিষ্টি। বলে এল যে, চাঁপা নাম দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার বনেদী জমিদা হরিপ্রসন্ন দাসের একমাত্র পুত্র হরলাল বাবুও শুনেছেন চাঁপা অসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা। তিনি একবার পদধূলি দেবেন চাঁপা গৃহে। দিন চারেক থাকবেন। চাঁপার কর্ত্তব্য হবে এই চার দিন ও রাত শুধু হরলাল বাবুর জন্য রিজার্ভ করে রাখা। পান আহারের ব্যবস্থা এবং নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর রাখতে হবে বটে কিন্তু বেশী রাত পর্য্যন্ত নয়, কারণ হরলাল বাবু চাঁপাকে একান চান। বাবু সেই কলকাতা থেকে একা আসবেন গোপনে বাপকে লুকিয়ে, সুতরাং মিস্ চম্পকরাণী—বলতে বলতে রঙ্গলাল একেবা মোসাহেবের অভিনয় করে এসেছে: হুজুরের যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সে জন্য আপনি সব ব্যবস্থা করে রাখবেন কিন্তু।

চাঁপা নত অপরাধিনীর মতো জিজ্ঞেস করেছিল: কিন্তু এখানে যে সব বাংলা—বিলিতি তো এখানে পাওয়া যায় না বিরিঞ্চি বাবু!

বিলক্ষণ!—হুজুরের জন্য আপনি কেন ভাবছেন? তাঁর সঙ্গে আসবে কয়েকটি বাক্স—সব বিলিতি মাল—দেখবেন একবার টে করে, আর ভুলতে পারবেন না মিস্—বরং আপনি এক কা করবেন, এই কেমিকালের গয়নাগুলো যেন হুজুরের সামনে পর বেরুবেন না।

কেমিক্যাল?—বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলো চাঁপা!

বিরিঞ্চি বলে উঠলো : না, না, আমি আপনার গয়নার কথা বলছি না। আপনাদের মধ্যে অনেকেই অমনি পরে থাকেন কি না। কৃত্রিমতা রাত্রে ধরা কঠিন!

প্রায় ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল চাঁপা : কিন্তু আমার গয়না একেবারে খাঁটি সোনার তা জানেন? আর এ কী দেখছেন, আমার জড়োয়া গয়না আছে দু' সেট, দেখবেন?

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে একটা কাচের আলমারী খুলে ফেলে বার করলো একটি মাঝারি সাইজের টিনের বাক্স। বিরিঞ্চির চোখের সামনে ডালাটা খুলে ফেলে বললো : দেখুন, পছন্দ হবে কি না আপনার স্যারের। আমি মশাই মেকি জিনিষের কারবার করি না। খাঁটি জিনিষ পাবেন আমার কাছে।

বিরিঞ্চি অনুরোধ জানালো : এইগুলোই তাহলে সে ক'দিন পরবেন, বুঝলেন? ভালো না লাগাতে পারলে আমারও চাকরি যাবে, মিস্ চম্পকরাণী—সেদিকে একটু যদি লক্ষ্য রাখেন। আপনার রূপ-গুণের কথা কত করে আমি বলেছি—

চাঁপা কথা দিয়ে দিয়েছে রঙ্গলালকে, সে সবগুলো জড়োয়ার গহনা পরে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে কলকাতার হরলাল বাবুকে।

স্থির হলো, মোসাহেব বিরিঞ্চিকে সঙ্গে করে যাবে হরলাল চাঁপার গৃহে। অকস্মাৎ অসুস্থতার ভাণ করে সেদিনকার নৃত্য-গীতের আসর ভেঙে দেওয়া হবে। তার পর রাত্রে চাঁপার নির্জ্জন কক্ষে হরলাল মদ্যপান করবেন। বিরিঞ্চির হাত-সাফাইএর ফলে চাঁপার গ্লাসে পড়বে একেবারে খাঁটি জনি-ওয়াকার! পুলিশ এসে বাইরে থেকে এদের একবার হাঁক দিয়ে চলে যাবার পর অকস্মাৎ হরলালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবো আমি। গলা টিপেই শেষ করা যাবে চাঁপাকে। ইসারা পেয়ে নির্জ্জন কক্ষে এসে প্রবেশ করবে রঙ্গলাল। জড়োয়া গয়নাগুলো নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়া যাবে। উত্তর দিকের বট গাছের ডালে সশস্ত্র যে দলটি আত্মগোপন করে থাকবে, তারা নিঃশব্দে নেমে রঙ্গলাল ও আমার দেহরক্ষীর মতো আমাদের ঘিরে অনুসরণ করবে···

একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা। শীঘ্রই বাস্তবে রূপান্তরিত করবার সর্ব্ব আয়োজন শেষ হয়ে গেল। কোনো স্বদেশী দলের ক্রিয়াকলাপ বলে আদৌ সন্দেহ করতে পারবে না পুলিশ। ফাল্গুনের এক জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রি নির্দ্দিষ্ট করা হলো। দেলভোগে সেদিন সাহাদের বাড়ীতে যাত্রাগান। স্বভাবতঃই গ্রামবাসী ও শ্রীনগরের পুলিশ, এমন কি গণিকাপাড়ার সবাই ঐ যাত্রাগান দেখতে যাবে। সেই অবসরে চাঁপার গৃহে আমরা গিয়ে হাজির হব। ওদিকে হবে ঘোষালের যাত্রা আর এদিকে চাঁপার গৃহে নাটকাভিনয়। সেনাপতি বলবন্ত সিং এনামেল-করা তরবারি চালনায় ও মুহুর্মুহুঃ কর্ণপটহবিদারী হুঙ্কারে যখন সহস্র সহস্র দর্শকের কাছ থেকে পারিতোষিক-স্বরূপ অর্জ্জন করবেন ঘন ঘন করতালি ও উল্লাসধ্বনি, চাঁপার রুদ্ধদ্বার কক্ষে একান্তে স্তিমিত আলোর নীচে তখন চলবে শিশির ভাদুড়ীর মূক অভিনয়, শনৈঃ শনৈঃ সে অভিনয় এগিয়ে চলবে ক্লাইমেক্সের পানে যেমন করে অজ্ঞ নৈশ মেলগাড়ী এগিয়ে যায় ফিসপ্লেট-খোলা লাইনের ওপর দিয়ে!···

দেখে তো ফুলবৌদি হেসেই অস্থির! হাসতে হাসতে বললেন : আজ আবার এ কী কাণ্ড বল তো? তোমার তো গোটাকতক ছদ্মবেশের কথা জানি, কিন্তু এই রূপ তো দেখিনি কোনো দিন! আজ কোন্ দিকে?

হেসে বললাম : অবান্তর প্রশ্ন। তার চাইতে তুমি একটু সজাগ থাকবার চেষ্টা করো। তিনটের মধ্যে ফিরে আসবোই। আর ভোর হয়ে গেলেও যদি না ফিরি, তাহলে কাল সকালে ফুলদাকে শ্রীনগর থানায় পাঠিয়ো জামীনের ব্যবস্থা করবার জন্য।—বলে আবার হাসলাম।

বৌদি চুপ করে গেলেন। এই নীরবতার অর্থ কী, তা আমি জানি। দুঃখ এঁদের অনেক দিয়েছি, আমাদের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের ফলে অনেক বিনিদ্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রজনী এঁদের যাপন করতে হয়েছে, তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু সমস্ত আবেগ ও আকুলতার উর্দ্ধে তুলে ধরেছি আমরা দেশাত্মবোধের ঝাণ্ডা!··· জন্ম থেকেই আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত!

রাত তখন বারোটা হবে। মা, বাবা ও অন্যান্য সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তমিজদ্দী চৌকিদার একবার হাঁক দিয়ে সরকারী চাকরি বহাল রেখে চলে গেছে। রঙ্গলাল তো গেছে সেই সন্ধ্যা বেলায়। চাঁপাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে একেবারে ফুলপরী তৈরী করে রাখতে হবে সবগুলো জড়োয়া গয়না পরিয়ে। নইলে জমিদার-পুত্র কলকাতার কাপ্তান হরলাল স্যার খুশী হবেন কেন! বিপদভঞ্জন তার সঙ্গে গেছে জল-ভরা গোটা কয়েক বিলিতি মদের বোতল আর কয়েকটি সত্যিকারের নারায়ণগঞ্জী সোডা নিয়ে। অন্যান্য যারা রিভলভার ও ছোরা নিয়ে রিজার্ভ ফোর্সের কাজ করবে, তারাও চলে গেছে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করবে তারা। আমার পকেটে থাকবে শুধু একখানা স্কাউট ছুরি, হাতলের বোতাম টিপলেই খচ করে বেরিয়ে আসে একখানি তীক্ষ্ণধার ফলা। অসুবিধা বোধ করলে চাঁপার কণ্ঠনালী সহজেই কেটে ফেলা যাবে!···

বৌদি বললেন : ফিরবে কি না, তাও বুঝি ঠিক নেই আজ?

বললাম : না। তবে যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহলে জীবনে এই হবে আমার প্রথম পরাজয়। তোমার কি মনে হয়—

সে কথায় কান দিলেন না বৌদি, বললেন : মা, বাবা—তার পর চুপ করে গেলেন আবার।

আরসীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। প্রতিবিম্বিত হয়েছে কলকাতার কাপ্তান হরলাল দাসের চেহারা। ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফের রেখা, মাঝখানে তেড়ি-বাগানো ঘন চুল কপালের দু'পাশে দুটি শিং-এর মতো করে ঘোরানো, চোখে ডিমের মতো কাচওয়ালা সোনার চসমা। পরনে শান্তিপুরী গিলে-করা ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, গলায় পাতলা ফুরফুরে চাদর আর হাতে কুকুরের মুখওয়ালা সরু ছড়ি।

ফুলবৌদি বললেন : কিন্তু তোমার কাছে এলেই স্পিরিট গায়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃত্রিম গোঁফ ধরা পড়ে যাবে।

হেসে জবাব দিলাম : তা হবে না। কলকাতার কাপ্তানের গা থেকে স্পিরিটের গন্ধ বেরুবে না তো কি ধূপধুনার সুবাস বেরুবে? ওতে কাজ হবে। মনে হবে এইমাত্র ইনি পান করে এসেছেন কোনো রূপসীর স্বাস্থ্য!

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

সাবধানে দক্ষিণের দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখলাম চতুর্দ্দিকে জোৎস্নার বন্যা। পুকুরঘাটের ওখানে নীচে নামতে গিয়ে পেছন ফিরে চাইলাম, ফুলবৌদি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন।···দ্রুত-পদে চললাম এগিয়ে। ম্যান্দার বাড়ীর হিজল গাছের নীচে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল অনাথ। আর জমির কারিগরের বাড়ীর ওপাশে গাব গাছের ডালে বসেছিল মণীন্দ্র। তারা এক জন চললো পেছনে, আর একজন সম্মুখে।

ঘোলোঘরগামী সড়ক দিয়ে নিঃশব্দে অথচ দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো কলকাতার বনেদী জমিদার হরিপ্রসন্ন দাসের একমাত্র কাপ্তান পুত্র হরলাল দাস।

দেলভোগের গণিকা-সম্রাজ্ঞী চম্পকরাণীর গৃহে তাঁর নৈশ আমন্ত্রণ!···

৪৩

একটু পরই আমরা কেয়টখালী গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে এসে মাঠে পড়লাম। চারি দিকে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না! ক্ষেতে তখনো শস্য বোনা হয়নি বা বীজ ছড়ানো হয়নি, সবে লাঙল চালিয়ে মাটির ডেলাগুলো উলটে ফেলা হয়েছে। রূপালী জ্যোৎস্নায় ডেলাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য অনড় ক্ষুদ্র তরঙ্গ। এর পর বীজ ছড়ানো হবে, তা থেকে একদিন মুখ বাড়াবে অঙ্কুর, অঙ্কুর পরিণত হবে চারা গাছে। তার পর একদিন সেই চারা গাছ বড় হয়ে উঠলে শ্যামল সেই শস্যক্ষেত্রের ওপর জ্যোৎস্না আবার সৃষ্টি করবে অসংখ্য দোদুল্যমান তরঙ্গ। সে তরঙ্গ আর মাটির ডেলা নয়, ধানের শীষের দোলন-তরঙ্গ!

নীরবেই পথ অতিক্রম করছিলাম, অকস্মাৎ মণীন্দ্র বলে উঠলো: পুলিশের বাবারও সাধ্যি নেই দাদা যে, আপনাকে চিনতে পারে। আমরা নেহাৎ আপনার গলার স্বরও চিনি, তাই। নইলে যে নিখুঁত মেক-আপ্ করেছেন—

একেবারে হরলাল দাস ছাড়া আর কিছুই হতে পারি না, তাই না?—বলে হেসে উঠলাম।

একটু পর জিজ্ঞেস করলাম: ওদিকে সব বেত্তি তো?

মণীন্দ্র বললো: হ্যাঁ, দাদা! সন্ধ্যের পরই গমুদা আর বিপদ-ভঞ্জন মদের বোতল-ভর্ত্তি প্যাকিং কেসটা নিয়ে গেছে। খগেন ওদের সঙ্গে গিয়েছিল। এসে বললো, চাঁপা খুব পরিপাটি করে মুরগীর কোর্ম্মা রান্না করছে। বিবিঞ্চি বাবু বলেছেন কিনা, হরলাল বাবু মুরগীর ঠ্যাং খুব ভালোবাসেন। যাত্রা শুনতে যাবে বলে অন্যান্য ঘরেও নাকি তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না চলছে। চাঁপা সবাইকে আগেই জানিয়ে রেখেছে যে, সে আজ আর কোথাও যাবে না, ঘরে নতুন বাবু আসবেন। খগেন থাকতেই সেই কেষ্ট ছোকরা নাকি খাবার এসেছিল। ইসারা করতেই চাঁপা তাকে বাজে কথা বলে ভাগিয়ে দিল বটে, কিন্তু বললো, ও নাকি খুব ছোটবেলার বন্ধু আর এ পথে কেষ্টই নাকি চাঁপাকে প্রথম নিয়ে আসে। সুতরাং একটা কৃতজ্ঞতা—

কৃতজ্ঞতা তো থাকবেই!—বলে মনে মনে হাসলাম। মনে মনে বললাম, ছোটবেলাকার বন্ধুত্বের আজই হবে সমাধি! কাল সকালে ঘরের মেঝেতে মরা চাঁপাকে দেখে ছোটবেলার বন্ধু যে তাজা কোনো গোলাপের সন্ধানে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়বে, তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। এরা ভ্রমরের জাত। ফুল থেকে ফুলে আনাগোনা করাই এদের স্বভাবধর্ম্ম।

দূরে ঘোলোঘর গ্রামের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। তীব্র জ্যোৎস্নায় যে দু'-চার খানা বাড়ীও দেখা যাচ্ছে, মনে হয় সেখানে কেউ আর জেগে নেই। কিন্তু ঘোলোঘরের বাজার অতিক্রম করবার পরই চাঞ্চল্য আশঙ্কা করছি। কারণ সাহাদের বাড়ীতে আজ আর কোনো দল নয়, একেবারে ঘোষাল অপেরা পার্টির যাত্রাগান। আশেপাশের অন্ততঃ দশখানা গ্রামের নর-নারী সেখানে ভেঙে পড়বেই।

অনাথ এক সময় নিরর্থক মন্তব্য করলো: মড়া পোড়ানো হচ্ছে।

দেখলাম, ডান দিকে ঘোলোঘর গ্রামের উত্তরে দূরে মাঠের মাঝখানে সত্যিই পাকা শ্মশানে আগুন জ্বলছে। বর্ষাকালে যে শ্মশান জলে ডুবে যায় না এবং যেখানে শান-বাঁধানো চুল্লী তৈরী করা থাকে, বিক্রমপুরে তাকে বলা হয় পাকা শ্মশান বা পাকা চিতা। গ্রামের কোনো কোনো ধনী এই শ্মশান-প্রতিষ্ঠাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করেন।

খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দু'-চার জন লোকের উপস্থিতি ও নড়াচড়া দেখা যায়। চিতার লাল আলো আশেপাশের গাছ-গুলোকে কেমন ভয়াবহ রূপ দিয়েছে। রূপালী জ্যোৎস্নার এই ফ্লোরেসেন্ট প্লাবনের মধ্যে যেন দেশী কোম্পানীর সস্তা কার্ব্বন-ভর্ত্তি বালব্ জ্বলছে। বিরক্তিকর মনে হয়।

কে এক জন মারা গেছে। কার ঘর শূন্য করে বেরিয়ে এসেছে খোকা, অথবা খুকু অথবা মা, বাবা, জানি না। কোন্ নিরবচ্ছিন্ন সুখের নীড়ে এমনি বজ্রাঘাত হয়েছে কে জানে! জ্যোৎস্না-বিধৌত এই অনির্ব্বচনীয় রাত্রি কার অন্তরে সৃষ্টি করছে মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকা, কে তার সংবাদ রাখে! চলিষ্ণু দুনিয়ার ষ্টীম রোলার ধক্‌ধক্ করে যখন এগিয়ে চলে, তখন তার নীচে চাপা পড়ে কোন্ অসহায় পিপীলিকা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল, তা নিয়ে কোনো দিন কখনো বিন্দুমাত্রও আলোড়ন সৃষ্টি হয় কি? ···কেমন অদ্ভুত একটা কথা আমার মনে জাগলো। কে জানে, কাল হয়তো এই পাকা শ্মশানেই আসবে দেলভোগের গণিকাসম্রাজ্ঞী চম্পকরাণীর শবদেহ ময়না তদন্তের পর, রাত্রিকালে এমনি দেশী কোম্পানীর বাল্‌ব জ্বালিয়েই হয়তো তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। কেউ কি স্বপ্নেও একবার ভাবতে পারবে যে, নিজের অজ্ঞাতে দেশজননীর বেদীতলে এই স্বৈরিণী কী ভাবে আত্ম-বলিদান করে গেল?···

অকস্মাৎ যেন ভূত দেখতে পেলাম! ঘোলোঘর গোয়ালাপাড়া ছাড়িয়ে মাঠের মাঝখানে একটা হিজল-বন আছে। সেই বনের মধ্যেই রাস্তাটা একটা মোড় ঘুরে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমকোণ সেই মোড়টা যেই ঘুরেছি, অমনি মাত্র ত্রিশ হাত দূরে দেখতে পাওয়া গেল হন্‌হন্ করে এগিয়ে আসছে জনকয়েক পুলিশ আর তাদের পুরোভাগে শ্রীনগর থানার দারোগা বা সহকারী দারোগা। ঠিক কে, তা জানা গেল না।

না গেলেও বিপদ যে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তা জানা গেল। কোনো দিকে পলায়নের পথ নেই। দৌড়লেই ওরা ধাওয়া করবে। চতুর্দিকে খোলা মাঠ আর জ্যোৎস্না। সুতরাং ধরে ফেলবেই। ব্যস্, তাহলেই বিরাট মামলা আর ওদের প্রচুর পুরস্কার লাভ। দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে 'সি' ক্লাশ কয়েদী হয়ে শ্রীঘরে পাঠিয়ে ঢাকার আই-বি আহ্লাদে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করবে।

কিন্তু চিন্তা করবার সময় কোথায়?

হুড়িটাতে ভর করে অকস্মাৎ আমার পা খোঁড়া হয়ে গেল। অনাথ তাড়াতাড়ি পেছন থেকে রাস্তা ছেড়ে একটু এগিয়ে ক্ষেতের মাঝখানে মূত্রত্যাগে বসে গেল আর মণীন্দ্র চিরকালই হাবা সেজে থাকে, তাই হাবার মতো বিপদকে থোড়াই কেয়ার করে চলে কিনা, তাই সে ডান হাতখানা সার্টের পকেটে পুরে দিয়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চললো। অসুবিধে বুঝলেই সে আজ এদের একটিকেও যে আর থানায় ফিরে যেতে দেবে না, সে সত্য আমার অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু বরাবরের মতো ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই দারোগা সহ পুলিশের দল যেমন গট্‌গট্ করে এগিয়ে আসছিল, তেমনি গট্-গট্ করেই আমাদের ক্রশ করে চলে গেল। কিন্তু বিশ পা গিয়েই বোধ হয় ওদের মনে সন্দেহ জেগেছে। দেখলাম, ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরেছে। তাড়া করতে পারে, আশ্চর্য্য নেই। মণীন্দ্র তো পকেট থেকে রিভলভারটা বার করেই ফেলছিল আমার সত্যিকারের দেহরক্ষীর মতোই, আমি বাধা দিলাম। ওদের টেনে নিয়ে আবার রওনা হলাম। পেছন ফিরে দেখলাম, ওরাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমার খোঁড়া পা আবার জোড়া লেগে গেল।

দেলভোগ সাহা-বাড়ীর পর দিককার পুকুর ধারে যে পথটি চলে গেছে, সে পথে অগ্রসর হবার সময় বুঝতে পারা গেল, যাত্রাগান পুরো দমে চলছে। দু'চার জন দর্শকের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ এরা হরলাল দাসকে চিনতে পারবে কী করে? সাহা-বাড়ীর দক্ষিণ দিকে বিরাট গেট-এর নীচে দিয়েই পথ। দেখলাম, হুড়্ হুড় করে তখনো দর্শক গেট পেরিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে হাসি পেল, সাহা-বাড়ীর যাত্রা চলছে, একটু পরই চাপার বাড়ীতে সুরু হবে নাটক। যাত্রার পরিণতি আনন্দময় হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু নাটকের পরিণতি কী হবে কে বলবে?···· বৌদিকে তো বলেই এসেছি, না ফিরলে সকাল-সকাল ফুলদাকে শ্রীনগর থানায় পাঠাতে জামিনের ব্যবস্থা করার জন্য।

মণীন্দ্রের মনে অস্বস্তি বোধ হয় তখনো ধোঁয়া পাকাচ্ছিল। এক সময় বলে উঠলো: ও ব্যাটারা যদি কেয়টখালী যায় দাদা?

অনাথ স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। সারাটি পথ একটি কথাও বলেনি সে। মণীন্দ্রের প্রশ্নে হঠাৎ যেন একটা বিপদের প্রশ্ন জাগলো তার মনে। তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো: সত্যিই তো, যা বলেছিস্ মণী। কী হবে ওরা যদি গিয়ে থাকে?

সঙ্গে কাকে দেখলে? কোন্ দারোগা? প্রশ্ন করলাম।

মণীন্দ্র জবাব দিল: নাঃ, কোনো দারোগা নয়। বোধ হয় কোনো এ-এস-আই। তাই বোকার মতো পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দারোগা হলে নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ করতো।

বললাম: তাহলে বোকার মতো সে আর কেয়টখালী গাঙুলী-বাড়ী যাবে না। আর শত হলেও এ-এস-আই। যে বাড়ীতে যায় কামাখ্যা মৈত্রের মতো রুই আর বড় দারোগার মতো কাতলা, সেখানে চুনো-পুঁটি হয়ে তার সাহসই হবে না হানা দেবার।

ওরা আর কথা কইলো না, কিন্তু বুঝলাম মনে মনে ওরা দু'জনেই ক্ষুব্ধ হয়েছে। মণীন্দ্র সার্টের পকেটে করে যে বস্তুটি এনেছে, তা ব্যবহার করবার জন্য তার হাত যে নিসপিস করছে, তা আমি জানি। কিন্তু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের প্রয়োজন যেখানে সীমাহীন, সেখানে ক্রোধ দেখাবার অবকাশ কোথায়?

গণিকা-পাড়ায় প্রবেশ-পথের মুখেই রঙ্গলাল দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে বিপদভঞ্জন। যেতেই বললো: সব মাটি হয়ে গেছে দাদা! বেটি আবার কোন্ ব্যাটার পাল্লায় পড়ে গেছে যাত্রাগান শুনতে। অবশ্য ঝিয়ের কাছে বলে গেছে যে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরবে। সে তো প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও চাঁপা যখন ফিরলো না, রঙ্গলাল তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এতদিনকার পরিকল্পনা সব ভেস্তে যাবে এক অবিমৃষ্যকারিণী গণিকার হঠকারিতায়? এক বদমায়েস জমিদারপুত্রের মোসাহেব সেজে কী মারাত্মক অভিনয় করে সে সব দিক গুছিয়ে এনেছিল, তা কি এমনি ভাবে চুরমার হয়ে যাবে এক মুহূর্ত্তে? এই ডাকাতি-লব্ধ অর্থে সংগঠনের কাজ কতখানি বাড়িয়ে দেয়া যাবে, তা নিয়ে আমার সঙ্গে সহর্ষ আলোচনায় যে সে একাধিক রাত্রি ভোর করে ফেলেছে। কেষ্ট কি আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে?

সত্যিই রঙ্গলাল মরিয়া হয়ে উঠলো। বললো: এসেই যখন পড়েছি দাদা, তখন চল, শেষ না দেখে যাচ্ছি না আজ। কেষ্টর সঙ্গে যাত্রাগান শুনতে ও গেছে নিশ্চয়ই। সেখানে চল। আমাকে ও চেনে আর ছোটকোন্‌কেও তার ভোলবার কথা নয়। ছোটকোন আর তুমি দর্শকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াবে আর আমি কৌশলে মহিলাদের দিকটাতে ঘোরাফেরা করবো। ওকে দেখলেই ইসারা করবো কিংবা আমায় দেখতে পেলে ও নিজেই উঠে আসবে দেখো। নগদ পাঁচশো টাকার লোভ সহজে ছাড়তে পারবে না। তার পর ইসারায় ছোটকোনকে দেখিয়ে দিলেই ও বেটি তোমায় দেখতে পাবে। তার পর আমাদের খপ্পরে না এসে ও যাবে কোথায়।

পরিকল্পনা মন্দ নয়। ঝুঁকির মাত্রা একটু বৃদ্ধি পেলেও দারুণ আশঙ্কার কোনো হেতু নেই। আর হত্যার সিদ্ধান্ত যেখানে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা আমাদের বিমুখ করবে কী করে?

সশস্ত্র যে দলটি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছিল, তাদের ডেকে আনা হলো। তার পর সবাই রওনা হলাম সাহাদের বাড়ীর দিকে।

কিন্তু বিরাট গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি আর এক বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। সাহাদের জনকতক প্রতিনিধি গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। ধূল্যবলুণ্ঠিত কোঁচা, ছড়ি ও সোনার চসমা দেখে আমাকে নিশ্চয়ই তাঁদের মনে হলো জনৈক বিশিষ্ট অচেনা অতিথি; সুতরাং শশব্যস্ত ভাবে দু'-তিন জন এগিয়ে এসে একেবারে কলরব করে অভ্যর্থনা জানালেন: আসেন, আসেন। আমাগো মত গরীবের বাড়ীতে আপনাগোর মত মহাশয় ব্যক্তিগোর পদধূলি—আসেন, আসেন।

এই অভ্যর্থনা এমনি ভাবে করা হলো এবং বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সাহা-বাড়ীর প্রতিনিধিবৃন্দ এমনি ভাবে আমায় সাদর আহ্বান জানালেন যে, কিছুতেই তাঁদের এড়ানো সম্ভব হলো না এবং একই সঙ্গে জনকতক পুলিশ দর্শক সহ আমায় নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হলেন যাত্রা-মণ্ডপের দিকে। এড়াতে চেষ্টা করেও শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হলাম এবং এঁদের অভ্যর্থনার বন্যায় আমার সমস্ত আপত্তি তৃণের মতো ভেসে গেল। যখন ধাতস্থ হলাম, তখন দেখি বসে আছি একটি বেঞ্চে ঘেঁসাঘেসি আরও জনকতক পুলিশ-দর্শকের সঙ্গে। বিপদভঞ্জন কিন্তু আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি। দেহরক্ষীর মতোই সে এসে বসেছে আমার পাশেই।

অত্যন্ত সাবধানে যাত্রার ষ্টেজের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রায় ফিস্‌-ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলাম: রঙ্গলাল ওরা কোথায়?

বিপদ বললো: কি জানি, দেখছি না তো তাদের এক জনকেও।

এরা আমায় চিনে ফেলেছে নাকি?

ফেলেনি এখনও মনে হচ্ছে। তবে একেবারে একই বেঞ্চে পুলিশের সঙ্গে—ঝুঁকিটা বড্ড বেশী মনে হচ্ছে দাদা! হরলালের খোলসটা ওরা চিনে না ফেলে।

বললাম: সহজে পারবে না। ছদ্মবেশে কোথাও ক্রটি নেই। আর গোঁফ-জোড়া থেকে যে স্পিরিট গামের গন্ধ বেরুচ্ছে, তাতে আরও নিঃসন্দেহ হবে ওরা।

কিন্তু পরিস্থিতি আদৌ ভালো নয়। পেছনের বেঞ্চে বসে আছেন স্বয়ং সতীন দারোগা, হামেসাই যিনি আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকেন। তাঁর পাশেই এ-এস-আই রবীন দত্ত। আশে-পাশে অন্যান্য অফিসার আর আমাদের বেঞ্চেও জনকতক পুলিশ। এতগুলো শ্যেন-দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কতক্ষণ রাখা যেতে পারে? কিন্তু মুশকিল এই যে, বিনা কারণে অকস্মাৎ স্থানত্যাগ করে উঠে গেলেও তো সবার চোখে পড়ে যাবো! কে জানে, হয়তো কাছেই কোথাও অপেক্ষায় আছে অভ্যর্থনাকারী দলের জনৈক সদস্য। উঠে দাঁড়ালেই হয়তো ছুটে এসে তিনি আবার অজস্র বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আমায় বসিয়ে দেবেন। কী করা যেতে পারে?...

বিপদভঞ্জন বললো: রঙ্গুদাকেও দেখা যাচ্ছে না। ভিড়ে কোথাও মিশে গেছেন। আমাদেরও হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন না। আমাদের দেরী করাও ঠিক হবে না।

এক জন লোক এসে আমাদের সবাইকে প্রোগ্রাম বণ্টন করে গেল, আর এক জন এসে দিয়ে গেল মিঠে পান। পান খাই না, কিন্তু খেতে হলো। প্রোগ্রামখানি পরীক্ষা করে বিপদ বললো: এই দৃশ্যেই তৃতীয় অঙ্ক শেষ হবে। কনসার্ট সুরু হলেই আমাদের সরে পড়তে হবে।

অস্ফুচ্চ কণ্ঠে বললাম: অল্‌ রাইট্‌।

সাহা বাড়ীর নীচে নেমে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রঙ্গলালদের দেখা নেই। ভেবেছিলাম ভিড়ের মধ্যে ওরা হয়তো গা ঢাকা দিয়ে আছে, আমাদের বেরিয়ে আসতে দেখেই ওরাও বেরিয়ে এসে যোগদান করবে। কিন্তু কোথায়?...তবে কি চাঁপাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে রঙ্গলাল? কার্যোদ্ধার করবার জন্ত ও যেমন পাগল হয়ে উঠেছিল, কিছুই বলা যায় না। হয়তো দেলভোগে ও আমারই অপেক্ষায় রয়েছে। না দেখে তো চলে যাওয়া যায় না।

সুতরাং আমরা আবার এলাম গণিকা-পাড়ায়। বিপদভঞ্জন দেখে এল, চাঁপার ঘরে তখনো তালা ঝুলছে। বেশ্যার আবার কথার মূল্য কী? হরলালের জন্য সর্ব্ব আয়োজন করে অবশেষে কেষ্টলালকেই সে হয়তো অভ্যর্থনা জানাবে, এতে আর বিস্ময়ের কী আছে?...

কিন্তু আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। রাত তখন তিনটে বেজে গেছে। যাত্রাগানের আসর ভাঙতে যত দেরীই থাক, কিছু সংখ্যক দর্শক নেমে আসছেন দেখা গেল। গৃহ-গমনেচ্ছুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। যে ভাবে ফাঁড়া কাটিয়ে বেরিয়ে আসা গেছে, এর পর আবার অতখানি ঝুঁকি নেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হলো না। তাই বিপদ ও আমি দ্রুত পদক্ষেপে রওনা হলাম গৃহাভিমুখে।

ম্যান্দার বাড়ীর কাছে এসে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালাম। দক্ষিণ দিকের আমার কক্ষে আলো-রেখা!

সমস্ত ব্যাপারটাই মুহূর্ত্তে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সেই এ-এস-আই শ্রীমান এসেছে ধূর্ত্তের মতো স্বগৃহে অন্তরীণ রাজবন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে দেখে যেতে। এসে দেখে সে নেই। ফুলবৌদি বা ফুলদা বেগতিক দেখে বোধ হয় আবোল-তাবোল কিছু বলে ধামাচাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এখন শ্রীমান ওৎ পেতে বসে আছে শীকার ধরবার আশায়।

বিপদ বললো: আমি দেখে আসি দাদা! আপনি এখানে থাকুন।

বলেই সে এগিয়ে যাচ্ছিল; আমি হাত ধরে ফেললাম। ও পকেট থেকে রিভলভারটি বার করে নিয়ে শান্ত স্বরে বললাম এবার যাও। ধরা পড়লে একটা গান ধরো। এটা পকেটে থাকলে গানের কথা ভুলে যাবে, Gunএর কথা মনে পড়বে এবং তখন তোমায় সামলানো যাবে না।

মুহূর্ত্ত পরেই বিপদভঞ্জন ফিরে এল ও হাসিতে সারা মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে তুলে আমায় একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে এবং বললো: চলুন!

রঙ্গলালের মুখে যা শুনলাম, তা হচ্ছে এই যে, দারোগা-পুলিশ সহযোগে সাহা-বাড়ীতে আমাদের অভ্যর্থনার বহর দেখে ওরা বুঝে নিয়েছিল যে, আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে। তাই পেছন থেকে ওরা সবাই সরে পড়ে সোজা ছুটে এসেছে বাড়ীতে। আমায় গ্রেপ্তার করবার পর পুলিশ অনতিবিলম্বেই যে এসে হানা দেবে গ্রামের প্রত্যেক ছেলের বাড়ীতে, সে তো জানা কথাই। তাই ওরা এসে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে আপত্তিজনক জিনিষপত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলে সর্ব্বশেষ এসেছে আমার কক্ষে।

সুতরাং হাসাহাসি সুরু হয়ে গেল। ফুলবৌদি পোঁটলা-বাঁধা বন্ধ করে চুপটি করে ঘটনাটি শুনছিলেন, এবার বলে উঠলেন: দাও, ক্ষতিপূরণ দাও! সারাটি রাত যে আমার ঘুম হলো না, তার দাম দেবে কে?

সবাই হেসে উঠলো।

[ক্রমশঃ।

সঙ্গীত সমাজ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

২

"সঙ্গীত সমাজ" ধনীদিগের মিলনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হইলেও তাহার পরিচালকগণ গুণীদিগকে সমাদর করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বাঙ্গালার দুই জন সামন্ত নৃপতি—কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ও ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর "সঙ্গীত সমাজে" সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বরদার গায়কবাড়ের সম্বর্দ্ধনার বিষয়ও বলা হইয়াছে।

কাশীনরেশ প্রভুনারায়ণ সিং বাহাদুর "সঙ্গীত সমাজে" সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন (২৮শে নভেম্বর, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ)।

গুণীদিগের আদরে "সঙ্গীত সমাজ" কিরূপ অবহিত ছিলেন, তাহা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সম্বর্দ্ধনায় বুঝিতে পারা যায়। এই সম্বর্দ্ধনার পশ্চাতে যে প্রেরণা ছিল, তাহা অনেকে জানেন না। জগদীশচন্দ্র যখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক তখনই তিনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক আবিষ্কার আরম্ভ করেন। তাঁহার অভিনব আবিষ্কারের গৌরব যে সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল, তাহা প্যারিসে সুধী-সম্মিলনে তাঁহার সম্মানে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্যে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার সেই সকল আবিষ্কার কিন্তু বহু য়ুরোপীয়ের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করিয়াছিল। ইংলণ্ডের কোন বিখ্যাত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি কলিকাতায় আসিয়া জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছুটী। জগদীশচন্দ্র সেই সময় উক্ত বৈজ্ঞানিককে ছুটীর সময় কলেজে লইয়া যাইয়া গবেষণাগার দেখাইয়াছিলেন। পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে কলেজের গবেষণাগার স্বয়ং দেখাইবার সুযোগে বঞ্চিত কলেজের য়ুরোপীয় অধ্যক্ষ জগদীশচন্দ্রের কৈফিয়ৎ তলব করেন, তিনি কেন অধ্যক্ষের বিনানুমতিতে এক জন বাহিরের লোককে (stranger) কলেজের গবেষণাগার দেখাইয়াছেন? পত্রখানিতে জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুরা অপমান বোধ করেন এবং জগদীশচন্দ্র পদত্যাগে প্রস্তুত হইয়া অধ্যক্ষকে লিখেন—ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি যে সভ্যজগতে কোথাও stranger, ইহা তিনি জানিতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ জগদীশচন্দ্রের বন্ধুরা তাঁহার জন্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হ'ন এবং ত্রিপুরার মহারাজা সে জন্য বহু সহস্র টাকা দিতে সম্মত হ'ন। একদিন প্রাতঃকালে বর্ত্তমান লেখক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট যাইয়া কথাপ্রসঙ্গে এই সংবাদ দিলে রায় মহাশয় তখনই প্রতিবেশী জগদীশচন্দ্রের গৃহে যাইয়া তাঁহাকে পদত্যাগ-সঙ্কল্প বর্জ্জন করান। রায় মহাশয়ের যুক্তি—প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগার অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, তাহা এ দেশের লোকের অর্থে—এ দেশের শিক্ষার্থী ও গবেষকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং, অধ্যক্ষের মত বিচারসহ নহে—তাঁহার পক্ষে কৈফিয়ৎ তলব ধৃষ্টতা।

সেই সময়—বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত ঘটনার জন্য—"সঙ্গীত সমাজে" জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। সেই সম্বর্দ্ধনানুষ্ঠানে সভাপতি—কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর। অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন :—

"জয় তব হোক জয়!
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয়!
বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি'
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।
জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টীকা।
অবারিতগতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ।

"সঙ্গীত সমাজের" প্রোগ্রাম

জগদীশচন্দ্র বসু

দুঃখ দীনতা যা' আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।"

এই সম্বর্দ্ধনা ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১১শে মাঘ "সারস্বত সম্মিলন" উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সম্মিলনে প্রথমে "সরস্বতী-বন্দনা" গীত হয়—

"নমস্তে পরমারাধ্যে পরমানন্দদায়িনি।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে বিদ্যে সর্ব্বসম্পদ্বিধায়িনি।
—ইত্যাদি

তাহার পর "জাতীয় সঙ্গীত"—"বন্দে মাতরম্" গীত হইবার পর পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন "বিজ্ঞানাচার্য্য ভারতরত্ন শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয়—কোবিদকুলমুকুটেষু"—সম্বোধনে জগদীশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন—সংস্কৃত কবিতায়।

রৌপ্যথালে বসু মহাশয়কে একখানি মূল্যবান শাল উপহার দেওয়া হয়। বসু মহাশয়ের শালগাত্রে প্রতিকৃতি অনেকে দেখিয়াছেন।

এই সারস্বত সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের গান—

"কমল বনের মধুপরাজি এস হে কমল ভবনে,"

বর্ত্তমান লেখকের রচিত একটি গীত প্রভৃতি গীত হয় এবং গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সুরবাহার বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

এই সকল ব্যতীত হাসির গান ও নাটকাভিনয়ও ছিল।

সারস্বত সম্মিলনে নিমন্ত্রণপত্র বাসন্তী বর্ণের কাগজে মুদ্রিত হইত এবং সমাজের সভ্যগণকে বাসন্তী বর্ণে রঞ্জিত ধুতি, জামা ও চাদর পরিধান করিয়া সমাজে আসিতে অনুরোধ করা হইত।

এ সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—হেমচন্দ্র বসুমল্লিক। কবি হেমচন্দ্র যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ইংরেজীর ঘীয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিশ;
টোল স্কুলী অধ্যাপক—দু'য়েরই ফিনিশ"

তেমনই হেমচন্দ্র বসুমল্লিকের সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি "সাহেবীয়ানা ও দেশীয় ভাব"—দু'য়েরই ফিনিশ। তাঁহার যে প্রকৃতি তাঁহার ব্যবহারে সপ্রকাশ হইত, তাহার পরিচয়ে বহু ঘটনার মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিতেছি:—

(১) যে দিন কুচবিহারের তৎকালীন দাওয়ান কালিকাদাস দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয় সে দিন, কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত লোক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি আসরে আসিলে হেমচন্দ্রের কোন আত্মীয় যখন তাঁহার জন্য একটি তাকিয়া আনেন, তখন হেমচন্দ্র আত্মীয়ের নিকট হইতে সেটি লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন—বৈষম্যমূলক ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে সম্মত ছিলেন না। সকলে স্তম্ভিত হইলেন; যতীন্দ্রমোহনকে অপমান করা হইল। যতীন্দ্রমোহন অতি বুদ্ধিমান—চতুর লোক ছিলেন। তিনি

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর

ব্যাপারটির উপর যবনিকাপাতের জন্য বলিলেন, "এই ত ঠিক। আজ এ সভায় সম্মান কেবল বরের—কেন না, বর শ্রেষ্ঠ।"

(২) বরদার গায়কবাড় সে বার কলিকাতায় আসিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ইতিহাসও কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ, সে সময় সামন্ত নৃপতিরা বৃটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী কলিকাতায় আসিলে সরকারই তাঁহাদিগের বাসাদির সব ব্যবস্থা করিতেন—তাঁহারা সরকারের অতিথি। ভূতপূর্ব্ব জঙ্গীলাট লর্ড রবার্টস কোন কারণে যতীন্দ্রমোহনের নিকট উপকৃত ছিলেন এবং সেই জন্য লর্ড কার্জ্জন বড়লাট মনোনীত হইলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি (লর্ড কার্জ্জন) যেন ভারতে যাইয়া যতীন্দ্রমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করেন—তিনি অনেক বিষয়ে আবশ্যক পরামর্শ দিতে পারিবেন। তিনি সে কথা যতীন্দ্রমোহনকে তার করিলে যতীন্দ্রমোহন তারে লর্ড কার্জ্জনকে তাঁহার গৃহে সম্বর্দ্ধনায় নিমন্ত্রণ করেন এবং লর্ড কার্জ্জনও সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে কাহারও কাহারও, বোধ হয়, তাহাতে "চক্ষু টাটায়" এবং লর্ড কার্জ্জন কলিকাতায় আসিয়া সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, যতীন্দ্রমোহন জমীদার মাত্র, বড়লাট, সাধারণতঃ, জমীদারের গৃহে গমন করেন না, বিশেষ কলিকাতায় তখন যতীন্দ্রমোহন ব্যতীতও ২ জন জমীদার মহারাজা (মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা)—বড়লাট এক জনের গৃহে যাইলে আর দুই জনকেও—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং নিমন্ত্রিত হইলে বড়লাটকে তাঁহাদিগের গৃহে যাইতে হইবে। এই অপমানের অবসান ঘটাইবার জন্য যতীন্দ্রমোহন "তদ্বির তদারক" করিয়া গায়কবাড়কে স্বীয় গৃহে আতিথ্য গ্রহণে সম্মত করান। উদ্দেশ্য, গায়কবাড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে (রিটার্ণ ভিজিট দিতে) বড়লাটকে যতীন্দ্রমোহনের গৃহে আসিতে হইবে। কলিকাতায় আসিয়া আমন্ত্রিত হইয়া গায়কবাড় ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইতে সম্মতি দিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের পরিচালকগণ সোৎসাহে বিজ্ঞাপনে তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন—গৃহ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন—গোলাবজলের ফোয়ারা হইতে কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি রাখেন নাই। এই সময়—অভিনয়ের দিন অপরাহ্নে—রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ পত্র পা'ন—গায়কবাড় নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। কাহার পরামর্শে জানি না. রঙ্গালয়ের পক্ষ হইতে অমৃতলাল বসু, অমৃত মিত্র প্রভৃতি "সঙ্গীত সমাজে" আসিয়া বিষয়টির কোনরূপ প্রতীকার করা যায় কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। গায়কবাড় না যাইলে তাঁহাদিগের চূড়ান্ত অপমান হইবে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ কয় জন তখন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, তাঁহার সহিতও গায়কবাড়ের পরিচয় আছে; তিনি ইহার প্রতীকার করুন। হেমচন্দ্র প্রথমে অস্বীকার করিলেও সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সম্মত হইলেন। সে দিন জগদ্ধাত্রী পূজার প্রতিমা-বিসর্জ্জন। হেমচন্দ্র বলিলেন, তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া দুইটি নূতন—ঢাকের বাজনায় চঞ্চল হইবে। তখন মন্মথনাথ মিত্রের জুড়ী গাড়ীতে তিনি সুরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গায়কবাড়ের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার কার্ড পাইয়া গায়কবাড় যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন হেমচন্দ্র তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলে গায়কবাড় বলিলেন, কেহ কেহ জানাইয়াছেন, রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীরা রূপজীবা—সুতরাং গায়কবাড় তাহাদিগের অভিনয় দেখিতে যাইলে—পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। শুনিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন তিনি যখন বরদায় গিয়াছিলেন, তখন গায়কবাড়ের প্রাসাদে যে সকল নর্ত্তকী নৃত্য করিয়াছিল দেখিয়াছিলেন, তাহারা কি সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী? গায়কবাড় ভাবিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণের পর তাহা প্রত্যাখ্যান করা কিরূপ অশিষ্টতার পরিচায়ক, তাহা ভাবিয়া দেখিতে বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও যে সকল কথা বলিলেন, তাহা প্রকাশ করিব না। গায়কবাড় ষ্টার থিয়েটারে যাইতে সম্মত হইলেন। হেমচন্দ্র তখন সুরেশচন্দ্রকে—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া, গায়কবাড়কে থিয়েটারে লইয়া যাইবার জন্য রাখিয়া "সঙ্গীত সমাজে" ফিরিয়া আসিলেন। থিয়েটারের কর্তারা শুভ সংবাদ পাইয়া সানন্দে ফিরিয়া যাইলেন।

কাপড় জামা জুতায় যেমন, গাড়ী প্রভৃতিতেও তেমনই হেমচন্দ্র কলিকাতায় "ফ্যাশানের" অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার সহিত পাল্লা দিতে যাইয়া বা তাঁহার অনুকরণ করিতে যাইয়া "সমাজের" একাধিক সভ্য অমিতব্যয়িতাহেতু বিপন্নও হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ংও অমিতব্যয়িতা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই।

"সঙ্গীত সমাজ" যখন কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহ হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কলিকাতায় বিদ্যুতালোক কেবল প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার পূর্ব্বে বিদ্যুতালোক দেখিতে লোককে হয় ইডেন গার্ডেনে, নহে ত হাওড়ার সেতুতে যাইতে হইত—ঐ দুই স্থানে বিদ্যুতের আলোক জ্বলিত। হেমচন্দ্র ব্যয় সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

এই ভাবেই—"সংগীত সমাজ" কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নূতন বাড়ীতে (২০১ নম্বর) স্থানান্তরিত হইলে তিনি প্রসিদ্ধ ইংরেজ কোম্পানীকে তাহার রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের ভার দেন। অবশ্য তাহার ব্যয় কুচবিহারের মহারাজা বহন করিয়াছিলেন।

সাজসজ্জা প্রভৃতি সম্বন্ধেও ব্যয় করিতে হেমচন্দ্র মুক্তহস্ত ছিলেন।

তিনিই তখন "সঙ্গীত সমাজে" যাহাকে "ডিক্টেটার" বলে তাহাই হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার সেই ক্ষমতা তাঁহার বন্ধুরাই সাগ্রহে তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সেই সকল বন্ধুর মধ্যে মন্মথনাথ মিত্র, পশুপতিনাথ বসু, অটলচন্দ্র সেন, রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি কাহাকে রাখিয়া কাহার নামোল্লেখ করিব, স্থির করা দুঃসাধ্য। তবে—তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনির্বাণচন্দ্র দত্ত এখনও জীবিত আছেন এবং সেই কারণে তাঁহার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি। এই প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার অকুণ্ঠ আগ্রহ ও সাহায্য আমি লাভ করিয়াছি।

"সঙ্গীত সমাজের" সারস্বত সম্মিলন বহু দিন নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের অনুষ্ঠানে—আবাহন, যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের পরে আবৃত্তি হয়—আবৃত্তি করিয়াছিলেন:—

(ক) শ্রীযুক্ত জে, সি, দত্ত,
(খ) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
(গ) কুমার শ্রীযুক্ত কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব,
(ঘ) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এই অনুষ্ঠানে বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" (নাটকাকারে) অভিনীত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, "সমাজের" সভ্যগণ অভিনয় করিয়াছিলেন।

এটর্ণী জে, সি, দত্ত, এটর্ণী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও প্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার ও গীত-রচনাকারী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—ইঁহাদিগের সমাবেশ যে চেষ্টার ফল সেই চেষ্টাই "সঙ্গীত সমাজকে" স্মরণীয় করিয়া রাখিবার কারণ। এটর্ণী দত্ত মহাশয় কলিকাতার প্রসিদ্ধ বিদ্যানুরাগী দত্ত পরিবারের লোক। এই পরিবারে কুমারী তরু দত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তরু দত্তের সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক এডমণ্ড গস লিখিয়াছেন—তাঁহার মৃত্যুতে ইংরেজী সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত করা অসম্ভব—বয়স ২০ বৎসর পূর্ণ হইবারও পূর্ব্বে এই বালিকা বিদেশী ভাষায় বহু স্থায়ী রচনা পাঠককে দিয়া গিয়াছেন—সাহিত্যের কোন সাফল্যই তাঁহার পক্ষে অলভ্য থাকিত না।—

"When the history of the literature of our country comes to be written, there is sure to be a page in it dedicated to this fragile erotic blossom of song."

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যরসিক, সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকবন্ধু ছিলেন। আমরা জানি, কোন সাহিত্যিক বন্ধুর রোগে তিনি অকাতরে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন—প্রতিদানের কোন আশা করেন নাই। তিনি অতিরিক্ত উদারতায় আপনাকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহ 'বসুমতী' সাহিত্য-মন্দিরের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করিয়াছে।

কেশবেন্দ্র যে পরিবারের সন্তান সেই পরিবারে রাধাকান্ত 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া জীবনের অপরাহ্নে বৃন্দাবনে বাস করিয়া তথায় দেহরক্ষা করিয়াছিলেন—বৃন্দাবনে যাইয়া মনের আবেগে লিখিয়াছিলেন—

"ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি যদ্‌বৃন্দাবনমাগতম্।
অত্র দেহপতনায় পূর্ণকামো ভবাম্যহম্।"

যেন—

"T'is the sunset of life gives me
mystic lore,
And coming events cast their
shadows before."

ঐ পরিবারে অপূর্ব্বকৃষ্ণও সাহিত্যিক ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

"সঙ্গীত সমাজ" দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকর কার্য্যে অবহিত ছিল। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ (১৯১১ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতার মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবল খেলায় বিজয়ী হয়। তাহার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় দল সে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। "সঙ্গীত সমাজ" মোহনবাগান সমিতিকে সম্বর্দ্ধিত করে (২১শে শ্রাবণ)। সেই উপলক্ষে তরুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙ্গালীর পরিচয় প্রসিদ্ধ কবিতা রচনা করেন। "সঙ্গীত সমাজ" তাহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিল :—

"মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে।"

পুস্তিকায় "নিবেদন" ছিল :—

শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত

হেমচন্দ্র বসুমল্লিক

"অক্ষয়কীর্ত্তি অক্ষয়কুমারের পৌত্র, নবীন কবি, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত গৌরবকাহিনী একত্র গ্রথিত করিয়া একটি মহদ্ভাব-গর্ভিণী সুন্দর-বচন-মনোরমা গাথা রচনা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সেগুলিকে নিত্যস্মরণের উপযোগী করায় সমস্ত বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বাণী-মুখে প্রথম প্রচারিত সেই অমৃত গাথা 'আমরা' আজ এই আনন্দোৎসবে বন্ধুবর্গকে উপহার দিলাম।"

কবির উক্তি—

"শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।"

কি স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার দ্বারা ভারতের জগৎজয়ের আশা ও অভিপ্রায় স্মরণ করাইয়া দেয় না ?

"সঙ্গীত সমাজ" সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা' প্রচার করিয়া দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল।

"সঙ্গীত সমাজের" বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে—রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন সম্মিলন অন্যতম। ঐ অনুষ্ঠানে দেশীয় প্রথায় দরিদ্রদিগকে ভোজন করান হয় ; কলিকাতায় গড়ের মাঠে বিরাট জনসমাগম হয়। "সঙ্গীত সমাজ"-গৃহে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া সভার পরদিন কাঙ্গালী-ভোজন করান হইয়াছিল। আয়োজন বিপুল—ব্যবস্থাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। সে কার্য্যে যাঁহারা অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন—পশুপতিনাথ বসু, সতীশচন্দ্র সিংহ, মন্মথনাথ মিত্র, রমানাথ ঘোষ প্রভৃতি তাঁহাদিগের অন্যতম। গড়ের মাঠে দৃশ্য অভিনব। জনসমাগম হইলে বড়লাট লর্ড কার্জ্জন সাধারণ বেশে—এক জন মাত্র সঙ্গী লইয়া লাটপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে জনতার মধ্য দিয়া ব্যবস্থা দেখিয়া যাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এক জন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া পার্শ্বস্থ এক জনকে "এ যে লর্ড কার্জ্জন" বলিলে লর্ড কার্জ্জন ওষ্ঠাধরের উপর অঙ্গুলী-স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাক্ হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফিরিয়া যাইয়া তিনি বড়লাটের প্রথামত চারি ঘোড়ার গাড়ীতে অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে আসিয়া সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"সঙ্গীত সমাজের" এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। যখন ইহা ঘটে তখন "সমাজ" কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নূতন গৃহে (২০১ নম্বর) গিয়াছে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পূর্ব্বে যে গৃহে ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয় জন কর্ম্মী সপরিবারে বাস করিতেন ও তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নারী-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে "অবলা ব্যারাক" বলিয়া ব্যঙ্গ করিত। নূতন গৃহের অধিকারী গিরিশচন্দ্র রায় "সঙ্গীত সমাজের" অন্যতম সভ্য ছিলেন। এই গৃহই শেষ পর্য্যন্ত "সঙ্গীত সমাজের" গৃহ ছিল। এই গৃহেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জন্য অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা হইয়াছিল।

তখন লর্ড কার্জ্জন ভারতে বড়লাট। তিনি আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন—যাহাকে Oriental splendour বলে, তিনি মনে করিতেন তাহা ব্যতীত প্রাচীতে সম্ভ্রম থাকে না। মহারাণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন ; এ দেশে সিপাহী যুদ্ধের অবসানে তিনি—ইংলণ্ডের রাণীরূপে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ করেন এবং সেই উপলক্ষে যে ঘোষণা প্রচার করেন, তাহার নারীজনোচিত সহানুভূতি স্নেহেতুষ্ট অত্যাচারপীড়িত ভারতবাসীকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে এ দেশে সাড়ম্বরে শোক প্রকাশ হয়, ইহাই লর্ড কার্জ্জনের অভিপ্রেত ছিল। তিনি সেই জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার ভার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেন। যতীন্দ্রমোহন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি স্বীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনরূপ অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করিতেন না এবং ব্যয় সম্বন্ধে সাবধান ছিলেন। কেবল সম্ভ্রম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিছু অতিরঞ্জিত থাকায় তিনি বৃটেনের অভিজাত সম্প্রদায়ের গৃহের অনুকরণে আপনার গৃহের "কাশল" নামকরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীররক্ষী না থাকিলেও কয় জন "তুড়ুক শওয়ার"—অর্থাৎ অশ্বারোহী পত্রবাহক প্রভৃতি ছিল—তাহাদিগের উর্দ্দী জমকাল। লর্ড কার্জ্জনের অভিপ্রেত অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বুঝিয়া তিনি—"অনেক চিন্তার পর" সে কাজের ভার "সঙ্গীত সমাজ" গ্রহণ করিতে সম্মত কি না জানিবার জন্য পত্র লিখিলেন—সঙ্গে সঙ্গে লর্ড কার্জ্জনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। এক দিন সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় যতীন্দ্রমোহনের "তুড়ুক শওয়ার" "সঙ্গীত সমাজে" তাঁহার পত্র দিয়া গেল। সন্ধ্যায় যখন "সমাজে" সদস্যরা সমবেত হইলেন, তখন পূর্ণ মজলিশে পত্রের বিষয় বিবেচিত হইল। প্রথমে তাহাতে কেহ বিশেষ উৎসাহ দেখাইলেন না। কিন্তু শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্তের "তৃতীয় পন্থা"। তিনি বলিলেন, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ সরকারের নিকট persona grataদিগকে বাদ দিয়া এই কাজ করিবার সুযোগ ত্যাগ করা "সমাজের" পক্ষে সঙ্গত হইবে না। নিবারণ বাবু সকল বিষয়ে বিরাট পরিকল্পনা করিতে ভালবাসেন—কলিকাতায় বাস চালাইবার পরিকল্পনা তাঁহার, তবে তখন তাহা সফল হয় নাই—কারণ, পুলিশ কলিকাতা হইতে দমদম পর্য্যন্ত পথে বাস চালান তখন নিরাপদ মনে করে নাই এবং সে কাজ কোন য়ুরোপীয় কোম্পানী না করিয়া ভারতীয়রা করিবে—ইহাও ইংরেজের অভিপ্রেত ছিল না ; কলিকাতা বেষ্টন করিয়া "সার্কুলার" রেলপথ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তিনি প্রথম করেন। যাঁহারা এইরূপ পরিকল্পনা করেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে অধিকাংশ স্থলে যাহা হয়, নিবারণ বাবুরও তাহাই হইয়াছে—

"ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর ;
বহিয়াছি এ জীবন—আশার ও নিরাশার।"

তাঁহার উৎসাহ সভ্যদিগের মধ্যে সংক্রমিত হইল। অনেকে মনে করিলেন, প্রতিষ্ঠা লাভের এই সুযোগ হেলায় ত্যাগ করা অসঙ্গত হইবে। তখন ইংরেজ দেশের রাজা—তাহার নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করা সহজেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত ছিল। কিরূপ অনুষ্ঠান করা হইবে—কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে সে সকল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা হেতু কেহ কেহ লর্ড কার্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণে দ্বিধানুভব করিতেও লাগিলেন। শেষে অধিকাংশের মতে যখন প্রস্তাব গ্রহণ করাই স্থির হইল, তখন নিবারণ বাবু যতীন্দ্রমোহনের পত্রের উত্তর দিতে স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সংবাদ দিয়া "সমাজ"-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন "সঙ্গীত সমাজ" অনুষ্ঠানের ভার লইলেন, তখন উত্তোগ-আয়োজন দ্রুত চলিতে লাগিল। স্থির হইল, হিন্দু প্রথায় অনুষ্ঠান হইবে—সকলে শুভ্রবেশে, নগ্নপদে গড়ের মাঠে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইবেন—দলে দলে কীর্ত্তনকারীরা মৃদঙ্গ ও করতাল সহ গান করিবেন; কাঙ্গালী-ভোজনের "ঢালাও" ব্যবস্থা হইবে। আদ্যশ্রাদ্ধে বিরাট আয়োজন তখন ধনীদিগের পরিবারে প্রচলিত প্রথা ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সেই আয়োজনের পরিধিবিস্তার করা হইল। কথিত আছে, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব (দে) ক্লাইবের মুন্সীগিরি করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং মুর্শিদাবাদ কান্দীর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মৃত্যুশ্রাদ্ধে কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল, তাহার পরিচয়ে বলা যায়, সমাগত ভিখারী প্রভৃতির ব্যবহার জন্য "তেল পুকুরে" অর্থাৎ যথেচ্ছা তৈল লইবার জন্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মত বিরাট আধার (চৌবাচ্চা) নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং "কবি"-গান ছিল :—

"মহিষের শিং হরিণের শিং, তা'রে কি
　　　　বলি শিং ?
শিং-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং।"

পূর্ব্ববঙ্গে ভাগ্যকুলের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায়-পরিবারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিরাট ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত।

হেমচন্দ্র বসুমল্লিকের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি "ছোট করিয়া" কোন কাজ করিতে পারিতেন না। তিনি তখন "সঙ্গীত সমাজের" কেন্দ্রে অবস্থিত। তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদিগের সমবেত চেষ্টায় কয় দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠান কি রূপ ধারণ করিবে, তাহার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়া গেল। "সঙ্গীত সমাজের" কর্ত্তারা—তাঁহাদিগের ব্যবস্থায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সরকারের আদৃত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন।

"সঙ্গীত সমাজের" আয়োজন যখন বিরাট হইয়া উঠিল, তখন উপেক্ষিত জমীদার সভা—বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের কোন কোন সদস্য সে আয়োজনে বাধাদানের চেষ্টাও করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

২রা ফেব্রুয়ারী (১৯০১ খৃষ্টাব্দ) গড়ের মাঠে জনসমাবেশ ও কীর্ত্তনের পরে ৩রা ফেব্রুয়ারী (রবিবারে) কাঙ্গালী-ভোজন। বিডন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল হইতে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের (কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটের) সংযোগস্থল পর্য্যন্ত সমগ্র কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের দুই পার্শ্বের ফুটপাথ কলিকাতা কর্পোরেশন "সমাজকে" ব্যবহার-জন্য দিলেন—দুই দিকের ফুটপাথে ৪ সারিতে কাঙ্গালীরা—নরনারীশিশু—আহার করিতে বসিল। আহার্য্য—

খিচুড়ী
কপির তরকারী
দধি
বোঁদে

কয়টি কেন্দ্রে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করিয়া গাড়ীতে লইয়া পরিবেশন করা হইল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাগ্রহে পরিবেশন-কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ভীমনাগ সন্দেশ দিয়াছিলেন।

অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। লর্ড কার্জ্জন সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। "সঙ্গীত সমাজের" গৌরব হইল। যে সকল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন লোক "সমাজের" সভ্য ছিলেন না, তাঁহারা সভ্য হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার জমীদার সভার গর্ব্ব ক্ষুণ্ন হইল—কারণ, সে সভা এ দেশে প্রথম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হইলেও—তাহার প্রয়োজনকাল অতীত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা সরকারের আদরেই গর্ব্বিত ছিল।

কিন্তু ইহাতে "সঙ্গীত সমাজের" কোন স্থায়ী উপকার হইল না। তাহার কারণ, "সমাজ"—যদিও সংস্কৃতি-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল এবং যদিও কলা-ভবন হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি এ কথা বলা যায় না যে, তাহাকে স্থায়িত্বদানের ও ক্রমবিকাশ-পথে পরিচালিত করিবার জন্য যে আন্তরিক ও সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন ছিল, "সমাজের" কর্ম্মকর্ত্তারা তাহা যোগাইবার চেষ্টা করেন নাই। অভিনয় হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য শোক প্রকাশের অনুষ্ঠান—সকল কাজেই তাঁহারা অস্থায়ী সাফল্যলাভের জন্য বিলম্বভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মত উৎসাহ দেখাইয়াই পরিতৃপ্ত ও নিবৃত্ত হইতেন। কোন স্থায়ী আদর্শ লইয়া তাঁহারা কাজ করিতেন না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি। "সঙ্গীত সমাজে" যত ধনীর সম্মিলন হইতেছিল, তত এক শ্রেণীর লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তথায় সমবেত হইতে থাকে। তাহাদিগের মধ্যে কয় জন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীও ছিল। ইহারা "শেয়ার" বাজারের আবহাওয়া লইয়া আসিত এবং ফাটকাবাজি তাহাদিগের প্রকৃতিগত ছিল। ইহাকে যেমন কাফিখানায় বাজারের লেন-দেন সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থা হয়, ইহারা "সঙ্গীত সমাজে" তেমনই ব্যবসার বাজারের কাজ চালাইয়া লাভবান হইবার চেষ্টা করিত। ফলে কোন কোন সদস্য আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং "কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাক" নীতি অনুসরণ করিয়া তাহা আর প্রকাশ না করিয়া ক্রমে "সমাজে"র সহিত সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা শিথিল করিতে থাকেন। ভুক্তভোগীদিগের নামোল্লেখ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না; নামোল্লেখের কোন প্রয়োজনও নাই।

যে উদ্দেশ্য লইয়া "ভারত সঙ্গীত সমাজ" ক্ষুদ্র আকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার দ্রুত বিস্তার সেই উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে অনুকূল হয় নাই। তদ্ভিন্ন "সমাজ" ক্রমে নানা শ্রেণীর লোকের মিলন-কেন্দ্র হয় ও তাঁহারা "সমাজের" প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত বা সচেতন ছিলেন না।

এই সকল কারণে ও ব্যয়বাহুল্যহেতু "সমাজের" অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল এবং "সমাজ" অনেক সুযোগের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। তাহা "সমাজের" ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়। "সমাজের" উদ্যোগী সভ্যরা গুণীদিগকে আদর করিতেন —সঙ্গীতে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, অভিনয়ে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আদৃত হইতেন—সে হিসাবে "সমাজে" ধনী ও মধ্যবিত্তে কৃত্রিম প্রভেদ ছিল না। তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল।

[ক্রমশঃ।

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

সেই যে মা'র কাছে এলো মিত্রা আর দু'মাস পরে ওকে যেতে হলো বাপা হয়ে জ্যাঠা মশাইর মৃত্যু-খবর পেয়ে। স্বজন হারানোর ব্যথা নিয়ে কাঁদলো ও।

এবার একসঙ্গের অন্ন ভিন্ন হয়ে উঠে গেলো যার যার ঘরে। এক হাঁড়িতে সেদ্ধ হবার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যেন চাল-ডালগুলো পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। শৈলনন্দিনী আর ভিন্ন হবেন কাকে নিয়ে—তিনি আর স্বর্ণময়ী রইলেন একসঙ্গে।

অমিত আজকাল একেবারেই অদৃশ্য মানুষ। দু'বেলার খাবার অবধি ঢেকে রেখে আসতে হয় ওর তেতালার ঘরে।

কমলার যখন-তখন গেয়ে-ওঠা গান আর শোনা যায় না। সে চলে গেছে স্বামীর কাছে।

নিজেকে স্বামীর সঙ্গে মিশ খাওয়াতে পারে না রাণী। ওপক্ষেরও নেই সেদিকে সামান্যতম গরজ। এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের ভেতর কেটে চলেছে মিলিত জীবন। এক জনের সত্তা-পেষা মৃত স্তব্ধতার ওপর অপরের প্রভুত্বের দাপট যেন ভস্মস্তূপের ওপর রাজসিংহাসন। ছেড়ে দিয়েছে রাণী বাপের বাড়ীর নাম উচ্চারণ—শুধু নীরব কৃতজ্ঞতায় মন ভরে আছে মিত্রার প্রতি। ছোট বোনটি পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করেছে, এবার ভর্তি হবে কলেজে। একটি তলিয়ে-যাওয়া মেয়ে ভেসে উঠেছে, বেঁচে উঠছে মিত্রার জন্য। কিন্তু এ কথা ওরা দুটি প্রাণী ছাড়া ঘরের দেয়ালগুলিও বুঝি সেদিন শুনে থাকলে আজ ভুলে গেছে।

আর জয়ন্তীর দাম্পত্য-জীবন গড়ে-পড়ে কেটে যাচ্ছে বেশ এক ভাব, একমত স্বামী যদি বা হাতের মুঠো আলগা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, স্ত্রী ধরলো চেপে। স্ত্রীর কোন দুর্বল মুহূর্তের জন্য স্বামী—সুখী জোড়। অর্থাৎ দুর্লভ এক সৌভাগ্যের অধিকারিণী জয়ন্তী।

তার উপর এক বড় বউ, তাতে পুরোনো হয়ে দিনকে দিন কর্ত্রী হয়ে উঠতে লাগলো জয়ন্তী। কিন্তু মিত্রার কর্ত্রী কোথায় যে সে কর্ত্রী হবে! সংসার-সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগলো ও ঢেউএর মাথার এক পুঞ্জ শুভ্র ফেনার মত।

দিনে দিনে বাড়ীটার চার পাশ ঘিরে জমে উঠতে থাকে কেমন যেন একটা চাপ-চাপ নিরানন্দ ভাব।

কিন্তু কমলার উপস্থিতির প্রাণ-প্রাচুর্য্য-বঞ্চিত হলেও বেশ কিছুটা আনন্দ ছড়িয়ে দিয়ে যায় ওর চিঠিগুলো। একের পর এক আসছেই—

এই বৌদিরা,

মুখ-দেখাদেখি থাকে তো তিন-মাথা এক করো। এক জন পড়, দু'জন শোন হাতে চিবুক রেখে। এক বাড়ীতে একই কথা তিন কপি করে লিখতে পারব না। কিন্তু এতো আয়োজন করে ডেকে বসিয়ে শোনাব কি গো!...তোমাদের অসিত বাবুটির দেখা মেলা ভার। ডাক্তার—তাতে মিলিটারীর। মিলিটারী কেতায় চলেন, ফেরেন, বলেন, কাজ করেন। গৃহস্থ মানুষ আমি—ঘোমটার ফাঁকে চোখ বড় করে চেয়ে থাকি। হাসছ তো? ঘোমটা আবার কবে মাথায় তুললাম? ওটা রূপক—মাথার ঘোমটা নয়, মনের। এ সমাজের মতো উপযুক্ত না হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত বুঝি সাহস পান না কোথাও নিয়ে বেরুবার। ভয়ে ভয়ে দু'-এক বার কথা তুলেই কেটে পড়েন। আর আমার কাটে বসে, নয় ত অর্দ্ধশায়িত ভাবে চোখ বুজে। ঘুমোতে যে মেয়ে যেতে চায় না চোখ বন্ধ করতে হয় বলে—সে মেয়ের জেগে চোখ বুজে থাকা! পালিয়ে আসব।'

পরের দিনই হয়ত এলো আবার চার লাইন—

প্রিয় বৌদিরা,

এই মাত্র পরিচয় হলো এক মুসলমান অভিজাত পরিবারের সঙ্গে। বেগম-গিন্নীর গড়গড়াটি মন হরণ করে নিয়েছে। মোগলাই বিরিয়ানী আর স্বামী কাবাব খেয়ে এখন শোফায় গা ডুবিয়ে অভাব বোধ করছি ঐ রকম একটি আতরগন্ধ অম্বুরি তামাক ভরা বেগমী গড়গড়ার। নিদেনপক্ষে একটা সিগারেট—চাইব নাকি ওর কাছে? অবশ্যি খানিক আগে নিজেই বাড়িয়ে ধরেছিলেন কৌটোটা—'।

রাণী আর মিত্রা হেসে লুটিয়ে পড়ে। জয়ন্তী হাসে আবার' সঙ্গে মন্তব্যও জুড়ে দেয়—'যেমন অসিত, তেমনি কমলা। ও ঠিক সিগারেট খাবে, দেখো।'

অপ্রত্যাশিত ভাবে সেদিন একেবারে কমলা নিজেই এসে উপস্থিত। একা নয়, সঙ্গে জা ননদ মিলে চার-পাঁচ জন। বেরিয়েছে দেওরের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।

ওকে পেয়ে সবার মনেই বেশ একটা খুসীর হাওয়া বয়ে গেল। মা বললেন—'ছেলেকে নিয়ে এলি না কেন?'

—'আমরা কি শুধু এখানেই এসেছি মা? কত জায়গায় ঘুরলাম—আরও ঘুরব।'

জয়ন্তী চিকোন-পাটী বিছিয়ে দিতে দিতে বলে—'ছেলেকে আমাদের কাছে রেখে বেরুলেই পারতে।'

রাণী জানতে চায়, চা খাবে তো?

'মরে গেলাম খিদেয়। বাড়ী-বাড়ী ঘুরে নেমন্তন্ন করা কি সোজা ঝকমারী, বাবা! একতলা, দোতলা, তিনতলা ওঠ আর নাম. নাম আর ওঠ। কোমর ভেঙে গেছে। হাতে চিঠি দিয়ে মুখে বল—'যাবেন কিন্তু।' তবেই নেমন্তন্ন সই।' নইলে চিঠি দিলে—'কই, কেউ তো এসে বলে যায়নি!' মুখে বলে এলে—'চিঠি তো পাইনি। এ নিয়ম আর চলতে দিতে নেই। চিঠি—শুধু মাত্র সুন্দর মনোরম ঝকঝকে একটি চিঠি; বাস্। ত্রুটিহীন নিমন্ত্রণ।'

মিত্রা হেসে বললে—'চিঠির মতো তোমার কাছে মূল্যবান আর কিছুই নয়?'

—'একেবারেই না। কিন্তু তুমি তো আবার সে বিষয়ে একেবারে কুঁড়ের সর্দার। ভুলেও চিঠি দেও না।'

—'এক বাড়ী থেকে একই কথা তিন কপি করে যাওয়া অর্থহীন।'

হেসে উঠল কমলা—'হারিয়ে দিলে।' চা-পর্ব শেষে ওঠার মুখে মা বলেন—'যাবার আগে থাকবি তো এসে দু'দিন?'

—'থাকলাম তো দু'ঘণ্টা।'

-'দু'ঘণ্টা আবার একটা থাকা নাকি?'

—'তবে দু'দিনও একটা থাকা নয়। থাকব একটি মাস। আপত্তি নেই তো?'

—'কি যে বলিস'—খুসীতে হেসে ফেলেন স্বর্ণময়ী।

তার পর গাড়ীতে উঠে বসে মুখ বাড়িয়ে বললো দাদাদের—'আমরা কিন্তু তোমাদের মতো বড় লোক নই দাদা। খাওয়াব। যদিও হাতে হাতে ডিস, তবু ভর পেটের ব্যবস্থা, বুঝলে?'

—'বড় লোক নোস বলে খাওয়াবি! সে আবার কি কথা রে? হেসে জিজ্ঞাসা করেন দাদারা।

—'আজকালকার বড় লোকরা খাওয়ায় না। শুধু নিজেরা খায়—খাওয়ার উপরে খায় আর মোটা হয়। কিন্তু শমি মামাকে তো পেলাম না জ্যাঠাইমা! তুমি বোলো, না গেলে রক্ষে রাখব না।'

বাড়ীটা যেন হাসি আর এক মুখের সহস্র কথার বন্যায় প্রাণ পেয়ে বাঁচলো।

কিন্তু হাসি দিয়ে আরম্ভ হলেই আর তার সমাপ্তিও হাসিতেই হবে, এমন কথা নেই। হলোও না। পরিণতি গড়িয়ে গেলো এক বিরাট অপ্রীতিকর ঘটনায়।

অভাবনীয় রূপে নেমন্তন্ন বাড়ীতে দেখা হয়ে গেলো মিত্রার ওর এক সহপাঠিনীর সঙ্গে। সেই কবে দু'বন্ধু গলা জড়িয়ে স্কুল-বাড়ী ঘুরে বেড়িয়েছে। টক কুল আর তেঁতুল খেয়েছে নুণ কাঁচা লঙ্কা গুলে। বাড়ীর সম্মতি আদায় করে নিতে পারলেই ছুটে এসেছে এক জন আর এক জনের কাছে কাটিয়ে যেতে। উঃ, কত যুগ আগের কথা যেন! আনন্দ-আতিশয্যে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো। ভীড় থেকে দূরে সরে, হল-ঘরটার কোণ ঘেঁসে বসলো কথা বলতে।

—'ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট এম. এ হয়েছিস্! প্রফেসরি করছিস মেয়ে-কলেজে? বিয়ে করিস্নি?'

—'না ভাই!—তাতেই ছিলাম ভাল। কিন্তু আর বুঝি ভাল থাকা অদৃষ্টে নেই।' রমা মৃদু হাসে।

সামনে মন্দ থাকার সম্ভাবনায় কেউ হাসে নাকি অমনি করে! নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলো মিত্রা।

—'শীগগিরই বিয়ে করতে হচ্ছে। অবশ্যি কোন হৈ-হাঙ্গামা নেই। রেজিষ্টার ম্যারেজ। সন্ধ্যায় কাগজটি সই করে, ঘরে এসে ডিনার টেবিলে মুখোমুখী বসা। জানতে চাওয়া, ভাত সহ্য হবে, না রুটি-কেক চাই। বাস্, দাম্পত্য-জীবন আরম্ভ।'

—'রুটি কেক কেন!'

—ভদ্রলোকটি যে সুদূর জর্মণ দেশীয়।

রমা টুপ করে মিত্রাকে যেন বিস্ময়-সমুদ্রে ছেড়ে দিলো।—জর্মণ!'

—'হ্যাঁ ভাই। এদেশে এসেছিলেন সংস্কৃত পড়তে। এক প্রফেসরের বাড়ীতে পরিচয় হলো, আর সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো নিজ বাড়ীতে। আমিও সংস্কৃতের ছাত্রী ছিলাম তো। কিন্তু ঐ চাপা চিবুকের স্বল্পভাষী ব্যক্তিটি যে ভেতরে ভেতরে আমায় বিয়ে করবার জন্ম ক্ষেপে উঠতে পারেন—কল্পনাও ছিল না ভাই!'

হাঁ করে কথা শোনা যাকে বলে, মিত্রা ঠিক সেই ভাবে বসে। ঠাট্টা-মেশানো স্তম্ভিত সুরে বললো—'সংস্কৃতে কথা বলিস নাকি তোরা?'

হেসে উঠলো রমা—দূর! ভাল ইংরেজী জানেন। আর কথাই বলেন না, তা ভাষা! বিয়ের প্রস্তাবটি পর্য্যন্ত করেছেন কথা বাদ দিয়ে। ওঁর মা'র জর্মণ ভাষার চিঠি ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমার সামনে রেখে চুপ করে বসে রইলেন। পড়লাম—'ভারতীয় মেয়েদের ভালো লেগেছে, তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছো জেনে আমরাও তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ বোধ করছি। যে মেয়ে ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে তোমায় এতটা শ্রদ্ধান্বিত করেছে, সে কি তোমার সঙ্গে আমাদের কাছে আসতে রাজী আছে—'

কখন যে কে এসে হাতে তুলে দিয়ে গেলো খাবারের ডিস, কখনই বা সে ডিস খালি করে ওরা চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়েছে চৈতন্যই ছিলো না দু'জনার। চমকে উঠলো জয়ন্তীর ডাকে।

—'এই যে মিত্রা! হয়রাণ হয়ে গেছি তোমায় খুঁজে-খুঁজে! চল শীগ্ গির। মা-জ্যাঠাইমারা বসে আছেন খাবার নিয়ে।

—আমি খেয়েছি দিদি! তার পর হাসিমুখে বললো—'এসো তোমার সঙ্গে রমার আলাপ করিয়ে দি—'

কিন্তু মিত্রার মুখের হাসি আর কথা একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো পিসিমা'র আঁতকে-ওঠা কণ্ঠস্বরে।

—'কি সর্বনাশ! কোন্ খাবার খেলে তুমি? এতে যে মাছ মাংসের চপ-টপ কত কি রয়েছে। ও ডিস খেয়ে উঠেছ?'

সমস্ত হল-ঘরটা যেন একসঙ্গে মুখ তুলে চাইল মিত্রার দিকে।

—'স্বাদ-গন্ধও টের পেলে না গো!' পিসিমা'র দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন।

বিমূঢ় মিত্রা।

না, স্বাদ-গন্ধ কিছুই সে ধরতে পারেনি। চিনে উঠতে পারেনি নানা আকার ও প্রকারের পুরী-কচুরি-মিষ্টির সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকা আমিষ খাবার। ওর মন বিদেশী সংসারে বাঙ্গালী বধূ রমার সঙ্গে, সুদূর জর্মণ দেশে চলে গিয়ে আনন্দ-বিস্ময়ে সব দেখবার-চেনবার চেষ্টা করছিল।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলো রমা—মিত্রা বিধবা। এ দেশের মেয়েকে জীবনের এ বৈধব্য-প্রহসন দূর হতে আর কত দেরী!

এমনি সময় ছুটে এলো কমলা। 'কি আশ্চর্য্য ছোট বৌদি তুমি তো দেখছি সত্যি বিশ্বসংসার ভুলেই বসেছিলে গো। নিজ হাতে আমি তোমায় লুচি-মিষ্টির ডিস দিয়ে গেলাম—একটু খেয়াল নেই? দাঁড়িয়ে রয়েছ হাঁ করে!'

পিসিমা কমলার এই ধোঁকা দেওয়ায় ভুললেন না। বাড়ী এসে ঘৃণায় অপ্রবৃত্তিতে শিউরে উঠতে লাগলেন।—'মা গো কি ঘেন্নার কথা! কমলার শ্বশুর-বাড়ীতে কি আর মান-সম্মান রইল!'

স্বর্ণময়ীর জীবনে এই প্রথম।

ননদের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'ঘরের সম্মান দু'পায়ে ডুবিয়ে থেঁতলে তোমার বড় আনন্দ হয়, না? এবার আমাদের টিপে মেরে তবে তোমার শান্তি। চিরটি কাল এই করছে। করবেও যত দিন বাঁচবে।'

স্বর্ণময়ীর অনভ্যস্ত চিৎকারে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও সামলে উঠতে আর পিসিমা'র কতক্ষণ! মুখ চেপে চেপে বললেন—'তোমার বৌ নয়, লোগাচ্ছি বুঝি তোমাদের আমি?'

—'এক হাট লোকের মাঝে তুমি বুঝি চেপে যেতে পারতে না? শত্রুতা থাকলেও যে এক জন আর এক জনকে এমন লাঞ্ছনা আর অপদস্থ করে না সবার মাঝে। আমরা কি তোমার শত্রুর চাইতে বেশী! তুমি কাশীতেই চলে যাও ঠাকুরঝি! অন্তত আমার কাছে আর ঠাঁই পাবে না।'

পিসিমা কেঁদে-ককিয়ে মৃত ভাইদের আহ্বান জানালেন একবার এসে তাঁর অপমান দেখে যাবার জন্য।

শৈলনন্দিনী ননদের হয়ে তিরস্কার করে ওঠেন স্বর্ণময়ীকে। 'এ কি অন্যায় মতো দোষারোপ করছো স্বর্ণ! আচমকা বিস্ময়ে মুখ দিয়ে কথা যে আপনা থেকেই বের হয়ে আসে মানুষের। এমন বেদিশা বেদস্তুর চলা—মিত্রা তো ছেলেমানুষটি নেই।'

—'না, মিত্রা ছেলেমানুষটি আর নেই। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তার।' ঘরের মাঝখানে এসে দরজা ধরে দাঁড়ালো মিত্রা। 'তার সব বোঝা উচিত এবং বুঝে-শুঝেই সে বলছে—ইচ্ছে করেই সে খেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সে খাবে। কারণ না খাওয়ার ভেতর ন্যায়সঙ্গত কোন যুক্তি নেই বলে—এ আপনারা আজ থেকে জেনে রাখুন।'

—'বেশ, বেশ, তোমার শাশুড়ীকেই কথাটা গুছিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেও—তবেই আমরা রক্ষা পাই। আমাদের বোঝা হয়ে গেছে অনেক আগে।' কথার শেষে ঘাড় কাত করেন না তো, যেন বিষ ঢালেন পিসিমা।

ভাঙ্গা-গলায় রক্ত-চোখে ছুটে এসে দু'হাতে ঠেলতে থাকেন স্বর্ণময়ী মিত্রাকে। যেন উন্মাদ হয়ে গেছেন।—'এ সব কি বলছ তুমি? যা খুসী তাই বলবে এমন নির্লজ্জ স্পর্ধা তোমার! ভদ্রঘরের বৌ না তুমি—চলে যাও এখান থেকে—এখান থেকে নয়—বাড়ী থেকেই দূর হয়ে যাও তুমি। তোমার মুখ দেখতেও আমি চাই না।'

মিত্রা দাঁড়িয়ে রইলো তেমনি শক্ত কাঠ হয়ে। রাণী এসে টেনে নিয়ে গেলো মিত্রাকে। ঘরে এসে কেঁদে ফেললো ও। এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আর জীবনেও আসব না এ-বাড়ীতে। না-ও ছোঁয়াব না কোন দিন। কি অসভ্য জানোয়ার এরা! খাওয়া নিয়ে এমন কাণ্ড—ঘেন্নায়-লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে কচ্ছে—এখানে থাকা হয়ে গেলো আমার—আর নয়।'

—'খুবই উচিত কথা মিত্রা। কিন্তু এটা করবার আগে ছুটে গিয়ে এক পসলা ঝগড়া করে আসবার কি প্রয়োজন ছিলো? ছেলে-মেয়ে দুটো ভয়ে-আতঙ্কে কেমন হয়ে গেছে দেখেছো?' ওদের দু'জনকে কাছে টেনে আদর করে রাণী। বলে—'বুদ্ধি কি তোমার মাঝে মাঝে হাওয়া খেতে বেরোয় মিত্রা! আজকের এ কাজটা একটুও সমর্থন করতে পারছি নে। এটা রুচিসম্মত হয়নি—অন্তত তোমার পক্ষে হয়নি।'

—'নিজ ঘরের বাইরে পা বাড়ালেই যে রুচিকে শুধু কোপ খেয়ে চলতে হয়, সে রুচিবোধ আর কত দিন টিকে থাকে!'

—'শুধু বাইরের রোদ-জলের ভরসায় গাছের বাঁচতে হলে অনেক গাছই মানুষকে ছায়া আর আনন্দ দেওয়ার আগে প্রাণ হারাতো। ঘরের জল ঢেলেই তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়। সৌন্দর্য-বোধটা আপন গরজের ব্যাপার—তোমায় বলব কি, এ শিক্ষা তো ভাই তোমার কাছেই পাওয়া। কিন্তু মেজাজ বিগড়োলো তো তোমার সব কল বিগড়োলো। যাক্—তুমি রওনা হয়ে পড়। আমি গিয়ে ওদের থামানোর চেষ্টা করে দেখি। মা আজ সত্যি পাগল হয়ে উঠেছেন। বড়দি আর ভাই দুটি গিয়ে ঢুকলো যার যার ঘরে। শমিত ওপরে। এই তো রুচি এই বাড়ীর। কমলা ছাড়া কেউ মানুষ নয়।' রাণী শাড়ীর আঁচল দিয়ে কুমার-মুন্নীর মুখ মুছিয়ে চুলগুলো দিলো হাত-আঁচড়ে পাট করে। তার পর চুমু খেয়ে গেলো বেরিয়ে।

ঘরের ভার ডালিমের উপর দিয়ে মিত্রা ছেলে-মেয়ের হাত ধরে উঠলো গিয়ে গাড়ীতে। একবার ফিরেও তাকালো না বাড়ীর এদিক-সেদিক দাঁড়ানো মানুষগুলোর দিকে। জয়ন্তীর ঘরের বাতিটা হঠাৎ টুক করে নিবে গেল আর অন্ধকার জানালায় দাঁড়ালো এসে একটা ছায়া—মিত্রা পিঠের অনুভবে তা বুঝতে পারে।

গাড়ী ষ্টার্ট নিয়েছে—নীরবে এসে ড্রাইভারের পাশে বসলো শমিত।

—'এই মোহন সিং, রোখো—' যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে গাড়ী থামালো মিত্রা। শমিতের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে রুখে উঠলো—'এ কি, তুমি উঠে বসলে যে?'

—'তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসতে।' সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে অবিচলিত শান্ত জবাব দিল শমিত।

—'কে ডেকেছে তোমায়, কোন প্রয়োজন নেই। যাও তুমি—নইলে আমিই যাচ্ছি—'

—'সিন করো না মিত্রা!' ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে এবার নিজেই গিয়ে বসলো শমিত ষ্টিয়ারিং ধরে।

দেড় ঘণ্টার পথ আড়াই ঘণ্টা, কিংবা তারও বেশী সময়-নেওয়া ঘুর-পথে চৌরঙ্গীর রাস্তায় গাড়ী চালিয়ে তার পর বালিগঞ্জের পথ ধরল শমিত। খোলা হাওয়া আর সময়—শান্ত হোক মিত্রা।

নিষ্ক্রিয় মন নিয়ে বসে না থাকলে গাড়ীর পথ ও গতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলতো ও। বাড়ীর দরজায় নেমে সোজা চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালো মিত্রা। বললো—'গাড়ীশুদ্ধ খানা-ডোবায় ফেলে না দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ! অবশ্যি তাতে নিজেরও যে বাঁচবার উপায় থাকত না!'

—'না, বাঁচবার আর উপায় দেখছি নে।' মুহূর্তে গাড়ী চালিয়ে চলে গেলো শমিত।

[ক্রমশঃ।
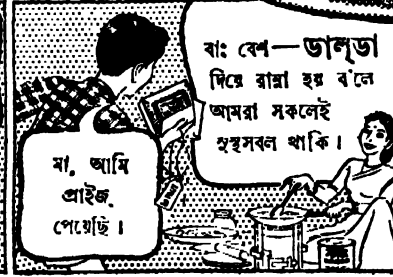
[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নয়

কিরীটির আচম্কা প্রশ্নে অবিনাশ যেন কেমন একটু চম্কে থতমত খেয়ে বলে : 'আজ্ঞে !'

'কেমন একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছো দেখছি কিনা ? পায়ে চোট্ লেগেছে নাকি ?—' বেশ মোলায়েম কণ্ঠে কিরীটি আবার শুধোয়।

'আজ্ঞে, ঠিক খুঁড়িয়ে নয় তবে জন্ম হতেই বাঁ পা'টা একটু খাটো কিনা, তাই একটু টেনে চলতে হয় চিরদিনই !—'

শতদল বাবু এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। হাতে তার একটা ভারী পিতলের বড় তালা ও একটা চাবী !

'এই নিন্ তালা কিরীটি বাবু !—' তালা ও চাবীটা এগিয়ে দিল শতদল কিরীটির দিকে।

'হাঁ, দিন !—' কিরীটি তালা ও চাবী শতদল বাবুর হাত থেকে নিল : 'চাবী কি এই একটাই, না duplicate key আছে ?'

'আছে—'

'সেটা কোথায় ?—'

'ও-ঘরে চাবীর রিংয়ে আছে। এনে দেবো কি ?'

'না থাক !—চলুন বাইরে যাওয়া যাক !—'

সকলে আমরা বাইরে এলাম। কিরীটি নিজে হাতে দরজায় তালা-চাবী দিয়ে চাবীটা নিজের জামার পকেটে রেখে দিল : এটা আমার কাছেই রইল শতদল বাবু! ডুপলিকেট চাবীটাও আমাকে দেবেন !—

'বেশ ত !—'

তার পর হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়েছে এই ভাবে আলো হাতে দণ্ডায়মান অবিনাশের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটি তাকেই প্রশ্নটা করলে, 'হাঁ, ভাল কথা অবিনাশ ! আজ এই কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যার দিকে তুমি যখন আমাদের সদর দরজা খুলে দিতে গিয়েছিলে বলেছিলে না, বড় বাবু মানে হরবিলাস বাবু তোমাকে আমাদের আসবার কথাটা জানতে পেরেই সদর দরজাটা খুলতে পাঠিয়েছিলেন ?—'

'আজ্ঞে—' মৃদু কণ্ঠে অবিনাশ জবাব দিল।

'আমরা যখন এ-বাড়ির সদরে এসে বাইরে থেকে ঘণ্টার দড়ি ধরে নাড়া দিই, তুমি আর তোমার বড় বাবু কোথায় ছিলে ?—'

'আমি রান্নাঘরের দিকে ছিলাম।—'

'আর বড় বাবু ?—'

'বড় বাবু রান্নাঘরের সামনে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারী করছিলেন।—'

'হুঁ ! ভুখনা কোথায় ছিল ?—'

'সে ত রান্নাঘরেই ছিল !—' পূর্ববৎ মৃদু কণ্ঠে অবিনাশ জবাব দেয় : 'রান্না করছিল বোধ হয় ?'

'হুঁ ! আচ্ছা, তুমি যেতে পারো।—আলোটা এইখানেই রেখে যাও।—'

অবিনাশ কিরীটির নির্দেশ মত হাতের হ্যারিকেনটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

একদৃষ্টে কিরীটি অবিনাশের গমন-পথের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

এবারে আমিও স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম সত্যিই অবিনাশ যেন তার বাম পা'টা একটু টেনে-টেনেই চলছে। যতক্ষণ অবিনাশকে দেখা গেল কিরীটি একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রমে অবিনাশ সিঁড়ি পথে নেমে নিচের দিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে যাবার পর কিরীটি শতদলের দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে : 'একটা ব্যাপার কখনো লক্ষ্য করেছেন শতদল বাবু, আপনাদের ঐ পুরানো চাকর অবিনাশের চলাটা একটু defective ! মানে চলবার সময় বাঁ পা'টা একটু টেনে-টেনে চলে ?'

'কই, না ! কখনো লক্ষ্য করিনি ত ?—' শতদল জবাব দেয়।

'লক্ষ্য করেননি ? আশ্চর্য !—'

না, সত্যিই লক্ষ্য করিনি। তবে একটু আস্তেই যেন ও চলা-ফেরা করে সাধারণত বলে মনে হয় !—' শতদল বললে।

'চলুন, আপনার ঘরে যাওয়া যাক !—' কিরীটি যেন তার নিজের দিক হ'তেই উত্থিত ক্ষণপূর্বের প্রশ্নটা অতঃপর এড়িয়ে গিয়ে শতদল বাবুর শয়ন-কক্ষের দিকে সর্বাগ্রে পা বাড়াল।

সকলে এসে আমরা কিরীটির পিছু-পিছু শতদল বাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এক কোণে একটা উঁচু টুলের 'পরে শাদা ডোম-ঢাকা আলো জ্বলছে। সমস্ত ঘরটা কিন্তু তবু সমান ভাবে আলোকিত হয়নি। ঘরটা আকারে বড় হওয়ার দরুণই বোধ হয় একটি মাত্র আলোয় সমস্ত ঘরটিকে তেমন ভাবে আলোকিত করতে পারেনি। ঘরের একটি মাত্র জানালা ছাড়া বাকী সব কয়টি জানালাই বন্ধ। এবং একটি মাত্র ঐ খোলা জানালা-পথে হু-হু করে সমুদ্রের হাওয়া ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করছিল।

কিরীটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সর্বাগ্রে ঐ খোলা জানালাটার দিকেই এগিয়ে গেল। আমিও কিরীটিকে অনুসরণ করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দূরে সম্মুখে দৃষ্টির সামনে যেন একটা দিগন্তপ্রসারী কৃষ্ণ চাদর আর কানে ভেসে আসে একটানা একটা চাপা গর্জন অন্ধকার ভেদ করে। কিরীটির হাতে তখনো শতদল বাবুর দেওয়া পাঁচ সেলের হান্টিং টর্চটা। তারই আলো সমুখের দিকে ফেলল কিরীটি।

আলোর রশ্মিটা বহু দূর পর্যন্ত গেল—একেবারে এ-বাড়ির গেট পর্যন্ত।

হাতের আলোটা বার কয়েক কিরীটি নিচে চারি দিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, তার পর আলোটা নিবিয়ে ঘুরে দাঁড়াল এবং শতদলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল: 'আপনি ত বলছিলেন শতদল বাবু, আপনার এ ঘরটা আপনার অনুপস্থিতিতে তালা দেওয়াই থাকে, তাই না?'

'হাঁ।'

'আজও তালা দেওয়াই ত ছিল?'

'না, বোধ হয় তালা দেওয়া ছিল না।'

'ছিল না?'

'না, এসেও দেখলাম, একটু আগে টর্চটা নিতে এসে, ঘরের দরজাটা কেবল ভেজানই আছে, তালা লাগান নেই!—কিন্তু আমার যত দূর মনে পড়ে, বিকালে বেরুবার আগে যেন তালা দিয়েই গিয়েছিলাম। 'কি জানি বোধ হয় তালা দিতে ভুলে গিয়েছি!—'

'চাবীটা কোথায় ছিল?'

'আমার পকেটেই ছিল।'

'আপনার এ-ঘরের তালার কোন duplicate চাবী ত নেই?—' কিরীটি আবার প্রশ্ন করে শতদলকে।

'আছে, সে-ও ঐ চাবীর রিংয়ের মধ্যেই!—'

'দেখুন ত, রিংয়ের মধ্যে চাবীটা আছে কি না? হাঁ, ঐ সঙ্গে রিং থেকে ষ্টুডিয়োর ঘরের তালার duplicate চাবীটাও আমাকে খুলে দিন।—'

কিরীটির নির্দেশে শতদল বাবু ঘরের কোণে রক্ষিত একটা কাঠের ভারী চেষ্ট ড্রয়ের একটা টানা খুলে তার ভিতর হ'তে একটা অনেকগুলো চাবীর গোছা সমেত রিং বের করলে। চাবীর রিং থেকে প্রথমেই শতদল ষ্টুডিও-ঘরের তালার ডুপলিকেট চাবীটা খুলে কিরীটিকে দিল; তার পর এ-ঘরের তালার ডুপলিকেট চাবীটা রিংয়ের চাবীর মধ্যে খুঁজতে লাগল। কিন্তু রিংয়ের সমস্ত চাবীগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও প্রয়োজনীয় ডুপলিকেট চাবীটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

'কি হলো, চাবীটা নেই?—' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আশ্চর্য্য! সত্যিই চাবীটা ত নেই দেখছি! বুঝতে পারছি না সুব্রত বাবু—পরন্তু ত যত দূর মনে পড়ছে দেখেছিলাম যেন রিংয়ের মধ্যে সে চাবীটা ছিল!—'

'যাক্! ও নিয়ে আর মিথ্যে ব্যস্ত হবেন না শতদল বাবু! আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম চাবীটা পাওয়া যাবে না।—' কথাটা বললে কিরীটিই।

'অনুমান করেছিলেন?'—বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শতদল কিরীটির মুখের দিকে।

'হাঁ!'—কিরীটির কণ্ঠ হ'তে ছোট সংক্ষিপ্ত জবাবটি উচ্চারিত হলো।

'আমি আপনার কথা ত ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়!—'

'আপনিই হয়ত দু'-চার দিনের মধ্যেই আমার কথার তাৎপর্যটা বুঝতে পারবেন। আমাকে আর কষ্ট করে বলতে হবে না শতদল বাবু! কিন্তু সে কথা থাক্। আপনি যে একটু আগে কি একটা চিঠির কথা বলছিলেন, চিঠিটা একটি বার দেখতে পারি কি?—'

'নিশ্চয়ই!'—শতদল বাবু এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা দেওয়াল-আলমারী খুলে তার ভিতর থেকে একটা শাদা, বড় আকারের রং ও তুলির সাহায্যে চিত্র-বিচিত্র খাম বের করে এনে কিরীটির হাতে দিল।

কিরীটি শতদল বাবুর হাত হতে খামটা নিয়ে আলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল। আমিও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

খামটার উপরে রংয়ের বাহার যেন চিত্র-বিচিত্র হ'য়ে উঠেছে। মানুষের মুখ হ'তে সুরু করে পশু-পাখী, ফল-ফুল, লতা-পাতা, কি যে নেই, তার ঠিকানা নেই।

অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে কিরীটি খামের উপরে আঁকা চিত্রগুলি দেখতে লাগল। খামের মুখটা খোলাই ছিল, অতঃপর তার ভিতর হ'তে একটা ভাঁজ-করা কাগজ টেনে বার করল।

আলোর সামনে ভাঁজ খুলে কাগজটা মেলে ধরল।

একটা চিঠি: চিঠির শীর্ষে ব্র্যাকেটের মধ্যে দুই লেখা।

(২)

আমার আত্মীয়দের প্রতি—ইহাই আমার শেষ নির্দেশ।	(৩)
সজ্ঞানে লিখিয়া যাইতেছি যে, রণধীর চৌধুরী আমি	(০)
আমার যাবতীয় সম্পত্তি ও এই 'নিরালা' গৃহখানি আমার	(৩)
দৌহিত্র শ্রীমান শতদল বোসকে আমার মৃত্যুর পর	(৫)
বর্তাইবে। কেবল মাত্র সে যেন স্মরণ রাখে যে আমার ষ্টুডিওতে	(৪)
যে সব আত্মীয়ের ছবিগুলো, যেমন পিতামহ প্রপিতামহের	(৬)
সেইগুলো ও অন্যান্য যে সকল পেনটিং ও ছবির	(৩)
এবং ঐ সঙ্গে ঐ কক্ষ-মধ্যস্থিত সমস্ত মূর্তিগুলোরও স্বত্ব	(২)
বাকী সব বর্তাইবে আমার দৌহিত্র শতদল কুমারে	(৩)
শুধু ঐ নয় আমার শিল্পী জীবনের নিন্দা ও যশের	(২)
উত্তরাধিকারীও একমাত্র সেই হইবে।	(৩)

ইতি—

রণধীর চৌধুরী: ৩০৩৫৪৩৩২৩২৩: ১৮ই ভাদ্র ১৩৫৩

অবাক-বিস্ময়েই চিঠিটা বার দুই আগাগোড়া পড়বার পরও চিঠিটার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। লেখা ছাড়াও চিঠিটার মধ্যে দু'পাশে দুখানি মুখের রেখা-চিত্র বা স্কেচ আঁকা।

কিরীটির দিকে আড়চোখে তাকালাম। কিরীটির সমস্ত চেতনা যেন চিঠিটার মধ্যেই তন্ময় হ'য়ে গিয়েছে। স্থির নিষ্পন্দ ভাবে চিঠিটা আলোর সামনে প্রসারিত করে হাতের মধ্যে ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা শতদল বাবুর কণ্ঠস্বরে কিরীটির তন্ময়তা ভঙ্গ হলো।

'দেখলেন ত চিঠিটা পড়ে মিঃ রায়? আমি আপনাকে ঠিক বলেছিলাম কি না যে, আমিই দাদুর যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং তাঁর সম্পত্তি বলতে এই নিরালা গৃহটা আর ষ্টুডিওর মধ্যে একটু আগে যে ছবি ও মূর্তিগুলো দেখে এলেন ঐগুলোই।'

'হাঁ! অন্তত চিঠিতে মোটামুটি ভাবে সেই নির্দেশই রয়েছে

দেখলাম।—' অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে যেন কিরীটি শতদলের কথার জবাব দিল।

ঘরের মধ্যে দেরাজের উপরে মাঝারী আকারের একটা টাইম-পিস্ ছিল, হঠাৎ সেটা ঝিং-ঝিং করে বেজে উঠতেই চমকে টাইম-পিস্‌টার দিকে তাকালাম: রাত্রি প্রায় পৌনে নয়টা।

শতদলও এ্যালার্মের শব্দে চমকে উঠেছিল, এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি এ্যালার্মের বোতামটা টিপে এ্যালার্ম বন্ধ করে দিল। কিরীটি রণধীর চৌধুরীর লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে পুনরায় খামের মধ্যে ভরে রাখতে রাখতে বললে: 'যদি কিছু মনে না করেন শতদল বাবু, এই চিঠিটাও আজকের রাতের মত নিয়ে যেতে চাই আমি। কাল আবার ফিরিয়ে দেবো।'

'বেশ ত, নিয়ে যান না!—' শান্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় শতদল।

'ধন্যবাদ! আজকের মত তাহ'লে আমরা বিদায় নেবো শতদল বাবু! কাল সকালে একবার পারেন ত হোটেলে আসবেন। আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে।'

'যাবো।—'

শতদল আমাদের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

অন্ধকারে দু'জনে পাশাপাশি আমি ও কিরীটি সাগরের ধার দিয়ে হোটেলের দিকে ফিরে চলেছি। অকস্মাৎ যেন কিরীটি অসম্ভব রকম গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছে।

কোন একটা চিন্তা যে তার মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছে, বুঝতে কষ্ট হয় না। এবং যে চিন্তাই হোক, বিষয়-বস্তুটা যে তাকে বেশ বিচলিত করে তুলেছে, বুঝতে পারছিলাম। আমিও অনেক কিছুই ভাবছিলাম।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই সন্ধ্যায় যে সব ঘটনা পর পর ঘটে গেল, কোনটার সঙ্গে কোনটারই কোন যোগসূত্র একটা খুঁজে না পেলেও একটা ব্যাপার যেটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল সেটা হচ্ছে শতদলের সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য যেন ক্রমেই ঘনীভূত হ'য়ে উঠছে। একটা আশু অমঙ্গলের ছায়া যেন ক্রমে ক্রমে চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কোন একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনা যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এবং অবশ্যম্ভাবী সে দুর্ঘটনাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আমাদের কারোরই হবে না।

হোটেলের সামনে সী-বীচে কয়েক দিন আগেকার সকালের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রহস্য ঘনীভূত হ'য়ে উঠছে এই কয়-দিন ধরে, যে ব্যাপারটাকে অন্তত আমি আদপেই কোন গুরুত্ব দিইনি অথচ প্রথম হতেই সেটা কিরীটিকে বিচলিত করেছে সেটাই যেন এখন ক্রমশ: স্পষ্ট আকার নিয়ে সত্যিই জটিল হ'য়ে উঠছে।

কিরীটিই এক সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বলে উঠলো: 'তোকে একটা কাজ করতে হবে সু!'

'কি?—'

'লুকিয়ে সীতার ও তার মায়ের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে হবে।—'

'কেমন করে সেটা সম্ভব হবে? ওরা থাকে বাড়ির মধ্যে—'

'যত দূর আমার মনে হয়, খুব বেশী দিন নজর রাখতে হবে না। দু'-চার দিন নিরালার আশ-পাশে সমুদ্রের ধারে ও নিরালার পিছনের বাগানে ঘোরাফেরা করতে পারলেই কিছু-না-কিছু তুই জানতে পারবি। তবে হাঁ, তোকে জেলের ছদ্মবেশ ধরতে হবে।—'

'বেশ। কাল সকাল থেকেই তাহ'লে সুরু করি?—'

'না, আজ রাত থেকেই।—'

'আজ রাত থেকেই!—'

'হাঁ!—'

হোটেলে পৌঁছে দেখি, আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন থানা-অফিসার রসময় ঘোষাল।

কিরীটিই প্রথমে ঘোষালকে সম্বর্ধনা জানাল, 'ঘোষাল সাহেব যে, কতক্ষণ?—'

'তা প্রায় আধ ঘণ্টাটাক ত হবেই। এসে শুনলাম আপনারা বেড়াতে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেননি। এত রাত হলো যে?—'

'হাঁ, একটু রাত হ'য়ে গেল। নিরালায় গিয়েছিলাম!'—কিরীটি বসতে বসতে বললে: 'উঠছেন কেন, বসুন!'

আমিও কিরীটির পাশেই উপবেশন করলাম।

'এতক্ষণ নিরালায় ছিলেন? শতদল বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?—' পুনরায় বসতে বসতে ঘোষাল বললে।

'হয়েছে।'

'সব শুনেছেন ত?'

'পরশু রাত্রের ব্যাপারটা ত?—' কিরীটি শুধোয়।

'হাঁ। মশাই, আমিও সত্যি তাজ্জব বনে গিয়েছি!—'

'ভাল কথা মিঃ ঘোষাল, আপনার যে দু'জন plain dress পুলিশের ও-বাড়িটা সর্বদা পাহারা দেবার কথা ছিল পরশু রাত্রে তারা ছিল না?'

'ছিল!'

'তাদের রিপোর্ট কি?'

'সে রাত্রে ঐ সময় অশোক সাহা বলে আমার যে লোকটি পাহারায় ছিল সেও নাকি গুলীর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। ঐ সময় সে নিরালার পিছনে বাগানেই ছিল।'

'অন্য কিছু সন্দেহজনক তার নজরে পড়েনি?'

'না!'

'পরে অশোক কি ঐ রাত্রে শতদল বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল?'

'করেছিল।'

'হুঁ! নিরালার একতলার বারান্দার শেষ প্রান্তে কতকগুলো কেডস্ জুতোর সোলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, জানেন?'

'জানি!—এবং তার ফটোও তুলে নেওয়া হয়েছে।—আজ সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি আসতাম কিন্তু স্থানীয় একটা আসন্ন উৎসবের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায়—'

'উৎসব! কিসের?'

'সামনেই ২রা মাঘ, ঐ রাত্রে প্রতি বৎসর এখানে একটা মেলা

বসে। সমুদ্রের ধারে এখানকার লোকেরা বলে মাঘী মেলা। এবং রাত্রে একটা বিরাট বাজীর প্রতিযোগিতা হয়।'

'বাজীর প্রতিযোগিতা ?'

'হাঁ, বহু জায়গা হ'তে এখানে লোকেরা বাজীর প্রতিযোগিতায় এসে যোগ দেয়, রাত ন'টা থেকে প্রায় বারটা সাড়ে-বারটা পর্যন্ত বাজী পোড়ান হয়, এই জায়গায় নিরালার উচ্চতা সব চাইতে বেশী বলে অনেকেই ঐ বাড়িতে গিয়ে ছাতে উঠে বাজী পোড়ান দেখে। রণবীর চৌধুরীর আমল থেকেই নাকি ঐ নিয়ম চলে আসছে। বছরের মধ্যে ঐ রাতটির জন্ম তিনি সকলের জন্ম বাড়ির দরজা খুলে দিতেন। এখন ত বাড়ির মালিক শতদল বাবু, তাই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম আমি জনসাধারণের দিক হ'তে, তাঁর কোন আপত্তি আছে কি না জানবার জন্ম—'

'তা, কি বললেন শতদল বাবু ?—'

'বললেন, নিশ্চয়ই তাঁর কোন আপত্তিই নেই। চিরদিন যা চলে এসেছে তাঁর দাদুর আমল থেকে এখনো সেই নিয়মই চালু থাকবে। সকলেই স্বচ্ছন্দে তাঁর ওখানে গিয়ে বাজী পোড়ান দেখতে পারেন। সব ব্যবস্থাই তিনি করে রাখবেন। After all he is a nice man! চমৎকার লোক!—' ঘোষাল বিশেষণ যোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

'আর দিন পাঁচেক বাদেই তাহ'লে সেই মেলা ?—' প্রশ্নটা করলাম আমি।

'হাঁ!—কাল-পরশু থেকেই সব দোকান-পসারীরা এসে ভিড় জমাবে দেখবেন!—আশপাশের অনেক জায়গা হ'তেই সব লোক-জনরা আসে।—কিন্তু আসলে আপনার কাছে আমার আসবার উদ্দেশ্য ছিল মিঃ রায়, শতদল বাবুর ব্যাপারটা আমাকে বিশেষ ভাবিত করে তুলেছে। এ বিষয়ে আমি আপনার পরামর্শ ও সাহায্য দুই চাই! শতদল বাবু নিজেও অত্যন্ত যেন নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন!—'

'তা ত হবারই কথা! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমার পক্ষেও কোন মতামত দেওয়া ত সম্ভব নয় মিঃ ঘোষাল! তবে আজ সন্ধ্যা থেকেই একটা কথা আমার মনে হচ্ছে মিঃ ঘোষাল যে, শিল্পী রণধীর চৌধুরীর সম্পত্তি কেবল ঐ নিরালা প্রাসাদখানিই নয়—there is something more! Something more!—'

'কি আপনি বলতে চান মিঃ রায় ?'

'আমি নিজেও এখনো অন্ধকারেই মিঃ ঘোষাল! কয়েকটা ছিন্ন সূত্র কেবল হাতে এসেছে ভাসা-ভাসা অস্পষ্ট! হয়ত দু'-এক দিনের মধ্যেই এমন কোন ঘটনা ঘটবে যার সাহায্যে আমরা কোন একটা সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে যেতে পারবো। Matter will take a shape!'

কিরীটির নির্দেশ মত ঐ রাত্রেই সাধারণ এক জন জেলের ছদ্মবেশে আমাকে হোটেল থেকে বের হ'তে হলো।

রাত্রি তখন বোধ করি এগারটা হবে।

সাগরের কিনার দিয়ে হন-হন করে চলেছি 'নিরালা'র দিকে। চাঁদ উঠতে এখনো ঘণ্টা খানেক দেরী।

সঙ্গে আমার একটা দড়ির মই, একটা টর্চ ও লোডেড পিস্তল।

নিরালার গেটের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালাম। গেট হ'তে আমার দূরত্ব তখন প্রায় হাত কুড়িক হবে।

তারার অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, পাশাপাশি দু'টি ছায়া-মূর্তি গেট খুলে বাইরে বের হ'য়ে এলো।

চট্ করে রাস্তার ধারে একটা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করলাম।

ছায়া-মূর্তি দুটো এগিয়ে আসছে। কে! কারা ওরা? অন্ধকারেই তাকিয়ে রইলাম।

[ক্রমশঃ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম শিক্ষকসমূহ

ইং ১৮০০ অব্দ. যখন প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় তখন কলেজের শিক্ষক বিভাগ ছিল এইরূপ,—

রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন, প্রোভোষ্ট।

" ক্লডিয়াস বুকানান, এ. বি., ভাইস্ প্রোভোষ্ট।

— অধ্যাপকমণ্ডলী —

লেফটন্যাণ্ট জন বেইলী—আরবী ভাষা এবং মুসলমানী আইন।

লে: কর্ণেল উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক, ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন এবং নেইল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোন—পারস্য ভাষা এবং সাহিত্য। জন গিলক্রীষ্ট—হিন্দুস্থানী ভাষা।

জর্জ হিলারো বার্লো—নীতি এবং আইনসমূহ।

রেভা: ক্লডিয়াস বুকানান—গ্রীক, ল্যাটিন এবং ইংরাজী পুরানো সাহিত্য।

এই উচ্চপদসমূহের শিক্ষকগণ ব্যতীত ছিলেন একাধিক পণ্ডিত এবং মুন্সী—যাঁরা শিক্ষক বিভাগে ছিলেন।

দেশে দেশে

"বিক্রমাদিত্য"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতার সংগ্রামে বোম্বাই ও বাংলা প্রদেশের সাংবাদিকগণের দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু যদি কোন দিন দেশের সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হয় তবে এঁদের দানের কোন উল্লেখ থাকবে কি না সন্দেহ। এর জলন্ত দৃষ্টান্ত হর্নিম্যানের জীবন। আজো মনে আছে, মৃত্যুর কয়েকটা দিন আগে হেসে বলেছিলেন যে, এই দেশই আমার মাতৃভূমি, এদেশেই আমি মরবো। কিন্তু সত্যিই যেদিন তিনি মরলেন তখন সাহায্যের জন্ত কেউ এগিয়ে এলো না। এই দেশের প্রতি তাঁর দানের কথা সবাই ভুলে গেলেন।

মৃত্যুর বছর খানেক আগে হর্নিম্যানকে নিজের হাতে-গড়া 'সেণ্টিন্তাল' কাগজ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। অতি তুচ্ছ কারণে কাগজের মালিকের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হলো। হর্নিম্যান কাগজ ছেড়ে দিলেন। কিছু দিন বাদে মালিক তাঁকে আবার অনুরোধ করলেন কাগজে ফিরে আসবার জন্য। কিন্তু তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাই জীবনের প্রদীপ নিববার আগে পর্য্যন্ত 'সেণ্টিন্তাল' ও 'ক্রনীকেলে'র দপ্তরে কোন দিন যাননি।

চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি চেষ্টা করলেন নতুন এক কাগজ বের করার। বোম্বাইর এক ধনকুবের তাঁকে উৎসাহ দিলেন। নতুন কাগজের নাম দেয়া হলো 'ভয়েস অফ দি নেশন' কিন্তু এই নতুন পত্রিকা বেরুবার আগেই ধনকুবেরটি সরে পড়লেন।

এর পরে হর্নিম্যানের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন রইলো কাগজে লেখা। 'ভারতজ্যোতি' কাগজে ধারাবাহিক ভাবে তিনি তাঁর জীবনী প্রকাশ করতে লাগলেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন মালিক হুকুম দিলেন যে এই লেখা আর 'ভারতজ্যোতিতে' বেরুবে না। কিন্তু কিছু দিন বাদে তিনি মত পরিবর্তন করলেন। 'ফিফটী ইয়ার্স অব জার্ণালিজম' ধারাবাহিকরূপে নিয়মিত ভাবে কাগজে বেরুতে লাগলো। এই বই প্রকাশের ভার নিলেন বোম্বাইর থ্যাকার কোম্পানী। কিন্তু তাঁর সেই লেখা কোন দিনই সমাপ্ত হয়নি আর সেই বই আজ পর্য্যন্ত বাজারে বেরোয়নি।

হর্নিম্যান 'ক্রনীকেল' ও 'সেণ্টিন্তাল' কাগজ ছুটো শুধু মাত্র প্রতিষ্ঠাই করেননি, এদের করে তুলেছিলেন জাতির কণ্ঠস্বর। যেদিন তাকে লর্ড উইলিংডন এদেশ থেকে বিতাড়িত করলেন, সেদিন 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজি লিখলেন ভারতবাসীকে হর্নিম্যান শিখিয়েছেন মুক্তির বাণী, তিনি আমাদের দিয়েছেন ডক্‌ট্রিন অফ লিবার্টি।

কিন্তু যেদিন অসুস্থ হয়ে হর্নিম্যান নার্সিং হোমে ঢুকলেন, সেদিন সবাই এই মুক্তির মন্ত্রদাতাকে ভুলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর শয্যার পাশে একমাত্র ছিলেন তার পুরানো সহকর্মী সেক্রেটারী কৃষ্ণা প্যাটেল। ইঞ্জেকশনের দরুণ পঁচিশ টাকার জন্ত কৃষ্ণা হর্নিম্যানের পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গেলেন, কিন্তু সাহায্য করতে সবাই অস্বীকার করলেন। যে দেশবাসীর জন্ত তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন, যাদের তুঃসময়ে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, তারা মৃত্যুর সময় তাকিয়ে দেখলো না।

এক দিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দাদারের বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে সাংবাদিকতার কথা উঠলো। তিনি হেসে বললেন, "মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান, ইফ ইউ রিমেন ইন জার্ণালিজম, দেন নেভার ফরগেট টু ফাইট এগেইনষ্ট ছাট ইজ আনজাষ্ট। ইন ডুইং সো, ইট ইজ বেটার ছাট ইউ ব্রেক্ ডাউন বাট্ নেভার বেণ্ড বিফোর হোয়াট ইউ থিং রংগ। নেভার বেণ্ড।"

হর্নিম্যানের যুগ চলে গিয়েছে, ভারতীয় সাংবাদিকতায় অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বিদ্রূপ করে অনেকে আজকাল বলে থাকেন এদেশের কাগজগুলো হচ্ছে 'ইণ্ডিয়ান মিরাকল'।

এ কাগজগুলো যে সত্যিই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের অন্যতম, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বোম্বাইর কফি হাউসে সাংবাদিকদের বৈঠকে। এ স্থানটা হচ্ছে রিপোর্টারদের 'রাঁদেভু'। সবাই মিলে এখানে বসে গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বর্ণনা করে নিজেদের অভিজ্ঞতা। এই আসরের সভাপতি বলা যেতো মালেয়াকে। জীবনে সতেরোটা কাগজে সে কাজ করেছে, তাই তার অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর। তার জীবনের প্রতি ঘটনাই একটি আরব্যোপন্যাস। আমাদের আসরের গতি যখনই মন্থর হয়ে আসতো তখন তাকে তাজা করে তুলতেন মালেয়া। তার তু'-একটা কাহিনী আজও মনে আছে।

ইংরেজের আমল। সরকার বিপদের আশংকা করছেন সুরাট বন্দরে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা আয়োজন করেছেন হরতালের। তাই পুলিশের আয়োজন করা হয়েছে যথেষ্ট। কাগজের সম্পাদক মালেয়াকে পাঠালেন এই হরতাল রিপোর্ট করতে।

ট্রেনে বসে মালেয়ার বেজায় ঘুম পেলো। তাই সে এক লম্বা ঘুম দিলো কিন্তু জেগে উঠে দেখতে পেলো যে ট্রেন সুরাট বন্দর ছাড়িয়ে বরোদায় চলে এসেছে। এই তুই স্থানের দূরত্ব অনেকটা। কিন্তু ফিরে যাবার কোন ট্রেনই তখন নেই। মালেয়া এতে ঘাবড়ালে না, বললে, কুছ পরোয়া নেই। আমি বরোদায় বসেই "কভার" করবো সুরাটের হরতাল। তার পর বসে লিখলে ছয় পাতা টেলীগ্রাম। কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। শহরে সুরু হয়েছে হরতাল এবং সেই সঙ্গে গোলমাল, দোকানপাটও নাকি লুঠ হয়েছে। শোনা যায়, তু'-একটা খুন-জখমও হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশ

জারী করেছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা। এই কাহিনীতে বলা হলো পুলিশের জুলুম। শুধু তাই নয়, বর্ণনা করা হলো অসহায় নাগরিকদের দুর্দশার কথা। বাজারে তরী-তরকারীর দাম বেড়ে গিয়েছে, গয়লারা নিয়ে আসছে না গাঁ থেকে দুধ।

টেলীগ্রাম যখন দপ্তরে এসে পৌঁছলো, নিউজ এডিটার পড়ে একটু হকচকিয়ে গেলেন। টেলীগ্রামের গায়ে ছাপ মারা আছে বরোদার, অথচ মালেয়ার যাবার কথা সুরাটে। চীফ সব-এডিটর মন্তব্য করলেন, "ওটা টেলীগ্রাম-মাষ্টারের ভুল। ট্রান্সমিশন্ মিষ্টেক্ ছাড়া আর কিছুই নয়।" নিউজ এডিটার মেনে নিলেন এ কথা।

পরদিন ব্যানার হেডলাইন করে এ খবর বেরুলো কাগজের প্রথম পাতায়। কাগজের বিশেষ সংবাদদাতার বিবরণ। ইংরেজের আমল, তাই পাঠকবৃন্দ 'সরকারী জুলুমের' খবর পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

এ খবর যখন সুরাটে পৌঁছলো তখন শহরে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। গোলমালের আশংকা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করেছিলেন, সত্য, কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি যে, বিপদ এতো শীঘ্রই ঘনিয়ে আসবে। শুধু তাই নয়, কড়া পাহারার আয়োজনও হয়েছে, তবু এ গোলমাল কি করে সুরু হলো তিনি ভেবে পেলেন না। অথচ, এই সংবাদের বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানেন না। পুলিশ-সুপারকে তিনি টেলীফোন করলেন। তাঁর অবস্থাও তথৈবচ, শহরে হাঙ্গামা হয়েছে অথচ তিনি কিছুই জানেন না। টেলীফোনে তিনি সার্কেল ইন্‌সপেক্টরকে কষে ধমকে দিলেন। বললেন, এই হাঙ্গামায় কোন খবর কেন তাঁকে দেওয়া হয়নি! সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করতে।

এদিকে শহরে গুজব রটে গেলো যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধেছে সুরাটে। আধ ঘণ্টায় শহরের সব দৈনিকপত্র বিক্রী হয়ে গেলো। দোকান-পসারীর দল ভয়ে-ভয়ে তাদের দোকান বন্ধ করছিলেন। পাড়ার মধ্যে জটলা সুরু হয়ে গেলো, অমুক পাড়ায় কি হয়েছে—ক'টা লোক হলো 'ষ্ট্যাব'। এই নিয়েই সুরু হলো বচসা, এর সমাপ্তি হলো হাতাহাতিতে, দু'-এক জনকে পাঠানো হলো হাসপাতালে। ভয়ে বাজার বন্ধ হলো, আনাগোনা বন্ধ হলো গয়লাদের।

এক কথায় সুরাটে কাগজ পৌঁছবার দেড় ঘণ্টা বাদে মালেয়া রিপোর্টে যা লিখেছিল, প্রতি অক্ষর-অক্ষর তা মিলে গেলো। সুরাটের হাঙ্গামার ব্যাপার নিয়ে এসেম্বলীর এক মেম্বার এক মুলতুবীর প্রস্তাব দিলেন এসেম্বলীতে।

বরোদা থেকে সুরাটে এসে মালেয়া দেখলো যে সুরাট ভরে গিয়েছে প্রেস-রিপোর্টারের দলে। সবাই তাকে কনগ্রাচুলেট করলে। বললে, 'হোয়াট এ ম্যাগনিফিসেন্ট ষ্টোরী'। দপ্তর থেকে পেলো সে নিউজ এডিটারের তার। বললে, 'ওয়েল ডান্। সেণ্ড থাউজেণ্ড ওয়ার্ডেড কলারফুল ডেসপ্যাচ, এ্যাডিং লোকাল কলার, পাব্লিক রিএকশন।'

বহু সাংবাদিকের সুরাটে সমাগমের হেতু, শহরের অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যেতে লাগলো। প্রতি কাগজেই বেরুলো বিভিন্ন খবর। বাধ্য হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সান্ধ্য-আইন জারী করলেন।

মালেয়ার এ কাহিনী আমার কাছে নতুন নয়। সাংবাদিক ক্ষেত্রে এমন অনেক বার সম্মুখীন হয়েছি যে ঘটনার সঠিক কারণ আজও খুঁজে পাইনি। এমনি ঘটনা যখন আজও শুনতে পাই তখনই আমার মালেয়ার কথা মনে হয়।

ইতিমধ্যে দিল্লীর খবরে প্রকাশ পেলো যে, রাজনীতিক আব-হাওয়ার কোন পরিবর্তনই হয়নি। কাশ্মীর সমস্যা ইউনাইটেড নেশনসে পেশ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু সমস্যা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। শ্রীনগর আক্রমণের আয়োজনের সংবাদও পাওয়া গেলো। শোনা গেলো, এই অভিযানে পাকিস্থানের সৈন্যরাও যোগ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীরও কয়েক জন আছেন।

নিজের জীবনে জিন্না কারো বাধা বা আপত্তি কোন দিন শোনেননি। তাই প্রথম যেদিন শুনতে পেলেন, কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠান হচ্ছে সেদিন তিনি হয়ে উঠলেন ক্ষিপ্ত। রাজপ্রাসাদে তলব করলেন পাকিস্থান সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের। আলোচনা শেষান্তে টেলীফোন করলেন রাওয়ালপিণ্ডিতে জেনারেল গ্রেসীর কাছে। হুকুম হলো শ্রীনগর দখল করা চাই। মুরী রোড দিয়ে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হবে। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে দখল করতে হবে-বানিহাল উপত্যকা আর শ্রীনগরে ওড়াতে হবে পাকিস্থানের ধ্বজা। কিন্তু আপত্তি এলো জেনারেল গ্রেসীর কাছ থেকে। তিনি বললেন, কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছে। এমত অবস্থায় শ্রীনগর এই ভাবে দখল করতে যাওয়া মানে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য্য। গ্রেসী বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন,

এই অভিযান সুরু করার আগে জেনারেল অচিনলেকের হুকুম চাই। বিপদ বুঝলেন জিন্না, তাই শেষ মুহূর্তে পেছপাও হলেন। তাই তাঁর এই কল্পনা কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হলো না।

জিন্না পাকিস্থানী সৈন্য দিয়ে শ্রীনগর দখল করা রদ করলেন সত্য, কিন্তু ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে নিরস্ত হলেন না। এতে সাহায্য পেলেন বহু বিদেশী কাগজ ও বেতার প্রতিষ্ঠানের। তাদের পরোক্ষ সাহায্য জিন্নাকে উৎসাহিত করে তুললো। জিন্না আজাদ কাশ্মীর ফৌজের এই অভিযানকে সমর্থন করলেন জোর-গলায়। তিনি বললেন, পাকিস্থানে যে সব ঘটনা ঘটেছে ওগুলো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নয়। তিনি এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন ভারতকে। অভিযোগ করলেন যে, তাঁর নতুন রাষ্ট্রকে পঙ্গু করাই নাকি ভারতের উদ্দেশ্য। তিনি সতর্ক-বাণী করলেন পাকিস্থান অধিবাসীদের প্রতি যে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, যারা মুস্লীম লীগের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করবে তাদের স্থান পাকিস্থানে হবে না। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল যে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলী রাওয়ালপিণ্ডিতে যেয়ে অভিযানকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, লিয়াকৎ আলী জগতের অন্যান্য মুস্লীম জাতির কাছে এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে সাহায্য প্রার্থনাও করেছেন। তাঁর অভিযোগে বলা হলো যে, "ভারত সরকার পাকিস্থানকে ধাপ্পা দিয়েছেন কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়ে। লিয়াকতের বক্তৃতার প্রতিবাদ প্রথমে করলেন স্বয়ং গান্ধীজি। তিনি তাঁর এক প্রার্থনা-সভায় বললেন যে, এই আক্রমণের জন্য পাকিস্থান সরকারই দায়ী। লিয়াকতের অভিযোগ শুনে তিনি অবাক হলেন। যদি কাশ্মীর রক্ষার্থে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বিলুপ্ত হয়ে যায়, তিনি বললেন, তা হলেও তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবেন না। তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'যদি ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কোন সংগ্রাম হয়—যদিও তিনি মনে করেন এই সংগ্রাম সুদূরপরাহত ও আকাশকুসুম মাত্র—তা হলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতীয় মুসলমান নাগরিকগণ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না। তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েক জন সৈন্য এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন শুনে। এর পরে লিয়াকৎ ও জিন্নার বক্তৃতার ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন নেহেরু ও সর্দার প্যাটেল। জিন্নার অভিযোগ যে "ভারত পাকিস্থানকে ধাপ্পা দিয়েছে" প্রতিবাদ করলেন নেহেরু, তিনি অস্বীকার করলেন লাহোরে জিন্নার সঙ্গে দেখা করতে।

দিনের পর দিন গান্ধীজির কাছে কাশ্মীর আক্রমণের বিবরণী এসে পৌঁছতে লাগলো। প্রথমে খবর দিলেন মেহেরচাঁদ মহাজন, কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ছাড়া পাবার আগে তিনি কাশ্মীরে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্থান সরকার তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেম যে, কাশ্মীরের নিরাপত্তা পাকিস্থান রক্ষা করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী তাঁর কথা রাখেননি। আফ্রিদিরা কাশ্মীরের বিভিন্ন দিক থেকে এই অভিযান চালিয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ করলেন যে, কাশ্মীরের প্রতি মুস্লীম লীগের দৃষ্টি অনেক দিনের। প্রায় ১৯৪৫-১৯৪৬এ, *লীগ প্রথম শ্রীনগরে তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করার চেষ্টা করে। কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীনগরে লীগ-নেতাদের বাড়ীর নক্সা পর্যন্ত তৈরী হয়েছিল।*

কিছু দিন বাদে দিল্লীতে খবর এলো যে, আজাদ কাশ্মীর ফৌজের এই অভিযান পরিচালনা করছেন পাকিস্থানের মেজর জেনারেল কিয়ানী। রাওয়ালপিণ্ডিকে করা হয়েছে প্রধান ঘাঁটা। প্রথম দিন আক্রমণের নেতৃত্ব করেন কাউলী খান। এক কালে কাউলী খান ছিলেন ব্রিটিশের গুপ্তচর কিন্তু স্বাধীনতা হবার পর হলেন এক জন উঁচু দরের দেশসেবক। শোনা যায়, বহু আগেই খান সাহেব তাঁর এই অভিযানের সংকল্প সবাইকে জানিয়েছিলেন। এক দিন ইদের এক সভায় তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়েছিলেন।

পাকিস্থান কী করে এই অভিযানের আয়োজন করেছিল, তার একটা বিবরণী কিছু দিন বাদে এক বন্দীর কাছ থেকে পাওয়া গেলো। নাম তার আবদুল হক, নিবাস পশ্চিম-পাঞ্জাবে। এই সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য লীগ তাকে এক দিন দলভুক্ত করে। তার কথায় জানা গেলো যে, এই আক্রমণ বহু পুরানো সংকল্প। এর জন্যে সমস্ত রসদ জুগিয়েছেন পাকিস্থান, আফ্রিদিদের যুদ্ধেও তাঁরা রপ্ত করে দিয়েছেন দৈনন্দিন কুচকাওয়াজ করিয়ে। খাওয়া-দাওয়া হতো বিনে পয়সায়। তার পর পিণ্ডির কোহালার ক্যাম্পে তাদের সবাইকে জড়ো করা হয়েছিল। সবাইকে প্রায় ছিয়ানব্বুই রাউণ্ড গুলী দেয়া হলো। উরীর কাছে এসে হক সাহেক দেখতে পেলো তার অন্যান্য সঙ্গীদের। কিছু দিন বাদে তারা সবাই মিলে দখল করলে বারামুলা। হক সাহেব ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা যখন এর পরে ফিরে যেতে চাইলো তখন তাদের বলা হলো যে, সে রাত্রেই শ্রীনগর আক্রমণ ও দখল করা হবে। কিন্তু মানুষের আশা বিধাতা কোন দিনই পূরণ করেন না। শ্রীনগর আক্রমণ করার অভিসংকল্প তাই কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হলো না। ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে শ্রীনগরের ভলাণ্টিয়ার বাহিনী 'বাচাও ফৌজ' রাজধানীকে রক্ষা করলেন।

* * * *

হঠাৎ এক দিন কাশ্মীর থেকে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ এলো। শোনা গেলো যে জিন্নার প্রাইভেট সেক্রেটারী খুরসীদ আহমেদকে শ্রীনগরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে ম্যাপ আর বহু জরুরী কাগজপত্র। শোনা গেলো, কাশ্মীরে খুরসীদের আগমন হয়েছিলো এই লড়াই বাধবার আগে। এক দিন তাঁকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলো জুম্মা মসজিদের কাছে। কিন্তু তাঁর ছদ্মবেশ 'বাচাও ফৌজের' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারলো না। খুরসীদ গ্রেপ্তার হলেন।

এই সংবাদে দিল্লীর সরকারী মহলেও রীতিমতো চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো যে এই অভিযান পাকিস্থানের গড়া। ইতিমধ্যে জিন্না রেডিও পাকিস্থানের এক বক্তৃতায় বললেন—"Our deads are proving the world that we are in the right and I can assure you the sympathy of the world, particularly the Islamic Countries are with you."

[ক্রমশঃ ।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্ সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP

দুই নগরের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

২১

গণদেবতার রুদ্র রোষ স্তিমিত হয়ে এল সাত দিন বিবোদ্গারের পরে। ঝড়ের পর প্রকৃতি হোল শান্ত। অন্য দিনের মত আজও মদের দোকানের পরিচিত আসনটিতে বসেছিল মাদাম ডফর্জ। কোলের উপর হাত দুটি জড়ো করে দেখছিল চেয়ে নরম রোদের দিকে। আজ তার মাথায় পরিচিত গোলাপটি নেই। থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে এত দিনে। এই সাত দিনেই সারা সহরের ক্ষুধিত মানুষদের মধ্যে একটা গভীর বোঝাপড়া হয়ে গেছে। মৃত্যুর উৎসবে প্রাণে প্রাণে গড়ে উঠেছে আত্মীয়তা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের কোন প্রতীকের আর দরকার নেই।

এই তো ক'দিন আগেও পথের লোকগুলোর দিকে তাকালে করুণা হোত। তাদের মুখে-চোখে ছিল নিরুপায় আক্রোশ। শুষ্ক বিবর্ণ তোবড়ান গালে অভাবী সংসারের গহ্বর দেখা যেত। ছেলে-মেয়েদের জীর্ণ চেহারায় অভাবের হাওয়া-লাগা রিক্ততা চোখে পড়ত বড় করুণ করে। কিন্তু ঐ ক'দিনে সব যেন বদলে গেছে।

দোকানে রাস্তায় লোক আনাগোনার বিরাম নেই। মানুষগুলোর চেহারায় কোথাও শ্রী লাগেনি বটে কিন্তু মুখে-চোখে কিসের যেন জৌলুষ! সে-জৌলুষ নতুন জাগা পৌরুষের। 'এত দিন বেঁচে থাকা ছিল একটা জগদ্দল পাথর, আজ বুঝেছি সেই পাথরে তোমাদের মুখ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।' শীর্ণ হাতগুলিতে খুনের শক্তি জেগেছে। যে সব নরম আঙুলে বোনার কাঁটা চলত দ্রুত, অনেক টাটকা রক্তের দাগ লেগেছে সেগুলিতে।

সকালের রৌদ্রময় পথে লোক-চলাচলের দিকে তাকিয়ে নানা কথা ভাবছিল মাদাম। তার পাশে বসে আর একটি মেয়ে। এখানকারই এক মুদীর ঘরের বৌ, দুটি বাচ্চার মা। মেয়ে-বিপ্লবীদের দলে সেও এক জন নেত্রী।

—'শুনছ, কে যেন আসছে।' সহচরীর সাড়া পেয়ে চকিত হয়ে উঠল মাদাম।

পাড়ার দূর প্রান্ত থেকে একটা কলগুঞ্জন চকিতে এসে পৌছল মদের দোকান অবধি। মাদাম চেঁচিয়ে হুকুম দিল—'চুপ করুন বন্ধুগণ! জ্যাকর্জ আসছেন।'

হাঁফ নিতে-নিতে এসে পৌছল জ্যাকর্জ। দোকানে ঢুকেই মাথার রক্তবর্ণ টুপিটা খুলে নিয়ে সে ঘরে-বাইরের কৌতূহলী জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু যেন জিরিয়ে নিতে লাগল।

—'কি হয়েছে?'

—'খবর আছে।'

—'কিসের খবর?'

—'তোমাদের মনে আছে বুড়ো ফুলোনের কথা। যে শয়তান আমাদের না-খেতে-পাওয়া মা-বোন-ছেলে-মেয়েদের বলেছিল ঘাস খেয়ে পেট ভরাতে। সেই শয়তানটা মরে হাড় জুড়িয়েছে শুনেছিলাম কিন্তু বেটা সত্যি মরেনি।'

—'তবে?'

—'মরেনি বেটা। আমাদের ভয়ে বেটা মরার গুজব রটিয়েছিল। এমন কি তার কবর অবধি হয়েছিল মিছিমিছি। সেই বেটাকে তার দেশেতে খুঁজে বার করেছে আমাদের ভাইরা। নিয়ে এসেছে আমাদের ভাইরা। নিয়ে এসেছে শেকল বাঁধা করে। তার কি শাস্তি পাওনা বল?'

সত্তর বছরের বুড়োর কানে সে জনতার রায় পৌছল না। যদি যেত সে আওয়াজেই তার পরিত্রাণ হোত।

ঝড়ের আগে অশুভ মৌন। চোখে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের চমক! মাদাম দাঁড়িয়ে উঠতেই তার পায়ের ঠোকায় একটা ড্রাম আর্তনাদ করে উঠল।

—'বন্ধুগণ, আর দেরী কেন?'

মাদামের কোমরে দীর্ঘ ছোরা। রাস্তায় ড্রামের আওয়াজ। চকিতে মৌনতার বাঁধ ফাটিয়ে কলরব উঠল রুদ্ধ প্রতিহিংসার। ফুঁসে উঠল জন-জলতরঙ্গ।

ক্ষিপ্ত পুরুষদের চেহারায়, তাদের হাতের অস্ত্রে বিপ্লবের শৌর্য্য। আর মেয়েদের চণ্ড মূর্তিতে বিপ্লবের জিঘাংসা।

'নেমে এস, শয়তানটার বুক চিরে ফেলব। শয়তান আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। খুন করেছিল আমার মাকে। আমার বাবা না খেয়ে মরেছে, তবু তার দয়া পায়নি।' বিপর্যস্ত বেশ বিপর্যস্ত কেশ বুক-ফাটা আর্তনাদে আকাশ ফাটিয়ে এগিয়ে এল মেয়েরা মায়েরা রুটি কোথায় পাবে, ঘাস খাও, বলেছিল শয়তান। না খেয়ে-খেয়ে আমার বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল, ফুলোন আমার কচি বাচ্চার মুখে খড় গুঁজে টানতে বলেছিল। আজ সেই অপরাধের শাস্তি দেব ওকে। কত জঠর-জ্বালার মৃত্যু ওর শোণিতে তৃপ্তি পাবে। কত কবরে মৃতদেহ নড়বে পৈশাচিক আনন্দে।

ছোটো ছোটো! শয়তানের ছলের অভাব নেই। হয়ত পালাবে, হয়ত ফসকে যাবে।

যে ঘরে শয়তানটা ছিল এরা ক'জন আগে গিয়ে হামলে পড়ল সেইখানে। বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার মানিয়েছে। হাত-পা-বাঁধা শকুনের মত পড়ে আছে ফুলোন। পিঠের উপর এক গাদা খড় বাঁধা।

'ঐ খড় খাবে শয়তান নিজে।'

হাতের ছোরাটি নিয়ে অস্থির খেলা খেলতে খেলতে বললে মাদাম।

এই পরিহাস মুখে-মুখে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। নারকীয় অট্টরোল উঠতে লাগল দিক্-দিগন্ত কাঁপিয়ে।

সাপের সঙ্গে খেলা। দড়ি-বাঁধা অপরাধী শয়তান মূকের মত চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল প্রতিশোধের চেহারা। শুনতে লাগল জিঘাংসার গর্জন।

যেন একটা তাল-গোল-পাকানো কি পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে বুড়োটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল রাস্তা অবধি। মুখে রা

নেই। যে মুখে বলেছিল পাপ কথা, সে মুখে ওরা গুঁজে দিয়েছে খড়ের গাদা।

তবু মিনতির শেষ নেই। বাঁচার কাকুতি করছে হাত তুলে তুলে। চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে পায়ের পাথর। হাত তুলে শাসাতেও ছাড়ছে না একটু সুবিধা পেলে।

পথের ওপর গ্যাস-পোষ্ট। তাতে দড়ি ঝোলান। সেই দড়ি গলায় বেড় দিয়ে ওরা ঝুলিয়ে দিল ওকে। রক্তাক্ত শরীর, মুখের খড়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। হাওয়ায় দোল খাচ্ছে যেন একখানা শুকনো কাঠ। দেখে জনতার আর উল্লাসের সীমা থাকে না।

সারা দিন কেটে গেল প্রতিহিংসার আগুন নেবাতে। সন্ধ্যায় জঙ্গল পথে টিম-টিম আলো। যে যার ঘরে ফিরল। সেখানে অভাব তো নিত্য-সহচর। ছেলেরা কাঁদছে রুটির জন্যে। স্তূপাকার রুটি মাংসের দোকানে লম্বা লাইন পড়েছে। তবু গল্পের বিরাম নেই। অরুচি নেই পুরোনো দুঃখের জাবর কাটতে।

কিন্তু আজ বাসি রুটি চিবোতে কষ্ট নেই। শয়তানদের রক্ত দেখে এসেছে ওরা ফোঁটা-ফোঁটা ঝরতে। দেখে এসেছে গ্যাসের আলোর নীচে শয়তানের দেহ দুলছে শেষ বারের মত। সেই ওদের পুষ্টি। এত দিনের ক্ষুধার তৃপ্তি।

রাত নিশুতি হোল। তবু মদের দোকানে আজ লোক আনাগোনার শেষ রইল না। ভোর বেলা দোকান বন্ধ করল অফর্জ!

দুই মানুষে যখন একলা হোল। অফর্জ বৌকে বললে—'তবে কি সত্যি বিপ্লব এল বৌ?'

বৌ বললে—'এল কি গো? বিপ্লব তো মসনদে বসেছে।'

২২

আশ্চর্য দিন-বদলের পালা পড়ল।

যে গ্রামের কুয়োর ধারে এক দিন সৈন্তরা চল্লিশ ফুট উঁচুতে ফাঁসীতে লটকেছিল এক জনকে, সারা গ্রামে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, আজও সেখানে মাঠ-ঘাট-বন-কুটো তেমনি আছে। সেই জেলখানা, সৈন্য পাহারা সবই আছে। শুধু কমেছে সৈন্যদের অত্যাচার দাপট। আজ অফিসাররাও জানে না, হুকুম দিলে পাহারাদাররা সে হুকুম মানবে কি না।

জেলখানা থেকে বহু দূর অবধি চোখে পড়ে দেশ। চোখে পড়ে বন্ধ্যা মাঠ আর নিরন্ন ঘর। যেমন মানুষ তেমনি ফসল। কচি ঘাসের সবুজে হলুদের ছোপ লাগা। গাছ-গুল্ম সবই যেন কেমন খর্বাকৃতি। বাড়-বাড়ন্ত নেই কিছুরই। মানুষের ঘরেও যেমন, প্রকৃতিরও তেমনি অত্যধিক অপচয়ে সৃজন-শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

জমিদার ভাবতেন ঈশ্বরের আদেশে তিনি ভাল করছেন। ভগবানের ভাঁড়ার ফুরোবে না কোন দিন। তাই ইক্ষুরস নিঙড়ে নিতেন কঠিন হাতে। মানুষের ঘরে প্রকৃতির দোষে শোষণ চলেছিল অবিরাম। তা এত শীঘ্র ফুরিয়ে যাবে কে ভেবেছিল।

এ সব জায়গা মাড়াতেন না তো কোন দিন। যদি বা কখনো আসতেন, টাকার জন্যে মহল পরিদর্শন করতেন। পাইক-বরকন্দাজ বেঁধে নিয়ে আসত প্রজাদের, তিনি শুষতেন তাদের রক্ত। আশে-পাশের বনে-জঙ্গলে পশুশিকারের মত এও ছিল তাঁর নেশার অন্তর্গত। সখের জন্যে গ্রাম-জনপদ বন হতে দিতেন যাতে জন্তু-জানোয়াররা বাড়ে। মনের খেয়ালের চরিতার্থতা ঘটে। এমনি করে বন্য জীবজন্তু বেড়েছে আর বেড়েছে লক্ষ্মীছাড়া সমাজের আয়তন।

এই গ্রামের রাস্তা-সারানো মিস্ত্রী লোকটা একলা কাজ করত দিনের পর দিন। রোদ-বাদলে তাঁর সঙ্গীও ছিল না, কাজের বিরামও ছিল না। যে মাটি কাটে সে, তা থেকে মুখ তুলে এক দিনও ভাবেনি সে যে, কার জন্যে সে এত খাটছে। যে মেহনত করে পেট পুরে অন্ন জোটে না, সে-মেহনতে তার কিসের দরকার। শুধু কোন-কোন দিন যখন দিগন্ত-জোড়া দেশ রোদে ঝলমল করত, তখন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে বসে সে চেয়ে দেখত—এক-এক জন অপরিচিত রুক্ষ চেহারার লোক তার পথ দিয়ে চলে যায়। পায়ে তাদের দূর-দূরান্তের ধূলো—কাঠের জুতোয় শুকনো মাটির সঙ্গে জড়ান পাতা আর শ্যাওলা।

এমনি এক দিন দুপুর বেলা শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল ভয়ানক। পথের ধারে পাথরের ঢিপির উপর বসেছিল সে আত্মরক্ষা করে। দেখলে তেমনি এক জন লোক বৃষ্টি-শিলা মাথায় করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। জনহীন পথে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে লোকটা আসছে যেন প্রেত।

কাছে এসে লোকটা তাকে দেখে সংকেত করলে। বললে—'জ্যাকুজ।' 'জ্যাকুজ' বলে মিস্ত্রী সাড়া দিতেই আগন্তুক বললে—'হাত দাও হাতে।' দু'জনে পাশাপাশি বসলে পাথরের ঢিপির ওপর। একটা নলে কি যেন ভর্তি করে লোকটা চকমকি দিয়ে আগুন জ্বালালে। তার পর দুই আঙুলে কি নিয়ে সেই আগুনে দিতেই দপ্ করে আগুন ফুঁসে উঠল। ধোঁয়া হোল চারি দিকে।

—'আজ রাত্তিরে?'

—'আজই?'

—'কোথায়?'

—'এইখানে।'

আগন্তুক বললে—'আমায় বলে দাও কোন পথে গেলে সুবিধে?' চড়াই পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে বললে মিস্ত্রী—'ঐ পথ ধরে-সামনে চলে-যাবে—কুয়োর ধার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে—'

—'দুত্তোর কুয়োর নিকুচি করেছে। কোথায় জায়গাটা বল না।'

—'গ্রামের শেষে যে পাহাড় ঢিবি তার থেকে দেখতে পাওয়া যায়।'

—'ব্যাস, ঐতেই চলবে। কতক্ষণ কাজ করবে বন্ধু?'

—'ধর না কেন, সন্ধ্যে অবধি।'

—'তবে যাবার আগে আমায় জাগিয়ে দেবে তুমি। দু'রাত হেঁটেছি। চোখের পাতা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। আমি একটু শুয়ে পড়ছি। তুমি আমায় জাগিয়ে দিয়ে যাবে নইলে আমার ঘুম ভাঙবে না।'

—'দেবো। তুমি শুয়ে পড়ো ভাই।'

সেই পাথরের ওপর পথের ধূলোয় শুয়ে পড়ল লোকটা। একটু পরেই একেবারে অচেতন।

বৃষ্টির পর মেঘ-স্তূপের আড়ালে সূর্য দেখা দিলেন। তার পর শুরু হোল মেঘ-রৌদ্রের খেলা। কখনো রৌদ্র-স্নান, কখনো বিচিত্র বর্ণালী। পাতায় শাখায় জলকণাগুলি হীরকের মত জ্বলতে থাকে বহু বর্ণে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। বিকেলের ভাঁটা-স্রোতে আসে সন্ধ্যা। ভেজা মাটীতে শুয়ে অঘোর নিদ্রা যায় লোকটি। সারা গায়ের পোষাক জলসিক্ত, তবু তার সাড় থাকে না।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে গ্রামে যাবার উদ্যোগ করে মিস্ত্রী ডেকে দেয় লোকটিকে। ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসতে বসতে বলে—'পাহাড়ের থেকে তিন ক্রোশ বলেছিলে না ?'

—'হ্যাঁ।'

গ্রামে ফিরে গিয়ে কথাটা বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারলে না সে। চুপি চুপি জানালে ক'জন পরম আত্মীয়কে। সেই কথা জানাজানি হতে হতে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হোল না। আজ আর খাওয়ার পর কেউ শুতে গেল না অন্য দিনের মত। বাইরে এসে বসে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আকাশের এক বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে।

গ্রামের মধ্যে জানাজানি হোল। এখানকার নায়েবের কানেও কথাটা পৌছল। রাতের গা-ঢাকা অন্ধকারে সেও বাসার ছাতের ওপর একলা দাঁড়িয়ে রইল। কি একটা অস্পষ্ট অস্বস্তিতে সারা গায়ে কাঁটা দিতে লাগল অমন তেজী পুরুষের। নীচের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় কুয়োর ধারে জটলা-করা এক দল নারী-পুরুষকে। তাদের নিথর দাঁড়িয়ে থাকাটাই যেন অশুভের সূচনা।

রাত যত গভীর হয় বাতাসের বেগ বাড়ে। মঁসিয়ের প্রাসাদের চারি পাশে বেড়-দেওয়া উদ্যান-কাননে একটি বনস্পতিও স্থির থাকে না। ঝড়ের হাওয়া কানন-বীথিকা পার হয়ে প্রবেশ করে প্রাসাদের ঘরে ঘরে। অস্ত্র-ঘরে ঝন-ঝন ওঠে ঝঙ্কার। রেশমের পর্দা তুলে ঝড় যেন খুঁজে খুঁজে দেখে তন্ন তন্ন করে। ঘর থেকে ঘরে প্রেত-কণ্ঠে সাড়া দিতে থাকে ঝড়ো হাওয়া।

আর সেই আদিগন্ত ঝড়ের পটভূমিকায় অন্ধকারের অন্তরাল থেকে চারিটি প্রাণী নিঃশব্দে বুকে হেঁটে আসে গাছেদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে। একবার এক হয় চার জনে তার পর আবার চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তখন শুধু রাত্রির অন্ধকারে রুদ্র প্রকৃতির শন-শন আওয়াজ উঠতে লাগল সব কিছু ছাপিয়ে। প্রলয় রাত্রিতে বিভীষিকা তার করাল পক্ষ বিস্তার করে রাখল।

কিন্তু ধীরে ধীরে সেই তিমির অন্ধকার বিদীর্ণ করে সারা প্রাসাদ কি এক ভৌতিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই অস্পষ্ট আলো বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। তার পর সম্মুখ দিকে দু'-একটি করে লেলিহান শিখা বাতাসের তাড়নায় সর্পফণার মত দুলতে লাগল তীব্র নীল লালসায়। প্রথমে বারান্দাগুলি জ্বলতে লাগল, তার পর দরজা জানলা-ছাত। আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

বাসায় যে ক'জন লোক থাকত, তারা ভয়ার্ত চীৎকারে ছুটে বেরিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কে যেন ছুটে এল নায়েব গ্যাবেলের বাড়ীর দিকে। সর্বনাশের কথা জানাতে এল।

পথে জেলখানার আগে কুয়োর ধারে নির্বাক্ জনতা। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বল-জ্বল করছে আগুনের আভায়। সে মুখে কি দেখলে ঘোড়সওয়ার সেই জানে, সপাৎ করে চাবুক হানলে সজোরে।

জেলখানার সামনে অফিসাররা দাঁড়িয়ে। পিছনে সৈন্যরা।

—'প্রাসাদ পুড়ছে। আপনারা শীগগির আসুন। সব যায়।'

সাড়া দিল না কেউ। অফিসাররা একবার পিছনের সারিতে সৈন্যদের দিকে তাকালে। সৈন্যরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আগুনের দিকে। চোখাচোখি হোল না অফিসারদের সঙ্গে। তখন অফিসারেরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে—'যাক পুড়ে। পুড়বেই তো।'

সারা গ্রামে আগুনের রোশনাই। বড় বড় কাঠের পাটাতন পড়ছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। পাথরের মূর্তিগুলো ওপর থেকে টলে পড়ছে বিকৃত বীভৎস হয়ে। আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে হাওয়া। পুড়ছে প্রাসাদ।

বাগানের গাছে গাছে আগুন লেগে গেছে। শাখায়-শাখায় পল্লবিত বৃহৎ বনস্পতির দল আগুনে ঝলকিত হয়ে উঠছে। এক শাখার আগুন প্রতিবেশী বনস্পতিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ঝড়ো হাওয়ায় মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। আগুনে হাওয়ায় শন-শন করছে বন। যেন লক্ষ লক্ষ শিশু শীৎকারে উন্মত্ত হয়ে নাচছে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে।

গ্রামের বিপদ-ঘণ্টা বাজাবার ইচ্ছা ছিল নায়েব গ্যাবেলের। কিন্তু তার আগেই লোকেরা দখল করে নিয়েছে সেই বিপদ-ঘণ্টা। আগুনের তালে তালে বাজছে সেই ঘণ্টা।

তার পর সবাই মিলে হানা দিল নায়েব গ্যাবেলের বাড়ী। নেমে এস। এত দিন যত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, যত বার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে জমিদার ঋণের ওপর সুদ চাপিয়ে বংশ বংশ ধরে উই-খাওয়া কাঠের মত ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, সব সুদে-আসলে শেষ হবে আজ। এসো। নেমে এসো।

উত্তেজিত জনতা আর উত্তেজক আগুন! গ্যাবেল মোটা মোটা কাঠ দিয়ে দরজা বন্ধ করলে। তার পর ছাতে গিয়ে দাঁড়াল। যদি ওরা দরজা ভাঙে, ছাত থেকে সে লাফিয়ে পড়বে ওদের ওপর। মরবার আগে দু'-এক জনকে মারবে।

কিন্তু কি জানি কেন, সে রাত্রে জনতা ঘরে ফিরে গেল। তারা ফিরে গেলেও গ্যাবেলের ভয় গেল না। সারা রাত সেই ভস্মাবশেষের দিকে তাকিয়ে সজাগ হয়ে বসে রইল সে।

সারা ফ্রান্সে এই আগুন জ্বলছে। কোথায় জনতার জিত, কোথাও বা সৈন্যদের। প্রলয় কালে অত সূক্ষ্ম অঙ্কের কে ধার ধারে বল ?

২৩

প্রলয়ের আগুন ধিকি-ধিকি করে জ্বলে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল দিনে দিনে। সে আগুন যাদের স্পর্শ করল তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরদিনের মত। যারা দর্শকের মত চেয়ে দেখলে, তারাও সেই হুতাশনের প্রলয়ঙ্কর রূপে বিমূঢ় হয়ে গেল। তিনটি বৎসর ধরে দাউ-দাউ করে জ্বলল সেই অগ্নি—তার পর ফ্রান্সের ভূমিতে শ্মশান রচনা করে যেন ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ল।

এই তিনটি বৎসর সমুদ্র-পারের এক নিভৃত পথের কোণে ছোট লুসির বয়সের মালায় আরো তিনটি কুসুম গ্রথিত হোল। একটি

নিভৃত সংসারের হাস্তময় দিন-রাত্রির কোথাও কোন বিঘ্ন রইল না। শুধু লুসির সেই মনের ভয় যেন কাটল না কিছুতেই। পথের লোক চলাচল যখন বাড়ে, পথের প্রান্তের এই গৃহে বসে সে শুনতে পায় জনতার পদধ্বনি, সারা মন অশুভের সংকেতে দুরু-দুরু করতে থাকে। কেমন যেন বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে যায় সে।

কোথায় কারা একটা রক্তনিশানের তলায় মৃত্যুর বেদীতে প্রতিষ্ঠাঙ্ক বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসছে দলে দলে। তাদের পায়ের আওয়াজে দূর-দূরান্তের মানুষ নিভৃত শান্তির নীড়ে সচকিত হয়ে ওঠে আচম্বিতে।

যারা কোন রকমে বেঁচে গেছে জনতার প্রতিহিংসা থেকে, অনুগৃহীত সেই সব নীল রক্তের জীবেরা ফ্রান্স থেকে দলে দলে পালিয়ে এসেছে ইংল্যাণ্ডে। কেউ এনেছে সঙ্গে করে ধন-রত্ন, কেউ পালিয়ে এসেছে কেবল পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে। পুরানো খদ্দেরের দিকে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে টেলসন ব্যাঙ্ক। অসময়ে ব্যাঙ্ক তাদের বিমুখ করেনি।

সেদিন কুয়াশাচ্ছন্ন আর্দ্র বিকেল বেলা বন্ধের কিছু আগে টেলসন ব্যাঙ্কে হৈ-চৈ ভীড়ের অন্ত ছিল না। লরি নিজের ডেস্কে বসেছিলেন, তাঁর সামনে ডেস্কে কনুই ঠেস দিয়ে নীচু-গলায় কথা বলছিল ডার্নে। চারি পাশের কলরবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা দু'জনে যেন গোপন কোন সলা-পরামর্শ করছিল। টেলসন ব্যাঙ্ক আগে কেবল টাকাকড়ি-সম্পত্তির কারবার করত, কিন্তু ফ্রান্সে বিপ্লব বেধে ওঠবার পর থেকেই হয়ে উঠেছে সংবাদ-প্রতিষ্ঠান। ধনী অভিজাত যারা আত্মরক্ষা করে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে এসেছেন, তাদের খবর আদান-প্রদানের কাজ হাতে নিয়েছে ব্যাঙ্ক। সেই কারণেই আজকাল লোক-জন থৈ-থৈ করে এখানে সব সময়। এখন টেলসনই আশা, টেলসনই ভরসা।

—'কিন্তু আপনি—' বললে ডার্নে।

—বুঝেছি, আমি খুব বুড়ো হয়ে পড়েছি—না ?'

—'আবহাওয়ার অবস্থা অনিশ্চিত। পথ দীর্ঘ। যান-বাহন পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই। চারি দিকে অরাজকতা,—এমন কি সহরও হয়ত নিরাপদ নয় আপনার পক্ষে। এমন অবস্থায়—?'

—তুমি দেখছি আমাকে থাকার চেয়ে যাওয়ারই যুক্তি দেখালে। সে দেশ আমার পক্ষে যথেষ্টই নিরাপদ। আমার মত বুড়ো-হাবড়াদের নিয়ে মাথা-ঘামানোর অত ফুরসুৎ কোথায় তাদের ? আর সহরের অবস্থা অরাজক যদি না হবে, ব্যাঙ্ক থেকে কেনই বা এক জন পুরোনো, বিশ্বাসী, সেখানকার কাজ-কারবার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোককে পাঠাতে যাবে ? যান-বাহনের অনিশ্চয়তা, পথের দীর্ঘতা আর শীত সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, এত বছর কাজ করার পর আজ যদি আমি ব্যাঙ্কের হয়ে এই ঝক্কিটুকু না নেই তো আর কে নেবে ?'

—'আমার ইচ্ছা আমিও যাই আপনার সঙ্গে।'

—'তুমি যাবে ? ফ্রান্সে তোমার জন্ম—তুমি যাবে সেখানে ? চমৎকার বুদ্ধি তোমার !'

—'আমি ফরাসী বলেই এ চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। দুঃস্থদের প্রতি যার দরদ আছে—যে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জমিদারী তুলে দিয়ে এসেছে তাদের হাতে, তার ভয়ের কি কারণ আছে ? লোকে তার কথা শুনবেই ; হয়ত তাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে কিছুটা সামলাতে পারব। আপনি চলে এলে কাল রাত্তে লুসির সঙ্গে আমার এ নিয়েই কথা হচ্ছিল।'

—'লুসির নাম উল্লেখ করতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তাকে ফেলে এই সময় তুমি ফ্রান্সে যেতে চাও ?'

—'অবশ্য আমি তো আর সত্যি যাচ্ছি না'—মুখে হাসি টেনে উত্তর দিল ডার্নে।

—'যে অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ-কারবার চালাতে হয় সে সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই তোমার'—দূরের বাড়ীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চাপা-গলায় বললেন লরি—'ভগবান না করুন, আমাদের দলিল-পত্র যদি কোন গতিকে জনতার হাতে পড়ে, কত লোকের মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। আজ বা আগামী কাল যে প্যারিস লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত, আগুনে ভস্মীভূত হবে না, কে বলতে পারে ? কাজেই এ সময় তাড়াতাড়ি দলিল-পত্র উদ্ধার করে কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। টেলসন ব্যাঙ্কের কর্তারা জানেন সে কথা। যাট বছর যাঁদের নিমক খেয়েছি আজ বিপদের দিনে তাঁদের অকূলে ভাসিয়ে দেব ?'

—'আপনার যৌবনোচিত সাহসের প্রশংসা করি আমি।'

—'এই মুহূর্তে প্যারিস থেকে যতই তুচ্ছ হোক না কেন, কিছু বের করে নিয়ে আসা এক রকম অসম্ভব। তোমার কল্পনার অতীত এমন লোক আজই বহুমূল্য জিনিস দলিল-পত্র নিয়ে এসেছে এখানে। তারা যখন সীমান্ত অতিক্রম করছিল তাদের প্রাণ একটি সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছিল। অথচ এক সময় ছিল, কত কিছুই সেখান থেকে এখানে আসা-যাওয়া করেছে। কোনই বাধা ছিল না, কিন্তু এখন সকল পথ রুদ্ধ।'

—'আজ রাত্রেই কি রওনা হবেন ?'

—'আজ রাত্রেই। এত জরুরী ব্যাপার যে আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করা অসম্ভব।'

—'কেউ সঙ্গে যাবে না ?'

—'অনেকের নামই উঠেছে কিন্তু কেউই আমার পছন্দ নয়। শুধু জেরীকে সঙ্গে নেব। এই কর্তব্যটুকু শেষ করে আমি টেলসন ব্যাঙ্ক থেকে চিরকালের মত ছুটি নেব। যথেষ্ট বুড়ো হয়েছি। এখন পরকালের কথা ভাববার সময় হয়েছে।'

ডার্নে যখন লরির সঙ্গে আলাপ করছিল ব্যাঙ্কের এক জন লরির কাছে এসে তার ডেস্কে একটি ময়লা মুখবন্ধ খাম রেখে প্রশ্ন করলে —'ঠিকানার কোন হদিস হোল ?'

ডার্নের খুব কাছে পড়েছিল খামটি। সহজেই তার নজর পড়ল ঠিকানাটার ওপর। তারই পূর্ব নাম চিঠিখানির উপরে দেখে কম বিস্মিত হোল না ডার্নে। ঠিকানাতে লেখা ছিল তার ফ্রান্সের জমিদারীর নাম। টেলসন ব্যাঙ্কের মারফত এসেছে ফ্রান্সের গ্রাম থেকে।

বিয়ের দিন সকালে ডাঃ ম্যানেট ডার্নেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন তার আসল নাম তাদের দু'জনের মধ্যেই গোপন রাখতে। ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে যেন বেফাঁস না হয় বাইরে। কেউ জানেও না আজ পর্যন্ত—তার বৌও না। লরির কথা অবশ্য আলাদা।

লরি বললেন—'যারা ব্যাঙ্কে আসে তাদের প্রত্যেককে দেখিয়েছি চিঠিখানা। কিন্তু ঐ নামের কোন লোকের আজও পর্যন্ত হদিস পাওয়া যায়নি।'

ব্যাঙ্ক বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। লরির ডেস্কের পাশ দিয়ে চলেছে নানা লোক। লরি তাদের দিকে চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কেউ চেনেন নাকি লোকটিকে।

কেউ চেনে না। কিন্তু নানা বিদ্রূপ মন্তব্য চলতে লাগল লোকটিকে নিয়ে। নানা শ্লেষাত্মক তীক্ষ্ণ ইংগিত। ফ্রান্সের জমিদারী ফেলে ইংলণ্ডে এসে বসে আছে। অথচ তার কাকাকে খুন করেছে জনতা। এত দিন সব সম্পত্তি বেওয়ারিশ হয়ে পাঁচ ভূতে লুঠে খাচ্ছে। কাপুরুষ, স্বার্থপর!

ব্যাঙ্ক একে একে খালি হয়ে গেল। রইল বাকি শুধু লরি আর ডার্নে।

ডার্নে বললে—'আমি চিনি লোকটিকে?'

—'তুমি এই চিঠির দায়িত্ব নেবে? জান তো কাকে দিতে হবে?'

—'ঠিক লোকের হাতেই পৌঁছে দেব। আপনি কি এখান থেকেই যাত্রা করবেন?'

—'এখান থেকেই। ঠিক আটটার সময়।'

—'আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিতে আসব।'

ডার্নে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এসে একটি নিরিবিলি স্থানে দাঁড়িয়ে চিঠি খুলে পড়তে লাগল অত্যুগ্র আগ্রহে—

'বহু দিন প্রাণ হাতে লইয়া কাটানোর পর অবশেষে প্রজাদের হাতে বন্দী হইয়াছি। তার পর চলিয়াছে নিদারুণ অত্যাচার ও অপমান। আমাকে পায়ে হাঁটাইয়া প্যারিসে লইয়া আসা হইয়াছে। পথেও অত্যাচারের অবধি ছিল না। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। তারা আমার বাড়ী-ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে।

যে অপরাধে আমাকে বন্দী করা হইয়াছে, যাহার জন্য আমার বিচার হইবে এবং বিচারে প্রাণদণ্ড হইবে—তাহা হইল এই যে, আমি নাকি প্রজাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছি। এক জন দেশত্যাগীর স্বপক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। কিন্তু আমি যে কখনই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, সে কথা যথাসাধ্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে? যেদিন হইতে আপনার সম্পত্তি বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তাহার পর আমি এক কপর্দকও কর আদায় করি নাই। আমি কোন প্রকার শঠতার আশ্রয় লই নাই। কিন্তু কে আমার কথায় কান দিবে? তাহাদের একমাত্র অভিযোগ—আমি এক জন বাস্তুত্যাগীর স্বপক্ষে কাজ করিয়াছি। কিন্তু কোথায় তিনি? সেই মহানুভব মঁসিয়ে মারকুইস এখন কোথায় দেশত্যাগী হইয়া আছেন? ঘুমের মধ্যেও আমি কাঁদি—কোথায় তিনি? ভগবানের নিকট কাতর মিনতি জানাই, তিনি কি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন না?

টেলসন ব্যাঙ্কের মারফৎ সমুদ্রের পরপারে পাঠাই আমার কাতর ক্রন্দন এই আশায়, হয়ত একদিন সেই কান্না পৌঁছিবে আমার মুক্তিদাতার কানে।

মহানুভবতা, ন্যায়, আপনার বংশের সুনাম ও সম্মানের দাবীতে আমি মিনতি করিতেছি, মঁসিয়ে যেখানেই থাকুন আপনি সত্বর আসিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আমার অপরাধ আমি আপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। আপনি এখন আসিয়া সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করুন।

এই ভীতির রাজ্য হইতে—এই অন্ধকার কারাকক্ষ হইতে আমায় উদ্ধার করুণ। প্রতি মুহূর্তে আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণিতেছি। আপনার চিরবিশ্বস্ত

হতভাগ্য গ্যাবেল।'

পত্রপাঠে বিদ্যুৎ-সঞ্চালনের মত ডার্নে এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যে জেগে উঠল। পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরোনো কর্মচারী—যার একমাত্র অপরাধ সে তার ও তার পরিবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি—আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। তার অনুযোগ-কঠিন মুখখানি ডার্নে যেন চোখের সামনে ভাসছে দেখতে পেল।

তাদের বংশের দুর্নাম, অত্যাচারের পরিণাম ভীতি, পিতৃব্যের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ, ধ্বসে-পড়া আভিজাত্যের রাশ আটকে রাখার প্রতি বিতৃষ্ণা বশতঃ ডার্নে জীবন-শিল্পে পাকা মুন্সীয়ানা দেখাতে পারেনি। হৃদয়ের অন্তস্তলে সে তো জানে যে, লুসির প্রতি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে এই বিবর্তিত জীবনে বদলে আসার সময় অনেকগুলি ফাঁক রেখে এসেছে পথে। এই নতুন পরিবেশের সুখ-মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। কিন্তু চারিদিকে চলেছে যুগ-পরিবর্তনের বিরাট ভাঙা-গড়া, অশান্তি আর ঝড়ের সমারোহ। আর ডার্নে শুধু সময়ের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে চলেছে। প্রতিরোধের—প্রতিবাদের কোন ক্ষমতা নেই তার। হারিয়ে ফেলেছে সে ক্ষমতা। ফ্রান্স থেকে আজ অভিজাত সম্প্রদায় নানা অলি-গলি পথে বন্যার জলের মত পালিয়ে আসছে। তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে—ফ্রান্সের বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হচ্ছে তাদের নাম—তাদের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু।

কিন্তু সে তো কারুর উপর অত্যাচার করেনি। কাউকে জেলে পাঠায়নি—কারুর কাছ থেকে কর আদায় করেনি জোর-জবরদস্তি করে। সে স্বেচ্ছায় নিজের দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে এসেছে। অজ্ঞাত কুলশীল হয়ে মিশে গেছে পৃথিবীর জনারণ্যে—যেখানে নেই কেউ তার সহায়, প্রত্যাশা করেনি কারুর আনুকূল্য। সে নিজের চেষ্টায় অর্জন করেছে নিজের প্রতিষ্ঠা—নিজের পরিশ্রমে সংগ্রহ করেছে অন্নজল।

মঁসিয়ে গ্যাবেল এত দিন তাদের রস-নিঃশেষিত ঋণজাল-জর্জরিত সম্পত্তির দেখা-শোনা করেছে—যতটুকু দেওয়া সম্ভব দিয়েছে দরিদ্র প্রজাদের হাতে তুলে।

গ্যাবেলকে বাঁচাতে তাকে যেতেই হবে প্যারিসে। ডার্নে তার সংকল্প স্থির করে ফেলল। চুম্বক আকর্ষণের মত দুরতিক্রমণীয় এক আকর্ষণে প্যারিস তাকে হাতছানি দিচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী নিরাপরাধ বন্দীর কাতর আবেদনে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই তার। বংশের সুনাম, ন্যায় ও কর্তব্যের আহ্বানে সে বধির হয়ে থাকতে পারে না।

সংকল্প স্থির করে ফেলল। প্যারিসে সে যাবেই। সে তো কোন অন্যায় করেনি। সুতরাং তার ভয় কি? কিন্তু যাবার আগে লুসিকে বা তার বাবাকে জানতে দেওয়া হবে না কিছু।

উদভ্রান্তের মত ইতস্ততঃ পায়চারী করতে লাগল ডার্নে। ক্রমশঃ টেলসন ব্যাঙ্কে ফিরে আসার সময় হয়ে এল। লরির নিকট

বিদায় নিতে হবে। প্যারিসে পৌঁছেই প্রথমে দেখা করবে লরির সঙ্গে। কিন্তু এখন তাঁকে সংকল্পের কথা জানতে দেওয়া হবে না।

ব্যাঙ্কের দরজায় গাড়ী প্রস্তুত ছিল। প্রস্তুত হয়ে এসেছে লরি।

—'চিঠিখানি দিয়েছি মালিককে'—বললে ডার্নে—'লিখিত উত্তর হাতে দিয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই নে। তবে তার মৌখিক উত্তর জানাতে পারেন।'

—'এক্ষুনি বল, যদি কোন বিপদ না থাকে।'

—'বিপদের কিছু নেই। তবে উত্তরটা দিতে হবে এক জন বন্দীকে।'

—'বন্দীর নাম?'

—'গ্যাবেল'—

—'কি বলতে হবে হতভাগ্যকে'।

—'বলতে হবে মালিক তার চিঠি পেয়েছে এবং আসবে।'

—'কখন আসবে, দিন-ক্ষণ কিছু বলেছে?'

—'আগামী কাল রাত্রে সে ফ্রান্সে যাত্রা করবে।'

—'অন্য কারুর নাম বলেছে?'

—'না।'

লরিকে পোষাক পরতে সাহায্য করল ডার্নে। ব্যাঙ্কের উষ্ণ নিরাপদ পরিবেশ পরিত্যাগ করে তারা দুটিতে কুয়াশা-ঢাকা ফ্লীট স্ট্রীটে পড়ল।

—'লুসি আর তার মেয়েকে আমার ভালবাসা দিও। যত দিন না ফিরি দেখো তাদের।'

ডার্নে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। কিন্তু মুখের হাসিতে কি মনের কপটতা ঢাকা পড়ে? গাড়ী ছুটে চলল বেগে।

১৪ই আগষ্ট। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে দু'খানা চিঠি লিখল ডার্নে। একখানি লুসিকে—প্যারিসে যাওয়ার কর্তব্যের কথা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করে। সেখানে তার বিপদের কোনই সম্ভাবনা নেই, এ কথাও উল্লেখ করতে ভুললে না। আর একখানি চিঠি লিখল সে ডাঃ ম্যানেটকে। স্ত্রী ও কন্যার ভার তাঁর ওপর সে অর্পণ করল সেই চিঠিতে। দু'জনকেই লিখল প্যারিসে পৌঁছেই খবর দেবে সে।

বিদায়ের দিনটি অতি দুর্বিসহ হয়ে উঠল ডার্নের পক্ষে। আসল উদ্দেশ্যটি সংগোপন রাখতে হবে লুসির কাছ থেকে। ঘুণাক্ষরেও যেন লুসির মনে কোন সন্দেহের রেখাপাত না করে।

দিন কেটে গেল দ্রুত-পায়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে লুসিকে গভীর আবেগে আলিঙ্গন করে ডার্নে কুয়াশা-ঢাকা রাস্তায় নেমে পড়ল।

একটা অদৃশ্য শক্তি অমোঘ আকর্ষণে তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে। এক জন বিশ্বস্ত চাকরের হাতে চিঠি দু'খানি দিয়ে এসেছে। মাঝ-রাত পেরোলে দেবে। নিরপরাধ বন্দীর আকুল ক্রন্দন কানে বাজছে ডার্নের। সে ক্রন্দনে বধির থাকতে পারে না সে। জীবনের প্রিয়তম যা কিছু সব পিছনে ফেলে চুম্বকাকর্ষণে ছুটে চলেছে সে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশিরকুমার সেনগুপ্ত, জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
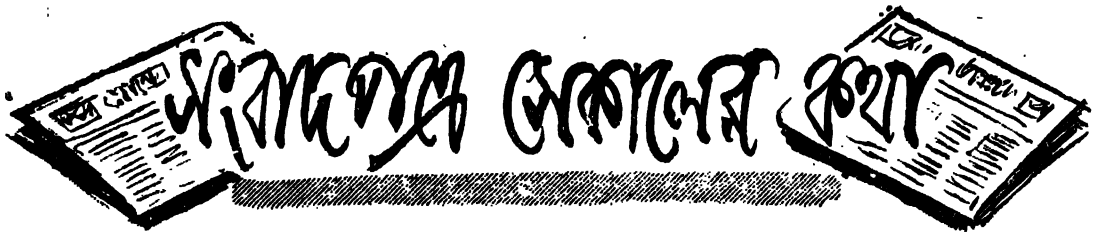
(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

[এক শত ষোল বৎসর পূর্বে বাঙলার কয়েকটি প্রধান জেলায় যে ধরণের অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক। কর্তব্যে অবহেলা করবার জন্ত ঐ বৎসর ১৪১ জন পুলিশ কর্মচারী দণ্ডিত হয়েছিল। আমাদের বিদেশী শাসকরা সাম্রাজ্যের বনিয়াদ কেমন পাকা করে গড়ে তুলেছিল, এই থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণদের আচরণ সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রিকায় অনেক উল্লেখ আছে। সমাজে তাদের যে বিশেষ অধিকার ছিল ইংরেজরা এসে তা সহজে লোপ করতে পারেনি। এদের আচরণের মধ্যে বিধর্মী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।
উদ্ধৃতাংশের তথ্যাদির যথার্থতা সম্বন্ধে সংকলকের দায়িত্ব নেই]

১৮৩৬ সালে বাঙলার কয়েকটি জেলার অপরাধীর খতিয়ান

অপরাধের খতিয়ান যত বিরক্তিকরই হোক না কেন জাতীয় জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই হিসাব ছাড়া আইন প্রণয়ন করা হবে অন্ধকারে; এবং আইন পাশ হলেও সমাজের উপর তার ফলাফল কি রকম হলো তা-ও জানা যাবে না। ভারতের সর্ব অঞ্চলের শাসনকর্তাদের সামনে অপরাধের তালিকা এবং সামাজিক পরিবেশের চিত্র থাকবে বলে আমরা আশা করি। সরকারী দপ্তরে অপরাধ সম্পর্কে যে সব তথ্য আসে তার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করলে ভালো হয়। Committee on Prison Discipline-এর রিপোর্টের পরিশিষ্টে বারাসত, ২৪ পরগনা, হুগলী, বর্দ্ধমান, যশোহর, নদীয়া এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁদের এলাকার জেলে ১৮৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সব দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী ছিল তাদের বিবরণ দিয়েছেন। কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে রিপোর্ট রচিত হয়নি বলে বিবরণীর মধ্যে সামগ্রিক ঐক্যবোধের অভাব আছে। অনুরূপ অপরাধকে বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। জনসংখ্যা জানা থাকলে অপরাধের আনুপাতিক হার বের করা যায়। আলোচ্য জেলাগুলিতে ঐ সময়কার জনসংখ্যার আনুমানিক হিসাব দিয়েছেন মিঃ অ্যাডাম তাঁর এডুকেশন রিপোর্টে। সেখান থেকে আমরা জনসংখ্যার হিসাব তুলে দিলাম: ১। ২৪ পরগনা ও বারাসত—১৬,২৫,,০০০; হুগলী—১০,০০,০০০; বর্দ্ধমান—১৪,৪৪,৪৮৭; যশোহর—১২,০০,০০০; নদীয়া—৮,০০,০০০; মেদিনীপুর ১৫,০০,০০০; মোট—৭৫.৬১.৪৮৭। মোট দণ্ডিত অপরাধীর সংখ্যা ৩.২৮৮। অবশ্য যদের ঐ বছর প্রাণদণ্ড, নির্বাসন অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে, তাদের কথা এই হিসাবে ধরা হয়নি।

প্রধান প্রধান অপরাধগুলির কারণ কি? কি উপায়ে বন্ধ করা যায়? কোন ধরণের অপরাধগুলি সমাজের অমঙ্গল সাধন করে চলছে অথচ বর্তমান বিচারব্যবস্থায় তাদের দমন করা যায় না? সমাজ-সচেতন পাঠকদের কাছে এগুলি খুবই জরুরী প্রশ্ন। আমরা আশা করি, আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা এই ধরণের বিবরণী পাঠিয়ে আমাদের সহায়তা করবেন।

১৮৩৬ সালে অপরাধ ও দণ্ডিত অপরাধীর তালিকা

অপরাধ	দণ্ডিত অপরাধীর সংখ্যা
অতর্কিত আক্রমণ	১৫৩
অধিকার ব্যতীত চাপরাস ব্যবহার	৪
অলঙ্কার কেড়ে নেওয়া	৪২
আগুন দেওয়া	১১
আদালত অবমাননা	১৬
উৎপীড়ন	৫
কর্তব্যে অবহেলা (পুলিশ কর্মচারীদের)	১৪১
গরু চুরি	১০
ঘুষ গ্রহণ	৮
চাকুরী ছেড়ে পালানো	৩
চুরি	৩১৮
চুরির চেষ্টা	৩
চোরাই মাল রাখা	৬১
চোরাই লবণ বিক্রয়	১০
ছেলে বিক্রয়	২
জালিয়াতি	২৬
জুয়াখেলা	১
জুয়াচুরি	৮
ডাকাতি	৮১২
ডাকাতি, রাজপথে	২৫৮
ডাকাতি, হত্যা সহ	৩.
ডাকাতির চেষ্টা	৬
ডাকাতির সহায়তা	১৬
তহবিল তছরুপ	৬

অপরাধ	দণ্ডিত অপরাধীর সংখ্যা
দাঙ্গাহাঙ্গামা	৩১৭
দাঙ্গাহাঙ্গামা, নরহত্যা সহ	১৩৮
দুষ্ট চরিত্র	৩০০
নেশাকর ঔষধ প্রয়োগ	১০
নৌকাচুরি	১১
ফুসলাইয়া বাহির করা	৬
বলাৎকার	৩
বিষ প্রয়োগ	৬
মানুষ গুম করা	৪
মিথ্যা এজাহার	৩০
মিথ্যা শপথ করা	৪১
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ানো	১
মুদ্রা জাল করা	৬
লুঠ	৪৩
শমন জারিতে বাধা	২০
শিশুহত্যা ও অলঙ্কার অপহরণ	১
স্বামী ত্যাগ	১
হত্যা	১৭১
হত্যা গোপন করা	১৩
হত্যার চেষ্টা	৫
হত্যার সহযোগিতা	১৪
বিবিধ	৫৬
	মোট ৩,২৮৮

ঐ বছর অপরাধীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশি ছিল মেদিনীপুরে; তার পর যথাক্রমে স্থান পেয়েছে যশোহর, বর্ধমান, ২৪ পরগনা, নদীয়া ও হুগলী।

টীকা: উপরোক্ত হিসাব বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন ক্রমে দিয়েছে। তাই অপরাধের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ঐক্য রক্ষিত হয়নি। একই অপরাধকে বিভিন্ন জেলা পৃথক্ নামে অভিহিত করেছে। বর্তমান বাঙলা তালিকায় আমরা একপ্রকার অপরাধগুলিকে এক নামের মধ্যে ফেলেছি। সুতরাং ইংরেজী তালিকার সঙ্গে এর হুবহু মিল নেই।

—(১৮৩১ সালের জুলাই সংখ্যার 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্ণালে' 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' থেকে উদ্ধৃত।)

হিন্দু জাতির রীতি ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের উপর অন্যান্য হিন্দুদের যে অন্ধ শ্রদ্ধা ছিল, তার সুযোগ নিয়ে কৌশলী ব্রাহ্মণরা আইন অমান্য করবার চেষ্টা করত। সরকারের পক্ষ থেকেই হোক্ কিংবা কোনো ব্যক্তিরই হোক্, হিন্দু পেয়াদা ব্রাহ্মণের উপরে শমন জারী করতে সাহস পেত না।

বাঙলা দেশে তো এই রীতি ছিলই, কিন্তু এর চেয়ে বেশি ছিল কাশী অঞ্চলে। আদালতের কর্মচারী যাতে দাবী আদায় করতে না পারে তার জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করা হতো। এ সব কারণে রাজস্বের এমন ক্ষতি হতে লাগল যে, গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হয়ে আদেশ জারী করতে হলো এই কৌশলগুলির প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে।

এ সব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা যে কৌশলগুলি অবলম্বন করত তাদের কতকগুলি হলো এই: দেহের চামড়া ছিঁড়ে ফেলা;—সাধারণত ক্ষুর বা ছুরি দিয়ে শরীরে ক্ষত করা হতো। বিষপানের ভয় দেখানো হতো; কখনো বা সত্যি বিষ খেত। আবার কখনো একটা গুঁড়াকে দেখিয়ে বিষ খাবার ভাণ করত। ব্রাহ্মণরা অনেক সময় অবলম্বন করত অন্য কৌশল। কাঠ ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ নিয়ে একটা কুঁড়ে তৈরি করে এক বৃদ্ধাকে তার মধ্যে বসিয়ে রাখত। নিজেরা উপবাস অথবা উপবাসের ভাণ করে অপেক্ষা করত নিকটেই। সরকারের পেয়াদা এসে কোনো জোর-জবরদস্তি করতে গেলে কুঁড়ে ঘরে আগুন দিয়ে বুড়ীকে শুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে এই ছিল উদ্দেশ্য। কখনো কখনো বাড়ীর মহিলা ও শিশুদের গভর্ণমেণ্ট পেয়াদার চোখের সামনে বের করে এনে তাদের মাথার উপর তরবারি ঘোরাত; পিয়ন অধিক অগ্রসর হলে নারী ও শিশুহত্যা হবে এই ভয় দেখানো হতো। গ্রেপ্তার কিংবা লাঞ্ছনার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণরা শুধু যে নিজেদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করত তাই নয়, পরিবারের মেয়েদের হত্যা করত এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। পরিবারের শিশু-কন্যারাও রেহাই পেত না। ব্রাহ্মণীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করত। সে কালের শিক্ষা ও সংস্কার এদের ব্রাহ্মণের মর্যাদা রক্ষার জন্য প্ররোচিত করত আত্মবলি দিতে। প্রতিবাদ জানানো, এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করবার পথও ছিল এই। যাদের জন্য এরা মরল তারা মৃতের প্রেতাত্মার কাছ থেকে নিয়ত যাতনা পাবে, এটা ছিল সে কালের বিশ্বাস। ব্রাহ্মণদের অসঙ্গত অহংকার থেকে এ সব প্রথার উদ্ভব হয়েছে। সরকারকে বাধ্য হয়ে আইন করতে হয়েছে যে, যারা অনুরূপ অবস্থায় পরিবারের শিশুদের হত্যা করবে তাদের নরহত্যার অপরাধে বিচার করা হবে।

এমনি একটি করুণ ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বারাণসীর উত্তরাঞ্চল থেকে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৭৮ সালে; মিঃ ডানকান তখন সেখানকার রেসিডেণ্ট।

এক ব্রাহ্মণের খাজনা বাকী পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেও আদায় করা যায় না; মিথ্যা অজুহাতে কেবলই ফাঁকি দিচ্ছে। দেশীয় তসিলদার তখন বাধ্য হয়ে সামান্য শাস্তির ব্যবস্থা করল। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চার-পাঁচ ঘা দেওয়া হলো ব্রাহ্মণের পিঠে। এই যৎসামান্য শাস্তির কথা সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ল; গুজব উঠল যে প্রহারের চোটে ব্রাহ্মণ হয় মারা গেছে, নয়তো তার আর বাঁচবার আশা নেই। আত্মীয়েরা যখন এ খবর শুনতে পেল তখন তারা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ-পত্নী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল; ফিরে এসে সব শুনতে পেয়ে সেই আগুনে আত্মাহুতি দিল। আর একটি ঘটনা শোনা গেছে এক ব্রাহ্মণের নিজের মুখ থেকে। প্রায় বারো বছর আগে এক ভাইয়ের সঙ্গে তার মামলা সুরু হয়েছিল। তাতে জয়লাভের কোনো আশা না দেখে ব্রাহ্মণদের প্রথা অনুযায়ী নিজের পেট চিরে মৃত্যুবরণ করবার সংকল্প করল। কিন্তু বাধা দিল তার স্ত্রী ও

পরিবারের অন্যান্য মেয়েরা। স্বামীর পরিবর্তে স্ত্রী প্রাণ দিতে চাইল। সে যুক্তি দেখাল যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী নতুন স্ত্রী ঘরে আনতে পারে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী তো আর স্বামী পাবে না। সুতরাং এই যুক্তি মেনে নিয়ে তরবারি দিয়ে স্ত্রীর ঘাড়ে এক কোপ বসাল ব্রাহ্মণ; নিজেরও আত্মহত্যা করবার মতলব ছিল, কিন্তু লোক-জন এসে তাকে বাধা দিল।

কাশী থেকে কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে এমনি আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। এক ব্যক্তির সম্পত্তি নিয়ে কলহ ছিল প্রতিবেশী-দের সঙ্গে। বিচারপ্রার্থী হলে তারই জয়লাভ করবার কথা; কিন্তু সে বিচারপ্রার্থী হলো না, জোর-জবরদস্তিও করল না। সে শত্রুপক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষুর দিয়ে নিজের পেট দু'ভাগে চিরে ফেলে বলল, আমাকে রেসিডেন্ট ডানকান সাহেবের কাছে নিয়ে চল; সেখানে আমি বিচার ভিক্ষা করব। কিন্তু ভিক্ষা নিবেদনের সুযোগ পাওয়া যায়নি। সদরে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হলো।

ব্রাহ্মণদের এ সব বর্বর প্রথা উৎসাহ পেয়েছে বুলওয়ার সিং ও চৈৎ সিংএর আমলে। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং নিষ্ঠুর প্রথাগুলি বন্ধ করবার জন্য কিছুই করেননি তাঁরা। চৈৎ সিংকে রাজ্যচ্যুত করবার দু'বছর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক ব্রাহ্মণের খাজনা বাকী পড়ায় সে ঘরে আগুন দিয়ে এবং পরিবারের দু'-তিনটি মহিলার মুণ্ডচ্ছেদ করে মাথাগুলি পাঠিয়ে দিল রাজসভায়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী—এই উভয় বিচারের ভারই তখনও ছিল চৈৎ সিংএর হাতে। কিন্তু এই বর্বর রীতি দমন করবার জন্য তিনি কিছুই করলেন না।

১৭৯৫ সালে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বানারস, বাঙলা ও বিহারে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণরা ঋণের টাকা ফিরে পাবার জন্য অথবা যে কোনো কারণে টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে এই উপায়টি ব্যবহার করত। এর দ্বারা ব্রাহ্মণরা সাধারণত তাদের অভীষ্ট লাভ করত। শেষ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টকে প্রথাটি বে-আইনী বলে ঘোষণা করতে হয়েছিল। কেউ নিষিদ্ধ পন্থায় অভীষ্ট লাভের চেষ্টা করলে তাকে প্রদেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে, সরকার এই শাস্তিবিধান করলেন। এই প্রথাটি হলো ধরনা দেওয়া। কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্মণরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে ধরনা দিত। উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত সে বাড়ীর দরজায় অনাহারে বসে থাকত। সঙ্গে নিয়ে যেত ধারালো অস্ত্র অথবা বিষ। যে বাড়ীতে ধরনা দেওয়া হতো সে বাড়ীর লোকরাও ভয়ে ভয়ে অনাহারে থাকত; তারা বাইরে বেরুতে পারত না; কিংবা বাইরে থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করাও সম্ভব ছিল না। কারণ তাহলে ব্রাহ্মণ হয় বিষপান করবে, কিংবা অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে। অবশ্য আদালতের কর্মচারীরা এসে প্রায়ই বলপ্রয়োগ করে ধরনা থেকে তুলে দিত।

১৮১৮ সালে কলকাতায় এমন একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল যা থেকে হিন্দুদের ধর্মান্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফৌজদারী জেলের পাঁচ জন কয়েদী সে-বার এক অসাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা স্থির করল যে, বিদেশীর তরবারি অথবা এমনি কোনো অস্ত্রাঘাতের বেদনা থেকে মুক্তি পেতে হবে। তারা একটা গাছের মূল রাঁধের কাছে বেশ করে ঘষে দিল। মূলের রসে ছিল মারাত্মক বিষ। বিষক্রিয়ায় অবিলম্বে তিন জন মারা গেল। চিকিৎসা করে দু'জনের প্রাণ রক্ষা করা গিয়েছিল।

—(এশিয়াটিক জার্ণাল, ডিসেম্বর, ১৮১৬।)

রিম্‌ঝিম্ রাত

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম-মাখা রাত্রির প্রহরে প্রহরে
বাতাবী ফুলেরা শুধু ঝরে।
রাত্রির মত কালো
আর হিংস্র ভয়াল সাঁওতাল
মহুয়ার নেশায় উত্তাল,
তীক্ষ্ণ বর্শা তবু তুলে ধরে
শ্যামলী মেয়ের দু'টি তুলতুলে গালে আর বুকে।
তখন আকাশে খেলা মেঘে মেঘে কী যে কৌতুকে!

মনে হয়:
জলে জলে
লেগেছে কী খেয়ালের ঢেউ,
গাছের পাতারা নড়ে
মৃদু মৃদু সিক্ত সমীরণে,
আমার চোখের পাতা
চুপি চুপি এসে যেন কেউ
মুঠো মুঠো নীল স্বপ্নে ভ'রে দেয় গোপনে গোপনে।

আকাশ মাটিতে এসে
মেশে বুঝি রিম্‌ঝিম্ রাতে,
ঝোপ-ঝাপ নিঃঝুম, বাতাসের মৌন আনাগোনা।
সাগরে সাগরে ওঠে কানাকানি আহ্বানে, আঘাতে,
আমার আঁখিতে শুধু
স্বপনের ইন্দ্রজাল বোনা।

রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফ্‌বয়ের
ফেনার আবরণে
যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।
লাইফ্‌বয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার বীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
লাইফ্‌বয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
L. 230-50 BG

ট্রেন
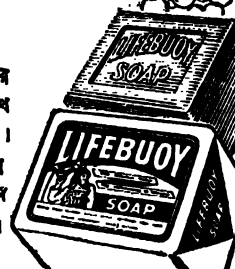
ভেরা পানোভা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এসে দেখা করার পর থেকে ডাক্তারের সমস্ত মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ চিন্তাগ্রস্ত হোয়ে উঠেছিলো। সারাক্ষণ কত চিন্তাই তো করতে হোতো, কাজ-কর্ম্ম নিয়ে, সীমান্তের অবস্থা নিয়ে, সুপ্রোগণ্ড, সোবোল, তাছাড়া নিজেরও খাওয়া, শোওয়া, হাসি, গল্প সব-কিছুর মাঝখানে একটি চিন্তা যেন সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত চমক্ দিয়ে নাড়া দিতো সমস্ত চেতনাকে, যেন বলতো—'আমি আছি, আমি আছি, আমাকে ভুলে থেকো না—' সে চিন্তা হোলো—ছেলে—ইগর।

সন্ধ্যা বেলা সারা দিনের সামরিক পোষাক খুলে, গরম কালের হাল্কা ডোরা-কাটা পাজামা পরে খালি গায়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতেন। অসহ্য গরম হয় ঐ সামরিক পোষাকে কিন্তু উপায় নেই—হঠাৎ বোমা পড়া সুরু হোলে কামরা থেকে তো আর অমন অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় বেরোনো যায় না— চার দিকে যখন এত মেয়েরা রয়েছে!

···যাই হোক গে, হাল্কা পোষাকে নরম ভেলভেটের সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে আরামে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে কি আরাম! কিন্তু আশ্চর্য্য, চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠতো ছেলে। শুধু ভেসে ওঠা নয়, এসে বসতো পাশটিতে—তার পর দু'জনে মিলে গল্প সুরু হোতো। (এক সময় অবশ্য উল্টো ব্যাপারই ঘটতো: ছেলে বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে হল্লোড় করতো, আর ডাক্তার পাশে বসে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতেন)।

"ইগোরিক"—ডাক্তার বলতেন—"বল্ তো বাবা, কি করে এমন হোলো? আমরা কেমন কোরে দু'জনে দু'জনকে হারালাম—"

চমৎকার মিষ্টি ছেলেটা ছিলো, ডাক্তার ভাবলেন। যখন মোটে দু'বছর বয়স, তখন একবার ঘর-সারানোর মই দেখে তার উপর চড়ে ছাদে উঠেছিলো। উঠানে যে সব ছেলেরা খেলা করছিলো তারা দেখতে পেয়ে সোনেচ্কাকে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে সোনেচ্কা দেখে যে, ছেলে একেবারে আলসের ধার ঘেঁসে পা ঝুলিয়ে বসে। তাই দেখে তো ওর চক্ষু স্থির, প্রায় মূর্চ্ছা যায় আর কি···শেষে এক জন প্রতিবেশী এসে ছাদের উপর উঠে যেমন ধরতে গেলো অমনি ইগোরিক ছুটলো চিমনীর দিকে। শেষ কালে ধরা পড়ে কি চেঁচানো আর পা ছোঁড়া!··· কিছুতেই নামবে না।

প্রতিবেশীটি উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলো, ইগোরিককে ধরে এমন মার দিতে যাতে রীতিমত শিক্ষা হয়, আর যাতে অমন দুষ্টুমি না করে। কিন্তু তার বদলে সোনেচ্কা ছেলেকে জড়িয়ে চুমা খেয়েছিলো, আর ডাক্তার যখন বাড়ী ফিরে সব শুনলেন, তখন তিনিই কি মেরেছিলেন?···তিনিও তো মায়ের মতই জড়িয়ে চুমা খেলেন। ভাবো একবার···মোটে দু'বছরের দুধের ছেলে···!

স্মৃতির সোপান বেয়ে ডাক্তার ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগলেন ফেলে-আসা অতীতের দিনগুলিতে।···

সেই যখন ওঁরা রাইটার ষ্ট্রীটে থাকতেন, একদিন ডাক্তার বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ছেলে আর মেয়ে—ইগোর আর লায়লাকে নিয়ে। ইগোরের এক হাত তিনি আর অন্য হাত লায়লা ধরেছিলো। লায়লার তখন সাত বছর, না, না, আট বছরই হবে। হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করতে করতে ছুটে এলো। লায়লা ইগোরের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে এসে বাবার পিছনে লুকালো—কিন্তু ইগোর সোজা তেড়ে গেলো কুকুরটার দিকে—আর মুখ ভেঙচে ভোঁ-ভোঁ করে কুকুরটার ডাক নকল করে চ্যাঁচাতে লাগলো। কুকুরটা তো তাইতেই ঘাবড়ে গিয়ে সোজা লেজ তুলে দৌড় দিলে···কতটুকু তখন ইগোর! পাজামা পরার বয়সও হয়নি, সাদা পিনাফোরের উপর ছোট্টো নীল ফ্রক পরে বেড়াতো—ছোট্টো ফুটফুটে খুকুর মত একরাশ ঘন চুলও ছিলো মাথায়···কিন্তু কি চমৎকার ছেলে, কি সাহসী ছেলে!

দানিলভ বলে শিক্ষা দিয়ে সাহসী করে তুলতে হয়, কে জানে হয়তো তাই, হবেও বা। কিন্তু ঐ দু'বছরের এক ফোঁটা ছেলেকে কে সাহসী হবার শিক্ষাটা দিয়েছিলো শুনি? নাঃ, এ সেই জিনিষ নয়। হয়তো সাহস দু'ভাবেই হয়—একটা অর্জ্জন করে, আর একটা সহজাত।

যাক্ গে, তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কিছু লাভ নেই। আসল কথা হোলো ছেলে—ইগোর—জন্মে থেকেই কি তেজী! শুধু তেজী, তেমনি অভিমানী, অতটুকু ছেলের কী স্পর্শকাতর মন! চমৎকার, —শুধু চমৎকার!···এক কথায় বলতে গেলে অসাধারণ···

লোকেরা মাঝে মাঝে বলতো, "কাল আমাদের বাড়ী-ঘর ধোয়া-মোছার দিন—খানিকটা সোডা কিনে রাখতে হবে, সব একেবারে সাফ করতে হবে"—

পরদিন যখন ধোয়া-মোছা করবার মেয়েটি এলো, ইগোরের বুদ্ধিতে এলো ওই মেয়েটির নামই বোধ হয় 'ধোয়া-মোছা'। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, সারা দিন মেয়েটির পিছনে-পিছনে ঘুরলো, আর লাফালো 'ধোয়া-মোছা মাসী' বলে, আর খুশীর চোটে সাবানের ফেনা আর বুদ্বুদ্-ভরা টবের জল নিয়ে খেলতে সুরু করলে।

একদিন ওর 'ধোয়া-মোছা' মাসী সঙ্গে করে তার ছোট্টো মেয়েটিকে এনেছিলো, ইগোরের চেয়ে সে বছর তিনেকের বড়ই হবে। নানা রকমের খেলা জানতো মেয়েটা—ইগোরকেও

শিখিয়েছিলো অনেক, তাইতে ইগোর তো মেয়েটার রীতিমত ভক্ত হোয়ে পড়লো—সারাক্ষণ তাকে জড়িয়ে, আদর করে, চুমু খেয়ে অস্থির করে তুলতো। সে আদর দেখে ইগোরের মায়ের মনেও বুঝি গোপন ঈর্ষা জাগতো!—"খোকা, তুই সবার চেয়ে কাকে ভালোবাসি বল তো…"

খোকার জবাব তৈরী—"সব চেয়ে ভালোবাসি তো লিডাকে"—

কিন্তু ক'দিন পরেই একে একে খোকার খেলনাগুলি অদৃশ্য হোতে লাগলো। সোনেচকা প্রথমটা কিছুই বলেনি, ছেলেটার মনে কষ্ট হবে বলেই চুপ করেছিলো। কিন্তু এক দিন আর থাকতে না পেরে বললে:—"ইগোরিক, লিডা মোটেই লক্ষ্মী মেয়ে নয়, দেখেছিস তো, তুই ওকে কত ভালোবাসিস, আর ওই মেয়েটা রোজ তোর সব ভালো ভালো খেলনাগুলো চুরি করছে—"

কিছু বললে না ইগোর, চুপ করে সোজা খাবার-ঘরে চলে গেলো। একটা সোফার উপর উঠে দুটি পা মুড়ে চুপটি করে বসে রইলো। কতক্ষণ ধরে অমনি মুখটি ভার করে বসে রইলো। সোনেচকা পরে বলেছিলো, তখন ওর চোখ দুটো নাকি বিস্ময়ে, ক্ষোভে-দুঃখে ছল-ছল করছিলো। অনেকক্ষণ পরে সোফা থেকে নেমে এসে মায়ের কাছে গিয়ে বললে:—"মা মণি, লিডা চুরি করেছে বোলো না লক্ষ্মীটি! তার চেয়ে বলবো আমিই ওকে স—ব খেলনা দিয়ে দিয়েছি, কেমন? ওকে আসতে যেন বারণ করে দিও না মা।"

পরদিন সকালে লিডা যখন এলো, তখন আড়াল থেকে সোনেচকা শুনলে ছেলে তাকে বলছে: "তোমার যদি ইচ্ছে করে তুমি আমার সব খেলনা নিয়ে নাও—যতগুলো ইচ্ছে করবে স—ব নাও,…সব তোমায় দিলুম। আমার একটাও চাই না—"

কী আশ্চর্য্য ছেলে! আশ্চর্য্য ছেলে!

যখন মোটে ছ'বছর বয়স, তখন এক দিন না বলে সোনেচকার থলি থেকে কয়টা টাকা নিয়েছিলো। ওর চুলগুলো ছিলো ভারী সুন্দর কোঁকড়ানো আর হাল্কা সোনালী রঙের। সোনেচকার খুব গর্ব্ব ছিলো ঐ চুল নিয়ে, কিছুতেই কাটতে দিতো না। ছেলেটা কেবল বায়না করতো কেটে দেবার জন্তে, কারণ সঙ্গীর দল ওকে দেখলেই ক্ষ্যাপাতো—'এই খুকি, ছোটো খুকি' বলে, কিন্তু সোনেচকার মাতৃত্বের গর্ব্ব আর দাবী চাড়া দিয়ে উঠতো: —"বলুক গে ওরা যা খুশী, ওরা কি কিছু বুঝে-সুঝে বলে? আর একটা বছর যাক, ঠিক একটা বছর, তার পর কেটে দেবো, কেমন?"

হঠাৎ এক দিন ছেলে খেলতে খেলতে কোথায় অদৃশ্য হোলো। যখন ফিরলো তখন মাথার সব চুল একেবারে ছাঁটা! ভুরভুর করছে অডিকলোনের গন্ধ।

—"কী কাণ্ড, কোত্থেকে এমন করে চুল ছেঁটে এলি"—সোনেচকার চোখ কপালে ওঠে আর কি! আর মুখের যা অবস্থা, এই বুঝি কেঁদে ফ্যালে!

ছেলে বললে:—"নাপিতের কাছে। তাকে তিনটে রুবল দিলাম, তাই জন্তে এই দেখো না আমার সারা গায়ে কেমন সুন্দর করে এসেন্স মাখিয়ে দিয়েছে—"

—"তিনটে রুবল্—কোত্থেকে পেলি? শীগ্‌গির বল।"

—"বা রে! কেন তোমার থলি থেকে…"

—"সে কি! কেন তুই না বলে নিলি …এর মানে চুরি করা। আমায় বলে নেওয়া উচিত ছিলো, তাহলে তো আমিই দিতাম…"

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলে বলে উঠলো:—"কক্ষনো না, চাইলে তুমি আমায় কক্ষনো দিতে না—"

আর কিছুই বলেনি সোনেচকা ছেলেকে। শুধু তার সত্ত-ছাঁটা নরম ভেলভেটের মত মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কেঁদে ফেললে সেই গুচ্ছ-গুচ্ছ সোনালী কোঁকড়ানো চুলগুলির শোকে—আর চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিলে ওর কচি মুখখানি…মায়ের অকারণ, অবারণ, উচ্ছলিত ভালোবাসা!

ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীও ইগোরকে আদর দিয়ে দিয়ে বেশ খানিকটা নষ্ট করেছিলেন। করবেনই তো, এমন ছেলেকে কেউ ভালো না বেসে পারে?

—"জানো বাবা, ক্লাসে সব্বাই বসে বসে অঙ্ক করে, আর আমি মজা করে ক্লাসময় ঘুরে-ঘুরে ওদের অঙ্ক কষা দেখি—"

—"কেন? তুমি অঙ্ক কষ না?"

—"হ্যাঁ, আমার তো সেই ক-খ-ন হোয়ে যায়—সব্বার আগে আমার অঙ্ক শেষ।"

—"কিন্তু তোমার শিক্ষয়িত্রী কিছু বলেন না, তুমি যে অমন করে ক্লাসে ঘুরে বেড়াও"—

—"ধ্যাৎ, কি আবার বলবে, সে যে আমাকে ভালোবাসে"—সোজা উত্তর ছেলের!

* * * *

ডাক্তার ভাবেন আর ভাবেন—কিন্তু ভেবেই কি কূল মেলে—এ কি সোজা প্রশ্ন?

কবে কখন বাপ আর ছেলের মাঝখানে একটা অদৃশ্য ছেদ পড়ে গেলো। এমন সময়ও তো এসেছিলো—কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত অত্যধিক আদরে, আর অকারণ অর্থহীন প্রশংসার চোটে বাড়ীশুদ্ধ সবাই যখন ইগোরের মাথাটি খেতে বসেছিলো, তখন ছেলের উপর তাঁর কি প্রবল বিতৃষ্ণাই না ছিলো!

কাজ সেরে বাড়ী ফিরে এসে সোনেচকাকে বেলা তিনটে অবধি বসে থাকতে হোতো। কেন? না, ছেলের স্কুলের আঁকাগুলো এঁকে দিতো বসে বসে। এত কুঁড়ে ছেলে যে সেটাও করে উঠতে পারতো না, পরদিন মায়ের আঁকাগুলো স্কুলে গিয়ে দেখাতো। ছি ছি:…

শুধু তাই? ছেলে স্কুলে যেতো নিজের ইচ্ছা মত, খুশী মত। এমন কথা কেউ শুনেছে কখনো? আর সেই সদিচ্ছার অভাবটাও ঘটতো প্রায়ই। সিনেমা দেখে কিম্বা স্কেট করে প্রায় মাঝ রাত্তে বাড়ী ফিরতো ছেলে। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠতেও চাইতো না …আর তার গর্ভধারিণী! উঃ, আশ্চর্য্য! স্কুলে কিনা চিঠি লিখে পাঠাতো যে, ছেলের মাথা ধরেছে, তাই যেতে পারবে না। কি তৈরী করতে চেয়েছিলো সে ছেলেকে?…নবাবপুত্তুর না বাউণ্ডুলে…?

বাপের মন ক্ষুব্ধ হোতো বেচারী লায়লার জন্তে। মেয়েটা স্কুলেতেও যেমনি ভালো লেখাপড়ায়, তেমনি হাসিখুশী, নরম মনটি—সোনার টুকরো মেয়ে! অথচ ইগোরকে যা আদর দেওয়া হোতো তার অর্দ্ধেকও বেচারার বরাতে জুটতো না।

দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে থাকতো লায়লা। ডাক্তার বাড়ী ফিরলেই ছুটে গিয়ে—'বাবা এসেছে'—বলে খুশীর চোটে এমন চেঁচামেচি লাগাতো যে, সারা ফ্ল্যাট জানতো ; লাফিয়ে চুমা খেয়ে বাবাকে ঘিরে কি কাণ্ডই না করতো! কিন্তু ইগোর? রাতে খাবার সময় ছাড়া তার টিকিও দেখা যেতো না, আর সে কি মূর্ত্তি! উস্কোখুস্কো চুল, মুখ ভার, ভ্রূ কুঁচকে উগ্র মূর্ত্তিতে এসে বসতো, আর কেউ কিছু বললেই কর্কশ উগ্র ভাষায় জবাব দিতো।

কিন্তু সোনেচ্‌কা শুনেও শুনতো না, কান দিতো না এই সব রূঢ় ভাষায় বাদানুবাদে। ছেলে যে! অন্ধ মাতৃস্নেহ!

আর ডাক্তারের কাছে সোনেচ্‌কা? এ সব প্রাত্যহিক তুচ্ছতা-গ্লানির অনেক উপরে একটি শুচিশুভ্র পবিত্রতার আধার। কিন্তু ডাক্তারের কাছে অসহ্য হোয়ে উঠেছিলো ইগোরিক, তাঁর আপন সন্তান। কি বসার ভঙ্গী!...মায়ের সঙ্গে কথা বলার কি উগ্র ভঙ্গী!...এতটুকু বিনয়, শালীনতা, দরদ, মমতা কিছুই নেই ছেলেটার! আশ্চর্য্য হৃদয়হীন! আশ্চর্য্য উদ্ধত!...

এক সময় এমন হোয়েছিলো যে, ইগোরকে দেখলেই ডাক্তারের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতো রাগে। বাড়ীতে প্রায়ই রাতের বেলায় গরুর মাংসের রোষ্ট তৈরী হোতো। লায়লা বরাবরই হাড়ের ভিতরের চর্ব্বিটা চুষে খেতে ভালোবাসতো, ইগোরও ভালোবাসতো। কিন্তু জিনিষটা জুটতো ইগোরেরই কপালে, লায়লার নয়।

এক দিন বেশ শান্ত ভাবেই ডাক্তার প্রশ্ন করলেন :—"আচ্ছা এর মানেটা কী? অন্ততঃ আজকের দিনটার জন্যেও লায়লাকে চর্ব্বির হাড় দেওয়া যায় না—একটা দিনের জন্যও নয়?"

সোনেচ্‌কা যেন শুনতেই পায়নি এমন ভাব করলে। আর লায়লা—কি লক্ষ্মী মেয়ে!...হাসতে হাসতেই বললে :—"না, না, বাবা, কিছু ভেব না তুমি, ওটা ইগোরিকই খাক না—আমি তো এখন বড় হোয়ে গেছি।"

ইগোর থালা থেকে মুখ তুলে বাবার মুখের দিকে একবার বিস্মিত ভাবে চাইলে,—নাঃ, সে দৃষ্টিতে বিস্ময় ছিলো কি? ছিলো কঠোর, রুক্ষ, বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টি। পর-মুহূর্ত্তে নিশ্চিন্ত ভাবে হাড়ের ভিতর থেকে মাংস চুষে চুষে খেতে লাগলো।

রাগে, লজ্জায়, ক্ষোভে লাল হোয়ে উঠলো বাপের মুখ—

সেই দিন থেকে ইগোর সব সময় এড়িয়ে চলতো বাবাকে। হ্যাঁ, সব সময়ই এড়িয়ে চলতো—কে জানে, এই ঘটনাটা বোধ হয় ওর মনে কিছু রেখাপাত করেছিলো। কিন্তু যাই হোক, তখন ছেলেটা ছিলো মাত্র পনেরো বছরের—আমার উচিত ছিলো তখনি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে ফেলা, ডাক্তার ভাবলেন। ছি, ছি, কি বোকামি, কি ছেলেমানুষিই না করেছি! তার ফলে কি ভীষণ ভুল বোঝা...

যে দিন ডাক্তার চলে এলেন—দিনটা এখনও মনে পড়ে। ইগোর প্রথমে পিছনেই ছিলো, হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো বাপের পাশটিতে। সবাই যখন বিদায় নিলে, তখন ইগোর হেঁট হোয়ে তাকালে বাবার মুখের দিকে—দৃঢ় ভাবলেশহীন স্বরে বললে—"বিদায় বাবা—"

আর ওর চোখ দুটিতেও যেন কি একটা ভাষা ছিলো—একটা নতুন কিছু, একটা তীক্ষ্ণ অন্বেষণী দৃষ্টি...সেটাই কি প্রকৃত বিদায় সম্ভাষণ? ক্ষমা? মীমাংসা?

...সে সময় তাঁর উচিত ছিলো দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরা ছেলেকে; তার পর বলা :—"ইগোরিক, বাবা আমার, যা কিছু হোয়েছে আমাদের মধ্যে, আজ সব মুছে গেছে, ধুয়ে গেছে...আজ আমাদের সামনের দিনগুলো খোলা পাতার মত পড়ে আছে, আমরা দু'জনে ভরিয়ে তুলবো ঐ পাতাগুলি—তুমি আর আমি..."

ইগোরিক, যা কিছু ঘটেছে আমাদের মধ্যে, সব মিথ্যে—সব ভুল। বর্ত্তমানই তো সব চেয়ে বড় সত্যি, আর আমরা দু'জনেই সেই সত্যের মুখোমুখি—একই সঙ্গে আমি আর তুমি...

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

নারীই গৃহের শ্রী

কল্যাণী বসু

নারীই গৃহের শ্রী। নারীবিহীন গৃহে কখনই শ্রী থাকে না। এই শ্রী শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। সুতরাং গৃহের লক্ষ্মী যাতে শান্ত থাকে সেই দিকে পুরুষের নজর রাখা উচিত। অনেক গৃহে দেখা যায় নারীকে লাঞ্ছিত করা হয়। এই সরলা অবলা নারীর উপর যথেচ্ছাচার চালানো হয়। সে যে একটা মানুষ, এটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না। এবং এই মানুষই যে মা-বোন-স্ত্রী-কন্যার রূপ নিয়ে সর্ব্বদা গৃহের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে, সে কথা অনেক পুরুষই চিন্তা কোরে দেখেন না। ফলে তাদের অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য কোরে থাকতে হয়। এবং এই জন্যই 'কমলা চঞ্চলা হয়ে ওঠেন ও গৃহে ভাঙন ধরতে দেখা যায়।

একটু চিন্তা কোরে দেখলেই বুঝা যায় এই কল্যাণময়ী নারী স্নেহ-মমতা-শ্রদ্ধা দিয়ে সর্ব্বদাই সংসারের মঙ্গল কামনা করে। তার কল্যাণ-হস্তের স্পর্শে গৃহ সুন্দর হয়ে ওঠে। কবি বলেছেন—

জননীর জাতি দেবতার সাথী
নারীরে বলো না হেয়,
অর্ধ জগতে কোর না গো হীন
জগতের মুখ চেয়ো।

যে গৃহে নারীর একান্ত অভাব, সে গৃহই শ্রীহীন। ঝি-চাকর-বামুন সবই রয়েছে, অথচ সময়ে খাবার আসছে না, এমন খাবার তৈরী হয়েছে যে, সে অখাদ্যেরই সমান, জিনিষপত্র যেন চারি দিকেই অগোছালো, অজস্র পয়সা খরচ হচ্ছে, কিছুতেই চুরি ও অপচয় বন্ধ করা যাচ্ছে না—ইত্যাদি অনেক অসুবিধাই কেবল মাত্র একটি লোকের অভাবেই দেখা যায়। সুতরাং এই একটি মাত্র লোক যে সংসারের কত উপকারে লাগে, তা সহজেই বোধগম্য। সংসার যেন এক বিশাল সাম্রাজ্যবিশেষ ও তার পরিচালনার ভার নারীর উপরেই ন্যস্ত থাকে। পরিচালকবিহীন হলে যেমন রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়, নারীবিহীন হলেও সংসারে তেমনি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যে সংসারে শাশুড়ী ও বৌ আছে, সেই সংসারে শাশুড়ী প্রধান মন্ত্রী এবং বৌ তাঁর সহকারী রূপে কাজ করা উচিত। মা-মেয়ের স্থলেও এই রকম করা যায়। যে বড়, তাকেই সংসারের প্রধান করা উচিত।

তবে অনেক নারী আছেন, যাঁরা কেবল নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে ব্যস্ত থাকেন। নিজের স্বামী, ছেলে, মেয়ে ছাড়া অপরের

কথা চিন্তা করেন না। সুতরাং গৃহের লক্ষ্মীকে শান্ত রাখতে হলে সে বিষয়ে পুরুষের যেমন নজর রাখা উচিত, তেমনি গৃহের শ্রী বৃদ্ধি কোরতে হলে নারীরও নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত। পরস্পরের সহযোগিতা পেলে সংসার সুন্দর হতে সুন্দরতম হয়ে ওঠে।

যুগ যুগ ধরে নারীই পুরুষকে চেতনা ও প্রেরণা দিয়ে এসেছে। মায়ের রূপ নিয়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কোরেছে, স্ত্রীর রূপ নিয়ে স্বামীকে প্রেরণা দিয়েছে, বোনের রূপ নিয়ে ভাইকে উৎসাহ দিয়েছে ও কন্যার রূপ নিয়ে পিতাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। সুতরাং এই নারী জাতির মর্য্যাদা রাখার চেষ্টা করা প্রত্যেক পুরুষেরই উচিত। সেই সঙ্গে নারীরও তার কর্ত্তব্য পালন কোরে যাওয়া উচিত। তাহলে সংসারের শান্তি ও সৌন্দর্য্য ঠিক মত বজায় থাকে।

মা হওয়ার আগে ও পরে

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ডাঃ গুপ্ত

দিদি প্রমীলাকে টুনী বহু বার তার বন্ধুদের ঐ ধরণের উপদেশ দিতে শুনেছে। আজকালকার দিনে প্রত্যেকেরই জন্ম-শাসনের ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া একান্ত ভাবেই কর্তব্য।

শুধু দৈহিক সুখ ও শান্তির জন্তই নয়, স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরের স্বাস্থ্যের জন্য এবং সংসার ও সমাজের মঙ্গল ও শ্রী-বিধানের জন্যও আজকালকার দিনে জন্মশাসন অপরিহার্য।

আজ টুনীর মনে পড়ছে বেশী করে তার বালিকা বয়েসের কথাই। ঋতুমতী তখনও সে হয়নি। যে ঋতু মেয়েদের জীবনে আনে বলতে গেলে সত্যিকারের প্রথম যৌন-চেতনা।

তলপেটে একটা অস্বোয়াস্তি ও চিনচিনে ব্যথার মধ্যে দিয়ে প্রথম তার পরিধেয় বসনকে রক্ততিলক পরিয়েছিল যে দিনটি—তার সেই প্রথম ঋতু-দর্শনের মুহূর্ত! চমকে উঠেছিল ও, ভয়ও পেয়েছিল সেই সঙ্গে দুর্নিবার একটা লজ্জা ওকে যেন কেমন বিব্রত করে তুলেছিল।

নারী-দেহে ঋতুর প্রথম অঙ্কুরটি সুপ্ত থাকে তার দেহাভ্যন্তরস্থিত দু'টি ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্ববীজের মধ্যেই। যেন ঘুমিয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ডিম্বাশয় দুটি সক্রিয় হয়ে উঠে—ঋতু আসে। এবং সক্রিয়ই থাকে যত দিন না নারীর নির্দিষ্ট একটা বয়ঃবৃদ্ধিতে ঋতু বন্ধ হয়।

ডিম্বাশয়ের সক্রিয়তা যেন জোয়ার-ভাটার মতই নির্দিষ্ট একটা সময়ের ব্যবধানে বৃদ্ধি পায় ও আবার ঝিমিয়ে যায়। সক্রিয় হওয়ার মুহূর্তটি থেকেই ডিম্বাশয়ের মধ্যস্থিত হাজারো ডিম্বকোষের মধ্যে একটি যেন নক্ষত্রের মত কক্ষচ্যুত হ'য়ে প্রজনন-লিপ্সায় শুক্রকীটের সন্ধানে নারী-দেহের জন্মাধারের দিকে ছুটে চলে। একেই বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন প্রজনন-চক্র বা Ovolution.

ঐ চক্রপথে যাওয়ার সময় ভাগ্যক্রমে যদি ঐ ডিম্বকোষ কোন শুক্রকীটের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে, তাহলেই নবজাতকের সৃষ্টি সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, নচেৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এই যে প্রজনন-চক্র সাধারণত মাসে আটাশ দিনের ব্যবধানে সক্রিয় হয় এবং প্রজনন-চক্রের আগমনের সংবাদ বহন করে আনে মাসিক ঋতু। নারী হয় ঋতুমতী বা রজঃস্বলা।

আটাশ দিনের ব্যবধানে নারীর দেহ-মধ্যস্থিত দুইটি ডিম্বাশয়ে যে কোন একটির অসংখ্য ডিম্বকোষের মধ্যে একটি ডিম্বকোষের ডিম্বাশয় হ'তে বিচ্যুতি ঘটে—ঐ বিশেষ ডিম্বকোষটি বিচ্যুতির একটি থলির মত আধারে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে—বিজ্ঞানীরা বলেন তাকে গ্রাফিয়ান ফলিকল। ঐ থলিটির মধ্যে এক প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে ভাসমান থাকে ডিম্বকোষটি। বিচ্যুতির প্রাক্কালে থলিটি যায় ফেটে বেলুন ফাটার মত, আর পরিপক্ক ডিম্বকোষটি বেরিয়ে আসে। শূন্য থলিটি ডিম্বকোষটিকে মুক্তি দিয়ে একটি গণ্ডের আকার নেয় ক্রমে এবং ঐ গণ্ড (corpus luteum) শরীরের রক্তধারার সঙ্গে একপ্রকার রস পদার্থ ক্ষরণ করে মিশিয়ে দেয়—তা থেকেই জন্মথলি বা ইউটেরাস তার পুষ্টি পায় ও সৃষ্ট প্রাণ বা ভ্রূণকে ধারণের উপযোগী হ'য়ে ওঠে।

উপরিউক্ত গণ্ডের নিঃসরিত পদার্থের পরিপুষ্টির সাহায্যেই থলির অন্তস্তক সন্তান সৃষ্টি ও ধারণের উপযোগী হয় যদি পুরুষ ও নারীর সঙ্গম ঘটে ও চ্যুত ঐ ডিম্বকোষ শুক্রকীটের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে। যদি তা না হয় প্রসারিত অন্তস্তক গলে গিয়ে জননেন্দ্রিয় পথে রক্তের মিশ্রণে নিঃসরিত হ'তে থাকে—ঐ রক্তক্ষরণই নারীর ঋতু বা প্রজনন-স্নান।

সত্যিই আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিল টুনী তার দিদির মুখে ঐ মেয়েদের ঋতু-রহস্যের আসল কথাটা জানতে পেরে প্রথম দিন। ঋতুপর্ব হতে শুরু করে দ্বাদশ দিবসে শুরু হয় প্রজনন-চক্র।

অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, সর্ব ক্ষেত্রেই আটাশ দিনে ঋতুচক্র আবর্তিত হয় না। ব্যতিক্রমও আছে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন কারো কারো তিন সপ্তাহের মাথায়, আবার কারো বা চার সপ্তাহের মাথায় ঋতুচক্র আবর্তিত হয়. কারো মাসিক হয় অত্যন্ত নিয়মিত ঠিক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, কারো হয় অনিয়মিত ভাবে। কারো বেদনাদায়ক, কারো সহজ ভাবেই স্বাভাবিক

ঋতু-দর্শনই কিশোরীর নারীত্বের দ্বারে শুভ পদসঞ্চার।

টুনী প্রথম যেদিন ঋতুমতী হলো ওর দিদি বলেছিল আগেকার কালে মেয়েরা প্রথম যখন ঋতুমতী হতো. তাদের ঋতুর তিনটি দিন ও রাত্রি সকলের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে গোপনে থাকতে হতো। তার পর ঋতু-শেষে স্নান করে শুদ্ধ ও শুচি হ'তে হতো। মেয়েদের নারী ঐ সময়টা অশুচির কাল, তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে হতো। কিন্তু আসলে তা নয়। আসল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা ভুলে গিয়ে অন্ধ একটা সংস্কারকেই তারা আঁকড়ে ধরেছিল ঋতুমতীকে সকলের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে হতো এই জন্য যে, ঐ সময়টা একান্ত ভাবে পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন, কম শ্রম ও বিশ্রামের প্রয়োজন, সকল প্রকার উত্তেজনার কারণ হ'তে দূরে থাকা প্রয়োজন ঐ সব কারণেই সমাজ সেদিন ঋতুমতী নারীকে অন্তঃপুরের নির্জনতায় তিনটি দিন ও রাত্রির নির্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল আধুনিক সভ্যতা আজ সেই ব্যবস্থাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে ঋতুমতী নারীকে যথেচ্ছাচারিতার মধ্যে টেনে এনে দাঁড় করায় ফলে অনেক সময় ঐ কারণেই নানা প্রকার ব্যাধি ও অসুবিধা সৃষ্টি করে। এমন কি, ঋতুর ঠিক পূর্বে ও ঋতুকালে নানা প্রকার মানসিক বৈকল্যও দেখা দেওয়া অসম্ভব নয় মেয়েদের। কোন কোন নারী ঋতুকালে শারীরিক যন্ত্রণায় বা শিরঃপীড়ায় অতিরিক্ত মাত্রা

...ষ্ট ভোগ করে। কারো ক্ষুধামন্দ বা বমি হয়—এমন কি ভাইরিয়াও ...তে পারে।

১৩ থেকে ১৪ বৎসরের মধ্যে প্রথম ঋতু দেখা দিয়ে ৪০ ও ...০ বৎসরের কালে নারীর ঋতু বন্ধ হয়ে যায়। এই ঋতুর ...ন্যেই নারীর যৌন-লিপ্সার জোয়ার-ভাটা খেলে। কোন কোন ...রী ঋতুকালেই উদগ্র যৌন-চেতনায় বা লিপ্সায় মদির-বিহ্বল ...'য়ে ওঠে, আবার কেউ ঋতু-অন্তে যৌনাসক্ত হয়।

প্রজনন-চক্রের সঙ্গে ঋতুচক্রের একটা অতি নিকট সম্পর্ক।

মায়েরা ছোটবেলায় মেয়েদের দোল দিয়ে সুর করে ছড়া বলে ...ম পাড়ান: রাঙা টুকটুক্ বর আসবে খুকুর আমার, মাথায় ...নার টোপর দিয়ে।

শিশুকালের সেই মায়ের মুখে শোনা রাঙা টুকটুক্ বরের ...প্ন ক্রমে আরো রঙিন কল্পনায় কিশোরী কন্যার মনে জুড়ে বসে।

এবং সত্যি সত্যি বিয়েও একদিন হ'য়ে যায়—সোনার টোপর ... হলেও শোলার টোপর মাথায় দিয়ে বর আসে তা সে রাঙা টুক্-...কুই হোক বা কালো হোঁদল কুঁৎকুতই হোক।

মেয়েদের জীবনে বর আসে।

কিন্তু কয় জনা মেয়ে বিবাহের পূর্বে প্রস্তুত হয় গৃহিণী হবার ...ন্য? সচিব সখী সন্তানের জননী হবার জন্য? মা হবার জন্য। ...্রী হবার জন্য?

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহটা যেন একটা অতি সাধারণ ...বশ্যম্ভাবী ঘটনায় গিয়ে পর্যবসিত হয়। বিয়ের পূর্বে যে বিবাহের ...কটা প্রস্তুতির প্রয়োজন, এটা কেউ-ই যেন স্বীকার করতে চায় না। ...াই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহের দু'-এক বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত ...ীবনের সমস্ত মধু ও রস যেন শুকিয়ে যায় নিঃশেষে। স্বামি-স্ত্রীর ...বনের আনন্দ যায় মিলিয়ে, আসে একঘেয়েমী ক্লেশকর দিন-...াপনের দৈনন্দিন রুক্ষতা—ব্যর্থতা।

যে মেয়ে একদা পুতুল বুকে করে সন্তান-স্বপ্নে তন্ময় হ'য়ে যেত, ...ামটা টেনে খেলাঘরে বৌ সেজে পাকা গিন্নীর আনন্দে হতো ...ভোর, সেই মেয়েই নিজের সন্তান পালনে রুক্ষ বদমেজাজী হ'য়ে ...ঠে। গৃহিণী হবার জন্য নিজেকে দেয় অভিশাপ।

মাতৃত্ব তার ব্যর্থ পীড়িত হ'য়ে ওঠে। বিতৃষ্ণায় বৈরাগ্যে মায়ের ...াভাবিক সহজাত স্নেহ-সাগরও শুকিয়ে যেন মরুভূমি হ'য়ে যায়।

পাশের একতলা বাড়ীর বৌটির সঙ্গে টুনীর মায়ের আলাপ ...াছে, মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে বৌটিকে কথা বলতে শোনে টুনী।

'কেমন আছ সরমা?—'

'আর বোলবেন না দিদি! পোড়া সংসার থেকে এখন বিদায় ...তে পারলেই বাঁচি। হাড়-মাস একেবারে ভাজা-ভাজা হয়ে ...ল।—'

পাশে ছোট তিন বছরের ছেলেটি ছেঁড়া একটা পেনী পরা, ...ক দিয়ে ঝরছে সর্দি, মায়ের আঁচল ধরে ঘ্যান-ঘ্যান করছিল, বিরক্ত ... শিশুর পিঠের উপরে ঠাস্-ঠাস্ করে গোটা দুই চড় বসিয়ে দিয়ে ...কিয়ে ওঠে: মর! মর—

তারস্বরে বাচ্চাটা চীৎকার জুড়ে দেয়।

'আহা! বাঠ! বাঠ! অমন করে মারে—'

'মরুক! মরুক! মরেও ত না—!'

হায় রে, কত বড় দুঃখেই যে জননী তার সন্তানের মৃত্যু কামনা করে!

অথচ ঐ জননীই কোন কোন দিন হয়ত বুকের মধ্যে সন্তানটিকে আঁকড়ে ধরে ঘুম পাড়ায়:

ধন! ধন—ধন!
এ ধন যার ঘরে নাই
তার কিসের জীবন!
তারা কিসের গরব করে
আগুনে পুড়ে কেন না মরে।

দিবানিশিই মায়ের দল যে আগুনে পুড়ে মরছে। ব্যর্থতার আগুন। দুঃখের আগুন।

কতকগুলো বৈদিক মন্ত্রের জোরে শালগ্রাম শিলা অগ্নি সাক্ষী করে একটি পুরুষ ও একটি নারীকে পবিত্র বিবাহের বন্ধনে বেঁধে দিলেই ঐ নারী আদর্শ গৃহিণী হ'য়ে উঠতে পারে না—ঐ পুরুষও পারে না আদর্শ স্বামী হ'য়ে উঠতে।

প্রস্তুতি নেই ত, ফল আসবে কোথা হ'তে?

পুরুষ ঘর বেঁধে দিতে পারে কিন্তু সেই ঘরকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত শান্তির আগার করে তুলবার তিতিক্ষা বা ধৈর্য তার কোথায়! সেখানে চাই স্ত্রীর কল্যাণ-হস্তের পরশ, ধৈর্য সহনশীলতা প্রেম স্পৃহা।

কেবল প্রচুর অর্থ থাকলেই সংসারকে গৃহকে সুখ ও শান্তিপূর্ণ করে তোলা যায় না।

কবি বলেছেন—

—মনে ছিল আশা।
ধরণীর এক কোণে
বাঁধিব আপন মনে;
ধন নয়, মান নয়, শুধু এতটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা;
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

শুধু কি কবিই? অমনি একটি নিরালা শান্ত গৃহকোণের স্বপ্ন কি এ জগতের সমস্ত পুরুষ ও নারীই জীবনের কোন এক মুহূর্তে দেখেনি?

বিয়ে হবে, স্বামি-পুত্র নিয়ে আনন্দের একটি সংসার গড়ে তুলবো—এ স্বপ্ন ত সব মেয়েরাই বিবাহের আগে দেখে। কিন্তু বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই সে স্বপ্ন মিলিয়ে যায় কেন বাস্তবের রূঢ় কঠিন আঘাতে?

দারিদ্র্য ও রোগ-শোক এইগুলোই কি হেতু?

সংসারে বাঁচতে হলে ত ওর একটিকেও বাদ দিয়ে কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখের সন্ধান পাওয়া যাবে না?

সুখ ত অর্থ দিয়ে বাজার-হাট থেকে কেনা যায় না।

তবে কোথায় সে সুখ ?

মান! দেবতার বর লাভ করতে হলে যে চাই সাধনা, চাই তপস্যা।

সে তপস্যা কই আমাদের ?

মেয়েদের শিক্ষিতা করে তোলা হয়। কতকগুলো পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিয়ে ইউনিভারসিটির ডিগ্রীর বোঝা তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষার ছাপ তাদের গায়ে এঁটে দেওয়া হয়. কিন্তু সত্যিকারের যে শিক্ষা দিলে তারা সত্যিকারের গৃহিণী হতে পারবে, মা হ'তে পারবে, সে শিক্ষা তাদের দেওয়া হয় কই ?

অথচ গৃহিণী হবার জন্য শিক্ষায় পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন নেই।

প্রতি ঘরে ঘরে মায়েরাই মেয়েদের সে শিক্ষা দিতে পারেন। এবং ঐ শিক্ষার সবার বড় কথা হচ্ছে সহানুভূতি ভালবাসা ধৈর্য ও ক্ষমা। সেই সঙ্গে জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

[ক্রমশঃ।

অঘোরমণি

শ্রীনির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

"তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন ? নারকেল নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউ শাক-চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারী, তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।"

ইনি ভাবছেন,—কেবল খাই খাই, কেবল খাই খাই। আমি গরীব কাঙাল লোক। কোথায় এত খাওয়াতে পাব ? দূর হোক, আর আসব না।

কিন্তু আসব না বললেই আসব না ? দক্ষিণেশ্বরের বাগান যেই পেরিয়েছেন, অমনি যেন পেছন থেকে কে টানছে। কোন মতে আর চলতে পারেন না। কত করে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিঁচড়ে তবে কামারহাটী ফিরলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে একদিন দেখা করে গেছেন। এরই ক'দিন পরের কথা। জপ করছেন। হঠাৎ ইচ্ছে হল, যাই দক্ষিণেশ্বরের সাধুকে একটু দেখে আসি। খানিক সন্দেশ কিনে নিলেন। "এসেছ? আমার জন্য কি এনেছ, দাও,"—রামকৃষ্ণ দেখেই লাফাচ্ছেন। ভারী আহ্লাদ। অঘোরমণি অনেক কাল বাদে এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আমি ত একেবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন করে সে রোঘো (খারাপ) সন্দেশ বার করি ? এঁকে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিষ এনে খাওয়াচ্ছে। আবার তাই ছাই কি আমি আসবা মাত্র খেতে চাওয়া!"

জন্মেছিলেন যত দূর জানা যায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে সাত-আট মাইল উত্তরে এবং দক্ষিণেশ্বরের দু'-তিন মাইলের মধ্যে চব্বিশ পরগণার কামারহাটীতে। রামকৃষ্ণ তখনও ভূমিষ্ঠ হননি, আসলেন আরো চোদ্দ বছর পরে।

বিয়ে ন বছরে, বিধবা তের-চোদ্দয়। বিয়ের সময় স্বামীকে সেই যে দেখেছিলেন, সেই প্রথম সেই শেষ। শ্বশুরবাড়ী চব্বিশ পরগণার বোড়ার পাইগহাটী গাঁয়ে। বাপের নাম কাশী বাঁড়ুয্যে (১), কামারহাটীতে নামডাক আছে। শ্বশুর ও বাপের বাড়ী সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না।

বছর তিরিশ বয়েস পর্যন্ত বাপের বাড়ীতেই কেটে গেল। এর মধ্যে এক সময় শ্বশুরবাড়ীর কুলগুরুর কাছ থেকে গোপাল মন্ত্রটি নিয়ে ফেলেছিলেন। সেই থেকে সমানে চলল গঙ্গায় চান, হবিষ্যি খাওয়া, পুজো-আর্চা আর নিষ্ঠা।

শ্বশুরবাড়ীর কিছু ধেনো জমি ছিল। গয়নাগাঁটি আর সেগুলো বেচে কয়েক শ' টাকা হল। তাই দিয়ে কোম্পানীর কাগজ করে দত্তগিন্নীর কাছে জমা রাখলেন। এই দত্তগিন্নীর স্বামী কলকাতার পটলডাঙ্গার (কলুটোলার) গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কামারহাটীতে। পূজারী ওখানকার নীলমাধব বাঁড়ুয্যে। বামনী অঘোরমণি নীলমাধবেরই বালবিধবা বোন।

গোবিন্দ দত্ত কলকাতার কোন নাম-করা সদাগরি অফিসে কাজ করতেন। এক ছেলে, দু' মেয়ে। ছেলেটি গেল মারা, মেয়েদের হল বিয়ে। বিষয় সম্পত্তি প্রচুর। গোবিন্দ আর তাঁর স্ত্রী প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে ধরলেন। দান-ধ্যান, পুজো-পার্বণে সময় কাটতে লাগল। কামারহাটীতে মন্দির উঠল।

গোবিন্দের পক্ষাঘাত হয়েছিল। বহু দিন পড়ে থেকে থেকে এক দিন তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল। কিছু কাল পরে মন্দিরের পাশের কুঠিতে থেকে দত্তগিন্নী দেখাশুনো করতে লাগলেন।

রামকৃষ্ণ এই দত্তগিন্নীর প্রশংসা করেছেন। কামারহাটী মন্দির থেকে ফিরে একদা বলেছিলেন, "আহা, চোখ-মুখের কি ভাব,—ভক্তি-প্রেমে যেন ভাসচে, প্রেমময় চক্ষু। নাকের তিলকটি পর্যন্ত সুন্দর।"

দত্তগিন্নীর সঙ্গে অঘোরের ঘনিষ্ঠতা হল। রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর বাড়ীতে দত্তদের বড় বাড়ীর অন্দর-মহলের শেষের দিকে দক্ষিণে চাকরদের জন্যে তৈরী একতলার ঘরে অঘোর স্থায়িভাবে থাকতে লাগলেন। তিরিশ বছর একটানা জপে সিদ্ধা বামনী এই ছোট ঘরে ১৮৫২ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত দীর্ঘ বাহান্ন বছর কাটিয়ে গেছেন।

দত্তগিন্নীর কাছে জমা-রাখা টাকার সুদে কোন রকমে যা চলত। হপ্তার বাজার হত হাটে। আলু, উচ্ছে, মুগের ডাল সেদ্ধ আর ভাত খেতেন দুপুরে। রাত্তিরে বাগানের নারকেলের নাড়ু ও দুধ একটু। উনুন ধরাতো গাছের শুকনো পাতা, ডালপালা। দু'মসের মশলাপাতি, চাল-ডাল হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিতেন। আসবাবপত্রের মধ্যে একটি তোরঙ্গ, তার ভেতরে দু'-একখানা কাপড়-চোপড়, আর কুলো শিল নোড়া। এই-ই বোধ হয় তাঁর কাছে বাড়াবাড়ি। এক দিন স্বামী সারদানন্দকে (২) বলছেন, "লোকে

---

(১) 'দেবী অঘোরমণি'র রচয়িতার মতে কাশী ঘোষাল। 'সাধিকামালা'য় স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কিন্তু শুধু কাশী ভটচায বলে বলেছেন।

(২) পূর্বাশ্রমের নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। জন্ম ১৮৬৬ খৃ (বাংলা ১২৭২ সালের ৭ই পৌষ। প্রয়াণ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট। রামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান শিষ্য ও "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

বলে সংসার ত্যাগ করব। শরীরটাই ত একটা প্রকাণ্ড সংসার। সবই দরকার—বঁটি, কাটারি, কুলো, বারকোষ, কড়া, খুন্তি, মেথিপাতা, কালজিরে, তেজপাতা, হাতা, চালুনি, ধুনুচি, আরো কত কি!"

ভাজা মুগের ডাল, উচ্ছে, রাঙা আলু, ডাব এই সব তাঁর প্রিয় ছিল। হিং-এর গন্ধ মোটেই সইতে পারতেন না। হাসতে হাসতে বলতেন, "গোপাল হিং খেতে ভালবাসে না।" বিশেষ বিশেষ তিথিতে জালা ভর্তি করে গঙ্গাজল রাখতেন। সেই জলে রান্না, খাওয়া চলত। ভাত খেয়ে-দেয়ে উঠে পুকুরে গা ধুতেন। এক বেলা গঙ্গায়, আর একবার পুকুরে, দুইবেলা চানটি চাই।

স্বল্পাহারী, স্বল্পভাষী ও নিতান্তই গরীব অঘোরমণি রাত দুটোয় উঠে সকাল আটটা-নটা পর্যন্ত জপ করে যেতেন। তার পর আরম্ভ হত রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে তাঁর ঝাঁটপাট, ধোয়ামোছা, পুজোর বাসন-মাজা, ফুল তোলা, মালা গাঁথা, চন্দন বাঁটা, অনেক কিছু। এ সব হয়ে গেলে রান্না করে গোপালকে ভোগ। প্রসাদ গ্রহণ করে একটু বিশ্রাম। তার পর সন্ধ্যে পর্যন্ত জপ। সন্ধ্যে হলে মন্দিরে আরতি দেখা ও ভজন শোনা। আবার সুরু হত জপ রাত পর্যন্ত।

নিষ্ঠাবান্ বামুনের ঘরের মেয়ে অঘোরের সাঙ্ঘাতিক রকমের আচার-বিচার। রান্না করে পরিবেশন করছেন রামকৃষ্ণকে। ভাতের হাতাটা কি ভাবে রামকৃষ্ণের ছোঁয়া লেগেছে। বোকনোর ভেতরে ভাত। তা অঘোরের খাওয়া ত হলই না, হাতাটি পর্যন্ত গঙ্গায় দিলেন ফেলে। তখন তিনি সবে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা করছেন। অঘোর যেদিন দক্ষিণেশ্বরে দুটি খেতেন, নহবতের ঘরের উনুনে রামকৃষ্ণের ঝোল ভাত রাঁধা হয়ে গেলে গোবরে গঙ্গাজলে তিন বার উনুন পেড়ে দিতে হত 'বউমা' সারদাকে। এই মানুষটিই আবার এক দিন সারদাকে বলেছিলেন, "বউমা, কি খাচ্ছিস একটু দে না।"

দেখতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বেশ মোটাসোটা, মাথায় খাটো এই মহিলাটি ছোটবেলা থেকে অভিমানিনী। আবার এদিকে স্পষ্ট বক্তা, অন্যায় দেখলে মুখের ওপর বলে ফেলতেন। বায়ুর ধাত, তাই ঘুমও কম। কখন কখন আবার বুক কেমন করত। "বাই বেড়ে বুক যেন আমার করাত দিয়ে চিরচে," অঘোর একদিন জানালেন। রামকৃষ্ণ এ কথা শুনে আশ্বস্ত করলেন, "ও তোমার হরিবাই; ও গেলে কি নিয়ে থাকবে গো? ও থাকা ভাল। যখন বেশী কষ্ট হবে, তখন কিছু খেয়ো।"

সকাল সাতটা সাড়ে-সাতটা। গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির, এলোথেলো পাগলী। চোখ কপালে, আঁচল ধুলোয়, কোন দিকে হুঁস নেই। রামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে তাঁর কাছে বসে পড়লেন। রামকৃষ্ণও গোপাল ভাবে তাঁর কোলে উঠেছেন। গোপালের তখন বয়েস আটচল্লিশ, আর তাঁর মা বাষট্টি বছরের বুড়ি। রামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, "দেখ দেখ, (অঘোর) আনন্দে ভরে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে।"

লীলাপ্রসঙ্গ" নামে জীবনীর রচয়িতা। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে ত্রিশ বছর সম্পাদক ছিলেন।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, শেষ রাতে তিনটের সময় জপ হয়ে গেছে, প্রাণায়াম করতে যাবেন। মনে হল রামকৃষ্ণ তাঁর বাঁ দিকে বসে। সাহসে ভর করে যেমনি তাঁকে ধরতে যাবেন, অমনি দেখেন কিছুই নেই, দশ মাসের এক ছেলে, হামা দিয়ে এক হাত তুলে ননী চাইছে। সব গোলমাল হয়ে গেল। মাকে নিয়ে আরম্ভ হল গোপালের যত কাণ্ড! একটু সুস্থির হতে দেয় না। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় "গোপালও কোলে উঠে চলল, কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলচে।"

রামকৃষ্ণ সেদিন গোপালের মাকে কত জিনিষ খাওয়ালেন। বামনী বলতে লাগলেন, "বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েচে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েচে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করচ?"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে উল্টোরথের সময় বলরাম বসুর বাড়ীতে বাগবাজারে। রামকৃষ্ণ বলছেন, "ওগো, সেই যে কামারহাটী থেকে বামণের মেয়েটি আসে, যার গোপাল ভাব,—তার সব কত কি দর্শন হয়েছে, সে বলে, গোপাল তার কাছ থেকে হাত পেতে খেতে চায়!...তাকে এখানে আনতে পাঠাও না।"

ভাবের চোটে আড়ষ্ট হয়ে পড়া গোপালের মা দেখতে পারতেন না। সন্ধ্যের সময় এসে দেখেন রামকৃষ্ণ বালগোপাল হয়ে ভাবে আচ্ছন্ন। বললেন, "আমি কিন্তু বাপু, ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়বে; ওমা, ওকি, একেবারে যেন কাঠ! আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নেই।"

দু'দিন দু'রাত কাটিয়ে সকালে দক্ষিণেশ্বরে ফিরছেন রামকৃষ্ণ। নৌকোতে অনেকে আছেন, গোপালের মাও। পুঁটলি দেখে খোঁজ করছেন কার। গোপালের মা ওতে কিছু বাগিয়েছেন, রামকৃষ্ণের মুখ ভার। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে গোপালের মা বলছেন নহবতে সারদাকে, "অ বৌমা, গোপাল এই সব জিনিষের পুঁটুলি দেখে রাগ করেছে, এখন উপায়? তা এ সব আর নিয়ে যাব না, এইখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই।"

ছেলেকে কোলে নিয়ে মেয়েরা যে ভাবে চলে, গোপালের মা সব সময় তেমনি ভাবে চলতেন। গোপালকে কেউ দেখতে পেত না। তবে কানে আসত তার মা কি বলছেন,—খাবি? খাবি? খা খা, কত খাবি খা।

কিছু কাল পরে। এক দিন কাঁদতে কাঁদতে গোপালের মা বলছেন রামকৃষ্ণকে, "গোপাল, তুমি আমার কি করলে, আমার কি অপরাধ হল, কেন আর আমি তোমায় আগেকার মত (গোপাল-রূপে) দেখতে পাই না?" জবাব এল, "ও রূপ সদা-সর্বক্ষণ দর্শন হলে কলিতে শরীর থাকে না। একুশ দিন শরীরটা থেকে তার পর শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে যায়।"

মাড়োয়ারী ভক্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ফল, মিছরি কত কি জমা হয়েছে। গোপালের মা হাজির। রামকৃষ্ণ তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলোচ্ছেন, আর বলছেন, "এ খোলটার (অঘোরমণির) ভেতর কেবল হরিতে ভরা, হরিময় শরীর।"

যত মিছরি সব গোপালের মাকে দিয়ে দিলেন। মা'র চিবুক ধরে আদর করে বললেন, "ওগো, ছিলে গুড়, হলে চিনি, তার পর হলে মিছরি। এখন মিছরি হয়েছ, মিছরি খাও আর আনন্দ কর।"

রামকৃষ্ণ এক দিন তাঁর সম্বন্ধে বলছিলেন, "কামারহাটার বামণী কত কি দেখে! একলাটি গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জন ঘরে থাকে, আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয়। কল্পনা নয়, সাক্ষাৎ, দেখলে গোপালের হাত রাঙা। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। মাই খায়, কথা কয়।"

আর এক দিন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে গোপালের মা'র কথাবার্তা হচ্ছে:—

রামকৃষ্ণ—তুমি এখনও অত জপ কর কেন? তোমার ত খুব হয়েছে।

গোপালের মা—জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে?

রামকৃষ্ণ—সব হয়েছে।

গোপালের মা—সব হয়েছে?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, সব হয়েছে।

গোপালের মা—বল কি, সব হয়েছে?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, তোমার আপনার জন্য জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে। তবে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছে হয়ত করতে পার।

গোপালের মা—তবে এখন থেকে যা-কিছু করব, সব তোমার, তোমার, তোমার।

নরেন (৩), গোপালের মা ও রামকৃষ্ণ। গোপালের মা নরেনকে বলছেন, "বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙালী কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তোমরা বল, আমার এ সব ত মিথ্যা নয়?" বুড়ীর কথা সব শুনে নরেন কাঁদছেন আর বলছেন, "না মা, তুমি যা দেখেছ, সে সব সত্য।"

দক্ষিণেশ্বরে নরেন মহাপ্রসাদ খেয়েছেন। রামকৃষ্ণ এক জনকে জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলছেন। এ কথা কানে যেতেই সমস্ত হাড়গোড় এঁটোকাঁটা গোপালের মা নিজের হাতে সাফ করলেন। "দেখ দেখ", রামকৃষ্ণ বললেন, "দিন দিন কি উদার হয়ে যাচ্ছে!"

রামকৃষ্ণ তখন বেঁচে নেই! বিবেকানন্দের বয়েস মাত্র তেইশ। দু'জন মহিলা এসেছেন বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিতে বাগবাজার থেকে—কুসুম আর গৌরমণি। স্বামীজী তাদের নিয়ে এসেছেন সোজা অঘোরমণির কাছে। অঘোর রাজী হচ্ছেন না। "তুমি কি যে সে?" স্বামীজী বললেন, "তুমি জপে সিদ্ধ। তুমি দিতে পারবে না ত কে পারবে? বলি, কিছু না পার, তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে যাও। তাতেই ওদের কাজ হবে। তোমার আর ওতে কি হবে?" অনেক হাঙ্গামার পর দীক্ষা দিলেন। কিন্তু গুরুদক্ষিণা নেবেন না। শেষে বলরাম বসু বুঝিয়ে বলায় দু' টাকা মাত্র। বলছেন, "ওগো মন-প্রাণ যে দেবার কথা!"

মাহেশের (৪) রথ দেখতে গিয়েছেন। মনে হল সব গোপাল। রথের ওপরে যিনি বসে, যারা টানছে, লোক-জন, আর রথটি পর্যন্ত, গোপালের ছড়াছড়ি, আকারে যা তফাৎ। ঐ সম্পর্কে অঘোর বলেছিলেন, "তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না। নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম।"

১৮৮৭র শেষের দিক। গোপালের মা'র কাছে সবাই জানতে চাইছে। মা বলছেন, "ওগো, আমি যে মেয়েমানুষ, বুড়ো-হাবা। আমি কি তোমাদের শাস্ত্রের কথা জানি? তোমরা শরৎ, যোগেন, নরেন, তারককে জিজ্ঞাসা করগে যাও না?" শেষে, "তবে দাঁড়াও বাপু, গোপালকে জিজ্ঞেস করি, ও গোপাল, গোপাল! ওরে, ওরা কি জিজ্ঞেস কচ্ছে। আমি কি কিছু বুঝি? এরা শাস্ত্রের কথা বলছে। তুই বাপু, এদের বলে দে না!" আবার বলছেন, "ওগো, গোপাল এই বলছে।" দু'-তিন জনের প্রশ্নের তখনও বাকী। বামণী ডাকছেন, "ও গোপাল, গোপাল! তুই চলে যাচ্ছিস কেন? ফিরে আয় না আমার কোলে। তোর বাপু কেবল খেলা আর ছুটোছুটি। ওদের কথার উত্তর দে!"

এক ভক্ত রাত্তিরে গোপালের মা'র ঘরে শুয়েছেন। হঠাৎ শেষ রাতে ঘুম গেছে ভেঙে। তিনি শুনছেন, মা বলছেন কাকে, "বোস বাবা, আলো হোক। কাক, কোকিল এখনও ডাকেনি। ফর্সা হোক, বাপধন আমার, তখন নাইবি।"

অঘোরমণির সখের বেড়াল নিবেদিতার (৫) ঘাড়ে শুয়ে আছে। নিবেদিতা চুপ। সেবিকা তাড়াতে গেছে। অঘোর বলছেন, "কি করলি মা, কি করলি। গোপাল গেল রে, গোপাল গেল।"

স্বামীজী (বিবেকানন্দ) দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যে যাওয়ার আগে বলছেন, "ও গোপালের মা, তুমি ত্রৈলিঙ্গ স্বামী হবে, আর আমরা পাঁচ জনে তোমার আরতি করব, কেমন?"

স্বামীজী আর একবার বলেছিলেন, "আমার সব সাহেব-মেম চেলারা আছে। তাদের কি তুমি কাছে আসতে দেবে, না তোমার আবার জাত যাবে?" "সে কি বাবা," অঘোর বললেন, "তারা তোমার সন্তান, তাদের আমি আদর করে নাতি-নাতনী বলে কোলে নেব গো! তোমার ও ভয় নেই।"

এক জনকে একটা ছোট মশারী কিনে আনতে বলেছেন। খুব ভাল এক মশারী কিনে এনে সে হাজির। গোপালের মা ত অসন্তুষ্ট। শেষে ছোট মশারী এনে দিয়ে তবে শান্তি।

শিষ্য উপদেশ চাইছে। মা বলছেন, "জিজ্ঞেস কর গোপালকে। তিনি তোমার ভেতর রয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে যত ভাল উত্তর পাবে, তেমন আর কেউ পারবে না।"

শিষ্যার মনে কষ্ট। কিছু দিতে পারছেন না। গোপালের মা বোঝাচ্ছেন, "তোরা আর কি দিবি? গোপাল আমার সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছেন। শুকনো উচ্ছে চারটি চারটি আনবি যখন আসবি। ব্যস, তা হলেই তোদের হবে।"

এক সাধুর কাছ থেকে তাঁর পুরোন গেরুয়া কাপড়খানা চেয়ে

(৩) নরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ নামেই সকলে জানে।

(৪) পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলায় শ্রীরামপুরে। মাহেশের রথ বিখ্যাত।

(৫) মিস্ মার্গারেট ই. নোবল, জন্ম আয়র্ল্যাণ্ডে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর, মৃত্যু দার্জিলিং-এ ১৯১১র ১৩ই অক্টোবর। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে 'Nivedita of Ramkrishna—Vivekananda' এই পরিচয় দিতেন।

নিয়েছেন। পরে দেখা হতে তাঁকে বলছেন, "দেখ, তোমার এই কাপড়খানি পরে বসলে আমার বেশ জপ হয়।"

শেষের দিকে গোপালের মা'র আর 'আমি' বলতে কিছু ছিল না, 'আমি' বলতে পারতেন না। সবই গোপাল করছে।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর কিছু কাল পরে কথা-প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, "নরেনের দেহত্যাগের কথা শুনে আমার গা-টা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, মাথা ঘুরে গেল, মাটিতে পড়ে গেলাম। চোখে অন্ধকার দেখলুম। পড়ে গিয়ে হাড়ে খুব চোট লেগেছিল।"

নিজের কাছে জমা যে দু'শ টাকা ছিল, বেলুড় মঠে তা দিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ দশ-বার বছর গেরুয়া পরেই থাকতেন, নিজেকে সন্ন্যাসিনী বলে মনে করতেন।

অঘোরমণির শেষের দিন। রামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদা কাছেই আছেন জানান হল। "গোপাল এসেছিস? আয়, আয়, দেখ, এত দিন তুই আমার কোলে বসেছিলি। আজ তুই আমাকে কোলে নে। এত দিন আমার পায়ের ধূলো নিয়েছিস, আমাকে আসন পেতে দিয়েছিস, পা ধুইয়ে দিয়েছিস। আজ তোর পায়ের ধূলো আমাকে দে।"

১৯০৬-এর ৮ই জুলাই দীর্ঘ চুরাশী বছর বয়েসে অঘোরমণি শরীর ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

ভগিনী নিবেদিতা, "The Master as I saw Him" বইতে লিখেছেন, (৬) "গোপালের মা বহু বছর ধরে বালগোপালের উপাসনা বেছে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর মনে হল বালগোপাল তাঁকে দর্শন দিচ্ছেন। এই ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এর পর কত বছর চলে গেল, কিন্তু গোপালের মা কখনও শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেননি। ইনিও গোপালের মাকে নিজের মা বলেই ভাবতেন।"

স্বামী বিবেকানন্দকে বলতে শোনা যেত, "আহা! তোমরা যাঁকে দেখে এসেছ, প্রাচীন ভারতের প্রতীক তিনি—প্রার্থনা ও চোখের জল ফেলা, জেগে থাকা ও উপোসের ভারত চলে যাচ্ছে, আর কখনও ফিরে আসবে না।" (৭)

---

(৬) পৃঃ ১১৩। "And she (Gopaler-Ma), whose chosen worship had been for many years Gopala, the Babe Krishna, the Christ-child of Hinduism,—saw Him revealed to her, as in a vision, as she drew her. How true she always was to this! Never once through all the years that followed, did she offer salutation to Sri Ramkrishna, who took her thenceforth as his mather."

(৭) পৃঃ ১১৫ "Ah! this is the old India of that you have seen, the India of prayers and tears, of vigils and fasts, that is passing away, never to return!"

কালবৈশাখী

শ্রীবারি দেবী

সজল কাজল মেঘে সাজিল রে অম্বর,
গুরু-গুরু ডাকে দেয়া, ঐ আসে, আসে ঝড়।
ক্ষুব্ধ পবন ঐ হাহা রবে ছুটিলো,
কালবৈশাখী সাঁঝে ঐ ঝড় উঠিলো।
গরজে অশনি নভে, প্রলয়ের হুঙ্কার
ঝর-ঝর আঁখিধারা ঐ ঝরে পড়ে কার?
সজল বাতাসে কার স্মৃতিটুকু আনে রে,
কোন্ দূর পরবাসে মন আজি টানে রে।
কার মধু পরশন আজি হিয়া মোর চায়
কার লাগি কাঁদে হিয়া অকথিত বেদনায়?
জনম জনম ধরি কারে আমি খুঁজি রে
বজ্রে তাহার বাঁশি বাজে ঐ বুঝি রে।
বারিধারা মাঝে কার শুনি পদছন্দ?
যূথীমালা গলে তার ভাসে মৃদু গন্ধ!

যুগ যুগ রহি যার প্রতীক্ষায় চাহি রে,
মেঘের সায়রে সে যে আসে তরী বাহি রে।
অম্বরে গুরু-গুরু ডম্বরু বাজিছে
প্রলয়ের সাজে বুঝি সুন্দর সাজিছে;
মশালের আলো তার ধ্বক্-ধ্বক্ জ্বলে ঐ
রণসাজে আসে সে যে নভোমাঝে চেয়ে রই।
দুরু-দুরু কাঁপে হিয়া দরশন লাগি রে,
অসহ পুলক ভারে আজি নিশি জাগি রে!
রুদ্ধ ভবন কেন? দ্বার খোল্ দ্বার খোল্
গগনে পবনে শুনি তার আগমন-রোল।
মঙ্গল-দীপ জালি বাজা তোরা শঙ্খ
সুদূরেতে বাজে শুনি তারি জয়ডঙ্ক,
সাজা রে বরণ-ডালি, মঙ্গল-বারি আন্
মেঘমল্লার রাগে কর তার আবাহন।

প্রলয়ের লগ্নে অরূপের অভিসার,
কালবৈশাখী আনে সেই শুভ সমাচার।

বাংলার কাঁথা

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দিগন্ত-বিস্তৃত ধান ক্ষেত, শ্লথ শিথিল-গতি নদী, ইতস্তত বৃক্ষলতা, ঝোপ জঙ্গল—এই পরিবেশে বাংলার পল্লীজীবন চলে আসছে বহু শতাব্দী থেকে—নিস্তরঙ্গ জলের মত পরিবর্তনহীন—বাইরেকার বিপুল পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায়। নিজেদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা নিয়েই ছিল জগৎ; প্রচুর ধন-ঐশ্বর্য যেমন ছিল রূপকথার সামগ্রী, সাধারণ আহার-বিহারে সচ্ছল জীবনের অভাবও তেমনি ছিল অজ্ঞাত। এই সমাজের আবেষ্টনীতে সুদীর্ঘ কালের মধ্যে যেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, কোন বৃহৎ চেতনাও তেমনি একে তেমন ভাবে আলোড়িত করেনি। সেই জন্যই এই সমাজের সাহিত্যে বা শিল্পে উল্লেখযোগ্য-রূপে মহৎ বা তুলনায় অদ্বিতীয় তেমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্বেও পরিবর্তনহীন গতানুগতিক এই জীবনে আনন্দ কিম্বা বৈচিত্রের নিতান্ত অভাব কখনও অনুভূত হত বলে মনে হয় না। সমাজ তার এই জীবনের মধ্যেই নিজের স্বভাব এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানা ধরণের সৌন্দর্য ও সুখের উদ্ভাবন করেছিল। এই সুখ ছিল পরিজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে দিনান্তের বিশ্রম্ভালাপে, লোককথা গান ও শ্রবণে, পার্বন এবং মেলার উল্লাসে, তীর্থপর্যটন এবং বিশ্রামে। সৌন্দর্যের যোগান দিত মন্দিরের রূপ ও প্রাচীর-সজ্জায় সমারোহ, পূজা এবং ব্রতের আলিপনা ও গৃহসজ্জা, দৈনন্দিন ব্যবহারের নানা টুকিটাকি, পুতুল প্রতিমা হাড়ি-সরা, সিঁকে-কাঁথা, পাটি-মাদুর। এই পরিশীলিত সুখ ও সৌন্দর্যের উৎস ছিল জীবনের প্রাচুর্য এবং প্রাণকেন্দ্র ছিল গূঢ় ধর্মপ্রবণতা। দৈনন্দিন গৃহজীবনের ক্ষুদ্র ক্রয়-বিক্রয়, বাণিজ্য, চাষবাস আর মাছধরা নিয়ে গ্রামনির্ভর এবং বাইরেকার সংস্রব-চ্যুত সমাজের জীবন রসাস্বাদনের এই উপকরণ স্বল্পায়তন হলেও এর মধ্যে রসমাধুর্য এবং বর্ণবৈচিত্র কিছু কম ছিল না। এই জীবন-পরিবেশ কল্পনায় যে অপূর্ব রূপজাল সৃষ্টি করেছিল, মধ্যযুগের সাহিত্যে এবং মন্দিরগুলির প্রাচীরের গায় লাগান খোদাই-করা ইটের কাজে তার পরিচয় খুব ভাল ভাবেই দেখা গেলেও অতি সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও এই কল্পনার ঐশ্বর্য কত বিস্তৃত ছিল, তার সন্ধান পাওয়া যায় কাঁথা আর আলপনার নক্সায়। এই কাঁথা-শিল্পে নারী-মনের যে গভীর রূপবোধ, চিরাচরিত সংস্কৃতির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং কল্পনা-বিলাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সমাজের নারীদের মধ্যে অজ্ঞাত। এদেশের পিতামহী মাতামহীরা কল্পনারসের অফুরন্ত ভাণ্ডাররূপে এদেশের শিশুমনকে চিরকাল আনন্দে অভিষিক্ত করে এসেছেন; এঁরাই ছিলেন দেশের সুপ্রাচীন অতীতের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র। এঁরাই নানা রকমের রূপকথা আর গল্প-প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে অতীতের নানা ঘটনা, ইতিহাসের কত উল্লেখযোগ্য কাহিনীর স্মৃতি জাগরূক রেখে শিশুদের বীর হাস্য রৌদ্র করুণ, নানা রসের দোলায় আন্দোলিত করে এদেশের মাটি জল বাতাসের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতেন। এঁদের কাছে ইতিহাস-পুরাণের কাহিনী ঝাপসা হয়ে গিয়ে থাকলেও—পুরাণ-কথার মূল শিক্ষাকে সৌন্দর্যানুভূতির রসে জীর্ণ করে যে অপূর্ব উপকরণ রচনা করতেন, জনগণের মানসিক পুষ্টি ও ধৃতির উপজীব্য হিসাবে তার মূল্য ছিল অনতিক্রমণীয়।

বাংলা দেশের একটি কাঁথা

নারী-সমাজে রূপ-কল্পনার এই বিস্তৃতি এবং চিরাচরিত সংস্কৃতি-ধারার সঙ্গে যোগ-সূত্রের এই পরিচয় আরও নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে পাওয়া যায় কাঁথা-শিল্পের মধ্যে। দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে টুকরো ছোট-বড় কাপড়ের ব্যবহার সকল জাতির মানুষের মধ্যেই অল্প-বিস্তর দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরণের টুকরো কাপড়ে নানা রকমের নক্সা ছুঁচ দিয়ে তৈরী করবার (Embroidery) রেওয়াজও অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। কিন্তু এই সব সৌখিন নক্সাদার কাপড় আর কাঁথা এক পর্যায়ের জিনিষ নয়। ব্যবহারের দিক থেকে কোন কোন বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এই দুই ধরণের জিনিষের উদ্ভব এবং ব্যবহারের মূলে যে অনুপ্রেরণা দেখা যায়, তা নিতান্তই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য শুধু ব্যবহারিক দিকের বৈশিষ্ট্যেই সীমাবদ্ধ নয়, উপকরণ নির্বাচন, নির্মাণ-পদ্ধতি এবং নক্সাগুলিতে 'নিহিত

ইঙ্গিতের তাৎপর্যেও এই স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। কাঁথার উপকরণ পরিত্যক্ত পুরোনো ছেঁড়া কাপড়; সেলাইয়ের জন্ত যে সুতোর ব্যবহার করা হয় তাও সংগ্রহ করা হয় পুরোনো কাপড়েরই পাড় থেকে। সুঁইয়ের ফোঁড়ে নক্সা-রচনার (Embroidery) দিকে খেয়াল সর্বত্রই বর্তমান থাকলেও পৃথিবীর অন্যত্র কোন জাতের মধ্যেই এই ধরণের নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী পুরোনো ছেঁড়া নেকড়া কাঁথার মত উল্লেখযোগ্য শিল্পব্যাপারে ব্যবহার হতে দেখা যায় না। জমি আর নক্সা-রচনার দিক থেকেও কাঁথার বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। সমস্ত জমিটা জুড়ে কাপড়ের টুকরোগুলোকে সমান করে সাজিয়ে টানা সুঁইয়ের ফোঁড় খুব ঘন করে সোজা আর আড়াআড়ি করে দিয়ে চৌকো চৌকো একটার ভেতরে আর একটা ক্রমে ছোট হয়ে যাওয়া খোপ খোপ করে কাঁথাগুলি সেলাই করা হত। এই ছিল কাঁথা তৈরীর প্রাথমিক পর্যায়। প্রথম বারের এই সেলাইতে কাঁথার নেকড়াগুলি ছেঁড়া পুরোনো অবহেলিত আকৃতি বিসর্জন দিয়ে থাপি সুতোর বোনা আনকোরা কাপড়ের মতই একটা সৌন্দর্য ও শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠত। এর পর সুনির্বাচিত রঙিন সুতোয় ফুটিয়ে তোলা হত নক্সার সমারোহ। কাঁথার জমি যেমন সেলাইয়ের গুণে জমাট হয়ে তাঁতে-বোনা কাপড়ের মত দোরোখা আর জমাট হয়ে উঠত, নক্সাগুলিও তেমনি ভরাট ফোঁড়ের গুণে কাঁথার দু'দিকে ফুটিয়ে তুলত এক অপূর্ব বৈচিত্র্য। কাশ্মিরী শালের কাজে আর চম্বার রুমালে দু'দিকে নক্সার এই সমান বৈচিত্র্য দেখা গেলেও অন্য কোন ছুঁচের কাজে এই ধরণের দোরোখা সেলাই বড় একটা দেখা যায় না। সুতোর রঙ নির্বাচনেও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মোটামুটি কালো, লাল আর হলদে এই তিন রঙের সুতোর ব্যবহারই ছিল বেশী। এ ছাড়া সবুজ, খয়ের, গোলাপী এই ধরণের আরও কয়েকটা রঙের সুতোরও ব্যবহার হত। ছুঁচের দোরোখা জমাট ফোঁড়ে যেমন পূর্ণতার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, নক্সায় ব্যবহৃত সুতোর রঙেরও তেমনি অর্থপূর্ণ তাৎপর্যের সন্ধান আছে বলে মনে হয়। সুতোর প্রধান তিনটি রঙ হলদে, লাল আর কালো সৃষ্টির সত্ত্ব-রজ-তম এই গুণত্রয়েরই প্রতীক। জমি এবং সুতোর এই ইঙ্গিতময়তা আরও বিস্তৃতি লাভ করে কাঁথার গায়ের সংখ্যাহীন নক্সাগুলিতে। এই সব নক্সার পরিকল্পনা ও বিন্যাস কোন দু'টি কাঁথায় এক রকম না হলেও এই নক্সাগুলির মূলে একটা ঐক্য এবং সম্নিবদ্ধতা (system) সহজেই চোখে পড়ে। কাঁথার গায় ফোটানো এই সব নক্সাগুলি কাঁথার ব্যবহারিক দিকটাকে অনুল্লেখযোগ্য করে এর ইঙ্গিতময়তার দিকটাকেই বড় করে তোলে। কাঁথার এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ সূচী-শিল্প থেকে কাঁথা-শিল্পকে একটু কৌলিন্যসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

আজকাল কোন কোন শিল্পকেন্দ্রে উৎসাহী মহিলারা নূতন করে কাঁথা-শিল্পের প্রবর্তন করবার প্রয়াস করে থাকলেও পুরোনো চলিত ধরণের কাঁথার সেলাই আর ব্যবহার এক রকম উঠে গিয়েছে ব'লেই চলে। যে সামাজিক পরিবেশ, যে অসীম ধৈর্য, শিল্প-ব্যাপারে যে অশিক্ষিতপটুতা এবং সর্বোপরি মানুষের যে অপরিসীম দরদ এই শিল্পের মাধ্যমে সজীব ছিল, এখন আর তার

কিছুরই অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অবস্থার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘরোয়া ধরণের আরও অনেক চলিত শিল্পের মতই—কাঁথার নির্মাণ ও ব্যবহার যদি আজ উঠে গিয়ে থাকে, তাতে হয়ত দুঃখ করবার কিছু নেই। তবে নিজেদের ভাল করে চিনতে হলে পূর্বপুরুষদের গুণ ও কর্মের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয় এবং এই সূত্রেই কাঁথা-শিল্পের আলোচনার সার্থকতা আছে মনে হয়। বর্তমানে যে সব কাঁথা শিল্পপ্রাণ ব্যক্তিদের সংগ্রহে বা সাধারণ সংগ্রহশালাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়, তার সংখ্যা খুব বেশী নয় আর তার কোনটিই শ'খানেক বছর থেকে বেশী পুরোনো নয়। অধিকাংশ কাঁথাই ২৫।৫০ বছরের মধ্যে তৈরী। বোধ হয় বাংলার সর্বত্রই কাঁথা সেলাইয়ের প্রচলন ছিল। তবে পূর্ব-বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনার কাঁথাই বেশী প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া বর্দ্ধমান আর মুর্শিদাবাদ বা রাজসাহী, ত্রিপুরা থেকেও কাঁথার সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্য অঞ্চলের কাঁথার সংগ্রহ বড় একটা দেখা যায় না। মেয়েরা সমস্ত গৃহকর্মের মধ্যে অবসর সময়ে এই কাঁথা সেলাই করতেন। কখনও কখনও এক জনের পক্ষে একখানা কাঁথা সেলাই করে শেষ করা সম্ভব হত না; পর-পর কয়েক জন মিলে কাঁথাটিকে শেষ করতেন। সেলাইয়ের আর নক্সার মূল সূত্রগুলি এমনি করেই পরম্পরাগত হয়ে বাংলার নারীসমাজের চিরদিনকার সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বাংলার নারীসমাজ এমনি করে আত্মগত করে থাকলেও ঐতিহ্যের দিক থেকে কাঁথাতে অনেক পুরোনো দিনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে মনে হয়। কাঁথার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে। উপনিষদের যুগেই মানুষের জ্ঞানের সীমা খুব বিস্তার লাভ করেছিল এবং সেই যুগ থেকেই ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষায় ইঙ্গিত এসে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই ইঙ্গিত-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় দ্ব্যর্থবোধক কথা ও শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে এবং উপমায়। শিল্পের জগতে এই ইঙ্গিত-প্রবণতা আরও আগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল; মানুষ যখন সভ্যতার পথে বেশী দূর অগ্রসর হয়নি তখন তারা নানাবিধ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করত; এই সব শক্তির কোনটিকে মনে করা হত মঙ্গলের আধার, আবার অন্য কতগুলিকে সকল অমঙ্গলের কারণ এই বিশ্বাসে ভয় করা হত। প্রত্যক্ষ ভাবে এইগুলির নাম উচ্চারণ করা হত না; শিল্পেও এই সব জিনিষের প্রত্যক্ষ চেহারার পরিবর্তে ইঙ্গিতময় অনুরূপ গুণবিশিষ্ট অন্য কোন জিনিষের ছবির ব্যবহার করত। সাংস্কৃতিক পরিশীলনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব ছবি এবং ইঙ্গিত মার্জিত এবং উন্নত স্তরের প্রকাশভঙ্গীর বাহনরূপে ব্যবহৃত হতে লাগল। ঐতিহাসিক যুগে সমাজ এবং ধর্মসংস্কারক মহাপুরুষেরা প্রায় সকলেই ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় উপদেশ প্রচার করে দ্ব্যর্থবোধক ভাষা এবং ইঙ্গিতকে এক নূতন মহিমা দান করেন। বহু প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহারিক এবং চারুশিল্পে ইঙ্গিত একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে বসে। সকল দেশের শিল্পে সংস্কার এবং ধর্মগত অনেক ইঙ্গিত motif বা চিত্রালঙ্করণের রূপে বিস্তৃত ভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিল্পের সকল অঙ্গে এবং সকল প্রকাশভঙ্গীতে ইঙ্গিত এবং রূপকের ব্যবহারে যে গভীরতা এবং দ্যোতনা দেখা যায়, তার তুলনা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। এই ইঙ্গিতময় প্রকাশের পরিচয় বুদ্ধের জীবন এবং বাণীতে খুবই ব্যাপক। ভগবান বুদ্ধদেব এবং তাঁর শিষ্যেরা যে পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, সেই পরিচ্ছদ তৈরী হত লোক-পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের সমষ্টি থেকে। নূতনই জীর্ণ হয় আর র্যাদের জ্ঞান উন্মেষিত হয়েছে তাঁদের কাছে নূতন এবং জীর্ণের পার্থক্য কিছু থাকে না। বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যদের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধানের মধ্যে এই পরম জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস দেখা যায়। মনে হয়, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের এই ইঙ্গিতময়ত্ব সম্বন্ধে ধারণা বুদ্ধ ভগবানের আবির্ভাবের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। উপনিষদে জীবনকে তাঁতে-বোনা বস্ত্রখণ্ডের টানা-পোড়েনের সঙ্গে উপমিত হওয়ার উল্লেখ আছে। দরিদ্র এবং সাধু সমাজে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের এই ব্যবহার থেকে মনে হয়, বহু প্রাচীন কাল থেকেই সমাজে সেলাই করা জীর্ণ বস্ত্রে তৈরী কাঁথার প্রচলন ছিল। কিন্তু কাঁথার গায় বিচিত্র নক্সা খচিত করবার রেওয়াজ কবে থেকে প্রচলিত হয়, তা ঠিক করে বলা যায় না। বিচিত্র নক্সায় সজ্জিত বস্ত্রখণ্ডের উল্লেখ সাহিত্যে ইতস্তত পাওয়া গেলেও এই ধরণের বস্ত্রখণ্ডের এখন আর কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না।

উপকরণের এই ইঙ্গিতপূর্ণতা থেকেও কাঁথার গায়ের নানা নক্সার বৈশিষ্ট্য আরও বিস্তৃত, অর্থপূর্ণ এবং ব্যাপক। ব্যবহারের বিভিন্নতার সূত্রে কাঁথাগুলির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিভিন্ন মাপের হত। অধিকাংশ কাঁথাই তৈরী হত সাধারণ আচ্ছাদন এবং আবরণের জন্য। দেহাবরণের জন্য তৈরী কাঁথা দৈর্ঘে ৪।৫ হাত আর প্রস্থে ৩।৪ হাত মাপের মত। অন্য দিকে আর্শী-চিরুণী মুড়ে রাখবার জন্য তৈরী কাঁথা এক হাতটাক লম্বা আর বিঘৎখানেক চওড়া করে তৈরী হত। এর মাঝামাঝি মাপের কাঁথা হত তোরঙ্গ-প্যাঁটরা ঢেকে রাখবার বা আরও নানা রকম কাজের জন্য। আয়তনের তারতম্যের মত খচিত নক্সার বিন্যাসেও তারতম্য ঘটত। মাঝারি আর বড় ধরণের কাঁথাগুলির অলঙ্কারের কেন্দ্র ছিল একটা বড় পদ্ম; পদ্মের চার দিকে অনেকগুলি পাপড়ি; সুপূর্ণ প্রস্ফুটিত অষ্টদল, শতদল বা সহস্রদল পদ্ম। পদ্মের এই নক্সা সকল অলঙ্কারের কেন্দ্ররূপে প্রায় সব কাঁথারই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাঝখানকার এই পদ্মের মত প্রত্যেক কাঁথার চার দিকে চারটি বন্ধনী (border) দেখা যায়। এই সব লক্ষণ থেকে কাঁথাগুলিকে একটা সুসম্বদ্ধ চিত্রপটের মতই মনে হয়। এই বন্ধনীর মধ্যে মাঝের পদ্মফুলের চার দিকে অসংখ্য ছোট-বড় নক্সা, কোথাও সাজান ভাবে কোথাও নিতান্ত অগোছাল ভাবে ছড়িয়ে থা-ক। কিন্তু সমগ্র ভাবে দেখালে এই অগোছাল ভাবে তোলা নক্সাগুলিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না, বরং রং বা রেখার বিন্যাস এমন ভাবেই চোখকে আকর্ষণ করে যে, মনে হয় এই অবিন্যস্ত নক্সাগুলিও যেন একটা সুষ্ঠু ভাবে সাজান ছকেরই অন্তর্গত। আবার মোটামুটি ভাবে দেখলে নক্সাগুলিতে যেমন একটা ভাবের ঐক্য রয়েছে, এগুলিকে সাজাবার মধ্যেও একটা সুসংবদ্ধতা আছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সব নক্সাই কেন্দ্রের পদ্মফুলকে অবলম্বন করে পদ্মের দিকে গতিশীল করে তোলা। আবার এই নক্সাগুলিকে পদ্মের চার দিকে যেমন একের পর এক সাজান বলে মনে হয়, তেমনি এই সারিগুলির মধ্যে মানুষের পারিপার্শ্বিক জগতের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের এমন জিনিষ কিছু

নেই যার সঙ্গে পরিচয় না হয়। বস্ত্র-সমারোহের এই নাটকীয় সমাবেশের মধ্যে মানুষ নিজেই হচ্ছে সর্বপ্রধান চরিত্র। নানা অবস্থায়, নানা ভঙ্গীতে, নানা পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত নানা জাতির নর-নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশে কাঁথাগুলির পট পরিপূর্ণ। কোথাও এরা প্রচলিত কোন আখ্যায়িকার অতি পরিচিত পাত্র-পাত্রী; অন্যত্র বিচিত্র ভঙ্গীতে এবং বিচিত্র বেশভূষায় যাঁরা এই কাঁথার দেহ অলঙ্কৃত করে আছে তাদেরও খুবই চিনি-চিনি বলে মনে হয়; বুঝতে পারি এরা দূরের লোক নয়; যাঁরা এদের নক্সায় তুলেছিলেন তাঁদের সঙ্গে এদের নিকট-সম্বন্ধ ছিল; তাঁদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে এদের যোগ ছিল অতি-নিকট। মানুষের পরেই আসে প্রতিবেশী জীবজন্তু বৃক্ষলতার সামগ্রিক পরিবেশ; জীবজন্তুর মধ্যে বন্য এবং গৃহপালিত ভেদে পরিচিত পশু-পাখীর প্রায় কিছুই বাদ যায় না। জীবজন্তু বৃক্ষলতার প্রতি ভারতীয় মনের যে অপরিসীম দরদ ভারতীয় শিল্পের পশু ও বৃক্ষলতার রূপকে এত বিচিত্র এবং সুসমৃদ্ধ করে রেখেছে, এই কাঁথাগুলিতে পশু-পক্ষী বৃক্ষলতার এই বিচিত্র সমাবেশে সেই দরদেরই ছাপ সুস্পষ্ট। আকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য হাতীর উপর ভারতবাসীর যেন একটা সহজাত আকর্ষণ রয়েছে; হাতীর রূপ ও আকৃতির যে বৈশিষ্ট্য ভারতীয়দের কাছে ধরা পড়ে, এমনটা আর কোন জাতির মানুষের কাছে পড়েনি। ভারত-শিল্পের সর্বত্রই প্রায় হাতী যে স্থান অধিকার করে আছে, কাঁথাগুলিতেও তার বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। রকমারী ভঙ্গীর বহু হাতী এই নক্সাগুলিতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এর পরই উল্লেখ করা যেতে পারে ঘোড়ার কথা; দুলকি-তালে-চলা বাঁকান-ঘাড় ঘোড়াগুলিও এই নক্সায় কম সুন্দর আকৃতি গ্রহণ করেনি। আর আছে বাঁদর, মাছ সাপ আর কুকুর।

গাছপালার মধ্যে কদম গাছের বাহুল্যটা সহজেই চোখে পড়ে; বাংলার গ্রাম অঞ্চলে ঘন বর্ষায় নব মঞ্জরিত বহু ফুলে সমৃদ্ধ কদম্ব বৃক্ষ যে দেখেছে, কদম্বের উপর বাঙ্গালী মনের এই আকর্ষণের কারণ তার কাছে আর ব্যাখ্যা করে দিতে হয় না। এছাড়া কৃষ্ণ-জীবন-লীলার সঙ্গে কদম্বের যোগাযোগও এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। একটা ছাড়া নানা পরিচিত ও কাল্পনিক ফুল, পাতা এবং গাছের। সমাবেশও কাঁথাগুলিতে কম নেই।

পশু এবং বৃক্ষলতার জগৎ ছাড়া আর যে সব বস্তুর সমাবেশ কাঁথার নক্সায় দেখা যায়, সেগুলি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি—গাড়ী, পাল্কী, নৌকো ইত্যাদি যানবাহন, হাঁড়ি-সরা, কুনকে-গাড়ু, ধামা-ধুচনী, থালা-বাসন ইত্যাদি তৈজসপত্র, আর্শী-চিরুণী, সাড়ী-গয়না, সিঁদুরের কৌটো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদি অলঙ্কার ও ঐশ্বর্যের সামগ্রী।

নক্সাগুলির এই বৈচিত্র্য ও তার বিন্যাসের মধ্যে কল্পনার বিভূতি এবং সজীবতা ছাড়া ইঙ্গিতপূর্ণতার যে একটা দিক আছে, তার বৈশিষ্ট্য কিছু কম নয়। এই দিক থেকে কাঁথার নক্সাগুলির সঙ্গে বাংলার অতি-প্রচলিত আলপনার নক্সাগুলির যে যোগাযোগ রয়েছে তা কোন সন্ধানী ব্যক্তিরই দৃষ্টি অতিক্রম করে যেতে পারে না। আলপনার নক্সাতেও সব অলঙ্কারের কেন্দ্র হচ্ছে একটি বৃহৎ ও বহু দলে প্রস্ফুটিত পদ্ম। ঐ পদ্মকে অবলম্বন করে চার দিকে নানা রকমের নক্সা। কাঁথার নক্সাতে যেমন, আলপনার নক্সা আঁকাতেও সাধারণ মেয়েদের শিল্পি-মনের অশিক্ষিতপটুত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু নক্সার ঐক্যেই নয় উপকরণের দিক থেকেও কাঁথার সঙ্গে আলপনার বেশ যোগাযোগ রয়েছে। আলপনার নক্সা আঁকা হয় মাটির উপর—যা কাঁথার ছেঁড়া নেকড়া থেকেও সুলভ এবং শাশ্বত। এই অঙ্কনের উপকরণ একমাত্র পিটুলিগোলা—পাড়ের সুতো থেকেও বাঙ্গালীর ঘরে সহজলভ্য। আলপনায় মূল রঙ হচ্ছে সাদা এই সাদা রঙ ত্রিগুণাতীত সার্বভৌমত্বের প্রতীক—কোথাও রঙিন আলপনারও প্রচলন দেখা যায়—কিন্তু পিটুলীগোলার শ্বেতশুভ্র আলপণারই প্রচলন বেশী। অবশ্য আঁকার অনতিকাল পরেই আলপনার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে যায়; মূল্যহীন উপকরণে তৈরী কাঁথার স্থায়িত্ব আর প্রয়োজনান্তে আলপনার ধ্বংসের মধ্যেও যেন একটা অলক্ষিত যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

হল শুরু

কিছুরই
সঙ্গে ঘটে
নির্মাণগ্র
কর্ব
পুর্ভ

...নাথ মুখোপাধ্যায়

...রক্ত আভা। সূর্য্য উঠছে। দিনের যাত্রা ...হল।

...র মনে প্রিয়নাথ বাবু তাঁর দৈনন্দিন দাতব্য আরম্ভ করলেন। ...ষুধ দিলেন রুগীদের, পথ্যের জন্যে পয়সা দিলেন, গরীব ছাত্রকে দিলেন স্কুলের মাহিনা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভোজ্য।

ঘণ্টা খানেক ধরে চলল তাঁর এই ব্যসন। প্রতিদিনের কাজ। এ কাজে ভারী আনন্দ প্রিয়নাথ বাবুর।

শান্তির সংসার। শোক পেয়েছেন, তবে সে-আঘাত তাঁকে মুহ্যমান বিমূঢ় করে রাখতে পারেনি। বৃহৎ শোকের ভিতর দিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছেন বৃহত্তর সার্থকতার পথ। কিছুদিন আগে সহধর্ম্মিণী ব্রজেশ্বরী ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সেই থেকে প্রিয়নাথের অন্তরে ফল্গুধারার মত বৈরাগ্যের একটি স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। ইচ্ছা করেছেন ছেলেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দীর্ঘ দিনের জন্যে তীর্থ পর্য্যটনে বার হবেন।

একটি মাত্র সন্তান পুত্র সুপ্রিয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সী পাশ করে নাম-করা হিসাব-রক্ষকের আপিসে শিক্ষানবিশী করছে। প্রিয়নাথের ইচ্ছা আছে ছেলেকে বিলাত ঘুরিয়ে এনে নিজস্ব আপিস খোলবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

পুত্রের বিবাহের ব্যাপারটাও স্থির করা আছে। বন্ধু ভবতারণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা প্রমীলার সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন মনস্থ করে রেখেছেন।

ভবতারণ ধানবাদের এক কয়লাখনিতে ম্যানেজাররূপে কাজ করতেন। কিছু দিন আগে বাত-ব্যাধিতে অশক্ত হয়ে পড়েন। বন্ধুর সংবাদ পাবা মাত্র প্রিয়নাথ পরম যত্নে ও সমাদরে ভবতারণকে কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর বাড়ীর পাশে তাঁর বাসস্থান ঠিক করে দেন। ভবতারণ বর্ত্তমানে কন্যাকে নিয়ে সেই বাসাতেই আছেন। প্রিয়নাথ প্রত্যহ সন্ধ্যায় বন্ধুর কাছে গিয়ে গল্প-গুজব করে আসেন। ভবতারণও বিপত্নীক।

সুপ্রিয় আর প্রমীলা উভয়েই জানে তাদের আসন্ন বিবাহের কথা। উভয়ের মধ্যে বহুদিন থেকেই একটি শান্ত-স্নিগ্ধ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

বড়বাজারের প্রান্তে প্রিয়নাথের বড় কারবার অনেক দিনের। জুট, হেসিয়ান ও আমদানি-রপ্তানির কাজে প্রিয়নাথের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সামান্য নয়। সরল ঋজু পথেই তিনি চিরদিন কারবার চালিয়ে এসেছেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপণতা ছিল না। অর্থ, প্রতিপত্তি ও যশ প্রিয়নাথ পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পেয়েছেন।

সম্প্রতি যে কাজে তিনি নিজেকে সব চেয়ে বেশী মগ্ন রেখেছেন তা হচ্ছে স্ত্রীর নামে একটি সেবাসদন নির্ম্মাণ। শহরের এক স্থানে কিছুটা জমি তাঁর ছিল। সে-জমি তিনি হাসপাতালের জন্য দান করেছেন। বাড়ী তৈয়ারীর কাজ শুরু হয়েছে। পল্লীর কয়েক জন উৎসাহী নাগরিক তাঁর কাজে সহায়তা করছেন।

রুগী ও প্রার্থীর দল চলে গেলে প্রিয়নাথ কাগজ-পত্র নিয়ে বসলেন। টেবিলের সামনে দেওয়ালের গায়ে স্ত্রী ব্রজসুন্দরীর প্রকাণ্ড অয়েল-পেণ্টিং টাঙানো। সেই ছবির স্মিত-হাস্য-স্ফুরিত মুখের পানে বারেক তাকালেন। তারপর একটা মোটা খাতা টেনে নিয়ে বোধ করি খরচপত্রের হিসাব লিখতে লাগলেন।

—আছেন নাকি? বলে এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকে নমস্কার জ্ঞাপন করলেন।

—আসুন, আসুন, পরেশ বাবু! আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। বসুন!

পরেশ বাবু ব্রজসুন্দরী হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারী। প্রিয়নাথের গুণগ্রাহী।

পরেশ বাবু আসন গ্রহণ করলেন। যথারীতি চা ও জলখাবার এল। প্রিয়নাথ বললেন—তারপর, বলুন, হাসপাতালের কাজ কত দূর এগুলো?'

পরেশ বাবুর কথায় জানা গেল, একতলার দরজা-জানলা বসানো হয়েছে। এইবার দোতলার জন্যে মালপত্র আনা দরকার।

প্রিয়নাথ বললেন—তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে পরেশ বাবু! এই কাজ যেদিন শেষ হবে সেদিন জানবো জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করেছি।

পরেশ বাবু বললেন—চেষ্টার ত্রুটি করছি না মুখুজ্যে মশায়! কিন্তু সম্প্রতি কিছু ঠেকে গেছি।

ব্যস্ত হয়ে প্রিয়নাথ বললেন—টাকা নেই নাকি?

—আছে। তবে তা যথেষ্ট নয়।

—তাই তো।

—ব্যাপার কি জানেন। বারে বারে আপনার কাছেই চাইতে সঙ্কোচ লাগছে। শুধু আমি নই—কমিটির আর সকলেও এ-বিষয়ে ভারী অপ্রস্তুত বোধ করছেন। আপনি তো যথেষ্ট দিয়েছেন। আমরা আপনাকে আশা আর সাহস দিয়েছিলাম যে, বাকী টাকা আমরা তুলে ফেলতে পারবো। আশ্বাসও পেয়েছিলাম অনেকের কাছ থেকেই। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা সবাই গা-ঢাকা দিয়েছেন।

প্রিয়নাথ চিন্তামগ্ন হলেন। পরেশ বাবু বলতে লাগলেন—অথচ এই সব ধনী ব্যক্তিরা যদি তখন টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি না দিতেন তা হলে আমরা অন্য ব্যবস্থা করতে পারতাম।

—তাই তো।

উত্তপ্ত কণ্ঠে পরেশ বাবু বললেন—নাম কেনবার লালসায় ছুঁচোর কেত্তনে ঢাক বাজাবার জন্যে এঁরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন কিন্তু···

প্রিয়নাথ হাসলেন:

—পরেশ বাবু, রেগে গেছেন। আপনাকেও তা হলে রাগিয়ে দেওয়া যায়! যাক্ শুনুন, রাগ করে লাভ নেই পরেশ বাবু! আমাদের কাজ আমাদেরই সম্পন্ন করতে হবে।

টেবিলের দেরাজ টেনে চেক-বই বার করলেন। দু'খানি চেক-এ সই করে তাদের ছিঁড়ে নিলেন। তারপর চেক দু'খানি পরেশ বাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এই দু'খানি ব্ল্যাঙ্ক চেক আপনাকে দিলাম। উপস্থিত প্রয়োজন মতো

আপনি দশ হাজার পর্য্যন্ত তুলে কাজ চালিয়ে যান। তারপর আমি ফিরে এসে···

পরেশ বাবুর বিস্ময় লক্ষ্য করে প্রিয়নাথ তাঁর কথা সমাপ্ত করলেন—ফিরে এসে বাকী ব্যবস্থা করব।

—ফিরে এসে?

—হ্যাঁ, পরেশ বাবু! আমি কিছুদিনের জন্তে তীর্থভ্রমণে বেরুব। প্রথমে যাব গয়া। সেখান থেকে অন্তান্ত তীর্থগুলি দেখব। এ আমার অনেক দিনের সাধ। আমার অনুপস্থিতিতে কাজ যাতে আটকে না থাকে, তাই এই ব্যবস্থা করলাম।

—কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক চেক···

—সঙ্কোচ হচ্ছে নিতে? প্রিয়নাথ মুক্তকণ্ঠে হাসলেন—এত দিন বৃথাই কি আপনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশলাম পরেশ বাবু? মানুষ চিনি আমি।

মুগ্ধ হৃদয়ে পরেশ বাবু চেক দু'খানি গ্রহণ করলেন।

* * * *

প্রমীলা এসে ঘরে ঢুকল।

—জ্যেঠামশায়! ডেকেছেন?

—হ্যাঁ, মা, এসো! কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ী যেতে পারিনি। এখন যাব। ভব ভাল আছে তো?

প্রমীলা মাথা নাড়লে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রিয়নাথ সামনের দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ছবির পানে তাকালেন। মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর ধীর মৃদুকণ্ঠে বললেন—প্রমীলা, তোমার জেঠিমার বড্ড ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে তীর্থ করবেন, ভারতবর্ষের নানা তীর্থে ঘুরবেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথমে মনে করেছিলাম তাঁকেই যখন সঙ্গে নিতে পারলাম না, তখন কোন তীর্থে আমি আর যাব না।

পত্নীবৎসল এই স্নেহময় লোকটির কর্ম্মব্যস্ত জীবনের অন্তরালে যে গভীর বেদনা ছিল, প্রমীলার কাছে তা অজ্ঞাত ছিল না। আজ হঠাৎ তারই অভিব্যক্তি শুনে সে বুঝল, কালের অতিবাহনে সে-শোক আজও প্রশমিত হয়নি। সে মৌনমুখে তাঁর পানে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়নাথ বলতে লাগলেন—কিন্তু কয়েক দিন আগে তাঁর কাছ থেকে আমি নির্দ্দেশ পেয়েছি যাবার। তিনি বলেছেন, দু'জনের অসমাপ্ত কাজ আমাকে শেষ করতে হবে। আমি গেলেই তাঁরও যাওয়া হবে। তিনি থাকবেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রমীলা নীরবে শুনতে লাগল।

প্রিয়নাথ বললেন—এদিককার কয়েকটা ব্যবস্থার বাকী আছে। সেগুলি শেষ করে আমি বেরুব। অনেক দিন ধরে অনেক তীর্থে ঘুরব।

উৎসুক কণ্ঠে প্রমীলা প্রশ্ন করলে—কবে যাবেন? কই, আগে কিছু বলেননি তো!

মৃদু হেসে প্রিয়নাথ বললেন—এত দিন যে মনস্থির করতে পারিনি। তাই কিছু বলিনি।

—কবে যাবেন?

—দিন এখনও স্থির করিনি। তবে যত শীগ গির হয়। মন চঞ্চল হয়েছে। পরেশ বাবুর সঙ্গে হাসপাতালের কাজের একটা ব্যবস্থা করেছি। আর-একটা ব্যবস্থা বাকী আছে ভবতারণের সঙ্গে। আপিসের জন্তে ভাবি নে। অঘোর আমার চেয়েও কর্ম্মিষ্ঠ; আমার চেয়েও দক্ষ। সুতরাং কোন দিক থেকেই প্রতিবন্ধক নেই। বেরুবার জন্তে ভারী উৎসুক হয়ে উঠেছি মা!

প্রমীলা চুপ করে রইল। প্রিয়নাথ বললেন—তোমায় ডেকেছি। ধীরে ধীরে এইবার সংসার বুঝে নাও। আমি নিশ্চিন্ত হই।

তাঁর কথায় প্রমীলার কর্ণমূলে আরক্ত আভা দেখা দিল।

দেরাজ থেকে এক গোছা চাবী বার করলেন প্রিয়নাথ।

—এইগুলি তোমার কাছে রাখো প্রমীলা! তিনটি পোষাকের আলমারীর চাবী, তোমার জেঠিমার ট্রাঙ্কের চাবী আর বাসনের সিন্দুকের চাবী আছে এর মধ্যে।

প্রিয়নাথ রিং-সমেত চাবীর গোছাটি প্রমীলার প্রসারিত হাতের দিকে এগিয়ে দিলেন। হঠাৎ কী এক আবেগে প্রমীলার সর্ব্বদেহ কেঁপে উঠল। হাত ফস্‌কে চাবীর গোছা সশব্দে মাটির ওপর পড়ে গেল। ব্যস্ত ভাবে প্রমীলা গোছাটি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

* * * *

—ভবতারণ!

—এসো ভাই, এসো!

প্রিয়নাথ ভবতারণ বাবুর ঘরে ঢুকে বিছানার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

একাদিক্রমে বাইশ বছর পরিশ্রম করবার পর বছর চারেক আগে ভবতারণ বাবু বাতে আক্রান্ত হয়ে কাজ-কর্ম্মে অপারগ হয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে দেখা দেয় হার্টের অসুখ। করোনারি থ্রমবোসিস্। নানাবিধ চিকিৎসা-পত্রের গুণে কিছু সুস্থ আছেন। ওঠা-হাঁটা, চলা-ফেরা বা কাজ-কর্ম্ম করার শক্তি নেই। নেই ডাক্তারের অনুমতিও।

কলেজ-জীবনে চার বছর একসঙ্গে পাশাপাশি বসে কাটিয়েছিলেন উভয়ে। প্রীতির সেই গ্রন্থি আজো অটুট আছে।

প্রত্যহ যেমন হয় আজো তেমনি নানা গল্প-গুজব হল। প্রিয়নাথ বাবুর তীর্থভ্রমণের কথা শুনে ভবতারণ বললেন—তোমার ভরসাতেই থাকা। অনেক দিন ধরে তুমি থাকবে না—তা ভাবতে ভাল লাগছে না।

মৃদু হেসে প্রিয়নাথ বললেন—উপযুক্ত প্রতিনিধি তো তোমায় দান করে যাচ্ছি। অসুবিধা বোধ করার কথা তো নয়।

বন্ধুর মুখের পানে তাকিয়ে ভবতারণ বললেন—তোমাকে নতুন করে বলবার কিছু নেই। সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ওই মা-হারা মেয়ে, তাও তোমাকে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি। আজ আর আমার কোন ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। তুমি যে ব্যবস্থা করবে, তাকে স্বীকার করে নিতে একটুও দ্বিধা করব না। শেষ জীবনে তোমাকে যে পেলাম সে আমার কত বড় সৌভাগ্যের ও সান্ত্বনার, তা ভাষায় বলা সম্ভব নয়।

ভবতারণ স্তব্ধ হলেন। ঝুঁকে পড়ে প্রিয়নাথ বন্ধুর একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিলেন।

দু'জনেই নীরব।

ঘরের মধ্যে একটি করুণ প্রশান্তির সুর ভেসে বেড়াতে লাগল।

* * * *

রেগে উঠেছে সুপ্রিয় এক মুহূর্ত্তে; চোখ পাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে—কোন্ সাহসে আর কোন্ অধিকারে তুমি আমায় এমন ক'রে উত্যক্ত করছ, তা জানতে চাই।

তেমনি গম্ভীর ভাবে প্রমীলা উত্তর দিলে—এত দিন বাদে এই সোজা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা কল্পনা করা কষ্টকর। প্রশ্নকর্ত্তার মাথার খুলির মধ্যে কী আছে—ঘী না অন্য কিছু—তা জানতে ইচ্ছে করে।

—বটে! বলতে চাও, গোবর আছে? অসহ্য!

—খবরদার! আর এক পা এগিয়েছো কি চেঁচাব।

হেসে ফেললে সুপ্রিয়।

—এই তো সাহস আর শক্তি! শেষ পর্য্যন্ত চীৎকার আর কান্নাই সম্বল আর অস্ত্র!

—ঈস্! আরও ঢের অস্ত্র আছে তূণে। সময় হলে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হব না। এই বলে এক অপরূপ ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়াল প্রমীলা।

—কথামিতে মেয়েরা যে ছেলেদের চেয়ে অনেক কাঠি সরেস, তার প্রমাণ পাওয়া গেল!

—মোটে না। চ্যালেঞ্জ করলে তার জবাব দিতে অপারগ নই, এই কথাই শুধু জানিয়ে দিলাম। সাহসের আর অধিকারের কথা না তুললেই পারতে।

একশোবার তুলব। বললে সুপ্রিয়—আমার ঘরে যদি ঢুকতে না দিই তো কোন্ অধিকারে ঢুকবে তুমি?

উত্তরে, পিঠের দিকে আঁচলের কাপড়টাকে টান দিলে প্রমীলা। ঝনাৎ ক'রে চাবির গোছা হাতের ওপর ফেলে বললে—চেয়ে দেখ এর পানে। এগুলো হল ওয়ার্ডরোবের, এটা বাসনের সিন্দুকের আর এটি হল জেঠিমার ট্রাঙ্কের চাবী। উপস্থিত এইগুলির স্বত্ব পেয়েছি। এর পর পাবো এই বাড়ীর চাবী আর লোহার সিন্দুকের চাবী। সুতরাং, অতঃপর প্রয়োজন হলে তোমায় তালা বন্ধ ক'রে রাখতেও পারি। আবার বন্ধ-তালার বাইরে দাঁড় করিয়েও রাখতে পারি। এখন বোঝো, কোথা থেকে কেমন করে সাহস আর অধিকার পেলাম।

চাবীর গোছার পানে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইল সুপ্রিয়। শেষ পর্য্যন্ত হার স্বীকার করতে হল তাকে। বললে—জয় হোক তোমার; "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

উত্তরে প্রমীলা বললে—"আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি, রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।"

—শোনাও না গানটা?

—বাঃ! অমনি লোভ। আচ্ছা, শোনাবো, সন্ধ্যার সময় এসো আমার ফুল-বাগানে।

গভীর বিস্ময়ে সুপ্রিয় বললে—তোমার ফুলের বাগান! সে আবার কোথায়?

কিছুদিন আগে প্রিয়নাথ তাঁর এই বাড়ীর সংলগ্ন পিছনের জমিটা কিনে নিয়েছিলেন; পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সেই জমিতে প্রমীলা অনেকগুলি ফুলের গাছ লাগিয়েছিল, তাদের মাথায় মাথায় ফুলের সমারোহ শুরু হয়েছে। সুপ্রিয় এ তথ্য জানতো না।

ঘাড় নেড়ে প্রমীলা বললে—সব কথাই এক নিশ্বাসে জেনে নেওয়ার চেয়ে একটু-আধটু না জানা থাকা ভাল। বলব না এখন।

হতাশ ভাবে সুপ্রিয় বললে—তথাস্তু। এই বলে সে জামার ওপর কোট চড়িয়ে দিলে। সে বেরুবার উদ্যোগ করছে।

সঙ্গীতে প্রমীলার পারদর্শিতা সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিছুদিন আগে সুপ্রিয়র আগ্রহে ও চেষ্টায় সে গ্রামোফোনে একটি গান দিয়েছে। সেই রেকর্ড আজ বাজারে বার হবে। সুপ্রিয় যাচ্ছে রেকর্ডের সন্ধানে।

প্রমীলা বললে—কোথায় চললে এখন? কোন্ রাজ-কাজে?

মৃদু হেসে সুপ্রিয় জবাব দিলে—একটু-আধটু না জানা থাকা ভাল। বলব না এখন।

মাথা হেলিয়ে প্রমীলা বললে—তথাস্তু।

* * * *

প্রসন্ন প্রভাতে মেঘমুক্ত আকাশে প্রদীপ্ত ভাস্করের পথ-পরিক্রমার সঙ্গে যে স্বচ্ছ-সুন্দর দিনের সূচনা হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটল একান্ত অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক দৈব-দুর্য্যোগের আবর্ত্তে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশের কোণে যে মেঘ দেখা দিয়েছিল, অকস্মাৎ তার দিগন্ত-বিস্তৃত জটাজালে পৃথিবী অবলুপ্ত হল।

ঝড় উঠল। প্রচণ্ড হতে প্রচণ্ডতর তার বেগ কাঁপিয়ে তুললো নিখিল চরাচর। বজ্রবিদ্যুৎ-বৃষ্টির দাপটে কাঁপতে লাগল ঘর-দালান-পথ-প্রান্তর।

রাত্রি যত গভীর হল ঝঞ্ঝাবাতের উন্মত্ততাও বেড়ে উঠল তত।

ঘুম নেই প্রিয়নাথের চোখে। জানলার বাইরে অনবরত কর্কশ-ভাষায় কে যেন তর্জ্জন-গর্জ্জন করছে…

ঘুম নেই সুপ্রিয়র চোখে। কানের পাশে গোঁ গোঁ শব্দে কে যেন কাতরাচ্ছে…

ঘুম নেই প্রমীলার চোখে। ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দের মধ্যে সে যেন কান্নার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে…কী এক অনির্দ্দেশ্য অশুভ অনুভূতির আতঙ্কে সে বারে বারে চকিতত্রস্ত হয়ে উঠছে…

সেই দিগন্তপ্লাবী ঝড়-বাদলের রাত্রে জন-মানবশূন্য কর্দ্দমাক্ত পথের ওপর ও কার ছায়া পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে? কিসের অন্বেষণে কোথায় কোন্ দিকে তার গতি?

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। বজ্রপাত হচ্ছে নিকটে দূরে। অবিরল জলধারায় পথ-ঘাট দুর্গম হয়ে উঠেছে।

ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে চলেছে। প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ীর সদর দরজা দেখা যাচ্ছে। পথিকের গতি রুদ্ধ হল সেই দরজার সম্মুখে।

* * * *

কে যেন সদর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কে যেন ডাকছে। প্রিয়নাথ চমকে উঠলেন। বিছানার ওপর উঠে ব'সে ডাক দিলেন চাকরকে—ভৈরব, ভৈরব!

সাড়া পাওয়া গেল না। বারান্দার অপর প্রান্তে ভৃত্যের ঘর। ক্ষণেক অপেক্ষা করে প্রিয়নাথ উঠলেন। এই দুর্য্যোগের মধ্যে কে এল? কে এল এত রাত্রে?

দরজা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ধাক্কায় টলে পড়লেন। দরজাটা ধরে ফেলে সামলালেন নিজেকে।

অদূরে সদর দরজা। বাইরে থেকে কেউ যে তার ওপর ধাক্কা দিচ্ছে তাতে সংশয় নেই। কোন বিপন্ন পথিক বুঝি আশ্রয় চাইছে?

এগিয়ে গিয়ে প্রিয়নাথ সদর দরজা খুলে দিলেন। বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠল চরাচর। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের ঝলক ঢুকল খোলা দরজাকে ছুলিয়ে দিয়ে।

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এই কি প্রিয়নাথ মুখুজ্যে মশায়ের বাড়ী?

প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি······

—প্রিয়নাথ! বলে উঠলেন আগন্তুক—বন্ধু প্রিয়নাথ!

ভিতরে প্রবেশ করে তিনি নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—আমায় চিনতে পারছো না প্রিয়নাথ?

আগন্তুকের মাথা মুখ সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। বিমূঢ়-বিস্ময়ে প্রিয়নাথ তাঁর দিকে তাকালেন।

আগন্তুক বললেন—ভাল করে চেয়ে ত্যাখ তো।

বিস্ফারিত-চোখে প্রিয়নাথ বললেন—কালিনাথ! হ্যাঁ কালিনাথই তো! কালিনাথ! তুমি!

—যাক, চিনতে পেরেছো তা হলে! বাঁচলাম। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে তা হলে আবার দেখা হল। খুঁজে পেলাম তোমায়!

কালিনাথের মুখে-চোখে এক বিচিত্র দীপ্তি ফুটে উঠল। বিহ্বল প্রিয়নাথ। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে যে বেদনা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যে বাল্যসাথীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার সঙ্গে আবার যে কোন দিন দেখা হবে তা তো প্রিয়নাথ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। কল্পনা করতে পারেননি, এমনি ঝড়ের রাতে ঘটবে তাঁর আবির্ভাব।

ছ'হাত বাড়িয়ে কালিনাথের ছ'হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন—কী আশ্চর্য্য! কালিনাথ! তুমি! এত দিন পরে! এসো! ঘরের ভিতর এসো!

পরম সমাদরে তাঁকে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ডাকাডাকি করে তুললেন ভৃত্যকে। বললেন—ভৈরব, চা করে দাও। আর, ঘরে কি খাবার আছে বার কর। আমার এক বন্ধু এসেছে।

উৎসাহে আবেগে প্রিয়নাথ স্পন্দমান। নিজের জামা-কাপড়-তোয়ালে বার করে দিলেন। কালিনাথ ভিজা কাপড়-জামা ছেড়ে প্রিয়নাথের শয্যার পাশে গদি-আঁটা চেয়ারের ওপর গা মেলে বসলেন। ভৈরব চা ও খাবার নিয়ে এল।

* * * *

ছুই বাল্যসাথীর মধ্যে অতীত দিনের বিচিত্র কাহিনীর আলোচনা হতে লাগল। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা। কালিনাথ মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে সেই বিগত স্মৃতির যে রোমন্থন করলেন, তা থেকে আমরা প্রায় সব কথাই জানতে পারলাম।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আগড়পাড়ার মুখুজ্জে বংশের নামডাক ছিল বহু-দূর বিস্তৃত। পুরুষানুক্রমে আভিজাত্য আর প্রভুত্বের যে মদগর্ব্বিত ধারা এই পরিবারের কর্ত্তাদের রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল, তার

প্রচণ্ডতা চরম সীমায় পৌঁছেছিল প্রিয়নাথের পিতা প্রমথনাথের জীবদ্দশায়। সারা গ্রাম তাঁর নামে কাঁপতো। তাঁর সামনে মাথা হেঁট করতো না এমন লোক গ্রামে ছিল না, এক জন ছাড়া।

এই অসাধারণ লোকটি হচ্ছেন কালিনাথের পিতা দুর্গাচরণ ন্যায়তীর্থ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পেশা যজমানি। সম্বলের মধ্যে খড়ের দু'খানা বাড়ী আর বিঘে দুই জমি। মেয়ে দুটির বিবাহ দিয়েছেন। একমাত্র ছেলে কালিনাথ। স্থানীয় পাঠশালায় লেখাপড়ার পর সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করে পিতার কাজে সাহায্য করতে শুরু করেছে।

একই গ্রামের ছেলে প্রিয়নাথ আর কালিনাথ। সমবয়সী। ভাবের অপ্রতুল ছিল না উভয়ের মধ্যে। স্কুলের পড়া শেষ করে প্রিয়নাথ চলে গেলেন কলকাতায় পড়তে। কালিনাথ গ্রামেই রয়ে গেলেন।

বিরোধ বাধল। এক দিকে প্রবল-প্রতাপ জমিদার প্রমথনাথ মুখুজ্জে, অপর দিকে গরীব পূজারী ব্রাহ্মণ দুর্গাচরণ ন্যায়তীর্থ। দুর্গাপূজার সময় পাশের গ্রামে এক বারোয়ারী পূজা বসাল সেখানকার অধিবাসীরা। শোনা গেল, ধুমধামের আয়োজন হচ্ছে বিরাট। ব্যাপারটা প্রমথনাথের মনঃপূত হল না। জানা গেল সেই পূজায় পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছেন দুর্গাচরণ।

প্রমথনাথ দুর্গাচরণকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, যারা টেক্কা দিয়ে পূজার ব্যবস্থা করছে তাদের পূজার ভার নেওয়া চলবে না দুর্গাচরণের।

দুর্গাচরণ বিস্মিত হলেন। বললেন, কথা দিয়েছেন তিনি।

প্রমথনাথ তর্ক করলেন, তারপর অত্যন্ত জেদাজেদি শুরু করে দিলেন। কিন্তু দুর্গাচরণ অটল। কথা যখন দিয়েছেন তখন তার খেলাপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রমথনাথ আর-কিছু বললেন না। কিন্তু ভুললেন না তাঁর এই পরাজয়।

তারপর পদে পদে সংঘাত ঘটতে লাগল উভয়ের মধ্যে। প্রমথনাথ প্রতিশোধ চান, কিন্তু দুর্গাচরণের মাথা হেঁট করার সাধ্য বুঝি তাঁর নেই।

নেই? প্রমথনাথ ক্ষেপে উঠলেন। এবং শেষ পর্য্যন্ত টাকার জোরে প্রতিশোধ নিলেন ভাল করেই।

মিথ্যা মামলার দায়ে দুর্গাচরণ সর্ব্বস্বান্ত হলেন। কিন্তু তবুও তাঁর মাথা হেঁট হল না।

বন্ধুরা বললে, একবার প্রমথনাথের কাছে গিয়ে দুর্গাচরণ যদি দাঁড়ান, তা হলে তৎক্ষণাৎ সব কিছু মিটে যায়। দুর্গাচরণ শুধু মৃদু হাসলেন। তারপর স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে মাথা উঁচু করেই গ্রাম পরিত্যাগ করলেন।

কালিনাথের মুখে সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে প্রিয়নাথ বারংবার নিদারুণ লজ্জায় বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন। বারে বারে বন্ধুর দু'হাত চেপে ধরে বলছিলেন—থাক ভাই, থাক। বড় লজ্জা বোধ করছি।

কালিনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। এর মধ্যে প্রিয়নাথের লজ্জা পাবার কোন কারণ বা প্রয়োজন নেই। প্রিয়নাথ তো কোন দিন কালিনাথকে কোন দুঃখ দেননি; বরং যত দিন কাছাকাছি ছিলেন, তত দিন উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনই ছিল। প্রিয়নাথের উদার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় কি কালিনাথের অজানা?

প্রিয়নাথ মৌন হয়ে রইলেন। কালিনাথ বিগত দিনের সেই শোচনীয় ও বেদনাক্লিষ্ট কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ বিবৃত করলেন।

দেশ-দেশান্তর ঘুরে কাশীধামে গিয়ে কালিনাথের বাবা আর মা দু'জনেই মারা গেলেন অল্পদিনের ব্যবধানে। কালিনাথ নিশ্চিন্ত হলেন। বাঁধন আর দায়িত্ব রইল না কিছুই। এখন তিনি বেপরোয়া। যা খুশী তাই করতে পারেন। মনে মনে নানা সংকল্প আঁটলেন। নানা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করলেন। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বাঁধতে পারলেন না। অবশেষে আবার নিজের দেশেই ফিরে এলেন।

শান্ত-সমাহিত কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন—দেশের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল তোমার কথা। বাল্যকালের বন্ধু তুমি। আমাদের পিতৃপুরুষের কাজ বা অকাজের জন্যে আমরা তো দায়ী নই। তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। আমি জানতাম, তোমার মনের কোণে আমার জন্যে সত্যিকারের সহানুভূতি সঞ্চিত আছে।

উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে প্রিয়নাথ বললেন—আছে বন্ধু, নিশ্চয় আছে।

কালিনাথ হাসলেন। বললেন—তাই তো তোমার কাছেই সর্ব্বাগ্রে এলাম।

—বেশ করেছো। এবং যখন এসেছো তখন আমার কাছেই থাকো, অনেক দিন, যত দিন তোমার ইচ্ছে।

—থাকবো? তোমার কাছে?

—হ্যাঁ, বন্ধু! আমার কাছে। একসঙ্গে!

কালিনাথ পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকালেন প্রিয়নাথের দিকে। ধীরে ধীরে বললেন—আচ্ছা। তাই হবে।

* * * *

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। আয়ত দুই চোখের দৃষ্টি জানলার বাইরে নিবদ্ধ। কিয়ৎকাল চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—তোমার বাড়ী, জমি, বাগান, সব কিছু আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব কালিনাথ। প্রায়শ্চিত্ত করবো বিধিমতে।

সকাল-বেলা দুই বন্ধুতে বসে জলযোগ করছিলেন। কালিনাথকে সমাদর করবার আগ্রহে প্রিয়নাথের ব্যস্ততার অবধি নেই। ঘন ঘন ভৈরবকে ডেকে নানাবিধ আদেশ করছেন।

পুরানো কথার আলোচনার জের তখনো বোধ হয় মেটেনি। সেই প্রসঙ্গেই প্রিয়নাথ বলে উঠলেন—আমি আজই এ বিষয়ে এটর্ণীর সঙ্গে কথা বলব।

উত্তরে কালিনাথ ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বললেন—তুমিও আমার প্রতি অবিচার করবে শেষ পর্য্যন্ত?

—অবিচার! আমি! তোমার প্রতি! সে কি কথা!

উদ্বেলিত হলেন প্রিয়নাথ বিস্ময়ে হতাশায়। কালিনাথ বললেন—তুমি কি ভেবেছ, এত দিন পরে আমি যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তা বিষয় ফিরে পাবার আশায়?

—না, না, তা নয়। তবে—

—"তবে"—র পর আর কিছু নেই। কালিনাথ মাথা দোলাতে দোলাতে বলতে লাগলেন—বিষয়-আশয় বাড়ী-ঘর বাগান-পুকুর, তাদের প্রতি প্রাণে কোন মায়া-মমতা আর নেই, প্রিয়নাথ! অনেক দেখলাম, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি কম নয়। বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি, পুতুল-খেলার মতো মানুষ এই সব নিয়ে যে খেলায় ব্যাপৃত থাকে তা দেখলে হোগলা-ঘেরা চালার মধ্যে পুতুল-নাচের কথাই মনে পড়ে, হাসি পায়। ওদিক থেকে কোন মোহ নেই প্রিয়নাথ, কোন লোভ নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো।

প্রিয়নাথ উদ্দীপ্ত হলেন—কিন্তু আমার কর্ত্তব্য! যখন তোমাকে আবার পেয়েছি তখন—

হঠাৎ কালিনাথ হেসে উঠলেন—নেব, নেব, যা প্রয়োজন, তা তোমার কাছে চেয়ে নেব।

* * * *

সুপ্রিয় নীচে নামলো। দেখলো, এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবা মহা হাসিখুসী মুখে গল্পগুজব করছেন।

প্রিয়নাথ হাঁক দিলেন—এদিকে এসো খোকা।

এ-নামে সুপ্রিয়র বড় আপত্তি। বিশেষ, বাইরের লোকের সামনে। বাবাকে বলে বলে আর পারা গেল না। সুপ্রিয় কাছে এসে দাঁড়াল। ভাবগম্ভীর মুখে সংক্ষেপে প্রিয়নাথ বললেন—এঁকে প্রণাম করো। পায়ের ধুলো নাও। এঁর নাম কালিনাথ চৌধুরী। এক গ্রামে আমরা একত্রে মানুষ। ভায়ের মতো। এঁকে কাকা ব'লে জানবে।

সুপ্রিয় পিতৃ-আজ্ঞা পালন করলে। কালিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রিয়নাথের চোখে জল এল।

* * * *

নিয়ে গেলেন কালিনাথকে ভবতারণের কাছে। পরিচয়াদি হল। প্রমীলা যথারীতি তাঁকে প্রণাম করলে। কালিনাথ মুক্ত-কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ জানালেন।

সেখান থেকে গেলেন হাসপাতাল নির্ম্মাণ পরিদর্শন করতে। পরিচয় করিয়ে দিলেন সেখানে যারা ছিল প্রত্যেকের সঙ্গে।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড। আপিস। বিশ্বস্ত ম্যানেজার অঘোর পাঠক অভ্যর্থনা জানালো। সোজাসুজি প্রিয়নাথ বললেন—অঘোর, ইনি শুধু আমার বন্ধু নন, ভাইও বটে। আমার অনুপস্থিতিতে এঁর পরামর্শ মতো কাজ করবে। বিদ্যাবুদ্ধিতে ইনি কারুর চেয়ে খাটো নন অঘোর! তুমি তো জানো না সব কথা···

—থাক, থাক প্রিয়নাথ!

কালিনাথ বাধা দিলেন বন্ধুর উচ্ছ্বাসে। অতঃপর উভয়ে বাড়ীমুখো হলেন।

[ক্রমশঃ।

ঘূর্ণাবর্ত্ত

বিভা মুখোপাধ্যায়

প্রমত্তা নদী ছুটে চলে বিপুল জলোচ্ছ্বাসে। এক দিক ভাঙ্গে, আর এক দিক গড়ে। এপারে যখন ওঠে উৎসবের কোলাহল, ওপারে ওঠে ভাঙ্গনের আর্ত্তনাদ। এই ভাঙ্গনের মুখে যারা ছিট্‌কে পড়ে জলের ঘূর্ণাবর্ত্তে, তারা ভেসে যায়। নিরুদ্দেশের পথে কে কোথায় তলিয়ে যায়, কে তার হিসেব রাখে?

প্রমত্তা নদী যেমন বয়ে যায় মাটির বুক ভেঙে-চুরে, তেমনি করে মহাযুদ্ধের স্রোত বয়ে গেল মানুষের জীবন ও সমাজের বুকে ভূমিকম্পের মত সব ওলট-পালট করে দিয়ে।

যুদ্ধ থেমে গেল। কিছুদিন আগেও যে কথা কেউ কল্পনা করতে পারেনি, আকস্মিক জোয়ারের মত সেই অভিনব পরিবর্ত্তন দেখা দিল মানুষের সমাজ ও জাতীয় জীবনে। বিশেষ করে দেশের গতানুগতিক নারী-জীবনের ধারা হঠাৎ যে ভাবে বদলে গেল, তা সত্যিই বিস্ময়কর। স্বাভাবিক গতিতে এই পরিবর্ত্তন হয়তো এক শতাব্দী পরে বাঙলার সমাজ-জীবনে দেখা দিত। কিন্তু সেই শতাব্দীর পথ অতিক্রম করে জাতিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল মাত্র সাত বছরের যুদ্ধ। তার ডানার ঝাপটায় সমাজের গতির রূপ এমন ভাবেই বদলে গেল যে, মানুষ পিছন ফিরে তাকাবার সময়ও পেল না। পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে গিয়ে ছেলেদের জীবনের সব আদর্শ গেল হারিয়ে, মেয়েদের জীবনেও এল আমূল পরিবর্ত্তন। সাতটি বছর আগেকার জীবন আর বর্ত্তমান জীবনের মাঝখানে এই পার্থক্য! এত বড় বিরাট ব্যবধান যে কি করে দেখা দিল, তাই ভাবছিল ইলা। যুদ্ধের পরেও জাতির যে কাঠামোটুকু বজায় ছিল, সেটুকু নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে। তার পূর্ণাহুতি হল বাঙলায়।

সেদিন দু' নম্বরের বাসে উঠে ইলা যাচ্ছিল কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে। ইচ্ছে ছিল কিছু উল কিনবে। সামনে বন্দনার জন্মদিন। তাকে সবুজ রঙের একটি গ্যারাজী ফ্রক বুনে দেবার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই মনে মনে ছিল।

বাসখানা ডালহৌসী এসে পৌঁছতেই রমা উঠল সেই গাড়ীতে, অনেক দিন পরে হঠাৎ রমাকে দেখে ইলার মন অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভরে উঠল।—"আরে! তুই? ভাল আছিস্ তো? কত দিন দেখিনি!"

"হ্যাঁ"—ছোট্ট একটু উত্তর দিয়ে রমা ইলার পাশে আড় হয়ে বসলো।

ইলাকে দেখে সে যতটা খুসী হয়েছিল তার চেয়ে অবাক হয়েছিল অনেক বেশী। কোথায় গেল ইলার সেই শ্রী! বড় বড় চোখের স্নিগ্ধ চাউনিটুকু হয়তো আজও হারায়নি; কিন্তু অনেকখানি রোগা হয়ে গেছে সে। সেই মিষ্টি হাসিটুকু ঠোঁটের কোণে আজও লেগে আছে, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদের সেই পরিপাটি আজ আর নাই।

রমার বুঝতে দেরী হল না যে, ইলার বিগত দিনের প্রাচুর্য্যতে লেগেছে মরণকাঠির ছোঁয়া, যেমন করে ওদেরও ভেঙেছে স্বপ্ন।

বান্ধবীর এই পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করে সে আহত না হয়ে পারেনি। কিন্তু স্পষ্ট করে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে রমার কেমন যেন লাগল। এই ইলা ছিল পোষ্ট-গ্রাজুয়েট জীবনে তার অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী। তার প্রেরণা, আদর্শবাদ ও হাস্যচঞ্চল স্বভাবে তাদের হষ্টেল-জীবন আনন্দমুখর হয়ে উঠত! নিত্য-নতুন অজানার স্বপ্ন তারা দেখত তখন। সেদিন আর এদিন—যেন কল্পান্তের ব্যবধান রচনা করে মনের মাঝখানে পাথরের দেয়াল তুলে দিয়েছে। ইলার এই বেশভূষা ও চাল-চলনের পরিবর্ত্তনটুকু দেখে রমার বুকে জমে ওঠে একটা দীর্ঘশ্বাস। মনে নানা কথা উঁকিঝুঁকি দিলেও, মুখ ফুটে রমা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না, পাছে ইলা ব্যথা পায়।

রমার অন্যমনস্কতাটুকু ইলার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। তাকে একটুখানি সহজ করে নেবার চেষ্টায় সে আবার প্রশ্ন করল—"কথা বলছিস্ না যে! কোথায় গিয়েছিলি শুনি?"

"এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে। নাম রেজিষ্ট্রারী করতে।"—কথাটা বলে রমা ইলার মুখপানে চেয়ে এক নজর দেখে নিল, পরিবর্ত্তনের কোন ছাপ পড়ে কি না।

"নাম রেজিষ্ট্রারী!"—ইলা একটু বিস্ময়ের সঙ্গে রমার মুখপানে চাইল।

ইলা শুনেছিল যে নাম রেজিষ্ট্রারী না করলে আজকাল আর চাকরী মেলে না। তবু মেয়েরা নাম রেজিষ্ট্রারী করে কি চাকরী করবে, সে তা ভাবতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগেকার কথা। তাদের প্ল্যান ছিল এম-এ পাশ করার পর গ্রামে গিয়ে স্কুল খুলবে। রমার সঙ্গে তাই নিয়ে কত দিন কত জল্পনা-কল্পনা করেছে। আর আজ চাকরির উমেদারি করতে রেজিষ্ট্রারী-করা টিকিট খুঁজে মরছে রমা। একটু ইতস্ততঃ করে ইলা জিজ্ঞেস করে—"নাম রেজিষ্ট্রারী করা হল?

বিষণ্ণ মুখে রমা জবাব দিল—"না, হল না। বড় ভিড়। একদিনে নাম রেজিষ্ট্রারী হয় না। আগে সাত-আট দিন ঘুরি, তার পর হয়তো ভাগ্যে একখানা টিকিট জুটবে।"

এবার ইলা হেসে ফেলে—"উমেদারির টিকিট নিয়ে কি চাকরি করবি শুনি?"

রমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ইলার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বলে—"যা পাই তাই। বাছাবাছি নেই। একটা কিছু পেলেই হয়।"

পুরানো দিনের দৃঢ়তা কণ্ঠে এনে ইলা বলে—"তার মানে কোন অফিসে ঢুকতে চাস্, এই তো? কিন্তু পারবি পুরুষের পাশাপাশি বসে দশটা-পাঁচটা কলম পিষতে?"

রমা দ্বিধাশূন্য ভাবে উত্তর দেয়—"অবস্থায় পড়লে মানুষ সবই পারে।"

"তা বুঝলাম রমা! কিন্তু চাকরি যদি করবি, অফিসে কেন? দেশে ইস্কুল-কলেজের তো অভাব নেই। জীবিকার মধ্যেও জীবনের একটা আদর্শ আছে।"

ইলাকে চিরদিনই রমা আদর্শবাদী বলে জানে। ইলার এ ধরণের উক্তি তার বহু শোনা। আগে হয়তো এই ধরণের কথা তাকে প্রলুব্ধ করত, লোভ দেখাত বিরাট মহান্ জীবনের। কিন্তু আজ মনে হয়, সে সব যেন স্বপ্ন। বাস্তব জীবনের সংঘাতে আজ রমা স্পষ্ট বুঝেছে যে, কল্পনার আদর্শ বাস্তবের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। জীবনের তাগিদ স্বপ্নবিলাসের ধার ধারে না।

রমা হাসিমুখে জবাব দেয়—"যা বলছিস্ তা হয়তো সত্যি। কিন্তু চাকরীর প্রয়োজন যে জন্যে, সে হল অর্থ। টাকা না হলে মানুষের চলে না। ইস্কুল-মাষ্টারির ষাট টাকা বেতন আজকালকার দিনে এক জনের জীবন ধারণের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। রাগ করিস্ না ইলা, চিরদিন তুই আদর্শবাদী। কিন্তু কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া শক্ত। অন্ততঃ আমি তা পারলাম না। তাই আজ অর্থের একান্ত প্রয়োজনে অফিসের চাকরিই খুঁজছি।"

ইলা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে—"বুঝলাম, কিন্তু—"

রমা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—"কিন্তুর আর অবসর নেই ইলা! বাবার বয়েস হয়েছে। তাঁর একার রোজগারে সংসার চলে না। ছোট ভাই-বোনদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এমন কি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হলেও অর্থের দরকার। অফিসের যে কোন কাজে একশো দেড়শো টাকা মাইনে দেয়। আর মাষ্টারি করে সারা দিন খেটে হয় তো একটি মেয়ে পায় পঞ্চাশ, না-হয় ষাট টাকা। অফিসের চাকরি যদি পাই, বুঝব বিধাতার আশীর্ব্বাদ, বাঁচবার পথে তবু খানিকটা অবলম্বন পাব।"

"সংস্কারে বাধবে না, রমা?"—ইলা জিজ্ঞেস করে।

রমা তার উত্তরে বেশ জোরের সঙ্গেই বলে—"এ দেশের মেয়েরা কোন দিন ঘর ছেড়ে বাইরে আসেনি ঠিকই। কিন্তু প্রয়োজনে তো তারা পুরুষের পাশাপাশি সমান ভাবেই চলেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বাঙালী মেয়েরাই নাকি খিদিরপুর ডকে বোমা ফেলেছিল।"

ইলা প্রতিবাদ করে না। শান্ত ভাবে উত্তর দেয়—"জানি এ দেশের মেয়েরা একদিন পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সংস্কৃতির সেই রূপ অনেক আগেই বদলে গেছে।"

এবার রমা বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল—"সংস্কার! সংস্কার আমাদেরই সৃষ্টি ইলা! তার রূপ বদলে দিতে হয় সামাজিক প্রয়োজনে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি যাতে হারিয়ে যায়, সে সংস্কার নিরর্থক। বাঁচতে হবে আগে, তবে তো সংস্কার। আজ যারা জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে অফিসে ঢুকেছে, তাদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে কেউ তাকায় না জানি। আমিও হয়তো তাকাইনি। কিন্তু সেই না-তাকানোর সার্থকতা কি?"

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে ইলা হঠাৎ রমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে—"থাক্, এ সব আলোচনা অন্য দিন হবে। এখন বল তো শুনি, বর্ত্তমানে কে কোথায়? সকলের খবর কি?"

রমা একটু ফিকে হাসির সঙ্গে বলে—"বাড়ীতে ঝুলুর আজ সাত দিন জ্বর। মাকে বললাম ডাক্তার ডাকতে। উত্তরে কি বললেন বুঝলাম না। তবে বুঝলাম, হাতে টাকা নেই।"

ইলার মনে হঠাৎ একটা ঝাঁকানি লাগে। কি বলতে গিয়ে থেমে যায়।

"থাক্। মন খারাপ করিস্ না। যাবো একদিন।"—ইলার ঠিকানাটা জেনে নিয়ে রমা বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে নেমে পড়ল। বাস ততক্ষণ বেথুন কলেজের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ইলার খেয়াল ছিল না, তা নয়। তবু উল কিনবার জন্যে নেমে পড়বার এতটুকু উৎসাহ যেন তার ছিল না। সে কেবলই ভাবছিল রমার কথাগুলো। রমা ঠিকই বলেছে যে, যে-সংস্কার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না—মানুষ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে কেন? হাতিবাগানের মোড়ে এসে বাসটা থামতেই ইলা কি ভেবে নেমে পড়ল। কর্মচঞ্চল রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার অনুভব করবার চেষ্টা করে, রমার কথাগুলো ঘুরে ঘুরে মগজের মধ্যে প্রশ্নের জাল বোনে।

উল কেনা হল না। একখানা ফিরতি দোতলা বাসে উঠে ইলা নির্জীব পদার্থের মত চুপটি করে বসল এক কোণে।

যাত্রী ওঠে-নামে। বাস ছুটে চলে দৈত্যের মত। ইলার মনের ভিতর চলচ্চিত্রের ছবির মত তর-তর করে বয়ে যায় অতীত জীবনের অসংখ্য স্মৃতি।

* * * *

সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ইলা। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা। বাপ-মায়ের প্রথম সন্তান বলে আদর-যত্নে ইলা বড় হয়েছে। সে চিরদিন দেখে এসেছে বিরাট মহান্ জীবনের স্বপ্ন! ছেলেবেলা থেকে আশা করে এসেছে সে বড় হবে। দশের মধ্যে এক জন হবে। স্বচ্ছন্দগতিতে ইলার জীবন-ধারা বয়ে চলেছিল। ইলা কল্পনা করতেই ভালবাসে বেশী। বয়সে আধুনিকা হলেও প্রাচীনপন্থীই ছিল তার মন। আজ রমার কথায় তার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল। একই হষ্টেলে ইলা আর রমা ছিল। ইলা ছিল ইতিহাসের ছাত্রী, রমা বাংলার।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মধ্যে ইলা ডুবে থাকত। মাঝে মাঝে তার মনে হতো, কালিদাসের কালে সে যদি জন্ম নিত, শকুন্তলাকে জানাত অভ্যর্থনা; মালবিকার কাছে চেয়ে নিত লীলাকমল। পদ্মিনীর জহর-ব্রতের কথা তার মনকে প্রলুব্ধ করত আত্মপ্রতিষ্ঠার গরিমায়। ইলা মনে মনে কত দিন সংকল্প করেছে, তাদেরই মত হবে চিরস্মরণীয়। ঐতিহ্যময় ভারতের স্বপ্ন তাকে মাঝে মাঝে তন্ময় করে রাখত। কিন্তু জীবনের সব আদর্শবাদ হঠাৎ চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল, যেদিন চোখের সামনে সে দেখল মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। হাজার হাজার বছর যারা প্রতিবেশী হয়ে বাস করেছে তাদের রক্তপিপাসার ছবি ইলা দেখেছে, তা ভাবতে সে এখন শিউরে ওঠে। ইংরেজ চলে গেল। শুধু দেশকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে নয়, এত বড় বিরাট ভূখণ্ডকে রক্ত-স্নান করিয়ে, তার মানুষগুলোকে নামিয়ে দিয়ে গেল জীবনের আদিম স্তরে।

রমার ছোট ভাই তুলুর আজ সাত দিন জ্বর। ডাক্তার ডাকবার মত পয়সাও নেই ওর মায়ের হাতে!

ইলারা শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত ভিটে আঁকড়ে পড়েছিল। কিন্তু একে একে সবাই যখন চলে এল, তখন ওরাও বাধ্য হল সাত পুরুষের সেই ভিটে ছেড়ে আসতে।

বাবার হাতে যে কয়টি টাকা আছে, তাও দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।...তার পর?

ভাবতে ইলার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে। ইলার যখন সংবিৎ ফিরে এল, তখন বাস জগু বাজার ছাড়িয়ে এসেছে।

অল্প পরিসর রাস্তা—নাম কালিঘাট রোড। গঙ্গার কাছাকাছি বলেই হয়তো তীর্থযাত্রী আর পুণ্যলোভাতুরদের এত ভিড়। অপরিচ্ছন্ন রাস্তার পাশে পুরানো একটি দালানের নীচের তলায় ইলারা ক'দিন হল উঠে এসেছে।

এই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরগুলো প্রথমে ইলার অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল। মানুষ এই ঘরে কেমন করে বাস করে সে কথা ভাবতে গেলে একদিন হয়তো সে শিউরে উঠত। কোলকাতায় সে আগেও বাস করেছে কিন্তু তখন কোলকাতা সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল ইউনিভারসিটি, কলেজ স্কোয়ার আর ছাত্রাবাসকে কেন্দ্র করে। এত বদ্ধ আবহাওয়া আর নোংরা পরিবেশ সত্যিই তার পক্ষে অসহ্য। তার বাবা দীনেশ বাবু আর মা ইন্দিরা দেবীর হয়তো আরও বেশী খারাপ লাগছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথাই বললেন না তাঁরা। ঐশ্বর্য্যের রাজপ্রাসাদ না হলেও গাছ-পালা লতা-পাতায়-ঘেরা পরিচ্ছন্ন মাটির ঘরে মুক্ত বাতাসে তাঁরা দিন কাটিয়েছেন। পর্য্যাপ্ত সূর্য্যালোকে দেহ-মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু এখন সূর্য্যালোক তো দূরের কথা, আকাশের মুখও দেখতে পাওয়া যায় না। ইন্দিরা দেবী মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলেন—"কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম! ভগবান জানেন কত দিন এ ভাবে থাকতে হবে?"

ইন্দিরা দেবীর এ প্রশ্নের জবাব দেবার সামর্থ্য আজ দীনেশ বাবুর নেই। ইলা মায়ের প্রশ্নকে এড়িয়ে যায়। দীনেশ বাবু একটু হেসে স্ত্রীকে বলেন—"এরই মধ্যে অধৈর্য্য হয়ে উঠলে?"

খানিকটা সান্ত্বনা দেবার হয়তো চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি নিজে কম হাঁপিয়ে ওঠেন, তা নয়। কোন দিন তো এ ভাবে জীবন ধারণ করতে তাঁরা অভ্যস্ত নন।

ইলা চুপ করে থাকে। কোন অভিযোগই করে না। অভিযোগ করলেও যে তার প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়—এ কথা ইলা বেশ ভাল ভাবেই বুঝেছে। তাই সব কিছু সে নীরবে সহ্য করে। কিন্তু মুস্কিল হয় ইন্দিরা দেবীকে নিয়ে।

সাত-আট ঘর ভাড়াটে। নীচের তলায় একটি মাত্র জলের কল। কোন দিন ওদের স্নান হয়, কোন দিন হয় না। জল-জল করে ভাড়াটিয়াদের মধ্যে নিয়ত ঝগড়া-মারামারি লেগেই আছে। ইন্দিরা দেবী দেখে-শুনে হতভম্ব হয়ে যান। মনে পড়ে দেশের বাড়ীর কথা। উন্মুক্ত আকাশ বাতাস জলাশয় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। গাঁদা ফুলের গাছগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। ভোর না হতেই পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা বাগানে এসে জুটত। আঁচল ভরে কুড়িয়ে নিয়ে যেত শিউলি ফুল কাপড় রাঙাবে বলে। ভাবতে ইন্দিরা দেবীর চোখের কোণ সজল হয়ে আসে। মাঝে মাঝে দীনেশ বাবুকে বিব্রত করে তোলেন দেশের বাড়ীর কথা তুলে।

ইলার ছোট ভাই মিন্টু দশ ছাড়িয়ে এগারোতে পা দিয়েছে। প্রথম কোলকাতায় এসে সে-ই অবাক হয়েছিল সব চেয়ে বেশী। মহানগরীর ঐশ্বর্য্য দেখে অপূর্ব্ব অনুভূতিতে তার দেহ-মন ভরে উঠেছিল। দিদিকে সে বার বার বিস্ময়ের নানা প্রশ্ন করেছে। ইলা তার কৌতূহল মিটাতে কখনও জবাব দিয়েছে, কখনও বা একটু হেসেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ,

মিউজিয়াম—সবই সে এ কয় দিনে দেখে এসেছে বিনয়দা'র সঙ্গে, কোলকাতা সহরটা মিনুটুর চোখে যেন একটা বিরাট বিস্ময়ের বস্তু!

কিন্তু তার সেই বিস্ময়ের ধাঁধাও দু'দিনেই কেটে যায়। প্রথম ক'দিন কোলকাতা শহরটা যত ভাল লেগেছিল, এখন যেন তত আর ভাল লাগে না। সবই কেমন একঘেয়ে মনে হয়। বদ্ধ আবহাওয়ায় তার মনও হাঁপিয়ে ওঠে। বাড়ীর পাশে ছিল খেলার মাঠ। বিকেল হতে না হতেই পাড়ার ছেলেরা জুটত এসে খেলার মাঠে, সন্ধ্যে উৎরে যেত, তবু ওদের খেলা শেষ হতে চাইতো না।···দুরন্ত শিশু-মনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

*　　*　　*　　*

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ। বাতাসে থম্‌থম্ করে ধোঁয়া আর স্যাঁৎসেঁতে মাটির ভাপসা গন্ধ। মানুষের মনের সঙ্গে প্রকৃতিও যেন মাঝে মাঝে কেমন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। রৌদ্রহীন দিনে শীতের প্রকোপ বেড়ে উঠেছে। দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে দেবার জন্যেই হয়তো প্রকৃতির এই আয়োজন।

আসবার সময় জিনিষপত্র কিছুই নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। বেনাপোলে দেহতল্লাসী আর মাল আটকের যে ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে পরনের কাপড়-জামা আর সামান্য কয়েকটি নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ ছাড়া অন্যান্য সবই ফেলে আসতে হয়েছে। সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছুই আনা সম্ভব হয়নি। ব্যাঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কেই পড়ে রইল। মাত্র হাজার দুই টাকা অতি কষ্টে বাবা এনেছিলেন ওখানকার এক আড়তদারের সাহায্যে। তাও দেখতে দেখতে কর্পূরের মত উবে গেল। এবার পেটে-পিঠে সমান টান পড়েছে।

দুশ্চিন্তায় দীনেশ বাবু যেন দিন-দিন কেমন হয়ে পড়েন। মুখে কিছু না বললেও, মনের ভিতর রাত্রি-দিন চলে সংগ্রাম। অসহায় হয়ে উপায় খুঁজে বেড়ান। ছেলে-মেয়েদের ছোট থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন। এবার বুঝি অদৃষ্ট সুদে-আসলে আদায় করবে তার খেসারৎ। কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবেন, সেই ভাবনায় আজ তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। এক পয়সা কোন সংস্থান নাই। এর পর যে পরিস্থিতি দেখা দেবে, তা তিনি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারেন। কিন্তু কোথাও কোন অবলম্বন খুঁজে পান না। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান সমাধানের পথ।

বাবার পরিবর্তন ইলার চোখ এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু এত বড় দুর্দ্দিনে কেমন করে নিজেকে তাঁর কাজে লাগাবে, ইলা তা ভেবে উঠতে পারে না। চাকরি বা টিউসানি যা হোক কিছু একটা জোগাড় করে নিতে পারে সে। কিন্তু বাবা হয়তো রাজী হবেন না। তাঁর আভিজাত্যে আঘাত লাগবে, চিরাচরিত সংস্কারে বাধবে। সে সংস্কার ভেঙ্গে ফেলতে পারেনি বলেই, লেখাপড়া শিখেও, কোন দিন চাকরী করেননি। কিন্তু এমনি তিল তিল করে নিজের কাছে পরাজিত হওয়ার চেয়ে চাকরির অগৌরব কি বেশী? ইলার মন বিদ্রোহ করে ওঠে। জীবন-যুদ্ধে নেমে দাঁড়াবার জন্য সে কৃতসংকল্প হয়। সেদিন রমার নাম-রেজিষ্ট্রারীর পালাটা তাকে হঠাৎ যে ধাক্কা দিয়েছিল আজ সেটা আপনা-আপনি যেন অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে আসে। মনে হয়, রমার সাথে আর একবার দেখা হলে ভাল হত।

সকাল থেকেই ইলার মনটা কেমন থমথমে হয়েছিল। মায়ের শরীর ভাল নেই। উনুনে আঁচ দিয়ে চায়ের কেটলিটা হাতে নিয়ে যখন ইলা রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হঠাৎ পিছন থেকে পুরানো চেনা-গলায় কে ডেকে উঠল—"ইলা!"

ইলা চমকে উঠে চায়—"কে? শেখরদা!"

"হাঁ।"—শেখর একটু হেসে এগিয়ে এল ইলার দিকে।

"এত কাল পরে হঠাৎ ধূমকেতুর মত কোথা থেকে এলে?" ইলা প্রশ্ন করে। প্রশ্নের ভিতর সহজ হবার চেষ্টা থাকলেও সংকোচের মাত্রা কম ছিল না।

অনেক দিনের আবছা অতীতটা নিমেষে ইলার চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা।

ইলাদের বাড়ীর পাশেই ওরা থাকত। ছেলেবেলা ইলা ও শেখর পাশাপাশি বড় হয়ে উঠেছিল। শেখর ইলার চেয়ে বয়সে বড়। তবু তার ছোটবেলার সঙ্গী ছিল ইলাই। মিত্তিরদের পেয়ারা গাছে উঠে শেখর পেয়ারা পাড়ত, ইলা নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিত—"ঐ যে, হাতের কাছে ডান দিকের ডালে বড় একটা পাকা পেয়ারা ঝুলছে।"

শেখর পেয়ারাটা ছিঁড়ে নিয়ে দু'-এক কামড় নিজে খেয়ে ছুঁড়ে দিত ইলার দিকে। ইলা রাগ করলে গাছ থেকে নেমে এসে সে পাকা পেয়ারা নজরানা দিয়ে তার রাগ ভাঙ্গাত। সেই অবধি জীবনের মাঝখানে বাধা পড়ল শেখরের বাবার মৃত্যুর পর। শেখরকে চলে যেতে হয়েছিল এলাহাবাদে মামার বাড়ীতে।

তার পর থেকে দু'জনের জীবন-ধারা চলেছে দুই বিভিন্ন পথে। শেখর আই-এ ফেল করে কোন সদাগরী অফিসে চাকরী নিয়েছে। ইলা পোষ্ট গ্রাজুয়েটের পড়া শেষ করে আগামী জীবনের প্রতীক্ষায় আছে।

পুরানো স্মৃতির রেশটুকু হয়তো বা মনের কোণে আজও লুকিয়ে আছে। তবু ইলার মনে শেখরের জন্য কোন বিশিষ্ট স্থান নেই। ইলাকে দেখে প্রথমটা শেখর বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিল। ইলার বলিষ্ঠ চাউনি শেখরকে যেন দূরে সরিয়ে দিতে চায়। ইলার সঙ্গে সে অতীত দিনের আত্মীয়তার সুরে আলাপ করলেও ইলা যেন তাকে ঠিক মেনে নিতে পারে না। শেখর যখন বলল—"লেখাপড়া তো যথেষ্ট শিখেছ, এবার কাজে লাগাও। জীবনে আওয়ায় অব নীড় এসে পড়েছে। চাকরীই হোক, আর টিউসানিই হোক—"

শেখরের অযাচিত উপদেশ ইলাকে আঘাত দেয়। ইলা ভাবে, নিজে লেখাপড়া শিখতে পারেনি বলেই হয়তো শেখর তাকে খোঁচা দেয়। শেখরের প্রস্তাব অসঙ্গত না হলেও ইলা মেনে নিতে পারে না। মুখে শুধু বলে—"ভেবে দেখি কি করবো।"

শেখর একটু বিদ্রূপ করেই বলে উঠল—"ভাবো। ভাবনাই তো এখন একমাত্র সম্বল।"

মনে মনে ইলা বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারে শেখর হয়তো কিছুটা আহত হয়েছে, তবু এ ধরণের অযাচিত উপদেশ সে যেন মেনে নিতে পারেনি। প্রথম দৃষ্টিতেই শেখরকে তার ভাল লাগেনি। শেখরের চোখের সেই স্বাভাবিক দৃষ্টি কেমন যেন বদলে গেছে। যাকে দেখে একদিন নিতান্ত আপন জন বলে মনে হয়েছে, আজ তার মুখপানে চেয়ে ইলা যেন কোন অবলম্বনই খুঁজে পায় না। তাই শেখরকে সে এড়িয়েই গেল।

শেখর একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে, ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভিতরে চলে গেল। ইলা একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। শেখরকে প্রত্যাখ্যান করলেও ইলা স্পষ্ট বুঝেছিল যে, চাকরিই হোক আর টিউসানিই হোক, যা-হয় একটা কিছু জোগাড় করে নিতেই হবে। অন্যের সাহায্য বা সহানুভূতি নিয়ে সারা জীবন চলে না। তিল তিল করে নিজেকে ছোট করার চেয়ে আত্মঘাতী হওয়াও অনেক ভাল। আত্মীয়-স্বজনের সহানুভূতি থেকে তারা দূরে সরে থাকতে চায়। তবুও সহানুভূতি দেখাবার লোকের অভাব হয় না। ইলা অবাক হয়ে ভাবে, এরা তো কোন দিন এমনি করে কথা বলেনি! আজ এই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তাদের এই অযাচিত সহানুভূতি যেন ইলাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অনেকের কাছেই সে শুনেছে—"লেখাপড়া শিখেছ, এবার কাজে লাগাও।"

মনটা বিরক্তিতে ভরে যায়। ইলা তাদের কথায় শুধু একটু হাসে। কোন জবাব দেয় না। একদিন যারা ছিল ওদেরই সহানুভূতির মুখাপেক্ষী, তারাও আজ করুণা দেখাতে ছাড়ে না। এত দুঃখের ভিতরও ইলার হাসি পায়।

* * * *

সেদিন শনিবার। সকাল থেকে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। শীতের বাদলায় হাত-পা যেন আড়ষ্ট হয়ে আসে। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়লে মনে হয় ছুঁচ ফুটছে। কনকনে হাওয়ায় দেহ-মন যেন শুটিপোকার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে চায়।

আচম্কা কড়া নাড়ার শব্দে ইলা একটু সজীব হয়ে উঠল, দরজা খুলে হঠাৎ রমাকে দেখে অপ্রত্যাশিত আনন্দে কলরব করে ওঠে—"যাক, দিনটা তা হলে ভালোই যাবে দেখছি।"

ইলার স্বভাব রমা ভাল করেই জানে। আনন্দে কলরব করে উঠলেও এই কয় দিনে ইলার যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, সেটা রমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। মুখপানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এক নজর চেয়ে বলে—"কি হয়েছে ইলা? এই কয় দিনে চেহারাটা যেন তোর দশ বছর এগিয়ে গেছে! অসুখ-বিসুখ—?"

বলতে বলতে রমা ভিতরে এল।

হাসিমুখে ইলা জবাব দেয়—"অসুখ নয়, তবে বিসুখ বলতে পারিস্। নিরবচ্ছিন্ন অবসর আর ভাল লাগে না। হাঁপিয়ে উঠেছি। আমায় কোন ইস্কুলে একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারিস্?"

ইলার কথায় রমা চমকে উঠল। তবে কি ইলার জীবনেও আজ সমস্যা দেখা দিয়েছে? মনের জিজ্ঞাসাটা গোপন করে রমা মুখে বলল—"চাকরী দিয়ে কি হবে ইলা? তার চেয়ে এবার পরীক্ষাটা দিয়ে দে না। কোর্স তো কমপ্লিট করাই আছে।"

ইলা চুপ করে রইল। রমার কথায় কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না, নিঃশব্দে শাড়ীর আঁচলটাকে আঙুলে জড়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বলল—"না, পরীক্ষা এবারও দেওয়া হবে না। চাকরি একটা চাই-ই। না হলে সংসার চলবে না। সংস্থান যা ছিল সবই গেছে, তবু বাঁচতে তো হবে রমা!"

রমা ইলার কথায় কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হয়ে রইল। ইলার মনের অবস্থা বুঝতে তার এক মিনিটও দেরী হল না। কিন্তু নিজেই সে চাকরির জন্যে লোকের দরজায় ধন্না দিয়ে বেড়াচ্ছে। ইলাকে কি করে ভরসা দেবে বুঝতে পারে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে, শুধু ইলার কথাটাকে সায় দেবার জন্যে রমা বলে উঠল—"তেমন জানা-শোনা তো নেই এখানে। তবে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নামটা রেজেষ্টারী করে এসেছি, চাকরির খবরাখবর তারাই দেবে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে এই আড়কাঠি অফিস খোলা হয়েছে। এখান থেকে লোকে চাকরির সন্ধান পায়, আমাদের সেই বিপুলাদির কথা মনে আছে? অসীতা বোস্, মোটা বলে সবাই যাকে বিপুলাদি বলতো; ভাল চাকরি পেয়েছে সরকারি অফিসে।"

"বিপুলাদিই বটে!" ইলা একটু হাসে। তার পর কি ভেবে নিয়ে বলে—"সুবিমল বাবুর ঠিকানাটা জানিস্? চেষ্টা করলে বোধ হয় কোন ইস্কুলে তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।"

ইলার মুখপানে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে রমা একটু হেসে বলে—"তিন-চার মাস আগে একদিন দেখা হয়েছিল। ভূপেন বোস এভেনিউএ থাকেন। নম্বরটা ঠিক জানি না। বাড়ীটা চিনি।"

হঠাৎ ইলার মনে পড়ে গেল পুরানো দিনের কথা। বছর দুই আগে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের এক সভায় সুবিমল সেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

অন্যমনস্কতার ঝোঁকটা কাটিয়ে নিয়ে ইলা জিজ্ঞেস করে, "যাবি একদিন? একবার দেখা করতাম—"

"আপত্তি কি?"—রমা মুচকি একটু হাসে। ইলার মনের গোপন দুর্ব্বলতা তার অজানা ছিল না।

ইলা ইচ্ছে করেই রমার চোখের দিকে চাইল না। রমা আরও কি বলতে গিয়ে যেন হঠাৎ থেমে গেল। কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব রইল।

বাইরে বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে রমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। যাবার বেলায় ইলা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জে নাম লেখাবার কথা।

রমা চলে যাবার পর ইলা অনেকক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আলো তখন প্রদীপ জেলে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। ইলা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

* * * *

ডালহৌসী স্কোয়ার। কর্ম্মব্যস্ত মহানগরীর স্নায়ুকেন্দ্র। বেলা ন'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত চঞ্চলতায় মুখর ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তার পর অস্তগামী সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে নিঝুম হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে রাতের অন্ধকারে। মনে হয়, যেন রূপকথার অভিশপ্ত রাজপুরী। সকালের সূর্য্য এনে দেয় জীবন-কাঠির স্পর্শ আর সন্ধ্যার অন্ধকার ছুঁইয়ে দেয় মরণ-কাঠি। লালদীঘির আশ-পাশের সেই কর্ম্মচঞ্চল রূপ ইলা কোন দিন প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পায়নি। বেলা দশটায় পথের দিকে চাইলে মনে হয়, আসন্ন প্রলয়ের সংকেতে লোকগুলো যেন আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্যে শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দ্রুতগামী ট্রাম-বাস, গাড়ী-ঘোড়ার ফাঁকে ফাঁকে অস্থির মানুষগুলো কিলবিল করে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পলে পলে জীবনকে বিপন্ন করার এই সমারোহ ইলাকে যেন কেমন বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। মুখে কিছু না বললেও অভিভূতের মত সে রমার পিছু-পিছু চলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দিকে।
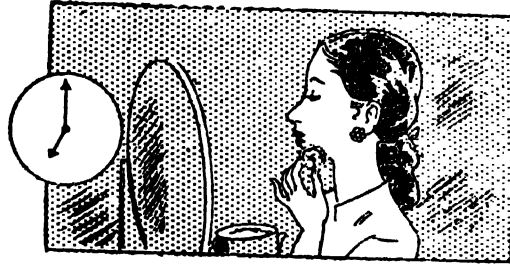
তখন বেলা দশটা বেজে গেছে, উঠি-পড়ি করে হতভাগ্য ডেলি-প্যাসেঞ্জার আর অর্দ্ধভুক্ত চাকরিজীবীরা ছুটে চলেছে অফিসের দিকে। তাদের মাঝে মাঝে চক্‌চকে বুট আর ইস্তিরী করা স্যুটের আবরণে মেটে, বাদামী, কালো—নানা রঙের মানুষগুলো কলের পুতুলের মত হন্‌-হন্‌ করে এগিয়ে চলে। এদের বেশভূষায় চাল-চলনে এতটুকু মলিনতা নেই। গর্ব্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে আপন-আপন রুজিখানার দিকে। এরাই সব ছোট-বড় নানা অফিসের ছোটখাটো মনসবদার! মেটে ইণ্ডিয়ান হলেও অফিসে এঁরা সাহেব নামে অভিহিত।

ডালহৌসীর মোড়ে ফিরে কৌন্সিল হাউসের দিকে কিছুটা এগিয়ে রমা বলে উঠল—"এটাই হচ্ছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ—অর্থাৎ চাকরির আড়কাঠি, বুঝলি? এখানেই নাম রেজিষ্ট্রারী করতে হয়।"

ইলা এক মিনিট তাকিয়ে দেখে নিলে। মস্ত বড় সাইনবোর্ডে লেখা সরকারি নির্দ্দেশ। দু'খানা হাতের করমর্দ্দন ছবিতে—প্রভু ও ভৃত্যের মিতালির সংকেত। রাইট মেন ফর রাইট ওয়ার্ক।

রমা আগে চলে। ইলা তার পিছু-পিছু চলে নূতন পরিবেশের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে। পুরুষের উদগ্র দৃষ্টি যেন ঘূর্ণী বাতাসের খড়-কুটোর মত ওদের দেহকে কেন্দ্র করে ঘূরপাক খেয়ে যায়। ইলা নিজে বেশ খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু রমা ইতিমধ্যে দু'-এক বার সেখানে এসেছে, তাই আবহাওয়াটা কতকটা তার গা-সহা হয়ে পড়েছিল। দু'জনে গিয়ে ঢুকল ম্যানেজারের ঘরে। দরজায় নাম লেখা: "মিস্ ধীরা রায়—"

মিস্ রায় ইলার চেয়ে বয়সে বড় বলেই মনে হয়। চেহারা বাঙ্গালী মেয়েদের তুলনায় হয়তো বা একটু বেশী লম্বা। বেশভূষা ও চালচলনে পুরা মাত্রায় আধুনিকা। পরনে হাল্কা পিঙ্ক রংয়ের জর্জ্জেট। গতিভঙ্গীর চেষ্টিত স্মার্টনেস চঞ্চলতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। চোখে রীমলেশ নীলাভ পিংটো চশমা। মুখের মিষ্টি হাসিটুকু বেশ লাগে। ইসারায় ওদের বসতে বলেন। ওপাশে আরও দু'-চার জন মহিলা বসে আছেন। হয়তো ওদের মতই এসেছেন চাকরির সন্ধানে। তাঁদের চোখ-মুখ দেখে অবস্থা শোচনীয় বলেই মনে হয়। ইলা নিবিষ্ট মনে তাঁদের কথাই ভাবছিল। হঠাৎ তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল মিস্ রায়ের কথায়—"আসুন, ফর্মটা ফিল-আপ করে দিন। নাম, ঠিকানা, কত দূর পড়েছেন, সবই লিখে দিতে হবে।"

ভদ্রমহিলার মিষ্টি ব্যবহারে অনেকখানি প্রীত হল। চাকরির উমেদার বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করবেন ভেবে, ইলার মনে বেশ একটু অস্বস্তি ছিল। নির্দ্দেশ মত ফর্মখানা লিখে তার হাতে দিয়ে, ইলা নীরবে একটু হাসল।

মিস্ রায় ইলার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বললেন—"আপনার নাম এনলিষ্টেড হয়ে রইল। কাজের খোঁজ এলে আপনার ঠিকানায় চিঠি যাবে। তিন মাসের ভিতর কাজ না হলে, কার্ডখানা আবার রিনিউ করে নিতে হবে। এখানেই আসবেন।"

'ধন্যবাদ!'—ইলা ছোট একটি নমস্কার করে বেরিয়ে এল মিস্ রায়ের ঘর থেকে।

ইলার সৌভাগ্যে একটু ঈর্ষা প্রকাশ করে, রমা মিস্ রায়কে শুনিয়ে বললে—"ইলার বরাতটা তা হলেই ভালই বলতে হবে। দু'-চার দিন ঘুরতে হল না।"

মিস্ রায় মুখ তুলে হাসলেন।

ওরা দু'জনে আবার পথে এসে দাঁড়াল। ইলা তখনও অন্যমনস্ক ছিল। জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করল আজ, তাতেই সে যেন অভিভূত হয়েছিল।

"কি ভাবছিস্?"—ইলার হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে রমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

"ভাবছি অফিস-পাড়ায় পা বাড়াতেই ছেলেরা ঢিল-খাওয়া মৌমাছির মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি এসে বসলে না-জানি কি অবস্থা হবে!"—ইলা হাসবার চেষ্টা করে কিন্তু হাসি ফোটে না।

"দু' দিন চঞ্চল হবে। তার পর দেখবি, ধীরে ধীরে সব স্থির হয়ে গেছে।"—রমা অভিভাবিকার সুরে বলে।

কথায় কথায় ওরা দু'জনে এসে পড়ল এস্‌প্ল্যানেডের কাছাকাছি। মোড়ের মাথায় একটু থেমে রমা জিজ্ঞেস করে—"এবার কোথায় যাবি? বালিগঞ্জ না শ্যামবাজার।"

"শ্যামবাজার?"—ইলা বক্র দৃষ্টিতে রমার মুখপানে চায়।

রমা কণ্ঠস্বরটা আরও সহজ করে নিয়ে বলে—"সেদিন বলেছিলি কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

রমার ইঙ্গিতটুকু বুঝতে ইলার দেরী হয় না। মুখ টিপে একটু হাসে। কোন উত্তর দেয় না।

সামনের টাওয়ার ক্লকটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে রমা বলে—"এখন সাড়ে এগারটা—একটার ভেতর আমায় ফিরতে হবে। ছাত্রী আছে। আসছে বুধবার তার পরীক্ষা।"

রমার কথা যেন ইলার কানে পৌঁছয় না। হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। রমা হাত ধরে একটা চাপ দিতেই সলজ্জ হাসির সঙ্গে ইলা তার মুখপানে চাইল।

রমা জিজ্ঞেস করে—"এত তন্ময় কেন? সত্যি বল তো, কি ভাবছিলি? ডক্টর সেনের কথা?"

"না, ঠিক তা নয়। ভাবছিলাম, ভদ্রলোকের বলবার ভঙ্গী ভারি চমৎকার। যেমন ফোর্সফুল তেমনি ইম্‌প্রেসিভ।"

রমা একটু হেসে প্রশংসমান সুরে বলে উঠল—"ব্রিলিয়াণ্ট! সত্যি ইম্‌প্রেসিভ। মনে যে গভীর দাগ কাটে, তা মুছে ফেলা যায় না।"

এবার রমা খিলখিল্ করে হেসে উঠল। রমার ইঙ্গিতটুকু বুঝতে ইলার দেরী হল না। কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলল—"বাড়ীই ফিরি। পথে পিসীমার ওখানে একবার নেমে যাব। কাল বিকেলে আসছিস্ তো?"—রমাকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে, ইলা হাসতে হাসতে উঠে পড়ল কালীঘাটের ট্রামে।

* * * *

বৈচিত্র্যহীন দিনগুলো একের পর এক নিঃশব্দে কেটে যায়, মনের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও দাগ কাটে না। সংসারের খুঁটিনাটি, আগে যা চোখে পড়ত না, এখন যেন সেগুলো বড় হয়েই দেখা দেয়। কোন অবলম্বন নাই। অলস মন চিন্তার জাল বুনে যায়। কয়েকটি মাসের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে জীবনে যে পরিবর্ত্তন এল, তাকে মূল্য না দিলেও ইলা আজ অস্বীকার করতে পারে না। মনে হয়, বয়েসটা বোধ হয় দশ বছর এগিয়ে

গেছে। ছেলেবেলার হাস্তচঞ্চল মুখর দিনগুলো মাঝে-মাঝে বর্ত্তমানের কালো পর্দায় ভেসে ওঠে। সেদিনের অতীতকে আজ শুধু স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আনন্দের চেয়ে দুঃখের বোঝাই বাড়িয়ে তোলে। তবুও অতীতকে ভাল লাগে। অনিমা, অরুন্ধতী, অলকাদি—যূথিকা, রতনদা, শৈবাল—বিস্মৃত গল্পের এক-একটি স্পষ্ট-অস্পষ্ট মানুষের মত মনের ভিতর উঁকি দেয়।

সেদিন মন্দির থেকে বেরুতেই দেখা হল অনিমার সঙ্গে। কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে! চিনতে কষ্ট হয়।

অনিমা ইলার বাল্যবন্ধু। ক্লাস ফোর থেকে দু'জনে একসঙ্গেই পড়ে এসেছে বি-এ পর্য্যন্ত। বি-এ পাশ করার পর ইলা চলে এসেছিল কোলকাতায় এম-এ পড়তে। অনিমার সে সুযোগ হয়নি। পাশ করে সে স্থানীয় ইস্কুলে চল্লিশ টাকা মাইনের একটা কাজ নিয়েছিল—কাজ মানে মাষ্টারি। অনিমার সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান যে ইলার ছিল না, তা নয়। কিন্তু তার অবস্থা যে এত শোচনীয় হয়ে পড়েছে এ কথা ইলা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। তাই অনিমাকে দেখে ইলা চমকে উঠল, দু'হাতে জড়িয়ে বিহ্বল ভাবে ইলা প্রশ্ন করল—"এত্তো বদলে গেছিস্?"

"ইলা!" অনিমা অপ্রত্যাশিত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—"বদলে যাওয়া কি অস্বাভাবিক ইলা? এত বড় ঝড়-ঝাপটার ভেতর দিয়েও যে বেঁচে আছি আজও, সেটাই তো আশ্চর্য্য!"

"সে তো তোর একার নয় অনিমা! পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা কেউ তো বাদ যায়নি।"—ইলা সান্ত্বনার সুরে বলে ওঠে।

"তা যায়নি, ঠিক। তবে—যাক সে কথা। কোথায় আছিস্ তোরা?"

"এই তো কাছেই, চল। মা খুব খুসী হবেন। তা ছাড়া কত কথা জমে আছে!"—অনিমাকে এক রকম টানতে টানতেই নিয়ে চলল তাদের বাড়ীর পথে।

পথে যেতে যেতে মুখ টিপে একটু হেসে ইলা প্রশ্ন করে—"রতনদা এখন কোথায় অনি?"—

ফিকে হাসির সঙ্গে অনিমা জবাব দেয়—"এখানেই।" আরও কিছু বলতে গিয়ে সে যেন হঠাৎ থেমে যায়।

"থাম্‌লি কেন?"—অনিমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ইলা হাসে।

"বলবার মত কিছু নেই। তিনি আর এখন ডাকঘরের কেরাণী নন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বড় পোষ্ট পেয়েছেন সরকারি অফিসে।"—নিতান্ত সহজ ভাবে অনিমা জবাব দেয়।

"তাই নাকি? ভাল খবর বলতে হবে।"—ইলা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

এক মিনিট কি ভেবে নিয়ে একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে অনিমা আবার বলে—"হ্যাঁ, সুখবর তো নিশ্চয়ই। লেট দেম বি হ্যাপি। ওরা সুখী হোক্।"

"তার মানে?"—ইলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

শান্ত ভাবেই অনিমা বলে চলে—"রতনদা বিয়ে করেছে। গত শ্রাবণে। এক রিটায়ার্ড সাবজজের মেয়েকে। নাম রীতা।"

"তাই নাকি!"—কথাগুলো ইলাকে যেন হঠাৎ কেমন ধাক্কা দেয়।

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরবে এগিয়ে যায়। ইলা ভাবে প্রসঙ্গটা না তুললেই ভাল হত। তার এই অহেতুক কৌতূহল হয়তো অনিমাকে অনেকখানি ব্যথিত করে তুলেছে। অবস্থাটা একটু সহজ করে নেবার চেষ্টায় অনিমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ইলা বলে—"যা চাই, তা পাই না। যা পাই, তা চাই না।···সবিতারা এখন কোথায় অনি?"

"নৈহাটীতে। সুনীল বোধ হয় এখানেই কি কাজ করে।"

দেখতে দেখতে ওরা এসে পড়ে ইলাদের বাড়ীর দরজায়। অনিমাকে দেখে ইন্দিরা দেবী সত্যি খুব খুশী হলেন।

অনিমাকে কাছে পাবার আনন্দ যত বেশীই হোক না কেন, ইলা রতনদার আচরণের কথাটা যেন এক মুহূর্ত্তও মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। রতনদা যেদিন যুদ্ধে যায়, সেদিনের কথা আজ সব চেয়ে বেশী করে মনে হচ্ছিল। ওদের বাড়ীর পিছনে করবীতলায় দাঁড়িয়ে সবিতা রতনদাকে জিজ্ঞেস করেছিল—'কেন বণ্ড লিখে যুদ্ধে যাচ্ছেন? এর মধ্যে তো অনেক কিছু বদলে যেতে পারে।' রতনদা নির্লিপ্ত ভাবে বলেছিল—'সব বদলে গেলেও তুমি তো বদলাবে না!' সবিতা একটু ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—'না, সে বদলাবে না।' ভুল হয় তো সবিতার হয়নি, হয়েছিল রতনদার। সবিতা সত্যিই বদলায়নি।

অনিমা জানতো রতনদা সবিতাকে ভালবাসে। কিন্তু সবিতার মনে কোন দিনই সে ভালবাসা ছায়াপাত করেনি। রতনদা ছিল অনিমার দাদা অনিমেষের বন্ধু। তার বেশী কোন পরিচয়ই তার ছিল না সবিতার কাছে। সবিতার বাবা রিটায়ার্ড ডিপুটী

ম্যাজিস্ট্রেট। ডাকঘরের সামান্য এক কেরাণীর কাছে তিনি কোন দিনই মেয়ে দেবেন না। এ কথা তিনি যতখানি জানতেন, সবিতাও তার চেয়ে কম জানত না। তাই রতনদার মনে যেটা ছিল স্বপ্ন, সবিতার মনে তার কল্পনাও কোন দিন উঁকি মারেনি।

সবিতার এই উদাসীনতাই হয়তো রতনদাকে যুদ্ধে বণ্ড সই করবার প্রেরণা দিয়েছিল সব চেয়ে বেশী। কিন্তু তার সেই প্রচ্ছন্ন অভিমান সবিতাকে আঘাত করেনি, আঘাত করেছিল অনিমাকে। রতনদা নিজে মুখে কোন কথাই অনিমাকে বলেনি। সে শুনেছিল অনিমেষের কাছে। সেদিন অন্যের অগোচরে চোখের যে জল গড়িয়ে পড়েছিল, তা শুধু অনিমার অন্তর্যামীই জানতেন। মনের কথা সে কোন দিন মুখ ফুটে বলতে পারেনি। কিন্তু রতনদা তার সবটুকু অস্তিত্ব নিঃশেষে গ্রাস করেছিল।

যাবার দিন অনিমা রতনদাকে প্রণাম করে শুধু বলেছিল—"গিয়ে চিঠি দেবেন তো?"

হেসে রতনদা জবাব দিয়েছিল—"চিঠি চাও? লিখবো।"

চিঠি রতনদা সত্যিই দিয়েছিল। কিন্তু অনিমাকে নয়, সবিতাকে। ট্রেণিংএ গিয়ে সে প্রথম সবিতাকেই চিঠি দেয়। কিন্তু সবিতা হয়তো ইচ্ছে করেই কোন উত্তর দেয়নি তার। নানা ক্লাব ও সোসাইটি নিয়ে সবিতা বেশীর ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকত। অকারণ চিঠি লিখবার অবসর হয়তো সত্যিই ছিল না তার। এদিকে অনিমা প্রতি সপ্তাহে রতনদাকে চিঠি দিত। বিদেশে হয়তো অনিমার চিঠিই হয়ে ওঠে রতনদার কাছে একান্ত আকর্ষণীয়! প্রতিদিন কাছাকাছি পেয়েও যে কথা অনিমা প্রকাশ করতে পারেনি, দূরে যাবার পর মনের সে ভাবকে আর সে চেপে রাখতে পারল না। ধীরে ধীরে অনিমা আর রতনদা দু'জন দু'জনের কাছে সহজ হয়ে উঠেছিল।

বাবার অমতেই সবিতা বিয়ে করল কমরেড সুনীল বোসকে। ওরা দু'জনে একই পার্টির সভ্য। অনিমার চিঠিতে সে খবর পেয়ে রতনদা লিখেছিল—"অস্তমিত সূর্য্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা বৃথা। শীঘ্রই দেশে ফিরব। নতুন করে স্বপ্নলোকের রাজধানী গড়ে উঠবে। রাজকন্যা যেন ঠিক থাকে।"

যুদ্ধ শেষ হল। রতনদা ফিরে আসার পর অনিমেষ তার কাছে অনিমার বিয়ের প্রস্তাব তুলতে—রতনদা হেসে বলেছিল—"তুমি না বললে, নিজেকেই বলতে হত!"

অনিমেষের বুক আনন্দে ভরে উঠেছিল।

অনিমা সে কথা শোনেনি, তা নয়।

বিয়ে বাড়ীর ঝাল চাটনী

শোভা হুই

বর্দ্ধমানের বিশিষ্ট উকিল শ্রীযুক্ত কেদার দত্তের ছোট মেয়ে রাগিণী দেবীর বিয়ে। রাগিণী ম্যাট্রিকের পর কলকাতায় মাসীর বাড়ীতে থেকে আই. এ, বি. এ পাশ করেছে। সম্প্রতি এম, এ পড়তে পড়তে এক সহপাঠীর প্রেমে পড়ে। দু'জনেই অত্যন্ত আতুর। ভাবলে, রেজেষ্ট্রী করে বিয়েটা হয়ে যাক, তার পর ধীরে-সুস্থে অভিভাবকদের জানানো যাবে। কারণ অমরেশের পিতা-মাতা এই বিয়েতে যে মত দেবেন না, তা সে ভালো করেই জানে। অবশ্য রাগিণীর মাতা-পিতা যে অমরেশকে জামাতা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাবেন সেদিকে সন্দেহ করবার কোন কারণই নেই, কাজেই প্রস্তাবটা অমরেশই দিল রাগিণীকে। কাজটা একবারে সেরে নিয়ে তার পর বাবাকে জানালে ভাল হয়।

অমরেশকে কষ্ট করে তার বিয়ের খবরটা জানাতে হোল না। লোকমুখে অমরেশের বিয়ের কথাটা শুনে কর্ত্তা একবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। গৃহিণী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। বললেন, রেগে-মেগে চেঁচিয়ে আর লোক হাসিয়ো না। ছেলে পছন্দ করে বিয়ে করেছে তাতে রাগের কিছু নেই। স্বজাতের মেয়ে। ব্যস্। এমনও তো হতে পারত, বেজাতের মেয়েকে ঘরে তুলেছে!"

কর্ত্তা কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "দূর করে দিতাম।"

ঠোঁট টিপে হেসে গৃহিণী বললেন, "সেদিন আর নেই।"

যথাসময়ে পাত্রের বিবরণ সহ কেদার দত্তের কানেও কথাটা পৌঁছল। তিনি আনন্দে উছলে উঠলেন। কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মণি বোসের একমাত্র ছেলেকে বিয়ে করেছে রাগিণী? বেশ করেছে। কাজের মত কাজ করেছে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন তিনি গৃহিণীকে, "আমার জীবনে এই শেষ কাজ। মনে হয় না আমার শ্যামলকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারব, কি বল?"

—"সে কি আর বলা যায়! সবই ভগবানের হাত।"

—বড় ঘরের, বড় লোকের ছেলেকে বিয়ে করেছে রাগিণী। ওকে আনতে লিখে দাও মাসীর সঙ্গে। হিন্দুমতে বিয়েটা বেশ ধুমধাম করে দেবার ইচ্ছে আমার। কালই কলকাতা যাব। মণি বোসের সঙ্গে দেখা করে দিন ঠিক করে আসতে।"

—তুমিই তো রাগিণীকে নিয়ে আসতে পার।"

—"আচ্ছা।"

ছোট মেয়ে রাগিণীর বিয়ে। নিমন্ত্রণলিপি পাঠালেন কেদার দত্ত সব আত্মীয়-স্বজনের কাছে এবং শুধু নিমন্ত্রণলিপিই নয়, তাতে বিশেষ অনুরোধ জানালেন আসবার জন্যে। পথ-খরচও পাঠিয়ে দিলেন সকলকে। গৃহিণীর তিন বোন, চার ননদ, জা দু'জন, আর খুড়তুত, জ্যাঠতুত জা, ননদ আট-দশ জন, মেয়ে তিনটি। তাছাড়া দূর-সম্পর্কের প্রায় সকল আত্মীয়কেই কেদার বাবু মনের আনন্দে বিশেষ অনুরোধ করে আসতে লিখলেন। বিয়ের কয়েক দিন আগে থেকেই বাড়ী লোক-জনে গমগম্ করতে লাগল। ভোর থেকে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ীতে হাট বসে গেল। গৃহিণী প্রত্যূষেই স্নান সেরে কোন রকমে একবার জপের মালা ঘুরিয়ে নাবেন সংসারের কাজে। একরাশ ভিজে চুল টেনে একটা হাত-খোঁপা করেন, তার পর আঁচলে একরাশ চাবির গোছা বেঁধে চরকি ঘুরতে থাকেন। কা'কে জলখাবার দিতে হবে, কি কি রান্না হবে, কোথায় কোন্ জিনিষ থাকবে, কে কোথায় মুখভার করল মান ভাঙ্গাতে হবে, কে
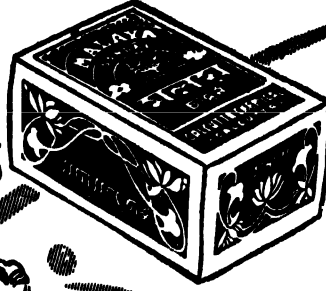
আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্যের জন্য
ক্যালকেমিকোর
মলয় চন্দন সাবান
শরীর স্নিগ্ধ রাখে চন্দনের গন্ধে চিত্ত প্রসন্ন করে।
ক্যাষ্টরল ...
সুপরিশ্রুত মধুর সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল। ব্যবহারে চুল ঘন, চিকণ ও রেশমের মত মসৃণ হয়।
লাবণি স্নো ও ক্রীম
মুখের শ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য্য।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯
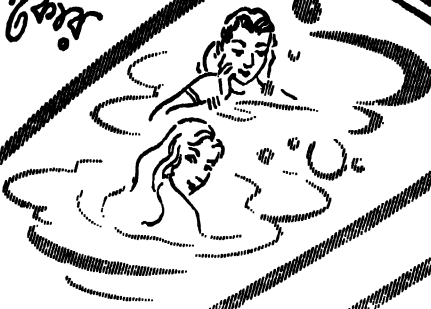
রাগ করল মিষ্টি কথায় তুষ্ট করতে হবে, ঝি-চাকরের নালিশের মীমাংসা করতে হবে, হাজার বার পয়সা দিতে হবে টুকটাক জিনিষ কেনার জন্তে, এমনি আরও কত কি! সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আর আরাম নির্ভর করছে গৃহিণীর উপর। গৃহিণীও যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন নিমন্ত্রিতদের খুশী করবার, লক্ষ্য রেখেছেন তাদের সুখ-সুবিধার দিকে কিন্তু তবু কি মন পাওয়া যায়? কোথায় যেন ত্রুটি রয়েই যাচ্ছে।

বিয়ের দানের জিনিষ একটা ঘরে সাজানো। রাগিণীর বড় তিন বোন—নলিনী, শিখারাণী, স্মৃতিরেখা। তন্ন-তন্ন করে শ্যেন-দৃষ্টিতে দেখে বললে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে, "দেখছিস, মায়ের কি অন্যায়! আমাদের বেলায় দিয়েছিলেন ড্রইংরুম সেট? দিয়েছিলেন ডাইনিংরুম আর বেডরুম এমন করে নিখুঁত ভাবে সাজিয়ে? সেই মামুলি একটা খাট, একটা আলমারি আর দুটো চেয়ার দিয়ে বিদায় করেছেন।"

মেজো শিখারাণী বললে, "কাঁসার বাসনও এত ভারী দেননি।" স্মৃতিরেখা বললে, "তোমরা তুলনা করে আর লোক হাসিয়ো না। কি দিয়েছেন আমাদের? কিছু না। দিয়েছিলেন রূপোর বাসন? দিয়েছিলেন জড়োয়া সেট গয়না? দিয়েছিলেন সিল্কের তোষক-বালিশ? যাক গে, চুপ করে দেখে যাওয়াই ভাল।"

বড় মেয়ে নলিনী উপহাসের সুরে বললে, "যেমন পাত্র তেমন দান। আমরা তো বড় লোকের একমাত্র ছেলে পাকড়াতে পারিনি।"

এমন সময় কি কাজে গৃহিণী এসে পড়লেন সেই ঘরে। কথাটা কিছু কিছু কানে গিয়েছিল, তাছাড়া মেয়েদের থমথমে মুখ দেখেও আন্দাজ খানিকটা অনুমান করেছেন, ভাবলেন মনে মনে, মেয়েদের মনে কষ্ট হওয়া তো অন্যায় নয়! ওদের বিয়েতে এর সিকিও পায়নি। অপরাধী ভাবে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, "তোদের বিয়েতে মা কিছুই দিতে পারিনি। তখন ওঁর উপায়ও কম ছিল, আর তাছাড়া ওঁর জীবনে বোধ হয় এই শেষ কাজ। তোমাদের বিয়ে কি দিয়ে যেতে পারবেন? খরচও অবস্থার বেশীই হয়ে গেল।"

নলিনী বললে, "কথাটা যখন নিজে থেকে তুললেই মা তুমি, তখন বলি, আমাদের কিছুই না দিয়ে আর এক জনকে ঢেলে দেওয়া, লোকচক্ষে কেমন দেখায়?"

শিখারাণী বললে, "সবাই যখন পাঁচ কথা আলোচনা করবে তখন আমরা সইব কি করে তাদের কথা? আমাদের শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা তো যা-তা বলবে তোমাদের। সে সব কথা শুনব কি করে বল তো?"

স্মৃতিরেখা বোনদের দিকে চেয়ে বললে, "শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বলুক গে যাক। তাদের যেমন মর্য্যাদা তেমন পেয়েছে, রাগিণী কত বড় লোকের বাড়ীতে বিয়ে করছে, খেয়াল আছে তোদের? রুই-কাতলা আর চুণোপুঁটির সমান দর নাকি?"

গৃহিণী নিজের মেয়ের কথার হুলের বিষে জর্জ্জরিত হয়ে বললেন, "তোরা রাগ করিস কেন? সব সময় কি মানুষের সমান অবস্থা থাকে? তোদের বিয়েতে তিন-চার হাজার করে পণ গুনতে হয়েছে। এখানে তো কোন পণ দিতে হবে না। তাছাড়া স্বীকার তো করছিই ওকে বেশী দেওয়া হয়ে গেল। তা বলে কি তোদের ভালবাসি না? সব জামাই আমাদের চোখে সমান। সন্তান কি কখনও মা-বাপের চোখে ভিন্ন হতে পারে?"

বড় মেয়ে বললে, "তাই তো জানতাম মা এত দিন। কিন্তু তুমিই আমার ভুল ভাঙালে। আমরা তো বানের জলে ভেসে আসিনি? আমাদের তো গর্ভে ধরেছিলে তুমি?"

শিখা বললে, "মা-বাপের এ রকম একচোখোমি কি ভাল?"

মেয়েদের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হয়ে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, "তোরা রাগ করিস নে, ছোট বোনটি না হয় পেলই একটু বেশী।" তার পর ঢোক গিলে বললেন, "তোদেরও একখান করে যাবার সময় গয়না গড়িয়ে দেব।"

তিন বোনেই বলে উঠলো—চাই না মা তোমার গয়না। তোমার ছোট মেয়েকেই বরং আরও দু'-একখান গড়িয়ে দিও।"

আর এক ঘরে খুড়তুত, জ্যেঠতুত জায়ের দল চা খাবার খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করছে। এক জন বললে, "কাল সারা রাত মশার কামড়ে ঘুম হয়নি।" আর এক জন ফোড়ন কাটলে, "একে অবেলায় খাওয়া তাতে আবার রাতে ঘুম নেই।"

মস্ত বড় একটা রাজভোগে কামড় দিতে দিতে তৃতীয় জন বললে, "তাই জন্তে আমার শরীর ভাল নেই ভাই! ম্যাজ-ম্যাজ করছে। পেটও ফুটফাট করছে। নিয়মের শরীর আমার। অনিয়ম একবারে সহ্য হয় না।"

আর এক জন বললে, "অনিয়ম কারই বা সহ্য হয়? পাওনার লোভে লোক জমালেই হোল? তাদের ভাল করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় না?"

বিধবা বোনেরা ভাঁড়ারে তাদের সুখ-দুঃখের কথায় ব্যস্ত। চার দিকেই লোক থৈ-থৈ করছে কিন্তু কাজ করবার লোক নেই। গৃহিণী জায়েদের মিনতির স্বরে বললেন, "ভাই, তরকারিগুলো একটু কুটে দাও, আঁচ কামাই যাচ্ছে।" মেয়েদের বললেন, "গায়-হলুদের তত্ত্বটি ঠিক মত সাজিয়ে দে। সময় হয়ে এল পাঠাবার।"

মেজো মেয়ে বললে, "মা, টুলুকে দুধ খাওয়াব, বার্লি কোথায়?"

গৃহিণী বললেন, "নিরিমিষ-ঘরে তোর পিসীদের কাছে আছে দুধ, বার্লি, মিছরী সব। নিগে যা সেখান থেকে।"

পিসীরা তখন নিরিমিষ-ঘরে তাদের রান্নায় ব্যস্ত। শিখা গিয়ে বললে, "পিসীমা, টুলুর একটু দুধ-বার্লি দাও।"

—"দাঁড়া দিচ্ছি। হাতের কাজটা সেরেনি। বাটি এনেছিস্?"

—"ওহো, ভুলে গেছি তো? দাও না তোমাদের একটা বাটিতে।"

—"না না, তা হতে পারে না। দেবতা-ব্রাহ্মণের ভোগে লাগে এ সব বাসুন, তুই একটা বাটি নিয়ে আয়।"

শিখা ছেলে কোলে বাটি আনতে গিয়ে তরকারি কোটার দলে বসে পড়ল। জ্যেঠি, কাকী আর কয়েক জন প্রতিবেশিনী তরকারি কুটতে কুটতে গল্পে একবারে মশগুল। তখন পাড়ার বড়মা তাঁর মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর ঐশ্বর্য্যের কথা পেড়েছেন। সুবিধে পেলেই তিনি মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর গল্প করতে ছাড়েন না। বললেন তিনি, "মাধুর আমার বেলা ন'টার আগে বিছানা থেকে উঠবার হুকুম নেই। তারপর ঘুম থেকে উঠতে না উঠতে দাসী আনলো এক গেলাস পেস্তার সরবৎ। মাধু বলে, মা, দিন-রাত খাওয়ার চর্চ্চা। এত খাই কি করে বল তো?"

শিখা বললে, "সত্যি বড়মা, বলতে নেই মাধুদির কপাল ভাল।"

বড়মা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "তা আর বলতে মা! ভগবানের আশীর্বাদে মাধু আমার রাজরাণি হয়েছে।"

পাড়ার খুড়ীমাই বা বড়মার অত অহঙ্কার সহ্য করবেন কেন? অন্ততঃ কিছু উত্তর দেওয়া তো উচিত। তাঁর জামায়ের কাছে ওঁর জামাই? মুখখু আর বিদ্বান অনেক তফাৎ। বললেন তিনি ছড়া কেটে, "বিদ্বান সর্ব্বত্র পুজ্যতে", প্রথম দিকটা লাইনটিতেই সব বোধ হয় ভুলে গেছলেন। তা যান, বুঝতে পারলে শেষের অর্থ। ছড়া কেটেই থামলেন না। বললেন স্পষ্ট করে, "আমার জামাই কলকাতার সরকারী কলেজের প্রফেসার। কত 'তার সম্মান! সভা-সমিতি'ওকে না হলে চলবেই না। সব জায়গায় ওকে হতে হবে সভাপতি। এক-এক দিন যে ফুলের মালা পায়, জানিস মা শিখা, এই এ্যাত"—"বলে তাঁর হাত দুটি এক মানুষ সমান উঁচু করলেন। জ্যেঠী-খুড়ীর দল মুচকী হেসে বললো, "তা তো ঠিক দিদি! বিদ্যা না থাকলে চলে আজকালকার যুগে?"

বড়মা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "টাকা না থাকলে এক পাও চলে না। সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব করা—ওটার আবার কি বাহাদুরী আছে? আমার জামাইকে হাতে-পায়ে ধরে সাধলেও করে না। খোদ লাটসাহেব সেবার নেমন্তণ্য করলেন, জামাই তাঁর অনুরোধ ঠেকাতে না পেরে পাশে বসে খেয়ে এল। ওখানের স্কুল, পাঠশালা, হাসপাতাল আমার জামাইয়ের টাকায় চলে। তাছাড়া সেও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট।"—বলে বড়মা একবার বক্র দৃষ্টিতে খুড়ীমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন কতটা দমাতে তাঁকে পেরেছেন। পাড়ার খুড়ীমাই বা অত সহজে হঠবেন কেন? মনের ভিতর জ্বলে গেলেও বাইরে বেশ প্রশান্ত ভাবে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আলুর খোসা ছাড়াতে লাগলেন। একবার বলতে তাঁর ইচ্ছে হোল, আজকাল জমিদারকে সবাই ঘেন্না করে। সম্মান করে না কেউ। কিন্তু পাল্টা জবাব আসতে পারে—স্বয়ং লাটসাহেব আর মন্ত্রীরা যখন সমাদর করে জমিদারদের তখন সাধারণকে গ্রাহ্য করে কে? কাজেই কথায় কথা বেড়ে যাবে, তার পর হয়তো লেগেই যাবে ঝগড়া সামনা-সামনি। অতএব খুড়ীমা নীরব তাচ্ছিল্যের হাসিতে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন জামাতা-গর্ব্বিতা বড়মাকে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্তে শিখা বললে, পাড়ার মাসীকে, "মাসীমা, আপনি সুধাদির বিয়ে দেবেন না?"

—"ওমা, তুই আবার সুধাদি বলিস কেন?" জন্মের সাল-তারিখের নিখুঁত একটি হিসাব দিয়ে বললেন, "বুঝলি তো মা, তোর চেয়ে দু'বছরের ছোট। যাক ওসব কথা, বিয়ে ও করতে চায় না। ভাল ভাল সম্বন্ধগুলো সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। মেয়ে এতগুলো পাশ করেছে, তার অমতে তো কিছু করতে পারি না।"

শিখা একটু মজা করবার জন্তে বললে, "পিসীমা, আপনি ছেলের বিয়ে দেবেন না?"

—"দেব বৈ কি মা! ছেলেও আমার এত বাধ্য, মুখের ওপর একটি কথাও বলে না। বহু সম্বন্ধ আসছে মা, আমারই পছন্দ হচ্ছে না। স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে আমার, একটু দেখে-শুনে তো দিতে হবে।"

—"কেন পিসীমা, আমাদের 'সুধাদি'—বলেই জিভ কেটে বললে,

মাসীমা রাগ করবেন না। সবাইকে দিদি বলা আমার অভ্যেসের দোষ। তাছাড়া 'দিদি' মানেই সব সময় বয়েসে বড় বোঝায় না। বিদ্যের জ্ঞানে সুধাদি তো সত্যিই আমাদের চেয়ে কত বড়!" মাসীমা খুসীর হাসি হাসলেন। কথার জের টেনে আবার শিখা বললে, "হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আমাদের সুধাদির সঙ্গে মনটুদার বিয়ে দিলে কেমন হয়? দু'জনেই বিদ্বান, সুন্দর—বেশ ভাল হয়, না পিসীমা?"

পিসীমা বললেন, "সে ভগবানের হাত মা! আমার মনটুর বৌ হবে স্কলারশিপ পাওয়া মেয়ে এই তোমার পিসে মশায়ের সাধ। অবশ্য সবই ভগবানের ইচ্ছে। তবু আমরা মা-বাপ, আমাদের কর্তব্য আছে তো! জানিস্ তো, মনটু আমার আগাগোড়া পাশ করেছে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হয়ে, কাজেই তার বউ অন্তত স্কলারশিপটা না পেলে চলে কি করে?"

শিখা নিজে একটাও পাশ করেনি, কাজেই পিসীর কথাটা খোঁচা দিল তাকে। বললে, "আপনার একমাত্র ছেলে, তার স্কলারশিপওয়ালা বৌ মানবে তো শাশুড়ীকে? তখন আবার বৌয়ের জ্বালায় কাঁদতে বসবেন না!" শিখার উত্তরে খুসী হয়ে উঠলেন মাসীমা।

শিখাকে শিখণ্ডী রেখে মাসী বলে উঠলেন, "আমার সুধা বলে দিন-রাত বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকলে ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হওয়া কিছুই নয়। তা বলি, তুই একটু পড়ে দেখিয়ে দে ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হতে পারিস কি না। তা মেয়ে বলে পৃথিবীর দিকে নাক-চোখ বন্ধ রেখে সব সময় বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকতে পারব না মা।"

পিসী বক্র হাসি হেসে বললেন, "শিখা, বইয়ে মুখ গুঁজে কে আর না থাকে? সবাই পারে হোতে? মাথায় থাকা চাই মগজ আর চাই ভগবানের আশীর্বাদ, তবে ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হওয়া যায়। কি বলিস্?"

নির্বিরোধী মুখে শিখা বললে, "তা তো ঠিকই পিসী, মনটুদার মত একটাও ছেলে নেই বর্দ্ধমানে। মনটুদাকে নিয়ে আমরা কত অহঙ্কার করি শ্বশুরবাড়ীতে।"

মাসী বোধ হয় মনে মনে উত্তর খুঁজছিলেন পিসীকে ঘায়েল করবার জন্যে, কিন্তু গৃহিণী কয়েক প্লেট খাবার নিয়ে হাজির হলেন, বললেন অনুনয় করে প্রতিবেশিনীদের দিকে চেয়ে, "সামান্য একটু মিষ্টিমুখ করে নিন।" তার পর মেয়েকে বললেন, "যা তো শিখা, চা এনে দে এখানে!"

প্রতিবেশিনীরা বললেন, "আবার চা কেন? খাবারও দরকার ছিল না। কাজের বাড়ী, কি দরকার ছিল আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবার।"

—"না না, একি কথা! সামান্য একটু মিষ্টিমুখ করবেন না?"

বড়মা বললেন, "দানের জিনিসপত্তর কোথায়? কি কি গয়না হোল রাগিণীর?"

—"দানের জিনিষ দোতলার ঘরে সাজানো আছে। গয়না এখনও আসেনি। সন্ধ্যে বেলা সব আসবে। রাত্রে আসছেন তো? সব দেখবেন তখন।"

মাসীমা বললেন, "আমাদের বর্দ্ধমানের মধ্যে কাজের মেয়ে রাগিণী। কলকাতায় থেকে এই বর্দ্ধমানের অনেক মেয়েই লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু কেমন কাজ গুছিয়ে নিল। সাবাস মেয়ে।"

গৃহিণী মাসীর কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, "আসি দিদি, অনেক কাজ পড়ে আছে। আসবেন সব রাত্তিরে।"

—"ওমা! আমাদের আবার বারে বারে নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি?" এমন সময় শিখা কয়েক কাপ চা ট্রেতে নিয়ে এসে সামনে রেখে বললে, "যাই, ছেলেটাকে খাইয়ে আসি।"

শিখা চলে যেতে জ্যেঠি-খুড়ীর দল ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে বললেন, "ছেলে পটাতে কি সবাই পারে? ও-সব ধড়ীবাজ মেয়েদেরই কাজ।"

আর এক জন বললেন, "পটিয়েছে কি যে-সে ছেলে! ব্যারিষ্টার মণি বোসের ছেলে—তার মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার উপায়, আর ঐ তো একমাত্র ছেলে। দেখতেও নাকি খুব সুন্দর।"

আর এক জন হিতৈষিণী বললেন, "এক সঙ্গে পড়তে পড়তে বন্ধুত্ব তো কত ছেলের সঙ্গেই হয়, তা বলে কি তারা বিয়ে করে? মেয়েটার খুব বরাত জোর।"

দীর্ঘনিশ্বাস চেপে আর এক জন বললেন, "তা আর বলতে দিদি —তবে আমার একটু খটকা লাগছে—" বলে কানে-কানে পার্শ্ববর্ত্তিনীকে কি যেন বললেন।

—"ওমা, আমারও ভাই তাই মনে হচ্ছিল। এক কথায় অত বড় ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে—ভাব তো এমন হামেশাই হয়ে থাকে। কি আর করবে কেলেঙ্কারী করে তো খালি লোক-হাসানো, তার চেয়ে বিয়ে হওয়াই ভাল।"

বড়মা বললেন, "তোমরা বোধ হয় জান না, বিয়ে রাগিণীর হয়ে গেছে প্রায় দু'মাস আগে। রেজেষ্ট্রি করে। উকিলের মেয়ে, পাকা কাজ।"

—"ওমা, তাই নাকি? তা তো জানতাম না। এটা বুঝি লোক দেখানো অনুষ্ঠান হচ্ছে?"

—"হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কি?"

—"উকিল ঘায়েল করলো ব্যারিষ্টারকে?"

বড়মা বললেন, "কলিযুগে সবই উল্টো বৌমা!"

বেলা দ্বিপ্রহর। গৃহিণী বললেন বোনদের ডেকে, "বসিয়ে দাও সবাইকে খেতে। তোমরা নিজেরা পরিবেশন কোরো।" মেয়েদের বললেন, "তোরাও মাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। দেখিস, দেশ থেকে যারা এসেছে, খাওয়ার কোন ত্রুটি না হয়। বড় বড় মাছ বেছে-বেছে দিস্। ভাঙ্গাচোরা মাছগুলো রাখিস আমাদের জন্যে। খাওয়া হলে পান দিস্ হাতে হাতে।"

ঠাকুর বললেন, "মা, চপ-কাটলেটের ডিম, আদা, পেঁয়াজ পোলাওর চাল, ঘি সব গুছিয়ে দিন। এখন থেকে আরম্ভ না করলে রাত হয়ে যাবে।"

—"চল ঠাকুর"—বলে গৃহিণী চলে গেলেন ছাদে, সেখানেই সামিয়ানা খাটিয়ে ভোজের রান্না আরম্ভ হয়েছে। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার বলে গেলেন মেয়েদের, "তোদের পিসীদের খাওয়া লক্ষ্য রাখিস। ঘি, দৈ, মিষ্টি সব নিতে বলিস।"

বিকাল চারটা। গৃহিণী সেইমাত্র খেয়ে মুখে একটা পান দিয়ে বললেন বোনকে, "বিমলা, এক ঘণ্টা না বিশ্রাম করলে মাথা ঘুরে পড়ে যাব। ঠিক পাঁচটায় তুলে দিও।"

—"তোমার ঘুম হবে দিদি?"

—"এই একটু চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম করব। আর কি? এই যে পয়সার থলি, এর মধ্যেই সব রেজকি আছে, এটা-সেটার জন্তে অনবরত পয়সার দরকার। যদি চায় পয়সা দিও।"—বলে থলিটি ...নের হাতে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

এক ঘণ্টা কতটুকু বা সময়, এর মধ্যেই চার বার চাকর এল ডাকতে গৃহিণীকে। শেষে কর্তা নিজেই এসে হাজির। বললেন তিনি, "কি গো, আজ না ঘুমুলে হয় না? চল নীচে পুরুত বসে আছেন ফর্দ নিয়ে। তা ছাড়া ছেলের বাড়ী থেকে সরকার এসেছেন। তুমি না থাকলে হয়?"

গৃহিণী ছেলের বাড়ীর সরকারের নাম শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। বোন আর মেয়েদের বললেন, "বড় হলঘরে দানের জিনিষ আছে। কাপড়গুলো ভাল করে সাজিয়ে রেখো। এই ঘরেই থেকো তোমরা।"

স্মৃতিরেখা আপত্তি তুললে, "বাঃ রে, বিয়ে-বাড়ীতে ঘুরে-ফিরে দেখবো না বুঝি? জিনিষ আগলিয়ে বসে থাকতে পারব না। কেন পিসীরা কি করছে? তারা আসুক না কেন?"

—"তাঁরা ভাঁড়ার আগলাচ্ছেন।"

—"ভাঁড়ারে দু'জন থাকুন, আর দু'জন এ ঘরে। পাঠিয়ে দাও মা তুমি দু' পিসীকে।"

—"তুই নিজেই ডেকে আন্।"

সন্ধ্যে আটটা। ঘরে ঘরে নিমন্ত্রিতের ভীড়। সুবেশা তরুণীরা সব হাসি-ঠাট্টার মশগুল। কনেকে ঘিরে বসেছে তাদের আনন্দের হাট। বালিকারা ফুলের মালা আর আতর দিয়ে অভ্যর্থনা করছে নিমন্ত্রিতদের।

দু'-তিনটি ঘর জুড়ে মধ্যবয়স্কারা সব গালগল্প আরম্ভ করেছেন। গল্প আর কি? সেই একই কথা। নিজের স্বামী, ছেলে-মেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনী অন্যের তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, উপার্জনে সব দিক দিয়েই। একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পুনরাবৃত্তি। তার সঙ্গে আছে ফিসফিসানি, মুচকি হাসা, ইসারা, ইঙ্গিত, বক্রদৃষ্টি—এ সব না হলে তো মহিলা মহলের আসরই জমে না। তরুণী-মহল আবার ও-সব আনুকালচারড কথাবার্তার মধ্যে নেই। তারা কতক রয়েছে কনেকে ঘিরে, আর কতক অন্য জায়গায় জটলা পাকাচ্ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কাফে, রেঁস্তোরা, সিনেমা, প্রফেসার, সবাই স্থান পেয়েছে তাদের আলোচনায়। এমন কি শাড়ী, গয়না, মডার্ণ সাহিত্য কিছু বাদ নেই। এক কথায় আধুনিক সভ্যতার সব-কিছু তাদের মগজে ঠাসা। সুবিধে পেলেই বেরিয়ে আসবে ফর-ফর করে।

ফলে কিন্তু হাটের মধ্যে থেকেও রাগিণী একা। ওদের ঠাট্টা, হাসি, গল্প কানে ঢুকলেও মরমে যাচ্ছে না। রাগিণী ভাবছে সেই অতীতের কথা। কত ভয়, কত সংশয়, কত ভাবনা, কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে সে। এই দিনটির জন্যে আকুল হয়ে প্রার্থনা করেছে ভগবানের কাছে। সত্যি হোল আজ তার—সব চিন্তার অবসান?

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

কুড়ি

সাহেবের সংগে দেখা, মানে বিড়ালের সুমুখে মুষিকের উপস্থিতি। বার বার নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে তাকায় দীনেশ সেন। এবারকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি খাস বৃটিশ লায়ন—ইতিপূর্বের ছুটি ছিল দেশী-বিলেতি মিক্শ্চার, যাকে সাদা কথায় বলে দোআঁশলা। তাদের দেখে অত ভয় পেত না দীনেশ সেন, হাজার হলেও কিছুটা গন্ধ ছিল দেশী।

দীনেশ সেন রিষ্টওয়াচটা ঘুরিয়ে দেখল। বেলা প্রায় চারটা। এখনও এক ঘণ্টা কাছারী আছে। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে দীনেশ সেন কার্ড দিল আরদালীর হাতে। সে ইসারা করে দাঁড়াতে বলে ভিতরে ঢুকল। যে দীনেশ সেন প্রত্যহ প্রায় হাজারটা সেলাম পায়, সে মনে মনে মহড়া দিতে লাগল একটা মাত্র স্যালুটের। অনভ্যস্ত হাতে আবার তেরছা বাঁকা না হয়ে যায়। কি সব বিশ্রি নিয়ম। সেও তো হাকিম, কিন্তু হুকুমের দাস ঐ শ্বেত প্রভুটির।

অনেকক্ষণ দীনেশ সেন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। লাল পর্দা ঠেলে সাহেব নিজেই বেরিয়ে এল এবং মুহূর্ত মাত্র দীনেশ সেনের দিকে চেয়ে নীচে নেমে গেল একটা কুকুরকে আদর করতে করতে। দীনেশ সেলাম ঠুকল, সাহেব যেন দেখেও দেখল না। সে কুকুর নিয়ে মসগুল।

অপমান বোধ হল খাসমহল অফিসার দীনেশ সেনের।

পেস্কার বলল, 'আপনাকে কুঠীতে যেতে বলেছে।'

আরও বিরক্ত বোধ হল তার। এমন সময় আরদালী এসে সেলাম জানিয়ে হাত পাতল। পেস্কার তাড়াতাড়ি তার হাতে একটা মোটা খাতা গছিয়ে দিয়ে চোখ রাঙিয়ে বলল, 'সাত নম্বর ঘর।' দীনেশ সেন এ সব কিছু লক্ষ্য না করে নীচে নেমে গেল।

'কে জানিস, দেবনগরের সাক্ষাৎ যম। এক্ষুনি পাঠাত যমালয়ে। খেতে খেতে দিশাহারা হয়ে গেছেন একেবারে!'

আরদালী সেলাম ঠুকে বলল, 'হুজুর ধর্মের বাপ—যা শিখলিয়েছেন তাই তো শিখেছি।'

'এখন ভাগ, খাতা নিয়ে যা—বচনবাগীশ।'

ত্রস্তে চলে যায় আরদালী।

নদীর পার—প্রকাণ্ড ফুল-বাগিচা। গোলাপ এবং মৌসুমী ফুটেছে স্তবকে স্তবকে। বাগানের এক পাশে একখানা কাঠের বাংলো,

মাথা খায় ইমারতের। এত বড় বাংলোটায় থাকে মাত্র দুটি লোক, সাহেব ও মেম। এতগুলো কোঠা কি কাজে যে লাগে তা ভেবে উঠতে পারে না এই জংলি হাকিম দীনেশ সেন। দেবনগরের তুলনায় খানসামা-বেহারাগুলি কি পয়-পরিষ্কার! আর আছেও যেন গণ্ডায় গণ্ডায়। এরাই সত্যি রাজপুরুষ! দীনেশ প্রভৃতি ঘোড়ার সহিসের সামিল। শুধু তামিল করে হুকুম।

ইতিমধ্যে ঘোড়া এল। ভদ্রতার খাতিরে এগিয়ে গেল দীনেশ হাকিম। সুমুখেই মেম সাহেব। মেম একটি মোমের পুতুলের মত হাসল। হাকিম হাত পেতে দিল। তার হাতে মেম সবুট পায়ের ভর রেখে সরাৎ করে উঠে গেল উঁচু ঘোড়ার পিঠে। মেম একটু মাথা নত করে আবার হাসল। হাকিম রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

হাকিমের সংগে বারান্দায়ই সাক্ষাৎ হয় সাহেবের। এখানেও সেই এক ভাব। কুকুর-প্রীতি। দীনেশ সেন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়। সে এসেছে একটা মুলুকের মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত করতে, আর উনি কি না খেল খেলছেন সার্কাসের ঢংয়ে।

সকলই শুনল সাহেব। বলল কিন্তু একটি কথা, 'All right! ঘা দিতে হবে ওদের সেণ্টিমেণ্টে।'

অর্থটা ঠিক বুঝল না দীনেশ। আবার যে প্রশ্ন করবে সে সাহস তার হল না। সে তো প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ জানে। কিন্তু সমষ্টিগত তাৎপর্য কি? দীনেশ মাথা নীচু করে রইল।

Don't fear Mr. Sen—ভয় কর না। এমনি একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল সাহেবের মুখে।

সাহস কিম্বা ভয়ের কথা এখানে অবান্তর। আসলে যে সে বুঝলই না ইংগিতটা।

সাহেব চেয়ে রইল দীনেশের মুখের দিকে।

দীনেশ লজ্জা ঢাকার জন্ত বোকার মত হাসল।

'Cheer up Mr. Sen. আমি ভেবেছিলাম you could not follow me.' এবার সাহেব দ্বিতীয় বারের জন্ত একটু উচ্ছাস প্রকাশ করল। খুশি হয়ে খানিকের জন্ত কুত্তার খেল বন্ধ রাখল। সে নিকটস্থ টেবিলের ওপরের একটা ডিস টেনে আনল ডান হাতে। কাছেই ছিল একটা ফর্ক। বাঁ হাতে সে গেঁথে তুলল এক খণ্ড অভুক্ত কদলী।

দীনেশ সেন মাথা নুইয়ে উঠে এল—যেন বুঝল সব। অথচ সারা পথ চিন্তা করেও ঠিক অর্থটা খুঁজে পেল না। সে তো বলেছে, ওরা দারুণ ক্ষেপেছে। তার জবাব কি ঐ হল? দীনেশ সেন মহা উদ্বিগ্ন হয়ে পথ চলতে লাগল।

'নমস্কার দীনেশ বাবু!'

'আদাব মৌলভী ছাহেব! আছেন কেমন?'

'ভাল—আপনি?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

'আছেন তো বেশ পাকা শশাটির মত।'

'সে আপনাদের দোয়া (আশীর্বাদ)।'

'না ছাহেব, না—ডিপার্টমেণ্টের গুণ।'

এ একজন প্রাচীন পুলিশ ইনসপেক্টর। নাম রেজ্জাক মিঞা। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে এর খ্যাতি হয়েছে সারা জেলায়।

দীনেশ সেন রাস্তার এক পাশে সরে সমস্ত খুলে বলল রেজ্জাক মিঞাকে। রেজ্জাক স্থির হয়ে শুনল সব।

কিছুক্ষণ বাদে সে একটা হাত ধরে টান দিল দীনেশের।

'মানে বুঝলাম না।'

'আচ্ছা আপনার যদি একটা পা ধরে টান দেই?'

'দেবেন—তাতে আর হয় কি?'

'কিন্তু যদি আপনার স্ত্রী-কন্তার গায়ে কেউ হাত দেয়—ক্ষমা করবেন দীনেশ বাবু, এ একটা নজির মাত্র—অর্থাৎ কিনা কোমল সেণ্টিমেণ্টে ঘা দেয়, আপনি নিশ্চয় মুষড়ে পড়েন।'

'হ্যাঁ, তা তো ঠিক। মান-ইজ্জতের আশংকায় কে না অধীর হয়?'

'দীনেশ বাবু, তখনি মানুষ নিষ্পত্তি করে—লাঠি ছেড়ে শুয়ে পড়ে।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন মৌলভী ছাহেব।'

'তবে আসি! নমস্কার'—

'আদাব, আদাব। কিন্তু শুনুন,...ওরা তো ক্ষেপেও যেতে পারে।'

'অসম্ভব নয় মোটেই।'

'তখন উপায়?'

'সরকারকে জানাবেন—বেয়নেট বন্দুক যাবে। আমরা থাকতে ভয় কি?' রেজ্জাক মিঞা চলে গেল হনহনিয়ে।

একটু স্তম্ভিত হয়ে রইল দীনেশ সেন। সেও একজন নাম-করা কড়া হাকিম। কিন্তু এ যে তারও বাড়া!

উপায় নেই—গত্যন্তর নেই! রাজদ্রোহীকে দণ্ড দিতে, বাধ্য করতে অসভ্য বর্বরকে, নিতেই হবে এ কৌশলের আশ্রয়। এ তো অবিচার নয়, অত্যাচারও নয়—সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখার, কটির মধ্যে মাত্র একটি যুযুৎসু!

দীনেশ সেনের একটা চোখ ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

একুশ

কাজে নামলেই মনের মরচে কেটে যায় দিবাকরের। শানিত ইস্পাতের মত ঝলসে ওঠে তার বুদ্ধি, বিবেক ও উপলব্ধি। সে পাড়ায় পাড়ায় সংঘ গড়ার প্রয়োজন বোধ করে। যারা ভাগ শিকারী, বর্গা-ভোগী, অথবা অল্প জমার মালিক, তারাই যেন ও কথায় এগিয়ে আসে বেশি—সহজেই তোলে আওয়াজ, 'বলন দিমু না।' তবে বড়দেরও দিবাকর জড়িয়ে রাখে নানান রকম কথার প্যাঁচে! একটা বড়, পাঁচটা ছোট মিলিয়ে গড়ে ছোট ছোট এক একটা জোটের মহল।

সেদিন শপথ নিল ব্রজর বাড়ীর পাশের মেয়েরা। মেয়েরা সে পাড়ার শেয়ানা। তারাও কেউ কেউ শুনল দিবাকরের বক্তৃতা আড়ালে বসে।

দিবাকর ভেবেছিল এগিয়ে যাবে। আসামীর মত ধরা পড়ে এক নারীর হাতে! 'অযোগ্যতার ভাড়া দা, আগাছা কাটে ওস্তাদ—যাও কই না খাইয়া দাইয়া বাড়ী পাশে আইস্যা?'

'মুক্তা কইলি কি? এ কি আগাছা কাটন?' একটা ব্যথার সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে দিবাকরের কণ্ঠে।

বুদ্ধিমতী মুক্তা এক লহমায় ধরতে পারে দিবাকরের খেদের কারণটা—সে সুকৌশলে কথার ইন্দ্রজাল বিস্তার করে। 'গোঁসাই গো, মুনিষ্যে তো আগাছাই কাটে, কাইট্যা সাবাড় করে যত ঝাঁটা ঝাড় ছুষমন পরগাছা। এতক্ষণ বুঝাইলা কি, কইলা দেখি সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের পরগাছার কাহিনী। তুমিই কও, ফের তুমিই ভোলো—শ্বেত পরগাছায় নাকি শুইষ্যা খাইল অভাগী মা বাঙলা ছাশের রসাল বৃক্ষ?'

'মুক্তা তুই ছিলি কই, বুঝলি আমার সব কথা?' আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দিবাকর মুখ-চোখ।

'মুক্তা তোমার গো কিনা বোঝে? সে তো আসল-নকল সকল খাখাই চেনে। শুধু পরমাশ্চ তুমিই পায় ঠেইল্যা যাও—গোঁসাই গো বুইনেরে গিয়া আইজই বিয়া দেও।'

'এ কথা এখানে আসে কিসে মুক্তা?'

'ঘর সামলাইয়া, তারপর মুনিষ্যে আসে বাইরে। কলিজায় ঘা, ওষুধ লাগাও পায়ে? আমরা তোমাগো অদ্দেক, আমাগো ফেইল্যা গড়াইতে চাও জোটের মহল? সোহাগা ছাড়া সোনা গলে?'

'মাইয়ালোকে এ সব কি বোঝে?' একটা নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় দিবাকর। 'আশ্চর্য্য করলি তুই!'

'পথ ছাইড়্যা একটু এই দিকে আও।' মুক্তার পিছু পিছু চলে দিবাকর। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটা স্থানে কুলগাছের আড়ালে গিয়ে ছুজনে থামে।

সন্ধ্যা প্রায় ঘোর হয়ে এসেছে। সংগীরা দিবাকরকে ডাকছে। মুক্তা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল নির্জ্জনে। 'তারা বুঝি ক্যাবল এই-ই জানে?'—বলে মুক্তা একটা তীব্র নক্সিবের ছাপ দিয়ে দিল দিবাকরের গালে।

দিবাকর চমকে ওঠে। ডাকাতনী করল কি? দিবাকর একবার ভাবল যে পালাবে, আবার স্থির করল—না। মুহূর্ত্তে জড়িয়ে ধরল মুক্তাকে। টেনে আনল বলিষ্ঠ বুকে।

মুক্তা এলিয়ে পড়ল হয়ত ইচ্ছা করেই। স্ত্রীলোক হয়ে বার বার ঠকিয়ে যাবে দিবাকরকে? আঘাত তো ওর মনে একটু না! মুক্তা দিয়েছিল একটা নক্সিরের ছাপ, দিবাকর দিল সহস্রটা।

সাংগোপাংগরা ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এল। 'দিবাকর ভাই গো—ও দিবাকর দাদু!'

মুক্তা বলল, 'তোমারা না খাইয়া যাবা কই?'

দিবাকর জবাব দিল, 'উত্তর দেও না ভাইরা? আমার কিন্তু ক্ষিধা নাই।' সে একটু তাৎপর্য্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মুক্তার প্রতি।

একটি যুবক প্রশ্ন করল, 'ক্যান এর মধ্যেই কি তুমি আমাগো ফেইল্যা নিজের কাম সারছ?'

'হু, উনি বড় আত্মশেয়ান।' মুক্তা ধীরে ধীরে মন্তব্য করল।

'তবে চলো চলো, আমরাই বা ঠকি ক্যান।'

দিবাকরও একখানা পিঁড়িতে গিয়ে বসল।

'একি গোঁসাই, এই যে কইল্যা ক্ষিধা নেই?'

'তখন ওনার তোষ (তৃষ্ণা) মেটে নাই—এখন আরও চারড্ডি খাউক—পাতিলে আমার ভাতের আকাল নাই।' মুক্তা পরিবেশন করে আর কথার হেঁয়ালী বোনে।

'জামাই কই?'

'হাটে গেছে।'

কখন গেছে, কেন গেছে, এ কথা আর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা করে না দিবাকর। সেদিন রাত্রের কথা একটুও ভোলেনি সে। মুক্তাও অনেক কিছু রঙ তামাসা করে, কিন্তু যার বাড়ী-ঘর-বৈভব তার বিষয় আর বিন্দু মাত্র সেও উল্লেখ করে না।

মুক্তা বলে, 'ভদ্রাসনের আসল মালিক আমরা, এই তোমাগো ঘোমটা দেওয়া বৌরা—গোঁসাইর অবশ্য সে বালাই নাই—তাগো যদি না ঢাকো, ছেনিদা লইয়া নামবে কারা? ভাঙবে কারা নাজির পুলিশের দাঁতের গোড়া?' মুক্তার মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলতে থাকে। 'নিলাম করাইছে জেলায়, খাস করতে আইবে বিলগাঁয়—শাসে জানি শক্ত হইয়্যা প্যান্টুল পইরা।'

ওরা উত্তেজনায় এক জনে খায় তিন জনার ভাত।

'পায়াস আছে।' মুক্তা বলে, 'হাত যে উঠাইলা—ওকি?'

'বড় মুস্কিল করলা মুক্তামালা—আচ্ছা গোঁসাই আর এক ঢিল চালাও।' বলে কোমরের কাপড়ের বন্ধন ঢিলা করে ছোকরারা।

দিবাকর একটু দূরে বসেছিল খেতে, সে আগেই উঠে গেল। এ তো মুক্তা নয়, তার চেয়েও অনেক দামী পাথর। না, না, দর ধরে এর মূল্য যাচাই করা একান্তই পাগলামী।

এ যে পরশমণি।

রাত্রি অধিক হয়েছিল বলে তখন আর কেউ রওনা দিল না। এখন ভরা পেটে বৈঠা চালায় কে?

শুয়ে শুয়ে দিবাকর ভাবে সত্যই পরশমণি মুক্তা। দিবাকর যখন জোটের প্রয়োজন বোঝাচ্ছিল আজ, বোঝাচ্ছিল সমবেত হওয়ার কারণ তখন কোথায় ছিল ও 'ভাঙলা' বেড়ার আবডালে? এমন কি মূল্যবান কথা বলেছিল দিবাকর? কিন্তু অমূল্য হয়েছে ওর অনুভূতির স্পর্শে। দিবাকর হর্ষে ও আনন্দে ঘুমাতে পারে না। হাজারো জেলে-জোলা বর্গাইতের পাশে এসে দাঁড়াবে ছেনিদা হাতে মেয়েরা। তাদের ডাকতে বলল মুক্তা। এই তো আসল সংগিনী।

এখনই কি ডাকবে দিবাকর? রাত নিশুতি, জেগে নেই একটি জনপ্রাণীও। সাথীরা ঘুমাচ্ছে অকাতরে। এই তো সময়। ধীরে ধীরে চুপে চুপে ডাকবে দিবাকর। ডাকবে মধুময় কণ্ঠে। 'জাগো চলো গো সংগিনী। কই তোমার ছেনিদা, অস্ত্র হাসুয়া—পুরুষের পাশে দাঁড়াবা রূপসী রণরংগিনী।'

একটু বাদে সত্য সত্যই ডাকল দিবাকর। 'মুক্তা, মুক্তা!'

মুক্তাও যেন প্রস্তুত হয়েছিল। বেরিয়ে এল বড় ঘরের দরজা খুলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে।

'ঘুম হয় না। ছ্যাৎ ছ্যাৎ করে পরাণডা—মনে পড়ে নানান কথা।'

'ওষুধ তো রইছে ঘরে, চলো না—তপ্ত শয্যা।'

'মসকরা নয় মুক্তা, গভীর কথা, অনেক দায়িত্ব। তুমি কি যাবা?' এর চেয়ে ভাল করে তখন কিছু বুঝিয়ে বলতে পারে না দিবাকর। একটা ভূকম্পনের আবেগে সবেগে আন্দোলিত হচ্ছে তার মন। ভেঙে চতুর্দিকে উৎসারিত হচ্ছে কথা ও ভাবের উপলখণ্ডগুলি। সে দেখছে, যেন একটা বক্রদন্ত শ্বেতবরাহ ছুটে

আসছে ভীমবেগে—কালো হলে ভ্রম জন্মাত মহিষাসুর বলে। এখন একার রণরংগিনী দেবীর। সেই দেবীই তো তার পাশে দাঁড়িয়ে। মুক্তা মশকরা নয়, চলো আমার সংগে।'

'কোথায়?'

'পাড়ায় পাড়ায়, গাঁয়ে গাঁয়ে।'

'একতারা লইয়া, বৈষ্ণবী হইয়া?'

'না, ছেনিদা হাতে রূপসী রণরংগিনীর মত। তোমার কথাই সত্য, লাগবে তোমাগো—শক্তি ছাড়া পুরুষ পুতুল।'

'যামু গোঁসাই, যামু তোমার সাথে···'

'তয় এখনই লও, আর কাইত (শোয়া) হমু না রাইতে।'

'পালাইয়া? চোরের মত? মুক্তা রুষ্ট হয়ে দু'কদম হটে যায়। সিংহিনীর মত একটা আওয়াজ বাজে কণ্ঠে। 'না গোঁসাই, তা হইবে না কিছুতেই।'

দিবাকর এগিয়ে গিয়ে একখানা হাত ধরে। 'আয় মুক্তা, তোরে বিয়া করি। বুকে আমার শত টান থাউক, তার চাইতেও তুই আমার প্রাণের পক্ষে জরুরী। তুই চোক্ষের (চোখের) পলকে জাইতে পার রাজ্য।'

'যামু, কিন্তু এখন নয়।'

'ক্যান লো মুক্তা? মনে পড়ছে নাকি সাবেক কথা, করলি নাকি মান? সময় বুইঝ্যা পালটা জবাব দেও? আমি তোরে সম্মানে নিমু—নিমু গন্ধর্ব মতে বিয়া কইর‍্যা, প্রাণ যে তোরে চায়।'

মুক্তার মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে বানের জোয়ারের মত। সে স্থির হতে পারে না। চুম্বকের পাহাড়ের কাছে যেন ছিটকে এসেছে একখণ্ড লৌহ কেমন করে। এখন অস্তিত্ব বজায় রাখা তার ভার। সে কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে দিবাকরের। না, না, আর সে বিচ্ছিন্ন হবে না। এ তার শৈশবের স্বপ্ন, যৌবনের কামনা। না, না, সে আর বিচ্ছিন্ন হবে না। বিধাতা ওদের গলিয়ে মিশিয়ে ফেলুক। নতুবা পারে তো গুঁড়িয়ে ফেলুক দিবাকর। মুক্তা কাঁপতে থাকে থরথরিয়ে।

দিবাকর ওকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে একটা চুমো খায়। 'এই আমাগো বিয়া হইল মুক্তামালা গন্ধর্ব মতে। এখন লও—বাধা কি যাইতে?'

কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তা একটু একটু করে সুস্থ হয়—একত্র করে বিক্ষিপ্ত মনকে। সে একটা লম্ফ জ্বালায়। 'যাইতাম গোঁসাই বাপের বাড়ী, কিন্তু বাধা তোমাগো জামাই, কাইল রাত্তিরে সে তো বাড়ী ফেরে নাই। কারেই বা এ সব বুঝাইয়া দিয়া যামু—আর খালি হাত-পায়েই বা যাই ক্যামনে—গয়না-গাঠি তো আমার কাছে নাই। তামাক খাও, এই নেও হুকা-কলকি—ভোর হইল পরায়।'

দিবাকর আর করণীয় কিছু না দেখে তামাক সাজে বাধ্য হয়ে।

পরদিন বিদায়ের সময় নায়ের কাছে যেয়ে মুক্তা ফের বলে, 'কনকের কাছে কইও, যামু শীগগিরই, যাইতাম আজই, কিন্তু মাইয়া লোকে ক্যামনে দেখ খালি হাত-পায় যায়?'

দিবাকর ব্যতীত আর সকলে মাথা নাড়ে। 'হয়, হয়।'

মুক্তাকে স্বর্ণের অভাবেই তার বাপ বিক্রয় করেছে ব্রজর কাছে। মুক্তাও বিবাহটাকে ব্যবসা বলেই গ্রহণ করেছে। প্রচুর লাভ

হয়েছে তার এই কটা বছরে। সে-স্বর্ণ কিছুতেই সে ফেলে যেতে পারে না। ঐ স্বর্ণের জন্যই তো যত সংগ্রাম।

মুক্তা বড় শেয়ান মেয়ে। দেহটাকে এড়িয়ে রেখে, লালসাকে উগ্র করে, সে শুধু উপঢৌকন আদায় করেছে ব্রজর কাছ থেকে। সোনার কেবল নয়, রূপোর গয়নাও তার হয়েছে অজস্র। সে ব্রজকে ভাবে ইতর। সেই ইতর নাচিয়ে সে দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। এই তো দিলাম, দিচ্ছি আর কি—মুক্তা ভেলকী দেখাচ্ছে আর কুড়িয়ে নিচ্ছে অর্থ। সুযোগ বুঝে শেয়ান মেয়ে চাল চেলেছে মস্ত।

কিন্তু দেহ তো তার কামনা-মুক্ত নয়। সে যাকে নিয়ে ঘর করবে, সুখী হবে, তার জন্য এ সঞ্চয়। ঝড় আছে, আছে কত অনিবার্য বিপর্যয়।

ডোঙা নাও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে—দিবাকর লগি ঠেলছে ধীরে ধীরে। মুক্তা বয়েছে পারে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য তার ঐ সুঠাম, সুপুরুষ যুবকের প্রতি, অথচ সম্প্রতি তা বুঝবে কে?

'মুক্তামালা চলি গ্যালে…'

'চলন নাই, আসো গিয়া…আমি তো যাইতাম, মাইয়া লোকের গোঁসাই পা বাড়াইতে অশেষ জ্বালা। জান ত সব, বোঝ ত বেবাক (সকল)!' কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে মুক্তার।

নৌকার অন্যান্য যাত্রীরা বলে, 'আহা, তাতে হইছে কি, আর একদিন না হয় যাবা।'

একটি রাত্রের সৌহার্দ্যে যেন কেমন একটা বেদনাবোধ জন্মেছে সকলের মনে· দিবাকর আর কোন দিকে দৃকপাত না করে সজোরে লগিতে ধাক্কা মারে।

জলের বুকে নাও যেন মাথা কুটে মরতে থাকে।

বাইশ

দীনেশ সেন কাছারীতে ফিরে এল বেশ নতুন একটা প্রেরণা নিয়ে। মানুষ যখন নিতান্তই অবাধ্য হয় তখনও তাকে বাধ্য করার চরম একটা পন্থা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেও ব্যবহার করবে ধর্ক। ভোক্তার কাছ থেকে ভোজ্য কি ভাবে ফস্কে যাবে? অন্যায্য দাবী—দেবে না নাকি 'বলন'! অথচ চলন আছে মান্ধাতার আমল থেকে। যাক, শেষ আঘাত হানবার আগে একবার সে খবর দেবে কেষ্ট কৈবর্তকে। যদি অল্পে মিটে যায়, তবে অনেক ঝঞ্ঝা সে ব্যয় করবে না।

দক্ষিণমুখী বাংলোখানার বারান্দায় বসেছিল দীনেশ সেন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল নদীটা বাঁক ঘুরে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। দু'পারে ঘন গাছপালা, সুপারি বাগিচা নানা রকম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল। গড়িয়ে এসে মিশেছে এই নদীর সংগে। এখন ভাটা। দীনেশ ভাবছে, খালগুলো কেমন অনর্গল বিনা প্রশ্নে দান করে যাচ্ছে নদীর বুকে আপনাকে। বৃহৎ যে, সে দান গ্রহণ করে—সময়তে মনে হয় শুষে নিচ্ছে বুঝি, কিন্তু তা-ই চরম সত্য নয়। জোয়ারের সংগে সংগে সে ফিরিয়ে দেয় সহস্র ধারায়। কেবল ইতর মানুষেই বোঝে না বিরাটের রীতি। দীনেশ সেনের হৃদয়ে একটা দুঃখ হয়। সে চেয়ে থাকে এক চোখে।

'হুজুর!'

'আসুন মাষ্টার মশাই!'

'আপনার কি শরীরটা খারাপ? কণ্ঠস্বরে যেন মনে হচ্ছে, একটা কি হয়েছে ভিতরে।' যতীন দাস বি-এ, বি-টি। একদা ইউনিভারসিটি তাকে এই সম্মান দান করেছিল—অধুনা তাকে পরীক্ষা করলে, আর যদি রেওয়াজ থাকত এ বিষয়ে উপাধি কিম্বা ডিগ্রি দেওয়ার, তা হলে, যতীন দাস ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হতো মনুষ্য-চরিত্র অধ্যয়নে। মোসাহেবীতে তো ইতিপূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল ডি-লিট।

'না, তেমন কিছু নয়—বলুন কি জন্য এসেছেন?'

'আগামী পরশু মিটিং। আমি আশা করি…'

'কোন আশাই করবেন না ওদের কাছে—ওরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ।'

'আমি মনে করি ওরা মূর্খ ছাড়া কিছুই নয়। ওদের কৃতজ্ঞতার পথে খেদিয়ে আনতে হবে।…আমার একটা আবেদন ছিল।'

'কি?'

'এবারের ডোনেসনের টাকাটা মেরামতে খরচ করতে চাই।'

'ভালই তো।'

'একটা সই…' যতীন দাস এগিয়ে দেয় একটা খাতা—কলমটা কালিতে ডুবিয়ে হাতের কাছে ধরে সবিনয়ে।

সই হয়ে যেতেই সে তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ করে।

বাংলোর পিছনে ছিল একজন প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে। হাতে তার সোনা-রূপো ওজন-করা একটা নিক্তি।

'শোন মতি স্যাকরা—এ বড় কষ্টের টাকা—তুমি টাক (ঠকান) দিও না আবার খাদ মিশিয়ে। এই নেও পঞ্চাশটা এখন। এবারেরটাও হবে প্রমাণ সাইজ হার। মেয়ে দুটোও ধিংগি হচ্ছে যেন কলাগাছের মত।'

'বিশ্বাস করবেন ক্যান। কষ্টিপাথরে কইষ্যা লইবেন।'

'জানি, জানি, কোন কথাকথিতেই কাজ হয় না ধর্মের ভয় না থাকলে। দেখ না আদালতেও হলফ করায়।'

মতি নেচে উঠে বলল, 'এই দেখি সার বুঝ বুঝছেন।'

বড় রাস্তার দিকে স্যাকরা চলে গেল।

কুন্তলা ডাকল, 'মাষ্টার মশাই!'

'নমস্কার! কোথায় গিয়েছিলেন? বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ আপনাকে—এমন তো শীগগিরও দেখিনি।'

একটা দামী ব্লু রংয়ের জামা গায় দিয়েছে কুন্তলা। কেয়তা দিয়ে ফিরিয়ে-ঘুরিয়ে পরেছে তেমনি দামী একখানা শাড়ী। হাতের চুড়ী ক'গাছা চকমক্ করছে সূর্য-কিরণে। গন্ধ আসছে মিহি মেয়েলী সুবাসের।

চশমা খুলল যতীন দাস। মাষ্টার হলেও সেও তো মানুষ বটে!

'বেড়াতে গিয়েছিলাম নদীর পারে। কি সুন্দর দৃশ্য!'

'অথচ রহস্য এই যে ওর ভিতর যত হেলে, জেলে, চোর, ডাকু, অসুন্দরের বাসা। এদিকে ভদ্র গৃহস্থের বসতি বিরল।'

'ভদ্রলোক কাদের বলেন?'

'হেঁ, হেঁ, বুঝলেন না দেবী'…অর্থাৎ যতীন দাসের মত যারা।

'আপনাদের মতের পরিবর্তন করুন—জনসাধারণকে আর অবজ্ঞা করবেন না। ক্ষুধায় তাদের অন্ন নেই, পরনে তাদের বস্ত্র নেই। কিন্তু সার জোগাচ্ছে ওরাই, এই অন্তঃসারশূন্য সভ্যতায়। কাদেরটা খাচ্ছেন একটি বারও কি ভেবে দেখেন না!'

যতীন দাসের ও-সব ভাবনার ফুরসৎ নেই। তার মাথায় ঘুরছে মেরামতের ফাঁকির অংক। তবু সে মোসাহেবী বজায় রাখে—যা তার বিদ্যার চাইতেও বড় মূলধন।

'দেবী, অজ পাড়াগাঁয়ের মাষ্টার আমরা—আমরা দেখি শুধু সদরটা। অন্দরের রহস্য বোঝার আপনাদের মত আমাদের সুখ-সুবিধা-প্রবৃত্তি কোথায়? আমরা লেখাপড়া শিখেও হয়েছি গজমূর্খ।'

'না, না, মাষ্টার মশাই, এ অতি বিনয়। আমরাও ভুল করি পদে পদে।' কুন্তলা জিজ্ঞাসা করে, 'ঐ লোকটা কোনও সংবাদ নিয়ে এসেছিল নাকি সেই আমাদের দিবাকরের কাছ থেকে? সে আসবে তো সভায়?'

'নিশ্চয়।'

একটু দীপ্ত হয়ে উঠল কুন্তলা। 'ও কে? কি বলে গেল? চলুন একটু বসবেন আমার ঘরে। বুঝলেন মাষ্টার মশাই, I am particularly interested about these folk.'

'সে তো সত্যি কথা। Folk Tales of Bengal পড়তেই তো আমরা কত ভালবাসি।'

'Exactly so! আর এরা তো গল্প নয়, জীবন্ত বলিষ্ঠ মানুষ। ও কে—ঐ লোকটা যে এসেছিল?'

মুস্কিলে পড়ল যতীন দাস; এখন কি বলে! একটা জবাব না আদায় করে কিছুতেই ছাড়বে না। মতি স্যাকরা মজাল যতীনকে।

যতই সভার দিন এগিয়ে আসছে, ততই ঢেউ খেলছে কুন্তলার মনে। ছোট ছোট বীচিমালা—একান্ত নিরালা জেগে উঠছে। বক্ষপঞ্জরে আঘাত দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। এমন কিছু গড়ছে না—তবু ঢেউ জাগছে বিস্তর। ও তো ঢেউ নয়, নিরাকার ভাব, চাচ্ছে আকার। তা এখন পাচ্ছে না কিন্তু প্রকারে যে বোঝা যাচ্ছে অনেক কিছু।

কুন্তলা পুনরায় প্রশ্ন করে, 'ও কে, কেন এসেছিল?'

'আর লজ্জার কথা বলব কি দেবী—ও মতি স্যাকরা। দুটো মাকড়ী বন্ধক রেখেছিলাম গতবার। আসলের কথা একবারও বলে না—কেবল চায় সুদ। অবশ্য আজকাল আসলটাও দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।'

'ও! মাষ্টার মশায় বিকেলে একবার আসছেন তো···নমস্কার, আমি বড্ড টায়ার্ড।' কুন্তলা চলে গেল।

এ কেমন, এক কাপ চাও খেতে বলল না। যতীন দাস ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। [ক্রমশঃ

ছন্দিতা

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখিনি কো আমরা কি কুঁড়িফুল ফাটতে···
উদয় আকাশ-মূলে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমে ঢুলে
হঠাৎ ঘুমের নেশা কাটতে?
ঐ টবে কাল ছিল ফুলটা নেহাৎ কুঁড়ি
শেষ তো দেখেছি রাত একটায়—
দেখলে না ঘুমভাঙা আলুথালু মেয়েটা,
চোখ-মুখ ভারি ভারি, এলোমেলো লাল শাড়ী,
তাড়াতাড়ি গায়ে টেনে জিব কেটে ঝাপটায়?

দেখেছো আলোর পথে ঘুম চাঁদ ডুবতে···
সকালে ফুলের গায়ে যত শিশিরের কণা
দেখেছো তো রবিকরে উবতে।
আমার দেখেছো তুমি সব কটা মরুভূমি
এক কোঁটা আঁখিজলে গলতে—
তুমিই নিবিয়ে দিলে, দাউ-দাউ জ্বলছিলো
বুকজ্বলা প্রদীপের সলতে···

এখানে তো আজ শুধু আশেপাশে ছল ছল
করুণ চোখের মত আকাশ তাকিয়ে আছে,
কাঁদি কাঁদি চোখে চায় নদীজল···
ফুটেছিল ফুলটা সে ঝরে গেছে তারপর,
অস্ত আকাশ ভরা পাঁপড়ি—
এই ফোটা এই ঝরা, ধূ ধূ পথে আঁকা শুধু
আলো-ছায়া দিয়ে বোনা জাফরী···

তোমার ও এলোচুলে অতলের ইসারা,
ছোপ ছোপ চাঁদে মাখা মুখটা,
যেন ডট্ ডট্ ডট্ কোথায় এগিয়ে চলে
ঢেউ লেগে দোল খাওয়া বুকটা···
কেন ছটফট করে হু হু বন-মর্মরে
চুলে জবাফুল গোঁজা সন্ধ্যা?
আমার হাতটা ধরো, কোথায় এগিয়ে চলো।
নব-বিদ্যুৎ-গতি ছন্দা···

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

রসিকচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। জন্ম—বরিশাল। আইন-ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—ফৌজদারী নজীর সংগ্রহ ১ম (১৮৭২), ২য় (১৮৭৫), দিওয়ানী নজীর সংগ্রহ (১৮৭৫)।

রসিকচন্দ্র মণ্ডল—গ্রাম্য কবি। জন্ম—১২২৮ বঙ্গ মেদিনীপুর খেজুরী গ্রামে। মৃত্যু—১২৭৩ বঙ্গ। পিতা—ফকিরচন্দ্র মণ্ডল। পাঁচালী-গ্রন্থ—ধন-বর্শ বা কালকেতুর রাজ্যপ্রাপ্তি।

রসিকচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার ও পাঁচালী। জন্ম—১২২৭ বঙ্গ হুগলী জেলায় পালাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩০০ বঙ্গ। ইনি এগারো-খানি পাঁচালী-গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—হরিভক্তিচন্দ্রিকা, কৃষ্ণ-প্রেমাঙ্কুর, বর্ধমানচন্দ্রোদয়, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলাবিহার, দশমহাবিদ্যা-সাধন, বৈষ্ণবমনোরঞ্জন, নবরসাঙ্কুর, কুলীন কুলাচার, শ্যামাসঙ্গীত, পঞ্চসূত্র, জীবনতারা।

রসিকলাল চক্রবর্তী—যাত্রাপালা-রচয়িতা। জন্ম—১২৬৩ বঙ্গ যশোহর জেলার রায়গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৩ বঙ্গ। ইনি বালক-সঙ্গীত যাত্রার দল প্রবর্তক। গ্রন্থ—জীবোদ্ধার, সীতার পাতাল-প্রবেশ, চণ্ডে পাগলা, মাধবের মধুর লীলা।

রসিকলাল দে—কবি। জন্ম—বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে। গ্রন্থ—পুষ্পাঞ্জলি, কানন, প্রেমের ডালি।

রসিকলাল সরকার—আইন-ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—The Stamp Act, XVIII of 1869. (১৮৭০)।

রসিকলাল হালদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বসন্ত কৌমুদী (১২৭১)।

রসিকানন্দ দেব গোস্বামী—বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৫১০ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার রোহিণী গ্রামে। মৃত্যু—১৬৫২ খৃঃ। পিতা—রাজা অচ্যুতানন্দ। মাতা—রাণী ভবানী। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্যামানন্দের শিষ্য। বহু পদ রচনা। গ্রন্থ—শাখার্বর্ণন ও রতিবিলাস।

রাইচরণ সরকার—গীতিনাট্যকার। গীতিনাট্য-গ্রন্থ—গন্ধেশ্বরী, কর্মফল, পাষণ্ডদলন, বেদ-উদ্ধার, শ্বেতার্জুন।

রাইমোহন সাহা—ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক। গ্রন্থ—প্রথম প্রশ্ন। সম্পাদক—কল্যাণশ্রী (১৩৫৪)।

রাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়—কবি। কাব্যগ্রন্থ—জীবন-দর্পণ (১২১৬)।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১২৯২ বঙ্গ ১লা বৈশাখ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে। মৃত্যু—১৩৩৭ বঙ্গ ১ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা সিমুলিয়া স্ট্রীটে। পিতা—মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (আইনজীবী)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল—১৯০০), এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯০৩), পিতামাতার উভয়ের মৃত্যু হওয়ার পড়াশুনা কয়েক বৎসর স্থগিত। বি-এ (১৯০৭), এম-এ (১৯১০)। জুবিলি রিসার্চ পুরস্কার লাভ (১৯১৩)। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন। কর্ম—ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী (১৯১০), সহকারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (১৯১১), পশ্চিম বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (১৯১৭)। পূর্ত বিভাগের অধ্যক্ষ (১৯২৪), অবসর গ্রহণ (১৯২৬)। ইঁহার বিখ্যাত কীর্তি মহেঞ্জোদড়োর প্রাচীন মুদ্রা ও শিল্পের আবিষ্কার। পাহাড়পুরের ধ্বংস খনন। পরে অধ্যাপক, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—বাঙ্গালার ইতিহাস ২ খণ্ড, পাষাণের কথা, প্রাচীন মুদ্রা (১৩২২), ত্রিপুরীর হৈহয় জাতির ইতিহাস, উড়িষ্যার ইতিহাস, ভূমারার শৈবমন্দির, বাঙ্গালীর ভাস্কর্য, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা, ব্যতিক্রম, অসীম, পক্ষান্তর, অনুক্রম, The Origin of the Bengali Script (১৯১৯) Palas of Bengal, Eastern Indian School of Medieval Sculpture (১৯৩৩)।

রাখালদাস ভট্টাচার্য—সাময়িকপত্রসেবী ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিন্দুবৌ (১৩০০), রাজা ডাকাত (১৩ ৮)। সম্পাদক—মানভূম (সাপ্তাহিক, বৈশাখ ১৩০৬, মানভূম)।

রাখালদাস মজুমদার—সাহিত্যসেবী। এম-এ। গ্রন্থ—শ্রীগীতা, ঋগ্বেদ-সংহিতা, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, আধ্যাত্ম-রামায়ণ। সম্পাদক—উৎসব।

রাখালদাস মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। বর্ধমান রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক। গ্রন্থ—পঞ্চরত্ন, শান্তিশতক।

রাখালদাস সিংহ—অনুবাদক। জন্ম—১২৭৫ (আনু) বঙ্গ নদীয়া কৃষ্ণনগরের কাঁঠালপোতায় জমীদার-বংশে। মৃত্যু—১৩৪৬ বঙ্গ ৮ই চৈত্র। গ্রন্থ—Gita (ইং অনুবাদ)।

রাখালদাস সেনগুপ্ত—কবি। গ্রন্থ—শেষ বন্দীর গান (কবিতা, ১২৮২)।

রাখালদাস হাজরা—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—জ্ঞান-দীপিকা (বর্ধমান, মাসিক, ১২৮৩)।

রাখালদাস হালদার—কবি ও অনুবাদক। জন্ম—১৮৩২ খৃঃ ২১এ ডিসেম্বর চন্দননগরের নিকটবর্তী জগদ্দলে। মৃত্যু—১৮৮৭ খৃঃ। শিক্ষা—উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বরে (১৮৪১ খৃঃ, পিতার কর্মস্থলে), চুঁচুড়া ও হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে (১৮৪৪-৪৫)। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তন্ত্রসাধনায় লিপ্ত, তৎপরে যৌবনে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরণায় আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত (১৮৫২)। ইনি তৎকালীন 'সাধুরঞ্জন' 'প্রভাকর', 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতির লেখক ছিলেন। কর্ম—ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুল, কটক (১৮৫৭), অতঃপর বিলাত গমন (১৮৬১ খৃঃ, ১১ই এপ্রিল) ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপনার গৌরব লাভ বাঙালীদের মধ্যে ইঁহারই সর্বপ্রথম। আইন পাশ (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়) ও ভারত প্রত্যাগমন (১৮৬২)। গ্রন্থ—শ্রীরাম-চরিত (১৮৫৪), Precepts of Jesus (রাজা রামমোহন রায়-কৃত) অনুবাদ। সম্পাদক—দূরবীক্ষণবাদ (১৮৫০, সাময়িকপত্র)।

রাখালমণি গুপ্ত—মহিলা কবি। গ্রন্থ—কবিতামালা (১৮৬৫)।

রাখালানন্দ ঠাকুর—বৈষ্ণব পণ্ডিত। জন্ম—১২৭৪ বঙ্গ ৮ই অগ্রহায়ণ বিখ্যাত রঘুনন্দনের বংশে বর্ধমান কাটোয়ার

শ্রীখণ্ডগ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৬ বঙ্গ ২৬এ আশ্বিন শ্রীখণ্ডগ্রামে। স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপনা ও অধ্যাপনা। শাস্ত্রী উপাধি লাভ। সম্পাদক—শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী (শ্রীখণ্ড)।

রাঘব পঞ্চানন—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপে। পিতা—রঘুনাথ ভট্টাচার্য শিরোমণি। গ্রন্থ—আত্মতত্ত্ব-প্রবোধ।

রাজঋষি সিদ্ধেশ্বর—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ভারতীয় যন্ত্রমন্দির (মাসিক, ১৩০৩)।

রাজকুমার বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সরোবরমন্থন, রামায়ণ-কাহিনী, গুরুদক্ষিণা, বস্ত্রহরণ, পরমানন্দ, ত্রিশক্তি, রস ও রসিকতা, কবি কালিদাস, তদন্তকাহিনী, দৈনিক লিপি।

রাজকুমার বেদতীর্থ—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে। স্মৃতিতীর্থ উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সামদেব-সংহিতা, গীতকুঞ্জ, প্রায়শ্চিত্ত পাঞ্চালিকা, প্রবন্ধপুষ্পাঞ্জলি, তারকেশ্বর তথ্য, গীতগোবিন্দ, নিশীথচিন্তা, ভাষাদর্পণ, দেবসমিতি, উপন্যাসকুঞ্জ, সন্দর্ভহার, নারীচিত্র, কাব্যমালা।

রাজকুমার সর্বাধিকারী—শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। জন্ম—১২৪৪ বঙ্গ খানাকুল কৃষ্ণনগরে সর্বাধিকারী বংশে। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ কাশীধামে। পিতা—যদুনাথ সর্বাধিকারী। শিক্ষা—বি, এ, বি, এল। কর্ম—সংস্কৃত ও আইনের অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ কলেজ (১৮৬৪—১৮৮৪)। সভাপতি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, সভাপতি, প্রেস অ্যাসোসিয়েসন। রায় বাহাদুর উপাধিলাভ। গ্রন্থ—ঠাকুর আইন সংক্রান্ত উপদেশমালা, ব্যাকরণ প্রবেশিকা। সম্পাদক—হিন্দু পেট্রিয়ট (কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর—ইনি হিন্দু পেট্রিয়টকে প্রাত্যহিক পত্রে রূপান্তরিত করেন—১৮৯২, ১৬ই মার্চ)।

রাজকুমার সেনগুপ্ত—কবি। গ্রন্থ—নবীনকুসুম (কাব্য, ১৩০৩)।

রাজকুমারী দে—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—তীর্থচরণে কুসুমাঞ্জলি, একটি কথা।

রাজকৃষ্ণ কুণ্ডার—কবি। গ্রন্থ—লঙ্কাবিজয় কাব্য (১২৮৬)।

রাজকৃষ্ণ গুহ নিয়োগী—কবি ও সাময়িকপত্রসেবী। গ্রন্থ—অশ্বত্থামা বিজয় কাব্য (১৩১২)।

রাজকৃষ্ণ দাস—কবি। জন্ম—পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা। গ্রন্থ—কবিতাকুসুম, ১ম (১৮৬১)। সম্পাদক—দেশ হিতৈষিণী (মাসিক, ১২৭৬)।

রাজকৃষ্ণ মিত্র—কবি। গ্রন্থ—বিষাদমুকুল (খণ্ডকাব্য, ১২৯১)।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও আইনজীবী। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ ৩১এ অক্টোবর নদীয়া জেলার গোস্বামী-দুর্গাপুর। মৃত্যু—১৮৮৬ খৃঃ। পিতা—আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কৃষ্ণনগর কলেজ, ১৮৬১), এফ-এ (ঐ, ১৮৬৩), বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৮৬৬), এম-এ (ঐ, ১৮৬৭), বি-এল (ঐ, ১৮৬৮)। কর্ম—অধ্যাপক, জেনারেল এসেম্ব্রিজ (১৮৬৭), আইন-ব্যবসায়, বহরমপুর (১৮৬৮), অধ্যাপক, কটন কলেজ (১৮৬৯), আইন-ব্যবসায়, বহরমপুরে। বঙ্গদর্শনের লেখক। গ্রন্থ—মেঘদূত (কবিতা, ১২৮১), যৌবন উদ্যান (১৮৭৪), কাব্য কলাপ (১৮৭১), মিত্রবিলাপ, History of Bengal for beginners (১৮৭৫)।

রাজকৃষ্ণ রায়—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৫৬ বঙ্গ জোড়াসাঁকো পাথুরিয়াঘাটায়। নিবাস—বর্ধমান রামচন্দ্রপুর। মৃত্যু—১৩০০ বঙ্গ। নাট্যগ্রন্থ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। অ্যালবার্ট প্রেসের ম্যানেজার (১২৮৩), স্থাপনা—বীণা প্রেস, বীণা থিয়েটার। গ্রন্থ—স্তবমালা (১৮৮১), নাট্যসম্ভব (১৮৮২), পতিব্রতা (১৮৮২), রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ, ভারতকোষ (পৌরাণিক অভিধান), অবসর সরোজিনী (কবিতা ১ম, ১২৮৫), ২য় (১২৮৬), নিশীথ চিন্তা (ক, ১২৮৪), উপ—হিরণ্ময়ী (১২৮৬), কিরণময়ী, অদ্ভুত ডাকাত (১২৯৫), ভারতে যুবরাজ (ক, ১২৮২), প্রতিফল (১৩০০), গীতিনাট্য—বামনভিক্ষা, প্রহ্লাদচরিত্র, নরমেধ যজ্ঞ, চন্দ্রাবলী, চতুরালী, মীরাবাঈ, খোকাবাবু, ডাক্তারবাবু, টাটকা টোটকা, জগা পাগলা, লক্ষহীরা, হীরামালিনী, শ্বশ্রশৃঙ্গ, বেনজীর বদরেমুনির, বনবীর, লয়লা মজনু, কল্কিপুরাণ, নিভৃত নিবাস (১৮৮৫)। সম্পাদক—বীণা (মাসিক, ১২৮৫)।

রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রকৃতি পাঠ (১৮৭২), নরদেহ নির্ণয় (১৮৭৩), কনকলতা।

রাজকৃষ্ণ সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঔষধ-কলাপাবলী (১৮৭২ (?))।

রাজনারায়ণ চক্রবর্তী—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—পথিক (মাসিক, ১২৮৪)।

রাজনারায়ণ বসু—জাতীয়তাবাদী প্রসিদ্ধ লেখক। জন্ম—১৮২৬ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৯ খৃঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর দেওঘরে। পিতা—নন্দকিশোর বসু। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ, গৃহে মুন্সীর নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা। কর্ম—শিক্ষকতা, সংস্কৃত কলেজ (১৮৪৯), প্রধান শিক্ষক, মেদিনীপুর স্কুল (১৮৫১—১৮৬৬)। দেশবাসী কর্তৃক 'ঋষি' নামে আখ্যাত। প্রচারক। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী (১৮৪৪)। আশৈশব বিদ্যানুরাগী, ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—মেদিনীপুর বালিকা বিদ্যালয়, সুরাপান নিবারণী সভা, ব্যায়ামশালা (মেদিনীপুর)। দেওঘরে অবস্থান (১৮৭৯—১৮৯৯)। গ্রন্থ—সেকাল ও একাল (১৮৭৪), বৃদ্ধ হিন্দুর আশা, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, দেহগৃহে দৈনন্দিন লিপি, সুরাপান নিবারণী সভা, জাতীয় গৌরবেচ্ছা সম্পাদনী সভা, বিবিধ প্রবন্ধ, ব্রাহ্মধর্ম (১৮৭৪), ধর্মতত্ত্বদীপিকা ২ ভাগ, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, Theistic Toleration & diffusion of Theism. The Adi Brahma Samaj as a Church, Hints showing the feasibility of constructing a science of Religions. Brahmo Catechesm, Old Hindu's Hope, Society for the promotion of National feeling among the Educated Nation of Bengal.

রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য—ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার। গ্রন্থ—History of Punjab (১৮৫৪)।

রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। পরিচালক ও সম্পাদক—অরুণোদয় (১৮৩৯ খৃঃ)।

রাজনারায়ণ মিত্র—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—কায়স্থ কৌস্তুভ (১৮৪৪, ১৭ জুলাই)।

রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—পল্লীবিজ্ঞান (মাসিক, ১৮৬৭ খৃঃ জানুয়ারি—ইহা বিক্রমপুরের দ্বিতীয় মাসিকপত্র)।

রাজমোহন মজুমদার—পণ্ডিত। জন্ম—ফরিদপুর। মৃত্যু—১৩২১। ইনি সাময়িকপত্রসেবী। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—ফরিদপুর হিতৈষী (মাসিক, ১৮৮১, পাক্ষিক, ১৮৯৭, সাপ্তাহিক, ১৯০৮)।

রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—চিত্তরঞ্জিনী (ত্রৈমাসিক, শ্রীবাটি সাহিত্য সভা, ১২৮৮)।

রাজলক্ষ্মী দেব্যা—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—কেদারবদরী ভ্রমণ, নেপালের পথে, সন্তদাস মহারাজের জীবনস্মৃতি, ব্রাহ্মসমাজের আদি চিত্র ও পরলোকতত্ত্ব, লক্ষ্মীশ্রী।

রাজশেখর, কবিরাজ—সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি! খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ১০শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত জীবিত। পিতা—দুর্দুক (বা দুহিক মহামন্ত্রী। মাতা—শীলবতী। ইনি কনৌজ রাজা মহেন্দ্র পালের উপাধ্যায় (৯০৩ খৃঃ) ও তৎপুত্র মহীপালের (৯১৭) উপাধ্যায়। কালিদাস বা ভবভূতির মত প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সংস্কৃত কাব্যজগতে ইহার প্রতিষ্ঠা বড় অল্প নহে। গ্রন্থ—বালরামায়ণ, বালভারত, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, কর্পূর-মঞ্জরী, কাব্যমীমাংসা, হরবিলাস, কবিবিমর্শ, ভুবনকোশ।

রাজশেখর বসু—রসসাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম—পরশুরাম। জন্ম—১৮৮০ খৃঃ। এম.এ, বি.এল। কর্ম—বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের—পরে ইহার কর্মাধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সভাপতি (১৯৩৫)। রস-সাহিত্য রচনায় ইঁহার দান অতুলনীয়। গ্রন্থ—কজ্জলী, গড্ডালিকা, হনুমানের স্বপ্ন, লঘুগুরু, গল্পকল্প, ধুস্তুরিমায়া ইত্যাদি গল্প, চলন্তিকা (অভিধান), কুটিরশিল্প (১৯৫০), ভারতের খনিজ ((১৯৫০), কালিদাসের মেঘদূত (অনুবাদ), রামায়ণ (অনুবাদ)।

রাজিয়া খাতুন—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—পথের কাহিনী।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—কৃষ্ণচন্দ্র চরিত (১৮০১, লণ্ডনে মুদ্রিত হয়—১৮১১ খৃঃ)।

রাজেন্দ্রকুমার রায়—সাময়িকপত্রসেবী। • জন্ম—কাঁচড়াপাড়া। সম্পাদক—কাঁচড়াপাড়া প্রকাশিকা (১৮৭৫)।

রাজেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—ছিন্নলতা (গীতিকাব্য, ১২৯৫), ভারত ভ্রমণ ও তীর্থদর্শন।

রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাময়িকপত্রসেবী। যুগ্ম-সম্পাদক—ধর্ম-প্রচারিণী (বেহালা, মাসিক, ১৮৬৪, মে)।

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—দার্শনিক। গ্রন্থ—আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ (সং, ১৮৪৮ শক), শাঙ্কর গ্রন্থাবলী (সম্পাদিত ১৩৩৫), অদ্বৈতসিদ্ধি, তর্কসংগ্রহ (১৩৩২), গীতা, বেদ মানিব কেন, বেদান্তদর্শনম্, ব্যাপ্তিপঞ্চক (টীকা, ১৩২২), তর্কামৃত (অনুবাদ, ১৮৪০ শকাব্দ), ভাষাপরিচ্ছেদ (১৩৪০), আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ (সং—১৮৪৮ শক) অদ্বৈতবাদের স্বরূপ ও প্রমাণ, খণ্ডন ও মণ্ডন, পদার্থ-নির্ণয়ক-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৩৩৫)।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৮০ বঙ্গ যশোহর জেলায় সাগরদাঁড়ি গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪২ বঙ্গ কাশীধামে। কর্ম—অধ্যাপনা, হাবড়া জেলায় নারিয়েট স্কুলে, মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউসন, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদিত গ্রন্থ—কালিদাস গ্রন্থাবলী। গ্রন্থ—কালিদাস ও ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ, দত্তক বিচার, কালিদাস।

রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী—দার্শনিক। জন্ম—১৭৮১ শকে, ৭ই ফাল্গুন ২৪-পরগনার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ এপ্রিল। পিতা—নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—ছাত্রবৃত্তি, আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় (১৮৭০), প্রবেশিকা (সংস্কৃত কলেজ, ১৮৭৮), এফ.এ (১৮৮০), বি.এ (১৮৮২), এম.এ (১৮৮৩), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ (১৮৮৫)। শাস্ত্রী উপাধি লাভ। অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, অধ্যক্ষ, লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজ, বাংলা গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক কার্যালয়ে ২য় সহকারী (১৮৮৬), পরে পুস্তকালয়াধ্যক্ষ। আজীবন সাহিত্যানুরাগী। 'সাহিত্যসভার' সম্পাদক। 'রায় বাহাদুর' উপাধিলাভ (১৯০৩)। সহ-সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। গ্রন্থ—ভাষাপরিচ্ছেদ!

রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—নির্মাল্য (মাসিক, ১৩০৫, বৈশাখ)।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য—গ্রন্থকার। বি-এ। সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। গ্রন্থ—৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ, রাণী ভবানী, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ, বাঙ্গলার প্রতাপ, বিপ্লবী বাংলা, ঝারবালা, পাতালে, যমুনা।

রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—প্রভা (কাশীপুর-টালা, মাসিক, ১৩০১)।

রাজেন্দ্রমোহন বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কাশ্মিরের বিবরণ (১৮৭৫)।

রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস—গ্রন্থ—বঙ্গীয় রহস্য (১২৯০)।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২২ খৃঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার উপকণ্ঠে শুঁড়ায়। মৃত্যু—১৮৯১ খৃঃ ২৬এ জুলাই। পিতা—জনমেজয় মিত্র। শিক্ষা—হিন্দু স্কুল, মেডিক্যাল কলেজ। ডি-এল (কলি-বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৭৫)। কর্ম—সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ ও পরে সভাপতি (১৮৮৫), এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল, ডিরেক্টর, ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউসন, সভাপতি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন (১৮৫৬-১৮৮০)। ইনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্মান প্রভৃতি বহু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রত্নতত্ত্বে ইহার অসাধারণ প্রতিভা। রায় বাহাদুর (১৮৭৭), সি, আই, ই (১৮৭৮), 'রাজা' (১৮৮৮) উপাধি লাভ। গ্রন্থ—প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪), শিল্পিক দর্শন (১৮৬০), শিবজীর চরিত্র (১৮৬০), মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১), ব্যাকরণ-প্রবেশ (১৮৬২), পত্রকৌমুদী (১৮৬৩), অশৌচ অবস্থা (১৮৭৩), মানচিত্র (১৮৫০-৬৮), **Prayer of St. Niersis Chajensis** (সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ—১৮৬২), **Chandogya Upanishad** (অনুবাদ, ১৮৫৬), **Antiquities of Orissa**, ১ম (১৮৭৫), ২য় (১৮৮০), **Bodh-Gaya, The Hermitage of Sakyamuni**

১৮৭৮), The Parsis of Bombay (১৮৮০), Indo-Aryans ২ খণ্ড (১৮৮১), The Sanskirt Buddhist Literature in Nepal (১৮৮২), Yoga Aphorisms of Patanjali (১৮৮৩), History of A. S. B. (১৮৮৫), Translation of Lalita Vistar ১৮৮৬); সম্পাদিত গ্রন্থ—চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক (১৮৫৪), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩ খণ্ড (১৮৫৯—৯০), প্রাকৃত ব্যাকরণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১৮৭১), গোপথ ব্রাহ্মণ (১৮৭২), তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য (১৮৭২), অগ্নিপুরাণ, ৩ খণ্ড (১৮৭৩—৭৯), ঐতরেয় আরণ্যক (১৮৭৬), ললিতবিস্তর (১৮৭৭), বায়ুপুরাণ ১ম (১৮৮০), ২য় (১৮৮৬), নীতিসার (১৮৮৪), অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (১৮৮৮), বৃহদ্দেবতা (১৮৯২), Descriptive Catalogue, A. S. B. (১৮৪৯)। পরিচালনা—বিবিধার্থ সংগ্রহ। সম্পাদক—বিবিধার্থ সংগ্রহ (সচিত্র মাসিক পত্রিকা, ১৮৫১), রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬৩)।

রাজেন্দ্রলাল সিংহ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—দিবাকর (মাসিক, ১২৮৩, বর্ধমান)।

রাজেশ্বর গুপ্ত—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—অঞ্জলি (চট্টগ্রাম, মাসিক, ১৩০৫, বৈশাখ)।

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত—কৃষি-বৈজ্ঞানিক। জন্ম—১৮৭৮ খৃঃ ২৬এ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুরে। মৃত্যু—১৯২৬ খৃঃ ২২এ নভেম্বর। পিতা—কাশীশ্বর দাশগুপ্ত (ব্যবহারজীবী)। মাতা—দুর্গাসুন্দরী দেবী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (বরিশাল), এফ. এ (ঢাকা কলেজ), কৃষিবিদ্যা (শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)। কর্ম—ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারল সার্ভিস (বাঙালার মধ্যে সর্বপ্রথম—ডেপুটি ডিরেক্টার)। রায় বাহাদুর উপাধি লাভ (১৯২০)। রাজকীয় কৃষি কমিশনের সময়ে Liaison Officerরূপে কার্য। বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তক। 'রাজেশ্বর প্লাউ' নামক হাল্‌কা উন্নত ধরণের লাঙ্গলের উদ্ভাবক। চুঁচুড়া কৃষি বিদ্যালয় ও কৃষিক্ষেত্র ও ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করেন। গো-মহিষাদি গণনা ও পাটের হিসাব (১৯২২) ও বঙ্গীয় বাৎসরিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ। গ্রন্থ—কৃষিবিজ্ঞান ১ম (কৃষির মূলনীতি), ২য় (ফসল, সব্জী ও ফল), ৩য় (গো-পালন)। প্রতিষ্ঠাতা—কৃষি-কথা (বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের প্রথম মাসিকপত্র)। Cattle Wealth of Bengal.

রাজেশ্বর সাধুখাঁ—কবি। গ্রন্থ—বিমাতৃক (কাব্য, ১৩১১)।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—অর্থনীতিবিদ্‌। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরে। পিতা—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (আইনজীবি)। এম. এ। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ। কর্ম—অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ (১৯০৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যক্ষ, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও ইউরোপ ও আমেরিকায় বক্তৃতাদান (১৯৩৭)। গ্রন্থ—বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য, মনোময় ভারত, তরুণের ভারত, দরিদ্রের ক্রন্দন, শাশ্বত ভিখারী, শিক্ষাসেবক, পল্লীপ্রচারক, বিশ্বভারত ২ খণ্ড। সম্পাদক—উপাসনা।

রাধাকান্ত দেব—বিদ্যোৎসাহী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৭৮৪ খৃঃ ১০এ মার্চ কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশে। মৃত্যু—১৮৬৭ খৃঃ ১৯এ এপ্রিল। পিতা—গোপীমোহন দেব (নবকৃষ্ণ দেবের পোষ্য)। আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি—সমভাবে পারদর্শী। অর্ধ শতাব্দীকাল বিবিধ জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ ও সাহিত্য চর্চা। হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর (১৮১৮), খেলাৎ ও শিরোপা পুরস্কৃত (লর্ড আমহার্ষ্ট কর্তৃক—১৮২৪), রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ (১৮৩৭ খৃঃ ১৮ই অক্টোবর), কে. সি. আই. ই (১৮৬৬ খৃঃ ৩০এ এপ্রিল—বৃন্দাবন বাসকালে)। অবসর-গ্রহণের পর বৃন্দাবনে বাস (১৮৬৪)। গ্রন্থ—নীতিকথা (১৮১৮, এপ্রিল), শব্দকল্পদ্রুম: (১৮১১—৫৮), বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ (১৮২১), সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ (১৮২৭), পদাবলী, ২ খণ্ড (১৮৬৪—৬৭), Translation of an Extract from a Horticultural work in Persian.

রাধাকিশোর চৌধুরী—কবি। জন্ম—ঢাকা। গ্রন্থ—পত্ররঞ্জন (১৮৭২)।

রাধাকৃষ্ণ বসু—সাময়িকপত্রসেবী। উড়িষ্যা-প্রবাসী। সম্পাদক—শ্রীরাধারমণ সন্দর্ভ (উড়িষ্যা)।

রাধাকৃষ্ণ, সর্বপল্লী—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১৮৮৮ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর। এম. এ, ডি. লিট্‌। কর্ম—শিক্ষক, মাদ্রাজ ক্রিষ্টান কলেজ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (মাদ্রাজ ১৯১১-১৭), মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮-২১), ৫ম জর্জ অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১-৩১; ১৯৩৭-৪১), ভাইস চ্যান্সেলর, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩১-৩৬), কাশী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৯-৪৮), আপটন লেকচারার, অক্সফোর্ড (১৯২৬, ১৯২৯-৩০), চিকাগো (১৯২৬), রাষ্ট্রদূত, সোভিয়েট রাশিয়া, সহ-সভাপতি, ভারত প্রজাতন্ত্র। গ্রন্থ—Indian Philosophy, ২য় খণ্ড, Hindu View of life, Kalki.

রাধাগোবিন্দ কর—চিকিৎসক। জন্ম—১৮৫০ খৃঃ (আনু)। পিতা—ডাক্তার দুর্গাচরণ কর। শিক্ষা—দিল্লী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ, ইউরোপ যাত্রা (১৮৮৩), চিকিৎসা-শাস্ত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (এডিনবারা, ১৮৮৭)। প্রতিষ্ঠাতা—কর প্রেস। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (প্রথম বে-সরকারী মেডিক্যাল কলেজ অধুনা আর. জি. কর হাসপাতাল)। গ্রন্থ—ধাত্রীসহায় (ডাঃ সুরথচন্দ্র বসু সহ), ভীষক্‌ সুহৃদ্‌, এনাটমী, কর-সংহিতা, সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ব, সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালকচিকিৎসা, রোগীপরিচর্যা নূতন ভৈষজ্যতত্ব, প্লেগ, স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা, গায়নকলোজী।

রাধাগোবিন্দ নাথ—ঐতিহাসিক। জন্ম—কুমিল্লা। এম. এ। গ্রন্থ—বল্লালচরিতের অনুবাদ। সম্পাদক—সাধনা (কুমিল্লা, ১৩৩৩)।

রাধাগোবিন্দ পাল—কবি। জন্ম—১৮৭১ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার কর্ণেলগঞ্জে। মৃত্যু—১৯৩৮ খৃঃ। পিতা—মহেন্দ্রনাথ পাল (জমীদার, তুর্কাগড়)। গ্রন্থ—কুরুকলঙ্ক (কাব্য, ১৩০৮)।

রাধাচরণ গোস্বামী—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রিকা (বৃন্দাবন)।

[ক্রমশঃ।

ছোটদের আসর

মান্ধাতার মুল্লুকে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চতুর্থ পর্ব্ব

দুঃসংবাদ

আরবদের একটি প্রবাদ : "নীল নদের জল একবার যে পান করেছে, আবার তা পান করবার জন্যে তাকে প্রত্যাগমন করতে হবেই।"

প্রবাদটা হয়তো অমূলক নয়। কারণ এবার নিয়ে এ অঞ্চলে বিমল ও কুমারের আসা হ'ল বার বার—তিন বার। তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে "আবার যকের ধন" ও "রত্নপুরের যাত্রী" উপন্যাসে।

দ্বীপনগরী মোম্বাসা—আগে ছিল (১৮৮৭—১৯০৭ খৃষ্টাব্দ) ইংরেজ-অধিকৃত পূর্ব্ব-আফ্রিকার রাজধানী। বয়স তার প্রাচীন। ১৩৩১ খৃষ্টাব্দেও বিখ্যাত আরব ভ্রমণকারী ইব্‌ন্ বতুতা তাকে একটি বৃহৎ জনপদ ব'লে বর্ণনা করেছেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দেও পর্ত্তুগীজ নৌবীর ভাস্কো-ডি-গামা এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য দেখে গিয়েছেন। ভারতবর্ষ থেকে জলপথে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় আসতে গেলে আজও প্রথমে এসে নামতে হয় মোম্বাসার কিলিন্দিনী বন্দরে।

মোম্বাসাকে নিয়ে আরব ও পর্ত্তুগীজদের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গিয়েছে—কখনো জিতেছে আরবরা, কখনো পর্ত্তুগীজরা। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরা এখানে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করেছিল, আজও তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু এখন আর তা আরব বা পর্ত্তুগীজ কারুর ভোগেই লাগে না। মাঝখান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সর্ব্বগ্রাসী ইংরেজরা, সেখানে আছে তাদের সামরিক রসদের ভাণ্ডার এবং কয়েদখানা। এই প্রাচীন দুর্গটির অবস্থান সুন্দর, চল্লিশ ফুট উঁচু প্রবালশৈলের উপরে দাঁড়িয়ে সে কাটিয়ে দিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং তার সুমুখ দিয়ে উচ্ছসিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে সুনীল ভারত-সাগরের অশ্রান্ত তরঙ্গমালা।

বন্দর থেকে বিমল, কুমার, রামহরি, বিনয় বাবু, কমল ও রামহরি প্রভৃতিকে নিয়ে রিক্সাগুলো ছুটতে লাগলো হোটেলের দিকে এবং আরোহীদের কৌতূহলী চক্ষু নিবদ্ধ হয়ে রইল রাজপথের দৃশ্যের দিকে।

আফ্রিকাকে আগে সকলে মনে করত রহস্যময় দেশ, কিন্তু তার পূর্ব্ব প্রান্তের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী নগরগুলো এখন যেন হয়ে উঠেছে সর্ব্বজনীন। রাজপথ দিয়ে ছুটছে রিক্সা, মোটর, ট্যাক্সি ও লরি এবং তাদের আরোহীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হরেক-রকম পোষাক পরা নানান দেশের নানান জাতের লোক। শ্বেতাঙ্গ য়ুরোপীয়, কালো-কুচকুচে 'সোয়াহিলি' বা স্থানীয় বাসিন্দা, অপেক্ষাকৃত অল্প-কালো আরব এবং শ্যামবর্ণ ভারতীয়।

বহু ভারতবাসী এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। রাজ-পথের নানা স্থানে দেখা যাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক—হিন্দু, মুসলমান, পার্সী। দিকে দিকে শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কত মন্দির ও মসজিদ এবং তাদের দেখে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, ভারতবাসীর সংখ্যা এখানে নগণ্য নয়। এমন কি, এখানে ভারতীয় বাজারেরও অভাব নেই।

একটি বিখ্যাত চলতি কথা আছে : "কোন ভৃত্যের কাছেই তার প্রভু বীর ব'লে গণ্য হয় না।" বলা বাহুল্য, এ কথা খাটে কেবল মনুষ্য-সমাজেই।

কিন্তু কুকুররা হচ্ছে প্রভু-গত-প্রাণ। প্রভুই তাদের দেবতা। কাজেই বিদেশে এসে বাঘা তার প্রভুর সঙ্গ ছাড়তে রাজি হয়নি, কুমারের পিছনে পিছনেই রিক্সায় এসে উঠেছে। ভালো ক'রে আঘ্রাণ নিয়েই সে বুঝতে পেরেছে এ দেশ তার কাছে মোটেই নূতন নয়—এখানে বাতাসে বাতাসে মিশিয়ে আছে পুরাতন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ! তার মনের ভিতরে জেগে উঠল বোধ করি নূতন নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত, কারণ লাঙ্গুল-পতাকা উত্তোলন ক'রে উদগ্র উৎসাহে সে চীৎকার করতে লাগল—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!

কমল হচ্ছে দলের মধ্যে সকলের ছোট। সে এর আগে আর কখনো আফ্রিকায় আসেনি বটে, কিন্তু পর্য্যটকদের পুস্তকে এখান-কার বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী পাঠ করেছে। তার কাছে আফ্রিকা হচ্ছে এক বিচিত্র রোমান্সের দেশ—যেখানে দিকে দিকে শোনা যায় সিংহ, গণ্ডার, হাতী, হিপো আর গরিলার গর্জ্জন, যেখানে জঙ্গলে জঙ্গলে বাস করে থাকে জুলু, হটেণ্টট ও মাসাই প্রভৃতি অসভ্য যোদ্ধাদের রণদামামা, যেখানে পথে-বিপথে পদে পদে অতর্কিতে হয় ভয়াবহ বিপদের আবির্ভাব!

কাজেই এখানে এসেও সে সেই নিত্যপরিচিত নাগরিক দৃশ্য এবং একান্ত সাধারণ, পোষ-মানা মনুষ্যজাতীয় জীবদের একঘেয়ে জনতা দেখে মোটেই তৃপ্ত হ'তে পারলে না, হতাশ ভাবে বললে, "মসিয়ে রোলাঁ, এখানে এসে মনে হচ্ছে না তো আমার স্বপ্নে দেখা আফ্রিকায় এসে হাজির হয়েছি। এ যে দেখছি বাংলাদেশের মফঃস্বলের কোন সহরের মত জায়গা!"

রোলাঁ মুখ টিপে হেসে বললেন, "এখান থেকে আমরা যাব এরও চেয়ে একটা বড় সহরে। নাম তার নাইরোবি, সেটা হচ্ছে কেনিয়ার রাজধানী।"

কমল মুখভার ক'রে বললে, "তাহ'লে আমরা কি আফ্রিকায় এসেছি সহরের পর সহর দেখবার জন্তেই?"

—"আপাততঃ তাই বটে। কমল বাবু, প্রথমে আমাদের গোড়া বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে চলতে হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে অনেক লটবহর, তাঁবু, মোটর লরি, আগ্নেয়াস্ত্র, একদল আস্কারি—"

—"আস্কারি আবার কি?"

—"এখানে আস্কারি বলে সেপাই আর পাহারাওয়ালাকে।"

—"কোথায় তারা ?"

—"ভারতবর্ষে থাকতেই যথাসময়ে তারবার্ত্তা পাঠিয়ে আমার এজেন্টকে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রাখতে বলেছি। এখনি ব্যস্ত হবেন না, অজ্ঞাত আফ্রিকার বুকে ঝাঁপ দেবার আগে যথাস্থানেই সব হাজির থাকবে।"

কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে কমল বললে, "তাহ'লে এখনো অজ্ঞাত আফ্রিকার অস্তিত্ব আছে ?"

রোলাঁ বললেন, "এখনো আছে কমল বাবু, এখনো আছে। কাপড়ের ধারে ধারে থাকে যেমন পাড়, আফ্রিকার চার প্রান্তেই আছে তেমনি সভ্যতার বসতি। কিন্তু তার অন্তঃপুর হচ্ছে এমন বিরাট যে, সেখানে কোথায় কি হচ্ছে আর কি না হচ্ছে, আজও কেউ নিশ্চিতরূপে সে সন্ধান রাখতে পারে না। এই তো সবে প্রস্তাবনা, এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন কেন ?"

বুঝতে পারছি, কমলের মত অনেক পাঠকও এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবেই প্রাথমিক পথের বর্ণনা দিয়ে আমরা মূল ঘটনাক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হব।

দিন-দুই মোম্বাসার দুঃসহ কাঠ-ফাটা উত্তাপ সহ্য করে অবশেষে তারা ট্রেণে চ'ড়ে নাইরোবির দিকে যাত্রা করল।

দুই দিকে দেখা যাচ্ছে রৌদ্রোজ্জ্বল তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঝোপঝাপ, বনজঙ্গল এবং মাঝে মাঝে ধূসর পাহাড়। সেখানে বিচরণ করছে হরিণ, উটপাখী, জেব্রা ও জিরাফের দল। এক জায়গায় খানার ধারে দাঁড়িয়ে জলপান করছিল একটা চিতাবাঘ, ছুটন্ত ট্রেণের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েই সে দৌড় মেরে একটা ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল বললে, "কুমার, মনে আছে, প্রথম বারে এ অঞ্চলে এসে কি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছিলুম ? সে যেন নানা জাতের জীবজন্তুর বিপুল শোভাযাত্রা !"

কুমার বললে, "হ্যাঁ, এক জায়গায় ট্রেণের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটা-দুটো নয়, একদল সিংহ !"

বিমল বললে, "এখানকার জীবরাজ্যকে ক্রমেই ধ্বংসের মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে সভ্যতা আর আগ্নেয়াস্ত্র। আজ যা দেখছি, দুদিন পরে তাও আর থাকবে না।"

তারপর সুদূরের রহস্যময়, কুয়াসা-মাখা নীলবর্ণের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল এক রৌদ্রবিধৌত পর্ব্বতের মেঘভেদী সমুজ্জ্বল তুষার-মুকুট।

কমল সবিস্ময়ে বললে, "দারুণ গ্রীষ্মের কবলে ছটফট করছিলুম, এখন এ যে দেখছি বরফের পাহাড় !"

বিনয় বাবু বললেন, "হ্যাঁ, ওর নাম কিলিম্যাঞ্জেরো।"

রামহরি বললে, "উঁহু, ওটা হচ্ছে এখানকার হিমালয়। বাবা মহাদেব এদিকে বেড়াতে এলে ঐখানে গিয়েই ওঠেন—এই ব'লে সে ভক্তিভরে দুই হাত যুক্ত ক'রে বাবা মহাদেবের উদ্দেশে ঘন ঘন প্রণাম করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কমল সাগ্রহে ব'লে উঠল, "দেখুন, দেখুন, আবার একটা বরফের পাহাড় !"

রোলাঁ বললেন, "হ্যাঁ, মাউণ্ট কেনিয়া। মাথায় তুষারের গম্বুজ থাকলেও এ হচ্ছে আগ্নেয় পর্ব্বত—কিলিম্যাঞ্জেরোর চেয়ে দুই হাজার ফুট নীচু। ওরই বুকের ভিতরে আছে আফ্রিকার বহু হ্রদ আর নির্ঝরের মূল।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে রামহরি বললে, "বাবা, এদেশে একটা নয়, দু-দুটো হিমালয় আছে !"

অবশেষে ট্রেণ এসে থামল কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির সুনির্ম্মিত আধুনিক রেল-ষ্টেশনে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামল শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর দল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কামরায় ছিল যথাক্রমে ভারতীয় ও আফ্রিকার দেশীয় যাত্রীরা।

গাড়ী থেকে নেমে প'ড়ে কমল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললে, "শুনেছিলুম আফ্রিকা হচ্ছে পশুরাজ সিংহের স্বদেশ। কিন্তু হায় রে, এতখানি পথ পার হয়ে এলুম, তবু পশুরাজের একগাছা ল্যাজের ডগাও তো দেখতে পেলুম না !"

রোলাঁ বললেন, "প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী আগে ম্যাপে নাইরোবির নাম খুঁজে পাওয়াও সহজ ছিল না। তখন এ জায়গা ছিল সিংহদের সখের বেড়াবার জায়গা। সহরের পত্তন হবার অনেক পরেও বড় বড় রাস্তায় বিচরণ করত সিংহের দল। তাদের ভয়ে রাত্রে কেউ বাড়ীর বাইরে পা বাড়াতে ভরসা করত না। বাড়ীর ভিতরে থেকেও গৃহস্থদের শান্তি ছিল না, কারণ সিংহরা খাবারের লোভে বারান্দায় উঠে ঘরের দরজা ঠেলাঠেলি করত। সহরে সিংহের কবলে মৃত কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের কবর এখনো দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিন আর নেই, আজকের নাইরোবি হচ্ছে যে কোন সভ্য দেশের উপযোগী সম্পূর্ণ আধুনিক নগর। সিংহেরা আধুনিক সভ্যতার পক্ষপাতী নয়। তারা ঘৃণাভরে এ অঞ্চল ছেড়ে স'রে পড়েছে। বাসিন্দারা এখন রাস্তায় শুয়েও নিরাপদে ঘুমোতে পারে।"

এমন সময়ে ষ্টেশনের জনতার ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে রোলাঁকে অভিবাদন করলে। লম্বায় সে প্রায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, গঠন অত্যন্ত বলিষ্ঠ। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। পরনে খাকী রঙের কোট, প্যাণ্ট ও জুতো।

রোলাঁ বললেন, "গেল বারে এ ছিল আমার সাফারির সর্দ্দার। এর নাম কামাথি, জাতে কিকুয়ু, অত্যন্ত বিশ্বাসী।"

কমল সুধোলে, "সাফারি কাকে বলে ?"

রোলাঁ বললেন, "যে সব কুলি বনজঙ্গলে লটবহর নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যায়।"

রোলাঁ স্থানীয় ভাষায় কামাথির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠল কেমন একটা দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

বিনয় বাবু বললেন, "মসিয়ে রোলাঁ, আপনি কি কোন অশুভ খবর পেয়েছেন ?"

রোলাঁ উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, "হ্যাঁ, অশুভ খবর—অত্যন্ত অশুভ খবর। তিন দিন আগে আর একদল শ্বেতাঙ্গ কঙ্গো প্রদেশের দিকে যাত্রা করেছে।"

—"এজন্যে আমাদের ব্যস্ত হবার কোন কারণ আছে ?"

—"নিশ্চয়ই আছে। আমাদের মত তাদেরও গন্তব্য স্থান হচ্ছে মিকেনো পর্ব্বত। বড়ই দুঃসংবাদ, বড়ই দুঃসংবাদ !"

[ক্রমশঃ।

গল্প নয় সত্যি

শ্রীঅমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তর্ক বেধেছে দু'টি ছেলের মধ্যে। সেক্সপীয়ার ইচ্ছে করলে নিউটন হতে পারতেন কিনা?

একটি কৃষ্ণবর্ণের ছেলে জোর-গলায় বললে, নিশ্চয়ই সেক্সপীয়ার নিউটন হতে পারতেন ইচ্ছে করলে।

অপর একটি ছেলে ঠিক তেমন ভাবেই বললে, না, কখনই পারতেন না।

ক্লাসের অপর ছেলেরা অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে ওদের দিকে।

কৃষ্ণবর্ণের ছেলেটি আবার বললে, আমি বলছি পারতেন।

অপর ছেলেটি এবার বললে,—তুমি প্রমাণ করতে পারবে?—

—নিশ্চয়ই। জবাব দেয় কৃষ্ণবর্ণের ছেলেটি।

কয়েক দিন পরে। গণিতের ক্লাস। সেই কৃষ্ণবর্ণের ছেলেটি লাষ্ট বেঞ্চে বসে কবিতা লিখছে। অঙ্ক তার ভাল লাগে না। অঙ্ক কষার চেয়ে কবিতা লেখা ঢের বেশী প্রিয় তার কাছে।

অধ্যাপক বোর্ডে একটা শক্ত অঙ্ক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেউ পারবে এটা করতে? বোর্ডে এস। সবাই নিস্তব্ধ।

সহসা সেই কৃষ্ণবর্ণ ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। সবাই ভাবলে বোধ হয় ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। কিন্তু না। ছেলেটি সোজা বোর্ডে এসে অঙ্ক করে দিল। ক্লাসের সকলে স্তম্ভিত। যে একটা ছোট সাধারণ অঙ্ক মিলাতে পারে না, সে এই শক্ত অঙ্কটা করল কি করে!

অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য কোন পদ্ধতি জান? আরেকটি পদ্ধতিতে অঙ্কটি করে গেল ছেলেটি।

অধ্যাপক বিস্মিত। এরূপ পদ্ধতিতে অঙ্কটা মিলতে পারে, তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

ছেলেটি কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্যই করল না। যে ছেলেটি তার সঙ্গে তর্ক করেছিল সেক্সপীয়ার নিউটন হতে পারতেন না বলে, তার দিকে তাকিয়ে বলল,—দেখলি ভূদেব, সেক্সপীয়ার নিউটন হতে পারতেন কিনা!

তারপর তর্কের কথা অধ্যাপককে বলে, বলল, অঙ্ক কিন্তু আমি আর করব না। ওটা আমার ভাল লাগে না। ক্লাসের সকল ছাত্রই নিস্তব্ধ।

জান এই কৃষ্ণবর্ণের ছেলেটি কে? ইনি বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কবি ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বন্দে মাতরম্

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

এশিয়ার পরিচয়

ক্ষণেক এবার দেখে নাও তবে এশিয়ার দিকে চেয়ে,—
চার দিকে চার উপমহাদেশ এই মহাদেশ ছেয়ে।
এশিয়াকে ভাগ করিয়া দু'ভাগে ভূমধ্য পর্বত
বহু দূর ব্যাপী আছে স্থির ওই ভূভাগের মেরুবৎ।
দুই দিকে দুই সাগরের জলে নিতি নিতি অবগাহি
কত কাল ধরি আছে এ পাহাড় নাহি জানা কারো নাহি।
পশ্চিমেতে ভূমধ্য সাগর, পুবে প্রশান্ত রয়,
ভুল হবে নাকো যদি দাও কভু নাম তার হিমালয়।
যেমন দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে তুলনা ইহার নাই,
পৃথিবীতে হেন বিশাল পাহাড় কে বলো দেখিতে পায়?
ওই দেখো এর পাঁচটি শৃঙ্গ আকাশের উদ্দেশী,
সকলেই এরা পঁচিশ হাজার ফুটের চাইতে বেশী।
কাশ্মীরে ওই নাংঘা পাহাড়, নেপালে ধবলাগিরি;
তিব্বতে হিম নন্দদেবীর চূড়াটি রয়েছে ঘিরি।
ভারতের উত্তরে এরা সব, হেথা দেখো তবে আর
এভারেষ্টের সাথে রেষারেষি কাঞ্চনজংঘার।

পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বতশৃঙ্গ

এভারেষ্টের গর্বটা হলো—পৃথিবীর মাঝে সেই
সব চেয়ে উঁচু পাহাড়শৃঙ্গ তার সম কেহ নেই।
ভারতবর্ষে কেমনে এমন অভারতীয়ের নাম
দিব্যি আসিয়া জুড়িয়া বসেছে, কেহ হয়নি বাম;
তার ইতিহাস শোন যদি, দেবে ভাগ্যেরে ধিক্কার,
কেন না যদিও বাঙালীর ছেলে রাধানাথ সিকদার
অঙ্কে কষিয়া ওই শৃঙ্গের উচ্চতা দিল ধরি
তথাপি তাহার ইংরাজ প্রভু তাহাকে নেয়নি বরি।
ভারতে গৌরীশঙ্কর নাম এককালে ছিল জানা
কিন্তু ও-নাম কোন্ শৃঙ্গের ধরিবে জানিলে তা না?
বিদেশী নামেতে স্বদেশী শৃঙ্গ হলো তাই পরিচিত,
একশো বছর কেটে গেছে তবু ওই নাম প্রচলিত।
ভারতের উত্তরে যেই দেশ ইরাণ তাহার নাম,
উত্তর-পশ্চিমে চেয়ে দেখো বিরাজে তুরাণ-ধাম।
ইরাণে তুরাণে চারশো মাইল, কোথা কোথা শত আট,
প্রস্থ ইহার চাহি বিস্ময়ে নির্বাক মরুমাঠ।
শাখা-প্রশাখার সংখ্যা অনেক, তাদের মিলন স্থল
পামির অধিত্যকা যেইখানে পাতিয়াছে অঞ্চল।
পামিরের উত্তরে এ পাহাড় বারশো মাইল হবে,
তার সাথে যদি উপত্যকার সংখ্যা মিলাও তবে
ব্যবধান হবে দুইটি হাজার মাইলের কম নয়,
হিমালয় থেকে কুমারিকা তক অর্থাৎ যত হয়।
এশিয়ার ওই উত্তরাপথ দক্ষিণাপথ ধরি
এক মহাদেশ বলো তারে দুই খণ্ডেরে যোগ করি।
উত্তরাপথ একাই একটি উপমহাদেশ হয়,
দক্ষিণাপথে অপর তিনটি মিলিয়া চতুষ্টয়।
দ্বিতীয় খণ্ডে পূব পশ্চিম দুই ভাগ ছাড়িলেই
মধ্যভাগের অংশ যা থাকে ভারতবর্ষ সেই।
এই যে চারটি উপমহাদেশ এরা সব একে একে
বহু দূর গেছে সাগরের দিকে ঢালু হয়ে এঁকে-বেঁকে।
ফলে উত্তর ভাগের নদীরা উত্তরবাহী হ'য়ে
পড়ে গিয়ে ওই আর্কটিকের অথৈ গভীর তোয়ে।

পশ্চিমের জল পড়ে ভূমধ্যে, প্রশান্তে পূব ধারা,
মধ্য সলিল গড়িয়ে ভারত-মহাসমুদ্রে হারা।
এশিয়া ছাড়িয়া ভারতবর্ষে এইবার তবে আসি,
তার আগে যেই কথাটি বলিব শুনিয়া উঠো না হাসি।

আরব দেশ

এ মহাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে ঢুকে বেশ
জাঁকিয়া বসেছে একটি যে দেশ, সে দেশ আরব দেশ।
প্রকৃতপক্ষে এই দেশ হলো মরুভূমি সাহারার—
তপ্ত সাহারা পোড়া সন্তান জননী আফ্রিকার।
মরুভূ তাহার ধর্ম ছাড়ে না, বালু তার ক্রীড়নক,
যেমন বালুকা তেমনি তাহার বাতাস মারাত্মক।
যে দেশে তাহার ভয়াবহ গতি যে দেশে সে খোঁজে ঘাঁটি,
সেই দেশ ক্রমে শুকাইয়া হয় আগাগোড়া পোড়ামাটি।
আরব দেশের অন্তরে বহি তারপর ক্রমে তরি
ইরাণ দেশের দক্ষিণ ভাগ সাহারা নিয়েছে ধরি।
সিন্ধু ভূভাগ, তাই তো সেখানে বৃথা জল লাগি সাধা;
আগের এ পথে রাজপুতানাই প্রথম দিয়াছে বাধা।
রাজপুতানার চিরগৌরব মস্ত তাহার দান,
যার খেয়ে গেছে তার কাছে এসে সাহারা বর্দ্ধমান।
আরব দেশটা এশিয়ার মাঝে দিব্য গিয়াছে ঢুকে,
কারণটা—মানচিত্রকরেরা ধরেছিল ভুলচুকে।
পরিখা বলিয়া লোহিত সাগর যা আছে বর্তমান
এশিয়া এবং আফ্রিকা মাঝে; তা শুধু করিছে ভান,
আসলে তা মরু, একটু তলিয়ে দেখিলে হইবে জ্ঞান—
উপরে যেটুকু জল তা ভারত-মহাসাগরের দান। [ক্রমশঃ।

পাতালপুরীর রাজ্যি

(জাপানের রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

কুশানাগি তলোয়ার নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হলো! শেষ কালে কিনা সমুদ্রের তলার রাজ্য যাকে তোমরা বল পাতালপুরীর রাজ্যি, সেখানে পর্য্যন্ত যেতে হলো।

ও মা! অবাক হয়ে চোখ বড় করে চেয়ে আছ কেন? জানো না বুঝি সে গল্প? আচ্ছা তবে শোনো; কুশানাগি তলোয়ার জাপানী সম্রাটদের যুদ্ধবিজয়ের একমাত্র অস্ত্র ছিল। এই অস্ত্র কাছে থাকলে যত বড় যোদ্ধা বা বীরপুরুষ যুদ্ধ করতে আসুন না কেন, পরাজিত হয়ে ফিরে যেতেই হবে।

এই কুশানাগির জন্য জাপানী সম্রাটরা বংশ-পরম্পরায় বিদেশী শত্রুদের পরাজিত করে নির্ভাবনায় ও নিশ্চিন্তে রাজত্ব করে চলেছিলেন।

জাপানী সম্রাট শিরাকাওয়া যে সময় রাজত্ব করছিলেন—সেই সময় একবার প্রবল বিক্রমে শত্রুরা তাঁদের রাজ্য আক্রমণ করলো। একেবারে অকস্মাৎ অতর্কিত আক্রমণ। সম্রাট তো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন আর খোঁজ পড়লো কুশানাগি তলোয়ারের। কামো দেবতার মন্দিরে এই তলোয়ার থাকতো, সেখানে আনতে গিয়ে দেখা গেলো তলোয়ার নেই। বলো কি, তলোয়ার নেই? সম্রাট তো ক্ষেপে উঠলেন। তার পর বললেন, যেখান থেকে পারো তলোয়ার খুঁজে বার করো—কেমন করে তলোয়ার চুরি গেলো?

চারি দিকে খোঁজ-খোঁজ সাড়া পড়ে গেলো কিন্তু তলোয়ার আর পাওয়া যায় না। মন্দিরের ভিতর থেকে তলোয়ার চুরি, এ তো সহজ কথা নয়! এমন কাজ কি করে যে হলো—কেউ বলতে পারে না, এমন কি মন্দিরের পুরোহিতও নয়।

কিন্তু কিছুতেই কুশানাগির সন্ধান পাওয়া গেলো না।

এমনি সময় একদিন সম্রাট এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। রাজ-পরিবারের এক জন রাণী যিনি বহু বছর আগে মারা গেছেন— সম্রাট দেখলেন তিনি এসে বলছেন:—জানো না কুশানাগি চুরি হয়ে গেলো কেমন করে?

সম্রাট বললেন: কই, কিছুই জানি না। এখন দয়া করে বলে দিন, কেমন করে কুশানাগিকে ফিরে পাবো, তা যদি না পাই আমাদের এত দিনের রাজত্ব সব চলে যাবে, মান-সম্ভ্রম-গৌরব সব ধূলায় লুটাবে।

রাণীর মাথার উজ্জ্বল মুকুট যেন শত সূর্য্যের মত ঝলসে উঠলো বললেন: না না, কিছুতেই তা হতে দেওয়া হবে না, তুমি যেমন করে পারো সেই তলোয়ার নিয়ে এসো। সমুদ্রের গভীর তলদেশে ড্রাগন রাজার প্রাসাদে সেই তলোয়ার আছে। এরাই চুরি করে নিয়ে গিয়েছে—তুমি তার উদ্ধার কর এবং সাম্রাজ্য বাঁচাও।

পরদিন সকালে সম্রাট সভা ডাকলেন। এই সভায় তাঁর প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও প্রধান মন্ত্রীরা এলেন। সম্রাট তাঁদের কাছে স্বপ্নের কথা সব খুলে বললেন।

স্বপ্নের অলৌকিক কাহিনী হলেও সভার সকলেই তা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করলেন। কিন্তু তা না হয় হলো, কিন্তু সেই পাতাল পুরীতে যাবে কে? কে সেই তলোয়ার উদ্ধার করবে? এক জন মন্ত্রী বললেন: যাবার লোক আছে, কাজেই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

অকিমাটাসু নামে এক জন মহিলা ছিলেন, তিনি মন্ত্র-তন্ত্র জানতেন। তাঁকে আর তাঁর মেয়ে ওয়াকামাটাসু—এই দু'জনকে ড্রাগন রাজার রাজ্যে পাঠানো হলো। বলে দেওয়া হলো সমুদ্রের গভীর তলদেশের রাজ্য থেকে এই তলোয়ার উদ্ধার করা চাই-ই।

একটা নৌকা করে মা আর মেয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিলো তার পর এসে পৌঁছলো অগাধ সমুদ্রের মাঝখানে—নৌকা দু'-চার বার পাক খেলো, তার পর মা আর মেয়ে সেই ঢেউ-ওঠা নীল জলরাশির মধ্যে তলিয়ে গেল।

তার পর?

তার পর আর কি? মায়ে-ঝিয়ে গিয়ে উঠলো সমুদ্রের তলার সেই অপূর্ব্ব নগরে। যত দেখে তারা ততই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তারাও তো মস্ত বড় সাম্রাজ্যের লোক—কিন্তু সমুদ্রের নীচেও এ ঐশ্বর্য্য ভরা, অপূর্ব্ব নগরের কথা স্বপ্নেও ভাবেনি তারা। আশ্চর্য্য আর বিস্ময়ে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে চললো রাজপ্রাসাদের দিকে। রাজপ্রাসাদের ফটকে পৌঁছতেই যে সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছিল—একটি কথাও না বলে ঝনাৎ করে খাপ থেকে তলোয়ার তুললো। মা ও মেয়ে তার অর্থ বুঝলো যে ভিতরে যাওয়া হবে না। প্রহরী কিন্তু নির্ব্বাক্। কথা বলে না আর বলতেও দেয় না। মা আর মেয়ে কি আর করবে, কিছু বুঝতে না পেরে রাজপ্রাসাদের ফটকে বসে

অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রায় বেলা কেটে এসেছে, সন্ধ্যা হয়-হয়—এমনি সময় তারা দেখলো এক জন সাধুপুরুষ প্রাসাদে ঢুকতে যাচ্ছেন, তাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: কেন তোমরা এখানে বসে আছ? মা উঠে বললে: আমরা কুশানাগি তলোয়ারের খোঁজে এসেছি, আমাদের সম্রাট বড় বিপন্ন হয়েছেন, শত্রু দেশ আক্রমণ করেছে। কুশানাগি না পেলে কিছুতেই জয় হওয়া সম্ভব নয়।

—কিন্তু ভগবান বুদ্ধের আদেশ না পেলে নগরেই ঢুকতে দেওয়া অন্যায়। তোমাদের ফিরে যেতে হবে।—এই কথা বলে সাধু চলে গেলেন।

মা আর মেয়ে ফিরে এলো আবার সমুদ্রের উপরে নিজেদের রাজ্যের সীমানায়।

সব কথা শুনে প্রধান মন্ত্রী বললেন: তাই তো! তা কি রকম দেখলে?

অম্নিমাটাসু বললেন: তা যদি বললেন মন্ত্রী মশায়, এ রকম কখনও দেখিনি আর দেখবো কি না তাও জানি না। পরিষ্কার ঝকঝকে নগরই শুধু নয়, রাজপ্রাসাদের সোনার দেওয়াল আর মুক্তা-বসান ফটক দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। ভিতরে যত'দূর চোখ যায়'দেখেছি, নানা রঙের দামী-দামী পাথর দিয়ে গাঁথা সব ঘর, কি ঝকমকে আর উজ্জ্বল—চোখ ঝলসে যায়। রাস্তার দু'-ধারের পাঁচীল-গুলো সব রূপোর, তার উপর আলো পড়ে আরো ঝকঝক করছে।

—আচ্ছা, আমি যাবো তাহলে সেই রাজ্যে।—প্রধান মন্ত্রী এ কথা বলে চারি দিকে তাকিয়ে আবার বললেন: কিন্তু চারি দিকে যা ভয়ানক অন্ধকার নেমেছে।

অম্নিমাটাসু বললেন. আমরা যখন সমুদ্রের নীচে গিয়ে পৌঁছলাম—একটা প্রকাণ্ড গুহা দেখতে পেলুম, কী ঘন অন্ধকার, চারি দিকে যেন অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে, তবু আমরা সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়েই এগোতে লাগলুম। যতক্ষণ কোনো সমতল জায়গা না পেলুম ততক্ষণ চলতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে এক চমৎকার জায়গায় এসে পৌঁছলুম আসার আগে পর্য্যন্ত ভাবতে পারিনি এমন একটা অপূর্ব্ব জায়গায় এসে পড়বো। এই আলো-ঝলমল্ জায়গায় দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকালাম—পরিষ্কার নীল আকাশ, চারি দিকের গাছগুলো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—মনে হচ্ছে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। গাছগুলো এত উজ্জ্বল—মনে হলো সেগুলো সোনার গাছ, পাতাগুলোয় মণি-মুক্তা দেওয়া। মণি-মুক্তার আলোতেই যে সে জায়গাটা আলো হয়েছে তা তখন বুঝতে পারলাম। যত দেখি চোখ ফেরাতে পারি না, এর আগে ভাবতেও পারিনি এমন একটা সুন্দর জায়গায় যেতে পারবো।

প্রধান মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন: এত সব রত্ন-মাণিক দেখে তোমাদের একটুও নিতে ইচ্ছা করলো না?

—ইচ্ছা? ওহো, এতক্ষণ বলা হয়নি—এই সব গাছগুলোকে ঘিরে আছে এক-একটা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ। তার কাছে যাবে বা গাছে হাত দেবে, সাধ্য কার?

প্রধান মন্ত্রী একটু চিন্তা করে অম্নিমাটাসুকে বললেন: কিন্তু আর এক বার যেতেই হবে, কুশানগি আনা চাই কাজেই চেষ্টা করতেই হবে। কামো মন্দিরে যাও—সেখানে পূজার পর আবার তোমরা যাত্রা করবে।

অম্নিমাটাসু মেয়েকে সঙ্গে করে মন্দিরে গেলেন। পুরোহিত কামো দেবতার পূজা শেষ করে তাঁদের আশীর্ব্বাদ জানানর পর মা ও মেয়ে আবার যাত্রা করলেন।

আবার সেই সমুদ্র। আবার নৌকা তিন-চার বার মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে তার পর মা আর মেয়েকে দেখা গেলো না। পাতালপুরীর রাজ্যে প্রবেশ করে তারা ড্রাগন-রাজার সোনার প্রাসাদের কাছে এসে পৌঁছলো। এখানে সব অদৃশ্য সান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছিলো—তাদের চোখে দেখা গেলো না বটে কিন্তু প্রাসাদ থেকে দু'জন মেয়ে বেরিয়ে এলেন—খুব ঝলমলে সাজ, দেখলেই বোঝা যায় যে তাঁরা রাজ-পরিবারের মেয়ে। তাঁরা বেরিয়ে এসে অম্নিমাটাসুদের হাতের ইঙ্গিতে সেখান থেকে সরে গিয়ে দূরে বুড়ো পাইন গাছটার নীচে দাঁড়াতে বললেন।

পাইন গাছের ছালগুলো চকচক করছিল সোনার মত। সামনের রাজপ্রাসাদের একটা জানলা খুলে গেলো, জানলার খড়খড়ীগুলোর মণি-মুক্তার কাজ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলো। দু'জন মেয়ের ভিতর এক জন বললে, এদিকে তাকিয়ে দেখো, এই যে জানলার দিকে।

অম্নিমাটাসু আর ওয়াকামাটাসু সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন—এক ভয়ঙ্কর দীর্ঘকায় সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা তুলে বসে আছে। সূর্য্যের তেজের মত আলো তার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে, রক্তের মত লাল জিব দেখলে আতঙ্কে চোখ বুজতে ইচ্ছা করে। সেই কুণ্ডলী-পাকান লেজের স্তূপের উপর একটি ছোট্ট সুন্দর ফুটফুটে ছেলে অগাধে ঘুমুচ্ছে। এই রকম একটা দৃশ্য দেখে মা ও মেয়ে আর কথা বলতে পাচ্ছে না। ভয়ে যেন কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে এসেছে।

সূর্য্যের আলোর মত চোখ দু'টোকে ঘুরিয়ে সাপ তাদের লক্ষ্য করে বললে: তোমরা এখানে এসেছ কুশানাগি তলোয়ারের খোঁজে? কিন্তু জানো কি আমি সেই তলোয়ার চিরদিনের মত এখানে এনে রেখেছি। তাছাড়া এটা জাপানের সম্রাটের তলোয়ার নয়। শোনো তবে বলি: বহু কাল আগে হি নদীর ধারে ড্রাগনদের এক যুবরাজ বাস করতে গিয়েছিল, সেখানে জাপানের এক যোদ্ধার সঙ্গে তার দেখা ও যুদ্ধ হয়। ড্রাগন-যুবরাজের জয় হলো আর জাপানী যোদ্ধা মারা যাবার সময় এই তলোয়ারটা যুবরাজকে দিয়ে গেলো। এর পর অনেক দিন কেটে গেলো—এক দিন এই সমুদ্রের এক ড্রাগন এক সুন্দরী রাজকন্যার বেশ ধরে জাপানে গিয়ে তাদের যুবরাজকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করলো এবং সেখানেই থাকতে লাগলো। আমার কুণ্ডলী-পাকানো ল্যাজের উপর যে বাচ্চা ছেলেকে ঘুমোতে দেখছো—এই ছেলের ঠাকুমা হলো সেই রাজকন্যা। একবার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধলো জাপানে—সেই সময় একে নিয়ে ওর ঠাকুমা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে একেবারে এখানে এসে উপস্থিত হলো। বুঝলে ব্যাপারটা? তোমরা ফিরে যাও—কুশানাগি পাওয়া যাবে না।

অগত্যা আবার তাদের ফিরে আসতে হলো নিজেদের রাজ্যে। সব কথা শুনে সম্রাট বললেন: তাহলে কি হবে, উপায় কি? তাহলে তো শত্রুদের কাছে পরাজয় সুনিশ্চিত?

সম্রাট যখন খুব ব্যস্ত হয়েছেন, খুব চিন্তিত হয়েছেন তখন এক জন যাদুকর এসে বললে: আমাকে আপনি অনুমতি দিন সম্রাট, আমি আমার যাদুবিদ্যায় সব বশীভূত করে কুশানাগি উদ্ধার করে এনে দেবো।

এবার তিন বারের যাত্রা—অম্নিমাটাসু, ওয়াকামাটাসু আর

্কর যাত্রা করলো। আর এবারের যাত্রা সফল করে তারা ানাগি উদ্ধার করে নিয়ে ফিরলো। তার পর সেই তলোয়ার ়ে সম্রাট যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরলেন।

এবার কিন্তু কুশানাগিকে খুব যত্ন করে একটা চমৎকার বাক্সের তর ভরে অটস্যুটা 'দেবের মন্দিরে ভালো ভাবে রেখে দেওয়া লা। অনেক বছর ধরে কুশানাগি এই মন্দিরে এই ভাবে কলো এবং বংশ-পরম্পরায় জাপানী সম্রাটরা ক্ষেত্রবিশেষে তার বহার করতে লাগলেন।

কিন্তু কুশানাগিকে রাখা গেলো না। বহু কাল সে থাকলো ট কিন্তু কোরিয়ার রাজ-পুরোহিত তাকে কৌশলে চুরি করে ়ে নিজের দেশে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠলো। ়ে জাহাজ ডুবে যায় আর কি। ক্যাপ্তেন কিছুতেই আর াহাজকে ঠিক রাখতে পারে না! জাহাজ শুদ্ধ লোক তখন প্রাণের ়ে চীৎকার করছে। এমন সময় সবাই শুনতে পেলো সমুদ্রের ভতর থেকে এক ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর: "ড্রাগন-রাজাকে ফাঁকি দিয়ে ব তার জিনিস নিয়ে যাচ্ছে—তার কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই।"

সকলেই চারি দিকে তাকাতে লাগলো—কে এমন কাজ করছে! কারিয়ার রাজ-পুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে লুকোনো কুশানাগিকে ার করে চেঁচিয়ে বললে: আমি এর মীমাংসা ও সন্ধি করার জন্য াই তলোয়ার বিসর্জ্জন দিচ্ছি।

সারা সমুদ্রের ঢেউগুলো ভয়ঙ্কর সাপের মত ফণা উঁচিয়ে উঠলো—ার মাঝে কুশানাগি অদৃশ্য হয়ে গেলো। ঝড় থেমে গেল, আকাশ াস্ত, চারি'দিক নিথর নিস্তব্ধ! কুশানাগি আবার ফিরে গেলো াগন-রাজার রাজ্যে।

খাম্‌খেয়ালী ছড়া

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

শোন্‌ রে নিমাই নস্কর,
(তোর) বাড়ীতে ঢুকেছে তস্কর।
ফস্‌ করে তুই ফোঁস্‌ কর,
(আর) দুধ কলা দিয়ে বশ কর।

*

ভজহরি ভঞ্জ, সে লোক ভারী পাক্কা
নাক দিয়ে বাতাসেরে মেরে চলে ধাক্কা
এক বারে গাঁজা মারে তিন তোলা ছাক্কা,
যত হোক্‌ টক, তবু ছাড়ে না সে দ্রাক্ষা।

*

আরশোলা গান গায় শুঁড় নাড়িয়ে
কোলা ব্যাং ভোলা ব্যাং শোনে দাঁড়িয়ে।
তাল ঠোকে রামঝিঁঝিঁ বাঁশ-ঝাড়ে ঐ,
ছাড়ে বোল্‌ "দারে দ্রুম্‌ দেরে দেরে দৈ।"

*

স্বপন দেখে তপনকুমার, রোজ দুপুরে মাঝ রাতে
পটাৎ করে হঠাৎ কে ভার ঠোকর মারে পাঁজরাতে।
তপনকুমার গোপন রাগে, গান জুড়ে দেয় দরবারী
হাঁফিয়ে মারে পেলেই বাগে কাঁপিয়ে ছাড়ে ঘর-বাড়ী।

কুঁকরে উঠে ডুকরে কাঁদে "কোথায় গেলি ছোড়্‌দি রে?
দেখ্‌, না আমায় ফেলছে কাঁদে, সত্য-ধরা সর্দ্দি রে!"
দস্যি ছেলে হাস্যলোচন, নস্যি টানে ঘট্‌ঘটাং
তপনকুমার স্বপন ভেঙে, ডিগ বাজি খায় চিৎপটাং।

*

বাথ রুমে গান গায় হোঁদারাম পাত্র
গান শুনে কান জ্বলে, জ্বলে সারা গাত্র।
এলোমেলো গানগুলো মুখে মুখে বানানো,
সুর সে তো নয়, যেন সুড়সুড়ি শানানো।
ঘটি দিয়ে তাল ঠোকে তেরে কেটে তাক্‌ তাক্‌
মনে হয় "এর চেয়ে মেরে কেটে যাক্‌ যাক্‌।"
মাঝে মাঝে ক্ষেপে বলে "তাল, কেন কাট্‌লি?
এই ব্যাটা সুর, কেন ভুল পথে হাঁট্‌লি?
মোর সাথে খেলা নয়, নই কারো ছাত্র।
নিজে আমি ওস্তাদ হোঁদারাম পাত্র।"
মাঠে মাঠে ঘাস দেখে দেখে গাধা, খাটে বসে বসে হাসে।
ঘাস ডেকে কয় "গাধা মহাশয়, এসো এসো মোর পাশে।"
গাধা কয় "যেতে সাধ যত মোর, তার চেয়ে বেশী বাধা।
ভাই রে, আমার দুটি পা রয়েছে খুটির সঙ্গে বাঁধা।"

[ক্রমশঃ।

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

পরের দিন। ডেলিগেট-সভা চুকল তো সাংস্কৃতিক সভা! মানুষ এত বকতেও পারে! সেই আটটার মুখে জলযোগ সেরে এসে বসেছি, তারপর থেকে এই চলছে। এত ধকল সইবে তো কলম-পেশার নির্বাক কাজ নিয়েছি কেন? অন্তত একটা হাফ-নেতা হওয়া কি যেতো না! সে পথ মাড়াই নি—এবম্বিধ মীটিং করা এবং তৎপরে খবর-ছাপানোর জন্য কাগজওয়ালাদের তোয়াজ করতে হবে, এই ভয়ে। তবে বিদ্যে এবং রুচিজ্ঞান কিছু বেশি হয়ে গেছে নেতা হওয়ার পক্ষে, এমন কথাও বলতে পারেন অবশ্য।

সে থাকগে। মনে মনে এতক্ষণ ধরে এক ভীষণ সঙ্কল্প ভেঁজে নিয়েছি। রাস্তায় হাঁটব, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াব। জীবনে ঘেন্না ধরে যায় ঐ এক কোঁটা ছেলে-মেয়েগুলোর জ্বালায়। ক্ষুদে অভিভাবক হয়ে বুড়ো বুড়ো নাবালকদের খবরদারি করে বেড়াবে! নিতান্ত অবোধ যেন আমরা এক-একটি, কিছু বুঝি না সংসারের—কোথায় কখন গোলমাল ঘটিয়ে বসি, সেই ভয়ে সদা তটস্থ। আয়েদের সুধা-তরঙ্গে হাবুডুবু খাচ্ছি—দাও না বাপু গোলমালের চোরাবালিতে একটুখানি পা ঠেকাতে। হোক না একটু পথের গণ্ডগোল—এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বেড়াই, ঠেকেই আসি না হাজার কয়েক ইয়ুয়ান সওদা করতে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছি মনে মনে—'পুণ্যে পাপে সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে'—তা বিশ-বাইশের গরবিনী ঐ মা-জননীরা বুঝবে সেকথা! মরীয়া আজকে, পালাবোই। তোমাদের বিনা মাতব্বরিতে বহাল তবিয়তে বেড়াতে পারি, প্রমাণ করে ছাড়ব। ক্ষিতীশ দু'দিন ধরে একটা টাইয়ের কথা বলছে, নিজেরা টাই কিনে চোখের উপর মেলে ধরব, কেমন—পারি না যে?

গলা খাঁকারি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। থুতু ফেলতে বাইরে যাচ্ছি এই আর কি! ক্ষিতীশের দিকে চোখ টিপে এসেছি। অনতিপরে সে-ও এলো।

নিচের তলায় মীটিং, এই বড় সুবিধা। অধিক আগল পেরোতে হবে না। বড়-দরজা পার হতে পারলেই লন, এবং তার পরেই রাস্তা। লনেও বিপদ থাকতে পারে। কিন্তু এই দেড় প্রহর বেলায় সকলেই প্রায় মীটিঙের তালে ব্যস্ত—সুড়ুৎ করে লনটুকু পিছলে যাওয়া যাবে না, তবে আর বড়-বিদ্যার কি শিখলাম এতদিনে!

আঃ, করো কি ক্ষিতীশ! তাকিও না কোনদিকে—ঝুপ করে বসে পড়ো সোফার উপর।

দোভাষি ছাত্র একটি আসছে। না, আমাদের দিকে নয়; আমাদের সন্দেহ করেনি। এমনি শঙ্কিত মন—সিঁদুরে মেঘ দেখলে অগ্নিকাণ্ড বলে ভাবি। সিঁড়ি বেয়ে ছোকরা তরতর করে উপরে উঠে গেল। চলে যাক একেবারে দৃষ্টির আড়ালে। আমরা বাপু নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে বসে আছি। দুষ্ট বুদ্ধি কিছু নেই, জিরিয়ে নিয়ে এখনই যাচ্ছি মীটিং-ঘরে।

গেছে চলে তো? এখন এগারোটা। একটায় লাঞ্চ—পাক্কা দু-ঘণ্টা। কাছে-পিঠেই একটা বাজার লক্ষ্য করা গেছে—মরিশন স্ট্রীটের উপর। বাজার চুঁড়বো, চলো—

কি আনন্দ! পায়ে হেঁটে বেড়ানো পিকিনের রাস্তায়—মোটরের গর্তে নয়। পিকিনের পথের ধুলো লাগছে পায়ে। পায়ে নয়, জুতোর তলায়। আর ধুলোই বা কোথা—ধুলো কি থাকতে দিয়েছে কোন খানে? যা-ই বলুন, এ-ও এক রকমের ব্যাধি। ধুলো-ময়লা মশা-মাছি নিয়ে শুচিবাই। আমার সেজ-খুড়িমার মতো—সর্বত্র গোবর লেপে তিনি নির্ভাবনা হতেন।

চলেছি। লোকে তাকাচ্ছে আমার দিকে। উৎসাহী কেউ কেউ পিছু নিচ্ছে। একবার দাঁড়িয়েছি পথের পাশে দোকানের জানলায়। পিছন ফিরে দেখি, ভিড় জমে গেছে। ও-ফুটপাথের লোকও রাস্তা পার হয়ে আসছে। তখন মালুম হল। এই কৃষ্ণমূর্তি—তার উপর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি-আলোয়ান। আজব চিজ পথে বেরিয়েছে, নিতান্ত অন্ধজন ছাড়া আসবেই তো ছুটে। নিখরচায় চিড়িয়াখানার মজা। বিপদ কত দিক দিয়ে কত রকম ভেবেছি, এক-চক্ষু হরিণের মতো এটা ভেবে দেখিনি তো!

একবার ওদের দিকে তাকাই, একবার বা নিজের দিকে। ফরসা মানুষদের মধ্যে দেহবর্ণ আরও যেন ঘন দেখায়! কৃষ্ণের বেদনা, আপনাদের মধ্যে যাঁরা গৌরাঙ্গ আছেন, বুঝতে পারবেন না। চারু-দার কথা মনে পড়ে। ফড়খেলা হচ্ছিল যশোরের এক মেলায়—চারু-দা ইস্কাপনের উপর এক আনা ধরলেন। হল না, গুটি অন্য ঘরে। আনিটা বাজেয়াপ্ত করে ফড়ওয়ালা বলে, ফরসা—। তার মানে, ঐ ঘর ফাঁকা—গুটি পড়ে নি! চারু-দা তৎক্ষণাৎ আর এক আনা বের করে সেই ঘরে রাখলেন। বললেন, আর একবার বলো ভাই—ফরসা। পাওনা হলেও চাইনে। আমার দিকে চেয়ে 'ফরসা' আজ অবধি কেউ বলে নি।

দ্রুতপদে হাঁটছি। ভিড় পিছনে ফেলে এগিয়ে উঠব। হাঁটা আর বলি কেন, দৌড়ানো। ক্ষিতীশের কোট-প্যান্টলুন—গঙ্গা-জলের ছিটার মতো ঐ পোশাকমাহাত্ম্যে তার কালো রঙের পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। গায়ে চাপিয়েছে কি সাহেব। দূর থেকে সে হাঁক পাড়ছে, দাঁড়ান—

দাঁড়িয়ে মরি আর কি ভিড়ের ঠেলায়! মানুষ চলাচল বন্ধ হবার জোগাড়—ট্রাফিক-পুলিশ শেষটা থানায় নিয়ে তুলুক।

মহাকালের মতো চলতেই হবে আমার, থামা চলবে না। স্যাহেব হয়ে পথে বেরিয়েছ, ভাগ্যবান তোমরা—হেলতে দুলতে ইতি-উতি দেখে শুনে গজেন্দ্র-গমনে এসো।

নতুন বিপদ। একদল সৈন্য ওদিককার পথ ধরে মরিশন ষ্ট্রীটে পড়ছে। পথ আটকে গেছে, ওদের লাইন শেষ না হওয়া অবধি এগোবার উপায় নেই। গতিশীল ভিড়টাও থমকে দাঁড়িয়েছে আমার সঙ্গে। সৈন্যেরা কুচ-কাওয়াজ করে খুব সম্ভব আসন্ন উৎসবের মহড়ায় চলেছে। কিন্তু তাদের চেয়ে বেশি দ্রষ্টব্য এখন আমি—আমারই উপর সমস্তগুলো চোখ। উপায়?

চতুর্দিকে দেখে নিলাম একনজর। সৈন্যরা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—পথ খালি হবার আশু সম্ভাবনা দেখিনে। বড় দোকান একটা। অকূলে ভাসমান—তৃণ কি মহীরুহ বাদবিচারের সময় নেই। যা থাকে কপালে—কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। আপাতত নিরাপদ তো বটে!

আইয়ে বাবুজি—

কি আশ্চর্য! জাত-ভাইয়ের গলা—হিন্দি জবানে বলছে। কি আনন্দ যে হল! ইচ্ছে করে, আধবুড়ো মানুষটাকে কাঁধে তুলে নাচাই।

বেরুমল আমার নাম। ঘর সিন্ধুদেশে। জমিজিরেত-ঘরবাড়ি সমস্ত এখন পাকিস্তানে। আপনারা আসছেন, কাগজে দেখতে পাচ্ছি। তা মশায়, আমরা পুঁটিমাছ—অত বড় মচ্ছবে মাথা সেঁধুতে ভয় পাই। জানি, এসেছেন যখন—পায়ের ধুলো একদিন পড়বেই। চিনে চিনে ঠিক এসেছেন দেখছি।
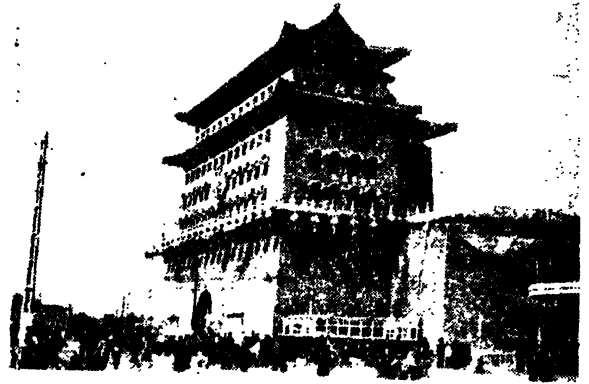
পিকিন রেল-ষ্টেশনের নিকটবর্তী নগরদ্বার (Chien Men)

গ্রীষ্ম-প্রাসাদে কলেজি ছেলেমেয়েদের ছুটির আনন্দ
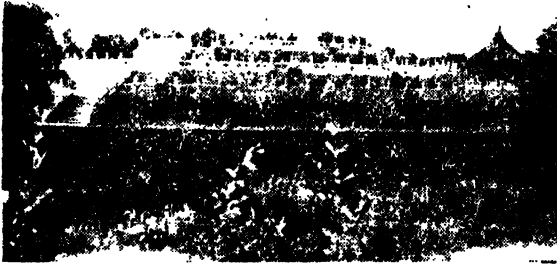
পিকিনের প্রাচীন রাজারা প্রার্থনার জন্ত এখানে সমবেত হতেন

এসেছি না চিনেই—

বেরুমল মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন।

দেখুন তাই। চিনবার কোন উপায় রাখতে দিল কি? দেশের মানুষের মুখ দেখতে পাইনে। কালে ভদ্রে কেউ যদি এসে পড়ে—সেই জন্যে ধরাপাড়া করলাম, বাপু হে, তোমাদের চীনে হিজিবিজি কে বুঝবে, সাইনবোর্ডখানা ইংরেজিতে লিখিয়ে দি—'ইণ্ডিয়ান সিল্ক সপ'। তা বিদেশি হরপ চীনা-মানবের চোখে পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। সদর জায়গায় চীনা ছাড়া আর কোন লেখা চলতে দেবে না। এমন গোঁড়া বামনাই দেখেছেন মশায়, ভূভারতে?

বটে তো! পথে ঘাটে এ ক'দিন যত লেখা দেখছি সমস্ত চীনা। গোটা চার-পাঁচ ক্ষেত্রে কেবল চীনার সঙ্গে একত্র রাশিয়ান দেখেছি। ঐ চারটে কি পাঁচটা পোষ্টারে—তার অধিক

চক্রেশ জৈন (ন্যাশনাল পিকিন য়ুনিভার্সিটি)।

নয়। নিজের ভাষা ছাড়া আর-কিছু লোকের নজরে আসবে না—এ কিন্তু গোঁড়ামি। আমরা কত দরাজ, বিবেচনা করুন তা হলে। এই কলকাতা শহরে, কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে পাদচারণা করুন, বিশ্বভুবনের যাবতীয় বর্ণমালা মিছিল করে দেখা দেবে। মানি, পুরানো জাতি তোমরা, অতি-পুরানো সংস্কৃতি—ঐশ্বর্যবান তোমাদের সাহিত্য। তা আমরাও কম হলাম কিসে? অত ঠেকার আমাদের নয়।

পরে আরও এক নমুনা দেখেছিলাম, পিকিন ছাড়বার মুখোমুখি সময়টা। শান্তি-সম্মেলন চুকে যাবার পর যতদিন ছিলাম, শুধুমাত্র মেলামেশা—ভাবের লেনদেন। আমাদের সাহিত্যিকদের কয়েকজনকে নিয়ে একটুখানি বৈঠক হচ্ছিল। সামান্য ব্যাপার—জন আষ্টেক সাকুল্যে, তন্মধ্যে দু-জন ওঁদের। ওঁরা বলছেন চীনা ভাষায়, দোভাষি ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। একটা জিনিষ ঠিক বোঝাতে পারছে না দোভাষি, লাগসই কথার জন্ত হাতড়াচ্ছে। বক্তা টুক করে জুগিয়ে দিলেন কথাটা। তবে তো মাণিক, জানো তোমরা ইংরেজি, ভাল রকমই জানো—এ ধকল দিচ্ছ কেন? মারফতি কথা না বলে মুখোমুখি চালাও তবে ইংরেজি।

সে হবার জো নেই। চীনা সাহিত্যিক চীনভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভাষায় কথা বলবে—কেন, ওঁদের ভাষা-সাহিত্য কম জোরের হল কিসে? মুখের বুলি কারো খাতিরে ভিন্ন দেশের চেহারা নেবে না—গরজ থাকে, তোমরা বুঝে নাও তর্জমা করিয়ে। আমাদের মওলানা আজাদেরও ঠিক এই রীতি। উর্দু ছাড়া অ-কুলীন কোন ভাষা জিভের ডগায় ঠাঁই দেন না।

আর, আমার কথা বলা যায়—মানুষটা আমিই বা কম কিসে? ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এই যে লোকের দৃষ্টিশূলের খোঁচা খাচ্ছি, পোশাকের এমন অমন হলে তো হাঙ্গামা ছিল না। হবার জো নেই—আত্মম্ভরিতা। বাঙালি মানুষ বাইরের দেশে এসেছি তো বাঙালি হয়েই ঘুরব। গরজে ভোল বদলাতে হলে সাহেবেরা আমাদের দেশে, অন্তত পক্ষে সামাজিক ব্যাপারে, ধুতি পরবে না কেন?

বেরুমল বলছিলেন, শেষ অবধি কথা হল ভারতের ফ্লাগ আঁকা থাকবে আমার দোকানের সাইনবোর্ডের উপর। আমতা-আমতা করে ওঁরা রাজি হলেন ভারত-দূতাবাস থেকে যদি কিছু না বলে। তারা কি বলবে। দূতাবাসগুলোই আমার খদ্দের—নানান দেশের ওঁরা আছেন বলেই কায়ক্লেশে টিকে আছি। তাই চক্রধারী ফ্লাগ রয়েছে দোকানের সাইনবোর্ডে, আর এক শাড়ি-পরা মেয়ে আঁকিয়ে রেখেছি দরজার পাশে। কিছুতে কিছু হয় না, কে দেখে খুঁটিনাটি নজর করে? এই আপনাকে দিয়ে বুঝুন না।

ক্ষিতীশ ঢুকেছে আমার পরেই। এখানেও টাই মজুত বহুত রকমের। কর্মচারীরা চীনা—তাদের একজন দেখাচ্ছিল। বেরুমল তিন লাফে সেখানে গিয়ে পড়লেন। গোটা চারেক বাক্স বাতিল করে টাই বের করলেন একটার ভেতর থেকে। মেলে ধরে বললেন, দেখুন তাকিয়ে—আসল আমেরিকান চিজ। পঁচিশ হাজার। কাঁইকুই করবেন না, দিল খুলে গলায় বেঁধে নিন। দেশের মানুষ—দুটো পয়সা কম নেবো তো বেশি নয়।

ক্ষিতীশ দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, কিন্তু অন্য জায়গায় আলাদা দর দেখে এলাম। এমনি জিনিষই তো!

বেরুমল হেসে ওঠেন।

আরে মশায়, চাঁদ বাঁকা আর তেঁতুলও বাঁকা। তামাম পিকিন চুঁড়ে হেন বস্তু আর একটি মিলবে না। পাবেন কোথা? বাইরের আমদানি বন্ধ—অতি-দরকারি জিনিষ ছাড়া আনতে দেবে না। নিজেরা যা বানাচ্ছে, তাতেই চালিয়ে-চুলিয়ে নাও। দর বাঁধা—আমদানি কম বলে যে দুটো পয়সা চড়িয়ে দেবেন, সে জো নেই। বিদেশি মালে তবু শতকরা তিরিশ অবধি মুনাফা দেয়, ওদের ঘরের জিনিষের উপরে খুব বেশি হল তো বারো। খরচখরচা কষে সরকারি লোক ঠিক করে দিয়ে যায়। সেই দর সেঁটে রাখো মালের গায়ে। খদ্দের সেজে ওরাই আবার ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে, সাঁটা দরের হেরফের হল কিনা তদারক করে যায়। বসেন কেন, নিকুচি করেছে পোড়া দেশের ব্যাপার-বাণিজ্যের!

বেরুমলের এক কনিষ্ঠ আছেন, তিনি এসে জমেছেন। ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে।

ঐ যে তিরিশ পার্সেন্ট—সে-ও কেবল কানে শুনতে। স্টেট বারো পার্সেন্ট ট্যাক্স টেনে নেয় ওর থেকে, কত থাকল তবে হিসেব করুন। চলে?

সহসা গলা নামিয়ে বলেন, বাইরের মাল বলে হিসেবের খুব কড়াকড়ি করতে পারে না—এই যা। আপন লোকের কাছে ঢাকাঢাকি কি—সামান্য হলেও আছে কিছু। কিন্তু নতুন মাল আসতে দেবে না, এ-ই বা চলবে আর ক'দিন?

বেরুমল বেজার মুখে বললেন, পুরানো জিনিষ ক'টা কেটে গেলে—ব্যস, হাত-পা ধুয়ে ঘরমুখো জাহাজে ভাসব। খরই বা কোথায় এখন, বেড়াবো আপনাদের দিল্লি-কলকাতার পথে পথে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রকমারি সিল্কে ঘরের ছাত অবধি ভরতি। সেই পর্বতপ্রমাণ সংগ্রহ ক'টা জিনিষ বলে উল্লেখ করে বেরুমল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

যা দেখতে পাচ্ছি, এ মালের কাটান দিতেই তো কলি কাবার—

কনিষ্ঠ বললেন, এই দেখছেন? একেবারে নস্যি মশায় আগের তুলনায়। পাশের ঐ দোকান, ওটাও আমাদের ছিল—এই দোকানের লাগোয়া। ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। এ বাড়ি নিজস্ব আমাদের। মেয়েছেলেরা উপরে থাকে, নিচে দোকানপাট।

বেরুমল বলেন, পঞ্চাশ বছরের দোকান, এক-আধ দিনের নয়। আমি নিজেই পিকিনে রয়েছি তিরিশ বছর। হাজার হাজার চীনা, বিবেচনা করে দেখুন, আমার দেশে ভাত করে খাচ্ছে। আর এই এত বড় শহরে গোটা পাঁচ-ছয় ভারতীয় দোকানের সমস্ত গেছে—শেষ আমিও যাই-যাই করছি। তখনই মশায় আঁচ করেছিলাম, চিয়াঙের দল খেদিয়ে এরা যখন এসে পড়ল। ভায়াকে বললাম, একেবারে ছেড়েছুড়ে যাওয়া ঠিক হবে না—কাঠামোটা ঠিক রেখে ওদের ভাবসাব বুঝতে লাগো। স্বদেশের হাল দেখে আসিগে আমি এই ফাঁকে। ইটখোলা করলাম আপনাদের কলকাতার কাছে সোনারপুরে। ব্যবসা জমে যায় তো সবসুদ্ধ দেশে গিয়ে পড়বে ঝাড়ু মেরে এই ছ্যাঁচড়া কারবারের মুখে। তা গেরো খারাপ মশায়! চোতমাসে এমন বিষ্টি···খানা খুঁড়ে ইট বানিয়েছিলাম—কাঁচা-ইট গুলে গিয়ে সে খানা সঙ্গে সঙ্গে ভরাট। ইটখোলায় তোবা করে আবার জাহাজে চড়লাম। পুনর্মূষিক হয়ে পড়ে আছি।

দেশের মানুষ পেয়ে মনের দাগা খুলে বলবেন। আমাদের সমবেদনা হওয়া উচিত, আর হচ্ছেও তা। তবু এক জায়গায় বসে কাঁহাতক এক কাঁদুনি শোনা যায়? চুপিসাড়ে বেরিয়ে এসেছি, —অনেক কৌশলের একটুখানি ছুটি। তা বেশ তো—জানাজানি হয়ে গেল, আসা যাবে আবার। আছি এখনো বেশ কিছুদিন—কত বার আসব! গরজও আছে। অনেক দিন ধরে আছেন চীনের সঠিক খবর নিতে চাই আপনাদের কাছে। দু'-পাঁচটা এখানকার হালকা জিনিষ নিতে চাই দেশের বন্ধুবান্ধবের জন্য—কেনাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

নিশ্চয়, একশ' বার। আত্মীয়জন ভাববেন আমাদের। যা যখন দরকার পড়ে। দোকান বন্ধ থাকে তো ঐ পাশের দরজায় বোতাম টিপবেন। উপরে থাকি সকলে। একদিন খেতে হবে কিন্তু আমাদের বাড়ি, সবাইকে পায়ের ধুলো দিতে হবে। এত জনকে একসঙ্গে পাওয়া ভাগ্যে হয় না তো কখনো!

দু'ভাই ফুটপাথে নেমে এসে যে-দরজায় বোতাম টিপতে হবে, দেখিয়ে দিলেন। ঠিক বুঝতে পারি নে, কেন নিতান্তই চলে যেতে হবে এঁদের। বিদেশি সিল্ক ও অন্য বিলাস-দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করেছে আজকের দিনে তিলমাত্র অপচয়ের উপায় নেই সেইজন্য। তা অন্য সকলের মতো চীনা কাপড়ের কারবার ধরলেই তো হয়! মনটা ভারাক্রান্ত হল—বাঁধা দোকান ছেড়ে দিয়ে সেই তো হাজার লক্ষ উদ্বাস্তুর দলে ভিড়বেন। এমন ধারা জমিয়ে নিয়ে বসবেন, সে অনেক কথার কথা। কিছু গুহ্য ব্যাপার আছে হয়তো, পয়লা দিনে ফাঁস করেন নি। শুনে নিতে হবে। সরকারি তরফের মানুষ আমাদের ঘিরে থাকেন—তাঁদের উল্টো-ভাবনা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের কথাও শুনতে হবে বই কি!

আবার ভিড় জমছে। তা হোক, মতলব ঠাউরে ফেলেছি এবার। পালাবো না—মানুষ ওরা, বাঘ-ভালুক নয়। আর এই ফাঁক রেখে চলার দরুনই মানুষ শেষটা বাঘ-ভালুকে দাঁড়ায়।
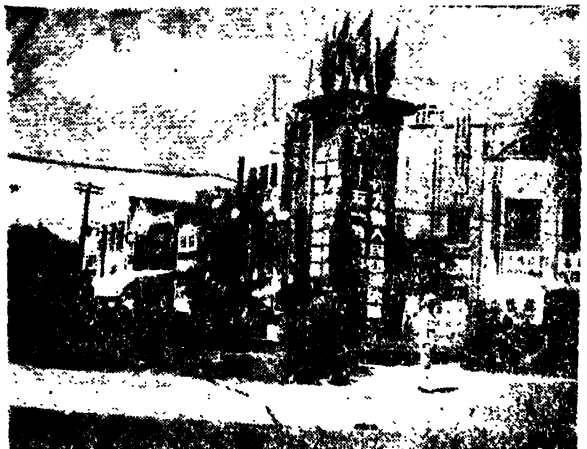
পিকিনের একটি পুরানো রাস্তা

এসো—ভাই সব, এসো এগিয়ে—

থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন নিজেই চলে যাই ওদের মধ্যে। কাঁধে হাত চাপিয়ে দিলাম একজনার। অবাক হয়ে গেছে। আর এতদিনে সর্বসংকুল্যে একটি চীনা কথা রপ্ত করেছি—সেটা ছেড়ে দিলাম এই মওকায়। ইন্দু—অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় আমি। কি মোক্ষম কথা রে বাপু, মড়া বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্র! সকলের মুখে সঙ্গে সঙ্গে অমায়িক হাসি। ভারতীয় আমরা—বুদ্ধের দেশের মানুষ। অন্য দেশের মনুষ্যে ওদের ভাষায় 'হু' অর্থাৎ বর্বর; কিন্তু ভারতের মানুষ হল 'থিয়েন-চু' অর্থাৎ স্বর্গের বাসিন্দা। আজকের নয়—এ কথা পুরানো কাল থেকে চলে আসছে। ইংরেজ টুঁটি চেপে আছে, তারও মধ্যে সেই চীনের বড় বিপদের দিনে আমাদের মেডিকেল মিশন তাবৎ দেশের ভিতর সেবা করে বেড়িয়েছে। অর্ধাশনে থেকেও দুর্ভিক্ষের চাঁদা দিয়েছি। তামাম দুনিয়া একদরে করলেও আমরা এবং আঙুলে-গণা-যায় এমনি কয়েকটা দেশ ইউনো-র লড়ে বেড়াচ্ছি নতুন-চীনের হয়ে। শক্তির দাপটে ভয় পাইনি, ঐশ্বর্যের হাতছানিতে লোভাতুর হইনি—চিরকালের কুটুম্বর পাশে সহজ আসনটি নিয়ে বসেছি। তা কুটুম্বিতা ওরা মেনে নিল ঐ একটি মাত্র কথায়; পথ চলতি নগণ্য মানুষ হলেও ভাসা ভাসা রকমের জানা আছে, ভারত ভাল লোক—নতুন-চীনের পরম বন্ধু।

দু'টি প্রাণী—আমি আর ক্ষিতীশ—একা-একা যাচ্ছিলাম পিকিনের পথে। দেখ, দেখ, কতজনে এখন আমরা! গা ঘেঁসে চলেছে, আমার আলোয়ানের প্রান্ত তুলে ধরে কাশ্মীরি কারুকর্ম দেখছে। বাজারের ভিতর ঢুকল এবার—হাত বাড়িয়ে দিবে তারা। গভীর আবেগে হাত নেড়ে দিয়ে নতুন বন্ধুরা বিদায় নিল।

কোরিয়ার লড়াই কতদিন ধরে শুনছি। কতটুকু দাগ পড়েছে মনে! কাছাকাছি এসে পড়ে এখনই কিঞ্চিৎ মালুম হচ্ছে। সেই যে মহাপ্রাচীরের নিচে ঝরণার জল খেতে দিল না—হায় রে, তেষ্টার জলটুকুও হতভাগাদের নির্বিচারে মুখে দেবার জো নেই!

কোরিয়া থেকে সদ্য-ফিরে-আসা একজনে আজকে বর্ণনা দিচ্ছেন। মনিকা ফেলটন—বৃটিশ মহিলা। এর আগে আরও একবার গিয়েছিলেন দল বেঁধে। রণবিধ্বস্ত কোরিয়া দু-দু'বার নিজের চোখে দেখে এসেছেন। পনের মাস আগে সেই প্রথম বারেই দেখেছেন ধ্বংসের ভয়াবহতা। শহরে একটা ইমারত আস্ত নেই। খাড়া রয়েছে হয়তো একটা থাম কি একটুখানি দেয়াল। এক এক টুকরা নমুনা রয়ে গেছে, আগে কি ছিল তার থেকে কিছু কিছু আন্দাজ করা চলে। ঐ যেমন দেখে থাকেন, মাটি কাটার সময় এক একটা ঢিবি রেখে দেয়, মাটির পরিমাণ হিসাব হবে বলে ইচ্ছা করেই রেখেছে কিনা, কে জানে! যে সর্বজনে দেখুক তাকিয়ে তাকিয়ে! এবং নিঃসংশয়ে বুঝে নিক—মারবার, পোড়াবার, গুঁড়োগুঁড়ো করে ভাঙবার ওস্তাদি কি প্রকার সুসভ্য মানুষের! অতএব দুর্বল জাতিবৃন্দ, 'যাহা পায় তাহা খায়, যাহা শোনে তাহা করে' এবম্বিধ প্রথম ভাগের সুবোধ গোপাল হও। ঘাড় তুলতে গিয়েছ কি মারা পড়েছ।

তব শোন, তাজ্জব ব্যাপার। ফেলটন বলতে লাগলেন, ধূমকেতুর মতো আকাশে উঠে দুশমন যখন তখন আগুন বৃষ্টি করে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষে আর ভয় পায় না। গা সহা হয়ে গেছে। মরার বাড়া গাল নেই—সেই মচ্ছব চালাচ্ছই তো দিবারাত্রি। আর কি করবে হে বাপু, এর উপর?

গোটা পয়ং-ইয়ং শহরে চুঁড়ে চারটে দেয়াল এবং তদুপরি ছাত—হেন গৃহ একটি পাবে না। তবু দেখা যাবে, ধ্বংস-স্তূপের এখানে-ওখানে ঘরসংসার পেতেছে মানুষজন। মানুষ মানে মেয়েলোক, শিশু ও বুড়োরা। সমর্থ পুরুষ সবাই লড়াইয়ের কাজে। এরই মধ্যে ত্রিপল খাটিয়ে একটু ইস্কুল মতো হয়েছে, বাচ্চারা পড়ে সেখানে। পড়ে আর মনের সুখে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় ভাঙা বাড়ির ইটকাঠের মধ্যে।

লোকে আকাশমুখো তাকায়—দেবতার করুণা চেয়ে নয়—রোষ আর ঘৃণার দৃষ্টিতে। যে আকাশ থেকে যখন তখন বোমা পড়ে হাস্যোচ্ছল জনপদে আগুন ধরায়, নির্বিচারে মানুষ মারে। এ সমস্ত অবশ্য জানা কথা, চোখে না দেখেও আন্দাজ করা চলে। যে খবর সকলে জানে না, সে হচ্ছে সর্বধ্বংসী আগুনের মধ্যে দুরন্ত জীবনোল্লাস। আমেরিকান আধিপত্যের খানিকটা স্বাদ একবার পেয়েছিল কিনা লড়াইয়ের গোড়ার দিকটায়! এখন তারা মরীয়া।

বৃটিশ ও আমেরিকান কয়েকটি বন্দী গল্প করেছে মনিকা ফেলটনের কাছে। তাদের ধরে ফেলল যখন বর্বর চীনারা। একে চীনা তায় কম্যুনিষ্ট—মেরে ফেলবে তো নির্ঘাৎ। আর মরার আগে আগে খবর বের করবার জন্য যা সব ঘটবে, আন্দাজ করতে সর্বদেহ হিম হয়ে যাচ্ছে।

এলো সেইক্ষণ। বন্দীদের হেড-কোয়ার্টারে এনে সারবন্দি তাদের দাঁড় করিয়েছে। হুকুম হল, হাত বাড়াও—

এক গুলিতে সাবাড় করবার পদ্ধতি এই। কিন্তু পেটের কথা পেটের মধ্যে রেখেই মরতে দেবে—এত দূর ভদ্র, জানা ছিল না তো! বন্দুকই বা কই সামনে? সিপাহিসান্ত্রী কোথায়? কয়েকটি মাত্র অফিসার।

হাত বাড়াতেই অফিসাররা হাত চেপে ধরছেন জনে জনের। সেকহ্যাণ্ড করছেন।

কিছু বলতে হবে না ভাই, সমস্ত জানি। কোরিয়ার যুদ্ধের জন্য দায়ী তোমরা নও। নিজেরাই কি কম ভুগেছ? যাকগে, বিশ্রাম আপাতত।

পেটের কথা ক্রমশ তারা নিজেরাই ফাঁস করেছে। একেবারে কিছুই জানত না—ঘরবাড়ি ছেড়ে সাত সমুদ্র-পারের লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছে পৃথিবীর অশান্তি রোধ করবার জন্য। তাই বুঝিয়েছিল তাদের। তারা নৃশংস নয়—মা-বাপ ভাই-বোন প্রীতিমতী প্রণয়িনী সমস্ত ছিল একদা, ছিল য়্যুনিভার্সিটির পড়াশুনো আর অফিসের চাকরি। আর ছিল এক রুচিবান আদর্শনিষ্ঠ শান্ত জীবন। রণদৈত্যের মুঠোর মধ্যে পড়ে সেই তাদের হেন জঘন্য কর্ম নেই যা করতে হয় না। তার উপরে ঔদ্ধত্য ছিল বিষম—এসব মানুষের জন্য, মানুষের সমাজের জন্য, সমাজ-শত্রুদের সায়েস্তা করবার জন্য। আজকে আর্তনাদ করছে অন্তরের মানুষ। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে: আমি নই—কিছু জানিনে আমি। আমার হাত দু'খানা দিয়ে বোমা ফেলেছে ওরা···

নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে মনিকা ফেলটনের তাবৎ কথা শোনা হল। ছবি যেন চোখের উপর দেখছি। এবারে চলো আর এক জায়গায়—অন্য এক ঘরে। নাকামুরা কি বলে, শুনে আসি।

হ্যাঁ, গতিক সেই রকম। পৃথিবী অতি ছোট—হাতের মুঠোর আমলকি বিশেষ। কোরিয়া বলুন জাপান বলুন, এবাড়ি ওবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। সবাই প্রতিবেশী আমরা। পীস হোটেল আর পিকিন হোটেল—দুটো মাত্র জায়গার মধ্যে সকলকার আস্তানা। দিনের মধ্যে অমন দশবার দেখাশুনো হচ্ছে। ভাষা না জানি তো বয়ে গেল! তাতে বুঝি পরিচয় আটকায়? ঐ তো আজ সকালেই যে কাণ্ড হল মরিসন ষ্ট্রীটের উপর বাজারে যাবার সময়। কোরিয়ার কথা শুনলাম, এবার জাপান কি বলে—শুনি গে চলো। জাপানি গবর্ণমেণ্ট নয়, জাপানের মানুষ।

নাকামুরা স্ফূর্তিবাজ অভিনেতা মানুষ—চলনে বলনে তার আমেজ পাওয়া যায়। হবে না কেন? রং মেখে সাজগোজ করে বাপের পিছন ধরে পাঁচ বছুরে শিশু একদিন ষ্টেজে উঠলাম, আজকে বায়ান্ন বছুরে বুড়ো নেচে-কুঁদে ঠিক সেই রকম লোক মাতাচ্ছি। জাত ব্যবসা মশায়, বাপ-দাদাও জীবন ভোর এই করে গেছেন। খাসা ছিলাম কাবুকি দলে, সেটা হল পেশাদারি অপেরা—টাকা কামাও, আমোদ-স্ফূর্তি করো, নাক ডেকে ঘুমোও—কোন রকম ঝামেলা নেই। সেই মানুষ আজ তামাম দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানীদের সামনে দাঁড়িয়ে আঁতের কথা বলতে উঠেছি। হেন দুর্ভোগ স্বপ্নে ভেবেছি কোন দিন?

লড়াই বাধল। লড়াইয়ের বাবদে যত গণ্ডগোল। কর্তারা বললেন, বাজে নাচনা-গাওনা নয়, মতলব নিয়ে লেগে পড়ো। নতুন পালা লেখানো হচ্ছে—লড়াই জিতলে ইন্দ্রধাম ধরায় নেমে আসবে, এমনি সব বিষয় নিয়ে। এমন মোক্ষম গাওনা শুরু করো, মানুষ যাতে দলে দলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাই সই। ঢাক কাঁধে ঝুলিয়ে দিল তো বাজিয়ে চললাম এক নাগাড় চার-পাঁচ বচ্ছর। কি ঝড় বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে, কত সর্বনাশ যে হয়ে গেল! কাগজে ক'টা কথাই বা লেখে! একটি কথাই বিশ্ববাসী সকলে জেনে রইলেন, জাপানের মতো হাড়বজ্জাত লড়াইবাজ জাত দুনিয়াদারিতে দ্বিতীয় নেই।

রামা-শ্যামা মানুষগুলোর কথা কানে যায় না যে আপনাদের! আর মন খুলে কথাও কি বলবার জো আছে? সাদা পোশাকে পুলিশ কোথায় ওৎ পেতে আছে, ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। তা মশায়রা, আমাদের দুর্ভাগা দেশের হয়ে একটা খবর নিবেদন করি—মার-কাট করনেওয়ালা গোঁয়ার-গোবিন্দ জাত সত্যি সত্যি আমরা নই। কপালের ফের—তা ছাড়া আর কি বলতে পারি? ঘুরে ফিরে আমাদের দিয়ে প্রলয়-নাচন নাচাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন—নেচে নেচে চেরিগাছে মুকুল ফোটাবো, সেইটেই আমাদের বিশেষ পছন্দ।

তা হতে দিচ্ছে কে? দু-দুটো এটম-বোমায় ঘায়েল হয়ে আছি, তবু রেহাই দেবে না। ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আবার ওখানে পয়লা নম্বরের ঘাঁটি করে নতুন এক লড়াই যদি বাধানো যায়। আমরাও ঠিক করছি মশায়, ন্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না। ঠিক করছে অবশ্য রামা-শ্যামা-বোদো-মোধোর দল—যাদের কথা খবরের কাগজে ওঠে না। কিন্তু শোনাবোই এবার আমাদের কথা। জেন শিনজা (গণনাট্য-দল) গড়েছি, নাটক করি। নাটক দেখতে লোক ভেঙে পড়ে। তা হলে দেখুন, ওরাই গুরু এক হিসাবে, ওদের কথা মেনে নিয়েছি—বাজে নাচনা-গাওনা নয়, মতলব হাসিল করতে হবে। বাধা শতেক রকমের। হুড়মুড় করে একদিন হাজার খানেক পুলিশ এসে সমস্ত তছনছ করে দিয়ে গেল। তখন মতলব হল, দু-চারটে পালা সিনেমা-ছবিতে পাকাপোক্ত করে তুলে রাখা মন্দ নয়। ছবি তোলা চাট্টিখানি কথা নয়—ম্যাও ধরবে কে? দেশের মানুষদের জানান দিয়ে দাও। তা মশায়, বলব কি, এক পয়সা দু-পয়সা করে লাখ লাখ টাকা উঠে গেল। চাঁদা তুলে সিনেমার ছবি—শুনেছেন এমনধারা? একবার হামলা দিল আমার উপর—অভিনয় করতে দেবে না। জনতার গোলাম-নফর আমি—ষ্টেজে উঠে করজোড়ে শুধাই, কি আদেশ তোমাদের?

শত কণ্ঠে গর্জন উঠল, লাগাও। আমরা আছি—কে ধরতে আসে দেখি।

পুলিশ প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল, স্ফূর্তিসে পালা গেয়ে যাচ্ছি। গতিক বুঝে পিঠটান দিল তারা অবশেষে।

হাসছে নাকামুরা নিজে, হাসাচ্ছে আমাদের। হাসতে হাসতে শিল্পীর লাঞ্ছনা ব্যক্ত করছে। আর এদিকে হাসতে গিয়ে জল ফুটে ওঠে শ্রোতাদের চোখে।

সুইং-ইঞা-মিঁ—সেই হাসিখুশি মেয়েটা—নজর খাটো বলে চশমা ধরেছে, কিন্তু পান থেকে চুন খসলেও দেখি টের পায়।

সকালের মীটিঙে ছিলেন না—

আমতা-আমতা করে বলি, ছিলাম বই কি! নিশ্চয় ছিলাম। হাজিরার লিষ্টি আছে তো—দেখ গিয়ে তার মধ্যে।

শেষ অবধি ছিলেন না।

অত মানুষের মধ্যে সেটাও ঠাহর করছে। কিছু আশ্চর্য নয়। আমাদের আটটি দশটি পড়েছে এক একজনের ভাগে। ছায়া হয়ে সাথেসঙ্গে ঘোরে, খেজমত করে বেড়ায়। ভাগের মানুষ সরে পড়েছে, টনক তো নড়বেই।

ধরা পড়েছি যখন, বুক ফুলিয়ে জাঁক করাই ভালো। বললাম, দু-দুটো মীটিঙের অত ভালো ভালো কথা সামলাতে পারলাম না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, তাই বেরিয়েছিলাম।

বললেন না কেন? সঙ্গে যেতাম।

ওঃ, ভারি সব লাটসাহেব এসেছি কি না—যেথায় যাবো, মিছিল করে চলতে হবে!

সুইং বলে, সে কথা হচ্ছে না। ধরুন, দরকার পড়ল কাউকে কিছু বলবার। কিম্বা চলতে চলতে হয়তো ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

তোমাদের তর্জমা ছাড়াও বলতে পারি কথা। বলবার ভাল কায়দা আজকে শিখে নিয়েছি।

বাজার থেকে অনেক জিনিষ এনেছি রঙিন বেতের ব্যাগ বোঝাই করে। সগর্বে মেলে ধরলাম।

দেখ, দেখ। হাতীর দাঁতের উপর কাজ-করা সিগারেট-হোল্ডার কুল্যে দশহাজারে। দশ দোকানে ঘুরে ঘুরে কেনা—এক ইয়ুয়ান

কমে নিয়ে এসো দেখি কোন একটা জিনিষ। বিনা কথায় হয়েছে এসব?

ভ্রূভঙ্গি করে সুইং বলে, সওদায় এখানে কথা লাগে না—বোবারাও করে থাকে। কেউ ঠকবে না, দরাদরি নেই—

শুনলেন? আমরা বোবা—ঠেশ দিয়ে তাই বলা হল কি না! ওদের ঐ হিজিবিজির ধাঁধায় না ঢুকতে পারলে ধরে নেবে নিতান্ত অবোলা জীব। কি করে বোঝাবো বলুন নির্বুদ্ধি মেয়েটাকে—মুখে বকবক না করেও চোখের চাউনিতে তামাম কথা বলা যায়। তাই তো বলেছিলাম মরিশন ষ্ট্রীটের উপর। সেই ভাষায় কথা বলেছি দোকানিদের সঙ্গে। তুমি ছিলে না মাতব্বর ঠাকরুন, ভাগ্যিস ছিলে না সঙ্গে! ঠিক করেছি, এমনি ফাঁক কাটাবো যখন তখন—লায়েক হয়ে গেছি, ডরাই নে আর কোন মানুষ। চীনের মানুষগুলো তো নগণ্য।

আর ঐ যে বলল, ঠকায় না কোন ব্যক্তি—সবাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। হেন তাজ্জব বিশ্বাস করতে বলেন কলিকালে? আর আমি 'হাঁ' বলে রায় দিলেও বিশ্বাস করবেন কি আপনারা বুদ্ধিমান পাঠকদল? জাতে চীনা—কলকাতার চীনা-বাজার চুঁড়ে বিস্তর চিনে রেখেছেন ওদের। জুতো কিনতে যান ওদিকে। জুতোর দাম বিশ টাকা হেঁকে বসল তো তার সিকি পাঁচ রুপেয়া থেকেই শুরু করবেন, না কি? ইংরেজি বলবেন, বাংলা বলবেন, সাহেব-সাহেব করবেন—একবার বা আঁটকুড়ির ব্যাটা বলে নিলেন ওর ফাঁকে। নাঃ, কিনবো না এখানে—রাগ করে রাস্তায় নেমে পড়লেন। পিছন থেকে তখন ডাকবে, আট রুপেয়ায় নিয়ে যাও জুতো, লোকসান করে দিচ্ছি।

দেশের দোকানে এসে বসলে সেই তারা নাকি একেবারে দরাদরি বরদাস্ত করবে না। পান্তিশিয়াল স্থান মাহাত্ম্যে ময়ূর হয়ে পেখম ধরেছে। আচ্ছা, হাতে-নাতে দেখিয়ে দেবো কাল-পরশুর মধ্যে। দেমাক সুইঙের যাবে।

আজ সন্ধ্যায় ভিয়েটনামের দল ডিনারে ডেকেছি আমরা ভারতীয়েরা। এই তো আসল—মানুষজনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। কনফারেন্সে ধুমধাড়াক্কা ব্যাপার, সর্ব চক্ষুর দৃষ্টি সেই দিকে, রিপোর্টাররা মুকিয়ে আছে বক্তৃতাদির কমাটুকুও বাদ না যায়। ইতিমধ্যে কিন্তু বিশ্বের নানান জাতের মানুষ মুখ-শোঁকাশুঁকি করে নিঃসংশয়ে বুঝে নিচ্ছি, ভাইবেরাদার আমরা—ডাণ্ডাবাজি নিতান্তই অহেতুক। খোলা মনে পাশাপাশি বসেই সব মীমাংসা হতে পারে।

নিচের ব্যাঙ্কুয়েট-হলে খাওয়া-দাওয়া। আচ্ছা মজার নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রকদের এক তিল ঝঞ্চাট পোহাতে হল না। ওদের ঘরবাড়ি, ওদের লোকজন, জিনিষপত্র সমস্তই ওদের। একটিবার মুখের হুকুম ঝেড়ে খালাস। শুধু নামের বেলা আছি—খাওয়াচ্ছি নাকি আমরাই।

খবরের কাগজ পড়েন, অতএব ভিয়েটনাম নামটায় চোখ পড়ে থাকবে। কি একটা গোলমেলে ব্যাপার চলছে যেন অনেক দিন ধরে? আজ্ঞে হ্যাঁ, নিব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলিকার সুসভ্য ফরাসি জাতি—দুর্জন ভিয়েটনামিরা গোলমাল বাধাচ্ছে উক্ত মহাশয়ের সঙ্গে। এক অতি হাস্যকর নিয়ম-বিরুদ্ধ কথা বলছে—ভিয়েটনাম 'নাকি 'ভিয়েটনাম-বাসীদেরই রাগ হয় না?

আমার ডান দিকে বসেছে গো-গিয়া-খাম। দুটো হাত নুলো। বক্তৃতায় হাততালি দিচ্ছে নুলো করাগ্র দুটোয় শুকনো কাঠি বাজানোর মতো। আলাপ-পরিচয়ের পর পরস্পর সেকহ্যাণ্ড করছি, সে নুলো হাত ঠেকাচ্ছে আমাদের হাতে। এ দশা ছিল না তার। জাপানি হামলার সময় ফরাসিরা তো রাতারাতি জাহাজ ভাসিয়ে দরিয়া পাড়ি দিল। গেরিলা-লড়াই করছে তখন এরা; নিরস্ত্র ও নিঃসহায়—তা হাতবোমা বানিয়েই নাস্তানাবুদ করতে লাগল জাপানিদের। একটা হাত গেল, তবু ছাড়ে নি। দুটো হাতই খতম তার পরে; মুখ পুড়ে মাংস দলা হয়ে আছে। খানিকটা নিশ্চিন্ত সেই থেকে। ছেলেটাকে বার বার চেয়ে দেখছি। বীভৎস, ভয়ঙ্কর মুখ, কিন্তু সাদা দাঁতে হাসির লহর খেলছে।

এটম-বোমার গুঁতোয় শিরদাঁড়া-ভাঙা জাপান পালাল তো খিড়কির পথে গুড়গুড় করে ঠাটঠমক সহ পুনশ্চ ফরাসিরা ঢুকে পড়লেন। এই যে, এসে গেছি। কিন্তু কোথায় ছিলেন বীরপুঙ্গবেরা বড় ডামাডোলের সময়টা? সেই যখন জাপানিরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাবৎ চাল বাইরে সরাল, আর অনাহারে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরল কীটপতঙ্গের মতো? লাইনবন্দি গোরুর-গাড়ি লাস সরাতে লাগল রাজধানী হানয়ের রাস্তা থেকে—তখন মহাশয়দের টিকি দেখা যায় নি। তার পরে শ্মশানভূমির নৈঃশব্দে প্রেতদলের মতো করোটি-কঙ্কাল নিয়ে ডাংগুলি খেলার উদ্দেশে আবার অভ্যুদয়?

গুয়েন-কুয়োক-ট্রি পঁচানব্বই টা লড়াইয়ের বীর। জাপানিদের সঙ্গে লড়েছে, এখনও লড়ছে। বলে, তোমরা ভারতীয়রা, বাপু যা হোক করে কাঁধের ভূত নামিয়েছে—কবে যে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলব আমরা!...

মঞ্জুশ্রী দেবী রবীন্দ্র-সঙ্গীত ধরলেন। পৃথিবী এমন সুন্দর, মানুষ এমন ভালো! বাংলা বোঝেন ক'জনই বা! কিন্তু প্রীতি-প্রসন্নতার আলো মুখে মুখে। সর্বব্যাপ্ত আনন্দ। এতক্ষণের আলোচনার যাবতীয় সমস্যা ও আক্ষেপ সুরতরঙ্গে ভেসে চলে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান এই প্রথম শুনল ওরা; সর্বপ্রথম এই ধ্বনিত হল পিকিন-হোটেলের কক্ষে। গানের শেষে ভিয়েটনামের একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরল মঞ্জুশ্রী দেবীকে। আবিষ্ট হয়ে আলিঙ্গন করছে, ছেড়ে দিতে চায় না। অপলক চোখে দেখছি আমরা। নিখিল পৃথিবীর পাহাড়-সমুদ্র যেন নিঃশেষে বিলীন হয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছে, এক হয়ে গেছে দূরবাসী আপন-মানুষেরা।

[ক্রমশঃ।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

মোগল-যুগের ভারত

হিন্দুস্থান প্রসঙ্গে

[বার্নিয়েরের সময় চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন এবং মঁশিয়ে কলবার্ট ছিলেন ফ্রান্সের অর্থসচিব। স্বদেশে ফিরে গিয়ে বার্নিয়ের হিন্দুস্থানের আর্থনীতিক অবস্থা ও সম্পদ, আচার-ব্যবহার, সেনাবাহিনী, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের অন্যান্য অংশের মধ্যে এই পত্রখানির ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। মোগলযুগের ভারতের সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার এই জাতীয় নিখুঁত চিত্র ও বিশ্লেষণ সমসাময়িক অন্য কোন সাহিত্যে বাস্তবিকই দুর্লভ।—অনুবাদক।]

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

৭

মাননীয়েষু,

এশিয়ায় কোন বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে শূন্য হাতে যাওয়া যায় না। মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের পোষাক স্পর্শ করার প্রথম সুযোগ ও সৌভাগ্য যখন আমার হয় তখন তাঁর সম্মানের জন্য আমাকে নগদ আটটি টাকা প্রণামী দিতে হয়েছিল। তাছাড়া একটা ছোরার খাপ, একটি কাটা এবং ভাল চামড়ায় বাঁধানো একখানি ছুরি আমাকে দিতে হয়েছিল ফজল খাঁকে। ফজল খাঁ একজন মন্ত্রী এবং সাধারণ মন্ত্রী নন, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মন্ত্রী। পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে আমার বেতন কি হওয়া উচিত তাও তাঁর উপর নির্ভর করে। মোটকথা, তিনি অনেক গুরুতর দায়িত্ব পালন করতেন, সেইজন্য তাঁকেও প্রথম সাক্ষাতের সময় ভেট দিতে হয়েছিল। যদিও এই ধরনের কোন রীতি আমি আমার দেশে ফ্রান্সে চালু করতে চাই না তবু হিন্দুস্থান থেকে ফিরে আসার পর এত তাড়াতাড়ি আমি সেখানকার রীতিনীতি ভুলে যেতেও পারি না। তাই আপনাকে চিঠিতেই সমস্ত কথা লিখে জানাচ্ছি। সম্রাটের সামনে উপস্থিত হতে আমি বাস্তবিকই সঙ্কোচবোধ করছি এবং সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের দেশের সম্রাটের সঙ্গে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের নানাদিক দিয়ে পার্থক্য আছে। দু'জনের সামনে গেলে দু'রকমের বিভিন্ন মনোভাব হয়। আর আপনার সামনেও বা আমি শূন্য হাতে কি করে যাই? ফজল খাঁর চেয়ে আপনাকে যে আমি কত বেশী শ্রদ্ধা করি, তা তো আপনি জানেনই। তাই এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের জানানো বিশেষ দরকার মনে করি।

হিন্দুস্থানে আমি দীর্ঘ বারো বছর কাটিয়েছি। সেই সময় কতখানি। হিন্দুস্থানে থাকার সময় আমি আপনার মতন মন্ত্রীর দক্ষতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছি। সে সব কথা এখানে আলোচনা করার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে হিন্দুস্থান সম্বন্ধে আমি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, সেই সম্বন্ধেই এই পত্র মারফৎ আপনাকে কিছু জানাতে চাই।

এশিয়ার মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলে মোগল বাদশাহের রাজত্বের বিশালতা সহজেই কল্পনা করা যায়। এই বিশাল রাজ্যই 'হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত। এই বিশাল রাজ্য আমি মেপে দেখিনি, দেখা সম্ভবও নয়। তবে আমার ভ্রমণ থেকে আমার যে ধারণা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, গোলকুণ্ডার সীমানা থেকে গজনি বা কান্দাহারের কাছাকাছি পর্যন্ত, অর্থাৎ পারস্যের প্রথম শহর পর্যন্ত, তিনমাসের ভ্রমণ-পথ এবং দূরত্বও প্রায় পাঁচশত ফরাসী লীগ, বা প্যারিস থেকে লিয়ঁ যতটা দূর তার প্রায় পাঁচগুণ বেশী দূর। আশ্চর্য হ'ল, এত বড় বিশাল রাজ্যের অধিকাংশই অত্যন্ত উর্বরা। তার মধ্যে বাংলাদেশ হ'ল অন্যতম। এরকম উর্বর দেশ পৃথিবীতে খুব অল্পই দেখা যায়। বাংলাদেশের সম্পদ ও ঐশ্বর্য অতুলনীয়। মিশরের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাংলার উর্বরতা মিশরের তুলনায় অনেক বেশী। মিশরে যে পরিমাণ শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী হয় বাংলাদেশে, যেমন ধান, গম ইত্যাদি। এছাড়া আরও নানারকমের ফসল ও পণ্যদ্রব্যাদি যা বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে হয়, মিশরে তা হয় না—যেমন তুলো, রেশম, নীল ইত্যাদি। হিন্দুস্থানের বহু প্রদেশে লোকসংখ্যা খুব বেশী এবং চাষ-আবাদও বেশ ভালভাবে করা হয়। শিল্পী ও কারিগররা সাধারণতঃ আয়েসী হলেও প্রয়োজনের তাগিদে তারা মেহনৎ করতে বাধ্য হয় এবং নানারকমের কার্পেট, ব্রকেড, সোনারূপোর কারুকাজ-করা দামী কাপড় ও সূক্ষ্ম জিনিসপত্তর তৈরী ক'রে বিক্রী করে এবং বিদেশে চালান দেয়।

হিন্দুস্থান প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব'লে মনে

হিন্দুস্থানে এসে পৌঁছায় এবং হিন্দুস্থানের গুপ্ত গহ্বরে অন্তর্ধান ক'রে যায়! আমেরিকা থেকে যে সোনা বাইরে বেরিয়ে এসে ইয়োরোপের নানারাষ্ট্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তারই একটা অংশ নানাপথ ঘুরে শেষে তুরস্কে এসে জমা হয়, তুরস্কের পণ্যের বিনিময়ে। আরও একটা অংশ স্মির্না ঘুরে পারস্যে যায়, সেখানকার রেশমের বিনিময়ে। তুরস্ক কফি চালান দিতে পারে না, কারণ ইয়েমেনের কাছ থেকে সে নিজেই কফি আমদানি করে। হিন্দুস্থানের পণ্যদ্রব্য তুরস্ক, ইয়েমেন ও পারস্য প্রত্যেকেরই দরকার। সুতরাং এই সব দেশ থেকে বেশ খানিকটা পরিমাণ সোনারূপো লোহিত সাগরের কাছে বন্দরে, পারস্য সাগরের শীর্ষে বসরায় এবং বন্দর আব্বাসিতে গিয়ে জমা হয়, হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা করার জন্য। প্রত্যেক বছর যথাকালে এই তিনটি বিখ্যাত বন্দরে হিন্দুস্থানের জাহাজ এসে ভিড় করে, নানারকমের বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে এবং সেই সব সোনা বোঝাই ক'রে নিয়ে আবার হিন্দুস্থানে ফিরে যায়। একথাও মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় জাহাজ তা সে যারই হোক, হিন্দুস্থানের নিজের বা ডাচ ইংরেজ ও পর্তুগীজদের—প্রত্যেক বছর যখন নানারকম পণ্য বোঝাই করে নিয়ে হিন্দুস্থান থেকে পেগু, তেনাসেরিম, শ্যাম, সিংহল, আচীন, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশে যায়, তখন সেই সব দেশ থেকে ফেরবার সময় সোনারূপো বোঝাই ক'রে নিয়ে আসে। মক্কা, বসরা ও বন্দর আব্বাসির সোনারূপোর মতন এই সব সোনা-রূপোরও একই পরিণতি হয়। ডাচ ব্যবসায়ীরা জাপানীদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে যে সোনা পেত তার শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে এসে জমা হ'ত। যা কিছু পর্তুগাল বা ফ্রান্স থেকে আসত, তাও আর ফিরে যেত না। তার বদলে হিন্দুস্থানের পণ্যদ্রব্য চালান যেত। এই ভাবে সারা দুনিয়ার সোনারূপোর একটা মোটা অংশ বাণিজ্যের দৌলতে হিন্দুস্থানে এসে জমা হ'ত এবং একবার জমা হ'লে আর ফিরে যেত না কোথাও, একেবারে মজুতদারের গুহায় আত্মগোপন করত।

আমি যতদূর জানি, হিন্দুস্থানের প্রয়োজন তামা, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, হাতি ইত্যাদি এবং এইসব জিনিস ডাচ ব্যবসায়ীরা জাপান, মলাক্কা, সিংহল ও ইয়োরোপ থেকে সরবরাহ করে। হিন্দুস্থানের সীসা ইয়োরোপ থেকে আমদানি হয়। বনাত আমদানি হয় ফ্রান্স থেকে। ভাল ভাল বিদেশী ঘোড়ারও খুব প্রয়োজন হিন্দুস্থানের। বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার ঘোড়া শুধু উজবেকিস্থান থেকে আমদানি হয়। কান্দাহার হয়ে পারস্য থেকে এবং মক্কা, বসরা ও বন্দর আব্বাসি থেকে সমুদ্রপথে আরবী ও হাব্‌সী ঘোড়াও অনেক আমদানি হয়। সমরকন্দ, বল্‌খ, বোখারা ও পারস্য থেকে টাট্‌কা ফলও প্রচুর পরিমাণে হিন্দুস্থানে আসে। দিল্লীতে আপেল, নাসপাতী, আঙুর ইত্যাদি ফল খুব বেশী দামে সারা শীতকাল ধ'রে বিক্রী হয়। শুকনো ফলেরও—যেমন বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি—চাহিদা খুব বেশী। এসব ফল বাইরে থেকে হিন্দুস্থানে আমদানি হয়ে থাকে। মালদ্বীপ থেকে সমুদ্রের কড়ি প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, এবং এই কড়ি দিয়ে বাজারে কেনা-বেচা চলে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে কড়ির চল খুব বেশী। অম্বরীও মালদ্বীপ থেকে আসে (যা তামাক ইত্যাদির সঙ্গে মেশানো হয়)। গণ্ডারের শিঙ, হাতির দাঁত ও ক্রীতদাস 'আমদানি হয় প্রধানতঃ হাবসীদের দেশ ইথিওপিয়া থেকে। মৃগনাভি ও পোর্সিলিন আসে চীনদেশ থেকে। মুক্তা আসে বহারীন থেকে (পারস্য সাগরের দ্বীপ—অল-বহারীন) এবং টিউটিকোরিন (মাদ্রাজের তিন্নেভেলি জেলার বন্দর) ও সিংহল থেকে। আরও অন্যান্য স্থান থেকে নানারকমের জিনিস আমদানি হয় হিন্দুস্থানে।

কিন্তু এত রকমের পণ্যদ্রব্যের আমদানি হলেও হিন্দুস্থানের প্রয়োজন হয় সোনারূপা চালান দেওয়ার। কারণ হিন্দুস্থানের বণিকরা সাধারণতঃ সোনা দিয়ে দাম না শোধ ক'রে, পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিতেই অভ্যস্ত বেশী। হিন্দুস্থানের এই বাণিজ্যিক বিশেষত্ব বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থানের বণিকরা পণ্যের পসরা নিয়ে জাহাজে ক'রে দেশে-বিদেশে সমুদ্রযাত্রা করেন এবং সেই জাহাজে তাল তাল সোনা বোঝাই ক'রে দেশে ফিরে আসেন। পণ্যের বদলে পণ্য দিয়ে তাঁরা বাণিজ্যের ঋণ পরিশোধ করেন। সাধারণতঃ সোনা দিতে চান না। তাই হিন্দুস্থানে সবদেশের সোনারূপো এসে জমা হয়।

আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য ব'লে আমি মনে করি। হিন্দুস্থানের মোগল সম্রাট দেশের সমস্ত সম্পদের একমাত্র মালিক। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির মালিকানা দেশীয় প্রথা বা বিধানসম্মত নয়। আমীর ও ওমরাহ, অথবা মনসবদার, যাঁরা বাদশাহের অধীনে নিযুক্ত, তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তি ও সম্পদের উত্তরাধিকারী হলেন বাদশাহ নিজে। হিন্দু-স্থানের প্রতি বিঘা জমির মালিক বাদশাহ, চাষী বা জমিদার নয়। বসতবাড়ী, উদ্যান, দীঘি, ইত্যাদি কয়েকটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি মধ্যে মধ্যে বাদশাহ নিজের খেয়াল ও মর্জি অনুযায়ী কোন কোন প্রিয়জনকে ভোগ করার জন্য দান করেন। এছাড়া 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' ব'লে হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রীয় বিধানে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

মোটকথা, হিন্দুস্থানে সোনারূপো প্রচুর পরিমাণে জমা আছে, যদিও সোনার খনি তেমন নেই। হিন্দুস্থানের সম্রাটই সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তির মালিক, রাজস্বও তিনি অনেক পান এবং ধনদৌলতও তাঁর অফুরন্ত। কিন্তু তাহ'লেও, হিন্দুস্থানের সম্পর্কে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যা আমি আপনাকে জানানো প্রয়োজনবোধ করি।

প্রথমত, হিন্দুস্থান একটি বিশাল সাম্রাজ্য একথা আগেই বলেছি। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অনেকটা অংশ হয় মরুভূমি, না হয় অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চল। এই সব অঞ্চলে জমিজমার আবাদ তেমন ভাল হয় না এবং লোকজনের বসবাসও তেমন নেই। ভাল আবাদী জমি আছে তারও বেশ খানিকটা অংশ লোকাভাবে পতিত থাকে, চাষ হয় না। আবাদ ক'রে যারা ফসল ফলায় সেই সব চাষীর অবস্থা হিন্দুস্থানে খুব শোচনীয়। সুবাদার ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয়

প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তারা মানুষের মতন ব্যবহার পায় না। উপরের কর্তারা সকলেই তাদের উপর নির্মম অত্যাচার করে এবং এই অত্যাচারের জ্বালায় অনেক সময় চাষীরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। সাধারণতঃ নগরের দিকে তারা পালাবার চেষ্টা করে এবং সেখানে গিয়ে বোঝা বয়, ভিস্তীর বা ঘোড়ার সহিসের কাজ করে। মধ্যে মধ্যে কোন রাজার (বার্নিয়ের বোধ হয় এখানে দেশীয় হিন্দু সামন্ত রাজাদের কথা বলতে চেয়েছেন) রাজ্যে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কারণ তাদের ধারণা, বাদশাহের রাজত্ব ছেড়ে কোন দেশীয় রাজার রাজ্যে গেলে অনেক বেশী সুখেস্বচ্ছন্দে থাকা যায়। দেশীয় রাজারা নাকি প্রজাদের উপর এরকম অমানুষিক অত্যাচার করেন না।

দ্বিতীয়তঃ—মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে একাধিক জাতির বসবাস আছে এবং সমস্ত জাতির সর্বময় কর্তা হলেন মোগল বাদশাহ। এই সব জাতির অনেকেরই নিজেদের 'প্রধান' 'নায়ক' বা 'রাজা' আছে। প্রধানরা ও রাজারা মোগল বাদশাহকে 'কর' দেন নামমাত্র। তাও আবার সকলে দেন না। কেউ দেন, কেউ দেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই 'পেশ্‌কস' বা 'কর' দেওয়াটা অতি নগণ্য ব্যাপার। বাদশাহের কাছে বশ্যতা স্বীকারের সঙ্গে এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। আবার এমনও দু'চারজন রাজা আছেন যারা 'কর' দেন না, বরং উল্টে আদায় করেন। তাঁদের কথাও বলব।

যেমন—পারস্যের সীমান্তে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে তারা কাউকেই কিছু দেয় না, পারস্যের রাজাকেও না, হিন্দুস্থানের বাদশাহকেও না। বেলুচি ও আফগানরা তো বাদশাহকে কিছুই দেয় না এবং নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ব'লে মনে করে। মোগল বাদশাহ যখন কান্দাহার অবরোধ করার জন্য সিন্ধু থেকে কাবুল অভিযান করেছিলেন তখন এইসব বেলুচি ও আফগানদের উদ্ধত ও গর্বিত আচরণ থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। পাহাড় থেকে জল সরবরাহ বন্ধ ক'রে দিয়ে তারা সেনাবাহিনীর অভিযান একরকম বন্ধ ক'রে দিয়েছিল এবং শেষে পুরস্কার আদায় ক'রে তবে ছেড়েছিল।

পাঠানরাও খুব দুর্ধর্ষ জাতি। একসময় তারাও হিন্দুস্থানের রাজত্ব করেছে, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে তাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মোগলরা ভারতে অভিযান করার আগে পাঠানরা হিন্দুস্থানের অনেক জায়গায় বেশ ঘাঁটি তৈরী ক'রে বসেছিল। প্রধানতঃ তাঁদের শাসনকেন্দ্র ছিল দিল্লী এবং আশপাশের প্রতিবেশী রাজারা (হিন্দু রাজা) পাঠানদের 'কর'ও দিতেন। হিন্দুস্থান মোগলদের অধিকারে আসার পরেও, পাঠানরা সহজে আত্মসমর্পণ করেনি। বিভিন্ন স্থানে তারা রীতিমত শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিল এবং দীর্ঘদিন ধ'রে মোগলদের নানাভাবে নাজেহাল ক'রে তাদের অভিযান প্রতিরোধ করেছিল। মোগল আমলে তাই পাঠানরা তাদের সেই স্বাধীন রাজ্য-পরিচালনার কথা বিস্মৃত হতে পারেনি সহজে। জাত হিসেবেও তাই তারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও স্বাধীনতাপ্রিয়, এমন কি পাঠান ভিস্তীরা ও অন্যান্য দাসানুদাসরাও আচার ব্যবহারে রীতিমত উদ্ধত।* পাঠানরা প্রায় কথায় কথায় বলে যে একদিন আবার দিল্লীর সিংহাসনে তারা তো উপবেশন করতে পারে। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক লোককে, সে হিন্দুই হোক আর মোগলই হোক, তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তারা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে মোগলদের, কারণ মোগলরাই তাদের দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত ক'রে দেশ থেকে দূরে পাহাড়ের কোলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সব পাহাড় অঞ্চলে পাঠানরা এখনও স্বাধীনভাবে বসবাস করে, তাদের নিজেদের প্রধান ও রাজাদের অধীনে এবং কারও কোন হুকুম মানতে চায় না, কারও বশ্যতাও স্বীকার করতে চায় না। অবশ্য স্বাধীন রাজ্য হিসেবে তারা যে খুব ক্ষমতাশালী তা নয়।

* দিল্লীর পাঠান সুলতানেরা ১১৯২ খৃঃ অঃ থেকে ১৫৫৪ খৃঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর রাজত্বকালের মধ্যে ছয়টি রাজবংশ ও চল্লিশজন রাজা রাজত্ব করেন। কখনও তাঁদের রাজ্যের সীমানা পূর্ববঙ্গের প্রান্ত থেকে কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কখনও বা তাঁরা কয়েকটি জেলার অধীশ্বর ছিলেন মাত্র দেখা যায়।

ভক্ত

দিলীপকুমার পুরকায়স্থ

সন্ধ্যাদীপ জন্ম লভি তুলসীর মূলে
ক্ষণিক আয়ুর কথা মর্মে গেছে ভুলে!
ধীরে ধীরে তেল যবে শেষ হয়ে আসে
নিবু-নিবু দীপশিখা গভীর নিশ্বাসে,
কহিতেছে বারে বারে "রক্ষা করো নাথ,
আয়ু মোরে দাও তুমি যতক্ষণ রাত"।
শুনিয়া ছায়াটি কহে মাটিতে লুটিয়া—
"কিছু নাহি চাহি প্রভু তোমারে ছাড়িয়া
তোমার পায়ের তলে আমারে রাখিয়ো,
যতক্ষণ রাখো শুধু প্রণামটি নিয়ো।"

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

অষ্টম উচ্ছ্বাস

(বিশ্রুত-চরিত)

সে তখন বলতে লাগল :—

হে দেব, বিন্ধ্যাটবীতে আমিও ভ্রমণ করতে করতে একটি কূয়োর ধারে একদা আট বছর বয়সের একটি ছেলেকে দেখতে পাই। ছেলেটি ছটফট করছিল ক্ষিদে আর তেষ্টায়। কষ্ট-পাবার মত চেহারা নিয়ে সে জন্মায়নি। আমাকে দেখে মহাভয়েই হড়বড় করে বলে ফেলল—

"আমার কপাল ভাল আপনি এখানে এসেছেন। ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছি। আমাকে সাহায্য করুন, জলতেষ্টায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে; জল খুঁজতে খুঁজতে এই কূয়োটাকে দেখতে পাই। আমার সঙ্গে যে বুড়ো মানুষটি ছিলেন, তিনি···আর আমার কেউ নেই জগতে···জল তুলতে গিয়ে কূয়োর মধ্যে পড়ে গেছেন। আমি কেমন করে উদ্ধার করব? কিছুতেই পারছি না।"

কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি লতা দিয়ে একটা দড়ি তৈরী করে কূয়োর ভিতর নামিয়ে দিয়ে কোনোক্রমে বৃদ্ধটিকে উদ্ধার করি। বাঁশের চোঙা ডুবিয়ে জল তুলে ছেলেটিকে খাওয়াই। এক-শরক্ষেপ উঁচু, এক লকুচ-গাছের মাথা থেকে, পাথর ছুঁড়ে, মাটিতে পেড়ে ফেলি গোটা পাঁচেক ফল। ফল আর জল খেয়ে যখন দুটিতে একটু সুস্থ বোধ করল, লকুচ-গাছের তলায় বসে, বুড়ো-গোছের সেই পুরুষটিকে শুধাই—"তাত, এই বালকটি কে? আপনিই বা কে? বিপদেই বা পড়লেন কেমন করে?"

বৃদ্ধের কণ্ঠ তখন চোখের জলে যেন ভিজে গেছে; বললেন—

"বলি শুনুন। "বিদর্ভ" নামে জনপদটিকে সকলেই জানেন। সেখানে রাজা ছিলেন "পুণ্যবর্ম্মা"—ধর্ম্মের অংশাবতার, ভোজ-বংশের অলঙ্কার। তাঁর মত সত্যবাদী, কীর্ত্তিমান, বদান্য এবং বিনয়ী পুরুষ—বিশ্বে বিরল। প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট নেতা; ভৃত্যেরাও তাঁকে ভালবাসত। মূর্ত্তিতে এবং বুদ্ধিতে যদিও তাঁর প্রকাশ পেত পৌরুষভাব ও উত্থানশীলতা, তবু চিত্তে ছিল অনুদগ্র নম্রতা। শাস্ত্রের প্রমাণ মেনে চলতেন। যখনই কোন কাজ আরম্ভ করতেন, তখনই 'শক্য, ভব্য এবং কল্প' এই বিধিগুলির বিধান অনুসারে, অর্থাৎ স্বসামর্থ্য, গণ-কল্যাণ, এবং অভঙ্গুর কল্পনার সাযুজ্য বজায় রেখে, সেই কাজ সম্পন্ন করা যায় কি না, পূর্ব্বেই বিচার করে নিতেন। বন্ধুদের নির্ব্বাচনে, সেবকদের উপর নিজের প্রভাব বিস্তারে, বিদ্বানদের গুণগ্রহণে, এমন কি শত্রুদের সংদমনে, যারা অসম্বন্ধ-প্রলাপী তাদের কথায় কর্ণপাতও করতেন না।

তাঁর যে কোন্ গুণ ছিল না—তা বলা অসম্ভব। কলাবিদ্যায় ধর্ম্মার্থসংহিতায় অসামান্য ছিল তাঁর জ্ঞান-নৈপুণ্য। যেখানে স্বল্পও উপকার পেয়েছেন—সেখানে তিনি প্রত্যুপকার করতে ভুলতেন না।

রাজকোষ এবং বাহন বিষয়ে	—	গবেষক,
অধ্যক্ষদের	—	পরীক্ষক,
কৃতকর্ম্মাদের	—	উৎসাহদাতা,
দৈবী বা মানুষী বিপদের	—	প্রতিকর্ত্তা,

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়—এই ষড়গুণে—ছিলেন সুনিপুণ; এবং মনু-মার্গের ব্রতাবলম্বন করে তিনি হয়েছিলেন চাতুর্ব্বর্ণের প্রণেতা।

কিন্তু সংসারে যা ঘটে তাই ঘটল। পুণ্যকর্ম্মের দাক্ষিণ্যে পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করে, প্রজাদের দীনপুণ্য করে একদিন তিনি প্রস্থান করলেন অমরদের রাজত্বে।

পুণ্যবর্ম্মার পরেই উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজা হলেন অনন্তবর্ম্মা। গুণগ্রামে সমৃদ্ধ হলে হবে কি, তাঁর আদরণীয় ছিল না "রাজদণ্ড-নীতি"। ঐটি ছিল তাঁর বিশেষ দোষ। সেই হেতু কর্ত্তব্যের খাতিরে, পিতৃ-সম্মানিত মন্ত্রিবৃদ্ধ "বসুরক্ষিত" একদা গোপনে তাঁকে নিজের মনের কথা প্রগলভ ভাষায় দ্বিধা করলেন না বলতে,—

"বৎস, আত্মসম্পদের যত কিছু উপকরণ, মানুষের থাকা প্রয়োজন সবই তোমার রয়েছে। তোমার মধ্যে রয়েছে নিসর্গ-পটীয়সী বুদ্ধি। সত্যই শিল্পে, ললিতকলায়, কাব্যে, চিত্রে, নৃত্য-গীত-বাদ্যে, তোমার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, তা অনন্যসাধারণ। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে—যেহেতু তোমার অভ্যাসসংস্কার নেই, সেই হেতু তোমার

বুদ্ধি অগ্নিশোধন-হীন স্বর্ণের মত দীপ্তিহীন বলে আমার মনে হয়। যে রাজাদের বুদ্ধি না থাকে তাঁরা অতিস্ফীত হয়ে ওঠেন ; শত্রুরা কাঁধের উপর চড়ে বসলেও তাঁদের চেতনা খোলে না ; কেবল ভাবেন—'আমি কত বড়'। সাধ্য কিংবা সাধনকে বিভাগ করে নিয়ে কোনো কাজ করতে পারেন না। অযথা ফল ফলায় কাজ—শত্রুর কাছে, এমন কি নিজের কাছেও, ঘা-সওয়া পরাজয়। অলব্ধ-লাভ যে যোগ, লব্ধ-রক্ষণ যে ক্ষেম, সেগুলি অবজ্ঞায় অজ্ঞাত থাকায় সেই সব রাজারা সাধন করতে পারেন না প্রজাদের কোনো কল্যাণ। শাসন লঙ্ঘন করে প্রজারা, যা-তা বলতে থাকে, যা-মন-চায় করতে থাকে। সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় স্থিতির সমগ্রতা। মর্য্যাদাবোধহীন জনগণ তাই ইহলোকে এবং পরলোকেও আত্মভ্রষ্ট হয়, স্বামিভ্রষ্ট হয়। অনন্তবর্মা, জেনে রেখো, আগমের প্রদীপ-জ্বালা পথ ধ'রেই সংসারে লোকযাত্রা চলেছে সুখে। যে সব বিষয় দর্শনের আড়ালে লুকিয়ে থাকে বা দূরপরোক্ষ, যে সব বিষয় সমাহিত রয়েছে ভূত-ভবৎ এবং ভবিষ্যতের গহ্বরে,—সে সব বিষয়ে একমাত্র শাস্ত্রই হচ্ছে দিব্যচক্ষুঃ, অপ্রতিহত তার বৃত্তি। যার সেই চক্ষুটি নেই সে লোক, বিশাল এবং আয়ত্ত দেহচক্ষুধারী হলেও অন্ধ জন্তুর মত,—যেহেতু অর্থদর্শনে সে অশক্ত। তাই আমি বলছি, বাহ্য বিদ্যায় আসক্তি ত্যাগ করে নিজের কুলবিদ্যা দণ্ডনীতিতে আগ্রহান্বিত হওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই অর্থনীতির অনুষ্ঠানেই সমস্ত শক্তি নিক্ষেপ করে অখণ্ডিতশাসন হয়ে, এই সমুদ্রমেখলা পৃথিবীতে রাজত্ব করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

মন্ত্রিবৃদ্ধ বসুরক্ষিতের মুখে এই কথাগুলি অনন্যমন হয়ে শ্রবণ করলেন অনন্তবর্মা। বললেন—"যোগ্যই হয়েছে গুরুজনদের অনুশাসন। পালন করাই আমার কর্ত্তব্য।" এই বলে প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে।

অন্তঃপুরের বিলাসিতার মধ্যে, প্রমদাদের কাছে গল্পচ্ছলে রাজা বলে ফেললেন বৃদ্ধমন্ত্রীর উপদেশের কথা। নিকটেই বসে ছিল কুমার-সেবক "বিহারভদ্র"। চিত্তবৃত্তির অনুকূল, এমন-ধারা কথা-বলবার শক্তি বা কৌশল যে, মানুষের থাকতে পারে, এই বিহার-ভদ্রকে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। রাজার প্রসাদই তার ঐশ্বর্য্য। নাচে, গানে, বাজনায় সে যাকে বলে 'বনটু' (অবাঙ্)। বারনারীরা তার প্রাণ। কথার ভঙ্গী দিয়ে রঙ্গ করে তাও-বাৎলানোয় (ভঙ্গিবিশারদঃ) সে সিদ্ধ। মুখে লাগাম নেই। পরের মর্ম্মকথার সন্ধান রাখা তার পেশা। হাস-কুটে, মহা-ঘুঁটে। পরনিন্দায় আর পৈশুন্যে মহাপণ্ডিত। ঘুষ নিয়ে নিয়ে এমন হাত পাকিয়েছে যে, এখন মন্ত্রিমণ্ডলের কাছ থেকেও ঘুষ নিতে দ্বিধা বোধ করে না। দুর্নীতির উপাধ্যায়। আর, কামতন্ত্রের তরণীখানি ঘাটে ভিড়োতে তার মত দক্ষ কর্ণধার ইহ-জগতে দুষ্প্রাপ্য। সেই হেন বিহারভদ্র একটু মুচকি হাসি ওষ্ঠে ঘনিয়ে বললে—

"দেব, ধূর্ত্তদের কথা, ভণ্ডদের কথা আর বলবেন না। দৈবের অনুগ্রহে যদি কেউ কিছু বিভূতি পেয়ে গেল, অমনি দেখবেন হাজির হয়ে গেছে ধূর্ত্তেরা সেখানে ; ভালমন্দ নানান্ কথায় নানান্ হীন নীচ প্রলোভনের সাহায্যে, বিভূতির সৌন্দর্য্যটাকে একটা কদর্থে জড়িয়ে নিজের স্বার্থটাকে সাফ হাসিল করে আচম্বিতে বেরিয়ে গেছে ধূর্ত্তেরা। এই দেখুন না কেন, :—ধূর্ত্তবেটাদের কীর্ত্তি—

মানুষ তো মরবেই। বেশ। কিন্তু মরবার পরে পরলোকে গিয়ে মানুষের কি কি লভ্য থাকতে পারে, কত লাভ হতে পারে, কেমন করে হবে লাভ, বেশী লাভ, ইত্যাদির পাহাড়প্রমাণ লোভ দেখিয়ে, আশা জাগিয়ে, জীবদ্দশাতেই ধূর্ত্তগুলো সেই মুমূর্ষু মানুষটার মাথা মুড়োবে, কুশের দড়ি দিয়ে বেটাকে বাঁধবে, হরিণের চামড়া পরাবে, ননী দিয়ে গা মাজাবে, অনশনের বিধান দিয়ে, শেষে একেবারে শয্যাশায়ী ক'রে নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নেবে মূর্খটার সর্ব্বস্ব। কী চমৎকার কীর্ত্তি বলুন তো!

এদের চেয়েও যারা আবার ঘোরতর পাষণ্ডী, তারা সেই মানুষটাকে বাধ্য করাবে,—স্ত্রী, পুত্র, শরীর, প্রাণ, সব বিসর্জ্জন দিতে। আবার এই সব মূর্খের মধ্যে যদি চালাক-জাতীয় কোনো জীব বেঁকে বসেন, নিজের হাতের পাঁচটিকে এই মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ভাসিয়ে দিতে না চান, তাহলে—আর যায় কোথা—তাকে এই ধড়িবাজরা ঘিরে বসবে, আর শোনাতে থাকবে বড় বড় কথা—যেমন :—

"এক বুড়ি কড়ি দিয়েই টানতে হয় লাখ লাখ বুড়ি ;
শস্ত্র না ধরেই সব শত্রুর নিপাত করা যায় ;
হে মানব, যদিও তুমি মরণশীল, যদিও তুমি একা, তবু আত্মার মধ্য দিয়েই তোমায় করতে হবে ভোগ, হতে হবে সম্রাট্।

আমরা যে পথের সন্ধান জানি, তোমাদের বলি, একমাত্র রয়েছে সেই মার্গ।"

নিমরাজী যজমান আবার প্রশ্ন করে,—"কি সেই মার্গ?" তখন এই ধূর্ত্তরা আবার উত্তর ছাড়ে :—

"বৎসগণ, জেনে রেখো। রাজবিদ্যা চারি প্রকার, যথা :—ত্রয়ী, বার্ত্তা, আন্বীক্ষিকী ও দণ্ডনীতি। এদের মধ্যে তিনটি, অর্থাৎ ত্রয়ী, বার্ত্তা ও আন্বীক্ষিকী হচ্ছে মহতী,—ধীরে ধীরে ফল ফলায়। সেগুলির কথা এখন থাক্। তার চেয়ে দণ্ডনীতি অধ্যয়ন করাই প্রশস্ত। মৌর্য্যদের কল্যাণের জন্য আচার্য্য বিষ্ণুগুপ্ত ইদানীং ছয় সহস্র শ্লোকে সেটি সংক্ষিপ্ত করেছেন। সেইটিকে অধ্যয়ন করে যদি সম্যক্ অনুষ্ঠান কর, তাহলে আমাদের উপদেশ অনুযায়ী কর্ম্মক্ষম হবে, ফল পাবে।"

যজমান বলে—"তথাস্তু"। এবং আচার্য্য বিষ্ণুগুপ্তের প্রণীত সংক্ষিপ্ত দণ্ডনীতি সে অধ্যয়ন করতে থাকে বা শুনে শিখতে থাকে। এই অধ্যবসায় করতে করতেই যজমানের দেহে দেখা দেবে জরা। এখানে কিন্তু একটি কথা ভুললে আমাদের চলবে না। এই শাস্ত্র অন্য সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সুতরাং, বাকী সর্ব্বশাস্ত্র যদি না জানো, তাহলে কেমন ক'রে অধিগমন করবে এই মূল তত্ত্ব? সুতরাং, বহুই হোক্ আর অল্পই হোক্, এই বিদ্যার অর্জ্জন সময়সাপেক্ষ।

এই শাস্ত্রে যে রাজারা অনুরাগী হবেন, তাঁদের প্রথম থেকেই কিন্তু বিশ্বাসের বাইরে রাখতে হবে নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। নিজের ছেলের জন্যও যদি ভাত রাঁধাতে হয়, তাহলে কত তণ্ডুল, কত কাঠ ...তার হিসাব নাও, মান-উন্মান কোরে তবে এতটা-এতটি করে চাউল দেওয়া হবে।

রাজা ঘুম থেকে উঠলেন,—মুখ ধোওয়া হোলো কি হোলো না, —দিবসের প্রথম তিনটি প্রহর বসে গেলেন শুনতে, হজম করতে।

কী? না, মুষ্টি, অর্দ্ধমুষ্টি! এই সব মুষ্টিযোগেরা নিয়ে আসছে রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব। এদিকে রাজার হিসাব নেওয়া চলছে, আর ওদিকে দেখ, রাজার চোখে ধুলো দিয়ে ধূর্ত্তেরা (অক্ষধূর্ত্তেরা) দ্বিগুণ করছে চুরি। চাণক্য যেখানে লিখে গেছেন চুরি-করার চল্লিশটি উপায়—সেখানে বিকল্পের মাহাত্ম্যে আত্মবুদ্ধির বলে তারা উদ্ভাবন করবে হাজারটি সুউপায়।

দ্বিতীয় প্রহরে,—বাদী-প্রতিবাদী মামলাবাজ প্রজাদের আক্রোশ অভিযোগ শুনতে শুনতে কান পুড়ে যাবে রাজার, জীবন ধারণটাই মনে হবে একটা কষ্ট। সেখানেও দেখবে, রাজার এত কষ্ট সত্ত্বেও প্রাড়্‌বিবেকেরা খুশীমত একে হারাচ্ছেন, ওকে জেতাচ্ছেন; নিজেদের অর্থলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুকেও জড়িয়ে ফেলছেন পাপে এবং অকীর্ত্তিতে।

তৃতীয় প্রহর। স্নান করতে ভোজন করতে একটু অবসর দেওয়া হয় রাজাকে। খেতে বসলেন রাজা,—ওজন করা ভোজন; কিন্তু সুস্থির মনে খাওয়া কি যায়? অসম্ভব ভয়, বিষ মেশায় নি ত?

চতুর্থ প্রহর। শাস্তি কম নয়। হিরণ্য প্রতিগ্রহের জন্ম হস্ত প্রসারণ করে থাকো।

পঞ্চম প্রহর। মন্ত্রীদের সঙ্গে গূঢ় মন্ত্রণা। রাজার পক্ষে সেটি একটি মহতী যন্ত্রণা। সেখানেও দেখবে, মন্ত্রীরাই মধ্যস্থ; সড় করে ইনি এঁকে, উঁনি ওঁকে, একবার করছেন দোষী, একবার করছেন গুণী। দূতের বাক্য, গুপ্তচরের তত্ত্বকথা, যা ঘটতে পারে না, দেশ কাল ও কার্য্যের অবস্থা, নিজের বা পরের শত্রু বা মিত্রমণ্ডল —সমস্ত কিছুকেই মন্ত্রীরা নিজেদের ইচ্ছামত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিছক পরিবর্ত্তন কোরে বা করিয়ে, উপজীবিকার খুলে রেখেছেন পথ। প্রয়োজন মত বাইরের বা ভিতরের ক্রোধাগ্নি দ্বন্দ্ব কলহ গোপনে গোপনে বাড়িয়ে দিয়ে, প্রকাশ্যে রাজস্বামীর সম্মুখে আবার সেই আগুনটা নিভিয়ে দিয়ে, রাজাকেই তাঁরা বন্দী করে রাখেন নিজেদের মধুর বক্তৃতায়।

ষষ্ঠ প্রহর!—রাজার ছুটি। যেমন খুশী বিহার করুন মহারাজ, যেমন খুশী গালগল্প করুন মহারাজ। যে স্বৈরবিহারের মাত্র তিন-তিনের-চারটি নাড়িকা সময় (অর্থাৎ $1\frac{1}{2}$ hrs)—সে পোড়া বিহারের বালাই নিয়ে মর।

সপ্তম প্রহরে রাজার প্রয়াস, খাটুনি—চতুরঙ্গবল পর্য্যবেক্ষণ।

অষ্টম প্রহরে, সেনাপতির সঙ্গে একত্রে বিক্রম-চিন্তাক্লেশ। সমস্তই ক্লেশ। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত—এই ত গেল ক্লেশের ইতিহাস।

তার পরে কী সৌভাগ্য! ধরাতলে আগমন করছেন শান্তিদায়িনী সন্ধ্যা। শান্তচিত্তে উপাসনার সময়। সন্ধ্যাহ্নিক করবেন রাজা। কিন্তু দেখো, উপাসনা-শেষেই রাত্রিভাগের প্রথমেই রাজাকে দর্শন দিতে হবে গূঢ়পুরুষদের। কোথায় উপাসনা আর কোথায় গুপ্তচর, গুপ্তঘাতক! এই ভয়ানক নৃশংসদের প্রেরণ করতে হবে নৃশংসতম রাজকার্য্যে—তারা শস্ত্রমারক, অগ্নিমারক, বিষমারক।

রাত্রিভাগের দ্বিতীয়ে—ভোজন। তারপরে শ্রোত্রিয়দের মত স্বাধ্যায়ের আরম্ভ। তৃতীয়ে, তূর্য্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শয়নে চলুন মহারাজ! চতুর্থ ও পঞ্চম—কী সুন্দর ব্যবস্থা!—পরিশ্রান্ত নরপতিকে ঘুমোতেই হবে—সময় তিন ঘণ্টা। অজস্র চিন্তাভারে বিহ্বল-মস্তিষ্ক বেচারী রাজার আবার নিদ্রাসুখ! তারপরে ষষ্ঠে—আরম্ভ করতে হবে শাস্ত্রচিন্তা, কার্য্যচিন্তা। সপ্তমে—মন্ত্রগ্রহ দূতদের অভিপ্রেরণ।

চমৎকার মহাশয় ব্যক্তি এই রাজদূতেরা। দো-তরফা প্রিয়াখ্যান অর্থাৎ তোষামোদের মাহাত্ম্যে অর্থ সংগ্রহ করে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন; পথে ভোগ করতে হয় না শুল্কের বাধা; অতএব বাণিজ্য চলতে থাকে পথে, বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থ; কাজ না থাকলেও কায়ক্লেশ উঠিয়েও খুঁজে বার করবোই কাজ—তারপর সেই কাজ নিয়ে অনবরত ঘোরাঘুরি, ভ্রমণ; ভ্রমণমূলেই হয় তাঁদের অর্জ্জন।

যাক্। এখন আসুন রাত্রিভাগের অষ্টম নাড়িকায়। শুভাগমন হবে পুরোহিতদের। তাঁরা বলবেন—"মহারাজ, অন্ত দুঃস্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রহেরা দুঃস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন. শকুনগুলিও সাতিশয় শুভ বলিয়া বিবেচিত হয় না। অতএব শান্তি স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। সৌবর্ণ হোম-সাধনের বিধানেই সাফল্য লাভ করিবে ক্রিয়া। ব্রহ্ম-বল্প উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা যদি স্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলেই কল্যাণতর হইবেক ক্রিয়া। এই ব্রাহ্মণগণ ক্লেশে ও দারিদ্র্যে লালিত অপত্যসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞ করিবেন। এঁরা বীর্য্যবন্ত, অত্যাপি প্রতিগ্রহণ করেন নাই। ক্ষেমপ্রাপণের সদুদ্দেশ্যে এঁরা যে মন্ত্রপাঠান্তে বিকীরণ করিবেন তণ্ডুল, তৎ-ফলেই মহারাজের আয়ুর্বৃদ্ধি, স্বর্গসুখ, অরিষ্টনাশাদির প্রাপ্তিযোগ।" এই রকমের অনেক কিছু জ্ঞান-গম্ভীর উপদেশের পীড়নে রাজাকে জর্জ্জরিত ক'রে ঐ ব্রাহ্মণগুলোর মুখ দিয়ে পুরোহিতেরা নিজেরাই একান্তে ভক্ষণ করবেন সর্ব্বস্ব।

অশ্রান্ত নিন্দা, অবিরাম ক্লেশ, সুখের লেশমাত্র নেই—এক অহর্নিশ। এই ধরণের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে যে রাজাকে অভ্যাস করতে হয় দণ্ডনীতি, সেই নয়জ্ঞ রাজার পক্ষে চক্রবর্ত্তিতা তো দূরের কথা, নিজের আত্মীয়স্বজনদেরও রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। এই শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে—যা কিছু দেওয়া হয়, যা কিছু মানা হয়, যা কিছু প্রিয়ভাষায় বলা হয়—সেই সবের পিছনেই বিত্তমান থাকে অবিশ্বাসের অভিসন্ধান। অবিশ্বাসই জন্মভূমি আলস্মীর। লোকযাত্রার জন্যে যতটুকু নীতির প্রয়োজন, এই লোকে ততটুকু নীতিই সিদ্ধ। শাস্ত্রের সমস্তটাই আবার লোকযাত্রায় ফলবান্ হয় না। যদি তাই হবে, তাহলে যে কোনো মূর্খ বলতে পারে—"মা, তুমিও আমার মত স্তন্যপান কর।"

মহারাজ, সেইজন্যে বলছি, ঐ দণ্ডনীতির অতিযন্ত্রণা ভোগ না করে আমাদের দেহের এই পাঁচ পাঁচটি ইন্দ্রিয় যে সুখ দেয় তা ভোগ করায় আমাদের বাধা কি? যাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন—"জিতেন্দ্রিয় হওয়া কর্ত্তব্য, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য ত্যাজ্য, শত্রু-মিত্র-উভয়েতেই সাম-দান-দণ্ড-ভেদ অজস্রভাবে প্রযোজ্য, সুখের অবকাশ না দিয়ে জীবনের এই ক্ষীণায়ুঃ সময়টিকে ব্যাপৃত করতে হবে সন্ধিবিগ্রহ-ইত্যাদির চিন্তায়,"—দেখবেন সেই সব মন্ত্রি-বকগুলো লুঠকরা রাজধনেই রাজভোগে ওড়াচ্ছেন দাসীদের গৃহে গৃহে। এই সব নিয়মপরাধেরা কারা? ঐ যাঁরা রয়েছেন—শুক্র,

অঙ্গিরস, বিশালাক্ষ, বাহুদন্তিপুত্র, পরাশর ইত্যাদি :—তাঁরা মন্ত্রকর্কশ, তাঁরা শাস্ত্রতন্ত্রকার—তাঁরাই কি জয় করেছিলেন ষড়রিপু ? না, তাঁরা অনুষ্ঠান করেছিলেন শাস্ত্র ? প্রারব্ধ কার্য্যগুলির মধ্যে তাঁরা কেবল দেখতেন দুটি জিনিষ—সিদ্ধি আর অসিদ্ধি। এই শাস্ত্রে যাঁরা পাঠ নিয়েছেন তাঁদের বারংবার কূট তর্কের মধ্যে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়, অ-পাঠীদের হাতে।

"সখা, তুমি যা করছ তা তোমারই সাজে। তুমিই দেবতা বিশেষ। সর্ব্বলোকবন্দ্য তোমার জাতি ; তোমার আয়ুতে দর্শন দেননি রাত্রি ; চেহারা দেখলে ঠিকরে পড়ে নিখিলের চোখ ; অপরিমাণ তোমার ঐশ্বর্য্য। বৃথায় নষ্ট কোরো না তোমার এই অসামান্য সর্ব্বস্ব ;—স্বরাষ্ট্রচিন্তার তন্ত্রে, অরিচিন্তার মন্ত্রণায়। অবিশ্বাসের বেদীর উপর বসে, সুখের আর ভোগের পথগুলো বন্ধ করবার শুভ আশায় জল্পনা কল্পনা কোরে মেরো না। তোমার রয়েছে দশ সহস্র হস্তী, তিন লক্ষ অশ্ব, অনন্ত পদাতিক সৈন্য ; তেমরত্নের সম্ভারে পূর্ণ হয়ে রয়েছে তোমার কোষগৃহ, গৃহের পর গৃহ। এতো তোমার আছে যে, মানুষ যুগসহস্র ভোগ ক'রেও শূন্য করতে পারবে না তোমার কোষাগার। এত তোমার আছে ; এও কি পর্য্যাপ্ত নয় ? তবে কেন অর্জনের আশায় তোমাকে স্বীকার করতে হবে আয়াস ? এইটুকু ত জীবন, চার-পাঁচ দিনের খেলা। তার মধ্যেও ভোগ করবার মত পাওয়া যায় একটা টুকরো বয়স, অল্পেরও অল্প। যারা মূর্খ, অপণ্ডিত, তারা পুনর্বার অর্জন প্রবন্ধে সেই অতটুকু বয়ঃখণ্ডকেও ধ্বংস করে ফেলে। যে ঐশ্বর্য্য অর্জ্জিত হল, তার এক কণাও আস্বাদ করতে সে পেল না। কি আর বেশী বলব ! সখা, রাজ্যভার দয়া কোরে সমর্পণ কোরে দাও—তাদের উপর—যারা শক্তিমান, ভারবহনপটু, যারা তোমার অন্তরঙ্গ। ব্যস্। তারপরে রয়েছে অন্তঃপুরিকারা,—অপ্সরাদের প্রতিরূপা, রয়েছে বিলাস বিহার, ঋতুতে ঋতুতে উৎসব, গীত, সংগীত, পানগোষ্ঠী : রয়েছে সমস্ত শরীরের দীর্ঘায়ুঃ-স্পৃহা।"

এই ভাষণের পর পঞ্চাঙ্গ দিয়ে ভূমিস্পর্শ ক'রে শিখর-চুম্বি অঞ্জলির প্রণাম বিরচন ক'রে, শুয়ে পড়ল বিহারভদ্র। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল প্রমদারা ; পুষ্পের মত প্রীতি-বিকশিত হয়ে উঠল তাদের চোখ। জননাথেরও থামতে চায় না হাসি ; হাসতে হাসতে বললেন "হিতোপদেশের গুরুমহাশয়, ওহে বিহারভদ্র, আপনি তবে এখন উঠুন। মাটিতে লুটিয়ে পড়লে লোকে শেসে অপবাদ দেবে, বলবে, গুরুত্বের বিপরীত অনুষ্ঠান দেখাচ্ছেন চাঁদ।"

বিহারভদ্রকে কুট্টিম-শয়ন থেকে উঠিয়ে আনন্দের নির্ভরতায় মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিলেন অনন্তবর্ম্মা।

দিন যায়। মন্ত্রিবৃদ্ধ বার বার প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু একই প্রস্তাব। বাক্য দিয়ে রাজা সমর্থন করেন প্রস্তাব ; কিন্তু মনে মনে করেন অবজ্ঞা, বলেন—"উনি জানেন না মানুষের মন।"

মন্ত্রীরও মনের মধ্যে ধীরে ধীরে এই রকমেরি একটি দেখা দিল বিবেকের বিচার।

"এটা আমার মোহ-ই বলতে হবে, তা না হলে এমন বোকামি করি ! সমস্ত চেষ্টাই বৃথা। স্পষ্ট বুঝতে পারছি—আমার উপদেশে অরুচি ঘটেছে রাজার। আমি হয়েছি—যেন একটা চোখ-ঠারানো হাস্য। এখন রাজা—আর আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন না। কথা কন, হাসি নেই। বলেন বটে, কিন্তু গোপন করেন রহস্য। শ্রদ্ধার হাত দিয়ে অঙ্গ স্পর্শ করেন না আমার। আপদে-বিপদে অনুকম্পা নেই। উৎসবে দেখান নাকো অনুগ্রহ। দু-একটা ভালো-মন্দ জিনিষ-পাঠানো, তাও আর পাঠান না। প্রাণপাত করে কার্য্যসিদ্ধি করলুম গণনায় আনলেন না। আজকাল আর জিজ্ঞাসাও করেন না ঘরের খবর, কে কেমন আছে। কোনো কাজেই আমার পক্ষ সমর্থন করেন না। নিজের কোনো দরকারী কাজে নিয়োগ করেন না আমাকে। যেন আমি বহিশ্চর লোক, অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ। মহারাজের দয়ার ধারাও কেমন যেন বদল হয়ে গেছে। যে কাজ আমার করা উচিত নয়, সেই কাজেই আমাকে পাঠান ; ওঁর গোপন অনুজ্ঞালাভ ক'রে অন্যেরা আক্রমণ করছে আমার আসন ; আমার শত্রুদের দেখান প্রণয়, বিশ্বাস ; আমার প্রশ্নের উত্তর দেন কদাচিৎ ; যেখানে সমান দোষ করেছে সকলে, সেখানে অপবাদ ভৎসনার অমৃতটুকু আমার ভাগেই পড়ে, মর্ম্মে আমাকে উপহাস ! আমার অভিমতের মূল্য নেই ; মহার্ঘ উপঢৌকন পাঠাই, মন ভেজে না ; আমার মুখের সামনেই মূর্খদের দিয়ে উদ্‌ঘোষিত করান নীতিজ্ঞদের ভুলচুক স্খলন। চাণক্য সত্যই বলেছেন—'চিত্ত এবং জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হোলে অনর্থগুলোও প্রিয় হয়। মনোভাবের প্রতিকূল হলেই ভালো জিনিষও হয় মন্দ।' এখন করি কি ? অবিনীত হোলেও, রাজাকে ত্যাগ করতে তো আর পারি না,—পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম।
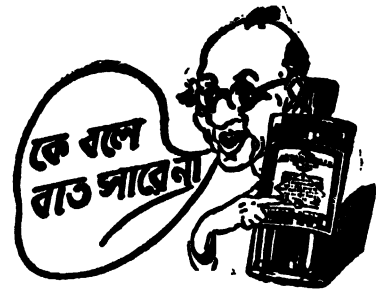
আমাদের যদি না ত্যাগ করেন, আমাদের শুভচিন্তা যদি কানেও না নেন, তাহলে আমরাই বা কী উপকারে লাগব! অশ্মকেশ্বর বসন্তভানু, তিনি নয়জ্ঞ। তাঁর হাতেই দেখছি এই রাজ্যটি একদিন গিয়ে পড়বে। আশা করি, এই ভাবী বিপদের আশঙ্কা একদা প্রকৃতিস্থ করবে আমাদের অনন্তবর্ম্মাকে। অপরাধ করে অনর্থ ঘটানো খুবই সহজ। হঠাৎ জেগে ওঠে হিংসা। কিন্তু হিংসার আমার রুচি নেই। ঘটুক, অনর্থই দেখছি ভবিতব্য। এখন আমার উচিত আমার এই নিষ্ঠুর রসনাটিকে স্তম্ভিত করে রাখা এবং চরণ দুটিকে কোনো প্রকারে স্থানভ্রষ্ট হতে না দেওয়া।"

মন্ত্রী বসুরক্ষিতের মনোবৃত্তি যখন এই রকমের এবং রাজা অনন্তবর্ম্মাও যখন অতিমগ্ন হয়ে রয়েছেন কামের চরিতার্থতায়, তখন রাজার পার্শ্বচর পরিমণ্ডলের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘটে গেল একটি নতুন ঘটনা। অশ্মকরাজের অমাত্য "ইন্দ্রপালিতে"র পুত্র "চন্দ্রপালিত" উদয় লাভ করলেন বিদর্ভে। তাঁর চরিত্রের কথা বেশী না বলাই ভালো। পিতৃনির্বাসিত, অর্থাৎ কিনা, বাপে-খেদানো ছেলে। তাঁর সহচরণ করত অনেক চারণ, অনেক ছদ্মকিঙ্কর, অনেক গুপ্তচর, নৈপুণ্যশালিনী কৌশলবতী অনেক শিল্পকারিণী বারাঙ্গনা। হরেক রকমের খেলা দেখিয়ে, মন ভুলিয়ে, চন্দ্রপালিত আত্মসাৎ করে নিলেন বিহারভদ্রকে। পরিচয়ের সূত্র ধ'রেই রাজার দরবারে স্থান পেয়ে গেলেন চন্দ্রপালিত। তারপরে তিনি এদিন সেদিন ক'রে ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন আত্মপ্রকাশ, কত রকমের যে বিলাসিতা হতে পারে তার তথাতথ কথকতা। কী তাঁর বর্ণনার বাহাদুরী! যথা :—

"দেব, ঔপকারিকী যদি কিছু থাকে, তাহলে—হ্যাঁ, ঐ একটিই রয়েছে। মৃগয়া। ওর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না বিশ্বে। ব্যায়ামের উৎকর্ষতায় মৃগয়া শ্রেষ্ঠ। আপদের সময়েও দেখবেন—জোরে পা চালিয়ে দীর্ঘপথ এক লহমায় লঙ্ঘন করার ক্ষমতা আপনাকে উপকার দেবেই। এই মৃগয়া, কফের অপচয় ঘটিয়ে অগ্রে এনে দেয় অগ্নিদীপ্তি, নীরোগ রাখে স্বাস্থ্য; মেদের অপকর্ষ ঘটিয়ে প্রত্যেক অঙ্গে এনে দেয় স্থৈর্য্য, কার্কশ্য, লঘুতা; শীত উষ্ণ, বাতবর্ষা ক্ষুৎপিপাসা সমস্ত সহ্য করায়; নানান্ অবস্থায় জন্তু-জানোয়ারদের ধরণ ধারণ, তাদের চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আনে; হরিণ গবল গবয়দের শীকার থেকে আসে শস্যলোপের প্রতিক্রিয়া; বৃকব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু সংহারের অনুগ্রহে শল্যশোধন হয় স্থলপথের; অরণ্য এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশের আলোচনায় সুবিধা ঘটে ব্যবসার ক্ষেত্রে; আটবিকবর্গের বিশ্বাস আসে রাষ্ট্রনীতিতে; নিজের সৈন্যসামন্তদের উৎসাহ বাড়ে। তার ফলে, শত্রুরা বিত্রাসিত হয়। এই দশটি গুণের পরেও অনেক গুণ দেখানো চলে মৃগয়ার। অথচ মূর্খেরা কি না এই মৃগয়াকে বলে বিলাস!

দ্যূতক্রীড়াকেও অনেকে বলেন বিলাস। তাঁরা জানতেই চেষ্টা করেন না এর মাহাত্ম্য, এর গুণাবলী। মানবের হৃদয়ে অনুপম ঔদার্য্য আনে দ্যূতক্রীড়া। তা না হ'লে কেউ কি তৃণের মত মুহূর্ত্তে ত্যাগ করতে পারে রাশি রাশি দ্রব্য, ধন, ঐশ্বর্য্য? খেলায় হারও আছে, জিৎও আছে; ভাগ্যবিপর্য্যয় হর্ষবিষাদের বাইরে নিয়ে যায় চিত্তকে। পৌরুষ সঞ্জাত বৃদ্ধি পায় ক্রোধ। অক্ষ-হস্তের প্রতারণার এবং পাশা চালার দুর্লক্ষ্য কূট কৌশলগুলো ধরে ফেলতে ফেলতে খুলে যায় বুদ্ধির নৈপুণ্য। একটি মাত্র বিষয়েই বিভোর হয়ে থাকে চিত্ত, তাই চিত্তে জন্মায় অতিবিচিত্র একাগ্রতা। অধ্যবসায়ের সহচর বেড়ে যায় সাহস। খেলতে হয় এই খেলা অত্যন্ত কর্কশ পুরুষদের সংসর্গে;—তাই অনন্যধর্ষণীয়তা এবং মান-অপমান-নিন্দার মধ্য দিয়েই পথ কেটে নিয়ে সাধন করতে হয় অকৃপণ শরীরযাপন। দ্যূতক্রীড়ার মাহাত্ম্যেই এই সাত সাতটি গুণ ত্বরায় অর্জ্জন করা সম্ভব হয়ে উঠে, কিনা বলুন।

মহারাজ, লোকে বলে রমণী-প্রসঙ্গও একটি বিলাস, পাপ। কিন্তু তারা ভুলে যায়—কামের ভিতর দিয়েই সফল হয়ে ওঠে ধর্ম্মার্থ। কোথা থেকে আসে পুরুষাভিমানের শ্রেষ্ঠতা? ভাবজ্ঞানের কৌশল? নির্লোভ প্রচেষ্টা? নিখিল কলাবিদ্যায় বিচক্ষণতা? কোথা থেকেই বা আসে—সেই বুদ্ধি এবং বাক্যের পটুতা—যার কৃপায় এবং দাক্ষিণ্যে—অলব্ধকে লাভ করা যায়, লব্ধের অনুরক্ষণ করা যায়, রক্ষিতের উপভোগ করা যায়, ভোগের অনুসন্ধান চলে, এবং অনুসন্ধানের ফলে সমাধান হয় রুষ্ট অনুনয়ের? বরাঙ্গনা—ভোগই নিয়ে আসে শরীরের উৎকৃষ্ট সংস্কার, আত্মার এবং দেহের পারিপাট্য, লোকসমাজের সমাদর, ব্যুৎপন্ন সুহৃৎ-প্রিয়তা, পরিজনদের শ্রদ্ধা ভালবাসা। মধুর বচনীয়তা, মহাপ্রাণতা, বদান্যতা এবং অপত্যোৎপাদনের প্রক্রিয়ায় ইহলোক এবং পরলোকের কল্যাণ, এই হচ্ছে স্ত্রীসংসর্গের রত্নোজ্জ্বল অবদান। কিন্তু মূর্খপণ্ডিতেরা তার ব্যাখ্যা করেন অন্যপ্রকার।"

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

চুল

শ্রীঅরুণেন্দু দাস

ঘামঝরা দেহ এই দমফাটা ছোট ঘর
বিছানায় এলোচুলে নেমে এলো ধূলি-ঝড়—
কর্কশ কুঞ্চিত লালচে অঢেল চুল
আছড়ায় মুখে মোর নেমে আসে ঘুমচুল।

জলঝড় কাঁপা রাত বিনিদ্র বিছানায়
উজ্জ্বল সর্পিল চুল কালো বন্যায়—
নীলাকাশ কাশবন সোণালী শরৎ এই
বেলফুল কবরীতে কামনার নেই থেই।

ধানখুসী মাঠ ঘিরে মনখুসী মিঠে ক্ষণ
হেমন্তী হাওয়া কাঁপা চুলের উদাম বন—
হিমেল বাতাস কাঁপা হিমঝড় কত রাত
ঘনতর হয়ে আসে চুল কার কার হাত?

বিরহী মাদক দিন বসন্ত মর্ম্মর
জানালার দিকে নামে চুলের রেশমী ঝড়—
মীনাক্ষী, তোমার চুল সময়ের সব দ্বার
পার হয়ে শাশ্বত রূপ যেন কামনার।

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লি
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মিঃ ডুলেসের প্রাচী-পরিক্রমা—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস গত মে মাসে মধ্য-প্রাচী এবং দক্ষিণ-এশিয়ার বারটি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মধ্য-প্রাচী এবং দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলি পরিদর্শন করিতে আসেন নাই। শুধু এই জন্যই যে মিঃ ডুলেসের তিন সপ্তাহব্যাপী এই পরিভ্রমণ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে তাহা অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, মিঃ ডুলেসের মধ্য-প্রাচী এবং ভারত-পাকিস্থান পরিক্রমা তাহারই দ্যোতক, একথা মনে করিলে ভুল হইবে না। ইতিপূর্ব্বে এই অঞ্চলে বৃটেনেরই ছিল পূর্ণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি। পৃথিবীর যে-সকল দেশকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন বিশ্ব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই স্বাধীন বিশ্বের একমাত্র শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। কাজেই এত দিন যে-সকল অঞ্চল বৃটেনের প্রভাবাধীন ছিল সেখানেও মার্কিণ প্রভাব অনুপ্রবেশ করিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। এই তথাকথিত স্বাধীন বিশ্বের নেতৃদেশের প্রতিনিধিরূপেই মিঃ ডুলেস মধ্য-প্রাচী এবং ভারত-পাকিস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। এই পরিদর্শনের যে বিশেষ প্রয়োজনও হইয়া পড়িয়াছিল, একথাও অনস্বীকার্য্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন বিশ্বের সম্প্রসারণের মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে যে-সকল দেশে কম্যুনিষ্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলিকে কম্যুনিষ্টদের কবল হইতে মুক্ত করা আবশ্যক। সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের কবলে চলিয়া যাওয়ায় সমস্যা আরও গুরুতর হইয়াছে। উত্তর-কোরিয়াতেও কম্যুনিষ্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি অতি দ্রুত কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করিত, তাহা হইলে গোটা কোরিয়াতেই কম্যুনিষ্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত। ইহার পর আছে ইন্দোচীনে ও মালয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামও যে কম্যুনিষ্টদের কারসাজি, সে-সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোন সন্দেহ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে স্বাধীন বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে এশিয়ার গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। কারণ এই দেশগুলি হইতে কম্যুনিষ্টদের প্রতিপত্তি উচ্ছেদ করিতে না পারিলে, ইউরোপ হইতে কম্যুনিজম উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। এই জন্যই এশিয়ার গুরুত্বকে কতক পরিমাণে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। এইখানেই মিঃ ডুলেসের প্রাচী পরিক্রমার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য।

মিঃ ডুলেস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব হওয়ার পূর্ব্বে হইতেই মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যখন ডেমোক্রাটিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল তখনও রিপাবলিকান মিঃ ডুলেস পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরামর্শ দিয়াছেন। জাপ শান্তি-চুক্তির সর্ত্তাবলীর রচয়িতাও তিনিই। কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে মিঃ ডুলেস কোরিয়া পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সোভিয়েট শিবিরের বিরুদ্ধে স্বাধীন বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে নিরাপত্তা-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি অবিচ্ছেদে জোর দিয়া আসিতেছেন। এশিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের পথে প্রধান সমস্যা কি এবং উহার সমাধানের জন্য কি প্রয়োজন, সে-সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা সুস্পষ্ট। এশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিজেরা বিব্রত বোধ না করিলেও তাহারা যে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে তাহারা যথেষ্ট সচেতন না হইয়া পারে নাই। তাহাদের সামরিক শক্তির একটা বৃহৎ অংশ এশিয়ার সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে। অথচ সোভিয়েট রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর একটি সৈন্যও কোথাও যুদ্ধ করিতেছে না। তাহার সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহাতে পশ্চিমী শক্তিবর্গ, বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হইয়া পারে নাই। তাছাড়া কম্যুনিষ্টরাও পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এশিয়ায় প্রচারকার্য্যের মস্ত একটা সুযোগ পাইয়াছে, ইহাও মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কদের ধারণা। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সৈন্যরা এশিয়াবাসীকে হত্যা করিতেছে, এশিয়াবাসীরা তাহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছে। ইহার জন্য কাহারও প্রচারকার্য্য অনাবশ্যক। মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কদের বিশ্বাস, কম্যুনিষ্টরা ইহার সুযোগ লইয়া এশিয়ায় শান্তি স্থাপন করিতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহারা আরও মনে করেন যে, মার্কিণ সামরিক শক্তির একটা বিশিষ্ট অংশ এশিয়ার যুদ্ধে নিয়োজিত থাকে ইহাই কম্যুনিষ্টরা চায়। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর লড়াইয়ের ধ্বনি তুলিয়াছেন। এই ধ্বনির প্রধান তাৎপর্য্য এই যে, এশিয়ায় যে সকল খণ্ড-যুদ্ধ চলিতেছে তাহা হইতে মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী সৈন্য সরাইয়া লইয়া তাহাদের স্থানে স্থানীয় সৈন্য নিয়োগ করিতে হইবে। গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫৩) মিঃ ইডেন এবং মিঃ বাটলার যখন ওয়াশিংটনে গিয়াছিলেন তখন মিঃ ইডেনও প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের এই নীতিতে রাজী হইয়াছেন। উহারই তিন সপ্তাহ পরে ওয়াশিংটনে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত তদানীন্তন ফরাসী প্রধান মন্ত্রী রেনে মেয়ারের আলোচনা হয়। তখন প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহার

যখনই হোক... যেখানেই হোক...
ব্রুক বণ্ড চা
Darjeeling
Brooke Bond Tea
Blend
Brooke Bond Tea
বাগান থেকে সদ্য আসে তাই এত তাজা
92/BB
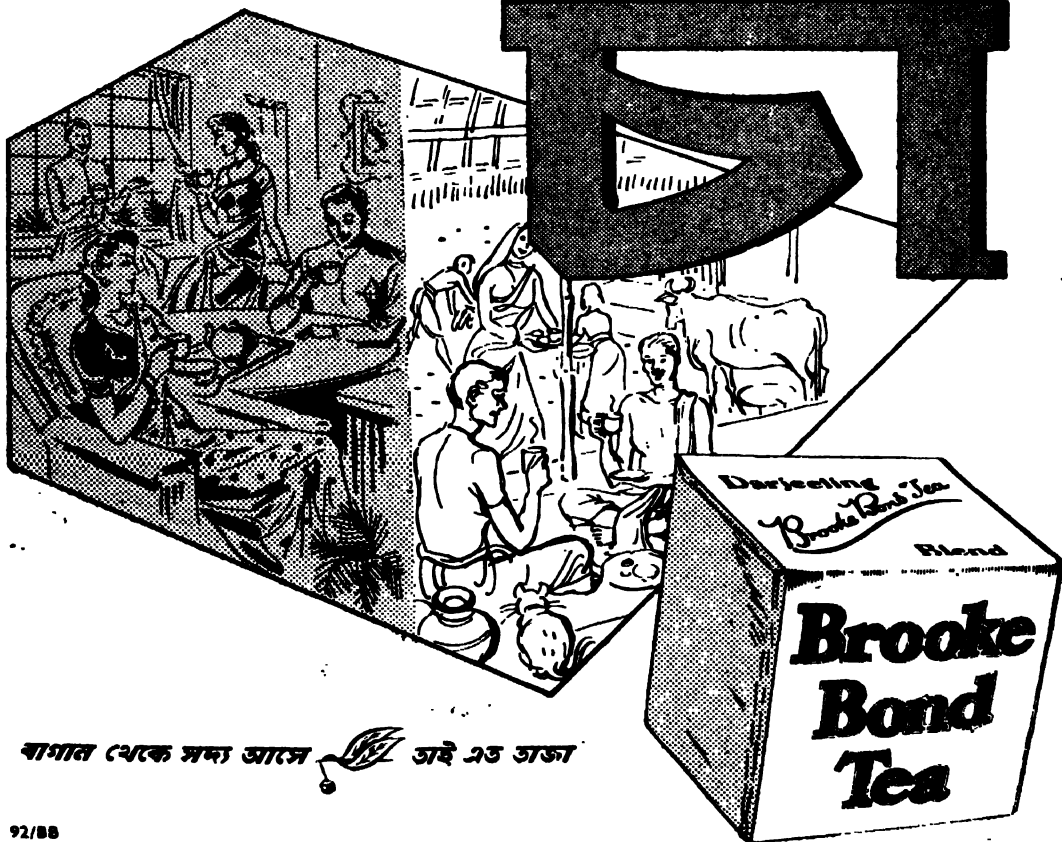
জানাইয়াছিলেন যে, ইন্দোচীনে এশিয়াবাসীর সহিত এশিয়াবাসীর লড়াইয়ের নীতি কার্য্যকরী করার জন্য আগামী বৎসর তিনি ফ্রান্সকে ৩০ কোটি ডলার সাহায্য দিতে রাজী আছেন।

এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর লড়াইয়ের নীতি মুখে বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। এশিয়াবাসীর সহিত এশিয়াবাসীর লড়াইয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে কে, এই প্রশ্নও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়াবাসীর মনে স্বাধীনতার জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহাতে শুধু টাকার লোভে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এশিয়ার সৈন্যরা এশিয়াসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, এতখানি দুরাশা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও করে না। হয়ত শুধু সৈন্য পাওয়া যাইতেও পারে, কিন্তু না পাওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি পাইলেও স্থানীয় সৈন্যের স্থান তাহাতে পূরণ হইবে না। এই জন্য প্রয়োজন এশিয়াবাসীর নেতৃত্ব। ১৯৫০ সালে মিঃ ডুলেস একজন সিনেটার হিসাবে নিউইয়র্কে এক বক্তৃতায় এইরূপ নেতৃত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার যে-বিবরণ 'নিউইয়র্ক টাইমসে' প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যায়:—"Lest efforts of the United States against Communism in China be misunderstood as imperialism……Dulles recommended that the leadership in battle to check Communist expansion in the Far East be furnished by those in region who have a stake in the struggle." অর্থাৎ 'চীনে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যকলাপকে লোকে পাছে সাম্রাজ্যবাদ বলিয়া ভুল বুঝে এই জন্য ডুলেস এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, সুদূর-প্রাচ্যে কম্যুনিজমের সম্প্রসারণের নিরোধের সংগ্রামে যে অঞ্চলের দায়িত্ব রহিয়াছে সেই অঞ্চলকেই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব যোগাইতে হইবে।' সুতরাং একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর লড়াইয়ের যে ধ্বনি প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তুলিয়াছেন তাহার বীজ মিঃ ডুলেসের উল্লিখিত উক্তির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার উল্লিখিত উক্তির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মিঃ ডুলেসের প্রাচী-পরিক্রমার গুরুত্ব বুঝিতে ভুল হইবার কোন কারণ নাই।

মধ্য-প্রাচীতে মিশরের এবং দক্ষিণ-এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের ভূমিকার গুরুত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উপেক্ষা করিতে পারে না। সামরিক দিক হইতে কম্যুনিষ্ট চীন যেরূপ দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে তাহাতে উহার সামরিক শক্তি প্রায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর দিক হইতে চীন এখনও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেও চীনের বিমানবাহিনীও দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে। অথচ সামরিক দিক হইতে জাপানের চীনের সমকক্ষ হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফরমোসাস্থিত কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে শক্তিশালী করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহার উপর ভরসা করিতে পারিতেছে না। দক্ষিণ-কোরিয়ায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু অফিসারের অভাব আছে। তাহাড়া বিধ্বস্ত দক্ষিণ-কোরিয়ার পক্ষে এই সৈন্যবাহিনী পোষণ করা সম্ভব হইবে না, যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দরাজ' হস্তে সাহায্য না করে। ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ডে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মদেশ নিজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা লইয়াই বিব্রত। ইন্দোনেশিয়ার অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। ইন্দোচীনে বাও দাইয়ের জন্য সৈন্যবাহিনী গঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা কুয়োমিণ্টাং সৈন্যের মত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। বাকী শুধু ভারত ও পাকিস্তান। তন্মধ্যে ভারত আবার আধা-নিরপেক্ষ। ভারতের এই আধা-নিরপেক্ষতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে না। কাজেই সামরিক দিক হইতে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে ভারত, পাকিস্তান এবং মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিকে বেশ ভাল ভাবে স্বপক্ষে আনা দরকার। অর্থাৎ এশিয়ায় যে রাজনৈতিক বিপ্লব চলিতেছে তাহার প্রতিবিধান না করিতে পারিলে এশিয়ায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের অনুকূলে কম্যুনিজম-বিরোধী সামরিক শক্তি গড়িয়া তোলা অসম্ভব। মিঃ ডুলেস এই উদ্দেশ্যেই মধ্য-প্রাচী ও দক্ষিণ-এশিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য কতটুকু সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। একমাত্র কার্য্যক্ষেত্রেই আমরা তাহার পরিচয় পাইব। তবে কিছু কিছু অনুমান করা একেবারে অসম্ভব নয়।

ভ্রমণ শেষ করিয়া ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই গত ২১শে মে মিঃ ডুলেস এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, মধ্য-প্রাচী এবং দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলির সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বন্ধুত্বের নূতন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মধ্য-প্রাচী ও দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলি বলিতে এই সকল দেশের শাসক-শ্রেণীকেই যে তিনি বুঝাইয়াছেন, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কারণ, গত ২রা জুন (১৯৫৩) বেতার ও টেলিভিশন মারফৎ তিনি তাঁহার মধ্য-প্রাচী এবং দক্ষিণ-এশিয়া সফরের যে-অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল দেশের জনসাধারণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেও সন্দেহের চক্ষে দেখে। যাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহার সহিত তাহারা সাগ্রহে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কেন সন্দেহের চক্ষে দেখে সে-সম্বন্ধে মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন, "এই সকল দেশের লোক ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি সম্পর্কে খুবই সন্দিহান। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও তাহারা সন্দেহ পোষণ করে, কারণ, তাহারা মনে করে, উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তিতে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া উহাদের উপনিবেশগুলি রক্ষার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিয়াছি।" ইহা শুধু তাহাদের ধারণা নয়, তাহারা প্রত্যক্ষই দেখিতেছে, ইন্দোচীনে, টিউনিশিয়ায় ফ্রান্সের সাম্রাজ্য এবং মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর সাহায্য দিতেছে। শুধু যে এই একটি কারণেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের সন্দেহ, তাহাও নয়। এশিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় রহিয়াছে, তাহাও তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। এমন কি, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পর্য্যন্ত আশঙ্কা করিতেছে যে, আমেরিকা তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই আশঙ্কার জন্যই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মৈত্রীর অন্তরালে গভীর সন্দেহ লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই দুইটি কারণ ছাড়াও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার

অলঙ্কারে বৈশিষ্ট্য
ফোন-এভিনিউ. ১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও
বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল) আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীত দিকে
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ: ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা : ফোন পি. কে. ৪৪৬১

আরও একটা কারণ রহিয়াছে। মধ্য-প্রাচী ও এশিয়ার দেশগুলিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জনস্বার্থের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকেই সাহায্য দ্বারা পুষ্ট ও শক্তিশালী করিতেছে। চিয়াং কাইশেক এবং দক্ষিণ-কোরিয়ার সিংম্যান রী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা অনাবশ্যক। চীনের যে ৪৫ কোটি অধিবাসী আমেরিকার বন্ধু বলিয়া পরিগণিত ছিল তাহারা কম্যুনিষ্টদের কবলে পড়ায় মিঃ ডুলেস বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া আমরাও বড় কম বিস্মিত হই নাই। চীনের ৪৫ কোটি লোক আমেরিকার বন্ধু ছিল কি না, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু চিয়াং কাইশেক যে আমেরিকার বন্ধু, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিয়াং কাইশেককে বিতাড়িত করিয়া চীনা কম্যুনিষ্টরা সমগ্র চীনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহা যে নিছক সামরিক বিজয়ের ফল নহে, তাহা মিঃ ডুলেসের অজানা থাকিবার কোন কারণ নাই। চীনের গৃহযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও যাঁহাদের আছে তাঁহারাও জানেন যে, চীনের ৪৫ কোটি জনগণের সমর্থনই চীনে কম্যুনিষ্ট বিজয়ের প্রধানতম কারণ। চীনে কম্যুনিষ্টদের আধিপত্যের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন, "নিকট-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-এশিয়াতেও এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের এ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে।" কিন্তু কি ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সচেতন হইবে?

মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন, "যুদ্ধের পরবর্ত্তী আমলে আমাদের দৃষ্টি ছিল প্রধানতঃ পশ্চিম-ইউরোপের দিকে। ঐ অঞ্চলের গুরুত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু উহাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিকট-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-এশিয়ার দিকেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে।" এই দৃষ্টি দিবার তাৎপর্য্য কি, মিঃ ডুলেস তাহাও বলিয়াছেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, নিকট-প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অধিকাংশ লোকই নিজেদের এবং অন্যান্যদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্‌গ্রীব। তাহাদিগকে এই স্বাধীনতা তিনি দিতে চান পশ্চিমী শক্তিবর্গের ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে। তিনি বলিয়াছেন, "However, without breaking from the framework of Western unity, we can pursue our traditional dedication to political liberty." নিকট-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-এশিয়ার অধিবাসীদিগকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের অধীনে তিনি স্বাধীনতা দিতে চান। এইরূপ স্বাধীনতা তাহারা পছন্দ করিবে কি না, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। কারণ, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ঐক্য রক্ষা করিতে গেলে উহা ছাড়া আর পথ নাই। অন্যথায় বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে। আমেরিকা তো তাহা চায়ই না; মিঃ ডুলেস জানাইয়াছেন, মধ্য-প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলির নেতৃবর্গও তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, এইরূপ বিচ্ছেদ ভয়ানক বিপজ্জনক হইবে। এই নেতৃবর্গ কাহারা তাহা প্রকাশ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্য বহাল থাকিবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হইবে, আবার এশিয়ার জনগণেরও জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে, এমন সব দিক বজায় রাখিবার মত সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণজনক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। এশিয়ার জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ঊর্দ্ধ আকাশ হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্যেন-দৃষ্টি কোথায় পড়িয়াছে, মিঃ ডুলেস তাহা গোপন রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের কল্যাণের দিক হইতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ্ তৈল, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম, অভ্র এবং অন্যান্য খনিজ দ্রব্যাদি এই সকল অঞ্চলে পাওয়া যায়। আর বিশ্বের তৈল-সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগই রহিয়াছে নিকট-প্রাচ্যে।" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যদি কল্যাণ হয়, তাহা হইলে বিশ্বের জনগণের কল্যাণ হওয়ার আর বাকী রহিল কি? সুতরাং আসলে যাহা দাঁড়াইতেছে তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজোড়া জনকল্যাণ সাম্রাজ্য (Welfare Imperialism) প্রতিষ্ঠা। যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদের রূপ বদলাইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি তাহার সাম্রাজ্যকে জনকল্যাণের রূপ দেয়, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ইহাই আমেরিকার দৃষ্টিতে স্বাধীন বিশ্বের রূপ। বন্ধুত্ব লাভ, সাহায্য দান, অনুন্নত অঞ্চলগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি শ্রুতিমধুর কথার অন্তরালে নিকট-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলির উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার যে কারণটি মিঃ ডুলেস জানাইয়াছেন, তাহাতে এশিয়ার জনগণ যে আনন্দে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই অঞ্চলের জনগণের কোন প্রয়োজন তো আমেরিকার নাই। শাসকশ্রেণীর সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব পাইলেই যথেষ্ট। এই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবার জন্যই মিঃ ডুলেস মধ্য-প্রাচী ও দক্ষিণ-এশিয়ায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কতকটা নিশ্চিত যে তিনি হইয়াছেন তাহাতেও বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এশিয়ার জনগণের সন্দেহ যে দূর হইবে না, সে-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মনেও বোধ হয় সন্দেহ আছে। বোধ হয় এই জন্যই মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থা অবিলম্বেই সম্ভব বলিয়া তিনি মনে করিতে পারিতেছেন না। উহাকে তিনি ভবিষ্যতের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।

মধ্য-প্রাচী এবং দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলির শাসকশ্রেণী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য-পুষ্ট হইয়া জনগণকে সামলাইতে পারিবে, ইহাই মিঃ ডুলেসের একমাত্র ভরসা। তিনি ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্রে, না, পুলিশী রাষ্ট্রে অধিকতর জনকল্যাণ সাধন করা সম্ভব তাহা লইয়া ভারত ও চীনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে। তাঁহার ভরসা এই যে, এই প্রতিযোগিতায় ভারত জয়লাভ করিলে উহার ফলে সমগ্র মানব জাতির সুবিধা তো হইবেই, আমেরিকারও হইবে। আমেরিকার কি সুবিধা তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এই সুবিধার জন্য ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য আমেরিকা সাহায্য করিতেছে। পাকিস্তানকে তিনি বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলিয়া তোয়াজ করিয়াছেন এবং পাকিস্তানের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং সামরিক শক্তিকে তিনি কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রাকার বলিয়া মনে করেন। এই ধরণের প্রশংসায় শাসকশ্রেণী

মুক্ত হইলেও জনগণের মনের সন্দেহ দূর হইবে না। বরং যে-ধরণের বন্ধুত্বের কথা, সাহায্য দানের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহাতে তাহাদের মনে আরও গভীর আশঙ্কা জাগ্রত হইবে। কম্যুনিজমের ভয় দেখাইয়া স্বাধীনতার দাবীকে দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। চিয়াং কাইশেককে আমেরিকা প্রচুর সাহায্য দিয়াও চীনের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিতে পারে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে না নামিলে সিংম্যান রীর অস্তিত্বও থাকিত না। গত ২২শে মে নয়া দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ ডুলেস বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় গণতন্ত্রের পরীক্ষা সুরু করিয়াছিল। এই পরীক্ষার ফল কি দাঁড়াইয়াছে তাহাই তিনি শুধু বলেন নাই। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলে গণতন্ত্রের যে-দানব সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মার্কিণ তাঁবেদারী গণতন্ত্র সম্বন্ধে এশিয়াবাসী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই দক্ষিণ-কোরিয়ায় সিংম্যান রীর শাসনকে গণতন্ত্রের বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করিয়া এশিয়াবাসীকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হইবে না। মালয়, কেনিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা যে-স্বাধীন বিশ্বের বিজ্ঞাপন, সেই স্বাধীন বিশ্বের প্রতি এশিয়াবাসীর লোভ হইবারও কোন কারণ নাই। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে মিঃ ডুলেস যে-স্বাধীনতা, জীবিকা-নির্ব্বাহের মানের উন্নতি বিধান করিতে চান, এশিয়াবাসী তাহাকে ভয়ের চক্ষেই দেখে। তথাপি মিঃ ডুলেসের এই সফর ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই সফরের ফলে মধ্য-প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-এশিয়ার শাসক-শ্রেণীকে তিনি তাঁহার দলে ভিড়াইতে পারিয়াছেন, এইরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তাহাতে এশিয়াবাসীর সহিত এশিয়াবাসীকে লড়াইয়ে লাগাইয়া দেওয়ার কতটা সুবিধা হইবে তাহা বলা কঠিন।

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি কি সত্যই আসন্ন ?—

গত ৮ই জুন (১৯৫৩) পানমুনজনে যুদ্ধবন্দী বিনিময় সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বন্দীবিনিময় সমস্যাই ছিল কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের পথে সর্ব্বশেষ প্রধান বাধা। বন্দী-বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এই বাধা অপসারিত হইয়াছে। অতঃপর যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হইয়া কোরিয়া যুদ্ধের অবসান সত্যই নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছে, অনেকেই এই আশা পোষণ করিতেছেন। বন্দীবিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এখন রহিয়াছে শুধু পরিচালনগত সামান্য ব্যাপার সম্পর্কে ব্যবস্থা (minor administrative arrangement) করা। এইটুকু হইলেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হইয়া কোরিয়া যুদ্ধের অবসান হইতে পারে। কিন্তু প্রায় দুই বৎসরব্যাপী যুদ্ধবিরতি আলোচনার ইতিহাস আলোচনা করিলে এই পরিচালনগত সামান্য ব্যাপারই যে যুদ্ধবিরতির পথে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করিবে না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। বিশেষতঃ দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিংম্যান রী যে রকম হুমকী দিতেছেন, তাহার অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য্যও এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক। কোরিয়া যুদ্ধ এবার সত্যই শেষ হইতে চলিতেছে কি না, এ-সম্পর্কে আলোচনার পূর্ব্বে যুদ্ধবিরতির আলোচনা যে-ভাবে বাধার পর বাধা, অচল অবস্থার পর অচল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, অবশেষে কিরূপে বন্দী-বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইল, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার এক বৎসর পর ১৯৫১ সালের ১০ই জুলাই কায়েসাংয়ে যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনার এক রকম সুরু হইতেই অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। ছোটখাটো সঙ্কট সম্পর্কে উল্লেখ করিবার স্থানও আমরা এখানে পাইব না। সর্ব্বপ্রথম বড় রকম অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় 'বাফার' বা অসামরিক অঞ্চল গঠনের প্রশ্ন লইয়া। অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, আলোচনা ফাঁসিয়া যাইবার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছিল। অতঃপর ১০ই আগষ্ট (১৯৫১) আলোচনা আরম্ভ হইয়াও ২৩শে আগষ্ট আবার আর এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ অচল অবস্থার পর ১০ই অক্টোবর পানমুনজনে পুনরায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনার স্থান পরিবর্ত্তনেও সঙ্কটের অবসান হয় নাই। বাফার বা অসামরিক অঞ্চল গঠন সম্পর্কে একটা মীমাংসা হইলেও বিমান ঘাঁটি মেরামত, পরিদর্শক-মণ্ডলীতে রাশিয়াকে গ্রহণ এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময় লইয়া সঙ্কট অবস্থা চলিতে থাকে। অবশেষে প্রথমোক্ত দুই সমস্যার সমাধান হয় বটে, কিন্তু বন্দীবিনিময় সমস্যাই হইয়া উঠে দুর্লঙ্ঘ্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ১১ই ডিসেম্বর (১৯৫১) এক-এক জন বন্দীর পরিবর্ত্তে এক-এক জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব উপাপন করা হয়। কম্যুনিষ্টরা উভয় পক্ষের সমস্ত বন্দীকেই মুক্তি দেওয়ার দাবী করে। ১৯৫২ সালের ৮ই জানুয়ারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে উল্লিখিত প্রস্তাবকেই রকমফের করিয়া উপাপন করা হয়। উহাতে বলা হয়, এক-এক জন বন্দীর পরিবর্ত্তে এক-এক জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার পর যে-সকল কম্যুনিষ্ট বন্দী অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের মধ্যে যাহারা দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিবে শুধু তাহাদিগকেই মুক্তি দেওয়া হইবে। এই ভাবে অনিচ্ছুক বন্দীর সমস্যা সৃষ্টি করা হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে কোজে দ্বীপের মার্কিণ বন্দী-শিবিরে চীনা ও উত্তর-কোরীয় বন্দীদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার চলে এবং উত্তর-কোরিয়ায় এবং চীনের কতগুলি অঞ্চলে রোগবীজাণুদুষ্ট কীটপতঙ্গাদি বর্ষণ করিয়া বীজাণু-যুদ্ধ চালান হয়, তাহার উল্লেখ মাত্র করাই এখানে সম্ভব।

বন্দীবিনিময়ের প্রশ্ন লইয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনায় সঙ্কট চরমে উঠে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে। ৮ই অক্টোবর যুদ্ধবিরতির আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর আবার যে-যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হইবে, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই ছিল না। বন্দী-বিনিময় সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের প্রস্তাব ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইলেও রাশিয়া ও চীন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। এই অবস্থায় গত ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ সমরাধিনায়ক জেঃ মার্ক ক্লার্ক পীড়িত ও আহত বন্দীদের মুক্তির জন্য উত্তর-কোরিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীনের নিকট এক প্রস্তাব উপাপন করেন। কম্যুনিষ্ট পক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী হয় এবং ৬ই এপ্রিল (১৯৫৩) পানমুনজনে আহত ও পীড়িত বন্দীদের বিনিময়ের

আলোচনা আরম্ভ হয়। আহত ও পীড়িত বন্দীবিনিময় সংক্রান্ত চুক্তিটি উভয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরেই কম্যুনিষ্ট পক্ষ হইতে পূর্ণ শান্তি-চুক্তির আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করার প্রস্তাব করা হয়। ২০শে এপ্রিল ('১৯৫৩) পীড়িত ও আহত বন্দীবিনিময়ের কাজ আরম্ভ হইয়া ২৬শে এপ্রিল উহা শেষ হয় এবং ঐ দিনই আরম্ভ হয় পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতির আলোচনা। একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধবিরতির জন্য প্রজাতন্ত্রী চীন এবং উত্তর-কোরিয়ার আন্তরিক আগ্রহের জন্যই এই আলোচনা আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের আন্তরিকতার জন্যই বন্দীবিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

'অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদিগকে জোর করিয়া ফেরৎ দেওয়া হইবে না'—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবী মানিয়া লইয়াই কম্যুনিষ্ট পক্ষ ২৬শে এপ্রিল নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করে। তাঁহাদের প্রস্তাবের মূল কথা ছিল এই যে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক বন্দীদিগকে অবিলম্বে ছয় মাসের জন্য একটি নিরপেক্ষ দেশে প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই সময়ের মধ্যে তাহাদের মনোভাব নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু কোন্ দেশ নিরপেক্ষ, ইহা লইয়াই শুধু সমস্যা দাঁড়ায় নাই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সুইজারল্যাণ্ডের নাম করিলেও বন্দীদিগকে কোরিয়ার বাহিরে প্রেরণ করিতে অস্বীকার করে। এশিয়ায় বহু দেশ নিরপেক্ষ থাকিতে সুইজারল্যাণ্ডই একমাত্র নিরপেক্ষ দেশ বলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গণ্য হইল কেন, তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। অতঃপর ২৯শে এপ্রিলের আলোচনা-বৈঠকে কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিগণ জানান যে, অনিচ্ছুক বন্দীদিগকে এশিয়ার কোন নিরপেক্ষ দেশে প্রেরণের তাঁহারা পক্ষপাতী। ঐ দিনের যুদ্ধবিরতির আলোচনার শেষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান আলোচনাকারী লেঃ জেঃ হ্যারিসন বলেন যে, "অনিচ্ছুক বন্দীদিগকে নিরপেক্ষ দেশে প্রেরণ করিতে কোন কোন বন্দীর উপর বলপ্রয়োগ করা হইতে পারে, কম্যুনিষ্টরা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন না।" মার্কিণ-আশ্রয়ের প্রতি চীনা ও উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীদের প্রবল অনুরাগ অবিশ্বাস্যরূপেই বিস্ময়কর বলিয়াই কি মনে হয় না? অতঃপর ৩০শে এপ্রিল তারিখের যুদ্ধবিরতি আলোচনা বৈঠকে লেঃ জেঃ হ্যারিসন কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিদিগকে জানাইয়া দেন যে, অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এশিয়ার কোন দেশের নিয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। বন্দী-বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে এইরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করিবার দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধা কেন পাইল, এশিয়াবাসীর তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। অতঃপর ৫ই মে লেঃ জেঃ হ্যারিসন কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিদিগকে জানাইয়া দেন যে, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে অনিচ্ছুক যুদ্ধবন্দীদিগকে নিরপেক্ষ দেশে পাঠাইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ রাজী হইবে না। বন্দীদের স্বদেশে ফিরিতে অনিচ্ছার প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কাই যে রাজী না হইবার কারণ তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

৬ই মে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তাহার সারমর্ম্ম এই যে, যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরেই সমস্ত কোরীয় বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে এবং তাহাদের কোরিয়ার যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই বাস করিতে দিতে হইবে। অনিচ্ছুক বন্দীদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না, কম্যুনিষ্ট পক্ষ এই নীতি মানিয়া লওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে-বিব্রত অবস্থায় পতিত হয়, তাহা এড়াইবার জন্যই যে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কম্যুনিষ্ট পক্ষ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ৭ই মে উত্থাপন করে আট দফা-সমন্বিত এক নূতন প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করিয়া তাহাদের হেফাজাতে অনিচ্ছুক বন্দীদিগকে রাখার দাবী করা হইয়াছে। ভারত, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনকে লইয়া এই নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১৩ই মে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এক পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এই প্রস্তাবে কতগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া কম্যুনিষ্টদের আট দফা-সমন্বিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কম্যুনিষ্টদের প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ পঞ্চ-শক্তির কমিশনকে মানিয়া লওয়া হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, এই কমিশনগুলি চীনা বন্দীদের দায়িত্বই গ্রহণ করিবে, কোরীয় বন্দীরা এই কমিশনের হেফাজাতে যাইবে না। তাহাদিগকে যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরেই অসামরিক ব্যক্তিরূপে মুক্তি দিতে হইবে। তাছাড়া আরও প্রস্তাব করা হয় যে, এই নিরপেক্ষ কমিশনের চেয়ারম্যান হইবে ভারত এবং প্রয়োজনীয় সশস্ত্র সৈন্যও ভারতই সরবরাহ করিবে। কম্যুনিষ্ট পক্ষ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। উহা অগ্রাহ্য করিবার প্রধান কারণ এই যে, উত্তর-কোরীয় বন্দীদিগকে জোর করিয়া রাখিয়া দিতে যদি ইচ্ছা নাই থাকিবে, তবে তাহাদিগকে নিরপেক্ষ কমিশনের হেফাজাতে রাখিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির আর কি কারণ থাকিতে পারে? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই নূতন প্রস্তাব যে তাহাদের পূর্ব প্রস্তাবের বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্কিণ প্রতিনিধি আলোচনা বন্ধের হুমকী দিতেও ত্রুটি করেন নাই। এদিকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুজী কম্যুনিষ্টদের প্রস্তাবকে কার্য্যতঃ একরূপ সমর্থন করেন। অবশেষে এই ভাবে কোণঠাসা হইয়া মার্কিণ প্রতিনিধি ২৫শে মে এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব সরকারী ভাবে প্রকাশ করা না হইলেও চার্চ্চিল ও নেহরু উহা সমর্থন করেন। অবশেষে যে ভাবে মীমাংসা হইয়াছে তাহাই শুধু এখানে উল্লেখযোগ্য।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্টদের নিরপেক্ষ পঞ্চ-রাষ্ট্রের কমিশনের দাবী মানিয়া লইয়াছে। ভারত এই কমিশনের চেয়ারম্যান হইবে এবং ভারতীয় সৈন্যরা বন্দীদিগকে পাহারা দিবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবী কম্যুনিষ্টরা মানিয়া লইয়াছে। চীনা বন্দী ও কোরীয় বন্দীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইবে না, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্টদের এই দাবী স্বীকার করিয়াছে। অনিচ্ছুক বন্দীদিগকে বুঝাইয়া-পড়াইয়া মত-পরিবর্ত্তনের সময় সম্বন্ধে আপোষ মীমাংসা হইয়া স্থির হইয়াছে যে, মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টার কাল ৯০ দিন হইবে। কম্যুনিষ্টরা প্রথমে দাবী করিয়াছিল যে, অনিচ্ছুক বন্দীদের প্রশ্ন যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তী রাজনৈতিক সম্মেলনে মীমাংসিত হইবে। উহার জন্য সময়ের কোন সীমারেখা নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দাবী করিয়াছিল যে, যুদ্ধবিরতির পরেই তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। অবশেষে এইরূপ মীমাংসা হইয়াছে যে, অনিচ্ছুক

দের প্রশ্ন রাজনৈতিক সম্মেলনেই স্থির করা হইবে বটে, কিন্তু দিনের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব না হইলে তাহারা স্বতঃই মুক্তি লাভ করিয়া অসামরিক মর্য্যাদা লাভ করিবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে অন্যত্র পাঠাইবারও ব্যবস্থা করা হইবে।

বন্দীবিনিময়ের সমস্যার সমাধান হওয়ায় অনেকেই আশা করিতেছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হইবে। এই আশা সফল হওয়ার মত আনন্দের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পথে বাধা এখনও বড় কম নয়। প্রথম সমস্যাই দেখা দিবে যুদ্ধবিরতির সীমারেখা নির্দ্ধারণ লইয়া। অনেকে মনে করেন, এ-সম্পর্কে একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারী ভাবে এ সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই। এদিকে দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রী যে-আস্ফালন আরম্ভ করিয়াছেন তাহা শুধু হাস্য-রস সঞ্চয় করিবার জন্যই, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি সমগ্র দক্ষিণ-কোরিয়ায় সামরিক আইন জারী করিয়াছেন, সৈন্যদের ছুটি বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং একাই উত্তর-কোরিয়া আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চিয়াং কাইশেককে চীন আক্রমণের নির্দ্দেশ দিবার ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারত তাঁহার দৃষ্টিতে কম্যুনিষ্ট-ঘেঁষা। দক্ষিণ-কোরিয়া জাতীয় পরিষদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার হুমকী পর্য্যন্ত দিয়াছেন। আসন্ন যুদ্ধবিরতির বিরুদ্ধে সিংম্যান রী যে প্রবল আক্রোশে ফাটিয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্যহীন নয়। তাঁহার গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি যুদ্ধবিরতি আলোচনা বয়কট করিয়াছেন। স্বয়ং সিংম্যান রী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কাঁদাকাটি করিয়া মাটি ভিজাইয়াই জানাইয়াছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দক্ষিণ-কোরিয়ার সহিত পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি করিতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে রাজী না হইলে, দক্ষিণ-কোরিয়াকে একাই ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনে যুদ্ধ করিতে দিতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে না নামিলে সিংম্যান রী এত দিন কোথায় থাকিতেন তাহার ঠিক নাই। তাঁহার পক্ষে এইরূপ হাস্যকর নর্ত্তন-কুর্দ্দনের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গভীর উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, মনে করিলে ভুল হইবে কি? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাকে যেরূপ চাহিতেছেন তিনি সেইরূপই বলিতেছেন। যাঁহারা বিনা প্রমাণেই বিশ্বাস করেন যে, উত্তর-কোরিয়াই দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ করিয়াছে, তাঁহারাও সিংম্যান রীর আস্ফালনে সন্দেহ না করিয়া পারিবেন না, দক্ষিণ-কোরিয়াই বোধ হয় প্রথমে উত্তর-কোরিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সিংম্যান রীকে তুষ্ট করিবার জন্য পত্র লিখিয়া যে-আশ্বাস দিয়াছেন তাহাতে সিংম্যান রীর এই আস্ফালনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, দক্ষিণ-কোরিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনের এক জন সদস্য হইবে। এইরূপ আশ্বাস দেওয়ার তাঁহার কি অধিকার আছে? তিনি দক্ষিণ-কোরিয়ার সহিত পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি করিবার আশ্বাসও দিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ আশ্বাসের উদ্দেশ্য হয় যুদ্ধবিরতি আলোচনা বানচাল করিয়া দেওয়া, না হয় ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনে প্রবল বাধা সৃষ্টি করা। এই প্রসঙ্গে আমাদের ইহাও মনে না পড়িয়া পারে না যে, কোরিয়া যুদ্ধে শুধু দক্ষিণ-কোরিয়াতেই নয় উত্তর-কোরিয়ার যে অঞ্চল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দখল করিয়াছিল, সেখানেও পুনরায় সিংম্যান রীর শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠিত হইলেও আবার সিংম্যান রীর শাসনই প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা ভরসা করা সিংম্যান রীর পক্ষেও হয়ত কঠিন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তিতে উত্তর-কোরিয়া জয় করিয়া ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের উপরেই সিংম্যান রীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, একথাই হয়ত ঠিক। ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্র হউক ইহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও চায়। কোরিয়া যদি আরও অনেক দিন বিভক্তও থাকে, তাহা হইলেও যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কোরিয়ায় পৃথিবীর ১৯টি দেশ সৈন্য, বৈমানিক ও নাবিক পাঠাইয়া উত্তর-কোরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ২৩টি দেশ দক্ষিণ-কোরিয়ায় মেডিক্যাল মিশন পাঠাইয়াছে এবং দক্ষিণ-কোরিয়াকে উপকরণাদি দিয়া সাহায্য করিতেছে। তথাপি তিন বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিতেছে এবং সামরিক শক্তি দ্বারা মীমাংসা করিতে গেলে কবে যে এই যুদ্ধের শেষ হইবে, তাহা বলা কঠিন। এই যুদ্ধকে আরও ব্যাপক করিতে গেলে তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কোরিয়া যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সৈন্য দিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। মোট আড়াই লক্ষ মার্কিণ সৈন্য কোরিয়ায় যুদ্ধ করিতেছে। তন্মধ্যে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬০২ জন। মোট ২৪,১৬৬ জন সৈন্য নিহত হইয়াছে। নিখোঁজের সংখ্যা ১১,৩৩৮ জন। বৃটিশ কমনওয়েলথের মোট ২০ হাজার সৈন্য কোরিয়ায় যুদ্ধ করিতেছে। তাহাদের হতাহতের সংখ্যা ৮ হাজার। অন্যান্য দেশের ৯৭৪৯ জন কোরিয়া যুদ্ধে হতাহত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিহতের সংখ্যা ১৯৮৫ জন। যুদ্ধের প্রারম্ভে দক্ষিণ-কোরিয়ার সৈন্য-সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। এখন উহা বাড়িয়া ৪,৫০,০০০ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কোরিয়া যুদ্ধে প্রতি বৎসর ৩০০ কোটি ডলার মূল্যের গোলাগুলী ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার কি মূল্য দিতে হইতেছে উল্লিখিত বিবরণ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত কোরিয়ার যে কি বিপুল ক্ষতি হইয়াছে তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। ২ কোটি ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১০ লক্ষ অসামরিক লোক নিহত হইয়াছে। বাসগৃহ ধ্বংস হইয়াছে ৪ লক্ষ। যে সকল কলকারখানা, যানবাহন, খনিতে কাজ করার যন্ত্রপাতি, পাকা-বাড়ী এবং জাহাজ নষ্ট হইয়াছে সেগুলির মূল্য ১৫০ কোটি ডলার। দক্ষিণ-কোরিয়াকে পুনর্গঠন করিতে হইলে সাত বৎসর ধরিয়া পুনর্গঠনের কাজ চালাইতে হইবে এবং উহার জন্য ব্যয় হইবে ২০০ কোটি ডলার। সাত বৎসর ধরিয়া এই অর্থ ব্যয় করিলে দক্ষিণ-কোরিয়া গৃহযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে মাত্র। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কোরিয়া যুদ্ধের এক বৎসরে যে পরিমাণ মূল্যের গোলাগুলী ব্যয় হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও কম অর্থ ব্যয় করিতে হইবে দক্ষিণ-কোরিয়ার পুনর্গঠনের জন্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি কোরিয়া যুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করিত তাহা হইলে কোরিয়া শুধু ঐক্যবদ্ধই হইত না, দক্ষিণ-কোরিয়াও বিপুল ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সত্যই যুদ্ধবিরতি চায় কি না, বন্দীবিনিময় সমস্যার সমাধান হওয়ায় এবার তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

একঘেয়ে কাজের যাঁতাকল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মনটা কেমন বিসিয়ে উঠেছিল। তার উপর ক'দিন ধরেই ছিল মহানগরীর দিক্‌বিদিক্‌ জুড়ে একটানা একটা বেরসিক গরম। মাথা প্রায় ঠিক থাকে না, অর্দ্ধভগ্ন জীবন-রথখানি কোথায় বুঝি দিশেহারা থমকে দাঁড়ায়। কোন্ ফাঁকে গতানুগতিকতার পথ-রেখা ধরে নববর্ষও পাশ কেটে গেলো সত্যি, কিন্তু ওর নামের পশরাখানি খুঁজে পেতে দেখলুম—কোথাও এতটুকু আনন্দ নেই—বৈচিত্র্যও নেই। এমনি কোন এক দুর্গত মুহূর্ত্তে একদিন ডাক পড়লো আমার 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদকের কক্ষে। সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক মশাই দেখেই বললেন—ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার প্রখ্যাত শিল্পীদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে মতামত-সম্বলিত প্রবন্ধ 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না—বলে কাজটি সম্পাদনের ভারটা দিলেন সরাসরি আমারই উপর। এই বিষয়টির দিকে অবশ্য আমার ঝোঁক ছিল বেশ কিছুকাল পূর্ব্ব থেকেই। সম্প্রতি কলকাতার কোন বিখ্যাত সাপ্তাহিকের চিত্র-সম্পাদক হিসাবেও আমার এ-সম্পর্কে হাত-পাকানোর সুযোগ ঘটে অনেকটা। সুতরাং 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদকের কাছ থেকে যখন আমন্ত্রণ পেলুম তখন মুসড়েপড়া আমার মনের পরদাগুলো সহসা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। বের হয়ে পড়লুম তৎক্ষণাৎ নতুন দায়িত্ব পালনের ভীষণ সুন্দর ব্যাকুলতা নিয়ে।

পাহাড়ী সান্যাল

সমগ্র ভাবে ভারতের বিশেষ ভাবে বাঙ্গালার চলচ্চিত্র শিল্প বর্ত্তমানে মহা দুর্দ্দিনের সম্মুখীন। কিসের দারুণ অভাব যেন একে কিছুকাল থেকেই জোর পেছনের দিকে টানছে। অথচ অন্যান্য দেশে এই শিল্পের কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক জীবনে একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে নির্দ্দিষ্ট। আমাদের দেশের এই শিল্পের ক্রমিক অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে, এই নিয়ে কোন প্রশ্নই নেই। সেই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পীদের মতামত সংগ্রহ করে যদি প্রকাশ করা যায় যার জন্য 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক মহোদয় সাগ্রহে অগ্রণী হয়েছেন, তাতে শিল্পিবৃন্দ তথা জনসাধারণের যেমন বহুবিধ চিন্তার খোরাক মিলবে—আমার বিশ্বাস, চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতির সূচনাও হবে তেমনি এরই মধ্য দিয়ে। আরও একটা উদ্দেশ্যের কথা এই ক্ষেত্রেই আমার না বললে নয়। শিল্পীদের সম্পর্ক সাধারণের ধারণা বেশ কিছুটা অদ্ভুত রকমের। তাঁরা যেন একটা আলাদা জগতের লোক। সম্পূর্ণ আলাদা আদব-কায়দা দুরস্ত। মঞ্চ বা পর্দার বাইরে এসেও আমার আপনার মত তাঁদের স্বাভাবিক হাসি-কান্নার রীতি নেই। কিন্তু এ যে একটা মস্ত ভুল, তা ভেঙ্গে দেওয়ার জরুরী তাগিদ আসে আমার কাছে। তাই নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নমালা তৈরী করে একে একে শিল্পনায়কদের কাছে আমি সেটি তুলে ধরে তাঁদেরই নিজ মুখের মনোরম জবাবগুলো জানিয়ে আমি আমার কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করছি।

চিত্রাভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যাল

সোমবার ২১শে বৈশাখ দিন স্থির হলো বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা শ্রীপাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার। শ্রীসান্যাল আমাকে পূর্ব্বাহ্নেই জানিয়েছিলেন ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় বেলা সাড়ে দশটার কথা যেন না ভুলি। সুতরাং যথাসময়ে প্রস্তুত হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে বের হয়ে পড়লুম। পাহাড়ী বাবুর সঙ্গে পূর্ব্বেই আমার পরিচয় ঘটেছিল অন্য সূত্রে। তিনি শুধু অভিনেতাই নন—তিনি একাধারে শিল্পী, গায়ক ও সুপণ্ডিত। এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলে মনের প্রসারতা বাড়ে। গতানুগতিক আলাপ-আলোচনার ধার ধারেন না তিনি। চলচ্চিত্র সম্পর্কে যতটা পারেন আলোচনা থেকে বিরত থাকেন—কোন কিছু প্রশ্ন করলে যত কম কথায় সম্ভব উত্তর দিতে কার্পণ্য করেন না। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় পুরোপুরি ভদ্রলোক। অবসর সময়ে পড়াশুনো নিয়েই তিনি আছেন। সম্প্রতি আবার "French" (ফরাসী) অধ্যয়নে ব্যস্ত। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, এ বয়সে আবার ছাত্র হবার সখ হলো কেন? উত্তর যা দিলেন তা সত্যি অনেকের শিখবার মত। মানুষের জীবনে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বুঝবার মত উপযুক্ত হতে হলে পড়াশুনোর প্রয়োজন, তাই পড়াশুনো করছি। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যখনই শ্রীসান্যালের কাছে গিয়েছি, দেখেছি তাঁর প্রাণ-খোলা হাসি, সদাপ্রসন্ন মুখ এবং পেয়েছি অমায়িক ব্যবহার। লোকসমাজে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন, বিশিষ্ট শিল্পী বলে। তবু তাঁর মধ্যে কোন প্রকার অহঙ্কার প্রবেশ করতে পায়েনি। আজও যে-ই তাঁকে প্রয়োজনের ডাক দেয় তিনি সেখানেই উপস্থিত হন। যাই হোক, আজ তাঁর ব্যক্তি-মানুষ সম্পর্কে আমার নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে এ প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করবো না।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে দশটায় হাজির হলুম পাহাড়ী বাবুর আড্ডায়। দেখলুম, কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও বন্ধু-বান্ধবের মাঝখানে তিনি বসে আছেন। প্রথমেই বললেন, 'কেমন আছেন'? বললেন আমাকে কিছু ব'লবার সুযোগ না দিয়েই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম তাঁর শরীরের কথা। তিনি উত্তরটি দিলেন চমৎকার। "শরীর যদি ভাল না রাখতে পারি তবে চাকুরি থাকবে না। কেন না, শরীর ভাল রাখাই আমার উপজীবিকা। যতটা সম্ভব স্বাস্থ্যের নিয়ম-কানুন মেনে চলি বলেই আজও শরীরটা ভাল রাখতে সক্ষম হয়েছি।"

তার পর ইংরেজী, হিন্দি ও বাঙ্গালায় আলোচনা সুরু হলো। এর মধ্যে অতিথি সংকারের কথাও ভোলেননি। বললেন, "চা খাবেন?" আমি তখনকার মত অস্বীকার করলেও পরে তাঁর হাত এড়াতে পারিনি। যাক্, কিছু সময় পরেই তিনি বললেন, চলুন। তাঁর পড়বার ঘরে যেতে হলো। সেখানে গিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা পাহাড়ী বাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চললো চলচ্চিত্র সম্পর্কে। বহু প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি বললেন, "এর উত্তর দু'-এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। এ ধরণের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হলে ২০।২৫ পৃষ্ঠার কমে কুলোবে না। এই শিল্প সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অসীম তা তাঁর আলাপ-আলোচনা থেকেই বুঝতে পেরেছি। গত ২০ বৎসরের অধিক কাল তিনি এই শিল্পেই আত্মনিয়োগ করে আছেন ও এখনও অপ্রতিহত ভাবে অভিনয় করে চলেছেন একের পর এক ছবিতে। "কিন্তু আজও তাঁর শিখবার যে প্রবল আগ্রহ তা বর্ত্তমান যুগে খুব কম লোকেরই আছে বলে মনে হয়।

এর পর চললো একের পর এক প্রশ্ন। আমি লিখতে সুরু করলুম আর তিনি তার উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি বললেন, "আমি ১৯৩৩ সালে মীরাবাঈ হিন্দি ও বাংলা ছবিতে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করি। প্রথম যোগদানের তারিখটিও আমি মনে করতে পারি—১লা মে। মাত্র কয়েক দিন হলো ২০ বৎসর অতিক্রম করেছি এই শিল্পকার্য্যে। 'বিদ্যাসাগর' 'বড়দিদি' 'প্রতিশ্রুতি' 'সেতু' 'নৌকাডুবি'তে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে তৃপ্তি লাভ করেছি সব চাইতে বেশী।"

চলচ্চিত্রে যোগদানের পর সাংসারিক জীবনে আগ্রহশীল কি না, এই প্রশ্ন করতেই শ্রীসান্যাল বললেন, "এক জন শিল্পীর পক্ষে সাংসারিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়তো সম্ভব নয়—; তবে সামগ্রিক ভাবে আমার কথা বলতে পারি যে, হাঁ, আগ্রহশীল।" 'চলচ্চিত্রে যোগদানে কখনও ব্যক্তিগত আপত্তি ছিল কি না' প্রশ্ন তুললে তিনি বললেন যে, কোন দিন আপত্তি তো ছিলই না বরং আগ্রহ ছিল, তবে প্রথম দিকে একটা ভয়ের আঁচ ছিল মনের উপর। এ আমার গৌরব যে আমি চলচ্চিত্র শিল্পে যোগদান করেছি। যেদিন চার আনার সিটে বসে "চণ্ডীদাস" ও "পুরাণ ভকত" দেখেছি তখন অনেক বন্ধু-বান্ধব আমাকে বলতো আমি চলচ্চিত্র শিল্পে যোগদান করি না কেন? এই শিল্পে যোগদান করলে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তার পর এক আকস্মিক ঘটনায় দেবকী বাবুর (পরিচালক শ্রীদেবকী বসু) সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। ভগবানের হয়তো উদ্দেশ্য ছিল আমি চলচ্চিত্র জগতে আসি।"

ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে শ্রীসান্যালের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন এসেছে কি না জানতে চাইলে তিনি সহাস্যে বললেন, "আমার নিজের বিশ্বাস, ছবিতে যোগদানের পর সামাজিক মানুষ হিসেবে আমার উন্নতি হয়েছে। সত্যিকারের মানুষের যে সকল দিক আছে তা দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি। আমি আর দশ জন লোকের মতই সামাজিক লোক।"

চলচ্চিত্রে বাঙ্গালী বিশেষ করে অভিজাত-পরিবারের ছেলে-মেয়েদের যোগদান করা সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "চলচ্চিত্র যে কোন বৃত্তির মত একটি বৃত্তি। অন্য সব বৃত্তি অবলম্বন করলে যেমন ক্ষতি হয় না এ বৃত্তি অবলম্বন করলেও ক্ষতির প্রশ্ন নেই।"

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন হয় প্রশ্ন করলুম। এর উত্তরে শ্রীসান্যাল জানালেন, "আমার মনে হয়, শতকরা এক-শত ভাগ ভাগ্য আর সেই সঙ্গে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব এবং নির্ভীকতা। ব্যক্তিত্ব বলতে আমি বাইরের সৌন্দর্য্য মনে করিনে। অন্যকে মুগ্ধ করতে পারাকেই আমি সৌন্দর্য্য বলে মনে করি—সে কার্য্যে এক জন পরিচালক, প্রযোজক কিম্বা অভিনেতা যিনিই সক্ষম হন না কেন।"

ব্যক্তিগত ভাবে কি ভাবে দৈনন্দিন কার্য্য সম্পাদন করে থাকেন, এ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, "সকাল সাড়ে পাঁচটায় উঠি, কিছু সময় বেড়িয়ে বেড়াই, তার পর খানিকক্ষণ "ফ্রেঞ্চ" ক্লাস করি অথবা সুটিং থাকলে সুটিং করি। তার পর যে সময় পাই পড়া-শুনোর মাঝেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। বিকেলে বাড়ী ফিরে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে বেড়াতে যাই। আমি সামাজিক জীবন যাপন করতে ভালবাসি এবং যতটা সম্ভব সামাজিক জীবনে জড়িত থাকতে চেষ্টা করি। তার পর সন্ধ্যায় স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে কখন কখন সিনেমাও দেখি।"

আপনার কোন হবি (Hobby) আছে কি? তার উত্তর হলো, "ফ্রেঞ্চ" পড়া ও আড্ডা দেওয়া। চলচ্চিত্রে যোগদানের পর থেকে খেলাধুলো করবার সময় হয়ে উঠে না। এক সময় হকি ও বিলিয়ার্ড খেলতুম। বিলিয়ার্ড এমন খেলা যে মানুষকে মনঃসংযোগ (concentration) শিক্ষা দেয়।"

নিজে ছবি দেখতে ভালবাসেন কি না এবং কোন্ ভাষার ছবি ভাল লাগে—এর জবাবে তিনি বলেন, "ছবি যদি সত্যিকারের ছবি হয় তবে আমি সব রকম ভাষারই ছবি দেখতে পছন্দ করি।" তার পর জানতে চাইলুম, কোন মাসিক কিম্বা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েন কি না এবং পড়লে কোন্ পত্রিকা পড়তে সব চাইতে ভাল লাগে? উত্তরে বললেন, "দৈনিক, মাসিক ও অন্যান্য সব রকমের কাগজই পড়ে থাকি।" কোন গল্প ও কবিতা লেখবার অভ্যাস আপনার আছে কি? শ্রীসান্যাল বললেন, "এমন মানুষ কেউ দুনিয়ায় নেই যে, কোন সময়ে তার জীবনে কবিতা ও গল্প লেখবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আমি জানি যে আমি গল্প অথবা কবিতা লিখতে পারি না।" বই পড়তেই সব চাইতে ভালবাসেন কি? উত্তর দিলেন, "হাঁ, বই পড়তেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। বই-ই হচ্ছে আমার সব চাইতে উত্তম সাথী। কেন না, বইকে কখনও তোষামোদ করতে হয় না।" পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত কি?—"অভদ্র ভাবে নিজেকে ভূষিত না করে যাতে আরাম পাওয়া যায় সেইটেই আমার কাছে পোষাক।"

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ছবির উৎকর্ষ সাধন কি প্রকারে হওয়া সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?—"এ-সম্পর্কে পরে আপনাদের জানাতে চেষ্টা করবো। দু'-এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তবে সংক্ষেপে বলতে হলে বলতে হয় প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন তবে এর উৎকর্ষ সাধন হতে পারে।" ভাল ছবি তৈরী করতে হলে কি করা প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করলে পাহাড়ী বাবু বললেন, "কারও দোষ খুঁজে বের না করে কোন্‌টা দোষ খুঁজে বার করতে পারলে এ বিষয় ঠিক ধরা সম্ভব"

ছবির পরিচালক হতে গেলে কি কি বিশেষ গুণ থাকা দরকার? —"স্থান, কাল, পাত্র, সময় এবং বুদ্ধির প্রখরতা, তার সঙ্গে চাই চলচ্চিত্র শিল্পের প্রত্যেক বিভাগের জ্ঞান—যা না থাকলে ছবির পরিচালক হওয়া যায় না। সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে দৃষ্টি।"

অভিনেতা ও অভিনেত্রী হতে হলে কি কি গুণের আবশ্যক? উত্তর দিলেন, "ব্যক্তিত্ব এবং ভাগ্য।" শিল্পীদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও শরীরের উপর দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কি?—"বেঁচে থাকতে হলে দেহের প্রাণরক্ষা যতটা প্রয়োজন শিল্পীদের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষাও ততটা প্রয়োজন।"

বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি?—"এ সম্বন্ধে আমি কোন হিসেব নেইনি।"

প্রসঙ্গত টাকা-পয়সা রোজগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "সেটা আপনারাই ধারণা করে নিন। টাকাটাকে আমি কখনই বেশী মনে করিনে, কমও মনে করিনে। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সর্ব্বদা সচেতন।"

[ক্রমশঃ।

দেখা ছবি

চিত্রমায়ার 'পথিক'

দেবকী বসু-পরিচালিত চিত্রমায়ার নিবেদন 'পথিক' সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করবো। ছবিটি কলকাতার তিনটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে ও শহরতলীর বিভিন্ন ছবিঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। অজস্র অর্থব্যয়ে প্রচারণার সাহায্যে সাধারণের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েও 'পথিক' বেচারী যথোপযুক্ত পাথেয়লাভে বঞ্চিত হয়েছে বলা চলতে পারে। চিত্রমায়ার আগেকার উপহার দেওয়া ছবি 'কবি' কিংবা 'রত্নদীপ' বেশ চলে গিয়েছিলো বাজারে, (ছবি দুটি কতোদূর কেমন হয়েছিলো সেকথা বলবার আজ আর প্রয়োজন নেই) কিন্তু দেবকী বাবুর সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। 'সার শংকরনাথ' যে জন্যে মর্মান্তিক ব্যর্থতার পরিচয় বহন করেছিলো—'পথিকে' তারি ধ্বনি পাওয়া যায়। সেটি হোলো গল্পের দুর্বলতা। মঞ্চের (সৌখিনী) 'পথিক' সম্বন্ধে আমার ধারণা নেই দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেজন্যে তার বিষয় কিছু বলতে পারছি না; কিন্তু বাণীচিত্রের 'পথিক' দেখে আমরা হতাশ হয়েছি। তুলসী লাহিড়ী মশায় ছায়াচিত্র-জগতের ধুরন্ধর ব্যক্তি, দীর্ঘদিন তিনি রচনায়, অভিনয়ে লিপ্ত আছেন তবু যদি তাঁর লেখনী সমালোচকের রসদ জোগায়—তার চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? এবং স্রেফ এই কারণেই দেবকী বাবর আপ্রাণ প্রয়াস শেষ পর্যন্ত পুরস্কৃত হতে পেল না।

সাহিত্যিক অসীম রায় বিগত জীবনের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ স্খালন করতে অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে তাদের সম্বন্ধে লেখার ত্রুটি সংশোধন করতে একদিন সব ছেড়েছুড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। সংগে তার ডায়েরী, কলম আর সাহিত্য-সাধনা-লব্ধ বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ। সে চলেছে তার জন্মভূমি বিহারের কোনো একটি গ্রামের বুকে আশ্রয় নিতে। ভুল পথে এগিয়ে এসে সে হাজির হোলো এক কয়লাখনি অঞ্চলে। সে অঞ্চলে আত্মারাম নামে এক ডাকাতের কৃপাদৃষ্টিপাতে ছোট-বড়ো সকলে তখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এখানে যশপাল নামে এক প্রৌঢ় দোকানী (তার দোকানে তৈরি-চা থেকে মশলা-সাবান সব-কিছু মেলে) তার মাতাল এবং সর্বগুণধর ভাইপো সুদর্শন আর mystic মেয়ে সুমিত্রা বাস করে। যশপালের দোকানে কুলিরা আসে। আসে ভালুকসোঁধা খাদের মালিক নিকুঞ্জ গড়াই, ভিহিকল্ ডিপোর কর্মচারী কয়েকটি ছোকরা। এরা অবিশ্যি আসে সুমিত্রার হাতের চায়ের লোভে। বাপ সুদর্শন মেয়ে সুমিত্রাকে ভাঙিয়ে নিজের অবস্থা ফেরাবার ফিকিরে ঘোরে, তারি প্রশ্রয়ে এবং প্ররোচনায় খাদের মালিক নিকুঞ্জ গড়াই উপহারের ডালি বয়ে আনে সুমিত্রার দ্বারে। সুমিত্রা বাপকে চেনে, তাই শুরুতেই সাবধান হয়। নিকুঞ্জকে মুখের ওপর জানিয়ে দেয় তার অসদুদ্দেশ্যের উদ্দেশে সাবধান-বাণী। অবিশ্যি নারী-লোভী নিকুঞ্জ তাতে লজ্জিত না হয়ে হুমকী দেয়। এমনি পরিবেশের মাঝে পথিক অসীম রায় এসে হাজির হয় এই চায়ের দোকানে। তার পর নিজ পথে যাত্রা করে ডাকাত আত্মারামের কাছে সর্বস্ব খুইয়ে আবার ফিরে এলো অসীম যশপালজীর দোকানে। যশপালজীর বুধনী নামে ঝি-টি ছিলো বেশ হাসিখুশি প্রকৃতির—স্বামী রাখুর নয়নের মণি। রাখু নিকুঞ্জ গড়াইয়ের খাদে কাজ করতো। একদিন রাখু ও আর একটি কুলি (সুমন্ত) দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো। কোম্পানীর নতুন ম্যানেজার ওই সুদর্শন নিকুঞ্জ গড়াইকে বাধ্য করে ঘটনাটা বেমালুম চেপে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো—পথিক অসীম এ ব্যাপারে বুধনী ও সুমন্তের পক্ষ নিয়ে মালিকের কাছ থেকে খেসারৎ আদায় করে দিলো। ফলে সুদর্শন (যশপালের ভাইপো) আত্মারামকে টাকা খাইয়ে অসীমের নিকাশের ব্যবস্থা করলো। তার পর? তার পর গুলী-পিস্তল-ডাকাত-পুলিশ—গুলি খাওয়া—(হ্যাঁ, গাঁজাও)—শেষে সুদর্শন মরলো আর পথিক বুকের কাছে গুলী খেয়েও দীর্ঘ বক্তিমে দিয়ে (গরম গরম) হিন্দী ছবিতে যেমন নায়ক বুকে দেড় হাত ছোরা খেয়েও পুরো ৭ মিনিটের গজল গান গায় তেমনি নায়কোচিত দৃঢ়তায় এগিয়ে গেল ট্রাকের দিকে। এই ট্রাকে করে তাকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু গাড়ি কিছুতেই চলে না। কি করা যায়—সমবেত কুলি-কাবাড়ী কাঁধ লাগালো—রথ পথ বেয়ে চললো, আকাশ-বিদারী গান নয় আবৃত্তি চললো, অসীম বাঁচলো কি মরলো বোঝা গেল না। সেটা দর্শকের খুশির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ হোলো এই। গল্পের জায়গায় জায়গায় গোটা কয়েক লাগসই বুকনী জুড়ে দেয়া হলেও কাহিনীতে যাকে বলে 'মাল' কিছু নেই। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চিত্রনাট্যের প্রয়োজন অনুযায়ী ঘটনার বিন্যাস দেখা যায়, কোনো কিছুই স্বতঃস্ফূর্তরূপে

চণ্ডীদাস কথাচিত্রে দুর্গাদাস ও উমাশশী

উপস্থিত হয় না। পথিক অসীম রায়ের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার কি এমন প্রয়োজন ছিলো? তাকে দোকানে ফিরিয়ে এনে রাত্রিবাস করানো অন্য হাজারো উপায়ে চলত। অমন হাস্যকর লুণ্ঠন-দৃশ্যের সমাবেশ হতে তাহলে ছবিটি মুক্তি পেত। ডায়েরীতে বার বার অস্পষ্ট চরিত্র বলে লিখে সুমিত্রাকে কি দর্শক-মনে বিশেষ স্থান করে দেয়া গেছে? কি জন্যে সে অতো গম্ভীর আর রবীন্দ্র-কাব্যে অনুরাগিণী? কি তার দুঃখ—কতোখানি সে ব্যথার দাহিকা-শক্তি—কিছুই অক্ষম রচনাগুণে পরিস্ফুট হতে পারেনি। সুদর্শনের কুটিলতা বা চরম উদ্দেশ্য কোনোটাই দানা বাঁধতে পারেনি। নিকুঞ্জ গড়াই তাকে যে ভাবে খাদের ম্যানেজার appoint করলো, সেটা কি একেবারে 'গ-ল-প' জাতীয় নয়? খাদের ভেতর থেকে সুমন্ত চেঁচাচ্ছে আর সে ডাক রাখু শুনতে পেল—এই বা কোন্ ধরণের কথা? ছবি দেখে মনে হোলো কয়লার খনি আজকাল টালিগঞ্জ অঞ্চলে পরিচালকের প্রয়োজনবোধে তৈরি হচ্ছে, নয়তো আসল কয়লাখনি হলে ভেতর থেকে সুমন্তর ডাক রাখু যে শুনতে পেত না এটা নিশ্চিত। কারণ দুর্ভাগ্যবশতঃ দু'-এক জন কয়লাখনির মালিকের সংগে অন্তরংগতা থাকায় এবং তাঁদেরি সবিস্ময় উক্তিতে ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হোলো। আর ডাকাত আত্মারামের উপস্থিতি সমুদয় কাহিনীর মধ্যে জোর করে ঢোকানো ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় কি? এবং সব চাইতে হাস্যকর তথা বিরক্তিকর মনে হয় যখন দেখা যায়, ওই দাড়িওলা ভীতিপ্রদ ডাকাত আসলে অসীম রায়েরই বাল্যকালের স্নেহভাজন আনন্দ নামধারী একটি লোক! তার পর গুলী-গোলা নিয়ে প্রায় শেষ দৃশ্যে ভিতিকুল্ ডিপোর কর্মীদের সংগে ডাকাতের ওই লড়াই দেবকী বাবুর মত পরিচালক কি করে কল্পনায় আনতে পারলেন, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না।

অভিনয়ে নায়ক এবং নায়িকা আমাদের নিতান্তই হতাশ করেছেন। মণিকা গাঙ্গুলীর অভিব্যক্তিহীন অভিনয় দেখে বার বার মনে হয়েছে নতুন করে এঁকে এ-রাজ্যে আনার এমন কি প্রয়োজন হোলো? পরিচালক মশাই না বোবার মুখে ভাষা ফোটান—তাহলে এমনটা সম্ভব হোলো কি করে? শম্ভু মিত্র সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিলো কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই—সে মনোভাব কর্পূরের মত শূন্যে বিলীন হয়েছে। অভিব্যক্তি ছাড়া যে অভিনয় অচল! এ ছাড়া নাম-করা শিল্পী যাঁরা আছেন—তাঁদের সুঅভিনয়ের জন্যে দায়ী কে বুঝতে পারছি না! পরিচালক, না তাঁরা স্বয়ং?

আবহ-সংগীতে দীনতার জন্যে কোনো দৃশ্যই দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। ঠিক মত সুর-সংযোগ হলে দর্শক-চিত্তে যথেষ্ট সাড়া

জাগানো যেত। আলোকচিত্র যথোপযুক্ত হয়েছে। শব্দগ্রহণে সোকেন বসুর সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে।

এখানে দু'-একটি কথা পরিচালক মশাইকে বলতে চাই। বাঙলা ছবির বাজার আজ বিশেষ মন্দা—শতকরা নব্বইটি ছবিই আঁতুড়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। সে ক্ষেত্রে তাঁর মত দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ পরিচালক কি করে এই ধরণের কাহিনী নির্বাচিত করলেন? কি আছে কাহিনীতে? 'ইন্‌সান্‌ জিন্দাবাদ' ধ্বনি করলেই জনসাধারণের চিত্ত ও বিত্ত দখল করা আজ আর যায় না—এ জ্ঞান কি তাঁর হয়নি? সমবেত-কণ্ঠের দৈববাণীর মত সমাপ্তি কাব্যোচ্চারণেও (রবীন্দ্রনাথের) প্রেক্ষাগৃহের শূন্যতা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। কারণ? কারণ আমার মত অনভিজ্ঞ দর্শকসাধারণই তো সে ছবি দেখবে! তারা যে এখন একটু-আধটু লক্ষ্য করতে শিখেছে! তারা যে ওসব Hero worship বোঝে না!

টকির টুকিটাকি

মাষ্টারের জীবন

কিছুদিন আগে চিত্রায়িত হয়েছিলো—'রবীন মাষ্টার'! একেবারেই সে ছবি দর্শক-মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়নি। এবার উঠছে মঞ্চ-সফল কাহিনী 'ভোলা মাষ্টার'। নীরেন লাহিড়ীর নেতৃত্বে এম. এল. বি. প্রোডাকসন্সের এটি দ্বিতীয় নিবেদন। অরবিন্দ বক্সী-রচিত কাহিনীটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য। পরিবেশন করবেন প্রাইমা ফিল্মস্।

'ওগো শুনছো'-য়

চমকে ওঠার কিছু নেই, আশপাশে কেউ কাউকে ডাকেনি। এ হচ্ছে চতুরংগের রংগ-চিত্র। ভংগ বংগদেশে হাসির গাড়ে তুফান তুলতে সাহিত্য-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র নব উৎসাহে উদ্যোগী হয়েছেন। বিগত অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে হাতে পাঁজী মংগলবারে মহরৎ সারা হয়েছে ছবি বিশ্বাস মশায়ের বাড়িতে। বহু শিল্পী প্রভৃতি সে অনুষ্ঠানে উপস্থিতির উত্তাপ দিয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ।

শ্যামলী চিত্র প্রতিষ্ঠানের

নির্মীয়মাণ ছবি হচ্ছে 'সতীর দেহত্যাগ'। ফণি বর্মা'র তত্ত্বাবধানে মানু সেনের পরিচালনায় এটি গৃহীত হবে। বীরেন ভদ্র মশাই পুরাণের এই কাহিনীটিকে যথারীতি চিত্রনাট্যে গ্রথিত করে দিয়েছেন। একে রূপায়িত করবেন দীপ্তি রায়, কমল মিত্র, শ্যাম লাহা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রূপশিল্পীরা।

মন্ত্রশক্তি

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবীর একটি অতিখ্যাত রচনা। চিত্ত বসুর পরিচালনায় এটির মহরৎ সেদিন সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়েছে।

দেবদাস ছবিতে প্রমথেশ ও যমুনা

রূপায়ণে আছেন বিভিন্ন স্বনাম-খ্যাত শিল্পীকুল—পরিবেশন-ভার পেয়েছেন চিত্র-পরিবেশক লিমিটেড।

চক্রবৎ পরিবর্তন করে

ইতিহাস! আবার তাই আমরা মেতে উঠেছি পুরাণের কাহিনী নিয়ে। অনেক-কিছু করেই তো দেখা হোলো, কতো 'ism'-এর সলিল-সমাধি তো চোখের সামনে হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু পুরাণের আবেদন আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে জনগণের মনে। 'কেরাণীর জীবন'-খ্যাত পরিচালক দিলীপ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই তাঁর নব-নির্বাচিত চিত্র-কাহিনীর জন্যে। 'সীতার পাতাল-প্রবেশের' প্রথম চিত্র-গ্রহণ সেদিন রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োয় আড়ম্বরের সংগে সারা হয়েছে। প্রচুর সম্ভাবনাময় এই কাহিনীটির সার্থক হোক চলচ্চিত্র-জীবন, বর্ত্তমান ধারাবাহিক বিফলতার মূলোচ্ছেদ করুক।

ভোর হয়ে এলো—

দুঃখের রাত্রি? মানুষ আমরা শত দুঃখ-কষ্টে জর্জ্জরিত হয়ে বেঁচে থাকি ভবিষ্যতের আশায়। এই যে পথ-চাওয়া, এ হোলো অমোঘ প্রকৃতির বিধান। আশার সমাধি হলে মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! দর্শক আমরা চেয়ে আছি ছায়াচিত্র-জগতের শীত-জর্জ্জরিত রাত্রি অবসান প্রত্যক্ষ করতে! এই 'ভোর হয়ে এলো' বাণী-চিত্রটির মুক্তি সমাগত—যুগোপযোগী কাহিনীর মাধ্যমে রচিত হয়েছে এর চিত্রনাট্য। পরিচালক সত্যেন বসুর সর্বাধুনিক প্রয়াস এটি।

কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠানের

প্রথম প্রচেষ্টা 'লক্ষহীরা'! শুভ মহরতের লক্ষ্যভেদ হয়েছে বিগত অক্ষয় তৃতীয়ায়।

চিত্রশিল্পীর

'মৃণালিনী' নব-উদ্যমে শুরু হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি। ঋষি বংকিমের এই একমাত্র গ্রন্থ যার চলচ্চিত্রায়ণ আজ পর্যন্ত হয়নি। বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নেই, কারণ একই গল্প একাধিকবার হয়ে থাকে বংকিম এবং শরৎচন্দ্রের। সে যাই হোক, 'মৃণালিনী'র প্রথম রূপ-পরিগ্রহ পর্দার মাঝে সার্থক হোক। এর পরিচালনায় আছেন খগেন রায়। সংগীত-পরিচালনায় কালোবরণ। ভূমিকা-লিপি ভবিষ্যতে পত্রস্থ করা হবে।

শ্রীরমেন চৌধুরী

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

মণিলাল গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

আগামী কাল—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দু টাকা আট আনা।

প্রাচীর ও প্রান্তর—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

অঙ্গার—শ্রীপ্রবোধকুমার স্যান্যাল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

কেন—শ্রীঅক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। বুকম্যান, ৩০৮, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৬। মূল্য দু টাকা।

গল্প-সংকলন—মন্মথনাথ ঘোষ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

বোম্বাই পরিচয়—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩১বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

কয়েকটি সনেট—শ্রীভক্তসখ বসু। একক প্রকাশনী, ৪৪৬।১, কালিঘাট রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য দেড় টাকা।

রক্তপদ্ম—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়। ৪।৩।এ, মদন দত্ত লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

শতাব্দীর কবি (১ম খণ্ড)—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। অনুরাধা প্রকাশনী, ১২৭।এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

Students Favourite Dictionary (11th Edition) Eng. to Beng. & Eng.—A. T. Dev. Sree S. C. Majumdar, 22/5/B, Jhamapukur Lane, Calcutta-9. Price Rupees Ten.

নিগম প্রসাদ—স্বামী সিদ্ধানন্দ। স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী, সারস্বত মঠ, কোকিলামুখ, যোড়হাট, আসাম। মূল্য এক টাকা চার আনা।

রূপের তুলি—শ্রীকামাখ্যাশঙ্কর গুহ। গৌহাটী, আসাম। মূল্য এক টাকা আট আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিত্তা (আবির্ভাব)—স্বামী অসিতানন্দ। শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ, ১৫।১।১।এ, বিশ্বকোষ লেন্, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

রাম ভরসা—শ্রীরাসবিহারী বসু। শ্রীনন্দিনী দেবী সরস্বতী, পোঃ ওড়ফুলি, গ্রাম চকক্মলা, জেলা হাওড়া। মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাসপোর্টের ভবিষ্যৎ

"একথা অবশ্য ঠিক যে, পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থাকে লইয়া যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা বৃহত্তর পাক-ভারত সমস্যারই একটা অংশ। কাশ্মীর ও খালের জল সম্পর্কে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যে জেহাদী মনোভাব অবলম্বন করিয়া বসিয়াছিল—পাসপোর্ট প্রথার 'প্রবর্তন' তাহারই একটা ফল। এই মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে এশিয়ার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এশিয়ার দেশগুলি মোটামুটি একই ধরণের মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিল। সেখানে অতীতের পাক-ভারত সম্পর্ক তিক্ত প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় নাই, ইহা সুখের কথা। দ্বিতীয়, ডুলেস সাহেব ভারত ও পাকিস্তান সফরের সময় পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর কানে যে মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পাকিস্তানের কার্য্যকলাপে সাময়িক ভাবে পরিবর্ত্তন আসাও বিচিত্র নয়। কিন্তু কথায় বলে, না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই। পাক-ভারত সম্পর্ক সম্বন্ধে একথা বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, যত দিন বৃহত্তর ক্ষেত্রে পাক-ভারত সম্পর্কে একটা মীমাংসা না হইবে, তত দিন পাসপোর্ট প্রথা সম্বন্ধেও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে কি-না সন্দেহ।"

—দৈনিক বসুমতী।

সতর্ক হউন

"কিছুকাল যাবৎ নিত্য-প্রয়োজনীয় কোন কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। তরিতরকারীর মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ অবশ্য যথাসময়ে বৃষ্টির অভাব। আবহাওয়ার অবস্থা স্বাভাবিক থাকিলে তরিতরকারীর মূল্য অদূর ভবিষ্যতে হ্রাস পাইবে আশা করা যায়; কিন্তু সরকারী অবিবেচনা এবং ব্যবসায়ী সমাজের কারসাজীর ফলে যেসব দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে অবিলম্বেই উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা একান্ত ভাবেই ভারত গবর্ণমেন্টের এক বিস্ময়কর অবিবেচনার ফল। তাঁত-শিল্পকে রক্ষার নামে তাঁহারা মিলের উৎপাদন কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কতকগুলি ভ্রান্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এখনও জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, তাহাদের অনুসৃত নীতি জনস্বার্থের কোনরূপ ক্ষতির কারণ ঘটায় নাই। ভারত গবর্ণমেন্টের কর্তব্য অবিলম্বে বস্ত্রোৎপাদনের বিষয়ে মিলগুলির উপর যে নিয়ন্ত্রণাদেশ আছে তাহা উঠাইয়া লওয়া। সম্প্রতি সরিষার তৈলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার বাস্তবিক কোন সঙ্গত কারণ নাই। কোন কোন শ্রেণীর সংরক্ষিত দুগ্ধজ খাদ্যবস্তুর মূল্য ব্যবসায়ীরা কিছুকাল যাবৎ যেভাবে বাড়াইতেছে, তৎপ্রতিও একাধিকবার আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি; কিন্তু এবিষয়েও কোন প্রতিকার হইতে দেখি নাই। এইভাবে কতকটা সরকারী অব্যবস্থা এবং কতকটা ব্যবসায়ী সমাজের কারসাজির ফলে নানাবিধ দ্রব্যের মূল্য যদি বাড়িয়া চলে, তবে সমগ্র ভাবে জীবিকা নির্বাহের ব্যয়ও নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইবে; ইহা ক্রেতা সাধারণের পক্ষেই মাত্র আশঙ্কার কারণ নয়, এইভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিলে ভারত গবর্ণমেন্টের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের পক্ষেও গুরুতর বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। আশা করি, সরকার সময় থাকিতেই ইহা লক্ষ্য করিয়া সতর্ক হইবেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

লজ্জা দিবে কে?

"গত কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা গিয়াছে যে, লোক্যাল ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীর অনেক কামরাতেই বর্ষার সময় ছাদ দিয়া জল পড়ে। সেজন্য গাড়ীর মধ্যে বসিয়াও যাত্রীরা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া যায়। অন্য দেশে পশুর জন্য নির্দিষ্ট গাড়ীতেও তেমন অভিজ্ঞতা ঘটে না। যাহা হউক, যাত্রীদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বাগাড়ম্বর শুনিয়া মনে হইয়াছিল যে, এবার বর্ষার সময় হয়তো গাড়ীর ভিতরে জল পড়িবে না। কিন্তু বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় গতকল্য আমাদের চিঠিপত্র স্তম্ভে যে অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা অতীত অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। তিনি লোক্যাল ট্রেণে কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর যাইতেছিলেন। পথে বৃষ্টি নামে। তারপরই কামরার ছাদ দিয়া গাড়ীর ভিতর অবিরল জল পড়িতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রীরা ভিজিয়া যান। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া টিকেট কিনিবার পরে যাত্রীদিগকে যদি গাড়ীর মধ্যে জলে ভিজিতে হয়, তবে বড়ই দুঃখের এবং লজ্জার কথা। সে সম্পর্কে আমাদেরও সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা কানে তুলা দিয়াছেন ও পিঠে কুলা বাঁধিয়াছেন—তাঁহাদিগকে লজ্জা দিবে কে?"

—যুগান্তর।

উপ যেন অপ না হয়

"পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলে আর একজন 'উপ' বাড়িল। শ্রীদেবেন দে প্রথমে নিরামিষ চীফ হুইফ হইয়া কংগ্রেসী রাজত্বে দেশসেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পর হুইফের সহিত যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাযোগে তিনি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হন। এই দক্ষিণার সহিত বাড়ী গাড়ী বাবদ উপরির ব্যবস্থা ছিল না। এবার তিনি উপমন্ত্রী হওয়ায় সে ব্যবস্থাও হইয়া গেল। নিষ্কাম সেবার পুরস্কার এমনি অযাচিত ভাবেই আসিয়া থাকে। ডাঃ রায় ইউরোপে যাইতেছেন; তাঁহার অনুপস্থিতে বামমার্গী ঝড়ে স্বরাষ্ট্র বিভাগ যাহাতে কাৎ হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যেই বোধ হয় তিনি এই

এই বিপ্লবী খুঁটি লাগাইলেন। দুই ডজন 'উপ' অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের হইয়াছে; তাহার উপর আর একজন "উপ" বাড়িলে আর আপত্তি কি? তবে, "উপ"রা ক্রমে "অপ"য় পরিণত না হন।"

—সত্যযুগ।

পুটশুড়ীর অরাজকতা

"শুনিয়াছিলাম, পেপসুর কোনও অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠনের কথা। আজ যে কথা বলিতে যাইতেছি তাহা বর্দ্ধমান জেলারই একটি গ্রামের কথা। পল্লীটি জেলার হেড কোয়ার্টার হইতে দূরে হইলেও থানা হইতে বেশী দূরে নয়, মাত্র ছয় মাইল। এই গ্রামটির নাম পুটশুড়ী এবং মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত। জেলা শাসক অথবা পুলিশ-প্রধান কেহই বোধ হয় পুটশুড়ির অরাজকতা সম্বন্ধে অবগত নহেন। তাঁহারা এই সংবাদ-পাইবেন কেমন করিয়া যদি থানার পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে সংবাদ সরবরাহ না করেন? কথা উঠিতে পারে, থানা হইতে মাত্র ছয় মাইল দূরে অবস্থিত গ্রামের যে থানা-অফিসার সংবাদ রাখেন না তিনি কত অযোগ্য! সংবাদ পাইয়াও যদি তিনি জেলা-কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করাইয়া না থাকেন তাহা হইলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় পুটশুড়ীর ঘটনা তাঁহার জ্ঞাতমতে ঘটিতেছে তাহা কি ভুল হইবে? থানা হইতে ছয় মাইল দূরে পুটশুড়ীর মত বিশিষ্ট একটি গ্রামে এমন অরাজকতা যদি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে থানা হইতে দূরে অবস্থিত সাধারণ পল্লীবাসীর ভাগ্যে কি ঘটিতে পারে তাহা ভাবিতেও শঙ্কা বোধ করি।"

—বর্দ্ধমান বাণী।

কর্তৃপক্ষ সজাগ হইলে

"সম্প্রতি শহর ও মফঃস্বল অঞ্চল হইতে প্রায়ই চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সেদিন জঙ্গীপুরে কয়েকটি চুরি বা চুরির চেষ্টা হইয়া গেল এবং যে সংবাদ আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পুলিশের কর্তব্য পালন সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছি। শহরের বুকে প্রধান রাজপথের পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের ধারণা। ঘটনার বিবরণ হইতেই বুঝা যায়, দুষ্কৃতিকারীগণের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে পুলিশ সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাহাদের এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া সত্যই আমরা বেদনাহত। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই পুলিশের অস্তিত্ব। জনসাধারণ পুলিশ বিভাগের জন্য বাংলার রাজস্ব হইতে মাথা-পিছু ২।৶০ খরচ করিয়া থাকে এবং আশা করে তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করাই পুলিশের প্রধানতম কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে সজাগ হইলে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি।"

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)।

যাত্রীদের দুর্ভোগ

"আসাম উপত্যকা ও পাহাড় সেক্শনের যাত্রী নিয়া যে ট্রেণ বদরপুর আসে, তাহার যাত্রীরা গত ২৪।২৫শে মে দীর্ঘ সময় রাস্তায় আটক থাকিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের কাছে অভিযোগ আসিয়াছে। প্রথমতঃ ইঞ্জিনের গোলযোগে লামডিংএ কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব হওয়ায় বদরপুরে গাড়ী যথাসময়ে পৌছিতে পারে নাই। কিন্তু এই গাড়ীর যাত্রীদের জন্য একটু সময়ও অপেক্ষা না করিয়াই বদরপুর হইতে করিমগঞ্জের পরবর্ত্তী ট্রেণ ছাড়িয়া দেয় পাহাড় লাইনের গাড়ী পৌছিবার মাত্র দশ মিনিট পূর্ব্বে। যাত্রীদের মধ্যে মহিলা এবং শিশু, পরিষদ সদস্য, সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীও ছিলেন বলিয়া জানা গেল। প্রকাশ, এই ভাবে ট্রেণ ছাড়িয়া দেওয়া ইহা নূতন নহে। ইহার পিছনে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের ও হোটেল রেঁস্তরাওয়ালাদের কোন স্বার্থ জড়িত আছে কি না, তাহা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তদন্ত এবং ভবিষ্যতে যাহাতে যাত্রীদের এ ভাবে দুর্ভোগ সহ্য করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন এই আশা করা যাইতে পারে কি?"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

ডাকঘরে ভেণ্ডার নেই?

"বোলপুর পোষ্টাপিসে টিকিট ও ষ্ট্যাম্প, খাম, পোষ্টকার্ড প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাবে ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী না থাকায় জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। একবার এ-জানালা, একবার ও-জানালায় বহুক্ষণ ধরিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া তবে খাম, পোষ্টকার্ড, টিকিট কিনিতে হয়। বোলপুরের ন্যায় কর্ম্মব্যস্ত সহরে এইরূপ অবস্থা একান্ত অবাঞ্ছনীয়। টিকিট, পোষ্টকার্ড প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য একজন নির্দ্দিষ্ট ভেণ্ডার থাকা আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে ডাককর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" —বীরভূম (বোলপুর)।

পাকিস্থানের বড় ভাই

"ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙলা-ভাষাভাষী প্রদেশ বাঙলা হইতে ছিনাইয়া বিহারের সামিল করা ইংরজের অন্যতম অপকর্ম্ম। যে অপকর্ম্ম দূরীকরণে বিহারের হিতাকাঙ্ক্ষী বিহারী নেতা শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহের মত ব্যক্তিও স্বীকৃত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী উড়িষ্যার সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ানকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিতে কোন দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু যে অংশ বাঙলার ছিল তাহা বাঙলার সামিল করিতে কত টালবাহানা করিতেছেন। বাঙলার একজন কংগ্রেসী শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক আজ ২২ দিন অনশন করিয়া সমস্ত বাঙলার তৎপরতা আনিয়াছেন। কংগ্রেসী কর্ত্তারা ইহাকে সামান্য বলিয়া অনুভব করিতেছেন। শ্রীভৌমিক স্বর্গতঃ শ্রীপত্তি রামুলুর মত আজ প্রায় মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত। বিহার রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের দেশ। আজ যদি শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক (ভগবান না করুন) ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন, আর যদি তার পর অন্ধ রাজ্যের মত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সুবিচার করার খেয়াল হয় তবে—

"নির্ব্বাণে দীপে কিমু তৈল দানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানং।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ।"

এই শ্লোকের মতই কার্য্য করা হইবে। উড়িষ্যার অংশ বিহারে আনিতে কোন ঝামেলা হইল না কিন্তু বাঙলার হৃত অংশ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে এত আপত্তি একদিন রাষ্ট্রপতিও কলিকাতায় বাঙলা ভাষায় ভাষণ দিবার সময় করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ও যদি তাই করেন, তবে মনে হইবে—

"সৎসঙ্গমে গুণ উপজে অসৎ সঙ্গমে যায়
হাঁস কাঁস সুত্তা পান্তা মিছরী ভাও বিকায়।"

মুখে বলিতে পারুক আর নাই পারুক, মনে মনে অনেকেই এই মত প্রকাশের চিন্তা করিবে। পাকিস্থানের বড় ভাই হইবার আগে একবার নিজের ঘরের খবরটা লওয়া ভাল। এই ব্যাপারে স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের দুটি লাইন মনে হয়—

"তোরা ঘরের পানে তাকা।
এটা কফ-ভরা রুমালের মত
বাইরে একটু আতর-মাখা।"

রাজস্বপ্রাপ্তির সঙ্গে প্রাপ্ত তহবিল ১১৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুসারে ১৯৫৩-৫৪ অব্দের শেষে ৫১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইবে। কাজেই—"ছিল ঢেঁকি হলো তুল,
কাটতে কাটতে নির্মূল।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ (মুর্শিদাবাদ)।

খারিজী মামলা পুনর্দাখিল

"লেভী সম্বন্ধে তমলুকের ৬টি থানা হইতে প্রায় ২০০ আপত্তি বা আপীল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দাখিল হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার একার দ্বারা সব মহকুমার প্রায় দেড় হাজার আপীল সত্বর নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব বিধায় মহকুমা শাসকগণকেও ঐ ক্ষমতা সম্প্রতি দেওয়া হইয়াছে। ফলে মীমাংসা ত্বরান্বিত হইয়াছে। তবে অধিকাংশ আপীলই রীতিমত বা নিয়মমাফিক হয় নাই বলিয়া নাকচ হইয়া যাইতেছে। তমলুকেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। এখন ৪।৫ মাস উদ্বেগে কাটাইবার পর যাহাদের আপীল নিতান্তই টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে খারিজ হইয়া গেল তাহাদের অবস্থা খুবই করুণ, নিঃসন্দেহ। কেন এরূপ হইল তাহাও এইসঙ্গে চিন্তার বিষয়। সরকার লেভী সম্বন্ধে অর্থাৎ লেভিতে ধান দেওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট প্রচারাদি করিয়াছিলেন কিন্তু এই আপত্তি দাখিলের নিয়ম-পন্থা সম্বন্ধে তেমন প্রচারাদি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ মামলা এই নূতন বলিয়া সামান্য ভুল-ত্রুটী থাকাও বিচিত্র নয়। সুতরাং যদি সুবিচার করিতে হয় তবে যাহাদের সত্যই আপত্তির কারণ আছে অথচ টেকনিক্যাল ত্রুটীর জন্য খারিজ হইয়া গিয়াছে, সেই সব খারিজী মামলা ঠিক পন্থায় পুনর্দাখিলের জন্য সুযোগ দান করা উচিত।"

—প্রদীপ (তমলুক)।

মূল্যবৃদ্ধির অভিযান

"ধান্যমূল্য বৃদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলিও যেন একযোগে মূল্যবৃদ্ধির অভিযান সুরু করিয়াছে। কাপড়, সুতা, ডাল-কলাই, সরিষার তেল, সুপারি, চিনি, মসলা প্রভৃতি ক্রমেই ধাপে-ধাপে চড়িতেছে। আবার কোন কোন জিনিসের ২।৪ দিনের তফাতে অসম্ভব রকম মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় লোকের মনে গোলকধাঁধার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যবসায়িক জগতের কারসাজি বা মুনাফাখোর বৃত্তি যে ইহার জন্য দায়ী নয়, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়! জীবনধারণের এই দুঃসহ অবস্থায় সাধারণের বাঁচিবার উপায় কি আছে! বিধাতাও বুঝি এদেশবাসীর উপর রুষ্ট হইয়াছেন। কারণ, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইতে চলিল, এখনও বৃষ্টির অভাবে চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে। অবশ্য সেদিন সামান্য কিছু বৃষ্টি হইলেও তাহাতে উপকার হইবার আশা কম; বরং মাঠে যে সমস্ত বীজধান্য বুনা হইয়াছিল, সামান্য জল পাওয়ার পর বর্ত্তমান প্রচণ্ড রৌদ্রে তাহাও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং আগামী দিনের আশাও ক্রমেই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। বৃষ্টির অভাবে লোকের সঞ্চিত তরীতরকারী বাগানগুলিও ঝলিয়া যাইতেছে, সহসা বাজারে তরীতরকারী আদির দ্বিগুণাধিক মূল্যবৃদ্ধিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবৎচিন্তা বাদ দিয়া মানুষ যতই বিপথগামী ও পাপাচারী হইতেছে, ভগবানের রুদ্ররোষও ততই প্রকট ভাবে দেখা দিতেছে।"

—নীহার (কাঁথি)।

জাতীয়তাবাদী ও পদলেহীর লোভ

"ইংলণ্ডের রাণীর অভিষেক উৎসব উপলক্ষে ভারতের একদল পদলেহী সম্প্রদায় যেভাবে মাতামাতি সুরু করিয়াছিল, তাহাতে লজ্জায় ও ঘৃণায় আপনা-আপনি মাথা নত হইয়া আসে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক হয় যখন দেখি জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচিত কয়েকটি সংবাদপত্র বড় বড় শিরোনামায় সংবাদ পরিবেশন করিয়া ও সম্পাদকীয় লিখিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, 'রাজা-রাণী'র ঘোর যেন এখনও আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আন্তর্জাতিক সৌজন্য প্রকাশের জন্য নিন্দা কেহই করিবে না। কিন্তু সেই সৌজন্য প্রকাশ যখন সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করিয়া এদেশের বিলাতী বণিকদের প্রসাদের আশায় নির্লজ্জ খোসামুদীতে পরিণত হয়, তখন সমগ্র ভাবে তাহা সংবাদপত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, মর্য্যাদা ও ধর্ম্মের চরম হানি করে। জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচিত সংবাদপত্রগুলি আর একটু সংযত হইয়া চলিলেও বোধ হয় সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা হয়।" —বীরভূমের ডাক।

কি বলেন ?

"রাজায় রাজায় লড়াই করে,
উলুখাগড়া প্রাণে মরে।

ব্যাপার হয়েছে তাই। কংগ্রেসের দলীয় কোন্দলে না খেতে পেয়ে গোষ্ঠীশুদ্ধ মরছে মৌভাণ্ডার মুসাবনীর ৮০০০ শ্রমিক-মজুরের দল। কথায় আছে;

রাজায় যদি মশায় কাটে মস্ত বড় ঘা,
তোমায় যদি লাঠিও মারে ও তো কিছু না।

নেতাদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে এমন কত-শত মজুরই ত মরছে— তার জন্য মাথা ঘামালে কি নেতাদের চলে, কি বলেন?"

—নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

'বিবৃতি-সাগর'

মাদ্রাজে গিয়ে মথুরালিঙ্গম খেবরের সঙ্গে বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি সুভাষ-পন্থী এবং তাঁর দল মার্কসবাদী নয়। তার পরে কলকাতায় এসেই আরেক বিবৃতিতে বলেন, তাঁর দল সুভাষপন্থী নয়, মার্কসপন্থী। কলকাতা পার হয়ে ডেহরি-ওন-সন যেতে না যেতেই আরেক বিবৃতিতে তিনি জানান যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আদর্শ ও কর্মনীতি, এবং রুশ-কেন্দ্রিক পররাষ্ট্র নীতির সমর্থনে তাঁর দলের কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। শুধু "নেশনেল বুর্জ্যোয়া" নিয়ে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি বড় বেশী মাতামাতি করছে বলে তাদের সঙ্গে তাঁর

দলের মিলন হতে পারে না। কমুনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে কলকাতায় যে নীতি গৃহীত হলো পুরীতে তা গেল উল্টে। শ্রীবাজীর বিবৃতির দৌলতে তাঁর নীতি যে কখন কি ভোল বদলায়, বহুরূপীও সেই কথা বলতে পারবে না। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন যে, সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান পার্টির সঙ্গে তাঁর দলের মিলনের কথাবার্তা প্রায় সবই ঠিকঠাক, শুধু ঘোষণার বাকী। সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান পার্টির সম্পাদক তার প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন, সুভাষবাদ ও আন্তর্জাতীয় নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় এরূপ মিলনের আলোচনা মোটেই অগ্রসর হয় নাই।—শ্রীবাজী সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন—তাঁর কৃতিত্বের আরেক পরিচয় দিয়ে: বিহারের সন্ন্যাসী মণ্ডলের এক লক্ষ সাধু নাকি মার্কসীজম্ গ্রহণ করে গেরুয়ার উপরে লাল আলখাল্লা চাপিয়ে তাঁর দলের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। নেতাজীর সঙ্গে যে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে সে সম্বন্ধে বিবৃতি তিনি দিয়েই রেখেছেন—এখন আরেকটা বিবৃতি শুধু বাকি: কমুনিষ্ট পার্টিকে খারিজ করে মার্কসীষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্ত কোমিন্‌ফরমের অনুমোদন আদায় করে এনেছেন—এই ঘোষণাটি বিবৃতি আকারে প্রকাশিত হলেই একটি বামপন্থী কন্‌ভোকেশন ডেকে তিনি যেমন 'শীলভদ্র' উপাধি ধারণ করেছেন তেমনি তার উপরে তাঁকে আরেকটি 'বিবৃতি-সাগর' উপাধি দিয়ে ভারতের বামপন্থী মহল নিজেদের ধন্ত মনে করবেন।" —মতামত (কলিকাতা)।

ঋণ বণ্টন ব্যবস্থায় ত্রুটি

"সরকারী বাস্তহারা পুনর্ব্বাসন বিভাগের ঋণ বণ্টন ব্যবস্থায় যে কত প্রকার ত্রুটি হইতেছে, ধুবড়ীর পুনর্ব্বাসন বিভাগ কর্ত্তৃক সাম্প্রতিক একটি অভিযোগ হইতে তাহার কতক আভাষ পাওয়া যায়। আজ প্রায় দুই মাস অতীত হইতে চলিল করতিমারি কুজ্জডোবা কলোনির (সাপটগ্রাম) বাস্তহারা সমিতির বর্ত্তমান সেক্রেটারী শ্রীঅতীন্দ্ররায় ও শ্রীমণীন্দ্রকিশোর দে (রেলওয়ে কর্ম্মচারী) গোঁসাই-গাঁও থানার পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়েন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৫।২।৫১ তারিখে করতিমারি কুজ্জডোবা কলোনির শ্রীহারু দাম নামক জনৈক ব্যক্তি ধুবড়ীর সরকারী বাস্তহারা ঋণ বণ্টন বিভাগ হইতে নগদ ৩৭০৲ টাকা ও দুই বাণ্ডিল টিন ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণের জন্ত শ্রীঅতীন্দ্র রায় নামক উক্ত অঞ্চলের কোনও ব্যক্তি জামিনদার ও সনাক্তকারী ছিলেন। ঋণ দানের সামান্ত কয়েক মাস পরেই নাকি সরকারী পুনর্ব্বাসন ঋণ বণ্টন বিভাগ জানিতে পারে যে, শ্রীমণীন্দ্রকিশোর দে নামক কোনও একজন ব্যক্তি নাকি নিজেকে হারু দাম বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া উক্ত ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। পুনর্ব্বাসন বিভাগের সহকারী অফিসার তৎপর সাপটগ্রামে যাইয়া টিনগুলি জব্দ করিয়া ধৃত শ্রীমণীন্দ্রকিশোর দের কোনও আত্মীয়ের জিম্মায় রাখিয়া আসেন। ইহার পর হইতেই স্থানীয় আর, আর, ও'র অফিস হইতে উক্ত মণীন্দ্র বাবু এবং জামিনদার শ্রীঅতীন্দ্র রায়ের উপর নগদ প্রদত্ত ৩৮০৲ টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চিঠিপত্র যোগে চাপ দেওয়া হইতেছিল। অবশেষে মাত্র সেদিন পুলিশ কর্ত্তৃক উক্ত অভিযোগে গ্রেপ্তার করাইয়া আদালতে বিচারের কারণে গোসাইগাঁও পুলিশ কর্ত্তৃক তদন্ত করান হইতেছে।" —মজদুর (ধুবড়ী)।

আর ফেলিয়া রাখা অনুচিত

"মাত্র কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু ইহাতেই পত্তনগরের অধিবাসীদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি সুরু হইয়া গিয়াছে। গতবার শিলচরে বন্তা বলিতে তেমন কিছুই হয় নাই। কিন্তু তবুও বিলপার, ইটখলা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদিগকে দুই দুই বার ঘরবাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় নিতে হইয়াছে। ইহা যে কিরূপ দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা কয়েক বৎসর যাবৎই শুনিয়া আসিতেছি, সরকার বরাক নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করিয়া বন্তা নিরোধ করিবেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী কোন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। যাহা হউক, এই অতি জরুরী বিষয়টি আর ফেলিয়া রাখা উচিত নয়।"

—জনশক্তি (শিলচর)।

বীরভূম কংগ্রেসে

"স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর চলিতে চলিতে অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, বীরভূম কংগ্রেস যেন এক জায়গায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইতেছে যেন চলিবার সামর্থ্য সে হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং বিবর্ত্তনের গতিতে জড় পদার্থতে পরিণত হইবার পর্য্যায়ে পড়িতেছে। দলাদলি, দ্বেষ, হিংসা, ইত্যাদির কল্যাণে কংগ্রেস আজ একই সাইনবোর্ডের মধ্যে থাকিলেও বহুধা-বিভক্ত। এক নেতা অন্ত নেতার প্রতি দোষারোপ ও ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিতে ব্যস্ত। যদিও জেলা কংগ্রেসে এই অবস্থা বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল—আজ সেই দলাদলির বীজ অঙ্কুর হইতে মহীরুহ গজাইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে জেলা কংগ্রেসকে নূতন করিয়া ঢালা হইতেছে এই মর্ম্মে কর্ম্মীদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়িয়া যায় এবং সাজা· শেষাশেষি নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন হয়। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে দেখা যায়, উপস্থিত কর্ম্মীবৃন্দ দুইটি পৃথক স্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত। নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন হইল কিন্তু দলাদলির নিরসন হইল না। যাই হোক, নানা চক্রান্তজাল বিস্তারের গভীর অন্ধকারে হঠাৎ শুনা গেল সব পণ্ড, নূতন নির্ব্বাচনে বাতিল হইয়া গেল, নূতন কর্ত্তারা গদীয়ান হইয়াও কর্ম্মের অধিকার হারাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানান হইল যে প্রদেশ হাইকমাণ্ডের নির্দ্দেশেই ইহা করা হইল। অবশ্য কি হেতু তাহা জানা গেল না—জনতার মঙ্গলামঙ্গলের দাবীদার কংগ্রেসের এই ছেলেখেলামীর ব্যাপারখানা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গেল। পুরাতন কমিটিই আবার গদীচ্যুত হইতে হইতে না হইয়া ক্ষমতার রজ্জু ধরিয়া রহিলেন।"

—বীরভূম বার্ত্তা (সিউড়ী)।

কংগ্রেসী কর্ণধারগণের নিমন্ত্রণ

"বর্দ্ধমান, কাটোয়া রাস্তাটি পি-ডব্লু-ডির হাতে তিন বৎসর যাওয়া অবধি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং এ বৎসরও এক লক্ষ টাকা বাজেটে দেওয়া হইয়াছে। কাজের মধ্যে এ পর্য্যন্ত মাত্র বর্দ্ধমান হইতে ৯ মাইল রাস্তা তৈয়ারী নয়, মেরামত করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ঐ নয় মাইল রাস্তা এমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে, মাঝে মাঝে পীচের তালি দিতে হইতেছে। কন্ট্রাকটার মহারাজ এমন পাৎলা করিয়া পীচ দিয়াছেন যে, কয়েক দিন যাইতেই এই অবস্থা। বর্ত্তমান তালি মেরামত কাজ বর্ত্তমান বরাদ্দর এক লক্ষ

টাকার মধ্য হইতে হইতেছে কি না, জানিতে কৌতূহল হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত ২১০ লক্ষ টাকায় অন্ততঃ ২০ মাইল রাস্তা মেরামত হইত। এই নয় মাইলের পরবর্তী নিগন পর্যন্ত যাহা পি ডব্লু-ডির হাতে রহিয়াছে তাহাও ইতিমধ্যে দুর্গম হইয়া উঠিল। পূর্ত্ত-বিভাগের ধূর্ত্ত কর্ম্মচারী ও রাঘব বোয়াল কন্‌ট্রাক্টরদের পাল্লায় পড়িয়া শেষ পর্যন্ত বর্দ্ধমান-কাটোয়া রোড নৌকাপথে পরিণত হইবে দেখিতেছি। বর্দ্ধমান কালনা রাস্তার জন্তও যে এক লক্ষ টাকা এবারের বাজেটে বরাদ্দ হইয়াছে, তাহার কোন কাজই এখন পর্যন্ত আরম্ভ হইল না। অথচ সামনে বর্ষা আসিতেছে। রাস্তাটি ইতিমধ্যেই বাস চলাচলের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের কংগ্রেসী কর্ণধারগণ খুব নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইতেছেন, এ বিষয়ে ত একটি কথাও তাঁহাদের মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না! ইংলণ্ডের রাণীর অভিষেক লইয়া যাঁহাদের আহার-নিদ্রা নাই তাঁহারা রাজ-কার্য্য ছাড়িয়া এ সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয়ে লক্ষ্য দিবেন, তাহার সময় কোথায়?"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ

"যদি বলা হয় শাসন-সৌকর্য্যের জন্ত বা আর্থিক সঙ্গতির জন্ত ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন করা বর্ত্তমানে সম্ভব নহে, তাহা হইলে আমরা বলিব অবিলম্বে আর্থিক ব্যবস্থা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ব্যয়সঙ্কোচ সাধনের জন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে ৬টি বা ৭টি মাত্র শাসনতান্ত্রিক ইউনিটে বিভক্ত করা হোক। পশ্চিম-বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামকে লইয়া পূর্ব্বাঞ্চল রাজ্য গঠিত হোক। সংখ্যালঘু হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও বাঙ্গালী জাতি তাহাতে আপত্তি করিবে না। আজও পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হিসাবে বিহারে ও অন্তান্ত স্থানে মণিঅর্ডার যোগে প্রেরিত হয় আর সামান্ত চাকুরী বা সংস্থানের অভাবে পশ্চিম-বাংলার জনসাধারণকে হয় আজ আত্মহত্যা করিতে হয় নতুবা তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। দেশোদ্ধার করিতে গিয়া বাঙ্গালী তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরের হাতে তুলিয়া দিয়া ভিক্ষান্ন বঞ্চিতের জীবন যাপন করিতেছে, তথাপি তাহার ক্ষোভ ছিল না, কারণ তাহার ত্যাগ ফলপ্রসূ হইয়াছিল—তাহার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু লইয়া স্বল্প-পরিমিত স্থানে আর্থিক ও সামাজিক বিপর্য্যয়ের মুখোমুখি হইয়া অপরের বিশেষ ক্ষতি না করিয়াও স্তায্য দাবী উপস্থিত করায় যখন তাহাকে অপদস্থ হইতে হয় এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে আন্দোলন করিবার জন্ত বাধ্য হইতে হয় তখন তাহার আন্দোলন ব্যতীত গত্যন্তর কোথায়? পশ্চিম-বাংলায় আজ এই আন্দোলন রাজনৈতিক কোন্দলের উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং সমস্ত দল মত-নির্ব্বিশেষে সমবেত প্রচেষ্টার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। বিস্ফোরণের পূর্ব্বেই স্তায়নীতির বিচারে একটা সুব্যবস্থা হোক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।"

—মেদিনীপুর পত্রিকা।

আমরাও বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি

"বিহারে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি ও ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবী বর্ত্তমানে একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। বিহারের বাংলাভাষাভাষী জনগণের মধ্যে বাঙালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার সম্যক ব্যবস্থা, ভাষাগত ও শাসন-তান্ত্রিক সমস্তা এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন সমস্তা সমাধানের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ, তাহার সন্নিহিত বিহারের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির যে দাবী করিয়াছে, তাহার প্রতি সুবিচার করিবার জন্ত সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান হইতেছে এবং ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রশ্নটি লইয়া বিচার-বিবেচনা করিবার জন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রী যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করিবার আশ্বাস দিয়াছেন, সেই কমিশন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত প্রশ্নটি লইয়া বিচার-বিবেচনা করিবে কি না, তাহার স্পষ্ট ঘোষণা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে দাবী করা হইতেছে। বিহার যেমন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, সেইরূপ আমাদের দাবী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে এবং তবেই ভারত সরকার তাঁহাদের বর্ত্তমান ভেদনীতি পরিত্যাগ করিয়া ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন এবং তখনই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক বিশাল ভারত গড়িয়া উঠিবে।"

—বার্ত্তাবহ (রাণাঘাট)।

রাণীর অভিষেক

"বৃটিশ রাণীর রাজ্যাভিষেকে জহরলাল রাজেন্দ্রপ্রসাদের মাতামাতি বাঙ্গালা দেশ কি চক্ষে দেখিয়াছে তাহা লিখিতে বসিয়াছি, এমন সময় পুরুলিয়ায় 'মুক্তি' আসিয়া পৌছিল। দেখিলাম, আমাদের অন্তরের কথাটিকেই তাঁহারা সুন্দরভাবে ভাষা দিয়াছেন। আমরা 'মুক্তি'র কথাই তুলিয়া দিলাম—

ইংরেজের রাজনৈতিক গোলামী হইতে রেহাই পাইলেও মনের দিক দিয়া গোলামী হইতে আমাদের স্বাধীন দেশের এই নেতৃবর্গ রেহাই পান নাই, বরং ইহাকেই তাঁহারা সম্মানের আসন দিয়া অভ্যস্ত গোলামীকে মর্য্যাদা দিতে চাহিতেছেন। এই গোলামী মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত হইতে না পারার জন্তই ইঁহারা দেশকে গোলাম করিয়া রাখিবার কার্য্যধারা ব্যতীত অন্ত কোন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কার্য্য ব্যবস্থা করিতে পারেন না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার দিকে তাকাইয়া ইঁহারা আফশোষ করেন ভারতবর্ষে জন্মিলাম কেন? ইংরেজ ঝাড়ুদার দেখিলে ইহারা স্বগোত্রীর মনে করেন, ভারতের চাষী ইঁহাদের নিকট অস্পৃশ্য ও কলঙ্কের দৃশ্য। আমেরিকা হইতে লোক না আনাইলে ভারতের গ্রাম-সংগঠনের কাজ হয় না, ইংলণ্ড হইতে লোক না আসিলে ভারতে কোন পরিকল্পনা রচনা হয় না। এই গোলামী রাজনৈতিক গোলামী হইতে আরও বেশী বিপজ্জনক। সংগ্রাম করিয়া রাজনৈতিক গোলামী হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, কিন্তু দেশের মাটির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে এই এই মানসিক গোলামী বাড়িতেই থাকে এবং এই গোলামীই সম্মানজনক বলিয়া মনে হইতে থাকে। ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যাভিষেক দরবারে পণ্ডিত নেহরু যোগ দেওয়াতে শুধু ভারতের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাকেই ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই, ইহা ভারতের গোলামী মনোভাবের পরিচয়কেই সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ইঁহাদের হাতে ভারতের শাসনরশ্মি থাকিলে ইঁহারা ভারতকে অসম্মানের অতলগর্ভে লইয়া যাইবেন, যাইতেছেনও তাহাই।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া চাইলাম এক ঘটি জল

"জমিদারের জমিদারী যাইবে বেশ কথা। বাংলার সহিত অন্যান্য প্রদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তুলনামূলক সমালোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। বাংলার হিন্দু জমিদারের বার মাসে তের পার্ব্বন বন্ধ হইবে। মুসলমান জমিদারগণের মসজিদের ও পীরের যাবতীয় উৎসবও লয়প্রাপ্ত হইবে। মহালে মহালে, ধর্ম্মরাজ, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি দেবতার সেবা-পূজাও বন্ধ হইবে। হউক ক্ষতি নাই। সেকুলার রাজ্যে সবই সম্ভব। পশ্চিম-বঙ্গের জমিদারগণের কর্ম্মচারীবৃন্দের সংখ্যাও কম নহে। তাঁহারা নিশ্চয়ই বেকার হইয়া পড়িবেন। তাঁহাদের স্থলে, রাজ্য সরকার আদায় ব্যবস্থার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে সুযোগ-সুবিধা দিবেন, এবং দেওয়াও উচিত হইবে বলিয়া আমরা বিবেচনাও করি। সামগ্রীক-ভাবে পশ্চিমবঙ্গের জমিদারগণকে নিন্দা করিবার অধিকার আমাদের নাই। অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ ইত্যাদি যে তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই এ কথা আমরা বলি না। তবে তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সদাশয় জমিদারের কল্যাণে জলাশয় ও দীর্ঘিকা খনন, শিক্ষা বিস্তারের জন্য সাহায্য দান, রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ এবং দরিদ্র পোষণ ইত্যাদি বহুবিধ জনহিতকর কার্য্য যে হইয়াছে, তাহাও অনস্বীকার্য্য। জমিদারী ক্রয়-বিক্রয়ে প্রজার কি সুবিধা হয় জানি না, তবে ইহাতে ঈর্ষ্যার এবং হিংসার যে একটা লাভ হয় এ কথাও মিথ্যা নহে। ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ হউক। লেভী অর্ডার যখন প্রচলিত হয় তখন একটা কথা উঠিয়াছিল—জোতদারের ধান্যের মূল্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা সরকারের নাই। জমিদারগণের সম্পত্তি কী—যে কোন সময়ে, যে কোন ক্ষতিপূরণে গ্রহণ করা সম্ভব? পশ্চিম-বাংলার আজ সংশোধিত খাজনা আইনের কল্যাণে জমিদার-বৃন্দ অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলায় এই জমিদারগণের সংখ্যা কম নহে, এবং তাঁহাদেরও বাঁচিবার অধিকারও আছে। পশ্চিম-বাংলায় তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও তাঁহাদের অস্তিত্ব আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টীম্ রোলারে সারা ভারতকে একত্রীভূত করিবেন। কিন্তু, বাংলার কৃষক—বাংলার ভূমিহীন,—বাংলার মজদুর,—বাংলার মেহনতী সম্প্রদায় যদি ভূমিই না পাইল তবে এই বহু-বিঘোষিত "জমিদারী উচ্ছেদের" প্রয়োজনই বা কী, এবং কেনই বা এই দুঃস্থ কৃষক সম্প্রদায় তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ যোগাইবে? তাই বলিতেছিলাম, তৃষ্ণার্ত্ত বাংলা জল চাহিল আর সরকার দিলেন আধখানা বেল? উপহাস না পরিহাস? কে জানে!" —রাঢ় দীপিকা (রামপুরহাট)।

মূঢ়ের স্পর্দ্ধা!

"ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সকৌন্সিল বিহারের অন্তর্গত মানভূম, সিংভূম দাবী করিলে, বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং ইহার নিষ্ঠুর প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন। বিহারের কংগ্রেস-সভাপতি লক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু মহাশয় বিহার হইতে সুচ্যগ্রভূমি বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া দিবেন না, এই কথা জানাইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতিকে অস্বীকার করিতেও তিনি কুণ্ঠা করেন নাই। ইহা কঠোর ভবিতব্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। যে বাঙ্গালী ভারতের স্বাধীনতার কারণ—সেই বাঙ্গালী জাতিকে এমন করিয়া নাকচ করার স্পর্দ্ধা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু মহাশয় কোথায় পাইলেন, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না। স্বদেশী আন্দোলনের সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধবের কথা কি তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভুলিয়া গেলেন? কিসের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সর্ব্বহারা হইয়াছিলেন? বাংলার ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রভৃতি ফাঁসির রজ্জু বৃথাই কি কণ্ঠে ঝুলাইয়াছিলেন? আজিকার ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে তাঁহারা কি কোন উদ্যোগই করেন নাই? আমাদের সুভাষচন্দ্রের প্রাণবলির রক্ত কি নিষ্ফল হইয়া যাইবে? অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি বটে; কিন্তু বাংলায় এই জাগরণের তুফান যদি না উঠিত, ভারতের স্বাধীনতার সূর্য্য আজও উদিত হইত কি না সে বিষয় সন্দেহ আছে।" —নবসজ্ঘ (চন্দননগর)।

শোক-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৩রা জুন বুধবার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার পার্শীবাগান লেনের বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত চারি বৎসর যাবৎ তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। মনঃসমীক্ষক স্বরূপে ডাঃ বসু আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের সহিত তিনি প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির সভাপতি ও উহার মুখপত্র "সমীক্ষার" সম্পাদক ছিলেন। ডাঃ বসু ১৯১০ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি পাশ করেন এবং ১৯১৭ সালে তিনি সেই বৎসরের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে সর্ব্বাধিক নম্বর পাইয়া মনস্তত্ত্বে এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার পরই তিনি অধ্যাপকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ বৎসরেই তিনি উক্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তিনি দুই বার ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মনস্তত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং এই সমিতির উদ্যোগে তিনি ১৯৪০ সালে মানসিক রোগগ্রস্তদিগের জন্য "লুম্বিনী পার্ক" নামে হাসপাতাল স্থাপন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বসু ইনষ্টিটুট প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। ডাঃ বসু ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহু গ্রন্থের রচয়িতা। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার দুই কন্যা ও স্ত্রী ইন্দুমতীকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লর্ড ক্লাইভ ও মীরজাফর

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড
তৃতীয় সংখ্যা
আষাঢ়
১৩৬০
৩২শ
বর্ষ

(স্থাপিত ১৩২১)

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। রাণী রাসমণি মার অষ্ট সখীর মধ্যে এক সখী ছিলেন। এই দেবালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করান, মা থাকবেন বলে। মার এই স্থান হচ্ছে অন্দর মহল, আর কালীঘাট মায়ের সদর কাছারী। মা ভোরবেলায় মাখম মিছরী খেয়ে কালীঘাটে যান, ভক্তের বাসনা পূর্ণ করতে। কত লোকে এসে নানান কামনা করে, মা সেই সব শুনতে দেখতে যান। আর রাত্রি নটার সময় মা এসে, মন্দিরের চূড়োতে হাওয়া খান ও গঙ্গা দর্শন করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। যে আসবে চেনা হোক অচেনা হোক, তুই আগে একটু মিষ্টি, এক ঘটি গঙ্গা জল খেতে দিবি। তোকে আর কিছু করতে হবে না। এই করলে জপ-তপ যাগ-যজ্ঞের ফল যা কিছু সব হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। আমায় দেখাও যা আর স্বয়ং ভগবানকে দেখাও তাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। যোগ সারাবার কথা বলতে পারি না; আবার ইদানীং সেব্যসেবক কম পড়ে যাচ্ছে। একবার বলি, 'মা তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও'; কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে; আজকাল আমিটা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখছি তিনিই এই খোলাটার ভিতরে রয়েছেন।

একজন ভক্ত। যদি অন্য ধর্ম্মে ভ্রম থাকে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। তা ভ্রম কোন্ ধর্ম্মে নাই? সকলেই বলে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে। কিন্তু কোন ঘড়িই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘড়িকেই মাঝে মাঝে সূর্য্যের সঙ্গে মিলাতে হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। মাতৃভাব যেন নির্জ্জলা একাদশী; কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে ফল মূল খেয়ে একাদশী; আর লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী। আমার নির্জ্জলা একাদশী; আমি মাতৃভাবে ষোড়শীর পূজা করেছিলাম। দেখলাম, স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। মুক্ত-অভিমানী মুক্তই হয়, আর বদ্ধ-অভিমানী বদ্ধই হয়। যে জোর করে বলে আমি মুক্ত হয়েছি, সে মুক্তই হয়। যে রাত-দিন 'আমি বদ্ধ আমি বদ্ধ' বলে, সে বদ্ধই হয়ে যায়।

আমাদের সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সংস্কৃত চর্চার উপযোগিতা আজ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় উপলব্ধি করিতেছেন—ইহার সম্প্রসারণ ও দেশের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহার প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আন্দোলন করা হইতেছে। দিকে দিকে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব শোনা যাইতেছে। ইহা খুবই সুখের কথা সন্দেহ নাই। তবে সংস্কৃত শিক্ষা আজ যে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন এই ভাবে তাহার কতটা সমাধান হইবে তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

সংস্কৃত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা নৈরাশ্যজনক। প্রাচীন ধরণে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের ধারা আজ শুষ্কপ্রায়। টোলের—বিশেষ করিয়া টোলের ছাত্রের—সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরাই অনেক ক্ষেত্রে টোলের ঠাট বজায় রাখিতেছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ও ছাত্রের সম্প্রদায় ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে যাইতেছে। পণ্ডিত বংশের ছেলেমেয়েরা টোল ছাড়িয়া স্কুল-কলেজে পড়িতেছে। স্কুল-কলেজের অবস্থাও খুব আশাজনক নহে। স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য হইলেও প্রীতিকর নয়। ইহার ব্যাকরণের খুঁটিনাটি, ইহার কাঠিন্য, সর্বোপরি ইহার মধ্যে চিত্তাকর্ষক বস্তুর অভাব ছাত্রদের মনে ভীতিমিশ্রিত বিরক্তির সঞ্চার করিতেছে। নিতান্ত দুঃখের কথা, ব্যাকরণ ও ভাষাকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা কোনক্রমে পরীক্ষা-সমুদ্র পাড়ি দিয়া সংস্কৃতের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করে। ফলে কলেজে সংস্কৃত-পাঠার্থী ছাত্রের সংখ্যা প্রতি বৎসর নিম্নাভিমুখী হইতেছে—অনার্স-পাঠার্থী ছাত্র জুটিতেছে না বলিলেই চলে। সমগ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ ছাত্রের সংখ্যা পঁচিশ-ত্রিশ জন মাত্র। যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক বলিয়া মনে করিতে পারি সেখানেও সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য। এদিক দিয়া অপর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েরও গৌরব করিবার মত কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ছাত্র-সমাজে সংস্কৃতের আদর অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। অন্ততঃ ছাত্রেরা অধিকতর সংখ্যায় সংস্কৃত পড়িত। আশি-একাশি বছর পূর্বেকার বাংলার সরকারি শিক্ষা-বিষয়ক বিবরণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, এনট্রেন্স এবং এফ. এ পরীক্ষায় অর্ধেকের বেশি ছাত্র সংস্কৃত পড়িত—কেবল নিম্নবঙ্গের হিসাব ধরিলে বার আনা ছাত্রই সংস্কৃত পড়িত। অবশ্য তখনও ছাত্রেরা সংস্কৃতকে কঠিন বলিয়াই মনে করিত।

বর্তমানে বিজ্ঞান ও অন্যান্য আধুনিক বিষয়ের দিকেই ছাত্ররা বেশি আকৃষ্ট হয়। দর্শন, ইতিহাস এমন কি আধুনিক সাহিত্যও ছাত্রদের তেমন ভাবে আকৃষ্ট করে না। এ অবস্থায় ছাত্রসমাজে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতের আদর ও মর্যাদা যাহাতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে পারে, সে জন্য সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই যত্নবান্ হইতে হইবে—বর্তমান সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে—গোড়ার গলদ দূর করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, এজন্য সংস্কৃতের পঠন-পাঠন পদ্ধতির আমূল সংস্কার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সাধারণ ছাত্র সংস্কৃতের প্রচলিত ব্যাকরণ পড়ে না বা বোঝে না। অথচ ব্যাকরণ বাদ দিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। সুতরাং এই ব্যাকরণকে সরল ও সাধারণের গ্রহণযোগ্য করিতে হইবে—প্রাচীন ধরণে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইবার চেষ্টা করিলে আধুনিক ছাত্রের বিশেষ উপকার হইবে না। ভাষা পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু নিতান্ত অপরিহার্য প্রথমে ততটুকু ব্যাকরণই পড়াইতে হইবে। প্রথমেই কিছু না বুঝিয়া সুঝিয়া বর্ণের উচ্চারণ-স্থান, সন্ধির নিয়ম, ষত্ব-ণত্ব বিধান, শব্দরূপ, ধাতুরূপ মুখস্থ করিতে গেলে গুরুতর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। অথচ কিছু সাহায্য করিলে ছাত্র নিজেই বর্ণের উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় করিতে পারিবে এবং তখন উহা মনে রাখা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। সন্ধি ও ষত্ব-ণত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাহাকে ধরাইয়া দিলে তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। বাংলা বুঝিবার জন্য—বাংলায় নূতন শব্দ গঠন করিবার জন্য সমাস, তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয়ের যে প্রয়োজন আছে সেই দিকে ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ছাত্রের কৌতূহল-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। নিজের মাতৃভাষার সহিত সংস্কৃতের যোগাযোগ প্রতিপদে দেখাইয়া দিতে পারিলে সংস্কৃত পড়ায় ছাত্রের আগ্রহ বাড়িবে এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়।

কেবল মাতৃভাষার সঙ্গে নয়, ছাত্রের সমস্ত জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার পড়ার মধ্য দিয়া ইহাও প্রতিপন্ন করিতে হইবে। এ জন্য পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে এমন সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে যাহা ছাত্রের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। হিন্দু গৃহস্থের দৈনন্দিন ধর্মাচরণে এমন অনেক স্তোত্র মন্ত্র প্রার্থনা আছে, যেগুলির ভাব অতি মহৎ—অনেক ক্ষেত্রে যাহাদের সাহিত্যিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়ভুক্ত করিয়া দিলে তাহাদের আহার ঔষধ দুইয়েরই ব্যবস্থা হইতে পারে। গীতার অংশ ছাত্রদের পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। সেই সঙ্গে চণ্ডীর কিছু কিছু অংশ পড়াইবারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। চণ্ডীও সারা ভারতে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত। গীতা দার্শনিক তত্ত্ববহুল—চণ্ডী সরস ও মাধুর্যময়। বৈদিক যাগযজ্ঞ আজ তেমন প্রচলিত না থাকিলেও নানা অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রের ব্যবহার এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। হিন্দুর জীবনযাত্রার সহিত বেদের যোগ এখনও অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং বেদ আলোচনায় কেবল অপ্রচলিত অপরিচিত যাগযজ্ঞের খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া বর্তমান ব্যবহারের বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করা দরকার—নামকরণ অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ পূজা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে বেদের যে সব অংশের ব্যবহার আধুনিক কালেও আছে তাহাদের দিকে ছাত্রসমাজের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইলে বেদ আর তাহাদের অনর্থক দুশ্চিন্তার কারণ হইবে না।

সংস্কৃত শিক্ষাকে ধর্মশিক্ষায় রূপান্তরিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে সংস্কৃত হইতে ধর্মকে একেবারে বাদ দেওয়ারও উপায় নাই—ধর্মসম্পর্কশূন্য সংস্কৃত-সাহিত্যের পঠন-পাঠন একরূপ অসম্ভব। প- ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা নিন্দার ভাব যাহাতে নাই—সনাতন ধর্মনীতি

যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেরূপ ধর্মপ্রসঙ্গ সম্পর্কে আপত্তির কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। আর কেবল ধর্মের কথাই যে ছাত্রদের একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় হইবে এমনও আমার বক্তব্য নয়। ব্যাকরণ থাকুক—পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের পশু-পক্ষীর গল্প থাকুক—ভট্টিকাব্য কিরাতার্জুনীয় শিশুপালবধও থাকুক। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হইলে ছাত্রদের আগ্রহ-সৃষ্টির সহায়তা হইতে পারে এবং একবার আগ্রহ সঞ্চারিত হইলে তখন সকল রকম জিনিষই অবাধে পড়ান চলিবে—কোন কিছু বাদ দেওয়ার বা কমাইবার প্রয়োজন হইবে না। গোড়ার দিকে কৌতূহল জাগরিত করিবার জন্য যেমন বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন তেমনি যে কোন দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন বস্তুর সংকোচন আবশ্যক। অনেক দিন পূর্বে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য-পরীক্ষার যে পাঠ সংকলন দেখিয়াছিলাম, এদিক্‌ দিয়া তাহা অনেকটা আদর্শ বলিয়া মনে হইয়াছিল। যত দূর মনে পড়ে তাহাতে বেদ-উপনিষদের অংশ ছিল—প্রাচীন দানপত্রাদির অংশ ছিল এবং অন্যান্য নানা বিষয় ছিল। সংকলনে এরূপ বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রয়োজন যথেষ্ট। এইরূপ সংকলনে রঘুবংশ কুমারসম্ভব ভট্টি প্রভৃতি কাব্যের অংশবিশেষও সন্নিবেশিত হইতে পারে। তবে এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যুগে-যুগে অন্যান্য বিষয়ের মত সাহিত্যেও মানুষের রুচি পরিবর্তন হইয়া থাকে। প্রাচীন সাহিত্যের দীর্ঘ বর্ণনা বা সকল রকম বচনভঙ্গী এখনকার লোকের পক্ষে তেমন তৃপ্তিকর নহে। অথচ প্রাচীন কাব্যে এমন সব জিনিষ আছে যাহা এখনও যে কোন পাঠকের হৃদয়কে অপূর্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত করে। সেই সব জিনিষ বাছিয়া এক জায়গায় সাজাইতে হইবে—তাহাদের সৌন্দর্য্যের ও বৈশিষ্ট্যের দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থগুলির শোভন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিলে তাহা সাধারণ পাঠকের রুচিকর হইতে পারে। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতের প্রসার বৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সুলভ মনোজ্ঞ সংস্করণ প্রকাশের উপযোগিতাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত গ্রন্থের সুপাঠ্য অনুবাদ—সাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের বিবরণ সংকলন, তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ সংস্কৃত প্রচারের পক্ষে অপরিহার্য। বাংলায় যে কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এ পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের জনপ্রিয়তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তথাপি তাহাদের সকলগুলিই যে সুখপাঠ্য এ কথা বলা চলে না। বস্তুত এ বিষয়ে জনসাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ আছে অথচ সে আগ্রহ-পূরণের যথোচিত উপকরণ বাংলা ভাষায় নাই। এই দিক্‌ দিয়া আমাদের অভাব নিদারুণ। একখানি অভিধান পর্যন্ত আজ সংস্কৃত পাঠার্থীর পক্ষে সুলভ নহে। কিন্তু একদিন এই বাংলা দেশে একাধিক ছোট-বড় সংস্কৃত অভিধান প্রচলিত ছিল। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের শব্দসার, শিবনারায়ণ শিরোমণির শব্দার্থমঞ্জরী, রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম, তারানাথ তর্কবাচস্পতির শব্দস্তোমমহানিধি ও বাচস্পত্য আজ আর পাওয়া যায় না। যাঁহারা সংস্কৃতানুরাগী—সংস্কৃতের প্রচারে যাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ আছে, তাঁহাদিগকে এই সব গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের আদরের বস্তু মূল্যবান্‌ প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সংস্কৃত ব্যবসায়ী মাত্রের সর্বদা ব্যবহার্য এই সব গ্রন্থ যাহাতে সুপ্রাপ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল উচ্চকোটির গবেষণা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না—জনসাধারণকে সমস্ত শাস্ত্রের মর্মকথা সরল সুন্দর ভাবে শুনাইতে হইবে—তাহাদের চিত্ত যাহাতে সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

জনসাধারণের একটা প্রধান অঙ্গ ছাত্র-সমাজ। অধ্যাপনার মধ্য দিয়া—অধ্যেতব্য বিষয়ের মধ্য দিয়া—যদি সেই সমাজকে আকৃষ্ট করিতে না পারা যায় তাহা হইলে বর্তমান যুগে অন্য কোন উপায়ে ইহার ব্যাপক প্রসার সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন পদ্ধতিতে যাঁহারা সংস্কৃত-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিবেন, ইতিহাস গণিত প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে আধুনিক শিক্ষায় কৃতবিদ্যদের সমান মর্যাদা দিলেই অনেকে সংস্কৃত অধ্যয়নে আকৃষ্ট হইবেন এমন কথা বলা যায় না। তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠার্থীর ক্রমিক অভাব দেখা যাইত না। কেবলমাত্র এই মর্যাদার স্বীকৃতি পণ্ডিতগণকে সকল কর্মের যোগ্যতা দান করিতে পারিবে না। সংস্কৃত-চর্চায় উৎসাহ দেওয়া—সংস্কৃত পণ্ডিতদের সম্মান প্রদর্শন করা—আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থকারদের পুরস্কৃত করা অবশ্যকর্তব্য সন্দেহ নাই। বিভিন্ন প্রদেশে আজ ইহার কিছু কিছু ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা খুব আনন্দের কথা। কিন্তু ইহার ফলেও সংস্কৃত সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিবে—ছাত্র-সমাজ সাগ্রহে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিবে এরূপ মনে করা চলে না। অথচ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সংস্কৃত ভাষা সংস্কৃত সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বিবিধ বিদ্যার তাৎপর্য সর্বজনবোধ্য সর্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। এ জন্য চাই সংস্কৃত পণ্ডিতের ও সংস্কৃত বিদ্যার মান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের যুগোপযোগী পরিবর্তন—সংস্কৃতের গৌরব ও প্রয়োজন সর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ব্যাপক প্রচার। প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক্‌ সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে সুষ্ঠু প্রচারের যে বিপুল আয়োজন ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যেও সংস্কৃত প্রচারের অনুরূপ ব্যবস্থা যাহাতে হইতে পারে, সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাকেন্দ্র পুস্তক প্রকাশক ও সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই আজ ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত সমবেত ভাবে সুপরিকল্পিত কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করিতে হইবে। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা সংস্কৃতকে ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্ধারণের প্রসঙ্গে উদ্যোক্তাদের এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া বোধ করি।

বঙ্গ ও কলিঙ্গ থেকে ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশের মুখর মুদ্রা ও নানা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রতিপন্ন করে যে ব্রহ্মের
কিয়দংশ ও মালাক্কা প্রধানতঃ বঙ্গ ও কলিঙ্গ থেকেই উপনিবিষ্ট।
[H. P. Phayer লিখিত History of Burma দ্রষ্টব্য]

এভারেষ্ট-বিজয়ী কে?

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

সে আজ একশো বছর আগের কথা। বাঙ্গালী রাধানাথ শিকদার হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আবিষ্কার করলেন—সমস্ত জগতে প্রচারিত হোল মাউন্ট এভারেষ্ট তার নাম। তার পর এই শতাব্দীকাল ধরে চলেছে জল্পনা-কল্পনার অফুরন্ত স্রোত; হিমালয়ের এই অভ্রভেদী উচ্চতা জয়ের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের মনে জেগে উঠেছে তীব্র সঙ্কল্প আর অদম্য উৎসাহ। প্রকৃত পক্ষে ১৯২১ সাল হ'তে হিমালয়ের উপর দিয়ে অভিযানের পর অভিযান চলেছে সেই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করবার দুর্ব্বার প্রেরণায়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে সেই এভারেষ্ট-বিজয়ের স্বপ্ন এই শতাব্দী কালের সাধনায় বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই সাফল্যের অন্তরালে একটা অটল দৃঢ়তা, অপরিসীম চেষ্টা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিপুল অর্থব্যয় আমাদের কাছে জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে। দুরধিগম্য পর্ব্বতারোহণে চাই অবিচল প্রতিজ্ঞা, শক্তি ও সাহস, মানসিক স্থৈর্য্য আর অসীম দূরদর্শিতা। পরস্পরের সহযোগিতাই এর প্রাণকেন্দ্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে এসেছে বিভিন্ন অভিযাত্রী দল, শক্তিতে তারা দুর্দ্দম, আধুনিক সজ্জায় তারা সজ্জিত, গাণিতিক, ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক তত্ত্ব তাদের সহায়, স্থানীয় অধিবাসী তাদের পথপ্রদর্শক; তারা এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের গা' বেয়ে ঐ গগনচুম্বী পর্ব্বতশৃঙ্গকে লক্ষ্য করে। এই অভিযানে হয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাদের জীবনের অবসান হবে। কিন্তু একথা জেনেও তারা পেছনে ফেলে এসেছে, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আর জীবনের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। সেই দুর্গম গিরিপথ পরিক্রমায় কোথাও বা প্রবল ঝটিকায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে অভিযাত্রী দল, কোথাও বা প্রবল তুষারপাতে জীবন্ত সমাধিলাভ করেছে এক দুর্দ্দম পর্ব্বতারোহীর বিরাট স্বপ্ন। জন্মভূমির স্নেহতপ্ত কোল ছেড়ে সে এসেছিল এক জীবন্ত, জাগ্রত শাশ্বত সত্যের সন্ধানে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সেই বিরাটের অভিযান, ঝরে পড়েছে সেই আশামুকুল, যেমন করে ঝরে যায় বৈশাখীর দুরন্ত বাতাসে আবেগ-রক্তিম কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পাঞ্জলি! কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি মানুষের অন্তর্নিহিত সেই চির-কিশোর প্রাণ, প্রকৃতির অনন্ত ঐশ্বর্য্যলীলায় তার মন ছুটে গিয়েছে নূতনতর উৎসাহে, নূতনতম অভিজ্ঞতার আশায়। তাই বিপদসঙ্কুল এভারেষ্ট গিরি-শৃঙ্গ-বিজয়ের ইতিহাসে এক দিকে যেমন সেই পাহাড়ের বুকে চলার পথে মানুষের জেগেছিল একটা তীব্র অভীপ্সা আর কত না অশ্রুত হাহাকার, আবার তেমনি তাদের মনে দেখা দিয়েছিল পরাজয়ের মধ্যেও বিজয়ের অভিসূচনা—একটা উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিচিত্র সম্ভাবনা।

এভারেষ্ট অভিযানের কাহিনী আমাদের বিস্মিত করেছে, প্রত্যেক অভিযানের বিবরণ এনে দিয়েছে সেই ভয়াবহ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের নৈসর্গিক পরিচয়। যাঁরা কখনও পর্ব্বতারোহণ করেননি, তাঁদের পক্ষে এই বিষয় কল্পনা করাও কঠিন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন চূড়াগুলিতে উঠতে গিয়েই অভিযাত্রিগণের যে ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ্য করতে হয়েছে—লৌহস্নায়ু না হলে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা একেবারেই অসম্ভব। হয়ত কোথাও দিনের পর দিন শুধু চড়াই, শিবির স্থাপন করবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত মেলেনি। আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে অক্সিজেন তারও নিতান্ত অভাব। সেই saefied উচ্চতায়, °2, °3'র অস্তিত্ব কোথায়? সমুদ্রের তীরে ওজোন-বহুল বাতাসে, °3 মানুষের বুকে এনে দেয় অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি, কিন্তু পর্ব্বতের উচ্চতর প্রদেশে °3 কেন °2 পর্য্যন্ত পাওয়া কঠিন, তাই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয় অক্সিজেনের যন্ত্রপাতি—একটু একটু করে সেই প্রাণবায়ু কৃপণের ধনের মত ব্যবহার করতে হয়। সঙ্গে থাকে নিত্য অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলি আর বরফ কেটে পথ তৈরী করবার নানাবিধ অস্ত্র। কোথাও বা পাহাড় এত খাড়াই উঠে গিয়েছে যে, পা রাখবার বা হাত দিয়ে ধরবার জায়গাটুকুও নেই। তখন অস্ত্র দিয়ে বরফ কেটে কোনো রকমে একটুখানি হাত-পা রাখবার স্থান করে সেই উচ্চতা লঙ্ঘন করতে হয়। অভিযাত্রী দলের কোমরে থাকে দড়ি বাঁধা; উচ্চ স্থানে উঠে দড়িতে টান দিয়ে তুলে নিতে হয় নিম্নস্থ অভিযাত্রী সহকারীদের। এমনি ভাবেই যথাক্রমে চলে সেই পর্ব্বতারোহণের বিচিত্র অভিযান! মুহূর্ত্তের অবহেলায়, হাত-পা ফস্কে গিয়ে কোথায় যে হারিয়ে যাবে, তার স্থিরতা নেই। সব চেয়ে বড় বিপদ হয় যখন নেমে আসে প্রবল তুষারস্রোত অথবা কোনও বরফের বিরাট স্তূপ—আর রক্ষা নেই—মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে হয়ে যায় সেই অভিযাত্রী দল! তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের বুকে রচিত হয় তাদের জীবন্ত সমাধি—সাক্ষী থাকে উর্দ্ধে ঐ অনন্ত নীলাকাশ! কিন্তু এই বিপদ নিশ্চিত জেনেও ছুটে যায় মানুষের মন সেই পর্ব্বতের দুরারোহ উচ্চতায়। কোনো বাধা তার পথ অবরুদ্ধ করতে পারে না, কোনো বিপদ তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে সক্ষম হয় না—প্রকৃতির ঝঞ্ঝা-ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে মর্ত্ত্যের মানব চায় তার স্বপ্নের সার্থকতা! সৃষ্টির আদিযুগ হতে আজ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলেছে মানুষের এই কঠোর আত্মপরীক্ষা।

তাই বহু দিন পরে মানুষ তার কল্পনাকে সত্যে পরিণত করেছে এই সেদিন শ্রীতেনজিং শেরপা ও স্যর এডমণ্ড হিলারীর মধ্য দিয়ে। আমরা শুনে স্তম্ভিত হয়েছি, আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছি মানবের প্রকৃতি-বিজয় অভিযানে নূতনতম সাফল্যের সংযোজনায়। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় যা মুদ্রিত হবে, তার সম্পূর্ণ বিবরণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। সেই সত্যানুসন্ধানেই এখানে আমি কিছু বলতে চাই—"Almost simultaneously" এই কথাটার কোনও অর্থই হয় না। কারণ, সে জায়গাটা এমন নয় যে মিলিটারী কায়দায় দু'জনে ঠিক একসঙ্গে সেখানে পা ফেলে উঠতে পারে। তাই যিনিই প্রথম এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে পদার্পণ করেছেন, তাঁর নামই ইতিহাসের পাতায় চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে থাকা উচিত। একথা সবাই জানেন যে, শিকারে, যার গুলী বাঘের গায়ে প্রথম লাগে, বাঘটা dead shot না হয়ে যদি অন্য শিকারীর ঘায়ে পরে নিহত হয়, তথাপি শিকার প্রথম শিকারীরই প্রাপ্য—

সেইরূপ আমিও জানতে চাই, হিলারী অথবা তেনজিং—কে এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গে প্রথম পদার্পণ করেছিল? প্রথম কৃতিত্ব কার? ঘণ্টা-মিনিটের কথা ছেড়ে দিয়ে, কয়েক মুহূর্ত আগেই হোক না কেন, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারেরও বিশেষ দায়িত্ব আছে।

স্যর জন্ হাণ্ট, স্যর এডমণ্ড হিলারী ও শ্রীতেনজিং শেরপা লোককে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে জানা যায় যে, শ্রীতেনজিং ও স্যর এডমণ্ড প্রায় একই সঙ্গে এভারেষ্ট-শৃঙ্গে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—এভারেষ্ট-শৃঙ্গের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে স্থানে পৌছান গিয়েছিল, সেখান হ'তে একযোগে পাশাপাশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়; এস্থলে হয় শ্রীতেনজিং শেরপা অথবা স্যর এডমণ্ড—দু'জনের কোনও একজন প্রথমে এভারেষ্ট-শৃঙ্গে পৌছেছিলেন। এই প্রথম ব্যক্তিটি কে? স্যর এডমণ্ড না তেনজিং? উভয়েই এ বিষয়ে প্রকাশ্য ভাবে নিস্তব্ধ। 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার গত ২৫শে জুনের সংস্করণে পঞ্চম পাতায় ষষ্ঠ স্তম্ভে প্রকাশিত কর্ণেল হাণ্টের বিবৃতিতে দেখা যায় যে, কলিকাতায় আগমনের প্রাক্কালে পাটনায় তিনি বলেছিলেন যে "কে প্রথম এভারেষ্ট-শৃঙ্গে পদার্পণ করেছে, এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ উভয়েই প্রায় একসঙ্গে এভারেষ্ট-শৃঙ্গে পৌছেছেন।" যদিও কর্ণেল হাণ্ট স্বীকার করেছেন যে, কে প্রথম পৌছেছেন এই প্রশ্নে বহু বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনও বিবরণ না দিয়ে সত্য গোপন করেছেন। সুতরাং সত্য প্রকাশের দাবী নিয়েই আমরা তাঁদের কাছে উপস্থিত হতে চাই। ২৫শে জুন তারিখে 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' প্রকাশিত বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে স্যর এডমণ্ড যে বিবৃতি দিয়েছেন, এবং গত ২৪শে জুন তারিখে রাজভবনে শ্রীতেনজিং ও স্যর এডমণ্ড যে বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে একটি বিরোধ দেখা দিয়েছে যে দক্ষিণের ২৮৫০০ ফুট উচ্চতায় পৌছুবার পর হ'তে কে অভিযানের পুরোভাগে ছিলেন—তেনজিং না হিলারী? শ্রীতেনজিং বলেছেন যে নবম শিবির হ'তে কখনো তিনি, কখনো হিলারী পুরোভাগে ছিলেন, কিন্তু স্যর এডমণ্ড বলেছেন যে দক্ষিণের সেই অবস্থান হতে তিনিই অভিযানের পুরোভাগে ছিলেন। এভারেষ্ট-বিজয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই প্রশ্ন হয়ত বেশী মূল্যবান্ নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে প্রকৃত তথ্যের উদ্‌ঘাটন একান্ত ভাবেই কাম্য এবং ভবিষ্যতের সমস্ত বাদানুবাদের সূত্র এখনই ছিন্ন করা প্রয়োজন।

গত ১১শে জুন তারিখের 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' প্রকাশিত তেনজিংএর যে আলোকচিত্র দেখা যায়—তাতে মনে হয় যে, কোনও নিম্নস্থান হতে সেই চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও স্যর এডমণ্ড হিলারী কোথাও বলেননি যে তেনজিং এর ফটো নেবার জন্য তিনি নীচে নেমে এসেছিলেন। এর থেকে এরূপ একটা সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যেতে পারে যে, উভয়েই খুব কাছাকাছি ছিলেন এবং তেনজিং পতাকা নিয়ে এভারেষ্ট-শৃঙ্গে পৌছিলে, স্যর এডমণ্ড নীচে হতে তাঁর আলোকচিত্র নিয়েছিলেন।

আমাদের মনে হয়, শ্রীতেনজিং এবং স্যর এডমণ্ড এখনও সমস্ত কথা বলেননি এবং তাঁদের কাছে আরও অনেক কিছু জানবার আছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, স্যর জন হাণ্ট শ্রীতেনজিং

শেরপা তেনজিং ও শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, তার প্রতিবাদে নেপালে শ্রীতেনজিং বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, তার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে, যদি তার সংশোধন করা না হয়, তবে তিনি "সব কথা ফাঁস করে দেবেন।"

ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম হতেই এই জিনিষটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এভারেষ্ট-বিজয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ইংরেজের; এটাই যেন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করবার একটা প্রবল চেষ্টা চলছে। ২৯শে মে এভারেষ্ট-বিজয় হয়েছিল, এই সংবাদকে প্রথমতঃ গোপন করে রাখা হয়, তারপর কাটমণ্ডুতে নেপাল রেডিও হ'তে সাঙ্কেতিক ভাষায় লণ্ডনে সে সংবাদ দেওয়া হয়, অথচ নেপালের রাজা ত্রিভুবনকে পর্য্যন্ত বৃটিশ রাজদূত সে সংবাদ জানিয়ে মামুলি ভদ্রতা দেখাবারও প্রয়োজন বোধ করেননি, যদিও তিনি রাজ-সমারোহে রাজা ত্রিভুবনেরই আতিথ্য গ্রহণ করে পরম সুখে অবস্থান করেন। পরদিন আমেরিকান রেডিও মারফৎ ভারতবর্ষ সে সংবাদ জানতে পারে।

প্রথম হতে আজ পর্য্যন্ত তেনজিংএর আচরণ লক্ষ্য করলে সুস্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, যেন কোনও একটা বিশেষ প্রভাব তার উপর প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এভারেষ্ট হতে কাটমণ্ডু, কলিকাতা, দিল্লী এবং লণ্ডন পর্য্যন্ত, এক দিকে যেমন তেনজিংএর সত্য গোপনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি কর্ণেল হাণ্ট ও এডমণ্ড হিলারীর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চ হয়ে উঠেছে সত্য গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টায় এবং এভারেষ্ট-বিজয়ের কৃতিত্ব একমাত্র যেন বৃটিশ জাতির বিজয় বলে জাহির করার কার্য্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। বিলাতের বিভিন্ন পত্রিকা, এমন কি স্যর উইনষ্টন চার্চিল পর্য্যন্ত এই গৌরব বৃটিশের জাতিগত বলে দাবী করার ব্যগ্রতা প্রদর্শন করতে পেছপা হননি।

গত ২০শে জুন প্রথম নেপাল রেডিও হতে তেনজিংএর একটি বিবৃতি প্রচার করা হয় যে, তিনি হিলারী অপেক্ষা পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে এভারেষ্ট-শৃঙ্গে পৌছেন। সেই দিনই 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেন যে এভারেষ্ট-বিজয় সকলের সমবেত চেষ্টার ফল এবং যদি তাঁর সহযোগী তাঁর কিছু পশ্চাতেও থাকেন, তবে তাতে কিছু এসে-যায় না।

ঠিক তার পরদিন হিলারী প্রতিবাদ করে জানান যে, তিনি প্রথম চূড়ায় ওঠেন এবং তেনজিং দড়ির অপর প্রান্তে ছিলেন। পরে বলেন যে, এভারেষ্ট-শৃঙ্গ এমন ভাবে সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে যে একজনের বেশী সেখানে দাঁড়াতে পারে না। তাহ'লে ত এই দাঁড়ায় যে simultaneously কথাটাই মিথ্যা এবং তেনজিং মোটেই উপরে ওঠেননি!

আসল কথা এই মনে হয় যে, হিমালয়ের উপর দিয়ে কাটমণ্ডুতে পৌছুবার পথেই তেনজিংকে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, অথবা হয়ত নানারূপ প্রলোভন দেখিয়ে তার মস্তিষ্ক চর্ব্বণ করা হয়েছিল, যার ফলে ২১শে জুন নেপাল রেডিওতে তেনজিং বলেন, "almost simultaneously—almost together" এমন কি, কর্ণেল হাণ্ট তেনজিংকে তাঁদের উপদেশ মত বিবৃতি প্রকাশে প্ররোচিত করেছেন—না হলে, ভয় দেখিয়েছেন—তেনজিংকে বিলেতে নিয়ে যাওয়া হবে না।—(হিন্দুস্থান টাইমস্, ২১শে জুন)

সব চাইতে মজার ব্যাপার এই যে, তেনজিংকে এভারেষ্ট অভিযাত্রী দলের সদস্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি। মোটের উপর এভারেষ্ট বিজয়ের যে কাহিনী বৃটিশ অভিযাত্রী দল প্রচার করেছেন—তার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক এবং ফাঁকি রয়ে গিয়েছে।

আর একটি সংবাদে প্রকাশ, কর্ণেল হাণ্ট ভারতের জাতীয় পতাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে দেননি। কিন্তু দার্জ্জিলিঙ হ'তে বিদায় নেবার সময় তেনজিং-এর এক বাঙ্গালী বন্ধু শ্রীরবীন্দ্র মিত্র, তেনজিংকে একটি জাতীয় পতাকা দেন এবং তেনজিং সেটা তাঁর জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন এবং সেই পতাকাই এভারেষ্ট-শৃঙ্গে উত্তোলন করেন। এই পতাকা উত্তোলন ব্যাপারটিও পূর্ব্বেই ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীরা প্রকাশ করায় কর্ণেল হাণ্টকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাটমণ্ডুতে স্বীকার করতে হয়েছে।

কর্ণেল হাণ্টকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তিনি সৈন্য বিভাগের লোক এবং যে সময় এখানে বৈপ্লবিক যুগ চলেছে তখন সেটাকে নির্মূল করবার জন্যে তিনি সানন্দে বাঙ্গলায় শুভাগমন করেন।

লণ্ডন ৫রা জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, লণ্ডনে এভারেষ্ট বিজয়ী দল উপস্থিত হলে জনসাধারণ তেনজিংকে প্রশ্ন করেন—কে সর্ব্বপ্রথম এভারেষ্ট-শৃঙ্গে পদার্পণ করেছেন? শ্রীতেনজিং এ সম্বন্ধে কিছু বলতে অস্বীকার করেন! হয়ত পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী শ্রীতেনজিং সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলার আর্ট এখনও শেখেননি। কিন্তু যখন স্যর জন্ হাণ্ট তাঁর সেই মামুলি উত্তর দেন, "Simultaneously" তখন তেনজিং নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আজ সব চেয়ে যে বড় প্রশ্নটি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, তা হল এই যে, এভারেষ্ট-শৃঙ্গে সর্ব্বপ্রথম কে পদার্পণ করেছে—তেনজিং না হিলারী? ইতিহাস সত্যের বাহক। সত্য প্রকাশের দাবী নিয়ে জনসাধারণ আজ তাই তাঁদের সামনে দাঁড়িয়েছে—সত্য ভাষণের সাহস তাঁদের হবে কি?

আজ নিখিলের নর-নারী এই অভিযাত্রিগণের বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছে। তেনজিং ও হিলারীকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য প্রতি মানুষের অন্তরে জেগে উঠেছে বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার আকুলতা। এই নিয়েই আমিও সেদিন গিয়েছিলাম কলিকাতার রাজভবনে তেনজিংকে দেখতে; তাঁর স্পর্শে এসে সেই ধবল-তুষার-মৌলি হিমাদ্রি বিজয়ের প্রাণচঞ্চল উন্মাদনা অনুভব করতে। আমার সঙ্গে ছিল পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনারায়ণ, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ ভূপেন্দ্র নারায়ণ, আর আমার আত্মীয় স্যর ইউ এন্ ব্রহ্মচারীর কনিষ্ঠ পুত্র, সম্বন্ধে আমার বৈবাহিক ডাঃ নির্ম্মলকুমার ব্রহ্মচারী, এস্ সি, পি-আর-এস্। রাজভবনে যখন আমার সঙ্গে শ্রীতেনজিংএর সাক্ষাৎ হয়, সামনে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রাদেশপালের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীগৌরেন সেন। আমি ছুটে গিয়ে শ্রীতেনজিংকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম, 'Hallo, Lucky seven!" তিনিও তাঁর পেশীবহুল ছোট হাত দু'খানি দিয়ে আমাকে নিবিড় ভাবে বেঁধে ফেল্লেন। আমার সঙ্গে ছিলেন দোভাষী হিসাবে ডাঃ মৈত্রী, এম্ ডি। তিনিও দার্জ্জিলিংএর অধিবাসী। তেনজিংকে তিনি

অলসের স্বপ্ন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সোভিয়েট সে তো স্টেটের রাজ্য নামে পেট ভরে হায়।
লুণ্ঠন করে এসে সেথা লোক, বণ্টন করে খায়।
মোর, প্রাণ সেথা যেতে চায়।

কিছু নাই কারো, সবারি যে সব, কিছুরি নাহিক ত্রুটি,
চাহিলেই মিলে মাংস মিঠাই পনীর মাখন রুটি।
সেথাকার সব গাভী কামদুধা, সবে আছে দুধে-ভাতে,
সকল জমিই লক্ষ্মীজোল যে, সোনা ধান ফলে তাতে।
ভরা সাধের ভরা তাহার জল মিঠা মধুবৎ,
চিনি কি মিছরি কিছুই লাগে না তুলিলেই সরবৎ।
খাটিতে হয় না সে বীর মাটিতে
দ্বিগুণ ফসল পায়,
মোর প্রাণ সেথা যেতে চায়।

আপেল আঙুর পীচ ফলে আছে পেস্তা ও কিসমিস্
অবারিত দ্বার, ভোজ এন্তার, যত খাস্ নিস্ দিস্।
বরফ সেখানে কুলপী বরফ, পাথর পরশমণি,
কামড়ায় না কো ফণায় মাণিক লয়ে ঘোরে-ফেরে ফণি
দুর্ভিক্ষ কি অনটন নাই, লেগে আছে উৎসব,
মহামারী নাই, মরিলে বাঁচায়, ভিষক্ মেচ নিকফ।
সব ফুল সেথা পারিজাত ফুল—
গন্ধে ও সুষমায়,
মোর প্রাণ সেথা যেতে চায়।

ষ্ট্রাইক নাহিক, নাহি হরতাল, অথবা ধর্ম্মঘট,
চুরি কি ডাকাতি কি হেতু করিবে? সব সাধু, নাহি শঠ।
নাহি আদালত বিচার খরচ জবাব বা আর্জ্জি,
নাহি কো বিশ্ববিদ্যালয় কি শম্ভু ব্যানার্জ্জি।
নাহি কো রানার রিক্সাওয়ালা পাল্‌কী-বেহারা মুটে
কলের মানুষে এ সকল করে সদা ফিরে তারা ছুটে।
'সিডম্যান রী'র মতন পাগলও
তিন দিনে সেরে যায়,
মোর প্রাণ সেথা যেতে চায়।

প্রশ্ন করলেন তাঁদের ভাষায়, তার পর আমাদের বুঝিয়ে দিলেন ইংরেজীতে।

তুষারশার্দ্দূল তেনজিং। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমস্ত জীবনটাই কেটেছে হিমালয়ের গহনে, তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য পথে। বার বার সাত বার নূতনতর উৎসাহে ছুটে চলেছে তেনজিং—হিমালয় ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে—সফল হয়নি তার কৈশোরের স্বপ্ন, তার যৌবনের উন্মাদনা। কিন্তু অবশেষে হিমালয়কে মান্‌তে হয়েছে মানুষের যুগ-যুগান্তের দাবী।

অদ্ভুত মানুষ এই তেনজিং। নিরহঙ্কার, হাস্যময়, প্রাণের আলোয় সমুজ্জল সেই নির্ভীক্ বীরের সাহচর্য্যে এসে মুগ্ধ হলাম। তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "এভারেষ্ট-শৃঙ্গে প্রথম পদার্পণ কে করেছিল?" উত্তরে পেলাম একটা উচ্ছল হাসি। আমি বল্‌লাম, "শুধু হাসি দিয়ে ফিরিয়ে দিলে চল্‌বে না, আমি ওইটুকুই জান্‌তে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।" আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই শুনেছেন যে সমস্ত বিবরণ তাঁর কাছে পেলাম; "কিন্তু সে সব কথা আজ বল্‌বার উপায় নেই, অন্ততঃ যত দিন শ্রীতেনজিং সে বিষয়ে লিখিত ভাবে কিছু না বলেন।

একশ' বছর আগে বাঙ্গালী রাধানাথ শিকদার সর্ব্বপ্রথম জানিয়েছিল এভারেষ্টের অস্তিত্ব আর উচ্চতা। একশ' বছর পরে ভারতের মৃত্যুঞ্জয়ীপ্রাণ তেনজিং এভারেষ্ট-গিরি-শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে জগৎকে জানিয়ে দিল—"ভারতবর্ষ আজো বেঁচে আছে!"

মৃত্যুজয়ী শ্যামাপ্রসাদ

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

কাশ্মীরের সহিত ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাঙ্গলার অদ্বিতীয় জননেতা ভারতের জন-হৃদয়-সম্রাট্ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বন্দিরূপে জীবন-বিসর্জ্জন দিলেন! পাকিস্থান রচনায় ভারত-জননীর একবার অঙ্গচ্ছেদে যে বেদনা অনুভূত হইয়াছিল—পুনরায় কাশ্মীরকে পৃথক্ করিবার কল্পনা—শ্যামাপ্রসাদের হৃদয়কে আলোড়িত ও উন্মথিত করিয়াছিল। দেশের দুর্ভাগ্য—তাঁহার এই বেদনা দেশবাসী তেমন ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই—তাই শ্যামাপ্রসাদ লোকের চৈতন্য-সঞ্চারের জন্য স্বয়ং কারাবরণ করিয়া দেশকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সত্যাগ্রহ চলিতেছিল,—সংবাদপত্রেও শ্যামাপ্রসাদের বাণী নিত্য প্রচারিত হইতেছিল, তথাপি তাঁহার মনে হইয়াছিল—এ আন্দোলনও পর্য্যাপ্ত নহে। কংগ্রেস নিজ-নীতিভ্রষ্ট হইয়া কাশ্মীরকে যে-ভাবে খণ্ডিত ও ভারত হইতে পৃথক্ করিতে চাহিতেছিল,—শ্যামাপ্রসাদ তীব্র ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিলেও কংগ্রেস-নেতাদের চৈতন্যোদয় হয় নাই। যে নীতির জন্য সমগ্র দেশীয় রাজন্যবর্গকে ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গের সহিত মিলিত করা হইল, স্বর্গত পেটেল মহোদয় যে কার্য্যের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন,—আজ পেটেল মহোদয়ের অভাবে সেই নীতি—সেই একতাবন্ধন-কার্য্য—কাশ্মীর-সমস্যা সমাধানের সময়ে ব্যাহত করিতে দেওয়া ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের সূচনা করে সন্দেহ নাই। হায়দ্রাবাদ সমস্যা-সমাধানের সময়েও কংগ্রেস পক্ষ হইতে যে নীতির অনুসরণ করা হইয়াছিল, কাশ্মীরের সময়ে তাহার অন্যথা-চরণ—শ্যামাপ্রসাদ সহ্য করিতে পারেন নাই। আজ কাশ্মীরকে পৃথক্ রাষ্ট্ররূপে গণ্য করিলে কালই হায়দ্রাবাদ সেইরূপ দাবী উত্থাপন করিতে পারে, রাজস্থানের বহু দেশীয় রাজন্যও এই ভাবে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে—তাই শ্যামাপ্রসাদ ভারতের চিরন্তন কল্যাণের জন্য, কংগ্রেসের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য, কেবল সত্যাগ্রহীদের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছিলেন, এই কাশ্মীর-সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়াই হিন্দু-মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রামরাজ্য পরিষদের পূজ্য স্বামী করপাত্রীজী, শ্রীনন্দলাল শর্ম্মা প্রভৃতি নেতৃগণও শ্যামাপ্রসাদকে পূর্ণ সমর্থন করিয়া উক্ত আন্দোলনকে সফল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হায়! বুঝি, ইহাতেও শ্যামাপ্রসাদের চিত্ত সন্তোষ লাভ করে নাই! তাই কারাগারের মধ্যে শেষ অর্ঘ্যরূপে নিজের জীবনকে ভারত-জননীর চরণে উপহার দিয়া শহীদ বীররূপে চির-কীর্ত্তিমান হইয়া রহিলেন! আজ যদি কংগ্রেসী-নেতাদের মনুষ্যত্ব বিক্রীত হইয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে শ্যামাপ্রসাদের জীবন-মূল্যে যেন তাঁহার সাধের কাশ্মীরের অখণ্ড-সত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, দেশবাসীও বুঝিবে—শ্যামাপ্রসাদের জীবন ব্যর্থ যায় নাই—ভারত-জননীর শিরোদেশের একাংশ—কাশ্মীরকে বাঁচাইবার জন্য শ্যামাপ্রসাদ আত্মজীবন দান করিয়া গিয়াছেন। দধীচির মত অস্থি দান করিয়া দানবের অত্যাচার হইতে ভারত-স্বর্গকে বাঁচাইবার জন্য শ্যামাপ্রসাদ আত্মাহুতি দিয়াছেন। হে শ্যামাপ্রসাদ! তোমার বিরহে তোমার বৃদ্ধা জননী ও বঙ্গজননী সমভাবে মুহ্যমান হইলেও—তোমার মুখের দিকে চাহিয়া শরণার্থীরা জীবনধারণ করিলেও—তোমার সৌর কিরণের মত গৌরবালোকে তাঁহারা চির-উদ্দীপ্ত থাকিবেন! মৃত্যুর মধ্যেও তোমার অমৃতবাণী—তোমার জীবনকাহিনী সমগ্র ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিবে। তোমার মৃত্যু হয় নাই—মৃত্যুর নামে ভারতকে অমৃত-দান করিয়া গিয়াছ। এই অমৃতের আস্বাদে মুমূর্ষু কাশ্মীর নব-জীবন লাভ করুক, ভারতের সহিত তাহার অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠিত হউক। আজ ভারতের বক্ষে—তোমার মৃত্যুরূপী এই বজ্রাঘাত নিদ্রিত অর্দ্ধচেতনাগ্রস্ত—অবসন্ন এই জাতিকে জাগাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করুক। এই মরণের জন্য যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয়, যদি তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়—তাহা হইলে আমরা কাঁদিব না—আমরা তোমার এই মরণকে পরম-কল্যাণময় দেব স্বরূপে হৃদয়-সিংহাসনে চিরদিন পূজা করিব। তুমি বাঙ্গলার ব্যাঘ্র স্বরূপ আশুতোষের যোগ্য সন্তান, রত্নগর্ভা তোমার জননীর মুখোজ্জ্বলকারী—বীর-পুত্র—আজ তোমার এই প্রয়াণ তোমার বংশোচিত কীর্ত্তিকে সমুজ্জ্বল করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়া সমগ্র ভারতকে যশোমণ্ডিত করিয়া সর্বজনবরণীয় হইবে। পার্লামেন্টে তোমার অখণ্ডনীয় যুক্তিজাল শ্রবণ করিবার জন্য তোমার বিপক্ষ-পক্ষও উৎসুক হইয়া থাকিত। আজ হইতে সে যুক্তিপূর্ণ বাণী রুদ্ধ হইলেও—তোমার জীবনদানের মৌনপ্রভাব দেশবাসীর হৃদয়কে নিরন্তর স্পন্দিত করিবে—সন্দেহ নাই। আজ লক্ষ লক্ষ লোক তোমার শবদেহের-সম্মানার্থ কি আবেগে ছুটিয়াছে—তাহা দেখিলে মনে হয়—সত্যই তুমি ভারতের জন-হৃদয়-আসনে সম্রাটের মত বিরাজিত ছিলে এবং চিরদিন থাকিবে। তোমার সঙ্কল্পিত মহান আদর্শ জয়যুক্ত হউক—তোমার অভীপ্সিত ভারতের অখণ্ডতা প্রীতিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক। পৃথিবীর সমস্ত নর-নারী তোমার এই আত্মত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করিয়া ভারতের প্রতি প্রেম ও মর্য্যাদা প্রদান করুক

স্মরণীয় স্মরণে

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

শ্যামার প্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ
শুদ্ধ সত্য যা-কিছু তা,
সঙ্গে ক'রে এনেছিলে ;

বাংলা মায়ের শান্ত ছেলে
সংগ্রামী বীর দেশের তরে
হেসে আত্মবলি দিলে।

শ্যামাপ্রসাদ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"জন্মিলে মরিতে হ'বে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে !"

এ কথা সত্য। কিন্তু যখন জীবনের মধ্যাহ্নে, আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তির পূর্ব্বে, বহু লোকের আশার কেন্দ্র কর্ম্মবীরের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত তিরোভাব ঘটে, তখন মানুষের মন বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহা অনিবার্য্য। সেই জন্যই গত ৯ই আষাঢ় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতরাষ্ট্রে শোকের নিবিড় ছায়া—বর্ষার আকাশে সান্দ্র অন্ধকারের মত লক্ষিত হইয়াছে। একাধিক কারণ সেই শোকের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি দেশ বিভাগের পরে কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত রাখিবার চেষ্টায়—ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ও কাশ্মীরের প্রধান সচিব শেখ আবদুল্লার কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রভুক্ত এই উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কাশ্মীরে যাইয়া বন্দিদশায় দেহরক্ষা করিয়াছেন ; স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে বন্দিদশায় অনাদরে এবং চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ত্রুটিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দেশের লোক তাঁহার অসুস্থতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাইয়াছিল—তাঁহার রোগ-সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু রহস্যাচ্ছন্ন এবং সেই জন্য তাহা লোকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে।

জন্ম ও শিক্ষা

কলিকাতায় ভবানীপুর পল্লীতে পিতামহের গৃহে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম হয়। তিনি পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার যখন জন্ম হয়, তখন তাঁহার পিতা আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররূপে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে উকীল হইয়া ভবিষ্যৎ গৌরবের ভিত্তিস্থাপন করিতেছেন। আশুতোষের পিতা পুত্র শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং আশুতোষ সেই গুণ উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। মিত্র ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্যামাপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বি, এ, ও দুই বৎসর পরে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। উকীল হইবার কয় বৎসর পরে তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। কিন্তু উকীল হইবার পরে যেমন ব্যারিষ্টার হইয়া আসার পরেও তেমনই, তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় কখন মনোযোগ প্রদান করেন নাই ; করিলে যে তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ শ্রমশীলতা ও বাগ্মিতা হেতু সে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। শুনিয়াছি, পিতা আশুতোষের কল্পনা ছিল, তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় মত প্রচারের জন্য সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং শ্যামাপ্রসাদকে সাংবাদিক করিবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। পিতা পুত্রকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে আপনার সহকারী করিয়া শিক্ষাদান করিয়াছিলেন—ফলে পুত্র—পিতারই মত—বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের কার্য্য নখদর্পণে দেখিতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই তাঁহার শিক্ষার পরিমাপ ছিল না। যাহাকে continuous student বলে তিনি তাহাই ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনে বিরতি ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য সম্পর্কে তাঁহাকে বিদেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি প্রভৃতি জানিতে হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

শ্যামাপ্রসাদ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" হন। বলা বাহুল্য, পিতার প্রভাব তাঁহার ঐরূপ অল্প বয়সে "ফেলো" হইবার অন্যতম প্রধান কারণ ; কিন্তু সে প্রভাব অন্যতম কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে—যোগ্যতাও অন্যতম কারণ। "ফেলো" হইবার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত করিতে থাকেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে দুই বিষয়ে—সাহিত্যে ও আইনে—"ডক্টর" উপাধি দেন ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার মনোনীত হ'ন। কথিত আছে, তাঁহার পূর্ব্ববর্তী ভাইস-চান্সেলার কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচনার জন্য চান্সেলার গভর্ণরের নিকট গমন কালে শ্যামাপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ; গভর্ণর যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহাই ভাইস-চান্সেলার শ্যামাপ্রসাদকে

বোড়াল গ্রামে শ্যামাপ্রসাদ

উত্তর দিতে বলায় গভর্ণর বলিয়াছিলেন—তবে ত শ্যামাপ্রসাদকেই ভাইস-চান্সেলার মনোনীত করা ভাল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা-ব্যবস্থা তিনি কিরূপ ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয়তার আগ্রহে কংগ্রেস মুসলমানদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য লীগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইতেছিল—মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অধিকার দাবী করিতেছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যয়ের আলোচনায় সুযোগে মিষ্টার রহমান যখন বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটীতে মুসলমান প্রতিনিধি-সংখ্যা অল্প, তখন শ্যামাপ্রসাদ বলেন, মুসলমানরা সম্প্রদায় হিসাবে শিক্ষাবিস্তারে আশানুরূপ আগ্রহের পরিচয় দেন নাই। কারণ—

(১) স্কুলে ও কলেজে ছাত্রদিগের শতকরা ৮০ জন হিন্দু ও মাত্র ১৯ জন মুসলমান।

(২) পূর্ব্ববর্তী ৪ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দান হিসাবে সে ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক জন ভারতীয় খৃষ্টান ২৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন—আর ৫ বৎসরে মুসলমানের দান—মাত্র ৬ শত টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার পিতারই মত মনোযোগ দান ও সময় ব্যয় করিতেন। তিনি নানা বিভাগে শিক্ষার ফ্যাকাল্টীর সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ইংরেজ এ দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা যে দেশের লোকের সংস্কৃতির, শিল্পের ও উন্নতির জন্য নহে, তাহা হাণ্টারও স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশের লোক ক্রমে বুঝিবে—"The end of natioual education is not to create a vast clerkly class but to fit all classes for their national work." অরবিন্দ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি বর্জনের সমর্থনে বলিয়াছিলেন—

"We are dissatisfied with the conditions under which education is imparted in this country, its calculated poverty, and insufficiency, its anti-national character, its subordination to the Government * * *"

শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভাইস-চান্সেলারের অভিভাষণে এই মতেরই সমর্থন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ছাত্রের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলাররূপে তিনি—সরকারের নিকট হইতে আবশ্যক সাহায্য না পাইলেও

(১) বিজ্ঞান বিভাগের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে সমাদৃত;

(২) যে কৃষিকার্য্যে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক জীবিকার্জ্জন করে, তাহা অবজ্ঞাত থাকা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর বুঝিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন;

(৩) বিহারীলাল মিত্রের প্রদত্ত অর্থে তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন করেন;

(৪) তিনি শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন—কারণ, যে শিক্ষক কেবল যাহা শিখাইবার তাহার অতিরিক্ত আর কিছু জানেন না, তিনি শিক্ষকই নহেন;

(৫) তিনি পুরাতত্ত্বের আলোচনার সুবিধার জন্য আশুতোষ মিউজিয়ামের ও অধ্যয়নসৌকর্য্যের জন্য পুস্তকাগারের সুব্যবস্থা করেন;

(৬) তাঁহার আগ্রহে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচিত হয়;

(৭) তাঁহার ব্যবস্থায় অনেকগুলি বিভাগের বাঙ্গালা পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়;

(৮) ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা প্রদানের চেষ্টায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সকল ব্যতীত তিনি ছাত্রদিগের কল্যাণকর বহু কার্যে যে ভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালার শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই প্রসঙ্গেই আমরা, তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের প্রস্তাবের প্রতিবাদের উল্লেখ করিব। সেই প্রতিবাদ যে আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, শ্যামাপ্রসাদ তাহার নেতৃগণের অন্যতম ছিলেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা সেই আন্দোলন শক্তিশালী করিবার অন্যতম কারণ হইয়াছিল।

রাজনীতিক্ষেত্রে

শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই, বোধ হয়, বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ অনিবার্য্য। বহুদিনের কথা—বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির আসন হইতে আশুতোষ চৌধুরী—বিপিনচন্দ্র পালের মতানুসারে—একটি স্মরণীয় উক্তি করিয়াছিলেন—পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। তাহারই প্রতিবাদে—পরে—সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—পরাধীন জাতির রাজনীতি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অবশ্য সে রাজনীতি—প্রজানীতি। পরাধীন জাতি রাজনীতিক মুক্তিলাভ না করিলে তাহার সর্ব্ববিধ উন্নতির শক্তি পঙ্গু হয়। ম্যাটসিনী সেই জন্যই বলিয়াছিলেন—মূল সমস্যার সমাধান না করিলে অন্যান্য সমস্যা সমাধানের আশা দুরাশামাত্র। কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান বিচারক যথার্থই বলিয়াছেন; শ্যামাপ্রসাদ যে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গত হইয়াছিল। কারণ, তিনি আদালতে তাঁহার মক্কেলদিগের জন্য বিচার দাবীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া সমগ্র দেশবাসীর জন্য বিচার দাবী করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁহার অসাধারণ শক্তি দেশবাসীর বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই রাজনীতিক কার্যের জন্যই তিনি পরে সংবাদপত্র পরিচালনের প্রয়োজন অনুভব করিয়া 'ন্যাশনালিষ্ট' ইংরেজী দৈনিকপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পত্র তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া পরিচালিত করিতে না পারায়—হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্ব হারাইয়া পাণ্ডবদিগের যে অবস্থা হইয়াছিল—তাঁহাকে হারাইয়া ঐ পত্রের সেই দশা হইয়াছিল।

তখন বাঙ্গালা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে বিব্রত ও বিপন্ন।

ইংরেজদিগের চক্রান্তে মুসলমানরা লর্ড মিণ্টোর সময় হইতে যে দুরাশা পোষণ করিতেছিলেন, তাহা দিন দিন পুষ্ট হইয়া বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছিল। বাঙ্গালায় মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনের পরে যখন কংগ্রেসের পরিচালকরূপে শরৎচন্দ্র বসু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃরূপে সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন গান্ধীপ্রমুখ অবাঙ্গালী কংগ্রেস নেতারা তাহাতে বাধা দেন। ইতোমধ্যে মুসলমানরা দলাদলি বর্জ্জন করিয়া পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ' দল হইয়া উঠেন এবং সাম্প্রদায়িকতার জয়যাত্রা আরম্ভ করেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুর সঙ্গত স্বার্থ রক্ষার জন্য—সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচনায় নহে—হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং সত্বরই তথায় প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু তিনি যে সাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী ছিলেন না, সে বিষয়ে আমরা তাঁহার শিক্ষাগুরু—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত একমত। তিনি হিন্দুদিগের সম্বন্ধে অবিচারের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন—হিন্দুদিগের জন্য কোন অসঙ্গত অধিকার বা ব্যবহার চাহিতে ঘৃণা বোধ করিতেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যের গৌরব অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার অন্য কার্য্যের গৌরব ম্লান করিয়াছে—তাহা অবশ্যম্ভাবী।

ফজলুল হকের আহ্বানে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘে যোগ দিয়া অর্থ-সচিব হইয়াছিলেন। তিনি যে মসলেম লীগ-প্রভাবিত সচিবসঙ্ঘে যোগ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসাম্প্রদায়িকতার পরিচায়ক। তিনি এই আশায় সচিবত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আপনার প্রভাবে ও চেষ্টায় বাঙ্গালার কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন, সাম্প্রদায়িকতার দাবানল উদারতার স্নিগ্ধ বর্ষণে নির্ব্বাপিত করিতে পারিবেন।

সে আশা সফল হয় নাই; না হইবার প্রধান কারণ, বাঙ্গালার তৎকালীন গভর্ণর ও ইংরেজ আমলাতন্ত্র—আর উগ্র সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট নিয়াজ মহম্মদ খাঁনের মত মুসলমান রাজকর্ম্মচারী। গভর্ণর হার্বাট সম্বন্ধে আমরা অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। পদত্যাগপত্রে শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব—

"It is amazing how in every matter concerning the rights and liberties of the people or where racial considerations were likely to arise, you have acted with singular indifference to the genuine interests of the people of this Province."

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করেন। তাহার পূর্ব্বে ১২ই আগষ্ট তিনি বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস যে দাবী করিয়াছেন, তাহাই জাতির দাবী। তিনি বড়লাটকে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

গভর্ণর হার্বাট যুদ্ধের সুযোগ লইয়া ও ভয়ে বঞ্চন-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া নৌকা অপসারিত করেন। তাঁহার বিষয় আর আলোচনা করিতেও ঘৃণাবোধ হয়।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর প্রবল বাত্যা ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে মেদিনীপুরের কতকাংশ বিধ্বস্ত হয়। পূর্ব্ববর্তী আগষ্ট মাস হইতে মেদিনীপুর রাজনীতিক কারণে—স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঘোষণা করায়—সরকারের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল। সরকার মেদিনীপুরবাসীদিগকে দলিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজকর্ম্মচারীরা লোকের প্রাকৃতিক কারণে দুর্গতির সুযোগ লইয়া যে অমানুষিক অত্যাচার করেন, তাহা পৈশাচিক। গুলী চালনা অপেক্ষাও ভয়াবহ ব্যাপার—নারীধর্ষণ। সে সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে বাঙ্গালা গভর্ণরের অতিরিক্ত সেক্রেটারী লিখিয়াছিলেন, বলাৎকার আইনানুসারে অপরাধ—সুতরাং যাহারা অত্যাচার ভোগ করিয়াছে, তাহারা আদালতে নালিশ করিতে পারে। মেদিনীপুরে অত্যাচারের বিবরণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ মিত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যে সরকার এইরূপ কাজ করিতে পারেন, শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার সহিত থাকিতে পারেন না। তিনি পদত্যাগ করেন।

এই সময়ে তিনি বলেন, যদি দেশ স্বাধীন করিবার চেষ্টা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে প্রত্যেক আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসী অপরাধী।

পদত্যাগ করিয়া—সরকারী দায়িত্বের বন্ধনমুক্ত হইয়া—শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতিক কার্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু সেই সময়ে তিনি আর এক কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইলেন। সে কর্ত্তব্যের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। হয়ত সেই কর্ত্তব্যের জন্যই তাঁহার পদত্যাগের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাহা অজ্ঞাত শক্তির বিধান।

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

গভর্ণর হার্বাটের ও আমলাতন্ত্রের অনুসৃত নীতির ফলে ও সচিবসঙ্ঘের সাম্প্রদায়িকতা দোষে বাঙ্গালায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের যে দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত, তাহার পরে সমগ্র বাঙ্গালায় আর কখনও এমন দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। এই দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত নহে—মানুষের সৃষ্ট। সচিবসঙ্ঘের পক্ষ হইতে সহিদ সুরাবর্দ্দী সাংবাদিকদিগকে লিখিতে থাকেন—তাঁহারা যেন খাদ্য দ্রব্যের অভাব গোপন করিয়া বলেন,—অভাব নাই! বাঙ্গালার পথে, ঘাটে, মাঠে—অনাহারে মৃতদিগের শব; গ্রাম, ত্যক্ত; সহর শীর্ণকায় নরনারীতে পূর্ণ। সরকার মৃতের সংখ্যা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে অসম্মত; ভারত সরকার প্রকৃত সংবাদ বিদেশে প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কত লোকের মৃত্যু—দুর্ভিক্ষে—হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অসম্ভব। কাহারও কাহারও মতে—দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ২০ লক্ষ—কাহারও কাহারও মতে ততোধিক। প্রকৃত অভাব লোককে জানাইতে বাঙ্গালীর আপত্তি তাহার প্রকৃতিগত। হাণ্টার লিখিয়াছেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়েও "it was impossible to render public charity available to the female members of the respectable classes, and many a rural household starved slowly to death without uttering a complaint or making a sign."

এই অবস্থায় দেশবাসীকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করিয়া শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভাকে কর্মিসঙ্ঘে পরিণত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

দায়িত্ব যেমন বিশাল—সে দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষমতা তেমনই বিরাট।

এই সময় শ্যামাপ্রসাদ যাহা করিয়াছেন—গৌরবে তাহা অতুলনীয়। সে কাজ ভুলিবার নহে।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শরৎচন্দ্র বসু কলিকাতায় আসিলেই কংগ্রেসের পক্ষে বল্লভভাই পেটেল প্রভৃতি তাঁহাকে সমাদর করিয়া বোম্বাইএ যাইয়া বাঙ্গালায় কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন-ব্যবস্থা করিতে ভার দেন। যাইবার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র যখন আমাদিগের নিকটে আসিয়া বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তিনি স্থির করেন, অন্ততঃ দুর্ভিক্ষকালে লোকরক্ষার জন্য শ্যামাপ্রসাদকে একটি আসন দিতে হইবে। শ্যামাপ্রসাদ যখন সেই কাজ করিয়াছিলেন, তখন কংগ্রেস নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান—কার্যভার শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার সহযোগে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত হিন্দু মহাসভার কয়'জন নেতা শ্যামাপ্রসাদকে বলেন—পাঁচটি আসনের মধ্যে তিনটি হিন্দু মহাসভাকে দিতে হইবে। কংগ্রেস তাহাতে অসম্মত হইলেও কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্র চেষ্টা করেন যে, শ্যামাপ্রসাদকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইবে না। কিন্তু কংগ্রেস তাহাতেও সম্মত না হইলে শ্যামাপ্রসাদ স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রার্থী হ'ন! তখন দেশে কংগ্রেসের আদর অধিক। নির্বাচন জন্য প্রচারকার্য্য পরিচালনকালে শ্যামাপ্রসাদ পীড়িত হইয়া পড়েন। পরে শরৎচন্দ্রও কংগ্রেসী নেতাদিগের সহিত কাজ করিতে পারেন নাই। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে সাহায্য দানে শ্যামাপ্রসাদের কার্য্যের প্রশংসা করিতে কখন বিরত হ'ন নাই এবং শ্যামাপ্রসাদের অসুস্থাবস্থায় তাঁহাকে দেখিতেও গিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে শ্যামাপ্রসাদের যে সহৃদয়তার পরিচয় প্রকট হইয়াছিল, তাহাই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যাপারে দেখা গিয়াছিল। ভারত সরকারের পুনর্বাসন নীতির দৈন্য তাঁহার কেন্দ্রী মন্ত্রিমণ্ডল ত্যাগের অন্যতম কারণ।

কেন্দ্রী সরকারে

দেশবিভাগ যখন রোধ করিতে পারা গেল না—যখন পক্ষকাল পূর্ব্বেও "দেশবিভাগ পাপ"—এই মত প্রকাশের পরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ক্ষমতালোলুপ অনুবর্তীদিগের আগ্রহে দেশবিভাগে সম্মতি দিলেন এবং কার্যতঃ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই দেশ বিভক্ত হইল, তখন শ্যামাপ্রসাদ অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার পরে হিন্দু মহাসভার আর রাজনীতিক হিসাবে প্রয়োজন নাই বুঝিয়া তিনি তাহাকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

সেই সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই পেটেল প্রভৃতি (গান্ধীজীর পরামর্শে ও সম্মতিতে কি না জানি না) ইংরেজীতে যাহাকে line of least resistance বলে তাহা গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে দুইটি প্রবল প্রতিষ্ঠানের নেতা দুই জনকে মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করিলেন—হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের নেতা ডক্টর আম্বেদকার।

সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিলেন—আশা, দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের সুযোগ পাইবেন। তিনি সাগ্রহে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তিনি প্রথম আঘাত পাইলেন—যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলিলেন, পাকিস্তানের পক্ষে লিয়াকৎ আলী বুঝিয়া গিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা অগ্রিম দান হিসাবে দিয়া পাকিস্তান কায়েম করিতে সাহায্য করিবেন। ভারত সরকার সেরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তথাপি যখন গান্ধীজী অকারণ উদারতার পরিচয় দিয়া সেই জন্য অনশন আরম্ভ করায় সেই টাকা দেওয়া হইল, তখন শ্যামাপ্রসাদের মনে হইল, সে কাজ অসঙ্গত। তিনি হয়ত তখনই পদত্যাগ করিতেন; কিন্তু গান্ধীজীর হত্যায় সমস্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

জওহরলাল পাকিস্তান সম্বন্ধে যে দুর্ব্বল—তোষণনীতির অনুসরণ করিতেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ তাহার বিরোধী ছিলেন। সেই নীতি কাশ্মীরের ব্যাপারে সপ্রকাশ ছিল। তাহার পরে জওহরলাল লিয়াকৎ আলীর সহিত যে চুক্তি করিলেন, শ্যামাপ্রসাদ তাহা সমর্থন করিতে পারিলেন না। তাহার প্রধান কারণ, জওহরলাল পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে দারুণ অবিচার করিলেন। বাঙ্গালার প্রতি অবিচারই হইয়া আসিয়াছিল। গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যদি তিনি পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করিতে না পারেন, তবে নোয়াখালীতেই তাঁহার জীবনান্ত হইবে; তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। কলিকাতায় হত্যাকাণ্ডের পর তিনি শহিদ সুরাবর্দ্দীকে পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছিলেন। জওহরলাল স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী—পশ্চিমবঙ্গে তাহাদিগের জন্য যথেষ্ট স্থান নাই—তাহারা আসিতেছে কেন? বল্লভভাই পেটেল একবার বলিয়াছিলেন—যদি পাকিস্তান হিন্দুদিগকে প্রাপ্য অধিকার না দেয়, তবে তাহাকে হিন্দুদিগের জন্য আবশ্যক ভূমি দিতে বাধ্য করিতে হইবে—জওহরলাল সে মতের সমর্থন করেন নাই। যে রাজাগোপালাচারী বাঙ্গালাকে (ও পঞ্জাবকে) পাকিস্তানে দিয়া ক্ষমতা সম্ভোগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জওহরলাল তাঁহাকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালীকে অপমানিত করিয়াছিলেন। তিনি যে বাঙ্গালী হিন্দুর স্বার্থ দলিত করিয়া লিয়াকৎ আলীর সহিত চুক্তি করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

পদত্যাগ কালে শ্যামাপ্রসাদ যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট ও সবল। তিনি বলেন, তিনি পাকিস্তান সম্বন্ধে ভারত সরকারের নীতিতে কেবলই অস্বস্তি অনুভব করিয়াছেন। সে নীতি দুর্ব্বল, সে নীতিতে সঙ্গতির অভাব। ভারত সরকারের উদারতা পাকিস্তান কর্ত্তৃক দৌর্ব্বল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং তাহাতে ভারতবাসীর নিকটেও ভারত সরকার হেয় হইয়াছেন। ভারত সরকার কেবল আত্মরক্ষাতৎপর—পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি আক্রমণ করিতে অসম্মত; বাঙ্গালায়—দেশবিভাগে—যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা

প্রাদেশিক সমস্যা নহে, পরন্তু সর্ব্বভারতীয় সমস্যা এবং তাহার সমাধানের উপর সমগ্র জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করিবে।

শ্যামাপ্রসাদ বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা ভারতরাষ্ট্রের দ্বারা রক্ষিত হইবার পাত্র; কিন্তু ভারত সরকার তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না। অথচ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা পুরুষানুক্রমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভারত সরকার অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু নেহরু-লিয়াকৎ আলী চুক্তিতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

"The evil is far deeper and no patchwork can lead to peace. The establishment of a homogenous Islamic State is Pakistan's creed and a planned extermination of Hindus and Sikhs and expropriation of thier properties constitute a settled policy."

এই কথা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী প্রধান-সচিবও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু নেহরু সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

জনসঙ্ঘ

কংগ্রেস ও নেহরু সরকার দেশের শাসন ও শোষণকার্য্যে এক হইয়া যাইবার পরে—গণতন্ত্রের অনিবার্য্য অঙ্গ বিরোধী দল হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ "জনসঙ্ঘ" গঠিত করেন। বিধান পরিষদে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের কার্য্যের সমালোচনা করিবার জন্য বিরোধী দল প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনে শ্যামাপ্রসাদ জনসঙ্ঘ গঠিত করেন। কংগ্রেস ও সরকার সম্মিলিত হওয়ায় চাকরী, ঠিকাদারী, পার্মিট, সব দিবার অধিকারে অধিকারী সরকারী কংগ্রেসের দলের সহিত প্রতিযোগিতায়ও যে নির্ব্বাচনে নানা স্থানে—এমন কি সরকারের রাজধানী দিল্লীতেও জনসঙ্ঘের মনোনীত প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন, ইহাই জনসঙ্ঘের লোকপ্রিয়তার পরিচায়ক। শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে বন্দী—জনসঙ্ঘের ও হিন্দু মহাসভার বহু কর্ম্মী ভারতে বিনাবিচারে আটক—এই অবস্থায়ও দিল্লীতে জনসঙ্ঘের মনোনীত প্রার্থীর নির্ব্বাচনে জয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কংগ্রেসের দেশে প্রভাব লাভের জন্য কত বৎসরের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলে জনসঙ্ঘের স্বরূপ উপলব্ধ হইবে।

দেশের দুর্ভাগ্য রাজনীতিক্ষেত্রে বহু দল—দলাদলির দৌর্ব্বল্যের কারণ। কম্যুনিষ্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, মার্কসিষ্ট প্রভৃতি নানা দলের লোককে কোন কোন বিষয়ে এক করিয়া জনসঙ্ঘ কংগ্রেসী সরকারের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছে, তাহা শ্যামাপ্রসাদের অসাধারণ নেতৃত্ব ক্ষমতার পরিচায়ক। এ বিষয়ে তিনি আইরিশ রাজনীতিক্ষেত্রে পার্ণেলের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার মনীষা, তাঁহার বাগ্মিতা—এই সকলের সমাবেশে তিনি নেতার পদ অধিকার করিয়াছিলেন এবং বিরোধী দল ক্ষমতা লাভ করিলে তিনিই যে ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হইবার উপযুক্ততম পাত্র ছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গেই আমরা পার্লামেন্টে শ্যামাপ্রসাদের কার্য্যের উল্লেখ করিব। বাক্যবিশারদ জওহরলাল নেহরু যদিও অনেক সময়ে শ্যামাপ্রসাদের সমালোচনায় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অশিষ্টতার পরিচয় দিতেন, তথাপি শ্যামাপ্রসাদ কখন যুক্তি ব্যতীত কোন উক্তি করিতেন না। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে একবার ডিশরেলীর অশিষ্ট উক্তির উত্তরে গ্লাডষ্টোন যাহা বলিয়াছিলেন, শ্যামাপ্রসাদের উক্তিতে তাহাই মনে পড়ে। গ্লাডষ্টোন সভাপতিকে বলিয়াছিলেন, যদিও ডিশরেলীর উক্তিতে তিনি বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না, তথাপি তিনি যদি কোনরূপে সংযমের ও শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করেন, তবে সভাপতি যেন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন। তাহার পরে তিনি ডিশরেলীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন:—

"I must tell the right hon, Gentleman that, whatever he has learned—and he has learned much,—he has not yet learned the limits of discretion, of moderation, and of forbearance, that ought to restrain the conduct and language of every Member of this House, the disregard of which is an offence in the meanest amought us, but it is of tenfold weight when committed by the leader of the Housc of Commons."

শ্যামাপ্রসাদ কখন যুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হইয়া পার্লামেন্টে কোন কথা বলিতেন না এবং সেই জন্যই কেহ কখন তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই; সেই জন্যই সকলে তাঁহার আক্রমণ ভয় করিতেন। জওহরলাল—যাহাকে spoilt child of the nursery—বলে তাহাই। তিনি আক্রমণের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া প্রলাপোক্তি করিতেন—শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতেন।

পার্লামেন্টে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা যেমন অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচায়ক ছিল—বাঙ্গালায় সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিত, প্রমাণ করিত, বক্তৃতায় যেমন বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে বা বিপ্লব নিবারণ করিতে পারা যায়, তেমনই ইতিহাস রচনাও করা যায়।

শ্যামাপ্রসাদ যেমন পার্লামেন্টের কার্য্যের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তেমনই বাগ্মিতারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। সে কাজ যে চেষ্টাসাপেক্ষ তাহা বলা বাহুল্য।

তিনি তাঁহার বক্তৃতার জন্য কিরূপ চেষ্টায় ও যত্নে উপকরণ সংগ্রহ করিতেন, তাহার অনেক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সে বিষয়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়ের পথাবলম্বী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা বা স্নেহ করিতেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ইঁহারা উপকরণ সংগ্রহ করিতে কখন কুণ্ঠানুভব করেন নাই, কখন দ্বিধানুভব করেন নাই। সেই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিতেন, তাহাতে সেই কথাই মনে হয়—ফুল তিনি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতেন—কিন্তু তাহাতে যে মালা গাঁথিতেন, তাহা তাঁহার। সেই মাল্য লোককে মুগ্ধ করিত।

অপর পক্ষের ত্রুটি লক্ষ্য করিতে তাঁহার বিলম্ব হইত না এবং সেই ত্রুটির সুযোগ তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিতেন, তাহাতেই পার্লামেন্টে নেতাদিগের মধ্যে তাঁহার আসন অতি উচ্চে ছিল। তিনি জওহরলালের মত বাগাড়ম্বরে তথ্যের অভাব গোপন করিতেন না—

কখন যুক্তির স্থানে অতিরঞ্জিত উক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেন না। তাঁহার প্রত্যেক উক্তি বিচার করিয়া করা হইত, প্রত্যেক শব্দ সুপ্রযুক্ত হইত, প্রত্যেক যুক্তি তীক্ষ্ণ হইত।

উদ্বাস্তু-সমস্যা

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সময় শ্যামাপ্রসাদের লোককে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার যে আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধানে তাহাই লোককে মুগ্ধ করিয়াছিল: উদ্বাস্তুদিগের দুঃখ ও দুর্দ্দশা তাঁহাকে কাতর করিত, আর উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধানে ভারত সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঔদাসীন্য, ত্রুটি ও দুর্নীতি তাঁহাকে চঞ্চল করিত। যখনই যে স্থান হইতে উদ্বাস্তুদিগের দুর্দ্দশার সংবাদ আসিয়াছে, তখনই শ্যামাপ্রসাদ ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন—সাহায্য সকল সময় করিতে না পারিলেও সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপে তাহাদিগের বেদনার ক্ষত দূর করিতে কখন কার্পণ্য করেন নাই। নিদাঘের রৌদ্র, বর্ষার বারিধারা, শীতের শৈত্য—পথের দুর্গমতা—সব উপেক্ষা করিয়া শ্যামাপ্রসাদ উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগের দুঃখ আপনি হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। জলৌকা যেমন মাতৃস্তনে রক্ত পায় জওহরলাল তেমনই উদ্বাস্তু-শিবিরে সর্ব্বস্বান্ত নারীর প্রকোষ্ঠে স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—তাহারা নিঃস্ব নহে! বিধানচন্দ্র রায় এক দিনের জন্যও শিয়ালদহ রেল-ষ্টেশনে যাইয়া উদ্বাস্তু নরনারীর দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করেন নাই। শ্যামাপ্রসাদ তাহাদিগের মধ্যে যাইয়া তাহাদিগের জন্য যথাসাধ্য করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু নরনারীরা শ্যামাপ্রসাদকে একান্ত আপনার—আশ্রয় বলিয়া মনে করিত, বিশ্বাস করিত, নির্ভর করিত। উদ্বাস্তু সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদের কৃত কার্য মনুষ্যত্বে সমুজ্জ্বল, সহৃদয়তায় সুরভিত, সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ। সেই সহানুভূতি সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিত। আজ যে তাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইল—ইহা তাহাদিগের দুর্ভাগ্য—ইহা দেশের দুর্দ্দশাদ্যোতক।

কর্ম্মবহুল জীবন

কবি লিখিয়াছেন—

"One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name."

শ্যামাপ্রসাদের কর্ম্মবহুল জীবন গৌরবোজ্জ্বল কার্যে পরিপূর্ণ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, কেন্দ্রী ব্যবস্থাপক সভায়, বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘে, ভারত সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলে, ভারতীয় পার্লামেন্টে তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কার্যের তালিকা শেষ হয় না। উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের কার্যে যেমন, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে রক্ষায় তেমনই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তদ্ভিন্ন মহাবোধি সোসাইটীর সভাপতিরূপে তিনি বুদ্ধের শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি বহন করিয়াছেন, বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সভাপতিরূপে তিনি বাঙ্গালা ভাষা প্রচারে সহায় হইয়াছেন, ব্যাধিতের সেবায় ঔৎসুক্য হেতু তিনি যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ও আরোগ্যশালার সভাপতিরূপে নানারূপে তাহার উপকার করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আশারাম হাসপাতালের ও হরলালকা হাসপাতালের অভিভাবকত্ব করিয়াছেন; সুন্দরবনে দুর্ভিক্ষে তিনি বিপন্ন সুন্দরবনবাসীর জন্য আবেদন জানাইয়াছেন ও স্বয়ং সুন্দরবন পরিদর্শনে গিয়াছেন; বোড়ালে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি-মন্দিরের কার্যে তিনি তথায় গিয়াছেন ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; প্রকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত মেদিনীপুরবাসীর জন্য তিনি সাহায্যদান-ব্যবস্থায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যে তিনি তথায় গিয়াছেন; হিন্দু মহাসভার ও জনসঙ্ঘের নেতৃত্বে তিনি সাহস, আন্তরিকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কর্ম্মবহুল জীবনে তিনি কত কাজই করিয়া গিয়াছেন।

কাশ্মীর

কাশ্মীর সম্বন্ধে জওহরলাল নেহরুর নীতি পরস্পর-বিরোধিতায় ও অসামঞ্জস্যের দুষ্ট ক্ষতে পূর্ণ। ভারতের অন্যান্য সামন্ত রাজ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, জওহরলাল কাশ্মীর সম্বন্ধে তাহা করেন নাই। ভারতীয় সেনাবল যখন কাশ্মীর হইতে অনধিকার প্রবেশকারী পাকিস্তানীদিগকে বিতাড়িতপ্রায় করিয়াছিল—তখন জয়ের সমাগমকালে তিনি সহসা জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিদেশে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হ'ন—কাশ্মীর ভারতভুক্ত হইবে কি না বিচার জন্য নহে—পাকিস্তানীদিগের কাশ্মীর প্রবেশ অসঙ্গত কি না সেই বিষয়ে নির্দ্ধারণ ও নির্দ্দেশের জন্য। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং বৃটেনে গোলটেবল বৈঠকে যখন বলিয়াছিলেন—ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকারের পথে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত, তখন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা ভারত সরকারকে লিখিয়াছিলেন—সাম্প্রদায়িকতার সেনাপতি শেখ আবদুল্লার দ্বারা কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ঘটাইয়া হিন্দু মহারাজাকে অপসারিত করা হউক। শেখ আবদুল্লাই কাশ্মীরে জওহরলালের অবলম্বন হইলেন এবং তিনি আপনাকে প্রধান-মন্ত্রী ও কাশ্মীর জম্মুর প্রধানকে রাষ্ট্রপতি বলিয়া—জিন্নার দুই-জাতি নীতির স্থানে তিন-জাতি নীতি প্রবর্ত্তিত করিলেন—হিন্দু, মুসলমান ও কাশ্মীরী। কাশ্মীর ভারতভুক্ত হইল না—জম্মু ও লাডক বলিল, ভারতভুক্ত না হইলে তাহারা তিব্বতের সহিত সংযুক্ত হইবে। অথচ ভারত রাষ্ট্র সেনাবল দিয়া কাশ্মীরের আবদুল্লা সরকারকে রক্ষা ও অকাতরে অর্থ দিয়া কাশ্মীরের উন্নতি সাধন করিতে লাগিল—ভারতবাসীর ধন-প্রাণ আবদুল্লা সরকারের জন্য ব্যয়িত হইতে লাগিল।

এই নীতির দোষ দেখাইয়া শ্যামাপ্রসাদ তাহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি চাহিলেন—

(১) কাশ্মীর যখন ভারতরাষ্ট্রের অংশ তখন কাশ্মীর-সমস্যায় সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ করা অসঙ্গত—তাহাকে হস্তক্ষেপে বিরত থাকিতে বলা হউক।

(২) কাশ্মীরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতরাষ্ট্রভুক্ত করিয়া একটি প্রদেশে পরিণত করা হউক।

জওহরলালের সহিত শ্যামাপ্রসাদের মতভেদ হইল। কারণ,

জওহরলাল মনে করেন, বুদ্ধি কেবল তাঁহারই আছে—তিনি গণতন্ত্রের নামে স্বৈরশাসন পরিচালিত করিতে পারেন—ইত্যাদি।

জওহরলাল ও শেখ আবদুল্লা যে বলিতেছিলেন, কাশ্মীর ভারত-রাষ্ট্রের অংশ তাহা যে মিথ্যা তাহা দেখাইবার জন্য শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গমন করিয়াছিলেন। তাহা প্রতিপন্নও তিনি করিয়া গিয়াছেন। কারণ,—

(১) শ্যামাপ্রসাদ ভারতের আদালতে অভিযুক্ত; ভারত সরকারের আদালত তাঁহাকে হাজির করিয়া দিতে বলিলে কাশ্মীর সরকার (হয়ত বা নেহরু প্রভৃতির ইঙ্গিতে) তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন—ভারত সরকারের সম্ভ্রমে পদাঘাত করিয়াছেন—ভারত সরকার তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হ'ন নাই।

(২) কাশ্মীরের হাইকোর্টে কাশ্মীরের এডভোকেট-জেনারল বলিয়াছেন, কাশ্মীরে ভারতীয় নাগরিকের প্রাথমিক অধিকার নাই।

ইহার পরেও কি লোক জওহরলালের কথায় বিশ্বাস করিবে—কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রভুক্ত অর্থাৎ ভারতরাষ্ট্রের একটি প্রদেশ মাত্র?

কাশ্মীরে অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্যামাপ্রসাদের জীবনের অবসান হইয়াছে। তিনি কাশ্মীর-সমস্যার ভারতের পক্ষে সম্মান-জনক সমাধান—কাশ্মীরের ভারতভুক্তির 'অসমাপ্ত কার্য্যের ভার তাঁহার দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন—

তোমার "ধরাদগ্ধ প্রাণ হউক শীতল
মর-জনমের হা—হা।
লভ লভ তুমি মরণ-সম্বল
জীবনে খুঁজিলে যাহা।"

মৃত্যু-রহস্য

শ্যামাপ্রসাদ যে অসুস্থ সে সংবাদ কাশ্মীর সরকার প্রকাশ করেন নাই। যে দিন প্রাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল—

শ্রীনগর—২২শে জুন—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জনসঙ্ঘের নেতা)—বর্ত্তমানে আটক আছেন। প্রকাশ, তিনি ফুসফুসের প্রদাহে আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি চিকিৎসার জন্য একটি শুশ্রূষাশ্রমে স্থানান্তরিত হইয়াছেন

সেই দিন—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাওয়া গেল—সব শেষ হইয়াছে।

লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব যে অনিবার্য্য, তাহা ইংরেজ সমাজের মুখপত্র 'ষ্টেটস্‌ম্যান'ও স্বীকার করিয়াছেন।

কেন সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে, কয়টি ঘটনা ও বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে—

(১) জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি দলিত করিবেন এবং তিনি হিন্দু মহাসভা ও জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে (অকারণে) সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান আখ্যা দিয়াছিলেন।

(২) শিখ-নেতা তারা সিংহ যে বলিয়াছেন, শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার ও আটক করায় জওহরলাল শেখ আবদুল্লাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ হয় নাই।

(৩) কাশ্মীর-সীমান্তে ভারত সরকারের কর্ম্মচারী শ্যামাপ্রসাদকে বিনা ছাড়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে বাধা দেন নাই; পরন্তু বলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সেরূপ কোন আদেশ নাই। (ইহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে, ভারতরাষ্ট্রে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে যদি আদালতে তাহার বিচার হয়, সেই জন্য ভারত সরকারের কর্ম্মচারী তাঁহাকে কাশ্মীরে যাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন যে, কাশ্মীরে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। সে জন্য কাশ্মীর সরকারের আদেশও প্রস্তুত ছিল।)

(৪) শ্যামাপ্রসাদ যখন কাশ্মীরে বন্দিদশায় ছিলেন, তাহার মধ্যে জওহরলাল নেহরু, কৈলাসনাথ কাটজু ও আবুল কালাম আজাদ ভারত সরকারের এই তিন জন মন্ত্রী কয় দিনের জন্য কাশ্মীরে গিয়াছিলেন—সকলেই শেখ আবদুল্লার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই বা করিবার অনুমতি লাভ করেন নাই, সুতরাং তিনি কি ভাবে ছিলেন, কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই বা জানা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

(৫) শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গ্রেপ্তারের পর হইতে মধ্যে মধ্যে জ্বর ভোগ করিতেছিলেন, সে সংবাদ প্রকাশ করা হয় নাই।

(৬) কাশ্মীর সরকার অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, শ্যামাপ্রসাদ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে মোটর যানে বসাইয়া প্রায় দশ মাইল দূরবর্ত্তী হাসপাতালে লওয়া হইয়াছিল।

(৭) কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানের একাধিক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মত প্রকাশ করিয়াছেন, শ্যামাপ্রসাদের যথোচিত চিকিৎসা হয় নাই (অবশ্য যদি চিকিৎসা হইয়া থাকে)।

(৮) শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-সংবাদ শেখ আবদুল্লা তাঁহার অগ্রজ রমাপ্রসাদকে দেন নাই—আবদুল্লা সরকারের কোন কর্ম্মচারী টেলিফোনে জানাইয়াছিলেন, শেখ আবদুল্লা জাষ্টিস রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জানাইতে চাহেন যে, ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে; শব সম্বন্ধে তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিতে চাহেন? যেরূপ অস্পষ্ট ভাবে সে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহা আপত্তিকর। কিন্তু ইংলণ্ডের রাণীর অভিষেকোৎসবে যোগদানের পর ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া জওহরলাল তাহারও সমর্থনে বলিয়াছিলেন, টেলিফোনের কল বিকল হইয়া গিয়াছিল—ইচ্ছা করিয়া অশিষ্ট ব্যবহার করা হয় নাই। যেন যন্ত্রও ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিল।

(৯) ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কায়রোর পথে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-সংবাদ জওহরলাল পাইয়াছিলেন। রয়টারের সংবাদ—সংবাদে তিনি "অত্যন্ত দুঃখিত।" কিন্তু স্বদেশে উপনীত হইয়া তিনি শ্যামাপ্রসাদের (বিরোধী দলের দলপতির) মৃত্যু সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই; পরন্তু বলিয়াছিলেন, তিনি দেশে ফিরিতে আনন্দানুভব করিতেছেন। কিন্তু যে কোন গণতন্ত্র-শাসিত দেশে রাজনীতিক হিসাবে বিরোধী দলের দলপতির স্থান প্রধান মন্ত্রীর পরেই।

(১০) কয় দিন পরের কয়টি ঘটনা লক্ষ্য করিবার বিষয়—

(ক) ২৬শে জুন জওহরলাল নেহরু ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহার চারি দিন পরে—প্রকাশ করা হইল, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব—এত দিন কোন কথা না বলিলেও—শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের বিক্ষোভের বিষয় জওহরলালের গোচর করিয়া সসঙ্কোচে বলিয়াছেন, এ অবস্থায় তিনি যাহা প্রয়োজন মনে করেন, তাহা করুন।

(খ) ১লা জুলাই কাশ্মীর সরকারের পক্ষে সচিব শ্যামলাল শাস্ত্রী (শেখ আবদুল্লা নহেন) এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তাঁহারা শ্যামাপ্রসাদের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই।

(গ) ২রা জুলাই জওহরলাল (ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সপ্তাহ কাল পরে) এক বিবৃতিতে বলিলেন, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাশ্মীর সরকারের "সাফাই" গাহেন—কাশ্মীর সরকার—তাঁহার সহিত মতভেদ থাকিলেও—শ্যামাপ্রসাদকে অবস্থানুযায়ী শিষ্টব্যবহার দেখাইতে ক্রটি করেন নাই।

(ঘ) পরদিন (৩রা জুলাই) প্রকাশ পায়, যে শেখ আবদুল্লা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-সংবাদ স্বয়ং তাঁহার অগ্রজকে প্রদান করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে লিখিয়াছেন, তিনি (ডক্টর রায়) কাশ্মীরে যাইলে বুঝিতে পারিবেন, কাশ্মীর সরকারের পক্ষে কোন ক্রটি হয় নাই। আর বিধানচন্দ্র উত্তর দিয়াছেন—তিনি য়ুরোপে যাইতেছেন, পাঁচ সপ্তাহ পরে (যদি ফিরিয়া আসেন) ফিরিয়া আসিয়া শেখ আবদুল্লার আমন্ত্রণে কাশ্মীরে যাইবেন। অবশ্য তত দিন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত দাবীর প্রাবল্য হয়ত হ্রাস পাইবে, অনেক কাগজপত্রও প্রস্তুত হইতে পারে।

(ঙ) ৪ঠা জুলাই জওহরলাল জানাইলেন, তিনি সকল বিষয়ে ওয়াকেবহাল হইয়াছেন—কাশ্মীর সরকারের কোন ক্রটি নাই।

সুতরাং শেষ কয় দিনে ঘটনার গতি দ্রুত। জওহরলাল—

(১) কাশ্মীর সরকারের সব কাজ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যখন তাহা করিয়াছেন, তখন কি আবার তদন্তের কথা উঠিতে পারে? কারণ, he is the State.

(২) তদন্তের কথা তিনি অবজ্ঞা করিয়াছেন। অথচ পঞ্জাবী অনাচারের সময় ইংরেজ সরকারও দেশবাসীর তদন্তের দাবী উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এবং তখন বিরোধী পক্ষ কংগ্রেস স্বতন্ত্র কমিটী গঠিত করিয়া তদন্ত করিয়াছিলেন।

(৩) শ্যামাপ্রসাদের চিকিৎসার্থ যে কোন বিশেষজ্ঞ লইয়া যাওয়া হয় নাই তাহাও নাকি অসঙ্গত নহে! কিন্তু আমরা জানি, জরায় ও তিনি যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহাতে ভগ্নস্বাস্থ্য—কন্যার ব্যবহারে মর্ম্মপীড়ায় কাতর মোতিলাল নেহরু যখন মৃত্যু-শয্যায় তখন বিদেশী সরকারের অনুমতি লইয়া কলিকাতা হইতে চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়কেই প্রয়াগে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। যেন—

"আপনার বেলা লীলা খেলা
পাপ লিখেছেন পরের বেলা।"

মোতিলালের জীবন শ্যামাপ্রসাদের জীবনের তুলনায় কিরূপ মূল্যবান ছিল, তাহার আলোচনা আমরা করিতে চাহি না।

এ কথা মনে করা অসঙ্গত নহে—কাশ্মীর-দিল্লী-কলিকাতা একসূত্রে বদ্ধ।

যদি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসম্বন্ধে নেহরু ও শেখ আবদুল্লা আপনাদিগকে ও তাঁহাদিগের সরকারদ্বয়কে সর্ব্বতোভাবে সন্দেহের অতীত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহারা কেন নিরপেক্ষ তদন্তে অসম্মত হইবেন? তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ তদন্তে অসম্মত হ'ন, তাহা হইলেই লোক সন্দেহ করিবে। সেরূপ সন্দেহের ফল কিরূপ হইতে পারে, তাহা আইরিশ নেতা পার্ণেলের মৃত্যুতে আইরিশদিগের ব্যবহারে বুঝা গিয়াছিল। তখন আইরিশরা বলিয়াছিলেন—ইংরেজের সহিত তাঁহাদিগের কখন সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে না—হইতে পারে না।

ভারত সরকার শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং কাশ্মীর সরকার যাহা করিয়াছেন, তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা যে সন্দেহাতীত ও নিয়মানুগ তাহা নিরপেক্ষ তদন্তে প্রতিপন্ন করিতে তাঁহারা সম্মত আছেন কি না?

জওহরলালের ও শেখ আবদুল্লার মুখের কথায় দেশের লোকের মন হইতে সন্দেহ দূর হইবে না এবং তাঁহারা তদন্তে অসম্মত হইলে সেই সন্দেহ ঘনীভূতই হইবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মত জওহরলালের উক্তিতে খণ্ডিত হইতে পারে না।

এই তদন্তের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক আর একটি দাবী করিতেছে—কাশ্মীরের ভারতভুক্তি—ভারতরাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণতি। জওহরলাল যদি তদন্তে ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে অসম্মত হ'ন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করাই দেশের লোকের পক্ষে প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য হইবে। তিনি যদি আপনাকে সমালোচনার অতীত মনে করেন—মনে করেন, তিনি লোকমত উপেক্ষা করিতে পারেন, তবে তিনি ভ্রান্ত। যদি কংগ্রেসী সরকারের কার্য তাঁহার সম্ভ্রমনাশের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তবে এই ব্যাপারে তাঁহার রাজনীতিক ক্ষমতার বিলোপ হইবে। লোকমতই দেশের মত—দেশমাতৃকার মত।

অবসান

অকাল-জলদোদয় যেমন রবিকর আবৃত করে, তেমনই অকাল-মৃত্যু শ্যামাপ্রসাদের জীবন হরণ করিয়াছে। তিনি দেশমাতৃকার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন:—

"অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে,
ফুটি যেন স্মৃতিজলে মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত—কি শরদে।"

মা তাঁহার ভক্ত সন্তানকে সে বর দিয়াছিলেন—শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার দেশবাসীর স্মৃতিজলে চির-বিকশিতরূপে অবস্থান করিবেন।

শ্যামাপ্রসাদের পারিবারিক জীবনের কথা আমরা আলোচনা করি নাই। তিনি স্নেহশীল পিতার প্রিয় পুত্র ছিলেন। পিতা জানিতেন, এই পুত্র তাঁহার বহু গুণের উত্তরাধিকারী হইয়া অনুশীলন-ফলে সে সকল বিবর্দ্ধিত করিতে পারিবে। তিনি তাহাকে সেই কাজের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পৌত্রী সুধার সহিত শ্যামাপ্রসাদের বিবাহ হইয়াছে। ভাগ্যবতী সুধা দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন। অগ্রজ রমাপ্রসাদের পত্নী মাতৃহীন সন্তানদিগকে মাতৃস্নেহ দিয়াছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মাতৃভক্ত ছিলেন। কাশ্মীরে স্বজনগণের নিকট হইতে বহুদূরে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তিনি তিন বার মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"মা! মা! মা!"

মানুষ যখন জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়, তখন হয়ত তাহার মোহান্ধকার অপনীত হইলে সে দিব্যালোকে দেখিতে পায়—ভক্তির

বন্দবেদীর উপর মা'র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। হয়ত শেষ সময়ে শ্যামাপ্রসাদের জননী—দেশমাতৃকার সহিত এক হইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া অসীম শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ তখন ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি দেখিয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে? কিন্তু তিনি তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে লিখিত পত্রে লিখিয়াছিলেন—

পরাজয়ের মধ্যে জয় বিদ্যমান :—

"'T'is the sunset of life gives me
mystic lore
And coming events cast their
shadows before."

জীবনান্তের পূর্ব্বে তিনি পরাজয়ের মধ্যে যে জয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাম্য সেই জয়লাভ তাঁহার দেশবাসীর জন্ম রাখিয়া তিনি মহাযাত্রা করিয়াছেন। তিনি যে আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—সে আদর্শ দধীচির—লোকহিতার্থ দেহত্যাগ। দধীচির অস্থিতে—ত্যাগপূত উপকরণে যে বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহাই পাপদৈত্য বিনাশের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। শ্যামাপ্রসাদের দেশ ও দশের হিতের জন্য উৎসৃষ্ট জীবনের আদর্শ দেশের সর্ব্ববিধ অকল্যাণ বিনাশ করুক। তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা যে ভারতের সে ভারত বদরিকাশ্রম হইতে কন্যাকুমারী ও দ্বারকা হইতে চন্দ্রনাথ—দেশ। সেই দেশ আজ খণ্ডিত, বিব্রত, বিপন্ন। সেই দেশ আবার—হয়ত নূতন ভাবে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত—মিলিত হইবে। কি উপায়ে তাহা হইতে পারে, তাহা আজ আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু

দিবস বিকাশে যবে পুরবের গবাক্ষে কেবল
প্রবেশিয়া রবিকর কক্ষ-মধ্য করে-না উজ্জল;
সম্মুখে উদিছে রবি—ধীরে ধীরে পুরব গগনে—
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, হাসে ধরা কনক-কিরণে।

সম্মুখে নীলোর্ম্মিমালা ভাঙ্গি পড়ে বেলাবালু 'পরে
সূচ্যগ্র মেদিনী যেন কোনরূপে জয় নাহি করে;
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, শত ক্ষুদ্র খাতে প্রবেশিয়া
স্নিগ্ধ নীল সিন্ধুবারি চারিদিকে যায় প্রবাহিয়া।

শ্যামাপ্রসাদের মত ত্যাগী দেশভক্তের সাধনায় হয়ত অলক্ষ্যে দেশ নূতন রূপে গঠিত হইতেছে—দেশের সেই রূপ শ্যামাপ্রসাদের ধ্যানরূপ—সেই রূপে তিনি মা'র পূজা করিবার জন্যই মনীষার পঞ্চপ্রদীপ ত্যাগের গব্যঘৃতে পূর্ণ করিয়া সেই সমুজ্জ্বল শিখাসম্পন্ন পঞ্চপ্রদীপে মা'র আরতি করিতে চাহিয়াছিলেন। মা তাঁহার সেই কামনা পূর্ণ করিবেন—শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন সফল হইবে। তাঁহার কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত মাতৃমন্ত্রে মুক্তির মোক্ষদ্বার' মুক্ত হইবে—সেই মন্ত্র আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিবে—"বন্দে মাতরম।"

পণ্ডিচেরীতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মকুণ্ডলী

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য
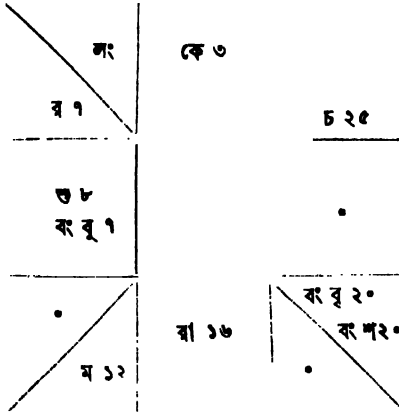
ভারতের বরেণ্য নেতা বাংলার দধীচি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম—১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই, বাংলা ১৩০৮ সালের ২২এ আষাঢ় শনিবার রাত্রি ২টা ৩ মিঃ (কলিকাতা); মৃত্যু:—১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন, বাংলা ৮ই আষাঢ়, ১৩৬০ সাল, সোমবার শেষ রাত্রি ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ৩টা ৪০ মিনিটে কাশ্মীর সরকার কর্ত্তৃক বন্দী অবস্থায় শ্রীনগরের এক আরোগ্য-নিকেতনে। নিম্নে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী-পরিচয় দেওয়া হইল। তাঁহার বৃষলগ্ন ও কুম্ভরাশি; জন্ম-সময় অনুযায়ী গ্রহস্ফুট ও লগ্নস্ফুট:—লগ্ন ১।৩।১; রবি ২।২১।৩২; চন্দ্র ১০।২১।৪২; মঙ্গল ৫।৩।৩৭; বক্রী বুধ ৩।১।৪১; বক্রী বৃহস্পতি ৮।১৪'৫৭; শুক্র ৩।৯।৩২; বক্রী শনি ৮।২০।৩৩; রাহু ৬।২৭।২১; কেতু ০।২৭।১১; নেপচুন ২।৭।৭; হার্সেল ৭।২১।১৭; প্লুটো ১।২৫।১৩।

সাধারণ দৃষ্টিতে জন্মকুণ্ডলীর বিশেষত্ব ধরা পড়া কঠিন। ইহা হইতে ভাবকুণ্ডলী করিলে দেখা যায়, লগ্নভাবে কেতু (মূলকুণ্ডলীতে দ্বাদশে কেতু), তৃতীয়ে রবি, বুধ ও শুক্র (মূলকুণ্ডলীতে দ্বিতীয়ে রবি), পঞ্চমে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু (মূলকুণ্ডলীতে ষষ্ঠে রাহু), অষ্টমে বৃহস্পতি, নবমে শনি (মূলকুণ্ডলীতে অষ্টমে বৃহস্পতি ও শনি) ও একাদশে চন্দ্র (মূলকুণ্ডলীতে দশমে চন্দ্র)। বৃহস্পতির দশায় শ্যামাপ্রসাদ বাবুর জন্ম এবং কেতুর দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। লগ্ন, হোরালগ্ন, চন্দ্র, লগ্নপতি ও অষ্টমপতির অবস্থান বিচারে আয়ুগণনায় মধ্যায়ুর বেশী আভাস দেয় না। মারকগ্রহ মঙ্গলদৃষ্ট দ্বাদশস্থ কেতুই ক্রূরভাবে অকালে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটাইয়াছে। নবাংশে শনির ক্ষেত্র মকরে লগ্ন, চতুর্থপতি রবি তুঙ্গক্ষেত্র মেষে, ভাগ্যপতি ও কর্ম্মপতি শনি তুঙ্গক্ষেত্র তুলায়, রবির সঙ্গে আছেন তৃতীয়পতি চন্দ্র; মঙ্গল শনির নবাংশে কুম্ভে, বৃহস্পতি রবির নবাংশে সিংহে, বুধ চন্দ্রের নবাংশে কর্কটে বর্গোত্তমী, রাহু বুধের নবাংশে মিথুনে তুঙ্গক্ষেত্রে, কেতু বৃহস্পতির নবাংশ ধনুতে ও শুক্র বুধের নবাংশে কন্যায়। মোটামুটি এইরূপ গ্রহসন্নিবেশের প্রভাবে জাতকের জীবন-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত। নবাংশে রবি ও শনির অবস্থান জাতককে মৃত্যুঞ্জয়ী-পথের সাধক করিয়াছে। লগ্নপতি অর্থাৎ তাঁহার জন্মভূমির দ্যোতক বৃষরাশির অধিপতি শুক্র নবাংশে নীচক্ষেত্রে এবং নবাংশ লগ্নের নবমে; ইহা হইতে বুঝা যায়, দেশ-সেবাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ এবং আরামের ক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে দূরে টানিয়া লইয়াছে।

বৃষ লগ্নে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর জন্ম। ইহা পৃথ্বীরাশি; বৃষের অধিপতি দৈত্যগুরু শুক্র। ধীরতা, স্থিরতা, একনিষ্ঠতা ও অনড় মনোবলই ইহার প্রধান লক্ষণ। মাটীর পৃথিবী শুক্রের সঞ্জীবন-মন্ত্রেই ফলপুষ্পে শোভিতা মনোরমা, তিনি প্রেয়সী, ধাত্রী ও জননী। ধীর, স্থির ও অধ্যবসায়ী শুক্রই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে একনিষ্ঠ সাধনায় পার্থিব-সম্পদকে মানুষের ভোগ-যোগ্য করিয়া তুলেন। সেই হেতু বৃষ লগ্নের জাতকের মধ্যে ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও অনমনীয় একনিষ্ঠতা দেখা যায়। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর চরিত্র-বিশ্লেষণে বৃষলগ্নের বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। লগ্নপতি শুক্র তৃতীয়ে জলরাশি কর্কটে থাকিয়া বুদ্ধির কারক বুধ যুক্ত হইয়াছেন; তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান বক্ষঃ ও হৃদয় বুঝায়। শুক্র একদিকে যেমন অনমনীয় সাধনার গুরু, অপর দিকে তিনি প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-মমতার কারক; তিনিই কলা-বিদ্যার আধার; সকল শাস্ত্রের তিনি প্রবক্তা। অনুভূতির ক্ষেত্র কর্কটে বুদ্ধি ও প্রীতির মিলনে হৃদয়ের উদারতা ও বাৎসল্য ভাবের প্রাধান্য জাতককে মহিমান্বিত করিয়াছে; শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে সেই জন্য দুর্দম আবেগ ছিল; দেশপ্রীতির আবেগ তাঁহাকে আরামের আসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। ভাবে তৃতীয়স্থ রবি ও নবাংশে তুঙ্গী রবি রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রাধান্য দিয়াছে। রবি মর্য্যাদা ও প্রভুত্বের কারক স্রষ্টা গ্রহ; তিনি পিতৃকারক বা পিতা। চতুর্থপতি রবি বাক্‌স্থানে দ্বিতীয়ে আসায় এবং তাহার উপর বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায় তাঁহার বাক্য তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ; তাহা প্রভুত্ব, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক; বৃহস্পতি ও শনিদৃষ্ট রবিই বজ্রনির্ঘোষে নির্ভীক চিত্তে আপনার যুক্তির দৃঢ়তা ও অকাট্যতা ঘোষণা করিতে পারে। তথাপি আষাঢ়ে মিথুনের রবি; স্নিগ্ধ-ধারায় তাঁহার হৃদয়, মন ও বাক্য রসার্দ্র। সেই হেতু পিতৃভাবের বাৎসল্য গুণে তাঁহার বাক্য রূঢ়তাবর্জ্জিত।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর জন্মকুণ্ডলীর পঞ্চম স্থানে মঙ্গল রহিয়াছে। পরাক্রম, শৌর্য্যবীর্য্য ও সৈনিকের কারক এই মঙ্গল। পঞ্চমস্থান বা বুদ্ধি-স্থানে থাকিয়া শক্তিধর মঙ্গল দিয়াছে নির্ভীকতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সৈনিকের মনোবল। রাহু ষষ্ঠে থাকিয়া জীবনের পথ বিঘ্নসংকুল করিয়াছে। ভাবে সপ্তম, অষ্টম ও শুক্রের অবস্থা বিচার করিলে জাতকের অকালে পত্নীবিয়োগাদির আভাস এই কোষ্ঠী হইতে পাওয়া যায়। কৃচ্ছ্রসাধনার কারক দুঃখবাদী ছায়ার নন্দন শনি। রোগ, শোক, জরা, ও মৃত্যু প্রভৃতি শনির অধিকারে। এইগুলিকে জয় করিবার প্রবৃত্তি দেয় শুভ শনি। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর জন্মকুণ্ডলীতে শনি মৃত্যুস্থানে মৃত্যুস্থানপতি গ্রহ বৃহস্পতি সহ অবস্থিত। বৃহস্পতি অমৃতের মন্ত্রদাতা দেবগুরু; তিনি সুখ-দুঃখে উদাসীন। শনি এই বৃহস্পতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর ভয় জাতককে বিচলিত করিতে পারে নাই। অষ্টমে বা মৃত্যুস্থানে কর্ম্ম ও ভাগ্যপতি শনি দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে মিলিত; অর্থাৎ জাতকের কর্ম্মধারা ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে কৃচ্ছ্রসাধনার পথে অমৃতত্ব বরণ করিয়াছে বা মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আটানব্বই

শিব গুহ-র বাড়ির ছেলে অন্নদা গুহ। অন্নদার কাছে নরেন আজকাল খুব বেশি আনাগোনা করছে। হাজরা নালিশ করল ঠাকুরকে।

'নরেন অন্নদা এক আফিসওয়ালার বাসায় যায়।' বললেন ঠাকুর। 'সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।'

'বামুনরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।'

'বামুনদের কথা শুনোনা।' ঠাকুর পরিহাস করলেন। 'তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভালো। অন্নদাকে আমি জানি, ভালো লোক।'

'শুনলাম বেশ কঠোর করছে আজকাল।' হাজরা বললে। 'সামান্য কিছু খেয়ে থাকে। ভাত খায় চার দিন অন্তর।'

'বলো কি!' যেন একটু আশ্চর্য হলেন ঠাকুর। শেষে বললেন আত্মস্থের মতো: 'কে জানে কোন ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্ যায়।'

'অন্নদার বাড়িতে নরেন আগমনী গাইলে।'

'সত্যি?' ঠাকুর যেন খুশি হলেন। নিরাকার থেকে সাকারে আসছে নরেন? জ্ঞানের প্রাখর্য থেকে ভক্তির স্নিগ্ধতায়?

বলতে-বলতেই নরেন এসে হাজির।

'তুই আগমনী গেয়েছিস? কি রকম গাইলি? গা না একটিবার—'

নরেনকে নিয়ে বাইরে এলেন ঠাকুর। গোল বারান্দা পেরিয়ে গঙ্গার পোস্তার উপরে এলেন।

'গা না—'

নরেন গান ধরল:

কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বলমা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই॥
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে
তুই না কি মা তারি সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে—
এবার নিতে এলে পরে বলব উমা ঘরে নাই॥

সেই অন্নদা গুহ একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

'তুমি তো নরেনের বন্ধু?' উৎসুক হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'জানো তো ওর বাবা মারা গেছে—'

মাথা হেঁট করে রইল অন্নদা।

'ওদের বড় কষ্ট। দিন চলে না। এখন বন্ধু-বান্ধবরা যদি কিছু সাহায্য করে তো বেশ হয়।'

অন্নদা চলে গেলে ঠাকুরকে বকতে লাগল নরেন। সে কি কড়া-কড়া কথা!

'কেন, কেন আপনি ওর কাছে ও সব কথা বলতে গেলেন?'

'তাতে কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে? আমার দুঃখ-দৈন্যের কথা যার-তার কাছে বলে-বলে বেড়াবেন? আমার কি একটা মান নেই? আমি কি ভিখিরি?'

বকুনি খেয়ে কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। বললেন, 'ওরে তুই ভিখিরি হবি কেন? আমি ভিখিরি হব। আমি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে করব তোর জন্যে।'

কিন্তু দুঃখ-কষ্টে দেহই যদি না থাকে তবে সবই বৃথা।

'বাঁচবার ইচ্ছে কেন? কেন দেহের যত্ন করি? ঈশ্বর নিয়ে সম্ভোগ করব, তাঁর নামগুণ গাইবো, তাঁর জ্ঞানী-ভক্ত দেখে-দেখে বেড়াবো।' ত্রৈলোক্য সান্যালকে বলছেন ঠাকুর: 'তাই মাকে বলেছিলাম, মা, একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি, এখানে-ওখানে যেতে পারি, সঙ্গ করতে পারি জ্ঞানী-ভক্তদের। তা হাঁটবার শক্তি দিলেনা কিন্তু—'

তাই কোথায় কোন দোরে গিয়ে তোর জন্যে ভিক্ষে করব?

ঠাকুরের বড় অভিমান হয়েছে মার উপর। নরেনের এখনো একটা হিল্লে হল না! দিন-দিন ম্লান হচ্ছে সেই চারুকান্তি।

তাই বলছেন ত্রৈলোক্যকে: 'এই দেখ না, নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে, বাড়িতে বড় কষ্ট, কোনো উপায় হচ্ছে না। শুধু দুঃখ ভোগ করছে।' একটু হয়তো থামলেন। বললেন, 'তা কি করা! ঈশ্বর কখনো সুখে রাখেন, কখনো দুঃখে রাখেন—'

'আজ্ঞে, তাঁর দয়া হবে নরেনের উপর।' যেন আশ্বাস দিল ত্রৈলোক্য।

'আর কখন হবে!' অভিমানে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল ঠাকুরের: 'তবে কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না। কিন্তু যাই বলো, কারু কারু সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।'

নরেন্দ্র কাছেই ছিল, তার দিকে সস্নেহ চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'আমি নাস্তিক মত পড়ছি।' নরেন নিস্পৃহের মত বললে।

'দুটোই আছে—অস্তি আর নাস্তি।' বললেন ঠাকুর: 'দুটোই যখন আছে, অস্তিটাই নাও না কেন?'

কী মনে হয় চার দিকে তাকিয়ে? একটা কিছু আছে? না, সমস্তই এলোমেলো, ভাঙাচোরা? ট্রেনে যেতে-যেতে দেখি মাঠের ধারে পোড়ো বাড়ি, ইটের পাঁজা ভেঙে পড়েছে, ফাটলে-ফাটলে বট-পাকুড়ের জড়িপটি। সহজেই বুঝে নিতে পারি, পরিত্যক্ত, জনশূন্য। আবার হঠাৎ কখনো আগ-রাতের দিকে চকিতে একটা আলো-জ্বালা বাড়ি চোখে পড়ে। কাউকে দেখা যায় না বটে, তেরছা আলোয় চোখে পড়ে কোনো আসবাবের টুকরো কিংবা কোনো দেয়ালের পট-পঞ্জী। কিংবা দিনের বেলায় আরেকটা বাড়িতে চোখে পড়ল, এরিয়েলের তার, কিংবা জামা-কাপড় শুকোতে দিয়েছে রেলিঙে। সহজেই বুঝে নিতে পারি, লোক আছে। শ্রী আছে, শৃঙ্খলা আছে, স্থিতি-গতি আছে। তেমনি পৃথিবীর চার দিকে তাকিয়ে কি মনে হয় এ একটা দেয়ালে-গাছ-গজানো পোড়ো বাড়ি, না, আলো-জ্বলা গানের-পরশ-লাগা আনন্দ-নিকেতন?

হয় নীতি, নয় শক্তি, নয় শৃঙ্খলা—একটা তো কিছু আছে। অন্তত একটা ধারাবাহিকতা। অন্তত একটা পুনরাবৃত্তি। থাকাটাই যদি সত্যি হয় তবে তাই, তাই ভগবান।

'কিন্তু ভগবান তো ভক্তকে দেখবেন।' সুরেশ মিত্তির বললে নরেনের পক্ষ হয়ে। 'নইলে তাঁকে ন্যায়পরায়ণ বলি কি করে?'

'সেই তো মায়া! ঈশ্বরের কাজ বুঝি এমন আমাদের সাধ্য কি। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে। পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পর দেখেন, ভীষ্মদেব কাঁদছেন। কি আশ্চর্য! পাণ্ডবেরা প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণকে—পিতামহ অষ্টবসুর এক বসু, এর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না। ইনিও মৃত্যুর মায়াতে কাঁদছেন? তারই জন্যে কি? জিগগেস করো ভীষ্মকে। জিগগেস করাতে ভীষ্মদেব বললেন, কৃষ্ণ, ঈশ্বরের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন সেই পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই। যখনই এই কথা ভাবি তখনই কাঁদি। এই ভেবে কাঁদি ঈশ্বরের কার্য বোঝবার জো নেই।'

'একটু গা না—' বললেন ফের নরেনকে।

'ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে।' ঘুরে দাঁড়াল নরেন।

ঠাকুর অভিমানের সুর মিশিয়ে বললেন, 'তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোনা তার কথা আনা-আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা, তার কথা কেউ শোনে না।'

সকলে হেসে উঠল।

'তুমি বাবু গুহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে। এ কথা বলতুম না—তা তুই কেঁড়েলি করলি কেন?'

নরেন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। শেষে বললে, 'যন্ত্র নেই। শুধু গান—'

'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা। এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!'

'কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার—' গান ধরল নরেন। ভাবাবেশে তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। দেখে ঠাকুরের মহানন্দ!

নরেন কি তবে ধ্যানের পথে? সমাধির পথে?

যিনি নাদরহিত, ব্যঞ্জনরহিত, স্বররহিত, উচ্চারণ-রহিত, রেখারহিত—নরেন কি সেই ব্রহ্মের সন্ধানে?

যেমন তিলের মধ্যে তেল, দুধের মধ্যে ঘি, ফুলের মধ্যে গন্ধ, ফলের মধ্যে রস, কাঠের মধ্যে আগুন তেমনি শরীরের মধ্যে আত্মা। সর্বব্যাপী, সর্বস্বরূপ। স্নেহস্বরূপ, স্বাদস্বরূপ, সৌরভস্বরূপ। বাতাস যেমন আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তেমনি ঈশ্বরও হৃদয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। হৃদয়ই আকাশ। বাতাস আর ঈশ্বর দুইই নিশ্বাসবস্তু। এই হৃদয়াকাশেই ধরতে হবে সেই সমীরণকে। নরেন কি সেই হৃদয়াকাশের অভিযাত্রী?

'লাল জ্যোতি দেখলুম।' ঠাকুর বলছেন তাঁর আশ্চর্য দর্শনের কথা: 'তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, মা ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'

নিরানব্বুই

দেহত্যাগের আর দেরি নেই। প্রায়োপবেশনেই সমাধি-শয়ন নেব এবার।

ঠাকুর তবে কি করতে আছেন? তাঁর ভালো-বাসায় তবে আর লাভ কি? তিনি থাকতে যদি মা-ভাই-বোনকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় তবে তাঁরই বা থাকবার কী অর্থ!

এটর্নির আফিসে কিছু খাটাখাটনি করল ক'দিন। অনুবাদ করল কখানা বইয়ের। জল গরম করবার মতও রোজগার নয়।

শত ঠেলা মেরেও সরানো যাচ্ছে না অভাবের হাতীকে। এবার ঠাকুর এসে হাত মেলান। তাঁর মার তো অনেক প্রতাপ। মার কাছে তাঁর তো অনেক খাতির। এবার তাঁর মাকে বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

ছুটল দক্ষিণেশ্বর। একেবারে ঠাকুরের পদপ্রান্তে। 'আপনার মাকে একবারটি বলুন।'

অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কি বলব?'

'মা-ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে পারিনা।' নরেন বললে প্রায় পরাভূতের মত: 'ওদের কষ্টের যাতে লাঘব হয়, একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি হয় আমার, আপনার মার কাছে সুপারিশ করুন একটু—'

ঠাকুর তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে। বললেন, 'আমার মা, তোর কে?'

পুত্তলিকা। প্রস্তরপ্রতিমা।

নরেন মাথা হেঁট করে রইল। বললে, 'আমার কে না কে, তাতে কী আসে-যায়? আপনার তো সব। আপনার কথা তো আর ফেলতে পারবেনা। একটু বলুন না আমার হয়ে। যাতে টাকাকড়ির একটু মুখ দেখি। মা-ভাই-বোনের ম্লান মুখে একটু হাসি ফোটাই।'

'ওরে ও সব বিষয়-কথা বলতে পারিনা—'

'ও সব বাজে কথা ছাড়ুন।' নরেন মরীয়া হয়ে উঠল: 'আপনাকে বলতেই হবে। নইলে ছাড়বনা কিছুতেই।'

ঠাকুরের চক্ষু দুটি ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে, জানিস না, কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি, মা, নরেনের দুঃখ-কষ্ট দূর কর্। নরেনকে টাকা দে—'

'বলেছেন? বেশ, আজ একবার বলুন।'

'তুই গিয়ে বল। কাছে বসে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসেনা।'

'তারই জন্যে তো হয়না কিছু সুরাহা।' ঠাকুর তাকালেন তার মুখের দিকে। 'তারই জন্যে তো তোর এত কষ্ট। তুই মাকে মানিস না বলে মা আমার কথাও শোনেন না। শোন,' ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন: 'আজ মঙ্গলবার। রাত্তিরে কালী-ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তার পর যা চাইবি মার কাছে, মা দিয়ে দেবেন। লুট করেও মার ভাণ্ডার শেষ করতে পারবিনে।'

'সত্যি?'

'তুই দ্যাখই না চেয়ে।'

তবে আর ভয় নেই। আকুল হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগল নরেন। প্রার্থনা করা মাত্রই রাত্রির অবসান হয়ে যাবে। সম্পদে-সৌন্দর্যে ভরে উঠবে ঘর-দুয়ার। ক্লেশভার কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাবে দারিদ্র্য। উচ্ছল দক্ষিণ বাতাসের মত আসবে এবার সচ্ছলতা।

কত সহজ সমাধান। শুধু প্রণাম আর প্রার্থনা। শুধু স্বীকৃতি আর সমর্পণ!

উৎকণ্ঠার কণ্টকের উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে এল সেই মঙ্গলরাত্রি। ক্রমে এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর এসে বললেন, 'যা এবার শ্রীমন্দিরে। প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর। তার পর চা প্রাণ ভ'রে।'

যেন নেশা করেছে নরেন, পা টলতে লাগল। কী নাজানি সে দেখলে! কী নাজানি শুনবে মার মুখের থেকে!

প্রস্তরময়ী প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। জড়পুত্তলী হয়ে উঠবে সুভাষিণী।

মন্দিরে আর কেউ নেই। শুধু নরেন আর ভবতারিণী।

কী দেখল নরেন চোখ চেয়ে? দেখল অখিল জগতের জননী প্রেম ও প্রসন্নতার নিত্যনির্ঝরিণী হয়ে বিরাজ করছেন। সৌম্যা সুন্দরী আর্তিহারিণী। সহস্রনয়নোজ্জ্বলা হয়ে সংসারে সমারূঢ় হয়ে আছেন। কোথাও শোক নেই দুঃখ নেই অভাব-অভিযোগ নেই।

ত্রিলোকমোহিনী মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে নরেন আর কী প্রার্থনা করবে? প্রণাম করে ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে বলে উঠল, 'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—'

তন্ময়ের মত ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'কি রে, গিয়েছিলি মার কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?'

নরেন বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'কি রে, বলেছিলি আমার সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর করে দাও?'

'কি আশ্চর্য, সব ভুল হয়ে গেল। এখন কী হবে?' অসহায়ের মত মুখ করলে।

'যা যা ফের যা।' ঠাকুর তাকে ঠেলে দিলেন মন্দিরের দিকে। 'গিয়ে ফের প্রার্থনা কর। মনের কথা মাকে না বলবি তো কাকে বলবি? কেন ভুল হবে? মাকে গিয়ে বল, মা আমাকে চাকরি দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে—'

নরেন আবার এসে দাঁড়াল ভবতারিণীর সমুখে।

সেই কনকোত্তমকান্তিকান্তা দয়ার্দ্রচিত্তা অখিলেশ্বরী। সর্বব্যাপিনী মহতী স্থিতিশক্তি। শক্তিমতী সত্তা। বিভারূপে উদ্ভাসিনী।

কী আর ভিক্ষা করব মার কাছে? মহীরূপে মৃত্তিকারূপে জগৎসংসারকে মায়ের মতনই বুকে করে আছেন। আমিও তো মার কোলে অমল শিশু।

'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—'

আবার ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

'কি রে, এবার চেয়েছিলি ঠিক-ঠিক?'

'পারলুম না। এলনা মুখ দিয়ে।'

'সে কি কথা? তুই কি আনাড়ি না আকাট?'

'মাকে দেখামাত্রই কি রকম একটা আবেশ আসে।' নরেন বলতে লাগল মুগ্ধের মত। 'যা চাইবো বলে ভেবেছিলুম তা আর মনে করতে পারলুম না।'

'দূর ছোঁড়া! নিজেকে প্রথমে একটু সামলে নিবি।' ঠাকুর যেন তাকে শিখিয়ে দিলেন: 'গোড়াতেই তলিয়ে যাবিনে। সামলে নিয়ে চার দিক বুঝে-সমঝে মাথা ঠাণ্ডা করে চাইবি। যা, আরেক বার গিয়ে চেষ্টা কর। এমন সোনার সুযোগ আর আসবেনা।'

নরেনকে আবার তিনি ঠেলে দিলেন। নরেন আবার এসে পৌঁছুল মন্দিরে।

পরমা মায়া মোক্ষরূপে বসে আছেন সামনে। সুদূরবর্তী আকাশ থেকে সন্নিহিত মৃত্তিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাঁর আসন। দেহবুদ্ধিরূপে তিনি, আবার মনোরূপে তিনি। সুখদুঃখভোক্তা প্রাণরূপে তিনি, আবার বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে তিনি। তিনি সর্বস্বরূপা সর্বেশ্বরী। হীনবুদ্ধির মতো তাঁর কাছে কী লাউ-কুমড়ো চাইব! যিনি বরদায়িনী মূর্তিতে অবাধ-দর্শনা হয়ে আছেন তাঁর কাছে আবার কী ভিক্ষে করব? যিনি সর্ববাধাপ্রশমনী তাঁর সত্তায় বিশ্বাস হোক এবার। তা হলে আর অভাব নেই কাতরতা নেই অন্ধকার নেই।

'আর কিছু চাইনা মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।' বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল নরেন।

প্রকৃষ্টরূপে অবনত হওয়ার নামই প্রণাম। অহংজ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করার নামই প্রণিপাত। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

মানুষের দরজায়, বিষয়ের দরজায় মাথা ঠুকব না আর। সহস্রশীর্ষে প্রকৃতিরূপিণী জননীকে প্রণাম করব।

'কি রে, চাইলি এবার?' ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'চাইতে লজ্জা করল!'

'লজ্জা করল!' আনন্দে হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

নরেন বসল তাঁর পদচ্ছায়ে। তখন ঠাকুর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোনোদিন।'

ও-সবে আর যেন আগ্রহ নেই নরেনের। বললে, 'আমাকে মার গান শিখিয়ে দিন।'

'কোন্‌টা শিখবি?'

'মা ত্বং হি তারা—সেই গানটা—'

ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন।

'মা ত্বং হি তারা
ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমিই আগু মূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে
সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা॥

সারা রাত গাইলে ঐ গান। ঘুমুতে গেল না। নিশীথরাত্রির সঙ্গীতময়ী মহতী সত্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

পর দিন দুপুর বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে নরেন। তার পাশে বসে আছেন ঠাকুর। যেন পাহারা দিচ্ছেন।

বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছে।

'ওরে এই ছেলেটিকে চিনিস? এ বড় ভালো ছেলে, নাম নরেন্দ্র।'

'এখনো ঘুমুচ্ছে যে?'

'কাল সমস্ত রাত মার গান গেয়েছে—মা ত্বং হি তারা। গাইতে-গাইতে রাত কাবার। কাল কী হয়েছিল জানিস নে বুঝি?'

কৌতূহলী হয়ে তাকাল বৈকুণ্ঠ।

'মাকে আগে মানতনা, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছিল তাই মার কাছে গিয়ে টাকাকড়ি চাইতে বলে দিয়েছিলাম। তা গিয়েছিল চাইতে, কিন্তু পারল না! লজ্জা করল!' বলতে-বলতে আনন্দে উছলে পড়ছেন ঠাকুর: 'বললে, ফুল-ফল চেয়ে কী হবে, মা তোকেই চাই। তাই গান শিখে নিয়ে গাইলে সমস্ত রাত—তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা। কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে, বেশ হয়েছে—তাই না?'

বৈকুণ্ঠ সায় দিল: 'বেশ হয়েছে।'

হাসতে লাগলেন ঠাকুর: 'নরেন কালী মেনেছে, মা মেনেছে—কী বলো, বেশ হয়েছে। কেমন? তাই না?'

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।[ক্রমশঃ।

"রাধাকৃষ্ণ"
—সুধীরপ্রকাশ নাথদেব অঙ্কিত

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

শোভা—দীপ্তি, প্রভা, কান্তি, সৌন্দর্য্য।
শোভিত—বিভূষিত, প্রভাযুক্ত, অলঙ্কৃত।
শোলা—জলজ তৃণ।
শোষ—শুষ্কতা, চোষানি, ক্ষয়, যক্ষ্মা।
শোষণ—শুষ্ক করণ, চোষণ, রসাদান।
শৌচ—পবিত্রতাজনক ক্রিয়া, স্নানাদি।
শৌণ্ডিক—শুঁড়ী, মদ্যজীবী, সুরাবিক্রেতা।
শৌন—মাংস ব্যবসায়ী, মাংসজীবী।
শৌর্য্য—শূরত্ব, পরাক্রম, বীরপণা।
শ্মশান—শবদাহস্থান, পিতৃবন, প্রেতাবাস।
শ্যাকুল—কণ্টক লতাবিশেষ।
শ্যাম—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, হরিদ্বর্ণ।
শ্যামা—কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী, কালী, দুর্গা, তারা।
শ্যালক—পত্নীর ভ্রাতা, শালা, সম্বন্ধী।
শ্যালকী—পত্নীর ভগ্নী।
শ্যেন—বাজপক্ষী।
শ্রদ্ধা—দৃঢ়বিশ্বাস, প্রত্যয়, ভক্তি, আস্থা।
শ্রদ্ধালু—শ্রদ্ধান্বিত, বিশ্বাসকারী, ভক্ত।
শ্রবণ—শুনন, শব্দের গ্রহণ, শ্রুতি, কর্ণ।
শ্রবণেন্দ্রিয়—কর্ণ, কাণ, শ্রুতি।
শ্রম—আয়াস, উদ্যম, বহুচেষ্টা, ক্লান্তি।
শ্রমী—শ্রমান্বিত, শ্রমকারী, সচেষ্ট।
শ্রাদ্ধ—পিত্রাদির উদ্দেশে অন্নাদি দান।
শ্রান্ত—শ্রমকাতর, অবসন্ন, ক্লান্ত।
শ্রান্তি—অবসাদ, ক্লান্তি।
শ্রাবণ—চতুর্থ মাস, পরগোচরে কথন।
শ্রী—লক্ষ্মী, সম্পত্তি, সৌন্দর্য্য, শোভা।
শ্রীখণ্ড—চন্দন কাষ্ঠ, গন্ধ কাষ্ঠবিশেষ।
শ্রীফল—বেল, বিল্ববৃক্ষের ফল।
শ্রীবৎস—বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলের চিহ্ন।
শ্রীভ্রষ্ট—নির্ধন, সম্পত্তিহীন, বিশ্রী।
শ্রীমান্—ভাগ্যবান, ধনী, শোভান্বিত।
শ্রীমুখ—পত্রের চিহ্নবিশেষ।
শ্রীযুক্ত—শ্রীযুত, শ্রীমান্, শোভাযুক্ত।
শ্রুত—যাহা শুনা গিয়াছে, শ্রবণাবগত।
শ্রুতমশ্রুত—তুচ্ছীকৃত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত।
শ্রুতি—শুনন, শ্রবণ, কর্ণ, রব, বেদ, শ্রোত্র।
শ্রুতিকটু—কুশ্রাব্য, কুশব্দ, অপ্রিয় ধ্বনি।
শ্রুব—যজ্ঞীয় দর্ব্বী, যাগ, হোম, ইজ্যা।
শ্রেণী—পংক্তি, আবলী, আনুপূর্ব্ব।
শ্রেণীভূত—শ্রেণীগত, আনুপূর্ব্বিক।
শ্রেয়ঃ—মঙ্গল, উত্তম, ভাল, উচিত, মুক্তি।
শ্রেষ্ঠ—প্রধান, মহৎ, জ্যেষ্ঠ, অধিপ।
শ্রেষ্ঠতা—প্রাধান্য, প্রভাব, উৎকর্ষ।
শ্রোণি—কটিদেশ, নিতম্ব, পাছা, কঙ্কাল।
শ্রোতা—শ্রবণকর্ত্তা, শ্রবণকারী, শুননিয়া।
শ্রোত্রিয়—সংস্কার ও বিদ্যাবিশিষ্ট।
শ্রৌত—বেদসম্মত, বেদোক্ত, বেদপ্রণীত।
শ্লথ—শিথিল, অদৃঢ়, ঢিলা, শ্লথ।
শ্লাঘা—সঙ্কীর্ত্তন, স্তুতিবাদ, প্রশংসা।
শ্লাঘ্য—শ্লাঘনীয়, প্রশংসনীয়, স্তবার্হ।
শ্লিষ্ট—সংযুক্ত, মিলিত, আলিঙ্গিত।
শ্লেষ—ব্যঙ্গ, সঙ্কেত বাক্য, দ্ব্যর্থ, সংযোগ।
শ্লেষ্মা—কফ, শারীরিক ধাতু।
শ্লোক—পদ্য, দোঁহা, কীর্ত্তি, যশঃ।
শ্বঃ—শ্বস, কল্য, আগামী দিবস।
শ্ববৃত্তি—কৈঙ্কর্য্য, দাসত্ব, চাকুরী।
শ্বশুর—পতি বা পত্নীর পিতা।
শ্বশ্রূ—পতি বা পত্নীর মাতা, শাশুড়ী।
শ্বসন—বায়ু, বাতাস, শ্বাস-প্রশ্বাস।
শ্বা—(কুকুর দেখ)
শ্বাস—মুখনাসিকানির্গত বায়ু, কাসরোগ।
শ্বিত্র—শ্বেতকুষ্ঠ, পাথর।
শ্বেত—শুক্ল, শুভ্র, শাদা।
ষট্—ষড়, ছয়, ষট্‌সংখ্যা, ছয়গুণ, ষটক।
ষট্‌কর্ম্ম—যজনাদি ব্রাহ্মণের ছয় কর্ম্ম।
ষট্‌কোণ—ছয় কোণবিশিষ্ট।
ষট্‌ক্ষণ—এক দণ্ড পরিমিত কাল।
ষট্‌পদ—অলি, ভ্রমর, ভৃঙ্গ, দ্বিরেফ।
ষট্‌পুরুষ—পিতৃপিতামহাদি ক্রমে ছয়।
ষড়ঙ্গ—বেদ, আদ্যশ্রাদ্ধে দেয় পাদুকাদি।
ষড়শীতি—ত্রেয়াশী, মীন, মিথুন, কন্যা, ধনুঃ, এই কয় রাশির অন্যতম রাশিতে সূর্য্যের সঞ্চার।
ষড়ানন—ছয় মুখবিশিষ্ট, কার্ত্তিকেয়।
ষড়ধা—ষড়বিধ, ছয় প্রকার।
ষড়্ভুজ—ছয় বাহুবিশিষ্ট, ষট্‌কোণ।
ষড়ষড়—ঝর ঝর, ক্রমিক শব্দ, চুক্কানি।
ষণ্ড—ষাঁড়, ঔৎসর্গিক বৃষভ, নপুংসক।
ষষ্ঠ—ছয়ের পূরণ।
ষষ্ঠী—তিথিবিশেষ, দেবীবিশেষ।
ষাইট—ষষ্টি, সংখ্যাবিশেষ।
ষিড়্গ—ভ্রষ্টাচারী, লম্পট, বিটুল।
ষোড়শ—ষোল, শ্রাদ্ধে দেয় ভূম্যাদি।
ষোড়শাঙ্গ—মিশ্রিত ষোল।
ষোড়শোপচার—ষোল প্রকার পূজাঙ্গ।
ষোল—ষোড়শ, সংখ্যাবিশেষ।

[ক্রমশঃ]

দ্বিতীয় প্রবাহ

সপ্তম তরঙ্গ

সংগ্রাম*

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত মাসিক 'শনিবারের চিঠি'ও ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হইল। বালক অভিমন্যুও তাহাকে বলা চলে। 'কল্লোল' 'কালি-কলম' 'প্রগতি' 'ধূপছায়া' 'উত্তরা' চোখা-চোখা অস্ত্র লইয়া "মার্-মার্" করিয়া আসিল, শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্র-রাধাকমল প্রমুখ সপ্তরথীও এই কৌরব-অক্ষৌহিণীর সঙ্গে যোগ দিলেন। কুরুক্ষেত্র জমিয়া উঠিল। সেদিন অভিমন্যু-বধ সম্ভব হয় নাই শুধু এই কারণেই যে, কৌরব-অক্ষৌহিণী সমবেত ভাবেও অভিমন্যুর সমকক্ষ ছিল না এবং সপ্তরথীরও কৌরবপক্ষে আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল না। অন্তত শরৎচন্দ্রের যে ছিল না তাহার প্রমাণ 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম্মে"র প্রতিবাদে লিখিত "সাহিত্যে রীতি ও নীতি" প্রবন্ধেই আছে:

…কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দু'টি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটেই হইল আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে নাকি যে ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর, অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত।

আসলে ইহাই হইল শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা। কিন্তু তিনি তর্কের ভাণ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পরিহাস করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই, কোনও কারণে সাময়িকভাবে তিনি কবিগুরুর প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। শরৎচন্দ্রের আসল মনের কথাটা বাদ দিয়া আমি তাঁহার ধানাই-পানাই লইয়াই তাঁহাকে এই বলিয়া আঘাত করিলাম—

মনস্তত্ত্ববিদেরা এক প্রকার কম্‌প্লেক্স-এর কথা উল্লেখ করেন, যাহার প্রভাবে পড়িয়া লোকে বিনা প্রয়োজনে মিথ্যা কহে। মিথ্যা বলিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত কোনও লাভ নাই, তবু মিথ্যা বলিবার লোভ তাহারা সম্বরণ করিতে পারে না। আইন-আদালতে এই শ্রেণীর মিথ্যা সাক্ষী অনেক দেখা যায়, সাহিত্যের আদালতেও সম্প্রতি দেখা দিয়াছে।

এই আঘাত শরৎচন্দ্র সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আমার প্রতি এমনই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তীকালে যত্রতত্র আমাকে পাগল বলিয়া অভিহিত করিয়া মনের ঝাল মিটাইতেন। তাঁহার ভক্ত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' পত্রে তাঁহার এই উক্তি একাধিক বার প্রচারিত হইয়াছে—আমি বিশ্বাস করি নাই ব্যক্তিগত আক্রোশে শরৎচন্দ্র এতখানি আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীঅতুল বসুর মুখে যখন সেই কথাই শুনিলাম, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ১৯৩৪ সালে শ্রীঅতুল

---

* কুক্ষণে বৈশাখ ১৩৬০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আত্ম-স্মৃতি'তে জমিদারি লাটে উঠার কথা লিখিয়াছিলাম। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রবিবারের 'দৈনিক বসুমতী'তে "সাহিত্য পত্র" বিভাগে "লাট না অষ্টম" নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়াতে জ্যৈষ্ঠের 'আত্ম-স্মৃতি'র ফুট-নোটে তাহার উল্লেখ করি। এখন আবার ২নং থানা রোড, আসানসোল হইতে শ্রীমহাদেব-দাস চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ৭।৭।৫৩ তারিখের পত্রে জানাইতেছেন, "আপনি পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় (বৈশাখে) আত্মস্মৃতিতে কিছুই ভুল লিখেন নাই।…যদি কিছু ভুল হইয়া থাকে তবে 'জমিদার' শব্দটির অপপ্রয়োগ হইয়াছে এবং তাহা পত্তনীদার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রচলিত ভাষায় 'জমিদার' ও 'পত্তনীদার' মধ্যে পার্থক্য করা হয় না।…কাজেই যদি কোনও অসঙ্গতি হইয়া থাকে—তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের পাদটীকাতেই হইয়াছে।" আমি জমিদার, পত্তনীদার, লাট, অষ্টম—শব্দগুলিই জানিতাম, কোন্‌টির গূঢ়ার্থ কি জানিতাম না। সুতরাং প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া আমার অনভিজ্ঞতার খেসারৎ দিতেছি।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অনুজাচরণের কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বোমার আঘাতে মৃত্যুর কথা লিখিয়াছিলাম। বর্দ্ধমান কাটোয়া রিলিফ অফিসের শ্রীযতীশচন্দ্র ভৌমিক আমাকে জানাইয়াছেন, ঘটনাটি কিছুকাল পরে ঘটিয়াছিল। যতীশচন্দ্র অনুজাচরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পুরাতন সংবাদপত্র খুলিয়া দেখিলাম তাঁহার কথাই ঠিক, অনুজাচরণ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতার তদানীন্তন পুলিস কমিশনার টেগার্ট-সাহেবকে মারিতে গিয়া স্বয়ং মৃত্যুবরণ করেন।

বসু তেলরঙে আমার পোর্ট্রেট আঁকেন। কলিকাতা যাদুঘরে একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীতে উহা প্রদর্শিত হয়। শরৎচন্দ্র প্রদর্শনী দেখিতে দেখিতে আমার ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিল্পী অতুল বসুকেই বলেন, "দেখেছ, লোকটার চোখে পাগলের দৃষ্টি, একেবারে পাগল! হবে না, ওর মা যে পাগল ছিলেন।" আশ্চর্য, আমার মায়ের মূর্চ্ছারোগ যে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্করোগে পরিণত হইয়াছিল শরৎচন্দ্র সে খবরও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিস্মিত হইবার কারণ এই যে, প্রায় ঠিক এই সময়েই আমি তাঁহার নিকট ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানীর হইয়া বই বেচিতে গিয়া সবিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় আমি 'বঙ্গশ্রী'র চাকুরিতে ইস্তফা দিই। শ্রীপরিমল গোস্বামী তখন 'শনিবারের চিঠি'র বেতনভোগী সম্পাদক, এবং আমারই মত অসহায়। তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে মন সরে না, অথচ অন্ন-সংস্থানের অন্য উপায়ও জানা নাই। শ্রীনিখিল দাস ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানীর নামকরা সেল্‌স্‌ম্যান, আমি এক সময় তাঁহার একজন বড় ক্রেতা ছিলাম, পরে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তিনি ভরসা দিলেন, "কুচ পরোয়া নাই, দুই জনে বই বেচিয়া কমিশন ভাগাভাগি করিয়া লইব। একসঙ্গে খাটিলে আয় মন্দ হইবে না।" আমি তখন নিমজ্জমান, যে কোনও কুটাই আমার হস্তধার্য। সুতরাং নিখিল দাস সজনী দাস দুই দাসে মিলিয়া দাস অ্যাণ্ড কোং প্রতিষ্ঠিত হইল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউস্থিত "ভারত-ভবনে" একটি কামরা ভাড়া লইয়া রীতিমত সাহেবী মেজাজের অফিস হইল, টেলিফোন হইল। নিখিলদার একখানা মোটরকার ছিল, নানা কারণে তিনি তাহা নিজেই চালাইতেন, কখনও ড্রাইভারের সাহায্য লইতেন না। আপিস তালাবদ্ধ করিয়া দুই দাসে শিকারে বাহির হইতাম। দিনান্তে অফিসে ফিরিয়া চা-চুরুট খাইতে খাইতে যখন হিসাব খতাইতাম, আমার চারিদিকে চা-চুরুটের ধূম্রজালের সঙ্গে ভাবনার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত। যাহা হউক, একদিন দুই জনে মিলিয়া শরৎচন্দ্রকে তাঁহার অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে বধ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে পাইয়া বিশেষ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। সেই আস্ত রেঙ্গুন লাইব্রেরি গিলিয়া খাওয়ার গল্প আরও সরস করিয়া বলিলেন এবং এক সেট বহুমূল্য বিজ্ঞানের বই নগদ দামে খরিদ করিয়া আমাদের বিদায় দিলেন। সেদিন স্নেহবিগলিত শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে শ্রীঅতুল বসুর নিকট পূর্বোক্ত কাহিনী শুনিয়া আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, পাগলকে সর্বরকমে তুষ্ট করিয়া ভয়ে ভয়ে সেদিন বিদায় করেন নাই তো! জবাব দিবার জন্য শরৎচন্দ্র তখন আর ছিলেন না।

যৌবনের উত্তেজনা বড় ভয়ঙ্কর, শক্তির উন্মাদনাও কম ভয়ঙ্কর নয়। আমরা একে একে প্রখর ব্যঙ্গে সপ্তরথীকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলাম। এই কালের 'শনিবারের চিঠি' যাঁহারা দেখিবার সুযোগ পাইবেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন, কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণই না আমরা মাত্র তিন-চার জনে ঘটাইয়াছিলাম! আমরা কয়েক জন একক, 'শনিবারের চিঠি' একা—বিরুদ্ধ পক্ষে বড় বড় মহারথীরা, একুনে সাতাশটি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র। চারিদিকে "ত্রাহি ত্রাহি" রব উঠিয়াছিল; সেকালের "অতি-আধুনিক" ও তাহাদের সমর্থক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা খুলিলেই ইহার পরিচয় মিলিবে।

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে ছিলেন। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁহার 'কল্লোল-যুগে' ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃত করিয়াছেন, ঔপন্যাসিকের স্বভাবসুলভ ধর্মে তিনি রবীন্দ্র-প্রসঙ্গেও খুশিমত আপন মনের মাধুরী মিশাইয়াছেন। আমি যে রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন সাহিত্যের অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলাম অচিন্ত্যকুমার লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ "সরাসরি খারিজ করে দিলেন আর্জি।" আমার আবেদনের দুই-তিন মাসের মধ্যেই তিনি যে "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেই কথাটাই অচিন্ত্যকুমারের জানা নাই। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের প্রথমার্দ্ধেই এই মামলা লইয়া নিখিল বঙ্গ পত্রিকা জগৎ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধ ঠিক আণবিক বোমার মত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ১৩৩৪ সালের ১লা শ্রাবণ 'বিচিত্রা'য়, বোমা নিক্ষেপ করিয়া তিনি মালয় ভ্রমণে চলিয়া যান, ফিরিয়া আসেন কার্তিকের মাঝামাঝি। তাঁহার আরও মারাত্মক বোমা "সাহিত্যে নবত্ব" ১৯২৭ সালের ২৩শে আগষ্ট

প্রানসিউস জাহাজে নির্মিত হইয়া অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র "যাত্রীর ডায়ারি" শিরোনামায় নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে তিনি লেখেন—

শক্তির একটা নূতন স্ফূর্ত্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল করে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল জলের নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুরাই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই বলেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ করে রাখে। বিলিতী পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে;—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে "রিয়ালিটির কারি-পাউডর।" ওর মধ্যে একটা হচ্চে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।

হিরোশিমার পরে নাগাসাকি: "সাহিত্য-ধর্ম্মে" আহত আধুনিক সাহিত্যিকেরা "সাহিত্যে নবত্বে"র আঘাতে মর্মাহত হইলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই সভা আহ্বান করিতে হইল তাঁহার জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা-ভবনে"। কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার অপরাধ আরও গুরুতর হইয়া উঠিল ২৩ পৌষ ১৩৩৪ তারিখে লেখা তাঁহার একখানি পত্র 'শনিবারের চিঠি'র মাঘ (১৩৩৪) সংখ্যায় মুদ্রিত হইবার ফলে। পত্রটি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত। ইহাতে 'শনিবারের চিঠি'র ও আধুনিক তরুণদের সাহিত্যিক মামলার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন:

'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌছেচে। আর্ট পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো করলে তাকে খর্ব্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গসাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্ব্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়। পৃথিবীতে উন্মার্গযাত্রার বড়ো বড়ো ছাঁদ, type আছে, তার একটা না একটার মধ্যে প্রগতিরও গতি আছে। যে-ব্যঙ্গের বজ্র আকাশচারীর জন্য তার লক্ষ্য এই রকম ছাঁদের 'পরে।...

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো আধো কথা নিয়েই গর্ব্ব করে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা," তখন বুঝতে পারি কচি ভাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেচে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে। স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে অস্থানে বাহাদুরী করে বেড়ায়, "আমরা তরুণ, আমরা তরুণ" করে আকাশ মাত করে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে, যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য বলে গণ্য করি নে। চিরকাল দেখে এসেচি তরুণ যার নিজেকে তরুণ বলে কল্পান্বিত করে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হয়ে উঠল, সে নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখচে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বিষফোড়ার মতো দগদগে তার রঙ। শুধু তাই নয়, তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপক পাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চলচে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য কবীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ করে কাউকে এগজামিনে পাশ করতে হয় না,—বিধাতার বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনিই আসে। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিগ্রীধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস্ লিখতে সুরু করেচে। তারা বলচে আমরা তরুণ-বয়স্ক বলেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,—আমরা যুদ্ধ করেচি বলে না, প্রাণ দিয়েচি বলে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই লিখেচি বলে। সাহিত্যের তরফে বলবার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে হয় ভালো নয় মন্দ বলব। কিন্তু তরুণ বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এ তো আজ পর্য্যন্ত শুনিনি।...এখন থেকে লেখকদের কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লেখার ভালোমন্দ ঠিক করতে হবে? কোনো তরুণ বয়স্কের লেখার নির্লজ্জতাদোষ ধরলে নালিশ উঠবে যে, সেটাতে কেবলমাত্র লেখার নিন্দা করা হোলো না, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত তরুণ আছে সবাইকেই গাল দেওয়া হলো! যা হোক্, আমার বক্তব্য এই যে, যথার্থ সাহিত্যের হাসি বিরাট, দূরগামী।...ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান,—নব-নব হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।

গোটা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ব্যাপিয়া প্রকাশ্য ভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ধনুর্ধরদের লইয়া এত যে সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল 'কল্লোল-যুগে'র লেখকের তাহা না জানিবার কথা নয়; তিনি নিজেই বিশিষ্ট ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন। তাই আশ্চর্য হই যখন দেখি তাঁহার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন :

> সব চেয়ে লাঞ্ছনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সে এক হীনতম ইতিহাস। 'শনিবারের চিঠি'র হয়তো ধারণা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ নন—তাঁরই প্রশংসার আশ্রয়ে তারা পরিপুষ্ট হচ্ছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিচিত্রাভবনে যে বিচার-সভা বসে তা উল্লেখযোগ্য।···দুদিন সভা হয়েছিল। অপূর্ব ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটি 'সাহিত্যধর্ম' নামে ছাপা হল 'প্রবাসী'তে।···এই "সাহিত্যধর্ম" নিয়েও তর্ক ওঠে। শরৎচন্দ্র প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখেন 'বঙ্গবাণী'তে—"সাহিত্যের রীতি ও নীতি"। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করেন।

'কল্লোল-যুগে'র ইতিহাস-অংশের ইহাই স্বরূপ! জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রাভবনে" সভা অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩২, শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার ঠিক আট মাস পরে; শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্রের প্রতিবাদও ততদিনে পুরাতন হইয়া বিস্মৃতির পর্যায়ভুক্ত। আমাদের আপত্তি করিবার কিছু নাই; বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে যে বেদব্যাস বে-পরোয়া রামকৃষ্ণ-মাইথলজি রচনা করিতেছেন তিনি "কল্লোল-যুগে"র রোমান্স-রচনার অধিকারী নিশ্চয়ই।

প্রকাশ্য যাবতীয় নজির ছাড়াও আমাদের নিজস্ব কিছু নজির আছে, যদ্দ্বারা আমরা জানি, আধুনিকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সত্য মনোভাব কি ছিল। অচিন্ত্যকুমার "হয়তো ধারণা হয়েছিল" এই উক্তির কোনও অবকাশ কোন দিক দিয়াই নাই। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪ (১৫ই নবেম্বর ১৯২৭) শান্তিনিকেতন হইতে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি এই :

কল্যাণীয়েষু—

তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহা-মহোপাধ্যায়দের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্ম্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখতে পাই—তাতে খুসি হই—কিন্তু তোমাদের শনিবারের চিঠির সমরাঙ্গনে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী দেখলে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না—তারা অপরাধিনী হলেও। নারীদের প্রতি পুরুষ-স্বভাবের অন্তর্গূঢ় করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়—আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা,—কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক। সিভিল ক্রিমিন্যাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে "ছায়েবানুগতা," ওরা যদি দোষ করে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত করে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তাহলে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময় স্থূল বস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়—মেয়েদের অপরাধ তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো বলে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্ম্মিণীর সহধর্ম্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্ম্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা করে দেখো। ইতি ২৮শে কার্ত্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন আমরা কার্তিক সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'র "মণি-মুক্তা" বিভাগে শ্রীরাধারাণী দত্ত লিখিত (১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত) "সাগর-স্বপ্ন" নামক গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক সাহিত্য-প্রসঙ্গে কিছু লিখিতে আহ্বান করিলাম। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই তাঁহার জবাব পাইলাম—

কল্যাণীয়েষু—

দোহাই তোমাদের, শনিবারের চিঠিতে আমাকে টেনো না। নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তাহলে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম—কেন না আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজম্ দাঁড়ায়। প্রবাসীতে এবার যেটা লিখেচি ["সাহিত্যে নবত্ব"] সেটাতেও হয় তো অনেকের গায়ে বাজবে—কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টন্‌টনে হয়ে রয়েচে। যৌবনের তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়, এখন সময় অল্প বলেই সেই সঙ্কীর্ণ সময়টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়—ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব না। অল্প কটা দিন আছে—শেষ ব্যবহারের জন্যে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার হ'ল সার্জ্জিকাল ডিপার্টমেন্ট, আর আমার আরোগ্য-স্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঈষ্টইণ্ডিজ ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তি-নিকেতনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, শুধু বিশ্রাম নয়,

তাঁহার বিচিত্র গানে গানে ঋতুরঙ্গশালা মুখর হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতার সাহিত্যপ্রাঙ্গণে যে কোলাহল আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, যাহা আসলে আমাদের আহ্বান ও তাঁহার উত্তর "সাহিত্য-ধর্ম্মে"রই জের, তাহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে পত্রাঘাত করিতেছিলাম তর্কের কোলাহলে নামিতে নয়, সম্পূর্ণ দলাদলিনিরপেক্ষ ভাবে চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে। তিনি লিখিলেন—

কল্যাণীয়েষু,

চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এর ওপরে হিবর্ট লেকচার এখনো লিখতে বসতে পারিনি বলে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে।

তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত করে দিয়েছে, যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্মুখের মুখোস পরে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তাহ'লে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই—চতুর্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহার পরই তিনি কলিকাতায় আসিলেন এবং আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি মত "বিচিত্রাভবনে" সভা আহ্বান করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চৈত্র মাসের ৪ঠা ও ৭ই দুইদিন এই সভা বসিল। প্রথম দিন আমরা উপস্থিত ছিলাম না। ৬ই চৈত্রের 'বাংলার কথা' নামক দৈনিকে প্রথম দিনের সভার এক সম্পূর্ণ কল্পিত মিথ্যা বিবরণী প্রকাশিত হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বলা বাহুল্য, এই বিবরণী অতি-আধুনিকদের রচিত। তিনি সুতরাং পরদিন ৭ই চৈত্র আবার সভা ডাকেন, উভয় পক্ষই স্বদলবলে এই সভায় উপস্থিত হই। রবীন্দ্রনাথ রিপোর্টারদের আর বিশ্বাস না করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় দুই দিনের সভার বিবরণ স্বয়ং লিখিয়া দেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখের ও জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে সেগুলি যথাক্রমে "সাহিত্যরূপ" (পৃ ১২২-১২৯) ও 'সাহিত্য-সমালোচনা" (পৃ ২২২-২২৭) শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার কাহিনী অচিন্ত্যকুমারের কতখানি স্বকপোলকল্পনাপ্রসূত এই দুইটি বিবরণীতেই তাহার প্রমাণ আছে, আমাদের নিকট লিখিত চিঠির প্রমাণ অধিকন্তু। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য দুইটি প্রবন্ধ হইতেই কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি :

সম্প্রতি সাহিত্যের "যুগ" "যুগান্তর" কথাটার উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে "যুগ" বলে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্নওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে,—বোঝাই সারা হলে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না, তার পরে আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়! সাহিত্যের যুগ বলতে কি বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েচে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোনো-একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় একথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিষ আর কিছু নেই।—"সাহিত্যরূপ," 'প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩৩৫, পৃ ১২৫।

শনিবারের চিঠির লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্য্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্য-সংস্কার কার্য্যে তাঁদের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র আছে—কিন্তু কর্ত্তব্যটি অপ্রিয় বলেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্ত ভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্র-চিকিৎসায় অস্ত্র-চালনায় সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেন না, আরোগ্যবিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়, সাহিত্যের চিকিৎসাই শনিবারের চিঠির লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটু মাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্রচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিস নয়, প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা করে শনিবারের চিঠি যদি কর্ত্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাঁকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। যাঁদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা যথাস্থানে ক্ষান্তি দাবি করি।

'কল্লোল-যুগে'র ঐতিহাসিকের যদি এই তথ্য-গুলির সঙ্গে পরিচয় থাকিত তাহা হইলে তিনি "সাহিত্য-ধর্ম্ম" ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি' বিরোধ-প্রসঙ্গ অত ফলাও করিয়া প্রচার করিতে ইতস্তত করিতেন; 'কল্লোল-যুগ' নামটা সম্বন্ধেও তাঁহার সঙ্কোচ আসিত। তবে কবি অচিন্ত্যকুমারের যদি এই আত্মবিশ্বাস থাকে—সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে, তাহা হইলে আমরা নাচার!

১৩৩৪, চৈত্রের 'কল্লোলে' (পৃ ১৪৩-৭৫) সম্পাদককে লিখিত "কশ্চিৎ মৃত-জীবিত বৃদ্ধের"

এক "পত্র" প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে আসল ইতিহাসের আভাস আছে। সম্পাদক মহাশয় ইহা পত্রস্থ করিয়াছেন, কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। বৃদ্ধ বলিতেছেন—

আপনারা এমন কিছুই ভাল লেখেননি যাতে সহসা বাংলা-সাহিত্যের একটা নতুন দিক খুলে গেছে—তাহলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ তাঁর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আপনাদের কোথাও না কোথাও স্বীকার করতেন। কারণ, তিনি বরাবরই বাংলা-সাহিত্যের অথবা রূপকলার যেখানে যা নতুন অভ্যুদয় হয়েছে, তাকেই আপনার উদার স্নেহস্পর্শে ধন্য করেছেন—তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথে মঙ্গল-আশিসের শুভবাণী বর্ষণ করেছেন।...রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়া আপনাদের ওপর নেই, এতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আপনাদের সাহিত্যে অভিনবত্ব কিছুই নেই, থাকলে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। বাংলা-সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক লেখা যে আর্ট হয়ে উঠেছে, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। যথাসময়ে তিনি তাকে যথা ভাবে স্বীকারও করেছেন।

আরও একটি সমসাময়িক সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করিতেছি। সাক্ষী 'প্রগতি' পত্রিকা—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, ঢাকার 'প্রগতি'-বাদী হইলেও উভয়েই কলিকাতার 'কল্লোলে'র দুইটি উত্তাল ঢেউ। সম্পাদকীয় "মাসিকী"তে 'প্রগতি' সেদিন লিখিয়াছিলেন—

'শনিবারের চিঠি' দেশের লোকের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করবেই বা না কেন? বাঙলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদক যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি যা'কে সস্নেহ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছেন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা যা'র পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহ-দাতা—সে পত্রিকার কিছুমাত্র মর্য্যাদা বা মূল্য নেই এ-কথা কেমন করে' বলি? 'চিঠি'র লেখকদের রচনাভঙ্গীর চাতুর্য্য, জ্ঞানের অদ্ভুত বিস্তার, কোনো বিশেষ লিখনভঙ্গী হুবহু অনুকরণ করবার আশ্চর্য্য শক্তি, হাস্যরসের ওপর অধিকার—এ-সব কা'কে না মুগ্ধ করেছে? প্যারডি করায় এঁদের বেশ হাত আছে, কবিতা লিখতে গিয়ে এঁদের ছন্দপতন হয় না, এঁরা অনায়াসে অজস্র লিখতে পারেন, এ-সব গুণ কি উপেক্ষণীয়?

কিন্তু আসল সত্য কথা হইতেছে এই যে, মাসিক 'শনিবারের চিঠি' সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল সম্পূর্ণ একক, একান্ত আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া। তাহার নিয়মিত লেখকসংখ্যা প্রারম্ভে মুষ্টিমেয়—মোহিতলাল, অশোক, যোগানন্দ ও এই অধম। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, নীরদ চৌধুরী, গোপাল হালদার প্রমুখ শক্তিমানেরা পরে একে একে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু শুরুতেই এমন প্রবল বিক্রমে আমরা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, মনে হইয়াছিল সপ্তরথীশাসিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মহড়া আমরা লইতে পারিব, অবশ্য জনার্দন রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে আছেন এই বিশ্বাস আমাদিগকে কম বলীয়ান করে নাই।

প্রথম সংখ্যা মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র পরিচয় দিয়াছি, দ্বিতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আবার আসিয়া জুটিলেন, এবারেও বিষয় সেই মুসলমানী সাহিত্য—"তারিখ-ই-বাঙ্গালা।" বাংলা দেশের পূর্বতন শাসন-পদ্ধতি আরও পাঁচশ বছর বজায় থাকিলে কি ঘটিতে পারিত তাহার আভাস এই কল্পিত ইতিহাসে ছিল। আরম্ভটি এইরূপ :—

এই যে নক্সা দেখিতেছ ইহার নাম বাঙ্গালা মুলুক। এই দেশের উত্তরে পাহাড়, দক্ষিণে সমন্দর, পূর্ব্বে আছাম ও পশ্চিমে বিহার শরিফ। সেকালে এই দেশে হিন্দু নামে এক জাতি বসতি করিত। তাহারা বোত পরস্তি করিত। ইট-পাথরের মূরত গড়িয়া তাহাকে ছেজদা করিত। আজ সহর কলিকাতা, যেখানে তোমাদের দেশের বাদশাহ বাস করেন, সেইখানে তাহাদের এক বোত ছিল তাহার নাম কালী। আজ যেখানে বাঁটু জুতাওয়ালার মছজেদ দেখিতে পাইতেছ সেইখানি এই বোতের ঘর ছিল।......

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী এই মাস হইতেই নিয়মিত আমাদের আসরে যোগ দিলেন ত পরবর্তী কার্তিক সংখ্যার জন্য তিনি কয়েকটি সাহিত্য-প্রসঙ্গ লিখিয়া আনিয়া আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ছাত্র-গৌরবে মোহিতলালের গর্ব ও আনন্দের অবধি ছিল না। নীরদচন্দ্র তখন পর্যন্ত ইংরেজীনবীশ ছিলেন, বাংলা লিখিতেন না। মাতৃভাষা-সাধনার প্রথম প্রয়াসই তাঁহার এমন পরিণত রূপ লইল যে, বিস্মিত না হইবার উপায় ছিল না। তিনি "বলাহক নন্দী" এই নামে লেখা ছাপিতে দিলেন। প্রথম কিস্তি "প্রসঙ্গ-কথা" দিয়াই তিনি স্বদেশ কিশোরগঞ্জে (মৈমনসিংহ) গেলেন। কার্তিক সংখ্যা সেখানে ডাকে পাইয়া ২৯. ১০. ২৭ তারিখে আমাকে লিখিলেন (স্বভাবতই ইংরেজীতে)—

Dear Sajani Babu,

Many thanks for the শনিবারের চিঠি which reached me yesterday. I had thought of waiting till I went back to Calcutta to congratulate you on the excellence of this number, but that is seven days, a good deal too far off to satisfy me. I cannot rest till I have dropped a few lines to tell you how I enjoyed it all. When I

come back would you introduce me to the wonderfully clever writer of the 'Bastabika' [বাস্তবিকা] ? Mohit babu had prepared me for the প্রবীণ পুরোহিত and I do think he had not praised it enough. I am glad that you have given an example of forceful plain-speaking in your "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রসঙ্গে. I enjoyed the সংবাদ-সাহিত্য and the "Mani-Mukta" [মণি-মুক্তা] too well to have words adequate for my delight in them…I am writing some more notes about style and language this time.

Yours sincerely
Nirad

এই কার্তিক সংখ্যা (১৩৩৪) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের "বাস্তবিকা"-আসরে হরিকুমারের আবির্ভাব ঘটে, নীরদচন্দ্রের "প্রসঙ্গ-কথা" প্রবর্তিত হয় এবং 'মণি-মুক্তা'র প্রথম সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। "শ্রীসরেশচন্দ্র বেশ। লিখচ" বেনামে "প্রবীণ পুরোহিত" সম্পাদক যোগানন্দ দাসের একটি অত্যুৎ-কৃষ্ট রচনা—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ "স্যাটায়ার"; "সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রসঙ্গে"—শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমার তীব্র আক্রমণ। অর্থাৎ এই সংখ্যা হইতেই সক্ষমভাবে সংগ্রামের আরম্ভ। স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সংখ্যাতে "আদালৎ-ই-ফানুস-ই-'ধর্ম্মবাণী'তে "সেকেলে কবির একেলে বিচার" নামে 'মানসী-মর্ম্মবাণী'র সাহিত্য-সমালোচনাকে ব্যঙ্গ করিয়া সাহিত্যের লড়াই আরও জমাইয়া তোলেন। মোটের উপর এই কার্তিক মাসেই আমরা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম।

নীরদচন্দ্র কিশোরগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। "বাস্তবিকা"-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল এবং তিনি ধীরে ধীরে পুরাপুরি ভাবে 'শনিবারের চিঠি'র সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। পরবর্তী মাঘ সংখ্যা হইতে সম্পাদনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহার উপর বর্তাইল, শ্রীযোগানন্দ দাস সম্পাদক-পদ হইতে বিদায় লইলেন। আমি হইলাম কর্মাধ্যক্ষ।

[ক্রমশঃ]

নাতি ও দাদু

শ্রীকালিদাস রায়

চলিয়াছি ট্রামে।
চড়কডাঙ্গার মোড়ে ট্রাম যবে থামে
দশ বছরের ছোট নাতি
তারে করি সাথী
এক বৃদ্ধ উঠিল গাড়ীতে
চাহিয়া দেখিল চারিভিতে
কোথাও নাইক ঠাঁই। একজন উঠিল দাঁড়ায়ে
বৃদ্ধে দেখি, বৃদ্ধ কিন্তু নাতিরে বসায়ে সেই ঠাঁয়ে
সারা পথ টলিতে টলিতে
দাঁড়াইয়া দাণ্ডা ধরি লাগিল চলিতে।
বড় তুচ্ছ কথা
এর মাঝে কবিত্বের নেইক বারতা।
• • •

ব'সে ব'সে আমি ভাবিলাম
বুঝিল কি অই নাতি দাদুর স্নেহের কোন দাম ?
অম্লান বদনে
বসিয়া রহিল নাতি আপন আসনে।
সারা দিন ছুটাছুটি ক'রে যেবা খেলে
দাঁড়ায়ে সে কিছুক্ষণ যাইতে পারিত অবহেলে।
বুদ্ধি তার নয় পরিণত,
তারে অপরাধী করা হবে না সঙ্গত।
এই নাতি হবে যুবা একদিন সবল সুঠাম,
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুশিক্ষিত তখনই কি এ স্নেহের দাম
বুঝিবে সে ? শত শত হেন তুচ্ছ স্নেহ-নিদর্শন
আজন্ম লভিল যাহা করিবে কি কোনোটি স্মরণ ?
দেখিবে সে খতাইয়া দাদা মহাশয়
কি রাখিল ব্যাঙ্কে আর কি রাখিল বিষয়-আশয়।
তার চেয়ে শতগুণে যাহা মূল্যবান্
অজস্র অমৃতধারা বাৎসল্যের করালো যা' পান
স্মরিবে কি তাহা কোন দিন ?
বিষয়-আশয় টাকা কিছু না মিলিলে
রক্তের বাঁধন তাও হয়ে যাবে ঢিলে।
জীবনের অঙ্গীভূত যেই সব দান
হায় কেহ ভাবেনাক তারে মূল্যবান্।
• • •

কালীঘাট মোড়ে নেমে যেতে হ'ত চারু এভিনিউ
ভাবিতে ভাবিতে দেখি এসে যে পড়েছি লেকভিউ।

মহামান্যা রাণী এলিজাবেথের প্রতি

ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার

[১৮৯৭ সালে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জুবিলি উপলক্ষে রচিত এই পংক্তিগুলি যে কোনদিন ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তিন বছর পরে জানুয়ারী মাসে মহারাণীর মৃত্যু হল। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল অনেকের মনে। পৃথিবীর সব চেয়ে মূল্যবান অংশটি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে বলে প্রতীতি জন্মাল। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় অমূলক প্রমাণিত হল সেই সন্দেহ ও প্রতীতি। মহাকাল বহু সম্পদ উদরসাৎ করেছে, কিন্তু ইংলণ্ড এবং তার বিশেষ সম্পদ ইংরাজত্ব, অর্থাৎ বৈশিষ্ট, কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন, দ্বিতীয় এলিজাবেথ "আমার রাজ্ঞী"। দীর্ঘদিন তিনি রাজত্ব করুন। আবার আমরা অজানা ভবিষ্যতের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছি। এবং এই অক্ষম কবিতাটি সেদিনকার মতো আজও আমার কাছে একান্ত সত্য। কিন্তু আমরা শক্ত আছি; কারণ, আমরা জানি, এই ইংলণ্ড নিশ্চিত থাকবে। তিন কুড়ি বছর আগে লেখা এই কবিতার মধ্যে আমি তাই মাত্র তিনটি শব্দ বদল করে প্রকাশার্থে দিলাম। ভিক্টোরিয়া নামের সঙ্গে এলিজাবেথ নামটির কী মধুর ধ্বনিগত মিল রয়েছে!—লেখক।]

এলিজাবেথ রাজ্ঞী আমার
ইংলণ্ড আর দেশ।
হে ঈশ্বর! জনবল তার
অগণিত হয় যেন বালুকার মত।
দিনরাত্রি—প্রতিক্ষণ
গুরুধ্বনি-জাগা তার সাগর-কিনারে
মৌনবিহীন মুখর ঊর্মিমালা
উচ্চকণ্ঠে ঘোষে স্বাধীনতা।

বৃদ্ধ ড্রেক স্বজন আমার,
শেক্‌স্‌পীয়রের এলিজাবেথ,
আর নেল্‌সন—খ্যাতি যাঁহার
মৃত্যুকে করেছে অতিক্রম।
যবে আমি ব্যাকুল নয়নে
শতাব্দির পৃষ্ঠাগুলি খুলি
দেখি মোর স্বদেশের শ্রেষ্ঠ বীরগণে
রক্তে জাগে উন্মাদনা,

কপোল উত্তপ্ত হয়,
হৃদিতল হয় আলোড়িত।
তাহাদের পদচিহ্ন ধরি
আগে যেতে জাগায় প্রেরণা।
দেশের শ্যামল মাঠ মিষ্ট মোর কাছে,
মিষ্ট লাগে প্রিয়গন্ধি গোলাপের আভা,
সমুদ্রের স্বাদ-বাহী বাতাসের শ্বাসে
ভেসে আসে মধুর মিষ্টতা।

এলিজাবেথ রাজ্ঞী আমার,
ইংলণ্ড আমার দেশ।
হে ঈশ্বর! জনবল তার
অগণিত হয় যেন বালুকার মত।

অনুবাদক: অ, ন, ম

[লেখকের অনুমত্যনুসারে ব্রিটিশ সংস্করণ 'রীডার্স ডাইজেষ্ট' পত্রিকার জুন সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশিত হল। উক্ত পত্রিকার প্রকাশকগণ কর্তৃক কবিতাটির সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

প্রতিযোগিতা

বিষয়
মৎস্য

প্রথম পুরস্কার—১৫৲

দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৲ তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

(ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২২শে শ্রাবণ)।

লেবু
-দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী
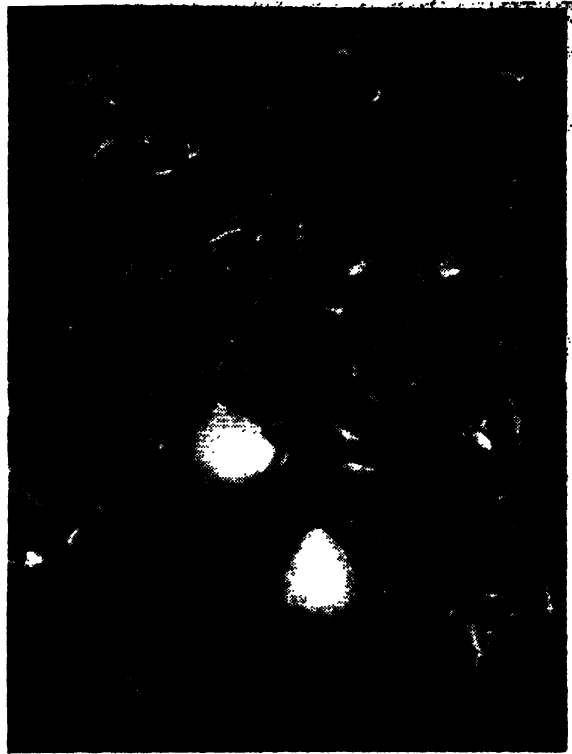
কাঁটাল (দ্বিতীয় পুরস্কার) —অজিতকুমার মিত্র

পেঁপে
—অর্দ্ধেন্দু প্রধান

নারিকেল
—অনামী

পেয়ারা (প্রথম পুরস্কার) —ভ্রমর ঘোষ

খেজুর —জ, মিত্র ফলাহার

আনারস (তৃতীয় পুরস্কার) —গোবিন্দলাল দাস

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখিয়া অঙ্কিত এবং তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত —রেবতীভূষণ ঘোষ অঙ্কিত

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মার্শাল সাহেবের প্রশংসা পত্র

[সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোকগমনে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয় এবং বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য ইংরাজীতে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রের সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মার্শাল সাহেবের একখানি প্রশংসাপত্র ছিল। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :]

"এতদ্দারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের সেরেস্তাদারের কাজ করিতেছেন। তিনি সরকারী সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং তথায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয় পাঠ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বাড়ীতে অনুশীলন দ্বারা তিনি ইংরাজী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যাপারে তিনি তাঁহার শিক্ষা ও বুদ্ধি দিয়া আমাকে যথেষ্ট মূল্যবান সাহায্য করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়েও বিশেষত: গত চার বৎসর যাবৎ সংস্কৃত কলেজের বার্ষিক বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি সানন্দে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার চাতুর্য্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সংস্কারমুক্ত মন আমাকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করিয়াছে। মোট কথা, অশেষ গুণাবলী, 'বুদ্ধিবৃত্তি, শ্রমশীলতা, উন্নত চরিত্র—এ সমস্তই তাঁহাতে অস্বাভাবিক উচ্চমাত্রায় বাসা বাঁধিয়াছে।"

জি, টি, মার্শাল
সেক্রেটারী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ,
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৪৬

প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে সার জন পীটার গ্রাণ্টের পত্র

[প্যারীচাদ মিত্র ১৮৩৬ সালে দি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর "সাব, লাইব্রেরিয়ান" নিযুক্ত হন। সার জন পীটার গ্রাণ্টের নিম্নলিখিত সুপারিশ পত্র প্যারীচাঁদকে এই পদলাভে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল]

"আমি যখন হিন্দু কলেজে আইন পড়াইতাম তখন প্যারীচাঁদ মিত্র ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি আমার ক্লাসে যোগ দিতেন। তখন হইতেই আমি তাঁহাকে জানি। জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ তিনি যে ভাবে কাজে লাগাইয়াছিলেন, তাহাতে এবং তাঁহার পাঠপ্রীতি ও বোধশক্তি দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণাই জন্মিয়াছে। সেই সময় হইতেই তিনি পাবলিক লাইব্রেরীর সাব-লাইব্রেরিয়ান আছেন এবং তাঁহার কাজ ও আচরণ সন্তোষজনক। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করি এবং তাঁহার সাধ্যায়ত্ত কোনও কর্ত্তব্য পালনে তাঁহাকে পরাঙ্মুখ দেখিলে আমি বিস্মিত ও নিরাশ হইব।

"তিনি ইংরাজীতে সুপণ্ডিত এবং তাঁহার আচার-ব্যবহার প্রশংসনীয়। তাঁহার নৈতিক জ্ঞান এবং বিদ্যাচর্চ্চায় তাঁহার আকর্ষণ গভীর। আমার মতে অধিক পুস্তক পাঠের সুযোগ পাইলে তিনি তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা তাঁহার বয়সের দেশীয় তরুণদের অপেক্ষা অনেক বেশী।"

জে, পি, গ্রাণ্ট

রাজা রাধাকান্ত দেবের পত্র

[রাজা রাধাকান্ত দেব প্রথম জীবনে কি ধরণের কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ১৮৩৩ সালের ১ই নবেম্বর গভর্ণমেণ্টকে লিখিত একখানি পত্রে পাওয়া যায়। পত্রের বিশেষ অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল]

বাবু রাধাকান্ত দেব স্কুল বুক সোসাইটীর কয়েকখানি পুস্তক সঙ্কলন, অনুবাদ ও সংশোধন করিয়াছেন। তিনি হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সদস্য, কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর দেশীয় সম্পাদক, ভারতের কৃষি ও বাগিচা সমিতির সহ-সভাপতি, গ্রেট বৃটেনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য, বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য এবং সাগর দ্বীপ সমিতির সদস্য। ১৮২১ সালে তিনি লিণ্ডলে মারের পরিকল্পনা অনুসারে একখানি বাঙ্গালা বানান পুস্তক প্রকাশ করেন এবং ১৮২৭ সালে তাহার এক সংক্ষেপিত সংখ্যা প্রকাশ করেন। তিনি ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় কতকগুলি উপকথা অনুবাদ এবং প্রাথমিক জ্যোতির্ব্বিদ্যা পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ সংশোধন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গৃহে প্রথম সোসাইটীর প্রকাশিত পুস্তকসমূহ রাখেন এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে তাহা বণ্টন করেন। দেশীয় স্কুলে শিক্ষকদের তিনি এই সব পুস্তক ব্যবহার করিতে রাজি করান।

তিনি বহু বৎসর যাবৎ শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলনে ব্যাপৃত আছেন এবং এ পর্য্যন্ত ইহার তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির সঙ্কলন সম্পূর্ণ করিতে আরও কয়েক বৎসর লাগিবে। তিনি যে সব য়ুরোপীয় ও ভারতীয়কে এই বই পড়িতে দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উহার প্রশংসা করিয়া লেখককে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

মূল্যবান তথ্য সরবরাহের পুরস্কারস্বরূপ ১৮২৮ সালের ১৭ই মে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে রাধাকান্ত দেবকে একটি ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। সোসাইটীর চেয়ারম্যান সার আলেকজাণ্ডার জনষ্টন ১৮২৮ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে একখানি পত্রে তাঁহাকে লেখেন—"সোসাইটী আপনার দেশভক্তিকে কিরূপে শ্রদ্ধা করেন, তাহা বড়লাটকে জানাইবার জন্য এবং বড়লাট যাহাতে আপনার এই কাজে সাহায্য করেন, তজ্জন্য আমি বড়লাটের নিকট সংযুক্ত প্রস্তাবটির একটি নকল প্রেরণ করিব।" রাধাকান্ত দেব সম্প্রতি পার্শী ভাষায় লিখিত বাগিচা সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকের ইংরাজী

অনুবাদ করিয়াছেন এবং ১৮৩২ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাহা রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

দেশীয় সম্প্রদায়ের অনুরোধে তিনি চীফ জাষ্টিস ইষ্ট ও বড়লাট হেষ্টিংসের বিদায়কালে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পার্শী ভাষায় মানপত্র রচনা করেন এবং তাহা উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সম্মুখে পাঠ করা হয়। ১৮২২ সালে তিনি মিঃ প্রিন্সেপের ইচ্ছানুসারে প্রেসিডেন্সীর সকল সম্ভ্রান্ত ও ধনী দেশীয় অধিবাসীর বিবরণ সরবরাহ করেন।

[শব্দকল্পদ্রুম সম্পূর্ণ করিতে রাজা রাধাকান্ত দেবের চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি ১৮৫১ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখে ম্যাক্সমূলরকে এক পত্রে লেখেন।]

"আমার স্বদেশে ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃত চর্চ্চার পুনরুজ্জীবনের জন্যই আমি শব্দকোষ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। এই কাজে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা যে আমাকে নূতন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল, সে কথা আমি গোপন করিব না! এই কাজে আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় এবং অপরিমিত শ্রম ও অর্থ নিয়োগ করিয়াছি। শব্দকোষ রচয়িতা হিসাবে আমার কৃতিত্ব ও মৌলিকতার দাবী না থাকিলেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমার শ্রম অন্ততঃ বৃথা যাইবে না এবং আমাকে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের অন্যতম উদ্যোক্তা বলিয়া গণ্য করা হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অধ্যক্ষ জে, কারের পত্র

[সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৫৩ সালে 'সংবাদ-প্রভাকরে' কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। কবিতাটির নাম "কামিনীর প্রতি উক্তি"। এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ জে, কার ফোর্ট উইলিয়ামের শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন]

টু দি সেক্রেটারী টু দি কাউন্সিল

অফ এডুকেশন, ফোর্ট উইলিয়ম

হুগলী, ২০শে ফেব্রুয়ারী
১৮৫৪

মহাশয়,

শিক্ষা-পরিষদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, বাঙ্গালায় কয়েকটি ভাল কবিতা রচনার জন্য সিনিয়র স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জীকে দিবার জন্য কুড়ি টাকা পাইয়াছি। কবিতাগুলি 'প্রভাকর' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। রংপুরের জমিদার বাবু রমণীমোহন রায় ও কালীচরণ রায় চৌধুরী এই পুরস্কারের টাকা দিয়াছেন। 'প্রভাকরে'র সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মারফৎ এই অর্থ প্রেরিত হইয়াছে।

জে, কার
প্রিন্সিপ্যাল।

মাইকেল মধুসূদনের পত্র

[মাইকেল মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার পিতামাতা এক জমিদারের সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ ঠিক করিলে তিনি তাঁহার বন্ধু গৌরদাসকে এই পত্র লেখেন।]

"তুমি জান না, আমার দুঃখের বোঝা কতখানি। এর চেয়ে যদি কেউ আমায় ফাঁসী দিত! তিন মাস পরে আমার বিয়ে—কি ভীষণ। ভাবিতে গেলে আমার রক্ত জল হইয়া যায়, চুল খাড়া হইয়া উঠে। যাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে, সে এক ধনী জমিদারের মেয়ে—হায় হতভাগিনী! ভবিষ্যতে তাহার কপালে কত দুঃখই না আছে। তুমি জান, আমি এদেশ ত্যাগ করিতে চাই এবং সে বাসনা ত্যাগ করা কত কঠিন। সূর্য্য উদয়ে ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমার এই বাসনা হৃদয় থেকে সরান যাইবে না। জানিয়া রাখ—এক বা দুই বছরের মধ্যে হয় আমি য়ুরোপ যাইব—নতুবা আমার অস্তিত্ব থাকিবে না;—এই দুইএর একটি হইবেই।"

পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র

[বিবাহ হইতে অব্যাহতি ও বিলাত গমনের সুবিধা হইবে ভাবিয়া মধুসূদন খৃষ্টান হইবার সঙ্কল্প করেন। পাদ্রী কৃষ্ণমোহনের নিম্নলিখিত পত্র এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।]

"আমি তখন কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে খৃষ্টীয় গীর্জার ধর্ম্মযাজক হিসাবে বাস করিতেছিলাম। এই সময় একদিন তিনি আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চান। দুই-তিন বার সাক্ষাৎকার এবং বহু আলোচনার পর আমার এই বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহার খৃষ্টান হইবার আকাঙ্ক্ষা বিলাত যাইবার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা প্রবল। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, বিলাত যাওয়ার ব্যাপারে আমি তাঁহাকে কোন সাহায্য করিতে পারিব না। ইহাতে তিনি নিরাশ হইলেন বলিয়া মনে হইল এবং তাঁহার আসার মাত্রা কমিয়া গেল। ঘটনাক্রমে আমি আমার এক উচ্চপদস্থ বন্ধুর নিকট হিন্দু কলেজের এই ছাত্রটির যুগপৎ খৃষ্টান হইবার ও বিলাত যাইবার অভিলাষের কথা জানাইতে তিনি যুবকটির সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। আমি দত্তকে এ কথা জানাইলাম এবং স্বেচ্ছায় তাহাকে একখানি পরিচয়-পত্র দিলাম। উক্ত বন্ধুটি মধুসূদনকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া তাহাকে খুব উৎসাহিত করিলেন এবং বাঙ্গালার তৎকালীন ছোটলাট মিঃ বার্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।"

[বিশপস্ কলেজে মধুসূদনের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি উল্লেখযোগ্য।]

"তিনি যে কবে বিশপস্ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন তাহা আমার মনে পড়ে না। বোধ হয় ১৮৪৩ সালেই হইবে। দত্ত যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন তখনই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি ইংরাজীতে শ্লোক রচনা করিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের দিন তাঁহার স্বরচিত স্তোত্র গীত হয়। এই সময় তিনি বাঙ্গলায় কিছু লিখিতেন না, বরং অবজ্ঞাই করিতেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় প্রখর ছিল। তিনি স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন এবং তিনি যে মত পোষণ করিতেন, তাহা হইতে তাঁহাকে টলান যাইত না। এইরূপ তেজস্বিতার ফলে পোষাক লইয়া বিশপস্ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ বাধে।

"এই সময় খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, ভারতীয়দের ইংরাজী পোষাক অনুকরণ করায় উৎসাহিত করা উচিত নয়। কলেজে কৃষ্ণবর্ণের পোষাক এবং চৌকা টুপি পরিধানের নিয়ম থাকিলেও, কর্তৃপক্ষ মধুসূদনকে সাদা পোষাক পরিধান করিতে বলিলেন। কিন্তু দত্ত তাহাতে রাজী নন। তিনি বলিলেন, কলেজের নিয়ম অনুযায়ী পোষাক পরিতে না দিলে তিনি তাঁহার জাতীয় পোষাক পরিধান করিবেন এবং তিনি জাতীয় পোষাক পরিয়াই কলেজে আসিতে লাগিলেন—মাথায় রঙীন পাগড়ী ও গায়ে সাদা রেশমী কাবা। বিশপস কলেজের ছাত্রের পক্ষে এই সৌখীন পোষাক পরিধান মানায় না। কিন্তু আমি অধ্যাপক হইলেও বাধা দিই নাই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত দত্তকে কলেজের চিরাচরিত পোষাকই পরিধানের অনুমতি দেওয়া হইল। কলেজের বাইরে তিনি পুরাপুরি সাহেবী পোষাক ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার পিতা আর কলেজের ব্যয়ভার (মাসিক ৬০ টাকা) বহন করিতে রাজী হইলেন না। ঐ কলেজের মাদ্রাজী বন্ধুরা দত্তকে বলিলেন, "মাদ্রাজে চল।"

মাইকেলের পত্র

[মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনারেল জর্জ্জ নর্টন মধুসূদনের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন; তাহার পরিচয় মাইকেল কর্ত্তৃক গৌরদাসকে লিখিত নিম্নলিখিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায়।]

"তুমি শুনিলে বিস্মিত হইবে, কয়েক দিন পূর্ব্বে এডভোকেট-জেনারেল মিঃ নর্টন আমাকে ডাকিয়া ছিলেন। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আমার সব কথা জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন যে, আমার জন্য এক ভাল সরকারী চাকরী যোগাড় করিয়া দিবেন। মনে হয়, তাঁহারা ঢাকা, বেনারস, হুগলী প্রভৃতির ন্যায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন। আমার প্রধান শিক্ষকের বা ইন্সপেক্টরের পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। মিঃ নর্টন মাদ্রাজে আমাকে পাইয়া খুসী হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, কলিকাতায় থাকিলে বহু কৃতবিদ্য লোক আমাকে কোণঠাসা করিয়া রাখিত, এখানে সে আশঙ্কা নাই। আমরা বন্ধুর ন্যায় পরস্পরকে চিঠি লিখি এবং তিনি আমাকে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ই, বি, পাওয়েলের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন।"

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের পত্র

[মধুসূদন কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি স্বনামধন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নিকট এক খণ্ড "ক্যাপটিভ লেডী" উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলে তাহার উত্তরে বেথুন সাহেব গৌরদাসকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন।]

"আপনার বন্ধু যে কবিতার পুস্তক পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইবেন। উপহারের বিনিময়ে আমি যে কথা বলিব, তাহা হয়ত খারাপ শুনাইতে পারে, তবুও আমাকে তাহা বলিতে হইবে। এ কথা আমি তাঁহার অন্যান্য স্বদেশ-ভাইকে বলিয়াছি। ভাষার ব্যুৎপত্তির প্রমাণ হিসাবে এই রচনা চলিতে পারে, কিন্তু এই ক্ষমতা ইংরাজী কবিতা না লিখিয়া দেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করিলে তিনি চিরস্থায়ী খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবেন এবং দেশেরও সেবা করা হইবে। আপনাদের দেশীয় ভাষার মান অতিশয় নিম্ন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ কবির পক্ষে তাঁহার স্বদেশবাসীদের জন্য স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করাই সঙ্গত। এমন কি, অনুবাদ করিলেও ভাল কাজ করা হইবে। এই ভাবে য়ুরোপের অধিকাংশ দেশের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।"

মাইকেলের পত্র

[বেথুনের পত্রে মধুসূদনের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হন। গৌরদাসকে লিখিত নিম্নোক্ত পত্রে তাহার পরিচয় মিলিবে।]

"তুমি হয়ত জান না, আমি প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা তামিল শিখি। আমার জীবন স্কুলের ছাত্রের চেয়েও কর্ম্মব্যস্ত। আমার পাঠতালিকা এইরূপ:—৬টা হইতে ৮টা হিব্রু, ৮টা হইতে ১২টা স্কুল, ১২টা হইতে ২টা গ্রীক, ২টা হইতে ৫টা তেলেগু ও সংস্কৃত, ৫টা হইতে ৭টা ল্যাটিন, ৭টা হইতে ১০টা ইংরাজী। আমি কি আমার পূর্ব্বপুরুষদের ভাষা সমৃদ্ধ করার মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছি না?"

মধুসূদনের পত্র

[পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিয়া মধুসূদন গৌরদাসকে এই পত্র লেখেন।]

মাদ্রাজ, স্পেক্টেটর প্রেস
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৫৫

প্রিয়তম বন্ধু,

গতকল্য মিঃ ব্যানার্জীর নিকট হইতে তোমার পত্র পাইলাম। ইহা অপ্রত্যাশিত এবং আমাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। আমি জানিতাম যে, আমার হতভাগিনী মা আর নাই, কিন্তু আমি যে একেবারে অনাথ হইব, ইহা ভাবিতে পারি নাই। ভাই গৌর, আমি এখন কি করিব? তুমি সম্পত্তির কথা বলিয়াছ—তিনি কি রাখিয়া গিয়াছেন? আন্দাজ কত সম্পত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিতে পার। তুমি জান, বাঙ্গলায় যাওয়া কত ব্যয়সাধ্য—অন্ততঃ আমার মত দরিদ্রের পক্ষে। তবে তুমি যদি আমাকে এই আশা দাও যে, আমার পিতা আমার পুনরুদ্ধারের মত অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমি অবশ্য এইক্ষণে নোঙ্গর তুলিয়া কলিকাতা যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি।

হায় ভগবান! কোথায় আমার আত্মীয়-স্বজনরা। তোমার মত উদারহৃদয় বন্ধু না থাকিলে হয়ত আমার পিতার মৃত্যুসংবাদ আমি বহু কাল জানিতে পারিতাম না। ভাই গৌর, তিনি কখন এবং কোথায় মারা গেলেন? আমার মন বড় বিচলিত হইয়াছে। আমাকে সব কথা জানাও।

সম্ভব হইলে আমি পরবর্তী ষ্টীমারেই যাত্রা করিব। কিন্তু ভাই এখন আমার হাতে কিছুই নাই। আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা হয় নাই। পরে সব কথা বলিব। ফেরত ডাকে আমায় পত্র দিও।

অবশ্য আমি জানি যে, যশোহরে আমার পরলোকগত পিতার ভূসম্পত্তি আছে। দ্বিপদ শকুনীদের কবল হইতে মুক্তি পাইবই—আমি কি বোকা। সকল শকুনীই দ্বিপদবিশিষ্ট। আমার কথার অর্থ তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ।

ভাই গৌর, আমার এক সুন্দর ইংরাজ স্ত্রী ও চারটি সন্তান আছে। তোমার স্ত্রী স্বর্গে—ইহা দ্বারা তুমি কি বলিতে চাহিয়াছ? তুমি কি দ্বিতীয়বার মৃতদার হইলে?

তাড়াতাড়িতে পত্র লেখা শেষ করিতে হইল। ইতি—

তোমার অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় পুরাতন বন্ধু

এম, এস, দত্ত।

পুঃ, আমি বর্ত্তমানে এই সহরের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র 'স্পেক্টেটরে' সহ-সম্পাদকের (সাব-এডিটর) কাজ করিতেছি।

[পদ্মাবতী সম্বন্ধে রাজনারায়ণের অভিমত জানিতে চাহিয়া ১৮৬০ সালের ১৫ই মে মধুসূদন যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

"কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি আমার প্রকাশককে আপনার নিকট নূতন নাটকের এক কপি পাঠাইতে বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানিতে আমি অত্যন্ত উৎসুক। আমার মত এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে আমাদের নাটক রচনা করা উচিত, গদ্যে নয়। তবে ধাপে-ধাপে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমার জীবিতকালে অন্যান্য নাটক লেখার অবসর হইলে আমি সাহিত্যদর্পণের বিশ্বনাথের নিয়ম মানিব না। আমি য়ুরোপের বিখ্যাত নাট্যকারদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিব। তবেই প্রকৃত জাতীয় নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হইতে পারিবে। কিন্তু পদ্মাবতী সম্বন্ধে আপনার মতামত আমায় জানাইবেন। আপনাকে আর ইহা জানাইবার প্রয়োজন নাই যে, প্রথম অঙ্কে গ্রীকদের সোনার আপেলের কাহিনী ভারতীয় আকারে লেখা হইয়াছে।"

[কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনাকালে মধুসূদন নটরাজ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে এই পত্র লিখিয়াছিলেন।]

বড় য়ুরোপীয় নাটকে জীবনের কঠোর বাস্তব চিত্র, প্রবল উত্তেজনা প্রভৃতি দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমাদের সবই কোমল, সবই রোম্যান্স। আমরা বাস্তব জগৎ ভুলিয়া পরীরাজ্যের কল্পনা করি। এদেশে নাটকের উন্নতি হয় নাই। আমাদের সবই নাটকীয় কবিতা। আমাদের প্রাচীন ভাষার বিদেশী স্তাবক উইলসন পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে আমি অনেক সময় নাট্যকারের চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়াছি। কবিতার সন্ধানে আমি অনেক সময় আসল কথা ভুলিয়া যাই। এখন হইতে আমি নিজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিব। কবিতার জন্য এদিক-ওদিক তাকাইব না। তবে যদি আপনা হইতে উহা আসিয়া পড়ে, তবে উহাকে বাদ দিব না এবং উহা আসিবে বলিয়াই মনে হয়। আমি স্বাভাবিক চরিত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব।"

[কৃষ্ণকুমারী নাটক সম্বন্ধে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে এই পত্র লেখেন।]

"আপনি কৃষ্ণকুমারীর যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট হই নাই। কিন্তু নাটকখানি আপনি যত অধিক পড়িবেন, ততই এর সম্বন্ধে আপনার ধারণা উচ্চ হইবে। নাটক সম্বন্ধে আমার কতকগুলি নিজস্ব মত আছে এবং আমি তদনুসারে নাটক লিখি। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ—তাহাদের মধ্যে আপনিও আছেন—আমার নাটক দেখিবা মাত্র সমালোচনার তোপ দাগিতে আরম্ভ করেন। আমার বন্ধুরা ভুলিয়া যান আমি ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে লিখি। আমাদের সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ পৃথক্ ধরণের। আমাদের প্রবৃত্তি একই, কিন্তু আমাদের বেলা তাহার প্রকৃতি মৃদু। কিন্তু দর্শনের কথা থাক্। আমার মনে যেরূপ চিন্তার উদয় হইবে, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব—এ সম্বন্ধে জগৎ যা বলে বলুক।"

[অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে যে মত পোষণ করিতেন, ক্রমে তাহা যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের নিম্নলিখিত পত্র হইতে পাওয়া যায়।]

"আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, পণ্ডিতরা "তিলোত্তমা" সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত অবশেষে ইহার মধ্যে ভাল জিনিষ দেখিতে পাইয়াছেন এবং "সোমপ্রকাশ"ও ইহার অনুকূলে লিখিয়াছেন। বইখানি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতেছে। আপনি 'এডুকেশন গেজেট' পড়েন কিনা জানি না। যদি পড়েন, তবে নিশ্চয়ই অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে সম্পাদকের মন্তব্য দেখিয়াছেন। "আর"···মিল্টন পড়েন বা উপলব্ধি করেন বলিয়া আমার মনে হয় না—নতুবা তিনি তাঁহার প্রবন্ধের শেষ দিকে ঐরূপ মন্তব্য করিতেন না। তিনি বাইরণ, স্কট ও মুর পড়েন। এঁরা ভাল কবি হইলেও বাইরণ ছাড়া অপর দুই জনের কবিতা শ্রেষ্ঠ নয়। আমার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাই বেশী ভাল লাগে···

"আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বিদ্যাসাগর কবিতার নূতন ছন্দের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতেছেন এবং ইহার প্রচারকের প্রতি সদয়ভাব ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন। পুরাপুরি অভ্যস্ত না হইলেও তিনি এই কবিতার মধ্যে খাঁটি জিনিষ দেখিতে পাইয়াছেন।

"আমি বইখানি তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়াছি। তিনি চমৎকার লোক। আমি তাঁহাকে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাল করিয়া পড়িতে না পারিলেও, এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত খুব ভাল। তিনি কাহাকেও খোসামোদ করিয়া কথা বলেন না। তাঁহার প্রশংসা খাঁটি।

তুলি ও রঙ

মিচেল জর্জেস্ মিচেল

অনুবাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

["মঁ পারনাশ"—বাংলায় বাম তীর।—পারীর এই মহল্লায় খেয়ালী শিল্পীদের প্রসিদ্ধ আড্ডা। তীব্র অভাব ও অনটনের মধ্যেও দুর্দমনীয় সাহস ও দুরন্ত আবেগে দিনের পর দিন চলেছে তাঁদের তুলি ও রঙের সাধনা। ব্রাউস্কী, কিসলিং, ওবিজ, কিকি, ম্যান রে, পিকাসো ষ্ট্রাভিনসকি, ইসাডোরা ডানকান প্রভৃতি খ্যাত ও অখ্যাতদের মিছিল "মঁ পারনাসে"। প্রখ্যাত ফরাসী লেখক "মিচেল জর্জেস্ মিচেলে"র যুগান্তকারী উপন্যাস "LES MONTPARNOS" —অনুবাদক।]

"মঁ পারনাশ: বাবলা গাছের তলায় দক্ষিণ উদ্যানবীথির ছায়াঘন স্তব্ধতা। হাল্কা রঙের পোষাক পরে, ক্রিওল স্কার্ফ গলায় ঝুলিয়ে মেয়েরা চলেছে, দীর্ঘদেহ মার্কিণ, পাণ্ডুবর্ণ স্কানডেনেভীয়, এবার্ড যুগের রুচির আচকান আর রুমাল-শোভিত ইতালীয় মডেলের দল—এক অপূর্ব মিছিল। ছোট খিনজি গলির ভেতর অসংখ্য ষ্টুডিয়ো। চীনেদের রেস্তোরাঁ, ইয়াঙ্কী রেস্তোরাঁ, মিঠে-ভুট্টার সুমধুর গন্ধ ভেসে আসে। তিন-চারটি বৃটিশ চায়ের দোকান তার প্রাক্-ম্যাকেলীয় যুগের পরিবেশ বজায় রেখেছে; কাঠ কয়লায় আঁকা ছবিতে প্রাচীরগাত্র পরিপূর্ণ, শ্যামলিমার আড়ালে ছোট আলোগুলি জুন মাসের নীল রাত্রি কিঞ্চিৎ আলোকিত করে রেখেছে।

"বোহেমিয়া? আর্ট? খেয়াল মাফিক অলংকরণ আর কিম্ভুত পোষাকের বিচিত্র কার্ণিভাল!

"দেখুন—একটু নিরাপদ ব্যবধান রেখে দেখুন—গলির পাশের ঐ কাফেটির জমকালো আলো দেখুন! যেন নিজনি নভগোরড বা কোনো আইল্যাণ্ডের কোনো মেলা বসেছে, এই অঞ্চলে যে-সব মহিলা-শিল্পী আনাগোনা করেন তাঁদের বিচিত্র অঙ্গরাগের সংগে বিদ্যুতের আলোর এক আসুরিক সংমিশ্রণ। পুরুষগুলি নোঙরা কিন্তু চাকচিক্য আছে। চতুর্থ শ্রেণীর থিয়েটারের 'গাউবয়', মধ্যরাত্রেরও তার পায়ে বুট। বদলেয়র আর কোলরিজের কৃত্রিম স্বর্গ রচনাকার। এরা বাহ্যতঃ বাবুয়ানার ঢঙ বজায় রাখলেও নিশ্চয়ই হীন কাজ করেই দিন চালায়। আর এদের স্ত্রীলোকরা? তারাও এদের মতই অদ্ভুত!। ববকরা চুল, ভুতুড়ে

ঘাঘরা, নগ্ন পায়ে স্যাণ্ডেল; ঠোঁটগুলি বেগুনী, কালো ও নীল; চোখে ঔজ্জ্বল্য আছে, কথা কিন্তু অস্পষ্ট। ভানুমতীর খেল দেখানেওলার বানরীর মত এই রমণীর অঙ্গে সকল নিষিদ্ধ নেশার গন্ধ।

"পথের ধারের কাফেগুলির এই বুলভার্দে মার্সাইয়ের জাহাজঘাটা, বা সিঙ্গাপুরের ডকের ধার বা সাউথ আমেরিকার সমুদ্রতীরের মত বৈচিত্র্যের একটুকু অভাব নেই। এদিকে একজন খাঁটি ভারতীয়, পোকায় কাটা অস্কার ওয়াইলড, ওদিকে নোট জালকরা বড় লোক, মেয়ে পকেটমার—এদের পকেট থেকে বেশী কিছু নিতে পারে না! ফটোগ্রাফার। এক জন মৃগীরোগী। সকল অবস্থার মডেল পাওয়া যায়। মুদীর দোকানের একটি মেয়েও এই দলে আছে, তাকে ওরা 'হারিকট রুজ' বলে। একটি চরিত্র বটে! মেঝে মুছে মুছে ক্লান্ত হয়ে এখন সে ওদের সংগে এসে আনাড়ির মত ক্যানভাসে রঙ লাগাচ্ছে।

"তবে হ্যাঁ, এই সব অ-সুন্দর ব্যক্তিরা সৌন্দর্য্যের পূজারী। এদের আঁকা মাষ্টার পীসের প্রদর্শনী হয়! আপনার চোখটা আধখানা বুজিয়ে রাখুন। কাফের ভিতর দিকে দেখুন। ধোঁয়ার ভিতর থেকে দেখুন—বিষাক্ত ধূমই মনে হবে আপনার—দেখবেন এক একটি টেবলে শূয়ারের মত ঘেঁষাঘেঁষি বসে ছয় বা ততোধিক প্রাণী এক গ্লাস বীয়র বা কফি নিয়ে বসে আছে। আরো ভালো করে দেখুন। দেওয়ালে এঁদের আঁকা ছবি আছে, ছয় চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট ফুল বা নেকটাই প্যাটার্ণের বিচিত্র নগ্নদেহ! এতদঞ্চলের কেরাণীকুলকে আতংকিত করার উদ্দেশ্যে এই শিল্পী নিজেরা যেমন পোষাক পরেন

কিকি

তেমনই অদ্ভুত ছবি আঁকেন এ কথা শুনে কি আপনি বিস্মিত হবেন? কিন্তু ওদের এই অতিরঞ্জনেই ওরা আত্মহারা। এই আচ্ছন্ন উচ্ছৃঙ্খলতা যদি ওদের অজ্ঞতা ও দাবীকে গোপন করার পথ হয় তাহলে অবশ্য ব্যাপারটি প্রায় নির্দোষ মনে হবে। সাবধান! এই পুতিগন্ধময় আর্টের বিষাক্ত বাতাস একদা-মনোরম এই অঞ্চল আজ ধ্বংস করেছে, আজ তা সারা প্যারীতে ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম করছে……"

সংবাদপত্রের এই প্রবন্ধটি টেবিলের চার পাশে হাতে হাতে ঘুরতে থাকে। চীৎকার করে প্রতিবাদী-গোষ্ঠীদের শোনানো হল, বিদেশীদের জন্য অনুবাদ করে দেওয়া হ'ল। প্রত্যেকে অপরকে প্রশ্ন করছে—

"এই মুখপোড়া কে হে—?"

"আস্ত ইডিয়ট—?

পোলদেশীয় শিল্পী কিস্‌লিং, আগে ফৌজে ছিলেন, তিনি এতক্ষণে বললেন—"এ আমরা চুপ করে সইবো না।" বরাবর যুদ্ধের সময় তিনি একটি প্রাচীন তলোয়ার নিয়ে যেতেন, তাঁর পিতৃদেব একবার এক রুশীয় অফিসরের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধ করেছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"শূয়ারটা কে?"

হিন্দু খারিস, ('ফকীর' নামেও সে এখানে পরিচিত), বলে উঠল "ওসব উপেক্ষা করাই উচিত!" এই নিয়ে নাকি তার ছশো বার জন্মান্তর ঘটলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাফেতে একই বেঞ্চে নিস্পন্দের মত বসে থাকে, টক্ দুধ খেয়ে ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ আর ডিনার সেরে নেয়।

শ্যাম্পেনের ট্রেঞ্চে যুদ্ধের সময় একটি হাত গেছে কবি সেনড্রারসের, তিনি বললেন: "কখনই নয়!" ফরাসী পদাতিকের জুয়াভ পোষাকের ফেজ টুপী দুলিয়ে তিনি আবার বললেন—"না, যারা আমাদের জানে না তারা আমাদের বাতুল বা সঙ বলতে পারে। যে আর্টের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই সেই জিনিষ তাদের দিচ্ছি, তার বিনিময়ে এই ত' আমাদের পাওনা। ওরা হয়ত সদিচ্ছা বশতঃই আমাদের আঘাত করে। কিন্তু এই বেয়াদবটা আমাদের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে প্রায় আমাদের সকলকেই গাল দিয়েছে, লোকটা চায়, সাধারণে জানুক আমরা একদল ভণ্ড—কি…"

"তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু লোকটা কে?"

দীর্ঘতনু মডেল কিকি বলে উঠল: "লোকটা এখানে অনেক বার এসেছে।" শিল্পী কিস্‌লিং ওকে বনদেবীর মত সাজাতে চায়, চোখে আর ভ্রূতে কাজল লাগিয়ে আরো স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ করে সাজায়।

"তুমি ওকে জানো নাকি?"

"আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। সত্যি ও কি অনেক নোংরা কথা লিখেছে আমাদের সম্বন্ধে?"

"সত্যি কি না প্রশ্ন করছ আবার? পড়েই দেখ না কি লিখেছে।"

"রাস্তার ওপাশে 'ডোমে' বসে আছে। এই প্রথম নয়। একবার ওর সঙ্গে একদিন ছিলাম।"

সেনড্রারস্ ও কিস্‌লিং উঠে দাঁড়াল। 'কাউবয়' গ্রানাটস্কী পিছনে চলল। ওদের পিছনে এল রাশিয়ানের দল, কয়েক জন স্ত্রীলোক তারপর আইস্‌কা।"

"ওই যে মাথায় তালপাতার টুপী আর চেক্‌প্যান্টপরা লোকটা?"

"হ্যাঁ।"

কিস্‌লিং বলল—"এ ত অতি সোজা ব্যাপার, দিচ্ছি ওর মুখ বন্ধ করে।"

অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটা বাজে। বর্তমান ঋতুর উজ্জ্বল সূর্যালোক ইফেল টাওয়ারের ছায়া পড়ে তীর চিহ্নের মত বিভক্ত হয়ে এসেছে, সমগ্র বুলভার্দে যেন গোলাপী রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। কাফে ত্য লা রোতুণ্ডের ঠিক সামনেই কাফে দ্যু ডোমে এই নোংরা প্রবন্ধের লেখক একটি ছোট গোল টেবলের ধারে বসে পরম নিশ্চিন্ততায় প্রাচ্যদেশীয় একটি সুগন্ধি সিগারেট টানছিলেন। কাফের অন্যান্য খদ্দেরদের মধ্যে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে ও স্বস্তিতে রয়েছেন বোঝা গেল।

বাতাসে একটা অবসাদ-জড়িত ক্লান্তির প্রলেপ।

তিনটি তরুণী গ্রীষ্মের পোষাক পরে চলে গেল। লেখক মনে মনে ভাবলেন: ক্ষুদে ফ্লোরেনটাইনের দল—সমুন্নত বক্ষ, হাসিভরা চোখ, আর রৌদ্রোজ্জ্বল ভ্রূযুগ।

তাদের দিকে লক্ষ্য করে লেখক হাত নাড়তে থাকেন।

কিসলিং.

মধ্যপথেই কিন্তু এই হাতনাড়া থেমে যায়। দুজন তার দিকে অতি ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একজন কিসৃলিং, পরনে এরোপ্লেনের মেকানিকদের মত নীল পাতলুন, গলায় লাল স্কার্ফ, টুপীটা একটু নীচে একেবারে চোখের ওপর নামানো, যেন হালকা নাটকের অন্তর্গত কসাই চরিত্র। সেনত্রারাসের একটি মাত্র হাত দুলছে।

সাংবাদিক তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিসৃলিঙের কাছ থেকে দশ হাত দূরে 'কাউবয়' ও আরো অনেকে প্রত্যাশাভরে তাকিয়ে আছে। দক্ষিণ দিকে আর একটি দল।

কিসৃলিঙের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: "কি ব্যাপার?"

কিসৃলিং এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন "তুমিই কি এই পোড়া ইডিয়ট···?"

সাংবাদিক ভদ্রলোক কাপুরুষ ন'ন, সংবাদপত্র অফিসে তিনি 'কঠিন' মানুষ হিসাবে খ্যাত, তাছাড়া তাঁর আরো গুণপনা আছে নিশ্চয়ই। যাই হোক, এই অদ্ভুত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জবাব দেন···"না।"

তার পর কিসৃলিঙকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললেন: "তবে বোধ করি, আমি তাঁর ভাই।"

সাংবাদিক উঠে দাঁড়ালেন, তার পর প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা না করেই এক চোখে চশমা লাগিয়ে শিল্পী এবং আর সবাইকে পর্যায়ক্রমে আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন।

মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার ওপর তাঁর ভরসা ছিল। তিনি জানতেন, এই অর্ধভুক্ত প্রাণীদের কাছে তিনি ঐশ্বর্য, দুর্ধর্ষ নারী, বুলভার্দের পারীর প্রতিনিধি। যতক্ষণ তিনি নারীর প্রতীক ততকাল তিনি অপরাজেয়। এই লোকটিই একদিন লিখেছিলেন যে বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি 'টপ হ্যাট' আর 'ফ্রক কোট' পরে পথে নেমে দাঁড়াবেন। কারণ, জনতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত শক্তি ও সামর্থের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর উপস্থিতিতে প্রভাবিত হয়ে থাকবে। তিনি সেই সংগে আরো লিখেছিলেন 'কিন্তু যদি একবার 'টপ হ্যাটটি' কোনো ক্রমে তারা ছুঁতে পারে, তাহলে তারা সব-কিছু পদদলিত করবে, ধন্য শক্তির প্রতীকময় প্রতিনিধি তখন সামান্য ব্যক্তি হিসাবে অপর ব্যক্তি বিশেষের করুণার পাত্র হয়ে থাকবেন।'

তিনি ভাবলেন—

"ওদের অন্ততঃ টাই ছুঁতে দেবেন না।"

ওরা কিন্তু অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। কিসৃলিং একবার পিছিয়ে গেল, আবার এগিয়ে এল, তার পর সাংবাদিকের মুখে একেবারে লোহার মত-ভারী প্রচণ্ড ঘুঁসী বসিয়ে দিলেন। সেনত্রারাসও সাংবাদিকের দেহে তীব্র আঘাত করলেন।

তার পর ওপারের কাফে থেকে সবাই হল্লা করে দৌড়ে এল। অদ্ভুত সব মানুষে পথের আশ-পাশ ভরে গেল। যুযুধান ব্যক্তিদের মধ্যে মারপিটের একটা জোয়ার জাগলো। সাংবাদিক শুনলেন, তাঁকে কুৎসিত ভাষায় সবাই অপমান করছে। মেয়েরা বলছে—"মেরে ফেল, লোকটাকে সাবাড় করো।"

ফ্রান্সেও পোগম?

এই দুর্গতির হাত থেকে মুক্ত হয়ে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। আঘাত এড়াবার সময় উনি ভাবতে থাকেন:

"আবার সেই বিপদ!"

হ্যাঁ, আগেও উনি গরম জলে পড়েছেন। বিশেষ করে চীনদেশে এক সকাল বেলায়। তখন "Le-Journal" পত্রিকায় বক্সার বিদ্রোহের সংবাদদাতা হিসাবে সেখানে ছিলেন। এক হাজার চীনার দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি এক চিনে মাটির দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একটি মাত্র ফাঁকা পিস্তল সম্বল ছিল, ভয় দেখাবার জন্য সেইটাই বার বার তুলে প্রায় তিন ঘণ্টা যুঝেছিলেন, তারপর তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এই কথা মনে হওয়ায় উনি হাসলেন, কারণ এইখানে তিনি একেবারে পারীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে, কয়েক পা গেলেই পুলিশ ষ্টেশন। সহসা সাংবাদিকের নজরে পড়ল সামনের টেবলে একটা সায়ফন রয়েছে, তিনি সেটা তুলে নিলেন, ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে নয়, অপর কাউকে সে কার্য থেকে বিরত রাখাটাই

শুধু ছবি আঁকতে চাই

তাঁর উদ্দেশ্য। তারপর চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন, যে-কোনো মাথার ওপর মুহূর্তে বোতল লাভ সম্ভব।

এইবার যুদ্ধবিরতি।

তিনি ঠাট্টা করে বললেন :—"কি হাঁফিয়ে পড়লে সব?"

এখন জনতা তার সামনে কেবল এদিক-ওদিক করছে, যেন খাঁচায় পোরা পশুকে দেখছে। সাংবাদিকের জামার কলার ছিঁড়ে গেছে, যেখানে মনোকোল চশমাটি ছিল সে জায়গাটায় একটা জ্বলজ্বলে লাল দাগ। তিনি কিন্তু ওদের দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মনে হল লোকগুলি ভীষণ রোগা, চোখগুলি কিন্তু অতিশয় উজ্জ্বল, জ্বরের জ্বালায় অমন জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে কিনা কে জানে?

এক জন ইহুদী বিড়বিড় করে বলল: "শেষকালে ফ্রান্সেও দেখছি প্রোগ্রাম সুরু হল।"

জনৈকা বৃদ্ধা এগিয়ে এল, তার শীর্ণ শরীরের সমস্ত চর্বি যেন তার দৃষ্টিতে এসে জ্বলছে, সে একটু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্চয়ই ঘৃণার চাইতে তার মনে কৌতূহলই ছিল বেশী। জনৈক মহারাজা উপহার দিয়েছিলেন ওঁকে একটি প্রকাণ্ড মুক্তা, বৃদ্ধা মুক্তা থেকে সুরু করে পায়ের পেটেন্ট লেদারের জুতা জোড়া পর্যন্ত বেশ করে দেখল। হয়ত তার একটি পাটির দাম পেলে বৃদ্ধাটির দুর্দশা-ভরা জীবনের একটি বছর সুখে কেটে যেতে পারে। এই লোকটি নিশ্চয়ই তাঁর কাছে সেই প্যারীর প্রতিনিধি, যে প্যারীর মোহ আশা ও আনন্দের আশ্বাস দিয়ে তাকে তার দুর্গত দেশের সুদূর প্রান্ত থেকে এইখানে টেনে এনেছিল।

দুরন্ত পশুদের যেন পোষমানা হয়েছে, তিনি ব্যঙ্গ ভরে বললেন: "তাই ত', আপনারা দেখছি ছবি আঁকায় যতটা দক্ষ লড়ায়ে তেমন পোক্ত ন'ন। প্রায় পনের মিনিট কাল আপনারা কুড়ি ত্রিশজন মিলে আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে তোড়জোড় করলেন—আমার ত' অনেক আগেই ঘায়েল হয়ে যাওয়ার কথা।"

ওদের মধ্যে কিসুলিং পুনরায় এগিয়ে আসছিল একটা গর্জন করে কিন্তু ঠিক সেই সময় জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন সুরু হ'ল:

"মোদ্‌রুল্লো! মোদ্‌রুল্লো!"

সাংবাদিক সবিস্ময়ে দেখলেন, জনতার মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেল। এই ভাবে যেটুকু পথ সৃষ্টি হ'ল তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এলেন জনৈক তরুণ, পায়ে স্যাণ্ডাল, ছেঁড়া ট্রাউজার, আর গায়ে সার্ট। ভারতীয়ের মত ভংগীতে ওঁর দিকে এগিয়ে এলেন লোকটি। মাথায় এক রাশ কালো চুল, পাণ্ডুর মুখ, আর চোখ দুটি যেন আগুন ভরা এমনই দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা সেই চোখে এবং এমনই মর্মভেদী তাঁর দৃষ্টি যে সাংবাদিকের সে দিকে তাকাতে সাহস হয় না।

ক্যানাডার মেয়ে

মোদ্‌রুল্লোর হাতে মোড়া সংবাদপত্রটি পর্যন্ত তিনি লক্ষ্য করেননি, এমন কি কম্পিত বুকটাও নজরে পড়লো না, কি বেদনায় সে বুক জ্বলছে? তিনি বুঝলেন, এইবার একটা কিছু হবে, আর এই একটি লোক! সেই অসহনীয় দৃষ্টিতে সম্মোহিত হয়ে তীক্ষ্ণ চোখের ওপর থেকে তিনি মুখ সরিয়ে নিলেন। তিনি কাফের অভ্যন্তরে সরে গেলেন, আরো কয়েক জন তাঁকে অনুসরণ করলো, তাঁর মনটা এতক্ষণে চঞ্চল হয়েছে, কারণ মোদ্‌রুল্লো যখন এই ঘটনায় জড়িত হয়েছে তখন এর পিছনে নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ আছে, বুলভার্দের ধারের ঐ অপমানিত লোকগুলির চাইতেও গভীরতর অভিযোগ আছে নিশ্চয়ই।

দুই

"দেখ, খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই আমার, কিন্তু ছবি আমাকে আঁকতেই হবে।"

এখনই যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া গেল তার দশ ঘণ্টা আগে, মন মাতারের এক সুসজ্জিত ঘরে জনৈক তরুণ মেহগনীর খাট থেকে সন্তর্পণে উঠলেন, গায়ে কাপড় চাপিয়ে নিলেন—পায়ে চটিটা পরলেন, তারপর ট্রাউজার ও জ্যাকেট পরে পকেট থেকে ছুরিটা বার করে নীরবে দরজার চাবীটা খুলে ফেললেন। এই কার্য করতেই পুরা আধ ঘণ্টা লেগে গেল, অনেক বার থেমে গভীর উত্তেজনায় চার দিক তাকিয়ে দেখতে হয়েছে।

চাবীটা অবশেষে খুলে গেল, দরজা খোলা গেল। পা টিপে নীচে নেমে গিয়ে সামনের হ'লে পৌঁছেই দৌড় সুরু করে দেয়। তারপর বুলভার্দে পৌঁছে তবে নিশ্বাস নেয়। পথ দিয়ে সে এমনই জোরে দৌড়েছে যেন দুঃস্বপ্নের ঘরে ছুটে চলেছে। এ্যাভিন্যু দ লণ্ড্রেস কাছে গিয়ে কারুসেল পার হয়ে গেল—তবু দৌড়াচ্ছে। তারপর ব্রীজের ওপর গিয়ে পৌঁছয়, যেন নদী পার না হ'তে পারলে আর নিরাপত্তা নেই।

পা কিন্তু আর চলে না, গ্রানাইটের তৈরী পাঁচীলের ওপর সে বসে পড়ল। সদ্য-জাগ্রত প্যারীর দিকে সে তাকিয়ে, সূর্যদেব নতরদামকে অভিষিক্ত করছেন—নগরীর সব কিছুর ওপরই তার করুণা-কিরণ পড়ছে। পথের ধারে গাছগুলির পত্রপুঞ্জ প্রভাতের তাজা হাওয়ায় আন্দোলিত। পুনরায় সাহস সঙ্কল্প করে সে বোনাপার্টের পথ ধরে সে আবার চলল। এইখানেই ৎবরোৎস্কীর সংগে দেখা।

ৎবরোৎস্কীকে অত্যন্ত আশাহত দেখাচ্ছে। যাই হোক, শ্রান্ত মোদ্‌রুল্লো তাকে জড়িয়ে ধরে অনুনয় করে—

"ৎবরো, আমাকে দু-চারটে সো (ফরাসী তাম্রমুদ্রা) দাও ভাই, অন্ততঃ মঁ পারনাশ যাওয়ার বাসের ভাড়াটা। রোসালি বা আর কোথাও গিয়ে কিছু খেতে হ'বে, নইলে আর এক পাও হাঁটা চলে না। সারা রাত্রি জেগে কাটাতে হয়েছে যাতে সহজে পালাতে পারি।"

পোলীস মুসেটের মত বিষণ্ণ ও উদ্দাম দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। হায় রে! এই নিয়ে সাত বার সে এই রাস্তার জাপানী রুটিওলার কাছে এসেছে, লোকটাও আগে দু'বার ওর নিজের জন্য এবং স্ত্রী ও কন্যার জন্য রুটি দিয়েছে। এখন কিন্তু রুটিওলা স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করেছে, সে বুঝেছে বাকী জীবনভোর এমনই চালিয়ে যেতে হবে।

রুটাওলা প্রশ্ন করেছে: "আচ্ছা, বরো, তুমি পোলাণ্ডে ফিরে যাও না কেন? তুমি ত' সেখানকার একজন প্রফেসর, নিজস্ব বাড়িও আছে শুনেছি—তুমি শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাক, কেন তোমার বাড়িটা কি গেছে নাকি?"

"না।"

"প্রফেসরগিরি?"

"না।"

"তবু তুমি পোলাণ্ডে না ফিরে প্যারীতে এই ভাবে দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাবে?"

"হ্যাঁ।"

"এ অতি অন্যায়, খুব খারাপ! কিন্তু আমি ত' তোমাকে চিরদিন পুষতে পারবো না, আর তুমি বরাবর বলে আসছ এইবার শেষ বার।"

"কেন কাল ত' আসিনি।"

"অন্য কাউকে জ্বালিয়েছ।"

শেষ পর্যন্ত ত্বরৌসকী চলে এসেছে। একটা দোকানের শো-কেসে রোমের কয়েকটি আলোকচিত্র দেখছিল এমন সময় মোদক্লো এসে পড়েছে।

পোল ভদ্রলোক স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনিও দুর্দশাগ্রস্ত। শিল্পী তখন একাই সোজা হয়ে দাঁড়াবার মত শক্তি সঞ্চয় করলেন।

"বেশ, বন্ধু, আচ্ছা, চলে এস।"

—কিন্তু ত্বরৌসকী লক্ষ্য করল ওর মুখ কেমন পাণ্ডুর হয়ে গেল, তাই সে বল্ল—"দাঁড়াও, এক মিনিট অপেক্ষা কর দিকি।" এই বলে আবার রুটীওলার কাছে ফিরল।

রুটীওলাকে বল্ল—"হেনরিখ, আমার জন্য তোমার চিন্তা নেই; আমার স্ত্রীর কথাও ভাবতে হবে না; আমার ছোট্ট মেয়ের কথাও নয়, কিন্তু এই মাত্র একজন বন্ধুর সংগে দেখা হল, লোকটা না খেতে পেয়ে মারা যেতে বসেছে; একজন ভালো আর্টিষ্ট—আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না—এই নাও আমার হ্যাটটা রেখে দিলাম, কিছু রুটি দাও, হ্যাটটা রাখো।"

দোকানের পিছন দিক থেকে ঝাঁঝালো গলায় একটি স্ত্রীলোক চিঁচিয়ে উঠলো—খবরদার! ওই নোংরা টুপী ছুঁয়ো না, বেরিয়ে যাও, দোকান থেকে বেরিয়ে যাও।"

ত্বরৌসকী মোদক্লোর কাছে ফিরে এল।

বল্ল: "দেখ আমাদের সহিষ্ণু হতে হবে। এমনই ত দিন চলছে। প্রথমে একটু জল খেয়ে নেওয়া যাক্। জলে অনেক শক্তি আছে। তারপর লিবায়ুদের কাছে যাওয়া যাবে।"

"একেবারে অতেউইল?"

"শীনের ধার দিয়ে যাব।"

"হ্যাঁ, ঐ রাস্তাটাই চমৎকার বটে…"

"ওর কাছে তোমার আঁকা কুড়িটা ক্যানভাস আছে, ছবিগুলোর জন্য কয়েক হাজার ফ্রাঁ দাম পেয়েও ও ছাড়েনি। ও নিশ্চয়ই আরো ছবি চায়, আর ছবির দাম যখন জানে তখন নিশ্চয়ই আমাদের কিছু এডভ্যান্সও করতে পারে।—অপরাধ নিয়ো না ভাই, এ ত আর ধার নেওয়া নয়, টাকার বিনিময় ওকে কয়েকটি ক্যানভাস্ এঁকে দিলেই হবে।"

"সত্যি। আমি কি ভাবছি তুমি জানো না, শুকনো রঙে আমার যে কায়দাটা সেটা ত' তুমি জানো, ক্যানভাসের ওপর একেবারে পোর্সেলেনের মত দেখায়? আমি প্রথমে এনামেল তার পর আনব রক্ত-মাংস—জানো ত বোরো, আমার মত ক্যানভাসে রক্ত-মাংস ফুটিয়ে তুলতে আর কেউ পারবে না—বুড়ো টিশিয়ান নিজেও পারেনি। কিন্তু কিছু জিনিষ-পত্র ত' চাই। আমি সব ফেলে এসেছি, ব্রাস, ক্যানভাস, টিউব, সব ঐ দজ্জাল মাগী চাবী দিয়ে রেখেছে,—এমন কি আমাকেও! আমাকে চাবী বন্ধ করে রেখেছিল। আমাকে যদি একটু কাজ করতে দিত তাহ'লে ওর মাতলামো, আফিমের নেশা, উদ্দাম পার্টি সব-কিছুই আমার সইতো! কেন ভাই বোরো, অমন স্ত্রীলোকের কাছে আমাকে ঠেলে দিয়েছিলে?"

ভোরের আলোয় প্যারী

"আমি ত নয়। এর জন্য ক্রাভেনই দায়ী। তার সংগে ওর ক্লাব-ক্লিতে দেখা। লণ্ডনের থিয়েটার পল্লীতে ওপরের তলায় ওর বোহেমীয় ধরণের ক্লাব, সেখানে শিল্পীরা মাঝে মাঝে মদের পার্টি দেয়, মডেলরা জাহাজের নাবিক সেজে হল্লা করে। এই বিরাট কালেভীয় স্ত্রীলোকটিকে ক্রাভেন বল্ল—'প্যারীতে একজন শিল্পীকে জানি যে রূপে দেবদূত, যারা তাকে জানে তাদের কাছে সে পরম আশ্বাস। তবে লোকটি দরিদ্র। একেবারে সে গোল্লায় যাচ্ছে, তাকে এখন বাঁচান উচিত।' স্ত্রীলোকটি তখন মদে চুরচুরে, তাই সে বলে উঠল 'আমি তাকে বাঁচাব।' তারপর সে সোজা প্যারীতে এসে উঠল, তার পর পাছে তার নার্ভ খারাপ হয় সেই ভয়ে দিবারাত্র মদে ডুবে রইল। আমার সংগে দেখা করতে এসে বলল তখনই তোমার কাছে নিয়ে যেতে। তোমাকে আমরা bal musette-এ আবিষ্কার করলাম। তুমি সেখানে তখন নাচছিলে। তোমারও তখন দু-চার পাত্র টানা হয়ে গেছে। সে তোমার কোমর ধরে টেনে নাচতে সুরু করল—তারপর আরো কয়েক পাত্র মদ দেয়। তা পরদিন ওর সুসজ্জিত ঘরে তোমার ঘুম ভাঙলো।"

"আর মেয়েটি আমাকে বলেছিল' ছবি সম্পর্কে তার অসীম আগ্রহের জন্য তাকে আমার ক্ষমা করা কর্তব্য। আমার দেহ-মনের সে সর্বময় কর্ত্রী হয়ে উঠল; তবে আমার রুটি, মদ, ক্যানভাস আর টিউবের জন্য টাকাও দিয়েছে। আঃ প্রতিদিন সকালে কাঠকয়লা কিনব না সসেজ কিনব এই ভাবনা না ভেবে কাজ করার যে কি আনন্দ! তবেও হল নির্লজ্জ ব্যভিচারিণী। এ হোল দানবী ও দেবদূতের সংঘাত। সত্যি দেবদূত। আর সেই দেবদূতের আজ পরাজয় ঘটেছে। আজ প্রভাতে তাই উড়ে আসুন

হয়েছে, ডানাটা অবশ্য রেখে আসতে হয়নি। তবে তুলি আর যন্ত্র সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে। আঃ বোরো যদি যে লোকটার সংগে দেখা করতে যাচ্ছি···"

"আমরা টাকা, রুটি আর ক্যানভাস নিয়ে ফিরব।"

"জানো, এক রাত্রে—আমাকে ত' দুদিন কোনো কাজ করতে দেয়নি—আমি এমনই ক্ষেপে গেলাম ঘরে যা-কিছু ছিল সব ভেঙে চুরমার করলাম—চীৎকার করলাম; বললাম সে আমার জীবনটা যা করে তুলেছে তার জন্য তাকে আমি কত ঘৃণা করি, তার মুখ আর দেহ কত কুৎসিত। সে আমাকে মারল আমিও প্রত্যাঘাত করলাম। ভাবলাম পরদিন নিশ্চয়ই কাজ করতে পারব। কিন্তু সে করল কি আমার ব্রাস লুকিয়ে রেখে ঘরে চাবী দিয়ে রাখল। বাড়িওলাকে বলল আমার কাছে নাকি পাওনা আছে, ভগবান জানেন কি তার পাওনা? বোরো আমি কাজ করতে চাই, বলো কি করা যায়—"

মোদিগ্লিয়ানির মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

"হ্যাঁ···?"

"ও কি এখনও কাফেতে আসে?"

"কে?"

"তুমিই জানো! বুঝতে পারছো না বলে আর ভাণ কোরো না বোরো।"

"কিন্তু হঠাৎ তোমার সে বিষয়ে এত উৎসাহ কেন, সেই—সেই মেয়েটি—"

"মুদীর দোকানের মেয়ে? তুমি ওকে দেখোনি, কিংবা ওর দিকে তাকাওনি, কোণে যখন বসেছিল কি সলজ্জ বঙ্ক ভংগী। তার দুটি কালো ভ্রূ, তার ভিতর দুটি নীল চোখ, গাল দুটি প্রায় গোলাপী। ঐ চমৎকার দেহ, ওই নাক, গলা, কাঁধ না লক্ষ্য করে কি থাকা যায়। তার সেই দৃষ্টি তোমার চোখে পড়েনি কি দৃঢ় আর দীপ্ত তার ভংগী। সেদিকে তাকানো যায় না। মুদীর দোকানের মেয়ে? দেখ, আমি নিজেই ত' চাষীর ছেলে। সব বড় আর্টিষ্টই জনগণের ভিতর থেকে এসেছে? মুদীর মেয়ে? অনেক পবিত্রতা, অনেক আদর্শবাদ, অনেক ভব্যতা আছে এই মুদীর মেয়ের মধ্যে যা অনেক পরিচিত মেয়ের মধ্যে নাই। তার অন্তর জানার জন্য তার সংগে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমার ভুল হয়নি ওকে দেখলেই, ওর কথা চিন্তা করলেই আমার ধমনীতে রক্ত নাচে। দু-একবার দেখেছি ও কেমন ছবি আঁকে। অতি স্থূল, একেবারে হাতে খড়ি। তবু ওর দৃষ্টি আছে, চিন্তা আছে—ওর চিন্তার মধ্যে আছে দুঃসাহস আর দুরাশা।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়

পলাশীর যুদ্ধে বাঙালী সিপাই

"A battalion of Bengali Sipahis fought at Plassey, side by side with their comrades from Madras···that the Bengali Sipahi was an excellent soldier, was freely declared by men who had seen the best troops of the European Powers."

—History of the Sepoy Mutiny :
Kaye and Malleson. Vol 1. P. 149.

"I have indeed understood from many quarters that the Bengalies are regarded as the greatest cowards in India; and that partly owing to this reputation, and partly to their inferior size, the sepoy regiments are always recruited from Behar and the Upper Provinces; yet that little army with which Lord Clive did such wonders was raised chiefly from Bengal."

—Bishop Heber : Indian Journal, Chap. IV.

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

তার পরের দিন—২৮শে সেপ্টেম্বর। ব্রেকফাস্টে চলেছি কয়েকজনে সাততলার খানাঘরে। লিফটের বোতাম টিপে অপেক্ষায় আছি।

হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। আমার নাম ধরে বলছেন। অমুক বলে কেউ আছেন আপনাদের মধ্যে?

অতএব ছেড়ে দিলাম সেবারের লিফট।

পিকিন য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক আমি—আলাপ করতে এসেছি।

চলুন তবে ঘরে গিয়ে বসিগে।

খেতে চলেছেন—খেয়েই আসুন তবে। না হয় আমিও যাচ্ছি সেখানে, খাওয়ার টেবিলে আলাপ হবে। উঠে যান—আসছি আমি একটু পরে।

আধ-ময়লা লম্বা মানুষটি। চৈনিক চেহারা এমন যে হতেই পারে না, এমন নয়। তার পরে জানাশুনো হল—চক্রেশের বাপ জগদীশ চৈন। হিন্দি পড়ান। মেয়ের সঙ্গে তো বিস্তর পরিচয় হয়েছে, বাপকে দেখলাম এবার। বম্বের এক কলেজের অধ্যাপক—চাকরিটা ছাড়েন নি। ছুটিতে আছেন। সমস্ত পরিবার বম্বে রয়েছে, এখানে শুধু বাপ আর মেয়ে।

এ মানুষকে হেলা করে চলে না। মাস ছয়েক এসে আছেন, কত কি নতুন কথা পাওয়া যাবে এঁর কাছে!

চীনা ভাষাটা শিখেছেন তো ভাল করে?

অধ্যাপক শিউরে উঠলেন। ওরে বাবা, সে কি ছ-দশ মাসের কর্ম?

ছ মাসের না হোক, দশ মাসেও হবে না?

না। সজোরে তিনি ঘাড় নাড়লেন।

অক্ষরই হাজার কয়েক। ভুল বললাম—অক্ষর নয়, লিপি। কিম্বা ছবিই বলুন না! এক একটা গোটা কথা ছবি দিয়ে প্রকাশ করে।

এত প্রগতি নানান দিকে—লিপির ঐ জগদ্দল বোঝায় অসুবিধা হয় না? সহজ কিছু বেছে নিলে তো পারে। লাতিন অক্ষর নিয়ে নিচ্ছে অনেক দেশে। কাজকর্ম চালানো কত সহজ হয় তা হলে?

এই আলোচনা পরে করেছিলাম অপর এক বিদগ্ধ জনের সঙ্গে। তিনি ঐ দেশীয়। খুব খানিকটা হেসে নিলেন। বললেন, অতি প্রাচীন পরিপক্ক জাত যে আমরা! আয়তনে যারা ইউরোপের চেয়ে বড়। ইজ্জতেও। কেউ আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। চার হাজার বছরের খবর পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ২৮০০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। হেন ঐতিহ্য দেখান দিকি আর কারো। আর সকলের যা চলে, আমাদের তা চলবে না। জান কবুল—পুরাণো ঐতিহ্যের আঁশটুকুও আমরা ছাড়তে পারব না।

আবার বললেন, ভাষা নিয়ে অসুবিধা আছে মানি। কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ভাষা-ত্যাগের প্রস্তাব তুলবে? তবে গবেষণা চলছে—সহজে ভাষা শেখবার একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিও বেরিয়েছে। মাস তিনেকে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো শেখা যায়।

খবরের মতো খবর। পুলকিত হবার ব্যাপার নিঃসন্দেহ

ছড়িয়ে দিন না পদ্ধতিটা। বিচিত্র আপনাদের প্রা সাহিত্য-ভাণ্ডার। যারা স্বাদ পেয়েছে, তারাই তো মজেছে। ভাল হয়েছে, সংক্ষিপ্ত পথে এগিয়ে মূঢ় জনে এবারে যদি একটু উঁকি ঝুঁকি দিতে পারে!

তিনি বললেন, বাইরের লোকে এখন খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে না। পদ্ধতিটা ধ্বনির উপর নির্ভরশীল। আমাদের বাগভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় থাকলে তবে হবে।

হিজিবিজি লিপির প্রবর্তন কেমনে হল, শুনবেন একটু। সত্যি মিথ্যে জানি নে—কষ্টিপাথরে ঠুকে যদি বলেন খাদ আছে, গণেশের দিব্যি করতে পারব না। যেমন শুনেছি, তেমনি লিখে দিলাম। আপনারাও গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুন, শুনতে পাবেন এই কাহিনী।

তখনো লিখন-শিল্পের আবিষ্কার হয়নি। লোকে দৈবজ্ঞের কাছে যায় ভবিষ্যৎ জানতে, রোগপীড়া সারাতে, গ্রহশান্তি করতে। সমস্ত শুনে নিয়ে দৈবজ্ঞ কচ্ছপের খোলা, মানুষের করোটি বা ঐ জাতীয় কিছু ফেলে দিলেন আগুনে। তারপর আগুন নিবিয়ে

বিয়ে রেজিস্ট্রি হচ্ছে

যন্ত্রগুলো বের করে আনা হল। উত্তাপে ফেটে ফেটে আঁকাবাঁকা রেখা ফুটেছে খোলার উপর। দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎ পড়ে গেলেন ঐ সমস্ত রেখায় চোখ বুলিয়ে। এই হল লিপিবিদ্যার আদি। রেখার মানে দৈবজ্ঞ বোঝে তো আপনি আমি চেষ্টা করলে বুঝব না কেন? অতএব সকলে লিখতে লাগল ঐ ধরনে, মানেও করতে লাগল। লিপির ধরন তাই অমন আঁকাবাঁকা।

অক্ষর নয়—ছবি। এক একটা আস্ত কথার ছবি করে দিয়েছে। একটা-দুটো টুকরো-রেখায় ছবির সঙ্কেত। নিরীখ করে দেখুন, মালুম হবে কতক কতক। রসবোধের নমুনা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। মানুষ—দেখুন, এক জোড়া পা। স্ত্রী—দেড় লাইনে মেয়েলোকের মতো বানিয়ে তার হাতে ঝাঁটার ইঙ্গিত। মামলা—দুটো কুকুর। কয়েদি—বাক্সের ভিতর গুড়ি মেরে আছে মানুষ। পুজা—মানুষ হাঁটু গেড়ে আছে। পুব-দিক—গাছের আড়ালে সূর্য। পশ্চিম—পাখীরা বাসায় ফিরছে। এমনি অজস্র।

অধ্যাপক চৈনের পরে পরাণ্ডপে। এসে অবধি তাঁর খোঁজ করছি, এত দিনে চোখে দেখলাম। ঝড়ের বেগে ইংরেজি বলেন। আর এমন তাজ্জব চীনা শিখেছেন—খাস চীনা মুলুকের মানুষও লজ্জা পেয়ে যায়। বড় ব্যস্ত—বসে দুটো কথা বলবার ফুরসৎ নেই। এঘরে-ওঘরে ছুটোছুটি করে দেশের ভাইদের সঙ্গে আলাপ করছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাটজনের সঙ্গে মোলাকাত সেরে ড্রইং-রুমে এলেন। ভারতীয় দূতাবাস চলে ফিরবার তালে আছে চীনের কাছ থেকে—তার জন্য নানা স্তরে নানাবিধ আলোচনা। আরও নানা ব্যাপার। একটুও সময় নেই। কাল আসব আবার। নয় তো, পরশু। আজকে মার্জনা করুন।

সাইকেল চেপে পরাণ্ডপে সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চলো যাই একজিবিসনে। নতুন চীন কি করছে, তার কিছু নমুনা দেখে আসা যাক। নিজ চোখে। এতকাল যাদের তল্পি বয়ে এসেছে জোট বেঁধে তারা তো একঘরে করে দিল। বোসো, দেখে নিচ্ছি—জব্দ করছি কম্যুনিষ্ট বেটাদের হুঁকো-নাপিত বন্ধ করে। কিন্তু শাপে বর হয়ে গেল। বাঁচতেই হবে, দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। যা দেশে-ঘরে আছে, তাই নিয়ে খুশি থাকো দেশের মানুষ। আর গড়ে তোল নতুন নতুন কারখানা, কোমর বেঁধে সর্বশক্তিতে লেগে যাও।

দশ বছরের বেশি ঘরোয়া লড়াই—অস্থি-মজ্জা কিছু কি আর ছিল? জিনিষপত্রের দাম লক্ষগুণ বললে বিনয় করে বলা হয়। ভারী-শিল্প কমে গিয়েছিল শতকরা সতর ভাগ, ছোট-শিল্প তিরিশ ভাগ। ফসল কমেছিল সিকি। সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। তাই বা কেন—উৎপন্ন এমন বেড়েছে কস্মিনকালে যা কেউ দেখেনি। আরও বাড়ছে দিনকে দিন। যেটা ওরা আশা করে, সে
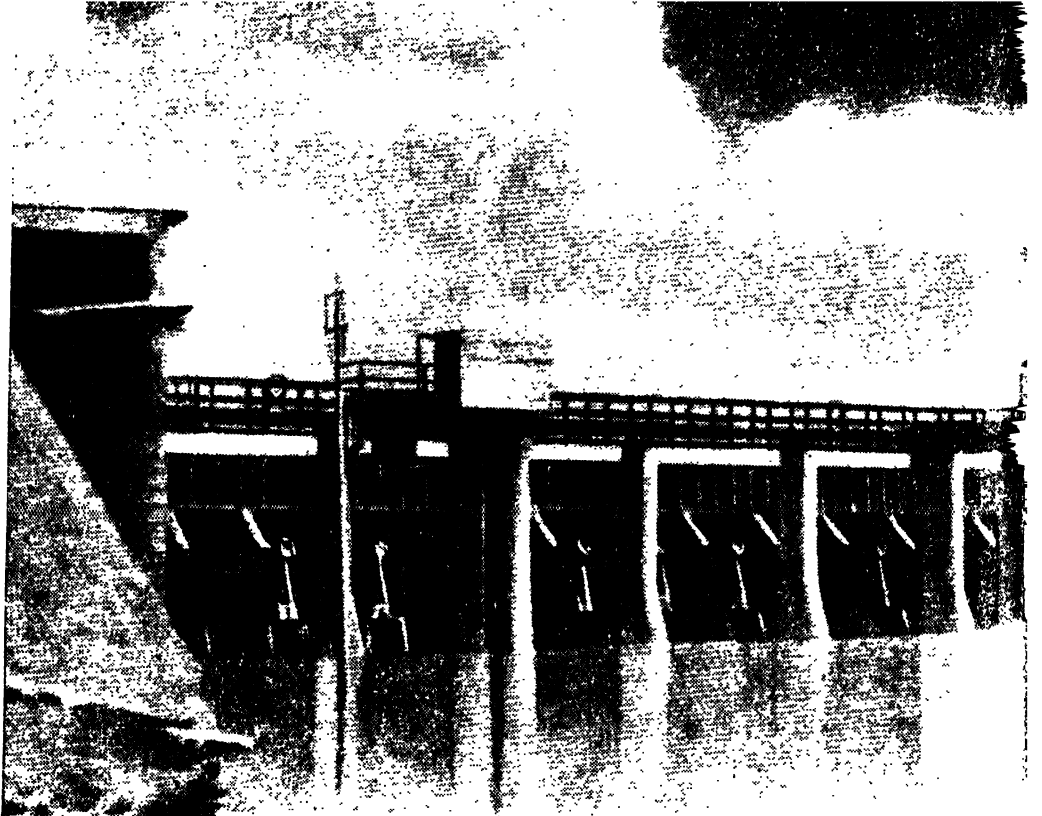
...ছাপিয়ে অনেক আরো এগিয়ে যাচ্ছে বছর বছর। কয়লা আর লোহা-পাথর চালান দিত আগে, এখন নিজেরাই ইস্পাত বানাচ্ছে। দেশের শিরা-উপশিরার মতো সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে রেললাইন। ভূমি-সংস্কার করে ফেলেছে—লাঙল যাদের তাদেরই জমি। নিজের হাতে লাঙলের মুঠো ধরতে হবে, তার মানে নেই অবশ্য; লোকজন দিয়েও করাতে পারে। কিন্তু ফরাসে পা ছড়িয়ে খাজনা আদায় চলবে না। দেশ জোড়া এত বড় কাজ যেন মন্ত্রের জোরে করে ফেলল। অথচ অস্বস্তি কত রয়েছে, ভেবে দেখুন। ঘর-শত্রু অদূরে ফরমোশায় ওৎ পেতে আছে—তাদের পিঠের আড়ালে ভুবনের শক্তিধর মহাশয়গণ। আর শিলাকস অর্থাৎ দেশের প্রাণকেন্দ্রের অতি-নিকটে কোরিয়ায় তো মার-মার কাট-কাট ব্যাপার—অহরহ সেদিককার ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তার মধ্যেও এত সমস্ত—এমন হাসি আর নির্বাধ আনন্দ!

ঘুরে ঘুরে দেখছি। হেন বস্তু নেই, যে দিকে এদের নজর পড়ে নি। ছবি-আঁকা মধুগন্ধী চন্দনের পাখা থেকে ভীমকায় বয়লার। আহা, সর্বরকমে নাজেহাল হয়েছে এত কাল ধরে—কেউ তো ছেড়ে কথা কয়নি! বারোয়ারি ময়দা—যে পেরেছে, সে-ই ঠেসে গেছে। আজকে দিকে দিকে নবজীবনের ব্যাপ্তি। একজিবিশন ঘুরে ঘুরে ওদের নবীন স্বাস্থ্যের নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করছি। ভাল হোক এদের—শান্তি ও সমৃদ্ধি উথলে উঠুক। এই আনন্দোচ্ছল স্বাস্থ্যোদ্ভাসিত ছেলেমেয়েদের মুখ মলিন না হয় যেন আর কখনো! আর আমি জানি, এমনি হাসি হাসবে আমাদের সন্ততিরাও। সার্বিক চেষ্টা চাই তার জন্য। দোষ আছে আমাদের মানি, গালি গালাজ করি—আত্মসমালোচনা বলে তা ধরে নিও। আমাদের কর্মচেষ্টা নিষ্কলঙ্ক ও ব্যাপকতর হোক। আনন্দের প্লাবন দেখে এলাম চীনে—সে আনন্দ হিমালয় ছাড়িয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে পড়ুক এখানে। প্রীতি ও সৌহার্দ্যে এপার-ওপার এক হয়ে থাক সেই প্রাচীন দিনের মতো।

কিনতে লোভ হয় নানান জিনিস। বিশেষ করে সিল্কের উপরে তোলা ছবি ও ব্যাগ। ভারি চমৎকার! চক্রেশ ও তার বাপ আছেন দলে—আমাদের সঙ্গে ঘুরছেন। হাঁ-হাঁ করে উঠল মেয়েটা। এখানে নয়, আমি কিনে দেবো। যারা তৈরি করে, জানি তাদের। অর্ডার দিয়ে দেবো—আরও ভালো হবে, অনেক ভালো—

ডায়েরির খাতা খুলে স্তব্ধ হয়ে আছি। বিজয়া দশমী। ছাপা আছে তাই, নইলে টের পাবার কথা নয়। শানাই বাজছে যেন। কোথায় অনেক দূরে। বাজছে করুণ হয়ে আমার কিশোরকালের একটি বিলুপ্ত দিনান্ত। এয়োস্ত্রীরা জমেছেন চণ্ডীমণ্ডপে, প্রতিমার কপালে সিঁদুর দিচ্ছেন—তার পর প্রসাদী সিঁদুর মাখাচ্ছেন এ-ওর কপালে। অতি-কুৎসিত মেয়েটাকেও কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এই

জেনহচি বাঁধ
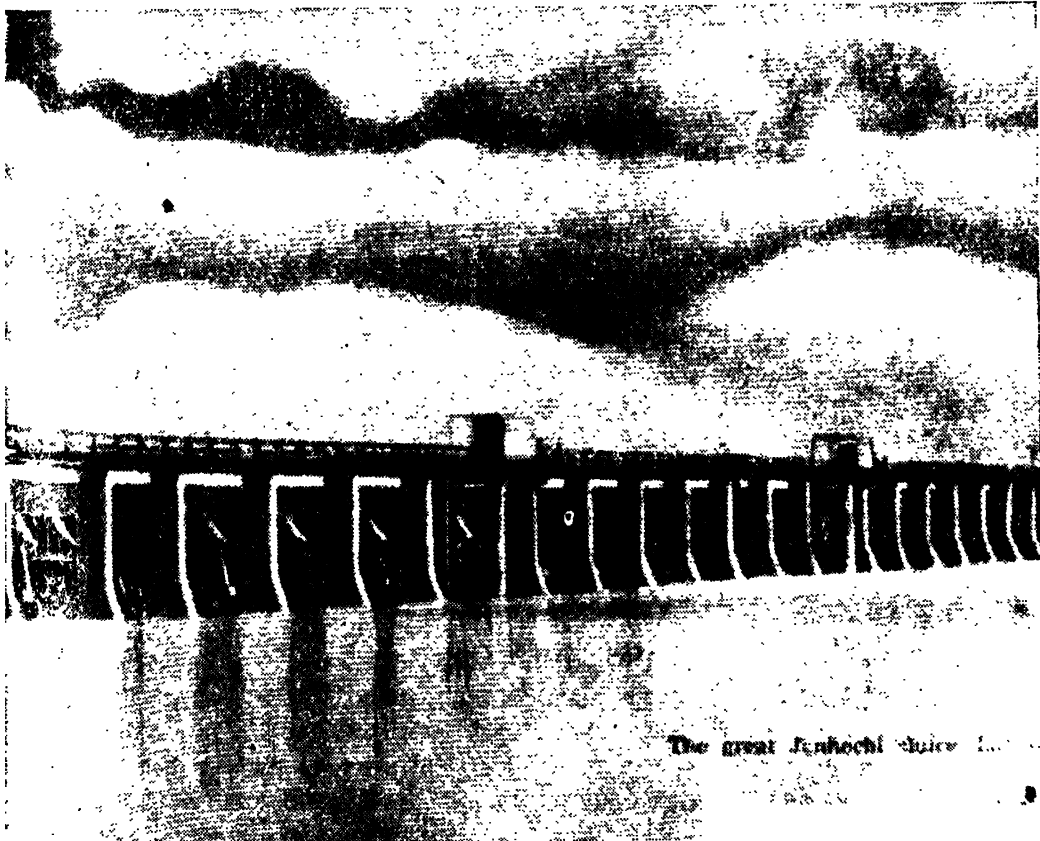
দশমীর দিন।...উঠানে নামান প্রতিমা। গর্জন তেল মাখিয়ে দিয়েছে—অপরাহ্ন-আলোয় ঝিকমিক করছে। মা গো, আবার এসো—

গিন্নি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ঠাকুর প্রতিমা নয়, মেয়ে। মা-খুড়ি এবং মাসীরা মিলে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছেন এই গ্রাম-কন্যাকে। পাশাপাশি আর এক ছবি। ঘাটে নৌকা। ছাতিমতলায় সকলে দাঁড়িয়ে। চোখে অঝোর ধারা বয়ে যাচ্ছে। মা গো—কাঁদিস নে মা, নিয়ে আসব তোকে সামনের অঘ্রাণে—

লগি ঠেলছে মাঝি। নৌকো এগোয় কই? কলমিফুলে ভরে গেছে নদীজল। কলমিলতারা শত বাহু মেলে আটকে আছে। এগুতে দেবে না...

তেমনি সানাই বাজে আজও যেন কোথায়! আমার সারা চৈতন্ত আচ্ছন্ন করে বাজছে! হঠাৎ কে কথা বলে উঠল, চমক লাগে। ইয়ং এসে বলছে—ছোকরা মানুষ, কিন্তু দোভাষিদলে কর্তাব্যক্তি!

পাকিস্তানের দল আসছেন। ভাবলাম, আপনিও গেছেন বুঝি এরোড্রোমে।

জানি নে তো—

আপনাদের অনেকেই গেছেন! এমন চুপচাপ ঘরের মধ্যে—শরীর খারাপ নাকি?

ভাবছি নানান কথা। লিখছি—

ছবি দেখতে যাবেন? আটটায়। ভালো ছবি। হুয়ে নদী আটক হয়েছে। সেই সর্বনাশা নদীর বন্দীদশা দেখবেন চোখে।

না ভাই, কোথাও নয় আজকে। চিঠি লিখব।

কত চিঠি লিখলাম গভীর রাত্রি অবধি। পর্বত-সমুদ্রের ওপার থেকে প্রণাম, প্রীতি আর আলিঙ্গন পাঠাচ্ছি সুহৃৎ-আত্মীয়দের। দক্ষিণ-দিগন্তে পাখনা মেলে মন উড়ে চলল ভারতের দিকে।

সকালবেলা নিচে নেমেছি। ড্রইংরুম হল দিনরাত্তের আড্ডাখানা। মহাটবীবৎ এই হোটেলের কোন খোপে কে সেঁদিয়ে আছেন, জানা সহজ নয়। ড্রইংরুমে হঠাৎ দেখা মিলে যায়। বেরোবার মুখে পরস্পরের সঙ্গে খানিকটা মোলাকাত সেরে যাই আরামপ্রদ আসনে বসে। ফিরে এসেও বসি খানিকক্ষণ। অথবা ঘুরে বেড়াই ঘরের এদিকে-ওদিকে—বই ও ছবির দোকানে, পোষ্টাপিসে, ব্যাঙ্কে।

তক্কে তক্কে বেড়াচ্ছি—কাল যাঁরা পাকিস্তান থেকে এলেন, তাঁদের পাকড়াতে হবে। অন্তত একজন-দু'জন—কে কে এলেন; খবর নিতে চাই। ভিন্ন দেশ বলে আলাদা দল করে এসেছেন—তবু এতগুলো দেশের মধ্যে রক্তসম্পর্কীয় অমন আর কে? বিশেষ করে যাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের। আমার সাত পুরুষের ভিটাবাড়ি, জন্ম থেকে সমস্ত কিশোরকাল কাটিয়েছি যেখানে। সে গাঁয়ের খানাখন্দ, জঙ্গলে গাছগুলো অবধি মুখস্থ। ঢাকা শহরের মধ্যেই বা কত বন্ধু আমার! সে আজ বিদেশ হয়ে গেছে। ভারতের দলে আছি আমরা কয়েক জন বাঙালি—আর ও-দলেও নিশ্চয় বাঙালি এসেছেন। ভাইবেরাদার একত্র হয়ে মনের খুশিতে খাশ বাংলায় হল্লোড় করে বুঝবব!

আচকান-পরা এক ব্যক্তি—তু, চেহারা ও বর্ণে স্বজাত বলে সন্দেহ করি। তবু সাবধানে এগুনো ভাল। ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রথম বোধ হয় দেখলাম মশায়কে?

মোহাম্মদ ইলিয়াস আমার নাম—

ব্যস, ব্যস—আবার কি! দু-হাত জাপটে ধরি। বিনামূল্যের খাদ্য খেয়ে—বলতে নেই—গায়ে কিছু তাগত লেগেছে। সদ্য-আগন্তুক আমাদের স্ফূর্তির ধকল সামলায় কি করে? অবাক হয়ে গেছে। স্বদেশীয় ভাষায় তখন সাহস দিই, ঢাহার মানুষ—সেইডা কন ভাইডি! জোব্বা দেখে ভড়কে যাচ্ছিলাম, বুঝি বা কোন চেঙ্গিস খাঁ তক্তাউস থেকে নেমে এলেন।

জবাব এলো, আর ঐ পয়লা জবানেই আমি দাদা।

আপনি চীনে এসেছেন, ঢাকা থেকেই শুনেছি দাদা।

এবং একথা-সেকথার পর—

দাদা, গরম মোজা কিনতে হবে যে এক জোড়া—

হবে, হবে—সেজন্য ভাবনা কি?

এই ক'দিনে আমরা পুরোপুরি লায়েক। ছোট ভাইয়ের চোখ-কান ফুটিয়ে দেওয়া সম্পর্কে দাদার বিশেষ কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা হতে বলি। পিকিন একেবারে নখদর্পণে—এমনি একটা ভাব। বললাম, সমস্ত পাওয়া যাবে ভায়া—ব্যবস্থা করে দেবো, ভাবতে হবে না।

অনতিপরেই বেরুলাম ইলিয়াসকে নিয়ে। ছেলেমেয়েগুলো বা অপর কেউ জানতে না পারে! বাহাদুরির জুত হবে না তাহলে।

হাজির করেছি বাজারের ভিতর। সারাপথ তালিম দিয়ে এনেছি। হোটেলে খাবার ব্যবস্থা কখন কি রকম, ব্রেকফাষ্টে কোন কোন পদ অতি-উত্তম, দেশে চিঠি দেবার প্রক্রিয়া কি, কাপড় ধোপার বাড়ি দিতে হলে কি করতে হবে...। কনিষ্ঠের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে চেষ্টার কসুর নেই।

জিনিষ দেখুন, পছন্দ করুন, এ দোকানে ও দোকানে দেখে বেড়ান—কিন্তু এক-দামে নাকি কেনা-বেচা। ঐ যে দর সাঁটা রয়েছে, মাথা খুঁড়ে মরলেও ওর থেকে পাই ইয়ুয়ান কমবে না।

ইলিয়াসও অবাক। চীনে দোকানে একদর—বলেন কি?

তাই বলে তো দেমাক করছিল। দেশে ঘরে যুধিষ্ঠির এরা নাকি সব। দেখা যাক একটু ভাল করে বাজিয়ে।

আরও ক'জনের মাল দেখা। তাঁরাও আমাদের। বাজার ঢুঁড়ছেন। অবসর পেলে বাজারে ঘুরে বেড়ানো নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘুরলাম অনেকক্ষণ ধরে। লাখ পাঁচেকের জিনিষ পছন্দ করেছি সকলে মিলে। দোকানিকে বলি, এত মাল গস্ত করছি, দশটা হাজার কমিয়ে দাও এর থেকে বাপু। ভদ্রলোকের মান রাখা তো উচিত। উচিত কিনা বলো?

হাত-মুখ নেড়ে প্রাণপণ করছি তো বোঝাবার! কতদূর কি বুঝল, কে জানে? হাসছে মিটিমিটি। হিসাব করবার একরকম যন্ত্র আছে—তারে-বাঁধা কতকগুলো গুটি, ফ্রেমে বসানো। সেই গুটির এটা এদিকে ওটা ওদিকে দ্রুতবেগে সরিয়ে ঘুরিয়ে কি দিয়ে কি করল—সেই দিকে চেয়ে একটুকরো বাজে কাগজে কসকস করে লিখে যাচ্ছে। আর আমরাও এদিকে পাঁচ আর নয়ে চোদ্দ, চোদ্দ আর সাত একুশ, একুশের এক নামে হাতে দুই রয়—এমনি করে

অনেক কষ্টে যখন লাখ লাখের যোগ শেষ করলাম, দেখি নির্ভুল ওদের হিসাব। কিন্তু কি পাবও দেখুন—এক ইয়ুয়ান, যার দাম এক পয়সার পঁচাত্তর ভাগ, তা-ও বাদ দেয়নি ভদ্রলোকদের খাতির করে। ঠোঁটের উপর ঐ একটু হাসি মাখিয়েই শোধ দিল।

রাগ মার বলি, তবে বাপু চললাম। সওদা হবে না তোমার এখানে—

তখনো হাসি। কথা না বোঝার সুখ আছে, দেখতে পাচ্ছি। যেমন ধারা দেখেছি, কালা হওয়ার দরুন সেকালের এক যশস্বী সম্পাদকের সুখ। লেখা ছাপানোর তাগাদার জবাব দিতে হত না।

দোকানদার ইতিমধ্যে আপন মনে ক্যাশ-মেমো কাটতে বসেছে। না গছিয়ে ছাড়ল না দেখা যাচ্ছে।

দশ হাজার না হোক, নিদেন পক্ষে পাঁচ। ছাড়তেই হবে কিছু। আজকে আমরা পণ করে এসেছি।

যোগ দিয়ে ঠিক সেই আগের সঙ্গে এসেছে। তার পরে—ও হরি, বাদ দিয়ে দিল পাঁচ নয়, দশ নয়—হাজার পঁচিশের মতো। ক্যাশ-মেমো সগর্বে পকেটে পুরি। দেখাবো সুইং-ইএ-মিকে। বড় যে জাঁক হচ্ছিল, খাতির-উপরোধ নেই—বোবা মানুষেও সওদা করতে পারে! কি হল তবে এই পঁচিশ হাজার বাদ দিয়ে দেওয়া?

ক্ষিতীশ আচ্ছা জমিয়ে নিয়েছে, দেখি, ওদিকে। বাজনার দোকানে ঢুকে পরখ করছিল একটা যন্ত্র। মিষ্টি হাত। লোক জমে গেল দোকানের জানলায়। তখন গান ধরল কিঞ্চিৎ। আর যাবে কোথায়? এ ব্যাজ কিনে এনে পরিয়ে দেয়, ও এসে সেকহ্যাণ্ড করে। তার পর বাজার থেকে বেরুল তো ভক্তদল ফিরছে পিছু পিছু। সমারোহ ব্যাপার!

জাতীয় উৎসব এসে পড়েছে। যে দিকে তাকাই, সাজ-সজ্জার ধুম। নতুন চেহারা খুলছে অতি-পুরানো পিকিন শহরের। এখন থেকে এই—আর সেই পরম দিনে মানুষজন কি করবে আন্দাজ করতে পারি নে।

বড় বাহার বেকুমলের দোকানের! সাজানো তবু শেষ হয় নি, নিশান টাঙাচ্ছে, তার টেনে এনে আলোর মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে দরজা ও কাচের শো-কেসের চতুর্দিক ঘিরে। মালিক দু-ভাই ফুটপাথের উপর; নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন। আমাদের দেখে হৈ-হৈ করে উঠলেন, আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়—

নাছোড়বান্দা। ভিতরে নিয়ে তুললেন। এমনই হয় দূর বিদেশে দেশোয়ালি পেলে। সেই যে বলে থাকে—কোথায় নিয়ে রাখি, ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়েয় খাবে, মাথায় তুললে উকুনে খাবে—এ যেন সেই বৃত্তান্ত।

চা খেয়ে যেতে হবে আজকে। খুব ভাল মাল খাচ্ছেন জানি—কিন্তু নিজের দেশের মতো চা করে খাওয়াবো। সে জিনিষ ওরা দিতে পারবে না। চীনা কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিলেন উপরে। মাকে বলে আয়, নিজ হাতে ভাল করে চা বানাতে কলকাতার বাবুদের জন্য।

বিস্তর জিনিষ কিনেছি আজকে। তর্কাতর্কির ঠেলায় এই দেখুন, সস্তা করে দিয়েছে।

ক্যাস-মেমো বের করে ধরলাম। বেকুমল নিশ্বাস ফেলে বললেন, ছিল মশায় সে সমস্ত দিন। একটা বছর আগে এলেও কিছু কিছু নমুনা পেতেন। এখন ফক্কিকার। মাল কেনো, দাম ফেল—ব্যস, বিদেয় হয়ে যাও। একেবারে শুকনো লেনদেন—ছুটো কথা-কথান্তরেরও ফাঁক রাখেনি।

এটা কি হয়েছে তবে? হাজার পঁচিশ ডিস্কাউণ্ট আদায় করে ছেড়েছি, চেয়ে দেখুন।

বেকুমল বললেন, সবাই দিচ্ছে। দোকানিদের ইউনিয়ন ঠিক করেছে, উৎসবের এক হপ্তা পাঁচ পার্সেণ্ট বাদ দেবে দামের উপর। তর্কাতর্কি করে থাকেন তো কথার বাজে খরচ করেছেন মশায়। বোবা মানুষ গেলেও ডিস্কাউণ্ট পাবে।

ফুটফুটে একটি মেয়ে এলো। বছর আষ্টেক বয়স। নাম মায়া। এরও দিদি আছে—দু'বছরের বড়। বেকুমল বললেন, নমস্কার করো বাবুদের—

মিষ্টি রিনরিনে গলায় মায়া বলে, নমস্তে—

তার পর চা ইত্যাদির সঙ্গে বড়টিও এসে দাঁড়াল।

কি পড়ো তুমি?

ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দি। আর চীনাও।

কি সর্বনাশ! শেল শূল গদা মুশল—শিশুপাল-বধের চতুরঙ্গ আয়োজন করেছেন একেবারে!

বেকুমল বললেন ফ্রেঞ্চ ইস্কুল বলে ফরাসিটা পড়তেই হবে। তা হলে কোনটা বাদ দেওয়া যায় বলুন। দূতাবাসগুলোর বস্ত ছেলেমেয়ে ঐখানে পড়ে। ইস্কুলটা স্রেফ বিদেশিদের নিয়ে বড় মুশকিল হয় আমাদের ছেলেপুলের পড়াশুনোর ব্যাপারে।

আবার গল্প জমে ওঠে সেই আঁতের ব্যথা নিয়ে। ব্যাপার-বাণিজ্যের সুখ একেবারে নেই মশায়। এই মরিশন স্ট্রীটে আগে সাহেব-মেমের ভিড়ে রাস্তা চলা যেত না, এখন চৌকাঠে ঠায় দাঁড়িয়ে গুনুন। গণ্ডা দুই-তিনের বেশি পাবেন না সমস্তটা দিনে। শখের মাল কারা কিনবে তবে বলুন? মা-ষষ্ঠীর দয়ায় এরাও অনেক। তা এরা কিনবে শৌখিন আমেরিকান সিল্ক? হয়েছে আর কি!

নীলরঙের গলাবন্ধ কোট আর পাজামা। মেয়েপুরুষ সকলের এক পোষাক। দামে অতি সস্তা—টাকা কুড়ির মতো সাকুল্যে। সুতি জিনিষ—খুব টেকসই, তুলোর প্যাড দেওয়া শীত ঠেকানোর জন্য। সরকারি কো-অপারেটিভ দোকানে পাওয়া যায়। দূর গ্রামাঞ্চল অবধি গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করে। ছুটোতেই বছর কাবার। সান-ইয়াৎ-সেন চেষ্টা করেছিলেন এই জিনিষ চালু করতে—তিনি তত জুত করতে পারেন নি। এদের আমলে, দেখুন, বিলকুল সব নীল হয়ে গেছে। তা হলে বুঝুন, আমাদের খদ্দের কোথা? দূতাবাসগুলো আছে, আর কদাচিৎ ছিটকে-আসা কেউ কেউ। আর এখন তো এ সবের আমদানি বন্ধ। আর ভাল লাগে না—আগেকার যা আছে খতম হয়ে গেলে এতকালের পাট চুকিয়ে দুর্গা বলে ভেসে পড়ি।

মাস আষ্টেক আগে—সে কি কাণ্ড—ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পাশের দোতলা দেখছেন—এক দোকানদার ঐ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরল ওদের হাতে পড়বার ভয়ে। ঘোড়া-ভেড়া সব সমান মশায় এ পোড়া দেশে—আপন লোক বলে খাতির-উপরোধ নেই। চোরা কারবারের দায়ে চারটেকে গুলি করে

মারল—তিনটে তার মধ্যে কম্যুনিষ্ট, কর্তাদের ভাইব্রাদার। মেরে ফেলল, তা-ও বরং ভাল—প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে যে দাগাটা দেয়! এক রকম আছে—প্রশ্ন করে যাওয়া। মানুষটাকে শুতে দেবে না, ঘুমুতে দেবে না—একের পর এক এসে অবিরাম প্রশ্ন। কমা-দাড়ি নেই প্রশ্নের—দিনের পর দিন পালা ক্রমে চলছে। কতক্ষণ সামলানো যায়? প্রশ্নের সাঁড়াশির টানে পেটের কথা হিড় হিড় করে বেরিয়ে আসে। এই তো দেখছেন, কোন দিকে কিছু নেই—খদ্দের সেজে এরই মধ্যে কতবার দর-দাম নিয়ে গেছে ঠিক কি? কার ভরসায় কি করবেন তবে বলুন। মানে-মানে সরে পড়াই উচিত।

বেকমলের দোকান থেকে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে আসছি। ঐ যে খেই ধরিয়ে দিলেন—তারপর খবরাখবর নিয়ে তাজ্জব হয়ে যাই। যা হয়ে থাকে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে মানুষের ঠিক থাকা মুশকিল। আদর্শ ধুয়ে মুছে যায়। এক বিপ্লবী দাদাকে জানি—সারা যৌবনকাল ফাঁসির দড়ি পিছনে কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে ছিলেন, বুড়ো বয়সে স্বাধীনতার আমলে সেই তিনি পারমিট বাগানোর ঘুঘু। এদেশে যা হয়েছে, ওদেশেও হয়ে উঠেছিল প্রায় তাই। মাথা ঘুরে গেল জন কতকের।

আর অমনি ছেড়ে দিল মোক্ষম অস্ত্র—সান-ফান অর্থাৎ তিন মানার আন্দোলন। দুর্নীতি নয়, অপচয় নয়, বনেদিআনা নয়। চোরা-কারবার কুলো বাজিয়ে দেশছাড়া করতে হবে; যা নইলে নয় সেইটুকু মাত্র নেবে, জিনিষের এক কণিকা নষ্ট না হয়; আর চিরকাল ধরে ঐ যে বাদশাহি মেজাজ দেখিয়ে আসছে একটা দল—কাজ করবে না, অন্যের শ্রমের উপর বসে বসে খাবে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আঁকড়ে থাকবে কলে কৌশলে—সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে তাদের অনাচার।

শাসন-শক্তি আজকে আলাদা কিছু নয়—কোন বিশেষ অঞ্চল থেকে পুলিশ-প্রহরায় আপতিত হয় না জনসাধারণের উপর। ঐ বস্তু ছড়িয়ে আছে সর্বসাধারণের মধ্যে। তোমাদের গাঁয়ের কাজ, তোমাদের পাড়ার ব্যাপার তোমরাই দেখ—কার বাপু দায় পড়েছে বাইরে থেকে চৌকিদারি করবার? না পেরে ওঠ, পিছনে পড়ে থাকবে তোমরা। পারবে সইতে হেন অপমানের দায়?

এত দুঃখদাহনের পরও এমন দুর্গ্রহ! কি লজ্জা, কি লজ্জা! টেনে বের করো দুরাচারদের জন সমাজে। মুখে চুণ-কালি দাও। সমাজের শত্রু—নতুন চীনের অগ্রগমনে পথের কাঁটা।

এই হল জনসাধারণের আন্দোলন। তখন ব্যাপারি মহল বলে, আমরাই বা কম হলাম কিসে? ওরা হুমকি দিয়ে কালোবাজার সামলাবে—কেন, নিজেরা খতম করতে পারব না আমাদের ভিতরকার কালো-ভেড়াগুলোকে? ব্যাপারিদের নিজস্ব আন্দোলন উ-ফান অর্থাৎ পাঁচ মানা। সাধারণের আন্দোলনের চেয়ে দুটো বেশি। ঘুষ দেবো না, সরকারকে ঠকাবো না, সরকারি মাল চুরি-চামারি করবো না, সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস করবো না, ট্যাক্সো ফাঁকি দেবো না।

কে কি অপকাণ্ড করেছ, খুলে বলো সরল মনে। একটা তারিখ ঠিক করে দেওয়া হল—অমুক দিনের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দোষ-ঘাট স্বীকার করো। তা যারা করল—দশের সামনে হা-হুতাশ করে বলল, এমনটি আর কস্মিন্ কালে হবে না—বকে ঝকে ছেড়ে দেওয়া হল তাদের।

ওদিকে হাঁকরাতে লাগল খবরের কাগজ, রেডিও, মিছিল, মিটিং শ্লোগান। উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম যে দিকে চরণ ফেলবেন—হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে। ব্যাপার হল, মালপত্র চেপে রেখে দুটো-পাঁচটা টাকা বেশি নিয়েছে। তা মানুষ খুন করলেও কোন দেশে এতদূর হয় না।

এই এক মজা ওখানে—উপরওয়ালারা একা-দোকা কিছু করে না, নিজেদের কাঁধে ভার রাখে না, সকলকে নিয়ে দল জোটায়। কেন বাপু, একলা আমাদের কি দায় পড়েছে? চোরা-কারবারের দরুন দুর্ভোগ সর্বসাধারণের নয়? সকলে নির্বিকার আর সরকারি কয়েকটা মানুষ চুঁ মেরে বেড়াবে—এমন হবে কেন তাহলে? আর পড়শিরা বিগড়ে রয়েছে—হেন লক্ষীছাড়া স্থানে আর যাই হোক, কালোবাজার কক্ষণো চলতে পারে না।

মামলা দায়ের হল হাজার দুয়েকের মতো। গণ-আদালতের ব্যাপার বেশির ভাগ—কম বেশি জরিমানা দিয়ে আসামিরা ছাড়ান পেল। কিন্তু প্রাণে মারা ওর চেয়ে বোধহয় মন্দ ছিল না। কি ধিক্কার! এই কাণ্ডের পরে আবার কি মাথা তুলে বেড়াতে পারবে? সমাজদ্রোহী রূপে চিরদিনের মতো দাগী হয়ে রইল।

দু-হাজারের মধ্যে প্রাণদণ্ড চার জনের। চোরা-কারবারের দায়ে গুলি করে মারা হবে। বুঝুন। আর তার মধ্যে কম্যুনিষ্ট তিন জন। এ দেশের মতোই হয়তো ভেবেছিল আমি শ্রীপ্রভঞ্জন শর্মা, অমুক কর্তার সঙ্গে দহরম-মহরম—মাকড় মারলে ধোকড় হবে রাজত্ব চালাচ্ছে যখন আমাদের দল! কিন্তু হুকুম শুনে চক্ষু কপালে উঠে যায়।

কি সর্বনাশ, খুনে ডাকাত নাকি হুকুম?

হাঁ। একজন দু-জন নয়—হাজারে হাজারে খুন করেছে। ডাকাতি এক-আধ জায়গায় নয়, লক্ষ লক্ষ বাড়িতে।

চুলচেরা হিসাব—অপকর্মের ফলে কত মানুষ খেতে পায় নি, কত খাদ্য পাতালপুরীর অন্ধকারে জমিয়ে রেখেছিল। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে হিসাব জানান দেওয়া হল দেশের সর্বত্র সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির মাতব্বর গোছের মানুষও আছে আসামিদের মধ্যে। এ সমস্ত চাউর হয়ে গেলে দোষ তোমাদের পার্টির উপরেও পড়বে যে? শত্রুর অভাব নেই, তারা হাসাহাসি করবে—চোখ টিপে বলবে, মাছ খেয়েছে বাপু আরো কত জন, ধরা পড়েছে হাঁদারাম এই কয়েকটি মাছরাঙা। বুদ্ধিমানেরা যেন অবস্থায় চেপে যান, ধমক-ধামাক দিয়ে সামলে নেন। কিন্তু তা গোঁয়ার গোবিন্দ। বলে, ছিল এককালে পার্টির মানুষ—এখন পতিত। আর পার্টির চেয়ে অনেক বড় হল মহাচীন।

[ক্রমশঃ।

বাংলার কাঁথা

[পুর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আলপনার ব্যবহার হয় গৃহস্থের ঘরে নানা ব্রত ও পূজার উপকরণ হিসেবে। পুরাণ-বিহিত নানা দেব-দেবীর পূজাতে আলপনার ব্যবহার থাকলেও এই ধরণের পূজার সঙ্গে একমাত্র মাঙ্গলিক চিহ্ন ছাড়া আলপনার আর কোন প্রত্যক্ষ প্রয়োগ বা ব্যবহারিকতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে অপ্রত্যক্ষ যোগ যে আছে এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নাই। আলপনার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ও ব্যবহার দেখা যায় কুমারী এবং সধবা মেয়েদের অনুষ্ঠিত নানা রকম ব্রতে। এক সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে এই কুমারী ও সধবাদের অনুষ্ঠিত ব্রতের প্রচলন ছিল; বার এবং ঋতু-ভেদে সম্বৎসরই প্রায় ব্রতের অনুষ্ঠান হত। ব্রতগুলির নামও ছিল ভারি সুন্দর। সাঁজসেঁজুতী ব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, অশথপাতা ব্রত, ষষ্ঠী ব্রত ইত্যাদি ব্রতগুলি এখন তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে থাকলেও কিছু দিন আগে পর্যন্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রতি ঘরে-ঘরে বিশেষ যত্ন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই সব ব্রত অনুষ্ঠিত হত। গভীর বিশ্বাস এবং ত্রুটিহীন নিপুণতার সঙ্গে মেয়েরা ব্রতের যোগাড় করত; আগেকার দিনে উপবাস করা, স্নান ও প্রক্ষালনের দ্বারা পবিত্র হয়ে ভোগ ও নৈবেদ্য রচনা করা—মাটিতে আলপনা দেওয়া এবং সর্বশেষে প্রচলিত কথা আবৃত্তি করাই ছিল ব্রতের বিভিন্ন অঙ্গ। গৃহ ও সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-ভ্রাতা, স্বামী-পরিজনের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি কামনাই ছিল এই সব ব্রত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ব্রতগুলির বহু ইঙ্গিত আজকের দিনে অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলেও এগুলির ব্যবহারের দিকে আলপনার নক্সাগুলির স্থান সম্বন্ধে বিশেষ অবোধ্য কিছু নেই। মানসিক নানা রকমের কামনা পূরণের উদ্দেশ্যেই ব্রতের অনুষ্ঠান করা হত। বিভিন্ন ব্রতকে বিভিন্ন কামনা পরিপূর্ত্তির উপায় বলে বিশ্বাস করা হত। এই সব

বাংলা দেশের একটি কাঁথা

আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ফলবতী করবার উপায় হিসেবে আলপনার নক্সাগুলিকে ব্যবহার করা হত। কথাগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রত প্রচলিত হওয়ার কাল্পনিক কাহিনীটি বিবৃত হলেও ব্রতের ভেতর দিয়ে অভীপ্সিত কাম্য-বস্তুর ছবিটি এই আলপনার মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। যে উৎস থেকে এই সব কাম্য-বস্তুর অধিকার আসবে সেই উৎসটির ইঙ্গিতময় নক্সা দিয়ে আলপনার আরম্ভ; ঐটি হচ্ছে আলপনার কেন্দ্রস্থ বহু দলে বিকশিত পদ্ম। পদ্মের জন্ম পঙ্কে, এর নাল থাকে জলের মধ্যে, আর ফুল সব অতিক্রম করে শূন্যে সূর্যের উদয়ের সঙ্গে তার মৃণালগুলি উন্মুক্ত করে আর সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে গুটিয়ে নেয়। পদ্মের এই সব লক্ষণের

বাংলা দেশের একটি কাঁথা

সঙ্গে মানুষের পরিকল্পিত নানা গূঢ় তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখে শিল্পে ও সাহিত্যে তার বহুল ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রায় সকল জাতির মানুষের কল্পনায়ই সূর্যকে সকল গতি ও প্রাণের কারণ বলে উপলব্ধি করে নানা ভাবে সূর্যকে পূজা ও পরিতোষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উপলক্ষে সূর্যের মূর্তি এবং নানাবিধ প্রতীকের উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে। ভারতবর্ষীয় ইঙ্গিত-কল্পনায় পদ্মফুল সূর্যের প্রতীকরূপে বহু দিন থেকেই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সূর্যই সকল প্রাণ সকল চেতনার উৎস—সকল কামনা সকল অভীপ্সা পূরণের একমাত্র শক্তি বা কারক। কাঁথা এবং আলপনার নক্সায় যে পদ্ম দেখা যায় এই পদ্মই আছে বিষ্ণু আর সূর্যমূর্তির হাতে আয়ুধরূপে এবং শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন প্রকরণে। জগৎ-মণ্ডলের প্রতীকরূপে পদ্ম ছাড়া কোথাও কোথাও সূর্যকে আকাশে জ্যোতির্ময় বৃক্ষের আকারেও কল্পনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষই বিভিন্ন জাতির মধ্যে কল্পবৃক্ষরূপে পূজা লাভ করেছে—ভারতবর্ষীয় কল্পনায় বৃক্ষ মাত্রই কল্পবৃক্ষের ছায়া। কদম্ব বৃক্ষ অনেক ক্ষেত্রে এই কল্পবৃক্ষেরই বিকল্পরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কাঁথার কেন্দ্রস্থিত পদ্ম এবং বৃক্ষগুলির রূপায়নে এই ইঙ্গিতগুলিই নিহিত রয়েছে। পদ্মের চার দিকে থাকে শঙ্খলতা, এই শঙ্খলতা শুভ্রতা এবং পবিত্রতার প্রতীক।

পদ্ম এবং শঙ্খলতার বাইরে বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নক্সার সমাবেশ করা হয়। কোনটাতে হাতী, ঘোড়া, কাঁকুই, আর্শী, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, পায়ের ছাপ; কোনটাতে নৌকো, পাল্কী; কোনটাতে চন্দ্র, সূর্য, ধানের শীষ, পূর্ণকুম্ভ, অলঙ্কার। ব্রত অবলম্বনকারী কুমারী এবং সধবা নারীরা যে সব আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের কামনায় এই সব ব্রত অনুষ্ঠান করতেন, আলপনার নক্সায় সেই সব দ্রব্যেরই রূপ; এ ছাড়া অন্যান্য নক্সাগুলি পূর্ণতা, প্রাচুর্য, পবিত্রতা ইত্যাদি কাম্য প্রসাদ ও গুণের নির্দেশক।

কাঁথার নক্সাগুলির সঙ্গে আলপনার নক্সাগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও এই উভয় ধরণের নক্সাগুলির মধ্যে একটা বিশেষ নৈকট্য রয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আলপনার নক্সার মত কাঁথাতেও হাতী, ঘোড়া, কাঁকুই, আর্শী, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, নৌকো, পাল্কী, চন্দ্র, সূর্য, ধানের শীষ, অলঙ্কার, নিত্য ব্যবহারের জিনিষ, বাড়ী-ঘর, বাক্স-প্যাটরা ইত্যাদি দেখা যায়। এ ছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের নানা দৃশ্যও এ কাঁথাগুলিতে থাকে।

কাঁথাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাঁরা সেলাই করতেন তাঁরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য তৈরী করতেন না, অতি আপনার আত্মীয় ও প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্যই এগুলি তৈরী হত। অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমে তৈরী কাঁথাগুলির নক্সার সৌন্দর্যই কিন্তু এই উপহারের প্রধান উপজীব্য ছিল না। এই নক্সাগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত মানস-কামনা এবং ফললাভের আশীর্বাদই ছিল এই উপহারের প্রধান লক্ষ্য। নক্সাগুলি ঠিক ভাবে আঁকা হলে তাতেই ঈপ্সিত ফললাভ হবে এই বিশ্বাস নিয়েই ধৈর্য, সংযম এবং পবিত্রতার সঙ্গে ব্রত পালন করা হয়, আলপনা আঁকা হয়। কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যেও যথেষ্ট ধৈর্য, সংযম, এবং পবিত্রতার পরিচয় আছে এবং ব্রত পালনের সকল নিষ্ঠাই কাঁথা সেলাইয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তার পর আসে উপহারের পালা। এ যেন যজ্ঞফল দান করারই আর এক উদাহরণ। উপহার দানের সঙ্গে সঙ্গে যেন এই কামনাই করা হল—আমার সকল নিষ্ঠা সর্ববিধ সংযম এবং সুদীর্ঘ পরিশ্রমে যদি কোন ফল হয়—যদি এই কাঁথায় অঙ্কিত কোন ঈপ্সিত দ্রব্যটি এই নিষ্ঠা ও সংযমের ফলে আমার প্রাপ্য হয়ে থাকে তবে তা তোমাতে বর্তাক—সে ফলে আমার কোন স্পৃহা নাই; আমি সম্পূর্ণ ভাবেই আমার লভ্য সকল ফলই তোমাকে অর্পণ করলাম। কাঁথা-শিল্পের এই দিকটি সামাজিক ও মনন-কল্পনার দিক থেকে সত্যই তুলনাহীন।

যে আদিম প্রকৃতি মানুষকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন এবং চিন্তা-কল্পনায় প্রবুদ্ধ করেছিল, তারই মধ্যে মানুষের আধি-দৈবিক এবং আধিভৌতিক সম্বন্ধে সচেতনতার মূল নিহিত রয়েছে। বর্তমানের মানুষ সভ্যতার গরিমায় এই সচেতনতাকে অস্বীকার করতে চাইলেও মানুষের সকল উন্নতির মূলে যে জ্ঞান তার অন্বেষণে আদিম অবস্থায় এই আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সম্বন্ধে চিন্তাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এ কথা অস্বীকার করবার পথ নেই। আদিম কাল থেকে শক্তিই হচ্ছে মানুষের একমাত্র কাম্য; এই শক্তি দ্বারাই সে তার নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়; এই শক্তির সহায়তায়ই সে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যা-কিছু সংগ্রহ এবং উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়। জীবনের অস্তিত্ব এবং সব কিছু ভোগের মূলেই হচ্ছে এই শক্তি। এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু করায়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত শক্তির অন্বেষণই মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে বিবর্দ্ধন করেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ আজ অকল্পনীয় শক্তির অধিকারী হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের অধিগত শক্তি জাগতিক শক্তির তুলনায় আজও কত নগণ্য! এই শক্তির উৎস জড় না চেতন এই সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয়নি এবং বিজ্ঞানের এই প্রগতির যুগেও তা অজ্ঞেয়ই রয়ে গিয়েছে। এক সময় ছিল, যখন মানুষের অধিগত শক্তি ছিল তার শৈশব অবস্থায়—কিন্তু শক্তি লাভের কামনা কিছু কম ছিল না। প্রকৃতির মধ্যে শক্তির যে অফুরন্ত উৎস রয়েছে, এ বিষয়ে তাদের সচেতনতা ছিল—অজ্ঞাত ভাবে সেই শক্তির কোন কোন আইনকে নিজের প্রয়োজনে তারা ব্যবহারও করেছিল। পাথর দিয়ে অস্ত্র নির্মাণ, তীর-ধনুকের মূল সূত্র আবিষ্কার ইত্যাদির মধ্যে এই শক্তিকে অধিগত করবারই প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এই অধিগত শক্তিতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না; তাদের প্রধান সমস্যা ছিল কি করে শত্রু নিপাত করা যাবে। সে যুগ ছিল মানুষের জীবন-মরণ সমস্যার যুগ। শুধু নখ-দন্তে সজ্জিত মানুষের দেহ অসংখ্য জন্তুতে অধ্যুষিত পৃথিবীতে কোন বিষয়েই প্রতিবেশীদের থেকে বেঁচে থাকবার পক্ষে বেশী উপযোগী ছিল না। সেই ভীষণ প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে উৎখাত করার মধ্যেই ছিল বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায়। এবং বেঁচে থাকবার জন্য এই ভয়াবহ সংগ্রামে তাদের নিজের বুদ্ধি এবং বাহুবলই ছিল একমাত্র প্রত্যক্ষ সহায়। তারা এই নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রত্যক্ষ ভাবে এই নিয়েই তারা সেই ভীষণ সংগ্রামে সফলকাম হয়ে থাকলেও তারা নিজেরা কিন্তু কখনও কেবল মাত্র নিজেদের শক্তির উপরে নির্ভর করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। কোন একটা অপরিজ্ঞাত শক্তির

উপরে নির্ভরশীলতা সেই আদিমতম কালেই আত্মপ্রকাশ করে। এই নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায় ইচ্ছার অভিব্যক্তির মধ্যে। ভীষণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম; সংগ্রামে হাতিয়ার ছুঁড়ে-মারা বল্লম, গাছের ডাল, পাথরের টুকরো। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আবাস-গুহার প্রাচীরে আঁকা হল সেই শত্রুর ছবি জীবিতাবস্থায়, সংগ্রামরত অবস্থায় এবং সর্বশেষে মানুষের হাতে মরণাহত অবস্থায়। মানুষের প্রবল ইচ্ছা শত্রু নিপাতিত হোক, এই প্রবল ইচ্ছারই রূপ দেখি এই ছবিগুলিতে; এবং তারা এই বিশ্বাসই পোষণ করত যে, এই ধরণের চিত্র অঙ্কনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অলক্ষিত কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিত ভাবেই তাদের শক্তিকে সাহায্য করবে, যাতে করে তারা ঠিক অমনি ভাবেই শত্রুকে নিপাতিত করতে পারবে। এই প্রক্রিয়াকেই ইংরাজিতে বলা হয় magic। এই magic-এর মূলে কোন যুক্তি নাই। তবে বিচার করে দেখলে দেখা যায়, magic মানুষের ইচ্ছাশক্তিরই প্রকাশিত রূপ—যার মধ্যে রয়েছে সেই অজ্ঞেয় শক্তির সচেতন প্রকাশ।

যে আদিম বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে এই magic-এ, সেই বিশ্বাস থেকেই পরবর্তী যুগে ব্রত-পার্বন পূজা-প্রার্থনার প্রবর্তন হয়। যাগ-যজ্ঞ পূজা-প্রার্থনার নানা আঙ্গিকের মতই ব্রতের আলপনার মূলে সেই আদিম মানুষের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আলপনায় সাজান নানা নক্সায় বিহিত দ্রব্যসামগ্রী পৃথিবীতে সত্য এবং আমার কাম্য। আমি এই কাম্য লাভ করতে চাই। এই কাম্য লাভের জন্য প্রয়াসও করা হবে। তবে আমার বিশ্বাস, আমার শক্তি গৌণ—যদি যথাযথ ভাবে ব্রত অনুষ্ঠান করা যায় তবেই অতি সহজেই এই সকল কাম্য আমার অধিগত হবে।

অতিপ্রাকৃতের উপর এই বিশ্বাস থেকেই ব্রত-পার্বন, পূজা-প্রার্থনার সূত্রপাত হয়। যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি পূজা-প্রার্থনার নানা আঙ্গিক এই বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি। অথর্ব বেদের নানা ক্রিয়াকলাপ এবং তন্ত্রশাস্ত্র এবং পুরাণ-বিহিত নানা বর্ণ, আকৃতি এবং বেশভূষায় কল্পিত বিবিধ দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার মূলেও ঐ কামনা পরিপূরণের প্রয়াসই সুস্পষ্ট।

ক্রমশ প্রকৃতির উপর আধিপত্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত ভাবে মানুষ আজ অনেকটা এই অতিপ্রাকৃতের উপর বিশ্বাসকে অতিক্রম করে উঠে থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে অতিশয় অগ্রসর সভ্য দেশের মানুষেরও এই ধরণের অতিপ্রাকৃতের উপর আস্থা রয়েছে। বর্তমানের মত বিজ্ঞানলব্ধ আলোক যখন মানুষের লভ্য ছিল না, তখন সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এই অতিপ্রাকৃতের উপর বিশ্বাস নানা ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। সূর্যই পৃথিবীর সকল শক্তির মূল আধার; এই বিশ্বাস থেকে প্রায় সকল সমাজেই অল্প-বিস্তর সূর্য-পূজার প্রচলন হয়েছিল। সূর্যের পরেই মানুষ নির্ভর করেছে অন্নপ্রসূ পৃথিবীর প্রজনন-শক্তির উপর। পৃথিবীর এই প্রজনন-শক্তিই মানুষকেও সন্তান-প্রজননের অধিকারী করেছে। এই প্রজনন-শক্তির অধিষ্ঠাত্রীকে নারীরূপিণী কল্পনায় বহু সমাজে নানা ভাবে পূজন ও তোষণের ব্যবস্থা করা হত। সকল কামনা-বাসনার পরিপূরক রূপে wish tree বা কল্পবৃক্ষ এবং পূর্ণকুম্ভের পরিকল্পনাও পৃথিবীর সকল সমাজেই বর্তমান। আধিভৌতিক শক্তির উপর এই আস্থা পৃথিবীর সকল জাতির মানুষেরই পুরুষানুক্রমে রক্ষিত সম্পদ। বিভিন্ন সমাজের মানুষ বিভিন্ন ভাবে এই সম্পদকে রক্ষা করেছে, রূপদান করেছে এবং উপভোগ করেছে।

আদিম জাতিগুলির মধ্যে নানা রকমের দৈবী কল্পনার উদ্দেশে ভোজ্য পেয় সঙ্গীত নৃত্য উপহারের প্রচলন দেখা যায়। এই সব সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী সরল; ভয় গভীর হলেও খুব বেশী জিনিষ সম্বন্ধে এই ভয় প্রসারিত নয়। এদের বিশ্বাসও তাই সরল, পূজাপ্রণালী অনাড়ম্বর।

বেদের যুগে মানুষ ছিল জীবনের ভোগ-সুখ সম্বন্ধে সচেতন, স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে নির্মম ও সংগ্রামশীল; তাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবন সেই যুগেই যথেষ্ট জটিল হয়ে পড়েছিল। তাহলেও ব্যবহারে তারা ছিল প্রত্যক্ষবাদী। ভোগ্য দ্রব্যের উপর অধিকার বিস্তারের জন্য তারা নিজের বাহুবল এবং কর্মশক্তির উপরই নির্ভর করত। এই বাহুবলকে পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী করবার জন্য যজ্ঞের মধ্যমে তারা ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্য, নাসত্য ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে ভোজ্য ও পেয় উৎসর্গ করত। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদিম মনের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর থেকে এক দিকে যেমন মোহমুক্তি ঘটেছিল, অন্য দিকে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং আদিম সমাজের নানাবিধ বিশ্বাস একসঙ্গে যুক্ত হয়ে পরবর্তী যুগে মাজিত ধরণের দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার মধ্যে রূপ গ্রহণ করল। এই ধরণের পূজা-অর্চনার মধ্যে যে সমাজের ছবি প্রতিফলিত হয় সেই সমাজের গঠন এবং সেই সমাজবর্তী মানুষের পেশা এবং এরা যে সব জিনিষ ভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা করত তা ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত এবং জটিল। সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা রাজ্য শাসন করত, যুদ্ধ-বিগ্রহে ছিল তাদের পরম উৎসাহ, জগতের সকল রকমের ধনরত্ন, বিত্ত-বিভবের দিকে ছিল তাদের দুর্দান্ত আকর্ষণ। বণিক শ্রেণীরা এই সমাজের বিলাস-ব্যসনের যোগান দিয়ে নিজেরা প্রভূত বিত্তের অধিকারী হত। এদের ধন-ঐশ্বর্য, রূপ-যৌবন, শক্তি-সামর্থ লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষারই ছবি দেখা যায় এই যুগের উদ্ভাবিত নানা রকমের প্রতিমার ধ্যান এবং পূজার উপকরণে। সমাজের উচ্চ স্তরে যে সময় নানা ঐশ্বর্যমণ্ডিত দেব-দেবীর পূজার প্রচলন হতে থাকে সেই যুগেই সমাজের সাধারণ স্তরে বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্যে এক অদ্ভুত মানস-কল্পনা রূপ গ্রহণ করেছিল। এই মানস-কল্পনার ছবি পাওয়া যায় মেয়েদের বার-ব্রত পূজো-আর্চায়। পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা সারা ভারতের মিলিত সংস্কৃতির যৌথ সম্পত্তি হলেও এই ধরণের ব্রত-অর্চনা মনে হয় বাংলার নিজস্ব। এই সব ব্রত-পার্বনের মধ্যে বাংলার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট! সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের নিজস্ব, তার প্রায় সব কিছুই বাংলার সমাজ আত্মস্থ করে নিয়েছিল এবং তারই সঙ্গে নিজের বৈশিষ্ট্য যোগ করে এক অপূর্ব এবং বিচিত্র মানস-লোকের সৃষ্টি করেছিল। রূপৈশ্বর্যে এবং প্রসাদগুণে এই ভাব-কল্পনার কোন তুলনা পাওয়া যায় না।

ব্রতগুলির উপলক্ষ এবং উদ্দেশ্য নানাবিধ এবং বিচিত্র। লক্ষ্মী-ব্রতে প্রাচুর্য ও ধনৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে তুষ্ট করবার জন্য ব্রতের আয়োজন; এই লক্ষ্মীকেই দেখা যায় বিষ্ণুর অন্যতমা শক্তি-রূপে; এরই মূর্তি সুপ্রাচীন শিল্পে গজলক্ষ্মীরূপে বিবৃত হয়েছে; ভারহুতের বৌদ্ধস্তূপের পাথরে তৈরী রেলিংএ শ্রীমা দেবতারূপে যে

আমরা বুঝতুমও বেশি এবং মনুষ্য জাতির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হতুম যে অনুপ্রেরণা না থাকলে মানুষ জগতের ভূষণ না হ'য়ে দূষণ হ'য়ে উঠত।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, পূর্ব এবং পশ্চিম-দ্বীপপুঞ্জের রীতিনীতি এবং ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা বলা হ'য়েছে, তা অত্যন্ত আলগা ভাবেই হয়েছে। আমি সাক্ষাৎ ভাবে মাত্র পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে পরিচিত বলে শুধু তাদের সম্বন্ধেই আমার মত লিপিবদ্ধ করব এবং আমাদের মধ্যে তাদের বিষয়ে যে-সব অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত আছে তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করব। এ কথা আমায় স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, আমরা হিন্দুস্থানের লোকদের মূঢ় পৌত্তলিক ব'লে এত সহজেই কি ক'রে বিশ্বাস করলুম—যখন আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি, কি রাজনীতি অথবা কি ব্যবসায় উভয় ব্যাপারেই তারা আমাদের চাইতেও অনেক উচ্চশ্রেণীর জাতি।

বেদ এবং শাস্ত্রের (হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র) উল্লেখ করেই আমার এ কথা জানানো উচিত যে, মালাবার ও করমণ্ডল উপকূল অঞ্চলের হিন্দুরা এবং সিংহলের হিন্দুরাও প্রথম উল্লিখিত গ্রন্থটি মেনে চলেন। বঙ্গপ্রদেশ ও বাকি ভারতবর্ষের আর সমস্ত অর্থাৎ প্রায় গোটা উড়িষ্যা, বাংলা দেশ, বিহার (Bahar), বেনারস, অযোধ্যা (Oud), এলাহাবাদ (Eleabas), আগ্রা, দিল্লী এবং গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধু-নদের দু'ধারে যত দেশ আছে, তারা সবাই শাস্ত্র মেনে চলে।

এই দুটি গ্রন্থেই ধর্মনীতি ও উপাসনা-পদ্ধতির দুটি স্বতন্ত্র রীতির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রূপক এবং গল্পচ্ছলেও সেগুলি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন রাজা-রাজড়াদের কাহিনীও এতে আছে। এই বেদ এবং শাস্ত্রের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে দুই দলের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু এর মধ্যে বর্ণিত নাম, দেবতা ও উপাসনা-পদ্ধতির সাদৃশ্য দেখে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, এই দুটি ধর্মগ্রন্থই গোড়াতে একই ছিল। এবং যদি আমরা শাস্ত্রগ্রন্থের গভীর পবিত্রতা ও নির্মল রীতির সঙ্গে বেদগ্রন্থের অত্যদ্ভুত কাহিনী ও কালুষ্যের তুলনা করি তাহ'লে স্পষ্টই প্রতীত হবে যে, বেদগ্রন্থ শাস্ত্রগ্রন্থেরই অপভ্রংশ মাত্র।*

যাহোক, আমি এখন শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য পেশ করব। পঠনের রুচি খাদ্যের রুচির মতই বিভিন্ন। এক জনের কাছে যা সুস্বাদু, অন্য জনের কাছে তা বিস্বাদ। আমি তো এ পর্যন্ত জীবনে এমন একটি ভোজের আসরেও যাইনি যেখানে খাদ্য-তালিকার অভাব নিয়ে দুঃখবোধ না করেছি! অতএব যাতে আপনারা ঐ শ্রেণীর দুঃখ না পান, সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের তৃপ্তির জন্য পরবর্তী কয়েকটি পাতায় আট রকমের তালিকা পেশ করছি। যদি আপনাদের কারুর পরিপূর্ণ ভোজনের স্পৃহা নাও থাকে তা হলেও ক্ষুধার পরিমাপে যথাযোগ্য খাদ্যবস্তু রুচি মত বেছে নিতে পারবেন।

(১) প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে আছে—আওরঙ্গজেব থেকে মহম্মদ সা (Aurenge Zebe to Mahomet Shaw) পর্যন্ত হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্যাধিকারের সাধারণ ইতিহাস। আমার উদারচেতা বন্ধু মিষ্টার জেমস্ ফ্রেজার ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে কিছু-কিছু লিখেছেন। তাঁর যে বিষয়টি বিশেষ ভাবে লেখা উচিত ছিল (নাদির সাহেব আক্রমণ) সে বিষয়ে তিনি অজ্ঞতাবশত কিছু লেখেননি এবং যা লিখেছেন তা এত ভাসা-ভাসা ভাবে লিখেছেন যে, এই স্মরণীয় ও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে সেগুলি সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই হয় না। ঐ সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে পাটনায় এক বুদ্ধিমান্ আর্মেনিয়ান্ আমাকে দিয়েছিলেন। যে সময়ে ঐ সব ঘটনা ঘটেছিল সে সময়ে ইনি সম্রাটের অধীনের এক গুরুত্ববিশিষ্ট অসামরিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং আগ্রা ও দিল্লীতে ক্রমান্বয়ে বাস করতেন।

(২) বাংলার সুবেদারির অদল-বদল—জাফর খাঁর শাসনকাল থেকে সুরু ক'রে আলিবর্দী খাঁর সিংহাসন দখল পর্যন্ত—যে অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে সুবে বাংলার ও আলিবর্দীর ভাই হাজি হামেদের উন্নতি।*

---

* হলওয়েল সাহেবের যুক্তি দেখে পাঠক চমৎকৃত হবেন না। অনেক বৈদেশিকই ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে সমান যুক্তির অবতারণা করেছেন। —অনুবাদক

* আমার অধিকৃত বিষয়বস্তুর এই অংশটি নিয়ে ইতিপূর্বেই এক ভদ্রলোক তাঁর আত্মম্ভরিতাপূর্ণ বিবরণীতে কিছু আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা সহরে মুদ্রিত এবং এটির নাম হচ্ছে—"হিন্দুস্থানের শাসন সম্বন্ধে আলোচনা এবং ১৭৩১ থেকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ"—(Reflections on the Government of Indostan, and a short skech of the history of Bengall, from the year 1739, to 1756.) এই ক্ষুদ্র রচনাটি মুদ্রিত হবার প্রায় দেড় বছর পরে আমার হাতে পড়ে। এটি পাঠ করবার পর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম যে—গ্রন্থকারের এই "সংক্ষিপ্ত বিবরণ"—ইত্যাদি আমারি পূর্বোল্লিখিত হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, বিশেষ ক'রে তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৩ থেকে ৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইওরোপ যাত্রাকালে আমি নানা স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে এই পাণ্ডুলিপিগুলি প্রস্তুত করেছিলুম। ইংল্যাণ্ডে আমার স্বল্প অবস্থানকালের মধ্যেই এই বিষয়ে আমি আমার বন্ধু স্যার উইলিয়াম বেকার, মিষ্টার ম্যাবট, মিষ্টার আর ডেক, মিষ্টার ডেভিস এবং ডক্টর ক্যাম্পবেল প্রভৃতিকে জানিয়েছিলুম। মূল পাণ্ডুলিপিটি কলিকাতা বিজয়কালেই হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পরে আমি জানতে পারলুম যে, আমার অজ্ঞাতসারেই এক জন এই পাণ্ডুলিপির একটা নকল রেখেছিলেন—এই ভদ্রলোকটিকে আমি আমার পাণ্ডুলিপিটি পড়তে দিয়েছিলুম। এই নকল থেকেই আমি আরেকটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে অনুমতি পেয়েছিলুম। কিন্তু এই "Reflections" ইত্যাদির গ্রন্থকার কেমন ক'রে যে সেটি সংগ্রহ করলেন তা তিনিই জানেন। এই পাণ্ডুলিপি থেকে নকল ক'রে তিনি আমাকেই সম্মানিত করেছেন—কিন্তু কোথা থেকে তিনি এই তথ্য সংগ্রহ করলেন তা স্বীকার করলে তিনি নিজেকেও সম্মানিত করতে পারতেন। চৌর্যবিদ্যাকে মিথ্যে ঢাকবার জন্য তিনি যে এত বিফল চেষ্টা করেছেন, তাতে আমার পরিকল্পনাকে ভেঙে-চুরে খাটো ক'রে একাকার করে ফেলা হয়েছে মাত্র।

(৩) বঙ্গদেশের 'সংক্ষিপ্ত বিবরণ—প্রধান প্রধান নগর, তাদের গুরুত্ব ও এক শহর অন্য শহর থেকে এবং প্রত্যেকটি কলিকাতা থেকে কত দূরে অবস্থিত, রাজস্বের আনুমানিক আয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভদ্রলোকদিগের প্রতি রুচিকর ও প্রবৃত্তিজনক উপদেশ।

(৪) শাস্ত্রানুগামী হিন্দুদের ধর্মনীতি সমূহের মূল তাৎপর্যের আলোচনা।

(৫) এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(৬) হিন্দুদের সময়-নির্দ্ধারণ রীতি, জগতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা এবং প্রলয়ের কাল-নিরূপণ।

(৭) হিন্দুদের উপবাস ও উৎসবাদির সংখ্যা ও কারণ আলোচনা, দুর্গাপূজার (Drugah) মত বিরাট উৎসবের বর্ণনা—এই সঙ্গে অন্যান্য প্রধান দেবদেবীর উল্লেখ ও অন্যান্য গৌণ দেব-দেবীর নির্ঘণ্ট। যদি কোনো জাতির উপবাস ও উৎসবাদির তাৎপর্য স্পষ্ট বোঝা যায়, তাহ'লে তাদের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হ'তে বেশি সময় লাগে না, কেন না একটি অন্যটির প্রকৃত মানদণ্ড।

(৮) হিন্দুদের জন্মান্তর তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—যেটাকে অসঙ্গত ভাবে পাইথোগোরিয়ান বলা হ'য়ে থাকে, কারণ এ সম্বন্ধে যা লেখা হ'য়ে গেছে, তাতে পাইথোগোরাসের মতবাদ কেউ-ই ঠিকমত বোঝাতে পারেননি।

আমার লেখনী গ্রহণের প্রকৃত কারণ উল্লেখ ক'রে গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে মোটামুটি ভাবে উপস্থাপিত করলুম। আমি এখন এই বিষয়ের প্রাথমিক আলোচনা শেষ করছি। জনসাধারণ যদি এই পরিশ্রমের উপযুক্ত সমাদর করেন তাহ'লেই সে আশানুরূপ পুরস্কার পেয়েছে ব'লে মনে করবে। তাদের বশংবদ সেবক।

জে, জেড, হলওয়েল।

[ক্রমশঃ।

সেতুবন্ধ

শান্তিকুমার ঘোষ

চলে ময়ূরাক্ষী নদী দু'ধারের গ্রাম গেঁথে গেঁথে
বৈশাখে বৈরাগী রূপ বর্ষায় মেতে :
তীরে তীরে জনপদ, ভাঙা ঘাট, বাবুইয়ের বন,
শীর্ণচূড়া নীলকুঠি—অতীতের সাক্ষী পুরাতন :
সোনালি বালির বুকে ঘুরে ঘুরে নীল শিরা এঁকে
শতাব্দীর পদচিহ্ন দুই পাশে যায় রেখে রেখে।

বৈশাখে দু'পারে তার আদিগন্ত ধূধূ তট—ফেটে ওঠে মাটি,
মৃন্ময় অহল্যা মাঠ, শিলীভূত দুর্ব্বাঘাস,
কোনোখানে নেই শেষ রসের কণাটি;
ছড়িয়ে রূপোর জাল বালুকার ঘূর্ণী হাওয়া চলে যায় চর হতে চরে—
অদৃশ্য ভুখা দু' কারা সারি সারি শ্বাস ফেলে দিকে দিগন্তরে :
দূর শূন্যে চেয়ে চেয়ে কুটীরে কৃষাণ শুধু মেঘ দেখে গুণে যায় দিন
বন্ধ্যা জমি, ভাঙা হাল, রুগ্ন দেহ—অনশনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ।

সহসা আষাঢ় রাতে সে কি ঝড় দারুণ তুফান
হঠাৎ হাজার ঘোড়া ছুটে আসে বান :
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডঙ্কায় পড়ে জোর ঘা—
শেষের প্রলয় রাত্রি কী উদ্যত ধরো ধরো বুঝি এল ঘা!
ভাসিয়ে ধানের গোলা, খোড়ো ঘর, নবাঙ্কুর ক্ষেত
খল খল মৃত্যুস্রোত ক্ষিপ্র বেগে হানে কী সংকেত!
ভাঙনের পাড়ে পাড়ে রাত্রির ছায়ায়
মুখোমুখি নরনারী ব্যর্থ অসহায়।

ওরাই উপায় জানে—ছোটে দূর সমুদ্র-শিখর,
জোয়ারে জাঙাল ফেলে মরুকেও করে কী উর্ব্বর :
বাহুতে অমর বীর্য্য রক্তে কোন্ নদী বেগবান
মৃন্ময় অনেক শক্তি অকস্মাৎ জাগে বলীয়ান :
সম্মিলিত পদক্ষেপে জনতার কর্ম্ম-কলরবে
উচ্চকিত রোল ওঠে—"সেতুবন্ধ হবে :

আমরা বাঁধবো নদী এই বাহুবলে—
আমরা বসতি আনি বাঘের জঙ্গলে,
আমরা রুখবো নিজে কোটালের বান,—
আমরা পুতুল নই—মজুর কৃষাণ।"

এপারে ওপারে কাজ—গ্রামে গ্রামে নগরে বন্দরে
নির্ম্মাণের ঐকতান বাজে আজ হাতুড়ি-হাপরে :
কলের লাঙলে আর কোদালের ঘায়
উপত্যকা চরে চরে টিলায় টিলায়
স্রোতের প্রখর বেগে বিদ্যুৎ-মন্থনে
বাঁধ গাঁথে, ঘর বাঁধে, জীবনের নব বীজ বোনে।

কাজের সে তালে তালে গান ধরে মজুরাণী গুনগুন্ তরল কলিতে—
"আমরা দু'জনে এসেছি ভুবনে পারিব জীবনে মধু মধু গালিতে।"
সে সুর ছড়ায় মাঠে, গ্রামের নদীর ঘাটে,—দূর মোহানায়
পাহাড়ে সাঁওতালী নাচে, মধুর রাখালী গানে, হারমনিকায়।

কত খাল বাঁকা খালে ছল-ছল বয়ে যায় জল
ধান ক্ষেত তিসি ক্ষেতে তীরে তীরে ফলায় ফসল
দুই দুই তটে তটে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম
উত্তাপে হাওয়ায় ঘেরা পরিচ্ছন্ন কত গণ্ডগ্রাম

খামারে খামারে হাটে ঘরে ঘরে কারখানা কলে
বিজলীর দীপাবলী অবিরাম সে আলোয় 'শুভরাত্রি' বলে
মেলে সে যুবক বৃদ্ধ হাতে হাত সাড়াৎ পড়োশী
কুমারী যুবতী সতী জননী প্রেয়সী।

সেদিন পথিক বলে,—'সুন্দরা পৃথিবী
সবুজ ক্ষেতের শেষে নীলকান্ত নীবি,
সূর্য্যোদয়ে অভিষেক, গোধূলির বর্ণ-সমারোহ,
সোনা করে দিয়ে গেল জীবনের সকল সংগ্রহ।'

মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র রচিত

ম্যাকবেথ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত

৩য় দৃশ্য

(পূর্ব্বোক্ত স্থান, দরোয়ানের প্রবেশ, ভিতরে দুয়ার ঠেলার শব্দ)

দারোয়ান। দুয়োর ঠেলা বটে, ঠক্ ঠক্ ঠক! যমের দুয়োরে।
দুয়োরি আমি, দুয়োর খুলতে খুলতে বুড়িয়ে
গেলাম। (শব্দ) ঠক ঠক ঠক্। যমরাজার দিব্যি,
কে তুমি বাপ? ওঃ দু'না ফসলে উনো কড়ি,
তাই দিয়েছ গলায় দড়ি? এখন চাগার পো
সরাসরি নরকে এসে হাজির! বেশ সময়ে
এসেছ; বড় বছরের গামছা এনেছ ত? নইলে
এ রাজ্যির গরমে গলদঘর্ম হবে। (শব্দ)
ঠক্ ঠক্, চিত্তির গুপ্তের দিব্যি, তুমি আবার কে?
হঁ, আদালতের দু'মুখো সাক্ষী? এ-পক্ষেরও সাক্ষী,
ও-পক্ষেরও সাক্ষী; ঈশ্বরের নাম নিয়ে ত অনেক
সাক্ষী দিলে, তবু স্বর্গে যাওয়া ঘটল না।
বেশ ভাই সাফাই সাক্ষী, তুমিও এস। (শব্দ)
ফের ঠক্ ঠক্? ঠেল, ঠেল। কে? খলিফার
পো? চাপকান কাটতে ফতুয়া কেটে অনেক
কাটা কাপড় গেঁড়া দিয়েছ ধন। ইস্তিরীটা
এনেছ ত? নরককুণ্ডে তাতিয়ে নিয়ে খাসা
কাজ চলবে। (শব্দ) আবার ঠক্ ঠক্!
একটু জিরোবার সময় নেই। তুমি আবার
কে এলে? যাই বলি, ঠাঁইটা নরকের
চেয়ে ঠাণ্ডা। এ পাপ দরোয়ানী আর করব
না। ভেবেছিলাম যে সব ফড়িং বাবুরা ফুলের
মধু চুষতে চুষতে এই আগুনের কুণ্ডের দিকে
আগিয়ে আসেন, তাঁদের সবাইকে একে
একে ঢুকিয়ে নেব। (শব্দ) যাচ্ছি, যাচ্ছি,
প্রাপ্যটা যেন পাই।

(দুয়ার খুলিয়া দিল, ম্যাকডফ ও লেনক্সের প্রবেশ)

ম্যাকডফ। কাল রাত্রে শয়নে বিলম্ব হ'ল বুঝি,
তাই কি জাগিতে এত দেরী?

দরোয়ান। হুজুর যা বোলেছেন, কাল রাতে
নেশা-ভাং সেরে, ভোর হ'য়ে গেল শুতে।

ম্যাকডফ। উঠেছেন তোমার মনিব?

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

এই যে আসেন তিনি,
আমাদেরই শব্দে তাঁর ভেঙে গেছে ঘুম।

লেনক্স। সুপ্রভাত!

ম্যাকবেথ। সুপ্রভাত জানাই উভয়ে।

ম্যাকডফ। ভেঙেছে রাজার নিদ্রা?

ম্যাকবেথ। এখনো জাগেনি।

ম্যাকডফ। সকালে জাগাইতে তাঁরে মোর পরে দিলেন
আদেশ। সে সময় প্রায় গত হোল।

ম্যাকবেথ। চল আমি সাথে যাই।

ম্যাকডফ। যদিও এ শ্রম তব আনন্দমূলক,
কষ্ট হবে তবু।

ম্যাকবেথ। যে শ্রম আনন্দ আনে দুঃখ তা ভুলায়।
চল, এই দ্বার।

ম্যাকডফ। সাহস করিয়া তাঁরে হইবে ডাকিতে,
আমারি উপর সেই ভার। [প্রস্থান।

লেনক্স। সেথা হ'তে রাজা তবে আজই ফিরিবেন?

ম্যাকবেথ। তাই ত রয়েছে স্থির।

লেনক্স। ভারি উচ্ছৃঙ্খল রাত্রি গেল,
আমরা ছিলাম যেথা ধোঁয়াঘর ঝড়ে গেল উড়ে,
বাতাসে জাগিল আর্তনাদ, লোকে বলে
মৃত্যুরই চিৎকার বীভৎস ভাষায় সবে দিল জানাইয়া
দুর্দিন-সঞ্জাত যত ধ্বংসের আভাষ,
বিশৃঙ্খল যত অঘটন, চোরা পাখী
চেঁচাইল সারা রাত ধরি; কেহ বা বলিল
ধরিত্রী কাঁপিছে ওই জ্বরের বেঘোরে।

ম্যাকবেথ। রাত্রিটা দুর্যোগই ছিল।

লেনক্স। মোর ক্ষুদ্র স্মৃতিপটে মিলে না কো জুড়ি।

(ম্যাকডফের পুনঃপ্রবেশ)

ম্যাকডফ। ওরে সর্বনাশ, সর্বনাশ, সর্বনাশ!
রসনা পারে না তোর নাম উচ্চারিতে,
হৃদয় ধরিতে নারে কল্পনায় তোরে।

ম্যাকবেথ ও লেনক্স। কী হ'য়েছে?

ম্যাকডফ। ধ্বংস রেখে গেল তার কীর্তি ঘৃণ্যতম;
পাপ-কলুষিত হত্যা পশি রাজদেহে
অভিষেকপূত সেই মন্দির হইতে
চুরি করি নিয়ে গেল দেবতুল্য প্রাণ।

ম্যাকবেথ। কি বলিছ, প্রাণ?

লেনক্স। আমাদের রাজা?

ম্যাকডফ। যাও কক্ষমাঝে,
অচল পাষাণ হও সে দৃশ্য দেখিয়া,
আমারে কহিতে কথা ব'ল না কো আর,
তোমরা দেখিয়া এস, যা বলার বল।

[ম্যাকবেথ ও লেনক্সের প্রস্থান।

জাগো, জাগো! বাজাও পাগলা-ঘণ্টি; হত্যা! রাজদ্রোহ!
জাগো ব্যাংকো, ডোনালবেন, জাগো ম্যালকম!
ছুঁড়ে ফেল্ সুখনিদ্রা মৃত্যুর প্রতীক,
দেখ এসে স্বয়ং মৃত্যুরে! ওঠ, ওঠ,
দেখে যাও প্রলয়ের ছবি, থাক যদি
মরণের তলে, কবর খুঁড়িয়া
উঠে এস, ছুটে এস প্রেতের মতন, দেখিতে
সে দৃশ্য ভয়ংকর! বাজাও বাজাও ঘণ্টা।

(ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল)

(লেডি ম্যাকবেথের প্রবেশ)

লেডি ম্যাক্। ব্যাপার কি? এমন বিকট তূর্যরবে
কেন এ আহ্বান জাগাতে নিদ্রিত পুরী।
বল বল।

ম্যাকডফ। দেবি,
সে কথা কহিতে নারি নারীর শ্রবণে,
তোমারে কহিলে হবে হত্যারই পাতক।

(ব্যাংকোর প্রবেশ)

ব্যাংকো, ভাই ব্যাংকো,
আমাদের রাজারে কোরেছে হত্যা।

লেডি ম্যাক্। হায় হায় কি বলিছ, আমাদেরি গৃহে?

ব্যাংকো। সর্বত্র হইত ইহা সমানই নিষ্ঠুর।
হাতে ধরি ভাই ম্যাকডফ, বল বল
মিথ্যা বলিয়াছ।

(ম্যাকবেথ ও লেনক্সের পুনঃপ্রবেশ)

ম্যাকবেথ। কিছু পূর্বে লভিলে মরণ
ভাবিতাম যাপিয়াছি সার্থক জীবন,
এখন এ বেঁচে থাকা, কোন অর্থ নাই।
সব ছেলেখেলা, মরিয়াছে খ্যাতি ও সম্ভ্রম
কৃপাল জীবনভাণ্ডে স্বচ্ছ সুধারস,
প'ড়ে আছে স্বাদহীন পঙ্ক-অবশেষ।

(ম্যালকম ও ডোনালবেনের প্রবেশ)

ডোনা। কোথায় কি হ'ল দুর্ঘটনা?

ম্যাকবেথ। তোমারি ঘটিল আর তুমিই জান না।
তব জীবনের উৎস মূল প্রস্রবণ
গিয়াছে থামিয়া, রুদ্ধ হ'ল গঙ্গোত্রীর ধারা।

ম্যাকডফ। রাজারে ক'রেছে হত্যা, তোমার পিতারে।

ম্যালকম। কে ক'রেছে?

লেনক্স। মনে হয় কক্ষের রক্ষীরা।
মুখে হাতে রক্ত মাখামাখি, উপাধানে
প'ড়ে আছে রক্তমাখা ছোরা। অর্থহীন
বিস্ফারিত চক্ষে উন্মাদ চাহনি। অমন
রক্ষক হস্তে দিতে নাই প্রাণরক্ষা ভার।

ম্যাকবেথ। তবু মোর হয় অনুতাপ,
ক্রোধবশে লইলাম তাহাদের প্রাণ।

ম্যাকডফ। কেন তা করিলে?

ম্যাকবেথ। একই কালে হ'তে পারে, হতবুদ্ধি, বুদ্ধিমান,
ক্রোধোন্মত্ত, বিবেচক, রাজভক্ত, নির্বিকার
সে লোক কোথায়? কোথাও পাবে না তারে।
হঠকারী দুর্নিবার রাজপ্রীতি মোর
না মানিল সুবুদ্ধির বাধা।
এখানে পড়িয়া ডানকান,—
রজত-ধবল অঙ্গে স্বর্ণবর্ণ শোণিত লাঞ্ছনা,
উন্মুক্ত ক্ষতের রাঙা দ্বারে প্রবেশ ক'রেছে মৃত্যু
রহি ক্ষয়-ক্ষতি জীবনেরে করি পরাজিত;
ওখানে র'য়েছে হত্যাকারী,—
দুষ্কর্মের রাঙা রক্তে রাঙিয়া শরীর,
পাশে প'ড়ে রক্তমাখা বর্বর ছুরিকা।
বুকে যার আছে প্রীতি, হৃদয়ে সাহস আছে
সে প্রীতিরে করিতে প্রকাশ,
সে কেমনে নিবারে আপনা?

লেডি ম্যাক্। ওগো, হেথা হ'তে নিয়ে যাও মোরে!

ম্যাকডফ। দেখ, দেখ মহিলাকে।

ম্যালকম। (ডোনালবেনের প্রতি)
আমরাই রহিব নীরব? বাকি সবে
করিবে এ আলোচনা আমাদের হ'য়ে?

ডোনাল্। (জনান্তিকে) কি কথা কহিব মোরা হেথা?
বিপদ লুকায়ে আছে আঁধার বিবরে,
না জানি সে কোন্ পথে সহসা করিবে আক্রমণ;
চল মোরা করি পলায়ন;
এখনও মোদের অশ্রু হয়নি উচ্ছ্বস।

ম্যালকম। মোদের মহান্ দুঃখ এখনও নিশ্চল।

ব্যাংকো। দেখ, দেখ মহিলারে।

[লেডি ম্যাকবেথকে লইয়া যাওয়া হইল]

সবাই কাঁপিয়া মরি অনাবৃত দেহে,
চল, শীতবস্ত্রে আবরি শরীর
পুনঃ মোরা হব একত্রিত।
এই মহা রক্তপাত, তথ্য এর হইবে নির্ণিতে।
হৃদয় বিহ্বল সব আতঙ্কে দ্বিধায়।
ঈশ্বরচরণচ্ছায়ে দাঁড়াইনু আমি,
সেথা হ'তে উন্মোচিব
গুপ্ত জিঘাংসার যত কাপট্য-কৌশল।

ম্যাকডফ। আমারও প্রতিজ্ঞা তাই।

সকলে। আমরাও তাই বলি।

ম্যাকবেথ। চল ত্বরা, দেহ ঢাকি পৌরুষ সজ্জায়—
সভাকক্ষে হই সম্মিলিত।

সকলে। বেশ কথা।

[ম্যালকম ও ডোনালবেন ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

ম্যালকম্। তুমি কি করিবে?
মোদের ওদের সাথে না যাওয়াই ভাল।
যে দুঃখ অন্তরে নাই,
সহজ প্রকাশ তার জানে মিথ্যাচারী।
আমিও ইংলণ্ডে যাব।

ডোনাল। আমি যাই আয়র্লণ্ডে।
উভয়ের ভাগ্য যদি চলে ভিন্ন পথে
বিপদের সম্ভাবনা কম।
এখানে গোপন ছুরি মুখের হাসিতে।
রক্তের সম্পর্ক যেথা যতটা নিকট
রক্তপাত তত সন্নিকটে।

ম্যালকম। হত্যা যে গোপন শর ক'রেছে নিক্ষেপ,
এখনও তা হয়নি নিঃশেষ, চল, মোরা
স'রে যাই তার লক্ষ্য হ'তে। চল,
দ্রুত অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ;
বিদায়ের বিড়ম্বনা বৃথা।
সে তস্করে নিন্দা নাহি করে কোন জন
সংগোপনে যে এড়ায় নিষ্ঠুর মরণ।

[প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য

(ম্যাকবেথের দুর্গপ্রাসাদের বহির্ভাগ। রস্ ও একজন বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। বেশ মনে প'ড়ে মোর সাড়ে তিন কুড়ি
বছরের কথা। এর মাঝে দেখিয়াছি
কত নিদারুণ দুঃসময়, অদ্ভুত ঘটনা বহু;
কিন্তু তারা তুচ্ছ সব এ রাতের দুর্যোগের কাছে।
রস। তাই বটে, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে হেরি মানুষের
এই রক্ত-অভিনয়, দেবতা ভ্রূকুটি করে।
ঘড়িতে ত দিন, কিন্তু আঁধার রজনী
চাপিয়া রেখেছে যেন চির-চলমান
নভোচর জ্যোতির্ময় দীপ।
রজনী কি হ'ল জয়ী? লজ্জালীন দিবা,
অন্ধকারে আবরিল ধরিত্রীর মুখ?
তাই সেথা নাই বুঝি আলোক-চুম্বন?
বৃদ্ধ। ভারি অঘটন। যে কাজটা ঘটে গেল
ঠিক তারি মত। গেল মঙ্গলবারে
শিকরেল পাখী এক ঘুরে ঘুরে উড়ে চলে
অনেক উঁচুতে, কোথা হ'তে এল এক পেঁচা,
ছোঁ মেরে বধিল তারে ইঁদুরের মত!
রস্। তা হ'তে অদ্ভুত কথা;—
ডান্‌কানের অশ্বগুলি, সুশ্রী তেজীয়ান,
সহসা খেপিয়া গিয়া দ্বার ভেঙে
বাহিরিল ছুটে; রুধিতে নারিল কেহ,
সব মানুষের সাথে যেন তারা মেতেছে লড়ায়ে।
বৃদ্ধ। শুনেছি ত ঘোড়াগুলো এ উহারে
ফেলিল গিলিয়া।

রস্। ঠিকই শুনিয়াছ; স্বচক্ষে দেখিনু আমি
অবাক হইয়া। এই যে
এসেছ ম্যাকডফ!

(ম্যাকডফের প্রবেশ)

দুনিয়ার খবরটা কি?
ম্যাক্। কেন, জান না কিছুই?
রস্। কে করিল রাজ-রক্তপাত, জানা গেল কিছু?
ম্যাক্। যাদের বধিল ম্যাকবেথ, তারা।
রস্। হায় হায়, কি উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের?
ম্যাক্। উৎকোচে হইল বশীভূত।
ম্যালকম ডোনালবেন রাজপুত্রদ্বয়
দু'জনে ক'রেছে পলায়ন,
সন্দেহ প'ড়েছে তাই তাদের উপরে।
রস্। এও বেশ স্বাভাবিক নয়। বেহিসাবী
নির্বোধ দুরাশা জীবনের মূল কেটে
ভরাল উদর! তাহ'লে ত দেখি
রাজত্ব অর্শায় ম্যাকবেথে।
ম্যাক্। তিনিই হ'লেন মনোনীত; এতক্ষণ
গিয়েছেন স্কোন্ নগরীতে অভিষেক তরে।
রস্। ডানকানের শবদেহ কোথা?
ম্যাক্। তাঁরি পূর্বপুরুষের পূত অস্থিচয়
যেথা সমাহিত সেই কম্‌কিল দ্বীপে।
রস্। যাবে তুমি স্কোনে?
ম্যাক্। না ভাই, ফাইপে ফিরিয়া যাব আমি।
রস্। আমায় স্কোনেই যেতে হয়।
ম্যাক্। কার্য্য যেন সুসম্পন্ন হয় সেথা।
পুরানো পোষাক ছিল ঢিলে,
কি জানি কি ঘটে ভাগ্যে নূতন পোষাকে।
আসি তবে।
রস্। আসি তবে পিতা।
বৃদ্ধ। হউক কল্যাণ;
শত্রুরে যে মিত্র করে মন্দে করে ভালো,
ভগবান্, তার শিরে আশীর্বাদ ঢালো।

[প্রস্থান।

[ক্রমশঃ।

স্বপ্ন

সীতা সেন

তোমার নয়নে আমার ছবিটি
দেখেছি সকাল-সাঁঝে
আজ মনে হয় সে বুঝি স্বপন
গভীর ঘুমের মাঝে।

সে মধু স্বপন দেখিতে আবার
মনে জাগে বড় সাধ
সব সাধ আজ ঘুচে গেছে হায়
এ কি ঘোর পরমাদ।

ভারতের স্থাপত্য ও শিল্প-সাধনা

নিশীথ রায়

ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্প থেকে ভারতীয় কৃষ্টি এবং সাধনা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। ভারতীয় শিল্প-প্রতিভা যে-সব উপাদান আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেছে, মন্দিরগুলি তার মধ্যে প্রধানতম বলা যেতে পারে। এ-সব মন্দির শুধু ধর্মজীবনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা নয়, সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবেও মন্দিরগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। কোন একটি মানুষের বিশেষ কল্পনা এ-সব মন্দিরে রূপ পরিগ্রহ করেনি। এদের মধ্যে রয়েছে যে-যুগে এই সব মন্দির নির্মিত হয়েছিল সেই যুগের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রকাশ। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করাই হয়তো বা মন্দির-নির্মাতাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় ঘটনা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার ভয়-ভাবনা এ-সবকেও মন্দির-শিল্পীরা অস্বীকার করতে পারেননি। মন্দির গাত্রে আঁকা অসংখ্য ছবি ও মূর্ত্তির মধ্যে ছড়ানো রয়েছে এ-সবের পরিচয়। সুতরাং যাঁরা ভারতীয় সমাজ-জীবনের পরিচয় জানতে ইচ্ছুক, আর যাঁরা ধর্মপ্রাণ পুণ্যার্থী, আর শিল্পরসিক—এঁদের সবার কাছেই এ মন্দিরগুলি অমূল্য সম্পদ।

মন্দিরের শিল্প-সম্পদের দিক থেকে উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারত বেশী সৌভাগ্যশালী। উত্তর-ভারতের উপর দিয়েই বৈদেশিক আক্রমণের দাপট চলেছে বেশী। আর তার ফলেই আর্য্যাবর্ত্তের অনেক মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ-ভারতেও বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে; কিন্তু সংখ্যা ও ব্যাপকতার দিক থেকে কম, সুতরাং ধ্বংসের পরিমাণও কম, দাক্ষিণাত্যের বহু অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার বাহন এই সব মন্দির এখনও অবিকৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, মামল্লপুরম, ইলোরা, ত্রিচিনপল্লী, চিদাম্বরম্‌, কাঞ্চীপুরম—মন্দিরবহুল এই সব স্থান ভারতীয় শিল্প-সাধনার পীঠভূমি।

আজকের আলোচনার বিষয় মাদুরার মন্দির। কিন্তু তার আগে দ্রাবিড় শিল্পরীতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা জানা দরকার। প্রথমতঃ, এই শিল্পরীতি অনুসারে যে-সব মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল তাদের বিশালতা ও বিস্তার বিস্ময়কর। শ্রীরঙ্গম, মাদুরা এবং রামেশ্বরের মন্দির তার প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি মন্দির সুউচ্চ এবং সুবিশাল আবেষ্টনী বা প্রাকার দিয়ে সুরক্ষিত। প্রাকারগুলির সংখ্যাও অনেক। বৃত্তাকার বা চতুষ্কোণ এই সব প্রাচীর একটির অভ্যন্তরে আর একটি এই ভাবে মূল মন্দিরকে বেষ্টন করে রয়েছে। তৃতীয়তঃ, মূল মন্দিরের ঠিক উপরে শিখর বা চূড়া। তাতে পর-পর সাজানো অনেকগুলো স্তর। প্রত্যেকটি স্তর নানা রকমের সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত। মন্দিরের প্রাঙ্গণে অসংখ্য পাথরে তৈরী স্তম্ভ ও অলিন্দ। স্তম্ভগাত্রেও কারুকার্য্যের অভাব নেই; বরং প্রাচুর্য্যই

মাদুরার যে-ক'টি মন্দির আছে তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য মীনাক্ষী মন্দির। জনশ্রুতি এই যে, মন্দিরটি খৃষ্টজন্মের দু'হাজার বছর আগে নির্ম্মিত হয়েছিল। আদি মন্দিরটি হয়তো বা খুবই প্রাচীন। কিন্তু সমগ্র মন্দিরটি একসঙ্গে তৈরী হয়নি। বিভিন্ন যুগে এই মন্দিরের পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন হয়েছে। অনেক কাল ধরে এ কাজ চলেছে। মন্দির সম্পর্কে আরও জনশ্রুতি এই যে, যে-স্থানে এখন মন্দিরটি রয়েছে সে জায়গায় ছিল নিবিড় কদম্ব বন। এই কদম্ব বনেই ছিল দেবীর অধিষ্ঠান। পরে দেবীর নির্দ্দেশক্রমে স্থানীয় নরপতি তাঁকে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মূল মন্দিরটি মীনাক্ষী দেবীর। কিন্তু তারই সংলগ্ন আরো একটি মন্দির রয়েছে। এটি হলো শিবমন্দির; সুন্দরেশ্বর বা ভৈরবের মূর্ত্তি এতে প্রতিষ্ঠিত। মীনাক্ষী মূর্ত্তিটি কালো পাথরে তৈরী। দেবীর দু'টি হাত; একটিতে নীলপদ্ম, অপরটি নিম্নে প্রসারিত।

সমগ্র মন্দির-এলাকাটি বিশাল—দৈর্ঘ্যে ৮৫০ এবং প্রস্থে ৭২৫ ফুট। মন্দিরের চারি পাশে উচ্চ প্রাচীরবিশিষ্ট চারিটি গোপুরম্‌; উচ্চতায় ১৫০ ফুট। মধ্যভাগে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে মূল মন্দির। মন্দিরটি স্বল্পায়তন। চারি দিকে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা মূল মন্দিরটি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। চারি দিকের শান্ত গম্ভীর বিশালতাই দৃষ্টিকে অভিভূত করে রাখে। মন্দির-স্তম্ভ, প্রাচীর এবং মূলগাত্রে বিচিত্র কারুকার্য্য এবং অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি। মন্দির-প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব দিকের গোপুরম্‌ দিয়ে মন্দির প্রবেশের রাস্তা। ২০০ ফুট লম্বা আর ১০০ ফুট চওড়া এই রাস্তার পরিবেশটি অত্যন্ত মনোরম। এই রাস্তার পরে ছোট আর একটি গোপুরম্‌—তার পরেই প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণেও চারিটি প্রবেশ-দ্বার—প্রাঙ্গণের প্রায় সবটাই ছাদ দিয়ে ঢাকা। প্রাঙ্গণের ভিতরে প্রবেশ করে আরও একটু অগ্রসর হলে প্রাচীর-ঘেরা ক্ষুদ্রতর আয়তনের আরও একটি প্রাঙ্গণ—এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলেই মূল মন্দির। মন্দিরের তিনটি ভাগ—বিমান অর্থাৎ দর্শনার্থীদের দাঁড়াইবার জায়গা, অলিন্দ এবং গর্ভগৃহ। এই গর্ভগৃহের উপরেই প্রকাণ্ড উঁচু চূড়া। মন্দির-এলাকায় দেব-দেবীর যে-সব চিত্র বা মূর্ত্তি রয়েছে তাদের বেশীর ভাগই শিবলীলা বিষয়ক। অতো প্রাচীন কালে আঁকা ছবি; কিন্তু রঙের উজ্জ্বল্য একটুও কমেনি। নটরাজ শিবের বিভিন্ন ভঙ্গী শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভায় চিত্রে এবং পাথরের মূর্ত্তিতে নিখুঁত ভাবে ধরা পড়েছে। নৃত্যপরায়ণ শিব ও কালীর যে সব বিভিন্ন মূর্ত্তি এখানে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অমূল্য সম্পদ। পুরাণে, তন্ত্রে ও শিল্পশাস্ত্রে যে-সব মূর্ত্তির

দক্ষিণ-ভারতে একটি মন্দির

উল্লেখ বা বর্ণনা পাওয়া যায়, তাদের অনেকগুলিই এই মাদুরা মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি-সম্পদের দিক দিয়ে মাদুরার মন্দির ভারতীয় মন্দির সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারে। শিল্পতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এবং সংস্কৃতির দিক থেকে এ-সব মূর্ত্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশী।

মাদুরার মন্দির সম্পর্কে একটা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, দ্রাবিড় শিল্পরীতি যে-যুগে পূর্ণ পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল, এ মন্দির সেই যুগে নির্ম্মিত হয়েছিল। সুতরাং এর গঠন-কৌশলে পূর্ণাঙ্গ শিল্পরীতির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। পাণ্ড্যরাজাদের আমলে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে শিল্প-পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তারই পরিবর্দ্ধিত এবং উন্নততর সংস্করণ ভিত্তি করে মাদুরার মন্দির-শিল্প গড়ে উঠেছিল। এই নীতি অনুসরণ করে প্রাচীন কালে নির্ম্মিত বহু মন্দিরের সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। স্বল্পায়তন এবং অনাড়ম্বর বহু মন্দির এই ভাবে সংস্কারের ফলে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুবৃহৎ মন্দিরে রূপান্তর লাভ করেছিল। মাদুরার মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বর মন্দির এরূপ সংস্কারের দৃষ্টান্ত। রাজা তিরুমল নায়কের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মন্দিরের সংস্কার হয়েছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক-জীবনে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, মন্দির-সংস্কারের মূলে হয়তো-বা তার খানিকটা প্রভাব ছিল। বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতা মাদুরাকে কেন্দ্র করে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেছিল। হিন্দুধর্ম্ম ও কৃষ্টি সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে মাদুরার রাজারা মন্দির-সংস্কারের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, এ সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। মূল মন্দিরকে ঘিরে তার চার পাশে গড়ে উঠল চত্বর ; তার পর উঁচু পাঁচিল—পাচিল-ঘেরা বিরাট প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে মূল মন্দির ছাড়া অসংখ্য স্তম্ভ, জলাধার, ছোট-বড় মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হলো। মীনাক্ষী মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থিত সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নায়ক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথের মন্ত্রী আর্য্য নায়ক মুদালী এই মণ্ডপটি নির্ম্মাণ করেছিলেন। হাজারটি স্তম্ভ নিয়ে এ মণ্ডপ গঠিত। এই সব স্তম্ভের গঠন-কৌশল অপূর্ব্ব। পাথর দিয়ে সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি তৈরী করে স্তম্ভ বসানো হয়েছে। সুন্দরেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ-পথে স্বামী সিঙ্গথানম্-এর যে স্তম্ভমূর্ত্তি রয়েছে, তার গঠন-পদ্ধতি শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বাইরের প্রাচীরের অনতিদূরে রাজা তিরুমল প্রতিষ্ঠিত বসন্ত-মণ্ডপ। এটি সুন্দরেশ্বরের গ্রীষ্মকালীন আবাস। ১৬২৬ থেকে ১৬৩৩ সালের মধ্যে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল। এতে ৩৩৩ ফুট লম্বা এবং ১০৫ ফুট চওড়া একটি হল-ঘর রয়েছে। এতেও অনেক সুন্দর, চিত্র-বিচিত্রিত স্তম্ভ রয়েছে। হিন্দু দেব-দেবীর বহু মূর্ত্তি অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে এতে খোদাই করা হয়েছে। তিরুমলের রাজপ্রাসাদের শিল্প-সৌন্দর্য্যও অনুপম।

সব শেষে মাদুরার মন্দির-পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমগ্র মন্দির-পরিকল্পনা দেখলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি দুর্গের পরিকল্পনায় গঠিত হয়েছিল। হয়তো বা উত্তর-ভারতের অভিজ্ঞতা থেকেই এ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। আর দক্ষিণ-ভারতে চতুর্দ্দশ শতকের মুসলমান অভিযানের অভিজ্ঞতাও কম তিক্ত নয়। দু'শো বছরেও তার স্মৃতি ম্লান হয়নি। তার পরিচয় পাওয়া যায় মন্দির-গাত্রে যে-সব চিত্র রয়েছে তার মধ্যে। একটি যুদ্ধের চিত্র বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুধ্যমান এক পক্ষে যে-সব সৈনিক তাদের আকৃতি ও পোষাক মুসলমানী। ষোড়শ শতাব্দীতে মন্দির-সংস্কার কালে মন্দির-নির্ম্মাতারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী গোপুরমগুলি বন্ধ করে দিলে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। মন্দির থেকে নির্গমনও কঠিন। মূল মন্দিরের চারি দিকে যে পাঁচিল-ঘেরা প্রাঙ্গণ রয়েছে তাতেও বহু লোক নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিতে পারে। এ-সব দেখে মনে হয় যে, মন্দিরের নির্ম্মাতারা রাজনৈতিক বা সামরিক আকস্মিক কোনও বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনার প্রতি উদাসীন ছিলেন না।

কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রথম জন্মোৎসবে বাঈ নাচ

Nautch in eelebration of the Birth of a child.—Last night a series of Nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko. in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assemblage of native gentlemen and professors of Sanscrit present on the occasion; the former were highly gratified with the musical performances of the nautch girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere Shawls, etc.

—ক্যালকাটা কুরীয়ার। (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

চিত্রিতা দেবী

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায়
সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা
অধ্যাভরত। ১

হে সবিতা,
আমার মন এবং বুদ্ধি
যুক্ত কর তাঁর সঙ্গে।
লক্ষ্য করে দেখ,
অগ্নির জ্যোতি—আর ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ
(তাকিয়ে দেখ, জগৎকে
আলো দিচ্ছে, ব্যক্ত করছে এরাই।
তবু হে সবিতা,
পূর্ণ কর মনস্কাম।
বাইরের দিকে নিরুদ্ধ কর
তাদের শক্তি)
আর সেই জ্যোতি ভরে দাও,
এই শ্রেষ্ঠ পার্থিব আধারে,
আমার এই দেহে। ১

যুক্তেন মনসা বয়ং
দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা। ২

হে সবিতা,
তোমার প্রসাদ আমরা পেয়েছি,
পরমানন্দলাভের জন্যে,
এখন তাই সমস্ত শক্তি নিয়ে,
বসেছি ধ্যানে। ২

যুক্ত্বায় মনসা দেবান
সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ
সবিতা প্রসুবাতি তান্। ৩

জ্যোতিস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে
যারা উদ্ভাসিত করতে পারে চিত্তে,
সেই ইন্দ্রিয়েরা চলেছে,
সুখস্বর্গের সন্ধানে।—
হে সবিতা, দয়া কর তাদের প্রতি,
বিষয়বাসনা হতে মুক্ত কর তাদের,
—যুক্ত কর পরমাত্মার সঙ্গে। ৩

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ।৪

সমস্ত করণ এবং মন,
যাঁরা যুক্ত করেছেন ব্রহ্মের সঙ্গে,
তাঁরা যেন এমনি করেই ডাকেন তাঁকে,
করেন সূর্য,স্তুতি,
কারণ তিনিই বহন করেন,
তিনিই হোতা
অদ্বিতীয় তিনি সর্বসাক্ষী।৪

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি-
র্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা,
আ যে ধামানি দিব্যাণি তস্থুঃ।৫

ওগো ইন্দ্রিয়প্রকাশ দেবতা,
তোমাদের আদি কারণ, সেই পরমব্রহ্মে,
যুক্ত করব আমার চিত্ত।
তাই ধ্যানে বসেছি আজ।
সূর্য্যপথে উত্থিত এই বাণী,
ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে—
ওগো দিব্যধামবাসী, অমৃতের পুত্র,
শোন তোমরা সকলে—।৫

অগ্নের্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ।৬

হে সবিতা, তব অনুমতি বিনা,
যে রয় কর্মে লিপ্ত,
কর্মই যত বন্ধন তার আসক্ত তার চিত্ত।
যেথায় অগ্নি মন্থিত, আর
বায়ুর যেথায় আহুতি,
পিষ্ট সোমের রসউচ্ছ্বাসে,
যেথায় যজ্ঞ মূর্ত্ত,
সেথায় কেবল ঘুরে মরে সে যে,
কর্মে ও ভোগে বদ্ধ।৬

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে
পূর্ত্তমক্ষিপৎ। ৭

কাজ কর তুমি সূর্য্য আদেশে,
মন ফেলে রেখো ব্রহ্মে,
তবেই কর্ম বয়ে লয়ে যাবে,
ডুবাবে না মোহপঙ্কে।৭

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮

কণ্ঠ ও শির বক্ষেরে তব,
কর স্থির উন্নত,
মনচেষ্টায় ইন্দ্রিয় কর,
হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট,
ব্রহ্মভেলায় পার হয়ে যাও
সংসারভয়স্রোত ॥ ৮ *

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং,
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্ ।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী,
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪

ধূলিবিলিপ্ত মলিন স্বর্ণ
অগ্নিশোধনে যেমন
দীপ্তি পায়,
স্বরূপ হেরিলে মানব আত্মা,
তেমনি শুদ্ধ, কৃতকৃতার্থ
শোকবিমুক্ত কায় ॥ ১৪

---

* (১—১৩) এই পাঁচটি শ্লোকে যোগের নিয়মাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যোগী কেমন করে পঞ্চপ্রাণকে সংযত করবেন, কেমন করে শ্বাসত্যাগ করবেন, কেমন করে ইন্দ্রিয়দ্বার হতে উপরত মনকে একাগ্র ধ্যানে প্রযুক্ত করবেন, (৯) কেমন পবিত্র নির্জন সমতল গুহাদি জাতীয় গোপন স্থানে বসে যোগ অভ্যাস করবেন, (১০) এই সব বর্ণনা। যোগসাধন কালে, তুষার ধূম্র, সূর্য্য, খদ্যোৎ, ইত্যাদি নানা রূপের অভিজ্ঞতা লাভ করে যোগী। (১১) পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ প্রকাশ হলে যোগীদেহে বিশুদ্ধ অগ্নি প্রদীপ্ত হয়—শরীরের সারভূত, তেজোরূপ, অঙ্গানাং রসঃ যে অগ্নি, সেই। আর সেই অগ্নিশুদ্ধ দেহ, জরামৃত্যুর দ্বারা বিকৃত হয় না (১২)। যোগসিদ্ধির পূর্বেই যোগীদেহে নানা পবিত্র চিহ্ন দেখা দেয় (১৩)—

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৫

আত্মগভীরে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্বলিছে দীপের মত,
যে জন দেখেছে, অজ, অবিকার,
বিশুদ্ধ, তার আলো,
মুক্ত সে জন অবিদ্যাঘেরা, বিচিত্র এই,
বন্ধন-পাশ হ'তে ॥ ১৫

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥ ১৬

সবদিকব্যাপী, সবার পূর্বে,
যে দেব হয়েছে জাত,
বিশ্বগর্ভে, আজো সে অন্তরীণ,
মানবশিশুর জন্মে, আজিও, তাঁহারই
নবীন জন্ম।
অনাগত কালে, তাঁহারই জন্ম,
হবে নানা রূপে রূপে,
সকলের মুখে, (তাই দেখা যায়)
তাঁহারি মুখের (আলো)।
সেই দেবতাই প্রতি মানুষের চিত্ত বাহির,
ব্যাপিয়া রহেন নিত্য ॥ ১৬

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু,
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭

আগুনে ও জলে, যে দেব বিরাজ করে,
বিশ্বভুবনে যে দেব সম্প্রবিষ্ট,
ওষধিতে আর বনস্পতিতে,
যে দেব রয়েছে নিত্য।
তাঁহারে নমস্কার ॥ ১৭
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক-রচয়িতার একটি উপদেশ

"তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না ; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ, বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি-গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলে স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন ২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নয়।"

—রামনারায়ণ তর্করত্ন।

(হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে
১৮৫৩ অব্দে প্রদত্ত প্রকাশ্য বক্তৃতা থেকে)

সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

রামমোহন ও রাধামোহন

আমরা অবগত হয়েছি যে, রামমোহন রায় এই মাত্র মাণ্ডুক্য উপনিষদের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থ মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি আছে তা দেশের লোকের হাতে তুলে দেবে। এই যুক্তিগুলি ব্রাহ্মণরা খণ্ডন করবার মিথ্যা চেষ্টা করবে। ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা সহ বেদান্ত সম্পাদনার কাজেও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে; সম্ভবতঃ রামমোহন তা মার্চ মাসের মধ্যেই প্রকাশ করবেন।

ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করবার জন্য এই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, তা বিশেষ প্রশংসার কাজ। যদিও তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টার তুলনায় সাফল্য আসবে ধীর-গতিতে, তথাপি আমাদের বিশ্বাস যে শীঘ্রই তিনি তাঁর কার্যের মঙ্গলময় প্রভাব অনুভব করতে পারবেন। এই প্রেসিডেন্সির অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আজকাল সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন যে, রামমোহনের বক্তব্যের পশ্চাতে যুক্তি আছে এবং হিন্দুদের প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থাদিতেও তাঁর মতবাদের সমর্থন পাওয়া যাবে। রামমোহন কর্তৃক অনূদিত সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে যে মত প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শিক্ষিত ব্যক্তিরা তার প্রতি গোপনে আস্থাশীল। কিন্তু অভ্যাস ও সংস্কারের এমনই প্রভাব যে, অন্তরের বিশ্বাসকে বাইরে প্রকাশ করবার শক্তি নেই। জাতিচ্যুত হবার ভয়ে প্রচলিত ধর্মের দাসত্ব হয়তো আরো কিছুকাল চলবে এবং ধর্মের ক্ষেত্রে নববিধান প্রবর্তনকেও বিলম্বিত করবে।

বিত্তশালী এবং বুদ্ধিমান হিন্দুদের যদি বোঝানো যায় যে অসংখ্য মূর্তিপূজা পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থের বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং তাদের যদি বিশ্বাস করানো যায় যে, পূজা-পার্বণে যে সময় ও অর্থ ব্যয় করা হয় তা ইহকাল অথবা পরকালে কোনোই কাজে আসবে না, এবং এরা যদি এক ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহ'লে—যত দিন পরেই সেই শুভদিন আসুক না—আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরে রামমোহন রায়ের প্রতিভাদীপ্ত একক সাধনার কথা স্মরণ করব। য়ুরোপে লুথার যে জন্য খৃষ্টানদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, রামমোহনও হিন্দুদের জন্য যা করেছেন তার ফলে চিরকাল শ্রদ্ধার আসন পাবেন।

রামমোহন ইতিমধ্যে যে কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য যে পরিকল্পনা তাঁর রয়েছে তা থেকে এবং নিচের কাহিনী থেকে উপরোক্ত মন্তব্য করতে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি।

বাংলার পণ্ডিতদের অগ্রণী গোসাঁই ভট্টাচাজ রাধামোহন গত বিজয়া দশমী দিন শান্তিপুরে বৃদ্ধবয়সে পরলোকগমন করেছেন। শেষ মুহূর্তে তিনি পৌত্তলিকদের মর্মপীড়া দিয়ে বেদান্তে বিশ্বাস ঘোষণা করে গিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আত্মীয়েরা তাঁকে নদীতীরে এনে শিয়রে তুলসী গাছ স্থাপন, দেহে গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে কৃষ্ণনাম লেখা, এবং কানের কাছে গঙ্গা, নারায়ণ, কৃষ্ণ উচ্চারণের আয়োজন করল কিন্তু রাধামোহন বন্ধ করতে বললেন এ সব অনুষ্ঠান। কারণ এ সব করলে একমাত্র সত্য পরমেশ্বরকেই বিদ্রূপ করা হবে। তিনি বড় পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, সারা জীবন তিনি লাভের উদ্দেশ্যে এই ধরণের মিথ্যা অনুষ্ঠান করে এসেছেন; সেই তিনি আজ জীবনের শেষ মুহূর্তে প্রচার করছেন যে, একমাত্র পরমেশ্বর ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই।

—(ক্যালকাটা মান্থলি জার্ণাল, ডিসেম্বার, ১৮১৭)

* * * *

একটি আবেদন

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার চার্লস এডওয়ার্ড গ্রে এবং অন্যান্য বিচারকদের নিকট এক দেশীয় ব্যক্তি (a native) নিম্নলিখিত আবেদন করেছিল: আমরা শুনেছি এবং বিশ্বাসও করি যে, আদালতের কাজে যে সব দলিলের প্রয়োজন হয়, সে সব বাংলা কিংবা ফার্সী দলিল ইংরেজীতে অনুবাদ করবার কাজ একচেটিয়া করে রেখেছে সুপ্রীম কোর্টের সহিত সম্পর্কান্বিত দু'জন খৃষ্টান কর্মচারী। অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে এঁরা দু'জন বেশ উপার্জন করছেন। পূর্বে হয়তো ইংরেজীতে অনুবাদ করবার জন্য উপযুক্ত দেশীয় লোক পাওয়া যেত না। কিন্তু এখন এই রীতি থাকা উচিত নয়। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে সরকারের প্রয়োজনে রামকমল সেনের নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সংস্কৃত ও ফার্সী বই অনুবাদ করেছেন। সুতরাং শুধু দু'জনের উপর অনুবাদের একচেটিয়া অধিকার না দিয়ে কাজগুলি ভাগ করে দেওয়া হোক মিশনারি, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। তাহ'লে মামলাকারীদের সুবিধা হবে। মাত্র দু'জন অনুবাদক থাকায় অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয় এবং মক্কেলের সুবিধার দিকে লক্ষ্য না রেখে তাঁদের সঙ্গে খেয়াল-খুশী মতো ব্যবহার করে।

—(ক্যালকাটা ম্যাগাজিন ও মান্থলি রেজিষ্টার, ১৮৩২)

* * * *

ব্রাহ্মণ

কিছুকাল পূর্বে এক ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে করে শিকারপুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে গেল ভিক্ষা করতে। এক বাড়ী

থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করল যে, ভিক্ষা না পেলে সপরিবারে বাড়ীর সামনে বসে মরবে। দু'দিন বসে থেকেও যখন ভিক্ষা পাওয়া গেল না, তখন ব্রাহ্মণ তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের মুণ্ডচ্ছেদ করে জানিয়ে দিল যে, ভিক্ষা না পাওয়া গেলে পর-পর প্রত্যেকটি সন্তানকে বলি দিয়ে সব শেষে নিজে আত্মহত্যা করবে। উন্মত্ত ব্রাহ্মণ পরদিন আর একটি সন্তানকে হত্যা করল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের পালা যখন এল সে তখন বাবার কাছ থেকে সরে গেল। একটা নিষ্ঠুর খেয়ালের জন্ম প্রাণ দিতে সে রাজী হলো না। ব্রাহ্মণ উপবাসে দুর্বল হয়ে পড়েছে, পুত্রকে জোর করে ধরে আনবার শক্তি নেই। ছেলেকে নিকটে আসতে অনুরোধ জানাল, বলল, আমি এখনই আত্মহত্যা করব, একবার কাছে এস। পুত্রের হৃদয় পিতৃ-স্নেহে বিগলিত হলো। নিকটে আসতেই ব্রাহ্মণ অতর্কিতে পুত্রকে হত্যা করল; তার পর স্ত্রীকে খুন করে নিজেও আত্মহত্যা করল।

—(রেভারেণ্ড জি, ক্রেটনের লণ্ডন অক্জিলিয়ারি বাইবেল সোসাইটির সভায় বিবৃত কাহিনী থেকে ১৮১৬ সালের ডিসেম্বার মাসের এশিয়াটিক জার্ণালে উদ্ধৃত)।

* * * *

ভারতীয় শাল

এক জন ফরাসী লেখকের মতে কাশ্মীরে শাল তৈরীর জন্ম ষোলো হাজার ফ্রেম অনবরত ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যেক ফ্রেমে তিন জন লোক কাজ করে। একটা শাল সম্পূর্ণ হতে এক বছর সময় লাগে। শাল তৈরীর পশম সরবরাহ করে তিব্বত ও তাতার। কাবুলে একটি সুদৃশ্য শালের দাম তিন থেকে চার হাজার ক্রাঁ। য়ুরোপের শালের তুলনায় কাশ্মীরের শাল বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপে যে রকম শাল দিয়ে মহিলাদের পোষাক তৈরী করা হয়, এ দেশে তা দিয়ে হয় মাথার পাগড়ী। মিঃ এলফিনষ্টোনের হিসাব অনুসারে কাশ্মীর থেকে বার্ষিক আশী হাজার শাল রপ্তানী করা হয়। য়ুরোপের মহিলা মহলে কাশ্মীরের শাল বিলাসের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বসরা প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি শাল বিক্রয় ক'রে বহু টাকা য়ুরোপ থেকে নিয়ে আসে। এক জন লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ভারতীয় শাল য়ুরোপের সর্বনাশ করবে। বৃটিশ শাল-প্রস্তুতকারীরা অবশ্য ভারতীয় পশম নিয়ে শাল তৈরী করতে আরম্ভ করেছে; অন্য সব দিক থেকে কাশ্মিরী শালের সমকক্ষ হলেও তেমন ঠাস বুনানি হয় না। তাছাড়া এমন আশঙ্কাও করা যেতে পারে যে, অধিক লাভের আশায় বৃটিশ নির্মাতারা ভারতীয় পশমের সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর পশম মিশিয়ে শালের উৎকর্ষ অবনত করবে।

—(এশিয়াটিক জার্ণাল, ডিসেম্বার, ১৮১৬)।

সুতা কাটা ও ভারতের দরিদ্র শ্রেণী

গ্রেট বৃটেন নিজের শিল্প গড়ে তোলবার জন্ম উৎসুক। তাই কাঁচা মাল আমদানী করতে তার আগ্রহ। কাঁচা মাল থেকে সম্পন্ন (finished) দ্রব্য তৈরী করলে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা যায় এবং লাভের মাত্রাও বেশি থাকে। এই জন্মই বৃটেন ভারতের কাঁচা তুলা আমদানী করে, এ দেশে প্রস্তুত সুতার প্রতি তার আগ্রহ নেই। অথচ তুলার বদলে সুতা নিলে জাহাজ ভাড়া কম লাগত, কাপড়ও সস্তা হতে পারত। রেশমের গুটি যদি বৃটেনে নিয়ে তা থেকে রেশম বের করা সম্ভব হতো, তাহ'লে বৃটেন তাই করত। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলেই বোধ হয় ভারতীয় প্রজাদের কর্মসংস্থানের জন্ম বৃটেন ব্যগ্র হয়েছে। বিদেশ থেকে রেশমের সুতা আমদানী করা বন্ধ হয়েছে সরকারের আদেশে। বিদেশে প্রস্তুত সাধারণ সুতা সম্বন্ধেও এই বিধি-নিষেধ সমান ভাবে প্রযোজ্য।

যে আলোকপ্রাপ্ত সরকার বৃটিশ-ভারত শাসন করছেন, তাঁরা দরিদ্রতম শ্রেণীর লোকদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব অগ্রাহ্য করতে পারেন না। বর্তমানে ভারতের প্রদেশগুলিতে দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণের অভাব মোচনের কোনো ব্যবস্থা নেই। বিধবা, অনাথা বালিকা, রোগে অশক্ত অথবা পদমর্যাদায় যাদের মাঠে কাজ করতে বাধে, জীবিকার্জনের জন্ম তাদের একমাত্র পন্থা সুতা কাটা। আবার যে সব পরিবারের পুরুষ উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে সেখানে মেয়েরা সুতা কেটে সংসার চালাতে পারে। উপার্জনের এই পন্থাটি অনেকের পক্ষে বাঁচবার একমাত্র উপায়। অন্তত: দরিদ্রের অভাবের চাপ যে লঘু হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দরিদ্র লোকদের কষ্ট সত্যি খুব বেশি; বিশেষ করে যে সব পরিবার এক দিন স্বচ্ছল অবস্থায় ছিল, কিন্তু এখন অবনতি ঘটেছে, তাদের কষ্ট আরো অসহ্য। এই ধরণের পরিবার ভারতে অসংখ্য রয়েছে; গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এরা বিশেষ কোনো সুবিধা পাবে কি না তা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের উপর এরা দাবী জানাতে পারে।

এই জন্ম আমাদের মনে হয় যে, যে কাজ দরিদ্র জনসাধারণের একমাত্র আয়ের পথ তার উন্নতির চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। সুতা প্রস্তুত করতে উৎসাহ দিলে গ্রেট বৃটেনও যে বাণিজ্য বিষয়ে লাভবান হবে, তাও আমরা দেখাতে পারি। বাঙলা দেশ থেকে বৃটেন কাঁচা তুলার চেয়ে সস্তা দরে সুতা আমদানী করতে পারে। আয়র্ল্যাণ্ড থেকে বিনা শুল্কে পশমের সুতা এবং সাধারণ সুতা বহু পরিমাণে আমদানী করে বৃটেন। এর জন্ম গ্রেট বৃটেনের শিল্পের যদি ক্ষতি না হয়ে থাকে তাহ'লে বাঙলার সুতার উপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে এবং অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি করে আমদানী করতে বাধা দেওয়া হয় কেন?

—(এশিয়াটিক জার্ণাল, ডিসেম্বর, ১৮১৬।)

বাঙলার ফুল

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ আগারে—
মালতী, কেতকী, জাতি
বান্ধুলি, কামিনী, পাঁতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা যে।

কে করে গণনা তার
অশোক, কিংশুক আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি তুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে!

—৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়

প্রথম কাজ

শ্রীমতী লিজেল্‌ রেমঁ

১৮৯৮এর ১২ই নবেম্বর, কালীপুজার দিন বাগবাজারে নিবেদিতার স্কুল খোলা হল।

গুটিকয় রোগা-রোগা ছাত্রী নিয়ে নিতান্তই ছোট একটি বিদ্যালয়। তা হলে কি হয়, উদ্বোধন-দিনে নিবেদিতা দরজার মাথায় প্রকাণ্ড এক সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন, তাতে বাংলায় লেখা 'বালিকা বিদ্যালয়'। পাতার মালা আর লাল-নীল-সবুজ কাগজের শিকল দিয়ে বাড়ি সাজান হল। ঢোকবার পথে স্বস্তিকা-আঁকা দুটি মঙ্গল-ঘট আর মস্ত দুটো কলা গাছ অভ্যাগতকে স্বাগত জানাচ্ছে। সিঁড়ির সামনে চালের গুঁড়ি দিয়ে আঁকা আলপনা; ক্ষণস্থায়ী কারুকৃতির সুচিত্রিত একখানি গালিচা যেন—সেদিনের সম্মানিতা অতিথি সারদা দেবীকে সংবর্ধনা করবার জন্য এই আয়োজন।

বিকাল তিনটা না'গাদ কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে এসে পৌঁছলেন তিনি। দু'জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর পিছনে পিছনে এলেন। একজন প্রবীণার মারফৎ অস্ফুটে সকলকে আশীর্বাদ জানিয়ে শ্রীমা ভিতরের উঠানে চলে গেলেন, সেখানে একটা ছাউনী মণ্ডন করা হয়েছিল। সারদা দেবী পাড়ার মেয়েদের আর ছেলে-পিলেদের অভ্যর্থনা করলেন সেখানে বসে।

তিনটি নিরীহ বাচ্চা মেয়ে নিয়ে স্কুল আরম্ভ হল। স্বামী সদানন্দ এদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তারা এমন লাজুক যে, কেউ তাদের দিকে তাকালেই হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। কিছু যদি বলেছে অমনি মুখ ভার হয়ে চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। যা হোক, তারা দৌড়ে পালাল না—ভয়-ভয় করে আবার কৌতূহলও আছে, মোটের উপর 'সিষ্টারের' বাড়িতে থাকতে পেলে খুশীই হয় তারা।

অনেক বার নিবেদিতা কল্পনা করতে চেয়েছেন স্কুলটি কী ভাবে শুরু করবেন। এ তাঁর নতুন অভিজ্ঞতা, অখণ্ড মনোযোগ আর সদা-সতর্ক দৃষ্টি চাই এর জন্য। আটশ' টাকা তাঁর মূলধন, তার বেশীর ভাগটাই কাশ্মীরের মহারাজার দান। এই টাকায় কতটুকু কী করা যাবে তাই নিয়ে হিসাব করেন। প্রথম পর্বটা পার হওয়ার জন্য এই মূলধনই যথেষ্ট, ইতিমধ্যে হিন্দুদের আস্থাভাজন হতে পারবেন—আর কী ভাবে শিক্ষা দেবেন তারও একটা ছক পেয়ে যাবেন হয়তো। নিবেদিতা বলতেন, 'এর পর স্কুলটা যদি চলবার মত হয় আর যে-উদ্দেশ্যে এর পত্তন তা যদি সিদ্ধ হয়, তা হলে আমি তার রিপোর্ট লিখে ইংল্যাণ্ড আর ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেব। ভাল ভাবে গড়ে উঠলে পর পৃষ্ঠপোষকদের নিয়মিত সাহায্যের জোরেই স্কুল টিকে থাকবে।'

স্বামীজির কাছে পরামর্শ চাইতে তিনি কেবল একটু হেসে বললেন, 'তোমার কাজ তুমিই কর। ছাত্রীদের কাছ থেকেই সব-কিছু শিখতে পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন তা তো ভালই, এখন তাকে হাতে-কলমে খাটানোটাই হল আসল কথা। তিনি খৃষ্টান মুসলমান কী পারিয়ার সঙ্গে খেয়েছেন, তাদের পোষাক পরেছেন, তাদের আচার পালন করেছেন,—উদ্দেশ্য যেন তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেন।' বাগবাজারের ছোট-ছোট বালিকারাই নিবেদিতার শিক্ষাদাত্রী হল। বিবেকানন্দ বলে দিলেন 'এর পরে—অনেক দিন পরে—পরস্পর মেলামেশা করতে-করতে তোমার কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের হাজার খুঁটিনাটি হতে উপাদান সংগ্রহ করে বিদ্যাদানের সার্থক পথটি খুঁজে পাবে।'

ছাত্রীরা অনিয়মিত আসে, কাজেই স্কুলের কোন-একটা সুনির্দিষ্ট সময়-সূচী নাই। কখনও কোন প্রাচীনা তাদের নিয়ে আসেন, কখনও-বা চোখে কাজল কোলের বাচ্চাটিকে কাঁকালে নিয়ে তাদের মা-ই মেয়েদের পৌঁছে দেন। মেয়েরা প্রথম বড় হল-ঘরটায় জড়ো হয়, তার পর কয়েক দিন কথা না বলে কেবল পরস্পরকে উৎসুক চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখে। সবাই মিলে খেলা করে না মোটেই। যদি বুঝল যে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে না, তখন সাহস পেয়ে এ ওকে বালা-চুড়ি পুঁতির কি শখের মালা দেখায়। প্রথমে তো কে কেমন চুল বেঁধেছে সেইটা পরস্পরকে দেখাবার ধুম পড়ে গেল। চুলের গোছা রেশমের গুছি আর রংবেরঙের ফিতা দিয়ে লম্বা করা হয়েছে। কারও কারও মুখে আবার জাফরানের গুঁড়ো মাখান, তামাটে চামড়া থেকে বেশ একটা সোনালী আভা ফুটে বেরোচ্ছে—যেন পাকা ফলটি।

নিবেদিতা তাদের ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করেন। কেউ কোনও রকম নিয়ম-শৃঙ্খলার ধার ধারে না। তবুও কোথায় ওদের স্বভাবের ঐক্য, সেইটি নিবেদিতা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেন। ওরা যে থেকে-থেকে চুপ করে যায়, অন্যের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক্‌ রাখতে পারে—এই দুটোতে নিবেদিতার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। পূজার্চনার সঙ্গে ওদের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তা স্পষ্টই বোঝা যায়, কারণ ওটা ওদের খেলার একটা অঙ্গ হয়ে গেছে। অনেক মেয়েই মাটি দিয়ে যেমন-তেমন একটা মূর্তি গড়ে, তার সামনে দিনের মধ্যে হাজার বার ফুল দেয়। পুতুল নিয়ে যেমন খেলে তেমনি এই দেবমূর্তি নিয়ে ওদের খেলা—কখনও ঘুম পাড়াচ্ছে, কখনও বকছে, যখন যেমন খেয়াল। তার পর খেলা যখন শেষ হয়ে গেল, মূর্তিটা ওরা ভেঙে টুকরো করে, সেই টুকরোগুলো একেবারে গুঁড়িয়ে ফেলে তবে শান্তি। এই যে মূর্তি গড়ে আর ভাঙে এতে ওদের ভারী আনন্দ, খুব হাসতে থাকে সবাই। ক্ষণভঙ্গের অন্তরালে নিত্য-সত্য পূর্ণতা যে একটা আছে, এ-তথ্যটা কেমন করে ওদের অবচেতন মনে ঢুকে গেছে। ফলে ওদের হাসি-কান্নার ধরন পশ্চিমের ছোট-ছোট

মায়েদের থেকে একেবারে আলাদা। তারা এই বয়সে কত কি আবিষ্কার করে, নিজস্ব সম্পত্তি জমায় আর তার দখলীস্বত্ব সম্বন্ধেও সাবধান হয়। এদেশের মেয়েরা যে ভাবে গড়ে উঠেছে, তার ধারা সুদূর অতীত থেকে বয়ে এসেছে ব'লে, দেশের ধর্মাচরণ আর আচার-নিয়মের সংস্কার থেকে সহজেই তারা অনিত্যের মাঝে নিত্যকে আবাহন ক'রে আবার তাকে বিসর্জন দেবার শিক্ষাও পেয়েছে।

নিজেদের বাড়ির ঘরোয়া চাল-চলনগুলি এই সব ছাত্রীরা স্কুলেও আমদানী করে। বড়রা যা করেন, খেলতে গিয়ে না ভেবে-চিন্তে সেই কাজগুলোই ওরা নকল করে। মাথায় জলের কলসী নিয়ে ওরা কোন্ কাল্পনিক 'কুয়ায়' জল আনতে যায়, পায়ে-পায়ে জড়িয়ে হাঁটে, আবার জল যেন এক ফোঁটা ছলকে না পড়ে সেদিকেও কড়া নজর। কখনও বা আদর্শ গৃহিণী সেজে খেলা করে—মন-গড়া অতিথিকে গড় হয়ে প্রণাম করে, সযত্নে খাবার পরিবেশন করে; বেশ সুন্দর নকল করে সব-কিছুর। এত দিন নিবেদিতা শিশুদের শিক্ষামূলক খেলাধুলা নিয়ে যে-গবেষণা করেছেন, এখানে তা কোন কাজেই লাগবে না। জীবন সম্বন্ধে শিশুকে সচেতন করে তোলাই ও-সব খেলার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সব হিন্দুর মেয়েরা অনেক কিছুই জানে, বোঝে। কুমোর-ছুতোর বা ভিস্তিওয়ালারা কাজ করতে-করতে যে-ছড়া কাটে, ওরা সে-সব শিখেছে, মায়েদের কাছ থেকে মুখে-মুখে রামায়ণ-মহাভারতের অজস্র গল্প শুনে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। মাটির 'পরে চিত্র আঁকতে একটুও ক্লান্তি নাই ওদের, চাঁদ, সূর্য, কৃষ্ণের পায়ের ছাপ, নাগরাজ, শতদল পদ্ম, ছোট-ছোট রকমারি ফুল···এই ওদের কাছে বিশ্বসংসারের প্রতীক যেন। জপের মালা ফেরানোর নিষ্ঠা নিয়ে একই কাজ বার বার ওরা করে যায়।

নিবেদিতার কাজ হল অতি সাবধানে ওদের স্বভাবের ঐশ্বর্যকে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলা আর ওদের সাধ্যমত কিছু লেখাপড়া শেখানো। ওদের নীরস দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে একটু যাতে রং লাগে। তিনি লক্ষ্য করেন, একটা দশ বছরের মেয়েও জানে তার অন্তরাত্মা ছাড়া আর-কিছুই স্বাধীন নয়। জীবনটা তার যন্ত্র, বিয়ের পর এক পরিবার থেকে আর এক পরিবারে চালান যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে শুধু কুমারী-জীবনের নিষ্কলঙ্ক শুচিতা—ওই তার একমাত্র সম্পদ। জীবন সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য তার নাই, কারণ সে জানে গুরুজনের আদেশ পালন করে অন্তঃপুরে গোপনচারিণী হয়ে থাকাই তার নিগূঢ় নিয়তি। বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে মুখে ঘোমটা টেনে, তাঁদের কথায় কথা না কয়ে ও মৌনমুখে দিন কাটানোই তার জীবনব্রত। ওরই মধ্যে পরিবারে কোথায় নিজের স্থান তা বুঝে নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে নিজেকে চালিয়ে নেওয়ার শিক্ষা সে পায়। তবু তার ছেলেখেলায় মাধুর্য আর কল্পনার খামখেয়ালি যথেষ্টই থাকে। তার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুই বজায় রাখতে চান নিবেদিতা, অন্ততঃ বিদ্যালয়ে এটুকু ও পাক আর ওর সকল কর্মে এই স্বাতন্ত্র্য সঞ্চারিত হ'ক।

মেয়েরা বড় ঘরে বসে কাজ করে, এক-এক জনকে এক-একটা কাজ দেওয়া হয়েছে। পড়া লেখা আর কিছুটা অঙ্ক এই হল মোটামুটি,—এই নিয়েই ওরা খেলে, অজানতে দেশ-কালের একটা ধারণা হয়ে যায় মনে। ওদের উৎসাহের সীমা থাকে না, কেন না তোতার মত দুর্বোধ কতকগুলো কথা আওড়াতে হয় না, ওরা নিজেরাই এখানে একেকটা জিনিস অধিকার করে চলেছে। একটা কথা আর তার অর্থ, প্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে ওদের ভাবনার মিল এইগুলো ওরা আস্তে-আস্তে বুঝে নেয়, এক দুই করে সংখ্যা গুনতে-গুনতে শতকিয়ার কোঠায় যায়।

খেলা দিয়েই সমবেত পাঠ দেওয়া হয়। মেঝেতে এক ঝুড়ি তেঁতুলের বিচি ফেলে গণিত শেখানো হয়। যে-ক'টা গুণতে পারে সে-ক'টা বীচি ওরা তুলে নেয়, তাই দিয়ে বেচা-কেনা চলে। একটা ভিখারীর মেয়ে দরজায় আসে রোজ, তাকেও এ-খেলার ভাগ দিতে ওরা ভোলে না। তার পর এক থাল কাদামাটি দেয়া হয়, ওরা মহানন্দে মূর্তি গড়ে, মন থেকে কত কী তৈরী করে, জলের মাছ থেকে আকাশের তারা কিছুই বাদ যায় না।

বাড়ীতে যা-কিছু দেখে তার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার প্রগতিপন্থী উপাদানগুলো মিলে ওদের ধর্মজীবন গড়ে ওঠে। প্রধান সমস্যা হল, আধুনিক চিন্তাকে কেমন করে স্বদেশী করে তোলা যায় আর প্রাচীন ভাবনাকে কেমন করে বর্তমানের উপযোগী করা চলে,—অর্থাৎ প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় কী করে সম্ভব। গুরুর কয়েকটা ভাবনা সমাজে চালু করবার দায়িত্ব নিলেন নিবেদিতা। স্বামীজি বলতেন, "পিতৃপূজাকে বীরপূজায় রূপান্তরিত কর। তার পর মেয়েদের ভগবান সম্বন্ধে যার যেমন কল্পনা সেই মত মূর্তি গড়তে বা ছবি আঁকতে বল, ওদের পূজার্চনা করবার জন্য একটা-না-একটা কল্পমূর্তি তো তোমায় বাৎলাতেই হবে। শিক্ষার আদর্শ হবে উদার। সকলের শাস্ত্রই শ্রদ্ধেয়,—শুধু বেদ নয়, খৃষ্টান-মুসলমান সবারই। কিন্তু পূজানুষ্ঠানে বৈদিক আচারই মানতে হবে—বেদির নীচে থাকবে পূর্ণকুম্ভ আর অনির্বাণ দীপের মালা! গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, পাখি সব রকম জন্তু-জানোয়ার জোগাড় কর, ওদের পরিচর্যা করতে শেখাও, পুরাতন কলা বা সূচীশিল্প ফিরিয়ে আনতে হবে,—ছুঁচে ফুল তোলা বা জরির কাজ এই সব। সব-কিছুর উদ্দেশ্য হল রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষের সেবা কর, প্রতিদিন ভিখারী, রুগ্ন বা নিরন্নের পরিচর্যা কর, তাদের খেতে দাও, রোগে শুশ্রূষা কর···হৃদয় আর কর্মক্ষমতা একসঙ্গে উৎকর্ষিত হবে এমনি করে হাতে-কলমে সব ধরনের শিক্ষা পেলে।"

নিবেদিতার প্রথম সহকর্মিণী হল সন্তোষিণী। মেয়েটি সবার চেয়ে সামান্য কিছু বড়, বছর বারো বয়স। স্বামী সদানন্দ এক নজরেই বলেছিলেন, ও-মেয়েটি সাধারণ নয়। মেয়েটি স্বাধীন-চেতা, তাকে শাসন করা বা বাগ মানানো ভারী শক্ত। কিছুতেই ওর স্বভাব বদলানো গেল না। সন্তোষিণীর বাবা বেজায় গোঁড়া, মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করেছেন শুনে তার টনক নড়ল। একগুঁয়ে মেয়ে তখন চেঁচামেচি শুরু করল,—'আমায় তোমার কাছে রাখ, কিছুতেই আমি বিয়ে করব না, তার চাইতে আমায় মেরে ফেল।' তখন জানা গেল, গোপনে সে চিরকুমারী থাকবার পণ করেছে যাতে নিবেদিতাকে কখনও না ছেড়ে যেতে হয়। ওর মনের ভাবটা আসলে কী, বোঝবার জন্য স্বামী সদানন্দ ওকে কিছু দিন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন, তার পর সরল ভাবে প্রস্তাব করলেন, 'আচ্ছা, ওকে আমরা এখানকার এক জন করে নিই না কেন?' ওর বাবার আপত্তি না থাকলে এ একটা সমাধান বটে।

কিন্তু সন্তোষিণীই গোলমাল বাধাল। 'বাবুন ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমি থাকতে পারব না।' দিন কতক বেঁকে থেকে তার পর ও আস্তে-আস্তে নরম হয়ে এল। সন্তোষিণীকে কিছু বলতে হল না, বাড়ির মধ্যে অনায়াসেই সে নিজের জায়গা করে নিল। সকালে ছোট-ছোট মেয়েদের দেখাশোনার ভার তার উপর। কাউকে জিজ্ঞাসা করে, 'আজ তোমার ছোট বোনকে আননি কেন?' কাউকে বা 'কাল বুঝি তোমার অসুখ করেছিল? হাত যদি নোংরা থাকে সিষ্টার কিন্তু রাগ করবেন···।'

সারদা দেবীর কাছে স্কুলটি একটা আগ্রহের বস্তু। নিবেদিতাকে তিনি মেয়েদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে তুচ্ছ কথাটিও জেনে নেন। নিবেদিতা স্বীকার করেছেন···অসংখ্য বিষয়ে রেয়াত করতে হয়েছে এদের জন্য। এ-সব ব্যাপারে স্বামী সদানন্দের আশ্চর্য ক্ষমতা। তিনি যদি না থাকতেন অস্থানে কঠোর হতে গিয়ে সব আমি ভণ্ডুল করে দিতুম।'—(মিসেস্ বুলকে লেখা চিঠি, ১৫ই মার্চ ১৮৯৯), শ্রীমা আবার মেয়েদের আর তাদের মায়েদের মনোভাব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন, এদের নিয়ে কোনও গোলমাল বাধলে তিনিই সব মিটমাট করে দিতেন। প্রত্যেক পর্বদিনে স্কুলে এসে মেয়েদের মিঠাই বিলিয়ে যেতেন। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-তিথিতেই সব চেয়ে বেশী আনন্দ। সে-বছর বিশেষ পূজা হল, তার পর সাতখানা গাড়ি করে সারদা দেবী আর তাঁর সঙ্গিনীরা, নিবেদিতা, স্কুলের ত্রিশটি মেয়ে—সবাই মিলে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী এক বন্ধুর অর্কিড বাগানে বেড়াতে গেলেন। সেদিন শুধু মেয়েরাই সেখানে যাবেন এমনি ব্যবস্থা ছিল। '···মোটেই ভেব না যে তার মানে আমরা দু'হাতে পয়সা উড়িয়েছি। চল্লিশটি প্রাণীর জন্য ঢালাও রকমের ব্যবস্থা হল বুঝতেই পারছ, অথচ সবসুদ্ধ বারো টাকারও কম খরচ পড়ল। এখানে কিছু করাটা খুব ব্যয়সাধ্য নয়, বেশ মজার, না?'

কিন্তু মিতব্যয়ী হয়েও নিবেদিতা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পান না। স্কুলের খরচ চালানো শক্ত হয়ে উঠেছে। বাজেটে যে মাথা-পিছু এক টাকা করে মাসিক বেতন ধরা হয়েছিল, একটি মেয়েও তা দেয় না। উল্টে অনেককেই পরবার সুতী শাড়ীখানাও যোগান নিবেদিতা। অনেকগুলি মেয়ের চিকিৎসা করতে হয়। তার মধ্যে এক জনের কুষ্ঠ, কবিরাজ বলেছেন ওকে ভাল করে দেবেন। আর স্বামী সদানন্দ যে-সব মেয়ে চুঁড়ে নিয়ে আসেন, তাদের স্বভাবে বৈশিষ্ট্য যেটুকু, দারিদ্র্য তার চাইতে বেশী। যখন দেখেন টাকা-পয়সার অনটন নিয়ে নিবেদিতা মাথা ঘামাচ্ছেন, সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'ভয় পাবেন না। সত্যিকারের দারিদ্র্য কাকে বলে তা তো এখনও এখানে উঁকিই দেয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদেহী হওয়ার পর বরানগরের পুরানো মঠ-বাড়িতে দারিদ্র্যের পীড়ন সহ্য করেছি বটে। শরীর ঢাকবার এক টুকরা কাপড় ছিল না, ভিক্ষা করে পেট ভরাতে হত। বিকাল বেলা স্বামীজি অল্পবয়সী ব্রহ্মচারীদের চেতিয়ে রাখবার জন্য মন্দিরা বাজিয়ে গান করতেন। তাঁর ভজন শুনতে-শুনতে আমরা গানের আনন্দে ধ্যানে ডুবে পেটের খিদে ভুলে যেতাম।'

সত্যি বলতে নিবেদিতা তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করছিলেন। মিস্ ম্যাকলয়েড প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন—শীগগির কলকাতা ছেড়ে যাবেন। একটা পুরো সকাল মেয়েদের নিয়ে খেলা করে কাটালেন। বাইরের থেকে মনে হচ্ছিল তাঁর মনটা খুশিতে ভরা, কোনও দিকে বিশেষ নজর নাই। এদিকে কিন্তু বাড়ির যা-কিছু অভাব-অনটন সবই লক্ষ্য করেছেন মেয়েদের শীর্ণ চেহারা আর নিবেদিতার দারিদ্র্যে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল। তাঁর টাকা আছে, এখন থেকে তিনি নিবেদিতার পৃষ্ঠপোষক হবেন—মুক্তহস্তে নিবেদিতাকে দিতে হবে যাতে সে-ও আবার পাঁচ জনকে দিতে পারে। পরদিন গাড়ি বোঝাই জিনিস নিয়ে ম্যাকলয়েড ফিরে এলেন, মেয়েদের জন্য একগাদা খাবার—টিন-ভরা বিস্কুট, আঙুর, জ্যাম, জমানো দুধ, মাখন, চিনি। তা ছাড়া স্কুলের দরকারি জিনিস একরাশ—শ্লেট থেকে শুরু করে বাঁধানো খাতা, থান-থান কাপড়, আঙুলপোষ, সুতোর রীল, কাঁচি। বন্ধুর জন্য এনেছেন একটি বালিস, আর সৌখিনতার চূড়ান্ত—খানিকটা চা।

যাঁর সঙ্গে বসে প্রথম স্কুলের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই হেনরিয়েটা মূলারের কাছ থেকে কোনও প্রত্যাশা নিবেদিতা রাখেন না। ১৮৯৯এর জানুয়ারিতে শেষবার দু'জনের দেখা হয়, স্কুল নিয়ে আলোচনাও হয়, কিন্তু দু'জনের উদ্দেশ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। গুরুর পরিকল্পনা মত কাজ করতে হলে তার বহরটা কী রকম, তা অনুমান করে মিস্ মূলার ভয় পেয়ে গেছেন, তিনি মরিয়া হয়ে খৃষ্টানের সেবার আদর্শটাকেই আঁকড়ে ধরেছেন। স্কুল যদি ঐ আদর্শ মত চলে, তা হলে বোধ হয় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি দান করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা সে দান প্রত্যাখ্যান করলেন। এ স্কুল ছাত্রীদের, তারা তাদের ঘরোয়া ভাবে স্কুলটিকে গড়ে নিচ্ছে। কোনও রকম খৃষ্টান আদর্শ ঢোকালে স্বামীজির উদার কল্পনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। দুই ভদ্রমহিলার আলাপ-আলোচনাটা সুখের হল না, ওঁদের পারস্পরিক সহযোগিতার ঐখানেই ইতি। নিবেদিতা বললেন, 'তোমার কাছ থেকে আমি কিছু নিতে পারব না, তুমি কিছু মনে করো না। মায়ের কৃপায় আমি একাই খেটে যাব!'

দুর্যোগে পড়ে শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীদের মাঝে প্রীতির বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হল, প্রাণের টান দ্বিগুণ বেড়ে গেল। জগন্মাতার পক্ষচ্ছায়ায় গোষ্ঠীবদ্ধ এক বিরাট পরিবার তাঁরা, প্রতিদিন মায়ের চরণে প্রার্থনা জানান। দিনের মধ্যে সব চেয়ে সরস হল সেই সময়টা যখন গল্পের আসর বসে, মেয়েরা সব ফেলে নিবেদিতাকে ঘিরে বসে, চেঁচামেচি করতে থাকে, 'মায়ের কথা বল, তিনি আমাদের কি রকম ভালবাসেন সেই গল্প কর···'

আর নিবেদিতা সেই হাজার বার শোনা গল্প শুরু করেন, মা তাঁর অবোধ সন্তানদের কত যে ভালবাসেন সেই গল্প। সে তো গল্প নয়, সে যে সত্যি! 'আচ্ছা খুকু সোনা, ছোট বেলায় সবার আগে কি দেখেছিলে মনে পড়ে? তুমি মায়ের কোলে শুয়ে, তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে হাসছ—এই না? মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছ? মা চোখ বুজলেন, ওমা! খুকী কোথায় গেল? চোখ মেলে দেখেন, এই যে খুকী!···আবার খুকী চোখ বুজল, মা নাই! নাই! আবার চোখ মেলতেই···এই যে!

'আচ্ছা মা যখন চোখ বোজেন কোথাও কি হারিয়ে যান তিনি? না তো! নই তো আছেন। কিন্তু তাঁর চোখ দু'টি বোজা,

দেখছ? তবু তিনি আছেনই…মা যখন চোখ বুজে থাকেন তখনই তাঁকে বলি কালী, জগদীশ্বরী, জগদম্বা!

'এমনও তো হয়েছে খানিকক্ষণ মনটা ভারী কাঁদুনে হয়ে আছে, মুখে হাসি নেই? তখন মা কি পিসী কিংবা আর-কেউ এসে কোলে নিয়ে আদর করলেন, চুমো খেলেন, যতক্ষণ তোমার ঠোঁটে না হাসি ফুটল ততক্ষণ কোলে-কোলেই রাখলেন। ভগবানও এমনি করেন কখনও-কখনও।

'তাঁর চোখ দু'টি বোজা দেখি বলেই আমরা ভয় পাই। এই লুকোচুরির খেলা শেষ করতে চাই…মনে হয় একা, বড় একা, অনন্ত দূরে সরে গেছি হারিয়ে গেছি যেন…যেমনি তুমি আর সইতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠ, অমনি মায়ের চোখের অপরূপ পাপড়ি দু'টি খোলে। আহা, অগাধ স্নেহ যেন টলমল করছে সে-দু'টি চোখে…কালী…কালী!

'মা আর-এক ধরনের লুকোচুরি খেলেন…কখনও-কখনও অন্য মানুষের মধ্যে লুকিয়ে পড়েন, কি অন্য যে-কোনও কিছুতে। কখন যে তাঁর দেখা পেয়ে যাবে, তার কিছু ঠিক নাই, হয়তো মায়ের চোখে চোখ পড়তে দেখলে তাঁর স্নেহ দৃষ্টি…হয়তো বিড়াল-ছানাটির সঙ্গে খেলতে গিয়ে, হয়তো ভুঁয়ে-পড়া পাখির ছানাটিকে তুলতে গিয়ে, তাদের চোখে দেখলে তাঁর চোখ…

আচ্ছা খেলা রাখ, বল দেখি—"মা, মা, একবার দেখা দে…চোখ মেলে চা' গো'…"

—(Kali, the Mother হতে)

এমনি গল্প চলতে থাকে। এ যে সত্যি গল্প। ছোট-ছোট মেয়েরা চোখ বড়-বড় করে তাকায়, এমনি করে মাকে দেখে ফেলবে তারা!. আর নিবেদিতার মনে হয়, মা হাসিমুখে আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সারা গায়ে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

অভিযোগ

চিত্ত ভট্টাচার্য

চিত্ত মাঝে অহরহ
কী এক দুঃসহ জ্বালা করি অনুভব;
তৃষিত অন্তর মোর: আক্ষেপের বন্যা উতরোল।
নির্মম এ সংসারের দীনতাকে
দূরে রেখে ঠেলে,
আশ্রয় যে নেব তব কোলে,
হে কাব্যকলা—স্বপ্ন জানি সব।
খণ্ড খণ্ড মৃত্যু দিয়ে গ্রন্থিত জীবন মাঝে
কোথা অবসর?
দীপান্বিতা রাত্রির রোশনাই নেই
আঁধারে আঁধার।
জানি আমি বুঝি সব
তবু ছেঁড়ে বন্যার বাঁধন
কেটে যায় কোথা দিয়ে, কোন দিন যদি
তোমার আলয়ে,—বিবশ প্রহর:
নিষ্ঠুরা নিয়তি মোর সময়ের হিসাব-রক্ষক
শোধ দিতে হয় পরে স্তূপীকৃত দেনা।
গোধূলির রক্তরাগ শেষে, সন্ধ্যার বিষাদ নামে
রাত্রি আসে জীবনে আবার।

শীতের পাতার মতো হরিদ্রাভ দিন সব
ঝরে যায়,
বিষণ্ণ মৃত্যুর মুখে।
দাগ তো কাটে না কোনো।
পরিমিত আয়ু:
জর্জরিত জীবনের প্রবাহের মাঝে
জাগ্রত চেতনা আজো তাড়া দেয়
—পশুর উল্লাস নিয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুর সামিল-
তাই আমি হাতড়াই পথ।
আলো কোথা আলো চাই আলোর কাঙাল।
সূর্য সম দীপ্ত তেজে দিগন্তকে উদ্ভাসিত করি
যুগ হ'তে যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে,
মুছায়ে দিয়াছে যাঁরা কলুষ-কালিমা
সম্মুখে তো আছে জানি
সেই শত সূর্যসেনা সব।
তবুও পাব না কেন আকণ্ঠ করিতে পান
আলোকের সুধা
নিশি-পাওয়া পথিকের মতো
কেন বল, অন্ধকারে হারা জীবন!

হে ঈশ্বর, তাই যদি বাসনা তোমার
চেতনাকে মৃত করে কেন তুমি পাঠালে না মোরে?

দণ্ডী বিরচিত

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

অষ্টম উচ্ছ্বাস

(শেষাংশ)

স্ত্রীসংসর্গ, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া যদি মহাব্যসন না হয়, তাহলে মানতেই হবে "পান" ও দোষ নয়। অসম্ভব গুণপ্রসূ এই মদ্য পান। নানাবিধ ব্যাধিকে নিরাময় করতে আসবের মত পটু ঔষধ বড় একটি দেখা যায় না, আসবসেবনই নিয়ে আসে জীবন-যৌবনের স্পৃহনীয়তা। পান করো,—বুদ্ধিতে জাগবে অহঙ্কার, তিরস্কৃত হবে দুঃখের মলিনতা! পান করো,—অঙ্গে জ্বলবে অনঙ্গের দীপ, বৃদ্ধি পাবে উপভোগের শক্তি, তৃপ্ত হবে অঙ্গনারা। পান করো,—তুমি মার্জ্জনা করে দেবে বিশ্বদোষ, তোমার মন থেকে উন্মূলিত হয়ে যাবে যন্ত্রণার কণ্টক। পান করো—দেখবে, তুমি অনর্গল প্রলাপ বকৃছ বটে, কিন্তু সে প্রলাপে নেই কপটতা, তোমার উপর বিশ্বাস বেড়ে যাবে লোকের। পান করো,—ভুলে যাবে হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য, উপভোগ করবে অনাবিল আনন্দের একতানতা। পান করো—অখণ্ডভাবে অনুভব করবে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের ক্রিয়াকলাপ। সংবিভাগশীলতার কৃপায় মিলনের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে সংখ্যাতীত সুহৃদ্। মহারাজ, কত আর বোঝাব আপনাকে মাদকতার মহিমা! এরই মহিমায় অনুপম হয় অঙ্গের লাবণ্য, অনুস্তরণ হয় বিলসিত চেষ্টা। সংগ্রামের সময় পান করো মন্ত, দেখবে, কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেছে মৃত্যুভয়, মৃত্যুযন্ত্রণা; তার বদলে চিত্তের মধ্যে এসেছে সাংগ্রামিকত্ব, সংগ্রামের ক্ষিপ্রক্ষুধা।

বাক্-পারুষ্য, দারুণ দণ্ড-পারুষ্য, অর্থ-দূষণ—এই তিনটি তথাকথিত মহাব্যসনকে যদি অবকাশ বুঝে কাজে লাগানো যায়,—তাহলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় এদের উপকারিতা। মুনি-ঋষিদের মত শান্তি আর বৈরাগ্যের গৌরব উপভোগ করবার জন্ত জন্মগ্রহণ হয়নি রাজাদের। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য শত্রুনাশ এবং লোকতন্ত্রের অবলম্বন।" চন্দ্রপালিতের এই মতবাদ সকলে বাহবা দিয়ে গ্রহণ করল। এ যেন গুরুর উপদেশ।

দেখতে দেখতে সেই মতবাদের অনুসারিণী হোলো প্রজা! বিশৃঙ্খলতার সঙ্গে সেবন করতে লাগল মহাব্যসন। সকলেই সেবা করছে,—কাজেই সকলেই হোলো সমানদোষী, কাজেই কে কার আর খুঁজে বেড়ায় ছিদ্র! যেমন রাজা তেমন প্রজা,—সুতরাং তন্ত্রাধ্যক্ষেরা (Departmental Heads) নির্ব্বিবাদে ভোজন করতে লাগলেন নিজের নিজের কর্ম্মফল।

দেখতে দেখতে রাজা অনন্তবর্ম্মার বিশীর্ণ হয়ে এল আয়-দ্বার। বিট-মহাশয়দের প্রাধান্য এবং প্রভুত্ববশতঃ দিন দিন হাঁ হয়ে যেতে লাগল ব্যয়ের মুখ। সকলের সঙ্গে রাজা সমান ব্যবহার করেন, সকলের উপরেই তাঁর সমান বিশ্বাস—কাজেই লজ্জার কোনো কারণ নেই, বাধার কোনো কারণ নেই, নিজেদের স্ত্রীদের নিয়ে সামন্তেরা এবং প্রধান প্রধান নাগরিকেরাও যোগ দিতে লাগলেন রাজার পানগোষ্ঠীতে, অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন তাঁর স্বেচ্ছাচারের। নরেন্দ্রও তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে ছলে-কৌশলে লিপ্ত হয়ে উঠলেন গুপ্ত প্রমোদের যথেচ্ছ ভোগে। রাজার অন্তঃপুরিকারাও ভোগের এই সব আদর্শ দেখে মোহিত হয়ে গেলেন, অবলম্বন করলেন ভিন্নপথ, ভিন্নবৃত্তি। ভেঙ্গে গেল তাঁদের ভয়; গর্হিত সুখের বিলাসে ভাসিয়ে দিলেন গা। ইতরলোকের ভাবভঙ্গি ও ভাষা, ব্যবহার করতে লাগলেন কুলাঙ্গনারা, কোথায় ভেসে গেল তাঁদের ভদ্রচারিত্র্য। তৃণজ্ঞান করতে লাগলেন স্বামীদের, ধাত্রীদের জায়েরা হোলো তাঁদের মন্ত্রণাদায়ক। এই মূল থেকে গজিয়ে উঠল অমর্ষ ও কলহের বিষবৃক্ষ। যাঁরা বলশালী তাঁরা আঘাত করতে লাগলেন, পিষে মেরে ফেলতে লাগলেন দুর্ব্বলদের। দেশের সর্ব্বত্র দস্যুবৃত্তি বাড়ল, যাদের ধন আছে অপহৃত হতে লাগল তাদের ধনসঞ্চয়, সকলেই চলতে লাগল পাতক-পথে, কারণ বাধা দেবার উপায়গুলি এখন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রজাদের দিকে চাইলেই দেখতে পাওয়া যেত এর ফল। কারোর ধন গেল, বন্ধু মরল, কেউ শূলে চড়ল, কারোর বা হোলো কারাবাস। কণ্ঠে কাঁপল আর্ত্ত চীৎকার, চোখে ঝরল জল। অযথা প্রণীত হতে লাগল দণ্ড, নিয়ে এল ত্রাস, নিয়ে এল ক্রোধ। অর্থ-কৃশ কুটুম্বেরা লোভী হয়ে উঠল। যাঁরা তেজ দেখাতে গেলেন তাঁদের অপমান-লাঞ্ছনার ইয়ত্তা রইল না। মান নিয়ে তাঁরা

পুড়তে লাগলেন। চলিৎ হয়ে উঠল গোপন ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা, দুষ্কর্ম্মের অভিসন্ধি।

এই বিপর্য্যয়ের সুযোগ নিয়ে এবং বিদর্ভ জনপদকে উপক্রুত করবার অদম্য বাসনায় অশ্মকেশ্বর বসন্তভানু কিন্তু নানান্ গূঢ় কর্ম্মে নিযুক্ত করে দিলেন তাঁর গুপ্তচর ও বিশ্বস্ত সৈন্তদের। প্রথমে তারা মৃগ-বাহুল্যের প্রতিরোধ করবার অজুহাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল বিদর্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃগদাবগুলিতে; অদ্রি-শ্রেণীর স্থানে স্থানে, বহির্নিষ্ক্রমণের পথগুলির মুখে মুখে, শুষ্ক তৃণ এবং বংশগুল্মের বড় বড় কূট রচনা করে লাগিয়ে দিল আগুন; অনেক সুখী নাগরিককে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর শিকার-বিলাসে প্রোৎসাহিত করে বাঘের মুখে ফেলে খাইয়ে মারল; ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্ত অনেক শিকারীকে মিথ্যা জলাশয় বা কূপের সন্ধান দেখিয়ে, দূরে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রাণহানি করতে ছাড়ল না; বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়ে গুল্ম-তৃণের আচ্ছাদনে ফাঁদগুলিকে গূঢ়-চ্ছন্ন করে হঠাৎ-পাতনের আঘাতে অনেককে পাঠাল যমালয়ে। পায়ের কাঁটা তুলে দিচ্ছি—এই ছল করে, বিষমুখো ক্ষুরের ব্যবহারে অনেককে করল চির-নিষ্কণ্টক। যে সব মৃগয়া-বিলাসী সঙ্গছাড়া বা একাকী হয়ে পড়তেন তাঁদের খুন করতেও দ্বিধা করল না। মৃগদের বাণবিদ্ধ করছি এই অভিনয় দেখিয়ে হঠাৎ তারা সেই বাণ দিয়েই বিদ্ধ করল মৃগয়াসুখী নাগরিকদের; বাজী ফেলে অনেককে দুর্গম অদ্রি-শৃঙ্গে চড়িয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মারল। বনচর এবং আটবিকদের ছদ্মবেশে সৈনিকদের ছোট ছোট দলগুলিকে ঘেরাও করে বন্দী করে ফেলল। অশ্মকেশ্বরের লোকেরা আরও কত যে অবলম্বন করেছিল উপায়,—তার ইয়ত্তা নেই। কোথাও পাশা খেলা হচ্ছে, কোথাও পাখীর লড়াই হচ্ছে, কোথাও বা যাত্রা-উৎসব ইত্যাদি হচ্ছে,—হঠাৎ সেখানে অনেকে মিলে প্রবেশ করে ঘটিয়ে দিত খুনোখুনি ব্যাপার। হিংসা উৎপাদন করিয়ে, এক নাগরিককে দিয়ে অন্য নাগরিককে খুন-জখম করিয়ে তবে তারা ছাড়ত। এই চরেরা ছিল ফন্দি-পারদর্শী। দেশের মাথা মাথা লোকেদের নামে গোপনে রটিয়ে দিত কুৎসা, প্রকাশ করত বহু লোককে জড়িয়ে বিশিষ্ট অপ্রিয় অপবাদ, মুদ্রা দিয়ে ক্রয় করে সৃষ্টি করত মনগড়া সাক্ষী, তারপরে ঐ সব কুকীর্ত্তির গুপ্তিকগণের উদ্দেশ্যে তাদেরি উপরে ফলিয়ে দিত গুপ্ত-ঘাতকের পরাক্রম। পরস্ত্রীদের সঙ্গে মিলিয়ে দিত লম্পট জারদের; সেই সংবাদ গোপনে জানাত স্বামীদের; তারপরে হয় স্বামি-হত্যা, নয় জার-হত্যা; সারা দেশময় কুখ্যাতির বিখ্যাপ।

বিশ্বাসঘাতিনী যোগনারীদের নিয়োগ করে সহৃদয় নাগরিকদের ভুলিয়ে নিয়ে আসাত সঙ্কেতস্থানে, সেখানে প্রথম থেকেই লুকিয়ে থাকত নিজেরা, তারপরে খুন,—ধামা চাপা পড়ে যেত প্রমাণ-সমেত এই অকথ্য অকীর্ত্তি। ঐশ্বর্য্য-রত্নের সন্ধান দেখিয়ে প্রলোভনে ফেলে, তারা অনেককে ভুলিয়ে নিয়ে আসত খনি-পরিদর্শনে, বা জনহীন গোপন গহ্বরে, বা মন্ত্রসাধন-স্থানে,—তারপরে প্রকাশ করে দিত, তাঁদের ঘটেছে আকস্মিক মৃত্যু। পাগলা হাতীতে চড়া নিয়ে, বা দুষ্টু হাতীকে রাগিয়ে দিলে সে বেটা কোন্ মুখে বা কোন্ মণ্ডলে ঘুরবে—এই সব নিয়ে বাজী ফেলে ঝগড়ার সৃষ্টি করে হত্যার পথ করত পরিষ্কার। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দায়াদ-ভাগ নিয়ে সহজ বিবাদের সৃষ্টি করে, একজনকে হত্যা করে অন্তের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত হত্যার দায়। সামন্ত এবং পুরজনদের মধ্যে যারা তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করত না, তাদের গুপ্তহত্যা করত; এবং দোষী বলে নাম ঘোষণা করে দিত মৃতব্যক্তির শত্রুদের। ব্যভিচারিণী যোগ্যাঙ্গনা জুটিয়ে দিয়ে, শিথিলমস্তিষ্কদের মধ্যে এনে দিত রাজযক্ষ্মা।

বস্ত্র, অলঙ্কার, ফুল, চন্দন এবং অঙ্গরাগে, কৌশলে বিষরস মিশিয়ে দিয়ে অনেককে পাঠাতে লাগল পরলোকে।

এমন কি চিকিৎসক সেজে রোগবৃদ্ধি করিয়ে পুরজনদের মৃত্যুমুখে পাঠাতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।

অভাবনীয় কৌশল, অজস্র অভিচার, ও নানান্ বীভৎস ফন্দীর ফাঁদে ফেলে বসন্তভানুর প্রেরিত তীক্ষ্ণরসদেরা (poisoners) ও গুপ্তঘাতকেরা ধীরে ধীরে জর্জ্জরিত করে দিল অনন্তবর্ম্মার কটক এবং শীর্ণ করে আনল বীরদের সংখ্যা।

যখন বসন্তভানু দেখলেন অনন্তবর্ম্মার রাজ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে বিপুল বিশৃঙ্খলা, তখন বানবাসিক সামন্তরাজ ভানুবর্ম্মাকে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্রোৎসাহিত করলেন। কিন্তু অনন্তবর্ম্মা দমন করলেন সে বিদ্রোহ। নিজের রাষ্ট্রকে শত্রুপরামৃষ্ট হতে দেখে অনন্তবর্ম্মা সকলকে শাসন করার অভিপ্রায়ে সমুত্থান করতে লাগলেন সৈন্তবল। সমস্ত সামন্তের মধ্যে অশ্মকেন্দ্র বসন্তভানুই তখন সর্ব্বপ্রথমে সাহায্যদানের অভিনয় কোরে উপনীত হলেন রাজার চরণপ্রান্তে এবং প্রিয়তর হয়ে উঠলেন। কিন্তু সংগ্রাম করতে লাগল অন্য সামন্তেরা। তাদের বিরুদ্ধে নর্ম্মদানদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করলেন অশ্মকরাজ।

বাইরে যখন সাংগ্রামিকতা চলেছে, তখন রাজা অনন্তবর্ম্মা নৃত্তকলা দেখছিলেন এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নর্ত্তকীর। কুন্তলপতি মহাসামন্ত 'অবন্তিদেবে'র আত্ম-নাটকীয়া অঙ্গনা ছিল এই প্রশস্ত নৃত্যকুশলা নর্ত্তকী। পৃথিবীর উর্ব্বশী বলে মনে হত তাকে। কুন্তলপতি যখন রণাভিযানে ব্যাপৃত, তখন সেই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে চন্দ্রপালিতকে দিয়ে নর্ত্তকীকে আহ্বান করে আনিয়েছিলেন রাজা অনন্তবর্ম্মা। অতিরঞ্জনের আবেশে একাঙ্কিনী করেছিলেন মধুমত্তা নর্ত্তকী উর্ব্বশীকে।

অশ্মকেন্দ্র বসন্তভানু তখন কুন্তলপতিকে একান্তে আহ্বান করে বললেন—"বন্ধু, রাজাটি ত প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন, আমাদের বৌ-ঝি নিয়ে সুরু করেছেন লীলা-খেলা! কতকাল আর সহ্য করা যায় এই অবজ্ঞা? একশত হস্তী আছে আমার, আপনার আছে পাঁচশত। আমাদের উভয়-শক্তির সঙ্গে, আসুন আমরা চেষ্টা করে মিলিত করি মুরলেশ 'বীরসেন'কে, ঋষীকেশ্বর 'একবীর'কে, কোঙ্কণপতি 'কুমারগুপ্ত'কে, এবং নাসিক্যনাথ 'নাগপাল'কে। নিশ্চিত তাঁরা আমাদের দলে আসবেন, সহায়তা করবেন। বলুন, কে সহ্য করতে পারে এই রকমের অবিনয়? বানবাস্ত 'ভানুবর্ম্মা' আমার পরম মিত্র। সমরের পুরোভাগে থেকে এই দুর্বিনীত অনন্তবর্ম্মাকে যখন আঘাত করবেন ভানুবর্ম্মা তখন আমরাও আঘাত করব পৃষ্ঠদেশে। কোশবাহন আমরা বিভাগ করে নেব।"

প্রস্তাবে সম্মত হলেন কুন্তলপতি। অশ্মকেন্দ্র তখন রাত্রিতেই হৃষ্টচিত্তে সামন্তদের নিকটে পাঠালেন নিজের আপ্তজন, এবং সঙ্গে পাঠালেন উপঢৌকন;—থালথাল বিংশতি বরাংশুক, পঞ্চবিংশতি কাঞ্চন-কুঙ্কুম-কম্বল। শুভমন্ত্রণার শেষে তাঁরা সকলেই অনুমোদন করলেন বসন্তভানুর অভিমত। তার পরের দিন যখন প্রভাতে জ্বলে উঠল যুদ্ধের আগুন, সামন্ত বানবাস্য ইত্যাদিদের মিলিত বাহিনীর সম্মুখে আমিষ হয়ে গেলেন অনন্তবর্ম্মা।

বলতেই হবে, দণ্ডনীতি বা নয়শাস্ত্রের উপর বিদ্বেষই তাঁর এই পরাজয়ের একমাত্র হেতু। বসন্তভানু কিন্তু অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রাজার অবশীর্ণ কোশবাহন নিজের অধিকারে এনে ফেললেন এবং সামন্তচক্রের নিকটে প্রকাশ্যে বললেন—"আপনার যথাবল এবং যথাপ্রয়াস বিভাগ করে গ্রহণ করুন কোশবাহন। আপনাদের অনুজ্ঞা অনুসারে আমি যে, যে-কোন একটি সামান্য অংশ গ্রহণ করে তুষ্ট থাকব, তা হতেই পারে না।"

শাঠ্যের আবরণে নিজেকে অন্তরালে রেখে, বসন্তভানু এই ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে সামন্তদের মধ্যে বাধিয়ে দিলেন উগ্র কলহ এবং একে একে তাদের ধ্বংস করে স্বয়ং গ্রাস করে ফেললেন সামন্তদেরও সর্বস্ব। বানবাস্যকে যৎকিঞ্চিৎ একটি অংশ-দানের অনুগ্রহ দেখিয়ে আত্মসাৎ করলেন অনন্তবর্ম্মার সমস্ত রাজ্য।

এই অব্যবস্থার মধ্যেও, মন্ত্রিবৃদ্ধ বসুরক্ষিত কিন্তু মৌলমন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সরিয়ে ফেলেছিলেন এই রাজপুত্র বালক 'ভাস্করবর্ম্মাকে,' এর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ত্রয়োদশবর্ষীয়া 'মঞ্জুবাদিনীকে', এর মাতা মহাদেবী 'বসুন্ধরা'কে। কিন্তু আপৎকালের ভাবনা-চিন্তার বৃদ্ধের হয় দাহজ্বর, তিনি দেহরক্ষা করেন। মহাদেবীর মিত্ররা তখন অনন্তবর্ম্মার বৈমাত্রেয় ভাই মিত্রবর্ম্মার কাছে মাহিষ্মতী নগরীতে নিয়ে যান পুত্রকন্যাসহ মহাদেবীকে। মিত্রবর্ম্মা তাঁদের স্থান দেন। কিন্তু অনার্য্য সেই মিত্রবর্ম্মা আর্য্যার প্রতি অন্যথা-ব্যবহার করতে চায়। অখণ্ডচরিত্রা মহাদেবীর ভর্ৎসনায় ক্রোধান্ধ হয়ে মিত্রবর্ম্মা খুঁজতে থাকে প্রতিহিংসার পথ। তার দৃষ্টি পড়ে রাজার্হ এই বালকটির উপরে। একে হত্যা করে পথ পরিষ্কার করবার স্থিরসঙ্কল্প করে। চক্রান্তটি জানতে পেরে দেবী আমাকে স্নেহ করে আদেশ দেন—"নালীজঙ্ঘ, আমার এই ছেলেটিকে এমন কোথাও নিয়ে যাও, যেখানে পৌঁছতে পারবে না এদের ক্রূর হস্ত। ওকে বাঁচাও। আমি যদি বাঁচি, তোমাদের অন্বেষণ করব। দয়া করে আমাকে জানিও তোমাদের কুশল সংবাদ।"

ষড়যন্ত্র-সঙ্কুল সেই রাজকুল থেকে আমি কোনক্রমে এই ছেলেটিকে উদ্ধার করে অন্তর্ধান করি বিন্ধ্যাটবীর গহনতায়। বেচারী ছেলেমানুষ, চলতে কষ্ট পায়, আশ্বাস দিতে দিতে, কথায় ভুলিয়ে, এখানে দুদিন, ওখানে দুদিন—বিশ্রাম নিতে নিতে লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে চলেছি। লেগে আছে নিত্য ভয়, কখন না জানি রাজপুরুষেরা আমাদের উপর চড়াও হয়। আজ অনেক দূর পথ হেঁটে এসেছি, নিদারুণ পিপাসায় আর্ত্ত হয়ে এইখানে ঐ কুয়োটিকে দেখে জল তুলতে যাই। এমনিই ভবিতব্য, পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম কুয়োর মধ্যে। আপনার যদি হঠাৎ এখানে উদয় না হত, যদি অনুগ্রহ না পেতুম তাহলে আমার এই রাজার ছেলেটির কী যে দশা হত ভাবতেও ভয় হয়। শরণহীনদের আপনিই এখন সম্বল।"

এই বলে নালীজঙ্ঘ অঞ্জলি রচনা করল তার শীর্ণ দুখানি হাতে। "আচ্ছা, এঁর মাতা কোন্ জাতির মেয়ে।"—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে বললে—"পাটলিপুত্রের বণিক 'বৈশ্রবণে'র দুহিতা 'সাগরদত্তা'র সঙ্গে বিবাহ হয় কোশলেন্দ্র 'কুসুমধন্বা'র। তাঁদের কন্যাই এই রাজপুত্রের মা।"

সস্নেহে আমি তখন ছেলেটিকে আলিঙ্গন করে বললুম, "তাই যদি হয়, তাহলে এঁর মা ও আমার পিতার একই মাতামহ।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল—'সিন্ধুদত্ত'—মহাশয়ের পুত্রদের মধ্যে কোনটি আপনার পিতা!"

"সুশ্রুত"।

আনন্দের আতিশয্যে আমি তখন প্রতিজ্ঞা করে ফেললুম—

"দণ্ডনীতির অবলেপের আশ্রয় নিয়ে যখন অনর্থ ঘটিয়েছে—ঐ অশ্মকেন্দ্র, আমিও তখন ঐ দণ্ডনীতিরই প্রয়োগ করে উন্মূলিত করব ঐ ধূর্ত্তকে, তারপরে প্রতিষ্ঠাপিত করব এই বালককে ওর পৈতৃক রাজ্যপদে।"

কিন্তু তারপরে চিন্তা এল। জল ছিল, পিপাসা মিটিয়েছি; এখন কেমন করে মেটাই আমাদের ক্ষুধা। চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি,—এমন সময় দেখি জনৈক ব্যাধের তিন-তিনটি বাণকে অতিক্রম করে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল দু-দুটো হরিণ। পিছনে পিছনে এল ব্যাধ। ব্যাধের হাত থেকে তার কোদণ্ডটি (কাঁড়) কেড়ে নিয়ে অবশিষ্ট দুটি বাণ দিয়ে অবর্থ-সন্ধানে বধ করলুম সেই হরিণ দুটোকে। একটি বাণ পুঙ্খ পর্য্যন্ত প্রবেশ করল, অন্য বাণটি নিষ্পুঙ্খ হয়ে দেহ বিদ্ধ করে বেরিয়ে গেল। আমি তখন একটি শিকার ব্যাধকে দিয়ে দিলুম। অন্যটির খাল ছাড়িয়ে লোম পর্য্যন্ত পরিষ্কার করে ফেললুম। ক্লোম, গাঁট, গুলি,— ইত্যাদি বেশ ভালো করে কেটে বার করে দিয়ে ঠ্যাঙ, ঘাড়, দাবনা ইত্যাদিকে যথারীতি খণ্ড খণ্ড করে শূলে বিঁধলুম। কাঠ এনে আগুন জ্বালিয়ে তপ্ত করে নিলুম শূল্য মাংস। তারপরে, আঃ, প্রাণভরে আশ মিটিয়ে মেটালুম আমাদের সকলের নিদারুণ ক্ষুধা। রন্ধন-কার্য্যে আমার সৌষ্ঠব দেখে আহ্লাদে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল কিরাত—তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওহে, মাহিষ্মতীর খবর কিছু রাখ?"

"রাখি না আবার! এই ত মশাইরা, সেখান থেকেই আসছি। আজই ত সেখানে বিক্রী করে এসেছি বাঘের খান কয়েক ছাল,—চামড়ার মসক (দৃতিঃ)। চণ্ডবর্ম্মার ছোট ভাই, ঐ যার নাম কি না 'প্রচণ্ডবর্ম্মা'—তিনি নাকি আসছেন মিত্রবর্ম্মার দুহিতা মঞ্জুবাদিনীকে বিবাহ করবার লোভে; তাই উৎসবে মেতে উঠেছে পুরী।"

কিছুক্ষণ পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল কিরাত। আমি বৃদ্ধ নালীজঙ্ঘকে কানে কানে বললুম, "মিত্রবর্ম্মা বড় ধূর্ত্ত, মঞ্জুবাদিনীর

উপর তার এসেছে অগাধ প্রতিপত্তি। তাকে দিয়েই বিশ্বাস জন্মাতে চায় তার মায়ের মনের মধ্যে। তাকেই মুখপাত করে ফিরিয়ে আনতে চায় বালকটিকে,—অবশ্য খুন করাটাই শেষ উদ্দেশ্য। আপনি এক কাজ করুন—আপনি ফিরে যান। দেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে গোপনে নিবেদন করবেন বালকের কুশল এবং আমার কথা, তারপরে প্রকাশ্যে রটনা করে দেবেন 'রাজপুত্রকে বাঘে খেয়েছে'। দুষ্ট রাজা নিশ্চয় মনে মনে অত্যন্ত খুশী হবেন, কিন্তু বাইরে দেখাবেন দুঃখের আতিশয্য, দেবীকে সান্ত্বনা ইত্যাদি বাক্যে অনুনয় করবেন, এ সুযোগ তিনি ছাড়বেন না। দেবীর মুখ দিয়ে আপনি তখন তাঁকে বলাবেন "আপনার কথা অগ্রাহ্য করেছিলুম, উপেক্ষা করেছিলুম—সেই পাপেই নিশ্চয় আমার ছেলেকে যেতে হয়েছে পরলোকে। এখন থেকে আমি আপনার আদেশকারিণী হয়ে রইব।" এই কথায় মিত্রবর্ম্মা হাতে পাবেন স্বর্গ।

দেবীর হাতে তখন আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে "বৎসনাভ" নামক মহাবিষ। জলে সেই মহাবিষটি মিশিয়ে, তিনি যেন একগাছি পুষ্পমাল্য ডুবিয়ে নেন সেই জলে। তারপরে সেই বিষাক্ত মাল্য দিয়ে আঘাত করতে হবে মিত্রবর্ম্মার বক্ষ, মিত্রবর্ম্মার মুখ। ঠিক তারপরেই যেন মালাখানি আবার পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে ধুয়ে, সমর্পণ করে দেন নিজের কন্যা মঞ্জুবাদিনীর হস্তে। মিত্রবর্ম্মা মারা যাবে। দেবী যেন তখন থাকেন নির্বিকার। প্রজারা তাঁর সতীত্বের প্রশংসা করবে, কিছুতেই কারোর মনে সন্দেহ জাগবে না যে তিনিই প্রাণঘাতিনী।

এদিকে আপনি তখন উপস্থিত হয়ে যাবেন প্রচণ্ডবর্ম্মার কাছে। তাঁকে বোঝাবেন—"অনায়ক হয়েছে রাজ্য;—রাজ্যের সঙ্গে বালিকা মঞ্জুবাদিনীও আপনার গ্রহণীয়া।" আমরা দুই ভাই-এ ততদিন কাপালিকের ছদ্মবেশে পুরীর বাইরে শ্মশানের নিকটেই বাস করব—দেবী আমাদের ভিক্ষাদান করে যাবেন প্রতিদিন। যখন সুসম্পন্ন হবে এই সব ব্যবস্থা তখন দেবী যেন গোপনে একদা আহ্বান করেন আর্য্যপ্রায় প্রৌঢ়বৃদ্ধদের, আপ্তজনদের, মন্ত্রিবৃন্দদের; যেন তাদের বলেন,—

"আমার পূজায় প্রসন্না হয়ে দেবী বিন্ধ্যবাসিনী অন্ত আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। তাঁর স্বপ্নবাণী এই—"আজ থেকে চতুর্থ দিনে প্রচণ্ডবর্ম্মার মৃত্যুযোগ। পঞ্চম দিনে রেবানদীর তীরবর্ত্তী আমার মন্দিরে, পূজারীরা পরীক্ষার পর নির্জ্জন মন্দির পরিত্যাগ করলে, কপাট খুলে যাবে;—তোমার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে উদ্‌ঘাটিত দ্বারপথে নির্গত হবেন একটি দ্বিজকুমার। সেই দ্বিজকুমারই অনুপালন করবেন এই রাজ্য এবং তোমার পুত্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করবেন রাজপদে। ব্যাঘ্রীর রূপ ধরে, আমি তোমার পুত্রকে তাড়িয়ে নিয়ে, স্থাপন করেছি সঙ্গোপন-প্রদেশে। তোমার কন্যা মঞ্জুবাদিনী সেই ব্রাহ্মণকুমারের হবে পত্নী—এই আমার কল্পনা।" আপনারা এই স্বপ্নাদেশ-প্রসঙ্গ গুপ্ত রাখবেন এবং কি ঘটে তা দেখে আশা করি যথাবিহিত করবেন ব্যবস্থা।"

নালীজঙ্ঘ অত্যন্ত প্রীত হয়ে প্রস্থান করল মাহিষ্মতী-নগরীর অভিমুখে। সুচারুভাবে আমার আদেশ পালন করতে তার বিলম্ব ঘটল না। লোকের মুখে মুখে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এই অদ্ভুত ঘটনার অভিব্যক্তি। আহা, পতিব্রতার কী অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! মাল্যপ্রহার তো নয়, এ যে একেবারে অসিপ্রহার। এর মধ্যে উঠতেই পারে না শঠতা বা কপটতার কূট কথা। অসম্ভব। তাই যদি হবে, তাহলে মেয়েটাও তো মরত, সে তো সেই মাল্য নিয়েই মণ্ডন করেছিল নিজের স্তন। পতিব্রতার শাসন যে পাষণ্ড মানে না, তাকে বাবা, হতেই হবে ছাই।"

তারপরে, মহাব্রতি-বেশে আমাকে এবং তাঁর পুত্রকে ভিক্ষার নিমিত্ত প্রবিষ্ট হতে দেখে, প্রস্তুত হচ্ছে বক্ষঃক্ষীর, প্রত্যুত্থান করে হর্ষকলকণ্ঠে দেবী বললেন, "ভগবান্ তোমাকে পাঠিয়েছেন, গ্রহণ করো আমার অঞ্জলির বিরচন। অনুগৃহীত করো এই অনাথাকে। আমার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়েছে। সে স্বপ্ন সফল না বিফল?"

আমি বললুম, "স্বপ্নফল অদ্যই দেখতে পাবেন।"

"যদি তাই হয়, আমার মত দাসীর তা বহু ভাগ্য। সেই স্বপ্নে রয়েছে আমার এই মেয়েটির বিবাহের আশংসা।"

কন্যাটির দিকে চেয়ে দেখলুম। মনে তো হোলো, মঞ্জুবাদিনীর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছে মুখ। তাকে দিয়ে আমাকে প্রণাম করিয়ে পুনর্ব্বার হর্ষগর্ভ বাক্যে দেবী বললেন—"যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তোমাদের এই শিশু-কাপালিককে কাল আমি আটক করব।"

"হ্যাঁ, তাই হবে।"—এই বলে সত্বর গ্রহণ করলুম ভিক্ষা। আমার ধৈর্য্য তখন বারণ মানছিল না; মঞ্জুবাদিনীর অনুরাগ-ভরা দীর্ঘ নয়নের কটাক্ষ আমার ধৈর্য্যের যেন আস্বাদন করছিল রস এবং আমি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছিলুম। নালীজঙ্ঘের সঙ্গে আমরা বেরিয়ে এলুম। তিনি ধীরপদক্ষেপে পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন। প্রশ্ন করলুম, "সেই প্রসিদ্ধ অল্পায়ুঃটি—সেই প্রচণ্ডবর্ম্মাটি কোথায়?"

উত্তর পেলুম—

"'রাজ্য এখন আমার'—এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে নিঃশঙ্কে এখন সমাসীন হয়ে আছেন রাজস্থানমণ্ডপে। উপাসনা ভোগ করছেন কুশীলবদের।"

"তাই নাকি, তাহলে এই উদ্যানেই আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।"—বৃদ্ধ নালীজঙ্ঘকে এই আদেশ দিয়ে রাজপুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি প্রস্থান করলুম। প্রাকারের একপার্শ্বে বিদ্যমান ছিল একটি ছোট শূন্য মঠ। সেইখানে খুলে ফেললুম আমার রাজকীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পরলুম কুশীলবের বেশ, ধরলুম তাদের ভেক। রাজপুত্রকে পরিচ্ছদাদি রক্ষায় নিযুক্ত রেখে প্রচণ্ডবর্ম্মার সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অনুরঞ্জন করতে লাগলুম গীতের এবং পদাবলীর কীর্ত্তন-মাধুর্য্যে।

দেখতে দেখতে গড়িয়ে এল বেলা। অস্তসূর্য্যকে দেখতে হোলো—রক্তসিক্ত মাংসপিণ্ডের মত লাল। জনসমাজের উপযোগী আরম্ভ করে দিলুম নৃত্য। স্তম্ভিত হয়ে সকলে দেখতে লাগল নৃত্য, শুনতে লাগল গান। পশুপক্ষীর ডাকের কত রকম যে অনুকরণ করলুম ডাক, তার ঠিকানা নেই। আর সে কি যে-সে নাচ?

আকাশে পা, মাটিতে দুটি হাত রেখে চক্রাকারে নাচলুম 'হস্তচংক্রমণ'; হাত দিয়ে মাটি ছুঁয়ে, পা দিয়ে আকাশ চিরে,

মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে দিলুম 'উদ্ধপাদ'-করণ ; তার পরে এক পা উদ্‌ধৃত ক'রে এবং অন্য পা'টিকে কুঞ্চিত করে তির্য্যক্‌ গতিতে নেচে দেখালুম 'অলাতপাদ'-করণ ; দক্ষিণ পাখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে লাগলুম পঞ্চতালে 'আলীঢ়'—স্থানক তারপরে স্বস্তিক-হস্ত দুটিকে হঠাৎ দ্রুতভ্রমী হংসপক্ষের মত বিপ্রকীর্ণ করে নেচে দিলুম 'বৃশ্চিক-রেচিত', পরে নাচলুম 'মকরলঙ্ঘন'-করণ। মাছের মত উল্‌টিয়ে-পাল্‌টিয়ে এঁকেবেঁকে প্রকাশ করলুম 'মৎস্যোদ্বর্ত্তন'-করণ। এবং সেই ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে, আসন্নবর্ত্তী পরিষদদের চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসী নাচ নাচতে নাচতে একে একে খুলে নিলুম তাদের ক্ষুরিকা। 'শ্যেনপাত' ও 'উৎক্রোশপাত' এই দুটি বিচিত্র এবং দুষ্কর নৃত্য, দেখাতে দেখাতে বিংশতি-চাপ দূরস্থিত প্রচণ্ডবর্ম্মার বক্ষদেশে সহসা ছুঁড়ে মারলুম একটি ক্ষুরিকা। আঘাত এবং মৃত্যুপতনের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার দিয়ে উঠলুম "বেঁচে থাক্‌ হাজার বছর বসন্তভানু"। পলকের মধ্যে একজন চারভটের হাতে লাফিয়ে উঠল তলোয়ার। আমাকে কাটবে নাকি! আমিই তার পুরুষ্ট কাঁধের মধ্যে বসিয়ে দিলুম আমার অস্ত্র। জ্ঞান হারিয়ে পড়তে না পড়তেই, আমি আকুল জনতার উচ্চকুম্ভ সামনে দিয়েই লাফিয়ে পার হয়ে গেলুম কুমারগৃহ-ভব প্রাকার। নেমে পড়লুম উপবনে। নালীজঙ্ঘকে বললুম—"আমার অনুসরণকারীরা এই পথেই আসবে।"

নালীজঙ্ঘ তখনি তাড়াতাড়ি বালির উপর আমার পরিস্ফুট পদচিহ্নগুলিকে সমান করে মিলিয়ে দিলেন। তমালগাছের বীথি দিয়ে প্রাকারের কোল ঘেঁষে আমরা ছুটতে লাগলুম পূর্ব্বদিকে। হঠাৎ দক্ষিণদিকে দেখি একটি পাঁচিল,—ইট খসে যাওয়াতে সিঁড়ির ধাপের মত হয়ে গেছে। সেই পথেই প্রাকার এবং পরিখা পার হয়ে যেতে বিশেষ কষ্ট হোলো না। শূন্য সেই ছোট্ট মঠটিতে এসে পৌছলুম। কুশীলবের বেশ পরিত্যাগ করে সাজ পরলুম কাপালিকের।

গতক্ষণে রাজদ্বারে তুমুল হয়ে উঠেছে কোলাহল। কুমারকে সঙ্গে নিয়ে অতিকষ্টে পথ ঠিক করে শ্মশানে এসে পৌছলুম। সেই দুর্গাগৃহে যেখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রতিমা, আগে থেকেই আমি একটি গহ্বর নির্ম্মাণ করে রেখেছিলুম সেখানে। স্থূল ভগ্নপার্শ্ব প্রস্তরের খণ্ডদ্বার দিয়ে স্থগিত করা হয়েছিল গহ্বরের মুখ। রাত্রি গভীর হয়ে এল। একটি বর্ব্বরকে দিয়ে সেখানে আনিয়ে নিলুম মহার্ঘ বস্ত্র, ভূষণ, পট্ট এবং নিবসন এবং আমি ও রাজপুত্র দুজনে গহ্বরে প্রবেশ করে বসে রইলুম নিস্তব্ধ।

আগের দিনই দেবী কিন্তু মালব প্রচণ্ডবর্ম্মার যথোচিত অগ্নিসংস্কার করিয়েছিলেন এবং চণ্ডবর্ম্মার কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, এই হত্যাকাণ্ডটি অশ্মকেন্দ্র বসন্তভানুরই কীর্ত্তি। পরের দিন প্রত্যূষেই পূর্ব্ব-সঙ্কেতিত পৌরামাত্য এবং সামন্তবৃন্দের সংগ্রহ করে ভগবতী বিন্ধ্যবাসিনীর অর্চ্চনা করতে দেবী উপস্থিত হলেন মন্দিরে। সকলের প্রত্যক্ষেই পরীক্ষিত হোলো মন্দির। মন্দির জনহীন এবং স্থির করে উপস্থিত সকলকার সমক্ষে মন্দিরের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করে দেবী আদেশ দিলেন—"পটহধ্বনি কর"। অনুতর রন্ধ্রপথে আমার কাছে ভেসে এল নাদ-সংজ্ঞা, আমি মাথা দিয়ে উৎক্ষিপ্ত করলুম প্রতিমা-সহ তাঁর লৌহপাদপীঠ। অনেক চেষ্টা করেও একটা মাংসল পুরুষেরও পক্ষে সেটি নড়ানো শক্ত। দুহাত দিয়ে সেটির এক পাশ তুলে ধরে অন্য পাশ দিয়ে আমি বাহির হয়ে এলুম। বিনির্গত করলুম কুমারকেও! তারপরে যেমনটি ছিল তেমনটি করে দুর্গা-প্রতিমাটি যথাস্থানে স্থাপিত করে, উদ্‌ঘাটিত করলুম মন্দিরের কপাট। সকলেই আমাদের দেখতে পেল। চোখ ঠেলে বিশ্বাস যেন বেরিয়ে এল, চামড়া ফুঁড়ে যেন ফুটে উঠল রোমাঞ্চ, রূঢ়বিস্ময় যেন রূপ ধরল সকলকার বক্ষ'গুলিতে। রাষ্ট্রের প্রজারা যেন এক প্রত্যক্ষ দৈব-বিস্ময়কে সাক্ষাৎ করল প্রণিপাত।

আমি তাদের বললুম—"

"দেবী বিন্ধ্যবাসিনী আমার মুখ দিয়ে এই আদেশ দিচ্ছেন আপনাদের।—'শার্দ্দূল-রূপ ধারণ করে যে বিপন্ন রাজপুত্রকে আমি তিরস্কৃত করি—এই সেই রাজপুত্র ;—তোমাদের হাতে একে আমি দিলাম। এর মাতৃপক্ষ দুর্ব্বল নয়, যেহেতু এ মৎপুত্র'—এই বিবেচনা করে আপনারা আজ থেকে এঁকে গ্রহণ করবেন। দুর্ঘটনার ঘনঘটা, শাঠ্য এবং নিষ্ঠুরতায় একনিষ্ঠ অশ্মকেন্দ্র বসন্তভানুর ঘন-ঘটন থেকে, মনে রাখবেন—এই রাজকুমারকে আমিই করেছি রক্ষা। রক্ষার নির্দেশ-স্বরূপ কুমারের সুন্দ্র ভগিনীকে আমায় সম্প্রদান করেছেন দেবী।" এই বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্রই সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল,—প্রীত প্রজাদের সে কি উচ্ছ্বাস! ভাগ্যবান বটে ভোজবংশ, যেখানে শোভমান আজ আর্য্যাদত্ত নাথ। মা দিয়েছেন।"

আমার শ্বশ্রূমাতার (মহাদেবী বসুন্ধরার) হর্ষাবস্থা তখন স্পর্শ করেছে অবাঙ্‌মনসগোচরত্ব। সেই দিনই তিনি যথাবিধি আনন্দোল্লাসের মধ্য দিয়ে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিলেন মঞ্জুবাদিনীর।

রজনীর নির্জ্জন গভীরতায় আমি ধীরে ধীরে গহ্বরটিকে প্রতিপূর্ণ করলুম,—সন্দেহের ছিদ্র রইল না কোথাও। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের মন ভরানো বড় দায়। আমি যে দেবতার অংশবিশেষ তার জন্য পরীক্ষা, প্রমাণ, পরিচয় সমস্তই দিতে হোলো আমাকে। আমাকে দেখাতে হোলো,—কী জিনিষ হারিয়েছ বা নষ্ট করেছ তা আমি বলে দিতে পারি ; কী আছে তোমার মুষ্টির মধ্যে ; কীই বা তুমি এখন চিন্তা করছ, তার বর্ণন—ইত্যাদি। শেষে নাগরিকেরা সমর্থন করলেন আমার দিব্যাংশতা এবং দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আজ্ঞা অমান্য করতে কেউ আর সাহসী হয়ে উঠল না। রাজপুত্রও যে আর্য্যাপুত্র—এ প্রসিদ্ধিও দেবীমাহাত্ম্যে বরণীয় হোলো সর্ব্বত্র। তারপরে একটি শুভদিন দেখে রাজপুত্রকে ভদ্রকরণের (মস্তকমুণ্ডন) পর পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠের মধ্যে সমাধা করালুম তার উপনয়নবিধি এবং লিপ্ত হয়ে পড়লুম রাজকার্য্যে। রাজকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পেয়ে বসল রাজ্যের চিন্তা। ভাবতে লাগলুম।

"ত্রিশক্তির আয়ত্তাধীন হচ্ছে রাজ্য। মন্ত্রশক্তি, প্রভাবশক্তি এবং উৎসাহশক্তি। রাজ্যকার্য্য চলে, যদি এই তিনটি শক্তি পরস্পর পরস্পরকে দেখায় অনুগ্রহ, এবং কার্য্যতঃ করে অনুগৃহীত। মন্ত্রশক্তি নিয়ে আসে অর্থ প্রাপ্তির বিনিশ্চয়তা, প্রভাবশক্তি আনে আরম্ভ এবং উৎসাহশক্তি নিয়ে আসে নির্বহন, অর্থাৎ হনন, উৎসাদন। সুতরাং রাজনীতি-রূপ এই বনস্পতির মূল হচ্ছে—পঞ্চাঙ্গমন্ত্র, অর্থাৎ

(১) সহায় (২) সাধনোপায় (৩) দেশবিভাগ (৪) কালবিভাগ এবং (৫) বিপত্তি-প্রতীকার-সিদ্ধি ; স্কন্ধ হচ্ছে বিরূপতা ও প্রভাব, অর্থাৎ (১) রাষ্ট্রের অর্থনীতি রূপ ও মানব-নীতি রূপ (২) সমৃদ্ধি ;

মূল হচ্ছে একটি—পঞ্চাঙ্গমন্ত্র। [অর্থাৎ (১) সহায়, (২) সাধনোপায়, (৩) দেশবিভাগ (৪) কালবিভাগ (৫) বিপত্তি প্রতীকার সিদ্ধি।]

স্কন্ধ হচ্ছে দুটি—বিরূপতা ও প্রভাব। [অর্থাৎ (১) সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক রূপ এবং (২) সমৃদ্ধ মানবতার রূপ।]

শাখা হচ্ছে চারটি—চতুর্গুণোৎসাহ। [অর্থাৎ দেহ, মন, ভাব এবং কর্ম্মের উৎসাহ।]

বৃক্ষপত্র হচ্ছে বাহাত্তর রকমের প্রজা—

[(১) মধ্যম (২) বিজিগীষু (৩) উদাসীন (৪) শত্রু etc.

See Tara Kumara Kaviratna's Key to Cal Univ. Course 1889. & Kautilya VI 2-97. Kamandaka XII 25.]

কিসলয় হচ্ছে—ষড়্‌গুণ। [অর্থাৎ (১) সন্ধি (২) বিগ্রহ (৩) যান (৪) আসন (৫) দ্বৈধ (৬) আশ্রয়।]

পুষ্প হচ্ছে—

শক্তি।

ফল হচ্ছে—

সিদ্ধি।

এই নয়শাস্ত্রের আবার অনেক অধিকরণ। কাজেই যারা সহায়সম্পর্কহীন, তাদের পক্ষে অতি দুঃখকষ্টে উপজীব্য হতে পারে এই শাস্ত্র। এখন কী করা যায়? অবস্থা তো এই। নাম শুনেছি বটে মিত্রবর্ম্মার মন্ত্রী "আর্য্যকেতুর"। কোসলের তিনি অভিজন, অতএব রাজকুমারের মাতৃপক্ষ। গুণবান্ মন্ত্রী। তাঁর সৎপরামর্শ অবমাননা করার ফলেই ধ্বংস হতে হোলো মিত্রবর্ম্মাকে। অতএব তাঁকে যদি লাভ করা যায় তাহলে খুব বড়রকমের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লাভ হয়।"

নালীজঙ্ঘকে নিভৃতে আহ্বান করে শিক্ষা দিলুম—

"তাত, আর্য্যকেতুর নিকটে গিয়ে গোপনে আপনাকে কতকগুলি কথা বলতে হবে,—'এই মায়াপুরুষটি কে, যে এখানকার রাজ্যলক্ষ্মীকে বসে বসে উপভোগ করছে? আমাদের রাজকুমার—নেহাৎ বালক; একটা ভুজঙ্গ তাকে ঘিরল? যদি বিষ ঢালে, গ্রাস করে?'—আর্য্যকেতু কি উত্তর দেন আমার জানা প্রয়োজন।"

কিছুদিন পরে নালীজঙ্ঘ ফিরে এসে নিবেদন করলেন—

"অনেক উপাসনা করতে হয়েছে আমাকে। চালতে হোলো অনেক উপঢৌকন। তারপরে পেলুম দর্শন। বিচিত্র জল্পনার সৃষ্টি করে, ধীরে ধীরে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর হস্তপদ সংবাহনের অধিকার পাই। ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে একদা কূট-কৌশলে উত্থাপন করি আপনার উপদিষ্ট প্রশ্ন। তিনি তখন আমাকে বলেন—

'ভদ্র, তোমার মুখে এমন প্রশ্ন শোভা পায় না। বিশুদ্ধ আভিজাত্য, অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি, বুদ্ধিনৈপুণ্য, অতিমানুষ প্রাণবল, অপরিমিত ঔদার্য্য, অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রকৌশল, অনন্ত শিল্পজ্ঞান, অনুগ্রহ-সিক্ত-চিত্ত, অবিষহ্য তেজ এবং শত্রুক্ষয়ী সাহস—এই সমস্ত গুণ তোমার এই মায়া-পুরুষটির মধ্যে আমি নিহিত দেখতে পাচ্ছি। অন্যত্র একটি-মাত্র গুণের বিদ্যমানতাই দুর্লভ। এই ব্যক্তিটি, শত্রুর কাছে শাশ্বত কটুগন্ধি বেলগাছ, প্রহ্বী-দের কাছে সুগন্ধি চন্দনতরু। নীতিজ্ঞ নয়বান্ অশ্মককে উৎসন্নে দিয়ে রাজপুত্র ভাস্করবর্ম্মাকে তার পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইনিই। এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কোথায়?"

এই শুভসংবাদ পাওয়ার পরে আমি অনেক বিচিত্র উপায়ে আর্য্যকেতুকে পরীক্ষা করি এবং তারপরে তাঁকে করলুম আমার মতি-সহায়ক। তিনি হলেন আমার সখা। আমরা তখন সৃষ্টি করলুম সত্যগুপ্ত অমাত্য এবং ছদ্মবেশী বিবিধব্যঞ্জনা গূঢ়পুরুষ। তাদের সাহায্যে আমরা গোপনে জেনে নিতুম—প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কারা লুব্ধ, কারা সমৃদ্ধ, কারা অত্যুদ্ধত, এবং কারা প্রায়-বিদ্রোহী। তাদের সাহায্যেই আমরা প্রকাশ্যে প্রচার করতুম অলুব্ধতা, উদ্ভাবনা করতুম ধার্ম্মিকত্ব। তারাই কদর্থ করত নাস্তিকতার, শোধন করত কণ্টক, প্রতিক্রিয়ার প্রয়োগ করে নিষ্ফল করে দিত অমিত্রদের চতুরালি। রাষ্ট্রের স্বধর্ম্মকর্ম্মে চাতুর্বর্ণ্যের দৃঢ় পত্তন তাদের সাহায্যেই আমি সম্পাদন করি। এই সব উপায় অবলম্বন করেই আমি সমাহরণ করতে লাগলুম রাষ্ট্রের রাজস্ব, অর্থ। দণ্ডবিশিষ্ট কর্ম্মারম্ভের মূলই হচ্ছে অর্থশাস্ত্র। রাজনীতিক্ষেত্রে দৌর্ব্বল্যের মত পাপিষ্ঠ আর কিছু নেই।

রাজনন্দন, এই ভাবেই আমার এসেছে অর্থযোগ এবং আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সুখাবস্থান।

ইতি শ্রীদণ্ডিনঃ কৃতৌ দশকুমারচরিতে
বিশ্রুত-চরিতং নাম অষ্টম উচ্ছ্বাসঃ।

৫.১.৫২

সমাপ্ত

শ্যামাপ্রসাদ

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ হাজার চোখের অশ্রু ঝরিল হারায়ে তোমা
ভক্তি-অর্ঘ্য তাহাদের ছিল শুধু তব তরে জমা।
হে বিরহী তব যৌবনে যবে প্রিয়ারে হারালে তুমি
উৎসর্গিলে আপন জীবন যেথায় জন্মভূমি।

নেতাহীন ছিল কর্ণধারের তরে সে অপেক্ষিছে
তুমি কাণ্ডারী নিজেরে ভুলিয়া নিলে মহাব্রত বেছে।
বাঙালীজনের চোখের অশ্রু মোছাবার ভার নিলে
তাহাদের তরে আপন জীবন তুমি আজ বলি দিলে।

আর কেহ নাই যে ভাবিবে হেন বঙ্গ বাঙালী তরে
কে নিবাবে জ্বালা জ্বলিতেছে যাহা শতজন অন্তরে।

অলঙ্কারে বৈশিষ্ট্য
ফোন-এভিনিউ.১৭৬১
গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,

ডি. এচ্. লরেন্স

[ইদানীন্তন কালের ইংরেজী সাহিত্যকে যাঁর স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ রচনা একটি বিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছে—মানবতার অন্তর্নিহিত দাবীকে যিনি তাঁর সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন—যাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না—প্রখ্যাত সমালোচকদের মধ্যে যিনি বহু আলোচিত, সেই ডেভিড হারবার্ট লরেন্স কিন্তু কোন একটি বিশেষ মতবাদের পৃষ্ঠপোষক বা কোন বিশেষ সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। যে প্রচলিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধতায় আধুনিক সাহিত্যের ভাবধারা প্রবাহিত, লরেন্সের সাহিত্যে তার আলোড়ন থাকলেও সেটাই তাঁর রচনার প্রধান তত্ত্ব নয়। জীবনকে তিনি দেখেছেন এমন একটি দিক থেকে, যেখানে প্রচলিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নতুন সংস্কারের তীব্রতা জেগে ওঠেনি, বরং প্রচলিত ব্যবস্থায় ভাল-মন্দ যাই থাক, নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তারা যেন এতটুকু বাধা সৃষ্টি না করে, এটাই ছিল যেমন তাঁর বড় কথা, তেমনি অপরের পক্ষেও এটাই ছিল তাঁর দাবী। সম্ভবতঃ এই মনোভাবের ফলেই লরেন্সের রচনায় কল্পনাবিলাস বা ভাবালুতার সমারোহ চোখে পড়ে না—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় প্রাঞ্জল বাস্তব জীবন-চিত্রই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তিনি যা দেখেছেন, তিনি যা অনুভব করেছেন তাঁর সমগ্র রচনার চরিত্রগুলি যে তারই প্রতিচ্ছবি—বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখতে হলে যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, লরেন্সের চেতন ও অচেতন দুই মনই ছিল এ বিষয়ে সমপারঙ্গম। তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁকেই আমরা বিশেষ ভাবে খুঁজে পাই।

তাঁর প্রথম যৌবনের রচনার মধ্যে 'Sons and Lovers' যে কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে, তার মূলে আছেন তিনি নিজেই। এই আখ্যায়িকার পশ্চাদ্‌পটে নটিংহামের যে কয়লার খনির উল্লেখ আছে, একদিন লরেন্সের জীবনও সেইখানে অতিবাহিত হয়েছিল। আর যে মোরেল-পরিবারের কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা তাঁর নিজের বংশেরই কথা। এই উপন্যাসের সবচেয়ে শক্তিশালী চরিত্র হচ্ছে মিসেস্ মোরেল। এঁর চরিত্রও যেমন দৃঢ়, রুচিও তেমনি মার্জ্জিত। কিন্তু ইনি যাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কয়লার খনির সামান্য একজন শ্রমিক মাত্র। নিজের ছেলেপুলেদের কয়লার খনির পরিবেশ থেকে এবং মাতাল, বর্ব্বর স্বামীর আবহাওয়া থেকে পৃথকভাবে মানুষ করার সঙ্কল্পে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর তৃতীয় সন্তান পলই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। এই বালকের রুচিবোধ ও কলাজ্ঞান তাঁর মনের অনেকটা খেদ মিটিয়েছিল, এবং তা থেকেই তিনি যা-কিছু প্রেরণা লাভ করেন। পল বড় হতে থাকে, তার জীবনে স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হয়। ক্রমে ক্রমে সন্তান ও জননীর ভালবাসার মধ্যে এমন একটি স্পর্শকাতর ভাব-সম্পর্ক আরম্ভ হয়, যেখানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই সঙ্গোপনে প্রকাশলাভ করে। সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে এই ভাবের সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টাই হচ্ছে আখ্যায়িকার মূল বস্তু।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর নটস্-এর ইষ্টউড পল্লীতে লরেন্স জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সেই তিনি স্থানীয় কয়লার খনিতে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হন। তেরো বছর বয়সে তিনি তাঁর পল্লীর শিক্ষায়তন থেকে নটিংহাম উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবার যোগ্যতা লাভ করেন। কিন্তু বেশীদিন এখানে তাঁর শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয়নি—অভাবের তাড়নায় অল্প বয়সেই অন্ন সংস্থানের জন্য তাঁকে চাকরি নিতে হয়। প্রথমে এক ডাক্তারি যন্ত্রপাতির দোকানে এবং পরে নিজ পল্লীর শিক্ষায়তনে তিনি সামান্য মাহিনায় শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। এই সময়েই তাঁর প্রথম উপন্যাস "The White Peacock"-এর সূচনা হয়, এবং ১৯১১ সালে তা প্রকাশিত হয়। এই প্রথম গ্রন্থ সাধারণ্যে সমাদৃত হওয়ার ফলে তিনি যে উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন, তাতেই পরবর্তী জীবনে সাহিত্য-সৃষ্টি ছাড়া তিনি আর কিছুই করেননি। ১৯১৪ সালে তিনি বিবাহ করেন। কিছুকাল অষ্ট্রেলিয়ায় অবস্থানের পর তিনি আমেরিকায় যান, এবং ১৯২৯ সালে সপরিবারে আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। এই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দুরারোগ্য যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ্চ দক্ষিণ-ফ্রান্সের ভাঁসে তিনি দেহত্যাগ করেন।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছোট নদীটির ধার দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে তার নাম গ্রীনহিল লেন। এক সারি বিশ্রী খড়ে-ছাওয়া কুটীর ছিল এই রাস্তার পাশে, নদীর ধারটিতে। কয়লা খনির শ্রমিকদের বাসস্থান। এই পাড়াটিকে সবাই বলত 'হেল রো'। এখন তার জায়গায় যে বাড়িগুলি উঠেছে, তাদেরই নাম 'দি বটমস্'।

তখন কয়লার খনিগুলি ছিল ছোট ছোট। এখান থেকে ছুটো মাঠ পেরিয়ে যেতে হ'ত। পুরোনো আমলের খনি—একটা চক্রকে ঘিরে এক পাল গাধা অনবরত পরিক্রমণ করত, আর তারই টানে খনি থেকে উঠে আসত কয়লা। ছোট নদীটির প্রবাহ আলডার গাছগুলির নিচে দিয়ে বয়ে বয়ে চলত; কালো কয়লার মালিন্য তাকে স্পর্শও করতে পারত না। সারা অঞ্চল জুড়েই ছিল এই ধরণের খনি। কবে, হয়ত সেই রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আমল থেকে এ

খনিগুলোতে কাজ সুরু হয়েছিল। পিঁপড়ে যেমন মাটিতে গর্ত খোঁড়ে, তেমনি গর্ত খুঁড়েছিল কতকগুলো মানুষ আর তাদের সঙ্গের গাধাগুলো। চারিদিকের সবুজ ক্ষেত, ঘাসঢাকা মাঠ—এর মধ্যে এই কালো গর্ত আর ঢিবিগুলোকে কেমন অদ্ভুত লাগত। এই কয়লা খনির মজুরদের বাড়ি, চাষীদের গোলা-ঘর আর যারা পশম বুনত তাদের দু' একটা কুটীর—এই নিয়েই ছিল বেষ্টউড, গ্রাম।

কিন্তু প্রায় বছর ষাটেক আগে হঠাৎ দেখা গেল এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। আগেকার খনিগুলিকে বিধ্বস্ত ক'রে তার উপর গজিয়ে উঠল বড় বড় মালিকের বিশালকায় খনি। এ অঞ্চলে প্রভূত কয়লা আর লৌহ-সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেল। তার ফলে বিখ্যাত কার্টন ওয়েইট্ কোম্পানীর আবির্ভাব। তাদের প্রথম খনিটির উদ্বোধন হ'ল স্পিনি পার্কে—প্রচুর আড়ম্বর ও বিপুল উত্তেজনার মধ্যে। উদ্বোধন করলেন স্বয়ং লর্ড পামারষ্টোন।

ঠিক এই সময়টিতেই এক অগ্নিকাণ্ডে 'হেল-রো'র কুটীরগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অনেক দিনের পুরোনো বলেই হয়ত, এ অঞ্চলে 'হেল-রো' এক ধরণের কুখ্যাতি লাভ করেছিল। এবারকার আগুনে সমস্ত আবর্জ্জনা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কার্টন, ওয়েইট্ কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল দিনে দিনে। নদীর ধারে ধারে নতুন নতুন খনির পত্তন হ'ল—কিছুদিনের মধ্যেই ছয়টি খনিতে রীতিমত কাজ শুরু হয়ে গেল। বনের পাশ থেকে ভাঙা মাঠ পেরিয়ে, প্রসারিত হ'ল রেলের রাস্তা, আর তার ধারে ধারে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছয়টি খনি। যেন একটি চন্দ্রহারে গাঁথা ছ'টি কালো মাণিক।

খনির অসংখ্য মজুর। তাদের বসবাসের জন্যে 'বেষ্টউডে'র সমস্ত উঁচু অঞ্চল জুড়ে কোম্পানীর তৈরী স্কোয়ারগুলো—বিস্তৃত চতুষ্কোণের চার ধারে মজুরদের আবাসগৃহ। এ ছাড়া নদীর ধারের সমতলে, পুরোনো 'হেল-রো'র জায়গাটিতে, 'দি বটমস্'-এর পত্তন হ'ল।

পাশাপাশি দুটি ক'রে সারি, তার প্রত্যেক সারিতে তিনটি ক'রে ব্লক। এর প্রত্যেক ব্লকে আবার বারোখানা বাড়ি। বেষ্টউড গ্রামখানি ঢালু হয়ে যেখানে এসে পৌঁচেছে, তার সব চেয়ে নিচু অংশে এই বাড়িগুলি। এখান থেকে বাইরের দিকে তাকালে দেখা যায় সামনের জমি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে গেছে। জমির এই ঢেউ-খেলানো রূপ সব চেয়ে ভালো নজরে পড়ে উপরের জানালা থেকে।

ভারী সুন্দর, পোক্ত বাড়িগুলি। এদের এক মাথা থেকে অন্য মাথা অবধি হেঁটে যাওয়া চলে। সামনে ছোট বাগান, নিচের তলায় নানা রঙের ফুল, উপর তলার ঝুমকোলতা। কিন্তু এ তো শুধু বাইরের রূপ। বাইরে থেকে যে ঘরগুলো চোখে পড়ে, সেগুলো খনি-মজুরদের বসবার ঘর। সেখানে কেউ শোয় না। শোবার ঘর কিম্বা রান্নাঘর এগুলো ভিতরের দিকে, ব্লকগুলোর মাঝখানে। পেছন দিকে ঝোপ-ঝাড়, ছাইগাদা। এরই পাশ দিয়ে দুই সারির মাঝখানে সরু কালি রাস্তা। সেখানে ছেলে-মেয়েরা খেলা করে, বাড়ির বউ-ঝিরা নিভৃতে গল্প করে, পুরুষরা কালে-ভদ্রে আয়েস ক'রে ধূমপান করে সেখানে দাঁড়িয়ে। 'দি বটমস্'-এর বাড়িগুলো দেখতে সুন্দর এবং মজবুত, কিন্তু থাকবার পক্ষে খুব ভালো নয়। ছাই-গাদার পাশে ঐ কালি রাস্তাটার উপরেই রান্নাঘরগুলো—আর রান্নাঘরেই লোকের বেশী সময় কাটাতে হয়।

বেষ্টউড থেকে 'দি বটমস্'-এ আসতে মিসেস্ মোরেলের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। একে তো নিচু জায়গায় বাড়ি, তার উপর বারো বছরের পুরানো। কিন্তু এর চেয়ে ভালো আর কোন উপায় ছিল না। আগের বাড়ির তুলনায় এ বাড়িটার ভাড়াও ছিল সপ্তাহে পাঁচ শিলিং-এর বদলে পাঁচ শিলিং ছ'পেন্স। এতে যদিও নিজেকে একটু উঁচু দরের লোক বলে ভাবতে পারতেন তিনি, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু সান্ত্বনা পেতেন না।

আট বছর হ'ল তাঁদের বিয়ে হয়েছে, এখন তাঁর বয়স একত্রিশ। ছোট মানুষটি, দেখতে নরম-নরম, কিন্তু একান্ত দৃঢ় প্রকৃতির। এ-পাড়ার মেয়েদের হাবভাব দেখে তিনি প্রথমেই বেশ একটু দমে গেলেন। জুলাই মাসে এই বাড়িতে এলেন তিনি, আর মাস দুই পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরেই তাঁর তৃতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করার কথা।

তাঁর স্বামী মোরেল খনির মজুর।

এ বাড়িতে আসবার সপ্তাহ তিনেক পরেই এদিককার বিখ্যাত মেলা শুরু হ'ল। এ সময়টা মোরেলের ছুটি আর আমোদের; মিসেস্ মোরেল তা জানতেন। মেলা বসবে সোমবার। সেদিন সকাল বেলাতেই মোরেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ছেলে-মেয়ে দুটি অধীর হয়ে উঠল আনন্দে আর উত্তেজনায়। সাত বছরের ছেলে উইলিয়াম—সকাল বেলা খাবার খেয়েই বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, মেলার আশপাশে উঁকিঝুঁকি মারবার জন্যে। ওর বোন এ্যানি পাঁচ বছরের, সে সারা সকালটা মেলায় যাবার জন্যে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদল। মিসেস্ মোরেলের হাতে অনেক কাজ। পাশের বাড়ির কারু সঙ্গে এখনও বিশেষ পরিচয় হয়নি যে তাদের সঙ্গে মেয়েটিকে পাঠাবেন। কাজেই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাকে মেলায় নিয়ে যাবেন বলে কথা দিলেন।

সাড়ে বারোটা যখন বাজে, তখন উইলিয়মের সাড়া পাওয়া গেল। খুব চটপটে ছেলে, চুলগুলো সুন্দর, গায়ে ডেন্ কিম্বা নরওয়ের লোকেদের মত বর্ণাভা।

মাথার টুপি না খুলেই দৌড়ে এসে ঢুকল সে রান্নাঘরে। বললে, 'খাবার দেবে, মা?—ও মা, শুনছ? লোকটা বলছিল, দেড়টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যাবে।'

—'তৈরি হলেই পাবে।' মা জবাব দিলেন।

বড় বড় নীল চোখ মেলে উইলিয়ম রাগতভাবে মায়ের দিকে তাকাল। 'এখনও তৈরি হয়নি! তাহ'লে আমি না খেয়েই চললুম কিন্তু।'

—'মোটেই নয়। আর পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে। মোটে তো সাড়ে বারোটা বেজেছে এখন।'

—'ওরা যে শুরু করে দেবে।' প্রায় চীৎকার ক'রে বলে উঠল উইলিয়ম।

'মরণ আর কী!' মা রেগেমেগে বললে, 'এখনও তো পুরো একটি ঘণ্টা রয়েছে—সাড়ে বারোটা তো সবে বেজেছে।'

চটপট্ ক'রে উইলিয়ম খাবার টেবিল গোছাতে লেগে গেল। তারপর তারা খেতে বসল তিন জনে। উইলিয়ম, উইলিয়মের মা আর বোন। খাবার—পুডিং আর জ্যাম। হঠাৎ লাফিয়ে চেয়ার

ছেড়ে উঠে পড়ল উইলিয়ম। উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগল। দূর থেকে তখন মেলার বাজনার শব্দ অস্পষ্ট ভেসে আসছে। উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল উইলিয়ম। রান্নার টেবিলের উপর থেকে টুপিটা উঠিয়ে নিতে নিতে বললে, 'তখনই আমি বলেছিলুম কিনা।' তার চোখ-মুখ তখন রাগে কাঁপছে।

মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'পুঁটিটা হাতে নিয়ে যাও খোকা।··· এখন তো মোটে একটা বেজে পাঁচ মিনিট, ভুল খবর এনেছিলে তুমি।···আর শোন, ছ'পেনিটা নিয়েছ?'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উইলিয়ম ঘুরে এল। এসে কোন কথা না ব'লে ছ'পেনিটা নিয়েই উধাও হ'ল।

এদিকে এ্যানি কান্না শুরু করলে—'আমি যাব, ও মা, আমি যাব।'

'—হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবে যাবে, না গিয়ে উপায় কী—নচ্ছার, কাঁদুনে মেয়ে কোথাকার!' মা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অবশেষে বিকেলের দিকে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। খাড়া রাস্তা, দু'ধারে ঘন ঝোপ। মাঠ থেকে শস্য কেটে নেওয়া হয়েছে, খোলা মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা গরু। চারিদিক শান্ত আর মধুর।

মিসেস্ মোরেলের মেলা-টেলাতে রুচি নেই। শুধু শুধু হৈ-হল্লা—এক ধারে তিনটে অর্গান বেসুরো বাজছে, কোথাও বা পিস্তলের কান-ফাটা আওয়াজ, কোথাও নারকোলের মালা-ভাঙার শব্দ। একটা লাঠির উপর কাঠ দিয়ে মানুষের মাথার মত করা হয়েছে, তার মুখে একটা পাইপ, কাঠ ছুঁড়ে সেই পাইপটাকে ভাঙতে হবে,—সেই কাঠ ছোঁড়ার খটাখট্ আওয়াজ। সেখানে একটি মহিলা তীব্র চীৎকার ক'রে চলেছেন। সারি সারি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, ঘোড়াগুলো অবশ্য কাঠের। উঠে বসলেই দৌড়বে। কতকগুলো ঘোড়া চলে বাষ্পের সাহায্যে, আর কতকগুলো টেনে নিয়ে যায় একটা ছোট্ট সত্যিকারের ঘোড়া।···

চারি দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ছেলেকে দেখতে পেলেন মিসেস্ মোরেল। ওই যে হাঁ-ক'রে হাঁদার মত দাঁড়িয়ে আছে; তন্ময় হয়ে কী যেন দেখছে। সেই দুর্দান্ত সিংহ যার থাবার ঘায়ে একটা নিগ্রো মারা গেল, আর দু'জন শ্বেতাঙ্গ সারা জন্মের মত জখম হয়ে রইল, তারই ছবি। দেখুক যতক্ষণ খুশি। মিসেস্ মোরেল মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই উইলিয়ম তাঁর সামনে এসে হাজির। চোখে-মুখে তখনও প্রচুর উত্তেজনা, বললে, 'কই, তুমি আসবে তো বলনি।···কী আশ্চর্য্য দেখছ, অনেক মজার মজার জিনিস রয়েছে···ওই যে সিংহটা, ও তিনটে মানুষ মেরেছে···আর শোন মা, সেই যে ছ'পেনিটা দিয়েছিলে না, সেটা খরচ হয়ে গেছে। এই দেখো'—ব'লে উইলিয়ম পকেট থেকে বের করলে দুটো ডিম রাখবার ছোট ছোট পেয়ালা। লাল গোলাপ ফুল আঁকা তাতে। প্রশ্ন করলে, 'কোত্থেকে পেয়েছি বল তো?' তার পর নিজেই তার উত্তর দিলে, 'ওই যে গো, যেখানে গর্ত্তের ভেতর মার্বেল ফেলতে হয়, এক-এক দানে আধ পেনি করে, আমি সেখান থেকে দু'বারে এই দুটো জিতেছি। কেমন সুন্দর, দেখেছ? আবার উপরে ফুল-কাটা!···আমি যে কত দিন থেকে চাইছি এগুলো।'···

মা জানতেন, ছেলে তাঁর জন্যেই এই জিনিসগুলো চেয়েছিল। খুশি হয়ে উঠল তাঁর মুখ। বললেন, 'বেশ তো! সত্যিই ভা—রী সুন্দর জিনিসগুলো!'

—'নয়?' উইলিয়ম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'এগুলোকে তুমিই নিয়ে যাও, বুঝলে, আমি যদি ভেঙে ফেলি!'

মা এসেছেন, মা তাকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, সব কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনিই দেখাচ্ছেন তাকে। উইলিয়মের উত্তেজনার আর সীমা রইল না। ছোট ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ছবি দেখে দেখে তিনি যখন গল্পগুলো বুঝিয়ে বললেন, উইলিয়ম মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল। তাঁকে ছেড়ে এক পা-ও যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না। সারাক্ষণ সে মার কাছে কাছে ঘেঁষে রইল। ছোট ছেলেরা মাকে নিয়ে এক ধরণের গর্ব্ব অনুভব করে, সেই গর্ব্বে উইলিয়মের মন-প্রাণ আজ ভরপুর। এমন মহীয়সী মা-ই বা আজ আর কে? তাঁর পোষাক, তাঁর কালো ওড়না—কত চমৎকার, কেমন দিব্যি মানিয়েছে তাঁকে।···ছেলেকে নিয়ে যেতে যেতে পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে মিসেস্ মোরেল মৃদু হাস্য করছেন। অবশেষে অনেকক্ষণ ঘুরে-ফিরে শ্রান্ত হয়ে মা বললেন, 'খোকা, তুমি কি এখন যাবে, না আরও পরে?'

উইলিয়ম আকাশ থেকে পড়ল। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, 'তুমি কি এক্ষুনি চলে যাচ্ছ নাকি?'

—'এক্ষুনি মানে?—চারটে কখন বেজে গেছে!'

উইলিয়মের সুর আরও চড়ল, 'কেন, কেন এক্ষুনি তুমি যাবে কেন?'

মা বললেন, 'তোমার খুশি হলে তুমি থাকতে পার। থাকো তুমি।'

ধীরে ধীরে মেয়েকে নিয়ে মা চলে গেলেন, উইলিয়ম দূর থেকে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাকে ছেড়ে দিতে তার মন কাঁদছে, কিন্তু মেলা ছেড়ে যেতেও চাইছে না।···মা এগিয়ে গেলেন। 'মুন এ্যাণ্ড ষ্টারস্' নামে যে মদের দোকান, তার সামনের খোলা মাঠে কতকগুলো লোক হল্লা করছে, বিয়ারের গন্ধও নাকে এল। হয়ত তাঁর স্বামীও আছে এই দলে। মিসেস্ মোরেল তাড়াতাড়ি হেঁটে চললেন।

সাড়ে ছ'টা বাজে-বাজে, এমন সময় ছেলে ফিরে এল। ক্লান্ত, শুক্‌নো মুখ—তাতে যেন বিষণ্ণতার আভাস। মাকে একা একা যেতে দেওয়া অবধিই তার মন ভালো নেই, যদিও নিজে সে বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। মা চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মেলাটাই তার কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল।

বাড়ি ঢুকেই উইলিয়ম প্রশ্ন করলে, 'বাবা বাড়ি[illegible]ছে?'

মা বললেন, 'কই, না তো।'

—'জানো মা, বাবা সেই 'মুন এ্যাণ্ড ষ্টারস্' দোকানটাতে কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে। আমি দেখলুম, টিনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, সে জামা গুটিয়ে লোকদের মদ ফিরি ক'রে যাচ্ছে।'

—'হুঁ।' মা সংক্ষেপে জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই আজ আর হাতে পয়সা নেই বাবুর।···ওরা তাকে টাকা-পয়সা দিক আর নাই দিক, পেট ভরে মদ খেতে দিলেই সে খুশি হবে।'

বাইরের আলো ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এল। মা সেলাই ছেড়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। আজ বাইরে শুধু আনন্দ আর উত্তেজনা। ছুটির দিনের চাঞ্চল্য অবশেষে মিসেস্ মোরেলকেও পেয়ে

বসল। ঘর ছেড়ে তিনি পাশের বাগানে এসে পায়চারি করতে লাগলেন। মেয়েরা সব মেলা থেকে ঘরে ফিরে আসছে, সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। তাদের কারু হাতে একটা সাদা ভেড়ার ছানা, কারু হাতে বা কাঠের ঘোড়া। কচিৎ কোন পুরুষকেও রাস্তায় দেখা যায় মাথা গুঁজে পাশ কাটিয়ে চলে আসতে, যত দূর সাধ্য মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছে সে। অবশ্য ঠাণ্ডা মেজাজের পুরুষমানুষ যে একেবারেই নেই তা নয়; তারা নিজের নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে। কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমই। মেয়েরা তাদের ছেলেপুলে নিয়ে সাধারণতঃ একা-একাই ফিরছে। গলির মোড়ে মোড়ে ঘর-কুণো মেয়েরা দিব্যি গল্প ফেঁদেছে; এদিকে আসন্ন-সন্ধ্যার আবছা আলো মিলিয়ে এল, তখনও গায়ের চাদর ভালো ক'রে জড়িয়ে নিয়ে তাদের গল্পের আর বিরাম নেই।

মিসেস্ মোরেল চিরদিনের মত আজও একা। ছেলে আর মেয়ে দুটি উপরে শুয়ে আছে—তারাই তাঁর বন্ধন। তাঁর সংসার ওদের নিয়েই। তাঁর মনের মাটিতে ওরাই আজ স্থায়ী এবং দৃঢ়মূল শিকড় গেড়েছে। কিন্তু আবার যেটি আসছে, সেটি না এলেই ছিল ভালো। পৃথিবীতে সুখ নেই, অভ্যস্ত একঘেয়ে জীবনে নেই পরিবর্ত্তনের স্বাদ। অন্ততঃ যত দিন না উইলিয়ম বড় হয়ে ওঠে ততো দিন কোন পরিবর্ত্তনের আশাও নেই। এই নীরস জীবনকে কোনমতে বহন ক'রে যাওয়া, কোনমতে সহ্য ক'রে যাওয়া এর দৈনন্দিনতাকে, এই তো তাঁর নিজের ভাগ্যলিপি। ছেলে-মেয়েগুলি যত দিনে একটু বড় হবে; আর এই যে নতুন আর একটি শিশু আসবে, তাকে তো তিনি কামনা করেননি। কী করে মানুষ করবেন তাকে, সে সঙ্গতিও তো তাঁদের নেই। স্বামী মদের দোকানে মদ ফিরি ক'রে বেড়াচ্ছে, আশ মিটিয়ে আকণ্ঠ মদ খেয়ে বাড়ী ফিরবে। মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। অথচ এরই সঙ্গে তাঁর সারা জীবনের সংযোগ। এই নতুন সন্তানটি আবার এক দুঃসহ দায়িত্ব বহন ক'রে আনছে। জীবনে শুধুই দারিদ্র্য, নীচতা ও শ্রীহীনতার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম। মাঝে মাঝে বিরক্তি এসে যায়। উইলিয়ম আর এ্যানির জন্যেই যত মুস্কিল, নইলে যে দিকে চোখ যায় চলে যেতেন এত দিনে।

হাঁটতে হাঁটতে মিসেস্ মোরেল সামনের বাগানে চলে এলেন। বাইরে যেতেও ইচ্ছে করছে না, অথচ ঘরের ভিতরেও শান্তি নেই—গরমে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। আর তখন যদি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসেন, বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে, মনে হয় এই বাড়িতে যেন তাঁর জীবন্ত সমাধি হয়েছে।

সামনের বাগানটি ছোট, ঝোপঝাড়ে ঘেরা খানিকটা চতুষ্কোণ জায়গা। ফুলের গন্ধ আর এই সুন্দর ক্লান্ত-সন্ধ্যা—এখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা মনের ভার লাঘব করবার চেষ্টা করলেন তিনি। তাঁর সামনের ফটক থেকে ধাপে ধাপে পাহাড় উঠে গেছে, ঘন ঝোপের তলা দিয়ে রাস্তা, তার দু'ধারে শস্যহীন খোলা মাঠের উপর সূর্য্যাস্তের উজ্জ্বল আভা। মাথার উপরে আলোকদীপ্ত আকাশ, উজ্জ্বল জীবনের মত তার দীপ্তি। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আলোকের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে আসছে—ক্রমে মাঠের বুকে অন্ধকার নেমে এল, ঝোপ-ঝাড়, পাহাড় ঢাকল আঁধারের আবরণে। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার, অন্য দিকে

পাহাড়ের উপর মেলার আলোকের লালচে আভা ফুটে উঠল। তার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে মেলার হট্টগোলের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে।

ঝোপের তলা দিয়ে যে পথটি নেমে গেছে তাতে আলোর চিহ্নমাত্র নেই। মাঝে মাঝে সেই পথ বেয়ে লোক-জন টলতে টলতে ফিরে আসছে। একজন জোয়ান লোক টলতে টলতে এসে পাগাড়ে পথের শেষ মাথায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মিসেস্ মোরেল শিউরে উঠলেন। লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তাটাকেই গালাগাল দিতে শুরু করলে, যেন রাস্তাটাই তাকে ব্যথা দেবার জন্য দায়ী।

এবার মিসেস্ মোরেল বাড়ির ভিতরে চলে এলেন। নিজের ভাগ্যের কথা তখনও তিনি ভুলতে পারেননি। আচ্ছা, এর কি আর পরিবর্তন নেই? যত দূর দেখা যায়, মনে হয় জীবন এই ভাবেই কাটবে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। যেন দূর স্বপ্নের মত মনে পড়ে। দশ বছর আগের সেই সহজ নিরুদ্বেগ জীবনের সঙ্গে আজকের ভারাক্রান্ত জীবনের কত প্রভেদ!

—'এর মধ্যে আমি কোথায়? আমার সুখদুঃখের মূল্য কে দেবে? জীবনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? এই যে সন্তানটি আসছে, এর সঙ্গেই বা আমার সম্বন্ধ কি? আমার নিজের কথা কেউ বোঝে না।' মনে মনে ভাবতে লাগলেন তিনি।

এমন হয়। কারু কারু জীবনে সময় এগিয়ে চলে, দেহ কাজ ক'রে যায়, কিন্তু সব কিছুই যেন ফাঁকা, যেন অবাস্তব। নিজেকে তা স্পর্শও করে না। তাদের জীবন শুধু দেহকে গ্রাস করে, কিন্তু হৃদয়কে করে উপেক্ষা।

'আমার শুধুই অপেক্ষা ক'রে থাকা', মিসেস্ মোরেল ভাবলেন, 'কিন্তু আমার কামনা শুধু হাহাকার ক'রে ফেরে, যা সে চায় তা পায় না।' ভাবতে ভাবতে মিসেস্ মোরেল রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। রান্নাঘরের টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে আলো জ্বালালেন, উনুনটা সাজালেন, আর কালকের জন্যে যা যা জামা-কাপড় কাচতে হবে সেগুলো ভিজিয়ে রাখলেন। তারপর আবার বসলেন সেলাই নিয়ে। সেলাই করতে করতে রাত্রি হ'ল—দীর্ঘ প্রহরগুলো যেন আর কাটতে চায় না। মাঝে মাঝে একটু নড়েচড়ে বসেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বুকের বোঝাটাকে একটু হালকা করবার জন্যে। সারাক্ষণ শুধু একটিই তাঁর ভাবনা, কি করে সামান্য সঙ্গতি নিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটিকে একটু সুখে রাখতে পারেন।

অবশেষে রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় স্বামী এসে উপস্থিত হলেন। গালে উজ্জ্বল লাল রঙের ছোপ, কালো গোঁফ জোড়ার পাশে মুখখানা যেন ঝকমক করছে। মাথাটি ঈষৎ দুলিয়ে দুলিয়ে যেন বিশ্বসংসারকে প্রাণের আনন্দ জানাচ্ছে সে।

—'বটে বটে, আহা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলে আমার জন্তে! আমি ঐ দোকানের এন্টনি ব্যাটাকে তার কাজে একটু সাহায্য করছিলুম। হাড় বজ্জাত ব্যাটা—আমাকে মোটে আধ-ক্রাউন দিয়ে বিদায় দিলে! বিশ্বাস করো, এর বেশী একটি কানা পেনিও দেয়নি।'—

—'বাকীটা মদ দিয়েই পুষিয়ে নিয়েছ।' সংক্ষেপে জবাব দিলেন মিসেস্ মোরেল।

—'না গো, না! তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, আজ খুবই কম খেতে পেয়েছি।' করুণ কণ্ঠে মোরেল বললে, 'আর শোন, তোমার জন্তে একটু খাবার আর ছেলে-মেয়ে দুটোর জন্তে একটা নারকোল এনেছি।' টেবিলের উপর জিনিসগুলো রাখতে রাখতে মোরেল বললে, 'কই, মুখের একটা ভালো কথাও যে বললে না? না, একটা ধন্যবাদ দেওয়াও তোমার স্বভাবে লেখেনি।'

একটা আপোষ করবার উদ্দেশ্যে মিসেস্ মোরেল নারকোলটা তুলে নিয়ে জল আছে কিনা নেড়ে-চেড়ে দেখলেন।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো নারকোল, বাজি রেখে বলতে পারি আমি।⋯ওই যে গো বিল্ হজকিনস্, তার কাছ থেকেই এনেছি ওটা। ওকে বললুম, বিল ভাই, তোমার তিনটে নারকোলের কি দরকার, তার চেয়ে আমার ছেলে-মেয়ে দুটোর জন্তে দাও না একটা? বিল অমনি বললে, নাও না তুমি, যেটা তোমার খুশি নিয়ে যাও।'

—'হ্যাঁ।' মিসেস্ মোরেল বললেন, 'তবে কিনা যখন লোকে মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে, তখন ভারী দিলদরিয়া হয়ে ওঠে।⋯ তার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও নিশ্চয়ই খুব প্রকৃতিস্থ ছিলে না।'

—'হয়েছে হয়েছে, মদ খেয়ে মাতাল হব আমি, কী যে বলো,' ব'লে মোরেল টেনে টেনে হাসতে লাগল। আজ সন্ধ্যায় 'মুন এ্যাণ্ড ষ্টারস'-এ কাজ ক'রে অবধি তার আনন্দের আর সীমা নেই। সে ক্রমাগত বকবক ক'রে চলল।

বিরক্ত হয়ে উঠে মিসেস্ মোরেল তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। মোরেল একা একা ব'সে চিমনীর আগুনটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জ্বালতে লাগল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—বিশু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য।

তৃতীয় নয়ন

প্রভাকর মাঝি

আকাশ কেবল নয় ধোঁয়া ধোঁয়া শূন্যগর্ভ ফাঁকা,
অনেক আশ্বাস আছে, জমে আছে অনেক বিস্ময়।
হিরণ্ময় সৌর স্বপ্নে, নিশীথের তারার অক্ষরে,
মুহূর্তে ফুটিয়া উঠে অনন্তের পূর্ণ পরিচয়।

পঙ্কিল পল্বলে জাগে কল্লোলিত সমুদ্রের স্বাদ,
কুটজ কুসুম-মাঝে দেখা দেয় অপূর্ব সুরভি।
দীর্ঘ নৈকট্যের ভারে তুচ্ছতম খর্জুর-বীথিকা
কখন জাগায়ে দেয় অতর্কিতে অন্তরের কবি।

এই ভগ্ন অট্টালিকা অই ব্যর্থ বিষণ্ণ বৈকাল,
স্থূল বস্তু-রূপ ছাড়ি নিয়ে আসে নবীন ব্যঞ্জনা।
প্রত্যহের পৃথিবীতে বেদনার অশ্রুবিন্দু-মাঝে
জেগে আছে, লেগে আছে সুন্দরের মধুর সান্ত্বনা।

আকুল আগ্রহে তাই অতন্দ্রিত সারা তনু-মন,
কখন খুলিয়া যায় অকস্মাৎ তৃতীয় নয়ন।

দেশে দেশে

"বিক্রমাদিত্য"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জানুয়ারীর মাঝামাঝি দিল্লী থেকে খবর এলো যে গান্ধীজি আবার অনশন করবেন। এটাই হলো তাঁর জীবনের শেষ অনশন। তখনও কেউ ভাবতে পারেনি যে এই অনশনই একদিন হয়ে দাঁড়াবে তাঁর মৃত্যুর কারণ।

তখন দিল্লীতে হত্যার তাণ্ডবলীলা অনেকটা কমে গেছে। তবুও মুসলমানদের শংকা দূর হয়নি। তাই গান্ধীজি এবার সবার এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলেন। তিনি বললেন যে, দিল্লীর শরণার্থীরা মুসলমানদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তারা তাদের মনের বিষ দূর করতে পারেনি। একদিন প্রার্থনা-সভায় তিনি এই দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন। যদি তারা এমনি ভাবে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়, তবে তারা ভারতের কলঙ্ক বয়ে আনবে, হিন্দুধর্ম্মের অপলাপ করবে। পাকিস্তানে মুসলমানেরা কি করছে সেদিকে দেশবাসীর তাকালে চলবে না, তাদের তাকাতে হবে এই দেশের বিপন্ন মুসলমানদের প্রতি।

যদি দরকার হয়, গান্ধীজি বললেন, "যদি তোদের ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলতেই হবে।" তিনি বললেন, 'যেদিন দিল্লীতে শান্তি ফিরে আসবে, সত্যিই মুসলমানদের জীবন হবে নিরাপদ, সেদিনই তিনি অনশন ভাঙবেন।'

অনশনের দ্বিতীয় দিন, গান্ধীজি তাঁর প্রার্থনা-সভায় আর গেলেন না, বক্তৃতা তিনি লিখে পাঠালেন। সেটা পড়ে শোনানো হলো।

এবারও গান্ধীজি ডাক্তার দেখানোয় আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন যে, ভগবানের পায়ে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, কাজেই সামান্য ডাক্তারে তার জীবন রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু বাধা দিলেন ডাক্তার গিল্ডার। বললেন, 'ডাক্তারদের রোজই বুলেটীন বের করতে হচ্ছে। যদি তারা গান্ধীজিকে পরীক্ষা করার সুযোগ না পায় তবে তাদের বুলেটীনে মিথ্যা খবর লিখতে হবে।' মিথ্যার আশ্রয় নিতে গান্ধীজির চিরকালই আপত্তি ছিল। তাই তিনি ডাক্তার দেখাতে রাজী হলেন।

তৃতীয় দিন। গান্ধীজি ভারত সরকারকে অনুরোধ করলেন যে, পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্নো কোটি টাকা ফিরিয়ে দিতে। এ টাকা ছিলো পাকিস্থানের অংশ, দেশ ভাগ হবার দরুণ। গান্ধীজি দাবী করলেন যে এ টাকাটা এক্ষুনি ফিরিয়ে দিতে হবে।

ভারত সরকার পরদিনই টাকা ফিরিয়ে দিলেন। গান্ধীজির শরীর ইতিমধ্যে অবসন্ন হয়ে আসছিলো। প্রার্থনা-সভায় যাবার মতো ক্ষমতা ছিলো না। তাই অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর মারফৎ তিনি বক্তৃতা দিলেন। তিনি আবেদন করলেন যে, অন্যে কি করছে সেদিকে আমাদের তাকানো উচিত নয়, আমাদের দেখতে হবে যে আমরা ন্যায় কাজ করছি কি না? আমাদের মনের গ্লানি ও বিদ্বেষ দূর করতে হবে। গান্ধীজি বেশীক্ষণ কথা বলতে পারলেন না, দেহ তাঁর ক্রমশঃই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলো। সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলেন যে, এই অনশন তিনি কেন করছেন? দেশে এখন কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা নেই, তাই মিছে কেন তিনি কষ্ট করছেন? তিনি জবাব দিলেন, আজ মুসলমানদের জীবন বিপন্ন হয়েছে। তাদের এই দুঃখ তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছে। এ সব ছোটখাটো ঘটনাগুলোকে তিনি হাঙ্গামার সামিল বলেই মনে করেন। তাই এগুলোকে তিনি উপেক্ষা করতে পারছেন না।

গান্ধীজি অস্বীকার করলেন যে, তিনি এই অনশন সর্দ্দার প্যাটেলের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদস্বরূপ করছেন।

চতুর্থ দিন। গান্ধীজির শরীর আরো অবসন্ন হয়ে পড়লো। মৌলানা আজাদ তাঁকে আবার অনুরোধ করলেন অনশন ভাঙতে কিন্তু গান্ধীজি মানলেন না। তিনি বললেন, একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর পথপ্রদর্শক। তিনি আজ তাঁরই হাতে। আজ তাঁর আর মৃত্যুকে কোন ভয় নেই।

প্রার্থনা-সভায় তিনি জানালেন যে, ভারত সরকার পাকিস্থানের প্রাপ্য টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে। তিনি আশা করলেন যে, এবার হয়তো কাশ্মীর সমস্যারও একটা সমাধান হবে।

দেশ-বিদেশ থেকে হাজার-হাজার টেলীগ্রাম আসতে লাগলো তাঁর শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞেস করে।

যেদিন থেকে গান্ধীজি তাঁর অনশন সুরু করেছিলেন সেদিনই দিল্লীর নেতাদের মধ্যে এক আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাড়ীতে রোজই বসছিলো বৈঠক। দিল্লীতে শান্তি ফিরিয়ে আনা ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন স্থাপন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। শুধু মাত্র একটা কাগজে সই করলে চলবে না, কারণ ওতে গান্ধীজি সন্তুষ্ট হবেন না। বিভিন্ন দলের নেতাগণ তাঁদের অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পঞ্চম দিনে সবাই মিলে তাঁরা একটা প্রতিশ্রুতির খসড়া করলেন। এতে সায় দিলেন সমস্ত দলের নেতাগণ। বলা হলো—এতে মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে, নির্ভয়ে সব বিপদসঙ্কুল স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারবে। হিন্দুদের দখলে যে সমস্ত মসজিদ আছে সেগুলোও ফিরিয়ে দেয়া হবে। নেতাগণ গান্ধীজিকে আশ্বাস দিলেন এই সমস্ত কাজ তাঁরা নিজেরাই তত্ত্বাবধান করবেন, কোন মিলিটারীর সাহায্য নেওয়া হবে না।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন তাঁর অনশন ভাঙতে। গান্ধীজি তখন এক বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, 'দিল্লী হলো ভারতের রাজধানী। এ কথায় সমস্ত দেশবাসী তাকিয়ে আছে দিল্লীর পানে। সমস্ত ভারতবাসীর আজ বোঝা উচিত যে, হিন্দু-মুসলমান-শিখ সব ভাই-ভাই। যতো দিন দেশের লোকেরা এ কথা না বুঝতে পারবে ততো দিন এ দেশের কোন মঙ্গল হবে না।'

হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, যাঁরা এই প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের গান্ধীজি অনুরোধ করলেন শুধু দিল্লীর হাঙ্গামা থামানোই তাঁদের দায়িত্ব নয়, দেশের অন্যান্য জায়গায় যে হাঙ্গামা হচ্ছে, তা রোধ করাও তাদের কর্ত্তব্য।

বলতে-বলতে গান্ধীজির চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগলো। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এই মর্ম্মস্পর্শী আবেদন তাঁদের মনে দাগ কাটলো। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে ফেললেন।

গান্ধীজি আবার বলতে সুরু করলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর হয়ে এলো ক্ষীণ। সুশীলা নায়ার সেগুলোকে জোরে বলে যেতে লাগলেন।

গান্ধীজি জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই কি এঁরা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন! তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবার জন্যেই কি তাঁরা এই ছলনা করছেন? তিনি নেতাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাইলেন যে, তাঁরা দিল্লীর শান্তি, মুসলমানদের নিরাপত্তা বজায় রাখবেন। যদি তাঁরা তাঁকে এ আশ্বাস দেন তবেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে পাকিস্থানে যাবেন এবং সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবেন।

এবার বক্তৃতা দিলেন মৌলানা আজাদ। তিনি গান্ধীজিকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁরা ইসলাম ধর্ম্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নকে দেখছেন না। এর পরে বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতা গণেশ দত্ত। তিনি গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন তাঁর অনশন ভাঙতে। পাকিস্থানের রাজদূত ও এক শিখ নেতাও বক্তৃতা দিলেন।

একটা ছোট চৌকীতে গান্ধীজি বসে রইলেন, তিনি তখন চিন্তায় মগ্ন। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ বাদে গান্ধীজি জানালেন যে, তিনি তাঁর অনশন ভাঙবেন। এর পরে তাঁকে কোরাণ, পার্শী ও জাপানী ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করে পড়ে শোনানো হলো।

মানু ও আভা গান্ধী এক ভজন গাইলেন। এক গ্লাস কমলা লেবুর রস মৌলানা আজাদ গান্ধীজির হাতে তুলে দিলেন। গান্ধীজি ধীরে-ধীরে সেটা পান করলেন।

সেদিন ভোর বেলা পণ্ডিত নেহরুও সংকল্প করেছিলেন যে, তিনি গান্ধীজির সঙ্গে-সঙ্গে অনশন করবেন। কিন্তু যখন তিনি গান্ধীজিকে কমলা লেবুর রস পান করতে দেখলেন, তখন বিদ্রূপ করে বললেন, 'না, এবার দেখছি আমার উপোস ভাঙতে হবে।'

গান্ধীজি নেহেরুর কথায় খুসীই হলেন বোঝা গেলো। বিকেলে তিনি নেহেরুকে এক চিঠি লিখে পাঠালেন তাঁর শুভকামনা প্রার্থনা করে।

* * * *

দপ্তরের কাজ যখন অনেকটা কমে এলো তখন একদিন দেখা করতে গেলাম ব্রজ বাবুর সঙ্গে। ভদ্রলোকের সঙ্গে পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। বহুদিন আগে বাংলা দেশ ত্যাগ করে বোম্বাইর বাসিন্দা হয়ে আছেন। প্রথম জীবনে একটা ছোট চাকুরী নিয়ে আসেন, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর পরহিত করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। বোম্বাই থাকাকালীন এক সাধুপুরুষের সন্ধান পেলেন, মুক্তির দীক্ষা নিলেন তাঁর কাছ থেকে।

এর পরে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ব্রজ বাবু পরোপকার ব্রত নিয়ে মগ্ন রইলেন। অনেকের সাহায্য নিয়ে তিনি একটা জনকল্যাণ সমিতি খুললেন। সুধীসমাজে পরিচিত হলেন তারই অধ্যক্ষ বলে। আমায় দেখে ব্রজ বাবু খুসীই হলেন। বললেন, 'ভালোই করেছিস্। আমি আগেই খবর পেয়েছিলুম তুই একটা কাগজে চাকুরী নিয়ে আসছিস্। তা মাইনে পাস্ কতো?'

ব্রজ বাবুর বিশ্বাস যে, পরোপকার ব্রত বা ধর্ম্মে অটুট বিশ্বাস রাখতে হলে আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন। নইলে পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা অত্যধিক। তাই যাঁদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাঁদের তিনি বারণ করে দেন এই কঠিন ব্রত থেকে নিরস্ত থাকতে। তাই পরিচয়ের প্রারম্ভে তিনি কৌলীন্য যাচাই করে নেন। অতএব এই প্রশ্নের গৌণ কারণ আমার জানা ছিল। তাই মাইনে একটু বাড়িয়েই বললাম, শুনে তিনি খুসীই হলেন। আর বললেন, 'তা বেশ, বেশ, ভালোই চাকুরী করছিস তা হলে। একটু ঘন দুধ খাবি?'

শেষের কথাটি শুনে বুঝতে পারলাম যে, কৌলীন্য যাচাইতে উত্তীর্ণ হয়েছি। কোন সন্দেহ রইলো না যে, আমার পদমর্য্যাদার গ্রেড তিনি ঠিক করে ফেলেছেন।

অসম্মতি জানালাম। ব্রজ বাবু বলতে লাগলেন, 'বুঝলি, মণ্টু এখানে এসেছিলো একটা দিশী কোম্পানীর কেরাণী হয়ে। এরা যে কেন বিদেশে কেরাণী হয়ে আসে বুঝতে পারি না। এসেই আমায় বললে একটা থাকার বন্দোবস্ত করে দিতে। তা বাপু, তুই যখন প্রথম এলি তখন সব বন্দোবস্ত করে এলেই তো পারতিস।'

ব্রজ বাবু এবার কাজের কথা বলেন। পাঞ্জাবের শরণার্থীদের জন্যে একটা রিলিফ টীম শীগ্‌গিরই যাবে দিল্লীতে। সেই উদ্দেশ্যে একটা চ্যারিটি শো হবে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে। শহরের ধনকুবেররা তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্বয়ং গভর্ণরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বলতে-বলতে হঠাৎ আমায় টেলীফোনের ডাইরেক্টরী আনতে বললেন। 'দ্যাখ তো, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের নম্বরটা কি? 'ফাংসনের' আগে আমায় একবার টেলীফোন করতে বলেছিলেন। এই সব বড়লোকদের খামখেয়ালী নিয়ে আর পারি না।'

পুরুষোত্তমদাসের সন্ধান পাওয়া গেলো না। কিন্তু ব্রজ বাবু হাল ছাড়লেন না। বোম্বাইর ধনকুবের সবাইকে তিনি টেলীফোন করতে লাগলেন।

টেলীফোন শেষে তিনি আমার দিকে হেসে বললেন, 'দেখলি তো, চ্যারিটি শো করা সহজ কথা নয়। এই সব 'রইস' আদমীদের পাকড়াও করার রীতিমতো ক্ষমতা থাকা চাই।'

বিদায় নিয়ে আসবার আগে তিনি আমায় বার বার অনুরোধ করলেন যেন চ্যারিটি শো'র দিন উপস্থিত থাকি! তিনি বললেন, 'তোর বাবা লিখেছিল তোর উপর একটু নজর রাখতে। আমার তো বাপু দেখতেই পাচ্ছিস, চারিদিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট। তা তুই-ই একটু মেহনৎ করে এদিকে পা মাড়াস্। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোকে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলুম, তুই সর্টহ্যাণ্ড জানিস তো?' ও বিদ্যেটা জানা আছে শুনে তিনি খুসীই হলেন। বললেন, 'ভালোই হলো, সেদিন গভর্ণর আসবেন। হয়তো একটা বড়ো রকমের বক্তৃতাও দেবেন। আর তা ছাড়া আমি ভাবছি সেদিন কিছু বলবো। দেখিস্, ভালো করে টুকে নিস্। আর তোর অন্যান্য কাগজের রিপোর্টার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ কর্, না।'

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লি
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

অনেকগুলো কথা তিনি একসঙ্গে বলেন। আমি আমার যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিই।

দু'দিন বাদে ব্রজ বাবু আমায় অফিসে টেলীফোন করলেন। বললেন, 'একটু এদিকে আসতে পারিস। বড্ডো দরকার।'

ঘণ্টা খানেক বাদে তাঁর বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। তাঁর বৈঠকখানায় রীতিমতো একটা ছোটখাটো মিটিং বসে গেছে। সবার মুখই বেশ গম্ভীর। ব্রজ বাবু আমায় দেখে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'তোর অপেক্ষাই ছিলাম।' কালকের সব কাগজে একটা ছোট খবর বের করে দিবি। আমাদের চ্যারিটি শো'র দিন পাল্টে গেছে। উঃ, কি করে যে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাবো, তা ভেবেই পাচ্ছি না। হয়তো এবার গভর্ণর আসবেনই না। এদিকে সবাইকে কার্ড পাঠানো হয়ে গেছে। আজ ভোরেও আমায় স্যর রুস্তম টেলীফোন করেছিলেন যে, সব ঠিক আছে তো। ছিলাম বেশ পরোপকার ব্রত নিয়ে, কেন যে মিছেমিছি মাথা গলাতে এলাম এই সব ঝঞ্ঝাটের কাজে।'

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, কি হলো যে আপনার যে চ্যারিটি শো'র দিন বদলে দিচ্ছেন?'

তিনি ভেংচি কেটে বলেন, 'তা দেবো না তো কি নিজেই হিরো সাজবো? ছাখদিখিনি কাণ্ডখানা! যতো সব স্নবারি। হিরোইনের মা আপত্তি করেছেন হিরোকে নিয়ে। বলে কি না অতো বড়ো অফিসারের মেয়ে, তাকে আমি ঐ ক্লার্কটার সঙ্গে এক্টো করতে দেবো না।'

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন পাশের এক ভদ্রলোক। এই অভিনয়ের হিরোইন অনুরাধা এক বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীর মেয়ে। সন্ত তাঁরা দিল্লী থেকে এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। বোম্বাইর সামাজিক আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত ন'ন। এই বইয়ের হিরো হলো এক সামান্ত কেরাণী। প্রথমে এ ঘটনাটা জানা যায়নি কিন্তু একদিন অনুরাধা টের পেলো যে, হিরো শঙ্কর বড় কেউকেটা নয়। তার মা এ কথা শোনা মাত্র বেঁকে বসলেন। দাবী করলেন যে, কেরাণীর সঙ্গে তাঁর মেয়ে একটিং করতে পারে না। এতে অভিনয় হোক বা না হোক।

বললাম, 'তা বেশ, হিরোইন বা হিরোকে কাউকে পাল্টে নিলেই হয়। সমস্ত ল্যাটা চুকে যায়।'

'ও, বাপু, তুমি তো দু'কথায় বলেই খালাস। অনুরাধাকে এই অভিনয় থেকে বাদ দিলে আমার টিকেটের সেল্ যে কমে যাবে! আর তা ছাড়া ওর বাবা হলেন শ্রীশ্রীগুরুদেবের শিষ্য।'

'তা হলে, হিরো শঙ্করকেই বাদ দিন। আরো তো লোক আছে,' আমি বলি।

'না, তা হয় না,' ব্রজ বাবুর পাশের ভদ্রলোকটি বলে উঠেন, 'শঙ্করকে বাদ দিলে এই প্লে একদম মাটী হয়ে যাবে। সেবার দাদারে পুজায় ও যা পার্ট করেছিল, তা দেখে সবার তাক্ লেগে গিয়েছিলো।'

উপস্থিত প্রায় সবাই এতে সম্মতি দিলেন।

ব্রজ বাবু বুঝতে পারলেন যে, শঙ্করের দল বেশ ভারী। তিনি এবার রেগে গেলেন। বললেন, 'তা হলে তোমরাই সব করো, আমি এতে নেই। আমি স্যর রুস্তমকে বলে দিচ্ছি। কাণ্ডের জন্তে আমি টাকা অন্ত উপায়েই তুলতে পারবো।' ব্রজ বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এর পরে চ্যারিটি শো নির্দ্ধারিত দিনেই হয়েছিলো, শুধু মাত্র অভিনয়টি হয়নি। কারণ শঙ্করের দল অনুরাধার মার আব্দারে রাজী হ'ননি এবং ব্রজ বাবুও অনুরাধার মাকে রাগাতে সাহস করেননি। গানের জলসা বেশ জমকালোই হয়েছিল। শহরের যাঁরা নামকরা শিল্পী তাঁরাই এসেছিলেন। টিকিটও বেশ বিক্রী হয়েছিলো। পরদিন অবশ্য এর একটা বেশ বড়ো রিপোর্টই প্রতি কাগজে বেরিয়েছিলো। এতে ব্রজ বাবু খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিছু দিন বাদে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন।

* * * * *

শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারী, ভারতের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনে গান্ধীজিকে হত্যা করা হয়।

এবার দিল্লীর অনশন গান্ধীজিকে অনেক কাহিল করে তুলেছিল। প্রার্থনা-সভায় তাঁকে চেয়ারে করে নিয়ে আসা হতো। একদিন প্রার্থনা-সভায় এক হৈ-চৈ উঠলো। শুনতে পাওয়া গেল এক হাত-বোমার আওয়াজ। জনতা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো, কিন্তু গান্ধীজি রইলেন অবিচলিত। তিনি সবাইকে শান্ত হতে বললেন।

শোনা গেল যে, এক পাঞ্জাবী শরণার্থী, নাম তার মদনলাল হাতবোমা ছুঁড়েছে গান্ধীজিকে হত্যার উদ্দেশে। কিন্তু নিশানা হয়েছে তার ব্যর্থ। আসামী অবশ্য গ্রেপ্তার হয়েছে।

এ ঘটনার উল্লেখ করলেন পরদিন গান্ধীজি প্রার্থনা-সভায়। বললেন, 'এমনি ভাবে হিন্দুধর্ম্ম জীইয়ে রাখা যাবে না। মানব-হত্যা কোন ধর্ম্মকে রক্ষা করতে পারে না।' তিনি বললেন যে, গান্ধীবাদই ধর্ম্ম রক্ষা করার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

তার পর এলো ৩০শে জানুয়ারী। বিকেল সাড়ে চারটা। আভা নিয়ে এলো গান্ধীজির খাবার। এটাই হলো তার 'লাষ্ট সাপার'। সামনে বসে রয়েছেন সর্দ্দার প্যাটেল ও তাঁর দুহিতা মনিবেন। আলোচনার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে গুজব রটেছে যে, সর্দ্দার প্যাটেল ও নেহেরুর মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। মীমাংসার দায়িত্ব নিয়েছেন গান্ধীজি। হাসতে হাসতে কথা বলতে লাগলেন গান্ধীজি। এর জবাব দিলেন সর্দ্দার। ইতিমধ্যে আভা এসে জানালো যে, প্রার্থনার সময় হয়েছে, হাতঘড়িটা ধরলো গান্ধীজির কাছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে পড়লেন গান্ধীজি। আভা ও মানুকে নিয়ে প্রার্থনা-সভার দিকে তিনি রওনা হলেন। যেতে-যেতে তিনি রসিকতা করতে লাগলেন ওদের সঙ্গে।

অনেকটা নালিশের সুরেই আভা বললে, 'বাপু, আজকাল আপনি আর আপনার হাতঘড়িটার দিকে নজর দিচ্ছেন না।'

জবাব দেন গান্ধীজি, 'ভয় কি, তোমরাই যে আমার টাইম-কিপার।'

মানু হেসে প্রশ্ন করে, 'কৈ এই টাইম-কিপারদের প্রতিও তো নজর দেন না।'

গান্ধীজি হাসেন, কিছু বলেন না।

সেদিন প্রার্থনা-সভায় বেশী লোক হয়নি, মাত্র শ'পাঁচেক লোক ছিল। মঞ্চে এসে পৌঁছবা মাত্র সবাই উঠে দাঁড়ালো।

এমনি সময় ভীড় ঠেলে এলো একটি লোক। দেখে মনে হলো,

সে গান্ধীজির পদধূলি নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠিক সামনে এসে লোকটা মানুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, তার পর রিভলভার বের করে পর-পর তিন বার গুলী চালালো।

প্রথম গুলীটা লাগলো পায়ে, কিন্তু গান্ধীজি দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্বিতীয়টা লক্ষ্য ভেদ করলো। রক্তের ধারা বইতে লাগলো। তাঁর মুখ থেকে শুধু বেরুলো 'হায় রাম।' তৃতীয় গুলীতে দেহ নিশ্চল হলো। চোখ থেকে খুলে পড়লো চশমা।

আভা ও মানু তাঁর মাথা তুলে ধরলো। নিয়ে আসা হলো তাঁকে তাঁর ঘরে। চোখ দুটো আধ-বোজা, মনে হলো যেন ক্ষীণ প্রাণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সর্দার প্যাটেল বাড়ীতেই ছিলেন, খবর পেয়ে ছুটে এলেন দৌড়ে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার ভার্গবের তলব হলো। কিন্তু তিনি এসে নিরাশা কণ্ঠে বললেন, 'না, এঁকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই, জীবন-প্রদীপ নিবে গেছে। প্রায় দশ মিনিট আগে। ইনি মারা গেছেন। চার দিক থেকে উঠলো ক্রন্দনধ্বনি।

নেহেরু ছিলেন সেক্রেটারিয়েটে। খবর পেয়ে পাগলের মতো ছুটে এলেন। মৃতদেহের উপর মাথা রেখে তিনি কাঁদতে সুরু করলেন।

এর পরে একের পর এক আসতে লাগলেন। এলেন গান্ধীজির পুত্র দেবদাস গান্ধী, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি।

দেশে-বিদেশে আগুনের মতো এই হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লো। বিড়লা-বাড়ীর প্রাঙ্গণ হলো জনাকীর্ণ। হত্যাকারী নাথুরাম বিনায়ক গোডসেকে গ্রেপ্তার করা হলো। জাতে সে মহারাষ্ট্রীয়, শোনা গেলো সে পুণায় এক কাগজের সম্পাদক।

* * * *

কিছুক্ষণ বাদে বিড়লা-বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নেহেরু জনতার উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা করলেন। চোখ তাঁর অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠ হয়ে এসেছে ক্ষীণ। তিনি বললেন, 'মহাত্মাজী মারা গেছেন, আমরা হারিয়েছি আমাদের নেতা। আজকের দিনে আমরা চতুর্দ্দিকে দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার ও দুঃখ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর আত্মা এই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের পথ দেখাবে।'

গান্ধীজির মৃতদেহ এবার ছাদে নিয়ে যাওয়া হলো। জনসাধারণের সুবিধার্থে দেয়া হলো সার্চলাইটের আলো। আশ্রমবাসীরা গীতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

পরদিন ভোরে গান্ধীজিকে পরানো হলো নতুন থানের কাপড়। এ দেহবাস সবার চোখে এনে দিলো জল। কেউ-কেউ অনুরোধ করলেন মৃতদেহ রেখে দেবার জন্যে। যাতে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে সবাই তাঁর শেষ দর্শন পায়। কিন্তু আপত্তি এলো প্যারেলাল ও দেবদাসের কাছ থেকে। দুপুর নাগাদ গান্ধীজির তৃতীয় পুত্র রামদাস গান্ধী এসে পৌঁছুলেন। বারোটার কিছু আগে মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে রাজঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো।

আগের দিন সারা রাত্রি এই শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। এর কোন ত্রুটিই রাখা হয়নি। জাতীয় পতাকা দিয়ে মৃতদেহকে আচ্ছাদন করে নেয়া হলো, ফুল দিয়ে ঢাকা হলো দেহ। শোভাযাত্রার প্রথম ভাগে রাখা হলো সাঁজোয়া বাহিনীর গাড়ী, এর পরে রইলো রাজপুতানা রাইফেলসের বাহিনী, লম্বায় এটা হলো প্রায় দু'মাইল।

রাজঘাটে শোভাযাত্রা পৌঁছুল প্রায় বিকেল সাড়ে চারটায়। কিছুক্ষণ বাদে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের প্লেন এসে মৃতদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি করে গেল; শোভাযাত্রা যতোই চিতার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো জনতার বৃদ্ধি পেলো ততোই।

তার পর সব হলো শেষ। রামদাস করলেন মুখাগ্নি। সেই ধুঁয়া উঠে গেলো দূরে, বহু দূরে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

শেষ হয়ে গেল একটা যুগ। আজ থেকে সুরু হলো ভারতে এক নতুন ইতিহাস। কিন্তু যে যুগ চলে গেলো সে থাকবে ইতিহাসে শাশ্বত।

* * * *

বোম্বাইর ডেস্কে খবর এলো, সব এডিট করতে করতে আমার মনে পড়লো পুরানো দিনের স্মৃতি। নোয়াখালী, পাটনা, বেলেঘাটা। আজও মনে আছে কাজিরখিলে, শ্রীরামপুরের ক্যাম্পের কাহিনী। মনে পড়ে সেই দিনের কথা। প্রথমে প্রাতর্ভ্রমণ। লাঠি ভর দিয়ে ক্ষেতের আল ভেঙ্গে যেতেন গ্রামের পর গ্রাম। আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সান্ত্বনা দেয়া, তাদের মন থেকে ভয় দূর করা। তার পর বিকেল হলে প্রার্থনা-সভা। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীত। নিজের অন্তর দিয়ে আহ্বান করতেন গ্রামবাসীদের, প্রয়োজন হলে শুনতেন গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশার কথা।

তার পর এলো বিহার। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আগুন জ্বলে উঠেছে গাঁয়ে গাঁয়ে। মূষিকের মতো পালিয়ে যাচ্ছে ভয়ার্ত্ত মুসলমানগণ। এমনি সময়ে আশার বাণী নিয়ে গান্ধীজি এলেন তাদের মাঝে। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি তাদের বললেন, 'ওরে তোরা যাস্ নে।' তাঁর সেই আশ্বাসবাণী এনে দিলো ওদের মনে আশ্বাস। গ্রাম থেকে গ্রাম তিনি ঘুরে বেড়ালেন। যারা পালিয়ে যাচ্ছিলো তাদের তিনি ফিরিয়ে আনলেন। সে তীর্থযাত্রা আজও আমার স্মৃতিপটে রঙীন হয়ে আছে।

শুধু তাই নয়, আরো বহু পুরানো কথ আমার মনে হলো। লোকমুখে বহু বাক্-বিতণ্ডা শুনেছি তাঁর সম্বন্ধে। প্রশংসা শুনেছি অজস্র, নিন্দাও শুনেছি কিন্তু কেউ-ই অস্বীকার করেননি যে, তিনি ছিলেন যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ।

মাঝে-মাঝে কোথাও তাঁর খ্যাতি ম্লান হয়েছিল, কিন্তু সেই অপ্রিয়তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। তার প্রমাণ বাংলা দেশ। এখানে তিনি যেমনি হাততালি পেয়েছেন তেমনি ধিক্কার পেয়েছেন, কিন্তু অস্বীকার করেনি কোন দিন বাঙ্গালী যে, তিনি ছিলেন মহাত্মা। তাই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়েছিলেন এই নাম।

আমার মনে পড়লো ত্রিপুরী কংগ্রেস ও নেতাজী সুভাষ বোসের পদত্যাগের কাহিনী। এ ঘটনার পর বাংলা দেশে অনেকটা জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন গান্ধীজি। নেতাজী বোস ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো ত্রিপুরী কংগ্রেসের কিছু আগে। নতুন কংগ্রেস সভাপতির জন্ম নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তিন জনের, মৌলানা আজাদ, নেতাজী বোস ও পট্টভি সীতারামিয়া। অসুখের অজুহাতে মৌলানা আজাদ এই নির্ব্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন কিন্তু দৃঢ়তা দেখালেন সুভাষ বোস। তিনি দাবী করলেন এই নির্ব্বাচনের জন্যে ইলেকসনের। তিনি

বললেন, 'অন্ত স্বাধীন দেশে যেমনি সভাপতির নির্ব্বাচনের জন্যে ইলেকশন হয়, এখানেও তেমনি হওয়ার প্রয়োজন।' এর জবাব দিলেন বর্দোলই থেকে সর্দ্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য্য কৃপালনী। তারা মানতে রাজী হলেন না যে, সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য কোন নির্ব্বাচনের প্রয়োজন আছে। চিরপ্রথা অনুযায়ী এই নির্ব্বাচন হবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে, বিনা ইলেকশনে। তাঁদের মতে কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য পট্টভী সীতারামিয়াই যোগ্য ব্যক্তি। এর জবাবে সুভাষ বোস বললেন যে, তিনি প্রত্যাশা করেননি এই নির্ব্বাচন নিয়ে অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যরা এই ভাবে পক্ষ নেবেন। তিনি বললেন, 'যদি সভাপতি নির্ব্বাচন সত্যিই ন্যায়ভাবে হয় তবে ভোট দেবার পূর্ণ স্বাধীনতা সবাইকে দিতে হবে। সুভাষ বোস জানালেন যে তিনি বামপন্থী নেতা আচার্য্য নরেন্দ্র দেও'র জন্য সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। এর জবাব দিলেন সর্দ্দার প্যাটেল। তাঁর আগের দাবী তিনি সমর্থন করলেন।

এর পরে এক বিবৃতি দিলেন নেহেরু। সভাপতির পদ নিয়ে এই বাদানুবাদের তিনি তীব্র নিন্দা করলেন। এই কলহের মধ্যে গান্ধীজি কোন কথা বললেন না, শুধুমাত্র হরিজনে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি এতে কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতির তীব্র নিন্দা করলেন। বললেন, 'এই ভাবে চললে পর কংগ্রেসের মধ্যে বিশৃঙ্খলাই দেখা দেবে, আর কিছু নয়।'

যথাসময়ে নির্ব্বাচন হয়ে গেল, ফলাফল বেরুলে পর দেখা গেলো যে, সুভাষ বাবু পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করেছেন। এর দু'দিন বাদে বর্দোলই থেকে এক বিবৃতি দিলেন গান্ধীজি। এতে তিনি বললেন, "পট্টভীর পরাজয় আমারই হার।"

সুভাষ বাবুর উদ্দেশে তিনি বললেন: 'I am glad of his victory but the defeat is more mine than his.... After all Subhash Babu is not an enemy of his country. He has suffered for it.'

গান্ধীজির এই বিবৃতি সুভাষ বাবুর অন্তরে দুঃখ দিল। তিনি বললেন যে, গান্ধীজির আশীর্ব্বাদ পাওয়া সর্ব্বদাই হবে তাঁর কাম্য। 'It will be a tragic thing for me, if. I succeed in winning the confidence of other people but fail to win the confidence of India's greatest man."

ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঠিক কিছু আগে গান্ধীজি সুভাষ বাবুকে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করতে নিষেধ করলেন। তিনি সবার কাছে অনুরোধ করলেন যে, এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পবিত্র করে তোলা।

গায়ে জ্বর নিয়ে মার্চ্চ মাসের প্রথমে সুভাষ বাবু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করলেন। গোবিন্দবল্লভ পন্থ এক প্রস্তাব আনলেন। এতে কংগ্রেস সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো, গান্ধীজির মতানুযায়ী নতুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে। অস্বীকার করলেন সভাপতি এই প্রস্তাব এ, আই, সি, সির সামনে পেশ করতে। এতে আপত্তি তুললেন পণ্ডিত পন্থ। বললেন, 'সামান্য কারণে এই প্রস্তাব বাতিল করে দে'য়া উচিত নয়।'

তার পর এলো অধিবেশন। অসুস্থতার জন্য নেতাজী কংগ্রেস অধিবেশনে আসতে পারলেন না। আসন গ্রহণ করলেন মৌলানা আজাদ। সভাপতির ভাষণ পাঠ করলেন শরৎ বোস।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গোলমাল দেখা দিলো। আনে প্রস্তাব করলেন যে, কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়ে যে অসুবিধা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো এ, আই, সি, সিতে আবার পাঠান হোক। বাধা এলো নেহেরুর কাছ থেকে। তিনি বললেন, আপনারা হরিজনে গান্ধীজির লেখা পড়লে দেখতে পাবেন যে, বর্ত্তমান কংগ্রেসের এই অবস্থায় তিনি অন্তরে কতো দুঃখ পেয়েছেন। তার কী কারণ? কারণ গান্ধীজি আসন্ন সংগ্রামের জন্য দেশকে ও দেশবাসীকে প্রস্তুত করতে চাইছেন।

আনে প্রস্তাব তুলে নিলেন।

অধিবেশনের তৃতীয় দিনে উত্তেজনার বৃদ্ধি পেলো। পণ্ডিত পন্থ এক প্রস্তাবে গান্ধীজির প্রতি আস্থা প্রকাশ করলেন। তিনি আবার দাবী করলেন যে, নতুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজির অনুমতি নিয়ে করা হোক। সমর্থন করলেন রাজাজী। তিনি গান্ধীজির নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করলেন। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলো।

এর পরে নাটক সুরু হলো কলকাতায়। এখানে সুরু হলো এ, আই, সি, সির অধিবেশন।

নেতাজী এই অধিবেশনে পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। এর কারণ তিনি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন যে, গান্ধীজির মত— নতুন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পুরানো সদস্যদের বাদ দে'য়া হোক। কিন্তু এই প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি। তাই তিনি অনুরোধ করলেন গান্ধীজিকে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার দায়িত্ব নেবার জন্য। গান্ধীজি আবার অস্বীকার করলেন এই দায়িত্ব নিতে। সমস্যার কোন সমাধান হলো না দেখে নেতাজী বোস পদত্যাগ করলেন।

গান্ধীজি অনুরোধ করলেন নেতাজী বোসকে এই পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে। কিন্তু নেতাজী বোসের কোন মত-পরিবর্ত্তন হলো না। সভায় তুমুল হৈ-চৈ হলো।

পরদিন অধিবেশনে পণ্ডিত নেহেরু নেতাজীকে আবার তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে বললেন। এতে সমর্থন দিলেন সরোজিনী নাইডু। কিন্তু নেতাজী বোসের কোন মতের পরিবর্ত্তন হলো না।

তাই নতুন সভাপতি হলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

[ক্রমশঃ।

সুখ-দুঃখ

"সুখের রাত্রি দেখিতে ২ যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে
ডুবে থাকে তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি
পোহাইল কিন্তু পোহাইতেও পোহায় না।"—টেকচাঁদ ঠাকুর।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP

S. 205-50 BG

আকাশকাম

বারীন্দ্রনাথ দাশ

লাইটহাউস থেকে সিনেমা দেখে বেরিয়ে আমি আর সাধনাদি' চা খেতে ঢুকলুম একটি ছোটো রেস্তরাঁয়। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, লোকজন খুব বেশী নেই, এমন কিছু অভিজাত নয় এটি। তবু এ পাড়ায় সিনেমা দেখতে এলে আমরা চা খেতে আসতুম এখানেই, কারণ আমাদের, এবং আরো অনেকের, কলেজ-জীবনের ছোটোখাটো রোমান্স-জীবনের স্মৃতি এর সঙ্গে জড়ানো।

বৈশাখের গোধূলি তখন হুমায়ুন প্লেস্‌এর জনতার সাড়ি আর গাউন আর টাই আর হাওয়াইআন শার্টের বর্ণবিন্যাসে রঙিন হয়ে উঠেছে। সাধনাদি'র উদাস চাউনী তারই প্রতিফলন নিয়ে ভাবনাময় হয়ে উঠলো। এদিকে-ওদিকে এক-একটা করে ঝলমল করে ওঠা নিয়নের আভায় সাধনাদি'র এলোমেলো ভাবনাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে।

টেকনিকালার ছবির গল্পটি সাধনাদি'র মনে তখন ভাসছে।

খুব আস্তে আস্তে আমায় জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা সলিল, সারা জীবন যাকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে চাওয়া যায় তাকে যদি হঠাৎ সত্যিই পাওয়া যায় একদিন, তা'হলে তার চেয়ে বড়ো সুখ আর ভাবা যায় না, কি বলো?"

আমি বললুম, "আমার কি মনে হয় জানো? যে সুখ ভাবা যায় তার গণ্ডী বড়ো ছোটো। তার বাইরে আরো আছে যার বৈচিত্র আর মাধুর্য অনেক বেশী।

সাধনাদি' বললে, "সে তো আমাদের মতো সাধারণদের আওতার বাইরে।"

"নিশ্চয়ই নয়," আমি বললুম, "সে আরো বেশী আটপৌরে।"

"তুমি যা বললে সে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, ধোঁয়াটে। আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু পেলুম না", সাধনাদি' বললে।

উত্তরটা সাধনাদি' সেদিনই পেলো। তবে আমার কাছ থেকে নয়।

* * * *

মিনিট দশ পরই রেস্তরাঁয় যে ঢুকলো সে আমার পুরোনো বন্ধু। ইউনিভার্সিটিতে পড়তুম একসঙ্গে। আমাদের দেখেই সোজা চলে এলো আমাদের টেবিলে। বললে, "একটা কথা বলতে এলুম, সলিল! তোকে আজ রাত্তিরে বাড়িতে পাওয়া যাবে?"

"কেন", জিজ্ঞেস করলুম।

"আসবো একবার। দরকার আছে।"

আমি অবাক হলুম, "আসিস, আমি থাকবো, কিন্তু কি দরকার বল তো? আমার কাছে তোর মতো বিগ শটের দরকার থাকতে পারে, সে কথা ভাবতেই পারছি না। গত তিন-চার বছরের মধ্যে তো আসিসনি একদিনও, আমায় ভুলে গেছলি না কি?"

"না রে", সে একটু হেসে বললে, "নানা রকম কাজে-অকাজে ব্যস্ত ছিলুম।"

আমি পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললুম, "বোস্।"

"অসুবিধে হবে না তো?" সে জিজ্ঞেস করলে।

"কিছু না।" সাধনাদি'কে বললুম, "একে চেনো না এখন বি-সি-এস্'এ আছে। কোথায় যেন এস-ডি-ও।"

"কোথায় রে?"

"এখন রাইটার্স বিল্ডিংএই আছে।"

"একে চিনিস? সাধনাদি'।"

বিমল হাত তুলে নমস্কার করলে, "আপনার কথা শুনেছি অনেক, আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়নি এদ্দিন।"

"চা খাবি নিশ্চয়ই। আর কি আনতে বলবো বল। বয়...! তারপর বল কি ব্যাপার।"

"রাত্তিরেই বলব'খন," সে বললে।

"খুব গোপনীয় ব্যাপার?"

সে হাসলো। বলল, "না, খুব প্রকাশ্য ব্যাপার।"

"কি?"

হাসিতে নিয়নের লাল আভার মতো একটু লজ্জার ছোঁয়াচ লাগলো। বললে, "বিয়ে করছি। তোকে নেমন্তন্ন করতে যাবো।"

"ও, এই ব্যাপার," আমি হতাশ হলুম। "বিয়ে করছিস? বেশ। মেয়ের বাপ কি করে? কতো দিচ্ছে?"

সাধনাদি' হেসে ফেললো। হাসিতে যোগ দিলো বিমলও।

"হাসির কি আছে." আমি বললুম। "সরকারী চাকুরে ছেলে, বাঙলা দেশের মেয়ের বাপ টাকা দেবে না?"

"মেয়ে কি করে, কি রকম দেখতে, তাই জিজ্ঞেস করো," সাধনাদি' বললে।

"মেয়ে আবার কি করবে," আমি বললুম, "বাঙলা দেশের মেয়ে, হয়তো কলেজে পড়ে, নয়তো বা সদ্য পাশ করেছে। দিনের বেলা মাছের ঝোল রাঁধে, দুপুরে সেলাই করে, সন্ধ্যে বেলা হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধে, রাত্তিরে নভেল পড়ে। দেখতে কি রকম তাও বলে দিচ্ছি, বি-সি-এস ছেলেকে যখন বাগাতে পেরেছে মেয়ের বাপ, তখন মেয়ে নিশ্চয়ই ডানাকাটা পরী, হয়তো ডানার ঘা'টা এখনো শুকোয়নি, যদিও দেখবে বিয়ের পর আর দশ জনের মতোই দেখতে হয়ে গেছে।"

বিমল একটু চুপ করে থেকে বললে, "মানসীকে মনে আছে? হিস্ট্রিতে পড়তো?"

"কেন বুঝি তাকে ফিরে মনে পড়ছে," আমি একটি সিগারেট ধরিয়ে বললুম।

একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বিমল বললে, "ইউনিভার্সিটির দিনগুলো বেশ ছিলো, না?"

সাধনাদি' বললে, "আচ্ছা সলিল, বলতে পারো, ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুনো সব ছেলেরই বিয়ে করবার সময় ইউনিভার্সিটির দিনগুলো ফিরে মনে পড়ে কেন?"

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগে বিমলই বলে দিলো, "সেই দিনগুলো বুদ্ধির পায়ে বোকামীর অঞ্জলি দিয়ে কেটেছে, আর আগামী দিনগুলো হয়তো বোকামির পায়ে বুদ্ধির অঞ্জলি দিয়ে কাটাতে হবে, এই তুলনায় অর্থহীন মাধুর্যটুকু উপভোগ করবার জন্যেই মনে পড়ে হয়তো।"

আমি অন্য কথা ভাবছিলুম। মানসী। মানসী গুহ! হিস্ট্রিতে পড়তো। বেশ মিষ্টি দেখতে। নাকটা একটু চাপা না হলে, চোখ দুটো ছোটো না হলে বেশ সুন্দরই বলা চলতো।

মুখ আর হাত দুটো অন্তত, স্বাভাবিক ভাবে নয়তো অস্বাভাবিক ভাবে, ফর্সা। তবে শরীরের যেখানে কম আর যেখানে বেশী হওয়ার কথা, কোথাও কোনো অসহ প্রাচুর্য বা হতাশাময় অভাব নেই। পোষাকে প্রসাধনে কথায় আর হাসিতে যথেষ্ট আকর্ষণময়। অতি-আধুনিকতার অনাচার নেই, বেশী সেকেলেপনার ন্যাকামি নেই। বেশ ভালো লাগে।

"মানসীকে তোমার মনে আছে, সাধনাদি'?"

সাধনা বললে, "হ্যাঁ। তেমন খুব আলাপ ছিলো না। তবে দেখেছি। মাঝে মাঝে একটা বড়ো বুইক গাড়িতে চেপে আসতো।"

"ওর মামার গাড়ি," বললে বিমল।

"হ্যাঁ, ও আলীপুরে মামার বাড়িতেই তো থাকতো"—আমি বললুম।

বিমল বললে, "ওর বাবা থাকতেন দিল্লীতে।"

"বাপের অবস্থাও তো ভালো ছিলো বলেই শুনেছি, সাধনাদি' বললে।

"সেন্ট্র্যালে কিসের যেন ডেপুটি সেক্রেটারী বলেই শুনেছি," আমি বললুম।

বিমল তার পাইপটি ধরিয়ে নিলো।

"আচ্ছা, বিমল," আমি বললুম, "মানসীর সম্বন্ধে তোমার এখন আর কোনো মোহ নেই তো?"

"মানসীর সম্বন্ধে?" বিমল একটু থামলো, "মোহ?" একটু ম্লান হাসলো সে। বললে, "না, এখন আর কোনো মোহ নেই। কেন?"

আমি বললুম, "আজ এই সন্ধ্যেটা আমি আর সাধনাদি' কি করবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিলুম না। চুপচাপ বসেছিলুম। সাধনাদি' একবার জীবনের দু'-একটা দার্শনিক তথ্য আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলো। তাতে প্রায় ঝগড়া বাধবো-বাধবো হয়েছিলো, তুমি এসে পড়াতে আমি বেঁচে গেলুম। এখন যদি মানসীকে নিয়ে আলোচনায় তোমার আপত্তি না থাকে—থাকা উচিত নয়, কারণ তুমি বলছো সে তোমার শেষ-হওয়া চ্যাপ্টার, তোমার কোনো মোহ নেই ওর ওপর—আজ মানসীর গল্প করা যাক, সন্ধ্যেটা ভালো কাটবে। ওকে আমি খানিকটা জানি, সাধনাদি' কিছুটা শুনেছে ওর সম্বন্ধে, তুমি ওর অনেক কিছু জানো, সব মিলিয়ে একটি গল্প করবার মতো গল্প, কি বলো? সাধনাদি', তুমিই সুরু করো।"

* * * *

সাধনাদি' বললে,—"মানসীকে আমি প্রথম দেখি আলীপুরে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে, সে থাকতো ওদের পাশের বাড়ি। শুনলুম দিল্লী থেকে বি-এ পাশ করে এম-এ পড়তে এসেছে কলকাতায়। সে হস্টেলে থাকতে চেয়েছিলো কিন্তু ওর মামা, খুব নামজাদা এটর্নী হাইকোর্টের, ওকে হস্টেলে যেতে দেয়নি। ওর বাবাও আপত্তি করেননি। তিনি চেয়েছিলেন মেয়ে কোনো অভিভাবকের চোখের সামনেই থাকুক।

তোমাদের কি জানি কেন মনে হোতো মেয়েটি খুব সাদাসিধে, কিন্তু আমার প্রথম থেকেই কি রকম যেন একটু আর্টিফিশিয়াল মনে হোতো ওকে, ওর সব কিছু যেন মেপে হিসেব করা—জামা-কাপড় পরা, চুল বাঁধা, কথা বলা, হাসা, সব কিছু। মনের সহজ প্রবৃত্তি থেকে কিছুই যেন বেরুতো না, নিজের কাছে নিজের রুচিরও যেন দাম ছিলো না মোটেও। সবই যেন পরকে [illegible] লাগানোর জন্যে, পরের রুচিকে আহত না করবার জন্যে। এ ব্যাপারে বেশ সাফল্যময় আর্টিষ্ট সে, তা নইলে তোমাদের তা'কে অতোখানি সহজ ও আকর্ষণময় মনে হবে কেন?

ওর কথা শুনে আমার মনে হোলো, সে এম-এ পড়তে কলকাতায় এলো কেন? দিল্লীতে কি এম-এ পড়ানোর ব্যবস্থা নেই? তা'ছাড়া ওর মা-বাবা রয়েছেন সেখানে।

আমার বন্ধুকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম। সে যা' বললে, তা'তে মনে হোলো, ওর মা-বাবা ওকে কলকাতা পাঠিয়ে মামার বাড়ি রেখেছেন ঠিকমতো ছেলে ধরতে। বড্ড অবিশ্বাস্য মনে হয়, বড্ড ছোটো ভাবতে হয় তা'কে,—কিন্তু যা দেখলুম, তা'তে অন্য কিছু মনে করবার কোনো কারণ পেলুম না। ছেলেধরা মেয়েরা বড্ড হ্যাংলা হয়। কিন্তু এখানেও সে অদ্ভুত আর্টিষ্ট। মামার বাড়িতে সে বড্ড লাজুক। ওকে হয়তো তাই ভেবে নিতুম, কিন্তু যখন দেখলুম ইউনিভার্সিটিতে সে অত্যন্ত সহজ সবার সঙ্গে, ইউনিভার্সিটির ভালো ছেলেদের মধ্যে একটা ব্যাপক চেনাশুনো ভর্তি হওয়ার কয়েক সপ্তা'র মধ্যেই, তখন ওর মামার বাড়িতে অতো লাজুক হওয়াটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হোলো। ওর মামাতো বোনেরা ওকে ওদের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে খুব উৎসুক, কিন্তু তার ভীষণ লজ্জা, কিছুতেই বেরুবে না ওদের সামনে। বেরুলেও বেশীক্ষণ থাকবে না। কিছু-দিনের মধ্যে দেখা গেল ওর মামাতো বোনেদের ছেলে-বন্ধুরা ওর জন্যে পাগল। তার পর বোনেতে-বোনেতে ঈর্ষা, ঝগড়া। কিন্তু ওর কোনো ক্ষতি হোলো না। ও তো বড্ড লাজুক। ছেলেরা যদি ওর জন্যে পাগল হয় তো ওর দোষ কি? ওর মামা-মামী ওকে সবার বিষেষ থেকে আড়াল করে রাখলেন। যে মেয়ে খুব ভালো কীর্তন গাইতে পারে সে ওর মামার কাছে শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। যে মেয়ে সরষে বাটা দিয়ে অত চমৎকার ইলিশ মাছের ঝাল রাঁধতে পারে, সে [illegible] মামীর কাছে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কী আসে-যায় যদি বাইরের ছেলেরা তাঁদের নিজের অসহ্য রকম আধুনিক মেয়েদের থেকে ওকে বেশী পছন্দ করে। তা'তে বরং তাদের রুচিকে বেশী পছন্দ করতে হয়। সুতরাং কিছু এলো-গেলো না মানসীর।

ইউনিভার্সিটিতে দেখতুম যদিও ছেলেদের সঙ্গে মিশতে, ছাত্রদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে কোনো সঙ্কোচ নেই মানসীর তবু সবার সঙ্গে তার পরিচয়টা বড্ড ওপর-ওপর, তেমন-তেমন অন্তরঙ্গতা নেই কারো সঙ্গেই—ছেলেদের সঙ্গেও না, মেয়েদের সঙ্গেও না। আমার আলীপুরের বন্ধুটিকে এ কথা বলতেই সে বললে হবে কি করে, পি-জি'র ছেলেরা তো এখনো সবাই ছাত্র, কা[illegible] কতো সম্ভাবনা এখনো কিছু বুঝবার উপায় নেই। হয়তো বড্ড বেশী সিনিক আমার বন্ধুটি। কিম্বা হয়তো কোনো [illegible] কোনো কারণে বড্ড অপছন্দ ওর মানসীকে, তবু ওর কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারলুম না, কারণ এ ধরণের মেয়ের কথা কি[illegible] আগেই শুনেছি। দু'-একটা দেখেছিও।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মেয়ে-মহলে একটা বদনাম শোনা গেল মানসীর সম্বন্ধে। সে নাকি কার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে

কে সে, জানা গেলো না। মানসী কাউকেই বলে না কিছু। ক্লাস করে খুব কম। বড্ড বেশী সেজে আসে। বড় বেশী আনমনা হয়ে থাকে। মেয়েরা বলতে সুরু করলো যে ও-রকম একটা কিছু যে হবেই, সে আমরা আগেই জানতুম। মনে হোলো, মানসীর ওপর ওদের রাগ ও যে নিজে কারো সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তা'তে নয়, রাগ এ জন্যে যে, ছেলেটাকে কেউ জানতে পারছে না। সবারই ব্যাপার মেয়েরা জানে, আর এই এক জনের ব্যাপার ওরা জানতে পাবে না, সেটা অসহ্য। কী রকম যেন একটা অচেতন ভয়ও ছিলো কোনো কোনো মেয়ের, মানসী হয়তো তাদের কোনো অনুরাগীকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হোলো প্রত্যেকের, কারণ ছেলেটি যখন ইউনিভার্সিটিরই, তখন তাই যদি না হয়, আর কি কারণ মানসীর থাকতে পারে তাদের না জানানোর? প্রত্যেক মেয়েই মানসীর সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, ভীত হয়ে পড়লো, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

এমনি করে কেটে গেল আট-নয় মাস।

তার পর একদিন মানসীর আর দেখা নেই। তখন ইউনিভার্সিটির দিনগুলি শেষ হয়ে এসেছে। পরীক্ষার ফীস দেওয়া, মাইনে মেটানো, নোট জোগাড় করায় অত্যন্ত ব্যস্ত সবাই। তাই অখোই একটি সুখবর ছড়িয়ে পড়লো মেয়েদের মধ্যে। যে ছেলেটির সঙ্গে মানসী জড়িয়ে পড়েছিলো সে নাকি মানসীকে হতাশ করেছে, মেলামেশা বন্ধ করেছে মানসীর সঙ্গে। মানসী তার সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত ছিলো যে, এই আকস্মিক ট্র্যাজেডি তাকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আঘাত করেছে। তাই আর ইউনিভার্সিটিতে এলো না মানসী। শীগ গিরই দিল্লী চলে যাবে। পরীক্ষা দেবে না এ বছর। আগামী বার হয়তো প্রাইভেট দেবে।

হাঁপ ছেড়ে বেঁচে খুশী হোলো মেয়েরা। নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াশুনো করে গেলো। সে বছর এম-এ পরীক্ষায় নাকি মেয়েদের শতকরা পাশের হার অন্যান্য বারের থেকে অনেক বেশী হয়েছিলো।

ছেলেটির সম্বন্ধে মেয়েরা বলতো যে, সে মানসীকে ছাড়লেও তাকে ভুলতে পারেনি। তার জীবন নাকি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাকে না জেনেও তার জন্যে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়েছিলো মেয়েরা, খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলো তার জন্যে।

আমি শুধু অবাক হয়েছিলাম এটুকুতে যে, ছেলেটি কে, সে কথা না জেনেও কি করে তার ব্যাপারটা মেয়েরা জেনেছিলো।

তবে এ নিয়ে আর ভাবিনি কোনো দিন। মানসীর কথা ভুলেই গেছলুম এদ্দিন। আজ তোমরা তার প্রসঙ্গ তোলাতেই মনে পড়লো।

আমি যা জানি সে এটুকুই।

* * * *

আমি বললুম, "এটা নিশ্চয়ই তুমি জানতে যে ছেলেটি হোলো বিমল।"

"তোমার কাছে অনেক পরে শুনেছিলুম", সাধনাদি' বললে।

"আমি প্রথম থেকেই জানতুম", আমি বলতে সুরু করলুম, "কারণ মানসীর সঙ্গে বিমলের আলাপ করিয়ে দিই আমিই। মানসীর সঙ্গে আমার আলাপ একটু অদ্ভুত ভাবে। সেদিন খুব বৃষ্টি নেমেছে। ছ'টা পর্যন্ত লাইব্রেরীতে কাজ করে নেমে এসে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে এক-হাঁটু জল। ভেতরে কেউ নেই বড় একটা। দেখি, সিঁড়ি দিয়ে মানসী নেমে এসে আমার পেছনে দাঁড়ালো। তার পর নিজের থেকেই আলাপ জমালো আমার সঙ্গে। বললে, 'এ রকম বৃষ্টি নামবে জানলে কে এতক্ষণ থাকতো লাইব্রেরীতে'?"

"নিজের থেকেই আলাপ জমালো?" সাধনাদি' চোখ কপালে তুলে বললে, "মানসীর পক্ষেই সম্ভব।"

আমি বললুম, "অকারণ ওর ওপর অবিচার করছো সাধনাদি', আমি বলেছি আলাপটা জমালো সে, কিন্তু সুরু করেছিলুম আমি। একটি মেয়ে চুপচাপ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি চুপ করে থাকবো ইজিপসিয়ান মামির মতো, সে অসম্ভব। আমিই প্রথম জিজ্ঞেস করলুম, সাঁতার জানেন? সে একটু চমকে উঠলো, কারণ আশা করেনি যে আমি কথা বলবো, কিম্বা হয়তো আশা করেছিলো, কিন্তু এ রকম একটা প্রশ্ন দিয়ে সুরু করবো ভাবতে পারেনি। সে বললে, 'জানতুম, কিন্তু এ রকম বৃষ্টি দেখে সাঁতার ভুলে গেছি।' আমি বললুম, আমি সাঁতার জানতুম না, কিন্তু এ রকম বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয়ই সাঁতার জানি, তা নইলে এতক্ষণ লাইব্রেরীতে বসেছিলুম কেন।—বুঝলে সাধনাদি' এ ভাবেই পরিচয় সুরু হোলো। বৃষ্টি থামতেই দারোয়ানকে দিয়ে একটি ট্যাক্সি ডাকিয়ে নিলুম। বললুম, আমি যাচ্ছি দক্ষিণে। আপনিও নিশ্চয়ই ও-পথে!'

সে বললে, 'আপনি যান। আমি বাস ধরবো একটু পরে।'

কিন্তু সে-কথা আমি শুনবো কেন। ট্রাম বন্ধ, জলের ওপর দিয়ে যে বাসগুলো ষ্টীম লঞ্চের মতো ঢেউ তুলে ভেসে যাচ্ছে, সেগুলোর ছাদেও দাঁড়াবার জায়গা নেই। মানসীকে আসতে হোলো আমার সঙ্গে।

পথে সে বললে, 'আপনার সিক্সথ পেপারের নোটগুলো আমায় কয়েক দিনের জন্যে দেবেন?'

'আমার সিক্সথ পেপারের নোট?' আমি অবাক। 'সে সব আপনার কি কাজে লাগবে?' জিজ্ঞেস করলুম।

সে বললে, 'কেন? নোট নিয়ে লোকে কি করে?'

আমি বললুম, 'আমার সাবজেক্টের নোট আপনার সাবজেক্টে কি কাজে আসবে?'

'সে কি?' সে অবাক। 'আপনার আর আমার সাবজেক্ট কি আলাদা নাকি?'

'নয় তো কি? আপনি তো হিষ্ট্রীতে পড়েন।'

'আপনি হিষ্ট্রীর নন্?'

আমি ঘাড় নাড়লুম।

'কী আশ্চর্য!' সে বললে, 'আমার যেন মনে হোলো আপনিও হিষ্ট্রীর। কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হোলো আপনাকে। ভাবলুম, নিশ্চয়ই আমার ক্লাসে দেখেছি। তা' নইলে আর কোথায় দেখবো। তাই চেয়ে বসলুম আপনার নোট। কিছু মনে করেননি তো?'

'না, না। মনে করবো কেন? মনে আপনারই করা উচিত।'

'কেন' মানসী জিজ্ঞেস করলে।

'ইউনিভার্সিটিতে এসে আমি কেন হিস্ট্রি না নিয়ে অন্য সাবজেক্ট নিয়েছি, এত বড়ো ভুল আমার কেন হোলো—'

মানসী হেসে ফেললো। বললো, 'আমি আপনার সাবজেক্ট কি জানতুম না? কিন্তু আমার সাবজেক্ট কি আপনি জানতেন। অদ্ভুত না?'

'সত্যিই অদ্ভুত,' আমি বললুম, "আজ এক বছর ক্লাশ করেও আমার নিজের সাবজেক্টটা সত্যিই কি, আমি আজো বুঝতে পারিনি। মাষ্টারদের বক্তৃতা শুনে মাঝে মাঝে মনে হয় ওঁরা অদ্বৈতবাদ পড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে মনে হয় ইংরেজী সাহিত্য পড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে মনে হয় এনথ্রপলজি পড়াচ্ছেন। এক-এক বার এক নাগাড়ে চার-পাঁচ-ছয় দিন ক্লাস পালানোর পর এসে দেখি সাবজেক্ট পাল্টে গেছে।'

মানসী আরো হাসলো, বললে, 'ক্লাস পালান বুঝি? কার সঙ্গে পালান?'

'একলা পালাই', আমি বললুম।

হাজরার মোড়ে নেমে গেল সে, ওখান থেকে আলীপুরের ট্রাম ধরবে বলে। আমায় কিছুতেই ওর বাড়ি পৌঁছে দিতে দিলো না। নামবার সময় বললে, 'আশা করেছিলুম আপনাকে দিয়ে উপকৃত হবো। আমার বরাত খারাপ। হোলো না।'

'কি?' আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'কতো কি,' সে বললে।

'ও, সিক্স্থ্ পেপারের নোট? আচ্ছা আপনাকে আমি জোগাড় করে দোবো।'

তার দু'-এক দিন ইউনিভার্সিটিতে দেখা হতেই সে যে মধুরতম হাসি বিকীরণ করেছিলো, তা'তে আমি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে দ্বারভাঙা বিল্ডিংএ যাওয়াই ছেড়ে দিলুম। তার পর দু'-এক দিন যখন আশুতোষ বিল্ডিংএর করিডর দিয়ে যাওয়া-আসা করতে দেখলুম, তখন মনে হোলো এবার আবার কয়েক দিন আমার ক্লাস পালানোর পালা নেওয়া দরকার।

তুমি হাসছো সাধনাদি', আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো, কিন্তু ওই দেখ, বিমল চুপ করে শুনছে, হাসছে না, সে আমায় জানে, আমি কি। আমি তখন ক্লাস পালাচ্ছিলুম কেন জানো? আমার ভয় মানসীকে নয়, আমার ভয় আমার নিজেকেই।

সেই সময়ের দিনগুলিও আমি অনেক সময় কাটাতুম এখানে এই রেস্তরাঁয়। তখনও এটা এখনকার এই পাঞ্জাবী রিফিউজী মালিক কিনে নেয়নি। তখন এটা ছিলো এক জন মুসলমানের, একটু নোঙরা অন্ধকার, এখনকার মতো এ রকম খোলামেলা জমকালো নয়, আর এদিকে-ওদিকে ছিলো পর্দা-ঢাকা অনেকগুলো কেবিন।

একদিন তারই একটাতে বসে আছি, হঠাৎ দেখি পর্দা ঠেলে মানসী এসে ঢুকলো। বললে, 'এসে বিরক্ত করলুম কি?'

আমি অবাক, 'আসুন। বিরক্ত করলেই বা, কি হয়েছে তা'তে? বিরক্ত করবার যথেষ্ট অধিকার আছে আপনার।'

'কেন?'

'কারণ আমার বিরক্ত হওয়ার অধিকার আছে বলে।'

বসে পড়ে মানসী বললে, 'আপনার কথাগুলোর কোনো মানে নেই, এলোমেলো কথার বিন্যাস মাত্র, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে না। তবে আমি বসবো না বেশীক্ষণ। আমি দেখলুম আপনি ঢুকছেন এখানে। দেখলুম আপনি একা, তাই চলে এলুম। ভাবলুম, কলেজে আপনার দেখা নেই এই ক'দিন, জেনে নিই আমার নোটের কি হোলো।'

'নোট? কিসের নোট?' আমি অবাক। 'ও, হ্যাঁ, ইয়ের নোট। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমি তো জোগাড়ই করে রেখেছি, আপনাকে দেওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'কাল আনবেন?'

'কাল? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তবে কাল তো আমি কলেজে যাচ্ছি না, আপনার যদি খুব অসুবিধে না হয় তো একবার আসুন না এখানে।'

'বেশ, তাই আসবো।'

মানসী উঠে চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমি উঠতে দিলুম না। বসিয়ে রাখলুম আর এলোমেলো কথাবার্তায় সময় কাটিয়ে দিলুম ঘণ্টা খানেক।

সেই একদিন মোটে মানসীর সঙ্গে বসে গল্প করা। তার পর আর কোনো দিন ওর সঙ্গে কাছাকাছি দেখা হয়নি।

তুমি যা বললে সাধনাদি' মানসীর সম্বন্ধে, আমার মনে সেটা ঠিক ওর নির্ভুল এস্টিমেট নয়। ওর সঙ্গে অনেক কিছুর গল্প করলুম, দেখলুম সব বিষয়েই সে গল্প করে, শুধু এড়িয়ে যায় ওর মা-বাবার কথা। আমার কি রকম যেন মনে হোলো ওর পারিবারিক জীবন খুব সুখের নয়, বড়ো-ঘরের ব্যাপার, সে যাই হোক, মোট কথা সে পালাতে চায় সেই জীবন থেকে। আর সেই জন্যেই সে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারে না বা চায় না কারো সঙ্গে। সে জন্যেই হয়তো কলেজের অন্য মেয়েদের সঙ্গে সে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে পারেনি, মেয়েদের কথাবার্তায় সাধারণতঃ একটা পারিবারিক কাঠামোর উপলক্ষ থাকে, যেটা মানসীর কাছে অসহ্য ঠেকেছে। তাই হয়তো ছেলেদের সঙ্গে একটু সহজতর ছিলো সে।—আমার আরো মনে হোলো, তার সেই ঘর-পালানোর মন থেকে খুব সহজ ভাবেই গড়ে উঠেছিলো একটি ঘর-বাঁধবার মন, খুব অবচেতন ভাবে। তবে কি জানি কেন আমার সঙ্গে সেই ঘণ্টা খানেকের আলাপে যে অন্তরঙ্গতা হোলো, সেটাও যেন তার কাছে নতুন বলেই আমার মনে হোলো। হয়তো সেটা সম্ভব হোলো তার সম্বন্ধে আমার নিস্পৃহতায় জন্যে। সে বললেও। বললে, 'আপনি তো বেশ বন্ধুত্ব করতে পারেন লোকের সঙ্গে, খুব সহজেই।' আমি বললুম, 'হয়তো বন্ধুতা আমি বেশী দিন রাখি না বলেই।'

'কেন' সে জিজ্ঞেস করলে।

'আমার চাল নেই চুলো নেই, সে জন্যে কারো সম্বন্ধে কোনো মমতাও নেই—' আমি বললুম।

'আপনার চাল-চুলো নেই?'—মানসী বললে।

'আমি মনে করি, নেই।'

'কেন?' সে জিজ্ঞেস করলে।

'কারণ চাল-চুলোর নাগপাশে আমি জড়াতে চাইনে বলে।'

মানসী কোনো উত্তর দিলো না। তার একটু পরেই সে উঠে চলে গেলো।

তার পরদিন মানসী যখন এলো তখনও আমি সেখানে একা বসে। মানসী জিজ্ঞেস করলো, 'নোট ?'

'আসছে', আমি বললুম।

বিমলকে বলে রেখেছিলুম। মানসীর কথা নয়, এমনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলুম। সে আসতেই মানসীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলুম, বললুম, 'এই আপনার সিক্‌স্‌থ পেপারের নোট।'

মানসী একটু অবাক হোলো, বিমলকে সে আশা করেনি। তবু সেটা বুঝতে দিলো না বিমলকে। বলল, 'আপনার কথা আমি শুনেছি। আপনি ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলেন অনার্সে, না ?'

বিমল লাজুক ছেলে, মুখ তার এতেই লাল, 'না, না, ফার্ষ্ট ক্লাস হওয়া আবার কি এমন, সে তো যে-সে হতে পারে।'

মানসী হাসলো আমি হাসলুম, বিমল আরো লাল হোলো। তখনকার বিমলকে তুমি দেখনি। বিমল পোষাকে যে রকম ফিটফাট স্মার্ট, কথায় ততোটা লাজুক, অগোছালো। ভালো ছেলে বলে যেমনি খাতির ছিলো বিমলের, তেমনি নাম-ডাক ছিলো পি-জি'র "most well-dressed boy" বলে। মানসী বিমলকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে মেপে নিলো।

আমি উঠে পড়লুম। বললুম, 'ও, হ্যাঁ, ভুলে গেছি, কাল আপনি আমাকে লাইটহাউসের টিকিট কিনতে দিয়েছিলেন দুটো, এই নিন,' বলে দুটো টিকিট বার করে দিলুম।

মানসী অবাক হোলো, কিন্তু কিছু বললো না, নিলো টিকিট দুটো।

আমি বিমলকে বললুম, 'দেখছিস, তোর থেকে নোট নেওয়ার জন্তে কি পরিমাণ ঘুষের আয়োজন করছে মানসী ? দেখিস্‌, খবরদার চট করে সব নোট দিয়ে বসিস্‌ না যেন। তোকে প্রচুর খাওয়াবে, সিনেমা দেখাবে, সাধাসাধি করবে, তার পর দিবি। আমি উঠে পড়ি, মিস্‌ গুহ। কাজ আছে। কথা দিয়েছিলুম, নোটের ব্যবস্থা করে দিলুম, এর পর যদি না হয়, আমাকে দোস দেবেন না।'

আমি উঠে এলুম, যখন ফুটপাথে নেমে এসেছি, পেছন থেকে মানসী ডাকলো। ফিরে দেখি বিমলকে বসিয়ে রেখে সেও উঠে এসেছে। কাছে এসে বললো, 'আপনি চলে যাচ্ছেন ?' আমি বললুম, 'তাই তো যাচ্ছি। কেন ?'

'এর পর কবে দেখা হবে', জিজ্ঞেস করলো সে।

'হবে না', আমি বললুম।

'কেন ?'

'দেখা যদি হওয়ার হোতোই, তবে আমি বিমলকে মাঝখানে টেনে নিয়ে এলুম কেন', আমি বললুম।

সেদিন সন্ধ্যে বেলা যখন থিয়েটার রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলুম এক জনের সঙ্গে, হঠাৎ দেখি মানসী আর বিমল আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে।

মানসীর সঙ্গে তার পর আর আমার দেখা হয়নি।

মাস সাত-আট পরে শুনেছিলাম যে বিমল মানসীর সঙ্গে মেশা বন্ধ করেছে। কিন্তু এই ক'মাসের খবর আমি কিছুই জানি না। যা' জানবার বিমলই জানে।

* * * *

"একটা ভুল তোমরা দু'জনেই করলে", বিমল বললে, "আমি মানসীর সঙ্গে মেশা বন্ধ করেনি। মানসীই আমার সঙ্গে মেশা বন্ধ করেছে। মানসীর এক জন ছেলেবেলার বন্ধু পড়তো ইউনিভার্সিটিতে, নাম সুলেখা। তোমরা চেনো না তাকে, দেখে থাকলেও খেয়াল করোনি, কারণ সে খেয়াল করবার মতো মেয়ে নয়। মানসী আর সুলেখার মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিলো, যার দরুণ ওরা কলেজে কোনো দিনই বেশী মিলতো না। ওদের দেখা হোতো কলেজের পর সুলেখার বাড়িতে। মানসীর সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা যা কিছু সবই বেরুতো সুলেখার কাছ থেকেই।

মানসীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে সলিল তো চলে গেলো। তার পর কি ভাবে কি হোলো ও-সবের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই। কারণ এ-সব নতুন কিছু নয়। আর সবার যা হয়, আমার বেলায়ও তাই হোলো। ক্লাস করা হোলো না। পড়াশুনো বন্ধ হোলো। দিনের পর দিন দুপুরগুলো কেটে গেল এখানে এই রেস্তরাঁয়। কলেজে কাউকে কোনো দিন জানতে দিইনি। দু'জনে আলাদা বেরিয়ে এসে মিলিত হতুম এখানেই।

তার পর একদিন ঠিক করলুম যে, এম-এ শেষ করেই আমরা বিয়ে করবো। আমার একটা কি রকম ভয় ছিলো যদি ওদের বাড়ি থেকে আপত্তি করে। মানসী বললে, 'আপত্তি করবে কেন ? তুমি রতনপুরের মিত্তির-বাড়ির ছেলে, তার ওপর আমি নিজে পছন্দ করছি, আপত্তি করবার কি আছে ? আর আপত্তি করলে শুনছেই বা কে ?' ওর ভয় যদি আমাদের বাড়ি থেকে আপত্তি করে, কারণ আমাদের বাড়ি অত্যন্ত সেকেলে জমিদার-বাড়ি, আমার নিজে পছন্দ করে বিয়ে করাটা যদি ওদের অনুমোদন না পায়। আমি বললুম, 'সে হবে কেন, তুমি যাঁর মেয়ে, তাঁর মেয়েকে বাড়িতে আনতে আমাদের পরিবার আপত্তি করবে না।'

'তুমি আমার বাবার সম্বন্ধে কি জানো, 'বিমল', মানসী বলেছিলো।

আমি বলেছিলাম, 'যেটুকু জানি তোমাকে দেখেই জানি, শুনে জানবার প্রয়োজন নেই আমার।'

মানসী কয়েক বার আমাদের বাড়ি আসতে চেয়েছিলো। আমি ওকে মানা করেছিলুম। অনেক রকম অসুবিধে ছিলো ওকে আমাদের বাড়ি আসতে দেওয়ায়।

মাঝখানে হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা হোলো আমার। কয়েক দিন কলেজে যাওয়া হয়নি। কি করে যেন আমার অসুখের খবর পৌঁছে গেলো মানসীর কাছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে সেদিন সে এসে উপস্থিত হোলো আমাদের বাড়ি।

আপনি জানেন না সাধনাদি' কিন্তু সলিল জানে, আমরা খুব বড় জমিদার-বাড়ির হলেও মামলা-মোকদ্দমায় 'বাবা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছিলেন। এখানে আমাদের বাড়িটা সেকেলে, মস্তো বড়ো, চকমিলান—কিন্তু একেবারে জীর্ণ, ভাঙাচোরা। তারই বেশীর ভাগ ভাড়া দিয়ে একটি অংশে আমরা থাকি একটা বড় লোকের পরিবার, কোনো রকমে ঠাসাঠাসি করে। তারই মধ্যে এসে উপস্থিত হোলো মানসী।

হঠাৎ এক জন হিলতোলা জুতোপরা হাতে ব্যাগ ঝোলানো মেয়ে আমাকে দেখতে আসায় বাড়ির লোক কেউ খুব খুশী হোলো

"সত্যি সত্যিই...
...লাক্স্ টয়লেট্ সাবান
মেখে আপনি আরও সুন্দর হ'তে পারেন"
রেণুকা রায়
বলেন।
এই হোলো আসল সৌন্দর্য্যের যত্ন! রেণুকা রায় বলেন "আমি লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের সুগন্ধি, মাখনের মতো ফেনা বেশ ভাল করে ঘ'ষে নিই। ধুয়ে ফেলার পর যখন আমি নরম তোয়ালে দিয়ে জল মুছি, আমার ত্বক্ এক নতুন তাজা লাবণ্যে ভ'রে যায়।"
LUX
TOILET SOAP
যতো সাদা, ততো বিশুদ্ধ, তেমনি সুগন্ধ
লাক্স্
টয়লেট্ সাবান
চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 876-X30 BG
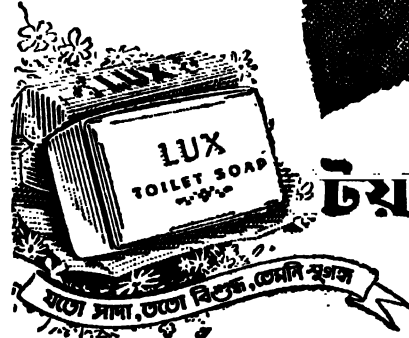
না। আমি পরিবারের একমাত্র ভরসা, আমাকে কেউ দখল করে নেয়, এ রকম কোনো সম্ভাবনা ওরা সহ্য করতে রাজি নয়। কেউ কিছু বললো না যদিও, মুখের ওপর মনের ভাব ওদের স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ছোট্টো আধো-অন্ধকার ঘরে আমার চৌকির পাশে একটি বেতের মোড়ার ওপর বসে অনেকক্ষণ গল্প করলো মানসী, সবার সামনে আমাকে অপ্রতিভ করে মাথায় হাতও বুলিয়ে দিলো দু'-এক বার, তার পর চলে গেল।

সেরে ওঠবার পর কলেজে গিয়ে দেখি, মানসী কয়েক দিন আসেনি কলেজে। আলীপুরে টেলিফোন করে জানলুম সে কলকাতায় নেই, দিল্লী চলে গেছে। আমি অবাক, আমায় না বলে সে হঠাৎ দিল্লী গেলো কেন?

মানসীর চিঠি এলো দিন দুই পর। লিখেছে: 'বিমল, অনেক ভেবে মনস্থির করে কলকাতা ছাড়লুম। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আমি দিল্লীতেই পড়াশুনো করছি। আমি তোমার অনেক পড়াশুনোর ক্ষতি করেছি, আমায় মার্জনা কোরো তার জন্যে। ভালো করে পড়াশুনো করে এম-এ'তেও ফার্ষ্ট ক্লাস নিও লক্ষ্মীটি!

একটা কথা তোমায় কি করে জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু সে যতো কঠিন, যতো নির্মম হোক জানাতে হবেই। আমি দেখলুম, তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জড়িয়ে যাওয়াটা তোমার পক্ষে—তোমার পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। সেদিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে যা' দেখলুম, তা'তে মনে হোলো তোমাদের পরিবারে আমার আসাটা অনধিকার-প্রবেশ হবে। তুমি যেমন করেই হোক জীবনে উন্নতি কোরো, তা'হলে আমার চেয়ে বেশী খুসী আর কেউ হবে না। তোমার বিয়ের সময় আমায় নেমন্তন্ন করতে ভুলো না, কেমন?—ইতি মানু।'

সেবার এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার পর পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের একটা ইণ্টারভিউ দিতে দিল্লী গেলুম। বহু খোঁজ করলাম মানসীর, কেউ বলতে পারলো না। ওর বাপের নাম জানা ছিলো না, ঠিকানা জানা ছিলো না, নিরাশ হয়ে ফিরে এলুম। ইণ্টারভিউ ভালো দিইনি। সেই চাকরীও হোলো না। তার পর বি-সি-এস পাশ করবার পরও অনেক দিন বিয়ে না করে বসেছিলুম। কি রকম যেন মনে হোতো সব সময় মানসীর খোঁজ একদিন না একদিন পাবোই। বছর পাঁচ কেটে যাওয়ার পর, একদিন সত্যিই হতাশ হয়ে পড়লুম। এদিকে বাবার শরীরও খারাপ হয়ে গেছে। মা'ও কান্নাকাটি জুড়লেন। আর পারলুম না। মা'কে বলতে হোলো—'আচ্ছা, মেয়ে দেখ।' মা বললেন, 'তোর কি রকম পছন্দ সেটা বলবি নে?' বললুম, 'না, তোমাদের যা-খুসী করো, তোমরাই ঠিক করো, তোমরাই ব্যবস্থা করো, শুধু বিয়ের দিন আমায় বললেই হবে।'

বিমল থামলো।

আমি হেসে বললুম, "বেচারী মানসী, তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া ওর আর হোলো না।"

বিমল তাকিয়ে দেখলো আমায়। তার পর হেসে ফেললো, বললো, "না, তা' আর হোলো না।"

সাধনাদি' বললে, "ওর ঠিকানা পেলে ওকে নেমন্তন্ন করতে?"

বিমল চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ, হাসিমুখেই। তার পর একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "বিয়ে যে মেয়েটিকে করছি, সে মানসী।"

* * * *

আমি অবাক। সাধনাদি'ও। আমি তাকালুম সাধনাদি'র দিকে। সাধনাদি' তাকালো আমার দিকে। তার পর দু'জনেই তাকিয়ে দেখলুম বিমলকে।

বিমল তার নিবে-যাওয়া পাইপটি আবার ধরিয়ে নিলো।

তার পর বললে, "মা আর কাকারা অনেক মেয়ে খুঁজেছিলেন আমার জন্যে, কোনো মেয়েই ওঁদের পছন্দ হয়নি। দেখতে ভালো হলে হয়তো দেওয়া-থোয়ার দিক থেকে খুসী হওয়ার মতো নয়। পণের দিকটা রাজি হওয়ার মতো হলে হয়তো মেয়ে ওঁদের পছন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত যেখানে মেয়ে পছন্দ হোলো, সেখানে পাকা দেখার দিন কনে দেখতে গিয়ে দেখি মেয়েটি মানসী।

আমি জমিদার-বাড়ির ছেলে হলেও যে-রকম আমরা আর জমিদার নই, মানসীও তেমনি খুব বড়ো অফিসারের মেয়ে হলেও, ওদের অবস্থা ভালো নয়, কি একটা সরকারী কাজে টাকার গোলমাল হওয়াতে মানসীর বাবা নিজের চাকরী বাঁচাতে বহু টাকা ধার করে রাতারাতি হিসেব মিলিয়ে দেন। তার পর তাঁর সারা জীবন গেছে শুধু সেই টাকা শোধ করতে। তাঁর ইন্সিওরেন্স বাঁধা রেখে কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন মানসীর। আমার মতো ছেলে তাঁদের আশার অতীত। তাই খুব দুঃসাধ্য হলেও মা আর কাকারা যে টাকা পণ চেয়েছিলেন, সে টাকা দিতে রাজি হয়েছেন তিনি।

অমায় মানসী ডাকিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলো। বললো, 'বিমল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে? আমায় বিয়ে কোরো না, বিয়েটা ভেঙে দাও।'

আমি মানসীকে যা বললুম তাতে কালিদাসের আরেকটি সম্পূর্ণ কাব্য হোতো।

মানসী বললে, 'তুমি জানো না বিমল, বাবা আমার জোর করে বিয়ে দিচ্ছেন। বাবার মুখ চেয়ে আমি রাজি না হয়ে পারছি না। কিন্তু এ বিয়েতে বাবা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন।' চোখ জলে ভেসে উঠলো মানসীর।

আমি বললুম, 'চাই নে আমার পণের টাকা।'

কাকারা রাগ করলেন, মা চোখের জল ফেললেন, কিন্তু আমাকে টলাতে পারলো না কেউ। পণ ছাড়াই বিয়ের ঠিক হোলো।"

বিমল থামলো।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'বিয়ের দিন কবে?'

"পরশু", বললে বিমল।

"বেশ। মাই কানগ্র্যাচুলেশান্স্ ডিয়ার—", আমি বললুম।

"এ্যাণ্ড মাইন্ টু", বললে সাধনাদি'।

"কিন্তু—", বলে বিমল একটু থামলো।

"আবার কিন্তু কি", আমি বললুম, "জীবনে যাকে চেয়েছিলে তাকে তো পেলে, আর কি চাও? এ সৌভাগ্য সংসারে ক'জনের হয়?"

"ভাই সলিল", বিমল বললে, "জীবনটা একটা ট্র্যাজেডী।"

"এর পরও ?" সাধনাদি' হেসে ফেললো।

কিন্তু আমি হাসতে পারলুম না। জীবনটা অতো সহজ নয়, ফাটল কোথাও থাকবেই।

বিমল বললে, "আজ সকালে নিউ মার্কেটে এসেছিলুম, হঠাৎ সুলেখার সঙ্গে দেখা।"

সুলেখা বললে, 'একটা খবর জানেন বিমল বাবু, মানসীর বিয়ে।'

বুঝলুম, পাত্রটা যে আমিই সেটা সুলেখা জানে না।

'তাই নাকি', আমি বললুম।

'কলেজ ছাড়বার পর আপনার সঙ্গে মানসীর আর দেখা হয়নি, না ?'—সুলেখা জিজ্ঞেস করলে।

আমি কিছু বললুম না। চুপ করে রইলুম।

সুলেখা বললে, 'দেখা হয়নি, ভালোই হয়েছে। ওকে বিয়ে করে আপনি খুব সুখী হতেন না। সেই যে আপনাদের বাড়ি আপনাকে দেখতে গেছিলো মানসী, সেদিন ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সোজা আমার বাড়ি। এসে কি বললে জানেন? রাগ করবেন বিমল বাবু—এদ্দিন পরে আপনি নিশ্চয়ই আর সেন্টিমেন্ট্যাল নন ওর সম্বন্ধে। বললে, 'জানিস ভাই সুলেখা, কি দেখলুম? নামে ও জমিদার-বাড়ির ছেলে। যে ভাবে ওরা থাকে তার চেয়ে বস্তীর লোকেরাও ভালো থাকে। ওদের যা অবস্থা, আর ও যখন বাড়ির বড় ছেলে, মনে হয় পাশ করে বেরুলে সমস্ত সংসার ওর ঘাড়ে চাপবে। পাশ করে বেরুলে এমন কী আর হবে সে, খুব বেশী হলে না হয় শ'তিনেক টাকা মাইনের একটি চাকরী পাবে। তাতে সে সংসারেই বা দেবে কি, আমাকেই বা খাওয়াবে কি। আমার একখানি সাড়ির দামও তো সে জুটোতে পারবে না। কে যাবে ওদের সংসারে গাড়ি ঠেলতে।' এই বললে। তার পর সে দিল্লী কেন গেলো জানেন? ওর বাবার এক-বন্ধুর ছেলে বিলেত থেকে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হয়ে এসে বড় চাকরী পেয়েছে দিল্লীতে। কয়েক দিনের জন্তে ওদের বাড়ি অতিথি, দিল্লীতে আরেকটা ভালো বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত। বাপ তাই মেয়েকে খবর পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি দিল্লী নিয়ে গেলেন। সে বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়নি অবশ্য। ছেলেটি বিয়ে করেছে এক জন মস্তো বড়ো ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়েকে। বহু টাকার সম্পত্তি পাবে। তার পর অনেক বিয়ের চেষ্টা হয়েছে মানসীর। হয়নি কোথাও। এদ্দিনে একটা ঠিক হোলো। ছেলেটা রাইটার্স বিল্ডিংএ কি একটা চাকরী করে। আপার ডিভিশন ক্লার্ক-টার্ক জাতীয় কিছু হবে হয়তো, তার চেয়ে বেশী আর কী পেতে পারে মানসী? বাপের যা অবস্থা! ওই অবস্থায় ভালো ছেলে মেলে না। যাক গে ও সব কথা। আপনি আজকাল কি করছেন বিমল বাবু? বিয়ে-থা করেছেন?'

'না, করিনি', বলে আমি চলে এলুম।

আমি হাসতে সুরু করলুম।

"তুমি হাসছো সলিল," বিমল বললে, "তোমার বোঝা উচিত।"

সাধনাদি' বললে, "তা'হলে কি করবেন? বিয়ে ভেঙে দেবেন?

বিমল বললে, "সে কথা ভাববার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ভাবতে পারলুম না। ভেবে দেখলুম মানসী আমায় ভালোবাসে কি বাসে না, কিছু আসে-যায় না তা'তে। সুপ্রতিষ্ঠ ছেলে খুঁজে বেড়ানো একটি মেয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ঘর যখন তাকে বাঁধতেই হবে, অনিশ্চিত ছেলেকে মন সঁপে দেওয়া আর জলে ঝাঁপ দেওয়া তো একই কথা। আমি ভেবে দেখলুম, মানসীর কোনো দোষ নেই। আমার মনে হোলো, আমি যে ওকে ভালোবাসি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি জীবনে কোনো দিনই হার মানিনি, ভালোবাসায়ও হার মানবো কেন? যাকে চেয়েছি, তাকে আমার পেতে হবেই।" একটু থেমে বিমল বললে, "শুধু কোথায় খারাপ লাগছে জানো? পণের টাকা নিলেই হোতো। ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। মিছে-মিছি মায়ের মনে কষ্ট দিলুম···।"

* * * *

বিমল চলে যাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ বসেছিলুম আমি আর সাধনাদি'। আমি খুব হাসছিলুম নিজের মনে।'

"তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছ, সাধনাদি'?" জিজ্ঞেস করলুম একবার।

"হ্যাঁ।"

"কী সেটা?"

সাধনাদি' বললে, "মানুষ সত্যিকারের সুখী হয় ভালোবাসা দিয়ে, ভালবাসা পেয়ে নয়।"

"এরা সুখী হবে, সাধনাদি'?"

"হ্যাঁ, সুখী হবে, কারণ এরা দু'জনেই পরস্পরকে ভালোবাসা দিতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায় না। তাই এরা জীবনের কাছে ঠকবে না কেউ। এদের মধ্যে যেটুকু ফাঁকি, সেটা এরা প্রত্যেকে নিজেকেই দিয়েছে, পরস্পরকে নয়।"

পথের জনতায় আমরা যখন নেমে এলুম তখন সন্ধ্যা অনেক এগিয়ে গেছে। অনেকের চোখের ক্লান্তিতে, অনেকের মুখের মলিনতায় আর আরো অনেকের মুখের হাসিতে একফালি জীবন আকাশের তৃতীয়ার চাঁদের মতো ঝলমল্ করছিলো।

যাত্রা হল শুরু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ জোয়ার এলে জল যেমন ফেঁপে-ফুলে উঠে দুকূল প্লাবিত করে, কালিনাথকে পেয়ে প্রিয়নাথও যেন তেমনি ফেনিল উচ্ছসিত হোয়ে উঠেছেন। হাসি আর গল্পের বিরাম নেই। পুরনো কথা। রহস্য-রসিকতা। ফষ্টি-নষ্টি।

বরাহনগরের প্রান্তে মুখুজ্জেদের বিরাট বাগানবাড়ী। বড় বড় থাম আর পদ্মকাটা অলিন্দের কারুকার্য্যে একদা যে-বাড়ীর শোভা রসজ্ঞদের অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জন করেছে, যার দীর্ঘ-প্রসারিত নাচঘরের মূল্যবান পারসিক গালিচা আর দেওয়ালের পাশ্চাত্য-রীতিতে আঁকা নারীমূর্ত্তির আকর্ষণে বহু খ্যাতিমান রসিক যেখানে বহু রাত্রি বিনিদ্র যাপন করেছেন, সেই বাড়ী আজ হতশ্রী, তার ফুলবাগানে আজ আগাছার সমারোহ।

পিতার মৃত্যুর পর প্রিয়নাথ সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। অরসিক ছিলেন না তিনি। গান-বাজনায় রসবোধ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বাগানবাড়ীর প্রয়োজন বোধ করেন নি কোন দিন। দু'-তিন বছর বড়দিনের সময় ব্যবসায়ী সাহেবদের খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন সেখানে। সে-সব দিন গত হয়েছে। বাগানবাড়ী এখন একজন মালির হেপাজতে তালাবন্ধ অবস্থায় যেন যখের বাড়ী।

কালিনাথের আগ্রহে দুই বন্ধু একদিন সেখানে গেলেন। নাচঘরের তালা খোলা হল। অনেক দিন বাদে খোলা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে প্রকাণ্ড ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচগুলো ঠুং-ঠাং শব্দে বেজে উঠল। ফ্রেমে-আঁটা সুন্দরীদের বিলোল কটাক্ষে প্রাণের স্পন্দন জাগল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা দুলিয়ে কালিনাথ বললেন—এমন বাড়ী আর এমন ঘর এই অবস্থায় দেখে আনন্দ বোধ করতে পারলাম না বন্ধু! তোমার বাপ-পিতামহের যে রসজ্ঞান ছিল, জীবনকে উপভোগ করবার যে আয়োজন ছিল, তা যে কেমন ক'রে তোমার মধ্যে থেকে একেবারে অন্তর্হিত হোল তা ভাববার বিষয়! এই ঘরে কত দিন কত রাত কত গানের জলসা বসেছে, দেশের সব চেয়ে বড় গাইয়ে-বাজিয়ে এখানে তাদের দক্ষতা প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছে, গহরজান, নূরজাহান, জানকিবাঈ···

কালিনাথের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন—সে সব দিন আর নেই ভাই!

কালিনাথ মাথা নাড়লেন—তা অবিশ্যি! কর্ত্তারা যা করে গেছেন তা ভাবলেও এখনো রোমাঞ্চ হয়, কিন্তু তাই ব'লে তুমি যে একেবারে বৈরাগী ব'নে গিয়ে জীবনের সকল আনন্দকে অস্বীকার করে চলবে, চিরজীবন শুধু কঠোর পরিশ্রমই করে যাবে, জীবনের রসাস্বাদনে কিছুমাত্রও ইচ্ছুক হবে না, তারও কোন অর্থ হয় না।

চুপ করে রইলেন প্রিয়নাথ। বন্ধুর হৃদয়োচ্ছাসে বাধা দিয়ে লাভ কি?

কালিনাথ বলতে লাগলেন—অবিশ্যি আমি বলছি না যে তুমি কর্ত্তাদের ওপর টেক্কা দাও বা তেমনিতর পথ অনুসরণ কর। তা না করেও কি আনন্দের আসর বসানো যায় না? এককালে তুমিও তো গান-বাজনা শুনতে কম ভালবাসতে না? আমার জীবনে সহস্র আঘাত সত্বেও ও-জিনিষটার প্রতি মোহ কাটেনি। বল তো, একদিন একটু আয়োজন করি। দু'-একজন ভাল ওস্তাদ সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে, শুনেছি।

প্রিয়নাথ আপত্তি করবার পথ পেলেন না।

* * * *

ঝাড়ায় বাতির ঝাড়লণ্ঠন আবার জ্বলল। মালিক্স-যুক্ত কার্পেটের কারুকার্য্যের ওপর মহার্ঘ পোষাকে সজ্জিতা, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে ভূষিতা দিল্লীর শ্রেষ্ঠা গায়িকা মাল্‌কা জান তার সঙ্গীতের আসর বসালো। দীর্ঘদিন পরে ঘরের দেওয়াল, আসবাব, শয্যা আর সজ্জা প্রাণপ্রাচুর্য্যে আবার ফেনিল হোয়ে উঠল।

ভারী খুসী প্রিয়নাথ। ইমনের সঙ্গে কল্যাণ যুক্ত হোয়ে যে স্বতন্ত্র রাগিণীর ঝঙ্কার তিনি শুনছেন তা তাঁর প্রাণের ভিতরকার দুটি সুর, আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। সঙ্গীতরসের বোদ্ধা তিনি। এ তথ্য বুঝতে বিলম্ব হয়নি গায়িকার। লাস্য-লীলা-কণ্ঠ-মাধুর্য্যে ঘরের মধ্যে যাদুর মায়া বিস্তারিত হল।

নাচ-গান শেষ হল। প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়ালেন। দুই চোখে অভিনব দীপ্তি। পকেট থেকে এক গোছা নোট বার ক'রে গায়িকাকে বখশিষ দিলেন। কালিনাথ মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন।

সকলে বিদায় নিলে বন্ধুর দিকে ফিরে প্রিয়নাথ বললেন—হাসছো যে?

—তোমার খুসীর মাত্রার আধিক্য দেখে। বললেন কালিনাথ।

উত্তরে প্রিয়নাথও হাসতে লাগলেন।

—ভাল লাগল গান?

সোল্লাসে প্রিয়নাথ বললেন—চমৎকার!

কালিনাথ মুখ টিপে বললেন—চমৎকার? গান? না, গায়িকা?

মুহূর্তে প্রিয়নাথ একেবারে যেন কুঁচকে গেলেন।

—আঃ! কী যে বলো!

* * * *

বাতাস বইছে একটানা। পাল তুলে দেওয়া হয়েছে। নৌকা চলেছে ভেসে বাধাবন্ধহীন।

প্রিয়নাথের জীবনে নতুন এক গতি এনে দিয়েছেন কালিনাথ। তাঁকে পেয়ে প্রিয়নাথ যেন কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। জীবনকে যে এমন করে উপভোগ করা যায় তা আগে কে জানতো?

কার্নিভাল এসেছে কলকাতায়। সন্ধ্যার পরে অগণিত নরনারীর সমাবেশ সেখানে। কালিনাথ বললেন—চল না দেখে আসি। নানা রকমের মজা!

গেলেন দু'জনে।

এ-সব দৃশ্য, এ-সব অভিজ্ঞতা প্রিয়নাথের জীবনে নতুন। তাঁর আগ্রহ আর উত্তেজনার অন্ত নেই। অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা 'খেলায়' যোগদান করলেন। প্রত্যেক টেবিলে কালিনাথ খেলাগুলির কলাকৌশল বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। অনেক খেলায় অনেক টাকা যেমন হারলেন, অনেক স্থানে জিতলেনও অনেক টাকা। প্রিয়নাথের বিস্ময় আর আনন্দের অবধি নেই। টাকার এ কী আশ্চর্য্য রীতি! এই যাচ্ছে আবার এই আসছে!

শেষ পর্য্যন্ত এক রকম জোর করেই কালিনাথ তাঁকে সেদিনকার মতো খেলার আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে আনলেন।

* * * *

বাতাসে লাগল দোলা। আকাশে বুঝি মেঘ দেখা দিয়েছে।

সকাল বেলায় দুই বন্ধু প্রতিদিনের মত প্রাতরাশের সঙ্গে খোস মেজাজে খোসগল্প শুরু করেছেন, এমন সময় ম্যানেজার অঘোর পাঠক এসে ঘরে ঢুকলো।

মুখ তুলে প্রিয়নাথ বললেন—অঘোর যে! এমন সময়ে?

অঘোর নিরুত্তর। অথচ তার চোখে-মুখে অনেক কথাই প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে বলে মনে হলো।

—কি খবর? কিছু বলতে চাও?

প্রিয়নাথের প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নেড়ে অঘোর বললে—আজ্ঞে হাঁ।

—বল।

অঘোর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্ষণেক তার পানে চেয়ে প্রিয়নাথ বললেন—যা বলতে চাও বল। তুমি তো জান, কালিনাথের কাছে আমার কিছুই গোপন করবার প্রয়োজন নেই।

কালিনাথ একটু ব্যস্ত ভাবেই বললেন—না হয় আমি ও-ঘরে...

তাঁর দু'হাত চেপে ধরে প্রিয়নাথ বললেন—বস তুমি। বল অঘোর।

অঘোর হাতের ফাইলখানা খুলে প্রিয়নাথের সামনে একখানা চিঠি মেলে ধ'রে ধীরে ধীরে তার বক্তব্য প্রকাশ করলে।

ব্যবসায়ের জটিল আবর্ত্ত। মাঝে-মাঝে যার আবির্ভাব ঘটে। সহসা এক সমস্যা-সঙ্কুল জটিলতা দেখা দিয়েছে প্রিয়নাথের ব্যবসায়ের গতিপথে। চুক্তি অনুসারে কাজ করার যে আইনগত দায়িত্ব আছে তা পালন করতে গেলে উপস্থিত এখনই পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন। টাকার অঙ্কটা অবশ্য বেশী নয়। তবে ইতিমধ্যে আরও কয়েকখানা চেক কাটা হয়েছে যাদের জন্তে ব্যাঙ্কে টাকা মজুত থাকা চাই। আর এদিকে ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা আগামী কাল চারটার মধ্যেই হাতে আসা দরকার।

অঘোরের কথা শুনে প্রিয়নাথ কিছু অন্তমনস্ক হ'য়ে পড়লেন। মনিবের পানে তাকিয়ে অঘোর বললে—আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আজ দুপুরে যদি আপনি একবার আপিসে আসেন তাহলেই......

চকিতে প্রিয়নাথের মুখের পানে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কালিনাথ বললেন—কাল ঠিক কখন টাকাটা পেলে আপনার চলবে ম্যানেজার মশায়?

প্রিয়নাথ মুখ তুলে বললেন—অ্যাঁ। কি বলছ?

কালিনাথ বললেন—তোমায় কিছু বলি নি। এই বলে তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে অঘোরের পানে তাকালেন।

মৃদুকণ্ঠে অঘোর জবাব দিলে—দুপুরের মধ্যে পেলেই ভাল হয়। তা, সে আমি......

কালিনাথ বললেন—বেশ তাই হবে। কাল বারোটা নাগাদ আমরা আপনার আপিসে যাব।

প্রিয়নাথ অবাক হলেন। বিমূঢ় বোধ করল অঘোর। ক্ষণেক নীরব থেকে বললে—তা হলে আজ একবার......

কালিনাথ জবাব দিলেন—তার আর দরকার কি? কাল একেবারে টাকাটা সঙ্গে নিয়ে আপিসে উপস্থিত হব।

অঘোর মনিবের দিকে তাকিয়ে তাঁর নির্দ্দেশের অপেক্ষা করতে লাগল। প্রিয়নাথ তাকালেন কালিনাথের দিকে।

কালিনাথ বললেন—একটা সহজ ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবো আশা করছি। তাই ঐ কথা বললাম।

প্রিয়নাথ দুলে উঠলেন। মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—ও, তাই বল! তা হলে অঘোর, তুমি এখন যাও। আর তো কোন কথা নেই?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, তাহলে কাল দেখা হবে।

* * *

কালিনাথের যে কথা সেই কাজ। এর চেয়ে সহজ ব্যবস্থা আর কি হতে পারে! দুপুরে বাড়ী ব'য়ে এসে এক মাড়োয়ারী টাকা দিয়ে গেল। অবশ্য কালিনাথ তাকে গিয়ে ডেকে এনেছিলেন। কোন কিছু হাঙ্গামাই হল না। সামান্য এক চিল্‌তা কাগজের উপর একটুখানি সই। হ্যাণ্ডনোট।

টাকা দিয়ে মাড়োয়ারী নিজেই যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে। কথায় আর আচরণে কি বিনয় আর সৌজন্য! যখনই প্রিয়নাথের দরকার হবে তখনই টাকা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে উক্ত মাড়োয়ারী মহাজন। এমনি ধরণের নানা মিষ্ট কথার পর লোকটি বিদায় নিলে।

নোটগুলি বাক্সের মধ্যে রেখে বিছানার ওপর ব'সে কালিনাথের পানে তাকিয়ে প্রিয়নাথ ভারী গলায় বললেন—বন্ধু বটে তুমি আমার!

* * *

চিন্তিত হয়েছেন ভবতারণ। ইদানীং প্রিয়নাথের দেখা পান না তিনি। যে-প্রিয়নাথ প্রত্যহ শত কাজের মধ্যেও তাঁর সংবাদ নিতে আসতেন, তাঁর কাছে বসে দু'দণ্ড আলাপ করে যেতেন, আজ-কাল তাঁকে ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না। বলে পাঠান, কাজে-কর্ম্মে বড় ব্যস্ত, সময় পেলেই আসবেন। ভবতারণের ইচ্ছা ছিল, সামনের মাসেই শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন করবেন। কিন্তু তার কোন সম্ভাবনাই আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

চিন্তিত হয়েছে সুপ্রিয়। পিতার আচরণে এবং দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে সে অস্বস্তি বোধ করছে। দুঃস্থ দরিদ্র আর অভাবগ্রস্ত মানুষের ভীড় আর জমে না সকাল বেলা। সারা দিন কালিনাথের সঙ্গে তিনি যাপন করেন। বেশী সময় বাড়ীর বাইরে। দুই চোখে তাঁর এক অস্বাভাবিক দীপ্তি লক্ষ্য করেছে সুপ্রিয়, যা তার ভাল লাগেনি। কি জানি কেন, কালিনাথের প্রতি সুপ্রিয়র বিতৃষ্ণার অবধি নেই। সুপ্রিয় অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরানন্দ বোধ করছে।

চিন্তিত হয়েছে প্রমীলা। হঠাৎ তার পরম শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় জ্যেঠামশায়ের এ কী হল! তাকে দেখে আগেকার মত তাঁর চোখে-মুখে স্নেহ আর আনন্দের দীপ্তি তো আজ-কাল আর ফুটে ওঠে না। কথায় সে স্নেহের সুর কৈ? প্রমীলাকে যেন এড়িয়ে যেতে চান তিনি। কি এক অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় প্রমীলার অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

চিন্তিত হয়েছে অঘোর পাঠক। মনিব প্রায় রোজই আপিসে আসেন বটে, কিন্তু তা কাজ-কর্ম্ম দেখার জন্য নয়। আসেন টাকা নিতে। অনেক কাজ আটকে আছে। যে প্রতিষ্ঠানের সম্ভ্রম আজও আছে আকাশস্পর্শী, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে তাকে বজায় রাখতে গেলে যে যত্ন এবং তীক্ষ্ণদর্শিতার প্রয়োজন তার কোন আভাসই পাওয়া যায় না কর্ত্তার আচরণে। অথচ এর চেয়ে অনেক জটিলতর গ্রন্থি তিনি অবহেলে মোচন করেছেন অতীত কালে বহু বার। দু'-একবার অঘোর মনিবকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। উত্তরে প্রিয়নাথ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এত দিন পরে ম্যানেজারের কাছে কোন-কিছু বোঝবার প্রয়োজন তাঁর নেই।

চিন্তিত হয়েছেন গুণগ্রাহী পরেশ বাবু, যাঁর কাছে প্রিয়নাথ ছিলেন দেবতার মত ভক্তির পাত্র। হাসপাতালের কাজ বন্ধ আছে। একদা যে-চেকগুলি প্রিয়নাথ পরেশ বাবুকে দিয়েছিলেন সে-গুলি তিনি ফেরৎ নিয়েছেন। ব্যবসায়-কর্ম্মে নানা গোলমাল, তাই প্রিয়নাথ এখন হাসপাতালের কাজে টাকা ঢালবার কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে পারছেন না। টাকা না পাবার জন্য পরেশ বাবুর দুঃখ নেই। কিন্তু অমন সদাপ্রফুল্ল দেবোপম মানুষটির মধ্যে সহসা এমন অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন এল কেমন ক'রে? তিনি রেসে যাচ্ছেন, জুয়া খেলছেন, নানা স্থানে জলসা ও গান-বাজনার আসরে সকলের চেয়ে বেশী হৈ-হল্লা করছেন, এ-সংবাদ যেমন কল্পনাতীত তেমনি বেদনাদায়ক। কিন্তু সংবাদ মিথ্যা নয়।

চিন্তিত হয়েছে বিশ্বস্ত ভৃত্য ভৈরব। যাকে তিনি চিরদিন ছেলের মত দেখেছেন, যার অসুখ করলে তিনি স্নানাহার ত্যাগ করে ছুটোছুটি করেছেন, সকাল থেকে শুরু করে রাত বারটা পর্য্যন্ত যে-ভৈরব ছিল তাঁর সর্ব্ব সময়ের সঙ্গী, তাকে তিনি আজ-কাল অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সে যে সামান্য চাকর, এই তথ্য কালিনাথ মারফৎ তাকে বারংবার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

* * * *

চিন্তিত নন প্রিয়নাথ নিজে। বহুদিন পরে সকল ভাবনার হাত এড়িয়ে তিনি এক নতুন আনন্দ-লোকের সন্ধান পেয়েছেন যেন। নিত্য-নব আনন্দ পরিবেশনে বন্ধু কালিনাথের জুড়ি মেলা ভার।

বাগানবাড়ীর নাচঘরে গানের আসর বসেছে ইতিমধ্যে একাধিক বার। সাধারণতঃ তবলচিরা ভাল সঙ্গত করতে পারে না। এককালে ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন প্রিয়নাথ। তাই গানের আসরে তবলচিকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই বাঁয়াতবলা টেনে নিয়েছেন।

প্রতি পদক্ষেপে এখন কালিনাথ তাঁর পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা। কালিনাথের কথা তাঁর কাছে বেদবাক্য। প্রিয়নাথের অর্থসঙ্কট কালিনাথের সহায়তায় আশ্চর্য্য সরল উপায়ে দূর হয়েছে বার বার।

একাধিক বার তিনি গেছেন কালিনাথের সঙ্গে তুলাপটির সেই মাড়োয়ারীর গদীতে। অল্প দু'চার কথা, ষ্ট্যাম্প-কাগজের ওপর শুধু একটি দস্তখৎ। ব্যস, গোছা-গোছা নোট নিয়ে পরমানন্দে প্রিয়নাথ ফিরেছেন। সুতরাং এ-হেন বন্ধু কালিনাথ যে তাঁর ওপর দুরতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করবেন তাতে আর বিস্ময়ের স্থান কোথায়?

* * * *

ম্লানমুখী কন্যাকে কাছে ডেকে ভবতারণ জিজ্ঞাসা করলেন—গিয়েছিলে ও-বাড়ী?

কন্যা ঘাড় নাড়লে।

—বলেছিলে আসবার কথা ?

—বলেছিলাম বাবা !

—কি বললে প্রিয়নাথ ?

—বললেন, কাজকর্ম্মে বড্ড ব্যস্ত। সময় পেলেই আসবেন।

নিশ্বাস ফেলে ভবতারণ বললেন—সেই এক কথা। এমন হবে আশা করি নি। সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হলে তাকে একবার আসতে বলিস তো মা !

প্রমীলা ঘাড় নাড়লো শুধু।

সন্ধ্যায় সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হল প্রমীলার। ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়েছিল সুপ্রিয়। কী যেন ভাবছিল। প্রমীলাকে দেখে উঠে বসে বললে—এসো। এমন সময়ে যে ?

ম্লান হেসে প্রমীলা বললে—কেন, আসতে নেই না কি ?

—এ আবার কেমনতর কথা হ'ল ! সুপ্রিয় প্রফুল্ল হবার চেষ্টা করলে।

—কী জানি ! কপালে কি আছে !

—হঠাৎ দার্শনিক হ'য়ে উঠলে যে। হেসে বললে সুপ্রিয়।

বীণা আছে। আছে তাতে তারের যোজনা, তবুও সুর তো বাজছে না ! উভয়েই তা অনুভব করছে।

সুপ্রিয় সোজা হোয়ে বসল ; গভীর কণ্ঠে বললে—অমন ম্লানমুখে থেকো না মিলা। আমি আজ-কালের মধ্যেই বাবাকে বলব।

প্রমীলা হাসল ; বড় করুণ সে হাসি। বললে—কিন্তু সেইটেই কি অতি-বড় দুঃখের কথা নয় ? একদিন যাঁর আগ্রহ আর স্নেহের অন্ত ছিল না, আজ তিনি কেন আমাদের এমন ক'রে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, তার কারণ বুঝতে গিয়ে যে বুক কেঁপে উঠছে বার বার।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লে সুপ্রিয়—মিথ্যে বল নি তুমি। কী অস্বস্তির মধ্যে যে দিন কাটাচ্ছি তা বলবার নয়। শনি ঢুকেছে আমাদের সুখের সংসারে। কিন্তু তাকে আমি তাড়াবো।

ব্যস্ত হোয়ে প্রমীলা বললে—না, না, রাগের বশে কোন কাজ করতে যেও না, তাতে হিতে বিপরীত হবে।

সুপ্রিয় চুপ করে রইল। মনে মনে সে যেন কি একটা সংকল্প আঁটতে লাগল।

ক্ষণেক নীরব থেকে প্রমীলা বললে—বাবা তোমায় ডেকেছেন।

ঘাড় নেড়ে সুপ্রিয় বললে—যাব।

প্রমীলা বললে—আমি এখন যাই।

—এসো।

* * * *

কথায় কথায় সুপ্রিয়র বিবাহের কথা উঠল। কালিনাথ বললেন—অবশ্য তোমার ছেলে, তুমি যে ব্যবস্থা করবে তার ওপর কথা বলবার সঙ্গত অধিকার আমার নেই ; কিন্তু তবুও বলব, বাগড়পাড়ার মুখুজ্জে-পরিবারের প্রকাণ্ড বংশ-মর্য্যাদার কথা বিস্মৃত হবার নয় এবং তা যে নষ্ট হয় তাও কল্পনা করা যায় না। সেই বংশের ছেলে এবং তোমার ঐ এক ছেলে, হীরের টুকরো ছেলে, তার বিয়ে হবে সমান সমান ঘরে, তার পিতৃ-পিতামহের মর্য্যাদার সঙ্গে তাল রেখে, উপযুক্ত আড়ম্বরে, এইটেই সবাই আশা করে।

সকাল বেলায় যথারীতি দুই বন্ধু চায়ের টেবিলে বসেছিলেন। কথাটা কালিনাথই ওঠালেন প্রথম। সোৎসাহে বললেন—তোমার নিজের বিয়ের কথা ভোল নি নিশ্চয়ই। চৌষট্টি ঘোড়ার গাড়ীর সেই বিরাট শোভাযাত্রা ! কনের বাড়ীর সামনের রাস্তায় মখমলের বাহার আর লক্ষ্নৌ-এর রসুনচৌকির সেই মন-মাতানো সুর ! কী বিপুল সমারোহ হয়েছিল তা কি ভোলবার ? তিন দিন ধরে উইল্‌সন্‌ হোটেলের ম্যানেজার খাবার পানীয় আর খানসামার দল সাপ্লাই করতে করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। কলকাতার হেন বড় সাহেব আর মুচ্ছুদ্দি ছিল না যে ওই বাগানবাড়ীতে এসে গড়াগড়ি দিয়ে না গেছে।

কালিনাথের বাচনভঙ্গীতে প্রিয়নাথ হাসতে লাগলেন। বললেন—সে সব দিন গত হয়েছে বন্ধু ! সুতরাং···

—সে-দিন গত হয়েছে বটে, কিন্তু সে-বংশের মর্য্যাদা তো গত হয়নি। সেই বংশের ছেলের বিয়ে হবে শ্রীহীন ভাবে, কোন জলুশ থাকবে না তাতে, বিয়ে হবে নিতান্ত অসমান ঘরে, তা কল্পনা করতে কষ্ট লাগে বৈ কি। অবিশ্যি, আগেই তো বলেছি, এ-সব ব্যাপারে তুমি যা বুঝবে তার ওপর কথা বলা সাজে না আমার। কিন্তু তবুও যে বললাম তা তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি বলেই। অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি···

—না, না, অন্যায় বলবে কেন ? ব্যস্ত হলেন প্রিয়নাথ। ক্ষণেক থেমে বললেন—তোমার আন্তরিকতা আমি বুঝি কালিনাথ ! কিন্তু···

ভৃত্য ভৈরব এসে জানালো, এক ব্যক্তি বাবুর দর্শনপ্রার্থী।

কালিনাথ বললেন—নিয়ে এসো তাঁকে।

ছাতা বগলে লাঠি হাতে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি ঘরে ঢুকে আভূমি-প্রণত প্রণাম জানিয়ে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসুমুখে প্রিয়নাথ বললেন—কোথা থেকে আসছেন ? বসুন।

অদূরে একখানা চৌকি ছিল। তার ওপর ব'সে আগন্তুক বললে—আজ্ঞে, আসছি আমি গোবরডাঙা থেকে। আপনার ছেলের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

কালিনাথ বললেন—আপনি ঘটক ?

ঘাড় নেড়ে আগন্তুক বললে—আজ্ঞে, আমার নাম হরিদাস, হরিদাস ভট্টাচার্য্য। অন্তত পাঁচশো বিয়ের ঘটকালি করেছি জীবনে। অঘটন ঘটিয়েছি অনেক জায়গায়।

কালিনাথ হাসতে লাগলেন, বললেন—বটে ! অঘটন-ঘটনকারী ঘটক ! তা, এবারকার অঘটন-ঘটন প্রচেষ্টার পটভূমিকা কি ?

কালিনাথের কথার দাপটে হরিদাস ঘটক মিইয়ে গেল। প্রিয়নাথের মুখের পানে তাকিয়ে বললে—হুকুম করেন তো নিবেদন করি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।

হরিদাস তখন সাহস পেয়ে জুৎসই হোয়ে বসল। তার কথায় জানা গেল, প্রিয়নাথের দান-ধ্যান এবং মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় জেনে এবং তাঁর একটি সুপুত্র আছে খবর পেয়ে গোবরডাঙার বনেদী জমিদার রায়বংশের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী তাঁর একমাত্র পরমা সুন্দরী কন্যাকে প্রিয়নাথের হাতে অর্পণ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। প্রিয়নাথের বিরাট মর্য্যাদার কথা রায় মহাশয়ের অবিদিত নেই।

তিনি সে-মর্য্যাদার সম্মান রাখতে কার্পণ্য করবেন না। নগদ দেবেন পনেরো-বিশ হাজার, পঁচিশ পর্য্যন্ত পিছপাও হবেন না। তার সঙ্গে উপযুক্ত যৌতুকাদি এবং কন্যাকে একশো ভরির সোনা, জড়োয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এই পর্য্যন্তই শেষ নয়। প্রিয়নাথ একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণের যে মহৎ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী ক'রে তোলার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, সে সংবাদও রায় মশায় জানেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় পরম আনন্দে তাঁর সেই প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে প্রস্তুত আছেন এবং প্রথম দফায় তিনি উক্ত হাসপাতাল-তহবিলে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে ইচ্ছুক হয়েছেন।

লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই। ক্ষণেক নীরব থেকে প্রিয়নাথ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কালিনাথ বাধা দিয়ে হরিদাস ঘটককে উদ্দেশ করে বললেন—পটভূমিকার চটক আছে তা মানতেই হবে। কিন্তু কি জানেন ঘটক মশাই, আমাদের এই মুখুজ্জে মহাশয় ব্যক্তিটি কিছু অন্য ধরণের। তিনি যা স্থির করবেন তার আর নড়চড় হবে না। অতএব আপনি আর-একদিন আসবেন।

—তা বেশ। তা বেশ। কবে আসবো ?

কালিনাথ বললেন—সন-তারিখ নির্দ্দিষ্ট করে বলতে পারছি না। ধরুন, সামনের সপ্তাহের যে-কোন দিন। কেমন ? আচ্ছা, এখন তাহলে···হ্যাঁ, বিলক্ষণ, নমস্কার !

কালিনাথ এমন ভাবে তার দিকে তাকালেন যে হরিদাস ঘটক আর কোন কথাই বলবার সাহস বা সুযোগ পেলে না। তাড়াতাড়ি উভয়কে নমস্কার করে প্রস্থান করলে।

প্রিয়নাথ হাসতে লাগলেন। মানুষকে এমন অপ্রস্তুত করতে পারে কালিনাথ ! বেচারা ঘটক একেবারে নাজেহাল।

কালিনাথ বললেন—তা তো হল। ঘটককে বিদায় করলাম বটে, কিন্তু তার প্রস্তাবটাকে তো সরাসরি বিদায় দিতে পারছি না !

ঘাড় নেড়ে প্রিয়নাথ বললেন—খুব ভাল সম্বন্ধ তাতে আর সন্দেহ কি ?

কালিনাথ যোগ করলেন—ভাল এবং যোগ্য। একেই বলে পালটি ঘর আর যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

—কিন্তু···

—হ্যাঁ, তোমার 'কিন্তু' আমি জানি প্রিয়। সেই জন্যেই তো কোন কথা বলছি না।

প্রিয়নাথ বললেন—তুমি তো জানই ভাই, সমস্ত ঠিক হোয়ে গেছে।

কালিনাথ জবাব দিলেন—সমস্ত ঠিক হোয়ে গেছে কি না জানিনে, তবে তুমি যে একটা কিছু স্থির করে রেখেছো তা জানি। যাক, ও কথা। এখন চল সেই কাজটা সেরে আসা যাক। ফতেলাল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

* * * *

সুপ্রিয়কে জন্মাতে দেখেছে অঘোর পাঠক। জ্ঞানলাভের পর থেকেই সুপ্রিয় দেখছে তাকে। তার কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র অঘোর পাঠক।

সকাল বেলা একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে বাড়ীতে এসে মনিবের দেখা না পেয়ে অঘোর প্রায় ব'সে পড়ল।

সুপ্রিয় বেরুচ্ছিল বাইরে। তাকে দেখে বললে—এই যে অঘোর কাকা ! কখন এলেন ?

অঘোর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে রইল। তারপর আপন মনে বললে—এই আমার শেষ চেষ্টা। দেখা যাক !

—শেষ চেষ্টা ? সে আবার কি অঘোর কাকা ?

—বলছি বাবা। চল, ঐ ঘরে বসি।

অঘোরের কথায় সুপ্রিয় যেমন স্তম্ভিত তেমনি মর্ম্মাহত হল। এত দিনের এত বড় প্রতিষ্ঠান ডকে উঠতে বসেছে আর তার বাবা নিশ্চেষ্ট নির্ব্বিকার। হিসাব-পত্র দেখছেন কালিনাথ ! টাকার লেন-দেনও তাঁর হাতে। সর্বনাশের আর বাকি কি ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সুপ্রিয় বললে—আচ্ছা, অঘোর কাকা, আপনি এখন যান। আমি আজই বাবার সঙ্গে কথা বলব।

অঘোর বললে—বোলো। তুমি যদি অপিসে গিয়ে বসতে পারো তাহলে আমি এখনো হাল ধরে একে বাঁচাতে পারি। তা নাহলে শুধু ভস্মে ঘী ঢালা হবে। আর, বারে বারে টাকাই বা জোগাড় করব কোথা থেকে ? একদিন ছিল যেদিন শুধু কর্ত্তার নাম করে লাখ টাকার ক্রেডিট পেয়েছি ! কিন্তু কথার খেলাপ হয়েছে বার বার। তাই সেদিন আর নেই। তোমাকে সামনে পেলে আমি আবার সেই দিনকে ফিরিয়ে আনতে পারি। বিশ্বাস আছে নিজের ক্ষমতার ওপর। কিন্তু বিশ্বাস নেই শনিকে।

সুপ্রিয় বললে—আচ্ছা অঘোর কাকা, সব দেবতার শত্রু আছে। শনি ঠাকুরের এমন কোন প্রতিপক্ষ নেই যাকে কাজে লাগানো যেতে পারে ?

মাথা নেড়ে অঘোর বললে—থাকলেও আমার জানা নেই বাবা !

—আচ্ছা, তাহলে ওই কথাই রইল। আপনি এখন আসুন। চলুন একসঙ্গেই বেরুই দু'জনে।

—তুমি কোথায় যাবে বাবা এখন ?

সুপ্রিয় বললে—মহাপ্রস্থানের পথে অর্থাৎ উত্তরমুখো। দমদম বাজারুল। আপনার তো গঙ্গার দিকে পা ? মানে, পশ্চিমমুখো, অর্থাৎ আপিসের দিকে ?

হেসে বললে অঘোর—তাই বটে।

* * * *

সেদিন বিকালে কালিনাথ যখন প্রিয়নাথের কাছে আগামী বৈঠকের একটি মনোমুগ্ধকর প্রোগ্রাম পেশ করছিলেন সেই সময় সুপ্রিয় সেখানে উপস্থিত হল।

মুহূর্ত্তে কথা বন্ধ করে কালিনাথ বললেন—এসো বাবা, এসো। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল ! প্রিয়নাথকে তাই বলছিলাম যে বহু ভাগ্য থাকলে তবে এমন ছেলে মেলে। এমন রত্ন যখন পেয়েছ তখন আর কেন ? তার হাতে সংসার আর ব্যবসাকর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে বাকি দিন ক'টা নাম গেয়ে কাটাও।

বারেক কালিনাথের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সুপ্রিয় পিতার দিকে ফিরে বললে—একটা বিশেষ কথা বলবার ছিল, বাবা !

যে-ভঙ্গিতে সুপ্রিয় এসে দাঁড়াল এবং কথা বললে তা প্রিয়নাথের কাছে একান্ত অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত। মুখ তুলে বললেন—বল।

সুপ্রিয় আবার কালিনাথের দিকে তাকালো। তিনি বললেন—বল বাবা, কি বলবে বল।
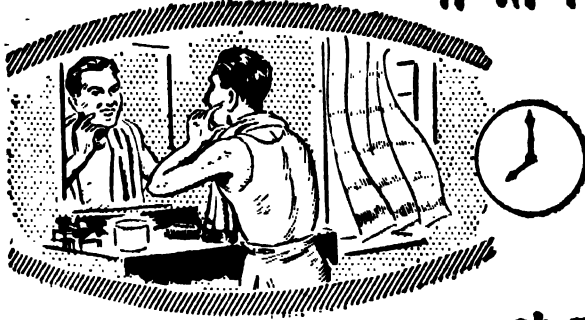
সকাল বেলায়
সারাদিন
খেলাধুলোর পরে
প্রফুল্ল
শোবার সময়
থাকতে...
স্নিগ্ধ, সুগন্ধ
হিমালয় বোকে
পাউডার
ব্যবহার করুন
ছুটি সুষ্ঠু ইয়ার্ডলি পাউডার
Himalaya Bouquet
Himalaya Bouquet
HIMALAYA BOUQUET SNOW
হিমালয় বোকে স্নো ত্বককে সব ঋতুতে রক্ষার জন্য
H.B.P. 7-X30 BG
ইয়ার্ডলি কোং, লিঃ, লণ্ডনএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

সুপ্রিয় তবুও মৌন রয়েছে দেখে প্রিয়নাথ বললেন—তোমার কালিনাথ কাকার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই সুপ্রিয়! সুতরাং অসঙ্কোচে তুমি বল।

সুপ্রিয় বললে—সারা জীবন ধ'রে আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। বিশ্রাম নেবার সময় হয়েছে এবার। আপিসের কাজ-কর্ম্ম এখন থেকে আমি দেখব।

সুপ্রিয়র কথায় প্রিয়নাথ একই সঙ্গে মনের মধ্যে সূক্ষ্ম অভিমান ও চাপা আনন্দ অনুভব করলেন। বললেন—তা বেশ ত।

কালিনাথ ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন—উপযুক্ত ছেলের মত কথাই বলেছ সুপ্রিয়! তবে এখনও সময় আসেনি প্রিয়নাথের বিশ্রাম নেবার। পাকা মাথা আর সাধা অভিজ্ঞতা নিয়ে তোমার বাবা যে-ভাবে নৌকোর হাল ধ'রে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছেন সে-দক্ষতা তো তোমার এখনও হয়নি। কাজেই তোমার সম্বন্ধে প্রিয়নাথ যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাকে অগ্রাহ্য করা তোমার উচিত হবে না বাবা!

ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে সুপ্রিয় বললে—অগ্রাহ্য তো করিনি। আমি বাবার এবং আপিসের সুবিধের জন্যেই বলছিলাম।

কালিনাথের কথায় প্রিয়নাথের আত্মাভিমান হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কালিনাথ ঠিকই বলেছেন। তুমি বরং আপিস অঞ্চলে একটা ঘর দেখ তোমার নিজের আপিস খোলবার জন্যে।

সুপ্রিয় বললে—কিন্তু আমি যে অঘোর বাবুকে বলে দিয়েছি যে কাল থেকে আমি আপিসের কাজ-কর্ম্ম দেখা-শোনা করবার জন্যে প্রত্যহ সেখানে যাব।

সুপ্রিয়র এই কথা শুনে প্রিয়নাথ কি যে বলবেন তা ভেবে না পেয়ে বোধ হয় বিমূঢ় বোধ করছিলেন, তাঁকে উদ্ধার করলেন কালিনাথ।

বললেন—কিন্তু তোমার এ ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বাবা!

—অনাবশ্যক কেন? প্রশ্ন করলে সুপ্রিয়।

ধীরে ধীরে কালিনাথ বললেন—অনাবশ্যক নয়? যেখানে খোদ কর্ত্তা নিজে প্রত্যহ আপিসে গিয়ে সমস্ত দেখাশোনা এবং বিলি-ব্যবস্থা করছেন, যেখানে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে আমি আমার বহুদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সমস্ত খাতাপত্র তন্নতন্ন করে দেখছি এবং বার বার বহু বাধা-বিঘ্নকে পার হতে সহায়তা করছি, যে স্থলে প্রিয়নাথ এবং আমি উভয়ে একযোগে কাজ ক'রে সঙ্কটকালে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছি, সে স্থলে তুমি যদি এসে ইন্টারফিয়ার করতে চাও তো তাকে অনাবশ্যক বলা বোধ করি অন্যায় হবে না। কি বল প্রিয়নাথ?

সজোরে ঘাড় নেড়ে প্রিয়নাথ বলে উঠলেন—নিশ্চয়, একশো বার। ডালহৌসী স্কোয়ারে ঘর নিয়ে তুমি তোমার নিজের আপিস খোলবার ব্যবস্থা কর।

ব্যাকুল কণ্ঠে সুপ্রিয় বললে—কিন্তু বাবা...

কালিনাথ বলে উঠলেন—বাপের কথা অগ্রাহ্য ক'র না সুপ্রিয়!

সুপ্রিয় আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। রুক্ষ তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল—কি যা-তা বকছেন আপনি তখন থেকে?

বিস্মিত হলেন প্রিয়নাথ। বিরক্ত হলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চড়া সুরে কথা বলেছে এমন লোককে তিনি কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারেন নি। ছেলের বেলাতেও পারলেন না। শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে বললেন—গুরুজনদের মান রেখে কথা বলার শিক্ষা আশা করি তুমি আর কখনও ভুলে যাবে না। এবারকার মতো তোমায় কিছু বললাম না।

ক্ষণেক নীরব থেকে পুনরায় বললেন—কালিনাথ যা-তা কিছু বলেন নি। অত্যন্ত সমীচীন কথাই বলেছেন। তোমার এখন আপিসে বেরুবার কোন দরকার নেই। আশা করি আমার কথা অমান্য করবে না। আর কিছু বলবার আছে?

—না।

—তা হলে তুমি এখন যেতে পার।

বিহ্বল হতভম্বের মত সুপ্রিয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দুই অখণ্ড নীরবতার মধ্যে কাটলো, তারপর কালিনাথ বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন—কি জানি, হয়তো আমরাই ভুল করলাম। সুপ্রিয়র হাতে আপিসের সব ভার দিয়ে হয়ত আমাদের সরে আসাই উচিত ছিল।

সবেগে প্রিয়নাথ বললেন—পাগল না কি তুমি? এই দারুণ ডামাডোলের মধ্যে একদিনও চালাতে পারবে না। ভাল কথা, কাল সকালে বারোটার মধ্যে হাজার দশেক পাওয়া যাবে তো? কি বলে মাড়োয়ারী?

ধীরে ধীরে কালিনাথ বললেন—হয়ত যাবে। অনেক ক'রে তো বলে রেখেছি। তবে প্রথমটার জন্যে তাগাদা করছিল। সময় অনেক দিন আগেই পার হয়ে গেছে; আর এ-সব লেন-দেনে সময় পার হওয়াটা যে খুবই বিপজ্জনক তাও নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই, তাই, মহাজনটিকে খুবই ভাল বলতে হবে, একবারের বেশি দু'বার বলে নি।

—দেব, দেব। সব একসঙ্গে মিটিয়ে দেব। বললেন প্রিয়নাথ।

কালিনাথ বললেন—কাল সব টাকাটা নিয়েই ফাটকা বাজার হয়ে মাঠে যাবে না কি?

মাথা নেড়ে প্রিয়নাথ জবাব দিলেন—নিশ্চয়। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।

* * * *

পশ্চিম আকাশে ঘনঘটার আভাস। দুরন্ত বায়ু খর বেগে বইতে সুরু করেছে। চারি দিক ছেয়েছে মেঘে। যে-তরণী পাল তুলে চলেছিল অনুকূল স্রোতে, তার হাল ভেঙেছে, পালের কাছি ছিন্ন হয়েছে। তরী বুঝি ডোবে।

কালিনাথ অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। আইনের অমোঘ বিধানকে তিনি নাকি অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন প্রিয়নাথকে। এ সঙ্কট তাঁরা পার হবেনই। কালিনাথ জীবিত থাকতে কোন মহাজনের সাধ্য নেই প্রিয়নাথের কেশাগ্র স্পর্শ করে। প্রিয়নাথও একান্ত অসহায়ের মত কালিনাথের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন।

সেদিন সকালবেলা আর-এক দফা বন্ধুকে আশ্বাস দিয়ে কয়েকখানা ডেমি কাগজে প্রিয়নাথের সই করিয়ে নিয়ে কালিনাথ বেরিয়ে গেলেন।

প্রিয়নাথ যথারীতি রওনা হলেন ফাটকা বাজারের দিকে।

* * * *

গণ্ডার রইল অক্ষত। ভাণ্ডার রইল অলুণ্ঠিত। রিক্তহস্তে প্রিয়নাথ বাড়ী ফিরলেন।

কিন্তু টাকা তো চাই। টাকা। কোথায় কেমন করে পাওয়া যায়? হরিদাস ঘটক পাশের ঘরে এসে বসে আছে জানা গেল।

কালিনাথ বললেন—প্রস্তাবটা একেবারে উপেক্ষা করবার মতো নয় প্রিয়নাথ! টাকার দিকটা আমি দেখছি না। আমি দেখছি বংশ-মর্য্যাদার দিকটা। তাছাড়া তোমার অত সাধের হাসপাতাল। তারও একটা কিনারা হয়।

তার পর নিম্ন স্বরে বললেন—ছেলে যে তোমার বিগড়ে যেতে বসেছে, সে কার প্ররোচনায় তা কি তুমি আজো বোঝ নি প্রিয়নাথ? তোমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর লক্ষ্য আছে ওদের।

—কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি কালিনাথ!

কালিনাথ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন—কিসের কথা! কথা দিয়েছো, বন্ধুর মেয়েকে সৎপাত্রে অর্পণ করবার ব্যবস্থা করবে। এই তো?

—হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে।

—বেশ। তাই কর না কেন! দেশে সৎপাত্রের অভাব নেই। দেখে-শুনে একটি স্থির করে দাও; দু'-পাঁচ হাজার তোমার খরচ হবে। তার আর উপায় কি! কথা যখন দিয়েছো।

প্রিয়নাথ চুপ ক'রে রইলেন। কালিনাথ বলতে লাগলেন—বন্ধুর জন্যে এতখানিই বা কে করে আজ-কালকার দিনে! এই যা করলে তুমি তা যথেষ্ট।

অন্ত আর কোন প্রলোভন না হোক, পাত্রীপক্ষ তাঁর হাসপাতালকে সাহায্য করবে, তাদের সহায়তায় তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ ও সার্থক হবে, এই আকর্ষণ প্রিয়নাথের মনে দুর্নিবার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া সমান সমান ঘরে ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছাটাও তো অসঙ্গত নয়। কিন্তু ভবতারণ আর প্রমীলা?···

সত্যিই কি প্রিয়নাথের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি লুব্ধ হোয়েছে ভবতারণ? তাই তার অত আগ্রহ, অত ত্বরা! প্রিয়নাথ দ্বিধায়, ইচ্ছাশক্তির অভাব-জনিত দুর্ব্বলতায় দুলতে লাগলেন।

—তাহলে ঘটককে বিদায় ক'রে দিই, কি বল?

কালিনাথের কথায় প্রিয়নাথ সজাগ সোজা হোয়ে বসলেন। বললেন—তোমার কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তা ঠিক। কিন্তু আমি ভবতারণের কাছে গিয়ে কেমন করে বলব···

—তোমায় যেতে হবে কেন? বললেন কালিনাথ—যা বলবার আমি গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলে আসবো। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি। নিজের স্বার্থের জন্যে নিশ্চয় তোমার সুবিধার প্রতি উদাসীন হবেন না। আমার বিশ্বাস, আমার কথা শুনলে, তিনি সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় রাজী হবেন।

—তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে। হাঁফ ছেড়ে প্রিয়নাথ বললেন—তাহলে ঘটককে বলে দাও, আসছে রবিবার তাঁরা যেন এসে কথাবার্ত্তা পাকা করে যান।

হৃষ্টচিত্তে মাথা দোলাতে দোলাতে কালিনাথ পাশের ঘরে গিয়ে ব্যবস্থা পাকা করে এলেন। [ক্রমশঃ।

স্বপ্নোত্থিতা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিশু চক্রবর্তী আর নমিতা হালদারের উপাখ্যান শেষ হয়ে এল। লেখকের চোখে ভাসছে বন্ধু-বান্ধবের সপ্রশংস চাউনি। ব্যর্থতার সবটুকুই ব্যর্থ নয়, পৌরুষের মর্যাদা আছেই। ভক্ত একলব্য গুরুপায়ে দক্ষিণ অনামিকা বিসর্জন দিয়েও রিক্ত কী? ভক্ত বিশু চক্রবর্তী দেবীর পদমূলে গোটা দক্ষিণ হাতটি বিসর্জন দিয়েই বা নিঃস্ব হবে কেন? রোমান্টিক পাঠকবর্গ দাম দেবে তার।

তিন-পেয়ে নড়বড়ে টেবিলের ওপর লেখা কাগজগুলো ছড়িয়ে আছে। হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে লেখক চিন্তামগ্ন। নমিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে বিশু চক্রবর্তীর পরাজিত পৌরুষ কতটা খাড়া রাখা চলে ভাবছে। শিকারীর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে মনের সর্বত্র বিচরণ করেও বিস্ময়কর মাল-মশলা কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। মেজাজ চড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

—ভাবছ কি ছাই অত, সত্যি কথাটা সহজ কথাতেই লিখে দাও না বাপু!

চোখ বড়-বড় করে লেখক তাকালো। কলম কথা বলছে। লেখক সশ্লেষে জবাব দিল, লেখা জিনিষটা এত সহজ হলে রামা-শামা সবাই লিখত, যা বোঝো না তা নিয়ে কথা ব'লো না।

থামো, থামো—! ঝাঁঝিয়ে উঠল কলম, রামা-শামা লিখলে তো বাঁচতুম। মিথ্যে কথার জাহাজ নয় তারা এমন, সাত কথা বলতে আমাকে সতের পাক ঘোড়দৌড় করিয়ে আনত না তোমার মত। তোমার নমিতা হালদারের দেখা মেলে পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে—অথচ কর চ এমন যেন কোন নন্দনকাননের দুর্লভ উর্বশীটি।

লেখক হাসতে লাগল মৃদু মৃদু। বলল, নিতান্ত তোমার পরিশ্রমের কথাটা তুললে বলে রাগ করলাম না। কিন্তু নমিতা হালদার সম্বন্ধে আর একটু সমঝে কথা বোলো। ট্রাম-বাসে সে চড়ে না।

—চড়ত। নিজের পয়সায় চড়ত। তোমাদের মত হা-ঘরে গৌরী সেনের দল থাকতে এখন আর চড়বে কেন? তোমরাই মেয়েটাকে বিগড়ে দিলে।

—দেখো, মেয়েটা মেয়েটা কোরো না বলছি, সম্ভ্রান্ত মহিলা তিনি।

কলম হেসে উঠল হা-হা করে। কি বললে, ভ্রান্ত মহিলা! তা মিথ্যে বলোনি খুব। সেদিন তোমাদের ক্লাবে রঘু বোস নমিতা হালদারের কর্মোন্নতির রহস্যটা যখন ফাঁস করে দিল সকলের কাছে, মুখখানা তার দেখবার মতোই হয়েছিল।

—মুখে তোমার কালি, ভালো দেখতে জানবে কি করে। কি রকম দেখতে হয়েছিল শুনি?

—চটো কেন। হাই-হিলপরা তরুণী মেয়েকে শুকনো ফুটপাতে পা পিছলে আছাড় খেতে দেখেছ কখনো?

—না।

—চলন্তি ট্রামে উঠতে গিয়ে আধুনিক মেয়েকে অচেনা পুরুষের বক্ষলগ্না হয়ে ঝুলতে দেখেছ নেক্সট্‌ ষ্টপ পর্যন্ত?

—না।

—তোমাকে তাহলে বোঝাতে পারলুম না কি রকম দেখতে হয়েছিল।

লেখক গুম্‌ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। সে জানে কি রকম দেখতে হয়েছিল নমিতা হালদারের মুখখানি সেদিন। হাল্কা আবহাওয়ার পরিবেশটা দিব্যি জমে উঠেছিল। সভ্যরা সবাই ছেঁকে ধরেছে নমিতা হালদারকে—খাওয়াতে হবে। এতবড় একটা প্রমোশান হল, জুনিয়র অফিসার এখন, চালাকি না কি! নমিতা স্মিত হাস্যে ভ্রূকুটি করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বাইরে ছিল তিন দিন, সে জানত না কি কিছু! ট্রেণ থেকে নেমেই তো একেবারে সরাসরি এখানে। সুখবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রেডি করে রাখা উচিত ছিল উল্টে তারই জন্যে। ছেলেরা হাসছিল ভুঁইফোড় হাসি। মেয়েরা হাসছিল বেদনা-করুণ হাসি। কোণের দিকে একমাত্র বিশু চক্রবর্তী অবশ্য বসেছিল চুপ-চাপ। এমন সময় কোথা থেকে মূর্তিমান রাহুর মত এসে উদয় হল রণু বোস। মাথা ঝাঁকিয়ে তড়-বড় করে বললে, কংগ্রাচুলেশানস্‌ নমিতা দেবী, কংগ্রাচুলেশানস্‌!

জবাবে নমিতা হালদার অনাবিল হাস্যে মাথা নোয়ালে একটু। কিন্তু তার পরেই বজ্রপাত। রণু বোস বলে বসল, কিন্তু আপনি একটু সাবধানে থাকুন নমিতা দেবী। বড় সাহেবের বউ মিসেস্‌ পাণ্ডে আপনাকে পাকড়াও করতে পারেন। মাথায় ছিট আছে জানেন তো?

সকলেই অবাক। নমিতা আরো বেশী। আমাকে! আমি তো তাঁকে চিনিনে!

—তিনি আপনাকে চেনেন। ইদানীং মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে আপনার এক্‌সকারসানগুলোর খবর পাচ্ছেন কেমন করে যেন। তিন জনকে টপকে আপনাকে প্রমোশান দেবার খবরও রাখেন দেখলাম। বুড়োকে ঘরে লক্‌ আপ করে শাসিয়েছেন, হিন্দু কোড বিল পাস্‌ হলে সবার আগে গিয়ে তিনি ডাইভোর্স করে আসবেন। কিন্তু তারও আগে আপনাকে একবার তিনি দেখে নেবেন বলেছেন। আমিও বলতে ছাড়িনি। বলেছি, পাণ্ডের মত এক পাল গাধাকে চরিয়ে বেড়াচ্ছেন আমাদের নমিতা দেবী। তোমার মত বুড়ীকে থোড়াই কেয়ার করেন তিনি।

ব্যস্‌! একেবারে বাসনমাজা জল পড়ল একপ্রস্থ। রণু বোস যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। শুধু গেল! এক ফুঁয়ে যেন ঘরের আলোটাকে শুধু নিবিয়ে দিয়ে গেল। এর পর আর আসর জমানোর প্রয়াস বৃথা। দুই-একজন চেষ্টা করল তবু। কিন্তু নমিতা হালদারের ভ্রূকুটি দেখে সভয়ে থেমে গেল। অতএব একে একে বিদায়ের পালা। সেন কাছে এসে গলাখাঁকারি দিয়ে চুপি-চুপি স্মরণ করিয়ে দিল, আজ আমার গাড়িতে আপনার বাড়ি

নমিতা মাথা নাড়ল, না—।

সেন চলে গেল। রায় বলল, মেট্রোর দু'খানা ভালো টিকিট কেটেছিলাম, আসবেন—?

নমিতা বলল, না—।

রায় চলে গেল। মিত্র বলল, ডে লাইট্‌ হোটেলে আজ ড্যান্স প্রোগ্রাম···মন ভাল হত, চলুন না—।

নমিতা জবাব দেয়, না—।

মিত্র চলে গেল। শেষ চেষ্টা দেখলে গুপ্ত, ডিলাইট্‌ কাফেতে আজও বোহেমিয়ান ডিনার, মেন্যু শুনেছিলাম—

নমিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, না—!

খাওয়ার প্রস্তাব করে প্রায় চড় খেয়ে প্রস্থান করল গুপ্তও। নমিতা হালদার এদিক-ওদিক তাকাতে চোখ পড়ল কোণে বিশু চক্রবর্তীর ওপর। এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে ইসারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে ক্লাব-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গট্‌মট্‌ করে।

পথ চলতে চলতে বিশু চক্রবর্তী এই প্রথম কথা বলল, রণু বোস স্কাউণ্ড্রেল—!

কী?

নমিতার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল বিশু চক্রবর্তী। আমতা আমতা করে বলল, এই বলছিলাম ড্যাম্‌. ব্লাডি, সোয়াইন্‌—!

—গরু, ছাগল, গাধা, মোষ, পাঁঠা উল্লুক, ভাল্লুক—রাগে নমিতা আরো জন্তুর নাম হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

সাহস পেয়ে সোৎসাহে বিশু চক্রবর্তী যোগ করে দিল, গি—ক্যাঙারু, সজারু, ইঁদুর, ছুঁচো—এক কথায় লোকটা আস্ত জানোয়ার!

—লোকটা নয় তুমি।

ঘাবড়ে গিয়ে বিশু চক্রবর্তীর কথা আটকে গেল।

—আমি! স—স—সবগুলো?

—সবগুলো, আরো অনেকগুলো। এতক্ষণে বুক ফুলিয়ে বলছেন, রণু বোস স্কাউণ্ড্রেল! তখন বলতে পারনি?

—ত-তখন বলব। লোকটা যে বক্সিং জানে!

—কাপুরুষ! তোমরা বিশ্বাস করেছ ওর কথা?

—বিশ্বাস করব না বলছ?

—ষ্টুপিড। লোকটা তিন বছর ধরে আমার পিছনে ঘুরে ঘুরেও সুবিধে করতে না পেরে আজ ঝাল ঝেড়ে গেল জানো না?—

জানে। বছরের পর বছর ধরে তো নিজেরাও ঘুরছে। তাদের রক্ত এমন অভদ্রোচিত গরম নয় বলেই রক্ষা। তবু কি অবিশ্বাস করবার কথা বলছে নমিতা হালদার বিশু চক্রবর্তী ভেবে পাচ্ছে না। আগের সাহেব প্রমোশান দিয়ে গেছে তিন-চারটে। পাণ্ডে তো একেবারে অফিসার বানিয়ে ছেড়ে দিলে। তার পরে সেনের গাড়ি চড়ানো, রায়ের সিনেমা দেখানো, মিত্রর নাচের প্রোগ্রাম, গুপ্তর ডিনার খাওয়ানো···। বিশু চক্রবর্তীর বুকের ভেতরটা মোচড়াতে লাগল কেমন।

নমিতা হালদার আলটিমেটাম্‌ দিলে, রণু বোসকে শিক্ষা দেবে কি না জানতে চাই।

বিশু চক্রবর্তী অকূলপাথারে পড়ল। রণু বোসের মূর্তিটা চোখে

ভাসছে। ফুটবল খেলা পা, বক্সিং শেখা হাত, শো-দেখানো বুক, আর হুইস্কি খাওয়া মাথা। বিশু চক্রবর্তীর জলতেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু সহসা যেন তমিস্রনাশিনী আলোক-রশ্মি দেখতে পেল একবিন্দু। মরুভূমিতে ওয়েসিস্। ক্রমশ সেটা বড় হয়ে দেখা দিল চোখে। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দেব শিক্ষা। এমন শিক্ষা দেব যে সে আর জীবনে ভুলবে না।

নমিতা হালদার ঠিক বিশ্বাস করল না। কিন্তু বিস্মিত হল। —কি করবে শুনি?

—আমি করব না, লেখক করবে। তার কলমের একটি ব্লো পয়েণ্ট মত পড়লেই রণু বোসকে আর উঠতে হবে না, একেবারে ক্লীন knock out!

—ননসেন্স।

—পারবে না বলছ?

—লেখকের ওই বেয়াড়া কলমকে তুমি চেন না? তার কোন কথা শোনে ওটা? উল্টে আমাকেই দেবে'খন খতম করে।

বিশু চক্রবর্তী রুখে উঠল প্রায়। জোর দিয়ে বলল, হতভাগা কলমের চৌদ্দ পুরুষ শুনবে এবার কথা। লেখক তার মুখ ভোঁতা করে দিয়ে শোনাবে। তুমি দেখে নিও।

কোন রকমে রাগ সামলে নমিতা বলল, তা হলেও সত্যিকারের রণু বোস তো আর নক্ আউট হচ্ছে না। সশরীরে সে যখন লেখকের কাছে এসে হাজির হবে কৈফিয়ৎ নিতে তখন?

বিশু চক্রবর্তীর মুখ শুকিয়ে গেল আবার। কথাটা ভাববার কথা বটে। খানিক চিন্তা করে বলল, তা হলে এক কাজ করা যাক। কলমের 'ব্লো'টা প্রেস থেকে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসার আগেই লেখক না হয় চেঞ্জের নাম করে মাস কতক অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে। তত দিনে রণু বোস নিশ্চয় অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। কি বলো?

কিন্তু জবাবে নমিতা যা বলে গেল শুনে বিশু চক্রবর্তী ষ্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইল। এক পশলা আগুনের হল্কা ছড়িয়ে নমিতা হালদার চলে গেল। ষ্ট্যাচুর গায়ে রক্ত চলাচল সুরু হল একটু একটু করে। শুধু তাই নয়, সমস্ত পুরুষকার গুমরে গুমরে চাড়িয়ে উঠতে লাগল যেন। ভেনজেনস্! মার্ডার! রণু বোস, হার্ক দাই ডেথ নেল্!

মনে মনে চিৎকার করে লেখককে ডাকতে ডাকতে বিশু চক্রবর্তী বাড়ি ফিরল। দিন কতক জল্পনা-কল্পনা করে লেখক বসল কলম নিয়ে। রণু বোসের নাক থ্যাবড়া করে দিয়েছে, তিল তিল করে গড়ছে নমিতাতিলোত্তমা। বিশু চক্রবর্তীর বিদায়-বিষণ্ণ মুহূর্তটি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই সব শেষ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া কলম এই শেষ বেলায় যত ফষ্টি-নষ্টি সুরু করেছে!

চোখ পাকিয়ে লেখক কলমের দিকে তাকাল। কলম নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল ভাবচ কী?

—ভাবচ কী! সমস্ত মুড টা নষ্ট করে দিলে এখন লিখি কি করে বলো তো? তোমার বেয়াড়াপনা অসহ্য—নমিতাকে বলা হয়েছে দরকার হলে তোমার মুখ ভোঁতা করে দেওয়া হবে সে কথা জানো?

—জানি। কিন্তু তোমাকে আর চেষ্টা করতে হবে না, তোমার মত হাঁদারামের পাল্লায় পড়েছি যখন, দু'দিন বাদে মুখ আপনি ভোঁতা হয়ে যাবে আমার। ঘরে বসে যত বীরত্ব, সেদিন রাস্তায় যখন আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দিলে নমিতা হালদারে তখন তো দিব্যি ঠাণ্ডা পাথরখানার মত সহ্য করলে?

—আমি! আমি কে?—বিশু চক্রবর্তী সহ্য করেছে, আমি লেখক।

—তুমি বিশু চক্রবর্তী। আমার দৌলতে কিছু কাল লেখকগিরি করেছ। এ মুখ ভোঁতা হলে দেখবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুমি একখানা আস্ত বিশু চক্রবর্তী। সে কথা যাক, শেষ বিদায়ের পালাটা কি রকম লিখতে চাও শুনি?

লেখক আপসের সুরে বলল, এই তো ভালো কথা, কোথায় এ বিপদে দু'টো পরামর্শ দেবে না শুধু চিমটি কাটা। আচ্ছা শোনো, যদি বলি, নমিতা তোমার চিরশত্রু রণু বোসকে খতম করেছি, ফলে আমাকেও সে আর আস্ত রাখবে না হয়ত—কিন্তু সে জন্যে আর এতটুকু ভয় করিনে। বিশু চক্রবর্তী বিদায় নিল। তার স্মৃতির সমাধির ওপর ফুটে উঠুক তোমার সফল জীবনের ভরা আনন্দগুচ্ছ। —কেমন হয়?

—তোমার মাথা হয়। ওর ভরা আনন্দগুচ্ছের গন্ধ পেলে সমাধির মধ্য থেকেও তোমার দীর্ঘনিশ্বাস উপড়ে আসবে। কলম মুখিয়ে উঠল, বিদায়ের প্রশ্ন ওঠে কেন, নমিতা হালদার সেদিন কী বলেছে শুনি?

লেখক মুখ ভার করে জবাব দিল, সেটা কি ভালো কথা যে শুনবে?

—তবু, শুনিই না?

—বলেছে ইডিয়েট।

—তার পর?

—তার পর রাস্কেল।

—তার পর?

—তার পর অনেক কিছু বলেছে, অত আমার মনে নেই।

—শেষে?

—শেষে বলেছে জীবনে আর আমার মুখ দেখবে না, আর সব শেষে বলেছে, আমি স্বচ্ছন্দে এবার জাহান্নমে যেতে পারি।

কলম বলল, ঠিকই বলেছে।

লেখক গরম হয়ে উঠল, ঠিক কেন?

—নয় কেন। তুমি তার সর্বনাশটি করে এখন দু'লাইন কাব্য করে সরে পড়তে চাইছ, বলবে না?

লেখক অবাক, আমি তার কি সর্বনাশ করলাম?

—তুমিই তো করলে। কি ছিল সে, আর কেন আজ এমন হয়েছে, বেশ করে ভেবে দেখ দেখি।

লেখক ভাবতে লাগল।···দশ বছর আগের সেই কিশোরী মেয়েটি। চোখে লজ্জা, ঠোঁটে হাসি, মনে ভয়, চলনে সঙ্কোচ, বলনে দ্বিধা। দারিদ্র্যের অন্তঃপুর থেকে তাকে টেনে এনে ছেড়ে দেওয়া হল চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের রাজপথে। বস্তু-জগতের পালিশ লাগল দেহে, মনে। আগে এক জনের জন্য গোপনে সাজত, এখন দশ জনের জন্য প্রকাশ্যে সেজে বেড়াচ্ছে। আগে এক জনের কথা মনে হলে মুখে রঙ লাগত, দশ জনের মন ভোলাতে এখন মুখে

রঙ মাখতে হচ্ছে। আগে এক জনকে দেখলে বুক দুলে উঠত, দশ জনের বুকে এখন ক্রমাগত দোলা লাগিয়েও তার আশ মেটে না। ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল লেখক। বলল, সবই তো তার ভালোর জন্যে করেছিলাম—কিন্তু সবার আগে এখন আমাকেই সে ভুলে বসল কেন?

—তার কারণ আজকের নমিতা হালদারের কাছে তুমি অচল। তোমার গাড়ি নেই, মেট্রোর টিকিট কাটতে পার না, ডে লাইট হোটেল চেন না, বোহেমিয়ান ডিনার খাওয়াবারও টাকা নেই তোমার—তুমি তার কোন্ কাজে লাগবে? তোমার আশা দেখিনে, কিন্তু তোমার নমিতা হালদারের কপালেও দুঃখ আছে অনেক।

লেখক বললে, তুমি দেখছি মাষ্টার মশাই হয়ে উঠলে। তার কপালে দুঃখ থাকবে কেন, কত লোক তো তাকে লুফে নেবার জন্যে হাঁ করে আছে।

কলম বললে, যেমন তোমার বুদ্ধি! লুফে নেবার জন্যে হাঁ করে নেই কেউ—তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলবার জন্যে অনেকে হাঁ করে আছে বটে। তার সতের থেকে সাতাশ বছরের পরিবর্তনটা তো দেখলে, সাঁইত্রিশের কথা ভাবতে পারো? শুধু কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে হবে তখন।

লেখক সচকিত হয়ে উঠল, সে কী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! চুলে পাক ধরবে, রক্ত ঠাণ্ডা হবে, ঘরে-বাইরে এত লোক কিন্তু সে কারো ঘরণী নয়, পথে-ঘাটে এত ছেলে কিন্তু সে কারো মা নয়। একখানি আস্ত একা'র কবর। কাঁদবে না! সারা রাত কাঁদবে। তার পর সকালে উঠে ওই কান্নার ওপর স্নো-পাউডার আর রং চড়িয়ে বেরুবে সঙ্গী খুঁজতে। কিন্তু পারতে আর কেউ তখন কাছে ঘেঁষবে না।

—কেউ না?

—উঁহু, সেন না, রায় না, মিত্র না, গুপ্ত না, কেউ না।

—কিন্তু আমি! আমি তো থাকব।

—তোমারও তখন আর ভালো লাগবে না তাকে।

—সর্বনাশ! নমিতা তা হলে বাঁচবে কেমন করে?

—অমনি তিলে তিলে আত্মহত্যা করে।

লেখক আঁতকে উঠল প্রথম, পরে কলমটাকে মাথার ওপর তুলে আছড়ে ভাঙতে উদ্যত হল।

—থামো, থামো, এখনো রাস্তা আছে।

লেখক কলম নাবাল, বলো শীগগির, নইলে তোমাকে আস্ত রাখব না আজ। নমিতাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে।

—তাহলে নিজে আগে বাঁচো।

—নিজে বাঁচব! কেন আমি কি বেঁচে নেই?

—না। লেখা ছেড়ে আপাতত আমাকে বিশ্রাম দাও, রোদে পোড়ো, জলে ভেজো, শক্ত দুটো হাত দিয়ে টাকা রোজগার করো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। তার পর যাও নমিতার রোগ ছাড়াতে।

—রোগ ছাড়াতে!

—হ্যাঁ। গত দশ বছরে একটা কাচের খোলের মধ্যে আটকে গেছে মেয়েটা, মাথা খুঁড়েও নিজে আর বেরুতে পারবে না ওটার মধ্য থেকে। ওই খোলস তোমাকে ভাঙতে হবে।

লেখক আশান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল, কেমন করে ভাঙব?

কলম জবাব দিলে, বলছি একে একে শোনো। প্রথমে সোজা গিয়ে উপস্থিত হবে তার ঘরে। বুঝলে?

—বুঝলাম।

—তার পর তার চিবুকখানা ধরে মুখটি নিজের মুখের দিকে তুলে ধরবে একটু।

—বেশ কথা।

—তার পর তুমি পিছনের দিকে সরে আসবে এক পা'।

—সরে আসতে হবে আবার?

—হ্যাঁ। সরে এসে দুই গালে দুই থাপ্পড় বসাবে। কোন রকম মায়া-দয়া করে নয়, বেশ কষিয়ে থাপ্পড়—ডান গালে একটি বাঁ গালে একটি।

শুনেই লেখকের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। আর্তনাদ করে উঠল প্রায়।—থাপ্পড়! আমি—! নমিতাকে—!

—তারপর তার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসবে নিজের বাড়িতে।

—কিন্তু তারও যে হাত আছে, আর আমার মাথায়ও ঝাঁকড়া চুল!

—তা হোক, না হয় একটু হাতাহাতি আর চুলোচুলি হল। কিন্তু ও ছাড়া আর গতি নেই।

আর সাড়াশব্দ নেই। দু'জনেই নীরব। লঘু পায়ের শব্দে মুখ ফেরাতেই লেখকের দেহের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। নমিতা ঘরে প্রবেশ করল। থমথমে মুখ খর খরে চোখ। দু'-চার মুহূর্ত নিঃশব্দে চেয়ে রইল লেখকের দিকে। পরে লেখা পাতা ক'টা চোখে পড়তে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল সেগুলো।

লেখক সকরুণ আবেদন জানাল, নমিতা আমি কোন দোষ করিনি, এই হতচ্ছাড়া বয়াটে কলম এই কাণ্ড করেছে! ওকে আজ আমি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে একাকার করে ফেলব—ও তুমি পড় না নমিতা।

নিষ্ফল। নমিতা পড়ছে। শুধু তাই নয়, মুখখানি লাল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ নিশ্বাস ঘন হয়ে আসছে। শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট ঘষতে লাগল লেখক। পড়া শেষ করে নমিতা কাগজগুলো রাখল। তাকাল তার দিকে। লেখকের গায়ে গরম ছ্যাঁকা লাগছে যেন। মেয়ে নয়ত, একখানি জ্বলন্ত ভিসুভিয়াস! নমিতা কাছে সরে আসছে।

মরিয়া হয়ে লেখক হাত বাড়াল কলমের দিকে। দ্যাখো, ওর কি হাল করি আজ—

এক ঝটকায় তার হাত সরিয়ে দিল নমিতা। চুলের মুঠি ধরে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল গালে। পরে ভাঙা টেবিলে বসে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল সে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে হতভম্ব লেখক দু'চোখ গোল করে কিছুক্ষণ দেখল সেই দৃশ্য। পরে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়াল কখন। ভাঙা গলায় বলল, আমি—মা-মানে —তুমি কেঁদ না নমিতা। তোমার—মানে—আমার একটুও লাগেনি আর কখনো এমন হবে না—কলমটাকে আজ ভাল হাতে শায়েস্তা করছি দেখো—

মাথা তুলে নমিতা গর্জে উঠল প্রায়।—কী? তার আগে আমি তোমাকে করব ভালো হাতে শায়েস্তা। একদিন নয়, রোজ। এখান থেকে আর এক পা'ও নড়ছি না আমি—।

লেখক হতবাক্।—তা তার মানে এ বাড়িতে তুমি থাকবে, আর কোথাও যাবে না ?

—না।

—বড় সাহেবের সঙ্গে এয়ারকারশানেও না ?

—না।

—সেনের গাড়িতে হাওয়া খেতে ?

—না।

—রায়ের সঙ্গে সিনেমায় ?

—না। বাড়িতেই হবে সিনেমা।

—মিত্রর সঙ্গে নাচের প্রোগ্রামে ?

—না, ঘরেই কালীর নাচ দেখবে'খন।

—আর গুপ্তর সঙ্গে বোহেমিয়ান ডিনারে ?

—না, এখানেই শাক-চচ্চড়ি খেয়ে বোহেমিয়ান হব।

লেখক হাঁ করে ভাবতে লাগল। শেষে বলল, কলম তে তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল! কিন্তু আমাকে তুমি মারলে কেন তোমাকে তো আমার মারবার কথা।

সুবোধ মেয়ের মত নমিতা চোখ বুজে গাল পেতে দিল। লেখক হাত তুলল। কিন্তু হাত তোলাই থাকল।...ধ্যেৎ, কলমটা আস্ত বর্বর। অমন একখানা গালে কখনো চড় মারা যায়! ভাবতেও বুকটা চড়-চড় করে উঠছে লেখকের। তার থেকে বরং...।

সামনের দিক ঝুঁকতে গিয়ে লেখক চমকে উঠল। হাতের ঠেলা লেগে খর খর করে হাসতে হাসতে কলমটা টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়বার মতলব করছে। তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। কাছে এনে দেখল। আদর করে ঝাঁকুনী দিল দু'টো। কলম হাসছেই। মুখে আর তার এক বিন্দুও কালি লেগে নেই।

একটি চাষীর মেয়ে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

ওই সভাতেই কিন্তু রেবতীকে নিয়ে হৈ-চৈ করার ইতি হয়।

মদনের সভাটা পর্য্যন্ত প্রথমে একবার স্থগিত হয়ে শেষে একেবারে বাতিল হয়ে যায়।

রেবতীর আপনজনেরা মনে-প্রাণে যা কামনা করছিল, ঘটনাচক্রে তাই ঘটে যায়।

রেবতীর নাম কাগজে বেরিয়েছে, এই তেজপুরেই প্রকাণ্ড একটা সভা হয়ে গেছে তাকে নিয়ে, তবু কোন দিকে এতটুকু টি-টি পড়ে যায়নি চাষীর ঘরের অকালপুষ্ট এত বড় মেয়েটাকে নিয়ে।

নিন্দে কি আর করেনি কিছু মেয়ে-পুরুষ! বাড়ী বয়ে এসে দু'চার জন কি আর গায়ে পড়ে শুনিয়ে যায়নি পিত্তি-চটকানো কথা—কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী লোক প্রশংসাই করেছে মেয়েটাকে।

অনেকে নীরব হয়ে থাকলেও তাই নিন্দা চাপা পড়ে গেছে প্রশংসার নীচে।

শুধু তাই নয়।

সোনারপুরের সম্পন্ন চাষী গোবর্দ্ধনের ছেলে মদনের পক্ষ থেকে এসেছে তাদের কল্পনাতীত রকমের মোটা কন্যাপণ ইত্যাদি দিয়ে রেবতীকে বিয়ে করার প্রস্তাব। বুড়ো গোবর্দ্ধন অবশ্য বাতিল করে দিয়েছে প্রস্তাবটা, আচ্ছা করে শাসনও করে দিয়েছে ছেলেকে। কিন্তু ওই নড়বড়ে দেহ নিয়ে খুক-খুক করে কাসতে কাসতে ক'দিন আর টিঁকবে বুড়ো গোবর্দ্ধন? তাতে আবার ম্যালেরিয়ার বাঁধা বছুরে রোগী। প্রতি বছর মাস দুই ভোগে।

কাঁপুনি জ্বরের আগামী পালাটা তার সইবে কিনা সে বিষয়ে গাঁয়ের লোকের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মদন পর্য্যন্ত লোক মারফতে জানিয়ে রেখেছে যে বছরখানেকের মধ্যে রেবতীর যেন অন্য কোথাও বিয়ে না দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধনকে নাকি রাজী করানো যাবে! তার সহজ মানে অবশ্য এই যে মদনও বিশ্বাস করে, বছর খানেকের মধ্যে তার বাপের রাজী-নারাজীর প্রশ্নটাই চিরতরে বাতিল হয়ে যাবে।

তবু রেবতীর আপনজনেরা চাইছিল তাকে নিয়ে হৈ-চৈ বন্ধ হোক, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাক। লোকের প্রশংসায় অসামান্যা হবার বদলে গরীব চাষীর ঘরের অজানা অচেনা তুচ্ছ সাধারণ মেয়ে হয়ে থাক।

অন্য দিকও তো আছে!

সভাটা হবার পরেই রেবতীর সঙ্গে ভাব করার ঝোঁকটা যেন চড়-চড় করে চড়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটা বখাটে ছোঁড়ার। বখাটে হলেও এবং কুবুদ্ধি টের পাওয়া গেলেও রেবতীকে একলা পেয়ে নাগালটুকু ধরাটা ঠেকানো সম্ভব নয়। দু'-এক জনকে ছাড়া।

জন্ম থেকে গাঁয়ের জানা, চেনা ছেলে। কোন ছুতো ছাড়াই যখন খুশী ঘরের মধ্যে ঢুকে পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে বাচ্চা বয়স থেকে পাতানো মাসী পিসী খুড়ি জেঠিদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে রেবতীর সঙ্গে মিষ্টি আলাপ জুড়লেও বলা যায় না, 'বেরো বখাটে, বেরো বাড়ী থেকে!'

ওৎ পেতে থেকে ঘাটের পথে মাঠের পথে একলা রেবতীর নাগাল ধরে 'কোথা যাচ্ছ?'—জিজ্ঞাসা করলেও রেবতীর ফুঁসে উঠবার উপায় নেই।

যতক্ষণ না অন্যায় কোন কথা বলছে, হাত ধরার চেষ্টা করছে!

গোমড়া মুখে হলেও রেবতীকে বলতে হবেই, 'ঘাটে যাচ্ছি।'

তার বাপের জ্বর কেমন, দাদার পেটের অসুখ সেরেছে কিনা, যে আত্মীয় এসেছিল সে আছে না চলে গেছে—এ রকম আরও কয়েকটা কথা বলে তো বটেই, রেবতীকে নিয়ে আবার কোথায় সভা হচ্ছে এ বিষয়েও দু'-চার মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার ওদের অনেকের আছে।

বিষ্টু যখন সাত বছরের কখনো স্যাংটো আর কখনো নেংটি পরা ছেলে, রেবতী তখন মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল স্যাংটো হয়ে।

স্যাংটো রেবতীকে, বালিকা রেবতীকে কি কম পেয়ারা আর আম খাইয়েছে বিষ্টু! সম্প্রতি সে বয়াটে বজ্জাত হয়ে গেছে বলেই দেখা হলে দু'-চার মিনিট কথা না বলে রেবতীর উপায় কি?

মধু, বংশীরা কয়েক জন এসে অভয় দিয়ে গেছে, 'ডরিও না মঠা। ডরালেই পেয়ে বসবে। কুকুরগুলো ঘুর-ঘুর করুক, কুকুর হলেও মানুষ তো, ওটুকু স্বাধীনতা দিতেই হবে। একটু বাড়াবাড়ি করে দেখুক কত ধানে কত চাল!'

গাঁয়ের এরা সোনারচাঁদ যোয়ান ছেলে। এদের ভয়েই খোটেগুলি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায় না। তবু এদের অভয়দানে একেবারে ভয় কাটে না। রেবতী যদি শক্ত থাকে, তবে অবশ্য কোন ভয় নেই। জন্ম থেকে চেনা-জানা গাঁয়ের ছেলে বলে একটুক্ষণ সাধারণ ঘরোয়া কথা বলার অধিকার আছে বলেই তো আর কোন রকম ইয়ার্কি দেবার, হাত ধরবার অধিকার তাদের নেই।

ওরকম বজ্জাতি করতে গেলেই রেবতী যদি চেঁচিয়ে ওঠে, পাঁচ জনে ছুটে এসে পিটিয়ে দফা নিকেশ করে দেবে পিরীত-কাতুরে বয়াটের। বিষ্টুরাও তা জানে।

কিন্তু কাঁচাবয়সী বাড়ন্ত মেয়ে। বিশেষ দিনে বিশেষ ক্ষণে বিশেষ এক জন হাত ধরলে মেয়েটা যদি নরম হয়ে যায়, যদি গলা ফাটিয়ে না চেঁচাতে চায়? শাস্ত্রেই তো বলেছে, পুরুষ হল আগুন আর মেয়েরা হল ঘিয়ের ভাঁড়।

বয়াটেদের আগুনের তাপ বেশী। কিশোর বয়স থেকে তারা বেপরোয়া বেহিসাবী হয়ে জীবন যৌবন ভবিষ্যৎ দাউদাউ করে পুড়িয়ে দিতে সুরু করে।

তাই আতঙ্ক।

সিন্দুকে পুরে তালা বন্ধ করে না রাখলে রেবতীকে ওই আগুন থেকে সরিয়ে রাখা যাবে না।

এত বড় মেয়েকে কি দিবারাত্র অন্দরে রাখা যায়? চোখে-চোখে রাখা যায়?

সংসার চলবে কি করে! গা ধুতে শাক ধুতে ঘটি-থালা মেজে আনতে কলসী ভরে জল আনতে এবং আরও অনেক কিছু করতে একলা ঘাটে যেতে দিতেই হবে রেবতীকে।

বিপদ তো শুধু এটাই নয়!

প্রসন্ন বাবুর চাকরাণী ধাই-মা—নাম-বিহীনা ভীমের মা ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসে হুকুমজারি করে যায়: বাবুর বাড়ীর মেয়েরা পরদিন দুপুরে রেবতীকে ভোজ খাওয়ার নেমন্তন্ন জানিয়েছে।

প্রসন্ন বাবুর বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ, ভীমের মা'র পঁয়ষট্টি।

হাত-মুখ নেড়ে একগাল হেসে ভীমের মা বলে, কপাল খুলেছে গেছে এ মেয়্যার। বাবু নিজে গিন্নিমাকে বললে, গাঁয়ের সবাই সম্মান করল, তোমরা একদিন খাওয়াবে না মেয়্যাটাকে?

পরদিন ভীমের মায়ের জিম্মাতেই রেবতীকে পাঠাতে হয় নিমন্ত্রণ রাখতে—সঙ্গে যায় পাঁচ বছরের মেধো। যেতে বলেছে একা রেবতীকে, বড় কারো সঙ্গে যাওয়া নিয়ম নয়।

প্রথম দিন নির্ভয়েই পাঠিয়েছে। প্রসন্নর মনে যাই থাক, অন্তঃপুরের মেয়েরাই যে রেবতীকে ভোজ খেতে নিমন্ত্রণ করেছে এ ঠাট তাকে বজায় রাখতেই হবে।

মেয়েরা দয়া আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটু সমাদর করবে, খাইয়ে-দাইয়ে তারাই রেবতীকে বিদায় দেবে অবহেলার সঙ্গে। নিয়মের ব্যাপার। এর মধ্যে আজ শুধু একটু নাক গলাবার বেশী কিছু করার সাহস প্রসন্নর হবে না।

কর্তাব্যক্তির ভারিক্কি ভাব বজায় রেখে সামনে দাঁড়িয়ে সাপের ব্যাপারটা সম্পর্কে দু'-চার কথা জিজ্ঞাসা করবে, দু'-একটি মিষ্টি কথা বলবে।

অন্দরে গিজ-গিজ করছে মেয়েছেলে। তার মধ্যে বড়-ছোট গিন্নি দু'জন, নিজের পাঁচটি মেয়ে। কোন রকম ছল-চাতুরীর আড়াল দিয়ে পর্য্যন্ত রেবতীর দিকে থাবা বাড়াবার চেষ্টা প্রসন্ন করবে না।

কিন্তু কে জানে কোথায় গড়াবে খ্যাতিলাভের জন্ত তুচ্ছ রেবতীর দিকে প্রসন্নর নজর পড়ার জের!

ভয় না পেলেও সকলের ভাবনা ছিল। যথাসময়ে ভীমের মার সাথেই মেধো আর রেবতী ভালয় ভালয় ঘরে ফেরায় এ ভাবনাটা দূর হয়। নিশ্চিন্ত অবশ্য তারা হতে পারে না। আসল দুর্ভাবনাটা তো রয়েই গেল।

রেবতীর মুখে নেমন্তন্ন খাওয়ার এবং প্রসন্নের আচরণের বিবরণ শুনে বরং বেড়েই গেল আশঙ্কা!

অমায়িক ভাবে প্রসন্ন তার সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করেছে, ফিরবার সময় নিজে তার হাতে তুলে দিয়েছে একখানা ভাল কাপড়।

হাসিমুখে বলেছে যে গোবিন্দের পা বাঁধতে তার নতুন কাপড়ের পাড় ছেঁড়া হয়েছিল, তারই ক্ষতিপূরণ করা হল!

ভাল শাড়ী। সর্ব্বদা পরা চলবে না। তবে প্রসন্নর বিবেচনা আছে। এত বেশী ভাল শাড়ী সে রেবতীকে উপহার দেয়নি যে। বিশেষ উপলক্ষে কোথাও যেতে হলেও কাপড়টা তার পক্ষে বেমানান হবে, পরতে তার লজ্জা করবে।

ক্ষতিপূরণ হিসাবে গোবিন্দও কাপড় দিতে চেয়েছিল, সেটা নেওয়া যায় নি। প্রসন্নের উপহার বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করতে হয়েছে।

হয়তো খুসী হয়েই নিয়েছে হাবাগোবা মেয়েটা।

রেবতী সগর্ব্বে বলে, কি সুন্দর ব্যাভার করলে গো মোর সাথে! ঠিক যেন সমান ঘরের মেয়ে গেছি নেমন্তন্নো খেতে।

: মেয়েরা করলে?

: মেয়েদের কেমন মুখ ভার দেখলাম—হিংসে হয়েছে। বাবু খাতির করলে খুব।

রাগে গা জ্বলে যায় সকলের। বাবুর খাতিরে খুসীতে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে! এমন বোকা মেয়ে কি জগতে আছে আরেকটা?

বড় একটা সার্বজনীন ব্যাপারে চাপা পড়ে যায় রেবতীর অসামান্য সাহস দেখাবার ছোট ব্যাপারটা।

জনসাধারণের কাছে তাকে তুলে ধরবার আয়োজন যাঃ করেছিল তাদের সময় থাকে না তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার।

সমস্ত চাষী সমাজের বিষম বিপদের আঞ্চলিক বাস্তবতাটা ফেনিয়ে উথলে ওঠায় ঘটনাপুঞ্জের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় একটি চাষীর মেয়ের একদিনের একটু ক্ষণের জন্য একবার অসাধারণ সাহস দেখাবার সাধারণ ঘটনা। চাষীরা সদরে গিয়েছিল শোভাযাত্রা করে, শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার দাবীটা জোরদার করার জন্য।

শোভাযাত্রার সামনে এগিয়ে ছিল কয়েকজন চাষী মা বৌ মেয়ে।

চাষীর মেয়ে রেবতীর সৎসাহস নিয়ে আরও বেশী হৈ-চৈ হলেও কর্তাব্যক্তিদের আপত্তি ছিল না, আবেদন করলে তারা রেবতীর জন্য একটা মেডেল-ফেডেল দিতেও রাজী হয়ে যেত।

খেতে পাই না, পরতে পাই না বলাটাই অন্যায়।

খেতে দাও পরতে দাও দাবী নিয়ে মেয়েদের সামনে রেখে শোভাযাত্রা করে সদরের কর্তার বাড়ীতে চড়াও হতে যাওয়া কত বড় অন্যায় কথা!

কর্তাব্যক্তিটির বাগানের গেট তারা ভাঙবে না, গায়ে আঁচড়ও দেবে না, শুধু খেতে চাই পরতে চাই বলে হৈ-চৈ করবে—তবু কেন এ ভাবে বাড়ীর সামনের রাস্তায় চড়াও হবার চেষ্টা?

শোভাযাত্রার সামনে ছিল পদ্মা। গুলীতে তার পেট ফুটো হয়ে গেল।

পেটে ছিল মাস পাঁচেকের আগামী দিনের একটা মানুষের সম্ভাবনা। সেটাও চুরমার হয়ে গেল।

তাদের ভয় দেখাবার জন্য হুকুম হয়েছিল ফাঁকা আওয়াজের। তবু কেন গর্ভবতী পদ্মার পেটে আর বুনো সাঁতরার বিধবা মার বুকে গুলী বিঁধল সে রহস্য আর রহস্য নেই সব চেয়ে নিরীহ গোবেচারীর কাছেও।

ভিন্ গাঁয়ের অচেনা অজানা মা বৌ, তবু রেবতীর গা জ্বলে যায় বৈ কি! সেও মনে-প্রাণে চায় বৈ কি যে ওদের নিয়ে প্রচণ্ড রকম হৈ-চৈ হোক।

কিন্তু তার সভাটা বাতিল করার জন্য রাগও রেবতীর হয়।

এমন কোন কথা আছে না কি যে ওদের জন্য সভা শোভাযাত্রা করতে হবে বলে তার সভাটা চাপা পড়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে?

এ কি অন্যায় কথা! এক জনকে আকাশে তুলে এমন ধপাস্ করে ফেলে দেওয়া!

আবছা ভোরে গোবিন্দ গট-গট করে হেঁটে চলে সরকারী সেই সড়ক দিয়ে—সাপ যেন জগতে ওই একটাই ছিল, আরেকটা সাপ কামড়ে দিলেও, রেবতীর মত কেউ তার প্রাণ না বাঁচালেও কিছুই যেন তার আসে-যায় না।

রেবতী সড়কে নেমে সামনে দাঁড়িয়ে তার পথ আটকায় না। গ্রাম জাগে আবছা ভোরেই। বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বললে কত জনের নজরে পড়বে কে জানে!

বাড়ীর খানিক তফাতে সাপের আসল আড্ডা বাঁশঝাড়ের আড়ালে থেকে স্পষ্ট গলায় ডাকে, 'শোন। কথা শুনে যাও।'

গোবিন্দ বাঁশঝাড়ের ঘন অন্ধকারে ঢুকে আন্দাজে অদৃশ্য রেবতীর দিকে মুখ করে বলে, চাও নাকি যে আরেকটা সাপে খাক?'

—'সাপে খেলে মোকে খেত, মোকে খাবে। কতক্ষণ ধন্না

দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক নেই। মানুষ এলে আশেপাশে সাপ থাকে?'

—'মোর কিন্তু ভোঁ বাজবে ছ'টায়।'

—'একদিন দেরী করে গেলে কি হবে?'

—'কামাই হবে। পাঁচ মিনিট দেরী হলে আদ্ধেক দিন কামাই। দশ মিনিট দেরী হলে একটা দিন কামাই। খাটিয়ে নেবে—না খাটতে চাইলে গেট্ আউট।'

: সদরের সভাটা হবে না মোর?

: তোমার সভা?

: মোকে নিয়ে সভা আর কি—যেটা হবার কথা ছিল।

: পদ্মাদের নিয়ে অনেক সভা হবে। ইচ্ছে হলে একটা সভায় গিয়ে বক্তিতা কোরো।

: আহা, বক্তিতা করতেই যেন চাই। পদ্মাকে শুনছি নাকি ভাড়া করে আনা হয়েছিল সহর থেকে? শোভাযাত্রার সামনে চলার জন্ম পঞ্চাশ টাকা ভাড়া ঠিক হয়েছিল?

ভোর হচ্ছে তাড়াতাড়ি। খোলা সড়কে রাত্রি কেটে গিয়ে দিনের আলো খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে—সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মানুষ চেনা যায়।

কিন্তু এখানে বাঁশঝাড়ের এই অন্ধকারে পরস্পরকে তারা দেখতে পাচ্ছে না।

গোবিন্দ দু'পা এগিয়ে যায়। আন্দাজে এদিক-ওদিক হাত বাড়ায়। কিন্তু বাঁশ আর অন্ধকার হাতড়ে রেবতীর নাগাল পায় না।

সে তখন গম্ভীর কণ্ঠে বলে, পদ্মা আমার বোন হত।

: তোমার বোন?

: মায়ের পেটের বোন নয়। বাবার খুড়তুতো ভায়ের মেজ ছেলের মেয়ে। আশ্বিন মাসে ওর বোনের বিয়েতে গেছলাম।

: ছি ছি! এমন মিছে কথাও লোকে বলে বেড়ায়! ভাড়া করে আনা মেয়ে!

: দু'-চার জন রটায় এসব কথা—পয়সা পায়। তোমার মত দু'-চার বোকার মনে খটকাও লাগে!

রাগ সামলে রেবতী জোর দিয়ে বলে, আচ্ছা, চালাক চতুর মানুষ এবার কাজে যান। আমি শোভাযাত্রায় যাব, সভায় যাব। বাড়ীতে কেটে ফেললেও যাব।

পদ্মাদের নিয়ে সদরে সভা হবে সতেরোই।

গোবিন্দের কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে বাড়ীতে মারুক কাটুক, ওই সভায় সে যাবেই। শুধু যোগ দিতে যাবে, আর কিছু নয়। দেখে-শুনে আসবে কি ভাবে এ ব্যাপারে মানুষ প্রতিবাদ জানায়।

কিন্তু মনের কথা মনেই চাপা থাকে তার। সভায় যাবার অনুমতি মিলবে না এটা জানা কথা, তবু মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করে একচোট ঝগড়া তো করা যেত সকলের সঙ্গে।

কিম্বা কাউকে কিছু না জানিয়ে পরে কপালে কি ঘটবে গ্রাহ্য না করে চলে তো সে যেতে পারে সভায়!

কিন্তু রেবতী জানে সভায় যাবার তার নিজেরই সাধ্য নেই।

যেতে সে পারে।

সত্যিকারের লোহার শিকল দিয়ে তো আর বেঁধে রাখা হয়নি তাকে!

তবু সে শিকলেই বাঁধা। আজ ঝোঁকের মাথায় যে কাজ করে বসবে তার ফলাফলের ভয়-ভাবনায় লোহার চেয়ে শক্ত শিকলে।

ক'দিন ধরে চিড়া কোটা হচ্ছে ঘরে। তাকেও মা মাসী পিসীর সঙ্গে ঢেঁকিতে পাড় দিতে হচ্ছে উদয়াস্ত।

রান্নাবান্না নেই।

সাতাশ মণ সিদ্ধ ধানের চিড়ে কোটার ফেলনা ফালতু কুড়িয়েই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে পেটপুজা। কুড়িয়ে আন' ডালপাতার আঁচে সিদ্ধ-করা দুটি-চারটি ভাতের চেয়ে পেটের ভোগ জুটছে ভালই, কিন্তু এটা নিছক সাময়িক ভাল। মাত্র ক'টা দিনের ব্যাপার।

ওই ফেলনা বাড়তি চিড়েই কিছু সঞ্চিত থাকবে ঘরে।

আসল চিড়ে চালান যাবে। একমুঠো আসল চিড়ে জুটবে না তাদের। তাদের শুধু ওই ফেলনা ফালতু দিয়ে বিচালীর হিসেবে পাওনা নটবরের পাতলা টক দই দিয়ে, চিটে গুড়ে মিষ্টি করে দু'বেলা ফলাহার।

কেউ তাকে ঠেকাবে না সে যদি ঘাটে যাবার নাম করে নেমে যায় ওই সরকারী সড়কে। গোবিন্দের মত গট-গট করে হেঁটে যায় ষ্টেশনে—আশেপাশের দশ জন যারা জড়ো হয়েছে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ওরাই টিকিট কাটবে তাকে সদরে পদ্মার শোকসভায় নিয়ে যেতে।

গোবিন্দই হয়তো সব ব্যবস্থা করবে।

দিনান্তে ওরা ফিরবে—পদ্মার জন্ম শোকসভা করার জন্ম যদি অবশ্য ওদের আটক না করা হয়। আটক করবে না জানা কথাই! একটা মানুষকে আটক করলেই মানুষের ঘাড়ে চাপে সে মানুষটাকে খাওয়ানো-পরানোও দায়। গায়ে-পড়া হাঙ্গামায় যদি দু'-চার-দশ জন জেল বা হাসপাতালেও যায়—বাকী সকলে ফিরিয়ে এনে ঠিকমত তাকে পৌঁছে দেবে তার ঘরের দরজায়।

কিন্তু তার পর?

বাড়ীর মানুষ গর্জন করে বলবে, না, এ বাড়ীতে আর তুমি ঢুকো না। সারা দিন যেখানে ছিলে সেখানে যাও। বলবে, মা বোন মাসী পিসী চিঁড়ে কুটবে, তুমি যাবে ধিঙ্গিপনা করতে। সারা দিন যেখানে ছিলে সেখানেই থাকো গে' যাও!

সত্যি কথা।

মা বোন মাসী পিসী সবাইকে বাদ দিয়ে, ওদের সবাইকে চিঁড়ে কোটার জন্ম ঢেঁকি পাড় দিতে দিয়ে, একলা সে কোন হিসাবে যাবে পদ্মার শোকসভায়? পদ্মার জন্ম তার কি একা শোক? ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে মা বোন মাসী পিসী কি ভাবছে না পদ্মার কথা, চোখে তাদের জল আসছে না?

তবু প্রাণ জ্বালা করে। তার অতি বাস্তব সত্যিকারের অক্ষমতা অসহায়তা যেন একটা ফাঁকা অজুহাত। নিজের প্রশংসা-কীর্তন শুনতে নিজের সভায় যেতে পারে আর পদ্মাদের জন্ম এমন একটা শোকসভায় যেতে একটু বেপরোয়া হয়ে উঠতে সে সাহস পায়।

সভা করে মানুষ মিছেই তার সাহসের গুণ গেয়েছে!

এ বাঁধন আমি ছিঁড়বই, এ শিকল আমি কাটবই।

রেবতী মনে-মনে গজরায়। সারা দিন খাটে আর জোড়াতালি

গাছে আধপেটা খায়। কাক-ডাকা ভোরে জেগে দীপ-নেবানো আঁধার ঘরে বাড়ন্ত বয়সের ঘুমে নিঃসাড় হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত মনে-মনে গজরায়।

কিন্তু নিজের মনে-মনে হলেও এ ভাবে যে গজরায় তার সারা দিনের কথাবার্তা চালচলন কি আগের মত থাকতে পারে।

মেজাজ কি থাকতে পারে ভয়াদি রসে সর্ব্বদাই পাঁকের মত নরম!

আনমনা হয়ে থাকে। হঠাৎ রেগে যায়। কোমরে আঁচল জড়িয়ে কোঁদল করে—ভাবভঙ্গি শাপমন্যি সব কিছু যেন হয় বুড়ী নাদু পিসীর কোঁদল করার অবিকল নকল।

বড়ই একটা জরুরী ব্যাপারে মেছুনি রম্ভার এ বাড়ীতে আসা দরকার হয়েছিল। সেদিন হাট থেকে ফেরার পথে না-কথা সুদের হিসাবে শোল মাছটা ফেলে দিতে এসে রেবতীর রকম দেখে বম্ভা থ' বনে যায়।

আর বছর মরিয়া হয়ে এদের ডোবাটা জমা নিয়েছিল—চারা পোণা ছেড়ে দেখবে কি আছে কপালে। দীঘি-পুকুরে ছাড়া পোণায় বাড়ার হারকে লজ্জা দিয়েই যেন বড় হচ্ছিল ডোবায় ছাড়া রুই কাৎলা মিরগেলের চারা।

আজকালের মধ্যে জাল ফেলিয়ে বাড়ন্ত পোণার বাড়তি অংশটা ছেঁকে তুলে নিয়ে সদর বাজারে চালান দেবার কথা ভাবছিল।

এতটুকু ডোবায় তো এতগুলি রুই কাতলা মিরগেল বড় হতে পারে না। আরও কয়েক বার ছেঁকে তুলে নিতে হবে বাড়তি ছোট মাছ। লোকসান নেই, ছোট পোণায়ও বাজারে খুচরো দর ন' সিকে আড়াই টাকা সের!

হঠাৎ একদিন দেখা গিয়েছিল সব মাছ মরে গিয়ে ডোবার জলে ভাসছে!

নাঃ, কারো শত্রুতা নয়। কারো মাছ খাওয়ার উৎকট লোভও এর জন্য দায়ী নয়। এ রকম শত্রুতা করার মত শত্রু এক জনও নেই রম্ভার। মাছ খেতে না পেয়ে যে পাগল হয়েছে সে-ও ডোবার জলে মেরে ভাসিয়ে তোলা মাছ খাবে না।

চুপড়িতে শুধু ওই একটাই শোল মাছ ছিল। গালে হাত দিয়ে রম্ভা খানিকক্ষণ নিজের মায়ের সঙ্গে রেবতীর কোমর বেঁধে কোঁদল করা ছাখে।

মজার কোঁদল। ঘাটে যাবে বলে ঘটিটা হাতে নিয়ে রেবতী গিয়েছিল ঘাটে। ঘটিটা দরকার বলে নয়, শুধু মেজে আনবার জন্য।

গাঁয়ের মেয়েদের ওসব দরকারে ঘটি-ফটি লাগে না। বাঁশবনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ডোবার জলে সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়ে কাজ সারে।

মেয়ে গেছে ঘাটে।

বড় যেন দেরী করছে ঘাট সেরে ফিরতে।

রাজু ঘাটে গিয়ে দেখতে পায় উপুড়-করা ঘটিটা জলে ভাসছে। বাঁশবনটা পাক দিয়ে খুঁজে আসে—রেবতী নেই। এমন কিছু ঘন বাঁশবন নয় যে দিন-দুপুরে অতবড় একটা ধাড়ী মেয়ে চোখে পড়বে না!

কপাল চাপড়ে নারকেল গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরী করা ঘাটে রাজু বসে পড়েছিল।

পিছন থেকে রেবতী এসে জলে নামতে যেতেই শক্ত করে চেপে ধরেছিল চুলের মুঠি।

'কোথা গেছিলি রে বজ্জাত?'

'আমবাগানে গেছলুম। বাঁশবনে বড্ড মশা—দু'দণ্ডে পা ফুলিয়ে দেয়। চুল ছেড়ে দে—ছাড় বলছি চুল!'

রাজু তার চুল ছেড়ে দিয়েছিল। তারও কি জানতে বাকী আছে বাঁশবনে কিছুক্ষণের মধ্যে কত লাখ মশা দল বেঁধে তেড়ে এসে কামড়ায়।

ঘাটে তখন আর কিছু বলেনি রেবতী। ঘরে ফিরে হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে মার সঙ্গে কোঁদল জুড়েছে।

গালে চড় পড়ে। পিঠে কিল পড়ে। চুল মুঠো করে ধরে তাকে কাবু করার চেষ্টা হয়।

তবু মেয়ে আকাশ ফাটিয়ে গর্জ্জে উঠে উঠে বলে তার যেখানে খুসী সে যাবে, যা খুসী তাই করবে, সবাই তারা চুলোয় যাক।

ক্ষেপেই গেছে মেয়েটা। অগত্যা বাড়ীর মানুষকে রণে ভঙ্গ দিয়ে তাকে নিজের মনে গজরাতে দিতে হয়।

চারুর হাতে শোল মাছটা দিয়ে রাজুকে আড়ালে ডেকে রম্ভা বলে, মেয়াকে কুথাও পাঠাতে পার না?

তার ভাব দেখে আর কথা শুনে রাজু ভড়কে যায়।

: কুথা পাঠাব মেয়েকে?

: দূরে কোন আপনজনার বাড়ী পাঠাবে। পাঠিয়ে দিলে ভাল করতে দিদি।

বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে রাজুর।

: কি বলছ একটু ভেঙ্গে বল না ব'ছা?

রম্ভা মাথা নাড়ে।

: ভেঙ্গে বলতে পারব না। বাবু তোমার মেয়েটিকে চায়। প্রথমে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভজিয়ে দেখবে, তার পর জোর খাটাবে। ছুঁড়িটাকে ভাগিয়ে দাও কোথাও।

: তুমি জানলে কি করে?

: তা জানতে চেওনি বাবা, ওসব শুনতে চেওনি। হাবাগোবা নাকি গো তোমরা সবাই? পেটে বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নাই! বাবুর নজরে পড়েছে মেয়াটা টেরও পাওনি?

রম্ভা চলে যাওয়ার পর আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হতভম্ব রাজুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় ভীমের সঙ্গে রম্ভার ঘনিষ্ঠতার কথা। কথাটা সবাই জানে।

রাজু চমকে ওঠে।

কে জানে রেবতীর মন ভাঙ্গাবার জন্য প্রসন্ন রম্ভাকেই কাজে লাগিয়েছে কি না। মেয়েটার সর্ব্বনাশ করতে চায় না বলে আকারে-ইঙ্গিতে বাঁচাবার উপায় জানিয়ে দিয়ে গেল!

অথবা হয়তো তাহাদের অগোচরে ইতিমধ্যেই অন্য ভাবে সুরু হয়ে গেছে রেবতীর মন ভাঙ্গানোর চেষ্টা, তারই ফলে এমন খাপছাড়া চাল-চলন হয়েছে মেয়ের, এমন মেজাজ হয়েছে। কথায়-কথায় তেজ দেখাচ্ছে আর যেখানে খুসী যাওয়ার আর যা খুসী করার কথা বলছে!

তাড়াহুড়ো করে রেবতীকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চিঁড়ে বিক্রীর কয়েকটা টাকাও সঙ্গে দিতে হয় খাই-খরচের জন্ত।

মামার বাড়ী ভিন্ গাঁয়ে।

ভিন্ন এক জমিদার গোলোকের এলাকায়। গোলোকের বয়স সত্তর পুরে এল, রাশভারি রকমের ধার্মিক বলে সে শেষ বয়সে চারিদিকে খুব নাম কিনেছে।

কিন্তু হায় রে, রেবতীর ভিন্ন জেলায় ভিন্ন জমিদারের ধর্মরাজ্যে মামা-বাড়ীতে পালিয়ে এসে রেহাই পাওয়ার আশা!

যে খবরের কাগজ তাকে খ্যাতি দিয়েছিল সেখানা এখানেও কয়েক কপি বিক্রী হয়। কিন্তু মাস খানেকের পুরানো একটা খবরের স্মৃতির সূত্র ধরে রেবতীকে কেউ আবিষ্কার করে না। তার মামা-মামীই রেবতীর নাম এক রকম প্রচার করেছে, ভুলে-যাওয়া খবরটাও আবার অনেকের মনে পড়িয়ে দেয়।

বড়ই গল্পে-মানুষ গোবর্দ্ধন আর গিরি।

পুরুষমহলে মেয়েমহলে দু'জনে তারা কত মানুষের নামে বানিয়ে বানিয়ে কত গল্পই যে শোনায়! সত্য ঘটনার ভিত্তি পেলে তো কথাই নেই।

অদ্বৈতের বাড়ীতে গিয়ে গোবর্দ্ধনকে সাপে কামড়ানো আর বিষ চুষে নিতে গিয়ে গিরির মুখ ফুলে ঢোল হয়ে মরার দশা হওয়ার গল্প আজও মানুষকে শোনাতে তারা ব্যাকুল, কিন্তু কেউ শুনতে চায় না বলেই হয়েছে মুস্কিল।

এক কাহিনী কত বার শোনার ধৈর্য্য থাকে মানুষের? সুরু করলেই জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি সব, তুমিই তো বললে সেদিন। খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে বটে। তা, বিপদ কি এক দিকে এক ভাবেই শুধু আসে? সেদিন কি যে কাণ্ড হল—

কিন্তু রেবতীর কাহিনীটা নতুন, রেবতী সশরীরে গ্রামে এসে হাজির হওয়ায় কাহিনীটা জোরদার হয়েছে। লোকে আগ্রহের সঙ্গে তার কাহিনী শুনতেও চায়, তাকে স্বচক্ষে দেখতেও চায়। এখানে এসেও তাই দেখতে দেখতে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে রেবতীর।

[ক্রমশঃ।

ঘূর্ণাবর্ত্ত

বিভা মুখোপাধ্যায়

তার পর হঠাৎ কি করে যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বিচিত্র এই পৃথিবী! বিচিত্র মানুষের মন! এক জন যখন কাঁদে, আর এক জন ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস। যে আঘাত পায়, সে হতভাগ্য। কিন্তু ইলা ভাবে—যে আঘাত করে, সে বুঝি আরও বেশী হতভাগ্য।

কথা বলতে বলতে অণিমা মাঝে মাঝে হঠাৎ কেমন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে যায়। আর পর-মুহূর্ত্তেই নিজেকে সচেতন করে নিয়ে হেসে বলে—"ইস্কুলে চাকরি নিলে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিনগুলো বেশ কেটে যায়।"

"হাঁ। অন্তত ঠকবার ভয় থাকে না। ওরা যখন হাসে, সত্যি হাসে, কান্না না পেলে ওদের চোখে জল পড়ে না কোন দিন।" —হাসতে গিয়ে ইলার চোখের কোণে জল দেখা দেয়। গলার স্বর ভারি হয়ে ওঠে।

অণিমা মুখ নীচু করে, কি ভাবে!

শ্যামবাজারের মোড় ছাড়িয়ে ভূপেন বোস এভিনিউ-এর মাঝামাঝি ছোট একখানা বাড়ী। তারই ওপরের দু'খানা ঘর নিয়ে সুবিমল সেন থাকেন। বাসা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। থাকেন তিনি একাই। আভ্যন্তরীণ সব-কিছু চালাবার ভার গোকুলের উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটে। গোকুল সে বাসার কর্ত্তাইও বটে, অর্থ্যাৎ পাচক ও ভৃত্য দুই-ই। সময় সময় প্রভুর উপর প্রভুত্ব করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। দাদাবাবু বলে ডাকলেও বয়সে সুবিমল গোকুলের চেয়ে অনেক ছোট।

আসবাব বলতে ঘরে একখানা খাট, কয়েকটি আলমারী, একটি টেবিল ও তিনখানি চেয়ার। খাটের কাছেই একটা টিপয়। আলমারীগুলো বইয়ে ভর্ত্তি। ঘরের মাঝখানে টেবিলটা ও তার পাশে চেয়ার তিনখানা সাজানো। সাজানো অর্থে সুবিন্যস্ত নয়, বরং ঘরখানি আগাগোড়া অগোছালই বলা চলে। বইগুলো ইতস্তত ছড়ানো। দিনের বেশী ভাগ সময় প্রফেসার সেনের বাইরে-বাইরেই কাটে; হয় কলেজ না-হয় লাইব্রেরীতে। বাকী যে কয়েক ঘণ্টা বাসায় থাকেন, তার ভিতরেও অপচয় করবার মত অবসরটুকু কাটে বিশ্রামে। তার বাইরে অবসর বলতে কিছু নেই তাঁর। রাত্রি-দিনের সঙ্গী ও অবলম্বন শুধু রাশি রাশি বই।

সেদিন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ডক্টর সেন একগাদা বই বগলে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকলেন ঘরে। টেবিলের উপর বইগুলো সশব্দে ফেলে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলেন বিছানায়। সুইচ টিপে আলোটা জ্বালবার মত ধৈর্য্যও হয়তো ছিল না তখন।

গোকুল ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দিতেই বলে উঠলেন—"থাক্ গোকুল! আলো আর এখন জ্বালতে হবে না! তার চেয়ে বরং এক কাপ চা করে আন্।"

নিষেধ সত্ত্বেও গোকুল নিরস্ত না হয়ে, ধীর স্বরে জবাব দিল,—"পত্তর আছে যে একখানা।"

"পত্তর!"

"হাঁ। ডাক-পিওন দিয়ে গিয়েছে।"

পত্তর কোথা থেকে হঠাৎ এলো ঠিক করতে না পেরে সুবিমল-বাবু একটু হেসে বলে উঠলেন—"তাই নাকি? তাহলে তো আলো জ্বালতেই হবে গোকুল! দাও দেখি, কোন্ রাজ্যের পত্তর এলো।"

রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজানু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফবয়ের
ফেনার আবরণে
ই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার
বীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয় সাবান মেখে
স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।
লাইফ্‌বয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার
বীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন
আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
50 BG

"তবেই তো!"—গোকুল টেবিলের উপর থেকে একখানা নীল খাম এনে তাঁর হাতে দিয়ে চলে গেল।

খামের উপর লেখাটা অচেনা মনে হলেও, মেয়েলী হাতের লেখা সেটুকু বুঝতে সুবিমলের বিলম্ব হলো না। খামখানা ছিঁড়ে প্রথমেই দেখলেন লেখকের নাম। লেখক নন, লেখিকা—ইলা রায়।

ইলা রায়! হঠাৎ ইলা রায়ের চিঠি তিনি প্রত্যাশা করেননি কোন দিনও। অল্প দিনের মধ্যে ইলার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও, সে যে তাকে চিঠি লিখবে এ কথা তিনি কোন দিন ভাবেননি। তা ছাড়া প্রায় দীর্ঘ দেড় বছর ইলার কোন খবরই জানেন না তিনি। মাঝে একদিন রমা মজুমদার এসেছিল। সেদিন ইলার খবর জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে থাকলেও, তিনি অকারণ সংকোচে সে প্রসঙ্গ তুলতে পারেননি।

ইলা লিখেছে যে কোন ইস্কুলে তার একটা কাজের খোঁজ করতে।

সুবিমল ভাল ভাবেই জানে, ইলা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তবুও তার আজ হঠাৎ চাকরীর প্রয়োজন হয়ে পড়লো কেন, সে কথা সুবিমল ভাবতে পারে না। হয়তো দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব-বাংলার হিন্দুদের যে পরিণতি ঘটেছে, তার হাত থেকে ইলাও নিষ্কৃতি পায়নি। তাই আজ সে চাকরী খুঁজতে বাধ্য হয়েছে এম-এ পরীক্ষার অপেক্ষায় না থেকে।

বিস্তীর্ণ এই বাংলা দেশ। মাঠ, বন, নদী, ক্ষেত—এর কোথায়ও ছিল না দারিদ্র্যের চিহ্ন। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও বাঙ্গালী অগ্রণী হয়ে এগিয়ে চলেছিল। বাঙ্গালীর বুকেই জেগে উঠলো স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম আহ্বান, দলে দলে বাংলার তরুণ-তরুণী এগিয়ে গেল ফাঁসির মঞ্চে। বাঙ্গালীর আত্মবলিদান সারা ভারতে জাগিয়ে তুললো প্রাণের সাড়া। অগ্নিমন্ত্রের সাধনা শেষ হলো, শত শত তরুণ প্রাণের পূর্ণাহুতি দিয়ে। জাতি স্বাধীন হলো। স্বপ্নলোকের কল্পনা এলো বাস্তবের রূপ নিয়ে। সারা ভারতে ধ্বনিত হলো আনন্দের মুখর কলরব। কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত বাঙ্গালীর হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল প্রচণ্ড আঘাতে দুঃস্বপ্নের আলোড়নে। বাংলা বিভক্ত হলো, লক্ষ লক্ষ নর-নারী হলো সর্ব্বহারা। উদ্বাস্তু লক্ষীছাড়ার দল খুঁজে বেড়াতে লাগলো তাদের জন্মভূমি যার জন্যে বুকের রক্ত নিঙড়ে দিয়েছে।—ইলারাও বাদ যায়নি।

হঠাৎ সুবিমলের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। গোকুলকে ডেকে দরজা খুলে দিতে বলার আগেই ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালো শেফালি গুপ্তা।

শেফালি সুবিমলের বন্ধু বীরেন দস্তিদারের ছাত্রী। বীরেন দস্তিদার সুবিমলের সঙ্গেই এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। বীরেন ছিল বাংলার ছাত্র।

সুবিমল উঠে বসে। শেফালির দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে—"বসুন।"

শেফালি মুচকে একটু হেসে জিজ্ঞেস করে, "ভাল আছেন তো?"

"হাঁ, ভালই বলা চলে। আলাপ করবো পরে। একটু চা খান।"—

বিছানা থেকে উঠে গোকুলকে ডাকতেই শেফালি বাধা দিয়ে বলে উঠলো—"না, চা এখন থাক্। এইমাত্র চা খেয়ে আসছি।"

"চাএ অরুচি ধরে গেল নাকি? আমার তো ধারণা, মিশন নিয়ে যারা দিন-রাত ঘুরে বেড়ায়, চা আর সিগারেটে তাদের ক্লান্তি আসে না কোন দিন। অবশ্য মেয়েদের বেলায় সিগারেটের কথা ভাবতে পারি না।"—সুবিমল হাসে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সিগারেট ধরায়।

"হাঁ, অন্তত বাঙ্গালী মেয়েদের বেলায়।" হেসে শেফালি জবাব দেয়।

এক মিনিট দু'জনেই নীরবে কি ভাবে! সুবিমল জিজ্ঞেস করে—"হঠাৎ বিনা নোটিশে যে? খবর কি?"

"উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই।"—শেফালি উত্তর দেয়।

"হাঁ, বিনা উদ্দেশ্যে দেখা পাবার সৌভাগ্য তো কোন দিন হয় না।"

"তাই নাকি?"—শেফালি হাসে। একটু থেমে আবার বলে—"আমরা একটা কাগজ বের করবো, ভাবছি।"

"উত্তম প্রস্তাব! কাগজই তো পার্টির বাহন। কি নাম দেবেন আপনাদের কাগজের?"—সুবিমল জিজ্ঞেস করে।

"নামটা তো আর মুখ্য নয়—মুখ্য হচ্ছে টাকা।"

"ও, তাই বুঝি আমাকে ভাল মক্কেল ঠাউরেছেন?"

"হাঁ, অন্তত এইটুকু ধারণা আছে যে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে যা চাঁদা পেয়েছি, আপনার কাছে তার চেয়ে কম পাব না।"—জোরের সঙ্গে শেফালি বলে।

"তাই নাকি?"—সুবিমল হাসে।

"হাঁ, সেই সঙ্গে আর একটা কাজও কিন্তু করে দিতে হবে।" অনুনয়ের সুরে কথাটা বলে শেফালি ইতস্তত করে।

"কাজটা কি, শুনি?"—জিজ্ঞাসু নেত্রে সুবিমল শেফালির দিকে চেয়ে আবার একটু হাসলো।

"কয়েক জন ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা দরকার। শেয়ালদা ষ্টেশনে বাস্তুহারাদের সেবা করার জন্যে।"—

হঠাৎ কথা বলতে বলতে শেফালির দৃষ্টি পড়ে গেল বিছানার উপর খোলা নীল খামখানার দিকে। হাতের লেখা ওর নিতান্ত চেনা। ইলার চিঠি। ইলার সঙ্গে ডক্টর সেনের পত্র-বিনিময়! শেফালি হঠাৎ যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক্ লেগে কেমন ঝিনঝিনিয়ে ওঠে।

সুবিমল বলছিল—"হাঁ, পার্টি করার চেয়ে সেবা করা ঢের ভাল। এবার আপনি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল হয়ে উঠবেন দেখছি।"

শেফালি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

"কি! এরই মধ্যে উঠলেন যে?"—বিস্ময়ের সঙ্গে সুবিমল প্রশ্ন করে।

"শরীরটা ভাল নেই।"

"সারা দিন রোদ্দুরে ঘুরেছেন বুঝি? এত বেশী ঘোরাঘুরি করলে"—

সুবিমলের কথা শেষ না হতেই, শেফালি জবাব দেয়—"হাঁ, আজ চলি। আর একদিন আসবো।"

"আসবেন। কিন্তু হঠাৎ কি হ'লো, ঠিক বুঝলাম না তো! সানষ্ট্রোক!"—সুবিমল শেফালির গাম্ভীর্য্যকে খানিকটা হালকা করে দিতে চায়। শেফালির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তার সত্যি কেমন খটকা লাগলো। কিন্তু কারণটা বুঝে উঠতে পারলো না। বেশী

পীড়াপীড়ি করা সুবিমলের স্বভাব নয়। তাই এবার শুধু ভদ্রতার খাতিরেই বললেন—"আসবেন আর একদিন।"

"আসতে কি সত্যি বলছেন?"—কথাটা যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেফালির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে, সে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সুবিমল কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। শেফালির এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের কারণটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

গোকুল ঘরে ঢুকে বলে ওঠে—"কি ভাবতেছ, দাদাবাবু? চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল!"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সুবিমল চায়ের পেয়ালাটি হাতে তুলে নেয়। গোকুলের চোখ থেকে অন্যমনস্কতাটুকু আড়াল করবার জন্যে একটু হেসে বলে—"ঠাণ্ডা চা খেলে গায়ের রঙ ফরসা হয়।"

"হেঁ—হেঁ—" গোকুল হাসতে হাসতে রান্নাঘরের দিকে চললো।

দিনের পর দিন, দলে দলে উদ্বাস্তু সর্ব্বহারার দল রাজধানীতে আসতে শুরু করেছে। মহানগরীর বুকে জমে উঠেছে ভিড়। এদের সীমা-সংখ্যা নেই। ষ্টেশনের আশে-পাশে কোথাও তিলধারণের স্থান নেই। ফুটপাথে, ময়দানে, পার্কে—চারিদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে দলে দলে রবাহূত কাঙালীদের মত। মাঝে-মাঝে লরী বোঝাই দিয়ে চালানী হাঁস-মুরগীর মত মানুষগুলোকে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে কোন না কোন আশ্রয়-শিবিরে। তবুও পথে পথে এরা কুণ্ডলী পাকিয়ে জটলা করে। জীর্ণ বস্ত্রে কায়ক্লেশে কঙ্কালসার দেহের আবরু রক্ষা ক'রে মেয়েগুলো জড়সড় হয়ে বসে থাকে। পুরুষগুলো খাবার সন্ধানে অলি-গলি ঘুরে মরে। সঙ্গে মালপত্র বলতে দু'-একখানা থালা-বাটি, ফুটো ভাঙা বালতি, খান কয়েক ছেঁড়া কাঁথা না-হয় কম্বল। গৃহস্থালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে তার চিতাভস্মটুকু হাতে নিয়ে জিহ্বিল্লা ফকিরের মত আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়।

সরকারি ব্যবস্থা ছাড়াও, রকমারি সেবাসঙ্ঘ আত্মনিয়োগ করেছে এদের সেবায়। কাপড়, চাপাটি রুটি, গুড়, পয়সা দিয়ে এদের সাহায্য করে। ধনী ব্যবসায়ীরা লাল শালুতে সাদা কালির বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র খুলে দিয়েছেন এদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে। ধর্ম্মের সঙ্গে আত্মপ্রচারের অভিনব সুযোগ! মনের কোণে চোরাকারবারের কাটা দাগে একটু মলম যে লাগে না তা নয়! আবার মাঝে মাঝে কলঙ্কও রটে। অভাবের সুযোগ নিয়ে ভদ্রঘরের মেয়েদের সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

আগে থেকে যারা সহরে মাথা গুঁজবার ঠাই করে নিয়েছে, তাদের ঘরে ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে আত্মীয়-স্বজন। রেশানের চালে নিজেদেরই চলে না, তার উপর এই আত্মীয়-স্বজনের ভিড়! তারাও হাঁপিয়ে ওঠে।

সহরের পল্লীতে পল্লীতে দেখা দিয়েছে কলেরা-বসন্ত। আশ্রয়-শিবিরগুলো হয়ে উঠেছে রোগের সূতিকাগার। পেটে যাদের ভাত নেই, তাদের ইনজেকশান আর টীকে দিয়ে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়! বারোয়ারী ব্যবস্থা সেখানে অচল হয়ে ওঠে। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারে! লোকগুলো যেন ক্ষেপা কুকুরের মত অস্থির হয়ে উঠেছে।

ইলারা যে পাড়ায় থাকে, সেখানেও সুরু হয়েছে মহামারীর প্রকোপ। মাঝে মাঝে এ-পাশের না-হয় ও-পাশের থমথমে আলোচনার ভিতর দিয়ে রোগের খবর ইলার কানে এসে পৌঁছায়।

সেদিন সন্ধ্যার পর ভাতের ফেন গড়াতে গড়াতে ইলা আনমনে এ-সব কথাই ভাবছিল। নিজেদের অবস্থার পরিণতির কথা ভাবতে ইলা আজ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। অলক্ষ্যে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ বাবার গলার শব্দ পেয়ে তার সম্বিৎ যেন ফিরে আসে। কণ্ঠস্বরে কেমন একটা আর্ত্ততা! ইলা চমকে ওঠে।

"মিন্টু, মিন্টু! তোর মা কোথায়?"—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দীনেশ বাবু এসে বাড়ীতে ঢুকলেন।

"কি বাবা?"—ইলা হাত ধুয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

দীনেশ বাবুর মুখে বিষাদের কালো ছায়া। ব্যাকুল ভাবে তিনি বলে উঠলেন—"তোর মা কোথায়! ইলা?"

"মা ও-ঘরে। শরীরটা ভাল নেই, তাই শুয়ে আছে। কিন্তু তুমি হাঁফাচ্ছ কেন, বাবা? কি হয়েছে?"—ইলা ব্যস্ত হয়ে বাবার কাছে এগিয়ে আসে।

দীনেশ বাবু ক্ষণকাল মুখ নীচু করে ইতস্তত করেন। কি যেন ভাবেন।

ইলা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বাপের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে চাপা-গলায় প্রশ্ন করে—"কোন খারাপ খবর পেয়েছ কি বাবা? মাকে ডাকবো?"

এক মিনিট ইলার মুখপানে নীরবে তাকিয়ে থেকে ভারী-গলায় দীনেশ বাবু বলেন—"জানিস্ ইলা, ওখানে ভীষণ খুনোখুনি আরম্ভ হয়েছে। আজ যে ঢাকা এক্সপ্রেস শেয়ালদায় এসে পৌঁছেছে, তাতে কোন লোক-জন আসেনি। এসেছে কতকগুলো হাত-পা আর কাটা মুণ্ড! যে কয়েক জন বেঁচে আছে, তারা প্রায় সকলেই আহত। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টগুলো রক্তে ভেসে গিয়েছে। বরিশাল সহর ও আশে-পাশে গ্রামগুলো কি অবস্থায় আছে কে জানে?"—পলকহীন ভাবে দীনেশ বাবু তাকিয়ে থাকেন।

"বড় ঠাকুরমা, রাণু পিসী, রাঙা দিদিমা, কানুদা—ওদের খবর কিছু পেয়েছ, বাবা?"—বিহ্বল ভাবে ইলা জিজ্ঞেস করে।

"না।"—দীনেশ বাবু শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা দিয়ে কম্বলখানা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর ইলা বলে ওঠে—"বাবা, চল না একবার ষ্টেশনে যাই। যদি আত্মীয়-স্বজন, চেনা-জানা কেউ এসে থাকে নিয়ে আসবো।"

"ঠিক বলেছিস্ মা! যাবি তাই?"—মেয়ের প্রস্তাবে হয়তো দীনেশ বাবু একটু আশ্বস্তই হলেন।

"হাঁ, চল না। যাই।"—ইলা অনুনয়ের সুরে বলে।

"চল, তোর মাকে বলবি না?"

"থাক্, এখন বলে কাজ নেই। মায়ের পিসীমারা তো এখনও সেখানেই আছেন, মা হয়তো শুনে কান্নাকাটি সুরু করবে।"

"—তা করবে।"—দীনেশ বাবু একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে বলেন—"তুই কাপড়টা বদলে নে। আমি ততক্ষণ হাত-মুখটা একটু ধুয়ে নি।"

"চা খাবে, বাবা?"—ইলা জিজ্ঞেস করে।

"না মা, চা আর এখন খাবো না।"—মাথায় হাত দিয়ে দীনেশ বাবু পা দুটোকে একবার কম্বলের উপর ছড়িয়ে দিলেন।

কাপড় বদলাতে ইলার আজ পাঁচ মিনিট সময়ও লাগলো না। র‍্যাপারখানা গায়ে জড়াতে জড়াতে ইলা সামনে এসে দাঁড়াতেই দীনেশ বাবু লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন। আলোকে দরজাটা বন্ধ করতে বলে পিতা ও পুত্রী দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ইলারা এসে পড়ে শেয়ালদা ষ্টেশনে। এর আগে ইলা বহু বার এসেছে এই ষ্টেশনটিতে। বাড়ী যাবার রাস্তা ছিল এটা। কিন্তু ষ্টেশনের সে রূপ আর নাই। কয়েক পা এগোতেই বাধা দিল ভলাণ্টিয়ার দল। সুশৃঙ্খল ভাবে লাইন বেঁধে যেতে হবে। বিভিন্ন সেবা-সমিতির তরফ থেকে অনেক জায়গায় খোলা হয়েছে ছোট ছোট কেন্দ্র। ভলাণ্টিয়াররা খবরদারি করছে, কেউ কেউ বা নাম-ধাম-ঠিকানা লিখে নেয়। রিফিউজী অফিসে ওদের খবরাখবর লিখিয়ে নাম রেজেষ্ট্রারী করা হচ্ছে। সেখান থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে ওরা কায়েমি হবে ভারত মুলুকে।

উদ্বাস্তু লক্ষ্মীছাড়ার দল উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে সবারই মুখ পানে চায়। হয়তো ভাবে, এই বিপদের মাঝখানে কেউ আসবে ওদের ত্রাণকর্ত্তা হয়ে। চোখে-মুখে শংকিত দৃষ্টি! দুশ্চিন্তা ও ভয়ে ওদের কণ্ঠনালী যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!

ঢাকা এক্সপ্রেসের খবরটা জানবার জন্যে দীনেশ বাবু এর-ওর কাছে জিজ্ঞেস করেন। দুঃসংবাদ অনেকেই জানে, কিন্তু কেউ সঠিক খবর দিতে পারে না। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদের ফাঁকে-ফাঁকে দীনেশ বাবু উৎসুক দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়ান চেনা মুখ, মনে হয়, কত চেনা-জানা মুখের ছায়া ওদের চেহারায় আঁকা। কিন্তু ঠিক যেন ধরতে পারেন না। মুখে কথা ফোটে না। তিনি আগে আগে চলেন, ইলা হতভম্ব হয়ে চলে তাঁর পিছু-পিছু।

এক হাত, দেড় হাত জায়গার ব্যবধানে গা-ঘেঁসাঘেঁসি বসে আছে এক একটি পরিবার। পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, শীর্ণ দেহ। মুখে হতাশার উলঙ্গ ছাপ। এরা প্রায় সকলেই ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারের ছেলে-মেয়ে। কিন্তু চেহারা দেখে তাদের চিনবার উপায় নাই। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে, বলতে ভয় পায়। বিপদের মাঝখানে পড়ে কেউ কেউ যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়নি, এমন কথা বলা চলে না।

এনকোয়ারি-ঘরের পাশে ইলাকে রেখে দীনেশ বাবু গেলেন ষ্টেশনের ভিতর তেরো নম্বর ডাউন এক্সপ্রেসের খবর নিতে।

প্রায় দু'হাজার লোক ষ্টেশনে পড়ে। এদের তখনও আশ্রয়-শিবিরে পাঠান হয়নি। অবাক্ বিস্ময়ে ইলা চেয়ে থাকে লোকগুলোর দিকে, একদিন হয়তো এদের ছিল গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুরে মাছ, ক্ষেতে ফসল, বাড়ীঘর সব। কোন-কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু আজ পথের ভিখারী। সব থাকতেও নেই কিছু। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ওরা পেয়েছে স্বাধীনতা, কিন্তু মানুষের মাঝখানে মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকারটুকু নিঃশেষে হারিয়েছে। কত বিনিদ্র রাত্রি হয়তো এরা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে বেড়িয়েছে। শিকারীর বন্দুকে তাড়া-খাওয়া শেয়াল-কুকুরের মত বনে-জঙ্গলে ঘুরেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। শিশু-সন্তানগুলোকে বুকের ভিতর লুকিয়ে সাত গঙ্গা পার হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই সান্‌-বাঁধানো পথে।

ভাবতে ইলার মাথা ঝিম্‌-ঝিম্ করে ওঠে। ছোট ছেলে-মেয়েগুলো পেটের জ্বালায় চীৎকার করে। অসহায় বাপ-মা ক্লান্তিতে ঝিমুচ্ছে। নিজেকে ইলা সামলে রাখতে পারে না। ও-পাশের রেলিংটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দীনেশ বাবু পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন। আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান করে বেড়ান, মাঝে মাঝে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করেন, ইলার ভয় হয়, হয়তো বা পাগল হয়ে যাবেন!

দীনেশ বাবুকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ইলা এগিয়ে যায়।

ছ'নম্বর প্লাটফর্ম্মের সামনে কয়েকটি ছেলে জটলা করে। ছাত্র বলেই মনে হয়। তারা দুধ চিনি আর শুক্‌নো চিঁড়ে দিচ্ছে রেফিউজিদের। ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন ডক্টর সুবিমল সেন। নির্দ্দেশ মত ছেলেরা শিশুদের পাত্রে খানিকটা দুধ ঢেলে দেয়। সামান্য দুধটুকু পেয়ে তারা অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে ওঠে।

মুহূর্ত্তে ইলার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার পায়ের গতি শ্লথ হয়ে আসে, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ইলা চেয়ে থাকে ডক্টর সেনের দিকে। একবার মনে হলো, ডক্টর সেনের দিকে এগিয়ে যায়। আবার পরক্ষণেই কি ভেবে অন্য দিকে ফিরলো। দু'-এক পা এগিয়ে গিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে হঠাৎ কি ভেবে সে আবার ফিরে চললো ছ'নম্বর প্লাটফর্ম্মের দিকে।

"ডক্টর সেন!"—আকস্মিক আড়ষ্টতাটুকু কাটিয়ে নিয়ে ইলা নমস্কার ক'রে সামনে দাঁড়ায়।

ডাক শুনে সুবিমল চমকে ইলার দিকে তাকান।

"আপনি! এখানে?"—কেমন যেন একটা অস্বস্তি তাঁর চোখে-মুখে ফুটে ওঠে।

"এমনি দেখতে এলাম। বাবা সঙ্গে আছেন—" শান্ত ভাবে ইলা জবাব দেয়। নিজের জবাবটা নিজের কাছেই বেসুরো মনে হয়। এ কি দর্শনীয় কিছু যে সে দেখতে এসেছে? ইলা কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। অকারণ লজ্জায় সে লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু সুবিমলের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি ছাত্রদের নির্দ্দেশ দিয়ে একটু হেসে বলেন—"আপনার চিঠি পেয়েছি। আসুন না একদিন আমার ওখানে। যেটুকু পারি আপনার জন্য নিশ্চয়ই করবো।"

"তা জানি।"—সলজ্জ হাসির সঙ্গে ইলা বলে। "আচ্ছা, আজ আপনি খুব ব্যস্ত। দেখা করবো একদিন।"—ইলা হাত তুলে নমস্কার করে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে ইলা হন্‌-হন্ করে এগিয়ে চলে পিতার সন্ধানে।

"শুনুন।"—পিছন থেকে সুবিমলের কণ্ঠস্বর কানে আসে।

ইলা ফিরে আসে। জিজ্ঞাসু নেত্রে সুবিমলের মুখ পানে চায়—"ডাকছেন?"

"হ্যাঁ, আপনার বান্ধবী শেফালি গুপ্তা, সেদিন আমার ওখানে এসেছিলেন চাঁদা চাইতে। ওদের পার্টি থেকে নাকি পত্রিকা বের

করবেন। কিন্তু কথা শেষ না হতেই হঠাৎ চলে গেলেন। কি হোল বুঝলাম না। আজ পর্য্যন্ত আর এলেনও না। জানেন তার খবর?"—সুবিমল প্রশ্ন করেন।

"শেফালি আপনার ওখানে প্রায়ই যায় বুঝি?"—নিজের অজ্ঞাতেই কথাটা যেন ইলার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে।

"না, না। প্রায়ই যান না তো। আগে একদিন গিয়েছিলেন, আর সেদিন গিয়েছিলেন চাঁদা চাইতে।"—সুবিমল জবাব দেয়।

"না, ওর খবর কিছুই জানি না আমি। আচ্ছা, একদিন যাব আপনার ওখানে"—হাত তুলে ইলা আবার নমস্কার করে।

হঠাৎ বাবাকে দেখতে পেয়ে ইলা বেরিয়ে আসে ষ্টেশন থেকে।

সেদিন শুধু নিঃশব্দে কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ আর চোখের জল পড়ে না। চোখের সবটুকু জল নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে। সাত-পুরুষের ভিটে ছেড়ে আসতে দীনেশ বাবু যতখানি বেদনার্ত্ত হয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশী কাতর হয়ে পড়লেন পরিত্যক্ত আত্মীয়-স্বজনের কোন খবর না পেয়ে। ষ্টেশনে লোকমুখে দেশের যে খবর পেয়েছিলেন তা থেকে সহজেই তিনি অনুমান করেছিলেন আকস্মিক বিপ্লবে পূর্ব্ববঙ্গে নিদারুণ বিপর্য্যয় ঘটে গিয়েছে।

প্রতিদিনের সংবাদপত্রে কিছু-কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু লৌহ-যবনিকার অন্তরালে সত্যই যে কি ঘটেছে তার সঠিক খবর কারও কানে পৌঁছয় না। ইন্দিরা দেবীর শারীরিক অসুস্থতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই যেন হঠাৎ কেমন হতভম্ব হয়ে গেছেন। বাড়ীশুদ্ধ সকলেই প্রতিদিন রাণু পিসি, শোভনদা, ছোট মামা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের আগমন প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে থাকে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁদের কোন খবরই পাওয়া গেল না। দীনেশ বাবু পর-পর দু'খানা টেলিগ্রাম করেও কোন উত্তর পেলেন না। যত দিন যায়, তিনি যেন তত বেশী অস্থির হয়ে ওঠেন। বাবার মনের অবস্থা দেখে মাঝে মাঝে ইলার মনে বড় ভয় হয়। দেশ ছেড়ে চলে আসবার সময়ও ইলা পিতার অবস্থান্তর লক্ষ্য করেছিল; কিন্তু সেদিন যেটুকু সাহস ও উৎসাহ তাঁর ছিল আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। কয়েক দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। ইন্দিরা দেবীও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। দিন-রাত চোখের জল ফেলা ছাড়া মনের অন্য কোন অবলম্বনই যেন আর নেই। পিতা-মাতাকে নিয়ে ইলা মাঝে মাঝে বড় বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন উপায় সে ভেবে উঠতে পারে না। তার স্বচ্ছ মনের গতিও ক্রমে থম্‌থমে হয়ে আসে দুশ্চিন্তার ছায়ায়। দেশে চিঠি লিখে বা টেলিগ্রাম করে কোন ফল হয় না। ইলাও ভাবে, যাঁদের ছেড়ে এসেছে তাঁরা বেঁচে আছে কি না কে জানে? কল্যাণী, মেজদি ও বন্দনার কথাও তার মনে আতঙ্কের ছায়াপাত করে। ইলা অস্থির হয়ে ওঠে।

সংসার চালাবার ভার এখন ইলার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। দীনেশ বাবু টাকা-পয়সা সব তার হাতেই দিয়েছেন। ছোট ভাই-বোনদের পড়াশুনা, তার উপর দৈনন্দিন হাট-বাজার, রেশান—যা-কিছু দরকার ইলাকেই দেখতে হয়। টাকা যা অবশিষ্ট আছে, তাতে বড় জোর তিনটি সপ্তাহ কোন মতে চলবে; তার পর?… বাবাকে ইলা সঙ্কোচে সে কথা জানাতে পারে না। জানিয়েই বা কি হবে? দেশ থেকে এ অবস্থায় টাকা তুলে আনা যে একেবারেই অসম্ভব, ইলা তা ভাল ভাবেই জানে। এ সময় যে কোন একটা চাকরী পেলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারতো। রোজই মনে করে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে কোন না কোন একটা কাজের সন্ধান আসবে, কিন্তু কোথায়! চাকরির আশা ক্রমেই দুরাশা হয়ে ওঠে। সুবিমল বাবুর কাছে নিজের সম্ভ্রমের বাঁধ ভেঙেও সে চাকরির অনুরোধ জানিয়েছে। তাতেও কোন ফল হোল না। চেষ্টা তিনি নিশ্চয়ই করেছেন। কিন্তু দুঃসময়ে পোড়া সোল মাছও হাত থেকে ছুটে যায়!

কয়েক দিন থেকে ইলার মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে বাবা ও মায়ের মানসিক পরিবর্ত্তনে ও যেন কেমন অসহায় বোধ করছিল। সকালে উঠেই হঠাৎ রমাকে পেয়ে ওর মনটা অনেকখানি সজীব হয়ে উঠলো। রবিবার সকালে রমা এসে আতিথ্য গ্রহণ করলো ইলাদের বাসায়। তারও জীবনের গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। জীবনকে নিয়ে যে এত বিপন্ন হবে কোন দিন, সে কথা কোন দিন তারা ভাবতেও পারেনি।

সকাল সকাল রান্না-খাওয়া সেরে নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে। শীতের দুপুর। সারা গায়ে পর্য্যাপ্ত রৌদ্রের স্পর্শ যেন দীর্ঘদিনের আড়ষ্টতা কাটিয়ে দিয়ে মনটাকে জীবন্ত করে তোলে।

বিদেশী শাসনের অবসান হয়েছে। ইংরেজ চলে গেছে। দু'শো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। পরাধীনতা গেলেও তার স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি। ইংরেজ-শাসনের সাক্ষ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় প্রাসাদ, সরকারী ও সদাগরি অফিসের ইমারতগুলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতীয় কৃষ্টির পাশাপাশি যে সভ্যতা এদেশে আত্মবিস্তার করলো তার নিদর্শনস্বরূপ মৌন গীর্জ্জার উচ্চ চূড়াগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সত্যিকারের যে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা শুধু মাত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহৃদয়তায়। ভিক্টোরিয়া চলে গেছেন, ইংরেজ-শাসন অবলুপ্ত কিন্তু ভারতবাসীর মন থেকে ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি আজও মুছে যায়নি। তাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে চেয়ে মন শ্রদ্ধায় নত হয়।

স্মৃতিসৌধের আশে-পাশে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ছুটোছুটি করে। ও-পাশে লেকের ধারে ইতস্তত বসে তরুণ-তরুণীরা বিশ্রম্ভালাপ করে। কোথায় গাছের অন্তরালে আধো ছায়ায় ও আধো রৌদ্রে নিশ্চিন্ত শুয়ে ঘুমচ্ছে দিন-মজুররা।

হঠাৎ কয়েকটি তরুণীর কলকণ্ঠে চমকে উঠে রমা বলে—"দেখেছিস ইলা, বাসন্তীদি!"—

"ওরা হাত-ধরাধরি করে জলে নামছে কেন?"—ইলা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

রমা তার অনুমানটাকে সঠিক সিদ্ধান্তের জোর দিয়ে বলে—"ম্যাগনোলিয়া খেয়ে হাত ধুতে যাচ্ছেন বোধ হয়। একজন মেয়ে আর একজন পুরুষ হলে মনে করতাম ডুবে মরবার চেষ্টা করছে।"—

ইলা সজোরে রমার পিঠে একটা কিল দিয়ে বলে ওঠে—"মরণ নেই তোর!"

"মরবার আয়োজন হতে দেরীও নেই বিশেষ। তবে সেটা ক'রেছে গিয়ে, না লেকের জলে তা আমার চেয়ে বাবা-মাই ভাল জানেন।"

"তার মানে?"—ইলা বিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

"থাক ও-সব কথা, চল ও-পাশের বেঞ্চটায় গিয়ে বসি। ঐ কলোফাইলাম গাছটা আমার বড় ভাল লাগে—ওর সবুজ পাতা কোন দিন ম্লান হয় না।

দু'জনে লেকের ও-পাশের বেঞ্চটার দিকে এগিয়ে যায়। বাসন্তীদি সঙ্গের ছিপ্‌ছিপে মেয়েটিকে ধমকাচ্ছেন, হাত ধুতে গিয়ে সে শাড়ীর আঁচলটা ভিজিয়েছে জলে।

ইলা হেসে বলে—"মাষ্টারি করা অভ্যেস্ তো।—এই ধমকানোটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।"

"বাসন্তীদি' এখন আর মাষ্টারি করেন না তো। এ-জি-বি অফিসে চাকরি নিয়েছেন, জানিস্ না বুঝি?—" রমা জিজ্ঞেস করে।

"তাই নাকি? জানতাম না তো। বাসন্তীদির মত গোঁড়া মেয়েও তা হলে সংস্কারের বাঁধ কাটিয়ে উঠেছে!"—ইলা কৌতূহলের সঙ্গে রমার মুখ পানে চায়।

রমা ফিকে একটু হেসে বলে—"নেসেসিটি নোজ নো ল। প্রয়োজনের তাগিদ কোন বিধি-নিষেধের ধার ধারে না, ইলা!"

আমরা যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্‌সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রারী করে এলাম, আজও তো সেখান থেকে কোন খবর এলো না, রমা!"—ম্লান স্বরে ইলা বলে ওঠে।

"না, এখনও কোন খোঁজ-খবর পেলাম না।"—একটু থেমে আবার বলে—"তবে সেদিন সুবিমল বাবুর ওখানে গিয়েছিলাম, তুই বলেছিলি, একদিন তোকে নিয়ে যেতে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছিলো না বলেই গেলাম তোর কথা বলতে—"

"আমারও একদিন যেতে হবে। সেদিন—" কি বলতে গিয়ে ইলা থেমে যায়।

হাসিমুখে রমা বলে—"বেশ তো, যাবি একদিন। শুনলাম, তোর সঙ্গে নাকি দেখা হয়েছিল। তুই তো বলিসনি সে কথা।"

"বলবার অবসর দিলি কৈ?"—মিষ্টি হেসে ইলা জবাব দেয়।

"হাঁ, শেয়ালদা ষ্টেশনে তোদের দেখা হয়েছিল শুনলাম, তা ছাড়া তোর চিঠি, চাকরীর খোঁজ, লেখাপড়ির কথা অনেক কিছুই বললেন তিনি!"

"অনেক কিছু মানে?"—ইলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রমার মুখপানে চাইল।

"মানে আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান!"—রমার চোখে-মুখে একটা চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়।

মানুষের মাঝখানে মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকারটুকুও ওরা আজ হারিয়ে ফেলেছে। তাই ঝাঁকে-ঝাঁকে মরণোন্মুখ পতঙ্গের মত অন্ধকারের ভিতর ছুটে আসে আশার ক্ষীণ আলো দেখে। বাঁচবার আশায় দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুর মুখে।

সরকারী-বেসরকারী দয়া-দাক্ষিণ্যের ছিটে-ফোঁটা যেটুকু পাওয়া যায়, তার কতক হয় অপচয় কতকটা হয়তো কাজে লাগে। কিন্তু সর্বহারা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে সেই হিসেবের কড়ি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সাত-পুরুষের ভিটের আম কাঁটাল আর সজনে গাছের ছায়ায় ছায়ায় যে ছোট ছোট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তার বুক থেকে হঠাৎ উল্কার মত যারা ছিটকে পড়েছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে রেল-ষ্টেশন, ফুটপাথ ও পথের ধারে খলপা-বেড়ার চালা-ঘর আর বাটি-মাপা দু'মুঠো ভাত, দু'খানা চাপাটি, না-হয় দেড় ছটাক শুকনো চিঁড়ে আর ভেলিগুড়ের ডেলা শুধু অকিঞ্চিৎকর তাই নয়, পরিহাস বলেও মনে হয়।

সরকারী সাহায্যকেন্দ্র ছাড়া আরও অনেক সম্প্রদায় ও সমিতি ভাল-মন্দ নানা রকমের রিলিফ ক্যাম্প খুলেছে। সেবাব্রতের ফাঁকে-ফাঁকে ঠগবাজি ও রাহাজানিও যে হয় না, তা নয়। কখনও কখনও মিথ্যা আশ্রয়ের আশায় সেবাব্রতীদের হাতে সর্ব্বস্ব তুলে দিতে হয়। রিলিফ ক্যাম্প থেকে সুন্দরী যুবতীদের নিখোঁজের খবরও সংবাদ-পত্রের মারফতে কানে আসে।

শেয়ালদা ষ্টেশনে দুঃস্থদের সেবা করার উদ্দেশ্যে নিছক কর্ত্তব্যের খাতিরেই সুবিমল ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ভলাণ্টিয়ার কোর। অপরিচিত নতুন জায়গায় বিভ্রান্ত হয়ে যারা ছুটে আসে, তাদের পরিচর্য্যা করে কিছুটা তৃপ্ত হবার ইচ্ছে নিয়েই সুবিমল এগিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু দু'দিন যেতে-না-যেতেই তার চিন্তার মোড় ফিরলো বাস্তবের নির্মম সংঘাতে। সত্যি যারা ঘর ছেড়ে সম্ভ্রমের দায়ে ছুটে এসেছে, তাদের মুখপানে চেয়ে সুবিমল স্থির থাকতে পারেন না। মনে হয়, স্বাধীনতার উৎসব-প্রাঙ্গণে নবমী পূজার বলির মত এরা যেন যূপকাষ্ঠের আশে-পাশে দাঁড়িয়ে রক্তমাখা বেলপাতা শুঁকছে। উৎসব শেষ হয়ে গেছে। ভাগ্যবানেরা করেছে মহাপূজার প্রসাদ বণ্টন, আর এই হতভাগার দল উৎসর্গ করা ছাগশিশুর মত দাঁড়িয়ে কাঁপে!

ছাত্রদের নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরে সুবিমল নির্দ্দেশ দেন। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটি পরিবারের লোকগুলোর মুখপানে চেয়ে থমকে দাঁড়ান। না দাঁড়িয়ে পারেন না। পরনে আধময়লা কাপড়; সঙ্গে যৎ সামান্য তৈজস্-পত্র—একটা বালতি একটা এলুমিনিয়মের মগ না-হয় পিতলের ঘটি-বাটি, দু'-একখানা কলাইকরা থালা, জীর্ণ দু'খানা কাঁথা না হয় একখানা ছেঁড়া কম্বল। আকস্মিক দারিদ্র্যে ভেঙে পড়লেও ওদের মুখে-চোখে আভিজাত্যের ছাপ এখনও সুস্পষ্ট। অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকলেও সম্ভ্রমের বনিয়াদ শিথিল হয়নি, মেয়েদের গায়ে সোনাদানা যেটুকু ছিল, কতক পাথের সংগ্রহ আর কতক দেহতল্লাসীর হিড়িকে নিঃশেষিত হয়েছে।

মেয়েরা মুখ তুলে চাইতে পারে না। অপরাধীর মত আড়ষ্ট ভাবে জড়সড় হয়ে ব'সে আছে। সুবিমল স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাদের মুখপানে চেয়ে থাকেন। বাঙলার পল্লীবধূ, মা, বোন, ঠাকুমা! সভ্য মানুষের দরবারে বাঁচবার অধিকার ভিক্ষে করে নিতে এদের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে দেহতল্লাসী! সুবিমল শিউরে ওঠেন। সারা গায়ের রক্ত একসঙ্গে চন্‌চন্ করে ওঠে মগজে।

প্রথমে ভলাণ্টিয়ার কোর তৈরী করা হয়তো সুবিমলের কাছে ছিল গৌণ। কিন্তু দেখতে দেখতে সেটা শুধু মুখ্য নয়, একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ালো। প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ-ছ' ঘণ্টা কাটে ষ্টেশনে। এক বিপদ এড়াতে না গিয়ে বিপন্ন মানুষের দল

যাতে অন্য বিপাকে না পড়ে, সুবিমলের সব সময়ই সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

শেফালিরা তৈরী করেছিল স্বতন্ত্র সেবাদল, ওদের পার্টির তরফ থেকে অর্গ্যানাইজ করা। শেফালির চেষ্টাতেই হয়তো প্রথমটা সুবিমল অগ্রসর হয়েছিলেন এই কাজে। কিন্তু নিজে ভলান্টিয়ার কোর তৈরী করে নিলেন দেখে, শেফালি অন্তরে ব্যথা কম পায়নি। তবে মুখ ফুটে সে কথা প্রকাশ করেনি কোন দিন।

সেদিন প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে সুবিমল যখন ষ্টেশনের চাতালে এসে দাঁড়ালেন, শেফালি তাদের পার্টির কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সুবিমলের চোখে চোখ পড়তেই মিষ্টি একটু হেসে এগিয়ে এলো।

সুবিমল স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—"ডিউটিতে এলেন নাকি ?"—

"হাঁ, আপনি দেখছি আজ-কাল রোজই আসছেন।"—সুবিমলের মুখপানে চেয়ে শেফালি হাসে।

"কতকটা তাই।"—

"তাও ভালো। আমি তো পারিনি আপনাকে কনভার্ট করতে—" হঠাৎ থেমে একটা ঢোক গিলে শেফালি বলে—"ইলাও এসেছে বুঝি ?"

"না। কেন বলুন তো ?"—সুবিমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন।

সুবিমলের অস্বস্তিটুকু শেফালির দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না।

এক মিনিট কি ভেবে নিয়ে হাসিমুখে শেফালি বলে—"তা হ'লে, শেষ পর্যন্ত আমার পথেই এলেন ?"

হঠাৎ শেফালি কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর মুখে যেন হাসি ধরে না।

সুবিমল শেফালির অপ্রত্যাশিত সজীবতায় অবাক্ হয়ে কি যেন ভাবছিলেন।

এক ঝলক হাসিতে শেফালির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সুবিমলের কাছে বিদায় নিয়ে সে তড়িৎগতিতে ষ্টেশনের ভিতর গিয়ে ঢুকলো।

[ক্রমশঃ।

জোটের মহল

[বড় গল্প]

অমরেন্দ্র ঘোষ

তেইশ

মুক্তার বহু পরিচয়ই দিবাকর পেয়েছে, কিন্তু এবারের পরিচয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যন্ত্রের মত জীবনটা চলছিল—এগিয়ে যাচ্ছিল বটে দুরন্ত গতিতে, হঠাৎ এলো শিহরণ, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তৃষ্ণার্ত যৌবন। দিবাকর এখনও পায়নি, কিন্তু পান করেছে কণ্ঠভরে বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বেষ্টন করে বুকে জড়িয়ে ধরে। আশ্চর্য, পিপাসা তো মিটল না। এ কি পানীয় যে উগ্র করে লালসা ? এ কি আলিংগন যে জ্বলতে থাকে সারা দেহ-মন ?

প্রকাণ্ড বিলের খোলা হাওয়ায় তো কমতে চায় না জ্বলুনী!

দিবাকর ছোট্ট একখানা গামছা পরে। তার পর লাফিয়ে পড়ে জলে। নায়ের সংগে এগিয়ে চলে সাঁতার কেটে।

সময় মত মুক্তা এলো না, রইল গয়নার লোভে ? সোনাদানা রূপার পৈছি বাজুই বেশি হল ? দাম দিল না প্রেমের। ক্রুদ্ধ হয়ে দিবাকর সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল জোরে! পদ্মের ডাঁটা, জলো ঘাসের ডগা ছিঁড়ে যেতে লাগল হস্ত-পদ সঞ্চালনে।

ও তো চোরের মেয়ে মানুষ, কথা বলে মুখে-চোখে (সত্য মিথ্যা), ওকে বিশ্বাস নেই—ওর থেই পাওয়া শক্ত।

ওকে নিয়ে দেশের এবং দশের কাজে নামবে ভেবেছিল দিবাকর। ও যে আসেনি, ভালই হয়েছে—একেবারে হাস্যাস্পদ হত লোকের চোখে। ওর রূপ, রূপ নয়—জ্বলন্ত আগুন। পুরুষের পাখনা পোড়ায়—হরণ করে বিবেক বুদ্ধি সমস্ত শক্তি। ও না এসে ভালই করেছে।...

'গোঁসাই নায়ে ওঠো—সামনে দাম দীঘি।' কেবল লকলকে ঘাস-বন। মাঝে মাঝে বর্দ্ধিষ্ণু কচুরী-পানার স্তর। প্রায় ক্রোশ দেড়েক যোপে এমনি চলেছে। বেগুনী ফুল আর সবুজ ঘাস পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। তাই এই স্থানটার নাম দাম দীঘি। হয়ত এককালে কোনও রাজা-বাদসাহের দীঘিই ছিল, আজ তা মিশে গেছে বিলের অংশে।

দিবাকর নায়ে উঠে কাপড় বদলায়। বাপ রে কি গরম—এতক্ষণে ঠাণ্ডা হইল দেহ।'

অথচ মনের জ্বালা তো কমে না। মুক্তাকে গাল দিল, আবার দিল চোরের মেয়ে মানুষ বলে, তবু সে স্মৃতি ছড়ায় কেন ওর মনের যৌবনে ? যৌবনের এ কি ধর্ম ? কাঁটা আছে, অথচ লিপ্সা থাকে কেন মণ ডালের ফুলের জন্য, ঠিক মর্ম বোঝে না দিবাকর। মুক্তা আবার দোদুল দোলে যেন স্বমুখে—দিবাকর অতর্কিতে কাঁটা গাছের ফাঁকে হাত বাড়ায়!

'গোঁসাই, তোমার গামছা ভাইস্যা যায়।'

খপ করে গামছাখানা ধরে দিবাকর। 'আইজ দিন খুয়ামু (নষ্ট) না—ঐ হাটের কোলে নাও ভিড়াও। সন্ধ্যাসন্ধি বাড়ী যামু, কি কও ?'

'কামে আইস্যা কাম করুম, তার আবার কওন-বলন কি!'

'খাওয়া-দাওয়া ?'

'না-ই বা হইল। কাইল রাইতে তো উপাস করি নাই।'

দিবাকর কূলে ওঠে এক লাফে। নাও ভিড়াও ঐ তাঁতি পাড়া গো বাঁ পাশে।'

সারা দিন ধ'রে দিবাকর বিপ্লবের বীজ বোনে। অকম্পিত

মনগুলিতে প্রথম দেয় চাষ, তারপর জোড়ে মই—অবশেষে ছড়ায় বীজ ধান্য। দেখতে দেখতে মন্ত্রে যেন অংকুর জন্মে। বিল জল জলা ওদের স্বভাব স্বপ্নের ধন—ওরা আর যা-ই দিক 'বলন' দেবে না।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে একটি ছেলে দিবাকরের কাছে এগিয়ে আসে। লম্বা বেশ বলিষ্ঠ গড়ন—রংটা খানিক তামাটে। চুলগুলো কটা কিন্তু কোঁকড়া, থোকা থোকা হয়ে রয়েছে কপালের দু'পাশে। কালো লোকের দলের মধ্যে ছেলেটি একটা বৈশিষ্ট্য। বিলের আবহাওয়ায় এতটা ফর্সা লোক প্রায় চোখে পড়ে না।

দিবাকর লক্ষ্য করেছে যে ছেলেটি সারা দিন ঘুরেছে ওর পিছে-পিছে। কখনও আনাজ-হাটা, কখনও ধান-হাটা, যখন যেখানে দাঁড়িয়ে দিবাকর বক্তৃতা দিয়েছে, ও যেন মুগ্ধ হয়ে শুনেছে।

'তোমার নাম কি ভাই? তুমি চাও কি?'

আমার মিঞার (পিতার) নাম ছেকেন্দর, আমার নাম আলাম। সেলাম লন আপনে।'

'আলেকুম সেলাম।' বলে প্রতিনমস্কার করে দিবাকর—বয়েসে ছোট বলে তুচ্ছ করে না। 'কি চাই এখন বলো।'

'আমাগো জমি নাই, আছে এট্টু বাড়ী, জলকর দেই বিঘা দুয়েকের—সেই জলের ধরি মাছ। তাও যদি যায় তবে ক্যামনে পালুম গুষ্ঠী, মা বুড়া বাপ অচল। আমি আপনাগো শিষ্য হইতে চাই।'

'মাছ যখন না ধরো, বিলে বন্যা, তখন কি কইর‍্যা খাও? সোংসার চলে কি ভাবে বছরের আষ্ট মাস?'

'জারির দলে জুড়ির কাম করি, খঞ্জরী বাজাই। শিরবয়াতি (শ্রেষ্ঠ গায়ক) না থাকলে গানও গাই।'

'কইলা কি, তুমি গানও জানো!' আশ্চর্য হয় দিবাকর।

ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে বলে, 'যদি শোনেন একখান গাইতে পারি।'

সকলে বলে ওঠে, 'গাও, গাও···বইস নায়ের গলুইতে।'

মাটি ধুয়ে আলাম ঝুলিয়ে রাখে পা দু'খানা গলুইর এক পাশে। একটি পুঁটলি খোলে। যত্ন করে একটি বড় গোছের খঞ্জরী বের করে, নাড়া দেয় এমন একটা তালে যে ছোট হাটখানা প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে নায়ের কাছে এসে হাজির হয়।

(ওগো) চাষী মজুর ভাই এত রাইতে শুনি ক্যান হাতুড় কাইস্তার কনকনি।
কাইস্তা মোদের নাতী-পুতী হাতুড় জোগায় ভাত
দোঁহার দৌলতে মোদের আইজও রইছে জাত
(ওগো) চাষী মজুর ভাই এত রাইতে শুনি ক্যান হাতুড় কাইস্তার ঝনঝনি।

গানটা শুনে দিবাকরের মনে পুরান দিনের একটা হারান স্মৃতি উদয় হয়। তখন যা তেমন মনোযোগ দিয়ে গ্রাহ্য করে শোনেনি এখন আঘাত দেয় অন্তরে। তবু একটা ফসল বুনে রেখে গিয়েছিল দিবাকরের অলক্ষ্যে তারই মনের মৃত্তিকায়। সে ফসল সুপক্ক প্রায়, এসেছে সংগ্রহের লগ্ন। তাই আজ মনে পড়ছে একটি বন্ধুকে।

কুঞ্জ ভুঁইমালীর দলে একদিন একটি ছেলে এসে উঠল। উস্কখুস্ক চুল, ঝড়ে ভাঙা যেন গঠন। প্রকৃতি রুদ্র কিন্তু মধুর। এসেছে সুদূর কোন সহর থেকে। কিছু দিন বাদে সে বলল, 'দেখলাম তো সব। দল চলে না চালাইবার দোষে।'

'সে ক্যামন—সে ক্যামন?' কুঞ্জ পান চিবুতে চিবুতে এগিয়ে এলো। 'কি দোষ দেখলা?'

'যদি স্বদেশী গান গাইতে পারেন, দখল করতে পারেন, জনসাধারণের অতৃপ্ত মনটা—তা হইলে বিনা ভেসেও দল চলবে, না হইলে হাজারও নামাবলী এবং শাড়ী কিইন্যা কুলাইবে না। মন বইদলা গেছে মানুষের, যুগ বইদলা গেছে মান্ধাতার।'

তখন আর কুঞ্জ মুখের ওপর কোন জবাব দেয়নি। পিছনে এসে বলেছে, 'ছোকরা ইঁচড়ে পাকা কোনও ফেরারি আসামী। তা না হইলে কি কইর‍্যা হয় এত জ্যাঠামি? কুঞ্জ ভুঁইমালীরে উপদেশ দেয়, যার দল কইর‍্যা 'ই' পাকল···।' একটা অশ্লীল কথা ছাড়ে কুঞ্জ।

সেই ছোকরাই মাঝে মাঝে গাইত এ গানখানা। সময় সময় দিবাকরকে দল ছাড়া করে নিয়ে যেত কোন নির্জন স্থানে। সেখানে বসে আর একটা গান শোনাত—তার দু' একটা কলি আজও মনে আছে দিবাকরের।

ইংরাজ মোরে আর কি দেখাও ভয়।
দেহ যদিও কয়াদ কর মন তো খালাস রয়।

কি যেন এক বৈদ্যুতিক প্রেরণায় সে অনর্গল বহু কথা বলে যেত। শক্তি কোথায়? সংঘে। সে সংঘ কি করে গড়ে তুলতে হয়—কাদের নিয়ে? তুচ্ছ চাষী মজুর ভাইদের সমবেত করে।

খুব নিবিষ্ট মনে দিবাকর এ সব না শুনলেও সময় সময় আকৃষ্ট হতো—আর গানগুলো তো রীতিমত কণ্টকিত করত ওর প্রাণ।

একদিন সে ছোকরা হঠাৎ অন্তর্ধান হল। সংগে সংগে পুলিশ এলো। সবাই বুঝল এ সাধারণ মানুষ নয়।

দিবাকরের হলো দুঃখ। তাই তো, অনেক কিছু সে অবহেলা করেই শিখে রাখল না।

কুঞ্জ ভুঁইমালী একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বাপ রে, বাচাইল বিধাতা। আমি আগে বলি নাই ও একটা জুয়ারী।'

'তুমি এ গান শিখলা ক্যামনে?'

আলামও বলল সেই ঝড়ো রুগ্ন ছেলেটির কথা।

ও শুধু দিবাকরের মনে নয়—ফসল বুনে রেখে গেছে সারা দুনিয়ায়। আগামী দিনের উজ্জ্বল সঞ্চয়।

দিবাকর বলে, 'আলাম, তুমি আমাগো সংগে চলো—আজ থিকা তোমার নাম রাখলাম ভাই এলেম (বিদ্যা)।'

আলাম সেলাম করে।

'বার বার সেলাম করার দরকার নাই, এখানে আমরা সকলডি সমান।'

'তা হয় না গোঁসাই। সব কামেরই বাজান আছে।'

একেবারে অযৌক্তিক বলেও কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারে না দিবাকর।

নাও চলেছে সমান্তরালে জলপথ ধরে। দু'পাশে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস, মাঝখানা সরু পথ, অন্ধকারেও চিনতে কষ্ট হচ্ছে না বাইছাদের।

মুক্তা এলো না, কিন্তু একটি কথা বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সে। কনকের বিয়ের কথা। এ দায়িত্ব উপলব্ধি করে দিবাকর, তবে পালন করে উঠতে পারেনি নানা কারণে। সে

দেশের কল্যাণে ব্যস্ত। তার জীবনে হয়ত ছুটির অবকাশ আসবে না। ক্রমে কাজ জটিল হবে বই শিথিল হবে না। তাই বলে কি কনকের জীবনেরও বসন্ত কাল অমনি অমনি গত হবে? দিবাকর বোধ হয় ভয় করে—সমাজে সংঘাত আসবে নিদারুণ। আসুক না সংঘাত; উঠুক না ঢেউ, সে টলবে না। জবরদস্তি করে যে শিকল পরান হয়েছে তা সে ভাঙবে। বিয়ের চেয়েও বড় যে প্রেম তা সে নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা করবে। রাবণ রাজার মত স্বর্গের সিঁড়ি দিবাকর অসমাপ্ত রাখবে না। আবার একটা গান মনে পড়ে ঝড়ো বন্ধুটির। দিবাকর অন্ধকারেই রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ও বাঙালী সামাল সামাল কোন দিকে যে চাও
ভরা-ডুবি হইবে যে তোর সমাজ বইল্যা ফুটা নাও।
বিধবা কন্যা কাঁইন্দা মরে
বিয়া কর (তুই) বৌ থাকতে ঘরে
হায় রে, আইশ-আমিষ তার সুমুখে নাইচ্যা নাইচ্যা খাও।
ও বাঙালী সামাল সামাল ডুবল ফুটা পুরান নাও।

দিবাকর উঠানে এসে দাঁড়াতেই দেখল যে তার বাড়ীর একটা পরিবর্তন হয়েছে। সাবেক ঘরের দক্ষিণ দিকে একখানা কুঁড়ে উঠেছে ছনের। ব্যাপার কি? তার বাড়ীতে তো আঁতুড় ঘর ওঠার কথা নয়। সংগীরাও একটু বিস্মিত হলো।

কনক দিবাকরের সাড়া পেয়ে সেই সদ্য তোলা ঘরের দোর ঠেলে বেরিয়ে এলো। তার পিছনে পিছনে এলো জীবন। তারা দু'জনে এসে গড় হয়ে প্রণাম করল দিবাকরকে।

দিবাকর একটা দেশলাই জ্বালাল।

কনকের কপালে টাটকা সিঁদুরের টিপ। মৃদু মৃদু হাসছে সে। 'দাদা, আশীর্বাদ কর।'

দিবাকর ক্ষণিক চুপ করে থেকে বলল, 'ধান দুর্বা আন।'

অন্য কোনও স্ত্রীলোক নেই। কনকই একটা ছোট ডালায় ধান দুর্বা, এবং একখানা থালায় কিছু মিষ্টি নিয়ে এলো।

'বাইচ্যা থাক তোরা শতায়ু হইয়া। জীবন তুই আইজ থিকা আমার বাড়ীর অদ্ধেক সরিক—ক্যাবল মাটির না, মাল-মাত্তিয়াৎ সব জিনিষের। কুঁইড়া ঘরে থাকলে রাগ হমু, বড় ঘরে আয়। আর ওখানা ঐ রকমই খাড়া থাউক, বছর অন্তর ঈশ্বর যেন কাজে লাগায়।'

একটু লজ্জিত হয় কনক।

দিবাকর সেদিকে লক্ষ্য না করে ফের বলে, 'ভাইরা জীবন, আমার অসমাপ্ত ব্রত সমাপ্ত করেছে—তোমরাও আশীর্বাদ কর, মিষ্টি মুখে দাও।'

সংগীরা যেন কেমন করতে করতে চলে যায় নায়ের দিকে—শুধু দাঁড়িয়ে থাকে আলাম।

কিছুক্ষণ বাদে একটা নিশ্বাস ছেড়ে দিবাকর বলে, 'সব যাউক—দুঃখ নাই, এলেম আমার তো রইছে।'

এলেম বলে, 'গোঁসাই দোয়া করি, মিষ্টমুখ সব আমারে দেও—তোমার বুইন আমাগো কামের প্রথম ধাপ গাঁইথ্যা দেছে।'

আলামকে জিজ্ঞাসা করে দিবাকর যে খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? দেবে নাকি ভিন্ন উনানে আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে? দেশী রীতি অনুসারে হিন্দুর মত মুসলমানরাও ব্যবধান রেখে চলে এখানে।

আলাম বলে, 'গোঁসাই যে কামে আইছি, তার মধ্যে খাওয়া-ছোঁয়ার বাছ-বিচার নাই। আর যে মানে মানুক, আমি ওসব মানি না।'

কনক ইতস্তত করে।

ঘরে এসে দিবাকর প্রশ্ন করে, 'কি রে কনক?'

'আছে জলভাত চারডি, আর একটু মাছ বুঝি। ভাতে বোধ হয় দুই জনার কুলাইবে না।'

'চড়াইয়া দে পাতিলডা।'

'চাউল বাড়ন্ত।'

'তোরা কি করিস সারা দিন?' বিরক্ত হয় দিবাকর।

খাওয়া-দাওয়ার বিষয় চিন্তা করেনি। শুধু দুজনে একটু আনন্দ করে কাটিয়েছে, বেঁধেছে ঐ নতুন ছনের নীড়। এগিয়ে জুগিয়ে দিয়েছে কনক, সাজিয়ে-গুজিয়ে চাল ছেয়েছে, বেড়া বেঁধেছে জীবন। ফুরসৎ পায়নি কেউ, মগ্ন ছিল উৎসবের আয়োজনে।

'যা আছে তা ভাগ কইর‍্যা দাও দিদি—ওতেই হইবে।'

'না, না—তুমি খাও আলাম, আইজ তুমি আমার অতিথি।'

আলাম মাথা নাড়ায়। তার পর দুজনেই ভাগ করে খায়।

কনকের জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলো আনুপূর্বিক বলে দিবাকর। সে কি অস্বীকার করতে পারে এ শুভ-মিলন? বিশেষ করে যা ঘটিয়েছে কনক নিজেই বহু চেষ্টা তদ্বির করে। দিবাকর ভাই হয়ে কোন সাহায্যই তো করেনি।

গ্রামে একটা অসন্তোষ ফেনিয়ে উঠবে—হয়ত ওলট-পালট হয়ে যাবে সব। 'চিন্তা হয় এলেম।'

'ভয় নাই গোঁসাই—ভরসা খোদা। বৈঠা যেন নড়ে না।'

না, না—দুর্জয় তুফানেও দিবাকর দিশা হারাবে না। তার একবার ইচ্ছা হল যে জীবনের কাছে জিজ্ঞাসা করে, কখন বিয়ে হল, কে কে উপস্থিত ছিল আসরে। কেনই বা তার জন্য অপেক্ষা করা হল না। সে কি বাধা দিত? কিন্তু তখন সবাই ঘুমিয়ে গেছে।

চব্বিশ

পরদিন ভোর বেলা দুজন লোক এল দেবনগর থেকে। তারা দিবাকরের কাছে এসে বলল যে যতীন বাবু হেডমাষ্টার সবাইকে ডেকেছেন—একটা সভা হবে ইস্কুলে। জানাতে হবে কার কি দাবী-দাওয়া। খাস মহলের ছত্র-ছায়ায় কোন অন্যায় হবে না—আর হলেও কেউ তা বরদাস্ত করবে না। কথাগুলো সাজান এবং চোখা-চোখা।

হঠাৎ আলাম প্রশ্ন করে, 'হুজুরের না একটা চক্ষু কাণা?'

আগন্তুকদের মধ্যে এক জন উত্তর দেয়, 'শুনছি সান্নিপাতিক জ্বরে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইছে ছোটকালে—তা তো ধরা যায় না চক্ষু দেখলে।'

'যার জ্ঞেয়ান আছে সে ঠিক পারে।'

'ইস্—চাকরী লওয়ার সময় ডাক্তারেই পায় নাই বড়।'

অন্য এক জন সংগীকে বাধা দেয়, 'সে তর্কে আমাগো কাম কি! হুজুর তো ডাকে নাই, ডাকছেন মাষ্টার মশাই।'

'তবে চল গোঁসাই।'

ওদের নিয়ে দিবাকর ও আলাম উঠল। গাঁয়ের মাঝখানে নাও

এসে থামল কেষ্ট কৈবর্তের দোকানের কাছে। কেষ্ট প্রভাতী প্রেমধ্বনির ব্যবস্থা করছিল—একবার মাত্র চোখ তুলে সবাইকে দেখল, কিন্তু কাউকে বসতে পর্যন্ত বলল না। বিদেশী লোক দুটোও অনাদরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় পাঁচটা মিনিট একটা অস্বস্তির মধ্যে গত হল। দীর্ঘ মেয়াদী প্রেমধ্বনি কি থামতে চায়!

'কি ব্যাপার দিবাকর?' কেষ্ট যেন রুষ্ট হয়েই প্রশ্ন করল।

এমন ব্যবহার দিবাকরের কল্পনার অতীত। সে বিশেষ অপমান বোধ করতে লাগল। নবাগন্তকরা ভাবছে কি? তবু সে সমস্ত খুলে বলল।

'বসেন বসেন, মাষ্টার মশাই পাঠাইছে,—ক্যান, মীমাংসা? আমরা তো কবুলিয়ৎ দিমু স্থির করছি কাইল। আবার সভা কিসের?'

'কি কইলা কেষ্ট, কি কইলা, কবুলিয়ৎ দিবা—কারে লইয়া?' একেবারে লাফিয়ে ওঠে দিবাকর।

'তোমারে ছাড়া গেরামের আর বেবাকটি (সকলে) জোট হইয়া। বেশ্বাঘাতক পাতকিনী! কি বিশ্বাসটাই না করছিল দশ জনে।'

দিবাকর বুঝল একটি রাত্রের মধ্যেই কেষ্ট কেমন উলটে দিয়েছে পাশা। খাসা সুযোগ পেয়েছে—কনকের বিয়ের সুযোগ।

দেবনগরের লোক দুটোকে দিবাকর বিদায় দিল। বলে দিল যে সভা হবে আগামী কাল। সে সবাইকে নিয়ে যাবে। হেড মাষ্টার মশাইর নেতৃত্বে সমস্ত দাবী-দাওয়া অবশ্য জানাবে। এমন সহৃদয় ব্যক্তির আহ্বান কিছুতে উপেক্ষা করতে পারে না।

ডোঙা নায়ে ফিরে এলো আলাম ও দিবাকর। বিলের ঠাণ্ডা বাতাসেও দিবাকর একটা তীব্র দাহ বোধ করতে লাগল। এত দিন বসে এত ক্লেশ করে সে যে পরিখা খনন করল, তার মধ্যেই জন্মাল শত্রু। বাইরের শত্রু নয়, শত্রু ঘরের। নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করছে নিজের। উঃ, কি শঠ! এত দিন উস্কানি দিয়েছে দিবাকরকে, আবার যেমনি একটু প্রলোভন পেয়েছে অমনি হাতে হাত মিলাতে যাচ্ছে অন্যায় গ্লানির বোঝা তারই মাথায় চাপিয়ে।

'কি করি, এখন বুদ্ধি দাও ভাই আলাম।'

আলাম লজ্জিত হয়। 'আমি তোমার যোগ্য নয় গোঁসাই—শুধু কইতে কও, একটা সামান্য কথা কইতে পারি। যে হলাহল ঢালছে কেষ্ট চলো সেই হলাহল তুমি পান করবা। ভয় নেই, তুমি নীলকণ্ঠ।'

'ঠিক কইছ—তাই চলো।'

নাও খোরে জোর 'চাল্লিতে' (চাপে)।

দিনটা একেবারে গত হয়ে গেল সাত জায়গার লোক এক জায়গায় আনতে। কেউ জাল ছেড়ে এলো, কেউ হাল। কেউ বা ছেড়ে এলো খামি ঘুরাণ। বহু লোক এলো হাট বন্ধ করে। ছোকরা বুড়ো নানা বয়সের লোক এসে জড়ো হল। দিগম্বরীতলা লোকে লোকারণ্য। উৎসুক ছেলেরা বটগাছের ওপরে চড়ল—কেউ ডাল ভেঙে পাতায় বসল আরাম করে।

দিবাকর মাথার গামছাটা গলার দুপাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। যেন এক অপরাধী নিজেই করবে তার সওয়াল। সারা দিন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, মুখখানা তার এমনিতেই শুকনো, আরও শুকিয়ে গেল দুঃখে। এত যে খাটল—বিনা দোষে অপরাধী হল সে। একবার তার ইচ্ছা হল এখান থেকে ছুটে পালায়—মুখ লুকায় গিয়ে আবডালে। আবার ভাবল, না, সে মিশে যাক মাটির তলায়! এত আর সইতে পারবে না।

জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পিছন থেকে আলাম সান্ত্বনা জোগায়। 'এখন আস্থহারা হইও না ঠাকুর ভাই। আমার তোমার কথা নয়—স্বাথ দশ জনার, মুস্কিল আসান করন চাই।'

দিবাকর গলবস্ত্র হয়ে আরম্ভ করে, 'উপস্থিত দশের কাছে আমি কৈফিয়ৎ দিমু, তার জন্য দুঃখ নাই, কিন্তু ভুল বুইঝ্যা কি কেও কুড়াল মারে নিজের পায়? পাঁচ পাড়ার হিন্দু মুসলমান গো আমি পঞ্চাইৎ মানি, তানারাই বলুক আগে শুনি 'কি আমার অপরাধ?' গলাটা খাদে নেমে যায় দিবাকরের। 'এই যে দিন নাই, রাইত নাই খাটছি যম-খাটুনী এই কি আমার দোষ?'

একটা গুঞ্জন ওঠে। ঠিক স্পষ্ট কিছু শোনা যায় না।

কেষ্ট এসেছিল। সে-ই এগিয়ে এসে বলে, 'বুইনডা তোমার কলংকিনী—আমাগো কি ডুবাইতে চাও?'

'কও, কও, বিচার করো পঞ্চাইৎ যারা—আমার বুইনের সংগে কি সম্পর্ক জল-জলা বিত্তের? সে মরুক বা খামখেয়ালী করুক, কিন্তু তোমাগো, স্বত্ব তোমাগো বাপ-দাদার তা যদি যায় ঐ কালা বাদুড়ের কথায় তবে দুঃখ রাখার ঠাঁই থাকবে না। আমি আইজ আসামী, ও পঞ্চাইৎ ভাইরা আমার কথা আমার মুখের দিকে চাইয়া একটু তলাইয়া বোঝবানি?'

স্বচ্ছ হয়ে গেল সব। অল্পতেই বুঝল সবাই।

বাদুড়ের কাহিনী অনেকেই জানত, ছোট বেলায় পাঠশালায় পণ্ডিতের মুখে শুনেছে পশু-পাখীর যুদ্ধের কথা। বাদুড় কেবল এ-পক্ষ ও-পক্ষ করত। বলল, 'আমরা যামু কাইলই ভাবনগর—বুঝছি যত ছল্লি-বল্লি (চতুরতা)। মুসলমানরা স্পষ্টই বলে গেল, বিধবার বিয়ে তো মোটেই বে-আইনী নয়, বরঞ্চ সুখের বিষয় হয়েছে একটা। 'যাও গোঁসাই আহার করো গিয়া, আর কেডা শোনে ঐ কেষ্টার ধাপ্পাবাজি।'

হিন্দুরা ভাবল, প্রয়োজন হলে ঘরোয়া বিচার ঘরে বসেই করবে। ওরা এর জন্য দিবাকরের মত বুদ্ধিমানের সংগ ছাড়বে না। প্রেম-প্রণয়ে অমন হামেশাই ঘটে গ্রামে। এধার যে যে-ক'টা জানে দৃষ্টান্ত দেখাতে লাগল।

আলাম হাসতে হাসতে বলে, 'নীলকণ্ঠ, এখন বাড়ী চলো।'

পঁচিশ

মাষ্টার মশাই ও কুন্তলা চায়ের টেবিলে উপবিষ্ট। দামী চায়ের গন্ধে ম-ম করছে টেবিলের আশ-পাশ। কুন্তলার প্রসাধন জনগণের মনের প্রতীক। চুল রুখুরুখু—যেন কত দিন তেল জোটেনি। তবে পরিশ্রম ও সাবান ক্ষয় হয়েছে অনেকটা। ঘর্ম হত প্রচুর কিন্তু মুখে প্রলেপ পড়েছে সুগন্ধি স্নো ও পাতলা পাউডারের। চেনা ঠিকই যায়, অথচ যেন ধরা যায় না কান্তিময়ী। শাড়ী ও ব্লাউজ শুভ্র—শুধু পাড় ও কারুকার্যের ওপর মায়প্যাঁচ। এক

দৃষ্টিতে মনে হয় যেন নিতান্ত আভিজাত্য-বর্জিত দীনহীনা এক দেবী।

'মাষ্টার মশাই, ওরা যে এলো না আজ?'

'ভূতের কথা বলেন কেন আর—ওদের কাছে কি সময়ের কোন মূল্য আছে। কালও আসে কিনা কে জানে!'

'কালও না! এ হতেই পারে না। দিবাকর যখন রয়েছে…'

'সেই তো ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছে। একটা বিধবা বোনকে নাকি কেবল বিয়ে দিচ্ছে।'

'How wonderful! বিপ্লবী পদে পদে।'

'নিজেও নাকি কেবল বিয়ে করতে চাচ্ছে প্রতিবেশীর এক সধবা মেয়ে।'

মুখখানা এবার শাদা হয়ে গেল কুন্তলার। 'আপনি কি করে জানলেন?'

'আমি অনুমান করছি। মুক্তা বলে একটা মেয়েকে নাকি ভালবাসে, এই জনরব। এর পরিণাম সধবা বিবাহ ছাড়া আর কি হতে পারে?' এক চুমুক চা খেয়ে যতীন দাস বলে, 'ভদ্রলোকের মত ওদের তো আব্রু নেই মোটে, তাই সব কথাই রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। একে যদি বলেন বিপ্লব তা হলে আর বলব কি!'

'না, না, তা নয়…তবে কি জানেন'…কুন্তলা নিজেই জানে না যে এর পর কি বলতে হবে। তাই বাক্যটা তার অসমাপ্ত থেকে যায়। চা জুড়িয়ে যেতে থাকে, সময় গড়িয়ে চলে স্পষ্ট পাদ-ক্ষেপে। টিকটিক করছে ঘড়ীটা—আর সব নীরব।

যতীন দাস বলে, 'আজ উঠি, কাল কিন্তু একটু ইয়ে, এই দ্রুত বন্দোবস্ত করে বের হবেন। অর্থাৎ কিনা আজকার মত এতটা সময় বৃথা ব্যয় করবেন না। ওরা এসে পড়লে, আপনাকে না দেখলে, গোলমালই থামবে না।'

'মুক্তা কে মাষ্টার মশাই?'

'একটি পরমা 'ছিনাল' মেয়ে?'

যতীন দাস লাঠিখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রমে কক্ষটা আঁধার হয়ে উঠল।

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের একটু পরেই অনেকগুলো ডোঙা ডিঙি এসে ইস্কুলের সুমুখে ভিড়ল। ছেলে-বুড়ো নানা বয়সের লোক আমদানী হয়েছে। একেবারে পাঁচ-ছ' বছরের কয়েকটি বালকও এসেছে বাপের সংগে বহু বায়না করে। কেউ বিড়ি, কেউ বা খেলার জন্য উদ্বিগ্ন করে তুলেছে কাছা-কোঁচা টেনে।

একটা ত্রিপলের নীচে কয়েকখানা টেবিল-চেয়ার সাজান হয়েছে বেশ পরিপাটি করে। দেবদারু পাতা এনে একটি তোরণও প্রস্তুত করা হয়েছে খাল পার। ইস্কুলের ছেলেরা যতীন দাসের হুকুমে ছুটোছুটি করছে চারি দিকে।

দিবাকর নাও ভিড়িয়েই হুড়মুড় করে উঠতে চাচ্ছিল, তাকে নিষেধ করা হল। অগত্যা সে দলবল নিয়ে খোলা নায়ে চড়া রৌদ্র বসে রইল। দুর্দান্ত ঘাম হচ্ছে, তবু উপায় নেই, অভ্যর্থনার জন্য আজ তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। ভবানীর ছোট্ট ছেলেটা এর মধ্যে আবার বিড়ির বায়নার কোঁপানি তুলল। 'বাঁবা—'

'দিবাকর, আমি একটা পয়সার বিড়ি নিয়া আসি।' ভবানী হুকুম চাইল।

'না, না—আগেভাগে কুলে উইঠ্যা মান খুয়াইও না।'

ভবানী ছেলেটার গালে একটা চড় মারে। 'সাধে কয় হাইল্যা জাইল্যা পো…মর্য্যাদা বোঝো এট্টু! সবুর কর…'

এমন সময় দেখা যায় যে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মত এগিয়ে আসছে কুন্তলা। দুগ্ধ-ধবল অতি মার্জিত বেশ-বাস, সংগে সংগে আসছে যতীন দাসের প্রিয় দুটি দশম শ্রেণীর ছাত্র। হিল তোলা জুতো সময়তে একটু হেলে-দুলে যাচ্ছে অসমতল পথে। ঠিক সেই তালেই বাঁকা-সোজা হচ্ছে কুন্তলার দেহ।

সভামণ্ডপে প্রবেশ করে কুন্তলা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

'বসুন দেবী—এখনও তুলিনি নাও থেকে। ফুলের মালা দু' ছড়া গাঁথতে বলেছিলাম, ছোঁড়ারা গেঁথেছে এক ছড়া। এখন ফুলও নেই আর, বললাম পাতাবাহারের পাতা দিয়ে গাঁথ আর এক ছড়া।'

একটি ছেলে এসে বলল, 'মাষ্টার মশাই হয়েছে।'

'তবে চল চল—বন্দে মাতরম্।'

সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'বন্দে মাতরম্।'

দিবাকরের গলায় পাতা-বাহারের মালা পরিয়ে দেওয়া হল। একটি মেয়ে কপালে এঁকে দিল রক্ত চন্দনের ফোঁটা।

কতগুলো ছেলে হঠাৎ দিল করতালি।

'ওরে থাম, থাম গোমুখোর দল, এখন কি কেউ দেয় হাততালি! বল, বন্দে মাতরম্, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।'

'বন্দে মাতরম্, ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

দিবাকরের সংগে সংগে ভেড়ার পালের মত এক দল লোক উঠল ওপরে। দিবাকরকে একখানা গোল টুলে বসতে দেওয়া হল, কুন্তলার চেয়ারের ঠিক বিপরীত দিকে।

এই তো ঠিক কমরেড। দাড়ি-গোঁফ কামানর বালাই নেই। মাথায় নেই লম্বা টেরি। না আছে কোনও সাজ-সজ্জা। গলায় একখানা পাঁচ হাত নতুন গামছা, পরনে দেশী মোটা খাটো ধুতি। কিন্তু কি সুন্দর উন্নত নাসা, গভীর ভ্রূ তার নীচে আরও সুগভীর দু'টো দীর্ঘ কালো চোখ। যেন স্বাভাবিক কোনও দেবমূর্তি।

'ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী কুন্তলা দেবী, অদ্যকার সভার সভানেত্রী। আর এ হচ্ছে বিক্রগাঁর বিপ্লবী বীর দিবাকর।'

কুন্তলা বলল, 'নমস্কার।'

দিবাকরের কেন জানি চোখ জলে ভরে উঠেছিল। সে একটু ধরা-গলায় 'পেন্নাম দেবী' বলে চোখ মুছল সংগোপনে।

যতীন দাস লক্ষ্য করল, ক্রিয়া হচ্ছে। সে খুব ফেনিয়ে কুন্তলার সম্যক্ পরিচয়টা এবার দিতে আরম্ভ করল দিবাকরকে। দিবাকর যেন ধীরে ধীরে অভিভূত হয়ে পড়তে লাগল।

মাঝখান থেকে ভবানী এসে কানের কাছে ঘেঁষে বলে গেল, 'গোঁসাই, ছাওয়ালডির যন্ত্রণায় বাঁচি না, আমি একটু দোকান ঘুইরা আসি। রইল এই বয়রা বাঁশের লাঠিখানা পিঠের কাছে।'

প্রায় মিনিট আষ্টেক বাদে ভবানী ও তার ছেলে বিড়ি টানতে টানতে দিবাকরের কাছে ফিরে এসে দাঁড়াল। একটা দুধের ছেলে! এ কি অসভ্যতা! কুন্তলা বিরক্ত বোধ করতে লাগল।

ঈশ্বরের কি যে অভিপ্রায়, ঠিক এমনি সময় দিবাকর অন্যমনস্ক ভাবে ছেলেটার হাত থেকে বিড়িটা টেনে নিয়ে দিব্য ধোঁয়া ছাড়তে

আরম্ভ করল। কেমন করে জানি না, হঠাৎ তার নজর পড়ল, দূরে ইস্কুলের কপাটে লেখা ধূমপান নিষেধ! সে ত্রস্তে নিঃশেষিতপ্রায় বিড়িটা ফেলে দিল। ছেলেটা উঠল চেঁচিয়ে।

কুন্তলার একটু মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল—তবে তা খানিকের জন্যই। কুশলী শিল্পী খোদিত বহু প্রাচীন ভাস্কর্যের প্রতি যেমন করে চেয়ে থাকে মানুষ, তেমনি করে আবার চেয়ে রইল কুন্তলা। এরা জনসাধারণ। অথচ সমস্তই এদের অসাধারণ। অবশেষে মুখোমুখি পরিচয় হল। কুন্তলাই আবিষ্কার করল। How wonderful!

যথারীতি সভার কাজ আরম্ভ হল। এতক্ষণ আলাম দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। লক্ষ্য করছিল সব—কাছে এসে ধীরে ধীরে বলল, 'গোসাই, খুব হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার কিন্তু।'

সহসা আলাম এ কথা বলছে কেন তা বিশ্লেষণ করল না দিবাকর। অথচ দ্রুত তার অভিভূতের ভাবটা কেটে গেল। হ্যাঁ, একেই বলে এলেম—এই তো অন্ধকার পথে বর্তিকা, বাত্যা-বিপদে বন্ধু।

যতীন দাস খানিকটা ভনিতা করে প্রথম বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে—

'আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। মানুষ যে হয় সে কোনও দিনই তার দাবী না আদায় করে মাথা নত করে দেয় না দুর্নীতির কাছে। আর আমি আপনাদের বেতন-ভুক শিক্ষক হয়ে কিছুতেই পারি নে অন্যায্যকে প্রশ্রয় দিতে, অপমানকে মাথা চাড়া দিতে। তাই তো ডেকেছি আপনাদের প্রত্যেককে—ছোট বড় উত্তম-অধম সবাইকে।' যতীন দাস একটু থেমে নিশ্বাস নেয় এবং সেই ফাঁকে লক্ষ্য করে দেখে যে তার কথায় কাজ হচ্ছে কেমন। তারপর সে পাকা মাঝির মত হালের হাতলে একটু চাপ দেয়। 'অন্যায় করেছে ব্রাহ্মণ নিচের স্বত্বের খাজনা পেয়েও ওপরের স্বত্বের খাজনা সরকারকে আদায় না দিয়ে। তার জন্যই তো আজ এ লড়াই, নিলাম হয়েছে আপনাদের বিত্ত। কিন্তু আমরা অহেতুক লড়াই করব কেন? আদায় দেব ন্যায্য খাজনা, ন্যায্য মনিবকে। কি বলেন, আমি কি অযৌক্তিক কিছু বলছি? খড়-কুটায় আগুন দিয়ে পেত্নী গেছে পালিয়ে, এখন জ্বলে মরি আমরা! তা হয় না। খাজনা যখন দিতেই হবে, দেব না হয় কিছু বলন। তা বলে আমরা শিং ভেঙে মরব না। মনিব ও যা বাপও তা—সামান্যর জন্য তার সংগে ধস্তাধস্তি করব না।'

এলেম একটু চাপ দেয় দিবাকরের কাঁধে।

দিবাকর চেয়ে দেখে যে জনতা যেন একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। অল্পতেই হারিয়ে ফেলতে পারে খেই। সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাধা দিল যতীন দাসকে। সভা-সমিতির সাধারণ নিয়ম সে মানল না।

'না, না, তা হয় না···'

যতীন দাস আপত্তি করল, 'দেখুন দেবী···'

কুন্তলা বলল, 'আহাহা, আগে শেষ করতে দেন মাষ্টার মশাইকে। বসুন আপনি। বসুন কমরেড···'

সত্য সত্যই জনতা মাথা নত করতে চাইছিল না। তারা কতকটা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। যতীন দাস কোন সুরের গান যে কোন সুরে ফেরতা দিয়ে আনল! তারা বলল, 'ক্যান বইবে, বইবে ক্যান—আমাগো গোঁসাই কি কিছু কইবে না?'

উদারা, মুদারা, তারা,—তিনটা তালে যেন দিবাকর বলে উঠল, 'না, না, তা হয় না। এই মানুষগুলো গরু-মইষ না যে ধস্তাধস্তি করবে, গুতাইবে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া এরা তো জুতাইবে। আমি আপনে কইলে তো ছাড়বে না। যত চর-জল-বাড়ী-ঘর এ যে ওগো বুকের রক্ত, স্বভাব স্বত্ব—বিত্তের চাইতে অনেক বাড়া। পূর্বকরের ওরা যখন কর দেয় না, খাজনা ট্যাক্‌সো দেয় না যখন হাওয়ার, তখন কি কারণে দেবে ওরা জল জমি ভদ্রাসনের খাজনা?'

যতীন দাস স্তম্ভিত হয়ে যায়। 'বল কি দিবাকর, মানবে না রাজার আইন?'

উচ্চ কণ্ঠ নীচে নামিয়ে আনে দিবাকর। 'কে কইল, ক্যান মানবে না রাজার আইন? বে-আইন হইলেও তা তো মাথা হেঁট কইর‍্যা এত দিন মাইন্যা আইছে, নিয়ম মত প্রিতি সন খাজনা দেছে।' তারপর সে আবার স্বর বদলায়। সেই বাঘের গল্পটা পুনরাবৃত্তি করে নানা অলংকার যোগ করে। শ্রোতারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'মরল বাওন পোড়াইবে যত দিন-আনে-দিন-খায় হাইল্যা জাইল্যা গো, এ কেমন কাণ্ড? লণ্ডভণ্ড হইবে না ক্যাশটা?' আরও নানা যুক্তিজাল রচনা করে দিবাকর।

কুন্তলা সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে দিবাকরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কি অদ্ভুত স্ফুরণ! কি অভিনব বিশ্লেষণ! এ মানুষটার রক্তে যেন যুক্তি জন্মেছে! সে লোল অঞ্চল সামলাতে ভুলে যায়—শুধু চুলগুলি একটু গুছিয়ে নেয়। তার রুমালটা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে অতি উগ্র সুবাস।

যতীন দাস বলে, 'আমার মতে আপোষ করাই উচিত···'

দিবাকর জবাব দেয়, 'কিন্তু আমার মতে লড়াই। তোমাগো ভাই কোনটা পছন্দ? কি তোমাগো চাই?'

জনতা লাঠি তুলে কলরব করে ওঠে। 'লড়াই, লড়াই।'

তখনি সভা ভাঙে। কুন্তলার অভিভাষণ কেউ আর শোনার জন্য অপেক্ষা করে না।

দিবাকর বলে, 'পেন্নাম ঠাইরেন (ঠাকরুণ), এখন যাই।'

কুন্তলার যেন স্বপ্ন ভাঙল। 'চললেন! চা খাবেন না?'

'চা? আমার তো চৌদ্দ পুরুষে খাই না।'

'ও, নমস্কার। আবার কবে আসছেন?'

'জানি না। গ্রামনগরের সব প্রয়োজনই তো আইজ চুইক্যা গেল।' দিবাকর দ্রুতপদে চলে যায়। 'থাম্‌, থাম্‌, আইছি রে···'

কুন্তলা শুধু চেয়ে থাকে।

পথ চলতে চলতে কুন্তলা বলে, 'যত সহজ ভেবেছিলেন মাষ্টার মশাই, তত সহজ নয়। জানবেন ওরাও বুদ্ধি রাখে।'

'আপনারাই তো আস্কারা দিয়ে ওদের মাথা খেলেন। গণ-দেবতা, জন-নারায়ণ, আরও কত কি যে শুনতে হবে কে জানে! দেখলেন ঔদ্ধত্যটা? ওরা খাজনা দেওয়াটাকে একেবারে বে-আইন বলে অস্বীকার করে; তবু যা এতদিন দিয়ে এসেছে তা যেন অনুগ্রহ করে! ভূ-সম্পত্তি ভোগ করবে অথচ রাজকর দেবে না!'

'দেবে কি জন্য? অন্যায় কিছু তো বলেনি দিবাকর। একটা ইস্কুল আছে এগেরদে, একটা পোষ্টাফিস? কোনও ভাল রাস্তা

ঘাট? সামান্য একটা চ্যারিটেবেল ডিসপেন্সারী? জায়গাটার চৌহদ্দি একবারটি চিন্তা করে দেখুন তো! কত লোকের বাস।'

'কিন্তু ইস্কুল তো রয়েছে।'

'আপনার আদর্শ ইস্কুলটি? ক্ষমা করবেন ওটির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম আমি।' একটু ব্যংগ হাসি দেখা যায় কুন্তলার মুখে।

যতীন দাস অত্যন্ত দুঃখিত হয়। এত পরিশ্রম করে যা সে গড়েছে তা আজ হল পণ্ডশ্রম। জীবনের একটি নয়, দুটি নয়—অনেকগুলি দামী বছর ক্ষয় হয়ে গেছে এর পিছনে। যৌবন এখন জীর্ণ। সুমুখে মরণ। আদর্শের পিছনে ছুটে ছুটে যাবে শেষ খেয়ায় শুধু অখ্যাতি ও অপযশ বহন করে? যতীন দাস নিজে নিজেই বলে, 'কি যে ভুল করলাম বুঝতেই পারছি নে। আর পাঁচ জন দেশহিতব্রতী যে ভাবে দেশের সেবা করে তার তুলনায় অনেক নীরবে অনেক ঐকান্তিক ভাবেই তো কঠোর সাধনা করে গেলাম।'

আর কোনও জবাব না দিয়ে কুন্তলা কাছারী-বাড়ীর দিকে ফিরল। পথে ভাবতে ভাবতে গেল অনেক কথা। সে'ও যথেষ্ট অপমানিত হয়েছে। একটু গ্রাহ্য পর্যন্ত করল না তাকে। মানুষ তো না, অহংকারের যেন সুমেরু শিখর এই দিবাকর। সংগের সবাই যেন এক একটি পর্বত-চূড়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্দ লাগে না কুন্তলার কাছে। ঐ অপমানের মধ্যেও সম্মানের সিংহাসন আছে—যে সিংহাসনে বসে জন-সাধারণ হয়ে উঠেছে দুর্জ্জয়। যতীন দাসের দিকে সগৌরবে তাকায় কুন্তলা।

কুন্তলা কিছু একটা বলার পূর্বেই দীনেশ সেন বলল, 'এসো, এসো মা! ওরা তোমার মুখের একটা কথা পর্যন্ত শুনলা না—এত বাড় বেড়েছে!'

রাগে দুঃখে যতীন দাস বলল, 'হ্যাঁ, একেবারে মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।'

'তাতে হয়েছে কি বাবা?'

দীনেশ সেন আশ্চর্য হয়ে যায়! মেয়ের মুখ চোখ গণ্ড রাঙা—অপমানের বৃশ্চিক দংশনে সমস্ত দেহ ও মন আহত, তবু প্রতিবাদ। এ কেমন প্রতারণা? নিজের কাছে নিজেকে একেবারে অবুঝের মত বঞ্চনা?

'তোমার অপমানে শুধু দেবনগরেরই অপমান নয়—'

'অসম্মান স্বয়ং ইংলণ্ডের অধীশ্বরেরও।' পাদপূরণ করে যতীন দাস। 'আমি আগে বুঝিনি!'

'কিন্তু আমি সবই বুঝেছিলাম মাষ্টার মশাই।'

দীনেশ সেন একখানা কাগজ বের করল। মোটা রেক কাগজ। 'এই দেখ কেষ্ট কৈবর্ত একসনা একখানা কবুলিয়ৎ দিয়ে গেছে। সংগে তার রমজান তালুকদার আছে। এত দিন যা আমাদের খাসে ছিল এখন তা দখল বলে আইনত সাব্যস্ত হল—জোর হল ডবল। এবার কাঁটা দিয়ে বুঝলেন মশাই—' প্রণালীটা দেখিয়ে দিল হাতের ইসারায় দীনেশ সেন সগর্বে।

কেন জানি কুন্তলা খুশি হতে পারল না। তার মাথাটা চন্‌চন্ করে উঠল। ঘুরছে যেন পৃথিবী। টলছে যেন কাছারী-বাড়ীর ঘরগুলি। সে নিজেকে একটা আরাম-কেদারায় নিমজ্জিত করে দিল!

এমন সময় এলো টাটকা গব্য মাখন তিনখানা প্লেটে। একটু মুণ ও যথেষ্ট মিশ্রির গুঁড়া। আর এলো তিন গ্লাস দেশী ঘোলের সরবৎ। সহরের দুধের চাইতেও অনেক উপাদেয়। নিত্যাই কৈলাস গোয়ালা দিয়ে যায় দোকান সেলামী বাবদ।

সরবৎটুকু খেয়ে কুন্তলা বেশ সুস্থ বোধ করে। দুপুর রোদ, দূর তো কম নয়—একেবারে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। 'আমি ভাবি বাবা, লোকটা কি পাঙচুয়াল। একটা দিনও ভুল হয় না।'

'আজ হক কাল হক অমনি পাঙচুয়াল হবে বিলগাঁ।'

'কিন্তু আমার আদর্শ ইস্কুলটি…'

'আমি যতদিন আছি একটি তৃণও নড়বে না।' [ক্রমশঃ।

পুরুষ এবং নারী, সিঁড়ি এবং শয়নকক্ষে সাবধানে চলাফেরা করুন!

সিঁড়ি মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান বিপদজনক বস্তু—যার জন্য পৃথিবীতে অধিকতম দুর্ঘটনা ঘটে এবং মানুষের মৃত্যু হয়। সিঁড়ি হয়তো আমাদের বহু উপকারে লাগে। সিঁড়ি না থাকলেও চলে না এই সভ্য জগতে। মানুষকে সিঁড়িতে ওঠা-নামা করতেই হয় নানা কাজে। এবং শুধু নিজের বাড়ীর সিঁড়ি নয়, অন্যের বাড়ীর সিঁড়িও ব্যবহার করতে হয়। পৃথিবীতে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খতিয়ানে দেখা যায়, এক-চতুর্থাংশ মৃত্যুর কারণ ঐ সিঁড়ি। যদিও সিঁড়ি থেকে পা পিছলে ওঠা-নামার সময় পোষাকে পা আটকে প'ড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে পুরুষই অধিক। আর নারীদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায় তাঁদের সুসজ্জিত শয়নকক্ষে। অন্ধকার ঘরে এবং এমন কি আলোকশোভিত শয়নকক্ষেও নারীদের ধাক্কা খেতে দেখা যায় যখন-তখন ঘরের আসবাবপত্রের সঙ্গে—যার ফলে ভয়াবহ আঘাতে অনেকের মৃত্যু হয়। শয়নঘরের দুর্ঘটনার দ্বিতীয় কারণ, মেঝে ভিজে থাকলে পা পিছলে পড়ে যেতেই হয় অসাবধানতা বশতঃ। তৃতীয় কারণ, ঘরের মধ্যেও অনেকের পোষাকে পা আটকে পতন এবং ফলে মৃত্যু হয়।

আমেরিকার বিখ্যাত বীমা ব্যবসায়ী মেট্রোপলিটান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বাৎসরিক রিপোর্টে দেখা যায়, পুরুষ এবং নারীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণের শতকরা পঞ্চাশটি হচ্ছে যথাক্রমে সিঁড়ি এবং শয়নকক্ষ। সুতরাং, হে পৃথিবীর পুরুষ এবং নারীসমাজ, আপনারা যথাক্রমে সিঁড়িতে এবং শয়নককে সাবধানে চলাফেরা করবেন; নতুবা……

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

গণিকাশ্রেষ্ঠা চম্পকরাণীর গৃহে হানা দেবার পরিকল্পনা এমনি-ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ছেলেদের সবার মনেই অসম্ভব জিদ দেখা দিল। একটা কিছু তারা করবেই। কী করবে, কোথায় করবে, কেমন করে করবে, তা নিয়ে নাকি মাথা ঘামাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার একার। ওরা শুধু চায় অর্ডার, হুকুম। খিজির খাঁর মতো আমি নাকি শুধু হুকুম করে যাবো আর সানন্দে ওরা সবাই তা তামিল করে যাবে কারুর বীর মতো। Theirs' not to reason why—কেন, এ প্রশ্ন কখনো জাগবে না তাদের মনে। কিসের অভিযান, কোন্ পথে আঘাত হানলে সর্বাধিক সাফল্যের সম্ভাবনা আছে, সে আঘাতের ঝুঁকি কতখানি, কার্যান্তে প্রত্যাগমনের কোনো পথ খোলা থাকবে কি না, এই সব মারাত্মক প্রশ্ন তাদের কাছে একেবারে নিষ্প্রয়োজন ঔৎসুক্য, অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। ফলাফল হৃষীকেশের হাতে তুলে দিয়ে উৎসর্গীকৃত সন্তানের মতো তারা আত্মবিলোপনে উন্মুখ। আধুনিক যুগের অত্যাধুনিক গণতান্ত্রিক ভার্নিশে পালিশ-করা মন নিয়ে সে যুগের সৈনিক মনোবৃত্তির পরিমাপ করা সহজ নয়। এ যুগে ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হয়েছে সবার ওপরে, গণতান্ত্রিক বিধানাবলীর জলসিঞ্চনে সমষ্টিগত দুঃসাহসী প্রস্তাবকে একেবারে ঠাণ্ডা করে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে। যুক্তির যাঁতাকলে ফেলে আবেগময় আবেদনকে একেবারে পিষে ফেলা হয়েছে। এ যুগে তাই কোনো এক জন নেতার অভাব, সংঘের প্রাধান্য এখন প্রবল। এ যুগে তাই গণতান্ত্রিক পথে চলে আলাপ-আলোচনা, শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ, প্রতিনিধি সভা, চলে পত্রালাপ, সাক্ষাৎকার ও সংবাদপত্রে বিবৃতি। Order of the day জারী করবার মত উত্তপ্ত আবহাওয়া এ যুগে বড় একটা দেখা যায় না। সৈনিকের সমাধির ওপর তাই উঠেছে যুক্তির মিনার।…

ছেলেরা যখন একটা কিছু করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় হয়ে উঠলো আবেগ-চঞ্চল, আমি তখন মনে মনে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম আর-একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। চাঁপার গৃহে আর যাওয়া চলতে পারে না। কেষ্টলাল তার ছোটবেলাকার বন্ধু। তার মোহ কাটানো সম্ভব নয়। তাই সে বেশ সহাস্যে ও সহজেই রঙ্গলালের ফাঁদে পা বাড়িয়ে আবার ফসকে গিয়ে ধরা দিল কেষ্টলালের জালে। ওর ঘরে জল-ভরা যে সব বোতল রেখে আসা হয়েছে, এত দিনে নিশ্চয়ই কেষ্ট তার স্বাদ গ্রহণ করে দেখেছে এবং বুঝতে পেরেছে কলকাতার কাপ্তান সংক্রান্ত ব্যাপারে কোথাও গলদ আছে। কাজে কাজেই দেলভোগ আর যাওয়া চলে না।

একদিন বিকেলে শ্রীনগর থানায় সাপ্তাহিক হাজিরা দিয়ে ফেরবার পথে দেলভোগের হাটের কাছে একটু দাঁড়ালাম। সেদিন ছিল গরুর হাট অর্থাৎ ঐ দিনে শুধু গরু বেচা-কেনা হয়ে থাকে। বিরাট হাট। অসংখ্য গরুর সমাবেশ। অসংখ্য ক্রেতা। বহু হাজার টাকার লেন-দেন হয়। সন্ধ্যার পরও কিছুক্ষণ হাট চলে, তার পর ভিড় ভাঙতে থাকে।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল।…পরের সপ্তাহে আবার শনিবারে ঐ হাটে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দু'-একটা গাইয়ের দামও যাচাই করলাম নিরর্থক। অপর ক্রেতার প্রদত্ত টাকার পানে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, দেখলাম সরু দীর্ঘ থলিতে নোটের তাড়া পুরে দিয়ে বিক্রেতা সেটা কোমরে এঁটে জড়িয়ে রাখলো।…চলে এলাম।

তার পরের সপ্তাহেই সর্ব্ব আয়োজন শেষ হয়ে গেল। রঙ্গলাল ও বিপদভঞ্জনকে পাঠানো হলো দেলভোগ গরুর হাটে দুপুর বেলাতেই। ক্রেতা হিসেবে হাটে প্রবেশ করে তারা ঘুরে ঘুরে নানা রকম গরুর দাম যাচাই করতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে রাখলো খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য রাখবার জন্য কোন্ বেপারী বেশ মোটা টাকা কোমরে জড়িয়ে রাখছে। অনাথ আর খগেন অপেক্ষা করতে লাগলো হাটের বাইরে মাঠে আর কালাচাঁদকে নিয়ে আমি নিজে অপেক্ষা করতে লাগলাম আরও দূরে পুব দিকে মাঠের মাঝখানে যে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তারই ধারে। ক'জন লোক মাছ ধরছিল ছোট ছিপ ফেলে। পুঁটি ও ট্যাংরা মাছ। দেখতে ভালো লাগলেও সে দৃশ্য অকস্মাৎ আমাদের কাছে যেন অত্যধিক সুন্দর মনে হলো। তাই আমরা সাগ্রহে দাঁড়িয়ে গেলাম সেখানে। একটি চক্ষু ফাতনার দিকে নিবদ্ধ রেখে অপর চক্ষু প্রসারিত করে রাখলাম হাটের পথে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনো তিথি ছিল, বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই খগেন এসে সংবাদ দিয়ে গেল যে, রঙ্গলাল ও বিপদ হাট থেকে রওনা হয়েছে। একটু পরই দেখা গেল, তারা হাসিমুখে আলাপ করতে করতে আরো দশ জন পথিকের মতই হাট থেকে বেরিয়ে এল এবং আমাদের দিকে আড়চোখে একটি অর্থবোধক দৃষ্টি হেনেই এগিয়ে চললো দক্ষিণ দিকের পথ বেয়ে। কিছু দূরে থেকে থেকে আমরাও একে একে তাদের অনুসরণ করলাম।

যে পথটি দেলভোগ হাট থেকে বেরিয়ে খানিকটে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে আবার পুব দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে দক্ষিণে সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের কাছে মুন্সীগঞ্জগামী বড় সড়কের সঙ্গে মিশে গেছে, আমরা সেই পথে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে পেছনে পড়ে বিপদ এক সময় এসে চুপি-চুপি আমায় জানিয়ে গেল যে, সম্মুখে যে লোকটা ছোট একটা বাছুর নিয়ে চলেছে, অনেক টাকা আছে তার কাছে এবং সে-ই হচ্ছে আমাদের শীকার।

এগিয়ে চলতে-চলতে সহগামী পথিকের সংখ্যা ক্রমেই কমে এল এবং এক সময় দেখা গেল কিছু দূরে দূরে জন তিনেক লোক অনেকক্ষণ যাবৎ একই পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি করে গরু বা বাছুর আছে। নিশ্চয়ই বেচা-কেনার পর এটি অবশিষ্ট আছে, তাই বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। সবার সম্মুখে চলেছে যে লোকটি, তার মাথায় তেল চপ্‌চপে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বাবরী চুল বেড়িয়ে বাঁধা একটি গাঢ় লাল কাপড়ের টুকরো, সরু গোঁফ, থুঁতনিতে ছোট নূর, হাতে গরু চরাবার পাচন, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। লোকটাকে দেখলেই লাঠিয়াল বলে মনে হয়। তার পশ্চাতে কিছু দূরে যে লোকটি চলেছে, সে একেবারে বৃদ্ধ, দীর্ঘ শ্মশ্রুতে মুখ ঢাকা, ময়লা লুঙ্গি পরিধানে, কাঁধের ওপর ততোধিক

ময়লা গামছা। একটি অস্থিচর্ম্মসার বাছুর নিয়ে চলেছে সে। সবার পশ্চাতে যে চলেছে একটি গরুর দড়ি হাতে করে, সে একেবারে অল্পবয়সী, কুড়ি-একুশের বেশী হবে বলে মনে হয় না।

বিপদ আবার পেছনে পড়লো। বললো: দাদা, ঐ বাবরীওলাকে ধরতে হবে। কিন্তু আর ছুটো লোকও যে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এদের কি করা যায়?

বললাম: এক জনকে ধরবার কথা ছিল, এবার তিন জনকে ধরতে হবে।

সহজ জবাব পেয়ে সহজ সৈনিক বিপদের মন একেবারে নিসপিস করে উঠলো! বললো: তাহলে আমি ধরবো ঐ ছোকরাকে, আর বাবরীওয়ালাকে আপনি। কেমন দাদা?

পিঠ চাপড়ে বললাম: আমার সঙ্গে থাকবে তুমি।

আরও খুশী হয়ে উঠলো সে! অনুরোধ জানালো: তাহলে ওটা আমার কাছে দেবেন না?

হেসে জবাব দিলাম: তাহলে লোকটা অতি সহজেই প্রাণ হারাবে। খুব ঠাণ্ডা মাথা রাখতে হয় এ সব কাজে। পোড়ানো লোহার মতো তুমি যে গরম, ছুঁলেই পুড়ে যাবে।

বিপদ হাসলো।

আরো কিছুক্ষণ হাঁটা গেল। কিন্তু এই তিন জনের জুটি আর ভাঙবার নয়। আমরাই বা আর কত দূর এদের অনুসরণ করবো? গ্রামের পায়ে-চলা পথ অনেক সময় পাড়ার মধ্য দিয়ে, পুকুরপাড় ঘুরে, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, লাউয়ের মাচার নীচে দিয়ে, অনেক সময় একেবারে উঠানের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলে। এমনি ভাবে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হলো অনেক দূর।

আকাশে চাঁদ থাকলেও মেঘও আছে প্রচুর। সঞ্চরমান লঘু মেঘ। তাই চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলছে বেশ। কি মাস, তা মনে নেই। তবে হেমন্তের শেষাশেষি হবে। শীত একেবারে এসে না পড়লেও তার আমেজ অনুভব করা যায় সন্ধ্যে হতেই। গ্রামের চতুর্দ্দিকে নীরবতা এসে যায় সন্ধ্যের পরেই।

আর দেরী করা সঙ্গত মনে হলো না। পথঘাট ভালো করে জানা না থাকলেও আমরা যে বীরতারা অভিমুখে চলেছি, তা বোঝা গেল। সুতরাং বিপথে যাবার আশঙ্কা নেই।

আমরা ছয় জন, আর ওরা তিনটি। সুতরাং দু'জনের তিনটি দল তৈরী হয়ে গেল। সবার সম্মুখে চলেছে সেই বাবরীওয়ালা লাঠিয়াল, সবার পশ্চাৎ থেকে এগিয়ে এলাম আমি কালাচাঁদকে সঙ্গে করে। বৃদ্ধের পশ্চাতে এসে জুটে গেল রঙ্গলাল ও অনাথ। ছোট ছেলেটার কাছাকাছি এসে পড়লো খগেন ও বিপদভঞ্জন। এমনি ভাবে আরও কিছুক্ষণ চলবার পর আমরা একটা মাঠে এসে পড়লাম। এবং—

অকস্মাৎ আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাঠিয়ালের চোখের ওপর ছোরা তুলে হুকুম করলাম: এই, কী আছে টাকাকড়ি—বার কর। জলদি—

পশ্চাতের ছেলেরাও তেমনি একসঙ্গে লাফিয়ে পড়লো শীকারের ওপর।

লাঠিয়াল প্রথমটা হকচকিয়ে গেল, তার পর-মুহূর্ত্তেই পলায়নের চেষ্টা করতেই লাফিয়ে তার সম্মুখে এসে পড়লাম এবং প্রাণপণ শক্তিতে ছুরিকাঘাতের অভিনয় করে শুধু ছোরার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটি তার পিঠের ওপর চেপে ধরে কালাচাঁদকে হুকুম করলাম: ছুরি দিয়ে এর পেটের ঝলি বার করে ফেলতো রহমৎ।

রহমৎ তৎক্ষণাৎ ছোরা বার করতেই লোকটা কম্পিত স্বরে বললো: হুজুর, আমার লগে কিছুই নাই।

সুতরাং ছোরার অগ্রভাগ আরো একটু চেপে গেল মাংসের ভেতর। ধমক দিলাম: চোপরাও বেয়াদপ। কী আছে, বার কর, নইলে টুকরো টুকরো করে ফেলবো তোকে।

লোকটা তবুও ইতস্ততঃ করতে লাগলো। ছোরার ফলা নিশ্চয়ই ততক্ষণে আধ ইঞ্চি বসে গেছে। প্রয়োজন হলে আধ ইঞ্চি কেন, আধ হাত বসিয়ে দিতেও কসুর করবো না আমি। কিন্তু চরম ব্যবস্থা তখনই গ্রহণ করা হবে, যখন অন্য সব পন্থা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই ছোরার ফলাটি আরো একটু বসিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলাম পাখীর পালক দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেবার মতো করে। রক্তে লাঠিয়ালের ফতুয়ার একাংশ সিক্ত হয়ে উঠলো।

এবার হুঁস্ হলো শ্রীমানের। ধীরে ধীরে কোমর থেকে সরু থলিটা খুলতেই কালাচাঁদ সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেটস্থ করে ফেললো। আর যেই আমি ছোরাটি তুলে নিলাম, অমনি সাহসী লাঠিয়াল জমির মধ্য দিয়ে সোজা ছুটে পালাল তাড়া-খাওয়া পাতি শিয়ালের মতো। পড়ে রইলো তার পাচন, পড়ে রইলো তার মাথার লাল বৈজয়ন্তী। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো গরুটি।

এবার ছুটে এলাম বুড়ো বেপারীর দিকে। দেখলাম, বিপদভঞ্জন আর খগেনও ততক্ষণে এসে গেছে সেখানে। বুড়োর সাহস দেখা গেল প্রায় অসহনীয়। রঙ্গলাল বার বার ছোরা ঘোরাচ্ছে তার নাকের ডগায়, আর বার বার ধমক দিচ্ছে, কিন্তু সে মিন-মিন করে প্রাণভিক্ষা চেয়ে অনর্থক দেরী করাচ্ছে আমাদের। দেরী করবার সময় কোথায়? লাঠিয়ালকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, পালিয়ে গেছে সেই ছোকরা। কাছেই কোনো পাড়াতে গিয়ে উঠলেই কে জানে, লোক-জন ছুটে আসতে পারে লাঠি, সড়কি ও লণ্ঠন নিয়ে। অকস্মাৎ মনে হলো বৃদ্ধ খুব হুঁসিয়ার ব্যক্তি; ইচ্ছে করেই এমনি কাঁদুনী গাইছে কালহরণের অভিসন্ধিতে! সুতরাং—

এগিয়ে এলাম আমি। ছোরা বার করে লোকটার কাঁধের ওপর চেপে ধরলাম আর হুকুম করলাম রঙ্গলালকে: ওর চোখ ছুটো উপড়ে ফেল ছমিরুদ্দী!

খগেন পশ্চাৎ থেকে দু'হাতে জাপটে ধরলো ওকে আর রঙ্গলাল অদ্ভুত ঝাঁকুনি দিয়ে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানি একেবারে তুলে ধরলো ওর চোখের ওপর।···এবার কাজ হলো। লোকটা কেঁদে উঠলো: দিতেছি হুজুর, দিতেছি।—বলে সে কোমর থেকে সরু থলিটা খুলে ফেলে রঙ্গলালের হাতে তুলে দিল। আমরা ছেড়ে দিলাম ওকে।

কিন্তু কার্য্যান্তে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। কোথা দিয়ে কোন্ অজানা বিপদ এসে পড়বে, কে বলতে পারে!···ডবল্ মার্চ্চ করে রওনা হলাম জমির মধ্য দিয়েই সোজা উত্তর দিকে। কিছু দূর আসবার পরই এক জন পথচারীর সঙ্গে দেখা। আমরা তাকে অতিক্রম করে চলে আসতেই লোকটা পশ্চাৎ থেকে হাঁক দিয়ে প্রশ্ন করলো: কারা যায়?

বিপদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: Your forefathers!

হুঁসিয়ার করে দিলাম : ভুল করলে। লোকে রেগে গেলেই হিন্দী বা ইংরেজীতে কথা কয়। অন্যত্র তাতে কিছু না এলে-গেলেও এই কাজে নেমে খুব সতর্ক হতে হয়। আমরা সাধারণ ও নিরক্ষর মুসলমান ডাকাত সেজে যদি ইংরেজীতে কথা বলি, তাহলে আমাদের ছদ্মবেশ তো ব্যর্থ হবেই, উপরন্তু আই-বি এর মধ্যে পাবে স্বদেশীর গন্ধ। বুঝলে ?

লজ্জিত বিপদভঞ্জন ত্রুটি স্বীকার করলো।

বিপদভঞ্জনদের বাড়ীতে এসে দেখি আর এক বিপদ! রঙ্গলাল প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ছোরা উদ্যত করবার সময় তা আচমকা লেগে গেছে অনাথের কনুইয়ের নীচে। খানিকটে মাংস উপড়ে কোথায় পড়ে গেছে। প্রবল রক্তপাত হচ্ছে। অনাথের কাপড়-জামা ও গায়ের সাদা চাদরখানা লাল হয়ে উঠেছে। যদিও হাসিমুখে সে বার বার বলছে যে বিশেষ কিছু হয়নি, তথাপি আমি বুঝতে পারলাম, বেশ কিছু হয়েছে। দেরী করা চলে না। খগেন ও বিপদ এক মুঠো কচি ঘাস থেঁতলে নিয়ে এল তাড়াতাড়ি আর রঙ্গলালকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলাম হাঁসাড়া গ্রামে আমার রাজনৈতিক বন্ধু গোপাল সেনের দাদা ডাক্তার বিজয় সেনকে ডেকে আনতে। হোমিওপ্যাথিক হলেও বিজয় বাবুর নামডাক আছে।

ইতিমধ্যে কালাচাঁদ এসে বললো : মোট এক হাজার তিন শো কুড়ি টাকা পাওয়া গেছে।

অল্ রাইট্।

বিপদদের পুকুরের বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম। আকাশে তখনো চলছে চাঁদ ও মেঘের লুকোচুরি খেলা। সঞ্চরমান মেঘ। ঝিরঝিরে হাওয়া ভারী মিষ্টি লাগছে কপালে বুলিয়ে-দেয়া নরম হাতের মতো।······

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

৪৫

পূর্ব্বে যে কথা বহুবার বলেছি, বড়-গলায় আবারও সে কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কখনো কোনো অবস্থাতেই যেমন পুলিশের আশঙ্কায় বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত হয়ে কোনো পরিকল্পনার সামান্যতম সংশোধনও করিনি, তেমনি আশ্চর্য্যতম সত্য যে, সহস্র চেষ্টা করেও তারা কোনো দিন হাতে-নোতে ধরতে পারেনি আমায়। সন্দেহ করেছে তারা প্রবল ভাবে এবং অনেক সময়ই দেখা গেছে তাদের সন্দেহের পশ্চাতে আছে অকাট্য যুক্তি, কিন্তু সন্দেহের ফলে এক জনকে রাজবন্দী করে রাখা চলতে পারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সাজিয়ে যাবজ্জীবন আন্দামানে পাঠাবার জন্য তৈরি সাজানো যায় না।······

স্কুলগুলি থেকে এই যে জাতীয়তামূলক গ্রন্থরাজি উধাও হয়ে গেল এবং সর্ব্বশেষ পায়ে-চলা পথের ওপর এই যে ডাকাতি হয়ে গেল, পুলিশের সন্দেহ-পঙ্কিল মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগলো না যে, এর মূলে থাকতে পারে কোনো স্বদেশী দলের অদৃশ্য হস্ত! অনাথের হাতের গভীর ক্ষত বিজয় সেনের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সহজেই ও শীঘ্রই সেরে উঠলো। বন্ধু ও সহকর্মী গোপালের দাদা হলেও বিজয় সেনের কণ্ঠের তুলসী মালা ও তাঁর তিরিক্ষি মেজাজকে সর্ব্বদাই সমঝে চলতাম আমি। বৈষ্ণবের কন্ঠি যখন তাঁর মনে 'মেরেছিস্ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না' সঙ্গীতের চন্দন-প্রলেপ বুলিয়ে দিত, তখন সীমাহীন সরল হয়ে উঠে যেমন বিজয় সেন অকাতরে, কোনো দিকে দৃক্পাত না করে আমাদের গোপনীয়তম কথাগুলিও একটি-একটি করে প্রকাশ করে দিতে পারতেন একেবারে হাটের মাঝখানে, আমি জানি এবং নিশ্চিত ভাবে জানি, তেমনি ভাবে মেজাজের প্রাইমাস্ ষ্টোভটি একবার দপ করে জ্বলে উঠলেই শুধু যে শব্দব্যঞ্জনায় ও উৎপ্রেক্ষায় অগ্নিস্রাব ছড়াবেন তিনি তাই নয়, তখন হাতের কাছে একখানা হাতিয়ার পেলে হয়তো রক্তই দর্শন করে বসবেন বিজয় সেন। এমনি লোককে নিয়ন্ত্রণ বোধ হয় আমিই একা করতে পেরেছি যত দিন আমার সংস্পর্শে ছিলেন, তত দিন।

ঢাকা শহরে রঙ্গলালকে পাঠিয়ে কিং কোম্পানী থেকে বিজয় সেনের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কিনে আনা হলো—যত দূর মনে পড়ে, কেলেণ্ডুলা। প্রতিদিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ীতেই চলতো অনাথের ক্ষত ধোওয়া ও ব্যাণ্ডেজ। গ্রামের মধ্যে এই বাড়ীখানাই ছিল পুলিশের কঠিনতম নেক-নজরে এবং বোধ হয় সেই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান ছিল এই বাড়ীটি। গ্রামে আমরা রটিয়ে দিলাম যে, মোহনগঞ্জ হাটে রঙ্গলাল ও অনাথ গিয়েছিল বেড়াতে। সেখানে একটি লেমনেডের বোতল খুলতে গিয়ে অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হয় এবং এক টুকরো কাচে অনাথের হাত কেটে গেছে। গ্রামের লোককে স্বকপোলকল্পিত গল্পে ভুলিয়ে দিলেও পুলিশ বা আই-বি এই চুরি ও ডাকাতি সম্পর্কে কেন যে অবিলম্বে আমাদের বাড়ীতে হানা দিল না, তা আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। সমগ্র বিক্রমপুরের যেখানে যত রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক ডাকাতি বা নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির জন্যই আই-বি সহযোগে পুলিশ প্রতি সন্ধ্যায় মা কালী দর্শনের মতো একবার করে কেয়টখালীর গাঙুলী-বাড়ীতে হানা দিতই, অথচ এত কাছে এমনি নিখুঁত ডাকাতির পর একটি বারও তাদের টিকিটিরও দেখা পাওয়া গেল না।

অবশ্য শ্রীনগর থানার দুর্দ্ধর্ষ যতীন দারোগা যে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিয়ে থাকেননি, তা পরে জানতে পারা গেল। ঐ রাত্রেই তাঁরা দেলভোগে চম্পকরাণীর গৃহে সদলবলে হানা দেন। সেখানে এক দল বিদেশী গ্রাহক সে রাত্রে চম্পকরাণীর নৃত্যে ও গোলাপী পেয়ালার মধু-রসে একেবারে নন্দনকানন সৃষ্টি করছিলেন। যতীন দারোগা সে কমলবনে মত্ত করীর মত প্রবেশ করলেন। মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে তাদেরকে নিয়ে এলেন থানায় এবং পেটেণ্ট দাওয়াই প্রয়োগে পেটের কথা টেনে বার করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হায়, সেখানে যে দেশী মালের সমুদ্র—তরঙ্গহীন, অন্তহীন, অতলস্পর্শ! সেখানকার কথা শুধু চম্পকরাণীর ঠুংরী ও গজল।··· তাই শেষ কালে গলাধাক্কা দিয়ে সে দলকে থানা থেকে বার করে দিয়ে দু'হাত ঝেড়ে ফেললেন যতীন দারোগা।

অতএব বোঝা গেল আমরা পুরোপুরি কৃতকার্য্য হয়েছি। স্কুলের জাতীয়তামূলক গ্রন্থরাজি চুরি ও এই ডাকাতি এমনি নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধা করা হয়েছে যে, পুলিশের মগজে এগুলো আদৌ কাঁটার মতো বেঁধেনি।···অবশ্য এক দিন এঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল, কিন্তু সে বড্ড দেরীতে···সে ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত করবো।

বন্দীশিবিরের রাজবন্দীদের কাছে আই-বি দারোগারা সে সময় সদম্ভে ঘোষণা করতেন যে, বিক্রমপুরের বৈপ্লবিক তৎপরতার কণ্ঠ তাঁরা এমনি ভাবে দু'হাতে চেপে ধরেছেন যে প্রাণত্যাগ করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। ঠিক সেই সময় আমার গুপ্ত কার্য্যাবলীর ঝলকানি তাঁদেরকে মাঝে মাঝে এমনি বিভ্রান্ত করে তুলতো যে, আমায় তাঁরা মনে করতেন একটি মারাত্মক বিস্ফোটক। সরকারী ভাবে কখনো ঢাকা থেকে কোনো আই বি অফিসারই আসেননি আমাদের বাড়ীতে রঙ্গলাল বা আমার সঙ্গে কথা কইতে এবং কথোপকথনের মাধ্যমে উত্তেজক কিছু নৈবেদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে যোগিনী বসু বা জিতেন ধরের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করতে। অথচ পরে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম যে, বে-সরকারী ভাবে তাঁদের মধ্যে অনেক ধুরন্ধরই রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন আমাদেরই বাড়ীতে আশে-পাশে নিশাচর প্রেতের মতো। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, ব্রেক ও স্মিথের মতো আমার ও রঙ্গলালের মৃত্যু নেই কোনো কালে।

যাঁরা বলেন আই-বি পুলিশ অত্যন্ত বুদ্ধিমান তাঁদের একস্‌রে আইজ ও শারলক হোমি কর্ম্মতৎপরতার প্রচণ্ড তোড়ে সে যুগের বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সর্ব্বপ্রকার সতর্কতার বর্ম্ম একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে ভেঙে পড়েছিল, আমি তাঁদেরকে বলবো এবং সর্ব্ব দায়িত্ব নিয়েই বলবো যে তাঁরা ভ্রান্ত, শোচনীয় ভাবে অন্ধবিশ্বাসী। যেখানে যত ষড়যন্ত্র-মামলা হয়েছে, তার সূচনায় আই-বি পুলিশের তদন্তের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওলটালে নিশ্চয়ই দেখা যাবে, লিপিবদ্ধ রয়েছে আমাদেরই সহকর্ম্মী ও বিশ্বস্ত সুহৃদের বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কময় কাহিনী। প্রকাশ্যে, স্পেশাল ট্রাইবিউনালের এজলাসে দাঁড়িয়ে আসামীর কাঠগড়ায় সমবেত সহকর্মীদের একটি-একটি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সনাক্ত করে দিয়ে তোতা পাখীর মতো শিখিয়ে-দেয়া বুলি উচ্চারণের মর্ম্মান্তিক সত্য কাহিনী কারুর অবিদিত নেই। রাষ্ট্রবিরোধী পাপকার্য্যের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে নাকে খৎ দিয়ে মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের করুণাভিক্ষার ঘটনাগুলিও নিশ্চয়ই মন থেকে মুছে যায়নি। সেখানে আই-বি পুলিশের কৃতিত্ব কোথায়? যতগুলি বৈপ্লবিক গুপ্তকার্য্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে বুক ঠুকে পুলিশ প্রচার করে বেড়িয়েছে নিজেদের দূরদর্শিতা ও কৃতকার্য্যতার কাহিনী, তার প্রত্যেকটির মূলে আছে আপনার, আমার, সবার বিশ্বস্ততম সুহৃদের নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা।…পশ্চাৎ থেকে আমরাই ছুরি মেরেছি আমাদের দেশের বিপ্লবীদের জল্লাদ মীরণের মতো, জগৎশেঠ-উমিচাঁদের নীল রক্ত এখনও অবশিষ্ট রয়েছে আমাদের ধমনীতে। তিক্ততম এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।…

অকস্মাৎ একদিন পুলিশ এসে হানা দিল আবার আমাদের বাড়ীতে। দেখা গেল, এবার লাল পাগড়ীর সংখ্যা প্রায় জন কুড়ি, যতীন দারোগা একা নন, সঙ্গে এসেছেন সহকারী দারোগা রবীন দত্ত। বোঝা গেল, এবার সত্যিই তল্লাসী হবে। প্রস্তুত হলাম।

যতীন দারোগাকে যেন একটু গম্ভীর মনে হলো। চা দিতে চাইলাম, আপত্তি জানালেন, বললেন: চা খেতে তো আমি আসিনি। যে কাজে এসেছি, তাই শেষ করে চলে যাবো। তথাস্তু। কিন্তু যতীন বাবু আবার বললেন: মহিলাদের একটি ঘরে অপেক্ষা করতে বলুন দ্বিজেন বাবু! কেউ যেন এখন এই বাড়ী ছেড়ে না যান, আর নতুন কেউ যেন না আসেন। সব দেখা হয়ে গেলে মহিলাদের দয়া করে একটি বার আমাদের সম্মুখ দিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে হেঁটে যেতে হবে, আপনি ওঁদেরকে একটু বুঝিয়ে বলুন দ্বিজেন বাবু! ওঁরা আবার কিছু মনে না করেন—

বাধা দিলাম: না, না, এতে মনে করবার কী আছে! আজ নিয়ে বোধ হয় বাইশ বার এই বাড়ী তল্লাসী হচ্ছে, একটি ছুঁচও পাওয়া যায়নি কোনো কালে। কিন্তু যতীন বাবু, আজ মহিলাদের সম্বন্ধেও এতটা সতর্কতার কারণ জানতে পারি কি? বোধ হয় কোনো পলাতক রাজনৈতিক আসামী মহিলা সেজে লুকিয়ে আছে, এই সংবাদই পাঠিয়েছে আই-বি কর্ত্তারা?

যতীন বাবু হেসে বললেন: হবে হয়তো।

সুরু হলো তল্লাসী বেশ তোড়জোড় করে। আমি কিন্তু প্রতিবারের মতো নিশ্চিন্তেই ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। একেবারে যে কিছু নেই, তা নয়। একটা রিভলভার, গোটা চারেক ছোরা ও খান দশেক বাজেয়াপ্ত বই আছে। কিন্তু কোথায়? দক্ষিণের কোঠার দেয়ালে একটি কুলুঙ্গি আছে, তার ওপর চমৎকার করে একখানা বড় ক্যালেণ্ডার-আঁটা। পুলিশের মগজে কুলুঙ্গির কথা আসতেই পারে না, কারণ আর কোনো কোঠায় এমনি কুলুঙ্গি নেই।…আমার নির্লিপ্ততায় যতীন দারোগা যে খুশী নন, তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না আমার।

কিন্তু আমার কাচের আলমারীর বইগুলো তল্লাসীর সময় অকস্মাৎ যেন সাপ বেরিয়ে পড়লো। যতীন দারোগা মহা উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন: Here it is! here it is! যা চেয়েছিলাম, তাই। স্কুল থেকে চুরি-করা বই! রবীন, ভালো করে খুঁজে দেখ, আর কতখানা এমনি ব্লেড দিয়ে স্কুলের সিল-কাটা বই পাওয়া যায়।

চমকে উঠলাম। তাহলে হেনা সব সরাতে পারেনি দেখা যাচ্ছে। কোনোখানাতেই সিল নেই সত্য, কিন্তু মালখানগর, কুসদী, হাসাড়া প্রভৃতি স্কুল থেকে যে-সব বই সম্প্রতি উধাও হয়ে গেছে, এগুলো যে তারই অন্যতম, সে সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেল।…চোরাই মাল পাওয়া গেছে। সোজা চারশো এগারো ধারা। এবার কোথায় যাবে দ্বিজেন গাঙুলী?…স্পষ্ট দেখতে পেলাম, যতীন দারোগার চোখে-মুখে খুশীর হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক আলো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। আর তল্লাসী করে কী হবে? প্রয়োজন কী? এবার শুধু প্রয়োজন চমৎকার করে তল্লাসী-তালিকা তৈরী ও নিখুঁত ভাবে রিপোর্ট রচনা। বিশেষ বার্ত্তাবহ মারফৎ সেই রিপোর্ট ঢাকাতে পাঠাতে-না-পাঠাতেই আসবে প্যাসবি সাহেবের ফরমান্: arrest that scoundrel! তার পরের ঘটনাগুলো ঘটবে দ্রুতগতি যন্ত্রের মতো—গ্রেপ্তার, তদন্ত, চার্জ্জসীট দাখিল, মুন্সীগঞ্জে বিচার, উকিলের সওয়াল……তার পর গম্ভীর মুখে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কামাখ্যা মৈত্রের রায় পাঠ…অতএব, আইন ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত এই গভর্ণমেন্ট ও সম্রাটের অনুগত প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার খাতিরে আমি আসামী

আদর্শ
লিভার টনিক
ORCL'S
QUMARESH
লিভারের রোগে কুমারেশ নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়—কিন্তু সুস্থ অবস্থায়ও কুমারেশ কম প্রয়োজনীয় নয়।
কুমারেশ অসুস্থ লিভারকে আরোগ্য করে এবং সুস্থ অবস্থায় লিভারকে সবল ও কার্য্যক্ষম রাখিতে সাহায্য করে।
কুমারেশ
ও, আর, সি, এল, লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।

দ্বিজেন গাঙুলীর প্রতি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিতেছি······

একটু চা হবে কি ?

আমার প্রশ্নে চমকে উঠলেন যতীন দারোগা। আকাশ-কুসুম রচনায় বোধ হয় বাধা পড়লো! বললেন: চা! না, না, চায়ের প্রয়োজন নেই, এবার তাড়াতাড়ি থানায় যাবার আয়োজন করতে হয়।

উনিশ-শো আটাশ সালের গোবরকে চকিতে চিৎ করে ফেলে দিয়ে অসংখ্য শীল্ড, কাপ ও মেডেল নিয়ে সমবেত জনতার মুহুর্মুহু আনন্দ-ধ্বনির মাঝে কুস্তিগীর গামা যেভাবে কলকাতার পার্ক-সার্কাসের বিরাট মণ্ডপের বাইরে এসে উঠেছিলেন অপেক্ষমান মোটরে, ঠিক তেমনি আমায় একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে কোলাহলরত পুলিশদের মধ্য দিয়ে যতীন দারোগা আট-দশখানা বই হাতে নিয়ে গট-গট করে এসে উঠলেন তাঁর অপেক্ষমান নৌকোয়। সদলবলে রবীনও গিয়ে তার নৌকোয় আরোহণ করলো। দেবেন কাকা ও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য জমির কারিগর ছিলেন তল্লাসীর সাক্ষী, সাদা তালিকার নীচে স্বাক্ষর করে তাঁরা সরে পড়লেন। পাড়ার কৌতূহলী দু'-চার জন এসেছিলেন দর্শক হয়ে, তাঁরাও নৌকা ভাসালেন।

যতীন বাবুর পশ্চাতে আমিও এসে নৌকোয় উঠলাম এবং পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তমিজদ্দী চৌকিদারের লম্বা দাড়ির ফাঁকে হাসির ছুরি চক্-চক্ করছে। এইবার শালা বোধ হয় আগুনের প্রতিশোধ নেবে আর পাবে মোটা রকমের বখশিস।······

বেশ ভারিক্কি সুরে কথা কইলেন যতীন দারোগা: কোথায় পেলেন এই বইগুলো ?

উদাস কণ্ঠে জবাব দিলাম: কিনেছি—সে অনেক কাল আগে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথে। যাই বলুন, ভারী সস্তা কিন্তু দারোগা বাবু, মাত্র চার আনা করে।

ভেতরের ষ্ট্যাম্পগুলো সাবধানে কাটা কেন ?

কেন-র যা উত্তর হতে পারে, তাই দিলাম: চোরাই মাল-টাল হবে হয়তো। নইলে জলের দামে দেয় কী করে।—এই দেখুন না, গোর্কির মাদার, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, সঞ্চয়িতা, ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—এর এক-একখানার সত্যিকার দাম কত, একবার দেখুন!

আমার হাত থেকে বইগুলো ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে নিজের কোলের পাশে গুছিয়ে রাখে দারোগা বাবু বিড়াল-ছানার মতো। তার পর বেশ টেনে উচ্চারণ করলেন: হুঁ—মুসকিল কি জানেন দ্বিজেন বাবু, কিছু দিন হলো গোটা কয়েক স্কুল থেকে এমনি ধরণের অনেকগুলো বই চুরি গেছে। জানেন না সে সংবাদ ?

কই, না তো!

স্কুলগুলির তালিকা দিলেন দারোগা বাবু, তার পর বললেন: বইগুলো আমায় একবার থানায় নিয়ে যেতে হবে, স্কুলের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

প্রমাদ গুণলাম! বেশ বুঝতে পারলাম, থানায় গেলেই সব বেফাঁস হয়ে যাবে এবং এই চুরির মধ্যে স্বদেশীর কটু গন্ধ একবার পেলেই ঝপাঝপ গ্রেপ্তার করে ফেলবে ছেলেদের। মামলাও চালাবে নিশ্চয়ই. সাজা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছুই নয়। অবশেষে কি পরাজয় মানতে হবে পুলিশের কাছে?···

ঘাবড়ে না গেলেও একটু চিন্তিত হলাম। বোধ হয় কোনো সূত্র থেকে সংবাদ পৌছেছে শ্রীনগর থানায়। আই-বি কাণ অবধি বোধ হয় এখনও পৌছেনি, নইলে এই তল্লাসী অভিযানের পুরোভাগে নিশ্চয়ই দেখা যেত সেই বীরপুঙ্গব দলকে। পুরো কেরামতিটা নিজেই গলাধঃকরণ করবার উদ্দেশ্যে বড় দারোগাকে দিয়ে এই তল্লাসীর হুকুম করিয়ে নিয়ে এসেছেন যতীন দারোগা! তাই আজ এত গম্ভীর তিনি সেই সুরু থেকেই। তাই চা—

অকস্মাৎ আবার বললাম হেসে: সে যা করেন, করবেন'খন মশায়। এখন আসুন তো, একটু চায়ের বাটিতে চুমুক দেয়া যাক্—

না, না, চা খাবো না, পেটটা আজ সকাল থেকে খারাপ যাচ্ছে। বাড়ীতেই খাইনি।—বলে একটু অস্বস্তির ভাণ করলেন তিনি।

বোঝা গেল, আজ আর চা চলবে না। ব্যাটা চালাক হয়ে গেছে।

একথা-সেকথা তাই সুরু করলাম ওর মনটা হাল্কা করে দেবার জন্য। দেশের বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতি থেকে সুরু করে একেবারে আজকের ইলিশ মাছের দর পর্য্যন্ত আলোচনা হলো। কাটলো অবশ্য ঘণ্টা খানেক, কিন্তু দেখলাম, ইলিশ মাছেও যতীন দারোগার মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব হলো না।

বইগুলো সে নিয়ে যাবেই।···

রবীন এসে জানালো: স্যার, বেলা বারোটা বাজে।

এঁ্যা,—চমকে উঠলেন দারোগা বাবু: বল কি? তাহলে এক কাজ কর। তোমার নৌকোয় সিপাইদের নিয়ে চলে যাও তুমি। আমি পরে আসছি, বলো বড়বাবুকে।

রবীন স্যালুট করে বেরিয়ে গেল। ওদের নৌকো চলে গেল। রইলো গোটা চারেক মাল্লা আর দুটো পুলিশ আর যতীন দারোগা। তমিজদ্দী একটু আড়ালে গেল বিড়ি খেতে। আমার দলবল নিয়ে এদের সায়েস্তা করা কিন্তু আমার কাছে কঠিন কাজ নয়। বইগুলো ছিনিয়ে নিয়ে একবার জলে ফেলে দিতে পারলেই তো কেল্লা ফতে। বর্ষার স্রোতে কোথায় তলিয়ে যাবে হদিসই তার পাওয়া যাবে না। কিন্তু গায়ের জোর সর্ব্বত্র সমান ভাবে নির্ব্বিচারে প্রযোজ্য নয়। কোনো কোনো সময় কব্জির চাইতে মগজের শক্তি বেশী কার্য্যকরী দেখা যায়! এ ক্ষেত্রেও মগজ চালানোই প্রশস্ত মনে হলো। অবশ্য দেখলাম, প্রতিপক্ষও আজ অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ!

আসরে নেমে পড়লাম তাই বুদ্ধির খরধার তলোয়ার নিয়ে। সে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলায় যতীন দারোগার ম্যাজিনো লাইনের কংক্রীট কচু কাটাবার মত কেটে ফেলতে লাগলাম। সহস্র রকম যুক্তিপূর্ণ কথার পদাতিক সেনা ছড়িয়ে দিলাম পিপীলিকার মতো। দারোগার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দূরপাল্লার কামানের অবিশ্রাম গোলার আঘাতে তারা দলে দলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও রক্তবীজের ঝাড় এগিয়ে চললো, যেমন করে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির নেশায় জার্ম্মাণ গুলী-গোলা অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করে এগিয়ে চলেছিল ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদল।

আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথার হাল্কা অবতারণায় যোগ দোব না বলে শপথ গ্রহণ করে দারোগা মুখ ফিরিয়ে বসে থাকলেও আমার সাঁড়াশী অভিযানের সম্মুখে তার নির্লিপ্ততা কতক্ষণ টিঁকে থাকতে পারবে? তাই ঘণ্টা খানেক প্রতিরোধের পর যতীন দারোগা পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হলেন, ড্রানকার্কের পুনরাবৃত্তি হলো।…

আমার কম্বু-কণ্ঠ যুক্তির অগ্নিস্রাব ছড়িয়ে তখন ধাওয়া করে চলেছে পলায়মান শত্রুকে: এতে আপনার ব্যক্তিগত লাভ কী হবে, সত্যি করে বলুন তো? ওপরওয়ালার'কাছ থেকে দু'-এক লাইন প্রশংসা-বাণী ব্যতীত আর কী পাবেন? ওতে পেট ভরবে কি? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আপনিও তো বাস করেন, মিষ্টি কথার চাইতে দুটো টাকার মূল্য আপনার কাছে বেশী নয় কি?…আর এ একেবারে দুটো নয়, পুরো একশো টাকার কথা বলছি। কাল সকালে গিয়ে আমি একটি-একটি করে দশখানা নোট গুণে দিয়ে আসবো আপনার বাড়ীতে।…যতীন বাবু, আমরা যে কাজে আত্মোৎসর্গ করেছি, সে কাজ তো সমগ্র দেশের, আপনারও। দেশ স্বাধীন হলে শান্তি পাবেন আপনি নিজেও। প্রকাশ্য ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন না সরকারি চাকরি করেন বলে, তা স্বীকার করি। কিন্তু এমনি ভাবে যদি কিছু করা যায়, যাতে আমাদের যেমন সাহায্য হয়, তেমনি আপনিও না ধরা পড়ে যান, তাহলে কেন তা করবেন না আপনি? দেশের নামে স্বদেশী দলের পক্ষ থেকে এই অনুরোধটি কি করতে পারি নে আমি আপনাকে?

দুর্যোধনের মতো একেবারে উরু ভেঙে পড়বার পূর্ব্বে যতীন দারোগা বিড়-বিড় করতে লাগলেন: তবুও তো জানেন, honesty of profession বলে একটা জিনিষ আছে তো—

এবারে একেবারে এ্যাটম বোম্ নিয়ে আকাশে উঠলাম: honcsty of profession? কার কাছে? এই অত্যাচারী বৃটিশের কাছে honesty? ভারত অধিকারের কালো ইতিহাসের কোনো পৃষ্ঠায় আছে কি এদের honestyর কথা? কোথাও দেখিয়েছে কি এরা বিন্দুমাত্র সততা? বেইমান প্রভুর কাছে সাধুতার সার্থকতা আছে কি?—

যতীন বাবু বললেন: কিন্তু ব্যাপার কি জানেন দ্বিজেন বাবু, রবীন জেনে গেছে যে, কতকগুলো বই পাওয়া গেছে।

বাধা দিলাম: রবীন! ওর সাধ্য হবে A. S. I. হয়ে আপনার মত একজন senior officerএর বিরুদ্ধে যাবার?

জানেন না দ্বিজেন বাবু, আমাদের পুলিশ লাইনটাই এমনি হারামির জাত। Bossএর কাণে লাগিয়ে নিজের উপকার কিছু করতে পারুক আর নাই পারুক, পরের অপকার করবার চেষ্টা সব শালাই করে থাকে।

হেসে বললাম: আচ্ছা, তাহলে না হয় ঐ রবীন শালাকেও দোব গোটা পঞ্চাশেক। তাহলে তো আর ভাবনা থাকবে না?

এবার হাসলেন যতীন বাবু, রীতিমত হাসলেন, বললেন: টাকা পেলে ওরা ঢেঁকিও হজম করে ফেলতে পারে।

কাজ হাসিল হয়ে গেছে। আমার কাঁদে গলা বাড়িয়ে দিয়েছেন দারোগা বাবু। হ্যাঁচকা একটি টান মারলেই একেবারে ফাঁসী, ভল্লুক তখন টুমটুমির তালে-তালে নাচবে। এবার তাই সিংহাসন-ত্যাগী ঔরংজেবের ভঙ্গির সুরু করলাম: না, না, ভেবে দেখুন যতীন বাবু, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, এ ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। এ পথে আমরা যখন নেমেছি, তখন সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েই এসেছি। কিন্তু তা বলে আপনার ব্যক্তিগত অকল্যাণ আমাদের কাম্য হতে পারে না। ফিরিয়ে নিয়ে যান না বইগুলো, যদি মনে করেন তাই আপনার কর্ত্তব্য। কী আর হবে এর ফলে? জনকতক ছেলে ধরা পড়বে, রাজবন্দীর সংখ্যা কিছু বেড়ে যাবে আর হয়তো আমার সাজা হয়ে যাবে কয়েক বৎসর!—তা হোক না, এখানে থেকে আমি তো সেই শুভদিনেরই প্রতীক্ষায় আছি, দেশের কাজে আন্দামান, ফাঁসী—

মহা অপরাধীর মতো গদ্‌-গদ্‌ করে উঠলেন যতীন দারোগা: ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন দ্বিজেন বাবু! নিন্, এই নিন্ বইগুলো, আজই সরিয়ে ফেলবেন। রবীনকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নোব। আপনি সকাল নটার মধ্যেই সোজা আমার বাসায় গিয়ে উঠবেন। মনে রাখবেন, বাবুদের বাড়ী ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে যাবেন, থানার কেউ যেন না দেখে।

বইগুলো নিয়ে ছইয়ের বাইরে আসতে যতীন দারোগা আবার বললেন: রবীন—তা পনেরোখানা নোটই নিয়ে যাবেন দ্বিজেন বাবু, কেমন? সাপের জাতকে বিশ্বাস নেই মশাই! আর আপনার আমার ওখানে চা খাবার নেমন্তন্ন রইলো বুঝলেন?

বললাম: চা তো আমি খাই নে।

খান না?

না, কারণ আপনি নিজে আজ আমার এখানে চা খেলেন না।

হা-হা করে পাগলের মতো হেসে উঠলেন যতীন দারোগা, বললেন: খাবো, খাবো। শুধু চা কেন, একেবারে পেট ভরে খেয়ে যাবো একদিন। আরে মশাই, তাও কি নিশ্চিন্তে পারবার যো আছে? ঐ আই-বি শালাদের কি মশাই, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানটুকুও থাকতে নেই? Honesty of professionটুকুও তো রাখতে পারে?

মনে মনে হাসি পেল। চোরাই মাল হাতে পেয়ে দেড়শো টাকার লোভে তা ছেড়ে দিয়ে সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখালেন উনি। আবার বড়াই হচ্ছে Honestyর!

নৌকো ছাড়বার সময় গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতিটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন: আপনার জন্য আমি প্রতীক্ষায় থাকবো কিন্তু দ্বিজেন বাবু! সকাল ন'টার মধ্যেই—

নৌকো ম্যাজার বাড়ীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই রঙ্গলাল এসে জানালো: প্রায় দুটো বাজে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। শেখরনগর যেতে হবে মনে আছে তো?

…কিন্তু পর দিন, তার পর দিন, তারও পর দিন এবং তারও পর-পর করে-করে অনেক দিনই চলে গেল, আমার নৌকো কোনো সকাল বেলাই আর বাবুদের বাড়ী ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি যতীন দারোগার ঘাটে ভিড়লো না।

বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার প্রতীক্ষা আর শেষ হলো না।

[ক্রমশঃ।

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দশ

এই দিকেই এগিয়ে আসছে ছায়া-মূর্তি দু'টো। কাছে আরো কাছে—এতক্ষণে তাদের অস্পষ্ট কথাবার্তার দু'-একটা টুকরো টুকরো শব্দও কানে আসছে।

চমকে উঠলাম এবারে, চিনতে পেরেছি ওদের। শতদল ও সীতা। দূরের একটানা সমুদ্র-গর্জনকে ছাপিয়েও ওদের মৃদু কথার শব্দতরঙ্গ আমার কানে এসে প্রবেশ করছিল। অন্ধকারে স্পষ্ট না দেখতে পেলেও কণ্ঠস্বরে ওদের চিনেছি। সীতা বলছিল, 'তুমি জান না শতদল, মায়ের দৃষ্টি কি অসম্ভব প্রখর! আমার মনে হয়, ঘুমের মধ্যেও তার দু'চোখের দৃষ্টি আমার সমস্ত গতিবিধির 'পরে রেখেছেন। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন এত রাত্রে তোমার সঙ্গে আমি বাড়ির বাইরে এসেছি—'

'সেই জন্যই আরো 'নিরালার' বাইরে এলাম। তোমার মার শকুনির মত দৃষ্টি। সত্যি বলছি আমার গা শির-শির করে!—' শতদল জবাব দেয়: 'তাই ত চিঠি লিখে তোমার এত রাত্রে এই বাইরে ডেকে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়েছে।'

'কিন্তু আমি যে তোমার চিঠি পেয়ে এত রাত্রে বাইরে আসবো ভাবলে কি করে? যদি না আসতাম?—'

'আমি জানতাম তুমি আসবেই, সেই জন্যই চিঠি দিয়েছিলাম।—যাক্, এই পাথরটার উপরেই এসো বসা যাক্।—'

পথের ধারে একটা বড় পাথরের উপরে দু'জন পাশাপাশি বসল আমার দিকে পিছন ফিরে, এ একপক্ষে ভালই হলো। আমি যে পাথরটার আড়ালে আত্মগোপন করেছিলাম সেই পাথরটা থেকে হাত তিনেক দূরেই বড় পাথরটার উপরে দু'জনে পাশাপাশি বসেছে।

মাথাটা একটু উঁচু করে দেখলাম, পিছন ফিরে সীতা বসে আছে, সাগর-বাতাসে তার সাড়ীর আঁচলটা ও খোলা চুলের রাশ উড়ছে। সীতার একেবারে গা ঘেঁষে বসে আছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে শতদল।

শতদলের কথায় সীতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর এক সময় বলে, 'সব-কিছুর পরেও তুমি কি করে আশা করেছিলে শতদল যে আমি আসব তোমার চিঠি পেয়ে?—'

'তুমি আমাকে আগাগোড়াই ভুল বুঝেছো সীতা!—'

'সব জায়গায় ভুল করলেও একটা জায়গায় মেয়েমানুষ বড় একটা ভুল করে না।—' সীতা জবাব দেয়।

'মানুষ মাত্রেই ভুল করতে পারে সীতা, তা সে কি মেয়েই হোক বা পুরুষই হোক। একতরফা তুমি বিচার করেছো।—'

'একতরফা বিচার করেছি?—' সীতার কণ্ঠে যেন বিস্ময়ের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

'নিশ্চয়ই। কেন যে তুমি হঠাৎ আমার 'পরে বিরাগ হয়ে উঠলে সেটা তুমি আমায় জানান পর্যন্ত কর্তব্যবোধ করলে না!—'

'জলের মতই যেখানে সব-কিছু পরিষ্কার সেখানে গলা উঁচিয়ে জানাতে যাওয়াটা কি বিড়ম্বনা নয়? কিন্তু পুরাতন কাসুন্দি ঘেঁটেই বা কি আর লাভ বল?—'

'তাহলে সত্যি সত্যিই তুমি আমাদের অতীত সম্পর্কটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ধুয়ে-মুছে ফেলতে চাও সীতা?—'

'সব দিক দিয়ে এ ক্ষেত্রে সেটাই ত বাঞ্ছনীয় শতদল! সেতারের একবার তার ছিঁড়ে গেলে আর কি ছেঁড়া তার জোড়া লাগালে পূর্বের সেই সুর বের হয়?—তবে কেন আর?—'

'কোন কথাই তাহলে তুমি আর আমার শুনতে চাও না?—'

মনে মনে আমি সীতার কথা শুনে না হেসে পারি না। এমনই মেয়েদের মন বটে! সমস্ত সম্পর্ক শতদলের সঙ্গে ধুয়ে-মুছে গেছে বলেই বুঝি শতদলের একখানা চিঠি পেয়ে এই নিশুতি রাত্রেও বাড়ির বাইরে আসতে দ্বিধা বোধ করেনি।

'শোন সীতা, কি কারণে তুমি হঠাৎ আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছো না জানি না। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ত আজকের নয়—গত তিন বৎসর হ'তে—এই তিন বৎসরেও কি আমাকে তুমি বুঝতে পারোনি?—'

'এত দিন তোমাকে বুঝতে পেরেছি বলেই আমার ধারণা ছিল কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার সে জানাটাই ভুল। কিন্তু সে কথা যাক্। কি জন্য এত রাত্রে এ ভাবে চিঠি লিখে তুমি আমাকে এখানে ডেকে এনেছো বল?—'

'আমাকেই যখন তুমি আর বিশ্বাস করতে পারছো না, তখন সে কথা তোমার আর শুনেই বা লাভ কি বল? থাক সে কথা—' শতদলের কণ্ঠে সুস্পষ্ট অভিমানের সুর।

এর পর কিছুক্ষণ দু'জনাই স্তব্ধ হ'য়ে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না। অখণ্ড রাত্রির স্তব্ধতা শুধু অদূরবর্তী গর্জমান সাগরের কলকল্লোলে পীড়িত হ'তে থাকে।

এদের মান-অভিমানের পালা-গান কতক্ষণ চলবে কে জানে? কিরীটির উপরে সত্যিই রাগ ধরছিল। নিজে দিব্যি হোটেলের বিছানায় আরাম করে নাক ডাকাচ্ছে আর আমাকে এই শীতের রাতে ঠেলে দিয়েছে। কি কুক্ষণেই যে ওর পাল্লায় পড়ে এই জায়গায় মরতে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, কয়েকটা দিন নিশ্চিন্ত আরামে কাটিয়ে দিয়ে যাওয়া যাবে সাগর-সিনারী দেখে, তা না,

কি এক ঝামেলায়ই না পড়া গিয়েছে! কোথাকার কে এক পাগলা আর্টিষ্ট, পাহাড়ের উপরে এক হানা-বাড়ি, যত সব ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা, তার মধ্যে মিথ্যে মিথ্যে এমন করে জড়িয়ে পড়বার কি প্রয়োজন ছিল বাপু?

হঠাৎ আবার সীতার কথায় চমক ভাঙল।

'তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছো শতদল!—'

'প্রতারণা করেছি? এ-সব তুমি কি বলছো সীতা?—শেষ পর্যন্ত তুমি এ কথা বললে যে, তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করেছি?—'

'হ্যাঁ। প্রতারণা। নিশ্চয়ই। প্রতারণা বৈ কি! আজ বুঝতে পারছি, দিনের পর দিন তুমি আমার সঙ্গে প্রেমের খেলাই খেলে এসেছো। মনের মধ্যে এক জনের চিন্তা অহোরাত্র করে বাইরে আর এক জনের সঙ্গে তুমি খেলা করেছো। কিন্তু কি এর প্রয়োজন ছিল? আমি ত যেচে তোমার কাছে গিয়ে কোন দিন দাঁড়াইনি। তুমি—' শেষের দিকে 'সীতার কণ্ঠস্বর কান্নায় যেন বুজে আসে। হায় রে! সেই চিরাচরিত ত্রিকোণ রহস্য। শতদল, সীতা ও রাণু! একটি পুরুষ দুইটি নারী। সেই চির-পুরাতন চির-নতুন খেলা। সেই পঞ্চশরের একঘেয়ে রসিকতা।

'ছিঃ ছিঃ! এত দিন এ কথা তুমি আমায় বলোনি কেন? রাণু! রাণুকে নিয়ে তুমি সন্দেহ করেছো? রাণু ত কুমারেশের বাগদত্তা। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। আর কুমারেশের সঙ্গে যে আমার কতখানি বন্ধুত্ব তাও নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই।—'

'কুমারেশ! কোন কুমারেশ?—'

'কুমারেশকে চেনো না! কুমারেশ সরকার! অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাচরণ সরকারের একমাত্র ছেলে। মস্ত-বড় ধনী! কিন্তু তার চাইতেও তার বড় পরিচয় হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে সব চাইতে বড় সাঁতারু। এবারে অলিম্পিকে যার সাঁতারে যোগ দেওয়ার কথা!—'

'ওঃ, তোমার সেই গায়ক কুমারেশ?—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই কুমারেশ ও রাণু! ওরা পরস্পর পরস্পরকে বহু দিন হ'তে ভালবাসে। আজ পাঁচ-ছয় বছর ওদের আলাপ দু'জনার সঙ্গে।—ছিঃ ছিঃ! দেখ তো কি একটা মিথ্যা কল্পনায় নিজেকে অনর্থক ব্যস্ত করেছো?'

আমি নিজে পুরুষ। শতদলও পুরুষ, তাই শতদলের শেষের কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছিল শতদলের পরিস্থিতিতে আমি পড়লে আমিও হয়ত ঐরূপই অভিনয় করতাম। ঐ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছিল, মাত্র কয়েক রাত্রি আগে হোটেলের বারে শতদল ও রাণুর কথোপকথন।

'তাহ'লে মিথ্যে তুমি দেরী করছো কেন? মাকে এবারে সব বললেই ত হয়?—' সীতা অনুরোধ জানায় শতদলকে।

'দাঁড়াও, আর কয়েকটা দিন যেতে দাও। এটর্ণীকে আমি চিঠি দিয়েছি, এই বাড়িটা আমি বিক্রী করতে চাই।—পেপারে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে।—'

'পাহাড়ের উপরে এই পুরানো বাড়ি কে তোমার কিনবে?—'.

কিনবে কি বলছো! জানো, ইতিমধ্যেই দু'-তিন জন খরিদ্দারের কাছ থেকে অফার পাওয়া গিয়েছে।—'

'অফারই যদি পেয়েছো ত বিক্রী করে দিচ্ছ না কেন?—'

'দাঁড়াও—ভাল দাম না পেলে ছাড়বো কেন?—'

'এই রকম একটা বাড়ির জন্ত তুমি ভাল দাম পাবে আশা করো?—'

'নিশ্চয়ই। দাদুর হাতে আঁকা ছবিগুলোরই কি কম দাম? অনেক দাদুর মতই পাগল শিল্পী আছে, যারা ঐ 'ছবির collections-এর জন্তই বাড়িটা হয়ত একটা fanatic দাম দিয়েও কিনবে।—'

'কিন্তু কয়েক দিন ধরে যে ভাবে তোমার উপর দিয়ে বিপদ যাচ্ছে—'

'সেটাই ত চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠেছে সীতা! ব্যাপারটা মাথা-মুণ্ড কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। প্রথমটায় কিরীটি বাবুর কথা আমি ত হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু তার পরের ব্যাপারগুলো সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখন বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কেউ আমার জীবন নিতে যেন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন? কারো ত আমি কোন ক্ষতি করিনি! আমার ত কোন শত্রু নেই?—'

'বাবা কি বলেন জান?—'

'কি?—'

'এ ঐ মামার প্রেতাত্মা। এ-বাড়ির মায়া আজও তিনি কাটাতে পারেননি তাই—'

'পাগল—' বলতে বলতে শতদল হঠাৎ সীতাকে দু'হাতে আরো কাছে টেনে নেয়।

'না, না—আমার সত্যি কিন্তু তাই মনে হয়—'

'দাদু আমাকে কত ভালবাসতেন তা জান? আর কেউ হলে না হয় বিশ্বাস করা যেত। দাদু আমার কোন রকম ক্ষতি করবেন এ আমি ভাবতেও পারি না। স্বেচ্ছায় তিনি সব আমার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন—'

'মা কিন্তু তা বিশ্বাস করেন না।—'

'তা জানি, কিন্তু তার লেখা চিঠি আছে—'

'মা বলেন, ও চিঠির কোন মূল্যই নেই—'

'মূল্য আছে কি না আছে, সেটা কোর্টই স্থির করবে। সে জন্ত আমি ভাবি না! তা ছাড়া আমি ত দিদিমাকে বলেছিই বাড়ি বিক্রি হলে কিছু টাকা তাকে দেবো—তার কোন প্রাপ্য এ-বাড়ি থেকে নেই তা সত্বেও। কিন্তু তা তিনি চান না। তিনি বলেন, এ-বাড়িতে তার অর্দ্ধেক অধিকার!—' তার পর একটু থেমে আবার বলে: 'বাড়ি বিক্রীর টাকা থেকে কিছু যে তাকে দেবো বলেছি সেও তোমারই জন্ত সীতা! দাদুর বোন বলে নয়—তোমার মা বলে।'

'এ ত খুব ভাল প্রস্তাব। মা বুঝি তাতে রাজী নন?—'

'না! এক একবার কি মনে হয় জানো সীতা?—'

'কি?—'

'দিয়ে দিই বাড়িটা তাকে! কি হবে মিথ্যে আপনার জনের সঙ্গে ঐ একটা পুরাতন বাড়ি নিয়ে গোলমাল করে? শেষ পর্য্যন্ত বাড়িটা ত আমাদেরই হবে?—'

'কি রকম?—'

'আরে, তোমাকে বিয়ে করলে ত আর আমি পর থাকবো না? আর তুমি ছাড়া ওদেরই বা আর কে আছে সংসারে!—যাক্ গে, চল, অনেক রাত হলো এবারে ওঠা যাক!—'

'চল!—'

অতঃপর দু'জনে উঠে দাঁড়াল। আমারই পাশ দিয়ে তারা দু'জনে পাশাপাশি এগিয়ে গেল।

নিঃশব্দে আমি তাদের অনুসরণ করলাম।

একটা নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। শতদল আর সীতার সম্পর্ক! কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা নতুন সংশয় মনের মধ্যে এসে উঁকি দিচ্ছে। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে ওদের আমি পিছনে পিছনে চলেছি। দেখতে পেলাম দূর হ'তে অন্ধকারে অস্পষ্ট ওরা নিরালার গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। আমি দাঁড়ালাম, ভাবছি এবারে কি করবো, সহসা কার মৃদু করস্পর্শ পৃষ্ঠদেশে অনুভব করতেই চকিতে চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি, সর্ব্বাঙ্গে একটা কালো বস্ত্র জড়িয়ে ঠিক আমার পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে, মুখের 'পরে ঘোমটা তোলা। কেবল মাত্র মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'কে?'

'চুপ। আস্তে, আমি!'

চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বরেও চিনতে কষ্ট হয় না। কিরীটি!

'কিরীটি!'

'হাঁ, চল, ফেরা যাক!'

'কিন্তু—'

'চল! ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে!'—বলে কিরীটি সত্যি সত্যিই ঢালু পাহাড়ী পথ ধরে নিঃশব্দে নীচের দিকে নামতে লাগল। অগত্যা আমিও তার পিছু নিলাম।

দু'জনে পাশাপাশি আবার হোটেলের দিকে হেঁটে চলেছি।

'এদিকে কোথায় এসেছিলি?—'

'নিরালার ষ্টুডিও-ঘরে কাজ ছিল!—' মৃদু কণ্ঠে কিরীটি জবাব দেয়। তার পর একটু থেমে পথ চলতে চলতেই বলে: 'কি এত মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছিলি?'

'শুনছিলাম বলেই জানতে পেরেছি!—'

'কি? ওদের আগে থাকতেই পরস্পরের সঙ্গে ভাব ছিল—'

আশ্চর্য্য হই কিরীটির কথায়। কিন্তু আমার কোনরূপ প্রশ্ন করবার আগেই কিরীটি বলে: 'সে রহস্যও সন্ধ্যা বেলাতে জানা হয়ে গিয়েছে। Nothing new!'

'তুই জানতে পেরেছিলি?—'

'নিশ্চয়ই। শতদলের চায়ের কাপে সীতার তিন চামচ চিনি দেওয়াটা অনিচ্ছাকৃত অন্যমনস্ক হয়ে ভুল নয়। শতদলের চায়ে তিন চামচ চিনি খাওয়ার অভ্যাসটার সঙ্গে সীতা পূর্ব্ব হতেই সুপরিচিত। এবং তা থেকেই আমি বুঝেছিলাম ওদের—শতদল ও সীতার মধ্যে একটা জানা-শোনা আছে এবং দুটি তরুণ-তরুণীর জানা-শোনা থাকা মানেই রংয়ের ব্যাপার।'— একান্ত অবলীলাক্রমেই যেন কিরীটি কথাগুলো বলে গেল।

বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক্ হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি। কিরীটির অতীব সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে আমি একান্ত ভাবেই সুপরিচিত, কিন্তু

তবু যেন নতুন করে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কত সামান্য ও তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে কিরীটি তার মীমাংসার সূত্র খুঁজে বের করে আবার নতুন করে, যেন আমার উপলব্ধি হলো।

'হিরণ্ময়ী দেবী ওদের এই সম্পর্কের কথা জানেন বলে তোর মনে হয় কিরীটি?—'

'না জানলেও তিনি সন্দেহ করেন।—'

'কিন্তু শতদলের রাণুর সঙ্গে সম্পর্কটা?—'

'রাণু ও শতদলের পরস্পর পরস্পরের প্রতি চিন্তাধারাটা আলাদা!—' বলতে বলতে হঠাৎ যেন কথার মোড়টা ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, 'শতদল আর সীতার মান-ভাঙাভাঙি নিয়ে তুই ব্যস্ত ছিলি ওদিকে নিরালা গেলে অন্য কিছু তুই দেখতে পেতি—more interesting!—আসলে সেই জন্যই তোকে আমি এই রাত্রে ওই দিকে পাঠিয়েছিলাম।—'

'কেন, সেখানে আবার কি হলো?—শতদলের হত্যাকারীর কোন সন্ধান পেলি না কি?—' শেষের কথাটা যেন কতকটা ঠাট্টা করেই আমি বলি।

'চোখ থাকলে দেখতে পেতিস্ শতদলের হত্যাকারী দূরের লোক নয়ই। ধোঁয়াটেও নয়। কিন্তু তার চাইতেও যে ব্যাপারটা বর্তমানে আমাকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছে—'

'কি?—'

'বুড়ো শিল্পীর চিঠিটা! যেটা শতদলের কাছ হ'তে আমি আজ সন্ধ্যার চেয়ে এনেছি। চিঠিটা শুধু যে বুড়োর শেষ উইল তাই নয়, নিরালা রহস্যের আসল চাবি-কাঠিটিই ওর মধ্যে আছে। ঐ চিঠির মধ্যে প্রতিটি অক্ষর—আঁচড়ের মানে আছে! তাছাড়া শতদল মুখে যাই বলুক, নিরালার কোন মূল্য নেই—একটা পুরাতন বাড়ি ও কতকগুলো ছবি আসলে নিশ্চয়ই তা নয়। অন্যথায় হিরণ্ময়ী ও তার স্বামী হরবিলাস, শতদল, ও-বাড়ির পুরাতন ভৃত্য অবিনাশ এরা অমনি করে খুঁটি পেতে বসে থাকত না।—'

'তোর তাহ'লে মনে হয় কোন গুপ্তধন ঐ বাড়ির মধ্যে কোথায়ও না কোথায়ও লুকানো আছে?—'

'গুপ্তধন আছে কি না বলতে পারি না। তবে থাকলেও আশ্চর্য হবো না। সেটাই বরং স্বাভাবিক।'

'শতদলের প্রাণের উপরে এই যে পর পর attemptগুলো হলো তাহ'লে তারও কারণ তাই?'

'তাছাড়া আর কি?—'

'শতদলের এখন কিন্তু বিশ্বাস হয়েছে যে সত্যি সত্যিই তার প্রাণ নেবার চেষ্টায় কেউ না কেউ ঘুরছে!'—

'হলেই ভাল!'—কতকটা উদাসীন ভাবেই যেন কিরীটি কথাটা বলে।

এতক্ষণে হঠাৎ যেন আমার মনে হয়, আমার সঙ্গে এতক্ষণ নানা ধরণের কথা বললেও তার মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'কি ভাবছিস্ বল ত?'—প্রশ্ন করি।

'ভাবছিলাম একটা মজার কথা!'—

'কি রে?'—

'তোদের হিরণ্ময়ী দেবীও পঙ্গু নন। আর তোদের ভূষণাও কালা নয়।'—

'বলিস কি?'—

'হাঁ। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেন একজন পঙ্গুর অভিনয় আর কেনই বা অন্য জন কালার অভিনয় করে যাচ্ছে! আর—'

'আর আবার কি?'—

'দু'জনার এক জনের ইতিমধ্যেও মরবার কথা ছিল কিন্তু এখনো মরছে না কেন?—'

বোকার মতই কিরীটির মুখের দিকে তাকাই। ওর কথা মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। তবু না প্রশ্ন করে পারি না; 'দু'জন কারা?'

'কুব্জা মন্থরা বা প্রিয়সখী ললিতা'—কিরীটি জবাব দেয়।

[ক্রমশঃ।

পেঁচা দিনেও দেখতে পায়?

পেঁচা রাতে জাগে আর দিনে ঘুমোয়—এই ধারণা আপনার থাকলে আপনি সেই বদ্ধমূল ধারণা নষ্ট করে ফেলবেন। কেন না, পেঁচা রাত্রে যেমন দেখতে পায়, দিনেও ঠিক তেমনি দেখতে পায়। তবে রাত্রে পেচককুল বাসা থেকে বেরোয় আর দিনে বেরোয় না তার একমাত্র কারণ, পেঁচা রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করতে পারে, কিন্তু দিনে অন্যান্য পাখীদের উৎপাতের ভয় তার অসাধারণ। পেঁচা দিনে বেরুলে লক্ষ্য করবেন, অন্ততঃ কাকের ঝাঁক তার পিছু নিয়েছে।

শান্ত হও, নার্ভ ঠিক রাখো, আরও অনেক কঠিন দিন যে আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে।"

অবাক হোয়ে জুলিয়া ভ্রূ দুটো উঁচু করলে। অবশ্য ভ্রূর বালাই ওর কোনো কালেই 'নেই, কেবল চোখের উপর ঈষৎ ফোলা- ফোলা লাল মাংসপিণ্ড তার উপর দাঁতমাজা বুরুশের মত খোঁচা- খোঁচা কয়েকটা লোম।

—"এই সব জিনিষ মোটেই তুচ্ছ করা চলে না। জানো না যে এতে ছুঁচে মরচে ধরতে পারে?"

—"তা জানি, কিন্তু লক্ষ্মীটি, এই নিয়ে অত মাথা গরম কোরো না, এতে তোমার নার্ভের ক্ষতি করবে। যাই বল, এমন কিছু ব্যাপারটা নয় যা নিয়ে এত উত্তেজিত হোচ্ছো"—নারীসুলভ সহানুভূতিতে কোমল শোনায় ফাইনার স্বর। দাঁতমাজা বুরুশ জোড়া আরও উঁচু হোয়ে উঠলো,—"বল কি? আর কে উত্তেজিত হবে আমি ছাড়া? এ তো আমারি কর্ত্তব্য উত্তেজিত হওয়া।"

বদ্ধ পাগল! ফাইনা ভাবে। সহানুভূতির ভাবটা কেটে যায়, অসহ্য লাগতে থাকে ক্রমেই।—

"দেখো ফাইনা অন্ততঃ একটা কাজ তুমি কর, তাহলেও বাঁচি —মিষ্টার স্মির্ণোভাকে এই নিয়ে খানিকটা বকাবকি কোরো, বুঝতে পারবে তো এই ভাবে চললে ওর হাতে তো ডিস্‌পেন্সারীর কোনো জিনিষ দিয়েই বিশ্বাস করা চলবে না—"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বলবোখ'ন—" ফাইনা আর একটুও দাঁড়ায় না। বাবাঃ, একঘেয়ে বকুনি, রীতিমত অসহ্য!

—"নিজের 'সজ্জা' দেখাতে গেলো"—জুলিয়া আপন মনেই মন্তব্য কোরলে।

চুপচাপ একা-একা দাঁড়িয়ে জুলিয়া দেখতে লাগলো ডিস্‌পেন্সারীর চার দিক—এইটিই তার নিজস্ব। এই ক্ষুদ্র রাজত্বটির সেই হোলো একমাত্র অধীশ্বরী—ভাবতেও মন খুসী হোয়ে ওঠে। চার দিক সুন্দর ভাবে সাজানো, প্রত্যেকটি জিনিষ ঠিক-ঠিক জায়গায় গোছানো। এখানে সাধারণ যন্ত্রপাতিগুলি সাজানো, ওই দিকে রাখা আছে হাড়ের ভিতর অপারেশন করার যন্ত্রপাতি। কাবার্ডের উপর রাখা আছে পরিশোধন করা এ্যাপ্রন, ওভারল। জায়গাটা অবশ্য একটু ছোটোই তাই বড্ড বেশী ঘিঞ্জি লাগছে। তিন জনের বেড এই কামরায়। অবশ্য তিন জনের পক্ষে সত্যিই বড় ঘেঁসাঘেঁসি —পাশ ফেরার জায়গাও মেলে না। কিন্তু অসুবিধা ঘটে না তার জন্য, কারণ প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিষই হাতের কাছে গুছানো। জুলিয়ার মনটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে…।

তা ছাড়া কি অদ্ভুত ভবিষ্যৎদৃষ্টি! সাধারণ নিয়মে ট্রেনেতে অপারেশন করা চলে না, ডিস্‌পেনসারী কামরায় শুধু ড্রেসিং করাই চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব রকম যন্ত্রই ছিলো সেখানে, কখন কি দরকার হয় কে জানে! কিন্তু যখনই যত-বড় অপারেশন করারই

ট্রেন

ভেরা পানোভা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

—"ছুঁচটা যে ঠিক করে রাখতে হবে, সেটুকু খেয়ালও নেই মিষ্টার স্মির্ণোভার"—জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভনা মেট্রন ফাইনার দিকে চেয়ে কথাগুলো বললে, বলার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা ঠোঁট দুটিতে খেলে গেলো অর্থপূর্ণ হাসি।

ফাইনা তখন নিজেকে নিয়েই নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত। বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মসলিনের রুমাল দিয়ে মাথাটা বাঁধতে বাঁধতে নেহাৎই অবহেলার সঙ্গে ফিরে দেখলে সিরিঞ্জটার দিকে। জুলিয়া রীতিমত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উঁচু করে তুলে দেখালো ত্রুটির এত-বড় সাক্ষ্য।

—"সিরিঞ্জটা ওকে দিয়েছিলেই বা কেন?"

—"ঐ ইলেক্ট্রিসিয়ান নিঝভেট্স্কিকে ইনজেক্‌শন দেবার জন্য। অর্শের যন্ত্রণায় ছটফট করাতে ডাঃ সুপ্রাগভই ওই ইনজেক্‌শন দিতে বললেন—"

ফাইনা ভ্রূ কুঁচকালো। ভারী বিশ্রী লাগে এই সব বিরক্তিকর অসুখগুলো শুনলে। দু'দিন আগেও ওর মনে তরুণ নিঝভেট্স্কি একটু সাড়া জাগিয়েছিলো বৈ কি। আর এখন?—অর্শ! বাবাঃ, এত সব রোগ থাকতে কিনা ঐ রোগ! নাঃ, ফাইনার কাছে নিঝভেট্স্কির অস্তিত্বের আর কোনো মূল্যই নেই।

মনে মনে বলে ফাইনা, "ট্রেনটা হয়েছে যেন রাজ্যের বুড়ো আর রুগ্ন লোকেদের আড়ৎ।"

কিন্তু জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভনার কাছে ভবী ভোলবার নয়। তখনো সেই একই ব্যাপার নিয়ে চলেছে ওর বকুনি।

—"নার্স হোয়ে যদি ছুচটাও ঠিক করে রাখতে না পারে, তবে সে কোনো জন্মেও ভালো কোরে নার্সিং করতে পারবে? কখনোই পারবে না, এ আমি জোর করে বলতে পারি—"

ধীরে-সুস্থে প্রসাধন আর বেশ-বাস শেষ করে এবার জুলিয়ার দিকে ফিরে তাকালে। উঃ, ওর মুখের দিকে তাকাতেই আবার ফাইনা মনে মনে শিউরে উঠলো, কী কুৎসিত রূপ ওর! সত্যি অত্যন্ত কুরূপা বেচারী জুলিয়া!

ফাইনা সহজ সহানুভূতির সঙ্গে কোমল স্বরে বললে, —"ছোটো ছোটো তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে তুমি বড্ড বেশী উত্তেজিত হোয়ে পড়ো।

হঠাৎ প্রয়োজন আসুক না কেন অভাব যেন না ঘটে কিছুর। সত্যিই এখানে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায়। কমিশার লোকটিও ভারী চমৎকার—আর ডাক্তাররা খুব ভালোই নয় কি, বিশেষ করে—সুপ্রাগভ!

জুলিয়া ভালোবাসে সুপ্রাগভকে। জুলিয়ার স্বভাবটাই তাই। সব সময় একজন না একজনকে ভালোবাসা ওর চাই-ই। জীবনে কত বিভিন্ন পরিবেশ আসে, কিন্তু যখনই কোনো নূতন পরিবেশ আসে তখনই জুলিয়ার দৃষ্টি চতুর্দিক খুঁজে বেড়ায় নতুন লক্ষ্য স্থির করতে। তার পর হঠাৎ কারো না কারো দিকে চেয়ে মনে হয়,··· এই তো,···এই-ই সেই, একেই তো ভালোবাসার জন্যে আমার মন আকুল হোয়ে উঠেছে···তার পর?···তার পর চলে তাকেই ঘিরে ভালোবাসার জাল বোনা।···

শহরের হাসপাতালে প্রফেসর স্থদারেভ স্থির সত্বেও জুলিয়া প্রেমে পড়েছিলো। দুজনে চোদ্দ বছর একই হাসপাতালে একই সঙ্গে কাজ করেছিলো। জুলিয়ারই চোখের সামনে একে একে পার হোয়ে গেলো দিনের পর দিন—বার্দ্ধক্য এসে ঘিরলো সেদিনের তরুণ প্রফেসরকে—কত কঠিন সমস্যা এলো আর গেলো,—একবার এলো একটা জটিল ক্যানসার অপারেশন, প্রফেসর সেই কেশ নিলেন, অপারেশনও শেষ হোলো। তার পর আর একবার কি কঠিন মারা জ্বরে ডাক্তার শয্যা নিয়েছিলো—সেরেও গেলো—সবই ঘটলো জুলিয়ার চোখের সামনে আর এই সব সময়টাই সে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভালোবেসেছে ডাক্তারকে।

অবশ্য মাঝখানে বার তিন-চার এই একনিষ্ঠ প্রেমে ভাঙ্গনও ধরেছিলো। মাঝে মাঝে তরুণ সহকারী ডাক্তাররাও বেশ রীতিমত দোলা দিয়ে যেতো জুলিয়ার মনে। কিন্তু···শেষ অবধি জয়ী হোতো 'সেই পুরাতন প্রেম'। আবার সুরু হোতো প্রফেসরকে ঘিরে রঙীন প্রেমের জাল বোনা, আর মাঝে মাঝে আপন মনের এই অসংযত চাপল্যে তিরস্কার করতো আপনাকেই।

কিন্তু বেচারা প্রফেসর এর বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। জানতো না তাঁর সহকারী ডাক্তারের দল। কেউ যে ভাবতে পারতো না জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভনা শুধু ডাক্তার নয়—সে নারী।

জুলিয়াও যে তাঁর প্রেমে পড়েছে এ কথা শুনলে ডাক্তার হয়ত বজ্রাহতের মতই স্তম্ভিত হোয়ে যেতেন। জুলিয়ার মনের কাছটিতে কেউ আসেনি—কেউ হোয়ে ওঠেনি ওর অন্তরঙ্গ।—কেউ তা ভাবতেও পারেনি!

—"ভালোই হোয়েছে যে তোমার বিয়ে হয়নি"—একদিন প্রফেসর বললেন।

শুনেই জুলিয়ার মনটা নেচে উঠলো। যদিও জুলিয়া জানতো যে প্রফেসর বিবাহিত। জানতো যে প্রফেসরের সম্প্রতি বিয়ের জয়ন্তী উৎসব হোয়ে গেছে—আছে একঘর ছেলে-মেয়ে—নাতি-নাতনী···

প্রশ্ন করলো জুলিয়া—"কেন বলুন তো?"

—"বিবাহিতাদের নিয়ে কাজের ঠিক সুবিধা হয় না—কাজের মধ্যে চাই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ—তাদের দ্বারা সেটা সম্ভব হয় না—"

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার সময় অন্ধকার-ছায়াচ্ছন্ন পথটি পার হোতে হোতে জুলিয়ার বার বার মনে হোতে লাগলো, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার ক্ষণটুকু। মনের কাছে তো কৈফিয়তের সীমা নেই—নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে আর্ত্ত মানবতার সেবায়। কিন্তু তাই কি ঠিক? 'উৎসর্গ' করেছে ঠিকই···কিন্তু সে 'তার' জন্যে। সে বিসর্জ্জন দিয়েছে তার বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন, তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। কি বিষাদময় অথচ কত মধুর। এমন ভ'বে ভাবতেও কত সুখ—শুধু 'তার' জন্যে—তারই ভালোবাসায়···

ফিনিশীয় যুদ্ধসীমান্তে জুলিয়া প্রেমে পড়েছিলো একজন ব্রিগেডিয়ারের। কিন্তু সে যুদ্ধ এত ক্ষণস্থায়ী যে ভালোবাসা ফুটতে না ফুটতেই মিলিয়ে গেল স্বপ্নের মত।

হস্‌পিটাল 'ট্রেনে' এসে প্রথম কিছু দিন জুলিয়ার মনের দ্বিধাটা কাটেনি—দানিলভ, কমাণ্ডাণ্ট আর স্থপ্রাগভ,—এই তিন জনের মধ্যে দুলছিলো মনটা···স্থির করতে পারছিল না তার লক্ষ্য।

প্রথমটা অবশ্য ঝুঁকেছিলো দানিলভের দিকেই। কিন্তু লোকটা তেমন আবেগপ্রবণ নয়। মনটা স্থির করে ফেললে জুলিয়া।

কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য ছিলো স্থনারেভস্কির—সেই একই শাদা চুল, চোখের নীচের ঝোলা চামড়া, আর ক্ষীণ কোমল কণ্ঠ।

নাঃ, যুদ্ধের সময় কামাণ্ডাণ্টের সঙ্গে শুধু কর্ত্তব্যের সম্পর্কই থাকা উচিত। আর কিছু নয়। বাকী পড়লো স্থপ্রাগভ।

জুলিয়ার ভালোবাসার কোনো দায়-দুঃখ ছিল না। অক্লান্ত পরিশ্রম করতো সারা দিন—কাজের শেষে গভীর শ্রান্তিতে নেমে আসতো নিবিড় ঘুম—আর ক্ষুধার দাবী মেটাতো চার জনের—পূর্ণবয়স্ক চার জনের খাদ্যে।

যদি ওকে বলা যেত যে ও পাবে অপরূপ সুন্দর তরুণ স্বামী—ভালোবাসায় ভরা যার মন—কিন্তু একটি মাত্র সর্ত্তে—কাজ ওকে ছেড়ে দিতে হবে···তাহলে ভ্রু জোড়া কপালে তুলে ওর বিস্মিত মুখ থেকে শুধু বের হোতো—"কখনোই না।"

জুলিয়ার সারা জীবনের একমাত্র অর্থই কাজ। প্রকৃতি ওকে বঞ্চিত কোরেছে যা' থেকে, কাজের মাঝেই ও পেয়েছে তার আস্বাদ। দুখানি কোমল হাতের সেবা আর হৃদয়ভরা ভালোবাসা···নারী-জীবনের এই দুটি আকাঙ্ক্ষাই তো পূর্ণতা পেয়েছে ওর নিরলস কাজের মাঝে। কাজ ছাড়া জীবন?···সে তো জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁচা···।

জুলিয়া বোঝে—সমস্ত অন্তর দিয়েই বোঝে যে, প্রেম ওর জীবনের জন্য নয়। ও জানে, ওর মনের গোপন ভালোবাসা প্রকাশের লজ্জা সইতে পারবে না—পাবে শুধু বিদ্রূপ, শুধু করুণা···। আত্মমর্য্যাদা ওর আছে—নিজেকে বঞ্চনা ও করেনি। নারী-হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি ওর লুকানো আছে মনের অন্তঃপুরে সাতটি কবাটের আড়ালে—ওর সুস্থ বলিষ্ঠ হৃদয় প্রহরায় আছে সেই—সেই নিভৃততম কোমলতায়।

জুলিয়ার মা-বাবা ছিলেন আর পাঁচ জনার মত অতি সাধারণ মানুষ। অথচ আশ্চর্য্য তাঁদের দুটি ছেলে—কি অপরূপ, কি আশ্চর্য্য সুন্দর···রূপে বুঝি সৌন্দর্য্যের দেবতা চিরতরুণ এ্যাপোলোকেও হার মানায়। আর একমাত্র মেয়ে জুলিয়া—কুৎসিত হতশ্রী।···দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে পাওয়া একমাত্র মেয়ে।

প্রথম প্রথম সব চেয়ে বেশী বাজতো মায়ের মনে—প্রতি রাত্রে শোবার আগে মা প্রার্থনা জানাতেন যে তাঁর যে-কোনো একটি ছেলের ওই ভুবনভোলান রূপের বিনিময় হোক হতভাগিনী মেয়ের ওই কুৎসিত রূপের।

দিনের পর দিন কেটে যায়—মায়ের চোখে আর মনে পড়ে অভ্যাসের প্রলেপ। এমনি করে যখন বছরের পর বছর ঘুরে গেলো, মায়ের চোখে তখন স্নেহের গভীর অঞ্জন—'কই, জুলিয়া সুন্দরী না হোলেও দেখতে তো খারাপ নয়।' বাপ উল্টোতেন পরিবারের পুরানো ছবির এ্যালবাম—মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতেন ঘনিষ্ঠ থেকে সুদূর সম্পর্কিত আত্মীয়দের ছবি···কার কাছ থেকে কোন ক্ষীণ রক্তস্রোতের সঙ্গে এলো তাঁদের একমাত্র স্নেহের দুলালীর এই রূপহীন অভিশাপ।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে একদিন সন্ধান মিললো। হুঁঃ, এর জন্য আসল দায়ী—দায়ী শুধু নয়, আসল দোষী হচ্ছেন ওঁর ঠাকুর্দ্দার বাবা—নিঝ্‌নি নভোগ্রাদের একজন গ্রীক মুদী।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার মনেও আছে বটে"—জুলিয়ার বাবা অতীতের স্মৃতি হাতড়াতে থাকেন—"তাঁকে একটা চাকাওলা চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে বেড়াতে হোতো—আর সারাক্ষণ তিনি বসে বসে তাস নিয়ে 'পেশেন্স' খেলতেন। তাঁর হাঁটুর উপর একটা ট্রে রাখা থাকতো, আর তার উপর তিনি তাসগুলি রাখতেন। সেই অতিবৃদ্ধ পিতামহ বেঁচেও ছিলেন একশো-চার বছর। অপূর্ব্ব সুন্দর দেখতেও ছিলেন।

"—অপূর্ব্ব সুন্দর?"—মায়ের কথা বুঝি বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যায়—"আর তুমি বলছো কিনা জুলিয়া ঠিক তারই মত দেখতে?"

—"বিশ্বাস কর আর নাই কর, ঠিক তাঁরই মত দেখতে।"

চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়তে থাকেন মা স্বামীর কথায়,—"আমি জানতাম না যে জুলিয়ার মধ্যে তাহলে গ্রীক-রক্তও আছে—"

সমগ্র পরিবারের এই গোপন ব্যথাটিতে ঐ 'গ্রীক-রক্ত' কথাটা বেশ খানিকটা উত্তেজনা আর রহস্যের প্রলেপ লাগানো। হ্যাঁ, জুলিয়া রূপসী নয় বটে—কিন্তু সে আর কি করা যাবে—গ্রীক-রক্ত!

কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, যেখানে যত লোক আছে প্রত্যেকের কানে কানে তো এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শোনানো সম্ভব নয়। আর সাধারণতঃ পুরুষেরা জুলিয়ার প্রতি যে খুব দরদী ছিলো সেটাও বলা চলে না। যদিই বা একজন মাত্র একটি বার যৎসামান্য দৃষ্টি দেবার উপক্রম করেছিলো—কিন্তু তার খাঁই এতই বেশী যে টিকলো না—কেউই বুঝলো না যে মেয়েটি কি অমূল্য রত্ন!

অবশ্য বাড়ীতে কখনো এই নিয়ে কোনো রকম আলোচনা হোতো না। এই পরিবারটি নিজেদের এ-সব আলোচনার অনেক উঁচু স্তরের বলে মনে করতো। জুলিয়ার বাবা ছিলেন একজন সহকারী ডাক্তার। আধুনিক অল্পবয়সী ডাক্তারদের উপর ছিলেন ভীষণ চটা—তাদের প্রসঙ্গ উঠলেই তাদের গালি দিতেন। তাঁর মতে সহকারী ডাক্তার হিসাবে তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ডাক্তার—রোগীদের সমস্ত বিশ্বাস আর নির্ভরতা তাঁকেই ঘিরে।

দুটি ছেলের গ্রীক দেবতার মত অপরূপ রূপ ছিলো। ছাত্র-জীবন—বিশেষ করে কলেজের দিনগুলি তাদের সহজেই কেটে গেলো মুগ্ধ তরুণীদের সাহচর্য্যে—ওদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ

ছিলো তরুণী-মহলে। কিন্তু দিন কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জীবনে এলো স্থিতি—এলো ঈর্ষাকাতর রূপহীনা স্ত্রী—আরও পরে এলো ছেলে-মেয়ের বন্যা।—তারও পরে এলো পিছনের অবহেলিত যৌবনের দিনগুলির জন্য অনুতাপ—আর বাপের কৃতিত্বের দিকে তাকিয়ে নিজেদের অক্ষমতা স্মরণ করে হিংসার জ্বালা।

আজ বাইশ বছর ধরে জুলিয়া অপারেশন-সিষ্টার হিসাবে কাজ করে—সমগ্র পরিবারটির দিকে তুচ্ছ অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে। বয়সে বড় দুই ভাই অকর্মণ্য অথচ বিরাট পোষ্য নিয়ে জুলিয়ার করুণা-ভিক্ষার দিকে চেয়ে থাকে। জুলিয়ার কাছে নিজেদের অবোধ বালকের মত মনে করে। ওদের অনেক দুর্ব্বলতা আছে। সারা জীবন ধরে ভুলও করেছে প্রচুর—চুল পাকবার বয়েস এলেও জীবন সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা আজও গড়ে ওঠেনি।

জুলিয়ার মনে কোথাও নেই এতটুকু দুর্ব্বলতা। মনের নিভৃততম কোণটিতে ভালোবাসার যে দীপটি অনির্বাণ—তার আলো সাতটি কবাটের আড়াল ভেদ করে কোনো দিন প্রকাশিত হবে না। জীবনে জুলিয়া কখনও ভুল করেনি—সব বিষয়েই ওর একটা সুনির্দ্দিষ্ট মতামত আছে।

পরিবারের সকলেই ওর উপর নির্ভর করে—ওর দৃঢ় প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে। শুধু পরিবার? হাসপাতালে কিম্বা অপারেশনের সময় প্রফেসর স্থ্রারেভস্কি নয়, জুলিয়াই হোলো সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। এ কথা হাসপাতালের প্রত্যেকেই জানতো, সে এমনি জানা যে প্রফেসর রাগে ফেটে পড়লেও তারা যত না ভয় পেতো, তার চেয়ে ঢের বেশী তটস্থ হোয়ে থাকতো জুলিয়ার সামান্য ভ্রূকুঞ্চনে। একবার জুলিয়ার ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, সেই সময় যত দিন না ও সুস্থ হোয়ে কাজে যোগ দিলো তত দিন ধরে প্রফেসর কিছুতেই কোনো জটিল অপারেশন কেস্ নিলেন না। এইতেই আরও সবার মনে দৃঢ় ধারণা হোলো যে প্রফেসর না হোলেও জুলিয়ার চলে, কিন্তু জুলিয়া না হলে সবই অচল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

প্যারী

এলা বসু

কত প্রাচীন কাহিনী সুপ্ত তোমার অন্তরে, প্যারী হে মোর প্যারী!
তব ভারাক্রান্তা দেহে গতি যেন মন্থরে যুগ যুগান্তেরি।
অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি তোমার হেরে আপনারে আপনি সকৌতুক,
যেন দুই ভিন্ন কারিগরে গড়িয়াছে তাহারে একখানি মুখ।
এক নয়ন হতে উচ্ছল যৌবন স্রোতে বহে মোহময় ঘোর,
দ্রাক্ষারসে রঞ্জিত বঙ্কিম অধর পিয়ে জীবনেরই স্বর!
অপর শান্তমতী স্বপ্নালসা আঁখি নত ধ্যানমগ্ন রতা,
এই বিশ্বের আলোক যত তাহা হতে অবিরত পাঠায় বারতা।
যেন চিরন্তন রহস্য অবগুণ্ঠন নারী খোলে বার বার,
ক্ষণে ক্ষণে অপরূপ ধনে ভরা তার নব নব জন্ম-উপহার!

শতাব্দী

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস

পথ জানা নাই। শুধু জানা ছিলো
করুণ স্পর্শ তার।
ভাষা জানা নাই। শুধু মনে ছিলো
নিবিড় অন্ধকার!
নির্জ্জন মাঠ। রাত্রির মায়া।
দীপ্ত তারকা জাগে।
শতাব্দী ভরা সঞ্চিত ব্যথা
উচ্ছল কী আবেগে,
ঝরিল তোমার প্রসারিত পথমাঝে।
চাহিয়া দেখিনু বেদনা-বাষ্পে,
তোমার নয়ন-ছায়া
রচিল ক্ষণিক তিমির অন্তরাল।
ক্ষান্ত হয়েছে প্রয়োজন আজ। দীপক অগ্নিবাণী,
তবুও শোনাই। চেননি কী মোর ললাটলিখন খানি!
আমার লগ্ন সপ্তমে রবি হেসেছে করাল হাসি,
নিরাশার বিষে জ্বলেছে হৃদয়,
বজ্র দহন সম,
দিগন্ত-পথে উদাসী পথিক
আজিও বাজায় বাঁশী।
উদ্ধতা আমি। চির যৌবন মম।
ম্লান বসন্ত ফিরে চ'লে যাক
লয়ে ফুল-সম্ভার।
মরণ-বৃন্তে অর্ঘ্য তবুও
রচিব বারম্বার।

পাষাণ

আদরিণী বন্দ্যোপাধ্যায়

যে পলি মাটিতে পাষাণ হয়েছে ফসিল হয়েছে দেহ
কতটুকু তার জেনেছি আমরা নিঃশেষি সন্দেহ।
কত শতাব্দী ঝড় ও ঝঞ্ঝা করেছে সে সম্ভোগ
যুগ যুগ ধরে বুকেতে সয়েছে প্রকৃতির দুর্য্যোগ।
স্তরে স্তরে তার জমা হ'য়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাস
পাষাণের বুকে কুণ্ডলি বাঁধে বেদনার নাগপাশ।
একদা পাষাণ ছিল না পাষাণ ছিল সে মাটির তাল
বুক পেতে নিত যত রাজ্যের যত কিছু জঞ্জাল।
হঠাৎ সেদিন মাটির বুকেতে হ'ল মহা বিদ্রোহ
মহা আলোড়নে হ'ল চুরমার ধ্বংসের সমারোহ।
ঢাকা প'ড়ে গেল মাটির গন্ধ মাটির ছন্দলীলা
তাই সে আজিকে পাষাণ হয়েছে হয়েছে কঠিন শিলা।

সুভাষ-স্মরণে

শ্রীবিভাবতী আচার্য্য চৌধুরী

আমাদের নেতাজীর
উচ্চ রহিল শির
হ'লো না এমন বীর বঙ্গে।
কি বিরাট অভ্যুদয়
হেরিনু জ্যোতির্ম্ময়
তিমির কি হলে লয় অঙ্গে?
চলো দিল্লী দিল্লী চলো
বাণী মুখরিত হলো
কণ্ঠ কি তাঁর হ'লো যন্ত্র?
উচ্চারিলা ভারতের
কি মহান্ গৌরবের
জয় হিন্দ অভয়ের মন্ত্র।
মণিপুর-বিজয়ীর
উচ্চ রহিবে শির
হ'বে না এমন বীর বঙ্গে।
হের তাঁর পথ-রেখা
এঁকেছে সহজ লেখা
চলো দ্রুত হ'বে দেখা সঙ্গে।

মা হওয়ার আগে ও পরে

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ডাঃ গুপ্ত

দিদির এক বান্ধবীর কথা টুনীর মনে পড়ে।

সুজাতা বি-এ পাশ মেয়ে, ভালবেসে সে বিবাহ করল অমলকে।

তিনটে বছরের মধ্যেই পর-পর দুটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সুজাতা রোগশয্যা নিল। অমল একটা দেশী ফার্মে চাকরী করে যা মাইনা পায় প্রথম দিকে সেটা সচ্ছল হলেও এখন হয় না। দু'টি রুগ্ন সন্তান—রুগ্না স্ত্রী। সর্ব্বদাই খিটি মিটি লেগে আছে। সুজাতার দূর সম্পর্কীয়া দুঃস্থা বিধবা বোনকে সুজাতাই সংসারটা দেখাশোনা করবার জন্ম কয়েক মাস আগে আনিয়েছিল, বর্তমানে সেই বিধবা বোন নমিতাই হয়েছে সুজাতার সংসারের বেশী অশান্তির কারণ। সুজাতা চায় তাকে আবার ফেরৎ পাঠাতে, অমল রাজী নয়।

দিদির সঙ্গেই টুনী সুজাতাদের ওখানে গিয়েছিল।

সুজাতাকে পূর্বে অনেক বার দেখেছে টুনী কিন্তু আজ সেই সুজাতা দু'টি সন্তানের জননী, রোগশয্যায় শায়িতা—সুজাতাকে যেন চেনাই যায় না।

'এ কি চেহারা হয়েছে তোর সুজাতা!—'

সত্যি, কোথায় সুজাতার সেই যৌবনের চল চল কমনীয় রূপ! অথচ দিদির বয়সীই ত সুজাতা, ছাব্বিশ-সাতাশের বেশী হবে না।

পর-পর দু'টি সন্তানের জন্ম দিতে গিয়েই আজ সে রিক্ত শূন্য চর্ম্মসার হয়ে গিয়েছে যেন!

নানা কথার মধ্যে এক সময় চোখের জলের ভিতর দিয়ে সুজাতা বলে: কি বলবো ভাই প্রমি! যে স্বামী একদিন বিবাহের পর আমাকে মুহূর্তের জন্ম চোখের আড়াল করতে চাইতো না আজ সে দিনান্তে একবার সামনে এসেও দাঁড়ায় না হাসি-মুখে। একবার সন্ধ্যার দিকে যা-ও আসে তা-ও মুখখানা যেন গোমড়া করে থাকে। অথচ নমিতার বেলায়—

'দুঃখ করিস না সুজাতা! আবার সুস্থ সবল হ'য়ে ওঠ তাড়াতাড়ি, দেখবি আজ যে স্বামী অনাদর করছে সেই স্বামীই আবার তোকে আদর জানাবে। দোষ তার—তোর স্বামীরও আছে কিন্তু আমি বলবো বেশী দোষ তোরই। পুরুষ মৌমাছির জাত, মধুর অভাব হয়েছে তোর মধ্যে; তাই সে নমিতা-পুষ্পের দিকে আকর্ষিত হয়েছে।'

—'কিন্তু আজ যে আমার এই দশা সে ত তারই দু'টি সন্তানের পর-পর জন্ম দিয়ে!—ছোট খুকী হবার পর হতেই—'

'বুঝি সব ভাই, কিন্তু সময়ে কেন সাবধান হস্‌নি। তোর যা শরীরের অবস্থা ছিল তাতে একটি সন্তান ধারণের উপযোগীও ছিলি না তুই। তা এত তাড়াতাড়ি দু'-দুটো সন্তান। তোর উচিত ছিল, সন্তান ধারণের আগে শরীরটাকে তোর সন্তান ধারণের উপযোগী করে নেওয়া। সব জমিতেই যদি ফসল ফলালেই চলতো তাহ'লে জমিকে চাষ করে ভাল সার দেওয়ার প্রয়োজন হতো না।'

'কি করবো, ওকে বুঝাতে গেলে—'

'পুরুষ ত চিরদিনই অবুঝ ভাই! ঐ সঙ্গে আমরা মেয়েরাও যদি অবুঝ হই তাহলে সংসারে শান্তি আসবে কোথা হতে? তাছাড়া সংসারের আসল ঝামেলা পুরুষকে কতটুকুই বা বহন করতে হয়, যত-কিছু ঝক্কি ত মেয়েদেরই। তাই ত তাদের হতে হবে সহনশীলা, সহানুভূতিসম্পন্না ও প্রেমময়ী। একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে একজন পুরুষ সামলে রাখা ত এমন বিশেষ কিছুই কষ্টসাধ্য নয় সুজাতা! তোমার কি উচিত ছিল জান, অন্তত বিবাহের পর কয়েক বৎসর জন্মশাসন করে—'

'কিন্তু ভাই, পুরুষদেরও তুমি জান না। জন্মশাসন সম্পর্কে কোন কথা স্বামীকে আমার বলতে গেলেই উনি বলতেন, ও মহাপাপ, তাছাড়া'—বান্ধবীর কাছে কেমন যেন একটা লজ্জা ও সংকোচ ওর রোগপাণ্ডুর মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে ক্ষণেকের জন্ম।

'তোর কথা বুঝেছি সুজাতা—হাঁ, তোর টুনীকে লজ্জা করবার কিছু নেই। ওর সঙ্গে আমি সব কথাই আলোচনা করি। টুনীকে দিয়ে আমি একটা experiment করছি সুজাতা! আমি ওকে আদর্শ জননী করে আদর্শ গৃহিণী করে গড়ে তুলতে চাই। হাঁ, যে কথা বলছিলাম। অনেকের ধারণা, স্ত্রী-পুরুষের জন্মশাসনের প্রক্রিয়াগুলো মেনে সঙ্গম করলে নাকি পূর্ণ সঙ্গম-সুখ পাওয়া যায় না। ভুল। প্রথমতঃ, জন্মশাসন করবার বহুবিধ উপায় আছে। দ্বিতীয়তঃ, সব প্রক্রিয়াই সকলের পক্ষে প্রযুজ্য নয়। উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে তারাই বাৎলে দিতে পারত ঠিক কোন প্রক্রিয়াটি তোর পক্ষে উপযুক্ত হতো। বিস্তারিত সে আলোচনা তোর সঙ্গে ভাই করবারও এখন আমার সময় নেই, ইচ্ছাও নেই। কিন্তু এখন ত বুঝতে পারছিস মুহূর্তের সুখের জন্ম কি বিড়ম্বনাই না তোকে ভোগ করতে হচ্ছে!'

'কিন্তু ভাই, এ-ও ত শুনেছি, জন্মশাসনের যে-সব প্রক্রিয়াগুলো চলিত আছে সর্বদাই যে সেগুলো (safe) নিরাপদ তাও ত নয়—'

'না। তা নয় সত্যি! তবে এ-ও জানিস্, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার কারণ হয় ঠিক উপযুক্ত প্রয়োগ-কৌশলের অভাবেই। বই বা কিতাব পড়েই যদি সব জানা যেত তাহলে এ দুনিয়ায় শিক্ষকের প্রয়োজন হতো না। কেন বুঝতে পারি না, মেয়েদের আমাদের দেশে এ-সম্পর্কে কোন পুরুষ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে লজ্জা হয়। এতে লজ্জার কি-ই বা আছে। কি যে অন্ধ কুসংস্কার আমাদের!—'

'আজ কালই দেখি এ-সবের প্রয়োজন। কই, আমার ঠাকুরমার বারটি সন্তান হয়েছে, তিনি ত আমার মত রুগ্ন হয়ে পড়েননি? আজও তাঁর কথা মনে আছে, পঁচাত্তর বৎসর বয়েসে যখন তিনি মারা যান তখনও তাঁর শরীরের কি চমৎকার ছিল—'

'অতীতের দোহাই দিয়ে বর্তমানের প্রয়োজনকে অস্বীকার করাটা আরো একটা বিশ্রী কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। ভুলে যাস কেন, তাঁরা যে সময়ে জন্মেছিলেন সে সময় খাদ্যের মধ্যে এত ভেজাল ছিল না। খোলা আলো-বাতাসে তাঁরা পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে মানুষ হয়েছেন। নিয়মিত যাবতীয় গৃহকর্মের মধ্যে নিজেদের নিযুক্ত রেখে শরীরের যে নিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজন তার চাহিদা মিটিয়েছেন। তাছাড়া তাঁদের তোদের মত বুড়ো বয়েসে বিবাহ হয়নি। হয়েছে বালিকা বয়েসেই। তখনকার দিনে মেয়েদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা ছিল—বিবাহের আগে পর্যন্ত মা ও ঠাকুরমায়েদের কাছে, বিবাহের পরে শাশুড়ীর কাছে। তারা বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে old fool ও ভারবাহী মনে করতো না, সংসারে সত্যিকারের মা-বাপের মত মনে করতো, শ্রদ্ধা করতো। তারা ছিল আচার ও নিয়মনিষ্ঠ। সংসারকে তারা পবিত্র দেবালয়ের মত দেখতো। কিন্তু সে দিনও নেই, সে যুগের মেয়েরাও নেই। আজ ক্রমবর্দ্ধমান বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য অতীতের জীবনযাত্রা হতে আমাদের অনেক দূরে টেনে এনেছে। গ্রাম ছেড়ে আজ বেশীর ভাগই আমরা জীবিকার জন্য, জ্ঞান আহরণের জন্য সহরে এসে ডেরা বেঁধেছি। জীবনযাত্রা পদ্ধতিটাও ঐ সঙ্গে সঙ্গে যুগের দাবী মিটাতে গিয়ে অন্য গতি নিয়েছে; বলতে গেলে সম্পূর্ণই পাল্টে গিয়েছে। সেই কারণেই বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের নতুন পথ আবিষ্কার করতে হয়েছে। অতীত যুগের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুনগুলো অচল হয়েছে। তাই সেদিন যা প্রয়োজন ছিল না আজকে তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সমাজ ও জাতির দিক দিয়েও আজ সন্তান উৎপাদন সম্পর্কে আমাদের সংযমী হওয়া একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া মানেই দারিদ্র্য, অশান্তি ও ব্যাধিকে ডেকে আনা। যে সন্তানের মুখ দর্শনে আমাদের পুন্নাম নরক হ'তে অব্যাহতি মেলে বলে আমরা স্বীকার করি সে সন্তান যেন আনন্দের বার্তাই বহন করে আনে, আনে জীবনে সুখ, শান্তি ও গৌরব। একটি সন্তানকে মানুষ করাই কত কষ্টের ব্যাপার, পর-পর যদি কেবল সন্তান হতে থাকে তাহলে মায়ের শরীরও টেকে না যারা আসে তারাও হয় রুগ্ন, ভারসর্বস্ব। অন্ততঃ পক্ষে চার থেকে পাঁচ বছরের ব্যবধান থাকা উচিত দু'টি সন্তানের জন্মের মধ্যে।'

এমন সময় বাড়ীর বুড়ী ঝি মোক্ষদা এসে ঘরে প্রবেশ করল। 'মা' এবারে ঐ সাড়ীটা বদলে একটা ধোয়া সাড়ী পরুন। বাবুর আসবার সময় হলো।'

'থাক মোক্ষদা, আর সেজে কি হবে! রোগ নিয়েই বাঁচি না!'

'উহুঁ, তা হবে না। যাও ত মোক্ষদা তোমার মাকে একটা কাচা সাড়ী পড়িয়ে দাও। মাথার চুলগুলো বেঁধে পরিষ্কার করে দাও'—কথাটা বললে প্রমীলা।

'বল ত বাছা! দিবারাত্র কি যে পেত্নীর মত হ'য়ে থাকে—বললে কথা শোনে না।'

'এ তোর ভারী অন্যায় সুজাতা! ভুলিস না, পরিচ্ছন্ন থাকাটা কেবল স্বাস্থ্যের পক্ষেই ভাল নয় বিবাহিত জীবনে মেয়েদের একটা কর্তব্যও।'

'এই বয়েসেও সেজে-গুজে স্বামীর মন ভোলাতে বলিস্?'

'কেবল এই বয়েসেই নয় রে, যত দিন বেঁচে থাকবি তত দিনই ভুলাতে হবে। পুরুষের বহির্মুখী মনকে আকর্ষণ করতে হলে নিয়মিত প্রত্যেক স্ত্রীরই বেশ ও কেশ প্রসাধনের ব্যাপারে অবহেলা করা উচিত নয়—মন্দিরকে মানুষে যেমন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে দেহও তেমনি, মন্দিরই সর্বদা পরিচ্ছন্ন না থাকলে দেহের দেবতা যে প্রাণ-জীবন সেও ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। বিবর্ণ হয়ে পড়ে। পরিচ্ছন্নতার অন্য নামই যে স্বাস্থ্য। নারীর বেশ-ভূষা ও মনভোলান প্রসাধনের প্রচলন হয়েছিল কেন জানিস? পুরুষের মনকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্যই। যুগে যুগে নারী তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে নানা প্রক্রিয়ায়, নানা বসন-ভূষণ-আভরণে, নানা সজ্জায়। যত রূপই তোমার থাক তাকে নিয়মিত ঘষা-মাজা না করলে তাতে মরচে ধরে যাবেই—'

'কি যে তুই বলিস প্রমি! আমি কি নটী? আমি তার বিবাহিতা স্ত্রী—'

'ওইখানেই তোরা ভুল করিস্ ভাই! নটী বলছিস, নারীর একটা রূপই যে নটী! ভুলিস কেন, একই নারীকে নিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পুরুষকে ঘর করতে হলে মনে তার একঘেয়েমীর শৈথিল্য আসবেই। তাই ত স্ত্রীকে প্রতিদিন নব নব রূপে স্বামীর চিত্তবিনোদন করতে হবে। তার মনের চিরদিনের সৌন্দর্য-পিপাসাকে ঝিমিয়ে পড়তে কোন মতেই দেওয়া চলবে না। যে স্ত্রী বসনে-ভূষণে সেবায় প্রেমে দরদে স্বামীকে সুখী রাখতে পারে সেই ত সত্যিকারের স্ত্রী। গৃহিণী ঘরণী। সচিব প্রিয়তমা। কেবল দু'বেলা রান্না করে খাওয়ান ও রাত্রে স্বামীর শয্যাসংগিনী হয়ে তার কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে গর্ভে তাঁর সন্তান উৎপাদন করলেই সত্যিকারের স্ত্রী হওয়া যায় না। ঐ কারণেই বেশীর ভাগ সংসারে আমাদের সুখ নেই শান্তি নেই সৌন্দর্য নেই। তোর দোষ নেই ভাই। বিবাহের আগে কোন মেয়েই আমাদের বিবাহিত জীবনকে কেমন করে সুখের ও শান্তির করে গড়ে তোলা যেতে পারে সে শিক্ষা পায় না। নতুনত্বের মোহ ক'দিন থাকে রে! বাসর-রজনীর প্রেমোচ্ছাস দু'দিনেই যে শুকিয়ে যায়। কঠোর বাস্তবের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে দু'দিনেই আমরা হাঁপিয়ে উঠি। স্বামীর ভালবাসা ও প্রেমকে এত সহজেই কি চিরদিনের মত পাওয়া যায়? বিবাহিত জীবনের প্রথম কিছু দিনের উচ্ছ্বাসকে আমরা প্রেম ভালবাসা বলে গদগদ হয়ে উঠি—তার পর যেই সেটার অভাব ঘটে, চোখ দিয়ে আমাদের জল ঝরে। ভাবি, এ কি হলো! এমন কেন হলো! ভুলে যাই আসলে ওটা দু'দিনের চোখের যৌন নেশা, আর কিছুই নয়। প্রেম বলে যাকে আমরা উচ্ছসিত হয়ে উঠি সেটা ত প্রেম নয় যৌবনের রঙিন চশমার রং। নে, অনেক বকর-বকর করলাম। উঠে বোস দেখি, সাড়ীটা বদলে চুলটা বেঁধে পরিচ্ছন্ন হয়ে বোস। আর একটা কথা মনে রাখিস, মনে তোর যতই বিরাগ সঞ্চিত হ'য়ে উঠুক না কেন, কোন সময়েই স্বামীর কাছে সেটা প্রকাশ করবি না। হাসি-মুখে তাকে আহ্বান জানাবি। নিজের গৌরবে নিজের সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠ দেখি—কেমন দেখি তোর স্বামী তোকে অবহেলা করতে পারে? ওরে, মিষ্টি কথা দিয়ে শত্রুর মনকেও জয় করা যায়, ও ত তোর স্বামী!—পারবি নে ভোলাতে একজন নারী একজন পুরুষকে।

[ক্রমশঃ।

রাধারাণী দেবী

আমার না-বলা বাণীর মন-যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়-গগনে শুধুই বাজে।
ক্ষণে ক্ষণে আমি না-জেনে করি গো দান—
উদাস মনের উছল নীরব গান।
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে
জানি না কখন নিজে কিছু লও তুলে।
অলস আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে,
মহান্ প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে।

ছোটদের আসর

আকাশপরীর গল্প

(ইন্দোনেশিয়ার রূপকথা)

ইন্দিরা দেবী

নিউ হেব্রাইডিসে ইকেট নামে যে দ্বীপটি ছিল অনেকে তাকে আবার ম্যাওউইচ দ্বীপও বলতো। সেই দ্বীপের একটা বড় প্রচলিত গল্প আজ শোনাবো।

গল্পটি হলো হংসকুমারীদের নিয়ে। এই হংসকুমারীরা আকাশে থাকতো। সেখানকার পৃথিবী তো আমাদের মাটীর পৃথিবী নয়—সেখানকার কাজ-কর্ম চলাফেরাও তাই অন্য রকম। এই সব হংসকুমারীরা ছিল অপূর্ব সুন্দরী, পিঠের দু'পাশে থাকতো সাদা ধবধবে দু'টা ডানা। এই ডানা দিয়ে তারা উড়তে পারতো। রাত যখন গভীর হতো, নীচের পৃথিবীর লোক অগাধে ঘুমিয়ে পড়তো—তখন তারা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে নামতো নীচে। নদীতে যখন ভাঁটা সে সময় পৃথিবীর নদীর পারে এসে জামাজোড়া খুলে জলে নেমে সাঁতার কাটতো, স্নান করতো, মাছ ধরতো। আবার ভোরের আলো আকাশের গায়ে রং ছড়িয়ে দেবার আগে সোসান পাখীরা গান গেয়ে উঠলেই তারা বুঝতো তাদের ফিরবার সময় হয়েছে, অমনি তারা জামাজোড়া গায়ে দিয়ে পাখনা মেলে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়ে দল বেঁধে উড়তো।

জামা-কাপড় পরলেও হংসকুমারীদের একটা আচ্ছাদন থাকতো, সেটা হলো শামুকের মত একটা খোলা। এই খোলাটায় তাদের শরীর ঢাকা থাকতো। এটা যখন তারা খুলে পৃথিবীর নদীতে নামতো তখন খুব সাবধানে একে রাখতে হতো, কারণ এটাই ছিল তাদের উপর থেকে নীচে আসা বা নীচে থেকে উপরে যাওয়ার উপায়।

এমনি করেই হংসকুমারীদের দিন কাটে।

একদিন যখন পৃথিবীর লোক ঘুমিয়ে পড়েছে—চারি দিকে জমাট অন্ধকার নেমেছে সেই সময় আকাশের বুক চিরে যে আলো জ্বলে উঠলো—সেই আলোতে দেখা গেল, হংসকুমারীরা উজ্জ্বল সাদা ডানা মেলে গান গাইতে গাইতে নামছে—মৃদু মৃদু হাওয়ার তালে ভেসে ভেসে তারা নামছে, গানের সুরের রেশ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গানের সুর শুনে সব স্থির হয়ে গেছে, চারি দিকের গাছপালা, নদী, মাছ জল থেকে মুখ তুলে দেখতে ও শুনতে লাগলো।

নামলো হংসকুমারীর দল। গায়ের খোলা খুলে রাখলো, তারপর গায়ের জামা-কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো—ভাসতে ভাসতে সাঁতার কাটতে কাটতে কত দূর-দূরান্তরে আনাগোনা করতে লাগলো।

এ রকম তো হয়ই—যেদিনই তারা নামতো মাটীর পৃথিবীতে। সেদিন যে অমন একটা কাণ্ড ঘটবে তা কি কেউ আগে ভেবেছিল?

নদীর ধারে কাছের কুটীরগুলোয় যারা থাকতো তারা তো কোনদিন এমন ব্যাপার দেখেনি, শোনেওনি। সেদিন রাতে এই অদ্ভুত ব্যাপার এক জনের চোখে পড়লো।

সাঁতার আর খেলাধুলো শেষে হংসকুমারীর দল অনেক রাত ধরে ডাঙ্গায় এলো। তারা যখন জল থেকে উঠে দাঁড়ালো—তাদের গায়ের উজ্জ্বলতায় চারি দিকে আলো হয়ে উঠলো—সেই আলোতে তারা নিজেদের জামা-কাপড় পরে খোলাটা গায়ে লাগালো। ও মা! এ কী কাণ্ড! একটা খোলা যে নেই! সব চেয়ে ছোট হংসকুমারী তার জামা-কাপড় আর খোলাটা চুরি গেছে।

খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ—এদিক ওদিক—ও-গাছের ডাল—এদিকের ঝোঁপ—চারি দিকে সকলে মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু হলো কিন্তু কোথায় পোষাক, কোথায় বা গায়ে ঢাকা দেবার খোলাটা!

এদিকে ভোর হয়ে আসছে—সোসান পাখীরা ডাকতে শুরু করেছে, আকাশের পূব দিক লাল হয়ে আসছে, হংসকুমারীদের যাবার সময় হয়ে এলো—বস্ত্র পোষাক পাওয়া গেল না! দিনের আলো ফুটে উঠলে মহা মুস্কিল হবে, তাই ছোট হংসকুমারীকে রেখে আর সবাইকে চলে যেতেই হলো। সকলেরই মহা কষ্ট, একলা ছোট বোনকে রেখে বড়দের চলে যেতে কি দুঃখ, তা বোঝাই যায়! কিন্তু কি আর করবে, নিরুপায়! বোনেরা উড়লো আকাশে আর ছোট বোন নদীর তীরে গাছের তলায় বসে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো।

কাঁদতে কাঁদতে আকাশ ফরসা হয়ে গেল—চারি দিকে মানুষেরা জেগে উঠলো—আর হংসকুমারী মাটির পৃথিবীর মানুষের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

এমন সময় একজন লোক এলো, বললে: কে গো তুমি, কাঁদছো কেন?

হংসকুমারী কিছুই বলতে পারে না—আকাশের লোক কি পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে? কিন্তু কি হবে—কোনও উপায় নেই।

সে বললে: এসো আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে, সেখানে তোমার সব কথা শুনবো।

কি আর করবে হংসকুমারী—যেতে হলো তাকে। সব কথা শুনে লোকটি বললে—এখানে থাকো, যদি তোমার পোষাক পাও তাহলে আবার ফিরে যেও।

হংসকুমারী ভাবলে, তা না করেই বা উপায় কি? মনের দুঃখ আর চোখের জল নিয়ে সে সেখানেই থেকে গেল।

কিন্তু কি ব্যাপার জানো? ঐ লোকটাই হংসকুমারীর পোষাক চুরি করে রেখেছে, কিন্তু হংসকুমারীকে কিছু বলেনি। বেচারী হংসকুমারী কিছু জানে না—দুষ্ট লোকটাকে বিয়ে করে তার সঙ্গে

তার বাড়ীতেই থাকতে হলো। বেচারা হংসকুমারীর মনের কষ্টে দিন যায়!

অনেক দিন কেটে গেছে। হংসকুমারীর দু'টি ছেলে হয়েছে। তাদের নাম হলো মাকা টাফাকী আর কারিসিবুম। ভারী অদ্ভুত নাম—কি বল?

ছেলে দু'টি মায়ের মত সুন্দর হয়েছে, মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই তারা থাকে। মায়ের মনে কিন্তু একটুও সুখ নেই, রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে, যদি বোনেরা এসে তাকে ডাকে—যদি তাদের দেখতে পায়—কিন্তু কোনো দিন তাদের সে দেখতে পায় না। কেঁদে কেঁদে সুন্দর চোখ দু'টি ফুলে ওঠে। সংসারে সুখ নেই—স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না, আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের মিল হয় না। হংসকুমারী মানুষদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না—তাই প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি হয়।

একদিন এমনি ঝগড়া-ঝাঁটির পর হংসকুমারীর স্বামী বললে: যাও, চলে যাও তোমার দেশে, এখানে তোমায় থাকতে হবে না—মজা পেয়েছ ভারী—আমাদের সঙ্গে থাকতে ভারী কষ্ট তোমার? দূর হয়ে যাও। হংসকুমারী এমন কঠিন কথা কোন দিন শোনেনি—তাই খুব কাঁদতে লাগলো আর সেদিন থেকে সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো যদি তার পোষাক পাওয়া যায়।

দুই ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে হংসকুমারী ভাবছিল তার নিজের দুঃখের কথা। হঠাৎ বড় ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো—'দেখ, দেখ মা, ওটা কি।'

—কি কি? ছোট বলে উঠলো।

মা দেখলে মাটিতে একটা জিনিস পোঁতা রয়েছে—তারই এক টুকরো বাইরে বেরিয়ে আছে—সেটা হলো তার পাখার একটা অংশ।

আর কি! আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলো হংসকুমারী, তখনি মাটী খুঁড়ে সেগুলোকে উদ্ধার করলে। বড্ড মলিন হয়ে গেছে সেগুলো—তা হোক, এত দিন বাদে তবু তো পাওয়া গেছে! পৃথিবীর এই আবহাওয়া থেকে এবার সে মুক্তি পাবে।

সব কথা ভেবে সেদিন ছেলেদের খুব আদর করলো হংসকুমারী। এদের জন্যই যা একটু মনটা কেমন লাগে।

সেদিন রাত্রি শেষে মাকা টাফাকী, কারিসিবুম অবাক হয়ে দেখলো—অল্প আলো-আঁধারে—পূব আকাশের লাল আলোয় এক দল হংসকুমারী ঝলমলে পোষাক ছড়িয়ে—ঝকঝকে পাখনা মেলে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

দুই ভাই অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল।

বন্দে মাতরম্

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

ভারতবর্ষ মহাদেশ তুল্য

এশিয়াখণ্ডে উপ-মহাদেশ ভারতবর্ষ রাজে;
যদি একে বলো ভিন্ন মহাদেশ, সে কথা হবে না বাজে।
বর্গ মাইলে দেড় কোটি হবে ভারত মাপেতে, তাই
চীন ছাড়া আর এত বড় দেশ এশিয়ায় মাঝে নাই।
প্রকাণ্ড দেশ রুশিয়া লখিতে কিন্তু দখিণে তার
বড় বড় হ্রদ আর মরুভূমি পর্বত-কান্তার।
তাই তো তাহার বহুল অংশে মানুষের বাস নাহি,
ধূ ধূ করে মাঠ সাইবিরিয়ার যতদূর দেখি চাহি।

প্রাকৃতিক সীমা

ভারতবর্ষ—ভেবো না শুধুই বিপুল আকার এর,
প্রকৃতিও এর ভিন্ন হয়েছে তুলনায় অপরের!
উত্তরে এর গগনচুম্বী দাঁড়ায়ে উচ্চ শির
হিমালয় নামী পাষাণ প্রহরী সন্ত্রাস পৃথিবীর।
আর তিন দিকে অতল পরিখা শুধু জল শুধু জল—
বহিছে ভারত-মহাসমুদ্র দুর্বার, চঞ্চল।
আরব সাগর কিংবা বঙ্গ উপসাগরের নাম,
হয়তো শুনেছ; কিন্তু তাদের কে দেবে কেমন দাম?
কারণ তারা যে ভারতের মহাসাগরেরি সন্তান,
তারি কল্যাণে পেয়েছে জীবন, এরে আছে আজো প্রাণ।
উত্তর-পশ্চিম আর ওই উত্তর-পূব দিক
দুই বাহু মেলি ধরেছে ভারত দুই সীমা প্রাকৃতিক।
এক দিকে তার ছবি দেখা যায় আফগানিস্থানের,
অপর দিকেতে ব্রহ্মদেশটা বৌদ্ধ ধর্মীদের।
দুইটি দিকেই পর্বতশ্রেণী দুস্তর, দুর্গম;
পরদেশীদের যোগাযোগে তাই ফুরায় বুকের দম।
কাবুলে কিংবা বেলুচিস্থানে যেতে হলে আছে খাস্
দুইটি দুয়ার—খাইবার পাস্ আর সে বোলান পাস্।
কিন্তু ব্রহ্মদেশের পথটা আজো রয়ে গেছে জলা
গিরিবনময় স্থলপথে সেথা সহজ নয়কো চলা।
এখন তা হলে দেখিয়া শুনিয়া বুঝেছ কি সবে বেশ
স্বয়ং প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে স্বতন্ত্র এই দেশ?
দেখিতে এদেশ কেমন আকার এইবার দেখা যাক—
গাছে যেন ঝুলে রয়েছে ত্রিকোণ মৌভরা মৌচাক!
রাজ্য বিভাগ ছেড়ে দিয়ে ধরো ভৌগোলিকের ভাগ,
তা হলে কায়দা করিতে পারিবে, এদেশ মানিবে বাগ।
পৌরাণিকেরা নবম খণ্ডে এদেশ ভেঙেছে আগে
মহাভারতের মতে এই দেশ খণ্ডিত চার ভাগে
ভৌগোলিকের বিভাগ কিন্তু মোটামুটি হলো দুটি
ঐ দেখো মাঝে মাথা তুলে আছে বিন্ধ্য পাহাড় ঝুটি।
উত্তরে তার উত্তরাপথ, দখিণে দখিণাপথ;
এইবার তবে চালাও তোমরা তোমাদের মনোরথ।
এশিয়ার মেরুদণ্ড যেমন দুর্জয় হিমালয়
বিন্ধ্য তেমনি ভারতের মেরু জেনে রাখো নিশ্চয়।
বিন্ধ্য পাহাড় হয়েছে মিলিয়া সাতপুরা আরাবলি—
যেন সে পুঞ্জ পাষাণের স্তূপ পাতালের অঞ্জলি।
আরাবলি যেথা তার পশ্চিমে রাজমহলের পূবে
যেইটুকু জমি পড়ে আছে, নাই একেবারে জলে ডুবে,
তাহারি একটি অংশ গড়েছে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে,
অপর অংশ বঙ্গ-আসাম পূববাসীদের তাঁবে।

উত্তরাপথ

উত্তরাপথ সমতল গোটা দেখা যায় যতদূর,
নাহি সেথা কোন গিরি-পর্বত অরণ্য, বন্ধুর।
শুধু এক স্থান ঠেলিয়া উঠেছে উচ্চে অকস্মাৎ
পাঞ্জাব যেথা হিন্দুস্থানে আদরে মিলায় হাত।
ফলে এইখানে নজরে পড়িছে যে সব স্রোতস্বিনী
তাদের কেহ বা পূবে বয়, কেহ পশ্চিমে প্রবাহিনী।
পশ্চিম ভাগে পাঁচটির নাম ঝিলম, চেনাব, রাবি,
সৎলেজ আর বিয়াস; কেহই ছাড়ে না আপন দাবী।
হিমালয়ে লভি জন্ম ইহারা মিলিয়া পরস্পর
পথিমাঝে, মেশে সিন্ধুদেশের সঙ্গে অতঃপর;
তারপরে ধায় যেথায় সাগর দুর্দম, দুস্তর—
বিস্তার যার অন্তবিহীন, মূর্তি ভয়ঙ্কর।
পাহাড় হইতে যে মাটি কাটিছে নিত্য নদীর জল,
তাই দিয়ে হয় তৈরী মোদের বাসভূমি সমতল।
অধুনা যাহারে পাঞ্জাব বলি সেই তো পঞ্চনদ,
পঞ্চনদের কৃপায় যাহার সঞ্চিত সম্পদ।
উত্তরাপথে পূব দিকে চাহি এইবার দেখো ছয়
নদীমালা অতি সর্পিল গতি সেথা প্রবাহিত হয়।
গঙ্গা, যমুনা, গোগরা, গোমতী আর গণ্ডক, কুশি
স্বেচ্ছাচারিণী অবারিত চলে যাহার যেখানে খুশি।
হিমালয় গিরি অচল অটল এদেরো জন্মদাতা,
কত যুগ ধরি কত উৎসের লাগি তার বুক পাতা।
উক্ত ছয়টি নদীর মধ্যে গঙ্গাই হলো সেরা;
গঙ্গার সাথে একে একে সবে মিলিত হয়েছে এরা।
সিন্ধুনদের সঙ্গে কিন্তু গঙ্গার ভেদ আছে,
সেই কথাটিই বলে রাখি হেথা ভুলে যাও সবে পাছে।
সিন্ধু তাহার সবটাই জল হিমালয় থেকে নেয়;
হিমালয় ছাড়া বিন্ধ্যগিরিও গঙ্গাকে জল দেয়।
বিন্ধ্যপাহাড়ে জন্ম নিয়েছে সোন আর চম্বল,
গঙ্গার সাথে মিশে দুয়ে তারা নাচে দিয়ে তালে তাল।
জীবন জলের আরেকটা নাম, গঙ্গা তাই জীবন
সারা উত্তরাপথের সে কথা মনে রেখো অনুখন।
রক্তের মতো যদি না গঙ্গা হইত প্রবহমান,
উত্তরাপথ তাহলে শুকাতো ছুটে যেতো তার প্রাণ।
হিন্দুস্থান প্রকৃতপক্ষে গাঙ্গেয় এই দেশ,
সভ্যতা বলি যাহা জানো তার এইখানে উন্মেষ।
আরাবলি গিরি—তার পশ্চিমে আর তার দক্ষিণে
ধূ-ধূ করে ওই তপ্ত মরুভূ, লহ তারে লহ চিনে।
ওই মরুভূর অন্তরে বহি দক্ষিণ দিকে নামি,
সিন্ধুনদ সে হয়েছে আবার সাগরের অনুগামী।
দু'ধারের দেশ সিন্ধুনদের ধরিছে সিন্ধু নাম,
রৌদ্র প্রখর, বাতাস সেথায় উচ্ছল, উদ্দাম।
সক্কর নামে সেথা যেই ভূমি কোথা তার জুড়ি পাই?
এই পৃথিবীতে তেমন গরম জায়গা কোথাও নাই।
বিন্ধ্যগিরির গা ঘেঁসে আসিয়া পূর্বে অনেক দূর
রাজমহলের নিকটে গঙ্গা তুলেছে মুক্তি সুর;
তারপর তার মিলন ঘটেছে ব্রহ্মপুত্র সনে
গোয়ালন্দের নিকট, সে কথা রাখিবে সবাই মনে।
হিমালয় থেকে ব্রহ্মপুত্র বা'র হয়ে বেগে ধায়,
ভুটানের পূবে দক্ষিণবাহী হয়ে মেশে গঙ্গায়;
তারপরে এই মিলিত গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র আর
আরো দক্ষিণে নামিয়া আসিয়া গলা ধরি মেঘনার
ছুটে চলে কার সঙ্কেতে যেন ছুটে চলে অভিসারে
যেথায় ভারত-মহাসাগরের তরঙ্গ ঝঙ্কারে।
মেঘনা সে কালো গারো পাহাড়ের দস্যি-দামাল মেয়ে,
মেঘ যদি উঠি উপরে আকাশ হঠাৎ ফেলেছে ছেয়ে,
তটিনী নটিনী অমনি ক্ষেপিয়া হেসে ওঠে খল্ খল্,
উত্তাল ঢেউ তোলে আর দোলে টলমল টলমল!

[ক্রমশঃ।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়

ইতালীর ঠিক নীচেই আছে ছোট্ট একটি দ্বীপ, নাম তার সিসিলি। যে সময়কার কথা বলছি সে সময় সেখানকার রাজা ছিলেন হীরণ। তখন সিসিলির ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে এসেছে বিপদের কালো মেঘ। ভূমধ্য সাগরের বুকে দেখা দিয়েছে রোমকদের যুদ্ধ-জাহাজ।···এগিয়ে আসছে বিদেশী সৈন্য দুর্বার দুরন্ত মৃত্যুর মত। লক্ষ্য এই ছোট্ট রাজ্য সিসিলি। মহা বিপদে পড়লো রাজা হীরণ। নগণ্য তাঁর সৈন্যবল। এই তুচ্ছ সৈন্যদল নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'লে রোমান সৈন্য ঝড়ের মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাদের। নিরুপায় রাজা ডেকে পাঠালেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ এক জ্ঞানীকে।

এখন উপায়? বিদেশীর লাঞ্ছনা হ'তে নিষ্কৃতির পথ কোথায়? উপায় খুঁজে বার করলেন জ্ঞানী মানুষটি! রোমান সৈন্য পর-রাজ্য জয়ের উপযুক্ত প্রতিদান পাবে। 'কিন্তু কি চাই?' ব্যাকুল রাজা জিজ্ঞাসা করলেন। হাতিয়ার?—কামান?—যুদ্ধ-জাহাজ? অস্ত্রশস্ত্র?—

কিছুই চাই না—' হাসি ফুটে উঠল জ্ঞানী মানুষটির মুখে।—'শুধু চাই কাচ।'

'কাচ?'

'হ্যাঁ, কতকগুলি বড় আতসী কাচ।' জবাব এল বৈজ্ঞানিক মানুষটির কাছ হ'তে।

বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল হীরণের মুখে।

গম্ভীর ভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন জ্ঞানী লোকটি। আতসী কাচের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত সূর্য্যরশ্মি কোন দাহ্য-বস্তুর ওপর স্থির ভাবে নিক্ষেপ করলে যে ভয়ানক উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাতেই জ্বলে ওঠে সেই বস্তু। এ আষাঢ়ে গল্প নয়···নিছক একটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

পরীক্ষার দিন এলো। এক সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনে রোমান সৈন্য-বাহী অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ ভিড় করলো সিসিলির উপকূলের কাছেই।

রোমান সৈন্যদের মুখ হ'তে খসে পড়ল বিস্ময়ের তারা। কি আশ্চর্য্য! সিসিলির রাজা করবে না যুদ্ধ! উপকূল-রক্ষীবাহিনী নেই। শুধু আছে খান-কতক কাঠ। সমুদ্র-বেলাভূমিতে দণ্ডায়মান অবস্থায়। সুন্দর দিনটিতে এক ঝলক আলো ঠিকরে পড়ছে তাদের যুদ্ধজাহাজে কাচগুলোর মধ্য দিয়ে। এ কি রহস্য!

রহস্যই বটে। খানিক পরেই কাঠের জাহাজগুলো জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। আর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল অধিকাংশ জাহাজেই। একটার পর একটায়!

বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির বার্ত্তা নিয়ে ফিরে চলল বাকী কয়েকটি জাহাজ স্বদেশের দিকে। পরাজয় স্বীকার করলে তারা এক বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কাছে।

এই অসামান্য জ্ঞানী লোকটি হচ্ছেন আর্কিমিডিস।

খামখেয়ালী ছড়া

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে কহিতেছে চিতাবাঘ
"নাহি জানি হায় মোর গায়ে কেন এত দাগ।
এই দাগ তুলে দেয় যদি কোনো বদ্যি
তবে আমি ভালো করে তার ঋণ শোধ দি'।"
চট্ করে চটে উঠে কহিতেছে কয়লা
"দুত্তোর, গায়ে মোর কেন এত ময়লা?
কল-তলা বসে বসে সাবান কি মাখ্‌বো?
নয় তো কি কেচে দিতে ধোপাকেই ডাক্‌বো?"

* * *

হাতে লয়ে কেরোসিন লণ্ঠন
একা মাঠে কে করিছে হণ্টন
আজি এই নিঝঝুম রাত্রে?
তালি-ভরা পাঞ্জাবী গাত্রে।
চলিতেছে লোকটি যে চট্‌পট্
পায়ে পায়ে চটি করে ছট্‌ফট্।
যদি এসে ছোব্‌লায় সর্প
চুরমার হবে যাবে দর্প।

* * *

কোথায় গেলি গদাই হেলি?
আয় ফিরে তুই, আয় রে আয়!
ঘোর বিষাদে বাপ-মা কাঁদে
বক্ষ ফেটে যায় রে যায়।
কাঁদ্‌ছে দাদা "আরে রে গাধা,
টান্‌বো না আর কান ধরে।
যতই পারিস্ জ্বালিয়ে মারিস্
যখন তখন গান ধরে।"
কাঁদ্‌ছে দাদু "আয় রে যাদু!
পালিয়ে বেড়াস্ কোন্ দূরে?
যেথাই যাবি কোথায় পাবি
আমার মতন বন্ধু রে?"
ঠাকুমা কাঁদে "মনের সাধে
খাস্ রে যতো চাস্ খেতে।
খাওয়ার শেষে খাবার ঠেসে
রাখিস্ ভরে বাক্সেতে।"
শোন্ রে বাঁদর থাকতে আদর
বুদ্ধি করে আয় চলে
নইলে পরে জান্‌বি ওরে
কাঁদতে হবে "হায়!" বলে।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

মোগলযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়ে বার্নিয়েরের এই চিঠিখানি অত্যন্ত মূল্যবান।

—অনুবাদক

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

৮

মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে লিখিত পত্র (২)

বিজাপুরের রাজাও মোগল সম্রাটকে কোন কর দেন না এবং তাঁর সঙ্গে বাদশাহের বিরোধ ও সংঘর্ষ প্রায় লেগেই থাকে। তিনি তাঁর সৈন্যবলের জন্য যতটা না শক্তিশালী, তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী আরও অন্যান্য কারণে। আগ্রা ও দিল্লী থেকে তাঁর রাজ্য অনেক দূরে, মোগল সম্রাটের শাসনকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রাজ্যের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। বিজাপুর রাজধানী অন্য কারণেও অনেকটা নিরাপদ বলা চলে। জলের ব্যবস্থা খুব খারাপ এবং সৈন্যদের কুচকাওয়াজের উপযোগী বিশেষ খোলা জায়গাও নেই চারপাশে। কতকটা দুর্গের মতন রাজার রাজধানী। এই কারণে অন্যান্য রাজারাও যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁর সঙ্গে যোগ দেন, শুধু ঐ রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য। সুরাট বন্দর লুণ্ঠতরাজ করার পর শিবাজীও তাই করেছিলেন।

গোলকুণ্ডার রাজাও খুব শক্তিশালী, বিজাপুর-রাজের মিত্র। বিজাপুরের রাজাকে তিনি অর্থ ও সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন গোপনে। এইরকম আরও শত শত রাজা-রাজড়া ও জমিদাররা আছেন যাঁরা সম্রাটকে কোনরকম কর দেন না এবং প্রায় স্বাধীনভাবে তাঁদের নিজস্ব রাজ্যে ও এলাকায় প্রভুত্ব করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বেশ শক্তিশালী, নিজেদের সৈন্যসামন্তও তাঁদের আছে এবং স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাঁদের যথেষ্ট। আগ্রা ও দিল্লী থেকে কেউ কাছে, কেউ দূরে থাকেন। এঁদের মধ্যে পনের যোল জন রাজার ধনৈশ্বর্য ও সামরিক শক্তি খুব বেশী, বিশেষ ক'রে চিতোরের রাণার, রাজা জয়সিংহের ও রাজা যশোবন্ত সিংহের। এই তিন জন রাজা যদি একবার হাত মিলিয়ে একত্রে কোন অভিযান করার সঙ্কল্প করেন তাহ'লে মোগল সম্রাটের সিংহাসনকে তাঁরা টলিয়ে দিতে পারেন। এরকম দুর্ধর্ষ তাঁদের শক্তি! প্রত্যেক রাজা ইচ্ছা করলে প্রায় বিশহাজার অশ্বারোহী রাজপুত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন করতে পারেন এবং সারা হিন্দুস্থানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। রাজপুত অশ্বারোহীদের শৌর্যবীর্যের কথা হিন্দুস্থানে কারও অজানা নেই। এই রাজপুত সৈন্যদের কথা পরে আরও বিশদভাবে বলব। রাজপুতরা পুরুষানুক্রমে যোদ্ধার জীবন যাপন করে। রাজার কাছ থেকে জমিজমা জায়গীর পায় এবং বংশানুক্রমে রাজার অধীনে সৈনিকের কাজের বিনিময়ে সেই জায়গীর ভোগ করে। যুদ্ধ ও বীরত্ব তাদের রক্তের মধ্যে আছে। এরকম কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভীক জাত হিন্দুস্থানে খুব অল্পই আছে। সৈন্য হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে তাদের সমকক্ষ আর বিশেষ কেউ নেই।

তৃতীয়তঃ—মোগল সম্রাট মুসলমান হ'লেও "সুন্নী" সম্প্রদায়ভুক্ত। তুর্কীদের মতন তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ওসমান হলেন মহম্মদের উত্তরাধিকারী। সম্রাটের পার্ষদ ও সভাসদরা, আমীর ও ওমরাহরা হলেন অধিকাংশই 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা আলির উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী ; পারসীদের মতন। তাছাড়া মোগল সম্রাট হিন্দুস্থানে অনেকটা বিদেশীর মতন বলা চলে। তাঁরা তৈমুরের বংশধর এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁরা ভারতবর্ষ জয় করেন। সুতরাং মোগলরা হিন্দুস্থানে চারিদিকেই শত্রু-পরিবেষ্টিত। হিন্দুস্থানে একশ'জন ভারতীয়ের মধ্যে একজন মোগল আছে কিনা সন্দেহ। শতকরা একজন মুসলমান আছে কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং হিন্দুস্থানে নিরাপদে রাজত্ব করা ও বসবাস করা মোগলদের কাছে একটা সমস্যার ব্যাপার! ঘরে শত্রু, বাইরেও শত্রু। ঘরে দেশীয় রাজারা প্রবল শত্রু, বাইরে পারস্য থেকে আক্রমণের আশঙ্কাও আছে। ঘরে-বাইরে এইভাবে শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়ে থাকার জন্য মোগল সম্রাটরা সর্বদা নিরাপত্তার ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকেন। সেজন্য তাঁদের বিশাল সেনাবাহিনী সবসময় প্রস্তুত রাখতে হয়। সঙ্কটের সময় তো হয়ই, শান্তির সময়ও হয়। এদেশের লোকদের নিয়েই সেনাবাহিনী গঠন করা ছাড়া উপায় নেই। তার মধ্যে অধিকাংশই রাজপুত ও পাঠান, এবং বাকি হ'ল মোগল সৈন্য। এখানে 'মোগল' কথাটা অবশ্য একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেকোন শ্বেতাঙ্গ বিদেশী ব্যক্তি মুসলমানধর্মী হলেই 'মোগল' ব'লে পরিচিত হন। আসল 'মোগল' কিন্তু 'মোগল' ব'লে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মধ্যে খুব অল্পই আছে। রাজদরবারেও বিশেষ নেই। উজবেক, পারসী, আরবী, তুর্কী সকলেরই বংশধররা এখন 'মোগল' নামে অভিহিত হন। এই প্রসঙ্গে একথাও জেনে রাখা দরকার যে, এই সব তথাকথিত 'মোগলরা' এদেশে কিছুদিন বসবাস করার পর আর তেমন মর্যাদা পান না। তাঁদের বংশধররা অনেকটা এদেশী হয়ে যান, সম্রাটের কাছে তাঁদের মোগলাই মর্যাদার জৌলুষও অনেকটা ম্লান হয়ে যায় এবং নবাগত বিদেশী মুসলমানরা

মোগলাই আভিজাত্যের তকমা এঁটে ঘুরে বেড়ান। দু'তিন পুরুষের মধ্যে তথাকথিত "মোগলদের" বংশধররা এমন এক সাধারণের স্তরে নেমে আসেন যে তখন মোগল সেনাবাহিনীতে সামান্য পদাতিক বা অশ্বারোহী হ'তে পারলেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করেন। এই হ'ল মোগলদের পরিচয়।

এইবার মোগল সেনাবাহিনী সম্বন্ধে আপনাকে দু'চার কথা বলব। কি পরিমাণ অর্থব্যয় যে এই সৈন্যদের জন্য করা হয় তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। প্রথমে হিন্দুস্থানের সৈন্যদের কথা বলি।

হিন্দুস্থানের সৈন্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, জয়সিংহ (Jesseingue) ও যশোবন্ত সিংহের (Jessomseingue) রাজপুত সৈন্যরা। এই দু'জন এবং অন্যান্য আরও রাজাদের মোগল সম্রাট যথেষ্ট টাকা দেন। টাকা দিয়ে তাঁদের সৈন্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা সংখ্যাকে নিজের কাজের জন্য নিযুক্ত রাখেন। অর্থাৎ রাজারা মোগল সম্রাটের অর্থের বিনিময়ে রাজপুত সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় তাঁকে সাহায্য করেন। অর্থ অনুপাতে সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। বিদেশী ও মুসলমান ওমরাহদের সমান মর্যাদা রাজারা পান। ওমরাহদের অধীনেও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য থাকে এবং সেই সৈন্যসংখ্যা অনুযায়ী তাঁরা জায়গীর ও তনখা পান। একাধিক কারণে এই দেশীয় রাজাদের এইভাবে হাতে রাখার দরকার হয়।

প্রথম কারণ হ'ল, রাজপুতরা সৈন্য হিসেবে চমৎকার, তাদের বীরত্বের তুলনা হয় না। আগেই বলেছি, এই রাজারা ইচ্ছা করলে একদিনে প্রত্যেকে বিশ হাজারের বেশী সৈন্য মোতায়েন করতে পারেন।

দ্বিতীয় কারণ হ'ল, এই রাজারা প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজ্যে রাজত্ব করেন। তাঁরা কেউ মোগল সম্রাটের বেতনভুক্ ন'ন, কোন হুকুমেরও ধার ধারেন না। 'কর' দিতে বললে তাঁরা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করেন এবং যুদ্ধে যোগ দিতে বললে আদেশ অগ্রাহ্য করেন। এহেন রাজাদের যদি ফিকির ফন্দি ক'রে কিছুটা তাবে রাখা যায়, তাহ'লে মোগল সম্রাটের তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবার কথা নয়!

তৃতীয় কারণ হ'ল, এই রাজাদের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে পারলে মোগল সম্রাটের পক্ষে সব চেয়ে সুবিধা। তাঁর রাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্যও তাই। তিনি সব সময় চেষ্টা করেন এই দেশীয় রাজাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি ক'রে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে। একজন রাজাকে বেশীমাত্রায় তোষণ ক'রে, উপঢৌকন দিয়ে তিনি অন্যান্য রাজাদের বিদ্বেষভাব জাগিয়ে তোলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে এই বিদ্বেষ থেকে, তাঁদের সৈন্যক্ষয় ও ধনক্ষয় হয় এবং তাঁরা দুর্বল হয়ে যান। তাতে মোগল সম্রাটের শক্তি ও নিরাপত্তা বাড়ে। এই কারণেও অনেক সময় মোগল সম্রাট দেশীয় নৃপতিদের দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন।

চতুর্থ কারণ হ'ল, এই দেশীয় রাজারা দলে থাকলে পাঠানদের জব্দ করার সুবিধা হয় এবং বিদ্রোহী ওমরাহদেরও সায়েস্তা করা যায়।

পঞ্চম কারণ হ'ল, গোলকুণ্ডার রাজা যখন 'কর' দিতে চান না অথবা বিজাপুর বা অন্যান্য প্রতিবেশী রাজাদের মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে চক্রান্তে সাহায্য করতে চান, তখন এই দেশীয় রাজাদের পাঠানো হয় তাঁকে জব্দ করার জন্য। সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত ওমরাহদের পাঠাতে সম্রাট ভরসা পান না।

ষষ্ঠ কারণ হ'ল, পারসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহের সময় এই দেশীয় রাজাদের উপর মোগল সম্রাট সব চেয়ে বেশী নির্ভর করেন। তার কারণ তাঁর ওমরাহরা অধিকাংশই পারসী এবং তাঁরা নিজেদের দেশের রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে রাজী হন না। তাঁদের ইমাম বা খলিফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তাঁরা কাফেরের হীন কাজ ব'লে মনে করেন। সুতরাং পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে মোগল সম্রাটের পক্ষে এই দেশীয় রাজাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই কারণেও রাজাদের স্বপক্ষে রাখার দরকার হয়।

যে কারণে মোগল সম্রাট রাজপুতদের স্বপক্ষে রাখতে বাধ্য হন, অনেকটা সেই একই কারণে পাঠানদেরও তিনি নিজের দলে রাখতে চান।

এছাড়া, বিশাল মোগল সেনাবাহিনীও তাঁকে নিযুক্ত রাখতে হয় এবং তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতেও তিনি বাধ্য হন। এই সেনাবাহিনীরও কিছুটা বিস্তারিত পরিচয় দিচ্ছি।

প্রধানতঃ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এই সেনাবাহিনী গঠিত। একদল সৈন্য সব সময় সম্রাটের নিজের প্রয়োজনের জন্য তাঁর কাছেই রাখা হয়, আর বাকি সৈন্যরা বিভিন্ন প্রদেশে সুবাদারদের অধীনে ছড়িয়ে থাকে। অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে সম্রাটের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য যারা তৈরী থাকে তাদের কথা প্রথমে বলছি। এই অশ্বারোহীরা ওমরাহ, মনসবদার, রৌশিনদার প্রভৃতির অধীনে বহাল থাকে। অশ্বারোহী সৈন্য ছাড়াও পদাতিক সৈন্য আছে এবং গোলন্দাজবাহিনীর মধ্যে পদাতিক গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী গোলন্দাজ আছে। তাদের কথাও একে-একে বলব।

একথা ভাববেন না যে রাজদরবারের ওমরাহরা বনেদী পরিবারের বংশধর, ফ্রান্সের অভিজাতশ্রেণীর মতন। আদৌ তা নয়। হিন্দুস্থানে সম্রাটই যেহেতু সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক, সেইজন্য সেখানে ইয়োরোপের মতন 'লর্ড' বা 'ডিউক'রা গজিয়ে ওঠার সুযোগ পাননি। বিরাট কোন সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব বংশপরম্পরায় ভোগ ক'রে কোন পরিবার হিন্দুস্থানে প্রচুর পরিমাণে ধনসঞ্চয় করবার সুযোগ পান না। সম্রাটের সভাসদরা সকলে ওমরাহদের বংশধরও ন'ন। সম্রাট সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ব'লে কোন ওমরাহের মৃত্যু হ'লে তাঁর ধনসম্পত্তির মালিক হন সম্রাট। আমীর পরিবারের আভিজাত্য একপুরুষ, কি দুইপুরুষের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এবং তাঁর পুত্র বা পৌত্ররা প্রায় ভিক্ষান্নজীবীর স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হন। তখন তাঁরা সম্রাটের সেনাবাহিনীতে সাধারণ অশ্বারোহী সেনাদলে নাম লেখান। সম্রাট অবশ্য সাধারণত মৃত আমীরের পত্নী ও নাবালকদের একটা ভাতার বন্দোবস্ত ক'রে দেন, কিন্তু সেটা আমিরী আভিজাত্য অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর যদি কোন আমীর সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘায়ু হন তাহ'লে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি চেষ্টা ক'রে হয়ত তাঁর পুত্রদের একটা ভাল

ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যেতে পারেন। সেটা আর কিছু নয়, কোনরকমে সম্রাটের সুনজরে এনে আমীরনন্দনদের কোন যোগ্য পদে বহাল ক'রে যেতে পারেন। কিন্তু সেরকম ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাও আবার তার জন্য আমীরনন্দনের সুদর্শন সুন্দর শ্রী থাকা দরকার, যাতে তাঁকে দেখলে বনেদী মোগলবংশজাত ব'লে মনে হয়। তা না হ'লে সম্রাটের নেকনজরে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সাধারণতঃ অবশ্য সম্রাট হঠাৎ কাউকে কোন উচ্চপদের মর্যাদা দিতে চান না। সাধারণ স্তর থেকে ক্রমে উচ্চস্তরে ধীরে ধীরে উঠতে হয় সকলকে। এইজন্য দেখা যায়, মোগল দরবারের ওমরাহরা সকলে বনেদী বংশের সন্তান ন'ন, কারণ বংশানুক্রমে আমিরী মর্যাদা ভোগ করা হিন্দুস্থানের খুব কম ভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব হয়। সাধারণতঃ ওমরাহরা বিদেশী ভাগ্যান্বেষীর দল এবং অধিকাংশই নিম্নবংশজাত। প্রায়ই দেখা যায়, তাঁরা ক্রীতদাসপুত্র এবং শিক্ষাদীক্ষার কোন বালাই নেই তাঁদের। সেইজন্যই সম্রাট নিজের মর্জি মাফিক তাঁদের পদমর্যাদায় ভূষিত করতে পারেন এবং টেনে নিম্নপদে নামিয়েও দিতে পারেন। মান-অপমান বোধ তাঁদের বিশেষ নেই।

ওমরাহরা কেউ 'হাজারী', কেউ 'দু'হাজারী', কেউ 'পাঁচহাজারী', কেউ 'সাতহাজারী', কেউ 'দশহাজারী' ইত্যাদি পদমর্যাদাবিশিষ্ট আছেন। হাজার ঘোড়ার অধিনায়ক যিনি তিনি 'হাজারী', দু'হাজার ঘোড়ার যিনি তিনি দু'হাজারী ইত্যাদি। হাজারী, দু'হাজারী, পাঁচহাজারী ইত্যাদি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। দ্বাদশহাজারীও কেউ কেউ আছেন, যেমন সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। সৈন্য সংখ্যার অনুপাতে ওমরাহরা তনখা পান না, ঘোড়ার সংখ্যা অনুপাতে পান। যিনি যতগুলি ঘোড়ার মালিক, তাঁর তনখাও সেইরকম। সাধারণতঃ একজন সৈন্যের জন্য দু'টি ক'রে ঘোড়া বরাদ্দ থাকে। কথায় বলে, যার একটি মাত্র ঘোড়া, তার এক পা নাকি মাটিতেই থাকে। কিন্তু ওমরাহরা যে তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী ঘোড়া পোষেন তা ভাববার কোন কারণ নেই। সম্রাট অবশ্য যিনি যত হাজারী, তাঁকে সেই অনুপাতে তনখা দেন। সৈন্যদের বেতন বাবদও তিনি বরাদ্দ টাকা পান। এই বেতন থেকে তিনি অনেকাংশ নিজে আত্মসাৎ করেন। তাছাড়া যতগুলি ঘোড়া তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী রাখার কথা তা তিনি কোনকালেই রাখেন না। ঘোড়ার 'রেজিষ্টার' বা হিসেবের খাতাটিতে অবশ্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ ঠিকই থাকে এবং সেই ঘোড়ার খরচ বাবদ তাঁর যা প্রাপ্য তা তিনি আদায়ও ক'রে নে'ন। ঘোড়ার বদলে ঘোড়ার বরাদ্দ টাকা তিনি নিজেই ভোগ করেন। কেউ কেউ নগদ টাকার বদলে জায়গীরও ভোগ করেন। অবশ্য বাইরে থেকে "হাজারী" খিলাতের হাঁকডাক যতটা, আসলে তার অনেকটাই ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছু নয়। দু'হাজারী যিনি, তাঁর হয়ত আসলে দু'শ ঘোড়া রাখার অধিকার আছে। সেই দু'শ ঘোড়ার ভরণপোষণের খরচ তিনি পান। তাই থেকে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত টাকা নিজে তিনি আত্মসাৎ করেন। আমি নিজে যে আমীরের অধীনে কাজ করতাম, তিনি একজন 'পাঁচহাজারী, কিন্তু তাঁর পাঁচশ' ঘোড়া পোষার হুকুম ছিল। এই পাঁচশ' ঘোড়ার বরাদ্দ টাকা থেকেও তিনি মাসে পাঁচ হাজার ক্রাউন আত্মসাৎ করতেন। তবু তো তিনি জায়গীরভোগী ছিলেন, নগদী ছিলেন, অর্থাৎ নগদ টাকায় তাঁর বেতন দেওয়া হ'ত। জায়গীরভোগীদের উপরি আয়ের যথেষ্ট সুযোগ থাকে, প্রচুর আয় তাঁরা করেনও। কিন্তু নগদীদের সে-সুযোগ খুব কম থাকে। তবু তাই থেকেও তাঁরা অল্প ঘোড়া পুষে, খাতাপত্রে ঘোড়ার হিসেব ঠিক দেখিয়ে, যথেষ্ট উদ্বৃত্ত টাকা নিজেরাই আত্মসাৎ করেন। এত আয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওমরাহদের মধ্যে ধনী ব্যক্তি খুব অল্পই আমার নজরে পড়েছে। আমি যাঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দেনার দায়ে জড়িত। অন্যান্য দেশের লর্ড বা ডিউকদের মতন তাঁরা যে নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য এরকম দুরবস্থার মধ্যে পড়েন তা নয়। অধিকাংশ ওমরাহের শোচনীয় দুর্দশার কারণ হ'ল, বছরে একাধিক উৎসব-পার্বণে তাঁদের ভেট দিতে হয় সম্রাটকে এবং তার জন্য বেশ মোটা টাকা গুণগার দিতে হয়। তাছাড়া অধিকাংশ ওমরাহকে অত্যধিক স্ত্রী, 'চাকর-বাকর, উট, ঘোড়া ইত্যাদি প্রতিপালন করতে হয়। প্রধানতঃ এই দুই কারণে তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে যান।

বিভিন্ন প্রদেশে, সেনাবাহিনীতে ও রাজদরবারে যথেষ্ট ওমরাহ আছেন। তাঁদের সংখ্যা ঠিক কত, তা আমি বলতে পারব না, তবে সংখ্যা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কিছু নেই। রাজসভায় ওমরাহের সংখ্যা পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের মধ্যে, তার বেশী নয়। সকলেই

প্রায় মোটা টাকা আয় করেন এবং আয়ের মাত্রা তাঁদের ঘোড়ার সংখ্যার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ঘোড়ার সংখ্যা এক থেকে বারোহাজার পর্যন্ত হতে পারে। এই ওমরাহরাই হলেন রাষ্ট্রের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। বড় বড় রাজকার্যের দায়িত্ব ও রাজকীয় মর্যাদা তাঁরাই পান। রাজসভায়, প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে সর্বত্র তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ পদমর্যাদার অধিকারী। ওমরাহদের মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ বলা যায়। তাঁরা রাজদরবারের জাঁকজমক বজায় রেখে চলেন, কখনও তাঁদের পথেঘাটে সাধারণের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখা যায় না।

বাইরে যখন তাঁরা যান তখন রাজকীয় পোষাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে যান। জমকালো পোষাক দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কখন যান হাতির পিঠে চ'ড়ে, কখন বা ঘোড়ার পিঠে। মধ্যে মধ্যে পাল্‌কিতে চ'ড়েও যেতে দেখা যায়। যখনই যেভাবে যান না কেন, বাইরে যাবার সময় তাঁদের সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈন্য থাকে। তাছাড়া, এক দল চাকর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। আগে যায় একদল, পথের লোকজন সরাতে সরাতে, ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে মশা-মাছি ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে। দুই পাশে যায় দুই দল চাকর, কেউ পিকদানী, কেউ পানীয় জল, কেউ হিসেবের খাতা ইত্যাদি নিয়ে। এই ভাবে ওমরাহরা বাইরে পথ চলেন। প্রত্যেক আমীরকে প্রত্যহ রাজদরবারে দু'বার ক'রে হাজরে দিতে হয়। একবার বেলা দশটা এগারোটার সময়, সম্রাট যখন বিচার করতে বসেন, আর একবার সন্ধ্যা ছ'টায়। প্রত্যেক ওমরাহকে সপ্তাহে অন্ততঃ পুরো একদিন (২৪ ঘণ্টা) পালাক্রমে দুর্গ পাহারা দিতে হয়। যাঁর যখন পাহারা দেবার পালা পড়ে তিনি তখন নিজের যাবতীয় আসবাবপত্র শয্যাদ্রব্যাদি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। সম্রাট শুধু তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করেন। নীচে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে, ধীরে ধীরে সেই হাত উপরে তুলে 'তছলিম' ক'রে তিনি সম্রাটের সেই প্রেরিত খাদ্য গ্রহণ করেন।

মধ্যে মধ্যে সম্রাটও বিলাসভ্রমণে যান, পালকি ক'রে, হাতির পিঠে বা 'তখৎ-রওয়ানে' চ'ড়ে। 'তখৎ-রওয়ান' ভ্রাম্যমাণ সিংহাসন, সম্রাটের ভ্রমণের জন্যই তৈরী করা। আটজন বেহারা তখৎ কাঁধে ক'রে ছুটে চলে, আরও আটজন সঙ্গে থাকে মধ্যে মধ্যে কাঁধ বদলাবার জন্য। সম্রাট যখন ভ্রমণে যাবেন, তখন ওমরাহরা তাঁর সঙ্গে যাবেন, এই হ'ল প্রথা। অসুস্থতা, বার্ধক্য বা অন্য কোন বিশেষ গুরুতর কারণ ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না। সম্রাট পালকিতে, হাতির পিঠে বা তখৎ-রওয়ানে চড়ে যাবেন, ওমরাহরা অশ্বপৃষ্ঠে তাঁর অনুগমন করবেন। ঝড়বাদল, ধুলো উপেক্ষা ক'রেই তাঁদের যেতে হবে। সবসময় সম্রাট চারিদিকে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে বাইরে চলবেন, যখনই হোক—শীকারের সময়ই হোক, যুদ্ধযাত্রার সময় হোক বা নগর থেকে নগরান্তরে যাত্রাকালেই হোক। যখন সম্রাট রাজধানীর কাছাকাছি কোথাও শীকারে যান, বাগানবাড়ী বা প্রমোদভবনে যান, অথবা মসজিদে যান, তখন খুব বেশী আমীর ওমরাহ, সাঙ্গোপাঙ্গ দাসদাসী নিয়ে যান না। সেদিনে যে ওমরাহদের পাহারা দেবার পালা পড়ে, কেবল তাঁদেরই তখন সঙ্গে নিয়ে যান।

মনসবদাররাও* ঘোড়া রাখতে পারেন এবং তাঁরাও তনখা পান। পদমর্যাদা তাঁদেরও আছে, তনখাও তাঁদের অল্প নয়। ওমরাহদের সমান তনখা না হলেও, সাধারণ কর্মচারীদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশী তনখা পান। সেইজন্য মনসবদারদের ক্ষুদে ওমরাহ বলা হয়। সম্রাট ছাড়া তাঁরা আর কারও অধীন ন'ন এবং ওমরাহদের মতন তাঁদেরও কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজকর্তব্য পালন করতে হয়। ঘোড়া রাখার অধিকার থাকলে তাঁরা স্বচ্ছন্দে ওমরাহদের সমকক্ষ হ'তে পারতেন। আগে এ অধিকার তাঁদের ছিল, এখন তাঁদের কেবল দু'টি, চারটি বা ছ'টি ঘোড়া রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক-রূপে রাখার অধিকার আছে। মনসবদারদের বেতন মাসিক দেড়শত টাকা থেকে সাতশত টাকা পর্যন্ত। তাঁদের সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয় তবে ওমরাহদের চেয়ে তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশী। বিভিন্ন প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে মনসবদার অনেকে আছেন, রাজদরবারেও তাঁদের সংখ্যা দুইতিনশ'র কম নয়।

[ক্রমশঃ।

* আরবী ও পারসী ভাষায় "মনসব" কথার অর্থ "Office" বা "পদ"। "মনসবদার" কথার অর্থ 'অফিসার' বা পদস্থ কর্মচারী। আকবর বাদশাহ মনসবদারের সংখ্যা ৬৬ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী'—প্রথম খণ্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)।

চীনকে ভারতবর্ষের সাহায্য

খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও যে ভারতের বণিককুল চীনদেশে গমনাগমন করতো তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চীনদেশের অনেক স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ বর্তমান থাকার কথা বহু ইতিহাসে ভূরি-ভূরি পাওয়া যায়। এরূপ কথিত আছে যে, একদা ঔপনিবেশিক হিন্দু বণিকগণ চৈনিক রাজার সাহায্যার্থ ২৮০০ নৌসেনা ও কতকগুলি রণতরী দিয়েছিল।

[Prof. Terriende Laconperie লিখিত Western Origin of the Chinese Civilisation দ্রষ্টব্য]

দিনে দিনে
আরও মসৃণ,
আরও লাবণ্যময় ত্বক্

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

এবার মিত্রাকে মামারা দস্তুর মতো আদেশের সুরে বললেন—বাস্ যথেষ্ট হয়েছে। দু'-বাড়ী ছুটাছুটি ছেড়ে দিয়ে এবার বোস স্থির হয়ে। ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবছ না? এ ভাবে এখানে দু'দিন ওখানে দু'দিন করে যে ওদের মনের স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে। এক জায়গায় শিকড় গাড়তে না পারলে বড় হবে কি করে?

স্থির হয়ে বসল মিত্রা শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জে।

কুমার মুন্নী ভর্তি হয়ে গেল কনভেন্ট মণ্টি সারিতে ছোটদের সঙ্গে। অখণ্ড অবসর। এখন এই মস্ত মস্ত দিনগুলো নিয়ে মিত্রা করে কি! একটা দিন নয় তো যেন একটা অলস-অজগর সামনে পড়ে। এ-বাড়ীতে গীতা আর গায়ত্রীই ছিল ওর সমবয়সী বন্ধু। ওরা চলে গেছে শ্বশুরঘর করতে। মামীমারা ব্যস্ত, ছেলে, মেয়ে, স্বামী সংসার। মা তো কাশী যাবার আগ্রহ ভুলে সার করেছেন কুমার মুন্নী। তার উপর আছে ডালিম। এদের দু'জনের হাত থেকে ছেলে-মেয়ের জন্য কিছু করতে যাওয়া নয় তো, কাড়াকাড়ি করা। প্রয়োজনটা কি?

সেই যে ঝগড়ার পর চলে এসেছে, তারপর থেকে ও-বাড়ীর খবর সে কিছুই পায় না। শুধু কমলা চলে যাবার আগে দেখা করে গেছে এমন সহজ ভাবে, যেন ও-বাড়ীর সঙ্গে মিত্রার সম্পর্কটা সম্বন্ধেও সে খুব সচেতন নয়। বলে গেছে, চিঠি দেব। তবে বেশী নয়। উদ্দেশ্য মহৎ—ঘন ঘন জবাব লেখা থেকে তোমায় বাঁচানো। গিয়েই পৌঁছ সংবাদ লিখেছে—'এই মাত্র ঘরে ঢুকলাম। কি রকম এই মাত্র জান? ষ্টেশন থেকে গাড়ী, গাড়ী থেকে বাড়ী, বাড়ীর বারান্দা দিয়ে জুতোর ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে,—(পা বেঁকে গিয়ে সে শব্দে ছন্দপতন ঘটে। হাইহিল রপ্ত হয়নি এখনও)—ঘরে ঢুকে সোজা টেবিলের কাছে। স্ত্রীর খাতিরে সদ্য ঝাড়পোঁছ করা টেবিল—নয় তো বুঝতেই পার এই এক মাসে টেবিলের অবস্থা কি হয়েছিল—হাতের ব্যাগটি নামিয়ে, পৌঁছন সংবাদ লিখতে বসা। লিখব, চিন্তা করো না—নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছেচি কিন্তু আমার মঙ্গল মতো ঘরে ঢোকা নিয়ে কি নিদারুণ দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠায় উৎচকিত হয়ে যে বৌদি আমার সময় কাটাচ্ছিলো—হাসব নাকি? থাক। ননদের জন্য ভাবিত হওয়া বৌদিদের উচিত। তুমি কি বই পড়তে পড়তে আর এ উচিতটুকুও করনি।···তা এমনি নিশ্চিন্ত করা চিঠি আরও খানকয়েক লিখতে হবে। জলন্ধরে জলকষ্ট আর গরম, দুটোই সমান। সুখ তো বুঝতেই পারছ।'

কমলার চিঠির জবাব লিখে, রাণীর কাছে একখানা লিখতে গিয়েও হাত থেকে কলম নামিয়ে রাখলো মিত্রা। না, রাণী যখন দু'মাস হতে চলল তবু এমন চুপ করে আছে, তখন নিশ্চয়ই ও-বাড়ীর আবহাওয়াটা তার প্রতি অনুকূল হাওয়ার পাল তুলে নেই। থাকবার কথাও তো নয়। কে জানে, হয় তো বারণই হয়ে গিয়ে থাকবে ওর সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কের আদান-প্রদান রাখা। কমলা মেয়ে, রাণী বৌ। কমলার পক্ষে যা করা সম্ভব, রাণীর পক্ষে তা অসম্ভব বৈ কি। থাক দরকার নেই। এমনিতেই স্বামি স্ত্রীর ভেতর যে হৃদ্যতা! আর ওকে নিয়ে কোন ঝামেলা না হওয়াটাই মিত্রা চায়। তবু কেমন যেন রাণীর খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে—কত দিন হয়ে গেল দু'জনে একসঙ্গে বসে কথা বলে না। কলম হাতে তুলে নিল মিত্রা—

'রাণী, ভয় পেয়ো না, লিখতে বসেছি বলেই যে সে চিঠি তুমি পাবে তার কি কথা আছে? তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তা তো আর এখন কোন মতেই সম্ভব নয়—তাই আলাপের দ্বিতীয় উপায়টাই হাতে তুলে নিলাম। পরে বিবেচনা করে যদি উচিত না মনে হয়—ছিঁড়ে ফেলব। তোমার অস্বস্তির বা অশান্তির কারণ ঘটতে দেব না।

—বেলা পড়ে এসেছে। এক্ষুণি সব বাচ্চারা স্কুল ফেরত এলো বলে। মামীরা ব্যস্ত বৈকালিক জলখাবারের আয়োজনে। সাহায্য করতে গেলে তারা উঠবেন না, না করে। মামারা করবেন রাগ, ডালিম হবে ক্ষুব্ধ, মা বিরক্ত। কিন্তু মিত্রা করে কি? আপাততঃ ঘরে বসে চার দেয়ালের ভাপে সেদ্ধ হচ্ছে। প্রায় থালায় পরিবেশিত হবার মতো অবস্থা।···দেখলে তো, পুরো বৈশাখটা চলে গেল, না নামল একদিন একটু বৃষ্টি, না উঠল একদিন কালবৈশাখীর ঝড়! ঝড়-ঝঞ্ঝারা সব স্থান পরিবর্তন করে জড়-জগৎ ছেড়ে এসেছে জীবনে,—পেয়েছে রক্তের স্বাদ···

বাচ্চাদের স্কুলগুলোতে নাকি চলছে প্রার্থনার আয়োজন। কিসের জন্য? বৃষ্টি। হায়, জলে পড়ে তৃণ আঁকড়ে ধরা আর বৃষ্টির জন্য শিশু-প্রার্থনা—দুটোই তো এক। কিন্তু জান, আগেকার দিনে এমনি নানা উপায়ে বৃষ্টি নামানোটা নাকি মোটেও অলৌকিক অশ্রুত-পূর্ব ঘটনা ছিল না। মল্লার রাগিণীর সম্মোহন টানে আবিষ্ট হয়ে বৃষ্টির মর্তে নেমে আসা ছিল নাকি অবশ্যম্ভাবী। অসম্ভবটাই কি? ইথার-তরঙ্গের বার্তা বয়ে নেওয়ার মতো, তেমন কোন সাধকের কণ্ঠ-সুর আকাশ-অন্তর চঞ্চল করে জল ঝরিয়ে এনেছে, হতে পারে। হতে পারে, সন্ন্যাসীদের যাগ-যজ্ঞ-হোমে নেমেছে। হতে পারে নেমেছে, মেয়েদের ব্রত-সাধনায় আর ছোটদের ছড়ায়।

কিন্তু সে রাজ্য থাকলেও রাম আর তার রাজা নেই, নেই রাণী সীতা। এখন শিশু-কণ্ঠের কচি-আহ্বানে, সন্ন্যাসীদের গুরু তপস্যায়, মেয়েদের প্রার্থনার ঐকান্তিকতায়ও আকাশের জল আকাশেই থাকে। কি আর করা যায়, নীল-নীলিমার পানে চাতক পাখীর মতো চেয়ে থাকা ছাড়া। আর তাই তো ছিলাম—বৃষ্টির আশা ছেড়ে দিয়েই বসেছিলাম শুধু সন্ধ্যার বাতাসটুকুর জন্য। কিন্তু আষাঢ়ী অপরাহ্ণ আকাশে, কালো-কৃষ্ণ মেঘের নিশানা দেখা যাচ্ছে

যে! মৃত মেঘ নয় তো? না, প্রাণ আছে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তার গুর-গুর ধ্বনি। বৃষ্টি নামল বলে।—তপ্ত হাওয়া ঠাণ্ডা করে, মনকে সুদূর শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে সত্যি বৃষ্টি নামল রাণী! তার পর? না, তার পরের মনোভাব আর মিত্রার কলমের ক্ষমতায় নেই। স্মরণ নেবো রবীন্দ্রনাথের? কোনটার—সে যে অসংখ্য। আহা, এমন সময় কেউ যদি গাইত—

'আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে
কিছুতে কেন যে মন লাগে না—'

তেতলার ঘর থেকে কি এ গান ভেসে আসছে না? না আসলেও তুমি গিয়ে বললেই গাইবে শমিত! তার পর যদি সুরে-তালে পাঠিয়ে দিতে পারতে সে গান! কিন্তু মানুষের মুখ ছাড়া তো কলমের মুখে সুর ধরা দেয় না! আচ্ছা, এ দুঃখে কি কলমের মরে যেতে ইচ্ছে করে না রাণী? অন্তত আমার তো বর্তমানে তাই করছে।

—না না, মিষ্টি বাজনা বাজিয়ে বড় ঘড়িটা ঘোষণা করল, চারটা। ওমনি দু' চোখ বন্ধ করে (নইলে প্রার্থনায় জোর হয় না) প্রার্থনা করলাম—হে ভগবান, রেডিওর ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের মনে সুমতি দেও, নাই বা থাকল আজকের অনুষ্ঠান পাত্র, তবু এমন আদর্শ মুহূর্তটিতে যেন ওঁরা কবির স্মরণ নিতে না ভোলেন। দস্তুর মতো দুর্গানাম জপে রেডিওটি খুলেছিলাম। ফলাফলটা লিখতে হবে? তুমিও কি আমার মতো নিরাশ হওনি? আর কানে শুনেও ভগবানই মুখ ফিরিয়ে থাকেন—এঁরা তো আদপেই শুনতে পান নি। কিন্তু নিজেদের চাহিদাও কি থাকতে নেই! যে হাতে খুলেছিলাম, সে হাতেই বন্ধ করে ত্যক্ত হয়ে উঠে এলাম। ধ্যাত্তোর! কিন্তু ধুইয়ে নিল বৃষ্টির জল মনের এই ভাব। এমন অঝোর-ঝরা জলের দিকে তাকিয়ে থাকলেই শরীর-মন স্নাত হয়ে যায়, যায় পবিত্র হয়ে। উঠে গিয়ে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে ভিজতে ইচ্ছে করছে—রইল কলম।

উঠে এলো মিত্রা। মুখটা জানালার শিকে চেপে ধরে আরামে বলে উঠল—'আঃ।' মিত্রার মনে হয় জলের বড় বড় ফোঁটাগুলো বুঝি ওর মুখের উপর এসে পড়েই শুকিয়ে যাচ্ছে তপ্ত বালিতে জল পড়ার মতো।···কিন্তু আজ যেমনি বাচ্চারা তেমনি বড়রা, বাড়ী ফিরতে ভিজে একসা হবে। এমন ঝমঝমে বৃষ্টি আর মিনিট কয়েক হলেই তো রাস্তায় দাঁড়াবে মুন্নীর গলাজল। মিত্রার মন উঠল চঞ্চল হয়ে। জানালা ছেড়ে চলে এলো ও সিঁড়ির মুখে।

এমনি সময় সে কি উল্লাসে মেতে ভিজতে ভিজতে ছোটদের ঘরে ফেরা। সময়ের এমন যোগাযোগ না ঘটলে তো আর ওদের অদৃষ্টে জলে ভেজা ঘটে না—শুধু হাত দুটি জানালা গলিয়ে বৃষ্টির জল ধরা ছাড়া। ঘাড়ের ব্যাগ নামাতে নামাতে একসঙ্গে তুললো সবাই কথার তুফান—

—'মুন্নী না মা, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে হাঁ করে বৃষ্টির জল খেয়েছে। ঠিক চাতক পাখীর মতো।'

—'আর তুমি আর টিপু যে বইপত্তর শুদ্ধ ব্যাগটা জলের ভেতর রাস্তায় ফেলে তার উপর চেপে বসলে? দেখ মা ওদের দু'জনার সব ভিজে।

—'তোমার সঙ্গে আমিও তো হাঁ করে জল খেয়েছি না মুন্নী?'

—বড় মস্ত কাজ করেছ, তোমরা জল খেয়ে, ওরা জলে ভিজে আর তোমাদের মায়েরা হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনে।' সুমিত্রা এসে অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়ালো। 'ওরা ভিজে-মাথায়, ভিজে কাপড়ে, এ খেয়ালও নেই তোমাদের?'

—'কিছু হয় না মা এতটুকু সময় ভিজে কাপড়ে থাকলে। সব রকমেরই অভ্যাস করাতে হয় শিশুদের।'

মেয়ের এ কথার কোন জবাব দেয় না সুমিত্রা। জিজ্ঞাসা করে —তোমার কাপড়-জামা কি করে ভিজল?'

—'আমার? ওঃ, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।'

—'কাপড় ছাড় গিয়ে মিত্রা। অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে আর অশান্তি করো না।' বাচ্চাদের নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

ছোট মামা এলো ভিজতে ভিজতে। নিজের ঘরে যেতে যেতে ডাকলেন—'শীগগির শুকনো তোয়ালে নিয়ে এসো সৌমী।' একটু বাদে, 'লীনা কোথায়?' সেজ মামা—রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো লীনা। 'কই গো, দেখ ছাতা ভুলে গিয়ে কেমন ভিজেছি।' বড় মামা। মামীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল কোথায় শুকনো তোয়ালে, কোথায় চটি আর ধোয়া গেঞ্জী লুঙ্গী।

আবার মিত্রা একা।

এমনি হঠাৎ হঠাৎ মিত্রা চমকে উঠে অনুভব করে ও যেন নিরবলম্বন শিকড়হীন আলগা। নাড়ীর যোগ নেই কোথাও। এ-বাড়ীতেও করে, ও-বাড়ীতে থাকতেও করেছে। কিন্তু কি প্রয়োজন ওর এখন একা ঘরে বসে থাকবার! ও কি মিশে যেতে পারে না এ-সব কাজের ভেতর? পারে। কিন্তু এ ভাবে বসে থাকার অর্থ নেই বলেই উঠে যেতে হয়—নইলে কারু প্রয়োজনের জন্য নয়। আর শুধু মাত্র সেই জন্যই মিত্রা বসে থাকে স্তব্ধ হয়ে। মামারা অবশ্যি কাপড়-চোপড় বদলেই চায়ের কাপটি হাতে ধরবার আগে ওকে খোঁজ করবেন, একসঙ্গে চা খাবেন। কিন্তু এ সব তো ভদ্রতা। না—না, মৌখিক ভদ্রতা ও বলছে না; বলছে না ভদ্রলোকের ভদ্রতার কথা। কিন্তু তাহলেও এও তো মার্জিত ঔদার্য্যেরই সদ্ব্যবহার মাত্র। ওকে দুঃখী ভাবেন সবাই। কেন, কিসের দুঃখ ওর? কি সুখ নীলাকান্ত ওকে হাত ভরে দিয়েছে যে আজ তার অভাবে ওর হাতের অঞ্জলি শূন্য।···কাপড় বদলে চুলটায় চিরুণী চালিয়ে একটু গোছগাছ করে তৈরী হচ্ছে মিত্রা মামাদের কাছে যাবার জন্য

—'দেখ কে এসেছে।' সৌমীর কথায় চমকে উঠে পেছন ফিরল—

রাণী!

রাণী এগিয়ে এসে দু'হাত জড়িয়ে ধরল মিত্রার। 'কি, এমন করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? ভূত দেখেছ নাকি?

সৌমী হেসে বললে—'অভিমান।'

—শ্বশুরবাড়ীর লোক দেখে কেউ নেচে ওঠে না।'

—'কিন্তু আমার আজ রাণীকে দেখে তাই ইচ্ছে করছে কেন বল তো মামী?' রাণী এমন ভাবে কথাটা বললো, যেন মিত্রাই বলছে।

—হেসে উঠল সৌমী।

মিত্রা রাণীকে বসতে বলে বললো—'কথাবার্তা যেটুকু শিখেছে,

সবই এই মিত্রার দৌলতে। এখন শুকমারা বিভায় পারদর্শিনী হয়ে উঠেছে বুঝলে মামী। কিন্তু তোমার কাছে মস্ত এক চিঠি লিখছিলাম রাণী—দিয়ে দেব হাতে হাতেই।'

লৌকিকতাক্তে চা-টা খেয়ে দু'জনে গুছিয়ে বসল কথা বলতে। মিত্রা জিজ্ঞাসা করল—কার সঙ্গে এলে? হঠাৎ এই ঝড়-বাদলের মধ্যে, সর্ব ভয়-ডর ত্যাগ করে—না তোমায়ই ত্যাগ করেছে ওরা?'

—'কোনটাই নয়। এসেছি দু'হাতে প্রেম বিলোতে বিলোতে।'

প্রেম আর সন্তোষ, সন্তোষ আর প্রেম, যে প্রেম কাউকে অবজ্ঞা করে না, যে প্রেম কাউকে ঘৃণা করে না, যে প্রেম কাউকেও ত্যাগ করে না বর্তমানে এই শুধু জানে রাণী।'

—'সাধু, সাধু। ফল হচ্ছে?'

—'অসাধারণ। নইলে কি আর আসতে পারতাম।'

—উদ্দেশ্যটা আমার এখানে আসা? এমন একটা মহৎ সাধনার পেছনে, এই তুচ্ছ কারণ? ভালো। কিন্তু প্রেম আর সন্তোষ কি উপায়ে বিলোনো হচ্ছে শুনি?'

—'সদাসর্বদার জন্য থাকবে গালের ভাঁজে, ঠোঁটের রেখায় একটি মধুর প্রসন্ন হাসি। কাণে কালা, মুখে বোবা। মনোভাবে—ওঁদের খুসী করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য আর নিজ জীবনটা উপলক্ষ মাত্র।

হেসে উঠল মিত্রা—'এমন একটা হঠাৎ পরিবর্তনে, সবাই ভাবছে, আমার মন্দ প্রভাব-মুক্ত হয়েই তোমার এই আত্মিক উন্নতি।'

—'তা, ভাবতে পারে।'

—'কিছু আপত্তি নেই। তোমার সুখ হলেই আমি খুসী। এখন তবে তোমাদের দু'জনের সম্পর্কটা স্বাভাবিক?'

—'আমাদের দু'জনার? স্বামি-স্ত্রীর?' হাসলো রাণী। বললো—'ঠিক প্যাচ নষ্ট হওয়া কলমের খাপের মতো? যতই ঘোরাও আর কস—কোথায় যে একটি সূক্ষ্মতম খাঁজ কেটে গেছে, এ আর লাগাবার উপায় নেই। তবু লাগিয়ে রাখতে হয়। আর খালি সামান্য অসাবধানতায় ছিটকে পড়ার দুর্ভোগ।'

মিত্রার বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠল রাণী। 'কি এমন করুণ চেহারা করে তাকিয়ে রয়েছ? ভাবছ, আহা মেয়েটা—কিন্তু জান একজন আমায় ভীষণ ভালোবাসে। একেবারে ভয়ানক।'

—'কবে থেকে?'

—'সে যবে থেকেই হোক। বাসে তো। ভাবছি কি করব।' গম্ভীর ভাবে বলতে গিয়েও হেসে ফেলে রাণী।

—'মামী, মামী' রান্নাঘর বা অন্য যে কোন ঘর থেকে থাকো—আহ্বান শোনা মাত্র চলে এসো।

সৌমী জবাব দিল—'আসছি দাঁড়াও।'

—'তুমি কিন্তু অনেক বদলেছ মিত্রা।

—'বলতে চাচ্ছ হাল্‌কা হয়েছি? চেষ্টা করছি রাণী। নইলে তলিয়ে গেলাম, হাঁপিয়ে উঠলাম কবে যে শামুকের খোলে ঢোকার মতো গুটিয়ে গিয়ে অন্তরবন্দী করেছিলাম নিজেকে—মনে নেই সেটাই অবশ্যি স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে—তবু এক-এক সময় মনে হয়, আর পারিনে—এবার তুমি আবার মুখখানাকে অমন করে তুলছ যে?'

—'না। মামীকে ডাকছ কেন তাই শুনি?'

—'আত্মহত্যার ব্যবস্থা করতে বলব।'

—'সে কি!' বিস্ময় প্রকাশ করল রাণী।

—'হ্যাঁ, ঠিক করেছি উষর এ জীবন আর রাখব না। প্রেম সবার জীবনে আসে। তোমারও এলো। আর আমার এলো তো না-ই, আসবার তাগিদটি পর্য্যন্ত নেই ভেতরে! গান কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কিছু জমে না প্রেম ছাড়া। তাই না আমার জীবন এমন ঢিলে ঢালা। আত্মহত্যা ছাড়া গতি কি?'

—'আত্মসমর্পণ কর।'

—'কার হাতে?'

দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে রাণী সামনে ধরল মিত্রার—'এ হাতে।'

—'লাভ?'

—'যথাস্থানে পৌঁছে দেবো।'

চমকে উঠলো মিত্রা—'সেটা কোথায়?' কিন্তু সে জিজ্ঞাসায় জোর নাই।

জোর হর্ণ বেজে উঠল নীচে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাণী ত্রাসসূচক শব্দ করে উঠে দাঁড়ালো তাড়াতাড়ি। 'মা গো, এত রাত হয়ে গেছে?'

—'কার সঙ্গে এসেছিলে তুমি?'

—'শমিত। এর ভেতর দু'ভাই দু'খানা নূতন গাড়ী কিনেছেন! সে উৎসবে বড় ভাই বেরিয়েছেন সস্ত্রীক সসন্তান। সেজ জন সবন্ধু। আগের গাড়ীখানার ড্রাইভার তুলে নিয়ে শহর চষে বেড়াচ্ছে শমিত। আজ সবাই বেরিয়ে গেলে খালি বাড়ীর সুযোগ নিয়ে বললাম—একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসবে আমায়? বললো—চলো। গাড়ীতে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাব জিজ্ঞাসা করলে না? বললো—জানি, মিত্রার ওখানে। আজ যাই। আবার সুবিধা করতে পারলেই চলে আসব।'

ঘুমন্ত কুমার মুন্নীকে সস্নেহে চুমু খেয়ে রাণী নীচে নেমে এলো। সঙ্গে এলো মিত্রা গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে।

বৃষ্টি ধরে গিয়ে দেখা দিয়েছে তখন আকাশের গায় ছোট এক টুকরো চাঁদ। তার আলো এসে পড়েছে মসৃণ ভিজে পিচ-পথে, সবুজ মর্ম্মরিত পাতায়, গাড়ীর মাথায় জল-বিন্দুর উপর। নব-আষাঢ় ধূলি-মলিন শহর ধুইয়ে তার সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে।

গাড়ীতে হেলে বসে সিগারেট টানছিল। ওদের দু'জনকে দেখে, হাতের প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা রাস্তার উপর ছুড়ে ফেলে, ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে গাড়ীর দরজাটা খুলে দিল শমিত।

আরো কিছুটা সময় পথে দাঁড়িয়েই ওরা দু'জনে পারিবারিক কথার আদান-প্রদান করল—যেটা এতক্ষণ বাকী রয়ে গিয়েছিল। এতটুকু বাঁধা সময়ের ভেতর কি আর সব কথা মনে হয়। শেষে চলে গেলে মনে হয় কত কথা জানবার ছিল, বলবার ছিল। সব বাকী রয়ে গেছে। বাড়ীর ছেলে-মেয়েগুলোর কুশল সংবাদ পর্য্যন্ত মিত্রার জিজ্ঞাস করতে এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। ভাগ্যিস শেষ অবধি ভুলটা ভুলই রয়ে গেল না। রাণী কি ভাবত—দুঃখিত হত বৈ কি। ভাবত মিত্রা, কি না একবারও ওর ছেলে-মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করল না! ত্রুটিটা শুধরে নিতে বার বার ও ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য আর পড়া-শুনার খবর নেয়।

মিত্রা বিদায় নিলে রাণী জিজ্ঞাসা করল শমিতকে—'তুমি মিত্রার সঙ্গে কথা বললে না কেন?'

গাড়ীর মোড় নিতে নিতে শমিত বললো—'সাহসের অভাবে।'

রাত তখন কত হবে কে জানে! অনেক যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মুসলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। সাদা-মেটে অনাড়ম্বর বাংলা—নাই পাহাড়, নাই পাহাড়ের উতরাই, চড়াই, ঝরণা, উৎস আর বিশালতার বিস্ময়। নাই সমুদ্র, নাই তার উত্তাল ঢেউ উদ্দাম ঝড়। অভিভূত আনন্দে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো তার প্রাকৃতিক সম্পদ কি আছে—শুধু আছে এই, অঝোর-ঝরা বৃষ্টি। মনকে নিয়ে যায় কোথায় উড়িয়ে, নয় তো যায় সব-কিছু ভালো লাগিয়ে দিয়ে।··· ···শিলের আঘাতে জানালা দরজা শব্দ তুলছে···কালো মিস কালো রাতটা যেন মিত্রার ঘরে লোভীর মত হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।···এখন যদি নীলাকান্ত তার চাহিদা নিয়ে এসে হাত বাড়াত—বালিসে মুখ চাপল মিত্রা।

পরের দিন উঠে-পড়ে লাগল মিত্রা বাড়ী-ঘর গোছগাছ করতে। ঝাড়ল, মুছল, ধোয়াল, সাজালো। ডালিমের কোমর ধরে উঠল জল টানতে টানতে। কি আর হয়েছে তাতে, একদিন তো। কুমার মুন্নীর সব-কিছুতে আজ-কাল মাই করেন। মামীদের বলল—যত ছেঁড়া জুতো, ময়লা কাপড় শোবার ঘরে রেখে কি সৌন্দর্য্য বাড়াচ্ছ শুনি? কি কাজে আসবে এ সব? নেও, চাকরকে দিয়ে দেও রাস্তায় ফেলে। মা, এত কি ডালা-কুলো সামনের দিকে—রইল এ-সব ভাঁড়ার ঘরে। বাচ্চাদের জিনিষ-পত্র এক জায়গায় গুছিয়ে বুঝিয়ে দেখিয়ে দিল, কি ভাবে নিতে হবে, আর রাখতে হবে। যে তা করবে না তার শাস্তি ভীষণ।

আবার কোন দিন পড়ল ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। বসল, মাথা ঘসার সেম্পো, বব কেটে দেবার কাঁচি, নখ-কাটার ইত্যাদি নিয়ে। 'ইস্, তোদের দেখে সবাই বলবে তোদের ঘরে মা নেই।'

মুন্নী আহ্লাদে মাকে জড়িয়ে ধরে বললো—'এই তো আমার মা।'

—'সে তো তুমি দেখছ। স্কুলের কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না। তারা তোমাদের অপরিচ্ছন্নতা দেখে ঠিক বলবে, ঘরে মা নেই মুন্নী দেবীদের। তাই না এমনি নোংরা থাকে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল মুন্নী—'তা ক-খ-নও ভাববে না। তোমাদের না দেখলে কি হবে, আমরা খেলছি, হাসছি, দৌড়াচ্ছি, আনন্দ করছি, ওরা ঠিক বুঝবে মা আছে। মা না থাকলে কি হাসতাম আমরা? বসে বসে ভাবতাম, সবার বাবা থাকে মা থাকে—আমাদের কেউ নেই কেন?'

একদিন গেল রাঁধতে। আজ সব রাঁধব আমি। আমিষ, নিরামিষ সব। দেখো, মামারা তোমাদের রান্নার চাইতে অনেক ভালো খাবেন। ঢুকল রান্নাঘরে। রাঁধল, খাওয়াল, তারপর মাথা ধরে-সারিডন খেয়ে এসে বিছানায় শুলো, বললো, 'ঠাকুর রাখব মামী। আপত্তি করতে পারবে না।'

মা রাগ করেন—'আর যাবে রাঁধতে? তোমার সব তাতে জুলুম। এখন বাধাও অসুখ। কুমারের তো জ্বর হয়েছেই মনে হচ্ছে।' মা রেগে গেছেন।

মামারা বোঝেন সব। থাকেন চুপ করে।

মামীরা হেসে বলে—'হলো তো একদিন একদিন করে সবই—আর দরকার নেই আমাদের সাহায্যের। তোমার বই নিয়েই তুমি থাক।'

মাথাটা ছেড়েছে—খাবে কি না ভাবছে মিত্রা, না এ অবেলায় আর ভাত নয়, চা খাবো। ডালিমকে ডেকে চা তৈরী করতে আদেশ করল মিত্রা।

সৌমী পাশের ঘর থেকে বললে—'দু'কাপ কিন্তু।'

এমনি সময় এসে উপস্থিত রাণী। প্রথমই দেখা হলো সুমিত্রার সঙ্গে। সুমিত্রা বললো—'কুমারের শরীরটা ভাল নেই। জ্বর হয়েছে। এসো, ঘরে এসো।'

উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল রাণী—'কবে হয়েছে? কই লেখে নাই তো মিত্রা?'

বেরিয়ে এলো মিত্রা। 'এসো রাণী। কিছু হয়নি। ছোট সময়ে পুতুল খেলতে খেলতে দেখেছি—এক রকম খেলায় বড় অরুচি ধরে। শুইয়ে, অষুধ খাইয়ে, জ্বর দেখে, মাথায় বাতাস করে—খেলতাম। মার প্রায় সেই অবস্থা। কিন্তু মুসকিল হয়েছে ওরা যে পুতুল নয়। ঐ দেখ—'

মিত্রার নির্দেশ মতো তাকিয়ে রাণী হেসে ফেললো। জ্যাঠাইমার সাড়া পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে কুমার।

কি উঠে এলে যে কুমার? কি দস্যি ছেলে বাবা! দাঁড়াও ডাবের জল আনছি। এখন উঠতে দিচ্ছি নে। আছেন তো জ্যাঠাইমা। তিনি কুমারকে টেনে নিয়ে চললেন।

—'দেখ মা, জ্বর নেই বলছি, তবু দিদিমণি—'

আর শোনা গেল না। হয়তো ডাবের জল মুখে ধরায়, কথা বন্ধ করতে বাধ্য হ'ল কুমার।

[ক্রমশঃ।

খোকাপা-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

—হ্যাঁ অনন্ত, যা শুনছি তা কি সত্যি?

অনন্তরামকে আড়ালে ডেকে প্রশ্ন করলেন হেমনলিনী। ভয়-কাতর কণ্ঠে।

—কি দিদিমণি?

প্রসঙ্গটা জানতো না অনন্তরাম। কণ্ঠে তার বিস্ময়।

—এই যে শুনছি আমার ভায়েদের জমিদারীর খাজনা বাকী প'ড়েছে! ঘড়ার টাকায় হাত প'ড়েছে! তুমি কি কিছুই জানো না? হেমনলিনী কথা বলেন মুখে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়ে।

আকাশ থেকে পড়ে যেন অনন্তরাম। মুখাকৃতি তার এমন হয় যে স্পষ্ট বোঝা যায় সে এই বিষয়ে একান্তই অজ্ঞ। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে অনন্তরাম বললে, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে,—কি সত্যি আর কি যে মিথ্যে আমরা কোথা থেকে জানবো দিদিমণি? কর্ত্তারা যাওয়া থেকে আমাকে কি কেউ আর মানুষ ব'লে মনে করে! জমিদারীর খাজনা বাকী পড়েছে, এমন কথা তো শুনি নাই দিদিমণি! তুমি কেমনে শুনলে?

—ঐ যে বৌ বলছিলো। শুনে আমি মরমে মরে আছি অনন্ত! আর কিচ্ছু ভাল লাগছে না। কত বড় অপমান আমার দাদাদের! হেমনলিনী কথা বলেন যেন অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে। মুখে তাঁর বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

হেমনলিনীর কথা শুনে অনন্তরাম হেসে ফেললো। বেশ কিছুক্ষণ হাসলো আপন মনে। দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, উবু হয়ে বসে পড়লো হাসতে হাসতে।

—এত অপমানেও হাসি আসছে তোমার অনন্ত? বিরক্তি সহকারে বললেন হেমনলিনী।

—হাসি কি আর সাধে আসে দিদিমণি! তোমাদের ঐ বৌয়ের কথা শুনে তুমি বিশ্বেস করলে? সে কি মানুষ দিদিমণি! বৌটা একটা মোমের পুতুল, ওকে দেরাজে সাজিয়ে রাখলেই ভাল। কথা বলতে বলতে খানিক থামলো অনন্তরাম। হাসির বেগ সামনে বললে,—বড় ভাল মানুষ দিদিমণি, বড় ভাল মানুষ! পৃথিবীর কিছু কি জানে বৌটা?

—আমিও তাই ভাবছি। বৌ হয়তো জানে না। হেমনলিনীর কণ্ঠস্বরে আশ্বাস।

অনন্তরাম বললে,—বৌকে যা বোঝাবে তাই বুঝবে। বৌয়ের কথা শুনে তুমি দিদিমণি মন-টন খারাপ ক'র না। খাজনা বাকী পড়তে যাবে কেন? খোঁজ নাও ঘড়ার টাকা কোথায় গেছে। হয়তো শুনবে মেয়েমানুষের পায়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

—মেয়েমানুষ! বল কি অনন্ত! হেমনলিনী চুপি চুপি বললেন।

—হ্যাঁ গো দিদিমণি, হ্যাঁ। মেয়েমানুষ, জলজ্যান্ত মেয়েমানুষ। তাও যদি আমাদের ঘরের মেয়ে হ'ত!

—তবে?

—মুসুলমান, মুসুলমান বাইজী একটাকে পুষে রাখেনি তোমার ভাইপোটি? বললে অনন্তরাম। চোখ বড় বড় করে বললে। মুখের হাসি কখন অনন্তরামের মিলিয়ে গেছে কথা বলতে বলতে।

—ওমা, কি হবে গো! তুমি ঠিক জানো অনন্ত? হেমনলিনী যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি শুনলেন তিনি? তাও শুনলেন যার-তার মুখ থেকে নয়, পুরাতন ভৃত্য অনন্তরামের মুখে!

—মদ খাওয়া ধ'রেছে পাকাপাকি, বাইজী পুষেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে, আর কি কিছু বাকী আছে? না জেনে আমি কথা বলি না দিদিমণি! অনন্তরাম তার কথায় দৃঢ়তা ফুটিয়ে কথা বলে।

তাই বল'! বললেন হেমনলিনী। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। বললেন,—শুনেছিলুম মদ খাওয়া ধ'রেছে অনেক দিন, অস্থানে-কুস্থানে যাতায়াত আছে তাও জেনেছি, কিন্তু বাইজী পুষেছে শুনিনি এ্যাদ্দিন। কথা বলতে বলতে দুঃখের হাসি হেসে বললেন,—আর বলতে হবে না, ঘড়ার টাকা কোথায় গেছে আর আমাকে বলতে হবে না। সব বুঝে নিয়েছি আমি।

সত্যিই যেন সকল কিছু বুঝে ফেলেছেন পিশীমা।

অনেক দেখেছেন যে হেমনলিনী, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে দেখছেন। অন্যের ঘরেও দেখেছেন, নিজের ঘরেও দেখছেন। দেখে-দেখে অভিজ্ঞতায় জর্জ্জরিত হয়ে আছেন। পুরুষ মানুষ যদি শুধু মদ খেয়েই ক্ষান্ত থাকে! পুরুষের যদি বহু নারী-ভোগের তৃষা না থাক্‌তো!

—তুমি বুঝবে না তো কে বুঝবে দিদিমণি? অনন্তরামের কথায় দুঃখের করুণতা।—তুমি যে দেখে-দেখেই এত বড়টা হয়েছো।—সারাটা জীবন তুমি যে কষ্টটা ভোগ ক'রে চলেছো, আমার চেয়ে কে বেশী জানবে!

—বৌটার জন্যেই আমার যত কষ্ট অনন্ত! আহা, ঐ লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মেয়েটার জন্যেই আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে!

—বৌমা কোথায়? শুধোলে অনন্তরাম।

হেমনলিনী বললেন,—বেলায় খেয়ে শুয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছে অবেলায়। আহা, ছেলেমানুষ, তাই আমি আর ঘুম ভাঙাইনি।

—ডেকে দাও দিদিমণি, ডেকে দাও। বললে অনন্তরাম। —অবেলায় ঘুমোলে শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করবে।

—হ্যাঁ, যাই তাকে তুলেই দিই। ভরসন্ধ্যেয় আর ঘুমোয় না।

কথার শেষে ধীর পদক্ষেপে ত্যাগ করলেন এই নির্জ্জনতা। ফাঁকা দালান একটা। একতলায়। সিঁড়ির পথ ধরলেন হেমনলিনী। যেতে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অনন্তরাম ব'সে রইলো দালানে। আকাশে চোখ তুল্‌লো।

আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেশ, আবেগ আর আঘাত খেয়ে যেদিকে তাকিয়ে জ্বালা দূর করে সেই আকাশ পানে তাকিয়ে এক্‌লা বসে আছে তো আছেই অনন্তরাম। ভাবছে, একান্ত নিবিষ্টচিত্তে সেও ভাবছে ঐ লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বধূটিকে। তার সুখ আর দুঃখের কাহিনী। তার সংসারের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা।

আকাশে সাঝের আঁধার ঘন হয়ে আছে।

সন্ধ্যাতারা চিক্‌-চিক্‌ করছে হেথায়-সেথায়। রাতের পাখী নীড়ের মায়া ত্যাগ করে শূন্যে উড়েছে। ঘরে-ঘরে আলো জ্বালছে কলকাতা নগরীর অধিবাসী। শরত-আকাশের এলোমেলো মেঘের মতই এলোমেলো হাওয়া। বইছে থেকে-থেকে।

কোন ঘরে ঘড়ি বাজলো ঠুং ঠুং ঠুং। দোতলার কোন ঘরে। দিন আর রাত্রির মিলন-লগ্ন ঘোষণা করলো যেন মেকেবের টেবিল-ক্লক্‌।

—আয় বৌ, চুল বেঁধে দিই।

খাস-কামরায় প্রবেশ ক'রেই ডাকলেন হেমনলিনী।

রাজেশ্বরীর ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙেছিল। তবুও সে শয্যা ত্যাগ করেনি। একটা তসরের চাদরে আবক্ষ আবৃত করে শুয়েছিল জেগে-জেগে। পক্ষ্মঘন সুদীর্ঘ আঁখি মেলেছিল ঘরের দ্বারে। কে কখন আসে! পিসীমা ব্যতীত এই গৃহের অন্য কাকেও যে চেনে না রাজেশ্বরী। চোখে ঘুমের জড়িমা ছিল তখনও। শরীরে যেন অলস-আচ্ছন্নতা। এলোমেলো হাওয়ায় বক্ষে কাঁপন লাগে বৌয়ের। শীতার্ত্ত বাতাস যে। পিসীমা গেলেন কোথায়? এ কি লজ্জা, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে রাজো!

বাইরের গাছে-গাছে পাখীদের সন্ধ্যাসঙ্গীত চলেছে। রাজেশ্বরী উঠে বসলো। তসরের আবরণ সরিয়ে নামলো খাটের ধাপ পেরিয়ে। বললে,—ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম পিসীমা!

—বেশ করেছিলি। বললেন হেমনলিনী। সস্নেহে।

এক গাল হাসলো রাজেশ্বরী। খুশীর হাসি। বললে,—গান তো শোনালেন না পিসীমা? আমিও এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছি।

তৃপ্তির হাসি হাসলেন হেমনলিনী। বললেন,—আচ্ছা শোনাবো, তোকে আগে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিই। নিজে চুল বেঁধে নিই। কাপড়টাও বদলে নিই।

—বেশ, তাই শোনাবেন। খুশী হয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। হেমনলিনীর প্রতিশ্রুতির আশায় খুশী হয় সে।

—হুজুরণী, আলো এনেছি। ঘরে যাবো?

বাইরে থেকে এক ঝলক আলো ঘরের মানুষ দু'টির রূপপ্রভা যথেষ্ট বর্দ্ধিত ক'রলো। হেমনলিনী বললেন—লণ্ঠন এনেছিস্‌ আয়ষা, দিয়ে যা।

সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ হেমনলিনীর। পরিচ্ছন্ন লণ্ঠনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ক্ষণেকের মধ্যে। তেলের আলো। বেলোয়ারী কাচের লণ্ঠন।

হেমনলিনী লক্ষ্য করেন রাজেশ্বরীর নিদ্রালু চোখ। বললেন,—যা বৌ, মুখে-চোখে জল দিয়ে আয়। এসে জল-খাবার খা। আমি দাসীকে বলছি তোর খাবার দিয়ে যাক্‌।

খাওয়ার নামে যে বমনের উদ্রেক করছে।

অনিচ্ছা প্রকাশ করে রাজেশ্বরী বিকৃত মুখাকৃতিতে। বলে,—না পিসীমা, এখন আমি কিছু খেতে পারবো না। দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে খেতে বলবেন না। বেলায় খেয়ে হাঁসফাঁস করছি এখনও।

লণ্ঠনের আলোয় বৌয়ের মৌখিক আপত্তিতে হেসে ফেললেন পিসীমা। বললেন,—বেশ, তবে থাক্‌। যখন খাবি তখন খাবি। আমাদের খেতে যে বড্ড বেলা হয়ে গেছে। তুই তবে মুখে জল দিয়ে আয়! আমি চুল বেঁধে দিই।

কথা বলতে বলতে দেরাজ থেকে কেশচর্চ্চার সামগ্রী বের করেন তিনি। রাজেশ্বরী ভয় আর ত্রাসে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। স্নানের ঘর আছে কাছেই। চোখে-মুখে জল দিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে বৌ! দালানটা যা অন্ধকার! স্নানাগারও তেমনি। এই সবে ঘরে-দালানে আলো দেওয়া হচ্ছে। খানসামার দল ঘোরাফেরা করছে হাতে মশাল ধ'রে।

—কোন্‌ শাড়ীটা পরবি বৌ? তোর যেটা পছন্দ।

বৌ ঘরে প্রবেশ করতেই প্রশ্ন করলেন হেমনলিনী। অন্য একটি দেরাজ খুলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি রাজেশ্বরীর প্রতীক্ষায়। সে দেখে যেটি পছন্দ করবে, পিসীমার নিজের সেই শাড়ীটাই শুধু পরতে দেবেন না, একেবারে চিরকালের মত দিয়ে দেবেন। আর ফেরৎ নেবেন না। ফিরিয়ে দিলেও নয়। রাজেশ্বরী জানতো পিসীমার এই দাতব্যের কথা। রাজেশ্বরী দেখলো, দেরাজ পরিপূর্ণ। কত হরেক রকমের পোষাক। জামা আর কাপড়। সুতি, রেশমী আর জরিদার জামা আর শাড়ী।

রাজেশ্বরী জাজিমে ব'সলো। সলজ্জায় বললে,—বেশ আছে তো পিসীমা! যেটা প'রে আছি, সেইটেই থাক। আমার খুব পছন্দ এই কাপড়টা।

খুন-খারাপি রঙের তাঁতের শাড়ী একখানা অঙ্গে ছিল বৌয়ের।

বৌ আসতেই পরিধান করতে দিয়েছিলেন হেমনলিনী। শাড়ীটাও ছিল নূতন। একটি বারের জন্যও কখনও পরেননি পিশীমা। সে বয়সও আর নেই যে কনে বৌয়ের মত বৌ-পাগলা রঙের শাড়ী পরবেন!

—তোর খুব পছন্দ হয়ে গেছে? তোকে তো দিয়ে দিয়েছি শাড়ীটা। এখন যদি অন্য কোন কাপড় পরতে ইচ্ছা হয়, বল্? লজ্জা কি, বল্ না? হেমনলিনী উন্মুক্ত দেরাজের সম্মুখে দাঁড়িয়েই কথা বলছেন।

লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে যেন রাজেশ্বরী। বলে,—না পিশীমা, এই কাপড়টাই থাক। দেরাজ বন্ধ করে তাড়াতাড়ি চুল বেঁধে দিন। দেরী হয়ে যাচ্ছে মিথ্যে মিথ্যে। আমি কিন্তু আপনার গান না শুনে যাবো না!

কথাগুলি শুনে খুশীই হন হেমনলিনী।

কবে কে বলেছে এত আগ্রহের সঙ্গে? কে তাঁর কণ্ঠের গান শুনতে চায় এত আনন্দ সহকারে? পিশীমা দেরাজের চাবি বন্ধ করে বললেন,—আচ্ছা আচ্ছা, গান তোকে শোনাবো। পাগলী মেয়ে, আমি কি গান জানি, না ঠিক-ঠিক গাইতে পারি? কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর নত করলেন তিনি। বললেন,—আমার কি আর সে বয়েস আছে বৌ! মরবার বয়েস হ'ল যে! ছেলেরা কিশোরের বয়েসী, বিয়ে দিলে ঘরে ছেলের বৌ আসতো!

—ছেলেদের কবে বিয়ে দেবেন পিশীমা? শুধালে রাজেশ্বরী। আঃ, এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ফেললো বৌ। দেরাজটা বন্ধ করেছেন হেমনলিনী, নিশ্চিন্ত হ'ল যেন রাজেশ্বরী। এতক্ষণ চোখ দু'টি যেন তার ঝলসে উঠছিল। রঙ আর জরির জৌলসে। কত রঙের পোষাক! ভেলভেটের জামা কত রঙের! ভেলভেটের জামা, জরির জড়োয়া কারুকাজে অলঙ্কৃত। যেন বেশীক্ষণ তাকিয়ে দেখা যায় না ঐ উন্মুক্ত দেরাজের দিকে। চোখ ঠিকরে যায়।

—বিয়ে আমি দেবো না বৌ! দীপ্তকণ্ঠে যেন মনের অভিমতটা ঘোষণা করলেন হেমনলিনী। এত হাসি ছিল মুখে, কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল সেই হাসি!

এই একই কথা পূর্ব্বেও কয়েক বার পিশীমাকে বলতে শুনেছে রাজেশ্বরী। তাই এই প্রসঙ্গটা সম্পর্কে অধিক ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে চায় না রাজেশ্বরী। বৌ বেশ লক্ষ্য করেছে, এই একটা কথা বলার সময় পিশীমার মুখাবয়ব আর স্বাভাবিক থাকে না। কেমন যেন ক্রোধ আর কষ্টের জ্বালা ফুটে ওঠে মুখে। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখা দেয় কথায়।

কথা সমাপ্ত ক'রে হেমনলিনী বসলেন রাজেশ্বরীর পিছনে। কথার জের টেনে বললেন,—দু'টো মেয়ের সর্ব্বনাশ করবো আমি? বেঁচে থাকতে নয়—

রাজেশ্বরী বসে থাকে জবুথবুর মত। মুখে তার কথা জোগায় না।

কি বলতে কি বলবে। পিশীমার উত্তর শুনে সে মৌন হয়ে যায়। হেমনলিনী আবার কথা বলেন, ক্রোধের ভঙ্গিমায়,—লেখাপড়া শিখবে না, জ্ঞানগম্যি হবে না, তার ওপর গোঁফের রেখা ফুটতে না ফুটতে বাইরে মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে থাকবে, আমি বৌ এ চোখে দেখতে পারবো না! যে যাই বলুক—

—ঠিক কথা। বললে রাজেশ্বরী। কি আর বলবে সে! রাজেশ্বরী ভাবছিল, তবে যে কত লোকে বলে যে, বিয়ে দিয়ে দিলে অনেক পুরুষ শান্ত হয়ে যায়। থাকে না আর তেমন উগ্রতা।

কিন্তু দেশের হাওয়া যাবে কোথায়! সমাজের ধারা?

দেশের হাওয়া দেশেই বইবে। হে মোর দুর্ভাগা দেশ!

রাজেশ্বরী হতাশ-চোখে ব'সে থাকে। হেমনলিনী বৌয়ের গুণ্ঠন খুলে দিয়ে বললেন,—কি যে কেবল কেবল ঘোমটা দিয়ে থাকিস্?

পাশেই ছিল কেশ-প্রসাধনের সাজ-সরঞ্জাম।

একটা রূপোর বিচিত্র রেকাবীতে। চিরুণী, কাঁটা, ফিতা, ফুলেল তেল আর সিঁদুর-কৌটা। বৌকে চুল বেঁধে দেবেন অপূর্ব্ব ছাঁদে। দেরাজ থেকে একটা রূপালী জরির চওড়া ফিতা বের করেছেন হেমনলিনী। বৌয়ের খোঁপাটা ঐ ফিতায় ঘিরে দেবেন। রাজেশ্বরীর বিনুনী খুলতে লাগলেন পিশীমা অভ্যস্ত হাতে। চিরুণী চালাতে থাকলেন।

হেমনলিনী হঠাৎ স্বগত করলেন,—আমার বৌঠান কি কম দুঃখে ঘরছাড়া হয়েছে? জ্ব'লে-পু'ড়ে খাক হয়ে শেষ-কালে কাশীবাসী হয়েছে। বেঁচেছে, বেঁচেছে বৌঠান।

রাজেশ্বরীর দেহটা অবশ হতে থাকে। নিথর হ'তে থাকে।

বক্ষযুগল থরথরিয়ে ওঠে পিশীমার মাত্র ঐ একটি কথায়। রাজেশ্বরীর শাশুড়ী-মাতাঠাকুরাণীর কথায়। কিন্তু এ জন্য রাজেশ্বরীর করণীয় আছে কি? সে কি করতে পারে? সে শুধু মৌন হয়ে থাকে। মনটা তার ক্ষণেকের মধ্যে বিষিয়ে ওঠে যেন। বীতরাগ হয়ে থাকে বৌ। ভাবতে থাকে, পিশীমার ছেলেদের বিবাহের কথা না বললেই ভাল হ'ত। শুনতে হ'ত না কোন কথাই।

কি যেন ভাবলেন পিশীমা। বললেন,—আমি বলি, তুই বৌ, চালাক-চতুর হওয়ার চেষ্টা কর্। তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ! জানবি কোত্থেকে?

—কেন পিশীমা? রাজেশ্বরী প্রশ্ন করলো শিশুসুলভ কৌতূহলে।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললেন হেমনলিনী,—নয় তো ঠকবি চিরটা কাল।

আর কোন কথা বলে না বৌ। পিশীমার কথাটি মনে লাগে তার। সে কি তবে মূর্খ, বোকা? কেন ঠকবে সে?

কে ঠকাবে? নানা কথার জাল বুনতে থাকে রাজেশ্বরী। ঠ'কে যাওয়ার ব্যর্থতায় মনটা তার ভাসতে থাকে বুঝি।

হেমনলিনী বৌয়ের চুলের জট ছাড়াতে থাকেন। এলো চুলে চিরুণী চালাতে থাকেন। রাজেশ্বরী চোখ কড়িকাঠে তুলে নানা কথার জাল বুনতে থাকে মনে-মনে। বহুদিন পরে আজ যেন একটি মানুষের না-দেখা মুখ মানস-পটে দেখতে পায় রাজেশ্বরী। ছবিতে দেখা শাশুড়ীর মুখটি মনে পড়ে। কত কঠোর তিনি! কত নিষ্ঠুর! কেমন মানুষ কে জানে তিনি, যার মনে ক্ষমার স্থান নেই?

—বৌঠান ক'দিন আগে একটা চিঠি দিয়েছে আমাকে। আছে আমার ঐ বালিশের নীচে। একবার পারিস তো পড়বি বৌ। হেমনলিনী চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে বললেন।

পিশীমার কথাটি শুনে বুকের ভেতরটা বৌয়ের ছাঁৎ করে উঠলো যেন। কি লিখেছেন কে জানে! কোথায় তিনি এখন কে জানে? কে জানে কেমন আছেন? রাজেশ্বরী ভাবছিল, সেই পলাতকাকে যদি ক্ষণিকের জন্ম কাছে পাওয়া যায়! সেই কুমুদিনীকে যদি দেখতে পায় রাজেশ্বরী! তাঁকে কাছে পাওয়া গেলে রাজেশ্বরী অভিমানের আবেগে কাঁদবে প্রথমে। তাঁর পা দু'টিতে মাথা রেখে বলবে, ফিরে আসতে। বলবে, ক্রোধ পরিত্যাগ করতে। বলবে, ক্ষমা করতে তাঁর পুত্রসন্তানকে। কিন্তু সেই অভিমানী অধরাকে কি দেখতে পাওয়া যাবে!

রাজেশ্বরী ভাবছিল বলবে, না, বলবে না। শেষ পর্য্যন্ত যেন আর থাকতে পারলো না। মুখ ফুটে বলে ফেললে,—পিশীমা, আমি যদি কাশীতে যাই?

—কেন রে বৌ? জিজ্ঞাসা করলেন হেমনলিনী।—কাশীতে যেতে যাবি কেন?

রাজেশ্বরী ভাবলো এক মুহূর্ত্ত। বললে,—আমি গিয়ে যদি তাঁর পায়ে মাথা রেখে অনুরোধ করি, মা ফিরে আসবেন না?

দুঃখের হতাশ-হাসি হাসলেন হেমনলিনী। রাজেশ্বরীর চুলে বিনুনী পাকাতে পাকাতে বললেন,—বৌঠান কি সেই মেয়ে যে নিজের কোট ছেড়ে চলে আসবে! তাকে ফেরাতে পারে এমন কেউ আছে এই দুনিয়ায়? তা হ'লে আর ভাবনা ছিল!

রাজেশ্বরী আবার বললে,—আমি আর আপনি যদি যাই?

—না রে বৌ, না। বৌঠান সে জাতের মেয়ে নয়। তাকে ফেরাতে পারে এমন সাধ্যি কারও নেই। যখন যায় তখন কি আর আমি বলতে কসুর করেছি কিছু? ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না। আহা, কেমন ঘরের বৌ! কত কষ্টই না পাচ্ছে সেখানে!

আর কোন বাক্যব্যয় করে না রাজেশ্বরী।

কড়িকাঠে দৃষ্টি মেলে থাকে। অপলক দৃষ্টি তার চোখে। রাজেশ্বরীর চিন্তা, কল্পনা, প্রস্তাব ধূলিসাৎ হয়ে যায় যেন পিশীমার কথায়। তবে আর রাজেশ্বরী কি করতে পারে! তার কি দোষ!

কুমুদিনী, শাশুড়ীর মুখখানি মানসপটে ভেসে ওঠে।

সেই সেদিনের দেখা কুমুদিনীর ধারালো মুখবিম্ব। যেদিন প্রথম দেখেছিল রাজেশ্বরী, সেই সেদিনের দেখা উপবাসক্লিষ্ট তপস্বিনীর মুখটি বারে বারে দেখতে পায় যেন চোখের সম্মুখে। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর প্রাঙ্গণে যেমনটি দেখেছিল কুমুদিনীকে, তেমনি মুখ কল্পনায় দেখতে পায় বৌ। তিনিই তো নিজের বৌকে পছন্দ করেছিলেন। নিজে দেখে পছন্দ করেছিলেন। মনে মনে কষ্ট পায় রাজেশ্বরী। বুকের ভেতরটা যেন গুমরে গুমরে ওঠে থেকে-থেকে। রাজেশ্বরী ভাবে, একখানা পত্র লিখলে কেমন হয়! তাঁকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বৌ যদি লেখে একটা চিঠি! তিনি কি উত্তর দেবেন! এক জনের অপরাধে আরেক জন নিরপরাধীকে কি তিনি পায়ে ঠেলবেন?

খোঁপা জড়িয়ে খোঁপায় সোনার কাঁটা বিঁধছিলেন হেমনলিনী। হেমনলিনী কেশচর্চ্চা জানেন বটে! কত বড় খোঁপাটা রচনা করেছেন তিনি! রাজ্যের মাথাটা যেন খোঁপায় ভারে নুয়ে পড়ছে।

সব ক'টা কাঁটা বিঁধে খোঁপার চতুর্দ্দিকে রূপালী জরির কুঞ্চিত ফিতার বেষ্টন দিতে দিতে বললেন হেমনলিনী,—বৌ, তোর পছন্দ হ'লো তো? আমরা আবার সেকেলে মেয়ে, জানি না অত-শত।

—হ্যাঁ পিশীমা! খোঁপা চাপড়াতে চাপড়াতে বললে রাজেশ্বরী।—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। কিন্তু আপনি যেন দেরী করবেন না পিশীমা। তাড়াতাড়ি চুল বেঁধে নিন আপনার। আমি কিন্তু গান না শুনে এক পা নড়ছি না।

হেসে ফেললেন হেমনলিনী। খুশীর হাসি হাসলেন বললেন,—আচ্ছা রে আচ্ছা। তোরও তো দেখছি জিদ কম নয়! আমি যে বৌ ভাল গাইতে পারি না। শুনে কানে আঙুল দিবি না তো?

—আপনি আর দর বাড়াবেন না পিশীমা! একটা-দু'টো গান শুনবো বৈ তো নয়। কথার শেষে উঠে পড়লে রাজেশ্বরী। উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—কোন্ বালিশের তলায় মায়ের চিঠি আছে পিশীমা?

—ঐ যে আমার বালিশের তলায়। আমি চুলটা বেঁধে নিই। তুই চিঠিটা প'ড়ে যা গা ধুয়ে আয়। কিন্তু কিছু খাবি না বৌ? জলখাবারের জোগাড়ই সার হবে আমার?

রাজেশ্বরী আলনা থেকে পোষাক-পরিচ্ছদ নিতে নিতে বললে,—এখন নয় পিশীমা, যাওয়ার আগে যদি পারি তো কিছু খাবো'খন। স্নান-ঘর থেকে এসে চিঠিটা প'ড়বো।

—বেশ, তুই যা বলবি। হেমনলিনী নিজের চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে বললেন। আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে বললেন।

রাজেশ্বরীর মুখটি তৈলাক্ত হয়ে উঠেছিল। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ত্রস্তপদে।

সাঁঝের আঁধার আকাশে। এখন আর ঐ মহাশূন্যে একটি-দু'টি নক্ষত্র নয়, অনেকানেক তারকার উদয় হয়েছে। সন্ধ্যাদেবী যেন কালো রঙের আচ্ছাদনে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। সোনালী চুমকি-খচা আচ্ছাদন। রাশি রাশি চুমকি ঐ আকাশে। ধুকধুকির মত জ্বলছে দপদপিয়ে। শরতের এলোমেলো বাতাসে কাঁপছে নাকি থরো-থরো!

—হেম আছো না কি ঘরে?

—হ্যাঁ, এই যে।

—নলিনী, হেমনলিনী, দেখো কি এনেছি তোমার জন্যে!

—কি গো, কি আবার আনলে আমার জন্যে?

—দেখোই না। হাতে নিয়ে দেখোই না। অপছন্দ হ'লে বলবে, ফেরত দিয়ে আসবো।

একটি স্বর্ণালঙ্কার। কণ্ঠহার।

নেড়ে-চেড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন হেমনলিনী। গদ্‌গদ চিত্তে বললেন,—শোন' একটি কথা বলি। আমার ভাইপো-বৌ এসেছে আজ। তাকে যদি দিই গয়নাটি, আমাকে অন্য একটা এনে দেবে না?

—নিশ্চয়ই দেবো। কখন এসেছে বৌমা? কোথায় সে?

—গেছে পোষাক বদলাতে। স্নানের ঘরে। এসেছে সকালের দিকে। সন্ধ্যে উৎরোলে চ'লে যাবে। এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আহা, কি লক্ষ্মী বৌ!

—তা হ'লে হারটা তাকেই দাও। আমি তোমার জন্যে অন্য একটা কিনে আনবো।

কথা বলছিলেন হেমনলিনীর স্বামী। শিবচন্দ্র বাবু।

কৃষ্ণকিশোরের পিশে মশাই। কর্ম্মক্ষেত্র থেকে ফিরেই উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রথমেই এসেছেন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। পরিশ্রান্ত শরীর তাঁর। সারা দিনের পরিশ্রমে দেহে ক্লান্তি নেমেছে। অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন যেন।

—পোষাক-আষাক ছাড়ো। আমি জল-খাবার আনি। কিছু মুখে দাও। হেমনলিনী উঠে পড়লেন কেশ-চর্চ্চার মধ্যপথে।

শিবচন্দ্র বাবু একটা আরাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে বললেন,—তাই দাও। বড্ড ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। বয়েস কি আর আছে, না সামর্থ্য আছে আগের মত? সারা দিন কি ভীষণ খাটুনি গেছে!

—তুমি কি এখন আবার বেরুবে? শুধোলেন হেমনলিনী সন্দিহান মনে।

—হ্যাঁ, একটু পরেই বেরুবো। তুমি ফিরে এসে আমার জামা-কাপড় বের ক'রে দাও। বললেন শিবচন্দ্র বাবু।

ভেঙ্গে পড়লেন যেন হেমনলিনী।

সংশয়ের ছায়া ঘনালো তাঁর মুখে। স্বামীর বহির্গমনের সংবাদ শুনে তাঁর যত আনন্দ এক নিমেষে অতৃপ্তিতে পরিণত হয়। ভাল লাগে না যেন কোন কিছু। স্বর্ণালঙ্কারের নীল ভেলভেটের বাক্সটা রেখে চ'লে গেলেন ঘর থেকে। ভাবতে ভাবতে গেলেন, সংসারে এমন অনেক অন্যায় আর অবিচার আছে, যাদের মেনে নিতেই হয়। নয় তো অশান্তির কালো ছায়া নামে। কলহ-বিবাদ হয়। মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পুরামাত্রায়। কিন্তু হেমনলিনী শান্তিপ্রিয়। বাধা দেন না কাকেও। এমন কি তাঁর স্বামীকেও নয়। হেমনলিনী বেশ জানেন, কিয়ৎক্ষণের মধ্যে স্বামী তাঁর পরিচ্ছন্ন পোষাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবেন। যাবেন শিমলের কাছাকাছি কোথায়—যেখানে না কি আছেন কে এক জন নারী—যে বশ ক'রেছে তাঁর স্বামীকে। সেখানে যাবেন, গিয়ে মদ গিলবেন। থাকবেন কতক্ষণ তার ঠিক নেই। ফিরবেন কখন কেউ জানে না।

শিবচন্দ্র বাবু বললেন,—হেম, আমার কাপড়-জামা বের ক'রে দাও। একটা বেনিয়ান আর কোঁচানো ধুতি চাই।

হেমনলিনী বেশ জানেন স্বামী তাঁর কোথায় যাবেন। তবুও বললেন,—কোথায় যাবে এখন? ভাইপো-বৌয়ের সঙ্গে দেখা করবে না? কথা বলবে না?

—কোথায় সে? বেশী দেরী হ'লে কিন্তু দেখা হবে না। টাইম দেওয়া আছে, একজন সাহেবের বাসায় যেতেই হবে। নয় তো অনেক টাকার কাজ ফস্‌কে যাবে।

—কাল সকালে যদি যাও? বললেন হেমনলিনী।—ক্ষতি হয়ে যাবে? বৌ গেছে স্নানঘরে। এক্ষুনি আসবে।

—নিশ্চয়ই, ক্ষতি ব'লে ক্ষতি! অনেক টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। কথা বলতে বলতে আরামকেদারা থেকে উঠে পড়লেন শিবচন্দ্র বাবু। পরনের জামার দুই পকেট থেকে বের করলেন যা কিছু ছিল। কাগজ-পত্র আর টাকা। এক বাণ্ডিল কারেন্সী নোট। কত টাকা কে জানে!

কথা বলতে বলতে কখন নিজের চুল বেঁধে ফেলেছেন হেমনলিনী।

পূর্ব্বে তিনি ছিলেন কেশবতী। ছিল রাশি-রাশি কোঁকড়ানো চুল। এখন আছে তারই অবশেষ। বাঁধতে সময় লাগে না অধিকক্ষণ। হেমনলিনী উঠে শিবচন্দ্র বাবুর বরাদ্দ দেরাজটা খুললেন। খুঁজে-খুঁজে বের করলেন একটা আদ্দির বেনিয়ান। কোঁচানো ধুতি। রুমাল। আতরের বাক্স আখরোট কাঠের। বললেন,—আর কিছু চাই?

—আবার কি চাই? কিচ্ছু চাই না। কথা বলতে বলতে একটু থেমে বললেন শিবচন্দ্র বাবু—হেম, বড্ড ক্ষুধা লেগেছে। ঘরে আছে না কি কিছু?

—কেন থাকবে না? কি খাবে বল'? দাদার পুরুৎ এক হাঁড়ি মিষ্টি এনেছে। আবার-খাবো সন্দেশ। দেবো গোটা দু'য়েক?

—মিষ্টি! এখন আবার মিষ্টি! দাও, তুমি যখন বলছো।

বললেন শিবচন্দ্র বাবু। বললেন,—বিপ্রপদ কোথায়? আছে না কি সে? না, বাড়ী চ'লে গেছে?

হেমনলিনীর মুখাকৃতিতে সামান্য লজ্জা খেলে যায়। খানিক নীরবতার পর বললেন,—হ্যাঁ, আছে। তার ঘরেই আছে। লিখছে বোধ হয় কোন কিছু।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন শিবচন্দ্র বাবু। বললেন,—ব'লে দিও, লিখে কিছু হবে না। না খেতে পেয়ে মরবে। তার চেয়ে বরং একটা চাকরী-টাকরী করুক। দু'পয়সা ঘরে আসবে।

হেমনলিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন,—তুমিই না হয় ব'ল। আমার কি দরকার বলবার। তোমার ভাই, তুমি বললেই ভাল দেখায়। সে তো আর আমার কেউ নয় যে গলা জড়িয়ে বলতে যাবো!

—সে আমার সামনে আসে কৈ? ভারী লাজুক ছেলে। বাড়ীতে একটা মানুষ আছে কে বলবে। বললেন শিবচন্দ্র বাবু। অন্তর্বাস ফতুয়াটা খুলতে খুলতে বললেন। তার পর নির্জন ঘরে আবার শরীর এলিয়ে দিলেন আরাম-কেদারায়। পরিশ্রম আর ক্লান্তিতে চক্ষু মুদিত করে ফেললেন।

সন্ধ্যার এলোমেলো বাতাস বইছিল থেকে-থেকে। হিমেল হাওয়া।

ঘরের দরজা আর জানলার পর্দা উড়ছিল হাওয়ার বেগে।

মুহূর্ত্ত কয়েকের মধ্যে ফিরে এলেন হেমনলিনী। দু'হাতে দু'টি রূপার পাত্র। জলপাত্র আর খাবারের রেকাবী। লণ্ঠনের আলোয় পাত্র দু'টি চিক-চিক করতে থাকে।

—খাবার এনেছি। বললেন হেমনলিনী। স্বামীর তন্দ্রার ঘোর টুটিয়ে দিয়ে বললেন।

উঠে বসলেন শিবচন্দ্র বাবু। বললেন,—গেছো আর এসেছো?

সে-কথার কোন উত্তর দেন না হেমনলিনী। অনুমানে বুঝতে পারেন দরজার বাইরে কে যেন অপেক্ষা করছে। দেখেন, লক্ষ্য ক'রে দেখেন কার যেন ছায়া! বলেন,—বৌ এসেছিস?

বাইরে যার ছায়া, তার মুখে কোন কথা নেই।

সে দেখেছে দ্বারের মুখে চৌকাঠের কাছাকাছি কোন' পুরুষের পাদুকা। এক জোড়া জুতো। এক জোড়া পাম্প স্যু। চক-চক করছে দালানে ঝুলানো বেল-লণ্ঠনের আলোয়।

—আয় বৌ, ঘরে আয়। ডাকলেন হেমনলিনী। স্নেহ-ভরা কণ্ঠে।

একগলা ঘোমটা টেনে রাজেশ্বরী ঘরে প্রবেশ করে। সেই খুনখারাপি রঙের শাড়ী-পরিহিতা রাজেশ্বরী। ত্রাস আর সঙ্কোচের সঙ্গে পিশে মশাইয়ের পদধূলি নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো। কি এক সুগন্ধিতে ঘরের হাওয়া যেন ভারাক্রান্ত ওঠে। কি এক অঙ্গবাসে গাত্র মার্জ্জনা করেছে রাজেশ্বরী। বিলেতী লালাবাই সাবানের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় বুঝি!

শিবচন্দ্র বাবু বৌয়ের মস্তকে হাত ঠেকিয়ে বললেন,—এসো মা, এসো। আমাকে দেখে এত ঘোমটা কেন? কখন এসেছো মাঠাকরুণ?

গুণ্ঠনের আবরণে রাজেশ্বরীর মুখ অদৃশ্যই থাকে। হেম-নলিনী বললেন,—এসেছে সকালের দিকে।

শিবচন্দ্র বাবু মিষ্টান্নের রেকাবী হাতে নিয়ে বললেন,—খাওয়ান-দাওয়ান ভাল হয়েছে তো?

পরিহাস ছলে হেমনলিনী বলেন,—না, উপোস করিয়ে রেখেছি। কি বল্ বৌ?

রাজেশ্বরী স্বল্প হাসে। পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

শিবচন্দ্র বাবু দু'টি মিষ্টি গলাধঃকরণের পর জলের পাত্র নিঃশেষ করে উঠে পড়লেন আরাম-কেদারা থেকে। বললেন,—হেম, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি। বৌমা লজ্জা পাচ্ছে আমাকে দেখে। তুমি আমার কাপড়, জামা, টাকা-কড়ি দিয়ে আসবে চল'। আমার হয়তো ফিরতে রাত্তির হবে।

ক্ষোভের সঙ্গে বললেন হেমনলিনী,—কোন্ দিন আর রাত্তির হয় না? এখন আর ভাবি না আমি। অভ্যেস হয়ে গেছে।

শিবচন্দ্র বাবুর মত বেপরোয়া লোকও স্ত্রীর এই কথায় লজ্জানুভব করলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গেলেন পাশের কামরায়।

কণ্ঠস্বর সহসা নত ক'রে বললেন হেমনলিনী,—বৌ, তুই সাজাগোজা কর্। আমি গা ধুয়ে আসছি এখুনি। আর বিদেয় ক'রে দিয়ে আসি আমার স্বোয়ামীটিকে।

কথায় সরলতা মাখিয়ে রাজেশ্বরী বলে,—পিশে মশাই কোথায় যাচ্ছেন এখন পিশীমা? এসেই বেরিয়ে যাচ্ছেন? একটু জিরোতে বলুন না।

হেমনলিনী কৃত্রিম হেসে বললেন,—তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না আমার কথা যদি শুনতো! যাবে আর কোথায়! যাচ্ছে মদ টানতে, যাচ্ছে মেয়েমানুষের ওখানে। একটা মেয়ের বয়েসী স্ত্রীলোককে বাঁধা রেখেছে যে। শুনিস্‌নি তুই?

রাজেশ্বরীর বক্ষঃস্থল হঠাৎ থরথরিয়ে উঠলো।

কেমন যেন ভীতির সঞ্চার হয় তার অবচেতন মনে। সে বলে,—না তো, আমি কিছু শুনিনি।

সহজ সুরে কথা বলেন হেমনলিনী,—কা'কেও বলিস্‌নে যেন! তুই এখন আমাদের ঘরের মেয়ে। ঘরের কথা কি কা'কেও বলতে আছে? কি বল্ বৌ?

কি বলবে রাজেশ্বরী! কা'কেই বা বলবে! কে-ই বা আছে তার!

নিরুত্তর থাকে সে। অপলক চোখে তার স্থিরদৃষ্টি। শুষ্ক মুখ।

স্বামীর পোষাক-পরিচ্ছদ তুলতে থাকেন হেমনলিনী। এক হাতে কাপড় আর জামা। অন্য হাতে টাকা-পয়সা।

কারেন্সী নোটের তাড়া। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন,—বৌ, তুই পড়লি চিঠিটা? বৌঠানের চিঠিটা?

রাজেশ্বরী বলে,—না পিশীমা! এইবার পড়বো।

কিন্তু পড়বে কি রাজেশ্বরী! রাজেশ্বরী কি আর রাজেশ্বরীতে আছে? পিশীমার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে মন তার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভাল লাগছে না কিছু। আরেক মুহূর্ত্ত থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না এই গৃহে। পিশীমার মত সর্ব্বগুণান্বিতার জন্য মন তার দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কে এমন মানুষ আছে যে ঐ পিশীমাকে অবহেলা করতে পারে? হেমনলিনী কখন ঘর থেকে অন্তর্হিতা হয়েছেন দেখতে পায়নি রাজেশ্বরী। আচ্ছন্ন হয়ে গেল যেন রাজোর দেহ আর মন। খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে পাষাণ-মূর্ত্তির মত।

এমনি ভাবে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরীই জানে না।

পিশীমার বালিশের তলা থেকে চিঠিটা খুঁজে নেয় যন্ত্রচালিতের মত।

লণ্ঠনের আলোর কাছাকাছি গিয়ে খাম থেকে চিঠিটা বের ক'রে পড়তে থাকে রুদ্ধশ্বাসে। পড়তে থাকে:

শ্রীশ্রীদুর্গা ভরসা

সাবিত্রীসমানেষু ভাই ঠাকুরঝি,

বহুকাল যাবৎ তোমাদের কোন সংবাদাদি না পাওয়ায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আছি। আমি সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তথাপি কখনও কখনও তোমাদের জন্য এই পোড়া মনটা হুহু করে। কয়দিন ধরিয়া তোমার জন্য কেন জানি না, মানসিক চাঞ্চল্যে কষ্টভোগ করিতেছি এবং সেই কারণেই এই পত্র দিতেছি। যথা সত্বর এই চিঠির একটুকু উত্তর প্রদান করিলে যৎপরোনাস্তি খুসী হইব। তুমি তোমার সংসার লইয়া সদাক্ষণ ব্যস্ত থাকো। তোমাকে পত্র দিয়া তদুপরি ব্যস্ত করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তুক এই পৃথিবীতে আমার কে-ই বা আছে? আমার শরীর ক্রমশঃ ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিতেছে। বাতের কষ্টে উত্থানশক্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। অপর এক নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে আমি চোখে দেখিতে পাই না। চক্ষের দৃষ্টি হারাইয়াছি। চশমা লইয়াও কোন ফল হয় নাই। একজন বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা দয়াপরবশ হইয়া আমার দেখা-শুনা করিতেছেন। তিনি এক বিশিষ্ট পরিবারের কুলবধূ। স্বামীকে অকালে হারাইয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তিনি আমার সকল কার্য্যের পথপ্রদর্শক। তাঁহাকে দিয়াই এই পত্র লিখাইতেছি। যাহা হউক, তুমি অনতিবিলম্বে দুই ছত্র উত্তর দিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ লইবে। তোমার পুত্রদ্বয়কে আমার স্নেহপূর্ণ আশীষ দিবে। অধিক আর কি লিখিব? তোমার পত্রোত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। ভগবান তোমাকে সকল দিক দিয়া খুশী করুন—ইহাই আমার অন্তরের প্রার্থনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার বৌঠান

পত্র পাঠে নিমগ্না রাজেশ্বরীর চক্ষু ছল ছল করে কেন!

তার হৃদয়ে কি বিষময় জ্বালা! তার সম্মুখস্থ সকল কিছু ঘূর্ণায়মান মনে হয়। পদতলের ভূমি কম্পমান হয়ে ওঠে। চক্ষুদ্বয় মুদিত ক'রে কিয়ৎক্ষণ অবিচলিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। এ অবস্থায় রাজেশ্বরীর করণীয় কি আছে? সে একজন নাবালিকা বধূ। এই নাতিদীর্ঘ পত্রে পুত্রবধূর সম্বন্ধে কৈ এক ছত্র লিখতেও পরাঙ্মুখ হয়েছেন তিনি। রাজেশ্বরীর মনের গহনে মাত্র একটি চিন্তা, মাত্র একটি কল্পনা বার বার উদিত হয়, তার শ্বশ্রূমাতা কত কঠোর! কি পরিমাণ অভিমান তাঁর! কেমন নিস্পৃহ কুমুদিনী! লোকে বলে, নারীচিত্ত অতীব কোমল। এখন লোকে এসে দেখতে পারে, নারী কতটা নিষ্ঠুরা হয়! দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই নারী-মনে! নেই বাৎসল্য, নেই ক্ষমা!

—বৌ?

রাজেশ্বরীর দুই কানে তালা লেগেছে কি!

—ও বৌ, শুনছিস্?

রাজেশ্বরীর কর্ণেন্দ্রিয় কি বধির হয়েছে!

—অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল, জল-খাবার দিতে বলি? কিছু মুখে দিবি না?

রাজেশ্বরীর বোধশক্তি কি লোপ পেয়েছে! বাক্‌শক্তি!

সহসা চমকে শিউরে উঠলো রাজেশ্বরী। শাড়ীর অঞ্চলে চোখের গড়ন্ত অশ্রুধারা মুছে বললে,—ডাকছিলেন পিশীমা?

—হ'ল কি তোর? ডাকছি কতক্ষণ, কোন সাড়াশব্দ নেই? খাবি না কিছু? জল-খাবার দিতে বলি এখন? সস্নেহে বললেন হেমনলিনী।

মনোভাব গুপ্ত করে বৌ। বলে,—মাথাটা বড্ড ঘুরছিল পিশীমা! যা খেয়েছিলুম সব বমি হয়ে গেল চানের ঘরে যেতেই। খানিক বাদে খাবো।

—পান খাবি একটা? পান অম্লনাশক। পিশীমা বলেন।

—হ্যাঁ, খাবো। দিন একটা পান। রাজেশ্বরীর কম্পিত কণ্ঠ।

হেমনলিনীর হাতেই ছিল পানের ডিবে। খুলে ধরলেন।

রাজেশ্বরী একটা পানের খিলি তুলে নেয়। মুখে দেয়!

পিশীমা বললেন,—সুপ্তি জর্দ্দা খাবি কিছু? খাস্ তো খা।

—ও বাবা! তা হ'লে আর রক্ষে আছে! মাথা ঘুরে পড়বো।

স্মিতহাস্যে কথা বললে রাজেশ্বরী। ব'সে পড়লো জাজিমে। পান চিবোতে লাগলো অধর সিক্ত ক'রে।

পিশীমা দেখলেন, বৌকে যেন কেমন কাহিল মনে হচ্ছে। যেন রক্তহীন পাণ্ডুর শরীর। আয়ত চোখের কোলে কালিমা প'ড়েছে। চোখে হতাশ দৃষ্টি।

হেমনলিনী বললেন,—পড়লি চিঠি? বৌঠানের দৃষ্টি গেছে লিখেছে, দেখলি?

—হ্যাঁ। কত কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। কিছু উপায় হয় না পিশীমা? ভগ্নকণ্ঠে কথা বলে রাজেশ্বরী।

হেমনলিনী বললেন,—না বৌ, না। কোন উপায় নেই। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, তবু বৌঠানের কথার নড়চড় হবে না। বরাতে দুঃখু আছে যার, কে খণ্ডাবে বল্? তা তোর এত ঘোমটার বহর কেন বল্ তো বৌ?

—পিশে মশাই যদি এসে পড়েন? বললে রাজেশ্বরী। লাজুক হেসে বললে।

হেমনলিনী ঠোঁট ওল্টালেন। বললেন,—কোথায় পিশে মশাই! তিনি তো বেরিয়ে গেছেন।

—ও। গুণ্ঠন মোচন ক'রে বলে রাজেশ্বরী। বলে,—কখন ফিরে আসবেন আবার?

দুঃখের হাসি ফুটে উঠলো হেমনলিনীর মুখে। বললেন,—সে-কথা আর বলিস্‌নি বৌ। কখন আসে তার ঠিক কি! আজকে আর না-ও আসতে পারেন। হয়তো ফিরবেন সেই কাল সকালে। তা তোর গাড়ী আসবে কখন?

রাজেশ্বরী বললে,—ব'লেছেন তো আদালত থেকে ফিরে জুড়ী পাঠাবেন। এখনও যে কেন এলো না কে জানে! আপনার গান না শুনে কিন্তু যাবো না পিশীমা! তাড়িয়ে দিলেও যাবো না।

—কি যে বলিস্ বৌ! সহাস্যে বললেন হেমনলিনী।—চল্ তবে ঐ ঘরে, যে ঘরে অর্গ্যানটা আছে। ভুলেও ভুলিস্ না দেখছি। জুড়ী যতক্ষণ না আসে—

রাজেশ্বরী উঠে দাঁড়ালো সানন্দে। গান শোনার আনন্দ। জুড়ী যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ মনের আনন্দে গান শুনবে সে। পিশীমার মধুকণ্ঠের গান।

জুড়ী তখনও গরাণহাটার গলির মুখে।

মালিক তখনও গহরজানের রুদ্ধদ্বার কক্ষে। গল্প-গুজব করছিলেন নিবিজানের সঙ্গে। হাস্য-বিনিময় করছিলেন। পানপাত্র প'ড়েছিল এক পাশে। ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে। শতেক অনুরোধেও আরেক পাত্র মুখে তুলতে চাইছিলেন না কৃষ্ণকিশোর। অনিচ্ছা প্রকাশ করছিলেন একটা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে। গহরজান ব'সেছিল খুব কাছাকাছি।

রুদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাত করে কে?

উন্মোচনের নিমিত্ত সশব্দ আহ্বান জানায়। কড়া ধ'রে নাড়ে। ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ধনুকের মত তীক্ষ্ণ ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে গহরজানের। বিরক্তিতে। সাড়া দেয় সে,—কে, কে, কৌন হায়?

ডাকছিল সৌদামিনী। বিশেষ প্রয়োজনে ডাকছিল

—দরজাটা খোল্ না গহর! একটা কথা আছে।

—মাসী ডাকছো? ঘরের ভেতর থেকে কথা বলে গহরজান। বেসামাল পোষাক ঠিক করতে করতে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বারের অর্গল খুলে দেয়। বলে,—ডাকছো মাসী?

—হ্যাঁ লো হ্যাঁ। ডাকছি। কতক্ষণ থেকে ডাকছি বল্ তো? সৌদামিনীর কথাতেও বিরক্তি ফুটে ওঠে।

গহরজান বললে,—বল' কি বলবে?

সৌদামিনী শ্বাস টানে একটা। দীর্ঘশ্বাস। বলে,—তোমরা দু'জনেই শোন'। পুরুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে তোমার ডালিমের বিয়ের পাকা কথা নে' এসেছি। আসছে বেরস্পতিবারে বিয়ে। হাতে মাত্তর পাঁচটা দিন!

আনন্দোচ্ছ্বাসে উৎলে ওঠে যেন গহরজান। পরমানন্দে জড়িয়ে ধরে সৌদামিনীকে। সহাস্য বদনে। বলে,—মাসী, তবে তুমি বিলকুল ব্যবস্থা ক'রে ফেলো! আমি কিছু জানি না। তুমি যা করবে তাই হবে।

—তোর নাগর আপত্তি করবে না তো? তোর কথাই কথা তো? না, যার টাকা তারও কথা নিতে হবে! সৌদামিনী কথাগুলি বলে কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে। অভিমানের সুরে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বললে গহরজান।—আমি ওনার কথা নিয়েছি। তুমি যা বলবে, যা করবে তাই-ই হবে।

উনি তখন বিস্ত নেশাচ্ছন্ন হয়ে প্রায় জ্ঞানহারা অবস্থায় আধা-শোয়া হয়ে প'ড়েছিলেন ফরাসে। একটা তাকিয়ায় এলিয়ে দিয়েছিলেন দেহ। ইটালীয়ান ওয়াইনের নেশা।

ঘরে কারা যেন কথা বলছে। রক্তবর্ণ চক্ষে কোন রকমে দেখলেন কৃষ্ণকিশোর। দেখলেন অনেক কষ্টে। ওরা ছ'জনে কে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে! গহরজান গেল কোথায়? শেকল কেটে পাখী উড়ে গেল নাকি!

—গহরজান! কোথায় গেলে তুমি? জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলেন কৃষ্ণকিশোর।

—এই তো আমি। আধো-আধো কণ্ঠে কথা বলে গহরজান। দরজায় পুনরায় অর্গল তুলে দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে এসে ফরাসে বসলো! চোখে মদালস চাউনি তার। বললে,—আজকে তোমাকে ঘরে ফিরতে দেবো না। থাকবে তুমি আমার কাছে।

কৃষ্ণকিশোর জড়িত কণ্ঠে বললেন,—না, না আজকে নয়। তক্ষণ এসেছি বল তো। এখন আমি যাই। ছুটি দাও আমাকে। কাল আসবো সকাল সকাল। তুমি আমাকে জুড়ীতে তুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর।

আন্তরিক দুঃখের ছায়া নামলো গহরজানের চোখে-মুখে। বলে,—চ'লে যাবে তুমি আমাকে ছেড়ে?

কৃষ্ণকিশোর তাকিয়া ত্যাগ ক'রে উঠতে চেষ্টা করেন। বলেন,—হ্যাঁ, কাল আবার আসবো। তাড়াতাড়ি আসবো। থাকবো অনেকক্ষণ। না গেলে বাড়ীতে সকলে ভাববে। হৈ-হৈ পড়ে যাবে।

—এসো তবে। গহরজান দোপাট্টার আঁচল পাকাতে পাকাতে কথা বলে।—আমি লোক ডাকি। তোমাকে গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—হ্যাঁ। লোক ডাকো। না গেলে বাড়ীতে যে ভাববে সকলে।

সকলের মধ্যে ব্যস্ত হওয়ার কে-ই বা আছে! এক রাজেশ্বরী ব্যতীত কে-ই বা আছে!

রাজেশ্বরী তখন সকল কিছু ভুলে পিশীমার গান শুনছিল। হেমনলিনী অর্গ্যানে ব'সে দরদী-কণ্ঠে গাইছিলেন রবিবাবুর একটি গীত। গাইছিলেন,—'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—'

[ক্রমশঃ।

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

মানসোল্লাস—আচার্য্য সুরেশ্বর, অনুবাদক স্বামী বশিষ্ঠানন্দ পুরী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা।

ভালমন্দ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, সম্পাদিত। বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, ৮৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

ডোরিয়ান গ্রের ছবি—অসকার ওয়াইল্ড; শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। নব ভারতী, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২। মূল্য চার টাকা আট আনা।

আমার বাংলা—শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। ঈগল পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস কলিকাতা—২০। মূল্য দু টাকা।

ফ্রয়েড প্রসঙ্গে—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ঈগল পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা—২০। মূল্য দু টাকা চার আনা।

আড়ল নদীর তীরে—শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা চার আনা।

অ্যালবার্ট হল—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা আটা আনা।

পূজা, কেলসাম—কবিরাজ বিভূতিভূষণ সামন্ত। গ্রাম ও পোঃ বৈষ্ণবচক, মেদিনীপুর। মূল্য দুই টাকা।

বুড়ো পৃথিবীর কথা—শ্রীদেবীদাস মজুমদার। ঈগল পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা—২০। মূল্য এক টাকা চার আনা।

নূতন পৃথিবী—শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

অন্তর ও বাহির—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

চারণের ডাইরী—শ্রীবাণীকুমার প্রবাসী। এ, বি, ঘোষাল, গীতাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। মূল্য এক টাকা চার আনা।

স্মৃতির অতলে—শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা আট আনা।

অনির্ব্বাণ শিখা—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য দু টাকা বার আনা।

বেড়িয়ে আসি বিশ্ব জগৎ—শ্রীদেবীদাস মজুমদার। ঈগল পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা—২০। মূল্য এক টাকা চার আনা।

যমের সঙ্গে যুদ্ধ—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ঈগল পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা—২০। মূল্য এক টাকা চার আনা।

যাঁর সাথে যার—শ্রীহৃষীকেশ হালদার। সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ৩/১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ঈগল পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা—২০। মূল্য এক টাকা চার আনা।

প্রচ্ছন্ন—শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায়। ২৩ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

যখনই হোক... যেখানেই হোক...
ব্রুক বণ্ড চা
বাগান থেকে সদ্য আসে
তাই এত তাজা
103/BB
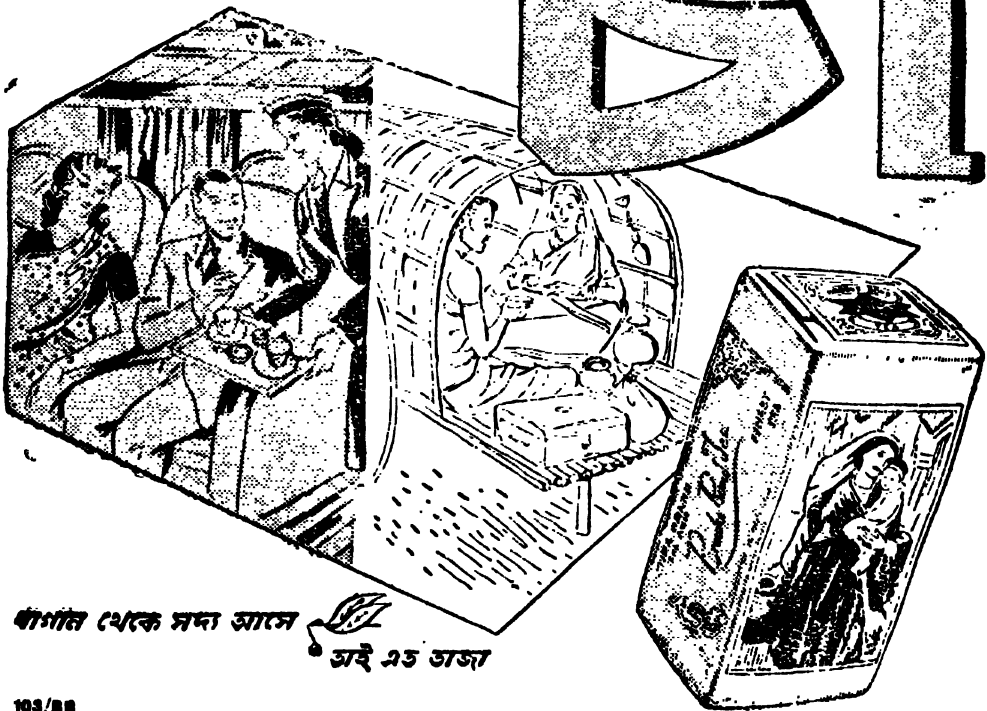
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পূর্ব্ব-বার্লিনের হাঙ্গামা—

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর মনে যখন গভীর আশার সঞ্চার হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রী কর্তৃক বন্দীবিনিময় চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া ২৫ হাজার যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়ার ঠিক পূর্ব্বদিন পূর্ব্ব-বার্লিনে এবং পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর আরও কয়েকটি স্থানে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গেল, তাহাকে কম্যুনিষ্ট-শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব-বার্লিনের জনগণের অভ্যুত্থান বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ম্যালেনকোভের সহিত আলোচনা করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি একাই তাঁহার সহিত আলোচনা করিবেন, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিলের এই ঘোষণার কিছু দিন পরেই পূর্ব্ব-বার্লিনে হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়াটা তাৎপর্য্যহীন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্ম্মাণ-সমস্যা সমাধানের অভিপ্রায়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বার্লিনের মধ্যে যাতায়াতের বাধানিষেধ বহুল পরিমাণে শিথিল করিবার পর এই হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ার তাৎপর্য্যও বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্ব-বার্লিনের গৃহনির্ম্মাণ শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের কোনই কারণ ছিল না, এক কম্যুনিষ্ট ছাড়া আর কাহারও পক্ষে নিঃসন্দেহে উহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নয়। পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি না করিয়া তাহাদের নিকট হইতে শতকরা দশ ভাগ কাজ বেশী আদায় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ইহা শুধু কম্যুনিষ্ট-বিরোধীদের মিথ্যা প্রচারকার্য্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণও দেখা যায় না। হাঙ্গামা সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর খনি ও লৌহ-শিল্প বিভাগের মন্ত্রী জনতার সম্মুখে তাঁহার বক্তব্য বলিতে অসমর্থ হওয়ার পর ঘোষণা করেন যে, গত মে মাসে যে 'নরমস্' (norms) বৃদ্ধির অর্থাৎ কাজ ত্বরান্বিত করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা বাতিল করা হইবে। কাজের পরিমাণ (working norms) বৃদ্ধি লইয়া গৃহনির্ম্মাণ-শিল্পের শ্রমিকদের সহিত পরিচালকবর্গের মধ্যে মতভেদকে পশ্চিম-বার্লিন হইতে আগত এজেণ্ট-প্রভোকেটরগণ কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। এই সুযোগ যদি না থাকিত, তাহা হইলে পশ্চিম-বার্লিন হইতে আগত হাজার হাজার এজেণ্ট-প্রভোকেটর দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে একেবারেই পারিত কি না তাহা বলা হয়ত কঠিন। কিন্তু পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বার্লিনের মধ্যে যাতায়াতের বাধা-নিষেধ শিথিল করার ফলে পূর্ব্ব-বার্লিনে হাঙ্গামা সৃষ্টির চক্রান্ত করা যে অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব-বার্লিনের হাঙ্গামাটা যে শ্রমিকদের অসন্তোষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি ছিল না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর শ্রমিকরা যখন সরিয়া দাঁড়াইল, তখন হাঙ্গামা দমন করা খুব কঠিন হয় নাই। হাঙ্গামা যদিও চারি ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হয় নাই, তথাপি এই সময়ের মধ্যে উহার ব্যাপকতা ও তীব্রতা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে উহার পিছনে যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষও সামরিক আইন জারী করিয়া এবং রাজপথে ট্যাঙ্ক বাহির করিয়া দৃঢ়হস্তে হাঙ্গামা দমনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের এইরূপ কঠোর হস্তে হাঙ্গামা দমনটা ভাল লাগে নাই। পশ্চিম-বার্লিনের মার্কিণ, বৃটিশ এবং ফরাসী সামরিক অধিনায়কগণ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তার সহিত হাঙ্গামা দমনের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-বার্লিনের হাঙ্গামার পিছনে যে মার্কিণ সামরিক অফিসারগণ এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের উস্কানি ছিল, তাহা গোপন রাখা সম্ভব হয় নাই। 'নিউইয়র্ক টাইমস' এই হাঙ্গামা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "১৯৫৩ সালের ১৭ই জুন বুধবার একটি গৌরবের দিন হইয়া থাকিবে।……বার্লিনের রাজপথে যাহারা অভ্যুত্থান করিয়াছে তাহাদিগকে আমরা জানাইতেছি, বেশ করিয়াছ। তোমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নাই।" কিন্তু একেবারেই ব্যর্থ হয় নাই, এ কথা বলা চলে কি? পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেন্যুয়ের বলিয়াছেন, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে তাহাদের সপ্তাহব্যাপী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইবে না। যে ভাবে এই দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল তাহাতে আরও কিছু দীর্ঘ সময় হাঙ্গামা চলিলে অবস্থা যে সত্যই অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত 'সকলি গরল ভেল।'

কি ভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং উহাকে ব্যাপক অভ্যুত্থানে পরিণত করিয়া কি ভাবে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট দখলের আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা সত্যই চমকপ্রদ ব্যাপার! ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট রাশিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনে এই ধারণা সৃষ্ট হইতে বিলম্ব হয় নাই। এই কল্পিত দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মার্কিণ গুপ্ত রেডিও হইতে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে বিদ্রোহ করিবার উস্কানী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শুধু রেডিও মারফৎ প্রচারকার্য্য চালাইয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। উহার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বার্লিনে যাতায়াতের যে বাধা-নিষেধ ১৯৪৮ সালে

এবং ১৯৫২ সালে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জারী করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করায় এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সুযোগ কি ভাবে কাজে লাগানো হইয়াছিল তাহা পশ্চিম-জার্ম্মাণীর কম্যুনিষ্ট নেতা হের ম্যাক্স রেইম্যানের বিবৃতি এবং হাঙ্গামার সময় ধৃত পশ্চিম-জার্ম্মাণীর বেকার নাট্যকার ওয়ার্ণার কাল্কোভস্কীর স্বীকার-উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্ব-বার্লিনের এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ম পশ্চিম-বার্লিনের কম্যুনিষ্ট নেতা হের রেইমান পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সমগ্র জার্ম্মাণী সংক্রান্ত মন্ত্রিদপ্তরের (All German Affairs Ministry) এজেন্ট-প্রোভোকেটার-দিগকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরের সহিত সোভিয়েট শিবিরের চুক্তি যাহাতে না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সমগ্র জার্ম্মাণী সংক্রান্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হের জেকিব কাইজার এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণীর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলি এই দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিবৃতি এবং ওয়ার্ণার কালকোভস্কীর স্বীকার-উক্তি হইতে ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, বার্লিনস্থিত মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণ গবর্ণমেন্ট মিলিত ভাবে এই হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ওয়ার্ণার কালকোভস্কী তাঁহার স্বীকার-উক্তিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-বার্লিনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা মার্কিণ মেজর জেনারেল সিভার্ট (Maj-Gen Sievert) অর্গেনাইজ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, হাঙ্গামা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরও ১০ জন লোক সহ পূর্ব্ব-বার্লিনে যাওয়ার জন্ম আমেরিকানরা তাহাকে প্ররোচনা দিয়াছিল। পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘটকে দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত করিয়া পূর্ব্ব-জার্ম্মাণ গবর্ণমেন্টের পতন ঘটাইবার জন্ম জার্ম্মাণ নেতার নিকট হইতে তাহারা নির্দ্দেশ পাইয়াছিল। মার্কিণ মেজর জেঃ সিভার্টের সম্বন্ধে উক্ত ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, ১৭ই জুন (১৯৫৩) সিভার্ট তাহাদিগকে জানায়, "Our instructions were to set buildings on fire, loot shopa, attack the people's police and generally upset order." অর্থাৎ গৃহে অগ্নিসংযোগ, দোকানপাট লুণ্ঠন, পুলিসকে আক্রমণ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে আমরা নির্দ্দেশ পাইয়াছি। শুধু পূর্ব্ব-বার্লিনের শ্রমিকদিগকে উস্কানী দিয়াই এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। উস্কানীদাতারা পূর্ব্ব-বার্লিনের কতক লোককে যে ভুলাইতে পারিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হাঙ্গামা করিবার জন্ম পশ্চিম-বার্লিন হইতে হাজার হাজার গুণ্ডাকে তাহারা পূর্ব্ব বার্লিনে আমদানী করিয়াছিল। হাঙ্গামাকারীদের মধ্যে পশ্চিম জার্ম্মাণীর ফ্যাসিষ্টপন্থী 'জার্ম্মাণ ইউথ' প্রতিষ্ঠানের অনেক লোক ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট-বিরোধী হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে, আলবেনিয়ায় অশান্তি দেখা দিয়াছে এবং বুলগেরিয়ায় সোভিয়েট প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছে, এইরূপ প্রচার-কার্য্যও পূর্ব্ব-বার্লিনে করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী এবং ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের সভাপতি হের অটো নুস্‌কেকে জোর করিয়া পশ্চিম-বার্লিনে লইয়া গিয়া হাঙ্গামায় নেতৃত্ব করিবার জন্ম প্ররোচিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন নাই। হের নুস্‌কে বলিয়াছেন, "এই সপ্তাহে পশ্চিম-বার্লিনের এজেন্টদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা যদি সাফল্য লাভ করি' তাহা হইলে জার্ম্মাণীতে এক নূতন যুদ্ধ আরম্ভ হইত।" বস্তুতঃ পশ্চিম বার্লিনে মার্কিণ সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল হাঙ্গামা যদি আরও দীর্ঘ সময় চলিত তাহা হইলে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ অতি দ্রুত হাঙ্গামা দমন করিতে সমর্থ হওয়া পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগই পান নাই।

রোজেনবার্গ দম্পতির হত্যা—

গত ১৯শে জুন (১৯৫৩) শুক্রবার মধ্যরাত্রে এথেল ও জুলিয়াস রোজেনবার্গকে নিউইয়র্কের সিংসিং জেলে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রাণদণ্ড বিচার বিভাগীয় হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহাদের প্রাণরক্ষার জন্ম সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন হইয়াছিল। সক্কো ও ভেনজেটির প্রাণদণ্ডাদেশের পর আর কোন মার্কিণ দণ্ডাদেশ পৃথিবীব্যাপী এইরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ১৯৫১ সালে রোজেনবার্গ দম্পতির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মার্কিণ ফৌজদারী মামলাতেও বহু বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। গত দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের প্রাণরক্ষার জন্ম কোন চেষ্টাই বাকী রাখা হয় নাই। সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি ডগলাস তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন। মার্কিণ গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে এই আদেশ নাকচ করিবার জন্ম সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। তখন আদালত বন্ধ থাকিলেও এই আবেদনের শুনানীর ব্যবস্থা হয়। সুপ্রীম কোর্টের ৯ জন বিচারপতির মধ্যে ৬ জন একমত হইয়া প্রাণদণ্ড স্থগিতের আদেশ নাকচ করিয়া দেন। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রোফেসার উরে (Prof. Urey) এটর্নি-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত এই ব্যাপার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি প্রেঃ আইসেন-হাওয়ারের নিকট যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাতে রোজেন বার্গ দম্পতির বিচারে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ার কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণদণ্ড মকুব করিবার জন্ম প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের নিকট দরখাস্তও করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

ইউরোপের বহু খ্যাতনামা ব্যবহারবিদ্ রোজেনবার্গ দম্পতির বিচারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করা হয় নাই। বস্তুতঃ, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করিবার মত কিছুই ছিলও না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন বৈদেশিক শক্তিকে পরমাণু-রহস্য জানাইবার চক্রান্তের অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। শুধু ডেভিড গ্রিনগ্লাস এবং তাঁহার পত্নীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। বিচারের সময় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডেভিড গ্রিনগ্লাসের মাথার কিছু গোলযোগ আছে এবং একটি পরমাণু-কারখানা হইতে ইউরেনিয়াম চুরির অভিযোগে সে লিপ্ত। গ্রিনগ্লাস এবং তাহার পত্নী রোজেনবার্গ দম্পতির সহিত চক্রান্তে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে অভিযুক্ত

করা হয় নাই। রোজেনবার্গ দম্পতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ যে, তাঁহাদের পক্ষে পরমাণু-শক্তির গোপন রহস্য রাশিয়াকে জানান সম্ভব নয়। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান এবং গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রিণগ্লাসের স্কুলের ছাত্রদের মত জ্ঞানটুকুও নাই। তাহার পক্ষে রোজেনবার্গ দম্পতিকে পরমাণু-রহস্য সরবরাহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাহার নিকট হইতে সে পরমাণু-রহস্য অবগত হইল? দুই জন বিজ্ঞানীর মধ্যে কথাবার্তা হইতে পরমাণু রহস্য অবগত হওয়া সম্ভব বলিয়া কোন পরমাণু-বিজ্ঞানীই স্বীকার করেন না। রোজেনবার্গের মামলায় আমেরিকার কোন পরমাণু-বিজ্ঞানীকে সাক্ষ্য দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আহ্বান করেন নাই। গ্রিণগ্লাস তাহার উকীল ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট যে-সকল পত্রাদি লিখিয়াছে, তাহাতে সে স্বীকার করিয়াছে যে, এফ-বি-আইয়ের নিকট সে যাহা বলিয়াছে, তাহার সব সত্য না-ও হইতে পারে। এই সকল চিঠিপত্র বিচারের পরে আবিষ্কৃত হইলেও, সেগুলি বিবেচনা করা হয় নাই। জুরীরা তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের জন্য কোন সুপারিশ করেন নাই।

রোজেনবার্গ দম্পতির বিচার হইয়াছে ১৯১৭ সালের গুপ্তচর-বৃত্তি আইন অনুসারে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ সালের পরমাণু-রহস্য আইন অনুসারে তাঁহাদের বিচার হওয়া উচিত ছিল। জুরীরা যদি সুপারিশ না করেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যদি বিশেষ কোন অপরাধ করা না হয়, তাহা হইলে পরমাণু-রহস্য আইন অনুসারে প্রাণদণ্ড দেওয়া চলে না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ অপরাধই প্রমাণিত হয় নাই। যে-সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, সাধারণ মানুষের পক্ষেও সেগুলি বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তবু রোজেনবার্গ দম্পতিকে বিচারের নামে হত্যা করা হইল। ম্যাকআর্থারেরই যেখানে প্রতিপত্তি, সেখানে এইরূপই হইবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

বেরিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয়—

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী 'টাস'-এর ১০ জুলাই তারিখের সংবাদে সোভিয়েট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভরেন্তি বেরিয়াকে পদচ্যুত, পার্টি হইতে বহিষ্কৃত এবং গ্রেফতার করার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্ববাসীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিবে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার ইতিহাসে এই ধরণের ঘটনা নূতন নয়। তাঁহার বিরুদ্ধে বিদেশী মূলধনের স্বার্থে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক, পার্টি-বিরোধী এবং রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্য-কলাপের অভিযোগ করা হইয়াছে। সোভিয়েট সুপ্রীম কোর্টের সামরিক বিভাগে নয়, খাস সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার বিচার হইবে। তাঁহার এই ভাগ্যবিপর্য্যয় ট্রটস্কি, জিনোভিয়েব, কামেনেভ, বুখারিন প্রভৃতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সোভিয়েট গুপ্তচর বিভাগের কর্ত্তা য়াগোডা ও ইয়েজোভকে অপসারিত করার সময় তাঁহারা ট্রটস্কীপন্থী ও বিপ্লববিরোধী এই অভিযোগই শুধু করা হয় নাই, মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার অভিযোগও তাঁহাদের বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল।

মঃ ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পূর্ব্বে বেরিয়া ছিলেন নিরাপত্তা বিভাগ ও গুপ্ত পুলিশ বিভাগের কর্ত্তা। রুশ ডাক্তারদের গ্রেফতার করার সময় তাঁহাদের গুরুতর অপরাধের সন্ধান পাইতে বিলম্ব হওয়ার জন্য নিরাপত্তা বিভাগের কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছিল এবং বেরিয়ার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়াও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ডাক্তারদের যখন সমস্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল, তখন বলা হইয়াছিল যে অভিযোগগুলি সবই মিথ্যা, তথাকথিত প্রামাণ্য তথ্যগুলি ভিত্তিহীন এবং বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করা হইয়াছে। ঐ সময় অদূর ভবিষ্যতে বেরিয়ার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা কাহারও মনেই জাগে নাই, এ কথাও বলা যায় না।

বারমুডা ও ছোট বারমুডা সম্মেলন—

১০ই জুলাই (১৯৫৩) হইতে ওয়াশিংটনে বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ছোট বারমুডা সম্মেলন আখ্যা লাভ করিয়াছে। গত ২১শে মে (১৯৫৩) বারমুডা সম্মেলন হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা স্বয়ং প্রেঃ আইসেনহাওয়ার। জুন মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই সম্মেলন দুই দফায় বাধা প্রাপ্ত হয়। প্রথম বাধা প্রাপ্ত হয় ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা সঙ্কটের জন্য। এই সঙ্কট কাটিয়া গেলে ৮ই জুলাই সম্মেলন হইবে বলিয়া স্থির হয়। অতঃপর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল অত্যধিক কাজের চাপে অসুস্থ হইয়া পড়ায় সম্মেলন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে, এবং উহার বিকল্প হিসাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছে বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিবত্রয়ের সম্মেলন।

মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁহার 'টেম্পেষ্ট' নাটকের ঘটনাবলীর স্থান যেখানে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বরমুডা দ্বীপপুঞ্জে ত্রিশক্তি সম্মেলন হইবে, প্রেঃ আইসেনহাওয়ার স্থির করেন। এই দ্বীপপুঞ্জের কতগুলি অঞ্চল ১৯৪০ সালে বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বিমান ও নৌঘাঁটির জন্য ইজারা দিয়াছে। বারমুডায় এই সম্মেলনের স্থান নির্ণয়ের বিশেষ কোন তাৎপর্য্য নাই। গত ১১ই মে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন কমন্স সভায় বলেন যে, অবিলম্বে প্রধান শক্তিবর্গের মধ্যে উচ্চস্তরে সম্মেলন হওয়া প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ১৪ই মে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সম্মেলন আহ্বান করিবার মত যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় রাশিয়া দেয় নাই। ইহার পরদিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুজী স্যার উইনষ্টনের বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই সকল ঘটনার পটভূমিকায় বারমুডা সম্মেলন আহূত হয়। এক কথায় আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদটা যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়। কিন্তু অতঃপর মতভেদ বিস্তৃততর হওয়াই শুধু বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, মতভেদ কতকটা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কোরিয়া, ইন্দোচীন ও জার্ম্মাণীতে অতি দ্রুত ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই সকল মিলিত কারণেই বারমুডা সম্মেলন যদি স্থগিত রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে চার্চ্চিলের অসুখটা ডিপ্লোমেটিক ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।
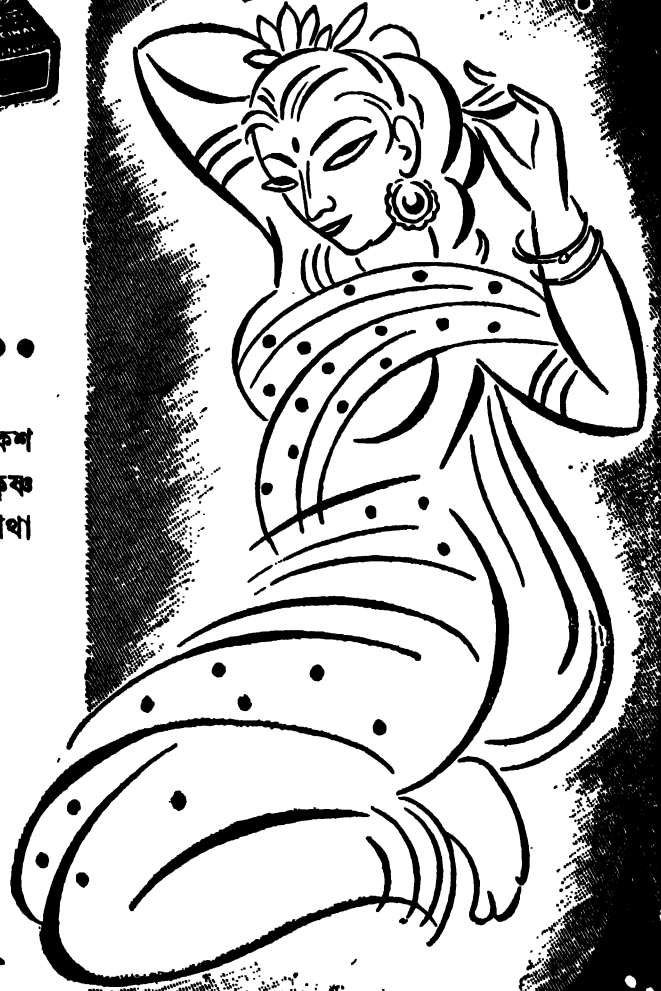
চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

২

চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সুনন্দা দেবী

২৭শে আষাঢ়, শনিবার, সকাল বেলা। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়ে যাত্রা করলুম বালীগঞ্জে শ্রীমতী সুনন্দা দেবীর গৃহে। আশা-নিরাশার কারণ, পূর্ব্বাহ্নে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে সংবাদ দিতে পারিনি আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। তারপর আর একটি চিন্তাও জুটেছিল মনের ভেতর। কেন না, সুনন্দা দেবী এখন নিজস্ব চিত্র-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। সুতরাং তাঁর কর্ম্মব্যস্ত জীবনের অন্ততঃ কিছুটা সময়

রূপ-সজ্জার বাইরে শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে দেবেন কি না, সে সংশয় জেগেছিল আমার মনে। সুধীর বাবুর পরামর্শ অনুযায়ী সকাল ৯টায় শ্রীমতী সুনন্দা দেবীর গৃহে উপস্থিত হ'লুম। একটি লোক বাড়ীর নীচে, ঘরে বসেছিল। তাকে সুনন্দা দেবীর স্বামী সুধীর বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করতে বললে যে, তিনি ঘুমোচ্ছেন। কাল সারা রাত্র স্যুটিং করে ক্লান্ত শরীরে ভোরে প্রত্যাবর্ত্তন করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। শুনে একটু ভাবলুম কী করা যায়। তার পরেই লোকটিকে বললুম, আমি এসেছি অবিশ্যি সুনন্দা দেবীর কাছে। তাঁর কাছেই আমার প্রয়োজন। লোকটি বৈদ্যুতিক "বেল" টিপে দিতেই একটি বেয়ারা নেমে এসে আমাকে উপরে নিয়ে গেল। একখানা শ্লিপ দিলে নাম-ধাম লিখতে। পরিবর্ত্তে আমার নামের কার্ডখানি তার হাতে পাঠিয়ে দিতেই আমার ডাক পড়লো সুনন্দা দেবীর বসবার ঘরে। গিয়ে দেখি, তিনি অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কি আলোচনা করছেন। আমাকে দেখেই জানতে চাইলেন আমার প্রয়োজন। আমি আমার উদ্দেশ্য তাঁকে বললুম—এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে রাখলুম, অধিক দেরী করা আমার পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক, সুতরাং আজই তাঁর মতামত জানতে পারলে ভাল হয়। সুনন্দা দেবীকে কর্ম্মব্যস্ত মনে হলো। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, আমাকে অন্ততঃ একটি দিন সময় দিন। আগামী কাল ঠিক এ সময়ে এলেই আপনার উত্তরগুলো দিতে চেষ্টা করবো। আমি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নমালাটি তাঁর হাতে দিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলুম।

রবিবার, সকাল ৯টায় ঠিক হাজির হলুম সুনন্দা দেবীর গৃহে। কয়েক মিনিট বাদে সুনন্দা দেবী এলেন সহাস্য মুখে আমার কাগজগুলো নিয়ে। আমাকে নমস্কার করেই আসন নিলেন এবং কুণ্ঠিতভাবে বললেন—গত কাল একটা বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়ে আপনার কাজটি করে উঠতে পারিনি। অবিশ্যি সেই সঙ্গে সংসারের কাজও কতকগুলো ছিল। তাই আজ আপনার আসবার পূর্ব্বে মাত্র কয়েকটি ছত্র লিখতে পেরেছি।

এবার সুরু হলো প্রশ্নোত্তর—আমার আসল প্রয়োজনের প্রসঙ্গ। সুনন্দা দেবী আরম্ভ করলেন—১৯৪১ সালে নিতিন বসু পরিচালিত "কাশীনাথ"-এ আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। আমি তাঁকে বললুম, কোন্ ছবিতে এবং কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করে আপনি সব চেয়ে বেশী তৃপ্তি লাভ করেছেন? উত্তর হলো—আমার অদৃষ্ট ভাল! এ পর্য্যন্ত যে সকল ছবিতে আমি অভিনয় করেছি, সব কয়টিতেই পেয়েছি নায়িকার ভূমিকা। সব চরিত্রই আমার ভাল লেগেছে। তার মাঝে বলতে পারি "কাশীনাথ", "বিরাজ বৌ", "সমাপিকা", নিজস্ব ছবি "দৃষ্টিদান" প্রভৃতিতে অভিনয় করে আমি সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি লাভ করেছি।

চলচ্চিত্রে যোগদানে কখনও আপনার ব্যক্তিগত আপত্তি ছিল কি—প্রশ্ন পেশ করলুম আমি সুনন্দা দেবীর কাছে। তিনি স্পষ্ট বললেন—চলচ্চিত্র-জগতে ঢুকবো বলে আগে আমার কোন কল্পনাই ছিলো না। অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে আমার স্বামীই এদিকে আমায় উৎসাহিত করেন। সুতরাং আমার আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠেনি। আজও পর্য্যন্ত আমি আমার স্বামীর কাছে সমান ভাবে উৎসাহ পেয়ে আসছি এই কাজটিতে।

সংসার-জীবন সম্পর্কে আপনার অনুরাগ কতখানি, প্রশ্ন করতেই সুনন্দা দেবী বেশ স্পষ্টভাবে বললেন, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাংসারিক জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। সংসার-জীবনে আমি স্ত্রী, মা, বোন,

মেয়ে—তার চেয়ে বড় পরিচয় আমি চাইনে। সংসার আমার খুব প্রিয়। ছবিতে আত্ম-প্রকাশের পর আমার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তন আসেনি।

প্রসঙ্গত তিনি এও বলেন, ভদ্র ও অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েদের চলচ্চিত্রে যোগদান ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তির ভাব আছে, আমি জানি। এই প্রশ্নের উপর আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি। আমি বুঝতে পারছিনে শিক্ষিত ও অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েরা যদি এদিকে না আসে, তবে এ শিল্পের উন্নতি কোথায়? ভাল এবং মন্দ সবটাই নির্ভর করছে নিজের উপর।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আমি (সুনন্দা দেবী) বলতে পারি—যে কেউ এদিকে আসতে চাইবেন সর্ব্বাগ্রে তাঁর রসবোধ থাকা চাই। সঙ্গীত ও সাহিত্য এ দুয়ের সমাবেশ, হৃদয়ের ভাবাবেগ ও আত্ম-সচেতনতা—এ না হলে আমার মনে হয় না যে, ভালভাবে অভিনয় করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকুক আর না-ই থাকুক, কুশলী অভিনেতা বা অভিনেত্রী হতে হলে অন্তত: বেশ কিছু "আউট নলেজ" (বাইরের জ্ঞান) থাকা অত্যাবশ্যক। দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সুনন্দা দেবী বলতে থাকেন—যেদিন স্যুটিং থাকে, তাড়াতাড়ি উঠে পূজা-অর্চনা সারি। তার পরেই ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-দাইয়ে ৮টা সাড়ে ৮টার ভেতরে বেরিয়ে যাই এবং রাত্তিরে বাড়ী ফিরি। আর যেদিন স্যুটিং না থাকে সেদিনের কর্ম্মসূচী আলাদা। পূজা-অর্চনা ও ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা, তাদের স্কুলে পাঠান এসব কাজ তো আছেই, তা ছাড়া সংসারের অপর সব কাজও দেখতে হয়। এ সময়ে আমি নিজের হাতে রান্না করে সবাইকে খাওয়াই। এতে আমার বড় আনন্দ হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষে খানিকক্ষণ বই, সাহিত্য, দেশ-বিদেশের খবরাখবর পাঠ করি। সাহিত্যচর্চ্চা ও বই পড়া আমার সব চাইতে বড় 'হবি' (Hobby)। খেলাধূলোয় আমার ততটা ঝোঁক নেই। হাতে অন্য কাজ না থাকলে একডালিয়া রোডে বাপের বাড়ীতে চলে যাই এবং কিছুটা সময় হৈ-চৈ করে বাড়ী ফিরি।

আমার অপর দু'-একটি প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা আমি প্রায়ই পড়ে থাকি, তবে যে সকল পত্রিকায় সিনেমা-সংক্রান্ত কোন আলোচনা থাকে না, যেমন "গল্পভারতী", সে ধরণের পত্রিকাগুলো আমার সব চাইতে ভাল লাগে। ছোটবেলায় "দেশ" প্রভৃতি পত্রে লেখা দিয়ে এসেছি। "নীহারিকা" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেছিলুম—এর সম্পাদনার দায়িত্বও ছিল আমার উপর। কিন্তু অবস্থার বিপর্যয়ে কাগজটি উঠে যায়। কবিতা আমি কখনও লিখিনি—গল্প লিখতুম।

সুনন্দা দেবী বলতে থাকেন—পূর্ব্বেই বললুম, বই পড়াটাই আমার "হবি"। সব রকম বই পড়তেই আমার ভাল লাগে। তবে তার ভেতর জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্যে যে-সব পুথি-পুস্তক আছে, গুলোই আমার বিশেষ প্রিয়। সাহিত্যের ভেতর টি. এস. এলিয়টের কবিতা আমার ভাল লাগে। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁদের লেখা তো আছেই, তা ছাড়া বর্ত্তমান যুগের [illegible]

বেশ-পরিচ্ছদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি (সুনন্দা দেবী) সূবো, লাল পেড়ে শাড়ী ও শাঁখার কাছে আমার মনে হয়

দামী বেনারসী ও জড়োয়া অতি তুচ্ছ। কেননা, এই হোল বাঙ্গালার ঐতিহ্য। দিল্লীতে সেবার যখন "ফিল্ম ফেষ্টিবেল" হলো, সেখানে আমি গিয়েছিলুম বাঙ্গালার প্রতিনিধি হয়ে। সেখানেও আমি এই পোষাক পড়ে যেতে কোন সঙ্কোচ বোধ করিনি।

বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ছবির মধ্যে কোন্ ছবি দেখতে আপনি পছন্দ করেন?—এই প্রশ্নের একটি ছোট কথায় উত্তর দিলেন তিনি—ইংরেজী ছবি। ভাল ছবি তৈরী সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত জানাতে গিয়ে তিনি বললেন, এর উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভব নয়। পরে প্রবন্ধাকারে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রাখি। ছবির পরিচালক হতে গেলে কি কি বিশেষ গুণ থাকা দরকার এই সম্পর্কে আমি কিছু মতামত দিতে চাইনে। কারণ নিজে আমি পরিচালক নই। না জেনে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা স্পর্দ্ধার পরিচায়ক হবে।

শিল্পীদের স্বাস্থ্য-রক্ষা করা ও শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কি?—নিশ্চয়ই, বাঙ্গালা দেশের খুব কম শিল্পীই সেটা করতে পারেন—তার একমাত্র কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা। তা ছাড়া ষ্টুডিওতে এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই নেই। শিল্পীদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্তে যে ধরণের আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা কোথায়? অপর একটি প্রশ্নের জবাবে সুনন্দা দেবী জানালেন—চিত্রপরিচালক, প্রযোজক বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ তো নেই-ই, বরং তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

সব শেষে আমি সসংকোচে জানতে চাইলুম তাঁর মোটামুটি আয়ের কথা। উত্তরে তিনি বললেন—এখন আমি গরীব "প্রডিউসার" (প্রযোজক)। আমি বাইরের কোন ছবিতে কাজ করিনে। তাই থেকেই বুঝতে পারছেন আর বলতে আমার কিছুই নেই। জমার ঘর শূন্য করে ক্ষতির অঙ্ক বেড়েই চলেছে। পূর্ব্বের কথা বলতে গেলে—আমি ৮বৎসর নিউ থিয়েটার্স-এ স্থায়ী শিল্পী হিসেবে কাজ করেছি। চিত্রজগতে প্রথম জীবন সুরু হয় আমার মাসিক আড়াই শো টাকায়। নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের জন্তে যেদিন বাইরের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হই, সেদিন আমার আয় ছিল আড়াই হাজার টাকা। বাইরের অন্য সব ছবিতে কি পেয়েছি না পেয়েছি সে কথা কি করে বলি। বলতে গেলে আপনি হয়তো এক্ষুনি ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের কাছে ছুটবেন, এই বলেই তিনি হেসে ফেললেন। আমিও না হেসে থাকতে পারলুম না।

টকির টুকিটাকি

শ্রীরমেন চৌধুরী

ত্র্যহস্পর্শ-যোগ

দেখা গেছে সেদিন—স্থান, কাল ও বিষয়বস্তুর! একে মেঘ-মেদুর আ'ষাঢ় তায় ইন্দ্রপুরী তার ওপর 'মনের ময়ূরের' কলাপ-ধারণ। মহাকবির কল্পনায় অপূর্ব বাস্তব রূপ। পরিচালক সুশীল মজুমদার মশাইকে এ যোগাযোগের জন্তে ধন্যবাদ জানাই। কথাটা পরিষ্কার করা যাক—'রাত্রির তপস্যা'-নির্মাতা রম্য ছায়াচিত্রের দ্বিতীয় নিবেদন 'মনের ময়ূরের' রূপায়ণ শুরু হয়েছে গত ৩রা আষাঢ় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োয়। মহিলা সাহিত্যিক প্রতিভা বসুর এই উপন্যাসটির সংগে মাসিক বসুমতী পাঠকগোষ্ঠীর পরিচয় ইতিপূর্বে থাকা হয়ে আছে। সেই কাহিনীটির পরিচালন-ভার নিয়েছেন বিশিষ্ট পরিচালক সুশীল মজুমদার।

য়্যারিষ্টোক্রেসী

'রাধা'র অপেক্ষারত চিত্র-নিবেদন। মুক্তির দিন গুণছে স‌ংগীত-সমৃদ্ধ এই ছবিটি কিছুদিন হোলো। সংগীত পরিচালনা করেছেন সুরশিল্পী রবীন রায়। পরিচালনায় আছেন 'কেরাণীর জীবন' ও 'সাবিত্রী-সত্যবান'-খ্যাত দিলীপ মুখোপাধ্যায়। অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘুণ-ধরা কাঠামোর ওপর রচিত হয়েছে চিত্রনাট্য, তাকে সঞ্জীবিত করেছেন বিভিন্ন রূপশিল্পী—তার মধ্যে অনুভা-জহর-রেণুকা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আবার গ-গণ্শা!

তবে একা নয়—সদলবলে! এক কথায় বলা যায় 'গণশা-বেঁতনা এণ্ড কোং'। একা একা দর্শন দেবে গণশা এমন শ-শম্মাই নয়! 'বরযাত্রী'র full fleet-কে handle করার গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন 'বরযাত্রীর' বর-কর্তা (পরিচালক) সত্যেন বসু।

স্বনাম-ধন্য শব্দযন্ত্রী লোকেন বসু

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিয়োর বর্তমান কর্ণধার! এতাবৎ ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের ছবি তুলেই সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, এবার চিত্র প্রযোজনায় আত্ম-নিয়োগ করবেন। দেরিতে হলেও এ পরিকল্পনা প্রশংসার দাবী রাখে।

বিন্দুর ছেলে

ইদানিংকার বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত প্রচেষ্টা! বাঙলা ছবির আয়, কাজেই আয়ু শোচনীয় ভাবে হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু মধ্যে মাঝে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মতো দু'-একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। 'বিন্দুর ছেলে' সেই ব্যতিক্রমের অন্যতম।

সমাপ্তি-মুখে

শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'। পরিচালনা করছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। এই আর একটি কাহিনী যার আবেদন বাঙলার নর-নারীর মনে রয়েছে অপরিসীম। কিছুদিন আগে রঙমহলের ভাঙা হাট জাঁকিয়ে তুলেছিল স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে। পরিবেশক নারায়ণ পিকচার্স ছবিটি সর্বাংগ সুন্দর করবার জন্য বদ্ধপরিকর।

মুক্তি টেকনিক সোসাইটির

'ষোড়শী'র ষোড়শোপচারে প্রস্তুতি চলেছে। 'নিষ্কৃতি'র কাজ শেষ করে পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এখানিতে হাত দেবেন। স্মরণীয় বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম গৌরব-মিনার 'ষোড়শী' নব রূপে আবির্ভূতা হয়ে অতীতের ত্রুটি সংশোধন করে নিক। জীবানন্দ ও ষোড়শীর চরিত্রে উপযুক্ত রূপশিল্পী নিয়োগের প্রচেষ্টা সর্ব বাধা-বিঘ্ন জয় করুক!

এক আধ টাকা নয়

একেবারে লাখ টাকা! মজা এমনি একটি কম হয়ে গেলে আর লাখ হয় না! অবিশ্যি লাক (Luck) ফেভার না করলে একটি কপর্দকেরও দেখা মেলে না। যাই হোক, 'লাখ টাকা' চিত্রায়িত হয়ে এসেছে পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর নেতৃত্বে।

টাটা এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

হাইকার্বন ইস্পাতের তৈরী টাটা এগ্রিকো যন্ত্রপাতি যেমন মজবুত, তেমনি টেকসই। শাণ-দেওয়া ধারাল মুখ থাকায় মাটীকাটার কাজ খুব ভালোভাবে করা যায়। সকল দিক দিয়ে পরখ ক'রে দেখা যায়, ক্রয় করার মতো এগ্রিকোর চেয়ে সেরা জিনিস আর নেই।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোদাল

সব রকম জমির পক্ষেই

কো

সেরা হাতিয়ার

টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড

সেল্‌স অফিস:
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

শাখাসমূহ:
বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, আমেদাবাদ, সেকেন্দরাবাদ, বিজয়নগরম্‌ ক্যাণ্ট, জলন্ধর ক্যাণ্ট ও কানপুর

বোম্বাই কোদাল

এগ্রি কোদাল

AG 3360
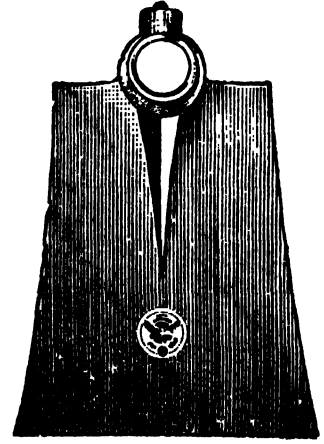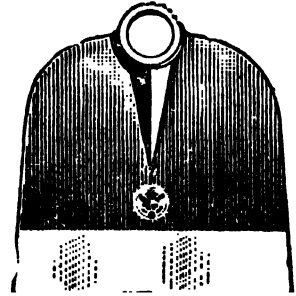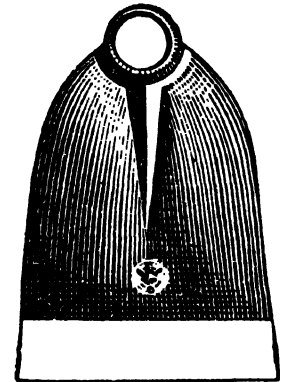
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সরকারী জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিবাদে মাসিক বসুমতীর এই সংখ্যায় "সাময়িক প্রসঙ্গ" প্রকাশে বিরত থাকিলাম।

—সম্পাদক মাসিক বসুমতী

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২টি দুষ্প্রাপ্য মুঘল চিত্র

…বিহারী মল্লিকের সৌজন্যে

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড
চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ
১৩৬০

৩২শ
বর্ষ

(স্থাপিত ১৩২৯)

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায়। যখন উপাধি সব চলে যায়,—বিচার বন্ধ হয়ে যায়,—তখন দর্শন। তখন মানুষ অবাক্ সমাধিস্থ হয়। থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে,—এ গল্প সে গল্প। যাই পর্দা উঠে যায় সব গল্প-টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে, তাহাতেই মগ্ন হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। 'নেতি' 'নেতি' করে বিচারের শেষ হলে ব্রহ্মজ্ঞান।—তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে ছাদও যে জিনিষে—ইট চূণ সুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ছোক্‌রাদের ভিতর এখনও কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই; তাইত ওদের এত ভালবাসি। হাজরা বলে, 'ধনীর ছেলে দেখে,—সুন্দর ছেলে দেখে,—তুমি ভালবাস'! তা যদি হয়, হরীশ, নোটো, নরেন্দ্র,—এদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রর ভাত নুন দে খাবার পয়সা জোটে না!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে ভাল জল হয়—সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন। ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নেই। তুমি এক রূপে ছেলে হয়েছ। এক রূপে তুমি বিষয়ী, আফিসের কাজ করছো, সংসারে ভোগ করছো;—আর এক রূপে তুমিই ভক্ত হয়েছ—তোমার সন্তান রূপে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। অহঙ্কার যাওয়া বড় শক্ত। অশ্বত্থ গাছ এই কেটে দিলে আবার তার পরদিন ফেকড়ী বেরিয়েছে। যতক্ষণ তার শিকড় আছে ততক্ষণ আবার হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। মহামায়ার মায়া যে কি তা একদিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো। আর জগতকে ঢেকে ফেল্‌তে লাগলো! আবার দেখালে,—যেন মস্ত দীঘি, পানায় ঢাকা। হাওয়াতে পানা একটু সরে গেল,—অমনি জল দেখা গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে চার দিককার পানা নাচতে নাচতে এসে, আবার ঢেকে ফেললে। দেখালে, ঐ জল যেন সচ্চিদানন্দ, আর পানা যেন মায়া। মায়ার দরুণ সচ্চিদানন্দকে দেখা যায় না,—যদিও এক-একবার চকিতের ন্যায় দেখা যায়, তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো

'আত্মজীবনী লেখা মানে কতগুলো মিছে কথার জাল বোনা।' বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'শুধু লোকের কাছে দেখাবার চেষ্টা আমি খুব বাহাদুর— আমার খাওয়া, শোওয়া, ঘুম, স্বপ্ন, চিন্তা সব অসাধারণ। দোষগুলি ঢাকা দিয়ে আমি মস্ত একজন ভগবানের স্পেশ্যাল-মার্কার তৈরি—এই তো বলতে হবে। দম্ভের এর চেয়ে আর কিছু প্রকাশ হতে পারে না। শুধু পালিশ করে নিজেকে দেখানো, আমি কত মহৎ, কত উদার, কত প্রতিভাশালী। আত্মজীবনী মানে নিজের ওকালতি করা।'

'কেউ কেউ তো আত্মজীবনীতে নিজের দুষ্প্রবৃত্তির কথাও বলে থাকেন।' বললেন একজন।

'তাও নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করবার জন্য।'

আমার অহঙ্কার ভেঙে ফেল, ধুলো করে দাও। একটি ফুৎকারে উড়িয়ে দাও মৃতপত্রের জঞ্জাল, আবার একটি ফুৎকারে বাজিয়ে তোলো স্তম্ভিত সমুদ্রের শঙ্খ। নিজের পুচ্ছের আলোতে জোনাকির মত আত্মসংসার আলোকিত দেখছি, সে সীমার বাইরে আর সবই অস্বীকৃত—এবার দেখাও তোমার স্পর্শপ্রগাঢ় অন্ধকার। যেখানে বিচ্ছিত্তি নেই, বিবিক্ততা নেই, শুধু অনন্ত অন্তর্ব্যাপ্তি। তুমি যদি পুত্রের থেকে প্রিয়, বিত্তের থেকে প্রিয়, অন্যতর সমস্ত কিছুর থেকে প্রিয় তবে সুখসাধনদ্রব্যে কেন সমাসক্ত রেখেছ? ভেঙে দাও এই মধুপাত্র। ভোগ তো একরকম মনোবিকার। ভেঙে দাও এই মত্ততার স্বপ্ন। কাটিয়ে দাও এই রোগরাত্রি। অহং থেকে আত্মাতে নিয়ে চলো।

'আহা, বসেছেন দেখ না!' বললেন ঠাকুর, 'যেন গোঁফে চাড়া দিয়ে সাইনবোর্ড মেরে বসেছেন!'

কিন্তু গোঁফের তেজ কত দিন! কত দিনই বা সাইনবোর্ডের চাকচিক্য।

একজন এলে আরেকজন যায়। আরেকজন এলে সে-একজন থাকে না। তাদের চিরকালের ঝগড়া। কিছুতেই তারা থাকতে পারে না একসঙ্গে। একজনের প্রকাশে আরেকজনের পলায়ন।

তারা হচ্ছে 'আমি' আর 'তিনি'। অহং আর আত্মা। হয় আমি থাকি নয় তুমি থাকো। আর, তুমি যদি আসো আমি কোথায়!

'পাছে অহঙ্কার হয় ব'লে গৌরীচরণ 'আমি' বলত না—বলত 'ইনি'। আমিও তার দেখাদেখি 'ইনি' বলতাম। আমি খেয়েছি না বলে বলতাম ইনি খেয়েছেন। সেজবাবু তাই দেখে একদিন বললে, সে কি কথা, তুমি কেন ওসব বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার তো আর অহঙ্কার নেই।'

না, আমারও বুঝি অহঙ্কার হত মাঝে-মাঝে!

পূর্বকথা, বেলতলায় তন্ত্রের সাধনার কথা বলতে গিয়ে বললেন ঠাকুর, 'যেদিনই অহঙ্কার করতুম তার পরদিনই অসুখ হত।'

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির সেই মেথরানির কথা মনে নেই? তার যে কি অহঙ্কার! গায়ে দু-এক খানা গয়না ছিল। যে পথ দিয়ে আসে গয়নার ঝলস দিয়ে বলে, এই, সরে যা! তার মানে, এই দেখে যা! মেথরানিরই এই, তা অন্য লোকের কথা আর কি বলবো!

একমাত্র নিরহঙ্কার যুধিষ্ঠির। পাঁচ ভাই চলেছে মহাপ্রস্থানে। সর্বপ্রথম পড়ল সহদেব। ভীম জিগগেস করল, সহদেবের পতনের কারণ কি? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করত তার মত প্রাজ্ঞ আর কেউ নেই—সেই অহঙ্কারে। তার পরে পড়ল নকুল। নকুল পড়ল কেন? নকুল ভাবত তার মত রূপবান আর কেউ নেই—সেই অহঙ্কারে। তার পরে অর্জ্জুন। অর্জ্জুন ভাবত, আমিই সর্বাগ্রগণ্য ধনুর্দ্ধর—

সেই অভিমানে। তার পরে ভীম। আমি কেন পড়লুম? তুমি অতিরিক্ত ভোজন করতে, অন্যের শক্তি উপেক্ষা করে নিজের শক্তির শ্লাঘা করতে, সেই দর্পে। সশরীরে স্বর্গে এলেন শুধু যুধিষ্ঠির।

তোমার দম্ভ নয় তোমার দয়া!

নদীতীরে বসে তপস্বী সন্ধ্যা করছিলেন, এক নিরাশ্রয় বৃশ্চিক ভাসতে-ভাসতে সেখানে এসে উপস্থিত। স্থলে আশ্রয় দেবার জন্যে জল থেকে তাকে তুললেন তপস্বী। তুলতে-না-তুলতেই বৃশ্চিক তাঁকে দংশন করল। বিষজ্বালায় অস্থির হয়ে জলে তখুনি তাকে ছুঁড়ে ফেললেন। জলে পড়ে বিপন্ন বৃশ্চিক আবার হাবুডুবু খেতে লাগল। দেখে আবার দয়া হল তাপসের। আবার তাকে তুললেন হাতে করে। আবার দংশন। আবার নিক্ষেপ। পরে ভাবলেন, বৃশ্চিক তার নিজের ধর্ম বারে-বারে পালন করছে বারে-বারে দংশন করে, কিন্তু আমি কেন ধর্মভ্রষ্ট হচ্ছি? আমার সর্বজীবে দয়া। আমি কেন তাকে জলে ছুঁড়ে ফেলছি? আমার চেয়ে বৃশ্চিক বেশি স্বধর্মাশ্রিত। এই ভেবে আবার তাকে তুললেন জল থেকে। দংশন করলেও এবার আর ফেললেন না। স্থলেই স্থান করে দিলেন।

বার-বার ঘষলেও চন্দন চারুগন্ধ। বার-বার ছিন্ন করলেও ইক্ষুকাণ্ড মধুস্বাদু। বার-বার দগ্ধ করলেও কাঞ্চন কান্তবর্ণ। তেমনি যারা সজ্জন তারা প্রকৃতিবিকৃতিশূন্য।

তোমার ক্ষোভ নয়, তোমার ক্ষমা।

তুমি অতৃণ মাঠ। সেখানে আগুন পড়লেও বা কি। আগুন মাটির স্পর্শে আপনিই শান্ত হয়ে যায়। তপ্ত লৌহকে ছেদন করবার জন্যে তোমার হাতে শীতল লৌহ। ধূলির ধরণীতে তুমিই ধারাধর।

তুমি পিঁপড়েটির পর্যন্ত নিন্দা করো না। বরং তার পায়ের নূপুরগুঞ্জনটি শোনো।

'নগণ্য পিঁপড়ের পর্যন্ত নিন্দে কোরো না।'

এ সংসারে সুখ দুর্লভ, সুখই আবার সুলভ। তাই কেউ যদি আমার নিন্দা করে প্রীতিলাভ করে, সমক্ষেই হোক বা অসাক্ষাতেই হোক, করুক, আনন্দ পাক। নিন্দা করার অধিকার দিয়েই তাকে আমি অভিনন্দিত করছি।

ভববল্লী কি? তৃষ্ণা। দারিদ্র্য কি? অসন্তোষ। দান কি? অনাকাঙ্ক্ষা। ভোগ্য কি? সহজ সুখ। ত্যাজ্য কি? অহঙ্কার।

নিজের অন্তরঙ্গদের দেখবার জন্যে ব্যাকুল তখন ঠাকুর। রাতে ঘুম নেই। কালীমন্দিরে বসে-বসে কাঁদেন। বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও। মা গো, ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে তা হলে আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। আমি দেখে আসি।'

থেকে-থেকে তাই ছুটে আসেন বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানেই প্রেমের হাট বসিয়েছেন। বলেন, 'জগন্নাথের সেবা আছে বলরামের। খুব শুদ্ধ অন্ন।' এসেই বলরামকে বলেন, 'যাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এস। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে তোমার ভালো বই মন্দ হবে না।'

বলরাম আবার একটু হাত-টান।

ঠাকুরকে একদিন গাড়ি করে দিয়েছে দক্ষিণেশ্বর যাবে। ভাড়া ঠিক ক'রেছে বারো আনা। সে কি কথা! বারো আনায় দক্ষিণেশ্বর? 'তা ও অমন হয়।' ঘাড় নেড়ে দিয়ে চলে গেল বলরাম। শেষকালে কেলেঙ্কার। রাস্তার মাঝেই গাড়ি পড়ল ভেঙে। ঘোড়া আর যেতে চায় না। চাবুক চালালো গাড়োয়ান। তখন সেই ভাঙা গাড়ি নিয়েই দে-দৌড়। পড়ি কি মরি ঠিক নেই।

যখনই দেখবে বন্দোবস্তটা একটু শিথিল বা কৃপণ, তখনই ঠাকুরের ভাষায় 'বলরামের বন্দোবস্ত'। গাড়ি না করে ঠাকুর যদি নৌকোয় আসেন তবেই যেন বলরাম বেশি খুশি।

কড়া-গণ্ডা উশুল করে নেওয়ার পক্ষপাতী। তাই বললেন একদিন ঠাকুর, 'যখন খাট দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আজ বিকেলে নাচিয়ে নেবে।'

কীর্তনের সময় ঠাকুর যখন নাচেন তখন বলরাম খোল বাজায়। সে আবার আরেক যন্ত্রণা। বলরামের তালবোধ নেই। তার ভাবখানা হচ্ছে এই, আপনারা গাও নাচো আনন্দ করো, আর আমি যেমন-তেমন খোলে চাঁটি মারি।

হাজরা ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার খালি বড়লোকের ছেলের দিকে টান।'

'তাই যদি হবে তবে হরীশ, নোটো, নরেন্দ্র—

এদের ভালোবাসি কেন? ভাত নুন দে খাবার পয়সা জোটে না নরেন্দ্রর।'

বলরাম জিগগেস করল, 'সংসারে পূর্ণজ্ঞান হয় কি করে?'

'শুধু সেবা করে। মায়ের সেবা করে। জগতের মা-ই সংসারের মা হয়ে এসেছেন।' বললেন ঠাকুর। 'যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে ততক্ষণ মার খবর নিতে হবে। তাই হাজরারে বলি, নিজের কাশি হলে মিছরি-মরিচ করতে হয়। যতক্ষণ এ সব করতে হয় মার খবরও নিতে হয়। তবে যখন নিজের শরীরের খবর নিতে পাচ্ছি না, তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।'

ঠাকুর ও ভক্তদের খাওয়াবার নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে বলরাম। বারান্দায় বসে গিয়েছে সার বেঁধে। দাসের মতন দাঁড়িয়ে আছে বলরাম, প্রভুর মত নয়। তাকে দেখলে কে বলবে সে এ বাড়ির কর্তা।

একদিন ভাবদৃষ্টিতে বলরামকে দেখলেন ঠাকুর। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত দেখলেন চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তনের দল চলেছে। তার পুরোভাগে বলরাম। কিরূপ ভক্ত এখানে আসবে আগে থেকে তা দেখিয়ে দেয় মহামায়া। বলরাম না এলে চলবে কেন? নইলে মুড়ি-মিছরি সব দেবে কে?

প্রথম যেদিন দেখলেন দক্ষিণেশ্বরে, বললেন, 'ওগো মা বলেছেন তুমি যে আপনার জন। তুমি যে মার একজন রসদদার। তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে—কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।'

তাই দেয় বলরাম। চাল-ডাল চিনি-মিছরি আটা-সুজি সাগু-বার্লি।

বলেন ঠাকুর, 'ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি। মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।'

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির নাম রেখেছেন 'মা কালীর কেল্লা'—প্রথম কেল্লা। দ্বিতীয় কেল্লা হচ্ছে বলরামের বাড়ি। ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রিট।

সেই বাড়িতেই ঠাকুরের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের দ্বিতীয় দেখা।

প্রথম দেখা এটর্নি দীননাথ বোসের বাড়িতে। বোসপাড়া লেনে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পড়ে প্রথম জানতে পায় পরমহংসদেবের কথা। এ আবার কেমন পরমহংস! ব্রাহ্মরা বেশ ভোল বদলাচ্ছে যা হোক। হরি ধরেছে, মা ধরেছে, এবার মনের মত এক পরমহংসও খাড়া করেছে দেখছি। ভেলকি ধরেছে মন্দ নয়। এমনি করে লোক বাগাবার মতলব। যাই একবার দেখে আসি গে।

বেজায় ভিড় হয়েছে। ঠাকুরকে ঘিরে বহু ভক্তের সমাগম। ঐ বুঝি কেশব সেন। ঘন-ঘন সমাধিস্থ হচ্ছেন ঠাকুর আবার সমাধিভঙ্গের পর উপদেশ দিচ্ছেন। যারা শুনছে তারা যেন কর্ণ দিয়ে সুধা পান করছে।

সন্ধে হয়েছে। সেজ জ্বেলে রেখে গেল ঠাকুরের সামনে।

ঠাকুরের তখনো অর্ধবাহ্যদশা। বললেন, 'সন্ধে হয়েছে?'

ঢং! গিরিশের মন তেতে উঠল। দিব্যি সেজ জ্বলছে সামনে, আর, বলছে কিনা, সন্ধে হয়েছে? সন্ধে না হলে আলো কেন?

সন্ধে হয়েছে? আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হ্যাঁ, হয়েছে। কে একজন বলে উঠল।

কেউ একজন না বলে দিলে যেন সন্ধে হয়েছে কিনা বোঝা যাবে না! চোখের সমুখে আলো জ্বেলে দিলেও না!

বুজরুকি আর কাকে বলে! বিরক্তিতে সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল গিরিশের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরলে জিগগেস করলে পিসেমশাই, সদরালা গোপীনাথ বোস 'কেমন দেখলে হে?'

একবাক্যে নস্যাৎ করল গিরিশ। 'বুজরুকি।'

[ক্রমশঃ।

আমিই ঠিক নাই

"ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, সরসতা আসিয়া উপস্থিত হইল, শুষ্ক মরুভূমি ফলফুলে পরিণত হইল। কর্ম্মক্ষেত্রে গেলাম, কর্ম্মের আড়ম্বরে ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেলাম, হৃদয় শূন্য হইল, প্রাতঃকাল মধ্যাহ্নকাল সায়ংকালের উপাসনা শূন্য ভাব ধারণ করিল। সেই ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমপূর্ণ সত্তা যেমন তেমনি রহিল, যাহা কিছু পরিবর্ত্তন তাহা আমাতেই হইল। চাঞ্চল্য কোথায়? আমার বিশ্বাসে, আমার মনে? আমি প্রকৃত মনে প্রকৃত বিশ্বাসে উপাসনা করিতে বসিলাম, পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। আবার যখন কল্পনাকে লইয়া উপাসনা করিতে গেলাম, পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া উপাসনা করিতেছি, কোথায় আমি, কোথায় ঈশ্বর! এস্থলে ঈশ্বর আপনি ঠিক পূর্ব্বের মত আছেন কেবল আমিই ঠিক নাই।"

—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বিতীয় প্রবাহ

অষ্টম তরঙ্গ

আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

তরুণেরা সেদিন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রৌঢ় বয়স উত্তীর্ণ হইয়া আজিও ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন যে, 'শনিবারের চিঠি'র অভিযান ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। কথাটা ঠিক নয়। আমাদের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছিল ভাণের বিরুদ্ধে, ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কণী-লেহনের বিরুদ্ধে। "সাহিত্যের আদর্শ" সম্বন্ধে আমরা সূত্রপাতেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলাম :

> সাহিত্যের যদি কোনও নীতি থাকে—তাহা প্রেম, সৌন্দর্য্য ও মানবের নীতি। এই নীতি শাস্ত্রগত নয়, ইহা জ্ঞানবান ও হৃদয়বান মানুষের অন্তরনিহিত নীতি, ইহা লোকব্যবহারঘটিত সংস্কার নহে। সাহিত্যও একটি অপূর্ব্ব জ্ঞানযোগ। ইহা মানুষের সমগ্র জীবনের প্রতিবিম্ব—পূর্ণদৃষ্টির সহায়। **সাহিত্য অশ্লীল হইতে পারে না।** যেখানে এই অশ্লীলতার বাধা রসাস্বাদে সত্যকার বাধা হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে কবির Inspiration বা দিব্যানুভূতিই মিথ্যা—তাহা যোগ নাই, সেখানে তাঁহার ভাবদৃষ্টি অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ।...সাহিত্যই আধুনিক মানবের জীবন-বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখিল মানবহৃদয়ের অসীম আকুতি, মানব-চরিত্রের অপার রহস্য, মন্থিত জীবনসিন্ধুর সুধা ও ফেন-গরল—এ সকলই সাহিত্যের অধিকারভুক্ত। এখন কবির সাধনার অবধি নাই। **জীবনের কিছুকেই তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন না।** তাঁহাকে সেই প্রেমিক হইতে হইবে, যাহার চক্ষে—"সকল সলিল তীর্থ-সলিল, জীবের আনন চন্দ্রানন।"... কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মানুষের স্বরূপ ও বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিবার অজুহাতে তার জীব-জীবনের মসীপঙ্ক উদ্ধার করিয়া এক নূতন আদর্শ সৃষ্টির উদ্যম চলিতেছে।...যাহা কিছু সুন্দর তাহারই প্রতি ইহাদের আক্রোশ।...মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান যদি দুর্নীতি হয়,—ভগ্নজানু, বক্রমেরুদণ্ড, বিকলচক্ষু প্রভৃতি যদি শক্তিমত্তার লক্ষণ হয়, তবে শাস্ত্র ও সমাজনীতি বহুগুণে শ্রেয়; সাহিত্যের মুক্তবায়ু অপেক্ষা কারাগৃহের রুদ্ধশ্বাস অধিকতর স্বাস্থ্যকর। যাহাকে বাঁধিয়া রাখা উচিত তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নাই। যে ফুল ফুটাইতে পারে না সে গাছ ছিঁড়িয়া বাগান উৎসন্ন করে; যে গান করিতে পারে না, সে বাদ্যযন্ত্র আছড়াইয়া কোলাহল করে—কেহ বা ধুননযন্ত্র বাজাইয়া তুলা উড়াইতে থাকে। সত্য সুন্দরকে চিনিবার শক্তি যাহার নাই, সে ভানমতীর ভেল্কী দেখাইয়া রাস্তায় লোক জড় করে...
>
> —সত্যসুন্দর দাস: 'শনিবারের চিঠি' আশ্বিন, ১৩৩৪

মোহিতলালের এই অকপট উক্তি যে সেদিনকার চিন্তাশীল বাঙালীকে 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত ও আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার প্রমাণ—বৎসর শেষ না হইতেই আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম (শ্রীরাজশেখর বসু), শ্রীসুশীলকুমার দে প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকেরা মাসিকের রঙ্গমঞ্চে পুনরায় অবতরণ করিলেন; রবীন্দ্রনাথ মৈত্র নূতন করিয়া "বাস্তবিকা"র আসর খুলিয়া বসিলেন এবং শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রথমে লেখক ও পরে সম্পাদকরূপে ইহাতে যোগ দিলেন। আর একজন লেখক আমরা পাইলাম, তিনি শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত পাঠক" এই বেনামীতে তিনি "সাহিত-বিকারের প্রতিকার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন যাহা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিক সমাজকে এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিল। এমন সার্থক তীব্র ব্যঙ্গ যাঁহার হাতে বাহির হইয়াছিল তিনি অনুরূপ আর কিছু লিখিলেন না, ইহা আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে। আর দুইজন অতি শক্তিমান লেখককে আমি আকর্ষণ করিলাম—একজন, ইঞ্জিনীয়ার কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং অন্যজন, ডাক্তার লেখক শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বাংলা-কাব্যসাহিত্যের উপর তখন যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা'র অত্যন্ত প্রভাব। তরুণেরা এমন কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যতীন্দ্রনাথের "চেরাপুঞ্জীর থেকে একখানি মেঘ ধ'রে দিতে পার গোবি সাহারার বুকে"—এই দুই পংক্তি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-সম্পদ অপেক্ষাও মূল্যবান। যতীন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁহারা 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'কালি-কলমে' এন্তার কবিতা লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার সংযত সহজাত বাক্‌ভঙ্গি স্বভাবতই তাঁহাদের ছিল না, তাঁহারা অনুপ্রাসের বাহুল্য দিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। এই অক্ষম সৃষ্টিগুলিকে ব্যঙ্গ করিয়া আমি আশ্বিনে ঠিক অনুরূপ ঢঙে দুইটি কবিতা লিখিলাম। এক "ফাটা ফুস্‌ফুসে আমি আর হুতো চোপসান-কাশি কাশি।" উদ্ধৃত করিলে ঢংটা বুঝা

সহজ হইবে, শুধু ঢং নয়—তৎকালীন তারুণ্যের অন্য পরিচয়ও মিলিবে :—

ও পাড়ার ওই পটলির মুখে পাণ্ডু-পাটল হাসি,
ফাটা ফুস্ফুসে আমি আর তুলো চোপসান-কাশি কাশি ;
সে কাশির পিছে পিছে
কোটি কামিনীর কত না কাতর কামনা নিশ্বসিছে !
বিবস দিবসে অলস বাসনা অবশ বসুন্ধরা,
তাতল তটিনীতটে তেঁতুলেতে পটলি পরিছে গড়া ;
নিদয় নিঠুর নিদাঘ রৌদ্র মখের মত তিতা—
মিতালি করিছে মাতাল বাতাস, শ্মশানে জ্বলিছে চিতা !
মোরা সে ঘাটের কূলে—
ক্যাওড়া ভাবিয়া শ্যাওড়ার ঝাড়ে আড়ি পেতেছিনু ভুলে।
গুঁতো দিল খুঁতো ঝিঁকা ছুতো ক'রে জুতো ভেদি ফুটে কাঁটা,
চমকি' চাহিনু, পটলির পিসী পিছনে তুলেছে ঝাঁটা।
ভয়েতে দিলাম দড়—
কামিনীকুসুমে এত কালকূট, কাংস্য কণ্ঠস্বর !
ঘরে এসে ভয়ে বাক্ নাহি সরে, মাথা ঢাকি কাঁথা দিয়া,
প্রেয়সীর সাথে নয়, বুঝি হয় মৃত্যুর সাথে বিয়া !
উসুখুসু করে মন—
মিশিমুখো পিসী কবে ম'রে যাবে, ঘাট হবে নিরঞ্জন !

দুই নম্বর কবিতা "কাব্যসৃষ্টি হয় শুধু ভাই বেদনার কালিদহে" লিখিলাম—

দল বেঁধে সবে মামুলী ছন্দ করিয়াছ একচেটে,
কাব্যসৃষ্টি হয় নাকো ভাই এঁটো কলাপাত চেটে।...
বুকের রক্ত উজাড় করিয়া যে রচিল 'মরীচিকা'
বেড়াল-ভাগ্যে সহসা তাহার ছেঁড়ে নি কাব্য-শিকা !
কথার উপরে কথা গেঁথে শুধু রচে নি অনুপ্রাস—
প্রতি পংক্তিতে জমাট বেঁধেছে বুকের দীর্ঘশ্বাস !
কেবল ছন্দ নয়—
বিশ্বের সাথে 'হাতুড়ে' কবির সুনিবিড় পরিচয়।
তোমরা করিছ কাব্যসৃষ্টি বাক্য উলটি দিয়া,
বিরোধী কথায় অনুপ্রাসের ছিটা মাঝে মাঝে দিয়া—
কাব্য সে নহে নহে—
কাব্যসৃষ্টি হয় শুধু ভাই বেদনার কালিদহে।
উপমার সাথে চাই নিরুপমা ভারতীর কৃপাকণা—
উদ্ভট কথা নহে শুধু, চাই অপরূপ কল্পনা !...

আমার আবেদন তরুণদের নিকট পৌঁছিল কিনা জানা গেল না, কিন্তু স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন। "তরুণের লজ্জা" উদ্রেকের জন্য তিনি পৌষে 'শনিবারের চিঠি'র আসরে অবতীর্ণ হইলেন। সেই হইতে আজ পর্যন্ত পুরা ছাব্বিশ বৎসর কাল তিনি লেখক, সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে 'শনিবারের চিঠি'র সহিত যুক্ত আছেন, তাঁহার প্রথম আবির্ভাবকে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি। নিষ্ফল তারুণ্যের অশোভন দম্ভ ও নির্লজ্জ বাহ্বাস্ফোটে সেদিন বাংলার সাহিত্যমণ্ডপ কি ভাবে আবিল ও কলুষিত হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিচয় যতীন্দ্রনাথের "তরুণের লজ্জা"য় আছে। সে রচনা আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, আমি এখানে সেটি অংশত উদ্‌ধৃত করিয়া আমার 'স্মৃতি-কথা'কেই সমৃদ্ধ করিতেছি :

আরও লজ্জার কথা হ'ল এই,—ঠিক যে যুগে বাংলার তরুণের ললাট কলঙ্কমসীলিপ্ত, আধুনিক ইতিহাসের যে সময়টিতে বাংলার তরুণের তীব্রতম ব্যর্থতা দিকে দিকে অঙ্কিত, ঠিক সেই সময় তরুণের এই জয়ঢক্কা বাজান হচ্চে। আজ বাংলার তরুণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করে,—জীবনের ক্ষেত্রে তার নূতন নূতন পথ কেটে বার হবার সাধনা নানা দিকে ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই সে একমাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে কালি-কলমের সাহায্যে তার তরুণত্ব সপ্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে। চীনের তরুণ, তুরস্কের তরুণ, জীবনযাত্রায় তাদের পিছিয়ে ফেলে জয়োল্লাস করতে করতে অনেক দূর এগিয়ে গেল! তরুণ কবি নজরুলের তরুণত্ব যে আজ নবীন তুরস্কের অভিযান-গীতি সম্পর্কে মৌন হ'য়ে প্রবীণ পারস্যের মৌন-গজলে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল, এর জন্য বাংলার সমস্ত তরুণ দায়ী। কর্ম্মের সংগ্রামে তরুণ চারদিক থেকে হটে এসেছে ; সেই বিফলতার ছায়া আজকের সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে যে নূতনত্ব প্রকাশ করচে, তাকে একটি অসামান্য সাফল্যের অগ্রদূত ব'লে নিঃসঙ্কোচে প্রচার করা মর্মান্তিক পরিহাস।...হায় বাংলার তরুণ! তোমারই মুখের পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত স্বদেশী প্রতিজ্ঞা বিদেশী সিগারেটের ধূমে কুণ্ডলায়িত হ'য়ে পশ্চিম আকাশে ফুল ফোটাচ্চে! যে জীবনের সাধনায় বিফল, সে সাহিত্যে আশাতীত সফলতা লাভ করচে, এ কি সত্য হ'তে পারে? ঋজু কঠিন মেরুদণ্ড কোনো দেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে জীবনের নব নব তরুণ অনুভূতি ও বিচিত্র প্রকাশকে ত বাধা দেয় নি। কিন্তু তোমার ভাষা পর্য্যন্ত যে ক্রমে ভাঙ্গা শিরদাঁড়ার কুচো হাড়ের মত এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ছে, সে কি শুধুই ভাবের আতিশয্যে, না, জীবনের বিফলতায়! আরও আশঙ্কার কথা এই, তোমার সব ত্রুটি তারুণ্যের আড়ালে ঢেকে রাখবার জন্য প্রবীণ বন্ধুর অভাব হবে না। কিন্তু এই বন্ধুত্বও কি একান্তই স্নেহপ্রসূত? প্রবীণে প্রবীণে যে সব মনোমালিন্য বহুদিন থেকে সঞ্চিত হয়েছিল, তোমাকে আশ্রয় ক'রে, সাহিত্যের আদর্শ বিচারের অছিলায়, সেই সব লুকানো অগ্নি তোমারি তোমাদের ইন্ধন পেয়ে আজ দীপ্তিমান হ'য়ে উঠছে না, সে বিষয়ে কি নিঃসন্দেহ হয়েছ?

তরুণ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের আস্ফালন এবং শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্র-রাধাকমলের গায়ে-পড়া ওকালতির লজ্জাকর মর্মকথাটা যতীন্দ্রনাথ যে ভাবে ধরাইয়া দিয়াছিলেন তেমন আর কেহ করেন নাই। ইহার কারণ, তিনি আন্তরিক ভাবে দেশের তরুণদের শুভ-কামী ছিলেন, তাহাদের ব্যর্থতার লজ্জা তাঁহাকে

মর্মান্তিক আঘাত দিয়াছিল, শিখণ্ডীরূপে তরুণদিগকে সম্মুখে রাখিয়া কোনও হীনতর উদ্দেশ্য সাধন—feeding fat some ancient grudge-এর মতলব তাঁহার ছিল না। যে সকল অবাস্তব বিকৃত সামাজিক সমস্যা উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান-চেষ্টার নামে বিকৃত রুচির ব্যাপক প্রচার তথাকথিত অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা কয়েকটি সাময়িকপত্রে করিতেছিলেন, সে সম্বন্ধেও যতীন্দ্রনাথ এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন: "ব্যষ্টিগত জীবনের সমষ্টিই সমাজ। যে সমস্যা সমাজে আজও প্রকট নয় জীবনে তা সত্য না হ'তে পারে; আর সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়ত বিলেতের আমদানী বায়োস্কোপের মতই অসার্থক। সমাজ ও রুচিকে আঘাত দিলেও সাহিত্য হ'তে পারে—এ কথা সত্য; কিন্তু তাদের আঘাত দিলেই সাহিত্য হয় না—এ কথা ততোধিক সত্য।"

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম. বি. তখন 'বঙ্গবাণী'র আসরে খ্যাতিমান। তাঁহার সামাজিক নাটক 'একাল', উপন্যাস 'যোগভ্রষ্ট', 'দশচক্র', গল্প "সিরাজীর পেয়ালা" বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতেছে। ১৩৩৩ হইতে ১৩৩৪এর মাঘ মাসের মধ্যেই তাঁহার গল্প-উপন্যাস-প্রতিভা তাঁহার প্রাচীনতর কীর্তি 'বেপরোয়া'কে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাঁহার কবিতা ও কার্টুন-ছবি সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' জলধরদাদা সার্টিফিকেট দিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'র রচনাভঙ্গি ও ব্যঙ্গপ্রিয়তা এই গুণী ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিল, আকর্ষণের বিশেষ কারণ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমার অভিযান। বাংলা দেশের ব্যর্থ তারুণ্যের দম্ভকে তিনি বরাবরই অত্যন্ত ঘৃণা ও অনুকম্পার সঙ্গে দেখিতেন। 'বেপরোয়া'তেও তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তিনি সুদূর মফস্বল হইতে (সম্ভবত ময়মনসিংহ, সেখানে তখন তিনি সিভিল সার্জন) "আমিও আছি" বলিয়া সাড়া দিলেন। ফাল্গুন সংখ্যার জন্য আসিয়া পৌঁছিল "আধ্যাত্মিক জাতি"র বিরুদ্ধে একটি সচিত্র কবিতা—একটি বমশেল। বলা বাহুল্য, চিত্রগুলি তাঁহারই অঙ্কিত। ঠিক তাঁহার জাতের কার্টুনিষ্ট আর এদেশে হয় নাই। লেখা এবং ছবি, এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্, অদ্ভুত সামঞ্জস্য। অত্যদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার। তিনি উল্টা চাপ দিয়া শুরু করিলেন, বৈজ্ঞানিক তারুণ্যের স্বপক্ষে আমাদের পচা প্রাচীনতার বিরুদ্ধে—

> জেনেছি আত্মা অবিনশ্বর, জেনেছি মিথ্যা দুনিয়া।—
> তাই আমাদের নাহি ভয় কানা-কৌড়ি;
> তাই পথ চলি দিনক্ষণ বেছে, খনার বচন শুনিয়া,
> সাহেব এড়াই সেলাম করি' বা দৌড়ি';
> কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি!
> ইহকালে যারা মজা লুটিবার লুটে নিক্,—
> আমরা রহিনু পরকালে হাত পাতি।

এই কালাপাহাড়ী সুরটাও 'শনিবারের চিঠি'র নিজস্ব, পূর্বাপর বজায় আছে। বনবিহারীবাবু আসিয়া এই দিকটাতে বিশেষ জোর দিলেন। আসর আরও জমিয়া উঠিল। পরশুরাম—রাজশেখরের সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক গিরীন্দ্রশেখর আসিলেন "রুচিসংসদের ডায়ারী" লইয়া, সঙ্গে চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন। পরশুরামের "সাহিত্য-সংস্কার" "তামাক ও বড়-তামাক" প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ রচনা 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। গিরীন্দ্রশেখরের "ঝরা শেফালির মতো"—(মাঘ, ১৩৩৪) সম্ভবত বাংলা-কথাসাহিত্যে তাঁহার একমাত্র "অবদান"—তাহাও পুনঃপ্রকাশিত হয় নাই।

ফাল্গুন সংখ্যায় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবর গোপাল হালদার 'শনিবারের চিঠি'র মণ্ডল-ভুক্ত হইলেন, "শেষ মহাসঙ্গীতি" দিয়া তাঁহার আরম্ভ। তিনি আমার পূর্বতন ঘনিষ্ঠ বন্ধু (অগিলভি হষ্টেলের) হিসাবেই শুধু নয়, একেবারে নিজগুণে অর্থাৎ ইংরেজী লেখার জোরে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'ওয়েলফেয়ারে'র সহিত যুক্ত হইলেন। পরে 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ'-য়েও প্রবেশ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল, প্রায় কুড়ি বৎসর 'শনিবারের চিঠি'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁহার কথা যথাসময়ে বলিব।

বৎসরের শেষে অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে পরবর্তী কালে 'শনিবারের চিঠি'র চারি স্তম্ভের অন্যতম 'বনফুল'—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শুভাগমন ঘটিল। আমি যখন ইস্কুলে পড়ি এবং জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া 'প্রবাসী'র গ্রাহক হইয়াছি, 'বনফুল' তখনই 'প্রবাসী'র লেখক-শ্রেণী-ভুক্ত। ছোট ছোট কবিতা লেখেন, আমার ধারণা ছিল তিনি স্ত্রীলোক, দেখিতে ছোট্টখাট্টটি।

স্বচ্ছন্দ-সরসতা ও সরল বলিষ্ঠতার জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতও ছিলাম। হঠাৎ একদিন 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি স্বশরীরে আবির্ভূত হইলেন, আর সে কি শরীর! বিপুল, বিশাল! গায়ে ঢিলাঢালা খদ্দরের পাঞ্জাবি, আমাদের রবি মৈত্রের মতই অসম্বৃতবাস। পরিচয় শুনিয়া তো আমার মনের 'বনফুল' শুকাইয়া মরিয়া গেল! কিন্তু জীবন্ত যে মানুষটি অন্তরে প্রবেশ করিল তাহাকে আর ছাড়িতে পারি নাই। ১৩৩৪ ফাল্গুন মাসে প্রথম দেখার পর অনেক দিন ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, সে পুনরাগমনায় চ।

সর্বাধিক আশ্চর্য এই, ঠিক এই মাসেই 'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী কালের দ্বিতীয় স্তম্ভ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পরিচয় পাইলাম, সরাসরি নয়—একটু তির্যক ভাবে। তিনি 'কল্লোলে'র (ফাল্গুন, ১৩৩৪) আবর্তে "রসকলি"র ছাপ লইয়া আমাকে দর্শন দিলেন। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি', 'ধূপছায়া' পাইলেই লাল-নীল পেন্সিল হাতে বসিয়া যাইতাম "মণি-মুক্তা" ও "সংবাদ-সাহিত্যে"র খোরাকের জন্য। অতিরিক্ত জিদের বশে ইহা বদ্‌অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। তারাশঙ্করের "রসকলি"তেও যে দাগ মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম আমার সে বৎসরের বাঁধানো 'কল্লোল' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, চাঁদমারির ওই দাগমারা পর্যন্ত। গুলি ছুঁড়িতে আরও দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

যাহা হউক, বনফুলের কথা হইতেছিল। আপ্যায়ন, আলাপ ও পরিচয়ের পর জানা গেল, আমরা উভয়েই একই বছরের (১৯১৮) ম্যাট্রিকুলেট এবং উভয়েই বিজ্ঞানের ছাত্র। বনফুল আই-এসসি পাস করিয়া ডাক্তারি লাইন ধরিয়াছিলেন, সবে পাস করিয়া বাহির হইয়াছেন, আমিও বি-এসসি পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজের দরজা-ফেরত। পরস্পর মুখ শোঁকাশুঁকি পর্যন্ত হইয়া রহিল। ডাক্তারকে ধরিলাম, অতি-আধুনিকতা-ব্যাধির ডাক্তারী মতে একটা ব্যবস্থা দিতে। ডাক্তার "আধুনিক গল্প-সাহিত্যে করুণ রস" লিখিয়া দিলেন। চৈত্রের 'শনিবারের চিঠি'তে তাহা বাহির হইল। যতদূর মনে পড়িতেছে, বনবিহারীবাবুই এই যোগাযোগ ঘটাইয়াছিলেন। তিনি শুধু ডাক্তারিতেই বনফুলের গুরু নন, সাহিত্যিক উপদেষ্টাও ছিলেন। "আধুনিক গল্প-সাহিত্যে করুণ রস"ই সম্ভবত বনফুলের রচিত প্রথম প্রবন্ধ। সুতরাং প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক। একটু উদ্ধৃত করিয়া রাখিতেছি:

গল্পে করুণ-রস প্রকাশ করিবার নানাবিধ উপায় আছে। লেখকগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের গল্পকে করুণ করিবার দুইটি সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন—নায়ক কিম্বা নায়িকাকে মৃত্যু-কবলিত করাইয়া, কিম্বা······(ডট্ ডট্) দিয়া শেষ করিয়া। এই নিদারুণ পরিণামে পাঠকগণও মুহ্যমান হইয়া যান। কারণ, পাঠক হইলেও তাঁহারা মানুষ এবং মানুষমাত্রেরই মৃত্যু ব্যাপারটাকে মর্মান্তিক বলিয়া মনে করা একটা সহজ দুর্বলতা। মানব-চরিত্রের এই দুর্বলতার সুবিধা লইয়া লেখকগণ পটাপট্ নায়ক-নায়িকাকে হত্যা করিতে করিতে সাহিত্য-মন্দিরকে "মর্গ" করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সকল নায়ক-নায়িকা একই ধাঁচে মারা যাওয়াতে কারুণ্যটা ক্রমেই একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছে।

দেখিতে পাই, নায়ক-নায়িকারা হয় (১) ধীরে ধীরে মারা যান, কিম্বা (২) হঠাৎ মারা যান। হঠাৎ মৃত্যু হয় সাধারণতঃ ত্রিবিধ উপায়ে—(ক) বিষ খাইয়া। (খ) গলায় দড়ি দিয়া। (গ) জলে ডুবিয়া। ধীরে ধীরে যাঁহারা মারা যান, তাঁহারা কিন্তু প্রায়ই যক্ষ্মাকাশ হইয়া মরেন, দেখিতে পাই।···রোগ যখন অনেক রকম আছে, তখন নায়ক-নায়িকারা কেবলমাত্র যক্ষ্মারোগে মারা যান কেন?···নায়ক আমাশয়ে ভুগিতে ভুগিতে মারা গেলেন, এ কথাতে হাসিবার কি আছে? আমাশয়ের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। যক্ষ্মারোগের জীবাণুর নাম Tubercle Bacillus, ইহার এক জ্ঞাতি আছে তাহার নাম Bacillus Lepri, উভয়ের চেহারা এক রকম—ধরণ-ধারণ এক রকম, মানব-শরীরে উভয়েরই ফল সমান করুণ।

ধরা যাক, নায়ক বিরহগ্রস্ত। বিরহে হাত-পা ঝিন্ ঝিন্ করিতেছে, গালে ঠোঁটে সুড়সুড়ি ধরিতেছে—তবু কই প্রিয়া ত আসিল না! তারপর যখন প্রিয়া সত্যই আসিল, তখন হয়ত স্পর্শানুভূতি হারাইয়া গিয়াছে। নায়ক স্পর্শ করিতেছেন—অথচ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। একসঙ্গে পাওয়া ও না-পাওয়া। ইহার অপেক্ষা করুণ ব্যাপার আর কি হইতে পারে? পরে ব্যাপার করুণতর হইবে।···নায়ক শেষে একেবারে বিগলিত হইয়া যাইবেন।

প্রণয় ব্যাপারে আরও দুইটি জীবাণুর কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। একটির নাম Treponema Pallidum—ইহারা সাধারণতঃ সমাজদ্রোহী নায়কদেহেই বিরাজ করে। ইহাদের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মানবদেহের এমন কোন বিকার নাই, যাহা ইহারা করিতে পারে না। আধুনিক বিদ্রোহী লেখকগণ ইচ্ছা করিলে নায়ককে এই রোগে আক্রান্ত করাইয়া যে কোন tragic situation সৃষ্টি করিয়া করুণা প্রকাশ করিতে পারেন। দ্বিতীয় জীবাণুটির নাম—Deplococcus Instracellularis of Neisser—ইহারা নিজেরাও খুব প্রেমিক, "usually occurs in pairs" এবং প্রেমিকদেহেই বিহার করেন, বিশেষতঃ যাঁহারা "বিবাহের চেয়ে বড়" কিছু করিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের দেহে।···

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আকর্ষণের কাহিনী এই পর্যন্ত।

বিকর্ষণও আছে, এবং সে কাহিনী অতিশয় মর্মান্তিক। এক হীন চক্রান্তের ফলে আমি সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্যুত হই। ১৩৩৪ শ্রাবণ মাসে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' গীতিনাট্যখানিকে পুরোভাগে রাখিয়া। ইহাতে সন্নিবিষ্ট বিচিত্র সুরের সুমধুর সঙ্গীতগুলি গান হইয়া কানের ভিতর দিয়া আমার মর্মে প্রবেশ তখনও করে নাই। 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায় নিতান্ত কবিতারূপে সেগুলিকে পড়িয়াছিলাম; পড়িতে ভাল লাগে নাই, শ্রুতিমধুরও ঠেকে নাই। মনে হইয়াছিল ভাবের দিক দিয়া তাহা পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ এবং অক্ষম অনুকরণ, ছন্দ ও মিল শিথিল। একদিন নিরবচ্ছিন্ন অবসর পাইয়া সেই কথাগুলিই প্রবন্ধের আকারে লিখিয়া ফেলিলাম, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'কল্পনা' 'খেয়া' প্রভৃতি এবং প্রচলিত পুরাতন গানগুলি হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া 'নটরাজে'র পংক্তির সহিত তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে, 'নটরাজ' রবীন্দ্র-প্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, ২৪।১ ঘোষ লেনের বাসায় এবং বিপিনবাবুর চায়ের দোকানে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে একাধিকবার পড়াও হইল; সকলেই তারিফ করিলেন, কোনও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আমাকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। খেয়ালের বশে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু উহা প্রকাশ করিবার তাগিদ নিজের মনে অনুভব করি নাই। প্রকাশের শিথিল চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, লেখাটি আমার দপ্তরেই পড়িয়া থাকে। অনেক দিন পরে বিপিনবাবুর চায়ের দোকানের আড্ডার বন্ধু "শচীন বাঙাল" অধুনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম সমঝদার, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরেজী-বাংলা একাধিক গ্রন্থের লেখক ডক্টর শচীন সেন একদিন জোর করিয়াই প্রবন্ধটি লইয়া যান, বলেন, তুই যখন ছাপ্‌বি না, ওটা আমার অরসিক রায় বেনামে 'আত্মশক্তি'তে ছাপিয়ে দেব। তিনি তখন 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকের সহিত যুক্ত। আমার অপরাধ হইয়াছিল লেখকসুলভ মোহের বশে "না" বলিতে পারি নাই। পরবর্তী ভাদ্র ও আশ্বিনের পর পর পাঁচ সংখ্যা 'আত্মশক্তি'তে যখন আমার "নটরাজ" প্রবন্ধ বাহির হয় তখন বিশেষ উৎসাহ অনুভব করি নাই এবং শেষ পর্যন্ত সে ব্যাপার স্মরণেও ছিল না। এমন উদাসীন ছিলাম যে প্রবন্ধের "কপি" সংগ্রহ করিয়া রাখার আবশ্যকতাও অনুভব করি নাই। চিন্তা-লেশহীন অবোধ বালক ঢিলটি নিক্ষেপ করিয়াই খুশি ছিল, আম পড়িল কি পাখী মরিল—সে সম্বন্ধে ভাবিয়াও দেখে নাই! সে চকিত হইয়া উঠিল তখনই যখন ঢিলটি ফিরিয়া তাহারই গায়ে আসিয়া লাগিল।

অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'র আন্দোলন তরুণদের সমর্থক রবীন্দ্র-পরিবেশভুক্ত কয়েকজন প্রধানকে আমাদের বিরুদ্ধে বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন দুই অধ্যাপক—অপূর্বকুমার চন্দ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই দলে ছিলেন।* 'শনিবারের চিঠি'র অপরাধে রবীন্দ্রপৃষ্ঠপুষ্ট সদ্যপ্রকাশিত 'বিচিত্রা'র প্রতি পুরাতন 'প্রবাসী'কে ঈর্ষাদুষ্ট প্রমাণ করিবার চেষ্টাও গোপনে গোপনে চলিয়াছিল, অরসিক রায়ের "নটরাজ" প্রবন্ধটিকে তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতে চেষ্টা করিলেন। শেষে স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্র আমাকে পর পর দুই দিন পাকড়াও করিয়া বিশ্বভারতী আপিসে লইয়া গেলেন এবং স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের সহিত জ্ঞাপন করিলেন, কাজটা আমি ভাল করি নাই। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আমার গহন মনে কি কি গূঢ় উদ্দেশ্য গোপন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্দ্র তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম, নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম আমার অসাবধানে-ফেলা-জল অনেক নীচ পর্যন্ত গড়াইয়াছে। আমি সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সরাসরি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন সাব্যস্ত করিলাম। সোজাসুজি সামনে যাইবার সাহস হইল না, একখানি দীর্ঘ পত্রযোগে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম। পত্রটি অংশত এই:—

শ্রীচরণকমলেষু, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র কয়েক সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আপনার 'নটরাজ' গীতিনাট্যখানির সমালোচনাটি লইয়া কিছুদিন যাবং গোপনে ও প্রকাশ্যে একটু আন্দোলন চলিতেছিল পরম্পরায়

---

* 'রবীন্দ্রজীবনী'—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় স, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৩২।

তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার কিছু জবাবদিহি করিবার আছে কি না ভাবিয়া তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া এতকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই বা পত্র লিখি নাই। কিন্তু গত পরশু ও কাল প্রশান্তবাবুর সহিত দুই একটি কথাবার্ত্তার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে অবিলম্বে আপনার নিকট আমার নিজের দিকটা খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক নতুবা আমার সহিত অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জড়াইয়া অকারণে তাহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা চলিতে পারে।

সমালোচনাটি আমার লেখা। অরসিক রায়ের নামের আড়ালে আমি যে কারণেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, ভাবিয়াছিলাম ওই নামটিই ওই প্রবন্ধটি সম্পর্কে অন্য আলোচনার অবকাশ দিবে না। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি বাংলাদেশে লেখার দ্বারা লেখার বিচার হয় না, লেখকের কুলজীকোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়। এ দেশের লোকেরা সত্যঅনুসন্ধিৎসু, গোপনতম সত্যটি তাহারা টানিয়া বাহির করিবেই কারণ কোন বিশেষ বস্তুর উপর স্বকপোলকল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্যটি আরোপ করিতে না পারিলে তাহাদের সত্য-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।...

আমি শুনিয়াছি আপনি এই লেখাটি সম্পর্কে একাধিক পত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিতে নাকি লেখা আছে আমি অপরের প্ররোচনায় প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম,...ইহাও কেহ বলিয়া থাকিবেন যে যেহেতু আমি 'প্রবাসী' অফিসের বেতনভোগী কর্ম্মচারী এবং যেহেতু 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দী সেই হেতু শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দিয়া ওই প্রবন্ধ লিখাইয়া 'বিচিত্রা'কে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাকে জানাইতেছি যে আমার লিখিত উক্ত সমালোচনাটিতে সত্য, মিথ্যা, বাতুলতা, প্রলাপ, ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ আমার, অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র প্ররোচনা বা অংশ নাই।...

যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বেনামীতে 'মেঘনাদ বধে'র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, যিনি বয়সের হিসাব ভুলিয়া গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ [বড় দাদা], চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত সত্যের খাতিরে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী নৈতিক ভয় দূর করিবার জন্য "সত্যের আহ্বান" করিয়াছিলেন তিনিই যদি আজ কাহাকেও স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করিতে দেখিয়া গোপন অনুসন্ধান ও হীন চরবৃত্তির প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।...বাংলা দেশের মানুষকে আপনি ৬৭ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন, আমার ভয় হয়, পাছে যাহারা নিরন্তর আপনাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহাদের ফেরে পড়িয়া আপনি ভুল করেন! ..

.আমার এই ২৬ বৎসরের জীবনে মানুষকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাই নাই সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি বহুবর্ষ যাবৎ এই পৃথিবীর হালচাল দেখিয়া আসিতেছেন, আপনি ভুল করিবেন না, এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি। আপনার অনেক ভক্ত আছে। কেহ কাছে থাকিতে পায়, কেহ পায় না। দূরে যাহারা থাকে তাহাদের ভক্তি বিন্দুমাত্র কম নহে। অন্ততঃ, আমার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ এবং এতকাল খোরাকও রবীন্দ্রনাথই জোগাইতেছেন। আমার ভক্তি বা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন তাহা হইলেই আমার চরমতম শাস্তি ঘটিবে। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অন্ততঃ সেই শাস্তিটুকু হইতে আমাকে রেহাই দিবেন।

প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

বেলা তিনটা নাগাদ 'প্রবাসী'-অফিসের পিওন-বুক-ভুক্ত করিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চিঠিটি পাঠাইয়া দিলাম। কবি প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের সম্বর্ধনা গ্রহণের জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমার পত্র এই অবস্থায় তাঁহাকে অতিশয় উত্যক্ত করিয়া থাকিবে, কারণ তিনি বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব লিখিয়া তখনই ডাকে দেওয়ান। রবীন্দ্রনাথের সামান্য চিঠিপত্রেও কখনও সাধু-চলিত ভাষার সংমিশ্রণ দেখি নাই; কিন্তু সেদিন তিনি এমনি রাগিয়া গিয়াছিলেন যে, গুরুচণ্ডালী দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার পত্রটি হুবহু এই:

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আত্মশক্তিতে কয়েক সংখ্যা ধরে নটরাজের যে সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ প্রকাশ হয়েছিল সেটা তোমার

লেখা বলে আমি জানতুম না বা সন্দেহ করিনি। বাইরে থেকে চিঠি পাই। তার উত্তরে লিখি, যাঁদের আমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করি তাঁরা আমার নিন্দা-প্রচারে আনন্দ বোধ করেন, এত বারবার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি যে ইহাতে আমি বিস্মিত হই না এবং এ কথা লইয়া আলোচনা করিতে আমার লেশমাত্র ইচ্ছা নাই।

নিঃসন্দেহ আমার দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় মন্দ লেখা বিস্তর আছে। সেইগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া ইতিপূর্ব্বে তুমি কখনো লেখ নাই। সম্প্রতি যদি আমার কোনো লেখা মন্দ হইয়া থাকে সেটা কি পাঁচখানা কাগজ ভরাইবার মতো এতই অসহ্য মন্দ? এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয় ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মশক্তিতে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমার পক্ষে সহজ কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

মেঘনাদ বধের সমালোচনা যখন লিখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫। তা ছাড়া তখন মাইকেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিম ও মহাত্মাজির সঙ্গে আমার যে দ্বন্দ্ব তাহা নৈতিক; তাহা কর্ত্তব্যের বিশেষ প্ররোচনায়। বঙ্কিমের কোনো গ্রন্থের সাহিত্যিক সমালোচনা যদি করিতাম তবে প্রধান ঝোঁক দিতাম তাঁহার গুণের উপর, ত্রুটির উপর নহে, কারণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধাই পজিটিভ গুণকে বড় করিয়া দেখে। এই জন্যেই রাজসিংহের সমালোচনা করিয়াছিলাম।

এত কথা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি তোমার কথা জানাইয়াছ বলিয়াই লিখিতে হইল। ইতি ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুঃখের বিষয়, এই চিঠিখানি লিখিয়াও তাঁহার সমস্ত রাগটা পড়িল না। এই হতভাগ্যের অপরাধে সমগ্র দেশের উপর তাঁহার রাগের শেষটুকু বর্ষিত হইল, আমার পক্ষে সর্বনাশ। ওই ১৩ই ডিসেম্বর (১৯২৭) অপরাহ্নে। রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মধুর সম্বর্ধনার উত্তরে সভাস্থ সকলের এবং পরদিন দেশবাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটু বেসুরা গাহিলেন। উহার প্রকৃত মর্ম একমাত্র আমিই বুঝিলাম, অন্য সকলের নিকট অজ্ঞাত রহিল। তিনি বলিলেন,

দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে, কাছের মানুষের কোনো দাবী আমি রক্ষা করি, কোনো দাবী আমি রক্ষা করতে অক্ষম, কেউ বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান, কেউ বা পান না, এই সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হ'য়ে ওঠে; নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগ-দ্বেষের ধূলিনিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি-বিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্ত কালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আলপিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে, তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এই রকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে-খর্ব্বতা তা আমি অনেক কাল থেকে অনুভব করে এসেচি। দেশের লোকের সভায় এরি সঙ্কোচ আমি এড়াতে পারিনে।···এদেশে, এমন-কি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়,—জানি যে, কত কি ঘরাও কারণে ও ঘর-গড়া অসন্তোষের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

১৪ই ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই ভাষণ পড়িয়া ও বেলা দশটায় রবীন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া আমি মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম।

একটি রাত

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

একটি রাত মধুর রাত আমার মনে আয় নেমে
সেই রাতের আগমনের আশায় মোর পথ চাওয়া,
দাঁড়িয়ে দিই ভরিয়ে দিই নিবিড়তায়
আর প্রেমে
ঈপ্সিত সুনিশ্চিত সেই আমার সব-পাওয়া!

অন্তরীণ হাজার দিন এই জীবন একঘেয়ে
ব্যাপ্তি চাই মুক্তি চাই—চাই হতে নিরুদ্দেশ
দীঘল চুল মেঘবরণ আমায় নি'ক সেই মেয়ে
উড়িয়ে নি'ক ছড়িয়ে দি'ক যেথায় সেই প্রিয়ার দেশ
অচিন সেই স্বপন-দেশ!

এই সে-রাত নিশুত রাত তাঁরারা ক্ষীণ দীপ জ্বালায়
তোমার নাম কি দেখলাম আকাশে লেখা টিপ-মালায়?
বিবশ মন কী নির্জন তোমার স্মৃতি মন ছাপে
হায় সুদূর সব বেসুর ব্যথায় ম্লান সংলাপে!

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সঙ্গী—সখী, সঙ্গিনী, আলি, বয়স্যা, মিত্রা, সই, সহি।
সংক্রম—রাশিসঞ্চার, স্থানান্তর গমন।
সংক্রান্ত—অনুগত, সম্পর্কান্বিত।
সংক্ষিপ্ত—অল্পে কথিত, অল্প বাক্য।
সংক্ষেপ—চুম্বক, বাক্যের অবিস্তার।
সংখ্যা—একাদি গণনা, একুন, সমস্ত।
সংগুপ্ত—লুক্কায়িত, ছাপান, অব্যক্ত, সংগোপন।
সংগৃহীত—সংপ্রাপ্ত, লব্ধ, স্বীকৃত, উদ্ধৃত।
সংগ্রহ—সঞ্চয়, আহরণ, একত্রকরণ।
সংগ্রাম—যুদ্ধ, সমর, রণ, আহব।
সংগ্রাহক—সঞ্চয়কর্ত্তা, সংগ্রহকর্ত্তা।
সংঘটনা—সঙ্গতি, শ্লেষ, আলিঙ্গন।
সংঘটিত—যুক্ত, মিলিত, সম্মত, সংশ্লিষ্ট।
সংঘট্ট—ঘটা, বহু লোকাগম, জনতা।
সংজ্ঞা—নাম, আখ্যা, বিশিষ্য, জ্ঞান।
সংযত—বদ্ধ, আটকান, জড়ীভূত, সংরুদ্ধ।
সংযন্তা—নিবারক, আটকানিয়া, বাধক।
সংযুক্ত—সংলগ্ন, মিলিত, বিশিষ্ট।
সংযোগ—মিলন, মিশ্রণ, সঙ্গ, সংসর্গ, সংযোজন।
সংরম্ভ—কোপ, ক্রোধ, রাগ।
সংলগ্ন—সঙ্গত, সংযুক্ত, সম্মিলিত।
সংশয়—শঙ্কা, ভয়, চিন্তা, সন্দেহ, দ্বৈধ।
সংশয়াপন্ন—সংশয়ী, দ্বিধাপ্রাপ্ত।
সংশ্রব—স্বীকার, সম্মতি, প্রতিজ্ঞা।
সংশ্রিত—আশ্রিত, শরণাপন্ন, রক্ষিত।
সংশ্লিষ্ট—সম্মিলিত, আলিঙ্গিত, সংযুক্ত।
সংশ্লেষ—সংযোগ, মিশ্র, সঙ্গ, আলিঙ্গন।
সংসক্ত—যুক্ত, সংলগ্ন, আসক্ত।
সংসক্তি—সংযোগ, নৈকট্য, পরিচয়।
সংসর্গ—সহবাস, সঙ্গম, আলিঙ্গন।
সংসার—জগৎ, বিশ্ব, গার্হস্থ্য, গৃহাশ্রম।
সংসৃষ্ট—সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, একত্র।
সংস্কার—মার্জ্জন, শোধন, জ্ঞান, স্মৃতির কারণ, অন্নপ্রাশনাদি দশকর্ম্ম।
সংস্কারক—দশসংস্কারকর্ত্তা, শোধক।
সংস্কৃত—প্রাপ্তোৎকর্ষ, পরিষ্কৃত।
সংস্থ—চর, স্বদেশী, পড়সী, প্রতিবাসী।
সংস্থান—সঙ্গতি, সঞ্চিত ধনাদি, যোত্র, সংস্থিতি।
সংস্থাপক—স্থিতিকর্ত্তা, পত্তনকারক।
সংস্থাপন—স্থাপিত করণ, বসান, রক্ষণ।
সংস্পর্শ—শ্লেষ, সম্মিলন, ধরা, ছুঁয়ন।
সংস্পৃষ্ট—সংলগ্ন, স্পৃষ্ট, হস্তধৃত।
সংস্মৃতি—জ্ঞান, স্মরণ, বোধ, উদ্বোধ।
সংস্রব—সংযোগ, সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সংসর্গ।
সংহত—যুক্ত, সংলগ্ন, ক্ষত, নষ্ট।
সংহতি—সমূহ, রাশি, সঞ্চয়, স্তূপ।
সংহর্ত্তা—বধকর্ত্তা, অপঘাতক, সংহারক।
সংহার—বধ, বিনাশ, অবঘাত, হত্যা।
সংহারমুদ্রা—পূজান্তে অঙ্গবিন্যাস।
সংহিত—সঞ্চিত, একত্রীভূত, সংযুক্ত।
সংহিতা—শাখা, বেদাঙ্গের বাক্যবিন্যাস।
সকর—রাজস্বাধীন, রাজকরযুক্ত।
সকরুণ—সদয়, সানুকম্প, সকৃপ।
সকল—সমুদায়, সমস্ত, অখিল, তাবৎ।
সকাম—কামনাযুক্ত, কামী, ফলার্থ ক্রিয়া।
সকারবকার—মন্দ কথা, অবাচ্য বাক্য।
সকাল—প্রাতঃকাল, প্রভাত, প্রত্যূষ।
সকুল—জ্ঞাতি, সগোত্র, মৎস্যবিশেষ।
সকৃৎ—একবার, একদা, সর্ব্বদা, বিষ্ঠা।
সখা—বন্ধু, মিত্র, সুহৃৎ, বয়স্য।
সখী—(সঙ্গী দেখ)
সগন্ধ—বাসিত, বাসযুক্ত, গন্ধযুক্ত।
সগর্ভ—একমাতৃক, সহোদর ভ্রাতা।
সগর্ভা—গর্ভিণী, সসত্ত্বা, গর্ভবতী।
সগুণ—গুণবান, পণ্ডিত, শরপত্র বৃক্ষ।
সগোত্র—জ্ঞাতি, বান্ধব, সমান গোত্র।
সঙ্কট—দায়, বিপদ, অগম্য, কঠিন।
সঙ্কর—উভয় বর্ণজাত সন্তান।
সঙ্কলন—একুন করা, সঞ্চয়ন, মিশ্রণ।
সঙ্কলিত—একত্রীকৃত, মিলিত, যুক্ত।
সঙ্কল্প—বৈদিক কর্ম্মের প্রতিজ্ঞা, মানস।
সঙ্কল্পিত—অভিপ্রেত, নিয়মিত।
সঙ্কাশ—সদৃশ, তুল্য, শোভান্বিত।
সঙ্কীর্ণ—ব্যাপ্ত, অপ্রশস্ত, অল্প, সঙ্কর।
সঙ্কীর্ত্তন—গুণকথন, গুণগান, স্তবকরণ।
সঙ্কুচিত—কুণ্ঠ, তোবড়া, সঙ্কীর্ণ, লাজুক।
সঙ্কুল—আকুল, ব্যস্ত, ব্যগ্র, ব্যাকুল।
সঙ্কেত—ইঙ্গিত, শব্দের অর্থপ্রকাশ শক্তি।
সঙ্কোচ—কুঁকড়ন, কুণ্ঠতা, সমীহা।
সঙ্গ—সাহিত্য, মেল, সংযোগ, সঙ্গম।
সঙ্গত—যথাযোগ্য, সংলগ্ন, সম্ভাবিত।
সঙ্গতি—মেল, সুযোগ, সম্ভাবনা, যোত্র।
সঙ্গম—মেলন, মিলন, সন্ধি, প্রণয়, সংযোগ।

[ক্রমশঃ]

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

চোরা-কারবারিদের বিচার হচ্ছে। চার জনকে গুলি করে মারা হবে। তিন জনই তার মধ্যে কম্যুনিষ্ট।

এক জনে আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে।

পথের কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে বেড়িয়েছি কুয়োমিনটাং আমলে, মুক্তিসৈন্যদের মধ্যে থেকে লড়েছি, ঘর-গৃহস্থালীর দিকে চোখ তুলে তাকাইনি কোনদিন। বিবেচনা করো, আমার গৌরবময় অতীত—

মৃত্যুও গৌরবময় হোক এবার। মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত্ত।

পিকিন শহরে ছটো লোক প্রাণ দিল এমনি। বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে—এমন কিছু বেশি দিন নয়। সারা দেশের মধ্যে বাকি আর দু-জন। পঞ্চাশ কোটি মানুষের চারটি—ব্যস, এতেই একেবারে ঠাণ্ডা। কালোবাজারে লালবাতি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা—ও-পথের ধুলো আর মাড়াবে!

কি অদ্ভুত পরিবেশ—দেশময় প্রায় যুধিষ্ঠির হয়ে উঠেছে। মানুষ তো তো! ইচ্ছে কি করে না ছটো পয়সা এদিক-ওদিক করে বেশি রোজগারের? কিন্তু জোট বাঁধে কার সঙ্গে? এমন হয়েছে, এমন চিন্তা মনের মধ্যে আনতেও ভয় করে। তা ছাড়া খাওয়া-পরা যখন মোটামুটি চলে যাচ্ছে, কিসের প্রয়োজন ঐ হাঙ্গাম হুজ্জতের মধ্যে যাবার?

সেন্ট্রাল কলেজ-অব-আর্টসে যাচ্ছেন জন-কয়েক। সে দলে আমার নাম নেই। অফিস-ঘরে চলে গেলাম।

লিষ্টি কে করছেন?

সেক্রেটারি বহু জন। যাকে বলি, তিনিই ঘাড় নাড়েন। শেষে টের পাওয়া গেল, বন্দোবস্ত কুমুদিনী মেহতার। তিনি খেতে গেছেন। খানা-ঘরে অতএব হানা দিলাম।

আমায় বাদ দিলেন কেন?

একটা বাসে ক'জন ধরবে? লেখক মানুষ, লেখাপড়া নিয়ে থাকেন—ছবিও বোঝেন নাকি?

পরখ করুন। যে ছবি সকলের গরু বলে মনে হবে, ঠিক বলে দেবো পার্বত্য-ঝরণা; জোটো তালগাছ যাকে বলেন, সেটা হবে বেণী-বিসর্পিণী আধুনিকা। ছবি দেখে দেখে ঘুন হয়ে আছি—

হেসে হেসে বলছিলাম। তার পরে ঝাঁজ এসে গেল কথায়। শিল্পীর দেশ মহাচীন—'হুনুরে চীন'। তাদের নতুন কালের শিল্প-সাধনা চোখে দেখতে দেবেন না—সে হবে না, যাবোই আমি।

আজকে ঘুরে আসুক তো এরা। না হয় আর একদিন—

খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুমুদিনী উঠে গেলেন। গটমট করে এক ফাঁকা টেবিলে আমি বসে পড়লাম। টাইপ-করা মেনু দিল হাতে। মেজাজ উষ্ণ—তালিকা ধরে একনাগাড় অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি।

নিচে এসে দেখলাম, কলহের ফল ফলেছে। ছাড়পত্র মিলেছে, আমার নামও জুড়ে দিয়েছে তালিকায়।

মেয়েরাই বেশি এই ছবি দেখার দলে। দু'টি মেয়ে-দোভাষিও চলেছে। একটি তো সুইং-ইএা-মি, আর একটির নাম—কোথায় লিখে রেখেছি, খুঁজে পেলাম না। স্মরণশক্তি অত্যধিক প্রখর কিনা—চীনা নাম বিলকুল ভুলে যাই।

আর দেখছি, মেয়েরাই যেন অধিক জমিয়ে তুলছেন। পুরুষদের ছাপিয়ে। রোহিণী ভাটে হলেন মধ্যমণি। তাঁর ঘরে এসে পিকিনের মেয়েরা ভারতীয় নাচ শেখে। রোহিণীও চীনা নাচ শিখে নিচ্ছেন। গানেরও এমনি পাল্টা-পাল্টি চলে। ভারত-চীনের মধ্যেকার হিমালয় পর্বত নিতান্তই নস্যাৎ করেছেন ওঁরা নাচ-গানের দাপটে।

আর ঐ গোলমেলে চীনা নামে তৃপ্তি হচ্ছে না বোধ হয়। বাসের মধ্যে সেই কথা উঠল। রোহিণী বললেন, ভাই তোমাদের নাম দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ভাষায়। সুইংকে বললেন, তোমার নাম হল উষা। অন্য মেয়েটাকে বললেন, তুমি সন্ধ্যা।

ওরা হেসে খুন। উছা—উছা—বার কয়েক বলে বলে সুইং তো নতুন নাম রপ্ত করে নিল। সন্ধ্যা নামে কিন্তু আমাদের ঘোরতর আপত্তি। কাঁচাসোনার রঙের মেয়ে—সন্ধ্যা কেন সে হতে যাবে? দেশে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা কেন—নিশীথিনী, অমাবস্যা, ঘোরা তামসী—যত খুশি নামকরণ কোরো। মানাবেও চমৎকার।

সুইং বলে, মানে কি উষার? মানে জেনে খুশির অন্ত নেই। বলে, ভারি ভালো নাম—আমার বড় পছন্দ। ভারতের যা-কিছু শোনে, সমস্ত ভালো ওর কাছে। বলে, তোমাদের ভারতে যাবো আমরা। দেখতে বড় লোভ হয়। যাবো যখন, আমায় কিন্তু এই নামে ডাকবে।

তা যেন হল—কিন্তু তোমার ঐ আদি-নামের মানেটা কি, এবার শুনি আমরা।

কিছুতে বলবে না। ফিক-ফিক করে হাসে। বলে, জানি নে—

তাই কি শুনি? এমন চালাক মেয়ে তুমি,—গ্রাজুয়েট হয়েছ, দুনিয়ার তাবৎ ব্যাপারের মানে জেনে বেড়াও, আর নিজের নামের মানে জানো না?

মানে নেই আমার নামের—

তখন বোঝাচ্ছি, দেখ, মিথ্যেকথা বলতে নেই। বিশেষ আমরা হলাম যখন খিয়েন-চু—

আধুনিক এরা স্বর্গীনবক মানে না, থিয়েন-চু বলে ভয় ধরানো যাবে না। তবু অতিথিক্তান এমন করে বলছে—বিশেষ যেগুলোকে সে অহরহ তাড়না করে বেড়ায়। সলজ্জ কণ্ঠে বলল, বিশ্রী নাম—মানে বলতে লজ্জা করে আমার। তখন এত সমস্ত কেউ তো জানত না, ফিউডাল নাম রেখেছেন বাপ-মা—

ঘাড় নাড়ে আর হাসে।

না-না, সে আমি কিছুতে বলতে পারব না।

আরও কৌতূহলী আমরা।

বলতেই হবে। ফাঁস করব না হে, কানে কানে বলো। এইও, কেউ শুনবে না তোমরা—

'সুইংইএ-মি' কথাটার মানে হল, গ্লোরি অব দি ফ্যামিলি—পরিবারের গৌরব।

এই ব্যাপার! আমরা ভাবলাম, কি না কি! খাসা নাম হে তোমার—গৌরব করার মতোই মেয়ে তুমি।

সুইং বলে, ছোট্ট একটু গণ্ডীর মধ্যে গৌরব হয়ে থাকা! পরিবার আবার কি? ওসব বাতিল, থাকা উচিত নয়।

বোঝানো যাচ্ছে, নিখিল মানব-গোষ্ঠীই হল একটা পরিবার। তার গৌরব তুমি। এই রকম মানে করে নাও না—লজ্জার কিছু নেই।

তারপর এক সময় গভীর কণ্ঠে বললাম, আর কোন দিন দেখা হবে না, কিন্তু এই নাম যেন সত্যি হয়ে ওঠে তোমার জীবনে। এই আশীর্বাদ রইল আমার।

পীস-হোটেলে ঢুকল বাস। কয়েকটি আমেরিকান বন্ধুকে তুলে নেবো।

প্রতিশোধ নাও তুমি সুইং, ছাড়বে কেন? তোমাদের ভারতীয় নাম দিয়েছে, তোমরা পালটা চীনা নাম দিয়ে দাও এঁদের—

বেশ তো, বেশ তো—

রোহিণী প্রভৃতি কলকণ্ঠে উল্লাস প্রকাশ করেন।

কাকে কি নাম দিচ্ছ, বলো। মুখস্থ করে ফেলি।

নাম বলতে গিয়ে মেয়ে দুটো থমকে গেল।

না, থাকগে এখন। ভেবে-চিন্তে দিতে হবে। এখন নয়, পরে।

নামকরণ হয় নি শেষ পর্যন্ত। অন্তত আমরা কিছু জানি নে।

আর্টস কলেজের মস্ত বড় বাড়ি। ঝকঝক তকতক করছে। পরিচালকেরা এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা করলেন। ঘরে ঘরে নানান শিল্পকর্ম। ছাত্রেরা নিবিষ্ট মনে কাজ করছে, পা টিপে টিপে সরে আসতে হয়। তারপর দোতলায় উঠলাম।

সামনেই শ্মশ্রু-সমন্বিত আমাদের আপন মানুষটি—রবীন্দ্রনাথ। বিশাল হলঘরে অগণিত ছবির ভিড়ের মধ্যে সব চেয়ে বৃহৎ আর সর্বপ্রধান। যত অন্যমনস্ক থাকুন, নজর আপনার পড়বেই।

সুদূর চীনদেশে জ্ঞানী-গুণীদের সমাজে গুরুদেব আজও জমিয়ে বসে আছেন, আমরা খবর রাখি নে। এদেশে-ওদেশে চিরকালের ভালবাসাবাসি—নতুন কালে সেই প্রীতি শান্তি ও সৌহার্দ্যের তিনিই দূতিয়ালি করলেন। চীন ঘুরে তাদের চিত্তজয় করে এলেন, চীনা-ভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে—সে কতদিন আগের কথা! চিত্রপটের রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হাস্যে তাঁর দেশের মানুষদের আহ্বান করলেন। শিল্পীর নাম চু-বি-আন (Chu-bei-huang)। কবিকে শিল্পী চোখে দেখেন নি—মানস-স্বপ্ন তুলির টানে তুলে ধরেছেন।

ঘরের অবধি নেই। ঘুরে ঘুরে দেখছি। হিন্দি কথাসাহিত্যের রাজা মুন্সি প্রেমচাঁদকে জানেন—তাঁর ছেলে অমৃত রায় বিস্তর নোট নিচ্ছেন ছবি সম্পর্কে। ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়ছেন কোথাও, ধীরে সুস্থে আনন্দ-স্নান করে চলেছেন যেন রসসমুদ্রে! আমি এক পাক ঘুরে দেখে নিয়েছি ইতিমধ্যে। আবার এসে ঐ দলে জুটেছি। দোভাষি অবাক—তাদের বলবার আগেই পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি অনেক ছবির; যেটা অতি-উপাদেয়, রসিক বান্ধবদের টেনে দাঁড় করাচ্ছি তার সামনে। দুই চোখের অপলক সুধাপান—বর্ণনা দিয়ে কি বোঝাব ছবির কথা? পুরাণো আর আধুনিক সকল রকম পদ্ধতিতে ছবি লিখেছে। গ্রামে গ্রামে ছড়ানো লোকশিল্প থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছে—সর্বক্ষেত্রে তার পরিচয়। আর ঐ যে ওদের নিয়ম, অকেজো বলে কোন জিনিষ বাতিল হবে না—ছেঁড়া কাগজ আর টুকরো কাপড় নানান কায়দায় জুড়ে একটু-আধটু তুলির পোচ টেনে পুতুল, জানলার পর্দা, ফুলদানি আরও কত কি শিল্পবস্তু বানিয়েছে। উড়কাটাই বা কত রঙের আর কত রকমের! দেখে তাজ্জব। নতুন চীনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প ছবি করে ফুটিয়ে তুলেছে।··· কুঁড়ে মানুষ, পরের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চায়—আজকের দিনে তার লাঞ্ছনার অন্ত নেই। জনতা টিটকারি দিচ্ছে, মাথা নিচু করে আছে লোকটি—টিটকারির কথাগুলো যেন কানে শুনতে পাচ্ছি জনতার ভাবে-ভঙ্গিমায়।···ভূমি-সংস্কার হয়েছে—চাষী এবারে জমির মালিক, ঢাকঢোল বাজছে—সেকালের বাতিল দলিলপত্র ফূর্তিতে ছুঁড়ে দিচ্ছে আগুনে।···একটা মজার ছবি—সরল গ্রামবাসীরা ভোট দিতে এসেছে গ্রাম-সমিতি নির্বাচনে। প্রার্থীরা সারি সারি দাঁড়িয়ে—পিছনে ভোটের বাক্স। কোন বাক্সে ফেলবে, ভাবছে ভোটদাতারা।··· আপোসে মামলা মিটিয়ে নিচ্ছে—আর ওরা মামলা করে উৎসন্ন যাবে না। ···শ্রমিকরা নৈশ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।···লড়াইয়ের দুর্দিনে বাচ্চা ছেলেদের শুকনো কুয়োর মধ্যে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখছে এক মা-জননী···

নাঃ, খাটিয়ে মেরে ফেলবে। এই ছবি দেখিয়ে আনল—রাতে আবার অপেরা। নাচ-গান-অভিনয়—হাজার বছরের ঐতিহ্য এর পিছনে। যে সব মানুষ অনেককাল আগে অতীত হয়ে গেছে, তারাই রূপে উল্লাসে ঝলমল করে দাঁড়াল ষ্টেজের উপর। পুরাণো চীনকে এরা একটুও ভোলে নি নতুন কালের ডামাডোলের মধ্যে! অপচয় ও বাহুল্যের বিরুদ্ধে এত জেহাদ—অপেরার ব্যাপারে কিন্তু দরাজ ব্যবস্থা। আলো, সাজপোশাক, বাজনা, দৃশ্যপট—টাকা ধুলোর মুঠোর মতো ছড়িয়েছে। পরে আরও অনেক পালা ও নাচ দেখেছি—পুরাণো বনেদে আধুনিক পালাও অনেক গেঁথেছে। চীনের এই নাচ-অপেরা নমো-নমো করে সারবার বস্তু নয়, মউজ করে বলা যাবে আর এক দিন। কি বলেন?

এখন তাড়াতাড়ি। শহর তোলপাড় বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে। কাগজে পড়ছি, শুধু পিকিন শহর নয়—সারা চীন

...উঠেছে। তাড়াতাড়ি উৎসব-দিনে পৌঁছানো যাক। ১লা ...বের কাল। দেশের দূরতম প্রান্ত থেকে জনস্রোত অবিরল এসে ...ছে। বাইরে থেকেও আসছে। তামাম দুনিয়ার যাবতীয় ...নের বুঝি একটি মাত্র লক্ষ্য—পিকিন।

সন্ধ্যায় ভোজ। ভোজ তো হামেশাই হয়ে থাকে—সে এক ...র বস্তু। কিন্তু আজকে বড় স্ফূর্তি। চীন দেশটাই ধরুন ছোটখাট ...পৃথিবী—উৎসব বাবদে তার সকল অঞ্চলের মাতব্বররা এসেছেন, ...খাবেন। যত দূতাবাস আছে, ঢালাও নিমন্ত্রণ সকলের ...এবং দুনিয়ার শান্তি-সৈনিক আমরা তো আছিই। পৃথিবীর ...পাশাপাশি পাত পাড়বে—নানান জাত নানান ধর্ম নানান ...মানুষের একসঙ্গে পংক্তি-ভোজন।

খাওয়াচ্ছেন মাও-সে-তুং। ঐটে ভেবে দমে যেতে হয়। ...লোকের অবস্থা সুবিধের নয়—আমাদের অনেকের চেয়ে গরিব। ...নে সর্বসাকুল্যে আট শ' (ইয়ং হিসাব দিল, জন তিনেকে আমরা ...দেখলাম শ' আষ্টেকের বেশি আমাদের টাকায় কিছুতে ওঠে না)। ...শুনলাম, দিবারাত্রি হাড়ভাঙা খাটনি খেটে—রাত্রি একটা-...র আগে কোনদিন শোওয়া জোটে না। ঐ মাইনের ভিতর ...শীয় ঠাটবাট বজায় রাখতে হয়। অতএব খান দুই-তিন ঘর ...য়ে বাসা, চৌপায়ায় শয্যা। আর অধিক কুলিয়ে ওঠে কি করে? ...চেয়ে প্রথম বয়সে সেই পিকিন য়্যুনিভার্সিটির চাকরিটাই বোধ হয় ...ছিল। লাইব্রেরির কাজ করতেন ওখানে। আসল লাইব্রেরিয়ান ...সহকারীদের একজন। ছাত্র-ছাত্রীরা ডেকে ডেকে দেখায় আজকে ...এইখানে বসতেন আমাদের মাও-তুচি, এই টেবিলে লেখাপড়া ...করতেন। সে আমলে যেমনটি ছিল, আসবাবপত্র ঠিক তেমনি ভাবে ...রাখা আছে। ওদের ম্যাগাজিন আছে—যেমন থাকে কলেজে-ইস্কুলে। ম্যাগাজিনের জন্য লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিল ওরা মাও-র ...কাছে। আপনি পুরাণো লোক এখানকার, সাহিত্যিক মানুষ—...দিন আমাদের কাগজে একটা লেখা। মাও তার জবাব দিয়েছেন, ...সময় কোথায় ভাই? সাহিত্যের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। তোমাদের দিন-কাল, তোমরাই লেখো। ...সেই চিঠি ওরা সগর্বে দেখায় বিদেশি আগন্তুক ...যারা য়্যুনিভার্সিটি দেখতে আসে।

তা সত্যি, ওদের মাও-তুচি সাহিত্যিক হিসাবেও খুব বড়—উঁচু ...দরের কবিতা-লিখিয়ে। রাজনীতির তালে না ...পেলে শুধু সাহিত্য করেই ...দেশ-বিদেশে নাম করতেন, দিব্যি বহাল তবিয়তে থাকতেন। কিন্তু কপালের গেরো,

তা ছাড়া আর কি বলি! গুহার ইঁদুরের মতো উত্তর-চীনের পর্বত-রন্ধ্রে কাটিয়েছেন কত কাল! যেখানে ওঁদের বুলেটিন ছাপা হত সেই যন্ত্র, আর কিছু পরিমাণ সেই বুলেটিন মিউজিয়মে রেখে দিয়েছে। দেখে হাসি ঠেকানো দায়। প্রথম স্ত্রীটাকে তো জ্যান্ত কোতল করল চিয়াং-কাইশেকের পার্ষদেরা; দ্বিতীয় স্ত্রী মরলেন আকাশের বোমায়। ঐতিহাসিক লং-মার্চের সময় দলবল যখন অতি-দুর্গম দক্ষিণ পথে ধাওয়া করেছে, সেই গোলমালের মধ্যে খতম হল দুটো ছেলে। তা বেশ-অনেকখানি হাত পা-ঝাড়া অবস্থা বলতে হবে মাও-র।

আর, কাকে ছেড়ে কার কথাই বা বলি! খোদ বড় কর্তা মশাই ঐ প্রকার, তা হলে মেজো-সেজোদের দশা আন্দাজ করে নিন। চাউ-এন-লাই, চু-তে—ইনি প্রিমিয়ার, উনি কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ—শুনতেই ভারী ভারী, বেতন কুল্যে ছ'শ তঙ্কা। আমাদের আধা-মন্ত্রীগুলোকেও ওর বেশি মাইনে দিয়ে থাকি। সুন-চিন-লিং ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেনের বিধবা। কচি-কচি চেহারা, আগুনের মতো দেহজ্যোতি—তিরিশ পেরিয়েছে, কে বলবে? নবীন-চীনের জননী তো বটেই, জগজ্জননী বলে ডাক পাড়তে ইচ্ছে করে। তা সে যা-ই হোন, রাজধানী পিকিনের বাস্তু কিন্তু দেড়খানা ঘর নিয়ে। সাংহাইয়ে সান-ইয়াৎ-সেনের বাড়ি দেখেছি (এক বন্ধুর দান অবশ্য)। দোতলা বাড়ি, একটু লনও আছে—আশপাশের বিশ-পঁচিশ তলা বাড়িগুলোর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও মোটের উপর ভালোই, ছবির মতন। কিন্তু ম্যাডামের ফুরসৎ কোথা সেখানে যাবার? অহোরাত্রি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার না হয়ে যদি আটচল্লিশ ঘণ্টার হত, তবে বোধ হয় দুনো খেটে ওঁরা আরও কিঞ্চিৎ সুখ করে নিতেন। এ চিত্র আমাদেরও অজানা নয়। মহাত্মাজী জীবনে হাঁটু ঢেকে কাপড় পরতে পারলেন না, দিল্লি এসে জায়গা হত ভাঙি-বস্তির মধ্যে। কিন্তু স্বাধীন-ভারতে চটপট ভোল পালটে ফেলেছি। পারেন তো কোন ঐতিহাসিক লিখে রাখুন গে সে সব দিনের কথা, ভবিষ্যতে ছেলেরা পড়বে।

ফ্যাক্টরি-শ্রমিকরা নৈশ-বিদ্যালয়ে যাচ্ছে [চীনা রঙিন উডকাট

সন্ধ্যাবেলা ওঁরা খাওয়াবেন। দুপুরটাই বা ছাড়া যায় কেন? পাকিস্তানি ভায়াদের খাইয়ে দিই আমরা। আপত্তি কি, যখন স্রেফ মুফতে খাওয়ানো চলে—এক আধেলা খরচ-খরচা নেই? ওঁরা চাইবেন না, আর আগ বাড়িয়ে কড়ি গুণে দেবে এমন আহাম্মক কে আছে কলিযুগে?

চিরকাল একসঙ্গে ঘরবসত—আজকেই ভিন্নভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান দু-এলাকার মানুষ হয়ে দর্শন দিয়েছি। দেশে থাকতে দশ জনে দশ রকম কথায় তাতিয়ে তোলে, বিদেশ-বিভুঁয়ে সেই দশম অবতারেরা নেই। খেতে খেতে অতএব মন খুলে সুখ-দুঃখের কথা চলল। এরোড্রোম অবধি ভারতীয়েরা গিয়েছিল পাকিস্তানিদের ডেকেডুকে আনতে। 'মন কেমন করে উঠল, ভাই, মাঠের প্রান্তে আপনাদের দেখে। কত দেশের মানুষই তো এসেছে—কই, আপনারা চুপ করে ঘরে থাকতে পারলেন না তো আর সকলের মতো!'

বলছিলেন—ভদ্রলোকের নাম পাওয়া গেল মজিবর রহমান। এই নাম তো জানি আওয়ামি লীগের সেক্রেটারির, মানুষ পাগল করে তোলেন নাকি মিটিঙে মিটিঙে। এই এক ছোকরা, এমন সারল্য কথাবার্তায়—নাম ভাঁড়িয়ে বলছেন না তো?

কিন্তু পরিচয়গুলো মুলতুবি থাক আপাতত। জরুরি চিন্তা মগজে। পরশু থেকে শান্তি সম্মেলন। বহুতর উৎকৃষ্ট জবান ছাড়া হবে বিশ্বজনের হিতার্থে—ঘরে ঘরে নিশিরাত্রে বক্তৃতার মহড়া চলছে, অনুমান করি। আর খোদার জীব আমরাও সেই ডামাডোলে নিতান্ত অবোলা হয়ে বসে থাকব না। কিন্তু তোড়ের মুখে হঠাৎ যদি কেউ বলে বসে, বাপু হে, ঘর সামাল করে তারপর পরের ভালো কপচাতে এসো। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে তোমরা যে পায়তারা ভেঁজে বেড়াচ্ছ, সেইটের ফয়শালা আগে করো দিকি।

মিলেছি যখন এই কল্যাণ-পরিবেশে, উপায় কিছু বাতলাবোই। মারামারি-কাটাকাটি করে যে সুহৃৎবর্গের গোপন আনন্দ জুগিয়েছি, ভাব করে ফেলে তাদের মুখে কাষ্ঠহাসি ফোটাব। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া নিজেরাই মেটাবো—বাইরের কেউ নাক গলাতে এসেছ কি নাক কেটে শূর্পণখা বানিয়ে দেবো নির্ঘাৎ···

সত্যি, কি মিষ্টি লাগল যে সকলের কথাবার্তা! মিষ্টি লাগল সেই ভোজের ঝাল-দোরমা অবধি (অতিকায় ঝাল-লঙ্কার খোলে মাংস ইত্যাদির পুর)। দইকে বলে সাওয়ার মিল্ক (sour milk)—ভোজের টেবিলের সেই দইয়েও যেন মধু ছিল সেদিন!

সন্ধ্যায় অনেক ধকল আছে—বিকালের বক্তৃতাদি থেকে রেহাই পাওয়া গেছে তাই আজ; দেদার ছুটি—কি করা যায়? আবার কি—ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াও কালকের উৎসব-ব্যবস্থা। দেখে দেখে সাধ মেটে না। বেলাবেলি কিন্তু ফেরা চাই হে—সেজেগুজে যে যার ঘরে বসে থাকবে, পাক্কা ছ'টার সময় বাসে পুরে ওঁরা অকুস্থলে চালান দেবেন। সবে তিনটে বাজল—ছ'টার অনেক দেরি। চলো।

সাহস কি পরিমাণ বেড়ে গেছে, শুনুন। আমার ধুতি-পাঞ্জাবিতে দৃষ্টি দিলে রক্ষে নেই—তেড়ে তেড়ে ধরছি তাদের। হাত টেনে নিয়ে সেকহ্যাণ্ড করি। ইন্দু, ইন্দু! ভালবাসা কুড়িয়ে টহল দিচ্ছি পিকিনের রাস্তায় রাস্তায় রাজচক্রবর্তীর মতো।

কাল জাতীয় উৎসব—যেদিকে তাকাই তারই আয়োজন। মানুষের অন্য ভাবনা-চিন্তা লোপ পেয়ে গেছে। মরা চীন নবীন মন্ত্রে মেতে উঠল এমনি দিনে তিনটে বছর আগে। নেপোলিয়ন সেই যে বলেছিলেন—'চীন? ঘুমন্ত দৈত্য—পড়ে থাকুক অমনি ঘুমিয়ে। জেগে যদি ওঠে—আরে সর্বনাশ! তামাম দুনিয়ার ঝুঁটি ধরে ঘুরপাক খাওয়াবে।' সেই কাণ্ড ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত।

লাল সিল্কের উপর সোনার রঙের হরপ বসিয়ে যাচ্ছে। মূর্খ মানুষ—পড়বার ক্ষমতা নেই। কি হে, কি অত লিখলে বলো দিকি? একটুখানি পড়ে মানে বলে দাও। 'চিরকাল বেঁচে থাকুক আমাদের এত সাধের নবীন-চীন; চিরজন্ম বেঁচে থাকুক আমাদের আদরের মাও-তুচি···'

মাও-তুচি মানে হল চেয়ারম্যান মাও। কণ্ঠের সমস্ত মধু ঢেলে দিয়ে ওরা উচ্চারণ করে। কেন জানি আমার মনে হত, প্রীতি বা শ্রদ্ধা তত নয়—বাৎসল্যের রসে কানায় কানায় ভরা কথা দুটো। চীনের তাবৎ মেয়েমদ্দ বাচ্চাবুড়ো মাও-সে-তুঙের মা বনে গিয়েছে। আহা, বিস্তর কষ্ট পেয়েছ তুমি মাও—আর নয়, সর্বসুখ ও শান্তি আসুক এবার জীবনে। কোটি কোটির মনে অহোরাত্রি ঐ একটি কামনা।

আলো, ফুল, পাঁচ তারার রক্ত নিশান, পীচবোর্ডের পায়রা—যেটা যেখানে চলে, সমস্ত খাটিয়ে ফেলতে হবে সন্ধ্যার আগে। আনন্দ-সজ্জায় ত্রুটি না থাকে কোন রকম। রাত্রে আজ বাড়িতে বাড়িতে ভোজ। বিয়ের আগে অধিবাসের মতন উৎসবের শুরু সন্ধ্যা থেকেই বলতে পারেন।

থিয়েন-আন-মেন—স্বর্গীয় শান্তির দরজা—নতুন গাঁথনি হয়েছে তার এদিকে-সেদিকে, নতুন করে রং ধরিয়েছে। হামেশাই এ পথে গতায়াত—সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরে, কখনো বা রাত দুপুরে। দিনে দিনে থিয়েন-আন-মেনের নতুন বাহার খুলছে। শরতের রোদে সমস্তটা দিন ঝিকমিক করে, আলো যেন ঠিকরে বেরোয়। শান্তির দরজা—তাই বটে! সুবিশাল অলিন্দের নিচে বড় দুয়ারটা খুলে ফেললেই বুঝি বিক্ষোভ-বেদনার সীমান্ত-পারে নিশ্চল মহিমময় শান্তি! দরজা ও পরিখা ইত্যাদির সামনের দিকটা বড় রাস্তা—পিকিনের চৌরঙ্গি বলতে পারেন। তার ওধারে অনেকগুলো পার্ক—পাঁচিল ভেঙে একসা করে দেওয়া হয়েছে। সমস্তটা মিলে পিপলস্ পার্ক। ভেঙে চুরে প্রতি বছরই জায়গা বড় করা হচ্ছে, এবারও হয়েছে, নইলে কুলোয় না। সবুজ ঘাস বসানো হয়েছে পার্কে, আর দূরতম প্রান্তে নানা রকম ফুল। কত ফুল ফুটে আছে, দুলছে প্রসন্ন হাওয়ায়!

সারারাত আলো-আলোময় করে রাখে উৎসব-ক্ষেত্র। তিনশ' কুড়িটা জোরালো বাতি—সিনেমা ষ্টুডিয়োয় যে ধরনের বাতি লাগে। গেল-বছর যা ছিল, তা থেকে একশ' কুড়িটা বেড়েছে। মহাচীনের বহু কোটি মানুষের প্রত্যাশা কেন্দ্রিত যেন এই একটি জায়গায়। এ আলো সরিয়ে নেওয়া হবে না উৎসব অন্তে। বছরের প্রতিটি রাত্রে জ্বলবে।

[ক্রমশঃ]

কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের পত্র

[নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর ... শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম-এর পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের ... এটর্নি স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়কে লেখা হইয়াছিল।]

১০, সাউথ স্ট্রীট, পার্ক লেন
লণ্ডন, ১১ই এপ্রিল

...,

সিলেক্ট কমিটি যে "নিউ বেঙ্গল রেণ্ট বিলের" কোন অংশ সম্পর্কে ... মত প্রকাশ করেন নাই, কমিটি যে মফঃস্বলের অফিসারদের ... বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং সরকার যে দ্রুত ... পাশ করাইবার চেষ্টা করাইবেন না—এই সকল সংবাদের ... আপনাকে ধন্যবাদ।

... সম্পর্কে আমি বিলের প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ... দির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছি। আমি জানিতে পারিয়াছি ... এখনও এখানে বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং এই কথা বলিলেই ... যে, বিলটি এখনও বিধিসঙ্গত ভাবে বিবেচনার অধ্যায়ে ... নাই; তবে ইহার প্রতি পূর্ণ-মনোযোগ আকর্ষণের পর্য্যাপ্ত ... হইয়াছে।

... আমার বিশ্বাস, বিলটি সংশোধন না করিয়া গৃহীত হইবে না ... এই সংশোধন রায়তকে পূর্ব-অধিকার দানের ভিত্তিতে করিতে ...।

আমি আশা করি, আপনি যে সব মূল্যবান তথ্যাদি সরবরাহ ... ছেন, তাহা বরাবর করিতে থাকিবেন। আমি আশা করি, ... বিলে আমি আপনাকে অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর দিতে ...।

আপনার রেগুলেশন, কলিকাতা গেজেট, বিলের উপর আপনার ... প্রভৃতির জন্য ধন্যবাদ। আমি এগুলির যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার ...। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

বঙ্গীয় বাকী খাজনা আদায় বিল

১০, সাউথ স্ট্রীট, পার্ক লেন
লণ্ডন, ৩০শে মে

...দের স্বাক্ষরের জন্য রচিত "সরাসরি বাকী খাজনা আদায় দ্বিতীয় ভাগের বিধান সমূহের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র আমার প্রেরণ করার জন্য আমি আপনার নিকট একান্ত ঋণী।

...টি সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী আইন সভার পরবর্তী ...ন পর্য্যন্ত খাজনা সংক্রান্ত বিলের আলোচনা মুলতুবী রাখিয়া ... খাজনা আইনটি সংশোধনের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করায় ...শেষ আনন্দিত হইয়াছি।

ইহাতে বড় ভালই না হইবে। তাঁহাদের শ্রম যেন সার্থক হয়।

আপনি যে সব সদস্যের নাম করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত ব্যক্তি।

আবেদনে এই কথাটি বিশেষ জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, জমিদারের দেয় খাজনা ১৭৯৩ সালে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে, কিন্তু রায়তের দেয় খাজনা ১৭৯৩ সাল অপেক্ষা তিন হইতে কুড়ি গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্যস্বত্বভোগীরা ইহার কিছুটায় ভাগ বসাইলেও রায়তের নিকট এরূপ কড়াকড়ি ভাবে অত্যধিক কর আদায় করা সঙ্গত নহে।

আবেদনে বলা হইয়াছে যে, ৩ ও ৪ ধারার বিধান সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

আপনি কি এ বিষয়ে একমত?

জমিদার মিথ্যা করিয়া বাকী খাজনার দায়ে চাষীর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিতে পারেন, এ বিষয়ে চাষীর আত্মরক্ষার উপায় নাই, ছোটখাট সরকারী কর্মচারীরা যাহাতে চাষীদের রক্ষার ব্যবস্থা না করেন তজ্জন্য তাঁহাদের উৎকোচ দিয়া বশীভূত করা যায়, কয়েক আনা খরচ করিলে মিথ্যা সাক্ষীর অভাব হয় না—এই সব মন্তব্যগুলি একান্ত সত্য বলিয়াই মনে হয়।

'ইণ্ডিয়ান ট্রিবিউন'এ প্রকাশিত যে তালিকা আপনি প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে বলা হইয়াছে—২৪ পরগণা জেলায় ১১১৫টি মামলায় বিবাদী পক্ষ মামলা লড়ে এবং তন্মধ্যে মাত্র ৭৮টি ছাড়া সবগুলিতেই জমিদার পক্ষের জয় হয়।

বাকী খাজনার মামলায় কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করিতে হইলে বাদী জমিদারের উপরই তাহা আরোপিত হওয়া উচিত।

ইহা ছাড়া "বেঙ্গল রেণ্ট বিলে"র দ্বিতীয় ভাগটি জমিদারের দুর্নীতি-পরায়ণ আমলার হাতে উৎপীড়নের যন্ত্রে পরিণত হইবে। এই সব দুর্নীতি দূর করার কোনও উপায় আপনি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন কি?

পূর্ববঙ্গে রেণ্ট লীগ সমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা কি সত্য?

বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গলায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত অধিক যে তাহা হাজার হাজার অধিবাসীর ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে।

পরে যখন পত্র দিবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া ইহার উল্লেখ করিবেন। এই ব্যাপারে রেণ্ট বিলের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমি চুপ করিয়া বসিয়া নাই।

সময় ও শক্তির অভাবে আরও কতকগুলি প্রশ্ন বাকী থাকিয়া গেল, সেগুলি পরের পত্রে উত্থাপন করিব। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

লণ্ডন, ২০শে জুন

মহাশয়,

১৯ : সালের এপ্রিল মাসের কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা পেরণের জন্য আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। ইহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারী বলিয়াছেন, জমিদারসুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সংশোধিত বিল তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজে লাগিবে না এবং তাঁহারা কমিশন চাহেন।

এখানে ইণ্ডিয়া অফিসের সংবাদ এই যে, বিলটি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সমগ্র বিষয়টি নূতন করিয়া একটি কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। সুতরাং কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই করা যাইতে পারে না।

নূতন কমিশনের সদস্য হিসাবে যাঁহাদের নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে তাঁহারা রায়তদের শত্রু নহেন এবং আমি ঐকান্তিক ভাবে আশা করি, তাঁহারা রায়তদের বক্তব্য শ্রবণ করিবেন এবং প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবেন।

এই ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের কোন উপায় অবশ্যই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কারণ এই সমস্যাটির তুলনায় অন্যান্য সকল সমস্যা অকিঞ্চিৎকর।

টাকার জোরে যাহারা সকলকে দিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করাইতে পারে, উকিল, সংবাদপত্র, আইন সভার দেশীয় সদস্য প্রভৃতি যাহাদের করতলগত, নূতন বন্দোবস্তে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইবে না এরূপ আশঙ্কা করিলে চলিবে না, তাঁহারা লাভবান না হইতেও পারেন।

এমন সদাশয় উকিল হয় ত আছেন যাঁহারা অর্থের লোভ ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বল রায়তের পক্ষ অবলম্বন করিবেন ; এমন সংবাদপত্রও পাওয়া যাইবে যাহা সঠিক তথ্যাদি প্রকাশ করিয়া রায়তদের সাহায্য করিবে। আমরা এমন আশাও করি, এমন দিন হয়ত আসিবে যখন আইন সভার দেশীয় সদস্যরা কেবল জমিদারের স্বার্থই দেখিবেন না।

ইউরোপের দেশ সমূহে তরুণেরা দরিদ্রদের সেবায় এই ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভায় পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছেন। অনেকে প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছেন।

নিঃস্বার্থ ভাবে রাজনৈতিক কাজ করা মস্ত গুণ।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা যায়। দেশীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের অধীনস্থ দরিদ্র চাষীদের নিকট হইতে ঘুষ আদায় করিয়া থাকেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

এক্ষণে ইংলণ্ড হইতে এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু রুশিয়ায় যথেষ্ট মাত্রায় আছে।

ভারতে যদি এমন একদল তরুণ পাওয়া যায়, (আছে বলিয়াই মনে হয়) যাঁহারা সরকারের অনাচার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিবেন, উৎকোচ গ্রহণে বিরুদ্ধ দল গঠন করিবেন এবং দেশীয় কর্ম্মচারীদের দরিদ্রদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করা বন্ধ করিবেন।

'একরূপ উদ্দেশ্য কতই না মহৎ।'

ভারতের ইংরাজ কর্ম্মচারীদের পক্ষে পিওন, ওভারসিয়র প্রভৃতি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের দরিদ্রদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ নিবারণ করা সম্ভব নহে। কেবল মাত্র দেশীয় ভদ্রলোকরাই উৎকোচ গ্রহণের বিরুদ্ধে লড়িতে পারেন। ঈশ্বর তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করুন।

গুরুত্বপূর্ণ 'ক্যালকাটা গেজেট'খানি পড়িয়া ফেলিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু সময় ও শক্তির অভাবে পড়া হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, ইংলণ্ডে ভারত ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দিয়াছে। ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেন্টের উভয় সভায় ভারতের প্রশ্ন স্বদেশের প্রশ্নের ন্যায় আলোচিত হইতেছে। ইংলণ্ডের এই নূতন জনমতকে সচেতন তথ্য সম্বন্ধে অবহিত করা দরকার।

আপনি যে আপনার মফঃস্বলের বন্ধুদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র প্রচার করিতেছেন এবং আপনি নিজে তথ্য সংগ্রহে বাহির হইতেছেন—ইহাতে আমি খুব আনন্দিত হইয়াছি। ইহাই দরকার।

বঙ্গীয় খাজনা আইন সংক্রান্ত কমিশনের কথায় আসা যাউক। রায়তের জমিকে সম্পত্তি বলা আপনার অভিপ্রেত হইবে না কি? ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এবং আমাদের দেশে এইরূপ হইয়াছে।

আইন অনুযায়ী দেয় খাজনা ব্যতীত বেআইনী ভাবে [illegible] আদায় হইতে রায়তকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন [illegible] উচিত। আইনতঃ গ্রাহ্য খাজনা সম্পর্কে খুব কম মামলাই হইয়া থাকে, কিন্তু বেআইনী ভাবে কর আদায়ের জন্য বহু মামলা হয়। স্বত্বাধিকারের ব্যাপারে জমিদারগণ সমর্থন লাভ করেন। [illegible] এক অবিসংবাদী মিশন দেখাইয়া দেন যে, প্রায়ই বেআইনী [illegible] টাকা আদায় করা হয়, তখন সকল প্রকার বিশেষ হস্তক্ষেপ বন্ধ [illegible] এবং রায়তরা বৈধ প্রতিকারের সম্মুখীন হন।

আমার মনে হয়, বর্ত্তমানে কর বা অতিরিক্ত করের মামলা দেওয়ানী মামলা হিসাবে রুজু করা চলে। ফলে ইহার নিষ্পত্তি হইতে বিশেষ বিলম্ব হয়। যাহাতে অল্প খরচে এবং শীঘ্র এই [illegible] মামলার নিষ্পত্তি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি? বাংলা ও বিহারে জমিদারের কাগজপত্র যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। জমিদারের কাগজপত্রের (খাজনার রসিদ) [illegible] লইবার জন্য রায়তদের মজঃফরপুর পর্য্যন্ত যাইতে হয়। জমি যদি ঠিক হিসাব রাখিতে না পারেন, তবে তাঁহারা সরাসরি [illegible] সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

আমি এখন লেখা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইতেছি। পরের চিঠি দিবার আশা করি।

ইতোমধ্যে আপনি আমাকে যে সব মূল্যবান তথ্য [illegible] করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আপনি আরও অধিক তথ্য সরবরাহ করিবেন। ইতি— আপনার বি[illegible]

ফ্লোরেন্স নাইটি[illegible]

মাদাম হেলভেসিয়াসকে লেখা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলি[illegible] প্রেমপত্র

[১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ফ্রান্সে আসেন স[illegible] কাজে। প্যারিসে যেখানে তিনি বাস করতেন তাঁর নিকট-প্রতি[illegible]

মাদাম হেলভেসিয়াস—বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক হেলভেসিয়াসের বিধবা পত্নী। ফ্রাঙ্কলিনের নিজের স্ত্রী-বিয়োগ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তথাপি এই পতিহীনা মনোরমার প্রতি তাঁর মন দিনে দিনে প্রেমরসে সিক্ত হয়ে উঠতে ... শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে ... পত্রটি লেখেন। ফ্রাঙ্কলিনের বয়স তখন বাহাত্তর আর ...টির বয়স একষট্টি। মাদাম তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও ...লিনকে তিনি প্রীতি ও ভালবাসার চক্ষেই দেখতেন। এই ...বাসা দিনে দিনে আরো গভীরতর হয়েছিল।]

পাসি, জানুয়ারী, ১৭৮০

...স্বামীর স্মৃতির প্রতি একনিষ্ঠ থাকবে জীবনের শেষ দিন ...—থাকবে সঙ্গীহীন একলা, তোমার এ অটল সংকল্পের কথা ... গভীর মর্মপীড়িত হয়ে গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এসে ... শুয়ে পড়েছিলাম বিছানায়। ভেবেছিলাম আমারও জীবন-...ফুরোল। যেন মর্তলোকের সকল সম্পর্ক চুকিয়ে চলে গেছি ...। সেখানে যেতেই কে যেন প্রশ্ন করল—'কাউকে ... ইচ্ছা হয় কি?' বললাম—'দার্শনিকদের কাছে নিয়ে চল ...।' 'মাত্র দু'জন দার্শনিক নন্দনকাননে বাস করেন। তাঁরা ...পরের প্রতিবেশী। পরম সম্প্রীতিতে আছেন তাঁরা।' 'কে তাঁরা?' ...তিস আর হেলভেসিয়াস।' 'দু'জনকেই আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। তবে হেলভেসিয়াসের সঙ্গেই আমি প্রথম সাক্ষাৎ করতে চাই। কারণ ফরাসী ভাষা আমি একটু-আধটু বুঝি কিন্তু গ্রীক ...বারেই নয়।' হেলভেসিয়াসের কাছেই নিয়ে গেল আমায়। ...নি সৌজন্যের সঙ্গে আমাকে আপদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। ...র সুনাম তিনিও শুনেছেন। যুদ্ধ, ধর্মের বর্তমান অবস্থা, ...স্বাধীনতা, ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে হাজারো প্রশ্ন ...লেন। আমি বললাম—'আপনি ত আপনার স্ত্রী মাদাম ...ভেসিয়াস সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞেসা করলেন না? তিনি ...পনাকে খুবই ভালবাসেন। এখানে আসার মাত্র আধ ঘণ্টা ... আমি তাঁর ওখান থেকেই আসছি।' তখন বললেন তিনি '...তোমার কথায় অতীতের বহু সুখস্মৃতি মনে পড়ছে। কিন্তু ...ন শান্তিতে থাকতে হলে সে সব কথা এখন ভুলে যেতেই ...। বহু কাল সে আমার দিনরাত্রির একমাত্র ধ্যান-ধারণা হয়ে ... অবশেষে মনের শান্তি ফিরে পেলাম। আর এক জনকে ...সেবে গ্রহণ করেছি এখানে। সে অবশ্য হেলভেসিয়াসের মত ... নয়। কিন্তু তার মত সেও শান্ত ধীময়ী। সেও আমাকে ভালবাসে। তারও একমাত্র চেষ্টা আমাকে খুশীতে রাখা। ...জন্য অমৃত আনতে গেছে সে। অপেক্ষা কর—এখুনি পড়বে।' কিন্তু আমি বললাম—'আপনার সহধর্মিণী ...চেয়ে অধিকতর বিশ্বস্ত—একনিষ্ঠ পতিপরায়ণা। ...কত লোক তাঁর পাণিপ্রার্থী কিন্তু প্রত্যেককেই ...ন করেছেন তিনি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমিও প্রাণভরে ভালবেসেছি। কিন্তু আপনার প্রতি নিষ্কলুষ ...জন্য আমার প্রতিও তিনি অত্যন্ত নির্দয় আচরণ করেছেন। ...ও প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি।' 'তোমার মন্দ-ভাগ্যের ...খ বোধ করছি'—বললেন তিনি—'সত্যিই সে অতি ভাল মেয়ে। অতি মনোরমা কিন্তু আবে দ্য লা রসি ও আবে মরেলে— ওদের দু'জনের এখনও সেখানে গতায়াত আছে কি?' 'তাঁরাও আসেন বৈ কি। আপনার স্ত্রী আপনার বন্ধু-বান্ধবদের এক জনকেও ত্যাগ করেননি।' 'কফি ক্রীম খাইয়ে আবে মরেলেকে তোমার হয়ে ওকালতি করাতে পার যদি তবেই সাফল্যের আশা আছে। লোকটি স্কোটাস ও সেণ্ট থমাসের মতই নিপুণ তার্কিক। এমন সুকৌশলে সে তার যুক্তির অবতারণা করে যে একেবারে অপ্রতিরোধ্য। অথবা আবে দ্য লা রসিকে যদি তোমার বিরুদ্ধে বলার জন্য পুরানো ক্লাসিক ঘুষ দিয়ে হাত করতে পার, তাহলে আরো ভাল হয়। কারণ আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, সে যা বলে ঠিক তার উল্টোটি করার দিকে মাদামের ঝোঁক।'

তাঁর সঙ্গে কথা শেষ হতে না হতেই সুধাভাণ্ড হাতে নব-পরিণীতা বধূ ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি যে আমার আমেরিকান বান্ধবী মিসেস্ ফ্রাঙ্কলিন, চিনতে আমার একটুও বিলম্ব হোল না। আমি তাঁকে ফিরে পাবার জন্য দাবী জানালাম। কিন্তু প্রত্যুত্তরে অতি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললে সে—'আমি দীর্ঘ উনপঞ্চাশ বছর চার মাস তোমার সঙ্গে ঘর করেছি। প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল! তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।' এই উত্তর শুনে আমি অতি ক্ষুণ্ণ হয়ে তক্ষুনি অকৃতজ্ঞের রাজ্য ছেড়ে চলে এলাম। সুখের আলোয় ভরা মর্তের পৃথিবীতে যেখানে তুমি আছ। আবার ফিরে এসেছি আমি। এস, আমরা এই অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ নি'। ইতি

আব্রাহাম লিঙ্কোলনের একখানি চিঠি

২৬শে জানুয়ারী, ১৮৬৩

প্রিয় মেজর জেনারেল হুকার,

পোটোম্যাক সৈন্যদলের নেতৃত্ব ভার আপনার উপর ন্যস্ত করিলাম। যথেষ্ট যুক্তি আছে বলিয়াই এরূপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। কিন্তু তথাপিও কতকগুলি ব্যাপারে আপনার আচরণে আমি আদৌ সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই, তাহা আপনাকে জানান সঙ্গত মনে করিতেছি। আপনি নির্ভীক সুদক্ষ সৈনিক। আপনি আপনার বৃত্তির সহিত রাজনীতির সংমিশ্রণ করেন না বলিয়াই আমার ধারণা। আপনি আত্মবিশ্বাসী, অপরিহার্য না হইলেও ইহা একটি মহৎ গুণ। আপনি উচ্চাকাংখী। একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উচ্চাকাংখা ক্ষতির পরিবর্তে মঙ্গলই করে। কিন্তু বলিতে বাধ্য হইতেছি। যে, জেনারেল বার্ণিসাইডের নেতৃত্বের সময় আপনি আপনার উচ্চাকাংখার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পদে পদে বাধা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আপনি দেশের এক অশেষ গুণসম্পন্ন মহান্ ভ্রাতার প্রতি অতীব অন্যায় আচরণ করিয়াছেন।

সৈন্য ও সরকারের পক্ষে এখন একজন ডিক্টেটারের প্রয়োজন, আপনার এইরূপ একটি সাম্প্রতিক উক্তির কথা আমি শুনিয়াছি। যাহাদের নিকট হইতে শুনিয়াছি তাহাদের অবিশ্বাস করিতে পারি না। অবশ্য ইহার জন্য নহে এবং এ সব সত্ত্বেও আপনার উপরই নেতৃত্ব-ভার অর্পণ করিলাম। একমাত্র সফলকাম সেনানায়কই ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠার ভয় অগ্রাহ্য করিয়াই আমি আপনার নিকট সামরিক সাফল্য প্রত্যাশা করি।

সরকার আপনাকে সাধ্যমত সকল প্রকার সাহায্য করিবেন এবং প্রত্যেক সেনানায়কের ক্ষেত্রে যেমন করিয়া থাকেন তাহার ন্যূনতা ঘটিবে না। প্রধান সেনানায়কের কার্যের সমালোচনা দ্বারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিয়া সেনা-মহলে যে মানসিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন, ভয় হয়, এখন তাহা আপনারও বিপক্ষে যাইবে। ইহা দমন করিতে আমি আপনাকে সাধ্যমত সাহায্য করিব। আপনি, এমন কি নেপোলিয়ানও—যদি তিনি এখন জীবিত থাকিতেন—কেহই এইরূপ চেতনাসম্পন্ন সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে না। অতএব হঠকারিতা সম্বন্ধে সাবধান! হঠকারিতা পরিহার করুন ইহাই আমার উপদেশ। অনন্তকর্মা হইয়া বিনিদ্র সতর্কতার সহিত অগ্রসর হউন। আমরা চাই জয়। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত—
এ. লিঙ্কোলন।

জুলিয়া ওয়ার্ড হাউয়ের চিঠি

[অস্কার ওয়াইল্ডের কবিতা-পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হলে রক্ষণশীল মহলে প্রবল আলোড়নের তুফান উঠেছিল। নীতিবাগীশরা কবিতার চেয়ে কবিকেই ভয় করতেন বেশী।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অস্কার ওয়াইল্ড আমেরিকায় এলে জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ নাম্নী জনৈক মহিলা তাঁকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক কার্যে ক্ষিপ্ত হয়ে কর্ণেল হিগিনসন তাঁকে তীব্র ভৎর্সনা করে একখানি চিঠি প্রকাশিত করেন 'উয়োম্যান্স জার্ণালে'। সেই পত্রের উত্তরে জুলিয়া ওয়ার্ড হাউও 'বোষ্টন ট্র্যান্সক্রিপ্টে' নীচের খোলা চিঠিটি লেখেন।]

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২

অস্কার ওয়াইল্ডকে ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীতে সংবর্ধনা করায় কর্ণেল হিগিনসন 'উয়োম্যান্স জার্ণালে' আপত্তি জানিয়েছেন। উক্তোক্তাদের মধ্যে আমার নামও উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই এ কথা আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, ওয়াইল্ডকে আমার বাড়ীতে অভ্যর্থনা করার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমার বাড়ীতে কাহাকে আমন্ত্রণ করা হবে বা হবে না, সে-সম্বন্ধে পত্রিকা মারফৎ মন্তব্য করার অধিকার কর্ণেলের নিজে গ্রহণ করার ধৃষ্টতা দেখে আমিও তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি।

মিঃ ওয়াইল্ডের প্রকাশিত কবিতা জগতের সামনেই রয়েছে। পাঠক মাত্রেরই সে-কবিতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা এক আর কবিকে নিন্দা করা সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রসঙ্গত, কর্ণেল লর্ড বায়রনের সমাজচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন। কর্ণেল হয়ত ভুলে গেছেন যে ব্যক্তিগত কলঙ্কই শুধু বায়রনের অসম্মানের জন্য দায়ী—তা ছাড়া তাঁর কবিতার গণতান্ত্রিক ভাবধারাও তদনীন্তন গোঁড়া রক্ষণশীল ইংল্যাণ্ডের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড নাড়া দিয়াছিল। লর্ড বায়রনের আপত্তিকর কবিতাগুলি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের গোড়ার নয়, শেষ পর্যায়ে লেখা। তাঁর স্বদেশবাসিগণের হস্তে লর্ড বায়রন যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন তার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই দুঃখিত এবং আমার বিশ্বাস, ইংল্যাণ্ডের অনেকেই আমার মত দুঃখিত। সমাজের একজন নিন্দনীয় ব্যক্তিকেও সমাজের মঙ্গলময় প্রভাব ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা খৃষ্টজনোচিত নয়। সেদিনের ইংল্যাণ্ড তার একজন অবিমৃষ্যকারী উজ্জ্বল সন্তানের প্রতি মাতৃসুলভ আচরণ করেনি। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে—মেয়েদের যদি সমাজের পবিত্রতার রক্ষক বলা হয়, তারা সুকোমল মতি ও স্বর্গীয় স্নেহ-প্রীতিরও ধারক।

বহু সুধীজন তরুণ অস্কার ওয়াইল্ডের মধ্যে প্রীতিময় গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যা কর্ণেল হিগিনসনের মত সুযোগ্য বিচারকও প্রশংসাযোগ্য বলতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি আমাদের দেশে এসেছেন জ্ঞান বিতরণ করতে কিন্তু যত দূর জানি, তাঁর স্বল্পস্থিতিকালে আমাদের দেশ থেকেও কিছু জ্ঞান আহরণ করে নিয়ে যাবার সংকল্প করেছেন তিনি। কাজেই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ গৃহদ্বার তাঁর জন্য অবারিত হোক্—আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী যাঁরা তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেওয়া হোক তাঁকে।

তাঁর শিরা-উপশিরার গভীরে মারাত্মক বিষ প্রবাহিত—অপবাদ প্রচার করা হলেও আমি তাঁর জন্য কর্কশ নিন্দা ও উগ্র ভৎর্সনার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা দিতে বলব না। বরং বলব, সমাজের মধুরতম বিশুদ্ধতম পবিত্রতম যা-কিছু তা আস্বাদনের সুযোগ দানের জন্য তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান হোক। তিনি যখন এ দেশের তটভূমি ত্যাগ করে যাবেন, আতিথ্যের মধুময় স্মৃতি যেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন। আমরা ভুলে যাব তাঁর যৌবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি। কামনা করব তাঁর উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ বিকাশ।

ইতি—
জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ

আগে ভাষা পরে রাজনীতি

প্রসিদ্ধ চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তাঁকে দেশ-শাসনের ভার দেওয়া হলে প্রথমে তিনি কি করবেন। কনফুসিয়াস উত্তর দিলেন,—"ভাষাকে নির্ভুল করা।" শ্রোতারা বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, "ভাষাকে নির্ভুল করার সঙ্গে দেশ-শাসনের কি সম্পর্ক?" উত্তর হ'লো—"ভাষা যদি নির্ভুল না হয় তাহলে যা বলা হবে তার মানে হবে আলাদা এবং মানে যদি আলাদা হয় তাহলে যা করতে চাওয়া হবে তা করা হবে না—ফলে নীতি, ধর্ম ও কলাশিল্পের অবনতি ঘটবে, সুবিচার হবে না, লোকে ভয়ানক মুস্কিলে পড়ে যাবে। সুতরাং যা বলা হবে তার মধ্যে যেন কোন স্বৈরাচার না থাকে। এইটাই হল সব চেয়ে বড় কথা।"

—মুকুল মুখোপাধ্যায়

চিংড়ী

প্রথম পুরস্কার)

—ক্ষুদিরাম মাইতি

সামুদ্রিক মৎস্য —নির্মল দত্ত

ইলিশ (দ্বিতীয় পুরস্কার) —সবিতা মিত্র

মাছ ধরা
অজিৎকুমার মিত্র
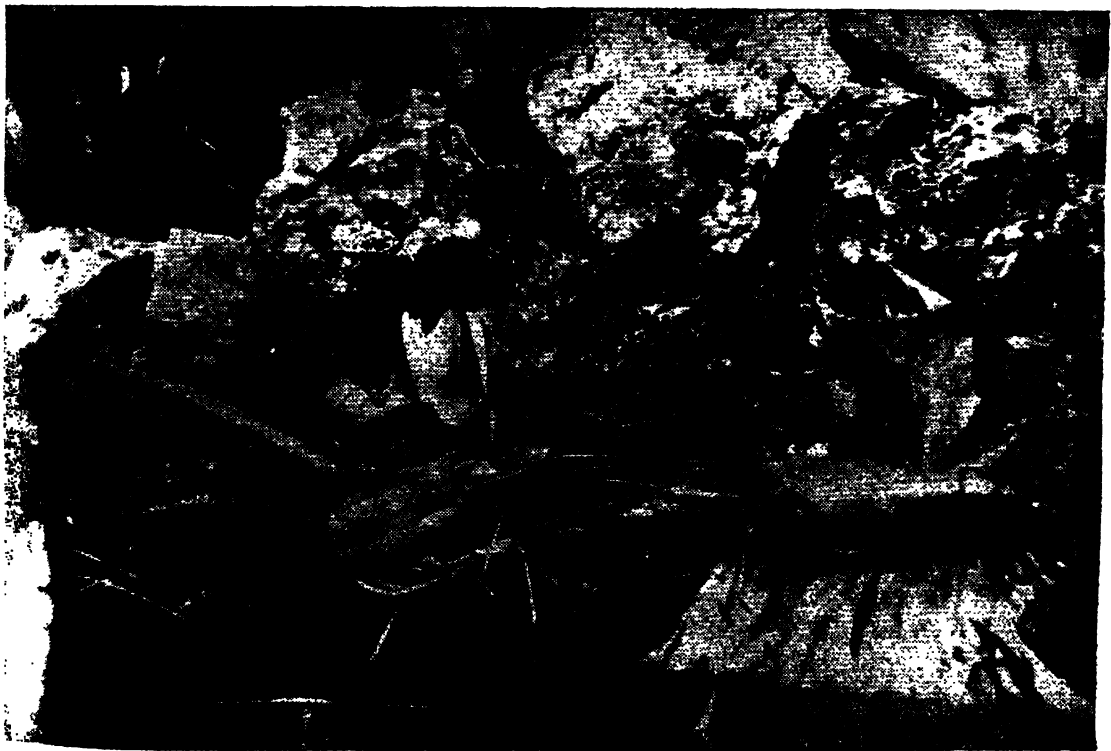
চিংড়ী
—গোবিন্দলাল দাস
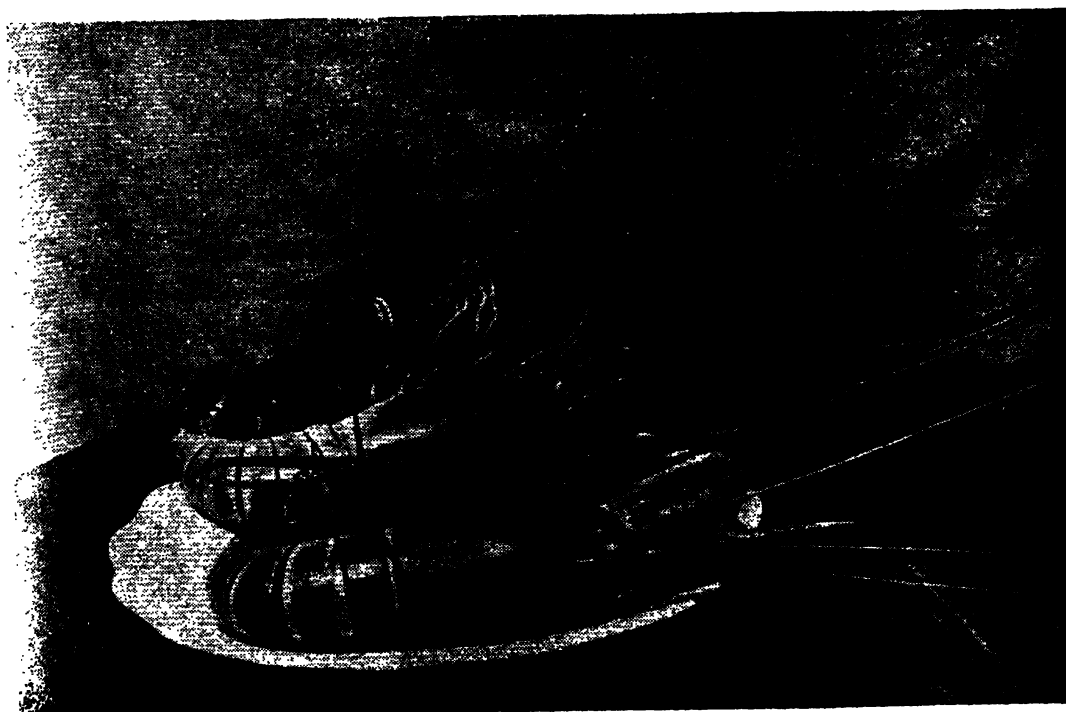
মাছ ভাজা
—গৌর দত্ত

-প্রতিযোগিতা-

বিষয়
বাঙলার মেয়ে

প্রথম পুরস্কার—১৫৲

দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৲ তৃতীয় পুরস্কার—৫৲

(ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২২শে ভাদ্র)।
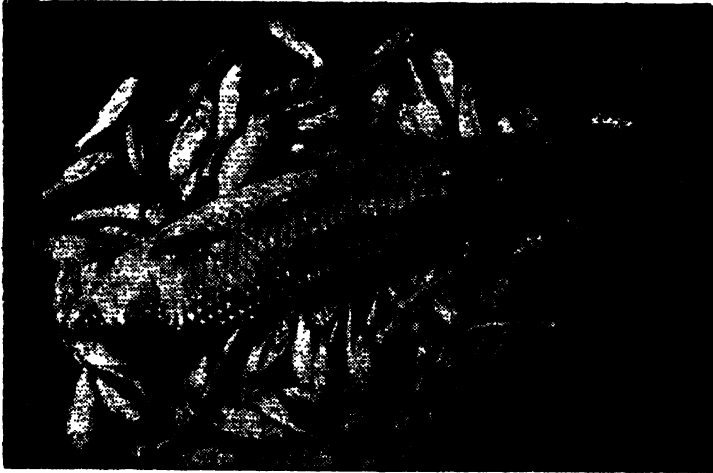
সপরিবারে
—শিশির চক্রবর্ত্তী
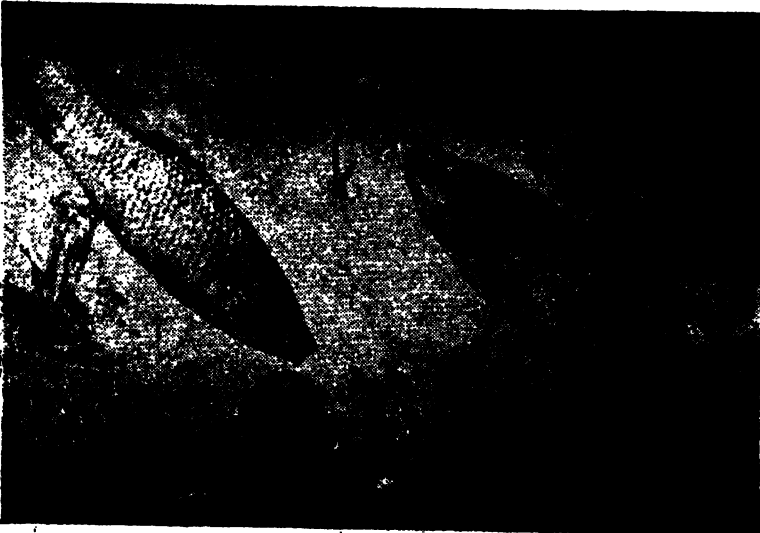
বঁড়শির মুখে
(তৃতীয় পুরস্কার)
—জহর ঘোষ

ভয়

পারুল চট্টোপাধ্যায়

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিগান থেকে লেখিকা 'ভয়' নামক এই কাহিনীটি পাঠাইয়াছেন। কাহিনীটির অন্যতম আকর্ষণ নায়ক, নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রগুলি বৈদেশিক। আমরা লেখিকার লেখায় সাহিত্যিক বৃত্তির সন্ধান পাইয়া লেখিকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মনে করিতেছি। কাহিনীটি পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণও তৃপ্তি পাইবেন। —সম্পাদক]

মিসিগানে তখন গরমকাল। ছোট শহরটিতে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না—একটা ছোট নদী, খানিকটা বন-জঙ্গল, কিছু দোকান-পত্র, আর একটা ছোট পাহাড়ের মত উঁচু টিবি, যার ঢালু পথটাকে সবাই গড়ানে বলতো। সন্ধ্যা বেলায় প্রায় সমস্ত দোকানপত্র বন্ধ হয়ে গেছে কেবল ড্রাগ ষ্টোরগুলো খোলা আছে। পথ-ঘাট খুবই ফাঁকা। পুবের আকাশে চাঁদ উঠেছে—সহরের মাঝখানে টাওয়ারের মাথায় ঘড়ি চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে।

সহরের ড্রাগ ষ্টোরগুলোতে ছোট ছোট পাখা ঘুরছে—বেশ গরম—লোক-জন ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠছে।

ল্যাভিনিয়া নেবস্ তার গাড়ীবারান্দার নীচে হাতে একটা লেমনেড নিয়ে বসেছিল—বয়স প্রায় আটত্রিশ—অবিবাহিতা রোগা সম্বাটে চেহারা। জিনিয়া আর হিবিশ্বাস ফুলের মৃদু গন্ধ—ল্যাভিনিয়ার মনে মায়াজাল বুনছে। "ল্যাভিনিয়া, কই রে?" ল্যাভিনিয়া ফিরে দেখল গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রনসিন। ফ্রনসিনও অবিবাহিতা, ল্যাভিনিয়ার বন্ধু—বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, দেখলে অবশ্য তা মনে হয় না—বড় বেশী ফ্যাকাশে।

ল্যাভিনিয়া উঠে দাঁড়ালো। সামনের ঘরের দরজা বন্ধ করে লেমনেডের গেলাসটা এক ধারে সরিয়ে রাখতে রাখতে বললো, "ভারি সুন্দর সন্ধ্যা—সিনেমা দেখার পক্ষে, ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না।" রাস্তার ওপার থেকে একটি মহিলা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলো, "ওগো মেয়েরা, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?" ওকে ওরা ঠাকুমা বলতো। এরা মুখ ফিরিয়ে বললো, "এলিট থিয়েটারে, একটা খুব ভাল বই হচ্ছে—'হে বিপদ স্বাগত', তাই আমরা দেখতে যাচ্ছি। নামের কেমন চটক দেখেছো ঠাকুমা!" ঠাকুমা আবার চিৎকার করে বললো "এই, যাসনি এই রাতে। ভুতুড়ে মানুষ গলা টিপে মেরে ফেলবে।" তার পর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। দুই বন্ধুতে হাসতে হাসতে চলতে আরম্ভ করলো। ল্যাভিনিয়ার বড় বেশী গরম হচ্ছিল—যেন একরাশ গরম রুটির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

ফ্রনসিন খানিকক্ষণ নীরবে চলার পর জিজ্ঞাসা করলো, "হ্যাঁ রে ল্যাভিনিয়া, এই যে ভুতুড়ে মানুষকে নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনা, এর কথা কি তুমি বিশ্বাস করো?" "আরে না, না, তুমি কি জানো না যে মেয়েরা গালগল্প পেলে আর কিছু চায় না!" "তবে এই যে হ্যাতি ম্যাকডলিসকে কে মেরে ফেললো, আর আগের মাসে রবার্টা মরলো, আর এলিস র‍্যামসেলই বা কোথায়?" "আমি বাজী ফেলে বলতে পারি হ্যাতি ম্যাকডলিস একজন বিদেশী ভ্রমণকারীর সঙ্গে পালিয়ে গেছে।" "কিন্তু বাকী ক'জন?"

কথা বলতে বলতে তারা সেই টিবির ধারে এসে পড়লো। এই টিবিটা সহরটা দু'ভাগে ভাগ করেছে। সামনের ভাগে আলোকোজ্জ্বল বাড়ী আর তার থেকে ভেসে-আসা মৃদু রেডিওর গান-বাজনা। আর অন্য ভাগে অর্থাৎ পিছনের ভাগে স্তব্ধতা আর ভয়াবহ অন্ধকার। সেই ভাগে ল্যাভিনিয়ার বাড়ী। আলোকোজ্জ্বল ভাগে যেতে হলে সেই টিবিটা পার হতেই হবে।

"সিনেমা গিয়ে কাজ নেই ল্যাভিনিয়া",—ফ্রনসিন বললো, "ভুতুড়েটা হয়ত পিছু নেবে তার পর গলা টিপে মেরে দেবে। আমি এই টিবিটা মোটেই পছন্দ করি না—কি দুর্ভেদ্য অন্ধকার রে বাবা!" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফ্রনসিন আবার বললো, "যাক্ বাবা, আমাকে আর এই পথ দিয়ে ফিরতে হবে না, দিনের আলোতে যখন তোমার বাড়ী আসছিলাম তখনও আমার কেমন গা ছম্‌ছম্ করছিলো—কে জানে কোন্ গাছের আড়ালে কে লুকিয়ে আছে!" "দূর ভীতু কোথাকার!"—হাসতে হাসতে ল্যাভিনিয়া বললো। "যাই হোক",—ফ্রনসিন মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, "তুমি এ পথ দিয়ে যখন আসবে তখন নিজের জুতোর খট্‌খট্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবে না।—সমস্ত টিবিটা তোমাকে একা পার হতে হবে। আচ্ছা ল্যাভিনিয়া, এই বাড়ীতে একা থাকতে তোমার ভয় করে না।" "চিরকুমারীরা একা থাকতে ভালবাসে,"—বললো ল্যাভিনিয়া, "এস আমরা এই সড়গড় পথটা ধরি ঘুর-পথে না গিয়ে?" "না না আমার ভয় করছে!" "কেন?"—বললো ল্যাভিনিয়া, "এখনও ত বেশী রাত হয়নি, ভুতুড়েটা এখনই কিছু তোমাকে তাড়া করে আসবে না।"

ল্যাভিনিয়া ফ্রনসিনের হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। খানিকক্ষণ নীরবে চলার পর ফ্রনসিন চুপি-চুপি বলে উঠলো, "দৌড় দাও ভাই!" "না, ছেলেমানুষী কোরো না ফ্রনসিন—আমরা দু'জনে রয়েছি, ভয় কি?"—সান্ত্বনার সুরে ল্যাভিনিয়া, বললো। "ও কি!" ল্যাভিনিয়া যদি তার মাথা না ফেরাতো তবে কিছুই দেখতে পেতো না, কিন্তু মাথা ফেরাতেই সে দেখতে পেলো। পথের ওপর দাঁড়িয়ে তারা যা দেখতে পেলো তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলো না। সেই ঝিঁঝিঁ-ডাকা রাত্রে ঝোপের মধ্যে আধখানা দেহ—আর আধখানা বাইরে ফেলে শুয়ে আছে এলিস র‍্যামসেল! যেন মাঠের ওপর শুয়ে রাতের আকাশে তারার ঝকমকানি দেখছে! ফ্রনসিন চিৎকার করে উঠলো। চাঁদের আলোয় এলিসার মুখখানি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—চোখ দুটি যেন ঠিক কাচের গুলীর মত ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আধখানা জিভ ঠোঁটের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে। ল্যাভিনিয়ার হঠাৎ মনে হোলো, সমস্ত জায়গাটা

যেন ভীষণ ভাবে দুলছে! ফ্রনসিনের গোঙানী—যেন কে তার গলা টিপে ধরেছে। এমন ভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর ল্যাভিনিয়া বলে উঠলো, "পুলিশ ডাকা উচিত।" "ল্যাভিনিয়া আমাকে বাঁচাও"—ফ্রনসিনের চিৎকারে ল্যাভিনিয়ার চটক ভাঙলো, দু'হাত দিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো।

* * * *

সমস্ত ঢিবিটা তখন পুলিশে ভর্তি হয়ে গেছে। চার দিকে বড় বড় উজ্জ্বল ফ্লাশ লাইট বসিয়ে তারা দেখাশুনা আরম্ভ করে দিল। ল্যাভিনিয়ার বুকে মাথা রেখে চোখ না খুলেই ফ্রনসিন বললো, "আমি যেন জমে বরফ হয়ে গেছি।" এমন সময় পুলিশের কর্তা বললো, "মেয়েরা, এখন তোমরা যেতে পারো, কাল সকালে থানায় এসো একবার, কিছু প্রশ্ন করার আছে।"

দু'জনে পুলিশের কর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার চলা আরম্ভ করলো। এবার ল্যাভিনিয়ারও শীত করছিলো—নিজের বুকের ধড়ফড়ানি এত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কখনও। ফ্রনসিন তখনও কোঁপাচ্ছে। এলিসা ব্যামসেল দু'জনেরই বান্ধবী—তার এমন শোচনীয় মৃত্যু হবে কেই বা জানতো! একজন পুলিশ চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলো, একজন পাহারাওলা তাদের চাই কি না? তাদের কিছুই চাই না বলে ল্যাভিনিয়া আবার পথ চলা সুরু করলো। পথ চলতে চলতে সে নিজের মনে যা দেখলো তা ভুলতে চেষ্টা করলো, "উঃ কি ভয়ানক!" ল্যাভিনিয়া বিশ্বাস করতে পারছে না। ভগবান সব ভুলিয়ে দাও। সে চায় না ভাবতে। কি সাংঘাতিক দৃশ্য!

"মরা মানুষ আমি এর আগে কখনও দেখিনি",—ফ্রনসিন বললো। ল্যাভিনিয়া হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "সবে সাড়ে নটা—হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে চল সিনেমা যাওয়া যাক্।" "সিনেমা · আবার!" "হ্যাঁ আমরা যা চেয়েছিলাম, নয় কি?" "ল্যাভিনিয়া, তুমি কি মানুষ?" "হ্যাঁ নিশ্চয়, আমি চাই যা দেখলাম তা ভুলে যেতে।" "কিন্তু এলিসার দেহ এখনও ওখানে পড়ে আছে।" "জানি। কিন্তু আমাদের এ-সব মনে রাখা উচিত নয়। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে ছবি দেখি গে চল।" "কিন্তু এই এলিসা একদিন তোমার বন্ধু ছিলো।" "তা আমরা কি করতে পারি—সব চেয়ে ভাল ওর কথা একেবারে ভুলে যাওয়া—এখনি বাড়ী গিয়ে আমি ওর কথা ভাবতে পারি না।"

তারা ঢিবি পার হয়ে সহরের আলোকোজ্জল ভাগে এসে পড়েছে, এমন সময় গলার শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। কে যেন ফিস্-ফিস্ করে বলছে, "আমি ভূতুড়ে, ভূতুড়ে, পেশা আমার মানুষ মারা।" "আমি এলিস ব্যামসেল,—দেখ, দেখ, আমি মরে গেছি। দেখ, আমার আধখানা জিভ বেরিয়ে পড়েছে,—দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ!" ফ্রনসিন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো। ল্যাভিনিয়া তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাড়াতাড়ি সহরের দিকে হাঁটতে সুরু করলো।

হেলেন এক পা সিঁড়িতে আর এক পা মাটিতে রেখে গাড়ী-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে বলে উঠলো, "আমি ভাবছিলাম তোমরা বুঝি আর এলে না।" "আমরা",—ফ্রনসিন আরম্ভ করলো। ল্যাভিনিয়া তার হাতে চাপ দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল, "জান, কে যেন এলিসাকে মরা অবস্থায় দেখেছে।" হেলেন চমকে উঠে বললো, "কে দেখেছে?" "আমরা জানি না।"—ল্যাভিনিয়া বললো, "চল, আর দেরী করে কাজ নেই, এখনও হয়ত শেষ 'শো'টা দেখা যাবে।—"

সেই রাতে তিনটি অবিবাহিতা কুমারী পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। হেলেন বললো, "ভাই, সিনেমা দেখা আমার মাথায় উঠে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি যখন এতটা পথ বয়ে এসেছো তখন আমার না বলবার ক্ষমতা নেই।" এবার সে ঘরের মধ্যে একটা সোয়েটার আনতে গেল। সেই ফাঁকে ফ্রনসিন চুপি-চুপি বললো, "কেন ওকে তুমি বললে না?" "এখনই ওকে উতলা করে লাভ কি? সময় ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না—" বললো ল্যাভিনিয়া। তিন জনে হাঁটতে সুরু করলো—রাস্তায় লোক-জন খুব বেশী নেই। চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেছে। হেলেন বললো, "আমরা পাগল,—তাই এই রাতে বেরিয়েছি।" "ভূতুড়েটা কিছু তিন জনকেই মেরে ফেলতে পারবে না"—বললো ল্যাভিনিয়া "আর এত তাড়াতাড়ি আর একটা খুন হতে পারে না।"

একটা ছায়া দেখে তিন জন ভীষণ চমকে থেমে গেল। "এবার ত হাতে পেয়েছি,"—গাছের আড়াল থেকে একটা লোক লাফিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "হে, হে, আমি ভূতুড়ে! টম ভিলন! টম! টম।" ল্যাভিনিয়া কর্কশ স্বরে বললো, "এ রকম ছেলেখেলা যদি আবার করো তবে হয়ত কারও গুলী খাবে তুমি!" ফ্রনসিন আবার কাঁদতে লাগলো। টম হাসতে হাসতে বললো, "আমি দুঃখিত, আর—" "তুমি কি এলিসার খবর জানো না?" তাকে থামিয়ে দিয়ে ল্যাভিনিয়া বললো, "সে মারা গেছে। আর তুমি মেয়েদের ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছ, লজ্জা হওয়া উচিৎ।" "সে কি অ্যাঁ!"—টম চিৎকার করে উঠলো।

মেয়েরা ততক্ষণে আবার চলতে সুরু করেছে। টম তাদের পিছনে চলতে লাগলো। "তার চেয়ে যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাও, আর নিজেকে ভয় দেখাও।"—ল্যাভিনিয়া বললো, "যাও, এলিসার মুখটা দেখে এসো—কোন মজা পাও কি না।" ফ্রনসিন তখনও কাঁদছিলো। হেলেন বললো, "কেন কাঁদছ, এটা একটা মজা বৈ আর কিছু নয়।" "তোমাকে এবার বলে ফেলা ভাল—আমরাই এলিসাকে মরা অবস্থায় দেখেছি। উঃ! তা বলা যায় না—সে দৃশ্য ভুলে যাওয়ার জন্যই আমরা ছবি দেখিতে বেরিয়েছি। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলাই ভাল! পয়সা-কড়ি ঠিক করে রাখ—টিকিট কাটতে হবে—আমরা প্রায় সিনেমার কাছাকাছি এসে পড়েছি।"

ছোট সহর,। কতকগুলো ড্রাগ ষ্টোর—একটা সিনেমা আর কিছু দোকানপত্র। তিন জনে একটা ড্রাগষ্টোরে ঢুকলো গরম কফির জন্য। কফি শেষ করে সিনেমা-হাউসের মধ্যে তিন জনে জড়সড় হয়ে বসলো। হেলেন আর ল্যাভিনিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখলো—কিন্তু ফ্রনসিন বড়ই কাতর, পর্দার ছবি তা' মনের দুর্বলতা জয় করতে পারছে না।

ছবি শেষ হয়ে গেলে তিন জনে আবার বেরিয়ে পড়লো। ওরা ঠিক করলো—প্রথমে হেলেন, তার পর ফ্রনসিনকে বাড়ী

পৌঁছে দিয়ে ল্যাভিনিয়া সেই ঢিবিটা পার হয়ে বাড়ী যাবে। ল্যাভিনিয়া বড় সাহসী। তখন প্রায় রাত বারটা কি সাড়ে বারটা। সন্ধ্যার চাঁদ কালো মেঘে ঢেকে গেছে, সহর জনশূন্য—বাড়ী-বাড়ী আলো নিবে গেছে—তিন জনের জুতোর খট্-খট্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। হেলেনের বাড়ীর কাছাকাছি তারা এসে পড়েছে। হেলেন বললো, "ল্যাভিনিয়া, তুমি ফ্রনসিনাকে পৌঁছে দিয়ে এত রাতে বাড়ী ফেরার চেষ্টা কোরো না, আমার কাছে ফিরে এসো—দু'জনে খুব আরামেই রাত কাটিয়ে দিতে পারবো—আমি চাই না তুমি একা এত রাতে সেই ঢিবিটা আবার পার হও। আমি জানি, তুমি সাহসী, তবু আমার ইচ্ছা নয়।" ফ্রনসিন সায় দিয়ে বললো, "হ্যাঁ লাভি, আমি তাহলে রাত্রে সুস্থির হয়ে ঘুমুতে পারবো যদি তুমি হেলেনের বাড়ীতে রাত কাটাও।" ল্যাভিনিয়া হেসে বললো, "তোমরা কি ভীতু—আমি রোজই ও-পথ দিয়ে যাতায়াত করি, কিছু হয় না। তোমাদের যত বাজে ভয়—!" তবুও হেলেন অনেক চেষ্টা করলো ওকে রাজী করাতে, কিন্তু ও বড় বেশী দাম্ভিক। যাই হোক, পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে তারা আবার চলতে লাগলো। হেলেন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ওদের চলার দিকে চেয়ে রইলো।—খানিক পর চিৎকার করে বললো, "ল্যাভি, বাড়ী পৌঁছে একটা ফোন করে দিও, কেমন।"

ফ্রনসিনকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ল্যাভিনিয়া একা হাঁটতে সুরু করলো। ফ্রনসিনও ওকে ধরে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছিলো কিন্তু সফল হয়নি। ল্যাভিনিয়া গুন-গুন করে একটা গান গাইতে গাইতে চলতে লাগলো। ঢিবিটার কাছাকাছি এসে কার পায়ের শব্দে থমকে দাঁড়ালো। ও হরি! ষ্টীভেন্স ষ্টীভেন্স ওদের রাস্তার চৌকীদার ওকে একা যেতে দেখে বললো, "হাই বাড়ী যাচ্ছ বুঝি, সঙ্গে যাবো কি—ভয় করবে না ত একা যেতে?" ল্যাভিনিয়া বললো, "অনেক ধন্যবাদ—আমি একাই যেতে পারবো। আচ্ছা, শুভরাত্রি। ষ্টীভেন্স আর ল্যাভিনিয়া বিপরীত দিকে হাঁটতে সুরু করলো।

ঢিবির উৎরাইএ উঠতে উঠতে ল্যাভিনিয়া আবার চমকে উঠলো কার পায়ের শব্দে। অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে পিছন ফিরে তাকিয়ে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না। মন থেকে সব চিন্তা দূর করে দেবার চেষ্টা বারে বারে ব্যর্থ হতে লাগলো। কি করা যায়—পরিষ্কার মনে হচ্ছে—কে যেন পিছনে পিছনে আসছে—পথ চলার খস্-খস্ শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—অন্ধকার এত ঘন—কিছুই দেখা যায় না—তবে এলিসার মাথার গ্রীবা মত চোখ আর আধখানা জিভ বের করা দেহ যেন অন্ধকার ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ল্যাভিনিয়া কি করবে বুঝতে পারছে না—। নিজেকে বারে বারে ধিক্কার দিচ্ছে এই সাহস নিয়ে পথে বের হয়েছে। কেন মরতে হেলেনের কথা শুনলো না—কি করবে? ফিরে যাবে? কিন্তু প্রায় অর্দ্ধেক পথ ত এসে পড়েছে। অতএব বাড়ীর দিকে যাওয়াই ভাল। হেলেন হয়ত এতক্ষণ শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, তাকে বিরক্ত করাট কি উচিত? এলোমেলো চিন্তা ক্রমশঃ তাকে পেয়ে বসছে ল্যাভিনিয়া ঠিক করলো, সে দৌড়ে দিয়ে বাকী পথটা শেষ করে দেবে, কিন্তু দৌড়তে যে কি কষ্ট—পায়ে হাই-হিল জুতো আর অন্ধকার এত বেশী যে কিছু দেখা যায় না। আরও মুসকিল, দৌড়েও নিস্তার নেই, পিছনের সেই অজানিত অনুসরণও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। ছুট দাও ল্যাভিনিয়া! ভাববার অবকাশ নেই, বাঁচতে যদি চাও তবে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটো! ল্যাভিনিয়ার গলা শুকিয়ে গেছে। মাথা দিয়ে আগুন ছুটছে। কেন মরতে হেলেনের কথা শুনলো না—সাহস দেখিয়ে এই পথে একা আসার কি প্রয়োজন ছিলো? নাঃ সে এসে পড়ছে—ঐ ত, হ্যাঁ, ঐ ত সাদা দেওয়াল! আঃ, বাঁচলো! এখনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সমস্ত আলোগুলো আগে জ্বেলে নিশ্বেস ফেলে বাঁচবে, তার পর রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ গরম কফি—না না, ভুলিব মধ্যে আছে হুইস্কি—অন্ততঃ আজ রাত্রিতে ঘুমুতে হলে নিশ্চয়ই হুইস্কিই ভালো,—তার পর হেলেনকে একটা টেলিফোন করে দেবে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছবার জন্য। না, সকালেই টেলিফোন করা ভাল। ও হয়ত ঘুমুচ্ছে এখন। গরম বিছানার স্বপ্ন কি মধুর! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো—এই নাক-কান মলে আর কখনও রাত্রে একা-একা বার হবে না। দরজা বন্ধ করে বসবার ঘরে এসে দাঁড়ালো। আঃ! বাড়ী ফেরার এত আনন্দ—ল্যাভিনিয়ার এই আটত্রিশ বছর অতিবাহিত জীবনে কোন দিন পায়নি। আলো জ্বালবার আগে মনে মনে কিন্তু ল্যাভিনিয়া হাসছিলো—কাল সকালে যখন হেলেন এই কথা শুনবে ওর মুখখানা ভয়ে সাদা হয়ে উঠবে। বলবে—"ল্যাভিনিয়া, তুমি কি সাহসী, আমি হলে ত ভয়ে ওখানেই মরে থাকতাম।" যাক্, কি দুর্ঘট, এবার শুতে যাবার বন্দোবস্ত করা যাক। কিন্তু—ও কি! সেই অন্ধকারে কে যেন গলা খাঁকারী দিয়ে উঠলো। ল্যাভিনিয়ার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল! আলোর সুইচ টেপার সাহস ফুরিয়ে গেছে, ভাবছে আবার দরজা খুলে প্রতিবেশীর দরজায় ধাক্কা দেবে নাকি! কিন্তু দেহ যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। মনের এই দুর্বলতা দূর করো। আজ রাত যদি কাটে কাল যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে। ভগবান দয়া করো। সব নিস্তব্ধ, আলো জ্বালবার সাহস আর নেই—কি করবে—বড় ঠাণ্ডা—কে জানে, হিটার বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়—আর সংশয় নয়। এবার কেবল গলা-খাঁকারী নয়, উজ্জ্বল টর্চ্চের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়, 'কোন সংশয় নেই—উপায়ও নেই, বড় দেরী হয়ে গেছে—কিছু করবারও নেই***

পরদিন আর একবার পুলিশের কর্ত্তারা ল্যাভিনিয়ার বাড়ী খোঁজ খবর করতে এলো। হেলেন আর ফ্রনসিন এলো দেহ সনাক্ত করতে। ফ্রনসিন এই দ্বিতীয় বার দেখলো—আধখানা দেহ ঝোপের মধ্যে নয়—কার্পেটের ওপর আর আধখানা দেহ মেঝের উপর ফেলে ল্যাভিনিয়া শুয়ে আছে, চোখ যেন কি দেখে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আকাশের তারা গুনবার অবকাশ নেই, কিন্তু কড়িকাঠের মধ্যে কি এমন খুঁজে পেলো ল্যাভিনিয়া—আধখানা জিভ ঝুলে পড়েছে। ফ্রনসিনের চোখ দুটি জলে ঝাপসা হয়ে এলো।

ইং রে জী

সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

পাথরী রোগে ডাক্তারের অস্ত্রোপচার

১৮১৮ সালের ১৩ই অক্টোবর মথুরা হতে লেখা একটি চিঠির অংশ :

সম্প্রতি এখানে এক হিন্দু চিকিৎসক বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে একটি অস্ত্রোপচার করেছে। এক ভৃত্যের তের বছরের ছেলে অনেক দিন থেকে পাথরীতে ভুগছিল। অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটায় একজন চিকিৎসক ডাকা প্রয়োজন হলো। মথুরা থেকে বারো ক্রোশ দূরে ভরতপুর জেলায় কামা গ্রামে নামসুখ রায় নামে এক চিকিৎসক আছে। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে পাথরী চিকিৎসায় তার খুব খ্যাতি। রোগীর পিতা শরণাপন্ন হলো সেই চিকিৎসকের। চিকিৎসক রোগী পরীক্ষা করে বলল যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে সে অস্ত্র করবে। অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে ছেলের যদি মৃত্যু হয় তাহলে যেন তাকে দায়ী করা না হয়। কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেয়ে পিতা ও চিকিৎসক খুশিমনে চলে গেল। পরদিন সকালে চিকিৎসক এসে সংবাদ দিল যে সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার হয়েছে, রোগী শীঘ্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। যে পাথর বার করা হয়েছে তার আকার একটা আখরোটের মতো, অস্ত্রোপচার করা হয়েছে ক্ষুর, ধারালো ছুরি এবং সূচের সাহায্যে। চিকিৎসক প্রথম মূত্রাশয়ের নিকটবর্তী জায়গা খুব ভালো করে জলপাইর তেল দিয়ে মালিশ করল, মালিশ ততক্ষণ চলল যতক্ষণ না চামড়া কোমল হয়ে পাথর উপরে ভেসে উঠল। তার পর গুহ্যদ্বার দিয়ে চাপ দিতেই পাথর কোথায় রয়েছে তা আঙুল দিয়ে স্পষ্ট অনুভব করা গেল। নির্দিষ্ট স্থানটি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে চিরে ফেলতেই পাথর বেরিয়ে এল, সন্না দিয়ে টেনে বার করবার প্রয়োজন হয়নি। অস্ত্রোপচারের পর রোগীর জ্বর হয়নি, এবং ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে। চিকিৎসক বলছে, কুড়ি দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। রোগীকে দেওয়া হয়েছে সাধারণ সুপাচ্য পথ্য। এই রকম বিপজ্জনক অস্ত্রোপচারের অনুমতি দিয়ে পিতা যে সাহস দেখিয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যে হিন্দুদের অস্ত্রোপচারে কোনো আপত্তি নেই। চিকিৎসক জাতিতে কায়স্থ, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এই বেঁটে-খাটো চেহারার চিকিৎসক নিজের ক্ষমতায় যেরূপ আস্থাবান তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।—এশিয়াটিক জার্ণাল, জুলাই, ১৮১৯।

সতী হবার পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে সকল অপবিত্র চিন্তা দূর করে মন বিশুদ্ধ করবে। কুসুমফুলে রঞ্জিত নববস্ত্র পরবে,—তাতে থাকবে সিল্কের পাড়। পানের রসে ওষ্ঠ রঞ্জিত হবে, দেহ সাজাতে হবে কুঙ্কুম, কাজল এবং সুগন্ধি ফুলের মালা ও অন্যান্য অলঙ্কার দিয়ে। চারজন কুমারী নির্বাচিত করে উপহার দিতে হবে, আর কিছু সামর্থে না কুলালে অন্ততঃ ফুলের মালা, বালা, রক্ত চন্দন ইত্যাদি দেওয়া কর্তব্য। শ্বশুর-শাশুড়ীকে অর্ঘ্যদান, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়বর্গ এবং নিজের সন্তান ও নাতি-নাতনীদেরও উপহার প্রদান বিধেয়।

এশিয়াটিক জার্ণাল, অক্টোবর, ১৮১৮।

* * * *

একটি অসাধারণ সতী : প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

বর্ধমান, ২৭শে নভেম্বর। কাল সতীদাহের ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। মৃতের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো,—তার বৃত্তি ছিল কৃষি। দেখলাম মাদুরে মৃতদেহ পড়ে আছে, পাশে বসে স্ত্রী কেশবিন্যাস করছে। আমাকে দেখে সে নতজানু হয়ে স্বামীর চিতায় সতী হবার জন্য অনুমতি চাইল।

ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি আসা মাত্র শব এবং বিধবাকে খাটিয়ায় বসিয়ে আত্মীয়রা কাঁধে তুলে নিল। দু'পাশের দর্শনার্থী জনতার মাঝখান দিয়ে খই ছড়াতে ছড়াতে শবযাত্রীরা শ্মশানে এসে পৌছল। স্ত্রীলোকটি বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছে এর মধ্যে। আত্মীয়রা ধরাধরি করে স্নান করিয়ে আনল।

একটু সুস্থ হয়ে বিধবা শাড়ীর খানিকটা অংশ ছিঁড়ে আট বছরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের গায়ে জড়িয়ে দিল। এর পর অনেক স্ত্রী-পুরুষ এল তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে। বিধবা মেয়েদের উপদেশ দিল প্রয়োজন হলে তারাও যেন তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। পুত্র অগ্নি সংযোগ করতেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। বিধবা তিনবার চিতা পরিক্রমণ করতে করতে হাতের পাত্র থেকে রজন ছড়াতে লাগল আগুন উসকিয়ে দেবার জন্য। চিতা যখন বেশ জ্বলে উঠেছে তখন বিধবা লাফ দিয়ে উঠে স্বামীর শবের পাশে বসল। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান অগ্নিশিখা তাকে ঘিরে ধরল। জনতা সেই আগুন আরো উসকে দিল নানাবিধ দাহ্য পদার্থ ছুঁড়ে। বিধবার প্রাণ শীগগিরই বেরিয়ে গেল ; কিন্তু দেহ সোজা বসবার ভঙ্গীতে স্থির হয়ে রইল। চার পাশের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে আবলুস কাঠের গোদা মূর্তির মতো বিধবার প্রাণহীন দেহ স্থির হয়ে আছে।

জনতা অবিরাম চীৎকার করে বলতে লাগল—এমন দৃঢ়চিত্ত সতী তারা আগে কখনো দেখেনি। উপস্থিত পুলিশ অফিসারও বললেন

যে তিনি অনেক সতী দেখেছেন, কিন্তু এমন শান্ত ও নির্ভীক সতী দেখবার সুযোগ এই প্রথম পেলেন। আমি চিতার তিন গজের মধ্যে ছিলাম ; বিধবা আমার দিকে মুখ করে বসেছিল। এমন সাংঘাতিক দৃশ্য কখনো ভুলব না। প্রথম যখন স্ত্রীলোকটিকে দেখি, তখন তার চোখে ছিল বিভ্রান্ত দৃষ্টি ; ক্রমে তা শান্ত ও সমাহিত হলো। শ্মশানে এসে প্রথম সে বড় দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু চিতা পরিক্রমা করতে করতে আবার শান্তভাব ফিরে এল তার মধ্যে।

স্ত্রীলোকটির বয়স পঞ্চাশ, তার স্বামীর বয়স ছিল ষাট। মোট তাদের তিনটি সন্তান। একটি বিবাহিতা মেয়ে,—বয়স কুড়ি। সাত ও আট বছরের দু'টি ছেলে।

সহমরণের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা বা বলপ্রয়োগ ছিল না। পুলিশের আদেশে জনতা দূরে সরে গিয়েছিল, আমি ছিলাম সকলের চেয়ে নিকটে। ইচ্ছা থাকলে চিতা থেকে লাফিয়ে পড়বার কোনো বাধা ছিল না। সতী হলে আত্মীয়দের কোনো লাভ হবে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কারণ সে ছিল দরিদ্র। নিকট-আত্মীয়দের নাবালক ছেলে দু'টির সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বীকার করে চুক্তিনামা দিতে হয়েছে। এ হচ্ছে ধর্মের উন্মাদনা, শিশুকাল থেকে শুনে শুনে মেয়েদের মনে সতীর আদর্শ আঁকা হয়ে যায়। আমার উপস্থিতির জন্য বিধবার কিংবা জনতার মনে কোনো দ্বিধা জাগেনি ; বরং তারা আমাকে সেই নিদারুণ দৃশ্য আরো ভালো করে দেখবার জন্য সুযোগ করে দিয়েছে।—বেঙ্গল হরকরা হতে এশিয়াটিক জার্ণাল, অগাষ্ট, ১৮২০ সালের সংখ্যায় উদ্ধৃত।

আদালতে বাঙলা ভাষার ব্যবহার

এই প্রেসিডেন্সিতে আদালতে ফারসীর পরিবর্তে বাঙলার ব্যবহার করতে গিয়ে কিছু-কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই অসুবিধাগুলি দূর করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের যথাশীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদালতের দেশীয় কেরাণীরা সরকারী নথিপত্রে বাঙলার সহিত ফারসী মিশ্রিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ; আবার কেউ কেউ করছে সংস্কৃতের অবাধ ব্যবহার। উভয় ক্ষেত্রেই দলিলের রূপটা মোটামুটি বাঙলায় রচিত বটে, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভাষা এখনো উদ্ভট এবং অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুর্বোধ্য। দেশীয় অধিবাসীরা সুদূর মফঃস্বল থেকে এই সব দলিলের কিছু-কিছু নমুনা আমাদের কাছে পাঠিয়েছে, এই নমুনাগুলি থেকে দেখা যায় যে বিদেশী ভাষা ব্যবহারের যে অসুবিধা, তার উপর যোগ হয়েছে বিভিন্ন ভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে গোলযোগ। ব্যবহার করতে করতে ভাষার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত এবং যত দিন পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত একটি মান নির্দিষ্ট না হয় তত দিন এই বিশৃঙ্খলা কিছু-কিছু থাকবে। আমাদের যে সব দেশীয় সংবাদদাতারা বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্য ব্যগ্র (কাজ-কর্মে নিয়ত ব্যবহারের দ্বারাই উন্নতি সম্ভব) তাঁরা এই ভেবে বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন যে, উপরোক্ত বিশৃঙ্খলার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে হয়তো দেশবাসীকে হতাশ করে ফারসীর ব্যবহারই বহাল রাখবেন। এই দুর্ভাগ্য রোধ করবার জন্য এবং বিশৃঙ্খলার প্রতিবিধান হিসাবে আমরা এই প্রস্তাব করি : যখন বাঙলা অনুবাদক (Bengali Translator) নিযুক্ত হবে তখন তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হবে বাঙলার আদালতে ব্যবহারের জন্য আইনের পরিভাষা স্থির করতে ; তাহ'লে দেশের সর্বত্র একই শব্দাবলী ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার দায়িত্ব থাকবে অনুবাদকের। তাঁর কর্তব্য হবে দীর্ঘকাল যাবৎ যে-সব আইন সম্পর্কিত শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাদের নির্বাচন করে তালিকা প্রস্তুত করা। শব্দ কোন্ ভাষা থেকে এসেছে তা বিচার্য নয়, দেখতে হবে কোন্ শব্দগুলির দেশে ব্যাপক প্রচলন আছে। তালিকা প্রস্তুত হলে কলকাতা এবং মফঃস্বলের কর্মচারীদের কাছে সংশোধন ও মন্তব্যের জন্য পাঠানো হবে। যে শব্দগুলি গৃহীত হবে তাদের সাহায্যে ভবিষ্যতে আইন এবং আদালতের দলিলগুলি অনুবাদের জন্য অবশ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাঙলা অনুবাদকের দপ্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় গভর্ণমেণ্টের আছে বলে শোনা যায়। আমরা প্রস্তাব করি যে, এই দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি সদর দেওয়ানী আদালত, সদর বোর্ড অব রেভিনিউ এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগের আদেশগুলি অনুবাদের দায়িত্ব বাঙলা অনুবাদককে দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এই দলিলগুলি ইংরেজী ও বাঙলা এই উভয় ভাষা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করা উচিত। এসব সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা এত বার লিখেছি যে নতুন করে তা উত্থাপন করলে পাঠকদের বিরক্ত করা হবে। আদালতের সংখ্যাবৃদ্ধি দেশীয় বিচারক নিয়োগ এবং আদালতে বাঙলার ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা গভর্ণমেণ্ট আইনকে দরিদ্রের রক্ষক এবং ক্ষমতাদর্পীর হাত থেকে অসহায়কে উদ্ধার করবার উপায় হিসেবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই সব হিতকারী প্রচেষ্টা আংশিক সাফল্য লাভ করবে মাত্র। কারণ আইনের সংশোধন কিংবা পরবর্তী সময়ে বিধিবদ্ধ উপধারাগুলির কথা একমাত্র আদালতের আমলারাই জানে। জনসাধারণের মধ্যে এদের প্রচারের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ মূল আইনের চেয়ে এদের মূল্য কম নয়। এই অন্যায় ব্যবস্থার ফলে সরকারী বিধান ও আদেশগুলি উৎপীড়নের শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠেছে। এর প্রতিবিধান সহজ। যে রহস্যের আবরণ দিয়ে জনসাধারণের নিকট থেকে সরকারী আদেশগুলি দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তা অপসারণ করলে আদালতের কর্মচারীরা বিচারের উদ্দেশ্যকে আর ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। আইন সংক্রান্ত সব আদেশ অনুবাদ করবার দায়িত্ব বাঙলা অনুবাদককে দিলে তাঁর কর্তব্য অধিকতর শ্রমসাধ্য হবে বটে, কিন্তু দেশীয় লোকে এর ফলে বিশেষরূপে উপকৃত হবে। বাঙলা অনুবাদকের দপ্তরের কার্যপরিধি সম্প্রসারিত করা হবে কিনা, এ সম্বন্ধে বোধ হয় বিবেচনার অবকাশ নেই। সকল দিক আলোচনা করে দেখা যায় যে, দেশ শাসনের জন্য যে সব আইন করা হয় তাদের মাতৃভাষায় সকলের নিকট জানিয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক প্রশাসনীয় ব্যবস্থা। যত দিন তা না হবে, তত দিন আমাদের বিচার বিভাগ ন্যায়নিষ্ঠা ও সুবিচারের জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না।—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ২৬শে এপ্রিল, ১৮৩৮)

মাছ বৃষ্টি

আমাদের এক সংবাদদাতার নিকট থেকে মাছ-বৃষ্টির নিম্নলিখিত বিস্ময়কর বিবরণটি পেয়েছি। সংবাদদাতার সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। কলকাতা থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে সুন্দরবনের দিকে এই ঘটনাটি ঘটেছিল এবং আমাদের সংবাদদাতা তা প্রত্যক্ষ করেছেন। * * *

"বর্তমান মাসের ২০শে বৃহস্পতিবার প্রবল বৃষ্টি হবার সময় কিছু পরিমাণ তাজা মাছ বৃষ্টির সঙ্গে পড়েছে। মাছগুলি প্রায় তিন ... লম্বা এবং সবগুলি একই জাতের। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ... আমার বাড়ী থেকে পুকুর পর্যন্ত এক সরল রেখা ধরে পড়েছে। কঠিন মাটির উপরে পড়বার ফলে অনেক মাছই মরে গেছে; কিন্তু ঘাসের উপরে যেগুলি পড়েছে সৌভাগ্যক্রমে তারা কোনো আঘাত পায়নি। আমি অনেকগুলি তাজা মাছ সংগ্রহ করে আমার পুকুরে ছেড়ে দিয়েছি। অনেকের ধারণা যে জলস্তম্ভ এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কারণ। জলস্তম্ভ নদী ও পুকুর থেকে জলের সঙ্গে মাছ ইত্যাদি উপরে টেনে নেয় এবং বৃষ্টির সঙ্গে আবার তারা ... উপরে নেমে আসে। এই বিস্ময়কর ব্যাপার আর কোনোরূপেই ব্যাখ্যা করা চলে না। মাছেরা যদি স্বেচ্ছায় পুকুর ছেড়ে উপরে উঠে এসে থাকে তাহলে তারা নিজেরাই যখন খুশি জলে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা হয়নি। আমি সব চেয়ে বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে, মাছগুলি এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েনি; পড়েছে এক হাত চওড়া একটি দীর্ঘ লাইন ধরে। এ রকম ঘটনার কথা আমি আগেও শুনেছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়নি। স্থানীয় লোকেরা এই মাছের নাম বললে 'টেংরা', আমি অবশ্য নিজের জ্ঞান থেকে বলতে পারব না এটা সত্যি কি মিথ্যা।"—২৮শে সেপ্টেম্বরের 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' থেকে ১৮৮৩ সালের।"(২৭শে সেপ্টেম্বরের 'ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায়' উদ্ধৃত।)

ভারতবর্ষের ব্যাধি

আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রোগের প্রকৃতিও বদলায়। আমার জীবনের দীর্ঘকাল গ্রীষ্মমণ্ডলে কাটিয়েছি, এ অঞ্চলে উষ্ণতার আধিক্য এবং এখানকার গাছপালা ও জীবজন্তু য়ুরোপবাসীর নিকট অপরিচিত। এখানকার ব্যাধিগুলির কারণ ভিন্ন এবং লক্ষণও নতুন। উষ্ণমণ্ডলের ব্যাধিগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তা লিপিবদ্ধ করলে বিশেষ কাজে আসবে

গ্রীষ্মমণ্ডলে ক্যানসার প্রায় নেই বলা যেতে পারে। যে পঁচিশ বছর আমি এদেশে ছিলাম, তার মধ্যে একটি মাত্র ক্যানসার রোগী দেখেছি এবং রোগের অঙ্কুর আক্রান্ত ব্যক্তি য়ুরোপ থেকেই নিয়ে এসেছিল। উষ্ণ আবহাওয়া ক্যানসার প্রতিরোধ করে, কিন্তু একবার আক্রমণ হলে সারাতে পারে না। যক্ষ্মা ভারতে খুবই বিরল। গলগণ্ডও সচরাচর দেখা যায় না। ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়া এই রোগের সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ভারতীয়, এমন কি যে-সব বানরদের নিয়ে যাওয়া হয় তাদের মধ্যেও অনেকে, ইংলণ্ডে গিয়ে আর্দ্র আবহাওয়ায় গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হয়। পিত্তপাথরীর একটি দৃষ্টান্তও আমি ভারতে পাইনি এবং মূত্রাশয়ের পাথরী উষ্ণমণ্ডলে প্রায় নেই বললেই চলে। শীতের দেশের চেয়ে বাত রোগের প্রাদুর্ভাব কম এবং আরোগ্য লাভও সহজসাধ্য। তবে প্লীহা ও যকৃতের ব্যাধি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যত বেশী দেখা যায় য়ুরোপে তেমন নেই। ভারতে যত দিন ছিলাম, তত দিন এমন লোক একটিও দেখিনি যার রোগলক্ষণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সে উপদংশে আক্রান্ত। এই নতুন রোগটি য়ুরোপে সচরাচর দেখা যায়। —ডাঃ এইচ, স্কটের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার। এশিয়াটিক জার্নাল অগাষ্ট, ১৮১৬।)

ভারতে বরফ

বিলাসের উপকরণ হিসেবে বাঙলায় বরফ প্রস্তুত করা হয়। বাংলার আবহাওয়ার উত্তাপ যখন বত্রিশ ডিগ্রীর উপর সেই হিমাঙ্ক (Freezing point) অবস্থায় বরফ প্রস্তুতের আয়োজন করা চাই। বরফ প্রস্তুতের প্রণালী এই: প্রায় সওয়া ইঞ্চি মাটির পাত্র ফুটন্ত জলে পূর্ণ করে অগভীর গর্তে রাখতে হবে। পাত্রের নীচে আট থেকে বারো ইঞ্চি পুরু আখের ছিবড়া কিংবা খড় দিতে হয়। রাত্রির আবহাওয়া যদি শান্ত ও মেঘশূন্য থাকে তাহলে থার্মোমিটারে উত্তাপ চল্লিশ ডিগ্রী উঠলেও বরফ জমে। পাত্রের নীচে যে খড়কুটা দেওয়া হয় সেগুলি ভিজে গেলে শুকনো খড় এনে দিতে হবে। এগুলি পাত্রের নীচে দেবার উদ্দেশ্য হলো, যাতে মাটির উত্তাপ পাত্রের জলে সঞ্চারিত হতে বাধা পায়।—এশিয়াটিক জার্নাল, নভেম্বর, ১৮১৬।

অপরাজেয় বঙ্গ-সৈন্য

"ভগবৎ কৃপায় যদি আমি বঙ্গ-সৈন্যকে পরাভূত করিতে পারি এবং জীবিত থাকি, দেখিও কিরূপে মোগলদিগকে হিন্দুস্থানের বাহির করিয়া দিই।"

—পাঠান শের খাঁ

আকাশ-পাতাল

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কখন গান শুনেছিল রাজেশ্বরী, কানে যেন সুরটা লেগে আছে এখনও।

হেমনলিনীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আর গানের শব্দঝঙ্কার যেন চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারে না বৌ। গান শুনতে শুনতে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিশীমার দক্ষতায় বিস্মিত হয়েছিল। আর বোধ করি গানের রচনাকারের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে মনে তার কৌতূহল উদ্রেক করেছিল। যেমন গান তেমনি কি তার সুর! রাজেশ্বরী বন্ধ-গাড়ীতে ব'সে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতে করতে ভাবছিল ঐ গান। রবি বাবুর গান—'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন'। ভোরের সূর্য্যালোক ছড়িয়ে প'ড়েছে দিকে দিকে; নিশার আঁধার কখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অভিসারিকার লজ্জার অন্ত নেই। সরমে জড়িত চরণে পথের মাঝে যেতে হবে যে! গাছের শাখে-শাখে পাখী ডাকছে ভোর হওয়ার আনন্দে, গাগরী ভরণে চলেছে পল্লীবধূগণ—এমন সময়ে শিথিল কবরী আবরি' কেমনে আপন কাজে যায় অভিসারিকা! লোকলজ্জা নেই?

গান গাওয়া শেষ হ'লে রাজেশ্বরী থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল—হ্যাঁ পিশীমা, কার গান গাইলেন? রামপ্রসাদের?

কথা শুনে হেসে ফেলেছিলেন হেমনলিনী। বৌয়ের বিদ্যার বহর দেখে হয়তো হেসেছিলেন! হাসতে হাসতে বলেছিলেন,—রামপ্রসাদের কেন হ'তে যাবে? রবীন্দ্রনাথের গান। রবি বাবু নইলে এমন গান কে লিখবে!

অত-শত জানে না রাজেশ্বরী! কে রামপ্রসাদ আর কে রবীন্দ্রনাথ! নামটা শুনেছিল কবে যেন রামপ্রসাদের। শুনেছিল, তিনি গান রচনা করেছেন। সুতরাং গান মাত্রেই রামপ্রসাদের তাতে আর সন্দেহ কি! গান শুনতে শুনতে কয়েক বার ঘরের জানলার বাইরে আকাশটা লক্ষ্য করেছিল বৌ। রাত্রির অন্ধকারে আকাশ কালো হয়েছে কি না তাই দেখছিল। রাজেশ্বরী তো আর অভিসারিকা নয় যে, রাত্রির আগমনে খুশীর বন্যায় ভাসতে থাকবে? তার মনে তখন ভাবনা। জুড়ী এখনও তাকে নিতে আসছে না কেন? খাজনার বাকী টাকা জমা পড়েছে কি? স্বামী তার আজকে আবার কোন্ মূর্ত্তিতে ফিরে আসবে কে জানে!

যাই হোক, সাঁঝের আঁধারে দিক্‌চক্র ঢাকা পড়া'র সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছিল অনন্তরাম। বলেছিল,—দিদমণি, জুড়ী এসে গেছে। আমাদের বাড়ীর বৌটিকে এখন ছুটি দাও।

হেমনলিনীর গান তখন শেষ হয়ে গেছে। তবুও তিনি বাদ্যযন্ত্রের সম্মুখের আসনে ব'সেছিলেন। গল্প করছিলেন বৌয়ের সঙ্গে। এ-কথা সে-কথা কইছিলেন। জুড়ী এসেছে শুনে বলেছিলেন.—কিছু খেয়ে যাবি না বৌ? বিকেলে জল-খাবার তো মুখে দিলি না!

—রক্ষে করুন পিশীমা। উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল রাজেশ্বরী। বলেছিল হাসতে হাসতে।—আপনি কষ্ট ক'রে উঠে আমার গয়না-কাপড় বের ক'রে দেবেন চলুন। শাড়ীটা আবার বদলাতে হবে।

—সেটি হচ্ছে না বৌ! কথা বলতে বলতে হেমনলিনী উঠলেন। বললেন,—তোমার কাপড়-গয়না তুমি নেবে চল, কিন্তু এই কাপড়টা ছাড়তে পাবে না। শাড়ীটা আমি তোমাকে দিলুম। তুমি এইটি প'রে ঘরের বৌ ঘরে ফিরে যাও মা!

—কেন পিশীমা, হঠাৎ বিনি কারণে এমন শাড়ীটা আমাকে কেন দিতে যাবেন! বৌ কথা বলে কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়ে।

হেমনলিনী বলেছিলেন,—সে কৈফিয়ৎ কি তোর কাছে আমাকে দিতে হবে বৌ? আমার সাধ হয়েছে দিয়েছি। আর কোন কথা নেই।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকেছিল রাজেশ্বরী। পিশীমার মুখের ওপর কোন্ কথা বলবে তাই খুঁজেছিল। কিন্তু কথা জোগালো না তার মুখে। হেমনলিনীর আত্মা স্নেহদানে ধন্য হয়ে গিয়েছিল যেন!

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল অনন্তরাম।

রাজেশ্বরীকে উদ্দেশ ক'রে বলে,—আর দাঁইড়ে থেকো না বৌমা! জুড়ী বহুৎক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

হেমনলিনী বলেছিলেন,—চল্ বৌ, চল্, তোর গয়না কাপড় দিই গে। একটা ছোট ট্রাঙ্ক দিই, তাতে ক'রে নিয়ে যা। সময় মত ট্রাঙ্কটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিস'খন।

—সেই ভাল। বলেছিল রাজেশ্বরী।—গয়না পরতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।

সেই খুনখারাপি রঙের বৌ-পাগলা শাড়ীটাই ছিল রাজোর পরনে। বন্ধ-গাড়ীর মধ্যে সে আর এলোকেশী। গাড়ীর কপাট বন্ধ, রাজেশ্বরীর দমও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। গাড়ীর জানলা নেই, শুধু কয়েকটা কাচের আড়াল থেকে গাড়ীর বহির্দ্দেশ দেখা যায়। তাও যদি কিছু দেখা যেতো! কাচ কয়েকটা বেগুনী রঙের। রঙীন দেখায় সকল কিছু।

জুড়ী চলছে তো চলছে।

ঝাংকহ্নয়ের পদশব্দ, বেশ একটা একটানা ছন্দের মত যেন কানে বাজে। রাজেশ্বরী হাঁফিয়ে উঠছে যেন। গাড়ীর দোলা খেয়ে না, অন্য কোন কারণে কে জানে নিজেকে যেন ঘূর্ণায়মান মনে হচ্ছে তার। অস্বস্তি বোধ করেছে খুব। বমনের উদ্রেক হচ্ছে যে!

বেশ বিরক্ত হয়ে রাজেশ্বরী বললে,—যাচ্ছে দেখো না গাড়ী! এলো, বলতে পারিস একটু জোরে চালাতে?

এলোকেশীর হাতে ছিল ছোট একটা ট্রাঙ্ক। যক্ষের ধন আগলে ছিল যেন।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে এলোকেশী,—বেশ তো যাচ্ছে। আরও জোরে চালালে তো এখুনি বাড়ী ফিরে যাবি! আবার তো সেই কেল্লার ভিতরে গিয়ে ঢুকতে হবে!

এলোকেশীর কথা শোনে কি শোনে না রাজেশ্বরী।

মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে কেমন যেন এলিয়ে পড়ে। হেলিয়ে পড়ে। চোখ দু'টো বন্ধ ক'রে থাকে। এখন আর কিছু ভাল লাগছে না বৌয়ের। ফাঁকা শয্যায় একটু শুতে পায় যদি তবেই স্বস্তি। কি জানি এ আবার কি হ'ল পোড়া-শরীরটার, মধ্যে মধ্যে ভাবছিল রাজেশ্বরী।

আর জুড়ী ছুটছিল সেই ঢিমে-তেতালায়।

সেই একটানা শব্দটা শুধু থেকে থেকে কানে বাজছিল। জুড়ীর খুরের শব্দ।

কোচবাক্সে ছিল অনন্তরাম।

এমন মিষ্টি শরৎ-সন্ধ্যার হাওয়া, মাথার 'পরে কলকাতা মহানগরীর মহাকাশ, বিশ্রী লাগছিল যেন অনন্তরামের গ্রাম্য-চোখে। আর মন যদি ভাল না থাকে তখন স্বর্গ দেখে ভাল লাগে!

কোচম্যান আবদুলকে বাজিয়ে দেখেছে অনন্তরাম।

তার মুখে যা যতটুকু শুনেছে, সে সব ভাল কথা নয়। কি আর ভাঙতে চায় মুসলমানটা! নিমক খাচ্ছে, কখনও নিমকহারামী করতে পারে? জনম-ভোর আছে, পেটের রোটি পাচ্ছে, বেইমানী করতে যায় কেন খামকা! তবুও যা যতটুকু মুখ ফসকে বলে ফেলেছে তাতেই বুঝে নিয়েছে অনন্তরাম। হাড়ীর একটা চাল টিপেই বুঝেছে। আবদুল কোন কথা আর ভাঙছে না দেখে হেসে ফেলে অনন্তরাম।

পুজোর বাজার, দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে। সম্ভার উপচে পড়েছে দোকান থেকে পথের ধারে। নগরবাসী যেন পেয়েছে কোথায় আনন্দের আভাস। পুজা, মহাপূজা সমাগত যে। সতী-সাধ্বী শূলধারিণী দক্ষকন্যা ক্রুরা সুন্দরী দুর্গার পূজা। দিকে দিকে যেন তাঁরই শুভাগমন প্রতীক্ষার হাওয়া চলেছে। আনন্দের হাওয়া। কলকাতার পথে-পথে দোকানে-দোকানে আলোকসজ্জা। অঢেল ব্যবস্থা। যা চাও তাই পাবে। যত চাও তত। জনাকীর্ণ পথে জুড়ীর বেগ সামলাতে হয় আবদুলকে। পথের মানুষ পথ চলতে জানে না। কায়দা-কানুন জানে না পথ চলার। জুড়ী হাঁকাতে হাঁকাতে কত বার তবুও রাশ টেনে ধ'রেছে আবদুল।

বদ্ধ-গাড়ীতে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় রাজেশ্বরীর।

দরজার পাল্লা দু'-দুটো থাকলেও খুলে দেওয়া যায় না। লোকে কি বলবে। মুখাকৃতি বিরক্তিপূর্ণ হয়ে আছে রাজেশ্বরীর। কতক্ষণে যে গাড়ী পৌছবে কে জানে? আর যেন পারে না সে। সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠছে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। চোখ দু'টি বন্ধ করে বসেই থাকে রাজেশ্বরী। একান্ত নিরুপায়ের মত। বমনের বেগ সামলায় অতি কষ্টে।

কি যে হয়েছে রাজেশ্বরীর, সে নিজেই জানে না।

কেমন যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে তার দেহে। কখনও এমনটি ছিল না। কিন্তু কি যে হয়েছে কিছু বুঝতে পারে না! সময় নেই, অসময় নেই, যখন-তখন জ্বরের জ্বালা অনুভব করে যেন। মাথাটা ঘুরতে থাকে। হাত-পা অবশ হয়ে আসে। যা খায় পেটে থাকে না কিছু। অম্লের কোন রোগ নয় তো! দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা বসে থাকতে মন চায় না। কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। শুয়ে থাকলেই যেন সে ভাল থাকে।

হেমনলিনী শুধু রোগটা ধ'রেছেন। কি দেখে, কি শুনে ধরলেন কে জানে।

বৌকে নিরালায় পেয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন,—ছাখ্, বৌ, তোর পেটে বাচ্ছা এসেছে। খু—ব সাবধানে থাকবি। আর কি কি করবি না করবি শীঘ্রি একদিন গিয়ে বলে দেবো।

ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের কথাটি শুনে রাজেশ্বরী মৌন হয়েছিল বহুক্ষণ। বোধ করি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিল। শুনে কোথায় খুশী হবে, হাসবে, আনন্দ করবে, তা নয়, শুনে কেমন যেন অদ্ভুত গম্ভীর হয়ে গেছে। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। বকে যেন তার বেদনার ঝড় বইতে লেগেছে।

জুড়ী ছুটছে তো ছুটছেই।

মধ্যে মধ্যে আঁখিদ্বয় উন্মীলিত করে পলকহীন চোখে ফ্যাল-ফ্যাল তাকায় রাজেশ্বরী। মধ্যে মধ্যে আজকে বড় বেশী ক'রে যেন মনে পড়ছে তার। সেই দুঃখবিলাসিনী পলাতকার না-দেখা মুখটি। কুমু, কুমুবৌকে যেন চোখের সমুখে দেখতে পাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ। যেন স্বপ্নের মত দেখছে।

কোথায় এখন সেই সর্বত্যাগী ভয়ঙ্করী নারী? সেই বিশালাক্ষী?

বারাণসীর কোন্ এক ঘাটের পৈঠায় ব'সেছিলেন তখন কুমুদিনী। তাঁর পাশে ছিলেন কে একজন অপরিচিতা। কাদের গৃহের পরিত্যক্ত কুলবধূ। আরেক সর্বহারা। এক অকালবৈধব্যের অধিকারিণী।

—বৌ? কথা বলছিলেন কুমুদিনী।—বৌ, কোথায় গেলে মা?

—কোথাও যাইনি তো মা!

অপরিচিতার কথার সুর অত্যধিক মিষ্ট। পাশেই ছিলেন তিনি। দেখছিলেন প্রবহমান গঙ্গানদী। সবেগে ছুটছে জলধারা। বোধ করি অনন্তকাল থেকে ছুটছে।

কুমুদিনী বললেন,—আমাকে ঐ দিকে ফিরিয়ে দাও তো মা!

দুঃখের হাসি হাসলেন ঐ নারী। বললেন,—আপনি মা ঐ দিকেই ফিরে ব'সেছেন যে।

—ও, আমি তো মা দেখতে পাচ্ছি না কিছু। কুমুদিনীর কম্পমান কণ্ঠ। বললেন,—সবই অন্ধকার দেখছি চোখে।

কুমুদিনী দৃষ্টিহারা হয়েছেন। দূরের নিকটের কোন' কিছুই দেখতে পান না। সব অন্ধকার দেখেন।

বর্তমানে একটি অভ্যাস তবুও তাঁর রক্ষা করা চাই, চোখে দৃষ্টি না থাকলে কি হবে। তবুও ভিখারিণীর মত সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন, যতক্ষণ গঙ্গাতীরে থাকেন। হরিশচন্দ্রের ঘাটে গেছেন, সেখান থেকেও দেখেছেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

কুমুদিনীর চোখে এখন মণি-কর্ণিকা। পৃথিবীর আর অন্য কিছু নয়।

যে মহাশ্মশানে চিতার আগুন জ্বলছে অবিরাম। দিবারাত্র। কত যুগ থেকে জ্বলছে কেউ জানে না। অঙ্গ-চ্ছেদের কালে দক্ষকন্যার কর্ণ যেখানে ভূমি-অবলুণ্ঠিত হয়েছিল। কুমুদিনীর প্রার্থনা, ঐ শ্মশানের এক কোণে স্থান পান। দগ্ধ হয়ে যান তিনি চিরকালের মত। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়।

ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না জানি না, জুড়ী যখন ফটক পেরিয়ে অন্দরের দ্বারপথে পৌঁছেচে তখনও বুঝতে পারেনি রাজেশ্বরী। মেয়ে নড়ছে-চড়ছে না দেখে এলোকেশী ডাকলো,—অ রাজো, নামবি না?

ডাক শুনে চোখ চাইলো রাজেশ্বরী!

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কোন রকমে নামলো গাড়ী থেকে। এখন আর অন্য কোথাও নয়, একেবারে শয্যায়। এক জোড়া পায়ের অলঙ্কার ঝম্‌ঝমিয়ে বাজতে লাগলো।

কাছারী আর গৃহের অন্যান্য মানুষ দূর দূর থেকে লক্ষ্য করলো, খুনখারাপি রঙের শাড়ী পরিধানে, গৃহকর্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করছেন।

পায়ের অলঙ্কারের শব্দে অন্দরের পরিচারিকাগণ অনুমানে বুঝলো, বৌঠাকরুণ দিদিমণির গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন।

কোথায় ছিল বিনোদা?

ছুটে এলো রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। বৌকে সম্মুখে দেখেই ফেটে প'ড়লো ক্রোধ আর ঘৃণার আতিশয্যে।

আনত চোখ তুলে দেখলো একবার রাজেশ্বরী। আরেকবার দৃষ্টিপাত না করে ঐ কুৎসিতাকৃতি নারীকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হয় রাজেশ্বরী। অবিচলিতের মত।

বিনোদা গালে হাত দেয়। বলে,—কালে কালে কতই না দেখবো!

রাজেশ্বরী সিঁড়ির প্রথম ধাপে পদার্পণ করতেই শুনলো, কে যেন ডাকলো।

—ওগো বৌ, শুনে যাও।

ডাকলো বিনোদা। রাজেশ্বরীর কাছাকাছি পৌঁছে বললো,—উদিকে মদে চুর হয়ে যে হুজুর ফিরেছেন। খেয়াল আছে?

রাজেশ্বরীর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়।

কোন কথা বলে না। সিঁড়ি বইতে থাকে। যন্ত্রের মত চলতে থাকে। ঐ একটি অভিযোগ, দিনের পর দিন শুনতে শুনতে যেন কাণ তার ঝালাপালা হয়ে গেল। স্বামী মদ্যপান করেছেন, রাজেশ্বরীর করণীয় কি আছে? সে কি করবে? কি করতে পারে! দেখে-শুনে মনে মনে ব্যথা পাবে। ভাগ্যকে দুষবে, গুমরে মরবে। যার জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছে কতদিন, জানিয়ে দেখেছে যে কোন' কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি। হাল ছেড়ে দিয়েছে এখন। তরণী বহে যাক্ যেদিকে খুশী। যা মন চায় করুক, আর ফিরেও তাকাবে না রাজেশ্বরী।

কিন্তু এ কি হ'ল রাজেশ্বরী!

শরীর বইছে না কেন? দেহে যেন কত কালের ক্লান্তি। অবশ পা।

খাস-কামরায় ঢুকতেই নজর পড়লো। একটি আরাম-কেদারায় এলিয়ে প'ড়েছেন কৃষ্ণকিশোর। মুদিতচক্ষু।

রাজেশ্বরীর পায়ের অলঙ্কারের শব্দ শুনেই হয়তো চোখ খুললেন। ঘোর লাল রঙে চোখ তাঁর ঝলসে উঠলো ক্ষণেকের তরে। রক্তবর্ণ চোখ বিস্ফারিত ক'রে যেন লক্ষ্য ক'রে দেখলেন স্ত্রীকে। রাজেশ্বরীর আপাদমস্তক দেখলেন কোথায় সেই সবুজ শাড়ী আর পান্নার গহনা। সকালে দেখেছিলেন যে পোষাকে, কোথায় হ'ল তাদের অন্তর্ধান?

সবুজ থেকে লাল। এমন শাড়ীটা পরতে কি রাজেশ্বরী চেয়েছিল! পিশীমা জোরজার করলেন। তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারেনি বৌ।

—পিশীমা ভাল আছেন?

কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞাসা করলেন এক পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে। কেমন যেন গম্ভীর ভগ্নকণ্ঠ। রাজেশ্বরী ঘরে প্রবেশ করা মাত্র গন্ধ পেয়েছে, উগ্র স্পিরিটের কড়া গন্ধ নাকে যেতেই বমনের বেগ সামলেছে অতি কষ্টে। সূক্ষ্ম ভ্রূ দুটো তার খড়্গের মত বক্র হয়ে উঠেছে চরম বিরক্তিতে। মুখে কথা নেই।

এই নে রাজো, এক্ষুনি তুলে রাখ্।

এলোকেশী জাজিমের 'পরে নামিয়ে রাখলো হাতের ট্রাঙ্ক।

বাক্সে গয়না আর কাপড় আছে রাজেশ্বরীর। যে পোষাকে সকালে যাত্রা করেছিল সেই পোষাক। কথার শেষেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে এলোকেশী। রাজোর স্বামীকে একবার দেখেছে ঘৃণার দৃষ্টিতে।

—কি আছে ট্রাঙ্কে?

গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণকিশোর।

রাজেশ্বরী ভেবেছিল কোন কথা বলবে না। মৌন হয়ে থাকবে। ইতস্তত কণ্ঠে বললে,—যেগুলো পরে গেছলাম সেগুলো।

—পিশীমা ভাল আছেন?

পুনরায় প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণকিশোর।

—হ্যাঁ। বললে রাজেশ্বরী।

আলমারীর চাবি খুলতে খুলতে বললে।

—লাল শাড়ী পিশীমা দিয়েছেন?

কৃষ্ণকিশোর কথা বলেন নিমীলিত চক্ষে। বোধ করি রক্তবর্ণ চক্ষু দু'টি দেখাতে তিনি পরাঙ্মুখ।

—হ্যাঁ। বললে রাজেশ্বরী।

—খাজনার টাকা জমা প'ড়েছে। আর কোন ভাবনা নেই। অনেক কষ্টে জমা দিয়েছি।

নেশার ঘোরে কি না কে জানে, কৃষ্ণকিশোর কথাগুলি বললেন। অপ্রত্যাশিত হ'লেও এ কথা যেন রাজেশ্বরীকে জানানোর প্রয়োজন ছিল।

—জেনে আমার দরকার নেই। আমি শুনতে চাই না।

রাজেশ্বরীর কণ্ঠ অশ্রুতপূর্ব ঝাঁঝালো। এমন সুরে কোন' দিন কথা বলে না সে।

কেনই বা বলবে না! কোন্ অভিসম্পাতে তার ললাট দগ্ধ হয়েছে!

অনেক দিন আর অনেক রাত্রে মনে মনে কত খতিয়ে ভেবেছে। ভেবে ভেবে কিছু ঠাওর করতে পারেনি। কি এমন পাপটা সে করলো এই জন্মে! হঠাৎ কেমন যেন কঠোর হয়ে গেছে রাজোর মত মেয়েও।

কিন্তু বড় ভীষণ উগ্র দেখাচ্ছে রাজেশ্বরীকে।

প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। ভয়ঙ্করী কোন এক দেবী-প্রতিমার মত। লালে লাল হয়ে আছে যে! রাঙা অধর।

সীমন্ত লাল। কপালে সিন্দুর। রক্তিম বাস। পদে অলক্তক।

কথা শেষ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। পায়ের অলঙ্কার অবাধ্যের মত তুললো শব্দঝঙ্কার।

বেশ লাগছিল রাত্রির প্রথম আবির্ভাব।

বেশ হৃষ্টচিত্তে ছিলেন কৃষ্ণকিশোর। নেশাটা বেশ জমেছিল। এমন মিষ্টি নেশা কোন' দিনের জন্ম হয়নি। কোন্ জাতীয় সুরা পান করেছিলেন কে জানে! রাজেশ্বরীর কথায় ব্যাজার হ'লেন।

ইটালীয়ান ওয়াইন। যার রঙ হয়তো রাজেশ্বরীর শাড়ীর মতই ঘোর লাল।

ঘরের জ্বলন্ত সন্ধ্যাদীপের শিখার প্রতি চোখ রেখে কৃষ্ণকিশোর মনে করতে চেষ্টা করছিলেন সেই মদিরার রঙ, যা তিনি পান করেছিলেন সানন্দে। পান ক'রে অন্য দিনের মত অখুশী হওয়ার পরিবর্ত্তে তৃপ্তি পেয়েছিলেন। এখনও তার যথেষ্ট আমেজ আছে। দেহ ও মন যেন রিমঝিম করছে। অবশ হয়ে গেছে শরীরটা।

শুধু কি মদের নেশা!

গহরজানের নেশা নেই? গহরজানকে যে দেখতে দেখতে নেশা লাগে দু' চোখে। হোক পতিতা, হোক বহুভোগ্যা, গহরজান বাইয়ের আকৃতিটায় এখনও আছে সম্মোহন। দেহতীরে অপূর্ব্ব আকর্ষণ!

সত্যিই দেখলে নেশা লাগে চোখে। অনেক কিছুর মিশ্রণ-নেশা। যেন অনেক জাতের মদের একত্র-পানের নেশা।

রাজেশ্বরীর হঠাৎ ঝাঁঝালো কণ্ঠ শুনে মনে মনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণকিশোর। অপমান বোধ করেছিলেন। বৌ কি তাঁকে অবহেলা করেছে! তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি!

আরাম-কেদারার একটি হাতের অগ্রভাগ দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে চেপে ধ'রলেন কয়েক বার। রুদ্ধক্রোধ প্রকাশ করলেন যেন। উঠে পড়লেন কেদারা থেকে। সোজা এগিয়ে গেলেন একটি দেরাজের কাছে। কি যেন খুঁজছেন কৃষ্ণকিশোর। দেরাজের 'পরে কি আছে!

ঐ তো রয়েছে। সবুজ কাগজ-আঁটা বাহারী শিশিটা রয়েছে। যা হয় এক শিশি পাওয়া গেলেই চলবে। ৪৭১১-মার্কা বিদেশী সুগন্ধির শিশি। উগ্র স্পিরিটের বিশ্রী গন্ধটা যদি ঢাকা পড়ে! সেন্টের শিশিটা খুলে অনেকটা গন্ধজল ঢেলে ফেললেন গাত্রবাসে। স্পিরিটের গন্ধ না হয় দূরীভূত করা গেল, কিন্তু নেশার প্রকাশ রোধ করা যায় কি! ইটালীয়ান ওয়াইনের তীব্র নেশা!

শিশি রেখে কৃষ্ণকিশোর আরাম-কেদারায় বসলেন না, পালঙে বসলেন। টেনে নিলেন লাল ভেলভেটের একটা তাকিয়া। বেশ আরাম পেলেন যেন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে।

ঘর থেকে বেরিয়ে রাজেশ্বরী অন্যত্র কোথাও যায়নি।

ঘরের সামনে দালানের একটা সুবৃহৎ জানলার কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আশাহত, ব্যথাহত মুখ তুলে দেখছিল হয়তো রাত্রির আকাশ। দেখছিল অনন্ত শূন্য, আঁধার, আঁধার, আঁধার! তমসাবৃত আকাশে ছড়িয়ে আছে মাত্র কয়েকটি নগণ্য নক্ষত্র। সহজে চোখে পড়ে না। মুমূর্ষুর হৃদয়ের মত ধুকপুক করছে। সোনালী আলোকরশ্মি

ক্ষীণ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। যত দূর দৃষ্টি যায় দেখছিল রাজেশ্বরী। একটা নক্ষত্র চোখে পড়লো কেন? কোথায় লুকিয়ে পড়লো অন্যান্য। এক তারা যে দেখতে নেই। রাজেশ্বরী মনে মনে সুগন্ধি পুষ্পের একেক নাম আওড়াতে থাকে। নাঃ, ঐ তো আরও একটা। একটা আর একটায় দু'টো। ঐ তে আরেকটা। তিনটে।

এক তারা মানুষ মরা—

নেশায় আচ্ছন্ন স্বামী ঘরে ব'সে আছেন, ভাবতেও ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে রাজেশ্বরীর। মুখদর্শন করতেও ইচ্ছা হয় না স্বামী-দেবতার! তার চেয়ে বরং মৃত্যু হোক রাজার। সেই ভাল। দেখতে হবে না আর এই সামাজিক বিশ্রীতা। বেঁচে ম'রে থাকা অপেক্ষা ম'রে গিয়ে বাঁচবে সে। কোথাও গিয়ে মনের জ্বালা জুড়াবে।

আকাশে স্বর্ণচূর্ণ ছড়িয়ে দিচ্ছে কি কেউ?

মুঠো-মুঠো সোনা এলো কোথা থেকে, আকাশের এক প্রান্তে।

বোধ হবি চাঁদ উঠবে। চন্দ্রোদয়ের পূর্বাভাষ।

সামান্য আলোর আমেজ ফুটেছে। সোনালী আলো। শরৎ দিনের দূরাগত পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ, কলকাতা মহানগরীর আকাশে এতক্ষণে জমায়েৎ হ'তে থাকে। আছে হয়তো এখানে কোন' যক্ষপ্রিয়া। কোন' এক যক্ষ। নগরীর কোলাহল স্তিমিত হয়েছে এখন। কলকাতা কি রামগিরির রূপ ধারণ করছে।

—গেল কোথায়? কারও যে পাত্তা পাওয়া যায় না!

তাকিয়া সরিয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন কৃষ্ণকিশোর। কথাগুলি উচ্চারণ করলেন আপন মনে। ঘরের দীপশিখার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। লণ্ঠনটা জ্বলছে। সুউচ্চ শিখা। কম্পমান শিখার আলোও কাঁপছে। সারা ঘরটা যেন কাঁপছে। কাঁপছে নয়, জলমধ্যে জলযানের মত যেন দুলছে।

ঘড়ি-ঘরে হঠাৎ ঘণ্টা পড়লো। সেই ফটকের পাশের ঘড়ি ঘরে।

এক, দুই, তিন; সময় কত হ'ল?

ঘরের মধ্যস্থিত ঘড়িটাও বেজে চলেছে ঠুং ঠাং ঠুং। কে যেন হঠাৎ পিয়ানোতে হস্তস্পর্শ করলো। গাণ্ড্‌ফাদার্স ঘড়িটায় জলতরঙ্গের ধ্বনি বেজে উঠলো।

ঘড়ি ঘরের ঘণ্টায় যেন পৃথিবীর অন্য সকল ঘড়ির শব্দকে ম্লান করে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। দুর্গের মত সুবৃহৎ অট্টালিকা। যেন কোন্ এক ব্যাশেল্ থেকে অস্তিত্ব ঘোষণা করে মহাকাল!

বহু—বহুদূর পর্য্যন্ত শোনা যায়, ভেসে যায় ঘড়ি-ঘরের আওয়াজ।

ফোর্ট উইলিয়ামের তোপের গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ পর্য্যন্ত হার মেনে যায়।

গহরজান বাইজীর স্মৃতি কেন কে জানে মন থেকে যেন মুছতে চায় না। গহরজানের রূপের স্মৃতি শুধু নয়, গহরজানকে জড়িয়ে আরও অনেক, অনেক কিছু দেখা যায় আর পরিবেশের ছায়াচিত্র দেখেন চোখে কৃষ্ণকিশোর। গোঁফের সূক্ষ্ম দুই প্রান্তে অঙ্গুলিবিন্যাস করতে করতে বাইজীটার রঙে যেন রঙীন হয়ে থাকেন।

অর্থদানের লাভ গহরজান। টাকা ফেলে পাওয়া।

টাকার সম্পর্কের। টাকা ফুরালে গহরজানও ফুরিয়ে যাবে। সম্পর্ক ঘুচে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ টাকা হাতে আছে ততক্ষণ কেন বৃথা অপব্যয় হ'তে দেওয়া যায়। আর, একটা মেয়েকে পুষতে কতই বা অর্থব্যয় এত যেখানে আধিক্য! ঘড়া ঘড়া টাকা। শুধু টাকা? গিনি মোহর হীরামাণিক্য। একটা গোটা তোশাখানা।

কৃষ্ণকিশোর বিশেষ আজ যেন লক্ষ্য করলেন গহরজান বাইজীর অন্য এক রূপ। ডালিম বেডালের বিয়ের টাকা হাতে পেয়ে ভোল যেন পাল্টে গেল মেয়েটার। ফূর্তিতে উচ্ছ্বসিতা হয়ে উঠলো ক্ষণেকের মধ্যে।

সেই হাসি-হাসি মুখ। সেই শঙ্খিনী না পদ্মিনী, যার মুখের মিষ্টি হাসিতে বিমোহিত হয়েছেন কৃষ্ণকিশোর। পয়সা খরচা ক'রে প্রেম বা ভালবাসাবাসির খেলা করছেন।

ঘরময় কে বুঝি আচম্কা কি এক পুষ্পগন্ধ ঢেলে দিয়ে যায়। ৪৭১১ সেণ্টের খোষবয়ে খাসকামরা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কার যেন পদশব্দ শুনে দ্বারপথ দেখলেন কৃষ্ণকিশোর।

দেখলেন স্বয়ং রাজেশ্বরী। শ্রাবণের মেঘের মত কেন তার মুখাবয়ব। থম থম করছে। লালে লাল হয়ে আছে খুনখারাপি রঙের শাড়ীতে। সিন্দুর, শাড়ী আর অলক্তকে।

বৌকে দেখে সামান্য হাসির সঙ্গে বললেন কৃষ্ণকিশোর,—আমার একটি কথা রক্ষা করবে তুমি?

আড়নয়নে একবার দেখলো রাজেশ্বরী।

কথাটি শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো। কোমরটুলীর মূর্ত্তির মত দেখলো যেন রাজাকে। লক্ষ্মীমূর্ত্তির মত।

—কি বলতে চান, বলুন। চেষ্টা করবো।

রাজেশ্বরী ভাঙ্গা-গলায় বললে। দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে।

কৃষ্ণকিশোর ক্ষণিক চিন্তিত হ'লেন। বললেন,—আপনি চুনীর অলঙ্কার পরিধান করুন।

হেসে ফেললো রাজেশ্বরী।

দুঃখের হাসি হাসলো। রাজেশ্বরীও অনুরোধ শুনে চিন্তাকুল হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তের মধ্যে। নেশার ঘোরের খেয়াল, হাসলো তাই রাজেশ্বরী। কিন্তু কোন দিন এই ধরণের অনুরোধ জানাননি কৃষ্ণকিশোর, ভেবে আকুল হয়ে ওঠে বৌ।

চুনীর গয়না। শুধু চুনী, আর কিছু নয়। তাও আছে রাজেশ্বরীর। চুড়ি আছে, হার আছে, কানবালা আছে। আর কি থাকবে! ক্রাউনের নকলে চুনীর ক্রাউনও আছে। এই ঘরের দেরাজেই আছে। রাজেশ্বরী বললে,—আপনার আদেশ পালন করছি জানবেন।

—তথাস্তু। বললেন কৃষ্ণকিশোর। সহাস্যে।

যখন-তখন দেরাজ আর আলমারী খুলতে সাহসী হয় না রাজেশ্বরী।

গয়নাগাটি আছে। আবার যদি কোন' একটা হারায়! চুরি যায়! নানা কথা ভাবতে-ভাবতে কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। আঁচলে-বাঁধা চাবির গুচ্ছ টেনে আলমারীটা খুলতে উদ্যোগী হয়। চাবি খুলতেই লণ্ঠনের আলোয় ঝলসে যায় যেন কৃষ্ণকিশোরের রক্তচক্ষু। রঙীন পোষাক আছে আলমারীতে। রূপালী আর সোনালী জরির চাকচিক্য খেলতে থাকে। রঙচঙে ভেলভেটের জামা, হাসতে থাকে বুঝি আলোর স্পর্শলাভে।

কোথায় গেল সেই কালো ক্যাশবাক্সটা!

চুনীর অলঙ্কার আছে সেই আধারে। আলমারী হাতড়াতে থাকলো রাজেশ্বরী। পোষাকের ভীড়ে হাত চালালো। আলমারীতেই আছে ক্যাশবাক্সটা। অদৃশ্য হয়ে আছে। খোঁজাখুঁজি করতে-করতে কিছু-কিছু পরিধেয় আলমারী থেকে মেঝেয় প'ড়ে যায়। সেদিকে খেয়াল নেই বৌয়ের। বেপরোয়ার মত যেখানে-সেখানে হাত চালায় সে। মরীয়া হয়ে গেছে যেন, এমনি তার মুখভঙ্গী। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

সোজা হয়ে কেন কে জানে বসতে পারছেন না কৃষ্ণকিশোর। ব'সে ব'সেই টলছেন যেন।

নেশার তীব্রতায় যেন অঙ্গ তাঁর শিথিল হয়ে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে। চেষ্টা ক'রে সামলে নিতে হয়, ভদ্রভাবে বসতে হয়। পাছে যদি ধরা পড়ে যান, এই আশঙ্কায় কৃষ্ণকিশোর বেশ সতর্ক হয়ে থাকেন। বৌ যদি ধ'রে ফেলে মদ খাওয়া হয়েছে।

এতক্ষণে পেয়েছে রাজেশ্বরী।

হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। মেঝেয় প'ড়ে-যাওয়া পোষাক তুলে রাখছে জড় ক'রে। একান্ত অবহেলার সঙ্গে রাখছে ঠেসে-ঠেসে। যেখানকার যা নয় সেখানে তাই রাখছে। তার হাঁফ ধ'রে যাওয়ার নিশ্বাস ফেলছে জোরে-জোরে। ক্রোধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে যেন রাজেশ্বরীর চাল-চলনে। ক্যাশবাক্সটা জাজিমে নামিয়ে আলমারী বন্ধ করে ফেললো। তার পর আঁচল চেপে ঘেমে-ওঠা মুখটা মুছলো অনেকক্ষণ ধ'রে। লাল হয়ে উঠলো মুখটা।

কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর প্রতি যেন দৃষ্টি নেই বৌয়ের।

ফিরেও তাকাচ্ছে না রাজেশ্বরী। ঘরে যেন অন্য মানুষই নেই। রাজো চাপটি খেয়ে ব'সলো জাজিমে। বাক্সটা খুলে ফেললো কি এক কল টিপতেই। বাক্সের ডালা খুলতে-খুলতে হাসলো আপন মনে। খুশী হওয়ার হাসি না ক্ষোভের হাসি বোঝা গেল না। তবে একটা অস্ফুট হাসির বিদ্যুৎ চমকালো যেন ঘরের ভেতরে।

কৃষ্ণকিশোর উঠে পড়লেন।

টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন একটি টেবিলের কাছে।

টেবিল প্রায় ফাঁকা। শুধু একটা কাঁশর। ঝুলছে কাঠের দোলনায়।

কৃষ্ণকিশোর কাঁশর বাজালেন। কয়েকবার বাজালেন। কাষ্ঠখণ্ডের আঘাতে।

চমকে উঠলো রাজেশ্বরী। হঠাৎ কাঁশরের শব্দে। পরম বিরক্তি অনুভব করলো। বাঁকা চোখে দেখলো একবার। দেখলো গম্ভীর, বিষন্ন মুখ কৃষ্ণকিশোরের। চোখ ফিরিয়ে চুনীর অলঙ্কার পরতে থাকলো। চুড়ি, হার আর কানবালা। লাল কাচের টুকরো এক মুষ্টি।

তবে কি বৌ ধ'রে ফেলেছে আসল অবস্থাটা!

সকালে যার হাসিমুখ দেখে জমিদারীর বকেয়া খাজনা জমা-দেওয়ার অছিলায় টাকা সমেত উধাও হয়েছিলেন, সেই হাসিমুখে হাসি দূরের কথা, একটা কথাও নেই!

কাঁশরের শব্দ শুনে কোন এক ভৃত্যের আগমন হয়। দালান থেকে হাজিরা জানায়।—হুজুর, হাজির আছি।

খুলে-যাওয়া ঘোমটা টানলো রাজেশ্বরী।

তার ধপধপে ফর্সা একটা বাহু লালের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আলোয় ভেসে উঠলো। সুডৌল বাহু।

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—ফুলদানিতে ফুল নেই কেন? বাগানের ফুল কি আর ফুটছে না?

ঘরের ফুলদানি সত্যিই শূন্য রয়েছে।

বিশেষতঃ পোরসিলেনের ফুলদানিটি। সাদা রঙের। এক নগ্ন নারীমূর্তি বেষ্টন ক'রে আছে ফুলদানি। অন্যান্য দিন ফুল থাকে ঐ পাত্রে। আজকে শূন্য থাকতে দেখে সত্যিই মনে মনে রাগান্বিত হন কৃষ্ণকিশোর। হুজুরের অভিযোগ শুনে দাঁতে জিহ্বা কাটলো অপেক্ষমান ভৃত্যটি। তড়িৎগতিতে দালান থেকে ছুটলো। শব্দহীন পদক্ষেপে। হয়তো ভুলে গেছে ফুল রাখতে।

চুনীর অলঙ্কার কয়েকটা অঙ্গে চড়িয়ে উঠে প'ড়লো রাজেশ্বরী।

ক্যাশবাক্সটা যথাস্থানে রেখে আলমারী বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

কৃষ্ণকিশোর পেছনে দুই হাতে পায়চারী করছিলেন কক্ষমধ্যে। গম্ভীর, বিষন্ন মুখ। পায়চারী করছেন প্রায় টলতে টলতে। তাঁর লুটন্ত কোঁচা। রূপালী জরির কুঁচানো ধুতি যেন মেঝে সাফ করার কাজ করছে। সেদিকে খেয়ালই নেই হুজুরের।

এখন কি করবে, তাই ভাবছিল রাজেশ্বরী।

ঘরের অভ্যন্তরে অসহ্য নীরবতা। কথা বলতে রাজেশ্বরীর মন চাইছে না। শয্যায় যদি আশ্রয় পাওয়া যায় যৎসামান্য! দেহ এলিয়ে দিয়ে যদি কিছুক্ষণের বিশ্রাম পাওয়া যায়! চোখ বন্ধ ক'রে চুপচাপ শুয়ে থাকবে রাজো। মাথাটা যে তার ঝিম-ঝিম করছে এখনও। পা দু'টো থেকে থেকে কাঁপছে ঠকঠকিয়ে। লণ্ঠনটা নিবিয়ে অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে চায় বৌ। কিন্তু মুখ ফুটে কি বলতে পারে বৌ

মানুষ হয়ে। তথাপি রাজেশ্বরী পালঙে ব'সলো পা মুড়ে। কত আশঙ্কা বুকে চেপে অত্যন্ত সন্তর্পণে ব'সলো পালঙের এক পাশে। গালে হাত দিয়ে ব'সলো শূন্যদৃষ্টিতে। ব'সতে গিয়ে খুলে গেল মাথার ঘোমটা।

কৃষ্ণকিশোর পায়চারী করছিলেন তখনও।

বৌকে পালঙে বসতে দেখেই কিনা কে জানে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—বাড়ীতে বৌ আনা হয়েছে বিছানায় শুধু ব'সে থাকতে নয়! সংসারের কাজকর্ম্ম দেখা, গেরস্থের কাজ করাই বৌ-ঝিয়ের কাজ।

বৌ-ঝি! ব'সেছিল রাজেশ্বরী। কথাগুলি শুনে উঠে প'ড়লো তৎক্ষণাৎ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কার প্রতি এই কথার লক্ষ্য? খড্গের মত দৃঢ় বক্র হয়ে উঠলো। রাগ এবং অভিমানে জ্বলতে থাকলো যেন। অপমান বোধ করলো। কি যেন বলতে গিয়েও বললো না। পায়ের অলঙ্কার শব্দায়িত হয়ে উঠলো। ঘরের বাইরে চললো রাজো। অধর দংশন করতে করতে বেরিয়ে গেল।

—যাও কোথায়?

ডাকলেন কৃষ্ণকিশোর।

দালানের অনেক দূর থেকে কথা ভেসে এলো,—সংসারের কাজকর্ম দেখতে, গেরস্থের কাজ করতে।

এতক্ষণে যে হৃদয়ঙ্গম হয় কৃষ্ণকিশোরের, কথাগুলি বলা উচিত হয়নি।

বড় অসময়ে বড় অন্যায় উক্তি করেছেন। নেশার ঘোরে কখন যে কি কাকে বলেন তার ঠিক আছে! মনে মনে বোধ করি অনুতপ্ত হন কৃষ্ণকিশোর। ঘরের দরজার দিকে কোন ক্রমে এগিয়ে ডাকেন,—বৌ, ও বৌ, শুনছো?

কোথায় কে? দালান ফাঁকা।

অন্য দিন এমন সময়ে একা যাওয়া-আসা করতে বেশ ডরায় রাজেশ্বরী। কখন কোথায় কাকে দেখতে পায়, এই ভয়ে। স্বর্গগত কোন মানুষ, এই বংশের মৃতজন কেউ যদি সশরীরে অবতীর্ণ হয়ে দেখা দেন, তখন!

রাজেশ্বরীর বক্ষে ভয় ও ত্রাস যেন তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, তাও আজ আর তার কোন' দিকে দৃক্‌পাত নেই। গৃহময় ঝম-ঝম শব্দের ঝঙ্কার। রাজেশ্বরীর পায়ের অলঙ্কারের শব্দ।

কাজে চ'লেছে রাজেশ্বরী। কাজ করতে চ'লেছে।

সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখতে। গৃহস্থের কাজ করতে। যেতে যেতে ইচ্ছা হয়, চুনীর গয়না ক'টা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে। কি ভাবে বৌ, একা একা এগিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। রান্না-বাড়ীর দিকে যাচ্ছে।

গৃহবধূকে সহসা সশরীরে দেখতে পেয়ে রান্না-বাড়ীর জন-মানুষ তো হতবাক্! কার' মুখে কথা ফোটে না। রাজেশ্বরীর মুখেও নয়। সে শুধু দাঁড়িয়ে প'ড়েছে। একটা থামের আড়ালে। ঠিক এই মুহূর্তে মুখখানি কাকেও দেখানো যায় না।

চোখ ভ'রে গেছে রাজোর। জলে ভিজে গেছে! অশ্রুজলে।

সোজাসুজি বললেই তো পারতেন, রাজেশ্বরী কি শুনতো না? সোজা কথা বললেই চলতো, বাঁকা কথার কি প্রয়োজন ছিল? কোন দিনের তরেও কোন কথা কি অমান্য করেছে রাজো?

—বৌদিদি, তুমি হেথায় কেন?

একজন পরিচারিকা। কে তার কে জানে! একজন দাসী।

রাজেশ্বরী ভিজে-যাওয়া চোখ আঁচলে মুছতে মুছতে ভাবছিল, স্বামীকে সুখী করতে, খুশী রাখতে সে কি চায় না! যখন তিনি যা বলেছেন তাই শুনেছে হাসিমুখে। কৃষ্ণকিশোরের মন যাতে ঘরে বাঁধা পড়ে সে জন্য রাজেশ্বরী মরতেও প্রস্তুত ছিল। এখনও আছে।

—কথা কও না কেন বৌদিদি? হ'ল কি তোমার?

দাসী আবার জিজ্ঞেস করলো। কেমন যেন ভীতকণ্ঠে।

কিন্তু অনেক দিনের অনেক দুঃখের চাপা-কান্নার বাঁধ ভেঙেছে এখন। চোখের জলে আঁচল ভিজে যাচ্ছে। একটা লণ্ঠন-হাতে অন্য এক দাসীর দেখা পাওয়া যায়। দূর থেকে, কথাবার্ত্তা শুনে দাসী আলো এনে হাজির করে। দেখা যায় রক্তাম্বর-পরিহিতা রোরুদ্যমানাকে। লাল শাড়ীর সিক্ত অঞ্চলও দেখা যায়।

—কিছু হয়নি। বললো রাজেশ্বরী।

—কাঁদছো যে তুমি?

—ও কিছু নয়। যাও তোমরা, কাজে যাও। [illegible] রাজেশ্বরী। তাই ব'লে কি রাজো এত মূর্খ যে [illegible] পরিচারিকাদের কাণে ঘরের কথা ভাঙবে? তাদের দু'জনকে এক রকম তাড়িয়ে দেয় যেন সে। স্বামী না হয় কটু কথা বলেছেন, তাই ব'লে কি—

কক্ষমধ্যে তখনও পায়চারী করছিলেন কৃষ্ণকিশোর। সত্য সত্যই তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন। নেশার ঘোরে খেয়াল ছিল না, কাকে কখন কোথায় কোন্ কথা বলতে হয়। তিনি ভাবছিলেন, স্ত্রীর শরীর হয়তো ক্লান্ত হয়েছিল; সারা দিন পরে হয়তো বিশ্রাম করতে বসেছিল। চুনীর অলঙ্কার পরলো বৌ, সে তো শুধু তাঁরই কথায় নয়, আদেশে। দু'বার বলতে হয়নি তাঁকে।

কিন্তু চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে কেন?

এইক্ষণে যে কথা ভাবছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গ মানসপটে উদিত হচ্ছে কেন? এ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়া কি! স্পিরিটের নেশায়? না, হঠাৎ চোখে প'ড়লো?

দেওয়ালে নির্ব্বাক্ চিত্র!

পলকহীন দৃষ্টি। মহারাণী যেন কোথাকার। তেমনি বেশভূষা।

কুমুদিনীকে দেখে কুমুদিনীকে মনে পড়লো কৃষ্ণকিশোরের। মাকে মনে পড়লো ছেলের।

মা তখনও বসে আছেন গঙ্গাতীরে। এখনও তাঁর চোখ পলকহীন।

দৃষ্টি হারালেই বা, কুমুদিনী তবুও তাকিয়ে আছেন ঐ দিকে।

যে দিকে মণি-কর্ণিকা। যে দিকে দাউ-দাউ চিতা জ্বলছে। শেষ-আশ্রয়ের দিকে চোখ কুমুদিনীর। ভুলে গেছেন পৃথিবী। পেছনে কে প'ড়ে আছে, ফিরে দেখবার মত সময় নেই।

চিত্রে কুমুদিনীর মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন হয়ে গেল কেন চকিতের মধ্যে।

কৃষ্ণকিশোরের চোখে হঠাৎ দেখা দিয়েছে গহরজান বাইজী। দেখার ভুল নয় তো!

নেশার ঘোরে কখন কি ভাবেন, কখন চোখে কি দেখেন তার ঠিক থাকে কখনও? বাইজীটাকে চোখের সমুখে দেখতে পেলেন যেন কৃষ্ণকিশোর। সঙ্গে সঙ্গে তার যেন সান্নিধ্যলাভের আনন্দ উপভোগ করলেন। মনটা যেন তাঁর হু-হু করে উঠলো। কোথায়, কোথায়, কোথায় গহরজান!

কোথায় আবার, যেখানে ছিল সেখানে।

খোস-গল্প করছিল মাসীর সঙ্গে। হাসির উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছিল যখন-তখন। গহরজানও যে পান করেছিল। একটুতে তার মন ওঠেনি, খেয়েছিল অনেকটা। নেহাৎ অভ্যাস আছে তাই রক্ষা।

ডালিমের বিয়ের বিষয়ে কথা বলাবলি করছিল পরস্পরে। কি হবে, কি না হবে সেই সব কথা বলতে আর শুনতে মশগুল হয়েছিল গহরজান।

মাসী সৌদামিনী শুধু দেখছিল কতক্ষণে গহরজানের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। নেশায় জড়িয়ে আছে, কখন ঘুম আসবে। সৌদামিনী এঁচে আছে যেন। গহরজানও ঘুমাবে, মাসীও তৎক্ষণাৎ গহরের দরজায় শেকল এঁটে দিয়ে [illegible] নিয়ে বসবে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসবে একা-একা।

টাকার ঘড়াটা উপুড় করে ঢালবে। মনের সুখে গুণবে টাকার রাশি। মুঠো-মুঠো টাকা রাতারাতি সরিয়ে ফেলবে এমন জায়গায়—

কৃষ্ণকিশোর ব'সে পড়লেন আরাম-কেদারায়!

কি যেন মনে পড়লো তাঁর। অস্বাভাবিক বিকট চীৎকারে ডাকলেন,—অনন্ত! অনন্ত! অনন্তরাম!

সুবৃহৎ অট্টালিকা। প্রতিধ্বনি উঠলো গৃহস্বামীর ডাকের। বহুদূর পর্য্যন্ত ভেসে গেল ঐ তীব্র আহ্বানের শব্দ। কাছাকাছি যারা ছিল চমকে শিউরে উঠলো ডাক শুনে।

অনন্তরামের আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়। সে যখন শোনে।

—ডাকছিলে আমাকে?

অনন্তরাম হাজির হয়। সাড়া দেয়।

—হ্যাঁ ডাকছি। তুমি আর কিছু দেখো না অনন্তদা, দেখো তো ঘরের দেওয়ালে কত ঝুল!

অনন্তরাম তো অবাক্। কথার সুরই পালটে গেল।

কৃষ্ণকিশোর কথা বললেন অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে। অনন্তরাম কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে কথা বললে,—ওঃ, এই কথা বলতে এমন ষাঁড়ের মত চীৎকার ক'রছো?

হেসে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। বললেন হাসতে হাসতে,—তুমি আমাকে ষাঁড় বললে অনন্তদা!

—তুমি শুধু ষাঁড় নয়, তুমি একটা মূর্খ, তুমি একটা—

কথা বলতে বলতে ঘরের বাইরে চলে গেল অনন্তরাম।

আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়লেন কৃষ্ণকিশোর। চক্ষু মুদিত করলেন। ৪৭১১ সেন্টের সুগন্ধ, ভারী ভাল লাগে যেন গন্ধটা।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে থাকে কাকেও কিছু না জানিয়ে।

রাত্রির নির্জ্জনতায় ঘণ্টাধ্বনি অধিক দূর পর্য্যন্ত শোনা যায়।

রাজেশ্বরীও শোনে। সেই অন্দরের রান্না-বাড়ীতে ব'সে ব'সে শুনতে পায়। তাকে কিছু করতে দেয়নি ব্রাহ্মণী আর দাসীদের দল। ন'ড়ে বসতে দেখেনি। একটা পিঁড়ে পেতে দিয়ে বসিয়ে রেখেছে। জবুথবুর মত এক নাগাড়ে ব'সে থাকতে থাকতে শুধু ঘামছে রাজেশ্বরী। তার বুক-পিঠের জামা ভিজে গেছে ঘামতে ঘামতে।

রান্না-বাড়ীতে পাঁচ-ফোড়নের গন্ধ।

আরও কত কি আহার্য্যের মিশ্রিত গন্ধ। ব্রাহ্মণী রাঁধছে রাত্রির আহার। কড়াইয়ে ফুটছে। ডালের হাঁড়ি উপচে পড়ছে! ক'জন দাসী ময়দা ঠেসছে এক দালানে।

আর রাজেশ্বরী চুপচাপ ব'সে দেখছে ইদিক-সিদিক।

একজন দাসী পেছনে দাঁড়িয়ে হাত-পাখার হাওয়া বওয়াচ্ছে। তবুও ঘামছে রাজেশ্বরী জানলাহীন ঘরটায়।

—ও বৌদিদি, তোমাকে হুজুর ডাকতে পাঠিয়েছে। দাসীদের কে এক জন কথা বললে সসম্ভ্রমে। নাতি-উচ্চ কণ্ঠে।

কথাটা যেন শুনেও শুনতে পায় না রাজেশ্বরী। ডাকছে তা কি করতে হবে? যাবে না রাজেশ্বরী, সংসারের কাজ-কর্ম্ম আর গৃহস্থের কাজের দেখাশুনা করবে। হুকুম করা মাত্রই যে গিয়ে হাজির হ'তে হবে এমন কোন কথা আছে? যাবে না, কিছুতেই যাবে না রাজেশ্বরী। ক্রোধ আর অভিমানে থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে রাজেশ্বরী। একটা কিছুর চাপা কষ্ট বুকটা তার মথিত করছে যেন। মদ খেয়ে যে মানুষ নেশায় ডুবে আছে তেমন মানুষের সংস্পর্শেও যেতে চায় না বৌ।

ওদিকে বাড়ী-কাঁপানো গগন-বিদারক কণ্ঠস্বর।

কৃষ্ণকিশোর ডাকছেন কাকে যেন। অন্য দিন এমনটি করেন না। আজকেই ব্যতিক্রম ঘটেছে। যখন তখন চীৎকার করছেন তিনি। ডাকছেন যাকে খুশী মন চাইছে। সাড়া না পেলে আরও জোরে গলা ছাড়ছেন। বৌকে

ডেকেছেন। তবুও বৌয়ের দেখা না পেয়ে ডাকাডাকি করছেন কাকে যেন।

—ডাকছিলেন আমাকে?

ঘরের বাইরে থেকে কথা বললে রাজেশ্বরী। ইচ্ছা না থাকলেও চীৎকারের আতিশয্যে আসতে বাধ্য হয়েছে সে।

একেবারে আরেক মানুষ। নম্র কণ্ঠস্বর। কৃষ্ণকিশোর বললেন,—হ্যাঁ গো বৌ, কোথায় চ'লে গেলে তুমি? ডেকে ডেকে সাড়াই পাওয়া যায় না তোমার!

খানিক চুপ ক'রে থাকলো রাজেশ্বরী। আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবলো। বললে,—গেছলাম সংসারের কাজ দেখতে। আপনি যে বললেন, বৌ-ঝিয়ের সংসারের কাজ-কর্ম দেখতে হয়। আপনি ডাকছেন, রান্নাবাড়ী থেকে আমি শুনতেই পাইনি।

কৃষ্ণকিশোর হো-হো শব্দে হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—তুমি কি বল তো বৌ? আমি বলেছি ব'লে তুমি চ'লে গেলে রান্নাবাড়ীতে?

নিরুত্তর থাকলো রাজো। কোন কথা বললে না।

দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হাসির রেশ টেনে কৃষ্ণকিশোর বললেন,—বাইরে কেন? ঘরে এসো না।

রাজেশ্বরী বললে,—এখনও সংসারের কাজকর্ম মেটেনি যে।

—তা হোক। তুমি ঘরে এসো।

কৃষ্ণকিশোরের কথায় যেন অনুরোধের ইঙ্গিত।

নির্বিকার, কোন কথা বলে না রাজেশ্বরী। স্থির পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে থাকে তো দাঁড়িয়েই থাকে।

রাগ নয়, অনুরাগের সুরে বললেন কৃষ্ণকিশোর,—কথা শুনছো না কেন? ঘরে এসো তুমি।

—ঘরে গিয়ে কি করবো আমি? শুধোলে রাজেশ্বরী। বললে,—কত কাজ বাকী এখনও! আমার আসতে রাত হবে।

আরাম-কেদারা থেকে উঠলেন কৃষ্ণকিশোর। হাসতে হাসতে এগোলেন দরজার কাছে। বৌয়ের একটা হাত ধ'রে টানতে টানতে ঘরে এনে হাজির করলেন। বললেন,—তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি শুধু এই পালঙে ব'সে থাকবে। তোমাকে সংসার দেখতে হবে না। দেখবার কত লোক আছে।

—তা তো জানি যে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক আছে আপনাদের বাড়ীতে। খেয়ে, ঘুমিয়ে আর ব'সে ব'সে দিন কাটাচ্ছে। তবু বৌ-ঝিয়ের কাজই হ'ল গেরস্থ দেখা।

কৃষ্ণকিশোর কথার সুর পরিবর্ত্তিত করলেন। বললেন,—তুমি যেন বৌ এক ধরণের! একটা কথা ব'লেছি, তার জন্যে তুমি যে কেমন করছো!

নিরুত্তর থাকলো রাজো। কেন কে জানে দর-দর বেগে অশ্রুপাত করতে থাকলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

চোখে জল দেখলে যেন থাকতে পারেন না কৃষ্ণকিশোর।

বৌকে বেঁধে ফেললেন বাহু-বন্ধনে। চিবুক ধ'রে বৌয়ের মুখটি তুললেন। বললেন,—রাগ কর' কেন? তুমি যদি কথায়-কথায় রাগারাগি কর' আমি তো নাচার। আমার আর কে আছে বল?

কোন কথার জবাব দেয় না রাজো।

আঁচলে চোখের জল মোছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে থেকে থেকে।

কৃষ্ণকিশোর হাসির রেশ টেনে কি খেয়ালে কে জানে বললেন,—জানো বৌ, একটা বেড়ালের বিয়ে দিচ্ছি।

কথাটি শুনে যেন আপাদমস্তক জ্বলতে থাকলো রাজেশ্বরীর। তবুও সে বললে,—কোথাকার বেড়াল? কার বেড়াল? আমি তো জানি না?

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—সে আর তোমার শুনে কাজ নেই। কার বেড়াল তা আর জিজ্ঞেস কর না।

রাজেশ্বরী বেশ বুঝতে পারে, স্বামীর কথার কোথায় যেন বেশ একটু রহস্য লুক্কায়িত হয়ে আছে। বৌ বললে,—বেড়ালের বিয়ে দিচ্ছেন, কার বেড়াল, কোথাকার বেড়াল যদি না বলেন তবে আর বললেন কেন কথাটা?

হেসে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। এ কি করছেন বুঝতে পারছেন না তিনি নিজেই। সব কথা ফাঁস ক'রে দিচ্ছেন তিনি নিজেই।

—বলছি গো বলছি। তুমি যে দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে কথা বলছো। কৃষ্ণকিশোর কথা বলেন বাহুপাশ দৃঢ় করতে-করতে।

—কত কাজ বাকী এখনও! আপনি খাবেন, বাড়ীর লোকজন খাবে, কাজ শেষ হ'তে অনেক দেরী এখনও। বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে রাজেশ্বরী। চিবিয়ে-চিবিয়ে।

—আর তুমি? তুমি খাবে না?

—না, আমার আর খেতে ইচ্ছে নেই।

—কেন?

—কেন? কথার মাঝে হাসলো রাজেশ্বরী। দুঃখের হাসি। বললে,—আমার জন্যে ভাবছেন কেন? আমি তো কত খেলাম বাড়ী ফিরতেই।

—কখন? কে আবার তোমাকে খাওয়ালে?

—আপনিই তো খাওয়ালেন? পেট আমার ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আর খেতে ইচ্ছে নেই।

ভাবনায় আকুল হয়ে পড়লেন কৃষ্ণকিশোর। ভাবলেন, কখন আবার তিনি খাওয়ালেন। কি খাওয়ালেন। বললেন,—আমি আবার কখন খাইয়েছি! কৈ, না তো! আমার তো মনে পড়ছে না।

—মনে নেই আপনার? নেশা করলে মানুষের কিছু মনে থাকে না। আপনি নেশা করেছেন কি না! রাজেশ্বরী কথা বলে বেপরোয়ার মত। ভয়লেশহীন কণ্ঠে।

কৃষ্ণকিশোর কথাগুলি শুনে ক্ষুব্ধ হলেন যেন কিঞ্চিৎ।

খানিক নীরব থেকে বললেন,—কে বললে যে আমি নেশা করেছি? কথা বলতে বলতে বাহুবন্ধন শিথিল করলেন। বললেন,—বেড়াল আমার মেয়ে-মানুষের, তারই বিয়ে দিচ্ছি। খরচা করছি হাজার পঁচিশেক টাকা। মানুষের বিয়েতেও চট ক'রে এত টাকা ব্যয় করে না!

—কেন? বললে রাজেশ্বরী। দুঃখের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বললে,—আমার ঠাগ্‌মাই তো লাখ খানেক টাকা খরচা ক'রেছে একটা আহাম্মুখ বাঁদরের বিয়েতে।

সজোরে বাহুর আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে গেল রাজেশ্বরী। ঘৃণা ফুটে উঠলো তার মুখে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটলো অবজ্ঞা।

—কবে আবার তিনি বাঁদরের বিয়ে দিলেন। জানি না তো আমি? কখনও তো বল'নি! বললেন কৃষ্ণকিশোর অদম্য কৌতূহলে।

—কেন? আমারই তো বিয়ে দিয়েছেন লাখ টাকা খরচা করে। রাজেশ্বরী কথা বললে দীপ্ত কণ্ঠে। বেপরোয়ার মত।

—তোমার তা হ'লে বিয়ে হয়েছে একটা বাঁদরের সঙ্গে? আমি তা হ'লে— কথার মধ্যপথে থেমে গেলেন কৃষ্ণকিশোর।

—নিশ্চয়ই, বাঁদর তো ছার। তার চেয়েও যদি—

—মুখ সামলে কথা বলবে তুমি। বললেন কৃষ্ণকিশোর ক্রুদ্ধ স্বরে।—তুমি ভুলে যাচ্ছো যে কার সঙ্গে তুমি কথা ব'লছো?

—উঁহু, আমি তো আর মদ খাইনি যে বাজে কথা বলবো। আমি ঠিকই বলেছি। কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যোগী হয় রাজেশ্বরী।

হুকুমের সুরে কথা বলেন কৃষ্ণকিশোর। বলেন,—যাচ্ছো কোথা? দাঁড়াও। আমি যতক্ষণ না আসছি ততক্ষণ এক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভবিষ্যৎ না ভেবে কথা বললে তার শাস্তিভোগ করতে হয়।

কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কৃষ্ণকিশোর। দ্রুতপদে।

রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে থাকে একা। ঘরের কড়িকাঠ গুণতে থাকে হয়তো।

কয়েক মুহূর্ত অতীত হ'তে না হ'তে ফিরে আসেন কৃষ্ণকিশোর। তাঁর হাতে একটা নাতিবৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র। একটা রাইফেল বোধ হয়।

—ওটা আবার কি হ'বে? এত রাতে শিকারে বেরোবে নাকি? ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে কথা বললো রাজেশ্বরী।

—শিকার করতে বেরুতে হবে না। ঘরে ব'সেই শিকার করবো। কৃষ্ণকিশোর রাজেশ্বরীকে লক্ষ্য ক'রে বন্দুক দাগতে দাগতে বললেন। ক্রোধ এবং অপমানে কাঁপতে কাঁপতে বললেন।

—তামাসা রাখো এখন। বললো রাজেশ্বরী।—অনেক কাজ এখনও বাকী। তামাসা ভাল লাগে না এখন।

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—তামাসা নয়, সত্যি সত্যিই শিকার করবো।

বন্দুক উঁচিয়ে ধরতেই আঁৎকে উঠলো রাজেশ্বরী। ভয়ে শিঁটিয়ে গেল যেন। ভীতিকাতর কণ্ঠে বললেন,—ওগো, এ কি ক'রছো তুমি? হাত ফসকে যদি—

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—যা করছি ঠিকই করছি। তোমার মত স্ত্রী না থাকাই ভাল!

—কেন, আমি কি করেছি? ওগো, বন্দুক রেখে দাও তুমি। তোমার পায়ে পড়ছি আমি। আর কখনও এমন কথা মুখে আনবো না আমি। এইবারটির মত ক্ষমা কর' তুমি! রাজেশ্বরীর কথায় অন্তরের মিনতি। কাঁদো-কাঁদো সুর যেন।

—ক্ষমা আমি কাউকে করি না। ক্ষমা করতে আমাকে কেউ শেখায়নি। কৃষ্ণকিশোর কথা বলেন জোরালো সুরে।

গুড়ুম!! গুড়ুম!!

প্রথম কার্ত্তুজটা ফসকে যায়। দেওয়ালে বিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় কার্ত্তুজ বিঁধে যায় রাজেশ্বরীর কণ্ঠে। রক্তধারা গড়াতে থাকে। কি যেন বলতে গিয়েছিল সে। বলা হয় না। মুখ থেকে কথা বেরোয় না আর।

গুড়ুম!! গুড়ুম!!

আবার দু'টো আওয়াজ। দু'টি কার্ত্তুজ দেগে বোধ করি তৃপ্ত হন না কৃষ্ণকিশোর। তাই আরও দু'বার ট্রিগার টানলেন। একটি লাগলো রাজোর ডান বাহুতে। অপরটি লাগলো বুকের ঠিক মধ্যস্থলে।

মূলচ্যুত বৃক্ষের মত ধরাশায়ী হয়ে পড়ে যায় রাজো। ছট-ফট করতে থাকে। কি এক অসহ্য কষ্টে যেন কাৎরাতে থাকে। গোঙানির শব্দ পাওয়া যায় রাজোর মুখ থেকে। আয়ত চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় যেন।

গুলীর বিকট শব্দে গৃহের জনমানুষ ছুটে আসে। ঘরে প্রবেশ করতে কেউ সাহসী হয় না। দরজার বাইরে দালানে ভীড় জমায়। ঠক-ঠক কাঁপতে থাকে কেউ-কেউ। ভয়ে আর আশঙ্কায়।

কৃষ্ণকিশোর বন্দুকটা রেখে দেন ভূলুণ্ঠিতা রাজেশ্বরীর পাশে। রাজো তখন স্থির আর অচঞ্চল হয়ে গেছে। আহত স্থান থেকে রক্তপাত হচ্ছে। মেঝেয় রক্তের ধারা বইছে। গাঢ় লাল রক্ত। বৌয়ের খুনখারাপি রঙের শাড়ীটা ভিজে যাচ্ছে।

—এ কি করলে তুমি? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো অনন্তরাম।

হেসে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। হাস্যমুখে বললেন,—আমি নয় অনন্তদা! ও নিজেই নিজেকে মেরেছে! আত্ম-হত্যা, সুইসাইড করেছে।

—আমাকে আর বোকা বানিও না তুমি! আমি তোমাকে খুব চিনি। বন্দুক বৌ পাবে কোত্থেকে শুনি?

[৬৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

দেশে দেশে

"বিক্রমাদিত্য"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(শেষাংশ)

আর একটা ঘটনা। আমার এক জার্নালিষ্ট বান্ধবী গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। খাতা বের করে তিনি চাইলেন এক অটোগ্রাফ। হেসে গান্ধীজি বললেন, 'টাকা দাও।' বান্ধবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জন্যে?'

'বাঃ রে, তুমি জানো না, এটা আমার হরিজন ফাণ্ডের প্রাপ্য।'

বান্ধবী আমেরিকান. গান্ধীজি তাঁকে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতো দিন এদেশে আছ আর ক'দিন পরেই বা তোমার বই বেরুচ্ছে?'

'প্রায় দু' বছর'—বান্ধবীটি জবাব দেন। হাসতে থাকেন গান্ধীজি, 'উঃ, দু'বছর। বল কী হে? **Two years is too long for an American to work on a book.'**

কথাপ্রসঙ্গে উঠলো মিস্ ক্যাথারিণ মেয়োর কথা। হেসে তিনি বললেন, 'মেয়োর পূর্ণ অধিকার ছিল আমার **quote** করায় কিন্তু **misquote** করার কোন অধিকারই তার ছিল না।'

বান্ধবী বললেন, 'আচ্ছা, আপনি বলেছিলেন যে আপনার ১২৫ বছর বাঁচবার ইচ্ছে আছে?'

'আমি সে আশা ত্যাগ করেছি,' তিনি বলেন। বান্ধবী এর হেতু জিজ্ঞেস করলেন।

গান্ধীজি বললেন, 'দেখতে পাচ্ছো না এ জগৎ ভরে গেছে হিংসায় ও পাপে? এই অন্ধকার, মারামারির মধ্যে বেঁচে থাকবার আমার কোন অভিপ্রায়ই নেই।'

তিনি তকলী কাটতে লাগলেন। তার পর আবার বললেন, 'তবে যদি ভগবান ইচ্ছে করেন তবে আমায় এই দীর্ঘকালই বেঁচে থাকতে হবে।'

কিন্তু আজ সব বিলীন হয়ে গেলো এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে। ধূলির সাথে তাঁর দেহ হলো একাকার, কণ্ঠ হলো নীরব। সেই কণ্ঠের সঙ্গীত আর কখনো বাজবে না, তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়বে না কোন জায়গায়।

* * * *

গান্ধী হত্যার খবর 'স্কুপ' করলো প্রমোদ রায়। প্রমোদ চৌকস, দৈনন্দিক নিয়মানুযায়ী সেদিনও গিয়েছিল প্রার্থনা-সভায়। সভার প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনা ঘটার পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না প্রমোদ। দৌড়ে গিয়ে টেলীফোনে খবর দিল অফিসকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীময় এ খবর ছড়িয়ে গেলো।

বোম্বাই দপ্তরে এ কাহিনী রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। নিউজ ডেস্কে বসে কাজ করলেন স্বয়ং নিউজ এডিটার ডান্‌কান হুপার। ওয়াটসনকে ভার দেয়া হলো এ, পি, আইর কাজ। সাহায্য করার জন্য আমাদের দল বলো।

ঘটনার পর প্রমোদ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু নিজেকে সামলে নিলো এক মুহূর্তে। তার পর দিলো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। তার উপর ভিত্তি করে লণ্ডনে 'কেবল্' পাঠালেন ডুন ক্যাম্পবেল।

* * *

সেদিন রাতে কাজ শেষ হলো ভোর চারটার সময়। উত্তেজনায় কাজ করা গিয়েছিল, কাজেই ক্ষিদের জ্বালা ঠিক বোঝা যায়নি। কিন্তু যখন সেটা উপলব্ধি করলাম তখন দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অভয় দিলো আমার এক সহকর্মী। বললে, 'যদি রাজী থাক, তবে নিয়ে যেতে পারি একটা জায়গায়। সে স্থানের খ্যাতি নেই, তবে অখ্যাতি আছে প্রচুর, এক কথায় বলতে পারো ওটা বারবনিতার আড্ডাখানা।'

খবরটা শুনে আর এক বন্ধু উল্লসিত হলেন। বললেন, 'ব্রাভো, আমার তো শুনে মনে হচ্ছে খাবারটা হজম হবে।' খিদের প্রবল তাড়নার দরুণ এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি করলাম না। এসে উপস্থিত হলাম ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে এক সরাইখানায়। দরজাটা আধ-ভেজানো, কিন্তু ভেতরের আলো দেখে বুঝলুম যে, ক্রেতার অভাব নেই।

খাবার নেয়া হলো প্রচুর। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেগুলো শেষ হয়ে গেলো। আরো কিছু খাবার নেয়া হলো।

হঠাৎ পাশের এক ক্যাবিন থেকে শুনতে পেলাম নারীকণ্ঠের কলধ্বনি। মনে হলো এর মধ্যে এক স্বর পরিচিত, কোথায় এর রেশ শুনেছি। বন্ধুবরেরা আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন। বললেন, 'ভায়া, ঘাবড়ে যেয়ো না। এটা শুধু জঠরের ক্ষিদে মেটাবার জায়গা নয়, দেহের ক্ষিদে মেটাবার জায়গাও বটে। যদি কখনো প্রয়োজন বোধ করো।'

কথাটা শেষ হলো না। সেই ক্যাবিন থেকে গোটা তিনেক মেয়ে বেরিয়ে এলো। রাত্রের সেই আলোয় এক জনকে চিনতে কষ্ট হলো না। সে অলোকানন্দা। অলোকা আমায় সেখানে দেখে একটু অবাক হলো।

আমার মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছি। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, বাংলা দেশ থেকে বহু দূরে বোম্বাইর এই হোটেলে অলোকার দেখা পাবো! আশ্চর্য, অলোকার এই জীবনধারা কখনও আশা করিনি।

অলোকা নিজেই এসে কথা বললো: 'আমায় এখানে দেখে অবাক হয়েছো। ওঃ, অনেক দিন তোমায় দেখিনি। দিল্লীর পর তুমি কোথায় আছ, তাও জানতুম না।'

আমি চুপ করে রইলাম। ও বলতে লাগলো, 'কী ভাবছো,

কেন এই পথে এলাম? কখনো আশা করোনি আমার এই জীবনধারা?'

জবাব দিলাম, 'না, কখনো তোমার এই জীবন কল্পনা করিনি। আমি জানতুম, তুমি অজয়কে ভালোবাস। কিন্তু এখন দেখছি সবই মিথ্যে।'

'হাঁ, ভালোবাসতুম, আর সেই ভালোবাসাই আমার সর্বনাশ করেছে। আমি জানি যে, আমার কোন অজুহাতই তুমি মানবে না। বলবে, মিথ্যে কথা। কিন্তু কথা বানিয়ে বলবার আজ কোন অভিপ্রায়ই আমার নেই। যে ঈপ্সিত জিনিষ পাবার জন্যে মানুষ সংগ্রাম করে, নেয় মিথ্যের আশ্রয়, তা পাবার কোন আকাঙ্ক্ষাই আমার নেই।'

আমার বন্ধু-বান্ধবেরা উঠে অন্য টেবিলে গেলো। অলোকা বলতে লাগলো: 'ভালো মন্দের ফিলসফি আজ আর আমায় শুনিও না। আজ এ জীবনের জন্যে দুঃখ হয় না, মনে আসে না গ্লানি। আর হবেই বা কেন? জীবনে ভালো ভাবে বাঁচবার অধিকার যেমনি আছে তেমনি মন্দো হয়ে বাঁচবার ত অধিকার সবার আছে। নইলে জগতে ভালো-মন্দের বালাই থাকতো না।'

আমার কণ্ঠস্বরে একটু ঘৃণার আভাষ দেখা দেয়। বলি, 'তোমার এই অমৃতবাণী শোনার মতো প্রবৃত্তি নেই। ভোর হয়ে আসছে, আমায় বাড়ী যেতে হবে।'

আমি যাবার উপক্রম করি।

অলোকা আমার হাত চেপে ধরে। বলে, 'না, তোমায় শুনতেই হবে আমার কথা।'

ওর চোখ দুটো দিয়ে বইতে লাগলো অশ্রুধারা। ও বললো, 'ভাবছো, কেন এই পথে এলাম? আমি জানি তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তবু বলছি—

"তুমি যাবার কিছু দিন পরেই আমার জীবনে এলো দুর্যোগ। মা মারা গেলেন, দাদা সৈন্যবাহিনী থেকে ছাঁটাই হয়ে এলেন। সবাই আশা করলো যে, ও একটা বড়ো চাকুরী পাবে। ও নিজেও সে আশা করেছিল। কিন্তু কোথাও কিছু হলো না, শেষ পর্যন্ত চাকুরী মিললো সামান্য কেরাণীর। একদিন দাদা অফিস থেকে আর ফিরে এলেন না। আজও কোথায় আছেন জানি না। তবু অজয়কে পাবো এ আশায় বেঁচে রইলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন এলো অজয়ের মৃত্যুখবর। আচার্য্য বলে এক ভদ্রলোক 'তার' পাঠিয়েছিলেন। বাবা 'তার' পড়ে কিছু বললেন না, শুধু আমার হাতে দিলেন। তুমি ভাবছো খবর পেয়ে আমি কেঁদেছি। না, মোটেই নয়। প্রথমে কাঁদবার খুব চেষ্টা করলাম, তার পর বিধাতার পরিহাস দেখে খুব হাসি পেলো। কী অন্যায় করেছিলাম যার জন্যে ভগবান আমায় শাস্তি দিলেন? 'তার' হাতে করে বাড়ীর পাশের জানলাটায় বসে রইলাম, রাস্তার অগণিত জনসমুদ্রের দিকে রইলাম তাকিয়ে। মনে হলো যেন অজয়কে দেখতে পাচ্ছি এই জনতার মধ্যে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে এই নিঃশব্দতা, এই চিন্তাধারা আমার অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো, নিস্তব্ধতা হয়ে উঠলো ভয়াবহ। বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবছো, এ কি করে সম্ভব। আমি নিজেও আজ ভাবি এ কী করে করলাম। ট্রামে উঠে রওনা হলাম এসপ্লানেডের দিকে। রাস্তার মাঝে-মাঝে দেখতে পেলাম সাইনবোর্ড—'জয়েন ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'। আমার চোখের সামনে অজয়ের চেহারা ভেসে উঠলো। সে যে কী নিদারুণ অসহ্য যন্ত্রণা, তা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। পরদিন নিয়মিত ভাবে অফিসে গেলাম। বান্ধবীদের সঙ্গে নিজের বর নিয়ে খুব রসিকতা করলাম। সবাই একটু অবাক হলো, কারণ, জানো তো আমি একটু গম্ভীর প্রকৃতির? কখনো রসিকতা করতে করি না। সবাই জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ রে, তোর কী হয়েছে রে?' জবাব দিলাম, 'কৈ, কিছুই হয়নি তো।' অজয়ের মৃত্যু-খবর ওদের কাছে চেপে গেলাম। বিকেল বেলা অফিস থেকে সোজা বাড়ী গেলাম না। ধর্মতলার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। অফিসের দুর্গা বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় এ পথ দিয়ে হাঁটতে দেখে একটু অবাক হলেন। বললেন, 'অলোকা দেবী, আপনি এদিকে পথ ভুলে আসেননি তো?' বললাম, 'না, পথভ্রষ্ট হয়ে এসেছি।' দুর্গা বাবু আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। দুর্গা বাবুকে বললাম, 'দুর্গা বাবু, আমায় সিনেমায় নিয়ে যেতে পারেন? মনটা ভালো লাগছে না।' আমার এই কথাটা নিজের কানেই কর্কশ লাগলো। দুর্গা বাবুর বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেলো কিন্তু সানন্দে রাজী হলেন। বহু দিন ধরেই তাঁর আমার সঙ্গে আলাপ করার অভিপ্রায় ছিল। তাই আমার এই 'অফারটা' তাঁর কাছে এলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। সেদিন সিনেমায় গেলাম ও রেষ্টুরেণ্টেও গেলাম। তার পরের কাহিনী বলে তোমার মন আর ভারাক্রান্ত করতে চাই নে। কারণ সে [illegible] এমন গৌরবজনক নয় যা তোমায় বলতে পারি। কিন্তু [illegible] বলতে পারি যে, আমার জীবনের কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে, রূপকথা বা আনর‍্যাচরাল, বাস্তব জীবনে কখনো এমন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু আমি জানি আমার কাহিনী সত্য। জীবনে যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম তা সহজে পাইনি, কিন্তু যা চাইনি তা পেয়েছি অতি সহজে।"

ব্যঙ্গ করে বললাম: 'রীতিমতো দার্শনিক হয়ে পড়েছ দেখছি।'

"হ্যাঁ তাই। আমাদের মতো জীবনকে ভিত্তি করেই তো মনীষীরা কাব্য লেখেন, দার্শনিক হয়ে আখ্যা পান, জগতে নাম হয়। কিন্তু আমাদের হয় অজ্ঞাতবাস। আমাদের কেউ জানে না। তা জানি তুমি আমার এ কথা বিশ্বাস করতে পারছো না। ভাবছো বানানো কথা। কিন্তু বহুদিন ধরে আমার এই কথা পুঞ্জীভূত ছিল মনে, কাউকে বলিনি। আজ তোমায় বললাম। তোমার সাথে যে কখনো এমনি ভাবে দেখা হবে, ভাবিনি।"

অলোকা বলতে থাকে: "নিজের জীবনের দুঃখকে ভুলতে পারতাম অজয়কে পেলে। কিন্তু আমার জীবনে দুঃখ যেন এলো বন্যার মতো। তার স্রোতে আমি ভেসে গেলাম। তা বলে পশ্চাতে যে কখনো তাকাইনি, এমন নয়। তাকিয়েছি, কিন্তু পেছনে তাকালাম তখন আমি অনেক দূরে। তখন ভাবলাম হবে জীবনে নিষ্ঠার পূজো করে যখন আমার সমস্ত ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। একবার ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করবো, কিন্তু সে করবার দুঃসাহস আমার ছিলো না। আজ বাজারে ভার্য্যা বলে নাম কিনেছি, কিন্তু যারা দিনে আমায় দেখে হাসে, তারা রাত্রে সোহাগ করে।"

আমি জবাব দিই, 'যারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন নেবার নজীর দেয় ...দের ব্যর্থতার, তাদের প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধাই নেই।'

এ কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। শুনে অলোকার মুখ ...কাসে হয়ে গেলো। শুধু বললো, 'জীবনে যদি কখনো গভীর ...া ভালোবাসো তবে তার ব্যর্থতার দুঃখ বুঝতে পারবে। তোমরা যারা উপদেশ দাও তারা কেন তলিয়ে দেখো না নিজের ...দিকে? ভেবে দেখো না কেন যে, জীবনে এমনি দুর্যোগ ...তো তোমরা কি করতে? যাক, তোমায় আমি আর বিরক্ত করতে ...ই নে, কারণ আমি জানি আমার এ কাহিনী তোমার কাছে বাংলা ...শ সিনেমার প্লটের মতো শোনাবে। তবে তোমায় একটা কথা ...ত পারি, আমরা মেয়েমানুষ, আমরা সব ভুলতে পারি, পারি ...া শুধু ভুলতে প্রথম প্রেম ও প্রেমাস্পদকে। নিজের জীবনে যদি ...ান মেয়েকে ভালোবাসো, তবে এ কথাটা মনে রেখো।'

অলোকার বন্ধুরা বাইরে দেরী করছিল। ও ওদের কাছে চলে ...লো। আমি চাঁদের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার স্তব্ধতা ভাঙ্গলো বন্ধুর ডাকে। বললে, 'ভয় নেই ব্রাদার, ...দের এখানে আগমন প্রতিদিনের। আজ যার সঙ্গে পরিচয় করলে ...ার সাথে প্রণয়ের বহু অবকাশ তুমি পাবে। চলো, আজ বাড়ী ...ফেরা যাক।"

প্রায় ভোর হয়ে এসেছিল। আমি বাড়ী চলে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"অপারেশন হায়দ্রাবাদ।" দেশের কাগজগুলোতে অনেক দিন ...রে এই সম্বন্ধে মন্তব্য চলছিল। তাদের অনুযোগ যে ভারত-সরকার নিজামকে অনেক সময় এবং সুবিধা দিয়েছেন এর একটা মীমাংসা পৌঁছবার জন্য। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিনের আলাপ-আলোচনার পরও যখন সমস্যার কোন সমাধান হয়নি তখন 'অপারেশন হায়দ্রাবাদই' একমাত্র পথ।

সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ...শেষ করে সাংবাদিকদের পক্ষে। হায়দ্রাবাদ থেকে বাইরে খবর ...পাঠানো ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। এই খবর পাঠাতে যেয়ে বিপদে ...া আওরাঙ্গাবাদের এসোসিয়েটেড প্রেসের ম্যানেজার। রজাকারদের ...অত্যাচার সম্বন্ধে সে এক কাহিনী পাঠিয়েছিল। এই খবর পেয়ে ...াম সরকার তাকে আটক করলেন আর আওরাঙ্গাবাদের এ, পি, ...র অফিসকে করা হলো তালাবন্ধী।

এই ব্যাপার অনুসন্ধান করার ভার দেওয়া হলো ওয়ানলকে। ...সাথী হিসেবে আমায় সঙ্গে যেতে হলো। মানমাদে গাড়ী বদল ...করে লাইন ধরে দুপুর নাগাদ আওরাঙ্গাবাদে এসে পৌঁছলাম। ...জিজ্ঞাসা করে খোঁজ পাওয়া গেলো এ, পি, আইর দপ্তর। কিন্তু ...জনমানবশূন্য, ম্যানেজারকে করা হয়েছে আটক, চাপরাশীর দলও ...নিখোঁজ। ঘটনার পূর্ণ বিবরণী বলবার মতো কাউকে পাওয়া না।

...এই হায়দ্রাবাদ এসে ঘটনার তদন্ত করা গেলো। কিছুটা খবর ...গেলো অসকার রেবেরোর কাছ থেকে। অসকার হায়দ্রাবাদে ...এ, আইর ম্যানেজার। নিজাম সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ...এ, আই ক্রীশ্চান কিংবা মুসলমান ছাড়া কাউকে হায়দ্রাবাদ ব্যুরোর ম্যানেজার করতে পারতেন না। অসকার হায়দ্রাবাদ পরিস্থিতির একটা বিবরণী আমাদের দিলে। বললে, 'নিজাম নাছোড়বান্দা, ভারত সরকারের সঙ্গে কোন চুক্তি করতেই রাজী নয়।'

নিজামের এই মনোভাব নতুন কিছু নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর যখন ভারত সরকারের সঙ্গে একটা মীমাংসার প্রশ্ন উঠলো তখন নিজাম বেঁকে বসলেন। তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন লায়েক আলী, কাসিম রাজভী ও মৈন নওয়াজ জং। আইনের ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন ওয়াল্টার মঙ্কটন।

দেশ স্বাধীন হবার আগে এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন আরো কয়েক জন রাজা মহারাজা। সাংবাদিক মহলে এক গুজব রটেছিল যে, জিন্না মহারাজাদের কাছে এক প্রস্তাব করেছেন পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্যে। তাঁদের নাকি তিনি বলেছেন যে, তাঁরা যদি পাকিস্তানে যোগ দেন তবে তাঁদের স্বাধীনতা অটুট থাকবে। ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে তাঁদের অস্তিত্ব বিলোপ হবার সম্ভাবনা আছে এ কথাটা জানাতে তিনি ভোলেননি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জিন্নার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার জন্যে চতুর্দ্দিকে দূত পাঠানো হলো। দিল্লীতে কোন এক মহারাণী সাহেবা এলেন, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে। তাঁরই এক বন্ধু ছিলেন জিন্নার বন্ধু। তাঁর সঙ্গে তিনি কথাবার্ত্তা চালালেন।

কিন্তু গোল বাধালেন মহারাজা শ্রী——। যাঁর শিরা-উপশিরায় আছে মহারাণা প্রতাপের রক্ত। খবরটা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। অথচ তাঁকে না হলে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হবে না। মহারাজা স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমায় নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন আমার পূর্ব্বপুরুষ মহারাণা প্রতাপ। আমি তাঁরই আদেশ মেনে চলবো।"

মহারাজার এই তেজস্বিতা অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের ভীত করে তুললো। মহারাজা ভারতের সংগে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে জিন্নার এই অভিসন্ধির খবর সর্দ্দার প্যাটেলের কানে পৌঁছল। তিনি জিন্নার উদ্দেশ্য বানচাল করে দিলেন। যাঁরা প্রথমে একটু গোলমাল করেছিলেন, তাঁরা হঠাৎ একদিন সবাই মিলে ভারতের সঙ্গে যোগ দিলেন।

সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলি যোগ দিল সত্য, কিন্তু নিজামের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখা দিল না। কথাবার্ত্তা চালাবার জন্যে ভারত সরকার প্রথমে ঠিক করলেন হায়দ্রাবাদে ভি, পি মেননকে পাঠাবেন। কিন্তু বাধা দিলেন নিজাম। বললেন, মেননের হায়দ্রাবাদে উপস্থিতি অনেক বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিজামের প্রতিনিধি হয়ে মঙ্কটন গেলেন দিল্লীতে। মঙ্কটন প্রস্তাব করলেন একটা 'ষ্ট্যাণ্ডষ্টিল এগ্রিমেণ্ট' করার। একটা খসড়াও সেই মর্মে তৈরী হলো।

মঙ্কটন হায়দ্রাবাদে ফিরে যেয়ে নিজামের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কাছে এই এগ্রিমেণ্টের খসড়া পেশ করলেন। প্রস্তাব সেইখানে পাশ হয়ে গেলো এবং নিজামও তাঁর সম্মতি দিলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই প্রস্তাবে তিনি সেই দিন সই করলেন না।

সেদিন শেষ রাত্রে, এক দল রজাকার বাহিনী ওয়ান্টার মঙ্কটন, ছত্রীর নবাব ও স্যর সুলতান আহমেদের বাড়ী ঘেরাও করে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে। এর উদ্যোক্তা ছিলো কাসিম রাজভী ও লায়েক আলী। লাউড স্পীকার লাগিয়ে চীৎকার করে বলা হলো, 'ভারত সরকারের সঙ্গে কোন মীমাংসা চাই না।' স্যর সুলতান, মঙ্কটন, ছত্রীর নবাব আপ্রাণ চেষ্টা করলেন পুলিশকে ডাকবার কিন্তু থানা থেকে কোন জবাব পাওয়া গেলো না। ভোর পাঁচটার একটু পরে ছত্রীর নবাবের অনুরোধে মিলিটারী এসে তাঁদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেলো।

এই ঘটনার পর নিজাম 'ষ্ট্যাণ্ডষ্টিল এগ্রিমেন্টে' সই করতে আপত্তি করলেন। বোঝা গেলো, রাজভীর প্রভাব নিজামের উপর বিস্তার লাভ করেছে। বিরক্ত হয়ে মঙ্কটন জানালেন নিজামকে, 'আপনার অর্থই আপনার সর্বনাশ করবে।'

পরদিন নিজাম ভারত সরকারকে জানালেন যে হায়দ্রাবাদে নতুন রাজনীতিক পরিস্থিতির জন্য আর এক নতুন ডেলিগেশন দিল্লীতে যাবে কথাবার্ত্তা চালাবার জন্যে। কিন্তু এবারও তাঁদের আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হলো।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন নিজাম মীমাংসা স্থগিত করে রাখলেন।

ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে অবস্থার ভয়ানক অবনতি ঘটলো। 'ষ্ট্যাণ্ডষ্টিল এগ্রিমেন্ট' সই হয়ে গেছে সত্য কিন্তু দু'দলের মধ্যে সদ্ভাব হয়নি। এবার গোল বাধলো ভারতের প্রতিনিধি কে, এম, মুন্সীর বাড়ী নিয়ে। নিজাম তাঁকে পুরানো রেসিডেন্সীতে স্থান দিতে রাজী হলেন না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অনুরোধে ঐ বাড়ী মুন্সীকে ছেড়ে দিলেন। পাকিস্থানকে কুড়ি কোটি টাকা ধার দেয়ার ব্যাপার নিয়ে আর একটা হৈ-চৈ উঠলো, শুধু তাই নয়, হায়দ্রাবাদ সরকার ভারতীয় মুদ্রাকে অস্বীকার করলেন এবং লোহা-লক্কড়ের রপ্তানী বন্ধ করে দিলেন।

অসকার বললে যে, অবস্থা এতো গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হায়দ্রাবাদ থেকে কোন খবরই আর বাইরে পাঠানো সম্ভব নয়। 'বর্ডার এরিয়ায়' গোলমালও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, গোয়েন্দা সদা-সর্বদাই তার পেছনে লেগে আছে।

* * * *

ফেরার পথে ওয়াদি ষ্টেশনে মালেয়ার সঙ্গে দেখা। ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে এক প্রান্তে সে চুপ করে বসে আছে, চেহারাটা অনেকটা বাউণ্ডুলের মতো, গাল ভর্ত্তি দাড়ী, দেখতে অনেকটা রজাকার নেতা কাসিম রাজভীর মতো দাঁড়িয়েছে। ওকে চেনাই মুস্কিল। দেখে চীৎকার করে উঠলাম, 'মালেয়া, তুমি এখানে ?'

মালেয়া দৌড়ে চলে এলো, তার পর চার দিক তাকিয়ে অতি সন্তর্পণে বললো, 'আস্তে—আস্তে, আই অ্যাম্ সাসপেক্টেড।' কথাটা শুনে বিস্মিত হ'লাম। মালেয়া ওয়েটিং-রুমের এক প্রান্তে নিয়ে চললো, 'আর বলো না বড্ড বিপদে পড়েছি। এডিটার পাঠিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে। এখন দেখছি প্রাণ নিয়ে টানাটানি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটি কি খুলেই বলো না।'

মালেয়া বললে, 'আর বলো কেন ভাই। একদিন দেখি, আবিদ রোডের এক মাথায় বেশ ভীড় দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাপারটি কি জানতে এগিয়ে গেলাম। দেখি একটা গোয়ানিজ মেয়ে কাঁদছে আর ওকে ঘিরে সবাই তামাসা দেখছে। পাশের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কী ? লোকটা জবাব দিলে, রজারিক হ্যাজ বিটিন হার। শুনে চমকে উঠলাম। রজাকার মেরেছে শুনে আর চুপ থাকতে পারলাম না, তক্ষুনি যেয়ে লিখে ফেললাম "থাউজেণ্ড ওয়ার্ডের কলারফুল ডেস্প্যাচ।" প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, অসহায় নারীর প্রতি রজাকারদের অত্যাচারের কাহিনী। খবর পড়ে নিজাম সরকার রেগে কাঁই হয়ে উঠলেন। আমার অজ্ঞাতে আমার ঘর বাক্স-পেঁটরা খানাতল্লাসীও হয়ে গেলো। হদিস্ পেলাম রজাকারেরা আমার খোঁজ করেছে। পরে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আমার খবরটার মধ্যে একটা ভুল ছিল। 'রজারিক হ্যাজ বিটিন হার' মানে নয় রজাকারেরা তাকে মেরেছে। রজারিক হচ্ছে মেয়েটির স্বামীর নাম। দুটো নামের সাদৃশ্য থাকায় এই বিভ্রাট। তাই পুলিসকে এড়াবার জন্যে এই ছদ্মবেশ।'

কিছুক্ষণ বাদে বোম্বাই অভিমুখী মাদ্রাজ মেল এসে পৌঁছল। মালেয়া ও আমি একটা খালি কামরায় উঠে বসলাম। সেখানে বসে মালেয়া বললো হায়দ্রাবাদের গল্প। বললে, 'ভারত সরকারের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও নিজাম কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিতে বা হায়দ্রাবাদে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে রাজি ন'ন। এ ছাড়া কাসিম রাজভীর প্রতাপ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে আজকাল রাজভীই দেশের শাসনকর্ত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

মালেয়া রাজভীর জেহাদ ঘোষণার বক্তৃতার কাহিনী বললে। খবরটা রিপোর্ট করেছিল অসকার। মালেয়াও সেখানে উপস্থিত ছিল। বললে, 'এক বিরাট রজাকার বাহিনীর কুচকাওয়াজের পর রাজভী এক গরম বক্তৃতা দেয়। সেখানে সে দাবী করে মাদ্রাজও এক অংশ। শুধু তাই নয়, দম্ভ করে রাজভী বলেছিল যে অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গোপসাগরের জল এসে নিজামের পা ধুইয়ে যাবে।'

মালেয়া বললে, 'অসকারের রিপোর্টের প্রতি অংশ অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। সে নিজের কানে এই বক্তৃতা শুনেছে, কাজেই রিপোর্টটা মিথ্যা বলা ভুল। ('লণ্ডন টাইমস্'এর রিপোর্টার এরিক ব্রিটার এই রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের প্রেস এটাশে আলান ক্যাম্পবেল জনসনকে তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই রজাকার প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি থাকাকালীন পর্য্যন্ত রাজভী কোন গরম বক্তৃতা দেয়নি। পরে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল যে, রাজভী এই বক্তৃতা দিয়েছিলো এবং অসকারের রিপোর্ট প্রতি অংশে-অংশে সত্য। 'অবজেক্টিভ রিপোর্টার' বলে অসকারের যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং সে সুনাম সে আজ পর্য্যন্ত বজায় রেখেছে। অসকার বেরেলো? জেনিভায় ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানিজেশনে কাজ করছেন।)

* * * *

বোম্বেতে ফিরে এসে শুনতে পেলাম যে মাউণ্টব্যাটেন হায়দ্রাবাদ সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারেননি। মীর লায়েক আলীর সঙ্গে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর তিনি এক প্রস্তাব করলেন। এতে বলা হলো, রাজভীকে দমন করতে হবে এবং রজাকার অনুষ্ঠিত মিটিং, জলসা ও বক্তৃতা বন্ধ রাখতে

হবে। হায়দ্রাবাদ ষ্টেট কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়ার আশু প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নতুন দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু তাই নয়, বৎসরান্তে নতুন কনষ্টিট্যুয়েণ্ট এসেমব্লী হবে প্রতিষ্ঠা। স্থির হলো যে, নিজাম এক ঘোষণা করবেন এবং এতে এই সব প্রস্তাবগুলো মেনে নেয়া হবে। কিন্তু যখন ঘোষণা প্রকাশ পেলো তখন দেখতে পাওয়া গেলো যে, এই প্রস্তাবের কোন উল্লেখই নেই। ভারত সরকার এতে ক্ষুব্ধ হলেন। এর মধ্যে রজাকার বাহিনী মীর লায়েক আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। গুজব রটলো যে লায়েক আলীর প্রতি তাদের আর কোন আস্থা নেই, কারণ তারা সন্দেহ করছে যে লায়েক আলী ভারতের সঙ্গে মীমাংসা করতে চায়। লায়েক আলী ধুরন্ধর, বিপদ বুঝে সে রাজভীর সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেললো।

বার বার ভারত সরকারের মীমাংসার প্রস্তাব নিজাম অগ্রাহ্য করলেন। নানা কৌশলে তিনি সময় কাটাতে লাগলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন নেহেরু ও প্যাটেল। দিল্লীতে নেহেরু লায়েক আলীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন। প্যাটেল স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে হায়দ্রাবাদকে বিনা সর্ত্তে যোগ দিতে হবে।

জুন মাসের মাঝামাঝি অস্‌কার টেলীফোন করলে যে ভারত-হায়দ্রাবাদ কথাবার্ত্তা সঙ্কিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। পনেরোই জুন বিকেলে দিল্লী থেকে খবর এলো মাউণ্টব্যাটেন হায়দ্রাবাদ ডেলিগেশনের সঙ্গে দেখা করেছেন। কথাবার্ত্তার পর এক খসড়া তৈরী হলো, প্রতিশ্রুতি দিলে লায়েক আলী যে বিকেল পাঁচটার সময় হায়দ্রাবাদ সরকার পাকা কথা দেবেন। কিন্তু কোন জবাব এলো না। ষোলোই তারিখ অস্‌কার জানালে যে, গুজব, নিজাম ভারত সরকারের প্রস্তাব মানতে রাজী হ'ননি। সতেরোই তারিখ সরকারী ভাবে জানা গেলো যে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে।

প্রেস কনফারেন্সে নেহেরু এই কথা জানালেন। আড়াই মাস বাদে হায়দ্রাবাদে পুলিশ য়্যাক্‌শন সুরু হলো।

* * *

হায়দ্রাবাদ ঘটনার কিছুদিন পরে পাশের ঘরের চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমার থাকবার জায়গাটা বারোয়ারী, বোম্বাই শহরের বাঙ্গালীদের প্রধান আশ্রয়। বিভিন্ন জাতির মিলন এখানে হয়নি সত্য কিন্তু বিচিত্র প্রকৃতির মানবের সমাবেশ এখানে হয়েছে। এখানকার বৈচিত্র্য এই যে আহারের কথা স্মরণ হলে নিদ্রা ভুলতে হয়, অথচ নিদ্রার কথা মনে হলে আহার হয় না। সহ-বাসের জন্য কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র তিনখানা খাট পেতেছেন তা নয়, কক্ষের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন জীবেরও স্থান করে দিয়েছেন। এই সব জীবদের সঙ্গে মিলনের একমাত্র সময় ছিল গভীর রাত্রে। যখন এঁরা দর্শন দিতেন তখন কর্তৃপক্ষের সৌজন্যের জন্য সারা রাত্র ধন্যবাদ দিতাম।

আমার পাশের ঘরে থাকতেন সুকুমার বাবু। পেশা—টেক্সটাইল কমিশনরের দপ্তরে কেরাণী বৃত্তি। নেশা—প্রভাতে দেব-দেবীর স্মরণ ও বিকালে পলিটিক্স আলোচনা। সুযোগ ও সুবিধা পেলে হোটেলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণার পরামর্শ সর্ব্বদাই দিয়ে থাকেন।

সুকুমার বাবু কবে, কি কারণে বোম্বাই সহরে আগমন করেছিলেন জানা নেই। মালিকের কাছে তাঁর আগমন নিতান্ত বিষাদেরই ব্যাপার। কারণ তিনি এখনও সাবেকী প্রথায় চলেন, ও পুরানো রেটে হোটেলের দেনা-পাওনা শোধ করেন। শুধু তাই নয় আহার-নিদ্রা ব্যাপারে তাঁর সাবেকী বিশেষত্ব বজায় আছে।

ভোর বেলার কলহের হেতু চাকরের মুখে শুনতে পেলাম। কিছুদিন আগে কলকাতার স্কুলগুলোতে ম্যাট্রিক টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। সাধারণতঃ টেষ্ট পরীক্ষার পর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনালের শেষে বাংলার বহু উদীয়মান তরুণ বোম্বাই শহরে তীর্থযাত্রা করেন। কারণটা অবশ্য বলা বাহুল্য। পরীক্ষা, বিশেষ করে, অঙ্কের পেপারটা ভালো হয়নি, তাই তরুণ চিত্র-তারকার দল আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আমাদের বারোয়ারী আড্ডায়। উদ্দেশ্য—ফিল্মষ্টার হবেন।

একদিন সুপ্রভাতে এক তরুণ অভিনেতার আগমন হলো সুকুমার বাবুর ঘরে। সুকুমার বাবু যখন আহ্নিকে মগ্ন, তখন তরুণ বন্ধুটি জানতে চাইলেন অশোককুমার, দেবীকারাণীর বাড়ীর ঠিকানা। প্রশ্নটা শুনে সুকুমার বাবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'ডেঁপো ছোকরা, দেখতে পাচ্ছো না যে পুজো-আহ্নিক করছি?' 'ছাই করছেন,' তরুণ বন্ধুটি জবাব দেয়, 'আপনার দেয়ালে টাঙ্গানো আছে ডরোথী ল্যামুরের ছবি। একদৃষ্টে তাকিয়ে তো আছেন ঐ দিকে।' জবাব শুনে বোমার মতো ফেটে পড়েন সুকুমার বাবু। এমনি জবাব তাঁকে কোন দিন শুনতে হয়নি এই মেসে। তাই বলেন, 'কী বললে, আমি তোমার বাবার বয়সী, তুমি কিনা আমায় যাচ্ছে-তাই করে অপমান করছো, বেরোও আমার ঘর থেকে।'

ভদ্রলোক সর্ব্বপ্রথম তাঁর বার্দ্ধক্যের কথা স্বীকার করলেন। সচরাচর তিনি বয়সকে পঁয়ত্রিশের নিচে বলেই জাহির করেন কিন্তু আজ রাগের মুখে সত্য কথাটা স্বীকার করলেন।

এই কলহ মেটাবার জন্য মেসে এক পঞ্চায়েৎ বসলো। সভাপতিত্ব মিললো আমার। সেই সূত্রে তরুণ বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় হলো। সমস্ত গোলমাল মিটে যাবার পর হৃদ্যতাও হলো একটুখানি। ছেলেটির নাম শংকর। টেষ্ট পরীক্ষার দুর্ঘটনাই তার বোম্বাই আসার একমাত্র কারণ নয়। তাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে অনুপমাও আংশিক কারণ বলতে হবে। অনুপমাও ম্যাট্রিকের পরিক্ষার্থিনী। টেষ্ট পেপারের আদান-প্রদানের দরুণ এদের সম্পর্ক ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠছিল। কিন্তু দু'পক্ষেরই পিতৃপক্ষ খবরটা জানতে পেরে বিপত্তি ঘটালেন। শংকর-অনুপমার দেখা-সাক্ষাৎ একদম বন্ধ হয়ে গেলো।

একদিন সন্ধ্যায় তাদের শেষ দেখা হলো দেশপ্রিয় পার্কে। দু'জনেই প্রতিশ্রুতি করলে যে ভবিষ্যতে তাদের মিলন বাঞ্ছনীয়, তবে মিলনের তারিখটা বর্ত্তমানে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রাখা হলো। এ খবরের কিছুটা আভাষ পেলেন অনুপমার বাবা-মা। তাই তাড়াহুড়ো করে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন অন্য এক ছেলের সঙ্গে। টেষ্ট পরীক্ষার আগেই অনুপমার বিয়ে হয়ে গেলো।

দেশপ্রিয় পার্কের সেই সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে শংকরের মন নারী জাতির প্রতি বিদ্বেষে ভরে উঠলো। তাই বিয়ের দিন অনুপমার ছোট বোনকে ডেকে বলেছিল যে তোর দিদিকে বলিস যে আমি 'দেবদাস' হয়ে যাচ্ছি। জবাবে অনুপমা জানিয়েছিল যে শংকর যদি দেবদাস হয় তবে তার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, তবে অনুপমার পক্ষে পার্ব্বতী হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বোম্বে আসার জন্য শংকর এক মাসের পাথেয়ও সংগ্রহ করে

এনেছিল। তাই মাস শেষে যখন পুঁজি নিঃশেষিত হয়ে এলো তখন তার উৎসাহ অনেকটা দমে এলো। বহু ষ্টুডিওতে সে ধর্ণা দিয়েছে কিন্তু কেউ বড়ো তাকে আমল দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হলো। 'মুভিটোন ডি লুক্স' থেকে তার ডাক এলো। একটা ছবিতে তাকে রাখাল-বালকের অংশ দেয়া হয়েছে।

মুভিটোন ডি লুক্সের পত্তন সবে মাত্র হয়েছে। কোন নিজস্ব ষ্টুডিও এর নেই, লামিংটন রোডে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে অফিস করা হয়েছে। মালিক কাপড়ের ব্যবসাদার। হঠাৎ একদিন রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে চিত্রের হিরোইনকে ধন্যবাদ জানাতে দাদারের ষ্টুডিওতে গিয়েছিলেন। তবে দ্বারপ্রান্ত থেকেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল, কারণ শেঠজীর প্রবেশাধিকার মেলেনি। সেই দিনই মুভিটোন ডি লুক্সের পত্তন হলো। কারণ শেঠজী প্রতিজ্ঞা করলেন যে যারা তাঁকে ষ্টুডিওর দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের তিনি গোলাম করে রাখবেন আর যে নায়িকাকে তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়েছিলেন তিনি হবেন—তাঁর মাইনে-করা চাকরাণী।

শেঠজী তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখলেন। সেই ষ্টুডিওর সবাইকে তিনি মুভিটোন ডি লুক্সে ডবল মাইনে দিয়ে নিয়ে এলেন। সহকারী ডাইরেক্টরকে প্রমোশান্ দেওয়া হলো ডাইরেক্টরের পদে।

ছ'মাস ধরে ছবির মহড়া চললো। ছবির বিষয়বস্তু ধর্ম্মমূলক। শেঠজী ধর্ম্মভীরু লোক, ব্যবসায়ে যেটুকু পাপ অর্জ্জন করেন সেটাকে স্খালন করতে চান পৌরাণিক বিষয়বস্তুর উপর ছবি তুলে। তাই মুভিটোন ডি লুক্সের প্রথম অবদান হলো মহাভারতের এক কাহিনী নিয়ে।

শংকরের শেঠজীর সঙ্গে পরিচয় হবার কারণ ছিল। দু'জনে একই সঙ্গে গিয়েছিল ষ্টুডিওতে হিরোইনের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এবং দু'জনাই একই সঙ্গে দ্বারপ্রান্ত থেকে বিতাড়িত হবার দরুণ একটা সৌহার্দ্দ্য জন্মেছিল। শেঠজীর অনুরোধে ডাইরেক্টর শংকরকে পার্ট দিয়েছিলেন।

শুটিংএর দিনে শঙ্কর অনুরোধ করলে তার সাহচার্য্যের। বললে, 'চলুন না, আমার একটিং একবার দেখে আসবেন।'

শুটিং দেখবার সৌভাগ্য আমার কোন দিন হয়নি, তাই শংকরের প্রস্তাবে রাজী হলাম। ষ্টুডিও আন্ধেরীতে। ষ্টেশন থেকে একটু হেঁটে যেতে হয়। তবে শুটিং বাইরেই হচ্ছিলো, তাই দেখবার কোন অসুবিধা হলো না।

দু'-একটা শট নেবার পর দর্শন মিললো শেঠজীর। তিনি এসে ডাইরেক্টরকে ধমকালেন। কেন তাঁর আসার পূর্ব্বেই ছবির শুটিং আরম্ভ হয়েছে ইত্যাদি। ডাইরেক্টর তার প্রমোশানের কথা স্মরণ করে জবাব দিলে। বললে, 'ষ্টুডিওর সমস্ত সরঞ্জাম ভাড়া করা। প্রতি ঘণ্টার জন্য তাকে পয়সা দিতে হচ্ছে। শেঠজীর জন্য এক ঘণ্টা প্রতীক্ষায় থেকে সে তার কাজ সুরু করেছে।

শেঠজী সুখী হলেন কি দুঃখিত হলেন বোঝা গেলো না, তবে একটু চিন্তার পর হুকুম দিলেন যে সমস্ত শট আবার 'টেক' করা হোক।

আদেশ অমান্য করলে ডাইরেক্টরের আবার সহকারীর পদে নেমে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই সে রাজী হলো। প্রথম দৃশ্য হিরোর মৃত্যু, হিরোইন শোকে কাঁদছে।

অভিনয় সুরু হবার পাঁচ মিনিট বাদে শেঠজী চীৎকার করে উঠলেন। হিরোইনকে কাঁদতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আরে বহুয়া, ইতনি খুপসুরুৎ আউরাৎ রোতী কিউ।'

ডাইরেক্টার কারণটা বাতলালে, কিন্তু সেটা শেঠজীর পছন্দসই হলো না। বললেন, 'রোণা নেহি চাহিয়ে। দো-চার, গানা-বাজনা লাগা দেও।'

অনন্যোপায় হয়ে ডাইরেক্টর হিরোইনকে হুকুম দিলে কান্না বন্ধ করে গান গাইতে। গান সুরু হলো।

এর পরের দৃশ্যে শেঠজী আবার আপত্তি তুললেন। হিরোইনের পরিধানে নিতান্ত সাধারণ শাড়ী দেখে তিনি হুকুম দিলেন যে তাকে কোন জমকালো শাড়ী পরানো হোক।

ডাইরেক্টর আপত্তি তুললে। চটে গেলেন শেঠজী, বললেন, 'পয়সা তেরা হ্যায় কি মেরা? যাও আভি মেরা দোকানসে এক জর্জ্জেট শাড়ী খরিদো আর ইন্‌কো পহনাও।'

অতএব পরের দৃশ্যে হিরোইন জর্জ্জেট শাড়ী পরে তার অভিনয় সুরু করলে। কিন্তু এতেও শেঠজী খুশী হলেন না, কারণ এক দৃশ্যে তিনি দেখতে পেলেন যে হিরো-হিরোইন হাত-ধরাধরি করে যাচ্ছে। অমনি তিনি হুকুম দিলেন, 'আরে ডাইরেক্টর সাহাব, ইয়ে কেয়া বাত? হিরোকী তো কভি হিরোইনকী হাত নেহী ছুনা চাহিয়ে। দোনোকো আলক্ আলক্ রহেনো দেও।'

অতএব হিরো-হিরোইন যতো দূর সম্ভব ব্যবধান রেখে অভিনয় করতে লাগলো।

এর পরে শেঠজী হুকুম দিলেন যে তাঁর চণ্ডীদাসের দুটো গান এবং "ঝুলা"র দুটো গান ভালো লেগেছিল। কাজেই ওধরণের দু'তিনটা গান যেন এ ছবিতে রাখা হয়।

অনেক পরামর্শ দিয়ে শেঠজী ক্লান্ত বোধ করলেন। তাই ছবির শুটিং স্থগিত রাখার আদেশ দিয়ে তিনি তাঁর ক্রফোর্ড মার্কেটের দোকানে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন যে বাজার মন্দা যাচ্ছে, যদি 'নাফা যাদা' না-হয় তবে ছবি তোলা বন্ধ করে দিতে হতে পারে।

এই ছবি শেষ পর্য্যন্ত বাজারে বেরিয়েছিল কি না আমার জানা নেই।

ফেরার পথে আহারের সন্ধানে পুরোহিতের হোটেলে এসে উপস্থিত হলাম। দ্বারপ্রান্তে দেশাইর সঙ্গে দেখা। দেশাই 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'র ক্রাইম রিপোর্টার। দেশাই জানালে, 'শুনেছো, এক বিরাট মার্ডার হয়েছে? এক ফিল্ম একট্রেস ইনভলবড়। আমি যাচ্ছি খবর আনতে, ওখানে যাবে নাকি?'

ঘটনাটা ঘটেছিল একটু দূরেই, ম্যারিণ ড্রাইভের এক বাড়ীতে। কাজেই যেতে আপত্তি করলাম না।

বাড়ীতে বেশ ভীড় হয়েছিল। পুলিশ ইন্‌সপেক্টর পরিচিত, কাজেই তাঁর কাছ থেকে ঘটনার একটা বিবরণ পেলাম। তিনি জানালেন যে মার্ডার নয়, আত্মহত্যা। কারণটা এখনও জানা যায়নি।

ইন্‌সপেক্টর হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বাঙ্গালী? মেয়েটাও যে বাঙ্গালী! মাত্র সাত-আট মাস আগে এখানে এসেছিল। নাম আলোকানন্দা। চেনেন কি?'

* * * *

অলোকানন্দার আত্মহত্যাই এ কাহিনীর এপিলোগ। তার আত্মহত্যার কারণ আজও জানতে পারিনি এবং জানবার চেষ্টা করিনি।

এর পরে বহু জায়গায় রিপোর্টার হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছি। বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু সে সব চরিত্র আজ আমার মনে

কিন্তু অজয়, অলোকা, আচার্য্য, মাসীমা, ব্রজানন্দ বাবু, ও ... আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে।

কিছুদিন আগে এক ডিনার-টেবিলে বসে এই কাহিনীটা ... জনকে বলেছিলাম। এদের মধ্যে দুটি মেয়ে ছিলেন। আমার ... শুনে এক জন বললেন, 'সবই ঠিক আছে কিন্তু অলোকার ... বড্ডো 'আনন্যেচারাল।' বিয়ের আগে অনেক মেয়েই প্রেমে ... কিন্তু শেষ পর্যান্ত হয়তো তার প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে হয় না কিন্তু ... এমনি ভাবে কেউ বখে যায় না। নিজের ঘর-সংসার ... সবাই পুরানো কথা ভুলে যায়।'

ভদ্রমহিলার স্বামী মন্তব্য করেছিলেন, 'ত্যাখো, ছেলে বখলে তাকে ...বানো যায় কিন্তু মেয়ে বখে গেলে তাকে বাগ মানানো মুস্কিল।'

ডিনারের শেষে অন্য মেয়েটি এসে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য্য! আমি বিশ্বাস করি নে যে অলোকা বখে গিয়েছিল। আমার মনে হয় যে ওর প্রেম ছিল গভীর, তাই ওর এই পরিণতি হয়েছিল।' তার পর একটু চুপ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ঠিক করে বলুন তো, সত্যিই ... অলোকা বলে কোন মেয়ে ছিল?'

জবাব দিয়েছিলাম—'দেখুন, এ কাহিনীর মধ্যে রূপও আছে, কথাও আছে তবে সম্পূর্ণটা যে রূপকথা নয় এ আমি হলপ করেই ... পারি।'

মেয়েটি জবাব দেয়,—'না, বিশ্বাস করেছি বলেই এই প্রশ্ন করছি। ... দেশে অলোকার অভাব হবে না একথা আমি জোর গলায় ... পারি। ওর মতো বহু মেয়ে আছে যারা তাদের পুরানো প্রেমিককে আজও ভুলতে পারেনি।'—বলতে-বলতে মেয়েটির চোখ ... হয়ে এলো। তিনি কোন রকমে কথা শেষ করে চলে গেলেন।

আচার্য্যের কোন খবরই জানি না। তবে অলোকার আত্মহত্যার কিছুদিন আগে ওর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে লিখেছিল—'...বী ছেড়ে দিচ্ছি, কোন একটা বড়ো বা মহৎ কিছু করার উদ্দেশে ...। অজয়ের মৃত্যুর পর আমার সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা-আগ্রহ ... বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ছুটী নিয়ে চার-পাঁচ বার এদিক-ওদিক চেয়ে ... ছি কিন্তু কোথাও তৃপ্তি পাইনি। সর্ব্বদাই মনে হয়েছে নিজেকে প্রবঞ্চনা করছি। চিঠি পড়ে হয়তো ভাবছো যে ...কার হয়ে গেছি। না, তা হইনি, যদি হতে পারতাম ... হয়তো এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতাম কিন্তু পারিনি বলেই ... আমায় এই পারিপার্শিক আবহাওয়া দগ্ধ করছে। পরোপকার ... মতো মহৎ উদ্দেশ্য আমার নেই, ওটা দেশের পলিটিসিয়ানদের ... তুলে রেখেছি। আমি কারো দুঃখ লাঘব করতে চাই না, ... নিজে বরণ করে নিতে চাই দুঃখকে। কিছুদিন আগে বিহারের ... প্রান্তে যোগবাণীতে গিয়েছিলেম। সামনেই হিমালয়, বড়ো ...। আর লোকগুলো বড়ো ভালো। এরা মন খুলে কথা বলে। ... ঠিক করেছি ওখানে যেয়ে আস্তানা গাড়বো। নিজের ...দের জন্যে একটা টী ষ্টল দেবার ইচ্ছে আছে। যদি কখনও ... আসেন তবে একবার দর্শন দেবেন—ইতি আচার্য্য।'

মাসীমার সঙ্গে 'কলকাতার শেয়ালদ' ষ্টেশনে হঠাৎ একদিন দেখা ...। নৈহাটী থেকে আসছিলাম, হঠাৎ দেখি ষ্টেশনের বাইরের ... দাঁড়িয়ে মাসীমা। আমায় দেখে তিনি খুসীই হলেন। বললেন, 'কাল প্লেনে এসেছি দিল্লী থেকে।' ভাবছি এই সব শরণার্থীদের জন্য একটা রিলিফের বন্দোবস্ত করবো। হ্যাঁ, ভালো কথা, দিল্লীর সবাই তোমার খোঁজ করছিল।'

সামনেই মাসীমার বিরাট বুইক গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। মাসীমা এক রকম প্রায় জোর করেই তাঁর গাড়ীতে নিয়ে বসালেন। তার পর বলতে লাগলেন এই সব শরণার্থীদের কথা: 'উঃ, এদের এই জীবন আমায় যে কি দুঃখ দিয়েছে তা তোমায় কি বলবো? আমি কখন এদের এই জীবনধারা চিন্তা করতে পারি নে।'—বলতে-বলতে মাসীমা দু'-তিন বার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সিল্কের রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। তার পর বললেন, 'ভাগ্যিস্ ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছিলাম। এদের এই 'লাইফের' কতোগুলো ছবি নিয়েছি। দিল্লীর ওরা দেখলে বড্ডো ইমপ্রেস্‌ড হবে।'

লেক মার্কেটের কাছে আমি নেমে গেলাম। যাবার আগে মাসীমা বললেন, 'পারো ত এসো একদিন। রিলিফের একটা পাব্লিসিটির বন্দোবস্ত তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই করা যাবে।'

শুনেছি ব্রজানন্দ বাবু এখনও বোম্বাইতে আছেন। তবে ধর্ম্মের কাজের সঙ্গে-সঙ্গে এখন একটু ব্যবসায় ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁর এই পরিবর্ত্তন দেখে এক জন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'পাগল, আর কী! আমি কি আর নিজে ব্যবসা করি? করুণাসিন্ধু আমার, একান্ত অনুগত লোক। এসে বললে, কিছু টাকা দিন, ব্যবসা করবো। বখেরা আধা-আধি।'

পরিচিত ভদ্রলোকটি বললেন, 'ব্যবসা যে পাপ কাজ ব্রজানন্দ বাবু!'

তিনি হেসে জবাব দিলেন, 'আমি কি আর সে কথা জানি না! সেটাও ভাগ করে নিয়েছি। ব্যবসা তো করে করুণাসিন্ধু, কাজেই পাপের ভাগটা ওর, টাকা দিয়েছি আমি, কাজেই পুণ্যের ভাগটা ন্যায়তঃ আমার প্রাপ্য।'

* ৬ * *

পরিশেষে অজয় সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে। অজয়ের জীবনের এই পরিবর্ত্তন আমার বিস্মিত করেছিল। সত্যিই কি ও মৃত্যুর ভয়ে অলোকাকে বিয়ে করেনি, না ওটা অলোকাকে এড়িয়ে যাবার অছিলা মাত্র।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে অজয় অলোকাকে ভালবাসতো না। অলোকাকে প্রবঞ্চনা করার কোন উদ্দেশ্যই ওর ছিল না, আর গভীর ভালোবাসা ছিল বলেই ও বিয়ে করতে দ্বিধা বোধ করেছিল; কারণ অলোকার জীবনকে ও কখনও দুঃখময় করে তুলতে চায়নি। অজয় মৃত্যুর আশংকা করেছিল, তাই চায়নি বিবাহের বন্ধনে আটকা পড়তে।

কিন্তু অজয় কেন মৃত্যুর আশংকা করেছিল? এটা আমার কাছে অনেকটা কুহেলিকার মতো মনে হয়েছিল। কারণ ছেলেবেলায় কখনো ও কোন কিছুকে ভয় পায়নি, মরবার ভয় ওর ছিল না। হাসি, ঠাট্টা, হৈ-চৈ করাই ছিল ওর চরিত্রের সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ। মৃত্যুর কথা কেউ যদি কখনো বলতো তবে ও বিদ্রূপ করে জবাব দিতো...

'হোয়েন দি লাষ্ট ট্রাম্পেট সাউণ্ডস্ এণ্ড উই আর কাউন্টেড ইন আওয়ার টুম্বস্, আই শ্যাল টার্ণ এণ্ড উইস্পার টু ইউ, মাই ফ্রেণ্ড, লেট আস প্রিটেণ্ড দ্যাট উই ডু নট হিয়ার ইউ।'

সমাপ্ত

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৩

"সঙ্গীত-সমাজের সদস্যগণ অর্থাভাবে তখন অন্যান্য রঙ্গালয়ে যাহা করা সম্ভব হইত না, তাহা করিতে পারিতেন। যেমন—'মেঘনাদ বধ' নাটকের অভিনয়ে প্রমীলার লঙ্কাগমনের দৃশ্যে প্রমীলা, অশ্ব ব্যবহার। সে জন্য ব্রহ্মদেশীয় অশ্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় অনেক ধনী ব্রহ্মদেশীয় (শান প্রদেশের) সুদৃশ্য "পোনি" ঘোড়া ব্যবহার করিতেন—সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয় নাই। তেমনই আবার 'দুর্গেশ-নন্দিনীর' অভিনয়ে জগৎসিংহ (হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল) তাঁহার পিতৃব্য চুনিরারাম শীলের প্রসিদ্ধ "চেকটব" শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে উপনীত হইয়াছিলেন।

সাজসজ্জা—অলঙ্কার প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব যে "সঙ্গীত সমাজের" অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। স্ত্রীবেশে অভিনয়কারী যে বর্ণের মূল্যবান বস্ত্রে মঞ্চে আসিতেন, সেই বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে অলঙ্কার (চুনীর বা পান্নার বা হীরকের) "মানায়" তাহাই ব্যবহার করিতেন। অলঙ্কার বাছিয়া—মিলাইয়া দিতেন, মন্মথনাথ মিত্র—রত্ন সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ—জহুরী ছিলেন।

রাজারাজড়ারাও সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না—সে সব অলঙ্কার ঝুঁটা নহে, আসল। তখন এ দেশে একরূপ নকল হীরা আমদানী হইয়াছিল—"ষ্টেটস ডায়মণ্ড", কাশীর রাজা "সঙ্গীত-সমাজে" আসিয়া অভিনয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—অলঙ্কারের হীরা কি ষ্টেট্স ডায়মণ্ড? শুনিয়া মন্মথনাথ মিত্র, পশুপতি বসু প্রভৃতি তাঁহার অজ্ঞতায় হাসিয়াছিলেন। দিলীপ রায় তাঁহার "তীর্থঙ্কর" পুস্তকে (১৮২ পৃষ্ঠা) রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :—

"মনে পড়ছে, আমার তখন অল্প বয়স। সঙ্গীত সমাজে নাট্য অভিনয়। ইন্দ্র চন্দ্র দেবতারা নাটকের পাত্র। উদ্যোগকর্তা অভিনেতারা ধনী-ঘরের। সুতরাং দেবতাদের গায়ের গহনা না ছিল অল্প, না ছিল ঝুঁটো, না ছিল কমদামের। সেদিন প্রধান দর্শক রাজোপাধিধারী পশ্চিম প্রদেশের এক ধনী। তাঁকে নাটকের বিষয় বোঝাবার ভার আমার উপরে; আমি পাশে ব'সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, সেখানে বসানো উচিত ছিল, হ্যামিল্টনের দোকানের বেচনদারকে। মহারাজের একাগ্র কৌতূহল গয়নাগুলির উপরে। অথচ অলঙ্কার শাস্ত্রে সামান্য যে পরিমাণ দখল আমার, সে বাক্যালঙ্কারের, রত্নালঙ্কারে আমি আনাড়ি।"

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একাধিক নাটকে বা গীতি নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন। 'বিসর্জ্জন' সে সকলের অন্যতম। তিনি 'বিসর্জ্জনে' রঘুপতির অভিনয়কালে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, খাঁড়া ব্যবহারকালে তাহা যে সত্য সত্যই তীক্ষ্ণধার তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; অভিনেতাদিগের মধ্যে আর এক জন তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ধ্রুবকে (অশ্বিনী) তাড়াতাড়ি সরাইয়া না লইলে হয়ত একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিত।

"সঙ্গীত সমাজে" অভিনয়ের জন্য রীতিমত শিক্ষালাভ করিতে হইত। শিক্ষকদিগের মধ্যে অন্যতম রাধামাধব কর—**hard task master**—শিক্ষা নিখুঁত না হইলে ছাড়িতেন না। একদা একজন সভ্য "দেব! দেব!" উচ্চারণে একটু ত্রুটি করিলে রাধামাধব বাবু বলিয়াছিলেন—"গলার বগলসটা ছাড়—নহিলে বাঙ্গলা উচ্চারণ দোরস্ত হ'বে না।" তখন কড়া বুকের ও কড়া কলারের সার্ট বাবু ধনীদিগের মধ্যে চলিত ছিল।

"সঙ্গীত সমাজে" অভিনয়ের আলোচনার পূর্ব্বে একটি বিষয়ে

মন্মথনাথ মিত্র

উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। সংস্কৃতিকেন্দ্র "সঙ্গীত সমাজ" বাঙ্গালার সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

বাঙ্গালায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতির প্রচলন ছিল। যাত্রা নানারূপ ছিল—যাত্রার বিষয়ও নানারূপ। সে সকলের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অন্যতম ও লোকপ্রিয় ছিল। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বহু দিনের। তাহা অবলম্বন করিয়া একাধিক বাঙ্গালী কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন। সাহিত্যে নিয়ম—a **thing becomes his at last who says it best** সেই নিয়মে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর লাভ করিয়াছে। কারণ, ভারতচন্দ্র শব্দের যাদুকর—তাঁহার রচনা কথার তাজমহল। আবার বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া বাঙ্গালায় নাটক রচনা ও সেই নাটকের অভিনয় হইয়াছিল ও যাত্রাগান হইত। কলিকাতা শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বকীয় গৃহে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন। শুনা যায়, যে ধনী বাঙ্গালী বিদ্যাসুন্দর যাত্রা রচনা করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে উহার ব্যয়নির্ব্বাহজন্য কলিকাতায় রাজভবনের নিকটস্থ একখানি গৃহ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। গানগুলি সুরজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের রচনা—তাই সে সকলে শব্দের ঝঙ্কার, সুরের টঙ্কার ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অলঙ্কার হৃদয়গ্রাহী। ওদিকে আবার অভিনয়ে নাচের ভঙ্গী, চোখের খেলা ও হাততালিতে তালদান—উল্লেখযোগ্য ছিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট তুলট কাগজে মাইষের রক্তে লিখিত পালা-পুঁথি ছিল। পালাও একাধিক রূপ ছিল—একরূপ ভদ্রলোকের বাড়ীর আসরে গীত হইত, আর একরূপ বাজারে বারইয়ারী আসরের জন্য—তাহাতে রসিকতা "মোটা"—সময় সময় আপত্তিজনকও বলা যায়। যেমন—

হীরা মালিনীর নিজ গৃহের ও নিজের পরিচয়—

(১) "ঐ দেখা যায় আমার বাড়ী
চারিদিক মালঞ্চে বেড়া,
ভ্রমরেরা করছে গুণ-গুণ, কোকিলেরা
দিচ্ছে সাড়া।
ময়ূর ময়ূরীসনে আনন্দিত কুসুমবনে
আমার ঐ ফুলবাগানে
কভু নাই বসন্ত ছাড়া।"

(২) "চল, যাদু, আমার বাড়ী
আমি দেব ভাল বাসা;
যে আশায় এসেছ, ও চাঁদ,
পূর্ণ হ'বে সেই মনের আশা।
আমার নাম হীরা মালিনী
ছিটেফোঁটা কতই জানি;
ভালবাসেন রাজনন্দিনী—
করি রাজবাড়ীতে যাওয়া আসা।"

গানের শব্দনৈপুণ্য ও সুর চিত্তগ্রাহী—

"যাইতে সাগরে আসা নাগরে
আশীষ তোমারে করি হে রায়।
দেশে বিদেশে করি শ্রবণ
তোমারি কন্যা করেছে পণ
আনন্দে রাজন, দেখিব কেমন—
রাজগণ যারে হেরি পলায়।
বিচারে যদি হারা'তে পারি
ঘটাব সিদ্ধি, করিব নারী—
আমি যদি হারি দাস হয়ে তারই
জটা মুড়াইব তাহারই পায়।"

অনুপ্রাসের ঘটা ও অলঙ্কারের ছটা সত্য সত্যই অসাধারণ। আবার গানের অনেক পদ বা উক্তি প্রবাদে পরিণত হইয়াছে—

(১) "কারিকুরী করতে গিয়ে হয় না যেন ছেলেখেলা।"
(২) "সোণার দাঁড়ে কাক বসা'লে!"
(৩) "দিলে গঙ্গাধরে গঙ্গাজল!"
(৪) "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।"
(৫) "সোণা বলে জ্ঞান ছিল, কসিতে পিতল হ'ল।"

—ইত্যাদি

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা এককালে বিশেষ আদৃত ছিল—কিন্তু "সঙ্গীত সমাজ" যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা কতকটা অনাদরে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছিল। তখন গগন ও পূর্ণ দুই ভাই দুইটি দল রাখিয়াছিল। "সঙ্গীত সমাজ" সেই যাত্রার স্বরূপ বুঝিবার জন্য দুই ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়া উভয়বিধ পালা গাহনার ব্যবস্থা

চারুচন্দ্র মিত্র ও অশ্বিনী

করিয়াছিলেন। কলিকাতার—কেবল কলিকাতার নহে, সমগ্র বাঙ্গালার শিষ্ট সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা সে কয় দিন "সঙ্গীত সমাজে" সমবেত হইয়াছিলেন। কি কি কারণে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা একদিন বাঙ্গালা মাতাইয়াছিল, তাহা বুঝিবার অবসর পাওয়া গিয়াছিল। দেব-মন্দিরের প্রাচীরে শৃঙ্গার-রসাত্মক ক্ষোদিত চিত্রই যাহাদিগকে আকৃষ্ট করে, তাহারা দেবতাকে পূজা করিবার মনোভাব লইয়া মন্দিরে গমন করে না। তেমনই যাহারা গানের বাঁধন, সুরের আলাপ, ভাবের ব্যঞ্জনা বুঝিতে চাহে না, তাহারা যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার কারণ উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। "সঙ্গীত সমাজেই" সে যাত্রার শেষ আদর লক্ষিত হইয়াছিল। সুরজ্ঞ শরদবাদ্যনিপুণ জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যাত্রার গানের সুরে যেন অভিভূত হইয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাপ্রসন্নের পার্শ্বেই নামোল্লেখ করিতে হয়—সতীশচন্দ্র সিংহের।

তখনও কীর্ত্তনের এমন অবস্থা হয় নাই যে, তাহাকে **Fasionable** করিয়া শিষ্ট সমাজে তাহার প্রচলন করিতে হয়। কীর্ত্তন তখন শ্রাদ্ধাদির আসরে অনিবার্য ছিল এবং বাড়ের পুরুষ কীর্ত্তন ও কলিকাতার নারী কীর্ত্তন—পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া রসজ্ঞ সমাজের চিত্তবিনোদন করিত। সে সময়ের প্রসিদ্ধ নারী কীর্ত্তনকারিণীর কাহারও কাহারও গান এখনও গ্রামোফোনে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সুরমা প্রভৃতির বাক্‌শুদ্ধ সুরমধুর গান—

"কোকিলকুল কূর্দ্ধতি কল
অলি-ঝঙ্কার কুসুমে;
হরিলালসে প্রাণ তেজব,
পাওয়ব আর জনমে

জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

মৃদুশীতল মলয়ানীল
মন্দ মধুর বহনা!
হরিবৈমুখী হমারই অঙ্গ
মদন-দহনে দহনা।"

প্রভৃতি গান লোককে এমনই আকৃষ্ট করিত যে—"**fools who came to scoff remained to pray.**"

"সঙ্গীত সমাজে" সেই কারণে স্বতন্ত্র ভাবে কীর্ত্তনের আসর বসাইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখন কীর্ত্তনগানে "সমাজের" আসর মজগুল রাখিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নাটোরের জগদীন্দ্রনাথ রায় অন্যতম। তিনি তখন তরুণ এবং সময় সময় "সমাজে" পাখোয়াজ বা তবলা-বাঁয়া বাজাইয়া "সঙ্গত" করিতেন। তৎকালীন কোন কোন প্রসিদ্ধ "পাখোয়াজী"ও সঙ্গীত সমাজে আসিয়া আপনাদিগের কলা-কৌশলে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

"সঙ্গীত সমাজে" সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য—তথায় যেমন উচ্চাঙ্গের গীতবাদ্যের অনুশীলন হইত, তেমনই নিম্নাঙ্গের তরল সঙ্গীতেরও চর্চ্চা হইত। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তখন স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর হয় নাই। তাহার আলোচনা ও আলাপ রবীন্দ্রনাথও করিয়া গিয়াছেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাল রাখিতেন।

"সঙ্গীত সমাজের" আদর্শে কলিকাতার সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায় একটি স্বতন্ত্র "সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "সঙ্গীত সমাজের" সদস্য চুনিয়ালাল শীল তাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাহার কারণ, "সঙ্গীত সমাজ" যে সম্প্রদায়ের মিলনকেন্দ্র ছিল, সে সমাজ কেবল অর্থের জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল না—তাহাতে বিদ্যার আদর ছিল—গুণের গৌরব ছিল—সামাজিকতা ছিল—ইত্যাদি।

"সঙ্গীত সমাজ" প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছিল—পরে ঐ পথে অপর গৃহে যায়। এই গৃহে বাঙ্গালা বহু নাটকের ও গীতি নাট্যের অভিনয়ের মতই সেক্সপীয়রের নাটক "জুলিয়াস সিজারের" অভিনয়ও হইয়াছিল। "সমাজে" রাজোপাধিকদিগের মত যে গুণীদিগেরও আদর ছিল, তাহা আচার্য জগদীশচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনায় দেখা গিয়াছে। সামন্ত রাজাদিগের মধ্যে বাঙ্গালার কুচবিহারের মহারাজা ও ত্রিপুরার মহারাজা ব্যতীত বরদার গায়কবাড় সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ইঁহারাও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। কাশীর মহারাজা তখনও, কাশীনরেশ হইলেও সামন্ত রাজার দলে, ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক, উন্নীত হ'ন নাই অর্থাৎ রামনগর দুর্গে তিনি সামন্ত রাজার অধিকার সম্ভোগ করিবার অধিকারী হ'ন নাই। কোন্ সূত্রে তিনি "সঙ্গীত সমাজে" সম্পর্কিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না। দ্বারবঙ্গের মহারাজা রামেশ্বর সিংহ ও বর্দ্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব—উভয়েই "সঙ্গীত সমাজে" আসিয়াছিলেন। উভয়ে যে প্রতিযোগিতার ভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুর প্রবাহের মত ছিল, আচরণে ও কথায় তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তাহা শিষ্টাচারসীমা লঙ্ঘন করিত না।

হেমচন্দ্র বসু মল্লিকের কঠোর শৃঙ্খলা-প্রিয়তা হইতে রাজারা অব্যাহতি ছিল না—একাধিকবার আগমনে বিলম্বের জন্য কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে এক টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইয়াছিল।

"সঙ্গীত সমাজে" যখন ইংরাজী নাটকের (সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজারে'র) অভিনয় হয়, তখন সে বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, কুচবিহারের নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাদিগের অন্যতম। তখন অমৃতলাল বসুকেও আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল। অমৃত বাবুর পুস্তক-সংগ্রহে সেক্সপীয়রের নাটকের একাধিক মূল্যবান সচিত্র সংস্করণ ছিল। সে সকল পরে মন্মথনাথ মিত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। সেরূপ বহু সচিত্র সংস্করণ হেমচন্দ্র বসু মল্লিকেরও ছিল। সেই সকল অবলম্বন করিয়া নিপুণ সজ্জাকারীদিগের দ্বারা বেশাদি প্রস্তুত করাইয়া—আবশ্যক চিত্রপট অঙ্কিত করাইয়া অভিনয় যাহাতে যথাসম্ভব নিখুঁত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে ত্রুটি করা হয় নাই। কলিকাতায় ইংরেজদিগের রঙ্গালয়ে মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা আসিয়া অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনুকরণে কলিকাতার কোন কোন কলেজে ছাত্ররাও ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। "সঙ্গীত সমাজের" অভিনয় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ইংরেজরাও তাহা স্বীকার করিয়া অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই অভিনয় "সঙ্গীত সমাজের" সংস্কৃতি বিভাগের কার্য্যের পরিচায়ক। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অভিনয় "সঙ্গীত সমাজে" আর হয় নাই।

"সঙ্গীত সমাজ" মিলনকেন্দ্র হইলেও যে সকল কারণে ও উপকরণে ক্লাব "জমিয়া" উঠে—ইহাতে তাহার অভাব ছিল। প্রথম—ইহাতে খাদ্য-পানীয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে পানীয় বলিতে বিশুদ্ধ জলই বুঝায় না। দ্বিতীয়তঃ—ইহাতে তাসের জুয়াখেলাও ছিল না। ইহা বিদেশী ধরণের ক্লাবের অঙ্গ বিশেষ। তৃতীয়তঃ—ইহাতে রাজনীতির উত্তেজনা বা সমাজনীতির আলোচনা ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ ব্যক্তিদিগের "পূর্ণিমা সম্মিলনেও" একটা উত্তেজনা ছিল—

"এটা নয় ফলার ভোজের আয়োজন।
এখানে আছে কিঞ্চিৎ জলযোগ আর
গানের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়
এইখানেতে হয়ে জড়—
বন্ধুভাবে আনন্দেতে করতে হ'বে কালযাপন।"

"সঙ্গীত সমাজে"র সেরূপ উত্তেজনাও ছিল না—আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে "সঙ্গীত সমাজ" যে শোক প্রকাশের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। কিন্তু তখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—জমীদার-সভার স্থান অধিকারের কাছে অধিকার করিবার সুযোগ "সঙ্গীত সমাজে"র সদস্যদিগকে উত্তেজনা প্রদান করে নাই—তাহার জন্য যে উদ্যম ও উৎসাহ প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা বিলয়ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মতই ক্ষণিকের সাফল্যদান করিয়াই বিলুপ্ত হয়। তাহার কারণ, সে উৎসাহ ও উদ্যম স্থায়ী কাজে প্রযুক্ত করিবার কল্পনাও 'সঙ্গীত সমাজে'র সদস্যরা করেন নাই। যাহাকে "দিনগত পাপক্ষয়" করা বলে—তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। সজ্ঘর্ষের তাপ—তথায় ছিল না—কর্ম্মের উৎসাহেরও অভাবই লক্ষিত হইত। অথচ ইহাতে অর্থব্যয় অল্প হয় নাই—সম্ভ্রান্ত শিষ্ট সমাজে ইহার প্রভাবও অল্প ছিল না। আবার ইহার কাজ করিবার সুযোগ যেমন ছিল কাজ সুসম্পন্ন করিবার শক্তিরও তেমনই অভাব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের যাঁহারা "সঙ্গীত সমাজে"র সহিত সংযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকের নামই মনে পড়ে। অনেকের নাম করিয়াছি। আর এক জনের নামোল্লেখ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি—রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তখন তিনি প্রতিকূল অবস্থার অন্ধকার রাত্রি অতিক্রম করিয়া ভাগ্যোদয়ের প্রভাতে উপনীত হইয়াছেন—তবে তখনও তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্যগগনে উপনীত হয় নাই। তিনি তখন রমেশচন্দ্র দত্তের বিডন ষ্ট্রীটস্থ গৃহ ক্রয় করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিলেন। তিনি "সঙ্গীত সমাজে" আসিতেন—প্রতি সন্ধ্যায় নহে, উৎসবাদিতে। তবে "সমাজে"র সাহায্যার্থ পরামর্শ ও অর্থ দিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি—সঙ্গীতে বা অভিনয়ে কখন যোগ দেন নাই, সে সকল উপভোগ করিতেন।

রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং তাঁহারই মত সময় সময় আসিতেন—তাঁহার প্রতিবেশী বাঙ্গালীর প্রসিদ্ধ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কর-তারক কোম্পানীর তারকচন্দ্র সরকারের মধ্যম পুত্র—কলিকাতা কর্পোরেশনের খ্যাতনামা সদস্য নলিনবিহারী সরকার। তিনি তখন কলিকাতায় শিষ্ট সমাজে যেমন, ব্যবসায়িসমাজেও তেমনই নিজগুণে সমাদৃত।

নলিন বাবুর অনুজ পুলিনবিহারী সরকারও, অগ্রজেরই মত, মধ্যে মধ্যে "সমাজে" আসিতেন।

এই সকল লোক ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না—কিন্তু সমাজের অলঙ্কাররূপেই প্রতিভাত হইতেন।

"সঙ্গীত সমাজে" মহিলারা সদস্য হইতে পারিতেন না। একবার "সঙ্গীত সমাজে" মহিলারা অভিনয় করিয়াছিলেন। সে অভিনয় মহিলাদিগের জন্য—'মৃণালিনীর' অভিনয়—(২২শে ভাদ্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ) আর "সমাজের" শেষ দশায় "ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান ওয়ার রিলিফ ফাণ্ডের" সাহায্যার্থ বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের

অতুলকুমার সেন

পল্লীর উদ্যোগে বঙ্গীয় মহিলাগণ কর্তৃক 'মীরাবাই' অভিনীত হয় (১১শে ডিসেম্বর, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ) কুচবিহারের মহারাণী ইন্দিরা দেবী তাহার উদ্যোগী ছিলেন। এ সকল কিন্তু "সঙ্গীত সমাজের" নিয়ম নহে—নিয়মের ব্যতিক্রম। কারণ, প্রতিষ্ঠাবধি "সঙ্গীত সমাজের" যাঁহারা ধারক ছিলেন, তাঁহারা ইহা পুরুষদিগের জন্যই মিলনকেন্দ্র ও সংস্কৃতিকেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা অভিনয়েও কখন স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনয় করাইবার কল্পনা করেন নাই। অথচ আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালায় প্রথম যে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতেও স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় হইয়াছিল। সে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন কলিকাতা শ্যামবাজার পল্লীর অধিবাসী নবীনচন্দ্র বসু সখ করিয়া স্বগৃহে লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে নাটকাভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহাতে ষোড়শী রাধামণি বিদ্যার অংশ অভিনয় করিয়াছিল এবং জয়দুর্গার সঙ্গীত সমবেত ব্যক্তিদিগকে প্রীত করিয়াছিল। এ বিষয়ে "সঙ্গীত সমাজের" প্রতিষ্ঠাতা হইতে পরিচালক সকলের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা কেহই করেন নাই এবং নৈতিক হিসাবে "সমাজের" সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ দোষারোপ করিতে পারেন নাই। গৌতম বুদ্ধ যখন তাঁহার সদ্ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন এ দেশের সমাজে—যাহাকে "অবরোধ প্রথা" বলা হয়, তাহা প্রচলিত ছিল না: কিন্তু তথাপি প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মমতে কেবল পুরুষরাই দীক্ষা গ্রহণের অধিকারী ছিলেন এবং যখন মহাপ্রজাপতির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকেও দীক্ষা দান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন তিনি প্রিয় সহকর্ম্মী আনন্দকে, আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি নারীরা এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগের অধিকারিণী না হইত, তবে সদ্ধর্ম্ম বহুদিন অনাবিল থাকিত—ধর্ম্মমত সহস্র বৎসর স্থায়ী হইত—কিন্তু নারীরাও গৃহ-ত্যাগের অধিকার লাভ করায় তাহা পাঁচ শত বৎসর মাত্র অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সে বিষয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নাই।

"সঙ্গীত সমাজের" বিবরণ সে বিতর্কের স্থানও নহে। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন এক নহে—ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল দৌর্ব্বল্য উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেও পারে, সামাজিক জীবনে সে সকল অবজ্ঞা করা যায় না এবং সে সকল অবজ্ঞাত হইলে সমগ্র সমাজের অকল্যাণ হয়। "ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের" কর্ম্মীরা যে সমাজের ও "সঙ্গীত সমাজের" জীবনে প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন—"সঙ্গীত সমাজের" নৈতিক নিষ্ঠা সম্বন্ধে কেহ যে তাঁহাদিগের ব্যবহারে কোনরূপ আপত্তি করিতে পারেন নাই, তাহার উল্লেখ করা আজ আমরা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সেই নিষ্ঠা হেতুই "সমাজ" সর্ব্ববিধ সামাজিক বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র হইয়াছিল। সেই বিষয়ে "সঙ্গীত সমাজের" আদর্শ পরবর্ত্তী অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতৃগণের পথিপ্রদর্শক হইতে পারে।

অগ্নিবীণার কবিকে

সত্যেন দে

অগ্নিবীণার প্রদীপ্ত শিখায়
স্থবিরা পৃথ্বী নির্বাক্ ছিল:
সেই দিন থেকে তোমার কোদণ্ডে
বিপ্লবের শর-সন্ধান; তূণ শূন্য হয়নি,
ধনু নমিত হয়নি, ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডে
মুষ্ট্যাঘাতের মতোই কঠোর, পাষাণ-নিষ্কম্প।
তোমার কোষে একদিন ছিল বিদ্যুৎ-হাতিয়ার:
বৈজয়ন্তী বরমাল্যে অভিষিক্ত জাগৃহি
সৈনিক তুমি! রণতূর্যের উদাত্ত আবাহনে
তোমার নির্ভীক জীবন সঞ্চালন···।
তারপর
তোমার হাতে আর বিদ্যুৎ খরধার
তরবারি নয়, বলিষ্ঠ লিখন-দণ্ড—
অগ্নিগিরির অটল নির্ভরতা:
সংঘর্ষে নির্ঘোষে প্রাণ-প্রাচুর্যের
উৎসারিত ভোগবতী···।
এইখানে···। হ্যাঁ এইখানেই—
সৃষ্টির বহ্নি-দাহনে যে তরংগাঘাত করেছিলে
তার স্পন্দন আজো থামেনি। সেই নীলাম্বু
বুদ্‌বুদ্ শতধা হয়েছে, সম্প্রসারিত
হয়েছে বাণী-পথ-যাত্রি
অযুত সবুজ অংকুরের অভ্যুত্থানে।

নাগপাশ বিচূর্ণের মন্ত্রবীজ ছিল
তোমার শোণিতে: কোটি কোটি জ্যোতিষ্কের শিশু
নিয়ে গেছে মাটির তীর্থরেণু
তোমারি পর্ণপুট থেকে। বিশুষ্ক দারিদ্র্যকে
তুমি দিয়েছো গৌরব, মৃত্যুকে করেছো লাঞ্ছিত,
যৌবনের দীপ্যমান ধ্রুবতারকা···
সেই দৃপ্ত বৈশ্বানর আজ মন্দাক্রান্তা—
তবু নিঃশেষিত নয়···আমাদের
আশ্বাস আছে আগামী পুনশ্চের···
তুমি এসো!
আরোগ্যের মেঘমুক্ত প্রাবৃটে
প্রাণবন্ত সাগ্নিক স্বাক্ষরে···
তুমি এসো!
তেজস্ক্রিয় পদাতিকের চরণ-ছন্দে
উপচারের অজস্র সম্ভারে···
ইস্রাইলের শাণিতে ছিদ্রে···।
কিংশুক আধারের দূরব্যাপ্তি হোক
পূর্বাচলের উদয় ত্রিশূলে···কৃষ্ণচূড়ার রক্তকেতন
অভ্রচুম্বি হোক আগমিক সংকেতে···যেই যৌবরাজ্যের
শ্যামল তৃণাসনে আমরা তোমায় আহ্বান করছি—
তুমি আবার এসো···গত দিবসের ব্যর্থ নীরবতার নির্মোক
অপসৃত হোক: নবজন্মের সজীব শপথে
দীক্ষা দাও প্রতীক্ষ্য জনতাকে।

মোগল-যুগের ভারত

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদক]

৯
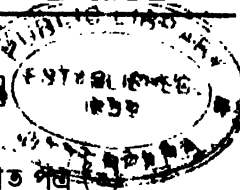
কলবার্টের কাছে লিখিত পত্র

"রৌজিনদাররাও" পদাতিকবাহিনীর অন্তর্গত। যারা রোজ বেতন পায় তাদেরই 'রৌজিনদার' বলে। রোজ বেতন পেলেও, তাদের বেতন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় "মনসবদারদের" চেয়ে বেশী। বেতন ও পদমর্যাদা অবশ্য অন্যরকমের, সম্মান বা মর্যাদার দিক দিয়ে মনসবদারদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। রাজপ্রাসাদের ব্যবহৃত কার্পেট বা অন্যান্য আসবাবপত্র যা মনসবদাররা নিজেদের জন্য ব্যবহারের সুযোগ পান, রৌজিনদাররা তা পায় না। এই সব আসবাবপত্রের সম্মানমূল্য অনেক সময় যথেষ্ট বেশী ধার্য করা হয়। রৌজিনদাররা সংখ্যায় অনেক বেশী। সম্রাটের দফতরখানায় তারা নানারকমের ছোটখাটো কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে। কেরাণীর কাজও অনেকে করে। অনেকে সম্রাটপ্রদত্ত বরাতের (১) উপর দস্তখতের ছাপ দেবার কাজ করে। বরাত হ'ল টাকা দেবার আদেশপত্র। এই সব 'বরাত' দেবার সময় তারা উৎকোচ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে।

সাধারণ অশ্বারোহীরা ওমরাহদের অধীন থাকে। দুই শ্রেণীর অশ্বারোহী আছে। প্রথম শ্রেণীর অশ্বারোহীরা দু'টি ক'রে ঘোড়া রাখে এবং ঘোড়ার পায়ে ওমরাহদের মোহরাঙ্কিত থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বারোহীরা একটিমাত্র ঘোড়া রাখে। প্রথম শ্রেণীর অশ্বারোহীদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ে বেশী এবং তাদের তনখাও বেশী। ওমরাহদের ব্যক্তিগত মর্জি ও উদারতার উপর সৈন্যদের বেতন অনেকটা নির্ভর করে। অবশ্য বাদশাহের হুকুমে প্রত্যেক অশ্বারোহী (একটি অশ্বের রক্ষক) অন্ততঃ পঁচিশ টাকা মাসিক বেতন পাওয়া উচিত। (২) এই বেতনের হারেই ওমরাহদের সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হ'ত।

পদাতিক সৈন্যরা সবচেয়ে অল্প বেতন পায়। শোচনীয় অবস্থা হ'ল গাদা-বন্দুকধারীদের। মাটিতে শুয়ে প'ড়ে যখন তারা তাদের বন্দুক ব্যবহার করে, তখন তাদের অবস্থা দেখলে করুণা হয় মনে। তারাও ভয় পেয়ে যায়। চোখ দুটো তাদের ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে থাকে। যাদের লম্বা দাড়ি আছে, তারা দাড়িতে আগুন লাগার ভয়ে ঘাবড়ে যায়। তাছাড়া, জিন্‌পরীদের ভয় তো আছেই। বন্দুকচীদের ধারণা যে জিন্‌দৈত্যদের চক্রান্তে গাদা বন্দুক ফেটে গিয়ে আগুন ধ'রে যেতে পারে। তাই বন্দুকচীরা বন্দুকের চেয়ে বেশী

---

(১) "বরাত" কতকটা আধুনিক কালের "pay order"-এর মতন। ঠিক একালের ব্যাঙ্কের চেকের মতন না হ'লেও, "বরাত"-কে অনেকটা মোগল যুগের চেক্‌ও বলা যায়। কি কাজের জন্য কত টাকা দেওয়া হ'চ্ছে, বরাতে তাই লেখা থাকত এবং বাদশাহের স্বাক্ষরসহ মোহরাঙ্কিত থাকত প্রত্যেকটি 'বরাত'। অনেক হাত ঘুরে, অনেক কর্মচারীর স্বাক্ষর-চিহ্নিত হয়ে, তবে বরাতের বিনিময়ে নগদ টাকা পাওয়া যেত। 'বরাত' সম্বন্ধে "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, রাজার কারখানার কারিগরদের এবং পিলখানা, অশ্বশালা, উষ্ট্রশালা ইত্যাদি বিভাগের কর্মচারীদের বরাতের মারফৎ বেতন দেওয়া হ'ত (আইন-ই-আকবরী : ব্লকম্যান, ২৬১ পৃঃ)। দেওয়ান বরাতের হিসেব দেখে তনখার ব্যবস্থা ক'রে দিতেন এবং পাশে লিখে দিতেন "বরাত নবীসন্দ"। মুস্তফী মুসরেফ তাই দেখে একটি 'কবচ' তৈরী ক'রে দিতেন। "কবচ" কথাটি ফার্সী কথা, অর্থ হ'ল কর বা হাতের তালু। কবচ থেকে কব্জা কথা এসেছে। কবচপত্র পেলে বোঝা গেল, উদ্দেশ্য হস্তগত হয়েছে। 'কবচ' কতকটা 'প্রমিসারী নোট' ও 'রসিদের' সংমিশ্রণ বলা চলে। এখন জমিদারে "কবচ" বা দাখিলা দিয়ে থাকেন, কিন্তু বাদশাহী আমলে কবচ একালের গবর্ণমেণ্ট নোটের মতন ব্যবহৃত হ'ত।

যাই হোক, মুস্তফী কবচ ক'রে দেন, তাতে দেয় টাকার কথা লেখা থাকে। সেই টাকার একচতুর্থাংশ কেটে নেওয়া হয়। পরে কবচ ও বরাত উভয়পত্রে তোজীনবীশ, মুস্তফী, নাজীর, দেওয়ান, উকিল প্রভৃতি সকলে দস্তখৎ করেন। তারপর বাদশাহের পাঞ্জা ও মোহরের ছাপ পড়ে। পাঞ্জামোহরের পাশে লেখা থাকে, কোন্ শ্রেণীর মুদ্রায় টাকা দেওয়া হবে।—অনুবাদক

(২) মোগল বাদশাহের আমলে যুদ্ধের অশ্ব চিহ্নিত করা হ'ত এবং তাদের সাতভাগে ভাগ করা হ'ত সাধারণতঃ। যেমন—আরবী, ইরাকী, মোজন্নস, তুর্কী, ইয়াবু, তাজী ও জঙ্গলী। যারা আরবী অশ্বারোহী তাদের বেতন ছিল প্রায় ৮০০ দাম (৫৫ দামে এক টাকা)। যারা ইরাকী অশ্বারোহী, তাদের বেতন ছিল ৬০৮ দাম, মোজন্নস অশ্বারোহীদের ৫৬০ দাম (ইরাকী ও তুর্কী অশ্বের সংমিশ্রণজাতকে মোজন্নস বলা হ'ত), তুর্কী অশ্বারোহীদের ৪৮০ দাম, ইয়াবুদের ৪০০ দাম। তাজী ও জঙ্গলী ভারতবর্ষের অশ্ব। তাজী অশ্বারোহীদের বেতন ছিল ৩২০ দাম এবং জঙ্গলী অশ্বারোহীদের ২৪০ দাম। যারা টাটু ঘোড়ায় চ'ড়ে সংবাদবাহকের কাজ করত, তারা ১৪০ দাম বেতন পেত। ('আইন্-ই-আকবরী' থেকে সংগৃহীত)—অনুবাদক।

দাড়ি ও চোখ সামলাতেই ব্যস্ত থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে। বেতন তাদের কারও কারও মাসিক কুড়ি টাকা, কারও পনের টাকা, কারও বা দশ টাকা মাত্র।

কিন্তু গোলন্দাজবাহিনীর সৈন্যরা অনেক বেশী বেতন পেয়ে থাকে, বিশেষ ক'রে বিদেশী পর্তুগীজ, ইংরেজ, ডাচ, জার্মান ও ফরাসী যারা তারা তো নিশ্চয়ই। গোয়া ও অন্যান্য ডাচ ও ইংরেজ কুঠির পলাতক কর্মচারীরা বাদশাহের গোলন্দাজবাহিনীতে অনেকে যোগদান করত। এইসব ফিরিঙ্গী বা খৃষ্টান গোলন্দাজরা অনেক বেশী বেতনও পেত। গোড়ার দিকে যখন গোলন্দাজসেনা সম্বন্ধে মোগল বাদশাহের বিশেষ ধারণা ছিল না, তখন তিনি রীতিমত উচ্চ বেতন দিয়ে ফিরিঙ্গীদের নিয়োগ করতেন। সেই সময় ফিরিঙ্গী গোলন্দাজরা সাধারণতঃ মাসিক দুই শত টাকা পর্যন্ত বেতন পেতেন। পরে যখন এদেশী লোক বেশ শিক্ষা পেয়ে গেল এবং গোলন্দাজবাহিনী গ'ড়ে উঠলো তখন বাদশাহ আর ফিরিঙ্গীদের এত টাকা বেতন দিতেন না। মাসিক ত্রিশ বত্রিশ টাকা ক'রে তারা বেতন পেত।

কামান দু'রকমের আছে—ভারী ও হালকা কামান। ভারী কামান সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলতে পারি যে, আমি একবার স্বচক্ষে সম্রাটের সসৈন্যে রাজধানী থেকে লাহোরের পথে কাশ্মীরযাত্রা দেখেছি এবং সেই সৈন্যদের সঙ্গে গোলন্দাজরাও ছিল মনে আছে। ভারী কামান প্রায় ৭০টি ছিল এবং দু'শ থেকে তিনশ' উটের পিঠে সরঞ্জাম-সহ সেগুলি বহন করা হয়েছিল। কামানগুলি সব পিতলের তৈরী। যাত্রাপথে বাদশাহ কি ভাবে শীকার করতেন নিছক আমোদের জন্য তা বাস্তবিকই বলবার মতন। প্রতিদিন কিছু-না-কিছু একটা শীকার তাঁর করা চাইই চাই—সে যাই হোক। আর কোনদিন তিনি তাঁর নিজের শীকারের পক্ষীগুলি ছেড়ে দিতেন এবং তারা কিছু শীকার ক'রে নিয়ে আসত। কোনদিন তিনি নীলগাই শীকার করতেন নিজে, কোনদিন বা সখ ক'রে হরিণ শীকার করতেন নিজের পোষা নেকড়ের দল লেলিয়ে দিয়ে। আবার কখনও বাদশাহী মেজাজ হ'লে সিংহ শীকারও করতেন।

বাদশাহের কাশ্মীরযাত্রার সময় হালকা কামানধারীদেরও বেশ সুসজ্জিত দেখেছি। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি হালকা কামান ছিল, সব পিতলের তৈরী। হালকা কামান প্রত্যেকটি সুন্দর একটি শকটের উপর বসানো এবং তার সঙ্গে গুলিগোলার বাক্স সাজানো। একটির পর একটি সারবন্দীভাবে সাজানো ছিল এবং তার উপর নানারকমের লাল পতাকা ঝুলছিল। দু'টি ক'রে বলিষ্ঠ ঘোড়া প্রত্যেক কামানের শকটের সঙ্গে যোতা ছিল টানার জন্য এবং পাশে আরও একটি ক'রে ঘোড়া ছিল তার সঙ্গে। ভারী কামানধারী যারা তারা রাজপথ বা সোজা সড়ক দিয়েই চলছিল, সব সময় যে বাদশাহের অনুগমন করছিল তা নয়। কারণ বাদশাহ সব সময় বাঁধা সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন না, মধ্যে মধ্যে আশপাশের সরু পথে ঢুকে পড়ছিলেন শীকারের সন্ধানে। সুতরাং ভারী কামানধারীদের পক্ষে সব সময় তাঁকে অনুগমন করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু হালকা কামানধারীদের তাঁকে পদে পদে অনুসরণ করার কথা এবং তারা করছিলও তাই।

প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্রাটের নিজস্ব সেনাবাহিনীর অন্যদিক থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, কেবল সংখ্যার দিক থেকে ছাড়া। প্রত্যেক জেলায় জেলায় ওমরাহ, মনসবদার, রৌজিনদার, সাধারণ সেনাদল, পদাতিক ও গোলন্দাজবাহিনী আছে। শুধু দাক্ষিণাত্যেই আছে প্রায় বিশ-পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও অন্যান্য রাজাদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার পক্ষে খুব বেশী সৈন্য নয়। কাবুলে বাদশাহ যে সৈন্য রাখেন তার সংখ্যাও প্রায় বারো হাজার থেকে পনের হাজার পর্যন্ত এবং পারসী, বেলুচী ও সীমান্তের অন্যান্য জাতির অভিযান ও উপদ্রব প্রতিরোধ করার জন্য এইরকম সৈন্যসংখ্যা না রেখে উপায়ও নেই। কাশ্মীরে প্রায় চার হাজারের বেশী সৈন্য থাকে। বাংলাদেশের সৈন্যসংখ্যা আরও অনেক বেশী, কারণ বাংলাদেশে বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকে। এইরকম প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রত্যেক অঞ্চলে বাদশাহী সৈন্য থাকে এবং স্থানের গুরুত্ব বিশেষে সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। এই কারণে সারা হিন্দুস্থানে মোট সৈন্যসংখ্যা এত বেশী যে, বাইরে থেকে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। পদাতিক সৈন্যের কথা আপাততঃ বাদ দিয়ে বলা যায় যে, শুধু সম্রাটের অধীনে অশ্বারোহী সৈন্য আছে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার। এর সঙ্গে প্রত্যেক প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা যোগ করলে প্রায় দু'লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায়।

পদাতিক সৈন্যের বিশেষ গুরুত্ব নেই বলেছি। সম্রাটের অধীনে প্রায় পনের হাজার পদাতিক সৈন্য আছে, বন্দুকচী ও গোলন্দাজদের নিয়ে। এই সংখ্যা থেকে প্রদেশের পদাতিক-সংখ্যা সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু অনেক সময় সৈনিক, চাকরবাকর, খিদমৎগার, খানসামা, দাসদাসী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক যারা সম্রাটের অনুগমন করে, তাদের সকলকেই পদাতিক নামে অভিহিত করা হয়। এর অর্থ কি, আমি ঠিক বুঝি না। (৩) যদি এভাবে পদাতিকের সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহ'লে সম্রাট যখন তাঁর রাজধানী ছেড়ে কোথাও যাত্রা করেন, তখন তাঁর সঙ্গে দু'লক্ষ থেকে তিন লক্ষ পদাতিক সৈন্য থাকে বলা চলে। সংখ্যার কথা শুনলে হয়ত আশ্চর্য হয়ে যাবেন। হবারই কথা। কিন্তু বাদশাহ যখন কোন জায়গায় যান তখন তাঁর সঙ্গে কতরকমের জিনিস ও কতরকমের লোকলস্কর থাকে সে-সম্বন্ধে যদি কোন ধারণা থাকত আপনার, তাহ'লে আপনি একেবারেই আশ্চর্য হতেন না। সম্রাট যান, তাঁর সঙ্গে যায় তাঁবু, আসবাবপত্র, নানারকমের জিনিসপত্র, চাকরবাকর, দাসদাসী, সৈন্যদের জন্য প্রচুর জেনানা ইত্যাদি। এইসব লোকজন ও লটবহর বহন করার জন্য যায় অসংখ্য হাতি, ঘোড়া, উট, গরু, পাল্কি, চৌপালা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে একটা বিচিত্র চলচ্চিত্র ব'লে মনে হয়। সম্রাট যেদেশে সর্বশক্তিমান মহাপুরুষ ও সর্বময় কর্তা, সম্রাট যেখানে দেশের সমস্ত ধনসম্পদের একমাত্র আইনসঙ্গত মালিক, সেখানে এরকম ঘটনা ঘটা কিন্তু মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। সেখানে রাজধানী প্রধানতঃ রাজাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে এবং রাজা না থাকলে রাজধানী হতশ্রী হয়ে যায়। দিল্লী ও আগ্রা এইরকম রাজসর্বস্ব রাজধানী। রাজা

(৩) আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ডাকহরকরা, সমবেশধারী বা কুস্তীগীর, পাল্কি-বেহারা, ভিস্তী প্রভৃতি সকলকেই পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে গণ্য করা হ'ত।

থাকেন ব'লে তার শ্রী থাকে, রাজা না থাকলে শ্রীহীন হয়ে যায়। রাজধানী ছেড়ে রাজা যখন কোন জায়গায় যান, তখন মনে হয় যেন গোটা রাজধানীটাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এদৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আমীর-ওমরাহ, আমলা-অমাত্য, সেনাবাহিনী, সাঙ্গোপাঙ্গ, দাসদাসী, কারিগর-কারখানার সঙ্গে উষ্ট্রশালা, হাতিশালা, অশ্বশালা সব সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। মনে হয় যেন রাজার সঙ্গে রাজধানীও চলেছে। রাজধানী একেবারে শূন্য হয়ে যায়। দিল্লী বা আগ্রা প্যারিসের মতন শহর নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির বলতে যা বোঝায়, দিল্লী ও আগ্রাকে অনেকটা তাই বলা চলে। শিবির গুটিয়ে সেনাপতি যেমন স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করেন, তেমনি হিন্দুস্থানের সম্রাটও তাঁর রাজধানী গুটিয়ে নিয়ে অন্যস্থানে যান। এরকম রাজধানীকে যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির ছাড়া কি বলা চলে?

সৈন্য ও আমলাদের বেতনের কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। আমীর-ওমরাহ থেকে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত সকলকে দু'মাস অন্তর বেতন দিতে হয়, না দিলে চলে না। কারণ সম্রাটের এই তনখার উপর জীবনধারণের জন্য তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। ফ্রান্সে যেমন কোন জরুরী অবস্থায় বা জাতীয় সঙ্কটের সময়, সম্রাট যদি তাঁর ঋণ দু'একমাসের জন্য পরিশোধ করতে না পারেন, তাহ'লে যে কোন কর্মচারী বা সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত নিজেদের সামান্য মজুত অর্থেও কোনরকমে জীবনধারণ করতে পারে, হিন্দুস্থানে তা কেউ পারে না, সাধারণ সৈনিক বা কর্মচারীরা তো নয়-ই, আমীর-ওমরাহরাও নয়। সম্রাটের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত আয়ের কোন উপায় নেই হিন্দুস্থানে। সম্পূর্ণ সম্রাটের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। সুতরাং নিয়মিত মাসিক তনখার গুরুত্ব হিন্দুস্থানে অত্যধিক। সেনাবাহিনীর সৈন্যদের যদি তনখা দিতে দেরী হয় তাহ'লে হিন্দুস্থানে তার ফলাফল ভয়াবহ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। প্রথমে তারা নিজেদের সামান্য পুঁজিপাটা যা কিছু সব বেচে ফেলে বাঁচার চেষ্টা করে। তারপর যখন সব নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সেনাদল ছেড়ে পলায়ন করে, বিদ্রোহ করে, অথবা অনাহারে দলে দলে মৃত্যু বরণ করে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য, দেখা যায় না এবং না দেখলে বিশ্বাসও করা যায় না। সিংহাসন নিয়ে হিন্দুস্থানের ঘরোয়া যুদ্ধের শেষ দিকে, লক্ষ্য করেছি, অর্থাভাবে সৈন্যরা তাদের নিজেদের ঘোড়া পর্যন্ত বিক্রী ক'রে দিতে চেয়েছে। বিক্রী তারা করতে আরম্ভ করত, যদি আরও কিছুদিন ঘরোয়া লড়াই চলত। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার একেবারেই কিছু নেই। কারণ, মাননীয় মন্ত্রী মশায়! আপনি হয়ত জানেন না যে মোগল সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সৈন্য ও সিপাই বিবাহিত। তাদের স্ত্রী-কন্যা আছে, পরিবার আছে, ঘরবাড়ী, দাসদাসী সবকিছু আছে। সকলেই তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে জীবিকার জন্য। অর্থাৎ তাদের মাসিক তনখার দিকে। হিসেব করলে দেখা যায়, এই-ভাবে কয়েকলক্ষ লোক, স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে সকলে, সরকারী কর্মচারী-দের মাসিক বেতনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে জীবন যাপন করে। জানি না, কোন রাজার রাজকোষ থেকে এত লোকের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব কি না?

মোগল বাদশাহের অন্যান্য খরচের কথা আমি এখনও উল্লেখ করিনি। দিল্লী ও আগ্রাতে বাদশাহ সব সময়ের জন্য প্রায় দু'তিনহাজার সুন্দর বাছা-বাছা ঘোড়া আস্তাবলে রেখে দেন। তাছাড়া, প্রায় আট-ন'শ হাতী এবং কয়েকহাজার টাটু, কাহার, বেহারা ইত্যাদিও থাকে সম্রাটের বড় বড় তাঁবু ও তার সরঞ্জামাদি(৪) বহন করার জন্য। বেগমসাহেবারা ও জেনানারাও বাদশাহের সঙ্গে যান। তার সঙ্গে যায় গঙ্গার জল(৫) ও হরেকরকমের জিনিসপত্র। এত জিনিস, এত সাজসরঞ্জাম, এত বিলাসসামগ্রী ইউরোপের কোন সম্রাটের দরকার হয় না কখনও। এর সঙ্গে যদি আবার হারেম বা বেগমখানার খরচের কথা বলি তাহ'লে আপনার কাছে রূপকথার কাহিনী ব'লে মনে হবে। দামী দামী সোণারুপোর কাজ করা

---

(৪) তাঁবু অনেক রকমের ছিল বাদশাহী আমলে। 'আইন-ই-আকবরী'তে তার খানিকটা বিবরণ পাওয়া যায়। আকার ও রকমভেদে তাঁবুর নাম ছিল নানারকম, যেমন—বরগা, চৌবীনরৌতি, ডুরাসনা-মঞ্জেল, খাটগা, সরাপর্দা, সামীয়ানা ইত্যাদি। 'বরগা' বিরাট তাঁবু, নীচে অন্ততঃ দশহাজার লোক দাঁড়াতে পারত। 'বরগা' তাঁবু একহাজার লোক সাতদিনে খাটাতে পারত। 'চৌবীনরৌতি' দশটা খুঁটির উপর টাঙানো হ'ত। তাঁবুর নীচে খসখসের চাল দেওয়া থাকত এক সঙ্গে খস্খস ও বেণা বোনা থাকত। খসখসের বেড়ার উপর ভাল কিংখাপ ও মলমল আঁটা থাকত। উপরে চাঁদোয়ার মতন লাল সুলতানী বনাত দেওয়া হ'ত। চৌবীনরৌতি তাঁবু টাঙাবার জন্য রেশমের ও তসরের দড়ি ব্যবহার করা হ'ত। দো-তলা তাঁবুর নাম ছিল 'ডুরাসানা-মঞ্জেল', আট-ন'টা খুঁটির উপর দাঁড় করানো। উপরতলায় বাদশাহ নমাজ পড়তেন, নীচের তলায় বেগমরা থাকতেন। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে সংকলিত)—অনুবাদক।

(৫) মোগল বাদশাহরা পানি-বিশারদও ছিলেন। পানীয় জল, স্নানের জল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের বিলাসিতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। "আইন-ই-আকবরীতে" এ-সম্বন্ধে চমৎকার বিবরণ আছে। সরকারী দফতরখানায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগই ছিল, যার কাজ ছিল পানীয় জল সরবরাহ করা, জল ঠাণ্ডা করা, ও বরফ আমদানি করা ইত্যাদি সম্বন্ধে তদারক ও ব্যবস্থা করা। সেই বিভাগের নাম ছিল—"আবদারখানা"। সাধারণতঃ সোরা দিয়ে বাদশাহের পানীয় জল ঠাণ্ডা করা হ'ত। বালি ও মাটির তৈরী কুঁজোতে জল ভ'রে, তার মুখে ভিজে কাপড় বেঁধে একটা বড় গামলায় রাখা হ'ত। সেই গামলায় জল থাকত এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে সোরা মেশানো থাকত। কুঁজোর গলায় তিনপাক রেশমের দড়ি দিয়ে, ঠিক যেমন ক'রে মন্থনদণ্ড ঘোরানো হয়, তেমনি ক'রে কুঁজো ঘোরানো হ'ত। খানিকক্ষণ ঘোরালেই কুঁজোর জল খুব ঠাণ্ডা হ'ত। একে "গড়গড়ী" জল বলে। "হর্ষচরিতে" এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাদশাহের পাকশালায় গঙ্গা ও যমুনার জল ব্যবহার করা হ'ত। পঞ্জাবের কাছে থাকলে হরিদ্বার থেকে জল আনা হ'ত, আগরায় থাকলে জল আসত প্রয়াগ থেকে। হিমালয়ের কাছ থেকে বরফও আমদানি করা হ'ত। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে সংগৃহীত)—অনুবাদক।

কাপড়চোপড়, রেশম, মণিমুক্তা, মৃগনাভি, সুগন্ধি আতর ইত্যাদি হারেমখানার জন্য অজস্র আমদানি করা হ'ত।(৬)

সুতরাং যদিও বাদশাহের রাজস্ব প্রচুর এবং ঐশ্বর্যও প্রচুর, তবু তাঁর এই অপরিমিত ব্যয়ের জন্য উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না বিশেষ। যেমন আয় তেমনি তাঁর ব্যয়। অনেক রাজার রাজস্ব আয় থেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহের আয় অনেক বেশী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি ধনী সম্রাট বলতে রাজী নই। মোগল বাদশাহকে ধনী বলাও যা, কোন কোষাধ্যক্ষকে ধনী বলাও তাই। কোষাধ্যক্ষ প্রচুর টাকা নাড়াচাড়া করেন, এক হাতে জমা নেন, অন্য হাতে দিয়ে দেন। সেই টাকার মালিক তিনি নন। তেমনি ঠিক হিন্দুস্থানের বাদশাহও। ধনী ও ঐশ্বর্যবান সম্রাট আমি তাঁকে বলতে পারি যিনি নিজের রাজ্যের প্রজাদের পীড়ন বা শোষণ না ক'রে এমন রাজস্ব আদায় করতে পারেন যা দিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর বিরাট রাজদরবারের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন, বড় বড় প্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরী করতে পারেন, রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্যসামন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বহাল করতে পারেন—এবং এত সব করা সত্ত্বেও যিনি বিপদ-আপদ ও সঙ্কটের জন্য প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত টাকা মজুত রাখতে পারেন। এসব অধিকাংশ গুণই বাদশাহের আছে বটে, কিন্তু যতটা পরিমাণে থাকলে ভাল হয়, তা নেই। আমি যা বলতে চাচ্ছি, আশা করি তা আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনিও নিশ্চয় হিন্দুস্থানের বাদশাহকে এই কারণে খুব ধনী সম্রাট বলতে চাইবেন না। এইবার আপনাকে আমি আরও দু'টি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি, যা থেকে আপনি আমার বক্তব্য সমর্থন করার মতন যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাবেন মনে হয়। এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবেন, মোগল বাদশাহের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বাইরের লোকের যে ধারণা আছে তা ঠিক নয়।

প্রথম ঘটনা: বিগত গৃহযুদ্ধের শেষদিকে সম্রাট ঔরঙ্গজীব সৈন্যদের বেতন সম্পর্কে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভেবেই কূল পাচ্ছিলেন না, কি ক'রে তাদের বেতন ও ভাতা দেবেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে গৃহযুদ্ধ পাঁচ বছর মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং সৈন্যদের বেতন স্বাভাবিক অবস্থায় যেরকম থাকত, তার চেয়ে কম ছিল। তাছাড়া কেবল বাংলাদেশ ছাড়া, যেখানে সুলতান সুজা তখনও লড়াই করছিলেন—হিন্দুস্থানের আর কোথাও বিশেষ যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছিল না। সর্বত্র শান্তি বজায় ছিল বললেও ভুল হয় না। এও মনে রাখা দরকার যে সম্রাট ঔরঙ্গজীব যেভাবেই হোক, সেই সময় তাঁর পিতা সাজাহানের অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা: সম্রাট সাজাহান যথেষ্ট বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে খুব বড় রকমের কোন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে তিনি লিপ্ত হননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছয় কোটির বেশী টাকা জমাতে পারেননি। অবশ্য এই টাকার সঙ্গে আমি সোণারূপোর অসংখ্য মূল্যবান জিনিস, দামী দামী পাথর মণি মুক্তা হীরা জহর ইত্যাদির মূল্য যোগ করছি না। এদিক দিয়ে বরং সম্রাট সাজাহানের মতন দৌলত অন্য কোন সম্রাটের ছিল না বলা চলে। কিন্তু এই সব মূল্যবান মণিমুক্তা হীরা জহরং ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধ'রে সঞ্চিত ও সংগৃহীত, অধিকাংশই হিন্দুরাজা ও পাঠানদের। ওমরাহদের কাছ থেকে উপহার পাওয়াও কম নয়। এ সবই সম্রাটের পবিত্র সম্পত্তি এবং স্পর্শ করা নিষেধ। দেশের দুর্দিনেও সম্রাট তাঁর এই সম্পদের কোন সাহায্য পান না।

(৬) হারেম বা বেগমখানারও সুন্দর বিবরণ আছে "আইন-ই-আকবরীতে"। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হারেম, তার মধ্যে এক একদল বেগমের জন্য এক-একটা মহল তৈরী থাকে। দু'তিনটে মহলের মধ্যে একটি ক'রে বাগান, পুষ্করিণী ও কূয়ো। আকবর বাদশাহের কিঞ্চিদধিক পাঁচহাজার বেগম ও সেবিকা ছিল। এক একদল বেগমের উপর একজন স্ত্রী-দারোগা নিযুক্ত থাকত। দারোগাদের যে সর্দার, তাকে হারেমকর্ত্রী বলা হ'ত। বেগমদের প্রত্যেকের মাসহারা ঠিক থাকত। বয়স ও রূপগুণানুসারে এক হাজার ছ'শ দশটাকা থেকে একহাজার আটশ' টাকা মাসহারা ঠিক ছিল। সেবিকাদের পঞ্চাশ থেকে দুশ' টাকা পর্যন্ত বেতন ছিল।

এলবাম

শ্রীঅনিলকুমার রায়

ফেলে-আসা জীবনের মালতীর ছোট এলবাম
পেলাম···পেলাম।
যৌবন অতীতের ভুলে-যাওয়া দিনের প্রণাম।

প্রণয়-প্রণত ভাবে সেদিনের মায়াবী প্রহর
দু'হাতে ভরেছ তুমি। কত প্রেম ছিল তো মুখর
রাতের কাজল ফ্রেমে ছবি দুইখানি
পাশাপাশি ছিল আহা তাও জানি···জানি।

মুখোমুখী বসিয়াছি উদ্ভিন্নযৌবন ছিল হাতে
দুজনার একটি প্রভাতে।

যা' দিয়েছ ভাবি নাই তার কোন ক্ষতি
শুধিতে পারিব এক রতি।

বাসর-বকুলে মালা গেঁথেছি তো তুমি আর আমি
আজ দূর···বহুদূর জীবনের পথে অনুগামী।
সে দিনের সন্ধ্যাও নাই
নাই সে মধুর রাতি। হিম-রাত একলা পোহাই।

চামেলি গহনে ফের তোমায় পেলাম
স্মৃতির শেফালী গাঁথা। আহা সে তোমারই শতনাম
ভুলে-যাওয়া জীবনের একখানি ছোট এলবাম।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

এমনিভাবে 'এপ্রিল ফুল' হবার পর যতীন দারোগা আর আসেননি আমাদের বাড়ীতে। যাঁর মনের উত্তাপ আমার গায়ে সোজাসুজি এসে না লাগলেও তা টের পেতে দেরী হলো না আমার। থানায় হাজিরা দিতে গেলে সবাই কলরব করে আমায় সম্বর্দ্ধনা জানালেও যতীন বাবুকে দেখতাম অকস্মাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর, কাগজপত্র ও ফাইলের প্রতি বেশী রকম মনোযোগী খালের ধারে ধ্যানরত বকের মতো। ক্ষুদ্রতম মাছ দেখলেই যে তিনি তৎক্ষণাৎ লম্বা ঠোঁট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তার ওপর, তা বেশ বুঝতে পারলাম। তাই আমাদের সতর্কতা আরো বৃদ্ধি করা হলো। স্কুল থেকে আনা বইগুলো আর প্রকাশ্যে বার করা হতো না, বাজেয়াপ্ত বইয়ের মতো গোপনে চলতো আদান-প্রদান। ওর মধ্যেই বাছাই করে কতকগুলো বাজে বই ফুলদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো ইছাপুরায় ফুলবৌদিদের ওখানে। সেখানে সেগুলো একেবারে মাটির নীচে কবর দেয়া হলো। এই গুপ্ত গ্রন্থাগারের সর্বময় কর্তৃত্ব দেয়া হলো রাজদিয়ার মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে। বিপ্লবী দলে একদিন আমিই তাকে নিয়ে এসেছিলাম সত্যি, কিন্তু উত্তরকালে প্রখর বুদ্ধি চালনায়, কর্মক্ষমতায়, সংগঠনের দক্ষতায় সে আমাকেও স্তম্ভিত করে ফেলেছে! বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের বোধ হয় একজনও সদস্য নেই, যিনি মধুসূদনকে চেনেন না বা তার নাম শোনেননি। অতি সাধারণ তার চেহারা, কথা কয় সে অত্যন্ত ধীরে অনুচ্চ কণ্ঠে, চলাফেরা একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন, শুধু অদ্ভুত তার হাসি। কঠিনতম সংকটময় মুহূর্ত্তেও তার অধরে দেখেছি অপরিম্লান সেই হাসির ঝিলিক। একেবারেই মাটির মানুষ মনে হয়েছে তাকে। রাজদিয়া গ্রামে তাদের বাড়ীকে বলা হতো পণ্ডিত-বাড়ী। দাদা ব্রজেন্দ্রদাস কাব্যতীর্থ রাজদিয়া হাই স্কুলের পণ্ডিত। সম্মানিত ব্যক্তি, স্বল্পভাষী ও যুক্তিবাদী। স্কুলের আয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না বলেই বাড়ীতে তাঁর একটি প্রেস, নাম হরিদাস প্রেস। সাংসারিক ব্যক্তি হলেও ধর্মভীরু এবং স্বভাবতঃই স্নেহশীল।

মধু দাদার এই স্নেহশীলতার সুযোগ নিয়ে কী যে কাণ্ডকারখানা করেছে, বাইরের লোক তার কতটুকু সংবাদ রাখে! ঐ হরিদাস প্রেসে কত যে বিপ্লবী ইস্তাহার ছাপানো হয়েছে, কত যে পলাতক রাজনৈতিক আসামী মধুদের বাড়ীতে রাত্রে সযত্নে-সাজানো এক থালা খাবার পেয়েছেন এবং পেয়েছেন রাত্রিযাপনের মতো বিছানা ও মশারী, আই-বি ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তা। অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে কোনো হাঁকডাক না করে নীরবে সমস্ত কাজ পরিচালনা করতো ঐ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। তন্তরের সুবোধ চক্রবর্ত্তীর মতোই মধুও বহু ছেলেকে এবং গোটা কতক মেয়েকেও দীক্ষা দিয়ে নিয়ে এসেছিল আমাদের দলে।

অনেক কাল ছাড়াছাড়ির পর ১৯৪৪ সালে সিকিউরিটি বন্দী হিসেবে রাজসাহী জেলে গিয়ে আবার শুনলাম মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের অদ্ভুত গুণপনার ইতিবৃত্ত। শুনলাম, জেলের সিপাইগুলোকে সে একেবারে বশীভূত করে ফেলেছিল। বাইরে থেকে আসতো জাতীয়তাবাদী নানা রকম বই, দলীয় জরুরী পত্র এবং ভেতরের সব উপঢৌকন চাইবার শোচনীয়তম মুহূর্ত্ত এতে দেখা দেয়া দূরে থাক, এতে আছে সৃষ্টির আনন্দ, ছাত্রের কাছে পরাজয়ের অননুভূত শান্তি, অগ্রবর্তী শিষ্যের উপর্যুপরি বিজয়ে রোমাঞ্চকর তৃপ্তি!

কলকাতা এসেও মধু বিপজ্জনক অনেক কাজ করেছে। এক সময় মাসিক পত্রিকা 'বেণু' প্রতাপ চাটার্জ্জী লেনের যে 'স্বপ্নলেখা' প্রেস থেকে ছাপানো হতো, মধুই তার তত্ত্বাবধান করতো দারুণ ঝুঁকি নিয়ে। অনেক গোপনীয় ইস্তাহার সে প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে। অনেক গোপন বৈঠক বসেছে সে প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষের কক্ষে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় মধুসূদন ভট্টাচার্যের দান অনস্বীকার্য্য!

১৯৩৪ সাল শেষ হয়ে গেল। মনে পড়লো, একটি-একটি করে বন্দিজীবনের দীর্ঘ চারটি বৎসর যেমন কাটালাম, তেমনি বয়সও এসে পৌছলো পঁচিশের কোঠায়। ধীরেনদা'র উৎকট উৎসাহে বহরমপুর বন্দীশিবিরে থাকাকালীন আই. এ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি বটে, কিন্তু তার পর বি. এ-র বইগুলো আর কিছুতেই ছুঁতে পারিনি। বাইরে এলে যে আমাদের পক্ষে আর পড়াশুনার সময় পাওয়া কঠিন, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

অভিভাবকেরা কিন্তু ভাবলেন, এই অবসরে যদি বিবাহের শৃঙ্খলে আমায় একবার বেঁধে ফেলতে পারেন, তাহলেই তাঁদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। পরাক্রান্ত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আতিথ্যেরও একদিন শেষ আছে, কিন্তু বিবাহের বন্ধন একেবারে অটুট ও অবিনশ্বর!

গোপনে চললো তাঁদের সলা-পরামর্শ, উদ্যোগ-আয়োজন। গুপ্ত সমিতির বিশিষ্ট সদস্য আমি নিজে, বাঘের ঘরে ঘোগের মতো আমাকেই ফাঁকি দিয়ে চললো তাঁদের গোপন অভিযান। ধীরে ধীরে একটি দলই পাকিয়ে ফেললেন তাঁরা। মরণি পিসিমা নিয়ে এলেন কয়েকটি মেয়ের সংবাদ, মাখন দোকানদার এসে জানালো যদু চাটুজ্জের বড় মেয়ে বুড়ীর কথা। বুড়ী আমাদের ছোটকোনের অর্থাৎ বিপদভঞ্জনের দিদি। আরো অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী নিয়ে এলেন আরো অনেক মেয়ের সংবাদ অর্থাৎ কেয়টখালী গ্রামের প্রায় সব মেয়ের পক্ষ থেকেই অলিখিত আবেদনপত্র গোপনে এসে অন্ততঃ একবার করে নিবেদিত হলো বাবা ও মায়ের কাছে।

কিন্তু আমায় জানাবে কে? বিবাহ তো করতে হবে আমাকে। সুতরাং আমার তো মেয়েগুলোর ইতিবৃত্ত জানা দরকার। কিন্তু কার স্কন্ধে দশটা মাথা আছে যে, এই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়?···অনেক ইতস্ততঃ, অনেক সঁকোচ ও অনেক দ্বিধার পর সাহসে ভর করে স্বয়ং মা-ই এসে একদিন সন্ধ্যায় হাজির হলেন আমার কক্ষে।

মাকে আমি দুঃখ দিয়েছি অনেক, বোধ হয় তার সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে জানতাম মা-ই আমায় ভালবাসেন সবার চাইতে বেশী। অপরেও জানতো। বোধ হয় সে জন্যই মাকেই পাঠানো হলো আমায় ঘায়েল করবার জন্য। সব খবরই ছিল আমার নখদর্পণে; তাই মা যেই ভূমিকা সুরু করলেন, আমি আসল প্রসঙ্গে এসে পড়লাম: কিন্তু আমায় কে বিয়ে করবে বল! এমনি বোকা মেয়ে এখনো আছে নাকি?

মা বললেন: মেয়ে আছে অনেক, তবে তারা একটিও বোকা নয়। একবার রাজী হয়ে যা দেখি, তার পরের সব ব্যবস্থা আমি করবো'খন।

প্রসঙ্গ হালকা করে ফেলতে চেষ্টা করলাম: নাম দাও তো মেয়েগুলোর, একবার আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে আসি। সবাই কি এই কেয়টখালীর, না দূরের মেয়েও আছে?

মা গম্ভীর হলেন: না, শোন্, তুই আর আপত্তি করিস না। বিয়ে করবি, এই কথাটা শুধু আমায় দে বাবা। আমাদের শেষ বয়সের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দে।—বলে মা আমার মাথায় হাত রাখলেন।

বিচলিত বোধ করলাম। হাত ধরে অনুরোধ জানাবার মতো মা আমার মাথা স্পর্শ করেছেন। শেষ বয়সের আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথাটি এমনি ধরা-গলায় উচ্চারণ করলেন যে, সহসা তার জবাব খুঁজে পেলাম না।···এ কী, এঁরা সবাই মিলে কি আমায় হত্যা করতে চান? যে একটি মাত্র পথ জীবনে বেছে নিয়েছি, সে পথে চলতে গিয়ে পদে-পদে দুঃখ দিয়েছি অনেককে। আমার মেধা ও বুদ্ধির ওপর তৈরী করা অনেকের অনেক রঙীন পরিকল্পনার কুতুবমিনার ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছি। শুধু দীর্ঘশ্বাসের কালো মেঘ নয়, অশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণে চলার পথ পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। তথাপি—তথাপি এগিয়ে চলেছি আমরা দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন বুকে নিয়ে দুর্জয় সাহস আর অন্তরে নিয়ে অপরিম্লান আশা···আমাদের এই সুকঠিন তপশ্চর্য্যা অবশেষে কি গৌরী এসে ভেঙে দেবে?

তাই যুক্তির আশ্রয় নিতে হলো: তুমি বুঝছো না মা, তোমাদেরই শান্তি দিতে পারলাম না কোনো দিন, এর মধ্যে আবার আর-এক জনকে কেন টেনে আনতে চাও বলতো! বিয়ে করবার সময় কোথায় আমাদের? আর জোর করে জুটিয়ে দিলেও সে ঝামেলা পোহাবে কে? সে দায়িত্ব পালনের অবসর কোথায়? বৃথাই আর একটি পরিবারের শান্তি নষ্ট করা হবে মাত্র।

মা তবু ছাড়তে চাইলেন না: বৌমা তো হবে আমার মেয়ে, আমার হেনার মতো। তোমার আবার ভাবনা কি? দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে না কিছু।

শেষ পর্য্যন্তও আমার সংকল্পে অটল রইলাম আমি, মা ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন। বাবা হলেন ক্ষুব্ধ। তাই এর পর থেকে দোতলায় বাবার উচ্চ কণ্ঠ মাঝে-মাঝে শুনতে পেতাম: তা আমার কাছে কিছু হবে না। যান না, যান না ঐ দক্ষিণের ঘরে, আগে রাজী করিয়ে আসুন, দেনাপাওনা ও মেয়ে-দেখার কথা তারপর হবে।

আমার কাছে কিন্তু কেউ আর আসতে সাহস করেনি।

বিক্রমপুরের প্রায় গ্রামেই একটি করে ড্রামেটিক ক্লাব আছে, যার সদস্যদের পেশা আদৌ নয়, নেশা হচ্ছে প্রতি বছর একবার বা সম্ভব হলে একাধিক বার নাটকাভিনয় করা। কোনো কোনো গ্রামে হয়তো কোনো বড়লোকের পক্ষপুটচ্ছায়ায় এই ক্লাব গড়ে ওঠে ও টিঁকে থাকে। বড়লোকটিরই চণ্ডীমণ্ডপের বিপরীত দিকে মঞ্চ বাঁধবার উপযোগী করে তোলা একটি টিনের ঘর আছে। সিনগুলো গুটিয়ে ওপরে বাঁধা থাকে আর উইংগুলো থাকে মাথার ওপর তোলা। দু'-তিন বাক্স পোষাক-পরিচ্ছদও আছে, সযত্নে তা রক্ষিত হয় ঐ বড়লোকেরই গৃহে। উনিই ক্লাবের আজীবন সদস্য ও সভাপতি এবং কার্য্যতঃ ডিকটেটার। কারণ অভিনয়ের যাবতীয় ব্যয় একাই বহন করেন উনি নিজে। আর যে গ্রামের ড্রামেটিক ক্লাব গরীব অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের জন্য যাকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করতে হয় সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকের চাঁদার ওপর, সেখানে প্রায়ই হানা দেয়া হয় কারুর চণ্ডীমণ্ডপে অথবা সুবিধে মত কোনো ঘরেই। হয়তো কখনো অস্থায়ী ভাবে একখানি একচালা খাড়া করা হয়, আবার অভিনয়ের পর তা ভেঙে ফেলে দেয়া হয়।

আরো দরিদ্র নাটুকে দল আছে, যাদের সঙ্গতির দৈন্য ঢাকা পড়ে যায় সদস্যদের সীমাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রাবল্যে। মঞ্চ বাঁধবার জন্য এরা হয়তো কারুর শোবার ঘরেরই বেড়াগুলো খুলে ফেললো, হয়তো গোটা দুই খুঁটিই তুলে ফেলে দিল এবং গোটা কয়েক তক্তপোশ জুড়ে তৈরী করে বসলো বিরাট রঙ্গমঞ্চ। এরা বাঁশ ও দড়ি থেকে সুরু করে সিন, উইং, পোষাক-পরিচ্ছদ, গোঁফ, দাড়ী ও মেয়েদের চুল—সবই ধার করে নিয়ে আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে। মুসলমান মাঝিরা নৌকো চালনার লগি ও পাল দিয়ে সানন্দে সাহায্য করে থাকে আর মেয়েরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক্—সাহায্য করে থাকেন সাড়ী ও ব্লাউজ দিয়ে।

গ্রামের অভিনয়ের আরো একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভূমিকালিপি নির্দ্ধারিত হয়ে গেলে পার্টগুলো লিখে ফেলা হয় এবং সেগুলো বণ্টন করা হয় শিল্পীদের মধ্যে। অনেকেই থাকেন বিভিন্ন শহরে কর্ম্মস্থলে। তাতে কোনই অসুবিধে হয় না ড্রামেটিক ক্লাবের। কারণ বিদেশে অফিসে কলম চালাবার ফাঁকে ফাঁকে নায়ক বা সহকারী নায়ক যখন রামের পার্ট মুখস্থ করতে থাকেন, তখন গ্রামে চলতে থাকে পুরোদমে মহলা। সেখানে প্রক্সি দিয়ে রাম বা লক্ষ্মণ চালানো হয়। এমনি ভাবে ঢাকা, কলকাতা, ময়মনসিংহ বা বরিশালে হয়তো প্রস্তুত হতে থাকেন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও সীতা। অবশেষে ক্যাজুয়েল লীভ অথবা তাতে সুবিধে না হলে প্রিভিলেজ লীভের সুযোগ নিয়ে একদিন ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল থেকে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এসে পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূত হন! অভিনয়ের দু' চার দিন পর আবার এঁরা নিজেদের চাকুরী-স্থলে ফিরে যান। এমনি নাটকের নেশা বিক্রমপুরের প্রায় গ্রামেই আছে।

কেয়টখালী গ্রামের এই নাটুকে দলের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন

—আজ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি—ডাঃ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিসপেনসারি ছিল বটে একটা বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়দের বৈঠকখানা-ঘরে, কিন্তু তার আলমারীগুলো যেমন খালি, তেমনি প্রায় সময়ই তার দরজায় ঝুলতে থাকে বড় একটি তালা। ডাক্তার বাবুর জায়গা-জমি যা আছে, তাতেই চলে যায় তাঁর সারা বছর। চিন্তা-ভাবনা যখন তেমন কিছু নেই এবং অবসর যখন প্রচুর, তখন স্বভাবতঃই গ্রামের নাটুকে দলের সভাপতির আসন পাবার যোগ্যতম ব্যক্তি তিনি মহলা হতো তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও উপস্থিতিতে। একটি হুঁকো হাতে করে একখানা চেয়ার নিয়ে এক কোণে বসে থাকতেন তিনি সজাগ দৃষ্টি মেলে। কারুর ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। মহলায় নিয়মিত উপস্থিতির জন্য ডাক্তার বাবুর বানরসেনার একটি অক্ষৌহিণী ছিল। দশ মিনিট দেরী হলেই তারা এসে একেবারে বাড়ীতে হাজির হতো এবং ঘাড়ে চেপে বসে থাকতো যতক্ষণ না শিল্পীআসামী এসে হাজির হতো মহলা-কক্ষে।

আরো বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে নিজের নাতিদীর্ঘ ও অপুষ্ট দেহের সুযোগ নিয়ে ডাক্তার বাবু একেবারে ব্যালেড গার্লের ভূমিকায় নেমে পড়তেন এবং রীতিমত যৌন-আবেদনময় লাস্য-নৃত্যে আবহাওয়া একেবারে সরগরম করে তুলতেন! মাথার চুল বা গালের দাড়ি একগাছিও কালো ছিল না তাঁর, তথাপি অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপ ও চটুল নৃত্যে ঐ অঞ্চলে নর্তকী ডাক্তার উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকক্ষ কেউ ছিল না বলা চলে। সংলাপ উচ্চারণ করা তাঁর পক্ষে অবশ্য একটু শক্ত কাজ ছিল, কারণ পূর্ববঙ্গীয় বিশেষ একটা টান প্রায় প্রতি শব্দেই এত স্পষ্ট হয়ে ধ্বনিত হতো যে, দিল্লীর দরবারে মতি বাঈয়ের কথা শুনে বার বারই মনে হতো বুঝি ঢাকা থেকে আমদানী করা হয়েছে তাঁকে। নিজে আবার ছিলেন নৃত্যশিক্ষক। ছোট ছোট ছেলেদের রিক্রুট করে মজুমদার বাড়ীর মণ্ডপে এক-দুই-তিন এক-দুই-তিন করে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। অভিভাবকরা এতে এতটুকুও আপত্তি করতেন না, কারণ ডাক্তার বাবু নাটক-পাগল হলেও নীতিকথায় তিনি ছিলেন একেবারে পাথরের মত কঠিন!···

কেদুটখালী গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় আমাদের বাড়ী। গ্রামের নাটুকে দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য হয়েও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নাটকাভিনয় করবার অধিকার ছিল আমার। প্রত্যেকটি অভিনয়ের পশ্চাতে আমাদের রাজনৈতিক প্রচ্ছন্ন একটা অভিসন্ধি ছিল বলেই এই অধিকার খুব ঘন ঘন প্রয়োগ করতাম আমি, বিশেষ করে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা কালে। ১১৩৫ সাল পড়তেই আমরা মহলা সুরু করলাম মন্মথ রায়ের "কারাগার" নাটকের। ভূমিকাগুলো বণ্টন করা হলো এমনি সব ছেলেদের মধ্যে, এক দিকে যেমন তাদের অভিনয়ের যোগ্যতা আছে, তেমনি দলে টানবারও উপযুক্ত তারা। আমাদের বাড়ীতেই মহলা সুরু হলো নিয়মিত ভাবে।

সরস্বতী পুজোর রাত্রে অভিনয় হবে ঠিক করা হলো। রাজদিয়ার হরিদাস প্রেস থেকে বাকিতে ছাপিয়ে নিয়ে আসা হলো নিমন্ত্রণ-পত্র ও প্রোগ্রাম। কংসের ভূমিকায় অবতরণ করবো আমি নিজে।

আমাদের বাড়ীর পুব দিকের পরিত্যক্ত গাঙ্গুলী-বাড়ীতে মঞ্চ নির্ম্মিত হলো। বছিরদ্দী মুসলমান পাড়া থেকে অসংখ্য বাঁশ, দড়ি ও নৌকোর পাল এনে দিল। হাঁসাড়ার বান্ধব সম্মিলনী ধার দিলেন সিন ও উইং। পূর্ব্বেই বলেছি, অভিনয়ে আমার খুব সুনাম ছিল। তাই শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, আশেপাশে অনেকগুলো গ্রামের দর্শকেরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সরস্বতী পুজোর রাত্রিটির জন্য।

ঠিক আগের দিন। দক্ষিণের কোঠায় সকাল বেলা নর্ত্তকীদের নৃত্যের মহলা সুরু হয়েছে সংগীত-পরিচালক রঙ্গলালের পরিচালনায়। সুরু হয়ে গেছে সংগীত :

ফুলবাড়ীতে ফুটলো যে ফুল
খায় মধু তার ফুলটুকি—

এমন সময় একেবারে এ্যাটম বোমার মত গট্‌-গট্‌ করে এসে হাজির হলেন স্বয়ং যতীন দারোগা। সঙ্গে মাত্র একজন পুলিশ। যেন ক্ষুদ্র ষ্টেশনে অপেক্ষা করছেন তুফান-এক্সপ্রেসের জন্য। থামবে মাত্র এক মিনিট, তারই মধ্যে উঠে পড়তে হবে। এমনি স্মার্ট!

গড়-গড় করে বললেন : **I am extremely sorry Dwijen Babu—**

বাধা দিলাম : কেন?

There is a transfer order by the Government—আপনাকে আবার **Village internment**-এ যেতে হবে, একেবারে মেদিনীপুর, কেশিয়াড়ী থানায়।

বলেই তিনি দীর্ঘ চার পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানা সরকারী হুকুমনামা বার করলেন। ছাপানো ফরম, মাঝে মাঝে ফাঁকগুলো টাইপ করে পূরণ করা। স্বাক্ষর যাঁর পেয়েছিলাম, তাঁর নাম—যত দূর মনে পড়ে গদাধর সিংহ রায়। স্যার জন এ্যাণ্ডারসনের অন্যতম সেক্রেটারী।

ভারী খুশী দেখলাম যতীন দারোগাকে। এতদিন পর তাড়াতে পেরেছেন বিক্রমপুর থেকে দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে। এবার সুনিদ্রা হবে তাঁদের। সুখে ঘরকন্না করতে পারবেন। আমি একটু চিন্তিত হলাম বৈ কি! এতগুলো নেমন্তন্ন পত্র ছাড়া হয়ে গেছে, ষ্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে, বিশেষ ধরণের দৃশ্যগুলোর জন্য বিশেষ সব জানালা ও দরজা ও কারাগার তৈরী করা হয়েছে মুলি বাঁশের বাতা দিয়ে ফ্রেম করে তাতে রঙীন বা সাদা কাগজ সেঁটে। সহর থেকেও দু'-চার জন শিল্পী আসছেন, সঙ্গে আসছেন তাঁদের দু'-চার বন্ধু কংসরূপী দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে দেখতে। সমস্ত আয়োজন শেষ, ঠিক এমনি সময় এসে যতীন দারোগা যেন নিক্ষেপ করলেন হিরোসিমার ওপর এ্যাটম বোমা!…

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে রটে গেল। বিক্ষুব্ধ অন্তর নিয়ে সবাই এসে হাজির হলেন। পাড়ার কাকারা, কাকীমারা, ছেলেরা, মেয়েরা, বছিরদ্দী ও তার সাকরেদের দল, পুব পাড়ার খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জন—গ্রামের অনেকেই। খোকা কোলে করে দেখলাম রেণুও এসেছে, এসেছে সুহাসিনীও।

সাহসে ভর করে রসিক কবিরাজ জিজ্ঞেস করলো : একদিন পরে গেলে হয় না দারোগা বাবু? আমাদের নাটকের এমনি আয়োজন—

না, হয় না। সরকারী হুকুম অমান্য করবার সাধ্য আমার নেই।—সংক্ষেপে সেরে দিলেন দারোগা বাবু।

রঙ্গলাল বললো : কিন্তু সাধারণ নিয়মে বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখবার পর তো ছেড়ে দেয়া হয়।

তা হয়, আমিও জানি। কিন্তু আপনার দাদার ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হলো। কারণ আপনার দাদার ব্যাপার সাধারণ নয়, অসাধারণ।—বলে কাষ্ঠহাসি হাসতে চেষ্টা করলেন তিনি।

বিপদ যুক্তি দেখালো : কিন্তু সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে যে—

মুরুব্বি চালে বললেন দারোগা বাবু : তা সরকারী আদেশের কথা বলে সবার কাছে মাপ চেয়ে নেবেন, তাহলেই হবে।

বোঝা গেল, কোনো উপায় নেই। দেখলাম বাবা ও মা একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সবার সঙ্গে। আমি হেসে বললাম : মা, যাক্‌, কিছু দিনের জন্য বিয়ের অত্যাচার থেকে বাঁচা যাবে।

মা কোনো কথা কইলেন না। কীই-বা আর বলবেন! এত কাল বলে যেখানে কোনো দিন কোনো কথাই থাকেনি, সেখানে মিছে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি? সন্তানবৎসল মা-বাবার কোনো কথাই শুনিনি কোনো দিন, বরং সারাটি জীবন আমাদের কথাই জোর করে চাপিয়ে দিয়েছি তাঁদের ওপর!…

উপায়ান্তর নেই। তাই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। জনসমাবেশ আরো বেড়ে গেছে ততক্ষণে। প্রায় ভিড় বলা চলে। আমার প্রকাণ্ড সুটকেসটি সটান মাথায় তুলে নিয়ে বছিরদ্দী বললো : লন, আমি সুটক্যাসটা থানায় পোছাইয়া দিয়া আসতে আছি।

বললাম : সে কি রে, সে যে প্রায় চার মাইল।

চল্লিশ মাইলেরেও ডরাই না কর্ত্তা! আমাগো যা কইরা থুইয়া গেলেন, খোদাই তা জানে।—বোধ হয় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো ছরদ্দী।

বাবাকে প্রণাম করে যখন মায়ের পায়ে হাত রাখলাম, তখন টপ করে এক ফোঁটা জল আমার কাঁধের ওপর পড়লো। তাই মাথা তুলে আর তাঁর মুখের পানে চাইতে সাহস হলো না। মা কাঁদছেন!

তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে বাড়ীর নীচে নেমে এলাম। অকস্মাৎ দেখি ম্যান্দার বাড়ীর নীচে হিজল গাছটার পাশে একান্তে দাঁড়িয়ে রেণু, কোলে খোকা। কথা কইলাম না, বোধ হয় কইতে পারলাম না। কিন্তু এগিয়ে গিয়েই মনে হলো পা দু'খানা ভারী হয়ে গেছে, আর চলছে না। থমকে দাঁড়ালাম। পেছন ফিরে চেয়ে দেখি দুটি নিষ্পলক কালো চোখ, চোখের সমুদ্রে উদ্বেলিত অতলস্পর্শ মায়ার তরঙ্গ! দু'পা এসে জিজ্ঞেস করলাম : কিছু বলবে আমায়?

মুহূর্ত্ত কাল চুপ করে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো রেণু পাথরের প্রতিমার মত, তার পর পাথরের ঠোঁট দুটি থেকে উৎসারিত হলো দুটি কথা মাত্র : মনে রেখো।

গট্‌-গট্‌ করে এগিয়ে চললাম শ্রীনগর থানার উদ্দেশ্যে। সম্মুখে সুটকেস মাথায় নিয়ে বছিরদ্দী, আর পশ্চাতে এ্যাটম বোমা যতীন দারোগা।

পশ্চাতের অপেক্ষমান জনতার পানে আর ফিরে চাইতে পারলাম না।……

সেদিন ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ সাল। [ক্রমশঃ।
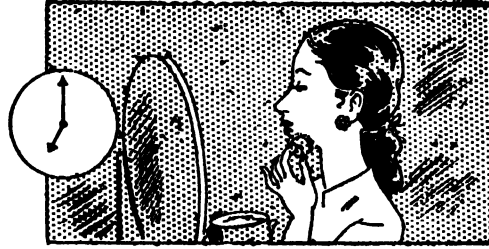
মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র রচিত

ম্যাকবেথ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত

৩য় অংক

১ম দৃশ্য

ফরেস প্রাসাদ।

(ব্যাংকোর প্রবেশ)

ব্যাংকো। এখন তোমার হয়েছে সবই ; রাজা, কডোর সর্দার,
গ্লামিস সর্দার, যা যা বোলেছিল ডাকিনীরা।
মনে হয়, এর তরে খেলিয়াছ অতি ঘৃণ্য খেলা।
তবু তারা বোলেছিল তব বংশে রবে না এ ধারা :
আমি হব সে বংশের মূল, বহু রাজা জন্মিবে যেথায়।
যাদের ভবিষ্যবাণী উদ্ভাসিল তোমার ললাট, ম্যাকবেথ,
তারা যদি সত্য কিছু জানে,
তোমাতে যা প্রত্যক্ষ ফলিল, আমাতে তা
কেন নাহি হইবে সফল পূর্ণ করি নবলব্ধ আশা ?
থাক্, আর নয়।

(তূর্য্যধ্বনি, রাজবেশে ম্যাকবেথ, রাণীর বেশে লেডি ম্যাকবেথ, লেনক্স, রস্, সর্দারগণ, মহিলাবৃন্দ ও পরিচারকগণের প্রবেশ)

ম্যাক্। এই যে এখানে প্রধান অতিথি আমাদের।

লেডি ম্যাক্। ওঁকে যদি ভুলি, মহাত্রুটি হবে নিমন্ত্রণে,
সব দিকে সে যে অশোভন।

ম্যাক্। আজ রাত্রে মদীয় ভবনে
আয়োজন করিয়াছি সান্ধ্যভোজনের,
ভবদীয় উপস্থিতি মোদের প্রার্থনা।

ব্যাংকো। বলুন আদেশ, সে আদেশে বদ্ধ আমি
কর্তব্যের ডোরে চিরতরে অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

ম্যাক্। অপরাহ্নে অশ্বপৃষ্ঠে হবে ত ভ্রমণ ?

ব্যাংকো। ইচ্ছা আছে তাই।

ম্যাক। তা না হোলে, ভেবেছিনু লব তব উপদেশ
দিবসের মন্ত্রণা-সভায় ; জানি সেই উপদেশ
কত মূল্যবান, কত তাহে প্রয়োজন মোর।
থাক্, কাল হবে। যাওয়া হবে বহু দূর ?

ব্যাংকো। এখন হইতে সান্ধ্যভোজনের আগে যতটা সম্ভব।
অশ্ব যদি দ্রুত নাহি চলে, হয়ত হইবে ঋণ
রজনীর পাশে অন্ধকার অর্দ্ধেক প্রহর।

ম্যাক্। ভোজনের পূর্বে আসা চাই।

ব্যাংকো। নিশ্চয় আসিব প্রভু !

ম্যাক্। শুনিতেছি, আমার আত্মীয়দ্বয় নিয়েছে আশ্রয়
ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডে, বীভৎস সে পিতৃহত্যা
করি অস্বীকার, রটাইছে ভিন্ন কথা অদ্ভুত অলীক।
সে কথা হইবে কাল, সাথে সাথে আরও কথা হবে
বিবিধ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে।
এস তবে ; রাত্রে পুনঃ হইবে সাক্ষাৎ।
ফ্লিয়েন্স চলেছে বুঝি সাথে ?

ব্যাংকো। সেও যাবে প্রভু। সময় অধিক নাই।

ম্যাক্। শুভ হোক যাত্রা তব,
অশ্ব যেন চলে দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপে।
বিদায় এখন।

[ব্যাংকোর প্রস্থান।

যতক্ষণ সাতটা না বাজে,
সবারই সময় থাক নিজ নিজ হাতে।
যদি রহি নিঃসঙ্গ এখন, সান্ধ্যভোজনের কালে
সকলের সঙ্গ হবে আরও সুমধুর।
সবার কল্যাণ হোক ঈশ্বর আশিষে।

[ম্যাকবেথ ও একজন পরিচারক ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

এই, শুনে যাও। তারা কি এসেছে ?

পরিচারক। হুজুর, রয়েছে তারা প্রাসাদের দ্বারে।

ম্যাক্। নিয়ে এস হেথা।

[ভৃত্যের প্রস্থান

এভাবে থাকাটা অর্থহীন ; যদি নাহি হই নিরাপদ।
ব্যাংকোর আশংকা মোর মর্মে আছে বিঁধে।
মহৎ স্বভাবে তার কি যেন বিরাজে
স্বতঃ হয় ভয়ের উদ্রেক। প্রচুর সাহস
আর নির্ভীক অন্তর চলে নিরাপৎ পথে
বুদ্ধির সতর্ক প্রহরায়। তারে ছাড়া কারেও না ডরি।
তারি শক্তিতলে দৈব মোর নিয়ত ধিক্কৃত
সিজারের পাশে মার্ক এ্যান্টনির প্রায়।
সেদিন যেমনি ভগ্নীত্রয় রাজা বলি সম্বোধিল মোরে,
তীব্র কণ্ঠে করিল আদেশ কহিতে তাহারও ভবিষ্যৎ।
দৈবজ্ঞের সম তারা সম্বোধিল তারে
বহু রাজন্যের আদি পিতা বলি।
মোর শিরে পরাইল নিষ্ফলা মুকুট,
হাতে তুলে দিল মোর বন্ধ্যা রাজদণ্ড
ছিন্ন করি লবে যাহা ভিন্নগোত্রী কর ;
আমার সন্তান কেহ হইবে না রাজা।
তাই যদি হয়,
ব্যাংকোর অপত্য লাগি কলংকিত করিনু অন্তর,
তারি তরে, হত্যা করিলাম আমি মহৎ ড্যানকানে ?
শুধু তাহাদেরি তরে
বিষাইনু অন্তরের শান্তির কটোরা,
বিকানু শাশ্বত মণি মানুষের চিরশত্রু
শয়তানের পায়, তাদের করিতে রাজা—
ব্যাংকো বংশধরে ?
তার চেয়ে, এস দৈব, এস নেমে দ্বৈরথ সমরে,
হোয়ে যাক্ তোমায় আমায় আজ শেষ বোঝাপড়া !
কে ওখানে ?

(দুই জন ঘাতক সহ পরিচারকের পুনঃ প্রবেশ)

দ্বারপাশে দাঁড়াও বাহিরে ; যতক্ষণ নাহি ডাকি
থাকিবে সেখানে। [পরিচারকের প্রস্থান।

কাল নয়? আমাদের হোল সব কথা?
১ম ঘাতক। কালই প্রভু।
ম্যাক। বেশ, ভেবে কি দেখেছ সব যা কহিনু আমি?
জেনে রেখো,—তোমাদের যত ক্ষতি ঘটিল অতীতে
সকলের মূলে ছিল সে; আমি নই।
বিগত সাক্ষাতে আমি তন্ন তন্ন দিয়েছি বুঝায়ে,
নিঃসংশয়ে কোরেছি প্রমাণ, কিভাবে সে
করিল ছলনা, কেমনে করিল পণ্ড তোমাদের আশা,
কে কে ছিল গূঢ় সেই অভিসন্ধিমূলে।
আরও যা যা বলিলাম শুনিলে সে সব
ছন্নমতি নির্বোধেও বলিবে তখনি—
এ কাজ ব্যাংকোর।
১ম ঘা। সে সকলি দিলেন বুঝায়ে।
ম্যাক। সে সকলি দিয়েছি বুঝায়ে, আরও কিছু বুঝায়েছি,
তারি তরে ডেকেছি আবার।
ধৈর্য্য কি এতই বেশী তোমাদের বুকে
অত ব্যথা সব যাবে ভুলে? তোমরা কি
এত ধর্মভীরু, রূঢ় হস্তে যে নামাল কবরের তলে,
ভিক্ষাঝুলি দিল তুলি সন্তানের কাঁধে,
সেই মহাত্মার শুভ, তারি সন্ততির শুভ
মাগিবে ঈশ্বর পাশে জুড়ি দুটি কর?
১ম ঘা। আমরা মানুষই প্রভু।
ম্যাক। হুঁউ, মানুষের তালিকায় আছে বটে নাম;
নেড়ি গোড়ে ডালকুত্তা সবই যথা কুত্তানামধেয়।
তবে মাঝে আছে শ্রেণীভেদ; কেহ ক্ষিপ্র;
কেহ বা অলস, কেহ রক্ষী, বুদ্ধিমান, কেহ বা
শিকারী। যে গুণ দিয়েছে যারে অকৃপণা প্রকৃতিসুন্দরী
সে গুণে সে গুণী; নামে এক গুণে ভিন্ন।
মানুষেরও তাই। বেশ, তালিকায় যোগ্য স্থানে
থাকে যদি নাম, যদি নাহি নেমে থাকো
মানুষের নিকৃষ্ট পর্য্যায়ে, বল মোরে,
হেন ব্রত দিব তোমাদের, শত্রু যাহে হইবে নিপাত,
পাবে যাহে আমাদের বুকভরা প্রীতি,
যাহার জীবনে মোরা চির স্বাস্থ্যহারা
মৃত্যু তার স্বস্তি দিবে আনি।
২য় ঘা। মহারাজ, এ পাপজগৎ যাহাদের
দিল শুধু আঘাতের উপর আঘাত,
আমি তারি এক জনা; আজ আমি সে আঘাত
বেপরোয়া দিতে চাই ফিরে।
১ম ঘা। আমিও আর এক হতভাগা,
দুর্দশার উপর দুর্দশা
অবসন্ন করিয়াছে অদৃষ্টের সহ মল্লরণে
যে কোন সুযোগে আজ
ভাগ্য ফিরাইব, কিম্বা দিব প্রাণ।
ম্যাক। ব্যাংকোই যে শত্রু সেটা বুঝেছ দু'জনে?
উভয়। বুঝিয়াছি প্রভু।
ম্যাক। আমারও সে শত্রু, আর এত সাংঘাতিক
সান্নিধ্যে সে আছে, যে কোন মুহূর্ত্তে তার
শাণিত জীবন হানিবে মরণ মোর প্রাণমর্ম্মমূলে।
আপনার নগ্ন শক্তিবলে পারি তারে সরাইতে
এ ধরণী হোতে, অনুকূলে সুযুক্তিও আছে,
কিন্তু তাহা করিব না। আমাদের উভয়েরই
মিত্র আছে যারা, হারাতে চাহি না আমি
সম্প্রীতি তাদের, নিপাতের মূলে রহি নিজে,
চাহি আমি তারি শোকে হইতে কাতর।
তাই আজি তোমাদের করেছি শরণ,
রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিবিধ কারণ আরও
লোকচক্ষু অন্তরালে সারিতে এ কাজ।
২য় ঘা। যে আদেশ করিবেন নিশ্চয় পালিব মহারাজ।
১ম ঘা। যদিও মোদের প্রাণ—
ম্যাক। তোমাদের মর্মকথা চোখে মুখে হতেছে প্রকাশ।
এখনই দিতেছি উপদেশ, কোন্‌খানে রহিবে লুকায়ে,
কোথায় কখন তারে পাবে; আজই রাত্রে
হওয়া চাই কাজ, প্রাসাদ হইতে কিছু দূরে;
মনে রেখো মোর 'পরে না পড়ে সন্দেহ।
ফ্লিয়েন্স, অপত্য তার, আছে সাথে সাথী,
এ কাজের বাধা ত্রুটি করিতে নিঃশেষ
তারেও পাঠাতে হবে অন্তিম আঁধারে;
পিতাপুত্র উভয়েরই চাই উৎসাদন।
কর মনস্থির, এখনই আসিব পুনঃ।
উভয় ঘা। মনস্থির করেছি আমরা।
ম্যাক। বেশ, এখনই করিব দেখা, যাও অন্তরালে।

[ঘাতকদ্বয়ের প্রস্থান।

ব্যবস্থা ত শেষ। ব্যাংকো, আত্মা তব যদি স্বর্গ চাহে
আজই রাত্রে স্বর্গই সে পাবে।

[প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

(লেডি ম্যাকবেথ ও একজন ভৃত্য)

লেডি ম্যাক। ব্যাংকো কি গেলেন চলি রাজসভা হ'তে?
ভৃত্য। গিয়েছেন মাতা, রাত্রে পুনঃ আসিবেন ফিরে।
লেডি ম্যাক। রাজাকে সংবাদ দাও, অবকাশ হয় যদি
কিছু কথা আছে।
ভৃত্য। চলিলাম আমি।
লেডি ম্যাক। নিঃশেষ হইল পুঁজি, ফল হোল ফাঁকি,
আকাঙ্ক্ষা পুরিল, পেনু শান্তির দেখা কি?
হত্যা কোরে ভয়ে ভয়ে বহা সুখভার,—
তা হ'তে যে হত হয় ভাগ্য ভাল তার।

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

কি ব্যাপার প্রভু? কেন থাক একা একা
দুঃখকর কল্পনারে নিত্যসাথী করি,
চিত্ত ভরি যত দুশ্চিন্তায়?

যাদের হোয়েছে শেষ, শেষ হোক চিন্তাও তাদের।
অপ্রতিবিধেয় যাহা ভেবো'না সে কথা।
হ'য়েছে যা হ'য়ে গেছে।

ম্যাক। আহত কোরেছি সর্পে, মারিতে পারিনি;
পুনরায় হ'য়ে উজ্জীবিত, মোদের আশার শিরে
বিষদন্ত পারে সে ফুটাতে। ভয়ে ভয়ে
মুখে তুলি গ্রাস, ঘুমালে কাঁপিয়া উঠি
প্রতি রজনীতে বিকট দুঃস্বপ্নঘোরে।
এর চেয়ে, ছিন্ন হোক জগৎ শৃংখলা,
ঘুচে যাক ইহ-পরকাল।
অন্তরের দুর্বিষহ কণ্টকশয়নে শুয়ে ছটফট করা,
এ হোতে যে হোত ভাল সে-সব মৃতের সাথী হোলে,
আপনি লভিতে শান্তি, যাদের পাঠানু শান্তিধামে।
সমাধি-শায়িত ডানকান্; জীবনের
জ্বরজ্বালা অবসানে অঘোরে ঘুমায়;
বিশ্বাসহন্তার অস্ত্র নিঃশেষে ফুরাল;
না অসি না বিষ, ঘরের বিদ্বেষ কিম্বা
পররাষ্ট্রসেনা কিছু তারে স্পর্শিবারে নারে।

লেডি ম্যাক। ধৈর্য্য ধর প্রিয়, মুছে ফেল মুখভাব চিন্তায় কুটিল।
সুপ্রসন্ন সমুজ্জ্বল মুখে ভেটিতে হইবে রাত্রে
অভ্যাগতগণে।

ম্যাক। তাই হবে প্রিয়তমে, তুমিও তেমনি হবে
মিনতি আমার। বিশেষ ব্যাংকোরে
কোরো বহু সমাদর। চোখে মুখে দেবে তারে
অশেষ সম্মান। যত দিন
এইরূপ চাটুতার স্রোতে প্রক্ষালিতে হবে
নিজ পদের মর্য্যাদা, তত দিন নহি নিরাপদ।
মুখ হবে বুকের মুখোস, গোপন করিতে
নিজ অন্তরের কথা।

লেডি ম্যাক। ত্যাগ কর ওই চিন্তা।

ম্যাক। ওগো, চিত্ত মোর ভরিল যে অজস্র বৃশ্চিকে, প্রিয়তমে!
তুমি জান—ব্যাংকো আর ফ্লিয়েন্স জীবিত।

লেডি ম্যাক। তারা ত মৌরসী পাট্টা পায়নি জীবনে।

ম্যাক। সেই যা সান্ত্বনা; তারাও নশ্বর।
আনন্দ কর গো তবে প্রিয়া!
বাদুড় ছাড়িবে যবে আঁধার খিলান
ঘুরে ঘুরে পক্ষ ঝাপটিয়া,—তারও আগে,
মসীকৃষ্ণা ভৈরবী-আহ্বানে তন্দ্রাময় ঝিল্লীনাদে
শর্ব্বরীর ধ্বনিবে গুঞ্জন,—তারও পূর্বে,
ঘটিবে ঘটনা ভয়ংকর!

লেডি ম্যাক। কি ঘটিবে?

ম্যাক। সে কথা এখন থাক্ প্রেয়সি আমার;
কার্য্য-অন্তে দিও সাধুবাদ। এস রাত্রি অন্ধকরী,
অঞ্চলে আবরি দাও দরদী দিনের সকরুণ
দৃষ্টিভরা আঁখি; রক্তাক্ত অদৃশ্য করে মুছে ফেল,
ছিঁড়ে কুচি কুচি কর, সে অমোঘ চুক্তিপত্র
যার ভয়ে সদাভীত আমি। গাঢ় হ'য়ে আসে আলো;
উড়ে চলে কাক কা-কা-ধ্বনি-মুখরিত বনে।
দিনের কল্যাণ যত ঢুলে তন্দ্রাভরে,
রজনীর কালো দূতগুলো জেগে উঠে শিকার-সন্ধানে।
বিস্মিত হোতেছ তুমি মোর কথা শুনি,
ধৈর্য্য ধর চিতে,
অন্যায়ে জনম যার জেনো পুষ্টি তার
অন্যায় হইতে।
রাখ কথা, এস মোর সাথে। [প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য

প্রাসাদের সন্নিকটস্থ উদ্যান

(৩ জন ঘাতকের প্রবেশ)

১ম ঘা। কিন্তু, কে তোমা বলিল যোগ দিতে আমাদের সাথে?

৩য় ঘা। ম্যাকবেথ।

২য় ঘা। ও যখন আমাদের সব কথা জানে,
ঠিক ঠিক বলিতেছে সকল নির্দেশ,
অবিশ্বাস কি হেতু করিব?

১ম ঘা। তবে থাক আমাদের পাশে।
পশ্চিমে এখনও ঝলে দিবসের শেষ রশ্মিছটা।
বিলম্ব হ'তেছে বুঝি' দূরের পথিক
কশাঘাতে দ্রুত যাত্রীশালা পানে;
মোদের বাঞ্ছিত জন হ'তেছে নিকট।

৩য় ঘা। ওই শোন, পাইতেছি ঘোড়ার আওয়াজ।

ব্যাংকো। (নেপথ্যে) এই, এদিকেতে আলো চাই মোরা।

২য় ঘা। তবে সেই বটে; বাকি যত নিমন্ত্রিত
এতক্ষণ পশিয়াছে রাজসভাগৃহে।

১ম ঘা। ঘোড়া ছেড়ে দিল নাকি?

৩য় ঘা। তাই রীতি; প্রাসাদের দ্বার হ'তে অর্দ্ধক্রোশ দূর
ঘোড়া ছেড়ে পদব্রজে যাওয়া।

২য় ঘা। ওই, ওই, আলো দেখা যায়!

(মশাল সহ ব্যাংকো ও ফ্লিয়েন্সের প্রবেশ)

৩য় ঘা। সেই বটে।

১ম ঘা। ঠিক থাকো।

ব্যাংকো। আজ রাত্রে বৃষ্টি হবে।

১ম ঘা। হোক্ না এখনি।

(সকলে মিলিয়া ব্যাংকোকে আক্রমণ)

ব্যাংকো। ওঃ হোঃ! কৃতঘ্নতা!
পলাও ফ্লিয়েন্স, বৎস, পলাও পলাও!
পার যদি নিও প্রতিশোধ। ওরে নরাধম! [মৃত্যু]
[ফ্লিয়েন্সের পলায়ন।

৩য় ঘা। কে নেবালো আলো?

১ম ঘা। তাই কি ছিল না কথা?

৩য় ঘা। একটা পড়েছে শুধু; ছেলেটা পলাল।

২য় ঘা। কাজের আসলটুকু হোল না সাধন।

১ম ঘা। চল, যা হয়েছে তাই ব'লে আসি। [প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য

প্রাসাদের ভোজনকক্ষ—ভোজ্য প্রস্তুত।

(ম্যাকবেথ, লেডি ম্যাকবেথ, রস, লেনক্স, লর্ডগণ ও পরিচারকগণ)

ম্যাক। যথাযোগ্য আসনেতে বসুন সকলে।
জনে জনে স্বাগত জানাই।
লর্ডগণ। ধন্যবাদ করুন গ্রহণ।
ম্যাক। সকলের সাথে আজ মিলিয়া মিশিয়া
ধন্য হব অতিথি সংকারে। নিমন্ত্রণ-সভাস্থলে
গৃহকর্ত্রী আজি গৌরব-আসনে সমাসীনা,
সময়ে পাইব তাঁর হৃদ্য সম্ভাষণ।
লেডি ম্যাক। এখনি জানান যাবে মম সম্ভাষণ,
অন্তর বলিছে মোর—সবাই স্বাগত।
(১ম ঘাতক দ্বারদেশে উপনীত)
ম্যাক। দেখি, হৃদয়ের ধন্যবাদ লহ সবাকার।
দু'পাশে বসেছ সবে সমান সংখ্যায়,
মাঝের আসনে আমি বসিব এখনি।
সকলে আনন্দ কর; পানপাত্র হাতে হাতে
চলিবে ঘুরিয়া। [দ্বারের নিকট গিয়া]
মুখে যে রক্তের দাগ।
ঘাতক। তা হোলে ব্যাংকোর রক্ত।
ম্যাক। সে না এসে তুমি এলে, এই মোর ভালো।
শেষ কোরেছ ত তারে?
ঘাতক। প্রভু, নিজ হাতে গলে তার বসায়েছি ছুরি।
ম্যাক। গলাকাটাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ তবে তুমি।
যে করেছে সেই কাজ ফ্লিয়েন্সের প্রতি
সেও কম নয়। তুমি যদি কোরে থাক,—
তুলনারহিত।
ঘাতক। কি বলিব মহারাজ, ফ্লিয়েন্স করেছে পলায়ন।
ম্যাক। তবে দেখি ফুরাল না দুর্ভোগ আমার।
ভেবেছিনু নিশ্চিন্ত হইব; স্নিগ্ধ হবো শিলাসম।
পাহাড়ের মতো দৃঢ়মূল, বায়ুর মতন
চির-উন্মুক্ত স্বাধীন। তা না হয়ে রহিলাম
ভয়ে ও সংশয়ে ক্ষুব্ধ বদ্ধ অবরুদ্ধ সংকীর্ণ কোটরে।
যাক, ব্যাংকোর ত শেষ?
ঘাতক। সুগভীর বিংশতি আঘাত-ক্ষত শিরে
পড়ে আছে গর্তের ভিতর; প্রাণ নিতে
যথেষ্ট হইত তার একটা আঘাতই।
ম্যাক। সেজন্য দিতেছি ধন্যবাদ। বিষধর সর্প সেথা
ধূলায় লুটায়। সর্পশিশু গিয়েছে পলায়ে;
সময়ে জন্মাবে তারও বিষ, কিন্তু সে
এখনও দন্তহীন। যাও তবে, কাল হবে
আমাদের অন্য সব কথা।
[ঘাতকের প্রস্থান।
লেডি ম্যাক। প্রভু, রাজ্যেশ্বর, কেন নাহি উচ্চারিছ উৎসাহের বাণী?
আপন আনন্দ দিয়ে নিমন্ত্রিতে না যদি নন্দিসে
নিমন্ত্রণ হবে তবে উদরপূরণ তুচ্ছ অর্থবিনিময়ে।
ভোজন ঘরেই শ্রেয়; নিমন্ত্রণ মিষ্ট হয় সাদর আহ্বানে।
ম্যাক। স্মরণ করায়ে দিয়ে করিলে বাধিত।
এবার আরম্ভ হোক্, ক্ষুধাযোগে পরিপাক
হয় যেন সহজ সরল।
লেনক্স। মহারাজ, বসুন আপনি।
[ব্যাংকোর প্রেত আসিয়া ম্যাকবেথের আসনে বসিল]
ম্যাক। বক্ষে ধরি দেশের সকল মান্য জনে
ধন্য আজি হইত এ গৃহ, শুধু যদি
ব্যাংকো হইতেন উপস্থিত। আশা করি
অবহেলা ইহার কারণ, দুর্ঘটনা ঘটে নাই কোন।
রস। কথা দিয়ে সে কথা না রাখা, দোষ ত তাঁহারই।
মহারাজ, ভবদীয় সঙ্গদানে করুন কৃতার্থ।
ম্যাক। পূর্ণ দেখি সমস্ত আসন।
লেনক্স। আসন রয়েছে শূন্য আপনার তরে।
ম্যাক। কোথায়?
লেনক্স। এই যে এখানে! মহারাজে কেন হেরি
চঞ্চল অমন?
ম্যাক। কে কোরেছে এই কাজ?
লর্ডগণ। কোন্ কাজ প্রভু?
ম্যাক। তুই কি বলিতে চাস্ আমি করিয়াছি?
কেন তবে ঝাঁকারিস মোর পানে চেয়ে
রুধিরমর্দিত ওই জটাবদ্ধ কেশ?
রস। আসন ছাড়িয়া সবে উঠুন ত্বরিতে,
মহারাজে সুস্থ নাহি হেরি।
লেডি ম্যাক। বন্ধুগণ, বসুন সকলে। স্বামী মোর মাঝে মাঝে
হন এই মতো বাল্যকাল হোতে।
মিনতি আমার, আসনে বসুন সবে।
এ রোগ ক্ষণিক, এখনই যাইবে কেটে।
যদি বেশী মনোযোগ দেন আপনারা
বিরাগ বাড়িবে তাঁর, বৃদ্ধি পাবে ব্যাধি।
ভোজন করুন সবে তাঁহারে ভুলিয়া।
তুমি কি পুরুষ?
ম্যাক। নিশ্চয় নহিক কাপুরুষ; তাহলে চাহিতে পারি
ওই মূর্তিপানে, যারে দেখি তৃষমন্ ডরায়?
লেডি ম্যাক। চমৎকার কথা! ও তব মানসছবি আতংক-অংকিত,
যেমন বলিয়াছিলে—বাতাসের আঁকা ছোরা
নিয়ে গেল ডানকানের পানে। মিথ্যা ভয়ে অকস্মাৎ
চিত্তের বিকার, এ যেন শীতের রাতে
আগুন পোহাতে দিদিমার মুখে শোনা জুজুবুড়ি নিয়ে
মেয়েদের গল্পের আসর! ধিক্ তোমা!
মুখের বিকৃত ভঙ্গী করিছ কি হেতু?
বুঝে দেখ, চেয়ে আছ শূন্য কাষ্ঠাসনে।
ম্যাক। দয়া কোরে তাকাও ওখানে! দেখ, দেখ, ওই দেখ;
কী বলিতে চাস্? কেন? তোরে কিসের পরোয়া?

মাথা ত নাড়িস্ দেখি, কথা ক'য়ে বল।
সমাধি কংকালশালা ফিরায়ে পাঠায় যদি
যত শবদেহ, শকুনিজঠরই ভাল মরণের পারে।
[প্রেতের অন্তর্দ্ধান]

লেডি ম্যাক। মিথ্যা ভয়ে একেবারে হ'লে অমানুষ!
ম্যাক। আমি আছি যদি সত্য হয়, দেখিয়াছি তারে।
লেডি ম্যাক। ছিঃ, ছিঃ, ধিক্ তোমা!
ম্যাক। পুরাকালে হয়ে গেছে বহু রক্তপাত,
তখন ছিল না বিধি-নিষেধের বাধা ;
তার পরে কত না বীভৎস হত্যা হ'ল সংঘটিত ;
জানা ছিল সর্বকাল,—কঠিন আঘাতে যদি
বাহিরিয়া পড়ে, খুলি ফেটে মাথার মগজ একবার,
মৃত্যু ঘটে, সাথে সাথে সব হয় শেষ।
আজ দেখি তারা সব উঠে এসে ফিরে
বিংশতি হত্যার চিহ্ন ধরিয়া মাথায়
চেপে বসে মোদের আসনে!
হত্যা হ'তে এ যে আরও বেশী বিস্ময়ের।
লেডি ম্যাক। মহারাজ, আপনার অভাবে বিমর্ষ বন্ধুগণ।
ম্যাক। আমারি বিস্মৃতি। প্রিয় বন্ধুগণ, মোর কার্য্যে
হয়ো না বিস্মিত ; এ এক অদ্ভুত রোগ,
আত্মীয়েরা জানে—কিছু নয়। এস, ধর প্রীতি,
লভ' স্বাস্থ্য ; এবার বসিব আমি।
দাও সুরা পানপাত্র ভরি'।
[প্রেতের পুনরাবির্ভাব]
সমাগত সকলের আনন্দ কারণ, করি আমি পান ;
ব্যাংকোরে পাইনি মোরা, তাঁহারও আনন্দ হোক্ ;
কি যে স্বস্তি দিত আজি তাঁর উপস্থিতি।
সকলের নামে আর ব্যাংকোরে স্মরিয়া
পাত্র তুলি মুখে, সর্বসুখ হোক্ সকলের।
লর্ডগণ। আমরাও স্মরিতেছি রাজ আনুগত্য আর
কর্তব্য মোদের।
ম্যাক। দূর হ'! চ'লে যা সম্মুখ হ'তে!
ফিরে যা মাটীর নীচে!
মজ্জাহীন অস্থি তোর, রক্ত তোর হিম,
মেলিয়া আছিস চোখ, চাহনি কোথায়?
লেডি ম্যাক। সজ্জন অতিথিবৃন্দ, দেখিছেন যাহা
রোগের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়।
আনন্দে পড়িছে শুধু সাময়িক বাধা।
ম্যাক। মানুষে যা পারে আমি পারি।
আয় তুই মেরুবাসী রুক্ষ ঋক্ষবেশে,
কিম্বা আয় বর্মধারী গণ্ডার হইয়া,
অথবা ইরানদেশী হিংস্র ব্যাঘ্ররূপে ;
ওই মূর্তি ছাড়া, যে রূপে দিবি রে দেখা
এই দৃঢ় স্নায়ুতন্ত্রী হবে না কম্পিত।
কিম্বা আয় পুনরায় হ'য়ে প্রাণবান্
অসিহস্তে চল যাই নির্জন প্রান্তরে দুই জনে,
তাহে যদি ভয়ে মোর অঙ্গে জাগে রোমাঞ্চ শিহর,
দুধের বালিকা ব'লে সম্বোধিস্ মোরে।
দূর হ বীভৎস ছায়া! দূর হ' রে অলীক মায়াবী!
[প্রেতের অন্তর্দ্ধান]
এই বার চ'লে গেছে, আবার মানুষ আমি।
দয়া কোরে স্থির হ'য়ে বসুন সবাই।
লেডি ম্যাক। আনন্দে ঠেলিয়া দূরে, আনিয়া বিস্ময়কর
যত বিশৃংখলা, ভেঙে দিলে হেন সম্মেলন।
ম্যাক। এও কি সম্ভব, তুচ্ছ করা যায় তারে
শরতের মেঘচ্ছায়া সম? নিজের প্রকৃতি
নিজে চিনিতে না পারি ভাবি যবে তোমার সাহস,
যে দৃশ্যে কপোল তব রহিল অম্লান,
মোর গণ্ড পাংশু-পাণ্ডু হ'য়ে গেল ভয়ে!
রস। কোন্ দৃশ্য প্রভু?
লেডি ম্যাক। আর কোন কথা নয়, মিনতি আমার ;
ক্রমেই বাড়িছে দেখি ব্যাধির প্রকোপ ;
প্রশ্নে শুধু ক্রোধ বাড়ে। বিদায় এখন।
কোন প্রয়োজন নাই মর্য্যাদানুযায়ী নিষ্ক্রমণে,
সবাই পারেন যেতে একত্রে এখনই।
লেনক্স। শুভরাত্রি, সুস্থ হোন মহারাজ।
লেডি ম্যাক। সকলের শুভরাত্রি করি নিবেদন।
[ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ ভিন্ন সকলের প্রস্থান
ম্যাক্। লোকে বলে—রক্ত সে নেবেই ; রক্তে রক্ত টানে।
শুনেছি পাথরও নড়ে, গাছে কথা কয়,
গণকেরা লক্ষ্য করি ছাতার কি কাকের চরিত্র
গুণে ব'লে দেয়—কে কোথা লুকাল রক্ত
অতি সংগোপনে। রাত কত?
লেডি ম্যাক। ভোর হ'তে দেরী নেই আর।
ম্যাক। ম্যাকডফ নিমন্ত্রণে নাহি দিল যোগ।
তোমার কি মনে হয়?
লেডি ম্যাক। তার কাছে লোক গিয়েছিল?
ম্যাক। শুনেছিনু আসিবে না ; এবার পাঠাব লোক।
হেন গৃহ নাই যেথা নাহি মোর অর্থপুষ্ট চর।
কালই এর করিব বিধান, এরই মাঝে
যেতে হবে ভাগ্যবিধায়িনী সেই ডাকিনীত্রয়ী পাশে।
খুলিয়া বলিবে তারা সব, সংকল্প কোরেছি মনে
চরম উপায়ে জানিব এ দুর্ভাগ্যের শেষ পরিণতি।
আমার ভালোর তরে অন্য যত ভালো
ভেসে যায় যাক্। নামিয়াছি বহু দূর রুধির-নদীতে,
আরও নেমে যেতে হবে, উঠে যাওয়া সমানই কঠিন।
অদ্ভুত সংকল্প সব আসিছে মাথায়,
সাধন করিয়া পরে বিচারিব তায়।
লেডি ম্যাক। ঘুমের অভাবই যত অনর্থের মূল।
ম্যাক। চল, ঘুমাইগে যাই, যত ভ্রান্তি মোর
নিতান্ত বালকোচিত মিথ্যা মায়াঘোর।
কাজে আজও দক্ষ নহি মোরা। [প্রস্থান।

৫ম দৃশ্য

ডাকিনীগণ ও হেকেট

প্রক্ষিপ্ত ও অপ্রয়োজনীয় বোধে বাদ দেওয়া হইল।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

ফরেস প্রাসাদ।

(লেনক্স ও একজন লর্ডের প্রবেশ)

লেনক্স। পূর্বে যা ব'লেছি তাহে ছিল তব চিন্তার খোরাক।
এখন বলিতে পারি—অদ্ভুত উপায়ে সব যেতেছে ঘটিয়া।
ম্যাকবেথ ডানকানে কত প্রীতি আহা,
সে ডানকান হইল নিহত। বীর ব্যাংকো
রাত করে চ'লেছিল পথে; আপত্তি না থাকে যদি
পারেন বলিতে—ফ্লিয়েন্সই ক'রেছে তারে বধ,
কেন না ফ্লিয়েন্স পলায়িত। রাত কোরে পথ চলা
ভাল নয় কভু। কে না বুঝে মনে মনে
কত বড় দুর্বৃত্ত ম্যালকম্ ডোনালবেন,
অমন বাপেরে হত্যা করে অনায়াসে।
জঘন্য ব্যাপার! ম্যাকবেথের সে কী শোক!
অধীর হইয়া সেই শোকপূত ক্রোধে
পানমত্ত নিদ্রাসক্ত পাপিষ্ঠ দুজনে
তখনই বধিল প্রাণে! মহত্ত্ব উঠিল ফুটি।
শুধু তাই? কি বিচক্ষণতা! পাপিষ্ঠেরা বেঁচে থেকে
সেই পাপ যদ্যপি করিত অস্বীকার,
কে আছে এমন লোক ধৈরয ধরিত?
তাই বলিতেছি, সব তিনি করেছেন পরিপাটীরূপে।
ভগবান না করুন, ডানকানের পুত্র যদি
কারাগ্রস্ত হ'ত, পিতৃহত্যা কারে বলে
দিতেন সমঝায়ে; ফ্লিয়েন্সেরও অনুরূপ
ঘটিত কপালে। কিন্তু থাক্! শুনিতেছি
স্পষ্ট কথা ব'লে, আর নিমন্ত্রণে না আসার হেতু,
ম্যাকডফ প'ড়েছে বিষম রাজরোষে।
জানেন কি এখন কোথায় ম্যাকডফ?

লর্ড। ডানকানের পুত্র, যাঁর জন্ম-অধিকার
ভোগ করিতেছে এই দুঃশাসক রাজা,
তিনি ইংলণ্ডে এখন। ধর্মপ্রাণ এডোয়ার্ড
ইংলণ্ডাধিপতি অতি যত্নে সসম্মানে
রেখেছেন তাঁরে না গণিয়া ভাগ্যবিড়ম্বনা।
সেখানে গেছেন ম্যাকডফ, ধর্মাত্মা রাজার পাশে
করিতে প্রার্থনা, উত্তরসীমান্তপতি সহ
যুদ্ধপ্রিয় স্যুয়ার্ডের সহায়তা তরে।
তা হ'লে হইতে পারে কোন সদুপায়,
উপরে আছেন যিনি তাঁর ইচ্ছাক্রমে?
আবার জুটিতে পারে পাত্র ভরি অন্ন আমাদের,
রাত্রি ভরি সুখনিদ্রা, আবার ঘুচিতে পারে
ভোজন-উৎসব মাঝে রক্তমাখা ছুরি;
ফিরিয়া আসিতে পারে অকৃত্রিম রাজভক্তি
সসম্মান প্রজাবৎসলতা, যে সবের লাগি চিত্ত
তৃষ্ণার্ত অধীর। পাইয়া এসব বার্তা অতি ক্রোধভরে
যুদ্ধসজ্জা করিছেন নৃপতি মোদের।

লেনক্স। ম্যাকডফের কাছে তাঁর দূত গিয়েছিল?

লর্ড। গিয়েছিল; জবাব মিলিল যবে সোজাসুজি 'না,'
রুষ্ট দূত ফিরে এল করিয়া ইঙ্গিত
এর তরে অনুতপ্ত হ'তে হবে পরে।

লেনক্স। এ হ'তে সতর্ক তিনি হ'লেন নিশ্চয়,
স্থির করিলেন কিছু দূরে দূরে থাকা।
আহা, কোন দেবদূত আগে আগে গিয়ে
জানাক ইংলণ্ডেশ্বরে ম্যাকডফের প্রাণের আকুতি;
দুর্বৃত্তের হস্ত হ'তে এ দুর্ভাগা দেশ
অচিরে লভুক পরিত্রাণ।

লর্ড। আমারও প্রার্থনা তাই।

[প্রস্থান।

৪র্থ অংক

১ম দৃশ্য

একটি গুহা, মধ্যস্থলে ফুটন্ত কটাহ; বজ্রধ্বনি।

(তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ)

১ম ডা। তিন বার ডেকে গেল চিতেবেড়ালী।

২য় ডা। চার বার সজারুটা কোরে গেল কাঁদাকাটা;

৩য় ডা। হাড়গিলে চিক্‌রুলো;
সময় হ'য়েছে তবে সময় হ'লো।

১ম ডা। খোলা ঘিরে ঘুরে চল চল্‌লো ঘুরে;
বিষে ভরা নাড়ীভুঁড়ি দেনা লো ছুঁড়ে।
ঠাণ্ডা পাথর-চাপা ব্যাংটা কি লো
দেড় কুড়ি এক রাত ঘমুচ্ছিল?
ঘেমে উঠে বিষ ঢালে গায়েব জ্বালায়,
ওই ব্যাং ফুটিয়ে নে ডাইনি-গোলায়।

সকলে। দুনো দুনো মেহনৎ কষ্ট কোরে,
আঁচে আঁচে ফুট্ নাচে কড়াই ভ'রে।

২য় ডা। জলঢোঁড়া সাপটার টুকরো কটা
সেঁকতে সিজুতে হবে গোলায় ওঠা;
গোসাপের চোখ আর ব্যাংএর আঙ্গুল,
কুত্তোর নোলা আর বাদুড়ের চুল,
কেউটের চেরা জিভ, পুঁয়েটার হুল,
গিরগিটি ঠ্যাঙেতে
প্যাঁচার পাখনা দে,
মরণের পাকতেল বিষিয়ে উঠুক,
জাহান্নমের ক্বাথ ফেনিয়ে ফুটুক্।

সকলে। দুনো দুনো মেহনৎ কষ্ট কোরে
আঁচে আঁচে ফুট নাচে কড়াই ভ'রে।

৩য় ডা। ড্রাগনের আঁশ আর নেকড়ের দাঁত,
ডাইনির শুঁটো মাস হাঙরের আঁত,

আঁধারে পাঁদারে তোলা বিষমূল বেঁটে
মিশিয়ে নে নচ্ছার ইহুদীর মেটে,
তুর্কীর নাক আর তাতারীর ঠোঁট—
পাঁঠার পিত্তি দিয়ে ভাল কোরে ঘোঁট,
মরুঘাটি পারে ব'সে গেরণের রাতে
কুচোনো সিজের ডগা মিশিয়ে দে তাতে,
খানায় বিইয়ে গ্রাসা সর্ব্বনাশী
ছেলের গলায় নিজে লাগা'ল ফাঁসি,
সেই মরা ছেলেটার আঙুল যে চাই
তবে ত ক্বাথটা হবে গড়গড়ে ভাই!
আস্ত বাঘের ভুঁড়ি মিশিয়ে দে তায়,
দাওয়াইটা হবে তবে পুরো মাত্রায়!

সকলে। দুনো দুনো মেহনৎ কষ্ট কোরে
আঁচে আঁচে ফুট নাচে কড়াই ভ'রে।

২য় ডা। ঠাণ্ডা কোরে নে দিয়ে বাঁদরের রক্ত,
তা হ'লেই ওষুধটা হবে পাকাপোক্ত।
বুড়ো আঙুল কনকনিয়ে
কুলোক এল দেয় জানিয়ে;
সেই দিক্ না ঘা,
দুয়োর খুলে যা!

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

ম্যাক। কি সংবাদ, কি করিছ হেথা
নিশীথের গুপ্তগৃহে কৃষ্ণ প্রেতিনীরা?

সকলে। এ কাজের নাম নেই।

ম্যাক। দিতেছি দোহাই তোমাদের, যে অজ্ঞাত শক্তিবলে
সব জ্ঞাত হও, সে শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগে
প্রশ্নের জবাব দাও মোর। তাতে যদি,—
ঝঞ্ঝা ছাড়া পেয়ে মন্দিরের সাথে মাতে রণে
নাহি গণি ক্ষতি; উত্তাল তরঙ্গ যদি ফেনিল কবলে
গ্রাস করে মহার্ণবে সকল তরণী,
কি বা যায় আসে? শস্যগর্ভ শ্যাম শীর্ষ
লুটাক মাটিতে, মহীরুহ উড়ুক পবনে,
দুর্গচূড়া উলটি পড়ুক তার প্রহরীর শিরে,
প্রাসাদ প্যাগোডা আদি মাথা নত করি
মাগুক্ না ভিত্তির পরশ; মহাপ্রকৃতির
সৃষ্টিবীজের ভাণ্ডার ধ্বংসমুখে হ'য়ে একাকার
প্রলয়ের ঘটাক অরুচি, তথাপি উত্তর চাই
যা আমি জিজ্ঞাসি।

১ম ডা। বল।

২য় ডা। প্রশ্ন কর।

৩য় ডা। আমরা উত্তর দিব।

১ম ডা। বল, শুনিবে মোদের মুখে,
কিম্বা যারা আমাদের গুণীন্ ওস্তাদ?

ম্যাক। ডাক' তাহাদের, তাদের দেখিতে চাই।

১ম ডা। যে শূয়োরী গিলে খেল ন-নটা বাচ্ছা তার
তারি খুন কড়াইএতে ঢেলে ঢেলে দে মটকে ঘাড়।
কাঁসিকাঠে ঘেমে উঠে চোঁয়ায় যে চর্বি
আগুনে তা আগে দিয়ে তবে ডাক্ ধরবি।

সকলে। আয় আয় আয় সব ছোট বড় আয় রে!
দেখা দে দেখা দে, গুণ বোঝা যেন যায় রে!

[বজ্রনাদ। প্রথম মায়ামূর্ত্তি;—একটি মুণ্ড]

ম্যাক। কহ মোরে, অজ্ঞাত শকতি—

১ম ডা। জানে সে জানিতে তুমি যা যা চাও,
যা বলে ও চুপ কোরে শুনে যাও।

১ম মূর্ত্তি। ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ! ম্যাকমেথ! হুঁশিয়ার;
ফাইপের সর্দার হ'তে রও হুঁশিয়ার।
যেতে দাও, আর কিছু নাই মোর বলিবার।

[নামিয়া গেল]

ম্যাক। যে হও সে হও মোর লহ ধন্যবাদ;
তোমার সতর্কবাণী প্রকাশিল অন্তরের
আশংকা আমার। শুধু কহ—

১ম ডা। আদেশ কোরো না ওরে। তার চেয়ে আরও গুণী
আসিছে আর একজন।

[বজ্রনাদ। ২য় মূর্ত্তি;—একটি রক্তমাখা শিশু]

২য় মূর্ত্তি। ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ!

ম্যাক। যদ্যপি থাকিত মোর তৃতীয় শ্রবণ, তথাপি
উৎকর্ণ হ'য়ে শুনিতাম ও মুখের বাণী।

২য় মূর্ত্তি। রক্তলিপ্সু, দুঃসাহসী, হও দৃঢ়ব্রত।
হাসিয়া উড়াও যত মানবী শক্তিরে।
নারী যারে জন্ম দিল হেন কারও হাতে
মৃত্যু তব নাই ম্যাকবেথ!

[নামিয়া গেল।

ম্যাক। তবে রক্ষা পেলে ম্যাকডফ! কি ভয়
তোমারে আর মোর? কিন্তু, তবু নিশ্চিতে
করিতে সুনিশ্চিত, শক্তি দিয়ে বাঁধিতে দৈবতে
নিতে হবে তোমার জীবন। তবে ত এ মোর চিত্তে
পাংশুমুখী ভয় মানিবে সে কয় মিথ্যা কথা;
তবে ত ঘুমাব আমি বজ্রের গর্জনে।

[বজ্রনাদ। ৩য় মায়ামূর্ত্তি,—মুকুটধারী বালক হাতে একটি বৃক্ষ]

এ কে? রাজার সন্তান যেন আসিল উঠিয়া!
পেলব ললাটে শোভে রাজচিহ্ন অপূর্ব মুকুট!

সকলে। শুনে যাও, কহিও না কথা।

৩য় মূর্ত্তি। সাহসে সিংহ হও, উদ্ধত গর্বে,
নিন্দুকে শত্রুতে কি তোমার করবে?
যত দিন রণসাজে বীর্ণাম মহাবন
শৈল ডান্সিনানে না করে আক্রমণ
তত দিন ম্যাকবেথ রহ তুমি নির্ভয়,
তত দিন ম্যাকবেথ নাহি তব পরাজয়।

[নামিয়া গেল]

ম্যাক। সে ঘটনা অসম্ভব। মহারণ্যে কে পারে চালাতে?
কাহার কথায় দ্রুমদল উৎপাটিবে ভূমি হ'তে
দৃঢ়বদ্ধ মূল? সুন্দর ভবিষ্যবাণী! অতি শুভংকর!

বিদ্রোহ তুলিবে নাকো শির, বীর্ণাম অরণ্য যদি
না হয় সচল। ভাগ্যশীর্ষে সমাসীন
তুমি ম্যাকবেথ, নিরুদ্বেগে কর দীর্ঘ জীবন যাপন,
দিও প্রাণ কালের চরণে ফুরাইলে পূর্ণ পরমায়ু।
তবু, জানিতে একটি কথা দুরু দুরু হৃদয় অধীর ;
কহ মোরে জান যদি তাহা। এ রাজ্যে কি
হবে রাজা ব্যাংকো-বংশধর ?

সকলে। আর কিছু চেয়ো না জানিতে।

ম্যাক। বলিতেই হবে। না দাও উত্তর যদি
বর্ষিত হইবে শিরে চির অভিশাপ।
বল মোরে। কটাহ নামিয়া যায় কেন ?
কিসের সঙ্গীত আসে কানে ?

১ম ডা। দেখা দাও।

২য় ডা। দেখা দাও।

৩য় ডা। দেখা দাও।

সকলে। নয়ন দেখুক যাহা কাঁদায় হৃদয়ে
ছায়ারূপে এস, ফিরে যাও ছায়া হ'য়ে!

[আট জন রাজার ক্রমিক আবির্ভাব, শেষেরটির
হাতে একটি দর্পণ, পশ্চাতে ব্যাংকোর প্রেত]

ম্যাক। এ যে দেখি ব্যাংকোর মূর্তির প্রতিচ্ছবি!
দূর হও! মাথার মুকুট তোর পোড়ায় নয়ন।
কে আবার তুই ? কনক-মণ্ডিত ভালে
ঝুলিতেছে কেশগুচ্ছ প্রথমেরই মতো!
এ দুয়ের অনুবর্তী কে তুই তৃতীয় ?
ওরে ঘৃণ্য ডাকিনীর দল! কেন মোরে দেখাস এ সব ?
আরও এক জন! অন্ধ হও তারাহারা আঁখি!
চলিবে কি এই অভিযান, যতক্ষণ
নাহি বাজে প্রলয় বিষাণ ? আবার! আবার!
সপ্তম মূরতি! আর দেখিব না।
তবু আসে অষ্টম ভূপাল, হাতে তার মায়ার দর্পণ ;
দেখি তাহে আরও কত কত, কারও হাতে
গোলক যুগল, কেহ বহে দণ্ড ত্রিফলক।
এ কি বিভীষিকা! বুঝেছি, বুঝেছি সত্য সবই ;
মোরে চাহি ওই যে হাসিছে ব্যাংকো
রক্তমাখা জটাবদ্ধ কেশ, দেখাইয়া
জনে জনে নিজ বংশধরে। [মায়াদৃশ্য অন্তর্হিত]
তবে এই হবে ?

১ম ডা। এই হবে, এই হবে। কিন্তু কেন
ম্যাকবেথ হ'লে তুমি অবাক হেন ?
আয় দিদি মনে প্রাণে ফুর্তি ভরি'
নেচে গেয়ে তাঁরে মোরা চাংগা করি।
বাতাসে মন্ত্র ঝেড়ে আমি তুলি তান,
তোরা দেখা রগড়ের সেই নাচখান ;
নেচে গেয়ে যদি মোরা রাজারে তুষি
বাছা বলবেন বড় হ'য়েছি খুশি।

[নৃত্যগীত করিতে করিতে ডাকিনীরা অন্তর্হিত]

ম্যাক। কোথায় তাহারা ? চলে গেল ?
আজিকার এ অশুভ ক্ষণ কুক্ষণ হউক চির
পঞ্জিকার পাতে। কে আছ, ভিতরে এস।

(লেনক্সের প্রবেশ)

লেনক্স। কি আদেশ দেব ?

ম্যাক। দেখিলে কি ভাগ্যবিধায়িনী ভগ্নীগণে ?

লেনক্স। দেখি নাই প্রভু।

ম্যাক। পড়ে নাই তোমার সম্মুখে তারা ?

লেনক্স। কই প্রভু, আসেনি ত কেহ।

ম্যাক। যে বাতাসে ভর করি চলে তারা, সে বাতাস
হোক কলুষিত। তাদের বিশ্বাস যারা করে
অভিশপ্ত হোক্ তারা। শুনিলাম অশ্বক্ষুরধ্বনি,
কে আসিল ?

লেনক্স। এসেছে দু'তিন জন প্রভু! সংবাদ এনেছে তারা
ইংলণ্ডে পলাল ম্যাকডফ।

ম্যাক। ইংলণ্ডে পলাল ম্যাকডফ ?

লেনক্স। তাই প্রভু!

ম্যাক। ওরে কাল! ভীষণ উদ্দেশ্য মোর ব্যর্থ কোরে দিলি!
সংকল্প কি সিদ্ধিপথে কভু দেয় ধরা
কর্ম যদি নাহি চলে সাথে ? এইক্ষণ হ'তে
যত সদ্যোজাত বক্ষের বাসনা
সদ্য সদ্য হাতে তুলে করিব লালন।
মণ্ডিতে সংকল্প মোর কর্মের কিরীটে
ভাবনার সাথে সাথে চলিবে সাধনা।
ম্যাকডফের গৃহদুর্গ অতর্কিতে করি আক্রমণ
ফাইপ করিব অধিকার, অসিমুখে
দিব তুলি পত্নীসহ শিশুপুত্রগণে,
আরও যত বংশে তার রয়েছে দুর্ভাগা।
এ নহে মূঢ়ের দম্ভ, এ কাজ সাধিব আমি
না জুড়াতে সংকল্পের তাপ।
কিন্তু, আর নয় সেই সব মায়াদৃশ্য!
কোথায় ? এলেন যাঁরা ? নিয়ে চল
তাঁহাদের পাশে। [প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

ফাইপ। ম্যাকডফের দুর্গপ্রাসাদ।

(লেডি ম্যাকডফ, তাঁহার পুত্র ও রসের প্রবেশ)

লেডি ম্যাক। এমন কি কোরেছিল, দেশ ছেড়ে হ'ল পলাইতে ?

রস। ধৈর্য্য চাই দেবি!

লেডি ম্যাক। কোথা গেল ধৈর্য্য তার ? বাতুলতা এই পলায়ন ;
কার্য্যে যদি খাঁটি থাকি তবু হেন ভয়
করি তুলে বিশ্বাসঘাতক।

রস। তুমি ত জান না, ভয় কি সুবিবেচনা কারণ ইহার।

লেডি ম্যাক। সুবিবেচনা! ফেলিয়া আপন স্ত্রীকে শিশুপুত্রগণে,
ফেলি গৃহ সর্ব অধিকার নিজে করে পলায়ন ?

ভাল সে বাসে না আমাদের, অন্তর মমতাহীন।
ক্ষুদ্র পাখী সেও লড়ে পেচকের সহ
হয়ে যদি নীড়ের শাবক। ভয়ই তার সব,
প্রেম কিছু নয়; যুক্তিহীন এই পলায়নে
ঠাঁই নাই সুবিবেচনার।

রস। ধৈর্য্য ধর বোন, মিনতি আমার। স্বামী তব
দূরদর্শী, বিচক্ষণ, মহাপ্রাণ, কালের কুটিলা গতি
বুঝেন সম্যক। এ হ'তে অধিক বলা অসম্ভব আজ।
সে-সময় বড় দুঃসময়, না জেনে কৃতঘ্ন হই যবে,
কান দিই আজগুবি ভয়ের গুজবে, না জেনে
কাহারে করি ভয়, ভেসে চলি ইতস্ততঃ
সংশয়-সংকুল সিন্ধুস্রোতে। এখন বিদায় মাগি,
অবিলম্বে আসিব আবার।
কল্যাণ হউক তব স্নেহের দুলাল!

লেডি ম্যাক। পিতা থেকে পিতৃহীন আজ।

রস। দেরী যদি করি আর হবে নির্বুদ্ধিতা,
নিজে অপ্রতিভ হব, তোমারেও ফেলিব সংকটে।
এখনই বিদায় হই তবে।

[প্রস্থান।

লেডি ম্যাক। ওরে, পিতা তোর মারা গেছে, কি হবে এখন?
কি ভাবে বাঁচিবি বল।

ছেলে। মাগো, পাখীরা যেমন বাঁচে।

লেডি ম্যাক। কি? পোকা কি ফড়িং খেয়ে?

ছেলে। মানে, যা মিলবে তাই খেয়ে,
পাখীরাও তাই করে।

লেডি ম্যাক। হায় রে বেচারা পাখী! জালে, ফাঁদে, ফাঁসকলে,
কোন কিছুতেই করিবি না ভয়?

ছেলে। কেন ভয় করিব মা? ছোট পাখী কে চাহে মারিতে?
যাই বল তুমি—বাবা মারা যাননি ত।

লেডি ম্যাক। হ্যাঁ রে গেছে মারা। পিতৃহীন কেমনে
কাটাবি কাল?

ছেলে। স্বামীহীন কেমনে কাটাবে, সেটা বল।

লেডি ম্যাক। বাজারে বিশটা স্বামী পাইব কিনিতে।

ছেলে। তাহ'লে কিনিবে শুধু বেচিবার তরে।

লেডি ম্যাক। এইটুকু ছেলে, তোর কথা শুনে মরি।
এত বুদ্ধি কোথা পেলি তুই?

ছেলে। মা, বাবা মোর বিশ্বাসঘাতক?

লেডি ম্যাক। ওরে, তাই বটে।

ছেলে। কারে বলে বিশ্বাসঘাতক?

লেডি ম্যাক। মিথ্যা বলে, ফাঁকি দেয় যারা।

ছেলে। তারা সব বিশ্বাসঘাতক?

লেডি ম্যাক। মিথ্যা বলে, ফাঁকি দেয়, তারা সবই বিশ্বাসঘাতক;
ফাঁসি দিতে হয় তাহাদের।

ছেলে। মিথ্যা বলে ফাঁকি দেয় যারা
সবাইকে ফাঁসি দিতে হয়?

লেডি ম্যাক। সবাইকে।

ছেলে। কে তাদের দেবে ফাঁসি?

লেডি ম্যাক। কেন, ভাল লোক যারা।

ছেলে। তা হ'লে মিথ্যুক ফাঁকিবাজ, বোকা তারা।
তারাই যখন দলে বেশী, এক হ'য়ে ভালোদের
দিতে পারে ফাঁসি।

লেডি ম্যাক। কি ঠ্যাটা এ ছেলে, বেঁচে থাক। কিন্তু বল
পিতৃহীন কি করিবি তুই?

ছেলে। বাবা মারা গেলে নিশ্চয় কাঁদিতে তুমি।
না কাঁদিলে বুঝে নেব, আর এক নূতন বাবা
শীঘ্র পাব আমি।

লেডি ম্যাক। কি যে বলে, যেন তোতাপাখী।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। কল্যাণ হউক মাতা, নহি আমি তব পরিচিত,
কিন্তু দেবি; জানি আপনারে আপনার পদমর্য্যাদায়।
বিপদ আসন্ন তব। গরীবের উপদেশ যদি মনে ধরে
স্থানত্যাগ করুন সত্বর পুত্রকন্যাসহ।
বর্বরের মতো ভয় দেখাইনু বটে, না দেখানো
হোত ঘোর নিষ্ঠুরের কাজ; সে নিষ্ঠুরও
প্রায় সমাগত। ঈশ্বর করুন রক্ষা।
হেথা আর না পারি রহিতে।

[প্রস্থান।

লেডি ম্যাক। কোথায় পলাব? কারো মন্দ করিনি ত।
বুঝিয়াছি, আছি মর্ত্তভূমে; এখানে যে মন্দ করে
প্রশংসার্হ সেই, ভাল করা বিপদের হেতু।
কেন হায় ভাবি তবে অবলার প্রায়—
কারো মন্দ করিনি ত আমি?
এ সব কাদের মূর্ত্তি!

(ঘাতকগণের প্রবেশ)

১ম ঘা। কোথায় তোমার স্বামী?

লেডি ম্যাক। আশা করি, হেন কোন ঘৃণ্যস্থানে
যান নাই তিনি, তোরা যেথা খুঁজে পাবি তাঁরে।

১ম ঘা। স্বামী তব বিশ্বাসঘাতক।

ছেলে। মিথ্যে কথা, জটাচুলো বদমায়েস!

১ম ঘাতক। আরে অপোগণ্ড ডিম্ব, কৃতঘ্নের ছানা!

[ছোরার আঘাত।

ছেলে। মাগো, আমাকে ফেলেছে মেরে,
পালাও মা তুমি। (মৃত্যু)

["খুন! খুন!!" চিৎকার করিতে করিতে লেডি
ম্যাকডফের নিষ্ক্রমণ, ও ঘাতকগণের পশ্চাদ্ধাবন]

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

পাদরী লং ও ধূমায়িত অগ্নি-বিপ্লব

শ্রীতারানাথ রায়
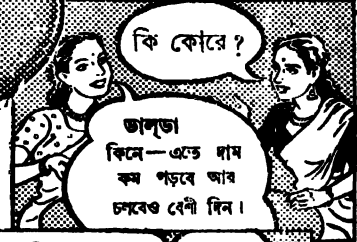
'ইংরেজের পায়ের তলায় হয়ত অগ্নিগিরি গড়ে উঠছে, হয়ত ভারতের গগনে কৃষ্ণ মেঘ ঘনিয়ে আসছে।' একশ বছর আগের কথা। বলেছিলেন, ইংরেজ পাদরী রেভাঃ জেমস্ লং। বলেছিলেন—"the combustible materials were gathering and only required the match to be applied by them"। বলেছিলেন—

'I, for years, have not been able to shut my eyes to what many able men see looming in distance. It may be distant, or it may be near; but Russia and Russian influence are rapidly approaching the frontiers of India.'

রুশ বিপ্লবীদের প্রভাবের জন্য ৫০ বছরও অপেক্ষা করতে হয়নি।

সেই একশ বছর আগে কলকাতার দেশী পাড়া কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে বাস করতেন পাদরী রেভাঃ জেমস্ লং আর তাঁর প্রতিবেশী পাদরী ডাঃ ডাফ। সেদিন ফোর্ট উইলিয়ম দখল করবার ষড়যন্ত্র করেছিল বিপ্লবীরা গোয়ালিয়রের মহারাজার সাহায্য নিয়ে। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে বিলকুল শ্বেতাঙ্গ হত্যার আয়োজন হয়েছিল। লর্ড ক্যানিং বিপ্লবীদের গুলী করবার জন্যে সেদিন ডাফ আর লংএর হাতে হাতিয়ার দিয়েছিল। ডাফের আনন্দের কথা উল্লেখ করে লং বলছিলেন, **"I shall never forget the gleam of glee that lighted up his face as he handled his musket."**

১৮৫৭-৫৮'র বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর ইংরেজের মুখপত্র—**'Friend of India'** স্পষ্ট করে সেদিন বলেছিল—**"When the next century comes round the princes of India will be Christians."** ৫৮এর বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর ভারতনিগ্রহকারী সার জন লরেন্স, সার ডোনাল্ড ম্যাকলিওড, সার রবার্ট মণ্টগোমেরী, সার হার্বার্ট এডোয়ার্ডস্ লর্ড ক্যানিংএর কাছে যুগ্ম বিবৃতিতে দাবী করেছিল—**'the elimination of all unchristian principles from the Government of India."**

এর পর নিপীড়ন আর ইংরেজের গুপ্ত অত্যাচার। এই পীড়ন ও অত্যাচার-বিপন্ন দেশবাসীর সক্রিয় নেতৃত্ব যেমন করেছিল সেদিন গুপ্ত বিপ্লবী দল **"The Hindu party of Calcutta"**, তেমনি গণ-অসন্তোষের প্রতিধ্বনি করেছিল বাংলা ভাষার সংবাদপত্রগুলো। ইংরেজরা এতে ক্ষেপে গেছল, সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়েছিল পাদরীরা। রেভাঃ লালবিহারী দে সে সময়ের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—**"whenever a European or a body of Europeans are denounced owing to questionable practices, by the Bengalee Press, denunciations are construed into seditious language, as if, every British loafer that prays upon the country is to be identified with the Government."**

অত্যাচারে অত্যাচারে দেশের মোড় তখন ঘুরছিল। মিশনারীরা হাজার চেষ্টা করেও দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন হতে পারছিল না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতার মিশনারীরা এক বৈঠক করে বলল— নেটিভদের মনোভাব ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। রেভাঃ লঙের উপর ভার পড়ল ইংরেজ শাসন আর খৃষ্টানীর পক্ষে ও বিপক্ষে দেশী জনমত ও সংবাদপত্রগুলো কি বলতে চায় তার সন্ধান করে জানাতে।

লং তাঁর রিপোর্ট দাখিল করে বলেছিলেন—**"The native feeling may end in bloodshed··· all classes of Europeans should watch the barometer of the Native mind."**

নীল বিপ্লবীদের প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ সংগ্রামের পর তাদের শান্ত করবার জন্য যে ইণ্ডিগো কমিশন বসেছিল, তাতে লং এ সম্বন্ধে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, তাতে সমসাময়িক এই বিপ্লবের আভাস পাওয়া যাবে। জবানবন্দীর কিছু অংশের অনুবাদ নীচে দেওয়া গেল।

মঙ্গলবার, ১২ই জুন, ১৮৬০

রেভারেণ্ড লং, সাং—কলিকাতা। চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটির মিশনারী। সত্য পাঠ করিয়া জবানবন্দী :—

সভাপতি—যে সব জেলায় নীল চাষ হয়, আর যে সব জেলায় হয় না, এই দুই রকম জেলায় সমাজের নিম্নস্তরের মানুষগুলোর ভাব ও আচার নির্ণয়ের কি কি সুবিধা আপনি পেয়েছেন, তা কি কমিশনের কাছে বলবেন ?

রেঃ লং—যে সব জিলায় নীল চাষ হয়, সে সব জিলায় আমি বাস করিনি, তবে এমন অনেক জিলায় আমি গিয়েছি। নীলকরদের ও অন্যান্য লোকজনের কাছ থেকে আমি নীল রায়তি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। কলকাতা ও বিভিন্ন গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর এমন সব দেশীয় লোকজনের সঙ্গে আমি ভাল ভাবে মিশেছি, নীল চাষের সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত। গত ১৬ বছর ধরে আমি দেশী ভাষার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলির নিয়মিত পাঠক। এ সব পত্রে নীলচাষ সম্বন্ধে নিয়ত যে আলোচনা চলেছিল, সেগুলো থেকেও আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। গবর্ণমেণ্টের প্রতি নেটিভদের আকর্ষণ জন্মিয়ে দিয়ে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে আর খৃষ্টানী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে ও এক দল বুদ্ধিমান কৃষক সৃষ্টি করতে আমি চাই। এরই জন্য এ বিষয়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। মিশনারী প্রচারকরা, এমন কি কলকাতারও মিশনারীদের অনেক সময় মন্তব্য শুনতে হয়েছে—"তোমার দেশের ঐ নীলকরদেরই কেন বল না একটু কম পীড়ন করতে। ধর্মের

... আগে তাদের কাছে গিয়ে বলে এস।" মিশনারী ...দের ছাত্রদের মুখেও আমি প্রায়ই শুনেছি—"আমরা ত বদ, ...দের খৃষ্টান দেশবাসীরাও বদ কেন? তবু তোমরা বল, ...দের ধর্মের চাইতে তোমাদের ধর্মই বড় ?"

প্রঃ—দেশী সংবাদপত্রগুলো আপনি পড়েছেন। সব শ্রেণীর ...দের সঙ্গে আপনি কথাবার্তা বলেছেন। এতে কি আপনি ... অনেক প্রমাণ পেয়েছেন যাতে আপনার মনে হয়েছে যে, ...দের নিম্ন পর্যায়ের মানুষগুলো সম্প্রতি বেশ স্বাধীন চিন্তা করতে ...ত হয়েছে ?

...ঃ। পণ্যের দাম বেড়েছে। শ্রমের মূল্য বেড়েছে। ...গুলো থেকে আমি দেখেছি নেটিভরা য়ুরোপীয়দের তাঁবেদারী ... কতকটা স্বাধীন হয়ে থাকতে চায়। আমার ধারণা, কতকটা ...দের প্রতিরোধের ফলেই সাক্ষাৎ ভাবে এ হয়েছে। এখানেই ... না। আমার মনে হয়, জনসাধারণের উপর এ খুব গুরুত্ব-... প্রভাব বিস্তার করবে। এই প্রভাবের ফলে গোলামী ... থেকে তারা মুক্ত হবে, এই থেকে তাদের দেখিয়ে দেওয়া ... যে, অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের কাছে তারা আপনাদের সর্ত ... করতে পারে। সেপাই বিদ্রোহে নেটিভদের সুপ্ত মন জেগে ...। এই বিদ্রোহে তাদের মনে এ ধারণাই হচ্ছে যে, তাদেরও ... আছে কিছু-কিছু। আজ জিনিষপত্রের দাম বাড়বার ... কি হয়েছে তার একটা উদাহরণ আমি দেব। কিছু দিন হ'ল ... থেকে কলকাতায় আসবার নৌকো কৃষ্ণনগর অঞ্চলে পাওয়া ... হয়ে পড়েছে। অনেক মাঝি নৌকোর কাজ ছেড়ে দিয়ে মজুর ...। মজুরগিরিতে বেশী পয়সা পায়। যেমন রেলওয়ে বাঁধের ...দের খুব বেশী হারে মজুরী দেওয়া হয়। জনসাধারণের মনে ... স্বাধীনতার বোধ জেগেছে তার দুটো প্রধান কারণ আমার ... পড়েছে। এ সম্বন্ধে আমি নিজে সন্ধান করেছি, আর আমার ... কাজ করবার সময়েও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। 'দুটো ... কারণ দেখতে পাচ্ছি। প্রথম, ইংরেজী শিক্ষা। সুখের কথা, ...দের মধ্যে এই শিক্ষা প্রসার হচ্ছে। এতে স্বাধীনতার ...তাদের হচ্ছে, ন্যায়-সুবিচার সম্বন্ধে তাদের মন সজাগ হচ্ছে, ...দের মনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজী ধাঁচের ঘৃণাবোধ ...। এই শিক্ষা বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীর নেটিভদের এক ... গোষ্ঠীতে পরিণত করছে। ভারতীয় ব্যাপারে তাদের ... বুদ্ধি এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কলকাতার একজন নেটিভ ... বোম্বাইএ গেছলেন। সেখানে পারসী আর গুজরাটিদের ... ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। এরা পরস্পরের ভাষা ... না। কিছু দিন আগে এই সহরে এক নেটিভ ইংরেজীতে ... পুস্তিকা প্রকাশ করলে মাদ্রাজে তাঁর দেশবাসীরা তার পুনর্মুদ্রণ ... তার ব্যাপক প্রচার করেছে। কলকাতার মত মাদ্রাজ ... বোম্বাইএ নেটিভরা ইংরেজীতে সংবাদপত্র পরিচালন করে। ... সংবাদপত্রে শিক্ষিত নেটিভদের মতামত অভিব্যক্ত। এই ... নীচুর দিকে নামছে। এই সব ইংরেজী ভাষায় লেখা ...দের ও পুস্তিকার মর্ম মুখে মুখে বা অনুবাদ করে জনসাধারণকে ... হচ্ছে। দেশী ভাষার সংবাদপত্রগুলোর প্রভাব বেড়ে উঠছে, ... নেটিভ মন প্রকৃত ভাবে ব্যক্ত করেছে। দুঃখের বিষয়, এ সব পত্রিকার ধমক ও খবরদারী য়ুরোপীয় সম্প্রদায় একটুও গ্রাহ্য করছে না। তবু দেশী সংবাদপত্রগুলো নেটিভ মনের প্রতীক। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমি দিল্লী, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ গিয়ে বিশেষ ভাবে উত্তরপ্রদেশগুলোর দেশী পত্রিকাসমূহের বিষয় পরীক্ষা করি। দেশীয় সংবাদপত্রের প্রেসগুলোর সন্ধানে দিল্লীর গলিতে গলিতে আমি খোঁজ করেছি। তখন আমার বেশ মনে হয়েছে, দিল্লীর বা অন্যান্য সহরের য়ুরোপীয়রা দেশী ভাষায় সাময়িক পত্রগুলোর দ্রুত কার্যাকলাপের খবর কত কম রাখে! রাজনৈতিক বিষয়ে যে সব বই প্রকাশিত হচ্ছে তার ক্রয়-আগ্রহ থেকে বেশ বুঝা যায়, এই সব দেশীয় সংবাদপত্রের প্রভাব কেমন। কলকাতায় দেশী সংবাদপত্রগুলোর প্রভাব এই ভাবে দেখান যায় :—

বিক্রয়ের জন্য গ্রন্থাদি—

১৮২৮ খৃঃ—৮০০০ খানি
১৮৫৩ "—৩০০০০০ "
১৮৫৭ "—৬০০০০০ "

দেশী ভাষার সংবাদপত্রগুলোর বেশী দৃষ্টি সামাজিক সমস্যাগুলোর দিকে। যেমন, বিধবা-বিবাহ আলোচনা থেকে রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায় ২৫খানি নানা রকমের পুঁথিপত্র। বাল্যবিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্ট আলোচনা এরা করেছে। কলকাতার এগরি-হরটি-কালচারাল সোসাইটি রায়তদের জন্যে কৃষি বিষয়ে একখানি বই প্রকাশ করেছেন। 'টেকচাঁদ' উপ নাম দিয়ে একজন নেটিভ তাদের দেশে মদ্যপান, নারীর অশিক্ষা আর ইয়ং বেঙ্গল-বাদের কুফল পরিষ্কার করে প্রকট করে দিয়েছে। তাঁর বইগুলোর খুব প্রচার। একটা ডিকেন্‌স, বা একজন মোলিয়ারের মত এঁর wit. তার পর 'ভাস্কর' ও ও 'প্রভাকরের' মতন বাংলা সংবাদপত্র—যেখানেই বাঙ্গালী যায়, সেইখানেই, এমন কি পাঞ্জাব পর্য্যন্ত ব্যাপক ভাবে প্রচারিত। বাঙ্গালীরা ইহুদী জাতের মত, সর্বত্র এদের গতি, উত্তর-ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলে এদের দেখা পাবেন। এরা নিজেদের ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করে, এরা মাত্র তাদের স্বদেশের সংবাদপত্রই পড়ে। তিন বছর আগে আমি বেনারস যাই। বেনারসের যে অংশকে বাঙ্গালীটোলা বলে, সেখানে ছিলাম। বাঙ্গালীটোলা সম্পূর্ণ বাঙ্গালীদের বাস। এরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। এখান থেকে দুইখানি বাংলা সংবাদপত্র ছাপা হত। এ সব বাংলা সংবাদপত্রের অনেক মফঃস্বল সংবাদদাতা আছেন, এঁরা বিভিন্ন জেলার খবর পাঠান। প্রত্যেক বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে থাকেন ইংরেজী সংবাদপত্রগুলো থেকে অনুবাদ করবার জন্যে একজন করে অনুবাদক। এই ভাবে য়ুরোপ ও ভারতের সব রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নেটিভ-মনের বেশ পরিচয় হয়েছে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় সাধারণতঃ যা মনে করেন তার চাইতেও। বাংলা সংবাদপত্রে সাধারণতঃ কি দেওয়া হয় নমুনা স্বরূপ গত বৃহস্পতিবারের 'ভাস্করে'র উল্লেখ করছি। এতে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—আয়কর সম্বন্ধে। এই প্রবন্ধে লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড উইলিয়ম বেনটিঙ্ক, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসী ও রণজিৎ সিংএর নীতির আলোচনা করা হয়েছে। তার পর লর্ড ক্লাইভের ভারত ত্যাগ সম্পর্কে সম্পাদকীয়। এর পর সার চার্লস ট্রেভেলিয়ান ও বর্দ্ধমানের রাজার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। তার পর চীনের সংবাদ, নীল কমিশনের সংবাদ, বাজার দর, খাসামের ষ্টিমার, সার জর্জ

ক্লার্ক, গোয়ালিয়ার, অযোধ্যা ও লেডি ব্যানি' সম্বন্ধে সংবাদ। সুদূর রঙ্গপুর জিলা থেকেও একখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানির গত সংখ্যায় আছে বাংলা প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার ঘোষণা; মসলেম শাসন সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ; কুচবিহারের রাজার গতিবিধি; নীল কমিশন আর গ্যাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। এই সব পত্রিকায় নিত্য সমালোচনার বিষয় হ'ল, আদালতের আমলাদের কথা, পুলিসের অবস্থা, আর ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রকৃতি। মনে পড়ে, ১৬ বছর আগে পড়ছি, 'ভাস্কর' আদালতের দুর্নীতি অতি তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করে কতকগুলো শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। এ কথা আমি ভাল করেই জানি যে, গোত ১০ বছর ধরে নেটিভদের এ সব সংবাদপত্রে নীল চাষ অবিরাম আক্রমণের বিষয় হয়ে আসছে। এ সব সংবাদপত্রের মতামত জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসেছে। এমন সব পথে নেটিভদের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যার খবর য়ুরোপীয়রা সামান্যই রাখে। এই ভাবে সেপাই বিদ্রোহের সময় প্রায়ই, গবর্ণমেন্ট কোন সংবাদ জানার আগে বাজারে সে কথা প্রচারিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি ১৮৬০, ২১শে মে তারিখের 'সোমপ্রকাশ' থেকে "নীলকরদের ধর্মবুদ্ধি" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধের অনুবাদ দাখিল করছি। 'সোমপ্রকাশ' একটা ভাল সাপ্তাহিক পত্রিকা, কলকাতায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় এবং আর যে সব পত্রিকা আমি দাখিল করছি, তাতে যে সব মতামত ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলো আমার মত না হলেও, মাত্র নেটিভ মতামতের অভিব্যক্তি হিসাবে এগুলো উপস্থিত করছি। 'নেটিভ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ভারতবন্ধু'রও এক অনুবাদ আমি দাখিল করছি।

নেটিভদের জনমত নির্ণয়ের আর এক সূত্র হল লোক-সঙ্গীত। বাঙ্গালীদের মনে সঙ্গীতের প্রভাব খুব বেশী। ধর্ম ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে সঙ্গীতের প্রয়োগে এখানে খুব ফল পাওয়া যায়। বার্ক যে মন্তব্য করেছিলেন, "কোন জাতের গাথা কি করে তৈরী হয়েছে আমায় জানাও, আমি সে জাতের নিয়ম-কানুন কি করে হয়েছে বলে দেব," এর সমর্থন বাংলায় পাই। এখানে আমি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একখানি পুস্তিকা দাখিল করছি। এর প্রচার খুব ব্যাপক। পুস্তিকার নাম "নীলকরদের অত্যাচার।" এতে এমন সব গান আছে যা নেটিভদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে গীত হয়। এই সব গানের কতকগুলোর মর্ম এই—নীলকরের দাদনের সুদ তিন পুরুষ ধরে জমে; পাট্টা বিক্রী করলে তা আর গঙ্গা পেরোয় না অর্থাৎ নীলকরদের হাত থেকে রেহাই পায় না; নীলকররা, রায়তদের কাছে প্রথমে ভিখারীর মত এসে নীল চাষ করবার খোসামুদি করে, কিন্তু তার পর রায়তদের হাতে দূর্ব্বা গজিয়ে দেয়; নীলকররা সুঁই হয়ে সেঁদোয় আর ফাল হয়ে বেরোয়; তারা পঙ্গপালের মত বাংলা ছারখার করছে, প্রজা ডুবে যাচ্ছে আর ওরা চেয়ে চেয়ে দেখছে, সব গেল—সব গেল, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের কাছে ছাড়া আর কাকে বলব; চোখ বুজলে দেখি সাদা মুখগুলো চোখের সামনে, আর ভয়ে আমাদের প্রাণ খাঁচাছাড়া হয়;

বেদনার জ্বলন্ত আগুনে আমাদের মন-প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে। (অনু ও মূল দাখিল করা হল)।

নেটিভ জনমত নির্ণয়ের আর এক সূত্র ওদের সভা-সমিতি। হিন্দুরা অভিনয় অর্থাৎ যাত্রা বড় ভালবাসে। যাত্রায় সং রসিকতা খুব। এ সব যাত্রায় কুলীনদের বহু-বিবাহকে নিন্দা করা হয়। য়ুরোপীয়দের শোষণও ওদের নজর এড়ায় না। প্রা দু'-বছর আগে আমার এক বন্ধু এক যাত্রায় উপস্থিত হয় শুনেছিলেন য়ুরোপীয়দের বিদ্রূপ করা হচ্ছে, য়ুরোপীয়দের ছোটলো ভাষা 'কার্স'ড নিগার' আর "ষ্টুপিড য়্যাস" পর্য্যন্ত উচ্চারি হয়েছিল। এই সব সভায় মাঝে মাঝে নীল চাষের নিন্দে-বিন্দ করা হয়।

এ কথা আমি কমিশনরদের নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি নীল চাষ সম্বন্ধে, নেটিভ নবনারীদের মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বল তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। এ সমস্যার একটা ন্যায্য ব্যবস্থা হও দরকার, নৈলে ভারতের ভবিষ্যৎ শান্তির কথা ভেবে আমি সত্যি স শঙ্কিত। কোন না কোনও মফঃস্বল জেলায় এই ভাবই জাগ যে, সরকার আর সরকারী কর্মচারীরা নীলকরদের পীড়ন দেখেও দে না। নেটিভরা বলছে, মুসলমান আমলেও এমন নির্মম অত্যাচার হয়নি। এই ভাব দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোতে ভাব বদ্ধমূল হয়েছে যে, ফরাসী আর রুশরা ভারতে স্থান পে আগ্রহান্বিত। এই ভাব বাংলার মফঃস্বল জেলাগুলোতেও ছড়ি পড়ছে। সম্প্রতি নেটিভরা বার বার বলছে—অন্য বিদেশী শাস এর চাইতে আর কি খারাপ আমাদের হবে? রায়ত আর নীলকর মধ্যে বিবাদের বিচারের জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেট আর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রে মামলার চালু অবস্থাতেও অনেক ক্ষেত্রে নীলকরেরই অতিথি হচ্ছে এ তারা প্রত্যক্ষ করছে।

নীলকরদের বিরুদ্ধে এই ভাব যে মাত্র বাংলার নেটিভদের নীচু স্তরের মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। অনেক শিক্ষি নেটিভ জানে যে, ফরাসী সংবাদপত্রগুলো নীল চাষের ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনের কলঙ্ক বলে বলেছে। সেপাই বিদ্রোহের সুরু আমি নিজে অযোধ্যার রাজার এক সভাসদের প্রকাশি একখানি পুস্তিকা পড়েছি। এই পুস্তিকায় বলা হয়েছে অযোধ্যার রাজার বিরুদ্ধে যে সব অত্যাচারের অভিযোগ আ হয়েছে, বাংলার নীল চাষের নিপীড়ন তার চাইতে কম ভীষণ নয় অথচ রাজ্যে পীড়নের অজুহাতে অযোধ্যার রাজাকে রাজ্য থেকে বঞ্চি করা হল। নীল পীড়ন যে ইংরেজ সরকার দেখেও দেখে না, পীড়নের জন্যে বাংলা থেকে এদেরও বঞ্চিত করা উচিত।

তার পর বেলাঃ লং নীল কমিশনে তাঁর জবানবন্দীতে দেখা চেষ্টা করেছিলেন, কি ভাবে বাংলা ভাষার বিপ্লবী ভাব হিন্দী মারাঠা ভাষায় বিসর্পিত হয়। শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার বিপ্ল যে দিকটা এই পাদরী দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, তার পূর্ণাঙ্গ বি সংগ্রহ না করলে ভারতের মুক্তি-ইতিহাস রচনা অপূর্ণ থে যাবে।

সৌম্যবাবু

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

চরিত্র :—কণিকা, মণিকা, সৌম্যবাবু

[পশ্চিমের কোন একটি ছোট সহরে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের একাধারে রান্না ও খাওয়ার ঘর। ষ্টেজের পশ্চাদ্ভাগের মধ্যস্থলে একটি জাফরী-কাটা জানালা, জানালার ভিতর দিককার গরাদের উপরে কয়েকটা মাটির টবে ছোট ছোট ফুলের গাছ। জানালার ডান দিকে (দর্শকদের আসন থেকে দেখলে) একটি দরজা, তার বাইরে বাগান। বাঁ দিকে দেয়ালে ঠাকুর্দার আমলের একটি বড় দেয়াল-ঘড়ি। তার বাঁয়ে বাসন-কোসন রাখার একটি তাক। ষ্টেজের দক্ষিণ দিকে একটি ছোট টেবিল, তার উপরে চীনামাটির পেয়ালা, পিরিচ ইত্যাদি সাজানো। একটি তাকের উপরে খানকতক বই। টেবিল ছাড়িয়ে আর একটি দরজা। বাঁ দিকে রান্নাঘরের সাজ-সরঞ্জাম, উনুনে আগুন জ্বলছে।

ঘরের কেন্দ্রস্থলে একটি টেবিলের পাশে বসে আছে মণিকা—শান্তপ্রকৃতি, ভীরুস্বভাব, স্বাস্থ্যবতী, কথা বলে অতি মৃদুস্বরে, বয়স ৩৩।৩৪, বসে বসে একটা মোজা রিপু করছে। দৃশ্যপট উঠতে দেখা গেল ঘড়িতে বেজেছে চারটা। মণিকা ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে ঘড়ির সঙ্গেই কথা বলতে আরম্ভ করল—নিঃসঙ্গতায় অভ্যস্ত লোকেরা যেমন আপন-মনে পোষা বেড়াল বা পাখির সঙ্গে কথা বলে থাকে। হাতের কাজে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হলে থেমে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো খেই হারিয়ে এক-একটা কথার পুনরুক্তি করছে, যেন অন্যমনস্ক ভাবে।]

মণিকা। চারটে বেজে গেল নাকি, ও ঠাকুর্দা? দিদির তবে আজ দেরি হয়ে গেল, কি বল? হাটবারে ত তার এখনো এত দেরি হয় না, সে আমি যেমন জানি, তুমিও ত তেমনি জান। খুব কম দিনই তাকে অপ্রস্তুত করতে পেরেছ তুমি।···নিজের সম্বন্ধেও যদি এই বড়াইটা করতে পারতাম! শনিবার বিকেল, চারটে বেজে গেল, রান্নার এখনো কোন জোগাড় নেই, আর এদিকে সৌম্যবাবুর মোজা রিপুও শেষ হল না। কি লজ্জা! ওঁর মুখোমুখি তাকাতে আমার কেমন লজ্জা লাগে ঠাকুর্দা, হাঁ, কেমন লজ্জাই লাগে ওঁর মুখোমুখি তাকাতে!··দিদির এত দেরি হওয়ার কি কারণ ঘটতে পারে, ভেবে পাই নে। হাট থেকে ফিরতে ওর ত কোন দিন এত দেরি হয়নি, এই পনের বছরের মধ্যে একদিনও না। আর এদিকে সৌম্যবাবু যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন তাঁর বাড়ীভাড়ার টাকা দিতে। ভদ্রলোক অমনি একটু গল্প-গুজবও করতে চাইবেন হয়ত বসে বসে, আমি তখন কি কথা যে বলব ওঁর সঙ্গে, তার মাথামুণ্ড কিছু মাথায়ই আসে না। তোমার সঙ্গে কথা বলা সহজ, ঠাকুর্দা, কিন্তু একজন জলজ্যান্ত পুরুষ মানুষ, বাপ্‌স্! সে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, আবার তার উত্তরও শুনতে চায়। তোমার সঙ্গে তার তফাৎ একেবারে আকাশ-পাতাল। আর, তোমার সঙ্গ যেমন দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে গেছে ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে ত তা নয়।······ঐ আর এক জন—অবিকল তোমার মত, ঠাকুর্দা, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নিয়মনিষ্ঠ। ধীর, মন্থর অথচ ধ্রুবগতি, যেন ঠিক তোমারই প্রতিরূপ। আর, অনেক সময়ই আমার কি মনে হয় জান?—ওঁর মুখেও যেন তোমার মুখের আদল আছে—গোলগাল, গম্ভীরদর্শন। ভদ্রলোক যখন কথা বলতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর গলার ভিতর থেকে কেমন যেন একটা গম্-গম্ আওয়াজ বেরয়, যেমন তোমার হয় ঘণ্টা বলার সময়।··· কিন্তু তুমি ত আমাদের পুরানো বন্ধু, ঠাকুর্দা, বলতে গেলে সব চেয়ে পুরানো বন্ধু, আর ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হল, সে ত আজ তিন মাসও হয়নি। কাজেই তোমার ঈর্ষা হওয়ার কোন কারণ নেই, ঠাকুর্দা, নাঃ!—তোমার ঈর্ষা হওয়ার কোন কারণই নেই। [একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে উঠে পড়ে, উনুনের কাছে গিয়ে একটু আগুনটাকে খুঁচিয়ে দেয়, তার পর ঘুরতে ঘুরতে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকায়। এদিকে মুখে কথার বিশ্রাম নেই।] হাঁ, তুমি মনে করে দ্যাখো, ভদ্রলোক পাশের বাড়ীতে এসে বাস করছেন ঠিক তিন মাস হবে এই আসছে মঙ্গলবারে। এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে সে যেন মনে হয় তিন বছর, আবার অন্য ভাবে ভাবলে তিন সপ্তাহের বেশি মনে হয় না। সময়ের ধরণই এই, ঠাকুর্দা, তুমি যতই কাঁটায়-কাঁটায় নিয়ম ধরে টিক্‌টিক্ করে চল না কেন, সময়ের ধরণ চিরকাল এই থাকবে। হয়, গুটি-গুটি চলছে কীটের মত ঘুরে-ঘুরে, আর নয়ত···আর নয়ত গড়্‌গড়িয়ে চলছে কসাইর গাড়ীর মত।···এঁ্যা! কি হবে! [ততক্ষণে আবার সে বসে পড়েছে] দিদির দেরি হয়ে গেল, ঠাকুর্দা! এত দেরি হতে ত কখনো দেখিনি যদি কিছু একটা ঘটে থাকে! কি হবে!

[বাগান-সংলগ্ন দরজাতে মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। দরজা খুলে গেল, দরজার চৌকাঠের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সৌম্যবাবুকে।—প্রৌঢ় বয়স্ক, ভারিক্কী চাল-চলন, কথাবার্তা ওজন-করা, গোলগাল ফর্সা মুখ জুড়ে গোঁফ, একটু-আধটু পাক ধরেছে। মণিকা লজ্জা-সঙ্কোচে ঈষৎ ত্রস্ত।]

সৌম্যবাবু। [স্পষ্টতঃই কথা বলতে বিশেষ অভ্যস্ত নয় তাঁর গলা, সেই গলাকে সচেষ্ট ভাবে ঝেড়ে] নমস্কার, মণিকা দেবী!

মণিকা। কে? সৌম্যবাবু?

সৌম্যবাবু। [চার দিকে তাকিয়ে] আপনার দিদি বাড়ীতে নেই?

মণিকা। না, সৌম্যবাবু, এখনো ফেরেনি। আমার ত একটু ভাবনাই ধরে গেছে। চারটের বেশি দেরি ওর কোনো দিন হয় না, আর দেখুন না, চারটে বেজে গেল আজ।

সৌম্যবাবু। তাহলে একেবারে একাই রয়েছেন আপনি?

মণিকা। [সে সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ ভাবে সচেতন হয়ে] হাঁ, একেবারে একা। [স্বচ্ছন্দ হওয়ার চেষ্টা করে] ভিতরে আসবেন না সৌম্যবাবু?

সৌম্যবাবু। [একটু চিন্তা করে] না, থাক, ধন্যবাদ। এখানেই বেশ আছি। দেখুন না, পান রয়েছে মুখের ভিতরে। এখান থেকেই পিক ফেলতে বেশ সুবিধে। [সুবিধেটা কার্যতঃ প্রমাণ করে] রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল যেন কথাবার্তা শুনলাম ঘরের ভিতরে। ভাবলাম আপনার দিদি বাড়ীতে এসে থাকবেন।

মণিকা। কথাবার্তা? ওঃ! সে আমি নিজের মনে বিড়-বিড় করছিলাম। ব্যাপার কি জানেন? [সলজ্জ ভাবে চাপা

হাসি হেসে] এখানে বসে বসে এই ঠাকুর্দার সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম।

সৌম্যবাবু। [ঘরের ভিতরে গলা বাড়িয়ে] ঠাকুর্দা ? ওঃ ! হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, এই ঘড়ির সঙ্গে।—ঠাকুর্দার সঙ্গে আলাপ ? [কিঞ্চিৎ হেসে] তা, আলাপ করা চলে বৈ কি !

মণিকা। [একটু অপ্রতিভ ভাবে হাস্য-বিনিময় করে] কাজটা নিতান্তই নির্বোধের মত, তা স্বীকার করি। কিন্তু কি জানেন, আমি যখন একা-একা থাকি, তখন ঠাকুর্দার সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ না করে পারি না। [কিঞ্চিৎ আত্মপ্রত্যয় সংগ্রহ করে] যাই বলুন, সঙ্গী হিসেবে কিন্তু চমৎকার,—নির্বিরোধ ভালোমানুষটির মত। দিদি ত প্রায়ই বলে, ঠাকুর্দা আমাদের ঘরেরই একজন পুরুষমানুষের মত। আচ্ছা, সৌম্যবাবু, আমাদের আসা-যাওয়ার উপর কর্তৃত্ব করছে কে ? এই ঠাকুর্দাই ত। তিনিই ত সব সময় বলে দিচ্ছেন, এখন এটা কর্, এখন ওটা কর্। সময় হল, এবার ওঠ তোরা ঘুম থেকে, আগুন জ্বালিয়ে উনুনে আঁচ দে। এবার তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নে তোরা। তার পর আবার—উনুনের ছাই ঝেড়ে ফেলে এখন শুয়ে পড়্ দেখিনি। হ্যাঁ, ঠাকুর্দাই এই বাড়ীর কর্তা। আমি মনে-প্রাণে তাই বিশ্বাস করি। আমরা দুটি নিঃসঙ্গ মেয়ে, কার উপরেই বা নির্ভর করি, বলুন ? তাই ঠাকুর্দার উপরেই আমাদের ভরসা, তাঁকে নিয়ে এ সব কথা আমরা ভাবব, তার আর বিচিত্র কি ? আর, তাও বলি, এ রকম নির্ভরযোগ্য সুন্দর ঘড়ি এ তল্লাটে কোথাও আপনি খুঁজে পাবেন না।

সৌম্যবাবু। হ্যাঁ, ইনি যে একজন প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিপদবাচ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। [কিয়ৎক্ষণ থেমে তিনি একটু পা নাড়াচাড়া করেন, মণিকা মুখ নীচু করে আর দু'-একটা সেলাইয়ের ফোঁড় দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে] এগুলো কি আমার মোজা ?

মণিকা। হ্যাঁ, সৌম্যবাবু। রিপুটা শেষ হয়ে এল বলে [একটুখানি চুপচাপ] পিঠেগুলো আপনার ভালো লেগেছিল, আশা করি।

সৌম্যবাবু। চমৎকার হয়েছিল পিঠেগুলো। [ঘরের ভিতরে এক পা অগ্রসর হয়ে] আমার জন্যে অনেক উপদ্রব সহ্য করেন আপনারা দুই বোনে, মণিকা দেবী।

মণিকা। না, না, উপদ্রব কিছু নয়, সৌম্যবাবু ! আর, এটুকু না করে উপায় কি বলুন। আপনি আমাদের পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী, আছেন একলা, দেখাশোনা করার কেউ নেই। নিজের সব নিজে দেখে-শুনে করবেন, তার কোন ধারণাই নেই আপনার। এ বিষয়ে আপনি শিশুর মতই অক্ষম।

সৌম্যবাবু। রান্না-বান্না বিষয়ে আমি একদম আনাড়ি, তা সত্যি। [আর এক পা অগ্রসর হয়ে] শুধু রান্না-বান্নার কথা বলছি না। রান্না-বান্নাই ত মানুষের জীবনে সব নয়। আর, মোজা রিপু করার কথা, সে আমি চেষ্টা করে দেখেছি। এ যেন মাছধরার জাল, একটা রিপু করতে না করতে আর একটা ফুটো বেরিয়ে পড়ে। না, বাস্তবিকই আমি খুব আরামে আর আনন্দে আছি আজকাল। জীবনে এত আরামে কোন দিন ছিলাম না।

মণিকা। [আগ্রহের সঙ্গে] আনন্দ হল শুনে। আপনার যখন যা দরকার হয়, অসঙ্কোচে বলবেন, আমাদের যথাসাধ্য আমরা করব।

সৌম্যবাবু। ধন্যবাদ, মণিকা দেবী। আপনাদের সহৃদয়তার তুলনা নেই। [আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে যান, মনের একটা গোপন কথা কিছু বলতে যেন উদ্যত। সঙ্গে সঙ্গে মণিকা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ে আবার] একটা কথা বলব ভেবেছিলাম—একটা বিশেষ কথা,—বলা প্রয়োজন, এসেছিলামও এই উদ্দেশ্যেই। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, আপনারা দু'জনেই তাতে জড়িত। তাই কণিকা দেবী ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করাই বোধ হয় উচিত।

[একটা চেয়ারে জমিয়ে বসবার স্থির-সিদ্ধান্তে উদ্যোগ-আয়োজন]

মণিকা। [অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনার আশঙ্কায় আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত] এতক্ষণ দেরি হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে ? এত দেরি ত কোন দিন হয়নি। সৌম্যবাবু—

সৌম্যবাবু। বলুন।

মণিকা। হয়ত আপনার উপর অত্যাচার করছি,—যদি কিছু মনে না করেন, রাস্তায় একটু এগিয়ে দেখ্‌বেন কি, দিদির দেখা পান কি না ?

সৌম্যবাবু। [অনাগ্রহের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে] নিশ্চয়, নিশ্চয়, মণিকা দেবী, আপনি বললে অবশ্যই যাব, চিন্তা করার কোন কারণ নেই যদিও। কণিকা দেবী কচি খুকি নন, ভয়ের কিছু নেই। যাক্ গে, আপনার মনে যখন দুশ্চিন্তা ঢুকেছে, আমি যাচ্ছি, রাস্তার ঐ চৌমাথার মোড় পর্যন্ত গিয়ে দেখব। [যেতে যেতে] উতলা হবেন না, উনি ঠিক এসে পড়বেন।

[প্রস্থান।

মণিকা। [জানালার কাছে গেল, সৌম্যবাবু চোখের আড়ালে চলে গেলে পর] অত্যন্ত আড়ষ্ট ভাবে চলছেন,—দেখেছ ঠাকুর্দা ? ভদ্রলোক যখন আরাম করে বসতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়েই কিনা আমি তাঁকে তাড়িয়ে দিলাম। কী লজ্জার কথা ! কিন্তু আমার ত আর কিছু করার উপায় ছিল না। দিদিও যখন ঘরে থাকে, তখন কোন হাঙ্গামা নেই, কিন্তু একলা এক ঘরে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে বসে থাকা—নাঃ, সে আমার দ্বারা কখনো হবে না তা সে যত কর্তব্যোচিত কাজই হোক্ না কেন। [জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে টেবিল ঝাড়তে থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর্দার সঙ্গে বাক্যালাপ চলছে অবিচ্ছিন্ন ভাবে] একটা বিশেষ কথা আমাদের কাছে বলার ছিল ? আমার মনে হয়—[একটু উদ্বিগ্ন ভাবে] বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দেবেন না তো ? দূর্ ছাই। কি সব আবোল-তাবোল বকছি, ঠাকুর্দা ! উনি ত সে রকম তরলমতি লোক নন। তুমি ত আমার চেয়ে তা ভালো জান। 'জীবনে এত আরামে কোন দিন ছিলাম না'—বললেন তিনি। তুমি নিজেই ত শুনেছ।···কী তাঁর মনে ছিল, কি জানি। [একটা বিস্ময়কর চিন্তা আকস্মিক ভাবে মনে এল] এঁ্যা, যদি মনে করে থাকেন—দূর্ ছাই ! কী সব হতচ্ছাড়া চিন্তা ! সে রকম কোন ইঙ্গিত ত মুখের কথায় বা চোখের দৃষ্টিতে কোন দিন

দেননি। তাছাড়া, যদি তা-ই হয়, তবে বুঝতে পারছ না, ঠাকুর্দা, তিনি কি আমাদের ছু'জনের এক জনকেই ডেকে, তা সে সে-ই হোক্ না কেন, বলতে চাইতেন না? কিন্তু তিনি বললেন, সেই বিশেষ কথাটা আমাদের ছু'জনকেই বলতে চান।······ যাক্ গে, জানা যাবে ত আর একটু পরেই। [ঘড়ির কাছে গিয়ে] ও কি, ঠাকুর্দা? চারটে বেজে দশ! কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে, আমি বুঝতে পারছি, নিশ্চয়ই ঘটেছে। [একটা চেয়ারে অসহায় ভাবে বসে পড়ে কাঁদো-কাঁদো ভাবে] ও দিদি, দিদি গো! [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার স্বরে] টিক্-টিক্, টিক্-টিক্! গ্রাহ্যই নেই তোমার! প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হলেও তোমার টিক্-টিক্ নিয়েই তুমি ব্যস্ত থাকবে, যতক্ষণ না আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছ। সত্যি কথা বলতে কি, পেটের ভিতরে কতকগুলো চাক্‌তী পুরে নিয়ে তুমি ত খাঁচার মত বসে আছ, হৃদয় বলে কি কোন পদার্থ আছে তোমার ভিতরে? তোমাতে আর ছোট্ট ট্যাকঘড়িতে তফাৎ কোথায়? [অশ্রুভারাক্রান্ত ভাবে] শ্রী সাফ করতে পাঠাবার সময় তুমি—এই তুমিই বাজিয়েছিলে সতেরোটা!···আঁা! [বাইরে একটা শব্দ শুনে জানালার কাছে দৌড়ে গেল] যাক্, বাঁচা গেল, ঠাকুর্দা! এই যে এসে পড়ল দেখছি দিদি শেষটা। বাঁচালে ভগবান!

[দরজা খুলে গেল সজোরে, ত্রস্তপদে কণিকা ঢুকল ঘরে এবং ঢুকেই শ্রান্ত ভাবে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। মণিকার চেয়ে বছর কয়েকের বড় কণিকা এবং তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত। চলাফেরা পাখীর মত ক্ষিপ্র ও চটুল এবং কথা বলার সময় অঙ্গভঙ্গী করা প্রায় মুদ্রাদোষের অন্তর্গত। তার এক হাতে একটা ঝুড়ি, সপ্তাহের খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ।]

মণিকা। [আনন্দে আশঙ্কায় দ্বিধাগ্রস্ত] দিদি, কি হয়েছে? ব্যাপার কি, দিদি?

কণিকা। [হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণ কণ্ঠে] ওঃ! মাথাটা গেল! কিছু যেন আর নেই মাথায়! কী কুক্ষণেই আজকের দিনটা আরম্ভ হয়েছিল! [ঝুড়িটাকে ধপ্ করে নামিয়ে রাখল] আর আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না। মণি, লজ্জা-অপমানের একশেষ হয়েছে আমাদের!

মণিকা। দিদি! [চেয়ারে বসে পড়ে কাঁদতে লাগল]

কণিকা। [কতকটা জোর করে আত্মস্থ হয়ে] কান্না থামাও, মণি! আগে শোনই ব্যাপারটা, তার পরে কাঁদতে বোসো। কাঁদতে জানি আমিও। [সে তার কাহিনী বলতে আরম্ভ করল ক্ষুব্ধ বিষণ্ণতার সঙ্গে এবং অপূর্ব বাক্‌পটুতা সহযোগে] একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছে বলে আমার সন্দেহ হয়েছিল গত সপ্তাহেই, যখন দেখলাম, ঐ সেই বিষকুম্ভী ধুমসী বুড়ী পাকড়াশী-গিন্নী আর ও-পাড়ার দুর্গামণি ঠাকরুণ ছু'জনে মিলে কানাকানি ফিস্‌ফিসানি চল্‌ছে আর আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে দাঁত বের করে হাসাহাসি! ঐ ছু'টি রত্ন একসঙ্গে জুটলে তারা যে কারুর প্রশংসায় বিগলিত হয়ে পড়ে না, এটা ঠিক জেনো। আমি কিন্তু সে সব গ্রাহ্যই করিনি। ওদের মত বিশ্বনিন্দুকদের মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। আজ হয়েছে কি জানিস্, আমি ত আমাদের হাঁস জোড়া বিক্রী করলাম—হাঁসের দাম এক টাকা ন' আনাতে নেমে গেছে তাও পেলাম যেন বহু ভাগ্যে—হাঁস জোড়া বিক্রী করে কিন্‌লাম আটা, ময়দা, চিনি আর মাংস—পাঁঠার মাংসটা খুব চমৎকার, তার সঙ্গে মিটুলিও এনেছি। সবই কেনা হল, বাকি রইল শুধু মাখন [উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের কোট, হাতের ঘড়ি ইত্যাদি রেখে] মাখন আজকাল হয়ে উঠেছে যেন বাঘের দুধ, পাওয়াই যায় না, আর দামও চড়েছে চার টাকায়। সব দোকানে তখন বিক্রী হয়ে গেছে ফুরিয়ে, একমাত্র ছিল ঐ পাকড়াশী-গিন্নীর কাছে—চিরকালই দেখে আসছি, ওর জিনিস বিক্রী হয় সব্বাইর শেষে, আর হবে না কেন। যাক্ গে, আমার ত মাখন না কিন্‌লে চলবে না, ওর ঐ পচা, বাসি গোবর দলা হলেও কিনতে হবে। কিন্‌লাম গিয়ে ওর কাছ থেকেই ছু' ছটাক। মুখে আমি কোন মন্তব্যই করিনি, নাকের কাছে তুলে ধরে হয়ত একটু নাক কুঁচকে থাকতে পারি। ঐ মাগীও গোড়ায় কিছু বলেনি। আমি দাম চুকিয়ে দিলে পয়সাগুলো গুণে সন্তর্পণে থলের ভিতরে রাখল—সেদিকে খুব হুঁসিয়ার মাগী। তার পরে বলে কিনা, 'খুব ভালো মাখন, কণিকা', যেন দৃক্‌পাত দেহি ভাব, যেন, আমি বলেছি, মাখন ভালো নয়। আমিও তেমনি, ওর মত মাগীর মন জুগিয়ে রাতকে দিন বলার পাত্রী আমি নই, এটা ঠিক জানিস্ তুই। আমি বললাম, 'এই দিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে, পাকড়াশী-গিন্নী, এর চেয়ে ভালো ত আর পাওয়া যাচ্ছে না, কি করা যাবে?' তখন ও উঠে দাঁড়িয়ে বলে কি, 'এত খুঁৎখুঁৎ ত তোমাদের আগে ছিল না। তোমাদের ঐ মনের মানুষটিরই বোধ হয় খুব বাবুয়ানা রুচি।'

মণিকা। [ত্রাসে বিহ্বল হয়ে] মনের মানুষ! দিদি! কে—

কণিকা। [গম্ভীর ভাবে] এখানকার কেবল মাত্র এক জনের কথাই আমার জানা আছে।

মণিকা। [নিশ্বাস রুদ্ধ করে] সৌম্যবাবু!

কণিকা। [কঠোর ভাবে আত্মসম্বরণ করে] হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তিটিই।—আমাদের মনের মানুষ—তোর এবং আমার। কথাটা যখন কানে এল, তখন আমার এমন অবস্থা যে, একটা পালক দিয়ে খোঁচা মারলেই বোধ হয় পড়ে যাব মাটিতে। জবাবে একটা কথাও আমার মুখে জোগাল না। বেশ বুঝতে পারছি, মণি, আমার সমস্ত মুখ-চোখ এক মুহূর্তে রাঙিয়ে উঠে কালো হয়ে গেল। এদিকে দুর্গামণি ঠাকরুণ পাশেই দাঁড়িয়েছিল, এবার সুরু হল তার পালা। গলিতনখী মার্জারী সুযোগ পেলে কি আর ছাড়ে? বলে উঠল—'লজ্জা তোদের হতে পারে, কণিকা! কিন্তু আমি বলি কি, তোদের ভালোর জন্যেই বলছি, বাছা, আমার কথা শোন্। যা হবার তা হয়েই গেছে, এখন তাড়াতাড়ি একটা বিহিত কিছু কর্ তোরা, তুই আর তোর সেই ধিঙ্গী বোন, তোরা ছু'জনে মিলে। তোদের সেই মিন্সে সৌম্যবাবুকে বল্, তোদের এক জনকে বিয়ে করে এই কেলেঙ্কারীটা বন্ধ করুক যত শীগ্‌গির সম্ভব।' [মণিকা উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠে আঁচলে মুখ ঢেকে ফেলল। কণিকারও ভেঙে পড়ার উপক্রম হল, কিন্তু আত্মসম্বরণ করে বলতে লাগল] কী লজ্জা! কী ঘেন্না! আমরা কারুর সাতেও

নেই, পাঁচেও নেই, কারুর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ নেই, কারুর নিন্দে-মন্দনায়ও থাকি না কোন দিন, তবু আমাদের পিছনে লাগা কেন? [আগুনের কাছে গিয়ে একটু খুঁচিয়ে দেয়] একটা কিছু করতে হবে, আর করতে হবে অবিলম্বে। [এক মুহূর্ত চিন্তা করে] উনি কোথায়?

…া। [আঁচলে মুখ ঢেকে, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো ভাবে কথা বলতে-বলতে] এইখানেই ত ছিলেন খানিক আগে···একটা বিশেষ কথা নাকি বলার ছিল আমাদের কাছে···বলবেন না তুই না আসা পর্যন্ত···তোর খোঁজ করতে গিয়েছিলেন রাস্তার দিকে।

…া। আমি পাহাড়ের পথ দিয়ে ঘুরে এসেছি। সেই জন্যেই ত এত দেরি হল। বুঝতেই পারিস, রাস্তায় কারুর সঙ্গে যাতে দেখা না হয়, সেই চেষ্টা করেছি। [বসে পড়ল] হুঁ! একটা বিশেষ কথা বল্‌বার আছে আমাদের কাছে! আছে নাকি? হুঁ! এবার বোধ হয় উল্‌টে ওঁকেই বিশেষ কিছু বলতে হবে আমাদের।

…া। [আঁচল মুখ থেকে ফেলে দিয়ে] দিদি! ওঁকে কিছু বলতে পার্‌বি না তুই! লজ্জায় মরে যাব আমি তাহলে!

…া। [অনিশ্চিত ভাবে] কি জানি, জানি নে। কিন্তু একটা কিছু ত করতেই হবে,—কী, তাই ভেবে উঠতে পারছি না। ওঃ! মাথা একদম ঘুরে গেছে, যেন গোলকধাঁধা!

…া। [চম্‌কে উঠে] দিদি! ফটক! ফটক খোলার শব্দ পেলাম! কে যেন আস্‌ছে!

…া। [দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে] ঐ ত, উনিই! ওঁকে কিছুতেই আসতে দেওয়া হবে না, কিছুতেই না। এই ঘরে আর পা মাড়াতে হবে না ওঁর কোন দিন। [দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে খিল বন্ধ করে দিল] ঐ যে!

…াস রুদ্ধ করে একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ ভাবে …অপেক্ষা করতে থাকে। দরজায় টোকা শোনা যায় অতি …ভাবে। একটু পরে দরজার কড়া ঝন্‌ঝন্ করে নড়ে উঠল। …র একটুক্ষণ চুপচাপ, তার পরে শোনা গেল সৌম্যবাবুর গলা]

…বাবু। বাড়ীতে আছেন কেউ?

…া। [দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে মুখ করে] দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, সৌম্যবাবু, আপনাকে ভিতরে আসতে দেওয়া হবে না।

…বাবু। কেন? কি হল আমাকে নিয়ে?

…া। সে আমি বলতে পারব না, কিন্তু আপনি ভিতরে আসতে পারবেন না। আমি কি দয়া করে চলে যাবেন, সৌম্যবাবু?

…বাবু। [এক মুহূর্ত চিন্তা করে] না। ব্যাপারটা কি, …জানা পর্যন্ত কিছুতেই নয়।

…া। [হতাশ ভাবে] আপনার পায়ে পড়ি, চলে যান।

…বাবু। [দৃঢ়তার সঙ্গে ধীরে ধীরে] কি হয়েছে, না-জানা পর্যন্ত কিছুতে নয়। দরজাটা যদি খুলে দেন তবে ধীরে-সুস্থে সব …তে পারবেন। আপনারা যদি না চান, তবে আমি ভিতরে ঢুকব না, কিন্তু ব্যাপারটা কি, জানার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।

কণিকা। [সন্ত্রস্ত ভাবে ফিস্ ফিস্ করে মণিকাকে] ভদ্রলোক কিছুতেই যাবেন না। কি করা যায়! [মণিকা অসহায় ভাবে মাথা নাড়ে] যদি আমি তাঁকে বলে দিই—[মণিকা আতঙ্কে হাত তুলে বারণ করে] কিছু একটা না বললে ত উনি যাবেন না। যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বলারই চেষ্টা করি। কি ঘটেছে জানতে পারলে তক্ষুনি ছুটে পালিয়ে যাবেন। আমাদের সঙ্গে যাতে তাঁর চোখাচোখি না হয়, সেদিকে সতর্ক থাক্‌ব। [একটা দুঃসাহসিক কাজের জন্য যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চয় করে খিল খুলে দরজাটাকে ইঞ্চি খানেক ফাঁক করে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিঠ দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে] আপনি দয়া করে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনার মুখের দিকে তাকাতে পারব না আমরা। কথাটা যদি বলতেই হয় তবে বলব, কিন্তু আপনার সামনে জীবনেও আর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব না।

সৌম্যবাবু। দুঃসংবাদটা কি এতই শোচনীয়?

কণিকা। তার চেয়েও শোচনীয়। এত শোচনীয় যে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না। [অদ্ভুত মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে] সৌম্যবাবু, সবাই আমাদের সম্বন্ধে বলাবলি করছে।

সৌম্যবাবু। আমাদের?

কণিকা। আপনার এবং আমাদের সম্বন্ধে। সারা শহর জুড়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে! কেলেঙ্কারী! হা ভগবান! এ সব শোনার আগে মরণ হল না কেন?

সৌম্যবাবু। [ধৈর্য অক্ষুণ্ণ রেখে] দয়া করে যদি সব ঘটনা আমাকে খুলে বলেন।

কণিকা। [অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে] আমরা ত কোন অনিষ্ট চিন্তাও করিনি। আপনার সঙ্গে শুধু প্রতিবেশীর মত ব্যবহার দেখিয়েছি। তা ছাড়া, আপনি নিতান্তই নিঃসঙ্গ, অসহায়।—এ সব কথা বলা পাপ, লজ্জাকর!

সৌম্যবাবু। [অসীম ধৈর্যের প্রতিমূর্তি] কী সব কথা বলা?

কণিকা। এই কথা [হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল]—এই কথা যে, আমাদের এক জনকে অবিলম্বেই বিয়ে করা উচিত আপনার।

[আসন্ন পরিণতির প্রত্যাশায় দু'জনেরই মন দুরু-দুরু। প্রথমেই তারা শুনতে পেল একটা দীর্ঘায়িত মৃদু শীষধ্বনি। তার পর বিমূঢ় হয়ে শুন্‌ল তারা মৃদু হাস্য। কণিকা সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে এল দরজা ছেড়ে। উন্মুক্ত হয়ে গেল দরজা। সৌম্যবাবুকে দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছেন সহাস্যবদন]

সৌম্যবাবু। ও-সব ত কোন্ কালের পুরানো কাসুন্দি। কবেই শুনেছি আমি। আমাকে বলতে এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন? আমিও ত মনে মনে ভেবেছি ঠিক এই কথাই।

কণিকা। [হতভম্ব হয়ে] কি ভেবেছেন?

সৌম্যবাবু। [ধীর ভাবে] কেন?—এই পাণিপ্রার্থী হওয়া!

কণিকা। [রুদ্ধ নিশ্বাসে] আপনি কি বলতে চান—

সৌম্যবাবু। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই রবিবার থেকে একপক্ষ কাল পরে—যদি আপনারা অপরাধ না নেন, যদি আপনারা দয়া করে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। [মণিকার প্রতি] ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে এসেছিলাম। ঘটনাচক্রের কী আশ্চর্য পরিণতি!

কণিকা। কিন্তু—আমরা ত কিছুই লক্ষ্য করিনি।

সৌম্যবাবু। না—কী করেই বা আপনারা লক্ষ্য করবেন? কি জানেন, এটাও ঠিক ঐ রান্নার ব্যাপারের মতই। আমি নিতান্তই আনাড়ি কি না। যাক, এবার ত আর গোপন রইল না। আমার উপরে রাগ করেননি, আশা করি?

কণিকা। না, না। কিন্তু সৌম্যবাবু—

সৌম্যবাবু। না, ব্যাপারটা এবার ভালো করে চিন্তা করুন আপনারা বসে-বসে। এতে টাকা-পয়সা আর হাঙ্গামা, দুই-ই যথেষ্ট বাঁচবে। আমার সঞ্চয়ের পুঁজিতে টাকাও জমেছে শ' কয়েক। বয়সে অবশ্য এখন আর তেমন তরুণ নই, কিন্তু আমাদের মধ্যে কারই বা সে বয়স আছে? তবে একেবারে বুড়িয়েও যাইনি বোধ হয়। আপনাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ভাবতেই পারি নে। আমার ত মনে হয়, একসঙ্গে বেশ আনন্দে আর আরামেই থাকতে পারব আমরা—এই আমরা তিন জনে, যদিও অবশ্য দু'জনকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আপনারা আলোচনা করে দেখুন। সেই বেশ হবে। নয় কি? আমি আবার আজ বিকেলের দিকেই একবার ঘুরে আসব?

[চলে গেল। মণিকা বসে পড়ল অভিভূতের মত। কণিকা মুহূর্তকাল শূন্যমনে বিমূঢ়ের মত বসে থেকেই উঠে গেল দরজার দিকে এবং ডাক দিল]

কণিকা। সৌম্যবাবু!···একবার দয়া করে আসুন এক মিনিটের জন্যে।

সৌম্যবাবু। [ফিরে এসে] বলুন!

কণিকা। [বিষম বিপন্ন ও হতবুদ্ধির মত] মাপ করবেন, জিজ্ঞেস্ করছি বলে। কিন্তু—আপনি কি দয়া করে বলবেন, আমাদের মধ্যে কোন্ জনের পাণিগ্রহণ করার কথা ভাবছিলেন আপনি?

সৌম্যবাবু। শুনে হয়ত হাসবেন আপনারা। কোন্ জন? সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেই জানি না—কোন্ জন। [উৎসাহ ভরে] যাক্, এতে কোন ইতরবিশেষ হবে না। আপনারা নিজেরাই এর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলুন। কোনো পক্ষ সম্বন্ধেই আমার তেমন বিশেষ কোনো-ইয়ে নেই।

কণিকা। [অজ্ঞাতসারেই হেসে উঠে] বাঃ! বেশ! সৌম্যবাবু! এমন অদ্ভুত কথা ত্রিভুবনে কাউকে কি কেউ বলতে শুনেছে কোন দিন? [বসে পড়ল]

সৌম্যবাবু। [মৃদু হেসে] তা ঠিক। আপনারা যত খুসি হাসুন। মণিকা দেবীও হাসছেন যে দেখছি। [আড়চোখে মণিকার দিকে তাকান। মণিকা অপ্রস্তুত হয়ে মুখ টিপে হাসতে থাকে] যাক্, এখন আর কারুর কোন অস্বস্তিবোধ নেই। বিবেচনা করি, এখন বোধ হয় আমি ভিতরে আসতে পারি, আর ভয় নেই কলঙ্কের। [দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটা চেয়ারে এসে বসেন, দুই হাঁটুর উপরে হাত রেখে হাস্যোজ্জ্বল মুখে দুই বোনের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন] হ্যাঁ, আমার অবস্থা হয়েছে সেই বিড়ালের মত—বহ্ন্যুৎসবের মাঝখানে বসে ভেবে পাচ্ছে না কোন্ দিক দিয়ে যাবে। আমি এই দিক দিয়ে ভেবে দেখেছি, ওই দিক দিয়েও চিন্তা করেছি, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হতে পারছি না। সব সময়েই একসঙ্গে দু'জনকে দেখে-দেখে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, এক জনের থেকে আর এক জনকে আলাদা করতে পারি না—জলের থেকে যেমন দুধকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু আমি ত আগেই বলেছি, এতে কিছু যায়-আসে না। আপনারা যদি দয়া করে দু'জনের মধ্যে একটা মীমাংসা করে নেন—

কণিকা। [প্রবল ভাবে আপত্তি জানিয়ে] আমরা কিছুতেই পারব না।

সৌম্যবাবু। [মণিকার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে] আপনিও পারবেন না?

মণিকা। [মাথা নেড়ে] সেটা ঠিক হবে না।

সৌম্যবাবু। [হাল ছেড়ে দিয়ে] আচ্ছা, আপনাদের যা অভিরুচি। মুস্কিল হয়েছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—হুঁ।

[মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সমস্যা সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন। দুই ভগিনী স্থাণুবৎ নিস্তব্ধ, শূন্যদৃষ্টি সম্মুখ দিকে প্রসারিত। মাথা তুলে তিনি মণিকার দিকে তাকান]

মণিকা। [তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে ব্যস্ত ভাবে] বিধি-ব্যবস্থা করতে দিদিই সব চেয়ে পটু।

[সৌম্যবাবু আশান্বিত ভাবে কণিকার দিকে তাকান]

কণিকা। [ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে] রান্না-বান্নাতে মণিকার কাছে কেউ লাগে না।

সৌম্যবাবু। [হাঁটুর উপরে হাত চাপড়ে] ব্যাপারটা হচ্ছে এই—আপনাদের দু'জনকে মিলিয়ে এক করতে পারলে হবে একটি সুসম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট রচনা। দুয়ে মিলে যা, তার চেয়ে কাম্য বস্তু কোন পুরুষ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। গোল হচ্ছে এইখানেই। সমস্যা সমাধানের ত কোন পথই খুঁজে পাই নে—অন্ততঃ বর্তমান সভ্য সমাজে। [প্রগাঢ় চিন্তার পর] ইস্লাম ধর্মী মুসলমানদেরই দেখছি দু'-একটা বিষয়ে সুবিধে বেশি। তাই নয় কি?

কণিকা। [প্রচণ্ড ভাবে আহত হয়ে] সৌম্যবাবু, আপনার কথা বলার ধরণ দেখে অবাক হচ্ছি।

সৌম্যবাবু। না, না, ওরকম চিন্তা করাও অন্যায়, তা আমি জানি। কিন্তু আর কোন উপায়ও যে খুঁজে পাই নে। [একটা চমৎকার কল্পনা এল মাথায়] এক কাজ করা যাক্—একটা আধুলি উপরে ছুঁড়ে কোন্ দিকে চিৎ হয়ে পড়ে দেখে তার নির্দেশ মেনে চলা যাক্।

কণিকা। [আরো মর্মান্তিক ভাবে আহত বোধ করে] না, কক্ষনো নয়—আমাদের বাড়ীতে এ সব চলবে না।

সৌম্যবাবু। কেন চলবে না, বুঝতে পারি নে। এ ত সোজা লটারি খেলা, এমন কিছু অশাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়। স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যদি পাশা খেলতে পারেন, তবে আমাদের এতে অন্যায়টা কোথায়?

কণিকা। [দ্বিধাভরে] এ একটা অস্বাভাবিক পথ। তবে আপনি যদি নিঃসন্দেহ হন যে, অশাস্ত্রীয় নয়—

সৌম্যবাবু। মহাভারতের নজীর রয়েছে যে। অশাস্ত্রীয় হবে কেন? [মণিকার প্রতি] আপনি কি বলেন?

মণিকা। [লাজুক ভাবে] তা, যুধিষ্ঠিরের নজির চলতে পারে বোধ হয়।

সৌম্যবাবু। [বিজয়োল্লাসে] দেখলেন ত! এখন কি বলেন? [কণিকার দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে তাকান। কণিকা সন্দিগ্ধ ভাবে ঘাড় নাড়ে, কিন্তু আর সাধা দেয় না। সৌম্যবাবু পকেটে হাত দিয়ে একমুঠো সিকি-আধুলি-রেজগী বের করেন, একটা আধুলি বেছে নিয়ে তুলে ধরেন] হ্যাঁ, যদি রাজার মাথা দেখা যায়, তবে কণিকা দেবী, আর উল্টো দিক পড়লে মণিকা দেবী। এই চলে গেল উপরে [তিনি আধুলিটাকে পাক খাইয়ে ছুঁড়ে মারেন, কিন্তু হাতের উপরে ধরতে গিয়ে ফস্কে যায়। পড়ল গিয়ে একটা কোণে। তিনি নেমে গিয়ে হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে আধুলিটাকে হাতড়ে বেড়ান। এদিকে ভগিনীদ্বয় আত্মসংবরণ করার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে] দূর ছাই! [আধুলিটাকে হাতে করে উঠে দাঁড়ান] মেঝেটা যদি পাকা হত!

কণিকা। [ক্ষীণকণ্ঠে] হল কি?

সৌম্যবাবু। দেখুন না, পড়ল গিয়ে ঐ এক গর্তে। আর তাও আটকে আছে কাৎ হয়ে,—না চিৎ হল রাজার মাথা, না উল্টো দিক। এর থেকে কে কি ধরতে পারে, বলুন? আচ্ছা, আমার রান্নাঘরের মেঝে ত পাকা, আপনাদেরটা কাঠের হল কেন?

মণিকা। বাড়ীগুলো যখন তৈরি হয়, তখন বাবা ইচ্ছে করেই এ রকম করেছিলেন। তিনি অনেক সময়ই সন্ধ্যার পরে পায়ের জুতো খুলে ফেলতে ভালোবাসতেন, আর পাকা মেঝে হলে তাতে পায়ে অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা লাগে, তাই।

সৌম্যবাবু। [বসে পড়ে] ঘটনাচক্র কি ভাবে চলে, দেখুন।

মণিকা। [গম্ভীর ভাবে] ভগবানের নির্দেশ!

কণিকা। [অনুরূপ গাম্ভীর্য সহকারে] নিশ্চয়ই এর একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। হয়ত ঠিক এই মুহূর্তেই বাবার দৃষ্টি রয়েছে আমাদের উপরে—কিছু বিচিত্র নয়। সৌম্যবাবু, আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটা নিছক নির্বুদ্ধিতা। এ সম্বন্ধে আমাদের আর উচ্চবাচ্য না করাই সব চেয়ে ভালো।

সৌম্যবাবু। আমি তো স্বীকার করি না। আপনার বাবা হয়ত চটিজুতো-পরা পছন্দ করতেন না, কিন্তু তার জন্যে কোন্ আইনে আমি বিয়ে করব না—যদি বিয়ে করা আমার অভিপ্রেত হয়। অন্য কোন উপায় বের করতে হবে—এই যা। [চিন্তামগ্ন]

মণিকা। [ভয়ে ভয়ে] যদি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা যায় আর সৌম্যবাবু চলে যান আমাদের কাছ থেকে দূরে, তবে হয়ত নিজের কাছে তাঁর মনের কথা ধরা পড়তে পারে।

সৌম্যবাবু। [সন্দিগ্ধ ভাবে] হয়ত পড়তে পারে, আবার হয়ত না-ও পড়তে পারে। মনটা বোধ হয় একটা জটিল যন্ত্র।

কণিকা। লোকে বলে, দূরে গেলে নাকি মনের টান বাড়ে।

সৌম্যবাবু। অতি সত্য কথা। কিন্তু যদি আপনাদের দু'জনের দিকেই টানটা বাড়ে? তবে? তা হলে কি হবে আমাদের অবস্থাটা? যাক্, আপনারা যখন বলছেন, তখন দেখব চেষ্টা করে, কিন্তু লাভ কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না। [দাঁড়িয়ে উঠে] আচ্ছা অদ্ভুত এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যা হোক! এ যেন গল্প-উপন্যাসের এক জট-পাকানো প্লট। অনেকার সব প্লট থাকে কিন্তু সে সব বইয়ে, যদিও তার মূলে কোন সত্যই থাকে না। আর আমি যত দূর বুঝতে পারছি—

কণিকা। [মাটিতে পদাঘাত করে] অসহ্য! কী রকম একটা সঙ্কটের মুখে এনে ফেলেছেন আমাদের! তার জন্য নত হয়ে কোথায় হাত জোড় করে আমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চাইবেন, তা না, গল্প-উপন্যাস নিয়ে হাসি-মস্করা করতে মেতে উঠেছেন আপনি! এতখানি বয়স হল, পুরুষ মানুষ, আর মনস্থির করতে শিখলেন না এখনো? অসহ্য লাগে আপনাকে!

সৌম্যবাবু। [তার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে] আঃ! তেজ দেখলেও ভালো লাগে! আপনাকে দেখলে মনে হয়, যেন আবার নিজের বাড়ীতে চলে গেছি, বোনের সঙ্গে আছি। আমার বোনও ঠিক এই ধরণের। তাকে চটিয়ে দিলে ঠকাস্ করে বেলুনি দিয়ে কত দিন যে মেরেছে আমার মাথায়, তার ঠিক নেই। স্ত্রী হিসাবেও সে হয়েছিল একটি রত্ন—তাও একবার নয়, দু'-দু'বার। আমি ভাবছি কি—[কণিকার দিকে তেমনি চিন্তামগ্ন ভাবে তাকাতে থাকেন, এমন সময় মণিকা নিজের অজ্ঞাতসারে একটু নড়েচড়ে বসতেই তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন] নাঃ! বুঝতে পারছি না। কথায় বলে, যোগ্যং যোগ্যেন,—আর আমি হচ্ছি নিজে শান্ত-প্রকৃতির মানুষ। চেহারার কথা বলতে গেলে—[মাথা চুলকে একবার এক জনের দিকে, আবার আর এক জনের দিকে তাকান] নাঃ! কিছুই বুঝতে পারছি না। [মণিকার প্রতি] নাঃ! আর
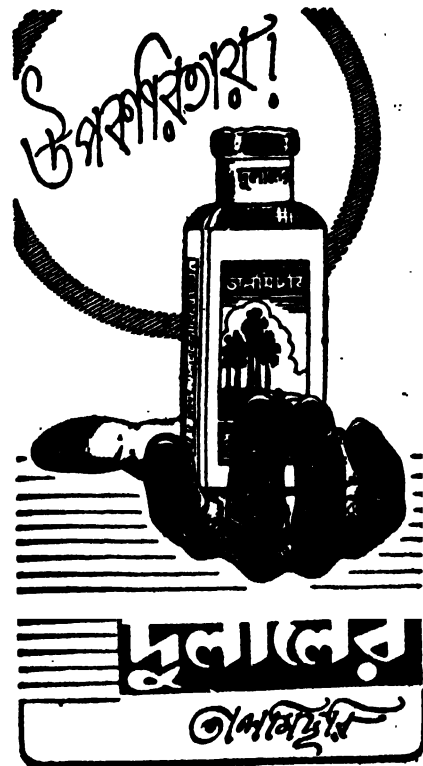
কোন পথই দেখছি না, আপনার প্ল্যানটাই পরীক্ষা করে দেখা যাক্‌। [দরজার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ থেমে] তবু কি মনে হয়, জানেন ?—যদি মুসলমান হয়ে জন্মাতে পারতাম !

[বেরিয়ে গেলেন। ভগিনীদ্বয় বসে থাকে নির্বাক্‌। উভয়ের মধ্যে একটা গোপনতার পর্দা নাম্‌ল তাদের জীবনে এই প্রথম। এক জনের উপস্থিতি অন্যের কাছে মনে হতে থাকে দুঃসহ ও অস্বস্তিকর। কণিকাই উঠল প্রথমে]

কণিকা। [দাঁড়িয়ে উঠে পরুষ কণ্ঠে] সাড়ে চারটে বাজতে চলল। এবার রান্না-বান্নার জোগাড় দেখতে হবে না ?

মণিকা। [উঠে কাজে লাগল] ভাবছি, পরোটা বানাব আজ।

কণিকা। [নাক সিঁটকে বিরক্তি সহকারে] ইচ্ছে হয়ত বানাও গিয়ে। তোমার ঐ পরোটা সম্বন্ধে বলতে চাই নে কিছু, বলিওনি কোন দিন। সে তুমি ভালোই জান। কর গিয়ে তোমার যা খুসি।

মণিকা। [কিঞ্চিৎ ভয়ে-ভয়ে, কিন্তু নিজের মত বজায় রেখে] হ্যাঁ, পরোটাই বানাব। [তাকের কাছে গিয়ে] আটা কোথায় ?

কণিকা। ঝুড়িতে আছে, তাও জান না ? কোথায় আবার থাকবে ? [ঝুড়িটা উঠিয়ে টেবিলের উপরে রাখল দুম্‌ করে। ভিতরের প্যাকেটগুলো কোনটা রাখল টেবিলের উপরে, কোনটা তাকের উপরে] ঐ নাও ! বানাও গিয়ে তোমার পরোটা ! মাংসটা চড়াই গিয়ে আমি। [পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল]

মণিকা। [হঠাৎ হাতের কাজ ফেলে দিয়ে ঘড়ির প্রতি কাতর অনুনয়ে] ঠাকুর্দা !—ও, ঠাকুর্দা ! কী হয়েছে দিদির, মিছামিছি কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দিল আমাকে ? আর, আমারই বা হল কি ? আমিও ত তার মুখে-মুখে কম জবাব দিইনি ? [একমনে কাজে মনোনিবেশ] পরোটা যা হবে আজ, তা জানি, ঠাকুর্দা ! কী যে করছি, নিজেই জানি না !···ঐ ছাখো ! ডিমের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম !

[পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এক চুপড়ী ডিম নিয়ে এল। একটা বাটিতে ভাঙল একটা ডিম। এমন সময় ফিরে এল কণিকা, টেবিলের দিকে এক নজর তাকিয়েই ডিমের চুপড়ী দেখে পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল]

কণিকা। [চুপড়ী দেখিয়ে নির্মম স্বরে অনুচ্চ কণ্ঠে] ঐ ডিমগুলো এনেছ বুঝি !

মণিকা। [একটু ভয় পেয়ে থেমে, মৃদু স্বরে] এনেছি ত হয়েছে কি ?

কণিকা। [গলার স্বর চড়িয়ে] তুমি বেশ ভালো রকমই জান যে, আজ তা দেওয়াবার জন্যে ঐ ডিমগুলো আমি রেখে দিয়েছিলাম !

মণিকা। [কাঁপতে কাঁপতে আশ্রয়ের জন্য টেবিল ধরে] জানলেই বা হল কি ?

কণিকা। [গলার স্বর আরো চড়িয়ে] তা হলে ঐ ডিমগুলো এনেছ কেন ?

মণিকা। আমি—আমার ইচ্ছে হলে যত খুসি ডিম আনব। নাও, হল ত ?

কণিকা। [কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে এবং বাক্যস্রোতে যতি না দিয়ে] কী নীচ মনোবৃত্তি !—হ্যাঁ, নীচ মনোবৃত্তি !—হ্যাঁ, নীচ না ত কী ! আমার ডিমগুলো নিয়ে এলে—তা দেওয়াবার জন্যে রেখেছিলাম আমি ! তুমি জান, ওদিকে হাঁসটা বসে আছে বাসার ভিতরে ডালা ছড়িয়ে দিয়ে ডিমে তা দেবে বলে। এ কী নীচ মনোবৃত্তি আমার ডিম নিয়ে এসে—

মণিকা। [ব্যঙ্গ করার ব্যর্থ নিষ্ফল চেষ্টায়] চুলোয় যাও গে তুমি তুমি তোমার ঐ এঁদো পচা ডিম নিয়ে ! [কেঁদে ফেলল]

কণিকা। [দৌড়ে কাছে গিয়ে] মণি ! বোনটি আমার ! [পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্না] এ যে চিন্তারও বাইরে ছিল ! আজ এত বছরের মধ্যে কোন দিন একটাও কথা কাটাকাটি হয়নি, আর আজ—জাহান্নমে যাক্‌ ঐ লোকটা !

মণিকা। [আহত হয়ে] দিদি !

কণিকা। [মরীয়া হয়ে] জাহান্নমে যাক !—আবার বল্‌ছি। কী কুক্ষণেই দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে ! নিজের চরকায় তেল দিক গে বসে-বসে !—তাই বল্‌ব এবার !

মণিকা। দিদি ! বল্‌তে গেলে আমরা দু'জনেই যে কথা দিয়ে ফেলেছি ! [বসে পড়ল] তা ছাড়া, বললেও যাবে না। দেখতেই অমনি সাদাসিধে, কিন্তু গোঁ আছে পুরোমাত্রায়

কণিকা। [মরীয়া হয়ে] এক মাসের নোটিশ দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মণিকা। দিদি ! তা হয় না ! নিরীহ মানুষ—দু'জনে মিলে অপমান করব একসঙ্গে, আবার ঘর-বাড়ীছাড়া করে তাড়িয়ে দেব ! তা হয় না।

কণিকা। [একটু নরম হয়ে] হয়ত অমানুষিকতা হয় একটু। কিন্তু আমাদের যে চল্‌তে পারে না এ ভাবে, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মণিকা। হয়ত মনস্থির করে ফেলতে পারেন শেষটা।

কণিকা। তাতে আরো খারাপ হবে, আরো খারাপ। মনোনয়ন করতে পারেন এক জনকে বই ত নয়। তখন অন্য জন যাবে কোথায় ? সেটা বল আমাকে।

মণিকা। [দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে] দিদি ! আমি—আমি ত বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হইনি, ভাই।

কণিকা। [কঠোর ভাবে] মণিকা, ঐ আছে তাকের উপরে বাবার ফোটো। ওর উপরে হাত দিয়ে আবার বল ঐ কথা, যদি তোমার সাহস থাকে।

মণিকা। [হাত দিয়ে মুখ ঢেকে] পারব না।

কণিকা। না। আমারও সেই অবস্থা। আর আমরা দু'জনেই ঘুরে মরছি কি না একই পুরুষের পিছনে ! তাও আবার আমাদের এই বয়সে—ঘেন্নার কথা ! দুটি নির্বোধ ধাড়ি মেয়ে—এই হচ্ছে আমাদের আসল রূপ !

মণিকা। [শিউরে উঠে] বোলো না, বোলো না, দিদি !

কণিকা। [নির্মম ভাবে] দুটি—নির্বোধ—ধাড়ি—মেয়ে ! কিন্তু না, তা হবে না ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার ঘটে এখনো কিছু কাণ্ডজ্ঞান রয়েছে, মনটা যদিও পাগলামীর বাষ্পে ভরা ! তা হতে দেব না। যত বেশি দিন ওকে থাকতে দেওয়া যাবে, ততই খারাপ হবে আরো। বলার আগে মনস্থির করতে পারল না কেন ? তা হলে ত এ রকম হত না।

মণিকা। বলতে যে ওঁকে বাধ্য করা হয়েছে।

কণিকা। তা ঠিক। ওর উপরে নির্দয় হওয়া উচিত হবে না। যোগ করি, এ ভাগ্যলিপি। তাও বলি, ভাগ্যবিধাতা যুদ্ধবিগ্রহ, খুনখারাপি আর অকালমৃত্যু নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই পারতেন, আমাদের মত নিরীহ, নির্বিরোধী লোককে এসে জ্বালাতন করা কেন? কিন্তু ভাগ্যবিধাতাকেও নির্বিচারে নিজের খেয়ালেই পুরোপুরি চলতে দেওয়া হবে না। এ অঞ্চলে ঈর্ষাকাতর স্ত্রীও থাকবে না, আর পাপমনা শালীও থাকবে না।

মণিকা। দিদি! কী সব অলুক্ষণে কথা!

কণিকা। স্পষ্ট কথা বলা আমার কর্তব্য। ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে দুঃখভোগ অনিবার্য, কিন্তু দুঃখভোগ করব মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে—এ পথ ত বেছে নিতে পারি আমরা। ওকে চলে যেতেই হবে!

মণিকা। [জানালার দিকে তাকিয়ে] দিদি! ফিরে আসছেন উনি। আর দেখেছ? গায়ে চড়িয়েছেন কাশ্মীরী শাল।

কণিকা। শাল! তবে বোধ হয় মনস্থির করে ফেলেছেন! কিন্তু নাঃ! সময় পার হয়ে গেছে। নাম বলতে দেওয়া হবে না ওঁকে, না—আমিই বাধা দেব। হয়ত কাজটা কঠিন হবে, তবু। [অনুচ্চ কণ্ঠে দ্রুতবেগে] মণি, শোন্। তোর মন বড্ড নরম, তোর দ্বারা এ কাজ হবে না। ওঁকে আমার কাছে ছেড়ে দে। তুই কোন কথা বলিস্ না। আর,—আর যাই করিস্, কাঁদতে আরম্ভ করিস্ না যেন। আমাদের শক্ত হতেই হবে, নইলে কোন জন্মেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না ওর হাত থেকে। চুপ!

[চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হল তারা। দরজা খুলে সৌম্যবাবু ঢুকলেন। গায়ে গরম জামার উপরে কাশ্মীরী শাল, ডান হাতে একটা বড় লাল গোলাপ ফুল। নির্মল হাসিতে মুখ উজ্জ্বল]

কণিকা। [হন্তদন্ত হয়ে] সৌম্যবাবু, আজ থেকে আপনাকে এক মাসের নোটিস দিলাম।

[তাঁর মুখের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, এক অপরিসীম বিস্ময়ের ভাব তার পরিবর্তে ফুটে ওঠে ধীরে-ধীরে। ঘরের ভিতরে ছিন্ন তারের বেসুরো রাগিণী। মণিকা চাপা কান্না কাঁদতে আরম্ভ করে]

সৌম্যবাবু। [ক্ষীণ কণ্ঠে] আমি একটি নিরেট গর্দভ, তা জানি; বুঝতে পারছি না কিছুই।

কণিকা। [তিক্ত ভাবে] বোঝবার কিছুই নেই! তোর প্যান্‌প্যানানি বন্ধ করবি, মণিকা? ব্যাপারটা আগাগোড়াই অত্যন্ত অশোভন, এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। কারণ জানতে চাইবেন না আপনি, বলতে পারব না। আপনাকে এ ভাবে বলতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত, আর আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে বলেও দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে চলে যেতেই হবে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে।

সৌম্যবাবু। [আত্মসংবরণ করে এবং আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখে ধীরে ধীরে] মার্জনা করবেন। যদি ভুল না করে থাকি, আমাদের মধ্যে বোধ হয় বিবাহ সংক্রান্ত কথার একটা আদান-প্রদান হয়েছিল।

কণিকা। হাস্যকর কথা! এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কিছু হতে পারে না। সে কথা ফিরিয়ে নিতে হবে।

সৌম্যবাবু। [পূর্ববৎ ধীর-গম্ভীর ভাবে] যদি ভুল না করে থাকি, আমাকে চলে যেতে বলেছিলেন আপনারা, আর যদি সম্ভবপর হয়, আমার মন—যা হৃদয়, যাই বলুন না কেন,—স্থির করে নিতে বলেছিলেন।

কণিকা। পার হয়ে গেছে সে সময়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা চলবে না, আপনার কাছে আমরা চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব তা হলে।

সৌম্যবাবু। [একবার নিজের জামার বোতামের দিকে, একবার হাতের ফুলের দিকে তাকিয়ে] যদি ভুল না করে থাকি, আমি ফিরে এসেছি এই কথা বলতে যে, অবশেষে একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছাতে পেরেছি। আমি বলতে এসেছি—অন্য জনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, কেন না, তিনিও যে কোন পুরুষেরই কাম্য 'নারী'—বলতে এসেছি যে, যাঁর পাণিগ্রহণ আমি করতে চাই, তাঁকে আমি মনোনয়ন করেছি। তাঁর নাম হচ্ছে—

কণিকা। [তাঁকে বাধা দিয়ে এবং নিজের কানে আঙুল দিয়ে] না! বলবেন না! বলতে পাবেন না! এমনি যথেষ্ট দুর্ভোগ হয়েছে, আর দুর্ভোগ বাড়াবেন না। আমাদের মধ্যে সে যে-ই হোক না কেন, তার একমাত্র উত্তর হবেই—'না'। তাই নয় কি মণিকা? [মণিকা নির্বাক্ ভাবে মাথা নেড়ে সায় দেয়। কণিকা একটু নরম সুরে বলে] যাই হোক, আপনাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর আশা করি, আমাদের সম্বন্ধে কোন কঠোর ধারণা আপনি পোষণ করবেন না। আপনার কথাও চিরদিন মনে থাকবে আমাদের—সহৃদয়তার প্রতীকরূপে। আমাদের মধ্যে ভাগ্যবতী যে-ই হোত না কেন, সে-ই গৌরব বোধ করত, কিন্তু বিধিনির্দেশ বিরূপ হল—আধুলিটা কাত হয়ে পড়ে গেলে তখুনি বলেছিলাম আপনাকে, মনে আছে নিশ্চয় এবং—এ্যাঁ, আপনি কি চলে যাবেন, না, দাঁড়িয়ে থাকবেন সং-এর মত?

সৌম্যবাবু। [শক্ত হয়ে উঠল কাঁধের মাংসপেশী] আচ্ছা, বেশ! [গায়ের শাল খুলে ফেলতে ফেলতে] জোর করে কোথাও নাক গলাবার লোক নই আমি। [শালখানা নাড়তে নাড়তে] ক্ষোভ প্রকাশ করব না···কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই না··· কোন নামও উচ্চারণ করছি না। [শালখানাকে পাকিয়ে পাকিয়ে গুটিয়ে ফেলছেন]

কণিকা। [নাক সিঁটকে] শালটাকে নষ্ট করে ফেলবেন। দিন্ আমার কাছে।

[শালখানা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে ভাঁজে-ভাঁজে ভাঁজ করে সুন্দর ভাবে পাট করে আবার ফিরিয়ে দিল তাঁর হাতে]

সৌম্যবাবু। ধন্যবাদ। সেবার কিনেছিলাম শালখানা, খুব কম শীত পড়ল তখন। আজই পরলাম প্রথম [কাঁধের উপরে ফেলে] ঘটনাচক্র কি ভাবে চলে—অদ্ভুত!···হ্যাঁ, যেতেই যদি হয়, তবে তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো। [গোলাপ ফুলটাকে টেবিলের উপরে রেখে] আমার মনোনীতার জন্যে—অমনোনীতা মনোনীতা···হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো। আচ্ছা, চলি তাহলে। [পকেট হাতড়ে] ঐ হোটেলটাতে বোধ হয় জায়গা পাওয়া যাবে—হোটেলটা বেশ ভালো, শুনেছি।—আমার বাকী জিনিসগুলোর জন্যে পরে লোক পাঠাব। [টাকা গুণে টেবিলের উপরে রেখে] তিরিশ টাকা—আইন অনুযায়ী এক মাসের ভাড়া।

কণিকা। [অভিভূত হয়ে] সৌম্যবাবু, আপনার কাছে এভাবে টাকা নেওয়া—

সৌম্যবাবু। [হাত তুলে দৃঢ়সঙ্কল্প ইসারায়] কিছু মনে করবেন না —আইন মাফিক দিচ্ছি, কারুর কাছে ঋণী থাকার ইচ্ছে নেই। সব মিটে গেল বোধ হয়। [দরজায় দাঁড়িয়ে] আচ্ছা, চলি।

কণিকা। নমস্কার—

সৌম্যবাবু। থাক্। প্রয়োজন নেই। ওসব হল আমাদের সভ্য সমাজের শিষ্ট রীতি। আমার কিন্তু অভ্রান্ত বিশ্বাস— মুসলমান সমাজে জন্মানো উচিত ছিল আমার।

[সৌম্যবাবু চলে গেলেন। ঘর নিঃশব্দ, যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। অবশেষে শোনা গেল মণিকার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর]

মণিকা। সারা জীবন বসে বসে ঘৃণা করবেন আমাদের!

কণিকা। [নিজের দুঃখকে অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পরাভূত করে] যা উচিত, তাই আমরা করেছি। তিনি আমাদের সম্বন্ধে কি ভাববেন, কিছু যায়-আসে না তাতে।—অন্ততঃ আমি গ্রাহ্য করি না। [পরিত্যক্ত ফুলটির উপরে নজর পড়ল। তুলে নিজের মুখের কাছে ধরল।]

মণিকা। [নিজের হাত বাড়িয়ে] আমাকে দাও। আমি সযত্নে রাখব।

কণিকা। [ফুল সমেত হাত পিছন দিকে চট্ করে সরিয়ে নিয়ে] তাঁর মনোনীতার জন্যে। তুমি হয়ত ভাবছ—

মণিকা। তোমার যে অধিকার, আমিও ঠিক সেই সমান অধিকারের ভাবতে পারি—

[তারা সংগ্রামেচ্ছু শত্রুর দৃষ্টি নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। কিন্তু ফাঁড়া কেটে গেল। মণিকা ভেঙে পড়ল ফুঁপিয়ে কান্নার আবেগে, কণিকা একটা অটল সঙ্কল্পে দৃঢ়বদ্ধ]

কণিকা। না, এ হতে দেব না। [আগুনের কাছে গিয়ে ফুলটাকে নিক্ষেপ করল, তার শিখায়] এই হল তার শেষ পরিণতি— যথাযোগ্য পরিণতি—ধুলো আর ভস্মকণা! কিন্তু মণিকা, কাঁদলে ত চলবে না, ভাই! কাজ করা চাই। রান্নার জোগাড় করতে হবে। এসো, হাত চালাও দেখিনি।

[তারা নিঃশব্দে কাজে লাগল]

যবনিকা

ব্রাত্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মাথা নিচু করে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল শ্রীবাস। উকিলের জ্বলন্ত বক্তৃতার জন্যে নয়, আদালত ভরা লোকের ধিক্কার-কঠিন তীব্র দৃষ্টির জন্যে নয়, এই মামলায় তার যে অবধারিত শাস্তি হয়ে যাবে, সে জন্যেও নয়। শুধু এক প্রান্ত থেকে অমলা যে অর্থহীন, কৌতূহলহীন বোবা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে—সেইটেই সে কোনো মতে সহ্য করতে পারবে না। ঘোস মশায়ের চল্লিশ জন ভাড়াটে গুণ্ডাকে একা হাতে লাঠি ধরে যে শ্রীবাস ঠেকিয়েছে—আজ সে যেন কাঠগড়াটাকে আশ্রয় করেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না!

উকিলের গলায় তখন বক্তৃতার ফুলঝুরি ছুটছে। পাকা অভিনেতার মতো একখানা হাত কোমরে রেখে আর একখানা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রীবাসের দিকে। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ স্বরে তিনি বলে চলেছেন, উত্তেজনায় কপালের দুটো রক্তভরা শিরা ফুটে উঠেছে তাঁর। আচমকা মনে হয় উকিল এখানে প্রতিভার অপব্যয় করে চলেছেন। তাঁর জায়গা আদালতে নয়—মনুমেন্টের তলায় কিংবা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গিয়ে দাঁড়ালেই যথাস্থান হত তাঁর পক্ষে। ঘন ঘন হাততালি পড়ত, মুখের ওপর বিদ্যুতের মতো চমকে যেত প্রেস্-ক্যামেরার ঝলক।

—ইয়োর অনার, দেশের বাস্তুহারাদের নিয়ে একদল জঘন্য চরিত্রের লোক কী ভাবে নিজেদের হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থ করছে, এই কেস্ তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। উপায়হীন উদ্বাস্তুদের সামনে এরা পেতেছে সর্বনাশের ফাঁদ আর সেই ফাঁদের একটি শিকার হল এই মামলার প্রধান সাক্ষী হতভাগিনী অমলা দেবী।

তেমনি মাথা নিচু করে অখণ্ড মনোযোগে শ্রীবাস উকিলের বক্তৃতা শুনে যেতে লাগল। সর্বনাশের ফাঁদ! অসহায়তার সুযোগ! সত্যিই কি সে সুযোগ সে নিয়েছিল অমলার ওপরে? যেদিন অমলাকে সে একান্তভাবে কামনা করেছিল সেদিন এ কথা কি একবারের জন্যেও মনে হয়েছিল তার? হাঁ, প্রশ্ন একবার জেগেছিল বটে—একবার মনে হয়েছিল, স্পষ্ট করেই অমলাকে বলে যে সামাজিক মর্যাদায়, জাতিগত কৌলীন্যে তার জায়গা অমলার থেকে অনেক নিচের তলায়। কিন্তু দ্বিধার জন্যেই সে কথা বলা হয়ে ওঠেনি। অমলাকে হারাবার ভয়ে নয়, অন্তত এসব সংস্কারের অনেক উর্দ্ধে অমলা—সে বিশ্বাস শ্রীবাসের ছিল। কথাটা সে বলতে পারেনি নিজের দীনতায়, কিন্তু আশা ছিল পরে একদিন—

উকিলের বক্তৃতার প্রবল তোড়ে আবার সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

—এই কেস্ আপনারা সবাই ভালো করেই জানেন। তবু আসামীর অপরাধের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা আবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

নিজের অজ্ঞাতেই শ্রীবাস আর একবার চোখ তুলে তাকালো। তেমনি অর্থহীন, কৌতূহলহীন বোবা দৃষ্টি মেলে পুতুলের মতো বসে আছে অমলা। রামেশ্বর মিত্র চাপা গলায় কী আলোচনা করছেন পাশের জুনিয়ার উকিলের সঙ্গে। একান্তে একখানা চেয়ারে বসে পরম পরিতৃপ্ত মুখে সরু গোঁফে তা দিচ্ছেন ঘোষ মশাই। এক মাস আগেও যিনি উদ্বাস্তু উপনিবেশ ভেঙে দেবার জন্যে দলে দলে ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছেন, রামেশ্বর মিত্রের চালেই রাতারাতি একটা জ্বলন্ত মশাল গুঁজে দিতে যাঁর উদ্যমের অবধি ছিল না—আজ এই মামলা চালাবার জন্যে তিনিই খরচ যোগাচ্ছেন রামেশ্বর মিত্রকে। তিনশো উদ্বাস্তুকে লাঠির মুখে পথে নামিয়ে দেবার চেষ্টায় যাঁর বিবেক এতটুকুও আর্তনাদ করেনি, আজ হিন্দুধর্মকে বাঁচাবার জন্যে তার কি প্রাণপণ উল্লাস!

হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো একটা অদ্ভুত ইচ্ছে জাগল শ্রীবাসের। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে তার মনে হল, এখন ঘোষ মশাইকে একটা ভেংচি কাটলে কেমন হয়?

কিন্তু উকিল তখন তার অপরাধের সুদীর্ঘ ইতিহাস আরম্ভ করে দিয়েছেন। অলস নিরুত্তাপ মনে শ্রীবাস সে ইতিহাস শুনে যেতে লাগল।

তিন বছর আগে কলকাতা থেকে মাইল ছয়েক জুড়ে একটা উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে ওঠে। স্থানীয় জমিদার ঘোষ মশাইয়ের বদান্যতার গুণে উদ্বাস্তুরা সেখানে সব রকম সুখ-সুবিধে ভোগ করতে পায়।

শ্রীবাসের হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। ঘোষ মশাইয়ের বদান্যতার গুণে! নিজের তরফে শ্রীবাস উকিল দেয়নি, অমলা যদি তাকে ক্ষমা করতে না পেরে থাকে, নিজের স্বপক্ষে কোনো কথাই তার বলবার নেই। কিন্তু এখন মনে হতে লাগল, অন্তত এই নির্লজ্জ মিথ্যার প্রতিবাদের জন্যেও একজন উকিল তার দরকার ছিল। বদান্যতাই বটে! তারই জন্যে কলোনী ভাঙবার চেষ্টায় অন্তত তিনবার লাঠিয়াল পাঠিয়েছেন ঘোষ মশাই!

কিন্তু রামেশ্বর! শ্রীবাসকে জেলে দেওয়ার জন্যে এই মিথ্যেকেও কি তিনি মেনে নেবেন? তাকে শাস্তি দেবার জন্যে এতখানি নিচে নামবার কি কোনো দরকার ছিল? নিজের অপরাধ নিজেই তো সে স্বীকার করতে চেয়েছে।

আর অমলা? অমলারও কি কিছু বলবার নেই?

এই উপনিবেশে অন্যান্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আসামী শ্রীবাস রায়ও এসে আশ্রয় নেয়। এখানে রায় পদবীটি লক্ষ্য করবার মতো। এই পদবীর মস্ত সুবিধে এই যে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অত্যন্ত নীচ জাতিও এর আড়ালে আত্মগোপন করতে পারে। আসামী শ্রীবাসও এরই সুযোগ নিতে দ্বিধা করেনি। যেভাবে সে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, তাতে তাকে সকলে সম্ভ্রান্ত কায়স্থের সন্তান বলেই মনে করেছিলেন।

না, সম্পূর্ণ মিথ্যে। নিজের সম্পর্কে কোনো পরিচয়ই দেয়নি শ্রীবাস। কোনো দিন কারো কাছে সে তার বংশগৌরব ঘোষণা করতে চেষ্টা করেনি।

তা ছাড়া আসামী শিক্ষিত। তাদের সমাজের তুলনায় তাকে উচ্চশিক্ষিতই বলা যায়। সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তার ওপর কারো সন্দেহ হয়নি।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আসামী নানা দিক থেকে উদ্বাস্তুদের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিল। কলোনীর অনেকেরই সে নানা ভাবে উপকার করেছে, সে কথাও ঠিক। এমন কি এ কথাও অস্বীকার করা উচিত নয় যে কলোনীর উদ্বাস্তুরা তার প্রতিটি কথা অন্ধের মতো চালিত হত। কিন্তু আসামীর নিজের মনের মধ্যে ছিল পাপের বীজ। সে সকলের বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে নিজের অত্যন্ত জঘন্য স্বার্থ সিদ্ধ করবার জন্যে। খুব সহজেই সে বাধা

র মেশ্বর মিত্রের পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

আত্মীয়তা স্থাপন! স্বেচ্ছায়!

—এসো বাবা, এসো—বারগোড়ায় শশা গাছটার পরিচর্যা করতে করতে রামেশ্বর মিত্র ডাকলেন।

—এখন আর বসব না মিত্তির মশাই। আমাদের কলোনীর লোকেদের যাতে রেশনের দোকানটা করানো যায়, সেই জন্যে যাচ্ছি।

—আরে সে তো আছেই—আরো আগ্রহ ভরে রামেশ্বর বললেন, কাজ ছাড়া তো তোমার আর কথাই নেই। এই তো দু' বছর একসঙ্গে আছি, এর মধ্যে একবারও তুমি আমার ঘরে পা দিলে না!

—দেখুন, সময় একেবারে পাওয়া যায় না—

—বুঝি বাবা, বুঝি। আমাদের জন্যেই রাতদিন খেটে মরছ তুমি। তবু একটা সামাজিকতা তো আছে। এক-আধ দিন আসতে-টাসতে তো হয়। এসো—এসো—এক পেয়ালা চা খেয়ে যাও—

—না, দেখুন—

—আজ তোমায় ছাড়ব না—এগিয়ে এসে রামেশ্বর শ্রীবাসের হাত ধরলেন: এক পেয়ালা চা তোমায় খেয়ে যেতেই হবে।—গলা চড়িয়ে রামেশ্বর ডাকলেন: অমলি, ওরে অমলি—

এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্দেশ্য 'ছিল রামেশ্বর মিত্রের কুমারী কন্যা অমলা। নানা ছুঁতো-নাতায় আসামী নিয়মিত রামেশ্বর বাবুর বাড়িতে আসতে আরম্ভ করে। রামেশ্বর বাবু মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও আসামীর জনপ্রিয়তার জন্যে মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারতেন না।

—বাঃ, বাড়ির সামনে দিয়ে অমন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছেন যে?—অমলার জিজ্ঞাসা। একেবারে সামনা-সামনি পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে—উপায় নেই পাশ কাটিয়ে যাওয়ার।

—দেখুন, বড্ড কাজের তাড়া—

—কাজের তাড়া তো লেগেই আছে—পালিয়ে যাওয়ার জন্যে ওই আপনার কৈফিয়ৎ!—তীক্ষ্ণ মধুর গলায় অমলা হেসে উঠল: কী অসম্ভব লাজুক আপনি! এত কাজ করে বেড়ান, একবার চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারেন না! সেদিন যে ভাবে মাথা নিচু করে বিব্রত ভাবে চা খাচ্ছিলেন, আমার তো মনে হচ্ছিল, কখন আপনার বিষম লাগবে।

—না, মানে—

—মানে আর আপনাকে বোঝাতে হবে না, আমি এমনিতেই বেশ বুঝতে পারছি। এখন আসুন, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

—দরকারী কথা!—শ্রীবাস যেন বিষম খেলো একটা। যেদিন ও-বাড়িতে গিয়েছিল, সেদিন বলতে গেলে অমলার দু গাছি সরু চুড়ি পরা দুখানা হাত আর একটা শাড়ীর পাড় ছাড়া কিছুই সে ভালো করে দেখেনি। আজ সেই অমলার সঙ্গে এমন কি দরকারী কথা থাকতে পারে-তার?

—কথাটা বাবাই বলতে চেয়েছিলেন, তবে একটু দ্বিধা হচ্ছে ওঁর। কিন্তু গরজটা যখন আমার, তখন আর লজ্জা করলে চলবে না। আসুন, আসুন—ভেতরে বসা যাক। চা খেতে খেতেই বলব।

রামেশ্বর বাবু বিপত্নীক। আপনারা সবাই জানেন, বিপত্নীকের পরিবারে কুমারী কন্যা থাকলে অসচ্চরিত্র লোক কী ভাবে তার সুযোগ নিতে চেষ্টা করে! সুতরাং আস্তে আস্তে অমলাকে মুঠোর মধ্যে এনে ফেলতে আসামীর খুব বেশি অসুবিধে ঘটল না।

—বিশ্বাস করুন, আমার একেবারে সময় হবে না।

—নিতেই হবে সময় করে। নিজেই তো জানেন, কী অবস্থায় আমরা সবাই রয়েছি। তার ওপরে প্রাইভেটে আই-এ পরীক্ষা দিচ্ছি। আপনি সাহায্য না করলে কিছুতেই আমি পাশ করতে পারব না। এত কষ্ট করে জোগাড় করা ফিসের টাকা খামোখা নষ্ট হবে, তাই কি আপনি চান?

—কিন্তু আমি দিনকয়েক পড়ালেই যে আপনি পাশ করবেন এ বিশ্বাস কী করে জন্মালো আপনার?—এতক্ষণে খানিকটা স্বাভাবিক হতে পেরেছে শ্রীবাস, একটা অবচেতন শ্রদ্ধা দেখা দিয়েছে নিজের ওপর।

—বিশ্বাস কী করে যে জন্মায় সেটা কৈফিয়ৎ দিয়ে বোঝানো যায় না। ওটা আসে ইনটুইশন থেকে—অমলা হাসল: বলুন, আপনি রাজী?

উকিল একটানা ভঙ্গিতে বলে চলেছেন। নিজের মধ্যে এতক্ষণ তলিয়েছিল শ্রীবাস, অস্বস্তি ভরা তন্দ্রার ভেতরে ছিন্ন ছিন্ন দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতির রোমন্থন চলছিল। সেই দিনগুলো—প্রভাত-পদ্মের প্রথম পর্ণ-মোচনের মতো অমলার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। চারদিকের এই অপরিচিত অবাঞ্ছিত বেষ্টনী—এই আইন-আদালতের পঙ্কিল পটভূমি থেকে কিছুক্ষণের জন্যে একটা শান্ত-কোমল আলোর ভেতরে ডানা মেলে দিয়েছিল সে।

মিথ্যার ওপরে কল্পনার জাল বুনে চলেছেন উকিল। অথবা কল্পনাকে ঐশ্বর্যময়ী করে তোলার জন্যেই হয়তো মিথ্যার সৃষ্টি। যেমন জীবন সৃষ্টি হয়েছে অভিনয়ের জন্যে।

অভিনয়ই বটে! শ্রীবাসের হাসি পেল। চমৎকার অভিনয় করছেন উকিল—আদর্শ মেলোড্রামার নায়ক। শুধু মাত্রা রাখতে পারছেন না—অতি-মাত্রার অতি-নাটক শ্রোতাদের কৌতূহলকে ঝিমিয়ে আনছে। এমন কি, তার নিজের বিরুদ্ধে গড়ে-তোলা এমন অশ্রুতপূর্ব রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলোতেও যথেষ্ট মনোনিবেশ করতে পারছে না শ্রীবাস।

কিন্তু রামেশ্বর? কিন্তু অমলা?

এমন অপূর্ব নাটকে তাদের কি কিছু বলবার নেই? তারা কি কাটা-সৈনিকের মতো নির্বাক্ ভূমিকাই নিয়েছে শুধু? লাঞ্চের জন্যে উঠলেন হাকিম। সওয়াল শেষ হওয়ার আগেই কোর্ট অ্যাডজোর্নড্ হল কিছুক্ষণের জন্যে।

কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে একটা বটতলায় বসল শ্রীবাস।

আশ্চর্য্য! উকিলের ভাষায় এমন চাঞ্চল্যকর কাহিনীর 'ভিলেন' কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। খাতা লেখা মুহুরীর দল বসেছে সার বেঁধে, শিকারী কুকুরের মতই আঘ্রাণশক্তি নিয়ে ঘুরছে টাউটের দল, চারদিক থেকে টকাটক করে উঠছে টাইপ-রাইটারের আওয়াজ। পান, বিড়ি, সিগারেট, ডাব, মিঠাই, তেলেভাজা। নিকেলের চশমা আর জীর্ণ গাউন-পরা মোক্তার—ছেঁড়া জুতোয় ঝকঝকে পালিশ

দিয়ে আভিজাত্য রাখবার চেষ্টায় নিরত বুভুক্ষু উকিল—তাদের দিকে গোপ-দুরন্ত ইউনিফর্মশোভিত আর্দালী-পেয়াদাদের কৃপার দৃষ্টি। আর বিচিত্র সুরে-ছন্দে অবিচ্ছিন্ন কথার ঐক্যতান—সরু-মোটা তীব্র কোমলের মিশ্র রাগিণী।

বটগাছের তলায় বসে শ্রীবাস একটা সিগারেট ধরালো। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে উঁচু জাতের মেয়েকে সে বিয়ে করেছে, জুয়াচুরি করে পবিত্র সামাজিক মর্যাদা কলঙ্কিত করেছে এক নিরুপায় নিরীহ উদ্বাস্তর। শাস্তি তার পাওনা বই কি। আইন তাকে ক্ষমা করবে না।

একটু দূরেই ঢক ঢক করে একটা ডাব গলায় ঢালছেন ঘোষ মশাই। আহা, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—কী খাটুনিটাই যে খাটছেন ভদ্রলোক! না হয় উদ্বাস্তু পাড়াটাকে নিকেশ করার জন্যে রামেশ্বরের ঘরে আগুন তিনি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মের চালায় যখন আগুন লাগছে, তখন আর কী করে সামলে রাখবেন নিজেকে? তাই এ মামলাটার সব খরচ-খরচা তিনিই বহন করছেন।

কিন্তু তার পক্ষের একজন উকিল থাকলে কী বলত? বিশুদ্ধ হিন্দু-সন্তান ঘোষ মশাই যখন গীতা স্পর্শ করে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন—

—নমস্কার শ্রীবাস বাবু।

শ্রীবাস চমকে মুখ ফেরালো। একজন ছোকরা উকিল। একটা চুরুট হাতে করে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটাকে এড়াবার জন্যে শ্রীবাস মুখ ফিরিয়ে নিলে।

—আমি আপনাকে চিনি না।

কিন্তু তরুণ উকিল তাকে ছাড়তে চাইল না।

—আপনার কেসটা আমি শুনছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং।

—বেশ তো। ভালো করে শুনুন।

—দেখুন, একটা কথা বলি—উকিল না-ছোড়বান্দার মতো তার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল: যদি অনুমতি করেন, আপনার হয়ে কেসটা আমি ডিফেণ্ড করি।

—ধন্যবাদ, দরকার নেই।

উকিল তবু সরল না: এক পয়সাও ফীজ চাই না আমায়। শুধু আপনার স্বপক্ষে একটু লড়ে দেখতে চাই আমি। একটু খোঁচা দিয়ে চুপ সে দিতে চাই বাঁড়ুয্যের ওই গলা-কাঁপানো সওয়াল।

শ্রীবাস ফিরে তাকালো। না, ছেলেটা এখনো বটতলার বুভুক্ষুদের দলে ভেড়েনি। বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। বেশে-বাসে স্বাচ্ছন্দ্যের তৃপ্তি—চোখের দৃষ্টিতে কিশোরের কৌতূহল আর উত্তেজনা। সবে পাশ করে বেরিয়েছে—বাপের টাকায় ট্রাম-বাসের ভাড়া দিয়ে কোর্টে আসে যায়। অথবা কে জানে, হয়তো গাড়িও আছে।

—আমি এর মধ্যে খোঁজ-খবরও একটু নিলাম। আপনি মিথ্যে পরিচয় দিয়ে অমলা মিত্রকে বিয়ে করেননি, রামেশ্বর মিত্রই বরং সেজন্যে দিনের পর দিন বিরক্ত করেছেন আপনাকে। আপনার প্রতি অমলা দেবীর অনুরাগের খবরটাও কারো অজানা ছিল না। আর ভাই জমিদার হীরালাল ঘোষ! আপনি একা হাতে লাঠি ধরে দু দু বার ওর গুণ্ডা তাড়িয়েছেন, তাই এই কেসে আপনাকে জড়িয়ে ও ফাঁসাতে চায়। আপনি কলোনী ছাড়লেই ও নিষ্কণ্টক—তিন দিনের মধ্যেই চালাগুলোকে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিলিয়ে দেবে।

ছোকরা উকিলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল শ্রীবাস। তার কিশোর চোখ দুটি দপ দপ করে উঠছে উত্তেজনায়। ওকালতি এখনো তার পেশা হয়নি—এখনো তা নেশার রঙে রঙীন।

—শুনুন, ওদের প্রোসিকিউশন চার্জকে এক্ষুনি আমি টুকরো টুকরো করে দিতে পারি। তা ছাড়া নানা দিক থেকে কেসটার গুরুত্বও আছে। উঁচু জাত—নীচ জাত। থাকবার জায়গা নেই, খাবার সঙ্গতি নেই—তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের মত পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে—এদের আবার জাতের বড়াই, বংশের প্রেস্টিজ! হিন্দুর টিকে থাকাই যখন শক্ত—তখন এসব ভুয়ো অহঙ্কারের ফানুস ওড়ানো! দিন না আমাকে আপনার পক্ষ থেকে ডিফেণ্ড করবার ভার—দেখুন, কী একখানা আর্গুমেণ্ট করি।

—ধন্যবাদ—অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার কোনো ডিফেন্সের দরকার নেই—শ্রীবাস উঠে দাঁড়ালো।

—শুনুন শ্রীবাস বাবু—ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ছেলেটি বলতে চেষ্টা করল।

—ধন্যবাদ—দ্রুত পায়ে সরে গেল শ্রীবাস। না, দরকার নেই। আজ অমলার কাছেও যদি জাতের প্রশ্ন এত বড় হয়ে থাকে, নিজের স্বপক্ষে একটা কথাও সে বলবে না। ছেলেটাকে নিরাশ করতে তার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া সে আর কী করতে পারত?

খানিক পরেই আবার পেয়াদার ডাক পড়ল, আবার গিয়ে নিজের জায়গাটায় দাঁড়ালো শ্রীবাস। চকিত কটাক্ষে দেখতে পেল, আগে যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই তেমনি অর্থহীন বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অমলা। কেমন একটা অস্বস্তিভরা প্রশ্ন খোঁচা মারতে লাগল শ্রীবাসের মনের ভেতর। তখন থেকে অমলা কি ঠায় এক জায়গাতেই বসে আছে? এক পা নড়েনি, বাইরে যায়নি একবারের জন্যেও? অমলার সমস্ত অনুভূতি কি পাথর হয়ে গেছে—ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় সমস্ত চিন্তাগুলো জমাট বেঁধে গেছে তার?

উকিল তেমনি নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর সওয়াল শেষ করে আনছেন।

—কিন্তু ইয়োর অনার, আগুন কখনো ছাই চাপা থাকে না। পাপকে কখনো বেশি দিন আড়াল করে রাখা যায় না। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে, মিথ্যের মুখোস আপনা থেকেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। আসামীর দুর্ভাগ্য বলতে হবে, বিয়ের তিন দিনের মধ্যেই দেশ থেকে আসামীর কিছু পরিচিত লোকজন ক্যাম্পে এসে পৌঁছোয়। তাদের মুখ থেকেই জানতে পারা যায়, আসামী শ্রীবাস রায় কায়স্থের সন্তান তো নয়ই, বরং যে জাতিতে তার জন্ম—সে জাতির কেউ বারান্দায় উঠলেও বর্ণ-হিন্দুর ঘরের কলসীর জল ফেলে দেওয়া হয়!

এর পরে রামেশ্বর মিত্রের মানসিক অবস্থা কী দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। যাকে তিনি ফুল ভেবে বিশ্বাস করেছিলেন, দেখতে পেলেন সে সাক্ষাৎ কেউটে সাপ! যার মধ্যে তিনি দেবত্ব কল্পনা করেছিলেন, তার অন্তরাল থেকে উঁকি দিলে জলজ্যান্ত শয়তান! তাঁর দুর্গতির সুযোগ নিয়ে তাঁরই সমধর্মী আর এক জন এমন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে—পরম দুঃস্বপ্নের ভেতরেও কি ভাবা যায় সে কথা?

আর অমলা দেবী! ইয়োর অনার—আপনার মতো বহুদর্শী অভিজ্ঞ বিচারকের কাছে তার সম্পর্কে কোনো কথাই আমি বলতে

না। শুধু এই পর্যন্তই বলা যেতে পারে, সমাজে এবং ব্যক্তি-জীবনে যে ক্ষতি আসামী করেছে, তার ক্ষত কোনো দিন মিলিয়ে যাবে না।

উকীল সওয়াল শেষ করলেন।

নিজের জায়গায় একবার নড়ে চড়ে দাঁড়ালো শ্রীবাস। ক্ষতি—ক্ষতিই তো! এ ক্ষতি কেমন করে ভুলবে অমলা। সমাজের সামনে কোনো দিন সে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না—লজ্জায়, অপমানে নিজের কাছে প্রতিদিন সে ধিকৃত হতে থাকবে। শ্রীবাসকে যেদিন সে ভালোবেসেছিল—সেই ভ্রান্তির অনুতাপে চিরদিন সে তিলে তিলে জ্বালায় জ্বলে মরবে;

উকিল বললেন, এইবার আমি সাক্ষী অমলা দেবীকে আহ্বান করতে চাই।

পা দুটো ভেঙে আসছে শ্রীবাসের—আর সে দাঁড়াতে পারছে না। হয়তো অমলাকে এইভাবে আদালতের নগ্ন নিষ্ঠুর দৃষ্টির সামনে দাঁড়াবার আগেই আত্মহত্যা করা উচিত ছিল শ্রীবাসের। কিন্তু তাতে কি মুক্তি পেত অমলা? মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে অবশ্য সরে যেত নিরাপদ দূরত্বে, কিন্তু শ্রীবাসের মতো একটা শয়তান যদি সামাজিক শাস্তি না পায়, তা হলে অন্তত এতটুকুও সান্ত্বনা কোথায় থাকত অমলার?

অমলা উঠে আসছে—পুতুল নাচের একটা মূর্তির মতো সরে আসছে কাঠগড়ার দিকে। সে আসছে, কিন্তু তার চলার মধ্যে কোনো শারীরিক গতি নেই; অমলা তাকিয়ে আছে, কিন্তু কোনো দৃষ্টি নেই তার চোখের ভেতরে। ভাবছা ভাবছা ভাবে দেখতে পেলো—পরম উৎসাহে নিজের চেয়ারটায় নড়ে-চড়ে বসলেন ঘোষ মশাই—উদ্বিগ্ন ভাবে অমলার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে লাগলেন রামেশ্বর—ঘরশুদ্ধ লোকের ক্ষুধার্ত চোখ নোংরা কৌতূহলে অমলাকে বিশ্লেষণ করতে লাগল।

অমলা কী যেন বলছে। শ্রীবাস শুনতে পেলো না। তাঁর সমস্ত শরীর—সমস্ত বোধশক্তি অদ্ভুত ভাবে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তার সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন পক্ষাঘাতে অসাড়—তার মস্তিষ্কটা যেন পাথরের পিণ্ড!

আচমকা যেন প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে শ্রীবাসের চৈতন্য যথাস্থানে ফিরে এল। কী বলছে—এ কী বলছে অমলা?

—এই মামলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বিয়ের আগেই আমি আমার স্বামীর জাতির খবর জানতাম। তিনি নিজেই সব কথা আমাকে বলেছিলেন—কিছুই গোপন করেননি। সমস্ত কিছু জেনেই স্বেচ্ছায় আমি তাঁকে বিয়ে করেছি। আমি সাবালিকা, আমার বয়েস এখন একুশ বছর।

আদালতে যেন বজ্র পড়ল!

চেয়ারশুদ্ধ প্রায় পড়তে পড়তে সামলে গেলেন ঘোষ মশাই—উকিল বাঁড়ুজ্যে কী বলবার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন! বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন রামেশ্বর—একটা মৃদু হাসি খেলে গেল হাকিমের মুখে।

—মিথ্যে—মিথ্যে—চেঁচিয়ে বলতে চাইল শ্রীবাস, বলতে চাইল

কণ্ঠনালী স্ফীত করে একটা আপ্রাণ চিৎকারে। কিন্তু গলাটা যেন তার বোবায় চেপে ধরল।

—কাটুস ইট্—একটা উল্লসিত মন্তব্য কানে এল। সেই ছোকরা উকিল।

আর পরক্ষণেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন রামেশ্বর। স্থান কাল ভুলে গিয়ে পৈশাচিক একটা আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা হারামজাদী! জীবনে আমি আর তোর মুখদর্শনও করব না!

সকলের আগেই কোর্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল অমলা। কিন্তু তারপর কেউই তাকে আর খুঁজে পেল না। রামেশ্বর নয়, ঘোষ মশাই নয়, এমন কি শ্রীবাসও নয়।

ভিড় ঠেলে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে যখন এগোচ্ছিল শ্রীবাস, তখন কে এসে একখানা কাগজের টুকরো গুঁজে দিয়ে গেল তার হাতে।

অমলা লিখেছে। অমলারই চিঠি।

—ভেবেছিলুম, তুমি সব জাতের উর্ধ্বে। কিন্তু যখন দেখলুম, নিজেকে ছোট ভেবে তুমি তোমার মনকেও ছোট করে রেখেছ, তখনই তোমাকে আমার ছেড়ে যেতে হল। আমায় ক্ষমা কোরো।

চিঠিটা মুঠোর মধ্যে ধরে অমলার মতোই অর্থহীন শূন্য চোখে শ্রীবাস তাকিয়ে রইল।

যাত্রা হল শুরু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভবতারণকে বুঝিয়ে বললেন কালিনাথ। বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে বললেন। সেই দিনই সন্ধ্যার পর তিনি ভবতারণের বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। তাঁকে দেখে সাগ্রহে ভবতারণ বললেন—আসুন আসুন চৌধুরী মশায়! অনেক দিন পরে। বসুন।

অদূরে একখানা হাতা-ভাঙ্গা চেয়ারের ওপর বসে কালিনাথ স্মিতহাস্যে ভবতারণের মুখের পানে তাকালেন। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উৎসুক চোখ মেলে ভবতারণ বললেন—শরীর নিয়ে আর পারলাম না কালিনাথ বাবু, ক্রমেই এগিয়ে চলেছি। তারপর? খবর কি বলুন। প্রিয়নাথকে অনেক দিন দেখিনি।

ঈষৎ হেসে কালিনাথ বললেন—বড়লোক, তায় আবার ব্যবসায়ী মানুষ। সময় কোথায় বলুন? তার ওপর ও-সব মানুষের মেজাজের অন্ত পাওয়াও ভার।

কথার সুরটি যেন কেমন লাগল। ভবতারণ বললেন—কাজ-কর্মে খুব ব্যস্ত আছে বুঝি?

—শুধু কাজে কেন, নানা কারণেই ব্যস্ত! বললেন কালিনাথ—তা আমি বললাম, আমাকে আর এ সব ব্যাপারে জড়াচ্ছ কেন প্রিয়নাথ? তোমার যা ইচ্ছে তা করসে, আমাকে নিমিত্তের ভাগী করে বিড়ম্বিত করা বৈ তো নয়।

দুর্বোধ্য! ভবতারণ বললেন কাজ-কর্মে কিছু কি গোলমাল ঘটেছে?

মাথা নেড়ে কালিনাথ বললেন—ব্যবসায়ে একটু-আধটু গোলমাল তো লেগে থাকবেই, তা নয়, প্রিয়নাথ ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। গোলমাল সেইখানে।

—সুপ্রিয়র বিয়ে, ভবতারণ বিস্মিত বিহ্বল হলেন—সে তো এক রকম···

মাথা দোলালেন কালিনাথ—আমি কতক কতক শুনেছি চক্রবর্ত্তী মশায়! কিন্তু ঐ যে বললাম। বড়মানুষ লোক, মেজাজের অন্ত পাওয়া ভার। গোবরডাঙ্গার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে ঠিক করেছেন। তারা নাকি লাখ টাকা খরচ করবে। আর মেয়েও নাকি অসামান্যা সুন্দরী।

আকাশ থেকে পড়লেন ভবতারণ। পতনের আঘাতে সর্বাঙ্গ যেন চুরমার হয়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বললেন—সে কি, এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

মাথা নেড়ে মহাবিজ্ঞের মতো কালিনাথ বললেন—সংসারের লীলা এমনই বিচিত্র যে কখন কোন্‌টা বিশ্বাস্য আর কোন্‌টা অবিশ্বাস্য তার হদিস পাওয়া অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না ভবতারণ বাবু! বিয়ের সমস্তই ঠিক। এ ব্যবস্থার রদ হবে না এবং সেই কথাই আপনাকে বলবার জন্যে প্রিয়নাথ আমায় পাঠিয়েছে। কী মর্মান্তিক ভাবের অপ্রিয় কাজ বলুন তো? আমি বললাম, প্রিয়, আমাকে কেন, তুমি নিজেই গিয়ে বলে এসো, তাতে বললে, ভৈরবকে দিয়ে বলে পাঠালেও চলত, তবে তুমি ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারবে। তা, প্রিয়নাথের দয়া-মায়া আছে বৈ কি! শেষকালে আমায় বলে দিলে আপনাকে জানিয়ে দিতে যে আপনি মেয়ের জন্যে পাত্র স্থির করুন, দু'-এক হাজার যা লাগে তা প্রিয়নাথ অবশ্যই দেবে, আপনাদের প্রতি তার স্নেহের কমতি নেই।

ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন ভবতারণ। জীবনে অনেক আঘাত, অনেক শোক পেয়েছেন, কিন্তু এতখানি বিমূঢ় আর বেদনাতুর কখনো বোধ করেননি। চারিদিকে এ কী ধূসর পাণ্ডুরতা! কালো আকাশের নীচে গোটা পৃথিবীটা কি এক মুহূর্ত্তে বেবাক লুপ্ত হয়ে গেছে?

কর্ত্তব্য সম্পাদন করে কালিনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বললেন—আপনি বেশী উতলা হবেন না ভবতারণ বাবু! ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই।

ক্ষীণকণ্ঠে ভবতারণ ডাকলেন—প্রমীলা!

মেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। বললেন—বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও তো মা!

—আচ্ছা, ভবতারণ বাবু! তাহলে আমি এখন নমস্কার! নারায়ণ, নারায়ণ!

বলতে বলতে কালিনাথ প্রস্থান করলেন।

—প্রমীলা!

—আমি পাশের ঘরেই ছিলাম বাবা! সব শুনেছি।

অকম্পিত কণ্ঠস্বর প্রমীলার। চোখের দৃষ্টিতে একটু বিহ্বলতা

ভবতারণ পাগলের মতো স্খলিত স্বরে বললেন—এও কি সম্ভব! ...লে প্রিয়নাথ···।

কথা শেষ করতে পারলেন না।

—বাবা।

—কি মা!

—চল, আমরা ধানবাদ ফিরে যাই।

ঘাড় নেড়ে ভবতারণ বললেন—ঠিক বলেছিস। আর এখানে ...দিনও থাকা উচিত নয়। এখনি যোগেশকে চিঠি লিখে দে। না, ...চিঠি নয়। টেলিগ্রাম করে দে। কেমন?

—তাই দেব বাবা!

*　*　*　*

পরের দিন ভবতারণের গৃহে আবার দেখা দিলেন কালিনাথ। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা উদ্দেশ্য বোধ করি।

বাইরে থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলেন—প্রমীলা মা কোথায় ...!

ডাক শুনে ঘরের ভিতর প্রমীলা চমকে উঠল। ভবতারণ ...লেন—কে?

—কেমন আছেন? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন কালিনাথ।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রমীলা বললে—বাবার শরীরটা ভাল নেই।

সমবেদনা-সূচক কণ্ঠে কালিনাথ বললেন—ভাল না থাকারই তো ...। মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ যে এমন হতে পারে তা কি সহজে ভাবা যায়! কাল সারা রাত ঘুমুতে পারিনি—কথা শেষ ...রে তিনি রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন।

...তারণ বললেন—আমরা বোধ হয় কালই চলে যাব, কালিনাথ ...প্রিয়নাথকে বলে দেবেন, তার ওপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ ...দুঃখ পেলাম বটে, সে আমার বরাত।

কালই যাবেন বুঝি? কালিনাথ বললেন—হ্যাঁ, তা এখন ভাল। আর এখানে থেকে লাভ কি? কিন্তু আপনার ...মন বন্ধুর প্রতি এতখানি অবিচার প্রিয়নাথ কেমন করে ...তো ভেবে পাই না। কি ক'রে সে বলতে পারলো ...বিষয়-সম্পত্তির ওপর আপনাদের লোভ। সেই জন্যেই···

...মীলা আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। বললে—দয়া করে চুপ করুন। এসব আলোচনা শুনতে ভাল ...।

...ম্পিত ভাবে কালিনাথ বললেন—কথাটা বলতে কি ভাল লাগল মা? থাক। নারায়ণ! আচ্ছা, আমি ...ভবতারণ বাবু। আবার কবে কোথায় দেখা হবে কে ... নমস্কার!

*　*　*　*

...র মুখে কথাটা শুনে রাগে দুঃখে হতাশায় আর আতঙ্কে ...স্ত দিশেহারা বোধ করতে লাগল।

...ও ঘটকের আনাগোনা হচ্ছে। শুধু তাই নয়। তার ...তার বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। পাকা কথাবার্তা ...। কিন্তু এও কি সম্ভব?

কোথায় যাবে? কি করবে সুপ্রিয়? প্রমীলা। কাল থেকে তার দেখা পায়নি। এই মুহূর্তে তাকেই যে প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।

ভৈরব এসে জানাল—কর্ত্তাবাবু ডাকছেন।

—বাবা কোথায়?

—নীচের ঘরে।

—আর কে আছে সেখানে?

—যিনি থাকবার। ভৈরব বললে—কালিবাবু! যত নষ্টের মূল হচ্ছে ওই লোকটা, তা তোমায় বলে দিলাম খোকাবাবু।

—আচ্ছা, তুই যা। বলগে যা, আমি যাচ্ছি।

ভৈরব চলে গেল। সুপ্রিয় ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। মনে মনে সে তড়িৎ গতিতে অনেক কিছুই আলোচনা করে নিলে। প্রস্তুত করে নিলে নিজেকে। কালো দিকটা আগে থেকেই ভেবে নিলে। ভেবে নিলে প্রমীলাকে। সাহস নিলে মনে। তারপর ছোট টেবিলের ওপর থেকে ফ্রেমে বাঁধানো মায়ের ছোট ছবিখানা আর মণিব্যাগটা পকেটে নিলে। অনেক দিন থেকেই অসহ্য বোধ হচ্ছিল। আজ একটা হেস্তনেস্ত হতে পারে, এই ভেবে অনেকখানি স্বস্তি বোধ করলে।

নীচে নামল সুপ্রিয়।

তাকে দেখে কালিনাথ বললেন—এসো বাবা এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সুপ্রিয় পিতাকে প্রশ্ন করলে—আমায় ডেকেছেন?

মুখ তুলে প্রিয়নাথ বললেন—হ্যাঁ, তুমি এখন বেরুচ্ছো না কি?

—হ্যাঁ!

—আচ্ছা। হ্যাঁ, শোন! কাল সকালে কোথাও বেরিও না। কয়েকজন ভদ্রলোক আসবেন বাড়ীতে।

—ও। কিন্তু আমাকে তাঁদের কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

প্রিয়নাথ বললেন—আছে।

কালিনাথ স্মিতমুখে বললেন—এক পাত্রীপক্ষ তোমায় দেখতে আসবেন বাবা!

—সে কি!

মাথা দুলিয়ে কালিনাথ বললেন—মস্ত লোক তাঁরা। গোবর-ডাঙার জমিদার। তোমার বাবা যে সেইখানেই তোমার বিয়ে স্থির করেছেন।

সুপ্রিয় প্রায় ফেটে পড়ল—অসম্ভব। হতে পারে না।

প্রিয়নাথ এইবার কথা বললেন। তাঁর ভিতরকার চিরকালের প্রভুত্বকামী শাসনপরায়ণ মনোবৃত্তি জেগে উঠেছে। বললেন—হতে পারে। সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। সব দিক বিবেচনা করেই এই ব্যবস্থা করেছি।

—কি বলছেন বাবা! সুপ্রিয় বললে—আপনার মুখ থেকে এ কথা যে কোনদিন শুনতে হবে তা তো কল্পনাও করিনি।

কালিনাথ বললেন—কিন্তু তোমার বাবা তোমার ভালর জন্যেই···

—আপনি চুপ করুন। রীতিমতো ধমক দিয়ে উঠল সুপ্রিয়।

—সুপ্রিয়! গর্জ্জে উঠলেন প্রিয়নাথ—গুরুজনদের সামনে অভদ্রভাবে কথা বলতে কি ভুলে গেছ নাকি! সেদিনও তুমি এমনি

ভাবে কথা বলেছিলে ওঁর সঙ্গে। এর মানে কি? তুমি জানো, কালিনাথ শুধু আমার বন্ধুই নয়, আমার ভাইএর মতো। তাঁর কোন অপমান আমি বরদাস্ত করব না!

—থাক, প্রিয়নাথ! উত্তেজিত হোয়ো না। ছেলেমানুষ। তাই···কি বলতে কি বলেছে।

মাথা নেড়ে প্রিয়নাথ বললেন—না, এ-সব ছেলেমানুষি বুদ্ধি নয়। নিশ্চয় এর পেছনে কারও ওস্‌কানি আছে। কিন্তু আমি সইব না কোন অন্যায়। বাপের কোন অন্যায় আচরণ আমি প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করিনি কোন দিন।

মাথা উঁচু করে সুপ্রিয় ধীরকণ্ঠে বললে—আপনারই তো ছেলে আমি, আমিও করব না।

—তার মানে?

সুপ্রিয় বললে—আমাদের জীবনের প্রতি আপনি যে অন্যায় আঘাত করতে চাইছেন, তা মানতে পারি না।

—আবার সেই এক কথা, অধীর হয়ে উঠলেন প্রিয়নাথ; প্রতিরোধের আঘাত পেয়ে তিনি তদ্দণ্ড ভীষণ আকার ধারণ করলেন। উঠে দাঁড়ালেন। দু'চোখে তীব্র আগুন। বললেন—আমার কথা মানবে না তুমি?

—মানতে পারি না বাবা, কাতর কণ্ঠে বললে সুপ্রিয়।

—ভবতারণের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না, বিয়ে হবে গোবরডাঙার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে। এই আমার সংকল্প—এই আমার পণ।

—অসঙ্গত সংকল্প, অন্যায় পণ।—দৃপ্ত কণ্ঠ সুপ্রিয়র।

—শাট্‌ আপ।

—হাঁ, হাঁ, কর কি, প্রিয়! কালিনাথ ব্যস্তভাবে দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

—বোস, বোস, প্রিয়নাথ!

—না, কোন কথা শুনতে চাই না। কাঁপতে লাগলেন প্রিয়নাথ—আমার কথা শুনবে না তুমি? ছেলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

মাথা নাড়লে সুপ্রিয় —শোনা সম্ভব নয়, বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথ বলে উঠলেন—তাহলে আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাকে আমি পরিত্যাগ করলাম। এ বাড়ীতে তোমার স্থান নেই!

বজ্রপাত হল। কিন্তু মুষড়ে পড়ল না শমীশাখা। সে ছিল প্রস্তুত। তাই রইল স্থির নিষ্কম্প।

কালিনাথ হঠাৎ যেন ব্যাকুল হলেন—না, না, এ তুমি কি বলছ প্রিয়! মাথা ঠাণ্ডা কর। বাবা সুপ্রিয়···

—বোসো তুমি কালিনাথ। বাষ্পলেশহীন-স্বরে প্রিয়নাথ বললেন—এই আমার শেষ কথা। অবাধ্য সন্তানের থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে বললেন—কিছু বলতে চাও?

মাথা নেড়ে সুপ্রিয় বললে—না। আমি চললাম। যাবার সময় এই প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছি, ভগবান আপনাকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করুন।

সুপ্রিয় সোজা বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত কাটলো নিশ্ছিদ্র নীরবতায়। তারপর যেন ... থেকে জেগে উঠলেন প্রিয়নাথ। বললেন—সুপ্রিয় যে সত্যিই ... গেল, কালিনাথ! তবে তুমি যে বলেছিলে, ও আমার কথা ... করতে সাহস করবে না।

সখেদে কালিনাথ বললেন—ছেলে হয়ে বাপের কথা ... করে অমান্য করবে, এমনি ভাবে বাপকে অপমান করবে ... ভাবতে পারিনি প্রিয়নাথ! যাই হোক, তুমি চিন্তিত হোয়ো না ... দু'দিন চেপে থাকো, তাহলেই দেখবে, বাবাজীর সব গরম ... হয়ে গেছে এবং তোমার কাছে ফিরে এসেছে। বুঝতে পারছো না ... পিছন থেকে যে আস্‌কারা আছে।

অন্যমনস্কের মতো প্রিয়নাথ বললেন—কিন্তু আমি কি ... করলাম, কালিনাথ?

—কখনোই নয়। অনেক দিক ভেবে অনেক গবেষণার ... তুমি যা স্থির করেছো তাতে যথেষ্ট বুদ্ধি আর দূরদর্শিতার পরিচয় আছে। না বুঝে সুপ্রিয় তোমায় আঘাত করে চলে গেল।

ধীরে ধীরে প্রিয়নাথ বললেন—ঠিক বলেছো তুমি। কিছু বুঝলে না। বুঝতে চাইলে না। গোঁ ভরে চলে গেল। যাক!

বুকের ভিতরটা যেন কেমন করতে লাগল প্রিয়নাথের। বললেন—তোমার সেই ওষুধটা আছে নাকি? দাও তো একটু। ভারী দুর্ব্বল বোধ করছি।

ব্যস্তভাবে কালিনাথ খাটের তলা থেকে স্যুটকেশ বার করে তার ভিতর থেকে একটি শিশি আর ছোট গেলাস বার করলেন। কবিরাজী ঔষধ আছে শিশিতে। তেজস্কর আর বলবর্দ্ধক। এক মাত্রা ঢেলে দিলেন বন্ধুকে।

ওষুধ খেয়ে মুখ মুছে প্রিয়নাথ বললেন—আমি ভুল করিনি কি বল কালিনাথ?

—নিশ্চয় ভুল করোনি।

* * * *

—তোমাকে স্মরণ ক'রে মনে জোর পেয়েছি, সাহস ... জমাট অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা দেখেছি, অগ্রাহ্য ... বাপের অন্যায় অনুশাসন। কিন্তু তার বিনিময়ে এ কী ... তোমার মুখে! আসবে না আমার সঙ্গে, অপেক্ষাও করবে না ...

গৃহত্যাগ করে সুপ্রিয় এসেছে প্রমীলার কাছে। ... ভবতারণ বাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে সুপ্রিয়র ... হবার সুযোগ হয়নি। ঘরের বাইরে লম্বা বারান্দার একান্তে ... সুপ্রিয় আর প্রমীলার মধ্যে কথা হচ্ছিল।

—যাবে না আমার সঙ্গে? একদিন যে গান গেয়ে শুনিয়েছিলে, 'পাড়ি দিতে নদী, হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি' ... সে কি মিথ্যে?

মনের ভাব আজ কিছুতেই কণামাত্র ব্যক্ত করা চলবে না ... ছিঁড়ে পড়ছে ভিতরটা। অসহ্য যন্ত্রণা! কিন্তু ভাব-লেশের ... কোন ছায়া নেই তার। নিষ্কম্প কণ্ঠে প্রমীলা বললে—সব ... করে বুঝিয়ে বলতে পারবো না আজ। শুধু এই মাত্র বলি ... নিজের স্বার্থ, নিজের সুখের চেয়ে আজ আমার কাছে ... মান, তাঁর অপমান, তাঁর বেদনা আর হতাশা। এ-সব ছেড়ে যাওয়া তো সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP

—বেশ, তাহলে আমায় এই কথা দাও যে আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অবিচলিত থাকবে তুমি সকল অবস্থায়। আমার বাবা আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করে আজ আমায় এই অবস্থায় এনেছেন, তোমার বাবাও হয়ত সেই রকম ব্যবস্থা করবেন তোমার সম্বন্ধে। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তোমায়।

—লাভ কি তাতে? তোমার আমার পথ আজ আর এক নয়। আমাকে ত্যাগ কর তুমি। ভুলে যাও।

কথা বলতে বলতে প্রমীলার চোখের পাতা কি কাঁপল? কৈ না তো। আশ্চর্য্য সংযম তার বাক্যে আর অভিব্যক্তিতে।

উত্তেজিত হল সুপ্রিয়—কি পাগলের মত বকছ! তোমার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এলাম আর তোমার মুখে এই কথা! তাহলে আমার প্রতি তোমার কোন স্নেহ-ভালবাসা নেই, ছিল না কোন দিন, অভিনয় করেছিলে আমার সঙ্গে এত দিন, এই কি আমাকে আজ মনে করতে হবে?

মৃদুকণ্ঠে প্রমীলা বললে—আশ্চর্য্য কি? এখনো মানুষকে বিশ্বাস কর তুমি?

সুপ্রিয় বললে—নিশ্চয় করি। তুমি আর আমাকে পরীক্ষা কোরো না। একেই তো অত্যন্ত বিহ্বল বোধ করছি, তার ওপর তুমিও যদি আজ এমন করে আঘাত দিয়ে কথা বল, তাহলে নিজেকে সামলানো দায় হবে।

ধীরে ধীরে প্রমীলা বললে- তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার অনেক পথ, অনেক ক্ষেত্র, অনেক সুযোগ প্রতি পদক্ষেপে, সুতরাং নিজেকে সামলে নিতে পারবে, পথ পাবে খুঁজে। সে-পথে আমাকে ডেকো না। তোমার জীবনে আমি নেই।

—কিন্তু কেন? কি আমার অপরাধ?

প্রমীলা জবাব দিলে—অপরাধ নয়। ভাগ্য। তোমার আমার সার্থকতার কথাটাই আজ শুধু ভাবলে চলবে না। বাপের অপমান আর দুঃখ, সেটা ভোলা কি সহজ? তাঁর মুখ চাইতে হবে আমায়, নিজের সুবিধাকে বলিদান দিয়ে। এই কথাটা বুঝতে পারছো না কেন? অকারণে সে-অপমান তাঁকে সইতে হল সে তো আমার জন্যেই, তাই আমার জীবন দিয়ে তাঁকে যতটা পারি সান্ত্বনা দিতে হবে বৈকি।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সুপ্রিয় বললে—সব কথাই তোমায় বললাম। শয়তান কালিনাথ যা বলে গেছে, নিশ্চয় জেনো, তার সব কথাই বাবার নিজের কথা নয়। যাই হোক, সর্ব্বস্ব রিক্ত হয়ে আজ পথে বেরিয়েছি, একান্ত অপরিচিত পথে অনির্দ্দেশ্য যাত্রা শুরু হল, কোন জ্ঞান নেই, নেই কোন অভিজ্ঞতা, কোথায় কী ভাবে যে এ যাত্রার পরিণতি ঘটবে তাও জানি না। বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যে আলোর শিখা ছিল, তাও আজ নিবল।

হাতের কাছে লোহার থামটা প্রমীলা শক্ত করে চেপে ধরল। মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ কি নিজেকে সামলাতে পারবে না সে?

—চললাম তাহলে। সুপ্রিয় বললে—তাহলে এই কি তোমার শেষ কথা?

গলার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। কোন রকমে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিয়ে প্রমীলা বললে—শেষ কথা কি না জানি নে। কিন্তু আজ আর অন্য কথাও কিছু বলবার নেই। মনের মধ্যে যেখানে অপমানের আঘাত আর গ্লানি, দুঃখ-বেদনায় অন্তর সেখানে ছত্রখান, সেখানে মিলনের বাঁশী বাজবে বেসুরো, সে মিলন সুখের বা কল্যাণের হবে না।

প্রমীলা স্তব্ধ হল। কয়েক মুহূর্ত্ত কাটল, তার পর নিঃশ্বাস চেপে সুপ্রিয় বললে—চললাম।

অস্ফুটে প্রমীলা বললে—এসো।

চলে গেল সুপ্রিয়।

* * * *

বাগানবাড়ীর নাচঘরের দরজা আবার খোলা হয়েছে। প্রিয়নাথকে আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে কালিনাথ গান-বাজনার আয়োজন করেছেন।

দু'দিন ধরে অসহ্য অস্থিরতার মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্ত যাপন করেছেন প্রিয়নাথ। কালিনাথ পাশে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা আর স্তোকবাক্য দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। স্তব্ধ ও নির্ব্বাক প্রিয়নাথ। দৃষ্টি বিহ্বল, কাতর।

কালিনাথের ভয় ছিল হয়ত আজকের এ আয়োজনে সম্মতি দেবেন না তিনি। কিন্তু, সহজেই রাজী হয়েছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুই বন্ধুতে বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

মালিটা ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছে। বাগানবাড়ীর চাবী এখন কালিনাথের হেপাজতে। চাবী খুলে কালিনাথ বন্ধুকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

প্রিয়নাথের দুই চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে দূরপ্রসারী। ফরাসের এক পাশে তাকিয়ার ওপর হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন—কখন আসবে সব?

কালিনাথ বললেন—সন্ধ্যা হোক! তবে তো।

আর কোন কথা হল না। কালিনাথ একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আর একবার ভিতরে ঢুকে প্রিয়নাথকে লক্ষ্য করছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল। কালো ছায়া নামল বাগানবাড়ীর সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে। কালো এবং করাল ছায়া।

প্রিয়নাথ বললেন, কই, কেউ তো আসছে না।

—আসবে না। দৃঢ়কণ্ঠ কালিনাথের।

—আসবে না! তার মানে? গান, নাচ? প্রিয়নাথ দু'চোখ মেলে তাকালেন।

—হবে না কিছুই। বললেন কালিনাথ—নাচ-গানের জন্যে আজ তোমায় এখানে আনিনি।

—তবে কিসের জন্যে এনেছো?

প্রিয়নাথের কথার উত্তরে কালিনাথ বললেন—এনেছি তোমায় আমার শেষ কথা শুনিয়ে যাব বলে?

—তোমার শেষ কথা?

মাথা দুলিয়ে কালিনাথ বললেন—হ্যাঁ, আমার শেষ কথা বলবার সময় হয়েছে আজ।

—তাহলে বল।

—শোন প্রিয়নাথ! বলতে আরম্ভ করলেন কালিনাথ—দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আমি তোমার কাছে এসেছিলাম কেন, তা কি তুমি জান?

মাথা হেলিয়ে প্রিয়নাথ বললেন—জানি বন্ধু। আমার সর্বনাশ করতে। আমার পিতৃপুরুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। এমন, ঠিক নয়?

—ঠিক! কালিনাথ বিকৃত কণ্ঠে হেসে উঠলেন—তোমার বুদ্ধি তাহলে একেবারে লোপ পায়নি! জানো কি তুমি, কি করেছি তোমার? তোমার ছেলেকে ঘর-ছাড়া করেছি আমি, তোমার সকল আশায়, সকল সুখে আগুন লাগিয়েছি আমি; তোমার মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি সমূলে নষ্ট করেছি আমি।

—জানি বৈকি।

কালিনাথ বলতে লাগলেন—তোমাকে তিলে তিলে ধ্বংস করেছি আমি, তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি কাল-পরশুর মধ্যেই ক্রোক হয়ে যাবে, তার মূলে আছি আমি। এর পর তোমার আর দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত থাকবে না। জান কি তুমি?

সোজা হয়ে বসে রুদ্ধশ্বাসে প্রিয়নাথ বললেন—তাও জানি।

চোখে-মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে কালিনাথ বসলেন প্রিয়নাথের পাশে। স্বরূপ-মূর্ত্তিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে শয়তান। বিকৃত কণ্ঠস্বরে আর বীভৎস হাসিতে বিষ ঝরে পড়ছে।

—হা, হা, হা, হা।

কালিনাথ হাসছেন। অপরিমিত বিষাক্ত হাসি। দু'চোখ জ্বলছে। সাপের মতো দেহটা দুলছে।

—আজ আমি সার্থক। আমার বেঁচে থাকা সফল হল। পিতৃলোকের তর্পণ সম্পূর্ণ হল আমার। পথের ধুলোয় লুটিয়েছে মুখুজ্জে বংশের অহঙ্কার আর মহিমা। সর্ব্বস্বান্ত আর হতমান হয়েছে প্রবল-প্রতাপ অত্যাচারী প্রমথনাথের পুত্র প্রিয়নাথ। কিন্তু আর একটু বাকী আছে। আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হতে আর একটু বাকী আছে। কিসে আমার আনন্দ চরম হবে তা জানো কি তুমি?

—না, তা তো জানি না। স্থির নেত্রে চেয়ে আছেন প্রিয়নাথ।

কালিনাথের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—আমার আনন্দ নিঃশেষে চরিতার্থ হবে সেই দিন, যেদিন দেখবে, প্রমথনাথের ছেলে প্রিয়নাথ, পথের ভিখারীর মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছেঁড়া কাপড়, জুতো নেই পায়ে, একমুষ্টি অন্নের জন্যে এ-দুয়ার থেকে ও-দুয়ারে যাতায়াত করছে, পেটের জ্বালায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে করুণ কণ্ঠে ভিক্ষা করছে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য যেদিন দেখব সেদিন আমার আনন্দের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হবে। কবে দেখবো? কবে দেখবো?

হঠাৎ শির-শির করতে লাগল প্রিয়নাথের সর্ব্বশরীর। দেহের সব রক্ত কি মাথায় উঠেছে? ব্রহ্মতালুর মধ্যে কি আগুন ধরেছে? মুহূর্ত্তে আত্মবিস্মৃত হলেন তিনি। যাকে বলে সাময়িক উন্মত্ততা, তাই গ্রাস করল তাঁকে। প্রতি রোমকূপ দিয়ে আগুনের প্রবাহ ছুটল।

—দেখবে, তুমি দেখবে? বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কালিনাথের ওপর।

প্রিয়নাথ হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ। আর সে-তুলনায় কালিনাথ কৃশ দুর্বল। সংঘাতের দুর্দ্দমনীয় বেগ সামলাতে পারলেন না, ধরাশায়ী হলেন।

—দেখবে? তুমি দেখবে?

বাঁ হাতে কালিনাথের গলা চেপে ধরেছেন প্রিয়নাথ, আর বলছেন—দেখবে? তুমি দেখবে?

কালিনাথের চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল—কী করছ! মারবে নাকি আমায়?

—দেখবে? তুমি দেখবে? ক্ষেপে গেছেন প্রিয়নাথ। সামনে, নীচু টেবিলের ওপর বসানো ছিল ভারী একটা ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি। দু'হাতে সেটা টেনে নিয়ে কালিনাথের মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরলেন।

—দেখবে? তুমি দেখবে? তবে দেখ, দেখ, দেখ! কথার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে আঘাত করতে লাগলেন, কালিনাথের মাথায়, বুকে, সর্ব্বাঙ্গে।

প্রলয় ঘটে গেল কয়েক নিমেষে। দু'-চার বার আর্ত্তনাদ করলেন কালিনাথ। সমস্ত শরীর ধনুকের মতো বেঁকে গেল। তার পর সব স্থির নিস্পন্দ!

সম্বিত ফিরে এল। উত্তেজনা প্রশমিত হল। হাতের ভারী পদার্থটাকে ফেলে কালিনাথকে চেপে ধরলেন প্রিয়নাথ। এ কী করেছেন তিনি? কালিনাথ, কালিনাথ! কিন্তু সাড়া দেবে কে? প্রাণহীন দেহ, নিথর নিস্তব্ধ!

কাঁপতে লাগলেন। খুন করলেন অবশেষে? বিষয়-সম্পত্তি গেল, মান-ইজ্জত গেল, এইবার খুনী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

শিউরে উঠলেন। অসহ্য লাগছে ভাবতে। কাঁপতে লাগল সর্ব্বাঙ্গ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত। মহাভয় গ্রাস করল তাঁর সমস্ত সত্তা। এ অবস্থায় লোকালয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন না। তা হলে কি করবেন?

পালাতে হবে। লোকালয় থেকে দূরে, বহু দূরে। তারপর পৃথিবী থেকে। পালাতে হবে। এই চিন্তাই তাঁকে আচ্ছন্ন করল। পালাও। পালাও। যেদিকে দু'চোখ যায়।

* * * *

রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চললেন, ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে লাগলেন, চোখের দৃষ্টিতে অপরিসীম বিহ্বলতার ছায়া। অদূরে লোক দেখে চমকে উঠছেন। সরে দাঁড়াচ্ছেন গাছের তলায়। ওই বুঝি কেউ এসে ধরল তাঁকে। দূরে কে যেন কাকে কি বলছে। সন্ত্রস্ত চকিত হলেন। তাঁকে উদ্দেশ করেই বোধ হয় বলছে।

রাস্তা পার হয়ে সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেখানেও নিস্তার নেই। গর্জ্জন করে উঠল এক জন—দাঁড়াও। কাঁপতে কাঁপতে সরে দাঁড়ালেন। রেডিওয় অভিনয় হচ্ছে। তাহলে তাঁকে কেউ কিছু বলছে না? ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সে-রাস্তা পার হয়ে আর একটা বড় রাস্তায় পড়লেন। দপ-দপ করে লাল আলো জ্বলছে নিবছে। আলোর লেখা ফুটে উঠছে—হত্যাকারী কে? দু' চোখ বিস্ফারিত করলেন। এরই মধ্যে কি সবাই জেনেছে? না। ওটা সিনেমা। ছবির বিজ্ঞাপন।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হল। ক্লান্ত পদ শ্লথ হল প্রিয়নাথের। কিন্তু থামার সাহস নেই। চলতে লাগলেন অবিরাম।

* * * *

পরের দিন অতিবাহিত হল। তার পরদিন সংবাদপত্রে খবর বার হল :

"বরানগরে হত্যাকাণ্ড।

"গত পরশু রাত্রে বরাহনগর অঞ্চলের এক বাগানবাড়ীতে এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জানা গিয়াছে যে উক্ত বাগানবাড়ীর মালি গত পরশু রাত্রে বাগানবাড়ীতে অনুপস্থিত ছিল। গতকাল সকালে কার্য্যে আসিয়া সে দেখিতে পায়, বাগানবাড়ীর মালিকের বন্ধু কালিনাথ চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক মৃত অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়িয়া আছেন। মালি সেই দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্থানীয় থানায় সংবাদ দেয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, বাগানবাড়ীর মালিক হইতেছেন কলিকাতার সুনামখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার বাড়ীতে ও কর্ম্মস্থলে সংবাদ লইয়া জানা যায়, তাঁহার পুত্র কিছুদিন যাবৎ কার্য্য-ব্যপদেশে কলিকাতার বাহিরে আছেন এবং তিনিও তিন দিন পূর্ব্বে পাট কেনা-বেচার কাজে মফঃস্বলে গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মস্থলের প্রধান কর্ম্মচারী জানান যে উক্ত নিহত কালিনাথ চৌধুরী প্রিয়নাথ বাবুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং কয়েক দিন আগে কলিকাতায় আসিয়া প্রিয়নাথ বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও জানা যায় যে, কালিনাথ বাবু প্রায়শঃই উক্ত বাগানবাড়ীতে রাত্রি-যাপন করিতেন। কালিনাথ বাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন তথ্য এখনো জানা যায় নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, নিহত ব্যক্তির কোন শত্রু অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কোন ভারী পদার্থের দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। ইহা চুরী বা ডাকাতি-জনিত হত্যা নহে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।"

* * * *

পরনের লম্বা কোট ঘামে ও ধূলায় মলিন। অনভ্যস্ত পথ-হাঁটার ক্লান্তিতে দুই হাঁটু ভেঙে পড়ছে। পকেটে মনিব্যাগের মধ্যে সামান্য অর্থ আছে। কিন্তু কোন দোকানের সমুখে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই। অর্দ্ধমৃত আচ্ছন্নের মতো প্রিয়নাথ ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছেন।

রুক্ষ চুল। শুষ্ক মুখ। খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে আকীর্ণ গণ্ডদেশ। এমনি করে আর কত দূর? পেরিয়ে এসেছেন অনেক পথ। ছোট-বড় অনেকগুলি রেল-ষ্টেশন, ছোট-বড় সেতু, প্রসারিত মাঠ আর দিগন্তবিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেছেন, পথ হেঁটেছেন ছোট-বড় গ্রামের ভিতর দিয়ে, অনেকগুলি লোকালয় আর জনপদ পিছনে ফেলে এসেছেন।

* * * *

ছোট একটি ভাঙা মন্দির। তার শূন্য অঙ্গনে কোন পুণ্যলোভীর ভীড় নেই। নির্জ্জন স্থানটিকে ঘিরে একটি অপার্থিব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত স্থান। ধীরে ধীরে প্রিয়নাথ এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের একটা ভাঙা পৈঠার ওপর বসলেন।

গাছের মাথায় মাথায় সূর্য্যাস্তের শেষ রক্তিমাভা মিলিয়ে যাচ্ছে। পাখীরা বাসায় ফিরছে। দূরে মেঠো রাস্তায় গোরুর গাড়ী চলেছে ঘরমুখো। তার চাকার বিচিত্র কর্কশ শব্দের রেশ বহু দূর থেকে ভেসে আসছে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল—**Here comes another!**

চমকে শিউরে উঠলেন প্রিয়নাথ। ধরা পড়ে গেছেন। আর নিস্তার নেই। কাঁপতে লাগলেন।

একগাদা ইটের স্তূপের আড়াল থেকে লোকটি এগিয়ে এল; হাসলে হা হা ক'রে। তারপর বলে উঠল—**"Angels & ministers of grace defend us. Be thou a spirit of heaven or goblin damned, be thy intents wicked or charitable thou come'st in such a questionable shape, that I will speak to thee!"** কী মশায়, কেমন আছেন? আজকের বাজার-দর কেমন? তেজী না মন্দি?

প্রিয়নাথ লোকটির পানে তাকিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। একটা পাগল। কিন্তু কী বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ! লোকটা যে বিশেষ শিক্ষিত তাতে সন্দেহ নেই।

—কী ভাবছেন? পাগল বললে—**The flesh is weak! Way of all flesh! How does your patient doctor? Canst thou not minister to a mind diseased, pluck from the memory a rooted sorrow?** "হে ভিষক! পারো নাকি মনোব্যাধি করিতে মোচন? স্মৃতি হোতে উখাড়িতে নারো কি হে তুমি, দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল?"

প্রিয়নাথ নীরব। অদূরে দাঁড়িয়ে লোকটা হাত-পা নাড়ছে আর ব'কে চলেছে। আবছা অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

বকতে বকতে হাসতে হাসতে পাগলটা মন্দিরের পিছন দিকে চলে গেল। প্রিয়নাথ মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বিস্ময়ে আর উৎকণ্ঠায় বিচলিত হলেন।

রাস্তার ওপারে একটি টিনের-চালাওলা বড় দোতলা মাঠকোঠায় আগুন লেগেছে। লোক-জনের চীৎকার শোনা যাচ্ছে। শিশুর কান্না আর স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ!

নীচেকার একটা জানলা-খোলা ছোট কুঠরির ভিতর দেখা যাচ্ছে। একটি শিশু জানলার গরাদ ধ'রে কাঁদছে। তার চারি দিকে আগুনের শিখা!

কী সর্ব্বনাশ। বাচ্ছাটা যে এখনি পুড়ে মরবে! লোক-জন চেঁচাচ্ছে বটে, কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হচ্ছে না। অথবা, ঘরটা এক টেরে বলে কেউ জানতে পারেনি ছেলের অবস্থা?

প্রিয়নাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। পরনের কোটটা খুলে ফেলে পৈঠার ওপর রাখলেন। তার পর অগ্রসর হলেন আগুনের দিকে।

অসহনীয় উত্তাপ চারি দিকে। ঝলসে যাচ্ছে গা হাত। কোন রকমে জানলার গরাদ ভেঙে ছেলেটাকে বার করে এলেন প্রিয়নাথ। তাকে আগুনের আঁচ থেকে বাঁচাতে নিজের বাঁ কাঁধ এবং মুখের বাঁ দিকটা রীতিমতো ঝলসে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেটাকে ফাঁকা জায়গায় এনে নামালেন। ছুটে এলো মা। লোক-জন ছুটে এলো। জয়ধ্বনি করল সবাই।

ওদিকে পাগলটা এক কাণ্ড করে বসল। প্রিয়নাথের প্রস্থানের পর আবার তাকে দেখা গেল। বকতে বকতে সে প্রিয়নাথ যেখানে বসেছিলেন সেখানে এসে দাঁড়াল, তাঁর পরিত্যক্ত কোটটার প্রতি দৃষ্টি পড়ল। তুলে নিলে সেটা। তারপর প'রে নিলে। কোট প'রে লোকটা মহা খুসী! এদিক-ওদিক তাকালো। ওদিকে আগুন জ্বলছে। মাঠকোঠাটা পুড়ছে। হঠাৎ পাগলটা সেই আগুনের দিকে ধাবিত হল।

—কে যায়? কে যায়? প্রিয়নাথ এগিয়ে গেলেন খানিকটা। কিন্তু পাগল তখন ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। সহসা প্রচণ্ড শব্দে মাঠকোঠার দোতলাটা ভেঙে পড়ল। ভেঙে পড়ল একেবারে পাগলটার মাথায়। মোটা কাঠের একটা গুঁড়ির আঘাতে তার বুক, মাথা আর মুখ থেঁত্‌লে চেপ্টে গেল।

—পুলিশ এসে গেছে—কে একজন বললে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন প্রিয়নাথ। লোকজনের পাশ কাটিয়ে দ্রুত পা চালালেন।

অজানা-পথ-যাত্রা আবার শুরু হল।

* * * *

একটি যাত্রী-বিরল রেল-ষ্টেশন। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে প্রিয়নাথ চলেছেন সেই ষ্টেশনের সামনে দিয়ে। নগ্নপদ, ছিন্ন বাস, মুখের বাঁ দিকটায় কালো দাগ। বাথাতুর করুণ দুই চোখের দৃষ্টি। মলিন অপরিচ্ছন্ন ক্লিষ্ট ক্লান্ত চেহারা।

এক গাল দাড়ি। রুক্ষ চুলগুলো ঝুলে পড়েছে। চেনা যায় না।

ট্রেন থেমেছিল। চলে গেল বাঁশী বাজিয়ে। একজন যাত্রী নেমেছিল। এক হাতে তার স্যুটকেশ। অন্য হাতে বেডিং। প্লাটফর্ম পার হয়ে রাস্তায় এসে লোকটি কুলি খুঁজতে লাগল। সামনে দিয়ে চলেছেন প্রিয়নাথ। তাঁকে দেখে লোকটি হাঁকলে—এই কুলি। ইধর আও।

থমকে দাঁড়ালেন প্রিয়নাথ। তাকালেন লোকটির দিকে। অধীর ভাবে যাত্রীটি বললে—দেখতা কেয়া? আও ইধর। সামান উঠাও। চলো ডাকবাংলো।

এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলেন প্রিয়নাথ। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বিছানার মোটটা মাথায় তুলে নিলেন। হাতে নিলেন স্যুটকেশ। শুরু হল নতুন জীবন। কুলি।

[ক্রমশঃ।

ফরগেট মি নট

বারি দেবী

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়···
এমন মেঘ স্বরে, বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন বরিষায়!"

বিশ্ব-হিয়ার কোন্ অকথিত বাণী বিশ্বকবি বলতে চেয়েছিলেন, জানি না···কিন্তু আজ শিলংএর ঝর ঝর বর্ষণ-মুখরিত মেঘকজ্জল, সন্ধ্যায়, ঐ গানের কথাগুলি যেন নিবিড় ভাবে ঘিরে ফেলেছে ডাঃ রঞ্জন গুপ্তকে!

খোলা জানলার ধারে তিনি বসেছিলেন মেঘমেদুর আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে। কি কথা বলবার ছিলো? বলা হয়নি। শিলংএর এই অপরূপ বর্ণ-ধ্বনিময় বর্ষা যেন তাঁর হারাণো কোন সুপ্ত বেদনার স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে বারে বারে।

মন যেন কোথায় ভেসে চলেছে। কুড়ি বছরের আগের জীবনের পর্য্যায়। মন ব্যাকুল ভাবে ছুটে চলেছে তার দিকে,—সেই অতীতের বেদনা-মধুর স্বপ্নময় অবিস্মরণীয় দিনগুলোর পানে।

সীতা! তুমি আজ কোথায়? জীবনে সম্মান, প্রতিপত্তি, সবই ত পেলাম, তবু কি মহাশূন্যতায় ভরা আমার হৃদয়-মন! তুমি যদি একবার দেখতে, একবার জেনে যেতে যে, তোমার আত্মা নিত্য ব্যাকুল হৃদয়ে অশ্রুধারায় তর্পণ করে পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে!

উচ্ছল হাসির শব্দে তিনি চমকে উঠলেন; বাগানে "ফরগেট মি নট" ফুলের ঝোপের ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে হাসির লুটিয়ে পড়ছে! মেয়েটির পরনে খাসিয়া পোষাক!

ডাঃ গুপ্ত বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে!

ডাকতে যাবার আগেই সামলে নিলেন নিজেকে, তাঁর ছেলে সমর গুপ্তকে মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য মিল সীতার সঙ্গে ঐ মেয়েটির? সেই সুন্দর নীল চোখ, সেই হাসি, দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও অবিকল তারই মত!

ডাঃ গুপ্ত আর ভাবতে পারেন না, ক্লান্ত ভাবে আরাম-কেদারায় দেহ এলিয়ে দিলেন! দারুণ লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিলেন! ছি! ছি! ঐ মেয়েটিকে যদি সীতা বলে ডাকতেন তাহলে?···কথাটা আর ভাবতে পারলেন না!

অসুস্থ শরীর তাঁর; শিলংএ এসেছেন হাওয়া বদলাবার জন্য। সঙ্গে একমাত্র ছেলে সমর এসেছে। আর এসেছে বহু দিনের পুরোনো চাকর ভজুয়া, মালী, দারোয়ান ইত্যাদি!

তাঁর স্ত্রী লিলি গুপ্ত আসতে পারেননি। বাতের ব্যথা তাঁর। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।···সেজন্য তিনি আছেন কলকাতায় সাদার্ণ এভেনিউর বাড়ীতে। সমর এবারে বি, এস-সি পরীক্ষা দিয়েছে! প্রেসিডেন্সি কলেজের সে একজন কৃতী ছাত্র। সুদক্ষ চিত্রশিল্পীরূপে পরিচিত হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। সম্প্রতি একটি ছবি সে আঁকতে আরম্ভ করেছে শিলংএ এসে।

ডাঃ গুপ্ত রোজ প্রাতর্ভ্রমণ করেন তাঁর অতি সখের ফুলের বাগানে! প্রত্যেক গাছের কাছে তিনি যান, প্রতি ফুলটিকে আদর করেন, সব শেষে ঘুরে এসে দাঁড়ান "ফরগেট মি নট" ফুলের গাছগুলির সামনে! গাঢ় নীল ফুলের স্তবকগুলো যেন কথা কয়ে ওঠে।···তারা যেন অশ্রুত ভাষায় দুলতে দুলতে বলে, "ফরগেট মি নট"! ডাঃ গুপ্ত ফুলগুলোকে স্পর্শ করেন; মৃদু স্বরে বলেন, "নেভার টু ফরগেট!"

এই গাছটি সীতা নিজের হাতে রোপণ করেছিলো আর হেসে বলেছিল, যখন আমি থাকবো না, তখন এর ফুলগুলো মনে করিয়ে দেবে আমার কথা···

চারি দিকে অসংখ্য ফুলের মেলা, বসরাই গোলাপের গন্ধে ভোরের বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে।···

ডাঃ গুপ্ত চলে আসেন নিজের ঘরে! ভজুয়া গরম কফি দিয়ে যায়! কফির পাত্রে চুমুক দিতে দিতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান ডাঃ গুপ্ত!

বিশ বছর আগে।···

রতনপুরের জমিদার নিরঞ্জন গুপ্তর একমাত্র কৃতী সন্তান রঞ্জন গুপ্ত ডাক্তারি পাশ করে সবে ফিরেছে তাদের দেওঘরের বাড়িতে। নিরঞ্জন বাবুর শরীর অসুস্থতার জন্য তিনি সপরিবারে কিছুদিন বাস করছেন দেওঘরে! সঙ্গে আছেন ছোট ভাই বিশ্বরঞ্জন, ও তাঁর স্ত্রী নীলিমা দেবী!

কলকাতার বাড়িতে তাঁর ছেলে রঞ্জন ও ভাইপো সুজন গুপ্ত ছিলো নিজেদের লেখাপড়ার জন্য। রঞ্জন দেওঘরে এসে রীতিমত অবাক্ হয়ে যায় একটি নতুন মুখের আবির্ভাব দেখে!

অনুসন্ধানে জানলো, মেয়েটির নাম সীতা! কাকীমার ভাইঝি! মা তার শিশুকালে মারা যান; সম্প্রতি বাবাও মারা গেছেন। লাহোরে ছিলো ওদের বাস, আর কেউ বাড়িতে না থাকায় মেয়েটিকে কাকীমা এখানে নিজের কাছে এনেছেন!

রঞ্জনের মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সীতার সুন্দর দুটি নীল চোখ, গোলাপী গায়ের রং আর সোনালী চুলের নিবিড় গুচ্ছ!···যেন র‍্যাফেলের আঁকা ম্যাডোনা মূর্ত্তিখানি!

রঞ্জনের ঘরখানি যেন প্রতিদিন কে নিপুণ হাতে গোছ করে রেখে যায়। টেবিল-ক্লথ, পরদা, বেড-কভার প্রভৃতির গায়ে, কোন্ শিল্পীর হাতের অপরূপ সূচীশিল্প?···রঞ্জন ভাবুক হয়ে ওঠে। টেবিলে ফুলদানীতে নিত্য কে রাখে নানা বর্ণের ফুলগুলো? আর টেবিল-ল্যাম্প-ধরা পাথরের মূর্ত্তিটির গলায় দোলে এক ছড়া টাট্‌কা যুঁথির মালা!

রোজ খুব ভোরে রঞ্জন ঘর ছেড়ে বাইরের প্রান্তরে ও বাগানে নেমে আসে প্রাতর্ভ্রমণের জন্য!

সেদিন বেলা আটটা বেজে গেছে। রঞ্জন অলস ভাবে পড়েছিলো বিছানায়! কার পায়ের শব্দে চোখ মেলে চাইলো, মনে হল, কে যেন ঘর থেকে চলে যাচ্ছে!

রঞ্জন ডাক দিলে, কে ওখানে?

মৃদু স্বরে জবাব এলো, আমি সীতা। আপনি এখনও ওঠেননি তা না জেনেই আমি ঘরে এসেছিলাম।

রঞ্জন ডাকে, সীতা! এক গ্লাস জল দেবে? বড্ড খারাপ লাগছে শরীরটা, উঠতে পারছি না—

সীতা জল নিয়ে যায়; চোখে তার উদ্বেগের ছায়া, হাত দিয়ে কপালটা স্পর্শ করে! উঃ, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। সীতা বলে, মাসীমাকে ডেকে আনি,······

রঞ্জন চায়, সীতা মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিক্।

[illegible] নিউমোনিয়াতে দাঁড়িয়েছে। জমিদার-বাড়িতে নেমেছে বিষাদের ছায়া। মা, বাবা, কাকা, কাকীমা অত্যন্ত উদ্বেগ ও চি[illegible] মাঝে দিন কাটাচ্ছেন। কলকাতা থেকে এসেছে বড় বড় ডাক্তার।

দিবারাত্রি কার সুকোমল হাতের পরিচর্য্যার স্নিগ্ধতা অ[illegible] করে রঞ্জন? কার দুটি সুন্দর চোখের ব্যাকুল চাউনি [illegible] যন্ত্রণার সময় শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয় রঞ্জনের সর্ব্বাঙ্গে? [illegible] রাত্রি পাখা হাতে মাথার কাছে বসে থাকে সীতা। যেন [illegible] মৃত্যুর আঁধার পথে জ্বলে উঠেছে একটি স্থির বিদ্যুৎ-শিখা!·· মৃত্যু-আঁধার ধীরে ধীরে সরে যায়। রঞ্জন ধীরে ধীরে ভালো [illegible] ওঠে। তবে শরীর এখনও বড় দুর্ব্বল, সেজন্য বিছানাতেই [illegible] ভাগ সময় থাকতে হয়। মা-কাকীমার আদেশে সীতা কাছে [illegible] গল্প ক'রে, বই প'ড়ে, কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনায়।

রঞ্জন বলে, সীতা, ভাগ্যিস্ আমার অসুখ করেছিল, [illegible] এমন নিবিড় ভাবে কাছে পেলাম তোমাকে! এ আমার রোগ[illegible] নয়···বাসরশয্যা!

সীতা গভীর বিষন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে, মৃদু স্বরে [illegible] রঞ্জনদা, ও-কথা ভুলে যান!···তার পর ধীর-পদে উঠে চলে যা[illegible] বেদনাহত হৃদয়কে শান্ত করতে!

রঞ্জন সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেছে।

কিন্তু এ যেন আরেকটি রঞ্জন! সে চায় না কর্ম্মস্থলে ফি[illegible] যেতে; তার প্রতিটি চিন্তা, অনুভূতির সাথে সীতার স্মৃতি জ[illegible] গেছে। সে পারবে না সীতাকে ছেড়ে কোথাও যেতে!

নিরঞ্জন বাবু সেদিন রঞ্জনকে ডেকে বললেন—কলকাতা [illegible] মিষ্টার সেন সপরিবারে এসেছেন এখানে, তুমি আজ বিকেলে [illegible] ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে। রঞ্জনকে বিকেলে যেতেই হলো [illegible] সেনের বাড়ীতে। সেন-দম্পতি নিখুঁত অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত ক[illegible] তাঁদের ভাবী জামাতাকে।

কিছু পরে তাঁদের আদরিণী কন্যা লিলি এলো। হ্যা[illegible] রঞ্জন! তুমি যে একেবারে আমাদের ভুলে গেছ দেখছি? ক[illegible] থেকে এসে আমাদের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখার প্রয়ো[illegible] বোধ করনি!

রঞ্জন লজ্জিত ভাবে বলে, না, না, তা ঠিক নয়! আমা[illegible] অসুখ গেল, শুনেছ বোধ হয়! এবারে কলকাতায় ফিরবো [illegible] মনে করছি। অনেক দিন তোমার গান শুনিনি লিলি! [illegible] গান শোনাবে নিশ্চয়!

লিলি বলে হ্যাঁ, শোনাতে আমার আপত্তি নেই, তবে [illegible] গান শোনবার ধৈর্য্য কতক্ষণ থাকবে, সেটা ভাববার কথা!

লিলি পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসে, মিষ্টি মিহি গলায় [illegible] ইংলিশ গান ধরে পিয়ানো বাজিয়ে। গান শেষ হল। [illegible] বলে, লিলি, একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনাবে না?

লিলি পরম বিস্ময়ে বলে, তোমার হল কি রঞ্জন? তুমি [illegible] গান ভালোবাসো বলে আমি ত বিলিতি গানেরই চর্চ্চা ক[illegible] তবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতও একেবারে ভুলে যাইনি।

একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে হয় লিলিকে। কিন্তু র[illegible] গান শুনছিল না! তার মনে ভেসে ওঠে সীতার মুখে [illegible] শোনা গানখানি! পিয়ানো নয়, শুধু গলায় সে গেয়েছিলো [illegible]
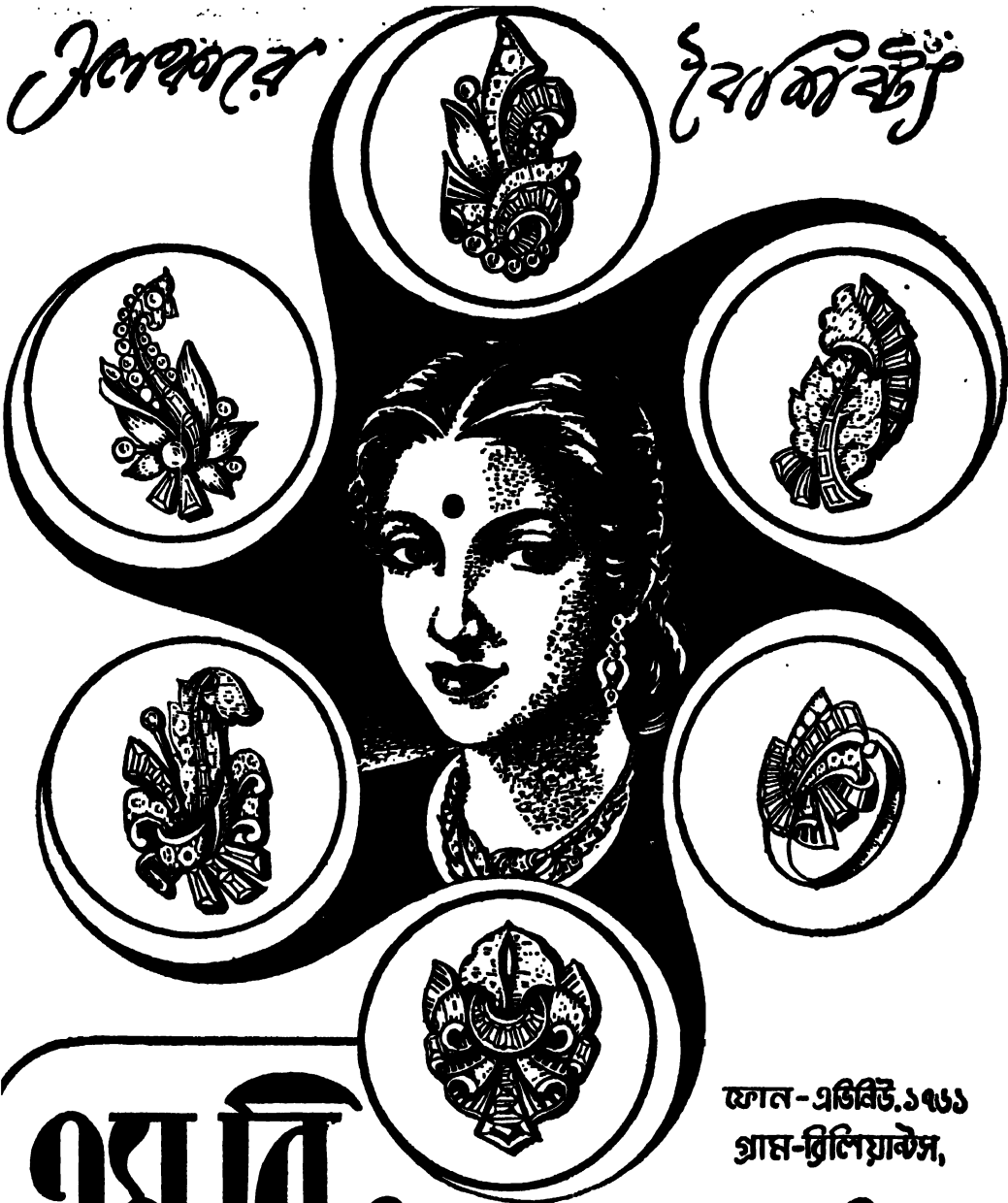
•••একটি হাসনুহেনার ঝাড়ের পাশে বসে। কি অপূর্ব্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর তার!•••অন্তরের সমস্ত দরদ ঢেলে সে গেয়েছিলো•••
'এমন দিনে তারে বলা যায়•••এমন ঘন ঘোর বরিষায়!'

লিলির গান শেষ হলো। রঞ্জন অন্যমনস্ক!

লিলি তীব্র স্বরে বিদ্রূপ করে রঞ্জনকে•••মনে হচ্ছে, তুমি যেন এ জগতে নেই! মনটি যেন কোথায় উধাও হয়ে উড়ে গেছে।

রঞ্জন সামলে নেয় নিজেকে, বলে, না, না। গানটা বড় ভালো লাগছিল, থামলে কেন?

লিলি ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আর গানে কাজ নেই।

প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার অরুণ সেন। নিবাস তাঁর কলকাতায় লেকভিউ রোডে। স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যা লিলি সেন। এই নিয়ে তাঁর সংসার। সেন-দম্পতির চালচলনে পাওয়া যেত একটি উগ্র বিলিতি ভাব! লিলিকে তাঁরা নাচে, গানে, বিদ্যায়, শিল্পকলায় তৈরী করেছিলেন সোসাইটির মনোহারিণী উজ্জ্বল তারকারূপে! জমিদার-পুত্র রঞ্জনের ওপর সেন সাহেবের ছিল বিশেষ নজর, তাকে জামাতারূপে লাভ করবার ছিল গোপন অভিলাষ।

নিরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে সেন সাহেবের যাতায়াত ক্রমশঃ ঘরোয়া ভাবে পরিণতি লাভ করলো। উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বে পরিবর্ত্তিত এবং পরে আরো নিকটতম কিছু হতে পারে, এই রকম আলোচনা বিদগ্ধ-মহলে শোনা যেত। রঞ্জনের ভালো লাগতো লিলিকে, পার্টিতে নৃত্যসঙ্গিনী হিসাবে লিলিকে সে আমন্ত্রণ জানায়। রঞ্জনের সঙ্গে লিলির সান্ধ্য-ভ্রমণ, সিনেমায় ও লেকে ওদের দু'জনকেই দেখে সকলে।

এটা গোপনীয় নয়, দুটি পরিবারের আছে এতে পূর্ণ সমর্থন।

অবশেষে সময় মত সেন-দম্পতি নিরঞ্জন বাবুর কাছে প্রস্তাব করেন—রঞ্জন ও লিলির বিয়েটা সমাধা করতে পারলেই তাঁরা এখন পরম নিশ্চিন্ত হন। নিরঞ্জন বাবু সানন্দে জানান, হ্যাঁ, এতে আমার আর কি আপত্তি থাকতে পারে? বিশেষ করে যখন ওরা দু'জন••• বুঝলে কি-না!

নিরঞ্জন বাবু হা! হা! করে হেসে ওঠেন। স্থির হল, রঞ্জনের ডাক্তারী পরীক্ষার শেষে শুভকর্ম্মটা সমাধা করা যাবে।

হঠাৎ নিরঞ্জন বাবুর শরীর অসুস্থ হওয়াতে তিনি সপরিবারে চলে আসেন তাঁর দেওঘরের বাড়িতে! ছ'মাস পরে দুটি পরিবারের আবার দেখা হল। সেন সাহেব ছুটি নিয়ে এসেছেন দেওঘরে।

নিরঞ্জন বাবু স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়েন। বলেন,—অরুণ বলছিলো, রঞ্জনের পরীক্ষা ত হয়ে গেছে, এবার বিয়ের দিনস্থিরটা করে ফেলার প্রয়োজন হচ্ছে। আমার ইচ্ছা, বর্ষাকালটা বাদ দিয়ে সামনের অঘ্রাণে দিনস্থির করি, কি বলো?

তার স্ত্রী সরমা দেবী বলেন, হ্যাঁ তাই বলে দাও ওঁদের।

রঞ্জনের কাছে সরমা দেবী খবরটা জানাতে সে একেবারে বেঁকে বসলো। দারুণ উত্তেজিত ভাবে বলে, মা, এখন আমি বিয়ে করবো না।

মা অবাক্ হয়ে বলেন, সে কি কথা? ওঁর শরীর খারাপ! তোর বিয়ে দেবার এত সাধ ওঁর; আর তা ছাড়া লিলির বাবাকে কথা দিয়েছেন যে।•••তুই ওঁর মাথা হেঁট করবি? আগে ত তোর এ বিয়েতে অমত ছিলো না?

রঞ্জন কথার জবাব দেয় না, চলে যায় নিজের ঘরে।

সন্ধ্যা বেলায় বাগানে দেখা হয় সীতার সঙ্গে! রঞ্জন ব্যাকুল ভাবে হাত চেপে ধরে সীতার। বলে, সীতা, তোমাকে আমি চাই আমার জীবনসঙ্গিনীরূপে। বলো•••তুমি আমার হবে কি না?

সীতা হাত সরিয়ে নেয়। ধীর স্বরে বলে, আপনি স্থির হোন! যার সঙ্গে আপনার বিয়ের ঠিক আছে, যেখানে আপনার বাবা বাক্‌দত্ত হয়েছেন, আপনি তাকে বিয়ে করুন। আপনি তাকে বিয়ে না করলে আপনার বাবা-মা মনে বিশেষ আঘাত পাবেন। জগতে কর্ত্তব্য পালনটাই সব চেয়ে বড় কাজ। আমার কথাটা আপনি ধীরচিত্তে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন বলে আমার মনে হয়।

রঞ্জন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, উত্তেজিত স্বরে বলে—না, না। ও-কথা আমি মানি না•••আমার জীবনের ওপর কারুর অধিকার নেই। বিয়ে কাকে বলে সীতা? দুটো মন্ত্রপাঠ, প্রাণহীন বাহ্যিক অনুষ্ঠান, আর একত্রে জীবন-যাপন? এই কি বিয়ের মূল উদ্দেশ্য? সারা মন-প্রাণ-দেহ যাকে চাইছে তাকে কেন আমি পাবো না? কোন্ বিষয়ে আমি তোমার অযোগ্য সীতা?

সীতার চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। ধরা-গলায় বলে,•••রঞ্জনদা, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। আপনাকে পাওয়ার কল্পনা আমার স্বপ্ন হয়ে থাক্, কারণ আমার সে অধিকার নেই যে!•••সে সৌভাগ্য নিয়ে জগতে আমি আসিনি! তবুও আমি এইটুকু জানি, যাকে ভালবাসা যায়, তার জন্য করতে হয় বিপুল ত্যাগস্বীকার। তাই আজ আপনার কাছে আজ আমার কাতর অনুরোধ, আপনি আমাকে ভুলে যান। লিলিকে বিয়ে করে বাবার সম্মান রক্ষা করুন, মাকে শান্তি দিন।

রঞ্জন অশান্ত আবেগে সীতার হাতখানি টেনে নেয়। ব্যাকুল ভাবে বলে—আমার ভালো-মন্দ চিন্তা করবার মত শক্তি আছে সীতা! শুধু তুমি একবার বলো তুমি আমার হবে কি না, তার পর আমার জীবনের পথ আমি বেছে নেব।

সীতা অশ্রুভরা চোখ দুটি মেলে চেয়ে থাকে রঞ্জনের দিকে। রঞ্জন সে চোখে কি জবাব পেয়েছিল জানি না।

পরদিন সীতা আর রঞ্জনকে বাড়ীতে পাওয়া যায় না।

শিলং-এ একখানি চমৎকার ছবির মত বাড়ী।

নিরঞ্জন বাবু অবসর সময়ে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্য পান করবার উদ্দেশে অতি মনোরম স্থানে বাড়ীটি করিয়েছিলেন। বাড়ী রক্ষা করার জন্য সেখানে থাকতো পুরোনো চাকর ভজুয়া, আর দু'জন মালী। রঞ্জন সীতাকে নিয়ে আসে সেই বাড়ীতে।

ভজুয়াকে বলে, ভজুয়া, আমরা এখানে এসেছি, এ কথা কেউ যেন না জানতে পারে। ভজুয়া ব্যাপারটা বোঝে, বিজ্ঞ ভাবে জবাব দেয়, খোকাবাবু, সে ভয় তুমি কোর না।

সামনের পূর্ণিমা তিথিতে তাদের বিয়ে হবে। মাঝে আর মাত্র পনেরোটা দিন। বিয়ের অনুষ্ঠান কি ভাবে করা যায়, বসে সে বিষয় নিয়ে ভজুয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে আর ভেতরে ভেতরে সব ঠিক করে ফেলে।

জগতে এত আনন্দ ছিলো? এত রং? এত আলো? এ•••

মধুরস ছিলো এ জীবনের মাঝে? কোন স্বর্গীয় আনন্দের অবগাহন করে ওরা দু'জনে? ওরা যেন মর্ত্যের মানব-মানবী নন মন্দাকিনীর স্রোতে ভেসে-আসা নন্দনের দুটি ফুল আজ হয়েছে এক জায়গায়! রঞ্জন আর সীতা। অন্তর দিয়ে উভয়কে অনুভব করে।

পার্ব্বত্য ঝরণার পাশে বসে দু'জনে। তাদের ভাবলোকের ভাষা যেন আজ হারিয়ে গেছে। নির্ব্বাক্ মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে দু'জনে দু'জনার দিকে। কখনও রঞ্জনের ভায়োলিন বেজে ওঠে মূর্চ্ছনায়, কখনও সীতার গানে পাইনের বনে লাগে সুরের দোলা।

হঠাৎ ওদের জীবন-আকাশে হল ধূমকেতুর আবির্ভাব। রঞ্জন সীতাকে নিয়ে বেড়িয়ে বাড়ীর পথে চলেছিল, রাস্তায় দেখা হল নিরঞ্জন বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু অবিনাশ সেনের সঙ্গে।

অবিনাশ বাবু বলেন, আরে রঞ্জন যে। কবে এলে এখানে? ইনি কে?

রঞ্জন শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দেয়। এই দিন পাঁচ-ছয় হল এসেছি! ইনি আমার স্ত্রী। তার পর তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় নির্দ্দিষ্ট পথে। ভদ্রলোক ভাবেন, ব্যাপারটা ত বড় গোলমেলে বোধ হচ্ছে! কিছুদিন আগেই ত গিয়েছিলাম নিরঞ্জন বাবুর বাড়ী, কই, তাঁর ছেলের বিয়ের কথা ত কিছু শুনিনি। তিনি বাড়ী ফিরে একটি চিঠি দিলেন নিরঞ্জন বাবুকে—তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে পথে দেখা হওয়ার সংবাদ জানিয়ে।

সীতা প্রতিদিন ভোর বেলা মালীর সঙ্গে লেগে যায় বাগানের কাজে। এ কাজে সে পায় বড় আনন্দ। তার বাবার কাছে সে শিখেছিল চমৎকার বাগান তৈরী করতে। এখানে এসে আবার সে মেতেছে উদ্যান-লীলায়। কত বাছাই-করা ফুলের গাছ আসে। সীতা নানা ছাঁদে রোপণ করে গাছগুলোকে।

একটি সুন্দর পাথরের বেদী ছিল বাগানে,···বেদীটির চারি ধার ঘিরে লাগায় "ফরগেট মি নট" ফুলের গাছগুলো। রঞ্জন প্রশ্ন করে, এ কি গাছ লাগালে? সীতার ঠোঁটে মৃদু হাসি জেগে ওঠে। ডাগর ভাষা-ভরা চোখে রঞ্জনের দিকে চেয়ে থাকে।

তার পর চুপি-চুপি বলে, "ফরগেট মি নট"। যখন ওর ফুল ফুটবে, হয়ত আমি তোমার পাশে থাকবো না। ওরা তখন মনে করিয়ে দেবে আমার কথা। রঞ্জন রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, কি বলছো তুমি সীতা! আমাকে আঘাত করবার জন্ম তোমার এত আয়োজন, এত চেষ্টা কেন বল তো?

সীতা ম্লান হাসি হাসে, জবাব দেয় না।

নিরঞ্জন বাবু গুপ্ত উন্মনা ভাবে চেয়ে থাকেন বাগানের ঐ নীল ফুলের পানে।···সীতার হাতে রোপণ-করা গাছগুলো আজ নীল ফুলে সজ্জিত হয়ে যেন কৌতুক ভরে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। নিরঞ্জন বাবু গুপ্তর দু'চোখের কোণে বেদনার অশ্রু জমে ওঠে। নিজের ভাবনায় নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যান···বিগত দিনের স্মৃতির জ্বালা ত অনেকটা নিবে এসেছিল! নানা কাজের মাঝে ডুবে মন অনেকটা শান্ত ভাব লাভ করেছিল।

আজ কেন বড় বেশী মনে পড়ছে সেই কথাগুলো? ঐ খাসিয়া মেয়েটিকে দেখবার পর থেকেই যেন নতুন করে জেগে উঠছে সীতার স্মৃতি!

হ্যাঁ, তার পর যেন কি হল?

অনুসন্ধানী মন তাঁর বিগত দিনের মাঝে আবার করে সীতার অনুসন্ধান। মধুর স্মৃতির স্বপ্ন-সায়রে আবার তিনি ডুব দিলেন।

অবিনাশ বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার তিন দিন পরেই এলো নিরঞ্জন বাবুর টেলিগ্রাম।···"শীঘ্র ফিরে এসো, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়!"

রঞ্জনের মুখে উদ্বেগের ছায়া নামলো।

সীতা জানতে চায়, কার টেলিগাম? রঞ্জন টেলিগ্রামটি দেয় সীতার হাতে।

সীতা টেলিগ্রামটি পড়ে কাতর স্বরে বলে, তুমি আজই যাও।

রঞ্জন একটু ভাবে, তার পর বলে,—না সীতা, আজ আমি যেতে পারবো না, আমাদের বিয়ের আর তিন দিন বাকি। বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে যাবো। যদি বাবা আমাদের প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন ভালো, তা না হলে আমরা অন্যত্র থাকবো।

পরদিন হঠাৎ এলো রঞ্জনের কাকীমার ছেলে সুজন গুপ্ত। সে এসে রঞ্জন আর সীতার সঙ্গে খুব সহজ সুরেই কথা বললে। রঞ্জনকে বলে ···সীতাকে বিয়ে করবে সে ত ভালো কথাই ··তার জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ড নেবার প্রয়োজন ছিলো না। ওদিকে জেঠাইমা তোমার চিন্তায় শয্যা নিয়েছেন, জেঠামশাইও খুবই অসুস্থ···মনোবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছেন।···ওঁদের কথাও ত একবার ভেবে দেখা উচিত ছিলো? আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে বোধ হয় এ কাণ্ডটা ঘটতো না। যা হোক, এখন দু'জনে ফিরে যাবে কি না বল?

রঞ্জন দৃঢ়স্বরে জবাব দেয়, হ্যাঁ, যাবো বৈ কি।' পরশু ঝুলন পূর্ণিমাতে আমাদের বিয়ে হবে। বিয়ের পর দু'জনে যাবো তাঁদের প্রণাম করতে।

সন্ধ্যা বেলায় রঞ্জনকে একবার বাইরে যেতে হলো বিয়ের কাজ যিনি করবেন তাঁর কাছে।

সীতা একা বসেছিলো···সুজন পাশে এসে বসলো। কঠোর স্বরে সুজন বলে, সীতা, তোমাকে আমি নিতে এসেছি। রঞ্জনের সঙ্গে তোমার বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না! জেঠামশায়ের উঁচু মাথা হেঁট করা কি তোমার উচিত? যে মেয়েকে তিনি পুত্রবধূ করবেন বলে বাক্‌দত্ত হয়েছেন, তার কথা তুমি একবার ভেবে দেখলে না? রঞ্জনের বৃদ্ধ বাপ-মার কথা একবার চিন্তা করলে না? যাঁরা অসময়ে তোমাকে আশ্রয় দিলেন, তাঁদের এত বড় ক্ষতি তুমি করছ কেমন করে—এ আমি কিছুতেই ভেবে পাই না। এই দেখো জেঠাইমার চিঠি।

একটি ছোট্ট চিঠি সে দিলো সীতার হাতে। তাতে লেখা ছিলো···

"সীতা! আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। যদি তা না দাও, তবে আমার অভিশাপ রইলো তোমাদের ওপর, আমার একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নিয়ে তুমি জীবনে কখনও সুখী হবে না। আমার বুকের আগুন তোমাদের চিরদিন দগ্ধ করবে।"

সীতা শিউরে ওঠে। থর্-থর্ করে কাঁপে তার সর্ব্বাঙ্গ; দু'হাতে সে মুখ ঢাকে!

সুজন বাঁকা চোখে দেখে বোঝে, পত্রাঘাতটা ব্যর্থ হয়নি।

তার পর বলে, রঞ্জনকে বলার দরকার নেই। কাল তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো, আমি তোমাকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হবো।

রঞ্জন ফিরে এসে সীতাকে দেখে চমকে ওঠে। ব্যাকুল স্বরে বলে—ওকি সীতা! তোমার শরীর কি অসুস্থ? মুখ অত বিবর্ণ হয়ে গেছে কেন?

সীতা শান্ত কণ্ঠে বলে—না। আমি বেশ ভালোই আছি।

আজ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। বাগানের বেদীতে বসেছিলো রঞ্জন আর সীতা।

ওপরে বর্ষণক্লান্ত মেঘমুক্ত নীল চন্দ্রাতপ। কানা-ভাঙ্গা রূপোর থালার মত চাঁদটা ছিলো ঠিক মাথার ওপর। চারি দিকে আলোর বন্যা। মোহময় সন্ধ্যা। উতলা বাতাস বয়ে আনছে ফুলের সুরভি।

রঞ্জনের চোখে রঙিন স্বপ্ন, ভবিষ্যতের কত মধুর কল্পনায় মন তার ভরপুর।

সীতার বুকে আসন্ন প্রিয়-বিচ্ছেদের অনন্ত বেদনা। সব কিছু হারানোর মর্মান্তিক জ্বালার বিপুল ক্রন্দন ভার মাঝে মাঝে তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে রুদ্ধ করে ফেলছিলো। তথাপি সে সংযত, শান্ত, সঙ্কল্পে অবিচলিত। পুরোনো একটি গাছে ফুটে ছিল "ফরগেট মি নট" ফুল। সীতা ছিঁড়ে আনে তার একটি গুচ্ছ। কম্পিত হাতে তুলে দেয় রঞ্জনের হাতে।

রঞ্জন বলে, কত সুন্দর ফুল রয়েছে চারি দিকে, তুমি এই ফুলটি কেন দিলে সীতা?

করুণ হাসি হাসে সীতা। বলে—এই ফুলটি আমার প্রতীক।

পরদিন সীতাকে আর বাড়ীতে পাওয়া যায় না। রঞ্জন পাগলের মত সারা বাড়ি, বাগান খুঁজলো। একটি ছোট্ট চিঠি পাওয়া গেল, তাতে লেখা ছিল,—"আমাকে ক্ষমা কোরো। অনুসন্ধান কোরো না। আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলাম।"

ওঃ! কি নিদারুণ যন্ত্রণা সেদিন বেজেছিল বুকে।

পৃথিবীর সব আলো যেন নিবে গেছে, চারি দিকে ভয়াবহ জমাট অন্ধকার, তার মাঝে ধ্রুবতারার মত জ্বলতে থাকে সীতার লাবণ্য-ভরা মুখখানি।

মাথার শিরগুলো যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। রঞ্জন দু'হাতে চেপে ধরে মাথাটা। বুকের স্পন্দন হয় দ্রুতগতি। একটা বুক-ফাটা আর্ত্ত স্বর বেরিয়ে আসে, সীতা।···

সুজন কাছে আসবার সাহস পায় না। দূর থেকে উপভোগ করে ব্যাপারটা।

তার পর···সুজনের সঙ্গে শূন্যমনে রঞ্জনকে ফিরে যেতে হয়, কলকাতার বাড়ীতে।

আর কিছুদিন বাদে লিলি আসে, তার স্ত্রীর অধিকার নিয়ে সীতার শূন্যস্থানে।

দীর্ঘ বিশ বছর কেটে গেছে।

প্রতি বর্ষায় রঞ্জন ফিরে আসে শিলংএর বাড়িতে। চোখের জলে তর্পণ করে সীতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে। ঐ "ফরগেট মি নট" গাছের পাশে ক্ষুদ্র বেদীটি তার জীবনের পরমপ্রিয় তীর্থস্থান। ওখানে বসে সে স্মরণ করে তার হঠাৎ-পাওয়া ও হঠাৎ-হারানো, জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ-আলোকময়ী পরমপ্রিয়াকে!

ধীরে ধীরে ডাঃ গুপ্ত পাইচারি করেন বারান্দায়। অন্যমনা কখন চলে এসেছেন সমরের ঘরে। একটি তৈলচিত্র দেখে চমকে ওঠেন।

ওটা কার ছবি? এ যে সীতার ছবি! এখানে এলো কি ক কে আঁকলো?

সমর ঘরে এসে দেখে তার বাবা পরম বিস্ময়ে চেয়ে আছেন, আঁকা ছবিটির দিকে।

সে এগিয়ে এসে বলে, বাবা! ও ছবিটা আমি এঁকেছি।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন, এটা কার ছবি?

ও একটি মেয়ের ছবি। এখানে আমার সঙ্গে আলাপ হ নাম তার ডালিয়া। ওর বাবা আইরিশ, মা বাঙ্গালী।

ডাঃ গুপ্ত টলতে টলতে একটি সোফার ওপর বসে পড়েন। ক স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, ওর মার নাম কি সীতা?

সমর বলে, তা ত জানি না বাবা! তবে ডালিয়া আসবে, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

কথা শেষ হবার আগেই···এক ঝলক দখিণ হা মত চঞ্চলা একটি মেয়ে ছুটে ঘরে এসে ডাক দেয়—স সমর! হঠাৎ অপরিচিত এক ভদ্রলোককে ঘরে দেখে সে দাঁড়ায়।

সমর বলে, ডালিয়া, ইনি আমার বাবা।

ডালিয়া হাত তুলে নমস্কার জানায়।

ডাঃ গুপ্ত পরম স্নেহ ভরে ডালিয়াকে পাশে বসান। কথার পর বলেন, আচ্ছা মা! তোমার মার নাম কি সীতা? মনে কোর না, কোনো বিশেষ কারণে আমি এ কথা জিজ্ঞেস ক

ডালিয়া বলে, হ্যাঁ, আমার মার ঐ নাম। আপনি কি মাকে চেনেন?

ডাঃ গুপ্ত মৃদু স্বরে বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমার আত্মীয়া। কোথায় থাকো মা?

ডালিয়া জবাব দেয়, আমরা আগে কার্শিয়ং-এ ছিলাম। বাবার চায়ের বাগান ছিলো। বাবা দু'বছর হল মারা গে চা-বাগান দেখবার-শোনবার লোক অভাবে সেটা বিক্রি করে শিলংএ বাবার একটি বাড়ী ছিলো, তার পর সেখানে ফিরে অনেক দিন আগে বাবা এখানেই বাস করতেন।

ডাঃ গুপ্ত স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন সব কথা···তারপর বলেন, মাকে আমার নাম বোলো, বোধ হয় চিনতে পারবেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, একদিন তোমাদের বাড়ী যাবার ইচ্ছা কিন্তু যেতে পারবো কি? তোমার মাকে বোলো যেন আমাকে দেখে যান। হয়ত বেশি দিন আমি আর বাঁচ যেন ওপারের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

সমর অবাক হয়ে শুনছিল এই অজানা কথাগুলো। বললো, বাবা আপনি বাঁচবেন না কেন? এ ধারণা কেন করছেন? এখানে এসে আপনার অবস্থারও উন্নতি হ

তার পর, বাবাকে খুসি করবার জন্য বলে, ডালিয়া খুব বাংলা গান গায়, বাবা।

ডাঃ গুপ্ত বলেন, হ্যাঁ, ওর মা-ও গাইতো। অপরূপ কণ্ঠ ছিল তার।

ঃ গুপ্তর অনুরোধে ডালিয়াকে গান গাইতে হয়···মায়ের মিষ্টি সুরে সে গাইলো···

মধু যামিনী রে···
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ফিরে।

ডাঃ গুপ্ত সোফায় মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

ঘরের জানলার কাচের শার্সি ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে যায়, এক ঝলক এলো সজল বাতাস শন্ শন্ শব্দে বয়ে গেলো···কোন্ তৃষিত আত্মার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের মত। ডালিয়া গাইলো···

আর তো হল না দেখা, জীবনে দোঁহে একা,
দু'জনে ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে।
মধু যামিনী রে···
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ফিরে।

গান শেষ হ'ল। ডাঃ গুপ্ত সস্নেহে ডালিয়ার মাথায় হাতটি রাখেন। মুখে তাঁর প্রসন্নতার স্নিগ্ধ ছায়া। মৃদু স্বরে বলেন, তোমার মতই মিষ্টি গলা তোমার, বড় আনন্দ দিলে মা আজ। মাঝে মাঝে আনন্দ থেকে বঞ্চিত কোর না তোমার এই বুড়ো ছেলেকে।

পরদিন। ডালিয়া এসে পায়ে হাত দিয়ে ডাঃ গুপ্তকে প্রণাম করে। হাসি-ভরা মুখে বলে, আপনি ত আমার মামা হন, তাই না? আর একদিন আপনাকে দেখতে আসবেন বলেছেন। আর বলেছেন, আমাকে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করতে।

ডাঃ গুপ্ত সস্নেহে ডালিয়ার পিঠে হাত দিয়ে বলেন, তোমরা আমার পরম স্নেহের পাত্রী! আর তুমি আমার সেবা-যত্নের ভার নিলে, এবারে তাহলে আমার যাওয়া হবে না! তার পর গাঢ় স্বরে বলেন, জানো মা, কত সন্ধান করেছি তোমাদের; কোথাও খুঁজে পাইনি। যদি উদ্দেশ পেতাম তোমাদের, তাহলে অনেক আগেই যেতাম তোমাদের কাছে!

ডালিয়া ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না, তারা ভিন্ন জাতের দুটি প্রাণী, সে মা ও বাবা ছাড়া আর কোনো আত্মীয়কে সে কোনো দিন দেখেনি, আজ তাই মামাকে পেয়ে সে খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে রোজ আসে, ডাঃ গুপ্তর কাছে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। গান গেয়ে শোনায়। ডালিয়া ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলে দেখে··· শুনতে শুনতে তার মামার চোখের কোণ বেয়ে বিন্দু বিন্দু ধারা গড়িয়ে পড়ে! কোন্ অজানা ব্যথায় ডালিয়ারও বুকটা করে ওঠে।

সেদিন টেলিগ্রাম আসে সমরের কাছে:

বৈষয়িক কোনো জরুরি কাজে সমরকে একবার কলকাতায় হবে।

সমর বলে, বাবা, আপনার ব্লাড-প্রেশারটা এখন খুব বেশী রয়েছে; অবস্থায় আপনাকে রেখে কেমন করে আমি যাবো? তার চেয়ে আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে চলুন।

ডাঃ গুপ্ত ফিরে যেতে চান না···বলেন, আমি এখানে বেশ আছি। ভজুয়া রইলো, পাশেই ডাঃ রায় আছেন। আর ওপরে রইলো ডালিয়া। আমার মা-মণি, সে রোজ দেখে যাবে। তুমি যাও, কাজ সেরেই ফিরে এসো। আমার দুশ্চিন্তিত চিন্তা করবার কারণ নেই।

সমর কলকাতায় রওনা হয়ে যায়।

দু'দিন পরে।

ঝুলন পূর্ণিমা। সকাল থেকে আজ আকাশে ঘন ঘোর মেঘের ঘটা। পাইনের বনে পাগল হাওয়ার মাতামাতি সুরু হয়েছে।··· যেন কার বুক-ফাটা কান্নার একটানা সুর ভেসে আসছে!

আজ ডাঃ গুপ্তর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হচ্ছে। থেকে থেকে যেন নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে ঝাপসা বোধ হচ্ছে! দারুণ অস্বস্তি ভাব যেন মাঝে মাঝে অস্থিরতা এনে দিচ্ছে!

ডাঃ রায় এসে পরীক্ষা করে দেখলেন, চলাফেরা একেবারে বন্ধ, সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলে ওষুধের ব্যবস্থা করে গেলেন। সমরকে টেলিগ্রাম করা হল,···"অবস্থা বিপজ্জনক, শীঘ্র এসো।"

ডাঃ গুপ্ত আপন মনে বলেন, কই সীতা, তুমি ত এলে না! এত অভিমান আমার ওপর কেন তোমার? কি আমার অপরাধ একবার যদি জানিয়ে যেতে···!

প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য সারা দিন আজ ডালিয়া আসতে পারেনি। সন্ধ্যা বেলায় আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, স্বচ্ছ নীলিমার বুকে জ্বলে ওঠে ঝুলন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র। গাছের পাতায়, ফুলের বুকে বৃষ্টি-কণাগুলোর ওপর চাঁদের আলো ঝলমল্ করছিলো। খোলা জানলার পানে চেয়ে ডাঃ গুপ্ত শুয়েছিলেন।

সহসা কার মৃদু স্পর্শে চমকে ওঠেন। ফিরে দেখেন, সীতা দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ বিশ বছর পরেও রয়েছে তার রূপের অম্লান জ্যোতি। সীতা বিছানার এক পাশে বসে পড়ে।

দু'জনে রইলো স্তব্ধ, মৌন, ভাষাহীন।

বহু প্রতীক্ষিত লগ্ন এসেছে; যার জন্য দুটি হৃদয় ছিলো উন্মুখ হয়ে।

কিন্তু হায়! সেই পরমুহূর্ত্তে যেন তারা ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কত অকথিত বাণীর স্রোত যে বয়ে চলেছে অন্তরের স্তরে-স্তরে! কত যে উচ্ছাস, কত যে বেদন-ভরা কথার সাগর তরঙ্গায়িত হয়ে আছড়ে পড়ছে হৃদয়-বেলাভূমে। কিন্তু কে দেবে তার ভাষা? উভয়ে তাদের অবরুদ্ধ হৃদয়কে আজ কেউ মেলে ধরতে পারলো না পরস্পরের কাছে।

রঞ্জন ক্ষীণ স্বরে বলে, সীতা এসেছ তুমি? কোথায় ছিলে তুমি সীতা? কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে তুমি? কোন্ অপরাধে আমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে? বল সীতা! চুপ করে থেক না। এইটুকু কথা শোনার জন্য আমি সারা জীবন প্রতীক্ষা করে আছি।

বাঁধ-ভাঙা অশ্রুধারায় সীতার গাল দুটি ভেসে যাচ্ছিলো। কম্পিত মৃদু কণ্ঠে বলে, তুমি স্থির হও রঞ্জনদা! আমি সব কথা বলবার জন্যই আজ এসেছি!

কাপড়ের ভেতর থেকে একটি ছোট চিঠি বার করে দিলো ডাঃ গুপ্তর হাতে—যে চিঠি তাঁর মা লিখেছিলেন সীতাকে।

তার পর···বলে যায় নিজের কাহিনী।

···এই চিঠি পাবার পর, তোমার জীবন থেকে আমি সরে যাবো এই সঙ্কল্প প্রবল হয়ে উঠলো আমার ভেতর। বিবেকের দংশন,

অনুশোচনার তীব্র জ্বালা আমাকে দহন করতে লাগলো, কিন্তু সুরঞ্জনদার সঙ্গে ফিরে যেতে মন চাইলো না! তোমাকে হারিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেলাম না···সে জন্য গভীর রাত্রে চলে এলাম ঐ পাহাড়ের ওপর খাদের পাশে! ওখানে কতক্ষণ বসে কেঁদেছিলাম মনকে একটু হাল্কা করবার জন্য। তার পর খাদের ভেতর লাফিয়ে পড়বার জন্য যেই এগুতে গেছি, পেছন থেকে সবল হাতে কে যেন আমাকে টেনে নিলো। ফিরে দেখি একজন খাসিয়া ছেলে। ভয়ে চীৎকার করে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই!

জ্ঞান ফিরতে আমি দেখি, একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে আমি পড়ে আছি। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ছোট্ট একটি জানলা ছিলো, সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর দেখি, বোঝা পিঠে নিয়ে একটি লোক চলেছে। আমি ইসারা করে তাকে ডাকলাম, সে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। আমি যুক্তকরে কাতর ভাবে বলি, আমাকে এক জন আটকে রেখেছে। দয়া করে দরজাটা খুলে দাও; আমার গহনা তোমাকে দেব। লোকটা প্রথমে কি ভাবলো, তার পর চারি দিক সতর্ক ভাবে চেয়ে দেখলে—কেউ ছিলো না। লোকটা দরজা খুলে তার প্রাপ্য গহনা নিলে, তার পর রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে, পালাও।

আমি ছাড়া পেয়ে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। নির্জন পথ, সহরের বাইরে এসে পড়েছি বলে বোধ হল। কিছু পরে বিকট চিৎকার শুনে ফিরে দেখি, দূরে পাহাড়ের পথ বেয়ে একজন ষণ্ডাগোছের খাসিয়া পুরুষ ছুটে আসছে আমার দিকে··বোধ হয় যে লোকটা আমাকে ধরে রেখেছিল সে-ই! ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এলো, আমি প্রাণপণ শক্তিতে ছুটতে লাগলাম। পাথরের ঘায়ে পা কেটে দর দর করে রক্ত পড়ছিলো। কাঁটার আঘাতে কাপড় ও গায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেলো! অদূরে একটি বাড়ি দেখে, সেই দিকে ছুটে গেলাম। বাড়ির বাগান পেরিয়ে সামনে যে ঘর পেলাম সেখানে দৌড়ে গিয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ে যাই। সেটা ছিলো গৃহস্বামীর রান্না-ঘর! রান্নার জিনিস, কাচের বাসন আমার পা লেগে ছড়িয়ে গেল চারি দিকে। বাবুর্চি ভীত হয়ে ডাকে বাড়ির মালিককে। গৃহস্বামী একজন আইরিশ-ম্যান! বয়স চল্লিশের কোঠায় হবে। তিনি এসে চোখে-মুখে জল দিয়ে আমাকে সুস্থ করেন। আমি সভয়ে জানতে চাইলাম, সেই খাসিয়াটা কোথায়? তিনি বললেন, কই, এখানে ত কেউ আসেনি? আপনি ভয় পাবেন না, এখানে কেউ আসতে সাহস করবে না। যদি আপত্তি না থাকে আমাকে বলতে পারেন, কি হয়েছিলো আপনার?

আমি সব ঘটনা খুলে বললাম। তিনি সব শুনে চিন্তিত ভাবে বললেন···তবে এখন কোথায় পৌছে দেব আপনাকে? আমি কাঁদতে লাগলাম। হায়! জগতে যে আমার কেউ নেই! আমার সুখের পথে নিজে হাতে কাঁটা দিয়ে এসেছি। কোথায় যাবো আমি? আমি কাতর ভাবে তাঁকে বললাম···দয়া করে যদি একটি কাজ দেখে দেন আমাকে, তা হলে আমার উপায় হয়। তা না হলে এখন কি যে করবো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। তিনি বলেন, বেশ! যত দিন আপনার কাজ না হয়, তত দিন আপনি আমার বাড়ীতেই থাকুন। কোনো অসুবিধে আশা করি হবে না। কয়েক দিন পরে তিনি বললেন, একটি কাজের প্রস্তাব করবো, যদি আপনি কিছু মনে না করেন। আমি জানতে চাইলাম, কি কাজ?

তিনি বলেন,···বোধ হয় জানতে পেরেছেন আমি [illegible] শিল্পী, ছবি আঁকা আমার নেশা ও পেশা। আমার ছবির [illegible] আমি এক জনকে মডেলরূপে পেতে চাই; অবশ্য যথেষ্ট পারি[illegible] থাকবে তার জন্য। যদি আপনার আপত্তি না থাকে···[illegible] আপনি হবেন আমার মডেল। রাজি না হয়ে আর উপায় ছিল কি? অসহায় ভাবে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান মাথা পেতে নিলাম।······তখন আমার জাগ্রত কোনো সত্তা ছিল না! একটা বিমূঢ় জড়তা আমার সমস্ত বুদ্ধি, জ্ঞানকে [illegible] করেছিলো। রোগী যেমন বিকারের ঘোরে চলা-ফেরা [illegible] সে কি করছে নিজে বুঝতে পারে না,···আমার সেই মোহ[illegible] অবস্থা চলেছে তখন।

সীতা কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে। রঞ্জন ডাকে, সীতা! কত কষ্ট পেলে তুমি আমার জন্যে। আমার সকল অপরাধ [illegible] ক্ষমা করো সীতা! তোমার সব কষ্টের জন্য দায়ী আমি।

সীতা বলে, না রঞ্জনদা! আজ ও-কথা বলে আমাকে [illegible] দুঃখ দিও না। তুমি যে চেয়েছিলে আমাকে স্বর্গে স্থান দিতে, আমি অবহেলায় তা হারিয়েছি। সে আমার অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছি।

সে আবার আরম্ভ করে নিজের জীবন-কথা।

ঐ ঘটনার বছর খানেক পর তিনি আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন। আত্মহত্যা ত আগেই করতে গিয়েছিলাম, সেদিন সফল হয়নি আমার চেষ্টা। সেই চেষ্টা সেদিন সফলতা লাভ করল বিবাহ নামে বাহ্যিক একটা অনুষ্ঠানের মাঝে; একটি নিস্প্রাণ জীবন্মৃত আত্মার অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ! তার অন্তরে যে বোবা কান্না গুমরে উঠেছিলো, সে কান্না শোনবার তখন কেউ [illegible] ছিলো না। অন্তস্তল ভেদ করে শুধু একটা প্রশ্ন জেগেছিলে··· কেন এমন হল? আমার সুখস্বপ্ন কেন এমন দুঃস্বপ্নে পরিণত [illegible] নন্দনকাননে যাবো বলে পথে বেরিয়েছিলাম, [illegible] মরুভূমিতে হল সে পথের সমাপ্তি!

এর পর তিনি আমাকে নিয়ে চলে যান কালিম্[illegible] সেখানে চা-বাগান ছিলো তাঁর। এক বছর পরে ডালিয়া [illegible] আমার কোলে।

সীতা চুপ করলো।

রঞ্জন তার একখানি হাত তুলে নিলে নিজের হাতে। [illegible] বলে, সীতা, যে স্বপ্ন আমাদের জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, তা [illegible] হোক্‌ আমাদের ছেলেমেয়ের জীবনে। ডালিয়াকে সমর ভালো[illegible] ওদের মাঝে আমাদের ব্যর্থ-জীবনের অনন্ত কামনা পূর্ণতা লাভ কর[illegible]

সীতা চুপ করে থাকে। শুধু ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রুধারা ঝরে [illegible] রঞ্জনের হাতের ওপর।

রঞ্জন বলে, সীতা! আজ সেই ঝুলন পূর্ণিমা। আজ আম[illegible] বিয়ে হবার কথা ছিল। ঐ দেখ, তোমার বসানো গাছ[illegible] ফুলে-ফুলে কি অপরূপ শোভা ধারণ করেছে! আমাকে কটু[illegible] এনে দেবে সীতা?

বাগানে যায় ; রাশি রাশি ফুল নিয়ে এসে রঞ্জনের বিছানাটি ভরিয়ে।

রঞ্জন হাসে, পরম তৃপ্তির হাসি। বলে, সীতা! এই নীল ফুল নাম কি? তোমার মনে আছে কি এর কথা?

সীতা বলে, "ফর গেট মি নট!" এ ফুলের গাছ যে আমিই লাম। কেমন করে ভুলবো এদের কথা!

রঞ্জন ধীরে ধীরে কথা বলে•••সীতা! জীবনে যা চায় মানুষ, র সবই ছিলো, অর্থ, সম্মান, স্ত্রী, পুত্র, অভাব কিছুই নেই••• ! তবুও! কি মর্ম্মদাহী দুঃসহ বেদনা প্রতি পলে ভোগ ছি তোমাকে হারিয়ে। একটা মহাশূন্যতার চরম হতাশা তিলে আমাকে গ্রাস করছে। তুমি কেন ভুল করলে সীতা? আমাকে একটি বার বলোনি যে, তুমি চলে যেতে চাও। র সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমার পথ আগলে রাখতাম, দেখতাম কেমন করে তুমি !

সীতা বলে, রঞ্জনদা, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি আর বোলো না। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, একটু তুমি।

রঞ্জনের আচ্ছন্ন ভাব আসছিলো•••সে জোর করে আবার বলে•••কথা বলতে দাও সীতা! আর•••আর বোধ হয় কথা পারবো না•••কত কি যে বলবার ছিলো! তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলাম সীতা! আমি জানতাম, এক দিন তুমি আমার কাছে।

সীতা রঞ্জনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

রঞ্জন পরম তৃপ্তিভরে চোখ বোজে।

নির্মল আনন্দ! পরম প্রশান্তি রঞ্জনের চোখে-মুখে! র সুমোহন স্পর্শে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে রঞ্জন। কি প্রগাঢ় ! কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধারায় ধুয়ে গেছে তার অন্তরের বেদন-কালিমা! নিবে গেছে প্রিয়-বিচ্ছেদের দুঃসহ জ্বালা! স্তিমিত নয়নে ধীরে ধীরে নেমে আসে পরম শান্তিপূর্ণ জড়িমা!•••

সীতা উঠে দাঁড়ায়। একবার গভীর তৃষিত দৃষ্টিতে চেয়ে রঞ্জনের পানে।

র পর বাইরে আসে। সামনে ভজুয়াকে দেখে বলে, ভজুয়া••• একটু এগিয়ে দেবে? ভজুয়া অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। যেন বহু দিনের আগের দেখা কোন একটি পড়ে। সীতা হেসে বলে, কি দেখছো ভজুয়া? চিনতে না? আমি সীতা।

দিদি? ভজুয়া হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে। চোখ মুছতে বলে, তুমি বেঁচে আছ? কোথায় গিয়েছিলে দিদি? আহা, আমার তোমার বেহনে কত কষ্ট পেয়েছেন গো?

সীতা বলে,•••সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা ভজুয়া! আমরা তাঁর হাতের পুতুল মাত্র!

ভজুয়া মাথা নাড়ে•••হ্যাঁ। তা ঠিক বলেছ দিদি, কবে এখানে। দাদাবাবুকে এতটুকু থেকে কোলে-পিঠে করে করেছি। তোমাকে হারিয়ে যখন সে আছাড়ি-পিছাড়ি করতো, দিদি গো, আমার বুকের কলজেটাকে কে যেন মোচড় দিত। তার পর বাড়ী নিয়ে গেলাম ; বিয়ে কি করতে চায়? অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে বিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সে আগের দাদাবাবু আর রইলো না গো দিদি! ভজুয়া কাপড়ের খুঁটে চোখ মোছে। তার পর বাবু স্বর্গে গেলেন, কাকীমাও স্বর্গে গেলেন। কাকীমা তোমার জন্য কত কেঁদেছেন ; আহা! স্বর্গে গিয়ে জুড়িয়েছেন। কাকাবাবু আর মা এখনও আছেন। তেনারা দেশের বাড়ীতেই থাকেন। তার পর চুপি-চুপি বলে, বৌদিদি বড় ম্লেচ্ছপনা করেন কি না। কিছু বিচার-আচার নেই দিদি! সে জন্য ওনারা তাঁর কাছে থাকেন না।

ভজুয়া শোনাবার লোক পেয়েছে। কত দিনের কত সঞ্চিত ব্যথা, তার আজ সীতাকে জানাবার ইচ্ছা ছিল,•••কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে, রাত্রি বেড়ে চলেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে, চলো দিদি! তোমাকে দিয়ে আসি। আরেক দিন সব বলবো, আর তোমার সব কথা শুনবো।

রাত্রি দুটো বাজলো। ডাঃ গুপ্তর ঘুম ভেঙে যায়। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! চোখ দুটো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। রঞ্জন চিৎকার করে ডাকে, ভজুয়া! ভজুয়া!

ভজুয়া ধড়মড় করে উঠে সাড়া দেয়, যাই গো দাদাবাবু! ছুটে খাটের কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে?

ডাঃ গুপ্ত কথা বলতে পারেন না।

বুকে বড় কষ্ট হচ্ছে! পৃথিবীটা যেন ঘুরছে! চোখের সামনে নেমে আসছে গাঢ় অন্ধকার! অতিকষ্টে বলেন—ডাক্তারকে ডাকো।

ভজুয়া ছুটে যায়, ডাক্তারের কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়ে নিজে অডিকোলন মিশিয়ে জল দেয় ডাঃ গুপ্তর মাথায়। হাওয়া করতে করতে বলে,—সীতা দিদিকে ডাকবো দাদাবাবু?

ডাঃ গুপ্ত যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে বলেন, না, না। তুই···কাছে থাক্ ভজুয়া। আর···আর···এই চিঠিটা দিস্ সমরকে। এই নীল ফুলগুলো···দিস্···সীতাকে···!

ডাক্তার রায় আসেন, কয়েকটা ইন্‌জেক্‌সান প্রয়োগ করেন রোগীকে···কিন্তু কোনো ফল হল না। রাত্রি চারটের সময় ডাঃ রঞ্জন গুপ্ত যাত্রা করলেন কোন্ অজানা দেশের পথে!

পরদিন······

সমর এসে পৌঁছলো শিলংএ।

সীতা আর ডালিয়া এসেছে।

আকাশে মেঘের গুরু-গুরু গর্জন! এলোমেলো বাতাসের পাগলামী সুরু হয়েছে!

পাইনের বনে অঝোরে ঝরে পড়ছে শ্রাবণ-ধারা। কাল রা... যে ফুলগুলো সীতা দিয়েছিলো রঞ্জনের বিছানায় সেগুলো এখ... রয়েছে অম্লান। সন্ত-তোলা টাট্‌কা ফুলের মত। বসরাই গোলা... আর দোলন-চাঁপার গন্ধে ঘরের বাতাস ভরপুর হয়ে আছে।

বাবার পায়ের ওপর সমর ছোট ছেলের মত কান্নায় ... পড়েছিলো। ডালিয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছিলো তার পাশে... মাথার কাছে পাথরের মত নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো সী... যেন কোন্ নিপুণ ভাস্করের খোদাই-করা একখানি শ্বেত মর্ম... বিষাদ-প্রতিমা!

ভজুয়া তার স্থবির, কুব্জ দেহটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আ... সমরের দিকে এগিয়ে দেয় একটি চিঠি। বলে—তোমার ... দিয়ে গেছেন।

তাতে লেখা ছিলো,···

"ডালিয়াকে তুমি বিবাহ কোরো। তোমাদের ওপর র... আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ!"

সীতার দিকে এগিয়ে যায় ভজুয়া···বলে এটা তোমাকে ... গেছেন। তার পর এগিয়ে দেয় একগুচ্ছ নীল ফুল,···"ফরগেট মি ন...

কালশ্চ নিরবধি

বাণী রায়

চক্রাকারে আবর্ত্তিত মার্বেলের সোপানশ্রেণী উঠে গেছে ঊর্দ্ধলোকের বিহারভূমিতে। চকচকে শাদা মার্বেলে কুচ কুচে কাল রেলিং গাঁথা। একখানা ফুরফুরে পেঁয়াজী শাড়ী উঠে যাচ্ছে বাতাসে দুলতে দুলতে।

দোতলার হলে বালিগঞ্জের সুবৃহৎ ক্লাব—প্রসিদ্ধি তার স্ত্রী-পুরুষের মিলিত উদ্যমে। যান-বিহীন পুরুষ, আর দ্যুতি-বিহীনা নারী সদস্য থাকে না। গ্রহণের সময়ে ক্লাবের মানদণ্ডে ওজন কম হ'লে আনা যায়।

আজ বিশিষ্ট উৎসবচিহ্নিত দিন একটি প্রতিষ্ঠানের খাতায়। সন্ধ্যার বৈকল্যের নিবারণার্থ প্রস্তুত রয়েছে কোণে বার্। ওয়াইন্‌-গ্লাস চলাফেরা করছে সুন্দরীর আঙুলে, পুরুষের দৃঢ়মুষ্টিতে। মোমে মসৃণ মেঝেয় ঘোড়া মিশিয়ে নৃত্য। যুগল রূপের সশব্দ পদক্ষেপে বিতল কম্পিত। প্রকাণ্ড হলের এক পাশে সাহেবী অরকেষ্ট্রা। অ্যাংলোইণ্ডিয়ানেরা বাজিয়ে যাচ্ছে একের পর এক সুর-উৎস।

তাদের কাছাকাছি একসারি চেয়ারের একখানিতে গালে হাত-রাখা এক তরুণী উপবিষ্টা। ছাপা গরদে প্রাচীন যুগের ছাপ। মুখে-চোখে আনাড়ির বিস্ময়। ও যে কি করতে এখানে এসেছে? বেচারী, বেচারী!

ধবল ক্ষৌমবাসা ওই যে নৃত্যপরা তরুণী, হ্রস্বকর্ত্তিত কেশ অল্পকুঞ্চিত—উনি এই বেচারীর মাতৃস্বসা। বেচারী ছিল ব্রহ্মদেশে। বর্ম্মা ত্যাগের সময়ে কাষ্ঠব্যবসায়লব্ধ সুপ্রচুর অর্থ তার মাতা-পিতা অনায়াসে এনেছেন সঙ্গে। নয়া বালিগঞ্জে নূতন নীড় নির্ম্মাণ করেছেন।

বয়স কিঞ্চিৎ হয়ে গেছে। অর্থশালীর গৃহজাতা। সুতরাং মেদভারে কাল রং বিপন্ন। মাসী আধুনিকী। মাসী ন... কলিকাতার মুকুটমণি। বড়দিদির অনূঢ়া কন্যার হিতার্থে অনুপ্রেরণা লাভ করলেন।

অতএব, বোনঝির দীর্ঘ কুন্তল আকৃষ্ট করে হ্রস্বকেশা মাসী ত... সামাজিক চড়কের গাজন-সন্ন্যাসী সাজালেন। ঘুরতে লাগল ... চক্রাকারে। পার্টি-পিকনিক্-ডিনার-ক্লাবে। কাঁটার যন্ত্রণা অ... পীড়া দিলেও, সাধনাভ্রষ্ট হ'লে চলে না। বেচারী, বেচারী!

মাসীর সহনৃত্যসঙ্গী যুবকটি যে মাসীর ডালিম-ফাটা গালে নিজের ক্ষৌরিত গণ্ড সংশ্লিষ্ট করে নাচছেন! যত বার ঘুরে ঘুরে আস... তাঁরা তত বার বেচারীর বুক দপ দপ করে উঠছে। এ কী রে, বা...!

মভ শাড়ীর মনোহারিণী তরুণী অবশ্য নৃত্যকালীন ব্যব... আতিশয্য দেখিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সকলের। কিন্তু, তিনি ... বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা। সুতরাং বিস্ময়াতীত ব্যবহার তাঁর। কিন্তু ... যে তরুণ, মেসো যে ওই লম্ফমানটার চেয়ে বহুলাংশে পাং...। তবে কেন স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষসত্তা মাসীর মনোমন্দিরে?

পেঁয়াজী শাড়ী উঠে এল এতক্ষণে। ফিন্‌ফিনে সিফন, ... ল্যাজের মত লাগানো আঁচলে লোমকাজের ফারখণ্ড। ... অংশে দুলছে মুক্তামালার বৃন্তগুচ্ছ।

তাকে দেখে উপস্থিত মহিলাযূথে উঠল ফিস্‌ফিসানি—ভ্র... ক্ষীণ গুঞ্জন। পুরুষদলে প্রত্যাশা।

বেচারীর উল্টো দিকে বসল সে পাখার নীচে। দুই ... উপবিষ্টের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে উন্মাদ তরঙ্গ—নৃত্যের গতিশীল ... উত্থান-পতনশীল।

জলদ হয়ে উঠল বাদ্যের রণন। দ্রুত লয়ে নৃত্য ...

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

হ'ল। হাততালির উল্লাসের মধ্যে যোড়া ভেঙে নর্ত্তক-নর্ত্তকী চলে এল।

জ্যাজের দ্রুততার কোল্ডড্রিঙ্ক পানে পরিতৃপ্ত জুটলার মধ্যে ডাক দিল ওয়াল্জের বিলম্বিত স্বপ্নজড়িত সঙ্গীত। বাদ্যকরেরা যথারীতি বিরতির পরে কর্ত্তব্য আরম্ভ করেছে।

মভ মনোহারিণী সহচরের সঙ্গে বারান্দায় বা'র হয়ে গেছিলেন। সুরঝঙ্কার তাঁকে ফিরিয়ে দিল নূতন সঙ্গীর লহরীতানে।

মাসী মন দিয়েছিলেন পরচর্চ্চায়। এবারে নাচ বাদ দিয়ে বোনঝি-সঙ্গমে এলেন। পাশে বসে বললেন, "কি রে, ঠাণ্ডা কিছু নিবি?"

"না, মাসী। আমি তো নাচিনি।"

ক্লাবের সদস্য বেশীর ভাগ বাঙ্গালী। সুতরাং নাচের সঙ্গী মনোনয়নে পূর্ব্বের অনুমোদন থাকে। পেঁয়াজী শাড়ীর কাছে একজন অগ্রসর হয়ে বাওবা করলেন। পায়ের গোড়ালী কাতর ভাবে দেখিয়ে পেঁয়াজী শাড়ী কি বা বলল। ভদ্রলোক সরে এলেন।

মাসী সাগ্রহে পাশের দোরস্তা রেশমকে জানালেন, "অসীমার বোধ হয় পা মচকে গেছে, না?"

দোরস্তা অবলীলাক্রমে লম্বা কালো হোল্ডারে সিগারেট সেবন করছিল। চোখ উল্টে বলল, "মোটেই না। ও ভাণ করছে। অরিন্দম নাচ ভালবাসে না, কি না।" বিবাহিতা কি না বোঝার পথে কাঁটা—বেশভূষায় সধবা, কুমারী, বিধবা সব সমান। বেচারী ধরে নিল পেঁয়াজী শাড়ীর স্বামীরই নাম অরিন্দম।

ইতিমধ্যে ক্লাবের আগামী অনুষ্ঠানের পরামর্শ-সভায় মাসীর ডাক পড়েছিল। তিনি গেলেন উঠে। খালি চেয়ারে আর একজন মহিলা এসে বসলেন। এঁরও বসন শুভ্র। রেশমে চওড়া লাল। ব্রোকেডের অঞ্চল। গ্রীবা ও স্কন্ধে তোলা আছে সে আঁচলা গলা-বন্ধের মত। কপালে সিঁদূরের টিপ, এলোখোঁপা বাঁধা। হাতে গলায় নেহাৎ পৌরাণিক একটি দুটি সোনার গয়না। শাড়ীর লাল পাড়, সিঁদূরের টিপ ইত্যাদি মিলিয়ে বেশ গৃহস্থবধূ তিনি। শান্ত-শ্রী মুখে, উগ্র প্রসাধন-বাহুল্য নেই। বেচারী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একেবারে জনপদবধূ।

বেচারীর সঙ্গে আলাপ জমালেন তিনি। মাতৃস্বসার গৌরবে বেচারী যে গরবিণী। আড়ালে হাসাহাসি করলেও প্রকাশ্যে সমাদরই দেখাতে হ'ত।

পরিচয়ে তিনি নিজেকে এক প্রাচীন বনেদী-পরিবারের বধূ বলে জানালেন। সুদর্শন স্বামীর সঙ্গেও আলাপ করে দিলেন।

বেচারী ঘরোয়া-সাজের মহিলাটির লক্ষ্মী-শ্রী দেখে আশ্বস্ত হ'ল। প্রকাশ্যে মেয়েরা যে এই ভাবে মদ খাচ্ছে, সিগারেটে টান দিচ্ছে, এটা কি ভাল? এ ধরণের নাচও উচিত নয়। বড় জোর ওরিয়েন্টাল নাচ দেখানো যেতে পারে। এ নাচে আর্ট কোথায়? তাছাড়া, বিদেশী পুরুষের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়ের এমন ভাবে লম্ফ-ঝম্প উচিত কি না, সে বিষয়ে জনপদবধূর মতামত জিজ্ঞাসা করবে স্থির করল। জনপদ-বধূ নাচ করেননি—বেচারী লক্ষ্য করেছিল।

মুখ সবে খুলেছে। জনপদবধূ অভিনীত আগ্রহে কথা শুনতে সম্মুখে ঝুঁকে বসেছেন। এ হেন কালে বেয়ারা ট্রে থেকে দু'জনের মধ্যে নামিয়ে দিল একটি ছোট ওয়াইন-গ্লাস। সোনালী সুরাপূর্ণ।

জনপদবধূ মদের পাত্রে ডুবে গেলেন। গোলা ঠোঁট বন্ধ করে ফেলল সে। জনপদবধূ ঘরোয়া-সাজে সেজে এসেছেন শুধু নূতন উদ্দেশে? বেচারী, বেচারী!

মাসী ফিরে এলেন সফর সেরে। দু'-এক-জন পুরুষ দেখা দিলে অর্ডারে ঠাণ্ডা পানীয়, শূকর মাংসের সসেজ টেবিলে দেখা দি[illegible] বেচারী তো শুওর-গরু খায় না। তার জন্য মাটনের কাবাব এল।

এক পালা খাওয়া-দাওয়ার পরে মহিলা দলে যেন একটু পৃথক্ আলাপের ইচ্ছা দেখা দিল। রসালো কোন বস্তু হাতে আছে কি[illegible] পুরুষেরা বারের প্রতি ধাবিত হ'লেন। এতক্ষণ কয়েক জন বেশ পানাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

এই তো অলকাপুরী! কোন দুঃখ নেই এখানে, [illegible] নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। আছে মেনকা-রম্ভা। অলঙ্কার-প্রসাধনে[illegible] দিব্যা স্ত্রী হয়েছেন নগরীর নাগরীকুল। আধুনিক গন্ধর্ব্ব নৃ[illegible] পুরুষের অবচেতন থেকে উত্থিত হয়ে আসছে। অমৃত রস [illegible] পাত্রে অধরে অধরে ফিরছে। উপবনবেষ্টিত বাড়াটি কি স্মরণ ক[illegible] দিচ্ছে না নন্দন কাননকে?

যারা দূর থেকে নিন্দা করে, তাদের মনে বোধ আসা উচি[illegible] অতি অসম্পূর্ণ, অতি ক্ষীণ ভাবে মানুষ এখানে স্বর্গকে [illegible] আনবার সাধনা করছে।

মাসীর পাশে বসলে বেচারী নগ থেকে অস্তিত্বে স্থান [illegible] মাসীর পাশে বসে ওর মনে হ'তে লাগল: কেন, এ সব মন্দ কি[illegible] চক্ষে দেখতে পারেন না। শুধু মাসীর পরামর্শে ভাল বি[illegible] আশায় মাসীর হেফাজতে আসতে দেন। করবেন বা কি? কা[illegible] তো ওঁরা চেনেন না কলকাতায়!

কিন্তু, মন্দ কি? পরনিন্দা-পরচর্চ্চা নিয়ে বাড়ীতে [illegible] কোণে বসে থাকলেই কি সৎ থাকা যায়? এখানে এরা না[illegible] করছে, মদ খাওয়া-খাওয়ি করছে। কারণ এদের পয়সা [illegible] সামাজিক প্রতিপত্তি আছে। আর আছে বুকের পাটা।

বাড়ীতে থেলো হুঁকো টেনে দাবা-পাশা-তাস-পেটা কি [illegible] মহৎ কিছু? গোল হয়ে বসে পাণ-জরদা সেবনান্তে সমবে[illegible] লোকের অনিষ্ট চিন্তা, কি বাঙ্গে নভেল বা সেলাই নিয়ে স[illegible] করলে মহিলারা এর চেয়ে স্বাস্থ্যকর আমোদ পেতেন?

নেশা করা? জরদা-পাণ-চা-তামাক কি নেশা নয়? না[illegible] করলেই চরিত্র যায়? তাহ'লে ঘরের কোণে বসে এত [illegible] চরিত্র যেত না।

বেচারী মনের সঙ্গে তর্কে জয়ী হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস [illegible] অতঃপর মাসীর আরও একটু কাছে ঘেঁষে বসল।

মাসী প্রায় কানে কানে বললেন, "এবার থেকে তুই [illegible] গাড়ীতে এখানে আসবি না। আমার বাড়ী হয়ে আমাকে দেখিয়ে আসবি। আজকের সাজ তোর যাচ্ছেতাই হয়েছে। আজই ছিল সব চেয়ে দরকার। আজ কিরণ মুখার্জ্জি এসেছে।"

রোমাণ্টিক চেহারার, ছিপছিপে যুবকটি কিরণ। দৈর্ঘ্যে, [illegible] সমবেত পুরুষমণ্ডলীর চেয়ে বিশিষ্ট। উদাস একটি ভাব [illegible] অভিনীত কি প্রকৃত বোঝা শক্ত। কিন্তু তাই লোভনীয় [illegible] কিরণকে।

এতকাল ধরে মাসী যে সব অনূঢ়ের সঙ্গে যোগাযোগ [illegible] সচেষ্ট হয়েছিলেন,, তন্মধ্যে 'ইহ বাচ্য' বুলির ভণ্ডামী ছেড়ে

সন্দেহে কিরণ শ্রেষ্ঠ। বেচারী নিজের দৈন্যে মনের মুখে ভদ্রভাবে সে বার সমার্জ্জনী প্রহার করল।

সে দেখেছিল, আধুনিক মত শাড়ীই না কেন ওঠে, ছাপা গরদ আদৃত। তাই নিজের দামী মুর্শিদাবাদীখানা পরে চলে এসেছে, কি পরা উচিত বুঝতে না পেরে। মাসী নির্দ্দেশ দিতেন। সম্প্রতি ওরই হাতে ছেড়েছিলেন মনোনয়নের ভার। দিনের দিনে বেচারী—**bungled the whole show ! Tut, tut !**

আসনের গরদ কি ওর এটার মত ? তার ছাপেই যে আধুনিকত্ব। কঙ্কি পাড়, কিউবিক্ ডিসাইন্। বেচারীর শাড়ীর একহাত পাড়, বড়-বড় ফুল, সবই প্রাগ-ঐতিহাসিক। মাসী পর্য্যন্ত বল পাচ্ছেন না।

মাসী নিশ্বাস ফেলে দোরাভাকে দেখালেন : "কিরণ পর্য্যন্ত ওর পেছনে ঘুরছে। সবাই ওর জন্যে পাগল। এখনও!"

দোরাভা হড়হড় করে, দাঁতে সিগারেটের হোল্ডার চেপে, কতকগুলো বলে গেল। বেচারী কিছু বুঝল না। ভাষাটা ইংরাজি। গেল দোরাভা পাঞ্জাবী। পাকিস্থান থেকে এসে ব্যবসা গুছিয়ে এরা এ দেশে। কি করে যে আধুনিক হ'বে ভেবে না। চুল কেটে, নাচে এসে, সিগারেট-মদ ধরে কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছে না।

মাসী ইংরাজিতে উত্তর দিলেন, "আসল ব্যাপারটা শোনা যাক ওকে ডেকে। ও ঠিক বলবে।"

জনপদবধূ বলে উঠল, "বলবে আবার কি ? বুনো জন্তুও তো ভাল লাগে। এত দিন দেখেছিল বাছা-বাছা ভদ্রলোক। দেখতে চায় আকাট চাষা।"

মনোহারিণী এদিকে এসে টিপ্পনী দিলেন, "অন্ততঃ শুনে রাখি ধাওড় বশ করতে হয়।"

নীল-বসনা একজন ফর্সা লম্বা তরুণী ছিলেন দলে। কাঁচুলী-দেহ কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। পায়ে কর্ক-সোলের উচ্চ জমির জুতো। লাল গালার কাজ-করা জামা—ব্যাগ। গলায় ফিতেয় ছোট সোনার মূর্ত্তি। এক হাতে অতি বিশ্রী লাল পাথর-বসানো সোনার চুড়।

নীলবসনা বললেন, "ও কি বলার কথা ? আমি তো অসীমার বড় বন্ধু—আমিই বুঝলাম না কি করে হ'ল। দুই চক্ষে পারত না অসীমা অরিন্দমকে। সব সময়ে ওকে নিয়ে হাসি করত।"

মাসী বললেন, "যাও না, অসীমাকে তুমি ডেকে নিয়ে এস।"

পেঁয়াজী শাড়ী অসীমা। ক্ষীণ-দীর্ঘদেহা, গৌরবর্ণা। সত্যই একটু অসামান্যা—বেচারী চেয়ে দেখল। এর মুখে-চোখে স্বপ্ন আছে এখনও। চোখের দীর্ঘ রেখায় এখনও অপার্থিব

অসীমা এসেই হাসল—গোলাপী রাগে রঞ্জিত অধরোষ্ঠ তার। নেই কোথাও—"আমার কাছে না কি শুনবে গল্প ? তা, এখানে কেন ? চলো না, বারান্দায় যাই।"

তলার প্রকাণ্ড টেরেসে চলে এল গোটা দল। রেলিংএর সাজানো ছিল। এবারে শুরু হ'ল অসীমার কাহিনী। পারিপার্শ্বিক যোগ দিল।

"তোমরা তো জানো, দশ-বারো বছর ধরে আলাপ-পরিচয় অরিন্দমের সঙ্গে। আমাদের সেটের লোক নয়, তবু দিন-রাত ধারে-কাছে থাকতে চাইত।"

শাদা গোলাপগুচ্ছ নীচের বাগানে মাথা তুলিয়ে সায় দিল। "হাসতাম ওকে নিয়ে। গানের আসরে এসেছিল পুরো-হাতা সার্ট ধুতির ওপরে পরে। সার্টের কাপড় সরু ডোরা-সিল্ক। সোনার বোতামে গাঁথা। আমরা হেসে মরে গেলাম।"

নীলার গলিত রং নীচের জলে। ঝিনুকের চাঁদও আকাশ থেকে একটু হাসল।

"আসত সব সময়ে, যেখানে আমি আসা-যাওয়া করি। ক্রমে সকলের চোখে পড়ল। তোমরা সবাই হাসতে। আমিও হাসতাম। মনে মনে জানতাম, ও কোন দিন আমার মনোহরণ করবে না। সেকেলে পরিবারের ছেলে। কলেজী বিদ্যা মাত্র সম্বল। টাকা আছে, নেই সংস্কৃতি। অথচ যা ওর হাতের বাইরে, তারই আশায় উদ্বাহু বামন ও। ঘরে সুখ পেত না। ছুটে আসত যেখানে আছে ওর স্বস্তিহীন সুখ। লক্ষ্য ধরেছিল আমাকে। আমি ওকে কোন গুরুত্ব দিতাম না।"

জলে ঝিনুকের চাঁদ ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকাশ যেন তার বাসভূমি নয়। নরম বেলেমাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে অনেক ঝিনুক। তাদের বুকে কি ঘুমিয়ে থাকে শীতল-শুভ্র একটি-দুটি মুক্তো ?

"দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, জানো তোমরা। মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন দেখা হ'ত না। আমি বা অরিন্দম দু'জনেই বাইরে চলে যেতাম। কখনও বা হতাশায় অরিন্দম সরে থাকত। কিন্তু ছেড়ে দেয়নি ও। কাছে থাকা, মনোরঞ্জনের চেষ্টা ইত্যাদি করে গেলেও

ও কখনও কাছে এসে জোর-দখল নিতে সাহস পায়নি। কারণ, ও ছিল লাজুক। স্ত্রী-স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বাস না করার ফলে ভীরুতাও দেখা দিত।"

সবুজ ঘাসের মুখে যেন জেগে উঠল কমনীয় লাজুক প্রেমিক এক তরুণ। ঘাস আনন্দে চমকে উঠল চাঁদের হাসি লেগে। জলের বাতাস দুলিয়ে দিল মাধবীগুচ্ছ।

"আমি জানতাম, ও আমার উপযুক্ত নয়। ধার নেই ওর, নেই কোন বিশেষত্ব। এ সমাজে ছিটকে এসেছে—জানে না উপযুক্ত আদব-কায়দা। আজ তোমরা অবাক হয়েছ। আমিও এত দিন ওর মধ্যে কিছুই দেখতে পাইনি। অনেক দিন পরে হঠাৎ এক দিন বোধোদয় হ'ল।"

রাত্রিচর পাখী দীর্ঘস্বরে ডাক দিল আকাশের তারাকে। আস্তে তারার চুমো ঝরল শিশিরের বিন্দুক্ষরণে। রাত্রির পাখীর ডাকে আকাশের তারা শিহরিত হ'ল নীল মেঘের জালিকাটা শাদা ইথারে।

"সেদিন আর একটি গানের আসর। প্রসিদ্ধ গায়কের সমাবেশ। ঘরে তিলধারণের জায়গা নেই। আমি যথারীতি মধ্যস্থলে বসেছিলাম। ও দাঁড়িয়ে ছিল এক কোণে আলোর নীচে।

হঠাৎ চোখ গেল ওর দিকে। ও একদৃষ্টে আমার দিকেই চেয়ে আছে। নূতন কিছু নয়—অনেক দেখেছি। কিন্তু অন্য একটা নূতন লক্ষ্যে এল।

উজ্জ্বল আলো—যা চোখে পড়ে না, তাই ধরিয়ে দেয়। দেখলাম স্পষ্ট ওর চিবুকের পাশে একটি দুটি রেখা। শিথিল পেশী কণ্ঠতটের। অত্যন্ত ক্লান্ত কেউ যেন জোর করে পরিশ্রান্ত সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তি কেউ।

চিবুকের শিথিল পেশী ওর কেমন যেন মনে আঘাত দিল আমার। এই লোকটি আমারি চোখের সামনে যৌবন পার করে ফেলল কি? হাসিখুসী গোলমুখ ভুরে-সার্টধারী ছেলেটিকে মনে পড়ে গেল। আজ সে চ্যুতযৌবন। তবু তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। ক্লান্ত সে পশ্চাৎধাবনে, তবু দাঁড়িয়ে যায়নি সে।

ওই মুহূর্ত্তে একটা কেমন মমতা অনুভব করলাম। মনের মধ্যে, বুকের মধ্যে করুণা জন্ম নিল অকস্মাৎ। শিথিল পেশী চিবুক। মায়া হতে লাগল। নিজের সঙ্গে একাত্মভূত বোধ করলাম ওকে। আর কি? সেই মুহূর্ত্ত থেকে ধরা দিলাম।"

গাছপাতা মর্ম্মর ধ্বনিতে গান গেয়ে উঠল। রাত্রিচর পাখীর দীর্ঘস্বর কণ্ঠ মধুরতায় ভেঙে পড়ল। ঘাসের ওপর বাতাসের পদচারণ। চাঁদের প্রসাদে জলের তলায় মাটীর নীচে ঝিনুকের বুকে জন্ম নিল মুক্তা।

বেচারীর সারা মন প্লাবিত করে দিল অতি কোমল, অতি সুন্দর ভাবের বন্যা। এই তো আছে—কবিতা, প্রেম, স্বপ্ন। সবই আছে পৃথিবীতে। অলস কৌতুকে কথিত একটি প্রেমের কাহিনী বদলে দিল পারিপার্শ্বিক মুহূর্ত্তে। ঘরের ভিতর হাল্কা পলকা বাজছে। যোগ দিয়েছে স্ত্রী-পুরুষ সংযুক্ত দেহে। বারের ধারে অগণিত মাথা। সিগারেট জ্বলছে নারী-অধরে। সে সব ভেদ করে দিয়ে বাইরে আকাশে চাঁদ উঠেছে। প্রেমের কাহিনী আবৃত করে দিয়েছে পল্কা নাচের সুরকে।

আছে, আধুনিক অলকায় নিষ্ঠা আছে। জাগ্রত … আছে প্রেম। ভয় কি? মন আপ্লুত হয়ে গেল বেচারীর।

মত্তমনোহারিণী বৃদ্ধ স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় কিঞ্চিৎ … শিখেছিলেন। হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাহ'লে … যাচ্ছে ভবভূতির কথাটা মিথ্যা নয়। 'কাল চ নিরবধি, বিপুলা … পৃথ্বী।' অপেক্ষা করে থাকলে যোগ্যতার পুরস্কার পাওয়া … অরিন্দম ধৈর্য্য ধরে ছিল ভাগ্যি।"

মাসী প্রশ্ন করলেন, "তাহ'লে তুমি অধ্যবসায় দেখে মুগ্ধ … কি বল, অসীমা?"

খট করে লাইটার ঠুকে দোরভা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে … মত তীক্ষ্ণ হাসি হেসে উঠল। বেচারীর স্নায়ু যেন শকে … উঠল।

অসীমা উত্তর দিল, "নিজের বিশ্লেষণ নিজেই করি। … তো পারলে না। জানো তো, আমার মন ছিল বহুকামী। … বেশী দিন ভাল লাগত না। মনের এ-ও একটা ব্যারাম। … একমাত্র প্রতিকার, প্রেম ছাপিয়ে মনে করুণার জন্ম হওয়া। Pity একমাত্র এমন মেয়েকে বন্ধন দেয় এক স্থানে—যাকে তোমরা … বলে থাক। তাই অনেক সময় বিয়ে করলে একত্রবাসে … আসে। কেটে যায় দোষ। পড়নি শেলী?—

Pity then will cut away
Thy cruel wings, and thou wilt stay."

"এখন কি তোমরা একসঙ্গে আছ?"

"না, তাহ'লে বাড়ী থেকে বিতাড়িত হবো। অরিন্দম … খুঁজছে।"

বেচারী বুঝে নিল বিবাহ এখনও হয়নি।

"কিন্তু, বিয়ে করবে না কি? কি করে হ'বে?"

বেচারী আকাশ থেকে পড়ল। মানে?

"দেখি, কি করে কি হয়।" অসীমা উঠে দাঁড়াল। ঘর … পুরুষ-কণ্ঠে ডাক এল—"আজ নাচের আসর কি ওখানেই জমবে?"

কলভাষিণী কলহংসীর মত মেয়েরা ভেসে উঠে ঘরের দিকে …। জনপদবধূ আমতা আমতা করে মত দিল, "কিন্তু, অরিন্দমের … স্ত্রীর কথা একটু ভেবে দেখা উচিত না?"

বেচারীর মুখে কে যেন পাঁচটা চড় বসিয়ে দিল। … অরিন্দমের অনবদ্য মধুর-করুণ প্রেমকাব্যের পেছনে এমন … বাস্তব? স্বপ্ন-দিয়ে-গড়া প্রেম নিয়ে মত্ত ছিল সে। … বেচারী!

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসীমা বলল, "ভাবিনি আবার? কি …! ছেলেবেলায় যে বাবা-মা ঘাড়ে অশিক্ষিতা স্ত্রী চাপিয়ে দিয়েছেন, … বুঝুন। **Hell's bell!**" ঘরে ভেসে চলে গেল … অসীমা তার অপার্থিব ভঙ্গী নিয়ে। খাদ্য-সংযম বহু ক্ষেত্রে … মুখে-চোখে অমন স্বপ্ন-জড়ানো অপার্থিবতা এনে দিয়ে … অন্তর্বাষ্পের প্রকাশ প্রয়োজন হয় না সরসতার সাধনায়।

বেচারী বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাসী তাড়া … "ঘরে চল না। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? তোকে নিয়ে … জ্বালা হয়েছে। যে পোষাকে এলি! ওধারে কিরণ চলে যাচ্ছে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে কিরণ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি …

মোটাসোটা, কালকেলো সেকেলে মেয়েটির দৃষ্টির সঙ্গে। ...ষ্ট মেয়েটির বেমানান উপস্থিতি তার লক্ষ্যগোচর হয়েছিল।
...কিরণ মুখোপাধ্যায়ের চোখ বলল: আজ অবাক হয়ে যাচ্ছ, চারি দিকে দেখে। সয়ে যাবে সব। তুমিও এমনি হয়ে ... মন তোমার বদলে যাবে। কাল চ নিরবধি।
...চোরীর চোখ বলল: আমি এ রকম থাকবো না। কিরণ মুখার্জ্জি, ...কে আমি দেখে নেব, জেনো। আমার মোটা দেহ হবে তন্বীর ...ব্যায়াম, ঔষধ, খাদ্য-সংযমে। কাল রং এ কস্‌মেটিক্‌স্ বিদ্যুৎ ...। পোষাক দেখে এই সব মেয়েরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। তখন তুমি কি করে সামলাবে নিজেকে? এখন রূপ হচ্ছে বিশুদ্ধ রাসায়নিক। আমার টাকা আছে। তোমাকে দেখাবার পর হ'বে চেষ্টা। তখন দেখো, কিরণ মুখার্জ্জি। অবজ্ঞায় একবার চেয়ে আজ চলে গেলে তুমি। রূপের সঙ্গে আসবে ব্যক্তিত্ব অধরের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা-ভঙ্গীতে। চোখে আসবে অভিজ্ঞতার প্রখর দীপ্তি। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করবে। আমি প্রথমে রাণীর মত বসে থাকব গরিমায়। তার পরে? কিরণ মুখার্জ্জি, তার পরে যা, তাতো আজই আমাদের ঠিক হয়ে গেল। তোমার ভাগ্য নিশ্চিত হয়ে গেছে আজকের নক্ষত্র উদয়ে। কাল চ নিরবধি।

ঘূর্ণাবর্ত

বিভা মুখোপাধ্যায়

তার চুপচাপ বসে থাকা চলে না। জীবনের স্বাভাবিক গতিটুকুও যেন শিথিল হয়ে আসে। পরিত্যক্ত আত্মীয়-...র জন্য আশঙ্কা ও উদ্বেগের চেয়েও সংসার চালাবার ভাবনা ...ক বেশী উতলা করে। জীবনের আদর্শ, সম্ভ্রম সব এবার শূন্যে ...য়ে যাবে। স্কুল কিংবা অফিস যেখানেই হোক, একটা চাকরী ...ড় করে নিতে না পারলে অবস্থা যে কি দাঁড়াবে, সে কথা ...ে ইলা শিউরে ওঠে। সুবিমল বাবুর কাছ থেকে চিঠির কোন ...বাবও এলো না এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজেষ্ট্রারি করে ...ও প্রায় দু'মাস। কিন্তু সেখান থেকেও কোন খবর নেই। ...র এমন কারো কথা আজ মনে পড়ে না, যাঁর কাছে চাকরির ...য়ে দাঁড়াবে। হাতে অবশিষ্ট যে টাকা আছে, তাতে ক'দিনই ...বে যাব? মনের স্বাভাবিক স্বচ্ছগতি যেন নিমেষে ঘোলা ...ঠে।

...দিন জীবনে ধীরে ধীরে যে অভাব দেখা দেয়, ইলা চেষ্টা ...গুলো গোপন করে চলবার। অত বড় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ...মা কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। মায়ের শরীর দিন দিন ...ড়ে। দু'বেলা দু'মুঠো খাইয়ে ভাই-বোনগুলোকে কেমন ...চিয়ে রাখবে, সে কথা ভাবতে ইলার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে। ...কাল পড়াশুনা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে। খবরের কাগজ ...বার আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান মন নিয়ে সে এগিয়ে ... কাগজটা তুলে নিয়ে প্রথম পাতাটি উল্টে শুধু 'কর্ম্মখালির' ...গুলো একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নেয়। যদি মেলে কোন ...। কিন্তু দিনের পর দিন ওর হতাশাই বাড়ে। মনটা বিরক্তি ...ভরে ওঠে।

... চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে ইলা যখন বাবার পাশে এসে ...ন দীনেশ বাবু গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাগজ পড়ছিলেন। ...কে দেখে বলে উঠলেন—"চিনিস্ ইলা, এই মেয়েটিকে?"

...কৌতূহলে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে ইলা বলে—"কে, বাবা?"

"...ফালি গুপ্তা—পড়ে দেখ",—দীনেশ বাবু কাগজখানা ইলার ...গিয়ে দেন।

...ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে খবরটার উপর চোখ বুলিয়ে নেয়। আশ্রয়-...থেকে কমলা মিত্র ও মায়া ঘোষকে কারা ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ডক্টর সুবিমল সেন ও শেফালি গুপ্তার চেষ্টায় দুর্বৃত্তের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। শেফালি গুপ্তার প্রশংসা করে সম্পাদক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ইলা চমকে উঠলো। তার মুখখানা নিমেষে সাদা হয়ে গেল। সুবিমলকে সে শিয়ালদা ষ্টেশনে ভলান্টিয়ারদের নিয়ে কাজ করতে দেখেছে। সুবিমলের কর্ম্মতৎপরতার জন্যই যে ওরা রক্ষা পেয়েছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেফালি কেমন করে এর ভিতর এলো! সুবিমলের সঙ্গে শেফালিও কি যোগ দিয়েছে ওদের ভলান্টিয়ার কোরে? কিংবা—ইলা ভাবতে পারে না। শেফালি ও সুবিমল হয়তো একসঙ্গেই কাজ করে। শেফালি সুবিমলকে এত দিনে ওদের পার্টিতেও টেনে নিয়েছে। ইলার মনে নানা প্রশ্ন তোলপাড় করে ওঠে।

মুখে কিছু না বলে কাগজটা ভাঁজ করে রেখে ইলা নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল। দীনেশ বাবু বলে উঠলেন—"চিনিস্ নাকি ঐ মহিলা সমিতির মেয়েটি কে?"

"চিনি।"—সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ইলা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দীনেশ বাবু তার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। খবরটা দেবার পর থেকেই বার বার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুবিমলের শান্ত মূর্ত্তি আর শেফালির চঞ্চল চলা-ফেরা। ওঁরা কাজে ব্যস্ত। তাই বোধ হয় আজও কোন চাকরির সন্ধান করা সুবিমল বাবুর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইলার অসহ্য রাগ হয় নিজের উপর। কেন সে লিখেছিল তাঁর কাছে?

"কি হ'লো দিদি?" চায়ের খালি কাপটা হাত নিয়ে আলো ঘরে ঢুকলো।

হঠাৎ আলোর কথায় লজ্জা পেয়ে ইলা আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে নিয়ে বলে—"কাঁচা কয়লা, ধোঁয়ায় ঘরে থাকা যায় না।"

এক নিশ্বাসে চায়ের পেয়ালাটি শেষ করে ইলা উঠে পড়ে।

* * *

রাগ, অভিমান, মান-সম্ভ্রম সব কিছুই প্রয়োজনের তাগিদে চাপা দিতে হয়। জোর করে ইলা বেরিয়ে পড়ে টিউসানীর সন্ধানে। কিন্তু কার কাছে যাবে? হঠাৎ বিনয়দা'র কথা মনে হতেই ইলা হাঁটতে হাঁটতে পিসীমার বাড়ী এসে হাজির হ'লো।

বেলা তখন প্রায় ডুটো। রান্নাঘরের বারান্দায় পিসীমা বিনয়দাকে খেতে দিয়ে সামনে বসে গল্প করছেন। ইলাকে দেখে প্রসন্ন-কণ্ঠে বলে উঠলেন—"কি রে, হঠাৎ দুপুরে কি মনে করে?"

"সখ ক'রে নয়, পিসীমা, প্রয়োজনের তাগিদে"—ইলা পিসীমার পাশে বসে পড়ে।—"যারা বোহেমিয়ান, তাদের কি ঘুরে বেড়াবার কোন সময়-অসময় আছে?"—ইলা ম্লান হাসির সঙ্গে বলে।

"হ্যাঁ, বোহেমিয়ান ছাড়া আর কি?" বিনয় এতক্ষণে মুখ তুলে চাইল।

"যারা পালিয়ে এসেছে, তারা হয়তো বোহেমিয়ান হয়েও টিকে আছে, কিন্তু যারা আসতে পারেনি, তারা কি অবস্থায় আছে কে জানে! বাবা তিন-তিনখানা টেলিগ্রাম করেও সাবিত্রী পিসীমার কোন খবর পাননি।"—ইলার চোখ ছলছল করে ওঠে।

বিনয় চমকে উঠে একবার মায়ের মুখপানে ও একবার ইলার মুখপানে তাকিয়ে মাথা নীচু করে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে লাগলো। আপন মনে বিড়-বিড় করে বলে—"সাবিত্রী বেঁচেই আছে। তবে মরলেও ক্ষতি ছিল না।"

ইলা দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করবার আগেই বিনয় তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে।

পিসীমার মুখের দিকে ইলা নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর পিসীমা ইলার হাত ধরে বললেন—"চল, ও-ঘরে যাই।"—

পিসীমার কথায় ইলার সম্বিৎ যেন ফিরে আসে। নিঃশব্দে সে এগিয়ে যায় পিসীমার পিছন পিছন।

পিসীমারা অনেক দিন থেকেই কোলকাতায় আছেন। কোলকাতায় তাঁদের ব্যবসা আছে; তার উপর দুই ছেলে চাকরি করে। সংসার স্বচ্ছন্দেই চলে। কোথাও দারিদ্র্যের এতটুকু ছাপ নেই। মুখে বেদুইনের বুলি আওড়ালেও বিনয় বোহেমিয়ান নয়। খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে বেশ আরামের সঙ্গে ডেক-চেয়ারে শুয়ে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে সে খবরের কাগজখানা উল্টাচ্ছিল।

ইলা পদ্দাটা সরিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"ঘুমোবে না কি?"

"না। কি খবর বল তো শুনি।"—বিনয় উঠে বসলো।

"খবর? আমার খবর তো কাগজে বেরুবার নয়, কাজেই বলবার জন্য পায়ে হেঁটে আসতে হয় তোমাদের দরজায়। একটা কাজ যোগাড় করে দাও। নইলে সংসার আর চলবে না। বাবার শরীর অচল।"—একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই কথাগুলো বলে ইলা পাশের খাটখানার এক ধারে গিয়ে বসলো।

বিনয় অপ্রতিভের সুরে বলে—"সত্যি সুবিধে করে উঠতে পারিনি। বলেছি অনেককে। কিন্তু—"

"কিন্তু কথাটা না-থাকলে তোমাদের অসুবিধা খুব বেশী হতো বিনয়দা। যাক্, নতুন করে আর দু'-চার জনকে বলো। যদি কিছু হয়।—" ইলা হাসে। হাসি ঠিক নয়, হতাশার একটা অস্পষ্ট আভাস।

কথাটার মোড় ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বিনয় হো-হো শব্দে হেসে উঠে বলে—"ভালো কথা, সেই সুবিমল বাবু কি করলেন? তুই যে লিখেছিলি কাজের জন্যে!"

"লিখেছিলাম। কিন্তু লেখা মানেই তো চাকরি হওয়া নয়।" ইলা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস কাটিয়ে দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে—"তিনি এখন খুব ব্যস্ত কি না, তাই বোধ হয় সময় পাননি? ওই কাগজেই পাবে তাঁর খবর। দেখ না—" কাগজখানা বিনয়ের হাত থেকে টেনে নিয়ে ইলা খবরটা তার চোখের সামনে ধরে দিয়ে হন-হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনয় যখন ডাকতে ডাকতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ইলা তখন সদর দরজা ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে।

* * * *

ডুবন্ত মানুষ যেমন করে এক টুকরো ভাসমান কাঠকেও আঁকড়ে ধরবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, ইলাও তেমনি যার কাছে এতটুকু আশার সংকেত পেয়েছে তাকেই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হতে পারেনি। যে কোন অফিসে সামান্য মাইনের একটা কাজ পেলেও ইলা আজ দেবতার আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে নেবে। কিন্তু কোথায়? কোন কাজের সন্ধানই মেলে না। অনেকের কাছেই চাকরীর আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। সঙ্কোচের বাঁধ কাটিয়ে ইলা সুবিমল বাবুকেও চাকরীর জন্য লিখেছিল। তিনি মূল্য দেননি ইলার সে আকুতির। কথাটা মনে হলেই ইলার মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারে না। আজ না-হলেও শেফালি একদিন ছিল ওর কে। শেফালির পথে সে কোন দিন কাঁটা হবে না।

নিজের উপর ইলার চিরদিন ছিল অপরিসীম আস্থা। কিন্তু বাস্তবের নির্ম্মম সংঘাতে সেই আত্মবিশ্বাস ও যেন হারিয়ে ফেলে।

দীনেশ বাবুর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙ্গে পড়ে। কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলেন না। মা শয্যাগত। হাতে যে টাকা ছিল তাও ফুরিয়ে এসেছে। এক সময় বাবা হাসিমুখে আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করেছেন। আজ ছেলেমেয়েদের জন্যে তাঁকে কারও কাছে হাত পাততে হবে, এ কথা ইলা ভাবতে পারে না।

"ইলা!"

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে ইলা চমকে ওঠে।

"কে? রাণু পিসী।"

"হাঁ, আমি, তোরা ভাল আছিস তো মা?"

ইলা যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, মুখে কথা ফোটে না।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব থাকে। নিজেকে সামলে নিয়ে ইলা স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"কবে এলে?"

"এসেছি ক'দিন হ'লো। বাড়ীর নম্বর জানতাম না, তাই আসতে পারিনি। শেখরের কাছে সন্ধান পেয়ে তারই সঙ্গে এলাম।"

"ও, শেখরদা নিয়ে এলো বুঝি?"

ইলার কথাটা শেষ হবার আগেই শেখর ঘরে এসে ঢুকলো। —"হাঁ, তোমরা তো খোঁজ কর না। তাই সঙ্গে করে এনে পৌঁছে দিয়ে গেলাম"—ইলার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে একটু খোঁচা দেবার উদ্দেশ্যে শেখর বলে।

"খোঁজ নিলেও তো খোঁজ পাওয়া যায় না শেখরদা ! বাবা পর-পর দু'খানা টেলিগ্রাম করেও কোন খোঁজ পাননি। সাবিত্রী পিসীমার কোন খবর আজও পাওয়া গেল না। তাও ভাল যে রাণু পিসীর বিপদ-আপদ কিছু হয়নি।"—ভারি-গলায় ইলা জবাব দেয়।

"দাদা খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন। যাই, আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি।"—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পিসীমা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

"দিন দিন তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ ! চেহারাটা রোগা হয়ে গেছে।"—প্রথমে শেখরই কথা শুরু করে।

শেখরের কথায় ইলা যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে। কোন উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব থাকে। তার পর হঠাৎ ইলা কথাটার মোড় ফিরিয়ে বলে—"একটা কাজ খুঁজে দিতে পার, শেখরদা !"

শেখর নিঃশব্দে ইলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কোন জবাব দেয় না। শেখরকে নীরব দেখে ইলা আবার বলে—"পাকিস্থান থেকে এখন তো আর টাকা তুলে আনা যাচ্ছে না। তাই মুস্কিলে পড়েছি। নইলে কৃষি-ব্যাঙ্কে এখনও বাবার যে টাকা আছে, তাতে কোন রকমে চলে যেত।"

"টাকার দরকার তোমার সে কথা তো কোন দিন বলোনি ইলা !"

"টাকার দরকার হলেই যে সব সময় বলবার দরকার হবে, সে কথা কেমন করে মনে এলো, শেখরদা ?"—ইলা একটু হাসে।

"যুদ্ধের সময় ঠিকেদারি করে কিছু টাকা পেয়েছি।"—গর্বিত স্বরে কথাটা বলে শেখর হাসিমুখে ইলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"ভালো। কিন্তু টাকার দরকার থাকলেও লোকের কাছে সাহায্য নেবার মত অবস্থা হয়ে ওঠেনি এখনও।"—কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে ইলা যেন নিজের কাছেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ইলার সঙ্কোচটুকু শেখরের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। তাকে একটু সহজ করে নেবার চেষ্টায় শেখর বলে—"তেমন সম্পর্ক তো ছিল না, ইলা !"

সম্পর্ক ! শেখরের সঙ্গে কি এমন সম্পর্ক ছিল তার ? শেখর কি বলতে চায়, ইলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার কথার কি উত্তর দেবে সে ভেবে পায় না।

শেখর আপন মনেই বিড়-বিড় করে বলে,—"ছেলেবেলার কথা তুমি ভুললেও আমি ভুলিনি।"

"ভুলব কেন শেখরদা ? খুব মনে আছে। একবার পেয়ারা গাছ থেকে আমায় ফেলে দিয়েছিলে। মনে পড়ে তোমার ?"—হাসিমুখে ইলা বলে।

ইলার কথা বলার ভঙ্গীতে শেখর যেন হঠাৎ কেমন নিষ্প্রভ হয়ে যায়- "গাছ থেকে ফেলে দিয়েছিলাম, সেটুকুই মনে আছে। আর কিছুই ছিল না মনে রাখবার মত ?"

"মনে রাখবার মত যা-কিছু ছিল তা সবই মনে আছে শেখরদা।"—নিজেকে সামলে নিয়ে নিতান্ত শান্ত ভাবে ইলা জবাব দেয়।

শেখরের মুখে ফিকে একটু হাসি ফুটে ওঠে। একটু থেমে বলে—"তাই এত বড় প্রয়োজনের সময়েও আমার কাছে টাকা নিতে পার না ! সংকোচ হয় !"

ইলা নির্ব্বাক্ হয়ে রইল। কথাটা বেশী দূর অগ্রসর হতে দেবার ইচ্ছা তার ছিল না। টাকা জোগাড় করতে না পারলে সামনে সপ্তাহে রেশন আনা হবে না, তা সে ভাল ভাবেই জানে। তবুও শেখরের এই অযাচিত সহানুভূতি সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। শেখর আজ সাহায্য করবার জন্যে কেন এত উদ্গ্রীব, এ কথা অনুমান করতে ইলার বিলম্ব হয় না।

শেখরকে হঠাৎ কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করতে দেখে ইলা উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—"তার মানে ? হোয়াট ইউ মীন, শেখরদা ?"

হঠাৎ কি রূঢ় কথা যেন ইলার ঠোঁটের কাছে এসে থেমে যায়। নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে শান্ত কণ্ঠে বলে—"মাপ করো, শেখরদা। টাকার আমার দরকার নেই।" উত্তরের অপেক্ষা না রেখে ইলা দ্রুতপদে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

শেখর নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। ইলার এই আকস্মিক আচরণ তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে।

কৈশোরের নিভৃত প্রহরে মাঝে মাঝে ইলা মনে যে দাগ কেটেছিল, আজও শেখরের অন্তরে তা শুকতারার মত জ্বল-জ্বল করে।

এত দুঃখ-কষ্ট, বিপর্যয়ের মধ্যে ইলা কোন দিন ধৈর্য্য হারায়নি। হাসিমুখে সব কিছুই মেনে নিয়েছে। কিন্তু শেখরের অযাচিত করুণায় হঠাৎ তার ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে পড়লো। যুদ্ধের কল্যাণে শেখরের এখন টাকার অভাব নেই। তাই সে আজ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চায় ! কথাটা ভাবতেই ইলার মন যেন অপমানে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সর্ব্বস্ব ফেলে এলেও আভিজাত্য ছেড়ে আসতে পারেনি—তাই শেখরের উপচে-পড়া সহানুভূতি তাকে আশ্বস্ত করতে পারে না, এবং উৎক্ষিপ্ত করে তোলে। সংসার অচল হলেও ইলা এ অপমান সইতে পারে না। যে শেখর একদিন সহানুভূতির জন্য ওদের মুখাপেক্ষী হয়েছে, সে আজ টাকা দিয়ে ওদের সাহায্য করতে চায় ! অদৃষ্টের কি পরিহাস ! ইলার চোখ ছাপিয়ে জল আসে। বিনিদ্র রাত্রি অস্বস্তিতে ভরে ওঠে।

* * * *

এত দিন সুবিমল সীমাবদ্ধ ছিল শুধু রাশি রাশি বইয়ের পাতায়। কিন্তু সর্ব্বহারা মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার পর থেকে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী যেন তার বদলে গেল, জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল নিতান্ত কাল্পনিক। তাই আজ বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার চিন্তার ধারা গেল ওলট-পালট হয়ে।

এক-এক দিন আট-দশ ঘণ্টা ষ্টেশনে। অক্লান্ত মনে সুবিমল কাজ করে যায়। খাওয়া-দাওয়া বা বিশ্রামের দিকে এতটুকু নজর দেবার মত অবসর তার থাকে না। শেফালি ও তাদের পার্টির মেয়েরা সুবিমলের আন্তরিকতা দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। তার ব্যবহারে শেফালিই অবাক হয় সব চেয়ে বেশী। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন যে ভাবে হাসিমুখে সুবিমল সর্ব্বহারাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তা দেখে শেফালির শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মাঝে মাঝে ষ্টেশনের ষ্টল থেকে চা ও বিস্কুট এনে সুবিমলকে সে কতকটা জোর করেই খাওয়ায়। শেফালি তাতে কতখানি তৃপ্তি পায়, সে কথা সুবিমল না বুঝলেও শেফালি অস্বীকার করতে পারে না। শেফালি যখন মুখের সামনে খাবার এগিয়ে দিয়ে অনুরোধ করে, সুবিমল প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার মুখপানে চায়। শেফালির আন্তরিকতাটুকু সে উপেক্ষা করতে পারে না। কারো আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করতে হয়তো সে জানে না।

সেদিন সুবিমল যখন ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফিরলো তখন রাত প্রায় এগারোটা। শরীরটা ভাল ছিল না। দিনের পর দিন যে ক্লান্তি জমে উঠেছিল, তার সঙ্গে অনিয়ম ও অত্যাচারে দেহ-মন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

গোকুল দরজায় পিঠ দিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। সুবিমল কড়াটা নাড়তেই ধড়ফড় করে উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—"রোজ রোজ এমনটা করলে শরীর বইবে কেমন করে?"

সুবিমল কোন জবাব দিল না। ক্লান্ত দেহটাকে যেন জোর করে টেনে নিয়ে গেল বিছানার উপর।

সুবিমলের মুখপানে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চেয়ে গোকুল জিজ্ঞেস করে—"অসুখ-বিসুখ হইছে না কি?"

"না। শরীরটা আজ ভাল নেই।"—জুতো খুলতে খুলতে সুবিমল জবাব দেয়। মুখে না বললেও, সত্যি অসহ্য যন্ত্রণায় সুবিমলের মাথাটা ভেঙ্গে পড়ছিল। চোখ দুটো খুলে গোকুলের দিকে ভাল করে চাইতেও কষ্ট হয়।

বালিশটা ধরে টান দিতেই কতকগুলো পুরোন চিঠি বেরিয়ে পড়লো। চিঠিগুলো এক পাশে ঠেলে রাখতে গিয়ে, হঠাৎ সুবিমলের নজর পড়লো ইলার চিঠিখানার ওপর। নিজের কাছেই সে লজ্জিত হয়ে পড়ে। এত দিনের মধ্যেও জবাব দেওয়া হয়ে ওঠেনি। বাংলা পার্টিশানের ফলে ইলারাও হয়তো খুব বিব্রত হয়ে পড়েছে।

ইলার সঙ্গে সুবিমলের পরিচয় হয়তো খুব বেশী দিনের নয়। তবু যেন ইলাকে ভাল লাগে। ছাত্র-জীবন থেকে যে সব মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, ইলা তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। ওর চাল-চলনের মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা মনের উপর সুস্পষ্ট রেখাপাত করে।

ইলা অনুনয় করে লিখেছিল, যে-কোন একটা কাজের জন্যে। কিন্তু সুবিমল সে অনুরোধের মর্যাদা রাখতে পারেনি। চেষ্টা করলে একটা স্কুলমাষ্টারি অন্ততঃ সে নিশ্চয়ই জোগাড় করে দিতে পারতো।

টিপয়টা সামনে টেনে এনে গোকুল চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে দিয়ে গেল। সুবিমলের সেদিকে খেয়াল ছিল না।

কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে গোকুল বলে—"চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে! কত দিন আর এমনি করে কাটাবে? বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার কর। শরীরের যত্ন-আত্তি হবে।"

"থাম্।"—সুবিমল ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়।

গোকুলের কথার মূল্য খুব বেশী না দিলেও, সুবিমল তার আন্তরিকতাটুকু অস্বীকার করতে পারে না। চায়ের পেয়ালাটি শেষ করে গোকুলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সুবিমল শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ বিছানার পাশে নির্বাক্ দাঁড়িয়ে থেকে গোকুল জিজ্ঞেস করে—"মাথাটা একটু টিপে দেবো, দাদাবাবু?"

"না। থাক্। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাও।"—একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে সুবিমল চোখ বন্ধ করে।

গোকুল আলোটা নিবিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

* * * *

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইলার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে জীবনের দিনগুলো যে ভাবে কেটেছিল, তাতে সে কোন দিন কল্পনাও করেনি যে, ভাই-বোনদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দেবার কথা ভাবতে এমন বিব্রত হয়ে পড়বে! আজ আর স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের কথা মনে আসে না। মনের উপর মাঝে মাঝে ছায়াপাত করে শুধু আশঙ্কা। অনাগত বিপন্ন দিনের ছবি মাঝে মাঝে তাকে শঙ্কিত করে তোলে।

সংসারে টাকার একান্ত প্রয়োজন। সংসার অচল হতে আর দেরী নেই। শুধু ওদের নয়, এই ঝড়ো হাওয়ায় সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে যারা ছিটকে পড়েছে, হা-ঘরের মত এখানে-সেখানে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়, তারা সবাই আজ এমনি বিপন্ন!

সে তো বেশী দিনের কথা নয়। এই কোলকাতা সহরের বুকে ইলার ছাত্র-জীবনের দিনগুলো কেমন স্বচ্ছল গতিতে চলেছিল! সেদিন তার পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন বান্ধবীদের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করেছে। সেদিনের সেই অনুভূতি আজও সারা মন জুড়ে আছে। তাই, অভাব হলেও, হাত পেতে কারো কাছ থেকে সাহায্য নেবার কথা ভাবতে শিউরে ওঠে। তার চেয়ে উপযাচক হয়ে চাকরির জন্য লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো অনেক ভাল। সুবিমল বাবু এত দিনের মধ্যেও চাকরির কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে ইলার মনে যে ক্ষোভ ছিল, সে ক্ষোভ এখন আর তার নাই। ভলান্টিয়ার কোর নিয়ে তিনি কি ভাবে জন-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, ইলা তা স্বচক্ষে দেখে এসেছে। কাজেই নিজের সংস্থান আজ নিজেকেই করে নিতে হবে। অকারণ অভিমানে মন ভারাক্রান্ত করলে দুঃখ বাড়বে ছাড়া কমবে না। নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে ইলা তার মনটাকে শক্ত করে নেয়। সুবিমলের সঙ্গে নিজেই গিয়ে দেখা করবে স্থির করে। পরদিন সকালে উঠেই ইলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় পা দিতেই হঠাৎ তার মনে হ'লো রমার কথা। অনেক দিন রমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কি ভেবে নিয়ে ইলা অন্য কোথাও যাবার আগে রমার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'লো।

মাণিকতলা মোড় থেকে প্রায় দশ মিনিটের পথ পায়ে হেঁটে গেলে হয় রমাদের বাড়ী। ছোট্ট একটা অন্ধ গলির মাঝামাঝি চূণ-বালি খসা পুরোন একটা তেতলা বাড়ীর নীচের দুখানি ঘর নিয়ে ওরা থাকে। বুড়ো বাপ-মা আর তের বছরের ভাই তুলু নির্ভর করে রমার উপর।

রমার মা রান্নাঘরের সামনে বসে তরকারী কুটছিলেন, হঠাৎ ইলাকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন—"এই যে ইলা! এস মা। সব ভাল তো? কত দিন দেখিনি।"

"রমাও তো অনেক দিন যায়নি মাসিমা!"—পায়ের ধূলো নিয়ে ইলা বলে।

"রমা কি এখানে আছে মা? পলাশডাঙ্গার এক ইস্কুলে চাকরি নিয়ে গেছে। কত নিষেধ করেছিলাম, কিছুতেই শুনলো না। ভেবেছিলাম বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করবো, কিন্তু সে গেল চাকরি নিয়ে বিদেশে।"

রমা পলাশডাঙ্গা স্কুলে কাজ পেয়েছে শুনে ইলা চমকে উঠলো!

বিস্ময়ের সুরে বলে—"আশ্চর্য্য! সে কথা ঘুণাক্ষরেও জানায়নি সে।"

"আমি ভেবেছি তুমি হয়তো জান। এই তো গেল রবিবার। তোমায় না জিজ্ঞেস করে তো কিছু করে না ও। হয়তো সময় পায়নি।" ইলা কোন জবাব দেবার আগেই আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করে বলেন—"দিন দিন কি যে হাল হচ্ছে মা! ভেবে কূল-কিনারা পাই না। ছেলেদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে মেয়েরাও সব পুলিশ-পেয়াদা হয়ে উঠলো।"

"আচ্ছা, আজ আসি মাসিমা।"—ইলা আর অপেক্ষা না করে উঠে পড়ে।

"একটু চা খেয়ে যাবে না মা?"

"আর একদিন এসে খাবো।"—যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এসেছিল, তেমনি হঠকারিতার সঙ্গে ইলা বেরিয়ে গেল।

ইলা ভেবেছিল রমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের জড়তা খানিকটা কাটিয়ে নেবে। কিন্তু হ'লো না। অগত্যা একাই দ্বিধা-জড়িত মনে সুবিমল বাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো।

বেলা তখন প্রায় নটা। ইলা সঙ্কোচের সঙ্গে দরজার কড়া নাড়তেই গোকুল এসে দরজাটা খুলে দিল।

"বাবুর অসুখ করেছে।"

"অসুখ! কি অসুখ?"—বলতে বলতে ইলা ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরটা এক নজর দেখে নিয়ে ইলা ঘরে পা দিতেই সুবিমল চোখ মেলে চাইল: "ও আপনি? আসুন।"—সুবিমল উঠে বসতে চায়।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ইলা বলে—"উঠবেন না। আমি বসছি।"—একটা চেয়ার টেনে ইলা বসে প'ড়ে উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করে—"জ্বর?"

"বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ঠাণ্ডা লেগেছে।"—সুবিমল শান্ত ভাবে জবাব দেয়। একটু থেমে আবার বলে—"আপনার চিঠিটার আজও উত্তর দিতে পারিনি। রোজই মনে করি—"

"তা হোক, ব্যস্ত হবেন না। সেরে উঠুন, তার পর হবে।"—ইলা সুবিমলকে থামিয়ে দিতে প্রশ্ন করে—টেম্পারেচার দেখেছেন?"

"না।"—সুবিমল ফিকে একটু হাসে।

"ডাক্তার ডাকাও হয়নি বোধ হয়।"

সুবিমল মাথা নাড়ে।

"খেয়েছেন কিছু?"

সুবিমল চোখ দুটো বন্ধ করে। ইলার বুঝতে দেরী হয় না যে, ভদ্রতার খাতিরে কথা বলবার চেষ্টা করলেও জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কি করবে ইলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একবার ইচ্ছে করে কপালে হাত দিয়ে দেখে। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়, কিন্তু পারে না। মুখে কিছু না বললেও সুবিমল যে যন্ত্রণা ভোগ করছিল, সেটা বুঝতে ইলার দেরী হয় না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে কি ভেবে নিয়ে সুবিমলের কপালে হাত দিয়ে দেখে: জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে! এবার ইলা সংকোচের বাধা কাটিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

"কি আপনার চাকরের নামটা?"

"গোকুল।" সুবিমল চোখ মেলে তাকায়।

একটু ইতস্ততঃ করে ইলা গোকুলকে ডেকে বলে—"কাছে যে ডাক্তার আছেন, তাঁকে একবার ডেকে আনতে পারো, গোকুল?"

"খুব পারি।"—গোকুল উৎসাহের সঙ্গে বলে।

সুবিমল কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। শুধু মাথা হেলিয়ে বলে "তাই ডাকো।"

"শোন, তার আগে একটু জল আর একখানা পাখা এনে দাও।"

"থাক, ব্যস্ত হবেন না। গোকুলই সব পারবে।"—ইলার ব্যস্ততা দেখে সুবিমল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে গোকুল টেবিলের উপর রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ডাক্তারের উদ্দেশ্যে। জলের গ্লাসটা নিয়ে আঙুল দুটো ভিজিয়ে ইলা সুবিমলের কপালে বুলিয়ে দেয়। সংকোচ অনুভব করলেও সুবিমল বাধা দেয় না।

"আপনি—আপনি"—সুবিমল কি বলতে গিয়ে থেমে যায়।

"এত জ্বর!"—গ্লাসটা নামিয়ে রেখে, ইলা সংকোচের বাঁধ কাটিয়ে সুবিমলের কপালের শিরা দুটো টিপে ধরে। মনের লাগামটা শক্ত করে ধরলেও নিমেষে সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গেল।

সুবিমল ও ইলা দু'জনেই নির্ব্বাক্। প্রতিটি মুহূর্ত্ত যে নিঃশব্দে পা ফেলে চলে ওদের শিরায়-শিরায়।

গোকুল গিয়ে ডাক্তার নিয়ে এলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশান দিয়ে গেলেন। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর ইলা গোকুলকে সময় মত ওষুধ-পথ্য দেবার কথা ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে, সুবিমলের কপালে হাত ছুঁইয়ে বলে—"ঘুমুলেন না কি?"

"না। আপনার অনেক দেরী হয়ে গেল।"—ইলার মুখপানে সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুবিমল বলে।

ইলা কোন জবাব দিল না। এক মিনিট দাঁড়িয়ে সুবিমলের কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

বর্ষার খেয়ায় বানচাল নৌকার মত অণিমার নিঃসঙ্গ জীবন ভেসে চলে। বিয়ে করে রতনদা সুখী হয়েছে কি না, সে কথা অণিমা জানে না, জানতে চায়ও না। সে শুধু জানে যে তার জীবনের স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে বাস্তবের নির্ম্মম সংঘাতে। মনে কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না কোন দিন, তাই আজ নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলবার কথা ভাবতেও পারে না।

প্রথম জীবনে সবিতা যখন আলেয়ার মত নাগালের বাইরে চলে গেল, তখনই রতনদা অণিমাকে স্বীকার করেছিল হয়তো নিতান্ত দু'দিনের জন্যে। রতনদার সেই সাময়িক দুর্ব্বলতাটুকু অণিমার মনে সৃষ্টি করেছিল সীমাহীন স্বপ্নজাল। তৃপ্তির আনন্দে ভরে উঠেছিল সে। তার পর হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল সে স্বপ্ন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। বাস্তব জীবনে যে সমস্যা আকস্মিক দুর্যোগের মত দেখা দিয়েছে তার ঝাপটায় অণিমা আজ কতখানি বিপন্ন সে কথা শুধু তার অন্তর্য্যামী জানেন। বেঁচে থাকবার সমস্যা যখন জীবনকে তোলপাড় করে, তখন মনের গভীরতম দুঃখকেও চাপা দিতে হয়। তবু রতনদাকে ভুলতে পারে না। অতীতের স্বপ্নময় স্মৃতিটুকু মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।—তবুও গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হয়। অনেক চেষ্টার পর বেহালা স্কুলে মাষ্টা

স্কুলমাষ্টারি জুটিয়ে নেয়। ভাবে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিনগুলো বেশ কেটে যাবে। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অণিমা যে কতকটা অন্যমনস্ক হয়নি, তা নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন দুরন্ত হরিণশিশুর মত উচ্ছল গতিতে হাসিমুখে ওর দিকে এগিয়ে আসে, ও ভুলে যায় নির্মম পৃথিবীর কথা—ভুলে যায় মানুষের হৃদয়হীন খামখেয়াল, যা নিমেষে জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। কারও প্রতি অভিযোগ ওর নেই, হয়তো ছিলও না কোন দিন। তবুও জীবনে যে আঘাত সে পেয়েছে, তার জন্য বার বার নিষ্ফল অভিমানে সারা মন জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। রতনদার প্রতি কোন ক্ষোভ বা বিদ্বেষ না থাকলেও নিজেকে যেন সে ক্ষমা করতে পারে না। ভুল রতনদা করেনি, ভুল করেছিল ও নিজেই। সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে সারাটা জীবন।

প্রথম কিছু দিন বেশ কাটলো। সহকর্মীরা মন্দ নয়। বিশেষ করে সুনন্দাকে পেয়ে অণিমা সত্যি খুসী হয়েছে। আগে সুনন্দা বাঙলার বাইরে মোটা মাইনের সরকারী কাজ জুটিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সে ফিরেছে, সে কথা মুখ ফুটে না বললেও, অণিমা অনেক বার তার আভাস পেয়েছে। সুনন্দা জানে, মনের লাগাম ধরতে, তাই দুঃখে সে ভেঙ্গে পড়ে না। সুনন্দার প্রভাবে অণিমা নিজেকে অনেকখানি আত্মস্থ করে নিয়েছে। প্রথমে অণিমা সাধারণ মিস্‌ট্রেস্‌ হিসেবেই স্কুলে ঢুকেছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেক্রেটারী সুখেন্দু বোসের পৃষ্ঠপোষকতায় সে এসিস্‌ট্যান্ট হেড-মিস্‌ট্রেসের পদে নিযুক্ত হয়েছে। সেক্রেটারীর সহৃদয়তায় অণিমা কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। কিন্তু তার প্রতি সেক্রেটারীর এই অযাচিত সহানুভূতির কথা শুনে সুনন্দা খুসী হতে পারে না। মাঝেমাঝে গম্ভীর হয়ে বলে—"সহানুভূতির চেয়ে দয়া অনেক ভাল।"

অণিমা ওর কথার ভাবার্থ না বুঝে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে থাকে।—"কেন?"

সুনন্দা বলে—"অযাচিত সহানুভূতি দুর্ব্বলতারই নামান্তর। ইঁদুর ধরবার জন্য বেড়াল খেলা পাতে।"···

অণিমা লজ্জা পায়; বাধা দিয়ে বলে—"না। তুমি যা ভাবছো তা নয়।"

"ভাল। তবুও বলছি, সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল।"—হঠাৎ সুনন্দার চোয়াল দুটো কেমন শক্ত হয়ে ওঠে।

সুনন্দার কথাগুলো অণিমাকে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দেয়। নিমেষে রতনদার কথা মনে পড়ে। কিন্তু রতনদা তো কোন ছলনা করেনি ওর সঙ্গে? হয়তো ওরই হয়েছিল বুঝবার ভুল। নিজের জীবনে যে আগুন জ্বলেছে, তার আঁচ রতনদার গায়ে লাগিয়ে লাভ কি? রতনদা সুখী হোক।

"হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? না-জেনে আঘাত করে বসিনি তো? মেয়েদের মনের ব্যথা বাইরে থেকে বোঝা যায় না!"—অণিমার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সুনন্দা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে।

সুনন্দার কথায় নিজেকে সামলে নিয়ে অণিমা শান্ত ভাবে উত্তর দেয়—"পলে পলে নিজেকে বঞ্চিত করার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল।"

মনটা শক্ত করে নিলেও, সুনন্দার কথা অণিমাকে খানিকটা চিন্তিত করে তোলে। সেদিন ক্লাশ নেবার ফাঁকে ফাঁকে সুনন্দার কথাগুলো ওকে নাড়া দিচ্ছিল। হঠাৎ শেষ ঘণ্টায় দারওয়ান এসে ওর হাতে একখানা চিরকুট দিয়ে বলে—"সেক্রেটারী বাবু একবার সেলাম দিয়েছেন।"

ক্লাশ শেষ হতে তখনও দশ মিনিট বাকী। ছাত্রীদের ছুটী দিয়ে অণিমা দ্বিধা-জড়িত পদে অফিস-ঘরের দিকে গেল। মাঝে মাঝে স্লিপ দিয়ে অফিস-ঘরে ডেকে পাঠান আজই নতুন নয়। আগেও সেক্রেটারী অনেক দিন ডেকেছেন ওকে। আগে আগে অণিমা উৎসাহিতই হয়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ যেন ওর পা দুটো ভারি হয়ে আসে।

পর্দ্দাটা সরিয়ে ঘরে পা বাড়াতেই একগাল হেসে সেক্রেটারী বলেন—"আসুন! অসময়ে ডাকলাম বলে বিরক্ত হননি তো?"

"বিরক্ত হবো কেন, বলুন! তবে ক্লাশ শেষ না করে আসতে পারিনি,"—অণিমা আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আজ আর বসবার ইচ্ছে ওর হয় না।

"আমি জানি আপনি কত দূর ডিউটিফুল! সে কথা একজিকিউটিভ কমিটিকে বলেছি। না হলে এত তাড়াতাড়ি আপনাকে লিফট দেওয়া কি সম্ভব হতো!"

অণিমা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। খানিকটা কৃতজ্ঞতা হয়তো ওর মনে এত দিন ছিল, কিন্তু সুনন্দার কাছে নানা কথা শোনার পর থেকে আর ভাল লাগছিল না ওঁকে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে অণিমা শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"কেন ডেকেছিলেন, বললেন না তো?"

"একটু দরকার ছিল। বসুন, বলছি, আমার কাছে এত সংকোচ কেন?"

তার মানে? অণিমার মনে খোঁচা লাগে। ওঁর কাছে সংকোচ থাকা না-থাকার কথা ওঠে কেমন করে! তবুও অণিমা চুপ করে শুনে যায়, কোন উত্তর দেবার ইচ্ছে হয় না।

"শরীরটা বুঝি ভাল নেই!"—সেক্রেটারী একটু হেসে অণিমার মুখপানে চাইলেন।

"ভালই আছে। দরকারি কথাটা কি, বললেন না তো?" সংযত ভাবে অণিমা আবার জিজ্ঞেস করে।

"এত ব্যস্ত কেন? বসুন না। আপনার সঙ্গে কথা বলে বেশ আনন্দ পাই। রিয়ালি আপনার কালচার আছে।"—সেক্রেটারী হাসেন। চোখ দুটো জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে ওঠে।

"সো কাইণ্ড অফ ইউ!"—অণিমা বিরক্তির সঙ্গে বলে।

"না। এটা আমার কথা নয়। একজিকিউটিভ কমিটিও এ কথা স্বীকার করে যে, আপনার হাতে স্কুলের ভার দিতে পারলে, সত্যিকারের কাজ হবে।"

"থাক। সে ভার আমি চাই না কোন দিন, তার দরকারও নেই। যেটুকু করেছেন যথেষ্ট।"

ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল। ছেলেমেয়েদের কোলাহল কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। "আচ্ছা, পরে দেখা হবে, নমস্কার।"

অণিমা হাত দুটো কপালে ছোঁয়ায়।

কয়েক পা এগিয়ে, কি ভেবে সেক্রেটারী ফিরে দাঁড়িয়ে একটু সংকোচের সঙ্গে বলেন—"সন্ধ্যের দিকে যদি পারেন একবার আসবেন! একটু দরকার আছে।"

অণিমা কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হষ্টেলের দিকে চলে গেল।

[ক্রমশঃ :

ডি. এচ্. লরেন্স

মিসেস্ মোরেলের এখানে একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তিনি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। তাঁর পূর্ব্বপুরুষরা নিজেদের রাষ্ট্রিক ও ধর্মগত স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে অনেক বার যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে তাঁকে দেউলে হয়ে যেতে হয়। তাঁর পিতা, জর্জ্জ কপার্ড ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। সুন্দর, বলিষ্ঠ ও উন্নত ছিল তাঁর দেহের গঠন, বংশের গৌরবে তিনি ছিলেন গৌরবান্বিত। গারট্রুড, অর্থাৎ মিসেস্ মোরেল নিজের চেহারা পেয়েছিলেন মায়ের দিক থেকে। কিন্তু নিজের দৃঢ় ও উন্নত স্বভাব, সেটা কপার্ড বংশেরই ধারা।

জর্জ্জ কপার্ড নিজেদের দারিদ্র্য দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পরে একটা ডক্-এর সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের পরিচালক হয়ে ওঠেন। গারট্রুড তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে। মেয়ে তার মাকেই বেশী ভালবাসত। কিন্তু তার নীল, উজ্জ্বল চোখ দুটিতে, তার প্রশস্ত ললাটে, কপার্ড বংশের ছাপ পরিস্ফুট ছিল। তার মা ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও মধুর প্রকৃতির, তাঁর মনটি ছিল একান্ত কোমল। বাবা যখন মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন, তখন গারট্রুডের রাগ ধরে যেত।···ছেলেবেলার কথা ভোলা যায় না। সেই বাঁধের উপর দিয়ে ছুটোছুটি, নৌকোর পেছনে দৌড়ানো। ডক্-এ বেড়াতে গেলে সবাই তাকে আদর করত। সেই অদ্ভুত শিক্ষয়িত্রীটি, যাঁর স্কুলে গারট্রুড কিছুদিন গিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল, ভারী মজার মানুষ ছিলেন তিনি। আর জন ফিল্ড···সে তাকে যে বাইবেলখানা উপহার দিয়েছিল সেখানা এখনও মিসেস্ মোরেলের কাছে আছে। গারট্রুড আর মিসেস্ মোরেল।···উনিশ বছর বয়সে গারট্রুড এই জন্ ফিল্ডের সঙ্গেই গির্জ্জা থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরত। সে ছিল লণ্ডনের এক অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারের ছেলে, লণ্ডনে কলেজে পড়েছিল, ব্যবসা শুরু করবে ব'লে ভাবছিল তখন।

মনে পড়ে, স্পষ্টই মনে পড়ে শরৎকালের এক রবিবারের বিকেল। নিজেদের বাড়ির পেছনে আঙুরলতার নিচে গারট্রুড আর সে। আঙুরলতার ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে মাটিতে নানা আকারের ছক কেটেছে,—তাদের দু'জনকে ঘিরে যেন সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা একটি ওড়না। আঙুরের পাতাগুলো মাঝে মাঝে হলুদ রঙে—হলদে ফুল যেন।

—'চুপটি ক'রে বসো এবারে', সে বলেছিল, 'তোমার চুলগুলোর দিকে চেয়ে থাকি।···কী অদ্ভুত রঙ তোমার চুলের, যেন তামা আর সোনা একসঙ্গে মেশানো। গলানো তামার মত লাল, আবার সূর্য্যের আলো লেগে সোনালী সুতোর মত উড়ছে। লোকে বলে, তোমার চুল কটা, তোমার মা বলেন, ক্ষুদে ইঁদুরের গায়ের মত রঙ।'···

জন্ ফিল্ডের উজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে থাকত গারট্রুড, নিজের মনের পুলককে কিছুতেই বাইরে প্রকাশ হতে দিত না। অন্য কথা তুলত, বলত, 'তোমার নাকি ব্যবসা ভালো লাগে না?'

—'ভালো লাগে! সব চেয়ে ঘৃণা করি, বলতে পারো।'

—'তা'হলে তুমি গির্জ্জের যাজক হয়েই যাও না কেন!' নিজের মনের কথা প্রায়ই সে বলে বসত।

—'তাই চাই আমি। যদি ভালো যাজক হবার ক্ষমতা আছে বলে মনে করতুম, তবে তাই হতুম।' জন বলত।

—'তবে? তাই কেন হও না।' সংশয়হীন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে গারট্রুড বলত, 'আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম, আমাকে কেউ বাধা দিতে পারত না।' মাথা তুলে চাইত গরবিণী। তার পাশে জন্ ফিল্ডকে নিতান্ত নিষ্প্রভ বলে মনে হ'ত।

—'কি জানো, আমার বাবা বড্ড কড়া মেজাজের। তিনি আমাকে ওই ব্যবসাতেই ঢোকাবেন।'

বিরক্ত হয়ে গারট্রুড প্রায় চীৎকার করে বলত, 'কিন্তু তুমি না পুরুষমানুষ!' জনও বিরক্ত হয়ে উঠত, বিরক্ত হ'ত নিজের অক্ষমতার উপর। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলত, 'পুরুষমানুষ হওয়াটাই খুব বড় কথা নয়।'···

এতদিন পরে পুরুষমানুষের সংস্পর্শে এসে, এই 'বটমস্'-এর বাড়িতে বসে, মিসেস্ মোরেলের মনে হ'ত, সত্যি, পুরুষমানুষ হওয়াটাই সব কিছু নয়।···

কুড়ি বছর বয়সে স্বাস্থ্য খারাপ চলছিল বলে গারট্রুড সে জায়গা ছেড়ে চলে আসে। তার বাবাও পৈতৃক বাড়িতে এসে বাসা বাঁধলেন। জন্ ফিল্ডের বাপ ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন, জনকে শিক্ষকের কাজ নিয়ে চলে যেতে হয় দূরে। দু'বছর তার আর কোন সংবাদ নেই। অবশেষে শোনা গেল সে বিয়ে করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। বিয়ে করেছে তারই বাড়ির মালিক, চল্লিশ বছরের একটি ধনী কন্যাকে।

তবু জন্ ফিল্ডের দেওয়া বাইবেলটি গারট্রুড সযত্নে তুলে রেখেছিলেন। অবশ্য তাঁর মনে কোন সুদৃঢ় আস্থা ছিল না। তবু বাইবেলটি রেখে দিয়েছিলেন তিনি, তার স্মৃতিও উজ্জ্বল হয়েই ছিল তাঁর মনে, কিন্তু সে শুধু নিজের তাগিদে। একদিনের জন্যেও মুখে তার কথা আনেন নি তাঁর মরণের দিন পর্য্যন্ত।

তাঁর বয়স যখন তেইশ বছর, তখন বড়দিনের উৎসব-উপলক্ষে এখানকার এক যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। যুবকটির নাম মোরেল। মোরেলের বয়স তখন সাতাশ। তার শরীরের গড়ন মজবুত এবং সুদীর্ঘ, আচরণে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। ঘন কালো

ঢেউখেলানো চুলে সুকুমার দীপ্তি। কালো দাড়িতে কখনো ক্ষুরের আঁচড় পড়েনি, তাতে বলিষ্ঠতার আভাস মেলে। গালে লালচে আভা, মুখের ভেতরটা যে রক্তের মত লাল তা সহজেই চোখে পড়ে। প্রাণখোলা তার হাসি। আর এমন অবাধ উচ্ছল সে হাসি যে এ সংসারে প্রায় দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কপার্ডদের মেয়ে গারট্রুড, এই পুরুষমানুষটিকে মুগ্ধ হয়ে দেখলে বার বার। প্রাণের প্রাচুর্য্যে, দেহের ঔজ্জ্বল্যে লোকটির তুলনা নেই। তার গলার সুরে কৌতুকের রেশ—যেন সবার সঙ্গেই সহজ পরিহাস করে চলেছে সে। গারট্রুড-এর বাবাও খুব হাসাতে পারেন লোককে, কিন্তু তার মধ্যে একটু হুলের খোঁচাও মাঝে মাঝে থাকে। কিন্তু এ একেবারে অন্য ছাঁদের লোক। এর হাসির মধ্যে প্রাণ আছে, দাক্ষিণ্য আছে, বুদ্ধির জটিলতার পরিবর্ত্তে আছে ক্রীড়ার চাপল্য।

গারট্রুড-এর স্বভাব ঠিক বিপরীত। তার হৃদয় শুধু গ্রহণ করে যায়; অন্যের দানে নিজেকে পূর্ণ করে নিয়েই তার বিলাস। অন্যের পরিহাস শুনেই তার তৃপ্তি, অন্যকে দিয়ে কথা বলিয়েই তার আরাম। অন্যের ভাবনার পরিচয় পেতে তার ভালো লাগে। লোকে জানে সে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করতে ভালবাসে—সব চেয়ে তার ভালো লাগে কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে ব'সে দু'দণ্ড ধর্ম্ম, দর্শন কিম্বা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু সে আর সর্ব্বদা পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই অন্যের জীবন-কথা শুনেই যা কিছু উপভোগ করা যায়!

গারট্রুড-এর চেহারা ক্ষীণ, দেখতে সে ছোটখাট। প্রশস্ত কপালে গুচ্ছ গুচ্ছ বাদামী রঙের চুল। নীল চোখ দুটি গভীর এবং সত্যান্বেষক—দৃষ্টি প্রখর এবং অনুসন্ধানী। কপার্ড-বংশের মেয়ে হিসাবে সুন্দর দুটি হাত পেয়েছে সে। পোষাকে অযথা বাহুল্য নেই। গভীর নীলরঙের রেশমী জামা, তাতে রুপোর এক লহর মালা। হাতে সোনার একটি ভারী ব্রুচ্। এ ছাড়া আর কোন আভরণ তার ছিল না। তখনো তার চরিত্রে কোন দিক দিয়েই কোন ভাঙন ধরেনি। মনে ছিল তার সুগভীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং সাবলীল সারল্য।

তার সামনে এসে ওয়ালটার মোরেল যেন এতটুকু হয়ে গেল। সাধারণ খনি-মজুরের কাছে ভদ্রমহিলারা এক অন্য জগতের মানুষ—অনেক কল্পনা আর রহস্য দিয়ে ঘেরা সে জগত। মেয়েটির কথা শুনে তার সমস্ত শরীরের মধ্যে শিহরণ জেগে উঠল, তার উচ্চারণে কোন খুঁৎ নেই, ভাষাতে নেই কোন আড়ষ্টতা। গারট্রুডও এই মানুষটির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ওয়ালটার মোরেল খুব ভালো নাচতে পারত; সহজ আনন্দের সেই নাচ দেখে ভালো লেগেছিল গারট্রুড-এর।···মোরেলের পিতামহ ফরাসী দেশ থেকে চলে এসে এখানে বিয়ে করেছিলেন (বিয়ে কি?) এই দেশেরই এক মদের দোকানের পরিচারিকাকে।···নাচের সময় মোরেলের দেহভঙ্গীতে অনির্ব্বচনীয় কোন আনন্দের আভাস পাওয়া যেত, তার রক্তিম মুখখানা পদ্মফুলের মত ফুটে থাকত কালো চুলের রাশির মধ্যে, আর তার নাচের সঙ্গিনী যেই হোক-না-কেন, মোরেলের মধুর হাস্যে সে আপ্যায়িত হ'ত। এই মানুষটিকে রহস্যের মত লেগেছিল গারট্রুড-এর। এর আগে এমন ধারা লোক আর তার চোখে পড়েনি। পুরুষমানুষ সম্বন্ধে গারট্রুড-এর যতটুকু ধারণা, সে তার বাবাকে দেখেই। একটু পোষাকী, একটু গর্ব্বিত, এবং সামান্য একটু চড়া মেজাজের লোক ছিলেন জর্জ্জ কপার্ড। তাঁর পড়বার রুচিও ছিল ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে, আর চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁর মিল ছিল শুধু একটি লোকের সঙ্গে, তিনি হচ্ছেন যীশুখৃষ্টের শিষ্য পল! কিন্তু এই খনির মজুরটি একেবারেই অন্য রকম। গারট্রুড অবশ্য নাচ জিনিসটাকে একটু অবজ্ঞার চোখেই দেখত, তার বাবার মত তারও রুচি ছিল গোঁড়া এবং প্রকৃতিতে ছিল কাঠিন্যের আভাস। তাই এই লোকটির সরল, সহজ জীবনের যে অনাবিল মাধুর্য্য, তাকে তার মনে হ'ল যেন অদ্ভুত কোন বস্তু, যা তার নিজের নাগালের বাইরে। ওর দেহ থেকে প্রাণের আনন্দ যেন বহ্নিশিখার মত বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার নিজের মধ্যে প্রাণের উত্তাপ পরিণত হয়েছে মননের ক্ষীণ জ্যোতিতে।

লোকটি তার সামনে এসে মাথাটি ঈষৎ নত করলে। তার সারা দেহ ব'য়ে উষ্ণ শিহরণ খেলে যেতে লাগল—মদ খেয়ে মাতাল হলে যেমন হয়।

যেন ছেলে ভুলোনোর সুরে সে বললে, 'এসো। এসো একটু নাচি দু'জনে। খুবই সহজ ব্যাপার এটা। তুমি একটু না নাচলে আমার মন স্থির হবে না।'

সে যে নাচতে পারে না, সে কথা আগেই তাকে বলেছিল। লোকটির নম্রভাব দেখে গারট্রুড মুগ্ধ হ'ল। একটু হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। তার হাসি দেখে মোরেল সব কিছুই ভুলে গেল।

—'না, না, আমি পারব না নাচতে।' নরম সুরে বললে গারট্রুড। অত্যন্ত পরিষ্কার আর মধুর তার কথাগুলো।

নিজের অজ্ঞাতসারেই মোরেল গিয়ে তার পাশে বসল—যেন কোন অস্পষ্ট অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়ে। ব'সে বিনম্র ভক্তের মত তার দিকে চেয়ে রইল।

—'কিন্তু তুমি? তুমি কেন আমার জন্যে নাচের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে?' গারট্রুড বাধা দিতে গিয়ে বললে।

—'চাই না, চাই না আমি নাচতে। ভালো লাগে না আমার এই নাচ।'

—'কিন্তু তুমিই ত' নাচবার জন্যে ডাকলে আমায়—'

শুনে মোরেল হেসে উঠল। তার সেই সহজ প্রাণখোলা হাসি। বললে, 'সত্যি, সে কথা আমার মনেই ছিল না।···তুমি ত' বেশ আমার কথা দিয়েই জব্দ করছ আমাকে!'

এবার গারট্রুড-এর হাসবার পালা। চপল হাসিতে মুখখানা ভ'রে উঠল তার। বললে, 'কিন্তু তোমাকে জব্দ করা কি সহজ কথা?'

—'হ্যাঁ, জব্দ হওয়া আমার ধাতেই নেই। কী জানো, আমি কখনো নিজেকে জব্দ হতে দিতে পারি না।' ব'লে আবার সেই অনর্গল হাসি।

—'তুমি বুঝি খনির মজুর?' গারট্রুড বিস্ময় জানালে তার কথায়।

—'হ্যাঁ। দশ বছর বয়স থেকেই আমি মাটির নিচে কাজ করি।

অভিভূত হয়ে গারট্রুড তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তার পর বললে, 'দশ বছর বয়স থেকে! ইশ্, খুব কষ্ট হ'ত না তোমার!

—'একবার অভ্যেস হয়ে গেলেই হ'ল। ইঁদুর যেমন গর্ত্তের মধ্যে থাকে, আবার রাত্রিবেলা বেরিয়ে এসে বাইরের জগতের দিকে একটু নজর দেয়—তেমনি আর কি।'

ভ্রুকুঞ্চিত করে গারট্রুড বললে, 'আমার কিন্তু নিজেকে কেমন অন্ধ বলে মনে হবে।'

সে হাসলে। তারপর বললে, 'ছুঁচোগুলো অন্ধকারে কিছু দেখতে পায় না। আর কতকগুলো মানুষও আছে ঠিক ঐ রকমের।' ব'লে চোখ বন্ধ করে যেন দিশাহারার ভাণ করলে সে।—'অবশ্য তারা ঠিক কাজকর্ম্ম ক'রে যায়।···তারা যে কী ক'রে চোকে, তা তুমি নিজের চোখে না দেখলে বুঝবে না। তুমি যদি বলো, তোমাকে একদিন নিচে নিয়ে যাব, তা'হলে নিজেই তুমি দেখতে পাবে ব্যাপারটা।'

চমকিত হয়ে গারট্রুড তার দিকে চাইল। হঠাৎ যেন একটা নতুন ধরণের জীবনের সঙ্গে তার মুখোমুখি পরিচয় হ'ল। এই যে হাজার হাজার শ্রমিক সারাদিন মাটির তলায় কঠিন পরিশ্রম ক'রে সন্ধ্যায় উপরে উঠে আসে, তাদের জীবনকে সে অন্তর দিয়ে অনুভব করলে যেন। মোরেলকে তার নতুন করে আবার বড়ো ব'লে মনে হ'ল। স্বচ্ছন্দে সে তার জীবন নিয়ে দিনের-পর-দিন এই কঠিন বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে, অথচ তার বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই সে জন্য! তাকে গৌরবের সিংহাসনে বসিয়ে গারট্রুড নম্রচিত্তে তার দিকে চেয়ে রইল।

মিষ্টি ক'রে মোরেল প্রশ্ন করলে, 'কী বল? ভালো লাগবে না তোমার? না, ময়লা হয়ে যাবার ভয় পাচ্ছ?'

এমন অন্তরঙ্গতার সুরে কেউ তার সঙ্গে কথা বলে নি।

এর পরের বছর বড়দিনের ছুটিতে তাদের বিয়ে হ'ল। বিয়ের পর প্রথম তিন মাস গারট্রুড-এর আর সুখের সীমা রইল না। প্রথম ছ'মাস নিজেকে সে অত্যন্ত সুখী বলে মনে করলে।

এই সময় শপথ করেছিল মোরেল, কোন দিন মদ সে ছোঁবে না! এমন কি মদ ছেড়ে দেবার চিহ্ন হিসাবে সে নীল ফিতেও ঝুলিয়েছিল গায়ে।* চিরকাল নিজেকে জাহির করাই ছিল তার অভ্যেস। যে বাড়িতে তারা থাকত, সেটা মোরেলের নিজের বাড়ি—অন্ততঃ গারট্রুড তাই ভেবেছিল। বাড়িটি ছোটখাট কিন্তু তার সুবিধে ছিল অনেক। ঘরে আসবাবপত্র ছিল প্রচুর। তার প্রতিবেশী মেয়েরা অবশ্য তার কাছে একটু অন্য ধরণের বলে ঠেকত—তার ভদ্র চাল-চলন দেখে মোরেলের মা এবং বোনেরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেও ছাড়ত না। কিন্তু তাদের নিয়ে তার প্রয়োজন কি। স্বামীর পাশে বসে সে বিশ্বসংসার ভুলে যেতে পারত। নিজের মধ্যে ডুবে থাকবার ক্ষমতা তার ছিল। প্রেমালাপের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সে নিজের হৃদয়ের কথাও খুলে বলতে চাইত স্বামীর কাছে। মোরেল খুব মনোযোগ দিয়েই শুনত তার কথা। কিন্তু সব কথা সে যেন বুঝে উঠতে পারত না। স্বামীর অন্তরঙ্গতা অর্জ্জন করবার জন্যে গারট্রুড-এর সমস্ত চেষ্টা এই ব্যবধানের ফলে ব্যর্থ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে অজানা আতঙ্কে গারট্রুড-এর মন উঠত কেঁপে। কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে মোরেলকে কেমন যেন অন্যমনস্ক বলে মনে হ'ত। মনে হ'ত, যেন স্ত্রীকে কাছে পেয়েও তার হৃদয় তৃপ্ত হচ্ছে না, আরও কিছু যেন তার চাই। তখন মোরেল ছোটখাট কাজ করতে লেগে যেত, আর গারট্রুডও হাঁপ ছেড়ে বাঁচত।

ছোটখাট জিনিস তৈরি করার ব্যাপারে মোরেলের প্রতিভা ছিল অসাধারণ। একদিন গারট্রুড বললে, 'তোমার মা যে উনুনে কয়লা দেয়ার যন্ত্রটা ব্যবহার করেন সেটা বেশ ছোট আর সুন্দর। ওটা আমার বেশ ভালো লাগে।'

—'তাই নাকি, দাঁড়াও, ওটা ত' আমারই তৈরি। দিচ্ছি তোমাকে আর একটা তৈরি ক'রে।'

—'তুমি কি বলছ—ওটা ত' লোহার তৈরি!'

—'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তাতে হয়েছে কি? তুমি ঠিক ঐ রকমটিই পাবে।' ব'লে সে কাজে লেগে গেল। জিনিসপত্র ছড়িয়ে একাকার, হাতুড়ির ঠকাঠক্ শব্দ, কিন্তু গারট্রুড-এর কোন কিছুতেই আজ আপত্তি নেই। আর মোরেল—সে ত' কাজের আনন্দেই মশগুল।···

কিন্তু তখন তাদের মাত্র সাত মাস বিয়ে হয়েছে—হঠাৎ একদিন মোরেলের কোট পরিষ্কার করতে গিয়ে তার বুক-পকেট থেকে একতাড়া কাগজ হাতে এসে পড়ল গারট্রুড-এর। কৌতূহলী হয়ে সে পড়ে দেখলে, সেগুলো বাড়ির আসবাবপত্রের বিল, এখনও দাম দেওয়া হয়নি।

রাত্রিবেলা মোরেলের খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে সে বললে, 'দেখো, তোমার কোটের পকেটে এই কাগজগুলো পেয়েছি। আচ্ছা এখনও তুমি কি এই বিলগুলো মিটিয়ে দাওনি?'

—'না, দিতে পারিনি—এখনো দেওয়া হয়ে ওঠেনি।'

—'কিন্তু তুমি যে বলেছিলে আমাকে, সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তুমি যদি বলো আমি শনিবার গিয়ে দামটা দিয়ে আসি। এ আমার ভালো লাগে না। এই অন্যের চেয়ারে বসা, দাম না দিয়ে অন্যের টেবিলে বসে খাওয়া—ভারী বিশ্রী লাগে!'

মোরেল নিরুত্তর।

—'তোমার ব্যাঙ্কের বইখানা দিও আমাকে। দেবে ত'?'

—'নিও, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

—'কেন আমি ত' ভেবেছিলুম',—কথাটা আরম্ভ করেই সে চুপ করে গেল। এ মানুষকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। অথচ কিছুদিন আগেই সে বলেছে, অনেক টাকা তার হাতে আছে। রাগে, বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল তার মন। শুধু নীরবে স্থির হয়ে ব'সে রইল সে।

পরের দিন, মোরেলের মা যে বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়িতে গিয়ে সে উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই ত' আপনার ছেলের সব আসবাবপত্র কিনে দিয়েছিলেন?'

—'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন তিনি।

—'আচ্ছা, ওর দাম হিসাবে উনি আপনাকে কত দিয়েছিলেন?'

প্রশ্নের ধরণে বৃদ্ধা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি যদি জানতেই চাও ত' বলি—দিয়েছিল, আশী পাউণ্ড।'

—'আশী পাউণ্ড! তবু এখনো আরও বিয়াল্লিশ পাউণ্ড বাকী রয়েছে!'

—'তা আমি কি করব বাছা!'

---

* ১৮৭৮ সালে আমেরিকায় এক নতুন সৈন্যদলের আবির্ভাব হয়। তারা মদ খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ ক'রে, তার চিহ্নস্বরূপ নীল ফিতা ধারণ করে।

—'কিন্তু টাকাটা গেল কোথায় ?'

—'কাগজপত্রগুলো একটু ভালো ক'রে দেখ। তাছাড়া ওর কাছে ভাড়ার দশ পাউণ্ড পেতাম, আর ছ'পাউণ্ড হ'ল ওর বিয়ের খরচ।'

—'ছ' পাউণ্ড!' গারট্রুড্ যেন যন্ত্রের মত উচ্চারণ করলে। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার সে, তার বাবা বিয়ের সব খরচ বহন করা সত্ত্বেও, ওয়ালটারের নিজের খরচ হয়ে গেল আরও ছ' পাউণ্ড, নিজেদের বাড়িতে ব'সে খাওয়া-দাওয়া আর আমোদ-প্রমোদের জন্যে।

সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, ওর ওই বাড়িগুলো তৈরি করাতে কত খরচ পড়েছে ?'

—'ওর বাড়ি! সে আবার কোথায় ?'

বিবর্ণ হয়ে গেল গারট্রুড্-এর মুখ। তার স্বামীর কাছ থেকে শুনেছিল সে, যে বাড়িতে তারা বাস করত এবং তার পাশের বাড়িখানা, দুটোই তার নিজের।

অতি কষ্টে সে বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, যে বাড়িতে আমরা থাকি সেটা'—

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বললেন, ও দুটোই আমার বাড়ি।...তাও আবার বাঁধা পড়েছে। বন্ধকের সুদ দিতেই প্রাণান্ত!'

গারট্রুড্-এর মুখ একেবারেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মুখে আর কথা নেই। তার গোপন গর্বের উপর আঘাত পড়েছে। দারিদ্রের উপর এই ঘৃণা সে তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

—'তাহলে আপনাকে মাসে মাসে ভাড়া দেওয়া উচিত আমাদের।' কথাগুলো যেন নিতান্ত বিরস।

—'হ্যাঁ, সে ওয়ালটার রীতিমতই দিয়ে যাচ্ছে।' মা বললেন।

—'কত ভাড়া ?'

—'হপ্তায় ছ' শিলিং ছ' পেন্স।' মা যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

বাড়ির তুলনায় ভাড়াটা যথেষ্ট বেশী। গারট্রুড্ তার মাথাটা উঁচিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'ভাগ্যি ভালো, অমন স্বামী পেয়েছ। টাকা-পয়সার ঝক্কি ত' সবই তার ঘাড়ে। তোমার কোন ঝঞ্ঝাটই নেই।'

গারট্রুড্ কোন জবাব দিলে না।

স্বামীর সঙ্গেও এ নিয়ে তার কোন কথা হ'ল না। কিন্তু সেই দিন থেকে স্বামীর প্রতি তার আচরণে এল পরিবর্তন। কোথায় যেন আঘাত লাগল তার চরিত্রের গভীরতম স্তরে—স্বামীর বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে উঠল তার অন্তর।...

মনে পড়ল, দু'বছর আগের এক বড়দিনের ছুটিতে তাদের প্রথম দেখা। এক বছর আগে সেই বড়দিনেই তাদের বিয়ে। আর এবারকার খৃষ্টপর্বে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হবার কথা।...

অক্টোবর মাসে একদিন তাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি নিজে বুঝি নাচেন না ?' সে বছর বেস্টউডে একটা নাচের ক্লাস খুলবার কথা হচ্ছিল।

মিসেস্ মোরেল বললেন, 'না। কোন রকমই নাচ আমার ভালো লাগে না।'

—'আশ্চর্য্য! অথচ ওঁর সঙ্গে হ'ল আপনার বিয়ে। উনি ত' খুব নামজাদা নাচিয়ে!'

মিসেস্ মোরেল হাসলেন। বললেন, 'নামজাদা নাকি; তা ত' জানতুম না!'

—'নিশ্চয়ই। কেন, উনি ত' পাঁচ বছর ঐ ক্লাব-ঘরে নাচের ক্লাস চালিয়েছিলেন—জানেন না ?'

—'চালিয়েছিলেন নাকি ?'

—'চালিয়েছিলেন বই কি!' প্রতিবেশিনী কোন বাধা না মেনে বলে চললেন, 'প্রত্যেক মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবার, ওঁর ক্লাসে লোক আর ধরত না।...আর তার মধ্যে ঢলাঢলি যে একেবারেই হয়নি, এমনও নয়।'

এই ধরনের কথাবার্তা শুনে মিসেস্ মোরেলের গা জ্বালা করত কিন্তু বাধ্য হয়ে শুনতে হ'ত প্রায়ই। দেখে-চেকে তাঁর সামনে কথা বলবে, এমন লোক এরা কেউ নয়। তিনি তাদের চেয়ে এক ধাপ উপরের লোক, এই ছিল তাদের ধারণা। কিন্তু এর কোন প্রতিকার ছিল না।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য।

প্রশ্ন করে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পলাশ আর মহুয়ার আরক্ত চোখগুলি (কথা বলা নেই)
হঠাৎ চাইলো ফিরে। সায়াহ্নের ছোটো-বড়ো পাহাড়ি পাথর
জেগে উঠে প্রশ্ন করে—হঠাৎ জাগবার
কী কারণ ঘটেছে তা সবাই শুনবেই;

মিশর দেশেতে আমি কোনো এক ফারোর সভায়
হয়তো ছিলাম দূত (অবধ্য নিশ্চয়)।
কী ক'রে আজকে বসে কাইলেতে নোট লিখে যাই ?
চৈত্রের গন্ধঘন লাটাইয়ে জড়াই
অনেক অবাধ্য সুতো
(নয় মন্ত্রপূত!)

তবুও হঠাৎ আজ বেহিসেবী মন
অসংখ্য ঘুড়িগুলো ওড়ায় যখন—
কোন ছাতে তুমি আছো জানি না—জানবো না কখনো
তবুও তোমাকে বলি মন দিয়ে শোনো:
জরা-ক্লান্ত হাড়গুলো (ভূতপূর্ব ছিলো সে কেরানি)
না চাইলেও উইলেতে তোমাকেই ক'রে গেছে বাণী।

মিচেল জর্জেস্ মিচেল

অনুবাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

["মঁ পারনাশ"—বাংলায় বাম তীর।—পারীর এই মহল্লায় খেয়ালী শিল্পীদের প্রসিদ্ধ আড্ডা। তীব্র অভাব ও অনটনের মধ্যেও দুর্দমনীয় সাহস ও দুরন্ত আবেগে দিনের পর দিন চলেছে তাঁদের তুলি ও রঙের সাধনা। হ্‌ব্রাউস্‌কী, কিস্‌লিং ওবিজ, কিকি, ম্যান রে, পিকাসো ষ্ট্রাভিনসকি, ইসাডোরা ডানকান প্রভৃতি খ্যাত ও অখ্যাতদের মিছিল "মঁ পারনাশে"। প্রখ্যাত ফরাসী লেখক "মিচেল জর্জেস্ মিচেলে"র যুগান্তকারী উপন্যাস "LES MONTPARNOS"—অনুবাদক।]

"যাক পৌঁছে গেছি।"

ওরা রু দ্য আতেউইলে এসে পৌঁছেচে। একটা ছোট গৃহস্থ-বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। হ্‌বরোস্‌কী ঘণ্টা বাজালেন। চাকর এসে দরজা খুলে দিতেই বরো তাকে বলল—এখনই মঁসিয়ে লিবায়ুদের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

চাকরটি এদের ভেতরে নিয়ে এসে হল-ঘরে অপেক্ষা করতে বলল।

মোদ্‌রুল্লো দেখতে লাগল উংরিল্লো, ওরটিজ, সুতিন, কুরবেট, পিকাসো, ফ্রিসং এবং মোরতিয়েরের ছাড়া তার নিজের আঁকা খান কয়েক ছবিও রয়েছে। যে কোনো ছবির ফ্রেম এতই মূল্যবান যে মোদ্‌রুল্লো সারা জীবনে যত ছবি আঁকবেন তার বিনিময়েও এত টাকা পাবেন না।

ড্রেসিং গাউন পরা জনৈক খর্বাকৃতি ব্যক্তি হল-ঘরে সিঁড়ির ওপর ধাপ থেকেই উচ্চ কণ্ঠে বললেন—

"কে হ্যা? কি চাও তোমরা? এই সাত সকালে দশটায় এসে হাজির হয়েছ, ব্যাপার কি?"

হ্‌বরোসকী বলে—"দেখুন মঁসিয়ে, মাফ করবেন। আমরা কিন্তু সেই মঁ পারনাশ থেকে সারা পথ হেঁটে আসছি, আমি আর মোদ্‌রুল্লো। ও ত' আপনাকে কয়েকটা ছবি এঁকে দিয়েছে—"

"হ্যাঁ, তার দামও দিয়ে দিয়েছি, আবার কি? আমাকে ... ফলাও করে অভাবের কাহিনী শোনাতে হবে না, ওসব ... শুনেছি। ব্যাপারটা কি? সকাল দশটায় আসবার মানেটা কি?"

মঁসিয়ে লিবায়ুদের জন্য নীচের তলায় চকোলেট তৈরী হচ্ছিল, তার সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত। হ্‌বরোসকীর মাথা ... গেল, সে বলল—"পেটের জ্বালার কি আর সময়-অসময় আছে, ... কোনো সময় ক্ষিধে পায়—" নিজেকে সংযত করে নেয় হ্‌বরোসকী— "আপনি আমাদের মাফ করবেন মঁসিয়ে লিবায়ুদ। আপনাকে অনটনের গল্প শোনাতে আসিনি—বড়ই জরুরী ব্যাপার—... আপনার কাছে আমি বরাবর সেরা ছবিই নিয়ে এসেছি—"

"বেশ, কি এনেছ দেখাও। এখনও ব্রেকফাষ্ট খাইনি, কিন্তু"

"দেখুন মঁসিয়ে ষাট ফ্রাঁ আমাদের দিন, মোদ্‌রুল্লো ... আপনাকে দুখানি ছবি এনে দেবে।"

"ট্রা লা লা,—কি কথাই বল্লেন। মোদ্‌রুল্লো কাল ... ক্যান্‌ভাস আন্‌চেন, আর আমাকে তাই কিনতে হবে।"

—"কিন্তু আমাদের যে তুলি ও রঙ আর ক্যানভাস কেনার ... নেই। আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেও ভেল্কী দেখাতে ... আর পারব না। মঁসিয়ে লিবায়ুদ, আমাদের অন্ততঃ ত্রিশ ফ্রাঁ দিন, নয়ত দশ ফ্রাঁ, কিংবা দু'-চার সো, টাকাটা পেলেই ছবি এনে দেব—"

মোদ্‌রুল্লো সহসা বলে—"খুব হয়েছে! মঁসিয়ের কাছে ... করেই তোমার শেষ হবে দেখচি।"

চাকরটা সমগ্র আলোচনা শুন্‌ছিল, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মোদ্‌রুল্লো বেরিয়ে যায়,—

হ্‌বরোসকীও পিছু নেয়।

-পিকাশো অঙ্কিত

ধনী ব্যক্তিদের কঠোর হৃদয় সম্পর্কে ওদের অভিজ্ঞতা ... নিদারুণ, তাই এ নিয়ে আলোচনা করার কিছু ছিল না। ... ওরা মনের জ্বালা চেপে থাকে। এই প্রচেষ্টার ফলে ...

শক্তি অন্তর্হিত হয়েছিল তা যেন আবার ফিরে এল। ওরা এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পরে ৎবরোসকী বলল—"শোনো, আমার ছোট মেয়েটির যে পোর্টরেটটা তুমি এঁকে দিয়েছিলে সেটা যে কোনো দিন বিক্রী করব, তা ভাবিনি। আজ কিন্তু সেটা বিক্রী করার চেষ্টা করতে হবে।"

মোদ্‌রুল্লো বলল—"তাই করো, আমি তোমাকে না হয় আরো কেশটা পোর্টরেট এঁকে দেব।"

লুক্সেমবার্গ ছাড়িয়ে ওরা রু বারা ধরে অনেক ছোট 'বাগান' ছাড়িয়ে ৎবরোসকীর বাসায় এসে পৌছল।

"একটু ঘুমিয়ে নেবে নাকি ?"

"না, এখন আর তেমন ক্লান্তি নেই, এখন বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠেছি।"

বোরো ওপরে উঠে গিয়ে পোর্টরেটটি নিয়ে এল; সুবর্ণ-গৈরিক পটভূমিতে ছোট্ট একটি মেয়ের মুখ, বেশ তীক্ষ্ণ রেখায় অঙ্কিত, গায়ের বর্ণ যেন আগ্নেয়গিরির মাটি, যে কোনো সময়ে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। জলভরা চোখ দুটি টল্ টল্ করছে, মাথার চুলের বিবর্ণটা অতি মৃদু ও মনোরম নীলবর্ণের—বাকী অংশের অঙ্কনশৈলীর সঙ্গে এ-অংশের কিছু পার্থক্য আছে।

ৎবলোর হৃদয় ব্যথায় আকুল। তার মেয়েটিকে আজ এর-তার হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু সময়টাও তেমন অনুকূল নয়। এ অঞ্চলের ছোটখাটো দোকানদার, যারা শিল্পী ও প্যারীর গ্যালারীর মধ্যে দালালী করে, তাদের হাতে আধুনিক শিল্পীদের ছবি অনেক জমে আছে, এমন কি মোদ্‌রুল্লোর ছবিও তার মধ্যে আছে। তাই, সাড়ে তিনটে নাগাদ, বোরো বলল—"একই ব্যাপার, আমাদের কিছু খেতে হবে।"

পথিপার্শ্বস্থ একটি কাফের সামনে ছবিখানি মাথার ওপর তুলে সে হাঁকতে লাগল—

"সস্তায় যাচ্ছে! মোদ্‌রুল্লোর ছবি, মাত্র দশ ফ্রাঁ!"

কেউ সেদিকে তাকাল না। একজন পাহারাওলা এগিয়ে এল। যেন ভাণ করে যেন রসিকতা করছে। তার পর আবার বলে—

"একবার ভেবে দেখুন। ছবিটার অন্ততঃ পাঁচ ছশো ফ্রাঁ দাম! দশ ফ্রাঁয় পাবেন।"

রু ভাভিনে একটা নাপিতের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই লক্ষ্য করল, নাপিতটা ছবিটা দেখছে, তখন বোরো প্রশ্ন করে—

"কি, ছবিটা কিনবে নাকি ?"

নাপিতের একজন খরিদ্দার বলল—"চমৎকার ছবি,—কিন্তু মেয়েটার মুখটায় কি রকম রঙমাখা, হেঁয়ালি ছবি, না ?"

ৎবোরো বলে—"এই ছবি এমন এক শিল্পীর আঁকা, যিনি একদিন সব শিল্পীর চাইতে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবেন।"

"এ ক দি ন !"

খরিদ্দারটি আবার বলে—"তা তেমন খারাপ নয় বটে।"

নাপিত বলল—"তা মন্দ নয়, ব্যবসার দিক থেকে দু'-চার জন খুসী হবে হয়ত! কত দাম ?"

ৎবোরো ভদ্র ভাবে বলে ওঠে—"দশ ফ্রাঁ।"

"দশ ফ্রাঁ হল ফ্রেম শুদ্ধ, ফ্রেমের ত' দরকার।"

"ফ্রেম-ট্রেম নেই।"

"তাহ'লে ছ' ফ্রাঁ।"

ৎবরোসকী বলে, "বেশ, তাহ'লে নিয়ে নাও।"

নাপিত তার দোকানের টানা খুলে গুণে ছ' ফ্রাঁ নিয়ে এল। তার পর ক্যানভাসটা আঙুলের ডগা দিয়ে সাবধানে ধরে নিয়ে গেল।

তার খরিদ্দার বলল—"ছবিটা ভালো হে, খুব জিতেছ।"

"হয়ত জিতেছি, কিন্তু ভায়া বউকে যেন বলে দিও না।"

এক বছর পরে এই ছবিটি জনৈক আমেরিকানের কাছে এগার হাজার ফ্রাঁ দামে বিক্রী হয়েছিল।

চোরের মত দৌড়ে ৎবরোসকী মোদ্‌রুল্লোর কাছে এসে বলে—

"যাক্ মিটে গেছে। ছ' ফ্রাঁ পেলাম।"

শিল্পী বললেন—"চমৎকার! কিন্তু শোনো ভাই বোরো, প্রথমেই আমাদের একটা ক্যানভাস, তুলি আর তিন টিউব রঙ কিনতে হবে। এখনই যদি টাকাটার ব্যবস্থা না করি তাহ'লে কাফে দ্য লা রোতুন্দায় গিয়ে সব খেয়েই উড়িয়ে দেব।"

"না, দিব্যি করছি শুধু কফি-ক্রীম খাওয়া যাবে। তার পর ক্যানভাস আর ব্রাস কিনে যদি কিছু বাঁচে ত' আবার ফিরে আসব।"

ওরা একটা কাফের কাছে এসে পৌছেচে। মোদ্‌রুল্লো এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে শেষ পর্যন্ত ৎবরোর কথায় রাজী হ'তে হ'ল। কিন্তু দেখতে পেল সবাই কাফে দ্য দোমের দিকে ছুটছে।

ঘটনাটি তাকে শুনা হ'ল—আইসকা তাকে সংবাদপত্রের প্রবন্ধটি দেখালেন। মোদ্‌রুল্লো সমগ্র প্রবন্ধটি পড়ে দেখলে। এ্যামেচার আঁকিয়ে আর বিক্রেতাদের স্বার্থপরতা ও ঔদাসীন্য। জনতার অজ্ঞতা, এই সব যেন যথেষ্ট নয়—এর ওপর আরো আছে—সহসা তার মুখখানা মৃতের মত শাদা হয়ে গেল। হারিকট রুজের সম্পর্কে যে শ্লেষাত্মক উক্তি আছে সেই অংশটুকু চোখে পড়ল।

উত্তেজনায় মোদ্‌রুল্লোর নাসারন্ধ্র কম্পমান। খবরের কাগজটি হাতের মুঠিতে তাল পাকিয়ে ফেলল। তার মনে হ'ল শূন্য উদর যেন বুকের কাছে ঠেলে আসছে! বুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

"কোথায় সেই লোকটা ?"

"কিসলিং আর সেনজ্রারসের সঙ্গে যুঝছে।"

বন্ধুদের সেই ভীড় ঠেলে মোদ্‌রুল্লো সাংবাদিকের সামনে এসে দাঁড়ায়।

সাংবাদিক সেই ভাবে কাফের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, মোদরুল্লো আর সকলের মতই তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তবে সে লোকটিকে বোঝবার চেষ্টা করছে। চতুর্দিকে স্তব্ধতা। মোদ্‌রুল্লো লোকটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখছে, আর সবাই অপেক্ষা করে আছে। তার পর সকলকে বিস্মিত করে, মোদ্‌রুল্লো কম্পিত কণ্ঠে বলে :

"মসিয়ে, আমার বন্ধুরা যে ভাবে আপনাকে আমাকে আপ্যায়ন করেছেন তার জন্য আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার প্রবন্ধ পড়ে অবশ্য আমাদের আহত হবার যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু ওঁরা একথা ভুলে গিয়ে অন্যায় করেছেন যে আপনি আমাদের অতিথি। মঁসিয়ে, আপনি আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে পানাহার করে আমাদের বাধিত করুন। আমি আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, কারণ এখন হয়ত অনেক মাস ধরে আমাদের পরস্পর দেখাশোনা হবে।

আমাদের এই কাফেতে এমন কোনো প্রাণী এখন পর্যন্ত পদার্পণ করেননি, যাকে আমাদের শিল্পীদের ভাষায় 'la verolt Montparnasse' (মঁপারনাসীয় বসন্ত রোগের ছোঁয়াচ) ব্যাধি স্পর্শ করেনি। এ ব্যাধি সিফিলিস নয়; সে বিষয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, কিন্তু তার চাইতেও খারাপ রোগ; দুরারোগ্য সেই ব্যাধি হ'ল এই স্থানটির প্রতি অপরূপ গৃহানুরাগ।

বর্তমান কালে এই স্থানটি পৃথিবীর এক চমকপ্রদ অঞ্চল! আপনি স্বয়ং সাংবাদিক, এই অঞ্চলের নরনারীর মধ্যে যে হাজার হাজার কাহিনী ছড়িয়ে আছে, সে কাহিনী অন্ততঃ আপনার দৃষ্টিতে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। এঁরা সবাই বিদগ্ধ মানুষ,—পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে এঁরা এখানে এসে মিলেছেন, সাইবেরিয়া, সাউথ আমেরিকা, স্ক্যানডানভিয়া আর কেপ, সকল দেশের লোক এখানে আছেন।

রাজনীতি ও শিল্প সম্পর্কে সকলেরই আছে বৈপ্লবিক মনোভাব। সকলেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্ভাবনাময়, এই পরিবেশেই গড়ে উঠছে আগামী কাল, আপনার মতে যা বিষময়।

আপনি হয় ত জানেন, হয় ত বা জানেন না, এই বিষেই গড়ে উঠেছেন পিকাসো, চিত্রজগতে তিনি বিপ্লব এনেছেন; ট্রটস্কি, আজ যাট কোটি বিদগ্ধ মানুষের তিনি সম্রাট। আরো অনেকেই আছেন, আজ এক কাপ কফি-ক্রীম খেয়ে যাঁরা উপোস করে আছেন, তাঁরাই আগামী কাল মাইকেল এঞ্জেলো বা টলেমান হয়ে বিকশিত হবার যোগ্যতা রাখেন।

যে সব পেটমোটা, পোষাকী নির্বোধের দল চায়ের দোকানে আড্ডা দেয় আর ট্যাঙ্গো নেচে বেড়ায়, তাদের চাইতেও আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা, অন্ততঃ চেনামুখের খাতিরে, আপনার কাছে আশা করা কি অন্যায় ? গচো বুট পরা লা স্মুয়েজেকের বন্ধুতা লাভে কি আপনার বাসনা হয় না? পৃথিবীর সকল অংশেই, তিনি সহধর্মী হয়ে ঘুরেছেন। একটি ছোট ঘরে দশটি স্ত্রীলোক নিয়ে তিনি থাকেন। তাদের সকলকে তিনি দীক্ষিত করেছেন, স্ব-আবিষ্কৃত এক অদ্ভুত ধর্ম সম্পর্কে তাদের তিনি উপদেশ দেন।

কিসলিং-এর সঙ্গে মদ্যপান করতে বাসনা হয় না? মাটির তাল নিয়ে ভাস্কর যে ভাবে মূর্তি গড়ে তেমনই কাঁচা রঙে সে মডেল বানাতে পারে। ওর পাগলের মত রাগ আর পানোল্লাস সত্ত্বেও কিসলিং এক বিরাট শক্তিমান পুরুষ, একথা স্বীকার করতেই হবে।

হাতির দাঁতের খোদাই কাজ করবে বলে যেরুসালেম থেকে পারীতে পায়ে হেঁটে এসেছে বেজালেল ইহুদী, আপনি তার ভক্ত হয়ে যেতে পারেন। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় ও নাকি দারুভূত হয়ে গেছে। সেই ভাবে, সেই অবস্থায় সে দু'দিন তিন দিন থাকে। রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগ্রন্থে যেমন ছবি দেখেছেন, সেই রকম শুভ্র সম্প্রদায়ের শাদা ঘোমটা পরা মেয়েদের সে ধর্মগ্রন্থ পড়াত, সেই সব ছেড়ে এসেছে, তাই নাকি এই প্রায়শ্চিত্ত।

আমরা আপনাকে আর সকলের মতই দেখতে চাই, পায়ে থাকবে জীর্ণ পুরাতন জুতো, জামার কলার থাকবে না, কারণ তথাকথিত 'সোসাইটি'তে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন আপনার নেই। আমাদের অন্তর যে-বিরাট মরমীয়া শুচিতার আগুনে প্রজ্বলিত, সে আগুনের পরশমণি আপনার আত্মাকেও স্পর্শ করবে। বিশ্বাস করুন, তাতে আপনার অধঃপতন ঘটবে না। এক দিন আপনিও ক্যানভাস, তুলি আর রঙ কিনে আমাদের মত কম্পিত আঙুলে 'কিউব' আঁকতে সুরু করবেন—"

"কিউব ?"

"হাঁ! কারণ প্রেম, বুভুক্ষা আর ধর্মাবেগের চাইতেও দুর্দমনীয় হ'ল ছবি আঁকার আগ্রহ। এই ছবিই আজ আমাদের সম্মিলিত করেছে,—সঙ্গীতবিদ, রাজনীতিবিদ, কবি দল যে কাজ করতে সক্ষম হননি, সেই দুঃসাহসিক কাজে আমরাই ব্রতী হয়েছি। আমরা নতুন করে আর্ট সুরু করেছি, সূত্রপাত হিসাবে সহজতম পথ ধরেছি—কিউব আঁকছি, কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী না হয়ে নতুন মাত্রা, নতুন আলো আর নতুন সত্যের নেশায় মেতেছি। আর দেখুন, সব মানুষেরই ত' তাই করা উচিত।

ছ' হাজার বছর ধরে মানুষ যা করেছে তাকে ধুয়ে মুছে ফেলতে হ'বে। এই ছ' হাজার বছরে নারী, বুভুক্ষা বা আর্ট এই তিনটি মূলগত প্রশ্নে ওরা কিছুতেই একমত হতে পারেনি, একমত হয়েছে শুধু পরস্পরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে।

ভণ্ড ? দু'চার জন আজে-বাজে ভণ্ড আছে বৈ কি! যেমন কিসলিং আর সেনজ্রারস যখন আপনাকে ঠেঙাচ্ছিল তখন ওদের পিছনে অনেকগুলো বাউণ্ডুলে এসে জুটেছিল, তারাই ত' 'মেরে ফেল' বলে চীৎকার করছিল।

আমরা কিন্তু এমনই বীতস্পৃহ যে আমরা আমাদের যুগের জন্য কাজ করছি না—আমরা জানি যে যখন নতুন করে ছবি আঁকার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি তখন এ কাজ দশ-বিশ বছরেও হয়ত শেষ হবে না।

আমরা পথ তৈরী করছি আগামী কালের মানুষের জন্য; অনেকটা অজ্ঞাতসারেই, যেমন মধ্যযুগের আদিম মানুষ করেছিল, যেমন করেছিলেন গিওতো আর ম্যাসাচিও আর সিনরেল্লি—একদিন হয় ত সৌন্দর্যের সম্রাট র‍্যাফেল এসে আবির্ভূত হবেন, তাই আমরা

সচেতন হয়েই তাঁর জন্য পথ রচনা করছি, আমাদের সকল আবিষ্কার সেই অনাগত পুরুষের দিব্য স্পর্শে সারা বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলবে। এসব তাঁরই জন্য, সেই অনাগত বিধাতার আবির্ভাব-আয়োজন।

যে সব স্ত্রীলোকদের আপনি অপমান করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি একদিন তাঁদেরই কারো গর্ভে এসে জন্ম নেবেন। সেই অনাগত মনুষ্যের জন্যই আমরা কলারহীন সার্ট পরছি, যেমন আমি এখন পরে আছি, তার জন্যই আজ রক্তমাখা পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমরা চাই সেই দিব্যশিশু যেন সুখে থাকে, যেমন র‍্যাফেল ছিলেন। র‍্যাফেলের মত তরুণ বয়সে তাঁরও দেহাবসান হবে। নগণ্য জীবন আর নগণ্য কাজের জন্য চিন্তা করার অবসর তাঁর মিলবে না—করা উচিতও নয়! আমরা—যারা দিনমজুর, তারাই গড়ে তুলব তাঁর অধিষ্ঠানমঞ্চ, সে মঞ্চ আমাদেরই অস্থি-মজ্জায় গড়া হবে।

মোদরুল্লো হাঁফাচ্ছে। বুলভার্দের দিকে নয়—উৎসুক নয়নে যে জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ভেদ করে ওর দৃষ্টি সেই নারীটির ওপর পড়ছে। মেয়েটি একমনে ওর কথাগুলি যেন গিলছে। মোদরুল্লোর কথার রেশ মেয়েটির কণ্ঠেও প্রতিধ্বনি করে ওঠে, সেই সঙ্গে সমগ্র জনতাও যোগ দেয়, মন্ত্রগুঞ্জরিত মন্দিরের মত কাফের ভিতরটা সমবেত কণ্ঠের সুরে ভরে ওঠে—

"সেই অনাগত পুরুষের জন্য! সেই অনাগত ম হা মা ন ব!"

সাংবাদিকটি মধুর গলায় বল্লেন—"বেশ, তা সেই অনাগত লোকটি কি ঐ শিশুর ছবিটার মত একরঙা একটা ছাপ মাত্র হবে?"

"আপনার কি সত্যই কোনো অনুভূতি নেই? একটা অনাসক্ত অভিব্যক্তি কি আপনার বোধগম্য নয়? এর মধ্যে রয়েছে গঠন সংযত প্রতিক্রিয়া, সুস্পষ্টতা, সারল্য ও শুচিতা। প্রচলিত শিল্পের জ্যাবড়া স্থূলতায় এসব কিছুই ত' পাওয়া যাবে না। একটা বিলাসিতা, মধুর আর মনোহরত্বের এই ত' প্রতিক্রিয়া; হঠাৎ-নবাবদের আর্টের আমরা বিরোধী পক্ষ। আমরা হলাম সাধারণ মনুষ্যের, আমাদের এ আন্দোলন হ'ল দারিদ্র্যের তপশ্চর্যার, নিয়মানুবর্তিতার—"

সাংবাদিক বল্লেন: "বাঃ, দারিদ্র্য, তপশ্চর্যা, আর মাইনে পাওয়ার আগের দিনের নিয়মানুবর্তিতা। ওয়েটার বিল নিয়ে এস—'

মোদরুল্লো বলে উঠল—"মাফ করবেন, বোধ করি আপনাকে বলেছি যে আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি।"

ওয়েটার এসে বলল—"পাঁচ ফ্রাঁ হয়েছে।"

কারণ, উপস্থিত ভদ্রগণের ভেতর কেউ এক গ্লাস বাড়তি কফি খেয়েছেন।

মোদরুল্লো হবরৌসকীর সেই ছটি ফ্রাঁ ওয়েটারের হাতে দিয়ে বুলভার্দ অতিক্রম করে বেরিয়ে গেল।

সহসা তার মনে হ'ল কে যেন পিছন থেকে জামা ধরে টানছে। সেই হাতের উষ্ণ রঙ বুক কাঁপিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হারিকট্ রুজ, সে কোনো কথা বলেনি সে ওর বাহুলগ্ন হয়ে রইল, সন্তান যেমন মার আঁচল ধরে থাকে, তেমনই তার ভঙ্গী। নিজের হাতের ভিতর ওর হাতটি টেনে নেয় মোদরুল্লো। মনে ভাবে কোনো দিন যেন বিচ্ছেদ না ঘটে।

হবরৌসকী বলে—"এইবার আমরা কি করব?"

তার মুখের পানে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মোদরুল্লো—যেন তাকে সতর্ক করে বলতে চায় "মেয়েটির সামনে কিছু বোলো না।"

পোলীস ভদ্রলোক সুতরাং নীরব হয়ে যায়।

এই ধরণের ট্র্যাজেডিতে অভ্যস্ত মেয়েটি কিন্তু বুঝলো ব্যাপারটা কি।

সে শুধু বলল—"একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।"

মেয়েটি কাফের ভিতর গিয়ে ক্যাসিয়ারের কাছে গিয়ে কি বলল, সে লোকটি মৃদু হেসে কাউন্টারের তলা থেকে মোটা ক্যানভাসের থলি তুলে নিয়ে 'মুদিখানার মেয়ে' হারিকট্ রুজের হাতে দিল।

এরা দু'জন বুঝলো থলিতে কি আছে।

হবরো বলল—"আমার বাসায় যাবে নাকি?"

মোদরুল্লো অতি কষ্টে বলে—"তাই চলো।"

তার মাথা ঘুরছে।

তিন

বুলভার্দ অতিক্রম করে ওরা চলে, পথে পড়ল বিরাট মুদীর দোকান, তার জানলায় নানাবিধ রসনালোভন ফলমূল ও অন্যান্য রুচিকর খাদ্যের বিচিত্র বাহার।

নীলাভ গোধূলি নেমে এল; গাছের পাতায় আর আকাশের গায়ে তখন কিছু গোলাপী রঙ লেগে আছে। রু দ্য সেভরেস্যুয়ের ভেতর ওরা ঢুকে পড়ে। তার পর নতর দাম-দে-শাঁসের নির্জন পথ ধরে, এর পর এসে পৌঁছয় রু বাবার ছোট্ট গলিপথে, এখানেই বস্তির ভেতর হবরোর বাসা। তটি বাড়ির ভেতর খাঁচার মত একটি ঘরে বাড়ি দেখাশোনা করবার জন্য পরিচারিকা থাকে, সে তার ঘর থেকে বিরক্তিভরে বলে ওঠে: "আর এক জনকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এল। বলে 'আপনি পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে।' নিজেরা কি খায় তার ঠিক নেই।"

ওরা তাকে পার হয়ে যায়। তেতলায় পৌঁছে হবরো দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলল—

ঘরে ঢুকতে গিয়ে হবরৌসকি বলে—"গ্যাস নেই ভাই, কেটে দিয়েছে, তবে জলটা এখনও আছে।"

হবরৌসকীর বাসায় তিনখানি পাশাপাশি ঘর। প্রথমটিতে একটি তলহীন চেয়ার ভিন্ন কিছুই নেই, দ্বিতীয় ঘরে কিছুই নেই, তৃতীয়টিতে ছেঁড়া কাপড় ঢাকা একটি পাতলা গদি মাটির ওপর রয়েছে। পোলীস হবরৌৎসকীর স্ত্রী সেই বিছানায় শুয়ে আছেন, অতি ক্ষীণ তাঁর তনু, চোখ দুটি টল্ টল্ করছে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ওরা সেইখানে এসে চুপ করে দাঁড়াল।

হবরৌসকী তৎক্ষণাৎ হারিকট্ রুজের সেই থলি দেখিয়ে বলে—"দেখ, কিছু খাবার জিনিস পাওয়া গেছে।"

মহিলাটি উত্তেজনায় কাঁপছেন। খাবার! মোদরুল্লো তাঁকে অভিবাদন জানায়, তার পর হারিকট্ রুজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। মাতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তিতে হারিকট্ ইতস্ততঃ এলোমেলো ভাবে ছড়ানো সেই বিছানার চাদরের মত বস্তুটা ঠিকমত গুছিয়ে রাখে। তার পর বলল:

"এখন কি ভাবে রান্না করা যাবে?"

কিছুই নেই কোথাও। এমন কি একটা মাটির হাঁড়ি বা সরাও নেই। একটা কেটলি আছে, কিন্তু তার গায়ে ময়লা পড়ে একেবারে জমে গেছে।

হারিকট্ রুজ বলল, "যদি শীসে বেরিয়ে গিয়ে না থাকে তাহ'লে কোনো দোষ নেই। আমাদের আবার একটু তেলও চাই।" কথাটা যেন ওদের হাসাবার জন্যই বলে।

একটি পুরানো ছুরি জোগাড় করে হারিকট্ সেই কেটলীর গা পরিষ্কার করতে বসে। তার পর কেটলির তলাটা বেশ পরিষ্কার হওয়ার পর ৎবরৌসকির কাছ থেকে থলিটা নিয়ে তার ভিতর থেকে কিছু খাবার জিনিস বার করল, কিড্নী বিনগুলি কেটলিতে ঠিক যেন বিলিয়ার্ডের বলের মত গড়িয়ে পড়ল। চারটি প্রাণী সেই দিকে এমন চোখে তাকিয়ে রইল যেন দীর্ঘ দিনের দুঃসাহসিক অভিযানের পর স্বর্ণগুপ্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।

"জল কোথায় পাবো?"

"এই যে আমি এনে দিচ্ছি।"

ৎবরৌসকি নীচে নেমে গিয়ে কেটলি-ভর্তি করে জল নিয়ে এল। হারিকট্ রুজ ফায়ারপ্লেসের ভিতর দুখানি ইট পাশাপাশি রেখে উনান তৈরী করে নিল।

অন্ধকার নেমে এসেছে,—পরদাহীন জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়ছে—ধূসর সবুজ আলো-আঁধারে ওদের চার জনকে যেন রঙ্গমঞ্চস্থ প্রেতের মত দেখাচ্ছিল।

"আগুন কি করে জোগাড় হবে?"

জল-ভর্তি পাত্রে বিনগুলি ভাসছে, ইটের ওপর সেটিকে বসানো হয়েছে কিন্তু—বাড়িতে না আছে কয়লা, না আছে কাঠ।

ৎবরো বলল—"মেঝে থেকে এক টুকরো কাঠ খুলে নেব? কিন্তু আর একবার জানলার একটা অংশ জ্বালিয়েছি—যদি ধরা পড়ে যাই, তাহ'লে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।"

হারিকট্ রুজ বলল—"আমার সায়াটা খুলে জ্বালাব?"

মোদরুল্লো বলে ওঠে—"না।"

ৎবরো দেয়াল থেকে একটা ছবি নামিয়ে নিয়ে ক্যানভাসটা টেনে ছিঁড়ল, তার চার পাশের কাঠগুলো খুলে ভেঙে ফেলল, তার পর কেটলির তলায় জড়ো করে রাখল। ওর থেকে দু'চার টুকরো কাঠ নিয়ে নিচে সিঁড়ির ওপরকার গ্যাস জেট থেকে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এল। তিন বার এই ভাবে যাতায়াত করার পর আগুন জ্বললো। তার পর সেই পাত্রটির ধারে ওরা সবাই চুপ করে বসে কেটলির পট্‌পট্ আওয়াজ শুনতে লাগল, অনেক পরে ধীরে ধীরে খাদ্যদ্রব্যের সৌরভে ঘর ভরে গেল।

সিঁড়িতে গানের সুর শোনা যাচ্ছে। কিস্‌লিং আসছে। সঙ্গে হয়ত দু'চারটি স্ত্রীলোকও আছে। তারা এখন সারারাত ধরে উপরের তলায় নাচানাচি করবে। এই হল কিস্‌লিঙের সনাতন রীতি, কয়েকটা স্ত্রীলোক জোগাড় করে তাদের মদ্যপান করাবে তারপর তাদের ষ্টুডিয়োতে টেনে এনে সারারাত নাচবে আর হল্লা করবে। উত্তেজনার মাথায় ওরা যখন নাচবে কিস্‌লিং তখন পেন্‌সিল নিয়ে সেই সব ভঙ্গীর স্কেচ করতে বসে।

জলটা ঠিক মত ফুটে ওঠার আগেই কিন্তু আগুনটা নিভিয়ে গেল। কেটলিটা তুলে নেওয়া হ'ল, ঘরেতে রোগীর ওষুধ খাওয়ানোর জন্য একটা চামচ ভিন্ন আর কিছুই নেই, একটু জুড়িয়ে আসতেই তাতে আঙুল ডুবিয়ে যে যা পারল তুলে নিয়ে সেই অর্ধসিদ্ধ মাংসের টুকরো খেতে লাগল। কারো কোনো অভিপ্রায় নেই, এমন কি সবাই নীরব। ৎবরোর ভাগ শেষ হ'তেই সে উঠে গিয়ে কলে মুখ লাগিয়ে জল খেয়ে নেয়। আর সকলেও সেই পথ ধরে।

"হারিকট্ রুজ যখন ঘরে ফিরে এল, দেখল মোদ্‌রুল্লো খালি মেঝের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

ৎবরৌসকী বলল—"অন্য ঘরে তোমাদের যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দেব।"

রোগিণী উঠে দাঁড়ালেন। ওরা দু'জনে সেই গদীটা তুলল, তার পর তার তলা থেকে চট, কাগজ, কাপড়ের টুকরো প্রভৃতি টেনে বার করল। অন্য ঘরে হারিকট্ রুজ আর ৎবরো দুজনে মিলে তাই মিশিয়ে যেন তেন প্রকারে একটা বিছানা বিছিয়ে দিল। তার পর দু'জনে ধরাধরি করে মোদরুল্লোকে সেইখানে শুইয়ে দিল। মোদ্‌রুল্লোর ঘুম কিন্তু ভাঙলো না।

হারিকট আর মোদরুল্লোকে সেই ঘরে রেখে ৎবরো তার রুগ্না স্ত্রীর কাছে ফিরে এল। [ক্রমশঃ।

কলিঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী?

" It was the Bengalis who founded the Kalinga Empire whence they spread their conquests beyond the seas and colonised Java and other islands of the Indian Archipelago.

—Dawn, 1909.

যা সাংঘাতিক মাথা ধরেছে—আমাকে আজকের
সভা বাতিল করতেই হবে!
(কিন্তু তাঁর সেক্রেটারী সারিডন-এর কথা জানতেন)
আজকে সভায় যাওয়া আর হল না। যা সাংঘাতিক মাথা ধরেছে তাতে সেখানে কাজ চালানো অসম্ভব।
আমার কাছে সারিডন আছে, স্যর্। খেয়ে দেখুন না কেন?
এসব ব্যথা কমানোর ওষুধ আমি দেখতে পারি না। খেয়ে অস্বস্তি লাগে, তার ওপর ঘামতে থাকি।
সারিডন-এ তা হয়না, স্যর্! এ একেবারে অন্য ধরণের ওষুধ—এতে বরং আপনার শরীর সতেজ মনে হবে। এই নিন, জল দিয়ে ট্যাব্‌লেটটা খেয়ে ফেলুন দেখি…
কয়েক মিনিট পর
অদ্ভুত! মাথাটা একদম ছেড়ে গেছে…সব কাজই এখন কর্‌তে পারবো। 'সারিডন'—নামটা ভুলবো না। ভাগ্যিস তুমি বলেছিলে—ধন্যবাদ!
অ্যাস্‌পিরিন বা কোন মাদক পদার্থ নেই—
খাওয়ার পর একটুও অবসাদ আনবে না—
ব্যথা দূর করে!
ব্যথায় কষ্ট পেলে—
সারিডন খান
১০টা ট্যাব্‌লেটের টিউব ১৷৶
10 Saridon
ANALGESIC TABLETS
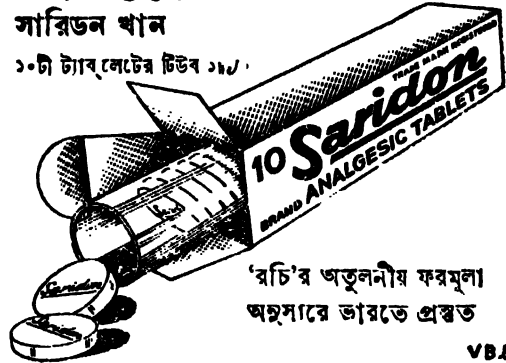
[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এগার

ইতিমধ্যে আমরা হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। হাতঘড়ির রেডিয়াম-দেওয়া ডায়েলের দিকে তাকিয়ে দেখি রাত প্রায় দেড়টা।

কুন্তী মন্থরা বা প্রিয়সখী ললিতা: কিরীটির শেষোচ্চারিত কথাটারই জের টেনে কি যেন আমি বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কিরীটি আমাকে বাধা দিয়ে নিরস্ত করলে: বড্ড ঘুম পেয়েছে রে! চোখ আর খুলে রাখতে পারছি না।

কথাটা উচ্চারণ করতে করতেই কিরীটি আমাদের নির্দিষ্ট ঘরের দিকে একবারে এগিয়ে গেল সোজা। বুঝলাম এখন আর কোনরূপ আলোচনা করতে কিরীটির ইচ্ছা নেই, তাই তার অকস্মাৎ মৌনভাব।

সত্যি সত্যিই কিরীটি অতঃপর সোজা পায়ের জুতোটা খুলে শয্যার 'পরে লেপটা গলা অবধি টেনে নিয়ে টান-টান হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

অগত্যা নিরুপায় আমাকেও গিয়ে বাকী রাতটুকুর জন্য শয্যার আশ্রয় নিতে হলো কিন্তু আমার চোখে আর তখন ঘুম নেই। বাকী রাতটুকু আমায় জেগেই কাটাতে হবে। শতদলের ব্যাপারটা ক্রমেই যেন বেশী অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। নিজে সেই সন্ধ্যা হ'তে মনে মনে সব কিছু বিশ্লেষণ করে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিলাম 'নিরালা'র মূল্য একমাত্র সেই বাড়িটাই নয় আরো কিছু আছে এবং সেইখানেই এ রহস্যের মূল। শতদল ও সীতার কথাগুলো মনে পড়ছে। শতদল বাড়িটা বিক্রি করতে চায় এবং কয়েক জন খরিদ্দারও ইতিমধ্যে জুটেছে এবং আশাতীত মূল্য দিয়ে তারা বাড়িটা ক্রয় করতে চায়। কিন্তু কেন?

তাছাড়া আরো একটা কথা। কিছুক্ষণ আগে হোটেলে ফিরবার পথে কিরীটি যা বলছিল: হিরণ্ময়ী দেবী নাকি পঙ্গু নন। কি উদ্দেশে তিনি নিজেকে এ ভাবে পঙ্গু সাজিয়ে রেখেছেন। আর পঙ্গুই যদি তিনি নন—পঙ্গু তিনি সেজে পঙ্গুর অভিনয়ই বা করে যাচ্ছেন কেন? আর কত দিন থেকেই বা এ অভিনয় করছেন? আর ভূখণাও নাকি 'কালা' নয়। ভূখণা শতদলের নিজের চাকর। তার কথা নিশ্চয়ই শতদল জানে। শতদল কি জানে হিরণ্ময়ী দেবীর রহস্য? আশ্চর্য! এও ত' বোঝা যায় না এক জন এমনি করে সুস্থ হ'য়েও দিনের পর দিন রাতের পর রাত পঙ্গুর অভিনয় করে যাচ্ছেন! আর ভূখণাই বা কেন কালা সেজে থাকে?

ইতিপূর্বে আরো কত জটিল রহস্যের মীমাংসা করেছি কিন্তু এতখানি জটিলতার সম্মুখীন ইতিপূর্বে হয়েছি বলে মনে পড়ে না।

* * * *

কিরীটির অনুমান যে এত তাড়াতাড়ি সত্যে পরিণত হবে, এমন পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় সত্য রূপ নেবে, সত্যিই সেদিন সন্ধ্যাতেও ভাবিনি। এবং সত্য কথা বলতে কি, শতদলের ব্যাপারটাকে প্রথম হতেই আমি খুব বেশী একটা গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু কিরীটি বুঝেছিল। তাই বোধ হয় দু'-চার বার অবশ্যম্ভাবী সেই সর্বনাশার ইংগিত দিয়েছিল।

শুধু শতদলের ব্যাপারেই নয় ইতিপূর্বেও আমি দু'-চার বার দেখেছি, কিরীটির অদ্ভুত বিশ্লেষণ-শক্তি, অন্ধকারের মধ্যেও যেন ভবিষ্যতের পদসঞ্চার সে শুনতে পায়। পঞ্চ অনুভূতির বাইরে তার যে একটা বিচিত্র ষষ্ঠ অনুভূতি যার সাহায্যে অনেক সময় এমন অসাধ্য-সাধন করেছে যে, ভাবতে গেলে যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কিরীটি বলে ওটা নাকি তার **common sense.** স্বাভাবিক বুদ্ধির বিচার-শক্তি।

কিন্তু যাক। যে কথা বলছিলাম।

দিন দুই পরের কথা। মেলার উৎসবে ছোট্ট সহরটিতে যেন প্রাণ-চাঞ্চল্যের একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে।

রাত্রে বিস্তীর্ণ সমুদ্রের বালুবেলার 'পরে বাজীর প্রতিযোগিতা হবে। এ্যামেচার ও পেশাদারী বাজীকরদের ভিড়ে সমুদ্র-সৈকতের নির্দিষ্ট স্থানটি গম্‌ গম্‌ করছে। রাত আটটা হ'তে বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। 'নিরালা'র উন্মুক্ত ছাদে স্থানীয় দর্শনার্থীরা এসে ভিড় করেছে। 'নিরালা'র গেট আজ খুলে দেওয়া হয়েছে বিকাল হতেই। সর্বসাধারণের কাছে আজ অবারিত নিরালার লৌহ-ফটক। আমি, কিরীটি ও স্থানীয় থানা-ইনচার্জ ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। শতদল সকলকে অভ্যর্থনা করতেই ব্যস্ত। হোটেল হ'তে রাণু দেবীও এসেছে। আসেনি তার মা মিসেস্‌ মিত্র। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে নাকি ফ্লু'তে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। দু'বেলাই স্থানীয় ডাক্তার চ্যাটার্জী যাতায়াত করছেন হোটেলে।

আজকের রাতের শীতটা বেশ আরামদায়ক। স্থানীয় দু'-চার জন অফিসারের স্ত্রী ও কন্যারা এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও অনেকে স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে বাজী-প্রতিযোগিতা দেখতে এসেছেন।

পরিষ্কার আকাশ। ঝক্‌-ঝক্‌ করছে তারাগুলো।

হঠাৎ একটা মিষ্টি হাসির তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সামনের দিকে চেয়ে দেখি, সীতা রাণুর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসছে।

সীতার এমন হাসি-খুশি আনন্দ রূপ এ কয় দিনের পরিচয়ের মধ্যে এক দিনের জন্যও দেখিনি।

সীতাকে মানিয়েছেও আজ ভারি চমৎকার! শাদা চওড়া জরির

পাড় বসান কালো জর্জ্জেট শাড়ী, গায়ে সিল্কের শাদা ব্লাউজ। মাথার চুল বেণীর আকারে পৃষ্ঠদেশে লম্বমান।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় বাজীর প্রতিযোগিতা সুরু হলো।

বিচিত্র সুন্দর দৃশ্য! কালো আশমানের বুকে লাল নীল শাদা হরেক রংয়ের আগুনের ফুলকীগুলো যেন আলোর ফুলঝুরি ছড়িয়ে চলেছে। হাউইগুলো সোনালী সর্পিল রেখায় কালো আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেন এক-একটা অগ্নি-ইংগিত এঁকে চলে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে।

সকলেই আমরা যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছি। হঠাৎ সেই কলগুঞ্জনের মধ্যে শতদলের কণ্ঠস্বর কানে এলো।

শতদল সীতাকে বলছে: এই ঠাণ্ডার মধ্যে গরম জামা গায়ে দাওনি কেন সীতা?

'ঠাণ্ডা আবার কোথায়?—'

'হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগতেই বা কতক্ষণ! যাও নিচে গিয়ে একটা গরম জামা গায়ে দিয়ে এসো!—'

'কিছু হবে না!—'

'না। আমার এই শালটাই না হয় গায়ে দাও!—'

'না। না—তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।—'

'না। আমার গায়ে গরম জামা আছে। নাও—'

কতকটা জোর করেই যেন শতদল সীতার গায়ে ডিপ লাল রংয়ের কাশ্মীরী শালটা নিজের গা হ'তে খুলে জড়িয়ে দিল।

ঠিক ভিড়ের মধ্যে নয় ছাদের একেবারে কিনার ঘেঁষে এক ধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সীতা ও শতদল। আমি ওদের থেকে হাত তিনেক মাত্র দূরে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই ওদের পরস্পরের কথাগুলো প্রায় স্পষ্টই শুনতে পেয়েছি। একটু পরেই দেখলাম শতদল ভিতরের দিকে চলে গেল।

ভিড় বাঁচিয়ে ছাতের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে কিরীটি ও থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল নিম্ন কণ্ঠে পরস্পারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করছে।

বাজী পোড়ানোর ব্যাপারে কিরীটির যে খুব বেশী মনোযোগ আছে বলে মনে হয় না। আজকের উৎসবে যোগ দিলেও সে যেন উৎসবকে বাঁচিয়েই চলেছে।

অতিথি—বিশেষ করে বিশিষ্ট অতিথিদের প্রতি যে শতদল বাবুর লক্ষ্য আছে বুঝলাম যখন কিছুক্ষণ বাদে ভৃত্য অবিনাশ ট্রে'তে করে কেক্, বিস্কিট ও ধূমায়িত চা পরিবেশন করে গেল আমাদের।

আরো আধ ঘণ্টাটাক পরে।

কালো আকাশ-পটে তখন বিচিত্র বাজীর অপূর্ব আলোর খেলা চলেছে। প্রত্যেকেই আমরা তন্ময় হ'য়ে একেবারে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। ঐ মুহূর্তে ছাদের উপরে উপস্থিত সকলেরই মনোযোগ ও দৃষ্টি আকাশের দিকেই কেন্দ্রীভূত।

হঠাৎ আমরা চম্‌কে উঠলাম একটা মেয়েলী কণ্ঠের আর্ত তীক্ষ্ণ চিৎকারে।

ভয়ার্ত আকুল চিৎকার!

কি হলো! ব্যাপার কি!···সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সকলেরই চোখেই একটা প্রশ্ন যেন!

চিৎকারটা এসেছিল কোন্ দিক থেকে তাও ভাল করে প্রথমটায় বোঝা যায়নি। সকলেই আমরা যেন বিস্ময়ে চকিত হতভম্ব! বিমূঢ়!

ঠিক সেই সময় একটি সুবেশা তরুণী একপ্রকার চেঁচাতে চেঁচাতেই ছাদে এসে দাঁড়ালেন: খুন! খুন হয়েছে!

কথা বলতে বলতে তরুণীটি হাঁপাচ্ছিলেন। ভয়ে আতঙ্কে চোখের মণি ছ'টো যেন তাঁর ঠিকরে বের হবে আসছে।

মুহূর্তে চার পাশ হ'তে সকলে এসে তরুণীটিকে ঘিরে ধরে।

খুন! কোথায় হয়েছে! কে খুন হলো! যুগপৎ একসঙ্গে বহু কণ্ঠ হ'তে প্রশ্ন উত্থিত হলো।

হঠাৎ এমন সময় কিরীটির শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: একটু অনুগ্রহ করে আপনারা সরে দাঁড়ান ত। সরুন। পথ ছেড়ে দিন।

তাকিয়ে দেখি, কিরীটি ও তার পাশে থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল।

'সরুন না। পথ ছাড়ুন না।—' শতদলের কণ্ঠস্বর।

শতদল মধ্যবর্তী তরুণীর কাছে এগিয়ে যাবার জন্য সকলকে পথ ছেড়ে দেবার মিনতি জানাচ্ছে।

বহু কষ্টে আমরা তরুণীর সম্মুখবর্তী হলাম।

শতদলই প্রথমে প্রশ্ন করে: আপনি কে? কে খুন হয়েছে? কোথায়?

তরুণী তখনও হাঁপাচ্ছে। চোখে-মুখে ভয়ার্ত ব্যাকুলতা।

এবারে কিরীটি তরুণীর সামনে এগিয়ে যায়: কোথায় খুন হয়েছে বলুন ত?

'নিচের বসবার ঘরে—'

কিরীটি বলে: আসুন শতদল বাবু! আপনিও আসুন।

সকলে অতঃপর আমরা দো'তলায় নেমে এলাম। অভ্যাগতদের বসবার জন্য দো'তলায় ষ্টুডিও-ঘরের পাশের ঘরটা খুলে কতকগুলো চেয়ার ও সোফা ঐ দিনের জন্য সাজান হয়েছিল।

ঐ দিনকার উৎসবোপলক্ষে ঝাড়বাতিটাও সন্ধ্যা হতেই জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন সর্বাগ্রে তরুণীটি এবং তার ঠিক পশ্চাতে আমি ও কিরীটি।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই চম্‌কে উঠেছিলাম: ঘরের ঠিক মধ্যখানে মেঝের 'পরে কাত হ'য়ে পড়ে আছে যে মৃতদেহটি, তাকে দেখা মাত্রই চিনতে আমার কষ্ট হয়নি।

সীতা!

শতদলের সেই রক্তবর্ণ কাশ্মীরী শালটায় তখনও তার দেহ আবৃত!

পশ্চাৎ হ'তে পৃষ্ঠদেশে গুলী করা হয়েছে। গায়ের শাল ও জামা ভিজিয়ে রক্তধারা ঘরের মেঝেতে: সেদিনই পরিষ্কার করা পরিচ্ছন্ন মসৃণ শ্বেত-পাথরের মেঝেতেও ছড়িয়ে জমাট বেঁধেছে।

মৃতদেহের চোখ ছ'টো বিস্ফারিত যেন ভয় ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন! হস্ত দুটি প্রসারিত।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে যেন আমার বাক্‌রোধ করেছিল। মুখটা এক পাশে কাৎ হ'য়ে আছে। শতদলও আমাদের পাশেই নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে নির্বাক্। তার সমগ্র মুখখানা জুড়ে একটা অসহায় আতঙ্ক যেন ফুটে উঠেছে। চোখে ভীত প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি!

কিরীটিও স্তব্ধ হ'য়ে মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পাশে রসময় ঘোষাল। এবং রসময় ও কিরীটির কাছ হ'তে বেশ কিছুটা ব্যবধান বাঁচিয়ে ভীত নর-নারীর দল চিত্রাপিতের মতই নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে। ঘরের মধ্যে পাথরের মতই জমাট একটা স্তব্ধতা যেন থম্ থম্ করছে।

বোধ হয় মিনিট চার-পাঁচ ঐ ভাবেই কেটে গেল।

কিরীটি এগিয়ে গেল সর্বপ্রথম মৃতদেহের খুব কাছে। ঝুঁকে নিচু হ'য়ে মৃতের অবশ-শিথিল হাতটা তুলে আবার যেমনটি ছিল ঠিক সেই ভাবে নামিয়ে রাখলো সন্তর্পণে আলগোছে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পৃষ্ঠদেশে গুলী করা হ'য়েছে।

'সীতা! সীতা খুন হলো!—' অর্ধাস্ফুট ভাবে কথাগুলো শতদলের কণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢাকল শতদল।

'বসুন শতদল বাবু! বসুন—' শতদল বাবুকে ধরে বসিয়ে দিলাম একটা চেয়ারের উপর: নার্ভ হারাবেন না।

'আপনিই দেখেছিলেন? আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?—' কিরীটি সেই তরুণীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।

'উনি মিস্ গুহ। এখানকার উকিল শরৎ বাবুর মেয়ে।—' জবাব দিলেন পার্শ্বেই দণ্ডায়মান প্রৌঢ় বয়স্ক একটি ভদ্রমহিলা।

'দেখুন!—' এবারে কিরীটি সমবেত সমস্ত নর-নারীকে সম্বোধন করে বললে: আপনারা সকলে এই ভাবে এই ঘরে ভিড় করলে ত চলবে না। অবশ্য আপনাদের সকলের সঙ্গেই আমাদের কথা বলবার প্রয়োজন হবে—তবে একে একে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে। কী বলেন রসময় বাবু? কিরীটি তার বক্তব্য শেষ করলে শেষ মুহূর্তে থানা-ইনচার্জ রসময় বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে।

'হাঁ। আপনাদের সকলকেই আমার প্রয়োজন হবে।—'

থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষালকে সকলে চিনতেন না। কেউ কেউ যাঁরা চিনতেন তাঁরাই বোধ হয় ইতিমধ্যে পাশাপাশি যাঁরা জানতেন না তাদের ফিস্-ফিস্ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন রসময় ঘোষালের সত্যিকারের পরিচয়টা। এবং কিরীটিকে রসময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দেখে তার সত্যকারের পরিচয়টা না জেনেই বোধ হয় তাকেও ঐ পর্যায়েই ফেলে ওদের দু'জনার সম্পর্কেই হঠাৎ যেন সকলে বেশ একটু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে প্রথমটায় সকলেই হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিল কিন্তু যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পারলে এর মধ্যে থানা-পুলিশও উপস্থিত, সমস্ত ঘটনার চেহারাটাই যেন বদলে গেল। প্রথমটার যে গুরুত্ব এতক্ষণ আকস্মিকতার মধ্যে ঠিক প্রকাশ পায়নি থানা ও পুলিশের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে সেই গুরুত্ব যেন সহসা সুস্পষ্ট ও কঠিন হ'য়ে দেখা দিল। আকস্মিক বিমূঢ়তার মধ্যে ফুটে উঠলো একটা ভয়-ব্যাকুল চাঞ্চল্য। সকলেই ভিতরে ভিতরে অবিলম্বে স্থান ত্যাগের জন্য যেন চঞ্চল ও ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

যুগপৎ নিঃশব্দে উপস্থিত সকলেরই মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটি নিঃসংশয়ে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারে। মৃদু হেসে যেন সকলকেই সাহস দেয়, 'আপনাদের ব্যস্ত হবার বা ভয় পাবার কোন কারণ নেই! সামান্য দু'-চারটে প্রশ্ন প্রয়োজন মত আপনাদের কাউকে কাউকে উনি রসময় বাবু ও আমি জিজ্ঞাসা করবো মাত্র। তার পরই আপনারা যে-যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিছুক্ষণের জন্য বাইরের বারান্দায় আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।—আমরা বেশীক্ষণ সময় নেবো না।—কেবল মিস্ গুহ, আপনি ঘরে থাকুন।—'

দেখতে দেখতে ঘর খালি হ'য়ে গেল।

ঘরের মধ্যে এখন আমি, কিরীটি, থানা-ইনচার্জ রসময় ঘোষাল, শতদল বাবু ও মিস্ গুহ।

'মিস্ গুহ, মনে হচ্ছে আপনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে ঐ মৃতদেহ দেখেছেন!—'

কিরীটির প্রশ্নে মিস্ গুহ কিরীটির মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে বোবা-দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে, কোন জবাব দেয় না। মৃতদেহ দেখার পর আকস্মিক ভাবে যে চাঞ্চল্য তরুণীর মনের মধ্যে জেগেছিল, তার কিছু মাত্র যেন এখন আর অবশিষ্ট নেই। একেবারে স্তব্ধ। বোবা হ'য়ে গিয়েছে যেন ও।

'আপনি নীচে এসেছিলেন কেন?—'

'জল পিপাসা পেয়েছিল তাই এই ধারে এসেছিলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকেই—' মিস্ গুহ আবার মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করে চুপ করে গেলেন।

কিরীটি বারেকের জন্য তার মণিবন্ধে বাঁধা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। পরে মৃদু কণ্ঠে বললে, "রাত এখন ঠিক ন'টা বেজে দশ মিনিট। আপনি তাহলে পৌনে ন'টা নাগাদ এ ঘরে এসেছিলেন?—'

'তাই হবে।—'

'সে সময় এ ঘরে আর কেউ ছিল না?—'

'না।—'

'নামবার সময় বাইরের বারান্দায় বা সিঁড়িতেও আর কারো সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?—'

'না।—'

'আপনি জল খেতে নামবার আগে আগাগোড়া ছাদেই ছিলেন? একবারের জন্যও নীচে নামেননি?—'

'না।—'

অতঃপর কিরীটি একে একে সকলকেই ডেকে তাদের গত এক ঘণ্টার গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো।

নবম জনকে প্রশ্ন করা হলো। মধ্য বয়েসী একজন ভদ্রমহিলা। সধবা। তিনি জবাবে বললেন, রাত তখন আটটা আন্দাজ হবে তিনি এ বাড়িতে আসেন। আসতে তাঁর একটু দেরীই হয়েছিল। এখানকার স্থানীয় স্কুলের তিনি একজন মিস্ট্রেস। নাম মালিনী সেন। মিস্। অবিবাহিতা।

মিস্ সেন বললেন: সিঁড়ি দিয়ে সবে দোতলার বারান্দায় উঠেছি—হঠাৎ এখন মনে পড়ছে দেখছিলাম যেন ঐ যিনি মরে পড়ে আছেন উনি ও আর একজন পুরুষ এই ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিম্ন কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিন্তু আমি তখন তাদের বিশেষ লক্ষ্য করিনি। সোজা উপরে ছাতে উঠে যাই!—

মিস্ সেনের কথা শুনে মুহূর্তের জন্য লক্ষ্য করলাম শতদল যেন তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

'সেই পুরুষটি দেখতে কেমন বা তার পরিধানে কি পোষাক ছিল আপনার মনে আছে কি মিস্ সেন?—' কিরীটিই প্রশ্ন করে।

'ভাল করে ঠিক ত তখন লক্ষ্য করিনি তবে মনে আছে ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশী হবে না। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। লম্বা ও বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। পরিধানে বোধ হয় ফুল-প্যান্ট ও একটা হাফ-সার্ট ছিল—'

'তাদের কোন কথাবার্তা আপনার কানে গিয়েছিল কি?—'

'না! তাঁরা এত আস্তে কথাবার্তা বলছিলেন যে তাঁদের কোন কথাই আমি শুনতে পাইনি। তাছাড়া ওঁদের দিকে আমি তত নজরও ত দিইনি!—'

সামান্য ঐ সংবাদটুকু ছাড়া আর বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধানই আর কারো কাছ হ'তে প্রশ্ন করে পাওয়া গেল না।

হঠাৎ এমন সময় বাইরে হরবিলাসের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল: শতদল! শতদল!

পায় সঙ্গে সঙ্গেই হরবিলাস এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে ভূপতিত একমাত্র কন্যার মৃতদেহটা জমাট রক্তের মধ্যে দেখে হঠাৎ যেন স্তব্ধ হ'য়ে পাষাণের মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

কারো মুখে একটি শব্দ পর্যন্ত নেই। নির্বাক্ কয়েকটি কঠিন মুহূর্ত।

তার পর হঠাৎ যেন সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ হলো: সীতা! সীতাকে মেরে ফেলেছে? সীতা নেই! সীতা মরে গিয়েছে!

পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে মৃত কন্যার শিয়রের সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লেন হরবিলাস। নিঃশব্দে একখানি হাত মৃত কন্যার হিম-শীতল মাথার 'পরে রেখে বার দুই কেবল উচ্চারণ করলেন: সীতা! সীতা! সত্যিই তুই মরে গিয়েছিস মা?

সমস্ত কক্ষখানি যেন এক মর্মন্তুদ বেদনায় ঐ কথা কয়টির মধ্যে গুমরে গুমরে হাহাকার করে উঠলো।

নিঃশব্দে হাতখানি মৃত কন্যার মাথার 'পরে বুলচ্ছেন হরবিলাস। আমরা সকলেই যেন স্তব্ধ-বিমূঢ়। হঠাৎ হরবিলাস কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন: কি হবে কিরীটি বাবু! হিরণ এখন কিছু জানে না। অবিনাশ আমাকে খবর দিতেই তাড়াতাড়ি আমি উপরে ছুটে এসেছি। হিরণ রান্নাঘরে—সে এখনও কিছু জানে না। তার পর হঠাৎ থেমে গিয়ে কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বললেন: জানতাম। এ আমি জানতাম। এ লোভের দণ্ড! লোভের দণ্ড! এত বড় মাশুল দেওয়া আমাদের বাকী ছিল বলেই হিরণ এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে চায়নি। কিছুতেই তাকে মত করাতে পারিনি।

বলতে বলতে আচম্কা হরবিলাস উঠে দাঁড়ালেন: না। না—এ আমি সহ্য করতে পারছি না। এ আমি সহ্য করতে পারছি না। সীতা! সীতা—

টলতে টলতে হরবিলাস কক্ষ হ'তে বের হ'য়ে গেলেন।

[ক্রমশঃ।

আমি আছি

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

এ জীবনে যতো কথা বলেছি ও যে কাজ করেছি
নানা ভাবে, নানা ছন্দে সুরে,
আমি আছি—এই কথা ঘুরে ফিরে হয়েছে ধ্বনিত
সর্ব প্রয়াসের বুক জুড়ে।
যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়ে করলাম মাটিরে চুম্বন,
মর্মে গাঁথা হয়ে গেল আমার সে পুণ্য জন্মক্ষণ,
নব জাতকের কণ্ঠে অর্থহারা ক্রন্দনের সুরে
আমার সে প্রথম ঘোষণা—
জগতে সবাই জানো, আমি আছি, আমি বেঁচে আছি,
একদিন হয়তো রবো না।
সে কণ্ঠ মুখর হলো দিনে দিনে তিল তিল করে,
এলো কথা, এলো সুর, গান;
নানা কথা-কাহিনীতে আপনার বিচিত্র প্রকাশ
সেই হতে চলেছে সমান।
যখন উঠেছি রেগে, ভব্যতার ভেঙেছে আগল,
ভাষণ হয়েছে রূঢ়, রক্তস্রোত হয়েছে চঞ্চল,
তখনো কথায় কাজে ইঙ্গিতে যা করেছি ঘোষণা
মর্ম তার আর কিছু নয়:
জগতে সবাই আছে, তার চেয়ে বড়ো সত্য এই—
আমি আছি, জয় মোর জয়।

যখন বিনয়ভরে মৃদু হাসে অতি মিষ্ট ভাসে
আলাপ করেছি কথা গুণে,
বাহবা দিয়েছে লোকে অহঙ্কারী নই আমি বলে
আমার সে শিষ্ট কথা শুনে।
নিরহঙ্কারী আমি, সেই মোর বড়ো অহঙ্কার
সহসা মনের রাজ্য গোপনে করেছে অধিকার,
আনন্দে উঠেছি নেচে আমি-আছি—এই কথা ভেবে,
মুখে কিছু করিনি প্রকাশ;
জগতে এমন লোক লাখে নাকি একজন মেলে,
লোকে বলে উঠেছে—সাবাস্!
সবারে বঞ্চিত করে বিত্ত যবে করেছি সঞ্চিত
পৈশাচিক দম্ভ ভরে নেচি',
আবার সর্বস্ব দানে রিক্ততারে করেছি ভূষণ,
সেখানেও সেই—আমি আছি।
আমি আছি— এর চেয়ে মোর কাছে সত্য নেই কিছু
সব কথা, সব কাজে ঘুরে মরি আপনারই পিছু,
পরার্থপরতা মোর সুচিন্তিত ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ
বৃহত্তর স্বার্থের আশায়,
পরের ভালোর মাঝে যেখানে নিজের ভালো নেই,
সেখানে আমার নেই সায়:

দৃষ্টিগোচর হোয়েই আবার বনের আড়ালে ঢাকা পড়লো।

নিজের দুটো হাত মুচড়িয়ে অস্ফুট কাতরোক্তি করে উঠলো সুপ্রাগভ—"ওরা যেখান থেকে পিছু হটছে, আমরা সেই ভীষণ জায়গাতে চলেছি—"

ট্রেন

ভেরা পানোভা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

সশব্দে খুলে গেলো ডিসপেন্সারীর দরজা—ভিতরে এসে ঢুকলো সুপ্রাগভ।—"আমরা তো প্রায় এসে গেলাম মনে হচ্ছে"—

ওর ভয়-খাওয়া চোখ দুটো আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ট্রেনটা তখনো চলেছে—খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই একই ঘন বন আর সীমাহীন প্রান্তর—দ্রুত ছবির মত মিলিয়ে যাচ্ছে পিছনে। সূর্য্য অস্তাচলে—তার শেষ রশ্মির রক্ত-আভা জ্বলে উঠেছে গাছের শাখায় শাখায়—আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ম্লান বনানীর শীর্ষদেশে. এগিয়ে চলেছে ট্রেন—পিছনে ফেলে একখানা দীর্ঘ কালো ছায়া।

—"স্কোভ থেকে আর আসবো নাইল"—সুপ্রাগভ জানালো—"একটা জিনিষ লক্ষ করেছো, আজ সকাল থেকে ট্রেনটা একটি বারের জন্যেও থামেনি কোথাও—?"

সুপ্রাগভ জুলিয়ার দিকে চায়—একা ওর চোখেই তবু খুঁজে পায় সমব্যথীর দরদ আর বন্ধুর অনুভূতি, অন্যেরা তো যেন একজোট হোয়ে ওকে অবজ্ঞা করে। অবশ্য ফাইনা ওকে একটু প্রশ্রয় দিতো—কিন্তু সে হোলো ফাইনার নারীসুলভ কৌতুক আর ছলনা। মেয়েরা কোনো দিনই ওর মনে এতটুকু সাড়া জাগায়নি আর এখন তো মেয়েদের দেখলে ওর বিরক্তি আসে।

—"যেখানে সমানে বোমা পড়ছে, সেইখানেই তো আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—"

—"কি জানি, জানি না।"—জুলিয়া সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

—"বনের ধার দিয়ে চলেছো, ভালো করে দেখে নাও, আর হয়তো কোনো দিনই দেখতে পাবে না।"

সুপ্রাগভের চোখ জলে ভরে উঠে। জুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বোমার ভয়ে নয়—যুদ্ধ-সীমান্তের অভিজ্ঞতা ওর আছে। এখন শুধু ভাল লাগছে সুপ্রাগভের পাশটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে—জুলিয়ার সঙ্গে যে ও এমন ভাবে কথা বলছে, তাইতেই ভরে উঠেছে জুলিয়ার মন।...ভালোবাসার নিবিড় অনুভূতি তাই বুকভরা দীর্ঘশ্বাসে বেরিয়ে আসে...

—"ঐ দেখো, দেখো"—হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে সুপ্রাগভ।

ঘন বনের অবকাশে হঠাৎ দেখা গেলো পথের রেখা—লাইন করে চলেছে ফৌজবাহিনী, আর তার পিছনে চলেছে অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই ক্যানভাস-ঢাকা সামরিক যান-বাহন।—মুহূর্তের জন্ত

—"কই, আমার তো মনে হয় না যে পিছু হটছে, কি করে বলছো তুমি? সাধারণতঃ ফৌজদের নতুন করে সংগঠন করার জন্যেও তো নিয়ে যায়। এ সব তো আর আমরা বুঝি না—" প্রতিবাদ করে জুলিয়া।

—"না, না, না—আমি জানি যে আমরাই মার খাচ্ছি। সমস্ত সংবাদ-কেন্দ্র থেকে তাই বলা হচ্ছে—আর তুমি যা দেখছো, জোর করেই সে সব সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে দেখার চেষ্টা করছো—কেউ যদি এর কারণ জিজ্ঞাসা করে, তুমি নিজেই বলতে পারবে না......"

সুপ্রাগভের গলার স্বর ক্রমেই উঁচু পর্দায় ওঠে। আশ্চর্য্য ঠেকে বৈ কি, কারো কাছেই যে মুখ তুলে কথা বলে না, জুলিয়ার কাছে তার অত উত্তেজনার অর্থ কি?

কালো কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢোকে জানলার ভিতর দিয়ে—নিশ্বাস বন্ধ হোয়ে আসে।

করিডোরে ডাক্তার বেলভের পাশে দাঁড়িয়ে দানিলভ। মনে হয়, কাছেই কোথাও আগুন জ্বলছে। বনের আড়ালের রাস্তাটা এগিয়ে এসে পড়েছে ট্রেনের পাশে পাশে। পথটা জুড়ে চলেছে সারি সারি যুদ্ধের উপকরণ-বোঝাই লরী, বন্দুক, সৈন্যবাহিনী—চলেছে তো চলেইছে, যেন শেষ নেই তাদের—এখন কিন্তু জুলিয়ারও মনে হোলো যে নিশ্চয়ই সৈন্যরা পিছু হটছে তা ছাড়া কিছুই নয়।

—"আমরা স্কোভ ছাড়িয়ে এলাম—" দানিলভ ফিশ-ফিশ করে বললে।

ডাক্তার শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। কি ভাবছিলেন? ইগোর স্কোভ ছেড়ে চলে গেছে কিনা,—সময় পেয়েছিলো কিনা যাবার? এই জনারণ্যে একটি ছেলেকে খুঁজে বের করা পাগলের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যদি পাওয়া যেতো তো কি হোতো? কি খুসীই না হোতো সোনেচ্কা। ডাক্তার তো ইগোরকে স্বচ্ছন্দেই ট্রেনে তুলে নিতে পারতেন, কোনো পুরুষ নার্সের কাজ দিয়ে! নাঃ, দানিলভ তাতে কিছু আপত্তি করতো না। এখানে থাকতে থাকতে সেই দুর্বিনীত ছেলে কত শান্ত বাধ্য হোয়ে উঠতো। তার পর যখন সেই ছেলেকে নিয়ে গিয়ে সোনেচকার হাতে সমর্পণ করে বলতেন,—'দেখো মায়ের আঁচলের বাইরে, পুরুষের হাতে ছেলেকে মানুষ হতে দিলে কেমন তৈরী হয়!'

—"বন্ধ কর, শীগ্‌গির জানলাগুলো সব বন্ধ করে দাও"—ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন,—"তা না হলে সমস্ত বিছানাপত্র টুকরো গুঁড়ো আর কয়লায় ভরে যাবে,—ফাইনা ভাসিলিয়েভ্‌না, শোনো শোনো, সবাইকে বলে পাঠাও যেন এক্ষুনি ট্রেনের সব জানলা বন্ধ করা হয়—"

অবশ্য তার আগেই ভিতরের জিনিষগুলিকে বাঁচাবার জন্যে সবাই নিজের নিজের কামরার জানলাগুলি বন্ধ করে দিয়েছিলো। অথচ ফাইনা এসেই হুকুম দিয়ে দিলে সব জানলা খুলে দিতে, সেই সঙ্গে পুরুষ নার্সদের একটু বকুনীও দিতে ছাড়লে না।

—"আশ্চর্য্য বোকামি"—ফাইনা যেতে যেতে ডাক্তারকে জানালে —"বুঝছেন না, জানলা বন্ধ করে দিলে প্রথম বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই তো কাচগুলো টুকরো টুকরো হোয়ে ভেঙে যাবে—"

বলা শেষ হোতেই আর না দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলো ফাইনা। ডাক্তার আর দানিলভ সেই দিকে চেয়ে পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করলেন।

—"কিন্তু ডিসপেন্সারী কামরার কি হবে—" ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

—"কে জানে কি হবে, আমরা আর কি কোরবো!"—দানিলভের সর্ব্বাঙ্গ তখন রাগে জ্বলছিলো। ডিসপেন্সারীর জানলাগুলো কিন্তু সমান ভাবেই বন্ধ ছিলো। পথে ফাইনাকে দেখে সোবোল আবার নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠলো,—"ওগো বীর, তার নাম ছিলো ফাইনা—"

ফাইনা সোবোলের পাশ দিয়ে যাবার সময় অবজ্ঞা দেখিয়ে স্কার্টটাতে এক ঝাঁকুনি দিয়ে না তাকিয়েই চলে গেলো। দু'চক্ষে দেখতে পারে না ও সোবোলকে। বারো মাস শুধু বার্লির তৈরী অখাদ্য খাইয়ে রেখেছে। আজকের দিনেও ফাইনার মধ্যে বেশ একটা বেপরোয়া উৎসাহের ভাব দেখা যায়। জুলিয়ার মত ১৯৪০ সালে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ওরও আছে। ও জানে, জীবনের দীপশিখা এই যুদ্ধ-সীমান্তে নিবে যেতে পারে যে-কোনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে। নিজের কামরাতে ঢুকেই ফাইনা কটাক্ষে একবার দেখে নিলো আয়নার বুকে নিজের প্রতিবিম্ব, পরক্ষণেই ওষুধের বাক্সটা খুলে একবার পরীক্ষা করলে সব ঠিক আছে কিনা—তার পর সোফার বুকে দেহ-ভার এলিয়ে বসে পড়লো। আসছে কঠিন মুহূর্ত্ত, তার আগে একটু বিশ্রাম!

কেমন একটা আত্মস্বস্তির ভাব জাগে মনে—শুধুই কি মাথায় সাদা রুমালের বাহার? আর হাত দু'খানি?···ললিত-লীলাবিলাসের জন্যে নয়—এ হোলো কর্ম্মীর হাত, সেবিকার হাত—শক্ত মোটা মোটা আঙুল, আয়োডিন আর কার্ব্বলিক এসিড লেগে লেগে ডগাগুলি কালচে, ছোট্টো করে নিখুঁত ভাবে কাটা পরিচ্ছন্ন নখগুলি! নিজের হাত দুটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ফাইনা···

সোবোল কামরার দরজায় উঁকি মেরে বললে,—"আচ্ছা, এই বেলা কি কিছু খেয়ে নিলে হয় না?"

—"তার মানে"—ফাইনার স্বরে বিস্ময়—"তুমি কি ভাবছিলে যে আমাদের খাওয়া-দাওয়া স্রেফ বন্ধ করে দেবে?"

—ভাবছিলাম বৈ কি"—সোবোল স্বীকার করে—"যাচ্ছে তাই ব্যাপার এই খাওয়ানোটা। নাঃ, বাজে কথা থাক্, সত্যিই কি এখন খাওয়া ঠিক হবে? মানে এই সব গুরুত্বপুর্ণ ঘটনার সামনে খাওয়াটা কি ঠিক?"

—"চুলোয় যাও! এখনই তো ভালো করে খেয়ে নেবার সময়—" বলে ওঠে ফাইনা।

সোবোলের কাঁধের আড়ালে দেখা গেলো দানিলভকে।

—"কমরেড সোবোল, আজ খাবার সময় মাংসের টিনগুলো বের করে দিও, বুঝলে। চারজন-পিছু এক টিন মাংস, আর চায়ের সঙ্গে ঐ একই অনুপাতে জমানো দুধের টিন দিও—"

এই রে! সোবোল তো সত্যিই এতটা ভাবেনি, ও তো এমনি ফাইনাকে দুষ্টুমি করে ক্ষ্যাপাচ্ছিল। ভীত-কাতর চোখে ও চায় দানিলভের দিকে। ব্যাপার কি? কমিশার দরাজ হাতে ভাঁড়ার খুলতে বলছে—নিশ্চয়ই ভয়ানক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। আর ঠাট্টা নয়!

সোবোল চলে গেলে ফাইনা বলে উঠলো—"বাঁচলাম বাবা, ঐ বার্লি খেয়ে খেয়ে পাগল হোতে বসেছিলাম।"

—"কি করি বলো"—দানিলভ বলে,—"যুদ্ধ-সীমান্তে কখন কি জোটে বলা যায় না তো! হাঁ, আর একটা কথা শোনো, একটু আগে যে ভাবে তুমি ট্রেনের কমাণ্ডান্টের সঙ্গে কথা বললে, ও ভাবে আর কখনো বোলো না—বলা উচিত নয়—"

—"কি বলেছি আমি?"—ফাইনার স্বরে বিস্ময়।

—"তুমি বললে, 'আশ্চর্য্য বোকামি! তিনি তোমাকে একটা আদেশ দিলেন, আর তুমি তাঁকে বোকা বলে বসলে—"

—"হায় রে কপাল, আমি কি ডাক্তার বেলভকে বলেছি? আমি ঐ নার্সদের বকছিলাম—"

হঠাৎ ট্রেনটা ভীষণ ভাবে ঝাঁকুনি খেলো, একটা কাচ সশব্দে নীচে ভেঙে পড়লো। দরজাটা আছড়ে পড়ছিলো, দানিলভ সেটা কাঁধ দিয়ে ঠেকালো।

—"ঈশ!"—ফাইনা শব্দ করে উঠলো, কিন্তু উত্তেজনায় চোখ দুটো ওর জ্বলছে—"টের পাচ্ছ কমরেড—?"

ট্রেনটা ভীষণ ভাবে ঝাঁকুনি খেতে লাগলো।

—"কমরেড কমিশার, আমি নিশ্চয়ই ক্ষমা চাইছি, আমি আনকোরা নই, আমি জানি বাধ্যতা বজায় রাখতে। কিন্তু এটাও মনে রেখো, আমি নারী—আমার নার্ভগুলোও ঠিক আর পাঁচ জনের মতই সাধারণ—"

ফাইনার ইচ্ছা হোলো আরও—আরও জোরে ঝাঁকুনি দিক, দুলে উঠুক ট্রেনটা, যুদ্ধটা আর যাই হোক যুদ্ধই নয় কি?—

[ক্রমশঃ]

অনুবাদিকা—শান্তা বসু

সিদ্ধি মা'র কথা

নির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্ব-পাকিস্তানে যশোর জেলায় মল্লিকপুরে এক বামুন থাকতেন। নাম তাঁর বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ধার্মিক লোক। আর থাকতেন তাঁর বামনী শ্যামাসুন্দরী দেবী। স্বভাবটি ভারি শান্ত। একেবারে মাটির মানুষ। এঁদেরই ঘরে জন্ম নিলেন কাত্যায়নী। সে বাংলা ১২৯৫ সনের কথা। এখন থেকে প্রায় চৌষট্টি বছর আগে। শ্যামাসুন্দরীর তিন ছেলে, দু' মেয়ে।

ছোটবেলায় কাত্যায়নী মামাবাড়ীতেই থাকতেন। জন্মেছিলেনও সেখানে, নৈলা গাঁয়ে, জামালপুর সাবডিভিশন, ময়মনসিং, পাকিস্তানে। পাঁচ বছর বয়েসের সময় শিবপূজো নিলেন। বোল পর্য্যন্ত নানা ধরণের ব্রত-পার্বণও করেছেন। অবশ্য পাড়াগাঁয়ের উঁচু

শ্রেণীর ভদ্রপরিবারে এটা খুব বিরল জিনিস নয়। ছোটবেলার কথা উঠলে একদিন বলেছিলেন, "বাল্যকালে বালিকাদের সঙ্গে ঠাকুর সেজে সেজে খেলা করতাম। রাধা-কৃষ্ণ সাজা খুব ভাল লাগত।"

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফেললেন, তখন বয়েস বার বছর। তারই কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তাঁর বিয়ে হয়ে গেল বাপের বাড়ীর দেশের ব্রাহ্মণডাঙ্গার গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছেলে কৃষ্ণলোচনের সঙ্গে। কৃষ্ণলোচন দেশে থাকতে চাকরি করতেন। বিষয়-সম্পত্তিও কিছু ছিল। প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে কাত্যায়নীকে বিয়ে করেন। কাত্যায়নীর কোন ছেলেপুলে হয়নি।

শ্বশুরবাড়ীতে যখন ছিলেন শরীরের দিকেও যেমন খেয়াল করতেন না, কাজকর্মের দিকেও তাই। তারা সব মনে করত, ভারি নোংরা আর অলস। শ্বশুরালয়ে কাত্যায়নীর বেশী দিন থাকা হয়নি।

কাত্যায়নীর বয়েস তখন বছর চল্লিশ। কৃষ্ণলোচনের ইচ্ছে দেশে গিয়ে থাকেন। কাত্যায়নীর তা নয়। স্পষ্টই বললেন, "আমি আর দেশে যাব না; আমার ত আর সংসার নেই। আমি এখানে সংসারের সার মা অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ পেয়েছি।"

কাশীতেই রয়ে গেলেন। সঙ্গে বাপ, মা আর স্বামী। কৃষ্ণলোচন সাইনবোর্ড লিখতেন, কখনও বা উপন্যাসও। আবার কবিতা, গানও। দু'পয়সা আয় হত। মাসে ষাট থেকে একশ' টাকার মত। কিন্তু উদারপ্রকৃতি কৃষ্ণলোচনের সঞ্চয় করার স্বভাব ছিল না। দান-ধ্যান করে আর বিশেষ করে সাধুদের খাইয়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন।

সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে কাত্যায়নীর জীবনের ঘটনা অল্পই। যা-ও আছে তা তিনি বলতে চাইতেন না। লোকের সঙ্গে বড় মিশতেনও না। আপন ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাই ঘটনা-বিরল তাঁর জীবন সম্বন্ধে বড় বেশী জানতে পারা যায়নি। সিদ্ধিমা নামটা কবে থেকে কি করে হল তারও হদিশ মেলা ভার। শোনা যায়, তাঁর মনে আপনা থেকে নামটা উঠেছিল।

প্রথম সাধন-ভজন আরম্ভ হয় কাশীতে এবং তা স্বামী মারা যাওয়ার অনেক আগে থেকেই। সে সময় এমন মত্ত থাকতেন যে অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া যেত না, শেষে খিল ভেঙে তাঁর ঘরে ঢুকতে হত।

খালিসপুরার মা বলেও পরিচিতা কাত্যায়নী সব সময় ভগবানের চিন্তায় এতই অন্যমনস্ক থাকতেন যে, রান্না করতে গিয়ে ডাল-ভাত প্রায়ই ধরে যেত। কৃষ্ণলোচন রাগ করতেন। কাত্যায়নী ঘোমটার মধ্যে দিয়ে মৃদু-মৃদু হাসতেন। বলতেন, "গোবিন্দের যা ইচ্ছে তাই করেছেন, আমি ত কিছুই জানি না। তাঁর অপরূপ শোভা দেখে স্তব্ধ হয়ে থাকি, আমি যে রাঁধতে পারি না, করি কি?"

কাশীতে খালিসপুরায় তিন-চারখানা ঘর। শুধু বসবার আসনের জায়গাটি ছাড়া চার ধারে ময়লা গিজ-গিজ করছে। ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে স্ফূর্তিতে। গায়েই কত নোংরা। শাঁখা ও সোনার চুড়ি ময়লাতে চেনবার জো নেই।

এই ভাবে কাশীতে স্বামীর সঙ্গে আঠার বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন সামান্য জ্বর এল, সঙ্গে সর্দি আর আমাশা। দশ-বার দিনের মধ্যে কৃষ্ণলোচন সরে পড়লেন এ জগত থেকে। দেহরক্ষার কিছুদিন আগে তাঁর মধ্যে 'কিছুই হল না' এরূপ একটা আকুল ভাব দেখা গিয়েছিল। মণিকর্ণিকার শ্মশান থেকে ফিরে এসে দরজায় খিল আঁট করে এঁটে উপাসনায় লেগে গেলেন কাত্যায়নী। খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ। শরীরে আর কত সয়? আমাশা হল। ভুগলেন বেশ। তখন বাংলা ১৩৩৫ সন চলছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর কাত্যায়নীর মনে কষ্ট হয়েছিল কি না এ কথা উঠলে বলতেন, "শোক কি দুঃখ কিছুই জানতে পারলাম না।"

কাত্যায়নী বলতেন, "আমি তোমাদের মত কখনও সংসার করতে পারিনি। আমার সংসারটি মোটেই ভাল লাগত না।" লোক-জন খাওয়াতে স্বামীর মত ইনিও ভালবাসতেন। শেষ জীবনে প্রায় উনিশ বছর রাতের বেলা প্রায়ই নিদ্রা যেতেন না বলে শোনা গেছে। আর উপবাস লেগেই থাকত।

কাশীতে কেদারঘাটে জলের ধারে তক্তায় বসে ধ্যান-ধারণা করবার সময় কোশাকুশি, কমণ্ডলু সমেত স্রোতে কত দিন ভেসে গেছেন, জ্ঞান নেই।

গঙ্গার জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতেন। বলতেন, "কি সুন্দর বর্ণনাতীত দিব্যরূপ। স্থূল জগতে তোমরা সামান্য দৃশ্য দেখে ভুলে যাও। সূক্ষ্ম জগতে যে কত সুন্দর বস্তু আছে, তা বলা যায় না।"

গঙ্গা থেকে উঠে টলতে টলতে চলেছেন। মাঘ মাস, দুর্দান্ত শীত। ভিজে কাপড় গায়ে। টপ টপ করে জল পড়ছে। লোকে বলছে, "বোধ হয় একটু শুচিবায়ু আছে।" সিদ্ধিমা হাসতেন। বলতেন, "ঠাকুরের ইচ্ছে।" বাড়ী এসে মনে পড়ল ঘাটে কাপড়-চোপড় পড়েই আছে। এ রকম কত দিন হয়েছে।

ঘরে বসে ধ্যান চলছে। চোর মশাই এসে দিব্যি চুরি করে চলে গেছে, হুঁস নেই।

শৌচে যাবেন। মাঝপথে থেমে আছেন। হয়ত গিয়েছেনও। ফিরছেন না। তিন-চার ঘণ্টা চলেই গেল।

আচার-অনুষ্ঠান খুব মানতেন। জাত-বিচারও ছিল। কিন্তু তাই বলে ভক্তি-শ্রদ্ধার কাছে তা ভেসে যেতে দেরি হত না। কাত্যায়নী দেবীর দীক্ষা দেওয়ার ধরণ ছিল অদ্ভুত। কাকেও কানে মন্ত্র দিতেন না, লিখে দিতেন; সেই মন্ত্র তাঁকে শোনাতে হত।

"ওরা আমাকে কামড়ায় না"—সিদ্ধিমা বলছেন সহজ ভাবে। বিছানায় অসংখ্য ছারপোকা। কামড়ের চোটে সারা গা ফুলে ঢোল! কেউ বললে বলতেন, "তাই নাকি! কোথায় দেখি!" দেখে হাসতেন।

গুরু-বোন বিধুমুখী দেবী আশী বছর বয়সের সময় তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন; আর নিয়েছিলেন তাঁর গুরুমা রাজলক্ষ্মী দেবী, যাঁর কাছে জীবন-প্রভাতে সিদ্ধিমা নিজেই মন্ত্র পেয়েছিলেন।

শেষ জীবনে তাঁর গুরুমার নিজের বাড়ীতে থাকতেন। তিনি শিষ্যার (সিদ্ধিমা'র) নামে বাড়াটি লিখে দিতে চাইলেন। উত্তর হল, "আমার ঠাকুরই সর্বস্ব। ঠাকুরের পাদপদ্মই আমার বাড়ী-ঘর; আমি আর কিছু চাই না। বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে আমার কি হবে?"

ধনী গুজরাটী ভক্ত গোবর্দ্ধন তাঁর জন্যে বাড়ী ও আশ্রম করে দিতে চাইলে। ঐ এক কথা। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামে ১২০ নম্বর হড়র বাগ, কাশীধামে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যত দিন বেঁচে ছিলেন, কেউ তাঁর জীবনী লিখতে চাইলে আপত্তি করতেন। প্রথমে শক্তিমন্ত্রের উপাসিকা সিদ্ধিমা পরে ব্রহ্মমন্ত্রের সাধন করেছিলেন বলে জানতে পারা গেছে।

সিদ্ধিমা বলে বেশী পরিচিতা ঢাকার সাধিকা আর ইনি এক নন। বাংলা ১২ই বৈশাখ, ১৩৫০ সাল (ইংরাজী ২৬-৪-১৯৪৩-এ) পঞ্চান্ন বছর বয়সে হঠাৎ রোগে দেহত্যাগ করে সিদ্ধিমা চলে গেছেন।

রবীন্দ্র-কাব্যে চিত্র

অপর্ণা সরকার

সৃষ্টির প্রথম আলোকধারায় অবগাহন করে মানুষ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল তার চারিদিকে রূপে বর্ণে রেখায় ফুটে রয়েছে অপরূপ ছবি। বিপুল আনন্দের উন্মত্ত আবেগে সেই ভাষাহীন যুগে সে হাতে নিল তুলি। বর্ণমালার আগে সৃষ্টি হল ছবির। বোবা পাথরের গায়ে ছবির মধ্যে সে এঁকে রাখল তার বোবা মনের ভাষা। সেদিন থেকে তার শিল্পি-মনের অন্ধ আবেগ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। তারই স্বাক্ষর আজও রয়েছে কোণার্কের বিশাল মন্দিরে, অজন্তার নির্জ্জন গুহায়, রয়েছে পটুয়ার নিভৃত ঘরের কোণে, কুমোরের পাঁচিল-প্রাঙ্গণে। শুধু স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে ও পটেই নয়, সাহিত্যের মাঝেও রইল তার চিহ্ন। চোখ মেলে যা দেখলে, কান দিয়ে যা শুনলে, প্রাণ দিয়ে যা অনুভব করলে, তারই নিপুণ ছবি মানুষ ফুটিয়ে তুলল তার লেখনীর মুখে। আজও তার ছবি আঁকার বিরাম নেই। রূপদর্শী রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যকে চিত্রিত করেছেন নানা রঙে নানা রেখায়। রবীন্দ্রনাথের যে মন সীমার মধ্যে দেখেছে অসীমের ব্যঞ্জনা সেই মনই তাঁকে কাব্যের মধ্যে ছবি আঁকবার প্রেরণা যুগিয়েছে। একথা সত্য যে, কবি গানের মধ্য দিয়ে দেখেছেন ভুবনখানি, কিন্তু তাতেই তাঁর মন তৃপ্ত হয়নি। সুর সীমার গণ্ডী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে অসীমের বুকে। অধরার পিছু-পিছু মন ছুটে চলে, নাগাল পায় না তার। অপ্রাপনীয়ের বেদনা শ্বসিয়ে ওঠে। "অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেছেন। নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়?" তাই সৃষ্টি হল রূপের। তাই কবি মাঝে মাঝে তাঁর গানের তরণী বাওয়া থামিয়ে নেমে দাঁড়িয়েছেন মাটির কোল ঘেঁসে, হাতে নিয়েছেন তুলি। কবির প্রতিভার যাদুস্পর্শে সেই ক্ষণকালের সঞ্চিত দৃষ্টিতে, তুলির আলতো ছোঁওয়াতেই ছবির মধ্যে দেখা দিল কত বৈচিত্র্য!

কাব্য-রচনার প্রথম যুগেই কবি বললেন—

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু নয়ন মেলি
কথাটি নাহি কব!—(প্রভাত সঙ্গীত)

"নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।...তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।" সেই কথা ও ছন্দের তুলিতে কবির যে ছবি আঁকার সুরু হল জীবনের শেষ পর্য্যায়েও একেবারে তার বিরতি ঘটেনি।

শিল্পী তাঁর চোখের সামনে যা দেখলেন তাই এঁকে দিলেন তুলির আঁচড়ে—

একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।—(ছবি ও গান)

ফ্রেমে-বাঁধা এ যেন একটি সুন্দর ছবি। পটভূমির সঙ্গে রয়েছে তার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। সন্ধ্যার নৈঃশব্দ সঙ্গিহীনা মেয়েটির চারি পাশে বিজন মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে। পাকা ধানের স্বর্ণাভা এই ছবির মধ্যে রঙের পরশ বুলিয়ে তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। ছবির প্রশান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কবি এখানে যেমন সহজ ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার করেছেন, ছবির মধ্যে রুদ্ররসকে মূর্ত্ত করে তুলতে তেমনি তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ, শাণিত।—

মেঘের গায়ে গায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে লাল আলো,
তার ছিন্ন বুকের রক্তরেখা।
বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে,
চালাচ্ছে ঝক্‌ঝকে খাঁড়া;
বজ্র শব্দে গর্জ্জে উঠছে দিগন্ত;
....
এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার,
শুক্‌নো ধূলোর দম আটকানো তুফান।—(পত্রপুট)

উন্মত্ত ঝড়ের রক্তলোলুপ হিংস্রতার আস্ফালন চলেছে মহাশূন্যে। তারই প্রতিফলন শিল্পীর পটে। বিভিন্ন রঙের সমাবেশে এই প্রলয়ের মত্তভাগ্নি মূর্ত্ত হয়ে উঠল আমাদের চোখের সামনে।

কবির দৃষ্টি ফেরে চারিদিকে। বিশ্বশিল্পীর মোহন স্পর্শে তাঁর চোখের সামনে থেকে উঠে যায় পর্দ্দা। সাধারণকেও তিনি দেখেন অসাধারণ রূপে। শুধু তাই নয়, তিনি দেখেন—'অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে, এও এসেছে হাটের ছবি ভর্ত্তি করতে।' সুন্দরের প্রসন্নতার দীপ্তিতে সামান্য জিনিষের ছবিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কবির চিত্রপটে। কথায় ও ছন্দে কবি তাকে রূপায়িত করে তোলেন।—

নির্ব্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে,
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাকসবজির ঝুড়ি চুপড়িতে,
আঁটি বাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।—(পত্রপুট)

সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে একটি আলোকের রেখা সংযুক্ত করে দিলে। ছোটখাট প্রতিটি জিনিষের ওপর পড়েছে কবির দৃষ্টি। এইখানেই শিল্পীর সার্থকতা, ছবির পূর্ণতা। এই ছবিটি পূর্ণ হয়ে উঠল তখন, যখন দেখলাম কেনা-বেচার হাটে 'পথের ধারে তালের গুঁড়ি আঁকড়ে অশথ, অন্ধ বৈরাগী তারি ছায়ায় গান গাইছে হাঁড়ি বাজিয়ে...।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর মন শুধু রঙে আর রেখায় তৃপ্ত হয় না। গতির আবেগে তাঁর প্রাণ চঞ্চল। কথায় ও ছন্দে ছবি

আঁকতে গিয়ে কবির মনে লাগে দোলা। তারই কাঁপনে সমস্ত পটটি নেচে ওঠে।—

হাঁসগুলো পড়ছে মুখ থুবড়িয়ে মাটিতে,
ঠোঁট দিয়ে ঘাস ধরছে কামড়িয়ে,
ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে সরে সরে
ঝটপট করছে পাখা দুটো।
নদীপারে ঝড়ের মুখে বাঁশঝাড়ের লুটোপুটি,
ডালগুলো ডাইনে বাঁয়ে আছাড় খায়,···(পত্রপুট)

ঝড়ের এলোমেলো গতির মধ্যে মরিয়া প্রাণের পাখার ঝটপটানি আর বাঁশঝাড়ের উদ্ধত প্রতিবাদ,—সব মিলিয়ে ছবির মধ্যে জেগে উঠল গতির আভাস, চলমান জীবনের সজীব স্পন্দন।

ছবির মধ্যে হল প্রাণপ্রতিষ্ঠা। গীতধর্মী কবি তাকে সুরের মন্ত্রে দিলেন দীক্ষা। মূক চিত্র মুখর হয়ে উঠল কবির ছন্দলালিত্যে।—

কেন বাজাও কাঁকণ কন কন, কত ছলভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চলো কনক কলসে জল ভরে॥
কেন জলে ঢেউ তুলি,' ছলকি ছলকি করো খেলা।
কেন চাহ খনে খনে, চকিত নয়নে কার তরে
হেরো যমুনা-বেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা
যত হাসিভরা ঢেউ, করে কানাকানি কলস্বরে।—(গীতবিতান)

কাঁকণের ক্বণিত নিক্কণের সঙ্গে জলের কলকলানি মিশে যে সুরের সৃষ্টি হয়েছে তার আবেশে মন মুগ্ধ হয়ে উঠল। তুলি ও গানের মিতালীতে ভরে উঠল পট। সুরের জমিনে বুনে উঠেছে ছবি।

এমনি করে কবি চোখে যা দেখলেন, কানে যা শুনলেন তাকেই এঁকে দিলেন। তাঁর শিল্পীতার সঙ্গে যুক্ত হল কবির কল্পনা, উপমার মধ্যে সেই কল্পনা পেল রূপ।—

কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।—(মহুয়া)

কবির কল্পনা, শিল্পীর মনের ভাবরূপটি এ ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছে অপরূপ মাধুর্যে। এই ভাবরূপ অন্যত্র আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কল্পনার সঙ্গে অনুভূতির মিলনে।—

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি, দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণ পর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।—(কল্পনা)

ছন্দের তালে বৈশাখের ভাবময় রূপ ফুটে উঠল কবির লেখনীতে। দেবতার তৃতীয় নেত্রে জ্বলে উঠল আগুন। কবির লেখনীর মুখে স্পষ্ট দেখতে পাই বীরভূমের রুক্ষ পাণ্ডুর তৃষ্ণাতুর প্রান্তরের মাঝে রুদ্রভৈরব তার প্রলয় নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। স্রষ্টার মন আর দ্রষ্টার মন একই পটে পড়ে বাঁধা।

কথায় ও ছন্দে ছবি আঁকতে বসে কবি যেমন আপনাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন, তেমনি আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেও তাঁর দৃষ্টি চলেছে চারিদিকে। এই দৃষ্টির পরিচয় পাই বহির্বিশ্বের খণ্ড খণ্ড ছবি ও জীবনের ঘটনার ছোট ছোট চিত্র অঙ্কনে।—

ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে।—(চৈতালি)

অলস মধ্যাহ্নের এ যেন এক নিখুঁত আলোকচিত্র। কল্পনার রঙ্গনী কবির চোখে ভাবের অঞ্জন পরিয়ে দেয় নি। ক্যামেরার লেন্সের ভিতর দিয়ে চলে গেছে তাঁর নির্লিপ্ত দৃষ্টি। কবির সেই বিশেষ দৃষ্টিই দেখেছে বেদের মেয়ের সঙ্গে পোষা কুকুরছানার খেলা, দেখেছে কেমন করে শিশু ভাইটি পা ছড়িয়ে বসে দেখে দিদির থালা ঘটি মাজা।

শিল্পীর মন কালের সীমানার বাধা মানে না। তাই বর্তমানের কবি দেখলেন—

হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
*　　*　　*　　*
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশ ধূপ বাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।—(কল্পনা)

এটি পড়ে কবির ভাষাতেই বলতে হয়—

এ যেন আর কোনো একটা দিনের আবছায়া,
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।—(পুনশ্চ)

চোখের সামনে দেখতে পাই তাদের ছবি—কালিদাসের কালে যাদের দেখা যেত—'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং, নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ। চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং, সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।' প্রাচীন যুগের পরিবেশটির ছবি কবির নিপুণ তুলিকায় ফুটে উঠেছে 'কল্পনা' ও 'কথা'র বহু কবিতার মধ্যে। এ ছাড়া বহু গাথা-কবিতার মধ্যে কবির শিল্প রচনার স্বাক্ষর রয়েছে।

শুধু বহির্দৃশ্যের ছবিই নয়, জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার ছবিও এঁকে গেছেন জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো।
উঠিলে নবশশী ছাদের পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো।
হৃদয় বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখিজলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।—(মানসী)

ভাষার মধ্যে বালিকা-বধূর বিরহ-বেদনা, প্রবাসী কন্যার উৎকণ্ঠার ছবি যেমন কবি ফুটিয়ে তুললেন তেমনি অনন্ত-প্রসারিত প্রাণের বিপুল আবেগ, হৃদয়ের অকথিত আনন্দের দিশাহারা ব্যাকুলতাও রূপ নিল কবির ছন্দে—

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি।
—(প্রভাতসঙ্গীত)

হৃদয়ের একটি বিশেষ আবেগ ছবির আকারে কথার মধ্যে যেমন মূর্ত হয়ে ওঠে, কবির চেতন-অবচেতন মনের আলোছায়ার ঝিরিমিরির পটভূমিকায় তেমনি ফুটে ওঠে কত মায়াময় ভাব। সেই অগোচর ভাবটিকেও কবি তুলির টানে বাইরে ফুটিয়ে তোলেন। মনস্তাত্ত্বিকরা একে বলেন স্বপ্নছবি। রবীন্দ্রকাব্যে এই স্বপ্নছবির একটি বিশেষ স্থান আছে। এই স্বপ্নছবির দুইটি মহল। বাইরের তুলির টানের (manifest content) অন্তরালে থাকে নিদ্‌মহলের একটি বিশেষ ভাব (latent content)। জনৈক মনস্তাত্ত্বিক রবীন্দ্রকাব্যে এই স্বপ্নছবির সব চেয়ে ভালো উদাহরণ দেখিয়েছেন 'সোনার তরী'।

একখানি ছোট খেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট খেত আমি একেলা॥

—(সোনার তরী)

এ কবিতা পড়ে একটি সুন্দর ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কিন্তু সে ছবির অন্তরালে রয়েছে আর একটি ভাব। 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন—'মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মত—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা বেষ্টিত—ঐ একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে।···যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা' কিছু নিত্য ফল, তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে—তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কি? তোমার জীবনের ফসল যা' কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।'—কবির মনের এই বিশেষ ভাবটি জেগে ওঠবার সঙ্গে তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল বহুদিন আগে দেখা শ্রাবণ দিনের একটি ছবি। বাস্তব জীবনের ঘটনাকে অবলম্বন করে মানুষের অবচেতন মনের কোনো ভাব স্বপ্নের মধ্যে একটি ছবির সৃষ্টি করে। 'স্বপ্নছবির যে latent content সেটি গৌণ রূপেই থাকে। যদি বা গোচর হয় সম্পূর্ণ গোচর হয় না। বাহিরের ছবিটাই তাহার মুখ্য রূপের ভূমিকা গ্রহণ করে, যেটি প্রকৃত মর্মকথা সেটি তাহারই অন্তরালে থাকিয়া যায়।' কিন্তু এখানে অন্তরালের ছবিটি (latent content) যদি না দেখি তাহলে এ কবিতার কোন কোন অংশ দুর্বোধ্য ঠেকে। তবে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না করে পরিপূর্ণ রসের দৃষ্টিতে দেখলে সমস্ত কবিতাটির ভাবের হদিশ হয়ত সহজে মিলবে না, কিন্তু এর এক-একটি অনুচ্ছেদ ছন্দে তালে আমাদের চোখের সামনে এক-একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলবে। এই ধরণের স্বপ্নচিত্রে রবীন্দ্র-কাব্য ভরপুর।

এ ছাড়াও দেখা-না-দেখায়-মেশা, বোঝা-না-বোঝার আলো-আঁধারিতে আর এক ধরণের ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকে গেছেন তাঁর কবিতায়। ছবির এই ভঙ্গীটিতেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এ ছবিটি ঠিক বাস্তব জগতের ছবি নয়, এ যেন স্বপ্নের ছবি—চোখের দৃষ্টিতে তাকে ধরতে পারি না অথচ মনের গহনে ধরা পড়ে তার রূপ তার ভাবটি আমাদের চেতনার দ্বারে নাড়া দিয়ে অনুভূতিকে সজাগ করে দেয়।—

ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি অশ্রুজলে,···(সোনার তরী)

এ ছবি দেখে স্পষ্ট বুঝি না কিছু কিন্তু নিবিড় রসে মন ভরে ওঠে, একটা আনন্দের ঢেউ এসে দোলা দিয়ে যায় সমস্ত সত্তাকে। এ যেন রূপের রেখা ও রসের রেখা মিলে গড়ে তুলেছে মায়ার চিত্রলেখা। 'বস্তু চেয়ে সেই মায়া ত সত্যতর।' কারণ তারও মাঝে হয়েছে কবির পূর্ণ প্রকাশ। সেই মায়ার চিত্রলেখা ঘা দিল চিত্তের মণি-কোঠায়, কবির মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

এমনি করে রঙে, রসে, তুলির আঁখরে কবি প্রকাশ করলেন বিশ্বচরাচরকে, তারই মাঝে দেখলেন আপনাকে। এই আত্মপ্রকাশের বিপুল আনন্দে কবি বলে উঠলেন—

আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।—(শ্যামলী)

মীরাবাঈ

কুমারী শ্রীলেখা সেন

মীরার আর্তস্বর চাতকের মতই হাহাকার করিয়া গাহিয়া উঠিল—

"জ্যোঁ চাতক ঘন কুঁ রটে, মছরি জিমি পানী হো,
মীরা ব্যাকুল বিরহণী, সুধ বুধ বিসরণী হো।"

সে কি আকুলতা! কি সকরুণ প্রার্থনা! শ্রীরাধিকা কি কৃষ্ণপ্রেম বিলাইবার জন্য আবার জগতে অবতীর্ণ হইলেন? এমন প্রাণ-মাতান গান, এমন সুললিত গানের সুর!

মীরাবাঈ রাজস্থানের পরম বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি শৈশব কাল হইতেই ঐশীশক্তিসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার ছোট্ট প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিত কোন এক অচেনা অজানার উদ্দেশ্যে। আত্মহারা হইয়া সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিয়া উঠিতেন—"মীরা কো চিত লীরা ন মানে, বেগ মিলো মহারাজ!" সে সুরের অপার্থিব মাধুর্যে বহু লোক আকৃষ্ট হইতেন, মুগ্ধ হইতেন।

চিতোরের শিশোদিয়া রাজবংশের মহাপ্রতাপী মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র ভোজরাজের সহিত রাঠোর সামন্ত ভক্তিমতী একমাত্র কন্যা মীরার বিবাহ দিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমে যিনি পাগলিনী, ভগবদ্ভাবে যিনি মাতোয়ারা, সাংসারিক ভোগ-বিলাস ও রাজপ্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল না। মীরা গিরিধরলালের সেবায় মন-প্রাণ অর্পণ করিলেন সাধু ও বৈষ্ণব ভক্তগণের সহিত তিনি ভজন গান ও ভগবৎ আলোচনা করিতেন। রাজ-পরিবার আপত্তি করিলে বন্ধনহীন মীরা বলিয়া উঠিলেন—

"সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ, লোক লাজ খোঈ,
ছাণ্ড দই কুলকি কান, ক্যা করেগা কোঈ।"

মীরার প্রেম-কাব্য মধুর ভাবপূর্ণ গীতের সঙ্কলন। আজিও ভারতীয় সমাজে মীরা জীবিত—অদ্যাপি সে কাব্য আমাদের উদ্বেলিত করে। মীরার বিরহ বেদনা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—

"আকুল ব্যাকুল ফিরু রৈন দিন।
বিরহ কালেজা খায়,
দুঃখ দিন বতায়া না যায়।"

কত ব্যথা। কি সরল ও সুন্দর ভাষায় মীরা হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন গোবিন্দ-নামের গানে।

মীরার ভজনাবলীতে রচনা-মাধুর্য্য, ছন্দ কবিত্ব প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমাবেশ পাওয়া যায়। ভক্তিপিপাসু গানগুলি যেন মূর্ত্তি ধরিয়া কাহাকে ধরিবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

ভোজরাজের মৃত্যুর পর বিক্রমজিৎ রাণা হইলেন, তিনিও মীরার এই সাধনায় ... জন্য বহু অত্যাচার করিলেন। বাধা পাইয়া মীরার হৃদয়ের সুপ্ত বাসনা দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—

"... কছু না বোয়
... বান সব খোয়
মেরে ... লোক লাজ না খোয়।"

অবিরত তিনি হৃদয়ের নীরব বেদনা জানাইতে লাগিলেন শ্রীগোবিন্দের চরণে, ভক্তসঙ্গ আর হরিনাম মাতোয়ারা, কৃষ্ণপ্রেম দিওয়ানা প্রেমোন্মত্ততা ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইল যে তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন—

"দিবস মে ভুখ নাঁহ নহি রৈনা
মুখ সে কথো ন আবে বৈনা
কথা কহু কছু কহত না আবে
মিল কর তপত বুঝাবে
পাবে দরশন দৌড়া আয়।"

কৃচ্ছ্রসাধনা ও শরীরের অনিয়মের জন্য দিন দিন মীরা ক্ষীণকায়া হইতে লাগিলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল কিন্তু এই রোগের ঔষধ দেওয়া যে বৈদ্যের সাধ্যাতীত।

"বৈদ মিলিয়া নাহি কোয়
মীরা কে প্রভু পীর মিটে জব
বৈদ সাঁবলিয়া হোয়।"

চিতোর রাজমহিষী হরিনাম গানে উন্মাদিনী হইয়া রাজপ্রাসাদ ত্যজিয়া বৃন্দাবনের পথে বাহির হইলেন। রাণা প্রবল আপত্তি তুলিলেন—

তুম সাদে রাণা মেরী তেরী
নাহি বনী,
মেরা কোয় নহি হৈ রোকনহার
মগন হোয় মীরা চলি।"

অতি উচ্চস্তরের সাধিকা মীরা বৃন্দাবনে আসিয়া আত্মহারা হইয়া গেলেন। রাস্তা ঘাট, বন-উপবন হরিনাম গানে মুখরিত হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন-অধিবাসিগণ অফুরন্ত উৎসবানন্দে মত্ত হইয়া উঠিল—"বৃন্দাবনকী কুঞ্জ গলিন মে তেরী লীলা গাসু"—হে প্রভু আমায় তোমার চাকর করে রেখে দাও। তোমার জন্য সব কাজ করব প্রভু, তোমার ফুলের বাগান দেখব, তোমার জন্য মালা গাঁথব বৃন্দাবনের পথে পথে তোমার লীলা গেয়ে বেড়াব, আর আশা করে থাকব—

"আঁধা রাত প্রভু দরশন দেইং
প্রেম নদী কা তীরা।"

যেথায় যেথায় যান সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের লীলা মীরার স্মৃতিতে জাগিয়া ওঠে। কৃষ্ণানুরাগে তাঁহার মুহুর্মুহু ভাব-সমাধি হইতে লাগিল। নিরুপায়ের উপায়, ব্যথায় ব্যথী, সেই পরমপুরুষকে আকুল হইয়া ডাকিতে লাগিলেন—প্রভু দেখা দাও, আর দেরী সহে না—

"মীরা কো চিত ধীরা ন মানে
বেগ মিলো মহারাজ।"

শোনা যায় এই সময় প্রায়ই ভাবাবেশের মধ্যে মীরা শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা দর্শন করিতেন। আমার জন্মমৃত্যুর সাথী।

"য়ো সন্সার সকল জগ ঝুঠো
ঝুঁঠো কুলকা ন্যাতি।"

আর কোনও চাহিদা নাহি প্রভু,

'ভক্তিমার্গ দাসীকো শিখাও
মীরা কো প্রভু সাঁচি দাসী বানাও।"

কিন্তু তাই বলিয়া কি এই অমূল্য জীবন নষ্ট করিবে?

"মানুখ জনম পদারথ পায়া
ঐসো বহুরি ন আতী,
মীরা কহে, হক্ আন আপকী
ঔরাঁ সূঁ সকুচাতি।"

তুমিই আশা। প্রভু, তুমি ছাড়া আর কাহার ভরসা করি?

"মীরাকে প্রভু আস তুমারী
লাজো কণ্ঠ লগাঈ।"

কি প্রাণঢালা ভক্তি! সকরুণ প্রার্থনায় কি প্রাণভুলান গান! কৃষ্ণবিরহে কাতর মীরা আর দূরত্ব সহ্য করিতে পারিলেন না আরও নিকট আরও সান্নিধ্য চাহেন

'মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর
জ্যোত মেঁ জ্যোত মিলাজ্যা।"

মীরা কৃষ্ণের মধ্যে লীন হইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে চান। আর কেন ব্যথা দাও প্রভু—তোমার জন্য সব ছাড়িয়াছি, এইবার তুমি এস—

"তুমহারে কারণ সব সুখ ছোড্যা
অব মোহি ক্যূঁ তরসাও,
অব ছোড়্যা নহি বনৈ প্রভুজি,
চরণকে পাস বুলাও।
বিরহ বিথা লাগি উর অন্দর
সো তুম আয় বুঝাও
মীরা দাসী জনম জনম কী
মম অঙ্গ সূঁ অঙ্গ লগাও
মম চিত্ত সূঁ চিত্ত লগাও।"

হয়ে। কেউ কোথাও নেই, লোকালয় ছাড়িয়ে এসেছে—হঠাৎ কে ডাকলো: রাজকুমার শোনো, তোমার ঐ পিঠে যদি আমায় খেতে দাও আর আমায় সঙ্গে নাও তোমার অনেক উপকার হবে।

—ওমা! এ'যে একটা কুকুর!—মোমতোরা দেখলো আর ভাবলো, নিই সঙ্গে—একাই তো যাচ্ছি। তাকে পিঠে খেতে দিয়ে ছ'জনে গল্প করতে করতে চললো। আবার অনেকখানি পথ পেরিয়ে যখন তারা একটা বুড়ো অশথ গাছের নীচে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে তখন শুনলো কে বলছে: মোমতোরা, আমাকে তোমার ঐ পিঠে একটু খেতে দাও, আর আমায় সঙ্গে নাও, দেখো তোমার সাহায্য হবে।

মোমতোরা গাছের দিকে তাকিয়ে দেখলো একটা মস্ত বড় বানর গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আরে ভাই, এসো এসো—বলে তাকে ডাকলো। তার পর তিন জনে মিলে আবার চলতে সুরু করলো।

অনেক দিন অনেক রাত্রি চলার পর ওরা এসে পৌছলো ড্রাগন বা দৈত্যের দেশে।

দৈত্যের দেশে এসে প্রথমে তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। পাথরের বাড়ী, তার মধ্যে ঢুকবেই বা কি করে আর যে কাজের জন্য এসেছে তার সিদ্ধিই বা হবে কি করে? তিন জনে বসে অনেক পরামর্শ করলো, পাথরের বাড়ীর ফটক খোলা হবে কি করে? বিরাট দুর্গের মত বাড়ী দেখলেই তো ভয় করে।

একদিন যখন সন্ধ্যা হয়-হয়—এমনি সময় তিন জনে গিয়ে দুর্গের সামনে একটা প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

রাত একটু যখন বেশী হলো, চারি দিক যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, সারা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে, সেই সময় বানর উঠে লাফ দিয়ে দিয়ে দুর্গের দরজার মাথার উপর উঠলো। প্রহরীদের চোখে তখন গভীর ঘুম—তাছাড়া বিপদের কোনো সম্ভাবনাই নেই দেখে তারাও ঘুমুতে সুরু করেছে। বানর লাফাতে লাফাতে উঠলো তার পর দুর্গের দরজা কিছুটা ফাঁক করতেই কুকুরের সঙ্গে মোমতোরা তার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ঘুমন্ত প্রাসাদ। ভীষণাকার প্রহরীরা গভীর ঘুমে অচেতন। প্রতি ঘরে ঘরে সকলে ঘুমুচ্ছে। তারা সকলে যখন দৈত্যের ঘরে ঢুকলো দৈত্য কিছু জানতে পারেনি—কিন্তু রাজকুমার গিয়ে দৈত্যের গায়ে আঘাত করতেই লাফিয়ে উঠলো সে—তার পর সে কী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! দৈত্য হুঙ্কার দিয়ে উঠলো: কে রে, একটা ক্ষুদে ছেলে কোথা থেকে এসেছে, কেমন করে ঢুকলো এই প্রাসাদের মধ্যে? আবার সঙ্গে একটা কুকুর আর বানর? এক গ্রাসে তিনটেকে পেটে পুরে দেবো—ক্ষুদে শয়তান কোথাকার!

কিন্তু কোথা থেকে যে এরা তিন জন দৈত্যের সঙ্গে লড়বার শক্তি পেলো তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

বিকট ও বিরাট দেহ দৈত্য যতই তাদের আক্রমণ করতে চায় ততই তারা কৌশলে এড়িয়ে যায়।

বহুক্ষণ যুদ্ধের পর দৈত্য অবসন্ন হয়ে পড়লো—অবশেষে তার দেহ লুটিয়ে পড়লো।

আঘাতের পর আঘাত করে করে মোমতোরারা সকলে মিলে তাকে মেরে ফেললে।

তার পর? তার পর কি, দৈত্যের প্রাসাদের ধন-রত্ন বা যাবতীয় যা-কিছু সব হয়ে গেল মোমতোরার। দেশে ফিরে এলো সকলে—আনন্দ-উল্লাসের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো।

মা চোখ মুছে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। দেশে শান্তি ফিরে এলো আর পীচ ফল থেকে বেরিয়ে-আসা ছেলে নিয়ে কাঠুরিয়া স্বামি-স্ত্রী পরম সুখ-শান্তিতে বাস করতে লাগলো।

মোমতোরা কিন্তু তার বন্ধু বানর আর কুকুরকে বন্ধুর মত চিরদিন কাছে রেখেছিল।*

জব্দ

শ্রীমতী গৌরী দেবী

রামহরি রায় রোজ দেখি যায়
ফল-বাগিচায় সন্ধ্যার পর,
কারো গাছে আম কারো গাছে জাম
পাড়ে অবিরাম নাই ভয় ডর।
সেদিন হঠাৎ হয়ে যায় রাত
চোখে ধারাপাত পথ ভুলে যায়।
গাছে গিয়ে চড়ে ভয় পাছে পড়ে
আঁকড়িয়ে ধরে ডাল যেটা পায়।
রাতে ওঠে ঝড় মেঘ কড় কড়
গাছ মড় মড় ভাঙে বুঝি ডাল,
ভাবে মনে মনে ফল আহরণে
এসে কুক্ষণে একি হল হাল!
রাত হলে ভোর ভয় কাটে ওর
নামে যেন চোর বুক কাঁপে তার
ধূলো-মাখা বেশে ঘরে ফিরে এসে
বলে ম্লান হেসে চেয়ে চারিধার—
রাতে খাই নাই বড় ক্ষুধা তাই
কিছু খেতে চাই দাও আগে জল—
ভাত বেড়ে পাতে থালা নিয়ে হাতে,
মা বলেন রাতে কোথা ছিলি বল?
এসেছি ত ঘরে শুনো সব পরে—
ভয় মোর করে শোনেনি ত বাবা?
মায়ে কয় হাসি দেবে নাকো কাঁসি—
ভাত আছে বাসি খা ত আগে হাবা,—
সকলে যে রাগি শুধু তোর লাগি
সারা রাত জাগি মরি ভাবনায়—
কাল এক্সপ্রেসে জয়হরি এসে
নিয়ে যাক্ দেশে সেই পাবনায়।

আবছা আঁচিল

শম্বুক

সকাল বেলায় আয়না দেখে আঁৎকে রাণী উঠলো কেঁদে
তিনটে আঁচিল ওষ্ঠপুটে আবছা মত উঠছে ফুটে।
আয়না ফেলে আছড়ে রাণী—বলে, ওরে গেলাম আমি
মরি বাঁচি নেই ঠিকানা আছিস্ কে রে বদ্যি আনা।

---

* মোমটেরো শব্দের অর্থ: মোম—পীচ ফল, টেরো—বড় ছেলে।

এলো ছুটে হাজার দাসী ছুটে আসে পাড়াপড়শী
ভাবে সবাই তাই তো বটে—। অনর্থ হায় কি-ই বা ঘটে।
আঁচিল তো হয় কত শত—এ যে আঁচিল আবছা মত।
তিন আঁচিলের আবছা ভাবে বাঁচবে রাণী কেমন করে?

ওঝা বদ্যি এলো কত হাকিম, ফকির শত শত
নিদাহারা ভাবে বসে আবছা আঁচিল সারে কিসে?
হাজার হাজার হাকিম বৈদ্য ঔষধ বেটে করলে হদ্দ
কেতাব ঘেঁটে পায় না হদিশ কিসে আছে আঁচিলের বিষ।

ফকির ব'সে দাড়ি কাঁপে ঝাড়ফুঁক শেষ করে শেষে
ওঝা ছেড়ে মন্ত্র ঝাড়ে তবুও রাণীর আঁচিল বাড়ে।
ঝাড়ে মন্ত্র জিব আড়ষ্ট মুখে ঝরে বুকের রক্ত
তবুও দিশে খুঁজে না পায় আবছা আঁচিল কিসে ঠেকায়।

ফুঁপিয়ে রাণী বললে, রাজা রাজ্যে নেইকো হাকিম তাজা
নোংরা আঁচিল নইলে পরে গজায় কি হায় ঠোঁটের 'পরে?
গজায় আঁচিল বামীর, বামীর, আঁচিল কি হয় রাজার রাণীর?
দুঃখে প্রাণ যায় না সওয়া মিথ্যে এমন জীবন বওয়া।

গাবাড় রাজা—বলে, রাণী তাই তো কেবল ভাবছি আমি
ভেবে ভেবে হ'চ্ছি সারা পাচ্ছি নে যে কূল-কিনারা।
আঁচিল হ'য়ে রাজার রাণীর তাতে হ'লে আবছা খানিক
কোথায় আছে কোন সে মাণিক কে আনবে তার আবছা খানিক।

অবশেষে এলেন ওঝা—মাথায় পাহাড়, পুঁথির বোঝা
নেমে, নেমে, হাতড়ে পুঁথি বলেন—এই তো রোগের নথি।
কঠিন এ রোগ মরণ সামিল, আঁচিল তো নয়, উতগু তিল।
চমকিয়ে রাণী ফুঁপিয়ে ওঠে হায় হায় মোর—কি-ই বা ঘটে।

ওঝা বলে—ভাবনা কি ছাই অতি সহজ লিখছে দাওয়াই।
সহস্র মণ চন্দনকাষ্ঠ তাহে ঘৃত শত মণ অষ্ট
জ্বালি তাই অগ্নি প্রচণ্ড দগ্ধ কর তিল উতগু।
রাণী বলে, শুনছো রাজা আঁচিল কোথা? ঠোঁট যে শাদা?
ভোরের আলোয় আয়না দেখা বুঝছো না সে ব্যাপার ফাঁকা?

গল্প হ'লেও সত্যি

শ্রীশ্যামলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সে অনেক দিনের কথা! সক্রেটিস্ তখন পরলোকে।

ঢং—ঢং—কোরে দু'টো বাজল টাওয়ারের ঘড়িতে।

সেদিন রোদ্দুরও বেশ একটু চড়া। এথেন্সের বাজারে ভীড়ও কম না। হঠাৎ একটি যুবককে দেখে নাগরিকরা পরস্পর পরস্পরের পানে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।

যুবকটি তখন ধীর-মন্থর গতিতে ঘোরা-ফেরা করছিল বাজারের পথে। বয়স তা'র বছর আঠার। দেহ কৃশ। সুন্দর ঢেউ-খেলান চুল। চোখে প্রতিভার অপূর্ব্ব দীপ্তি। বেশভূষায় কোন রকম চাকচিক্য বা বিলাসের চিহ্ন ছিল না।

নাগরিকদের হাব-ভাবের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না যুবকটি। একটু ঘাবড়িয়েও গিয়েছিল প্রথমে। তার পর সাহস এনে বলল—দার্শনিক প্লেটোর বাড়ীটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। দয়া করে বাড়ীটা কেউ দেখিয়ে দেন—

—মশাইয়ের আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

—ষ্ট্যাগিরা থেকে।

—সে জায়গাটি কি সভ্য দেশের বাইরে?

—আরে, তা' না হ'লে মনীষী প্লেটোর খবর রাখে না। বিদ্রূপ করলেন একজন।

বেশ ভীড় জমে গেল যুবকটির চারিধারে। সে তখনও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছে।

—আমি ম্যাসিডনের রাজবৈদ্যের ছেলে। এসেছি প্লেটোর কাছে দর্শন অধ্যয়ন করতে।

—কিন্তু তিনি ত এখন নেই এখানে। কবে আসবেন তারও ঠিক নেই কোন। আচ্ছা, চলুন বাড়ীটা দেখিয়ে দিই আপনাকে একটু নম্র হলেন ভদ্রলোক।

দু'জনে এগিয়ে গেলেন প্লেটোর বাড়ীর দিকে।

তার পর তিন বছর গেল পার হয়ে। প্লেটো ফিরে এলেন এথেন্সে। তিন বছরের কঠোর তপস্যা বুঝি সফল হল যুবকের একটি বিরাট প্রতিভার সন্ধান পেলেন প্লেটো যুবকটির মাঝে আনন্দের আতিশয্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন তিনি।

এই যুবকটি কে জান?—বিশ্ববিখ্যাত আরিষ্টটল্, যাঁর নামে আজও শিক্ষিত সমাজের মস্তক অবনত হয়ে আসে।

তাই বীর আলেকজান্দার বলেছিলেন— "To my father I owe my life; to Aristotle, the knowledge how to live wo.thily."

বন্দে মাতরম্

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

বঙ্গদেশ

গঙ্গা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র এ তিনের সমাবেশ
সৃষ্টি করেছে মোদের শস্য-শ্যামল বঙ্গদেশ।
বেণী-কোমল এমন দেশটি ভূভারতে নাহি আর,
এইখানে যার হয়েছে জন্ম ধন্য জীবন তার।
ঋষি বঙ্কিম এই যুগে যার গাহি বন্দনা-গান
সারা ভারতের ঘুম ভাঙালেন সঞ্চারি নব প্রাণ;
কবি দ্বিজেন্দ্র যেথায় জীবন লভিয়া মরিতে চেয়ে
কামনার শেষ রাখিয়া গেলেন ধূলিতে ধূলিতে ছেয়ে,
বিশ্বের মাঝে ভাস্বর যার পূজ্য, অতুল ছবি
সোনার তুলিতে আঁকিলেন রবি—এ-যুগের মহাকবি,
পরমহংস, শ্রীঅরবিন্দ, বিবেক জ্বালায়ে ধূপ
পূজিলেন যারে;—এই সেই দেশ অপরূপ অপরূপ।

দক্ষিণাপথ

এবার আমরা চলো যাই সবে দক্ষিণাপথে নামি,
পুরাকাল হলে তোমরা কিন্তু পদে পদে যেতে থামি।
কারণ তখন বিন্ধ্য পাহাড় ছিল অতি দুর্গম,
তার মাঝ দিয়ে যেতে গেলে নীচে বন্ধ হইত দম।

শ্রীরামচন্দ্র যদিও বিন্ধ্য পায়ে হেঁটে হয়ে পার
সেকালে লঙ্কা করিয়া বিজয় দেখালেন বল তাঁর,
তথাপি তাঁহার ফিরতি বেলায় বিমানারোহণ আজ
আমরা পষ্ট বুঝিতে পেরেছি বুদ্ধিমানের কাজ।
ভাগ্যি আমরা জন্মেছি সব বৈজ্ঞানিকের যুগে
নইলে হয়তো ভূত হতে হতো পথে মরে ভুগে ভুগে।
বিন্ধ্য পাহাড়ে ফাঁক আছে এক, খাণ্ডোয়া তার নাম,
দুই পা হাঁটিতে এইখানে গায়ে দরদর ঝরে ঘাম।
সেকালে ও পথে যাতায়াত ছিল যত লোক দুর্ভোগ
যদিও কচিৎ, তথাপি ও পথ দু'ভাগের যোগাযোগ।
ছাড়িয়া এলাহাবাদ যদি চাও যেতে ওই বোম্বাই
খাণ্ডোয়া-ফাঁকে দেখো সেথা চেয়ে রেলপথ ছুটে ধায়।
উত্তরাপথ জ্যামিতি'র মতে যেন বা চতুর্ভুজ,
নিম্ন ভূভাগ কন্যাকুমারী-মুখী তিনকোণা গম্বুজ।
নিম্নে দু'পাশ পাহাড়ে বাঁধানো যেন বা দুইটি পাড়—
পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট, পূর্ব পূর্বঘাট।
দক্ষিণাপথ ভূভাগটিকেই মালভূমি সব কয়,
কারণ ইহার দেশের মধ্যেই এইটা পাহাড়ময়।
এই ভূভাগের পশ্চিম পার মালাবার সমতল;
পূর্ব পারের অংশ ধরিছে নাম করমণ্ডল।
করমণ্ডল মালাবার থেকে কিছুটা প্রস্থে বেশী
আর ঢালু হয়ে গেছে ছুটে দ্রুত সাগরের অন্বেষী।
মালাবার যেন সাগর ছাড়িয়া উঠেছে দর্পভরে
করমণ্ডল গড়িয়ে পড়েছে সাগরের অন্তরে।
তাই তো পূর্ব উপকূলে যেন সারি সারি তালিবন
উঠেছে উপরে সাগর-বক্ষ করিয়া উন্মোচন।
দক্ষিণাপথে উত্তরে দুটি আছে নদী অদ্ভুত
নর্মদা আর তাপ্তি নামেতে, তারা যেন অচ্ছুত।
তারা কোন তরী বহে নাকো বুকে, তাদের বাহিত জল
সৃষ্টি করেনি মানুষের কোন বাসভূমি সমতল।
দক্ষিণে এর সব ক'টি নদী পূববাহিনী হয়
গোদাবরী আর কৃষ্ণা, কাবেরী ত্রিনামে তিনটি বয়।
পশ্চিমঘাটে জন্ম এদের পশ্চিম হতে পরে
নামিয়া আসিয়া পড়েছে নিম্নে বঙ্গ-উপসাগরে।
করমণ্ডল গড়েছে এরাই, এরাই তাহার প্রাণ;
এখানে যে সব ফসল ফলিছে ইহাদেরি তাহা দান।
পশ্চিমঘাটে তিনটি ফোকর—উত্তরে থালঘাট,
আর দক্ষিণে চেয়ে দেখো ওই বোরঘাট, পালঘাট।
এরা না থাকিলে যেতে কি পারিতে মালাবার কোঙ্কন?
অথবা কোয়িম্বাটুর যাহার সুকঠিন বন্ধন
দক্ষিণাপথের অন্তর সাথে বেঁধেছে পশ্চিম কূল
পর্বত যার শির চেয়ে দেখো নিস্তল জল মূল?
বঙ্গ এবং দক্ষিণাপথের মাঝে দুটি অঞ্চল—
উত্তরে দেখো মধ্যপ্রদেশ দক্ষিণে উৎকল।
মধ্যপ্রদেশ জঙ্গলে ভরা আর পর্বতময়;
উৎকলে অধিকাংশ কিন্তু সমভূমি পড়ে রয়।
এই দুটি দেশ দক্ষিণাভুক্ত হয়নি কখনো, তাই
উত্তরাপথে টানিয়া তাদেরে যথারীতি রাখা যায়।
দক্ষিণাপথের অন্তর্ভুক্ত মাদ্রাজ, বোম্বাই
দুটি দেশ যেন দাক্ষিণ্যের অন্ত খুঁজিতে চায়।
নীচ থেকে দূরে দৃষ্টি ফিরাও হিমালয়ে উত্তরে
বাম থেকে ক্রমে ডানে চেয়ে দেখো চার দেশ পরে পরে।
কাশ্মীর আর নেপাল, সিকিম, ভুটান তাহার পর
পাহাড়িয়া দেশ পাহাড়ে পাহাড়ে পাশাপাশি করে ঘর।
সংস্কৃতের অপভ্রংশ কাশ্মীরীদের ভাষা,
নেপালেও ঠিক অমনি একটা ভাষাই বেঁধেছে বাসা।
অপর পক্ষে সিকিম, ভুটান চীনের গোত্রধারী
চৈনিক চুং-চাং তার তাই অন্তঃপুরচারী।
ভাষার বর্ণসঙ্কর রূপে অনেক সময় মেলে
কোন্ জাত এসে কোন্ জাতে মিশে আদি রূপ দেয় ফেলে।
বড় হয়ে সব তোমরা সবাই এ কথা জানিবে ঠিক—
ভাষা-পরিচয়ে জাতি-পরিচয়, ভাষাই মাধ্যমিক। [ক্রমশঃ।

খামখেয়ালী ছড়া

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

নাটুরাম

নাটোরের নাটুরাম মোক্তার ভক্ত সে ভারী পান দোক্তার।
ঝগড়ায় হরদম ঝোঁক তার কিছু এড়ায় নাকো চোখ তার।
এমনি যে পাগলামি রোগ তার দোস্ত না হয় কোনো লোক তার।
লাভ ক্ষতি যাই কিছু হোক তার হয় না'কো হর্ষ বা শোক তার।

পাতিরাম

পিটপিটে পাতিরাম পাণ্ডা কখনো খায় না সে আণ্ডা।
ঘিরে রাখে ঘর ও বারাণ্ডা, চট করে পাছে লাগে ঠাণ্ডা।
হাতে রাখে হরদম ডাণ্ডা, ছাতে ওড়ে ঝলমল ঝাণ্ডা।
হাঁড়িকে সে বলে থাকে হাণ্ডা, পেট ভরে খায় মিঠে মণ্ডা।

বদভূত

এক যে আছে বদভূত (তার) মেজাজ ভারী অদভুত।
কেউ যদি দেয় ধাপ্পা হয় না মোটে খাপ্পা।
অস্থির করে ছটফট্টি প্রশ্ন শুধায় চটপট্টি।
কেউ যদি দেয় উত্তর। রেগেই বলে "দুত্তোর্"।
ঝোড়ো হাওয়ার ঝটকা লাগায় নাকো খটকা।
চাঁদের আলোর গন্ধ, পাখীর গানের ছন্দ,
নদীর কল-কল্লোল, দখিণ হাওয়ার হিল্লোল,
চটায় তাকে হরদম একেবারে ভরদম।

রোদ-দুপুর

ভীম রোদ্দুরে মাঠ ফাটে, হায় রে কাঠুরে কাঠ কাটে,
হাতের কুঠার কই থামে? এই ওঠে আর এই নামে।
লাটু মিস্তিরি, হায় বরাত! কাঠে চালায় জোর করাত।
ঘস্ ঘস্ করে কাঠ ফাড়ে ছুতোরখানায় মাঠ-পারে।
আগুন-ঝরানো রোদ্দুরে যাবি তুই দাদা কদ্দূরে?
হায় রে পথিক, হায় রে হায়! আয় রে গাছের এই ছায়ায়।
শান্ত করে নে মনটা তুই, জিরিয়ে নিয়ে ঘণ্টা দুই,
তারপর বলে "জয় গুরু!" যাত্রা করিস্ ফের সুরু।

সেবক-মঞ্জুষা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১৮৮৪ খৃঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। পিতা—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (আইনজীবী)। শিক্ষা—বহরমপুর স্কুল, এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), বি-এ (ঐ, ১৯০১), এম-এ (১৯০২), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৯০৫); পি-এইচ-ডি (১৯১৫)। কর্ম—অধ্যাপক, রিপন কলেজ (১৯০৩), বিশপ কলেজ, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক অধ্যাপক, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯১৬), মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২১), লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণায় ইঁহার দান অতুলনীয়। 'ইতিহাস-শিরোমণি' উপাধি-লাভ (বরোদা-সরকার কর্তৃক); ডি-লিট (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)। অধ্যাপনা-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ইনি জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন (১৯০৬—১৯১৫), উর্দ্ধতন পরিষদের সদস্য (১৯৩৭), ফ্লাউড কমিশনের সদস্য (১৯৩৭—১৯৪০), বর্তমানে কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য। ইঁহার নামে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারশিপের ব্যবস্থা আছে, এবং ইঁহাকে 'ভারত-কৌমুদী' নামে একটি গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। গ্রন্থ—অখণ্ড ভারত, **A History of Indian Shipping, The Fundamental Unity of India, Local Government in Ancient India, Nationalism in Hindu Culture, Men & Thought in Ancient India, Hindu Civilisation, Asoke, Harsha, Ancient Indian Education, Chandragupta Maurya & His Times, Gupta Empire, Early Indian Art, Asokan Inscriptions, India's Land System, A new approach to the Communal Problem, The University of Nalanda.**

রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০০ বঙ্গ রাজশাহী জেলায় নাটোরের অন্তর্গত চৌকিপাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ৩২এ শ্রাবণ। পিতা—হরিচরণ চক্রবর্ত্তী। ছাত্রাবস্থা হইতেই সাহিত্য সাধনা। প্রতিষ্ঠা—ছাপাখানা (নাটোর), কেয়া (মাসিক), পঞ্চপ্রদীপ (মাসিক); পরিচালনা—বঙ্গলক্ষ্মী। গ্রন্থ—উপন্যাস—হোয়াইট কেবিন, সাত্তন, ঘরমুখনী, মৃগয়া, ঝড়, তপ ও তাপ। গল্প—বুকের ভাষা, বৈরাগীর চর, চক্রপাক। কবিতা—আলেয়া, দীপা, পল্লব, তিলকধারী। সম্পাদক—অত্রি (মাসিক), রংছবি (শিশুমাসিক)।

রাধাচরণ দাস—সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০১ বঙ্গ ২০এ চৈত্র পাবনার উত্তর উপকণ্ঠে শালগাড়িয়াতে। তরুণ বয়স হইতেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। কাব্য-সমালোচনার জন্য পাবনা সাহাজাদপুর বাণী সম্মিলনী কর্তৃক রৌপ্যপদক লাভ, (১৯৪১) 'সাহিত্য-রত্ন' উপাধি লাভ। 'ভারত প্রেস' মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১৩৩৬)। গ্রন্থ—কবির দুঃখ (১৩৩০)। প্রকাশক ও সম্পাদক—আরতি (ত্রৈমাসিক, ১৩৩২-১৩৩৩): সহ-সম্পাদক—সুরাজ (পাবনা, সাপ্তাহিক)।

রাধানাথ বসাক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শরীরতত্ত্বসার (১৮৭২)।

রাধানাথ মিত্র—কবি। জন্ম—১২৩২ বঙ্গ ২৬এ ভাদ্র হুগলী জেলায় জেজুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩২৮ বঙ্গ ২৩এ জ্যৈষ্ঠ। কর্ম—প্রধান শিক্ষক, কলিকাতা শীলস্ ফ্রী কলেজ। ইনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। গ্রন্থ—অপূর্ব্বকাহিনী (১৩০৪), গোরাচাঁদ (১২৯২) ঘরের ছবি (১৩১০), বিশালাক্ষী (১৩০৩), মূলুকচাঁদ (১২৯৬) মোহিনী (১৩১০), লালকুঠি (১৮৮৬), লাড়ুগোপাল (১২৯৩) রাধামতি, রত্নমালা ১ম (১২৯০), ২য় (১২৯১), ভাগ্যলক্ষ্মী দময়ন্তী, প্রণয়-প্রসঙ্গ, জোড়া ডিটেকটিভ, শ্রীসংসচিন্তা, কানাকড়ি সম্পাদক—বাঙ্গালী (মাসিক, ১৩০৫ চৈত্র)।

রাধানাথ রায়—কবি। উড়িষ্যাপ্রবাসী। উড়িষ্যার স্কুল পরিদর্শক। 'রায় বাহাদুর' উপাধি-লাভ। কবিতা ও সাহিত্যরচনা কাব্যগ্রন্থ—কবিতাবলী (১৮৬৮)।

রাধানাথ রায়চৌধুরী—কবি। গ্রন্থ—পদ্মাপুরাণ (পদ্যানুবাদ ১৩১৯)।

রাধানাথ শিকদার—গাণিতিক ও সাহিত্যানুরাগী। জন্ম—১৮১৩ খৃঃ কলিকাতা শিকদার পাড়ায়। মৃত্যু—১৮৭০ খৃঃ ১৭ মে। পিতা—তিতুরাম শিকদার। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ (১৮২৪), গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত। সার্ভে অফিসে কর্ণেল এভারেষ্টের অধীনে কম্পিউটারের কার্য (১৮৩২), হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা মাপিয়া ২৯০০২ ফুট নির্ণয় করেন—কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এভারেষ্টের নামানুযায়ী চূড়াটির নাম হয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য নিরন্তর চিন্তিত ছিলেন। যুগ্ম-সম্পাদক—মাসিক পত্রিকা (মহিলা-পাঠ্য প্রথম মাসিক পত্র ১৮৫৪, আগষ্ট)'।

রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—কোষ্ঠী-প্রদীপঃ, হোরাবল্লভঃ, গ্রহবিপ্র ইতিহাস, বীজগণিতম্, উডুদায়প্রদীপঃ, লীলাবতী (বঙ্গানুবাদসহ), সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, গণিতাধ্যায়, গ্রহযামল।

রাধাচরণ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষিবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন (১৮৭২)।

রাধাদামোদর মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯২১ খৃঃ বীরভূম জেলায়। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। 'সাহিত্য-সরস্বতী,' 'সাহিত্য-বিনোদ' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—যুগের বাণী (নাটক)।

রাধানাথ চাকাকতি—সাময়িকপত্রসেবী। ডিব্রুগড়বাসী। সম্পাদক—Times of Assam (১৮৯৫)।

রাধানাথ পতি—আইন-ব্যবসায়ী, শিক্ষা—বি-এ, বি-এল (১৮৮৬)। আইন-ব্যবসায়ী, মেদিনীপুর। গ্রন্থ—কেশিয়াড়ী (ইতিহাস, ১৩২৩)।

রাধাবল্লভ দাস—বৈষ্ণব কবি। প্রকৃত নাম—রাধাবল্লভ মণ্ডল। পিতা—সুধাকর মণ্ডল। মাতা—শ্যামপ্রিয়া। জন্ম—কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় রচনায় সিদ্ধহস্ত। গ্রন্থ—বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি (অনুবাদ, রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত), সূচক (ঐ, সনাতন গোস্বামী কৃত), সহজতত্ত্ব (ঐ)।

রাধাবল্লভ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনস্তত্ত্বসার-সংগ্রহ (১৮৪৯)।

রাধাবিনোদ পাল—বিচারক ও ব্যবহারজীবী। জন্ম—১৮৮৬ খৃঃ

...রারি নদীয়া জেলার সলিমপুরে। এম-এস (১৯২০), ডি-এল (১৯২৫), অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ (১৯১১—২০), ঠাকুর আইন অধ্যাপক (১৯২৫, ১৯৩০, ১৯৩৮), বিচারক, কলিকাতা হাইকোর্ট (১৯৪১—৪৩), ভাইস চ্যান্সেলর, কলি: বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৪—৪৩), আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অন্যতম বিচারক (টোকিও, ১৯৪৬, মে—১৯৪৮ নভেম্বর)। গ্রন্থ—আইন-সংক্রান্ত গ্রন্থ।

রাধাবিনোদ হালদার—গ্রন্থ—প্রেমের হাট (১৮৮১), বনলতা (১৮৯০), সরোজ প্রতিমা (১৮৮১)।

রাধামাধব বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মুসলমান দায়ভাগ (১৮৭৩)।

রাধামাধব মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কুলকামিনীর খেদ (কবিতা, ২৭০)।

রাধামাধব শীল—আভিধানিক। গ্রন্থ—বঙ্গভাষার অভিধান (১৮৭০)।

রাধামাধব হালদার—সাময়িকপত্রসেবী। গ্রন্থ—এই কলিকাল। সম্পাদক—হুতম (মাসিক, ১২৮১ কলি: আহিরীটোলা), কুসুম (মাসিক, ১২৮৭), যুবরাজের ভ্রমণবিবরণ (মাসিক ১২৮২), সর্পচিকিৎসা বিজ্ঞান (মাসিক, ১৩০৫, আষাঢ়)।

রাধামোহন দাস (ঠাকুর)—বৈষ্ণব কবি। জন্ম—১০৯৫ বঙ্গ। মৃত্যু—১১৭৫ বঙ্গ। পিতা—গতিগোবিন্দ ঠাকুর। আচার্য শ্রীনিবাসের প্রপৌত্র। মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কর্ম। সংস্কৃতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। গ্রন্থ—পদামৃতসমুদ্র (সংগ্রহ-গ্রন্থ)।

রাধামোহন সেন—গীতিকার। জন্ম—কলিকাতার কাঁসারিপাড়ার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে। গ্রন্থ—সঙ্গীততরঙ্গ (১৮১৮ ! বিদ্যোন্মাদ-তরঙ্গিণী (১৮২৬), অন্নপূর্ণামঙ্গল (১৮৩৩), রসসার-সঙ্গীত (১৮৩১)।

রাধারমণ চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—ব্রজবিদেহী শ্রীসন্তদাস ও শ্রীমতী শোভা সা।

রাধারমণ বিশ্বাস—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৯০১ খৃ: বাঁকুড়া জেলার দারাপুর গ্রামে। পিতা—উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (আইনজীবী)। শিক্ষা—বি-এ, বি-এল। কর্ম—সহকারী অধ্যাপক, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল। পাবলিক প্রসিকিউটর, বাঁকুড়া। স্থাপয়িতা—বাঁকুড়া উন্মাদ মন্দির। গ্রন্থ—ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়া, সিফিলিস ও গণোরিয়া, গর্ভিণী ও প্রসূতি, ব্রংকাটিস ও নিউমোনিয়া, মেটেরিয়া মেডিকা, নোসোড্‌স্‌, গ্রন্থিরস-বিজ্ঞান, আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যৌন-বিজ্ঞান, বিবাহ-বিজ্ঞান, ঔষধের মনোলক্ষণ, মৃত্যুর পর কি ও কোথায় যায়।

রাধারমণ সাহা—আইনজীবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা শহরের উপকণ্ঠে কালাচাঁদ পাড়ায়। বি-এল। আইন-ব্যবসায় (বিহারের আরা শহরে, পাটনা) গ্রন্থ—পাবনা জেলার ইতিহাস ৬ ভাগ (১৩৩০), আইন ও আদালত (কাশী, ১৩৪০)।

রাধারাণী দেবী—মহিলা কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০৪ খৃ:। পিতা—আশুতোষ ঘোষ (ম্যাজিষ্ট্রেট, কুচবিহার)। স্বামী—কবি নরেন্দ্র দেব। শিক্ষা—প্রবেশিকা পর্যন্ত। বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের লেখিকা। ছদ্মনাম—অপরাজিতা দেবী। কয়েকখানি বারোয়ারি উপন্যাসের অংশ গ্রহণ করেন। গ্রন্থ—কাব্য—লীলাকমল, বনবিহগী, সীথিমৌর, মিলনের মন্ত্রমালা, বুকের বীণা, আঙিনার ফুল, পুরবাসিনী, বিচিত্ররূপিণী; উপন্যাস—শেষের পরিচয় (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ)। সম্পাদক—কাব্য-দীপালি (নরেন্দ্র দেব সহ), ছোটদের সোণার কাঠি (১৩৪৪, কার্ত্তিক)।

রাধারাণী দেবী—মহিলা গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—চন্দননগর। গ্রন্থ—প্রেমের পূজা।

রাধিকানাথ গোস্বামী—বৈষ্ণব সাহিত্যিক। সম্পাদক—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (প্রথমে পাক্ষিক, ১২৯৭ বঙ্গ, পরে মাসিক, ৪১৪ চৈতন্যাব্দ)।

রাধিকাপ্রসাদ দত্ত—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—সঙ্গিনী (মাসিক, ১২৯৬)।

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১৩ বঙ্গ। মৃত্যু—১৩৫৩ বঙ্গ ২১এ চৈত্র। আইন-ব্যবসায়ী, আলিপুর। বিভিন্ন সাময়িকপত্রের লেখক। গ্রন্থ—সবিনয় নিবেদন, বিস্মৃত বেদিয়া ছন্দ, কলঙ্কিনীর খাল।

রাধেশচন্দ্র শেঠ—সাময়িকপত্রসেবী। সম্পাদক—ক্রীড়া ও কৌতুক (সাপ্তাহিক, ১২৯৫)।

রাণী চন্দ—মহিলা সাহিত্যিক। গ্রন্থ—জোড়াসাঁকোর ধারে (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ), ঘরোয়া (ঐ), পূর্ণকুম্ভ।

রামকমল চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ব্যবস্থাপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ (১৮৩৮ ?)।

রামকমল চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বঙ্গদর্পণ (১৮৩৮)।

রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লাবণবধ কাব্য (১৮৭০)।

রামকমল বিদ্যালঙ্কার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রাকৃতিবাদ।

রামকমল ভট্টাচার্য—পণ্ডিত। জন্ম—১২৪০ বঙ্গ ১৬ই চৈত্র কলিকাতার শিমুলিয়া অঞ্চলের মাসিরবাগান নামক স্থানে। মৃত্যু—১৮৬০ খৃ: ১১ই জুলাই (উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা)। পিতা—রামজয় তর্কালঙ্কার। শিক্ষা—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, সিনিয়র বৃত্তি (১৮৫৪) এবং বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন। কর্ম—প্রধান শিক্ষক, কলিকাতা নর্মাল স্কুল (১৮৫৭-৬০)। ইংরেজি ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি-লাভ। গ্রন্থ—জ্যামিতি (১৮৬২), বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ (১৮৬১), আন্বীক্ষিকী (দর্শন—অসমাপ্ত), জীববৃত্ত (অসমাপ্ত), শিক্ষাপদ্ধতি (ঐ), ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৭১)।

রামকমল সেন—আভিধানিক। জন্ম—১৭৮৩ খৃ: ১৫ই মার্চ ২৪ পরগণার গৌরীভা বা গরিফা গ্রামে। মৃত্যু—১৮৪৪ খৃ: ২রা আগষ্ট গরিফা গ্রামে। শিক্ষারম্ভ (১৮০১)। কর্ম—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (১৮১২), এসিয়াটিক সোসাইটির কর্মচারী (১৮১৮), সম্পাদক (ভারতীয়), কলিকাতা ট্যাকশালের দেওয়ান (১৮৩১), কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভ্য (১৮৩১), সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের ট্রেজারার (১৮৩৩)। প্রতিষ্ঠাতা—এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি (১৮৪৪)। গ্রন্থ—ইংরেজি-বাংলা অভিধান (১৮৩০)।

[ক্রমশ: ।

আকাশ-পাতাল

[৫৬৮ পৃষ্ঠার পর]

তুমি যে কতটা গোঁয়ার তা আর আমি জানতে বাকী নেই। অনন্তরাম কথা বলে সজল চোখে।

—যাও যাও, নিজের কাজে যাও তুমি। তিরস্কারের সুরে বললেন কৃষ্ণকিশোর। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দালানের ভীড় ঠেলতে-ঠেলতে এগিয়ে চললেন।

কান্নার একটা রোল উঠলো দালানে। কে কে যেন ডাক-ছেড়ে কাঁদতে থাকলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় মধ্য রাতে পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। তারা আসে ঘোড়া ছুটিয়ে।

একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। বোধ করি একজন ডেপুটি কমিশনার। আর তাঁর সঙ্গে কয়েক জন সার্জ্জেন। কমিশনার উপস্থিত হওয়া মাত্র সাক্ষাৎ করতে চাইলেন গৃহের মালিকের সঙ্গে। দেখতে চাইলেন নিহতকে। কৃষ্ণকিশোরকে দেখেই বললেন,—আপনিই মার্ডার করেছেন?

—নাঃ, কে এ কথা বললে? কার কাছ থেকে শুনলেন?

—আমরা রিপোর্ট পেয়েছি। এখনই থানায় যেতে হবে আপনাকে। ডেপুটি কমিশনার বললেন অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে। সহকর্ম্মীদের বললেন,—হাতকড়া লাগাও টুমলোগ্।

হেসে ফেললেন কৃষ্ণকিশোর। বললেন,—লোহার হাতকড়া আমি প'রতে পারবো না। বড্ড লাগে যে। অপেক্ষা করুন। কথার শেষে ডাক ছাড়লেন,—কে আছে এখানে?

—আমি আছি হুজুর। হেড নায়েব সাড়া দিলেন বৈঠকখানার বাইরে থেকে।

কৃষ্ণকিশোর সহজ সুরে বললেন,—কাছারীর সিন্দুক থেকে সোনার হাতকড়াটা শীঘ্রি নিয়ে আসুন। দেরী হয় না যেন।

ডেপুটি কমিশনার বললেন,—আপনি কি ড্রিঙ্ক করেছেন? মদ খেয়েছেন?

—সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে সাহেব? সহাস্যে বললেন কৃষ্ণকিশোর।

—আলবৎ। হামরা এসেছি টোমাকে গিরিফ্‌তার করতে। রিপোর্ট নিতে ডেপুটি কমিশনার কথা বললেন তাচ্ছিল্যের সুরে। কথার শেষে হাতের জলন্ত পাইপ মুখে তুললেন। ধোঁয়ার জাল বিস্তার করলেন।

কৃষ্ণকিশোর যেন অনন্যোপায় হয়ে বললেন,—ড্রিঙ্ক আমি করি। অভ্যাস আছে। আজকেও খেয়েছি। লিখে নাও সাহেব।

—ঠিক বাত্ আছে। কথা বলতে বলতে জামার পকেট থেকে কাগজ আর পেন্সিল বের করলেন সাহেব। বললেন,—মার্ডার আপনিই করেছেন?

আমি? সবিস্ময়ে বললেন কৃষ্ণকিশোর।—না সাহেব, না, আমি নয়। সুইসাইড কেশ। সে আত্মহত্যা করেছে। আমি কখনও আমার স্ত্রীকে খুন করতে পারি? আমি ড্রিঙ্ক করেছি এই দুঃখে সে সুইসাইড করেছে। আমি খুন করেছি, তার সাক্ষী আছে কেউ?

বাঁকা হাসি হাসলেন ডেপুটি কমিশনার। বললেন,—আলবৎ আছে। আপনার স্ত্রী গান্ পাবে কোথায়? আপনার বাড়ীর লোকই সাক্ষী ডেবে।

—ঘরেই ছিল বন্দুকটা। টোটা-ভর্ত্তি বন্দুক। বললেন কৃষ্ণকিশোর। চিন্তাকুল দৃষ্টিতে।

এমন সময়ে সোনার হাত-কড়াটা আনলেন হেড নায়েব। সাহেব দেখে শুধু বিস্মিত হ'লেন না, যেন হতবাক্ হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—সাহেব, তোমার সাগরেদদের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বল। কিছু কথা বলতে চাই আমি।

—অল্ রাইট। বললেন ডেপুটি। ইংরাজীতে কি যেন বললেন। তৎক্ষণাৎ পারিষদবর্গ ঘরের বাইরে চ'লে গেল। কতকগুলো বুটের শব্দ হ'ল খটাখট। ঘর ফাঁকা হয়ে গেল।

—চল' সাহেব, তোমাকে একটা ঘর দেখাই। দেখে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। উঠে পড়'। আর দেরী ক'র না। কথা বলতে বলতে ফরাস ছেড়ে উঠলেন কৃষ্ণকিশোর।

ডেপুটিও উঠলেন। মশ্-মশ্ শব্দ উঠলো। জুতোর শব্দ। চললেন হত্যাকারীর পিছু-পিছু।

এ-ঘর সে-ঘর পেরিয়ে, অনেকগুলো দালান অতিক্রম ক'রে চললেন। সিঁড়ি ভাঙলেন।

কৃষ্ণকিশোর অন্দরের দোতলার একটি ঘরের সম্মুখে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন,—এই যাঃ, ঘরের চাবিটা আনতে ভুলে গেছি। অপেক্ষা কর সাহেব। ডাক ছাড়লেন তিনি,—ওরে কে আছিস্?

একজন তাঁবেদার কাছাকাছি কোথায় ছিল। দৌড়তে দৌড়তে এসে উপস্থিত হ'য়ে কুর্নিশ করে বললে,—হুকুম হুজুর।

—এই ঘরের চাবিটা নে আয় কাছারী থেকে। ছুটে যাবি। দেরী করবি না। বললেন কৃষ্ণকিশোর।

রাত্রি কত কে জানে। অন্যান্য দিন কোন আলো এমন সময়ে জলে না। নিবে যায়। গভীর রাত্রি যে। ঘড়ি-ঘরে কখন তিনটে বেজে গেছে।

—ডেড্-বডি এই ঘরে আছে? শুধোলে ডেপুটি।

—না সাহেব, না। যা আছে, দেখলে তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে। বললেন কৃষ্ণকিশোর।

চাবি এনে হুজুরের হাতে তুলে দেয় তাঁবেদার। সেলাম করতে করতে পিছু হ'টে যায়।

—যাস্ কোথায়? বললেন কৃষ্ণকিশোর।—একটা মশাল

নে আয়। ছুটে যা। সিঁড়ির মশালটাই নে আয় আপাততঃ।

মশাল আনে তাঁবেদার। মুহূর্ত্তের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে চ'লে যায়।

সাহেব তো দেখে হতবাক্। পাশাপাশি ঘড়া। অনেকগুলো। পাশাপাশি সিন্দুক। অনেকগুলো।

একটা একটা সিন্দুক খোলেন কৃষ্ণকিশোর।

চোখ বড় ক'রে দেখে সাহেব। সোনা, রূপো আর হীরা জহরৎ। দেখে যেন থ হয়ে যায়! পাইপ টানে আর দেখে! তার চোখে লোভ আর লোলুপতা।

কৃষ্ণকিশোর বললেন,—যা চাইবে তাই পাবে সাহেব। কিন্তু লিখে নিতে হবে সুইসাইড কেশ।

কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলো ডেপুটি কমিশনার। অনেক ভেবে বললে,—বেশ কথা। টাই হবে। But, আমি এখন কিছু নেবো না। পরে একদিন আসবো, এসে নিয়ে যাবো। কিন্টু কেউ যেন না জানটে পারে।

সহাস্যে বললেন কৃষ্ণকিশোর,—শুধু তুমি আর আমি। কেউ জানবে না। ভগবানও নয়।

—অল্ রাইট। বললে ডেপুটি নিশ্চিন্ত হয়ে। বললে,—ডেড্-বডি বের ক'রে দাও বাড়ী ঠেকে। দেরী কর না। দেরী করলে লোক-জানাজানি হয়ে যাবে। আমি লিখে দিচ্ছি সুইসাইড কেশ। But, বডি নিয়ে যাওয়ার সময় যেন চীৎকার করে না কেউ। খুব সাবধান!

সানন্দে বললেন কৃষ্ণকিশোর,—এক্ষুণি ডেড্-বডি চ'লে যাবে। তোমার কোন' চিন্তা নেই। তবে যতক্ষণ না ডেড্-বডি যায় তোমাকে সাহেব থাকতে হচ্ছে যে!

—বেশ কথা। হামি ঠাকবো।

—চল' তোমাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে আসি আগে। বললেন কৃষ্ণকিশোর।

তখন শেষ-রাত্রি।

একটি শবদেহ বহন ক'রে নিয়ে যায় কয়েক জন লোক। নীরব শোক-শোভাযাত্রা।

রাজেশ্বরী রাজ্যেশ্বরী সেজে ঘুমন্ত অবস্থায় লোকান্তরের পথে যাত্রা করে। বাড়ীতে একটা চাপা কান্নার রোল ওঠে। গলা-ফাটিয়ে কাঁদে শুধু এলোকেশী। সেই শিশুবেলা থেকে যে হাতে ক'রে মানুষ করেছে রাজেশ্বরীকে।

কালো আকাশ। পাতালের মতই বোধ করি কালো আকাশ। আঁধার, আঁধার, আঁধার। আকাশ পাতাল। কলকাতায় মানুষ আছে কি নেই বোঝা যায় না।

পূর্ণশশী শুধু সেই রাত্রির অন্ধকারে সন্তর্পণে পুকুর-ঘাটে নামছিলেন স্নান করতে। তিনিই যে স্বহস্তে সাজিয়ে দিয়েছেন রাজোকে। লালে লাল ক'রে দিয়েছেন রাজোকে সিঁদুর আর আলতায়। সুগন্ধ ঢেলে দিয়েছেন রাজোর অঙ্গে। ৪৭১১ সেণ্টের পুরা শিশিটা।

পুকুর-ঘাটে নেমে কেমন যেন গা ছম-ছম করে পূর্ণশশীর।

চতুর্দ্দিক দেখেন ভয়ে-ভয়ে। দেখেন আঁধার, আঁধার, আঁধার। আকাশ পাতালের মতই কালো হয়ে আছে।

আকাশ-পাতাল।

শেষ

প্রেসক্রিপশনে কি লেখা থাকে?

প্রেসক্রিপশন লেখবার সময় চিকিৎসকগণ প্রথমে লেখেন একটি বড় 'R' এবং ঐ 'R' শব্দটির শেষ দিকটা একটু নীচের দিকে টেনে তার উপর দিয়ে একটা ছোট্ট আঁচড় দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেন। এটি হ'লো হাজার বছরের পুরোনো প্রথা।

"আর" ল্যাটিন "রেসিপি" শব্দের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন, আর ঐ আঁচড়টি হলো ভগবান 'জোভ'এর "জে"।

রোগীরা ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনের মানে বোঝে না, তাই তারা বলে ডাক্তারদের হাতের লেখা খারাপ। আর প্রথমে ঐ যে 'R' লেখা তার মানে তো তারা বুঝতেই পারে না।

"রেসিপি" শব্দের অর্থ ঔষধের ব্যবস্থা-পত্র। চিকিৎসকের সাঙ্কেতিক ব্যবস্থা-পত্রের ভাষা কিন্তু ঔষধ-বিক্রেতা ঠিক বুঝতে পারে। রোগীকে কি ঔষধ দেওয়া হ'লো তা, তাদের বুঝতে না দেওয়াই সম্ভবতঃ চিকিৎসকদের অভিপ্রেত।
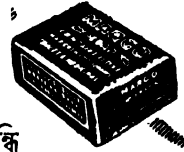
[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

মিত্রা রাণীকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। মিত্রা তাকিয়ে থাকে রাণীর দিকে—কি সুন্দর লাগছে রাণীকে! কচি কলাপাতা রংএর শাড়ী, সাদা ব্লাউজ। মাথাভরা চুলে মস্ত এক খোঁপা। বড় ভালো মেয়ে। ও ছেলে হলে কামনা করত এমনি একটি স্ত্রীর। কিন্তু রাণীর স্বামীর কেন রাণীকে নিয়ে মন ওঠে না? যেতে হয় অন্যত্র সুখ-অন্বেষণে! কি সে সুখ, কিসের সে অতৃপ্তি, যা ঘরে মেলে না? তবু জীবিত কি মৃত—এঁদের জন্যই জীবন-যৌবন উৎসর্গ করে মরণের দিন গুণতে হবে! শ্রেতবটা মিত্রার জলে ওঠে—অদৃষ্ট, অদৃষ্ট বলে অদেখা ভাগ্যের কাঁধে সব দোষ চাপিয়ে, দেখা-দৃষ্টির দুর্ভোগ থেকেও উদ্ধার পাওয়ার উপায় থাকবে না? কারা ওদের এ ভাবে বেঁধে রেখে গেছে? কবে? এখনও কি সে শৃঙ্খলে পচন ধরেনি? টেনে ফেললে ছিঁড়বে না? সহজে নয়। বছর বছর নূতন করে গড়িয়ে আনা হচ্ছে। বর্তমানেরটা টাটা ইস্পাতের। সোনার পাত মোড়া আধুনিক ডিজাইনের—হাত বন্ধ, না বাজু বন্ধ বোঝা দায়।

রাণী ওর ব্যাগ ঘেঁটে এতক্ষণে একটা চিঠি বের করে হাঁফ ছাড়লো। বাবাঃ, পেয়েছি। বেশী যত্নে একেবারে কোথায় ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। নেও পড। দেখ কি মজার চিঠি লিখেছে কমলা।

মজার চিঠি তো কমলা সব সময়ই লিখছে। এবার আবার বিশেষ কি মজা ভরে পাঠালো। চিঠি খুলে মিত্রা পড়তে আরম্ভ করে—

আচ্ছা বৌদি, পা ফেলা দেখে যেমন ধরা যায় মানুষটা নেশাগ্রস্ত কিনা—হাতের কলম চলা দেখেও কি সেটা বোঝা সম্ভব? তুমি কি বুঝতে পারছ, কমলার হাতের কলম নেশায় টলে টলে চলছে?

কি করব বলো! ভদ্রলোকটি দুরন্ত একরোখা। বলেন, সামান্য খেলে এ্যাপিটাইট বাড়ে—অর্থাৎ ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে হয় স্বাস্থ্যোন্নতি। আর মাত্রা ছাড়ানো? সে তো বিশ্ব-সংসারের সব-কিছুর ফলাফলই মন্দ।

বললাম—এই কাঠি কাঠি হাত-পা নিটোল হবে?

বললেন—নিশ্চয়।

আজ আমাদের সেই পর্বের প্রথম রাত। সাহেবি কেতায় নয়, পুরো ভারতীয় প্রথায়। পরিকল্পনায়—অসিত বোস।

ভারী কাশ্মীরি গালিচার মাঝখানের ভাসে সাদা আর লাল গোলাপের গুচ্ছগুলো দুলছে বাতাসে। কাছে পীত-বর্ণের পানীয়ভরা টলটলে জাগ। ট্রে'র উপর পেয়ালা-সরঞ্জাম! ঘর আমোদিত আতর সৌগন্ধে। একেবারে নির্ভেজাল ওমরের শয়ন-ঘর। দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক না গাইলে কাল আর কমলা চোখ মেলছে না।

কিন্তু অমন ঢলঢলে চেহারা হলে কি হবে—বস্তুটি স্বাদে গন্ধে বিস্বাদ। মা গো, মুখটাকে তেতো গেলা করে তো প্রথম মাত্রা শেষ করা গেলো। দ্বিতীয় অবস্থা—এর জন্য এত! তৃতীয়ে—হ্যাঁ তো, কেমন যেন একটা অচেনা হৃদয়াবেগের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফুর্তির নিশানা মিলছে—ভারী হয়ে আসা চোখের পাতায়, অস্পষ্ট উচ্চারণে জড়িত জিবে কথা বলতে। হেসে গড়িয়ে পড়লাম। বৌদিগুলো তো নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে—কমলা যে রসে টইটুম্বুর হয়ে উঠেছে আঙ্গুর নির্যাস পান করে, কল্পনাও করতে পারছে না! উঠে দাঁড়ালাম—চিঠি লিখব।

অসিত বাবু তো স্তম্ভিত—বলো কি! যা বলেছি, বলেছিই। কার্পেটের উপর উপুড় হয়ে পড়লাম কাগজ নিয়ে। কি আর করে! শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে আর মাঝে মাঝে চুল ধরে টানছে—হলো। লোকটা মন্দ নয়। এখন তো অপূর্ব লাগছে।

ভাবছ তো, লক্ষ্মীপূজোর তেল-সিঁদুর কপাল বেয়ে নেমে আসা গৃহস্থ-ঘরের মেয়ের মুখে এ কি কথা! কিন্তু বাইরের মন্দ সঙ্গ মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া, রাস্তার ড্রেনে ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা বা থানা পুলিশ করতে না হওয়া—এ কি চাট্টিখানি কথা?

তাই খুব চুপি চুপি বলছি—শোন বৌদি (কমলা কিন্তু এখন দস্তুর মতো সিরিয়াস) স্লিপ লিখে দোকানে পাঠাও চাকরকে। এখানকার পরিকল্পনায় অসিত বোস—তোমারটার ব্যবস্থাপনা হোক রাণী দেবীর। বন্ধ কর ঘরের দরজা, জানালা—অবশ্যি দাদাকে ভেতরে রেখে। তার পর নিজে নেও—দাদাকে দেও। কথা বল অনর্গল। মিস দেবীর ট্রেনিংএর শুধু ভালো কথা আর রাশভারী কথা নয়—খুশী, যা মন চায়। হালকা হতে বলছি? হ্যাঁ, তাই বলছি। বাঁচতে হবে যে—আপেক্ষিক সামঞ্জস্য করে নেও ভাই। জীবনটা—না আর নয়। বড্ড বেশী ভাব-গম্ভীরতা এসে যাচ্ছে, আবার বেচারীর এত আয়োজন সব পণ্ড করব শেষে।

চিঠি শেষ করে অন্যমনস্ক মিত্রা হাসলো—মেয়েটার মাথা হাতের কাছে পেলে দিতাম গুঁড়িয়ে। কেমন লিখেছে, মিস দেবীর ট্রেনিংএর কথা নয়। কিন্তু ভগিনীর পরামর্শটা ভ্রাতা নিলে হয়! এ জাতীয় ছেলেরা আবার অতি গোঁড়া প্রাচীনপন্থী হয়ে থাকেন। বাড়ীর মেয়েদের চরিত্র আর চাল-চলনের প্রতি এঁদের সজাগ দৃষ্টি। দেখিয়েছ চিঠি?

—পাগল!

দিন যায়।

মিত্রার হাতে বই থাকে বটে, কিন্তু তাতে মন থাকে না। বইএর কাল্পনিক মানুষগুলোর সুখ, দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে যাবার আগেই, কাছের মানুষ এসে দখল করে বসে ওকে। ও এখন কোথায়, এখানে না জার্মাণী। ঠিকানাটার জন্য মনটা ছটফট করে। সেদিন কি অবাঞ্ছিত অবস্থার ভেতরই না ওদের শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়েছিলো—নইলে কখনও মিত্রা ভুলত না ঠিকানাটা চেয়ে রাখতে? বিদেশী জীবনযাত্রার কত নূতন কথা ও আরব্য উপন্যাস পড়ার মতো পড়ত ঘরে বসে। শুনত রমার

...স্বামীর প্রেম-ভালোবাসার গল্প, ওদের দাম্পত্য-জীবনের ...। ভদ্রলোকটির চেহারাখানা নিশ্চয়ই হবে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে, ... বলিষ্ঠের। তাই তো হয় জর্মনরা। ঐ থাবার মতো ... বড় হাতে রমার ছোট পাতলা হাতখানা—নিজের হাতটা ... মেলে ধরল চোখের সামনে। না, ওর হাতের মতো সুন্দর ... শুধু রমা কেন, খুব কম মেয়ের আছে। হাতটা একবার শক্ত ... করে—আবার মেলে দেয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পাতলা ... চামড়ার নীচ দিয়ে লাল রক্তের খেলা। আংটিটা মাংসের ... ঢুকে গেছে—মোটা হলো নাকি আরও।···শমিতের আঙুলের ... হীরে তো নয়, যেন একটা জলন্ত চোখ! ঠিক অমনি ... আংটি শমিত কমলাকে যাবার সময় উপহার দিয়েছে। কি ... চিঠিই না লিখেছে মেয়েটা—নাঃ, কমলা আর কমলা! ওর চিঠিটা যেন মিত্রার মাথার ঘিলু কুরে কুরে খাচ্ছে সেদিন থেকে। কিন্তু কি আছে ওতে, এত পেয়ে বসবার? অসিত আর কমলার ছেলেমানুষি তো মিত্রা কম দেখেনি—বসেছিল নাকি মনে করে। ... ছেলেমানুষির বয়স চলে গেছে? কুড়ি-বাইশে? কবে ... কুড়ি-বাইশ, চলেই বা গেলো কবে? কি নিয়ে গেলো সে ... যৌবনের উপচার? তার চাহিদা—কই, কুড়ি-বাইশ তো ... স্মরণ করিয়েও দেয়নি একবার। তখন কি মিত্রা মরেছিলো? ... তন্বী তরুণী—ত্রিশেই বুঝি গেলো বয়স চলে! কিসের বয়স ... সুখের, আনন্দের, সম্ভোগের? যেমন বাল্যে যায় পুতুল খেলা, কৈশোরটি পার হলেই যায় চাপল্য? তাই যদি যাবে, তবে কেন মিত্রা বিসর্জনের নয়, আগমনীর গান শুনতে পাচ্ছে হৃদয়ে? ... সে যতই আগমনীর গান শুনতে পাক আর অনাস্বাদিত অনুভূতির উপস্থিতি অনুভব করুক—চোখের উপর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়ে গেলেও নিরুপায় গৃহস্থের কি করবার থাকে?

হাতের বই রেখে উঠে পড়ে মিত্রা। গিয়ে দাঁড়ায় আয়নাটার কাছে। আষাঢ়ের গোমট গরমে ঘামে ভিজে পাতলা ব্লাউজটা গেছে শরীরের সঙ্গে লেপটে—কে আর আসছে এখন, টেনে খুলতে গিয়ে—... ছিঁড়েই গেলো ব্লাউজটা। পচেই ছিলো বুঝি। জামাটা খুলে ... স্বেদ-স্যাঁতসেঁতে শরীরে দিলো কৌটো উপুড় করে পাউডার ঢেলে। পাউডার-হাত দিয়ে বসে মিলিয়ে দেয় না তো যেন মনে হয় ভেলভেটের উপর হাত বুলোচ্ছে। হাতের স্পর্শে যে সৌন্দর্য এত ...—কোমল—আয়নাটার প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে সে সৌন্দর্যকে ...ছে কিনা জমা পাথর! দেহ-সুরূপতায় জীবন নাই, আছে ... ইলোরার প্রাণহীন কাঠিন্য।···হাত দুটি কোলের উপর রেখে বসে রইলো মিত্রা···

কমলাদের ওমরের শয়ন-ঘর কি আজও বসবে? বাতাসে গোলাপ দুলবে, হাওয়ায় উড়বে আতর-গন্ধ। অসিত সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাত বাড়িয়ে কাছে টানবে কমলাকে—নাঃ, ...বার সেই কমলা আর কমলা।

কিন্তু বৃথা। যতই রাশ টেনে ধর আর চোখ রাঙাও, মন তার আপন স্মৃতির পথে ঘুরে-ফিরে গিয়ে উপস্থিত হয়—এই তার ধর্ম। ...বিড়ম্বনা—অসহিষ্ণু ভাবে উঠে জানালাগুলো সশব্দে খুলে দিলে মিত্রা। ঘরটা ভরে যাক্ আলোতে।

কিন্তু রাত্রিও ওকে বঞ্চিত করলো একটানা শান্তিপূর্ণ ঘুমটুকু থেকে। অসংলগ্ন সব স্বপ্নের ভীড় চোখের পাতা দুটি এক হতে না হতে ওকে জাগিয়ে ছাড়ে। দেখে—গড়িয়ে যাচ্ছে মস্ত উঁচু এক পাহাড় থেকে। দাঁত ভেঙ্গে মাথা থেঁত্‌লে চুলে-রক্তে একাকার। কিন্তু রক্তগুলো কি দারুণ সাদা—মা গো! কোন দিন দেখে—হলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। অবসাদে হাত চলে না। জানে না একটি প্রশ্নের জবাব। অন্য মেয়েরা সব দেস্কে মাথায় এক করে কত কি লিখে চলেছে। আর করুণ নয়নে তাকিয়ে ও তাই দেখছে। বা, চমকে উঠল মিত্রা। পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে ওর কলমশুদ্ধ হাতটা কে ধরলো এমন শক্ত মুঠোয়। লিখে চললো দ্রুতগতিতে পাতার পর পাতা। নির্ভুল জবাবে ওর শূন্য খাতার বুক উঠল ভরে। ···'হয়ে গেছে এবার চলো।' গলার স্বরটি ভীরু মিনতি-মাখা কিন্তু হাতের মুঠোটা কি দৃঢ়! কিছুতেই পারে না ও নিজেকে মুক্ত করতে—কুমার, মুন্নী···

মার হাতের ঝাঁকানিতে জেগে উঠে মিত্রা দেখে ওর দু'চোখ ভরা টলটলে জল। তার পর রাত-জাগা মিত্রাকে নিয়ে বাকী রাত—মন যে খেলা খেলে, সে খেলার সঙ্গী না থাকলে শুধু অন্তরিন্দ্রিয় ক্ষয়।

···'বইপত্রের ব্যবস্থা করে দেও। আর দেও এক জন ভালো প্রফেসর ঠিক করে। পড়ব।' মামাদের গিয়ে বললো মিত্রা।

বড় মামা বললেন—'চাকরী তোমাকে সমস্ত জীবনেও করতে হবে না। তোমার শ্বশুরবাড়ীতে ভাঙ্গন আরম্ভ হয়েছে, ভাগও হলো বলে। সেখানে তোমার অংশ সামান্য নয়। পড়ে হবে কি?'

তরল কণ্ঠে বলে মিত্রা—'হবে না কিছু। তবু ডিগ্রি—জানো, বিধবাদের একাদশী করায় পুণ্য নেই, কিন্তু না করলে সে পাপে হয় নরকবাস। এই ডিগ্রিগুলোও হয়েছে ঠিক তেমনি।'

মেজ মামা খুসী হয়ে ভাগ্নীর তারিফ করলেন—'খাসা বলেছিস।'

ছোট মামা বললেন—'কাল থেকে একটা সময় করে নেও, ভোরে কি সন্ধ্যায়। আমি তোমায় ইংরেজী পড়াব। চুক্তি—শিক্ষককে নিয়ে বিলাত ভ্রমণ।'

উৎসাহে মেতে ওঠে মিত্রা—'বাঃ, চমৎকার! কিন্তু শেষে যদি এ-গুজব সে-গুজব তোল ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।' পরক্ষণেই নিরাশ কণ্ঠে বলে—'দূর, একসঙ্গে সপ্তাহের ছুটি মেলে না তোমাদের, তোমরা নিয়ে যাবে বিলেত।'

মামারা হেসে বলেন—'আচ্ছা, সে হবে, তুমি তো ইংরেজী শিখতে আরম্ভ কর।'

কিন্তু কর বললেই কি আর করা যায়? এক যুগ বাদে কেন, তার চাইতেও বেশী সময় অলস অবসরে কাটিয়ে কি ঝট্ করে লেখাপড়ায় মন বসে? ইচ্ছে করে ইংরেজীর বাংলা, বাংলার ইংরেজী তরজমায়—দেং তেরি!

কিন্তু গোটা জীবনটাই তো আর 'দেং তরি' বলে দূরে ঠেলে রাখা সম্ভব নয়। এমনি সময় নিতান্তই আকস্মিক ভাবে মিত্রা আবিষ্কারের বিস্ময়ে দেখলো, আঁকার হাত তো তার তুচ্ছ করবার মতো নয়! ছেলে-মেয়েদের ছবির বই থেকে ওদের খেলা দিতে গিয়ে, পেন্সিলের টানে টানে দিব্য গোঁফ ফুলিয়ে দাঁড়ালো তো বিড়ালছানাটি! খাতা ভরে এঁকেই চললো সে। আনন্দ ধরে না বাচ্চাদের। যে যতটা পারলো আদায় করলো, ছুটল বাড়ীর সবাইকে দেখাতে। ওরা চলে গেলেও হাতের পেন্সিল নামলো না মিত্রার, নিজের

নাম-ছাপানো প্যাডটা টেনে নিয়ে অবশিষ্ট রাখলো না তার একটি পাতাও। স্তম্ভিত মিত্রা—কে আঁকছে এ সব? ওর হাত? কি কাণ্ড! এই গুণ নিয়ে তুমি চুপচাপ বসে আছ কুঁড়ের সর্দার হয়ে? নড়তে-চড়তে এত কষ্ট! আমি যদি আগে জানতাম—তবে তোমার সাধ্য ছিলো কি কোলের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবার। কত সার্থক কাজ করিয়ে নিতাম। যেমন সময় নষ্ট করেছ,—এখন দ্বিগুণ খাটিয়ে হবে তার উসুল!

আঁকার সরঞ্জাম আনলো গাড়ী-বোঝাই করে! ঘর ভরে উঠতে লাগলো মিত্রার সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ ছবিতে। মামারা উৎসাহ দিলেন। আঁকবার হাত দেখে বিস্মিতও হলেন কম নয়, ছোট মামা তো পারলে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন, নয় তো দেন একজন শিক্ষক রেখে।

মামীরা বলেন—'ঘর-দোর সব যে রঙ্গীন হয়ে উঠলো মিত্রা!'

অর্দ্ধসমাপ্ত ছবিখানা, এ-কাতে সে-কাতে দেখতে দেখতে মিত্রা বলে—'শুধু কি বাড়ী-ঘর—আমার ছবি তোমাদের রং-শূন্য মন পর্য্যন্ত রাঙিয়ে তুলবে। এখন থেকে বুঝে চললে, প্রাতঃস্মরণীয়া না হোক, অন্তত ষান্মাসিক স্মরণীয়া মহিলার বন্ধু-খ্যাতি লাভের আশা করতে পার।'

কমলাকে লিখলো, তোমার নেশাটার স্বাদ অবশ্যি জানি নে, কিন্তু আমি যে নেশার স্বাদ পেয়েছি—মনে হচ্ছে তুমি বুঝি ভাই হেরেই গেলে। তোমারটায় মোহ-ঘোরে জগৎ আচ্ছন্ন করে, আর আমারটায় ফুলে-ফলে, লতা-পাতায়, মানুষে-প্রাণীতে মিলে গোটা জগৎটা জীবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। পাঠাচ্ছি অবাক-করা নমুনা।

রাণীকে লিখলো, যে ভাবেই হোক, পারিপার্শ্বিক শান্ত অশান্তি না করে চিঠি পাওয়া মাত্র চলে এসো—ভীষণ খবর!

রাণী তো ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে—'কি ব্যাপার?'

ইজেল-খাটানো ছবিটা দেখিয়ে মিত্রা বললো—'মিত্রা এঁকেছে। এবং এমনি আরও খান ত্রিশেক সমাপ্তি-পথে। তার মামারা বলছেন, সম্ভাবিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত এ সব ছবির ভেতর রয়েছে।'

—'ওঃ, এই তোমার ভীষণ কথা!'

—'কেন কমটা হলো কিসে?' মিত্রা ভ্রূ বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—'না, না, কম হতে যাবে কেন? ভালো আঁকতে পারাটা কি কি তুচ্ছ নাকি—না, চারটিখানি কথা! সত্যি খুব খুসী হয়েছি। তবে যে ভাবে চিঠি লিখেছ, ভয় পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছিলাম।'

—'ভয় পেয়েছিলে, আর ভয়ের নয় আনন্দের শুনে বুঝি নিরাশ কণ্ঠে বলে উঠলে—'ওঃ এই কথা!' ভাঁড়ানোর আর লোক পেলে না। আসলে ভেবেছিলে প্রেম-উপাখ্যান কিছু বলব।'

হেসে ফেললো রাণী।

—'আচ্ছা, আমি যদি সত্যি তেমন কোন কাহিনী তোমায় শোনাতাম—তোমার একটুও খারাপ লাগতো না?'

—'খারাপ লাগবে! কেন যে এখনও শোনাচ্ছ না আমি তাই ভাবি।'

—'ভাব? একেবারে চিন্তার বিষয়-বস্তু করে ফেলেছ?'

—'কি করি বল—

—'যে আমার সব নিতে পারে,
তারে আমি খুঁজিতেছি যেন।
বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই নিতে নাই কেহ।'

ভালোবাসব—তেমন ব্যক্তি কই? হ্যাঁ, ভালোই যদি বাসতে হয়, লোকে চাই যে, এমন ভাবী কালের মেয়েরাও হিংসে করবে আমায়! যেমন স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি পড়ে আমি ভগিনী নিবেদিতাকে হিংসে করি। তেমনি মহান্, তেমনি শ্রদ্ধেয় ভালোবাসা।'

—'বর্তমানে তেমন আসন শূন্য। তা আর কি করা যাবে! এখনকার নায়ক শ্রীনেহেরু। তাঁকে ভালোবাসতে পার।'

—'তাই তো বেসে বসেছিলাম। নিত্য-দিনের সন্ধ্যার মালাটি ছিল আমার তাঁর জন্য। কিন্তু হায়—'

—'দেখলে হয়ত মন টলতো।'

—'হয়তো! নিশ্চয় নয় কেন? কিন্তু এ হায়টা ভাই মিত্রার নিজের দুঃখে করেনি। করেছে নেহেরুজীর জন্য। কারণ, সে মালা আর মিত্রা তাঁর জন্য গাঁথে না।…কিন্তু তুমি এতটা উদার মনের হয়ে উঠলে কবে থেকে? আমি তো দূরে। এবার কার প্রভাবে?'

—'ইস্, আমার বুদ্ধি-বিবেচনা যেন কেবল ধারের কারবার করে চলে।'

সৌমী এসে রাণীর দিকে তাকিয়ে বললো—'তবু ভালো! আপনাকে দেখে মেয়ের মুখে আজ কথা শোনা যাচ্ছে।'

—'জান মামী, সব চাইতে ওস্তাদ কথক হলো মানুষের মুখ নয়—এই হাত দুটি। কাগজ-কলম, রং-তুলি, বাজনা—যা মন চায় বোস হাতে করে। গুণী হলে এমন জমবে, মুখ কথা ভুলে যাবে। দুনিয়াতে শান্তির শত্রুই হলো কথা। পৃথিবীর লোকগুলো যদি শান্তি-প্রস্তাব নিয়ে সম্মিলন না ডেকে, শুধু চুপ করে থাকবার প্রতিজ্ঞায় যার যার ঘরে বসে থাকতো—তবে শান্তি-প্রস্তাবের প্রশ্নই পৃথিবী থেকে উঠে যেত।'

—'যেন তোমার সঙ্গে কথার জন্য কত অশান্তি বেধেছে আমাদের রাণী বলে।'

—'বাধতে কতক্ষণ। জিবটি তো রসালো হয়েই আছেন। তার কি বল—সে তো বলেই মুক্তো সদৃশ দাঁতের সাজানো ঘটি আত্মগোপন করবে। তারপর যতই শাসাও তাকে টেনে বার করা সহজ কথা নয়।'

সৌমী আর রাণী হেসে ওঠে।

—'তাই দিব্য নির্ঝঞ্ঝাট কথা বলে মিত্রা তার—মুটে-মজুর আশ্রয়প্রার্থী, চিন্তামগ্নাদের সঙ্গে? আর ওরা যে শুধু আর সঙ্গেই কথা বলছে তা নয়। এবার ছড়িয়ে পড়বে তার কথা নিয়ে দেশে-বিদেশে। হাসছো তো? জান, মানুষের জীবন শুধু কতগুলো অসম্ভব ঘটনার সমষ্টি। কেউ বলতে পারে না, কাকে দিয়ে কি হবে আর না হবে—কার ভেতর কোন সম্ভাবনার বীজ লুকোনো রয়েছে! মিত্রা রায় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা শিল্পী—উঃ আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ

আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্ব-কাজে,
আনন্দ সর্ব-লোকে মৃত্যু বিরহ শোকে।'

মিত্রা উঠে এসে স্প্রিংএর খাটে ঝুপ করে ছেলেমানুষের মতো

...ে শুয়ে পড়লো !—মস্ত এক বক্তৃতান্তে মিত্রা ক্লান্ত। এবার ...া গান হোক। মামী !—অনুনয়ের দৃষ্টিতে মিত্রা সৌমীর দিকে ...।

সৌমীকে গাইতে হলো। বেচারী গান প্রায় ভুলেই গেছে। স্থানে অস্থানে দম নিয়ে কোন মতে শেষ করে বললো—'এমন বিশ্রী গান শুনাতে লজ্জা করে না ?'

—'একটুও নয়। তবে চর্চ্চা করা উচিত। আজ থেকে আমি ছবি আঁকব আর তুমি বসে বসে গান গাইবে। অর্থাৎ প্রেরণা সঞ্চারিত করবে আমার মনে, বুঝলে ?'

ছবি পেয়ে চিঠি লিখলো কমলা—'স্তম্ভিত হয়ে গেছি—হ্যাঁ, তোমার ছবি দেখে। তোমার ননদ-পতি বলছেন, লিখে দেও বৌদিটিকে এখানে চলে আসতে। ভিন্‌দেশীয় জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ...—তার পর তা আঁকুন। জান—কি মুশকিল বল তো, এর পর বেশ কিছুটা সময় গম্ভীর ভাবে চুপ করে থেকে যে তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে নেবো, তার উপায় নেই। যতই কলম থামিয়ে বসে থাকি, ...থাকব আমি। তুমি তো পড়ে যাবে দিব্য একটানা। মাঝে মস্ত এক হাইফেন দিলেই বা লাভ কি। চোখের হাইজাম্পে তো ...র দরকার হয় না।

যা বলছিলাম, জান তোমার ছবিগুলো এখানকার একটি পত্রিকা ...ে গেছে এবং নিয়েছে সবিশেষ আগ্রহের সঙ্গে। বাংলার ব্যাপারে ...র ভারি উৎসাহ। কিন্তু ছবিগুলো নিয়ে যাওয়ার পর বসে ভাবছি —মা গো, কি ভালো আমি! শহরশুদ্ধ লোককে ডেকে ডেকে, ...র মতো চায়ে আপ্যায়ন করে ছবি দেখালেন, তার পর একেবারে ...য়ে দিলেন কি না পত্র-পত্রিকায় প্রকাশার্থে। আর আমিও তাই ...ে দিলাম। যদি নাম কর, প্রশংসা ছাড়িয়ে পড়ে, আরও ছবি চায়, ...ী ছাপাতে, জীবনী লিখতে! পারব না সহ্য করতে বৌদি, পারব না। 'ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী—ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম—' না হলাম শিল্পী, ...না হলাম সাহিত্যিক, তাই বলে হিংসার শক্তিটুকুও ধরব না! প্রায় নিজেকে ধি-ধিক্কার দিয়ে উঠব—না, এই তো কি যেন একটা হুল-ফোটা যন্ত্রণা অন্তরে অনুভব করছি। রান্না কি হবে জিজ্ঞাসা করতে এলে অহেতুক এক প্রচণ্ড ধমক খেল বাবুর্চ্চি। ছেলেটার পিঠে পড়লো কিল-চড়। আর ভদ্রলোকটির অফিস-ফেরত শ্রান্ত অদৃষ্টে কি রয়েছে কে জানে! বাস্! সুমহতী ঈর্ষার উপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলো। এখন ভালো হতে পারাটা আরও সুমহান্ ধর্ম। প্রবৃত্তির উপরে চলে যাওয়াটাই হলো কথা। ষড়রিপু—অর্থাৎ ছয় শত্রু-ব্যেষ্টিত হয়ে না চললে শক্তির পরীক্ষা হবে কি করে! সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই না অভিমন্যু বীর। (মিত্রা দেবীর কোন এক সময়ের বক্তৃতার উদ্ধৃত অংশ হইতে।) তবে আর তাকেই লিখা কেন? আপন চরিত্রবল ঠিক রাখতে। নইলে কবে অপরের গোটা লেখা চালিয়ে দেব হাড়ে-মাংসে, কিন্তু স্বীকৃতিটুকু থাকবে না ছায়া অবলম্বনেরও। তার পর আসছ তো? বেশী বড় হয়ে উঠবার আগেই খাতির রাখতে চাচ্ছে কমলা—এই আর কি।'

মামারা খবর নিয়ে এলেন—সর্বভারতীয় প্রদর্শনী হবে দিল্লীতে। বহু সময় দিয়েছে—ছবি তৈরী কর।

এত আনন্দ, এত সার্থকতা—কল্পনা করতে পারে না মিত্রা। সময় যেন তার ডানায় বসিয়ে ওকে নিয়ে উড়ে চলেছে। রাতের স্বপ্ন দিনে আর ওকে পাড়ি দেয় না। জলের উপর শিশির-ধোয়া পদ্মের মত টলটলে মন নিয়ে ঘুম ভেঙ্গে উঠেই ও মগ্ন হয় ওর আঁকার সাধনায়। স্নানের ঘরের ভিজে দেয়ালে, রান্নাঘরের ধোঁয়োটে মলিনতায়, ছায়া-আবছায়া আলো-অন্ধকার—সর্বস্থানে মিত্রার চোখ দেখে কেবল ছবি আর ছবি। ঘোরে ওর চোখে দৃশ্যময় জগৎ। অদৃশ্য এক শক্তির পায় মাথা কুটে-কুটে প্রার্থনা করে—প্রতি কাজে অপর দশ জনের চাইতে যে অনন্যসাধারণতার পরিচয় দিয়েছি, বৈলক্ষণ্যের সেই বিশেষ নিপুণতা আজ হাত ভরে দেও ভগবান!

[ক্রমশঃ।

-ত্রুটি স্বীকার-

গত সংখ্যায় প্রকাশিত রাধারাণী দেবীর 'তুমি' কবিতাটি প্রকাশের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছি। কবিগুরুর মূল কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি ও শব্দ পরিবর্ত্তিত ক'রে রাধারাণী আমাদের যেরূপ ধোঁকা লাগিয়েছেন তাতে তাঁর সাহিত্যিক মনোবৃত্তি অপেক্ষা চৌর্য্যবৃত্তিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি "বুকের বীণা"র লেখিকা রাধারাণী নন। পাঠক-পাঠিকার জ্ঞাতার্থে আমরা এই মন্দকবিযশঃপ্রার্থিনীর ঠিকানা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। ঠিকানা—৬ সি, চক্রবেড়িয়া লেন, কলিকাতা-২০।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি—

অবশেষে ৩ বৎসর ১ মাস ৩ দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর গত ২৭শে জুলাই (১৯৫৩) কোরীয় সময় রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি হইয়াছে বটে, কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধের অবসান সূচিত হইয়াছে কি না, তাহা এখনও বলা অসম্ভব। ১৯৫১ সালের ১০ই জুলাই যে-যুদ্ধবিরতি আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, ২ বৎসর ১৬ দিন ধরিয়া নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে সে-আলোচনা অগ্রসর হইতেছিল এবং বহুবার সে-আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা সৃষ্ট হইয়াছিল, সে-সম্পর্কে চূড়ান্ত মতৈক্য হওয়া সম্ভব হয় ২৬শে জুলাই এবং ২৭শে জুলাই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ১২ ঘণ্টা পর যুদ্ধের বিরতি হয়। এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হওয়া যে কম্যুনিষ্ট পক্ষের গভীর আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছার জন্যই সম্ভব হইয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ স্বাধীন বিশ্ব তাহা হয়ত স্বীকার করিবে না। কিন্তু ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য অবশ্যই দিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিরূপে যুদ্ধবিরতি আলোচনায় বাধার পর বাধা, অচল অবস্থার পর অচল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল এবং অবশেষে কিরূপে ৮ই জুন (১৯৫৩) যুদ্ধবন্দী বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইল, সে-সম্পর্কে মাসিক বসুমতীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা আলোচনা করিয়াছি। যুদ্ধবন্দী বিনিময় সমস্যাই কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের পথে সর্ব্বশেষ প্রধান বাধা বলিয়া সকলের মনে হইয়াছিল। কিন্তু এই বাধা অপসারিত হওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিখণ্ডীরূপে দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সিংম্যান রী কিরূপে যুদ্ধবিরতির পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনা না করিলে যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তী রাজনৈতিক সম্মেলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, যুদ্ধবিরতি আলোচনাকে বানচাল করিবার জন্য ডাঃ রীর সর্ব্বশেষ অব্যর্থ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কম্যুনিষ্ট পক্ষের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার জন্যই যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু আন্তরিকতা ও সদিচ্ছারও যে একটা সীমা আছে সে কথাও আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। রাজনৈতিক সম্মেলনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত ডাঃ রীর অন্যায় জেদ পূর্ণ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রী চীন এবং উত্তর-কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট আত্মহত্যা করিয়া আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার পরিচয় দিতে পারে না। এই জন্য যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে, রাজনৈতিক সম্মেলনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ডাঃ রীর সম্মিলিত ফ্রণ্ট কি ভাবে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিবে তাহা বুঝিতে হইলে ডাঃ রী কি ভাবে বন্দীবিনিময় চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনাকে বানচাল করিবার শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক।

শিখণ্ডী সিংম্যান রী

বিশ্ববাসী সকলেই যখন আশ্বস্ত চিত্তে শীঘ্রই কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আশা করিতেছিল, এমন কি, কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার তারিখ ২৫শে জুন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হইবে, এইরূপ একটা কথাও শুনা যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রীর আদেশে ২৫ হাজার কম্যুনিষ্ট-বিরোধী উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীকে ১৮ই জুন মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ দিন রাতে কোরিয়াস্থ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক কমাণ্ডের যোগাযোগ-রক্ষী অফিসারগণ বন্দী-শিবিরগুলি হইতে ২৫ হাজার বন্দীর পলায়ন সম্পর্কে পানমুনজনে কম্যুনিষ্টদের হাতে এক পত্র দেন, ঐ পত্রে বলা হইয়াছে যে, পলায়িত বন্দীদিগকে পুনরায় গ্রেফতার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে। এই পত্র দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই আরও ১ হাজার ৮ শত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। সিংম্যান রী কিরূপে যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তি দিতে সমর্থ হইলেন, কোরিয়াস্থ মার্কিণ সামরিক কর্ত্তাদের সহযোগিতা ব্যতীত বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া তাঁহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইল?

কম্যুনিষ্ট-বিরোধী উত্তর-কোরীয় বন্দীদের মুক্তিদানের সংবাদ পাইয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল ১৮ই জুন কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর এবং এই সংবাদে তিনি গভীর ভাবে বিমূঢ় (**deeply shocked**) হইয়াছেন ও অত্যন্ত আঘাত (**greatly hurt**) পাইয়াছেন। কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিণ সর্ব্বাধিনায়ক জেঃ মার্ক ক্লার্ক ১৮ই জুন তারিখেই সিংম্যান রীকে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, কোরীয় সামরিক পাহারাদারদিগকে তাঁহার (জেঃ ক্লার্কের) আদেশ অমান্য করিতে এবং বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে তিনি (সিংম্যান রী) নির্দ্দেশ দেওয়ায় তিনি গভীর ভাবে বিক্ষুব্ধ (**profoundly shocked**) হইয়াছেন। জেঃ ক্লার্ক ২১শে জুন (১৯৫৩) এক বিবৃতিতে উত্তর-কোরীয় যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব সিংম্যান রীর ঘাড়ে চাপাইয়া বন্দীমুক্তির ব্যাপারে দক্ষিণ-কোরীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কমাণ্ডের যোগসাজস থাকা অস্বীকার করিয়াছেন। প্রথমেই জিজ্ঞাস্য এই যে, বন্দীমুক্তির সংবাদ শুনিয়া জেঃ ক্লার্ক সত্যই **profoundly shocked** হইয়াছিলেন কি? টোকিও হইতে প্রেরিত ১৮ই জুন তারিখের রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জেঃ ক্লার্কের হেড-কোয়ার্টার্সের একজন মুখপাত্র বলিয়াছেন, কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের কার্য্যতায় কোন বিস্ময় সৃষ্ট হয় নাই, কারণ উহা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বন্দীবিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এবং আসন্ন যুদ্ধবিরতির বিরুদ্ধে সিংম্যান রী যখন আস্ফালন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার এই আস্ফালনের

[illegible] মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহা [illegible] পক্ষেই অনুমান করা সম্ভব হয় নাই। তিনি একাই [illegible]রিয়া আক্রমণের যে হুমকী দিয়াছিলেন, তাহার উপর কেহই [illegible] আরোপ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে উত্তর-কোরিয়া [illegible]র বিরুদ্ধে হিসাবে কম্যুনিষ্টবিরোধী উত্তর কোরিয় বন্দী-[illegible] মুক্তি দিতে পারেন, এই কথাটাই হয়ত অনেকের মনে জাগ্রত [illegible] নাই। ৮ই জুন (১৯৫৩) বন্দীবিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয় [illegible]র দুই দিন পরে ১০ই জুন তারিখে বিলাতের 'টাইমস' [illegible] পানমুনজনস্থ বিশেষ সংবাদদাতা যে সংবাদ প্রেরণ করেন [illegible] উত্তর-কোরিয় বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার গুজব রটনা [illegible]র কথা আছে। উক্ত বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—
"Among reumours circulating here is one that the Korean troops at present gaurding some 40,000 communist prisoners who object to being repatriated will be suddenly withdrawm leaving the prisoners free to go where they wish." [illegible] 'এখানে যে সকল গুজব রটিয়াছে তন্মধ্যে একটি গুজব [illegible] স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে অনিচ্ছুক ২৬ হাজার কম্যুনিষ্ট বন্দীদিগকে [illegible] কোরীয় সৈন্য বর্ত্তমানে পাহারা দিতেছে, বন্দীদিগকে যেখানে [illegible] খুসী যাওয়ার স্বাধীনতা দিবার জন্য তাহাদিগকে হঠাৎ সরাইয়া লওয়া [illegible]।' বন্দীবিনিময় চুক্তি হওয়ার দুই দিন পরেই এই গুজব রটিয়াছিল এবং এই গুজব রটনার ৮ দিন পরে বন্দীদিগকে মুক্তি [illegible] হয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া বন্দীদিগকে যাহাতে [illegible] দেওয়া না হইতে পারে, তাহার জন্য জেঃ ক্লার্ক কোন ব্যবস্থা [illegible] করেন নাই কেন? গুজবকে তিনি ভিত্তিহীন বলিয়া মনে [illegible] করিয়াছিলেন কি? কিন্তু তাঁহার হেড-কোয়ার্টার্সের জনৈক [illegible]র উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, বন্দীমুক্তির ব্যাপারটা [illegible] অপ্রত্যাশিত ছিল না।

সিংম্যান রী অবশ্য ১৯শে জুন (১৯৫৩) এক বিবৃতিতে [illegible], 'কম্যুনিষ্ট-বিরোধী বন্দীদিগকে ইহার অনেক পূর্ব্বেই মুক্তি [illegible] উচিত ছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমাণ্ড এবং অন্যান্য [illegible]র সহিত আলোচনা না করিয়াই আমি কেন ইহা করিয়াছি, [illegible] কারণ এত স্পষ্ট যে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।" কিন্তু সেই সঙ্গে [illegible] ইহাও জানাইয়াছেন যে, "Most of the U. N. authorities with whom I have spoken about our desire to release prisoners-of-war are with us in sympathy and principle." অর্থাৎ 'যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তি [illegible] আমাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে যে সকল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ [illegible]র সহিত আমি আলোচনা করিয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশই [illegible] সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন এবং নীতির দিক হইতে আমাদের একমত।' সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে-সকল কর্ত্তাব্যক্তির [সহিত] তিনি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কাহারা? এ সম্পর্কে [illegible] কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু [illegible] জুন সিউলে সিংম্যান রীর গৃহে একটা বৈঠক হইয়াছিল। [illegible] চীফস্ অব-ষ্টাফের মনোনীত চেয়ারম্যান এডমিরাল [illegible], দক্ষিণ কোরিয়াস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত এলিস ও ব্রিগস্,

মার্কিণ অষ্টম বাহিনীর কম্যাণ্ডার লেঃ জেঃ ম্যাক্সওয়েল টেইলর, প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রী এবং তাঁহার পররাষ্ট্র-সচিব পিটন তুন তায় এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বৈঠকে কি আলোচনা হইয়াছে, তাহা গোপন রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই বৈঠকের ছয় দিন পরেই ২৫ হাজার ৮ শত উত্তর-কোরীয় বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই বৈঠকেই বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার কথা আলোচিত হইয়াছিল এবং বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার নীতি সম্পর্কে রীর সহিত একমত হইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। গত ১৯শে জুন (১৯৫৩) পিকিং রেডিও মারফৎ 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী' যে সংবাদ পরিবেশন করেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-কোরিয়ার জাতীয় পরিষদে অবিলম্বে অনিচ্ছুক সমস্ত কোরিয়া বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার এবং অনিচ্ছুক চীনা বন্দীদিগকে ফরমোসায় পাঠাইয়া দেওয়ার এক প্রস্তাব ৯ই জুন তারিখে গৃহীত হয়। এই সংবাদ সত্য নয় মনে করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। যুদ্ধবন্দীরা বন্দী শিবির ভাঙ্গিয়া পলাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কথাও জেঃ ক্লার্কের হেড অফিস হইতে ওয়াশিংটনস্থ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই জানানো হইয়াছিল।

মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদে নিউ ইয়র্কের সদস্য মিঃ ইমানুয়েল সেলার বলিয়াছেন, "রীর কার্য্য মার্কিণ অফিসারগণ পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া বাধা দিতে পারিতেন, কারণ এ সম্পর্কে পূর্ব্বেই যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" কোরিয়াস্থ মার্কিণ সামরিক কর্ত্তারা যে শুধু চোখ বুঁজিয়া ছিলেন, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধবন্দী শিবিরের একজন সিনিয়র অফিসার ২০শে জুন বলিয়াছেন, "মার্কিণ নিরাপত্তা গার্ডদিগকে পলায়নপর বন্দীদিগকে গুলী না করিবার জন্য কড়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।" উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে শুধু একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। দেশে ফিরিতে অনিচ্ছুক বন্দীর ধুয়া তুলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত করিয়াছিল। উহার বিরুদ্ধে শুধু বিশ্বজনমতের প্রতিবাদ এবং আমেরিকার মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিবাদ বাধ্য হইয়া অবশেষে গত ৮ই জুন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট পক্ষের সহিত বন্দীবিনিময় চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য হয়। এই চুক্তিকে ব্যর্থ করিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিবার একটি পথই খোলা ছিল—কম্যুনিষ্ট বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরোক্ষ ভাবে এই পন্থা গ্রহণ করার পথে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। নিজের মুখ রক্ষা করিয়া এই পন্থা গ্রহণ করা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই এই অপকর্ম্মটি মার্কিণ তাঁবেদার সিংম্যান রীকে দিয়া করাইয়া লওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তথ্যেরও অভাব নাই। ডাঃ রী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহাদের সৈন্যসামন্ত সহ কোরিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য হুকুম করিয়াছেন এবং জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি কিছুতেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি মানিবেন না। দক্ষিণ কোরিয়ার ২১ হইতে ২৭ বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে তিনি সৈন্য হইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি হুমকী দিয়াছেন, যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ভারতীয় সৈন্য দক্ষিণ-কোরিয়ায় অবতরণ করিলে তাহাদের

সহিত দক্ষিণ-কোরীয় সৈন্যদের সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিবে। ডাঃ রী আরও জানাইয়া দিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চল হইতে তাঁহারা সরিয়া আসিবেন না, পোল ও চেক সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিবেন। মার্কিণ কর্তৃপক্ষ সিংম্যান রীর এই সকল ঔদ্ধত্য দমনের জন্য কিছু করেন নাই, বরং তাঁহাকে তোয়াজ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

উত্তর-কোরীয় বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার পর প্রেঃ আইসেনহাওয়ার শুধু নিয়ম রক্ষা গোছের এক প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তিনি মার্কিণ সহকারী রাষ্ট্র-সচিব মিঃ রবার্টসনকে ডাঃ রীর সহিত আলোচনা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ডাঃ রী-ই মিঃ রবার্টসনকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সে-সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীজওহরলাল নেহরু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার প্রস্তাব করেন কিন্তু মার্কিণ কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব পছন্দ হয় নাই। যে সকল দেশের সৈন্য কোরিয়ায় যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, যেরূপ অবস্থা চলিতেছে, সেইরূপ অবস্থা চলিতে দেওয়াই উচিত। ছাড়িয়া দেওয়া বন্দীদিগকে ধরিবার কোন চেষ্টাই হইতেছে না। জেঃ ক্লার্ক গত ২৯শে জুন (১৯৫৩) কম্যুনিষ্টদের পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে পুনরায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ছাড়িয়া দেওয়া বন্দীদিগকে পুনরায় ধরা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া তিনি কবুল জবাব দিয়াছেন। দক্ষিণ-কোরিয়ার জনগণের সঙ্গে তাহারা মিশিয়া গিয়াছে বলিয়াই কি তাহাদিগকে ধরা অসম্ভব, কিন্তু মুক্ত বন্দীদিগকে বেশ দ্রুত দক্ষিণ-কোরীয় বাহিনীতে গ্রহণ করা হইতেছে। এই সকল মুক্ত বন্দীর আছে অন্ন-সমস্যা। দক্ষিণ-কোরিয়ার জনসাধারণ কত দিন তাহাদিগকে খাইতে-পরিতে দিতে পারিবে? কাজেই মুক্ত বন্দীদিগকে ধরিতে পারা অসম্ভব নয়। জেঃ ক্লার্ক তাঁহার পত্রে ইহাও বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টরা যে-পঞ্চাশ হাজার দক্ষিণ-কোরীয় যুদ্ধবন্দীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে পুনরায় ধরা যেরূপ অসম্ভব, মুক্ত উত্তর-কোরীয় বন্দীদিগকে ধরাও তেমনি অসম্ভব। কম্যুনিষ্টরা পঞ্চাশ হাজার দক্ষিণ-কোরীয় যুদ্ধবন্দীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই অভিযোগ এত দিন তাঁহারা উত্থাপন করেন নাই কেন? এই অভিযোগ সিংম্যান রীর পক্ষে মার্কিণ কর্তৃপক্ষের সাফাই ছাড়া আর কিছুই নহে। গত ১৮ই জুন তারিখেই সিনেটর ম্যাকার্থি বলিয়াছেন, 'পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতাপ্রিয় লোকেরা সিংম্যান রীর কাজের প্রশংসাই করিবে।' সিনেটর উইলে (Wiley) বলিয়াছেন, 'ক্রেমলিন যদি শান্তি চায়, তাহা হইলে বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য কোরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত বা বিলম্ব হওয়া উচিত নয়।' জেঃ ক্লার্কের পত্রের মধ্যে কি উহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না?

মার্কিণ সিনেটের সামরিক বাহিনী কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর ষ্টাইল ব্রীজেস বলিয়াছেন, "কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি আলোচনা যদি ব্যর্থ হয় এবং আমাদের তথাকথিত মিত্রবর্গ যদি অধিকতর সক্রিয় সহযোগিতা করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে আমেরিকার একাই অগ্রসর হওয়া উচিত!...আমি মনে করি, যুদ্ধ শেষ করার জন্য আমাদের পরমাণু-বোমা বর্ষণ করা খুবই সঙ্গত হইবে।" সিংম্যান রীর দাবীর সহিত তাঁহার এই উক্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রী চাহেন, যুদ্ধবিরতির আগেই দক্ষিণ-কোরিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা চুক্তি করিতে হইবে। চীনা সৈন্য ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনীকে একই সঙ্গে কোরিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। রাজনৈতিক সম্মেলন ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করিতে হইবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। রী-রবার্টসন গোপন আলোচনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রীর দাবী কতখানি মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। চুক্তির বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই। যুক্ত কমিউনিকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কতগুলি অর্থহীন কথার সমষ্টি মাত্র।

কম্যুনিষ্টদের সদিচ্ছা

রী-রবার্টসন আলোচনা সম্পর্কে যুক্ত কমিউনিক প্রকাশিত হওয়ার পর ডাঃ রী এবং তাঁহার মুখপাত্রগণ এমন সমস্ত উক্তি করিয়াছেন, যেগুলি যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাইবার পক্ষে খুবই পর্য্যাপ্ত ছিল। ডাঃ রী যুদ্ধবিরতি চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। কিন্তু ইহাও সকলেরই জানা কথা যে, মার্কিণ সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যেই তিনি যুদ্ধ চালাইতে চান। কিন্তু যুদ্ধবিরতির আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তাঁহার আপ্রাণ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে কম্যুনিষ্ট পক্ষের সদিচ্ছার জন্য। ডাঃ রী যে ১৩ হাজার যুদ্ধবন্দীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহাদিগকে পুনরায় গ্রেফতার করার জন্য কম্যুনিষ্ট পক্ষ কোন দাবী আর যুদ্ধবিরতি আলোচনায় উত্থাপন করেন নাই। তাঁহারা রাজনৈতিক সম্মেলনে এই দাবী উত্থাপন করিতে পারিবেন। কিন্তু উহা পরের কথা। দক্ষিণ-কোরিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি মানিয়া চলিবে—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ হইতে যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আস্থা স্থাপন করা কঠিন। জেঃ ক্লার্ক বন্দী-বিনিময় চুক্তি হওয়ার পর ডাঃ রীর সদিচ্ছা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন; এই আশ্বাস দেওয়ার পরই ডাঃ রী ২৬ হাজার যুদ্ধবন্দীকে ছাড়িয়া দেন। তথাপি কম্যুনিষ্ট পক্ষ যুদ্ধবিরতি চুক্তি করিতে রাজী হইয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে কম্যুনিষ্ট পক্ষের দুর্ব্বলতা বলিয়াই মনে করিতেছেন। কিন্তু কয় বৎসর যুদ্ধ করিয়াও মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গ কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিতে পারে নাই, এ কথা বিবেচনা করিলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের মধ্যে শান্তির জন্য কম্যুনিষ্ট পক্ষের আন্তরিক আগ্রহেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট শান্তির জন্য অনুরূপ কোন আগ্রহের পরিচয় এ-পর্য্যন্ত দেয় নাই। যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও প্রেঃ আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ ডুলেস যে সকল উক্তি করিয়াছেন, ডাঃ রীর সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে নিরাপত্তা চুক্তি হইয়াছে এবং রী-ডুলেস আলোচনার পর যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যুদ্ধবিরতিকে বানচাল করিবার অভিপ্রায় সুপরিস্ফুট।

রী-মার্কিণ চক্রান্ত

যুদ্ধবিরতি চুক্তি যদিই সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে কিরূপে উহাকে বানচাল করা যাইতে পারে তাহার সলা-পরামর্শ রী-রবার্টসন

...ক হইতেই সুরু হয়। রী-রবার্টসন বৈঠকের ফলাফল প্রকাশ হয় নাই বটে, কিন্তু উক্ত বৈঠকের পরবর্ত্তী সময়ে রী-রবার্টসন ও ডাঃ রীর বিভিন্ন উক্তি হইতে উহা অনুমান করিতে পারা যায়। ১৭ই জুলাই (১৯৫৩) বেতার বক্তৃতায় মিঃ রবার্টসন বলিয়াছেন যে, যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তী রাজনৈতিক সম্মেলনে কম্যুনিষ্টরা যদি সদিচ্ছার সঙ্গে আলোচনা না চালায়, তাহা হইলে সম্মিলনের জাতিপুঞ্জের কম্যাণ্ড সম্মেলনটা ধাপ্পা ও শঠতামূলক চালাকী বলিয়া ধার্য্য করিয়া উহার অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন। দক্ষিণ-কোরিয়া কেন যুদ্ধবিরতিকে ভয় করে তাহার কারণ বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই আলাপ-আলোচনা দ্বারা তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য যুদ্ধবিরতি তাহাদের একটা কৌশল ও ফাঁকি মাত্র। কিন্তু তাঁহার এই উক্তিটা যে প্রকৃত পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ডাঃ রীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। তিন বৎসর তেত্রিশ দিন যুদ্ধ করিয়াও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উত্তর-কোরিয়া দখল করিয়া ডাঃ রীর অধীনে অখণ্ড কোরিয়া গঠন করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক সম্মেলনকে সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সিওল যাত্রার পূর্ব্বে মিঃ ডুলেসের উক্তি এবং ডাঃ রীর সহিত তাঁহার বৈঠকের পর উভয়ের যুক্ত বিবৃতি হইতে ইহা অনুমান করা কঠিন হয় না। মিঃ ডুলেস ২৮শে জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, রাজনৈতিক সম্মেলনের অগ্রগতি ভাল ভাবে না চলিলে মার্কিণ প্রতিনিধিরা ৯০ দিন পরে সম্মেলন ত্যাগ করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ডাঃ রীকে দিয়াছেন। রী-ডুলেস বৈঠকের পর যে-যুক্ত বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। রী-ডুলেস বৈঠকের পূর্ব্বে ডাঃ রী বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে-পর্য্যন্ত কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিতে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিবে সে-পর্য্যন্ত তিনি রাজনৈতিক সম্মেলনকে বানচাল করিবেন না। কিন্তু জাতিপুঞ্জ এই পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে তিনি একাই অবস্থার সম্মুখীন হইবেন। আমেরিকার খুঁটির জোরেই তিনি এই হুমকী দিবার সাহস পাইয়াছেন। দক্ষিণ-কোরিয়ার ১৬ ডিভিসন সৈন্যের মধ্যে ৮ ডিভিসন সৈন্যই প্রাক্-যুদ্ধবিরতি যুদ্ধে একরূপ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। রী গবর্ণমেণ্ট ঐক্য কোরিয়া গঠনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১৯৪৮ সালের ১২ই ডিসেম্বরের প্রস্তাবের উপর জোর দিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবে সমগ্র কোরিয়াতে রী গবর্ণমেণ্টকে একমাত্র আইনসঙ্গত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ডাঃ রী চাহেন, দক্ষিণ-কোরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া যে-জাতীয় পরিষদ গঠিত হইয়াছে উত্তর-কোরিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা উহার অবশিষ্ট আসনগুলি পূর্ণ করিয়া ঐক্য কোরিয়া গঠন করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই তাঁহার অধীনে ঐক্য কোরিয়া গঠিত হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও ইহাই চায়। রাজনৈতিক সম্মেলনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রতিনিধিগণ মিলিয়া ঐরূপ প্রস্তাবই উত্থাপন করিবেন এবং ৯০ দিনের মধ্যে ঐ প্রস্তাব গৃহীত না হইলে তাঁহারা সম্মেলন হইতে চলিয়া যাইবেন। তার পর ঐক্য কোরিয়া গঠনের জন্য কবে যুদ্ধ আরম্ভ করা হইবে তাহা অবশ্য আমেরিকার সম্মতি ব্যতীত স্থির করা হইবে না।

উক্ত যুক্ত বিবৃতি ঘোষিত হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ-কোরিয়ার মধ্যে একটি দেশরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্টরা বিনা প্ররোচনায় পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়াকে সাহায্য করিবে। এদিকে গত ৭ই আগষ্ট কোরিয়া যুদ্ধে সৈন্য-প্রেরণকারী ষোলটি দেশ এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া কম্যুনিষ্টদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, দক্ষিণ-কোরিয়ার উপর নূতন আক্রমণ হইলে তাহারা বাধা তো দিবেই, তাহাদের যুদ্ধ সীমান্তের মধ্যে আবদ্ধও থাকিবে না। যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পরই ২৭শে জুলাই ওয়াশিংটনে এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করা হয়। এই সকল হুমকীর পটভূমিতে মনে আশঙ্কা জাগে যে, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবার অজুহাত সৃষ্টির জন্য ডাঃ রী যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া উত্তর-কোরিয়ার সহিত সংঘর্ষ বাধাইবেন এবং উহার দায়িত্ব উত্তর-কোরিয়ার উপর চাপাইয়া যুদ্ধ সুরু করা হইবে।

ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের জন্য লাল চীনের সহিত আলোচনা দ্বারা চুক্তি না করিলে চলিবে না। কিন্তু মিঃ ডুলেস স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, জাতিপুঞ্জে লাল চীনের প্রবেশ নিরোধ করিবার জন্য আমেরিকা ভেটো পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে পারে। লাল চীন আত্মহত্যার চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে ইহাই কি মিঃ ডুলেস আশা করেন? কম্যুনিষ্টরা সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যাহা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন রাজনৈতিক সম্মেলনে তাহাই স্বেচ্ছায় তাঁহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করিবেন, ইহাও কি মিঃ ডুলেস প্রত্যাশা করেন? মার্কিণ-দক্ষিণ-কোরিয়া নিরাপত্তা চুক্তি অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়ায় নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীর জন্য ঘাঁটি স্থাপন করিতে পারিবে। কিন্তু যুদ্ধবিরতির যে চুক্তি করা হইয়াছে তাহাতে কোরিয়া হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণের প্রশ্নটি আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসা করার সর্ত্ত আছে। উক্ত চুক্তি দ্বারা যুদ্ধবিরতি চুক্তির এই সর্ত্তটির খেলাপ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়ার সহিত নিরাপত্তা চুক্তি করিলে লাল চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া উত্তর-কোরিয়ার সহিত অনুরূপ চুক্তি করিবে না, করিতে পারিবে না কিম্বা তাহাদের ঐরূপ চুক্তি করা সঙ্গত নয়, ইহা মনে করিবার কোন কারণ আছে কি? মার্কিণ-দক্ষিণ কোরিয়া নিরাপত্তা চুক্তি এবং রী-ডুলেস বৈঠকের মধ্যে রাজনৈতিক সম্মেলন ব্যর্থ করিবার জন্য রী-মার্কিণ চক্রান্তই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

রাশিয়ার হাইড্রোজেন বোমা—

গত ৮ই আগষ্ট (১৯৫৩) মিঃ ডুলেস কর্ত্তৃক দক্ষিণ-কোরিয়ার সহিত নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করা, রী-ডুলেস যুক্ত বিবৃতি ঘোষণা করা এবং কোরিয়া যুদ্ধে জাপানকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ কুইকু দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে দেওয়ার ঘোষণা করার অব্যবহিত পরেই সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ম্যালেনকভ সর্বোচ্চ সোভিয়েটের যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, হাইড্রোজেন বোমা এখন আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়, উহার উৎপাদন-কৌশল সোভিয়েট রাশিয়াও আয়ত্ত করিয়াছে। রাশিয়া পরমাণু বোমা তৈয়ার করিয়াছে, এই সংবাদ পাওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যেরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছিল, রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করার সংবাদে সেরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। উহাকে রাশিয়ার প্রচারকার্য্য বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এ-সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করেন নাই! কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুই জন শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী মঃ ম্যালেনকভের দাবীতে বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জেনারেল সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, ইহাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হয়, তিনি মনে করেন, রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার না করিলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত না।

ডাঃ মোসাদ্দেকের জয়—

মজলিশ ভাঙ্গিয়া দিবার প্রশ্ন লইয়া ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেক যে রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়াছেন। অধিকাংশ ভোটারই মজলিশ ভাঙ্গিয়া দিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই জয় ডাঃ মোসাদ্দেকের বিপুল জনপ্রিয়তার পরিচায়কই শুধু নহে, তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মজলিশের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করার পর হইতে গত ছয় মাস ধরিয়া ব্যাপক সঙ্কট অতিক্রম করার মধ্যে তাঁহার রাজনৈতিক কৌশলের সার্থকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। মজলিশ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে। তিনি কৌশলে মজলিশকে পঙ্গু করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে নেশন্যাল ফ্রন্টের ও তাঁহার সমর্থক ডেপুটিগণ পদত্যাগ করিলেন। ফলে কোরামের অভাবে মজলিশের আর কিছুই করিবার ক্ষমতা রহিল না। এই অবস্থায় তিনি উপস্থিত করেন মজলিশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রস্তাব। ইরাণের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী একমাত্র শাহই মজলিশ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। কাজেই মজলিশ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রেফারেণ্ডাম সম্পর্কে কোন বিধান শাসনতন্ত্রে নাই। মার্কিণ প্রেঃ আইসেনহাওয়ার এইরূপ রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রবিরোধী বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু কিছুই তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই। রেফারেণ্ডামে তাঁহার বিপুল জয় হইয়াছে। এই জয়লাভে কম্যুনিষ্ট তুদে পার্টি সাহায্য করিয়াছে, এ কথা সত্য। কিন্তু ইহাতে জন-মানসের উপর তুদে পার্টির প্রভাবই সূচিত হইতেছে। অতঃপর মন্ত্রিসভায় তুদে পার্টিকে গ্রহণ এবং সৈন্য ও পুলিশ বিভাগ হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগকে বিতাড়ন করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

তুদে পার্টির সহিত ডাঃ মোসাদ্দেকের সহযোগিতা ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের দুশ্চিন্তার কারণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাশিয়ার সহিত ইরাণের সমস্ত বিরোধ মিটাইবার জন্য যে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ইঙ্গ-মার্কিণ শিবির উদ্বিগ্ন না হইয়া পারিবে না। সীমান্ত লইয়া রাশিয়ার সহিত ইরাণের ১৯ দফা বিরোধ আছে। তাছাড়া ১১ টন সোনার উপর ইরাণের দাবী লইয়াও বিরোধ রহিয়াছে। আলোচ্য বৈঠকে এই সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য আলোচনা হইবেই, তাছাড়া ১৯২১ সালের সন্ধিও ইরাণের অনুকূলে করিয়া পরিবর্ত্তন করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। ডাঃ মোসাদ্দেক অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকটেও সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তাঁহার

উত্তরে প্রে: আইসেনহাওয়ার ডা: মোসাদ্দেককে বৃটেনের সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে ইরাণের জনগণের মধ্যে মার্কিণবিরোধী মনোভাব আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

তৈলের আয়টা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ইরাণের অনেক অসুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তৈলের আয় যখন পাওয়া যাইত তখনও তাহাদের দুরবস্থার সীমা ছিল না, এখনও তাহাদের সেই অবস্থাই রহিয়াছে। অর্থের অস্বচ্ছলতা ঘটিয়াছে শুধু ধনী শ্রেণীর। ইহার ফলে ডা: মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার শক্তিও তাহাদের হ্রাস পাইয়াছে। সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তৈলের আয় বন্ধ হইয়া গেলে ছয় মাসের মধ্যে ইরাণের পতন ঘটিবে। কিন্তু তৈলের আয় বন্ধ হওয়ার দুই বৎসর পার হইলেও ইরাণের অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে সরকারী খরচ চালান যে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, এ কথাও অনস্বীকার্য্য। তা ছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকেও স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। মোল্লা কাশানি এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, ইরাণের জাতীয় ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্ক মেল্লি' যে ৭৫০ কোটি রিয়ালের নোট প্রচলন করিয়াছে যাহার পিছনে কোন মজুত স্বর্ণ বা সিকিউরিটি নাই। সম্প্রতি মি: হোসেন মাক্কীকে ব্যাঙ্ক মেল্লির সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হইয়াছে। মোল্লা কাশানি এবং মি: মাক্কী প্রথমে ডা: মোসাদ্দেকের সমর্থক ছিলেন। এখন তাঁহার বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের তৈল খনিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার সমর্থক ছিল। কারণ, তাহার আশা ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর মার্কিণ তৈল কোম্পানী ইরাণের তৈল খনিগুলি ইজারা লইতে পারিবে। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। অথচ এদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ডা: মোসাদ্দেকের নীতি সমর্থন করায় ইঙ্গ-মার্কিণ বিরোধ তীব্রতা লাভ করে। অতঃপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক নূতন প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই যে, 'এ্যাংলো ইরাণী তৈল কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন মীমাংসার জন্য ইরাণ শালিস নিয়োগের প্রস্তাব মানিয়া লইলে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের তৈল ক্রয় করিবে। ডা: মোসাদ্দেক এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট রাগিয়া ইরাণ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেন, ইরাণের তৈল তাঁহারা ক্রয় করিবেন না। এই বাগেই প্রে: আইসেনহাওয়ার ডা: মোসাদ্দেকের সাহায্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। আলাপ-আলোচনার দ্বারা রাশিয়ার সহিত ইরাণের বিরোধগুলির যদি মীমাংসা হয় তবে রাশিয়া ইরাণের তৈল ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে ইরাণের আর্থিক সমস্যারই শুধু সমাধান হইবে না, আবাদানের তৈল কারখানাতেও পুনরায় কাজ আরম্ভ হইতে পারিবে। রেফারেণ্ডামে ডা: মোসাদ্দেক জয়লাভ করায় মজলিশ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনে যে ডা: মোসাদ্দেকই জয়লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার পরিণামে ইরাণের শাহকে সিংহাসন ত্যাগ করিতেও হইতে পারে।

ফ্রান্সে ব্যাপক ধর্ম্মঘট—

সম্প্রতি ফ্রান্সে যে-ব্যাপক ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছে, ১৯৩৬ সালের পর এইরূপ ধর্ম্মঘট ফ্রান্সে আর হয় নাই। এই ধর্ম্মঘটের প্রধান কারণ অর্থ-নৈতিক। কিন্তু এই অর্থ-নৈতিক কারণটি উদ্ভূত হইয়াছে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ফ্রান্সের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে বলিয়া। ব্যয় হ্রাসের জন্য গবর্ণমেণ্ট সরকারী চাকুরীগুলিতে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের মনস্থ করেন। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে পেনসান লওয়ার বয়স হ্রাস এবং বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা অন্যতম। ক্রমাগত জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি এবং বাসগৃহের অভাব ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। গত দেড় বৎসরে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ এই সময়ে অধিকাংশ স্থলেই বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের ডাকে সাড়া দেওয়ার পক্ষে উহা একটি প্রধান প্রেরণা যোগাইয়াছে। ধর্ম্মঘটের পিছনে আরও একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে—কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণপন্থীদলের কোয়ালিসনে গঠিত গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ করিয়া বামপন্থী পপুলার ফ্রন্ট গবর্ণমেণ্ট গঠন করা।

৭ই আগষ্ট (১৯৫৩) হইতে এই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে কম্যুনিষ্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করে নাই। পরে তাহারাও এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। সোশ্যালিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন, কম্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন, খৃষ্টান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, এমন কি, ফ্রান্সের রক্ষণশীল ট্রেড ইউনিয়ন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফেডারেশন অব পাবলিক সার্ভিস পর্য্যন্ত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করায় উহা ৪০ লক্ষ লোকের এক সর্ব্বাত্মক ধর্ম্মঘটে পরিণত হইয়াছে। যানবাহন চলাচল, ডাকবিলি প্রভৃতি বন্ধ হওয়ায় সমগ্র ফ্রান্সের জীবনযাত্রা একরূপ অচল হইয়া উঠিয়াছে।

ফ্রান্সের ঘরে এই সঙ্কটের কারণ তাহার সাম্রাজ্য-সঙ্কট। গত সাত বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ফ্রান্স সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে। আমেরিকার নিকট হইতে বিপুল সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্স সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি ভিয়েটনামে হানয় হইতে ১৫০ মাইল দূরবর্ত্তী ফ্রান্সের নাসাম দুর্গের পতন ঘটিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসেও (১৯৫২) এই দুর্গটি ভিয়েটমিনদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল এবং উহার পতন আসন্ন হওয়ার কথাও শোনা গিয়াছিল। ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী এই দুর্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হওয়ার কথাও প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, ভিয়েটমিনরা এই দুর্গ দখলের জন্য আক্রমণ না চালাইয়া উহাকে পাশে রাখিয়া অগ্রসর হয়। ইহার ছয় মাস পরেই নাসাম দুর্গের সামরিক মূল্য কমিয়া গেল কেন, ইহা কি তাজ্জব ব্যাপার নয়? এদিকে মরক্কোতেও গৃহযুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। মরক্কোর সুলতান এই আসন্ন গৃহযুদ্ধ দমনের জন্য ফ্রান্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

ও

চিত্রাভিনেতা শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য

[আজ থেকে ২৭।২৮ বছর আগেকার কথা। সে-যুগ ছিল **নির্ব্বাক্** চলচ্চিত্রের যুগ। সে-যুগে যাঁরা এ শিল্পজগতে যোগদানের ছাড়পত্র নিয়েছিলেন সমাজ-জীবনে তাঁদের অজস্র বাধা-বিপত্তি ও নিন্দাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে **শিল্পের সত্যিকারের দরদী হিসেবে যাঁরা একে আঁকড়িয়ে রাখলেন,** তাঁদের অন্যতম প্রধান বলতে পারি খ্যাতিমান্ শিল্পী শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্যকে। প্রথম অবস্থায় বহু বাধা আর আপত্তি পথ আগলে রেখেছিল তাঁর এগোবার—শুধু সামাজিক দিক থেকে নয়, পারিবারিক দিক থেকেও। কিন্তু আশ্চর্য্য, তখনকার দিনে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সকলেই যখন সন্দেহাকুল, সেই সময় নির্ভীক্ যুবক অন্ধকার ঠেলে পথ করে নিলেন আপনার। সে সময়ে আর একটি প্রচণ্ড বাধা ছিল তাঁর সরকারী চাকুরি। চলচ্চিত্র-শিল্পে প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় বেরিয়ে এলেন তিনি সেখান থেকে। তার পর একমন একনিষ্ঠা নিয়ে অবিচল ধৈর্য্য সহকারে সেধে চলেছেন তিনি আপনার ব্রত আজ অবধি। তার ফলস্বরূপে আমরা দেখতে পেলুম শুধু তিনি নিজেই—প্রখ্যাত শিল্পী হয়েছেন তা নয়, তাঁর ন্যায় নিষ্ঠাবান্ শিল্প-পূজারীদের পেয়ে বাঙ্গালার চলচ্চিত্র-শিল্পও এ ক'-বছরেই অনেক দূর এগিয়ে গেল।

এবারের সংখ্যায় শিল্পীদের মতামত সংগ্রহের জন্য যখন ভাবছি, তখন কি জানি কেন ধীরাজ বাবুর কথাই আমার মনে হ'লো। তাই তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলুম সাক্ষাৎ আলোচনার দিন, সময় স্থির করবার জন্যে। দিনও স্থির হয়ে গেল এমনি একটি দিনে যেদিন তাঁর স্যুটিং ছিল না। আমাকে জানিয়ে দিলেন সাক্ষাৎ হবে তাঁর নিজ গৃহে নয়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিত্র-পরিচালক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের গৃহে। এইখানেই আমাদের প্রাথমিক কথা শেষ হ'লো অবশ্যি টেলিফোনযোগে। স্থানটা প্রেমেন বাবুর গৃহে কেন নির্ব্বাচন করা হ'লো, জানবার একটা সাধারণ কৌতূহল থেকে গেল আমার মনে।]

শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য

২৩শে শ্রাবণ, সকাল ৯টা। স্থান—সাহিত্যিক ও পরিচালক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের বহির্ব্বাটীর একটি কক্ষ। কক্ষটি ক'খানা কোচ, এ'খানা টেবিল দ্বারা সজ্জিত। কাঁটায়-কাঁটায় ৯টায় উপস্থিত হলুম। একতলা বাড়ীটির মধ্যে প্রবেশ করতেই মনে হ'লো কবি ও সাহিত্যিকের বাড়ীই বটে। লতাকুঞ্জ, ফুলের বাগান ও চারদিকে নির্জ্জন পরিবেশ। ধীরাজ বাবুরও কবি-মন। তাই সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে যান প্রেমেন মিত্রের রচিত মনোরম সাহিত্য-কুঞ্জে। এই গৃহটির একটি নিজস্ব আবেদন রয়েছে বলেই বোধ করি আমাকে ধীরাজ বাবু আহ্বান করেন সেখানেই—যদিও সেটা তাঁর নিজ গৃহ নয়।

আমি পৌছুবার আগে থেকে ধীরাজ বাবু প্রেমেন বাবুর সঙ্গে অন্য ঘরে কথাবার্তায় মসগুল ছিলেন। আমি এসে গেছি শুনে তিনি আর বেশী দেরী করলেন না। সাদাসিধে পোষাকপরা খাপি মানুষটি যখন এসে ঢুকলেন, দেখেই আমার ধারণা গেল পাল্টে। ভেবেছিলাম, ধীরাজ বাবুর মত একজন খ্যাতিমান্ শিল্পীকে জাঁকজমকের মধ্যে হয়তো দেখতে পাবো। কিন্তু তিনি যে বাড়ীর বাইরে এসেও অন্য পাঁচ জনের মতই একজন, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। শিল্পীর মর্য্যাদা এ ক্ষেত্রে অনেকখানি বেড়ে গেল আমি বলবো।

ভূমিকার বিশেষ অবকাশ দিতে হ'লো না। সুরু হ'লো আমাদের আলাপ-আলোচনা—ছক্‌কাটা প্রশ্নোত্তরের পালা।

ধীরাজ বাবু আরম্ভ করলেন—২৭ বছর আগে ১৯২৫-২৬ সালে নির্ব্বাক্ চিত্র "সতীলক্ষ্মী"তে আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। নির্ব্বাক্ চিত্র "কালপরিণয়" ও "নৌকাডুবি"তে নায়কের ভূমিকায় ও সবাক্ চিত্র "রাজকুমারের নির্বাসন", "অভয়ের বিয়ে", "সমাধান",

"কঙ্কাল", "কালোছায়া", "কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে", "হানাবাড়ী" ও মুক্তি-প্রতীক্ষিত "ময়লা কাগজ" ছবিগুলিতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে আমি সব চাইতে তৃপ্তিলাভ করেছি। চলচ্চিত্রে যোগদানে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি তো ছিলই না বরং স্কুলের পাঠ্যাবস্থাতেই আমার এদিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। প্রথম দিকে সে জন্মে আমার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিয়েছিল বেশ কিছুটা, কেননা সে-যুগে আত্মীয়-গুরুজনেরা চাইতেন না কেউ চলচ্চিত্রে যোগ দেয়। সামাজিক মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থা অবশ্যি কেটে গেছে।

প্রশ্ন করলুম—চলচ্চিত্রে যোগদানের পর আপনি কি সাংসারিক জীবন যাপনে আগ্রহশীল?—হ্যাঁ, আগ্রহশীল। এই ছোট্ট কথাটিতে সমগ্র প্রশ্নটির উত্তর দিলেন তিনি।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? আমার প্রশ্ন করলুম তাঁকে। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বললেন—কিছু শিক্ষা, অসীম ধৈর্য ও অবিচল নিষ্ঠা। প্রথমে ভাল chance না পেলেও ধৈর্য্য ধরে থাকা চাই। অপর একটি প্রশ্নের সূত্র ধরে তিনি বললেন—চলচ্চিত্র-জগতে যোগদান সম্পর্কে কোন কোন মহলে এখনও আপত্তির প্রশ্ন উঠতে শোনা যায়। অবশ্যি শিক্ষিত ও অভিজাত-পরিবারের ছেলেমেয়েরা এদিকে আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশী ঝুঁকছে। যেটুকু বা গলদ ও দূষিত আবহাওয়া আছে, প্রগতিশীল শিক্ষিত, অভিজাত-পরিবারের ছেলেমেয়েদের যোগদানের ভিতর দিয়ে সেটুকু দূর হয়ে যাবে। একটা শিল্প গড়ে তুলতে হলে শিক্ষিত, অভিজাত ছেলেমেয়েদের এদিকে যোগ দেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। নতুবা এ শিল্পের উন্নতি সত্যি কি ভাবে হবে?

বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধন কি প্রকারে সম্ভব?—এর উত্তরে ধীরাজ বাবু বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর সময়-সাপেক্ষ। সংক্ষেপে যতটুকু বলা যেতে পারে, তাতে এ জন্য কাহিনীকার, প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী, প্রেক্ষাগৃহের মালিক, এমন কি দর্শকদেরও আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন। এ হবে কি না জানি না; যদি কোন দিন এ অসাধ্য সাধন হয় তবেই হয়তো বাংলা ছবির সত্যিকারের উৎকর্ষ সাধন হবে। ছবির পরিচালক হতে হলে যে-যে গুণ থাকা দরকার বর্তমানে বাংলা ছবির বেশীর ভাগ পরিচালকের তার এক আনাও নেই। পরিচালক হতে হলে প্রধানতঃ ক্যামেরা সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান না থাকলে নয়। দ্বিতীয়তঃ, মূল কাহিনীর গতি—Tempo of the story is essential, কিন্তু সত্যি সেই tempo থাকে না। এ জন্য চাই tempo ও নিখুঁত রসজ্ঞান। এই সম্পর্কে নিজস্ব অধিকার না থাকলে কুশলী পরিচালক হওয়া সম্ভব নয়। সর্ব্বোপরি চাই অসীম ধৈর্য্য—যার কথা পূর্ব্বেই বললুম। সামান্য কারণে ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, সেদিকে সতর্ক থাকা আবশ্যক। কুশলী অভিনেতা ও অভিনেত্রী হতে হলে সুঠাম চেহারা তো চাই-ই, তদুপরি চাই ব্যক্তিত্ব, কিছু শিক্ষা ও নিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে এক্ষুনি বিশদ আলোচনা ও মতামত জ্ঞাপন সম্ভব নয়।

এর পর আরও কতকগুলো প্রশ্ন উথাপন করলুম আমি। ধীরাজ বাবু ধীরে ধীরে উত্তর দিয়ে চললেন—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারে মানুষের যে স্বাভাবিক রীতি আছে, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। আমার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী সাধারণের কর্ম্মসূচী থেকে মোটেই আলাদা নয়। কেবল স্যুটিং-এর দিনগুলিতে কর্ম্মসূচীর একটু ইতর বিশেষ ঘটে থাকে। আমার খেয়াল (Hoby) বলতে আছে বই-পড়া আর লেখা। মাঝে-মাঝে নিজ হাতে রকমারী রান্না করাও আমার একটা 'হবি' বটে। খেলাধূলার মধ্যে ক্রিকেটই আমার বিশেষ প্রিয়। কারণ এই খেলার মধ্যে আছে ধৈর্য্যের দাবী আর সেই সঙ্গে একটা উত্তেজনা।

পড়াশুনোর ব্যাপারে প্রধানতঃ Crime সম্পর্কিত ইংরেজী বই পড়তেই আমার ভাল লাগে। অন্যান্য ভাল Author-এর বইও আমি পড়ে থাকি। সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে আগে আমি 'ভারতবর্ষ' পড়তুম। বর্তমানে **'মাসিক বসুমতী'** ও সাপ্তাহিক 'দেশ' আমি নিয়মিত পড়ে থাকি। গল্প ও কবিতা লিখবার অভ্যাস আমার আছে। গত ২০ বছরের মধ্যে আমার বহু কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শরৎবাবু (কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) আমার লেখা পছন্দ করতেন। অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী'তে শরৎবাবুর যে সময়ে "পথের দাবী" বেরোয়, তখন উক্ত পত্রে আমার "শেষের দিক" গল্পটিও প্রকাশ পায়। শরৎবাবুই এই গল্পটি মনোনয়ন করে উক্ত কাগজে দেন।

এর পর ধীরাজ বাবু বললেন—ছবি দেখা সম্পর্কে যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন, তবে আমি বলব—ইংরেজী ছবি দেখতে আমি সবচেয়ে ভালবাসি। আর বাংলা ও হিন্দী ছবি যদি সত্যি ভাল হয়, তাহলে সেও আমার ভাল লাগে; ভাল ছবি না হলেও যে দেখতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তবে আমি আবারও বলবো, এখনকার ছবির মধ্যে ইংরেজী ছবিই দেখতে আমি পছন্দ করি।

তিনি বলে চললেন—পোসাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বলতে গেলে আমার নিজের কথায় বলতে হয়, খুব একটা পারিপাট্য আমি পছন্দ করি নে, সাদা-সিধে ধরণের পোসাক-পরিচ্ছদই আমি পছন্দ করি—শুধু তা পরিষ্কার হলেই হ'লো।

শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং শরীরের উপর দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক কিনা—এ প্রশ্নের এক কথায় জবাব দিলেন ধীরাজ বাবু—নিশ্চয়ই! সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি কবিতার ছত্রও আওড়ালেন—

"দেহ-পট সনে নট সকলি হারায়।"

তার পর গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন—বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিল্পীই এই মহৎ বাক্যটি বিস্মৃত হয়ে থাকেন।

তার পর একটি হাল্কা প্রশ্ন করা হ'লো—বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি না? স্মিতহাস্যে তিনি জবাব দিলেন—প্রচুর। সেদিক দিয়ে পারিবারিক জীবনে খুব কম শিল্পীকেই সুখী হতে দেখেছি। অপ্রিয় হলেও কথাটি সত্যি।

হাল্কা প্রশ্নের পালা এখানেই শেষ হ'লো না। আমি জিজ্ঞেস করে বসলুম তাঁর নিজস্ব আয়ের খবর। আমাদের আয়ের কোন গড়পড়তা নেই—ধীরাজ বাবু বলে চললেন। প্রায় ২৭ বছর ধরে এ শিল্প-জগতেই আমার কাজ-কারবার। এ পর্য্যন্ত রোজগার

বা আয় কম করিনি কিন্তু হিসেব কী দোব। এম, পির "বিদেশিনী" ছবিতেই বারো হাজারের উপর আমার প্রাপ্তি-যোগ ঘটে। আর এটাই হচ্ছে একটা ছবিতে আমার সব চাইতে বেশী পাওয়া। সব চাইতে কম যে ছবিতে পেয়েছি সে হ'লো "কালপরিণয়" (নির্ব্বাক্)—দেড় বছরে দেড়শো টাকা।

পরিচালক, প্রযোজক বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ আছে কি? প্রশ্ন শুনে ধীরাজ বাবু হেসে উঠলেন। বললেন—থাক্‌লেও এ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতে আমি অক্ষম। কেন না, আরও কিছুদিন এ লাইনে আমি টিকে থাক্‌তে চাই। বলতে বলতে তিনি আবার হেসে ফেললেন।

এই ভাবে ঘণ্টা খানেক আলোচনা যখন চললো তখন আমি প্রশ্ন বন্ধ করলুম। ধীরাজ বাবু একরূপ নিজ থেকেই চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে আমায় কিছু শোনাতে চাইলেন। তাঁর মধ্যে সে-মুহূর্ত্তে একটা বেগবান উচ্ছ্বাসের ভাব দেখা গেল। আমি উন্মুখ হয়ে শুনছি, তিনি অনর্গল ভাবুকের দৃষ্টি নিয়ে বলে চললেন- চলচ্চিত্র-শিল্পের দিক থেকে পৃথিবীতে আমেরিকার পরই ভারতের স্থান। দেশে বহু লোক এ শিল্পে প্রতিপালিত হয়। ভারতেও এর সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এখানে এ শিল্পের প্রতি সেরূপ দরদ নেই। এটা দুঃখের কথা হলেও বলতে হবে, অন্যান্য দেশে এ শিল্পের জন্যে স্থানীয় সরকার প্রচুর সহযোগিতা করলেও এখানে আমরা তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ যেন একঘরে ছেলে, দেখবার আপন বলতে কেউ নেই। অথচ এই শিল্প থেকেই দেশীয় সরকারের প্রচুর আয় হয়ে থাকে। বাংলার চলচ্চিত্রের মান বাড়াতে গেলে আমি এদিকটা ভেবে দেখার উপর বিশেষ জোর দোব।

ধীরাজ বাবুর বলা তখনও চলেছে—এ শিল্পের উন্নতির দাবীতে আরও একটি বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে চাইব। আমার মনে হয়, চিত্রের কাহিনী বা গল্প নির্ব্বাচনের জন্যে একটি বলিষ্ঠ কমিটি গঠিত হওয়া উচিত—যাতে থাক্‌বেন সর্ব্বসাধারণের আস্থাভাজন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকপ্রমুখ প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ। এ কমিটির উপর গল্প নির্ব্বাচনের ভার থাকবে এবং তাঁরা যখন যেটি নির্ব্বাচন করবেন, সুদক্ষ পরিচালকের দ্বারা তা চিত্রে রূপায়িত করা হলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হবে না।

রাধা ফিল্মস্‌ কোম্পানীর "এ্যারিষ্টোক্রাসী" চিত্রে অনুভা গুপ্তা

টকির টুকিটাকি

শ্রীরমেন চৌধুরী

নাগরিক

আস্‌ছে! সাজ সাজ রব পড়ে গেছে উদ্যোক্তাদের ঘরে! আয়োজনের এতো যখন ধুম তখন মনে হয়, বিপদ-বাধানেওয়ালা পদমর্যাদাধারী কোনো পুরুষ-পুঙ্গব হবেন এই আগন্তুক! কিন্তু প্রচারকের বিজ্ঞপ্তিতে এ ভ্রম দূর হোলো! এ 'নাগরিক' আমাদের গোদো-মোধো'র সমগোত্রীয় রামু! হ্যাঁ হ্যাঁ, রামু! খুব চেনেন একে! সেই যে চোখে রাজ্যের রঙিন স্বপ্ন নিয়ে এ-আপিস ও-আপিসে ইন্টারভ্যু দেয়, চিত্র-বিচিত্র কর্মময় জীবনের হাতছানির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে—আর পনেরটা দিন কি বড়ো জোর এক মাস, তার পর মনের মিতা উমাকে বরণ করে আনবে তার ভাড়া ঘরের অধিষ্ঠাত্রীরূপে! আহা, উমা যে তার কথায় বড্ড বিশ্বাস করে, সে যে পথ চেয়ে আর দিন গুণে বসে আছে!—কেমন চিনতে পারলেন তো রামুকে? এই রামুর দল তো আজ বাঙলার ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রের অপরূপ ব্যবস্থার মহিমায়! দেখেছেন ঘুম-কাতর চোখ দুটো মেলে—দেখেছেন কি পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছরের মেয়ে-পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা কি ভাবে শুকিয়ে দুমড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে? তা যদি দেখতে পেতেন তা হলে আর বড়বাবু আপনি বুক চিতিয়ে ঘুরতে পারতেন না! আপনারা চোখ থাকতেও দৃষ্টিহীন! ফিল্মগিল্ডের এই সর্বজনীন বাণীচিত্র 'নাগরিক'কে পরিচালিত করেছেন ঋত্বিক ঘটক! নগরে গ্রামে গ্রামান্তরে 'নাগরিক'কে, অবিলম্বে দেখতে পাওয়া যাবে!

নিউ থিয়েটার্সের

দোভাষী ছবি 'নবীন-যাত্রা' সম্পাদক-পরিচালক সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। শারদীয় শুভ লগ্নে যাত্রা শুরু হবে 'নবীন-যাত্রা'র। এর কাহিনী রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক মনোজ বসু।

সংকটের জয়-যাত্রায়

ঘৃতাহুতি দিতে আসছে 'চিকিৎসা-সংকট'! দেশ জুড়ে চলেছে বহুধা-বিভক্ত সংকটের খেলা, কোনোটারই রেশ মিলোতে পারছে না এমনই তার বিকট ধ্বনি! পরশুরামের লেখা এই কাহিনীটিকে চিত্ররূপায়িত করেছেন [illegible] সেন!

শেষের কবিতা

যে কোনো দিন সেলুলয়েডের ফিতেয় আবদ্ধ হতে পারবে এ ধারণা ছিলো না অনেকেরই! গুরুদেবের এই মিষ্টিক্ গদ্য কাব্যটি পাঠক-চিত্তে প্রেমের আসন অধিকার করে আছে, এর চরিত্রগুলিকে কল্পনার তুলি বুলিয়ে সজীব করে রেখেছেন তাঁরা। অমিট্রায়ে, সিসি-লিসি, বন্যা—এরা তো সবাই অনন্য অনন্যা! পরিচালক মধু বোস দুরূহ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন বলতে হবে—তবে ব্রত সফল হোক এ শুভেচ্ছা আমাদের আছে যদিও শিল্পী নির্বাচনে আমরা আদৌ প্রীত নই।

দিনে দিনে দেখবো কতো!

স্বর্ণকমল চিত্রপটের প্রথম প্রচেষ্টা, প্রস্তুতি চলেছে পুরো উদ্যমে! দেশটা (বাঙলা) কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে তারি পটভূমিকায় গড়ে উঠছে 'দিনে দিনে দেখবো কতো'র আখ্যায়িকা। শুনে প্রকাশ, এতে নাকি ডকুমেন্টারি ভ্যালু থাকবে বিশেষ করে। কি করে বাঙলার কনক-প্রদীপ ক্রমে মৃৎপ্রদীপে রূপান্তরিত হয়ে এখন নির্বাণোন্মুখ হয়ে পড়েছে সে সম্বন্ধে আলোকপাত করবেন কর্তৃপক্ষ। সেই সংগে আজকের যুবক-সম্প্রদায় কি ধরণের গীত-রসিক হয়েছেন, তারও ইংগিত থাকবে এতে! শনিবার ও রবিবারের দুপুর বেলা হলে কখন বেতারে রেকর্ড প্রোগ্রাম (অনুরোধের আসর) শুরু হবে তার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে আজকালকার কলেজ ইস্কুলগামী ছেলে-ছোক্‌রার দল—সেই যেন 'জলকে চলা'র রূপান্তরিত অবস্থা! পথঘাটের এই নব রূপ অবিশ্যি উপভোগ্য মেয়েদের কাছে! যাই হোক, স্বর্ণকমল চিত্রপটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা একটু উদ্বিগ্ন রইলুম।

এম, বি, পিক্‌চার্সের

'বিক্রমোর্বশী' স-নৃত্য-গীত বাঙলা কথাচিত্র। এটিও পরিচালনা করছেন মধু বোস, নৃত্য-পরিকল্পনা সাধনা বোস। চরিত্রায়ণে আছেন সাধনা বোস, জয়শ্রী সেন, বাণী গাঙ্গুলী, নীলিমা দাস, পদ্মা দেবী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, নীতীশ মুখার্জি, ভানু ব্যানার্জি প্রভৃতি। স্যুটিং যথারীতি এগিয়ে চলেছে।

দ্রুতগতি এগিয়ে চলেছে

'সীতার পাতাল প্রবেশ' প্রস্তুতি! জনমদুখিনী সীতার পুণ্য চরিত-কথার চিত্রায়ণ দিলীপ মুখার্জির নেতৃত্বে অতি সামান্য সময়ের ব্যবধানে অর্ধপথ অতিক্রম করেছে। সীতার চরিত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন শ্রীমতী দেবযানী। সংগীত পরিচালনায় আছেন জটাধর পাইন এবং গীতগুচ্ছ রচনা করেছেন রমেন চৌধুরী।

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

পাতালে এক ঋতু—শ্রীদীপক চৌধুরী, রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

পুরশ্চরণ-রত্নাকর—শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত, ১৭৪।৬।১ নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড কলিকাতা-৪০। মূল্য পাঁচ টাকা।

জননায়ক শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-রহস্য—আচার্য্য শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, ৩০ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

কামাখ্যায় কুমারী পূজা—শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, ব্রহ্মচারী শ্যামচৈতন্য, দক্ষিণ বাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম, হালিশহর ২৪ পরগণা। মূল্য এক টাকা।

সাহেবের লাশ—শ্রীইন্দুভূষণ দাস, গণদীপায়ন পাবলিশার্স, ১০৩ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৪। মূল্য এক টাকা চার আনা।

খেলাঘর—শ্রীবলাই প্রামানিক, ৩৭ তারক প্রামানিক রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য দু' টাকা।

বাংলা বর্ষলিপি (১৩৬০ সাল)—সম্পাদক শিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী, সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা-২৯। মূল্য দু' টাকা আট আনা।

বিপ্লবী মেদিনীপুর—শ্রীসুমোহন দে, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

ক্যানসার চিকিৎসা—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, রাজবৈদ্য, আয়ুর্বেদ ভবন, ১৭২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

মনীষী জীবনকথা (১ম খণ্ড)—শ্রীসুশীল রায়, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

ছন্দপতন—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২ টাকা।

সাহিত্য-পাঠকের ডায়ারি (২য় পর্যায়)—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, গুপ্ত প্রকাশনী, ৮ গুপ্ত লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা আট আনা।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা—শ্রীকুড়রাম, অরুণা প্রকাশনী, ৬।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

এই মর্ত্যভূমি—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

কান্না হাসির দোলা—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

আবদুল্লার পতন ও শ্রীশ্যামাপ্রসাদের আত্মার শান্তি

"শ্যামাপ্রসাদ-জননী তাঁহার পুত্রের অকালমৃত্যুর সম্পূর্ণ বিবরণ সর্ব্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পুস্তিকাটির প্রতিটি ছত্র সাক্ষ্য দিতেছে—এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। যাহারা ইহা করিয়াছে তাহাদের শাস্তি যাহারা চাহিবে না, ইহাদিগকে শাস্তি হইতে যাহারা বাঁচাইতে চাহিবে, ন্যায়ের চক্ষে, ধর্ম্মের চক্ষে, ঈশ্বরের চক্ষে তাহারাও অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইবে। শেখ আবদুল্লা বাঙ্গালার ও ভারতের যে অনিষ্ট করিয়াছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। আজ শেখ আবদুল্লার পতন ঘটিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতি এবং বক্সী গোলাম মহম্মদের প্রধান মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ নাটকীয় ঘটনার মত ঘটিলেও উহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল, এ কথা বলা চলে না।···আপাততঃ কারাগারে বন্ধনপীড়িত ও হৃত শ্রীশ্যামাপ্রসাদের আত্মার শান্তি হইল।··· কাশ্মীরে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন এবং শেখ আবদুল্লার পতনের ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী মহল এবং পাকিস্তান একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। শেখ আবদুল্লার পতনের সংবাদ বাহির হইতে না হইতেই পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলি পণ্ডিত নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পাকিস্তানী লীগের মুখপত্র 'ডন' এক দেড়গজী প্রবন্ধে ভারতের বিরুদ্ধে প্রাণ ভরিয়া শুধু যে গালিগালাজ করিয়াছে তাহাই নয়—শেখ আবদুল্লার অপসারণের ফলে যে মস্ত বড় বিপদ দেখা দিবে, এমন ইঙ্গিত করিতেও ছাড়ে নাই।···আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরিয়া কাশ্মীরকে সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধ-ঘাঁটীতে পরিণত করিবার চক্রান্ত করিয়া আসিতেছে। অতি সম্প্রতি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা এক স্বাধীন কাশ্মীরের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিল যে, ইহাতে পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডুলেসের আশীর্ব্বাদ আছে। গত মে মাসে মিঃ এডলাই ষ্টিভেনসন যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি কাশ্মীরেও গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত শেখ আবদুল্লা "স্বাধীন কাশ্মীর" গঠন সম্পর্কে পরামর্শ করিয়াছিলেন। ভিতরে ভিতরে এই চক্রান্ত অনেক দূর পাকিয়া উঠিয়াছিল এবং বক্সী গোলাম মহম্মদ ও সদর-ই-রিয়াসৎ যথাসময়ে চক্রান্তের মূলোচ্ছেদ না করিলে কাশ্মীর মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ তথা পাকিস্তানের কুক্ষিগত হইত নিশ্চয়। হাতের মুঠির ভিতর হইতে এই সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটী ফসকাইয়া যাওয়াতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও তাহাদের তাঁবেদার পাকিস্তানের ক্রোধের অন্ত নাই। ইহারা যে এখনও নানারূপ চাপ দিয়া, চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়া কাশ্মীরকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভুল নাই। পাকিস্তানের সাহায্যে কাশ্মীরে ইহারা সরাসরি অশান্তি সৃষ্টি করিলেও কেহ বিস্মিত হইবে না।"

—দৈনিক বসুমতী।

সাংবাদিক বীরবংশ নির্ব্বংশ হয় নাই

"দেশশুদ্ধ লোককে নির্বোধ, নাবালক ও না-লায়েক ধরিয়া লইয়া কাটজু-শ্রেণীর লোকের উদ্ধত মুরুব্বীয়ানাকে যথাস্থানে সংযত রাখিবার উদ্যম শিথিল হইবে না। যাহাদের নিরলস সংগ্রামে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে, যাহার বলে আজ কাটজু-শ্রেণীর ব্যক্তিরা ক্ষমতার আসনে বসিয়াছেন, তাহাতে সংবাদপত্রের দান সামান্য নহে। বৃটিশ সাম্রাজ্য-নীতির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যাহারা অকুতোভয়ে সংগ্রাম করিয়াছে, কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, বাজেয়াপ্তি যাহাদের ঋজু মেরুদণ্ড বক্র করিতে পারে নাই, সংবাদপত্র-জগতে সেই বীরের বংশ নির্বংশ হয় নাই, তাহাদের করধৃত তীক্ষ্ণ তরবারি আজিও অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়া আছে এবং থাকিবে। ক্ষমতার অসম্বৃত আবেগে কাটজু মহাশয় সমালোচনামুখে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, প্রকৃতিস্থ মুহূর্ত্তে তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিলে উপকৃত হইবেন। সাংবাদিকগণ দৈহিক এবং তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর অদৃশ্য নিগূঢ় পীড়নের ভীতিতে ক্ষমতার স্তবস্তুতি করিবে না, মন হইতে এই দুরাশা তিনি এবং তাঁহারা মুছিয়া ফেলুন—তাহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

কংগ্রেসী সরকারের বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি

"গত ১৬।১৭ দিন ধরিয়া কলিকাতায় নাগরিক-জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছিল এবং এমন একটি আশঙ্কা দেখা দিতেছিল যে, সমগ্র সহরই সম্পূর্ণরূপে অচল হইয়া পড়িবে। গত কয়েক দিনে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে, প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি নাশ হইয়াছে এক এক পয়সার বাড়তি ভাড়ার বদলে কত দিকে যে কত প্রকার সর্বনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।···অবশেষে জনমতের জয় হইয়াছে। ট্রামের বাড়তি ভাড়া স্থগিত রহিল। পুলিশ যেভাবে গুলী চালাইয়াছে, লোকজনকে হতাহত করিয়াছে, নির্বিচারে লাঠি চালাইয়াছে, গ্যাস ছুঁড়িয়াছে এবং বাড়ীতে ঢুকিয়া সমস্ত কিছু তচনচ করিয়া দিয়াছে, আর অজস্র লোককে (কত সহস্র কে জানে?) গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাতে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে "এত কেরামতি কবে শিখিলেন মহাশয়? ইংরাজ আমলের লাঠির দাগগুলি কি এত তাড়াতাড়ি মুছিয়া গেল?" এই লাঠি কেবল গত দুই সপ্তাহ যাবৎ আন্দোলনকারী কিম্বা সাধারণ জনতার পৃষ্ঠ ভাঙ্গিতেছে না (একজন প্রবীণ শিক্ষক পর্য্যন্ত লাঠি-প্রহারে প্রাণ দিয়াছেন!) সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররাও বাদ পড়ে নাই।"

—যুগান্তর।

সেবা ও রাজনীতি

"সরকারের টাকা যেহেতু সর্ব্বসাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে সঞ্চিত এবং সাহায্যপ্রার্থীরাও দলমতনির্ব্বিশেষে সকল দলের লোক, অতএব

উপমা রামকৃষ্ণস্য। শ্রীরামকৃষ্ণের যত রসাত্মক বাক্য ও গল্প আছে তার একটি সযত্ন চয়ন ও আলোচনা। কিংবা, যিনি একাধারে আলোক ও লোচন তাঁর বন্দনা। ব্যাখ্যা করতে করতে বন্দনা করেছেন—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গভীর, কাব্যের দিক থেকে তেমনি সুন্দর।' ভূমিকায় বলেছেন অচিন্ত্যকুমার—'তত্ত্বের তাৎপর্য না বুঝি কাব্যের আনন্দটুকু আহরণ করি। তত্ত্বের অর্থোপলব্ধিতে সমাহিত না হতে পারি কাব্যরসাস্বাদে বিমোহিত হই। সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, সীমাহীন সংক্ষেপ ভাষায় বলেছেন সুষমান্বিত করে।

গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিলেন কিছুকাল। শুধু নাম দস্তখৎ করতে পারতেন। একছত্র রচনা করেননি নিজের হাতে। তাঁরই কাব্যরূপ উদ্ঘাটন করবার জন্য আহ্বান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। [illegible] সালের শরৎচন্দ্রস্মৃতিবক্তৃতার বিষয়ই হল "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ"। সংসারের অনেক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে এ একটি। সেই বক্তৃতা-মালার গ্রন্থনই এই গ্রন্থ। স্বাধীনভাবে এরই প্রকাশিত করবার অনুমতি দিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে অচিন্ত্যকুমার তিনদিন ধরে এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন গত নভেম্বর মাসে, প্রথমে দ্বারভাঙ্গা হল ও পরে 'আশুতোষ হলে বিপুল জনমণ্ডলীর সম্মুখে' (আনন্দবাজার); 'আশুতোষ হল্ হুইচ ওঅজ প্যাক্‌ড টু সাফোকেশন' (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড)। সেই বক্তৃতার বিষয় "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ" প্রকাশিত হচ্ছে এই প্রথম।

সংসারাশ্রম, সত্যকথা, সরলতা, বিশ্বাস, ব্যাকুলতা, সন্ন্যাস, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি নানা-বিষয়ে নানা কাব্যকথা। তা ছাড়া সেই সব আশ্চর্য গল্প—বুড়ি গয়লানির নদীপার, কৌপীনকা ওয়াস্তে গৃহস্থালী, স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল, গাছের উপর বহুরূপী, বাইরের বেয়ানের গুহা লুকোনো। শুধু আবিষ্কারের দিক থেকে নয়, উদঘাটনের দিক থেকে অদ্বিতীয়। বাংলাসাহিত্যে অশ্রুতপূর্ব। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ। শোভন গ্রন্থসজ্জা, কাপড়ে বাঁধাই, দাম চার টাকা।

'আমাকে রসে বশে রাখিস মা, আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিসনে'—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা। অচিন্ত্যকুমার ব্যাখ্যা করছেন—এই হচ্ছে নিত্যকালের কবির প্রার্থনা। রস চাই, সঙ্গে-সঙ্গে বশও চাই। আবেগ চাই, সেই সঙ্গে চাই বন্ধন, সংযম, শৃঙ্খলা।···রস যদি অ-বশ হয় তাহলে যা—বশ যদি বি-রস হয় তাহলেও তাই। ফল একই, কোনোটাই কবিতা হয়না।···কবিতা কাকে বলে? অল্প কথায় কবিতা হচ্ছে একটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে রসে জাল দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা ঝঙ্কার, এ সব বসন-ভূষণ মাত্র, প্রাণবস্তু নয়।···

শ্রীরামকৃষ্ণের কবিতার কাঠামোটি গদ্য। গদ্যে যে কবিতা হয় তাতে দ্বৈধ নেই। আর সে গদ্য রদ্দুরে ঝলসে-ওঠা ছুরির ফলার মতো ঝক্-ঝকে। তীরের মতো তীক্ষ্ণ-লক্ষ্য। দূরভেদী।

শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকে সকলের চেয়ে সহজ করে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন সুন্দর করে। রসাত্মক বাক্যের সহযোগে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ গোড়াতেই বলেছেন, 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারা'। যতক্ষণ পেটে অন্ন নেই ততক্ষণ সংসারে রস নেই। আর যতক্ষণ রস নেই, ততক্ষণ ঈশ্বরও নেই। যতক্ষণ তার পেটে রুটি নেই ততক্ষণই চাঁদ ঝলসানো রুটি। যতক্ষণ তার মাঠে ধান নেই, ততক্ষণই চাঁদ কাস্তে। অজন্মা বা অভাবের সমস্যা চিরকালিক নয়। অভাবের শেষ আছে কিন্তু ভাবের শেষ নেই। ক্ষিদে জুড়োয় কিন্তু চাঁদ ফুরোয় না।

তাই 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারা'র পরেই 'অন্য-চিন্তা পরাৎপরা'। তখন, সেদিন, চাঁদকে মনে হয় শিশুর হাসি, প্রিয়ার মুখ, মায়ের স্নেহধারা। শুধু রুটি নয়, রুচি চাই। শুধু প্রেমা নয়, চাই প্রেম। তখন রামকৃষ্ণের মতো দেখি 'চাঁদমামা সকলের মামা।'···

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট বুকশপে আজই আপনার অর্ডার দিয়ে রাখুন

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। বালিগঞ্জে : ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

সরকারী সাহায্য কোনমতেই একমাত্র কংগ্রেস দল মারফৎ অথবা কংগ্রেসী দলের অনুমোদনে সরকারী কর্ম্মচারী মারফৎ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। এইরূপ ব্যবস্থা গণতন্ত্রের আদর্শের বিরোধী। ইহার ফলে অন্যায় ভাবে জনসাধারণের প্রদত্ত সরকারী অর্থে বিশেষ একটি দলের প্রভাব ও প্রচার বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী নষ্ট হইয়া যায়। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের বুনিয়াদ নষ্ট হইয়া যায়। আমরা আজও মনে করি, রাজনীতি-ক্ষেত্রে মেদিনীপুর সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। সেই অগ্রগামী মনকে কোন ভাবেই পিষ্ট করিয়া দিবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনমতকে জাগ্রত না করাইয়া দিবার সাময়িক দুর্ব্বলতাকে জয় করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিবার মহান্ দায়িত্ব প্রকৃত দেশসেবিগণের এবং পত্রিকাসমূহের। সেবার ক্ষেত্রে রাজনীতির স্থান বহু উর্দ্ধে। আমাদের আন্তরিক অনুরোধ, সমগ্র জেলা ও জেলাবাসিগণের সামগ্রিক সমস্যা ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান দুর্যোগ কাটাইয়া উঠিবার জন্য এবং ভবিষ্যৎ দুর্যোগের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমগ্র জেলার সকল সুসন্তানগণ যেন জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, রাজনৈতিক মতবাদ, ক্ষুদ্র দলাদলি ও সাময়িক ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা, সাহায্য ও সম্ভাবনাকে একত্রিত করিয়া সুপরিকল্পিত পন্থায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিজেদের ও মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সমুজ্জ্বল ও সম্ভাবনাপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন।"

—মেদিনীপুর পত্রিকা।

মুর্শিদাবাদে সরকার পরিচালিত কলেজ

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজটিকেও অবশেষে সরকারী পরিচালনাধীনে লইতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলায় একমাত্র পুরাতন কৃষ্ণনাথ কলেজ ব্যতীত বাকি চারটি কলেজ সরকারী পরিচালনাধীনে গেল। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি কারণে এত নিষ্করুণ, বুঝা যায় না। অথচ কৃষ্ণনাথ কলেজ বাংলার একটি পুরাতন কলেজ, বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত কলেজের শত বৎসর পূর্ণ হইতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে মোট শিক্ষিতের সংখ্যা: ২,২৪,০২৫। লিখন-পঠনক্ষম—১৫১,৫৯৮, মধ্য-বিদ্যালয়—৫৪,১৪১, ম্যাট্রিক—১১,৪৩২, আই, এ, বা আই, এস-সি—২,৮৯১, গ্রাজুয়েট—১,৬০৯। মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষিতের শতকরা হার পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অতি নিম্নস্থানে অথচ সাধারণ শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে সরকার কালেজী শিক্ষার প্রসারে অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছেন। নতুবা এই জেলাতে চারটি ছাত্রদের এবং একটি ছাত্রীদের মোট পাঁচটি কলেজের মধ্যে চারটি সরকারী পরিচালনায় চলিত না।"—মুর্শিদাবাদ সমাচার (খাগড়া)।

শ্রীমুখার্জীর সুপারিশ

"আসাম রাজ্য খাদি ও গ্রাম্য শিল্পবোর্ডে কাছাড়ের একমাত্র সদস্যরূপে করিমগঞ্জ কংগ্রেসের যে খাদিভেকধারী ব্যক্তিটিকে মনোনীত করা হইয়াছে, তাহার অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদ্বয় শ্রীমুখার্জী ও শ্রীচৌধুরী সম্যক্ অবগত আছেন—ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। এতৎসত্বেও খাদি ও গ্রাম্য শিল্প সম্পর্কিত প্রাদেশিক বোর্ডের সভাপদে এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল কেন—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর হয়ত কেহই দিতে পারিবেন না। কিন্তু করিমগঞ্জ তথা কাছাড় হইতে অনুরূপ পদাদিতে নিয়োগ ব্যাপারে আসাম সরকারের সাধারণ নীতির কোন ব্যতিক্রম ইহাতে হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না; কারণ, ইতোপূর্ব্বে স্থানীয় স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ এবং অন্য কয়টি বোর্ড বা কমিটির সদস্য মনোনয়নেও এরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন মহলের ধারণা এই যে, কোন দায়িত্বশীল বা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক করিমগঞ্জে তথা কাছাড়ে পাওয়া যায় না—এরূপ প্রমাণ করাই হয়ত মন্ত্রীবর শ্রীমুখার্জীর গূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরাও কি কাছাড় সম্পর্কিত সব ব্যাপারেই একমাত্র শ্রীমুখার্জীর সুপারিশকেই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন?"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

চিনি নাই

"কিছুদিন আগে এক সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বাজারে প্রচুর চিনি ছাড়া হইবে। সরকারী সংবাদ। এই সংবাদের প্রত্যক্ষ ফল পাইতেছি যে চিনি দিন দিন অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিতেছে—বাড়ীতে বাড়ীতে চায়ের জন্য গুড় আসিতেছে। ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে—There is a lull before a storm. ঝড়ের পূর্ব মুহূর্ত্তে প্রকৃতি নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। বোধ হয়, চিনির প্লাবনের জন্যই চিনির চিহ্ন বাজার হইতে বিলুপ্ত হইতেছে। প্লাবনের আশায় দিন গুণিতেছি।"

—অনামী (মালদহ)।

উপযুক্ত ছাত্রাবাস চাই

"আমরা আমাদের পত্রিকার মাধ্যমে রামপুরহাট কলেজে ছাত্র ও ছাত্রী ভর্ত্তি করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে মহকুমাবাসী তথা সারা পশ্চিমবঙ্গের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। রামপুরহাটের স্বাস্থ্য, এবং খাদ্য-খরচ এখনও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভাল, এবং নিম্নতর তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষাদান পদ্ধতির মানদণ্ড অবশ্য পাশের শতকরা হারের উপরেই নির্ভর করে। তাহাতেও রামপুরহাট কলেজ যে একটা আকর্ষণীয় কলেজ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে আমরা শুনিয়াছি, রামপুরহাট কলেজের হোষ্টেলে বেশী ছাত্র ভর্ত্তি হেতু স্থানাভাব ঘটিতেছে এবং তাহা হইবারই কথা। আমরা শিক্ষা-দরদী আমাদের মহকুমা শাসককে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যখন রামপুরহাট কলেজকে আর অপাংক্তেয় রাখিতে অনিচ্ছুক, তখন তাঁহার কর্ম্মব্যস্ত জীবনের অবসরে বেসরকারী চাঁদা বা সরকারী সাহায্য বা অন্য যে কোন উপায়ে একটি উপযুক্ত ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অবশ্য জনমত গঠন এবং বেসরকারী চাঁদার আদায়ের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করার দায়িত্ব সাংবাদিক হিসাবে আমরা আদৌ অস্বীকার করি না বা করিতে পারি না।"

—রাঢ়দীপিকা (রামপুরহাট)।

উদ্বাস্তু ছাত্রদের সাহায্য

"উদ্বাস্তু ছাত্রদিগকে সাহায্য করার জন্য সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি বিভাগ হইতে এইবারও দরখাস্ত নেওয়া হইয়াছে। যে-সব ছাত্রের অভিভাবকের আয় এক শত টাকার অধিক, তাহারা গতবার কোন সাহায্য পায় নাই। কিন্তু এই নীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার।

এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান এক শত টাকার মূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব কুড়ি টাকার সমান। এই স্বল্প আয় একটি ছোটখাটো পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত নহে। কাজেই যে সব ছাত্রের অভিভাবকদের মাসিক আয় দেড় শত টাকার অনধিক, তাহারাও যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সাহায্য হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।"

—জনশক্তি (শিলচর)।

কোচবিহারের ছিট মহাল

"পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে কোচবিহারের ১২৯টি ছিট মহাল আছে। ইহার মোট জমির পরিমাণ ২৬.৮ বর্গ-মাইল। ইহার জনসংখ্যা ১২,৮০০। কুচবিহারের মধ্যে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ৯৫টি ছিট মহাল আছে ১৮.৩ বর্গ-মাইল। ইহার মোট জনসংখ্যা ১১,০০০। এই সকল ছিট মহাল বিনিময় করিলে ৮.৪৮ বর্গ-মাইল জমি পূর্ব্ব-পাকিস্থান-ভুক্ত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় ঐ অতিরিক্ত জমির পরিবর্ত্তে কুচবিহার-সংলগ্ন সমপরিমাণ জমি যাহাতে পাওয়া যায় তাহাই চান। বেসরকারী সূত্রে প্রকাশ যে, পাকিস্থান জমি না দিয়া টাকায় উহা পরিশোধ করিতে চায়। ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের সম্মেলনে ঐ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন কিছুই ঠিক হয় নাই। কেবল পাকিস্থান বিনিময় নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পাকিস্থানের জেদ ও আব্দারের কাছে বহু বারই নতি স্বীকার করা হইয়াছে। আশা করি, এবারও তাহার পুনরাবৃত্তি না হয়। দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর সহিত ডাঃ রায় এ সম্পর্কে আলোচনা করিবেন?"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

জল-সংযোগ নাই?

"অনেক দিন ধরিয়া আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, জলের কলের নানা অংশ সম্প্রসারিত করা হইয়াছে এবং সহরবাসীদের গৃহে জলের কলের সংযোগ দিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অথচ ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এক সংবাদে জানা যায় যে, কতকগুলি কমিশনার মহোদয়দের গৃহে জলের সংযোগ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সহরবাসীর ভোট পাইয়া তাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন; অতএব সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাইবার একচেটিয়া অধিকার ত তাঁহাদেরই! পৌরসভার কমিশনারগণের সামান্যতম চক্ষুলজ্জাবোধও নাই। তাই যে চাঁচলরাজের বদান্যতার ফলে ওয়াটার ওয়ার্কস নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহার দানে সহরবাসীরা পানীয় জল পাইতেছেন, সেই দানী রাজার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে জলের সংযোগ দিবার কোন ব্যবস্থাই আমাদের কমিশনারগণ করিতে পারেন নাই। মনুষ্যত্বের খাতিরেও ত তাঁহাদের উপযাচক হইয়া রামনগর রাজবাড়ীতে জলের সংযোগ দেওয়া উচিত ছিল। আশা করি, কমিশনার মহাশয়রা সচেতন হইবেন এবং এ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।"

—উদয়ন (মালদহ)।

বন্যা-পীড়িত উদ্বাস্তুগণ

"নৃসিংহপুরের উদ্বাস্তুগণের বাসভবন বন্যার প্লাবনে ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ায় বহু উদ্বাস্তু নিরাশ্রয় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে রণগ্রামে এবং কান্দীতে আশ্রয় লইয়া অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেছে। এই সকল সর্ব্বহারা নিরাশ্রয়গণকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কান্দী মহকুমা কংগ্রেসের কর্ম্মিগণ সভাপতি ও সম্পাদকের নেতৃত্বে সাহায্য সংগ্রহ করিয়া ঐ সকল সর্ব্বহারাকে খাদ্যদান করিতেছেন। সরকারও কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন। মাননীয় মহকুমা শাসক মহাশয় কয়েক জনের চাকরি সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাহাদের অসীম উপকার করিয়াছেন। আশ্রয়হীন, নিঃসম্বল উদ্বাস্তুগণকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য জনসাধারণের যথাশক্তি সাহায্য দান করা উচিত। অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র যিনি যাহা দিবেন মহকুমা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমদনমোহন সিংহের নিকট অথবা সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ত্রিবেদীর নিকট প্রদান করিলে তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।" —কান্দী-বান্ধব।

নূতন কমিশনার

সেলট্যাক্সের নূতন কমিশনার হিমাদ্রি রায় আসিয়া চার্জ্জ নিয়াছেন। আফিসে নাটকীয় পট-পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে।

প্রথম দৃশ্য

[নূতন কমিশনার লায়ন্স রেঞ্জের অফিসারের ঘরে কাজ দেখিতেছেন, এমন সময় হ্যাং সাহেবের প্রবেশ ও আসন গ্রহণ। কিছু পরে গুহ সাহেবের প্রবেশ ও আসন গ্রহণ। প্রভু-তোষণে উভয়ের প্রতিযোগিতা।]

কমিশনার। আপনাদের কাজকর্ম্ম কি খুব কম?

গুহ ও হ্যাং সাহেব। না স্যার, ভীষণ কাজ, সারা দিন খাটতে খাটতে দেহপাত হয়ে গেল স্যার।

—তবে এতক্ষণ বসে আছেন? দরকার হলে আপনাদের তো ডাকতেই পারি।

[লজ্জিত হইয়া উভয়ের স্থানত্যাগ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গুহ সাহেবের ঘর]

জনৈক অফিসার। স্যার, নূতন কমিশনার আসায় আপনার তো অনেক সুবিধা হলো। অনেক কাজ কমে গেল।

গুহ। হাঁ, আমার কাজ কি আর কমে? আমার হলো আপীল শোনা, একেবারে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত। প্রকাণ্ড জুডিশিয়াল ক্যাসন আমার। আর কমিশনারের কি কাজ? সারা দিনে দুটো চিঠি সই আর ট্রান্সফার। আর এরা কি আর কাজ বোঝে? রেজিষ্ট্রেসন সার্টিফিকেট আমি আটকে রাখছিলাম। তিনি এসেই সার্টিফিকেট জারী করবার হুকুম দিয়ে ডিপার্টমেন্টকে গোল্লায় পাঠাচ্ছেন। পুলিশকে ডেকে আবার বলে দিয়েছেন, রেজিষ্ট্রেসন সার্টিফিকেটের তদন্তে দেরী হলে চলবে না। আমার মত একাউণ্টেন্সির কোয়ালিফিকেসনও নেই, আইনজ্ঞানও নেই।

[দু'টি ক্রসের ধৈর্য্যকে পরাজিত করিয়া গুহ সাহেব একাউণ্টেন্সি পাশ করিয়াছেন। তিনি বেলফাষ্টের এল-এল-বি, এঁদের প্রাকটিস করিবার ক্ষমতা নাই। জনৈক আই-সি-এস কমিশনার লিখিয়া গিয়াছেন গুহ সাহেব বিভাগের পোষ্ট বক্সের কাজ খুব ভাল করিয়া করিতেছেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[গুহ সাহেবের ঘরে কমিশনার]

কমিশনার। মিঃ গুহ, কনষ্টিটিউসনের ২৮৬ ধারার (প্রদেশের বাহিরে মালবিক্রয় সম্পর্কিত ধারা) ব্যাপারটা কি একটু বলুন তো?

গুহ। ২৮৬? ২৮৬? ২৮৬?

[ঘন ঘন ঘণ্টা বাদন]

—নেত্য বাবু, নেত্য বাবু, কনষ্টিটিউসনের বইটা আনুন তো, দেখি?

[নেত্য বাবুর পুস্তক হাতে প্রবেশ। কমিশনার মুচকি হাসিয়া হাত বাড়াইয়া বইখানি নিজে গ্রহণ করিলেন।]

—যুগবাণী (কলিকাতা)

দায়িত্ব কাহার?

"পুরাণের স্যমন্তক-মণি-হরণের বৃত্তান্তে পাওয়া যায় যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার তদানীন্তন রাজা উগ্রসেনের নিকট স্যমন্তক-মণি রাজারই হিতার্থে আপনার নিকট রাখিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেই হেতু স্যমন্তক-মণি অপহৃত হইলে সেই কলঙ্ক চৌরচূড়ামণির উপরই আরোপিত হয়। এবং শ্রীগোবিন্দ সেই কলঙ্ক অপনোদনের নিমিত্ত সেই স্যমন্তক-মণির উদ্ধার সাধন করেন। দৈনিক পত্রিকায় বার্ণপুরের গুলী চালনার ব্যাপারে এক সংবাদে প্রকাশ যে, সাত জন শ্রমিক (তাহাদের নামও প্রকাশিত হইয়াছে) শোভাযাত্রার সহিত মহকুমা হাকিমের নিকট আসিয়াছিল কিন্তু (প্রজা-শাসনের জন্য) লাঠি, গ্যাস ও গুলী চালনার পরে তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রথমে অনুমান করা গিয়াছিল যে তাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে, কিন্তু জেল-হাজতে ও হাসপাতালে তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সমস্ত শ্রমিকগণ তাহাদের মাতা-পিতার নিকট মণিস্বরূপ এবং পরিবারের উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি হিসাবে ইহাদের মূল্য স্যমন্তক-মণি হইতে কম নহে। সুতরাং এই সমস্ত শ্রমিকদের যখন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না তখন তাহাদের সন্ধান করিয়া দেওয়া সরকারেরই উচিত। নতুবা জনসাধারণ সরকার তথা আরক্ষী বিভাগের উপর বিরূপ ধারণা করিতে পারে। ইহা ছাড়া যখন আমাদের জাতীয় সরকারের পৃথক একটি অনুসন্ধান বিভাগ আছে—তাহাদের সহায়তায় এই সকল শ্রমিকগণের সন্ধান পাইতে বিলম্ব হইবে না। আমরা আশা করি, সরকার এই সমস্ত নিরুদ্দিষ্ট শ্রমিকগণের সন্ধানে অতঃপর তৎপর হইয়া এবং তাহাদের সংবাদ প্রকাশ করিয়া দিয়া শ্রমিক-পরিবারের তথা জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন।—বন্দে মাতরম্।" —আসানসোল হিতৈষী।

মূর্খের আত্মপ্রসাদ

"পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন শুনাইয়াছেন যে, এই প্রদেশে চাউলের গড়পড়তা মূল্য মণকরা প্রায় এক টাকা কমিয়াছে; এক মাস পূর্বে যে চাউলের মণ ছিল পঁচিশ টাকা তিন আনা, এখন তাহা চব্বিশ টাকা দুই আনায় দাঁড়াইয়াছে। আর চিনি সম্পর্কে তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতেছেন যে, পূজার মাসে সাড়ে বারো আনা সের-দরে লোকে প্রচুর চিনি পাইবে। এই লোকটির

মুখে টন আর গড়পড়তার হিসাব গুনিতে গুনিতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; তবু ইনি মধ্যে মধ্যে পাণ্ডিত্য জাহির করিবেনই। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক ভাবে অনাহার আরম্ভ হইয়াছে; লোকে পেটের জ্বালায় গাছের পাতা ও কচু-ঘেঁচু খাইতেছে। মণকরা এক টাকা চাউলের মূল্য কমিলে এই অবস্থার পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নাই। পূজার সময় সাড়ে বারো আনা সের-দরে (এখনও ইহাই প্রায় বাজার-দর) তিনি খাওয়াইবার কথাটা এখন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ। তবুও ভদ্রলোক এই কাহিনী শুনাইয়া মূর্খের আত্মপ্রসাদ লাভের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই।" —সত্যযুগ।

রাষ্ট্র বেকার-সমস্যা

রাষ্ট্র বেকার-সমস্যার জন্য কমিশন বসাইয়াছেন। উহা সহর অঞ্চলের শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্ম-সংস্থানের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন। এই কমিশন সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যকর্তৃপক্ষগণের নিকট ১১ দফা পরিকল্পনা-সংবলিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদপত্রে যতটুকু প্রকাশ, তাহাতে জানা যায় যে, ইহাতে শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মের সুযোগ ও শ্রমশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-সংস্থানের ক্ষেত্র মনোনীত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থাপনে সাহায্যদান, যে সকল কর্ম্মে কর্ম্মীর অভাব, সেই সকল কর্ম্মে কর্ম্মীদের শিক্ষাদান, পরিবহন, বস্তি-সংস্কার ও উদ্বাস্তু-নগরী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য রাজ্য-গভর্ণমেণ্টগুলিকে উদ্যোগী ও সাহায্যকারী হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পিত প্রস্তাব বিশদ ভাবে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ও উদ্দিষ্ট কর্ম্মসাধনে কি ভাবে কার্য্যকরী করা হইবে তাহা না জানান পর্য্যন্ত, সে সম্বন্ধে আশা-নৈরাশ্যের কোনও মন্তব্য করা সমীচীন নহে। তাই আমরা এ বিষয়ে নীরব রহিলাম। তবে এই পরিকল্পনা যে শুধু নগরাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারদের জন্যই সীমাবদ্ধ, তাহা গোড়াতেই বুঝা যাইতেছে। অতএব দেশের ব্যাপক কর্ম্মহীনতার প্রতিকার ও সর্ব্বজনীন জীবনবৃত্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় যে সমস্যা, সে সমস্যার মীমাংসা ইহার মধ্যে নাই। অবশ্য নাগরিক শিক্ষিত বেকারদের প্রশ্নটিও যদি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার সমাধানে উদ্যোগী হইয়া থাকেন, তাহাও বড় কম কথা নহে। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও যোগ্যতার সহিত একটা প্রশ্নের সুমীমাংসা হইলে, তাহা বৃহত্তর প্রশ্নের সমাধানেও আলো দিবে, সাহস দিবে। আমরা জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে সমধিক আলোকপাত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি। দেশের চিন্তাশীল সম্প্রদায় এই জীবন-সমস্যার প্রতিকার-চিন্তায় খুব ব্যাকুল বলিয়াই আমরা জানি। তাহার সমাধান যত সন্নিকট হয়, ততই মঙ্গল, ততই তাহা বাঞ্ছনীয় ও অভ্যর্চ্চনীয়। —নবসঙ্ঘ (চন্দননগর)

উদ্বাস্তু ঠেঙানো শক্ত হবে

"ডেপুটি কমিশনারের প্রশ্নের উত্তরে কাছাড় উদ্বাস্তু সমিতির সভাপতি নাকি বলিয়াছেন, শুধু ইন্ডাষ্ট্রীতেই উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের সূত্র নিহিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি কাছাড়ে প্রচুর বাঁশের কথা উল্লেখ করিয়া পেপার মিল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব দিয়াছেন। প্রস্তাবটা সময়োপযোগীই বটে! বাঁশের ঝাড় উজাড় হলে উদ্বাস্তু ঠেঙানো শক্ত হবে। বলা বাহুল্য, মন্তব্যটি পূর্ব্বোক্ত উদ্বাস্তু-দরদীরই।" —কাছাড়

জুলাইয়ের শিক্ষা

"শ্রমিক, কর্ম্মচারী, ছাত্র, যুবক, মহিলা—সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নামিলে সে শক্তি কত দুর্ব্বার হইয়া উঠে, জুলাইয়ের কলিকাতা সেই শিক্ষাই দিয়াছে। গণতান্ত্রিক দলগুলি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইলে সে আন্দোলন কত প্রবল হয় কলিকাতার প্রতিরোধ আন্দোলন তাহারই পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছে। আন্দোলনের আগুনে যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সুসংহত ও প্রসারিত করিয়াই আজ গণ-শক্তিকে নব নব জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। শহর ও গ্রামের ঐক্য; শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্য; শ্রমিক, কর্ম্মচারী, মধ্যবিত্ত—সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপক ঐক্যের পথেই আজ যাত্রা করিতে হইবে। এই পথেই খাদ্য, চাকরি ও জমির জন্য দেশব্যাপী বিরাট গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার দিন আসিয়াছে। ইহারই জন্য চাই আন্দোলনের অগ্রণী শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর একতা, ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্য। চাই—শ্রমিকের পরম মিত্র, আন্দোলনের প্রধান শক্তি কৃষক সমাজের ভিতর ঐক্যবদ্ধ কৃষক সংগঠন। গণ-আন্দোলনের ইহাই হইবে প্রধান দুর্গ। ১৫ই আগষ্ট বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসী নেতারা

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে পতাকা ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছেন, কমিউনিষ্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে মিলিত ভাবেই সে পতাকা আজ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হইবে। ১৫ই আগষ্ট ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তির সেই নব সঙ্কল্প গ্রহণের দিন। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের অবসান চাই। ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার চাই। ইহারই জন্য দেশব্যাপী প্রবল গণ-আন্দোলন গড়িবার সঙ্কল্প গ্রহণের দিন আজ। - আজিকার এই দিনে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ উঠুক: বিধান সরকার গদি ছাড়ো! ভারত সরকার কমনওয়েলথ ছাড়ো!"

—স্বাধীনতা।

তদন্ত

"তদন্ত" শব্দ 'তদ' (তৎ) ও 'অন্ত' এই দুই শব্দের সংমিলনে উৎপন্ন। তদন্ত মানে (১) তাহার অন্ত অর্থাৎ শেষ (ষষ্ঠী তৎ)। (২) স্বরূপ নির্ণয় চেষ্টা, তত্ত্বাবধারণের প্রয়াস। তাহার অন্ত হয় যদ্দ্বারা (বহুব্রীহি)। বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে যে-পক্ষ নিজেদের অপরাধী বলিয়া জানে, তাহারা ঘটনার সত্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটনকে বিপজ্জনক মনে করিয়া সত্যতা যাহাতে লোকলোচনের গোচরীভূত না হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং তদন্তকারী ব্যক্তি বা ট্রিবিউনাল নিয়োগের সময় অপরাধী পক্ষ পূর্ব্ব হইতে তাঁবেদার বা এই ব্যাপারের পর চার ফেলিয়া প্রলোভিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে যত্নবান হয়। আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের দ্যোতক চিহ্ন অশোকস্তম্ভের নীচে রাষ্ট্রভাষায় "সত্যমেব জয়তে"। এ-হেন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক সত্য তথ্য অনুসন্ধানে কেন যে তৎপরতা দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা দেশবাসী অনেকের মনেই সন্দেহের উদ্রেক করিতেছে। দেশের মঙ্গল সাধনের অছিলা করিয়া নানা ব্যাপারে রাজকোষ হইতে কোটি কোটি টাকার আত্মশ্রাদ্ধে কোনও অপরাধী ব্যক্তির দণ্ডবিধান তো হয়ই নাই, বরং সংশ্লিষ্ট অসাধু রাঘব-বোয়ালদের প্রায় সকলেরই পদোন্নতি হইয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সন্দেহজনক মৃত্যুর ব্যাপারে মায়ের চিঠির যে জবাব প্রধান মন্ত্রী দিয়াছেন, তাহা কাহারও মনঃপূত হয় নাই। কাশ্মীর সরকার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রীর এ কথা যদি সত্য হয়, তবে সত্য ব্যাপার যতই অনুসন্ধান করা হউক না কেন, তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। রাষ্ট্রভাষায় বলে, "চন্দনকো ঘিঁসনেসে দেতরহে সুবাস" অর্থাৎ চন্দনকে যতই ঘর্ষণ করা যাক তাহার ততই সুগন্ধ বাহির হইবে। সারা ভারত যে তদন্ত চায়, তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়াই সন্দেহের কারণ হইয়া পড়ে।

* * * *

আমরা নেতাদের বিড়লা সেল্স ট্যাক্স ট্রিবিউন, বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন, কুচবিহার হত্যা তদন্ত কমিশন, কর্পোরেশন তদন্ত কমিশন প্রভৃতির কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। ট্রিবিউন বা তদন্তের ভাঁওতায় যেন লাঠির ঘা ও গুলীর আঘাত ভুলিয়া, "আগাড়ী লাত, পিছাড়ী বাত" পুলিশের কায়েমী স্বত্ব হইয়া না যায়।"

—জঙ্গীপুর সংবাদ।

শোক-সংবাদ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র গত ২৫শে জুলাই সকাল ১০টার সময় কৃষ্ণনগরে তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। পণ্ডিত মৈত্র পার্লামেণ্টের কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের নির্ব্বাচিত সদস্য, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-পরামর্শদাতা বোর্ডের সদস্য ও শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কংগ্রেস একজন সুবিবেচক, চিন্তাশীল এবং সৎসাহসী কংগ্রেসসেবীকে হারাইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্তা বিধবা পত্নী এবং পুত্রকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

গত ৩১শে জুলাই শুক্রবার প্রাতে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ তাঁহার পার্ক ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। অধ্যাপক মহলানবিশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানের "এমারিশাস প্রফেসার" এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গভর্ণিং বডির সভ্য, প্রেসিডেন্সী কলেজের ডীন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। তিনি শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞান বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের খুল্লতাত। আমরা তাঁহার পুত্রদিগকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

গত ২৬শে জুলাই রবিবার রাত্রি ৭-৪৫ মিনিটের সময় হাওড়ার জনপ্রিয় শিল্পী ও সাধক সঙ্গীতাচার্য্য অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। অভয়পদ বাবু একজন দরদী শিল্পী ছিলেন এবং তিনি বহু ছাত্র-ছাত্রীকে বিনা পারিশ্রমিকে সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, সঙ্গীত-বিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী—তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা করিতেন। আমরা পরলোকগতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ও তাঁহার চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের একমাত্র পুত্রবধূ এবং স্বর্গীয় ডাক্তার অমৃতলাল সরকারের পত্নী শ্রীমতী বিনোদিনী সরকার গত ১৪ই জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১টার সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ভক্তিমতী দানশীলা রমণী ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
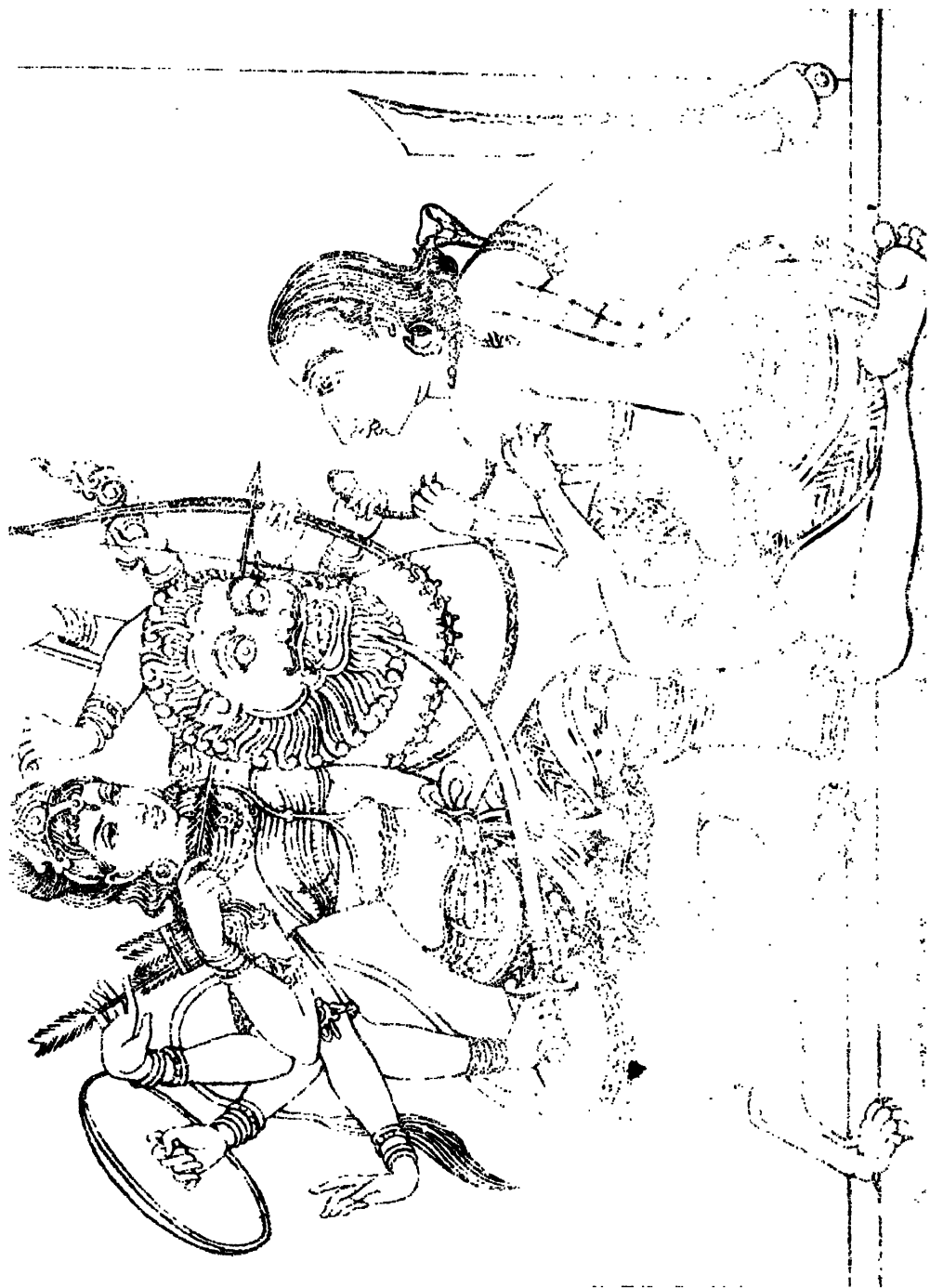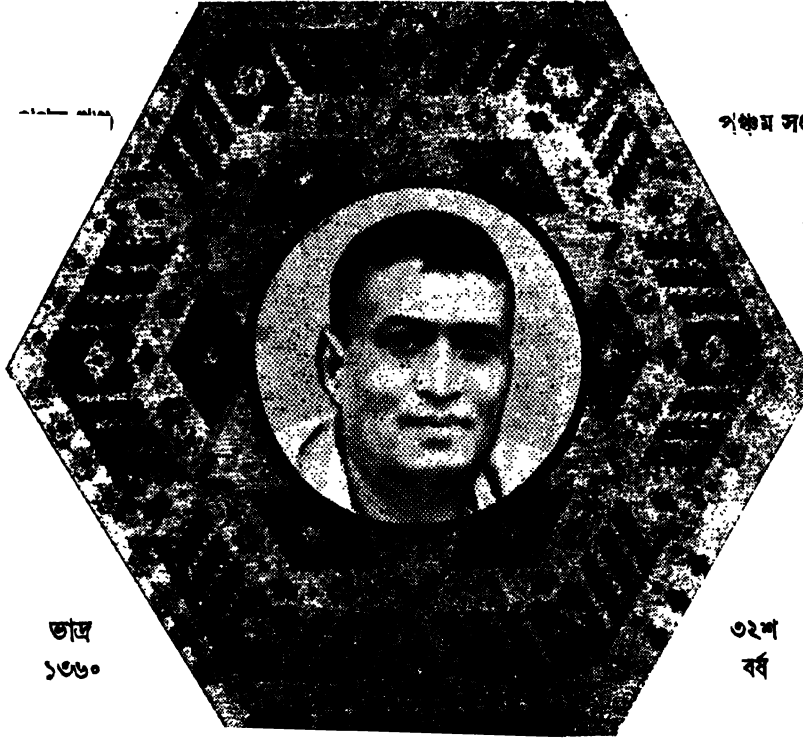
(স্থাপিত ১৩২১)

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। 'রা' শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বোঝায় আর 'ম' শব্দে ভগবান অর্থাৎ রাজা—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা—তিনি রাম হচ্ছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্ব কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ উভয় যদি শনি ও মঙ্গলবারে পড়ে ত বিশেষ প্রশস্ত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। মনে কর, একজন কাশী যাবে বলে সমস্ত ঠিক করে বসে আছে। এমন সময় টেলিগ্রাম এল যে, তোমার ভাইয়ের অসুখ, যায়-যায় অবস্থা, তুমি যদি শীঘ্র আস ত দেখা হতে পারে। সে তখন ছটফট করে বাঁকুড়ায় চলে গেল, কাশী যাওয়া আর হ'ল না। এখন ভেবে দেখ কার ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁগা তামক খেলে কি হয়?

কবিরাজ। ওটাতে বায়ু কম হয়, আপনি যখন তামাক খাবেন, তখন চিলিমির উপর কিছু ধনেরচাল ও মৌরী দিয়ে খাবেন, তাতে উপকার পাবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সোঽহং সোঽহং করলেই হয় না, জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ সুমুখ ঠেলা। এরও কপাল ও লক্ষণ ভাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সত্ত্বগুণের লোকদের বাড়ী ভাঙ্গা, কোন রকম ফিটফাট নেই। রজোগুণের লোক, ঘড়ি ঘড়ি-চেন, হাতে আংটী। তমোগুণে নিদ্রা, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁগা, আমি এ সব জানি, শুনেছি, দেখেছি, তাই বলছি তা কি দোষ হবে?

ভক্তগণ। না, না, আপনি বলুন, বেশ ভাল লাগছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তপ্রসঙ্গ

(শ্রীম'র অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে)

শ্রীঅনিল গুপ্ত

আজ বৃহস্পতিবার ৭ই জানুয়ারী শুক্লা-দ্বিতীয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। দেহের অসুখ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে কিন্তু কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই—এক চিন্তা, 'মা এদের যেন দেখিস্।' কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয় তাই-ই সর্ব্বক্ষণ চিন্তা—আর মার কাছে গদগদ স্বরে প্রার্থনা করেন। ভক্তদের লইয়া কতই না আনন্দ করেন, কতই না লীলা করেন। কখন হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া অপ্রপঞ্চ ধামের সীমাহীন আনন্দে লীন আবার পরক্ষণেই ভক্তদের মঙ্গল ও জীবের উদ্ধারের জন্য তা' ত্যাগ করে বিলাইয়া দেন সর্ব্বস্ব—আহা! তুমিই ত্যাগীশ্বর!

আবার কখন বালগোপাল ভাবে পাঁচ বছরের বালকের ন্যায় দিগম্বর হইয়া ভক্তদের সঙ্গে বিচরণ করেন। কত ভাবে যে প্রতিনিয়ত লীলা করেন তাহা ধরা ভার! তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মভাব, আশ্চর্য্য পবিত্রতা, বালোচিত সরলতা, গভীর জ্ঞান, প্রেমে টল-টল মূর্ত্তি, কঠোর বৈরাগ্য, রোগ-ভোগের অদ্ভুত যন্ত্রণা সত্ত্বেও শান্তির প্রতিমূর্ত্তি—আশ্চর্য্য করিয়া রাখে সকলকে। আবার মুগ্ধ করেন সকলকে, তাঁর সরল অথচ গভীর অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের রত্নরাজিতে!

বৈকাল সাড়ে ৪টা হইয়াছে। মাষ্টার উপরের পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলেন। দেখিলেন ঘরে নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে দু'-একটি ভক্ত আছেন।

ঈশ্বর দর্শন জন্য নরেন্দ্র বিশেষ ব্যাকুল ও মনে তীব্র বৈরাগ্য আসিয়াছে। গত ৪ঠা জানুয়ারী নরেন্দ্র দু'-একটি ভক্ত সঙ্গে অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে পঞ্চবটীতে সাধনা করিতে গিয়াছিলেন। আজও ইচ্ছা আবার সেইখানে সাধনা করিতে যান। তাই এসেছেন ঠাকুরের কাছে, কি মন্ত্রে সাধনা করিবেন তাঁর নির্দ্দেশ লইতে।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আজ কি করবো বলুন? রোজ কি কি করবো সব বলতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐখানে, পঞ্চবটীতে।

নরেন্দ্র। আজ্ঞা, কি করবো বলুন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। আজ **'রাম'** চিন্তা কর।

নরেন্দ্র (উল্লাসের সহিত)। আজ্ঞে, তা খুব পারবো, আগে ছেলেবেলায় খুব ভালবাসতুম। রামচরিত যখন পড়তুম বিভোর হয়ে যেতুম!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে, সেই **রামই সকলের মূল।**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিল ও মানসপটে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-চরিত ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—দৃশ্যের পর দৃশ্য, একের পর আর এক!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—**'ঐ রামই সকলের মূল, আজ ঐ চিন্তাই কর!'**

কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া নরেন্দ্র আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)। আপনি যে এক মাস বেলতলায় ছিলেন, কি পেয়েছেন?

মাষ্টার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ইঙ্গিত করিলেন—**'ওঁকেই পেয়েছি।'**

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িলেন ও নরেন্দ্রকে বলিলেন, 'মাষ্টার সব জানে, ভাল করে জিজ্ঞাসা কর।'

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)। বলুন না, কি পেয়েছেন?

মাষ্টার পুনরায় ঐ একই ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'ওঁকে পেয়েছি, ওঁর মধ্যেই সব। সব ভাবের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। যে যত ওঁকে জানতে পারবে, সে তত উন্নত হবে।'

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। উনি তো বার বার ঐ এক কথাই বলছেন—'ওঁকে পেয়েছি!'

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃদু হাস্য।

এই সময় কালী আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া নরেন্দ্রের পাশে বসিলেন।

নরেন্দ্র (কালীর প্রতি)। তুই যাবি দক্ষিণেশ্বরে? (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—ও কি যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কালীর প্রতি)। তুই যাবি? থাক্ তোর গিয়ে কাজ নেই। (নরেন্দ্রের প্রতি)—গোপাল (বুড়ো) আর শশীকেই নিয়ে যা।

নরেন্দ্র ও মাষ্টার একটু চুপি চুপি কথা কহিতেছেন, ঠাকুর লক্ষ্য করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি কথা কইছ গা।

মাষ্টার লজ্জা পাইয়া মস্তক অবনত করিলেন।

নরেন্দ্র। উনি বলচেন, সেই প্রথম দিনে ওঁকে দেখে দুই কথায় চুপ, সেই চুপ এখনও চুপ!

ভবনাথ। আহা! আহা!

* * * *

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনি তারকেশ্বর ক'বার গিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিন বার, সে অনেক দিন হলো।

নরেন্দ্র ভূমিষ্ঠ ভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বিদায় লইলেন।

নরেন্দ্র বিদায় লইলে ঠাকুর নরেন্দ্র সম্বন্ধে ভক্তদের বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে জানবার জন্য নরেন্দ্রর এখন খুব ব্যাকুলতা আর তীব্র বৈরাগ্য এসেছে। ঈশ্বরলাভের উপায়—অনুরাগ আর ব্যাকুলতা। আহা! ওর স্বভাব কি হলো, আগে কত কি বলতো আর এখন দেখছ না স্বভাব সব বদলে যাচ্ছে, শুধু প্রাণ আকুপাকু করছে।

"সাধন চাই! সাধন চাই! সাধন চাই! তা না হলে কিছুই হবে না। বিবেক-বৈরাগ্য চাই, সাধুসঙ্গ করে মন পবিত্র করা চাই, তবে তো হবে। যার ঈশ্বরকে জানবার জন্য অনুরাগ হয়, ব্যাকুলতা আসে তখন তার প্রাণ শুধু আকুপাকু করে, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। তার মন অন্তরাত্মা সর্ব্বস্ব ঈশ্বরে গত হয় আর অস্থির ভাবে বিচরণ করে, শুধু কাঁদে আর বলে, আমায় দেখা দাও, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও, তোমার প্রতি মতি দাও! সেই সময় ঈশ্বর তাকে একটু খাটিয়ে নেন তার আধার প্রস্তুত করার জন্য, তবেই তো সে ধারণ করতে পারবে; তবেই তো ঈশ্বর উপলব্ধির আনন্দ বোধ হবে।

"আমি তাই ভাবতুম, ৬।৭ বৎসর গাছতলায় আমি কত কঠোর তপস্যা করেছি তা নরেন্দ্রের কি কিছু করতে হবে না? নরেন্দ্র অখণ্ডের ঘর কি না, সব করিয়ে নিচ্চে। আমি ত' বলিনি এত ত্যাগ। খুব উঁচু ঘর, এখানকার সকলের চেয়ে উঁচু। তাই পূর্ণ বিকাশ হবার আগে সব করিয়ে নিচ্চে?"

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন,—সাধন ভিন্ন ঈশ্বর উপলব্ধি হয় না—নরেন্দ্র অখণ্ডের ঘর সত্ত্বেও, এই অপূর্ব্ব ত্যাগ আর কঠোর সাধন! নরেন্দ্র জগতের মঙ্গল করিবেন, লোকহিতকর কাজ করিবেন, শিক্ষা দিবেন, তাই কি এই কঠোর সাধন! সেই কারণ কি ঠাকুর বলিলেন—"পূর্ণ বিকাশ হবার আগে সব করিয়ে নিচ্চে।"

পূর্ণ বিকাশ না হলে, ঈশ্বর উপলব্ধি না হলে, ঈশ্বরের আদেশ না হলে কি কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করা যায়, না নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরণা আসে। লোকহিতকর কাজ করা কি মুখের কথা, না হেজীপেজী লোকের দ্বারা সম্ভব।

ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর দর্শন ভিন্ন—পূর্ণ বিকাশ ভিন্ন কিছুই হবে না। যা কিছু কর না কেন, সব পণ্ডশ্রম মাত্র। লোকহিতকর কাজ কি ঈশ্বর উপলব্ধি ভিন্ন করা যায়, কখনও না, তাতে লোকমান্য এসে পড়ে আর সকাম হয়ে যায়। সকাম কাজে পরের মঙ্গল সাধন কখনও হয় না।

তাই কি ঠাকুর বলেন—মাখন খাবার ইচ্ছা, তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন বল্লে কি হবে? খাটতে হবে। ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা, দেখবার ইচ্ছা, লাভ করবার ইচ্ছা, তা ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন বল্লে কি হবে! সাধন চাই!

সেই কারণ কি ঠাকুর আবার বলিতেছেন—সাধন চাই! সাধন চাই! সাধন চাই! বিবেক-বৈরাগ্য চাই! অনুভূতি না হলে কি অভিব্যক্তি হয়? কখনও না। সাধন, বিবেক-বৈরাগ্য আর সাধুসঙ্গের গুণে ভগবৎ-কৃপা লাভ হয়—অনুভূতি, তবেই অভিব্যক্তি। তখনই সব ঠিক ঠিক।

* * * *

পরদিন শুক্রবার ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। নরেন্দ্র কাশীপুর উদ্যান-বাটীর উপরের ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন করিলেন। ঘরে মাষ্টার ও কয়েকটি ভক্ত আছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে গান গাহিবার জন্য বলিতেছেন—গা না শ্যাম নাম।

নরেন্দ্র। 'রাম নাম লেতে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'রামনাম', 'কবে তব দরশনে', আচ্ছা, যা হয় গা।

"সত্যং শিব সুন্দর" এই গানটি গাহিবার জন্য মাষ্টার নরেন্দ্রকে বলিলেন।

নরেন্দ্র (অবিশ্বাসপূর্ণ ব্যঙ্গভরে)। জ্ঞান আনন্দ ছাই, ছাই দেখেন ব্রহ্মজ্ঞানী !!!

শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য।

পরে নরেন্দ্র গাহিলেন। 'গেরুয়া বসন' ইত্যাদি।

গানের পর নরেন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক পুকুরধারে নির্জ্জনে গমন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রের কি হলো?

ভক্ত। সবই আশ্চর্য্য কি না, আপনিই জানেন।

ঠাকুরের খাবার সময় হইয়াছে, মাষ্টারকে বলিলেন, 'এখনও আনলে না?' পরে পায়স আনা হইলে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন। সকলে বিদায় লইলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে পদসেবা করিতে বলিলেন। মাষ্টার পদসেবা করিলেন ও গায়ে লেপ দেওয়াতে বলিলেন, 'থাক থাক।'

পরে মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

পুকুরধারে নরেন্দ্র বসিয়া আছেন। মাষ্টারকে দেখিয়া নিকটে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দুই জনে কথা আরম্ভ করিলেন।

নরেন্দ্র। সংসারী কাউকে ভাল লাগছে না অবশ্য এক জনকে (আপনাকে) ছাড়া, আপনি সচেতন।

"আবার ওঁকে অনেক কিছু বললাম, আমার কি হবে, আমায় কিছু দিন। তা বল্লেন, তোকে অনেক উচ্চ অবস্থা দেবো······তোকে পরমহংসত্ব দেবো। তুই বাড়ীর একটা আগে ঠিক করে আয় না, সব হবে।

"আর কাল তো সবই দেখলেন, 'রাম' নাম কুলের ইষ্টমন্ত্র, তাও আমায় দিলেন।"

মাষ্টার। হাঁ, রঘুবীর······

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতিজলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে।"

যিনি বিদেশযাত্রার সময় বঙ্গভূমির নিকট পূর্ব্বোদধৃত প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন—কলিকাতার উপকণ্ঠে আলীপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে সেই মধুসূদনের "ধরাদগ্ধ প্রাণ" দেহত্যাগ করিয়াছিল। পরদিন তাঁহার শব কলিকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোডের পার্শ্বস্থ সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়।

মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন—"স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই; কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি; অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। সেই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে?"

যে স্থানে মধুসূদনের মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়, তাহারই পার্শ্বে তাহার চারি দিন মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার পতিগতপ্রাণা পত্নীর শব সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।

কিন্তু দীর্ঘকাল গত হইলেও সেই স্থানে কোন স্মারকচিহ্ন নির্ম্মিত হয় নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এক বৈশাখী অপরাহ্নে মধুসূদনের কবিতার ভক্ত বাঙ্গালী যুবক নগেন্দ্রনাথ সোম কৌতূহলবশে মধুসূদনের শেষ শয়ন-স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া ক্ষেত্রাধ্যক্ষের অনুগ্রহে স্থানটি স্থির করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় দুঃখ করিয়া বলেন, যিনি তাঁহার স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহার সমাধিস্থান নির্দ্দেশের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই! কি লজ্জার কথা!

এই ঘটনার অল্প দিন পরে একেশ্বরবাদী ডলের শব সমাধিস্থ করিবার জন্য সেন্ট্রাল বেঙ্গল ইউনিয়নের সদস্য কয় জন বাঙ্গালীও ঐ সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইলে সমাধিক্ষেত্রের রক্ষকদিগের কেহ বা কেহ কেহ, বোধ হয় যুবক নগেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়া, আগন্তুকদিগকে জানাইয়া দেন, নিয়ম এই যে, কোন ব্যক্তির সমাধিস্থানে কোন স্মারকচিহ্ন দশ বৎসরের মধ্যে স্থাপিত না হইলে সেই স্থান খনন করিয়া পূর্ব্বের দেহাবশেষ অপসারিত করিয়া তথায় অন্য দেহ প্রোথিত করা হয়—সেই নিয়মানুসারে মধুসূদনের সমাধিস্থান হইতে তাঁহার দেহাবশেষ অপসারিত করিয়া তথায় অন্য শব প্রোথিত করা হইবে। এই সংবাদ পাইয়া সমবেত ব্যক্তিরা মধুসূদনের সমাধিতে স্মারকচিহ্ন স্থাপনের জন্য ইউনিয়নকে একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনকে কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক ও অর্থরক্ষাকারী করেন। এই সময় যশোহর-খুলনা সম্মিলনী সভার পক্ষ হইতে সহযোগ করিবার প্রস্তাব করা হয়। মধুসূদন যশোহর (পরে খুলনা যশোহর হইতে করা হয়) জিলার অধিবাসী ছিলেন। তখন উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করা হয়। সমিতির পক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কার্য্যের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রকাশ করেন—

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবনাথ শাস্ত্রী
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
উমেশচন্দ্র দত্ত
নরেন্দ্রনাথ সেন

উদ্যোগিগণ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, তিন শত টাকায় কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কিন্তু যেমন বুঝা যায়, ঐ অর্থে কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, তেমনই মধুসূদনের অনুরাগীদিগের নিকট হইতে অর্থ আসিতে থাকে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বহু লোক অর্থ দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদিগের নামের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচনকালে সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ৩ শত টাকা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক শত টাকা, মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০ টাকা, শেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী ৫০ টাকা দিয়াছিলেন। মোট প্রতিশ্রুত ও প্রদত্ত টাকার পরিমাণ—১০৩৮ টাকা এক আনা। ইহার মধ্যে কেবল দ্বারবঙ্গের মহারাজার প্রতিশ্রুত এক শত টাকা হস্তগত হয় নাই। সংগৃহীত অর্থের মধ্যে ৭ শত ৫০ টাকায় যে মর্ম্মর-মণ্ডিত সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য পারিশ্রমিক ও আবরণোন্মোচন অনুষ্ঠানের সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এক শত টাকা ছিল।

মৃত্যুর কয় বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন স্বীয় সমাধিস্তম্ভের জন্য নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছিলেন :—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

সমাধিস্তম্ভের এক দিকে মর্ম্মরফলকে এই কয় চরণ উৎকীর্ণ হইয়াছিল—আর এক দিকে ইংরেজীতে কবির পরিচয় দিয়া লিখিত হয়—কবির কৃতজ্ঞ ও গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীদিগের দ্বারা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল।

১লা ডিসেম্বর এই স্তম্ভের আবরণ উন্মোচিত হয়।

উন্মোচনানুষ্ঠানে প্রাথমিক বক্তৃতায় নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার বক্তব্যে বলেন—আজ চারিদিকে জাতীয় জীবনের জাগরণের যে পরিচয় প্রকট হইতেছে, মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ সে সকলেরই অন্যতম দৃষ্টান্ত! যে জাতি তাহার পরলোকগত বরেণ্যদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সে জাতির উন্নতির আশা আছে।
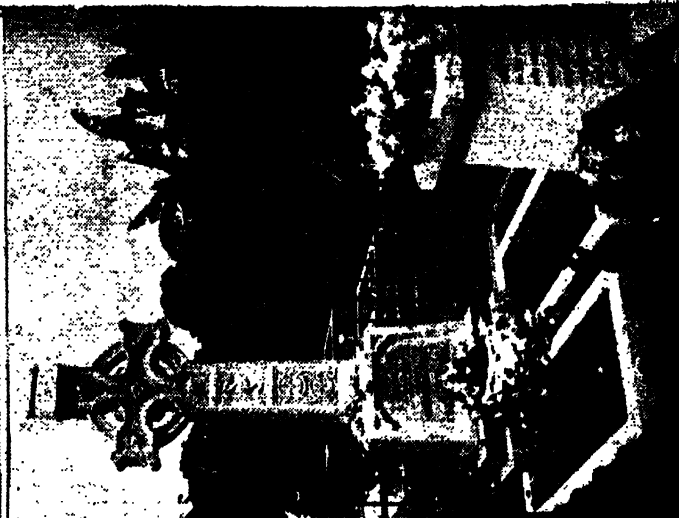
নরেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচিত করিবার সময় মনোমোহন ঘোষ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন—প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন যখন ইটালীর কবিগুরু দান্তের স্মরণোৎসবের জন্য ফ্রান্সের ভার্সেলসে চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন তিনি (মনোমোহন) তাঁহার নিকটে ছিলেন। সেই কবিতা এইরূপ :—

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমিরপুঞ্জে, হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান। জনম তব পরম সুক্ষণে।
নব-কবিকুল-পিতা তুমি মহামতি
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।

দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা পশে
পাপ-প্রাণ; তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।

যশের আকাশ হ'তে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীটে কাটে এ কোরকে?

মধুসূদনের লিখিত এই কবিতার ইতিহাস এতদিন পরে দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রবীন্দ্র দাশগুপ্তের চেষ্টায় বাঙ্গালী জানিতে পারিয়াছে। তিনি বহু চেষ্টায় ইটালী সরকারের দপ্তরখানা হইতে যে দুইখানি পত্রের প্রতিলিপি পাইয়াছেন, সে দুইখানিতে দেখা যায়, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইটালীবাসীরা যখন দান্তের জন্মভূমি ফ্লোরেন্সে তাঁহার ছয় শত বৎসরের জন্মোৎসবের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন নানা দেশের নানা কবি সেই আয়োজনের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিলেন। মধুসূদন তখন ফ্রান্সে। তিনি বিদেশী হইলেও কবিগোত্র বলিয়া সেই আয়োজনে সহযোগিতা করিবার প্ররোচনা দমন করিতে পারেন নাই।

সেই উৎসবের জন্য ইংরেজ কবি টেনিশন লিখিয়াছিলেন :—

"King that hast reign'd six hundred years,
and grown.
In power, and ever growest, since thine
own
Fair Florence honouring thy nativity
Thy Florence now the crown of Italy,
Hath sought the tribute of a verse
from me
I, wearing but the garland of a day,
Cast at thy feet one flower that fades
away."

মধুসূদন তাঁহার কবিতা যখন ইটালীর তৎকালীন রাজার নিকট প্রেরণ করেন, তখন তিনি ফরাসী ভাষায় পত্রে লিখিয়াছিলেন—তিনি কবিতা লিখিলেও আপনাকে কবি বলিবার স্পর্দ্ধা রাখেন না। তিনি গঙ্গার কূলে জাত এবং ইটালীর কবিগুরুর রচনার ভক্ত। দান্তের সমাধি-সজ্জিত করিবার জন্য ইটালীতে যে মাল্য গ্রথিত হইতেছে, তাহাতে সংযুক্ত করিবার জন্য তিনি প্রাচীর একটি ক্ষুদ্র (কবিতা) কুসুম প্রেরণ করিতেছেন।

ইটালীর রাজার পক্ষ হইতে তাঁহার মন্ত্রী কবিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি গঙ্গার কূল পর্য্যন্ত ইটালীর কবির খ্যাতিবিস্তারে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন—তাঁহার বিশ্বাস—"The moment is not very distant when Italy will see accomplished her auspicious destiny of being the ring which will unite the Orient with the Occident."

মধুসূদনের আত্মশক্তিতে প্রত্যয়ের অভাব ছিল না। 'মেঘনাদবধে' তিনি বাগ্‌দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি দাসে দেহ পদছায়া।
তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

'ব্রজাঙ্গনায়' তিনি বলিয়াছেন—"মধু—যার মধুধ্বনি।"

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে তিনি নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন :—

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে জোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে;—
সেই আমি ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে;—

কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল কেমনে,
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে;—

কল্পনা-দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার-ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে);

বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর-জায়া পক্ষে বীর পতিগ্রাসে;
সেই আমি শুন যত গৌড়চূড়ামণি।

সেই মধুসূদন স্বাভাবিক বিনয়বশে লিখিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে কবি বলিয়া পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা রাখেন না। এই বিনয় তাঁহার স্বদেশের ও বিদেশের বহু কবির সম্বন্ধীয় রচনায় যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে রচিত কবিতায় তেমনই সপ্রকাশ। তিনি স্বদেশীয় কবিদিগের মধ্যে—কাশীরাম, কীর্ত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বাল্মীকি এই কয় জনের উদ্দেশে এবং বিদেশী কবিদিগের মধ্যে হুগো, টেনিসন, দান্তে—এই কয় জনের উদ্দেশে কবিতায়

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় প্রতিভাবানের প্রতিভার উৎস হইতে উৎসারিত।

মধুসূদন যখন বিদেশে দান্তের উদ্দেশে কবিতা রচনা করিতেছিলেন, তখন তিনি মনোমোহন ঘোষকে দুইটি কথা বলিয়াছিলেন :—

(১) সকল দেশেই কবিদিগের দুর্ভাগ্য—মৃত্যুর বহুদিন পরে না হইলে তাঁহারা যশঃ লাভ করেন না।

(২) (দান্তে সম্বন্ধীয় কবিতাটি ফরাসীতে অনুবাদ করিবার সময় তিনি বলেন—) বিদেশীয় ভাষায় যত অধিকারই কেন থাকুক না কেহ যেন মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কবিতা রচনার চেষ্টা না করেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি মধুসূদনকে এক দিন ড্রিংকওয়াটার বেথুন বলিয়াছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন মধুসূদনের দৃষ্টান্ত দিয়া রমেশচন্দ্র দত্তকে বাঙ্গালা লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

প্রথম কথা কিন্তু মধুসূদন সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সঙ্গত হইবে না। সে কথা মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও বলিয়াছিলেন আর তাহার পূর্ব্বে কবির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"যশঃ মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? * * * * যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।"

এক দিকে নব্য বঙ্গসাহিত্যের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, আর এক দিকে পুরাতন সময়ের প্রধান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—উভয়েই মধুসূদনের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর যখন 'মেঘনাদবধ' অসামান্য কাব্য বলিলেন, তখনই প্রাচীন সংস্কৃতানুরাগীদিগের দিন শেষ হইল; সেই জন্যই যে সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা প্রথমে মধুসূদনের দারুণ বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রতিবাদে মৃদু গুঞ্জন মাত্র করিতে পারিয়াছিলেন। অরবিন্দের উক্তি :—

"'Tilottama' was a gauntlet thrown down by the Romantic school to the Classical. Romanticism won."

তাহার কারণ, এই দলে ছিল—যৌবনের অগ্নি, উৎসাহ, ভক্তি ও অসাধারণ প্রতিভার রচিত কবিতা।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের সঙ্কীর্ণতার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির পথ বিঘ্ন-কঙ্কর-কণ্টকিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই প্রায় বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—, 'খদির' বলিতেন। কদাচ 'চিনি' বলিতেন না,—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ 'ঘৃতে' নামিতেন। * * * পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন উন্নতি হইত না।"

মধুসূদন ভাষা লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সকল পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ভাষা বিষয়ের উপযোগী হইবে। তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যে লিখিয়াছিলেন :—

"মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে; দেখেছি,
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি হেরি শর হেন ভয়ঙ্কর।"

ভাষার ঝঙ্কার, ছন্দের টঙ্কার, উপমার অলঙ্কার—সকলই অসামান্য।

আবার তিনিই 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে লিখিয়াছিলেন :—

"কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি,—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হ'লে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা?"

মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ছড়া :—

বাহিরে ছিল সাধুর আকার
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম-ধোয়া।
পুণ্য-খাতায় জমা শূন্য
ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম—
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।"

মধুসূদন ভাষার ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। তিনি জয়দেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে তাহাই বলিতে হয় :—

"মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে;
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবে মনে?"

মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন কালে মনোমোহন ঘোষ বলিয়াছিলেন—তিনি "perhaps, the greatest poetical genius that Bengal has yet produced."

আর সেই উপলক্ষে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বাঙ্গালায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দেশবাসীর মত অভিব্যক্ত হইয়াছিল :—

"মধুসূদনের বন্ধুগণ ও স্বদেশবাসিগণ, আমি আপনাদিগকে বাঙ্গালায় কয়টি কথা বলিতে ইচ্ছা করি; কারণ, যাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহার যে রচনার প্রতি আকর্ষণ আমাদিগকে এই স্থানে আকৃষ্ট করিয়াছে, সে সকল বাঙ্গালায় লিখিত। যখন কোন জাতির জীবনে বিপুল পরিবর্ত্তন-যুগ সমাগত হয়, তখন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তিরাও আপনাদিগের যুগে আপনাদিগের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। যে সময় পুরাতন মতের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং নূতন মত তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে না যে সময় দেশের পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হয় বা হইয়া আসে, যে সময় সভ্যতা এবং আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি নূতন ভাব গ্রহণ করে, সে সময় মনীষীরাও আপনাদিগের কাব্য লোককে শুনাইতে পারেন না। সুতরাং সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় যিনি জাতীয় সাহিত্যে নেতৃস্থানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেইরূপ লোক ছিলেন। প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে তিনি তাঁহার জাতির প্রতীক ছিলেন। যদিও বাঙ্গালী বহুক্ষেত্রে নিন্দিত, তথাপি বাঙ্গালীর বিরাট আদর্শবাদ আছে এবং বাঙ্গালী অন্যান্য জাতির চিন্তা অধিকার করিতে পারে; তাহার ভাব প্রচুর, কল্পনা অসাধারণ এবং তাহার অনুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। এই সকল মানসিক গুণ মাইকেল মধুসূদনের অসাধারণরূপ ছিল। তবে—এই সকল তাঁহার স্বজাতীয় আমাদিগের মধ্যে বিকশিত না হইয়া সুপ্ত থাকে কেন? আমাদিগের গ্রামে বীরগণ কেন আত্মপ্রকাশ করেন না? আমাদিগের মহাকবিরা কেন মৌন থাকেন? আজ আমরা যাঁহার সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাকল্পে সমবেত হইয়াছি, তিনি কেন এই সকল বিষয়ে শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন? মধুসূদনে সংস্কৃতির সহিত শক্তির সমন্বয় হইয়াছিল। তিনি যেমন ধী-শক্তিতে তাঁহার দেশবাসীর প্রতিনিধি ছিলেন, তেমনই পরিপূর্ণ মানসিক সংস্কৃতিতে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয়ই তাঁহার মাতৃভাষা হইয়াছিল এবং তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু সাহিত্যের মত য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যও অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন—এবং তাহার সহিত ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান নব্য ভাষাসমূহও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যিনি বহু ক্ষেত্র হইতে এইরূপ সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তিনি যে কেবল আপনার মন সমৃদ্ধ না করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ জাতির মানসও সমৃদ্ধ করিবেন, তাহাই স্বাভাবিক। আজ আমি আমার চারি পার্শ্বে যে বহু তরুণকে সমবেত দেখিতে পাইতেছি, তাঁহাদিগকে আমি বলিতেছি, তাঁহারা 'মেঘনাদের' ও 'তিলোত্তমার' কবির উদার সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুকরণ করিয়া নানাস্থান হইতে উপকরণ আহরণ করুন। কিন্তু কেবল তাহাতেই (কার্য্যসিদ্ধি) হইবে না। আমাদিগের মহাকবি সমন্বয়ের ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমতাবলে তিনি প্রাচীর ও প্রতীচীর চিন্তা সমূহকে একই কবিতায় বিকশিত করিয়াছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য কেবল সংস্কৃতানুসারী হইবে না—কখনই সর্ব্বতোভাবে য়ুরোপীয় হইবে না। ভবিষ্যতে ভারতীয় ভাবে—ভারতীয় ভাষায়—ভারতীয় চিন্তায় য়ুরোপীয় ভাব ও তেজ, মত ও রুচি স্থান লাভ করিবে। মধুসূদনের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যসমূহে ভবিষ্যতের সেই সাহিত্য-সৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি জানি, পূর্ব্বগামী কবিদিগের মত তিনিও দৌর্ব্বল্য ও ত্রুটির উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি এখন যে অমরলোকে বিরাজ করিতেছেন তথায় কবি-সম্রাটদিগের সিংহাসনে হোমর ও দান্তে, মিলটন ও আমাদিগের কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতির সিংহাসনমধ্যে আমাদিগের প্রিয় কবি মধুসূদনের সিংহাসন সমুন্নত ও সমৃদ্ধ। তিনি তথায় শান্তিতে বিরাজিত থাকুন। যাঁহার মাতৃভাষায় আমরা কথোপকথন করি, আমরা যাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করি, যে স্থানে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষা করিয়া তাহা পবিত্র মনে করি সেই স্থান পুণ্যভূমি মনে করিয়া আমরা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। মধুসূদনের নাম—বাঙ্গালায়—কেবল বাঙ্গালায় নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতে—অমর হইয়া থাকুক।"

ইংরেজী ভাষাও মধুসূদন মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনোমোহনকে বলিয়াছিলেন—বিদেশী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া কেহ অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন না। তরু দত্ত ইংরেজীতে যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সে সকল পাঠ করিয়া বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক ও সাহিত্যিক গস বলিয়াছিলেন তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"When poetry is as good as this it does not much matter whether Rouveyre prints in upon Whatman paper, or whether it steals to light in blurred type from some press in Bhowanipore,"

কিন্তু তিনি ইহাই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, যখন ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হইবে তখন—"There is sure to be a page in it dedicated to this fragile exotic blossom of song." পরবর্ত্তী কালে সরোজিনী নাইডুর তাহাই হইয়াছে। মধুসূদন তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন:—

> হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
> তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
> পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
>
> কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
> অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন,
> মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
> কেলিনু শৈবালে—ভুলি কমল-কানন।
>
> স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে—
> 'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি;
> এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
> যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।'
> পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
> মাতৃভাষারূপ খনি—পূর্ণ মণিজালে।

সেই খনি হইতে অমূল্য মণি সংগ্রহ করিয়া তিনি সে সকল তাঁহার দেশবাসীকে উপহার দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিভা সে সকল মণিকে সংস্কৃত ও সমুজ্জ্বল করিয়াছে—

"বিশ্বকর্ম্মা শাণযন্ত্রে শাণিলে ভাস্করে,
হয়েছিল শোভা তাঁ'র উজ্জ্বল যেমন।"

মধুসূদনের দেশবাসীরা তাঁহার প্রতিভার গৌরব অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে যে দুঃখ করিয়াছিলেন—তাহার কারণ ঘটিয়াছিল—

"এই ভাবি মনে,
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ রাখে তার তলে?"

মধুসূদনের সেই কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। ১২৬৫ বঙ্গাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার 'গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয় নাই। সেই বিলম্বজনিত বেদনায় সান্ত্বনা—এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবন্ধ লিখিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—তাঁহার কৃতিত্ব-পরিচয় দিয়াছিলেন।

মধুসূদনের মৃত্যুর ১৫ বৎসর পরে তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহার সমাধিস্থানে স্মারকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বিলম্বের অন্যতম কারণ, বাঙ্গালায় চিতার উপর মঠ প্রতিষ্ঠার প্রথা অধিক প্রচলিত ছিল না এবং নানা কারণে সে প্রথা লোক প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল।

যাহাই হউক, ১৫ বৎসর পরে—কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দেশের লোক সচেতন হইয়াছিলেন। তবে স্মারকস্তম্ভ মহাকবির উপযুক্ত হয় নাই। পরে দেশের লোকের চেষ্টায় মধুসূদনের সাধ্বী পত্নীর সমাধিস্থানে স্মারকচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক্ষণে দেশবাসী মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়ন দত্তের সন্তানদিগের নিকট দেশবাসীর অসমাপ্ত কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করায় কৃতজ্ঞ। তাঁহারা কেবল যে পিতামহের ও পিতামহীর সমাধির স্থান নির্ভুলরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাই নহে—সমাধি সর্ব্বতোভাবে কবির উপযুক্ত করিয়াছেন। নিকটেই তাঁহাদিগের জননীর শব সমাহিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল, আলবার্টের শবাবশেষ লক্ষ্ণৌ হইতে আনিয়া তাঁহার পিতামাতার শেষ শয্যার নিকটে স্থাপিত করেন। কিন্তু সমাধিক্ষেত্রের রক্ষণভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদিগের নিয়মে তাহা সম্ভব হয় নাই। মধুসূদনের সমাধিস্থানের শিরোভাগে আয়র্লণ্ড হইতে নীত বৃহৎ প্রস্তর-ক্রশ স্থাপিত হইয়াছে। সমাধিগুলির স্থানটি লৌহবৃতিতে বেষ্টিত হইয়াছে এবং স্থানটি মধুসূদনের মত কবির শেষ বিশ্রামস্থানের উপযুক্ত করিতে চেষ্টার, কল্পনার, অর্থের ব্যয়ে কোনরূপ ত্রুটি করা হয় নাই।

এখন এই সমাধি—জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করিবার ভার একটি সমিতি গঠিত করিয়া সদস্যদিগকে প্রদান করিবার প্রস্তাব হইতেছে। তাঁহাদিগের ও আমাদিগের আশা ও অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় রাজ্যপাল—মধুসূদনের সমধর্ম্মী ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করুন।

এই সঙ্গে আমরা আর একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি—যে উদ্যম, উৎসাহ ও উদারতা লইয়া রাজ্যপাল দার্জ্জিলিংএ দাশ মহাশয়ের মৃত্যু যে গৃহে হইয়াছিল তাহা জনহিতকর কার্য্যের জন্য ব্যবহার-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রযুক্ত করিয়া খিদিরপুরে মধুসূদনের বাসগৃহটিও অনুরূপ জনকল্যাণকর কার্য্যে ব্যবহারের জন্য জাতীয় সম্পত্তিরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

অপ্, জল, Water, পানি

(১) "দেবশত্রু দ্বারা জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'লে অশ্বিদ্বয় তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন।"—(ঋগ্বেদ ১।১১৭।৪)

(২) "বন্দন নামক মুনি কূপে নিক্ষিপ্ত হ'লে অশ্বিদ্বয় তাঁকে উদ্ধার করেন।"—(১।১১৭।৪)

(৩) "বশিষ্ঠ মুনি আত্মহত্যার চেষ্টায় গলায় শিলাবন্ধন পূর্ব্বক সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন কিন্তু সমুদ্র তাঁকে তীরে নিক্ষেপ করে।"—(মহাভারত—আদি)

(৪) "সমুদ্রের কাছে পরাজিত হয়ে বশিষ্ঠ পুনরায় নিজেকে পাশবদ্ধ ক'রে নদীর স্রোতে নিমজ্জিত হন, কিন্তু নদী তাঁর পাশমুক্ত ক'রে তাঁকে তীরে উৎক্ষিপ্ত করে ও "বিপাশা" নাম গ্রহণ করে।"—(মহাভারত—আদি)

(৫) দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু তৎপুত্র প্রহ্লাদকে নিহত করার জন্য শিলা সহ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করেন।

(৬) সগরপুত্র অসমঞ্জ প্রজাপুত্রগণকে জোর পূর্ব্বক সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপে নিহত করেন।

(৭) চ্যবন মুনি সুদীর্ঘকাল জলমধ্যে তপস্যারত ছিলেন। ধীবরগণ কর্ত্তৃক জল হইতে উত্তোলিত হন।

(৮) দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের জল স্তম্ভিত ক'রে তন্মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন।

(৯) দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

(১০) বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (Old Testament) যাত্রা পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে মোসীর প্রভাবে সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পলায়নপর ইস্রায়েল জাতিকে পথ দিয়েছিল, কিন্তু তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী ফারাওনের সৈন্যগণকে গ্রাস করেছিল।

[আজ-কাল রেওয়াজ হয়েছে যে বিখ্যাত কোন' একজনের নামের সঙ্গে নিজেদের নাম লেজুড়ের মত জুড়ে দিয়ে বিখ্যাত হওয়ার বৃথা চেষ্টা ! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিথিপূজা, শরৎ বসুর জন্মবার্ষিকী, নজরুলের সাহায্য-ভাণ্ডারের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যত সব অকর্ম্মণ্য দেশকর্ম্মী, বুদ্ধিহীন সরকারী কর্ম্মচারী, পেটমোটা বিত্তবান, মাতাল ও দুশ্চরিত্র সম্পাদক ইত্যাদি ইত্যাদির নাম থাকবেই। যেন, তেনারা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দর দেশে আর অন্য কোন মানুষই নেই ! যাই হোক, 'মাসিক বসুমতী'র বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে প্রায় প্রতি সংখ্যাতে চার জন এমন বাঙালীর সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে, যাদের নাম ঘুষখোর দৈনিক কাগজগুলোর ছাপানো তালিকায় খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যায় না।

মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে এই পরিচিতির তথ্য সংগ্রহ করছেন শ্রীমান্ আশীষ বসু। —সম্পাদক]

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

'পশ্চিমের কঠিন লাল মাটির ধারে ধারে শাল, তমাল, মহুয়া আর ইউক্যালিপটাস গাছের সার, ছোট ছোট টিলা আর তার মধ্যের আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী নদী আমাকে কবি করেছে। পঞ্চকোট পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ছোট্ট গাঁ গোবিন্দপুর আমার মনকে চিরকাল কবিতার খোরাক জুগিয়েছে। সেখানকার ঝুলিয়া নদীকে নিয়ে মনে মনে কত কবিতাই না রচেছি। কত দিন বিকেলে নদীটির ধারে গিয়ে বসেছি। মনে মনে গান রচনা করেছি। সূর্য্যের আলো এসে নদীর জলে পড়েছে। কতই না মনোরম সব সৌন্দর্য্য দেখেছি।' বলতে বলতে বাক্‌রোধ হলো বৃদ্ধ কবির।

গঙ্গার ধারে তাঁর ছোট্ট সুন্দর বাড়ীটির সামনের বারান্দায় বসে আছি দু'জনে। কবি অস্তর নিংড়ে বলে চলেছেন তাঁর কথা। বলে চলেছেন, 'কলকাতায় যখন General Assembly's Institutionএ (বর্তমান স্কটীশ) পড়ি, তখন আমি কবিতার মোহে পাগল। খাতা ভরিয়ে ফেলছি নিজের লেখায়। মন ভরিয়ে ফেলছি মাইকেল, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে।' বলতে বলতে কপালে হাত ঠেকিয়ে যুক্ত-করে প্রণাম করলেন। তারপর আবার সুরু হোল, 'শান্তিপুরে গিয়ে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হলাম। সেখানকার হাই স্কুল থেকেই এন্‌ট্রান্স পাশ করে ফিরে এলাম আবার General Assembly Institution এ। এই সময় আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশিত হয়। তারপর 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা', 'রবীন্দ্র আরাত', 'শতনরী' প্রভৃতি একে একে ছাপা হোল।'

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা জীবনই প্রায় তার কেটেছে শিক্ষকতায়। সরকারী ও বেসরকারী স্কুল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী নিয়ে কেটেছে বিশ বচ্ছর। এখন তিনি ৭৬ বৎসর অতিক্রম করে চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে কবি বললেন, 'সুধীন ঠাকুরের সঙ্গে সদ্য লেখা কবিতার খাতাটি সঙ্গে করে ভয়ে ভয়ে একদিন হানা দিলাম তাঁর দরজায়। কয়েক মিনিটেই পরিচয় ঘটলো অন্তরের।' হঠাৎ এই প্রসঙ্গ শেষ করে বললেন, 'বেশী কিছু বলে কি হবে। কবিগুরুর সঙ্গে ছবি তুলেছি। সে ছবিতে কে কে ছিল জানো ? যতীন বাগচী, সত্যেন দত্ত, দ্বিজেন বাগচী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, আর ঠিক ডান পাশটিতে আমি। তাঁর কাছে লেখা নিয়ে গিয়ে কত সাহায্য যে পেয়েছি। আজকালকার কবিরা তো আর তা পেলো না।'

শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে বললেন, 'শরৎচন্দ্রকে আমি 'দাদা' বলতাম। এ থেকেই বুঝে নাও। তিনিও আমাকে নিজের ভায়ের মতই আদর-যত্ন করতেন।'

বর্ত্তমান কবিতার সম্পর্কে তিনি খুবই আশাবাদী। বললেন, 'কবিতার সুর পাল্টেছে। কারণ দেশ, কাল, সমাজ ও প্রকৃতির পট পরিবর্তন ঘটেছে। নবীন কবিদের কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। নতুন পালা শুরু হয়েছে। এটাই বাঞ্ছনীয়।'

'মাসিক বসুমতী'র তিনি একজন নিয়মিত গ্রাহক। প্রতি মাসের বসুমতী বাঁধিয়ে আলমারীতে সাজিয়ে রেখেছেন দেখলাম। বললেন, 'আমার সবচেয়ে প্রিয় কাগজ 'মাসিক বসুমতী।'

মৃণালিনী এমার্সন

(অধ্যক্ষা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা)

...হবার কথা পেন্টার, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তাকে কখনো ...হতে হয়েছে কার্পেন্টার, এ আর এমন বেশী কথা কি ! ...দের দেশের অনেক শক্তিমান শিল্পীকেও ছবি আঁকা ছেড়ে ...নির ম্যানেজারী করতে শোনা গেছে। অন্যান্য দেশেও ...এমন অনেকের খবর মিলবে। মৃণালিনী এমার্সন পিতামহের ...থেকে পেলেন জাতীয় আদর্শের ভাবধারা, পিতার কাছ থেকে ...কয়েক আলমারী আইনের বই কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তিনি ...শিক্ষক। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি শ্রদ্ধেয় ...বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত পিতামহের সংস্পর্শে কেটেছে তাঁর ...কাল, এ কথা বলতে বলতে আনন্দে কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে এল তাঁর। '...বাবা একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার, তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি ...পড়ি। আমারও ইচ্ছে তাই। সুতরাং এম-এ পাশ করার পর বি-এল নিলাম। কিন্তু ওই পাশ করাই, আদালতের দরজা আর মাড়াতে হোল না। আইনের বইগুলো আজও আমি বার ...করে আলমারী থেকে পড়ি। আইন থেকে শিক্ষকতা, একবার ভাবুন তো ! সে যাই হোক, প্রথম কয়েক বছর কাটলো গোখলে ...রিয়াল স্কুলে, তারপর কিছুদিন ডায়োসেসনে, সেখান থেকে ...বেথুনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা হয়ে আর সেই থেকেই ...গেছি, অবশ্য প্রিন্সিপাল হয়েছি বছর আষ্টেক মাত্র।'

...হাস্যময়ী এই মানুষটির কাছে যখন আমার এই লেখার প্রস্তাব করলাম, তিনি তো প্রথমে অবাকই হয়ে গেলেন, পরে একটু ...বললেন, 'বলেন কী ? আমি তো একটু হকচকিয়েই যাচ্ছি। আমি কী এসবের উপযুক্ত হবো ?'

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পড়তে খুব ভালবাসেন আর সব চেয়ে ভালবাসেন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে। বেড়াবার কথা-প্রসঙ্গে তিনি ...লেন, 'ইউরোপে তিনবার গেছি। প্রথম ১৯১২ সালে, বয়স তখন ...বৎসর মাত্র। তারপর একেবারে ১৯৪৭ সালে ও পরে আর একবার ১৯৫১ সালে। সাংহাই গেছি, আরও কিছু কিছু বাইরে ঘুরেছি। জাপানে যাবার খুব ইচ্ছে রয়েছে মনে মনে। সুযোগ পাচ্ছি না ঠিকমত।'

১৯৪১ সালে তিনি বিয়ে করেছেন। এ বছর এপ্রিলে তিনি ৭২ বছরে পা দিলেন।

সাধারণ ভাবে সবচেয়ে তাঁর প্রিয় হোল কুকুর। তিনি গান ভালবাসেন, কবিতার প্রতিও তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে।

'বাংলা কাব্যের পরিবর্তনটা হচ্ছে খুব দ্রুত। সুধীন দত্তকে ...মধ্যে আমার ভালো লাগে। মেয়েদের মধ্যে বাণী রায়ের ...মন্দ লাগে না। অবশ্য একথাও স্বীকার করছি অনেক কিছুই ...আমি পড়িনি।'

ভারতীয় সংবাদপত্রের আদর্শকে তিনি খুব উচ্চে স্থান দেন। ...তবে তিনি বললেন, 'টেকনিকের ত্রুটি আছে যথেষ্ট। সংবাদ প... উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ছবি ছাপা সম্বন্ধে উন্নত ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে হতে হবেই।'

'মাসিকপত্রগুলি দেশের প্রাণ। "মাসিক বসুমতী" তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর।'

ইনি মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠক।

সাধারণ ভাবে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত হিসাবে তিনি অবশ্য গ্রহণ করে নিয়েছেন। মনে মনে আইনজীবি হবার কথা আজও হয়ত তিনি ভাবেন। গবেষণার কাজ নিয়ে তিনি এখন বিশেষ ব্যস্ত রয়েছেন।

যে কোন কাজ নিয়েই হোক না কেন, মানুষটির কাছে যাঁরাই যাবেন তাঁরাই একটা অদ্ভুত ছাপ মনে নিয়ে ফিরে আসবেন। মনে হবে ঠিক এমনি হাসিখুসী, প্রাণখোলা, মনখোলা মানুষ কই চট্ করে তো বড় একটা চোখে পড়ে না !

মৃণালিনী এমার্সন

রাধাবিনোদ পাল

অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টা, পরিশ্রম ও অমানুষিক কষ্ট স্বীকারের ফলে বড় হয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন যে কয়েক জন মনীষী ডাঃ রাধাবিনোদ পাল তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন। প্রথম জীবনে স্কুলে ও কলেজের প্রত্যেকটি দিন তাঁকে দারিদ্র্যে
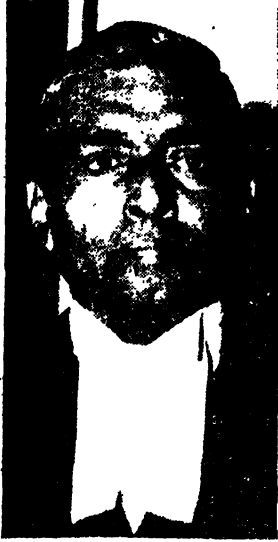
রাধাবিনোদ পাল

বিরুদ্ধে করতে হয়েছে নিয়মিত-সংগ্রাম। সামান্য রাঁধুনীর কাজ নিয়ে তাঁর জীবন-সংগ্রামের সুরু। পরের বাড়ীতে বছরের পর বছর থেকেছেন, তাদের বাড়ীর সমস্ত কাজ করে দিয়েছেন আর তারই মধ্যে স্কুল-কলেজের পরীক্ষার গণ্ডীগুলো সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর জীবনে এসেছে সাহায্য। স্কুলে এসেছেন ইনস্পেক্টর পরিদর্শনের কাজে। একটি মাত্র কথা বলেই বুঝতে পারলেন রাধাবিনোদ উত্তরকালে হবেন একজন খ্যাতিমান পুরুষ। বন্দোবস্ত করলেন স্কলারশিপের। স্কলারশিপ পেলে কি হবে, সে স্কুল নানা কারণে সে বছরই গেল উঠে। আবার সেই নিরাশ্রয়। আবার এলো আশ্রয়। 'এমনি নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে আমার জীবন।' বললেন ডাঃ রাধাবিনোদ পাল তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে।

সৌম্যদর্শন, দীর্ঘাঙ্গ এই মানুষটির প্রখর ব্যক্তিত্ব প্রথম দর্শনেই সকলকে সচকিত করে দেবে। বলে দেবে, তুমি এমন একজনের কাছে এসেছো যাঁর কাছে সম্ভ্রমে তোমাকে মাথা নোয়াতেই হবে। মুখে হাসিটি তাঁর লেগেই আছে। ৭৭ বছর বয়সেও তিনি যতখানি সোজা হয়ে পথ চলেন দেখলে আশ্চর্য হতে হয়।

আইনজীবী ডাঃ রাধাবিনোদ পালকে অনেকেই চেনেন। কিন্তু শিক্ষক হিসাবেও তাঁর একটা পরিচয় লুকিয়ে আছে। ... দশ বৎসর ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে তিনি গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি Tagore Law Professor হিসাবে দীর্ঘকাল বক্তৃতা দিয়েছেন ও পরে সেখানে ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছেন।

শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরে থেকেও তিনি জয়মাল্য নিয়ে এসেছেন। হেগে 'ইন্টারন্যাশানাল কংগ্রেস অফ কমপ্যারেটিভ ল'র তিনি সভাপতি ছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা আজও অনেকেই মনে করে রেখেছেন। সর্বভারতীয় আইন-সভার তিনি সভাপতি। International Law কমিশনের এ বছরের সভাপতি তিনি। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে থাকবেন আমাদের মনে টোকিওতে International Military Tribunalএ তাঁর সাহস ও তেজোদীপ্ত ভাষণে। তিনি চিরকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, আজও তাঁর সে সংগ্রাম শেষ হয়নি।

'বসুমতী' সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুবই উচ্চে। সংবাদপত্র সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত। 'মাসিক বসুমতী'র তিনি একজন প্রায়-নিয়মিত পাঠক।

আইন সম্বন্ধে তিনি একাধিক বই লিখেছেন। কথাবার্তা শেষ করার আগে তিনি বললেন, 'ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বড় একটা কথা বলবার তো সময় পাই না। আজ শনিবার, একটু সময় পেয়েছি, যাই।'

সুধাংশু বসু

(সম্পাদক, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)

সুধাংশু বসু
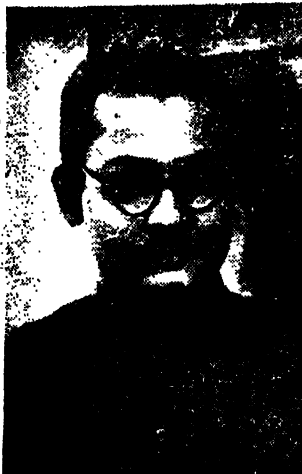
বাবা ছেলেকে বললেন, তোমার জীবনে তুমি কি হবে সে সম্বন্ধে লেখো তো একটা রচনা। অনেক ভেবে চিন্তে ছেলে লিখলো সে হবে সাংবাদিক। বাবা তো হেসেই আকুল, 'সে কি রে! তুই হবি সাংবাদিক! কেন ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারীং কি আর কিছু।' 'ও সব তো সবাই হবে লেখে, আমি একটা নতুন কিছু লিখলাম।' সাংবাদিক হবার কোন ইচ্ছাই যাঁর ছিল না, জীবনে ভাগ্যের বিড়ম্বনাই তাঁকেই হোতে হোল কিনা সাংবাদিক। 'কবে একদিন খেলার ছলে কি বলেছি আর তাই কিনা এমনি করে আমার জীবনে সত্য হয়ে দেখা দেবে।' হাসতে হাসতে বললেন সুধাংশু বাবু তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে।

'আমি স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি চিরকালই ভালো ছেলে বলে খ্যাতি পেয়ে এসেছি। রাজনীতিতে একবারে যোগ দিইনি যে, তা নয়। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দেবার আগেই পর-পর মারা গেলেন বাবা, জ্যাঠামশাই, জামাইবাবু। পড়াশুনায় ফিরে এলাম রাজনীতি থেকে। বুঝলাম পড়াশুনা আমাকে করতেই হবে। পিউরিটান স্কুলে আমি পড়েছি। তাই স্বভাবতই আমি ইংরেজ-বিদ্বেষী। চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমার মনে হয় ওতে কুলীর রক্ত মেশানো আছে। মনে-প্রাণে আমি ইংরেজীয়ানাকে ঘৃণা করি। ১৯৫০ সালে যখন ভারতীয় সাংবাদিকদের হয়ে আমি বিলেত যাই তখন রয়টারের প্রতিনিধি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রিটিশ প্রেস সম্বন্ধে কি ধারণা ... আমার। আমি বলেছিলাম বৃটিশ প্রেসের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অত্যন্ত নীচু। মাত্র এক পাতা সংবাদ ছেপে বাকী সাত পাতা আপনারা ...

আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করেন। জনমত তৈরীর দায়িত্ব বৃটিশ প্রেস গ্রহণ করেনি বলেই মনে হয়। বহু সংবাদ বৃটিশ প্রেস বিকৃত করে ছাপে।'

তবে 'টাইমস্,' 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

'আমি ইংরেজী কাগজের সম্পাদক হবো এ ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর। মাত্র দশ বছর আগেও আমি শিক্ষকতা করেছি কলেজে। ইংরেজী আমি ইচ্ছা করে পড়তাম না। শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, আমার ইংরেজী জ্ঞান শুরু হয় শার্লক হোমসের ভেতর দিয়ে। তারপর থ্যাকারে, ডিকেন্স, ডুমা পড়েছি। 'ক্রইট্জার সোনাটা' আমার প্রথম পড়া ইংরেজী পুস্তক।'

'Advance পত্রিকায় আমার সাংবাদিকতা জীবনের হাতেখড়ি। তারপর এলাম 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' আর সেই থেকেই রয়ে গেছি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাংলাদেশের সাময়িকপত্রগুলি সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?'

'পরীক্ষা চলছে নানান ক্ষেত্রে সত্যি। কিন্তু 'প্রবাসী,' 'ভারতবর্ষে' তা নেই কেন? 'মাসিক বসুমতী'কে ধন্যবাদ, সে অনেক বিষয়ে নতুন নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছে। আমার নিজের ধারণা, গোষ্ঠী না থাকলে ভালো সাময়িকপত্র হয় না। এই 'কল্লোল' কিংবা 'পরিচয়'কেই (সুধীন দত্তের) দেখুন না।'

'বাংলা দেশের উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি নিয়ে যে পরীক্ষা চলছে এটার সম্বন্ধে আপনার কি বলবার আছে?'

'পরীক্ষা সব সময়েই ভালো। তবে সাহিত্যে বেশী প্রচার-প্রবণতা থাকলে সে সাহিত্য বাঁচবে না।'

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভীষণ খেলাধুলা পছন্দ করেন। কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে প্রায় নিয়মিত ভাবে তিনি উপস্থিত থাকেন। আধুনিক গণনাট্য সংঘের নাটকগুলি সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

সব শেষে তিনি বললেন, 'আপনি যেদিন এলেন এটা আমার জন্মতিথি। ভালোই হোল, এ জন্মতিথিটা এই জন্যেই মনে থাকবে।'

গত ২৮শে জুলাই তিনি ৪১শে পা দিলেন। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় 'Hindusthan Standard' পত্রিকাখানি ক্রমে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

গঙ্গা ও উমার কলহ

(পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে)

শ্রীশান্তি পাল

একদিন ভগবতী পুত্র ল'য়ে ছাড়ি' পতি
উঠে গিয়া লা'য়,
হেন কালে জটা থেকে গঙ্গা হরে বলে ডেকে—
উমা কোথা যায়?
কা'রে কিছু নাহি বলা জানে কত ছলাকলা
খেয়ালের বশে,
চলিয়াছে মদভরে দৃক্‌পাত নাহি করে
ডগমগ রসে!
এই কথা শুনি কানে, উমা জ্বলে মনে-প্রাণে,
থরথর কাঁপে—
বলে, নাম্ মাথা থেকে তেজ তোর যাব দেখে,
গর্জ্জে যেন সাপে!
শোন্, কালা কলঙ্কিনী তোরে আমি ভাল চিনি,
হর অনুরাগী,
বৃদ্ধ স্বামী ল'য়ে মোর থাক্ রাত্রি দিন ভোর
যাই তোর লাগি।
তোর মত দুরাচার সে কথা যে কহা ভার
লোকে ঘৃণা করে,
যত সব বাসি মড়া পায়ে বেঁধে দড়িদড়া
ফেলে তোর 'পরে!
পচি গোটা বুক বেয়ে নিত্য খেয়া দেয় নেয়ে
লজ্জা নাহি পাস্,
মাঝি মারে দাঁড়-বাড়ি বুকে ব'সে গায় 'সারি'
নাহি কোন ত্রাস!

উমার এ কথা শুনি কহে গঙ্গা সুরধুনী
অতি কটু স্বরে—
সঙ্গে ল'য়ে ছেলেপিলে কা'র ঘরে গিয়েছিলে
বল্ না রে মোরে?
হ'য়ে শেষে দশভুজা সর্ব্ব ঘটে ল'য়ে পূজা
—হাড়ি-ঝির বাড়া,
যত ছুলে ডোম পশি' তোর মুখোমুখি বসি'
গায় 'কবি-জারি'!
তাই বুঝি মর্ত্ত্যে যাস্ ঘরে ঘরে পূজা চাস্
র'স চারি দিন,
শোন্ গিরি-রাজার ঝি আরো কিছু বলিব কি,
সে কি সমীচীন?
তোর যত অনাচার জানে লোক সবি তার
কব আর কত?
শুম্ভ-নিশুম্ভের সনে যুঝেছিলি রণাঙ্গনে
দোঁহে করি হত!
ত্যজি নিজ কটিবাস ত্রিভুবনে আনি' ত্রাস
উঠি' পতি-বুকে,
ঢাল-খাঁড়া ল'য়ে হাতে কত রঙ্গ সখি-সাথে
কালি-মাখা মুখে!
প'রে ছিলি কা'র দেওয়া শাঁখা জোড়া দিল কে রে,
প'রেছিস্ হাতে?
দু' সতীনে এই মত করে বাদ অবিরত
দোঁহে দিন রাতে!

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো এক

দ্বিতীয় দেখা বলরাম-মন্দিরে।

অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছে বলরাম। গিরিশকেও। কিন্তু ও কে?

ওকে চেন না? ও বিধু। কীর্তনওয়ালী।

ঠাকুরকে প্রণাম করল বিধু। ঠাকুরও মাটিতে মাথা রেখে দীনভাবে নমস্কার করলেন। কথা বলতে লাগলেন বিধুর সঙ্গে। পরিহাসমধুর সরল আলাপ।

অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ছিলেন সেখানে। তাঁর ভালো লাগল না। গিরিশের সঙ্গে জানাশোনা, তাই তাকেই জানালেন তাঁর বিরক্তি। বললেন, 'চলো হে গিরিশ আর কী দেখবে?'

'না, আরো একটু দেখি।'

'এই তো দেখলে—' প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন গিরিশকে।

গিরিশ দেখেও দেখল না, বুঝেও বুঝল না।

চৈতন্যলীলা অভিনয় করছে গিরিশ। দৃশ্যপট আঁকছে যে চিত্রকর তার সঙ্গে কথা কইছে। আঁকিয়ে গৌরভক্ত। ভক্তি না হলে রেখায় ফুটবে কি করে পেলবতা! চোখে জাগবে কি করে সংবেদনের স্বপ্ন!

'তোমার গৌরাঙ্গের মহিমা কিছু বলতে পারো?'

পারি বৈ কি। তাঁকে দেওয়া ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ দেখি।

'বলো কি হে—'

'সারা দিন খেটে খুটে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরে স্নান করে নিজের হাতে রাঁধি। গৌরহরিকে ভোগ দিই। আকুল হয়ে ডাকি তাঁকে অন্ধকারে। দেখি তিনি খেয়ে গেছেন। ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ।'

অন্তরের প্রেমধ্যানটি চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে। অগাধ বিশ্বাসের স্বচ্ছ সরোবরে ভক্তির শ্বেতপদ্ম। এ যেন সেই তনু বিনু পরশ নয়ন বিনু দেখা।

ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে বসল গিরিশ। কে দেবে আমাকে সেই তৃতীয় নয়ন? কে আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবে? কে দেবে সেই আলোকময়ের সংবাদ?

চৈতন্যলীলা মূর্ত হল রঙ্গমঞ্চে। নামল জগাই-মাধাই। গগনমণ্ডপ থেকে নামলেন গৌরচন্দ্র। বাজল খোল-করতাল। হরিনামের বান ডেকে এল। সবাই ডুবল সেই নামপ্রেমসাগরে।

'থিয়েটারে গৌর নেমেছে। তীর্থ হয়েছে নাট্য-শালা। বসে গিয়েছে ভক্তির চাঁদনি বাজার। চল দেখে আসি—'

লোক আসছে দলে-দলে। শহর-গ্রাম ভেঙে। দিঙ্মূঢ় হয়ে। কিন্তু হে অমানীমানদ, দূর্বাদলশ্যামমূর্তি, তুমি কবে আসবে? হে লাবণ্যমনোরম, কবে দেখব তোমাকে?

মাধাই বলছে জগাইকে: 'জগা তুই নাচছিস কেন?'

'বৈরাগী হব। ব্যাটারা কিন্তু বেড়ে গায়, হরি হে দেখা দাও। মেধো, আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস?'

'আচ্ছা হরে কে রে শালা, জগা, জানিস?' মাধাই টলছে নেশার ঝোঁকে: 'আমি হলে বলতেম, ধরে লে আও শালাকো! আমার মনে হয় এক শালা মালপোওয়ালা। খিদে পেলেই ডাকে।'

'চিল্লে খিদে বাগিয়ে নেয়। আমার তো চারখানা খেতেই কুপোকাৎ। আর ওরা এক-এক ব্যাটা রাধা বলে আর বিশখানা ওড়ায়।'

'এক শালাকে এক দিনও বাগে পেলুম না।' মাধাই আপশোষ করল।

জগাই ঠেলা মেরে বললে, 'তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস—'

'দ্যাখ মাতাল বলিস তো ভালো হবে না। কোনো দিন মাতাল দেখেছিস? তুই যেমন ছটাকে —আমি দু' সের খেয়ে সানসা আছি। এখন চলেছিস কোথায়?'

'চল না কেত্তন শোনা যাক গে। ব্যাটারা বেড়ে বাজায়—'

'তুই বড় গান শোননেওয়ালা—' ঠেলা মারল মাধাই।

'ওরে বেশ এক রকম রাধে-রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপতিনীকে মনে পড়ে।'

'তুই দেখছি বৈরাগী হবি—'

'তোর চৌদ্দ তুগুনে বাহান্ন পুরুষ বৈরাগী হোক।'

আহত অভিমানের সুরে মাধাই বললে, 'ভেয়ের চৌদ্দপুরুষ তোলে রে শালা ?'

কে এরা জগাই-মাধাই ? এরা কি তুকড়ি সেন আর স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ?

ট্যাঁকে মটর-ভাজা, গিরিশের বাড়িতে এসেছে তুকড়ি। এসেছে মদের পিপাসায়। বাবা, সঙ্গে 'দোগ্ধ মটর' আছে, এখন একটু মদিরা পেলেই দাহ মেটে।'

মদ নেই। আসবাব-পত্র পালিশ করবার জন্যে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট আছে। তাই সই। নরেন সেই স্পিরিট ঢেলে দিল গেলাশে। জল না মিশিয়ে অম্লানবদনে তাই টেনে নিল তুকড়ি। অম্লানবদনে দগ্ধ মটর চিবুতে লাগল।

'এ করলে কি ?' নরেনকে ধমকে উঠল গিরিশ : 'এ যে সাক্ষাৎ বিষ। লোকটা যে এক্ষুনি মারা যাবে।'

'আরে মশাই, ওতে আমার কি হবে ?' অম্লানবদনে বললে তুকড়ি সেন। 'ও আমি নিত্য খাই।'

'বোতল বোতল মদ খেয়েছি। এক দিন বাইশ বোতল বিয়র খেয়েছিলুম।' অতীতের কথা বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'মদ খেয়ে দেখেছি কি জানো ? জোর করে মনকে ধরে রাখা—সে চেষ্টায় আবার অবসাদ আসে—আবার সেই অবসাদ দূর করবার জন্যে আবার মদ খাও।'

'তামাক ?' জিগগেস করলেন কুমুদবন্ধু।

'তামাক ! তামাক ঢের দেখেছি। ওর ঝাড়ে-বংশে খেয়েছি। শুধু কি তামাক ? গাঁজা, আফিং, চরস, ভাং—কিছু বাকি রাখিনি।'

'তাই বলে গাঁজা ?'

'গাঁজাতে ভীষণ উইল-পাওয়ার বাড়ে। যখন গাঁজা টেনে বুঁদ হয়েছি, তখন সত্যি-সত্যি রোগ সারিয়েছি উইল-পাওয়ারে। কিন্তু যাই বলো, আফিঙের মত ছোটলোক নেশা আর নেই। আমার শেষ নেশা দাঁড়িয়েছিল আফিং। এক দিন আঙুর কিনেছি কতগুলি। অবিনাশ, বামুনের ছেলে, সর্বদা আসে এখানে। ওকে চারটে আঙুর দিলাম। কিন্তু দেবার পরক্ষণেই মনে হল চারটে না দিয়ে দুটো দিলেই হত। তখন মনে মনে বিচার করলাম—মন শালা এত ছোটলোক হল কেন ? ভেবে-চিন্তে দেখলাম, আফিঙের এই কাজ। তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে আফিং ত্যাগ করলাম—'

'আর সব ?'

'সব ছেড়েছি।'

'ছাড়তে পারলেন ?' বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আপ্লুত কুমুদের কণ্ঠস্বর।

'সাধে ছেড়েছি ? প্যায়দায় ছাড়িয়েছে।'

'কোনো নেশা করতে ইচ্ছে হয় না ?'

'ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয় না।' অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল গিরিশের চোখ : 'জীবনে অনেক অকাজ-কুকাজ করেছি। কোনো পাপ করতে আমার বাকি নেই। সব রকম হয়েছে। কিন্তু ওই আমার গৌরবের পসরা। ধুলোকাদা মেখেই দাঁড়িয়েছি ঠাকুরের সামনে। শুধু এই আমার গৌরব—আর আমার কিছু নেই—এই আমার পাপ, এই আমার ধুলোকাদা। এখন তুমি কোলে তুলে ধুলোকাদা মুছে নাও তো নাও—'

আর আমার কিছু নেই। আমার শুধু শরণাগতি। আমার শুধু সমর্পণের তর্পণ।

তুমি যদি আমাকে ফেলে দেবে তো দাও। কিন্তু কোথায় তুমি ফেলবে ? যেখানে ফেলবে সেখানেও তোমার কোল মেলা। তোমার কোলের বাইরে তো আর জায়গা নেই। তাই যেখানে রাখবে সেখানেই আমি তোমার কোলে ব'সে।

শাস্ত্রে বলে, কাশীতে মরলে মুক্তি মেলে। তাই মৃত্যুকালে কবীর চললেন কাশী ছেড়ে। বললেন, কাশীর বাইরেও যে মুক্তি আছে এটি প্রত্যক্ষ করব'।

পরিচ্ছন্ন ও পুণ্যরুচিকে স্থান দেবে এর মধ্যে বাহাদুরি কি ! যে কাঠে ঘুণ ধরে তাকে যজ্ঞের সমিধ করতে পারো তবেই বুঝি বাহাদুরি। যে লোহায় মরচে ধরে তাকে করতে পারো স্বর্ণপ্রভ তবেই বুঝি তোমার কৃতিত্ব। আর যে দেহে কামের বাসা তাকে করতে পারো তোমার মোহন মুরলী তবেই বুঝি তুমি কত বড় কারিগর।

তোমার দরশ-পরশ যে অমৃতসরস তা বুঝি কি করে ? তোমার প্রেম যে শুনি স্পর্শমণি তার প্রমাণ কি ? আমার হৃদয় ছাড়া কোথায় আর তার পরখ হবে ? যদি আমিও হিরণ্ময় হতে পারি তবেই তো বলতে পারি তোমার প্রেম পরমধন পরশমণি। আমি যদি নিরাময় হতে পারি তবেই তো জানবে জগজ্জনে তুমি অন্নময় অমৃতময় কল্যাণকরুণাময়। তুমি রোগার্তের ভিষক, অকিঞ্চনের সর্বস্ব, দরিদ্রের অক্ষয় কোষাগার।

যখন তপ্ত লোহার শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে ছিদ্র করেছ তখন বুঝিনি, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছি, কিন্তু এখন যখন হাতে তুলে মুরলী করে বাজাচ্ছ, তখন এই বলে কাঁদছি, শুধু সপ্ত ছিদ্র না করে কেন আমাকে তুমি শতচ্ছিদ্র করোনি? বাঁশকে যদি বাঁশিই না করবে তবে কেমন তুমি বংশীধর?

"চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখে বৈষ্ণব বাবাজীরা ভয়ানক বিগলিত হয়েছে। সব সময়ে ঘিরে আছে গিরিশকে। তার হল্‌ঘরে তাদের ঘনঘন আনাগোনা। কেউ বলছে তার মধ্যে নিত্যানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন, কেউ বলছে আপনার উপর মহাপ্রভুর কী কৃপা!

গিরিশ দেখল তার কাজকর্মের সমূহ বিপদ। এদের না তাড়ালে রক্ষে নেই।

সে দিন হল্‌-ভর্তি লোক। বাবাজী বৈষ্ণবদেরই ভিড়। কেউ বলছে, কি ভক্তি, কেউ বলছে, কি প্রেম! কেউ বলছে, কি গান! এমন সুধার হরিনাম সাধের পণে কিনবি আয়!

বোতল খুলে গেলাশে মদ ঢালল গিরিশ।

'কি খাচ্ছেন? ওষুধ?' জিগগেস করল এক বাবাজী।

আরেক জন গদগদ হবার চেষ্টায় বললে, 'ও কি মহাপ্রভুর চরণামৃত?'

'না, মদ।' গিরিশ একটা বোমা ফেলল ঘরের মধ্যে।

'রামো! রামো!' নাকে-কানে কাপড় গুঁজে পালালো বাবাজীরা।

হ্যাঁ, মদের নেশা। পদের নেশা। ঈশ্বরপদের নেশা। নেশা ছাড়তে-ছাড়তে চলেছি। একটার পর আরেকটা। নতুনের পর আরো নতুন। নেশা ছাড়া নিশি নেই। সর্বশেষে সর্বনাশের নেশা। শিখর-শিহর।

চৌরাস্তায় রকে বসে আছে গিরিশ। ভক্তপরিবৃত হয়ে সমুখ দিয়ে চলে গেলেন ঠাকুর। চোখের পরে চোখ পড়ল। এক চোখের আকাশ থেকে আলো এসে পড়ল আরেক চোখের উঠোনে।

হৃদয়ের ঘুড়িতে যেন কার সুতো বাঁধা। টান পড়েছে ঘুড়িতে। কান্নিক খাচ্ছে।

'আপনাকে ডাকছেন পরমহংসদেব।' একজন ভক্ত এসে খবর দিল।

লাফিয়ে উঠল গিরিশ। 'কোথায়?'

বলরাম-মন্দিরে।

আর কথা নেই, ডাক এসে গেছে কিন্তু পাব কি ঠিকানা? ঠিকানা পেলেও কি পারব পৌঁছুতে?

'বাবু আমি ভালো আছি। বাবু আমি ভালো আছি।' আপন মনে বলছেন ঠাকুর।

এ কি গিরিশকে উদ্দেশ করে বলা?

বলতে-বলতে ভাবান্তর হল ঠাকুরের। বললেন, 'না না এ ঢং নয়। এ ঢং নয়।'

কি করে বুঝলেন আমার মনের কথা? কে এ সত্যবাক, সত্যজ্ঞানী? যে রূপে যা নিশ্চিত তাই সত্য। সর্বরূপে নিত্য যে বিরাজিত সেই সত্য। সমস্ত সংশয়খিন্ন বুদ্ধির উপরে সেই সত্যই কি জ্বলছে সূর্যের মত?

সরাসরি আলাপ হল গিরিশের সঙ্গে।

'গুরু কি?' জিগগেস করল গিরিশ।

'ঐ যে, কুটনি। যে মিলন ঘটিয়ে দেয়। ঘটক।'

সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হলেই বিশ্বজয়। একলব্য কি করেছিল? মাটির দ্রোণ তৈরি করে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণ নয়, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য। তবেই বাণসিদ্ধি।

যদি সদগুরু হয় জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। সেই যে ঢোঁড়া ব্যাঙ ধরেছিল, ছাড়াতেও পারে না গিলতেও পারে না। দুয়েরই অশেষ ক্লেশ। জাত সাপে ধরলে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত।

'তা তোমার ভয় নেই। তোমার গুরু হয়ে গেছে।'

হয়ে গেছে? কে সে? কোথায়?

বুঝেও বুঝল না গিরিশ। আবার বলল, 'মন্ত্র কি?'

'ঈশ্বরের নাম।'

দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম খুশি। যদি একটু রুচি থাকে তবেই বাঁচবার আশা। তাই নামে রুচি।

এ সেই 'খেতে-খেতে বেশ লাগছে।' জানো না বুঝি গল্প? মার রান্নাতে অরুচি—আরে, ছি ছি, এ যে মুখে দেওয়া যায় না। তুমি কি বলছ? এ যে আমি রেঁধেছি। বললে এসে স্ত্রী। তুমি রেঁধেছ! খেতে-খেতে বেশ লাগছে। [ক্রমশঃ]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১৩ই ডিসেম্বর ১৯২৭-এর পত্রে আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড অভিমান প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের অর্থাৎ 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি তিনি বিরূপ হন নাই। ওই ১৩ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র-পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ তিনি এই বলিয়া শেষ করিয়াছিলেন :

> সৃষ্টিশক্তির যখন দৈন্য ঘটে তখনি মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃত-রস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্ব্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালী কবির কাব্যে দেখ্‌লুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেচেন "খুন"। পুরাতন "রক্ত" শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রং যদি না ধরে তাহ'লে বুঝব সেটাতে তাঁরি অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক্‌ লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে। সাহিত্যে এই রকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিউমার্কেটে "খুন" ফরমাস করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক্‌।

সুনীতিকুমারের নিকট লিখিত যে পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র "ক্ষমতার অসামান্যতা অনুভব" করার কথা বলিয়াছিলেন [গত আষাঢ়ের কিস্তিতে উদ্ধৃত] তাহাও ১৯২৮ সনের ৮ই জানুয়ারি (২৩ পৌষ, ১৩৩৪) লিখিত। আষাঢ়ে উদ্ধৃত ৪ঠা মার্চ, ১৯২৮ (২০ ফাল্গুন, ১৩৩৪) তারিখের পত্রও 'শনিবারের চিঠি' সম্বন্ধে তাঁহার অ-বিরূপতার আর একটি প্রমাণ। বস্তুত, "নটরাজ" লইয়া 'আত্মশক্তি'তে আমার নির্বোধ হঠকারিতা আমার প্রতি ব্যক্তিগত অভিমানেরই কারণ হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ বা অভিমান 'শনিবারের চিঠি'কে স্পর্শ করে নাই। 'আত্মশক্তি'-ঘটিত দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে আমি তাঁহাকে আর একবার উত্ত্যক্ত করিতে ছাড়ি নাই। 'প্রবাসী'র অল্প মাহিনার চাকুরি আমার আত্মীয়-স্বজনের পছন্দমাফিক ছিল না। তাঁহারা বলিতেন, পরমার্থিক উন্নতি যতই হউক, ওই চাকুরিতে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাঁহাদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আসলে এইরূপ ব্যবহার একমাত্র 'প্রবাসী'রই বৈশিষ্ট্য নয়, বাংলা দেশে সাময়িক পত্র সেবার সাধারণ পুরস্কারই এই। যাহা হউক, ওই সময় কলিকাতা মহাকরণিকে বাংলা অনুবাদক-পদের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনদৃষ্টে আত্মীয়েরা আমাকে আর স্বস্তিতে থাকিতে দিলেন না। দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্র প্রয়োজন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় নিবেদন করা মাত্রই দীর্ঘ এবং সুদীর্ঘ পরিচয়-পত্র দিলেন। বন্ধুরা বলিলেন, এতৎসহ রবীন্দ্রনাথের কলম হইতে সামান্য কিছু যুক্ত হইলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে এক পত্রাঘাত করিয়া বসিলাম, জানাইলাম, ১৬ই ফেব্রুয়ারির (১৯২৮) মধ্যে প্রশংসাপত্র আমার হস্তগত হওয়া চাই। ১৫ই তারিখে নিষ্পত্র চার ছত্র ইংরেজী রচনা রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত সহিসম্বলিত হইয়া আমার নিকট পৌঁছিল :

> "Santiniketan, Feb, 13. 192
>
> I know Babu Sajanikanta Das and I ca certify that he is an author whose mastery c Bengali language and knowledge of our litera ture is remarkable.
>
> Rabindranath Tagore."

কবির সহৃদয়তায় ও বদান্যতায় মরমে মরিয়া গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়া ফেলিলাম রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রের অপমান ঘটিতে দিব না সরকারি ভাল চাকুরি মাথায় থাক্‌। সুতরাং ১৯২৮ সনের দরখাস্ত আজও পর্যন্ত অ-প্রেরিতই রহিয়া গিয়াছে "প্রবাসী'র মায়া কাটাইব কাটাইব করিয়াও তখন কাটাইতে পারি নাই। এই আত্মঘাতী সঙ্কল্পের দ্বারা আমি যে কবিকে কতখানি সম্মান করিলাম তাহা তিনি জানিতেই পারিলেন না। তাঁহার সহিত আমার দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল, এদিকে আত্মীয়েরাও আমার প্রতি বিরূপ হইলেন।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে আমার গ্রহ-সংস্থানে রবির কুপিত দৃষ্টি সত্ত্বেও অন্যান্য নানা দিক দিয়া ভাগ্যকে সুপ্রসন্নই বলিতে হইবে। জীবনের এতকাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বৈচিত্র্যহীন শ্যামল সমতল ক্ষেত্রই প্রধানত আমার বিহার ছিল; বিদেশ বলিতে একবার মাত্র কাশী গিয়াছিলাম। অবশ্য মানভূমকে আমি বঙ্গবহির্ভূত বলিয়া কখনই ধরি না। এই বৎসরের প্রারম্ভে হিমালয় এবং মধ্যভাগে সাগর-দর্শন ঘটিল। কূপমণ্ডূক মন প্রসারতা লাভ করিল। প্রকৃতির উত্তুঙ্গ ও উত্তাল পরিধি আমার কবি-মনকে যথেষ্ট আলোড়িত করিল। কিন্তু ইহার অধিক যাহা লাভ করিলাম তাহা হইতেছে কালিম্পং-এ অন্তরীণ-বদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং পুরীর সমুদ্রতীরে একসঙ্গে ত্রয়ী তরুণ সাহিত্যিক অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-অজিতের সাক্ষাদ্দর্শন।

এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা দেশের চিত্র-শিল্পীদের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুযোগ আমার মত আর কোনও বাঙালী সাহিত্যিকের ঘটে নাই। ভাস্কর-শিল্পী-সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সহিত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড্ডায় প্রথম সাক্ষাৎ অচিরকাল মধ্যে অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যে পরিণত হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক যুগে কখনও গভীর রাত্রে, কখনও রাত্রির শেষ যামে খামখেয়ালি শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের মোটর-বিহারের সঙ্গী হইয়া বহু দিন দেবীপ্রসাদের শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটস্থ আবাসিক ষ্টুডিওতে হানা দিয়াছি। চিরতরুণ চিরহাস্যময় উদার-হৃদয় বাবুজী—দেবীপ্রসাদের বৃদ্ধ পিতা—আমাদিগকে সাদর আপ্যায়ন জানাইয়া ভাজি-লুচি সহযোগে সোৎসাহে অতিথি-সৎকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কখনও অপ্রস্তুত করিতে পারি নাই। আমাদের নৈশ হুল্লোড়ে তিনি অবাধে যোগ দিয়াছেন। পিতাকে মধ্যস্থ রাখিয়া পুত্রের সহিত আমার প্রেম দিনে দিনে প্রগাঢ় হইয়াছে। ছবি আঁকা মূর্তি গড়া খাওয়া গল্পগুজব একসঙ্গে চলিতেছে, বাবুজীর স্নেহাশীর্ব্বাদ চন্দ্রাতপের মত আমাদিগকে ঘিরিয়া আছে। দেবীপ্রসাদ তখনও প্রসিদ্ধ হন নাই, কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা বাবুজীর সঙ্গে আমাদের চিত্তকেও উদ্বেল করিতেছে। তাঁহার বিচিত্র অনন্যচিত্ত অধ্যবসায়ের সাক্ষী আজ আমরাই আছি। শিল্পীর নিশীথ সাধনা শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিবার সুযোগই লাভ করিতাম তাহা নহে, তিনি আমাদিগকে নানা ভাবে উপকরণ হিসাবেও ব্যবহার করিতেন, আমাদিগকে জড় পদার্থজ্ঞানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আঁকাইয়া বাঁকাইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান চিত্রে বা মূর্তিতে প্রয়োগ করিতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়িতেছে, তাঁহার বিখ্যাত রঙীন চিত্র "মুসাফিরে"র যষ্টিধৃত একটা হাত তাঁহার কিছুতেই মনঃপূত হইতেছে না, বার বার আঁকিতেছেন, বার বার মুছিতেছেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে মুসাফিরের ভঙ্গিতে লাঠি ধরিয়া বসিতে হইল, আমার হাতের ছায়া ছবিতে চিরদিনের জন্য রহিয়া গেল। ছবিটি ১৩৩৪, আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। দেবীপ্রসাদ তখন শিশু-সাহিত্য রচনা করিতেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত শৈশবের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে নাই, ইদানীং যৌবনের সাহিত্য তিনি প্রচুর রচনা করিয়াছেন, বন্ধুত্বের বশে তিনি এই বিষয়ে আমাকে গুরুর মর্যাদা দিয়া ধন্য করিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় শিল্পীবন্ধু শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। বয়সে তিনি আমার চেয়ে বড় কিন্তু তাঁহার মন এমনই উপাদানে গঠিত যে তাহাতে কখনও বার্ধক্যের ছোপ লাগিবে না। আমার মত যাঁহারা তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ-সৌহার্দ্য পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন তাঁহার তুল্য ভাবুক রসিক এবং রসস্রষ্টা, শিল্পী-সমাজে দুর্লভ। তিনি সংসার-বিরাগী হইয়া দীর্ঘকাল হিমালয়ের নিঃসঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তাঁহার 'কৈলাস ও মানস-সরোবর'। সংসারের আকর্ষণ প্রবলতর হইলে তিনি যখন ফিরিয়া আসেন তখনই আমার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু আমাকে শান্তিনিকেতন হইতে নির্দেশ দেন মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটের বাসায় শিল্পী প্রমোদকুমারের সহিত আমি যেন সাক্ষাৎ করি। প্রথম দর্শনেই প্রেম জন্মে। তিনি আমাকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া 'ভাই' বলিয়া গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল সে সম্পর্ক অটুট আছে। প্রমোদকুমার সেই কালে বিপুল বহরের ছবি আঁকিতেন, অধিকাংশই পৌরাণিক বিষয়ে। সেই সকল ছবি বহন করিতে আমি গলদঘর্ম হইয়া উঠিতাম। প্রমোদকুমার আজ বাংলা-সাহিত্যে বাঙালী তন্ত্রসাধনার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সে যুগে তাঁহার মুখে শুধু অবিমিশ্র হিমালয়-বন্দনাই শুনিতাম।

তৃতীয় শিল্পীবন্ধু শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দলে স্বদেশী ডাকাতিতে লিপ্ত সন্দেহে তিনি ধৃত হন, পরে সন্দেহের বশেই কালিম্পং-এ তাঁহাকে নজরবন্দী রাখা হয়। ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসে আমি কালিম্পং যাই। একমাত্র দ্রষ্টব্য হিমালয় দেখিতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না, কমলালেবুর বাগানের আকর্ষণও দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং মানুষের সন্ধানে মন দিলাম। সেখানে স্বাস্থ্যকামী আর আপিসমুখী এই দুই শ্রেণীর লোক, পুলিশের ভয়ে তখন সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত। ধরপাকড় তখনও খুবই চলিতেছে। চৈতন্যদেবের খবর পাইলাম, ভয়ে তাঁহার সহিত কেহ আলাপ পর্যন্ত করে না; তিনি পাহাড়ীদের মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। গেলাম একদিন তাঁহার আস্তানায়। সঙ্কীর্ণ অগোছালো ঘর, রঙে তুলিতে ছবিতে বিচিত্র। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। শিল্পী সেখানে ছিলেন না। শুনিলাম কাছেই বৌদ্ধগুম্ফায় ছবি আঁকিতে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখি গুম্ফার অভ্যন্তরে তাঁহার ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি। রক্ষকের সহিত বন্ধুত্ব জমাট বাঁধিয়াছে, তিনি যাবতীয় সযত্নরক্ষিত অন্যের অদৃশ্য প্রাচীন পট শিল্পীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, শিল্পী নিবিষ্ট চিত্তে বুদ্ধলীলা ধ্যান করিতেছেন। নিজেই নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার কাছে তো বাঙালীরা কেউ পুলিশের ভয়ে আসে না, আপনার ভয় করিল না? আমি বলিলাম, আমি শিল্পীকে দেখিতে আসিয়াছি, বিপ্লবীকে নয়। এই পরিবেশে আপনার সত্যকার মূর্তি আমি দেখিতে পাইতেছি। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে বিলম্ব হইল না। আমি কলিকাতায় ফিরিবার কালে সঙ্গে তাঁহার কয়েকটি ছবি লইয়াই ফিরিলাম না, একজন ভাবুক সাধকের স্মৃতি আমার চিত্তে অক্ষয় হইয়া রহিল। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত চিত্র "কালিম্পং-এর ভুটিয়া ভিখারী" শ্রাবণের (১৩৩৪) 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়া দিলাম। চৈতন্যদেবের শিল্পসাধনা যে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হইবে—এ অনুমান আমি প্রথম পরিচয়েই করিতে পারিয়াছিলাম। চৈতন্যদেবের সহিত 'বঙ্গশ্রী'র যুগে সম্পর্ক গাঢ়তর হইয়াছিল।

বৈশাখে নগাধিরাজ হিমালয় দিলেন শিল্পীকে, আশ্বিনে পুরীর সমুদ্রসৈকতে দেখিলাম সাহিত্যিক-কে। অচিন্ত্যকুমার তাঁহার আত্মজীবনী 'কল্লোল-যুগে' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

> পুরীতে বেড়াতে গিয়েছি, সঙ্গে বুদ্ধদেব আর অজিত। এক দিন দেখি সমুদ্র থেকে কে উঠে আসছে। পুরাণে-মহাভারতে দেখেছি কেউ কেউ অমনি উদ্ভূত হয়েছে সমুদ্র থেকে। তাদের কারুর হাতে বিষভাণ্ডও হয়তো ছিল। কিন্তু এমনটি কাউকে দেখব তা কল্পনাও করতে পারিনি। আর কেউ নয়, স্বয়ং সজনীকান্ত।
>
> একই হোটেলে আছি। প্রায় একই ভোজনভ্রমণের গণ্ডির মধ্যে। একই হাস্যপরিহাসের পরিমণ্ডলে।
>
> সজনীকান্ত বললে, শুধু বিষভাণ্ড নয়, সুধাপাত্রও আছে। অর্থাৎ বন্ধু হবার গুণ আছে আমার মধ্যে।

অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস-উপমা-প্রবণতা স্বভাবতই তাঁহার স্মৃতিকে প্রতারিত করিয়াছে। আশ্বিনের 'শনিবারের চিঠি' বাহির করিয়া মাত্র তিন দিনের জন্য সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরী বেড়াইতে গিয়া এক পাণ্ডার আশ্রয়ে ভাড়া-করা ঘরে ছিলাম। পরস্পর সাক্ষাৎ অবশ্য একাধিকবার হইয়াছিল, কিন্তু আলাপের প্রসঙ্গ কখনও সাহিত্য-প্রসঙ্গে পৌঁছায় নাই। সাহিত্যের যাহা চিরন্তন বিষয় তাহারই সন্ধানে সকলেই এতই ব্যাকুল ছিলাম যে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অচিন্ত্যকুমার এইখানে আমার মুখ দিয়া এক গাদা কথা বলাইয়াছেন এবং নব-সাহিত্য-বন্দনা বিষয়ক একটি কবিতাও আবৃত্তি করাইয়া লইয়াছেন। মগজে কল্পনা এবং হাতে কলম থাকিলে এ সবে আটকায় না। কিন্তু কবিতাটি যে আমি পরবর্তী পৌষ মাসে রচনা ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিয়াছিলাম ইহা জানা থাকিলে অচিন্ত্যকুমার সাবধান হইতে পারিতেন। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে'র গত মাসের কিস্তিতে অচিন্ত্যকুমার গিরিশচন্দ্রের মুখ দিয়া যে বলাইয়াছেন, "আত্মজীবনী লেখা মানে কতকগুলো মিছে কথার জাল বোনা" * তাহা সম্ভবত

---

* গিরিশচন্দ্রের জবানীতে যাবতীয় আত্মজীবনীগুলিকে "কতগুলো মিছে কথার জাল বোনা···শুধু লোকের কাছে দেখাবার চেষ্টা আমি খুব বাহাদুর—আমার খাওয়া, শোওয়া, ঘুম, স্বপ্ন, চিন্তা সব অসাধারণ" বলিয়া অচিন্ত্যকুমার সুকৌশলে নস্যাৎ করিয়াছেন। ইহার ফলে আদি, নববিধান, সাধারণ তিন ব্রাহ্মসমাজেরই রুইকাতলারা কাৎ হইয়াছেন: যথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্র, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র ('জীবনবেদ'), শিবনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি। ট্রিনিটির আদি রাজা রামমোহনের ক্ষুদ্র হইলেও একটি আত্মজীবনী চলিত আছে। অচিন্ত্যকুমারের ঢিলে চুনোপুটি যে কত মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি ঘায়েল হইয়াছেন। কেশব-জননী, রাসসুন্দরী, সৌদামিনী, প্রসন্নকুমারী প্রভৃতি মহিলারাও কম আহত হন নাই। গিরিশচন্দ্র তথা

তাঁহার আত্মজীবনী 'কল্লোল-যুগে'র কথা স্মরণ করিয়াই। পরমপুরুষ বোধ হয় তখনও অচিন্ত্যকুমারের স্কন্ধে পুরাপুরি ভর করেন নাই।

পুরীর সমুদ্রকে সাক্ষী রাখিয়া 'কল্লোল'-পক্ষ ও 'শনিবারের চিঠি'-পক্ষে সেদিন যে মিলন হইয়াছিল তাহার প্রভাব শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে স্পর্শ করে নাই। অচিন্ত্যকুমার ও অজিতকুমার বন্ধু-পদবাচ্য হইয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া পরস্পর নিমন্ত্রণ আদান-প্রদানও হইয়াছে। অচিন্ত্যকুমারের "তিবিশ গিবিশের"র বাসায় গিয়া আমরা রসগোল্লা খাইয়াছি এবং আমার ঘোষ লেনের বাসায় আসিয়া তাঁহারা চা খাইয়াছেন। পুরী-পর্ব এই পর্যন্ত।

"সাহিত্য-ধর্মে"র যুদ্ধে এই সময়ে আমরা আরও সমর্থন লাভ করিলাম, রবীন্দ্র-স্নেহ-বিপর্যয়ের মধ্যে ইহাই হইল সান্ত্বনা। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় একটি পত্রে আমাকে লিখিলেন :

দৈবক্রমে "সাহিত্য" শব্দের মূল অর্থ সমাজ, সমাজের ইষ্ট বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া বাঙ্ময় রচনা সাহিত্য নাম পাইয়াছে। মানুষের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণ, এই তিন গুণ হইতে যেমন বায়ু-পিত্ত-কফ তিন ধাতু কল্পনা ; তেমনই জ্ঞান, কর্ম, রস এই তিন ভাগে তাহার প্রয়োজন বিভক্ত করিতে পারি। অতএব, সাহিত্যের তিন ভাগ, (১) জ্ঞান সাহিত্য যেমন দর্শন বিজ্ঞান, (২) ক্রিয়ার সাহিত্য যেমন স্থাপত্য, অন্নপাক ; (৩) রস-সাহিত্য, যেমন পদ্যে কাব্য, গদ্যে উপন্যাস। উপস্থিত আলোচনায় রস-সাহিত্য লক্ষ্য। দেখা যাইতেছে সমাজের হিত চিন্তাই রসের লক্ষ্য। সমাজধর্ম সে-ধর্ম, যাহা থাকিলে সমাজ সম্ভব হয়, সাহিত্যধর্ম সে-ধর্ম, যাহা থাকিলে 'সাহিত্য সম্ভব হয়। বোধ হয় ইহার অধিক বলিতে পারা যায় না। কাজেই সীমা কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু আর একটু স্পষ্ট করা যাইতে পারে। বহুজন সমাজের যে বিধির প্রশংসা করে, যেমন সদাচার, সে বিধিদ্বারা সমাজ নিয়মিত হয়। সেইরূপ, সাহিত্যধর্ম, সে-ধর্ম বহুজন যে-ধর্মের স্তুতি করে। ইহার প্রকাশ-রীতি সম্বন্ধে আমাদের আলঙ্কারিকগণ তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারের উপর কথা কহিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

'পুরাতন-প্রসঙ্গে'র লেখক প্রবীণ অধ্যাপক বিপিন-বিহারী গুপ্ত লিখিলেন :

কুক্ষণে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বাংলা সাহিত্যে "বস্তুতন্ত্র" শব্দটি আমদানী করিলেন।...আজিকার এই আধুনিক বস্তুতন্ত্রতার দুঃশাসন সভামধ্যে কলালক্ষ্মীর বস্ত্রহরণ করিতেছে দেখিয়া প্রবীণ সমাজ লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন।...ইহা একটা সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিমা। সেই ভঙ্গিমায় কতৃতা আছে, পৌরুষ নাই ; বর্বরতা আছে, বীর্য্য নাই ; ক্ষুধা আছে, সংযম নাই। ইহাদিগকে তরুণ দল বলিলে ঠিক এই সকল সাহিত্যসেবীর সংজ্ঞানির্দেশ করা হয় না। ইহারা কি বলিতে চাহেন, ইঁহাদের কণ্ঠ হইতে নূতন কোনও বাণী উদ্গীরিত হইতেছে কিনা, বহু আয়াসেও তাহা ধরা যায় না। কোনও নূতন প্রেরণা, কোনও অজ্ঞাতপূর্ব্ব দার্শনিকতত্ত্ব,—এমন কিছু, যাহা সংসারকে সৌন্দর্য্যস্নাত ও কল্যাণমণ্ডিত করিবে? যদি না থাকে, তাহা হইলে এই সাহিত্যিক বিক্ষোভের, এই বীভৎস ভঙ্গীর সার্থকতা কি?

অচিন্ত্যকুমার সম্ভবত হিসাব করিয়া দেখেন নাই 'কথামৃত' 'লীলাপ্রসঙ্গে' পরম পুরুষের আত্মজীবনী অংশের ওজন কতখানি।

তরুণদের কবিতার বিষয় এবং ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া ১৩৩৪ মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে আমার "চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর, ঢাকাই পরোটা খাই" এবং ফাল্গুনে "আমি যে প্রথমতম" বাহির হয়। জবাবে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও অজিতকুমার তিনজনে মিলিয়া "ঢাকা-ঢিক্কি" নামক একটি কবিতা রচনা করিয়া 'শনিবারের চিঠি'তেই প্রকাশার্থ পাঠান। অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল-যুগে' লিখিয়াছেন, ইহা "কবিতার অনুপ্রাস নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপের প্রত্যুত্তর।" 'কল্লোল যুগ' পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত এই ছয় স্তবকের কবিতাটির প্রথম স্তবকটি দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহাতে কেবল শব্দের অনুপ্রাসই ছিল, অর্থের বালাই ছিল না :—

ফাগুনের গুণে 'সেগুনবাগানে' আগুনে বেগুন পোড়ে,
ঠুনকো ঠাটের 'ঠাঠারি বাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক,
ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেঁকুর ঢিঢিক্কারেতে ঢোঁড়ে,
সং 'বংশালে' বংশের শালে বংশে সেঁধেছে শিক।

পাশাপাশি "আমি যে প্রথমতম" কবিতাটি পড়িলেই এ-পক্ষে ও-পক্ষে সাহিত্যিক তফাতটা ধরা সহজ হইবে :—

তাজা-বয়লার কয়লাকুঠির ময়লা-গাদার ধারে,
গয়লা-বধূর পয়লা সোয়ামী ফেরে কম্পাস-ঘাড়ে।
বিশাই তাহার নাম—
যত বাড়ে বেলা বোঝা ঠেলে ঠেলে ছোটে তত কালঘাম।
ফার্লঙ দূরে লঙ সাহেবের অবলঙ বাঙলায়,
ধানী গয়লানী সানি দানি' ঘানী-বলদে পানি পিলায়।
পাশে হাসি' হাসি' বাঁশী-চাপবাশী কাশির ইসারা করে,
কটক-চটকে ভুলিয়া কামিনী চলিল ফটক পরে—
বিশাই দেখিল হায়,
পহেলি সহেলি 'বহেলি তাহারে আন্ বাড়ি পান যায়।
মেঘল হইল দীঘল বদন মুঘল-চিত্রসম,
দাঁড়ায়ে বিশাই—ভাবে, দুনিয়ায় কে বুঝে বেদন মম?
কহিল, "প্রেয়সী ধানী,
শীতল করুক শয্যা তোমার আমার চোখের পানি।

ধূধূ মরুভূমি হেথায় আমার, ক্লান্ত পথিক চলি—
আমার বুকের সাহারা শ্যামাক তোমায় বনস্থলী।
নিরালা যাত্রা মম
প্রিয়তম তব যে হবে হউক, আমি যে প্রথমতম।"

সুতরাং ত্রয়ীর "টরেটক্কা"-কাব্য অমনোনীত হইয়া ফেরত গেল ; সমুদ্র-বেলায় সদ্যরচিত বালুঘর সামান্য আঘাতেই ভাঙিয়া চূরমার হইল।

আমার ব্যঙ্গকবিতাটি পড়িয়া শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। বাঙালী জাতির তৎকালীন চরিত্র-শৈথিল্য এবং শিল্প-সাহিত্য ও জীবনে তাহার প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র বক্রোক্তি আজিও স্মরণ করিবার যোগ্য। তিনি লেখেন :—

"গয়লা-বধূর পয়লা সোয়ামী" ক্যারিকেচার বলে লোকে বুঝতে পারবে ত? আজকালকার বাজারে ঐ রকম ভাষা ও ভাবই যে সারাইম! তরুণের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযান কেন? তাঁরা কিছু বলেছেন নাকি? হরতাল ছাড়া কিছু করেছেন নাকি? আমার ত মনে হয় তাঁদের এতটা আস্ফালনের জন্য তাঁরা মোটেই দায়ী নন। ভ্রম, সমস্তটাই হচ্ছে ট্রান্‌স্‌মিশন অব ফোর্সেস,—কুলোর ওপর ভাঙা কলায়ের নৃত্য। আপনারা ভয় পাবেন না, যাকে প্যাথলজিকাল মনে করচেন, সেটা একেবারেই ফিজিকাল ; গ্রীষ্মকালে কোল্ডব্লাডেড অ্যানিমালের টেম্পারেচার বাড়ে, সেটা জ্বর নয়। আমাদের এ এক অপূর্ব দেশ! এখানে সাম্যের ধারণা জাগলে লোকে পৈতে পরে বামুন হ'তে চায়! এখানে সমানাধিকারবাদের ফলে মেয়েদের খোঁপা কমে না, পুরুষের খোঁপা বেড়ে যায়!

উদ্বিপরা ঝিতে আপত্তি করলে চলবে কেন? ওছাড়া লোক কোথায়? আমরা যখন রাণী, বাণী, শ্যামা, এলা, বেলা, টেলার কথা লিখি, তখন যে মনে পড়তে থাকে ঐ ঝিটাকে। উর্বশী মেনকার কটাক্ষে কাজ হ'ত। ঝির বেলায় চাই হেমেন্দ্র মজুমদারিজম্—তা না হ'লে প্রেম জাগবে কেন? যাঁদের অবশ্য হায়ার সেন্‌সিবিলিটিজ তাঁদের এতটা দরকার হয় না। তাঁদের এক-গাল ভাত বেশী খাইয়ে দিতে হয়। প্রমাণ 'পথের দাবী'র ভারতী। তিনি নামলেন জুতো পায়ে—কিন্তু কথা কইলেন সাবিত্রী রাজলক্ষ্মীর স্বরে—"আর দুটি ভাত খাও।"

এই বৎসরের শেষের দিকে অর্থাৎ মাঘ মাসে চিত্রশিল্পী শ্রীমুকুল দের সহিত পরিচয় ঘটিল। তিনি লণ্ডনের নাইটস্‌ব্রিজে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নিজস্ব ষ্টুডিওর পাট তুলিয়া দিয়া সদ্য দেশে ফিরিয়াছেন, ড্রাই-পয়েণ্ট এচিং-এ তাঁহার বিশেষ নাম হইয়াছে ; কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। 'প্রবাসী'তে তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ভার আমার উপর পড়িল। উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া পরিচয় হইল। ফাল্গুন মাসে আট পৃষ্ঠাব্যাপী আমার সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইল। নিমন্ত্রণ-যাতায়াত-চিত্রোপহার সবই হইল কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোথায় কিসের যেন অভাব ছিল, "সিটি-লাইট্‌স"-এর নৈশ প্রেম দিনের আলোকে স্থায়ী হইল না, ভালবাসা ত্বক ভেদ করিয়া গভীরে প্রবেশ করিল না। এই বিচিত্র আত্মসর্বস্ব শিল্পী মানুষটির সহিত বন্ধুত্ব আজিও সেই প্রথম স্তরেই আছে তবে খণ্ডিত হয় নাই। ইহারই সহোদর শিল্পী শ্রীমান মনীষী দের সহিত পরে আমার ঘনিষ্ঠ স্নেহসম্পর্ক ঘটিয়াছিল।

আজকাল বোম্বাই-সিনেমা-গানের বিকৃত অনুকৃতিতে আমাদিগকে যেমন পথেঘাটে বনে-বাদাড়ে এবং লাউড স্পীকারের জ্বালায় শয়নে স্বপনে উদ্বেজিত হইতে হয়, সেই সময় নজরুলী-গজলের স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ আক্রমণও ছিল সেইরূপ মারাত্মক। বাড়িতে বাড়িতে স্নানঘরে অবিশ্রাম কলজলপতনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ছেলেমেয়েদের করুণ "কে বিদেশী" গান অভিভাবকদের অতিশয় উত্যক্ত করিত। দিলীপকুমার পরিচালিত কয়েকটি আসরে স্বয়ং নজরুল স্বদেশী গানে ইস্তফা দিয়া এই গজল-গান একটু বেশি প্রচার করিতেছিলেন ; গ্রামোফোন কোম্পানীগুলিতেও তখন তিনি প্রধান সঙ্গীত-ও-সুরকার। লাউড স্পীকারের রেওয়াজ না থাকিলেও ঘরে ঘরে এবং পানবিড়ির দোকানে গ্রামোফোনে গজল গান অবিরাম চলিতে থাকিত। স্রেফ ব্যঙ্গ করিয়া এই মন্দাকিনী স্রোত রোধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম। ঠিক ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইতে হয় নাই, কারণ বহু সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন রসিক আমাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। পৌষ সংখ্যার "কচি ও কাঁচা"য় কবি বাইরনের মুখ দিয়া গাওয়াইয়া দিলাম :

জানালায়　টিকটিকি তুই টিক্‌টিকিয়ে করিস্‌নে আর দিক।
ওবাড়ির　কল্‌মিলতা কিসের ব্যথায় ফাঁক করেছে চিক্।
বহুদিন　তাহার লাগি রাত্রি জাগি গাইনু কত গান।
আজিকে　কারে জানি নয়না হানি হাস্‌ল সে ফিক্ ফিক্। ইত্যাদি

ফাল্গুন সংখ্যায় বাহির করিলাম "জলসা"—দিলীপী নাচগানের আসরকে ব্যঙ্গ করিয়া। তখনও উদয়শঙ্কর-কনকলতা-অমলা নন্দীর আবির্ভাব ঘটে নাই, শ্রীমতী রেবা রায় তখন শ্রেষ্ঠ নৃত্য-পটীয়সী। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া লেখা আমার "জলসা"র অন্তর্গত "হাঘরে"-নৃত্যের গান বিশেষ সোরগোলের সৃষ্টি করিল। "জলসা"য় দুইটি গজল-গানও সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলাম, মূল গজল গানগুলিকে ছাপাইয়া সেইগুলিই দীর্ঘকাল

কলিকাতার পথে ঘাটে গীত হইতে শুনিয়াছি, সুতরাং অনুমান করিতে পারি, ঔষধ ধরিয়াছিল। আমার গজল দুইটির কথা ছিল এই :

কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
বাঁশী-সোহাগে ভিরমি লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের ক'নে।
ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা, বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা—
বোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা খাওলা-পড়া নীল গগনে।···
কুকুরবালা অনেক রাতে দেয় নাক' মুখ এঁটো পাতে,
বিড়াল-বধূ দুধ ও ভাতে তেয়াগি কাঁদে হেঁসেল-কোণে!
সাবল হাতে সিঁধেল চোরে—ভাসে সে সুরে নয়ন-লোরে,
দোহাই তোরে আর বেঘোরে মারিও নাক' গরীব জনে।'

দ্বিতীয় গজলটি এই :

তেপায়ায় ট্যাকঘড়ি তুই টিকটিকিয়ে ক'স কি নিশিদিন!
কচি সব পাড়ার ছুঁড়ি—ওই যা, থুড়ি, বালিকা আই মীন—
তারা সব হয় না বড়, জলদি কর, বাড়াও বয়স ভাই,
এখনও বুঝতে নারে ঠোরে-টারে চোখের আলাপিন।
আজো যে ফ্রক প'রে হায়, ঘুরে বেড়ায়, চায় না আঁখি তুলে,
কবে যে ঘোমটা চিরি' ধীরি ধীরি বাজবে আঁখি-বীণ?
কবে যে দখ্‌নে হাওয়ার বুঝবে পাওয়ার প্রেম-টাওয়ারে উঠে,···
ঘড়ি তুই চল্‌ ছুটিয়া টিকটিকিয়া বাড়িয়ে গতি ক্ষীণ।
তোরে যে ফি বছরে অয়েল ক'রে যতন করি কত,
সময়ে পারিস না কি দিতে ফাঁকি, ওরে সুইস-জীন্‌।

এই কালকেই ব্যঙ্গ করিয়া বন্ধুবর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় পরে লিখিয়াছিলেন—

এ পাড়ার ছোঁড়াগুলো বেজায় ছলো
গাইছে গজল নজরুলিয়া।

বৎসরের শেষ মাসে অর্থাৎ চৈত্রে আমার প্রথম উপন্যাস 'জীবনের খরস্রোতে'র প্রথম কিস্তি "ডলি" বাহির হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, ইহা আমার শেষ উপন্যাসও বটে। অর্থাৎ উপন্যাস রচনার শুরুতেই আমার শেষ। ইহাই বৎসরকাল পরে রঞ্জন প্রকাশালয়ের দ্বিতীয় উপন্যাসরূপে পুস্তকাকারে বাহির হয়। নাম বদলাইয়া 'অজয়' রাখি। রঞ্জনের প্রথম উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। যে উপন্যাস আমার মনে ছিল তাহার ভূমিকামাত্র আমি লিখিতে পারিয়াছিলাম, আসল গল্প আর লেখা হয় নাই। সেই ভূমিকাই 'অজয়'। আত্মজীবনী 'কল্লোল-যুগে' অচিন্ত্যকুমার লিখিয়াছেন :

তখন একটা বাগভঙ্গি চলেছে আধুনিকদের লেখায়। সেটা হচ্ছে গল্পে-উপন্যাসে ক্রিয়াপদে বর্তমানকালের ব্যবহার। এ পর্যন্ত রাম বললে, রাম খেল, রাম হাসল ছিল—এখন সুরু হল রাম বলে, রাম খায়, রাম হাসে। সর্বনাশ, প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম যে, 'শনিবারের চিঠি' ব্যঙ্গ সুরু করল। অথচ সজনীকান্তর প্রথম উপন্যাস 'অজয়' এই বর্তমান ক্রিয়াপদ।

অচিন্ত্যকুমারের এই সমালোচনা সমীচীন। আসলে আমি গোড়ায় আধুনিকদের গল্প-উপন্যাসের বিষয় ও রচনাভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই 'জীবনের খরস্রোতে' লিখিতে আরম্ভ করি। কিন্তু এক কিস্তি লিখিতে না লিখিতেই নিজের প্যাঁচে নিজে ধরা পড়ি। আমার কবিসত্তা ব্যঙ্গ করিতে গিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। উহা আমার নিজেরই কবি-জীবনের কাহিনী হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ভূমিকামাত্র। তবে স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, লিখিতে-লিখিতে আমি অনুভব করি নিত্যবর্তমান ক্রিয়াপদে ভাবের গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

এই সময়েরই আর একটি ঘটনার কথা অচিন্ত্য-কুমার লিখিয়াছেন—

সজনীকান্ত একদিন কল্লোল-আপিসে এসে উপস্থিত হল। আড্ডা জমাতে নয় অবিশ্যি, কখনো পুরানো কাগজ কিনতে নগদ দামে। উদ্দেশ্য মহৎ, সাধ্যমত প্রচার করতে কাউকে। ভাবখানা এমন একটু প্রশ্রয় পেলেই যেন আড্ডার ভোজে পাত পেড়ে বসে পড়ে। আসলে সজনীকান্ত তো 'কল্লোলে'রই লোক, ভুল করে অন্য পাড়ার ঘর নিয়েছে। এ রোয়াকে না বসে বসেছে অন্য রোয়াকে।···প্রেমেন শুয়ে ছিল তক্তপোষে। বললুম, "আলাপ করিয়ে দিই—"···

কলির ভীমের মত প্রেমেন হঠাৎ হুমকে উঠল : "কে সজনী দাস?"

এ একেবারে দরজায় খিল চেপে চাপিয়ে ঘর বন্ধ করে দেওয়া। আলো নিবিয়ে মাথার উপরে লেপ টেনে দিয়ে ঘুমুনো। প্রশ্নের উত্তর থাকলেও প্রশ্নকর্তার কান নেই! আবার শুয়ে পড়ল প্রেমেন।

সজনীকান্ত হাসল হয়তো মনে মনে। ভাবখানা, কে সজনী দাস দেখাচ্ছি তোমাকে।

টেকনিক বদলাল সজনীকান্ত। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রেমেনকে বন্ধু করে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে শৈলজা। ক্রমে-ক্রমে নজরুল, পিছু পিছু নৃপেন।

শক্তিধর সজনীকান্ত। লেখনীতে তো বটেই ; ব্যক্তিত্বেও।

এই উক্তি মোটামুটি সত্য হইলেও ঘটনার পূর্বাপরতা ঠিক নাই, এবং অচিন্ত্য-কল্পনার হাইড্রলিক প্রেসারে সময়ের পরিধি কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে। অচিন্ত্যকুমার আরও কয়েকটি নাম করিতে ভুলিয়াছেন—যথা অচিন্ত্যকুমার, অজিতকুমার, যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং স্বয়ং দীনেশরঞ্জন দাশ। কিন্তু সজনীকান্ত মোটেই টেকনিক বদলায় নাই। সৃষ্টির আদিকাল হইতে যে

টেকনিকে বুনো হাতী এবং বন্য ব্যাঘ্রও পোষ মানে সেই চিরন্তন টেকনিকেই ইহারা বশ মানিয়াছেন। ইহাদের প্রসঙ্গ যথাসময়ে আসিবে।

দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর পরে আজ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের সালতামামি করিতে বসিয়া দেখিতেছি ঝড়ঝঞ্ঝাবিরহ-বিচ্ছেদ কণ্টকিত হইলেও এই বৎসরেই আমার জীবনের যাবতীয় শুভ-সূচনা লক্ষিত হইয়াছে। মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ইহা আরম্ভ বৎসর; এবং বনস্পতির সাময়িক বিরূপতা সত্ত্বেও ছোট-বড় বহু পাদপপত্র-বীজনে আমার অরণ্যজীবন শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়াছে। এই বৎসরকে আমি নানা কারণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সরকারী চাকুরির যূপকাষ্ঠে বাঁধা পড়িতে পড়িতে এই বৎসরেই আমি চিরতরে বাঁচিয়া গিয়াছি, যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরে শনিমণ্ডলকেও জ্যোতিষ্মান্ করিয়াছেন তাঁহাদের স্পর্শ বা দৃষ্টি এই বৎসরেই অনুভূত হইয়াছে এবং 'প্রবাসী'র গতানুগতিক সহসম্পাদকীয় কর্তব্য ধীরে ধীরে আমার শ্বাসরোধ করিয়া আমাকে মুক্তির জন্য বিচলিত করিয়াছে। সে মুক্তি পাইতে এক মাসের অধিক বিলম্ব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের সূচনাও এই বৎসরে—'অজয়' রচনার সঙ্গে সঙ্গে। এই বৎসরের সমাপ্তিতেই সাহিত্যিক যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিলাম—

বুয়ারে ইংরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছে, যুদ্ধ কভু ভাল নয়—
মশা ও ছারপোকা দু'হাতে মেরে মেরে কেহ কি করিয়াছে ক্ষয়?...
বুয়ারে-ইংরাজে যুদ্ধ বুড়া রাজা লিখিলা এই লিপিখান—
"দু দল দুই দলে করুক বিনিময় চুরুট, চা ও মিঠাপান।
বেচারা এক পাশে আছি,
আমারে ছুঁয়ো নাক' করিয়া বুড়ি, যদি বা খেল কাণামাছি।
পাঞ্জা লড়িবার সুবিধা নাহি পাও, বগলে দিও কাতুকুতু,
মিটিবে গুঁতাগুঁতি, হস্তে এঁটোপাত আদরে ডাক দিলে তুতু।"

এই সাদর আহ্বানেই শেষ পর্যন্ত বুয়ার-ইংরেজের যুদ্ধ মিটিয়াছিল, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্বে।

অণুবীক্ষণ ও ষ্টেথোস্কোপ যন্ত্র, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে—

লেয়ার্ড নিমরুদের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে স্বচ্ছ প্রস্তরের মুক্ত লেন্স দেখতে পেয়েছিলেন। সেনেকা লিখেছেন, জলপূর্ণ কাচের সাহায্যে সাধারণত ছোট ছোট পদার্থ পরীক্ষা করা হত। 'ত্রিশ-বর্ষকালীন যুদ্ধে'র সময় সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা অনেকেই জানত। এণ্টনি ভ্যান লিউয়েনহোয়েকই প্রথম কাচের লেন্স দিয়ে উন্নত ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করেন। রবার্ট হুক সূক্ষ্মতম লেন্সের সাহায্যে এ বিষয়ে অনেক আবিষ্কার করেন। ইতালীয় ফাদার দি তোরি হুকের পদ্ধতি প্রয়োগ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করেন। সার আইজ্যাক নিউটন ১৬৭২ সালে কনকেভ দর্পণের সাহায্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণের প্রস্তাব করেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেন বার্কার, স্মিথ, মার্টিন এবং আমিসি। ১৮৩০ সালের পর থেকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

ষ্টেথোস্কোপ

একটি কাগজের রোল ব্যবহারের সময় একদিন লেনেকের মনে এর কল্পনা উদয় হয়। প্রথমে তিনি কাগজ পাকিয়ে লম্বা নলের মত করে আটা দিয়ে জুড়ে দেন। পরে দেড় ইঞ্চি ব্যাসার্দ্ধ ও এক ফুট লম্বা কাঠের নলের ষ্টেথোস্কোপ প্রস্তুত করা হয়। এর এক দিকে ফানেলের মত করে তা ফুটো করে দেওয়া হয় এবং অপর দিকে কাঠের গুঁজি দিয়ে তার মধ্যেও ছিদ্র করা হয়। এই ভাবে প্রথমে বক্ষ পরীক্ষার কাজ চালান হত, পরে ১৮৪৩ সালে লণ্ডনের ডাঃ উইলিয়মস্ মনোর‍্যাল ষ্টেথোস্কোপ প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৫০ সালে প্যারিসের মঃ ল্যাণ্ডুসী এক রকম ষ্টেথোস্কোপ প্রস্তুত করেন তার বুকে লাগাবার অংশটা ঘণ্টার মত এবং তার সঙ্গে কতকগুলি নল সংযুক্ত থাকে। ১৮৫২ সালে ডাঃ জি, পি, ক্যামান দুইটি নল সংযুক্ত ষ্টেথোস্কোপ তৈরী করেন।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সঙ্গীত—মিলিত গান, গতি।
সঙ্গীতশাস্ত্র—গানপুস্তক, গানবিদ্যা।
সঙ্ঘ—সংঘাত, সমূহ, পাল, সঞ্চয়।
সচকিত—সভয়, ভীত, ত্রস্ত, তটস্থ।
সচরাচর—বিশ্ব, স্থাবরজঙ্গম, সাধারণ।
সচল—চলৎশক্তিমান, চলনক্ষম, চরিষ্ণু।
সচিন্ত—উদ্বিগ্ন, ভাবিত, চিন্তাযুক্ত।
সচিব—মিত্র, সহায়, অমাত্য, মন্ত্রী।
সচেতন—প্রাণী, জ্ঞানবিশিষ্ট, জাগ্রৎ।
সচেষ্ট—সযত্ন, চেষ্টান্বিত, উদ্যুক্ত।
সচ্চিদানন্দ—পরমেশ্বর, পরমাত্মা।
স্বচ্ছ—পরকলা, নির্ম্মল, শুদ্ধ, সরল।
সচ্ছল—বদান্য, দাতা, দানশীল, ব্যয়ী।
সচ্ছলতা—দাতৃত্ব, ব্যয়শীলতা, ঔদার্য্য।
সজল—জলবিশিষ্ট, আর্দ্র, জলা, জলুয়া।
সজাগ—জাগ্রৎ, ঈষৎনিদ্রিত, সচেতন:
স্বজাতি—এক জাতি, সমান জাতি।
সজীব—জীবনপ্রাপ্ত, জীবিত, বিদ্যমান।
সজ্জন—সংজন, সুজন, সাধু ব্যক্তি।
সজ্জা—বেশ, সাজ, কবচ, আয়োজন।
সজ্জিত—সজ্জাবিশিষ্ট, সাজান, প্রস্তুত।
সঞ্চয়—সংগ্রহ, সঙ্গতি, একত্রকরণ।
সঞ্চার—সংক্রম, উপস্থিতি, প্রস্তাব।
সঞ্চিত—সংগৃহীত, একত্রীকৃত, রাশীকৃত।
সটীক—টিপ্পনীযুক্ত, টীকাসমেত।
সড়কা—শড়িঙ্গা, দীর্ঘাকার, লম্বা।
সড়া—পচা, বিকৃত, নষ্ট, দূরিত, অধম।
সড়গড়—অভ্যাস, সাধন, চলন।
সড়সড়ান—টনটনান, চুল্কান।
সৎ—সত্য, সাধু, যথার্থ, নিত্য, বর্ত্তমান।
সতত—সর্ব্বদা, নিরন্তর, নিত্য, সদা।
সতর্ক—সাবধান, মনোযোগী, জাগ্রৎ।
সতা—সতীন, সপত্নী, পতির অন্য স্ত্রী।
সতী—পতিব্রতা, সাধ্বী, সুচরিত্রা।
সতীর্থ—এক গুরুর শিষ্য, সমাধ্যায়ী।
সতৃষ্ণ—সতৃষ, তৃষ্ণাতুর, পিপাসু, লোভী।
সতেজ—তেজস্বী, বলবান, শক্তিমান।
সৎকার—সম্মান, সমাদর, শবদাহ।
সত্তা—বিদ্যমানতা, সদ্গুণ, বিশিষ্টতা।
সত্ত্বগুণ—সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিজনক গুণ।
সৎমা—বিমাতা, মাতৃসপত্নী।

সত্য—যথার্থ, ন্যায্য, তথ্য, নির্ণয়।
সত্যঙ্কার—বায়না, সত্যাপণ, সত্যাকৃতি।
সত্যতা—যাথার্থ্য, নিশ্চয়, নির্ণয়।
সত্যবাদী—যথার্থবাদী, সত্যবক্তা।
সত্যব্রত—সত্যবাদী, যাথার্থিক, সত্যপর।
সত্যযুগ—চারি যুগের প্রথম যুগ।
সত্যানৃত—সত্যমিথ্যা, বাণিজ্যাদি।
সত্বর—ত্বরান্বিত, শীঘ্রতাবিশিষ্ট।
সদন—সদ্মন, নিকেতন, গৃহ।
সদয়—কৃপান্বিত, দয়াবান, সকরুণ।
সদর্থ—বাক্যের সার, যথাযোগ্য অর্থ।
সদসৎ—ভদ্রাভদ্র, উত্তমাধম, ভালমন্দ।
সদস্য—অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বিধিদর্শী।
সদাচার—সাধু ব্যবহার, ভদ্রাচার।
সদাতন—সনাতন, নিত্য, অনন্ত, চিরস্থায়ী।
সদার—সস্ত্রীক, সভার্য্য, সপত্নীক।
সদাশিব—মহাদেব, ত্রিলোচন, শঙ্কর।
সদৃক—সদৃশ, তুল্য, তদ্রূপ, সমান, ন্যায়।
সদেশ—নিকট, সমীপ, অন্তিক, একদেশ।
সদ্গতি—স্বর্গবাসাদি উত্তম গতি, মুক্তি।
সদ্বৃত্ত—সচ্চরিত্র, সুশীল, সদ্ব্যবহার।
সদ্ভাব—বিদ্যমানতা, প্রণয়, হৃদ্যতা।
সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে, তদ্দিবস।
সদ্যোজাত—তদ্দিনোৎপন্ন, নবীন, সাদ্য।
সধবা—পতিবত্নী, সভর্ত্তৃকা, সপতিকা।
সধর্ম্মিণী—বিবাহিতা স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী।
সনাতন—নিত্য, নিরন্তর, চিরস্থায়ী।
সন্তত—নিত্য, বিতত, বিস্তৃত, নিয়ত, অনন্ত।
সন্ততি—সন্তান, পুত্রকন্যা, পুত্রাদি, বংশ।
সন্তপ—সন্তাপিত, সন্তাপী, তাপযুক্ত।
সন্তরণ—সাঁতার, সন্তরণ, ভাসনা।
সন্তর্পণ—তোষণ, বহু চেষ্টাকরণ, যত্ন।
সন্তাপ—উত্তাপ, খেদ, দুঃখ, শোক।
সন্তুষ্ট—হৃষ্ট, তৃপ্ত, আহ্লাদিত, হর্ষিত।
সন্তুষ্টি—সন্তোষ, হর্ষ, তৃপ্তি, আনন্দ।
সন্তোলন—সাঁতলান, সম্বরণ।
সন্তোষ—হর্ষ, আহ্লাদ, আনন্দ, প্রীতি।
সন্দংশ—জাঁতী, সাঁড়াশি, সযোনি, সোন্না।
সন্দর্ভ—ক্রম, আনুপূর্ব্ব প্রকরণ সম্বন্ধ।
সন্দর্শন—নিরীক্ষণ, সাক্ষাৎকার।

[ক্রমশঃ

পর্যন্ত তিনি জর্জ হেনরী লুইসের সঙ্গে ঘর করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ সেদিন এতখানি উগ্র নৈতিক স্বেচ্ছাচারিতাকে কিছুতেই তৃপ্ত চিত্তে বরদাস্ত করতে পারেনি। তাই তাঁর জীবিতকালে যা সম্ভব হয়নি, মৃত্যুর পর সমাজ তাঁর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবীতে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে না দিয়ে। কিন্তু ইলিয়টের অন্তিম ইচ্ছা ছিল যে তাঁর মৃতদেহ ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবীতেই যেন সমাধিস্থ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁর বন্ধু হাবার্ট স্পেন্সার ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবীর ডীনকে অনুরোধ করে পত্র দিতে তদানীন্তন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। হাবার্ট স্পেন্সার বিশ্ববিশ্রুত জীববিজ্ঞানবিদ্ হাক্সলীকেও অনুরোধ করে পত্র দিয়েছিলেন—হাক্সলীর উত্তরটি নীচের চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত জর্জ ইলিয়টের মৃতদেহ হাইগেট কবরখানায় সমাধিস্থ করা হয়। বস্তুতঃ সমাজসংস্কারক, বৈজ্ঞানিক, স্বাধীন চিন্তানায়করা এইখানেই সমাধিস্থ হতে বেশী পছন্দ করেন। মৃত্যুর পর হাবার্ট স্পেন্সার ও কার্ল মার্ক্সের শবদেহও এখানে কবর দেওয়া হয়েছে।]

৪, মালবোরো প্লেস,
২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮০

প্রিয় স্পেন্সার,

শুক্রবার সন্ধ্যায় আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত হতবুদ্ধি হইয়াছি। ঠিক এই সম্বন্ধেই আমি মর্লীর সঙ্গে তখন আলোচনা করিতেছিলাম। ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবীতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন সম্বন্ধে আমাদের মনে দ্বিধা সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ শান্তি ও সম্মানের সহিত জর্জ ইলিয়টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, ইহা মর্লীরও কাম্য।

কিন্তু আপনার এই প্রস্তাব বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসকে পুনরায় খোঁচাইয়া তুলিবে এবং ইহা লইয়া যে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠিবে, সন্দেহ নাই। এমন কি, ধর্মধ্বজাধারিগণের মতামতও এ বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত। কাজেই এ বিষয় ভুলিয়া থাকাই মঙ্গলজনক।

এই ব্যাপার লইয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ডীনকে চাপ দিবার পূর্বে আমাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন। যে বিষয় লইয়া তাঁহাকে তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে তাঁহার মত পদস্থ ব্যক্তির পক্ষে সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হইবে কিনা, তাঁহাকে অনুরোধ করিবার অগ্রে আমাকে তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

তাঁহাকে অনুরোধ করা সমীচীন হইবে না বলিয়াই আমি মনে করি। এ পরিস্থিতি যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবী খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের গীর্জা—সর্বধর্মপীঠস্থান নয় এবং ডীন সরকার-নিযুক্ত ধর্মযাজক। এ্যাবীতে ইলিয়টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের অনুরোধ দ্বারা তাঁহার প্রতি দুর্লভ খ্রীষ্টীয় সম্মান প্রদর্শন যাচ্ঞা করা হইবে। ইহলৌকিক পাপের জন্য যে মৃত্যুকালে অনুতাপ করে নাই তাহার কবরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে আমি ডীনকে কেমন করিয়া অনুরোধ করিব? তাঁহার অবস্থায় পড়িলে আমি সে-কাজ করিতে জোরের সহিত অস্বীকার করিতাম, তাঁহাকে সেই কাজে প্রবৃত্ত হইতে আমি কি ভাবে প্ররোচিত করিব?

আপনি জানাইয়াছেন, এ্যাবীতে তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ হইবে ইহাই অন্তিম ইচ্ছা ছিল জর্জ ইলিয়টের। তাহার ইচ্ছার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও আমাকে বলিতে হইবে যে, তাহার ইচ্ছার কথা জ্ঞাত হইয়া আমি অতীব দুঃখিত। যাহাদের আমরা ভালবাসি মৃত্যুর পরও তাহাদের পার্শ্বে অবস্থান করার আকুতি ছাড়া আর অন্য কোন কারণে যে এবংবিধ ইচ্ছা সঞ্জাত হইতে পারে ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য। ইহা যে সর্বসাধারণের অভিপ্রায়প্রসূত এ চিন্তাও আরো দুর্বোধ্য। বস্তুতঃ ইহা শিশুসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয়। চিন্তা ও কার্যে যাহারা স্বাধীনতার বড়াই করে তাহাদের পুরস্কারের জন্য লালায়িত হওয়া উচিত নয়।

অতএব, এ প্রস্তাব আমার বিচারে অসমর্থনীয় এবং আমি ইহার সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাই না।

অনভিপ্রেত এই দীর্ঘ পত্রে যে মত প্রকাশ করিলাম তাহার অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য আরোপিত করিলে বিশেষ দুঃখিত হইব। ইতি—

আপনার অতি বিশ্বস্ত
টি, এইচ, হাক্সলী

সুরশিল্পী মোজার্টের চিঠি

[সুরশিল্পী মোজার্ট স্যালজবার্গের আর্কবিশপ কলোরেডোর অধীনে কাজ করতেন। বিশপ ছিলেন উন্নাসিক অতি দাম্ভিক মানুষ। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন; ক্ষমতার মত্ততায় মোজার্টের মত শিল্পীকেও তিনি অধীন ভৃত্য মনে করার ঔদ্ধত্য পোষণ করতেন মনে। শিল্পীর মর্মবেদনা চরম হয়ে উঠলেও কোন বিদ্রোহ করেননি তিনি। নিঃশব্দেই সহে এসেছিলেন সেই অপমানের অন্ন পরিত্যাগ করে। দীর্ঘ আট বছর দু'জনে দু'জনকে কোন মতে মানিয়ে চলেছিলেন, কিন্তু যে আগুন এত দিন তুষের মত ধিকিধিকি জ্বলেছিল হঠাৎ বিস্ফোরণে তা বিদীর্ণ হোল। আর্কবিশপের সঙ্গে মোজার্টের হোল চূড়ান্ত বোঝাপড়া। মোজার্ট বিশপের অধীনে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাবাকে নীচের চিঠিখানি লিখেছিলেন নিজের কার্যের সমর্থন চেয়ে।

পিতার সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও মোজার্ট আর আর্কবিশপের অধীনে কাজে ফিরে আসেননি কখনো। তবে বিশপের অধীনে কাজের মত নিরাপত্তাও পাননি কখনো। সারা জীবন তাঁকে সংসারের দুঃখ-দৈন্য-অভাব-অভিযোগের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে যেতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অপুষ্টি ও গুরুতর পরিশ্রমে হতক্লান্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ সুর-প্রতিভাকে বিদায় নিতে হয়েছে পৃথিবী থেকে।]

এখনও অসহ্য ক্রোধে সর্বাঙ্গ আমার রী রী করিতেছে। এ চিঠি পড়ে আপনারও মনে নিঃসন্দেহ প্রতিকূল ঝড় উঠিবে। দীর্ঘকাল অগ্নিপরীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। স্যালজবার্গের দাসত্ব করার মন্দ-ভাগ্যের রাহু-কাল কাটিয়া গিয়াছে। আজ সত্যিই আমার জীবনের এক মহা সুখের দিন।

তাঁহাকে কি ভাষায় বর্ণনা করিব জানি না। একাধিক বার তিনি আমায় অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছেন। সে সব কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আপনার মনে দুঃখ দিতে চাই না। একমাত্র আপনার কথা স্মরণ করিয়াই সে-সময় আমি প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত ছিলাম। তিনি আমাকে লম্পট দুরাচার বলিয়া গালি দিয়াছেন—এখান হইতে

...য়া যাইতেও বলিয়াছেন। কিন্তু সে-সবই আমি মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছি। জানি, ইহাতে শুধু আমার নয় আপনার সম্মানও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবু আমি প্রতিবাদ করি নাই। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন ভৃত্য আসিয়া সেই মুহূর্তে আমাকে স্থানত্যাগের নির্দেশ জানাইয়াছে। একমাত্র আমাকে ছাড়া আর সকলকেই যাইবার দিন পূর্বাহ্ণে জানান হইয়াছিল। ...গে হউক, আমি দ্রুত আমার জিনিষপত্তর একটি বাক্সে লইয়া ...িয়া আসিয়াছি। মাদাম ওয়েবার আমাকে দয়া করিয়া তাঁহার ...তে ঠাঁই দিয়াছেন এবং থাকার জন্ম চমৎকার একখনি ঘরও ছাড়িয়া ...য়াছেন। আমি এখন যাহাদের সঙ্গে বাস করিতেছি তাঁহারা সকলেই ...তি অমায়িক, সজ্জন ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রয়োজনীয় সকল ...নিসই সংগ্রহ করিয়া দেন। আগামী বুধবার বাড়ী ফিরিয়া যাইব ...স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও প্রাপ্য টাকা না পাওয়ায় শনিবার ...র্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে!

আজ টাকার তাগাদা দিতে যাইলে একজন বেয়ারা আসিয়া ...নাইল, আর্কবিশপ একটি পার্শেল আমার সঙ্গে পাঠাইতে চান। খুব ...রী কিনা জানিতে চাহিলে, শুনিলাম—'খুবই দামিত্বপূর্ণ জিনিষ'। প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম—'দুঃখিত, মহামান্য আর্কবিশপকে ...ব্যাপারে সাহায্য করিতে আমি অপরাগ। কারণ শনিবারের ...গে আমি যাইতে পারিব না। তাঁহার আস্তানা ছাড়িয়া দিয়াছি। ...খন নিজের খরচায় থাকিতে হইবে। কাজেই যতক্ষণ না রসদ ...োগাড় করিতে পারিতেছি, ভিয়েনা ত্যাগ করা অসম্ভব আমার পক্ষে।'

আর্কবিশপের নিকট যাইবার সময় আমার বন্ধুরা উপদেশ দিল—'আর্কবিশপকে বলিবে গাড়ীতে সকল স্থান পূর্ণ।' আর্কবিশপের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম—'আজ রাত্রেই ...ইতাম। কিন্তু গাড়ীতে সমস্ত স্থান ভর্তি হইয়া গিয়াছে।' এ উত্তর ...না মাত্র মুহূর্তে তাঁহার মুখোস খুলিয়া পড়িল। অভদ্র কণ্ঠে যাহা ...লিলেন তাহার মর্মার্থ হইল—আমার মত লম্পট তিনি কখনো দেখেন নাই। তাঁহার অধীনে যাহারা কাজ করিয়াছে আমার মত নীচাশয় কেহই নয়। আজই যদি চলিয়া না যাই তিনি বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দিবেন। আমার মাহিনাও বন্ধ করিয়া দিবেন।'

আমি একটি কথারও প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। এমনি ...তাশনের মত তিনি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিলেন। নির্বাক ...ণ্ঠে তাঁহার প্রতিটি তিরস্কার শ্রবণ করিলাম। আমার মুখের উপর তিনি মিথ্যা কথা বলিলেন যে আমার মাসিক বেতন পাঁচশ' গোল্ডেন, আমি বদমায়েস, লম্পট, উড়নচণ্ডী। এ ছাড়াও আরো অনেক কথা বলিলেন যাহা আর উল্লেখ করিতে চাহি না। তাঁহার তিরস্কার-তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে অবশেষে আমারও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া পড়িল। নিজেকে আর কিছুতেই দমন করিতে পারিলাম না; বলিলাম—'আপনি কি আমার কাজে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন?' 'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাইতে চাও?'—তিনি গর্জিয়া উঠিলেন—'তোমার মত পাষণ্ডের মুখ দেখিতে চাই না। দূর হও।' কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় বলিলাম—'কাল আমার পদত্যাগ-পত্র পাইবেন।'

আপনি আমার জন্ম কিছুমাত্র কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। ভিয়েনাতে আমার সাফল্য সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দিহান। বিনা কারণে পদত্যাগ করিলেও ক্ষতি ছিল না। এখন সত্যিকার কারণ ঘটিল—বার বার তিন বার। দুই বার আমি কাপুরুষের মত আচরণ করিয়াছি কিন্তু আর নয়।

আর্কবিশপ যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে থাকিবেন কোন কনসার্টে যোগ দিব না। আপনি হয়ত ভাবিতেছেন, রাজা ও রাজপুরুষ-মহলেও আমার সুনাম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আর্কবিশপকে এখানে সবাই অপছন্দ করেন—বিশেষ করিয়া রাজা স্বয়ং। তা ছাড়া রাজা তাঁহাকে লুকসেমবার্গে আমন্ত্রণ না করায় আর্কবিশপ অগ্নিশর্মা হইয়া আছেন। পরের ডাকে আপনাকে কিছু টাকা পাঠাইব। আপনি দুঃখ করিবেন না বাবা—আমার সৌভাগ্যের সবে সূচনা হইতেছে। আমার সৌভাগ্যে আপনারও সৌভাগ্য। আমার কাজে খুশী হইয়াছেন তাহা লিখিয়া জানাইবেন। আর্কবিশপ হয়ত আপনার সঙ্গেও উদ্ধত আচরণ করিতে পারেন। তেমন কোন সম্ভাবনা দেখিলে বোনকে লইয়া তক্ষুনি ভিয়েনায় চলিয়া আসতে দ্বিধা করিবেন না। তিন জনের বাঁচিয়া থাকার মত প্রাণ-রস সংগ্রহ করিতে পারিব ভরসা রাখি। তবুও আরো একটি বছর অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিব। স্যালজবার্গের জীবনের এইখানে ইতি হইল। আর্কবিশপের স্মৃতি আমার জীবনে বিস্বাদ অভিজ্ঞতা।

আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। বোনটিকে ভালবাসা দিবেন। ইতি—

আপনার অনুগত পুত্র
ডাব্লু. এ. মোজার্ট।

স্যামুয়েল পেপিসের চিঠি

[১৭০৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে জন এভিলিন তাঁর রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করেছেন—'আজকের তারিখটি স্যামুয়েল পেপিসের মৃত্যু-দিবস হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রইল। পেপিস ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে একজন শ্রমশীল, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির তিরোধান ঘটল। নৌ-বিজ্ঞানে তাঁর সমতুল্য জ্ঞানসম্পন্ন লোক সারা ইংলণ্ডে বিরল। সর্বজনপ্রিয়, অতিথিপরায়ণ পেপিস নিজে ছিলেন বহু বিদ্যাপারদর্শী। বিদ্যানুরাগী হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।'

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্যামুয়েল পেপিস সম্বন্ধে এই চিত্রটি সত্য। কিন্তু সেই বছরই তাঁর নিজের লেখা রোজনামচার কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। তা থেকে মানুষটির সত্যকার পরিচয় জানা যায়। এবং সে-চিত্র পূর্বোল্লেখিত চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই গুণী লোকটি প্রহার ক'রে নিজের স্ত্রীর চোখে কালশিটে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। তরুণ নৌ-অফিসারদের অল্পবয়সী পত্নীদের সঙ্গে ব্যভিচার করতেন, তা না হলে তারা স্বামীর বেতনের অর্থ সরকারী তহবিল থেকে পেতে পারত না। সরকারী অর্থ প্রতারণা করে চুরি করতেন, উৎকোচ গ্রহণ করতেন, রাজসভার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে খোসগল্প করতে ভলেবাসতেন অর্থাৎ এক কথায় পেপিসের নীতিজ্ঞান ছিল অতি দুর্বল। পেপিসের ডায়রীটি শর্টহ্যাণ্ডে লেখা। বলা বাহুল্য, তাঁর গোপন কথা সাধারণ্যে প্রচারিত হয় এ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে নৌ-যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে ঐতিহাসিক প্লেগের মহামারী সুরু হয়। সেই প্লেগ মহামারী সম্বন্ধে অনেক

ডাক্তার লিখেছেন—'খৃষ্টমাসের আগে থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রায় সাত মাস ধরে যে পশ্চিমী হাওয়া চলে তার ফলে প্লেগ দেখা যায়। সহরের পশ্চিম অঞ্চল থেকেই এর সূত্রপাত—তার পর ধীরে ধীরে সমস্ত নগরীর উপর তার করাল ছায়া বিস্তার করে। হঠাৎ সংক্রমণ হিসেবে এক স্থান থেকে সুরু করে দুরারোগ্য ক্ষতের মত ধীরে ধীরে সমস্ত দেহে বিস্তার লাভ করার মত নয়—ঠিক যেন বৃষ্টিধারার মত একই সঙ্গে সহরে এবং সহরের উপান্তে সর্বত্র প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেয়।'

পেপিস তখন নৌ-সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং যে সমস্ত অফিসাররা সাহস করে লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন এই সময় তিনি তাঁদের অন্যতম। 'লোকে যদি রাজা ও দেশের জন্য যুদ্ধের বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে আমিই বা সহরে থেকে রোগ-সংক্রমণ বিপদের সম্মুখীন হতে ভয় পাব কেন?'—মন্তব্য করেছিলেন পেপিস। স্যার জর্জ কারটারেটের স্ত্রী শ্রীমতী কারটারেটকে লেখা নীচের চিঠিতে পেপিস লণ্ডনে প্লেগের তাণ্ডব সম্বন্ধে একটি ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেবার লণ্ডনে সাড়ে চার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে আট হাজারের বেশী লোক প্লেগে মারা গিয়েছিল। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের প্লেগের মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা নূনাধিক সত্তর হাজার।]

উলউইচ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৬৬৫

সুস্মিতাসু—

ইতিপূর্বেই আপনাকে যে আমার চিঠি লেখা উচিত ছিল, সে লজ্জা পাবার জন্য আপনার নিকট হতে পত্রের প্রত্যাশায় ছিলাম এ কথা হয়ত আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না। যে সহরে অবস্থান করছি তার ভীতিব্যঞ্জক ঘটনাপঞ্জী আপনাকে জানাতে চাই নে বলেই পত্র দিতে এত বিলম্ব ঘটল। রণপোতবহর পাঠিয়ে দিয়ে বর্তমানে আমি উলউইচে এসেছি বিশ্রাম নিতে। আজ ছ'দিন হোল কাগজ-কালি-কলম নিয়ে বসেছি—এবার আর আমার নৈঃশব্দ সম্বন্ধে অভিযোগ করবার কোন কারণ ঘটবে না। যা হোক, এ কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনার প্রীতিলাভের মুহূর্তটিতে আপনার ও আপনার পরিজনবর্গের স্বাস্থ্য ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ কামনা না করে একটি দিনও আমি অতিবাহিত করিনি।

বিরাট এক নৌবহর নিয়ে লর্ড স্যাণ্ডুইচ গিয়েছেন শত্রুর সঙ্গে মোলাকাৎ করতে আর তাঁর শ্রীমতী সখী-পরিবৃতা হয়ে হিনচিনব্রোকে সুস্থ শরীরে কালযাপন করছেন।

এ শহরের শ্মশানপুরীতে পরিবেশনযোগ্য কোন ঘটনা ঘটার অবকাশ কোথায়! শুধু সেই একই দুঃখের কাহিনী যা আপনার শ্রুতিসুখকর হওয়া তো দূরের কথা, মনকে দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলবে। আমি এত দিন সহরেই ছিলাম। এখানে সপ্তাহে সাত হাজারের অধিক করালগ্রাসে নিপতিত হয়েছে—তার মধ্যে ছ' হাজার মরেছে শুধু প্লেগ মহামারীতে। একমাত্র গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া রাতে-দিনে আর কোন শব্দই শোনা যায় না এখন। লাম্বার্ড স্ট্রীটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এলে কুড়ি জনেরও অধিক লোক চোখে পড়বে না। এক্সচেঞ্জেও পঞ্চাশ জনের বেশী নয়। দশ-বার জনের এক-একটি পরিবার সবংশে নির্মূল হয়ে গেছে। আমার চিকিৎসক ডাক্তার বর্নেট যিনি আমাকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত প্লেগের কবলে প্রাণ দিয়েছেন। মৃতের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, যারা আগের দিন সকালে মারা গেছে তাদের মৃতদেহ কবর দেওয়ার পক্ষে দীর্ঘতর রাতও ছোট মনে হয়। দোকান দোকান ঘুরেও ভাল মাংস বা মদ পাওয়া যায় না। মদওয়ালা দোকান বন্ধ করে দিয়েছে—রুটিওয়ালার পরিবারের সকলেই প্লেগে মারা গেছে।

কিন্তু ভগবানের দয়ায় ও পূর্বপুরুষগণের আশীর্বাদে এ বিনীত দাস এখনও সুস্থ আছে—যে আপনার ও আপনার পরিবারের প্রয়োজনে সর্বশক্তি নিয়োগে কৃতসঙ্কল্প।

ডেপটফোর্ডের অবস্থা কিরূপ, স্থানীয় লোকের কাছে তার খবর পেয়েছেন নিশ্চয়।

গ্রীনউইচ দ্রুত রোগ-কবলিত হচ্ছে। রাজার আদেশে আমরা রোগ-প্রতিরোধমূলক সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। এই উদ্দেশ্যেই গতকাল উপাসনার পর টাউন অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হলে তাঁরা অনেক শোকাবহ বার্তা শোনালেন। তার মধ্যে একটি ঘটনা আপনাকে জানাচ্ছি। সহরের কোন রোগাক্রান্ত গৃহ থেকে সদ্য-আনা একটি শিশুকে নিজ গৃহে স্থান দেওয়ার জন্য এক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেল শিশুটি এই সহরেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক জন। সে-পরিবারের সব ক'টি ছেলে-মেয়ে চিরশান্তি পেয়েছে। লোকটি নিজে স্ত্রী সহ একটি গৃহে অবরুদ্ধ। মুক্তির সকল উপায় সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে সে তার এই একমাত্র পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য সকাতর অনুরোধ জানিয়েছে। অসুবিধা সত্ত্বেও সে-অনুরোধ গ্রাহ্য হয়েছে। ছেলেটিকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে জানলা থেকে তার এক বন্ধুর হস্তে সমর্পণ করা হয়েছিল—বন্ধুটি তাকে নতুন বেশ পরিয়ে গ্রীনউইচে পাঠিয়ে দিয়েছে। অল্ডারম্যান খবর দিয়েছেন—আমরা ছেলেটিকে থাকার অনুমতি দিয়েছি।

আমাদের হতভাগ্য নাগরিকরা যে মহা দুর্বিপাকে পড়েছে এ তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

যাক্, আর এ দুঃখের পাঁচালি বাড়াব না। সাত-আট দিন শীতল আবহাওয়ার দরুন, আশা করি, পরের চিঠিতে ভগবানের দয়ায় রোগ প্রশমনের সুখবর দিতে পারব।

শ্রীমতী ক্ল্যানিংকে দয়া করে এই খবরটি দেবেন যে, তার ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠির উত্তরের জন্য পোর্টারের গৃহে বারংবার লোক পাঠাচ্ছি—এখনও সে সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম।

তরুণ দম্পতীর প্রতি আমার স্ত্রীও শতকোটি শুভ কামনা জানাচ্ছেন। আপনার ও শ্রীমতী ক্ল্যানিং, শ্রীমতী স্কট ও মিঃ সিডনীর প্রতিও আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার। স্কটহলে শ্রীমতী স্কটের পুনরাগমন (যদি আপনার পক্ষে ভারস্বরূপ না হয়ে থাকে) মিঃ সিডনীর পরম সন্তোষবিধায়ক হবে যেমন শুনে আমি প্রীত হয়েছি। ইতি—

আপনার অতি অনুগত ও প্রিয়
বশংবদ স্যামুয়েল পেপিস

শেফালী
ঘোষ

—অর্কেন্দুশেখর ভৌমিক (প্রথম পুরস্কার)

বেলা যে প'ড়ে এল জলকে চল্

ডলি দাস

-প্রচ্ছদ-পরিচিতি-

১৭৯৮। ইংরেজের দুর্দ্দিন। নেপোলিয়ন কখন বা ভারতে এসে পড়েন। নেপোলিয়নের মিত্র টিপু সুলতান ইংরেজের দুষমন। সারা ভারত তাঁর দিকে। অতর্কিতে ইংরেজ আক্রমণ করে শ্রীরঙ্গম পত্তন দুর্গ। টিপু বীরের মত যুদ্ধ করে। দুর্গ জয় করে ওরা টিপুকে জ্যান্ত বন্দী করতে চায়। জেনারেল বেয়ার্ড ও কর্ণেল ওয়েলেসলি মশাল হাতে খুঁজতে খুঁজতে দেখে টিপুর তোরণ দ্বারে প্রাণ দিয়েছেন, মান দেননি।

প্রচ্ছদ-পটে তারই অমর ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র।

গাগরী-ভরণে

(দ্বিতীয় পুরস্কার)
—শি, সু, বসু

আধুনিকা
(তৃতীয় পুরস্কার)
—বি, এন, মিত্র

প্রতিযোগিতা-

বাঙলার মেয়ে নামে প্রচুর সংখ্যক আলোকচিত্র প্রাপ্ত হওয়ায় আগামী সংখ্যাতেও ঐ বিষয়ের চিত্রাদি মুদ্রিত হইবে। আগামী ২২শে আশ্বিন পর্য্যন্ত উক্ত বিষয়ের ছবি আরও গ্রহণ করা হবে।

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর স্মৃতি-মন্দির, জয়রাম বাটী —রামকৃষ্ণ সরকার গৃহীত

ঘর-কন্না —পারমলকুমার ঠাকর

মধুকরী — জলী ভট্টাচার্য্য

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

১০

কলবার্টের কাছে লিখিত পত্র (৪)

অবশেষে আমি এই কথা বলতে চাই যে যদিও মোগল সাম্রাজ্যের সোনারুপোর ও সম্পদের আদিঅন্ত নেই, তাহ'লেও সোনা যে অন্য দেশের তুলনায় তার খুব বেশী আছে তা মনে হয় না। বরং হিন্দুস্থানের লোকদের দেখলে মনে হয় তারা অন্যান্য অনেক দেশের লোকের তুলনায় বেশী দরিদ্র। মনে হবার কারণ আছে। প্রথম কারণ হ'ল: সোনা অনেক পরিমাণ গলিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়। অর্থাৎ সোনা গলিয়ে মেয়েদের নানারকমের অলঙ্কার তৈরী করা হয় এবং হাত, পা, মাথা, গলা, নাক, কান সর্বত্র অলঙ্কৃত করার জন্য সোনা অপচয় করা হয়। সোনা থেকে নানারকমের জরি-জালিদাও তৈরী করা হয়। সেই সব সোনার জরি দেওয়া পাগড়ি, পোশাক ইত্যাদি দেহের শোভাবর্ধন করে। এইভাবে কতটা পরিমাণ সোনা যে হিন্দুস্থানে অপব্যবহার করা হয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আমীর-ওমরাহ থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলে গিল্টি করা অলঙ্কার ব্যবহার করেন। সাধারণ পদাতিকরা পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করার জন্য উদগ্রীব। অনাহারে ও অর্ধাহারে যারা আছে, ভারতবর্ষে তারাও সোনার গহনা পরার লোভ ও অভ্যাস ছাড়তে পারে না।(১)

দ্বিতীয় কারণ হল: সম্রাট দেশের সমস্ত সম্পদের মালিক, বিশেষ ক'রে ভূসম্পত্তির। সামরিক কর্মচারীদের বেতন হিসাবে তিনি ভূসম্পত্তির ভোগাধিকার দান করেন। তাকে "জায়গীর" বলে, যেমন তুর্কীতে বলে 'তিমর'। এই জায়গীর থেকে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য বেতন আয় করেন। প্রাদেশিক সুবাদারদেরও জায়গীর দেওয়া হয়, শুধু বেতনের জন্য নয়, সৈন্যসামন্তদের জন্যও। একমাত্র শর্ত হ'ল এই যে বাৎসরিক বাড়তি রাজস্ব যা আয় হবে সেটা সম্রাটকে দিতে হবে। যে সব ভূসম্পত্তি জায়গীর দেওয়া হয় না, সেগুলি সম্রাটের নিজস্ব আয়ত্তে থাকে এবং তিনি রাজস্ব-আদায়কারী (জমিদার ও চৌধুরী) নিয়োগ ক'রে তার রাজস্ব আদায় করেন।

এইভাবে ভূসম্পত্তির অধিকারী যাঁরা হ'ন—সুবাদার, জায়গীরদার ও জমিদার—তাঁরা প্রজাদের একমাত্র হর্তাকর্তা বিধাতা হন। চাষীদের উপর তাঁদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকে, এমন কি নগরের ও গ্রামের বণিকশ্রেণী ও কারিগরদের উপরেও। এই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য তাঁরা যে কি নির্মমভাবে প্রয়োগ করেন, নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতন, তা কল্পনা করা যায় না। এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করারও কোন উপায় নেই। কারণ যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক। এমন কোন নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কেউ নেই, যাঁর কাছে তারা অভিযোগ পেশ করতে পারে। আমাদের দেশের (ফ্রান্স) মতন হিন্দুস্থানে পার্লামেন্ট নেই, আইনসভা নেই, আদালতের বিচারক নেই—অর্থাৎ এমন কিছু নেই যার সাহায্যে এই নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের বর্বরতার প্রতিকার করা যেতে পারে। কিছু নেই, কেউ নেই। আছেন শুধু কাজী সাহেব, কিন্তু কাজীর বিচারও তেমনি, কারণ কাজীর কাছে জনসাধারণের সুবিচারের কোন আশা নেই। রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও দায়িত্বের এই চরম লজ্জাকর অপব্যবহার কেবল রাজধানীতে (দিল্লী ও আগ্রা) বা রাজধানীর কাছাকাছি, নগরে ও বন্দরে একটু অল্প দেখা যায়, কারণ নিদারুণ কোন অন্যায় বা অত্যাচার এই সব স্থানে ঘটলে, সম্রাটের কর্ণগোচর হ'তে দেরী হয় না। এই অবস্থাকে আমরা 'দাসত্ব' ছাড়া আর কি বলতে পারি?

এই দাসত্বই হ'ল হিন্দুস্থানের প্রগতির পথে সব চেয়ে বড় অন্তরায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক অবস্থা, ব্যক্তিগত জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, সবকিছু এই কারণে এত অনুন্নত ব'লে মনে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেও বণিকশ্রেণী বিশেষ কোন উৎসাহ পান না, কারণ বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ ঘটলে আশার চেয়ে আতঙ্কের সম্ভাবনা বেশী। প্রতিবেশী স্বেচ্ছাচারী তাঁর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের দম্ভে সার্থক ব্যবসায়ীর সর্বনাশ করার চেষ্টা করবেন সবদিক দিয়ে এবং কিছুতেই অন্য আর একজনের ঐশ্বর্যের প্রতিপত্তি সহ্য করবেন না। সুতরাং হিন্দুস্থানের বণিকশ্রেণী ও বাণিজ্যেরও কোন ক্রমোন্নতি নেই, কোন প্রসার ও প্রগতি নেই। তাছাড়া, হিন্দুস্থানের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যদি কেউ ধনোপার্জন করেন, তাহলে তিনি কখন ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য এক কপর্দকও খরচ করেন না। তাঁর ঘরবাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র সব একরকম থাকে, কখন বদলায় না এবং তা দেখে বোঝবার উপায় নেই তাঁর ধনদৌলত কত আছে। কৃপণতাই হিন্দুস্থানের ধনিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এদিকে ক্রমে তাঁর সোনারুপো মজুত হতে থাকে, এবং মাটির গভীর তলদেশে স্তূপাকারে সমাধিস্থ হয়ে আত্মগোপন ক'রে থাকে। ধনী কৃষক, ধনী কারিগর, ধনী বণিক—সকলের ঠিক একইরকম মনোবৃত্তি—মুসলমান বা হিন্দু যে সম্প্রদায়েরই লোক হ'ন না। সাধারণতঃ

---

(১) বার্নিয়েরের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের শক্তি দেখে বাস্তবিকই আশ্চর্য হ'তে হয়। মোগল বাদশাহদের একটি 'রত্ন-ভাণ্ডার' ছিল। রত্নভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষের নাম 'তেপকচী'। একজন জহুরী দারোগাও থাকতেন। চুনী, পান্না, হীরা, নীলা প্রভৃতি নানারকমের মণিমাণিক্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকত।

হিন্দুস্থানের ধনিকশ্রেণী বলতে হিন্দুদেরই বুঝায়, কারণ হিন্দুরাই ব্যবসা-বাণিজ্যাদি নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছেন। তাদের ধারণা বা বিশ্বাস যে উপার্জিত অর্থ এইভাবে সঞ্চয় ক'রে রাখলে পরলোকে পরমাত্মার সদ্‌গতি হয়। অর্থাৎ অর্থ ও পরমার্থ তাঁদের কাছে এক পদার্থ। মুষ্টিমেয় একদল লোক যাঁরা সম্রাট বা আমীর-ওমরাহের আওতায় থাকেন, তাঁরাই কেবল ভোগবিলাসের জন্য ব্যয় করেন এবং বাইরে দীনদরিদ্র সেজে থাকেন না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সোনারূপো এইভাবে মজুত ক'রে রাখার অভ্যাস, যুক্তিহীন মিতব্যয়িতা এবং খরচ না ক'রে টাকা জমিয়ে রাখার প্রবৃত্তির জন্যই হিন্দুস্থানের দারিদ্র্য এত বেশী। উপার্জিত অর্থ দিয়ে লেনদেন না ক'রে যদি তা ঘরের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখা হয়, তাহলে পর্যাপ্ত ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও কোন দেশের অভাব ও দারিদ্র্য দূর হ'তে পারে না। (২)

যে-বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হ'ল তাতে সকলের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগবে। প্রশ্নটি এই :

সম্রাট যদি সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক না হতেন এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হ'ত, তাহ'লে কি হিন্দুস্থানের আরও অনেক বেশী উন্নতি হ'ত? (৩)

এই প্রশ্ন নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। ইয়োরোপে যে সব রাষ্ট্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার আছে এবং যে সব রাষ্ট্রে নেই, তাদের অবস্থা তুলনা ক'রে দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করলে রাষ্ট্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়। পূর্বালোচনা থেকে আমরা বুঝেছি, হিন্দুস্থানের সোনা-রূপো কিভাবে জায়গীদার, সুবাদার ও জমিদাররা গোপন সিন্দুকে মজুত ক'রে ফেলেন এবং বহির্জগতের লেনদেনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলে আত্মসাৎ করেন। তাঁদের এই নিষ্ঠুরতার কোন যুক্তি নেই।

(২) আধুনিক কীনেসিয়ান অর্থনীতির (Keynesian Economics) ছাত্রদের কাছে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ প্রায় তিনশ' বছর আগে, বার্নিয়ের ভারতবর্ষ ভ্রমণ ক'রে গিয়ে তার অর্থনৈতিক অবস্থার এই বিশ্লেষণ করেছিলেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি আজও কেউ মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখেন, তাহলে বার্নিয়েরের এই বিশ্লেষণ থেকে তিনি যথেষ্ট মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পেতে পারেন। আধুনিক অর্থনীতির ছাত্ররা জানেন "Saving", "Spending", "Consumption" ও "National Income"-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি, এবং "Consumption curve" কাকে বলে। তিনশ' বছর আগে বার্নিয়ের এইসব বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তাৎপর্য না জেনেও বিশ্লেষণের মধ্যে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন।

(৩) সামাজিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে "ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের" একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানী সেকথা স্বীকার করবেন। বার্নিয়ের এইখানে চমৎকার ভাবে সেই ভূমিকার আভাস দিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-শক্তি দেখলে অবাক হ'তে হয়।

জায়গীরদার, জমিদারদের এই নিষ্ঠুরতা সংযত করার ক্ষমতা সম্রাটের পর্যন্ত নেই, একমাত্র রাজধানীর কাছাকাছি অঞ্চলে ছাড়া। সাধারণত: রাজধানী থেকে দূরে এক-একটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে এঁরা যথেচ্ছাচার করতে থাকেন এবং তার অধিকাংশই সম্রাটের কর্ণগোচর হয় না। সুতরাং যথেচ্ছারিতার সীমাও থাকে না। এই যথেচ্ছাচার মধ্যে মধ্যে এমন কদর্যভাবে সীমা ছাড়িয়ে যায় যে চাষী ও কারিগররা দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও সংস্থান করতে পারে না এবং না পারার জন্য অনাহারে, নিদারুণ কষ্টের মধ্যে নীরবে মৃত্যু বরণ করে। এই যথেচ্ছাচারিতার জন্য দরিদ্র চাষীদের বংশবৃদ্ধিও হয় না এবং হলেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের তারা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যায়। অনেক সময় তারা গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে চ'লে যায়, উদার ব্যবহারের প্রত্যাশায়, অথবা সেনাবাহিনীতেও যোগদান করে। চাষবাস সম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই চাষীদের, নেহাৎ বাধ্য হয়ে করতে হয় তাই করে। সাধারণ চাষীদের পক্ষে জলসেচনের জন্য খাল নালা ইত্যাদি খনন করা সম্ভব নয়, তাদের সামর্থ্যে কুলায় না। সুতরাং জলসেচন ব্যবস্থার অভাবের জন্য চাষবাসের প্রচণ্ড ক্ষতি হয় এবং যথেষ্ট আবাদী জমি পতিত থাকে। দেশের বসত-বাড়ীর অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়, সবই জরাজীর্ণ এবং নতুন ক'রে তৈরী করার সঙ্গতিও খুব অল্প লোকের আছে। মনে হয়, হিন্দুস্থানের চাষী ও সাধারণ লোকের মনে এই প্রশ্নই জাগে: "কেন আমি এক জন স্বেচ্ছাচারী জায়গীরদার বা জমিদারের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খাটব? খাটুনির সার্থকতা কি? যে-কোন দিন আমার সমস্ত সম্পত্তি ও অর্জিত ধন যদি খেয়ালখুশীর বশে স্বেচ্ছাচারী প্রভুর কবলিত হতে পারে, তাহ'লে মেহনতের মূল্য কি? জীবনের সামান্যতম নিরাপত্তা নেই যেখানে, সেখানে মেহনতের সার্থকতা নেই। সুতরাং যেভাবে হোক, জীবনের ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। ফসল ফলিয়ে, সম্পদ বাড়িয়ে লাভ কি?"

ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন রাজস্ব আদায়কারী জমিদারদের মনেও জাগে। তাঁরা ভাবেন: "দেশের অবস্থা, জমিজমা চাষবাসের অবস্থা কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তা ক'রে লাভ কি? তার জন্য আমাদের অর্থ ব্যয় করাও অর্থহীন। কেনই বা আমরা জমির উন্নতির জন্য, ফসল ও সম্পদবৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করব? যে-কোন দিন সম্রাটের মর্জি অনুযায়ী আমাদের সমস্ত অধিকার অপহৃত হতে পারে, আমরা সাধারণ প্রজা ব'লে গণ্য হতে পারি। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের সুকাজের সুফল যে আমাদের বংশধররা উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং ক্ষণিকের রাজা যখন আমরা, তখন প্রজাদের শোষণ ক'রে যতদূর সম্ভব অর্থ রোজগার করাই ভাল। তাতে যদি প্রজারা অনাহারে মরে বা ভিটেমাটি ছেড়ে চ'লে যায়, তাহ'লে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ আমরাই বা ক'দিন আছি প্রভুত্ব করতে? আজ আছি, কাল নেই। দেশের ভবিষ্যৎ, প্রজার কল্যাণ ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয় চিন্তা ক'রে আমাদের লাভ কি? যে ক'দিন পারা যায় আমরা লুটে নেব এবং যখন সব ছেড়ে চ'লে যাব তখন এমন ভয়াবহ রিক্ত অবস্থায় রেখে যাব জমিদারী যে ভবিষ্যতে সম্রাটের নিযুক্ত অন্য কোন জমিদার সেখান থেকে আর কিছু শোষণ করতে পারবেন না।"

এই কারণেই শুধু হিন্দুস্থানের নয়, এশিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ক্রমিক অবনতি হয়েছে। যে-দেশের গবর্ণমেণ্টের এই অবস্থা, সেখানে অবনতি ছাড়া উন্নতি হবে কি ক'রে? এই অবনতির চিহ্ন হিন্দুস্থানের সর্বত্র দেখা যায়। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ নগরের ঘরবাড়ীর অবস্থা খুব শোচনীয়, মাটির তৈরী ঘরবাড়ী এবং এইরকম পরিত্যক্ত নগরের অভাব নেই সেখানে। জীর্ণ ঘরবাড়ীর ভগ্নস্তূপে পরিণত নগরও অনেক আছে। যেগুলির অস্তিত্ব আজও আছে, তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'তে আর বেশী দেরী নেই।

হিন্দুস্থান অনেক দূরে। হিন্দুস্থানের কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যায় যে আরও কাছাকাছি অন্যান্য দেশের অবস্থাও প্রায় একরকম। সেই স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রীয় শক্তির ধ্বংসলীলার সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্বত্র বিরাজমান—মেসোপোতামিয়ায়, আনাতোলিয়ায়, ফিলিস্তিনে, সর্বত্র। একসময় এই সব দেশ ছিল সোনার দেশ, মাটীতে সোনা ফলত বললেও ভুল হয় না। দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল ফসলক্ষেত এই সব দেশের প্রাকৃতিক শোভাবর্ধন করত। এখন সেখানে মরুভূমির অবস্থা বিরাজ করছে, ক্ষেতের দিকে চাইলে কল্পনা করা যায় না যে এককালে সোনা ফলত এই সব দেশে। যেখানে আবাদ করলে সোনা ফলত সেখানে এখন জঙ্গলাজঙ্গল, কীটপতঙ্গের উপদ্রব হয়েছে এবং মানুষের বসবাসের অযোগ্য স্থান হয়ে উঠেছে। সোনার দেশ মিশরের ইতিহাসও ঐ একই করুণ মর্মান্তিক ইতিহাস, অর্থাৎ ধ্বংসের ও ক্রমিক অবনতির ইতিহাস। মিশরের দশভাগের একভাগ অঞ্চল বিগত আশী বছরের মধ্যে অনাবাদী পতিত জমিতে পরিণত হয়েছে, জলসেচনের প্রণালীগুলি সংস্কার করা হয়নি এবং করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষই মাথা ঘামাননি। নীল নদের নিয়ন্ত্রণের সমস্যা নিয়েও কেউ মাথা ঘামানোর প্রয়োজনবোধ করেননি। তার ফলে ভাঁটি অঞ্চল প্রতিবৎসর প্রবল বন্যায় ভেসে যায় এবং বালিতে ঢেকে যায়। এই বালির আবরণ পরিষ্কার করা রীতিমত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কে করবে?

এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কোন দেশের শিল্পকলার সুস্থ বিকাশ হ'তে পারে কি? পারে না। কোন শিল্পী শিল্পকলার উৎকর্ষের জন্য এই পরিবেশের মধ্যে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন না। চারিদিকে যেদেশে দারিদ্র্যের বীভৎসতা প্রকট হয়ে থাকে, এবং ধনীরা যেখানে সরলতার ভাণ ক'রে কৃপণতাকে জীবনের ধর্ম ব'লে গ্রহণ করেন, সুলভ মূল্যের দ্রব্যাদির জন্য যেখানে সকলে লালায়িত, সেখানে শিল্পকলার আসল উৎকৃষ্টতা বা সৌন্দর্য বিচার্য বস্তু নয়, তার কোন মূল্য নেই। যেদেশের ধনীরা ফকিরের জীবন যাপন করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে মনে করেন, না খেয়ে না প'রে কেবল মাটির তলায় টাকা পুতে রাখতে চান, খরচ করতে চান না এবং করতে জানেনও না, তাঁদের জীবন সম্বন্ধে কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে না। আর যাই হ'ন, তাঁরা কখন শিল্পকলার সমঝদার বা পৃষ্ঠপোষক হ'তে পারেন না। এই অবস্থায় শিল্পকলা বা শিল্পীর বিকাশ বা সমৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যেখানে শিল্পীদের তথাকথিত "অপরাধের" জন্য কথায় কথায় বেত্রাঘাত পর্যন্ত করতে সঙ্কোচ হয় না, সেখানে শিল্পীরা তো মানুষ বলেই গ্রাহ্য নয়। শিল্পীদের সেখানে কোন মর্যাদা নেই, কোন স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই। তাঁদের সৃষ্টির জন্য কোন ব্যক্তিগত সম্মানও তাঁদের দেওয়া হয় না। তাঁরাও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতন দাসত্বই করেন। যেখানে শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা নেই এবং তার কোন স্বীকৃতিও নেই, সেখানে শিল্পকলার উন্নতির জন্য শিল্পীরা কোন প্রেরণা পেতে পারেন না। শিল্পীদের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। অর্থ উপার্জনের কোন স্বাধীনতা শিল্পীর নেই। ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করার ব্যক্তিগত অধিকারও নেই। বংশপরম্পরায় শিল্পীদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই এইজন্য দায় হয়ে ওঠে। সামান্য অর্থও সঞ্চয় করার অধিকার তাঁদের নেই। একেবারে ঠিক ক্রীতদাসের মত অবস্থা। একটু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন না, কারণ পোশাক দেখে যদি আমীর ওমরাহ বা জায়গীরদার-জমিদারদের মনে সন্দেহ হয় যে তিনি বিত্তশালী, তাহ'লে তাঁর পরিত্রাণ নেই। আমার বিশ্বাস হিন্দুস্থান থেকে শিল্পকলার অস্তিত্ব বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহরা নিজেরা বেতনভুক শিল্পী নিয়োগ না করতেন, তাঁদের বংশধরদের শিল্পশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না করতেন, এবং সবার উপরে, পুরস্কার ও তিরস্কার বা চাবুকের ভয় না দেখাতেন। ধনিক বণিক ও ব্যবসায়ীশ্রেণীও শিল্পীদের নিজেদের কাজকর্মের জন্য নিয়োগ করেন এবং তার জন্য শিল্প ও শিল্পীর অস্তিত্ব কিছুটা বজায় থাকে। অনেক সময় তাঁরা বেশী বেতনও দেন। কোন মহানুভবতা বা উদারতার জন্য বেশী দেন না, সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থের জন্য, কাজের তাগিদে দিতে বাধ্য হন। চাবুকের ভয় দেখিয়ে ধনিক বণিকরাও কারিগর ও শিল্পীদের কাজ করাতে দ্বিধাবোধ করেন না। কারিগর ও শিল্পীর কোন উপায়েই ধনসঞ্চয় করার উপায় নেই। দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে, সামান্য মোটা কাপড়ে লজ্জানিবারণ ক'রে তাঁরা বেঁচে থাকেন এবং তাতেই তাঁরা খুশী। তাঁদের তৈরী কারুশিল্পাদির ব্যবসা ক'রে প্রচুর ধনসঞ্চয় করেন বণিকরা এবং বণিকদের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক যাঁরা তাঁদের সন্তুষ্ট করা, শিল্পীদের নয়।

এই যে সমাজের পরিচয় দিলাম, এর ভবিষ্যৎ কি? এরকম সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হতে পারে না। অশিক্ষাই এই সমাজব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম। হিন্দুস্থানে এই অবস্থার মধ্যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলেজ বা একাডেমী জাতীয় কিছু কি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর? আমার তো মনে হয়, সম্ভব নয়। কারণ প্রতিষ্ঠাতা কোথায় পাওয়া যাবে, কে প্রতিষ্ঠা করবে? প্রতিষ্ঠা করলেও বা বিদ্বান ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যাবে? সেরকম লোকই বা কোথায়, যাঁরা খরচ করবেন শিক্ষার জন্য? যদিও বা সেরকম লোক দু'চারজন থাকেন তাঁরা ভয়ে তা করবেন না, কারণ তাঁদের

অর্থসামর্থ্য যে আছে একথা তাঁরা প্রকাশ্যে প্রচার করতে চান না। আর যদি এত অসুবিধা সত্বেও শিক্ষা পায় কেউ, তাহ'লে সেই শিক্ষার উপযুক্ত মর্যাদাই বা দেবে কে? অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম, চাকরি-বাকরি এমন কিছু নেই যার জন্য বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা বা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার প্রয়োজন। সুতরাং তরুণরা শিক্ষার প্রেরণাই বা পাবে কোথা থেকে?

এই অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি সম্ভব নয়।(৪) কারণ বাণিজ্যের অধিকার যদি বাধাবন্ধহীন না হয়, তাহ'লে তার বিস্তারও হয় না। ইয়োরোপের মতন তাই হিন্দুস্থানের বাণিজ্যিক উন্নতি হয়নি। এমন লোক কে আছে, যে পরের স্বার্থের জন্য নিজে পরিশ্রম করবে, দুশ্চিন্তা করবে এবং বিপদ-আপদের সম্মুখীন হবে? প্রাদেশিক সুবাদার যদি বাণিজ্যের মুনাফার মোটা অংশ গ্রাস ক'রে ফেলেন, তাহ'লে বণিকদের বাণিজ্য করার দরকার কি? যে বণিক যত মুনাফাই করুন না কেন, তাঁকে বাইরে সেই দীনদরিদ্রের বেশেই থাকতে হবে, এবং দৈনন্দিন জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগও তিনি নিশ্চিন্তে করতে পারবেন না। কারণ তাহ'লেই তিনি তাঁর প্রতিবেশী জমিদার বা সুবাদারের ঈর্ষার পাত্র হবেন এবং তাঁর ধন-সম্পত্তি থেকে হয়ত বঞ্চিতও হবেন। সাধারণতঃ বণিকরা অবশ্য উচ্চপদস্থ ফৌজদার বা আমীরের আশ্রয়ে থেকে ব্যবসা করেন, তা নাহ'লে তাঁদের পক্ষে ব্যবসা করাই বিপজ্জনক। তাহ'লেও কিন্তু বণিকের কোন স্বাধীনতা বা সম্মান নেই হিন্দুস্থানে। বণিকরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয়দাতা প্রভুদের ক্রীতদাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁদের আশ্রয় ও পোষকতার জন্য তাঁরা বণিকদের কাছে যে কোন মূল্য দাবী করতে পারেন। সাধারণতঃ মূল্য হ'ল বাণিজ্যের মুনাফার অংশ এবং কোন চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট অংশ নয়, আশ্রয়দাতার খেয়ালখুশী মতন অংশ।

মোগল বাদশাহ তাঁর নিজের রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের জন্য কখন রাজবংশ ও বনেদী সম্ভ্রান্তবংশের লোক নির্বাচন করেন না। এমনকি সাধারণ ভদ্র নাগরিক, বণিক বা ব্যবসায়ী কেউ কোনদিন তাঁর নেকনজরে পড়ে না। শিক্ষিত লোক, সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন পরিবারের লোক, যাঁরা সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাজকর্তব্য পালন করতে পারেন, বিপদে-আপদে নিজেদের সামর্থ্য নিয়ে সম্রাটের পাশে দাঁড়াতে পারেন, দেশের প্রতি অনুরাগ যাঁদের বেশী, নিজেদের মানমর্যাদা সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন, তাঁরা কেউ সম্রাটের রাজকার্যের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমন্ত্রিত হন না। তার বদলে সম্রাট তাঁর চারিদিকে নিরক্ষর ও বর্বর ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালবাসেন। সমাজের জঘন্য আবর্জনাস্তূপে কুড়িয়ে নেওয়া একদল পরানুগ্রহজীবী মোসাহেব তাঁকে ঘিরে থাকে। তারা দেশপ্রেম বা রাজভক্তি কাকে বলে জানে না। তার ধারও ধারে না। সম্রাটের নেকনজরে থেকে তার মিথ্যা দম্ভের বড়াই করে শুধু, সৎসাহস সম্মান বা শালীনতার তোয়াক্কা করে না। দরবারের শোভা তারাই বর্ধন করে।

এইভাবে হিন্দুস্থান ক্রমে অবনতির চরম সীমায় পৌঁছেচে। বিশাল এক সেনাবাহিনী ও বিরাট এক রাজদরবারের কৃত্রিম জাঁকজমকের ব্যয়ভার বহন করতেই হিন্দুস্থান সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। সেনাবাহিনী প্রয়োজন, কারণ তারই জোরে হিন্দুস্থানের জনসাধারণকে পদানত ক'রে রাখতে হয়। সৈন্যসামন্ত নাহ'লে রাজার রাজত্ব হিন্দুস্থানে একদিনও চলে না। হিন্দুস্থানের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশারও যেন সীমা নেই মনে হয়। কেবল ডাণ্ডা আর চাবুকের জোরে তাদের ক্রীতদাস ক'রে রাখা হয়েছে। অমানুষিক খাটুনিও তারা খাটে এবং চাবুক মেরেই তাদের খাটানো হয়। নানাভাবে নির্মম নির্যাতন ক'রে জনসাধারণকে বিদ্রোহের প্রান্তে আনা হয়েছে হিন্দুস্থানে। গণবিদ্রোহ কেবল সামরিক শক্তির জোরে দাবিয়ে রাখা হয়েছে।

হতভাগ্য দেশ হিন্দুস্থান! হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্যের আরও একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, বড় যুদ্ধবিগ্রহের সময় বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট প্রচুর অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করেন। প্রাদেশিক সুবাদাররা ক্রয়মূল্যের এই টাকা কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নেন। উচ্চহারে সুদ দিয়ে টাকাটা তাঁরা কর্জ করেন। প্রদেশগুলি এইভাবে কেনা হোক বা না হোক, প্রত্যেক প্রদেশের সুবাদার, জায়গীরদার ও রাজস্বআদায়কারী জমিদারদের মূল্যবান জিনিসপত্র উপহার দিতে হয় প্রতিবৎসর উজীর, খোজা বা বেগমখানার কোন মহিলাকে—রাজদরবারে যাঁর প্রতিপত্তি আছে এবং বাদশাহের উপর যাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব আছে যথেষ্ট। ভেট না দিয়ে কোন কাজ হাসিল করার উপায় নেই। প্রাদেশিক সুবাদার সম্রাটের নিয়মিত কর পেস্কসাদিও আদায় ক'রে দেন। এইভাবে একজন অতি নিম্নস্তরের লোক, সাধারণতঃ গোলামশ্রেণীর লোক, ক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হয়ে দেশের মধ্যে হোমরাচোমরা ব্যক্তি ব'লে গণ্য হন।

এইভাবে হিন্দুস্থান প্রতিদিন ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির কোন চিহ্ন নেই কোথাও হিন্দুস্থানে। আলোর কোন আভাস নেই, চারিদিকে কারাগারের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ও গাঢ় অন্ধকার থম্ থম্ করছে মনে হয় হিন্দুস্থানে। প্রাদেশিক সুবাদাররা হঠাৎ-নবাব হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন এবং এই জাতীয় ক্ষুদে নবাবদের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও যথেচ্ছাচার করার ক্ষমতাও অপরিসীম। তাঁদের ঔদ্ধত্যের রশ্মি সংযত করবার মতন কেউ নেই। এই সীমাহীন অত্যাচার দিনের পর দিন মাথা হেঁট ক'রে হিন্দুস্থানের জনসাধারণ নীরবে সহ্য করে। প্রতিকারের কোন পন্থা নেই, ন্যায়বিচারের কোন আশা নেই। অভিযোগ ও আবেদন করার মতন কোন নিরপেক্ষ বিচারক নেই কোথাও। রক্ষকরাই সেখানে ভক্ষক।

---

(৪) প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে বৃটিশযুগের আগে পর্যন্ত ভারতীয় বণিকশ্রেণীর বিকাশের ইতিহাস নিয়ে আজও অর্থনীতি বা ইতিহাসের কোন ছাত্র গবেষণা করেননি। অথচ ভারতীয় বণিকশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। ভারতীয় বণিকরা দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করতেন এবং বাণিজ্যের দৌলতে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও কেন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হ'ল না, কেন এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের যুগের আবির্ভাব হ'ল না, কেন বণিকরা যুগে যুগে সমাজের উপেক্ষার পাত্রই হয়ে রইলেন, এ সব প্রশ্ন ইতিহাসের দিক দিয়ে জটিল প্রশ্ন। বার্নিয়ের এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এখানে এবং বিস্ময়কর বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

প্রথম—জীবনের প্রথম নীলাকান্তের উদ্দেশ্যে হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি বাড়িয়ে ধরল মিত্রা। বঞ্চিত করে করে, —নারীত্বে, সখ্যে, সৌহার্দ্যে, সর্ব দেওয়ায় বঞ্চিত করে তুমি আমার জীবনটাকে এমন ফাঁকির শূন্য ভাণ্ড করে ফেলেছিলে বলেই না ভ'রে উঠবার আগ্রহে আমার এই নিজেকে আবিষ্কার—অন্তরের ধূমায়মান অগ্নিকণিকার জ্বলে উঠবার তাগিদ। অপূর্ণতার দুঃখ-বেদনা যদি জীবনকে মহত্তর পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে—তবে আর আঘাত বেদনায় ক্ষোভ কিসের!···

এমনি একাগ্রমনা সাধনা-লীন মিত্রা, যখন প্রকৃতির দাবীর উপর প্রতিভার জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেবার আনন্দ-অধীরতায় বিশ্বসংসার ভুলতে বসেছে—তখনই কিনা হঠাৎ একদিন অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সে। ম্যানিনজাইটিস? ম্যালিগনেন্ট মেলেরিয়া? ওষুধে-ডাক্তারে গৃহস্থ-বাড়ীর বাতাস ভারী হয়ে উঠল হাসপাতালী গন্ধে। প্রাণ-সংশয়ে মনকষাকষি ভুলতে না পারলেও মুলতবী রাখতেই হয়। এল ওর ভাসুর, জা, শাশুড়ীরা। মামা-মামীদের সঙ্গে শুশ্রূষায় অংশ গ্রহণ করল এসে রাণী আর শমিত—দিন থেকে মধ্য রাত পর্য্যন্ত অক্লান্ত শ্রমে ব্যবস্থা-পত্রে লিখিত অষুধ যোগাড় করে আনে। অবসর সময় গাড়ীর গদিতে হেলে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টানে। বেশী বাড়াবাড়ি-জনিত উদ্বিগ্নতার ছাপ বাড়ীর চেহারায় ফুটে উঠতে দেখলে উপরে গিয়ে মিত্রার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। সুমিত্রা সেই যে মেয়ের কাছে এসে বসল—সবাই বুঝল, মেয়ে না উঠলে মার এ-বসাও শেষ বসা।

বিকারের ঘোরে মিত্রা কখনো চিৎকার করে, কখনো কাঁদে, কখনো চায় চুল ছিঁড়তে। তিন জন ডাক্তার পরস্পর পরামর্শ করেন—কি বলেন, কি লেখেন, বোঝে না কেউ। ছয়টি দিন কাটল নিরবচ্ছিন্ন জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায়। ইনজেকসনে ইনজেকসনে নীল হয়ে উঠল মিত্রার দু'হাতের কব্জির জোড়া আর বাহু। সাত দিনের দিন "মাথার ঘাম পায়ে ঝরানোর" প্রবাদবাক্য সত্যি করিয়ে যখন মিত্রা ঠোঁট নেড়ে অস্পষ্ট স্বরে জল চাইল, নিজে থেকে সে জল খেল এবং ডাক্তাররা বিপদকাল উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করলেন সেদিন, সাত দিন পর দমবন্ধ বাড়ীটা আবার প্রথম সহজ ভাবে নিশ্বাস টানল। নীলাকান্তের মৃত্যুর রাতে যাদের মনে হয়েছিল কোন কিছুতেই মানুষের হাত নেই—তারাই আবার ভাবল—মানুষ কি না করতে পারে?

এবার আর সুমিত্রাকে অনুরোধ করতে হলো না। ধীর পায়ে উঠে গিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকল। খানিক বাদে এক কাপ গরম দুধ দিতে এসে দেখা গেল গভীর ভাবে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজ সমস্ত দিন ধরে মিত্রাও শান্ত-ঘুমে শুধু ঘুমোচ্ছে। এ-ঘুমে যেন সামান্য ব্যাঘাত না হয়—ডাক্তারদের এই নির্দ্দেশ। এ ক'দিন মিত্রার শ্বশুরবাড়ীর সবাই যাওয়া-আসার ভেতর থাকলেও রাণী প্রথম দিন থেকেই এখানে। সৌমী আর রাণী মিত্রার পাশের ঘরে বসে মৃদু স্বরে কথা বলছিল। এমনি সময় রাস্তায় পরিচিত গাড়ী থামার শব্দ হলো।

—"শমিত বাবু এলেন বুঝি!" বলে সৌমী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ঘরে এসে ঢুকল শমিত। জিজ্ঞাসা করল—"রোগী আছে কেমন?"

—"ভালো আছে। তা আপনি এত রাত্রে?"

বসতে বসতে শমিত বললো—"মস্ত এক ঘুম দিয়ে এলাম। সেই মধ্যাহ্ন থেকে এই পর্য্যন্ত। এখন দিন দেখি সব ওষুধপত্র বুঝিয়ে। আর আপনারা চলে যান ঘুমোতে।"

সৌমী আপত্তি করে—"কেন আবার এই হাঙ্গামা করলেন? এ কয় দিন তো আপনার উপর দিয়েও কম যায়নি?"

রাণী বলে উঠল—"ওর ওপর দিয়ে গেছে? ও তো শুধু গাড়ী দৌড়েছে মাত্র! আর এ গাড়ী দৌড়োনটা আপনাদের শমিত বাবুর অতি প্রিয় কাজের ভেতর একটি। এ ছাড়া কোন কাজ ও করেনি। তার উপর চোখ-মুখ স্পষ্ট বলছে বেশ ভালো একটি ঘুম ঘুমিয়ে এসেছে। আজকের রাত জাগার পালাটা ওর ওপর দিয়েই যাক না, আপত্তি কি?"

—"বুঝিয়ে দিয়ে যাও ওষুধপত্র।" শমিত বলে।

সৌমী উঠে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল—যেখানে সবই গুছানো আছে। বললো—"জল খেতে চাইলে সঙ্গে এই পাউডারের গুঁড়োটুকু মিশিয়ে দাওয়া, একমাত্র ওষুধ। আর ক্ষিদে পেয়েছে বললে ফলের রসটুকু, ব্যস্! আর যা করতে হবে তা হলো দস্তুরমত সজাগ থেকে এক-এক বার রোগীকে দেখে আসা। আমরা দু'জনে সময় ভাগ করে নিয়েছিলাম, কোন অসুবিধে হত না।"

—"কোন অসুবিধে নেই বলেই তো আপনাদের বিশ্রাম করতে পাঠানো! ঝামেলা থাকলে কি আর আসতাম—না, এসেছি এ কয় দিন—কি বল?" এবার এ কথাটা শমিত রাণীকে সম্বোধন করে বললো।

রাণী উঠে দাঁড়িয়ে বললো—"কি বলব, এক হাত দূরে বসে তোমার কথা আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কি, কি কানে কান-মাথা এগিয়ে এনে কি বসে গল্প করা চলে? আজকের এই বিশ্রামটি দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি।"

সৌমী আর রাণী বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে—দেখিয়ে দিয়ে গেল ফ্লাস্ক-ভরা চা, এগিয়ে দিয়ে গেল হাতের কাছে বই।

—"বা, অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!" শমিত অর্ধশায়িত ভাবে কৌচের ওপর বসল—বই হাতে। কিন্তু ঐ হাতে নেওয়া পর্য্যন্ত।

নীরব নিথর রাত। প্রহর শেষের সঙ্কেত-ডাক ডাকছে মোরগ। এতগুলো দিনের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর হয়রাণির পর সবাই আজ স্বস্তি-ঘুমে মগ্ন। কিছু না ভেবে, না করে, চুপচাপ বসে থেকে সময় পার করে দিতে লাগল শমিত। শুধু মাঝে মাঝে পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে আসে—মিত্রাকে।

একটা শব্দ কানে আসতে আবার উঠে গেল শমিত। এবার গিয়ে ঢুকল ঘরে। কাছে এসে লক্ষ্য করে দেখল জেগেছে কিনা। না, তেমনি ঘুমুচ্ছে সে।

ঘরের সামান্য পাওয়ারের টেবিল-আলোটার শেডে রঙ্গিন কাপড় চাপা দিয়ে আলোটাকে আরো স্নিগ্ধ করা হয়েছে। মাথার উপর পাখাটা ঘুরে চলেছে খট্ খট্ খট্। শব্দ তো নয়, যেন একটানা একটা সুর। মিত্রার বাঁ হাতখানা বুকের উপর। ডান হাতটা ঝুলে পড়েছে খাটের বাইরে। তেলহীন রুক্ষ চুলে, রক্তশূন্য ঠোঁটে, রোগ-পাণ্ডুর নরম গালে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ঘুম-জড়ানো সবজে আলো। আজ বোধ হয় বিছানার চাদর, ওঁড় দেওয়া হয়েছে পালটে। অষুধের গন্ধে হয়ত মিত্রা বিতৃষ্ণায় নাক কুঁচকে থাকবে, তাই ঢেলে দেওয়া হয়েছে দামী সেন্ট। স্প্রিংএর গা-তলিয়ে-যাওয়া খাটে, ঐ ধবধবে বিছানায়—ঘর-ভরা সেন্টের সুমিষ্ট সৌগন্ধের নেশার আমেজের ভিতর ডুবে নিদ্রালস মিত্রা।···দাঁড়িয়ে রইল শমিত। খানিক বাদে পাশের নিচু চেয়ারটায় বসে মিত্রার হাতটা তুলে নিল বিছানায় তুলে রাখবার জন্য। রাখলও। কিন্তু ও হাত সরিয়ে নেবার আগেই মিত্রা 'মা' বলে পাশ ফিরে কাত হলো ওর দিকে। কেঁপে উঠল শমিত—মিত্রার বুকের নীচে সম্পূর্ণ হাতখানা চাপা পড়ে গেছে ওর। ঘড়িটার টিক্-টিক্ শব্দের সমতালে ওঠা-নামা করতে লাগল শমিতের বুকের ভেতরটা। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল—"কিছু অস্বস্তি হচ্ছে মিত্রা?"

'মা' ডেকেছিল ঘুমের ঘোরে। কিন্তু শমিতের প্রশ্নে জেগে উঠে তাকাল ওর দিকে। যেন বুঝে উঠতে পারছে না এমনি ভাবে ভ্রূ বাঁকিয়ে স্মরণে আনতে চাইল কিছু।

শমিত বললো—"বোঝবার কিছু নেই। রাণীদের বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে, আজকের রাত তোমার কাছে রয়েছি আমি।

—"ও।"

—"কি অস্বস্তি হচ্ছে বললে না? জল দেব?"

জবাব দিল না মিত্রা, এক লক্ষ্যে তাকিয়ে রইল শমিতের মুখের পানে।

—"এ ভাবে তাকিয়ে আছ যে?" একটু হাসবার চেষ্টা করল শমিত।

কিন্তু কেন যে ওর দিকে এমন স্থির দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রয়েছে সে—তা কি মিত্রাই বলতে পারে? না, বলতে পারার মতো ভেবে-চিন্তে সে তাকিয়ে আছে।

না, আর পারে না—রোগক্লান্ত দুটি চোখের তারা মেলে মিত্রা যদি ওর দিকে এ ভাবে চেয়ে থাকে, তবে সে আর পারে না।—"অমন করে চেয়ে কি দেখছ বল না?" দু' হাত দিয়ে মিত্রার মুখটা সোজা করে ধরল শমিত।

আর অমনি আপনা থেকেই যেন বিবশ বোজায় মুদে এলো ওর চোখের পাতা দুটি।

অধীর আবেগে মিত্রার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে, অর্ধস্ফুট ভাঙ্গা-গলায় বলে উঠল শমিত—"ভয় করে মিত্রা। এ হয়ত তোমার অসুস্থ মুহূর্তের সাময়িক দুর্বলতা। কাল যদি ক্ষমা করতে না পার।···"

পলকের জন্য মাত্র আবার চোখ খুলে মিত্রা শমিতের চোখে চোখ রাখল।—তার পরের ঘটনা বহু চেষ্টায় সেও-আর কোন দিন স্মরণে আনতে পারেনি।

অল্পক্ষণ পরেই মিত্রাকে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়তে দেখে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালো শমিত। ওর ঘামে-ভেজা চুলগুলো দিল অতি নরম হাতে কানের পাশে সরিয়ে, দিল মাথার বালিশটা ঠিক করে। তার পর নিঃশব্দ পায় গিয়ে দাঁড়ালো বাইরের বারান্দায়। চললো একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে।—এ কি অসম্ভব পাওয়া এই মাত্র ও পেয়ে এলো। এ কি অবিশ্বাস্য জয় এই মাত্র ও করে এলো।···দূরের আকাশে রাতের অন্ধকার পাতলা করে চাঁদ উঠল। তাল গাছের পাতাগুলো শির-শির করে কেঁপে চললো, ঠিক যেন ওর শরীরের রক্তবাহিকা ধমনীর কম্পনের মতো। চুলের ফাঁকে জমে-ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিল তার স্পর্শ বুলিয়ে—ঘরে-বাইরে, সব কিছু এমন রমণীয় মোহময় করে আজ ওর জন্য কে সাজিয়ে রেখেছে? এমন কত রাত ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশ-বাতাস দেখেছে—কই, এমন করে তো কোন দিন ওর মনের সপ্ত সুর ধ্বনি তোলেনি।

পরের দিন ভোর বেলা বাড়ী যাবার সময় নিতান্ত জানা পথেও, কোথা দিয়ে যে কি ভাবে একেবারে উল্টো পথে গাড়ী চালিয়ে চলেছে, প্রথমে বুঝতেই পারল না শমিত। যখন সে খেয়াল হলো তখনও চমকে উঠল না বা চেষ্টা করল না ভুল শোধরাবার। ভোরের বাতাসে ঘুরল বহুক্ষণ। বাড়ী ফিরল দস্তুর মতো বেলা হয়ে গেলে। সোজা নিজের ঘরে চলে যাবার মুখে একবার থমকে দাঁড়ালো মিত্রার বন্ধ ঘরটার কাছে! তাকালো অপরিসীম মমতা-ভরা দৃষ্টিতে। তার পর গিয়ে ঢুকলো ওর তেতলার ঘরে। মিত্রার খবরটা যে একবার বাড়ীতে বলে যাওয়া উচিত সে খেয়ালটাও হলো না। কোন্ কথাটাই বা শমিতের খেয়াল আছে! মনে আছে কি, কালকের সৌমীর দেওয়া গ্লাসের চা তেমনি রয়ে গেছে, আজও সে সকাল থেকে চা খায়নি?

জয়ন্তী এসে ঢুকল ঘরে—"মিত্রা ভালো আছে তো?"

বিছানার উপর হাত-পা টান করে শুয়ে পড়েছিল শমিত। জয়ন্তীর কথায় এমন ভাবে চমকে উঠল সে, যেন জয়ন্তীর গলার স্বরটা ওর মাথার স্নায়ুতে গিয়ে হাতুড়ির ঘা মেরেছে। হেসে উঠে বসে বললো—"হ্যাঁ, ভালো আছে।"

—"খবরটা একবার বলে আসতে হয়। তোমার সাড়া পেয়েই তো মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

—"আমার কাছে তোমরা এত আশা কর?" পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললো শমিত।

—"আশা কেন, কল্পনাও করতে পারি না এমন কত কি ঘটছে, যার তুলনায় এ আশা তো তুচ্ছ।"

—"যথা ?"

—"সব। রাত দুপুরে দোকান খুলে অষুধ যোগাড় করা—টাকা বেশী দিয়ে ভালো অষুধ তৈরী করানো,—এমন রাত-জাগা সেবা—"

—"'ইত্যাদি'। বাকী বক্তব্য ?"

হেসে উঠল জয়ন্তী—"বাকী বক্তব্য আর কিছু নেই। যা দেখছি, তাই বললাম। একটা কথাও কি বানানো ?"

—"না, বানানো তো নয়ই, কিছু বরং বাদই পড়ে গেছে। তা যাই হোক—মিত্রার জন্য এতটা ব্যস্ত হওয়া তবে তোমার পছন্দ হয়নি বল ?"

মুখ বাঁকালো জয়ন্তী—"আমার কেন পছন্দ হতে যাবে না। তুমি কর আর নাই কর, তাতে আমার কি।"

—"তবে ? ওর জন্য যতটা ব্যস্ত হয়েছি, তোমাদের জন্য সে রকম হই না কেন ?"

চটে উঠল জয়ন্তী—"বয়েই গেছে। কেন, আমাদের কি খোঁজ করবার লোকের অভাব হয়েছে যে, তোমার কাছে হাত পাতব।"

—"লোক আছে, তাই চাইবে না ? মিত্রার তো লোক নেই। তবে আর আপত্তি কি ?"

—"আমি কি তোমার কাছে 'ভীষণ প্রতিবাদ' নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি বলে একবারও বলেছি ?"

—"না, তা বলনি।" মাথা নাড়ল শমিত।—"তবে শুধু ভেতরের ব্যাপারটা আঁচ করতে চাইছ ? বেশ বোসো বলছি। গম্ভীর ভাবে বলে চললো শমিত—"মিত্রাকে আমি ভালোবাসি। এমন ভালোবাসা সাজাহান বেসেছিল মমতাজকে। সেলিম নুরজাহানকে। নেপোলিয়ান যোশেফাইনকে—খুবই দুঃখিত, ঐতিহাসিক ভালোবাসার হিন্দু নাম মূর্খের স্মরণে এলো না। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরগণ একবাক্যে বলবে শমিত ভালবেসেছিল মিত্রাকে। এ নিয়ে এমন কাব্য রচনা করতে চাই, যে গাথা নারীর জন্য রচিত হলেও এমনটি আর কেউ লিখতে পারেন নি—স্বয়ং বিশ্বকবিও নয়।" হেসে উঠল শমিত।

—"বাবা, কি কথায়, কি কথা এনে মাথা ঘুরিয়ে তোল। যে বলতে আসে, সেও ভুলে যায় কি কথা বলতে সে এসেছিল।"

—"ভুলে গেছ তো ? বাঁচা গেছে। অপরের কি ভালো লাগল না লাগল তা নিয়ে নিজের মন খারাপ হতে দিয়ে, মূল্যবান সময় অপব্যয় করতে নেই। তোমার কি ভালো লাগে বল—করছি।"

—"আমার ভালো লাগা আবার তুমি কি করবে !"

এমন একটা মরা কথার সাজানো দেহ টেনে বের করল কেন জয়ন্তী গলা থেকে !

জ্বলে উঠল শমিতের চোখ। এই মুহূর্তে জয়ন্তীর দর্প ও গুঁড়িয়ে দিতে পারে। না থাক, এমন মেয়ে ও বহু দেখেছে জীবনে। বললো—"তবে আমার ভালো লাগা তুমি কর।"

—"কি ?" জয়ন্তীর কণ্ঠ দিয়ে যেন কথা বেরুতে চায় না।

—"এক কাপ চা পাঠিয়ে দেও যদি।"

সামান্য সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জয়ন্তী নেমে গেল নীচে।

পরের দিন রাণী এলো মিত্রার আরো সুস্থ হয়ে ওঠার খবর নিয়ে। তার আর থাকবার প্রয়োজন নেই। বিকেলের দিকে প্রতিদিন স্বর্ণময়ী নিজেই যান মিত্রাকে দেখতে। শমিত চুপচাপ ঘরে বসে রইল দু'দিন। তার পরও যে কয় দিন গেল—দশ জনের সঙ্গে ছাড়া একটি মুহূর্তের জন্যও মিত্রাকে একা পেলো না সে। ঘরে ঢোকার সময় একবার চোখ তুলে তাকায় মিত্রা, চলে আসবার সময়ও ঠিক তাই—অস্থির হয়ে উঠল শমিত।

দিন আট-দশেক বাদে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে একা পেয়ে গেল শমিত মিত্রাকে। দুপুরের দিকে একটা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে বাড়ী ফিরবার মুখে হঠাৎ খেয়াল হলো, একবার একটু মিত্রাকে দেখে যাওয়া যাক। মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল—হয়ত এ সময় ওকে একটু নির্জনে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। বেলা তখন প্রায় দুটো বাজে। না স্নান, না খাওয়া, এসে উপস্থিত হলো এ-বাড়ীতে।

সৌমী বই পড়ে শোনাচ্ছিল মিত্রাকে। চাকর এসে খবর দিল শমিত বাবু এসেছেন।

উঠে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালো সৌমী—"আসুন শমিত বাবু।" সে এসে ঘরে ঢুকলে বললো—"রোগীকে ভালো হয়ে উঠতে দেখে যেন উৎসাহ কমে গেল আপনার ? তিন-চার দিন ধরে একেবারেই দেখা নেই। বসুন আজ আপনি। সকাল-সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে মেয়ে তৈরী হয়ে থাকেন দুপুরটি জাগবার জন্য। আর ভোগান্তি আমার—বই পড়, গান কর—কত কি। আজ আপনি।"

একেই তো বলে হাতে স্বর্গ পাওয়া !

হঠাৎ শমিতের দিকে তাকিয়ে সৌমী বললো—"স্নান খাওয়া হয়েছে তো ? চেহারা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না ?"

হাত দিয়ে চুলগুলো পাট করতে করতে শমিত বললো—"সব হয়েছে। তবে কিছুটা সকালের দিকে। একটা কাজের ঘোরাঘুরিতে বেরিয়েছিলাম। যদি শুধু এক কাপ চা—সম্ভব কি ?"

—"নইলে ইলেকট্রিক ষ্টোভটা আছে কোন্ প্রয়োজনে ?"

সৌমী চলে গেলে শমিত মিত্রার খাটের পাশের নিচু মোড়াটায় বসে জিজ্ঞাসা করল—"শরীর ভালো ?"

চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে রেখেছিল মিত্রা, তেমনি ভাবেই জবাব দিল—"ভালো।"

—"কি বই পড়া হচ্ছিল ?" সৌমীর রেখে-যাওয়া বইটা হাতে তুলে নিল সে। সৌমী চা দিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত এর চাইতে বেশী অগ্রসর হওয়া যাবে না। অবশ্য চা চেয়ে সময় নষ্ট ! কিন্তু ক্ষিদেটা ও অবহেলা ভরে সইতে পারে একমাত্র কাপের পর কাপ চা পেলে তবেই।

[ক্রমশঃ]

একবিংশ অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজের মৈত্রী

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

১৮৯৮এর ডিসেম্বরে উত্তর-ভারত থেকে ফিরে এসে মিস্ ম্যাক্‌লয়েড আর মিসেস্ বুল ক'লকাতায় ছিলেন কিছু দিন। আমেরিকান কন্‌সালের অতিথি হলেন তাঁরা। কন্‌সাল-পত্নী কথা দিয়েছিলেন স্থানীয় ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দেবেন।

মোটে কয়েক দিন ছিলেন, কিন্তু তাতেই কাজ হল যথেষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দের অনেক এদেশী বন্ধুর সঙ্গে সেবার তাঁদের পরিচয় হল। তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষ এক জন। তাঁর মারফত আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও এঁদের বন্ধুত্ব হল। তিনি তখন শিলাইদহ থেকে একরাশ কবিতা লিখে ফিরে এসেছেন, সে-সব কবিতা বাংলার গর্বের ধন।

নানা ব্যস্ততার মধ্যেও মিস্ ম্যাক্‌লয়েড তাঁর সঙ্কল্প ভোলেননি। বিবেকানন্দের কাজে তিনি সাহায্য করবেন। আত্ম-পরিবারের সামাজিক প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে নানারকম সুবিধা আদায় করে দিলেন। বেলুড় মঠ স্বয়ং আবেদন করলে সে-সব কখনই পেত না। এমন কি কতকগুলি জমিজমার স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধাও মিস্ ম্যাক্‌লয়েড আদায় করলেন। তার ফলে সেচ আর স্বাস্থ্য-উন্নয়ন সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে কতকগুলো কল্পনা ছিল, সেগুলো কাযে পরিণত করা চলবে।

মিস্ ম্যাক্‌লয়েডের ধারণা, নিবেদিতা এখন অধ্যাত্ম-জীবনের প্রথম ধাপে আছেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু যে কী কৃচ্ছ্রসাধন করছেন তা স্বপ্ন কল্পনাও করতে পারেননি। কতখানি যে অবাক হয়েছেন স্বামীজির কাছেও তা প্রায় প্রকাশ করে ফেললেন, তিরস্কারের সুরে বললেন, 'নিবেদিতার এ কী করেছেন?' তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ওর জন্য ভেবো না। ও এখন সব-কিছুর উর্ধ্বে, ভারতবর্ষের কাছে ও নিবেদিতা। দোহাই তোমাদের, ওকে মাটি ক'রো না। অন্য সবাইর চাইতে ওর পিছনে অনেক বেশী সময় দিতে হয়েছে আমাকে…'

সে-কাজের তাড়ায় নিবেদিতার নির্জন তপস্যা ঘুচে গেছে, যার পিছনে তাঁর সমস্তটা দিন মাটি হচ্ছে, সে-কাজের স্বরূপটা বোঝবার জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত নাই। তিনি খুঁটিনাটি সব জানতে চান। স্কুলের কাজ সারা হলে নিবেদিতা লিখতে বসেন। লণ্ডনে রকমারি সংবাদপত্রে তিনি লিখতেন, এখানেও কাজ খুঁজে পেয়েছেন। প্লেগ মহামারী নিয়ে নিবেদিতা প্রবন্ধ আর রিপোর্ট লিখছিলেন, সেই সূত্রে প্রধান-প্রধান ভারতীয় সংবাদপত্রে তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছিল। তার পর থেকে পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলেছেন। অনেক ইংরেজী পত্রিকাও তাঁর লেখা নিত। ক'লকাতার 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে' ম্যাক্‌মুলারের শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী নিয়ে নিবেদিতা বিস্তৃত সমালোচনা লিখেছিলেন, প্রথম ওতেই তাঁর খুব নাম হল। প্রবন্ধটি পুরো দু' কলম, পশ্চিমের বেদান্ত-ভাবনার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ছিল ওতে। যিনি প্রচার করেছিলেন 'যত মত তত পথ' সেই অদ্ভুতচরিত্র মহামানবকে ঐ বইখানিতেই ইউরোপ সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিল। তখনকার 'এক্সপ্রেস' পত্রিকায় রঙ্গচিত্র বের করা হত। তারা নিবেদিতার কাছে কলকাতার 'দিশী অঞ্চলের' সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ চেয়ে বসল। ক্ষণেকের জন্য যে সব টুকরো ছবি চোখের সামনে দেখে নিবেদিতা এত আনন্দ পেয়েছেন, ভারতেও পারেননি ভাব বর্ণনা লোকের এত হৃদয়গ্রাহী হবে।

এই সব প্রবন্ধে ভারতবর্ষের অনাদি ছন্দ ধ্বনিত হত। কর্মগতি আর অনুভবের সকল ধারাই এক মৃত্যুতরণ মহাত্রিবেণীতে যুক্ত এখানে, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্" এই এদেশের মন্ত্র। সুপ্রাচীন অনুশাসনে জীবন গড়ে ওঠে, প্রত্যহের যত খুঁটিনাটি—খাওয়া, পরা, স্নান, আর প্রসাধন, সব-কিছুকে জড়িয়ে রয়েছে ধর্মচর্যার পুণ্য গরিমা, জীবনটাই একটা অখণ্ড সাধনা। নিবেদিতার কাহিনীগুলিতে গ্রাম্য জীবনের অন্দরের খবর থাকা—থাকত ভিস্তীওয়ালা, কুষ্ঠরোগী, ভিখারী আর মাঠের চাষার কথা। এদেশের পশুমুখ দেবতা পুরুভুজ দেবী, এক মন্দিরের থেকে অন্য মন্দিরে ঠাকুরের শোভাযাত্রা—সব-কিছু নিপুণ তুলিতে আঁকতেন নিবেদিতা; হিন্দু পরিবারের যে একত্র-বোধ সহজে বাইরের লোকের চোখে পড়ে না, পর্দা সরিয়ে তাকেই যেন প্রকট করে তুলতেন।

রক্ষণশীল হিন্দু মহলে এই সব প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দরুণ একটা প্রীতির ভাব সৃষ্টি হল, কিন্তু সেই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত বিরোধিতাও দেখা দিল। ইংরেজরা তাঁর ছবির মত বর্ণনাগুলি পড়ে আনন্দ পেতেন, কারণ নিবেদিতা যার কথা বলছেন সে-ভারতবর্ষকে তারা চেনে না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে মুখপাত্র করে প্রগতিপন্থী যে হিন্দুগোষ্ঠী, তাঁরা প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন।

শিগ্‌গিরই বন্ধুরা এ বিষয়ে নিবেদিতাকে অবহিত করলেন। প্রগতিবাদিনী যে-সব মহিলা সমাজ-সংগঠনের কাজে নেমেছেন তাঁদের কাছ থেকেও চিঠি এল। এক জন লিখলেন, 'আপনার লেখাগুলোতে ব্রাউনিঙের রস মেলে, ভাবালুতার ছড়াছড়ি যথেষ্ট, কিন্তু যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের বুলি আপনি কপচাচ্ছেন ওর থেকে জন্মেছে মেরুদণ্ডহীনতা আর কাপুরুষতা—তাতেই তো আমাদের এই হাল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার মূলে যে অন্ধবিশ্বাস, এ-সবের উৎপত্তি হচ্ছে তারই থেকে…'

এই তীব্র আক্রমণের পর নিবেদিতা তাঁর মনের ভাব সবাইকে বুঝিয়ে বলতে চাইলেন। মিস্ ম্যাক্‌লয়েড খুব তাড়াতাড়ি তার

একটা সুযোগ ঘটিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যে বন্ধুগোষ্ঠী, তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তিনি একটা সম্বর্ধনা-সভার ব্যবস্থা করলেন। নিবেদিতা সবার মনেই একটা আলোড়ন তুললেন। যখন তিনি চলে যাচ্ছেন মৃদু গুঞ্জনে সবাই বলাবলি করছেন, 'মিস্ নোবেলের জীবন কী অদ্ভুত! শেষ পর্য্যন্ত গেরুয়া ধরবেন না কি?' নিবেদিতা জানতেন তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কিত কাজে সকলের আগ্রহ দিন দিন বেড়ে উঠছে, যদিও সে-কাজ এখনও ভাল করে আরম্ভই হয়নি; কারণ আর কিছুই নয়, শুধু পরিকল্পনাতেই মানুষের চমক লাগে। সরলা ঘোষাল ঠাকুরবাড়ির এক মহিলা, এর মধ্যে অনেকবার বাগবাজারে এসেছেন। নতুন বিদ্যালয়ের বিধি-বিধানগুলো হাতে-কলমে কি ভাবে খাটানো হচ্ছে তাই দেখতে আসতেন। ফিরে গিয়ে শত-মুখে নিবেদিতার প্রশংসা করতেন। শুনে ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা স্ত্রী এডুকেশন সম্বন্ধে নিবেদিতার মতামতগুলো শোনবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। এই করে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁদের একটা সন্ধি হয়ে গেল, কোনও দশ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কেউ কিছু বলতে এলে প্রথমেই যে-বিরুদ্ধতাটা জাগবার কথা, এ ক্ষেত্রে তা আর জাগল না।

কিন্তু তর্কাতর্কিকে নিবেদিতা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানেরা যে-অদ্বয় তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, ব্রাহ্মসমাজীরাও কি তাই করেন না? তাঁরাও তো হিন্দুধর্মকে সংস্কৃত করতে চান, বিধি-নিষেধের সমস্ত গণ্ডী ভেঙ্গে অদ্বয় ব্রাহ্ম-সমাধির পথে উত্তরায়ণের যাত্রী হতে চান! বিগত শতকে রামমোহন যে সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা বলে গেছেন সে ধর্ম হিন্দু মুশলিম খৃষ্টান সকলকে এক বন্ধনে বাঁধতে চায়, তার এক মন্ত্র—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তাঁর এই শিক্ষায় পশ্চিমের যুক্তি-বুদ্ধি শুদ্ধ বেদান্তের সঙ্গে মিলে ধর্মজগতে একটা দ্রুত বিবর্তনের আশ্বাস এনে দিয়েছিল, সামাজিক গুণীজ্ঞানীরা তাতে খুবই উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। এদেশের জনসাধারণ স্থূল পূজার্চনা নিয়ে দিন কাটায়, তাদের আধ্যাত্মিক প্রগতি মন্থর। তার তুলনায় ব্রাহ্ম-সমাজের শুদ্ধচিত্তের উপাসনাকে বলা চলে অধ্যাত্ম-সাধনার শেষ কথা।

কিন্তু নিবেদিতা গুরুর দিকেই রইলেন। স্বামীজি বলতেন, 'একটা জাতিকে বুঝতে হলে তার সব-কিছু গ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষ পৌত্তলিক। সে যা তাই থাক, আমাদের কাজ শুধু তাকে সাহায্য করা।' গুরুর যুক্তিকে শিষ্যা সমর্থন করতেন। এই যে কিম্ভূত কিমাকার বংসেরের নাদাপেটা মূর্তিগুলিকে পূজা করছে জনতা, দেবতার সান্নিধ্য লাভের জন্য কী মর্ম্মন্তুদ ওদের আকুতি! তাই দেখে নিবেদিতার মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠত। তিনিও ঐ দেবতার পায় মাথা নোয়াতেন তাদের সঙ্গে। 'হে দেবতা, তুমি দুজ্ঞের্য়। তোমার যতটুকু বুঝেছি, যা পেয়েছি হাতের মুঠোয়, তারই অর্চনা করি, অপূর্ণ মানুষ হবে বেশী আর কী করতে পারি?' বটগাছ শিকড় দিয়েই প্রথমে রস টানে, তার পর ডাল থেকে ঝুরি নামায়। মানুষও প্রথমে তার মর্ত্যবাসনাকেই বড় আসন দেয়, আত্মার অভীপ্সা পূরণের কথা ভাবে না। শাস্ত্র-পণ্ডিতের কী এমন অধিকার আছে যে তিনি ধর্ম আর নীতির অনুশাসন কপচিয়ে আপামর সাধারণের 'পরে কালাপাহাড়ি করবেন, তার মনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেবেন? প্রত্যেকেই সারা জীবনের চেষ্টায় সাধ্যমত অধ্যাত্ম-উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, ক্রমে সে শুদ্ধ হতে শুদ্ধতর ভাবের সন্ধান পায়। ব্রাহ্মণ আর পারিয়া একই পথ ধরে লক্ষ্যের দিকে চলেছে। নিবেদিতা বলতেন, 'এ-পর্যন্ত এমন কিছু তো চোখে পড়ল না, যাকে নিছক জড়োপাসনার কোঠায় ফেলতে পারি। অথচ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুরা বলেন, ভারতবর্ষ নাকি পৌত্তলিক।'

প্রোটেষ্টান্টের ঘরে নিবেদিতা বড় হয়েছেন। যে-ধর্ম বহিরাড়ম্বর বর্জন করে চলতে চায় তাকে সমর্থন করবার মত যুক্তি-তর্ক তাঁর খুবই রপ্ত আছে! তা ছাড়া স্বভাবতঃ তিনি বিচারশীল, মন তাঁর অনুসন্ধিৎসু। সুতরাং কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে যুক্তিবাদী মার্গারেট নোবল্ প্রতীকোপাসিকা নিবেদিতা হল কি করে, তার উত্তরও নিবেদিতার মুখে জোগানো আছে। রূপান্তরের মূলে আর কিছু নয়, শুধু সঙ্কীর্ণ সত্য হতে উদারতর সত্যের পথে চিত্তের অগ্রাভিযান। এ ধরণের যুক্তিতে বিদগ্ধ সমাজে নিবেদিতার সমাদর বাড়ে। স্বামীজি আর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নতুন করে সেতুবন্ধন করলেন নিবেদিতা। সত্যি বলতে কি, পরমহংসদেবের শিষ্য হবার আগে তরুণ বয়সে বিবেকানন্দ যে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন, তা কেউ ভুলতে পারেননি। এই থেকেই নিরাকার উপাসনায় হাতেখড়ি হয় তাঁর। এমন কি ব্রাহ্মরা মনে করতেন, বিবেকানন্দের বাণীতে যে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের সুর তার মূলে রয়েছে তাঁদেরই মতবাদের প্রভাব।

আমেরিকান বান্ধবী দুটি ক'লকাতা ছেড়ে যাবার আগেই নিবেদিতা ঠাকুরবাড়ির এক জন মান্য অতিথি হয়ে উঠলেন। তিনি গেলেই ধর্মবিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেম আর সৌন্দর্যের জগৎ খুলে যায় চোখের সামনে। অপরূপ সুরেলা কণ্ঠে কিছু আবৃত্তি করেন তিনি, অপার মাধুরীতে মন ভরে ওঠে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর আনন্দে কেটে যায়। কখনও বা রবীন্দ্রনাথ বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে আসেন। নিবেদিতা তাঁর নিঃসজ্জ বৈঠকখানায় কবিকে সমাদর করে বসান। অল্পক্ষণ পরে আলোর গানে আর আনন্দের হাওয়ায় সে-ঘর যেন প্রাসাদের মত গমগমে হয়ে ওঠে।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও রবি ঠাকুরের কাছে নিবেদিতার চরিত্র জটিল বলে মনে হত। অনেক আপাত-বিরোধ তাঁর স্বভাবে। নিবেদিতার কল্পনার ঔদার্যে কবি স্তম্ভিত হয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁর স্বভাবের রোখ আর অতিমাত্রায় উৎসাহের বহর তাঁর ভাল লাগত না। নিবেদিতা জানতেন না, অজানতে কবিমানসে একটা উপন্যাসের নায়কের ছায়া ফেলছিলেন তিনি। রবিবাবুর মনে দানা বাঁধছিল তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি গোরার চরিত্র। গোরা সঙ্কল্পে কঠিন, অথচ সে নম্রস্বভাব হিন্দু; সব কাজে নেতৃত্ব করা তার পক্ষে সহজ। অত্যন্ত গোঁড়া সে, অথচ মুক্তির উপাসক, স্বাধীনতার পূজারী। শেষ পর্যন্ত গোরা জানতে পারল, আসলে সে আইরিশ সৈনিকের ছেলে! এ-চরিত্রের পরিণাম হবে কি? রবি ঠাকুর নিজেও তা জানতেন না। শুধু জানেন একটি পুরুষের চরিত্র আঁকবেন—নিবেদিতার মতই কথা বলতে-বলতে যার চোখে আগুন ঝলসে ওঠে, যার ব্যক্তিত্বে আছে একটা দুরন্ত প্রবেগ। গোরাকে কবি বলেছেন 'রজত-গিরি'; কথাটায় নিবেদিতার গৌরবর্ণের আভাস আছে। আর গোরাকে আইরিশ তো করবেনই! বাকীটার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন, পূর্ণ মহিমা আর অদম্য তেজ নিয়ে কেমন করে নিবেদিতা দিনে-দিনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন সেইটি বইয়ের পাতায় জীবন্ত করে তোলাই কবির কাজ। ১১২৪৫

নিবেদিতার দেহত্যাগের তের বৎসর পরে উপন্যাসটি বের হয়। নিবেদিতার জীবনের নানা ঘটনায় বইখানি ভরা। বইয়ের কাহিনীটা তিনি জানতেন, এ নিয়ে কবি আর নিবেদিতা কত দিন আলোচনা করেছেন।

একদিন দুজনের মধ্যে তুমুল বিবাদ বাধবার উপক্রম হয়েছিল। রবি ঠাকুর তাঁর ছোট মেয়েকে ইংরেজী শেখাবার জন্য নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, 'সে কি! ঠাকুরবংশের মেয়েকে একটি বিলাতী খুকী বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে?' রাগে দুই চোখ জ্বলে ওঠে নিবেদিতার। 'ঠাকুরবাড়ীর ছেলে হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই প্রভাবিত হয়েছেন যে নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান?'

অধ্যাত্ম-জীবনে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিবেদিতা নির্জিত করেছেন, অথচ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ এবং অভ্রান্ত বিচারবুদ্ধি। এইটাই রবি ঠাকুরের আশ্চর্য লাগত। একদিন সকালে দুজনে একটা জটিল দর্শনের বই নিয়ে আলোচনা করছেন—বইটা বাংলায়। এমন সময় বেলুড় থেকে এক চাকর এসে জানাল, স্বামীজি নিবেদিতাকে ডাকছেন। নিবেদিতা অমনি থেমে গেলেন, তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। বুদ্ধি যেন আর কাজ করছে না, আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটির কাছে এসব গোপন করবার চেষ্টাও করলেন না, বলে উঠলেন, 'স্বামীজির আশীর্বাদ অনুক্ষণ আমায় ঘিরে আছে। এক্ষুনি আমায় যেতে হবে।' রবি ঠাকুর কুণ্ঠিত বিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর প্রখর বুদ্ধিমতী বান্ধবী হঠাৎ গুরুগত-প্রাণা সেবিকা হয়ে গেছেন। অস্ফুটে বললেন, 'নিবেদিতা অন্তরের ভক্তি নিবেদন করবার মানুষ পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নাই।'

নিবেদিতার কাজের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর পরিকল্পনার ঔদার্যে। তাঁর বৈরাগ্যে-অনুপ্রাণিত কর্মযোগের পিছনেও যে উদার হৃদয়ের প্রেরণা, তারই প্রভাবে তাঁর ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য-সূত্রে বাঁধা পড়লেন। ঘন ঘন সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করে নিবেদিতাকে তাঁরা জন কয়েক প্রগতিবাদী মুসলমান নবাব আর বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। নিবেদিতাও সরলা ঘোষালের সঙ্গে মিলে একটা পাঠচক্র গড়ে তোলবার আয়োজনে লাগলেন। জানুয়ারী মাসে স্কুল-প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মবন্ধুদের সকলকে আর স্বামীজিকে এক চায়ের পার্টিতে আমন্ত্রণ করলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মদের ব্যূহ ভেদ কর দেখি।' ১৮৯৯এর প্রথম তিন মাসে নিবেদিতা যে-সব ভাষণ দিয়েছিলেন, তার দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এটা স্বামীজির আদেশের ফল। তখনকার ক'লকাতার অনেক রঙ্গালয়েই নিবেদিতা শিক্ষা আর ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। সাধারণতঃ স্থানীয় জনসাধারণ কিংবা নব্য-ভারত সংগঠনের পাণ্ডারাই হত শ্রোতা। প্রত্যেকবারই ব্রাহ্মসমাজের গুণী-জ্ঞানীরা সাগ্রহে নিবেদিতার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

ঠাকুর-পরিবারের একটি ছেলে বিশেষ করে নিবেদিতার প্রতি অনুরক্ত হল। ছেলেটির বয়স ছাব্বিশ, কবির এক ভাইপো। ভারতবর্ষকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তারুণ্যের দীপ্তি আছে স্বভাবে। ছেলেটির উপর নিবেদিতার পূর্ণ নির্ভর।

বাগবাজারে গিয়ে ভারতের নানা সমস্যা নিয়ে সে আলোচনা করত। জমিদারির তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে বহুদিন, সেই সূত্রে বাংলার চাষীদের কথা সে খুব ভাল করেই জানে। বেশির ভাগ তাদের সুখ-দুঃখের কথাই হত। কেমন করে সংবৎসর ধরে তারা কাজ করে, রোদে-পোড়া শক্ত মাটিতে মাসের পর মাস লাঙল চালায়, অনাবৃষ্টির ভয়ে সর্বদাই কাঁটা হয়ে থাকে, তার পর যখন বর্ষা নামে তখন সে কী খাটুনি, বন্যার ভয় বা আর-কিছুই তাদের দমাতে পারে না। শুনতে-শুনতে গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির অসহায় রায়তদের বুক-ফাটা কান্না ভেসে আসে নিবেদিতার কানে।

নানা প্রশ্ন করেন তিনি। সুরেন্দ্র জবাব দেয়। সম্ভাবিত নানা সংস্কারের কথা তোলেন, সুরেন্দ্র কি বলে তা শোনেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেশের কথা আলোচনা করেন দুজন।

সুরেন্দ্রনাথ একে-একে তাঁর বন্ধুদের নিবেদিতার কাছে নিয়ে আসেন, বালিকা-বিদ্যালয়টি দেখান সবাইকে। নাটোরের মহারাজকে বলেন, দেখুন এই বিদ্যালয় হতে কালে বড় একটা কিছু গড়ে উঠবে; ছাত্রীরা এখানে আনন্দ-মনে অনায়াসে বেড়ে উঠছে। ভবিষ্যতের দৃপ্ত মহিমাকে নিবেদিতা রূপ দিচ্ছেন।'

সুরেন্দ্র প্রায়ই বলতেন, 'আপনার কাজ করবার মত বয়স আমার হয়নি, আমি এখনও ছেলেমানুষ। কিন্তু কি করব আপনার জন্য, বলুন না?' উত্তর হত, 'যে-সব চাষীরা তোমার জিম্মায় আছে, তাদের ভার নাও, তাদের যন্ত্রপাতি যোগাও, ভাল বাড়ি-ঘর করে দাও, জমির খাজনা কমাও—ওদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাও, বুড়োদের দেখাশোনা কর—একটা জীবনের পক্ষে এই কাজই তো ঢের!'

উৎসাহের চোটে তরুণ সুরেন্দ্রনাথ জমি বিলির উন্নততর বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে নানা খসড়া করতে লাগলেন। একদিন নিবেদিতা বললেন, 'পরের জন্য কাজ করাটা যে রীতিমত একটা "তপস্যা" এটা বোঝ তো?' ঐ সনাতনী কথাটা ব্রাহ্মের কানে বাজে, তিনি অসন্তুষ্ট হন। নিবেদিতা বুঝতে পারেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, 'জানি, নিজের অজানতে আপনি আমায় হিন্দু করে তুলতে চান। সেই জন্য আপনার সঙ্গে চণ্ডী পড়তে বলেন, তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার কৌশল ওটা।' উত্তর হল, 'ঠিকই বলেছ বোধ হয়। আমার কাজ করতে চাও না? ওতেও আমারই কাজ করা হয়...' দুই বন্ধু ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঝগড়াটা ভুলে যান।

কবির পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পঁচিশ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ স্নেহাশীর্বাদ পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনে সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বেলুর মঠ আর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অন্তরঙ্গতার মূলে ওই ঘটনাটিই।

দেবেন্দ্রনাথ তখন তাঁর পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে উত্তর-কলকাতায় জন্মভিটার পুরানো বাড়িতে চলে এসেছেন। তাঁর জন্যে ছাদের উপর একটি ছোট্ট ঘর করা হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার এখন সেইখানে প্রার্থনা আর ধ্যান-ধারণায় দিন কাটান, একলা থাকেন।

নিবেদিতা তাঁর দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন। বন্ধুদের কাছে একথা বলতে তাঁরা পরদিনই ভোরে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। ঠিক হল সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে যাবেন।

বৃদ্ধের দৃষ্টিতে অপার করুণা, আর তাঁকে ঘিরে স্নিগ্ধ প্রশান্তির পরিমণ্ডল—দেখে নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরে বলেছেন, '…মনে হল আমার আর স্বামীজির যুক্ত প্রণাম ওঁকে নিবেদন করে দিলাম যেন, তাঁকে একথা বললামও। আর সত্যি স্বামীজিও আমায় বলে পাঠিয়েছিলেন, মহর্ষির ওখানে যাওয়াতে তিনি খুব খুশী হয়েছেন।' মহর্ষি বললেন, "স্বামীজিকে যখন দেখেছি তখন তিনি বালক, আমি তখন বোটে করে ঘুরতাম। আর একবার যদি আমার এখানে আসেন, খুব খুশী হব…" (১৫ই, ২১শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯এর চিঠি)

মহর্ষির মনে কি ছবির মত সেদিনের দৃশ্য ফুটে উঠেছিল? অনেক বছর আগে…গঙ্গার বুকে দেবেন্দ্রনাথের বজরা বাঁধা থাকত। স্বামীজি তখন নেহাত ছেলেমানুষ। মহর্ষির সঙ্গে তাঁর দেখা করবার ইচ্ছা হল। ক'লকাতায় তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্যবর্গের কাছে খোঁজ নিতে থাকেন। এক শুধু মহর্ষিই স্বামীজির সংশয় মেটাতে পারেন। গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে দেখলেন, মহর্ষির বোট বাঁধা রয়েছে। খুব বেশী দূর নয়, স্বামীজি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু স্রোত ছিল প্রখর, তাঁকে বেশ বেগ পেতে হল। যখন বোটে উঠলেন তখন হাঁপাচ্ছেন, ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। অনেক কষ্টে ডেকের উপর উঠে সটান কেবিনে গিয়ে দরজা খুললেন। মহর্ষি তখন আসনে বসে ধ্যান করছিলেন, আচমকা শব্দে চোখ মেললেন।

'আচার্য, আপনি ভগবানকে দেখেছেন? আমিও দেখব, তাঁর দেখা চাই-ই চাই!'

বৃদ্ধ সাধু তরুণ ছেলেটির সংশয়-কাতর ব্যাকুল মুখের দিকে তাকালেন, সে-মুখে অনুক্ত ভাষায় যেন লেখা আছে—'সত্যিই কি বেদ অপৌরুষেয়? শাস্ত্র সত্য? ভগবান কি, কে?'

খাপছাড়া ভাবে নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, 'আমায় অদ্বৈতবাদ বুঝিয়ে দিতে পারেন?'

মহর্ষি এক কথায় জবাব দিলেন, 'ঈশ্বর আমায় এ যাবৎ শুধু দ্বৈতলীলাই দেখিয়েছেন।' এমন প্রাণখোলা উত্তর পেয়ে নরেন দমে গেলেন। কিন্তু মহর্ষি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হতাশ হয়ো না বাবা, তোমার চোখ যোগীর মত, ভগবানের দৃষ্টি আছে তোমার 'পরে…'

স্বামীজি যখন শুনলেন দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। 'সত্যি একথা বলেছেন তিনি? নিশ্চয়ই যাব আমি, তুমিও এস না! শীগগির একটা দিন স্থির কর।'

কয়েক দিন পরে গুরুর সঙ্গে নিবেদিতা ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। সেদিনের কথায় বলেছেন, 'আমাদের তখনই মহর্ষির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ির দু'-এক জন সঙ্গে চললেন। স্বামীজি এগিয়ে, গিয়ে বললেন, "প্রণাম", আমি দুটি গোলাপ ফুল দিয়ে প্রণাম করলাম। মহর্ষি আমাকে আশীর্বাদ করে স্বামীজিকে বসতে বললেন। তার পর মিনিট দশেক বাংলায় কথা চলল। স্বামীজি যে-সব বাণী প্রচার করে যশস্বী হয়েছেন, মহর্ষি একে-একে তার উল্লেখ করতে লাগলেন। বললেন, আগাগোড়া তিনি স্বামীজির কার্য্যকলাপের 'পরে নজর রেখেছেন, গভীর আনন্দ ও গৌরব বোধ নিয়ে তাঁর ভাষণ শুনে গেছেন। ঠাকুরবাড়ির সবাই আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছিল. কেন জানি না মনে হচ্ছিল ও-সব কথা যেন তাঁর কানেই যাচ্ছে না। এটা তাঁর সলজ্জতা। তার পর বৃদ্ধ চুপ করলেন। স্বামীজি তখন খুব বিনীত ভাবে তাঁর আশিস্ ভিক্ষা করলেন। মহর্ষি আশীর্বাদ করলে পর আগের মতই প্রণাম করে আমরা নীচে চলে এলাম।'

স্বামীজি তখনই বেলুড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর বাড়ির সবাই ছাড়লেন না। পুরুষেরা এক-একে তাঁর চারপাশে এসে জমা হলেন। তিনি চা খেলেন না, একটি পাইপ নিলেন শুধু। যথারীতি আপ্যায়নের পর স্বামীজি বিখ্যাত ব্রাহ্ম-নেতা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন, 'তিনি নব্য ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।' সকলে তাঁর মুখে এই-ই যেন শুনতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের সামনে এ ধরণের কথা বলায় নতুন একটা সম্ভাবনার গোড়াপত্তন হল। তার পরে অবশ্য প্রতীকোপাসনা আর কালী সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। এ-প্রসঙ্গ উঠতেই নিবেদিতা আর তাঁর অনুগত সুহৃৎ সুরেন্দ্রের কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। এক পক্ষের কাছে কালী হলেন মদমাতালে শাক্তদের দেবতা, আবার অন্য পক্ষের কাছে তিনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী বিশ্বজননী। ভাগ্য ভালো, স্বামীজি সেদিন আপোষের সুরেই বললেন, 'আপনাদের মতটাই শাস্ত্রসম্মত, তা ঠিক। কিন্তু অপর মতটাও আপনাদের মেনে নেওয়া উচিত, অন্ততঃ অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রকীকোপাসনার যে একটা সম্পর্ক আছে এটা স্বীকার করাই ভালো…' দুদিকই রক্ষা হল। স্বামীজি চলে যাওয়ার সময় খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আবার তাঁকে আসতে বলা হল, তিনি তাঁদের বেলুড়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।

ঠাকুর-পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে সরলা আর সুরেন্দ্রনাথ বেলুড়ে গেলেন। বিবেকানন্দ তাদের নিয়ে ঘুরে-ফিরে মঠ দেখালেন। সরলার সঙ্গে ছিলেন তিনি আর ব্রহ্মানন্দ। অন্য একজন সাধুকে নিয়ে নিবেদিতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। বেলুড় মঠ সেদিন যেন ঝলমল করছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে স্বামীজি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, সরলা তখন উদাসিনীর মত তফাতে দাঁড়িয়ে। নিবেদিতা তাঁর বন্ধুর জন্য মনে-মনে ঠাকুরকে ডাকেন, 'ঠাকুর, তোমার বিরুদ্ধে এই যে বিরূপতার বাধা এ তুমি চূর্ণ করে দেবে না কি? প্রসন্ন হও ঠাকুর, আমিও একদিন অমনি ছিলাম…'

বিকাল বেলা বিবেকানন্দ অতিথিদের নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। মেয়েরা ঘাটে স্নান করছে, যাত্রীরা নদীর পারে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। স্বামীজিকে দেখেই রব উঠল, 'জয় গুরু মহারাজকী জয়।' স্বামীজি পাল্টা জবাব দিলেন, 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণকী জয়।' সরলা আর সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী উপরে উঠলেন। স্বামীজি রইলেন বোটেই। ওঁরা বাগানে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। সেদিন সন্ধ্যায় নিবেদিতা লিখলেন, 'কী সুন্দর যে লাগল আজকের দিনটি। সরলা, সুরেন আর আমি গাছতলায় বসেছিলাম। যখন উঠে আসি, সরলা দেখালো সিঁড়ির ধাপে-ধাপে পাছপালার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে ডাল-পাতার নক্সা কেটে। নদীর ধারে-ধারে

বাতির আলো, এক জায়গায় রক্তশিখ বিরাট দুটি চিতার আগুন চোখে পড়ে। পাল তুলে দিয়ে বড়-বড় নৌকা উজিয়ে চলেছে।

'তার পর এলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে। মন্দিরটা দেখাবার জন্য চত্বর দিয়ে ওদের নিয়ে আসা হল। কালীর মন্দির তখন বন্ধ; কিন্তু এই উৎসাহী ছেলে-মেয়ে দুটি দেউলের জাঁকালো স্থাপত্য দেখেই খুশী হয়ে ফিরে এল।(১)

'রাজা এই এতক্ষণ আমাদের জন্যে বোটেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের নিয়ে মঠে ফিরলেন। সবাই একত্রে ছিলাম, উনি এবার সরলার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমরা স্বামীজিকে যেমন ভালবাসি, মনে হল সরলাও ওঁকে সেই চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। উনি বললেন, 'সরলা একটি রত্ন, ও অনেক বড় কাজ করবে'।(২)

'ভক্তি-বিশ্বাসের ধারাটি এখানে প্রাণোচ্ছল। আমার বন্ধুরা তার স্বাদ পেল কি?' নিবেদিতা মনে-মনে ভাবেন। 'নিরবচ্ছিন্ন তৈল-ধারার মত বয়ে চলেছে এ-জিনিস, এক খাত হতে অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে নির্ঝরের তুষার-শীতল প্রবাহ। সে-প্রবাহিণীতে সকল পাত্রই পূর্ণ করা চলে—তা সে স্ফটিকেরই হ'ক আর মাটিরই হ'ক। তার পর অমূল্য সম্পদের মত আপন ঘরে বয়ে আনা হয় তাকে। অরুণ-রাগে যেমন করে ফুল পাপড়ি মেলে, তেমনি করে হৃৎপদ্ম ফুটে ওঠে গুরুর ছোঁয়ায়...'

কিন্তু দু'দিন পরে সরলার কাছ থেকে একখানা চিঠি এল। স্বামীজির সাদর আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সরলা লিখেছে, ঠাকুরবাড়ির সহযোগিতা পেতে হলে তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ছাড়তে হবে। তাহলে তাঁরাও স্বামীজির কাজে যোগ দেবেন তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়ে।

চিঠি পড়ে নিবেদিতা কেঁদে ফেললেন। মনে হল যা ঘটল তার জন্য তিনিই দায়ী। ব্রাহ্মসমাজ আর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন নিবেদিতা। ঠাকুরবাড়ির ওরা কে যে সে-চেষ্টাকে এমন ভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে? মায়াবতীর(৩) সন্ন্যাসীদের যে নিরাকার উপাসনায় ব্রতী করেছেন স্বামীজি, ওরাও তো তাই-ই করে। বাগবাজারের বাড়িতে একখানিও পট নাই দেখে ওরা খুশী। কিন্তু কিছুতেই ওরা শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে মাথা নোয়াবে না, এ কী জিদ!

গুরু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'যদি নিশ্চিত জানতাম মূর্তিপূজা তুলে দিলেই মানুষের কল্যাণ হবে, বিনা দ্বিধায় ওটা উঠিয়ে দিতাম। কিন্তু গভীর দীনতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী স্মরণ করি, "ঈশ্বর সাকার-নিরাকার দুই-ই, আবার তা ছাড়াও কিছু। তিনিই শুধু বলতে পারেন, আরও কত কী তিনি।" দেখ মার্গট, যারা একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে জগতে আসে, তাদের কখনও এমন প্রত্যাশা থাকতে নাই যে মানুষ তাদের কথা শুনবে। আবার এ-ও জেনো, যারা মনে করে তারা স্বতন্ত্র, তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নাই তাদের, অন্তরে অন্তরে তারাই সবার চাইতে তোমার পা-চাটা। যারা সাকার পূজা উড়িয়ে দেবার জন্য বাড়াবাড়ি করে, তারা নিজেদের মন জানে না। যে-ভাবের বিরুদ্ধে নিজেরা মনে-মনে লড়াই করছে, অন্যের মধ্যে তার প্রকাশ দেখে তারা জ্বলে ওঠে! যদি নিজের মন বুঝতো তারা!' (৮ই আর ৯ই তারিখের চিঠি, ১৮৯৯)

নিবেদিতার কিন্তু শিক্ষা হল। তিনি মাথা নিচু করে থাকেন। মনটা ভার-ভার লাগে।

এই ব্রাহ্মসমাজে একটি লোককে দেখে নিবেদিতা সঙ্গে-সঙ্গে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু। চল্লিশ বছর বয়সেই তিনি স্বনামধন্য হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু নাম খ্যাতি তাঁর কাছে একটা বোঝার শামিল। জগদীশ বোস সত্যান্বেষী, দেখলেই মনে হয় মানুষটি বিরুদ্ধ সমাজের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। তাঁর নম্র-নিরীহ ভাবটা দেখলে কেমন একটা ধাক্কা লাগে, আবার মনটা টানেও।

প্রথম আলাপেই নিবেদিতা অদ্বৈত তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। ও তাঁর একটা মনের মত প্রসঙ্গ। বৈজ্ঞানিক হাসলেন, 'অদ্বৈত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিজ্ঞানের প্রমাণ চান?'

'ঠিক তাই।'

'জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অনুভব যে এক জিনিস এ আপনি বিশ্বাস করেন?'

'উপনিষদগুলোতে তো তেমনি ইশারাই আছে......'

এই কথাবার্তার ফলে সহজেই ওঁদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল, পরস্পরের অনুভব বিনিময়ের তাগিদ এল।

এই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে জগদীশ বোসের দিন কাটছে নানা গোলমালে। হিন্দু হওয়ার দরুন কমিটি তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে নারাজ। তাঁর বেতনের হার কম, আর তাঁকে নিজস্ব ল্যাবরেটরীও দেবে না ওরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু সহকর্মীদের মুখ চেয়ে আচার্য বোস ঠিক করলেন, তিনি একাই এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন। কম বেতন নিতে তিনি স্রেফ অস্বীকার করলেন। তিন বছর ধরে বিবাদ চলল। 'সমাবর্তন' (**Polarisation**) নিয়ে তিনি যে-গবেষণা করছিলেন তাতে একটা সাড়া পড়ে গেল, লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে বৃত্তি দিয়ে সম্মানিত করল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সরকার তাঁকে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এর জন্য আচার্য বোসকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

জগদীশ বোস ভয়ানক নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরিবারে, নিজের এলাকায় তিনি একা। নিবেদিতা এটা আঁচ করেছিলেন। এই সত্যান্বেষীর মাঝে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। তিনটি বেড়াজালে বন্দী বোস্। নিবেদিতা তাঁর ক্ষমতায় যতদূর কুলায় চেষ্টা করবেন ওঁকে মুক্ত করতে। প্রথম কাজ হল, ওঁর জন কয়েক বন্ধু জুটিয়ে দেওয়া। তিনি নিজে তো আছেনই।

বোসের দিকে প্রথম মিসেস্ বুলের মন টানবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে লিখলেন, 'মহৎ হৃদয়কে কি করে বড় কাজে উদ্দীপিত করতে

---

(১) এই সময় নিম্নশ্রেণী বা বিদেশীদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হত না। শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবিতা কালীকে নিবেদিতা কখনও দেখেননি। মন্দির-চত্বরেও কখনও যাননি।

(২) ২৩শে মার্চ ১৮৯৯এর চিঠি।

(৩) আলমোড়ায় সেভিয়ারদের প্রতিষ্ঠিত মঠ। ওখানে অদ্বৈতবাদের রাজত্ব, কোনও রকম পূজার্চনা চলে না।

হয় তা তুমি জান। বোসের কথা ভেবে দেখ। স্বভাবটি ওঁর করুণ কোমল, নিখুঁত চরিত্র, ওঁকে বড় করে তুলতে পারলে তুমিও আরও বড় হবে। তুমি ওঁকে আশ্রয় দাও। স্বামীজির মত এঁকেও তোমার আরেকটি সন্তান বলে মনে কর। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বোস, তবু অবিশ্রাম খেটে চলবার আগ্রহ আছে তাঁর সত্যিই। শুধু এইটুকু দেশের লোকের কাছে প্রমাণ করতে চান, যে-কোনও ইউরোপীয়ানের মত তারাও বিজ্ঞান-চর্চায় অমিত সাফল্য লাভ করতে পারে।'

সেই সঙ্গে নিবেদিতা যথাসম্ভব সন্তর্পণে জগদীশ বোসকেও বলেন, 'মিসেস্ বুলকে মায়ের আসন দিতে হবে।' বুঝিয়ে বলেন, 'তুমি তাঁকে চিঠি লেখ, তোমার কাজের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানাও তাঁকে। তাঁর কাছে কিছু লুকিও না। ধীরা মাতা তোমার প্রতীক্ষায় আছেন, একটু সাড়া পেলেই তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। তোমার শক্তিতে তাঁর আস্থা আছে।' বোসও তাই চাইছিলেন। এদেশী খবর-কাগজগুলোতে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে যখন আলোচনা হতে লাগল, তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। নানা জায়গা থেকে অভিনন্দন পত্র পেয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। অথচ সন্দেহ মাত্র করেননি যে নিবেদিতা এ-সবের পিছনে আছেন।

বোস আর নিবেদিতার এই জীবনব্যাপী সৌহার্দ বড় অদ্ভুত। দুজনেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁর-যাঁর নিজের আদর্শ আঁকড়ে ছিলেন। সে-আদর্শ পরস্পরের একেবারে বিপরীত, দুয়ের মধ্যে একটা আপোবরফার কথা উঠতেই পারে না। নিবেদিতা শুধু তাঁর কাজ সহজ করে দিয়েছেন, তাঁকে পাঁচ জনের সামনে এনে তাঁর প্রতিভাকে লোকখ্যাত করেছেন—এই মাত্র। বোস এই মেয়েটির কথা ভাবতে গেলে ধাঁধায় পড়তেন। মেয়েলীপনা ওর মধ্যে নাই বললেই হয়। অথচ কোনও যুক্তি দিয়েই ওর বুদ্ধিকে হার মানানো যায় না। অনন্ত স্বরূপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও এত নিঃসংশয় যে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ও অন্ধের মত অধ্যাত্ম অনুভবের রাজ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠলেই জগদীশচন্দ্র বলতেন, 'যখন শুনলাম স্বামীজি বলছেন দেশের লোককে মানুষ করে তোলাই তাঁর ব্রত—তখন কী যে চমক লেগেছিল। তার পর দেখেছি সর্বজনীন সনাতন সত্যের জন্য, মানুষের জন্য স্বামীজি তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা জীর্ণবস্ত্রের মত হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু ব্যর্থতার তলিয়ে গেলেন তিনিও। যে হতে পারত প্রাতঃস্মরণীয় দেশনায়ক, সেই মানুষটা হল কিনা একটা নতুন সম্প্রদায়ের ব্যাপারী!' (৪ই এপ্রিল ১৮৯৯এর চিঠি)। নিবেদিতা মিসেস্ বুলকে লেখেন, 'দেশ-বিদেশের ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার কথা তুমি যে বলতে, এত দিনে তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছি। ধর্মের প্রসঙ্গ যখনই ওঠে, বোসের কথায় মন মুষড়ে পড়ে। বেশ বুঝতে পারি, আমি যে-দৃষ্টিতে সবকিছু দেখছি, ওকেও যদি তা দেখাতে চাই, তাহলে একমাত্র ঐ তুলনামূলক আলোচনার পথেই তা সম্ভব।' (১৫ই মার্চ ১৮৯৯এর চিঠি) তর্কের পথটি নিবেদিতা খোলাই রাখেন। তাঁদের মতের মিল হয় শুধু বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারিতে। নিজের বাড়িতে সাধারণ একখানা ঘর, চেয়ারে টুলে যন্ত্রপাতি এলোমেলো ছড়ানো, মেঝেতে টেষ্ট টিউব আর বোঝা-বোঝা গ্রাফ। এখানে মানবীয় কিছু নাই, আছে শুধু নিছক ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ফল। তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোনও কিছুর সম্পর্ক নাই।—বোসের সাহায্যে নিবেদিতা অদ্বৈত তত্ত্বের রহস্যের মধ্যেও যে প্রামাণিক সত্য আছে তা অনুভব করেন—এই তো 'অণোরণীয়ান্' আর 'মহতো মহীয়ানের' সাযুজ্য। আনন্দে ঝলমলিয়ে ওঠেন নিবেদিতা।

নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতে-দেখতে বোস বলেন, 'জড়ের মাঝেও প্রাণ আছে আমি দেখেছি। কোনও ভুল নাই, জড়ও চৈতন্যময়। প্রাণ সর্বত্র—এমন কি ধাতুও প্রাণবস্তু। একদিন তাকে পাকড়াও করবই। প্রথম গাছপালায়, তার পর পাথরেও যে প্রাণ আছে তা প্রমাণ করব। আছে, আমি জানি।'

নিবেদিতা সাগ্রহে অণুবীক্ষণের উপরে ঝুঁকে পড়েন। প্রাণ, পরমাণু, ঐক্য এই সবের কথাই অপ্রত্যাশিত ভাবে ওঠে,—কত অনুমান, কত প্রকল্প! একদিন বোসকে বললেন, 'আমায় যা বলছ তা তোমার লিখে ফেলা উচিত। এ-সব জরুরী কথা লেখা দরকার।' অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে বোস বলেন, 'যা বিদ্যুচ্চমকে আমার মনে খেলে যাচ্ছে, সে-কল্পনাকে রূপ দেব এ কী করে আশা করেন! ও যে আমার কাছে মরীচিকা!'

'আমি তো আছি। আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মত তোমার কাজ করবে। মনে কর এ-লেখা তোমারই।'

বোসের সম্বন্ধে মিসেস্ বুলকে অনেক-কিছু লিখে এই বলে চিঠি শেষ করেন, '...আমার মন যেমন তেমনি তোমার মনও আমি জানি। তুমি, আমি আর য়ুম—আমরা এই দুটি লোকের চারপাশে প্রীতির একটা আতপ্ত পরিবেশ রচনা করব, দেব শক্তি, সারা দুনিয়াকে ওদের ঘর করে তুলব—এখনও তার সময় আছে। স্বামীজিকে ভালবাসলে অন্যকে ভালবাসতে বাধা নাই, আর অন্যদের ভালবাসলে তাঁর কাছে তা মিথ্যা হয়ে যায় না।' (৫ই এপ্রিল ১৮৯৯এর চিঠি)

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

উপাসনার জমি

"যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, উপাসনা সরস করিবার সংকেত কি? আমি বলি জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চ রাখ, অভিসন্ধিকে বিশুদ্ধ রাখ, বিনয়কে হৃদয়ে ধারণ কর; অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিও না, এবং হৃদয়ের ক্ষুদ্র আসক্তি সকল উৎপাটন কর; তবে উপাসনার জমি প্রস্তুত হইবে। আরও হয়ত তাঁহাকে বলি, জমি প্রস্তুত না করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না, আমাদিগকেই দর্শন কর। দেখ, আমরা কত উপাসনা করিতেছি, তাহার ফল নাই, সরসতাও নাই। ভিতরে ঐ সকল কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন এই ব্যাধিগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।"

—শিবনাথ শাস্ত্রী।

মহাকবি সেক্সপিয়র রচিত

ম্যাকবেথ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত

৩য় দৃশ্য

ইংলণ্ড ; রাজপ্রাসাদের সম্মুখ

(ম্যালকম ও ম্যাকডফের প্রবেশ)

ম্যাল। চল মোরা খুঁজি কোন ছায়া জনহীন,
সেথা বসি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া লঘু করি
হৃদয়ের বোঝা।

ম্যাকড। তার চেয়ে মৃত্যুবর্ষী অসি ল'য়ে করে
দাঁড়াই না বীরের মতন, ভূলুণ্ঠিতা
জন্মভূমি রক্ষণের তরে। নিত্য নব প্রাতে সেথা
নব নব বিধবার উঠে আর্তরব,
নব পিতৃমাতৃহীন করে হাহাকার,
নব নব দুঃখ হানে নির্মম আঘাত
ঊর্দ্ধমুখে আকাশের বুকে, সেথা হ'তে
আসে ফিরে ক্ষুব্ধ প্রতিধ্বনি সারা স্কট্‌ল্যাণ্ডের
যেন ব্যথিত ক্রন্দন।

ম্যাল। সঠিক জানিলে তবে হইবে বিশ্বাস,
বিশ্বাস জন্মিলে খেদ করিব নিশ্চয় ;
তার পরে, পাই যদি সুসময়, যথাশক্তি প্রতিকারও
অবশ্য করিব। যা করিলে হয়ত বা সত্য তাহা।
এই দুঃশাসক, যার নাম উচ্চারণে রসনায়
জন্মে আজ দাহ, একদিন ভালো ব'লে
জানা ছিল তারে। তব সাথে ছিল তার
ঘনিষ্ঠ প্রণয়। আজও সে ত কোন ক্ষতি
করেনি তোমার। আমি ক্ষুদ্র বটে,
তবু তুমি পেতে পার মোর বিনিময়ে
কিঞ্চিৎ সুবিধা তার কাছে,
রুষ্ট দেবতার তুষ্টি করিতে অর্জন
বুদ্ধিমানে বলি দেয় নিরীহ নিষ্পাপ মেষশিশু।

ম্যাকড। বিশ্বাসঘাতক আমি নই।

ম্যাল। ম্যাকবেথ বিশ্বাসঘাতক। ধর্মপ্রাণ
সজ্জনেরও রাজাদেশে ঘটে পথচ্যুতি।

ম্যাকড। তা হ'লে ছাড়িনু সব আশা।

ম্যাল। সন্দেহ জাগিল মনে হয়ত তোমারি ব্যবহারে।
কেন হেথা এলে ত্বরা স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া
না ল'য়ে বিদায় তাহাদের? তারা ত
তোমার প্রিয় সকলের চেয়ে, বদ্ধ তারা
সব হ'তে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে। শোন কথা,
মনে কিছু করিও না ; আমার সন্দেহ শুধু
আত্মরক্ষা তরে, নহে তব অপমান হেতু।
হয়ত তুমিই খাঁটি লোক।

ম্যাকড। হে মোর দুর্ভাগা দেশ! অঝোরে ঝরায়ে যাও
মর্মের শোণিত। রে দুর্দান্ত উৎপীড়ন!
ভিত্তি তোর গাঁথ দৃঢ় করি, মঙ্গল যে ভয় পায়
বাধা দিতে তোরে। ভোগ কর্ নিজ কদর্জন।
তোরই অধিকার আজ হ'ল নিরংকুশ।
এবার বিদায় দিন দেব! অত্যাচারী রাজার
সমগ্র রাজ্যসহ পাই যদি রত্নপূর্ণা প্রাচী,
তথাপি হব না আমি দুর্বৃত্ত তেমন,
যেমন আমারে আজ ভাবেন আপনি।

ম্যাল। ক্ষুণ্ণ নাহি হও বীর! যা ব'লেছি সে ত
শুধু তোমারে সন্দেহ কোরে নয়। বুঝি আমি—
ডুবিছে মোদের দেশ অত্যাচার ভারে,
ঝরিতেছে আঁখি তার, ঝরিছে শোণিত,
প্রতিদিন বাড়ে ক্ষত নূতন আঘাতে। এও জানি—
আমার সাহায্য তরে বহু বাহু হবে উত্তোলিত।
আশা আছে—সমুদায় ইংলণ্ড হইতে
পাব দশ সহস্র সেনানী। পরিশেষে যবে
চরণে দলিব সেই দুঃশাসক-শির,
কিম্বা তারে অসিমুখে তুলিয়া ধরিব,
দুর্ভাগ্য আমার দেশ পড়িবে নিশ্চয়
গুরুতর দুঃখ মাঝে, ভুঞ্জিবে সে অশেষ যন্ত্রণা
নূতন শাসকহস্তে।

ম্যাকড। কে বা সে শাসক?

ম্যাল। আমি নিজে। জানি মোর মর্মমূলে যত
পাপ র'য়েছে গোপনে তারা যবে উঠিবে ফুটিয়া,
দেখাবে তুষার শুভ্র কৃষ্ণ ম্যাকবেথে ;
সীমাহীন অত্যাচারে মোর, বুঝিবে বিপন্ন দেশ
যে ছিল সে ছিল মেষশিশু।
তার চেয়ে ম্যাকবেথই ভাল।

ম্যাকড। স্কট্‌ল্যাণ্ড! স্কটল্যাণ্ড! হে মোর দুর্ভাগা দেশ,
স্বত্বহীন শাসনে পীড়িত! আর কি দেখিবে কভু
সৌভাগ্যের মুখ? তব যোগ্য রাজবংশধর
নিজ মুখে নিজ কুৎসা রটায়ে অবাধে করিছে
বংশের অপমান। পিতা তব ছিল রাজা
পুত সাধুত্তম। যে-রাণীর গর্ভে জন্ম তব
আপনারে দিল বলি তিল তিল করি
ব্রত নিষ্ঠা ধর্মের চরণে। নিলাম বিদায়।
এত দোষে দুষ্ট যবে তুমি, আমিও হ'লাম দেশত্যাগী।
হে মোর হৃদয়! সব আশা ফুরাল তোমার।

ম্যাল। সততা-সঞ্জাত তব মর্মান্ত উচ্ছ্বাস
ধুয়ে মুছে দিল মোর অন্তর হইতে
মসীকৃষ্ণ সকল সন্দেহ। বুঝিলাম তুমি সৎ,
তুমি সুমহান্। দুর্বৃত্ত ম্যাকবেথ পূর্বে
নানা ছলে করিয়াছে বহুল প্রয়াস
মুষ্টিমাঝে পাইতে আমারে, সতর্ক হইতে তাই
ত্যজিয়াছি হঠকারী সরল বিশ্বাস।
তোমার আমার মাঝে সাক্ষী ভগবান ;
আজি হতে মানি ল'ব তোমারি নির্দেশ ;

আরও কহি শপথ করিয়া—
যত কিছু নিজ পাপ করিনু জ্ঞাপন
মিথ্যা সে সকলই। আমার প্রকৃত সত্তা
অর্পিনু তোমায়, নিয়োজিত কর তারে
দেশের কল্যাণে। তোমার আসার পূর্বে
বৃদ্ধ সির্ডয়ার্ড আমার সাহায্য তরে হয়েছে প্রস্তুত
ল'য়ে দশ সহস্র সেনানী! একত্র হইয়া
চল হই অগ্রসর; ধর্মযুদ্ধে যেন হই জয়ী।
কি, নীরব রহিলে কেন?

ম্যাক্‌ড। এত শুভ এমন অশুভ কথা, ক্ষণমাত্রে সমন্বয়
একান্ত দুরূহ।

(রসের প্রবেশ)

দেখুন, কে আসিতেছে হেথা।

ম্যাল। আমারি দেশের লোক, কিন্তু ঠিক চিনিতে না পারি।

ম্যাক্‌ড। চিরপ্রিয় ভ্রাতা মোর, এস এস হেথা।

ম্যাল। এখন চিনেছি আমি। ভগবান,
জানারে যা করিছে অজানা,
সত্বর করহ দূর সে দারুণ বাধা।

রস। আমারও প্রার্থনা তাই দেব।

ম্যাক্‌ড। স্কটল্যাণ্ড যেখানে ছিল আছে সেইখানে?

রস। হায় রে দুর্ভাগা দেশ! ভয় পায় নিজেরে জানিতে।
মাতৃভূমি নহে সে ত আর, আজ সে হয়েছে গোরস্থান।
নিতান্ত যে অর্বাচীন সে ছাড়া কেহই সেথা
ভুলেও আসে না; দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, কাতর চীৎকার
উঠে সদা আকাশ ভেদিয়া, শুনিবার কেহ নাই।
মর্মভেদী দুঃখ সেথা—সাধারণ ভাববিহ্বলতা।
শবধ্বনি শুনি কেহ শুধায় না—'কে?'
মানুষের জীবন ফুরায় সেথা আজ
না শুকাতে কেশের কুসুম।

ম্যাক্‌ড। কত সত্য সুবর্ণিত এই বিবরণ!

ম্যাল। আছে কিছু নবতম শোকের সংবাদ?

রস। প্রত্যেক মুহূর্ত সেথা জন্ম দেয় নব নব শোকে,
দণ্ডপূর্বে যা ঘটিল সে বাসি সংবাদ
কহিলে বিদ্রূপ করে লোকে।

ম্যাক্‌ড। পত্নী মোর ভাল আছে?

রস। ভালই আছেন।

ম্যাক্‌ড। পুত্রকন্যাগুলি?

রস। তারাও ভালই আছে।

ম্যাক্‌ড। রাজ-উৎপীড়নে আজও শান্তিহারা হয়নি তাহারা?

রস। দেখে এনু আসার সময়, শান্তিপূর্ণ তারা।

ম্যাক্‌ড। কথায় কেন এ কৃপণতা? খুলে বল
সকল সংবাদ।

রস। যখন আসিতেছিনু আপনার পাশে
সংবাদ বহন করি ব্যথাতুর চিতে
শুনিলাম জনরব—বহু যোগ্য লোক সব
হ'য়েছে বিদ্রোহী; প্রমাণ মিলিল হাতে হাতে
দেখিনু যখন—দুঃশাসক সাজাইছে বাহিনী তাহার।
দেশে ফিরিবার যোগ্য সময় ত এই; আপনার উপস্থিতি
আপনি সৃজিবে সৈন্যদল, রমণীরা করিবে সমর
ঘুচাতে দারুণ দুঃখদিন।

ম্যাল। আশ্বস্ত হউক সবে, সত্বর যেতেছি মোরা সেথা।
মহামান্য ইংলণ্ডের পতি
দিয়েছেন মোরে দশ সহস্র সৈনিক
মহাবীর স্যুয়ার্ড-অধীনে। কিবা শৌর্যে
কি অভিজ্ঞতায় স্যুয়ার্ডের সমকক্ষ
নাহি ধরণীতে?

রস। যদি পারিতাম দিতে তুল্য সুসংবাদ!
ইচ্ছা হয় বার্তা মোর দিই ছড়াইয়ে
হাহা রবে মরুবালুস্তরে,
যেখানে শুনিতে কেহ নাই।

ম্যাক্‌ড। সে মহাদুঃখের বার্তা সে কি সকলের?
অথবা একটি বুকে হানিবে সে নির্মম আঘাত?

রস। সে দুঃখ লেগেছে বুকে সব সজ্জনের,
তবু তাহা একান্ত তোমারি।

ম্যাক্‌ড। যদি তা আমারই, গোপন কোরো না আর,
শোনাও সত্বর।

রস। যে দারুণ দুঃখবার্তা উচ্চারিবে রসনা আমার
কখনো শোনেনি তাহা তোমার শ্রবণ,
তা বোলে কোরো না দোষী রসনারে মোর।

ম্যাক্‌ড। হুঁ, মনে হয় বুঝিতেছি সব।

রস। তোমার প্রাসাদদুর্গ অবরুদ্ধ হইল সহসা;
সেথা তব পত্নীসহ সব শিশুগণ
পশুবৎ হইল নিহত; বর্ণিলে সে হত্যার কাহিনী
মৃত সে মৃগের স্তূপে আহুতি পড়িবে শুধু
তব শবদেহ।

ম্যাল। দয়াময় ভগবান! এ কি বন্ধু,
শিরস্ত্রাণে ঢেকো না ক' মুখ;
ভাষা দাও দুঃখের বদনে। যে শোকের
মুখ নাহি ফুটে, গুমরি গুমরি সে যে
অতি দুঃখভারে ভাঙিয়া ফেলিতে চাহে বুক।

ম্যাক্‌ড। আমার সন্তানগণও?

রস। পত্নী পুত্র ভৃত্যগণ, যাদের মিলিল দেখা, সব!

ম্যাক্‌ড। আর আমি দূরে সে সময়!
স্ত্রীও মোর হয়েছে নিহত?

রস। ব'লেছি ত।

ম্যাল। শান্ত হও। মর্মান্তিক এ শোকের প্রতিষেধ লাগি
এস রচি যোগ্য প্রতিশোধ।

ম্যাক্‌ড। পুত্র ওর নাই! আনন্দদুলালগুলি, সব!
কি বলিলে সব? সব কাট? ওরে নারকীয় শোন!
সুন্দর শাবকগুলি সহ
পক্ষিণীরে এক সাথে করিলি নিধন?

ম্যাল। যুদ্ধ কর মানুষের মতো।

ম্যাকডফ। তাই হবে ; কিন্তু
মানুষেরই মতো আগে করি অনুভব।
শুধু মোর মনে পড়ে,—ছিল তারা,
ছিল তারা মহামূল্য মাণিক আমার।
বিধাতা পাষাণ সম রহিল চাহিয়া
রক্ষা তরে না তুলি' তর্জনী ?
ওরে মহাপাপী ম্যাকডফ,
তোরি তরে হত হোল তারা ! কত অকিঞ্চিৎ আমি,
কোন দোষ ছিল না তাদের, মোর দোষে
গেল প্রাণগুলি। ভগবান তুলে নিল কোলে।

ম্যাল। হোক ইহা শাণ-শিলা তোমার অসির।
শোক পরিণত হোক ক্রোধে ; দুঃখ যেন
হৃদয়েরে না করি নির্জীব,
উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে তারে।

ম্যাকড। নয়নে আনিয়া অশ্রু, রসনায় বৃথা আস্ফালন,
নিতে পারি নারীর ভূমিকা। কিন্তু, দয়াময় বিধি,
বিলম্ব যে নাহি সহে আর ; মুখোমুখী কোরে দাও
মোর সাথে স্কটল্যাণ্ডের সেই পিশাচেরে ;
এনে দাও অসির সীমার মাঝে তারে ;
তবু যদি পায় সে নিস্তার,
তুমি তারে ক্ষমা কোরো দেব !

ম্যাল। এই ত পুরুষকণ্ঠ শুনি।
চল যাই রাজ সন্নিধানে ; সৈন্যেরা প্রস্তুত সবে,
বাকী শুধু শেষ অনুমতি।
অতিপক্ক ফল সম, নাড়া পেলে ম্যাকবেথ
পড়িবে খসিয়া, মোরা হব
ভাগ্যনিয়োজিত শুধু নিমিত্তের ভাগী।
অন্তরে সান্ত্বনা লভ', লঘু হোক্ ব্যথা,
যে রজনী পোহাবে না সে রজনী কোথা ?

[প্রস্থান।

৫ম অংক

১ম দৃশ্য

ডান্‌সিনেন ; দুর্গের সম্মুখ কক্ষ

(একজন ডাক্তার ও একজন সেবিকার প্রবেশ)

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে দু'রাত্রি জেগে ত নজর রাখছি। কই, তুমি যা বোলেছিলে তার কিছুই ত দেখছি নে। শেষ কবে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ?

সেবিকা। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পর থেকে আমি লক্ষ্য কোরে দেখেছি—বিছানা ছেড়ে উঠলেন, রাতের পোষাক পরলেন, পাশের ঘরে চাবি খুলে কাগজ বার কোরলেন, ভাঁজ কোরে কি লিখলেন, পড়লেন, শেষে মোহর কোরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সব সময় গভীর ঘুমে মগ্ন।

ডাক্তার। স্বীয় প্রকৃতির বিষম বিপর্যয় হ'লেই মানুষ নিদ্রাসুখে মগ্ন থেকেও জাগ্রতের ন্যায় কাজ কোরে যায়। আচ্ছা, ঘুমের ঘোরে এই রকম উত্তেজনার মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে অন্য সব কাজ করার মধ্যে মাঝে কোন সময় তাকে কিছু বলতে শুনেছ ?

সেবিকা। তিনি যা বলেছেন তা আমি কাউকে বলতে পারব না।

ডাক্তার। আমাকে বলতে পার, আর আমায় বলাই উচিত।

সেবিকা। আপনাকে বা কাউকে তা বলতে পারব না, সে সব কথার ত আমার কোন সাক্ষী নেই।

(বাতিহস্তে লেডি ম্যাকবেথের প্রবেশ)

ঐ দেখুন, তিনি এই দিকে আসছেন ! ঠিক এই তাঁর ধরণ ; আর জোর কোরে বলতে পারি উনি সম্পূর্ণ ঘুমন্ত। বেশ কোরে দেখুন, একটু আড়ালে চলুন।

ডাক্তার। বাতি কোথায় পেলেন ?

সেবিকা। কেন, তাঁর বিছানার পাশেই, সব সময় পাশে আলো থাকবে, তাঁর হুকুমই তাই।

ডাক্তার। ওঁর চোখ ত খোলা।

সেবিকা। তা বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নেই।

ডাক্তার। ও আবার কি করছেন এখন ? কি রকম হাত কচলাচ্ছেন দেখ !

সেবিকা। ওই ওঁর অভ্যাস, মনে হয় যেন হাত ধুচ্ছেন। পনের মিনিট ধোরে আমি তাঁকে ওই রকম করতে দেখেছি।

লেডি ম্যাক। তবু, এখানে একটা দাগ রইল।

ডাক্তার। শোন, শোন, কথা কচ্ছেন ! যা বলেন লিখে নিই, নইলে ভুলে যেতে পারি।

লেডি ম্যাক। মুছে যা, সর্বনেশে দাগ ! বলছি আমি— মুছে যা ! এক। দুই। তবে ত তার ঠিক সময় হয়েছে। নরকটা কী অন্ধকার ! ছিঃ স্বামী, ছিঃ ! বীর তুমি, এমন ভয় পাও ? তারা যে আমাদের কাজ জেনে ফেলবে সে ভয় কেন করব ? আমাদের কৈফিয়ৎ দাবী করবার আছে কে ? ইস ! বুড়ো মানুষের দেহে এত রক্ত, কে জানত ?

ডাক্তার। কথাটা শুনলে ?

লেডি ম্যাক। ফাইফ সর্দারের এক স্ত্রী ছিল। সে এখন কোথায় ? আরে, এ হাত দুটো কি কিছুতেই পরিষ্কার হবে না ? ও রকম আর কোরো না স্বামী, ও রকম আর কোরো না। ওই চমকানিতেই সব পণ্ড কোরে দিলে।

ডাক্তার। আর কেন ? যা জানবার নয় তাও তুমি জেনেছ।

সেবিকা। এ কথা ঠিক, যা বলবার নয় তাই তিনি ব'লেছেন। তাঁর মনের কথা ভগবানই জানেন।

লেডি ম্যাক। রক্তের গন্ধ এখনও ছাড়ে নি। যেখানে যত ভাল
গন্ধ আছে সব ঢাললেও এ ছোট্ট হাত আর
সুগন্ধি হবে না। ওঃ, ওঃ, ওঃ!
ডাক্তার। কি দারুণ দীর্ঘশ্বাস! বুকে যেন পাষাণ চাপানো!
সেবিকা। অমনতর বুক নিয়ে আমি রাণীর পদবীও চাই নে।
ডাক্তার। ঠিক, ঠিক, ঠিক।
সেবিকা। তাই বলুন, ভগবান যেন সব ঠিক কোরেই দেন।
ডাক্তার। এ রোগ আমার বিদ্যার বাইরে। তবে আমি
জানি এই রকম রোগীও শেষে শান্তিতে
মৃত্যুবরণ কোরেছে।
লেডি ম্যাক। হাত ধুয়ে ফেল, রাতের পোষাক পর। মুখ
অমন ফ্যাকাশে কেন? বার বার তোমায়
বলছি, ব্যাংকোকে কবর দেওয়া হ'য়েছে, কবর
থেকে সে বেরুবে কি কোরে?
ডাক্তার। তবে, এও?
লেডি ম্যাক। শোবে চল, শোবে চল! দুয়োরে ঘা পড়ছে।
এস এস এস, আমার হাত ধর। যা কোরেছ
তার আর হাত নেই। শোবে চল, শোবে চল,
শোবে চল। [প্রস্থান।
ডাক্তার। এইবার কি শুতে গেলেন?
সেবিকা। হ্যাঁ, এখনি শোবেন।
ডাক্তার। চারিদিকে চাপাকণ্ঠে রটিছে কুকথা।
উৎকট কার্য্যের ফল দেখা দেয় উৎকট লক্ষণে।
পাপভারাক্রান্ত চিত্ত আপন গোপন পাপ
জানায় বধির উপাধানে। চিকিৎসা হইতে এঁর
বেশী প্রয়োজন ধর্মমতে শান্তি স্বস্ত্যয়নে।
ভগবান, ভগবান, ক্ষমা কর আমাদের সকলের পাপ।
সাবধানে সেবা কর, চোখে চোখে রেখো,
দেখো যেন নাহি ঘটে কোন দুর্ঘটনা।
যা দেখিনু চিত্ত মোর হইল বিকল,
ভাবিতেছি বহু কথা, রসনা অচল।
শুভরাত্রি তবে।
সেবিকা। শুভরাত্রি। [প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

ডানসিনেন-সন্নিহিত স্থান

(মেন্‌টিথ, কেদনেস্, এ্যাংগস্, লেনক্স ও সৈন্যগণ)

মেন্। ম্যালকমের অধীনস্থ ইংরাজবাহিনী হ'ল সন্নিকট,
পিতৃব্য স্যুয়ার্ড আর ম্যাকডফ্ সহায়।
প্রতিহিংসা জ্বলিছে অন্তরে সবাকার;
যে দারুণ অত্যাচার হ'ল অনুষ্ঠিত, মড়া তাহে
বেঁচে উঠে ছুটে রণস্থলে বুকের শোণিত দিয়ে
জিনিতে সমর।
এ্যাংগস্। বীর্ণাম অরণ্য পাশে সাক্ষাৎ মিলিবে তাহাদের।
ওই পথে আসিতেছে তারা।
কেদ্। কে জানে ভাইএর সাথে
ডোনালবেন আছে কিনা আছে।
লেনক্স। জানি আমি তিনি সাথে নাই।
পদস্থ যাহারা আসে, আছে মোর নামের তালিকা।
স্যুয়ার্ডের পুত্র আছে সাথে, আরও আছে
শ্মশ্রুহীন অনেক তরুণ, বীরত্বে কেহই নহে ন্যূন।
মেন্। কি করিছে দুঃশাসক রাজা?
কেদ্। দৃঢ়তর করিতেছে দুর্গ ডানসিনেন্।
কেহ বলে হ'য়েছে উন্মাদ; যারা তারে
ঘৃণা নাহি করে আজও, তারা বলে
ক্রোধোচিত উন্মাদনা ইহা। কিন্তু এও সুনিশ্চয়,
বিশৃঙ্খল নিজ দলে বাঁধিতে সে পারিছে না
শাসন-শৃঙ্খলে।
এ্যাংগস্। যত গুপ্তহত্যা তার লিপ্ত আছে হাতে,
আজ তা করিছে অনুভব। সৈন্যদলে পলে পলে
চ'লেছে ভাঙন, স্মরণ করায়ে দিয়া গূঢ় তিরস্কারে
নিজ কৃতঘ্নতা। যারা আছে তাহার অধীনে,
তারা শুধু আজ্ঞাদাস, প্রীতি নাই কাহারও অন্তরে!
রাজোপাধি আজ আর মানায় না তারে,
বামনের অঙ্গে যেন ঢলঢোলে বীরের পোষাক।
মেন্। যে চিত্ত পীড়িত নিত্য গ্লানি ও ধিক্কারে,
সে চিত্ত শিহরে যদি সংকোচে ও ত্রাসে,
কি বা তার অপরাধ?
কেদ্। চল মোরা যাই, সত্যপথে আনুগত্য নিত্য
প্রাপ্য যাঁর, চল তাঁরই পাশে। রুগ্ন এ দেশের
আজি তিনি মহৌষধি। তাঁরই কাজে আমাদের
প্রতি বিন্দু ঢালি, ব্যাধিমুক্ত করি জন্মভূমি।
লেনক্স। ফুটাইতে পুষ্পরাজে আগাছা মারিয়া
যে হিমকণার আজ আছে প্রয়োজন,
ঢালিতে তা হবে আমাদের।
চল যাই বীর্ণাম অরণ্য অভিমুখে।
[সামরিক পদক্ষেপে প্রস্থান

৩য় দৃশ্য

ডান্‌সিনেন দুর্গমধ্যস্থ একটি কক্ষ

(ম্যাকবেথ, ডাক্তার এবং অনুচরগণের প্রবেশ)

ম্যাক। আর কোন সংবাদ এনো না মোর কাছে।
যেতে দাও, ওরা সব ছেড়ে চলে যাক্।
যতক্ষণ, বীর্ণাম অরণ্য নাহি আসে ডান্‌সিনেনে
ততক্ষণ নাহি মোর ভয়। কে বা সে বালক ম্যালকম্?
নারী কি দেয় নি জন্ম তারে? মানুষের
সকল ভবিষ্য যারা জানে, সেই ডাকিনীর দল
করিল ঘোষণা, "ভয় নাই ম্যাকবেথ, নারী
যারে জন্ম দিল হেন কারো হাতে ভয় নাই তব।"
পলা তবে, বেইমান সর্দার যত, পলা তোরা
উদরসর্বস্ব ওই ইংরাজের দলে।

যে চিত্ত চালায় মোরে, যে হৃদয় বহি বক্ষোমাঝে,
তারা কভু নত নাহি হইবে সংশয়ে,
কিম্বা কাঁপিবে না ত্রাসে।
(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)
অমন ফ্যাকাশে মুখে কোথা হ'তে এলি?
যমালয়ে ছিল নাকি ঠাঁই? কি চেহারা!
ভয়ে ভয়ে একেবারে শ্বেত পাতিহাঁস!
ভৃত্য। ওখানেতে দশ হাজার—
ম্যাক। পাতিহাঁস? পাজির পাঝাড়া!
ভৃত্য। সৈন্য প্রভু!
ম্যাক। দূর হ'! ঘসে আয় মুখখানা, রক্ত ফুটে
যদি রং ফেরে। মুখ না ছাইএর গাদা! কাপুরুষ!
কোন্ সৈন্য? যম কি ভুলেছে তোরে?
ফ্যাকাশে ও গাল দুটো ডেকে আনে ভয়।
কোন্ সৈন্য, বল?
ভৃত্য। হুজুর ইংরাজ-সৈন্য।
ম্যাক। সরে যা সম্মুখ হ'তে।
[ভৃত্যের প্রস্থান।
সেটন্! বুক দমে যায়, দেখি যবে—
এই সেটন্! এ ধাক্কায় হয় মোরে চিরতরে
বসাবে গদীতে, নয় ঠেলে ফেলে দেবে।
বহু কাল বেঁচে আছি, জীবন শুকায়ে এল
পাণ্ডু পত্র সম; সম্মান, বশ্যতা, প্রীতি,
বন্ধুবৎসলতা, বার্দ্ধক্যের যা কিছু সম্বল,
সে সব আমার নহে। মোর প্রাপ্য—
অস্ফুট গভীর অভিশাপ, মৌখিক সম্মান,
আন্তরিকতাবিহীন ভীরুর ভয়ের তোষামোদ।
সেটন্!
(সেটনের প্রবেশ)
সেটন্। প্রভুর কি অভিপ্রায়?
ম্যাক। নূতন খবর কিছু আছে?
সেটন্। যা যা শোনা গিয়েছিল, সব সত্য প্রভু!
ম্যাক্। অস্থি হ'তে মাংস মোর নেবে খুড়ে খুড়ে
তখনও যুঝিব আমি। বর্ম দাও মোর।
সেটন। সে সময় এখনো আসেনি।
ম্যাক। এখনই পরিতে চাই। পাঠাও নূতন অশ্বসাদী,
চারিদিকে করুক সন্ধান, ফাঁসি দিক্ ধোরে ধোরে
ভয়ের গুজব যারা করে। দাও, বর্ম দাও মোর।
কি ডাক্তার, তোমার রোগীর কি খবর?
ডাক্তার। রোগ ত এমন কিছু নয় মহারাজ! এলোমেলো
কল্পনার ভীড়ে ঘটাইছে মনের বিকার, তাই
তিনি পান না বিশ্রাম।
ম্যাক। কর তারে নিরাময়। ডাক্তার!
পার না কি রুগ্ন মনে করিতে নীরোগ,
স্মৃতি হ'তে উপাড়িতে ব্যথার শিকড়,
ঘ'সে তুলে ফেলে দিতে মগজের দুশ্চিন্তা-লিখন,
আর তার পরে,
সকল-ভুলানো কোন মিষ্ট মহৌষধে
পার না কি ঘুচাতে দুর্ভর হৃদিভার
যে ভারে ভাঙিয়া পড়ে বুক?
ডাক্তার। রোগীর নিজেরই হাতে এর প্রতিকার।
ম্যাক্। তোমার দাওয়াই তবে ছুড়ে ফেলে দাও,
ওতে মোর নাহি প্রয়োজন। এস, পরাইয়ে দাও
বর্ম মোরে; দাও রাজদণ্ড। সেটন্,
এখনই পাঠাও সৈন্যদল। ডাক্তার,
সর্দারেরা ছেড়ে যায় মোরে। কর ত্বরা।
ডাক্তার, পারিতে যদি নাড়ী পরীক্ষিয়া—
ধরিতে এ দেশটার রোগ, যদি সে পাইত ফিরে
পূর্বস্বাস্থ্য তার বিরেচক ঔষধে তোমার,
হেন উচ্চ সাধুবাদ দিতাম তোমায়
ফিরে ফিরে আসিত তা প্রতিধ্বনি মুখে।
আঃ, খুলে ফেল বর্ম মোর।
হরীতকী, জয়পাল, নাই কি এমন কোন রেচক ভেষজ
দেশ হ'তে ইংরাজ তাড়ায়? শুনেছ ত
তাহাদের কথা?
ডাক্তার। হ্যাঁ প্রভু, আপনারই সমরাভিযানে
কিছু কিছু পেয়েছি সংবাদ।
ম্যাক। নিয়ে এস সাথে সাথে।
মৃত্যু কিম্বা ধ্বংসে নাহি ডরে মোর মন,
ডান্‌সিনেনে না আসিলে বীর্ণাম কানন।
ডাক্তার। (স্বগত) ডান্‌সিনেন্ ছাড়িতে পারিলে একবার
এমুখো হব না কোন প্রয়োজনে আর।
[প্রস্থান

৪র্থ দৃশ্য

বীর্ণাম অরণ্যের নিকটবর্তী স্থান

(পতাকা ও বাদ্যভাণ্ড। ম্যালকম, বৃদ্ধ স্যুয়ার্ড ও তাঁহার পুত্র ম্যাকডফ, মেন্‌টিথ, কেদ্‌নেস, এ্যাংগস, লেনক্স, রস ও সৈন্যগণ—যুদ্ধসজ্জায়)

ম্যাল। ভ্রাতৃগণ, যেদিন প্রতিটি গৃহ হবে নিরাপদ
সেদিন আগতপ্রায়।
মেন্। নাহিক সংশয়।
স্যুয়ার্ড। কোন্ বন সম্মুখে মোদের?
মেন্। বীর্ণামের বন।
ম্যাল। সৈন্যেরা প্রত্যেকে যেন এক একটা ডাল কেটে নিয়ে
ঢেকে চলে নিজ নিজ দেহ। তা হ'লে
মোদের সংখ্যা রহিবে গোপন, শত্রুচর
বুঝিবে না সৈন্যবল কত।
সৈন্যগণ। তাই হবে!
স্যুয়ার্ড। দুঃশাসক ম্যাকবেথ নিশ্চিন্ত নির্ভরে
সুরক্ষিত ডানসিনেনে রহি, অপেক্ষা করিছে আক্রমণ!
এ ছাড়া সংবাদ কিছু নাই।

ম্যাল। সেই তার পরম ভরসা। ছোট বড়, যেখানে যে
পেয়েছে সুযোগ, ছাড়িয়া এসেছে তারে ;
এখনও যাহারা আছে দলে,
নিতান্ত অনিচ্ছাভরে আছে শুধু শাসনের ডরে।
ম্যাক্ড। ফল দেখে করা যাবে কাজের বিচার ;
দৃঢ়পদে চল যাই ক্ষত্রোচিত পথে।
স্যুয়ার্ড। হিসাব নিকাশ হ'লে দ্রুত যাবে জানা
আমাদের ভাগ্যে শেষ দেনা কি পাওনা।
বৃথা জল্পনায় শুধু বৃথা আশা জাগে,
পাইতে নিশ্চিত ফল বাহুবলই লাগে।
চল যুদ্ধে নামি।

[সামরিক পদক্ষেপে প্রস্থান।

৫ম দৃশ্য

ডানসিনেন দুর্গের অভ্যন্তর

(পতাকা ও বাদ্যভাণ্ড। ম্যাকবেথ, সেটন্ ও সৈন্যগণ)

ম্যাক। দুর্গের প্রাচীরচূড়ে উড়াও নিশান।
'এল এল' ধ্বনি উঠে শুনি। সুরক্ষিত এই দুর্গ
হাসিয়া উড়াবে অবরোধ। আসিছে মরিতে তারা
রোগে ও ক্ষুধায়, কাতারে কাতারে চারিধারে।
আমার সহায় যারা, তারা যদি নাহি দিত
রিপুদলে যোগ, বাহিরিয়া বীর্য্যভরে
মুখোমুখি করিতাম রণ, শত্রুদলে দিতাম খেদায়ে।

(ভিতরে স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি)

ও কিসের শব্দ ?
সেটন্। স্ত্রী-কণ্ঠে রোদনধ্বনি প্রভু ! [প্রস্থান।
ম্যাক। আমি প্রায় ভূলে গেছি ভয়ের আস্বাদ ;
ছিল দিন, সর্বস্নায়ু উঠিত কাঁপিয়া
শুনিলে রাতের কান্না বিভীষিকাময়,
খাড়া হয়ে উঠিত দাঁড়ায়ে সমস্ত মাথার চুল
প্রাণবান হয়ে। আতংকে অরুচি আজ—
আকণ্ঠ করিয়া তারে পান। হত্যার চিন্তার পথে
পরিচিত হ'ল মোর সর্ব বিভীষিকা,
ঘুচেছে তাদের ভয় তাই।

(সেটনের পুনঃপ্রবেশ)

কিসের ক্রন্দন ?
সেটন। মহারাজ, রাণীর ঘটিল মৃত্যু।
ম্যাক। পরেও ত এ মৃত্যু হ'তোই একদিন ; সেই পরে
এ সংবাদ পেলে হ'তো ভাল।
ধীরে অতি ধীরে ওই আসে আসে আসে
প্রতিটি আগামী কাল, আসে আর যায়
কালের পুঁথির পাতা শেষ যত দিনে ;
গত-কালগুলি চলে বাতি জ্বালাইয়া
দেখাইয়া মূঢ় নরে ধূলি-ছন্ন মরণের পথ।
নিবে যা, নিবে যা ক্ষীণ বাতি !
জীবন চলন্ত ছায়া, মূঢ় অভিনেতা
দম্ভভরে মঞ্চোপরে ঘুরি কিছুক্ষণ
চীৎকারে ভাঙিয়া গলা ডুবে যায় অবলুপ্তিমাঝে ;
শূন্যগর্ভ শব্দ আর উত্তেজনাভরা এ এক
নির্বোধমুখে কথিত কাহিনী
কোন অর্থ নাই যার।

(দূতের প্রবেশ)

এসেছ ত রসনার কণ্ডু নিবারিতে।
যা বলিবে ব'লে ফেল।
দূত। কি বলিব প্রভু, দেখেছি যা বলিতেই হবে,
কিন্তু নাহি জানি কেমনে বলিব।
ম্যাক। দয়া কোরে বল।
দূত। দাঁড়ায়ে পর্বতোপরে দিতেছি পাহারা,
চাহিনু বীর্ণাম পানে, সহসা দেখিনু যেন
সারা বন আসিছে চলিয়া।
ম্যাক। মিথ্যাবাদী, নরাধম !
দূত। মিথ্যা যদি হয় তবে বুক পেতে লব তব ক্রোধ।
দেড় ক্রোশ ব্যবধানে দেখিনু চাহিয়া,
সত্য কহি, চলন্ত অরণ্য।
ম্যাক। যদি মিথ্যা হয়, জীবন্ত টাঙাব তোরে
ওই বৃক্ষশাখে, শুকায়ে মরিবি তুই
ক্ষুধায় তৃষ্ণায়। আর যদি সত্য বোলে থাক,
ওই শাস্তি নিজে লব নিতান্ত হেলায়।
বল্গা টেনে যে বিশ্বাসে রুধি এতদিন
সংশয় জাগিছে তাহে আজ, শয়তানীরা
দ্ব্যর্থ বাণী কয়েছে আমায় সত্যরূপী মিথ্যা দিয়া।
"ভয় নাই যত দিন বীর্ণামের বন নাহি আসে ডানসিনেনে",
এখন সে বন আসে ডানসিনেন পানে।
অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও, যুদ্ধযাত্রা কর !
সত্য যদি হয় এই দূতের বচন,
অসম্ভব—ব'সে থাকা কিম্বা পলায়ন।
এই সৃষ্টি, যেন ভাল নাহি লাগে আর,
লুপ্ত হ'য়ে যাক্ আজই এ বিশ্বব্যাপার।
বাজাও পাগলাঘণ্টি, জাগ প্রভঞ্জন !
ধ্বংসমুখে বর্মবুকে বরিব মরণ।

[প্রস্থান।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

ডানসিনেন দুর্গের সম্মুখ

(পতাকা ও বাদ্যভাণ্ড। ম্যালকম, স্যুয়ার্ড, ম্যাক্ডফ
এবং তাঁহাদের সৈন্যদল—বৃক্ষশাখা হস্তে)

ম্যাল। এখন এসেছি কাছে, খুলে ফেলে শাখা-আচ্ছাদন
নিজেদের করহ প্রকাশ। পূজনীয় খুল্লতাত,
আপনার যোগ্যপুত্র সহ প্রথমে করুন

আক্রমণ। পূর্বের ব্যবস্থামত আমি আর
ম্যাকডফ লইতেছি অন্য সব ভার।
স্যুয়ার্ড। বিদায় এখন। আজি রাত্রে ভেটি যেন
সসৈন্য ম্যাকবেথে। যদি তারে নারি পরাজিতে
পরাজয় বরি লব নিজে।
ম্যাক। বাজাও তুরী ও ভেরী কাড়া ও নাকাড়া,
রক্তসিক্ত মৃত্যুপথে অগ্রদূত তারা। [প্রস্থান।

৭ম দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের অপরাংশ। বাদ্যধ্বনি।

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

ম্যাক। ভালুকের মতো মোরে বাঁধিয়া খুঁটায়,
কুকুর লেলিয়ে দিল চারিদিক হ'তে,
পলাইব, সে উপায় নাই; লড়িতে হইবে
ঠিক ভালুকেরই মতো। নারীতে দেয় নি জন্ম
সে নর কোথায়? তারে ছাড়া কারে মোর ভয়?

(তরুণ স্যুয়ার্ডের প্রবেশ)

স্যুয়ার্ড। কি নাম তোমার?
ম্যাক। শুনে ভয় পাবে।
স্যুয়ার্ড। নরকে যে সব নাম আছে
তা হ'তে জঘন্য নাম ধর যদি তুমি,
তবু নাহি ডরি।
ম্যাক। মোর নাম—ম্যাকবেথ।
স্যুয়ার্ড। এর চেয়ে ঘৃণ্য নাম উচ্চারিতে পারিত না
স্বয়ং শয়তান।
ম্যাক। এর চেয়ে ভয়ংকর নামও নেই আর।
স্যুয়ার্ড। মিথ্যা কথা, ঘৃণ্য অত্যাচারী,
মোর তরবারি মুখে সে মিথ্যা করিব সপ্রমাণ।

(উভয়ের যুদ্ধ ও স্যুয়ার্ড নিহত)

ম্যাক। নারী তোরে জন্ম দিয়েছিল।
নারী জন্ম দিল তার অসি আস্ফালন,
হাসিয়া উড়াই আর দেখাই শমন।

[প্রস্থান।

(বাদ্যধ্বনি। ম্যাকডফের প্রবেশ)

ম্যাকডফ। এই দিকে শব্দ শুনেছিনু।
মুখ দেখা ওরে অত্যাচারী; মোর অস্ত্রাঘাত বিনা
যদি তুই হত হোস আর কারও হাতে,
শান্তি নাহি দিবে মোরে স্ত্রীপুত্রের প্রেতাত্মা আমার।
কি হইবে প্রাণে মেরে যত তোর
অধম ভাড়াটে সৈন্যগণে?
হয় তুই আয় ম্যাকবেথ, নহে কোষবদ্ধ করি
অক্ষত অক্ষম মোর অসি।
ওখানে তুমুল শব্দ শুনি, মনে হয় আছে কোন
বিশিষ্ট নায়ক; হয়ত আছিস্ তুই!
ওগো ভাগ্যদেব, তার সাথে করাও সাক্ষাৎ,
অন্য কিছু নাহি চাহি আমি।

[প্রস্থান।

(ম্যালকম ও বৃদ্ধ স্যুয়ার্ডের প্রবেশ)

স্যুয়ার্ড। এ পথে আসুন; অনায়াসে দুর্গ আজ হ'ল অধিকৃত।
বিপক্ষের সৈন্যদল যুঝিল উভয় পক্ষে;
যুঝিল সর্দারবৃন্দ অতুল সাহসে।
জয় তব করায়ত্ত-প্রায়, সাঙ্গ হ'ল যত করণীয়।
ম্যাল। শত্রুসৈন্যে বহু লোক যুঝিল মোদের পক্ষ হ'য়ে।
স্যুয়ার্ড। দুর্গমাঝে করুন প্রবেশ।

[প্রস্থান।

৮ম দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

ম্যাক। মূঢ় রোমীয়ের মতো কেন বা মরিতে যাব
নিজ অসি মুখে? সে অসি হানি না কেন
চারিদিকে অরাতির বুকে।

(ম্যাকডফের প্রবেশ)

ম্যাকডফ। ফিরে দাঁড়া, ফিরে দাঁড়া, নরক-কুক্কুর!
ম্যাকবেথ। সকলের মাঝে আমি তোরেই এড়ায়ে চলি আজ।
সরে যা সম্মুখ হ'তে, তোরি রক্তে এ অন্তর
একান্ত পীড়িত।
ম্যাকডফ। বাক্য নাহি জানি আমি। অসিমুখে শুনিবারে
পাবি মোর বাণী। বাক্যের অতীত তুই
শোণিত-পিশাচ!

(উভয়ের যুদ্ধ)

ম্যাকবেথ। কেন এই পণ্ডশ্রম তোর? অচ্ছেদ্য বাতাসও যদি
ছিন্ন হয় ওই অসিধারে, তথাপি এ দেহে
নাহি হবে রক্তপাত। মর্ত্যজনে হান্ তরবারি;
মোর প্রাণ দৈবসুরক্ষিত, নারী যারে জন্ম দিল
হেন কারো হাতে নাহি তার নাশ।
ম্যাকডফ। সে দৈবভরসা তবে ছাড়; যে পিশাচে
এতদিন করিনি অর্চনা, সে তোরে
জানায়ে দিক আজ,—অকালে লভিল জন্ম
এই ম্যাকডফ জননীর উদর ফাড়িয়া।
ম্যাকবেথ। ধ্বংসে যাক্ সে রসনা এ কথা করিল উচ্চারণ
সে যে মোর পৌরুষে করিল কাপুরুষ!
দ্ব্যর্থক ভাষায় যারা ভুলায় মানুষে
সে সব পিশাচে যেন কেহ আর না করে প্রত্যয়।
কানে দিয়ে মিষ্ট প্রতিশ্রুতি, কার্যকালে
ভাঙে বুক নৈরাশ্য জাগায়ে!
তোর সাথে যুঝিব না আর।

ম্যাকডফ। কাপুরুষ, কর তবে আত্মসমর্পণ,
বাঁচিয়া রহিবি শুধু এ যুগের দর্শনীয় হ'য়ে।
তোরে নিয়ে খুলে দিব মেলা, নিশানে
অঙ্কিত করি মূর্তি তোর লিখে দিব তাতে
"দেখে যাও এইখানে অত্যাচারী অদ্ভুত পিশাচ।"
ম্যাকবেথ। করিব না আত্মসমর্পণ, চুম্বিতে চরণধূলি
শিশু ম্যালকমের, সহিতে বিদ্রূপজ্বালা
ঘৃণ্য জনতার। যদিও বীর্ণাম বন
এল ড্যানসিনেনে, নারীগর্ভ-অসঞ্জাত তুই
ম্যাকডফ যদিও দ্বৈরথে মোরে করিলি আহ্বান,
তথাপি করিব আজি শেষ চেষ্টা আজ।
বর্মে চর্মে বীর সাজে দাঁড়াইনু সম্মুখ সমরে,
অসি হস্তে আয় ম্যাকডফ, যে প্রথমে
চাবে ক্ষমা 'আর না' বলিয়া, নরকস্থ
হয় যেন সেই।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(পশ্চাদপসরণ সূচক বাদ্যধ্বনি। বাদ্যভাণ্ড ও পতাকাসহ ম্যালকম, বৃদ্ধ স্যুয়ার্ড, রস, অন্যান্য সর্দারগণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ম্যাল। যে সব সুহৃদগণে পাই নি খুঁজিয়া, আশা করি
নির্বিঘ্নে ফিরেছে তারা সবে।
স্যুয়ার্ড। কিছু খোয়া যাবে সুনিশ্চয়। তবু যারা
ফিরেছে এখানে, দেখে মনে হয়, স্বল্পক্ষয়ে
জিনিয়াছি এই মহারণ।
ম্যাল। ফিরে নাই ম্যাকডফ,
ফিরে নাই আপনার সুযোগ্য তনয়।
রস্। দেব! পুত্র তব শুধিয়াছে ক্ষত্রিয়ের ঋণ।
বয়সে বালক তবু সাহসে যুবক ;
নির্ভয়ে করিয়া রণ অতুল বিক্রমে
বীরের মতন দিল প্রাণ।
স্যুয়ার্ড। তা হ'লে সে নাই?
রস্। রণভূমি হ'তে দেহ হ'য়েছে আনীত।
শোক যদি কর দেব পুত্রগুণ স্মরি'
সে শোকের না রহিবে পার।
স্যুয়ার্ড। অস্ত্রক্ষত ছিল কি সম্মুখে?
রস্। বক্ষস্থলে দেব!
স্যুয়ার্ড। ক্ষত্রধর্ম পালি তবে গেছে স্বর্গলোকে।
যত কেশ শিরে আছে, তত পুত্র থাকিলে আমার
হেন গৌরবের মৃত্যু তা সবার হ'ত কাম্য মোর।
তার কথা ফুরাল এবার।
ম্যাল। শোক তার আরও মূল্যবান,
সেই মূল্য দিব তারে আমি।
স্যুয়ার্ড। এর বেশী প্রাপ্য নহে তার। শুনিলাম
করিল সে সসম্মান মরণ বরণ
শোধ করি জীবনের ঋণ, ঈশ্বরের পদপ্রান্তে
থাক সে এখন।
আসে ঐ নূতন সান্ত্বনা।

(ম্যাকবেথের মুণ্ড হস্তে ম্যাকডফের প্রবেশ)

ম্যাকডফ। হে রাজন্! রাজসম্বোধনে আজ সম্বোধি তোমায়,
এই দেখ রাজ্য-অপহারকের অভিশপ্ত শির।
এল দিন সম্পূর্ণ স্বাধীন। জানি সুনিশ্চয়,
রাজ্যের রতন যত রয়েছে এখানে
মোর সাথে তোমারেই বরিছে অন্তরে।
তাদের প্রাণের কথা বাণী পাক্ মোর সম্বোধনে।
জয় জয় স্কটল্যাণ্ডের রাজা!
সকলে। জয় জয় স্কটল্যাণ্ডের রাজা!
ম্যাল। হে মোর সামন্ত আর আত্মীয় নিচয়,
তোমাদের প্রীতিঋণ অচিরে করিব পরিশোধ।
'আর্ল'-উপাধিতে সবে করিনু ভূষিত।
দুঃশাসক অত্যাচারে যে সব সুহৃৎগণ
ছাড়ে জন্মভূমি, তাদের ফিরাতে হবে অতি সমাদরে।
ওই ঘৃণ্য ঘাতকের, আর তার পৈশাচিক সহধর্মিণীর
ছিল যারা প্রত্যক্ষ সহায়, বিধিমত শাস্তি তারা
অবশ্য পাইবে। শুনিলাম সে পিশাচী
আপন নির্মম করে আপনারে করিল বিনাশ।
এখনও রয়েছে বহু কর্তব্য রাজার,
সে সব সাধিব আমি যথাবিধি সময়ে সুযোগে।
ধন্যবাদ জানাই সবারে ; স্কোনে হবে
অভিষেক, সকলের নিমন্ত্রণ রহিল সেথায়।

শেষ

ভক্তের প্রার্থনা

"প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে, আমি দরিদ্র, আমি অকিঞ্চন, আমার দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।" ইহাই ভক্ত-হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন কি, মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগসুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ঈশ্বরের আক্ষরিক প্রতীক

শ্রীমৃণাল পাল চৌধুরী

হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্র চারি ভাগে বিভক্ত ; যথা—(১) ধ্যানমন্ত্র, (২) পূজামন্ত্র, (৩) প্রণামমন্ত্র এবং (৪) স্তব বা প্রার্থনামন্ত্র। পূজামন্ত্রের অন্য নাম বীজমন্ত্র। বীজমন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত—পুরুষ ও স্ত্রী।

ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার। ঈশ্বরের এই উভয়বিধ রূপকেই গ্রহণ করা হয় মন্ত্রে ; যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণে প্রভেদ নাই তেমনই নাম ও নামীতে অভেদ। সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বরূপেই মন্ত্রবদ্ধ। মন্ত্ররূপে ঈশ্বরলাভ হয়। জপ দুই প্রকার—'সংখ্যা জপ' ও 'অজপা জপ' অর্থাৎ শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ। এই দুই প্রকার জপেই সাধারণতঃ বীজমন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

মন্ত্রোপাসনায় সহায়ক ঈশ্বরের যে সকল প্রতীক মনুষ্য-সমাজে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, সেগুলি কোন না কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমা। [illegible] শালগ্রামশিলা, শিবলিঙ্গ, গঙ্গা, মণি, যন্ত্র, ধর্ম্মগ্রন্থ, ঘট, জল এবং পুষ্পই সাধারণতঃ ঈশ্বরের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে যে সকল প্রতীক ঈশ্বরের স্মারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আক্ষরিক। বেদে ও তন্ত্রে, প্রধানতঃ ঈশ্বরের তিনটি আক্ষরিক প্রতীকের সর্ব্বত্র উল্লেখ আছে। আক্ষরিক প্রতীক তিনটি—ওঁ, শ্রীঃ ও হুং বা হং। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি সর্ব্বজন-পরিচিত এবং প্রায় সর্ব্বমন্ত্রের অগ্রভাগে উচ্চারিত হয়। শেষের দুইটি অল্প পরিচিত।

ঈশ্বর ত্রেধাত্মা—সৃজনকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও ধ্বংসকর্ত্তা। 'তিনে এক, একে তিন'। পুরাণমতে, সৃজনকর্ত্তার নাম ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তার নাম বিষ্ণু এবং ধ্বংসকর্ত্তার নাম মহেশ্বর। এই দেবতাত্রয় বিবাহিত। ইঁহাদের স্ত্রীদের নাম যথাক্রমে বিদ্যারূপিণী সরস্বতী, ঐশ্বর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী এবং শক্তিরূপিণী দুর্গা। এই দেবীত্রয় যথাক্রমে ঈশ্বরের চিৎশক্তি, হ্লাদিনীশক্তি ও তটস্থাশক্তির প্রতিনিধিস্বরূপা। আকাশ বা স্বর্গ তাঁহাদের বাসস্থান। ওঁ, শ্রীঃ ও হুং বা হং—এই আক্ষরিক প্রতীক তিনটিতে ঈশ্বরের ত্রিরূপ, ত্রিশক্তি ও অবস্থানস্থল যথাক্রমে একত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের যৌথ আক্ষরিক প্রতীক—'ওঁ'। ওঁ পুংলিঙ্গ শব্দ। 'ওঁ' অর্থ অ (অর্থ—ব্রহ্মা) + উ (অর্থ—বিষ্ণু) + ম্ (অর্থ—মহেশ্বর)। সেইরূপ তাঁহাদের স্ত্রী সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং দুর্গার যৌথ আক্ষরিক প্রতীক—শ্রীঃ। 'শ্রীঃ' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। 'শ্রীঃ' অর্থ শ (অর্থ—সরস্বতী) + র্ (অর্থ—রমা বা লক্ষ্মী) + ঈঃ (অর্থ—ঈশ্বরী বা দুর্গা)। 'ওঁ' এবং 'শ্রীঃ' শব্দদ্বয় বৈদিক। পরবর্ত্তী কালে তন্ত্রগুলিতে ওঁ এবং শ্রীঃ ব্যতীত হুং নামে আর একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রগুলি স্বর্গস্থ মহেশ্বর মহেশ্বরীর কথোপকথনাকারে রচিত। স্বর্গস্থ মহেশ্বর মহেশ্বরী বা ঈশ্বর ঈশ্বরীর আক্ষরিক প্রতীক 'হুং'। 'হুং' দ্বৈতবাদমূলক শব্দ। 'হুং' অর্থ হ্ (অর্থ স্বর্গ) + উ (অর্থ বৈদিক মহেশ্বর বা ঈশ্বর) + উম (উম্ শব্দের উৎপত্তি উমা হইতে। উমার অন্য নাম মহেশ্বরী, তিনি ঈশ্বরী।) কথায় বলে, জপসিদ্ধ সমাধিবান সাধকগণ 'হাঁ' করিয়া 'হুং' দেখান। তাহার অর্থ এইরূপ—মুখব্যাদান করিলে ওষ্ঠদ্বয় গোলাকার হয়। ঐরূপ ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়া জিহ্বা এবং আলাজিহ্বা দেখা যায়। গোলাকার ওষ্ঠদ্বয় শূন্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হ্ অর্থাৎ স্বর্গ বুঝায়, জিহ্বা স্ত্রীযোনির প্রতীক এবং আলাজিহ্বা পুরুষযোনির প্রতীক, সেই সূত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ মহেশ্বরী ও মহেশ্বরকে বুঝায়। এই ভাবে স্বর্গস্থ মহেশ্বরীকে 'হাঁ'এর মধ্যে দেখান হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বালক বয়সে বৃন্দাবনে পালিকা মাতা যশোদাকে এই ভাবে হাঁ মধ্যে বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিশ্বস্থ প্রকৃতি-পুরুষকে দেখাইয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদীরা 'হুং' শব্দকে অপভ্রংশে 'হং'রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। 'হুং'এর মতই 'হং' অর্থ হ (অর্থ স্বর্গ) + অ (অর্থ বিষ্ণু বা মহেশ্বর) + ম্ (অর্থ মহেশ্বরী)—অর্থাৎ স্বর্গস্থ মহেশ্বর মহেশ্বরী। 'হুঃ' এবং 'হং'এর একই অর্থ হইলেও 'হুং' শব্দ দ্বৈতবাদমূলক এবং 'হং' শব্দ অদ্বৈতবাদমূলক। কারণ, এখানে 'হং' তাঁহাদের 'সোঽহং' মন্ত্রের 'অহং'এর শেষ ভাগ। জপে সিদ্ধিলাভের পর সমাধি কালে তাঁহারা 'সোঽহং' হইতে প্রাপ্ত 'হং' শব্দ (হিন্দি হম্, অর্থ আমি। অন্যত্র 'হ' অর্থ শিব বা বিষ্ণু) সংক্ষেপে আমি শিব বা বিষ্ণু অর্থাৎ ঈশ্বর অর্থে আক্ষরিক প্রতীকরূপে জপ করেন। বৌদ্ধ অদ্বৈতবাদিগণ সোজাসুজি শূন্যবাদী। তাঁহারা ঈশ্বরকে 'শূন্য' জ্ঞানে পূজা করেন এবং সেই অর্থে 'হং' শব্দ অন্য মন্ত্রের সহিত জপ করেন।

আর একটি অক্ষর 'ঈশ্বরীয়' না 'স্বর্গীয়' অর্থে হিন্দুসমাজে বহুকাল ধরিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা (চন্দ্রবিন্দু)। ইহা ওঁএর অর্থাৎ ম্ ; মহেশ্বর অর্থে ব্যবহৃত। মৃত্যুর পর মর্ত্ত্যবাসী প্রাণিগণের শিবলোক বা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, যেহেতু শিব বা মহেশ্বর ধ্বংসের দেবতা। সেই কারণে ৺—মহেশ্বরের নামের আক্ষরিক প্রতীক পরলোকগত বা স্বর্গগত মর্ত্ত্যবাসী মনুষ্য ও অমর্ত্ত্যবাসী দেবদেবীগণের নাম লিখিবার সময় নামের পূর্ব্বে লিখিত হয়। লৌকিক আচারের ভাষায় বলিতে গেলে,—'চন্দ্রে বা পরলোকে গত বিন্দু বা রস বা জীবনীশক্তি'—এই অর্থে চন্দ্রবিন্দু—আক্ষরিক প্রতীকরূপে মৃত ব্যক্তিদের নামের পূর্ব্বে লিখিত হয়। এক কথায় যাহা কিছু স্বর্গগত বা স্বর্গীয়, তাহাদের সকলের নামের পূর্ব্বেই '৺'—আক্ষরিক প্রতীকরূপে লেখা পৌরাণিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যধামে লোকাচারে চলিয়া আসিতেছে। সিদ্ধ সাধকগণ সেই কারণে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপী বিন্দু বা তাহার আক্ষরিক প্রতীক '৺' চিহ্ন স্থাপনগ্রহণ পূর্ব্বক জীবদ্দশাতে সমাধিলাভ অভ্যাস করেন।

প্রশ্ন

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

যুগ-যুগ নাকি মানব-হৃদয় তোমার দরশকামী।
হেরিব তোমায় কেমন করিয়া নিখিল ভুবনস্বামী।
যখন যে পথে যাই,
যখন যে দিকে চাই,
তোমারে কেবল আড়াল করিয়া দাঁড়ায় আমার আমি।

"আমার-আমার" তনু-মনে-ভরা সকল সুখে ও শোকে
একাকার ক'রে গড়েছ যে তুমি আমার আমিত্বকে।
ভরেছ আমার মনে
বাসনা-সিংহাসনে—
প্রাসাদ সাজানো ভোগ-সম্পদ-স্বপন দিবস-যামী।

শত প্রলোভনে বন্দী করিয়া রুধিয়াছ মোর দ্বার,
শত্রু রেখেছ মিত্রের বেশে আমার অহংকার।
যশ-মর্যাদা লোভে
রাজবেশ যেন শোভে,—
এ বেশ ছাড়িয়া কেমন করিয়া পথের ধূলায় নামি।

কত রূপ-রস সুরভি-পরশ সুরের বিলাসে ভ'রে
রত্নের মতো ষড়রিপু-হারে তুমিই সাজালে মোরে।
গরল-মেশানো সুধা
মিটেও মেটে না ক্ষুধা,—
এ ক্ষুধা ভুলিয়া কেমন করিয়া হবো তোমা অনুগামী।

ব্যথা দিয়ে তুমি ডাকো বুঝি যবে নয়নের জলে ভাসি,
তোমারি রচিত সুখের মায়ায় আবার উঠি যে হাসি।
নয়ন কেবলি ভোলে,
হৃদয় কেবলি দোলে;
এর মাঝখানে তব আহ্বান শুনিতে কোথায় থামি।

জানি তুমি আছ জগৎ ব্যাপিয়া জীবনের দীপ জ্বেলে,
তোমার বিচারে সে আলো-আঁধারে তাকালে কী ভেদ মেলে।
তবু সাধু-অসাধুকে
সমান টানিয়া বুকে—
ভালোবাসি বলা মনে হয় যেন পুরোপুরি পাগলামি।

আমার "আমি"-ও করিতে কি পারে কোনো সাধুতার দাবি,
যত মান আর অভিমানে শুধু আপনারি কথা ভাবি।
অপরের অপমানে
কী বেদনা বাজে প্রাণে;—
তোমার এ জীব-জগতের প্রেমে পলাতক সে-আসামী।

সুখে বা দুঃখে কখনো তোমায় যদি ভালোবাসি বলি;
জ্ঞানপাপী আমি তোমাকে তো নয়—আমাকেই আমি ছলি,
তোমার সৃজন মেলা
ঘৃণায় করিয়া হেলা—
তব নাম নিয়ে গর্বিত হ'য়ে করিব কি ভণ্ডামি?

যুগে-যুগে যারা ঘোষিছে তোমার চির সাম্যের বাণী,
তব প্রেম আশে তাহাদেরো 'পরে পাশব আঘাত হানি।
এমন স্বার্থপর
এ মলিন অন্তর—
লুকাবো কেমন করিয়া তোমায় ওগো অন্তরযামী।

আমার এ গান কোনো অতি-মহামানবের গীতি নয়—
ধূলি-ধূসরিত জীবন-নাটকে মানুষের অভিনয়।
নাহি যেথা পাকা বাঁধ,
নাহি কোনো বনিয়াদ,
পদে পদে শুধু ফাটল-ধরানো সব রসাতলগামী।

শাসক-শাসিত তৃপ্ত-ক্ষুধিত স্বার্থের আলোড়নে—
খুঁজিছে তোমায় সকলে সবার বিরোধী দৃষ্টিকোণে।
খাদ্য-খাদকে প্রীতি
ঘটাবে সে-কোন নীতি,
কিছুতেই যেন ঘুচিবার নয় আমার এ-মূর্খামি।

দেশে দেশে শ্রেণী-বর্ণ-বিভেদী ধর্মের কলনাদে
যে তুমি ঘোষিত ঘৃণায়-প্রণয়ে পুণ্য-পাপের ফাঁদে,
নিশ্চিত জানি তাই
সে-তুমি কোথাও নাই;
শুধু দিকে দিকে মুখোশ-পরানো তোমার ছদ্মনামী।

আমার জীবনে তাই তো তোমায় স্বীকার করি না কভু,
তোমাকে পূজার কোনো যোগ্যতা নাহিক জেনেও তবু—
তোমার সভায় এসে
বসি' ভক্তের বেশে
ভাবের আবেগে এই কপটতা কেমনে ভাবিব দামী।
হেরিব তোমায় কেমন করিয়া নিখিল ভুবনস্বামী।

চীন দেখে এলাম

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোজ বসু

শহর উৎসব-সজ্জা পরেছে। কাল যা দেখেছি, সকালবেলা দেখি ভিন্ন একরূপ। এখন আরও চমকদার। আর এ শহর-জায়গা বলে নয়—শুনতে পাচ্ছি, কাগজে পড়ছি, দেশের তামাম জায়গা জুড়ে এই কাণ্ড।

দোকানের সামনে, বাড়ির দরজায় দরজায় লাল সিল্কের গেট বানিয়েছে। চীনের ঐ চিরকালের রেওয়াজ—আমোদ-স্ফূর্তিতে এন্তার লাল সিল্ক ওড়ায়। আর বিশ-তিরিশ হাত অন্তর লাউডস্পীকার। চতুর্দিক গমগম করছে। উৎসবের বাজনাবাদ্য এবং হৈ-হুল্লোড় ঘরে বসেই কানে যাবে! কিন্তু যা কাণ্ড—ঘরে থাকবে কি একটা মানুষ আনন্দের দিনে?

শান্তি-সম্মেলনে দেশ-দেশান্তরের মানুষ আসছে। জল স্থল আকাশ—সকল পথে আনাগোনা। আসছে এখনও—ঐ যে ইয়ং-পায়োনিয়ারেরা এবং একগাদা ফুলের তোড়া বাস বোঝাই হয়ে চলল এরোড্রোমে কিংবা রেল-ষ্টেশনে। উঃ, এতও পারে মানুষে! অবিরত অভ্যর্থনা। একটা দল আছে শুধু অভ্যর্থনা করতে। এদ্দিনে ফুল যা খরচ হল, শুধু সেই হিসাবটা ধরুন না। জমিয়ে রাখলে এক পাহাড় হয়ে যেতো।

দেশে দেশে মানুষের কত রং রূপ চেহারা পোশাক এবং আচার থাকতে পারে, এখন এই পিকিন শহরে পাদচারণা করেই আন্দাজ পেয়ে যাবেন। আর বাইরের মানুষ বলে কেন—চীন একাই তো প্রায় এক পৃথিবী! পাঁচ হাজার বছরের পাকা ইতিহাস আছে, সেই গুমরে তো বাঁচেন না—কিন্তু মরু জঙ্গল ও উপকূলে হেন জাতও আছে, এই সেদিন অবধি যারা হাজার হাজার বছর পিছনে ছিল। এখন অবস্থা পালটেছে অবশ্য—তারা সামনে এসেছে। চীনা মহাজাতির সমান হকদার—আর দশটা মানুষের সঙ্গে তাদের সমান ইজ্জত।

আসছেন তা-বড় তা-বড় বীর—কৃষক বীর, শ্রমিক বীর। কোরিয়ার যুদ্ধে যারা ভলাণ্টিয়ার হয়ে গেছে, মেয়েরাও আছে তার মধ্যে—তারা বিশ্বজনের কাছে তারা লড়াইয়ের টাটকা খবর ও চোখে-দেখা বৃত্তান্ত নিবেদন করবে। ইংরেজি নিউজ-বুলিটিন ও সাংহাই-নিউজ দিয়ে যায় আমাদের রোজ। তার মধ্যে দেখতে পাই, পাল্লা চলছে ফ্যাক্টরিতে-ফ্যাক্টরিতে। উৎসব-ক্ষণে কাজের পরিচয় দিতে হবে না? প্রাণপাত করে খেটেছে—যে কাজ এক বছরে করবার কথা, আট মাসে তা সেরেসুরে বসে আছে। কাজ দাও, আরও কাজ, আরও। পরম আন্তরিক তাদের পরম প্রিয় মাও-তুচিকে দেখাতে চায় কে কি করেছে দেশের জন্য। মাও, তোমার পিছনে আছি আমরা—চীনের আবালবৃদ্ধ সকলে। তুমি যা চেয়েছ তারও এগিয়ে আছি, এই দেখ!

জিনিষপত্রের বেচাকেনা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। পুজোর বাজার আর কি! আমাদের কলকাতায় এই হপ্তাখানেক আগেও যেমনটা ছিল। অনেক দুঃখ-ধান্দার পর দিন পেয়েছে—ঐ পরম দিনে জগৎবাসীর সামনে সেজেগুজে তারা অসামান্য হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়ানো বলি কেন—নেচে বেড়াবে, অফুরন্ত জীবন-প্রবাহে ভেসে ভেসে বেড়াবে। দিকে দিকে তার আয়োজন।

ঘরেতে ঘরেতে মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে। কি মাতামাতিটা করেছিলাম সাতচল্লিশ সনের পনেরই আগষ্ট দিনটায়। তার পরে মিইয়ে এলো বছরের পর বছর। রীতরক্ষার মতো এক একটা নিশান…তাই বা তোলে ক'জন? মনে থাকে না তারিখটা।

পুরানো দলিল পোড়ানো (চীনা উডকাট)

আমার জানা এক গ্রামে বাস্তুদের সর্দার আছেন, তাঁর কথাগুলো মনে পড়ছে। সর্দার মশায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। খুব তড়পাচ্ছিলেন। 'মনে আবার থাকে না! হাটে হাটে ঢেঁড়রা দিয়ে দিই—নিশান না তুললে কন্‌ট্রোলের চাল-কেরাসিন বন্ধ। তখন ঘরের চালে গাছের ডগায় সর্বত্র লোকে নিশান তুলে বেড়াবে। নিশান বেচেই কত জনে, দেখবেন, লাল হয়ে যাবে—দালানকোঠা তুলবে। কিন্তু সে সব কিছু যে হবার জো নেই, মেম্বাররা মত দেয় না—'

হোটেলের দরজায় কুমুদিনী মেহতা। দরজা থেকে নেমে লনের এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক একবার দেখে আসছেন।

শিগগির তৈরি হয়ে আসুন। দু-মিনিটের মধ্যে।

ছ'টার দেরি আছে এখনো—

হাত-মুখ নেড়ে কথা বলা শ্রীমতীর অভ্যাস। সেই ভঙ্গিতে বললেন, সময় বদলে গেছে। খবর পাঠিয়েছে, রওনা হতে হবে সাড়ে-পাঁচটায়। দুঃখ প্রকাশ করেছে এই গোলমালের জন্য।

কিন্তু সময় আছে মনে করে যাঁরা না ফিরবেন?

যাওয়া হবে না তাঁদের—

রায় দিয়ে তর-তর করে তিনি উপরে উঠে গেলেন। সময় বদলের খবর চাউর হয়ে গেছে এদিকে। হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটেছেন। একে দুয়ে তৈরি হয়ে নামতে শুরু করলেন আবার। নেমে এসে হলের ভিতর দাঁড়াচ্ছেন। সময় অতি-সংক্ষিপ্ত—এরই মধ্যে যেটুকু পারা গেছে। হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ক্রিম ঘসছেন—টেড়ি ঠিক করছেন কেউ কেউ। যে বঙ্গনন্দনকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোট-প্যান্ট ছাড়তে দেখি নি, তিনি দেখি ধুতি-কামিজে সেজেছেন, স্কন্ধোপরি শাল। মেয়েদের তো চেনাই দায়—এক এক পটের পরী হয়ে আসছেন বাহারের সাজ-পোশাকে। ক্ষিতীশ বলে, কত শাড়ি বয়ে এনেছে রে বাপু, ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানোর জন্য? তা দোষ দিলে হবে কেন—পাগড়ি বিহনে পেয়াদা অথবা খোলা বাদ দিয়ে চিংড়িমাছের কি বাকি থাকে বলুন? মুখের বাক্য শুনে বিতৃষ্ণা ধরলেও ঐ সাজের দৌলতে লোকে দেড় মিনিট কাল চেয়ে থাকবে অন্তত। আজকের এই সব শাড়ি এত দিনের মধ্যে অঙ্গে ধরেন নি—তোলা ছিল পরম দিনের জন্য। চাট্টিখানি কথা নয়—মাও-সে-তুঙের সঙ্গে এক ঘরে বসে খেতে হবে। আরও যদি কপালে থাকে, তিনি হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন সেকহ্যাণ্ডের জন্য। কিছু বলা যায় না। হাতের চেটোয় একটু ক্রিম ঘষে নেবেন নাকি?

আমার পোশাকেরও কিঞ্চিৎ রকমফের আছে। বিলকুল সাদা। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, এবং ধবধবে আলোয়ান। বলতে পারেন, কালো কালো হাত দু-খানা ঐ যে বেরিয়ে রইল সাদা হাতা উত্তীর্ণ হয়ে? ছন্দপতন ঠিকই—কিন্তু আমি তার কি করতে পারি বলুন? স্রষ্টা যে অনেক উর্ধ্বে থাকেন—কৃষ্ণ হাতের নাগালের ভিতর থাকলে উত্তম রূপ পরিচয় করা যেত।

সুরলোকের ক্রিয়াকর্মে নারদ ঢেঁকি চড়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ করতেন—আজকের ব্যাপারও প্রায় তাই। পাইকারি নিমন্ত্রণ সকলের। আর এক তাজ্জব—এত নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়েছে, সমস্ত হাতের চিত্রকর্ম—মাও-সে-তুঙের সই প্রত্যেকখানা চিঠিতে।

হোটেল থেকে সারবন্দি মোটরগাড়ি আর বাস চলল নিমন্ত্রিতদের নিয়ে। ডক্টর জ্ঞানচাঁদের পাশে আমি। জাঁদরেল পণ্ডিত, ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন—প্রদীপ তুলে চাঁদকে আমি আর কি দেখাব?

জ্ঞানচাঁদ বললেন এক আই. সি. এস. সাহিত্যিক আছেন বাংলায়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্নদাশঙ্কর রায়ই বটে! তাঁকে আমি জানি। লেখেন কেমন? তিনি এলে বেশ হত। মতামত যা-ই হোক, চোখ মেলে দেখলে তবে বিচারের সুবিধা হয়—

জনারণ্য পথের দু'ধারে। কি করে অভিনন্দন জানাবে, দিশে পায় না। উল্লাস ফেটে পড়ছে তাদের চোখে-মুখে। তাই তো ভাবি, কোন সে মন্ত্র যাতে সকল বয়সের মানুষকে মাতোয়ারা করে দেয়। মহাচীন, অতুলন তোমার প্রাণশক্তি—আশ্চর্য গতিতে এগিয়ে চলেছে সকল দিকে। সমস্ত মানি। কিন্তু আনন্দের যে প্লাবন দেখে এসেছি দেশের সর্বপ্রান্তে, সমস্ত কর্মোদ্যম ছাপিয়ে দিয়ে তারই হাস্যধ্বনি আজ এই লিখতে লিখতে আমার কানে বাজছে।

সেক্রেটারি-দলের একজন হলেন ধর। উপাধি দেখে আন্দাজ হয়েছিল বাঙালি, ডক্টর নীলরতন ধরের জ্ঞাতগুষ্ঠি কেউ হবেন বা! তা নয়, পাঞ্জাব-পুঙ্গব। এক তাজ্জব, হাসতে দেখিনি ভদ্রলোককে। হাসতে জানেন না, তা বলি নে; কিন্তু দগ্ধ চক্ষুর দর্শন-ভাগ্য হয় নি। চলতি বাসের মধ্যেই তিনি তালিম দিয়ে যাচ্ছেন সেই থেকে। নিমন্ত্রণ-চিঠি আছে তো সকলের সঙ্গে? ভাল করে দেখে নিন। পরখ করবে ওরা তন্নতন্ন করে, নামধাম দেখবে। আর আলোয়ান-ওভারকোট ইত্যাকার জবড়জং বস্ত্র নিয়ে ঢোকা যাবে না, বাইরে রেখে যেতে হবে…

ভয় ধরিয়ে দিলেন দস্তরমতো; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে শুনতে শুনতে। মাও-এর সঙ্গে এক দালানে ঢুকবার আগে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি সার্চ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কি প্রক্রিয়ায় কতক্ষণ ধরে চলবে, সেই এক ভাবনা। অবশ্য গাড়িতে

শ্রমিকরা নৈশ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে (চীনা রঙীণ উডকাট)

পাখী কেঁচো খাচ্ছে (শিল্পী চি পাই-সি)

দেখাও দিতে পারি নে। নতুন-চীন চক্ষুশূল অনেকেরই। গোটা দক্ষিণ ও পূব অঞ্চল জুড়ে বিস্তর সাধুজন জগদ্ধিতায় দল পাকাচ্ছেন গা ঢাকা দিয়ে। এই দুটো বছর আগে পঞ্চাশ সনের উৎসব-দিন নায়কগণ সহ গোটা থিয়েন-আন-মেন ডিনামাইটে উড়িয়ে দেবার নিখুঁত ব্যবস্থা হয়েছিল—ব্যবস্থাপকরা তৎপূর্বে শুভার্থীর ভেক ধরে রাজ্যের আতিথ্য ভোগ করছিলেন। আজকের এই অতিথি-পল্টনের ভিতর থাকতেও পারে তাদের চেলাচামুণ্ডা শিষ্য-শাগরেদ কেউ কেউ। মুখে হাসি, পকেটে পিস্তল—অসম্ভব কিছু নয়। সন্তর্পণে আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। সকাল বেলা নখ কেটে ছিলাম, ব্লেডখানা রয়ে গেছে। সকলের অলক্ষ্যে ফেলে দিলাম সেটা—অস্ত্র রাখার দায়ে না পড়ি।

নিষিদ্ধ শহরের এলাকা। আগেকার দিন হলে আপনার আমার শতেক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। খান পনেরো বাস আমাদের নিয়ে সারবন্দি মস্ত বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকল। আরও কত মোটর, কত বাস এসে জমেছে। গাছে গাছে ভরা বিশাল চত্বর—বিস্তীর্ণ লেক একপাশে। জোরালো আলো দিয়েছে গাছের মাথায়—আলোয় ঝলমল করছে লেকের জল। গাড়ি চলছে কি না চলছে—অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলেছে লেকের কিনারা ধরে।

বাস থেকে নেমেও অনেকখানি পথ। একের পিছনে আর একজন—চলেছি তো চলেছিই। পাঁচ-সাত গজ অন্তর ফ্লাশ-আলো—একেবারে দিন-দুপুর বানিয়ে তুলেছে। নিশ্চল দুটো সৈন্য—একের হাতে বন্দুক, অন্যের কোমরে রিভলভার। মানুষ না পুতুল—নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আর একটু এগিয়ে যেতে—ওরে বাবা! হাজার খানেক হাত শানিয়ে আছে সেক-হ্যাণ্ডের জন্য। বিদেশ-বিভূঁইয়ে এবারে প্রাণটা গেল। প্রাণ না-ই যদি যায়—এ হাতে খাবার তুলে ভোজ খাব, তার কোন আশা নেই।

এমনি করে অসংখ্য জাতি ও অগণ্য মানুষের প্রীতির পথ বেয়ে এসে পড়লাম সুবিশাল হলঘরে। আজকে ভোজনাগার—পরশু থেকে শান্তি-সম্মেলন বসবে এখানে। রাজসূয় ব্যাপার—বর্ণনা পড়ে হেন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। লম্বা টানা টেবিল সারি সারি চলে গেছে। একটু-আধটু ব্যাপার? হাঁটুন না টেবিলের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। পা টনটন করবে। আর টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো যাবতীয় খাদ্য ও পানীয়। গুণে দেখলাম, পঁচিশ পদ তো হবেই। টেবিলের দু'পাশে নিমন্ত্রিতেরা লাইনবন্দি দাঁড়িয়েছেন। বসবার ব্যবস্থা নেই—খেতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বুফেঁ ডিনার বলে এমনি অবস্থায় খাওয়াকে। আগের দিককার জায়গা বেবাক ভরতি—সুইং ঠেলতে-ঠেলতে আমাদের নিয়ে চলল। চলেছি তো চলেইছি। 'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?'

কিচলু দলপতি; তাঁকে রেখে দিল এদিকে—কর্তাদের সঙ্গে মোলাকাতের প্রয়োজন হবে। আর নিরামিষাশী যাঁরা—রবিশঙ্কর মহারাজ, যোশী, হোসেন, মালবীয়—এঁদের জন্য আলাদা রকমের সাত্ত্বিক বন্দোবস্ত। বন্দোবস্ত করে এ দলেও যদি জুটতে পারতাম! পাকিস্তানিরা পিকিনে পরে এসেও, দেখা যাচ্ছে, অধিক এলেমদার—ঠিক সময়ে এসে উত্তম জায়গা বাগিয়ে বসে পড়েছেন। আর আমরা চলেছি, চলেছি—এবং চলেছি দূরপ্রান্তের এক রঙিন দেয়াল লক্ষ্য করে।

ঠিক সাতটায় মাও-সে-তুং এলেন। সঙ্গে তাবৎ নায়কবৃন্দ। চোখে কি আর দেখেছি কিছু? কানের পর্দা-ফাটানো হাততালিতে বোঝা গেল, এসেছেন এইবার। হাজার খানেক আমরা—বেশি হবো তো কম নই। নানান চেহারা, রকমারি সাজ-পোশাক। আর অগণিত ফ্লাশ-আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠছে, ক্লিক-ক্লিক—ফোটো তুলছে এদিক ওদিক থেকে—ফ্লাশ-আলো নিবিয়ে দিচ্ছে

তাঁবুর জীবন (চীনা উডকাট)

চিংড়ি মাছ

[শিল্পী চি পাই-সি'র আঁকা। চাষীর ঘরে জন্ম। তিরানব্বুই বছর বয়সে এই সব আঁকছেন।]
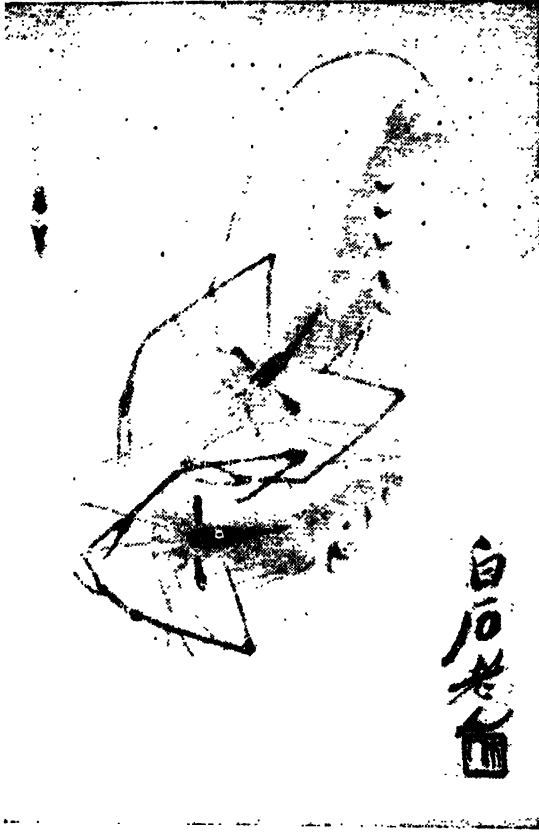
তারপর।• ধর বলেছিলেন, নিমন্ত্রণ-পত্র দেখবে, সার্চ করবে হলে ঢুকবার আগে। রামো! দ্বারে ঐ তো যাত্রাদলের দুই কাটা-সৈনিক, আর তাবৎ লোক এদিকে সেকহ্যাণ্ড ও হাততালিতে ব্যস্ত। অত সব হ্যাঙ্গামের ফুরসৎ কোথা? এই তো এলাহি ব্যাপার—অতি-উৎসাহীরা আবার ঠেলেঠুলে সামনে ধাওয়া করছেন ভাগ্যবশে ফোটো উঠে যায় যদি কোন কর্তাব্যক্তির পাশে। নিদেন পক্ষে গা ছোঁয়াছুয়ি হতেও পারে। আমার ভয়-ভয় করছে—এলাকাড়ি এতদূর ভাল নয় বাপু, কিঞ্চিৎ ফাঁকে-ফাঁকে থাকো। সকলের লাথি-ঝাঁটা খাওয়া জাতটা মাথা খাড়া করে দাঁড়াচ্ছে—বহুৎ জনে মুখে সাবাস দিচ্ছেন, মনে মনে কিন্তু মোটেই ভাল ঠেকছে না।

সামনের দেয়াল ঘেঁসে উঁচু প্লাটফরম। ফুলে ফুলে অপরূপ। আটত্রিশটা দেশের নিশান সাজানো গুচ্ছরূপে। নিশানগুলোর উপরে শিল্পী পিকাসোর আঁকা শান্তির পারাবত। এরই উপর নাজিম হিকমত কবিতা কেঁদে বসালেন—

আটত্রিশটা নিশান হলের ভিতর—
মহীরুহের যেন আটত্রিশ শাখা।
শাখাদলের মধ্যে পাখা ঝাপটায়
শান্তির শ্বেত-কবুতর।

আন্দাজ করেছিলাম, উঁচু জায়গাটা মাও-সে-তুঙের জন্য। ভাল করে তাঁকে দেখবে সকলে। তা নয়, শুধু পতাকা ঐ জায়গায়।

বাজনা, আলো আর হাততালি। কি এক ব্যাপার চলছে, একজনে একরকম বলে। মাও এবার করমর্দন করছেন নানান জায়গার মাতব্বরদের সঙ্গে···সুং-চিং-লিং মেয়েদের মধ্যে চলে গেলেন···চাও-এন-লাই কিচলুকে কি বলছেন, ঐ দেখুন। দেখছি না কোন-কিছুই, শুধু অগণিত নরমুণ্ড।

এক ললনা—কোন দেশের জানি না, যেমন বেঁটে তেমনি মোটা—আকুলি-বিকুলি করছেন নজর খানেক মাওকে দেখে নেবার জন্য; একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছেন। মনে হয়, গড়িয়ে বেড়াচ্ছেন সুবিশাল এক পিপে। তার পরে তাজ্জব কাণ্ড—সেই বস্তু টপাটপ দেয়াল বেয়ে অত্যুচ্চে এক কুলুঙ্গি মতো জায়গায় উঠে পড়লেন। রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। নিম্নস্থ আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেছে। বোঝার ভারে রেলিঙ ভেঙে যাওয়া বিচিত্র নয়। ওজনে নেহাৎ যদি তিনটি মণও হন, মাথার উপর পতন হলে নির্ঘাৎ চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবো।

তারপর দেখি, যে যেমনে পারছেন—ঐ মহদ্‌দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছেন। মেয়ে-পুরুষ কটা-কালোয় তফাৎ নেই। মানুষের আদিপুরুষ কারা ছিলেন, এতদ্দর্শনে আর সংশয় মাত্র থাকে না। হঠাৎ মালুম হল, আমিও শূন্যদেশে। দিব্যি করে বলছি, ইচ্ছে করে উঠি নি—এবং পা দিয়েও উঠেছি কিনা সন্দেহ। দেয়ালে দেয়ালে ফুলের তবক ঝোলানো—তারই একটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছি, আর পায়ের ভর কাঠ পাথর কি মানুষের মাথার উপর-আজও তা সঠিক বলতে পারব না। দেখতে পেলাম মাওকে—স্পষ্ট দেখছি। অপর দশজনার মতো নিচেই তাঁর আসন। প্ল্যাটফরম ···ক শুধু পতাকার জন্যে—ব্যক্তি-মানুষের চেয়ে পতাকা অনেক ব··।

বক্তৃতা করছেন মাও। চীনা ভাষায় বলছেন। রুশীয় এবং তার পর ইংরেজিতে তার তর্জমা হল। এক-একটা কথা আর হাততালি ও আনন্দোচ্ছ্বাস।

'প্রিয় বন্ধুরা, সম্বর্ধনা জানাই সকলকে। মহাচীনের তৃতীয় মুক্তিবার্ষিকী এসে গেল'। বিশ্বশান্তি ও লোকহিতের জন্য অতীতে আমরা কাজ করেছি, আগামী বছরে আরও অনেক কিছু করবার আশা রাখি।'

সর্বসাকুল্যে গোটা চারেক বাক্য। সবে থাম ঠেশান দিয়ে কান উঁচিয়ে জুত করে দাঁড়িয়েছি। ব্যস, খতম। বক্তৃতা ও তর্জমা ইত্যাদি নিয়ে সাকুল্যে মিনিট তিনেক। না মশায়, কথাতেও ট্যাক্স লাগে যেন এদের! জওহরলালের রাজ্যের মানুষ—নিক্তি-মাপা কথায় আমাদের সুখ হয় না। অপচয় বন্ধ—তা বলে সভাস্থলের বক্তৃতাতেও?

এক জনে টিপ্পনি কাটলেন, ডালকুত্তা কুকুর এরা—ঘেউ-ঘেউ করে না, একেবারে মোক্ষম কামড় হানে।

হবে তাই। ভোজন শুরু এবারে। পানপাত্র ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নানান জাতের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কামনা। এক চীনা ভদ্রলোক—ইংলণ্ড ও কন্টিনেন্টে-পড়া বৈজ্ঞানিক—এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। এমনি ঘুরে ঘুরে সকলে আলাপ-পরিচয় করছেন।

জ্ঞানিক একটু সুরা ঢেলে দিতে গেলেন গ্লাসে। আমরা নিলাম না। দুঃখ পেলেন বুঝতে পারছি। ম্লান হেসে বললেন, মোটেই খাবে না? ডক্টর জ্ঞানচাঁদ ও আমি লেমনেড ঢেলে নিয়ে গেলাস ঠেকিয়ে রীতি রক্ষা করলাম।

কত দেশের কত মানুষ! অনেকে আসে তীর্থযাত্রীর মতো জীবনে একটিবার। আসে মাওকে দেখতে, মাও-র সঙ্গে কথা বলতে। আত্মীয়-বন্ধু মরেছে লড়াইয়ে, গায়ের উপর কত অস্ত্রের দাগ! তত অতি বড় দুর্দিনে ছিল একটিমাত্র পরম আশ্বাস, সকলের চেয়ে আপন জন, তাদের বড় আদরের মাও—মাও তুচি। মাও আজকেও ঠিক সেদিনের মতো, একই রকমের নীল কোর্তা গায়ে। কোনরকম বিশেষ উর্দি নেই যাতে চেনা যায়, ইনি মাও-সে-তুং—পিকিন-বাজারের কোন দোকানদার নয়। পরমাত্মীয়ের মতো সেকালের মানুষগুলোকে কাছে টেনে নিচ্ছেন। পরিচিত কথাবার্তা। মাওকে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে কেউ প্রশংসা করে, মাও দেখিয়ে দেন তাদের। তাঁর একার কিছু নয়, কৃতিত্ব সকলের। মাও আলাদা নন ঐ মানুষগুলো থেকে।

ভিড়টা এখন কিছু থিতিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে অনেকেই মাওকে মুখোমুখি দেখে আসছেন। অধ্যবসায়ী কেউ কেউ সেকহ্যাণ্ড করে এসেছেন, এমনও শোনা যাচ্ছে। সোয়া-আটটায় মাও হল ছেড়ে চলে গেলেন।

আমাদের পাশের টেবিলে মাঙ্গোলিয়ান ও উত্তর-পশ্চিম চীনের পিছনে-পড়া কয়েকটা জাত। একটি মেয়ে—হেন রঙ নেই যা তার অঙ্গের পোশাকে না আছে, তার উপর গাড়ির চাকার ধরনের পাগড়ি মাথায়। হ্যাঁ, সাজ করতে হয় তো এমনি—মাও-সে-তুঙের পরে সকলের চক্ষুর দৃষ্টি এখন মেয়েটার দিকে। এই নাকি জাতীয় পোশাক ওদের। কয়েকটা বছর আগেও শিকার করে ঝলসানো মাংস খেত। এমনি বিস্তর জাত চীনে—আজকে তাদের বড় খাতির, শ্রদ্ধার নব নামকরণ হয়েছে 'ন্যাশনাল মাইনরিটি'। কাণ্ড—সবুর করুন কয়েকটা বছর—পয়লা দলে টেনে ওদের তুলবেই।

চাউ-এন-লাই, দেখি, চলে এসেছেন এদিকে। চোখ মেলে দেখবার মতো। এক টেবিলের ধারে আসেন, হাত বাড়িয়ে দেয় সকলে—পাঁচ-দশখানা যা হাতের মাথায় পাওয়া গেল কিঞ্চিৎ ঝাঁকিয়ে নিয়ে গেলাস ঠোকাঠুকি করে গেলাসটা একটু ঠোঁটে ঠেকিয়ে চক্ষের পলকে আর এক জায়গায়। অত বড় হলের হাজার মানুষের ভিড়ে চরকি-সওয়ার হয়ে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ডান হাত উঁচু করে তুলে কার্তিক ওদিকে তুড়িলাফ দিচ্ছে। চাউ সেকহ্যাণ্ড করে গেছে আমার সঙ্গে—হেঁ-হেঁ, চালাকি নয়! সযত্নে হাত তুলে রেখেছে, ছোঁয়াছুঁয়িতে মহিমা এক তিল ক্ষয়ে না যায়।

আমি আরও রসান দিই, ও-হাত ধুয়ে ফেলবেন না, খবরদার! কটা দিন বাঁ-হাতে খেয়ে নিন। দেশে ফিরে তার পর রুপোয় বাঁধিয়ে নেবেন।

নানান দেশের, নানান সাজের মানুষ একখানা ঘরের মধ্যে অসংখ্য ভাষায় হুল্লোড় করছে। বসবার ব্যবস্থা নেই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হবার যোগাড়। উৎসবে কিছুতে ভাঁটা পড়ে না। পৃথিবীর যত ক্ষ্যাপা জুটে পড়েছে একটা জায়গায়? হঠাৎ এরই মধ্যে গান ধরে বসল একজন। একজন দু-জন করে বেশ একটা দল। তারপরে আর যাবে কোথায়—সকলকে প্রায় গানে পেয়ে বসেছে—দল তখন আর গোণাগুণতিতে আসে না। ইংরেজি, ফরাসি, স্পানিস, রুশীয়, আর চীনা তো আছেই—আমাদের মঞ্জুশ্রী দেবী বাংলায় গান ধরলেন। কত মানুষ এসে জুটল এই বাংলা গানের দলে। কোন পুরুষে বাংলা জানে না, অথচ কেমন দিব্যি ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে। এই মানুষই জাতবেজাত হয়ে এ-ওর বুকে গুলি মারে, এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? না, হতে পারে না—। এসে দেখে যান এই গানের আসর, আপনিও দিব্যি করে সেই কথা বলবেন।

ফিরছি। অসংখ্য মানুষের তেমনি করমর্দণ আর হাত তুলে আনন্দ-জ্ঞাপন। রাস্তায় রাস্তায় সকল বয়সের মেয়ে-পুরুষের ভিড়। কাল উৎসব—আজকে এরা ঘুমোবে না, সারা রাত পিকিন শহরে টহল দিয়ে বেড়াবে।

উৎসব-স্থানে, বলেছি তো, আলোয় আলোয় দিনমান। মানুষ এখনই বোধ হয় পাঁচ-সাত হাজার। (খবরের কাগজের লোক নই—কাজেই আন্দাজে বলা। ওঁরা নজর হেনে সঠিক বলে দেন। গণে দেখবার উপায় নেই, অতএব ঘাড় হেঁট করে যা বলেন তাই মেনে নিতে হয়।) বাস পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। টের পেয়ে গেছে ভোজের আসরের ফেরত আমরা। হাততালি দিচ্ছে। এক মা যাচ্ছেন রিক্সায় চড়ে বছর খানেকের বাচ্চা ছেলে নিয়ে। হাসিমুখে সেই বাচ্চার দু-হাত ধরে তালি দেওয়াচ্ছেন তিনি। রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামাল একটু, হাত তুলে আমাদের অভিবাদন জানাল। যারা দূরে ছিল, সচকিত হল হাততালির আওয়াজে। রে-রে করে আসছে অভিবাদন জানাতে। ভিড় হয়ে গেল—চালাও, চালাও গাড়ি। ছুটে আসছে এদিক-ওদিক থেকে—এসে পড়বার আগে পালাও।

হোটেলে এসে স্থির হওয়া গেল না। ঘরে বসতে মন চায় না। আবার বেরুনো হল—একটা গাড়ি নিয়ে বেরুলাম কয়েকজন। আনন্দ, আনন্দ—আনন্দের লহর খেলে যাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল উৎসবমত্ত পিকিনের পথে। রোহিণী ভাটে হাতের বালা খুলে দিলেন একটি মেয়েকে। মেয়েটা যেন পাগল হয়ে উঠল—কি করবে ভেবে পায় না—গলার স্কার্ফ খুলে জড়িয়ে দিল রোহিণীর গলায়। চোখে জল বেরিয়ে আসে—মানুষ এমন মেতে যায় দরদি মানুষকে কাছে পেয়ে! মহাপ্রভু ভাবের বন্যায় সারা দেশ ডুবিয়ে দিলেন। সে কেমনধারা? পুঁথিতে বর্ণনা পড়ি। উল্লসিত এই জনসমুদ্রের মধ্যে 'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, ন'দে ভেসে যায়—' এই গানের কলি কেন জানি কেবলই আমার মনে আসছে।

[ক্রমশঃ।

সা হি ত্য

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

রামকানাই দত্ত—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫১ বঙ্গ ত্রিপুরার অন্তর্গত সুলতানপুরে। পিতা—উমানাথ দত্ত। বাল্যকাল হইতে সাহিত্য সাধনা। আইন-ব্যবসায়ী (১৮৭০)। প্রতিষ্ঠাতা—এডওয়ার্ড উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০১), উপাসনা সমাজ (১৯০৮)। গ্রন্থ—দানবনন্দিনী, চৈতন্যলীলা, বিশ্বমঙ্গল, মণিপুরবিক্রম, কবিতাশতক (১৩১১), বিরাটে পাণ্ডব, নবপাঠ, লিপিদর্পণ, ভারতজুবিলী, ক্ষেপারামু, জীবন-গীতা, সেবক সঙ্গীত, নব ব্রহ্মোপাসনা, সিদ্ধার্থ, বিদুর, হাসান হোসেন। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—উষা (ত্রিপুরার প্রথম মাসিক পত্রিকা, ১৩০০)।

রামকুমার নন্দী মজুমদার—যাত্রাপালা-রচয়িতা। জন্ম—১৮৩১ খৃঃ শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ উপ-বিভাগের বেজুড়া গ্রামে। ইনি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই—আপন চেষ্টায় পারস্য, ইংরেজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত শিক্ষা করেন। বহু গীতাভিনয়, পাঁচালী, যাত্রাপালা রচনা করেন। গ্রন্থ—বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর (ঢাকা), পরমার্থ-সঙ্গীত, ৪ ভাগ, দাতাকর্ণ (১৮৪২), নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, বিজয়-বসন্ত, পদাঙ্কদূত, কংসবধ, উমার আগমন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রাসলীলা, দোলঝুলন, ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ, কলঙ্কভঞ্জন, লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দ্ব, বাঙ্গালার বোধন (কাব্য, ১৩০৫), উদ্বোধাহ কাব্য, ২ খণ্ড, নবপত্রিকা কাব্য, প্রবন্ধমালা, জীবন্মুক্তি, মালিনীর উপাখ্যান (উপ), গণিততত্ত্ব, কীর্ত্তন, মানসী।

রামকুমার পণ্ডিত—গ্রন্থকার ও সমাজ-সংস্কারক। গ্রন্থ—বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থা (ঢাকা)।

রামকুমার বসু—গ্রন্থকার। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। গ্রন্থ—**The Penal Code or Act xlv of 1860** (১৮৬৭)।

রামকুমার লস্কর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পথিক বা যতো ধর্মস্ততো জয় (১৩০২)।

রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রভাবতী (১২৯১)।

রামকৃষ্ণ গোস্বামী—বৈষ্ণব পণ্ডিত। সম্পাদক—চৈতন্য (হিন্দী, বৃন্দাবন, ১৩৩৩), আচার্য (পাক্ষিক, ৪২৩ চৈতন্যাব্দ)।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্বর্ণলতা (১৮৮৪)।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সন্তান, দেওয়ানজী, ব্রাহ্মণ পরিবার, বান্ধবী।

রামগতি চট্টোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—মুরারিবধ কাব্য।

রামগতি ন্যায়রত্ন—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩১ খৃঃ ৪ঠা জুলাই হুগলী জেলার ইলছোবা-মণ্ডলাই গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৪ খৃঃ ১ই অক্টোবর চুঁচুড়া। পিতা—হলধর চূড়ামণি। শিক্ষা—স্থানীয় পাঠশালা, সংস্কৃত কলেজ (১৮৪৪), জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা (১৮৪৯), সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা (১৮৫১)। কর্ম—শিক্ষক, হুগলী নর্মাল স্কুল (১৮৫৬), প্রধান শিক্ষক, বর্দ্ধমান (লাকুড্ডি) গুরু ট্রেনিং স্কুল (১৮৬২), অধ্যাপক, বহরমপুর কলেজ (১৮৬৫), প্রধান শিক্ষক, হুগলী নর্মাল স্কুল (১৮৭৯), অবসর গ্রহণ (১৮৯১)। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। গ্রন্থ—কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস (১৮৫৮), বস্তুবিচার (১৮৫৯), বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম (১৮৫৯), রোমাবতী (১৮৬২), বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৬৪), ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস (১৮৬৫), ঋজুব্যাখ্যা (১৮৬৬), শিশুপাঠ (১৮৬৮), দময়ন্তী (১৮৬৯), চণ্ডী (১৮৭২), বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭২), ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৭৫), গোষ্ঠীকথা (১৮৭৭), কুপিতকৌশিক নাটক (১২৮৫), নীতিপথ (১৮৮১), রামচরিত (১৮৮৩), ইলছোবা (১২৯৫)।

রামগোপাল চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কাব্যতরঙ্গ (১৮৬৮)।

রামগোপাল দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—টাঙ্গাইলের অন্তর্গত তৈরফি সহদেবপুরে। গ্রন্থ—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

রামগোপাল সেনগুপ্ত—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—সুরেন্দ্রনাথ (১৩০০)। সম্পাদক—বীণাপাণি (মাসিক, ১৩০০)।

রামচন্দ্র কবিভারতী—বৌদ্ধ পণ্ডিত। জন্ম—১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বরেন্দ্রভূমির রেবতী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে। পিতা—গণপতি। মাতা—দেবী। ইনি ধর্ম, পুরাণ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। লঙ্কায় গমন (১২৪৫ খৃঃ)। সিংহলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীরাহুল সঙ্ঘরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। সিংহলরাজ প্রক্রমবাহু (১২৪০—১২৭৫) কর্ত্তৃক 'বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী' উপাধি লাভ ও সিংহলের সমস্ত বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপদেশকের পদ-লাভ। সিংহলবাসী কর্ত্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজা-লাভ। ইনি সিংহলের তোটগমপুরাণ বিহারে বাস করিতেন। গ্রন্থ—বৃত্তরত্নাকর পঞ্জিকা, বৃত্তমালা, বৃত্তরত্নাকর (টীকা), ভক্তিশতক।

রামচন্দ্র চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার নওপাড়া গ্রামে। গ্রন্থ—বিষাদ প্রতিমা।

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২০০ বঙ্গ ২৪-পরগনার হরিনাভী গ্রামে। মৃত্যু—১২৫২ বঙ্গ। পিতা—রামধন মুখোপাধ্যায়। নামান্তর—দ্বিজ রামচন্দ্র। 'কবিকেশরী' ও 'কবিশেখর' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—আনন্দলহরী (১২৩১), আচাররত্নাকর (১২৪৪), কৌতুকসর্বস্ব নাটক (১৮২৮), চন্দ্রবংশ (ঐ), দুর্গামঙ্গলান্তর্গত গৌরীবিলাস (১৮১৯), ঐ কঙ্কালীর অভিশাপ, অক্রুর-সংবাদ (১২৫৬), হরপার্বতী-মঙ্গল (১২৫৮), শাতাতপীয় কর্মবিপাক (১৭৭৬ শক), কালীপুরাণ (১২৫৫), নলদময়ন্তী (১২৬০), মাধবমালতী (১২৭৫)।

রামচন্দ্র দত্ত—রসায়নশাস্ত্রবিদ্। জন্ম—১২৫৮ বঙ্গ নারিকেলডাঙ্গায়। মৃত্যু—১৩০৫। পিতা—নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত। শিক্ষা—শুঁড়া স্কুল, প্রবেশিকা পর্যন্ত (জেনেরাল এসেমব্লি), ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল। কর্ম—অধ্যাপক মেডিকেল কলেজ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ। ইঁহার বাগানে রামকৃষ্ণদেবের দেহাবশেষের বিভূতি স্থাপিত হওয়ায় 'কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান' তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। গ্রন্থ—রসায়ন-বিজ্ঞান, রামকৃষ্ণের জীবনী, রামচন্দ্রের বক্তৃতা। সম্পাদক—তত্ত্বপ্রকাশিকা (মাসিক)।

রামচন্দ্র দাস—কবি। গ্রন্থ—পুষ্পমালিকা, ১ম (১৮৭৩)।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—পণ্ডিত। জন্ম—১৭০৭ শকে ২৯শে

মাঘ পানপাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৭৬৬ শক ২০এ ফাল্গুন মুর্শিদাবাদে। পিতা—লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। ইনি ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাশী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন ও ১৫ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে রাজা রামমোহন রায়ের অভিপ্রায়ে উপনিষদ-বেদান্ত-দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিমুলিয়াস্থ হেদুয়ার নিকট বাটী ক্রয় করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনা ও অধ্যাপনা করেন। ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ ও ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারক। কর্ম—অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮২৭—১৮৩৭), হিন্দু কলেজ পাঠশালা (১৮৪০), সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক (১৮৪২—৪৫)। গ্রন্থ—জ্যোতিষ-সংগ্রহসার (১২২৩), অভিধান (বাঙালী রচিত প্রথম অভিধান—১৮১৮), পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান, বিবাদচিন্তামণিঃ (১৮৩৭), হিন্দুকলেজ পাঠশালার পাঠারম্ভ কালে বক্তৃতা (১২৪৩), নীতিদর্শন (১৮৪১)।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ। জন্ম—১৮৬২ খৃঃ নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। মৃত্যু—১৯০২ খৃঃ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (প্রথম স্থান), এফ-এ (প্রথম স্থান)। আয়ুর্বেদীয় ও এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসাব্যবসায়ী। গ্রন্থ—দ্রব্যগুণপরিধি, আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা। সম্পাদক—ঋষি (মাসিক, ১৩০৫, আষাঢ়)।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবি। গ্রন্থ—লক্ষ্মণদিগ্বিজয় (কাব্য, ১৮৬৮)।

রামচন্দ্র ভৌমিক,—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাজনিয়ম ও ব্যবস্থা-সংহিতা (১৮৬৯), সংক্ষিপ্ত নজীর সংগ্রহ (ঢাকা, ঐ), আদালত গাইড (Small Causes Court Act. ঢাকা), Income-Tax Act (ঐ), The Stamp Act (ঐ)।

রামচন্দ্র মল্লিক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রেম (১৮৯০), যোগমায়া (১২৯৭)।

রামচন্দ্র রায় বীরবর—যাত্রাপালা-রচয়িতা। জন্ম—১৮৪৪ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার দাঁতন নামক স্থানে। মৃত্যু—১৯২১ খৃঃ। পিতা—কিশোরীচন্দ্র রায় বীরবর (জমীদার, গড়মোহনপুর)। গ্রন্থ—রামচন্দ্র গীতাবলী (১৩১৯)।

রামচন্দ্র মিত্র—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮১৪ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৭৪ খৃঃ। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ। কর্ম—অধ্যাপনা, হিন্দু কলেজ (১৮৩০-১৮৫৪), প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৫৪-১৮৬২), সম্পাদক, বীটন সোসাইটি (১৮৫১-১৮৬০), ফেলো, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৬৪)। জষ্টিস অফ দি পীস (১৮৬৪)। পরিচালনা—পশ্বাবলি (দ্বিতীয় পর্যায়—মাসিক পুস্তক, ইংরেজি-বাংলায় (১৮৩৩), জ্ঞানান্বেষণ (সাপ্তাহিক, ১৮৩৯), জ্ঞানোদয় (মাসিক, ১৮৩১), পক্ষির বিবরণ (১৮৪৪)। গ্রন্থ—মনোরমা পাঠ, ১ম (১৮৫৫), পাঠামৃত, A speech delivered at the opening of the Hindu College Pathsala (১৮৪০), An easy primer of the English language particularly adopted to assist Indian youth in learning the English tongue.

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—২৪-পরগনার অন্তর্গত মরিনাভি গ্রামে। পিতা—রামধন মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—দুর্গামঙ্গল, গৌরীবিলাস, মাধব-মালতী, গোবিন্দমঙ্গল।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। জন্ম—১৩২৬ বঙ্গ ১৭ই মাঘ। মৃত্যু—১৩৫০ বঙ্গ ১৬ই ফাল্গুন। পিতা—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বসুমতী স্বত্বাধিকারী)। শিক্ষা—এম-এ, ঈশান স্কলার। ছাত্রজীবন হইতে সাহিত্য সাধনা। প্রতিষ্ঠাতা—উৎপলা-প্রেস। পরিচালক—কিশলয়।

রামচন্দ্র সেন—অনুবাদক। গ্রন্থ—The Muhammadan Law of Inheritance (১৮৬৯)।

রামচরণ দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Pleaders' Guide ১-২য় ভাগ (১৮৭২), ৩য়-৫ম ভাগ (১৮৭৩)।

রামচরণ মিত্র—আইনব্যবসায়ী। এম-এ, বি-এল। 'সি, আই, ই' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—The law of joint property and practice in British India.

রামজয় তর্কালঙ্কার—সংস্কৃত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর। মৃত্যু—১৮৫৭ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা। পিতা—পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। কর্ম—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ (১৮১৬-১৮১৯), সুপ্রিম কোর্টের জজ পণ্ডিত (১৮১৯-১৮৫৭)। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত। গ্রন্থ—সাংখ্যভাষ্য সংগ্রহ (১৮১৮), দায়কৌমুদী, দত্তকৌমুদী এবং ব্যবস্থা-সংগ্রহ (১৮২৭), বেদান্তচন্দ্রিকা (ইংরেজি অনুবাদ—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত, ১৮১৭)।

রামজীবন বিদ্যাভূষণ—পাঁচালীকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দী পূর্ববঙ্গে। গ্রন্থ—আদিত্যচরিত বা সূর্যের পাঁচালী (১৬৮৯), মনসা-মঙ্গল (১৭০৩)।

রামদয়াল ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মানস-কুসুম (১৮৭২ ?)।

রামদাস আদক—কবি। জন্ম—হুগলী জেলার আরামবাগ হায়াৎপুরে। পিতা—রঘুনন্দন আদক। গ্রন্থ—অনাদিমঙ্গল।

রামদাস ভট্টাচার্য—শিক্ষাব্রতী। এম-এ। প্রধান শিক্ষক, পুর্ণিয়া জেলা স্কুল। গ্রন্থ—The Dawning of Conscience.

রামদাস সেন—কবি ও পুরাণতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর বহরমপুরে। মৃত্যু—১৮৮৭ খৃঃ ১১এ আগষ্ট হাটবোয়ালি গ্রামে। পিতা—লালমোহন সেন (নিমকির দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেনের অগ্রজ কৃষ্ণগোবিন্দের পুত্র। কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটে ইঁহাদের বাটী দেওয়ান বাড়ী বলিয়া পরিচিত)। শিক্ষা—গৃহে ও কিছুদিন বহরমপুর কলেজে। বহরমপুর বাসভবনে ইঁহার স্থাপিত বিরাট পুস্তকাগার ইঁহার বিদ্যানুরাগের পরিচয় দেয়। ১৩ বৎসর বয়স হইতেই কাব্যচর্চা, পরে ভারতীয় পুরাতত্ত্বচর্চা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন। 'ডক্টর' উপাধি লাভ (ইটালির ফ্লোরেনটিনো একাডেমী কর্তৃক)। ইউরোপ ভ্রমণ (১৮৮৫)। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভ্য। গ্রন্থ—তত্ত্ব-সংগীত লহরী (১৮৫৯), কুসুমমালা (কাব্য, ১২৬৮), বিলাপতরঙ্গ (ঐ, ১২৬৪), কবিতালহরী (১২৭৪), চতুর্দশপদী কবিতামালা (১২৭৪), ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম (১২৮১), ২য় (১২৮২), ৩য় (১২৮৫), রত্নরহস্য (১২৯০), ভারতরহস্য (১২৯২), বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন (ভ্রমণ, ১৮৮৬), বুদ্ধদেব (১৮৯১), ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা (বহরমপুর, ১৮৭২), মহাকবি কালিদাস (১৮৭২)।

রামদাস হাজরা—কবি। গ্রন্থ—কবিতা-কথা (১৩০৩)।

[ক্রমশঃ।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

৪৭

নিয়ম হচ্ছে, কোনো রাজবন্দীকে জেলা থেকে স্থানান্তরিত করবার সময় জেলার পুলিশ সুপারের সমক্ষে তাকে একবার উপস্থিত করা হয়। চেহারা নিরীক্ষণ ও দু'-চারটে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে সাহেব বিচার করতে চেষ্টা করেন বন্দিত্বের যাঁতাকলের চাপে বন্দীর পূর্ব্বেকার গোঁ কমেছে কি না এবং কতখানি কমেছে। আবার যে জেলায় তাকে স্থানান্তরিত করা হলো, সেখানেও অমনি জেলার কর্ত্তা অতিথির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার গুরুত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন, কারণ রোগ বুঝে ও তার বিশেষ লক্ষণগুলো দেখে যথাযথ দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা যে তাঁকে করতে হবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের মতো।

কিন্তু নিয়ম হলেও হামেসাই এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। হয়তো বন্দীকে আদরেল গোছের জনৈক ইন্‌স্‌পেক্টারের কক্ষেই আনা হলো, চা ও খাবার দিয়ে আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে ফাঁকে আলগোছে দু'-একটি প্রশ্ন করা হলো। জবাব পাওয়া গেল, ভাল; আর না পাওয়া গেলেও সুপার সাহেবের ডায়েরীতে কিন্তু স্পষ্ট করে লেখা হয়ে রইলো, **The detenu was presented before me. I had an hour's talk with him and I was convinced that he had not shaken off that abominable views and practices....** সুতরাং আরও কয়েক বছর তাকে আটকে রাখলে ভালো হয়। এমনি সুপারিশ করা সুপারের পক্ষে ভারী সহজ, বিশেষ করে রাজবন্দীদের বেলায়, যাদের মেয়াদের কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমা নেই। বৃটিশের কাগজ—গভর্ণমেণ্ট কাগজে ও কলমে ভারী দুরন্ত—গলদ ধরবার উপায় নেই।...

শ্রীনগর থানার সহকারী দারোগা রবীন দত্ত সহযোগে রমনার আই, বি অফিসে এসে উঠতেই যোগিনী বাবু বরাবরের মতো একেবারে কলরব করে অভ্যর্থনা জানালেন বিয়ে-বাড়ীর কনের বাপের মতো: আসুন, আসুন দ্বিজেন বাবু! পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?—বসুন।

এ মামুলী প্রশ্ন জবাব আশা করে না, তাই যোগিনী বাবু বলে চললেন: ফেব্রুয়ারী হলে কী হবে, বেশ ঠাণ্ডা, কি বলেন? রবীন, যাও, তুমি পোষাক ছেড়ে হাত-মুখ ধোও গে, যাও। আর এখনি দ্বিজেন বাবুর হাত-মুখ ধোবার বন্দোবস্ত করে দাও।—দ্বিজেন বাবু, সাহেব একটু বেরিয়ে গেছেন। এলেন বলে। আপনাকে যে একটু অপেক্ষা করতে হবে ভাই!—দাদা আমার যেন মহা অপরাধীর মতো কথা কইলেন।

বললাম: তাতে আর কী হয়েছে।

রবীন, চা ও খাবার জলদি।—বলেই জলদি বেরিয়ে গেলেন যোগিনী বাবু।

এই দ্বিতীয় বার এলাম ঢাকার আই, বি, অফিসে। ১৯৩১ সালে প্রথম গ্রেপ্তারের সময় অফিস ছিল আদালতের পেছনে, এবার উঠে এসেছে রমনায়। ছোট দোতলা বাড়ী। পারিবারিক গৃহকে অফিসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সমুখে পিচ-ঢালা রাস্তা, ওপারে প্রকাণ্ড মাঠ। জেলা আই, বি-দের কাছে আমি 'টেরর' বলেই সর্ব্বদাই ওরা আমার সর্ব্বদায়িত্ব চাপিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় আই, বি-দের ওপর। তাই আমার ওপর কড়া নজর রাখা সত্ত্বেও জেলা আই, বি অন্যান্য ব্যাপারে আমায় কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের বন্দী হিসেবে গণ্য করে। জেলার বাইরে একবার পাঠাতে পারলেই এদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। এরা বাঁচবে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা ও জলখাবার এসে গেল। সোফায় বসে দিব্যি তার সদ্ব্যবহার করবার সময় লক্ষ্য রাখলাম সম্মুখের বারান্দার দিকে। যারা যাওয়া-আসা করছে, সবগুলোই স্পাই না-ও হতে পারে, কিন্তু যেভাবেই হোক আমাদের আপ্রাণ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যই যে তারা দৃঢ় পরিকর, সে কথা তো মিথ্যে নয়। তাই তাদের মধ্যে যত বেশী সংখ্যককে চিনে রাখতে পারা যায়, কাজের পক্ষে ততই ভাল।

কিছুক্ষণ পরই বাইরে মোটর এসে থামবার শব্দ পাওয়া গেল এবং সর্ব্বত্রই যেন একটু চাঞ্চল্যও লক্ষ্য করলাম। বুঝতে দেরী হলো না যে, ওদের সাহেব এসেছেন।

কয়েক মিনিট পরই শশব্যস্তে ফিরে এলেন যোগিনী বাবু। বললেন: চা খেয়েছেন? আসুন তাহলে দ্বিজেন বাবু! সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করবেন, আসুন।

দোতলায় উঠেই যোগিনী বাবু অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, হেসে প্রশ্ন করলেন: সঙ্গে আবার কিছু নেই তো?—আসুন, নিয়ম রক্ষা করবার জন্য পকেটগুলো একবার দেখে নিই।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিলাম: মাফ করবেন যোগিনী বাবু! আপনাদের সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি লালায়িত হইনি, ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন আপনারা বা আপনাদের সাহেব নিজে। আপনাদের দেবতার মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে দেহ-তল্লাসী যদি অপরিহার্য্য বিধি হয়ে থাকে, তাহলে এখান থেকেই প্রণাম জানাচ্ছি তাঁকে।—চলুন, নীচে যাই!

মহা বিপদে পড়লেন যোগিনী বাবু: এই তো, আবার হাঙ্গামা করছেন শুধু-শুধু। কী হবে ভাই একটুখানি নামকোওয়াস্তে—

সেটা আপনাদের কাছে হতে পারে দাদা! আমাদের কাছে ওটা অবমাননাকর, নীতির পরিপন্থী। যেখানে নীতির কথা, সেখানে আমরা এক ইঞ্চিও হেলি নে কখনো। হয়তো ভেঙে যাবো, কিন্তু নুয়ে পড়বো না। বুঝলেন?

কী বুঝলেন, তা যোগিনী বাবুই জানেন। দেহ-তল্লাসীর কথা আর পীড়াপীড়ি করলেন না। গ্র্যাসবি সাহেবের কক্ষের দরজায় পৌঁছে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন নীরবে।

গ্র্যাসবি সাহেবের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। বয়স খুব বেশী তা নয়। তবে চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ দেখলাম বেশ স্পষ্ট। বড় বড় দুটি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। নাকের পাশে ক্ষতের দাগটি এখনও মিলিয়ে যায়নি, যেখানে রিভলভারের গুলি আটকে ছিল। আমি চেয়ারে বসতেই বোধ হয় কটিবন্ধ থেকে বা ড্রয়ার থেকে দুটো রিভলভার বার করে শ্রীমান টেবিলের ওপর দু'হাতের সামনে রাখলো। তার পর চোখ দিয়ে আমায় বিঁধতে চেষ্টা করে প্রশ্ন করলো: ভারী গণ্ডগোল সুরু করেছ তুমি।

আকাশ থেকে পড়লাম: কই, না!

...বাহ বলছো।—বলে সাহেব মিঠিয়ে মিঠিয়ে বলতে গেলো: গভর্ণরকে যারা গুলী করলো, তারা সব তোমার দলের লোক আছে, তাই না? মেদিনীপুরে যারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে খুন করলো, তারাও সব তোমার দলের লোক। I know your Party is B. V.—সত্য গুপ্ত, যতীশ গুহ, সুপতি রায়, ভূপেন রক্ষিত সব তোমার দলের লোক। তাই না?

আমি চুপ করে রইলাম।

মুহূর্ত নীরব থেকে গ্র্যাসবি আবার বললো: All right, we shall find out all your activities—এর মধ্যে সবই জানতে পারবো আমরা but in the meantime you will have to rot in village domicile—আর তোমার ছাড়া পাবার উপায় দেখি না। অন্ততঃ দশ বরষ!

তবুও আমি নীরব।

সাহেব ঘণ্টা বাজালো। যোগিনী বাবুর প্রবেশ। ইসারা করতেই আমায় নিয়ে নীচে নামলেন যোগিনী বাবু। আমার escort party এসে গেছে ততক্ষণে। দু'জন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সৈন্য, একজন সহ-দারোগা।

ঢাকা ষ্টেশনে ট্রেণে আরোহণ করে যাত্রা করলাম নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে। নারায়ণগঞ্জে এসে চেপে বসলাম গোয়ালন্দগামী মেল ষ্টীমারের রিজার্ভ-করা ইণ্টার ক্লাস কামরায়। কিন্তু একটু পরেই সঙ্গী সহ-দারোগার সঙ্গে আমার বেশ এক পশলা বচসা হয়ে গেল।

লোকটার বয়স চল্লিশের নীচে নয়। ভারী অলস ও বদমেজাজী। ইণ্টার ক্লাসের লম্বা বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ব্যাটা আমায় সতর্ক করে দিলেন যেন আমি কোথাও না যাই।

কেন?—প্রশ্ন করলাম।

জবাব দিলেন: সিপাইরা কি আপনার পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়াবে?

বললাম: নিশ্চয়ই।

বললেন: নিশ্চয়ই নয়।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম: পারেন, বাধা দিন।

বাধা যে ওরা দিতে পারে এবং বেশ ভাল ভাবেই দিতে পারে ও দেবার সময় তার মাত্রাজ্ঞান ওরা বেশ সহজেই হারিয়ে ফেলতে পারে, এ সত্য আমার অজানা ছিল না। কিন্তু যেখানে আত্মসম্মানের প্রশ্ন, সেখানে বিপ্লবীদের কাছে দুটি মাত্র পথ আছে খোলা—হয় সম্মান অটুট রাখা, নয় তো প্রতিরোধ করা এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বিপক্ষ যদি অমিতবিক্রম হয়, তাহলে রণক্ষেত্রেই শেষ-শয্যা রচনা করা। মধ্যবর্ত্তী পন্থার কোনো সম্ভাবনা নেই, নেই আলোচনা ও আপোস-রফার সুযোগ। আত্মসম্মানের প্রশ্ন উঠলে বিপ্লবীরা ক্ষমাহীন নিক্ষিপ্ত শায়কের মতো হয় সোজা ভেদ করে বেরিয়ে যায়, নইলে প্রতিপক্ষের ইস্পাতের বর্ম্মে ঠোক্কর খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। ভায়া-মিডিয়ার সুযোগ নেই সেখানে। হয়তো একটুখানি পাশ কাটালেই বা একটুখানি পাশ দিলেই একটা বড় রকমের সংঘর্ষ এড়ানো যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে কোনো ষ্ট্র্যাটেজি নেই, এক পা পেছিয়ে এসে দু'পা এগিয়ে যাবার tactics নেই! আত্মসম্মান-বোধ সীমাহীন তীব্র বলেই নিজের দেশমাতার সম্মানরক্ষার জন্য বিপ্লবীরা বিলিয়ে দেয় প্রাণ হেলায়-ফেলায় ঝড়ো হাওয়ার মুখে এক মুঠি ধূলির মতো...!

গাড়োয়ালী সেনাদের বন্দুক দুটি যে একেবারে মিলিটারী রাইফেল, বেয়নেটে যে আছে ক্ষুরের ধার এবং সহকারী দারোগার কোটের নীচে যে আঁটা আছে একটি সার্ভিস রিভলভার, এ সত্য আমার অজানা ছিল না। কিন্তু চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার সময় রাইফেল বা রিভলভার বিপ্লবীদের কাছে সমানই তুচ্ছ বস্তু।

তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম এবং চলন্ত ষ্টীমারে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। সহকারী তার অন্যতম সহকারীকে পাঠালো আমার পেছনে ফেউয়ের মতো।

ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাণ্ডা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। ষ্টীমারের একেবারে সম্মুখ ভাগে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগে। হু-হু করে এগিয়ে চলেছে ষ্টীমার প্রচণ্ড বেগে দু'পাশে জলরাশি উৎক্ষিপ্ত করে। বাতাসের বেগে সেই জলরাশির অজস্র ঠাণ্ডা কণা এসে গায়ে লাগে। মাঝে মাঝে দু'-এক ঝলক জলও ষ্টীমারের ওপর উঠে আসে যেন বিক্ষোভ জানাবার জন্যই। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই উদ্যত ফণা তাদের লুটিয়ে পড়ে, নিষ্প্রাণ হয়ে তারা গড়িয়ে পড়ে আবার সেই নদীতে। ট্রেণের মতো তীরের দিকে তাকিয়ে কিন্তু ষ্টীমারের গতি নির্ণয় করা যায় না। প্রথমতঃ, তীর বেশ দূরে, লাইনের ধারে ধারে ঝোপঝাপের মতো নয়। তার পর জলের মধ্যে চাকা চালিয়ে এগিয়ে যেতে হয় ষ্টীমারকে। ট্রেণ ছুটে চলে মসৃণ লাইনের ওপর দিয়ে শুধু বাতাসের বাধা ঠেলে। ষ্টীম থেকে যে শক্তি সঞ্চালিত হয়ে ষ্টীমারের প্রপেলার হু-হু করে ঘুরিয়ে দেয়, সেই শক্তি রেল-লাইনের ওপর চলমান কোনো বাষ্পীয় যানে সংযোজিত করলে তার গতিবেগ কতখানি হতে পারে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরর্থক তাই কল্পনা করতে লাগলাম। জলকণা মাঝে মাঝে এসে শরীরে তুষারকণার মতো বিঁধলেও বেশ ভালো লাগছিল এমনি গতিবেগ নিরীক্ষণ করতে।

মনে পড়ে গেল আজ সরস্বতী পুজো। সরস্বতী পুজো আমাদের দেশে ঘরে-ঘরে হয়ে থাকে। সারাটি বছর একেবারে বই না স্পর্শ করলেও এই দিন ছাত্র-ছাত্রীরা অকস্মাৎ অতীব ভক্তিভরে বই-খাতার ধূলো-বালি ঝেড়ে নিয়ে কালীর দোয়াতে দুধ পুরে তার মধ্যে কাশদণ্ড দিয়ে তৈরী কলম গুঁজে বাণীদেবীর সম্মুখে পরিপাটি করে সাজিয়ে দেয়। তার পর মুখে অঞ্জলির মন্ত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করলেও মনে মনে বোধ হয় নিবেদন করে: হে মা সরস্বতী, সারাটি বছর তো ফাঁকি দিয়ে চলেছি। এবার অন্ততঃ পাস্-মার্কের ব্যবস্থা করে দাও মা! নইলে বাবা যে আর রক্ষে রাখবেন না।...

সরস্বতী পুজোর দিন বাজার থেকে ইলিস মাছ আসবেই। ইলিস সেদিন আর সাধারণ মাছ নয়, সেদিন সে মর্ত্তে আগত স্বর্গের দেবীবিশেষ। একা আসেন না, আসেন জোড়া বেঁধে। বাড়ীতে এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই এয়োরা স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই তাঁরা এগিয়ে আসেন হুলুধ্বনি করে। পরিষ্কার করে ধোওয়া একটি কুলোর ওপর তাদেরকে শুইয়ে দিয়ে একখানা ছুরি দিয়ে ধীরে ধীরে আলগোছে খোসা ছাড়িয়ে ফেলা হয়। যেন ব্যথা না লাগে। তার পর স্নান করানো হয় তাদেরকে কলসীর তোলা শীতল জলে, তার পর এয়োরা ভক্তিভরে

পরিয়ে দেন এদের কপালে সিঁদুরের টিপ। ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনি করে তার পর সারি বেঁধে নিয়ে যান একেবারে বাড়ীর প্রধানতম কক্ষে। সেখানে তাদের উৎসর্গ করা হয় তীক্ষ্ণধার বঁটির কাছে। শুধু হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্না-করা সেদিনকার ইলিস মাছ মনে হয় যেন অমৃত!··· এই অমৃত-ইলিস আজ আর জুটলো না আমার ভাগ্যে। সরস্বতী পুজো আর সে উপলক্ষে নাটকাভিনয়ের আনন্দটা এ বছরটা মাঠেই মারা গেল দেখছি।

চলনদার যদি কৃপণ হন, তাহলে রাজবন্দীদের সাধারণ নীতি হচ্ছে একেবারে দিলদরিয়া বনে যাওয়া। বৃথা ও বাজে পয়সা ব্যয়ই তখন নীতি হয়ে দাঁড়ায়। তাই, দ্বিপ্রহরে আহারের কথা উঠতেই একই সঙ্গে ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের খাদ্যের হুকুম ছেড়ে দিলাম অবলীলাক্রমে। দোতলায় পেছন দিকে খাবার ঘর। লম্বা টেবিলের ওপর বিছানো রঙীন ক্লথ। বাবুর্চির সাদা পোসাক তাড়াতাড়ি পরে নিয়ে স্বয়ং রাঁধুনী মিঞাই এসে গেলেন পরিবেশন করতে। সাদা ধবধবে ভাত, একটির সঙ্গে অপরটির সান্নিধ্য থাকলেও সংযোগ নেই। কিন্তু দেখা গেল ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন, শাক ও মুগের ডালের পরই এসে গেল একেবারে ইলিস মাছ, ইলিস মাছের ঝাল। চট্টগ্রামী ঝাল মানে সত্যিকার গলা-জ্বালানো ঝাল। তাতে যেমন অজস্র পেঁয়াজ ও রসুন আছে, তেমনি আছে 'অষ্ট গণ্ডা লঙ্কা!'

তবুও ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে খাদ্য-বিভাগীয় মিঞাদের উদ্দেশ্যে। কারণ সরস্বতী পুজোর দিনটিতে ইচ্ছেয় হোক বা অজানতেই হোক, ইলিস মাছের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাশের খাদ্য-সূচী শেষ হয়ে গেলে এল ফার্ষ্ট ক্লাশের মেনু—মুরগীর কোর্ম্মা!···আহারটি বেশ পরিতোষ সহকারেই শেষ করা গেল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে ট্যাক্সিতে সোজা আমায় নিয়ে যাওয়া হলো হাওড়া ষ্টেশনে। মেদিনীপুরগামী ট্রেণ অপেক্ষা করছিল, তার একখানি ইণ্টার ক্লাশ কামরা জাঁকিয়ে বসলাম আমরা। এতখানি পথ একটিও পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। চেষ্টা করেছিলাম এবং আশাও করছিলাম। রিভলভার দুটি যে কোথায় রেখে এসেছি, সে সংবাদটি অন্ততঃ যথাসম্ভব সত্বর যথাস্থানে পাঠানো একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমার ঘরের কুলুঙ্গিতে যে আর নেই তারা। এই সব নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনো একটি স্থানে বেশী দিন জমা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই বৌদিরা এই গুপ্ত স্থানের অস্তিত্ব টের পাওয়া মাত্রই তার আশ্রয়-স্থল পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। পুব দিকের ভুতের বাড়ীর বেতঝোপের মধ্য দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে। পরিধি কম, বসে-বসে প্রবেশ করতে হয়। প্রায় ত্রিশ গজ সোজা চলে যাবার পর একটি ধুতুরা ফুলের গাছ আছে। তার গোড়াকার মাটি তুলে ফেললেই প্রায় আঠারো ইঞ্চি নীচে থেকে বেরুবে একটি ম্যাকুসোর বড় টিন। সেই টিনের মধ্যে ছোট সাইজের দুটি রিভলভার আছে। কেউ জানে না, একা আমি ব্যতীত!···

মেদিনীপুর শহরে যখন এসে পৌছুলাম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। উঠলাম বোধ হয় পুলিশ ক্লাবে। ক্লাব মানে বাইরে থেকে বলা উচিত ডাক-বাংলো। তবে এখানে এসে থাকতে পারেন শুধু মফঃস্বল থেকে শহরে আগত পুলিশ অফিসার ও ঐ বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা। খাবার ব্যবস্থা আছে, চার্জ্জ বাজারের চাইতে কম।

মেদিনীপুরের পুলিশ-সুপার তখন ছিলেন সি, উইলী। সেকালের কথা যাঁদের মনে পড়ে তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, ইনি অত্যন্ত কড়া মেজাজী ও মিলিটারী সাহেব নামে খ্যাত ছিলেন। এই সদ্‌গুণের জন্যই তাঁর ওপরওয়ালা পরবর্ত্তী কালে তাঁকে বোধ হয় একেবারে পুলিশের ইন্‌সপেক্টার জেনারেল অথবা কলকাতায় কেন্দ্রীয় আই-বি অফিসে একেবারে ডেপুটি কমিশনার করে পাঠান। ঠিক মনে পড়ছে না। আমায় কিন্তু আর উইলীর কাছে যেতে হলো না। নিশ্চয়ই তাঁর ডায়েরীতে নির্জ্জলা সত্য কথাটি লেখা হয়ে গেল—The Detenu was produced before me. He said he had his full meals in the journey and had no complain. ইত্যাদি।

তার পর আবার ট্রেণে চড়লাম। এবার সঙ্গে এলেন মেদিনীপুর জেলা আই-বির লোক। নামলাম এসে কাঁথি রোড ষ্টেশনে, সেখান থেকে মাইল আটেক গরুর গাড়ীতে এসে অবশেষে পৌছুলাম কেশিয়াড়ী থানায়। তখন বেলা বারোটা হবে। বড়বাবু থানায় নেই, কোন্ মামলার তদন্তে মফঃস্বলে গেছেন। অভ্যর্থনা জানালেন সহকারী দারোগা অবিনাশ বাবু। বললেন: আসুন, আসুন। মালপত্রগুলো সব ডেটিনিউ বাবুর ঘরে নিয়ে যাও তো, রামভরসা সিং। চাবী দেখ দেয়ালে আছে মালখানার। এই বেলায় আর আপনার পক্ষে রান্না করা সম্ভব হবে না ডেটিনিউ বাবু, আমার এখানেই দুটো ডাল-ভাত—

কী যে বলেন!—বলে মৃদু হাস্য করলাম।

৪৮

আমার ঘরখানার পরিধি দশ ফুট চওড়া ও দশ ফুট লম্বা হবে। খড়ের ছাউনী, ঝাঁপের দরজা ও জানালা। মাথার ওপর 'সিলিং' বলে কিছু নেই, একেবারে চালের নীচে বাঁশের কাঠামো দেখা যায়। ছিটে-বেড়ার ওপর মাটি লাগিয়ে সেটা দেয়ালের মতো তৈরী করবার চেষ্টা হয়েছে, জানালার শিকগুলো বাঁশের, মাটির মেঝে। সম্মুখে আবার কয়েক ফুট চওড়া বারান্দা। সম্মুখেই একটি টিউব ওয়েল সর্ব্বসাধারণের জন্য। ওপারে আমার রান্নাঘর।

পশ্চিম দিকের জানালার বাইরেই একটি ফুলের বাগান। শোনা গেল, আমার পূর্ব্বেকার রাজবন্দীর নিজের হাতের তৈরী বাগান। সারাটি দিন বাগান নিয়েই পড়ে থাকতেন তিনি। গাছে জল দেবার ব্যবস্থাটি কিন্তু চমৎকার। টিউবওয়েলের জল সরে যাবার ড্রেণটি টেনে নিয়ে বাগানের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সারাটি বাগান ঘুরে সেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

টিউবওয়েলে স্নান সেরে নিয়ে এসে তক্তপোষের ওপর বিছানাটা বিছিয়ে নিয়ে বসলাম। দেখা গেল তক্তপোষের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। কেন সেটা সাত ফুট হলো না, সে ইতিহাস পরে জানতে পারলাম। ঘরে আছে একখানি টেবিল ও একখানা হাতলহীন চেয়ার। একখানা ধুতি ভাঁজ করে পরিপাটি করে বিছিয়ে দিলাম টেবিলের ওপর টেবিল-ক্লথের মতো। 'বি' টাইপিসূটা বসিয়ে দিলাম তার ওপর।

একটু পরই এল খাবার ডাক। অবিনাশ বাবুর ওখানে পাশাপাশি খেতে বসে থানার ইতিবৃত্ত মোটামুটি সংগ্রহ করা গেল।

অবিনাশ বাবুর চাকরি হয়েছে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। সরাসরি সরকারী দারোগার পদে নিযুক্ত হয়েও কেন তিনি আজও দারোগা পদের জন্য ওপরওয়ালার মনোনয়ন পেলেন না এবং কী করে সেদিনকার ছোকরা এল, সি-গুলো বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার মতো চড়চড় করে বেড়ে উঠলো দেখতে দেখতে ও সিনিয়রদের টপকে একেবারে দারোগা, এমন কি, অফিসার-ইন-চার্জ্জ হয়ে বসলো, তারই সকরুণ কাহিনী বিবৃত করে তিনি বললেন: মুশকিল তো ঐখানেই দ্বিজেন বাবু, পুলিশের চাকরী করি বলে ওদের মতো বিবেক তো আর খোয়াতে পারলাম না আর সেটাই হলো আমাদের মস্ত অপরাধ। এই তো ধরুন না, আমাদের এই ক্ষীরোদ বাবুর কথাই। মাত্তর তো আট বছরের নোকরি। লাল পাগড়ী মাথায় বেঁধেছিস্ তো পুরো পাঁচটি বছর। বন্দুক কাঁধে ঘাস-বিচালী করেছিস তো পুরো দুটি বছর! তার পর যেই সুরু হলো সিভিল ডিজওবিডিয়েন্স, তখন কর্ত্তারা চোখে দেখলেন সরষে ফুল আর গরু ভেড়া ছাগল সবাইকে রাতারাতি জমাদার করে থানায় থানায় পাঠালেন ভলান্টিয়ারদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে।

বলেই অবিনাশ বাবু অকস্মাৎ নেপথ্য পানে তাকিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন: কেন, কী হয়েছে তাতে? সত্যি কথা বলবো, তাতে আবার ভয় কীসের! দ্বিজেন বাবু সবে এলেন, এখানকার ব্যাপার-স্যাপার ওঁর সব জানা থাকা ভাল।

বুঝলাম স্ত্রীর আপত্তি আছে। আমার আপত্তি কিন্তু আদৌ নেই। পশ্চিমবঙ্গীয় পেটেন্ট ঝালবিহীন রান্না যতই বিস্বাদ লাগুক না কেন এবং সেই সঙ্গে অবিনাশ বাবুর আত্মপ্রচার যতই বিশ্রী ঠেকুক না কেন, থানার পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করাই যে আমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য যত শীঘ্র পালন করা যায়, ততই আমার পক্ষে সুবিধে।

হেসে বললাম: বৌদি বুঝি ভয় পাচ্ছেন?

জবাব দিলেন অবিনাশ বাবু: ভয়? ভয় কীসের? আমি ক্ষীরোদেরটা খাই না পরি? বদমাইসকে বদমাইস বলবো না তো কি বলবো রামকৃষ্ণ পরমহংস? শুনুন দ্বিজেন বাবু, বললে হয়তো হাসবেন মনে মনে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে দেখেই আমার ভালো লেগেছে। তাই এখানকার সব কথা জানিয়ে আপনাকে সতর্ক করে দেয়া আমার কর্ত্তব্য।

বলে অবিনাশ বাবু আর-একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে বোধ হয় নেপথ্যের নীরব সমর্থন নিয়ে যা বললেন, তার মর্ম্ম এই যে, ক্ষীরোদ বাবু মহিষাদল থানায় এ-এস-আই থাকাকালীন এক সত্যাগ্রহীদের সভায় গুলী চালিয়ে তেরো জনকে আহত ও দু'জনকে নিহত করে এস-আইয়ের অফিসিয়েটিং পেয়েছে এবং একেবারে থানার কর্ত্তা হয়ে এসেছে এই কেশিয়াড়ীতে। জানা গেল, ক্ষীরোদ অতি বদলোক, মাতাল, ঘুষখোর ও চরিত্রহীন। মফঃস্বলে গেলেই নিত্য-নতুন সাঁওতালী মেয়ে তার চাই-ই। আর এখানে থাকতেও—না, না, তুমি যতই বারণ কর, সব আমি বলবোই। সত্যি কথা বলবো, তাতে ভয় কীসের শুনি!

নেপথ্যে চুড়ীর আওয়াজ ও শাড়ীর খস্‌খস্ শোনা গেল এবং একটু পরই অবিনাশ বাবুর স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সম্মুখ দিয়ে বড় ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। কণ্ঠস্বর এবার খাটো করে বলতে লাগলেন অবিনাশ বাবু: মশাই, ডাকে বৌদি বলে, অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া, আর তাঁকে কিনা আড়ালে পেয়ে বলে, বৌদি, তোমার ফিগারটা কী সুন্দর! বলুন তো দ্বিজেন বাবু, শুনেছেন কোনো দিন এমনি লম্পট দেওরের কথা? শালার সাতপুরুষের ভাগ্যি যে, আমি সদরে গিয়েছিলাম সে রাত্রে, নইলে জুতিয়ে শালার মাথা থেঁতলে দিতাম—না, না, ও কি, মাথাটা খান দ্বিজেন বাবু। এ কিন্তু বরফের মাছ নয়, একেবারে জটাধর বাবুর পুকুরের, পাকা রুই যাকে বলে।

হৃষ্ট মনে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। ভালোই হলো, দারোগা আর জমাদারের এই কোন্দল খুশী মত কাজে লাগানো যাবে। লিপ্সাকে লেলিয়ে দেওয়া, হিংসাকে খাদ্য দেয়া, অত্যাচারকে প্ররোচনা দেয়া, এরই নাম চাণক্যের রাজনীতি!...

পরদিন সকাল বেলাতেই বহু-প্রতীক্ষিত লম্পট দেওর, দারোগা-পুঙ্গব ক্ষীরোদ দত্তের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অনেক রাতে ফিরেছেন মফঃস্বলের কাজ শেষ করে, তাই টের পাইনি। নতুন জায়গা প্রদক্ষিণ করবার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি থানার বারান্দায় টেবিলে বসে নিবিষ্ট মনে ডায়েরী লিখছেন। যেতে হলো এবং কাছে আসতেই বললেন: বসুন। কাজটা সেরে নিই, তার পর কথা বলছি।

সুপুরুষ নিশ্চয়ই বলতে হবে। যেমন ফর্সা রং, তেমনি বলিষ্ঠ দেহ। মাথায় কুঞ্চিত কেশ, পুলিশী ষ্টাইলে ছাঁটা। সরু করে কামানো গোঁফ। আড়চোখে দেখলাম, হাতের লেখাটিও সুন্দর। দু'পৃষ্ঠার মাঝে কার্ব্বন লাগিয়ে ফাউন্টেন পেন দিয়ে চেপে লিখছেন। লিখতে লিখতেই সিগারেটের টিনটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন। বললাম: আমি খাইনে।

কাজ সেরে প্রথম প্রশ্ন হোল তাঁর: আপনি কদ্দিন ধরে ডেটিনিউ হয়ে আছেন?

জবাব দিলাম: তা—প্রায় সাড়ে তিন বছর হবে।

ঢাকা জেল থেকে আসছেন?

জেল নয়, ঢাকা জেলা। হোম ইন্টার্ণ ছিলাম।

আপনার এরিয়াটা দেখেননি নিশ্চয়ই।—জমাদার বাবু!

শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন জমাদার অবিনাশ বাবু ঘর থেকে। নেপথ্যে অজস্র আস্ফালন দেখলেও এখন কিন্তু সাহসী পদক্ষেপ বা নিঃশঙ্ক ভঙ্গিমার আভাস পেলাম না এতটুকুও, বরং দেখলাম স্পষ্ট এম-ও-এস-এর একটি সাধারণ সংস্করণ মাত্র।

ক্ষীরোদ বাবু তাঁর দিকে না তাকিয়েই হুকুম দিলেন: ডেটিনিউ বাবুকে তাঁর এরিয়াটা আজই একবার দেখিয়ে দেবেন।

এ এরিয়া নিয়েই প্রথম মতভেদ ও মনোমালিন্য সুরু হলো আমার ক্ষীরোদ বাবুর সঙ্গে। কেশিয়াড়ী গ্রামের পুব দিকে যে হাট আছে, সপ্তাহে তা দু'দিন বসে—সোমবার ও শুক্রবার ঐ হাটই আমার পুব দিকের সীমারেখা। হাট-বাজারের সুবিধে দিতে হবে বলে ঐ ব্যবস্থা। উত্তর দিকে ঘন জঙ্গল, কাঁটা বাঁশের ঝোপে ভর্ত্তি। সেদিকে দেয়া হয়েছে একেবারে কেশিয়াড়ী গ্রামের শেষ সীমানা।

দক্ষিণেও নলিনী রাউতের মণিহারী দোকানের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু পশ্চিম দিকের সীমানা নিয়েই গোল বেধে গেল। ক্ষীরোদ বাবুর মতে ওদিকে জটাধর সেনাপতি মশাইয়ের বাড়ীর উল্লেখ থাকলেও বাড়ীটা সীমানার মধ্যে নয়, বাইরে। অর্থাৎ তাঁর বাড়ীর পুব দিকের সীমানা আমার এরিয়ার পশ্চিম দিকের নিশানা।

বললাম যে, তা হতেই পারে না পুব দিকে ব' দক্ষিণ দিকে কেশিয়াড়ী হাট বা নলিনী রাউতের দোকান লেখা থাকলে যদি সে দুটো স্থান আমার এরিয়ার অন্তর্গত হয়, তাহলে পশ্চিমের সীমানা বলে উল্লিখিত জটাধর সেনাপতির গৃহ বাইরে থাকবে কোন্ যুক্তিতে? হয় সবগুলোই আমার এরিয়ার অন্তর্গত, নইলে সবগুলোই বাইরে। ক্ষীরোদ বাবুর খুশী মত কোনোটা বাইরে ও কোনোটা ভেতরে হতে পারে না।

ব্যস্, লেগে গেল দারোগার সঙ্গে। বেদম কথা-কাটাকাটি হবার পর কথা বন্ধ। বিকেল পাঁচটায় থানায় গিয়ে তাঁকে দেখেও যেন দেখতে পাইনে আমি। ভেতরে গিয়ে অবিনাশ বাবুর টেবিলের পাশে বসি, দু'মিনিট বসে আবার বেরিয়ে যাই।

মনে মনে অবিনাশ বাবু ভারী খুশী। যাক্, দারোগা তাহলে পারেনি আমায় হাত করতে। তিনি না থাকলে তো বিকেলের চা ও জলখাবার ওখান থেকে আসবেই, দুপুরেও আসবে ছ্যাঁচড়া, মাছের ঝোল, বৌদির হাতের তৈরী গজা ও অন্য কিছু। ক্ষীরোদ বাবু আবার বড্ড বেশী মফঃস্বল-প্রিয় ছিলেন এবং একবার গেলেই দু'-চারটে রাত বাইরে কাটিয়ে আসতে ভালবাসতেন। জমাদার বাবুও তাই চাইতেন। কারণ তাহলেই রাত্রে এসে পড়তো আমার নেমন্তন্ন দুটো ডাল-ভাতের। কিন্তু দেখা যেত প্রকাণ্ড থালার ঠিক মাঝখানে দুটো ভাত এভারেষ্টের মতো পরিপাটি করে সাজিয়ে থালাখানা বেষ্টন করে সাজানো একই আকারের বাটি, নানারূপ ব্যঞ্জনে, মাছে ও মাংসতে ভর্ত্তি। খেতে বসে একথা-সেকথার মধ্য দিয়ে কখন এসে পড়তো ক্ষীরোদ-প্রসঙ্গ: বুঝলেন মশাই, এমনি বাটি সাজিয়ে ঐ শালাকেও অনেক দিন খাইয়েছি। আদর কি কম করেছি মশাই, না আপনার বৌদি পর ভেবেছে কখনো? কিন্তু কি করা যাবে, শালা আদরের কদর বুঝলো কই? আরে, বৌদিকে আমরা জানি মাতৃস্বরূপা; তাঁকে বলিস্ ফিগার সুন্দর—কিন্তু ও কি, তুমি চললে কোথায়? দ্বিজেন বাবু যে তাহলে না খেয়েই পালাবেন। বসো বসো—

কিন্তু বৌদি বসলেন না। নিজের ফিগারের বিশদ আলোচনায় যোগদানের ভিগার বোধ হয় আর ছিল না তাঁর। দরজার আড়ালে গিয়ে স্থান নিলেন।

সংবাদ সংগ্রহ করলাম যে, অবিনাশ বাবুর তৃতীয় পক্ষ ইনি এবং কতকটা আধুনিক। তাই ক্ষীরোদ ঠাকুরপোর তারিফটাকে তিনি খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করে স্বামীর কাছে উল্লেখ করে একটু আমোদ করতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। ব্যস, তাতেই দাদা একেবারে ফায়ার!···আধুনিকা হলেও সূর্য্যের মুখ দেখবার আর উপায় নেই তাঁর। জমাদার বাবু শ্যেনদৃষ্টি মেলে সর্ব্বদা পাহারা দেন। দু'মাস কেটে গেলেও আমার সঙ্গে তেমন হালকা সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হলো না। ঘোমটাও দিতেন না, কথাও কইতেন, কিন্তু সে, কথা বৌদি ও ঠাকুরপোর নয়, পাঞ্জাব মেইলের সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীর সঙ্গে যাত্রিণীর কথা মাত্র!···

কিন্তু দারোগা-জমাদারের এই বিরোধ সুবিধে মত আমার কাজে লাগাতে কসুর করলাম না। দারোগার সঙ্গে মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে সিনেমার ভিলেইনের মতো এঁর কথা ওঁর কানে এবং ওঁর কথা এর কানে লাগিয়ে কৌশলে এঁদের কান বেশ ভারী করে তোলা গেল। ফলে দু'জনেই আমায় তাঁদের পরম সুহৃদ্ ও শুভানুধ্যায়ী মনে করতে লাগলেন পৃথক্ ভাবে। কিন্তু দু'জনেই থানায় থাকলে আমি পেছন দিককার গেট্ দিয়ে বেরিয়ে যেতাম, সদরের দিকে ফিরেও চাইতাম না। ক্ষীরোদ দত্তের মুখেই শুনলাম যে, অবিনাশ বাবুর স্ত্রীর পরিচয় নাকি রহস্যাবৃত, শ্বশুরবাড়ী থেকে কেউ কোনো দিন আসেনি এখানে, বৌদিও কখনো যাবার নামটি করেন না। এমন কি, কোথায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী, সে প্রশ্নের কোনো যুক্তিসহ জবাব তিনি দিতে পারেন না। এই রহস্যময়ী নারী অকস্মাৎ ক্ষীরোদ বাবুকে দেবরাধিক আদর-আপ্যায়ন করে তাঁকে এত আপনার করে নেন যে, ক্ষীরোদ বাবু সত্যিই তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা, জমাদার বাবু যখন সদরে গিয়েছিলেন একটা মামলায় সাক্ষী দিতে, তখন—বলতে-বলতে দারোগা কণ্ঠস্বর নীচু করে বললেন: সে ঘটনা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না আপনাকে, দ্বিজেন বাবু! তবে কথাপ্রসঙ্গে এসে গেল বলেই বলছি। আর কাউকে বলবেন না যেন। কেমন আমার ফিগারটি, বল তো ঠাকুরপো—বলে বৌদি আমার মুখের সামনে এগিয়ে এসে এমনি একটা বিশ্রি ভঙ্গী করে দাঁড়ালো যে—

বাধা দিলাম: থাক্, সে ঘটনা আমার আর শুনে কাজ নেই।

এরিয়া নিয়ে যে মতভেদ, তার মীমাংসা করবার জন্য কড়া দরখাস্ত পাঠালাম সদরে। যথারীতি তার কোনো জবাব এল না। আমি এবার লিখলাম, জটাধর বাবুর বাড়ীতে আমি যাবোই। এতে আইনভঙ্গ হয়ে থাকলে মামলা কর আমার নামে। তারও জবাব নেই। এদিকে ক্ষীরোদ দারোগা গোপনে পাঁয়তাড়া কষতে লাগলেন যে, গ্রেপ্তারের হুকুমটা একবার এলেই হয়। এল-সি সুধীর সংবাদটা জানিয়ে দিল।

থানার বাইরে একটু দূরেই দাতব্য চিকিৎসালয়। সেখানকার ডাক্তার রামমোহন বাবু বেশ ভদ্র ও অমায়িক। ডাক্তারী বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা কতখানি, সে বিচার করবার সুযোগ অবশ্য আমি পাইনি, তথাপি প্রায়ই সকাল বেলা সেখানে গিয়ে বসে-বসে নানা রকম রোগীর সমাগম দেখতাম শুধু সময় কাটাবার জন্যই। ডাক্তার বাবু বাস করেন সপরিবারে, কিন্তু কম্পাউণ্ডার বাস করেন একা। স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যা গেছেন বাপের বাড়ীতে অনেক দিন। এত দিনে অবশ্য ফিরে আসা উচিত ছিল, কিন্তু মাইনে যা পান তাতে করে চালানো দুষ্কর। আর দেশে বিনোদ বাবুর বৃদ্ধা মায়ের পরিচর্য্যার জন্য একজনকে অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন বলে বিনোদ বাবু স্থির করে রেখেছেন, এবার আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধকল সইবার মতো শক্তি অর্জ্জন করলেই তাঁদের পাঠানো হবে মায়ের কাছে।

ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেলে প্রায়ই বিনোদ বাবুর কোয়ার্টারে বসে গল্প করতাম। স্পষ্ট মনে পড়ে, আজও বিনোদ বাবুর অমায়িক

ক্ষুদ্রের কথা! অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক, প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তি। যে সব নিরীহ ও নির্লিপ্ত লোক দেখে সাধারণত: করুণার উদ্রেক হয়, বিনোদ বাবু তেমনি ক্ষুদ্র নন; এঁকে দেখলেই কেন জানিনে এঁর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কইতে ইচ্ছে করে হাতের কাজ ফেলে রেখে এবং দু'-চার দিন মেলামেশা করলেই এঁর দরদী অন্তরের একটা আভাস পাওয়া যায়।

দেশের কাজের কথা উঠতেই বিনোদ বাবু বলেন: কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনে কাজ হবে বলে মনে হয় না আমার। কারণ আদালতে যতই যুক্তি দেখাই না কেন তার ফলে Boss কখনো স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন না। আর যেতে পারেন না যে! আমার দেশের টাকা দিয়ে যার সংসার চলে, দু'বেলা উনুনে হাঁড়ী চড়ে সে কি এমনি আত্মঘাতী উদারতা দেখাতে পারে কখনো? তাহলে আমরাই যে তাকে বোকা বলবো।

সুযোগ পেয়ে গেলাম। মেদিনীপুরে বিভিন্ন শাখা তো স্থাপিত হয়েছে বহু পূর্ব্বেই, যার ফলে পর-পর তিনটি সাদা চামড়ার ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হয়েছে। তাই মন্ত্র ছড়িয়ে যেতে ক্ষতি কি? শাখার সঙ্গে পরে সংযোগ স্থাপন করে দিলেই চলবে! প্রশ্ন করলাম: তাহলে কোন্ পথ আপনি সুপারিশ করেন?

বিনোদ বাবু উত্তর দিলেন: শুধু সুপারিশ নয় দ্বিজেন বাবু, যে পথ একেবারে অব্যর্থ বলে মনে হয় দ্রোণাচার্য্যের তীরের মতো। কিন্তু তার কথা ভাবতেই যে আমার বুক কেঁপে ওঠে। বার্জ্জকে মারবার সময় আমি ছিলাম শহরে। খেলার মাঠেও গিয়েছিলাম সেদিন বেড়াতে বেড়াতে। সত্যিই, কষ্ট হলো বেচারাকে দেখে। একেবারে কুকুরের মতো গুলী খেয়ে পড়ে আছে রাস্তার ধূলোয়!··· তাই ভয় হয় আপনাদের দেখে।

কিন্তু কার্য্যত: ভয় আদৌ আর রইলো না। কেশিয়াড়ীতে কম্পাউণ্ডার বিনোদ বাবুই হয়ে উঠলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অবিনাশ জমাদার এতে আপত্তি করলেন না, এল-সি সুধীর তো আহ্লাদে আটখানা আর থানার অন্যান্য সিপাইরাও একবাক্যে বললো যে, কম্পাউণ্ডার বাবুর মতো ভালো লোক এ তল্লাটে আর নেই। শুধু গোপনে সংবাদ পেলাম যে, ক্ষীরোদ দারোগার এটা ভালো লাগেনি। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ডেটিনিউ কেন মিশবে এত? ওরা তো কয়েদী!

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, দারোগা ও জমাদারের মনোমালিন্য আমি কাজে লাগাতে সুরু করলাম। ফলে, মাস চারেক কেটে যেতেই অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে, ক্ষীরোদ বাবু একবার মফস্বল গেলেই সারা থানার মালিক তখন হয়ে বসি আমি। দিব্যি সন্ধ্যের পর থানার বারান্দায় বসিয়ে দিই তাসের আড্ডা কিংবা বিনোদ বাবুর কোয়ার্টারেই রাত কাটিয়ে আসি, নইলে কোনো সিপাইর সাইকেল নিয়ে গ্রামের মেঠো পথে খুশী মত ঘুরে বেড়াই। ঘূণাক্ষরেও দারোগার কানে যাবার আশঙ্কা নেই আর।

বিনোদ বাবুর নামে এনভেলপে বিক্রমপুর থেকে পত্র আসে। তাতে সেখানকার সংবাদ পাই সবই—কী ভাবে কাজ চলছে, কোন্ গ্রামে বা স্কুলে টোপ ফেলতে পারা গেছে, কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা—আমিও তার জবাব লিখে পাঠিয়ে দিই একেবারে কলকাতায় মতি সাহার সঙ্গে। সেখানে চিঠিগুলো পোষ্ট হয়ে যায় ছোটকোনের মায়ের নামে। মতি সাহারই একমাত্র ফলের দোকান কেশিয়াড়ীতে। প্রতি সপ্তাহেই তাকে কলকাতায় যেতে হয় নানা রকম ফল কিনে আনতে। বিনোদ বাবুর মারফৎ তাকেও দলে টেনে নেয়া গেল।

আমার মাসিক ভাতা পঁচিশ টাকা প্রথম সপ্তাহেই আসতো নিয়মিত ভাবে মেদিনীপুর আই. বি অফিস থেকে মনিঅর্ডারযোগে। ১৯৩৫ সালের অবস্থা এখন কিন্তু কল্পনা করা কঠিন। সে যুগে ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একখানা ঘর ভাড়া করে কলকাতা শহরে খুব স্বচ্ছন্দে না হলেও বিনা দুঃখেই দিন কাটাতে পারতেন। একশো টাকা মাইনের বর সে যুগে অত্যন্ত মহার্ঘ মনে করা হতো।

আমার কিন্তু কিছুতেই চলতে চাইতো না। কি করে, কোথা দিয়ে সব টাকা শেষ হয়ে যেত তৃতীয় সপ্তাহেই। গিয়েই যে চাকরটা পাওয়া গেল, ব্যাটা একদিন আমার ফাউণ্টেন পেন নিয়ে সরে পড়লো। তার পর জমাদার যেটাকে জুটিয়ে দিলেন, সেও একদিন চম্পট! ফলে, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রায়ই বিভ্রাট লেগে যেত। জমাদারের বাড়ীতে এমনি খাওয়া ভদ্রতাসূচক দেখায় না বলেই হাট থেকে মাছটা, মিষ্টিটা কিনে পাঠিয়ে দিতে হতো। তাই হতো ব্যয়-বাহুল্য! কিন্তু উপায় কী? জীবনে মেসে খাইনি, রান্নাও করতে জানিনে।

ক্ষীরোদ বাবু মফস্বল থেকে প্রায় সাত-আট দিন পর ফিরে এসে আমার দুরবস্থার কথা শুনলেন। আমি দু'বেলা অবিনাশ বাবুর বাসায় খাই শুনে আমার অব্যবস্থার জন্য তাঁর দরদ যেন অকস্মাৎ একেবারে উত্তাল হয়ে উঠলো। বললেন: বলেন কি, আপনার চাকর পলাতক? তাহলে তো ভারী কষ্ট হচ্ছে আপনার—

বলতে চেষ্টা করলাম: না, না, কষ্ট কীসের? অবিনাশ বাবুর ওখানে বেশ যত্নেই তো খাচ্ছি একেবারে নিজের বাড়ীর মতো।

দারোগা কণ্ঠস্বর খাটো করে বললেন: দেখবেন, গৃহকর্ত্রী আবার আপনাকে বেশী আপনার না ভেবে বসেন। চেহারাখানা তো আপনার ভালো নয়, তাই সে আশঙ্কা—

বাধা দিলাম: না, না, ওকি কথা বলছেন, দারোগা বাবু! তবে হ্যাঁ, আদর-যত্ন খুব করেন বৌদি!

দারোগা হেসে উঠলেন!

তার পর রামভরসা সিংকে কোথায় পাঠিয়ে ডেকে আনালেন একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে। বললেন: দ্বিজেন বাবু, চাকর-বাকর এখানে কিছুতেই পাবেন না। আমরাই পাই না, পাই তো রাখতে পারি না। শালারা কোথাও দু'দিন টিঁকে থাকে না। তার চাইতে এক কাজ করুন, এই মেয়েছেলেটিকে রাখুন। ভালো রাঁধতে পারে, খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আপনি একা মানুষ, ওই সব কাজ করে দেবে। আর বাড়ী এই কাছেই, আপনাকে খাইয়ে-দাইয়ে কাজকর্ম্ম সেরে রাত্রে বাড়ী চলে যাবে।—কি রে হরিমতী, থাকবি ডেটিনিউ বাবুর বাসায়?

দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। মুখখানা আধখানা ঘোমটায় ঢাকা।

দারোগার প্রশ্নের জবাবে কোনো সাড়া না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লো। মনে হলো, ভারী লাজুক। কাজ হয়তো ভালোই করবে, অন্ততঃ দারোগার ভয়ে না-ও পালাতে পারে।···কিন্তু মেয়ে রাঁধুনী—

বললাম: চাকর-বাকর কি এদেশে একেবারেই মেলে না দারোগা বাবু?

হ্যাঁ, মিলবে না কেন,—দারোগা সোৎসাহে জবাব দিলেন: তবে কি জানেন, প্রায়ই দেখবেন গায়ে চক্করওয়ালা। রামমোহন ডাক্তারের ওখানে তো নিশ্চয়ই দেখেছেন এমনি অসংখ্য রোগী। ম্যালেরিয়া আর সিফিলিস, এই হচ্ছে এ দেশের বৈশিষ্ট্য!

আঁৎকে উঠলাম! সিফিলিস!···

দারোগা বলতে লাগলেন: তার চাইতে জানা লোক নেয়া অনেক ভাল। ভাবছেন বুঝি ঝি বলে। তাতে দোষ কী? মিথ্যে বদনাম অন্ততঃ রাজবন্দীদের কেউ দিতে সাহস করবে না। আর করলেই কি আপনারা তাই কেয়ার করে চলবেন?

সত্যিই তো, মিথ্যাকে কীসের পরোয়া?···থানা-কক্ষের অভ্যন্তরে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতেই দেখলাম অবিনাশ বাবু তাঁর কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা বড় বড় চোখ দুটো মেলে যেন আমায় জ্বালিয়ে দিতে চাইছেন রোদে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মুখে নারকেলের ছিবড়ের মতো।

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে, হরিমতী বহাল হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

শালপাতা

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অরণ্য সভায়
সেদিন দেখেছি তারে পরিপূর্ণ আত্মমহিমায়
অস্তিত্ব গৌরবে তার উর্দ্ধপানে তুলি
আছে চেয়ে কৌতূহলী,
অসীম আকাশ পানে—
যেথা হতে বৃষ্টিধারা আনে,
আনন্দ-অমৃত রস,
যেথা হতে সূর্য্যালোক রেখে যায় উত্তপ্ত পরশ।

রক্তিম অধর তার কেঁপেছিল দুরন্ত আবেগে
কোন্ স্বপ্ন-শয্যা হতে অকস্মাৎ উঠেছিল জেগে
বনচ্ছায়া মর্ম্মরিত ফাল্গুনের তপ্ত বায়ুশ্বাসে
কী প্রচুর প্রাণের আশ্বাসে।

মহীরুহ আনন্দ-অধীর
তুলেছিল উচ্চকিত শির
কান পেতে শুনেছিল অব্যক্তের আনন্দের ধ্বনি
দণ্ড পল রেখেছিল গণি
কবে হবে তার অভ্যুদয়,
কঠিনের আবরণ চূর্ণ হল—জয় তব জয়।

কুঞ্চিত কোমল তনু সবুজের সজ্জা নিল পরে
থরে থরে
নিজেরে প্রসারি দিল অরণ্যের আনন্দ-মেলায়
বাতাসের নৃত্যছন্দে বৃন্তবন্ধ ঘেরি দোল খায়
সে যে তার যৌবনের দিন
তারা ছিল সৌভাগ্যে রঙ্গীন।

তারপরে অকস্মাৎ
আচম্বিতে নামিল আঘাত
আকাশ পিঙ্গল হল, বাতাস তুহিন
তনুর লাবণ্য গেল—হল তারা পাটল, শ্রীহীন,

অকরুণ ভাগ্যের ইঙ্গিত
নেমে এলো—বৃন্তবন্ধে হারালে সম্বিৎ।
পরদিন প্রাতে
নিজেরে মিলায়ে দিলে রাশি রাশি ঝরাপাতা সাথে

ভেবেছিনু জীবনের শেষ প্রান্তে নেমে
ইতিবৃত্ত গেছে বুঝি থেমে
ভেবেছিনু তব পরিচয়
অরণ্য-মর্ম্মরে বুঝি হয়ে গেছে লয়।
নূতন পাতার বুকে
জীবনের বাঁশী তব বাজিবে না আর বুঝি অন্তহীন সুখে।

* * *

তারপরে দেখি
এ কি!
পাংশুম্লান নির্জীবিত লঘু শুষ্ক শবে
টেনে নিয়ে এসেছ নীরবে
বনের সাচ্ছন্দ্য হতে নগরীর ক্লীব জড়িমায়
চেয়ে আছ হায়
দীন হতে দীন
ধনীর প্রাসাদ হতে দরিদ্রের কুটিরে মলিন।
প্রয়োজন অতিরিক্ত আজি তব মূল্য কিছু নাই
সেথা আছ যেথা আছে ছাই,
যেথা আছে আবর্জ্জনা,
উপেক্ষায় শোধ কর অবশিষ্ট জীবনের দেনা।

হায় মৃতদেহ
তোমারে কি বলেনিকো কেহ
এখনো শালের বনে নিত্য চলে জীবনের দীপ্ত উদ্বোধন
অতন্দ্র তপস্যা আর সুগম্ভীর উর্দ্ধে ওঠে আনন্দ মহান্।

রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যের বাস্তবতা

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

রসদৃষ্টি ও তত্ত্বদৃষ্টি, অনুভূতি ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ কবি ও সমালোচকের সমন্বয় হওয়ার দৃষ্টান্ত একটা সাধারণ ব্যাপার না হইলেও একেবারে বিরল নয়। এক ইংরাজী সাহিত্যেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কোলরিজ প্রভৃতি এমন অনেক প্রথম শ্রেণীর কবির নাম করা যায় যাঁহারা একাধারে কবি ও সমালোচক, স্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা। কিন্তু এইরূপ সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন সার্থক ও পরিপূর্ণ ভাবে দেখা যায় আর কোন কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। তবে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় রবীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলির আংশিক পরিচয়ও এখনও সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই, প্রকাশিত হইলে, আশা করা যায়, রবীন্দ্র-সাহিত্যে এখনও যে দুর্বোধ্যতা-রহস্যময়তার আভাস আছে তাহা দূরীভূত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ ও পাশ্চাত্য সমালোচকগণের সহিত তুলনামূলক আলোচনায় সাহিত্যের রূপ ও স্বরূপ নির্দ্ধারণে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বদৃষ্টির গভীরতা ও মৌলিকতা কতখানি, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

বাংলা-সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস যিনি লিখিবেন তিনি সাহিত্য-সমালোচকরূপে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশিত করিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার একটা বিশেষ দিক্ উদ্ঘাটিত করিবেন। বর্ত্তমান আলোচনায় সাহিত্য-সম্বন্ধীয় রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য লেখার সামান্ত পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয়; তাই তাঁহার সাহিত্য-বিষয়ক নানা শ্রেণীর আলোচনার মধ্য হইতে একটি বাছিয়া লইয়া সাধারণ ভাবে যথাজ্ঞান আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। সে বিষয়টি—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যে বাস্তবতার আদর্শ। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে 'বাস্তবতা' কথাটি অতি পুরাতন। দেশী-বিদেশী, খ্যাত-অখ্যাত নানা শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচক নানা ভাবে বাস্তবতার স্বরূপ এবং সাহিত্যে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। বলা যায়, **Realism** বা বাস্তববাদ এবং ইহার প্রতিস্পর্দ্ধী যুগ্মশব্দ **Idealism** বা আদর্শবাদ এই দুইটি 'বাদ' লইয়া বিংশ শতকের সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে যত প্রকার বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে সাহিত্যের অপর কোন রীতি লইয়া বোধ হয় এত আলোচনা হয় নাই। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সেরূপ বাদ-প্রতিবাদমূলক কোন আলোচনায় প্রবেশ করিব না, কেবল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাস্তবতার কি রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ ইহাকে কোন্ তাৎপর্য্যের ভূমিকায় গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

"সাহিত্যের পথে" নামক বইখানিতে বিভিন্ন সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি আলোচনা সংকলিত হইয়াছে। বইখানির "বাস্তব" নামক প্রথম প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছিল ১৩২১ সালে আর শেষ প্রবন্ধটি "সাহিত্যের-তাৎপর্য্যের" রচনা-কাল ১৩৪২—৪৩, এবং শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তীকে লেখা যে পত্র-প্রবন্ধটি গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার রচনা-কাল ১৩৪৩। এই দীর্ঘ বাইশ-তেইশ বছরের ব্যবধানে লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাব ও ভঙ্গীতে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবতার সূত্রে যদি এই পার্থক্যটি লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিব, প্রথম প্রবন্ধটিতে বাস্তবতা সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তাহা খুবই অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও অগভীর। বিরোধী-পক্ষকে আক্রমণ করিয়া লেখা বলিয়া অনেক জায়গায় আক্রমণের সুরই উঁচু ও চড়া হইয়া উঠিয়াছে; বাস্তবতা সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব স্পষ্ট হয় নাই। ইহার তুলনায় ১৩৪০ সালে লেখা "সাহিত্য-তত্ত্ব" প্রবন্ধে বাস্তবতা সম্বন্ধে যে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য-আলোচনা আছে, তাহা নিশ্চিতই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। এই আপাত-বৈষম্যের কথা ছাড়িয়া দিলে বাস্তবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখার মধ্যেই একটা গভীর ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সে ঐক্যটি এই—সাহিত্যে রস-বিবিক্ত বাস্তবের কোন অস্তিত্ব নাই। সাহিত্যে বাস্তবের তাৎপর্য্য রসের ভূমিকায়। অবশ্য শুধু বাস্তবতার আলোচনায় নয়, সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি বলিয়াছেন—রসই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। সুতরাং সাহিত্য-সমালোচক-রূপে রবীন্দ্রনাথ রসবাদেরই সমর্থক।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব, এই লইয়া একটা জনমত এক সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল। "সাহিত্যের পথে"র 'বাস্তব' নামীয় প্রবন্ধটি সেই জনমতের বিরোধী আলোচনা। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কাব্যের মূল উপাদান বস্তু-জগৎ। এই বস্তু-জগৎকে অবলম্বন করিয়া এবং এই বস্তু-জগতের অতীত হইয়া কাব্যে রসলোকের উদ্বোধন ঘটে, সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় রসলোকেই কাব্যের কাব্যত্ব। এই যে রসলোক ইহা কাব্যেরও নয়, কবিরও নয়। কাব্য-বর্ণিত বস্তু-জগতের আশ্রয়ে পাঠকচিত্তের বাসনালোকের স্ফুরণ ঘটাইয়া উদ্বুদ্ধ হয় রসলোক। ইহা পাঠকচিত্তেরই আনন্দময় অনুভূতি। পাঠকচিত্তের অনুভূতির বাহিরে রসের কোন অস্তিত্ব নাই, রস তাই রসিকের অপেক্ষা রাখে। ভক্তি-রসের রসিক ভক্ত, কাব্য-রসের রসিক পাঠক। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এই রসিক-পাঠকের পারিভাষিক নাম "সহৃদয়-সামাজিক"। এ যুগে রস-সাহিত্যের আস্বাদন সহৃদয়-সামাজিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই কাব্যবিচারে রস অপেক্ষা বস্তুর দিকে কোন কোন সাহিত্য-সমালোচকের সজাগ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বাস্তবতা বলিতে বুঝিয়াছেন বস্তু-জগৎ। বস্তু-জগৎ হইল এই পরিদৃশ্যমান বাহ্য বা লৌকিক জগৎ। ইহা কাব্যের লক্ষ্য নয়, উপাদান। বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা-ওবেলা ওঠা-নামা করে, বস্তুজগতে তাই নিত্যতা নাই, নিত্যতা আছে রসে। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, কালজয়ী কাব্যগুলি বস্তুপিণ্ডকে আশ্রয় করিয়া অমরত্ব লাভ করে নাই, উপরন্তু যে কাব্য-গুলিতে বস্তুবাহুল্য অধিক সেগুলি কালের স্রোতে বুদ্বুদের মত চিহ্নটুকু না রাখিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজিমের জরোত্তাপ যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চড়িয়া উঠিতেছিল তখন এক দল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল। তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়? * * * আর শেলি, কীট্‌স্ ইহাদের কাব্যের বাস্তবতা কি দিয়া নির্দ্ধারণ করিব? ভিক্টোরিয়া-

যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সঙ্কীর্ণ হইতেছে।"

আলোচনার ধারা দেখিয়া মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল—যে কবি তাহার যুগের ভাবধারার সহিত সাম্য রাখিয়া চলিয়াছেন, সমসাময়িক যুগের জনমতের সঙ্গে যে কবির যোগ ঘনিষ্ঠ তাহার কাব্য যথার্থ বাস্তব হইয়া উঠে কিন্তু রসের দিক্ দিয়া নিঃস্ব হয়। অপর দিকে প্রচলিত লোকাচারের উর্দ্ধে মর্ত্ত্যজগতের সমস্ত যোগ ছিন্ন করিয়া যিনি নিরলম্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন তাঁহার কাব্যের বাস্তব-দৈন্য রস-বৈভবে ঢাকিয়া যায়। এবং কবি হিসাবে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ কথা স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলেন নাই যে, সাহিত্যে বাস্তবতা কথাটি গুরুত্বহীন। আবার সাহিত্যে বাস্তবতার প্রকৃত অর্থই বা কি সে সম্বন্ধেও তিনি চুপ। প্রবন্ধটি মূলতঃ বস্তু ও রস সম্পর্কে অতি সাধারণ আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যাহাকে বলিয়াছেন বস্তু বা বিভাব, রবীন্দ্রনাথ সেই বস্তুকেই বাস্তব অর্থে ধরিয়াছেন। এবং মনে করিয়াছেন বাস্তবতা সাহিত্যের দূষণ।

এ কথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, বস্তুরূপই কাব্যের যথার্থ রূপ নয়। বস্তু-সংস্পর্শজাত পাঠকচিত্তের যে স্পন্দন-অনুভূতি সেই অনুভূতিতেই কাব্যের কাব্যত্ব। সুতরাং কাব্যের বাস্তবতা-বিচারে সেই অনুভূতি পর্য্যন্ত যাইতে হইবে, ইহার মধ্যবর্ত্তী বস্তু-স্তরে থামিয়া কাব্য সম্বন্ধে কোন বিচার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে যে কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সে কথাটি এই প্রবন্ধে অনুল্লিখিত রহিয়া গিয়াছে; সেটি এই—বস্তুর রসতা প্রাপ্তি। বস্তু রস নয়, কিন্তু এই বস্তুই আবার রসলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা অনেক কাব্য বস্তু-বাহুল্যের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সে কথা আদৌ ঠিক নয়। সে কাব্য যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ কবি বস্তুকে রসরূপ দিতে পারেন নাই। কাব্য মাত্রেরই অবলম্বন বস্তু, নিরলম্ব শূন্যলোকে রসালাপন সম্ভব নয় আর এই বস্তুকে রসরূপ দিবে কবি-কল্পনা। আলঙ্কারিকেরা যাহাকে বলিয়াছেন, "অভিনব বস্তু-নির্ম্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা।" রবীন্দ্রনাথ ভুল করিয়াছেন বস্তু ও রসকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করিয়া। বস্তু যে রসের উপাদান সেদিকে তিনি লক্ষ্য করেন নাই। এবং বাস্তবতা ধর্ম্ম যে বস্তুর ধর্ম্ম নয় রসেরই ধর্ম্ম, সেটিও তিনি লক্ষ্য করেন নাই।

এই প্রবন্ধের আরম্ভেই আছে—"যদি এমন কথা কেহ বলিত যে আজ-কাল বাংলা দেশে কবিরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা দ্বারা লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব আমিও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম কথাটা ঠিক বটে, এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।" এখানে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, যে দৃষ্টিতে তখনকার লোকে বাংলা কাব্যে বাস্তবতার অভাব লক্ষ্য করিয়াছিল সেটি বাস্তবতার প্রকৃত ব্যাখ্যা নয় কবি নিজেও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। "জনসাধারণের উপযোগী নয়" এবং "লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না"—এই দুইটির অভাব প্রকৃত বাস্তবতার অভাব নয়। যে কাব্য জনসাধারণের কাব্য তাহা হাটের কাব্য এবং যাহা লোকশিক্ষার কাজ করে তাহা প্রয়োজন-মূলক সাহিত্য, রস-সাহিত্য নয়। এই দুইটি অভাব পূর্ণ হইলেই যে কাব্য বাস্তব হইয়া উঠিত একথা আদৌ ঠিক নয়। এই কথারই উত্তর রবীন্দ্রনাথের ১৩৪১ সালে লেখা "সাহিত্য-তত্ত্ব" প্রবন্ধটিতে আরও সূক্ষ্ম আরও গভীর ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-তত্ত্ব প্রবন্ধটি ১৩৪১ সালে লেখা। ইহা বাস্তব প্রবন্ধটি লিখিবার প্রায় উনিশ বছর পরের ঘটনা। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে কতখানি সহজ ও স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে তাহা প্রবন্ধটি পড়িলে অতি সহজেই বোঝা যাইবে। প্রথম প্রবন্ধটিতে দেখিয়াছি, বাস্তবতা নামে কবি-ভাবনার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং পাঠক-সমালোচকের পক্ষে সাহিত্যের শ্রেণী-বিচার করিতে গেলে কবি-ভাবনার যে আদর্শবাদ-বাস্তববাদ রোমাণ্টিকবাদ প্রভৃতি নামকরণ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন মন্তব্য করেন নাই। উপরন্তু আলোচনা দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের যেন ধারণাই ছিল বাস্তবতা কাব্যের একটা দূষণ। বাস্তববাদ, আদর্শবাদ, রোমান্টিকবাদ ইহারা কাব্যের দূষণও নয় ভূষণও নয়। কাব্যের অন্তরঙ্গ রসপরিপূর্ত্তির সহিত ইহাদের বিন্দুমাত্র যোগও নাই। ইহারা কবিভাবনার এক-একটি বৈশিষ্ট্য। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ পরে স্বীকার করিয়া এই বৈশিষ্ট্যের প্রকার প্রকৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম-গভীর আলোচনা করিয়াছেন।

সাহিত্য-তত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতা সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলি করিয়াছেন তাহাই বাস্তবতার প্রকৃত ব্যাখ্যা। বাস্তবতার ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক, সাহিত্যে বাস্তবতার অর্থ সত্য। ঘটনাগত সত্য বা বস্তুগত সত্য নয়—উপলব্ধিতে যাহা সত্য তাহাই বাস্তব। অনুভূতির বাহিরে যেমন রসের অস্তিত্ব নাই অনুভব-উপলব্ধির বাহিরে তেমনি বাস্তবেরও অস্তিত্ব নাই। পত্রভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়াছেন, "মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হ'ক অতথ্য হ'ক কিছুই আসে যায় না। এমন কি সেই অদ্ভুতের সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্য তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে।" এখানে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে সত্য বলিয়াছেন তাহারই পারিভাষিক নাম বাস্তব। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কাব্যের রস-নিষ্পত্তি ও বাস্তবতা ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন বিরোধ নাই। আর বাস্তবতার প্রকৃত অর্থ বস্তুবাহুল্য নয়, কাব্যের বাস্তবতা রসেরই প্রকার-বিশেষ। এ দুইটি বিষয় বাস্তব প্রবন্ধটি লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ তেমন পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করেন নাই।

সাহিত্য-তত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হ'য়েছে আমার আপন।" আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, "মানুষও শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়ে এসেছে, প্রত্যক্ষ-বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদা-সর্ব্বদা হ'য়ে থাকে, যা যুক্তিসংগত। যে-কোন রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট ক'রে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে গেলে সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মূল ভাবনা তাহার আলোচনা আবশ্যক। বস্তুত, আদর্শবাদ-বাস্তববাদ ইহার স্বরূপ সাহিত্যতত্ত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপলব্ধি করা যায় না। মূল সাহিত্যবোধের সঙ্গে এগুলি

গভীর ভাবে অন্বিত। রবীন্দ্রনাথও মূল সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলি আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং সাহিত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে প্রথমে বিশ্লেষণ করা যাক্। এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখিব, সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল তত্ত্ব প্রাচীন রসবাদী প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণের তত্ত্বের সহিত অভিন্ন।

বিশ্বের উপর আমাদের মনের কারখানা বসিয়াছে। এই মনের আশ্রয়েই বিশ্বকে আমরা জানি। এই জানার পরিধি যত ব্যাপ্ত হয়, বিশ্বের উপর আমাদের অধিকারও তত বিস্তৃত হয়, ততই আমরা নিজেকে বিস্তৃত করি, আত্মবোধকে প্রশস্ত করি। বাহিরের বৈচিত্র্যের বাহুল্য আমাদের চৈতন্যকে স্পর্শ করিয়া আমাদের আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে, "আমি আছি" এই বোধকে জাগাইয়া তোলে। "আমি আছি" এই বোধটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সুতরাং যাহাতে আমার সেই বোধকে বাড়াইয়া তোলে তাহাতেই আনন্দ। দুর্গম অসাধ্যসাধনে মানুষের যে এত আকর্ষণ, অপ্রাপ্য দুর্লভের উপর মানুষের সে এত মোহ, তাহার কারণও এই। ইহা আমাদের চৈতন্যকে স্পর্শ করে, আমাদের প্রাত্যহিক স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মধ্যে চাঞ্চল্য আনিয়া 'আমি আছি' এই বোধকে জাগাইয়া তোলে—তাহাতেই আনন্দ। আর ইহার বিপরীত চৈতন্যের অসাড়তাই নিরানন্দের কারণ। "বদ্ধজল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তব্ধ হ'য়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।"

জানা বা বিশ্বের উপর আমার চৈতন্যকে বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়া আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিবার দুইটি উপায়—জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। জ্ঞানে জানি বিষয়কে, অনুভবে জানি আপনাকে। এই অনুভব বা উপলব্ধির যে আনন্দ তাহাই সাহিত্য বা ললিতকলার আনন্দ। অনুভব বা উপলব্ধি একটা জটিল প্রক্রিয়া—রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য-কিছুর অনুসারে হয়ে উঠা, শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোন বিশেষ রঙে বিশেষ রসে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব।" ইহার একটু পরেই বলিয়াছেন, "অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লে জানি নে।" এই আত্মোপলব্ধির আনন্দ বা অনুভবের আনন্দ প্রকারান্তরে রসেরই আনন্দ এবং উপলব্ধির প্রক্রিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে রসের প্রক্রিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বাইরের ঘটনার বৈচিত্র্য-বাহুল্য আমাদের চৈতন্যকে স্পর্শ করিয়া 'আমি আছি' এই বোধকে জাগ্রত করে এবং তাহাতেই আনন্দ। রসের উপায় ও লক্ষ্যও ঠিক একই। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'বৈচিত্র্য-বাহুল্য' বলিয়াছেন, রসের প্রক্রিয়ায় তাহাকেই বলা যায় আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব। এই আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাবের আশ্রয়ে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের সহযোগিতায় কাব্যের স্থায়িভাব অতিসম্পন্ন হয়, এদিকে পাঠক-দর্শকের বাসনালোকে আছে ভাব। পাঠকের বাসনালোকধৃত ভাব এবং কাব্যের অতিসম্পন্ন ভাব ইহারা একত্র হইয়া রস-নিষ্পত্তি ঘটায়। সাহিত্য-তত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাসনালোক কথাটির কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। তথ্য-সত্য নামক প্রবন্ধটিতে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। * * * কাব্যে চিত্রে গীতে গ্রীক-শিল্পীর পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্ত্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকে একের মিলন হয়।" ইহাকেই আমি বলিয়াছি পাঠকের বাসনালোকধৃত ভাব এবং কাব্যের অতিসম্পন্ন ভাবের মিলন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে অনুভবের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, অনুভবের অর্থ অন্য কিছুর অনুসারে হইয়া উঠা—সেখানে রসের প্রক্রিয়ার প্রধান ক্রিয়া "সাধারণীকরণের" উপর লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার যেখানে বলিয়াছেন, উপলব্ধির আনন্দ বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হইয়া যাওয়ার আনন্দ, সেখানেও ইঙ্গিত সাধারণীকরণের একটা বিশেষ অবস্থার দিকে। সাধারণীকরণের অর্থ পরিমিত ব্যক্তিত্ব লোপ করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত একীভবন।[১]

আলঙ্কারিকেরা যাহাকে পরিমিত বোধের লোপ বলিয়াছেন, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই সূত্রটিকেই আরও গভীর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সাহিত্য যে অপ্রয়োজনের আনন্দ দেয় সেই মৌলিক তত্ত্বটি সিদ্ধ করিয়াছেন। পরিমিত ব্যক্তিত্ব কি? আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক প্রয়োজন-সিদ্ধ সত্তা। এই সত্তা প্রয়োজন-বেড়ার মধ্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সংকুচিত। এই পরিমিত ব্যক্তিত্বকেই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বিষয়ী মানুষ অত্যন্ত কম মানুষ, সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাটা মানুষ।" এই প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে প্রাত্যহিক বৈষয়িকতার ঊর্দ্ধে, পরিমিত-বোধের ঊর্দ্ধে যে অসীম অহৈতুক দায়মুক্ত বৃহৎ জগৎ তাই শিল্পের জগৎ। সেই জন্য সাহিত্য-শিল্পের আনন্দ অপ্রয়োজনেরই আনন্দ।[২]

বাস্তবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা স্পষ্ট বুঝিতে গেলে উপরি-আলোচিত এই তত্ত্ব দু'টিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। তত্ত্ব দুটি সংক্ষেপে এই—সাহিত্য অনুভবের আনন্দ, প্রকারান্তরে আপনাকে জানার আনন্দ। আর, সাহিত্যের আনন্দ অপ্রয়োজনের আনন্দ। বাস্তবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত এই তত্ত্ব দুইটির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই তত্ত্ব দুইটি স্বীকার না করিলে বাস্তবতা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করা শক্ত হইবে। এই তত্ত্ব দু'টি একটি দৃষ্টান্তের মধ্যে কি ভাবে মিলিয়া গিয়াছে, তাহা দেখা যাউক। "ছিলেম মফঃস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল, তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য ক'রবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ী চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন-কাঁধে কাজকর্ম্ম করে। তার প্রধান গুণ সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলাম যেদিন সে হ'ল অনুপস্থিত। সকালে দেখি, স্নানের

১। 'বাসনালোক', 'সাধারণীকরণ' এবং রসের অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা আছে ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত 'কাব্যালোক' গ্রন্থে।

২। এখানে আমি কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তটি বলিলাম। ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "সাহিত্যের স্বরূপ" বইখানিতে।

জল তোলা হয়নি, ঝাড়-পোঁছ সব বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, কোথায় ছিলি? সে বললে, আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে। ব'লেই ঝাড়ন কাঁধে নিঃশব্দে চলে গেল। বুকটা ধক্ ক'রে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল, মেয়ের বাপ ব'লে তাকে দেখলুম। আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হ'য়ে গেল, সে হ'ল প্রত্যক্ষ, সে হ'ল বিশেষ। প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হ'ল বাস্তব।"

মোমিন মিঞা ছু'টি কাজ করিল—ভৃত্যের প্রয়োজনীয় রূপের অতীত হইয়া 'বিশেষ' হইল, এবং সেই 'বিশেষ' রূপে কবির স্বরূপের সহিত তাহার স্বরূপের মিলনে কবি তাহাকে অনুভব করিলেন। এই ভাবে সাহিত্য জগতের উপর হইতে প্রয়োজনের আবরণ দূর করিবার কাজে আছে। সে ক্রমশই যাহা আছে আমাদের প্রত্যক্ষের অতীত, অনুভূতির বাইরে, তাহাকেই আমাদের অনুভবগম্য প্রত্যক্ষ-বাস্তব করিয়া তুলিতেছে, হউক তাহা অসত্য, হউক তাহা অতথ্য। তাই সাহিত্যে বাস্তব বলা যায় তাহাকেই কল্পনার ভূমিকায় আমাদের আপন উপলব্ধিতে যাহা সত্য। বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার পার্থক্য এইখানে। বিশ্বে বস্তুকে বস্তুরূপে দেখি, কল্পনার ভূমিকায় দেখি না। কিন্তু সাহিত্যের বাস্তবতা-নির্দ্ধারণের একমাত্র কষ্টিপাথর 'অনুভব'।

আর্ট-সাহিত্যকে এবার একটা স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত হইতে দেখা দরকার। এতক্ষণ যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে পাঠকচিত্ত মুখ্য, শিল্পী গৌণ। এইবার শিল্পীর দিক হইতে সাহিত্যকে দেখিতে হইবে। পাঠকের দিক দিয়া দেখিলে আপনাকে জানার কাজে আছে সাহিত্য। কবির দিক হইতে দেখিলে আপনাকে প্রকাশ করিবার কাজে আছে সাহিত্য। প্রকাশ একটা ঐশ্বর্য্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে প্রকাশ কোথায়? প্রকাশ হইবে তাহা দ্বারাই সম্পূর্ণ শোষণেও যাহা নিঃশেষ হয় না। মানুষের যে ভাব নিজের প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হইয়া যায় না, যাহার ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্য আপনার মধ্যে আপনি রাখিতে পারে না, যাহা স্বভাবতই দীপ্যমান তাহারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব।

আবার প্রকাশের বেলায় আমরা অপরিমিতকে উপলব্ধি করি। সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কি অর্থে কি সামর্থ্যে। এই জন্য বস্তুতথ্য যখন কাব্যসত্যে পরিণত হয় তখন তথ্যের যথাযথ রূপ আর কিছুতেই বজায় থাকিতে পারে না। পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে অপরিমিত অনির্ব্বচনীয়তায় পরিণত করিয়া অতিশয় করিয়া তোলে। আধুনিকপন্থী সমালোচকেরা যে বলেন বাস্তবের যথাযথ অনুসরণই বাস্তবতা এ সিদ্ধান্ত ত তত্ত্বের দিক দিয়াই ভ্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন, "সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথ ভাবে আর্টের বেদির উপর চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কারণ আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয় লাগে। নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিক-ঠাক ক'রে বলা যাক্ না, শব্দের নির্ব্বাচনে, ভাবার ভংগীতে, ছন্দের ইশারায় এমন কিছু থাকে যেটা সেই ঠিক-ঠাককে ছাড়িয়ে গিয়ে ঠেকে সেইখানে যেটা অতিশয়।" এই জন্য মানুষের মুখ আঁকিতে গিয়া কবি যখন বলেন, "চরণ নখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে" তখন তাহাকে পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তখন ভাবার মধ্যে প্রবল অনুভূতির সংঘাতে তাহা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া "অতিশয়" হইল। "যা আমাদের দেখা অভ্যস্ত ঠিক সেইটেকেই যদি ভাবায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির ক'রে দেয় তবে তাকে ব'লব সংবাদ। কিন্তু আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিষকেই সাহিত্য যখন বিশেষ ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব্ব হ'য়ে, সে হয় একমাত্র আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র।" সে হয় বিশেষ এবং বাস্তব।

"বিশেষ" কথাটি লক্ষ্য করিবার। সাহিত্যে আমরা বস্তুর যে রূপ পাই সে বস্তুর বিশেষ রূপ, এই বিশেষ রূপেই বস্তু বাস্তব হয়। সংসারের অধিকাংশ পদার্থই আমাদের কাছে সাধারণ। রাস্তায় যত লোক চলে তাহার প্রত্যেকেই যদিও বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তাহারা সাধারণের আস্তরণে আবৃত। আমার আপনার কাছে আমি বিশেষ। তাই যদি কেউ বিশেষরূপে আমার কাছে আসে তখন তাহাকে আমারই সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া আমি আনন্দিত হই। তখন সে হয় বাস্তব। আমার ধোপা- আমার কাছে প্রয়োজনের যোগে স্পষ্ট কিন্তু সে আমার ব্যক্তি-পুরুষের অনুভূতির বাইরে কিন্তু মৃত কন্যার পিতা মোমিন মিঞা প্রয়োজনের সীমা ডিঙ্গাইয়া সে হইল বিশেষ। আমার অনুভূতিতে সে সত্য ও বাস্তব।

এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাস্তবতার স্বরূপটি ধরিবার চেষ্টা করা গিয়াছে—এই আলোচনায় যে কথাগুলি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি সেগুলি মোটামুটি এই—সাহিত্যে যে আনন্দ দেয় সেটা অনুভবের আনন্দ। যাহা পাঠকের অনুভবে সত্য তাহা বাস্তব। প্রত্যক্ষের যথাযথ অনুসরণই বাস্তব নয়। প্রত্যক্ষ যাহা কিছু তাহা সমস্তই ছন্দের দোলায় ভাবার মহিমায় অতিশয়তা পায়। আর সাহিত্যে তাহাকেই আমরা বাস্তব বলি, যাহা প্রয়োজনের সীমা এড়াইয়া কল্পনার ভূমিকায় আমার কাছে বিশেষ।

রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্বগুলির নির্গলিতার্থ এই—সাহিত্যে রূপের চেয়ে তত্ত্বের মূল্য বেশি। রূপ বাহ্যিক বা লৌকিক, সুতরাং সাহিত্য বিচারে ইহাকে 'এহো বাহ্য' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া রূপের আড়ালে যে তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্বকে জাগ্রত করিতে হইবে এবং সেই তত্ত্ব ভিত্তিতেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। ঠিক এইরূপ দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও অনুস্যূত দেখা যায়। এই জন্য এক সময় তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে তাঁহার মধ্যে সুখদুঃখবিরহ-মিলনপূর্ণ হাসিকান্নার রূপজগতের প্রতি আকর্ষণ প্রবল, না অরূপের প্রতি আকর্ষণ প্রবল। রবীন্দ্রনাথ নিজে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া যাহার সদুত্তর পান নাই—তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মধ্যে সে প্রশ্নের সার্থক উত্তর রহিয়াছে।

অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্য যে, কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায়, তাহা নয়। ইহা ভারতীয় কবিদৃষ্টিরই একটি বৈশিষ্ট্য। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই একটি চমৎকার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি "গ্রীকদিগের নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল; এই জন্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোন বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাহাদিগকে লজ্জা দিত। সেই জন্য তাঁহারা আপন দেব-দেবীর

মূর্ত্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন; নতুবা জাগতিক সৃষ্টির সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টির একটা প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তি ও আনন্দে ব্যাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্ত্তিই দিই না কেন, আমাদের কল্পনার সহিত বা বহির্জ্জগতের সহিত তাহার কোন বিরোধ ঘটে না। মূষিকবাহন চতুর্ভুজ, একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্ত্তি আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে, কারণ আমরা সেই মূর্ত্তিকেই আমাদের মনের ভাবে দেখি—বাহিরের জগতের সহিত চারি দিকের জগতের সহিত তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে; আমরা যে-কোন একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।" (সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ 'পঞ্চভূত')। ভারতীয় কবিদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য "মনের ভাবের মধ্যে দেখা." যে-কোন একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া মনের ভাবটা জাগ্রত করা। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার ভৃত্য মোমিন-মিঞাকে মেয়ের বাপরূপে দেখিলেন তখন তিনি নিজের মনের ভাবে দেখিলেন, মোমিন-মিঞার রূপে দেখিলেন না। কিংবা তাহার বারো টাকা বেতনের মুহুরীকে (ইহার কাহিনী পঞ্চভূতের মনুষ্য নামক প্রবন্ধে আছে) যখন পিসিমার ভাইপোরূপে দেখিলেন তখনও ঠিক এই দেখা, মনের ভাবে দেখা। কিন্তু রূপজগতের ঐশ্বর্য্যের প্রতি, যাহার আশ্রয়ে আমাদের মনের ভাব জাগে তাহাকে ঠিক এই ভাবে উপকরণরূপে বিড়ম্বিত করা রূপজগতের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার নামান্তর নয় কি? রূপজগতকে ঠিক উপলক্ষরূপে না রাখিয়া লক্ষ্যরূপে সামনে রাখিয়াও সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব। আজকাল আধুনিকপন্থী কবি-সাহিত্যিক যাঁহারা সাহিত্যে বাস্তবতার নূতন তাৎপর্য্য আরোপ করিতেছেন তাঁহারা এই রূপজগৎকে আরও একটু অন্তরঙ্গ ভাবে দেখিয়াছেন—তত্ত্বকে এড়াইয়া গিয়া ইহার প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের মূল লক্ষ্য সাহিত্যকে তত্ত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া রূপের আশ্রিত করা।

আধুনিক যুগের সাহিত্যে এই ভাবে বাস্তবতার যে নূতন আদর্শ পাওয়া যাইতেছে ইহার মূলে আছে কবির impersonal বা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি। এই প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথ "আধুনিক কাব্য" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সে প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য আলোচনা করিলে স্পষ্ট ধরা পড়িবে সাহিত্য-তত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে বাস্তবতা বোধ এই প্রবন্ধের বাস্তবতা বোধ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আমি যাহাকে 'তত্ত্ব' বলিয়াছি এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই বলিয়াছেন 'মোহ'। এবং বলিয়াছেন, আজকের যুগের সাহিত্য এই মোহের আবরণ তুলিয়া দিয়া যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখিতে চায়। এক সময় বাহ্যিকতা হইতে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়াছিল। সেটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটসের যুগ। তাঁহারা বাহিরকে নিজের অন্তরের চোখে দেখিয়াছিলেন, জগৎটা হইয়াছিল তাঁহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও হইয়া উঠিত। কিন্তু এ যুগে নিজের মনের মত করিয়া পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলিবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যাহা কিছু আছে তাহাকে আছে বলিয়াই মানিয়া লয়। এ সাহিত্য দাঁড়াইয়া আছে আপন আত্মতা (character) নিয়া। "কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এই জন্য কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলঙ্কারের উপর নয়। কেন না, অলঙ্কারটি ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবের জোর হ'চ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্য।" এই উক্তি হইতে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, সাহিত্য-তত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবতার কথা বলিয়াছেন আলোচ্য বাস্তবতা হইতে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত আধুনিক সাহিত্যের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন খাঁটি বাস্তবের সংজ্ঞাও তাহাই—"বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কি, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে এইটেই শাশ্বত ভাবে আধুনিক।" আবার বলা যায় এইটেই আধুনিক বাস্তবতা। কিন্তু আধুনিক বাস্তবতা কথাটি ভিত্তিহীন; সাহিত্যের বিষয় ও ভংগী প্রত্যেক যুগেই পরিবর্ত্তিত হয়। তাই বাস্তবতার অর্থও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। এইটুকু পর্য্যন্ত বলা যায়, বিশেষ যুগের বিশেষ প্রেরণার সঙ্গে যুক্ত হইয়া নিরাসক্ত চিত্তে সাহিত্যকে বিষয়-প্রধান করিয়া তোলাই বাস্তবতা।৩

যে কারণেই হউক, রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিষয়ের আত্মতা অপেক্ষা বিষয়ীর আত্মতাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের আত্মতার জন্য চাই বস্তুলীন কবি-কল্পনা। রবীন্দ্র-কবিতায় ইহার অভাব। বহির্জ্জগৎকে তিনি কোথাও বা নিজের মনের ভাবে বিধৃত করিয়া দেখিয়াছেন, কোথায়ও বা বহির্জ্জগতের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন অন্তর্লোকে। অবশ্য বলা যায় যে, লিরিক কবিদের আত্মভাব এত প্রবল হয় যে কোন-কিছু বস্তুমূলক ভাবে দেখা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আত্মলীন কবিকল্পনাই লিরিক কবিদের বৈশিষ্ট্য; তবু ইহা যে একেবারেই অসম্ভব সে কথা স্বীকার করা যায় না—কীট্‌সের 'Ode to the nightingale' কবিতাটি একটি চমৎকার লিরিক, আবার ইহাতে বস্তুলীন কবিকল্পনারও নিদর্শন আছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের কোন কোন গল্পে ইহার ব্যতিক্রম আছে। গল্পগুচ্ছের প্রেরণার মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। শান্ত নিস্তরঙ্গ পল্লী-জীবনের যে রূপ-মহিমা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল সে রূপ-বৈভবকে রবীন্দ্রনাথ কোথায়ও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই গল্পগুচ্ছের মধ্যে বাংলার পল্লী-জীবনের রূপটি এমন প্রত্যক্ষ এমন অকৃত্রিম ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বদৃষ্টি বাঙ্গালীর সাধারণ সমাজ-পরিবারের জীবন-চিত্রটিকে কেবলমাত্র চিত্ররূপেই শেষ হইতে দেয় নাই, কবির ভাবানুরঞ্জনে ইহা এক লোকাতীত মহিমা ও অনির্ব্বচনীয়তা লাভ করিয়াছে।৪

৩। এই প্রসঙ্গে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত 'শিল্পলিপি' বইএর 'রিয়্যালিজম্' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৪। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের একটি চমৎকার মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবকে অন্তরের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, শরৎচন্দ্র সেই বাস্তবকেই বাহিরের দিক হইতে নিকটতর করিয়া দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যে

মৌলিক অধিকার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আছে জোর যার এই মুল্লুক তার,—
এটি মানুষের মৌলিক অধিকার।
যুগ যুগ ধরে বহু টিকা টিপ্পনী,
হয়েছে এবং হতেছে ইহার শুনি,
পরিবর্ত্তন কিন্তু হয়নি আর।

দুর্ব্বল হওয়া অপরাধ আর পাপ।
বিড়ম্বনা তো বটে—বটে অভিশাপ!
জাতি গুণী হোক, উন্নত যত হোক,
হউক নিরীহ, ভাবুক পুণ্যশ্লোক,—
হবে পরাজয় লাঞ্ছনা তার লাভ।

প্রবলের আছে জুড়ি' এই সংসার
হত্যা করার মৌলিক অধিকার।
হত্যা ধ্বংস হইলে অপরিমেয়,
গৌরব তাহা—মোটেই নহেকো হেয়,
শৌর্য্যের চেনা—বস্তু প্রশংসার।

ছলে বলে যারা শাসন করিবে ধরা
খেয়াল তাদের সঙ্ঘ গঠন করা।
সকলে মিলিয়া একবে ধরিয়া মার,
কৌলিক আর মৌলিক অধিকার।
সমবায়ে এই ধরণীর ভার হরা।

জ্বালাতে পোড়াতে যাহারা শক্তিধর—
তারাই অগ্রগণ্য অগ্রসর।
পুড়িয়া মরিতে সম্মত নয় যারা,
পুড়িবার লাগি বাঁচিতে পাইবে তারা,
নব কৃষ্টির ইহাই শ্রেষ্ঠ বর।

কল্য কিম্বা কয় শতাব্দী পর,
প্রভু ও কর্ত্তা হবে ঘরে বর্ব্বর।
যুগটা যদিই হয় বর্ব্বরতম
নরহত্যার সংখ্যাটা হবে কম ও
করিবে তাহারা এ সভ্যতাকে গড়।

আজিকে যে সব বড় বড় নাম শুনি,
তাহারা তাদিকে বলিবে বৃহৎ খুনী।
ঘৃণায় তাদের কুশপুত্তলি দহি,
জানাবে এ যশ কত ভঙ্গুর ক্ষণী,
তারা নিজেদিকে ভাবিবে পরম গুণী।

সন্ধিপত্র বড় বড় যাহা পাবে—
জ্বালায়ে তাহাতে কল্প ঝলসি খাবে।
বৃহৎ বৃহৎ মৌলিক অধিকার,
বস্তু হইবে ঘৃণা ও উপেক্ষার,
স্ফীত ইতিহাস উপকথা হয়ে যাবে।

কাবুলিওয়ালা, পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি গল্পগুলি এই সূত্রে স্মরণীয়। ইহার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটি স্মরণ করিতে বলি। গফুর-মহেশ-আমিনা যে আমাদের চিত্ত অধিকার করে সে তাহাদের আত্মতায় (character)। এইখানে দেখি বিষয়ের আত্মতা। আর রহমৎ-রতন যে আমাদের হৃদয় অধিকার করে সে বিষয়ীর আত্মতায়। আমরা রতনকেও দেখি না, রহমৎকেও দেখি না, দেখি যিনি উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে। কিন্তু গফুর-মহেশকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের অশ্রুসাগর যখন উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন মনে হয় না কে ইহাদের স্রষ্টা। স্রষ্টা যেন আত্মলোপ করিয়া সৃষ্টির সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। ইহাকেই বলি বস্তু-মূলক কবি-কল্পনা, ইহাই বিষয়ের আত্মতা।[৫]

বিষয়ের আত্মতা আমি ইহাকে বলি আধুনিক বাস্তবতা—রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে তাহার প্রমাণ 'আধুনিক-কাব্য' প্রবন্ধ। কিন্তু রসদৃষ্টিতে তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যই অনুসরণ করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের পরিধি সীমাহীন হইয়া আনন্দঘন শান্তরসের উদ্বোধন করে, শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক কল্পনার সুখদুঃখের সেই সীমারেখা কোথায়ও হারাইয়া যায় না—ব্যথার ব্যথাটুকু শেষ পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে।" আধুনিক বাংলা সাহিত্য।

৫। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প রস-বিচারে ইহাদের কাহার গল্প শ্রেষ্ঠ আমি কিন্তু সে বিচার করি নাই! আমি কেবল প্রয়োগ-কৌশল (Technique)-এর দিকে ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কেহ আবার ভুল বুঝিবেন না।

রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফ্‌বয়ের
ফেনার আবরণে
যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।
লাইফ্‌বয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার বীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।
LIFEBUOY SOAP
লাইফ্‌বয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
L. 229-50 BG

হলওয়েল বর্ণিত ভারতের কথা

অনুবাদক—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

৩

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগল সম্রাটগণের সিংহাসন অধিকার

যে কেউ মনোযোগ সহকারে রাষ্ট্র ও রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস পড়েছেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তিনি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে, ন্যায়ের পবিত্র বন্ধন, স্বাভাবিক স্নেহ, কৃতজ্ঞতা ও প্রকৃত হিতৈষণা ইত্যাদি সমস্ত মানবিক ধর্ম চিত্ত থেকে প্রথমেই বহিষ্কার ক'রে দিয়ে তবে রাজত্ব, রাজ্য ও শক্তি আত্মসাৎ করা হ'য়ে থাকে। হাজার বছরের ইতিহাসের মধ্যে হয়তো গোটা কয়েক ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু সে ব্যতিক্রমগুলি সংখ্যায় এত অল্প যে, তার দ্বারা উপরোক্ত মতটি প্রত্যাহার করা যায় না।

রাজমুকুটের অত্যুজ্জ্বল সম্ভাবনা যুক্তি ও বিচারশক্তিকে এমন ভাবে ঝলসে দেয়, দৃষ্টিকে এমন ঝাপসা করে যে, মনুষ্যত্বের কোনো সাড়াই আর মনে জাগে না।

উচ্চাভিলাষ বা রাজত্ব ও শক্তির অনির্বাণ তৃষ্ণা চিরকালই মানুষের সাধারণ অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে বিষতুল্য হ'য়ে এসেছে। এই তৃষ্ণা মানুষের ধাতুগত এবং এটি তার মূল স্বভাব ও চরিত্রের মধ্যে শিকড় গেঁথে ব'সে আছে। তা যদি না হ'ত তা হ'লে মনুষ্যচরিত্র আমাদের কাছে দুর্বোধ হ'য়ে পড়ত। কারণ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, মনুষ্যজাতির বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই প্রাণপণে নিজের অধিকার বিস্তারের চেষ্টা ক'রে চলেছে, তা সে চেষ্টার তারতম্য যাই হোক না কেন। অথচ মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই এই অধিকার বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে বাধ্য। যে ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও স্বত্ব অপহরণ করেন তাঁর নিজের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও স্বত্ব যে অপহৃত হ'তে পারে—এই সত্য কেউ-ই অস্বীকার করতে পারেন না। চিরন্তন কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে অধিকার বিস্তার নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে, তা সে সমষ্টিগত ভাবেই হোক আর ব্যষ্টিগত ভাবেই হোক—এই স্পৃহা কেন যে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তা নিয়ে পরে আলোচনা ও সমাধানের চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু এটা যে আছে তা দুঃখের সঙ্গে হ'লেও—আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

আওরঙ্গজেবের (Auring Zeb) বংশধরদের ভারতের সিংহাসন অধিকারের যে ছোট বিবৃতি এখন দিচ্ছি তা থেকে স্পষ্টই প্রতিভাত হবে যে, শাসন করার এই মারাত্মক মোহের শোচনীয় পরিণাম এখানে যে-ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে আর কোথাও তেমন হয়নি। এই সিংহাসন আরোহণ ব্যাপারে স্বয়ং আওরঙ্গজেবকেও রক্তের সমুদ্র পার হ'তে হয়েছিল আর এ জন্য নিরঙ্কুশ ভাবে যে ভণ্ডামি, প্রতারণা ও অত্যাচার তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন তার কোনো তুলনা নেই। রাজ্যমোহের আকর্ষণের চেয়ে কোনো প্রবলতর বন্ধন—তা সে যত পবিত্রই হোক না কেন—আর কিছুই নেই, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি স্বয়ংই এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পরবর্তী অধিকারিগণ তাঁরই নৃশংস উদাহরণের অনুসরণ করেছিলেন মাত্র।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ মুয়াজ্জম (Mauzam) সিংহাসন অধিকার করেন। যদিও আওরঙ্গজেব তাঁর শেষ উইলে স্পষ্ট আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্র মহম্মদ আজম শা সিংহাসনের অধিকারী হবে। কিন্তু মহম্মদ মুয়াজ্জম তাঁর পিতার সার্থক অনুসরণ ক'রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে রাজমুকুট নিয়ে বিবাদ সুরু করলেন। আগ্রার নিকট যুদ্ধে আজম শা পরাজিত এবং নিহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ মুয়াজ্জম সম্রাটরূপে ঘোষিত হলেন। সম্রাট হ'য়ে তিনি যে সকল উপাধি গ্রহণ করেছিলেন (এগুলি মিষ্টার ফ্রেজার উল্লেখ করেছেন) সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে শা' আলম অর্থাৎ দুনিয়ার বাদশা। আমার সংগ্রহের মধ্যে এই সম্রাটের রাজত্বকালের দুটি স্বর্ণমোহর আছে। একটি ১৭০৯ এবং অন্যটি ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। এর মধ্যে প্রথমটিতে শা' আলম এবং অন্যটিতে বাহাদুর শা অর্থাৎ বীর বাদশা লেখা আছে। এই শেষের উপাধিটি তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

অত্যন্ত অশান্তি ও হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে তিনি মাত্র ছ' বছর রাজত্ব করেছিলেন। যুদ্ধজয়ের সৌভাগ্য তাঁকে পিতৃরাজ্যের অধিকারী করেছিল বটে কিন্তু পিতার শক্তি ও যশের অধিকারী করেনি। তাঁর জীবিত অবস্থাতেই চার পুত্রের মধ্যে রাজ্যলাভের প্রচেষ্টায় বিবাদ সুরু হ'তে দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও অশান্তির মধ্যে মারা যান—খৃষ্টাব্দ ১৭১৩। তাঁর ছেলেদের নাম ছিল মৌজদ্দিন, মহম্মদ আজিম, রফিল্ অল্ কদর্ এবং খোজিস্তা আখতর (Manz O'din, Mahommed Azim, Raffeeil Al Kaddr and Khojista Akhter)। এঁরা প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশের শাসনকর্তারূপে বৎসর কয়েক যাবৎ নিযুক্ত ছিলেন বলে প্রবল সেনাবলে বলী ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর আপন আপন সৈন্যবলের উপর নির্ভর করেই প্রত্যেকেই সিংহাসন দাবী করলেন।

শক্তি, সম্পদ ও যশে মহম্মদ আজিম ছিলেন সব ভায়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কারণে অন্য তিন ভাই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়ে কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করলেন যে, তাঁরা কেউ কারুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। এই যুদ্ধে যে মুহূর্তে মহম্মদ আজিম পরাজিত হবেন সেই মুহূর্তেই তাঁরা তিন জন রাজ্যটি তিনটি সমান ভাগে ভাগ ক'রে নেবেন।

এই ব্যবস্থামত তিন ভাই নিজেদের সৈন্য একত্রে সমাবেশ করলেন, যুদ্ধ সুরু হ'ল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই মহম্মদ আজিম নিহত হলেন। হাতীর পিঠে চড়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তিনি মৌজদ্দিনের সৈন্যব্যূহ ভেদ করবার চেষ্টা করছিলেন—কারণ সংবাদ পেয়েছিলেন যে মৌজদ্দিন স্বয়ং তাঁর সৈন্যব্যূহের মধ্যে উপস্থিত আছেন—কিন্তু একটি তীরের অতর্কিত আক্রমণে সব শেষ হ'য়ে গেল।

মৌজদ্দিনের তরফের জুলফিকার খাঁ নামে একজন ওমরাহের তৎপরতায় মহম্মদ আজিমের ধনসম্পদ সমস্তই তার হাতে এসে পড়ে এবং সেই টাকার দ্বারাই মৌজদ্দিন তাঁর ভায়েদের সৈন্যদেরও গোপনে

নিজের দলে টেনে নিয়ে পূর্বকৃত সমস্ত শপথ ভুলে গিয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই অন্য ভায়েদের আক্রমণ করলেন।

ভায়েরা এই আকস্মিক ও অসম্ভাবিত বিশ্বাসঘাতকতার জন্য একেবারেই প্রস্তুত না থাকায় উপযুক্ত ভাবে প্রতিরোধ করতেও সমর্থ হলেন না। দুই ভায়ের মধ্যে যিনি বড় অর্থাৎ রফিল্ অল্ কদর তৎক্ষণাৎ নিহত হলেন এবং আশ্চর্য এই যে তিনি মহম্মদ আজিমের মৃতদেহের ওপরেই পতিত হলেন। খোজিস্তা আখতর—চার ভায়ের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন—তিনি নিজের এবং রফিল্ অল্ কদর্-এর বহু সৈন্য সংগ্রহ ক'রে স্বীয় রাজ্য দাক্ষিণাত্যের দিকে পলায়ন করলেন। কিন্তু মৌজুদ্দিন তাঁর পেছনেও তাড়া ক'রে অবশেষে তাকেও নিহত করলেন।

এই ভাবে বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ভাইদের হত্যা ক'রে মৌজুদ্দিন তাঁর বাপ ও ঠাকুরদাদার মতই হিন্দুস্থানের সিংহাসন অধিকার করলেন। অবশ্য মৌজুদ্দিনের সপক্ষে এ কথা বলা যেতে পারে যেটা আর দু'জনের সম্পর্কে বলা যায় না, যে তিনিই ছিলেন সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আবার এও সত্য কথা যে, সেই একমাত্র উত্তরাধিকারিত্বের অধিকার ভায়েদের সঙ্গে সর্তে প্রবিষ্ট হবার সময় তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। যাই হোক, তিনি সম্রাটরূপে ঘোষিত হ'য়ে উপাধি গ্রহণ করলেন মৌজুদ্দিন জাহান্দার শা—যার অর্থ হ'ল বিশ্ববিজয়ী নৃপতি। জুলফিকার খাঁকে তিনি উজির নিযুক্ত করলেন।

জাহান্দার শা ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ

জাহান্দার দুর্বল-প্রকৃতির রাজা ছিলেন। সিংহাসনে কায়েমী হ'য়ে বসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'য়ে তিনি অবিলম্বে হারেমের বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ভাসিয়ে দিলেন! লালকুঁয়ার (Lol Koar হিন্দুস্থানে Loll Kooree নামে খ্যাত) নামে এক বিখ্যাত বারবনিতার সঙ্গে তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতেন। এ জন্য তিনি মনুষ্যোচিত অথবা রাজোচিত সমস্ত কর্তব্য থেকেই ভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

এই বারবনিতা অসাধারণ সৌন্দর্যশালিনী ছিলেন এবং নৃত্য ও গীতবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শিনী ছিলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গীতে এই পারদর্শিতার কারণ ছিল এই যে বাল্যকাল থেকেই তাঁকে ঐ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করতে হয়েছিল। এই সব গুণ ছাড়াও, কথিত আছে যে, আলাপনের দ্বারা লোককে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। সম্রাট তাঁর মোহিনী শক্তিতে এমনই মাতোয়ারা ছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছাই ছিল সম্রাটের ইচ্ছা। রাজ্যের যে-সব উচ্চপদ বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাসের ছিল, সেগুলিতে সম্রাট লালকুঁয়ারের নীচ আত্মীয়দের নিযুক্ত করেছিলেন—এমনই ছিল লালকুঁয়ারের প্রভাব। এই মোহগ্রস্ত আচরণের ফলে সম্রাট স্বয়ং ও তাঁর সাম্রাজ্য—দুই-ই জনসাধারণের কাছে নিতান্ত ঘৃণার্হ হ'য়ে উঠল। রাজ্যের বড় বড় আমীর ও ওমরাহেরা অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠতে লাগলেন এবং একে একে নানান্ ছলে রাজ্যপরিসর থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে সম্রাটকে রাজ্যচ্যুত করবার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এই সকল অসন্তুষ্ট সভাসদগণের মধ্যে হাসান আলি খাঁ ও আবদাল্লা খাঁ নামে দু'জন ওমরাহ ছিলেন। সৈয়দ-বংশোদ্ভূত এই দুই ভাই নিজেদের চরিত্রবলে ও ব্যক্তিত্ব-গুণে অতিশয় প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। মুসলমানেরা এই সৈয়দ-বংশীয়দের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখে থাকেন। এঁরা দু'জন অন্যান্য ওমরাহদের সঙ্গে যুক্তি ক'রে স্থির করলেন যে মহম্মদ ফরুখশায়ারকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবেন। তদনুসারে হঠাৎ একদিন বাছাই-করা এক সৈন্যদলের নেতৃত্বে তাঁরা বাংলা দেশে চ'লে গেলেন—ফরুখশায়ার সে সময় বাংলা দেশে বাস করছিলেন।

এই তরুণ রাজকুমার পূর্বোক্ত মহম্মদ আজিমের পুত্র ও সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি পিতামহ শা আলমের নির্দেশক্রমে কিছু কাল যাবৎ ঢাকায় বাস করছিলেন। সে সময় ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল। এই ঢাকায় ফরুখশায়ার এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে, আজ পর্য্যন্ত সেখানকার জনসাধারণ তাঁর শোচনীয় দুর্ভাগ্যের করুণ কাহিনী বিস্মৃত না হ'য়ে অশ্রুসিক্ত লোচনে গান গেয়ে থাকে।

ফরুখশায়ার তাঁর পিতামহ শা আলমের মৃত্যুসংবাদ এবং পিতা ও পিতৃব্যদের শোচনীয় পরিণামের কথা শুনেই ঢাকা থেকে স'রে গেলেন। তাঁর মতন একজন এত নিকট-আত্মীয় বেঁচে থাকতে জাহান্দার যে সিংহাসন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন না এ কথা তিনি ভালো ক'রেই জানতেন। তিনি যে কোন পথ অবলম্বন করবেন তা ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না। এক অল্পসংখ্যক কিন্তু বিশ্বাসী অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে তিনি যখন বাংলা দেশ থেকে চ'লে আসছেন তখন বিদ্রোহী দলের পক্ষ থেকে সংবাদবাহকেরা এসে তাঁকে অবিলম্বে বিহার (Bahaar) প্রদেশের পাটনা সহরের দিকে অগ্রসর হ'তে বললেন। পাটনায় পৌঁছবা মাত্র সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ, সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান আমীর ও ওমরাহেরা ফরুখশায়ারকে সাদরে গ্রহণ ক'রে হিন্দুস্থানের সম্রাটরূপে ঘোষণা করলেন।

এই বিদ্রোহ ও নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর সংবাদ দিল্লীর রাজপরিষদকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলল। কিন্তু লালকুঁয়ারের বাহু-বন্ধনে জ্ঞানহারা সম্রাট ব্যাপারটিকে নিতান্ত বাজে ও নগণ্য বলে মনে ক'রে তাঁর ছেলে ইজুদ্দিনের সঙ্গে পনের হাজার অশ্বারোহী সৈন্য বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন—বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহীর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসবার হুকুমও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

দূতের পর দূত এসে খবর দিতে লাগল যে, ফরুখশায়ারের দল প্রতি মুহূর্তেই নূতন সৈন্যবলে বলীয়ান হ'য়ে উঠে আগ্রার দিকে আসছে। এবার সম্রাট তাঁর উজির জুলফিকার খাঁ এবং তাঁর প্রিয়পাত্র কোকলতাস খাঁর (Gokuldas Khan) যুক্ত নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী তাঁর ছেলের সাহায্যে পাঠালেন। এই কোকলতাস খাঁ ও জুলফিকার খাঁর মধ্যে ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও শত্রুতার অভাব ছিল না।

ইতিমধ্যে ফরুখশায়ার রীতিমত সৈন্যসংগ্রহ ক'রে ফেললেন। পাটনা ত্যাগ করবার মতন শক্তিসঞ্চয় করা মাত্র তিনি পাটনা ত্যাগ করে এলাহাবাদ (Eleabas) প্রদেশের Chivalram (?) পর্যন্ত সসৈন্যে এগিয়ে গেলেন। এইখানে ইজুদ্দিন পনের হাজার সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এই তরুণ রাজকুমার কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরেই শত্রুপক্ষের সৈন্যদলের বলাধিক্য বুঝতে পেরে আগ্রার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই উচিত বিবেচনায় সেখানেই ফিরে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আগ্রার কাছে সম্রাট কর্তৃক প্রেরিত উজির এবং কোকলতাস খাঁর অধীনস্থ সৈন্যদল ইজুদ্দিনের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিল। স্থির হ'ল যে, এইখানে থেকেই তাঁরা শত্রুদের জন্য অপেক্ষা করবেন। অবশ্য এ জন্য তাঁদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি—শীগগিরই যুদ্ধ বেধে গেল।

জুলফিকার খাঁর পরামর্শ মত সম্রাটের সৈন্যদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হ'ল। মধ্য ভাগের সৈন্যদল রইল ইজুদ্দিনের অধীনে, দক্ষিণ ভাগ কোকলতাসের (Gokuldas) অধীনে এবং বাম ভাগ জুলফিকার খাঁর অধীনে।

ফরুখশায়ারও অনুরূপ ভাবে সৈন্যবিভাগ করলেন। তিনি মধ্য ভাগের সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিলেন সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ-কে, দক্ষিণ ভাগ সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ-কে এবং বাম ভাগের নেতৃত্ব স্বয়ং গ্রহণ করলেন। এই বাম ভাগের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করলেন; কারণ বাম ভাগের নেতৃত্ব নেবার অর্থ কোকলতাস খাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, যেটি সব থেকে বিপদজনক ব্যাপার। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই কোকলতাস খাঁ সম্রাটবাহিনীর দক্ষিণ ভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি রাজ্যের সর্বত্রই সুদক্ষ ও সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষ ব'লে খ্যাত ছিলেন।

[ক্রমশঃ।

যীশুখৃষ্টের জন্মকাল গণনায় ভুল ?

আধুনিক কালের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ গবেষণার দ্বারা স্থির করেছেন যে, যীশুখৃষ্টের জন্মকাল থেকে কালগণনার প্রণালী যখন ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে Dionysius Exigus নামক রোমীয় ধর্ম্মযাজক কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় তখন নাকি ডায়োনিসিয়াস এক্সিগাস্ ভুল বশতঃ চার বছর পিছিয়ে যীশুর জন্মকাল ধার্য্য ক'রেছিলেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

রাত্রি তখন দুটো হবে। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। দু'-একটা রিক্সার ঠুনঠান আওয়াজ কদাচিৎ শুনা যায় মাত্র। রাজপথে লোকচলাচল বহুক্ষণ পূর্বে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তার দু'পাশের গ্যাসের আলোক বৃথা জ্বলে জ্বলে যেন নিবে যেতে চাইছে। নয়া রাস্তার মোড়ের পেট্রোল-পাম্পের লাল চোখের উজ্বল আলোকও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বের সমুচ্চ অট্টালিকাগুলিকে এখন ঘুমন্ত দৈত্যের মতো মনে হয়। এই সব অট্টালিকার দু'-একটি কক্ষ হতে দু'-এক বার রুদ্ধপ্রাণ ক্ষীণ আলোক জ্বলে উঠলেও তার সঙ্গে বহির্জগতের এখন কোনও সম্পর্কই নাই। রাত্রির স্বাভাবিক নিস্তব্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে পরক্ষণেই তা নির্বাপিতও হয়ে যায়। দুরন্ত শহরটাকে যেন জোর করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

তালাতোড় কিষণিয়া ও মদনিয়া ধীর পদবিক্ষেপে তাদের গন্তব্য-স্থানে এগিয়ে চলছিল। সহসা তারা শুনতে পেলে পিছনে একটা খট্‌খট্ শব্দ। একজন টহলদারী সিপাহী এই সময় জুতোর শব্দ করতে করতে ফুটপাত ধরে এগিয়ে আসছিল। নিরালা ফুটপাতের সঙ্গে সংঘর্ষজনিত সিপাইদের ভারি জুতোর শব্দ পথিপার্শ্বের বাসিন্দাদের উপভোগের বস্তু। নিঃসাড় নিস্তব্ধতার অন্তরাল হতে ভেসে-আসা এই শব্দ তাদের ঘুমের আমেজ বাড়িয়ে তোলে এবং সেই সঙ্গে তাদের মনের মধ্যে এনে দিয়ে থাকে এক নিশ্চিন্ত ভাব ও নিরাপত্তা বোধ। তাদের তখন মনে হয় তারা নিঃসহায় বা একা নয়, ঘরের কাছে তাদের আরও লোক আছে। টহলদারী সিপাহীরা কিন্তু এই সময় ভাবে যে বিপদে-আপদে তাদের জন্য সেখানে কেউ-ই নেই, তাদের যা-কিছু বল তা 'বলং বলং বাহুবলম্'। সিপাহীদের এই সুপরিচিত জুতোর শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতায় দূরপ্রসারী হয়ে নিশাচর পথবিহারী, পুরানো সেয়ানা ও নৈশ অভিযাত্রীদের ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। পিছনে শাস্ত্রীসুলভ ভারী জুতোর খট্‌খট্ আওয়াজ কানে যাওয়া মাত্র কিষণিয়া ও মদনিয়া একটি গলির মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য ঢুকে প'ড়ে টহলদার সিপাহীর নজর এড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কিষণিয়া ও মদনিয়া যতোই সাবধানে পথ চলুক, তারা পাহারাদার শাস্ত্রীটির দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাদের এতো রাত্রে রাজপথে দেখে টহলদার সিপাই চেঁচিয়ে হুকুম করলো, 'খাড়া রহো উধা, হুঁসিয়ারিসে। কোন হ্যায় তু'লোক?' কিষণিয়া ও মদনিয়া ছিল পুরোনো সেয়ানা, তারা অপেক্ষা তো করলোই না, বরং তাদের চলনের গতি তারা বাড়িয়ে দিল। এবং পাহারাদার সিপাহী তাদের দিকে এগিয়ে আসা মাত্র তারা প্রাণপণে সম্মুখের দিকে দৌড় দিলে। পাহারাদার সিপাহীটিও এই জন্যে পূর্ব হতেই তৈরী ছিল, সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগে হুইসিল দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জুড়ীদার ভাই আসামী ভাগে-এ-ও!' রাস্তার মোড়ের ওপারে তার জুড়ীদার সিপাহী সতর্কতার সঙ্গে টহল দিচ্ছিল, সেইখান হতে সে চেঁচিয়ে উত্তর করলো, 'যাতে হো-ও-ও।' সিপাহীদের তাড়া খেয়ে কিষণিয়া ও মদনিয়া ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসে রাস্তার বাম ফুটের উপর উভয়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। এই ফুটের উপর এই সময় জন কুড়ি-পঁচিশ ভিখিরী নরনারী অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। সহসা তাদের অধিকৃত ফুটপাতের উপর উভয়কে শুয়ে পড়তে দেখে তারা সমস্বরে চেঁচামেচি সুরু করে দিলে। অন্য সকলের মতো ভিখিরীদেরও এলাকা ভাগ করা আছে। এইখানকার ভিখিরীদের এলাকা ছিল মুক্তোরাম বাবুর মোড় হতে মাণিকতলার মোড় পর্য্যন্ত নয়া রাস্তার উভয় ফুটপাত। এই নবাগতরা তাদের দলের লোক না হওয়ায় তারা এদের উপস্থিতি কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না। স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে এদের কয় জন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে-কামড়ে নাস্তানাবুদ করে তুললো, কিন্তু কিষণিয়া ও মদনিয়া কিছুতেই স্থানত্যাগ করতে চাইল না।

ভিখিরীদের উপ-সর্দ্দার বাবুরাম বাবু অদূরে বসে-বসে ঝিমুচ্ছিল। বেচারা সবে সেখানে এসেছে তাদের বড়ো সর্দ্দারের নির্দ্দেশ মতো। ভোর বেলায় প্রত্যেক ভিখারীর উপার্জ্জিত অর্থ তাদের কাছ হতে সংগ্রহ করে তাকে তা বড়ো সর্দ্দারের আফিসে জমা দিয়ে আসতে হবে। এই সব ভিখিরীরা দিনান্তে সমধিক উপার্জ্জন করতে পারুক বা না পারুক, তাদের দৈনিক আহার প্রদানের দায়িত্ব তাদের সর্দ্দারের। বিনিময়ে তারা দিনান্তে যা-কিছু উপার্জ্জন করে তা উপ-সর্দ্দার বাবুরামের মারফৎ বড়ো সর্দ্দারের কাছে জমা দিতে হয়; কিন্তু তাঁকে কি হয়, বড়ো সর্দ্দারকে তারা এযাবৎ চোখেও দেখেনি। তাদের যা-কিছু সম্পর্ক তা উপ-সর্দ্দার বাবুরামের সঙ্গে। তারা শুনেছে, বড়ো সর্দ্দারের অধীনে আরও বহু উপ-সর্দ্দার আছে, তাই তারা তার নামকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। প্রকৃত পক্ষে বড়ো সর্দ্দারের নামে শহরের এই অঞ্চলের ভিখিরীসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি এমনি বহু তাঁবেদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। বড়ো সর্দ্দারের নাম নিয়ে তাদের ধমকানো হয়, শাসন করা হয়, তাই বড়ো সর্দ্দারকে না দেখলেও তারা তাঁর নামে তটস্থ ও সন্ত্রস্ত থাকে। উপ-সর্দ্দার বাবুরামকে এদের নিকটের ভিখিরী বস্তীতে এনে যেমন প্রতিদিন খাওয়াতে হয়, তেমনি এদের মধ্যে কলহাদি হলে তাকে তার মীমাংসাও করে দিতে হয়। বাবুরাম নিজে সুস্থ ও সবল হলেও সে পায়ে ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া জড়িয়ে ভিখিরীদের মধ্যে অবস্থান করতো, তাদের কে কতো উপায় করে তার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখবার জন্যে।

এতো রাত্রে ভিখিরীরা চেঁচামেচি করে উঠায় সে তন্দ্রামুক্ত হয়ে যথারীতি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে ধমকে উঠলো, 'কি সব তোরা চেঁচামেচি করছিস। ভোর হয়ে এলো, ঘুমুবিও না একটু।' বাবুরামের সঙ্গে তালাতোড় কিষণিয়ার পূর্ব হতেই পরিচয় ছিল। বিভিন্ন মিলন-স্থানে তাদের সহিত তার রাতে-বেরাতে দেখা হয়েছে।

কিষণিয়া তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার কোমরে বাঁধা সিঁধকাটিতে বাবুরামের হাতটা ঠেকিয়ে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিল যে, তারা ভিখিরী না হলেও তাদের সমগোত্রীয় ব্যক্তি, তারা কেউ চাকুরে বা সাধারণ শ্রমিক নয়।

ভিখিরী-সমাজের সঙ্গে অপরাধী সমাজের এক স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক তাদের চিরন্তন ও শাশ্বত যুগের, তাই তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য। ভিখিরী-সমাজ হতে কেউ যদি কখনও চোর হয়ে উঠতে পারে তো সে হয় অন্য ভিখিরীর কাছে সম্মানী ব্যক্তি, তাদের মধ্যে কেউ ডাকু হতে পারলে তো কথাই নেই, সে তখন অন্যের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে। কিষণিয়া ও মদনিয়ার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া মাত্র বাবুরাম নিঃস্বরে সকলকে চুপ করতে বলে নিজেও তাদের সঙ্গে ঐখানে শুয়ে পড়লো। গোলমালে ফুটপাতনিবাসী ভিখিরীদের অনেকেই জেগে উঠেছিল। এদের মধ্যে একজন যুবক ভিখিরী পাশে শায়িতা এক তরুণী ভিখিরিণীর পায়ে চিমটি কেটে নিম্ন স্বরে বললো, 'এই ময়না, আতু'না'। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে কিছুটা দূর গড়িয়ে এসে ময়না উত্তর দিলে, 'উহু! হু যা' না।' অদূরে ফুটপাতের ওপর করপোরেশন থেকে কয়েক বড়ো বড়ো ফাঁপা মেইন-পাইপ রেখে দিয়েছিল, বোধ হয় এদেরই সুবিধের জন্যে। উভয়ে একে একে গুঁড়ি মেরে মেরে রাস্তার ধারে রাখা একটা পাইপের মধ্যে ঢুকে পড়লো, কি উদ্দেশ্যে তা তারাই জানে। এদিকে সিপাহী-দু'জনও তাদের পলাতক আসামীদের খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখানে-ওখানে বিজলী টর্চের আলো ফেলে, ফুটপাতের যত্র-তত্র তারা লাঠি ঠোকাঠুকি করলো। ভিখিরীদের কাউকে কাউকে চুলে ধরে তারা উঠিয়ে এধার-ওধার সরিয়েও দিলে, কিন্তু পলাতক আসামীদের কোথায়ও তারা খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ এখানে-ওখানে বৃথা খোঁজাখুঁজি করে হায়রাণি হয়ে তারা করপোরেশনের ফেলে-রাখা বড় গোল পাইপটার ওপর পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়লো।

এক নাগাড়ে অধিকক্ষণ ঘোরাফেরা করলেও মানুষের কষ্ট হয় না, কিন্তু সামান্য বিশ্রাম মানুষকে অতিমাত্রায় অসহায় করে তোলে। এই কারণে সিপাহী দু'জন একবার বসে পড়ে আর সেখান হতে উঠতে পারছিল না। তারা কিছুক্ষণের জন্যে যেন নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কর্তব্যবিরত হয়ে উঠল এবং তাদের মনে পরস্পরের মনোভাবের আদান-প্রদানের ইচ্ছার উদ্রেক হলো। তাদের মনের এই প্রবল ইচ্ছা তারা দমন করতে পারল না। নিমিষে তাদের মন ডুবে গেল নিজেদের সুখ-দুঃখ ও গালগল্পের মধ্যে। কার বাড়ী হতে কবে খত এসেছে, কেমন সংবাদ আছে তাতে, কার মুল্লুকে পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়েছে, কোন্ ইনেসপেক্টার বাবু বহুত কড়া, তাদের কোন্ বাবু খানদানি আদমী, কোন্ কোন্ অফসার ঘুষ খায়, কে কে বা তা খায় না, কোন্ কোন্ বাবু বহুত বুড়বাক ইত্যাদি। এমনি বহু অন্তর কথাবার্ত্তার মধ্যে তারা তাদের পরিশ্রান্ত দেহ-মন হালকা করে নিচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে নজর রাখছিল দূরের রাস্তার প্রতি। কারণ থানার উর্দ্ধতন অফসাররাও পাহারাদার ও টহলদার সিপাহীদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের জন্য রাত্রে রোঁদে বেরিয়েছেন। যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁদের এক জনের এই দিকে আগমন হতে পারে। সহসা সিপাহী দু'জনের কানে এলো ঐ গোল পাইপের ভিতর হতে একটা খড়-খড় শব্দ। বিস্মিত হয়ে সিপাহীদের এক জন বললো, 'আরে ইসকো অন্দরমে চৌর লোক ঘুঁসা নেহি তো?'

পলাতক সেয়ানা দু'জনার এই পাইপের মধ্যে আত্মগোপন করা অসম্ভব ছিল না, তাই এদের এক জন নেমে এসে ভেতরটা দেখে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু তার জুড়ীদার সিপাহীর এতো শীঘ্র গালগল্প হতে বিরত হতে ইচ্ছা ছিল না, সে বিরক্তির সঙ্গে তাকে প্রত্যুত্তর করলো, 'ক্যা দেখেগা, রাস্তাকো কুত্তা হোগা ভিতরমে ঘুস গয়া, আউর কেয়া? দেখতা না, কেইসেন খড়খড়তা।' অপর সিপাহীটির মন কিন্তু এতে সায় দিল না, সে বিজলী টর্চের বোতাম টিপে রাস্তার ওপর নেমে পড়ছিল, ঠিক এই সময় দূরে দেখা গেল একটা পুলিশের গাড়ীর আলো। উভয় পাহারাদার বুঝলো নিশ্চয়ই কোনও অফসার এই দিকে আসছে, তাদের এখানে উপবিষ্ট দেখলে, তারা তাদের ভৎসনা তো করবেই, তা ছাড়া গাফলতিও ধরে দেবে। পরদিন হয়তো এই জন্যে তাদের খামকা দলিল বা জরিমানাও হতে পারে। বহু দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় রাতের পর রাত তারা টহল দিয়েছে, জীবন বিপন্ন করেও দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের এই সামান্য গাফলতির জন্যে এই সব খাটুনি ও সাহসের কোনও মূল্যই ওপরওয়ালারা দেবে না। ওপরওয়ালারা তাদের নিকট হতে চায় তাদের দেহ-মনের সবটুকু শক্তি-সামর্থ্যের মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন কর্ত্তব্যবোধ, পরিশ্রম, সাহস আর ভালো কাজ। এই জন্যে বহু ক্ষেত্রে চোর-ডাকুদের দিকে লক্ষ্য না রেখে তাদের লক্ষ্য রাখতে হয়েছে উর্দ্ধতন অফসারদের সুপরিচিত বাহন যন্ত্র-শকট ও সাইকেলের প্রতি। কারণ তাঁরা সিপাহীদের না দেখতে পেলেও সিপাহীরা যদি তাঁদের না দেখতে পায় তাহলে তা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এমন কি এ সব অবস্থায় ধরে নেওয়া হয় যে, তারা ঐখানে ঐ সময় গরহাজির ছিল বা আদপেই উপস্থিত ছিল না। সামান্য সিপাহীর পদে বহাল থাকায় তাদের কোনও কৈফিয়ৎ গৃহীত হবে না, গৃহীত হবে শুধু তাদের বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন অফসারদের রিপোর্ট। সিপাহী দু'জন আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে ঐ লরীর অপেক্ষায় রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

সিপাহীদের অনুমান মিথ্যা হয়নি, ক্ষণিকের মধ্যেই সেখানে এসে দাঁড়ালো একটি পুলিশের লরী। লরীর ওপর বিশ জন সশস্ত্র শাস্ত্রী সহ প্রণব বাবু বসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিল খুকুর মাষ্টার রতন বাবু ও প্রণব বাবুর বিশস্ত ইনফরমার রামদিন। সারা দিন ও সারা রাত তাঁরা কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে খুকুরাণীর সন্ধানে হানা দিয়েছেন, কিন্তু এযাবৎ তাঁরা তার কোনও সন্ধানই পাননি—ডাক্তাররা নিজেরা পরিবারের লোকদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলে তাদের মনের অবস্থা যেমন হয়, রতন ও প্রণব বাবুর মনের অবস্থা ছিল সেই রকম—এক অজানা আশঙ্কা ও আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা বারে বারে তাঁদের মনকে ব্যথিত করে তুলছিল। এ রকম দুরূহ তদন্তে যে সুস্থির মনের প্রয়োজন, তা তাঁরা বহু চেষ্টায়ও ফিরিয়ে আনতে পারছিলেন না। প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁদের কাছে মনে

হচ্ছিল যেন একটা যুগ ; সামান্য ক্ষণের বিলম্বে হয়তো খুকুরাণীর জীবনের চির অবসান ঘটবে ! কে জানে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে কি দুঃসহ যাতনা ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে ! তাঁরা যেন আর ভাবতে পারেন না। প্রণব বাবু এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলেন যে সমগ্র রাষ্ট্রের আনুকূল্য ও নিরঙ্কুশ শক্তি তাঁর পিছনে থাকলেও তিনি আজ কতো অসহায় ! সহসা তাঁর মনে হলো গীতার অমর উপদেশ ! কে যেন তাঁর কানে কানে বললে, বৃথা উতলা হয়ো না, ফলাফলের কথা না ভেবে শুধু এগিয়ে চলো। প্রণব বাবু প্রতিজ্ঞা করে নিলেন, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন এবং তার পর রামদিন ও রতন বাবুর সঙ্গে রাস্তার উপর নেমে এলেন। তাঁদের লরী হতে নামতে দেখে উর্দ্দীধারী সিপাহী দু'জন প্রণব বাবুর দস্তখতের জন্য পকেট হতে পকেট-বুক বার করে এগিয়ে এসে সেলাম জানিয়ে বললো, ঠিক হ্যায় হুজুর, বিলকুল ঠিক। প্রণব বাবু নিমিষে তাদের পকেট-বুকের পাতায় দুটো সই করে দিয়ে যেন ন্যাকা সেজে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফুট'পর ইনলোক কোন হ্যায় ?' পুরানো অফসার প্রণব বাবুর এইরূপ প্রশ্নে তারা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। একটু আমতা-আমতা করে এদের এক জন উত্তর করলো, 'ইনলোক হুজুর ! ইনলোক ফুটপাতকো জনতা। পয়দাভি ইনলোককো হোতা ফুটপাতমে।' প্রণব বাবু এই দিন তাদের পকেট-বুক সই করে সেখানে তাঁর উপস্থিতি জানাতে আসেননি, তিনি একটি বিশেষ সংবাদ অনুযায়ী সেইখানে তদারকে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ এধার-ওধার নিরীক্ষণ করে নিম্ন-স্বরে তিনি রামদিনকে বললেন, 'এই তো এখানে অনেক ভিখারী শুয়ে রয়েছে। কৈ, সেই রকম কেউ তো এখানে নেই।' ইনফরমার রামদিনের সতর্ক দৃষ্টিও এতোক্ষণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর এক স্থানে তার চোখ পড়া মাত্র সে দ্রুতগতিতে পিছিয়ে এসে প্রণব বাবুকে জানালো, 'আছে হুজুর, এইখানেই আছে। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে ভদ্রলোক আমাকে চিনে ফেলবে। চলুন, লরীতে উঠে আবও একটু এগিয়ে যাই।'

রামদিনের অনুরোধে সকলে পুনরায় পুলিশ-লরীতে উঠে পড়লে, লরীটা ডান পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। লরীটা ধীর-গতিতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এসে পৌঁছলে নিশ্চিন্ত হয়ে রামদিন বললে, 'হুজুর, ভিখিরীদের কন্‌ট্রাকটার বাবুরাম বাবু নিজেই ওখানে রয়েছে। ওদের দল বাদশা মিয়া বা বিহারী বাবুর দল হতে একটা বিলকুল ভিন্ন দল। ওদের নায়ক একজন বাঙালী ব্যবসায়ী, তার তাঁবে আরও অনেক ভিখিরীর কন্‌ট্রাকটার আছে, তবে তাদের অধীন ভিখিরীরা ফুটপাতে থাকে না, তারা থাকে ভিখিরী-বস্তিতে। তবে ভিখিরীদের বড়ো সর্দ্দারের খোদ ডেরা যে কোথায় তা আমি জানি না। শুনেছি, তার ডেরাতে ছোট ছোট শিশুকে ধরে এনে বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়, কাউকে বিশেষ প্রক্রিয়াতে এরা অন্ধও করে দিয়েছে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করাবার জন্যে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, খুকুরাণীকে ওরা এদের হাতেই তুলে দিয়েছে। খুউব সম্ভব, তারা তাঁকে দিয়ে অন্য কোনও এক শহরে ভিক্ষে করাবে, তবে খুকুরাণী যদি ইতিমধ্যে খোদ বড় সর্দ্দারের নেক-নজরে পড়ে যান তো সে স্বতন্ত্র কথা। হুজুর, ওদের বড়ো সর্দ্দার শুনেছি এখোন দিল্লীতে হাওয়া খেতে গেছে, সেইখানেও তাদের একটা আস্তানা আছে কি না। এখোন এর মধ্যে তার লোকেরা খুকুরাণীকে অন্ধ বা বিকলাঙ্গ যদি করে দেয়, এই যা ভয়। এই বাবুরাম বাবু বড়ো সর্দ্দারের বড়ো পেয়ারের লোক, একমাত্র সেই তার খোদ আড্ডার খবর রাখে।'

দুরু-দুরু বুকে রতন ও প্রণব বাবু রামদিনের কথা ক'টি শুনে গেলেন। তদন্তের মাত্র এই একটি সম্ভাব্য পথ খোলা আছে। তা ছাড়া রামদিনের সংবাদে অবিশ্বাস করবারও কিছু নেই। প্রণব বাবু ভিখিরীদের উপ-সর্দ্দার বাবুরামের নাম অন্য সূত্রেও শুনেছিলেন। বাবুরাম পায়ে পুরু ন্যাকড়া জড়িয়ে ছিন্নবাসে সারা দিন, কখনও কখনও সারা রাত্রিও ভিখিরীদের সঙ্গে রাস্তায় বসে থাকেন, কিন্তু ছুটি পাওয়া মাত্র তার রক্ষিতার গৃহে ফিরে দামী সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে সিনেমা দেখে আসে। কখনও কখনও সুবিধা মত রক্ষিতার গৃহে বিজ্‌লী পাখার তলায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে রাত্রিযাপনও সে করে থাকে। গাঁয়ে-ঘরে তার স্ত্রী-পুত্র বর্ত্তমান, মণিঅর্ডার যোগে প্রতি মাসে সেখানে অর্থ প্রেরণও করা হয়। বড়ো বড়ো শোভাযাত্রা বা প্রসেশনে নিশান ধরবার জন্য দু'-একশ' লোকের দরকার হলে, বাবুরাম তার ভিখিরীদের এই কার্য্যের জন্য সরবরাহ করে থাকে। এই জন্য কারো কারো কাছে সে ভিখিরীদের কন্‌ট্রাকটাররূপেও পরিচিত। কিন্তু এ-হেন বিখ্যাত বাবুরাম যে প্রণব বাবুর নিজের থানার এলাকাতে এসে আড্ডা গেড়েছে, তা তাঁর ধারণাব বাইরে ছিল।

প্রণব বাবুর একবার মনে হলো এক্ষুণি বাবুরামের টুঁটিটা চেপে ধরে খুকুরাণীর সন্ধান তার কাছ হতে জেনে নেন, কিন্তু রামদিনের সাবধান-বাণী তাঁকে এই কার্য্য হতে বিরত রাখলো। রামদিনের মতে বাবুরামকে মেরে কেটে ফেললেও তার মুখ হতে একটা বাক্য বার হবে না। অগত্যা প্রণব বাবু রামদিনের পরামর্শ মত সন্তর্পণে বাবুরামকে অনুসরণ করে তার ডেরাটা প্রথমে জেনে নেওয়াই সমীচীন মনে করলেন। পুলিশ-লরীটা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে রেখে প্রণব বাবু কেবল রামদিন ও রতন বাবুকে সঙ্গে করে পুনরায় নয়া রাস্তায় এসে দেখলেন, বাবুরাম বাবু একটা ছেঁড়া চটের থলি হাতে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে চলেছে। প্রণব বাবুর দল সন্তর্পণে তাকে অনুসরণ করতে সুরু করে দিলে। কখনও এ-ফুটপাত কখনও বা ও-ফুটপাত ধরে তাঁরা বাবুরামের নজর এড়িয়ে পথ চলছিলেন। এমনি ভাবে এ-পথ ও-পথ ঘুরে তাঁরা মাণিকতলার একটি বস্তীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু যতোই সাবধানতা অবলম্বন করুন প্রণব বাবুরা বাবুরাম বাবুব নজর এড়াতে পারেননি। অদূরে গ্যাস-পোষ্টের পিছনে দু'জন কুষ্ঠরোগী ব'সে ভিক্ষা করছিল। বাবুরাম বাবু একবার ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং তার পর ইসারায় তাদের কি বলে সে তার চলনের গতি বাড়িয়ে দিয়ে পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়লো। প্রণব বাবুর দল এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁরাও দ্রুত তাকে অনুসরণ করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁদের কার্য্যে বাদ সাধলো কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত ভিখারী দু'জন। সহসা তারা তাদের অর্দ্ধ-গলিত ক্ষতদুষ্ট হাত দুটো ভিক্ষা করবার অছিলায় বাড়িয়ে দিয়ে প্রণব ও রতন বাবুর সম্মুখের পথ রুদ্ধ করে দিল। যতোই তাঁরা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চান, ততোই তারা তাঁদের পথ আগলে মুখ হতে এক অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে থাকে।

তাদের গালের কিছু অংশ জিভ সহ খসে পড়েছে, তাদের গায়ের ক্ষত হতে গড়িয়ে পড়ছে এক প্রকার রস। প্রণব ও রতন বাবু বিব্রত হয়ে পিছু হটে রাস্তার অপর ফুটপাতে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁরা আশে-পাশে কোথায়ও ইনফরমার রামদিনকে আর দেখতে পেলেন না। এতো দুঃখের মধ্যেও প্রণব বাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিলেন, রামদিনের অন্তর্ধান তাঁর মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি না করে আশার সঞ্চার করেছিল।

রতন বাবু পকেট থেকে একটা সিকি বার করে প্রণব বাবুকে বললেন, 'আসুন প্রণব বাবু, ভিখিরী দুটোকে কিছু দিয়ে ঐ গলিটার মধ্যে আমরাও ঢুকে পড়ি।' প্রণব বাবুর অভিজ্ঞতা ছিল রতন বাবুর অপেক্ষা অনেক বেশী। প্রকৃত বিষয় বুঝতে তাঁর বাকী থাকেনি। সক্রোধে ভিখারী দুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে তিনি উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, ওরা ভিখিরীই বটে! এমন ভিখিরী যে ওদের হাজতে রাখা চলে না, ছোঁয়া তো নয়ই। পয়সা ভিক্ষা করার জন্য যে ওরা আমাদের পথ আগলায়নি, সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যাই হোক, অন্ততঃ রামদিন ওদের নজর এড়িয়ে বেমালুম সরে পড়তে পেরেছে। এখোন আমরা তার জন্যে এইখানেই অপেক্ষা করবো।' মনের নিদারুণ অস্থিরতা নিয়ে প্রণব ও রতন বাবু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেইখানে অপেক্ষা করলেন।

পথিপার্শ্বের গ্যাসের আলো স্তিমিত করে দিয়ে ভোরের আলো জেগে উঠছে, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁরা ঐ একই স্থানে দাঁড়িয়ে। বারে বারে তাঁরা এ-দিক ও-দিক নিরীক্ষণ করেন, কিন্তু রামদিনের দেখা পান না। সহসা তাঁরা সম্মুখে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। ছোটো ছোটো কেরাসিন কাঠের চৌকো কয়েকটা নীচু গাড়ী সারিবন্দী ভাবে সম্মুখের গলি হতে বার হয়ে আসছে। কয়েক জন লুঙ্গী-পরা লোক ব্যক্তি দড়ী ধরে সেগুলো টেনে আনছিল। প্রতিটি গাড়ীর মধ্যে হাটু মুড়ে বসে রয়েছে এক-এক জন বিকলাঙ্গ মানুষ। তাঁদের বুঝতে বাকি রইলো না যে, নিকটেই এক ভিখিরী-বাড়ী আছে। সেখান থেকে বহন করে এনে এখন এদের রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে রাখা হবে। পরে নিশ্চয়ই উপার্জ্জিত অর্থ সহ এদের পুনরায় ঐ বস্তিতে ফিরিয়ে আনা হবে। এদের যে বাবুরাম বাবুর আস্তানার নিকটে কোনও স্থান হতে আনা হয়েছে, তাতে প্রণব বাবুর কোনও সন্দেহ ছিল না। ভিখিরীদের এই সংগঠন সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে প্রণব বাবু রতন বাবুকে বললেন, 'বুঝলাম তো সবই, কিন্তু রামদিন গেল কোথায়? শেষে ওদের সঙ্গেই সে ভিড়ে পড়েনি তো? তাহলেই তো কম্ম সারা। ঐ দেখ, ইতিমধ্যে কুষ্ঠরোগী দু'জনাও ঐ স্থান হ'তে সরে পড়েছে। না, হেথা গতিক খুব ভালো মনে হয় না।'

পেশাদারী ইনফরমার বিশ্বাসঘাতক হয়ে কখনও কখনও দুদিকে যে না কেটেছে, তা'ও নয়। কিন্তু রামদিন সম্পর্কে প্রণব বাবুর সন্দেহ ছিল অমূলক। রামদিন ইনফরমার এই প্রকৃতির ব্যক্তি নয়, এককালে সে নিজে ছিল পুরানো সেয়ানা। কিন্তু এখোন চুরি-চামারী ছেড়ে দিয়ে সংসারী হয়েছে, তার মধ্যে কিছুটা আদর্শও এসে গিয়েছে। এখন সে চোর ও চুরি ধরানোর মধ্যে পায় একটা বিমল আনন্দ, একটা নেশার আমেজের সঙ্গে এ আনন্দের তুলনা করা চলে। পুলিশকে সংবাদ দিয়ে অর্থোপার্জ্জনের অপেক্ষা কৃতিত্ব অর্জ্জন করা তার অধিক কাম্য। বড়ো বড়ো অফসাররা আজ তার উপরে নির্ভরশীল, তারা আজ তার উপদেশ মতো চলে থাকে, এই সুখচিন্তা অপেক্ষা তার কাছে আর কি উপভোগ্য আছে? সহসা প্রণব বাবু ও রতন বাবু দেখলেন, রামদিন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে রেখে-আসা লরীটা করে শান্ত্রীদল সহ তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাঁরা উভয়ে বুঝলেন যে, রামদিন বাবুরামের ডেরা আবিষ্কার করে সোজা চলে গিয়েছিল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এবং তার পর সশস্ত্র পুলিশ সহ লরীটা ডেকে এনেছে তাঁদের তুলে নেবার জন্যে।

লরীটা তাঁদের নিকটে এসে দাঁড়ানো মাত্র রামদিন লাফিয়ে নেমে পড়ে কুর্ণিশ করে বললো, 'হুজুর, আমি ঠিক পাশ কাটিয়ে ওনাকে 'ফলো' করেছিলাম। ও না এই বস্তীর শেষে একটা দোতলা কোঠা বাড়ীতে থাকে। বাড়ীটা তো চিনে রেখেছিই মায় তার নম্বর, রাস্তার নামও জেনে এসেছি। এখোন সব রেডি হুজুর, এক্ষুনি ওখানে হানা দিতে হবে।'

প্রণব ও রতন বাবু দ্বিরুক্তি না করে লরীটাতে উঠে বসলেন। হু-হু শব্দে এ-পথ ও-পথ ধরে লরী ছুটে চললো, রামদিনের নির্দ্দেশ মত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লরী একটা ছোট দোতলা বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। বাড়ীর সদর দরজা খোলাই ছিল। একটা ঝুলানো চটের পর্দা ছাড়া সেইখানে আর কোনও বাধাই নেই। প্রণব বাবু দলবল নিয়ে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লেন। রতন বাবু এইরূপ দৌড়াদৌড়ি ও ছুটোপাটিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি প্রায় স্তব্ধ হয়ে দোতলার সিঁড়ির নিকট দাঁড়িয়ে রইলেন। খুকুরাণীর আশু উদ্ধারের সম্ভাবনায় তাঁর বুক দুরু-দুরু করে কাঁপতে থাকে। যুগপৎ ভয় ও আনন্দ তাকে নিমিষে যেন সম্বিৎহারা করে দিয়েছে! প্রণব বাবুর কিন্তু বৃথা চিন্তা করার এতটুকু অবসরও ছিল না। তিনি কয়েক জন শান্ত্রীকে বাড়ীর চারিদিকে মোতায়েন করে তাদের অপর কয়েক জন সহ তর্‌-তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে গেলেন। এদিকে অবশিষ্ট কয়েকজন শান্ত্রীকে নিয়ে রামদিন নিম্নতলের প্রতিটি কক্ষ তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে সুরু করে দিলে। উপরে উঠে প্রণব বাবুর যা দৃষ্টিগোচর হলো তাতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। একটি দামী কৌচ-সুসজ্জিত কক্ষে একজন সুবেশ ভদ্রলোক এবং একজন সুবেশা নারী। মূল্যবান কার্পেটের উপর পদযুগল আরামে ন্যস্ত করে নরম সোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে তারা চা পান করছেন। প্রণব বাবুকে দুয়ারের নিকটে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনি, এ্যাঁ? কাকে চান আপনি?'

'আজ্ঞে', প্রণব বাবু সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিলেন, 'বাবুরাম বাবু নামে কেউ এখানে থাকেন?' 'ওঃ, বাবুরাম বাবু! তিনি পিছনের ফ্ল্যাটে থাকেন', নির্লিপ্ত ভাবে ভদ্রলোক বললেন, 'বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে যাবেন। কিন্তু, ব্যাপার কি মশাই? কোনও মামলা আছে না কি। লোকটাকে আমাদেরও সন্দেহ হতো। এখোন কি তাকে পাবেন, তা আসুন না ভিতরে।'

এই ভাবে তাঁকে ভিতরে আমন্ত্রণ করতে সাহসী হওয়ায় প্রণব বাবুর আর সন্দেহ রইলো না যে, ভদ্রলোক আর যেই হোন, বাবুরাম বাবু নয়। কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করার মত পর্য্যাপ্ত

সময় প্রণব বাবুর ছিল না। ভদ্রলোকের প্রশ্নের কোনও উত্তর না করে প্রণব বাবু সদলবলে নেমে আসা মাত্র রামদিন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যা, হুজুর! না মিলি?' 'দো আদমী মিলা হ্যায়', ক্ষুণ্ণ মনে প্রণব বাবু বললেন, 'লেকেন্ উনলোকো দুসরা আদমী। আভি জলদী বাহার চলো। পিছুমে আউর একটো দরজা হ্যায়।'

প্রণব বাবু দ্বিতলের সংবাদ সংক্ষেপে রামদিনকে অবগত করানো মাত্র রামদিন মহা আক্ষেপ করে বলে উঠলো, 'এ ক্যা কিয়া আপ! এতনা পরিশ্রম বরবাং কর দিয়া। ওহি আদমী বাবুরাম বাবু হ্যায়। আপকো ধোঁকা দেকে হটায় দিয়া।' রামদিনের কথা শুনে প্রণব বাবু স্তম্ভিত হয়ে কয়েক পল দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তার পর তিনি আর্ত্তনাদ করে বলে উঠলেন, 'এঁ্যা! কেয়া বোলতা তুম্?' এবং তার পর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে উপরে উঠতে সুরু করে দিলেন। আদেশ ব্যতিরেকেই তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে চললো তাঁর সশস্ত্র বিশ্বস্ত সিপাহীর দল। তাঁরা উপরের বারাণ্ডায় উপস্থিত হওয়া মাত্র বাবুরাম বাবু ঘর হতে বার হয়ে বারাণ্ডার রেলিং ঘেঁসে দাঁড়ালো। তার পর রামদিনের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে রেলিঙ টপকে দেওয়ালের পাইপ ধরে সে বাড়ীর পিছনে এক উন্মুক্ত স্থানে নেমে পড়লো। প্রণব বাবু তাকে ধরবার জন্যে দৌড়ে রেলিঙর নিকট এসে পৌছবার পূর্ব্বেই বাবুরাম বাড়ীর পিছনে অবস্থিত খোলা মাঠের উপর দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে সুরু করে দিলে। কিন্তু রামদিনও এ বিষয়ে পিছপাও ছিল না, সে সকলকে চমৎকৃত করে ঐ একই জলের পাইপের সাহায্যে অধিকতর দ্রুত নিচে নেমে এলো এবং তার পর বাবুরামের পিছু-পিছু ধাওয়া করে উপস্থিত সকলের চক্ষের সম্মুখেই তাকে ধরে ফেললো। প্রণব ও রতন বাবু বারাণ্ডার উপর হতে এই দৃশ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন, কিন্তু তা নিতান্ত ক্ষণিকের জন্যে। উভয়কে মাঠের উপর মল্লযুদ্ধ করতে দেখে প্রণব বাবু ভাবছিলেন এক্ষুনি নেমে রামদিনকে সাহায্য করতে যাবেন, এমন সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন, বাবুরাম অতর্কিতে রামদিনকে উপুড় করে দিয়ে তার পিঠে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করে দিয়েছে। রামদিন আহত হয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে যাওয়া মাত্র বাবুরাম উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়ে মাঠের ওপারের এক বস্তীর অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

প্রণব বাবু বৃথা উপরে আর অপেক্ষা না করে দলবল সহ ত্বরিত-গতিতে ঐ মাঠে এসে দেখলেন, রামদিন রক্তাক্ত দেহে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে, কিন্তু প্রণব বাবুকে দেখে যন্ত্রণার মধ্যেও তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। প্রণব বাবুকে তাকে অধিক সান্ত্বনা দিতে হলো না সেই প্রণব বাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কিছু ভাববেন না বাবু আমি কয়েক দিনেই সেরে উঠবো। এ জান কঠিন জান, সহজে ঘায়েল হবে না। এই রকম চাকুর আঘাত আমি আগেও খেয়েছি, এই দেখুন না, আমার হাতে, কাঁধে কি রকম গর্ত্ত হয়ে রয়েছে। একটা কাপড় দিয়ে পিঠটা বেঁধে আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। আমি সেরে উঠে আবার আপনাদের কাযে লেগে যাবো হুজুর।'

পুলিশ-অফসার মাত্রেরই কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান থাকে, তাড়াতাড়ি রামদিনের প্রাথমিক চিকিৎসা সমাপ্ত করে প্রণব ও রতন বাবু তাকে ধরাধরি করে অপেক্ষমান পুলিশের লরীতে শুইয়ে দিলেন। প্রণব বাবু লরীচালককে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে রতন বাবুকে বললেন, 'আপনি, রতন বাবু, একে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ে আসুন। আমি আপনার জন্যে বাবুরামের ঘরে অপেক্ষা করবো, বাবুরামের জেনানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার আছে। মহিলাটি বোধ হয় তার উপপত্নী-টুপপত্নি হবে। একটু পীড়াপীড়ি করলে মহিলাটির কাছ হতে প্রয়োজনীয় সংবাদ আদায় করা যাবে। আপনি ঘুরে আসুন তা'হলে—'

কিছু রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে রামদিনের চোখের উপরও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। হাওয়ায় রক্তটা জমাট বেঁধে এতোক্ষণে তার চোখের একটা পাতা বুজিয়ে দিয়েছে। কাতরাতে কাতরাতে বাঁ হাতে ঐ জমাট সরিয়ে চোখ মেলে হাত-তুলে ক্ষীণ হাসি হেসে অস্ফুট স্বরে রামদিন প্রণব বাবুর উদ্দেশ্যে বললো, 'বাবুসাব, সেলাম, আমি ঠিক বেঁচে যাবো, বাবু!' প্রণব বাবু আর রামদিনের প্রতি চেয়ে দেখতে পারলেন না, তাড়াতাড়ি তিনি অন্য দিকে মুখটা ফিরিয়ে ড্রাইভারকে নির্দ্দেশ দিলেন, 'জলদী ইনকো হাসপাতাল লে' যাও।'

রতন বাবু ও রামদিনকে বিদায় দিয়ে প্রণব বাবু পুনরায় ঐ বাড়ীর দো'তলায় এসে দেখলেন সেই মহিলাটি ঘরের একটি সোফায় গুম হয়ে বসে আছে। তাকে দেখলে মনে হয় স্বভাবতঃই সে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পুলিশ যে পুনরায় তার ঘরেই ফিরে আসবে তা সে প্রতি মুহূর্ত্তেই আশঙ্কা করছিল। প্রণব বাবুকে দেখে সে চমকে তো উঠলই না, বরং তাঁর দিকে চোখ মেলে নিবিষ্ট মনে চেয়ে রইল।

'যা জিজ্ঞেস করবো তার ঠিক ঠিক জবাব দেবেন,' মহিলাটিকে উদ্দেশ করে গম্ভীর হয়ে প্রণব বাবু বললেন, 'মিথ্যা কথা বললে কিন্তু বিপদ ঘটবে। জেনে রাখবেন, আমি একজন সাংঘাতিক লোক। আমার অসাধ্য কোনও কায নাই। দরকার হলে আমি মানুষ পর্য্যন্ত চিবিয়ে খেতে পারি। এখোন বলুন, আপনি বাবুরামের কে হন? বিয়ে করা বউ, না…'

'আম'কে অপমান করবার অধিকার না থাকলেও আপনাদের ক্ষমতা আছে। আপনি যা-খুশী বলতেও পারেন এবং তা করতেও পারেন।' শাড়ীর একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে মহিলাটি উত্তর দিলে, 'কিন্তু আমি আজ একটা কথাও মিথ্যে বলবো না। আমি বিয়ে করা না হলেও আমি বাবুরাম বাবুর বৌ-ই। সত্যকারের বিয়ে একটা অনুষ্ঠান বা মন্ত্রের অপেক্ষা করে না, পরস্পরের প্রকৃত বিশ্বাস ও হৃদয়ের বিনিময়ই সত্যকারের বিয়ে। গত আট বৎসর আমরা একান্ত একনিষ্ঠার সঙ্গেই একত্রে ঘর করে আসছি।'

'ওঃ, কথা-বার্ত্তা তো আপনার খুবই উচ্চদরের দেখছি,' একাধারে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু লেখা-পড়াও শিখেছেন তাহলে? কিন্তু এই গুণ্ডাদের আড্ডায় উপস্থিত হলেন কি করে? এখোন বলুন তো আপনার তথাকথিত স্বামীর বর্ত্তমান পেশা বা কাযকর্ম্ম কি? আর তিনি এমন ভাবে উধাও হলেনই বা কোথায়? বলুন, বলুন, চুপ করে থাকলে হবে না, বলতে হবে। কি করে সত্য কথা বার করতে হয় তা আমরা জানি!'

'ধন্যবাদ! অতোটা কষ্ট না করলেও চলবে। আমি নিজে ইচ্ছে না বললে কাউর সাধ্য নেই আমাকে কথা বলাবে। তবে কোনও

কারণে এই ব্যাপারে আমি নিজে হতেই সবটুকু না হোক, কয়েকটা কথা আপনাদের বলবো।' স্থির-গম্ভীর ভাবে মহিলাটি উত্তর দিলে, 'আমার স্বামী কি বা কে, তা আপনারা ভালো ভাবেই জানেন। তার সম্বন্ধে যেটুকু আপনারা জানেন না, সেইটুকু আপনাদের আমি বলবো। আমার স্বামী একদিন আপনাদের মতই নিরীহ ভদ্রলোক ছিল। আমরা উভয়ে আপনার এলাকাতেই পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতাম। কয়েক দিন পরেই আমাদের বিবাহ হবার কথা, এমন সময় এই তল্লাটের এক ধনী লম্পটের নজরে আমি পড়ে যাই। এর ফলে এক সাংঘাতিক মিথ্যা মামলায় ফেঁসে আমার দয়িতকে ফেরার-জীবন যাপনে বাধ্য হতে হলো, অন্যথায় তার ফাঁসী অনিবার্য্য ছিল। এর পর আত্মরক্ষার্থে বাধ্য হয়েই আমাকে তার অনুগামী হতে হয়েছে। এমন ভাবে আমাদের হন্তে কুকুরের মত পল্লী হতে পল্লীতে আপনারা তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছেন যে, আমরা আইনানুযায়ী বিবাহ পর্য্যন্ত করবার সময় পাইনি। এর পর আমার চোখের সামনে বাধ্য হয়ে এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে তাকে আত্মনিয়োগ করতে হয়, জীবন ধারণের নিতান্ত প্রয়োজনে। এতে আত্মগোপনের সুবিধা ছিল, তাই আমি তার এই কাজে বাধা দিইনি। দেখতে দেখতে আমারই চোখের সামনে সে মানব-দানবে পরিণত হয়ে গেল, অভ্যাস ও সংসর্গের কারণে; কিন্তু অপর সকলের ন্যায় আমি তাকে কি করে পরিত্যাগ করতে পারবো, বলুন? তবে সে যাই হোক, আমার স্বামীর বিপদ হতে পারে এমন কোনও সংবাদ আমার নিকট আশা করবেন না, কিন্তু আপনারা এখানে কেন হানা দিয়েছেন তা আমি ভালো করে জানি। যার জন্যে আপনারা এখানে এসেছেন, তার জন্যে আমিও কম চিন্তিত নই। খুকুরাণী আমার বাল্যকালের খেলার সাথী। শহরতলী অঞ্চলে একই স্থানে আমাদের দু'জনেরই মাতুলালয়। বহু দিন পর মাতুলালয়ে এসে শুনলাম খুকুর পিতৃবিয়োগ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এও শুনলাম, তার মা তাকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। তাদের সম্বন্ধে এখানে-ওখানে কিছু কিছু কানাঘুষা যে শুনিনি, তা'ও নয়। আমাদের বর্তমানকালীন অধঃপতনের পর আমার স্বামীকে না জানিয়ে কয়েক বার তার সঙ্গে আমি দেখাও করে এসেছি। আমার ইচ্ছে ছিল আমার স্বামীকে এই গুণ্ডাদের হাত হতে উদ্ধার করে অন্য কোনও শহরে চলে যাবো। কারণ এই শহরে ভদ্র ভাবে জীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমি চেয়েছিলাম আমার স্বামীকে বাদ দিয়ে বাকি সকলকে ধরিয়ে দিতে। চোখের সামনে শহরের বুকের ওপর এই দস্যুদলের অনাচার ও অত্যাচার আমাদের চক্ষুঃশূল ছিল। তাই খুকুরাণী এবং আমি একযোগে এই কাযে আত্মনিয়োগ করি। খুকুরাণীর কাছ হতে এ যাবৎ আপনি যতো খবর পেতেন, তার অধিকাংশই ছিল আমার দেওয়া। কিন্তু আপনারা এতো অসহায় যে, বড়ো বড়ো রুই-কাতলার গায়ে হাত দিতে সাহসী হলেন না, কেবল চুনো-পুঁটীদের বিনাশ করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। আমি জানি, একদিন এই কাজের জন্য আমারও খুকুর মতই বিপদ হবে কিন্তু আমি তাতে ভীত নই। আপনার লোকটি যে ছুরী দ্বারা আহত হয়েছে, তাতে বিষ মাখানো ছিল, এখোন ওর দ্বারা আপনাদের আর কোনও সাহায্যই হবে না! তবে যদি বিশ্বাস করেন আমি তার আরব্ধ কায শেষ করে দেবো। এখান হতে খুউব কাছে একটা ভিখিরী বস্তী আছে বটে, কিন্তু সেখানে খোঁজাখুঁজি করে কোনও লাভ হবে না, ওখান হতে আজ সকালে যারা বেরিয়ে গিয়েছে, তারা কেউই আর সেখানে ফিরবে না। আমাকে বিশ্বাস করে একটা দিন অন্ততঃ সময় দিতে পারবেন কি? বড়ো সর্দ্দারকে আমি চিনি, কিন্তু তার প্রধান আড্ডা কোথায়, তা জানি না। এই একটু আগে রতন বাবুকে এখানে দেখেছিলাম, তিনি এখোন গেলেন কোথায়? আমার কথায় অবিশ্বাস হলে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, দু'-একদিন খুকুর ওখানে তিনি আমাকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। তাঁকে বলবেন, আমি বারো নম্বরের বাড়ীর খুকুরাণীর এক সময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু চন্দ্রা। হায়, জানি না, খুকুরাণীর তারা এতোক্ষণে কি দুর্দ্দশা করেছে, তাকে আমি বারে বারে বলেছিলাম, এই সব পুলিশদের দিয়ে এই শক্তিশালী দলের মূল উৎপাটন করা অসম্ভব। এই কাজে এবার হতে আমাদের ক্ষান্ত দেওয়াই মঙ্গল। খুকুর বোধ হয় দস্যুনিধন অপেক্ষা চাকরীতে আপনার সুনাম ও পদোন্নতিই অধিক কাম্য ছিল, তাই সে আমার প্রস্তাবে রাজী হলো না, তাই এখোন—'

কথা বলতে বলতে মহিলাটি এইবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছে। প্রণব বাবু হতবাক্ হয়ে মহিলাটির কাহিনী এতোক্ষণ শুনছিলেন। সহসা তাঁর মনে হলো এমনি [illegible] একটি মহিলার কথা। একদিন তাঁর কুহক-জালে ভুলে গিয়ে তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। আর তিনি কোনও মেয়েকে বিশ্বাস করতে রাজী নন। প্রণব বাবু মনে মনে ঠিক করলেন, রতন বাবু ফিরে আসা মাত্র মহিলাটিকে থানায় নিয়ে যাবেন। [ক্রমশঃ।

দুঃখ পাও, দুঃখ দাও

"এ'সংসারে আমাদের কাছে যা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে মানুষের লাঞ্ছনা—এক দিকে প্রকৃতির হাতে, আর এক দিকে মানুষের হাতে। মানুষ যেমন অশেষ দুঃখ নিজে পায়, তেমনি অশেষ দুঃখ পরকে দেয়। মানুষের এই দুঃখ আর এই পাপকেই যদি সার সত্য বলে স্বীকার করতে হয়, তা হ'লে ভেবে দেখুন ত, মনের অবস্থাটা কতটা আরামের হয়ে ওঠে!"

—প্রমথ চৌধুরী।

বামাচরণ বাগুলি

পুলকেশ দে-সরকার

বামাচরণ বাগুলি আজন্ম বামপন্থী। জন্মাবার পর অবস্থায় সামান্য সংশয় জেগেছিল মা'র মনে। প্রাণপণ ...ল-রসায়নও করেছিলেন ডান পা-টায়; কিন্তু সম্ভবত, অঙ্গ-সংবাহন-বিশেষজ্ঞা নন বলে ডান পায়ে আর কিছুতেই যেন স্বাভাবিক সামর্থ্য ফিরে এল না। মা যা সন্দেহ করেছিলেন, তাই হ'ল, অষ্টবক্র মুনির একটি বক্রতা ডান পায়ে নিয়ে জন্মালো ছেলেটা। ফলে যখন হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে এই পৃথিবীর মাটিতে এগোতে লগাল তখন তার সমস্ত দেহের ভার পড়ল বাঁ পায়ে। বাগুলি-বংশোদ্ভূত বামাচরণের বামপন্থী না হ'য়ে গত্যন্তর ছিল না।

মা ছেলের কাল্পনিক দুঃখে বার বার চোখ মোছেন, কিন্তু বামাচরণ একটি চরণে ভর ক'রে ছেলেবেলায় সারা পাড়া এমন চষে বেড়াতে লাগল যে, মাকে এবার চোখ মুছতে হ'ল অন্য কারণে। চেনা-অচেনা লোকেরা বামাচরণের দুরন্ত আচরণের নালিশ অনবরত মায়ের আদালতে পেশ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অভিযোগের মাত্রা এল কমে, বামাচরণের ওপর অপর লোকের শারীরিক পীড়নের মাত্রা গেল বেড়ে। মা'র পক্ষে সংগ্রামী ছেলেকে সামলানো হ'ল দায়। দুই পায়ে ভর করে অন্য ছেলেরা যা করতে পারত না, বামাচরণের বক্রভঙ্গিতে তাই ছিল অনায়াস-সাধ্য। মা বুঝেছিলেন, এ ছেলের কাছ থেকে দুঃখ ছাড়া আর কিছু তিনি পাবেন না।

স্কুলেও অবশ্য তার স্বাতন্ত্র্য ছিল। কৃতী ছাত্র না হ'লেও ক্লাশের সীমা ডিঙোতে সে একবারও ব্যর্থকাম হ'ল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা থেকে নিবৃত্ত হ'ল সে নিজেই। কেন না, তখন তার কানে প্রচলিত আইনের সীমা-লঙ্ঘনের জন্য দেশের ডাক এসে পৌঁছেছে। গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে পুলিশ যখন তার আস্ত কয়েকটি হাড় ভেঙে রেখে গেল, তখন বামাচরণ সঙ্কল্প ক'রলে সে জেলে যাবেই। সে নিজের কাছে কখনো একথা স্বীকার করতে রাজী হয়নি যে, দুইখানি আস্ত পা আর দেড়খানি পায়ের মধ্যে সামর্থ্যের দিক থেকে কোন পার্থক্য আছে। বামাচরণের এই অস্বীকৃতির জেদই ছিল তার অবিশ্রাম অগ্রগতির মূল প্রেরণা।

স্কুলের পড়া সাঙ্গ হ'ল বটে, কিন্তু বাড়ীতে অপাঠ্য পাঠ্যের মাত্রা এত বাড়ল যে মা শঙ্কিত হ'য়ে বললেন, পড়া যখন ছাড়লিই না, তখন স্কুল ছাড়লি কেন? বামাচরণ বলল, স্কুল ছেড়েছি, বই আর ছাত্রদের তো ছাড়িনি। মা বুঝলেন, এ তাঁর কথার জবাব নয়! কিন্তু বামাচরণ অকস্মাৎ স্থানীয় স্কুলের ধর্মঘটে তার কথার সত্যতা প্রমাণ ক'রে দিল। বামাচরণের পড়ার ঘরই হ'ল ধর্মঘটী ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের ব্যস্ত কার্যালয়। বামাচরণ তাদের প্রেরণাস্থল। ধর্মঘটী ছাত্রদের দাবীও ছিল অসাধারণ। স্কুলের দেয়ালে, ধর্মঘটী ছাত্রদের হাতে বা কণ্ঠে যে দাবী লিপিবদ্ধ বা উচ্চারিত হ'ল তা স্কুলের ইতিহাসে অভিনব। অভিভাবকেরা পর্যন্ত এই দাবীতে প্রমাদ গুণলেন। ধর্মঘটী ছাত্রদের যারা নেতৃস্থানীয়, শিক্ষকেরা তাদের চেনেন। সোজা পথে এরা কোন কালেই শ্রেণী থেকে শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'তে পারে কি না এ বিষয়ে শিক্ষকদের সংশয় ছিল। কিন্তু বামাচরণের কৌশলে ধর্মঘটীরা যে দাবী উত্থাপন করেছে তাতে শিক্ষকগণের তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করার কারণও ছিল। এরা যখন উপর্যুপরি চীৎকারে দাবী তুলল, ফেল করানো চলবে না, শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে, তখন তাঁরা স্মিতহাস্যে হতবাক্ হ'য়ে রইলেন। একমাত্র প্রধান শিক্ষকই প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু দাপাদাপি করলেন, কয়েকটি ছেলে স্কুল থেকে বিতাড়িত হ'ল আর পুলিশ বামাচরণকে আর একবার সতর্ক ক'রে দিল।

বামাচরণের লাভ হ'ল এই যে, তার দল বৃদ্ধি হ'ল এবং সে নিজে দাদার পর্যায়ে উঠল। সময়ে-অসময়ে বাইরের ছেলেরা বামাচরণদা'র খোঁজে এলে মা ভাবতেন, খোকা বড় হ'য়েছে। তারও বড় কথা, এখন এই অঞ্চলের কোন কাজ বামাচরণের দলকে বাদ দিয়ে হবার জো ছিল না। পারিবারিক বিবাহেও যদি তাদের অগ্রগণ্য না করা হ'ত তবে বামাচরণ ঘটনাস্থলে হাজির হ'য়ে কৈফিয়ৎ তলব করত। যাঁরা খবর দিয়ে এই দলের সহযোগিতা কামনা করতেন তাঁদেরও শেষ পর্যন্ত ঋণ সমেত "পরিবর্তিত বাজেট" রচনা করতে হ'ত। বামাচরণের তদারকে কাজ কিছুটা এগোত কিন্তু অনুষ্ঠানের কয়দিন এদের পোষণ করতে যে বেগ পেতে হ'ত তাতে অভিভাবকের মনে হ'ত, মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে এর চাইতে দুঃসহ দুঃখ হ'তে পারে না।

তবে বারোয়ারীর ব্যাপারে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকা যেত,—যদি চাঁদাটা চাঁদা আদায়কারীদের নির্দেশ মতো মিটিয়ে দে'য়া যেত। ওতে আর কারও কিছু করার থাকত না। কোথা থেকে ত্রিপল, কোথা থেকে বৈদ্যুতিক সংযোগ আর কার বাড়ীর বাসন-কোসন, টেবিল-চেয়ার আনতে হবে ওরাই স্থির ক'রে ফেলত। ফেরৎ পাওয়া যেত, তবে অবশিষ্টাংশ। বলার উপায় ছিল না, কেন না তা অসামাজিক এবং আধুনিক ভাষায় অগণতান্ত্রিক হ'ত।

কিন্তু বামাচরণ মায়ের মুখোজ্জ্বল ক'রে রাখত তিনটি কাজে। নিরুপায় রোগীর পাশে এই দলটিতে দেখা যেত এবং এজন্য অবশ্য এ অঞ্চলের সবাইকে তার দায়িত্বের অংশ নিতে হ'ত। লোকের অভাবে মড়া শ্মশানে যাবে না এমন ঘটনাও বামাচরণ ঘটতে দেয়নি। বুড়ো বয়সে বিয়ের সখ ঘুচিয়ে বামাচরণ নিজের দলীয় ছেলের সঙ্গে বাগ্‌দত্তার বিয়ে দিয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে দুটি। আর বামাচরণের অঞ্চলে কোন মেয়ে বা ছেলের অবাঞ্ছিত অকাল আসঙ্গ-লিপ্সাও ঘটতে দেয়নি সে। বামাচরণের ঐটিই ছিল রাজনীতি। কিন্তু কূটনীতিও যে তার ছিল অভিভাবকেরা তাও বুঝলেন সেদিন—যেদিন দেখলেন বামাচরণের দলে মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে, আর মেয়ে সমাগমের সঙ্গে ছেলে সমাগমের সংখ্যা দ্বিগুণ বেগে বাড়তে লাগল। রাজনীতির নামে অথবা আরও ভাল দেশসেবার নামে, আরও ভাল লোকসেবার নামে তরুণ-তরুণীর সম্মেলনে বাধা দেবার সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না কেউ। আরও সত্য কথা, দরিদ্র পিতার কুৎসিত কন্যা উদ্ধারের এই সম্ভাব্য পথাবিষ্কারের জন্য কেউ-কেউ আড়ালে বামাচরণকে আশীর্বাদই জানালেন।

কিন্তু এর পর যে ঘটনা ঘটল তাতেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বুঝতে পারল, বামাচরণ খাঁটী বামপন্থী। তিন-নাথের মেলায় লোকেরা এক পকেটমারকে হাতে-নাতে ধরে খুব উত্তম-মধ্যম দিলে। তাতেও তৃপ্ত না হ'য়ে একে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে যখন কয়েকটি লোক থানার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন বামাচরণের দল এসে হাজির। বামাচরণের দল কখনো কোথাও নিঃশব্দে আসে না।

তারা যখন আসে জিগীর দিয়ে আসে। তাই তাদের আগমন-বার্তা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে বিঘোষিত হ'তে লাগল: "সাম্প্রদায়িকতা চলবে না, চলবে না।" "বিরোধ চাই না, শান্তি চাই।"

এ অঞ্চলের লোকেরা বামাচরণীয় বামপন্থীদের দুর্বোধ্য দাবীতে ঢোক গিলতে লাগল। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কথাই বা এল কি ক'রে আর শান্তি চাইবার এই কি মারাত্মক রীতি?

অভিভাবকদের মধ্যে বেপরোয়া বৃদ্ধও আছেন দেখা গেল। তিনি দুর্জয় সাহসে ভর ক'রে বামাচরণের অনুগত একটি ছেলেকে জিগগেস করলেন, হাঁ বাবা, এতে সাম্প্রদায়িকতা কোথায় হ'ল?

ছেলেটি বলল, বাঃ, আপনারা মুসলমানকে ধ'রে মারবেন?

কিন্তু ও তো জাতে পকেটমার!

না। বামাদা বলেন, মুসলমানরা প্রথমে মুসলমান, তার পর যা-কিছু। সুতরাং পকেটমার মারা মানেই মুসলমানকে মারা। আর মুসলমানকে মারা মানেই সাম্প্রদায়িকতা। আমরা এই সাম্প্রদায়িকতা সহ্য করব না।

তোমরা কারা?

আমরা বামপন্থী।

বাবা, আমায় যদি ওরা মারে।

ছেলেটি ফস্ ক'রে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললে, তার বিচার হবে আদালতে। কিন্তু মুসলমান পকেটমার হ'লে তাকে মারা চলবে না।

কিন্তু তোমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দল ক'রে লাঠি নিয়ে এলে কেন বাবা?

তার কারণ, আমরা গান্ধীবাদী নই। দরকার হয় লাঠি হাতে নেব, কিন্তু অশান্তি হ'তে দেব না।

তোমাদের দলে ক'টি মুসলমান আছে বাবা?

একটি। কিন্তু সংখ্যা বড় নয়, নীতি বড়।

এই নীতির দোর্দণ্ড-প্রতাপ দেখা গেল যখন সত্যিই দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশীর বিরুদ্ধে চরম আঘাত এল। এরা সারা দেশের লোককে বিস্মিত ক'রে বলতে লাগল, সংগ্রাম এদের বিরুদ্ধে নয়, এদের শত্রু। বিরুদ্ধে।

আবার সাহসে ভর ক'রে কোন কোন অভিভাবক জিগগেস করলেন, কেন, বাবা, এই যে তোমরা দু' মাস আগে বললে, সাম্রাজ্য-বাদ নিপাত যাক্।

সে তো নিপাত গেছে, মানে, মরণ-শয্যায় ধুঁকছে। আজ শত্রু ফ্যাসিবাদ। সে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদের গায়ে মরণ-কামড়।

তাই বুঝি সাম্রাজ্যবাদের মুমূর্ষু দেহে চীৎকারের কোরামিন ইঞ্জেকসান দিচ্ছ?

তা নইলে ফ্যাসিবাদকে মারবে কে?

বাবা, একটা কথা বলব?

আপনারা প্রাচীনপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, কি কথাই বা আপনারা বলবেন?

প্রাচীন মতেই বলব। আমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু সাম্রাজ্যবাদ। তোমরা বলছ, সে মুমূর্ষু। এবার দাও না তাকে চরম আঘাত।

আমি আগেই জানতাম আপনি এক জন ফ্যাসিবাদী, তাই সাম্রাজ্যবাদকে মেরে ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করতে চান। কিন্তু এ আমরা সহ্য করব না। এখন সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানার কথা উঠতেই পারে না।

ও দুটো বুঝি আলাদা?

আপনার মাথায় ও-সব ঢুকবে না। কিন্তু আপনি সাবধান!

সাবধান হ'য়েও লাভ ছিল না। ইংরাজের চরের নির্ভুল তথ্যের ওপর ভর ক'রে ফ্যাসিবাদের চর অপবাদে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ অভিভাবক কারারুদ্ধ হলেন। জেল থেকে শুনলেন, তাঁদের লোকালয়ে গণ-অভ্যুত্থানের হট্টগোলে তাঁর একমাত্র ছেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে সার্জেন্টের রিভলভারের গুলীতে প্রাণ হারিয়েছে। তাতেও দুঃখবোধ করেননি। জেলের দরজায় মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যখন শুনলেন, বামাচরণের একটি অনুগত ছেলের অঙ্গুলি নির্দেশেই সার্জেণ্ট পলায়নপর ছেলেটাকে গুলী করেছে, তখন এত দিনে তাঁর অভিভাবকতার মূর্খতা ধরা পড়ল। স্বীকার করলেন, তাঁর নিজের বিশ্বাসের কোন জোরই ছিল না, অথবা হয়তো সে বিশ্বাস তাঁর আন্তরিক ছিল না। ছেলেটা সেই তো স্কুল থেকে ফেরার পথে মারা গেল। ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে নিজের বিশ্বাস সিদ্ধির জন্য তিনি তো পারেননি ছেলের হাতে রিভলভার তুলে দিতে, হয় ইংরাজ নয়তো ইংরাজের সহচর ঐ বামপন্থীদের কাউকে মারবার নির্দেশ দিতে? অথচ এই বিশ্বাসের জোরেই তো বামাচরণের অনুগত শিষ্য অনায়াসে একটি নিরীহ ছেলেকে হত্যার জন্য জহ্লাদকে দেখিয়ে দিতে পারল, তার বিশ্বাস এতটুকু কাঁপল না। সে তো এই দৃঢ় বিশ্বাসেই এই কাজ করল যে, আমার সঙ্গে ওদের মতদ্বৈধ আছে, ছেলেরও থাকতে পারে, অতএব শত্রু নিপাত যাক্? সমগ্র সমস্যাকে এমন একান্ত ক'রে দেখতে তিনি তো পারেননি। তিনি তো পারেননি সারা পৃথিবীকে দুটো ভাগে ভাগ করতে— ফ্যাসিবাদ আর অফ্যাসিবাদে। তিনি চেয়েছেন ফ্যাসিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদকে এক ক'রে দেখতে—পারেননি অফ্যাসিবাদের শিবিরে সাম্রাজ্যবাদকেও সাদর অভ্যর্থনা জানাতে? সুতরাং, তাঁর সেই অন্ধ বিশ্বাস কই, যে বিশ্বাসে লোকে বলতে পারে, আমার সঙ্গে যে নয় সে আমার শত্রু, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি না—সে পিতা হোন্ গুরু হোন্, খ্যাতনামা লেখক হোন্ বা বৈজ্ঞানিক হোন্। দেশের প্রচলিত ঐতিহ্য যদি আমার পথানুমোদন না করে তো সেও আমার বর্জনীয়। কোথায় এই বিশ্বাস ৬০ বছরের প্রাচীন বটবৃক্ষের?

কিন্তু বামাচরণের দল ব্যর্থকাম হ'ল। দেশপ্রেমিকদের ফ্যাসিবাদের পঞ্চম বাহিনী বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও এই পঞ্চম বাহিনীরই জয় হ'ল। বিদেশী শাসন বা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ অপসৃত হ'ল এবং দেশের অন্যান্য দলের ব্যর্থতার চূড়ায় সর্বাধিক সঙ্ঘবদ্ধ কংগ্রেস খণ্ডিত ভারতবর্ষের শাসন-পতাকা উড়িয়ে দিল। অকস্মাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরে হতবাক্ (বামাচরণীয়) নেতৃবৃন্দ হতাশার খাঁচায় বন্দী হ'য়ে হাত-পা খিঁচোতে লাগল, "রুখতে" পারল না কিছুই। নিতান্ত বেপরোয়া বামাচরণের সাঙ্গোপাঙ্গরা প্রথমে দল বেঁধে পথে বেরোল, আকাশে মুষ্ট্যাঘাত করল, এ আজাদী ঝুঠা হায় ব'লে হিন্দীতে তারস্বরে আর্তনাদ তুলে গলা ভাঙল, তার পর তাতেও যখন 'গণচেতনাকে' উদ্বুদ্ধ করা গেল না, তখন আতসবাজী কারবারীদের কুটির-শিল্প থেকে গুটিকয়েক পটকা পথের ওপর মেরে বিপ্লবের বহ্নি বিস্ফোরণে নিজেরাই জ্বলে

অলঙ্কারে
রুচি ও
সৌন্দর্য্যের
পরিচয়
এম.বি.
সরকার এণ্ড সন্স
১৬৭সি, ১৬৭সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে)
আমাদের পুরাতন শোরুমের বিপরীত দিকে ফোন-এভিন্যু ১৭৬১ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ: ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ফোন: পার্ক ৪৪১৬

গেল। তার পর কিছুকাল নিষ্ক্রিয় কারাবাসে নিষ্ফল উত্তেজনায় হৃদয়-মন নিপীড়িত হ'লে বামাচরণপন্থীদের বদলে গেল মতটা। 'ছেড়ে দিল পথটা।' ঝুটা আজাদীর ঝুটা সবিনান স্বরাজী দলের মতো সাগ্রহে কারবারী করবে বলে ঘোষণা করল। কেন না, জনমত তাই চায়।

স্যার গ্যালাহাডের দল এগিয়ে এলেন। বোটারী ক্লাবে স্যার বৈশম্পায়ন শাস্ত্রী, স্যার মতিরাম পতিরাম, স্যার জগদীশনারায়ণ, স্যার রূপেন্দ্রকুমার তরফদার, রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র খাসনবীশ, রায়বাহাদুর বগলাপদ মুখার্জি, রায়সাহেব মাঙ্গিলাল ভাণ্ডিলাল, রায়সাহেব ভূপতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভি এন ঘোষ, ডাঃ কে ডি সোরকর, মিঃ সেইন, মিঃ লাহাড়ী, মিসেস্ নাম বোনার্জি, মিস্ পি সি ব্যাটন এক দিনকার আলোচনায় নিঃসংশয়ে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, এ আজাদী ঝুটা তো নয়ই, এ আজাদী তাঁরাই ইংরাজের কাছ থেকে দেশকে পাইয়ে দিয়েছেন। জরাব্যাধি রোগে শীর্ণ দেহে খাস সাহেব-দরজী দিয়ে তৈরী আধুনিক স্যুট চাপিয়ে স্যার বৈশম্পায়ন শাস্ত্রী রাজভাষায় বললেন, সন্ত্রাসবাদীদের আমরা যে নিন্দা করেছি তার কারণ আমরা ছিলাম অতি সপন্থী—গান্ধীজীর পূর্বগামী। মেদাধিক্যে মন্থরগতি মারোয়াড়ী ইংরাজীতে বললেন, বরাবর আমরা ইংরাজ বণিকের সঙ্গে লড়েছি। পুলিশ বিভাগের প্রাক্তন প্রধানতম পরিদর্শক স্যার রূপেন্দ্রকুমার তরফদার বললেন, দেশে বিপ্লবের বহ্নি জ্বালতে দিইনি বলেই না ইংরাজ আজ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হ'ল। রায়বাহাদুর বগলাপদ মুখার্জি সিভিলিয়ানী ভাষায় বললেন, ইংরাজকে শাসন-পরিচালনার দক্ষতা না দেখালে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করত কি?...

অতএব স্বাধীনতা এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের হাতে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হ'ল তখন এঁরাও এঁদের জোরদার নিঃসংশয় দাবী নিয়ে এলেন; বললেন, জেল খাটা আর শাসন-পরিচালনার দক্ষতা এক নয়। শাসন-পরিচালনায় আমাদেরই জন্মগত অধিকার। রায়সাহেব মাঙ্গিলাল ভাণ্ডিলাল তাঁর গৃহশীর্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রে বললেন, আসল স্বাধীনতা উৎপাদনে—পয়সায়, সে কাজ আমরাই ক'রে এসেছি; রাষ্ট্রের মূল ভিৎ আমরাই।

বামাচরণ বাঙালি অস্থির হ'য়ে উঠল। আর কিছুই দেন করার নেই, এই হতাশায় হাতের যে কোন কর্মসূচীকেই কণ্ঠের জোরে বৈপ্লবিক ক'রে তুলতে লাগল আর দেশের যত পুরানো রোগ তা জনসমক্ষে প্রদর্শন করতে লাগল। স্যার গ্যালাহাডেরা সে সুবিধাও দিলেন। কেন না, স্যার গ্যালাহাডেরা সর্ববিশ্বকে আত্মবৎ গণ্য ক'রে থাকেন এবং নিজের দিকে দৃষ্টি রেখে 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্' মন্ত্র আওড়াতে জানেন। সুতরাং রাজ্য পেয়ে ওঁরা বেলুনের মত ফাঁপতে লাগলেন সারা জনপদবাসীর দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে। বামাচরণ পার্কে পার্কে গবেষণা ক'রে বেড়াল—যে জনশক্তি ইংরাজ-শক্তিকে তাড়িয়েছে সেই শক্তিই তাড়াবে এই ছদ্মবেশী প্রভুশক্তিকে।

বামাচরণপন্থীরা এদেশের জনপদবাসীদের এই বলে সজাগ করতে চাইল যে, স্যার গ্যালাহাডের দলই আসলে এদেশের শাসক, আর তাঁদেরই বহু দিনকার পোষ্য আমলারা এখনও টোপ মাথায় দিয়ে রাজ্যির ভারী ভারী চাকরীগুলো আগলে আছেন। অকস্মাৎ বরাত জোরে বা করকোষ্ঠি ফুঁড়ে যাঁরা মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন তাঁরা ওঁদের কোলে আত্মসমর্পণ করেছেন। এ নিয়ে পার্কে পার্কে সভা হ'ল, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হ'ল যে, অমুক অমুক ১৯২১ সালের আমল থেকে স্বদেশী পিটে বড় হয়েছে; দেশ স্বাধীন হবার পর আরও বড় চাকরী বাগিয়েছে। এ নিয়ে ট্রামে-বাসে আলোচনার ঢেউ চলল। সত্যিই তো, কুকীর্তির স্তম্ভগুলোর কাছে স্বদেশী বাবুরা যদি কুর্নিশ করে তবে এদেশের দুর্নীতির বাকী কি? সওদাগরী অফিসে সরকারী কর্মচারীরাও খুব আড়ম্বরে সম্মেলন করল এবং এই সব দুর্নীতির অতি তীব্র প্রতিবাদ করল।

দেশ জাগল না। তর্ক জমল কিন্তু দেশ জাগল না। বামাচরণদের পাড়ায় সেই অভিভাবকটি আর নেই কিন্তু ট্রামে-বাসে দু'-চারটি দুঃসাহসী লোক বামাচরণের আওয়াজে এই বলে আওয়াজ ছাড়ল যে, দেশ-বিভাগে মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী তো বামাচরণও সমর্থন করেছিল; আর তারও আগে সত্যিকার সংগ্রামকালে ১৯৪২ সালে ওরাই তো এই আমলাতান্ত্রিক শাসনকে রক্ষা করেছে! শুনে বামাচরণ ক্ষেপে গেল। নূতন শ্লোগান দিল: ঐক্য চাই। প্রতিক্রিয়াশীলদের বাদ দিয়ে বিপ্লববাদীদের এক ঐক্যবদ্ধ মোর্চা চাই। দলবদ্ধ হয়ে বামাচরণের দল এই কথাটাই বোঝাতে লাগল যে, অন্যান্য ছিটেফোটা দলের অস্তিত্বের কোনই মানে হয় না। ওদের লবণ-সমুদ্রে স্নান করা উচিত। সে লবণাম্বুরাশি আমরা। সুতরাং হে বিক্ষিপ্ত, ব্যর্থ ক্ষুদ্র দল, 'মামেকং শরণং ব্রজ।'

সর্বত্রই একটি মাত্র সংস্থা চাই। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বামাচরণের। সর্বক্ষেত্রে বামনের মতো তার পদক্ষেপ। স্বর্গ মর্ত পাতাল—এর কোথাও যেন-না তার প্রভাব থেকে স্খলিত হয়। তার পর দক্ষিণা শ্রমিক-সংস্থা চাই একটি, সে সংস্থায় বামাচরণের বৈজ্ঞানিক বচন গম্ গম্ ক'রে প্রতিধ্বনিত হবে। ছাত্র-সংস্থা হবে একটি—সেখানে বামাচরণের চরণচিহ্ন থাকবে প্রস্ফুট। কেরাণীকুলের সংস্থা থাকবে একটি—সেখানে বামাচরণের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হবে। এ কেবল শ্রেণী হিসেবে নয়, বিভাগ হিসেবেও। কারখানার শ্রমিক, বন্দরের শ্রমিক, রেলের শ্রমিক, ছাপাখানার শ্রমিক, রাস্তার শ্রমিক। তাও নয়; কারখানা বলতে কেবল কি ইঞ্জিনিয়ারিং, কেবল কি পাট? বামাচরণের ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। সুতরাং, ঐক্য চাই। ঐক্যের নির্গলিতার্থ বামাচরণ স্বয়ং। এ কথাটা যত দিন না দেশের লোকে বুঝবে তত দিন বামাচরণের শান্তি নাই, বামাচরণপন্থীদের নিদ্রা নাই, দেশের লোকের স্বস্তি নাই, অন্যান্য পন্থীর ভিন্ন-চিন্তার অবকাশ নাই; কেন না, এ কথা না কেউ বলে যে, দেশের কল্যাণের জন্য তারা ঐক্য চায় না।

বামাচরণের ঐক্যের আওয়াজটা বেশী জোরালো হ'ল যখন ওরা নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে জব্দ করার সঙ্কল্প নিয়ে এল। ঐক্য চাই ঐক্য চাই শব্দে সাধারণ লোকের জীবন এমন ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠল যে, তারা যে যেখানে পারল এলোপাথাড়ি ভোট দিয়ে বসল। কিন্তু বামাচরণের ঐক্যের আওয়াজ একেবারে ব্যর্থ হ'ল না, ঐ ঐক্যের অর্থ যারা বোঝে এমন বুদ্ধিমান্ নির্বাচকদের মধ্য থেকে বামাচরণের দল গুটিকয়েক এমেলের গতি ক'রে ফেলল।

কিন্তু তাতেও যখন দেশের দুর্গতি ঘুচল না, তখন বামাচরণ মহাসমারোহে এক সংস্কৃতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করল। তাতে

দেশবিদেশ থেকে অনেক পয়সা খরচ ক'রে মনীষিদের আনা হ'ল ; তার পর সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য, বক্তৃতার মধ্যে আধুনিক বুর্জোয়া সাহিত্যকে খুব কষে গাল দিয়ে অন্যান্য দেশের কয়েকটি সাহিত্যিকের সঙ্গে এদেশের সনাতন হাজরার তাড়ি-সাহিত্যেরও খুব যশোগান করল। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল যে, এই শ্রেণীর প্রগতি-সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারলে দেশের বহুমুখীন্ দৈন্য ঘুচতে পারে।

তবু যখন দেশের একটি দৈন্যও ঘুচল না, তখন বামাচরণপন্থীরা অনেক পরিশ্রম ক'রে কলকাতার মতো নোংরা সহরে পল্লীবাসীর এক ভয়ঙ্কর চিত্র উদ্ঘাটিত করল। কলকাতার আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের পাশেই সহরতলীতে কোন্ প্রেতাত্মারা বাঙালী নাম নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে তাদের এক বিরাট মিছিল নিয়ে এল চৌরঙ্গীতে বামাচরণ— ঘৃণায়, ক্রোধে, বিরক্তিতে সহর-কোতোয়াল এই ভয়ঙ্কর চিত্র লক্ষ্য ক'রে কাঁদুনে গ্যাস ছাড়লেন! চিত্রটি তাতেই ফেঁসে গেল। বামাচরণ চেষ্টা ক'রেও আর তাদের খুঁজে জড় করতে পারল না।

ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে বামাচরণ ভদ্রবেশী বেকারদেরই জমায়েৎ করল ময়দানে। ইচ্ছা এদের নিয়ে একবার বিধানসভায় যায়। অজগরের মতো এদের দীর্ঘ গতি দেখে বামাচরণও আঁৎকে উঠল—সহরের কর্তাব্যক্তিরা উপেক্ষার জালের অন্তরালেও এই বিপুল মূর্তি প্রত্যক্ষ ক'রে প্রমাদ গুণলেন। বিধান-সভা পর্যন্ত যখন এই বিরাটাকৃতি ভদ্র বেকারের মিছিল নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল, বামাচরণ অস্বস্তি বোধ করল! কিছুই তো কোথাও হ'ল না! বিধানসভার কোলাপসিবল গেটে মাথা কোটাকুটি হ'ল ; বিধান-সভাকর্তারা একবারের জন্যও দর্শন দিলেন না। ভয়ানক বক্তৃতার বিক্ষোভ হ'ল, কণ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠল, বামাচরণপন্থীরা বিধানসভা থেকে রাগে বেরিয়েও এলেন। কিন্তু এর পর?

"বন্ধুগণ! আজ আপনারা যে বৈপ্লবিক অভিযান করলেন তা বুর্জোয়া সভ্যতার ভিৎ কাঁপিয়ে দিয়েছে। পুঁজিপতিদের শুভানুধ্যায়ী মন্ত্রীরা ভয়ে আপনাদের সম্মুখীন হ'ল না ; চোরাপথে পালিয়ে গেল। জয় আপনাদেরই। জয় অবশ্যম্ভাবী। বারে বারে আপনাদের এই বৈপ্লবিক অভিযান করতে হবে, বারে বারে ওরা চোরাপথে পালাবে, কিন্তু এক দিন সে পথে পালাবে সেই পথই হবে ওদের শেষ পথ ; তখন আপনাদের জয়। আজ আপনারা এই বৈপ্লবিক বাণী নিয়ে বাড়ী যান। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

পরদিনই আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল এবার শ্রমিক অভ্যুত্থান হবে। বামপন্থীরা একমত হয়েছেন। এবার শ্রমিকেরা আসবে কল থেকে, কারখানা থেকে, রেল থেকে, ডক থেকে, পথ থেকে। ফলে পোর্টফোলিও নিয়ে নেতারা বেশ ক'দিন হাটাহাটি করলেন চিন্তা মাথায়। তার পর সত্যিই এক দিন এল বিরাটকায় অজগর বেরিয়ে উৎপাদনের অন্ধ-গুহাগুলো থেকে! নেতারা খুসী হলেন, মন্ত্রীরা তাজ্জব বনলেন। কিন্তু মিছিলটি আবার এসে থামল সেই রুদ্ধ প্রহরীরক্ষিত কোলাপ্‌সিবল গেটের কাছে। সেই জনস্রোত এসে এই রুদ্ধপথে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল ; সেই জনস্তম্ভকে অগস্ত্য মুনির মতো আনত ক'রে নেতারা বললেন, জয়যাত্রা। চলবে এই অভিযান। এই বুর্জোয়া কাঠামোর প্রত্যেকটা ইট খুলে নেব আমরা। আজ মন্ত্রীরা গোপন পথে পালাচ্ছে, সেদিন পালাবার পথ থাকবে না, পড়বে তারা আপনাদের পায়ে, আপনারা তাদের ক্ষমা করবেন কি রাখবেন সে বিচার করবেন আপনারাই। আজ সেই বিচারের সূত্রপাত হ'ল। জয় আপনাদের অবশ্যম্ভাবী। আপনারা গৃহে গৃহে এই বিপ্লবের বাণী নিয়েই ফিরুন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

আবার আবহাওয়ায় সঞ্চিত হ'তে লাগল উদ্বাস্তু সমাবেশের সম্ভাবনা। আবার নেতারা ছুটোছুটি করলেন। তার পর সত্যি-সত্যিই এক দিন দেশবিভাগের অভিশাপ সরীসৃপের মতো কলকাতার ঐশ্বর্যপথে বেরিয়ে এল। গগনচারী দিল্লীর বাদশাদের গোপন ষড়যন্ত্রের অস্ত্রোপচারে দ্বিখণ্ডিত ভারতমাতার রক্তের মতো বেরিয়ে এল অভিশপ্তদের মিছিল। শেষে এসে ঠেকল ঐ কঠিন লৌহদ্বারে। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, কাজ দাও, কোথাও মাথা গুঁজতে ঠাঁই দাও। তোমাদের রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে বলিদান আমরা।

কিন্তু বৃথা। সমাবেশের সমাপ্তিতে খুসী নেতারা অভিযানকে অভিনন্দন জানালেন ; বার বার এই অভিযানে শাসকদের তক্তভৌষ ভাঙ্তে হবে একথাও জানালেন, মন্ত্রীদের পরাজয় ও পলায়নের কথা ঘোষণা করলেন। তার পর জয়োল্লাসে এদের ফিরে যেতে বললেন।

কিন্তু এরা ফিরে যেতে নারাজ। যে মামলা নিয়ে তারা এল তার ফয়সলা হ'ল কোথায়? যাবার কথা হবে পরে। নেতারা প্রমাদ গুণলেন। বিপ্লবের বাণী কি এখানে এসেই বানচাল হ'য়ে যাবে? নেতার পর নেতা বক্তৃতা দিতে লাগলেন। এইটেই যে মূল অভিযানের "সূচনা" "প্রথম পদক্ষেপ", চরম আঘাতের প্রথম মুষ্টাঘাত, এই কথা বার বার বোঝাতে লাগলেন।

সমুদ অচল। স্তব্ধ।

বামাচরণ উদ্বাস্তুদের এই অবৈপ্লবিক মনোভাবে বিরক্ত হ'য়ে যখন স্থানত্যাগের জন্য পা বাড়িয়েছে তখন পুলিশবাহিনীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল।

রণধীশ বলল, বামাদা, পুলিশ বোধ হয় কিছু করবে।

বামাচরণ ক্রুদ্ধ কটাক্ষে রণধীশকে বলল, বামাচরণ যখন এগোয় তখন পিছোয় না। আমাদের সম্মুখে বিপ্লব।

কাঁদুনে-গ্যাস ছাড়ার স্পষ্ট আওয়াজ এল। মনুজেন্দ্র বলল, বামাদা!

বামাচরণ ধমকে বলল, দৃষ্টি সম্মুখে রাখ। পেছনে অতীত ইতিহাস! অবান্তর।

আরও কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ার আওয়াজ।

বামাচরণ সঙ্গীদের নিয়ে এগোতেই লাগল, এগোতেই লাগল। বামাচরণের দেড়খানা পায়ে অদ্ভুত তড়িৎ-গতি, অব্যাহত।

এক সময় রণধীশ বলল, বামাদা, ভুল ক'রে বোধ হয় আমরা একই গলিতে আনাগোনা করছি। মনুজেন্দ্র বলল, এই তো এখানটা দিয়ে একবার গেছি! রণধীশ অনেকটা অসহায়ের মতো বলে উঠল, বামাদা, আমরা বোধ হয় অন্ধগলিতে ঢুকে পড়েছি।

আজন্ম বামপন্থী বামাচরণ দৃক্‌পাত না ক'রে এগোতেই লাগল।

স্মরণে

(দেওঘর হ'তে পুরী)

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায়

ফাল্গুন মাসের প্রায় শেষ। আমরা সপরিবারে বৈদ্যনাথ-ধামে অনেক দিন কাটালাম। শেষের দিকে ইচ্ছা হ'লো আমাদের ভেতর দু'-এক জনের পুরীধাম যাবার। আমি আর শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্র ভায়া রওনা হ'লাম, সংগে নিলাম আনন্দ খানসামাকে।

তখন পুরীর 'ফুল সিজন্'। হোটেলে তখন ভাল স্থান পাওয়া যায় না। বহু চেষ্টা ক'রে ফ্লাগষ্টাপের ধারে একটা হোটেলে স্থান পেলাম। তখন হোটেলওয়ালাদের পায় কে? ম্যানেজার বললেন, "স্থান ত নেই, তবে তিনতলার ছাদের চিলে-ঘরটা একবার দেখে আসুন গে। দু'জন, আর একটা চাকর ত, বোধ হয় হ'য়ে যাবে।" গিয়ে দেখলাম, উপরে ছয় ফুট প্রস্থ দশ ফুট লম্বা চিলে-ঘর। জানলা চার পাশ মিলিয়ে গোটা আটেক, একটা দরজা। দু'খানা তক্তপোশ জোড়া লাগান। জানালাগুলো খুলতেই প্রচুর বাতাস, উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। ছাদখানি থাকবে নিরবচ্ছিন্ন আমাদের অধিকারে। এই সব বিবেচনা ক'রে র'য়ে গেলাম সেই সঙ্কীর্ণ কুটিরেই। গরজ বড় বালাই!

নীচে তলায় মরশুমে বহু বন্ধু জুটে গেলেন। তাঁদের মধ্যে জগদীশ বাবু এক জন। খুলনা জেলার লোক। উৎসাহী ও সকল কাজেই অগ্রগামী। আমরা সমুদ্র-স্নান ক'রতে গেলে তাঁকে না নিয়ে কোন দিন যেতাম না। নুলিয়াদের চেয়েও দক্ষ ছিলেন। সাঁতারের আর্ট তাঁর কাছ থেকেই শেখা আমাদের। তাঁর নিজের ঘরে থাকলে বই বুকে নিয়ে প'ড়ে থাকতেন। তাস খেলায় যোগ দিতেন না। এতো ক'রে বললেও না।

আমরা নীচে নামলেই দেখতাম বই নিয়ে ব'সে রয়েছেন জগদীশ বাবু। আমি বললাম, "জগদীশ বাবু! এই বয়সে নভেল পড়েন?" আমার দিকে চেয়ে বলতেন, "কেন, দোষ আছে কি কিছু?" আবার দেখা হ'লেই বলতাম, "ছিঃ! জগদীশ বাবু, আপনি নভেল পড়েন?" পরিহাস না বুঝে বলতেন, "কী করবো বলুন ত? আপনাদের মত তাস খেলি না, ঘরে চুপটি ক'রে ব'সে থাকবো?" আমি বলতাম, "কেন? এই প্রকৃতির রাজ্যে এসে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারছেন না অনন্তের ভিতর?"

চুপ ক'রে থাকলেন কোন কথা না ব'লে জগদীশ বাবু।

বিকেলের দিকে এসে দেখলাম, জগদীশ বাবু বই পড়ছেন আপন মনে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়েই বই রেখে দিলেন ড্রয়ারে। কি জানি, লজ্জা হ'চ্ছিল বোধ হয়।

—"আজ যে দেখছি খুব ভাল মানুষ জগদীশ বাবুকে।"

—"না মশাই। আপনার ও বড় কথা বলা সোজা। কিন্তু দেখলাম ও-সব অনন্ত-টনন্ত ভাবা যায় না।"

বিজ্ঞের স্বরে বললাম, "অভ্যাস করুন, আনন্দ পাবেন"।

ঠিক করলাম রথ আসছে আর থাকা হবে না, না হ'লে মোক্ষ হবে এইখানেই আমাদেরও। যে রকম ঢোল-সহরৎ ক'রছে মিউনিসিপ্যালিটি। ভোটে ঠিক হ'লো ভগবানের স্নান-যাত্রাটা দেখে তবে রওনা দেওয়া যাবে।

উদয়ের আগে উঠে ডাক দিলাম, "উঠুন জগদীশ বাবু! আজ যে ভগবানের স্নান-যাত্রা। প্রস্তুত হন, শীঘ্র উন।"

তিনি বললেন "আজ সুপ্রভাত! আপনার মুখ দেখে উঠলাম।"

তেল মেখে চললাম জগদীশ বাবুকে নিয়ে সমুদ্র-স্নানে। আগেই বলেছি তিনিই আমাদের পথ-প্রদর্শক। বালুর উপর নেবেই দেখেন জগদীশ বাবু, মাথার উপর একটা জলের পাহাড় ভেঙে আসতে চাইছে। কৌশলী মানুষ প্রাণরক্ষা ক'রবার হাজার চেষ্টা ক'রেও পেরে উঠলেন না। বালি চেপে ধরে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থেকেও না। নাক-মুখ থেঁতো হ'য়ে গেল বালির ঘর্ষণে। আমাদের কাছে এলেন যখন, ভয় হ'তে লাগলো রক্ত-মাখা মুখের চেহারা দেখে।

অত সাহসী মানুষও ভয়ে কাঁপছেন তখন। বললেন ভয়ে ভয়ে, "এমন ত হয় না, আজ এ কি হ'লো আপনার মুখ দেখে?"

গম্ভীর হ'য়ে বললাম, "আজ সমুদ্রে প্রাণ যাবার যোগ ছিল আপনার। ভাগ্যে আমার মুখ দেখেছিলেন।"

—"ও! তাই নাকি?"

ক্ষত-বিক্ষত মুখে চললেন আমাদের সংগে মন্দিরের পথে। হাতী এসে শুঁড় দিয়ে পয়সা নিতে এলেই বলেন, "যা বাবা, আমাদের কাছে কেন? যা বড়লোকের হাতী, বড়লোকের ঠাঁই নিগে যা।"

বুঝলাম, বিরক্ত হ'য়ে আছেন জগদীশ বাবু। ভিখারীরা বিরক্ত ক'রছে, "ও রাজা! ও রাণীমা!"

তিনি বললেন, "কেন বাপু! রোগ ছড়াচ্ছো এই রাস্তায় ব'সে।"

জগদীশ বাবু চলেছেন রাস্তা ধ'রে পুরীর মন্দিরের দিকে। এক দল গরু নিজের দলেরই আর কয়েকটার সংগে মারামারি করতে করতে তাদের একটা ছিটকিয়ে এসে পড়বি ত পড় জগদীশ বাবুর পায়ের উপরেই। অন্য স্থানে আঘাত তেমন লাগলো না, পা এক রকম খোঁড়া হ'য়ে গেল খুরের আঘাতে। অসহ্য যন্ত্রণায় বলতে বাধ্য হ'লেন, "আমি আপনাদের সাহায্য না পেলে চলতে পারবো না।"

মন্দির আর বেশী দূর নাই, অতি কষ্টে যেতে যেতে বললেন জগদীশ বাবু, "আপনার মুখ দেখে আজ আমার পা'খান খোঁড়া হ'লো মশাই।"

আমিও তৎক্ষণাৎ বললাম, "পা এম্পুটেশন করবার যোগ ছিল ঠিক আজকের এই সময়ে এই দিনে। কি ভাগ্যে আমার মুখ দেখেছিলেন।"

—"ও! তাই নাকি।"

তার পর কোন গতিকে উপস্থিত হ'লাম ভগবানের দরবারে। তিনি তখন নিজের আসন ছেড়ে উপস্থিত হ'য়েছেন দরবারে। মনোরম মুক্ত খোলা ময়দান। ভগবানের বসবার জন্য মঞ্চের মত করা র'য়েছে। হাজার হাজার দর্শক এই দিনে কোল দিতে পায় শ্রীভগবানকে। আমরা ভীড় ঠেলে কোন গতিকে কোল দিয়ে এলাম।

এবার জগদীশ বাবুর পালা, খোঁড়া মানুষ গিয়ে হাত ছাড়াতে পারেন না ভগবানকে ধরে পিছু দিকের চাপে। উপরে বসে থাকা পাণ্ডা মহারাজ মাথায় প্রচণ্ড কিল মেরে বসিয়ে দিলেন জগদীশ বাবুকে। আমরা যখন তুলিয়ে আনলাম জগদীশ বাবুকে তখন তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'য়েছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "আজ আপনার মুখ দেখে কি সর্বনাশ হ'তে চললো বলুন দিকি?"

হেসে, বলার কথাটাকে সরল করে বললাম, "আজ মাথায় বজ্রাঘাতের যোগ ছিল আপনার। আমার মুখ দেখেছিলেন বলেই ব্রাহ্মণের সামান্য একটা কিলের উপর দিয়ে গেল।"

এবার সে কথা মেনে না নিয়ে বললেন, "এতোগুলো পর-পর বিপদ আপনার মুখ দেখার দিনেই জড়ো হ'য়েছিল বলতে চান? সামান্য ব্রাহ্মণের একটু কিল! ভীরমি লেগে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলাম দেখেননি?"

আমি বললাম, "তা হ'লেই বুঝুন। বজ্রাঘাত হ'লে কি আর জ্ঞান ফিরে আসতো?"

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট্‌
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT SOAP

S. 207-50 BG

ইংরেজী

সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

বাবা পঞ্চানন্দ

'দিরপুর পুলের নিকটবর্তী পঞ্চানন্দের বিগ্রহ কলুষিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের মনে ত্রাস ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একজন বাঙালী মুসলমান গত রবিবার রাত্রিতে মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে বিগ্রহের মাথা ভেঙ্গে ফেলে। পাহারাদার দেখতে পেল একটি লোক গম্ভীর রাত্রিতে বিগ্রহের বড় মাথাটি দুই হাতে ধরে মন্দিরের সামনে পায়চারি করছে। পাহারাদার তাকে থানায় ধরে এনেছে। ছুটির পরে আদালত না খোলা পর্যন্ত সে হাজতে থাকবে। বিগ্রহ ভগ্ন করা সম্বন্ধে আসামী এই কৈফিয়ৎ দিয়েছে: মুসলমানটির ব্যবসায় হলো হাকিমী। তার একজন রোগী মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় সে বাবা পঞ্চানন্দের কাছে মানত করল যে রোগী আরোগ্য লাভ করলে সে একটি পাঁঠা দিয়ে তাঁর পুজা দেবে। কিন্তু রোগী মারা গেল এবং রোগী আরোগ্য হলে তার যে চৌদ্দ টাকা পাবার কথা ছিল তাও পাওয়া গেল না। সেই ক্ষোভে হাকিম সংকল্প করল যে, সে পঞ্চানন্দের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। পুজারী চলে যাবার পর সেই রাত্রিতে মন্দিরে ঢুকে হাকিম বিগ্রহকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, "তুমি আমার প্রার্থনায় কান দাওনি; আমার রোগী মারা গেল, চৌদ্দটা টাকা হারালাম। কিন্তু তবু তোমার জন্ম রুটি, মাংস ও মদের ডালি এনেছি; তোমার ভক্তরা তোমার সম্বন্ধে যা বলে তা যদি সত্য হয় তাহ'লে তুমি এই নৈবেদ্য গ্রহণ করো।" এই অনুরোধ সে দু'ঘণ্টা ধরে আবৃত্তি করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু দেবতা তবু যখন তার ডালি গ্রহণ করলেন না তখন সে বিগ্রহের মাথা ভেঙ্গে ফেলল। ব্রাহ্মণরা হাকিমের বিরুদ্ধে পঞ্চানন্দের মুকুট চুরির আর একটি নতুন অভিযোগও এনেছে। মুকুটের দাম হবে প্রায় আড়াইশ' টাকা। প্রকাশ যে, আসামী যাতে গুরুতর শাস্তি পায় সে জন্যই নাকি এই নতুন অভিযোগটি যোগ করা হয়েছে। তা না হ'লে শুধু বিগ্রহ ভঙ্গের অপরাধে যথেষ্ট শাস্তি হবে না বলে তাদের আশঙ্কা। পঞ্চানন্দের মন্দির এখনো বন্ধ আছে। পঞ্চানন্দের এক সহযোগী বিগ্রহকে বারান্দায় স্থাপন করা হয়েছে; পুজারীরা বর্তমানে তাঁকেই অর্চনা করে। বাঙালী মুসলমানরা যে কোরাণ সম্বন্ধে কত অজ্ঞ তা হিন্দুর দেবতার প্রতি তাদের আকর্ষণ থেকে বোঝা যায়। শুধু মুসলমানরাই নয়, নবদীক্ষিত দেশীয় খৃষ্টানরাও হিন্দু দেবতার কাছে পুজা দেয় বলে শোনা যায়।

—বেঙ্গল হরকরা, ৪ঠা অক্টোবর, ১৮৩৮।

উড়িষ্যাবাসীর উপর কর

কলকাতায় যে সব উড়িষ্যাবাসী অর্থোপার্জনের জন্য আসত তাদের কাছ থেকে সর্দার বা প্রামাণিকরা একটা কর আদায় করত। ১৭৯০ সালে এই বে-সরকারী করের হার ছিল এইরূপ:

(১) যে কোনো উড়িষ্যাবাসী কলকাতায় কাজের সন্ধানে আসবে তাকে বার্ষিক চার আনা দিতে হবে।

(২) স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর ভাড়া করে কোন উড়িয়া যদি কলকাতায় থাকে তাহ'লে তাকে দিতে হবে বার্ষিক এক টাকা।

(৩) বিয়ে হলেও একটা কিছু নজর দেওয়া চাই।

(৪) দুই দলে বিবাদ হলে তদন্তের ফলে যে দোষী সাব্যস্ত হবে তার কাছ থেকে উপযুক্ত জরিমানা আদায় করবে প্রামাণিক।

(৫) বিয়ের সময় এক শত পান ও এক শত সুপারী দিতে হতো।

(৬) কেউ যদি দু'-চার টাকার ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করে এবং পাওনাদার যদি নালিশ করে, তাহ'লে প্রামাণিক ঋণ শোধ করতে বাধ্য করে এবং ফীস হিসেবে কিছু পায়।

(৭) কেউ জাতি ত্যাগ করে অন্য জাতিতে বিয়ে করলে কিছু দিতে হবে।

(৮) অন্য জাতির হাতে খেলে জরিমানা দিতে হয় সর্দারকে।

(৯) উড়িষ্যা থেকে কোন ব্যাপারী অথবা বস্ত্রবিক্রেতা কলকাতা এলে দোকান-পিছু পাঁচ টাকা করে আদায় করা হবে।

(১০) স্বর্ণকার, চিনির ব্যবসায়ী, ধান-চালের কারবারী, ধোবা প্রভৃতি সবাইকে কিছু নজর দিতে হবে।

(১১) উড়িষ্যাবাসীদের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে প্রামাণিক এসে মৃতের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করে। শ্মশানকৃত্যের ব্যয়টা রেখে উত্তরাধিকারীকে অস্থাবর সম্পত্তি দিয়ে দেয়। কিন্তু উত্তরাধিকারী না থাকলে কিংবা তাঁর খোঁজ না পাওয়া গেলে সম্পত্তির কিছু অংশ শ্রাদ্ধের জন্য ব্যয় করে অবশিষ্ট অংশ প্রামাণিক নিজে গ্রহণ করে।

(১২) উড়িষ্যাবাসী পাল্কীবাহক মারা গেলে এবং তার উত্তরাধিকারীর সন্ধান না পেলে ছ'মাস কাল মৃতের সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা হয়। এই ছ'মাসের মধ্যে তার বাড়ী থেকে কোনো লোক এলে তাকে সম্পত্তি দেওয়া হবে; না এলে দান করে দেওয়া হয়।

(১৩) উড়িয়া ব্রাহ্মণ এবং যাদুকরদেরও কিছু নজর দিতে হয়। এই নজর আদায় নিয়ে এমন অত্যাচার সুরু হলো যে তা সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গভর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী

করে এই বে-সরকারী কর আদায় করা বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন এবং এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনের ভার দিলেন কলকাতার কালেক্টরের উপরে।

—ক্যালকাটা গেজেট, ৫ই অগাষ্ট, ১৭৯০

উৎকোচ দেবার চেষ্টা

জগন্নাথ—সাধারণতঃ জগন্নাথ বাবু বলে পরিচিত—(কটকের অধিবাসী, বর্তমান বাসস্থান মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা এবং 'রয় রয়ানের' কর্মচারী) একজন সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ দেবার চেষ্টা করবার অপরাধে অপরাধী বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সে গভর্ণমেণ্টের অধীনে যে কোনো কাজের অযোগ্য বলে পরিগণিত হবে এবং এই আদেশের প্রতি যাতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় সে জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অবহিত হতে হবে।

—ক্যালকাটা গেজেট, ১৪ই জুলাই, ১৭৯১

কলকাতায় চালের দর

আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কলকাতায় চালের দাম আবার বেড়ে যাচ্ছে। বানারস এবং পশ্চিম-ভারতে ফসল ভালো হয়নি বলে সম্প্রতি ওদিকে চাল পাঠানো হচ্ছে; সম্ভবতঃ সেই জন্য সম্প্রতি দাম বেড়েছে।

বর্তমানে চালের দাম এরূপ :

মুর্শিদাবাদের চাল···টাকায় ২৭ সের।
পাটনার চাল···টাকায় ২৭ সের।
দিনাজপুরের চাল···টাকায় ২৮ সের।
হুগলী ও হিজলীর ১ম শ্রেণীর চাল টাকায় ২০ সের।
ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর চাল টাকায় ২৫ সের।
বীরভূম ও বর্ধমানের ২য় শ্রেণীর চাল টাকায় ২২ সের।

—ক্যালকাটা গেজেট, ২২শে জানুয়ারী, ১৭৮৯

ব্রহ্মতেজ

গত কাল এমন একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে যা থেকে ব্রাহ্মণের ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই দৃষ্টান্ত প্রমাণ করবে কত সহজে এরা অপমানিত বোধ করে।

কাশীর এক ব্রাহ্মণ গঙ্গায় স্নান করে ফিরছিলেন; পথে দেখা হলো নিমু মল্লিকের ভৃত্যের সঙ্গে। আকস্মিক ভাবে ভৃত্য ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে ফেলল। অমনি সেই অপরাধে ব্রাহ্মণ তাকে চড় দিলেন; ভৃত্য বিনা দোষে মার খেয়ে কষে এক ঘা ফিরিয়ে দিল। মার খেয়ে ব্রাহ্মণ নিমু মল্লিকের বাড়ী এসে প্রতিকার দাবী করলেন। নিমু মল্লিক সব শুনে ভৃত্যকে আদেশ করলেন ব্রাহ্মণকে বাড়ী থেকে বের করে দিতে। এই নতুন অপমানে ব্রাহ্মণ জ্বলে উঠলেন; পরদিন সকালে নিমু মল্লিকের দরজায় গাদা-বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

এক দল ব্রাহ্মণ এসে শবদাহ করল নিমু মল্লিকের বাড়ীর ঠিক প্রবেশ-পথের উপরে। ক্রুদ্ধ জনতা পাছে বাড়ী আক্রমণ করে এই ভয়ে নিমু মল্লিক শঙ্কিত; খবর পেয়ে মিঃ মট শান্তিরক্ষার জন্য তাঁর পেয়াদা পাঠানোর পর নিমু মল্লিক স্বস্তি পেলেন।

—ক্যালকাটা গেজেট, ১লা অক্টোবার, ১৭৮৯

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা

হিন্দু ও মুসলমানদের দুটি প্রধান পর্ব—দুর্গাপুজা ও মহরম—একসঙ্গে পড়ায় শহরে কয়েক দিন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে একে কেন্দ্র করে কয়েকটি হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়েছে।

গত সোমবার রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ধনী মুৎসদ্দী দুর্গাপ্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল এক বিরাট শোভাযাত্রীর দল। বৈঠকখানার নিকটে মুসলমানরা শোভাযাত্রীদের আক্রমণ করে প্রতিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং কয়েক জন পুরুষ ও মহিলা আহত হলো। রামকান্ত বাবুর পুত্রও আহতদের মধ্যে একজন। আমরা যত দূর জানি, মুসলমানরাই প্রথম আক্রমণ করেছিল। পরদিন সকালে পঞ্চাশ-ষাট জন সশস্ত্র পেয়াদা সহ রামকান্ত বাবু বৈঠকখানা অঞ্চল আক্রমণ করে সেখানকার মুসলমানদের সবগুলি দরগা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন।

প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা বিকেলে সুখময় ঠাকুরের বৌবাজারের বাড়ী আক্রমণ করে টাকা-পয়সা, আসবাব-পত্র সমস্ত লুণ্ঠন করে নিয়েছে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে সোনার মোহর ছিল পাঁচ হাজার খানি এবং কোম্পানীর কাগজ যা গেছে তার মোট দাম হবে আট হাজার টাকা। হিন্দুদের মনে আঘাত দেবার জন্য মুসলমানরা দুটো গরুও হত্যা করে গেছে। আক্রমণকারীরা বাড়ী ঢুকবার উদ্যোগ করতেই সুখময় পালিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তার দু'জন লোক মারা গেছে এবং কয়েক জন আহত হয়েছে আততায়ীদের হাতে।

আমরা জানতে পেরেছি যে এই দুষ্কার্যের পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে বিচারপতি হাইডের এজলাসে উপস্থিত করা হয়েছে। সুখময় ঠাকুরের আবেদনক্রমে একটি মাদ্রাসায় হানা দিয়ে কিছু কিছু লুণ্ঠিত দ্রব্য পাওয়া গেছে।

আমরা অবগত হয়েছি যে বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহী মোতায়েন করে শহরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

—ক্যালকাটা গেজেট, ১লা অক্টোবর, ১৭৮৯

মাতৃভাষার প্রবর্তন

১৮৩৮ সালটি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এ বৎসর থেকেই জনসাধারণকে মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ পুনরায় দেওয়া হচ্ছে। একে কেন্দ্র করে নানা বিতর্ক ও বিরোধ দেখা দেবে। কিন্তু সে সব একদিন শান্ত হবে। বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লোকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে থাকবে মাতৃভাষা প্রবর্তনের তারিখটি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে মাতৃভাষার প্রবর্তন নিশ্চয়ই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ দেশের লোকেরা মাতৃভাষার এই নতুন প্রয়োগ গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। মাতৃভাষার প্রচলন পরীক্ষামূলক ভাবে এক বৎসরের জন্য করা হয়েছে; ভালো ফল না পাওয়া গেলে আবার বিদেশী ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে। এক বৎসর পরে যে রিপোর্ট পাওয়া যাবে তার জন্য অপেক্ষা না করে মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করলে মন্দ হয় না।

বীরভূমের খবরে প্রকাশ যে সেখানকার কর্তৃপক্ষ ফার্সী অক্ষরে উর্দু ব্যবহার আরম্ভ করেছেন প্রাচীন ফার্সী তুলে দিয়ে। এই

ব্যবস্থায় লোকের সুবিধার পরিবর্তে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। সেখানকার লোকেরা বরং ফার্সীর পুনঃপ্রবর্তন চায়; কারণ তা অনেকেই বুঝতে পারে। উর্দু কেউ জানে না। এই ব্যবস্থা যে অবিবেচনাপ্রসূত তা অ্যাডাম সাহেবের মূল্যবান পরিসংখান থেকেই বুঝা যায়। ঐ জেলার দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে বাঙলা পড়ুয়া ছাত্র আছে ৬,৩৮৩; এবং ফার্সীর ছাত্র ৪৮৫ জন। সুতরাং এ জেলায় যে বাঙলার প্রাধান্য তা স্পষ্টই দেখা যায়। তুলনায় ফার্সীর প্রভাব খুব কম। এখানে বাঙলা ভাষার প্রবর্তন হলে শিক্ষা উন্নত হবে।

মেদিনীপুর থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে যে, সরকারী কাযে বাঙলা ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। এই পরিবর্তনে জনসাধারণ বিশেষ সন্তুষ্ট। এই জেলাতেও দেশীয় বিদ্যালয়ে ফার্সী ও বাঙলা পড়ুয়া ছাত্রের আনুপাতিক হার বীরভূমের মতো। কিন্তু উড়িষ্যা প্রতিবেশী হওয়ায় এখানে ওড়িয়া ভাষার বিদ্যালয় আছে ১৮২টি; বাঙলা বিদ্যালয় ৫৪৮টি। আমাদের সংবাদদাতা বলছেন যে, স্থানীয় লোকেরা মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগকে মস্ত বড় আশীর্বাদ বলে মনে করে। কারণ এখন আদালতের আদেশ ইত্যাদি এমন ভাষায় রচিত যা তারা নিজেরাই পড়ে বুঝতে পারে।

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ২৬শে জুলাই, ১৮৩৮

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি

দেশীয় বিদ্যালয়ের জন্য ভারতীয় ও য়ুরোপীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রেসিডেন্সির কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি সমিতি গঠন করেছেন। এ দেশের লোকদের চারিত্রিক উন্নতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনে সাহায্য করাই সমিতির প্রধান লক্ষ্য।

সমিতির নামকরণ হয়েছে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। সমিতি ধর্ম-পুস্তক রচনায় হাত দেবে না জেনে আমরা সুখী হয়েছি। অবশ্য দেশীয় লোকদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে নীতি-বিষয়ক পুস্তিকা প্রচার করা যেতে পারে। এ জাতীয় পুস্তকের উদ্দেশ্য হবে মানসিক উন্নতি সাধন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করায় সমিতির উদ্দেশ্য যে শুধু নৈতিক উন্নতি সাধন ও জ্ঞানবিস্তার সে সম্বন্ধে দেশীয় সমাজে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

— ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, মে, ১৮১৭

পরলোকগত কালিদাস পণ্ডিত

কালিদাস পণ্ডিত ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। প্রায় দশ দিন পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের বিশ বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ পরিচয় ছিল। কালিদাসের গুণাবলী বিচার করলে নিশ্চয়ই বলা যায় যে তাঁর সম্বন্ধে একটু পরিচিতি দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পণ্ডিত হিসেবে কালিদাসের পিতার প্রসিদ্ধিও কম ছিল না। বাঙলা দেশে যে বিষয়টির চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, সেই জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন তিনি খুব অল্প বয়সেই। তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করে গ্রহণ করেছিলেন জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে এর বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি। পুরাণে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে যে সব উদ্ভট আলোচনা আছে তা তিনি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং উইলকিন্সের সঙ্গে নানা ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন তিনি। স্যার উইলিয়াম জোন্স একবার তাঁকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গ্লোব দিয়েছিলেন, সেটি এখন পরিবারের পুরুষানুক্রমিক গৌরবের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর পুত্র কালিদাস শৈশবে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা রিউবেন বারোর (Reuben Burrow) কাছ থেকে সর্বদা উপদেশ লাভের সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। পিতার ন্যায় কালিদাসেরও পূর্ণ আস্থা সিদ্ধান্তের উপরে। গোঁড়া না হলেও তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। পুরাণে বর্ণিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় করতে ধর্মবিশ্বাসে বাধে। এক দিকে সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর শ্রদ্ধা, অপর দিকে শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি—এই দুই পরস্পরবিরোধী অনুভূতির ঘাত-প্রতিঘাতে কালিদাসের মন দ্বিধাখিন্ন হতো। প্রচলিত কুসংস্কারের দ্বারা তাঁর মতো লোককেও পীড়িত দেখে আমরা অনেক সময় দুঃখ অনুভব করতাম।

কালিদাস যদিও বাঙলার শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ছিলেন তথাপি বিজ্ঞান-চর্চা অপেক্ষা তিনি বেশি ভালোবাসতেন শিশুসুলভ জ্যোতিষের আলোচনা করতে। আমাদের মনে হয় না যে তিনি কখনো জ্যোতিষ গণনার যুক্তিহীনতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মতো কালিদাসেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করে। কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি জ্যোতিষ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। শিশুর জন্মের পর তাঁরা আসতেন কোষ্ঠী করাতে; কালিদাস তাঁর মক্কেলদের নতুন বৎসরের বর্ষফল প্রস্তুত করে নিজে বাড়ী-বাড়ী দিয়ে আসতেন এবং তার জন্য বেশ মোটা রকম দক্ষিণা পেতেন। অশুভ গ্রহের রোষদৃষ্টি শান্ত করবার জন্য ব্রাহ্মণদের দান করতে হয়, এই উপলক্ষেও কিছু প্রাপ্তি ঘটত তাঁর। আমাদের পরিচিত এক ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রহশান্তির উদ্দেশ্যে একবার দু'হাজার টাকা দান করেছিলেন।

মৃত্যুর সময় কালিদাস পণ্ডিতের বয়স হয়েছিল সত্তর। শেষ বয়সে তিনি গঙ্গা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে পৈতৃক বাটীতে থাকতেন। শেষ মুহূর্ত আসন্ন হয়েছে জেনে তাঁকে পুরাণ পাঠ শোনাতে বললেন। তার পর তাঁকে নিয়ে আসা হলো গঙ্গার তীরে। তখন রাত্রি, আকাশে চাঁদ উঠেছে। কালিদাস বললেন, রাত নয় তো, উজ্জ্বল দিন, পৃথিবী ছেড়ে যাবার এই শুভ লগ্ন। এ যুগের অন্যতম শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হিন্দু এমনি করেই মৃত্যুর অন্ধকারেও আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন।

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ১৮৩১

হাওড়ার পুল

আমাদের পাঠকরা জেনে সুখী হবেন যে, হুগলীর উপরে ভাসমান সেতু নির্মাণের জন্য আমরা যে প্রস্তাব করেছিলাম তা কয়েক জন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধানও করেছেন তাঁরা। আমাদের এক বিজ্ঞানী বন্ধুর কাছ থেকে যে-সামরিক পূর্তবিদ সমিতির কার্যবিবরণীর দ্বিতীয় খণ্ড পাওয়া গেছে। সেখানে ভাসমান সেতু সম্বন্ধে সচিত্র সুন্দর বিবরণ পাওয়া যাবে। ডেভেনপোর্ট ও

টরপয়েন্টের মধ্যে হামোয়েজ নদীর উপরে এমনি একটি ভাসমান পুল আছে। পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে হুগলীর উপরে সেতু নির্মাণের প্রধান প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম বিবেচ্য বিষয় হবে এই যে নির্মাণের পর এই সেতু লাভজনক হবে কিনা? লাভজনক হোক আর নাই হোক, মানবতার দিক থেকেও পারাপার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গভর্ণমেন্টের এই প্রচেষ্টায় সক্রিয় সমর্থন থাকা উচিত। অবশ্য যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভাসমান সেতু থেকে লাভ পাওয়া যাবে, তাহ'লে হয়তো বে-সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। ইতিমধ্যে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে; কিন্তু আরও চাই। একটি খসড়া প্রস্তাবে আমরা দেখেছি, এই পুলের বার্ষিক আয় ত্রিশ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এবং ষ্টীম টাগ কোম্পানী সেতু নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে বলে প্রস্তাবক বলেছেন।

সেতুর আনুমানিক আয়ের অঙ্কটা দৈনিক কত লোক নদী পারাপার হয় তার হিসেব থেকে পাওয়া যেতে পারে। রিভার পুলিশ কনষ্টেবল ডব্লু, জে, গুডসনের কাছ থেকে যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তা এই:

(ক) গোলাবাড়ী ঘাট থেকে খেয়া নৌকায় ২৯শে মে (১৮৩৯) সকাল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত যাত্রী-পারাপারের হিসেব:

গোলাবাড়ী থেকে কলকাতা—১,০৪০
কলকাতা থেকে গোলাবাড়ী—১,০০৯

মোট ২,০৪৯ জন যাত্রী।

(খ) রামকৃষ্ণপুর ঘাটের হিসাব; ১৮৩৯ সালের ৩১শে মে সকাল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত যাত্রী-চলাচল:

রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে কলকাতা—২,২০০
কলকাতা থেকে রামকৃষ্ণপুর ঘাট—২,৩০০

মোট ৪,৫০০

(গ) ১৮৩৯ সালের ৪ঠা জুন সকাল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত শালকিয়া ঘাটে যাত্রী-চলাচলের হিসেব:

শালকিয়া থেকে কলকাতা—৩,১০০
কলকাতা থেকে শালকিয়া—৩,০০০

মোট ৬,১০০

(ঘ) শালকিয়া ঘাটের সঙ্গে হাওড়া ঘাট নিয়ে প্রায়ই গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু এরা এক নয়, বিভিন্ন স্থানে এদের অবস্থিতি। তাই কনেষ্টবল গুডসন পৃথক্ হিসেব দিয়েছে। ১৮৩৯ সালের ২৪শে মে হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে ৭,৭০০ জন যাত্রী আসা-যাওয়া করেছে।

যদি বর্তমান ভাড়ার হার অপরিবর্তিত থাকে তাহ'লে একটু বেশী হাঁটতে হলেও যাত্রীরা পুলের উপর দিয়ে নদী পার হওয়া পছন্দ করবে। খেয়া নৌকায় পার হওয়া অস্বাচ্ছন্দ্যকর এবং বিপদসঙ্কুল। প্রতি বৎসর নৌকাডুবিতে অনেকের মৃত্যু হয়। খেয়াঘাটগুলি গভর্ণমেন্ট ইজারা দেন। এই ইজারা বাতিল করে যারা পুল তৈরী করবার দায়িত্ব নেবে তাদের কিছুকালের জন্য সেতুশুল্ক আদায়ের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে খেয়ার ভাড়া আধ পয়সা; আমরা মনে করি, সেতুশুল্ক এক পয়সা করলে নিরাপত্তার কথা ভেবে জনসাধারণ আপত্তি করবে না। প্রতিদিন মোট যাত্রী চলাচল করে ২০,৩৪৯ জন; মাথা-পিছু এক পয়সা করে দিলে দৈনিক শুল্ক আদায়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩১৭৸৶০ আনা। আমরা শুধু দরিদ্রের দেয় অর্থের উপর নির্ভর করতে বলছি না; গাড়ী, ঘোড়া, পাল্কী ইত্যাদির শুল্ক বেশি হবে। সুতরাং সন্দেহ নেই যে মূলধন বিনিয়োগকারী লাভজনক প্রতিদান পাবে। আমাদের হিসাব অনুযায়ী পুল নির্মাণে এক লাখেরও কম টাকা লাগবে। অতএব ষ্টীম টাগ অ্যাসোসিয়েশান এই কাজের জন্য অন্তত: প্রাথমিক জরিপ সুরু করতে পারেন; লোকসান হবার আশঙ্কা নেই। এঁরা যদি কাজে হাত না দেন তাহ'লে আমরা আশা করি যে সাধারণের সুবিধার জন্য গভর্ণমেন্ট সেতু নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। জনসাধারণের সুবিধা ছাড়াও কলকাতার সঙ্গে পুল দিয়ে যোগাযোগ হলে হাওড়া অঞ্চলের জমির উন্নতি ও মূল্য বৃদ্ধি হবে।

—বেঙ্গল হরকরা, ২৬শে অগাষ্ট, ১৮৩৯।

বাংলার লৌকিক দুর্গাপূজা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

পরিকল্পনা এবং উৎসব ও সমারোহের দিক দিয়া দুর্গাপূজা বাঙ্গালী হিন্দুর সর্বপ্রধান পূজা। কিন্তু এই পূজা সকলে করে না, করিতে পারে না। ইহার বিধি-ব্যবস্থা এমনি যে, সর্বাঙ্গ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে যথেষ্ট লোকবল এবং অর্থবলের প্রয়োজন। সাধারণ বাঙ্গালী সাধারণ গৃহস্থের লোকবল থাকিলেও তেমন ধনবল কোথায়? ইহা পূর্বেও যেমন সত্য ছিল, এখনো তেমনি সত্য। পূর্বেও যেমন ঘরে ঘরে দুর্গাপূজা হইত না, এখনো হয় না। শুনা যায়, প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের গৃহে প্রথম যে পূজা হয়, তাহাতে সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। পরবর্তী কালে সেই রাজার আদর্শ অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী ধনী, মানী এবং জমিদারেরাই এই মহদনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন এবং পূজায় অপারক শত-সহস্র লোককে 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' ধ্বনি তুলিয়া পরিতৃপ্তি দিয়াছেন এবং নিজেরা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। বর্তমানে তাঁহারাও হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন এবং দেবীর পূজায় তাঁহাদের ভক্তিস্পৃহা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। ব্যক্তিগত পূজা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বে দাঁড়াইয়াছিল বারোয়ারিতে, বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে সর্বজনীনেতে।

সাধারণ লোক যে সচরাচর দুর্গাপূজা করিত না এবং করে না, তাহার মূলে আরও কারণ রহিয়াছে। পুরাণাদিতে দুর্গার যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার মতো শিক্ষা ও জ্ঞানই বা সাধারণ লোকের কোথায়? শাস্ত্রবাক্য যদি আমরা অনুধাবন করি, দেখিতে পাইব, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরীশক্তি সম্বন্ধে মানুষের ধ্যান ধারণা যেন 'দুর্গা'র পরিকল্পনায় আসিয়া প্রায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কে এই দুর্গা? এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যে শক্তির লীলা আমরা প্রকট দেখিতেছি—যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, চিন্তার অতীত যাহা, সেই সর্বব্যাপিনী নিত্যা চৈতন্য-শক্তিই দুর্গা।

আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
দয়া নিদ্রা চ ক্ষুত্তৃপ্তিঃ তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতা হি সা।
বৈকুণ্ঠে সা মহালক্ষ্মী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী হি সা।
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তি প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে।
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতি শক্তিশ্চ ধারণা হি ধরাসু সা।
ব্রহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু চ।
তপস্বিনাং তপস্যা চ গৃহিণাং গৃহদেবতা।
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীঃ সা বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধুনাং ত্রয়ী ত্বন্তরতারিণী।

* * *

'তিনি (দুর্গা) আদ্যা, নারায়ণী শক্তি, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, লজ্জা—এই সকলের অধিদেবতা তিনি। তিনি ক্ষীরোদে মর্ত্যলক্ষ্মী, তিনি দক্ষকন্যা সতী। তিনি সরস্বতী, তিনি সাবিত্রী, তিনি বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী। অগ্নিতে দাহিকাশক্তি তিনি, সূর্যে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্যশক্তি—(সকলই তিনি)। শস্যপ্রসবিনী শক্তি তিনি, ধরায় ধারণাশক্তি তিনি, তিনিই ব্রাহ্মণে ব্রহ্মণ্যশক্তি, সুরের তিনিই দেবশক্তি। তপস্বীদের তপস্যা, গৃহীদের গৃহদেবতা, রাজাদের রাজ্যলক্ষ্মী, বণিকদের লভ্যরূপিণী তিনি। সংসার-ভবসিন্ধু পার হইতে যে ত্রিবেদ, তাহাও তিনি। এই সর্বব্যাপী নিত্যা চৈতন্য-শক্তির ধ্যান-ধারণা এবং অর্চনাই দুর্গাপূজার মর্মকথা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি দুর্গা কে—এই প্রশ্নের বিবিধ [illegible] দিয়াছেন। 'আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। পরভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নিরূপা। ইহা আধিভৌতিক অর্থ। দুর্গা রুদ্রের শক্তি। ইহা আধিদৈবিক অর্থ। রুদ্রদেবের শক্তি, রুদ্র-যজ্ঞের [illegible]। সে অগ্নি নানা রূপে খৃঃপূঃ ৪৫০০ অব্দ হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছে।'

কিন্তু সাধারণ লোক এত সব বোঝে না, তাহাদের ধনবল [illegible] স্বল্প, ধ্যান-ধারণা-জ্ঞানও তত উচ্চস্তরের নহে। তাই তাহারা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছে, ধনী-মানী ও জ্ঞানবৃদ্ধদের মহাড়ম্বরপূর্ণ পৌরাণিক দুর্গাপূজার সাথে তাহাদের অসংখ্য লৌকিক চণ্ডীপূজার ভিতর দিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেছে। পৌরাণিক দুর্গাপূজা [illegible] বৎসরে একবার, মাত্র তিনটি দিন, তারপর দেবী কৈলাসে চলিয়া যান। কিন্তু সাধারণ লোক তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের চেয়ে তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের [illegible] বেশী। তাহারা এমন দেবতা চায়, যিনি তাহাদেরই মধ্যে [illegible] অবস্থান করিবেন, ডাকা মাত্র আসিবেন,—সুখে দুঃখে বিপদে [illegible] পার্শ্বে দাঁড়াইবেন, অন্তরের কথা শুনিবেন, বরাভয় দিবেন। বহু [illegible] লৌকিক চণ্ডী বা দুর্গা দেবতারা বাঙ্গালার এই শ্রেণীরই দেবতা। ইহাদের সংখ্যা এত যে বলিয়া শেষ করা যায় না, যেমন, [illegible], নবদুর্গা, শুভদুর্গা, রালদুর্গা, শুভচণ্ডী, বণচণ্ডী, বথাইচণ্ডী, [illegible], উড়নচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, অবাক্ চণ্ডী, বসনচণ্ডী, কফাইচণ্ডী, [illegible] চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী। আবার মঙ্গলচণ্ডীরই বা প্রকার-ভেদ [illegible] বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটমোচন মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী, [illegible] মঙ্গল সংক্রান্তি। এইরূপ আরও কত কি নামে লৌকিক [illegible] পূজায় বাঙ্গালী অন্তঃপুরচারিণীরা পৌরাণিক চণ্ডীপূজার [illegible] মিটাইতেছে।

কিন্তু এক সাধারণ চণ্ডী নামের অন্তর্ভুক্ত হইলেও [illegible] এক একজন স্বতন্ত্র দেবতা, ইঁহাদের প্রকৃতিও সকলের এক [illegible] বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনা হইতে ইঁহাদের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকটির ব্রতপ্রকরণ ও ব্রতকথা [illegible] অনেক ব্রতকথার মধ্যেই দেবতার পরিচয় ও ব্রতোৎপত্তির [illegible] পাওয়া যায়। চণ্ডী বা দুর্গা নামের সংস্পর্শ হইতে ইঁহাদের [illegible] উৎস যে পুরাণ তাহা মনে করিবারও কোন সঙ্গত কারণ [illegible]।

আদর্শ
লিভার টনিক
ORCL'S
QUMARESH
লিভারের রোগে কুমারেশ নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়—কিন্তু সুস্থ অবস্থায়ও কুমারেশ কম প্রয়োজনীয় নয়।
কুমারেশ অসুস্থ লিভারকে আরোগ্য করে এবং সুস্থ অবস্থায় লিভারকে সবল ও কার্য্যক্ষম রাখিতে সাহায্য করে।
কুমারেশ
ও, আর, সি, এল, লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান কালে বাঙ্গালা দেশে যখন পৌরাণিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, তখন যে এই দেশটা দেবতাশূন্য ছিল, বা এখানকার অধিবাসীরা কোনও আচার-অনুষ্ঠান পালন করিত না, তাহা নহে। জগদ্ব্যাপারের অন্তরালে অলৌকিক শক্তির কল্পনা এবং সেই শক্তিকে নানা নামে রূপে বিবিধ উপচারে পূজা এবং তাঁহাদের নিকট বরাভয় প্রার্থনা সৃষ্টির গোড়া হইতেই মানুষ, সহজাত প্রবৃত্তিবশেই করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলা দেশেও পৌরাণিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার মুখে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা এবং জনশ্রুতি হইতে জাত বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য লৌকিক দেবতার অস্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেদের ইষ্টানিষ্টের জন্য সম্পূর্ণরূপে এই সকল গ্রামদেবতার উপর নির্ভর করিত: ইঁহারা লোকালয়ের মধ্যেই থাকিতেন এবং ভক্তে ডাকিবা মাত্রই সাড়া দিতেন। ইঁহাদের কাহারো অধিষ্ঠান ছিল (যেমন আজও আছে) গ্রামের ঐ বিশাল বটবৃক্ষে, কাহারো শেওড়াতলে, কাহারো শিলাখণ্ডে! পথে, ঘাটে, নদীতীরে, বনছায়ায় সর্বদা ইঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেন, পূজারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। ইঁহাদের উপচারেরও কড়াকড়ি বাড়াবাড়ি ছিল না। সাধারণ মানুষ যখন যাহা সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহাদের জ্ঞান-বিশ্বাস মত যাহা দেবতার প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইত, অথবা দেবতা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া যাহা দিতে বলিতেন, তাহা দিয়াই তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। ইঁহাদের কাহারো উপচার মাটির ঢেলা, কাহারো খড়-কুটা, কাহারো ফুল-দূর্বা, কাহারো তৈল-সিন্দুর, কাহারো বা পাণ-সুপারি। সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে কিছুই পড়ে না। অথচ এই সকল লৌকিক দেবতা এক একজন অসীম শক্তিশালী বলিয়া পরিকীর্তিত হইতেন, ইঁহাদের ব্রতের ফল ছিল—'হারালে পায়, ম'লে জিওয়, নির্ধনের ধন হয়, অপুত্রার পুত্র হয়, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, কাটা মাথার জোড়া লয়, সতীন মেরে ঘর হয়, রাজা মেরে রাজ্য পায়,'—এবং এইরূপ আরও অনেক কিছু পার্থিব সুখ-সম্পদ।

পরবর্তী কালে বাংলা দেশে পৌরাণিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার মুখে লৌকিক ধর্ম ও উচ্চস্তরের পৌরাণিক ধর্মের মধ্যে একটা সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং উল্লিখিত লৌকিক দেবতাসমূহের অনেকেই পৌরাণিক দেবতার নামের এবং গুণ ও কর্মের আবরণে আত্মগোপন করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে থাকেন। কালক্রমে দেখা গেল, স্ত্রীদেবতাদের অধিকাংশই চণ্ডী নামের ভিতর দিয়া শিবপত্নী পার্বতীর সহিত অভিন্ন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডীদেবতাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে বহু ক্ষেত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে চণ্ডী নামটি বিশেষ কোন দেবতার নাম না হইয়া দাক্ষিণাত্যের মরী বা মরী আম্মা কথাটির মত লৌকিক স্ত্রীদেবতাদের নামের শেষে একটা সাধারণ পদবীর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।(১) ইহা যে কতকটা পৌরাণিক চণ্ডীর প্রভাবেরই ফল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে চণ্ডী বা দুর্গাপূজার প্রমাণ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন; তৎপরে মার্কণ্ডের চণ্ডীর বাংলা অনুবাদ হইয়াছে; কথক ঠাকুররা গ্রামে গ্রামে আসর পড়িয়া চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন; সমাজের উচ্চস্তরে ধনী-মানীদের গৃহে দুর্গাপূজা বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, এইরূপ নানা সূত্রে পৌরাণিক চণ্ডী মাহাত্ম্য—শিবদুর্গার কাহিনী সর্বস্তরের বাঙ্গালী-সমাজে ছড়াই পড়ে। অন্তঃপুরচারিণীরা তখন নিজেদের উপাসিতাদের উ চণ্ডীর শুধু নামই আরোপ করিলেন না, তাঁহার অনেক গুণ কর্মেরও আরোপ করিয়া লইলেন এবং

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

বলিয়া নিজেদের বহুকালের দেবতার চরণে প্রণাম জানাইলেন এ বরাভয় প্রার্থনা করিলেন।

অনেকে বলেন, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পরবর্তী পুরাণগুলি রচি ও প্রচারিত হইবার বহু পূর্বেই বাঙ্গালীর সমাজে অপরাপর চণ্ডী না হউক, অন্ততঃ মঙ্গলচণ্ডীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; তখন অষ্টাহব্যা মঙ্গলচণ্ডীর গীত হইত; মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লো চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং সেই সময়কার অনে পুরাণেও মঙ্গলচণ্ডীকে স্বীকার করা হইয়াছে। কাজেই বাঙ্গালা দে লৌকিক স্ত্রীদেবতাদের মধ্যে যে চণ্ডী নামের বা চণ্ডী পদবী এত আধিক্য তাহার মূলে পৌরাণিক চণ্ডীর প্রভাবই একমা কারণ না-ও হইতে পারে। ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের মধ্যে চাণ্ডী এবং মূর্তিচাণ্ডী নামে দুইটি দেবতার অস্তিত্ব আছে এবং মহা ঘটা করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে তাহারা ইঁহাদে পূজার্চনা করিয়া আসিতেছে।(২) মঙ্গলকাব্যোক্ত কালকেতু উপাখ্যানে মঙ্গলচণ্ডী যেমন পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ওরাওঁদের চাণ্ডী দেবীও তাহাই, শিকারী ওরাওঁ যুবকেরাই তাঁহা পূজা করে বেশী। মূর্তিচাণ্ডী সন্তানের মঙ্গলকারিণী দেবী, বাঙ্গাল ব্রতিনীরাও মঙ্গলচণ্ডীর নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করেন, তন্মধ্যে পুত্রবর অন্যতম। ওরাওঁদের সেই শক্তিদেবতা চাণ্ডী দেবীর প্রভাব যে বাঙ্গালীর লৌকিক চণ্ডীর উপর না আছে, তাহা বলা যায় না।

লৌকিক চণ্ডী দেবতার উদ্ভবের উৎস যাহাই হউক না কেন এব তাহাদের প্রকৃতি পরস্পর যত স্বতন্ত্রই থাকুক না কেন, পৌরাণিক পার্বতীর মধ্যে শেষ পরিণতি লাভ করিয়া, অথবা তাঁহার সঙ্গে কোনওরূপে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া ইঁহারা বাঙ্গালা দেশে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

লৌকিক স্ত্রীদেবতাদের মাহাত্ম্য এবং ব্রত সমাজে কিরূপে প্রচার লাভ করিয়াছে এবং কিরূপেই বা তাহারা পৌরাণিক পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, কয়েকটি মাত্র ব্রতের কথা ও আলোচনা হইতেই তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। অনেক দেবতা আবার চণ্ডী বা দুর্গা নামের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বনামেই আপনাকে শিবপত্নী দুর্গারূপে প্রচার করিয়াছেন এবং ব্রতিনীরাও তাঁহাকে সেইরূপ ধ্যানমন্ত্রেই পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত দেবতার মধ্যে আছেন সুমতি, সুবচনী, ঘাটাকুলি, সঙ্কটত্রাণী প্রভৃতি। কিন্তু ইঁহারাও যে আর্যেতর সমাজেরই দেবতা ছিলেন, পরে চণ্ডী বা দুর্গার সঙ্গে অভিন্না হইয়া আত্মপ্রকাশ

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

করিয়াছেন, ব্রতের উপকরণ এবং ব্রতকথার মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জয়মঙ্গলচণ্ডী

চণ্ডীনামধেয় দেবতাদের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী অন্যতমা। মঙ্গলচণ্ডীর আবার বহু প্রকার-ভেদ আছে, তন্মধ্যে জয়মঙ্গলচণ্ডী একটি। ইঁহার ব্রতকে জয়মঙ্গলবারের ব্রতও বলা হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কয়টি মঙ্গলবার পড়ে, সেই কয়টিতেই এই ব্রত করিতে হয়।

ভাগীরথী অঞ্চলে যে নিয়মে ব্রত করা হয়:—পদ্মের আলপনার উপর কয়েকটি ধান ছড়াইয়া দিয়া একটি জলপূর্ণ ঘট বসানো হয়, ঘটের মুখে থাকে আমপল্লব, এক জোড়া পাণ ও একটি কলা এবং গায়ে থাকে সিন্দূর অঙ্কিত ছইটি মূর্ত্তি। ইহাই চণ্ডীর ঘট। ঘটের কোলে দিতে হয় প্রত্যেক ব্রতিনীর পক্ষে (পাঁচ-সাত জন ব্রতিনী একত্র হইয়া এই ব্রত করা যায়) এক জোড়া করিয়া আম, জাম, কলা, লিচু, খেজুর প্রভৃতি যাবতীয় ফল। এই ফল-সম্ভারকে বলা হয় বারা। বারার কাছে থাকে ১৭টি কাটালপাতা, সিন্দূর-লিপ্ত ১৭গাছা দূর্ব্বা ও ১৭টি বেলপাতা। এতদ্ব্যতীত, একটি কলার পাতার ঠোঙ্গে পৃথক্ ভাবে রাখা হয়—১৭টি তুলসী পাতা, ১৭টি আতপ চা'ল ও ১৭টি যব, ব্রতের শেষে এই তিনটি জিনিষ কলার সঙ্গে চটকাইয়া তিনবার দাঁত না ঠেকাইয়া গিলিয়া খাইতে হয়—ইহাকে বলে 'গদ' খাওয়া। ব্রতে চাল বা চিনির নৈবেদ্য এবং আর্সী, চিরুণী সিন্দূরের কৌটা প্রভৃতিও দেওয়া হয়। পুরোহিত চণ্ডীর উদ্দেশে ধ্যান ও মন্ত্রপাঠ করেন। ব্রতিনীরা পাঁচালী শুনেন ও ব্রতকথা বলিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

এই ব্রতে পৌরাণিক চণ্ডীপূজা-পদ্ধতি অনুসৃত না হইলেও ব্রতকথায় স্পষ্টই দেখা যায়, জয়মঙ্গলচণ্ডী আর শিবপত্নী পার্ব্বতী অভিন্না, মর্ত্ত্যে তিনি পূজা প্রচারের জন্য উদ্বিগ্না। পশ্চিম বাঙ্গালার জয়মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের ব্রতকথাটি সংক্ষেপে এইরূপ:—

পার্ব্বতী একদিন পদ্মাকে জানাইলেন, মর্ত্ত্যে গিয়া তিনি তাঁহার পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন।

এক দেশে এক সদাগর, তাহার সাত মেয়ে, কিন্তু কোনও ছেলে নাই। পার্ব্বতী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে—হাতে নড়ি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, মাথায় জটা, সেই সদাগরের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সদাগরের স্ত্রী তাঁহাকে আদর-আপ্যায়ন করিয়া ভিক্ষা দিলেন, কিন্তু তিনি পুত্র আঁটকুড়ের (পুত্রহীনার) ভিক্ষা গ্রহণ করেন না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সদাগরের স্ত্রীর মনে ভারি দুঃখ হইল, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সদাগর এবং অন্য লোক-জন ছুটিয়া আসিল,—ব্যাপার কি জানিয়া সকলে সেই বৃদ্ধাকে খুঁজিতে বাহির হইল, দেখিল, অদূরে এক বটগাছের তলায় তিনি বসিয়া আছেন। সদাগর তাঁহার পায়ে পড়িয়া অনেক কান্নাকাটি করিল এবং যাহাতে তাহার ঘরে একটি ছেলে হয়, সেইরূপ কোনও ঔষধ দিতে অনুরোধ করিল।

বৃদ্ধা তাহাকে একটি ফুল দিয়া বলিলেন, "ঋতুস্নানের পর তোমার স্ত্রী যেন এই ফুলটা ধুইয়া জল খায়, তাহা হইলেই ছেলে হইবে।"

সদাগরের স্ত্রী নির্দ্দেশ মত কাজ করিল এবং সন্তান-সম্ভবা হইল। দশ মাস দশ দিন যায়, ব্যথায় অস্থির, কিন্তু সন্তান হইতেছে না। ওদিকে কৈলাসে পার্ব্বতীর আসন টলে। তিনি পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ব্যাপার কি?

পার্ব্বতী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অমনি এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সেই সদাগরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সূতিকা-গৃহ হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া তাহার পদ্মহস্ত সদাগরের স্ত্রীর পেটে বুলাইয়া দিলেন। অমনি চাঁদের মত একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হইল। পার্ব্বতী উহার নাম 'জয়দেব' রাখিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই দেশেই ধনপতি নামে আর এক সদাগর ছিল, তাহার সাত ছেলে, কিন্তু কোনও মেয়ে নাই। পার্ব্বতী অতঃপর তাহার বাড়ীতেও একদিন পূর্ব্বোক্তরূপে ভিক্ষা করিতে গেলেন এবং কন্যা আঁটকুড়ের (কন্যাহীনার) ভিক্ষা গ্রহণ করেন না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। শেষে ধনপতির স্ত্রীও দেবীর কৃপায় ঐরূপে একটি কন্যাসন্তান লাভ করিল এবং তাহার নাম রাখিল 'জয়াবতী।'

জয়াবতীর যখন ছয়-সাত বৎসর বয়স, সে সঙ্গিনীদের লইয়া বনের ফুল-পাতা কুড়াইয়া, বালির নৈবেদ্য দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে। এমন একদিন জয়দেবের উড়ন্ত পায়রা আসিয়া তাহার কোলে পড়িল। জয়দেব পায়রা লইতে আসিল, কিন্তু জয়াবতী প্রথমে তাহা দিতে স্বীকৃত না হইলেও শেষে দিতে বাধ্য হইল। জয়দেব জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা ফুল-পাতা-বালি দিয়া ও সব কি করিতেছে। জয়াবতী উত্তরে জানাইল, তাহারা জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেছে, এই ব্রত করিলে হারানো ধন ফিরিয়া পায়, মরিলে বাঁচিয়া উঠে, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, সতীন মারিয়া ঘর হয়, রাজা মারিয়া রাজ্য পায়।

জয়দেব আর কিছু বলিল না, পায়রা লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিল, জয়াবতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ না দিলে সে উঠিবেও না, খাইবেও না।

শেষে উভয় পক্ষের সম্মতিতে জয়দেব ও জয়াবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের দিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের এক মঙ্গলবার,—সেদিন জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিয়াছে। বাসরে আঁচল খুলিয়া 'গদ' খাইতেছে, এমন সময় জয়দেব জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করিতেছ, তুক্ না তাক্?' জয়াবতী স্বামীকে জানাইল, সে তুক-তাক কিছুই করে নাই, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের গদ খাইয়াছে, বিবাহের হৈ-হল্লায় সারা দিন খাইতে পারে নাই। "এই ব্রত করিলে কি হয়?" "হারালে পায়, মরলে জিওয়, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, সতীন মেরে ঘর হয়, রাজা মেরে রাজ্য পায়।"

জয়দেব মনে মনে বলিল, আচ্ছা, পরীক্ষা করা যাইবে। পরদিন তাহারা নৌকা করিয়া চলিয়াছে, জয়দেব জয়াবতীর সব কয়টি অলঙ্কার পোঁটলা বাঁধিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। কৈলাস হইতে পার্ব্বতী তাহা জানিতে পারিলেন। তাঁহার আদেশে অমনি এক রাঘব বোয়াল পোঁটলাটি তাহার পেটের মধ্যে পুরিল।

বউভাত, জেলেরা মা পার্ব্বতীর চক্রান্তে অন্য কোনও মাছ না পাইয়া নদী হইতে সেই রাঘব বোয়ালটিই ধরিয়া আনিল। জয়াবতী সেই মাছটি কাটিতে যাইয়া সমস্ত অলঙ্কার ফিরিয়া পাইল। এইরূপে জয়াবতী আরও বহু পরীক্ষায়,—১৭ শত বেণের রন্ধনে, ১৭ শত বেণের একত্র পরিবেশনে উত্তীর্ণ হইল। মা দুর্গা কখনো খেত

মাছি, কখনো শ্বেত কাক প্রভৃতির রূপ ধরিয়া আসিয়া জয়াবতীকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

জয়াবতীর ছেলে হইল ; জয়দেব এক সুযোগে তাহাকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। পার্ব্বতী তাহাকে বাঁচাইয়া জয়াবতীর কোলে তুলিয়া দিলেন। আর একদিন জয়দেব কুমারের পোণে গিয়া ছেলেকে রাখিয়া আসিল ; কুমারেরা পোণে আগুন দেয়, আগুন আর জ্বলে না। মা পার্ব্বতী কৈলাস হইতে সব জানিতে পারিলেন। তিনি এক বৃদ্ধার বেশে আসিয়া কুমারের বাড়ী উঠিলেন, জয়াবতীর ছেলেকে পোণ হইতে অলক্ষ্যে কোলে তুলিয়া লইয়া আসিলেন, অমনি পোণ জ্বলিয়া উঠিল।

শেষে সেই রাজ্যের রাজা মারা গেল। রাজার শ্বেত হস্তী অন্য রাজার খোঁজে বাহির হইয়া জয়দেবকে নিয়া সিংহাসনে বসাইল। এইরূপে জয়দেব দেখিল, জয়াবতী ব্রতের ফল যাহা যাহা বলিয়াছিল, সকলই ফলিল। দেশে দেশে জয়মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল।

এই ব্রত-কথাটিতে আমরা কি দেখিলাম,—পার্ব্বতী আর জয়মঙ্গলচণ্ডী অভিন্না। পার্ব্বতীই জয়মঙ্গলচণ্ডীরূপে মর্ত্ত্যলোকে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। তিনি যাহার পুত্র নাই তাহাকে পুত্র দেন, যাহার কন্যা নাই তাহাকে কন্যা দেন। তিনি কখনো বৃদ্ধা, কখনো শ্বেত মাছি, কখনো বা শ্বেত কাক প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা,—জয়াবতীর কাটা মৃত পুত্রকে তিনি হস্তস্পর্শে মাত্র বাঁচাইয়া তোলেন, কুমারের পোণ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন, রাজা মারিয়া রাজ্য দেন। লৌকিক পার্ব্বতী তথা জয়মঙ্গলচণ্ডীর এইরূপ অলৌকিক ক্ষমতা আমাদিগকে সে যুগের সিদ্ধা ডাকিনীদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মঙ্গলকাব্যোক্ত ধনপতির উপাখ্যানেও দেখা যায়, বাণিজ্য-যাত্রাকালে ধনপতি খুল্লনার উপাস্যা মঙ্গলচণ্ডীকে 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন এবং তাহার পূজার ঘট ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। কে জানে এই সব লৌকিক স্ত্রীদেবতাদের কেহ কেহ এককালে মহাজ্ঞানসম্পন্না ডাকিনীই ছিলেন কি না,—পরবর্ত্তী যুগে দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছেন !

মঙ্গলচণ্ডীর আরও আট প্রকার ব্রত বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত আছে ; প্রত্যেকটিরই ব্রতপ্রকরণ ও ব্রতকথা বিভিন্ন হইলেও সকলেই শেষে পৌরাণিক চণ্ডীর মধ্যে গিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে এখানে আর আলোচনা না করিয়া অতঃপর অপর কয়েকটি লৌকিক চণ্ডীর বিবরণ দিতেছি।

রথচণ্ডী বা রথাইচণ্ডী

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কোথাও কোথাও রথযাত্রা অথবা পুনর্যাত্রা দিবসে রথচণ্ডী বা রথাইচণ্ডী নামক এক দেবতার ব্রত হইয়া থাকে। ব্রতিনীদের বিশ্বাস, ইনি দেহ-রথের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মানুষ ইঁহারই কৃপায় সুস্থ দেহে চলাফেরা করে, আবার ইঁহারই কোপে অসুস্থ হইয়া পড়ে। পৌরাণিক জগন্নাথদেবের পূজার দিনে এইরূপ চণ্ডীব্রতের প্রথা লৌকিক স্ত্রীদেবতাদেরই প্রাধান্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই দেবতার পূজায় কোনও মূর্ত্তি স্থাপন করিতে বা পুরোহিতকে ডাকিতে হয় না। একটি কলার মাজ-পাতায় চিড়া, কলা, দুধ, চিনি উপকরণ দিয়া, ব্রতকথা বলিয়া এই অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। ব্রতকথাটি অতি সাধারণ :—

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আর তাহার স্ত্রী। রথযাত্রার দিনে সকলেই ঠাকুর দেখিতে চলিয়াছে, তাহারাও যাইতেছে। বহুদূর যাইয়া তাহারা একটা বটগাছের নীচে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। এমন সময় দেবী রথচণ্ডী এক বৃদ্ধার বেশে আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা যে রথে যাও, কাহার জোরে যাও ?" ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "আবার কাহার জোরে যাইব !—নিজেদের জোরে যাই।" দেবী "আচ্ছা যাও" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

কতক্ষণ বিশ্রামের পর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উঠিতে যাইবে, কিন্তু এক তিলও নড়িতে পারিল না। তাহারা অবাক্ হইয়া গেল, তবে কি ঐ বৃদ্ধাই কোনও তুক-তাক করিয়া গেল ? চাহিয়া দেখে, দূরে সেই বৃদ্ধা লাঠিতে ভর করিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ডাকিল এবং নিজেদের বিপদের কথা নিবেদন করিল। বৃদ্ধা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন,—সমস্ত শক্তির উৎস তিনি, তাঁহার ইচ্ছায় মানুষ, পশু, পাখী সকলে চলে ফেরে, অনিচ্ছায় অচল হইয়া পড়ে,—রথচণ্ডী তাঁহার নাম। বৃদ্ধার নড়ির স্পর্শে তাহাদের জড়তা বিনষ্ট হইল, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার ব্রতের নিয়ম-কানুন বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আর জগন্নাথ-দর্শনে গেল না। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া রথচণ্ডীর ব্রত করিল ; দেশে দেশে এই ব্রতের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল।

এখানে দেখা যাইতেছে, চণ্ডী নামের আবরণে এক লৌকিক দেবতাই বাঙ্গালার অন্তঃপুরে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। ইঁহাকেও সমস্ত শক্তির উৎস বা দেহ-রথের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করিয়া আদ্যাশক্তি পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইঁহার প্রভাব নাই, মাত্র অঞ্চলবিশেষেরই ইনি দেবতা।

রালদুর্গা

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান কালে বাঙ্গালা দেশে অনেক লৌকিক স্ত্রীদেবতাই যে পৌরাণিক দুর্গা বা চণ্ডী নামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বহুজন-পূজিত সূর্য্য ঠাকুরকেও কোথাও কোথাও 'দুর্গা' পদবী গ্রহণ করিয়া হিন্দুপূজায় স্থান লাভ করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে রালদুর্গার ব্রত নামক এক ব্রত প্রচলিত আছে। সধবা স্ত্রীলোকেরা কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য এবং পুত্রসন্তান কামনা করিয়া এই ব্রত করিয়া থাকে। 'রাল' শব্দটি পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে 'রাউল'রূপে উচ্চারিত হয় এবং ইহা দ্বারা ধর্ম্ম বা সূর্য্যকেই বুঝাইয়া থাকে। মিশর দেশেও সূর্য্যের এক নাম 'রা', 'রাউল' বা রায়। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে একটি ষাঁড়কে বরাবরের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; হিন্দুরা ইহাকে 'রাউলের ষাঁড়', 'ধর্ম্মের ষাঁড়' এবং মুসলমানেরা 'খোদার ষাঁড়' বলিয়া অভিহিত করে। পরিবারে যদি কোনও স্বাস্থ্যবান যুবক কাজকর্ম্ম না করিয়া কেবল ঘুরিয়া-ফিরিয়া সময় কাটায় তাহা হইলে অভিভাবককে বিরক্ত হইয়া ঐ যুবকের উদ্দেশে বলিতে শুনা যায়, 'যেন রাউলের ষাঁড়'

বাঙ্গালার সাধারণ লোকের নিকট রাল, ধর্ম্ম এবং সূর্য্য একার্থবোধক। কাজেই এই রালদুর্গার ব্রত যে বাঙ্গালার একটি লৌকিক সূর্য্যপূজারই নামান্তর তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ ব্রতকথায় এবং ব্রতের উদ্দেশ্যেও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রতকথাটি সংক্ষেপে এই :—

একদিন লক্ষ্মী-নারায়ণ পাশা খেলিতে বসিয়াছেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সাহায্যকারী হইল; কথা রহিল, যদি লক্ষ্মীকে হারায় তবে সে ভস্মীভূত হইবে, আর যদি নারায়ণকে হারায় তবে 'কুটে আতুর' হইবে। নারায়ণ হারিয়া গেলেন; ব্রাহ্মণ 'কুটে আতুর' হইয়া রাস্তায় শুইয়া রহিল। রাজার মেয়ে ইচ্ছামতী শিবপূজার ফুল তুলিতে যায়, আতুর ব্রাহ্মণ কিছুতেই পথ ছাড়ে না। ওদিকে শিবপূজার বেলা হইয়া যায়, রাজার মেয়ে অগত্যা তাহাকে প্রতিশ্রুতি দেয়,—সে যদি পথ ছাড়ে স্বয়ম্বর-সভায় তাহাকেই সে মালা দিবে। ব্রাহ্মণ পথ ছাড়িয়া দিল এবং কালক্রমে ইচ্ছামতী সেই কুটে আতুরকেই বিবাহ করিল। দূর বনের ধারে এক কুটীরে তাহারা থাকে,—আতুরের সেবায় রাজার মেয়ের দিন কাটে। লক্ষ্মীর বড় দয়া হইল; একদিন তিনি রালদুর্গা-ব্রতের নিয়ম-প্রণালী ইচ্ছামতীকে শিখাইয়া দিলেন। অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দ্বিপ্রহরে এই ব্রত করিতে হয়। একটি কলার মাজপাতে ১৭টি চাউল (আতপ) ও ১৭টি দূর্ব্বা এবং তাহার একটি টাটে সিন্দুর, চন্দন, গুড়ফুল, জবার মালা, জোড়া কলা উপকরণ সাজাইয়া দিয়া ইচ্ছামতী চার মাস যথারীতি ব্রত করিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিলেন, 'কুটে আতুর' স্বামীর কন্দর্পের মত শরীর হইল। রালদুর্গার তাহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না, একটি সুন্দর পুত্রসন্তানও তাহারা লাভ করিল। সংবাদ পাইয়া রাজা কন্যা-জামাতাকে দেখিতে গেলেন, কন্যার মুখে রালদুর্গার ব্রত-মাহাত্ম্য শুনিলেন। নিজেও বাড়ী আসিয়া সেই ব্রত করিলেন, অপুত্রক ছিলেন তিনি, পুত্রলাভ করিলেন

ব্রতটির নাম 'রালদুর্গা' হইলেও দুর্গার এখানে কিছুই করণীয় নাই। ব্রতিনীর আরাধ্য দেবতা দেখা যাইতেছে রালদুর্গা নামধের সূর্য্য। সূর্য্যপূজার অন্যতম উদ্দেশ্য যেমন কুষ্ঠব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ, রালদুর্গা ব্রতের উদ্দেশ্যও তাহাই।

সুমতি

বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলের মহিলারা সুমতি নামক আর এক দেবতার ব্রত করিয়া থাকেন। তৈল-সিন্দুর এবং পাণ-সুপারি এই ব্রতের প্রধান উপকরণ। উপস্থিত বিপদ-আপদ এবং অশান্তি-উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে এই ব্রত করা হয়। নির্দ্দিষ্ট কোনও বার-তিথি নাই।

ব্রতকথায় দেখা যায়, দেবীর নাম সুমতি হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনিও দুর্গা, এবং স্বয়ং দুর্গাই মর্ত্ত্যলোকে এক বৃদ্ধার বেশে তাঁহার মাহাত্ম্য ও ব্রত প্রচার করেন। প্রথমতঃ, অতি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেই ইঁহার ব্রত প্রচলিত ছিল, ক্রমে উচ্চ-শ্রেণীর ধনী-গৃহেও ইহা প্রসার লাভ করে এবং সে-ক্ষেত্রে আবার মহাদেব উদ্যোগী হন। শুধু তাহাই নহে, তিনিও এই ব্রত করেন এবং তাহার ফলে

গঙ্গা ও দুর্গা দুই সপত্নীর মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। ব্রতকথাটি সংক্ষেপে এই : বিধবার ছেলে গোবিন্দ রাজার হাঁস চরাইত। এক দিন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সে একটি হাঁস মারিয়া খাইয়া ফেলে। রাজা তাহার গর্দ্দান নিতে চাহিলে বিধবা কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হয়। আকাশ-পথে তখন শিবদুর্গা সমুদ্র-স্নানে যাইতেছিলেন ; দুর্গা লোকালয়ে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া এক বৃদ্ধার বেশে নামিয়া আসিলেন এবং বিধবাকে আশ্বস্ত করিয়া তৈল-সিন্দুর ও পান-সুপারি দিয়া সুমতির ব্রত করিতে ও সেই ব্রতের জল মৃত হাঁসের পালকে ছিটাইয়া দিতে বলিলেন। বিধবা তাহাই করিল এবং পালকগুলি হাঁস হইয়া প্যাঁক প্যাঁক করিতে করিতে রাজার বাড়ীর দিকে ছুটিল। বিধবা তো অবাক্। তখন আকাশ-বাণী হইল—'সুমতি ঠাকুরাণী আর কেহই নহেন—স্বয়ং দুর্গা, তিনিই তোর বাড়ীতে বৃদ্ধার বেশে গিয়াছিলেন।'

বিধবা এখন প্রতি মাসেই সুমতির ব্রত করে। তাহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। একদিন রাণীদের ডাকিল ব্রতের কথা শুনিতে। কিন্তু গর্ব্বে তাহারা আসিল না। সুমতির কোপদৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল এবং রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা গোবিন্দার নিকট সুমতি-ব্রতের কথা শুনিলেন এবং তিনিও সে-ব্রত করিতে উদ্যোগী হইলেন। পুরোহিতকে ডাকা হইল,—তিনি সে ব্রতের মন্ত্র জানেন না। গোবিন্দার মাকে ডাকা হইল, সে রাণীদের পূর্ব্বের অবহেলার কথা স্মরণ করিয়া বলিল,—'আমি গরীব গৃহস্থের ব্রতকথাই জানি, রাজা-রাজড়ার ঘরের কথা জানি না।'

ভক্ত রাজার দুরবস্থা দেখিয়া শিব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রাজবাটীতে ছুটিয়া আসিলেন এবং স্বয়ং সুমতি-ব্রত করাইয়া এবং ব্রতকথা বলিয়া গেলেন। যাইবার সময় মানত করিলেন, কৈলাসে গিয়া যদি গঙ্গা ও দুর্গার মধ্যে সম্প্রীতি দেখেন, তিনিও অবশ্যই এই ব্রত করিবেন। শিব কৈলাসে গিয়া তাহাই দেখিলেন এবং খুব ঘটা করিয়া সুমতির ব্রত করিলেন। সুমতি ঠাকুরাণীর এমনি মাহাত্ম্য !

শুভদুর্গা

বাঙ্গালা দেশের আর একটি লৌকিক স্ত্রীদেবতা দুর্গা নামের আবরণে আত্মগোপন করিয়া দীর্ঘকাল বাঙ্গালী হিন্দুর অন্তঃপুরে পূজা পাইয়া আসিতেছেন ;—ইনি শুভদুর্গা। ব্রতিনীদের বিশ্বাস, শুভদুর্গা-ব্রতে সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়, আপদ-বিপদ দূর হয়। ইহাতে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের বা দেবতার কোনও মূর্ত্তি স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। ঘরের মধ্যে কলার একটি মাজ-পাতায় এক মুছি (ছোট শরা) চাউলের গুঁড়া ও সামান্য দুধ-কলা উপকরণ দিয়া ব্রতিনী ব্রতকথা বলেন এবং ভক্তি-কামনা জানাইয়া নিঃশব্দে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই ব্রতের কোনও নির্দ্দিষ্ট বার-তিথি নাই, যে কোনও দিন দিবাভাগে ইহা করা যায়। এখানে ময়মনসিংহ জেলার একটি ব্রতকথা সংক্ষেপে বিবৃত হইল :—

এক বিধবা ব্রাহ্মণী সূতা কাটিয়া, সূতা বেচিয়া একমাত্র পুত্রটিকে দুইয়া কোনওরূপে দিন চালায়। একদিন ছেলেটির ইচ্ছা হইল, মাছ-মাংস খাইবে—কারণ সেদিককার সকলেই মাছ-মাংস খায়, সেই বা শুধু নিরামিষ খাইবে কেন ?

মা অগত্যা এক জেলেনীর নিকট হইতে মাছ রাখিলেন—সূতা বেচিয়া তার দাম দিবেন। কিন্তু কতক্ষণ পরই আসিয়া জেলেনী তাগিদ আরম্ভ করিল। সূতা তখনও বিক্রী হয় নাই, ছেলে জানি কোথায় গিয়াছে। মা কি করেন,—নিরুপায় হইয়া ঝোলটুকু রাখিয়া রাঁধা মাছগুলিই জেলেনীকে ফেরত দিলেন।

ছেলে খাইতে বসিয়া বলিল, "মা, শুধু ঝোলেরই এত স্বাদ,—মাছ-মাংস না জানি কেমন ?"

ছেলের লোভ বাড়িয়া গেল,—একদিন সে রাজার একটি হাঁস মারিয়া খাইয়া ফেলিল। গুপ্তচরের তো আর অভাব নাই, সে সন্ধান পাইয়া অমনি যাইয়া রাজার কাছে নালিশ করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ পাইক-পেয়াদা পাঠাইয়া ছেলেটিকে নিয়া আটক করিলেন।

এদিকে মা কাঁদিয়া অস্থির। এমন সময় শুভদুর্গা ঠাকুরাণী এক বৃদ্ধার বেশে ব্রাহ্মণীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "কাঁদিস না, তুই 'শুভদুর্গা ব্রত' কর্, সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবি, তোর ছেলে রাজকন্যা বিবাহ করিবে।" বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে ব্রতের নিয়ম-কানুন বলিয়া দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ব্রাহ্মণী ব্রত করিয়া ব্রতের ফুল-দূর্ব্বার জল হাঁসটার পালকের উপর ছিটাইয়া দিলেন, আর হাঁসটা অমনি উঠিয়া প্যাঁক প্যাঁক করিতে করিতে রাজার বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল।

ব্রাহ্মণী তখন রাজদ্বারে গিয়া রাজকর্মচারীদের অনুরোধ করিল, "দোহাই আপনাদের, আপনারা যেন বিনা দোষে আমার পুত্রকে শাস্তি দেন না। গণিয়া দেখুন, আপনাদের হাঁস সব ঠিক আছে।"

রাজকর্ম্মচারীরা দেখিল, ১০৮টি হাঁস ঠিকই আছে। রাজা তখন ব্রাহ্মণীর পুত্রকে আরও ইনাম-বক্শিস দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বাড়ী আসিয়া ব্রাহ্মণীর পুত্র মাতার নিকট শুভদুর্গা ঠাকুরাণীর কথা শুনিল, শুনিয়া সে তাঁহার খোঁজে বাহির হইল। যাইতে যাইতে এক বটগাছের তলে দেখে, এক বৃদ্ধা—হাতে নড়ি, মাথায় জটা—বসিয়া আছেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর পুত্রকে বলিলেন, 'আমিই শুভদুর্গা, এই বৃক্ষে আমার অধিষ্ঠান। আমার পূজায় সমস্ত বিপদ বিনষ্ট হয়।'

শুভদুর্গার এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহার ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণীর সকল দুঃখ দূর হইল, রাজার মত সংসার হইল, পুত্র তাহার রাজকন্যা বিবাহ করিল।

প্রায় প্রত্যেকটি ব্রতেরই বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি একই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ব্রতকথা প্রচলিত আছে, ব্রতের নিয়মও সর্ব্বত্র এক নহে। বিভিন্ন অবস্থা এবং ঘটনা হইতে যে এক একটির উদ্ভব হইয়াছে এবং কালক্রমে যে সকলেই একই পরিণতির দিকে ছুটিয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

ব্রতিনীদের বিশ্বাস, মেয়েলি আচার-ব্রত যত প্রায় সকলই শিবপত্নী পার্ব্বতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া আসিয়া লোকালয়ে প্রচার করিয়াছেন। মনে হয়, ব্রতকথাগুলিও সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কালক্রমে কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। কারণ প্রকরণ এবং কথাগুলি বিভিন্ন ধরণের হইলেও প্রায় সবগুলিতেই একজন বৃদ্ধাকে অযাচিত ভাবে আসিয়া ব্রত-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে এবং সেই ব্রতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সঙ্গে আপনার তথা পার্ব্বতীর অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে দেখা যায়। আমরা বর্ত্তমানে লৌকিক চণ্ডী বা 'দুর্গা'দের লইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইব না।

ট্রেন

ভেরা পানোভা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শেষ হোলো দ্বিপ্রহরের খাওয়া। ট্রেনটা টিকোতে টিকোতে চলেছে, কখনো এখানে থামছে, কখনো ওখানে, যেন চলতে আর পারছে না। পাশাপাশি পথটা কখন মিলিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে চোখে পড়ে দূরের পল্লী। ছোটো ছোটো ঝোপে-ঢাকা মাঠ, কুঁড়ে ঘর, খামার—ছোটো একটি গ্রাম্য কুটীর, আগুনের ধোঁয়ায় কালো দেয়ালগুলো—মাথার চালটা উড়ে গেছে—জানলাগুলো হা-হা করছে। তারও পিছনে আরও দূরে জ্বলে যাচ্ছে একটা গ্রাম, আগুনের শিখাও যাচ্ছে দেখা, জ্বলে যাচ্ছে ক্ষেত-খামার, ধোঁয়ায় ভারী হোয়ে উঠেছে বাতাস। মাটীর বুক চিরে চিরে ট্রেঞ্চ খোঁড়া রয়েছে। মানুষ-জন চোখেও পড়ে না। ট্রেনটা অনবরত ঝাঁকানি খাচ্ছে—আর চাকার সশব্দ গর্জ্জন ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে নিরবছিন্ন ভাবে বোমাবর্ষণের ভীষণ শব্দ।

জুলিয়া ডিসপেন্‌সারীর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চেয়েছিলো দূরের দিকে। এই হোলো সেই জায়গা—আজ শত্রুর কবলিত হোচ্ছে—সেই স্কোভ.' স্কোভ তার চেনা জায়গা। জুলিয়ার অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকতো এখানে—ছোটো বেলায় এখানে তাদের মাঝখানে জুলিয়ার অনেকগুলো দিন কেটেছে। তখন তো আর ট্রাম হয়নি, ষ্টেশন থেকে জুলিয়ারা যেতো ঘোড়ার গাড়ী করে। চার দিকে তখন ছিলো লিনডেনের মরশুম—মিষ্টি একটা মধুর গন্ধ পাওয়া যেতো সবখানেই। সন্ধ্যা বেলায় কালো আকাশের পটভূমিকায় ছায়ার মত গির্জ্জা—আর তার বিরাট ঘণ্টা বাজতো—কি গভীর, উদাত্ত আওয়াজ তার···

কি গর্ব্ব আর আনন্দের সঙ্গেই না জুলিয়ার মাসী বলতো—'আমরা হোলাম স্কোভের লোক'—যেন সারা রাশিয়ায় তাদের সঙ্গে আর কারো কোনো তুলনাই চলে না। আর এখন?···কি দশা সেই স্কোভের? চালহীন হতশ্রী কুটীরগুলো—গ্রামের বুক-জ্বালানো হুহু করা আগুনের শিখা! দাঁড়িয়ে আছে বজ্রাহত স্কোভ, ছারখার হোয়ে যাচ্ছে বোমার ঘায়ে, ফৌজেরা পালাচ্ছে—দাঁড়িয়ে আছে একলা স্কোভ—তার সর্ব্বাঙ্গে ট্রেঞ্চের ক্ষত, বোমার আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হোয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে স্কোভ···

অনেকক্ষণ ধরে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিলো এক জায়গায়; অসংখ্য লাইনের সমাবেশে জটিল হোয়ে উঠেছে জায়গাটা। লাইনগুলো প্রায় সবই ভর্ত্তি—সামনেই একটা মস্ত মালগাড়ী পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে

গুলো ধোঁয়ায় কালো হোয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে কালো ধোঁয়ার মেঘের আড়ালে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো আকাশ, আর দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত ঘর-বাড়ীগুলোর রক্তচক্ষু।

ভারী বিশ্রী লাগছিলো জুলিয়ার এই ভাবে চুপ-চাপ কোনো কাজ না করে দাঁড়িয়ে থাকতে, বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে এমন একটা ভীষণ জায়গায় প্রতি মুহূর্ত্তে কত কাজের দরকার।

নার্সকে ডেকে জুলিয়া বললে:—"ক্লাভা, ষ্টাফ-কামরায় গিয়ে দেখো তো কমাণ্ডাণ্ট আর কমিশার কোথায়—?"

—"এক মিনিট জুলিয়া, আমি বরং গাড়ী থেকে নেমে বাইরে দিয়েই ছুটে চলে যাই ও-কামরায়?"

—"সে কি! তুমি নিয়ম জানো না?—কেউ এখন ট্রেন থেকে নামতে পাবে না—না, তুমি কামরাগুলোর ভিতর দিয়ে দিয়ে যাও।"

ক্লাভা চলে গেলো। ডিসপেন্‌সারীর জানলার সামনেই যে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিলো সেটা চলতে সুরু করলো—আরও একটা ট্রেন ছাড়লো। এইবার স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়লো সর্ব্বত্র ঘিরে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। আগুন আর আগুন···জ্বলে উঠেছে আকাশের বুক রক্ত-রাঙা আগুনের হলকায়···এইবার হসপিটাল ট্রেনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ষ্টেশনের আরও কাছে—এগিয়ে এলো চতুর্দ্দিকে অগ্নি-শিখার উত্তপ্ত উজ্জ্বল আলোর কাছে—আরও কাছে এগিয়ে এলো—নির্ভীক ভাবে এসে দাঁড়ালো অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে, মাথার উপরে রেড ক্রশের রক্ত-রাঙা চিহ্ন নিয়ে—ডাইনে-বাঁয়ে শুধু জ্বলতে লাগলো সর্ব্বগ্রাসী লেলিহান শিখা! ক্লাভা ফিরে এলো।

—"জুলিয়া, কমাণ্ডাণ্ট জানালেন তুমি যেখানে আছো সেখানেই থাকো। কমিশার ইভাকু জায়গায় গেছেন কি করতে হবে জানতে—"

ষ্টেশনের মাঝখানে এসে পৌছালো ট্রেনটা।

চতুর্দ্দিকে জ্বলন্ত আগুন—কেউ চেষ্টাও করছে না সে আগুন নেবাতে—কার সাধ্যই বা নেবায় সেই দিগন্তব্যাপী সর্ব্বগ্রাসী শিখা? চার দিকে ভীত, আর্ত্ত মানুষগুলো দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটোছুটি করছে। প্লাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে চার জন—তিন জন ভদ্রলোক সুটকেশ হাতে আর দানিলভ।

—"সার্জ্জন"—ক্লাভা ছুটে গিয়ে ষ্টাফ-রুমে নিজের বুদ্ধিমত খবর দিলে—"আহত-সেবা-কেন্দ্র থেকে আমাদের তিন জন সার্জ্জন পাঠিয়েছে—তারা এখানেই অপারেশন করবে—"

সার্জ্জন! মনটা নেচে উঠলো জুলিয়ার সত্যিকারের কাজের আশায়। যাক্, তিনটি সুটকেশের সঙ্গে এবার সত্যিকারের চিকিৎসা-বিজ্ঞানও প্রবেশ করলো ট্রেনেতে—ওর ডিসপেন্‌সারীতে। ট্রেনেতে অপারেশন! ব্যাণ্ডেজ! ড্রেসিং···!

ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হাতে জুলিয়া ব্যবস্থা করতে লাগলো। তিন জন

সার্জ্জন—তিনটে টেবিল। অপারেশনের যন্ত্রপাতি—যথেষ্ট মজুত—গরমজল, গ্লাভস্—সব আছে। হ্যাঁ, সহকারী হবে কে? প্রথমেই তো সে নিজেই। তার পর—সুপ্রাগভ। ·নাঃ, ওর নার্ভ বড় দুর্ব্বল, তার চেয়ে হোক অলগা মিখেলোভনা, আর তৃতীয় হবে ফাইনা।

—"ক্লাভা, ব্লাকআউটের পর্দ্দাগুলো টেনে আলো জ্বালিয়ে দাও—আর টেবলের উপরটা পারমাঙ্গানেটে ধুয়ে ফ্যালো—"

ক্লাভা মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলে। কখনোও এ-সব কাজ করেনি, এখন করতে বাধ্য হোচ্ছে। ওর দিকে চেয়ে বিরক্তিভরে জুলিয়া বললে: "ঠিক আছে, আমি নিজেই ধোবো টেবলগুলো। তুমি ভাঙা কাচগুলো পরিষ্কার করে সরিয়ে ফ্যালো—

সুরু হোলো আসল কাজ।

ফাইনা ঠিকই বলেছিলো, আধ ঘণ্টার মধ্যে সারা ডিসপেন্সারীর কামরার একটা জানলাও আস্ত রইলো না আর। নার্সেরা তাড়াতাড়ি কাচগুলো পরিষ্কার করতে এগিয়ে এলো। বেচারীরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, এক জন তো কাঁদতেই সুরু করে দিলে। কিন্তু সবার মনেই একটা জিনিষ বড় বেশী করে আঘাত দিলে—জার্ম্মানরা এমনি করে কত সুন্দর একটা গাড়ী সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিলে।

কাচ আর লোহার টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে করতে অস্ফুট স্বরে ব্রান বললে,—"কত রাত জেগে, কত সুন্দর করেই না কামরাটাকে সাজিয়েছিলাম—"

মোটাসোটা আহ্লাদী পুতুল আইয়া তো ভয়েই অস্থির—ট্রেনের ভিতর কানুন তার মাথায় উঠে গেলো। ভয়ে আত্মহারা হোয়ে ট্রেন থেকে নেমে জ্বলন্ত ষ্টেশনের মধ্যে ছুটলো আশ্রয়ের খোঁজে। কারুর মনেই ছিল না ওর কথা,—পরদিন যখন ফিরে এলো তখন কয়লার গুঁড়ো আর ধূলোয় সর্ব্বাঙ্গ ভরা—চুলে, মুখে, হাতে লেগে রয়েছে কাদা আর মাটি।

দানিলভ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য একটা ছোটোখাটো দল যোগাড় করে ফেলেছিলো—নিঝভেট্স্কি এগিয়ে এলো—

—"চলো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—"

—"কিন্তু আলোর ব্যাপারটা—?"

—"ক্রাভট্সভ দেখবে। ওকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি।"

—"ক্রাভট্সভ আবার কি করবে? সে হোলো ইঞ্জিনিয়ার, আর তুমিই হোলে ইলেক্‌ট্রীসিয়ান—না, কোনো কথাই না, তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। ওরা অপারেশন করবে···"

—"বেশ, কিন্তু আমি থাকছি না—কিছুতেই না, সে তুমি যাই বলো"—বলতে বলতে এগিয়ে এলো ফাইনা—"আমি সব সময়ই সামনে থাকবো, বোমা আর গোলাগুলী আমাকে ছুঁতেও পারবে না—"

ওর উত্তেজনায় অজ্ঞাতসারেই হেসে ফেলে দানিলভ।

—"কিন্তু ফাইনা, তোমাকে তো আমি সঙ্গে নিতে পারবো না, কমাণ্ডান্ট তোমাকে অপারেশনের জন্তে ঠিক করেছেন—"

—"হায় রে কপাল আমার! এই নাও লেনা, তুমিই আমার থলিটা ধর"—ফাইনা এগিয়ে যায় লেনার দিকে, সে তখন দুটি হাত পিছনে রেখে সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্লাটফর্ম্মের উপর—ওর বালকসুলভ উজ্জ্বল কচি মুখখানা পিছন দিকে বেশ একটু দৃপ্ত ভঙ্গীতে হেলানো।—

"এই নাও লেনা—সত্যি ভারী চমৎকার মেয়েটি, সব সময়েই সব কিছুর জন্তে একেবারে তৈরী—"

দানিলভ সুপ্রাগভের দিকে চেয়ে বলে,—"ডাক্তার, জানো, আজ সারা ইউরোপ চেয়ে আছে আমাদের দিকে—"

সুপ্রাগভ একটাও কথা বলতে পারছিলো না···মৃতের মত বিবর্ণ মুখে শুধু দানিলভের দিকে চাইলো। একবার কি যেন একটা বলতে গেলো—হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তেই একেবারে পাশেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হোলো—সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ো কয়লার মেঘের রাশিতে ঢাকা পড়লো চু'জনেই।

এতক্ষণে সুপ্রাগভ যেন সম্বিৎ খুঁজে পেলো—বুঝতে পারলো কি হতে চলেছে। ওর মনে হোলো আর উপায় নেই—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হোয়েছে—কি বীভৎস মৃত্যু! আর কেন কষ্ট? ইচ্ছা হোলো এই মুহূর্ত্তেই এই কঠিন যন্ত্রণার বেড়াটুকু পেরিয়ে সেই অতল শূন্যতার কোলে আশ্রয় নেয়। মৃত্যুর পর আর ভয় নেই—অচল শান্তি, নির্ভাবনা, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। অতএব এখুনি শেষ করে দাও এই যন্ত্রণাময় বর্ত্তমানকে, এগিয়ে চলো মৃত্যুর দিকে।—"এই যে আমি"—নেমে আসতে আসতে চেঁচিয়ে উঠলো সুপ্রাগভ, যেন ওর ভিতরের জমাট কান্না রূপ পেলো ভাষায়।—"এই যে আমি, শেষ করে দাও আমাকে, আর আমি সহ্য করতে পারছি না এই বীভৎস ভয়কে—"

দানিলভ হাতটা বাড়ালে। সুপ্রাগভ ওর হাতটা ধরে ছুটলো সঙ্গে সঙ্গে। বসে বসে যাচ্ছে ভারী বুটশুদ্ধ পা, চোখ খোলা যাচ্ছে না কয়লার গুঁড়োর ধোঁয়ায়।···সামনেই দেখা গেলো এগিয়ে আসছে একটি আহত সৈনিক, রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে, কোনো মতে রাইফেলে ভর দিয়ে টেনে টেনে এগোচ্ছে।

—"হসপিটাল ট্রেনটা কি অনেক দূরে? ওরা আমাকে সেখানেই যেতে বললে—"

—"না, না, ঐ তো ঘরগুলোর পিছনেই দেখা যাচ্ছে—" দানিলভ ব্যস্ত হয়ে ওঠে—"কিন্তু তোমাকে ষ্ট্রেচার এনে দিই—"

—না, আমার দরকার নেই, যেতে পারবো, তোমাদের সবগুলো ষ্ট্রেচারেরই দরকার হবে, অনেক বেশী আহতরা রয়েছে পড়ে—"

রাস্তার কোণেই বছর চোদ্দর একটি ছেলে পড়েছিলো—পুরো জ্ঞান রয়েছে কিন্তু একটু গোঁঙাচ্ছে না, গম্ভীর উজ্জ্বল চোখে শুধু চেয়ে আছে আর্দালীদের দিকে। দানিলভ ষ্ট্রেচারের জন্ত বলতেই লেনা ঝুঁকে পড়ে ছোট্টো বাচ্চা ছেলের মত টপ করে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলে—নিতেই ছেলেটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হোয়ে পড়লো—ঝুলে পড়লো মাথাটা।

সুপ্রাগভ রেগে চেঁচিয়ে উঠলো—"যা জানো না তাইতে এগিয়ে যাও কেন, এ কি পুতুল খেলা? তোলো ওকে ষ্ট্রেচারে, কি দেখছো তোমরা হাঁ করে—?"

আবার একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ—ধোঁয়ার কুণ্ডলী এসে ঢেকে দিলো সবাইকে। একটু পরে শোনা গেলো দানিলভের গলা—"সব ঠিক আছে তো?"

হ্যাঁ, ঠিকই আছে সবাই—শুধু যা কয়লার গুঁড়োয় কালো হোয়ে গেছে সর্ব্বাঙ্গ—আর প্রচণ্ড শব্দে কানে ধরে গেছে তালা।

কালো মূর্ত্তি সুপ্রাগভ বক্তের মত হেসে উঠলো,—"ছেলেটিকে

জুলিয়ার কাছে দিয়ে চলে এসো—আমাদের না পেলেও পথে আহত কাউকে পেলে তুলে নিয়ে যেও"—দানিলভ আদেশ দেয়—"ও কি স্থপ্রোগভ, তোমার কাঁধে বিস্ফোরণের কিছু টুকরো ঢুকে গেছে নাকি?"

"—কই? কোথায়? ওঃ, এখানে? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। একটু ছড়ে গেছে মোটে—ও কিছুই নয়"—মাতালের মত চলেছে স্থপ্রোগভ। নিজের এই বেপরোয়া সাহসের অনুভূতিতে, উন্মাদনায় ও আচ্ছন্ন।

ডাঃ বেলভ ট্রেনের ভিতর দিয়ে আসছিলেন। সারা ট্রেনটার ভিতর দিয়ে একটা গরম হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, বাইরে আগুনের লকলকে শিখা আর ধোঁয়ার ফলে ভিতরটা একটা ঝাপসা আলোয় ভরা। অথচ আজই সকালে কি সুন্দর পরিষ্কার ছিলো এই ট্রেনটাই!

ডাঃ যেতে যেতে ভাবলেন, 'কি যেন একটা ভুলে যাচ্ছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না, কি যেন ভুলে যাচ্ছি···' কিন্তু কি যে সেটা কিছুতেই ভাবতে পারলেন না।

প্রত্যেকেই বেশ তৈরী। প্রত্যেকটি জিনিষ মজুত—সবই যেন আগে থেকে জানা। একটা দল চলে গেছে আহতদের আনতে। হ্যাঁ···খাবার। দুপুরের খাওয়া তৈরী করতে হবে। আর সকালের প্রাতরাশ।

—"মিষ্টার স্মির্নোভা, রসদ-পরিচালককে ডাকবার জন্যে কাউকে পাঠাও তো···"

সোবোল হাজির হোলো। নেহাৎ অনুৎসুক দৃষ্টিতে ডাক্তার দেখলেন তার দিকে—ও কি রেশন ভাগ করছিলো, না, কিছুই করছিলো না? কিছুই করছিলো না সোবোল—বেচারী শুধু ফুটো বেলুনের মতো ভয়ে চুপসে যাচ্ছিল।

—"হ্যাঁ, শোনো"—ডাক্তার বললেন—"আমাদের দুপুরের খাওয়া চাই—প্রায় একশ' বিশ জনের মত। হ্যাঁ, বেশ ভালো খাওয়া—"

—"খাওয়া তো হোয়ে গেছে—" সোবোল থতমত খেয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে।

—"শোনো, যাতে ভালো হয় খাওয়াটা"—ডাক্তার কানেই তোলেন না ওর কথা—"যে সব আহতরা আজ থেকে আসতে সুরু করলে তাদেরও হিসেবে ধোরো। তোমার ঐ স্বাদহীন মিলেট নয়, ভালো পরিজ, জ্যাম, কফি, বিস্কিট আর মাখম—শুনছো?"

—"মাখম?"—সোবোল ভাবলে, স্বপ্ন দেখছে না তো?

—"হাঁ, মাথা পিছু পঞ্চাশ গ্রাম"—

—"পঞ্চাশ?"—সোবোলের চোখ কপালে উঠলো—"একশ" বিশ বার তাহলে পঞ্চাশ গ্রাম মানে ছ'হাজার···"

—"কি, কি যেন একটা ভুলে যাচ্ছি"—সোবোলের দিকে না চেয়ে ডাক্তার আবার এগিয়ে যান ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়। কেন তিনি তো ইগরকে খোঁজবার কোনো চেষ্টাই করলেন না? টেলিফোন, খোঁজ নেওয়া, লিখে পাঠানো, জিজ্ঞাসা করা কাউকে—না লোক কিছু তো করতে পারতেন?—অসম্ভব, শুধু পাগলামি—কোথায় টেলিফোন করবেন, কোথায় খোঁজ নেবেন আর জিজ্ঞাসাই বা করবেন কাকে?···না, না, কিছু অন্ততঃ করা যেতো, যেতে পারতো। সোনেচকা থাকলে ঠিক করতো। তিনি সত্যিই কোনো কাজের নন। সোনেচকা পারতো—সে যে সত্যিই ভালোবাসতো ইগরকে। সত্যিকারের ভালোবাসা যে সব পারে। তিনি তো অমন করে ছেলেকে ভালোবাসতে পারেননি—অসমর্থ, স্নেহহীন, অপারগ বাপ! তিনি ভালোবাসতেন লায়লাকেই বেশী। তবুও সে কি বেশী ভালো? না, শুধু মাথা-ভরা নরম কোঁকড়ানো চুল, উজ্জ্বল মুখ, মিষ্টি হাসি-ভরা চাউনী দেখতেই তাকে ভালো লাগতো। তাই তো তিনি তাকে দিতেন অজস্র আদর, দিতেন থিয়েটার দেখার টাকা, আর ইগর চাইলে তাকে ফিরিয়ে দিতেন। মাত্র তিরিশটি রুবল···খোকা, বাবা আমার, ক্ষমা কর আমায়, সব তুই নে—আমার এই জীর্ণ-শীর্ণ জীবনে যা-কিছু আছে সব তোর। শুধু তুই বেঁচে থাক। শুধু ফিরে আয়···অমন করে ফেলে যাসনি···এত শীগগির এমন হঠাৎ চলে যাসনি তুই···ফিরে আয় আমার বুকে···আমার খোকা!

মাত্র বারো দিন আগে যখন জুলিয়া সৈন্যদলে যোগ দিলে—সেদিন ওর ভাইয়েরা, বৌদিরা, আরও আত্মীয়-স্বজনরা সবাই এসেছিলো ওকে বিদায় দিতে। খুব খাওয়া-দাওয়া হোয়েছিলো—যেন জন্মতিথি উৎসব···জুলিয়া নিজের হাতে টেবিল পরিষ্কার করে সবচেয়ে ভালো চাদর পেতে দিয়েছিলো—মাত্র বারো দিন পর আজও জুলিয়া নিজের হাতে টেবল পরিষ্কার করে সাদা চাদর পাতলে··· শুধু তফাৎটা কোথায়···?

প্রথম আহতটি এলো—সেই সৈনিক। রাইফেলটাকে কোণে দাঁড় করিয়ে রীতিমত স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে—"কোন টেবিলটাতে আমি শোবো?"

—"যেটাতে তোমার ইচ্ছে"—জুলিয়া নরম সুরেই বলে—"কিন্তু আগে জামাটা খুলে ফ্যালো। কোথায় লেগেছে তোমার? পায়ে? ক্লাভা, ওর জুতো জোড়া কেটে ফ্যালো তো—"

ক্লাভা জুতো জোড়া কেটে ফেলেই আতঙ্কে, বিস্ময়ে চমকে উঠলো। ওর মুখের দিকে চেয়ে সৈনিকটি ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠলো: —"কি ব্যাপার? কি এমন হোলো শুনি? কখনো দেখনি বুঝি? এ তো মাছির কামড়ের ঘা—আর—আরও জানতে চাও?—নাঃ, এখনো হাড় অবধি ক্ষতটা পৌঁছয়নি—"

জুলিয়া এতক্ষণ ওভারল হাতে প্রস্তুত ছিলো—ডাক্তারের হাত ধোয়া হোতেই তখনি তাকে ওটা পরিয়ে হাতে স্পিরিট ঢেলে এগিয়ে দিলে গ্লাভস্ জোড়া। সুপুরুষ বৃদ্ধ ডাক্তারটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে চাইলে—হ্যাঁ, জন্ম-সেবিকাই বটে! ওর পেশা যেন ওর কাছে এক পবিত্র কর্ত্তব্য—এমনি নিষ্ঠা! একটা কিছু চাইতে হোলো না—বলার আগেই সব তৈরী হাতের কাছে।

অদ্ভুত ধৈর্য্য আর সংযম সৈনিকটির। মাঝে মাঝে 'উফ' করে সজোরে নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া এতটুকু কাতরোক্তি শোনা গেলো না মুখে। জুলিয়া বাস্তবিকই এমন রোগীই পছন্দ করে। অসহ্য গরম ভাপে ভরে উঠেছিলো সমস্ত গাড়ীটা। জুলিয়া ধীরে ধীরে সৈনিকটির কপালের ঘাম মুছে দিলে। সে জানালে তার কৃতজ্ঞতা।

এলো আর একটি। অচৈতন্য বালক, ঊরুর হাড়খানা টুকরো টুকরো হোয়ে গেছে। কী চমৎকার দেহের গঠন, কি সতেজ, সবল পেশীগুলি···চক্ষের পলকে জুলিয়া দেখে নিলে যে পা-খানা কেটে বাদ দিতে হবে। ডাক্তার দেখে বোঝবার আগেই।

—"পিশাচ, শয়তানের দল—" ছেলেটির দিকে চেয়ে ক্লাভা বলে।

থর-থর করে কাঁপছে ছেলেটির চিবুক—দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন জুলিয়াকে ক্লোরোফর্ম দিতে পারবে কি না। শুধু ক্লোরোফর্ম! আসলে বলতে কি, জুলিয়া অপারেশনও বেশ ভালো ভাবেই করে দিতে পারবে—নেহাৎ ওর করবার অধিকার নেই তাই।

অপারেশনের সময় ডাঃ বেলভ এসে ঢোকেন।

—"আমার সাহায্যের কিছু দরকার আছে?"

জুলিয়া ভৎর্সনার ভঙ্গীতে তাকায় তাঁর দিকে। ডাক্তার মুখ বাড়িয়ে সিষ্টার স্মির্নোভাকে বলেন ছেলেটিকে এগারো নম্বরে নিয়ে যেতে। পাশের ঘরে টেবিলে আর একটি আহত স্ত্রীলোককে আনা হয়েছে—তার ব্যবস্থার জন্য এগিয়ে যান ডাক্তার।

সহকারী ডাক্তার অলগা মিখেলোভনা বলে, মেয়েটির আর ব্যবস্থার দরকার নেই। মেয়েটির মুখের ঢাকাটা তুলে ফেলে। চওড়া, শ্লাভ জাতীয় মুখ, উঁচু হোয়ে আছে গালের হাড় দুটো, সুন্দর ঠোঁট দুখানি, গভীর ক্ষতের দাগ নাকের ওপর দিয়ে চলে গেছে।

—"অনেকক্ষণ হোয়ে গেছে"—সার্জনটি বলে ওঠে।

বলতে বলতেই হঠাৎ সে অপর দিকের টেবিলের উপর একেবারে উল্টে পড়ে গেলো, সেই টেবিলেই ছেলেটিকে শোয়ানো হোয়েছিলো। ছেলেটি ছিটকে পড়লো মাটিতে। প্রত্যেকটি লোকই একটা প্রবল ধাক্কায় ছিটকে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লো—একমাত্র জুলিয়া ছাড়া। জুলিয়া দরজার গায়ে ছিটকে পড়েই তোয়ালে রাখা রডটি সজোরে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেয়াল আর ছাতের গা থেকে নতুন সাদা রঙের চটা উঠে গেলো—খানিকটা জায়গা ভেঙে পড়লো, একেবারে জুলিয়ার কপাল ঘেঁসে, রগের পাশটার খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে।

—"খুব কাছেই বোমাটা পড়লো এবার—" ডাঃ বেলভ বললেন।

ছেলেটিকে তুলতে তুলতে জুলিয়া সায় দিলে—"হ্যাঁ, সোজা আমাদের ট্রেনের উপরই আক্রমণটা হোলো।

কোস্ত্রামিন আর মেওভেদিয়েভ আর এক প্রান্ত থেকে চীৎকার করতে করতে ছুটে এলো :—"চোদ্দ নম্বর গাড়ীখানা একেবারে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। কমাণ্ডাণ্ট কোথায়?"

কমাণ্ডাণ্ট ততক্ষণে নেমে পড়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুটেছেন জ্বলন্ত গাড়ীখানার দিকে। ভীষণ ভাবে জ্বলছে গাড়ীটা—একে শুকনো কাঠ, তায় শুকনো নতুন রঙ—সৌভাগ্য যে কোনো আহত ছিল না ওটায়। সবাই ঠিক আছে তো? ঐ তো নান্দা, হেঁট হোয়ে ক্রমাগত রক্ত-ভরা থুতু ফেলছে। জামা-কাপড় ওর ভরে গেছে রক্তে। কি ব্যাপার! নান্দা কি আহত হোলো?

—"কখনোই না কমরেড কমাণ্ডাণ্ট। শেলফে ছিটকে পড়ে আমার জিভটা শুধু কেটে গেছে, তাই—"

—"আর কোস্ত্রামিন? বেঁচে আছে তো?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো তোমাকেই ডাকতে গেছে।"

এসে দাঁড়ালো কোস্ত্রামিন, হাতে জলের বালতী, পিছনে মেওভেদিয়েভ—কিন্তু এক বালতী জলে কি হবে? অন্য দিক থেকে হাজির হোলো এসে নিঝভেটস্কি আর ক্রাভটুসভ—অনেকটা মন্থর ভঙ্গীতে। ডাক্তার চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—"হাত চালিয়ে, ছেলেরা হাত চালিয়ে—"

নিঝভেটস্কি এগিয়ে এসে দ্বিগুণ উৎসাহে যোগ দিলে; কিন্তু ক্রাভটুসভ পকেটে হাত দিয়ে তেমনি ভঙ্গীতেই বলে উঠলো—"জলটা পাওয়া যাবে কোথায়?"

—"জল? কেন বড় চৌবাচ্ছাগুলো রয়েছে—ইঞ্জিনে জল রয়েছে—"

—"এক ফোঁটা জলে হবে কি—" বলতে বলতে হঠাৎ পাশের সৈন্যদের দিকে চেয়ে ক্রাভটুসভ গর্জ্জন করে ওঠে—"এই, শীগ গির গাড়ীখানা খুলে আলাদা করে ফ্যালো। পাশেই ডান দিকে একটা ডায়নামো রয়েছে—আর হাঁ করে বোকার মত সব দাঁড়িয়ে আছো? শোনো শোন ভাই"—একটা মেশিনে তেল দেবার মিস্ত্রীকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে তাকেই ডাকে ক্রাভটুসভ—"একটু হাত লাগিয়ে আমাদের সাহায্য কর ভাই—গাড়ীখানা খুলে ফেলতেই হবে—"

—"হ্যাঁ, বলে হাজারখানা গাড়ী ছাই হোয়ে গেলো—আর ঐ একখানার জন্যে ভেবে মরি—"

—"বুঝছো না ভাই, পাশেই গাড়ীগুলোতে আহত সৈনিকরা রয়েছে আবার ওপাশে ডায়নামো রয়েছে একটা—গাড়ীখানা খোলা ছাড়া কোনো উপায় নেই—"

—"চুলোয় যাও। আহ্লাদ দ্যাখো না—বোমা পড়ছে তখন জ্বলন্ত গাড়ী খুলে ট্রেনখানা বাঁচাও—'

—"তোকেই চুলোয় পাঠাবো"—রাগে চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো ক্রাভটুসভের, পেশীগুলো ফুলে উঠলো, মিস্ত্রীটার কান ধরে টেনে নিয়ে এলো। ডাক্তার পাথরের মত দাঁড়িয়ে—ব্যাপার দেখে একেবারে স্তম্ভিত। মিস্ত্রীটা ক্রাভটুসভের পেটে লাথি মারতে লাগলো আর ক্রাভটসভ লাগালে তার ঘাড়ে একের পর এক রদ্দা। মিস্ত্রীটা শেষে কাবু হোয়ে এগিয়ে এলো জ্বলন্ত গাড়ীখানা খুলতে। সবাই মিলে ঠেলতে ঠেলতে গাড়ীখানাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, এঞ্জিন থেকে তার উপর জল ঢালতে লাগলো।

ইতিমধ্যে জুলিয়া তখন লোকটিকে অপারেশন করাবার জন্যে তৈরী—ডাক্তারের হাতে একের পর এক যন্ত্রগুলি এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে···সারা রাত ধরে জলে পুড়ে ছাই হোয়ে যাচ্ছে সারা সহরটা—আর বিরামবিহীন ভাবে এসে পৌঁছাচ্ছে আহতদের দল। কাউকে আনা হচ্ছে ষ্ট্রেচারে, কাউকে লরীতে, কেউ আসছে নিজেই···ভোরের দিকে প্রফেসারের শক্তি একেবারে চরম সীমায় পৌঁছালো।

"উঃ, যথেষ্ট হোয়েছে"—ওভারলটা খোলার আর তর সইলো না প্রফেসারের, গা থেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে বলে উঠলো—"আমি আর পারছি না—আজ পাঁচ দিন পাঁচ রাত ধরে সমানে···"

ফাইনা বিশ্রামের জন্য তাকে নিয়ে গেলো অন্য ঘরে। যাবার সময় জুলিয়াকে বলে গেলো কিছুক্ষণের জন্য সেও তার নিজের ঘরে যাচ্ছে—অন্ততঃ কাপড়-জামাটা বদলাতে। রক্তের গন্ধে তার পেটের ভিতর অবধি পাক খাচ্ছে—আর ঘামে ভিজে সপসপে হোয়ে গেছে অন্তর্বাস।

আর একটি সার্জনও বলে উঠলো—"আমিও আর পারছি না—' বলতে বলতেই অদৃশ্য হোলো। অলগা রোগীদের ড্রেস করানো ঘরে একটা ডিভানের উপর শুয়ে পড়েই বলে উঠলো,—"এক সেকেণ্ড ঠিক এক সেকেণ্ডের জন্যে একটু···" বলতে বলতে, মুখের কথা শে

ছোটদের আসর

"শান্তিনিকেতন"

শ্রীসাধনা কর

বোলপুর প্রান্তরের অবারিত সৌন্দর্যে, দুটি ছাতিম গাছের ছায়ায় এবং দিগব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে যে একটি নির্মল সত্য এবং আনন্দরূপ বিরাজিত ছিল, তারই আকর্ষণে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রান্তরে মাঝে-মাঝে আশ্রয় নিতেন। 'ডাঙা' নামেই এই প্রান্তর ছিল পরিচিত—এখনো গ্রামবাসিগণ এ স্থানটিকে 'শান্তিনিকেতন ডাঙা' বলে থাকে। সেদিন মহর্ষিদেব এই প্রান্তরের মধ্যে যে একতলা গৃহে এসে থাকতেন সেটিরই নাম দিয়েছিলেন "শান্তিনিকেতন"। সেদিন ছাতিমতলাটি ছিল তাঁর অন্তরের গভীর উপলব্ধির স্থল, এখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশটিরও একটিমাত্র বাস্তব সংজ্ঞা ছিল ঐ "শান্তিনিকেতন"। গৃহটির নামের থেকেই জায়গারও নামকরণ হয়। ছাতিমতলায় খোদাই করা ছিল "তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি;" আর "শান্তিনিকেতন" গৃহটির মাথায় লিখিত হয়েছিল "সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দং।"

আগে মহর্ষিদেব প্রান্তরের এই অংশে তাঁবু স্থাপন করে সাধনা করতেন। "কিছুদিন পরে এখানে স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করিতে মনস্থ করিয়া সন ১২৬৯ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ভুবনবাবুর পুত্রদের নিকট কুড়ি বিঘা ভূমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনা ধার্য করিয়া মৌরসী পাট্টা গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে এই জনশূন্য প্রান্তরে বহু অর্থব্যয়ে বাসোপযোগী প্রথমে একতলা পরে দোতলা পাকা ইমারত প্রস্তুত হইল, প্রয়োজনীয় গৃহোপকরণ আসবাবাদি সংগৃহীত হইল, আম জাম নারিকেল কাঁটাল আমলকী শাল দেবদারু বকুল কদম্ব প্রভৃতি বিবিধ ফলবনে ও ছায়াতরু সকল রোপিত হইল, নানাজাতীয় পুষ্পসম্ভারে প্রস্ফুটিত মালতী ও মাধবীর লতাবিতানে কঙ্করময় ঊষরভূমি পরম শোভাময় হইয়া উঠিল। মহর্ষি এই পরম রমণীয় উদ্যানবাটিকার নাম দিলেন 'শান্তিনিকেতন'—("শান্তিনিকেতন আশ্রম" গ্রন্থ, পৃ ১৩)।

রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডেও গ্রন্থকার লিখেছেন যে এই প্রান্তরে যখন জমি কেনা হল "তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। কালে দেবেন্দ্রনাথ তথায় একখানি ক্ষুদ্র একতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন, উত্তরকালে উহা শান্তিনিকেতন অতিথি-শালায় পরিণত হয়।"

মহর্ষিদেবের শান্তিনিকেতন বাসকালের সম্বন্ধে "শান্তিনিকেতন আশ্রম" নামক গ্রন্থে আছে "মহর্ষির অন্তরঙ্গ সখা রায়পুরনিবাসী বাবু শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের নামোল্লেখ না করিলে মহর্ষির শান্তিনিকেতন প্রবাসের কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মহর্ষি ইঁহাকে শান্তিনিকেতনের 'বুলবুল' বলিতেন।"

"ইনি বহু সময় শান্তিনিকেতনে মহর্ষির সহবাসে থাকিয়া সেই নির্জন শান্ত শান্তিনিকেতনকে ঝঙ্কারিত করিয়া রাখিতেন"—(পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী'—পৃ ২১৭)।

এই দুটি স্থানে শান্তিনিকেতন যে-অর্থে উল্লিখিত হয়েছে সেটা স্থানের নাম অর্থে—এখন যে-অর্থে শান্তিনিকেতন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শান্তিনিকেতন গৃহের নাম থেকেই যে স্থানের নামও হয়ে দাঁড়ায় শান্তিনিকেতন, এ কথা কম লোকেই জানে।

এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই বোলপুরের কুঠিবাড়িতে আসেন। হয়তো এর আগেও পিতামাতার সঙ্গে এসে থাকতে পারেন, কারণ মহর্ষিদেব এবং তাঁর পুত্রকন্যাগণ এখানে প্রায়ই আসতেন। কিন্তু সে ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-বয়সের নয়। এগারো বছর বয়সে বোলপুরে আসাটাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা, তাই এটাই তিনি জীবনস্মৃতিতে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করে গেছেন। এ থেকে জানা যায় যে ১৮৬৩—৭২ সালের মধ্যে এ বাড়িটি তৈরী হয়েছিল। এই একটিমাত্র বাড়িই সমস্ত প্রান্তরে শোভা পেত। মহর্ষিদেব এখানে এসে এই বাড়িটিতেই মাত্র বাস করে গেছেন। এরই কাছাকাছি আরেকটি একতলা ঘর ছিল—রান্নাঘর—এখন সেটি শিল্পভবনের গৃহ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখছেন "আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সঙ্গে বোলপুরের প্রভেদ এই ছিল যে, কুঠিবাড়ি হইতে রান্নাঘরে যাইবার পথে যদিও কোনোপ্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌদ্র বৃষ্টি কিছুই লাগে না।"

তখন হিমালয় পাহাড়ে সাধনা করতে যাবার পথে মহর্ষি মাস দুয়েক এ বাড়িতে থেকে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিনের স্মৃতি সম্বন্ধে লিখছেন "এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন ক'রে এবং রুক্ষ রিক্তভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ ক'রে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জন বাস। যখন রেল-লাইন স্থাপিত হল তখন বোলপুর ষ্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রাভঙ্গ করতেন।"

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আশৈশব ছিলেন শাসনাবদ্ধ। এই বোলপুরের বাড়িতে এসেই প্রথম মুক্তি লাভ করেন। "আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা" নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ বলছেন "অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা-খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতাও নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ, এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারদিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। * * * সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তারপরে আমার অবাধ ছুটি। * * * আমার

'পরে একটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তারপরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে, আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম।"

সেবার রবীন্দ্রনাথ এক মাস এ বাড়িতে থেকে যান।

অনেক দিন অবধি এইটিই ছিল এখানকার একমাত্র বাড়ি। ১২৯৭ সালে রাজধানীর রাজনৈতিক উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন চলে আসেন। রবীন্দ্রজীবনীতে আছে "কিন্তু এই রাজনৈতিক উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস কোথায় গেল? অল্প দিনের মধ্যে কবিকে দেখি শান্তিনিকেতনে, একলা দোতলার বাড়িতে আছেন, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিপার্শ্বিক, নূতন পটভূমে কল্পনাবিলাসী মনের নবতর বিচরণভূমি। বহুকাল পরে লিখিলেন, কয়েকটি লিরিক, 'ভালো করে বলে যাও'। (৭ জ্যৈষ্ঠ), 'মেঘদূত' (৮ জ্যৈষ্ঠ), 'অহল্যার প্রতি' (১২ জ্যৈষ্ঠ)।"

শান্তিনিকেতনে এই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রীষ্ম যাপন। জ্যৈষ্ঠ মাসেও কালবৈশাখীর ঝোড়ো খেলার শেষ হয় নাই, কবির নূতন অভিজ্ঞতা।

প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়।" 'শান্তিনিকেতন' গৃহের উপরে দক্ষিণ দিকে খোলা বারান্দা, ছাদ; পূর্ব দিকে বারান্দা, নীচে বারান্দা। এই বারান্দা এবং ছাদে দাঁড়িয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতেন।

১৩০১ সালের আশ্বিন মাসের দিকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন চলে আসেন, কবিতা লিখবার উপযোগী নির্জনতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজন। সে সময়কার কথা রবীন্দ্রজীবনীতে আছে "তখনকার শান্তিনিকেতনে দোতলা-অতিথিশালা ও ব্রহ্মমন্দির ব্যতীত আর কোনো ঘরবাড়ি আশেপাশে ছিল না।

"এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে শালবনের বেষ্টনে সমস্ত দরজা খোলা [illegible] দোতলায় একলা ঘরে বসে তিব্বত সম্বন্ধে ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিতেছেন; 'সাধনা' নামে একটি কবিতা লিখলেন এইখানে (৭ কার্তিক ১৩০১)।"

কার্তিক মাসে হঠাৎ জোর বাদলা শুরু হয়; কবি শান্তিনিকেতনেই। রবীন্দ্রনাথ তখন 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক এবং বাড়িতে বসে তার জন্যে লিখছেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

এস্কিমো উপকথা

শ্রীতরুণকুমার দত্ত

আজ তোমাদের বলি শোন এস্কিমো উপকথা শুকতারার গল্প। শুকতারা চেন? ভোর বেলা পূর্ব দিকে কিংবা সন্ধ্যা বেলা পশ্চিম দিকে যে তারাটি সব চেয়ে জ্বলজ্বল্ করছে, সেটি হচ্ছে শুকতারা। আমরা ত' বলি শুকতারা কিন্তু এস্কিমোদের দেশের ছেলে-মেয়েরা তা বলে না; তারা যা বলে তার মানে হচ্ছে "লোকটি এখনও দাঁড়িয়ে শুনছে।" কিন্তু তারা এমন অদ্ভুত নাম কেন দিল এখন সেই কথাই বলি শোন।

সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন এস্কিমোদের দেশে থাকত এক বুড়ো। বুড়োটি ছিল ভারি বদরাগি আর খিট্‌খিটে, সেই জন্য কেউ তাকে পছন্দ করত না। কোন ছেলে তার বাড়ীর সামনে এসে একটু হেসে খেলা করলেই বুড়ো রেগে লাঠি নিয়ে তেড়ে যেতো। সে ছোট ছেলে-মেয়েদের হাসি মোটেই ভালবাসত না। কি ভীষণ রাগি লোক বল ত'? একদিন বুড়োটি একটা বর্শা হাতে নিয়ে সাদা বরফের ওপর দিয়ে চললো সিল মাছ শিকার করতে। যেতে যেতে সে একটা গর্তের কাছে এসে দাঁড়াল। সেই গর্তে ছিল অনেক সিল মাছ। সে কান পেতে শুনতে লাগল সিল মাছগুলো গর্তের মুখের দিকে আসছে কিনা। সে যেখানে ছিল তারই কাছে ছিলো দুটো খাড়াই পাহাড়। আর পাহাড় দুটোর মাঝে ছিল একটুখানি জায়গা। সেইখানে এক দল ছোট-ছোট ছেলে খেলা করছিল।

যেই গর্তের কাছে একটা সিল মাছের মুখ দেখা যায় তখুনি ছেলের দল হো-হো করে হেসে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে সিল মাছ পালিয়ে যায়। তাই না দেখে বুড়ো ত' রেগে আগুন। সে কি করলে জান? একটা বর্শা নিয়ে ছেলেদের পিছন পিছন ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে বললে, "তোরা দূর হয়ে যা এখান থেকে, যত সব পাজি ছেলের দল!" তার পর আবার সে ফিরে এলো সিল মাছ শিকার করতে।

পিছন পিছন ছেলের দলও ফিরে এলো। আবার আগের মত তারা হাসতে লাগল। তখন বুড়ো বললে, "না, এ ভাবে এদের হাসির শব্দ শোনান যাবে না, পাহাড়ের মাঝের রাস্তাটা বন্ধ করে দিতে হবে। তাহলে আর এদের হাসির শব্দ শোনা যাবে না।" এই বুড়োর ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা-বলে সে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারত। সে বলে উঠলো, "পাহাড়ের মাঝের রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাক্, বন্ধ হয়ে যাক্। এদের গোলমালে—আমি কিছুতেই সিল মাছ ধরতে পারছি না।" সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই পাহাড়ের রাস্তাটি বন্ধ হ'য়ে গেল।

এমন ভাবে রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গেল যে ছেলের দল কিছুতেই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারল না। তাদের চারিদিকে সাদা বরফের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় আর মাথার ওপর একটুখানি কুয়াশা-ঢাকা আকাশ। প্রথমে তারা বেরিয়ে আসার জন্য খুব ছোটাছুটি করলে কিন্তু যখন বেরিয়ে আসতে পারল না, তখন বরফের ওপর বসে পড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। কিন্তু কাঁদলেই বা কি হবে, কেউ ত' তাদের কান্না শুনতে পাচ্ছে না। এদিকে তাদের খিদে পেয়ে গেল। তখন খিদের জ্বালায় তারা আরো জোরে কাঁদতে লাগল। এক জন বললে, "আমরা এখন কি করেই বা খাবার পাব ভাই, আমরা সকলে নিশ্চয় না খেয়ে মরে যাব।"

তখন উপর দিয়ে এক দল সামুদ্রিক পাখী উড়ে যাচ্ছিল, তারা এদের কান্না আর ওই কথা শুনতে পেল। পাখীগুলোর মনে বড়ো দয়া হল আর তারা কিছু খাবারের টুকরো তাদের কাছে ফেলে দিল। ছেলের দল আনন্দে কুড়িয়ে কুড়িয়ে পাখীদের দেওয়া খাবার খেতে লাগল। কিন্তু অত কম খাবারে কি তাদের খিদে মেটে?

আবার তারা কাঁদতে লাগল। একটা ছেলে বললে, "দেখ,

মিছে কেঁদে লাভ নেই, তার চেয়ে আমি পাহাড় বেয়ে ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাই। তার পর বড়দের সাহায্যে তোমাদের উদ্ধার করা যাবে।" সেই কথা মত ছেলেটি অপর একটি ছেলের কাঁধের ওপর উঠে পাহাড় বেয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পাহাড়ের গা-টা ছিল এমন তেলা যে, সে কিছুতেই একটুও উঠতে পারল না। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল বরফের ওপরে। আহা, বেচারার শীতেও ঘাম ঝরতে লাগল!

এদিকে গ্রামের লোক বেরিয়েছে তাদের খোঁজে। কিন্তু তারা কোথাও ছেলেদের খুঁজে পেল না। কি করেই বা খুঁজে পাবে? অমন জায়গা থেকে কি খুঁজে পাওয়া যায়?

এদিকে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ছেলেদের বড় ভয় পেতে লাগল। আর তারা আবার ভীষণ কাঁদতে লাগল। ভয়ে তারা সবাই মিলে সমুদ্র-দেবতাকে ডাকতে লাগল। তখন তাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে সমুদ্র-দেবতা তাদের কাছে এলেন আর একটি সুড়ঙ্গ করে দিলেন। তখন তাদের কি আনন্দ! আনন্দে চিৎকার করতে করতে তারা সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। ছুটতে ছুটতে হাজির হল যে যার নিজের বাড়ীতে। তারা সব কথা বলে দিল বাড়ীর সবাইকে। তখন গ্রামের লোকে জড় হয়ে ছুটল, রাগি বুড়োর বাড়ীর দিকে··· তারা সবাই ঠিক করল যে, "আজ বুড়োকে একদম মেরে ফেলতেই হবে।" বুড়ো তাদের আসতে দেখে ছুটল তার বাড়ী-ঘর-দোর সব ফেলে দিয়ে।

তখন সমুদ্র-দেবতা এগিয়ে এলেন আর বুড়োকে বললেন, "দেখ বুড়ো, তুমি মহা অন্যায় করেছ। তোমায় শাস্তি পেতেই হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিল মাছের শব্দ শোনাটাই যদি তোমার কাছে বড় কাজ হয়, তবে চিরকাল তুমি তাই করবে।"

সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর দেহ ঝলমল্ করে উঠল আর সে সাঁ করে আকাশে উঠে গিয়ে তারা হয়ে গেল। সেই থেকে এখনও সেই বুড়োটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিল মাছের শব্দ শুনছে। এই বুড়োই হল আমাদের শুকতারা। শুনলে ত' শুকতারার গল্প আর কেনই বা এস্কিমো ছেলে-মেয়েরা তাকে বলে, "লোকটি এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।*

গল্প হলেও গপ্পো নয়

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ ঘটনাটা যে সময়ের, সে-সময়ে তোমরা তো জন্মাওইনি বরং তোমাদের অনেকেরই বাবা-কাকা-মামারাও সেদিন ঠিক তোমাদের আজকের মতই ছোট্ট ছিলেন। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল জান?—একটা ট্রেণের মধ্যে। সেই ট্রেণটির কোনও একটি কামরাতে ছিলেন এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, দুটি মিলিটারী সৈন্য ও আর একজন বাঙালী সন্ন্যাসী।

আচ্ছা, স্থান-কাল-পাত্র তো হোল, এইবার গল্পটা সুরু করা যাক। ট্রেণটি ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়িয়েছে একটি ষ্টেশানে। ট্রেণটির ভিতরে একটি কামরার যাত্রীদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আগেই করিয়ে দিয়েছি। সেই সাহেব দু'টিকেও তোমরা চিনেছ। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চা-সিগারেট-পান-বিড়ী ইত্যাদি বিক্রী করে জান তো, এখন সেই সাহেব দু'টি প্ল্যাটফর্ম থেকে দু'টি কমলা লেবু কিনল, তার পর ট্রেণ ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা কমলা লেবু খেতে আরম্ভ করল। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তারা লেবুর ছিবড়েগুলো যথাস্থানে না ফেলে ফেলতে লাগল মহিলাটির মুখাবয়ব লক্ষ্য করে। তখন ভারতে স্বাধীনতার আস্বাদন ভারতবাসী পায়নি, ভারত তখন পরাধীন আর তখনকার ভারতীয় জননীরাও আপনার মান আপনি রাখতে আজকের মত কৃপাণ ধরতে এতটা সাহসী হননি। তদুপরি সাদা-কালার পার্থক্য তো নিজেদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সে ক্ষেত্রে মুখ বুজে গোরাদের সমস্ত লাঞ্ছনা তাঁরা সহ্য করে যেতে লাগলেন—যেমন দু'শো বছর ধরে কয়েক জন বাঙালী নিজের স্বার্থের খাতিরে, পদোন্নতির লোভে, অভিজাত সমাজে নিজের নাম তালিকা-ভুক্ত করাবার লোভে এমনই মুখ বুজে বুজে বিদেশী বণিককে রাজার আসনে বসিয়ে তার ক্ষমতা বাড়িয়ে আজকের দিনের এই জাতিগত দৈন্যকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম করে তুলেছে।

সহ্য করলেন না কিন্তু সেই প্রশান্ত সন্ন্যাসী অসভ্য দাম্ভিক কামাসক্ত কুত্তাদের এই জঘন্যতম আচরণ। তাঁকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করল। তারই পথের এক অগ্রগামী পথিকৃৎ বিবেকানন্দের শক্তি যেন তাঁর মধ্যে আবার নবভাবে রূপ পরিগ্রহ করল। স্বীয় আসন থেকে উঠে এলেন তিনি আস্তে আস্তে, কামরার দরজাটি খুললেন, তার পর লোকে যে ভাবে পুতুল তোলে ঠিক সেই ভাবে গোরা দু'টিকে দু'হাতে তুলে চলন্ত ট্রেণ থেকে সটান ফেলে দিলেন নীচের দিকে। তার পর তাদের কি হোল তা তোমরা বুঝেই নাও।

গোরাদের এই ভাবে দমন করে আচ্ছা করে ভর্ৎসনা করলেন তিনি সেই মহিলাটির পতিদেবতাটিকে। যিনি পথে স্ত্রীকে শত্রুর কবল থেকে বাঁচাতে পারেন না, তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেরুনো কেন? আর স্ত্রীকে যিনি পাষণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন না তাকে তিনি বিয়েই বা করেছেন কেন?

তাহলে দেখছ, ঐ রকম চাংড়াই গোরা দুটিকে যিনি পুতুলের মত তুললেন তিনি কত শক্তিমান ছিলেন আর সেই সঙ্গেই বুঝছ মানুষের মত বাঁচতে হলে শক্তিচর্চার কত প্রয়োজন। একদিন তোমরাও বড় হবে, একদিন তোমাদের উপরই পড়বে দেশ-শাসনের গুরুভার, কিন্তু সেই সঙ্গে জননী-ভগিনীদের পবিত্রতা রক্ষার ভারও তোমাদের উপরেই পড়বে।

আজকাল দেশের বহু সত্যিকারের রত্নেরা ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছেন। সেই স্মৃতির কোষাগার থেকে মুছে যাওয়া মনীষীদের মধ্যে আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বা বীরশ্রেষ্ঠ তাপস সোহহং স্বামী অন্যতম। আজ তোমরা এত উন্নত, এত আলোকপ্রাপ্ত এঁদের মতই কয়েক জন মহাপুরুষের দানে। কিন্তু প্রতিদানে আজ তোমরা এঁদেরই ভুলে যাচ্ছ দিনের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। তাই আর অকৃতজ্ঞতার বোঝা না বাড়িয়ে সেই বিস্মৃতির অতল তলে বিলীন-হয়ে-যাওয়া মহানায়কদের আবার তোমরা—অনাগত কালের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের—অনাঘ্রাত কচি গোলাপের পাঁপড়ির দল—স্থাপন কর স্মৃতির গৌরীশিখরের তুঙ্গ শীর্ষে।

---

* 'The Golden Book of knowledge'এর Who Becomes a Star গল্প অবলম্বনে রচিত।

বন্দে মাতরম্

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

ভারতবর্ষের প্রকৃতি

ভারতবর্ষ আর তার মাঝে যেই সব দেশ রয়
মোটামুটি পেলে এতখন ধরি তাহাদের পরিচয়।
এ দেশ মোদের গ্রীষ্মপ্রধান প্রথমত ধরা যায়,
উত্তরাপথে দক্ষিণাপথে তবুও প্রভেদ পাই।
গোলকের মানচিত্রে চাহিলে সেইখানে যায় দেখা
ভালো বাসি যেন জড়াইয়া আছে ওইটিকে বহু রেখা।
দুটি রেখা দেখো নহে একটানা, যেন কাটা-কাটা আঁকা,
মাঝখানে ওই বিষুবরেখার দু'দিকে দু'ভাবে বাঁকা।
বিষুবরেখার উত্তরে বাস কর্কটক্রান্তির,
দক্ষিণ দিকে মকরক্রান্তি নীচু করে আছে শির।
দুইটি রেখার দুই দিকে, যথা উত্তরে দক্ষিণে
দেশগুলি সব কাঁপে থরথর প্রখর রৌদ্র বিনে।
কিন্তু ও-দুটি রেখার মাঝারে যে ভাগ তাহার পরে
সূর্যের তেজ অতি প্রচণ্ড ঠিক খাড়া হয়ে ঝরে;
তাই সে ভূভাগ গরম বলিয়া সকলের আছে জানা
ভারতের যত দখিণের দেশ ওই ভাগে দেখো টানা।
উত্তর ভাগে শীত ও গ্রীষ্ম সমান প্রবল হয়;
দক্ষিণ ভাগ গরম হলেও অসহনীয় সে নয়;
কারণ এ ভাগ প্রথমত উঁচু, আর তিন দিকে জল;
দীপ্ত সূর্য তাই তো সেথায় হৃততেজ, হতবল।

দুই খণ্ডের মাটি

মাটিতে শস্য তৃণ গাছপালা, মাটিই জীবন-সার;
মাটি নিয়ে তাই পৃথিবীর সাথে মানুষের কারবার।
মাটি পাথরের বিকার মাত্র গলিত চূর্ণ রূপ
বসুন্ধরা যে আসলে পাষাণী বক্ষে পাষাণ-স্তূপ।
সাধুরা তো বলে আমাদের দেহ গড়েছে মাটিই খাঁটি
মাটি হতে সব এসেছি আমরা মরিলে হইব মাটি।
তোমরা তো জানো পাহাড় গুঁড়ায়ে নদ-নদী নীচে নামি
তা-ই দিয়ে গড়ে নরম কোমল পলিমাটি সেরা দামী।
আর কালো মাটি যা আছে ধরায় গলিত পাষাণ তা যে,
অগ্নিদেবতা আগ্নেয়গিরি লাগায় অন্ত কাজে।
উত্তরাপথে সবটাই প্রায় পলিমাটি চোখে পড়ে,
দক্ষিণাপথ আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যাগারে গড়ে;
যামন যদিও দক্ষিণাপথ, বয়সে অনেক বড়ো,
সেই তো প্রথম এসেছে ভারতে পাথর করিয়া জড়ো;
তার আগে ছিল উত্তরাপথ জলময় জল-দেহ
নদ-নদী তারে দিল মাটি-রূপ একথা কি জানো কেহ?
উত্তরকালে দু'পথ ধরিল বিন্ধ্যগিরির ধার,
দুটি প্রাণ যেন এইখানে আসি মিলে হলো একাকার।
কেবা আগে ধায়, কেবা অনুগামী, বয়স কাহার কত,
বড় হলে সব পাবে ভূতত্ত্বে তথ্য সে শত শত।

দেশভেদে হয় জলবায়ুভেদ, আর তাহা কেন হয়
সে কথা জানিলে ঋতু-পরিচয়ে হয়ে যাবে প্রত্যয়।
মেঘমালা উঠি সাগর হইতে বাতাসে উড়িয়া পরে
বৃষ্টির ধারা রূপে দেশে দেশে ঝমঝম্ করি ঝরে।
পবন দেবতা কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে ছুটে যান
তারি পরে করে নির্ভর যত বৃষ্টির পরিমাণ।
সিন্ধু দেশটা চাতকের মতো চাহিছে 'ফটিক জল',
আসাম কিন্তু অতিবৃষ্টির বনময় অঞ্চল।
বাদল বাতাস বলি মোরা যারে তার চলিবার রথ
দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ধরে উত্তর-পুব পথ।
প্রথমে এ বায়ু অঝোরণ জল ঢেলে মালাবার-বুকে
পশ্চিমঘাটে বাধা পেয়ে ঘুরে বাংলায় এসে ঢুকে।
তার পরে জেনো উত্তরাপথে এই বায়ু যায় বেঁকে—
উত্তর-পশ্চিমে গতি তার দক্ষিণ-পুব থেকে।
এ বায়ু ঝরায় বঙ্গ-আসামে প্রচুর শীতল জল
বর্ষা ঋতুর বর্ষণে জাগে তরু-লতা-তৃণদল।
বাদল বাতাস পারে না ধরিতে পঞ্চনদের তীর,
তাই তো বঙ্গ ভাসে যবে জলে, পাঞ্জাবে নাহি নীর!

কৃষিক্ষেত্র

ভারতবর্ষ কৃষির ক্ষেত্র প্রধানত বলি খ্যাত,
রপ্তানি হয় কত যে দ্রব্য এদেশের কৃষিজাত।
এদেশ আমার ঋষিদেরো দেশ ঋষিরা সেকালে সব
বনে বনে বসি মনে এনেছিল মানসিক বৈভব।
দণ্ডকবন, নৈমিষবন অথবা বৃন্দাবন
ঋষিদের ছিল তৃষিত ক্ষেত্র নন্দন-নিকেতন।
এদেশের রাজা জনক ঋষির খ্যাতি ছিল কৃষিবল,
কৃষ্ণের ভাই বলরামে চিনি কাঁধে যাঁর লাঙ্গল।
অর্থাৎ যাঁরা সেকালে ছিলেন জ্ঞানী-গুণী-যোগী-ধ্যানী
আসলে তাঁহারা বনের মনের সংযোগ সন্ধানী।
তাঁদের লব্ধ সত্যের ধারা আজো প্রবাহিত ওই,
তাই তো ভারতে কৃষিজীবী দেখো শতকরা নব্বই।
এদেশের মাটি নগর গড়েনি গড়েছে কেমল গ্রাম,
সংখ্যা তাদের সাতটি লক্ষ, নিযুত নিযুত ধাম।
নগর-সংখ্যা হাতে গোণা যায়, সপ্তদশক কি না
সে কথা বলিতে বাধে না আদৌ, বলা যায় শ্রম বিনা।
সন্ধান যদি পেতে চাও এই ভারতের আত্মার
নগর ছাড়িয়া যাও তবে গ্রামে, সেইখানে আছে সার;
এ যুগের কবি বলেছেন রবি এ-কথা, মিথ্যা নয়।
সভ্যতা হেথা আসলে গ্রামীণ, ছড়াইয়া গ্রামময়।
যদিও ইহার শাখা-সঞ্চারে পাই না আকিঞ্চন,
তবু দেখো এর মূলে দেয় রস সেকালের তপোবন;—
এ-কথা যাহারা পারে না ধরিতে ভ্রান্ত তাহারা ঠিক,
তাদের চোখেতে পড়ে নাকো দৃঢ় সত্য ভৌগোলিক।

(আগামী বারে সমাপ্য)

বহুশোভমানা হৈমবতী উমা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

উমা আমাদের চিত্তে সত্য সত্যই বহুশোভমানা। কখনও তিনি তাঁহার অতসীকুসুমবর্ণাভা দীপ্তিতে মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তিতে বিরাজমানা, কখনও আবার তাঁহার নবীন হেমকান্তিতে আমাদের স্নেহের দুলালী আদরিণী কন্যা। এই শৈলসুতা পার্বতী হিমালয়ের কোন্ বিপুলপ্রান্তভূমিতে নবজলদশব্দে ঈষদুদ্ভিন্ন রক্তকান্তি শস্যাঙ্কুররূপে প্রথম দেখা দিয়াছিলেন, তখনকার দিক্‌সমূহের প্রসন্নতা, ধূলিহীন বায়ুপ্রবাহের ভিতরে কাঁহারা পুষ্পবৃষ্টি এবং শঙ্খনাদের দ্বারা এই দেবীর আবির্ভাব স্বাগত করিয়াছিলেন, কেহই সে কথা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেন নাই। হিমালয়ের সেই গহন রহস্যভূমিতে আজ আর আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, আজ শুধু দূর হইতে বুদ্ধির সাহায্যে সম্ভাবনা বিচার।

উমা শব্দটি কি সংস্কৃত শব্দ? ইহার অর্থ কি? অভিধানে ইহার স্পষ্ট কোনও প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ করা হয় নাই। কতগুলি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার অধিকাংশই মনগড়া। কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'উ' শব্দের অর্থ শিব, আর 'মা' শব্দের অর্থ শ্রী; শিবের শ্রী এই অর্থে পার্বতী হইলেন উমা। আবার 'মা' শব্দের অর্থ 'মননকারী'ও করা হইয়াছে, যিনি শিবকে (পতিরূপে) ধ্যান করেন তিনি উমা। 'মা' শব্দের 'পরিমাণ করা' অর্থও লওয়া যাইতে পারে, শিবের যিনি পরিমাপক, অর্থাৎ যাঁহার ভিতর দিয়া অপরিমেয় শিব সৃষ্টিপ্রপঞ্চরূপে পরিমিত হন সেই শক্তিরূপিণীই হইলেন উমা। আমাদের কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে উমা অর্থ শিবের শ্রীই গ্রহণ করিয়াছেন।—

"উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তাঁর।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার॥"

কবি কালিদাস কিন্তু অন্য কথা বলিয়াছেন। মদনভস্মের পরে শিব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পার্বতী হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গে গমন করিয়া একাকিনী কৃচ্ছ্রতপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন, স্নেহের দুলালী কন্যার নবযৌবনে এই তপঃকৃচ্ছ্রতা মায়ের অন্তরে আঘাত করিল, তিনি কন্যাকে বলিলেন,—'উ মা'—'ওগো, তুমি আর এই তপস্যা করিও না।'—

তাং পার্বতীত্যাভিজনেন নাম্না
বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উ মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম॥

"বন্ধুজনেরা স্বজনপ্রিয়া তাহাকে তাহার কুলোপাধি অনুসারে পার্বতী বলিয়া ডাকিতেন, পরে 'উ—ওহে, মা—তপস্যা করিও না'—এই বাক্য দ্বারা সে মাতা কর্তৃক তপস্যা হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সেই সুমুখী উমা আখ্যা লাভ করিয়াছিল।" এখানে একটি জিনিস বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে; উমা নামটি হিমালয়দুহিতার মূল নাম নহে, মূলে তিনি পার্বতী, গিরিজা প্রভৃতি নামেই খ্যাতা ছিলেন, যেমন করিয়া হোক, উমা নামটি তাঁহার সম্বন্ধে পরে প্রযুক্ত হইয়াছে। কালিদাস যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে কাব্য-চমৎকৃতি বর্ধিত হইয়াছে, কিন্তু উমা শব্দটির মূল অর্থ সম্বন্ধে সংশয় আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে কুমারসম্ভবে কালিদাস প্রদত্ত এই ব্যাখ্যারই প্রতিধ্বনিমাত্র দেখিতে পাই।—

যতো হি তপসে পুত্রি বনং গন্তুঞ্চ মেনকা।
উ মেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী॥

পুরাণাদিতে উমা শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়; সে সব ব্যাখ্যায় তত্ত্ব-গভীরতা যাহাই থাক, ব্যুৎপত্তিগত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান মেলে না। বরাহ-পুরাণে বলা হইয়াছে,—পূর্বে নারায়ণ একা ছিলেন, এই হরির পরে আর কিছুই ছিল না। তিনি একা একা কখনই রতি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার এইরূপে দ্বিতীয় চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধ্যাত্মিকা চিন্তা হইল, এই চিন্তা অভাব-সংজ্ঞা এবং ভাস্করসন্নিভা; তিনি তখন দ্বিধাভূত হইলেন—এই দ্বিধাভূতত্বই হইল উমা; এই উমাই একাক্ষরীভূত হইয়া উমা সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং এই সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।

পূর্বং নারায়ণস্ত্বেকো নাসীৎ কিঞ্চিদ্ধরেঃ পরম্।
সৈক(?)এব রতিং লেভে নৈব স্বচ্ছন্দকমনুঃ॥
তস্য দ্বিতীয়মিচ্ছন্তশ্চিন্তা বুদ্ধ্যাত্মিকা বভৌ।
অভাবেত্যেব সংজ্ঞাসা ক্ষণন্তাস্করসন্নিভা॥
তস্য অপি দ্বিধা ভূতা চিন্তাভূদ্ ব্রহ্মণাদিনঃ।
উমেতি সংজ্ঞা যত্তৎ সদা সাধ্যা ব্যবস্থিতা॥
উমেত্যেকাক্ষরীভূতা সসর্জেমাং মহীন্তদা।

ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ শ্রুতি—'তিনি একাকী রমণ করিতে পারেন নাই' প্রভৃতির সহিত শিব-শক্তি-তত্ত্বকে মিলাইয়া দিয়া একটা ব্যাখ্যার চেষ্টা মাত্র। উমা কথাটিকে অনেকে 'অ-উ-ম'-জাত ওঁ বা প্রণবেরই রূপান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রণবই গায়ত্রীর বাচক, আর গায়ত্রীই ভর্গরূপিণী আদিশক্তি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ব্রহ্মা দেবীকে স্তুতি করিয়াছেন—

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥

কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন, "উমার স্বরূপ—'ওঁ মা'"। স্বমত পরিপোষণের জন্য উমা শব্দের যিনিই যে ব্যাখ্যা দিন না কেন, কোন ব্যাখ্যাই সর্বজনগ্রাহ্য নহে, উমা শব্দের ব্যাখ্যার এই বৈচিত্র্যই আমাদের মনে সংশয় তুলিয়াছে, হয়ত উমা শব্দটি মূলতঃ কোনও সংস্কৃত শব্দ না-ও হইতে পারে।

উমাকে আমরা দেবীরূপে কখন কি ভাবে পাইয়াছি তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে 'কেন'-উপনিষদের উল্লেখ করিতে হয়। এই স্থানে আমরা উমার আবির্ভাবের সহিত ইন্দ্রের একটা যোগ দেখিতে পাই, ইন্দ্রই জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে এই দেবীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ দেবীসূক্ত ছাড়া বৈদিক-সাহিত্যে শক্তিরূপিণী দেবীর বর্ণনা পাই আমরা অথর্ববেদে, এবং আমার মনে হয়, এই উল্লেখই বৈদিক সাহিত্যে দেবীর স্পষ্টতম উল্লেখ। এখানে দেবী সম্বন্ধে চারিটি সূক্তের মধ্যে দেখিতে পাই—এই দেবী "সিংহে, ব্যাঘ্রে এবং

...ভিতরে ; দীপ্তি যিনি অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে ; ইন্দ্রকে জন্ম ...ছেন যে সুভগা দেবী, তেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে ...ন।"

সিংহে ব্যাঘ্রে উত যা পৃদাকৌ
ত্বিষি অগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান
সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা॥ ইত্যাদি।

...নও তাহা হইলে ইন্দ্রের সহিত দেবীর একটি বিশেষ যোগ লক্ষ্য ক...ছি। কি অবস্থার ভিতরে কেনোপনিষদে দেবী ইন্দ্রের সম্মুখে ...র্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে হইলে সংক্ষেপে সেই ...নটির আলোচনা করা দরকার। দেবাসুরে যুদ্ধ হইলে পর ... দেবতাগণের জন্য বিজয় লাভ করিলেন, দেবতাগণ এই ... ভিতর দিয়া সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের মহিমা উপলব্ধি করিতে ...লেন না, তাঁহারা 'আমাদেরই এই বিজয়' বলিয়া নিজদিগকেই ...ন্বিত মনে করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম দেবতাদিগকে শিক্ষা দিবার ... তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, দেবতারা বুঝিতে পারিলেন ... এই পূজনীয় পুরুষ। দেবতারা প্রথমে অগ্নিকে পাঠাইলেন ...রুষকে জানিতে। অগ্নি সম্মুখস্থ হইলে এই পুরুষ জিজ্ঞাসা ...লেন, 'তুমি কে, তোমাতে কি শক্তি আছে?' অগ্নি উত্তর ...ন, 'আমি জাতবেদা, সব কিছু পোড়াইয়া ফেলিতে পারি।' ... তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখা হইল, তিনি তাঁহার সর্বশক্তি ...য়োগ করিয়াও সেই তৃণ দগ্ধ করিতে পারিলেন না। বায়ুরও ঠিক ...দশা হইল। শেষে যখন ইন্দ্র অগ্রসর হইলেন তখন সেই মূর্তি ...রোহিত হইলেন। ইন্দ্র তখন 'তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম ...শোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্'।—ঠিক সেই আকাশেই একটি স্ত্রীকে ...ত পাইলেন (প্রাপ্ত হইলেন) তিনি বহুশোভমানা হৈমবতী ...। সেই উমা দেবীই ইন্দ্রের নিকটে ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমা বর্ণনা ...প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত করিলেন।

দার্শনিক দৃষ্টিতে এই উমাকে বলা হইয়াছে ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিণী ; ...ত দেবতাগণকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন, এই ব্রহ্মবিদ্যাই ...জ্যোতিরূপিণী আদিশক্তি—প্রথম জ্যোতিরূপা বলিয়া তিনি ...ন্তি—তিনি হৈমবতী। শক্তিরূপিণী উমাই প্রথমে ব্রহ্মের ... ও মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন—ইহাই সুন্দর এবং স্বাভাবিক ...ছ। এই দার্শনিক দৃষ্টি অস্বীকার না করিয়া একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টি ... আমরা উপাখ্যানটিকে বিচার করিতে পারি। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি ... প্রথমেই বড় করিয়া লক্ষ্য পড়ে এই প্রসঙ্গটিতে উমা কথাটির ...। উমা এখানে বিশেষ কোনও ব্যুৎপত্তিগত দার্শনিক অর্থে ...হৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; উমা এখানে নানাভরণ-...ষিতা শোভমানা নারীরূপে বিরাজিতা—ইহা স্পষ্টতঃ দেবীর ...রূপে ব্যবহৃত। এই নামটি এখানে কোনও প্রকার ভূমিকা বা ...পরিবর্জিত ভাবে এমন সহজে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, মনে হয়, এই ...নিষৎকারের নিকট এই নামটি একটি বিশিষ্ট দেবীর নামরূপে ...সিদ্ধ ছিল। অথচ ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, এই কেন-উপ...র পূর্বে কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থেই আমরা আর এই উমা কথাটির উল্লেখ ... নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রসঙ্গে উমা নামটির সহিত 'হৈমবতী' ...টির ব্যবহারও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। হেমকান্তি জ্ঞানের সহিত যুক্ত বলিয়াও যেমন দেবী হৈমবতী হইতে পারেন আবার হিমবৎ-পর্বতের কন্যা বলিয়াও তিনি হৈমবতী হইতে পারেন। উমা শব্দে এখানে যখন নামই বুঝাইতেছে, তখন হৈমবতী শব্দের দ্বারা এখানে হিমালয় পর্বতের সহিত উমার যোগের ইঙ্গিত বুঝানই স্বাভাবিক। তাহা হইলে আমরা এখানে এইটুকু অবগত হইতে পারি যে, কেন-উপনিষৎকার যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন হিমবৎ-পর্বতের কন্যা উমার একটি বিশিষ্ট দেবীরূপে বেশ প্রসিদ্ধি ছিল।

আমরা ইহা ছাড়া আর কোনও আরণ্যক বা উপনিষদে উমার আর কোনও স্পষ্ট উল্লেখ পাই না বটে, কিন্তু পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ অনেক সময় আরণ্যকগুলির ভিতরে উমার উল্লেখ আবিষ্কার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 'সোম' কথাটির ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন, 'উময়া সহ বর্তমানঃ', এবং উমা কথাটিকে তিনি এখানে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বাজসনেয় সংহিতার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার মহীধর ও তৈত্তিরীয় সংহিতার ব্যাখ্যায় ভট্ট ভাস্কর মিশ্র 'সোম' কথাটিকে ঠিক এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার একস্থানে 'অম্বিকা-পতয়ে' শব্দটি আছে, এই গ্রন্থের দক্ষিণ-ভারতীয় সংস্করণে 'অম্বিকা-পতয়ে'-র স্থানে 'উমা-পতয়ে' পাঠ পাওয়া যায়।

আরণ্যক উপনিষদের যুগের পরে আমরা রামায়ণ-মহাভারতে আসিয়া উমার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখি, ধাতুসকলের আকর পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমবানের দুইটি কন্যা ; মেরুদুহিতা মেনা এই হিমবানের মনোজ্ঞা পত্নী, এই মেনাই উক্ত কন্যাদ্বয়ের মাতা। এই দুই কন্যার মধ্যে গঙ্গা হইলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা, আর দ্বিতীয়া কন্যা হইলেন উমা। সুরগণ দেবতাগণের কার্যের নিমিত্ত শৈলেন্দ্র হিমালয়ের নিকট এই ত্রিপথগা নদী গঙ্গাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, শৈলেন্দ্রও এই লোকপাবনী তনয়াকে ত্রৈলোক্যের হিতের জন্য দান করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রের অন্য যে কন্যা ছিলেন, তিনি ব্রত অবলম্বন করিয়া উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই উগ্র তপস্যাযুক্ত কন্যা উমাকে হিমালয় উমার অনুরূপ দেবতা লোকপূজ্য রুদ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন—

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ নাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি॥
যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া॥
তস্যাং গাঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভবৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব॥
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্॥
দদৌ ধর্মেণ হিমবান্ তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া॥
* * * *
যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥

মহাভারতের মধ্যেও আমরা উমা সম্বন্ধে এই-জাতীয় বর্ণনা পাইতেছি। মহাভারতের অনুশাসনিক পর্বে যে প্রসিদ্ধ পার্বতী-মহেশ্বর-সংবাদ রহিয়াছে তাহার ভিতরেও শৈলসুতা পার্বতী উমা নামে পরিচিতা।

ইহার পরে উমা সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচনা দেখিতে পাই, কালিদাসের কুমার-সম্ভব কাব্যে। কালিদাসের মতে দক্ষসুতা সাধ্বী সতীই পিতৃকৃত অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া যোগবলে তনুত্যাগ পূর্বক জন্মলাভ কামনায় শৈলবধূ মেনকার গর্ভে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে সতী যেদিন দেহত্যাগ করিলেন মহাদেবও সেই দিন হইতে সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবদারুবৃক্ষ-পরিবৃত হিমালয়ের এক সানুপ্রদেশে গিয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। ইহার পর উমা কর্তৃক যোগেশ্বর মহাদেবের তপোভঙ্গ এবং উমা-মহেশ্বরের পরিণয় এবং দেবকার্য সাধনের জন্য দেবসেনাপতি কুমার কার্তিকের জন্ম প্রভৃতি উপাখ্যান সর্বজনবিদিত। ইহার পরে পুরাণাদিতে এই কাহিনীই নানা ভাবে পল্লবিত রূপ ধারণ করিতে লাগিল।

আমরা উমা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম তাহার ভিতরে কয়েকটি তথ্যের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, উমা শৈলসুতা; তাঁহার অপর নাম পার্বতী বা গিরিজা তাঁহাকে মুখ্যতঃ পর্বতের সঙ্গেই যুক্ত করিতেছে। আরও দেখিতে পাই, এই দেবী হয় কৈলাস-বাসিনী, না হয় মন্দরবাসিনী, না হয় বিন্ধ্যবাসিনী। সর্বক্ষেত্রেই পর্বতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। দ্বিতীয় আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, এই উমা বা পার্বতী দেবী সিংহবাহিনী। পার্বত্য দেবীর সিংহকে বাহনরূপে গ্রহণ করার ভিতরেও বেশ একটা সঙ্গতি রহিয়াছে। এই সিংহবাহিনী শৈলসুতা উমা দেবী বা পার্বতীই ভারতবর্ষের শক্তিদেবীর প্রাচীন রূপ বলিয়া মনে হয়; এই দেবীর সহিতই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেবীগণ একত্রিত হইয়া একটি সর্বরূপা মহেশ্বরী দেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সিংহবাহিনী শৈলসুতা দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মাতৃপূজা বা দেবীপূজার ইতিহাসের কিছু কিছু তথ্য উল্লেখ এবং আলোচনা করিতে পারি। এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বহু অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল হইতে একটি মাতৃপূজা বা দেবীপূজার ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই দেবীও পার্বত্য দেবী এবং সিংহের সহিত ইঁহার যোগ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। ইহার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল ক্রীট দ্বীপের ক্নোসোস্-এ প্রাপ্ত একটি মুদ্রাঙ্কিত আংটি (signet-ring), ইহাতে একটি দেবীমূর্তি পাওয়া যাইতেছে, তিনি একটি পর্বতের শিখরদেশে দণ্ডায়মানা, এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহ দ্বারা তিনি পরিরক্ষিতা। গ্রীক্ মাতৃদেবীও পার্বত্যদেবী—তাঁহার যে মূর্তি পাওয়া যায় সেখানে দেখি, তিনি সুশোভিত আঁচল পরিহিতা, হাতে তাঁহার রাজদণ্ড বা বর্শা; তিনিও পর্বতশিখরে দণ্ডায়মানা এবং সিংহ কর্তৃক পরিরক্ষিতা। ক্রীটের মাতৃদেবীই এশিয়ার প্রসিদ্ধ মাতৃদেবী সিবিলির সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এশিয়ার এই সিবিলি দেবীকে অনেক স্থলে আসনারূঢ়া দেখা যায়—এবং তাঁহার পায়ের কাছে কতগুলি সিংহকে নত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। কখনও এই দেবীর সহিত সিংহ, ভল্লুক, চিতাবাঘ এবং অন্যান্য নানাবিধ পশু সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সিবিলি মিসিয়া (Mysia), লিডিয়া (Lydia), ফ্রিগিয়া (Phrygia) প্রভৃতি স্থানের পর্বতে পূজিতা হইতেন।

প্রাচীন কালের এই মাতৃ-দেবতার বিবরণ বিচার করিয়া এ-কথা মনে করিলে কি খুব ভুল হইবে যে, পৃথিবীর অন্যত্র যে সিংহযুক্তা পর্বতবাসিনীর উল্লেখ পাই, আমাদের সিংহবাহিনী পর্বতবাসিনী উমা বা পার্বতী সেই দেবীরই ভারতীয় রূপ? এ-কথা কি মনে করা যাইতে পারে যে একটি সাধারণ দেবীমূর্তির পরিকল্পনাই প্রাচীন কালে সব দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল? এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, উমা কথাটি মূলে একটি সংস্কৃত শব্দ কিনা এই সন্দেহ একেবারে অমূলক নহে, অন্ততঃ কথাটির যে-সকল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনটাই সর্বজনগ্রাহ্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মাতৃ-শব্দের ব্যবিলনীয় প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্মু' বা 'উম্ম'; শব্দটির এক্কাডীয় (Accadian) প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্মি'; দ্রাবিড়ী প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্ম'; এই শব্দগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং সবগুলিই আবার ভারতীয় 'উমা' শব্দটির সহিত মিলিত করিয়া দেখা যাইতে পারে।* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হুবিষ্কের একটি মুদ্রাতে যে দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহারও নাম 'ওম্মো'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এই সিংহবাহনা পর্বতবাসিনী পার্বতী বা উমা দেবীর সহিত অন্যান্য দেশে প্রচলিত মাতৃদেবীর সাদৃশ্য শুধু আকৃতি-প্রকৃতিতে নহে, নামেও।

কবি কালিদাস পর্বত-দুহিতা উমাকে কন্যারূপে, পত্নীরূপে এবং জননীরূপে সৌন্দর্যে, মাধুর্যে এবং প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া ভারতবাসীর অন্তরের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। পুরাণগুলির ভিতর দিয়া এই প্রাচীন পার্বতীদেবী যখন দুর্গা বা চণ্ডীর সহিত যুক্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহার উমামূর্তিটি আস্তে আস্তে একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের ভাস্কর্যে উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তি অনেক পাওয়া যায়, সেখানে শিবও পরমকল্যাণময় সুন্দরমূর্তি, উমাও প্রেম ও মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। একটা জিনিস এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভিতরে আমরা এই উমাকে যেন হারাইয়াই ফেলিয়াছি। অর্গলাস্তবের মধ্যে দেবীকে হিমাচলসুতা বলিয়া অভিহিত হইতে এবং দেবী-কবচে তাঁহাকে শৈলপুত্রী বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি বটে, কিন্তু আসল চণ্ডী-গ্রন্থের ভিতরে তাঁহার উমা পরিচয় কোথাও তেমন পাইতেছি না। 'চণ্ডী'-মধ্যে দু'-এক স্থানে দেবীকে পার্বতী বলা হইয়াছে, হিমালয় দেবীকে সিংহ-বাহন দিয়াছেন, দেবীকে হিমালয়ের শিখরে সিংহবাহনারূপেও দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু দেবীর উৎপত্তি হিমালয়ের ঔরসে এবং মেনকার

---

* "The Babylonian word for 'Mother' is Ummu or Umma, the Accadian Ummi, and the Dravidian is Umma. These words can be connected with each other, and with Uma, the mother goddes." 'Mother Goddess' by—
S. K. Diksit.

পূর্ব নহে, দেবীর উৎপত্তির যে যে বিবরণ পাইতেছি তাহা অন্য রকমের।

উমা জগজ্জননী বটে, এবং শিব-পত্নীও বটে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া দেবীর একটা কন্যারূপ আমাদের চিত্তে একটি কোমল রেখা টানিয়া দিয়াছে। ভারতীয় দেবী-পূজার ইতিহাসে দেবীর এই কন্যা-রূপকে অবলম্বন করিয়া একটা স্নিগ্ধ ধারাও বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। দেবী শুধু গিরিরাজ-দুহিতা রূপেই দেখা দেন নাই, তিনি কাত্যায়ন আশ্রমে দেবকার্যের জন্য আবির্ভূতা হইয়া মুনির কন্যাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া দেবী কাত্যায়নী—এই উপাখ্যানও পুরাণে আছে*; জহ্নু মুনির কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া পতিতপাবনী মা গঙ্গা জাহ্নবী নাম ধারণ করিয়াছেন। দুই শতাব্দী পূর্বে দেবীসাধক রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ একটি কিংবদন্তী মাতৃপূজারী বাঙালীর হৃদয়—অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের অন্তরীপ কুমারিকা নিত্যস্নানপূতা চিরকুমারীব্রতধারিণী হইয়া দেবী হইয়া আছেন। কন্যাকুমারী দেবী দুর্গারই একটি নাম। দুর্গাদেবী পুরাণে 'কুমারী' নামেও খ্যাতা। তান্ত্রিক মতে 'কুমারী' দেবীরই প্রতীক, এই জন্য তান্ত্রিক পূজায় কুমারী পূজার এত প্রাধান্য। শুধু তান্ত্রিক মতে নহে, এই বিশ্বাস এবং প্রবণতা আমাদের সমাজ-স্মৃতিতেই এত প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল যে, আমরা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে সমাজ-জীবনেই 'গৌরী' বলিয়া জানিতাম—এবং এই বিশ্বাস হইতেই আমাদের 'গৌরী-দানে'র সামাজিক প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের বাঙলাদেশে যে শারদীয়া দেবীপূজার প্রচলন রহিয়াছে তাহাকে আমরা মুখ্যতঃ মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত করিয়া লই। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর ভিতরে মাঝে মাঝে যে স্তব-স্তুতি-গুলি রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া দেবীর অধ্যাত্ম তত্ত্বমূর্তিটি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং যাঁহারা এই দেবীপূজার ভিতরকার অধ্যাত্ম-সাধনার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এগুলিই প্রধান অবলম্বন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তা ছাড়া এই মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর ভিতরে দেবীর যে একটা অসুরবিনাশিনী এবং আশ্রিতবৎসলা মূর্তি রহিয়াছে, বিবিধ ভাবে অত্যাচারিত জনসাধারণের তাহার প্রতি একটা ভীতি-মিশ্রিত ভক্তির আকর্ষণও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, বাঙালীর সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব এবং ধর্মানুষ্ঠান এই শারদীয়া দেবীপূজার পিছনে এই শাস্ত্রই বড় কথা নহে,—ইহার পশ্চাতে একটা গভীর এবং ব্যাপক লোক-সংস্কৃতি রহিয়াছে; সে লোক-সংস্কৃতি গিরিরাজ হিমালয় এবং গিরিরাণী মেনকার একমাত্র আদরিণী কন্যা উমাকে লইয়া। এই জন্য মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর মধ্যে উমা-আখ্যান যতখানিই থাকুক পড়ুক না কেন, বাঙালীর দুর্গাপূজার সমস্ত মাধুর্য এই উমাকে লইয়া। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে এই উমাকে লইয়া বাঙলা-সাহিত্যে যে আগমনী এবং বিজয়া-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে স্নেহের দুলালী কন্যাকে লইয়া বাৎসল্য রসের এমন স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝর সাহিত্যে অতি দুর্লভ। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাঙলা দেশের এই শারদীয়া দুর্গাপূজাকে শারদীয় শস্যোৎসবের সহিতই যুক্ত করুন,

বা সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্যের চণ্ডীপূজার সহিতই যুক্ত করুন, অথবা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকালবোধনের সহিতই যুক্ত করুন, আসল ব্যাপারটি সম্বন্ধে জনগণের সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। বাঙলার জনগণ জানে, গিরিরাণীর উমা বা পার্বতীর নবীন যৌবনে দরিদ্র এবং বৃদ্ধ বর শিবের সহিত বিবাহ হইয়াছে; বৎসর ঘুরিয়া আসিতে না আসিতে মা মেনকাও কন্যাকে দেখিতে আকুল হইয়া ওঠেন, কন্যাও বাপের বাড়ী আসিবার জন্য আকুল হইয়া ওঠেন। কিন্তু খেয়ালী বর শিব, উনাকে কিছুতেই আসিতে দিতে চাহেন না, আসিতে দিলেও তিন দিনের বেশী চারি দিন থাকিতে দেন না; উমা তাই শুধু তিনটি দিনের জন্য কৈলাস ছাড়িয়া পুত্রগণ সহ গিরিপুরে মা-বাপের কাছে আসেন—তিন দিন ধরিয়া অফুরন্ত আনন্দ—কত বস্ত্র-অলঙ্কার খাওয়া-দাওয়া—ঢাক-ঢোল—বাঁশী-বাজনা—নৃত্য-গীত; তার পরে আবার চোখের নিমেষে সুখমিলনের এবং আনন্দোৎসবের তিনটি দিন কাটিয়া যায়—বিজয়া দশমীতে আবার—

'আঁধার ক'রে ঘরের আলো
সত্যি কি তুই চল্‌লি উমা?'

কালিদাসের যুগে আমরা যে উমা-উপাখ্যান দেখিতে পাইয়াছি তাহার ভিতরেই শিব এবং উমার ভিতরে বিবাহ হইবার মধ্যে যে কতগুলি সামাজিক অসঙ্গতি রহিয়াছে তাঁহার উল্লেখ পাই; বটু-ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী শিবের উমার প্রতি ছলনার উক্তিগুলির ভিতরেই এই অসঙ্গতির উল্লেখ দেখিতে পাই। কালিদাসের কুমার-সম্ভবে রহিয়াছে, কঠোরতপস্যারতা উমা মহাদেবের প্রতিই আসক্তা এই কথা জানিয়া সেই ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন,—"আমি সেই মহাদেবকে চিনি; তুমি তাহারই প্রত্যাশিনী? অমঙ্গলকর সকল অভ্যাসে রতিসম্পন্ন তাহার (মহাদেবের) কথা চিন্তা করিয়া আমি এ বিষয়ে তোমাকে কিছুতেই মত দিতে পারিতেছি না। অবস্তুতে প্রগাঢ় অনুরাগিণী হে পার্বতি, যখনই সেই শম্ভু তাহার সর্পবিজড়িত হস্তে তোমার বিবাহ-সূত্র-সমন্বিত হস্ত প্রথম ধারণ করিবে, তখন তুমি তাহা কি প্রকারে সহ্য করিবে? আচ্ছা, আর একটা কথা তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ—কলহংস-চিহ্নিত নববধূ-দুকূল এবং শোণিতবিন্দুবর্ষি গজচর্ম—এই উভয়ের যোগ কি কখনও উচিত হয়? গৃহপ্রাঙ্গণে যে কুসুমরাশি ছড়াইয়া থাকে তাহাতে ন্যস্ত থাকে তোমার পদযুগল,—এই পদযুগল অলক্তকে রঞ্জিত হইয়া শবকেশ-পরিব্যাপ্ত শ্মশানভূমিতে বিন্যস্ত হইবে—নিতান্ত পরও একথা অনুমোদন করিতে পারে না। তুমি ত্রিনেত্রবক্ষ (শিবের আলিঙ্গন) অনায়াসে স্বীকার করিবে ইহা অপেক্ষা অযুক্ত আর কি হইতে পারে? তোমার যে স্তনদ্বয় হরিচন্দনে অনুলিপ্ত হইবার যোগ্য তাহা চিতাভস্মে ধূসরিত হইবে! আর তোমার সম্মুখেত এই আর একটি বিড়ম্বনা দেখিতেছি; বিবাহের পরে গজরাজকর্তৃক বাহিত হইবার যোগ্যা তুমি যখন একটা বৃদ্ধ বৃষে আরোহণ করিয়া যাইবে তখন সজ্জনলোকেরাও তোমাকে দেখিয়া হাস্যমুখ হইবেন। এই শিবের বপুর বিচারে তিনি বিরূপাক্ষ (বিরূপ বা বিকৃত চোখ যাহার), জন্মপরিচয় অজ্ঞাত; আর তাহার সম্পদের কথা দিগম্বরত্বেই সূচিত হইতেছে; হে বালমৃগাক্ষি, বরের ভিতরে যে সকল গুণ খোঁজা হয়, তাহার একটিও কি এই ত্রিলোচনের

* আসলে সম্ভবতঃ কাত্য জাতির দেবী বলিয়া দেবী কাত্যায়নী।

আমরা স্বাধীন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না—
পেটে দানা নাই, শুধু খাবি খাই,
কোপ্‌নি আঁটিয়া রামধুন গাই ;
কত ন্যাকা ন্যাকা বুলি আওড়াই—
তা'তেও যে ভবী ভোলে না !
আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না !

তুমি কি জান' না, ফিরপো ডিনারে উদ্ধার করি দেশ—
বলিহারি ভাই—কালোবাজারেও ব্যবসা চালাই বেশ !
মোদের মগজ এমনি নিরেট
তা'র মাঝে ছুঁচ গলে না !
আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না !

মুখের কথায় আমরা সাজিনু
নিধিরাম সর্দ্দার—
ওঠা-নামা করে প্রেমের তুফানে
প্রাণের ব্যারোমিটার !
খুঁষিটি বাগায়ে করি বক্তিমা
কী যে ব'লে যাই,—নাই তার সীমা ;
কাজের বেলায় ফাঁক থেকে যায়—
শুধু ভেঁজে যাই তেলেনা !
আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না !

কত মারামারি, কত কাটাকাটি—কাশ্মীর-অভিযান—
কাঠের ভেলায় ভাসিয়া চ'লেছি সুদূর আন্দামান
ধান্দা অনেক ফুড-প্রব্লেমে—
এম্‌নি স্বাধীন বলে না !
আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না !

কিছু নাই করি, তবুও জেনেছি,
—সব কর্ম্মের সার—
গাল পেতে দিয়ে চড় খাওয়াটাই
চরম পুরস্কার !
বহু মার খাওয়া অভ্যাস আছে,
এ জাতি তাহাতে টলে না—
আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না !
ভেজালে বাজার হ'য়েছে উজাড়, কিছু কি পা'ব না খাঁটী ?
বেহায়ার মত তবু মোরা হাসি মেলি' বত্রিশপাটী—!
ছত্রিশ জাতে ভরিয়াছে ঘর—
তবুও কি চোখ খোলে না ?
আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না !
রোগা প্যান্‌পেনে, ফুলে হ'ল ঢোল—
নরমে গরমে ছাড়ে কত বোল—
সে দিনের দিনু—আজ তারো কাছে
কাঁদিলেও ফল ফলে না !
আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না !
ওপারের যারা করে অপমান,
তবুও তাদের করি জয়গান—
যদিও কেহই তাদের সমান—
ঠেসে কান দু'টি মলে না !
আমরা স্বাধীন, এ কথা ভুলিলে চলে না !
আছি বহু কাল পিঠে বেঁধে কুলো—
চোখে ঠুলি আর কানে দিয়ে তুলো—
আমরা যে ভাই দেশলাই কাঠি—
ভিজে কি না—!—তাই জ্বলে না !
আমরা স্বাধীন, সে কথা ভুলিলে চলে না ।

ভিতরে আছে ?" মহাকবি কালিদাস শিবকর্তৃক উমাকে পরীক্ষাচ্ছলে যে সব কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজজীবনে সেই কথাগুলি একান্ত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। কৌলীন্যপ্রথার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে কুশ্রী দরিদ্র বৃদ্ধ স্বামীর হাতে সমর্পিত হইত বাঙলাদেশের শত-সহস্র কুমারী। স্বামী শুধু বৃদ্ধ নন, শুধু কদাকার নন, শুধু নিঃস্ব নন, তিনি হয়ত ঘরেও আসেন না, স্ত্রী-পুত্রাদির কোনও খোঁজ-খবরও করেন না, নেশা করিয়া আপনার মনে স্থানে-অস্থানে পড়িয়া থাকেন,—তাঁহারই সংসার আগলাইতে হয় বসিয়া এই সকল কুমারীকে। দুঃখের ইহাতেই শেষ নহে, কুলীন হইলে বৃদ্ধ এবং দরিদ্র স্বামীরও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার ছিল, সুতরাং শুধু বৃদ্ধের ঘর করিতে হইত না—সতীন লইয়াই ঘর করিতে হইত। বাঙলাদেশের মা-গণের আর কিছু না থাক, ছিল কন্যার প্রতি অফুরন্ত স্নেহ, ছিল দুশ্চিন্তা—অনিদ্রা—অনাহার। পাষাণ-প্রাণ পিতা ত কন্যার বিবাহ দিয়াই একরূপ নিশ্চিন্ত—মায়ের যে পলে পলে উদ্বেগ—উৎকণ্ঠা। বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহের এই শত-সহস্র কুমারী বাঙালী কবির চিত্তে আসিয়া একটি রূপ লাভ করিয়াছে—সে চির-আদরিণী স্নেহের-পুত্তলি উমা,—এই কন্যাকে ঘিরিয়া পলে পলে শত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা লইয়া চোখের জলে জাগিয়া থাকা বাঙালী মা-ই হইলেন মেনকা,—শত আকুতি আবেদন-ভর্ৎসনেও অটল অচল পাষাণ-প্রাণ পিতাই ও গিরিরাজ হিমালয়। সমাজ-জীবনের সহিত এই নিগূঢ় যোগে আমাদের শারদীয়া দেবী-পূজার অধ্যাত্ম-সাধনা বাঙালীর জীবনে এমন সত্যমূর্তি লাভ করিয়াছে। তিন দিনের জন্য তাঁহাকে গৃহে আনিয়া আমরা শুধু শাস্ত্রীয় উপকরণে তাঁহাকে স্নান করাই নাই,—আমাদের স্নেহ-প্রীতি উৎসারিত চোখের জলে তাঁহার অতসীপুষ্পবর্ণাভা হেমকান্তি দেহকে স্নান করাইয়া লইয়াছি। এই একটি ধর্মানুষ্ঠানে এমন করিয়া আমাদের সমাজ-জীবন এবং অধ্যাত্ম-জীবনের ভিতরে একটা নিগূঢ় যোগ—একটা সহজ সমন্বয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া শারদীয়া দেবীর পূজা আমাদের জাতীয় ধর্মানুষ্ঠান এবং জাতির সর্বাপেক্ষা বড় উৎসবরূপে দেখা দিয়াছে।

"সময়ে সামান্য সতর্ক হলে সহজেই সংক্রমণ রোধ করা যায়"

রোগবাহী জীবাণুই রোগ-সংক্রমণের কারণ। জীবাণু এত ছোটো যে খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এরা ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়। যে-বাতাস আপনি শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেন, যে কোনো জিনিসে আপনি হাত দেন, এমন কি আপনার গায়ের ত্বকেও লক্ষ লক্ষ জীবাণু রয়েছে।

শরীরের কোথাও কেটে বা চামড়া উঠে গেলে সেই মুহূর্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে জীবাণু আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সামান্য একটু পিনের খোঁচাকেও তুচ্ছ করবেন না, তা থেকেই সারা শরীর বিষাক্ত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত অঙ্গহানি কি প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

সুতরাং জীবাণুর হাত থেকে নিজে ও বাড়ীর সবাই নিরাপদে থাকতে চান তো 'ডেটল' ব্যবহার করুন — 'ডেটল' আধুনিক জীবাণুনাশক।

প্রসবপথের মুখে বা ভেতরে সামান্য একটু ক্ষত থাকলেও প্রসূতিজ্বর দেখা দিতে পারে, যা থেকে চিরতরে অকর্মণ্য বা বন্ধ্যা হয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। ডাক্তাররা তাই জীবাণু-সংক্রমণের ভয় দূর করবার জন্য প্রসবের সময় প্রসূতিকে জীবাণুনাশক 'ডেটল' ব্যবহার করতে বলেন।

ক্ষতস্থান যত ছোটোই হোক তা যেন বিষাক্ত হতে না পারে। কেটেকুটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগাবেন। ডেটল জীবাণু নাশ করে, বিষাক্ত সংক্রমণের পথ রুদ্ধ করে এবং ক্ষত শুকোতে সাহায্য করে।

ডাক্তারদের মতো আপনিও 'ডেটল' ব্যবহার করুন—'ডেটল' স্নিগ্ধ, এতে জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না। 'ডেটল' লাগালে কাপড়ে বা গায়ে দাগ হয় না। শিশুরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে। খরচ খুব কম, একটুতেই অনেকটা কাজ হয়।

"মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" নামক স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। চিঠি লিখুন:—এফ্, বি (বি-২) বিভাগ, পোঃ বক্স নং ৬৬৪ কলিকাতা—১।

দাড়ি কামানোর জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে নেবেন, তাতে ছোট-খাটো কাটাকুটি বা আঁচড় আর বিষিয়ে ওঠার ভয় থাকবে না। বেশী জলে অল্প 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচো করলে গলায় আরাম ও উপকার পাবেন।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিঃ,
পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা ১

AEL 3010 (R)

D31-2

হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগী

ডাঃ সুবলচরণ সাহা এম. বি. টি. ডি-ডি

বহু বৎসর যক্ষ্মা-চিকিৎসায় এবং শত শত যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে আছি। যক্ষ্মা রোগ এবং যক্ষ্মা রোগীদের সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সমস্যা উপলব্ধি এবং লক্ষ্য করিয়াছি। সেই বিষয়ের সূচনা হিসাবে কিছু বলিতে চাই। যক্ষ্মাক্রান্তের পক্ষে সর্বপ্রথম কার্য্য এবং চেষ্টা হওয়া উচিত তাহাকে নিজের হঠাৎ পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া। কেবল নিজের রোগকালীন অবস্থার সহিত নহে, ডাক্তার এবং তাঁহার সহকারীদের নির্দ্দেশ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কেও রোগীকে ঐকান্তিক সহযোগিতা খুসী মনে দান করিতে হইবে। হাসপাতালের অন্যান্য রোগীদের সম্পর্কেও মনোভাব শান্ত এবং প্রীতিপূর্ণ রাখা প্রয়োজন।

'নিজের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া'—কথাটি হয়ত প্রথমে রোগীর নিকট সহজবোধ্য হইবে না। কথাটি অদ্ভুতও মনে হইতে পারে। পরিষ্কার করিয়া বলিব। মানুষ মাত্রেই যখন সুস্থ এবং সবল থাকে, সহজ আয়াসে সে যখন কাজ-কর্ম্ম করিয়া চলে, রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে মনে হয় অসম্ভব। সে ভাবে, অন্য যে কোনো লোক রোগাক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সে নিজে চিরকাল সুস্থ-সবল জীবন যাপন করিবে। প্রত্যেক মানুষ নিজেকে সাধারণের ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিয়া লয়। মনের এমনি অবস্থায় সে যখন হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়, তাহার দেহে যখন যক্ষ্মার প্রকাশ দেখা দেয়, তাহার মনে ঘটে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। তাহার কাছে ইহা অঘটন বলিয়া মনে হয়। দায়ী করে সে নিজের দেহকে। মনে দুঃখ অপেক্ষা ক্ষোভের ভাবই অধিক প্রকট হয়। সুস্থ-সবল, পরম কার্য্যক্ষম ব্যক্তি এই হঠাৎ আঘাতে একেবারে ধরাশায়ী হয়। যে মনে করিত তাহাকে ছাড়া সংসার চলিবে না, সে দেখিতে পায়, তাহাকে বাদ দিয়াও সংসার অচল হইল না। নিজের যে 'মূল্য' ছিল বলিয়া সে পূর্ব্বে মনে করিত—রোগাক্রান্ত হইবার পর সে আবিষ্কার করে, সংসারের কাছে তাহার মূল্য অনেক কম। তাহাকে ছাড়াও কাজ চলিয়া যাইতেছে। যে লোক মনে করিত নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, হঠাৎ সে দেখে পরের সাহায্য, অনুকম্পা এবং সেবা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। সংসার এবং কর্ম্মস্থলের কর্ত্তা হঠাৎ নিজেকে দীনতম ব্যক্তি বলিয়া আবিষ্কার করে। ইহাতে বিষম এক দুঃখজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অসম্ভব, অকল্পনীয় যাহা ছিল, হঠাৎ যেন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে তাহা বজ্রের মত নামিয়া আসে। সমস্ত পৃথিবীর সুন্দর রূপ এক নিমেষে বিষম কুরূপে পরিণত হয়। সব কিছুই হঠাৎ-যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট অদ্ভুত, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু উপায় নাই। রোগীকে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু 'করিতে হইবে' বলিলেই মানুষের পক্ষে নিজেকে সব সময় সব কিছুর সহিত মানাইয়া লওয়া সহজ হয় না। মনকে বাগ মানাইতে সময় লাগে যথেষ্ট।

পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার যখন বলিলেন 'তোমার যক্ষ্মা হইয়াছে'—রোগীর পক্ষে সেই সময় এক অতি কঠিন মুহূর্ত্ত। ডাক্তারের কথা শুনিয়া প্রথমে রোগী মনে করিবে—চিকিৎসকের নিশ্চয় কোনো ভুল হইয়াছে—তাহার মত এমন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির দেহকে যক্ষ্মা কখনই ঘায়েল করিতে পারে না। কিন্তু ক্রমে যখন সে বুঝিতে পারিবে, ডাক্তার ভুল করেন নাই—তখন রোগীর পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল বলিয়া বোধ হইবে। তাহার সকল আশা, সুখের পরিকল্পনা, পরম সম্ভাবনাপূর্ণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সবই যেন এক মুহূর্ত্তে অতলে তলাইয়া গেল! রোগী যখন তাহার রোগের কথা প্রথম জানিতে পারে, তখন তাহার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। রোগী তাহার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, তাহার দেহে যক্ষ্মার আক্রমণ, কোন্ পাপে কোন্ অন্যায়ের জন্য হইল—তাহাই সে জানিতে চায়।

ক্রমে রোগীর ভাবান্তর হইতে থাকে। নিরাশার অন্ধকার ভেদ করিয়া মনে আশার ক্ষীণ আলো দেখা দিতে থাকে। রোগী যখন দেখে যে যক্ষ্মা হইলেই মৃত্যু অবধারিত নহে, যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তিও আবার নিরাময় হইয়া সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে পারে, তখন নিজের সম্পর্কেও সে আশান্বিত হইয়া উঠে। যক্ষ্মা সম্পর্কে অযথা অতি-ভয়ের ভাবও ক্রমে কাটিয়া যায়। হঠাৎ আঘাতের প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্তি পাইবার পর রোগীর অন্য চিন্তা আসে। অর্থ, চাকরী, প্রিয়জন হইতে দূরে নির্ব্বাসিত জীবনের অসহ্য দুঃখের কথা—এই প্রকার আরো নানা চিন্তা রোগীকে বিব্রত, ব্যাকুল করে। বিশেষ করিয়া রাত্রিকালে বিশ্রামের সময় সহস্র প্রকার চিন্তার জটলা তাহাকে অভিভূত করে। এমন অবস্থায় 'চিন্তা করিও না' কিংবা 'তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই'—বলা নিরর্থক। চিকিৎসক এবং নার্স রোগীকে নানা ভাবে, নানা কথায় চিন্তা হইতে মুক্তি দিতে সাহায্য মাত্র করিতে পারেন। রোগীর মনে আশার ভাব জাগ্রত করিয়া তাহাকে প্রফুল্ল রাখিতে প্রয়াস অবশ্যই করিতে হইবে। রোগীর মনের এই বিষম অবস্থাও ক্রমে চলিয়া যাইবে, যখন সে দেখিবে, আরো বহু এমন যক্ষ্মারোগী রহিয়াছে, যাহাদের সাংসারিক অবস্থা তাহার অপেক্ষা খারাপ, চিন্তার কারণ তাহাদেরও আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই সব রোগী—ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া, অনর্থক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভাল হইবার জন্য চিকিৎসককে পূর্ণ সহযোগিতা দান করিতেছে। রোগী ক্রমশঃ বুঝিতে পারে, যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়াও মানুষের আশা করিবার অনেক কিছু আছে। যক্ষ্মা রোগীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আকাশ-কুসুম নহে।

বলা বাহুল্য, হাসপাতাল কিংবা স্যানাটোরিয়াম যক্ষ্মা-চিকিৎসার পক্ষে প্রকৃষ্ট। রোগীর বাড়ীতে যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে সকল ব্যবস্থা করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন পূর্ণ বিশ্রাম। হাসপাতাল এবং স্যানাটোরিয়ামে আরো বহু রোগী থাকে, তাহাদের সাহচর্য্য এবং দৃষ্টান্ত নূতন রোগীর পক্ষে হিতকর। যেখানে বহুসংখ্যক রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থামত বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া রোগের সুচিকিৎসা পাইতেছে, এবং তাহার ফলও হইতেছে আশানুরূপ, সেখানে নূতন রোগী নিজেকে সহজেই সকলের সহিত এক হইয়া চলিতে উৎসাহিত বোধ করিবে। হাসপাতালের পরিবেশে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, রোগীর মনের সাময়িক বিকারও দূর হইবে।

যক্ষ্মা রোগীর মনে আর একটি ভাবের অতি-প্রকাশ দেখা যায়; ইহা আর কিছুই নহে, অধৈর্য্যতা। রোগী চায় তাড়াতাড়ি ভাল হইতে, তাড়াতাড়ি তাহার কাজ-কর্ম্মে এবং পারিবারিক জীবনে ফিরিয়া যাইতে। রোগীকে মনে রাখিতে হইবে, যক্ষ্মা-চিকিৎসায়

ছাড়া চলে না। চিকিৎসার ক্রম একটি নির্দ্ধারিত ধারায় ...., ইহার কোনো ব্যতিক্রম রোগীর পক্ষে অহিতকর। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হইবে, চিকিৎসক রোগীকে ...না হইতে হয়ত নড়িতেও দিবেন না। বিরক্ত বোধ করিলেও রোগীকে ডাক্তারের এ-ব্যবস্থা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। রোগী ...নিবেন যক্ষ্মা-চিকিৎসার প্রধান 'ঔষধ' বিশ্রাম, পূর্ণ বিশ্রাম, এবং ...বো বিশ্রাম। বিশ্রাম বাদ দিয়া যক্ষ্মার অন্যবিধ চিকিৎসা ...নও সার্থক হইতে পারে না। এ-পি, ফ্রেনিক, থোরাস্ এবং ...ন্য প্রকার অপারেশন রোগ ভাল করে না, যক্ষ্মা রোগীকে ... হইতে সাহায্য করে মাত্র। যক্ষ্মা রোগীর ভাল হওয়া, ...ং সুস্থ জীবনে ফিরিয়া যাওয়া তাহার নিজের উপরেই ...পেক্ষা বেশী নির্ভর করে। যক্ষ্মা এমন ব্যাধি, যাহা শরীরের ...বিশেষ কাটিয়া বাদ দিলেই দূরীভূত হইবে না। যক্ষ্মা-...ণু দেহের অভ্যন্তরে এমন এমন স্থানে জড়াইয়া থাকিতে ..., যাহা অপারেশন করিয়া বাদ দিবার কথাই উঠিতে পারে না। নানা ঔষধ, বিবিধ প্রক্রিয়া, এবং পূর্ণ-বিশ্রাম দান করিলে, ...ভ্যন্তরের যক্ষ্মা-বীজাণু দমন করা যাইতে পারে।

যক্ষ্মা-চিকিৎসা সময়সাপেক্ষ ও দীর্ঘকালব্যাপী—ইহার কোনো ... রাস্তা বা সর্ট-কাট্ নাই। চিকিৎসকের ব্যবস্থামত রোগী ...বিছানায় পূর্ণ-বিশ্রামের সহিত অন্যান্য চিকিৎসা গ্রহণ করে, ... হইতে তাহার সময় কম লাগিবে। রোগকে একবার বাগে ...তে পারিলে, রোগীর পক্ষে পুনরায় সুস্থ হইয়া দীর্ঘ জীবন ... করা সম্ভব। এই কথা মনে রাখিয়া রোগীকে দীর্ঘ রোগ-...নের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বিশ্রাম সময়ে ডাক্তার ... অন্য কোনো চিকিৎসা এবং ঔষধাদি ব্যবস্থা না করিলেও, ... কখনও মনে করিবেন না যে ডাক্তার তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। ... রোগীর জন্য সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছেন, এবং তাহার ...য়ের জন্য যথাকালে শ্রেষ্ঠ পন্থাই অবলম্বন করিবেন। চিকিৎসকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রোগীর থাকা চাই—ইহাতে তাহার কল্যাণ হইবে।

অনেক সময় যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসক এবং নার্সকে প্রীতির সহিত ... করিতে পারে না। রোগীর মনে তাঁহাদের প্রতি এক বিরুদ্ধ ... দেখা যায়। চিকিৎসকের বিধি-ব্যবস্থা, নিয়মাদি পালনের ...কে রোগী জবরদস্তি বলিয়া মনে করে। সুখের বিষয়, রোগীর এ মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রোগীর এ-মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে চিকিৎসক এবং নার্সকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যও বহু ক্ষেত্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। যক্ষ্মারোগী নিজে ডাক্তার হইলেও, রোগিজনসুলভ এই প্রকার মনোভাব হইতে ... পান না—এমনও দেখা গিয়াছে। যক্ষ্মার আক্রমণে রোগীর ... যে ভীষণ বিপর্য্যয় ঘটে—তাহারই ফলে মনের এ-বিকার দেখা ...। রোগী যদি শান্ত মনে, ধৈর্য্যের সহিত নিজেকে অবস্থার সহিত ... খাওয়াইতে পারে, তাহার চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

হাসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের মধ্যে নানা প্রকার ছেলেমানুষ ... করা যায়। সামান্য ব্যাপার লইয়া নিজেদের মধ্যে কলহ, মনোমালিন্য প্রায়ই দেখা যায়। যেমন দেখা যায় স্কুলের ছেলেদের মধ্যে। এই সময় চিকিৎসক এবং নার্স রোগীদের সহিত নানা বিষয় আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া তাহাদের মানসিক সমতা ফিরাইয়া আনিতে পারেন। যে-ব্যাপার লইয়া রোগীদের মধ্যে কলহ বাধে, তাহা যে কত তুচ্ছ, এবং তাহা লইয়া কলহ করা যে কী ভীষণ ছেলেমানুষী, তাহা হালকা কথায়, ব্যঙ্গ-পরিহাসের মধ্য দিয়া বুঝাইতে পারিলেই রোগীদের মন হইতে কলহের মেঘ এক নিমেষেই কাটিয়া যাইবে। এক রোগী, অন্য রোগীদের যদি 'এক পরিবারভুক্ত' বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে, তাহার পক্ষে হাসপাতাল কারাগার সমান হইবে। কাজেই হাসপাতালে নিজেকে সর্ব্বদিক হইতে মিশ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। অন্যের কথা চিন্তা করিয়া, অন্যের সুখ-সুবিধা, কষ্ট-অভাবের কথা ভাবিয়া, রোগীকে শান্ত এবং ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে।

যক্ষ্মা-চিকিৎসায় ডাক্তার ম্যাজিকের খেলা দেখাইতে পারেন না। যক্ষ্মার কোনো অমোঘ ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। চিকিৎসকের প্রকৃষ্ট সহায়তা এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পাইতে হইলে রোগী ডাক্তারকে তাহার মঙ্গলকারী বন্ধু বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। রোগী জানিবেন, চিকিৎসক পূর্ব্বে অনেক কঠিনতর যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাশা-সাগর হইতে আশার কূলে লইয়া গিয়াছেন। রোগীর পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ, তাহার পক্ষে কোন্ চিকিৎসাবিধি প্রকৃষ্ট, তাহা একমাত্র চিকিৎসকই জানেন। কাজেই চিকিৎসকের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা স্থাপন রোগীকে করিতে হইবে। চিকিৎসার ভাল-মন্দের বিষয় রোগীর নিজের চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নাই।

যক্ষ্মা রোগীর মনে রাখা দরকার ডাক্তার এবং নার্সও মানুষ। তাঁহাদের জীবনেও সুখ-দুঃখ-বেদনা আছে। তাঁহাদের মন-মেজাজও

সময় সময় নানা কারণে খারাপ হইতে পারে। কাজেই কখনও যদি ডাক্তার কিংবা নার্স রোগীর সহিত ভাল করিয়া কথা না বলেন, হাস্য-পরিহাসে যোগদান না করিতে পারেন, রোগীর দুঃখিত হইবার কোনো কারণ নাই। ইহা নিশ্চিত, তাঁহারা রোগীর প্রতি কর্ত্তব্যে কখনও অবহেলা করিবেন না।

হাসপাতালে রোগীদের আর একটি ব্যাপার খুবই অধৈর্য্য করে। এক রোগীকে যখন চলাফেরা করিতে অনুমতি ডাক্তার দেন, অন্য রোগী ইহা তাহার প্রতি অবিচার বলিয়া ভাবে।—অমুক আমার পরে হাসপাতালে আসিয়া আমার পূর্ব্বেই পায়চারী করিবার অধিকার পাইল, অথচ আগে আসিয়াও আমাকে ডাক্তার কেবল বিছানাতে বিশ্রাম লইতে নির্দ্দেশই দিতেছেন—এই কথাই রোগীর মনে বার বার হইতে থাকে। সকল রোগীর অবস্থা এক রকম হয় না, কাহারও দেহে যক্ষার আক্রমণ গুরুতর, কাহারো বা ততটা গুরুতর নহে। রোগের অবস্থা এবং সামর্থ্য বুঝিয়া ডাক্তার বিশেষ রোগীকে চলাফেরা করিবার নির্দ্দেশ দিবেন। রোগী নিজেকে যতটা ভাল মনে করে, সকল সময় তাহা প্রকৃত না হইতেও পারে। রোগী তাহার দেহের অভ্যন্তরের সংবাদ ঠিক জানে না—যেমন জানেন ডাক্তার। আজ যে রোগীকে ডাক্তার কেবল বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম লইতে বাধ্য করিতেছেন, কয়েক দিন পরেই হয়ত তাহাকে একটু একটু করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে দিবেন। নূতন রোগী দু'-চার দিনের পর বেড়াইবার অনুমতি লাভ করাতে পূর্ব্বতন রোগীর ভয়ের বা চিন্তার হেতু নাই। অন্যান্য নানা রোগেও যেমন কেহ তাড়াতাড়ি সারে, কাহারো বা দীর্ঘতর সময় লাগে—যক্ষাতেও তেমনি হয়।

রোগী যখন বেড়াইবার অনুমতি পাইবে—তখন ডাক্তার হয়ত বেড়াইবার সময় এবং মাত্রা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। প্রথমে হয়ত ১৫ মিনিট ঘরের বারাণ্ডায়, কিছু দিন পরে ২০ মিনিট সামনের বাগানে বা মাঠে, এই ভাবে বেড়াইবার সময় এবং মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িবে। ঔষধের মতই চলাফেরা করিবার 'ডোজ' ডাক্তার স্থির করিয়া দিবেন। এই 'ডোজ' রোগী কখনও অমান্য করিবে না। রোগীর মনে হইবে, সে অনায়াসে আরো বেশীক্ষণ এবং বেশী দূর বেড়াইতে পারে—বেড়াইবার লোভও হইতে পারে, কিন্তু সাবধান ডাক্তারের বিধান রোগী কোনক্রমেই অমান্য করিবে না। হাসপাতালে যত দিন রোগী চিকিৎসায় থাকিবে, ডাক্তারের আদেশ এবং বিধান যত তিক্তই মনে হউক, তাহা পালন করিতে হইবে। এই ভাবে আদেশ পালনে রোগীর ভবিষ্যৎ জীবনও সংযমশীল হইবে, কাজ-কর্ম্মে নিয়মানুবর্ত্তিতাও আসিবে।

যক্ষা হইয়াছে বলিয়াই মানুষের জীবন বেকার হইয়া যাইবে এমন কোনো কথা নাই। হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসা গ্রহণ কালেও যক্ষাক্রান্ত ব্যক্তি তাহার বিশ্রাম-অবসর কালকে বহু কিছু শিক্ষায় নিয়োজিত করিতে পারে। বলা বাহুল্য, রোগী কি শিক্ষা করিবে, এবং কোন্ শিক্ষা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য, তাহা একমাত্র চিকিৎসকই বলিতে পারেন। শিক্ষা করিবার এমন বহু কিছু আছে, যাহা দেহ এবং মনকে ক্লান্ত না করিয়া প্রফুল্ল এবং উৎসাহপূর্ণ রাখিতে পারে। একটা কথা মনে রাখা দরকার। দৈহিক শক্তির প্রয়োজন, এমন কোনো বিষয় রোগীর শিক্ষার পক্ষে অনুকূল নহে। সহজে এবং দেহ-মনকে পীড়িত না করিয়া রোগী শিক্ষা করিতে পারে: চিত্রাঙ্কন, সূচী-শিল্প, ন্যাকড়ার খেলনা তৈয়ারি, রেডিও সেট্ মেরামতী, বেতের এবং বাঁশের নানা প্রকার দ্রব্য তৈয়ারী এবং এই প্রকার আরো বহু কিছু। লেখাপড়ার কাজও করা চলে, তবে মনকে ভারাক্রান্ত করে, এমন পরিমাণে নহে। হাসপাতালে রোগাক্রান্ত অবস্থায় রোগী এমন বহু শিল্পকলা শিক্ষা করিতে পারে, যাহা তাহার রোগোত্তীর্ণ ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগিবে। চিকিৎসাকালে রোগী যদি তাহার সময়কে উপরি-উক্ত প্রকার কোনো বিষয় শিক্ষায় নিয়োজিত রাখিতে পারে—তাহার হাসপাতাল-জীবন ভারাক্রান্ত না হইয়া আনন্দপূর্ণ হইবে। তাহার মনও চিন্তামুক্ত থাকিবে। ইহার ফলে তাহার হাসপাতাল বাস হয়ত অপেক্ষাকৃত কমই হইবে।

রোগী নানা প্রকার অনায়াসলভ্য আমোদ-আহ্লাদে তাহার হাসপাতালবাসের দিনগুলিকে আনন্দময় করিয়া রাখিতে পারে। এ বিষয় বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিদেশের অনেক যক্ষা রোগী রোগাক্রান্ত অবস্থায় বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। যক্ষার মত ভীষণ ব্যাধি তাঁহাদের দেহকে আঘাত করিয়াছিল কিন্তু মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

রোগাক্রান্ত অবস্থায় মানুষ নিজেকে জানিবার চিনিবার অবকাশ পায়। দীর্ঘ বিশ্রাম ভোগ কালে রোগীর চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে মানুষ তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনাও করিতে সক্ষম হয়। জনকোলাহলের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে যে-মানুষ তাহার চিত্তবৃত্তির সঠিক সন্ধান পায় না, যক্ষাক্রান্ত হইয়া সেই মানুষ হইয়া উঠে দার্শনিক। জীবনের যে দিকগুলি ছিল তাহার কাছে অস্পষ্ট, তাহা নূতন আলোকপাতে স্বচ্ছ-সহজ হইয়া উদ্ভাসিত হয়। জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে সার্থকতার পথ দেখায়।

যক্ষা হইলে তাহার চিকিৎসা অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু স্তিমিত হতাশাপূর্ণ মনে নহে। যক্ষাকে জয় করিবার জন্য প্রতি নিয়ত নব নব বৈজ্ঞানিক পন্থা বাহির হইতেছে। এখনো অমোঘ ঔষধ কিছু আবিষ্কার না হইলেও, বহু প্রকার অতি ফলদায়ক ঔষধ বাহির হইয়াছে। এই সকল ঔষধ, নবতর চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং পূর্ণ-বিশ্রাম, যক্ষাকে দমন করিবে। অতএব রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি পূর্ণ-বিশ্বাস লইয়া, আশাপূর্ণ মনে চিকিৎসকের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করেন—তাহার রোগোত্তীর্ণ হইতে সময় লাগিবে না। যক্ষাক্রান্তের মনে সব সময় এই কথাটি থাকা চাই—"যক্ষা রোগী ভাল হয়, আমিও যথাকালে অবশ্যই ভাল হইব।"

অমর কবি সেক্সপিয়র বলিয়াছেন:

"Our remedies oft in ourselves do lie
Which we ascribe to Heaven"

অবসর এবং সুযোগ পাইলে আগামী বারে—যক্ষা রোগী কি নিজেকে আরোগ্যের পথে অগ্রসর করিতে নিজেই সাহায্য করিতে পারে, তাহার আলোচনা সুরু করিব।
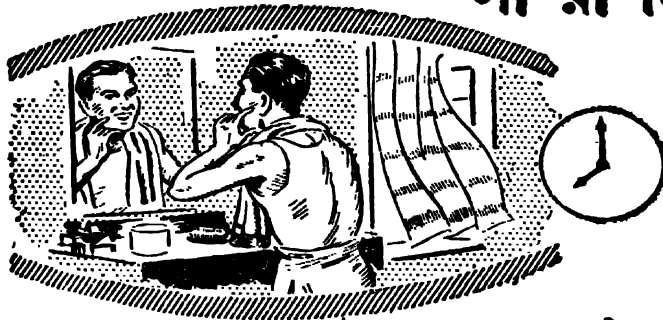
সকাল বেলায়
সারাদিন
খেলাধুলোর পরে
প্রফুল্ল
শোবার সময়
থাকতে...
স্নিগ্ধ, সুগন্ধ
হিমালয় বোকে
পাউডার
ব্যবহার করুন
দুটি সুষ্ঠু ইয়ার্ডলি পাউডার
Himalaya Bouquet
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
HIMALAYA BOUQUET SNOW
হিমালয় বোকে স্নো ত্বককে সব ঋতুতে রক্ষার জন্য
ইয়ার্ডলি কোং, লিঃ, লণ্ডনের তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বার

একটা বেদনার ঝড় তুলে যেন প্রস্থানরত হরবিলাসের কতকটা আত্মোক্তির মত উচ্চারিত কথাগুলো তার পিছনে পিছনে মিলিয়ে গেল চাপা হাহাকারের মতই।

এবং আমাদের বিমূঢ় ভাবটা কাটবার আগেই আচমকা জ্ঞান হারিয়ে শতদলের শিথিল দেহটা চেয়ারের উপরেই ঢলে পড়লো। আমার আগেই কিরীটি ক্ষিপ্রগতিতে শতদলের দিকে এগিয়ে এসে উৎকণ্ঠিত ভাবে বললে, 'শতদল বাবু হঠাৎ বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছেন সুব্রত! এসো ধর। ওঁকে ঐ সোফাটায় শুইয়ে দিই—'

আমি ও কিরীটি দু'জনে ধরাধরি করে শতদলের জ্ঞানহীন দেহটা কোন মতে তুলে পাশের সোফাটায় শুইয়ে দিলাম। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তখন শতদলের। চোখ দু'টো বোজা। মুখটা ফ্যাকাসে বিবর্ণ। ঘরের কোণে রক্ষিত কুঁজো থেকে একটা গ্লাসে করে জল নিয়ে শতদলের চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলাম।

কয়েক মিনিট শুশ্রূষা করবার পরই শতদল চোখ মেলে তাকাল। লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে নিল।

'শুয়ে থাকুন শতদল বাবু! একটু বিশ্রাম নিন—' আমিই বলি বাধা দিয়ে।

ইতিমধ্যে কিরীটি শতদলের শয়নকক্ষ হ'তে একটা শাদা চাদর এনে মৃতদেহটা ঢেকে দিয়েছিল। চোখের সামনেই রক্তাক্ত বীভৎস মৃতদেহটা যেন ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠছিল।

কিছুক্ষণ আগেও যাকে ছাতের 'পরে শতদলের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি তারই নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত দেহটা সামনে ঐ মেঝেতে পড়ে আছে!

সামান্য এই দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কখনই বা সে নীচে নেমে এলো, কেনই বা এলো, আর কার হাতেই বা এমন নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হলো? ঘূর্ণাবর্তের মতই প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে।

আর কখনই বা তাকে হত্যা করা হলো? নিরীহ ঐ মেয়েটির পৈশাচিক হত্যার মূলে কি মোটিভ (উদ্দেশ্য) আছে! ছাতের উপর থেকে অলক্ষ্য থেকে অলজ্য মৃত্যুই যেন ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল নিচে। কিন্তু হত্যা করলে কে? কে? হত্যাকারী কে?

'শরীরটার মধ্যে কেমন যেন অস্থির-অস্থির করছে!—' শতদল ক্ষীণ কণ্ঠে বললে।

'সুব্রত, শতদল বাবুকে ওঁর ঘরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও।—' কিরীটি আমাকে সম্বোধন করে বলে।

'না। না—আমি একা থাকতে পারবো না।—' অস্থির উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে শতদল: এখানেই আমি থাকবো। শতদলের সমস্ত মুখখানা যেন ভয়ে পাংশুটে হ'য়ে গিয়েছে, অভাবনীয় আকস্মিক আঘাতটা যেন খুবই লেগেছে।

তাহ'লে সোফাটার 'পরে ভাল করে শুয়ে পড়ুন।—' কিরীটি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে।

'একজন ডাক্তারকে ডাকলে হতো না?—' কথাটা আমিই বলি।

'সুব্রত মন্দ কথা বলেনি। কোন জানা-শোনা ভাল ডাক্তার আছে আপনার মিঃ ঘোষাল?—' প্রশ্ন করে কিরীটি।

'আছে। ডাঃ আদিত্য চ্যাটার্জী! সব চাইতে তাঁরই এখানে ভাল প্র্যাকটিস। ছোটখাটো একটা নার্সিং-হোম মত্ও তার আছে।—'

'তাকে একটা খবর দেওয়া যায় না?—'

'বিপিন গেটের বাইরে plain dressএ পাহারায় আছে। তাকেই আমি বলে আসছি।—' মিঃ ঘোষাল বলেন।

'সুব্রত, মিঃ ঘোষালের সঙ্গে যা!—'

কিরীটির মুখের দিকে তাকালাম। বুঝলাম একাকী শতদলের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকতে চায়। আমিও আর দ্বিধা না করে ঘোষালের দিকে তাকিয়ে বললাম: চলুন মিঃ ঘোষাল!

সিঁড়ির ঠিক শেষ ধাপের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল অবিনাশ, এ বাড়ির পুরাতন ভৃত্য।

সিঁড়ির আলোর খানিকটা অবিনাশের মুখের একাংশে তির্যগ ভাবে এসে পড়েছে। আমাদের দেখে অবিনাশ তাড়াতাড়ি সরে গেল। মনে হলো অবিনাশ আমাদের সান্নিধ্য থেকে যেন পালিয়ে গেল। অভ্যাগতের দল সকলেই চলে গিয়েছেন।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভৌতিক স্তব্ধতা যেন থম্‌থম্ করছে।

টানা বারান্দার মাঝামাঝি আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম: সামনের ঘরের খোলা দরজার সামনেই ইনভ্যালিড চেয়ারটার উপরে নিশ্চল পাথরের মত বসে আছেন হিরণ্ময়ী দেবী। বারান্দার ঝুলন্ত বাতির আলো ওঁর উপর এসে পড়েছে। সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাসে বিবর্ণ। প্রাণের চিহ্ন পর্য্যন্ত যেন সে চোখে-মুখে নেই। হাত দু'টি শ্লথ ভাবে কোলের 'পরে ন্যস্ত। তার নিত্য-সহচর উলের বল ও বুননটা কোলের 'পরে নেই।

আমাদের দু'জনের পদশব্দেও কোনরূপ স্পন্দন জাগল না যেন হিরণ্ময়ী দেবীর মধ্যে। যেমন নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মত স্তব্ধ অনড় বসেছিলেন ইনভ্যালিড চেয়ারটার উপর, ঠিক তেমনই বসে রইলেন। চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ।

আরো একটু এগিয়ে গেলাম ইনভ্যালিড চেয়ারে উপবিষ্ট হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে।

এবারে নজরে পড়ল দুই চোখের কোল বেয়ে দু'টি অশ্রুর ধারা। হিরণ্ময়ী দেবী কাঁদছিলেন। তাঁর চোখে জল।

আমি আর অগ্রসর হলাম না। দেওয়াল ঘেঁষে একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে কোন শব্দ না করে কেবল নিঃশব্দে চোখের ইংগিতে ঘোষালকে এগিয়ে যেতে বললাম। ঘোষাল চলে গেলেন বারান্দার অন্য প্রান্তে দ্বারের দিকে।

হরবিলাস বোধ হয় এতক্ষণ ঘরের মধ্যেই ছিলেন, বের হ'য়ে এলেন। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে হিরণ্ময়ীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা স্ত্রীর স্কন্ধের 'পরে রাখলেন। মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন: 'হিরণ!'

তথাপি নিশ্চল-স্তব্ধ হিরণ্ময়ী। এতটুকু কম্পনও নেই। স্বামীর ডাক যেন তাঁর কানে পৌঁছায়নি।

'ঘরে চল হিরণ!—'

তথাপি হিরণ্ময়ীর দিক থেকে কোন সাড়া এলো না। পূর্ববৎ নিশ্চল স্তব্ধ।

'হিরণ!'—আবার মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন হরবিলাস।

স্বামি-স্ত্রীর এই শোকের মধ্যে নিজেকে কেমন যেন আমার বিব্রত মনে হ'তে লাগল। এ সময় এখানে না থাকাই উচিত বোধ হয়। স্থানত্যাগ করাই কর্তব্য।

আচম্কা এমন সময় হিরণ্ময়ীর পাথরের মত স্তব্ধ দেহটা ঈষৎ নড়ে উঠলো। হিরণ্ময়ী স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। নিষ্প্রাণ অর্থহীন দৃষ্টি! স্বামী ডাকলেও যেন কিছু বুঝতে পারেননি তিনি।

'ঘরে চল।—'

'সীতাকে কি ওরা নিয়ে গিয়েছে?'—ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হিরণ্ময়ী।

'ঘরে চল হিরণ!'—স্নিগ্ধ কণ্ঠে হরবিলাস কেবল বললেন।

'তুমি দেখেছো! সত্যিই সীতা মরে গিয়েছে? মনে নেই তোমার, ছোটবেলায় ওর ফিটের ব্যামো ছিল। ফিট্ হয়নি ত!—সত্যিই হয়ত ও মরেনি, ফিট্ হ'য়ে আছে। Smelling Saltএর শিশিটা নিয়ে যাও—'

'না! তুমি ঘরে চল!—'

'না। ঘরে যাবো না। এইখান দিয়েই ত সীতাকে ওরা নিয়ে যাবে।—'

'তা ত জানি না। ওসব কথা আর ভেবে কি হবে হিরণ? মনকে শক্ত করা ছাড়া ত আর উপায় নেই।—'

'কিরীটি বাবু কোথায়?—'

'উপরেই আছেন!—'

'তিনি কি বললেন? তিনিও কি ধরতে পারলেন না কে আমার সীতাকে খুন করল?'—কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ হিরণ্ময়ী দেবী চুপ করে রইলেন, তার পর আবার যেন আপন মনেই বলে উঠলেন: 'সে ঠিক ধরতে পারবে আমার সীতাকে কে মেরেছে। সে ধরতে পারবে। পারবে।'

ক্ষীণ পদশব্দ কানে এলো।

চেয়ে দেখি ঘোষাল ফিরে আসছেন, আমিও আর বিলম্ব না করে পা টিপে-টিপে সোজা দো'তলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সত্যিই ঐ শোকের দৃশ্য যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি, কিরীটি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে আপন মনে পায়চারী করছে। মুখে পাইপ। শতদল বাবু সোফার 'পরে যেমন অর্ধশয়ন অবস্থায় ছিল তেমনই আছে।

আমার পদশব্দে কিরীটি পায়চারী থামিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল: 'ঘোষাল কই?—'

'আসছেন।—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষাল ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

'ডাক্তারকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছেন?—'

'হাঁ! বিপিনও সেই লোকটির কথা বললে মিঃ রায়?—'

'কার কথা?—'

'মিস্ সেন যে লোকটির কথা বলছিলেন!—লোকটাকে বিপিন সদর দিয়ে বের হ'য়ে যেতে দেখেছে। রাত তখন পৌণে ন'টা নাগাদ হ'বে।—'

'আসতে দেখেনি লোকটাকে?'—কিরীটি প্রশ্ন করে।

'না! কেবল বের হ'য়ে যেতেই দেখেছে। তবে মিস্ সেন তার বেশভূষার যে description (বর্ণনা) দিয়েছেন তার সঙ্গে মিল নেই!—'

'কি রকম?—'

'গায়ে একটা কালো রংয়ের গেঞ্জি কোট ছিল আর মাথায় একটা কালো রংয়ের ফেল্ট ক্যাপ ছিল। ক্যাপটা ডান দিকে একটু টেনে নামান ছিল। চেহারার বর্ণনায় মিল আছে। উঁচু লম্বা বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। এবং সদর দিয়ে বের হ'য়ে যাবার সময় সদরের আলোয় লোকটার মুখের একাংশ যা দেখতে পেয়েছিল, বললে মুখে নাকি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ছিল, কিছুদিন যে লোকটা shave করেনি বোঝা যায়।—'

ঘোষালের কথা শেষ হতেই কানে এলো একটা কুকুরের গুরু-গম্ভীর ডাক।

চম্কে উঠেছিলাম প্রথমটায়, পরক্ষণেই মনে পড়ল সীতার কুকুরের ডাক। আজ সন্ধ্যায় এখানে লোক-সমাগমের জন্য সীতার কুকুরটাকে নিচের তলার একটা ঘরে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে কুকুরটা এক লাফে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল এবং সোজা এসে সীতার ভূপতিত নিষ্প্রাণ হিম-শীতল দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

সকলেই আমরা স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি এ্যালসেসীয়ান প্রকাণ্ড কুকুরটার দিকে। স্থির দৃষ্টিতে সীতার মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা।

হঠাৎ কুকুরটা হাঁটু ভেঙ্গে সীতার মৃতদেহের সামনে বসে পড়ল তার পর মুখটা সীতার গায়ের উপর রেখে কুঁই কুঁই শব্দ করতে লাগল।

কুকুরটা কাঁদছে।

অত বড় একটা জানোয়ার যে অমন করে তার প্রভুর জন্য কাঁদতে পারে, অমন করে তার শোক প্রকাশ করতে পারে দেখে সত্যিই যেন বিস্ময়ের অবধি ছিল না। নির্বাক্ আমরা সকলেই।

একটা জানোয়ারের শোক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটা যেন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠেছে।

ঠিক এমনি সময় হাঁপাতে হাঁপাতে খালি গায়েই হরবিলাস ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর কুকুর বাঁধার মোটা শিকলিটা।

কুকুরটা কিছুতেই তার প্রভুর মৃতদেহের পাশ হ'তে নড়বে না, এক প্রকার জোর করেই গলার বকলেসে শিকল এঁটে হরবিলাস কুকুরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন।

রাত প্রায় পৌণে বারটায় ডাক্তার আদিত্য চ্যাটার্জী এলেন, বয়েস প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দার্শনিকের মত এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল। মিঃ ঘোষালই ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয়টা করিয়ে দিলেন। এবং নিরালার দুর্ঘটনাটাও সংক্ষেপে তাঁর গোচরীভূত করলেন।

ডাঃ চ্যাটার্জী ওখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা। সহরেই প্র্যাকটিস্ করেন এবং নিজের একটি ছোটখাটো নার্সিং-হোমও আছে। মিঃ ঘোষালের মুখে সমস্ত কাহিনী শুনে তিনি বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। কেবল একবার মৃদু কণ্ঠে বললেন: How horible!

আরো বললেন এ গৃহ তাঁর পরিচিত, আগেও নাকি দু'-এক বার এসেছেন এখানে শিল্পী রণধীর চৌধুরীকে দেখতে। এবং সীতাকেও তিনি চিনতেন। এই বাড়িতেই আলাপ হয়েছিল রণধীর চৌধুরীর জীবিত কালে।

কিরীটির অনুরোধে শতদলকে ডাঃ চ্যাটার্জী পরীক্ষা করলেন। বললেন: 'Simple nervous shock? একটু ষ্টিমিউলেণ্ট ও ক'টা দিন বিশ্রাম পেলেই আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে।'

এমন সময় কিরীটি ডাঃ চ্যাটার্জীকে অনুরোধ জানাল: 'আমারও তাই মত ডাঃ চ্যাটার্জী! এবং আমার ইচ্ছা, শতদল বাবুর উপর দিয়া উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ধরে যে নার্ভাস ষ্ট্রেন গিয়েছে তাতেই তিনি আজকে দুর্ঘটনায় একেবারে ব্রেকডাউন করেছেন। এ অবস্থায় আমার মনে হয়—যদিও আমি ডাক্তার নই—ওঁর কিছুদিন রেষ্ট নেওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য—complete bodily and mental rest এবং এখানে নয়—অন্যত্র কোন জায়গায়। স্থান-পরিবর্ত্তন ওর এখন বিশেষ প্রয়োজন। আপনি কি বলেন ডাঃ চ্যাটার্জী!'

"খুবই ভাল হয় তাহলে। You are right!'

'আপনার নার্সিং-হোমে সুবিধা হয় না?—'

'আমার নার্সিং-হোমে?—'

'হাঁ। আমার ত মনে হয়, ওঁর পক্ষে আপনার নার্সিং-হোমই সব চাইতে ভাল জায়গা হবে। আপনার কেয়ারেও থাকবেন উনি এবং strict order থাকবে কেউ যেন ওঁর সঙ্গে দেখা না করতে পারে!'

'বেশ ত! তা হ'তে পারে।—'

'কোন সিংগল রুম খালি আছে কি?—'

'তা আছে।—'

'তবে সেই ব্যবস্থাই ভাল। এখুনি ওঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তাহলে করুন!—'

'বেশ ত। আমার টমটম্ এনেছি। আমার সঙ্গেই উনি চলুন।—'

সেই মত ব্যবস্থাই হলো। আমার 'পরেই কিরীটি ভার দিল ডাঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে শতদল বাবুকে নিয়ে গিয়ে একেবারে নার্সিং-হোমে পৌঁছে দিয়ে আসার।

কিরীটি ও মিঃ ঘোষাল থেকে গেলেন মৃতদেহের একটা ব্যবস্থা করবার জন্য।

গতকাল থেকে শতদল বাবু ডাঃ চ্যাটার্জীর নার্সিং-হোমেই আছে। নার্সিং-হোমে ষ্ট্রীক্ট্ অর্ডার দেওয়া আছে একমাত্র কিরীটি ও শতদল বাবু ছাড়া এবং তাদের বিনানুমতিতে কোন ভিজিটার্সকেই কোন উপলক্ষ্যেই শতদল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

সীতার আকস্মিক মৃত্যুর পর হ'তেই কিরীটিকে লক্ষ্য করছিলাম হঠাৎ যেন সে বেজায় গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। কি একটা চিন্তা যেন তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আরো একদিন পরের ঘটনা। হঠাৎ নার্সিং-হোম থেকে একজন লোক সংবাদ নিয়ে এলো সন্ধ্যার কিছু পরে ঘণ্টা খানেক আগে থেকে শতদল বাবু নাকি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন এবং ডাঃ চ্যাটার্জী অবিলম্বে কিরীটিকে একবার নার্সিং-হোমে যেতে বলেছেন। ডাক্তার তার টমটম্ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি ও কিরীটি আর কালবিলম্ব না করে তখুনি নার্সিং-হোমে যাবার জন্য টমটমে উঠে বসলাম।

ছোট্ট শহরটা। হোটেল থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে ষ্টেশনের কাছে ডাঃ চ্যাটার্জীর নার্সিং-হোম। প্রায় এক বিঘে জমির 'পরে বাগান, এক-মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর-ঘেরা সীমানার মধ্যে দোতলা একটি বাড়ি—নার্সিং-হোম। বাইরে থেকে একমাত্র গেট ছাড়া নার্সিং হোমের মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সোজা আমরা টমটম্ থেকে নেমে দো'তলার কোণের ঘরে যেখানে শতদল বাবু আছেন সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

শয্যার 'পরে শতদল বাবু শুয়ে। বুক পর্যন্ত চাদরে আবৃত। চোখ দু'টি বোজা।

পাশে দাঁড়িয়ে ডাঃ চ্যাটার্জী শতদলকে একটা ইনজেকশন দিচ্ছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে একজন নার্স।

ইনজেকশন দেওয়া শেষ হলে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার নার্সের হাতে সিরিঞ্জটা দিয়ে: 'চলুন আমার ঘরে। ভয় বোধ হয় কেটে গিয়েছে।'

ডাঃ চ্যাটার্জীর ঘরে এসে আমরা বসলাম।

'কি ব্যাপার ডাঃ চ্যাটার্জী!—'

'Morphiea poisoning—কেউ বোধ হয় শতদল বাবুকে মরফিন খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল!—'

'বলেন কি?—' কিরীটিই প্রশ্ন করে!

'হ্যাঁ!—হঠাৎ নার্স এসে ঠিক সময় মত আমার খবরটা না দিলে বোধ হয় রক্ষা করা যেত না life!—' অতঃপর একটু থেমে বললেন: 'এখন ত দেখছি সেদিন ওঁকে এখানে এনে ভালই করেছি।'

'কিন্তু কি করে সম্ভব হলো? How it was done!—' প্রশ্ন করলাম আমি।

'প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি দুপুরের দিকে কে একজন ভিজিটার্স দেখা করতে এসেছিল, কিন্তু দেখা

করবার অর্ডার না থাকায় নার্স দেখা করতে দেয়নি। ভদ্রলোক কিছু ফুল ও একটা কাগজের বাক্সে কিছু মিঠাই রেখে যান ওঁকে দেবার জন্য। সেই মিঠাই খেয়েই নাকি !—'

'হুঁ !—আচ্ছা ডাক্তার, আপনার সেই নার্স—যার হাতে সেই ভদ্রলোক ফুল ও মিঠাই দিয়ে গিয়েছিল এখানে তাকে একবার ডাকাতে পারেন ? তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই !—'

'নিশ্চয়ই !—'

ডাক্তার বেল বাজালেন। বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল, ডাঃ চ্যাটার্জী তাকে বললেন নার্স সরলা মিত্রকে ডেকে দিতে। নিচের ওয়ার্ডে সরলা মিত্র তখন ডিউটিতে ছিল।

'ভাল কথা ডাঃ চ্যাটার্জী, যে মিষ্টি খেয়ে শতদল বাবু অসুস্থ হ'য়ে পড়েন তার কিছু অংশ এখনো বাকী আছে নিশ্চয়ই ?' কিরীটি ডাক্তারকে শুধায়।

'হ্যাঁ। বোধ হয় গোটা দুই সন্দেশ খেয়েছিলেন—বাকীটা এখনো বাক্সেই আছে, রেখে দিয়েছি বাক্সটা সমেত—' বলতে বলতে বসবার টেবিলের ডান দিককার একটা ড্রয়ার চাবী দিয়ে খুলে ড্রয়টা টেনে কাগজের একটা ফ্যান্সী চৌকো বাক্স বের করে দিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী।

ফ্যান্সী কাগজের চৌকো বাক্স : বাক্সের উপরে চমৎকার একটা ডিজাইন ও দোকানের নাম লেখা : বান্ধব সুইট হোম। কাগজের বাক্সের উপরে লেখা নামটা পড়তে পড়তে কিরীটি বললে : এ ত দেখছি এখানকারই দোকান।

ডাঃ জবাব দিলেন, 'হাঁ ! এখানকার বিখ্যাত মিষ্টান্নের দোকান। এদের কড়াপাকের সন্দেশ খুব বিখ্যাত এবং খেতেও খুব ভাল।'

বাক্সের ডালা খুলতেই দেখা গেল, গোটা বার সন্দেশ তখনও অবশিষ্ট আছে।

সরলা মিত্র এসে কক্ষে প্রবেশ করল : আমাকে ডেকেছিলেন ডক্টর চ্যাটার্জী ?

'কে, সরলা ? এসো। আমি ঠিক নয় ইনি। এঁকে তুমি চেন না। বিখ্যাত লোক কিরীটি রায় !—'

'নমস্কার !—' সরলা হাত তুলে নমস্কার জানায়।

চব্বিশ-পঁচিশ বয়স হবে মিস মিত্রের। বেশ গোলগাল চেহারা এবং চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে।

'নমস্কার। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই মিস্ মিত্র !—' কিরীটি বললে।

'বলুন !—'

'৩ নং কেবিনে অর্থাৎ শতদল বাবুর কাছে আজ যখন ভিজিটার্স আসেন আপনি সে সময় নিচে ডিউটিতে ছিলেন শুনলাম !—'

'হ্যাঁ—'

'সময়টা আপনার মনে আছে কি ?—'

'হাঁ ! সাড়ে তিনটে হবে।—'

'যিনি এসেছিলেন তিনি দেখতে কেমন ?—'

'বাইশ-তেইশ বছরের একজন সুশ্রী-সুবেশা মহিলা।'

'মহিলা !—'

'হাঁ ! তিনি শতদল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বললাম পারমিশন নেই—তখন এক থোকা গোলাপ ফুল ও একটা মিষ্টির বাক্স দিয়ে আমায় অনুরোধ জানান শতদল বাবুর ঘরে সেগুলো পৌঁছে দিতে !—'

'সঙ্গে তাঁর আর কেউ ছিল ?—'

'না !—'

'তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন ?—'

'হয়ত চিনতে পারব তবে চোখে কালো চশমা ছিল।—'

[ক্রমশঃ।

ফাঁকি

শ্রীমতী মিনতি নাগ

এ ভুবন যদি শুধু মোরে দেয় ফাঁকি
আমার ললাটে মলিন কালিমা আঁকি—
তবুও তাহারে বাসি মন দিয়া ভালো
জ্বেলে যাব মোর এই জীবনের আলো
পূজাব অর্ঘ্যে পূজিয়া চরণ
ঝরিবে নিয়ত আঁখি—
এ ভুবন যদি শুধু মোরে দেয় ফাঁকি।

অন্ধকারের ঘোর নিরাশায়
কাঁদে যদি মন আলোর তৃষায়
হানাহানি করি বিফলে ঘুরিয়া
পথ যদি কোন না পায় খুঁজিয়া—
বরণ করিয়া আঁধারে লইব
তবুও হৃদয়ে ডাকি
এ ভুবন যদি শুধু মোরে দেয় ফাঁকি।

ডি. এচ. লরেন্স

ক্রমশঃ মোরেল দেরি করে বাড়ি ফিরতে লাগল।

মিসেস্ মোরেল একদিন তাঁর ধোপানীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এখন বুঝি খনিতে অনেক রাত অবধি কাজ হয়?'

'কই না ত'। বরাবরের চেয়ে বেশী দেরি হয় বলে ত' শুনিনি। তবে কি জানো, ওই এলেনের দোকানে মদ গিলতে ঢোকে ওরা আর তারপর ওখানে কথাবার্ত্তা শুরু হয়ে গেলে—বোঝই ত' ব্যাপার! বাড়ি ফিরে তেমনি জোটে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত! যেমন মজা তার তেমনি সাজা।'

'কিন্তু মিষ্টার মোরেল তো কখনো মদ খান না!'

ধোপানী তার কাজ থামিয়ে একবার হাঁ ক'রে তাকালে মিসেস্ মোরেলের দিকে, তারপর কিছু না বলে আবার কাপড় কাচতে শুরু করে দিলে।

প্রথম ছেলেটির জন্মের সময় মিসেস্ মোরেল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন মোরেল তাঁর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত, কিন্তু তবু তাঁর কেমন একা একা লাগত। যেন তাঁর আত্মার আত্মীয় কেউ নিকটে নেই, তাদের থেকে অনেক দূরে তিনি সরে এসেছেন। তাঁর স্বামীর সান্নিধ্য এই একাকীত্বের অনুভূতিটাকে আরও তীব্র, আরও দুর্বিষহ করে তুলত।

জন্মের সময় ছেলেটি ছিল রোগা আর ছোট, কিন্তু খুব শীগ গিরই সে বাড়তে লাগল। দিব্যি ছেলেটি, কোঁকড়ানো সোনালী চুল, ঘন নীল চোখ দুটি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হ'ল পরিষ্কার ধূসর রঙে। মা তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। তাঁর নিজের জীবনে যখন আশাভঙ্গের দুঃসহ বেদনা, ঠিক সেই সময়টিতেই এই সন্তানটির আবির্ভাব। যখন তাঁর অটল আত্মবিশ্বাসে ভাঙন ধরেছে, আগামী জীবনকে রুক্ষ আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছে, সেই পরম ক্ষণে এই ছোট্ট শিশুটি এল তাঁর ঘরে। তিনি তাকে কোথায় রাখবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর বাড়াবাড়ি দেখে মোরেলের ঈর্ষ্যা হতে লাগল।

অবশেষে স্বামীর প্রতি তাঁর অন্তর বিষিয়ে উঠল। স্বামীর দিক থেকে পুরোপুরিই তিনি সরে এলেন সন্তানের দিকে। নতুন গৃহ-রচনা করে মোরেল তাঁকে যে আদর দিয়েছিল, এবার তার বদলে জুটল অবহেলা। লোকটার চরিত্রে দৃঢ়তা নেই, বিরক্ত হয়ে ভাবলেন মিসেস্ মোরেল। ওর জীবনে শুধু ক্ষণিক উপভোগের আচম্কা উচ্ছ্বাস, কোথাও ধরা দেওয়া ওর স্বভাবে লেখে না। ওর শুধু বাইরের চাকচিক্য, অন্তরের দিক থেকে ওর দারিদ্র্যের সীমা নেই।

এর পর স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অন্তরের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। এ বড় নিদারুণ সংগ্রাম, এক পক্ষকে হত্যা না করে এর সমাপ্তি নেই। স্বামীকে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার জন্যে, নিজের কর্ত্তব্য পালন করবার জন্যে, প্রাণপণ সংগ্রাম করলেন তিনি। কিন্তু মোরেল এক ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তার চরিত্রে শুধু বাইরের জগতে উপভোগের উপাদান খুঁজে বেড়ানো, তাকে তিনি চাইলেন নীতি আর ধর্ম্মশিক্ষা দিতে। তিনি চাইলেন, সে যেন নিজের দায়িত্ব দেখে পালিয়ে না বেড়ায়। কিন্তু এই তীব্র সংগ্রাম তার সহ্য হ'ল না—তার মন পীড়িত হয়ে উঠল।

ছেলেটি তখনও ছোট, মোরেলের মেজাজ এত রুক্ষ হয়ে উঠল যে কখন সে ফেটে পড়বে বলা যায় না। ছেলেটি একটু বিরক্ত করেছে কি, তখনই তাকে ভয় দেখিয়ে ধমক দেওয়া—আর একটু মেজাজ চড়া থাকলে শক্ত হাতে ঐ শিশুকে প্রহার করতেও সে কসুর করত না। তখন মিসেস্ মোরেলের রাগ ধরে যেত, মনে মনে তাকেও ঘৃণা করতেন তিনি। কয়েক দিন অবধি এই ভাবেই মোরেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পেট পুরে মদ খেত। মিসেস্ মোরেল স্বামীর জন্যে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। শুধু স্বামী বাড়ি ফিরে এলে কড়া কড়া কথা বলে আরও বিষিয়ে তুলতেন তাকে।

এই ভাবে তাঁদের মনের বন্ধন আস্তে আস্তে ছিন্ন হয়ে গেল। মোরেল জ্ঞাতসারেই হোক কিম্বা অজ্ঞাতসারেই হোক, তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে লাগল, এমন ব্যবহার তার কাছ থেকে আর তিনি কোন দিন পাননি।

উইলিয়মের বয়স তখন এক। সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, মায়ের গর্বের আর সীমা নেই ওকে নিয়ে। তাঁদের অবস্থা এখন আর স্বচ্ছল নয়, তবু ছেলেটিকে তাঁর বোনেরা কাপড়-জামা দিয়ে সাজিয়ে রাখত। মাথার শাদা টুপীতে একটা উটপাখীর পালক, গায়ে শাদা কোট, ছোট্ট মাথাটি ঘিরে একরাশ কোঁকড়ানো চুল—মায়ের চোখের মণি ছেলেটি। এক রবিবারের সকাল বেলা মিসেস্ মোরেল শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলেন, নিচে বাপ আর ছেলেতে কি যেন বক্‌বক্ করে চলেছে। তারপর আবার তাঁর তন্দ্রা এল। কিছুক্ষণ পরে নিচে নেমে এলেন। নিচের চিম্‌নিতে গনগন করছে আগুন, ঘরটি গরম; সকাল বেলার খাবার কোনমতে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে—আর চিম্‌নির কাছে চেয়ারে বসে মোরেল,—একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে যেন। তার দু'পায়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছোট্ট ছেলেটি—তার মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা—একেবারে ন্যাড়া—কিন্তু অদ্ভুত ভাব ধারণ করেছে মাথাটি। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে চেয়ে আছে শুধু তাঁরই দিকে। সামনে একটা খবরের কাগজের উপর একরাশ কোঁকড়ানো চুল, তার উপর আগুনের আভা এসে পড়তে সেগুলোকে দেখাচ্ছে যেন কতকগুলো সোনালী গাঁদা ফুল!

মিসেস্ মোরেল নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রথম সন্তান! তাঁর মুখ থেকে সমস্ত রক্তের ছোপ বিলুপ্ত হয়ে গেল। কী বলবেন ভাষা খুঁজে পেলেন না।

মোরেল অপরাধীর মত হাসলে। প্রশ্ন করলে, 'কেমন লাগছে বলো ত'?'

দুই হাত আপনা-আপনি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল মিসেস্ মোরেলের। হাত দুটি তুলে তিনি এগিয়ে এলেন? মোরেল সন্ত্রস্ত হয়ে একটু পিছনে সরে গেল।

—'তোমাকে আমি খুন করতে পারি জানো!' মিসেস্ মোরেল এতক্ষণ পরে কথা খুঁজে পেলেন। রাগে তাঁর গলা বন্ধ হয়ে এল, মুঠি দুটি রইল উদ্যত হয়ে।

ভয়ার্ত্ত গলায় মোরেল বললে, 'তুমি কি ওকে একটি মেয়ে করে রাখতে চাও নাকি?' কিন্তু সে আর মাথা তুলতে পারলে না, চোখোচোখি চাইতেও সাহস হ'ল না তার। মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল।

মিসেস্ মোরেল ছেলের এই অদ্ভুত চুল-ছাঁটা মাথার দিকে ভাল করে চাইলেন এবারে। তারপর তার মাথায় নিজের হাত দুটি রেখে তাকে আদর করতে লাগলেন। ছেলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলা আটকে গেল, ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, মুখে দেখা দিল কুঞ্চন, অবশেষে ছেলের কাঁধে মাথা রেখে তিনি কেঁদে ফেললেন।

অনেক মেয়ে আছে যারা সহজে কাঁদতে পারে না। পুরুষ মানুষের মত তাদের মনে আঘাত লাগে, কিন্তু সে আঘাত প্রকাশ পায় না কান্নায়। মিসেস্ মোরেলও ছিলেন এই ধরণের মেয়ে। কিন্তু আজ যেন তাঁর অন্তর নিংড়ে কান্নার স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল।

মোরেল চিত্রার্পিতের মত হাঁটুর উপর কনুই রেখে বসে রইলেন

অবশেষে মিসেস্ মোরেল শান্ত হলেন। ছেলেকে শান্ত করে, খাবার টেবিল গোছাতে আরম্ভ করে দিলেন তিনি। শুধু যে কাগজখানাতে চুলগুলো ছিল সেখানা যেখানে ছিল সেইখানেই পড়ে রইল। মোরেল সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে উনুনের মধ্যে ফেলে দিলে। সারাক্ষণ মিসেস্ মোরেলের মুখে আর কথা নেই, নীরবে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন তিনি। মোরেল পরাজয় স্বীকার করল, মনে মনে নিজের উপর রাগ হতে লাগল তার। অপরাধীর মত সে আশে-পাশে ঘুরতে লাগল, সেদিনকার খাবার পর্য্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল তার কাছে। মিসেস্ মোরেল দু'-এক বার অত্যন্ত ভদ্রভাবে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন, সকাল বেলার ঘটনা সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতই তার মধ্যে নেই। তবু মোরেলের কেমন যেন মনে হতে লাগল, আজকের ঘটনায় সব কিছু যেন শেষ হয়ে গেছে, এ ভাঙন আর জুড়বে না।

মিসেস্ মোরেলও অবশ্য নিজের বোকামির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। সত্যি ত', ছেলের চুল আজ না হয় কিছুদিন পরে ত' কাটতেই হ'ত। স্বামীকে এমন কথাও তিনি বলেছিলেন যে, নাপিতের কাজটা যে সে সেরে ফেলেছে সেটা একদিক থেকে ভালই হয়েছে। কিন্তু মনে মনে দু'জনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে আজকের ঘটনায় মিসেস্ মোরেল তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে দুঃসহ আঘাত পেয়েছেন। সারা জীবন একটা বিষাক্ত ক্ষতের মত এই ঘটনা তাঁর মনে জেগে থাকবে; এমন তীব্র অন্তর্দাহ তাঁর আর কোন দিনই হয়নি।

আজকের ঘটনায় মোরেলের প্রতি তাঁর যেটুকু ভালবাসা অবশিষ্ট ছিল, তারও নিঃশেষ হয়ে গেল। এর আগে যতই তিক্ত হয়ে উঠুক না কেন তাঁদের সম্বন্ধ, তবু স্বামীর জন্তে তাঁর দরদ ছিল, পথভ্রষ্টের প্রতি ছিল অনুকম্পা। কিন্তু আজ সব কিছু চুকে গেল। এখন আর স্বামীর প্রেমের কামনা পর্য্যন্ত রইল না। আজ থেকে স্বামী তাঁর কাছে বাইরের লোক মাত্র। এতে যেন জীবনের বোঝা অনেকখানি হাল্কা হয়ে উঠল।

তবু তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্তে অনবরত সংগ্রাম করতে লাগলেন তিনি। তাঁর মনের সুগভীর নীতিবোধ তাঁকে নিরন্তর প্রেরণা দিতে লাগল। তাঁর পিউরিটান পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে এই নীতিবোধ লাভ করেছিলেন মিসেস্ মোরেল। এ যেন তাঁর কাছে একটা ধর্ম্মবিশ্বাসের মত হয়ে উঠল। স্বামীর অন্যায় আচরণ তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হ'তে লাগল। অন্যায়ের জন্তে তাকে নিরন্তর পীড়া দিতে লাগলেন তিনি। স্বামীকে তিনি ভালবাসেন, অন্ততঃ এক সময়ে ভালবাসতেন। তাকে নিয়ে তিনি মরীয়া হয়ে উঠলেন। সে যদি মদ খেত, কিম্বা মিথ্যা কথা বলত, অথবা আলস্য কিম্বা প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় নিত, তা'হলে নির্ম্মমভাবে তাকে শাসন করতে তিনি ত্রুটি করতেন না।

তাঁদের দু'জনের চরিত্রে মিলের চেয়ে গরমিলই ছিল বেশী। যত মুস্কিল এই নিয়েই। সে যা, তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারতেন না তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন তার আরো বড় হওয়া উচিত। তাকে জোর করে মহত্তর করতে গিয়ে তিনি তার সর্ব্বনাশ ডেকে আনলেন। অবশ্য এই নিয়ে নিজেও তিনি ভুগলেন কম না. দেহে এবং মনে জ্বালা ধরে গেল তাঁর, কিন্তু তাঁর চরিত্রের কোন গুরুতর ক্ষতি হ'ল না তাতে। তাছাড়া সন্তান দুটিও ছিল তাঁর সম্বল।···

মদ মোরেল যথেষ্ট পরিমাণেই খেত। অবশ্য খনির অনেক মজুরই এর চেয়েও অনেক বেশী মদ খায়। আর মদ খেলেও বীয়ারই ছিল তার একমাত্র পানীয়। কাজেই শরীরের কোন স্থায়ী অনিষ্ট করতে পারত না, সাময়িক আচ্ছন্নতা ছাড়া। সপ্তাহের শেষ-ভাগেই ছিল বড়ো আমোদের সময়। শুক্রবার সন্ধ্যায় গিয়ে মোরেল ঢুকত মদের দোকানে, আর দোকান বন্ধ করার সময় অবধি সেইখানেই বসে থাকত। শনিবার এবং রবিবারের সন্ধ্যাও কাটত এই ভাবে। সোম-মঙ্গলবারে দশটার মধ্যেই চলে যেতে হ'ত। অন্য দু'দিন হয় সে বাড়িতেই থাকত, নয় ত' বেরুলেও ঘণ্টাখানেকের জন্তে। মদ খেয়ে কাজে গরহাজির হওয়ার অভ্যেস তারনা ছিল। কিন্তু নিয়মিত কাজ করে গেলেও, তার মাইনে কমে যেতে লাগল। দোষের মধ্যে লোকটা ছিল বড্ড মুখ-পাতলা, কখন কোন কাকে কি ব'লে বসত তার ঠিক ছিল না। অন্য কেউ তার উপর খবরদারি করবে এটা অসহ্য লাগত তার কাছে। কাজেই সময় সময় খনির উপরওয়ালাদেরও সে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল করত।

এমনিই ছিল তার কথাবার্ত্তার ধারা—

'ওহে, আমাদের সর্দ্দার ব্যাটা আজ সকালে এসেছিল আমার কাছে। এসে বলে কি, ওয়ালটার, এ রকম ত' চলবে না। এই খুঁটিগুলো দিয়ে ত' চলবে না। বলে কি ব্যাটা!···বললুম, কেন, কি হয়েছে খুঁটিগুলোতে? কি বলতে চাও তুমি?···সে বললে, এ ভাবে খুঁটি রাখলে একদিন ছাদসুদ্ধ ধ্বসে পড়বে।···শোন কথা! আমি বললুম, দাঁড়িয়ে যাও, ভাই। একটা মাটির ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে যাও—তোমার মুণ্ডুটা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখো ছাদটাকে। আমার কথা শুনে লোকটা পাগল হবার যোগাড়, অনেক শাপ-মণ্যি করলে আমাকে, আর আশপাশের লোকগুলো হেসে সারা হ'ল।'···

মোরেল খুব ভালো নকল করতে পারত। ম্যানেজারের ভাঙা, মোটা গলার অনুকরণে এবং তার বিশুদ্ধ ভাষা বলবার প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করে সে যখন কথা বলত, তখন তার সঙ্গী মজুররা হেসে গড়িয়ে পড়ত।···মোরেলের কথার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল। খনির ম্যানেজার খুব কিছু শিক্ষিত লোক ছিল না। ছেলেবেলায় মোরেল আর সে একসঙ্গেই কাটিয়েছে—দু'জনে দু'জনকে হিংসে করেছে সত্যি, কিন্তু দু'জনেই দু'জনকে মেনে নিয়েছে।···কিন্তু এমন প্রকাশ্যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, যতই সে তার বন্ধু-লোক হোক-না-কেন, এ তার সহ্য হ'ল না। কাজেই মোরেলকে ক্রমশঃ এমন সব খাদ কাটতে দেওয়া হতে লাগল, যেখানে কয়লার পরিমাণ সামান্য এবং কয়লা কেটে আনাও শক্ত। ভালো কাজ জানা সত্ত্বেও মোরেলের রোজগারের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল।

গ্রীষ্মকালে এমনিতেই খনির কাজ কমে যায়। পুরুষরা দল বেঁধে সকাল বেলা দশটা, এগারোটা কিম্বা বারোটার সময় আবার বাড়ি ফিরে আসে। খনির সামনে শূন্য গাড়িগুলো আর দাঁড়িয়ে থাকে না।···ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরে আসতে আসতে যখন দেখে সব গাড়িগুলো দূরে চলে গেছে, তখন বাবা দুপুরে বাড়ি আসবে এই আনন্দে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-বুড়ো সবার মনে বিষাদের ছায়া নামে, কেন না খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তাদের উপার্জ্জন কমে যাবে, সপ্তাহের শেষে কষ্টের আর সীমা থাকবে না।

মোরেল সাধারণতঃ সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং করে স্ত্রীকে দিত। এর মধ্যে ছিল বাড়ি-ভাড়া, খাবার, পোষাক, ক্লাব, জীবনবীমা এবং ডাক্তারের খরচ। অর্থাৎ সংসারের প্রায় যাবতীয় খরচাই মিসেস্ মোরেলের হাত দিয়ে হ'ত। কখনও কখনও হাতে বেশী টাকা থাকলে, মোরেল তাঁকে পঁয়ত্রিশ শিলিং অবধি দিত। কিন্তু বেশীরভাগ সময়ই মোরেলকে হাত গুটিয়ে আসতে দেখা যেত—পঁচিশ শিলিং-এ। শীতকালে ভালো খাদে কাজ পেলে সপ্তাহে সে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন শিলিং পর্য্যন্ত রোজগার করত। তখন খুব খোশমেজাজে থাকত সে। শুক্র, শনি কিম্বা রবিবার রাত্রে, সে ইচ্ছামত খরচ করত, কুড়ি শিলিং কিম্বা তারও বেশী খরচা করে দিয়ে তবে তার তৃপ্তি হ'ত। তার মধ্যে ছেলেমেয়েদের জন্তে দু'-এক পেনি বেশী খরচ করা কিম্বা তাদের কিছু ফল কিনে দেওয়া—এসব খুব কমই ঘটত—বেশীরভাগই যেত মদে। কিন্তু রোজগার মন্দা হয়ে এলে তার মদ খাবার নেশা কমে আসত। চার দিকের অভাবের মধ্যেও মিসেস্ মোরেল বলতেন, 'দেখছি আমার কষ্টে থাকাই ভালো। হাতে পয়সা বেশী হলে ত' দু'দণ্ডও শান্তি নেই ওর জন্তে।'

সে যতই বেশী রোজগার করত, ততই নিজের জন্তে তার বেশী পয়সা দরকার হ'ত। আর রোজগার কমে এলেও তার থেকে নিজের জন্তে কিছু-না-কিছু সরিয়ে রাখত। কিন্তু এক পেনিও তার সঞ্চিত ছিল না এবং স্ত্রীকেও একটি পেনি জমাবার সুযোগ সে দিতে চাইত না। বরং অনেক সময় তার নিজের দেনা স্ত্রীকে শুধতে

হ'ত।···অবশ্য মদের দেনা নয়, ওটা গৃহিণীদের কাছে চাওয়ার রীতি ছিল না, কিন্তু অন্য ধরণের দেনা—যেমন হয়ত সে একটা পাখী কিনে এনেছে কিম্বা একটা সখের বেড়াবার ছড়ি। এই বাড়তি খরচগুলো মিসেস্ মোরেলের ঘাড়ে এসে চাপত।

এবার মেলার সময়টাতে মোরেলের রোজগার কমে যাচ্ছিল আর মিসেস্ মোরেল আসন্নপ্রসবা ছিলেন ব'লে কিছু কিছু সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময়ে এমন ভাবে আমোদ করে বাইরে কাটানো আর পয়সা উড়িয়ে দেওয়া নিয়ে মিসেস্ মোরেলের অন্তর একেবারে তিক্ত হয়ে উঠল। সে ত' দিব্যি বাইরে ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে, আর তিনি একা-একা ঘরে বসে চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন।···

এখন দু'দিন ছুটি। মঙ্গলবার সকালে মোরেল খুব ভোরে উঠল। তার মেজাজ আজ বেজায় ভালো, খুব ভোরে উঠে শিস দিতে দিতে সে যখন নিচে নেবে গেল, মিসেস্ মোরেল শুনতে পেলেন। ওর শিস দেবার ধরণ ছিল খুব সুন্দর—যেমন জোরালো, তেমনি মিষ্টি। শিস দিয়ে সে সাধারণতঃ প্রার্থনার গানগুলো গাইত। ছেলেবেলায় সে গির্জ্জার গাইয়েদের দলে ছিল এবং একা-একাও গান করার অভ্যাস করেছিল। সকাল বেলার এই শিসে তার পরিচয় পাওয়া যেত।

মিসেস্ মোরেল শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলেন, স্বামী নিচের বাগানে টুকিটাকি মেরামতের কাজ করছে। করাত দিয়ে কাঠ কাটতে কাটতে কিম্বা হাতুড়ি পিটতে পিটতে জোরে জোরে শিস দিচ্ছে সে। ভারী ভালো লাগত তাঁর সকাল বেলা শুয়ে শুয়ে এই শিস শোনা—এই শিস যেন পরিচয় দিত হৃদয়ের উষ্ণতার, চারি দিকের গভীর শান্তির। ছেলেমেয়েরা তখনও ঘুম থেকে জাগেনি, সেই সোনালী ভোরে তার হৃদয়ের আনন্দকে সে প্রকাশ করছে পুরুষ-মানুষদের নিজস্ব রীতিতে, জোর গলায় শিস দিয়ে।

তখন ন'টা বেজেছে। ছেলেমেয়েরা মোজা খুলে শোফার উপর বসে খেলা করছে। মা জামা-কাপড় ধুয়ে রাখছেন। মোরেল বাইরের মিস্ত্রীখানার কাজ সেরে ঘরে ঢুকল। সার্টের হাত দুটো গুটানো, ছোট কোটটার বোতাম খোলা। দেখতে সে এখনও সুপুরুষ, কাল চুলে ঢেউ খেলানো, বিশাল কালো গোঁফ তার উপরের ঠোঁটে। মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন একটু অস্বাভাবিক, সাধারণতঃ তার চাউনিতে থাকে একটু যেন বিরক্তির আভাস। কিন্তু আজ সে খুশি। যেখানে তার স্ত্রী কাপড়-জামা ধুয়ে রাখছিলেন সোজাসুজি সেইখানে গিয়ে সে হাজির হ'ল।

'কি হচ্ছে ওখানে?' উল্লাসের স্বরে মোরেল বললে, 'সরো সরো, আমি আগে হাতটা ধুয়ে নি।'

'দাঁড়াও আমার শেষ হোক আগে।'

'তাই নাকি? আর যদি আমি না দাঁড়াই?'

স্বামীর এই পরিহাসে মিসেস্ মোরেল কৌতুক অনুভব করলেন। বললেন, 'তুমি গিয়ে ঐ ছোট্ট চৌবাচ্চাটায় হাত ধুয়ে নাও।'

'হ্যাঁ, যেমন বুদ্ধি তোমার!' ব'লে মোরেল খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সরে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ইচ্ছে হ'লে মোরেল খুবই ভালো ব্যবহার করতে পারত। তার চেহারাও ছিল খুব ভদ্র। সাধারণতঃ বাইরে বেরুবার সময় তার গলায় একটা রুমাল বাঁধা থাকত। এবার মোরেল তাঁর প্রসাধন শুরু করলো। খুব তাড়াতাড়ি সে গা ধুয়ে নিলে; তারপর তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নাটা একটু নিচু; তাই নিচু হয়ে সে তার কাল চুলের রাশ আঁচড়াতে লাগল। তার তাড়াহুড়া দেখে মিসেস্ মোরেল বিরক্ত হয়ে উঠলেন। গলায় ভাঁজ করা কলার, কাল নেকটাই আর লম্বা কোট পরে তার চেহারা খুবই খুললো। পোষাক তাকে যেমনই মানাক না কেন, তার মুখের ভাবে তাকে মনে হ'ত আরও বেশী সুন্দর।

সাড়ে ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে জেরি পারডি তার বন্ধুর খোঁজে এল। মোরেল আর সে অনেক দিনের বন্ধু। দু'জনে খুবই অন্তরঙ্গ। কিন্তু মিসেস্ মোরেল এই লোকটাকে মোটেই দেখতে পারতেন না। লম্বা একহারা চেহারা, মুখে শেয়াল-পণ্ডিতের মত ধূর্ত্ত ভাব। চোখগুলি এত গর্ত্তে ঢোকা যে, দেখলে মনে হয় যেন চোখের পাতা নেই। লোকটার হাঁটবার ভঙ্গী যেন কাঠের পুতুলের মত। তার মধ্যে যেন দয়া-মায়া ব'লে কিছু নেই। কিন্তু খুবই চতুর সে। যাকে তার ভাল লাগত তার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করত। মোরেল ছিল তার খুবই প্রিয়। সে যেন সর্ব্বদা তাকে আগলে রাখত। মিসেস্ মোরেল ঘৃণা করতেন লোকটাকে। এর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সে বেচারা ক্ষয় রোগে ভুগে ভুগে মারা গিয়েছে। শেষ অবস্থায় স্বামীর প্রতি তার এত ঘৃণা জন্মেছিল যে, সে ঘরে ঢুকলেই তার অসুখ বেড়ে যেত। কিন্তু জেরির তার জন্যে কোন মাথাব্যথা ছিল না। এখন তার পনেরো বছরের বড় মেয়েই সংসার চালায়। ছোট দুটি ভাই-বোনকে মানুষ ক'রে কোন রকমে ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে দেয় মাত্র।

'লোকটার মন বড় নিচু; ওর মনটা শুকিয়ে গেছে।' এই ছিল তার সম্বন্ধে মিসেস্ মোরেলের অভিমত।

মোরেল প্রতিবাদ করত। বলত, 'কখনও নয়। আমার জন্মে দেখিনি ওকে কিপটেমি করতে। ওর চেয়ে দরাজ হাত, ওর চেয়ে উঁচু মন তুমি খুঁজে বের করো দেখি!'

'দরাজ ত' শুধু তোমার বেলায়।' মিসেস্ মোরেল মন্তব্য করতেন, 'কিন্তু ছেলেমেয়ের বেলায় ত' ওর হাতের মুঠো খোলে না। আহা, ওদের জন্যে দুঃখু হয়!'

'দুঃখু হয়! কেন, কী এমন দুঃখ ওরা করছে বলো ত', দেখি।'

কিন্তু মিসেস্ মোরেল কিছুতেই লোকটার উপর প্রসন্ন হতে পারলেন না।

যাকে নিয়ে তাঁদের তর্ক হচ্ছে, হঠাৎ দেখা গেল ভাঁড়ার ঘরের পর্দ্দার উপর দিয়ে সে তার লম্বা গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। মিসেস মোরেলই তাকে প্রথম দেখতে পেলেন।

'নমস্কার, গিন্নী ঠাকরুণ! কর্ত্তা বাড়িতে?'

'হ্যাঁ—বাড়িতেই।'

জেরিকে আসবার কথা কিছু বলা হ'ল না, তবু না বলতেই সে এসে হাজির। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। কেউ তাকে বসতে পর্য্যন্ত বললে না—কিন্তু সে এসে গম্ভীরভাবে দাঁড়াল—যেন পুরুষমানুষের ন্যায্য অধিকার কিম্বা স্বামিত্বের দাবী জোর করে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই সে এসেছে। মিসেস্ মোরেলকে সে বললে, 'কেমন চমৎকার দিনটি!'

'হ্যাঁ।'

'দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াবার মত সকাল, আজকে—অনেক দূরে ঘুরে আসা যায়।'

'ও, আপনি বুঝি বেড়াতে যাচ্ছেন?' মিসেস্ মোরেল প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, তবে আমি একা নই, আমরা বলুন। আমরা দু'জনে আজ হেঁটে নটিংহাম যাচ্ছি।'

'ও:।'

পুরুষমানুষ দুটি পরস্পরকে স্বাগত জানালে। দু'জনেই তাবা দু'জনকে পেয়ে খুশি। জেরির হাবভাব বেপরোয়া, কিন্তু মোরেল যেন একটু সঙ্কুচিত, স্ত্রীর সামনে নিজের মনের আনন্দ প্রকাশ করার যেন সাহস নেই তার। তবু তাড়াতাড়ি সে বুটের ফিতে খুলে বাঁধলে, তার হাবভাবে মনের চাঞ্চল্য ধরা পড়ল। আজ তাদের দশ মাইল দূরে নটিংহাম-এ বেড়াতে যাবার কথা। মাঠের উপর দিয়ে পথ। 'বটমস্'-এর দিক থেকে পাহাড়ের উপর উঠে তারা দু'জনে সকাল বেলাকার রোদে মনের আনন্দে হাঁটতে শুরু করলে। প্রথমবার তারা 'মুন এণ্ড ষ্টারস' থেকে কিছু মদ টেনে নিল, দ্বিতীয়বার থামলে 'ওল্ড স্পট'-এ। এর পর পাঁচ মাইল সমানে হেঁটে এসে থামল একেবারে 'বুলওয়েল'-এর দরজায়, সেখানে পুরোপুরি এক পাঁইট। এর পর কিছুক্ষণ মাঠে বসে চাষীদের সঙ্গে কাটালে, তাদের বোতলও ছিল ভারী, কাজেই শহরের কাছাকাছি এসেই মোরেলের ঘুম পেতে লাগল। অত বড় শহরটা তাদের সামনে ছড়িয়ে আছে, দুপুর বেলার রোদে যেন গা-ঘামছে তার। দক্ষিণ দিকে মঠের চূড়ো, কারখানার ছাদ আর চিম্‌নি—সব যেন আকাশটাকে ছেয়ে রেখেছে। শেষ মাঠটা পার হয়ে আসবার সময় মোরেল একটা ওক্ গাছের ছায়ায় শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভেঙে যখন আবার হাঁটা শুরু করলে, তখন কেমন যেন সারা শরীর আচ্ছন্ন লাগছে তার।

'দি মীডোজ' ব'লে খাবার দোকানে তারা দুপুর বেলার খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলে। জেরির বোনও সেখানে ছিল। তারপর তারা গিয়ে ঢুকল 'পাক্ রোসে'—সেখানে পায়রা-ওড়ানোর খেলা চলছিল, সেই খেলার উত্তেজনার মধ্যে তারাও গিয়ে যোগ দিলে। মোরেল তার জীবনে কখনো তাস খেলেনি—তার মনে হ'ত যেন তাসের মধ্যে কোনো দুষ্টু মায়ার খেলা আছে, মুখেও সে তাসগুলোকে বলত 'শয়তানের ছবি'। কিন্তু স্কিটল কিম্বা ডোমিনো খেলায় সে ছিল ওস্তাদ। স্কিটল খেলায় সে নিউইয়র্ক-এর একটা লোকের সঙ্গে বাজি রেখে বসল। সেখানে যত লোক ছিল তারাও দু'পক্ষে এসে জুটল, কেউ বা বাজি রাখলে এক দিকে, কেউ বা অন্ত দিকে। মোরেল তার কোট খুলে ফেললে। তার টুপিতে টাকা ছিল, সেটা জেরিকে রাখতে দিলে। টেবিলের আশ-পাশে সব লোক তন্ময় হয়ে খেলা দেখছে—তাদের কারু কারু হাতে মদের পাত্র। মোরেল প্রথমে কাঠের বলটাকে পরীক্ষা করে নিলে, তারপর দিলে গড়িয়ে। খেলার শেষে সে আধ-ক্রাউন জিতল। আপাতত: পয়সার দিক দিয়ে কিছুটা স্বচ্ছলতা এল তার।

সাতটার মধ্যে তাদের অবস্থা খুবই ভালো হয়ে উঠল। অবশেষে সাড়ে সাতটার গাড়িতে বাড়ি ফিরে এল দু'জনে।···

সন্ধ্যাবেলা 'দি বটমস্'-এর অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠত। যারা ঘরে থাকত তারাও এই সময় বেরিয়ে আসত বাইরে। বাড়ির মেয়েরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, গায়ে শাদা চাদর জড়িয়ে, দু'ব্লকের মাঝখানের সরু রাস্তাটিতে দাঁড়িয়ে গল্প জমাত। পুরুষরা মদ খাবার ফাঁকে ফাঁকে মাটিতে বসে নানা ধরণের গল্প করত। সারা বাড়ি জুড়ে এক ধরণের ভ্যাপসা গন্ধ—বাড়ির কাল শ্লেট-পাথরের ছাদগুলো গরমে যেন চকচক্ করত।

মিসেস্ মোরেল ছোট মেয়েটিকে নিয়ে নদীর ধারের মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়—বেশী হলে দু'শ গজ। নুড়ি আর ভাঙা পাথরের উপর দিয়ে নদীর জল কুল-কুল করে বয়ে চলেছে। মা আর মেয়ে দু'জনে রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। মাঠের অন্য প্রান্তে কয়েকটা ছেলে ন্যাংটো হয়ে জলে বারবার ডুব দিচ্ছে—কচিৎ কোন লোক মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে দূরে চলে গেল,—এই রুক্ষ, ধূসর মাঠের উপর দিয়ে যেন একটি উজ্জ্বল জোনাকির মত। উইলিয়মও রয়েছে ঐ ডুব-দেওয়া ছেলেদের দলে। তাঁর ভয় হতে লাগল, পাছে সে ডুবে যায়।···এদিকে অ্যানি গাছগুলোর নিচে খেলা করছে, ছোট ছোট ফল আনছে কুড়িয়ে, অ্যানির কাছে ওগুলো সবই আঙুর। মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখাও সহজ কাজ নয়, আবার মাছিগুলো ভন্-ভন করে সারাক্ষণ জ্বালাতন করে মরছে।

সাতটার সময় ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমিয়ে পড়ল। এবার নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণ কাজ করতে পারবেন তিনি।···

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য।

লেখকদের কর্ত্তব্য কি?

"আমার বিশ্বাস, দেশের লোককে আশার কথা, আনন্দের কথা শোনানই এ যুগের লেখকদের পক্ষে কর্ত্তব্য, নৈরাশ্যের কথা, ঔদাস্যের কথা নয়। আনন্দই হচ্ছে একমাত্র প্রকাশ করবার, দশ দিক ছড়িয়ে দেবার, দশের মনে চারিয়ে দেবার বস্তু; অপর পক্ষে বেদনা দশের মন থেকে ছাড়িয়ে, দশ দিক থেকে কুড়িয়ে নিজের অন্তরে সঞ্চিত ও ঘনীভূত করাই সকলের পক্ষে না হোক, অন্তত লেখকদের পক্ষে কর্ত্তব্য; কেন না যে পরের ব্যথার ব্যথী নয়, সে পরকে কখন আনন্দ দিতে পারে না।"

—প্রমথ চৌধুরী।

পেঁচা

অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

চ্যা-চ্যা-চ্যা…।

কালো আকাশের বুক চিরে ডেকে ওঠে একটা পেঁচা। কর্কশ-ধ্বনির ঝিকিয়ে-ওঠা আঘাতে ছিঁড়ে যায় স্বপ্ন-বাসর। বাগানের এক কোণে সবুজ তৃণাকীর্ণ কার্পেটের ওপর ঝুঁকে-পড়া শরীরটা, পাশ ফিরে নিতে চায় এক ঝলক গন্ধ। ক্রিসেন্থিমামের ঝোপে একটুও গন্ধ নেই কেন? অন্ধকারে দোদুল লিলি-হোয়াইট দেখা যায় না তো! না, ওই পেঁচা কর্কশধ্বনি সব মাটি করে দিলো। উঠে বসে ডাটন। মিঃ এস. ডাটন। ফ্লাস্কের কুচিকুচি বরফে ডোবানো শ্যাম্পেনের বোতলটা বার করে নেয়। গলায় ঢেলে দেয় ঢকঢক করে এক সংগে অনেকটা সুরা। সুরা বুঝি-বা আবার সুর ফেরায়। কিন্তু এই সুযোগেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে ললিতা।

: উঠে পড়লে যে!

: রা । হয়ে গেলো অনেক। বাড়িতে সবাই ভাববে

ওহো, তাইতো বটে। তুমি আবার ঘরনী। মাঝে মাঝে ভুলে যাই কথাটা। আমায় ক্ষমা করো রানী। সাপ চলার মতো চাপা হিস্‌হিসে হাসি হাসে ডাটন।—একটু খাবে নাকি ললিতা? বরফের কুচি দেওয়া ফ্লাস্কের মুখ ঘোরাতে থাকে ডাটন।

: আমি তো ও-সব খাই না।

: তাই তোমার কণ্ঠে সুর নেই। আবার হিস্‌হিস করে ওঠে ডাটনের কণ্ঠস্বর :

: অনেক রাত হয়ে গেলো। স্তিমিত কণ্ঠে ললিতা বলে ওঠে।

: বুঝেছি, টাকা চাইছো তো?

: টাকার জন্যেই এ-পথে এসেছি আর টাকা নেবো না! ললিতার চোখের তারা দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে কেমন এক অস্বস্তিকর আলোয়।

ডাটনের মনে পড়ে যায় পেঁচার কর্কশ ডাক। সংগে সংগেই নারকেল গাছের চূড়ো থেকে পেঁচাটা আবার ডেকে ওঠে: চ্যা-চ্যা-চ্যা…।

: না, সব মাটি করে দিলে এই পেঁচাটা। ডাটনের কণ্ঠনালী বজবজ করে ওঠে শ্যাম্পেনের যাত্রাপথে।

ললিতা হাসে।—ও তোমার নাগালের বাইরে। ওর তো কোন অভাব নেই। সেই এক হাসি।

ডাটন উত্তরে কিছু বলে না। কেবল কণ্ঠনালীর বজবজ ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। সবটুকু শেষ করে উঠে পড়ে ডাটন।—চলো, এবার যাওয়া যাক।

নীরবে ললিতা ডাটনের অনুসরণ করে চলতে থাকে। ঝোপের পাশ দিয়ে নুড়ি-ছড়ানো পথটা ধরে। বাতাসের ঘায়ে ঘায়ে ছড়িয়ে পড়ে ফুলের গন্ধ। ক্রিসেন্থিমাম…লিলি-হোয়াইট…স্নো-ড্রপ…।

ফটকের মুখে দারোয়ানের ঘরের সামনে এসে পড়তেই খাটিয়া হতে উঠে পড়ে সেলাম করে রঘুবীর। পরমুহূর্তে লণ্ঠন হাতে এগিয়ে চলে রঘুবীর বাগানের সেই কোণে। তৃণাকীর্ণ কার্পেটের সন্ধানে। সেখানে আছে এয়ার-পিলো…ফ্ল্যাস্ক…টুকিটাকি আরো কতো কি। সেই সব আনতে।

প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে দেয় ডাটন। সোনালী চেনে বাঁধা চাবির রিং। দরজায় চাবি এঁটে ঘোরাতেই খুট করে গেলো। ভেতরে ঢুকে ষ্টিয়ারিং-এর পাশের দরজা খুলে দেয়।

: আমি আজ ভেতরেই বসি। ললিতা মিনতি করে।

: কেন?

: আমার মেয়ে পুজোর ছুটিতে হষ্টেল থেকে ফিরেছে। কথাটা বলে ফেলেই ললিতা বোঝে, কতো বড় ভুল সে করেছে। কিন্তু সব ফেরানো যায়; বলা কথা নয়।

ডাটন চোখ বুজে হেসে ওঠে।—তাতে কি, চলে এসো। মেয়ে মা'কে বুঝতে পারবে না। আবার হাসি।

উপায় নেই। ললিতা ডাটনের পাশেই বসে পড়ে। কিছু করার নেই। ডাটন চোখ ফেরায় রঘুবীরের ঘরের দিকে। লছমী ঘটি মাজতে মাজতে থেমে পড়েছে। এবার ডাটনের দিকে চেয়ে হেসে ছুলিয়ে দেয় নিজেকে।

সাহস আছে তো খুব। আমার দিকে চেয়ে রঘুবীরের বউ হাসছে।

অভাব।

না, এটা ওর স্বভাব।

একদিন খোঁজ করে দেখবে বুঝি?

তার আগে তোমার খোঁজ নেওয়া শেষ করি!

রঘুবীর এসে পড়েছে। পিছনের সিট-এ রেখে দেয় জিনিসপত্র। ললিতার অংগ অবশ হয়ে গেছে ডাটনের কথায়। মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন ওঠে গাড়িতে। গেট খুলে সেলাম করে সরে দাঁড়ায় রঘুবীর। মনে মনে বলে ওঠে সে: সীয়ারাম। সীয়ারাম। আওর একঠো আফশোষ কি রাত গেলো। গাড়ি গড়িয়ে পড়ে পথে: বি. টি. রোড।

ফার্স্ট গিয়ার সেকেণ্ড গিয়ারের ফাঁকে একসিলেটরে চাপ পড়ে। গাড়ির গতি ক্রমশ দূরত্বকে আর লক্ষ্যকে মুঠোর মধ্যে এনে দেয়। আশপাশে কুচিকুচি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে শহরতলীর ছোটখাটো আস্তানা সব। স্তব্ধ রাত। জনহীন পথ। গাড়ি ছুটে চলেছে। সামনে একটা গরুর গাড়ি পড়ে। লণ্ঠনের অভাবে ঠোঁয়ার মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে আপন মনে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু হাম্বার-হক সে-কথা শুনবে কেন! ব্রেক কষে হর্ণ বাজায় ডাটন। হর্ণের শব্দে এতোক্ষণে নিজেকে খুঁজে পায় ললিতা। গরুর গাড়ি পথ ছেড়েছে। একসিলেটরে আবার চাপ পড়ে।

ললিতা অস্ফুটে কথা বলে: একবার ভেতরের আলোটা জ্বালবে?

: ভুলেই গিয়েছি। এক হাত ষ্টিয়ারিং-এ রেখে অন্য হাতে অটোমেটিক ম্যাচে সিগারেট ধরায়। একরাশ ধোঁয়া সামনের কাচে ভ্যাপসা ছাপ তোলে। ডাটন বোতাম টেপে। ভেতরের মৃদু আলো জ্বলে ওঠে।

ললিতা ভ্যানিটির ক্লিপ খুলে ছোট আয়না বার করে। কাগজে মোড়া সিঁদুর থেকে মাথায় স্বল্প ছড়িয়ে দেয়। হাতটা একটু কেঁপে যায়, বড় মেয়ে এলার কথা মনে পড়ায়। তারপর পাউডারের পাফ তার উজ্জ্বল ত্বক ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভ্যানিটিতে পুনরায় বন্দী হয়। ললিতা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, শহর এসে গেছে। অবিন্যস্ত শাড়ির পাট ঠিক করে নেয় ললিতা। মনের মধ্যে ঘুরে যায় আর একবার এলার কথা। মেয়েটা নিশ্চয়ই আজ দু'বছর পরে বাড়ি ফিরে এতো রাতেও মা'কে ফিরতে না দেখে অবাক হয়ে গেছে। কেমন থরথর করে কেঁপে ওঠে সারা শরীর। স্বামীর কথাও মনে পড়ে। এতোক্ষণ হয়তো নেশায় বেঁহুশ। আর খোকা?

: শুনছো ?

: কি ? ডাটন উত্তর দেয়।

: এখন কিছুদিন আমাদের আর দেখা না হওয়াই ভালো।

: কেন, এলা এসেছে বলে ! বিদ্রূপ করে ওঠে ডাটন। হাতে থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পোড়া সিগারেট।—তাকে নয় ব্যাপারটা খুলেই বললে। অবশ্য তোমার অভিনয়-ক্ষমতাটাও বোঝা যাবে এই ফাঁকে। ভেবেছিলাম একটা ছবি করবো। তোমাকে না-হয় হিরোইনের পার্টটাই দেওয়া যাবে।

: চাই না আমার অমন পার্ট।

: আহা, রাগ করো কেন। ব্যাংগের হাসি এখনো ডাটনের মুখে-চোখে। গাড়িটা নতুন পথ ধরে। সেন্ট্রাল এভিনিউ।

বহু পথ ঘুরে শেষে ডাটনের গাড়ি থেমে যায় শহরের প্রান্তে ঝাউ-পাইন-ঘেরা এক নির্জন পথে। একটি দোতলা বাড়ির সামনে। আশে-পাশের গৃহে নিদ্রাতুর অন্ধকারের নীরব পরিচয়। তাই বিনা কারণে ডাটনের হর্ণ বেশি জোর শোনায়। অথবা ডাটন বিনা কারণে হর্ণ বাজায় নি। কারণ, তার সন্ধানী চোখ দোতলার বারান্দায় থেমে যায়।

: ওই বুঝি তোমার মেয়ে এলা ?

কথাটা শুনে ললিতা গাড়ি হতে নামতে গিয়ে হোঁচট খায়। ডাটনের প্রশ্নে একটু কেঁপে ওঠে। প্রত্যুত্তরে বলে : আমার টাকা ?

: দিচ্ছি। অন্ধকারে ডাটনের চোখ দুটো না দেখা গেলেও তো অনুভব করে তার হিংস্র উত্তাপ। ডাটন চিবিয়ে চিবিয়ে ওঠে : কিছু বেশিই দিলাম। তোমার মেয়ে এসেছে, তাই।

: আমাদের এখন দেখা না হওয়াই ভালো।

: সেটুকু নির্ভর করছে আমার ওপর। অগ্রিম দক্ষিণার মনে রেখো। সেবারে সেই তোমার খোকন না কার অসুখের টাকাটা···। কথাটা শেষ করার প্রয়োজন বোধ করে না। তার গাড়ি বাঁক নিলো।

হর্ণের শব্দে এলা বারান্দায় ছুটে এসে ভুল করে নি। একটু বিস্মিত এলা হয়েছে, এতো রাতে মাকে গাড়ি হতে নামতে দেখে। কিন্তু হতবাক্ হয়ে গেছে মাকে একজন পুরুষের কাছ থেকে, যাকে এলা চেনে না, তার কাছ থেকে কতকগুলো নোট নিতে দেখে। আর তো দেরি করলে চলে না। এলা চলতে চলতে বহুপরিচিত স্যুইচ বক্সে স্যুইচ টিপে একে একে ঘর-সিঁড়ি-ড্রয়িং রুমে আলো জ্বেলে দরজা খুলে ললিতার পায়ে ভেঙে পড়ে প্রণাম করতে যায়। ললিতাই বাধা দেয় : আমায় এখন ছুঁসনি।

: কেন মা ?

: তোর মা পড়িয়ে এলো কিনা ! নিরলস কণ্ঠস্বরে পাশের ঘর থেকে সুদর্শন বলে ওঠে।

: এতো রাতে মা···!

: হাাঁ, এখানে টুশানিটা রাত-ঘেঁষা। তুই এখন ওপরে যা এলা। তোর মা যাচ্ছে। সুদর্শন পাশের ঘর থেকে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

এলা দেখে, ললিতা আর সুদর্শনের মধ্যে কেমন যেন অপরিচিত, অনাসক্ত চাহনি। সুদর্শনের ওপরে যাওয়ার কথাটা এলা অবহেলা করতেও পারে না। নীরবে নিঃশব্দে সে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যায়। তার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আরো গোলমালে পড়ে গেছে ললিতা নিজে। তাকে উদ্ধার করে সুদর্শন।—ভাবচো, আজ এখনো আমি নেশা করিনি কেন ? তার উত্তর, এইমাত্র যে এখান থেকে চলে গেলো—সে।

: এলা ?

: হাাঁ। এতোদিন নেশা করেছি রাতে তোমায় সুস্থ চোখে দেখতে চাই না বলে। আজ যাই হোক, আমাকে সংযত থাকতে হবেই। আমার মেয়ে এসেছে মনে রেখো।

: তুমিই তো আমায় হাত ধরে এ-পথে এনেছো, আর তুমিই আমায় এতো ঘৃণা করো ?

: করি। এ-পথে এনেছি না-এসে উপায় ছিলো না বলে। আর যে-দিনেই উপায় হবে এলাকে নিয়ে আমি চলে যাবো।

: খোকন ? আমার কি হবে ?

তোমার কথা জানি না। খোকন ?—তাকে বিষপুত্র বলাই ভালো।

খোকন বিষপুত্র !

আমার তাই মনে হয়।

তুমিই তো সবের মূল। ললিতা একটা চেয়ারে ভেঙে পড়ে।

মানি। কি করবো, চাকরি গেলো। রেসে আর ফাটকা বাজারে ভাগ্য ফিরলো না। দেনায় ডুবে গেলাম।

তাই বলে······! তোমার লজ্জা করে না !

আমার লজ্জা তো এখন তোমার সাথে। হেসে ওঠে সুদর্শন। তাছাড়া তুমি গরীবের মতো কষ্ট করে থাকতে পারবে না। তাই, তোমার একটু সাহায্য নিয়েছি।

এই কি স্ত্রীর কাছে স্বামীর সাহায্য চাওয়া ? আমি কষ্ট করে থাকতে পারবো না, তোমায় কে বলেছে ?

কেউ বলে নি। আমি বলছি। তাছাড়া একেবারে তোমার মত না থাকলে তুমি আমার কথা কি শুনতে ?

আমি তোমার, এলার, খোকনের মুখ চেয়ে বাধ্য হয়েছি।

সে-কথা আমি বিশ্বাস করি না।

একদিন করতে ?

এখন অন্তত সে উত্তরে প্রয়োজন নেই। আমার মেয়ে এসেছে। মেয়ে

তোমার মেয়ে, আমার মেয়ে নয় ?

একদিন ছিলো—আজ স্বীকার করি না। যাক্, বাজে কথা রাখো। রাত হয়ে গেলো অনেক। আমি ওপরে যাচ্ছি। আমার মেয়ে যেন এসব না জানতে পারে। আর একটা কথা, ডাটনকে হারালে তোমাকে পথে নামতে হবে। রাস্তায়। গলির ধারে। সুদর্শন তার হোম-স্লিপারে পা গলিয়ে ওপরে চলে যায়।

ললিতা একলা। তার চোখে জল নেই। মনে ভাব নেই। কোন ভাবনাও নয়। একেবারে হিম হয়ে গেছে সে। কেবল মনে পড়ে যায় সুদর্শনের কথা। 'রাস্তায়। গলির ধারে।' সেই ভালো। এখন এদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে রাস্তায় নামবে। দরজা খুলে পথে, ফুটপাতে এসে দাঁড়ায় ললিতা। ঠাণ্ডা বাতাস ভেদ করে এগিয়ে চলে। কোথায় যাবে ? ললিতা জানে না। হঠাৎ

থেমে পড়ে ললিতা, একটা দেবদারু গাছের তলায়। কাদের ছেলে কাঁদছে না! খোকনের কথা মনে পড়ে। খোকনকে নিয়ে আসতে হবে। সে বিষপুত্র। তারও স্থান নেই। কিন্তু এলা? এলাকে ছেড়েই বা সে থাকবে কি করে! ফিরতে থাকে ললিতা। এতক্ষণে তার মনে হয়, কেউ দেখে ফেলেনি তো! এ আধুনিক কুলিন পাড়া। এখানে পথে কেউ থাকে না। ভিখিরিরাও ভরসা পায় না থাকতে, আশ্রয় নিতে।

ফিরে এসে ললিতা বাথরুমে প্রবেশ করে। উজ্জ্বল আলোকে দেওয়াল-আয়নার সামনে নিজেকে মুক্ত করে দেয়। তার অপস্রিয়মান যৌবনের এখনো অনেক কথা বলার আছে। এখনো উন্নত দেহে অনেক ইংগিত। ললিতা দু'চোখ ভরে একবার দেখে নেয় তার বহু-ঈপ্সিত আর অভিশপ্ত দেহকে। মাথার ওপর রিজার্ভ ট্যাঙ্কের জল ফোয়ারার মতো পড়তে থাকে। সেই জলেই তার চোখের জলও ধুয়ে গেলো। এলা তার মেয়ে নয়। খোকন বিষপুত্র হঠাৎ পেঁচার কর্কশধ্বনির কথা মনে পড়ে। ললিতা ভয়ে শিউরে ওঠে। ফোয়ারাকলের জল ঘুরে ঘুরে তার দেহকে ভিজিয়ে দেয়। দেহের তটরেখা ডুবে যায় জলে। এমনি করে যদি মুছে যায় ললিতার অতীত। ধুয়ে যেতো বর্তমান।

অন্ধকার ঘরে চুপি চুপি ললিতা খোকনের পাশে শুয়ে পড়ে। ললিতার পায়ের ওপর নরম দুটি হাতের চাপ।—মা তুমি ঘুমোলে?

: না রে। ওকি রে পায়ে মাথা রাখিস নি। আমার লাগছে আয়।

ললিতার দেহের আশ্রয়ে এলা ফিস্‌ফিস করে বলে ওঠে: মা, আমরা খুব গরীব হয়ে গেছি?

: হ্যাঁ মা।

: আমরা অন্য কোথাও থাকতে পারি তো মা?

ললিতার মনে পড়ে সুদর্শনের কথা: 'পথে। গলির মোড়ে।' থরথর করে কাঁপুনি ধরে ললিতার দেহে। চোখের জলে এলার চুল ভিজে যায়।—তুই আমায় ঘৃণা করিস এলা?

: তোমায় ঘৃণা করবো? কেন মা?

: না, এমনি বলছিলাম।

: আচ্ছা মা, তুমি কি ওই ভদ্রলোকের স্ত্রীকে পড়াও? বাবা বলছিলেন।

ললিতার কণ্ঠনালী কে-যেন চেপে ধরে। তবু বলতে হবে। বলেও: হ্যাঁ।

তাই তুমি তখন টাকা নিলে বুঝি।

। যা, রাত হয়ে গেলো। ঘুমোগে যা। কণ্ঠস্বরে ধার-করা বিরক্তি ফিরিয়ে আনে ললিতা।

· তোমার পাশে শোব আমি।

না-না, আমার পাশে নয়।

কেন মা?

উনি রাগ করবেন। যা। আর বকাসনি আমায়। আর এলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে যায়। তার আবার সব গোলমাল হয়ে গেলো। মা কেন এমন? বাবা কেন অন্য ঘরে? এলার কান্না পায়। চোখের জল চাপতে চাপতে সে ছুটে চলে যায়।

সে কি শুনতে পাবে তার মায়ের কান্না! ললিতা ভাবে: এলা কাঁদছে। ললিতার চোখের জলেও গণ্ডদেশ ধুয়ে যায়। এ-দুই কান্না কি এক? কিসের বাধা দু'জনকে দু'পাশে সরিয়ে দিলো! ললিতা তার সপ্তদশী মেয়েকে কি বোঝাবে?

চোখ খুললেও অন্ধকার। চোখ বুজেও অন্ধকার। পাশে শুয়ে খোকন। এইটুকুই যা রক্ষে। আলোর একটু নিবু-নিবু পরিচয়। ললিতা কেন জানে না শিউরে ওঠে, নারকেল গাছের চুড়োয় কালো পেঁচাটার কথা মনে পড়ে যায়। সেই পেঁচাটা যেন নিঃশব্দে এই অন্ধকার ঘরে উড়ে-উড়ে চলেছে। আর তার ডানার ঝাপটানি অস্বস্তিকর এক ঠাণ্ডা বাতাসে ললিতা বিবশ হয়ে পড়ে।

যাত্রা হল শুরু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক বছর পরে এই আখ্যায়িকার যবনিকা আবার উঠল। দেখা পেলাম সুপ্রিয়র।

বোম্বাই। কলকাতা ছেড়ে সুপ্রিয় সোজা বোম্বাই চলে আসে। সেখানে ছিল তার এক সতীর্থ ও বন্ধু, পরিমল। সরকারী কাজে পরিমলের বাবা থাকতেন বোম্বাই-এ। ইতিপূর্ব্বে একবার সুপ্রিয় বোম্বাই বেড়িয়ে গেছে। পথে নেমে পরিমলকেই স্মরণ করে সুপ্রিয়।

সব কথা শুনলে পরিমল। নির্ব্বাক্ হোয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—ভাবিস নে। সব ঠিক হোয়ে যাবে।

পরিমলের পিতৃবন্ধু শেঠ রনছোড়দাসের মস্ত বড় কারবার। দেশ-জোড়া নানা প্রতিষ্ঠান। হেড-আপিস বোম্বাই সহরের হর্ণবি রোডে। দু'দিন পরে পরিমল তাকে নিয়ে গেল সেখানে। হাজির করলে শেঠজীর সামনে। বললে—এর কথাই বলেছিলাম শেঠজী।

টেবিলের ওপর থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে শেঠ রনছোড়দাস বললেন—বস্থন। বোস পরিমল।

আলাপ-পরিচয় হল। যা-কিছু বলার তা আগে থেকে পরিমল বলে রেখেছিল। শেঠজি সেই দিনই সুপ্রিয়কে তাঁর আপিসে বহাল ক'রে নিলেন। হিসাব-রক্ষাবিভাগের নিম্নতর সহকারী।

কাজ চেয়েছিল সুপ্রিয়। কাজ পেল। দু'হাত বাড়িয়ে বন্ধুর হাত চেপে ধ'রে কৃতজ্ঞতা জানাল। থাকবার কোয়ার্টার পেল আপিসেরই সংলগ্ন একটি সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে।

ছেলেটিকে অনেকক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করেছিলেন শেঠ রনছোড়দাস।

কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কার্য্যক্ষমতার পরীক্ষা করলেন নিত্য-নতুন কাজের ভার দিয়ে। মাস দুয়েকের মধ্যেই সুপ্রিয় প্রমোশন পেল। মাইনে বাড়ল দ্বিগুণ। বসবার জন্যে আলাদা টেবিল নির্দিষ্ট হল। শেঠজি বুঝলেন, তাঁর নির্ব্বাচন ভুল হয়নি। স্বয়ং ম্যানেজার একদিন এসে মনিবের কাছে নতুন সহকারীর কাজের প্রশংসা ক'রে গেল।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে শেঠজির নানা কারবার। জব্বলপুর আপিসের পুরাতন খাতাপত্র অনেকদিন ধ'রে পড়ে ছিল হিসাব-নিকাশের অপেক্ষায়। সুপ্রিয়র ওপর সেই ভার পড়ল।

আনন্দিত হল সুপ্রিয়। কাজের মধ্যে সে ডুবে থাকতে পারবে। ভুলে থাকতে পারবে জগৎ-সংসার। টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো খাতাপত্রের মধ্যে সে নিমজ্জিত হল।

ছ'মাসের কাজ একা হাতে ছ'দিনের মধ্যে সম্পাদন করলে। শেঠজি শুনে একটু অবাক হলেন। বললেন—ব্যালান্স-শীট করেছো? অথবা ট্রায়াল ব্যালান্স?

—করেছি।

—দাও তো দেখি।

সুপ্রিয় হিসাবের কাগজপত্রগুলি তাঁর হাতে দিলে। শেঠজি বললেন—আচ্ছা। কাল আবার দেখা হবে।

সুপ্রিয় চলে গেল নিজের কাজে। শেঠজি ফোন করলেন অডিটরকে। তাঁর সবচেয়ে সুদক্ষ লোক যেন এখনি একবার আসে।

অডিটর সাহেব নিজে এলেন। হেসে বললেন—ব্যাপার কি শেঠজি! এমন জোর তলব কেন?

—আপনি নিজে এলেন?

অডিটর বললেন—যে-রকম কড়া তাগাদা। অন্য কাউকে পাঠাতে ভরসা হল না।

হাতের কাগজগুলি হিসাব-রক্ষকের হাতে দিয়ে শেঠজি বললেন—অনেকদিনের একটা পুরানো হিসাব আজ তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেটা ঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা ক'রে বলে দিতে হবে।

কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে অডিটর বললেন—খাতাপত্রগুলি একবার দেখতে চাই। আর যে কেরাণী করেছে এই কাজ তাকে চাই। দু'চারটে প্রশ্ন আছে।

শেঠজি ডাক দিলেন সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয় এসে দাঁড়াতে বললেন —মুখার্জ্জি, ইনিই আমাদের অডিটর মিঃ বাটলিবয়। তোমার কাজটা ইনি ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। বুঝিয়ে দাও। খাতাপত্র যে-ঘরে আছে সেই ঘরে এঁকে নিয়ে যাও।

সুপ্রিয় বললে—আসুন।

হিসাবরক্ষক সুপ্রিয়র সঙ্গে গেলেন। ফিরে এলেন ঘণ্টা দুই পরে। কাগজগুলি টেবিলের ওপর রেখে বললেন—নিখুঁত কাজ। এর চেয়ে ভাল আমিও পারতাম না। হিসাবের ব্যাপারে আশ্চর্য্য মাথা ছোকরার, অদ্ভুত জ্ঞান। কোথায় পেলেন একে?

—কুড়িয়ে পেয়েছি।

—পাকা জহুরী আপনি। বললেন অডিটর।

* * * *

ধাপে ধাপে সাফল্যের সোপান অতিক্রম করতে লাগল সুপ্রিয়। কাজ চাই, আরও কাজ। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত কাজের মধ্যে মগ্ন হোয়ে রইল সে। এই কাজের বাইরে যে অন্য কোন পৃথিবী আছে তা সে ভুলে থাকতে চায়।

তার কর্ম্মনিষ্ঠা আর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন শেঠ রনছোড়দাস। আপিসের দশ জন প্রধান অফিসারের মধ্যে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন। মুখার্জ্জি সাহেবের এখন স্বতন্ত্র ঘর, আলাদা টেলিফোন, পৃথক আরদালি, বেহারা, মোটর-গাড়ী।

সেদিন বন্ধু পরিমল আপিসে তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ ক'রে হাসিমুখে বললে—চাপরাশি ঢুকতে দেয় না হে! বলে, সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন!

খাতাপত্র বন্ধ ক'রে সুপ্রিয় হেসে বললে—তাই নাকি! কিন্তু অনেক দিন পরে এলে ব'লে মনে হচ্ছে।

—মনে হচ্ছে তাহলে? হেসে বললে পরিমল—ঢের ঢের লোককে কাজ করতে দেখেছি, কিন্তু তোমার মত কাউকে দেখলাম না। ডুব দিয়ে আর উঠতে চাও না যে! দু'দিন এসে ফিরে গেছি, তা জানো!

ছোট একটা নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে সুপ্রিয় বললে—এই কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলে, তাই বেঁচে গেছি বন্ধু! এ ছাড়া আর আমার কি আছে বল!

তাড়াতাড়ি পরিমল বললে—সব আছে। সব আছে। সব ফিরে পাবে তুমি। আপাতত, শুনলাম নাকি, আমাদের ছেড়ে কিছুদিনের মতো যাচ্ছ বাংলা দেশে?

—কে বললে?

—কেন, শেঠজি স্বয়ং। ধানবাদের কয়লাখনিতে নাকি অনেক দিনের হিসেব-নিকেশ বাকী পড়েছে। তাই তোমাকে পাঠাচ্ছেন সেখানে তিন-চার মাসের জন্যে।

সংক্ষেপে সুপ্রিয় বললে—হ্যাঁ, অর্ডার হয়েছে। যাবার দিন শেঠজি নিজেই স্থির করবেন বলেছেন।

পরিমল বললে—আমি আজ রাত্রে যাবার একটা কাজে পুণা যাচ্ছি। তাই দেখা ক'রে গেলাম। ফিরে এসো আরও সাফল্য, সার্থকতা আর গৌরব সঙ্গে নিয়ে, এই কামনা করি।

উঠে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় বন্ধুর দুই হাত ধরলে। বললে—আমার ভাষা বড় দুর্ব্বল। মনের কথাটা বুঝে নিও তুমি।

তার দু'হাতে ঝাঁকানি দিয়ে হাসিমুখে পরিমল চলে গেল। চলে গেল সুপ্রিয়র মনকে দুলিয়ে দিয়ে। আরও সাফল্য, সার্থকতা আর গৌরব কামনা ক'রে গেল পরিমল, কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ যে হারিয়ে গেছে, কী হবে সাফল্য আর গৌরব দিয়ে?

চেয়ারে বসল সুপ্রিয়। কাজে মন লাগছে না। টেবিলের এক ধারে বসানো ছিল ফ্রেমে-আঁটা মায়ের ছবিখানি। নির্নিমেষ নেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেই ছবির স্মিত-মুখের পানে। তারপর ধীরে ধীরে দেরাজ টেনে একখানি খাতা বার করলে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক টুকরো লম্বা ছাপা-কাগজ বার হল। অনেকদিন আগেকার খবরের-কাগজের এক-টুকরো সংবাদ। সযত্নে সেটিকে রেখে দিয়েছে সুপ্রিয়। কাগজখানি হাতে নিয়ে সে আর একবার পড়লে:

"বিখ্যাত দানবীর ও সমাজসেবীর আত্মোৎসর্গ।

"গভীর পরিতাপের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতার স্বনামধন্য

ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও দানবীর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এক দৈবদুর্ঘটনায় পরের জীবন রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিন-চার দিন পূর্ব্বে তিনি কার্য্যব্যপদেশে বর্দ্ধমান অঞ্চলে গিয়াছিলেন সংবাদ পাওয়া যায়। গত পরশু সন্ধ্যায় তিনি কোন কাজে বোধ হয় শক্তিগড় ষ্টেশনে নামিয়াছিলেন। সেখানে ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে একটি বস্তি অঞ্চলে সে-সময় অকস্মাৎ আগুন লাগিয়া যায়। শিশু ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া প্রিয়নাথ বাবু তাহাদের বাঁচাইবার জন্ম সেই আগুনের মধ্যে প্রবেশ করেন ও একটি শিশুকে অগ্নির কবল হইতে বাহির করিয়া আনেন। অতঃপর তিনি পুনরায় অন্ম লোকদের বাঁচাইবার জন্ম অগ্রসর হন; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ, অকস্মাৎ সমগ্র মাটকোঠাটি তাঁহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ে ও তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মাথা, মুখ ও দেহের উপরিভাগ সম্পূর্ণ নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পরনের জামা ও পকেটের মণিব্যাগ ও কয়েকটি কাগজ-পত্র হইতে তাঁহার পরিচয় জানা যায়। মানুষের সেবায় প্রিয়নাথ বাবু তাঁহার সমগ্র জীবন নিবেদিত করিয়াছিলেন, শেষ অবধি সেই জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিয়া এক অত্যুজ্জ্বল মহিমাময় আদর্শ লোকসমাজে স্থাপন করিয়া গেলেন। প্রিয়নাথ বাবু বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিদেশে। আমরা তাহাকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

* * * *

ধানবাদ।

শেঠ রনছোড়দাসের প্রকাণ্ড কোলিয়ারি। বহু শত লোকজন, অাপিস, হাসপাতাল, খনি, ব্যারাক, কোয়ার্টার। সর্বসমেত একটা বিরাট ব্যাপার।

ভবতারণ বাবু এখানকার ম্যানেজার ছিলেন। তিনি কাজ থেকে অবসর নেবার পর সহকারী যোগেশ চট্টোপাধ্যায় সেই পদে উন্নীত হয়েছে। কাজের লোক যোগেশ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। বছর দশেক এখানে কাজ করছে। তার পূর্ব্বে দালালি কাজে হাত পাকিয়েছিল। কোলিয়ারীর কাজেও জ্ঞান অর্জ্জন করেছিল সামান্য নয়। দশ বছরে যোগেশ এখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। কুলিদের সর্দ্দার, বস্তিবাসীদের নেতা, শ্রমিকদের দলপতি, এবং ঐ ধরণের বহু লোক তার অনুগত। কোলিয়ারীর মধ্যে সকলেই তাকে ভয় করে। অত্যন্ত কড়া তার মেজাজ। তার অপ্রসন্ন দৃষ্টি যদি কারুর ওপর পড়ে তাহলে তার আর নিস্তার নেই। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে কোন কাজ করতেই পিছপাও নয় যোগেশ। বাইরে অমায়িকতা আর ভদ্রতার অভাব নেই অবশ্য। কোয়ার্টারে তার মা আছে। আর আছে দুই বোন, সুমিতা আর নমিতা। যোগেশ এখনো বিবাহ করেনি। তবে সম্প্রতি সে বিবাহের জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। এবং পাত্রী নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছে।

উল্লেখযোগ্য আর যারা এখানে বাসা বেঁধেছে তাদের মধ্যে হিতেন সরকার আর তার ভগিনী শোভা এখানকার সকলেরই পরিচিত। হিতেন কোলিয়ারীতে যোগেশের সহকারিরূপে কাজ করে। শোভা কলকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে দাদার কাছে এসে আছে।

আর আছেন, মহিম হালদার, এখানকার বহুদিনের পুরানো কর্ম্মচারী। বৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কাজকর্ম্মে পটুতা এখনো খর্ব্ব হয়নি। স্ত্রী-পুত্র থাকে দেশে। ছোট একটি ঘর নিয়ে একা থাকেন। একটি চাকর আছে। সে-ই রান্না-বান্না এবং অন্য সমস্ত কাজ ক'রে দেয়।

আর আছে রামলাল। কুলিদের সর্দ্দার। বৃদ্ধ হয়েছে রামলাল অনেকদিন। লম্বা ঝুলে-পড়া দাড়ি। অবিন্যস্ত পাকা চুলের গোছা মাথায়। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ। ছ'মাস হবে রামলাল এখানে এসেছে। কিন্তু এই অল্পদিনেই সে এখানকার সকলের চিত্ত জয় করেছে। কোলিয়ারীর সবাই শুধু নয়, এই কোলিয়ারীর সংলগ্ন যে বাঙালী-পল্লী আছে সেখানকার অধিবাসীরাও রামলালকে বিলক্ষণ চেনে ও ভালবাসে। সকলকার তাঁবেদারি করে রামলাল। ছেলে-বুড়ো সকলের কাছে সে সমান প্রিয়। সে যে-কুলি-ব্যারাকে থাকে সেখানকার শ্রমিকরা তো তাকে দেবতার মতো ভক্তি করে। প্রতি মাসে রামলাল যা রোজগার করে তার বেশীর ভাগই তার খরচ হয় এই সব শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের পিছনে। ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পরাতে, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতে, দুঃস্থ অনাথাদের টাকা জোগাতে রামলাল সর্ব্বদা প্রস্তুত। এসব কাজে তার ভারী আনন্দ।

* * * *

কোলিয়ারীর লাগোয়া বাঙালী-পল্লীর প্রবেশমুখে ভবতারণ বাবুর বাড়ী। বছর দশেক আগে তিনি এই বাড়ীখানি তৈরী করেছিলেন। বাতে অশক্ত হোয়ে চিকিৎসার জন্যে বন্ধু প্রিয়-নাথের আগ্রহাতিশয্যে কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় গিছলেন এক বিধবা ভগিনীকে বাড়ীতে রেখে। এখানকার সবাই ভবতারণকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। যোগেশ তো তাঁকে রীতিমতো ভক্তি করত। তাই চরম দুঃখের আর অপমানের দিনে যোগেশের কথাই ভবতারণের মনে হয় এবং তাকেই টেলিগ্রাম করা হয় তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। 'তার' পেয়েই যোগেশ কলকাতা যায় এবং ভবতারণ বাবুকে ধানবাদ দিয়ে আসে। এখানে এসে মাস দুয়েক মাত্র বেঁচে ছিলেন তিনি। এই সময়ের মধ্যেই তিনি যোগেশের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহ দেবার বাসনায় ব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্যে সে-কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

কলকাতা থেকে আসবার পর প্রমীলা যেন অন্য এক জগতের মানুষে পরিণত হয়েছে। কথা বলে, হাসে, গল্প করে, বাপের সেবায় দিন-রাত্রি ভেদাভেদ করে না। যোগেশ প্রত্যহ আসে। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ত্রুটি নেই প্রমীলার। মাঝে মাঝে মেয়েদের গানের আসরে গিয়েও বসে। কিন্তু তবুও প্রমীলাকে যারা জানে তারা বুঝবে, এ-প্রমীলা তার বাইরের কোন এক ধার-করা সচল মূর্ত্তি, তার আসল রূপটি কোন্ দিগন্তপারের মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে তা তার কথায়-বার্ত্তায় আচার-আচরণে টের পাওয়া যায় না, মাঝে মাঝে শুধু মাত্র তার আভাস পাওয়া যায় তার আয়ত দুই চোখের ক্লান্ত, করুণ আর অন্যমনা দৃষ্টির গভীরে।

শেষের দিনে ভবতারণ মেয়েকে কাছে ডেকে বলেছিলেন—জীবনের সত্যিকার প্রকাশ কোন্‌টি, কোন্‌টি সত্যি আর কোন্‌টি মিথ্যে তা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম না মা! তাই তোর ওপর আমার কোন অনুশাসন নেই, কোন আদেশ, কোন নির্দ্দেশ নেই।

জীবনে সত্যিকার পথ কোন্‌টি তা যেন পরমেশ্বর তোকে দেখিয়ে দেন।

* *

পিতার মৃত্যুর পর পিসিমাকে নিয়ে প্রমীলা ধানবাদে নিজেদের বাড়ীতেই রইল। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে সে একরকম মনস্থির করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত পিসিমার খাতিরে তাকে থাকতে হল। ভাইএর ভিটা ছেড়ে তিনি নড়তে চাইলেন না।

ভবতারণের লাইফ ইনসিওরেন্স, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং আরও কিছু সঞ্চিত অর্থ যা ছিল, দুটি নারীর ছোট সংসারের পক্ষে তা অকিঞ্চিৎকর নয়। মন্থর উদাসীনতায় প্রমীলার দিন কাটতে লাগল।

যোগেশ প্রায় প্রত্যহই আসে। এই সংসারের দেখাশোনার ভার সে ভবতারণ-কাকার কাছ থেকে পেয়েছে। পিসিমাও তাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। প্রমীলার মনের অন্ত সে পায় না বটে, কিন্তু তার প্রতি কোন বিমুখতার প্রমাণও সে পায়নি। তাই সে প্রমীলার পিতৃশোক প্রশমিত হবার অপেক্ষায় আছে। এমনি করে প্রায় এক বছর কেটেছে।

* * * *

অপরাহ্ন বেলায় সামনের খোলা মাঠের একটি বেঞ্চিতে প্রমীলা একাকী বসেছিল। কোলিয়ারীর পিছন দিকে তার বাড়ীর সামনে এই জনবিরল প্রান্তটি প্রমীলার প্রাত্যহিক বেড়াবার ক্ষেত্র। সুদূর-বিস্তৃত তৃণভূমির একান্তে ব'সে সে দু'চোখ মেলে দেয় সামনের পৃথিবীর পানে। দৃষ্টির সঙ্গে মন পেরিয়ে যায় কত পথ-প্রান্তর, কত দেশ-দেশান্তর। মহাশূন্যের মতো তার ভিতরটাও যেন শূন্য হোয়ে গেছে। কোন অনুভূতি নেই। না আছে আনন্দ, না আছে বেদনা। অবলম্বনহীন তৃণখণ্ডের মতো সে যেন সেই শূন্যপ্রবাহে ভেসে চলেছে। ছেড়ে দিয়েছে সে নিজেকে সেই ভাগ্য-স্রোতে। তার মনের সব আসক্তি সব শক্তি নিঃশেষ হয়েছে বুঝি।

অদূরে বৃদ্ধ রামলালকে দেখা গেল। কোন কাজে বোধ করি এদিকে এসেছিল। চলেছে, ঘর-মুখো। এই রামলালকে দেখলে প্রমীলার মন মায়ায় ভ'রে যায়। ঘর-ছাড়া এই বুড়ার করুণ শান্ত মুখের পানে তাকালে প্রমীলা মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অনির্দেশ্য বেদনা অনুভব করে। তার সঙ্গে কথা ব'লে ভারী তৃপ্তি পায় প্রমীলা।

আধা-হিন্দি আধা-বাংলা মিশিয়ে রামলাল যখন কথা বলে তখন তন্ময় হোয়ে প্রমীলা শোনে। রামলালের কথার সুর যেন তার মনের তারে গিয়ে আঘাত করে।

—রামলাল! প্রমীলা ডাকলে।

ঈষৎ চমকে উঠল রামলাম। থমকে দাঁড়াল। ঘাড় তুলে বললে—হামায় ডাকছেন মাইজী?

প্রমীলা বললে—এখান দিয়ে যাচ্ছ, অথচ আমার সঙ্গে কথা বললে না যে?

দু'হাত কচলে রামলাল জবাব দিলে—মাইজি বহুৎ উদাস হোয়ে কী যেন ভাবছিলেন। বিরক্ত হবেন, তাই কথা বলতে সাহস করিনি।

হাসলে প্রমীলা, বললে—শুধু শুধু উদাস হব কেন? এমনি চুপচাপ বসেছিলাম। এদিকে কোথায় গিছলে তুমি?

—হরিয়ার মায়ের তিন রোজ খুব অসুখ। তার দাওয়াই নিতে এসেছিলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। দেখা হল না।

প্রমীলাদের বাড়ীর কাছে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার থাকেন। রামলাল প্রায়ই তাঁর কাছে ওষুধ নিতে আসে।

প্রমীলা বললে—তুমি যে দেশে যাবে বলেছিলে রামলাল? যাবে নাকি? কবে যাবে?

—যাবো বৈ কি, মাইজি, শীগ গিরই যাব। দেশে যাবার জন্যে মনটা আমার বড় উদাস হয়েছে।

—দেশে তোমার কে আছে রামলাল?

রামলাল ঘাড় ঝুঁকিয়ে বললে—সবাই আছে মাইজি, ছেলে আছে, জমি-জমা আছে, গরু-বাছুর আছে•••

—তোমার ছেলের মা?

—নেই। বহুৎ রোজ। একটু থেমে রামলাল বললে—এইবার শীগগিরই ছেলের সাদি হবে মাইজি! রামলালের কণ্ঠে উৎসাহের সুর ফুটে উঠল—দেশে গিয়েই ছেলের বিয়ে দেব।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রমীলা বললে—এখানে আসবার আগে তুমি কোথায় ছিলে রামলাল?

রামলালের দেহ আরও যেন ঝুঁকে পড়ল, বললে—কত দেশ ঘুরেছি মাইজি, গয়া, পাটনা, পুরী, কটক। আমি এখন যাই, মাইজি!

—আচ্ছা। এসো।

ধীরে ধীরে রামলাল চলে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে প্রমীলাও বাড়ী ফিরল।

* * * *

সন্ধ্যার পর এলো যোগেশ। কিছুক্ষণ পিসিমার সঙ্গে গল্প করলে। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে বসল। প্রমীলা চা নিয়ে এলো।

—কেমন আছ এ-বেলা?

যোগেশের প্রশ্নের উত্তরে মুখ তুলে প্রমীলা বললে—ভালই তো আছি! কেন বলুন তো?

যোগেশ বললে—সকাল-বেলা নাকি খুব মাথা ধরেছিল, ওবেলা তোমার এখান থেকে গিয়ে সুমিতা বলছিল।

মৃদুকণ্ঠে প্রমীলা বললে—সে অতি সামান্য। এতক্ষণ পর্য্যন্ত অসুস্থ থাকার মতো অসুখ নয়।

কিছুক্ষণ কাটল নীরবে।

যোগেশ একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর বললে—একটা কথা বলবার জন্যে আজ এসেছিলাম।

প্রমীলার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ফাঁসীর আসামীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হোয়ে গেছে; নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার আর কোন আশা-ভরসা চিন্তা নেই, তবুও শেষ দিনে যখন তাকে জানানো হয় যে, সময় হয়েছে এবার, প্রস্তুত হও, তখন তার বুকটা দুলে ওঠে বৈ কি।

যোগেশ বললে—পিসিমা বলছিলেন যে, তিনি দিন একরকম স্থির ক'রেই রেখেছেন। আসছে মাসেই কাকাবাবুর মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হবে। পিসিমা তো বলছেন আসছে মাসের শেষের দিকেই দিন ফেলবেন।

বহুদিন ধ'রে প্রতিরোধ করেছে প্রমীলা। শক্তি ফুরিয়েছে এবার।

তাছাড়া, লাভ কি প্রতিরোধের? প্রয়োজনই বা কি? যা হয় হোক। চোখ বুজে থাকুক প্রমীলা। সত্যিই সে দু'চোখ মুদলো।

যোগেশ বললে—কাকাবাবুর খুবই ইচ্ছে ছিল। পিসিমার তো আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু আসল মানুষটির কাছ থেকে সাড়া পেলাম কই? তাই যতক্ষণ না স্পষ্ট ক'রে তার কথা শুনতে পাচ্ছি ততক্ষণ মনে শান্তি নেই, উৎসাহও নেই।

এটা যোগেশের কূটনীতি। সে জানে, সাংসারিক, বৈষয়িক প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে প্রমীলাদের সংসারের সঙ্গে নিজেকে জড়িত ক'রে সে এমন ভাবে সকলকার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে যাতে কেউ তার প্রস্তাবে আপত্তি করবে না, বরং আনন্দই প্রকাশ করবে। সে আরও জানে, প্রমীলার অন্তর তার জন্যে তেমন উন্মুখ না হলেও তাকে প্রত্যাখ্যান করবে না সে। প্রমীলার মনের খবর সঠিক সে জানে না, পিসিমার মুখে তাদের কলকাতা-বাসের যে-কাহিনী সে শুনেছে তা থেকে নিশ্চয় ক'রে কোন সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব নয়। তাই সে প্রমীলার মুখ থেকে সম্মতিসূচক বাণীটি শুনতে চায়।

আজ হঠাৎ সকল গ্রহ-নক্ষত্র আর নিখিল চরাচর বুঝি প্রমীলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কোন্ দিকে চাইবে প্রমীলা?

—কথা বলছ না যে! উত্তর দেবে না?

ক্ষীণকণ্ঠে প্রমীলা বললে—বাবা আর পিসিমা যা স্থির করেছেন তাতে আপত্তি করিনি তো।

—কিন্তু তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেও তো প্রকাশ করনি? পিসিমা বলেন, তিনি তোমায় বারে বারে জিগেস করেছেন, কিন্তু তুমি কোন দিন কিছু বলোনি। সাধারণত মৌনকে সম্মতির লক্ষণ ব'লে মেনে নিতে পারা যায় বটে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমার মনে খটকা লাগছে। তাই, স্পষ্ট ক'রে বলো তুমি।

মুখ তুললে প্রমীলা। শান্তকণ্ঠে বললে—আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে ব'লে কিছু নেই। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, আপনাকে শ্রদ্ধা করি, তাতে কোন ভুল নেই। এই পর্যন্ত বলতে পারি।

সোচ্ছ্বাসে যোগেশ বললে—ব্যস। ওতেই হবে। অনেক ধন্যবাদ তোমায়। আজ চলি, কেমন? ঝরিয়া থেকে এক সাহেব এসেছে। তার সঙ্গে ডিনারে বসতে হবে।

যোগেশ বিদায় নিলে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে ব'সে রইল প্রমীলা। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হোয়ে উঠল। এ কী হল? এ কী করলে সে? পিতার মুখ স্মরণ ক'রে সে যে এই চরম দণ্ড মাথা পেতে নিলে,—এ ছাড়া কি আর পথ ছিল না? এই কি সত্য পথ?

নৌকা ভেসেছে অকূলে। তীর দেখা যায় না। ধীরে ধীরে প্রমীলা নিজের ঘরে গিয়ে শয্যার আশ্রয় নিল। এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমাও প্রমীলা। আজকের রাতের মতো ঘুমাও। কাল নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ হবে। আসবে নতুন খবর। নতুনতর পরিস্থিতি। নতুনতর এবং জটিলতর। কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তোমায়।

* * * *

সকাল-বেলা কলরব করতে করতে এলো সুমিতা, নমিতা, শোভা। কলকণ্ঠের মহা কোলাহল উঠল।

প্রমীলা বললে—ব্যাপার কি? সকাল-বেলাতেই এত উত্তেজনা? এখনো সারাদিন প'ড়ে আছে। হল কি?

শোভা বললে—অসম্ভব।

—তার মানে?

সুমিতা মাথা-ঝাঁকানি দিলে—মোটেই অসম্ভব নয়।

প্রমীলা তার পানে চেয়ে বললে—তারই বা মানে?

নমিতা বললে—দিদি আর শোভাদির মধ্যে তর্ক বেধেছে, বাজী ধরা হয়েছে। মীমাংসার ভার তোমার ওপর।

এখানে যে-ক'জন মেয়ে আছে তারা সবাই প্রমীলার অনুগত। প্রমীলার গান রেকর্ড হোয়েছে। গায়ক-গায়িকার মুখে মুখে ফেরে সেই গান। মেয়ে-মহলে তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম নয়। মেয়েদের নানা অনুষ্ঠানে তার নির্দ্দেশ, মতামত ও ব্যবস্থা চূড়ান্ত ব'লে স্বীকার করে সবাই সানন্দে।

প্রমীলা না হেসে থাকতে পারলে না, বললে—ও, এই কথা। তা মীমাংসা তো হোয়েই রয়েছে। দু'জনের বাজীই বাজেয়াপ্ত।

কথায় কথায় আসল কথাটা জানা গেল। আগামী-কাল সকালে সুমিতার দাদা যোগেশের হেড আপিস বোম্বাই থেকে এসে পৌঁছবেন একজন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। তিনি যে আসছেন এ খবর আগেই এসেছিল। একেবারে কালই যে আসছেন, তা জানা গেছে কাল রাতে-আসা জরুরী টেলিগ্রামে। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নাকি খোদ মালিকের ডান হাত, খুব নাকি উগ্র স্বভাব, তবে বাঙালী, এই যা সুরাহা। সুমিতার দাদা যোগেশ সকাল থেকে খুব ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে। খোদ মালিকের কোয়ার্টারে থাকবেন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। ঝাড়ামোছা আরম্ভ হয়ে গেছে। কাল সকালে ষ্টেশনে যাতে অভ্যর্থনাটা ঘটা ক'রে হয় তারও ব্যবস্থা করেছে যোগেশ। শুধু আপিসের সবাই ষ্টেশনে যাবে না,—সুমিতা, নমিতা, শোভা, এরাও যাবে। সঙ্গে থাকবে ফুলের মালা, শাঁখ, খই, চন্দন ইত্যাদি।

প্রমীলা বললে—তা তো হল। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভবের মীমাংসার হদিস তো পেলাম না এখনো?

সুমিতা বললে—ক্রমে পাবে। শোন মন দিয়ে। দাদা বলেছেন, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে অভ্যর্থনায় আর আপ্যায়নে একেবারে অভিভূত ক'রে দিতে হবে। কাল তিনি দুপুরে আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন খাবেন। রাত্রে হিতেনদা'র বাড়ী ডিনার। পরশু দিন সন্ধ্যায় তাঁর জন্যে ইনষ্টিটিউটে এক সম্বর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করছেন দাদা। নাচ-গান দিয়ে জমকালো বিচিত্রানুষ্ঠান হবে। সেই সব নাচ-গান তৈরী করা আর অনুষ্ঠান পরিচালনা করার ভার পড়েছে তোমার ওপর। শোভা বলছে, একদিনের মধ্যে কোন ভাল প্রোগ্রাম তৈরী করা অসম্ভব। আমি বলেছি মোটেই অসম্ভব নয়। এখন তুমি বল।

—এই কথা! প্রমীলা বললে—তা এ আর এমন শক্ত কথা কি! সম্ভবও বটে আবার অসম্ভবও বটে।

—এ আবার কেমন ধারা মীমাংসা হল?

—অর্থাৎ যদি তোমরা তৈরী হোয়ে নিতে পারো তাহলে সম্ভব, অন্যথায় অসম্ভব। প্রমীলা হাসতে লাগলো।

সুমিতার উৎসাহ প্রবল। সে বললে—না প্রমীলাদি, হাসলে চলবে না। সময় নেই মোটেই। কি হবে না হবে, ঠিক ক'রে দাও।

আলোচনার পর স্থির হল, নতুন কোন নাচ বা গান তৈরী করা সম্ভব নয়। যা তৈরী আছে তাই দিয়েই অনুষ্ঠানলিপি রচনা করতে হবে। সুমিতা আর নমিতার দ্বৈত সঙ্গীত, নমিতার আরতি নৃত্য, "ক্ষম হে ক্ষম" গানের সঙ্গে শোভার ভাব-নৃত্য এবং সমবেত সঙ্গীত—"আমাদের যাত্রা হল শুরু"।

সুমিতা নমিতা শোভা তিন জনেই চেঁচামেচি করতে লাগল, প্রমীলার একটি গান থাকা চাই। প্রমীলার রাজী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

সুমিতা বললে—তাহলে যাই দাদাকে বলি গে। হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি কাল সকালে ষ্টেশনে যাচ্ছ তো?

—দূর! আমি যাব কেন? বললে প্রমীলা।

—বা রে! আমরা যাচ্ছি কেন?

—তোমাদের দাদারা নিয়ে যাচ্ছে বলে। উত্তর দিলে প্রমীলা।

শোভা হঠাৎ বলে উঠল—তাহলে তুমি যাবে যোগেশদা' তোমায় নিয়ে যাবেন বলে। খবর পেয়ে গেছি সুমিতাদের বাড়ী।

সুমিতা শোভাকে চোখের ইসারা করলে। শোভা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, চুপ ক'রে গেল।

প্রমীলা বললে—তাহলে যেমন গোলমাল করতে করতে এসেছিলি সব, তেমনি গোলমাল করতে করতে চলে যা এখন। আমার কাজ আছে।

* * * *

টেলিগ্রাম পেয়ে যোগেশ ব্যস্ত হয়েছে। ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন। কোলিয়ারী পরিদর্শন করতে যিনি আসছেন তাঁকে সে চেনে না। শুনেছে, হিসাব-নিকাশের কাজে একেবারে ধুরন্ধর, আর বিচার করে চুলচেরা। বাঙালী বটে, তবে তাতে ভরসার কথা কিছু নেই। সঙ্গে আসছে একজন ভাটিয়া সহকারী। যাকে বলে একেবারে সরজমিনে তদন্ত।

এতদিন ধ'রে যে রাম-রাজত্ব পরিচালনা করেছে যোগেশ, সে-রাজত্ব কি টলমল ক'রে উঠবে এবার? মনে মনে কঠিন হল যোগেশ। পরিদর্শন করুক যে যত পারে, কিন্তু তার রাজত্বে হস্তক্ষেপ করা সইবে না সে।

কিন্তু হয়ত অমূলক তার ভয়! দু'-চার দিনের জন্যে যে আসছে, আদর-আপ্যায়নে আর মধুর ব্যবহারে তাকে বশীভূত করতে পারবে না সে? নিশ্চয় পারবে। তবুও সাবধানের মার নেই। খাতা-পত্রগুলো ঠিক ক'রে ফেলতে হবে দু'-এক দিনের মধ্যেই।

মহিম হালদারকে আপিস-কামরায় ডাকা হল। বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন হুকুমের প্রতীক্ষায়। যোগেশ বললে—কাল সকালে বোম্বাই মেলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসছে, জেনেছেন বোধ হয়।

মহিম বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, হিতেন বাবু এসেই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন।

—কাল সকালে সবাই ষ্টেশনে যাবেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, যাব বৈ কি।

যোগেশ বললে—হয়ত তিনি আপিসের খাতাপত্র দেখবেন। সেগুলো সব আপ টুডেট্ করা আছে তো?

—তা আছে।

—হিসাব-পত্র?

মহিম ঘাড় নেড়ে বললেন—অন্ত সমস্তই ঠিক ক'রে নিতে পারবো বা বুঝিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু আপনি নিজে যে টাকাগুলোর লেনদেন করেছেন তার কোন হিসেব দেননি। সে-সম্বন্ধে···

যেন কিছুই মনে নেই এমনি ভাবে যোগেশ বললে—দিইনি নাকি? কত টাকা?

—তা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা! তিন-চার দফায়।

—চার বছরে চল্লিশ হাজার! এমন কিছু বেশী নয়। বললে যোগেশ—হিসেবটা আপনি ঠিক ক'রে নেবেন।

—আজ্ঞে, আমি কেমন করে···

তীক্ষ্ণ হাসি হাসলে যোগেশ। তীক্ষ্ণ ও অর্থপূর্ণ। বললে—হালদার মশায় হাসালেন। যোগ দিয়ে আর বিয়োগ ক'রে, কেটে আর জুড়ে চুল পাকালেন, আর এই সামান্য কাজটায় ভড়কে যাচ্ছেন! চার বছরে চল্লিশ রকম খরচ দেখিয়ে টাকাটাকে খাইয়ে দেবেন, এই আর কি! আশা করি, আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে না। কিছু উপরি রোজগার ক'রে নিন না। ধরুন, হাজার খানেক! হিসেবটা শেষ ক'রে আমায় দেখাবেন আর টাকাটা এসে রাত্রিবেলা আমার বাড়ী থেকে নিয়ে যাবেন।

হাঁ হোয়ে রইলেন হালদার মশায়। কিছুক্ষণ পরে বললেন—তা কি সম্ভব হবে?

—দেখুন হালদার মশাই। একটা কথা ব'লে দি। থমথমে যোগেশের কণ্ঠস্বর—জলে বাস করতে হলে কুমীরের সঙ্গে ভাব রাখতেই হবে। অন্যথায় বিপদ। আশা করি, কথাটা বুঝলেন। অতএব যান, হিসাব আর খাতাপত্র ঠিক ক'রে ফেলুন গে।

ঘণ্টা বাজালে যোগেশ। বেহারা ঘরে ঢুকতে বললে—সরকার-বাবু।

হতভম্বের মতো মহিম বাবু প্রস্থান করলেন। হিতেন ঘরে ঢুকলো। যোগেশ বললে—লোকজন লেগেছে কাজে?

হিতেন ঘাড় নাড়লে।

—কাল সকালে সবাইকে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকতে বলবে।

—বলে দিয়েছি।

যোগেশ এক মিনিট কি যেন ভাবলে, তারপর বললে—সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ভদ্রলোকটিকে চিনি না। তবে শুনেছি খুব রাশভারী আর কড়া মেজাজের লোক। তাঁকে আমাদের আদর-অভ্যর্থনা ভাল ভাবেই করতে হবে। কি বল?

হিতেন ঘাড় নাড়লে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু তাই ব'লে ভয় পেলে চলবে না। তিনি যদি এসেই আমাদের ওপর যথেচ্ছা হুকুম চালাতে থাকেন, তাও আমাদের মনঃপূত হবে না।

যোগেশের কথার তাৎপর্য্য হিতেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কি না, বোঝা গেল না। সে চুপ করে রইল।

পুনরায় কিয়ৎকাল নীরব থেকে যোগেশ বললে—সাবধানে কাজকর্ম্ম করবে। আর আমাদের প্রোগ্রামটা শুনে নাও। কাল দুপুরে তিনি আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাবেন। বিকালে তুমি তাঁকে চায়ের নেমন্তন্ন করবে। পরশু তাঁকে আমরা সভা ক'রে অভ্যর্থনা জানাবো। নাচ-গানের একটা অনুষ্ঠান তৈরী করবার জন্যে সুমিতাকে বলেছি প্রমীলার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ব্যবস্থা করতে।

আমি নেমন্তন্ন-পত্রের একটা খসড়া ক'রে দিচ্ছি। খানকয়েক টাইপ করিয়ে নাও। বাইরের লোকের মধ্যে পুলিশ সাহেব, মুনসেফবাবু আর জিতেন উকিলকে বলবে। বাদবাকী আমরা নিজেরা। এই নাও।

যোগেশ পেনসিলে-লেখা একটুকরো কাগজ হিতেনের হাতে দিয়ে বললে—খানদশেক টাইপ করিয়ে রাখ। কাল তিনি এলে, তারপর বিলি করা হবে।

অন্যান্য দু'-চার কথার পর হিতেন চলে গেল। তারপর এলো জগুয়া। কুলিদের একজন সর্দ্দার। অনেকদিন এখানে আছে। যোগেশের হাতের লোক। শ্রমিকদের মধ্যে যারা গুণ্ডা-প্রকৃতির, বদমায়েস, তাদের বশীভূত ক'রে রেখেছে যোগেশ এই জগুয়ার সহায়তায়। টাকা পেলে জগুয়া পারে না এমন কাজ নেই।

সেলাম ক'রে বললে—হুজুর ডেকেছেন ?

—হ্যাঁ, জগুয়া। যোগেশ সোজা হোয়ে ব'সে বললে—কাল বোম্বাই থেকে একজন বড়-সাহেব আসছেন, সঙ্গে আছেন আর একজন ছোট-সাহেব। তাঁরা কোলিয়ারীর কাজ দেখবেন, তারপর বোধ হয় নতুন নতুন আইন জারী করবেন।

জগুয়া ঘাড় নাড়ল—তাতে আমাদের ভাল হবে তো হুজুর ?

—তা তো বলতে পারি না জগুয়া। তবে তোমাদের যখন আমি এতদিন দেখে এসেছি তখন এখনো দেখবো, তোমাদের ওপর কোন অন্যায় আমি মেনে নেব না।

—হুজুর মা-বাপ। আপনার ভরসাতেই আমি আর অন্য সবাই এখানে আছি।

—কাল তাঁরা আসছেন। যোগেশ বলতে লাগল—তোমরা সবাই ফরসা কাপড়-চোপড় প'রে গেটের সামনে হাজির থাকবে। তাঁদের খুব ঘটা করে আমরা খাতির দেব। তারপর দেখা যাবে। এই নাও।

একখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিলে যোগেশ। এমনি বখশিষ জগুয়া প্রায়শই পেয়ে থাকে। নোটখানা কোমরে গুঁজে সেলাম ক'রে জগুয়া বললে—হুজুরের গোলাম আমি। যা হুকুম করবেন তার খেলাপ হবে না।

—আচ্ছা, যাও।

জগুয়া চলে গেল। সর্ব্বশেষে এলো রামলাল।

—রামলাল! কোথায় ছিলে? অনেকক্ষণ ডেকেছি তোমায়। যোগেশের কণ্ঠস্বর ঈষৎ রুক্ষ শোনালো।

মাথা চুলকিয়ে রামলাল মহা-অপরাধীর মতো বললে—হরিয়ার মায়ের খুব অসুখ হুজুর! তার জন্যে দাওয়াই আনতে গিছলুম।

যোগেশ বললে—কাল বোম্বাই মেলে দু'জন ভারী সাহেব আসছে আমাদের কারখানা দেখতে। ষ্টেশনে হাজির থাকবে। আর যিনি বড়-সাহেব, তিনি থাকবেন শেঠজীর বাংলায়। সেখানকার ঘর-দালান আজকের মধ্যে সাফ হওয়া চাই। হিতেন বাবুকে ব'লে দিয়েছি। তুমিও গিয়ে দেখ। আর বড়-সাহেব যে-ক'দিন এখানে থাকবেন, সে-ক'দিন তুমি থাকবে তাঁর আর্দালি। তোমায় অন্য কাজ করতে হবে না।

—বহুৎ আচ্ছা, হুজুর।

—যাও। তোমার ব্যারাকে যে-সব কুলি আর বেহারা থাকে তাদের বলে দাও গে, কাল সকালে তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোয়ে গেটের সামনে হাজির থাকে।

এই ব'লে যোগেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রামলাল মন্থর গমনে চলল তার পিছনে পিছনে।

* * * *

সন্ধ্যার পর যোগেশ এলো প্রমীলার কাছে। বললে—সুমিতারা এসেছিল সকালে ?

ঘাড় নাড়লে প্রমীলা।

ভৃত্য বুধন চা দিয়ে গেল। পাত্রটা নিঃশেষ ক'রে যোগেশ বললে—সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এবং মহাপ্রভু দু'জন যে-ক'দিন থাকবেন সে-ক'দিন ব্যস্ত থাকতে হবেও। রোজ হয়ত দেখা হবে না। পরশুর প্রোগ্রামটা ঠিক ক'রে দিয়েছো ?

মৃদুকণ্ঠে প্রমীলা জবাব দিলে—ওরাই একরকম ঠিক ক'রে দিয়েছে।

—তুমি একটা গান গাইবে তো ?

প্রমীলা জবাব দিলে—ওরাই গাইবে। আমার গানের দরকার হবে না। ইচ্ছে নেই।

ঈষৎ ঝুঁকে ঈষৎ জোর দিয়ে যোগেশ বললে—না, তোমার একটা গান থাকা চাই। আমার বিশেষ অনুরোধ। গাইবে তো ?

—আচ্ছা।

খুসী হল যোগেশ। বললে—সুপারিন্টেন্ডেন্ট-সাহেব লোকটি বাঙালী। আশা করি, তোমার গান শুনে তারিফ করবার মতো রসবোধ তাঁর আছে।

প্রমীলা একটুখানি হাসল। নরম গলায় বললে—আপনাদের কাছে আমার গান যতখানি ভাল লাগে, অন্য সকলের কাছেও তা তেমনি ভাল লাগবে, এমন তো কোন কথা নেই। ভাল নাও লাগতে পারে।

—বলো কি! তোমার গান শুনে ভাল লাগবে না, এমন মানুষ আছে নাকি ?

—থাকতে কি পারে না ?

—সম্ভব নয়। মৃদু হেসে যোগেশ বললে—আর একটা কথা। সুমিতাদের বিশেষ ইচ্ছে, কাল ষ্টেশনে তুমি ওদের সঙ্গে যাও। আমারও খুব ইচ্ছে।

প্রমীলা মুখটা ঈষৎ ঘুরিয়ে নিলে। শান্তকণ্ঠে বললে—মাপ করবেন। ষ্টেশনে যাব না। আমায় বাদ দিতে হবে।

তাড়াতাড়ি যোগেশ বললে—বেশ। তোমায় যেতে হবে না। আমিও সেই কথাই ওদের ব'লে দিয়েছি।

কথায় কথায় আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর যোগেশ বিদায় নিলে। প্রমীলা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে। বাতাসে মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে। আকাশের কোণে একটা বড় তারা অনবরত দপ দপ করছে। কিসের ইঙ্গিত যেন সে জানাতে চায় প্রমীলাকে।

প্রান্তরের ওপারে ঝক্‌ঝক্ শব্দ। ট্রেন আসচে। বেশ লাগে ট্রেনের শব্দ শুনতে। কত লোক আসছে। কত লোক তাদের ঈপ্সিত স্থানে চলেছে। তাদের হৃদয়ে কত না আশা, প্রিয়-মিলনের কত না প্রত্যাশা!

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রমীলা। ট্রেন আসছে।

[ক্রমশঃ।

ঘূর্ণাবর্ত

বিভা মুখোপাধ্যায়

ন'দিন জ্বরে ভুগে সুবিমল সেরে উঠলো। এ কয় দিন ইলা রোজই একবার করে এসেছে। গোকুলের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। তাই ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা ইলাকেই করে দিয়ে যেতে হয়। ইলার সেবা-যত্নে সুবিমলের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। এত দিন যে সংকোচটুকু তার ছিল, সেটা অলক্ষ্যে শিথিল হয়ে গেল।

ইলার মুখে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তার যে ছাপ সুবিমল দেখেছে, তাতে বুঝতে বাকী ছিল না যে, ইলাদের পরিবারও কম বিপন্ন হয়নি। শিয়ালদা ষ্টেশনে ভিটে-ছাড়া অসহায় মানুষের ছবি সে নিজের চোখে দেখেছে। তাদের কথা ভাবতে মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে ওঠে।

টেবিলের উপর বইগুলো আবার এলোমেলো হয়ে পড়েছে। কয়েক দিনেই জমে উঠেছে ধূলোর পুরু আবরণ। মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। অপদার্থ গোকুল! কেষ্টার আর এক সংস্করণ। যেখানে-সেখানে পড়ে দিন-দুপুরে ঘুম, আর গালাগাল দিলে দরজার পাশে মুখ বাড়িয়ে বোকার মত হাসি। সুবিমল চীৎকার করে উঠে —"গোকুল! চারটে বাজে। এখনও পড়ে ঘুমুচ্ছিস্? আক্কেল আর হবে না তোর!"

"হঠাৎ এত রাগ কার ওপর?"—স্নিগ্ধ হেসে ইলা ঘরে ঢুকলো! সুবিমল কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

"এসে বুঝি শাসনতন্ত্রে বাধা দিলাম?"—ইলা হাসে।

"গোকুল শাসনের বাইরে। এ কয় দিনে আবার সব অগোছালো করে ফেলেছে। একেবারে নিরেট!"

"তবুও ভাল। ভাবলাম, বুঝি কোন অনর্থ ঘটিয়েছে। চাকরি নিয়ে যাবে।"

"এমন পেট্রন থাকলে চাকরি কি সহজে যায়!"

"কিন্তু যে কাজ ওর নয়, তাও কি ওর কাছে চিরদিন আশা করবেন?"—সলজ্জ হাসির সঙ্গে ইলা সুবিমলের মুখপানে চায়।

"তা সত্যি, তুমি যা করেছ, তা কোন দিনই ওর দ্বারা সম্ভব নয়।"

কথাটা বলে ফেলে সুবিমল কেমন অস্বস্তি বোধ করে। লজ্জায় ইলার মুখপানে চাইতে পারে না। ইলার সারা মুখে যেন রক্তপ্রবাহের জোয়ার আসে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে টেবিলের বইগুলো গোছাতে শুরু করে।

অস্বস্তিটা কাটিয়ে নিয়ে সুবিমল হাঁক দেয়। গোকুল ছুটে আসে। ইলাকে টেবিল গোছাতে দেখে আমতা আমতা করে বলে—"এ কি করতেছ, দিদিমণি? আমি তো—আমিই তো আছি।"

"থাক, তোমায় আর করতে হবে না। তুমি বরং দু'বাটি চা নিয়ে এসো।"—ইলা সুবিমলের মুখপানে চেয়ে হাসে।

"আপনি ওকে যত বোকা ভাবেন, ও ততটা নয়। চাকরের কাজ করতে এসে অনেক বুদ্ধিমানই অমন বোকা বনে যায়।"

ইলার কথা শেষ না হতেই ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো শেফালি। কয়েক দিন সুবিমলকে ষ্টেশন-ক্যাম্পে না দেখে ও প্রথমে ভেবেছিল, হয়তো কোন জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন। কিন্তু দিনের পর দিন প্রতীক্ষায় থেকেও কোন খোঁজ না পেয়ে, শেফালি নিজেই ছুটে এসেছে। হঠাৎ এসে ইলাকে এ অবস্থায় দেখে কেমন হকচকিয়ে গেল।

সুবিমল হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে—"দিনটা আজ ভাল বলতে হবে।"

শেফালি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সুর টেনে বলে—"ক'দিন যাননি দেখে ভেবেছিলাম অসুখ!"

সুবিমল জবাব দেবার আগেই ইলা বলে উঠলো—"মিথ্যে ভাবনি। সত্যি ক'দিন জ্বরে ভুগলেন।"

"ও! তুমি? আমি খেয়ালই করিনি।"

শেফালির কথাটা জলবিছুটির মত ইলার গায়ে লাগে, কিন্তু সে কোন জবাব দেয় না।

শেফালি বক্র কটাক্ষে একবার ইলার আর একবার সুবিমলের মুখপানে তাকায়।

থমথমে অবস্থাটা কাটিয়ে হঠাৎ গোকুল চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সুবিমলের হাতে একটা পেয়ালা তুলে দিয়ে, অন্য পেয়ালাটা ইলার দিকে এগিয়ে দিতে দেখে সুবিমল হেসে ওঠে—"বুদ্ধি তোর আর হবে না কোন দিন। ঘরে লোক তিন জন, আর চা এনে হাজির করলি দু'পেয়ালা!"

গোকুলের হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে ইলা শেফালির হাতে তুলে দিয়ে বলে—"ও তো দু'জনকেই দেখে গেছে। ওর আর দোষ কি?"

গোকুল হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

শেফালি যেন কোনমতেই অবস্থাটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল না। তার অস্বস্তিটুকু সুবিমলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। একটু সহজ করে নেবার চেষ্টায় সুবিমল বলে উঠলো—"যাক, আপনার ওদিকের খবর কি—আগে বলুন!"

শেফালি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—"আজ যাই, আর একদিন আসবো।"

যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মত শেফালি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুবিমল ও ইলা হতবাক্ হয়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে। শেফালির ব্যবহারে সুবিমল আগাগোড়াই এই হঠকারিতা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না।

* * * *

মুদিয়ালী রোডে সেক্রেটারী সুখেন্দু রায়ের বাড়ী। সন্ধ্যার পর বারান্দায় কৌচের ওপর গা ঢেলে দিয়ে সুখেন্দু রায় কি ভাবছিলেন। হাতের চুরুটটা জ্বলে-জ্বলে ছাই হয়ে গেল, সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। বয়েস যৌবনের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও, দেহ-মন তাঁর আজও সজীব হয়ে আছে উদ্দাম জীবনীশক্তিতে।

মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে পীড়া দেয়। অবসরের মুহূর্তগুলি যেন কাটতে চায় না। সংসারে আকর্ষণের কেন্দ্র বলতে সুখেন্দু বাবুর একটি মাত্র ভাইপো ছাড়া আর কেউ ছিল না। শেয়ার মার্কেটের ফটকা নিয়ে সারাটা দিন এক রকম কাটে। কিন্তু সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহ-মনে ঘনিয়ে আসে অবসাদ। জীবনের

কোথায় যে বিরাট এক শূন্যতা জমে আছে, সুখেন্দু রায় সেটা স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারেন না। নিঃসঙ্গতাটুকু কাটিয়ে উঠবার জন্যে মন চায় নিরালার সঙ্গী। স্কুল পরিচালনার ভার নেওয়ার পর থেকে তিনি মাঝে মাঝে শিক্ষয়িত্রীদের আমন্ত্রণ করেন। সামান্য স্কুল-মিসট্রেসদের পক্ষে সেক্রেটারীর সহানুভূতি কম কথা নয়! বিনিময়ে তিনি হয়তো চান ক্ষণিকের সঙ্গ—হাসি-গল্প আলাপ-আলোচনা। তার বেশী তো কিছু নয়! করবী ভট্টাচার্য্যের কথা মনে হলে আজও বিশ্রী লাগে। সামান্য স্কুল-মিসট্রেসের অত স্পর্দ্ধা কোন দিন দেখেননি তিনি। করবীর চোখে যে আগুনের ফুল্‌কি তিনি দেখেছিলেন, সে কথা সুখেন্দু রায়ের মনে চিরদিন জ্বলন্ত হয়ে থাকবে!

কিন্তু বেশ মেয়ে ওই অণিমা। করবীর চেয়ে অনেক সুন্দর, অথচ যেমন শান্ত তেমনি হাস্যচঞ্চল! সুখেন্দু রায়ের আমন্ত্রণে সে অনেক বার এসেছে তাঁর বাড়ীতে। কত কি আলোচনা করেছেন দু'জনে রাত ন'টা পর্য্যন্ত বারান্দায় বসে। অণিমা মাঝে মাঝে ওঁকে অভিভূত করে তোলে।

সন্ধ্যা উৎরে গেল। সাড়ে আটটা বাজে, তবুও অণিমা এলো না দেখে সুখেন্দু বাবু অধীর হয়ে উঠলেন। মনে আশঙ্কা হয়, পাছে আবার ঘটে সেই বিভ্রাট। করবী রিজাইন দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে গেছে। কিন্তু অণিমার বেলায় হয়তো ঘটবে তার উল্টো। সুখেন্দু রায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন।

কোন শিক্ষয়িত্রীকে বিশ্বাস করতে এখন আর পুরোপুরি সাহস হয় না। বাইরের রূপ দেখে মেয়েদের চেনা কঠিন। চাল-চলনে যত আধুনিকাই হোক, আসলে তারা সেই সনাতনপন্থী। পলকে প্রলয় সৃষ্টি করতে ওদের দেরী লাগে না।···কিন্তু অণিমা তো সে ধরণের মেয়ে নয়! হঠাৎ বারান্দায় পায়ের শব্দ পেয়ে, সুখেন্দু রায় চমকে ওঠেন—"কে?"

আগন্তুক ভয়ে ভয়ে সামনে এগিয়ে আসে। স্কুলের বেয়ারা। বেহালা থেকে এসেছে। সেক্রেটারীর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। চিঠিখানি হাতে নিয়ে সুখেন্দু বাবু একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির আপাদমস্তক তাকিয়ে নিলেন।

অণিমা লিখেছে, শরীর তার অসুস্থ, তাই আজ সে আসতে পারবে না। তাছাড়া, এভাবে যখন-তখন আসা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতে এ ধরণের অনুরোধ যেন আর না করা হয়।··· ক্রটির জন্যে বার বার ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। এই স্নেহ ও সহানুভূতি সে চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবে।

জুতো মেরে গরু দান! নিমেষে সুখেন্দু রায়ের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঝিম্‌-ঝিম্ করে ওঠে। পরক্ষণেই মনে উঁকি-ঝুঁকি দেয় নানা প্রশ্ন। করবীর কথা শোনেনি তো? না সুনন্দার প্রভাব? বক্র কটাক্ষে ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—"আচ্ছা, যাও।"

ছেলেটি যেমন ভীরু পায়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি ভীত-সন্ত্রস্ত গতিতে চলে গেল।

সুখেন্দু বাবু অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে লাগলেন। একটা পরাজয়ের গ্লানি যেন ওঁর সারা মন তোলপাড় করে। সুখেন্দু রায় পরাজয় মানে না। সে জানে কেমন করে শিকার হাতের মুঠোয় আনতে হয়। অণিমা—সুনন্দা—যেই হোক, সুখেন্দু রায়ের হাতে চুরুটের মত পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।

* * * *

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইলাদের পরিবারে ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ করেছিল। সেদিক থেকে পুরোপুরি প্রগতিবাদী হলেও পারিবারিক-জীবনে তাদের বনিয়াদি রক্ষণশীলতাটুকু অটুট ছিল। সামাজিক-জীবনে যে আভিজাত্য পুরুষানুক্রমিক ভাবে আঁকড়ে ধরে এত কাল তাঁরা পারিবারিক গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে, আজও তা শিথিল হয়নি। ইলার বাবা কতকটা উদারনৈতিক হলেও সে-সংস্কারের বনিয়াদ ভাঙতে পারেননি। ইলা যখন প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বি. এ. পাশ করে কোলকাতা এলো এম. এ. পড়তে, দীনেশ বাবু বার বার তাকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, য়ুনিভারসিটিতে গিয়ে গায়ে যেন উল্টো হাওয়া না লাগে!

ইলা সে উপদেশ মাথা পেতে নিয়েছিল। তবুও অনাগত জীবনের আকর্ষণ তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেল। সংস্কারের পিছুটান অবশ্য ইলারও ছিল। লেখাপড়া শিখলেও আর পাঁচ জনের মত সে সংকোচের বাঁধ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

সেদিনের কথাগুলো আজও সুস্পষ্ট হয়ে ইলার মনে জেগে আছে। সুবিমলের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন ইলা যেন ছিল একটা কলের পুতুল। তার সেই জড়তা প্রথম কেটে গেল সুবিমলের রোগশয্যার পাশে বসে। এখন প্যারটের মত অনর্গল বলে যেতে পারে। সহজ ভাবে পুরুষের মুখপানে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দ ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে কথা বলতে পারে। সুবিমলের সংস্পর্শে ইলা যেন দিন দিন সজীব ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কয়েক দিন সুবিমলের সঙ্গে শিয়ালদা ও অকল্যাণ্ড প্লেসে ঘোরাঘুরি করে ইলাও ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লো ওদের ভলাণ্টিয়ারী কোরে। এত দিন শুধু বাইরে থেকে দর্শক হিসেবে যাদের পথ-ঘাটে দেখেছিল, তাদের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের সুযোগ যখন হলো, তখন ইলা আর আভিজাত্যের অভিমানে আত্মগত থাকতে পারলো না। এক-একটি পরিবারের সঙ্গে যখন ওর ঘনিষ্ঠ চেনা-জানা হয়, ইলার সারা সত্তা প্রচণ্ড আলোড়নে ভেঙ্গে পড়ে। চোখে জল পড়ে না, কিন্তু বুকের ভিতরটা আর্ত্তনাদ করে ওঠে। একদিন এদেরও ছিল ঘর-সংসার, আত্মীয়-স্বজন, মান-সম্ভ্রম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের নির্মম নিষ্পেষণে সব চুরমার হয়ে গেল আজ' বার বার শুধু এই প্রশ্নই মনে জাগে, 'হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেইড অব ম্যান!' সভ্যতার অভিযানে মানুষ এগিয়ে চলেছে সম্মুখের পথে, তাই মানুষের নীতিতে আর-এক দল অসহায় মানুষ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল অতলস্পর্শ অন্ধকারে! ভাবতে ভাবতে চেতনা যেন মুহ্যমান হয়ে আসে। 'পণ্য এরা!— এক দল মানুষকে বাঁচবার স্বচ্ছন্দ অধিকার দিতে আর এক দল পুড়ে ছাই হয়ে গেল!'

"ইলা!"—সুবিমল ডাকে।

ইলার অন্যমনস্কতার কারণটুকু অনুমান করে নিতে তার বিলম্ব হয় না। ইলার চমক ভাঙে। সুবিমলের মুখপানে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—"পারবেন—এদের কোন ব্যবস্থা করতে? এতগুলো লোকের দুঃখের বোঝা মাথা পেতে নেওয়া—"

"সম্ভব নয়, বলে যদি সবাই এড়িয়ে চলে, তাহলে কি এর সমাধান হবে কোন দিন?"—সুবিমল হাসে।

ইলা একটু লজ্জিত হয়ে উত্তর দেয়—"আমি তা বলছি না। বলছি, এই রাষ্ট্রগত দুর্ভাগ্যকে রুখতে হলে চাই বিপুল অর্থ আর সামর্থ্য। তার কোনটাই তো নেই।"

"যেটুকু আছে, তাই দিয়ে যদি একটি পরিবারকেও রক্ষা করা যায়, তার মূল্যও তো কম নয় ইলা!"

মূল্য যে কম নয় এ কথা ইলা অস্বীকার করে না। একটি পরিবার কেন, একটি মাত্র মানুষকেও যদি বাঁচানো যায়, তার মূল্যও তো কম নয়। রাজনীতির খেয়াল মেটাতে যে রাষ্ট্রগত দুর্ভাগ্য আজ দেখা দিয়েছে, তাতে দলে দলে জীবন্ত মানুষ হয়ে পড়েছে মূল্যহীন ভাঙা পাথরবাটির সামিল। একদিন যে প্রস্তর-পাত্রে জন্মভূমির মুক্তিপূজার নৈবেদ্য সাজানো হয়েছিল, আজ তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে আঁস্তাকুড়ের ছাইয়ের গাদায়! ইলা সুবিমলের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার চেয়েও অগণিত অসহায় নর-নারীর রিক্ততার বেদনা তাকে আজ বেশী পীড়া দেয়।

বাইরের জগতকে ইলা এত দিন দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে। বিশ্বব্যাপী দানবিক ও আণবিক যুদ্ধের ঝড় মানুষের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে কেমন করে ওলট-পালট করেছে, এত দিন সে সম্পর্কে ছিল ওর আনুমানিক জ্ঞান। যুদ্ধ মানুষকে টেনে নামিয়েছিল অর্থনৈতিক ব্যভিচারের পংকিল আবর্ত্তে। ছেচল্লিশের হানাহানি তাদের টেনে নামালো পাশবিক হিংস্রতায়। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু নিঃশেষ হয়ে গেল স্বাধীনতার যুপকাষ্ঠে। বাংলার সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হলো দেশ ভাগাভাগির পর।

বিকেল বেলা শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে ইলা বাসে উঠে যাচ্ছিল যাদবপুর কলোনীর দিকে। সরকারী আশ্রয়-শিবির ছাড়া সহরের আশে-পাশে ছোটখাটো অনেক কলোনী গড়ে উঠেছে। সামান্য সঙ্গতি যাদের ছিল, তারা এসে আশ্রয় নিয়েছে এই সব কলোনীতে। কেউ দালান-কোঠা, কেউ বা মাটীর ঘর তৈরী করে মাথা গুজবার মত একটু ঠাঁই করে নিয়েছে।

বাস সার্কুলার রোড ধরে ছুটে চলেছে। অত্যন্ত ভীড়। বসবার জায়গার অভাবে কয়েকটি মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে। কন্ডাক্টর চেষ্টা করেও তাদের নিরস্ত করতে পারে না। প্যাসেঞ্জারের ঠেলাঠেলি ক্রমেই বেড়ে ওঠে। ইলার কোন দিকেই বিশেষ নজর নেই। নিতান্ত অন্যমনস্ক হয়ে সে একটি কোণে বসেছিল। হঠাৎ হৈ-চৈ শুনে চমক ভাঙ্গলো—"পিক্-পকেট! পকেটমার! মানিব্যাগ তুলে নিয়েছে।"

ইলা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক জামার পকেটে হাত দিয়ে 'হায়, হায়' করছেন। পকেট থেকে কে তাঁর মানিব্যাগটি তুলে নিয়েছে, আশেপাশে সবাই ধোপদুরস্ত জামাকাপড়-পরা ভদ্রলোক। অসহায় দৃষ্টিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাদের দিকে তাকান, কিন্তু মুখ ফুটে কা'কেও কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন না। মাথা হেঁট করে খুঁজতে সুরু করেন লোকের পায়ের কাছে। অবস্থা দেখে পাশের এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"খুঁজছেন কি মশায়? সাফাই হাতে ব্যাগ সরে গেছে।"

"হাঁ, ব্যাগ। জানেন? জানেন আপনি? দয়া করে বলুন! যথাসর্বস্ব ছিল ব্যাগে! সংসারটা উপোস যাবে।"—মনে হয় বৃদ্ধ বুঝি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন।

"পকেটমার—মশায়, পকেটমার। ভদ্রবেশী পাকা চোর! কালে কালে কি হয়ে উঠলো! আমি দেখেছি; স্বচক্ষে দেখেছি কে আপনার ব্যাগ নিয়েছে। কিন্তু বলি কি করে?"—ভদ্রলোকের চোখ দুটো যেন ভাঁটার মত ঘুরপাক খায়।

যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই অকারণ আতঙ্কে আপন আপন পকেটে হাত দিয়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে; যদি কারু পকেট থেকে ব্যাগটা বেরিয়ে পড়ে!

বৃদ্ধের পিছনে দাঁড়িয়ে তিনটি মহিলা। মনে হয় কলেজী মেয়ে। পোষাক-পরিচ্ছদে পর্য্যাপ্ত পরিপাট্য, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ।

"দিয়ে দিন না মশায়, যদি কেউ পেয়ে থাকেন ভদ্রলোকের ব্যাগটা। আহা, বেচারা ভদ্রলোক!!"—একটি মহিলা বলে উঠলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ভদ্রলোকটি এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ফেললেন—"আপনার সঙ্গিনীকে বলুন ব্যাগটা ফিরিয়ে দিতে, ছিঃ!"

ভদ্রলোকটির কণ্ঠস্বর অপর মেয়েটির কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে

বলে মনে হলো না। সে নির্লিপ্ত ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"শুনছেন ? এই বুড়ো ভদ্রলোকের ব্যাগটা দিয়ে দিন—"

মেয়েটি এতক্ষণে ফিরে তাকালো। দেখে অভিজাত বলেই মনে হয়। বয়স—অনুমান পঁচিশ-ছাব্বিশ।

"শুনছেন ? মিস্ না মিসেস্— !"

"আমায় বলছেন ?"—বিস্ময়ের সঙ্গে মেয়েটি জবাব দেয়।

"হাঁ, আপনাকেই বলছি। ভদ্রলোকের ব্যাগটি ফিরিয়ে দিন।"

"তার মানে ?"—মেয়েটির চোখে-মুখে যেন ধক্-ধক্ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

"মানে খুব পরিষ্কার—" ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন।

যাত্রীদের ভিতর গুঞ্জন ওঠে। দু'-চার জন প্রতিবাদ করে বলেন—"কি বলছেন মশায়, ভদ্রমহিলার নামে ?"···

"ঠিকই বলেছি, দাদা ! ওঁর ব্লাউজের ভিতরটা দেখলে এখুনি সন্দেহভঞ্জন হবে।"—দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি আবার বলে উঠলেন—"দেখুন—দেখুন না, হাতে-নাতে ধরা পড়বে।"

বেগতিক বুঝে মেয়েটি তাড়াতাড়ি ব্লাউজে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেই, সহযাত্রী ভদ্রলোক তার হাতখানি ধরে টান দিলেন, ব্যাগটি ছিটকে বেরিয়ে এলো ব্লাউজের ভিতর থেকে।

বাস-শুদ্ধ লোক হৈ-হৈ করে ওঠে। মেয়ে-পিক্-পকেট ! ভদ্র-ঘরের মেয়ে ট্রাম-বাসে শুরু করেছে চুরি। পুলিশে দাও—পুলিশে দাও !

ইলার মাথাটা লজ্জায় হেঁট হয়ে আসে, সত্যি তো ! ভদ্র-ঘরের মেয়ে সুরু করেছে পকেটমারা ! ঘৃণায় পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন রী-রী করে ওঠে।

কিন্তু কেন ? জীবনধারণের জন্যে এই বৃত্তি ! অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার চাপে সমাজের বুকের ভিতর দেখা দিয়েছে ক্যানসার ? না—না। ইলা তা বিশ্বাস করতে পারে না। ওই শাড়ি-ব্লাউজ, ভ্যানিটি ব্যাগ—ওর কোথাও তো নেই দারিদ্র্যের ছাপ !

মেয়েটি মুখ নীচু করে পার্ক-সার্কাসের মোড়ে নেমে গেল। কি হবে তাকে পুলিশে দিয়ে। ভদ্রলোকেরা নিরস্ত হলেন। কিন্তু ইলার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করতে লাগলো। সত্যি কি মেয়েটা চোর ! না—না। এখনও ওর অটুট স্বাস্থ্য। দরকার হয়, লোকের দরজায় খেটে খাবার মত শক্তি তার আছে।

তবু সে চোর ! পিকপকেট ! মহিলা পকেটমার ! ভাবতে ইলা শিউরে ওঠে। সমাজের কাঠামোতে ঘুণ ধরেছে। এবার বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়বে।

ইলা যখন সচেতন হলো তখন বাস গন্তব্য-স্থান ছাড়িয়ে বহু দূর এসে পড়েছে।

* * * *

প্রখর রৌদ্রদগ্ধ আকাশে এক টুকরো মেঘ দেখে তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন সজীব হয়ে ওঠে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের চিঠিটা হাতে পেয়ে ইলাও তেমনি আশান্বিত হলো। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত এমপ্লয়মেণ্টের দৌলতে ওর ডাক এলো।

বুধবার বেলা বারোটায় কেন্দ্রীয় সরকারের রেভেনিউ অফিসে কথা কহবার জন্ম ওর ডাক এসেছে। নিয়োগ-পত্র হাতে না পেলেও, এই সামান্ম আমন্ত্রণ-পত্র ওর মনে কম ভরসা জোগায় না। যদি একটা কিছু সুরাহা হয়···। সংসার অচল হতে আর দেরী নেই।

লাট-ভবনের কাছাকাছি লাল রঙের বিরাট অট্টালিকা। ফটকে উর্দ্দিপরা দারওয়ান লম্বা সেলাম করে সকলকেই সম্ভাষণ জানাচ্ছে। বাইরে থেকে বাড়ীটা এক মিনিট দেখে নিয়ে ইলা ভিতরে ঢুকে পড়ে। গিস্‌গিস্ করে লোক, সরকারী অফিসের কর্ম্মচারীদের ভিড়ের সঙ্গে বে-সরকারী, সওদাগরী—নানা সম্প্রদায়ের মালিক-কর্ম্মচারীদের সমাবেশে বিরাট অট্টালিকা যেন প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়। এই জনবহুল পরিবেশের মধ্যে এসে ইলার দেহ-মন ছমছম করে। এ-পাশ ও-পাশ দেখে নিয়ে ঘরের নম্বর দেখে ইলা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো।

দোতলার বারান্দায় প্রকাণ্ড একটা কিউ। প্রায় শ'খানেক ছেলে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এক মিনিটের জন্ম ইলা হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো। মনে হয় যেন কন্‌ট্রোলের দোকানে কিংবা সিনেমার টিকিট-ঘরের সামনে ক্রেতারা লাইন দিয়েছে। চাকরির জন্ম যে এভাবে লাইন দিতে হয়, এ ধারণা তার ছিল না। নিমেষে মনটা দমে আসে। সামান্ম চাকরি, কিন্তু তারও প্রার্থীর অন্ত নাই। জীবিকা অর্জ্জনের অন্য কোন পন্থা এদের জানা নেই, তাই গতানুগতিক ভাবে কোনমতে একটা ডিগ্রী নিয়ে ধরাবাঁধা গোলামি-জীবন ! ভাবতে ভাবতে ইলা সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

"সামনের ঘরে গিয়ে বসুন।"—এক ভদ্রলোক নির্দ্দেশ দিলেন।

কয়েক জন যুবক গুঞ্জন করে ওঠে—"মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়।"

বাঁচবার প্রশ্ন যেখানে জটিল, সেখানে আদর্শবাদের মুখরোচক বুলি আর আত্মগত আভিজাত্য নিয়ে বসে থাকা যায় না। হঠাৎ রমাকে ইলার মনে পড়ে। রমা ঠিকই বলেছিল—অর্থের প্রয়োজনে চাকরী। স্কুলের যাট টাকা মাইনে এক জনের জীবনধারণের পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

এক পাশে ইলা চুপচাপ বসেছিল। কখন যে তার ডাক পড়বে কে জানে ! মাঝে মাঝে চাপরাশী এসে একে একে ডাক দিচ্ছে। চাপরাশীর মুখে নিজের নামটা শুনেই ইলা সচেতন হয়ে ওঠে। তার নির্দ্দেশ মত পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে। এই ঘরে বসেছে নির্ব্বাচনী কমিটি।

ইলা ঘরে পা দিতেই এক জন কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। সে চাউনিতে ইলা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তবুও কম্পিত পায়ে এগিয়ে যায় টেবিলের সামনে হাত তুলে। মাথাটা একটু নুইয়ে ওঁদের নমস্কার করে। কাঠগড়ায় আসামীর মনের অবস্থা যেমন হয়, ইলার মনের অবস্থাও তেমনি যেন কতকটা হয়ে উঠলো।

হাতের পাইপটা মুখে ছুঁইয়ে ঠোঁটের পাশ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মাঝের অফিসারটি প্রশ্ন করলেন—"কত দূর পড়াশুনা করেছেন ?"

প্রশ্নের ধরণ দেখে একটু বিরক্ত হলেও ইলা শান্ত ভাবেই জবাব দেয়—"এম এ, পরীক্ষা দিয়েছি।"

"এর আগে কোথায় কাজ করেছেন ?"

"না।"

"তবে কি করে কাজ করবেন?"—শ্লেষের হাসি হেসে পাশের অফিসারটি প্রশ্ন করলেন।

"শিখে নেবো।"—ধীর স্বরে ইলা জবাব দেয়।

ওঁরা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করেন। "সার্টিফিকেট আছে?"—চশমাটা কপালে তুলে চেয়ারে-হেলান-দেওয়া অফিসারটি প্রশ্ন করলেন।

পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেটগুলো ইলা সঙ্গে করেই এনেছিল। ডিপ্লোমা বার করতে দেখে একজন বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—"এ সার্টিফিকেট নয়। অন্য কোন রেস্‌পন্‌সিবল অফিসার বা বড়লোকের সার্টিফিকেট?"

"না, সে রকম সার্টিফিকেট আমার নেই, তবে দরকার হলে আনতে পারি। কাজ দেখে যদি খুসী না হন, তাড়িয়ে দেবেন।"—মৃদু হাসির সঙ্গে ইলা জবাব দেয়।

"এক্‌জ্যাক্টলি!"—পাইপটি বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে ধরে সাহেবটি বলেন—"আচ্ছা যান।"

নমস্কার জানিয়ে ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। প্রশ্নের বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

* * * *

মরশুমি বাতাস যখন আসে, তখন আপনা-আপনিই হয়তো বর্ষণের পর বর্ষণ নামে। চাকরির ইনটারভিউ দিয়ে আসার কয়েক দিন পরই ইলা একটা টিউশানী পেল। আই-এ ক্লাসের ছাত্রী; সন্ধ্যায় ঘণ্টা দুই পড়াতে হবে, মাসিক ষাট টাকা বেতন। দেড়শো টাকা মাইনের একটা চাকরির সম্ভাবনা, সেই সঙ্গে মাসিক ষাট টাকা বেতনের টিউশানী পেয়ে দুর্ভাবনার হাত থেকে সে অনেকখানি রেহাই পেলো।

সন্ধ্যার পর ছাত্রী পড়িয়ে ইলা বাড়ী ফিরছিল। গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে ট্রামটা সর্পিল গতিতে ছুটে চলেছে। চলমান গাড়ীর দোলায় অবসন্ন স্নায়ুতন্ত্রী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসে। চোখ দুটো ঘুমে ভেঙ্গে পড়ে। হঠাৎ কয়েকটি তরুণীর কলকণ্ঠে ও সচেতন হয়ে ওঠে। লেডিস্ সিটের অভাবে কয়েকটি মেয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে। ওদের চেহারা, বেশভূষা, চাল-চলনে বোঝা শক্ত যে, তারা বাঙালী—না, বিদেশী। পরনে গাঢ় সবুজ রঙের পাড়-বিহীন জর্জ্জেট। তামাটে রঙের চুল, কা'রও বব—কারও বা রোল করা, চোখে লম্বা করে সুর্মা টানা, রুজ আর লিপষ্টিকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কথায় কথায় খিলখিল করে হেসে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে। অশোভন চটুলতায় আরোহীরাও বিরক্ত হয়ে ওঠে, নারীর প্রতি ইলার যত পক্ষপাতই থাক, তারও ভাল লাগছিল না মেয়েগুলোর এই অভব্য আচরণ, ইচ্ছে করেই ইলা মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল, হঠাৎ কাঁধের উপর একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে ওঠে—"কে?"

"ওমা! ইলাদি', তুমি?—এতক্ষণ চিনতেই পারিনি।"—উচ্চ কণ্ঠে মেয়েটি হেসে ওঠে।

ইলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখপানে তাকিয়ে থাকে, ঠিক চিনে উঠতে পারে না।

"আমাকে চিনতে পারলে না ইলাদি'? আমি মাধবী।"—মাধবীর উজ্জ্বলতা ক্ষণেকের জন্ত স্তব্ধ হয়।

ভূত দেখলে মানুষের মুখের চেহারা যেমন নিমেষে বদলে যায়, ইলার মুখের অবস্থাও তেমনি বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

"মাধবী! তুমি?"—কথাটা বলে ইলা সবিস্ময়ে মেয়েটির মুখপানে তাকিয়ে রইল। ওর চাউনিতে মেয়েটি একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

মাধবী জ্ঞান বাবুর মেয়ে। ছ'বছর পর ইলা দেখলো মাধবীকে। সেদিনের সেই মাধবীকে দেখে চেনা আজ সত্যি কঠিন। ভোরে উঠে মাধবী স্নান করে পিঠের উপর কালো চুলের গোছা এলিয়ে দিয়ে ফুলের সাজি হাতে ইলাদের বাগানে আসতো পূজোর ফুল তুলতে। কোথায় গেল ওর সেই মেঘের মত কালো লম্বা চুল! জ্ঞান বাবুরা ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়তে দেবার রীতি তাঁদের পরিবারে ছিল না। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, মাধবীকে স্কুলে পাঠাবার জন্ত ইলা কত অনুনয় করেছিল ওর বাপ-মায়ের কাছে। সেদিনের সেই মাধবীর এতখানি পরিবর্ত্তন ইলা কল্পনাও করতে পারেনি। চোখের সেই শান্ত ভীরু দৃষ্টি কোথায়? কোথায় গেল ওর সেই কমনীয়তা?

দেশ ভাগাভাগির পর সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো। মাধবীরা কোথায় গিয়ে পড়েছিল সে খবর ইলা জানতো না। তাই হঠাৎ চোখের সামনে মাধবীর এক নতুন সংস্করণ দেখে ইলা হতবাক্ হয়ে গেল। আজকার মাধবীর মধ্যে সেদিনের সেই পুরোন মাধবীকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইলার নীরবতা ভঙ্গ করে মাধবী বলে—"তোমরা কোথায় আছ ইলাদি'?"

"কালিঘাটে···তোমরা? মাসীমা, মেসমশায় ভাল আছেন তো?"—ইলা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে।

"আমি 'উইমেন্‌স্ লজ'-এ থাকি। মা মারা গেছেন বছর খানেক হবে। বাবা কাকার কাছে গিরিডিতে।"—একটু ইতস্তত করে মাধবী জবাব দেয়।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব থাকে। হয়তো দু'জনেরই মনে অতীত জীবনের স্মৃতি একসঙ্গে নাড়া দিয়ে ওঠে। সে জীবন ছিল স্বাভাবিক,—বাঙলা দেশের মেয়েদের নিজস্ব জীবনধারার এক-একটা প্রতীক্। আজ হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী; আগাগোড়া কৃত্রিমতায় মোড়া।

"তুমি কি কোন চাকরি করছো, মাধু?"—নীরবতা ভঙ্গ করে ইলা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। একটা কোম্পানীতে চাকরি নিয়েছিলাম—কিন্তু মন যোগাতে পারিনি। তাই এখন—" একটা ঢোঁক গিলে মাধবী থেমে যায়।

"থামলে কেন?"—সস্নেহে ইলা প্রশ্ন করে।

"কিছু না, ইলাদি'! তুমি জিজ্ঞেস করো না। না—না। তোমায় বলতে পারবো না সে কথা।—" হঠাৎ যেন মাধবী কেমন হয়ে ওঠে।

ইলার অনুমান করতে বিলম্ব হয় না যে, মাধবীর বুকে কোথায় যেন গভীর ক্ষত লুকিয়ে আছে, যা সে আজ প্রকাশ করতে পারে না।

"আমায় বলতে পারো না, এমন কি কাজ?"—মনের কৌতূহল ইলা যেন দমন করতে পারে না।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে নিজেকে হঠাৎ একটা গতিবেগ দিয়ে মাধবী বলে—"বেশভূষা থেকেই অনুমান করতে পারো—"

"তার মানে ?"—ইলা জিজ্ঞেস করে।

"মানে, ব্যবসা করি।"—ইতস্তত করে আড়ষ্ট গলায় মাধবী বলে। সঙ্কোচে ওর সমস্ত শরীরটা নুয়ে পড়ে।

সঙ্গের মেয়েটি হঠাৎ ওর হাতে একটা ঝাঁকানি দেয়। ট্রামটা থামবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নেমে পড়ে।

দ্বিতীয় কোন কথা জিজ্ঞেস করবার সুযোগ ইলার হয় না। মনের ভিতরটা তোলপাড় করে ওঠে। মাধবীকে দেখে সে যতটা অবাক্ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী অবাক্ হলো মাধবীর কথায়। চাকরিতে সে মন যোগাতে পারেনি। তবে কি কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল কোন অন্যায় সুযোগ নিতে? ইলা শিউরে ওঠে। না—না—ও তা ভাবতে পারে না। এই তো সেদিন ইনটারভিউ দিয়ে এসেছে! ছেলেরাও যেমন চাকরি করে, মেয়েরা ঠিক তেমনই করবে। আপন আপন ডিউটি করা ছাড়া, মন যোগানোর কি প্রশ্ন তাতে থাকতে পারে? যদি তা-ই হয়, ওরা বিদ্রোহ করে না কেন? ছিঃ! ছিঃ! ইলার সারা অন্তর বিদ্রোহ করে ওঠে। ব্যবসা! কি ব্যবসা করে মাধবী? ইলা বুঝে উঠতে পারে না। ওর মনে এলোমেলো নানা প্রশ্নের ঝড় বয়ে যায়।

*   *   *   *

সামান্য ব্যাপার নিয়ে যে এতখানি বাড়াবাড়ি হবে, অনিমা তা ভাবতেও পারেনি। সুনন্দা অবশ্য ওকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু অনিমা তার কথায় খুব বেশী গুরুত্ব দেয়নি। দেখা-সাক্ষাতের মৌখিক আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার দরুণ যে তাকে এতখানি অপদস্থ হতে হবে, এ ধারণা তার ছিল না। সুনন্দা অবশ্য বলেছিল—"চাকরিটা এবার হারাতে না হয়। অপমান হজম করবার পাত্র সুখেন্দু রায় নন। তা ছাড়া, খাদ্য-খাদক সম্পর্ক।"

সেদিন অনিমা কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। সে সত্যি ভাবতে পারেনি যে, উপরওয়ালার ব্যক্তিগত খুসী-অখুসীর উপর নির্ভর করে চাকরির ভাল-মন্দ! কাচের চুড়ির মত ঠুনকো সে জিনিষ! একটুখানি আঘাত লাগতে না লাগতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে! সেক্রেটারীকে কি ভাবে অপমান করা হলো, অনিমা তা আজও বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে।

স্কুলের একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং। কয়েকটি জরুরী বিষয়ের আলোচনার জন্যই সদস্যদের আহ্বান করা হয়েছে। অন্যান্য বারের মত এবারও শিক্ষয়িত্রীরা যোগ দিয়েছেন মিটিং-এ।

স্কুল সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আলোচনার পর হঠাৎ একজন সদস্য মন্তব্য করলেন যে, অনিমা চৌধুরী আশানুরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারছেন না। অস্থায়ী ভাবে তাঁকে এসিসটেণ্ট হেড-মিস্ট্রেসের পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ চালাতে পারেননি।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত এই মন্তব্যে অনিমা যেন আকাশ থেকে পড়লো। সে ভাবতে পারে না, কি অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। নিজেকে সংযত করে সম্ভ্রমে প্রশ্ন করে—"সঠিক অভিযোগটা জানতে পারি কি? কিসে কর্তৃপক্ষের এ ধারণা হলো—"

তার কথা শেষ না হতেই সেক্রেটারী সুখেন্দু রায় গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন—"আপনি আগের মত যত্ন নিয়ে পড়ান না।"

অনিমা স্তব্ধ হয়ে যায়: "আগের মত যত্ন নিয়ে পড়াই না! এ অভিযোগ কে করেছে?"—আপন মনে বিড়-বিড় করে বলে।

পাশের মেম্বারটি বিদ্রূপ করে ওঠেন—"নিজের ত্রুটি কে আর দেখতে পায় বলুন। তা ছাড়া—"

অনিমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। প্রকাশ্য সভায় এ ভাবে অপদস্থ করায় সে প্রথমটা সংকুচিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এবার পরিষ্কার গলায় জবাব দেয়—"এর চেয়ে ভাল পড়ান আমার দ্বারা হবে না।"

অনিমার কথায় সুখেন্দু রায়ের চোখে যেন ধক্ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সদস্যরা পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করেন।

কিছুক্ষণ পর সেক্রেটারী একটা ঢোঁক গিলে বলেন—"কি যে বলেন! আপনার যোগ্যতা তো আমি জানি। একটু চেষ্টা করলে আপনি যা পারবেন, অন্যের দ্বারা তা হবে না।"—সুখেন্দু রায় যেন হঠাৎ নরম হয়ে যান।

অনিমা কোন জবাব দেয় না। চাকরিটা হারালে খুব অসুবিধায় পড়তে হবে একথা অনিমা জানে, কিন্তু এদের এই আচরণও তো তাই বলে নিঃশব্দে মেনে নেওয়া যায় না।

অন্য একজন মেম্বার মধ্যস্থতা করে বললেন—"দেখুন অনিমা দেবী, সেক্রেটারীর কানে যখন কথাটা পৌঁছেছে তখন একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যাই হোক, আপনাকে অনুরোধ করবো যে, ভবিষ্যতে যাতে এরকম রিপোর্ট আর না আসে, সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন; নইলে—"

কথাটা শেষ হতে না হতেই অনিমা উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—"চাকরি যখন করি তখন সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছুই সইতে হবে জানি।"

"তার মানে?"—সেক্রেটারী রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করেন।

"মানে? আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন।" দ্বিতীয় কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখে অনিমা হন্-হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রেয় ও প্রেয়

শ্রীমতী সুষমা দেবী

পাহাড়ের গায়ে একটু সমতল জায়গা। সেখানে ছোট ভাঁজ-করা টুলের উপর বসে আশীষ সামনে-রাখা হাল্কা ফ্রেমের উপর লাগান ক্যানভাসের উপর তুলি দিয়ে একমনে ছবি আঁকছে। পাহাড়ের গা'টি নানা রকম ফার্ন ও লতায় ঢাকা। বিলাতী মরশুমী ফুলের মত সুদৃশ্য বনফুল তারই মধ্যে এখানে-সেখানে ফুটে আছে। পাহাড়ের উপর থেকে সরু লাল রাস্তা এঁকে-বেঁকে নীচে নেমে গেছে। পাহাড়ী ঝরণার অবিরাম মৃদু মর্মর ধ্বনি আশীষের কানে আসছে। নীচের দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না,

চায়ের সঙ্গে
চমৎকার!
KOLAY
THIN
ARROWROOT
BISCUIT
এরই মধ্যে
জনপ্রিয়তা
লাভ করেছে
কোলে
বিস্কুট
KOLAY
Kb
BISCUITS
বৈশিষ্ট্যের প্রতীক
কোলে বিস্কুট কোম্পানী লিঃ
৩৬, ষ্ট্রাণ্ড রোড্ – কলিকাতা-১
K/O.P/B.1
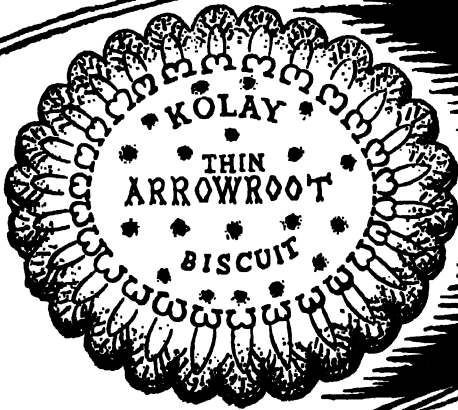
কুয়াশায় সব ঢেকে গেছে। তারই ভিতর থেকে ঢেউ খেলান সবুজ মখমলের মত চা-বাগানগুলি এখানে-ওখানে উঁকি মারছে।

আশীষ একমনে এঁকে চলেছে, অন্য কোনও দিকে চাইবার তার অবসর নেই। ছোট বেলা থেকেই তার ছবি আঁকার সখ। মাত্র ক'দিন হ'ল সে বাবা-মার সঙ্গে দার্জিলিঙে এসেছে। তার বাবা নতুন বাড়ী করেছেন সেখানে। আশীষ আগের রাত্রেই ঠিক ক'রে রেখেছিল সে ভোর থাকতে উঠে মোটর-বাইক নিয়ে মাইল পনেরো দূরে গিয়ে পাহাড়ের দৃশ্য আঁকবে। এই জায়গাটাই সে পছন্দ করেছে। তার ইচ্ছা ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি আঁকবে, কিন্তু কুয়াশার জন্যে তা হ'ল না।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। মাঝে মাঝে কুয়াশা এসে সামনের সমস্ত দৃশ্য ঢেকে দিচ্ছে। আশীষের গা-মাথা কুয়াশার জলে ভিজে গিয়ে শীত ধরিয়ে দিচ্ছে। তবুও সে এঁকে চলেছে।...হঠাৎ হাতের তুলি পায়ের কাছে পাথরের উপর রেখে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। অল্প দূরে তার মোটর-বাইকটা দাঁড় করান ছিল। সেখানে গিয়ে বাইকের পিছনে ক্যারিয়ারে বাঁধা টিফিন বাক্স খুলে সে দেখল সেখানে চায়ের ফ্লাস্ক বা স্যাণ্ডউইচের কৌটা নেই, বাক্সটি সম্পূর্ণ খালি। তার বেয়ারা নিশ্চয়ই ভুল ক'রে এই কাণ্ডটি করেছে যদিও সে তাকে বিশেষ ক'রে ব'লে রেখেছিল খাবার ঠিক ক'রে ক্যারিয়ারের বাক্সে ভ'রে দিতে।

ঘড়িতে বেলা দেড়টা বেজে গেছে। তৃষ্ণায় আশীষের গলা শুকিয়ে উঠেছে। নিরুপায় হ'য়ে ঝরণার জলই খানিক খেয়ে নেবে ব'লে ঝরণাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে দেখল যে তাও সম্ভব নয়। পাহাড়ের মাঝখানে বিরাট ফাটল। তারই অপর পাশে পাহাড়ের গা ব'য়ে সহস্র ধারায় জল পড়ছে। সে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখল, তার পর কি ভেবে রঙ, তুলি, মোটর-বাইক, সব ফেলে রেখে পাহাড়ের সরু হাঁটা পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করল। অল্প দূর যাবার পরেই সে দেখতে পেল চারদিকে ফুল বাগানের মাঝখানে লাল রঙের একটি ছোট কাঠের বাংলো, তার পিছন দিকে উঁচু-নীচু পাথুরে জমিতে বাঁধাকপির ক্ষেত, তাতে অসংখ্য কপি হয়েছে। বাংলোর গেটের সামনে আশীষ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার পর একটু ইতস্তত ক'রে গেট খুলে সে বাগানের মধ্যে ঢুকতেই একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠল। বাংলোর সামনের ঘেরা-বারান্দার এক পাশে কুকুরটা বাঁধা আছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আঠারো-উনিশ বছরের একটি গৌরাঙ্গী তরুণী ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কুকুরটার দিকে চেয়ে বলল—"কি হয়েছে, পমি?" তার পর অপরিচিত আগন্তুককে দেখে বেশ সপ্রতিভ ভাবে পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান? কোনও দরকার আছে?"

আশীষ তরুণীটির দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়েছিল। অপরূপ তার সৌন্দর্য। গায়ের রঙ দেখে বাঙালী ব'লে মনে হয় না। সাধারণ শাড়ীর উপর একটি লাল আলোয়ান জড়িয়ে আছে, তাতেই কি সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন একটি সদ্য-ফোটা পদ্ম ফুল! নীলাভ চোখ দুটিতে ইন্দীবরের স্নিগ্ধ নীল জ্যোতি। মুখে একটু স্মিত হাসির ভাব।

তরুণীর সপ্রতিভ সম্ভাষণে আশীষ একটু চমকে উঠল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ দুটি নীচু ক'রে ঈষৎ হেসে সে উত্তর দিল—"আমি বাঙালী, তাই বাঙলাতেই বলছি। আশা করি কিছু মনে করবেন না। বাড়ীতে কি অপর কেউ আছেন?"

তরুণী বাঙলাতেই উত্তর দিল—"এ সময়ে ত কেউ থাকেন না। তবে একটু পরেই কাকাবাবু ফিরবেন। অপর পুরুষ মানুষ ও বাড়ীতে কেউ নেই। আপনার যদি কোনও দরকার থাকে, আমাকে বলতে পারেন। তিনি বাড়ী ফিরলে তাঁকে জানিয়ে দোব।"

লজ্জিত ভাবে আশীষ বললে—"বিশেষ ক'রে কারও সঙ্গে দরকার আমার কিছু নেই। আমার নিজের দরকারেই আপনাদের শরণ নিতে হয়েছে। জানি না কি মনে করবেন।...আমি বড় ক্ষুধার্ত, আর তার চেয়েও বেশী তৃষ্ণার্ত। কাছাকাছি কোনও হোটেল বা খাবারের দোকান না দেখতে পেয়ে আপনাদের দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছি।"

আশীষের চেহারা ও সাজ-পোষাক দেখে তরুণী বাঙলোর সামনের দরজাটি ভাল ক'রে খুলে দিয়ে তাকে আমন্ত্রণ করল—"আসুন ঘরের ভেতরে। আপনি এত বেলা পর্যন্ত অভুক্ত! আমাদের খাওয়া-দাওয়া আগেই হ'য়ে গেলেও ঘরে সামান্য যা আছে, তাই খাবেন। একটু বসুন, আমি মাকে ডেকে আনি।"

কিছু পরেই মেয়েটি একটি প্রৌঢ়া শ্যামাঙ্গী মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। তাঁকে দেখে আশীষ দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করল। মহিলাটি বললেন—"বাবা, এত বেলা অবধি আপনার খাওয়া হয়নি জেনে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি। এখানে হোটেল, বাজার পাবেন কোথায়? লোকালয়ই নেই বললে চলে। কেবল আমরা আছি আর কিছু দূরে একটি গির্জা আছে। তারই আশে-পাশে কয়েক ঘর মিশনরী আর পাহাড়ীদের বাস।" তার পর মেয়েটিকে বললেন—"যাও ত নীলা, চা তৈরি ক'রে আন, আর বিকালের জন্যে যা জলখাবার করা আছে, তাও নিয়ে এস। দেরি কোরো না যেন।" তিনি একটি পশমের সোয়েটার বুনছিলেন। হাতের কাঁটা ও পশম পাশের টেবলের উপর রেখে একটা মোড়া টেনে নিয়ে আশীষের পাশে বসলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন—"এদিকে বুঝি নতুন এসেছেন? পথ ভুলে যাননি ত?"

লজ্জিত হ'য়ে আশীষ বলল—"আজ্ঞে না।" তার পর সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলল—"এই অসময়ে এসে আপনাদের বিব্রত করার জন্যে আমি খুবই লজ্জিত। প্রথমে ভেবেছিলাম—আসবই না, সোজা বাড়ী ফিরে যাব। কিন্তু ছবিটি এখনও অনেকখানি বাকী আছে। আর ভোর থেকে বাইরে খোলা জায়গায় থাকাতে এত গলা শুকিয়ে গেছে যে, শেষ পর্যন্ত আপনাদের শরণ না নিয়ে পারলাম না।"

মহিলাটি ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—"সে কি কথা! আমরা সাধারণ গৃহস্থ। আপনাদের মত বিশিষ্ট অতিথিদের যোগ্য আদর-আপ্যায়ন করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবুও অভুক্ত অতিথির সেবার সুযোগ পেলে আমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি।...তা ছাড়া আপনি বাঙালী। আমরা এখানে বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না বললেই চলে। বিদেশে বার মাস প'ড়ে থাকি। কোনও বাঙালী দেখতে পেলে আমাদের এত ভাল লাগে যে কি বলব? দেখুন না, সেদিন ক'জন বাঙালী টুরিষ্ট এদিকে বেড়াতে এসে মোটর উল্টে গিয়ে কি ভীষণ এ্যাক্সিডেণ্ট হ'ল। নীলা ত খবর পেয়ে

...র 'ফাষ্ট-এডে'র বাক্স নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটল। এদিকে স্থানীয় পাহাড়ীরা কম্বল পেতে তাতে শুইয়ে আহত লোকগুলিকে একটির ...র একটি ক'রে আমাদের এখানে নিয়ে এল। সেদিন যে কি ক'রে ...ক করেছি, মনে করতেই পারি না! আমি আবার ওসব কাজ ...শেষ পারিও না। এ সব বিষয়ে নীলা খুব করিতকর্মা, আর ওর ...কাটিও কম ন'ন। তিনি অবশ্য ডাক্তার মানুষ—কিন্তু তবু বয়স ...য়েছে ত!...এই যে নীলা, খুব শীগগির চা ক'রে এনেছ ত?

"জল ত দিন-রাতই আগুনে চড়ান আছে, কাজেই চা করতে ...রী বা হবে কেন?" তার পর তিনি নীলার হাত থেকে খাবারের ...টা নিয়ে আশীষের সামনে নামিয়ে রাখলেন ও চা তৈরী করতে ...গলেন।

* * * *

আশীষ সেই আগেকার জায়গাতেই ব'সে ছবি আঁকছে। আজ ...কাশ পরিষ্কার নীল। উত্তর দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রভাত-সূর্যের ...লো প'ড়ে তার তুষারকিরীট গলিত কাঞ্চনেরই মত জলছে। ...ন মহান্, এমন উদার দৃশ্য বিশ্বভুবনে বিরল! চারিদিকের ...স্তব্ধতা ভেদ ক'রে গির্জার ঘণ্টা মধুর-গম্ভীর স্বরে মাঝে মাঝে বেজে ...ঠছে। আশীষ একমনে এঁকে চলেছে। বেলা বাড়তে বাড়তে ...মে দুপুর গড়িয়ে পড়ল। স্যাণ্ডউইচের কৌটা ও চায়ের ফ্লাস্ক ...মন ছিল তেমনই প'ড়ে রইল। আজ এ ছবিটা তাকে শেষ ...রতেই হবে।

"আপনি ত ভারি সুন্দর ছবি আঁকেন! ছবি আঁকেন জানতাম, ...কিন্তু এত চমৎকার যে আঁকেন, তা ধারণা করতে পারিনি।"

আশীষ চম্‌কে উঠতে হাতের তুলিটা ক্যানভাসের উপর একটু ...'ড়ে গেল। পিছন ফিরে সেদিনকার সেই তরুণীটিকে দেখে সে ...ত তুলে নমস্কার করল, কিন্তু তার কথার উত্তর না দিয়ে নিজেই ...ক জিজ্ঞাসা করল—"আপনি এদিকে কোথায় এসেছিলেন?"

হাতের এক গোছা মোটা মোটা বই দেখিয়ে নীলা উত্তর দিল—...র্জাতে মিশনারীদের কাছে পড়তে গিয়েছিলাম। এই পথটায় ...কটু 'শর্ট-কাট' হয়, সেই জন্যে প্রায়ই এই দিক দিয়ে ফিরি।... ...পনি তাহ'লে রোজই এখানে আসেন?"

মৃদু হেসে একটি ছোট্ট তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে আশীষ ...ল—"হ্যাঁ, ছবিটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমায় রোজই এখানে ...সতে হচ্ছে। তবে আশা করছি, আজই এটা শেষ হ'য়ে যাবে।" ...র পর হঠাৎ টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে লজ্জিত স্বরে বলল—"মাফ ...রবেন, আপনি যে দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা আমার মনেই হয়নি। ...সুন, টুলটায় বসুন, আমি এই পাথরের ঢিবিটার ওপর বসছি।"

নীলা বসবার পর আশীষ তার খাবার বার করতে বসল। ...শ্চর্য হ'য়ে নীলা জিজ্ঞাসা করল—"এত বেলা হ'য়ে গেছে, এখনও ...পনার খাওয়া হয়নি?"

আশীষ উত্তর দিল—"খাবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি যদি না এমন ক'রে এসে দাঁড়াতেন, তাহ'লে খুব সম্ভব ...খনও মনে পড়ত না, মিস্ চক্রবর্তী!" তার পর স্যাণ্ডউইচের ...ৌটার ঢাকনাতে খান কয়েক স্যাণ্ডউইচ তুলে নীলার দিকে এগিয়ে ...রে বলল—"নিন, আপনিও খান।"

লম্বা টানা টানা নীল চোখ দুটি তুলে আশীষের দিকে চেয়ে নীলা বলল—"সে কি? আপনার খাবারের ওপর আমি ভাগ বসাব কেন? ছি! তা কি হয়? আপনি খান। আমি বাড়ী যাই।"

আশীষ মিনতি ক'রে বলল—"মিস্ চক্রবর্তী, আপনি যদি না খান, তাহ'লে আমারও খাওয়া হবে না।" তার পর মৃদু হেসে বলল—"অতিথিকে না খাইয়ে কি মানুষে খায়? সেটা ত আমাদের চেয়ে আপনারাই বেশী জানেন।"

নীলা হেসে একখানা স্যাণ্ডউইচ তুলে নিয়ে বলল—"অতিথি সংকারে যখন আপনার এতই আগ্রহ, এই নিন, খাচ্ছি।"

প্রায়-সমাপ্ত ছবিখানির দিকে অপলক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নীলা ব'লে উঠল—"সত্যি, এ রকম ছবি দেখলে পেণ্টিং শিখতে ইচ্ছে করে। আমি অবশ্য আর্টের কিছুই জানি না, আর যে জায়গায় আমরা থাকি, সেখানে থেকে কোনও কিছুই শেখবার উপায় নেই।...কাকাবাবুর যেমন কাণ্ড! চিরকাল সহরের বড় হাসপাতালে চাকরি করে শেষকালে রিটায়ার ক'রে এই জংলী জায়গায় এলেন বাস করতে! কেউ কিছু বললে আবার বলেন—'না রে, এখানে চাষবাসের উন্নতি করেছি। তা ছাড়া স্থানীয় গরীব লোকেদের চিকিৎসা করি, ওদেরবাদের দেখবার আর কেউ নেই। ওদের ছেড়ে আমি কি ক'রে যাই?'...দেখুন না, পড়াশোনার অবস্থাও প্রায় সেই রকমই। ভাগ্যে মিশনের 'নানে'রা আমায় ভালবাসেন, তাঁদের দয়াতেই যেটুকু শিক্ষাদীক্ষা হবার হয়েছে।"

তার মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে আশীষ একদৃষ্টে চেয়ে আছে দেখে ঈষৎ লজ্জিত হ'য়ে নীলা জিজ্ঞাসা করল—"আপনি ওরকম ক'রে চেয়ে কি দেখছেন?"

হো-হো ক'রে হেসে উঠে আশীষ বলল—"তাহ'লে আগে বলুন, মিস্ চক্রবর্তী, আমার উত্তর শুনে রাগ করবেন না?"

নীলা সহজ ভাবে উত্তর দিল—"রাগ করব কেন? মনে করবার মত যদি কিছু না থাকে, তাহ'লে নিশ্চয়ই মনে করব না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে আশীষ বলল—"জানেন, আমি আপনার মধ্যে আমার মানসলোকের আদর্শ মূর্তিকে দেখতে পাচ্ছি? আমার মনের পর্দার ওপর চোখ দিয়ে সেই মূর্তি এঁকে চলেছি।...আচ্ছা মিস্ চক্রবর্তী, আমি যদি আপনার ছবি আঁকি, তাহ'লে কি আপনি আপত্তি করবেন? আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সুন্দর জিনিষ কিছু চোখে পড়লেই শিল্পী চায় তার চোখের দেখা সেই জিনিষটিকে তুলির টান দিয়ে ক্যানভাসের ওপর ফুটিয়ে তুলতে। এটা হচ্ছে শিল্পীর মনের সহজ ধর্ম।"

নীলা হেসে বলল—"আপনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড়, ঝরণা, আকাশ, মেঘ, গাছপালা—এই সব আঁকছেন। এর ভেতরে আবার আমার ছবি আঁকবেন কেন? আপনার মাথাটা দেখছি একটু খারাপ আছে!" তার পর আশীষের বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে আবার বলল—"আগে আমাকে তুলি ধরতে শিখিয়ে দিন, তার পর না হয় আপনার প্রস্তাবটা বিবেচনা ক'রে দেখা যাবে।"

আশীষ সাগ্রহে বলল—"সত্যি আপনি আঁকা শিখতে চান? এ ত খুব ভাল কথা। আমার যেটুকু সাধ্য আপনাকে শেখাতে চেষ্টা করব, মিস্ চক্রবর্তী! কিন্তু আমার সময় বড় অল্প, হয়ত শীগগিরই এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। তাহ'লেও যে ক'টা দিন আছি, সানন্দে

আপনাকে সাহায্য করব। তাহ'লে হয়ত ভবিষ্যতে এই অভাগার কথা কদাচিৎ আপনার মনে পড়তেও পারে, কি বলুন ?"

নীলা সে কথার উত্তর না দিয়ে মাটি থেকে তার বইগুলি কুড়িয়ে নিল। তার পর আশীষকে নমস্কার ক'রে বলল, "আজ আসি, মিষ্টার মুখার্জি! কাল এই সময়ে এসে হাতে-খড়ি করা যাবে। আজ আর বসতে পারছি না, মা ভাববেন। অনেক দেরী হ'য়ে গেছে।" সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পাহাড়ে পথ ধ'রে নীচের দিকে নামতে লাগল।

ছবি আঁকা, বাড়ী ফেরা—সব ভুলে গিয়ে আশীষ শিল্পীর মন ও শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে নীলার অপার্থিব সৌন্দর্যের ধ্যানে স্থির হ'য়ে ব'সে রইল।

নীলা পেণ্ট করছে। পেন্সিলে টানা রেখার উপর কাঁচা হাতে সে তুলি বুলাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সব লেপে-মুছে একশা হ'য়ে যাচ্ছে। নীলার অবস্থা দেখে আশীষ হো-হো ক'রে হেসে উঠল। দাঁত দিয়ে লাল পাতলা ঠোঁট দুটি চেপে রাগের ভাণ ক'রে নীলা জিজ্ঞাসা করল—"অত হাসবার কি আছে? অঙ্কন-বিদ্যায় কি আপনি প্রথম দিনেই একবারে বিশারদ হ'য়ে গেছলেন ?"

আশীষ হেসেই উত্তর দিল—"না, তা হইনি।"

রঙের উপর তুলি ঘসতে ঘসতে নীলা বলল—"আগে আমাকে এই টানটা শিখিয়ে দিন দেখি। ঐ গাছের ডালটা কিছুতেই ঠিক ক'রে আঁকতে পারছি না।"

তুলি-শুদ্ধ নীলার হাতটি ধ'রে কাগজের উপর টান দিতে দিতে আশীষ বলল—"এই রকম ক'রে করুন দেখি, তাহ'লে ঠিক হবে।...নাঃ, আপনি কোনও কর্মের নন, না হ'লে সমানে চেষ্টা করছেন, অথচ এখনও পারছেন না! তার মানে হচ্ছে আসলে আপনার শেখবার ইচ্ছেই নেই!"

রঙ, তুলি সমস্ত বাক্সে ভ'রে বাক্সটা আশীষের দিকে এগিয়ে দিয়ে নীলা বলল—"না, আমি আঁকা শিখব না। ফিরিয়ে নিন আপনার সব জিনিষ, আমার কোন দরকার নেই।"

আশীষ হেসে বলল—"আমাকে কি কালীঘাটের কুকুর করবেন না কি? দিয়ে আবার কি কেউ ফিরিয়ে নেয়?...যাক্, এইবার একটু হাসুন দেখি, অত রাগ করে না! তার পর ঐ পাথরটার ওপর গিয়ে বসুন। আপনার ছবিটাতে রঙ দেওয়া এখনও অনেক বাকী আছে। আজ সেটা শেষ করি।"

"না, আমার ছবি আঁকতে হবে না। আমি চললাম"—বলেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে নীলা রাস্তা ধ'রে এগিয়ে গেল।

আশীষ প্রথমে ঠিক করতে পারল না কি করবে; কিন্তু পরমুহূর্তেই ছুটে নীলার কাছে গিয়ে মিনতি ক'রে অনুরোধ করল—"লক্ষ্মীটি, মিস্ চক্রবর্তী, ফিরুন! আমি যদি অন্যায় ক'রে থাকি, আমায় ক্ষমা করুন।"

উচ্ছ্বসিত হাসিতে লুটিয়ে প'ড়ে নীলা বলল—"আচ্ছা, চলুন। কিন্তু ছবি যদি খারাপ হয়, আমার দোষ নেই।"

আশীষ কৃতার্থ হ'য়ে নীলাকে সঙ্গে ক'রে ফিরল। নীলা পাথরটার উপর যথানিয়মে বসল; আশীষ তার ছবি আঁকতে লাগল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তুলি নামিয়ে রেখে নীলার কাছে গিয়ে বলল—"আমার আজ কিছু ভাল লাগছে না।"

বড় বড় চোখ ক'রে তার দিকে চেয়ে নীলা জিজ্ঞাসা করল—"সে আবার কি? জবরদস্তি ক'রে আমাকে টেনে এনে ছবি আঁকতে বসালেন, এখন আবার বলছেন—'ভাল লাগছে না!' শিল্পীরা শুনেছি এই রকমই খামখেয়ালী হন।"

ম্লান হাসি হেসে আশীষ বলল—"হয়ত তাই হবে। কি যে আমার হয়েছে, নিজেই ভেবে পাই না। বলতে পারেন, মিস্ চক্রবর্তী, কেন আমার এ অবস্থা হ'ল? সারা জীবন ধ'রে কেবল আমি আর্টেরই সাধনা ক'রে এসেছি। আমার কাছে এর চেয়ে প্রিয় কিছুই ছিল না।...কিন্তু আজ আমার যেন সব কি রকম গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। সমস্ত অন্তরটা আমার যেন শূন্য হ'য়ে গেছে।" তার পর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জলভরা চোখে নীলার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার হা'ত দুটি নিজের হাতে নিয়ে আশীষ বলল—"আমার সারা অন্তরের ভালবাসার অর্ঘ্য নিয়ে আপনার কাছে দীন ভিখারীর মত আজ আমি দাঁড়িয়েছি।...কোন্ শুভ কি অশুভ মুহূর্তে একটা ক্ষণিক খেয়ালের বশে আমি এখানে এসেছিলাম। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, প্রতিদিন তিল তিল ক'রে রচনা করা আমার শিল্পি-মনের আদর্শ মূর্তির দর্শন এইখানে এমন ভাবে পেয়ে যাব!"

নীলার আয়ত নীলাভ চোখ দু'টি তখন জলে ভ'রে এসেছে। আশীষের হাতের মধ্যে তার নরম হাত দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠছে। তার হাত দুটি আরও জোর ক'রে চেপে ধ'রে আশীষ আকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"নীলা, আমার এই সোনার স্বপন কি সত্যিই সফল হবে? সত্যিই কি আমার অন্ধকার জীবনে আলো হ'য়ে তুমি দাঁড়াবে, তুমি আমার হবে?...তোমার চোখ দুটি বলছে আমার এ আশা দুরাশা নয়। তবুও তুমি একটি বার মুখ ফুটে বল, নীলা, বল যে, আমার আকুল নিবেদন বিফল হবে না!"

চোখ দুটি হাতের উলটা পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে নীলা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি কি বলব, আশীষ? মেয়েরা কি সব কথা বলতে পারে? তবে তুমি এত মিনতি ক'রে জানতে চাইছ ব'লেই বলছি যে, তোমার ভালবাসা একতরফা নয়। আমি জংলী দেশে মানুষ হয়েছি, সভ্যতার কৃত্রিমতা কেবল বইয়েতেই পড়েছি। ঘরের গণ্ডীর বাইরে কখনও যাইনি, কারও সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগও পাইনি। তোমায় প্রথম বার দেখেই আমার কি রকম মনে হয়েছিল—যা অপর কাউকে দেখে আমার কখনও মনে হয়নি!...আমাদের দু'জনের মিলন বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রেত, না হ'লে এত জায়গা থাকতে তুমিই বা হঠাৎ এখানে এলে কেন, আর যদি এলে তবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে আমাদেরই দরজায় এসে দাঁড়ালে কেন?"

আশীষ ভগবানের উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণতি জানিয়ে নীলাকে বলল—"আচ্ছা, এখনই যদি গিয়ে তোমার মাকে আর কাকাবাবুকে জানাই, তাহ'লে কি কিছু দোষের হবে? আমি তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা শেষ ক'রে ফেলতে চাই, কারণ আসছে সপ্তাহেই আমায় কলকাতা ফিরতে হবে।"

নীলা বলল—"এতে আবার দোষের কি আছে? তাঁদের ত জানাতেই হবে। কাজেই যত আগে হয়, ততই ভাল। তাড়াতাড়ি চল, ওসব জিনিষপত্র আমি এসে গুছিয়ে তুলে নিয়ে যাব।" তখন তারা দু'জনে একসঙ্গে বাঙলোর দিকে অগ্রসর হ'ল।

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

বাড়ীতে ঢুকতেই সামনে রেবতীবাবুকে দেখে নীলা ব'লে উঠল—"আজ যে এরই মধ্যে ফিরে এলেন, কাকাবাবু?"

আশীষের দিকে চেয়ে নমস্কার ক'রে রেবতীবাবু বললেন—"আজ কপিগুলো চালান দিয়েই ফিরলাম। তা ছাড়া গির্জাতে একবার যেতে হবে, এক জনের হঠাৎ খুব অসুখ হয়েছে। আসুন, মিষ্টার মুখার্জি, ভেতরে আসুন। বাইরের ঐ কন্‌কনে শীতে কি ক'রে যে আপনি সারা দিন এক জায়গায় ব'সে ছবি আঁকেন, আমি ভাবতে পারি না। মনে হ'লেই যেন শীত ধ'রে যায়। আপনাদের অবশ্য বয়স কম, রক্তের তেজ আছে। কিন্তু তবুও ত ঠাণ্ডাটা ভীষণ প'ড়েছে।···নীলা, মা, আজ কিন্তু আমাদের কফি খাওয়াতে হবে, চা খাব না। আর কাঞ্চাকে বল, ঘরে একটু আগুন করুক।"

কফি খেতে খেতে আশীষ রেবতীবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে বলল—"দেখুন, আজ আমি আপনাদের কাছে একটা কথা জানাতে ও আপনাদের অনুমতি নিতে এসেছি। আশা করি, বিমুখ করবেন না।"

রেবতী বাবু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—"কি কথা, বলুন না, মিষ্টার মুখার্জি? আমাদের মত লোকের কাছে আবার অনুমতি চাইবেন কি?"

একটু চুপ ক'রে থেকে আশীষ বলল—"আমি আপনাদের মেয়ের পাণিপ্রার্থী। নীলার এতে অমত নেই। আশা করি, অযোগ্য বোধে আপনারা আমাকে নিরাশ করবেন না।··· প্রস্তাবটা একটু তাড়াতাড়িই করতে হ'ল—কারণ আসছে সপ্তাহেই আমায় কলকাতা ফিরতে হবে, সেখান থেকে শীগগির একটা কাজে আমাকে ইউরোপ যেতে হবে।"

রেবতীবাবু ও তাঁর স্ত্রী আশীষের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগলেন, কোনও কথা কইলেন না। তাই দেখে আশীষ প্রথমটা একটু মনমরা হ'য়ে গেল। তার পর জোর ক'রে নিজেকে ঈষৎ শক্ত ক'রে জিজ্ঞাসা করল—"আমি কি অতিরিক্ত বেশী দুরাশা করেছি, ডক্টর চক্রবর্ত্তী?"

গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রেবতীবাবু বললেন, "মোটেই নয়, মিষ্টার মুখার্জি! আপনার সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই খুব উচ্চ ধারণা। আপনার মত পাত্র পাব কোথায়? কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে। আপনি যখন নীলাকে বিয়ে করতে চান, তখন সমস্ত কথা আপনার কাছে খুলে বলতেই হবে। নীলা যখন খুব ছোট, তখন থেকেই আমরা ঠিক ক'রে রেখেছি যে তার সঙ্গে বিয়ে করতে কেউ চাইলে আগে আমরা নীলার ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত ইতিহাস তাঁকে জানিয়ে দোব। তার পরেও যদি তিনি তাকে বিয়ে করতে চান, তবেই নীলাকে তাঁর হাতে তুলে দোব। তার জীবনের কয়েকটা ছোট্ট কথা আছে যা সে নিজেও আজ পর্য্যন্ত জানে না।" তার পর একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন—"নীলার জীবনের ইতিহাস আজ তার সামনেই বলব, যাতে সেও তার নিজের পথ চিনে নিতে পারবে।"

"নীলা, নীলা, শুনে যাও"—ব'লে রেবতীবাবু তাকে ডাকলেন। সে এসে তাঁর পাশেই মোড়াতে বসল। তখন আদর ক'রে তার পিঠে হাত রেখে রেবতীবাবু বললেন—"মা নীলা, আজ যে কথাগুলো বলব তা শুনে তুমি ভয় পেও না বা মন খারাপ কোরো না। এতদিন এগুলো বলবার দরকার হয়নি, তাই বলিনি। কিন্তু আজ মিষ্টার মুখার্জি তোমার পাণি-প্রার্থনা ক'রে আমাদের অনুমতি চেয়েছেন। তাই তোমার জীবনের ইতিহাস আজ আমাদের প্রকাশ করতেই হবে।"

নীলা ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গিয়ে রেবতীবাবুর স্ত্রীর দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"কি কথা, মা? এমন কি কথা আমার সম্বন্ধে আছে যা' আমার কাছ থেকে পর্য্যন্ত এতদিন তোমাদের লুকিয়ে রাখতে হয়েছে?" রেবতী বাবুর স্ত্রী উঠে এসে নীলাকে জড়িয়ে ধ'রে গাঢ় স্বরে বললেন—"ইচ্ছে ক'রে বলিনি, নীলা! তুমি আমার ভয় পাবার মেয়ে নও!" তার পর নীলার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে শক্ত ক'রে ধ'রে তিনি ব'সে রইলেন।

রেবতীবাবু আর একবার গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন—"আমি যখন চাকরি থেকে রিটায়ার ক'রে প্রথম এখানে আসি, সে আজ বহুদিন আগেকার কথা। একদিন এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটি রোগীর খুব বেশী অসুখ শুনে তাকে দেখতে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি পাহাড়ের ওপর ছোট্ট একটি এক-কুঠরী কাঠের বাড়ীর মধ্যে একটি বাঙালীর মেয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় প'ড়ে আছেন। একজন বৃদ্ধ পাদরি তাঁর পাশে ব'সে বাইবেল প'ড়ে শোনাচ্ছেন। তাঁদেরই অদূরে পদ্মফুলের মত একটি সদ্যোজাত শিশু কম্বলের ওপর প'ড়ে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই পাদরি হাত দিয়ে ইশারা ক'রে আমাকে কথা কইতে বারণ করলেন। কোনও কথা না ব'লে রোগিণীর কাছে গিয়ে দেখি তাঁর তখন শেষ অবস্থা। কি করব ভেবে না পেয়ে আমি সেইখানেই স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ফেলে মেয়েটির দেহ নিস্পন্দ হ'য়ে গেল। বাইবেল থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প'ড়ে সেটি বন্ধ ক'রে মেয়েটির বুকের ওপর সন্তর্পণে রেখে দিয়ে পাদরি কিছুক্ষণ চোখ বুজে নীরবে প্রার্থনা করলেন। তার পর চোখ চেয়ে বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—'ডাক্তার, সব শেষ হ'য়ে গেল! হঠাৎ এ রকম হ'বে, বুঝতে পারিনি।···আমি ত এখানে থাকি না, গির্জাতে থাকি। খবর পাওয়া মাত্র এসেও এই অবস্থাই দেখেছি। সেই মুহূর্তেই আপনাকেও খবর পাঠিয়েছি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়েটি কে, আর ঐ অবস্থাতে এখানে একলাই বা ছিলেন কেন?' খানিক ইতস্তত ক'রে পাদরি উত্তর দিলেন—'এঁকে ভালবেসে আমি বিয়ে করেছিলাম। কাছে রাখতে পারতাম না ব'লে এই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।' তার পর শিশুটির দিকে চেয়ে বললেন—'দেখুন ত ডাক্তার, ও এখনও বেঁচে আছে কি না?' শিশুটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম সে জীবিত আছে। তার পর হঠাৎ আমার মাথায় কি খেয়াল এল, জিজ্ঞাসা করলাম—'এ শিশুকে নিয়ে আপনি কি করবেন?' তিনি উত্তর দিলেন—'দেখি, কোনও পাহাড়ী যদি নিতে চায় দিয়ে দোব, না হ'লে আমাদের মিশনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। আপনি এখন সবার আগে এইটিকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন।' আমার মাথায় তখন আমার সদ্য সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা স্ত্রীর কথা উদয় হ'ল। আমি ব'লে উঠলাম—

অপরকে দেবেন কেন? যদি বিলিয়ে দিতেই চান, তাহ'লে শিশুটি আমাকেই দিন না? একে আমরা নিজের সন্তানের মতই পালন করব।' তখন আমার হাত দুটি ধ'রে অবরুদ্ধ কণ্ঠে পাদরি বললেন—'তাই তবে হোক। আপনিই ওকে নিয়ে যান। ও আপনার মেয়ে ব'লেই জগতে পরিচিত হোক। ওর মা স্বর্গ থেকে আপনাদের আশীর্বাদ করবেন।...যদি কোনও দিন দরকার হয় বা ও নিজের পরিচয় জানতে চায়, তার জন্যে এই আমার একটি ফোটোগ্রাফ আর স্কটল্যাণ্ডের ঠিকানা রইল, বড় হ'লে ওকে দেবেন। আমি শীগগির দেশে চ'লে যাচ্ছি'—এই ব'লে পকেট থেকে একটি লেফাফা বা'র ক'রে আমার হাতে দিলেন। তার পর আমি শিশুটিকে নিয়ে এসে আমার স্ত্রীর কোলে তুলে দিলাম।"

নীলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মা'র কোলে মুখ লুকাল, তার পর কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"মা, তুমি কি তা হ'লে সত্যি আমার মা নও?"

তার মাথায়-পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে রেবতীবাবুর স্ত্রী বললেন—"আমিই তোর সত্যিকার মা, নীলা! সে ত কেবল তোকে পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়েই চ'লে গেছে।"

নীলা নির্বাক্ হ'য়ে সেই অবস্থায়ই তাঁর কোলে মুখ গুঁজে প'ড়ে রইল।

আশীষের দিকে চেয়ে রেবতীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"নীলার ইতিহাস শোনবার পর আপনার কি কিছু বলবার আছে, মিষ্টার মুখার্জি?"

আশীষ গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে না! আমার বক্তব্য যা ছিল, তা আগেই আপনাদের জানিয়েছি। আমি মন সম্পূর্ণ স্থির ক'রেই আপনাদের সম্মতি চাইছি।"

রেবতীবাবু একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন—"আপনার নিজের মন ত স্থির ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু আপনার বাবা-মা? তাঁদের সম্মতিটাও ত চাই। তা ছাড়া আপনি অভিজাত ব্রাহ্মণ-সন্তান, জাতির গণ্ডীর বাইরে যাবার আগে তাড়াতাড়ি না ক'রে একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখুন—যাতে শেষে না অনুতাপ করতে হয়।"

মৃদু হেসে আশীষ বলল—"আপনি খুবই ঠিক কথা বলেছেন, ডক্টর চক্রবর্তী! কিন্তু আমার বাবা-মা সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবাপন্ন, তাঁদের হৃদয়ও খুব উদার।...আর তাঁরা যদি সম্মতি নাও দেন, তাতেও বিশেষ কিছু আসে-যায় না। আমি ত নিতান্ত নাবালক নই। আমার নিজের স্বাধীন মতামত ও ব্যক্তিত্ব ব'লে একটা জিনিষ আছে। তবে হ্যাঁ, তাঁদের জানাব বৈ কি। তাঁদের মতামত জেনে কালই আপনাদের জানিয়ে দোব।" তার পর দাঁড়িয়ে উঠে নীলার দিকে চেয়ে বলল,—"আজ আর ওঁকে বিরক্ত ক'রে কাজ নেই। এদিকে সন্ধ্যাও হ'য়ে গেছে। আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি"—ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে ড্রইং-রুমে ঢুকে আশীষ দেখল তার বাবা-মা কয়েক জন মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে গল্প করছেন। তার মা বললেন—"এই যে আশীষ, এত দেরী হ'ল কেন? আবার বুঝি বেশী দূরে কোথাও গিয়েছিলে? ছবি আঁকতেই গিয়েছিলে ত? তা ক'খানা ছবি আঁকলে?...এদিকে ডিনারের সময় হ'য়ে গেছে। যাও, তাড়াতাড়ি তৈরি হ'য়ে নাও গে।"

মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আশীষ বলল—"ডিনার হ'য়ে যাক, তার পর সব ছবি তোমায় দেখাব এখন।"

আহারের পর যখন তারা আবার ড্রইং-রুমে এল, তখন সারা বাড়ী নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। আশীষের ভাই-বোনেরা শুয়ে পড়েছে। তারা সকলেই তার চেয়ে ছোট। আজকের ডিনারটা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার ছিল, বাইরের কেউ ছিলেন না। মিসেস্ মুখার্জি কফি খেতে খেতে বললেন—"কই আশীষ, তোমার ছবিগুলো দেখালে না?"

আশীষ পাশের ঘরে গিয়ে তার চামড়ার বড় পোর্টফোলিওটা নিয়ে এসে মায়ের পাশে একটা চেয়ারে বসল। কোলের উপর পোর্টফোলিও রেখে তা থেকে ছবি বার করতে সামনেই নীলার ছবিটা মিসেস্ মুখার্জির চোখে পড়ল। তিনি ব'লে উঠলেন—"বাঃ, কী চমৎকার মুখখানি! কাকে দেখে আঁকলে, আশীষ? না কি মন থেকেই এঁকেছ?"

আশীষ উত্তর দিল—"মন থেকে তা নয়, মা কিছুদিন আগে তোমায় বলেছিলাম, বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ,—একদিন সকালে বেয়ারা আমার সঙ্গে খাবার ও চায়ের ফ্লাস্ক দিতে ভুলে গিয়েছিল, অনেক বেলা অবধি না খেতে পেয়ে জলের খোঁজে এই মেয়েটিরই বাড়ীতে গিয়ে পড়েছিলাম।"

মিসেস্ মুখার্জি তখন বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে।...কি সুন্দর মেয়েটি! ছবিখানা ত এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, দেখছি।" তার পর সেটা স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন—"দেখ, কি আশ্চর্য সুন্দর! আজকাল এ রকম ত চোখে পড়ে না। কই, বাঙালীর মেয়ের এ রকম কাচের মত নীল চোখ ত বড় দেখা যায় না। আশ্চর্য ত! চুলও দেখছি খুব ঘন কালো নয়—যেন একটু সোনালি আভা রয়েছে।"

আশীষ থেমে বলল—"মা, তুমি ঠিকই ধরেছ। মেয়েটির মা বাঙালী হ'লেও ওর বাবা ছিলেন একজন স্কচ পাদরি।" তার পর নীলার জীবনের ইতিহাস সে সংক্ষেপে বলল।

মিসেস্ মুখার্জি সাগ্রহে আশীষের কথা শুনছিলেন। তাঁর স্বামী অন্যমনস্ক ভাবে একখানা সচিত্র সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। নীলার ইতিহাস ব'লে আশীষ চুপ করল। তার মা সহানুভূতির নিশ্বাস ফেলে বললেন—"আহা, বাছা রে! অমন অপূর্ব রূপ, কিন্তু কি ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিল!"

মুখখানি নামিয়ে নীচু-গলায় আশীষ তখন মাকে বলল—"মা, আমি কিন্তু ঐ মেয়েটিকেই বিয়ে করতে চাই। জানি না তোমরা কি মনে করবে, কিন্তু আশা করি, সব কথা শুনে তোমরা আপত্তি করবে না।"

তার কথা শুনে মিসেস্ মুখার্জি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে রইলেন, তার পর ব'লে উঠলেন—"তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে, আশীষ? এ রকম অদ্ভুত প্রস্তাব তুমি করলে কি ক'রে? মেয়েটি খুবই সুন্দরী, স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের হিন্দু ভদ্রসমাজে কি কেউ ঐ মেয়েকে বৌ ক'রে আনে? ও ত না হিন্দু, না খৃষ্টান। ওর কোনও জাতই নেই!"

আশীষ উঠে ফায়ার-প্লেসের সামনে গেল ও চিমটে ক'রে খান কয়েক কয়লা আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আবার নিজের আসনে এসে বসল। তার পর ধীর ভাবে মাকে বলল—"তোমরা সম্পূর্ণ

La·bonny
SNOW
উৎসব অনুষ্ঠানে
ক্যালকেমিকোর অপরিহার্য্য অঙ্গরাগ
কান্তা মনোমুগ্ধকর সুরভিসার, মনকে আমোদিত করে।
লাবণি স্নো দিনের প্রসাধনে চর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়।
লাবণি ক্রীম রাত্রে শোবার আগে ব্যবহার করলে চর্ম্ম নরম ও মসৃণ হয়।
মলয় চন্দন সাবান ব্যবহারে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও চন্দনের গন্ধে চিত্ত প্রসন্ন করে
ক্যাষ্টরল মধুর সুগন্ধি এই কেশতৈল ব্যবহারে কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে।
CASTOROL
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

আধুনিক মতাবলম্বী হ'য়ে এ কথা কি ক'রে বলছ, মা? তোমরা যদি প্রাচীন পথে সনাতন হিন্দুমতে আমাদের মানুষ করতে, তাহ'লে না হয় কথা ছিল। কিন্তু নিজেরা সারা জীবন বিলিতি ভাবে থেকে, আমাদেরও পুরো ইউরোপীয়ান ভাবে মানুষ ক'রে এ সব কথা কি তোমাদের মুখে শোভা পায়?"

মিষ্টার মুখার্জি এতক্ষণ তাদের কথাবার্তা চুপ ক'রে শুনছিলেন। এইবার মুখখানা অস্বাভাবিক রূপ গম্ভীর ক'রে তিনি ব'লে উঠলেন—"যে ভাবেই আমরা তোমাদের মানুষ ক'রে থাকি না কেন, আশীষ, তাতে কিছু আসে-যায় না। বাইরে পুরোদস্তর সাহেব হ'লেও বিয়ে, পৈতে ও অন্য সামাজিক ব্যাপারে অন্য পাঁচজন হিন্দুর মতই আমাদের চলতে হয়। হিন্দু সমাজও আমরা ত্যাগ করিনি! আমাদের ছেলে হিসেবে তোমাকেও সেইভাবেই চলতে হবে।"

আশীষ ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"বাবা, তুমি যা বলছ, বাধ্য হ'য়ে কায়গতিকে যদি আমি তা না মানতে পারি? তাহ'লে কি হবে?"

মিষ্টার মুখার্জি অনায়াসে উত্তর দিলেন—"তাহ'লে তোমাকে ত্যাগ করতেও আমরা কুণ্ঠিত হব না!" তাঁর গলার স্বরে উত্তেজনার বিন্দুমাত্রও আভাস দেখা গেল না। তিনি আবার বললেন—"তাহ'লে আমার এই বিশাল কারবারের একটি কাণাকড়িও তুমি পাবে না!"

স্বামীর রূঢ় ভাষণে মিসেস্ মুখার্জি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি মিষ্টি-গলায় আশীষকে বললেন—"যাক গে, যত সব বাজে কথা! তুমি ত শীগগিরই বিলেত চ'লে যাচ্ছ, তার আগেই যদি তুমি বিয়ে ক'রে যেতে চাও, তাহ'লে কালই আমি তার ব্যবস্থা করছি। মণিকারা ত এখানেই রয়েছে। তাকে নিয়ে তা'র বাবা-মা আজ সকালেই আমাদের এখানে এসেছিলেন।"

আশীষ উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে একটা স্থির দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ রয়েছে। সে ধীর কণ্ঠে বলল—"তা হয় না, মা! আমার মন আমি স্থির ক'রে ফেলেছি। নিতান্তই যদি তোমরা সম্মতি না দাও, তাহ'লে আর কি করব? কিন্তু আমার সঙ্কল্প পরিবর্তন করতে বোলো না, সে আমি পারব না।" এই বলে কোনও দিকে না চেয়ে সে নিজের শোবার ঘরের দিকে চ'লে গেল।

পরদিন সকালে আশীষ নীলাকে নিয়ে তাদের সেই ছবি আঁকবার জায়গাটিতে গেল। একটি সমতল পাথরের উপর দু'জনে পাশাপাশি বসল। নীলার মুখখানি এক রাত্রির মধ্যে শুকিয়ে গেছে, যেন একটি বাসি গোলাপের মত দেখাচ্ছে। অযত্নরক্ষিত চুলগুলি মুখে-চোখে এসে পড়ছে। তার বড় বড় নীলাভ শান্ত চোখ দুটি ঈষৎ লাল ও ফোলা দেখাচ্ছে। নীলার একখানি হাত কোলের উপর টেনে নিয়ে আশীষ বলল—"ছিঃ নীলা, এখনও তুমি মন খারাপ ক'রে আছ? অমন করে না, লক্ষীটি! একটিবার হাস দেখি? তুমি কি জান না, তোমার হাসি মুখ দেখলে আমি সব ভুলে যাই? তোমার ঐ বিষন্ন মুখ দেখে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।"

একটু ম্লান হাসি হেসে নীলা বলল—"কেন তুমি আমার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ, আশীষ? কিছু ভেবো না, দু'-এক দিনের মধ্যেই আমার মনের এই অশান্তিটুকু চ'লে যাবে।"

করুণ স্বরে আশীষ বলল—"নীলা, আগে কবে কি হয়েছিল না হয়েছিল ভেবে এখন আর মন খারাপ কোরো না, লক্ষীটি! কত রকমের কত ঘটনাই ত নিত্য পৃথিবীতে ঘটছে। তোমার জন্মবৃত্তান্তই বা এমন আর আশ্চর্য কি? তোমার আমার হৃদয়ের এই অকস্মাৎ মিলন, এটা কি তার চেয়েও অনেক বেশী আশ্চর্য নয়? তুমি যে আমায় ভালবাসবে এ যেন আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এ ঐশ্বর্য পাওয়ার পর জগতের আর সমস্তই যেন আমার চোখে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে গেছে। তোমার ভালবাসা পেয়ে আমার এমন হয়েছে যে, আমার বাবা আজ আমায় ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলাতেও আমার কিছু মনে হয়নি। তাঁর সে কথা শুনেও আমি আকুল হ'য়ে তোমারই কাছে ছুটে এসেছি।"

চমকে উঠে আশীষের হাত ছেড়ে দিয়ে নীলা জিজ্ঞাসা করল—"কি বললে, আশীষ? আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছ ব'লে তোমার বাবা তোমায় ত্যাগ করবেন?... আমাদের বিয়ে না হয় নাই হ'ল, তাতে এমন কি-ই বা আসবে-যাবে? আমাদের পরস্পরের ভালবাসা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!"

নীলার হাতখানি আবার টেনে নিয়ে নিজের মুখে মাথায় বুলাতে বুলাতে আশীষ বলল—"আমি ত বেশী কিছু চাইনি, নীলা। শুধু তুমি পূর্ণিমার চাঁদের মত সারা জীবন আমার হৃদয় আলো ক'রে থাক, তোমার প্রেমে আমি ধন্য হ'য়ে থাকি। সেটুকুও কি আমি আশা করতে পারি না? এই ব'লে সে নীলার মুখখানি তার দু'হাত দিয়ে তুলে ধরল। নীলা দেখল আশীষের উদ্গত অশ্রু বাধা না মেনে তার দুই গাল ব'য়ে গড়িয়ে পড়ছে। আশীষ আবার আবেগরুদ্ধ স্বরে বলল—"আমার প্রাণের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে যদি সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো ফোটালে, রাণী আমার, তবে আবার কেন নিষ্ঠুর হচ্ছ? বল, বল, তুমি আমায় ভালবাস, নীলা! একটি বার বল, রাণী, আমি শুনি।"

কান্না চেপে নীলা আশীষের গায়ে-মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—"সত্যিই আমি তোমায় ভালবাসি, আশীষ! এত ভাল আমি জীবনে কখনও কাউকে বাসিনি। তুমি আমার হৃদয় আনন্দে, আলোতে ভরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু, আশীষ, আমার নিজের সুখের জন্যে তোমাকে তোমার সব-কিছুর থেকে বঞ্চিত করতে আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে ভুলে যাও, আশীষ, আমার জন্য তোমার বাবা-মাকে ছেড়ো না।"

আশীষ দৃঢ় কণ্ঠে বলল—"না, আমি তোমার কোনও আপত্তি শুনব না। আমি ব্যবস্থা করছি যাতে এই সপ্তাহেই রেজেষ্ট্রি ক'রে আমাদের বিয়ে হ'য়ে যায়। তার পর তোমাকে নিয়ে বিলেত চ'লে যা'ব। এই স্থির রইল।" নীলা মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। হাত দিয়ে তার মুখ চাপা দিয়ে আশীষ গাঢ় স্বরে বলল—"এই জায়গাটি আমাদের পুণ্যতীর্থ, নীলা! আমি এখানে শ্বেত পাথরের ওপর লিখিয়ে রাখব—'আমাদের মিলন-তীর্থ,' আর ভবিষ্যতে মাঝে মাঝে এখানে এসে আমাদের এখনকার এই সোনার স্বপন দিয়ে ঘেরা দিনগুলি স্মরণ করব, কেমন?" খানিকক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত চুপ ক'রে থেকে আশীষ বলল—"এখন চল, ডক্টর চক্রবর্তীকে ব'লে সব ব্যবস্থা ক'রে নিই। দেরী যাচ্ছে।"

তার পর তারা আবার সেই পাহাড়ে সরু পথটি ধ'রে বাঙলোর [illegible] নেমে গেল।

চারিদিক কুয়াশায় অন্ধকার হ'য়ে আছে। টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। দিনের বেলাতেই বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জ্বলছে। কুয়াশার আবরণে পাহাড়ের উপরের গাছপালাগুলিকে গভীর অরণ্যের মত দেখাচ্ছে। জনহীন কার্ট রোডের উপর হঠাৎ বহু দূরে মোটরের দুটি হেড-লাইট দেখা দিল। আলো দুটি ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল ও আয়তনে বাড়তে লাগল। কার্ট রোডে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে ইংরেজী টুপী ও বর্ষাতি পরিহিত আশীষ সরু পাহাড়ে পথটি ধ'রে বেবতীবাবুর বাঙলোর দিকে অগ্রসর হ'ল। বাইরের দরজার কড়া নাড়তেই একটি পাহাড়ী মেয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে জানাল, দিদিমণি গির্জাতে গেছেন, আশীষকেও সেখানে যেতে বলেছেন।

আশীষ প্রথমটা একটু আশ্চর্য হয়ে গেল যে এই দারুণ দুর্যোগ মাথায় ক'রে নীলা হঠাৎ গির্জায় গেল কেন! তার পর নিজের মনেই হেসে বললে—'বুঝতে পেরেছি, নীলার সারা জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই গির্জা-ঘিরে। চ'লে যাবার আগে সে সকলের কাছে বিদায় নিতে গেছে। তখন প্রসন্ন মনে সরু রাস্তা ধরে আশীষ পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। ফালি পথটি পাহাড় ঘরে গোল হ'য়ে গির্জার ফটক অবধি উঠে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে গির্জার সামনে এসে দাঁড়াল। ছবি আঁকবার সময়ে নীচে থেকে গির্জাটিকে সে বহুবার দেখেছে, কিন্তু কাছে এসে সামনে থেকে কখনও দেখেনি। চারদিকে নানা রকম ফারন্ ও পাতাবাহারের গাছ। পিছনে এক সারি পাইন কুয়াশা ভেদ ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গির্জার দু'পাশে সারি সারি কতকগুলি ব্যারাকের মত লম্বা একতলা বাড়ী। বৃষ্টি ও কুয়াশা অগ্রাহ্য ক'রে সুন্দর স্বাস্থ্যবান পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা এখানে-ওখানে খেলা করছে।

আশীষ গির্জায় ফটক খুলতেই ভিতর থেকে একটি পাহাড়ী ভৃত্য এসে তার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করল। আশীষ তার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিতে মাথা নেড়ে সে ভিতরে চ'লে গেল। অল্পক্ষণ পরেই আবার বেরিয়ে এসে আশীষকে গির্জার ডান দিকের ব্যারাক-বাড়ীর একটি কামরায় নিয়ে গিয়ে বসাল, তার পর তেলের আলো জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অধীর আগ্রহে আশীষ নীলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, ঘন ঘন হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল। সে ক্রমশ অধৈর্য হ'য়ে পড়ল। একবার উঠে সঙ্কীর্ণ ঘরটির মধ্যে পায়চারি করে—আবার বসে। আবার উঠে পায়চারি করে—আর যত আকাশ-পাতাল ভাবে।

হঠাৎ ঘরের ভিতর দিকের দরজাটি খুলে গেল। চমকে উঠে আশীষ দেখল—আগুল্‌ফলম্বিত কালো পোষাক পরা একটি মেয়ে ছায়ামূর্ত্তির মত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। কালো 'হুডে'র ভিতর থেকে মেয়েটির সাদা মুখখানি টলটল করছে। তার বুকের উপর সরু চেনে বাঁধা একটি ছোট রূপার 'ক্রশ' ঝুলছে। গির্জার কোনও খৃষ্টান সন্ন্যাসিনী ভেবে আশীষ দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নীচু ক'রে তাকে অভিবাদন জানাল। তার পর ভাল ক'রে চেয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—"এ কি, নীলা, তুমি! আমি তোমাকে প্রথমে চিনতেই

পারিনি। এ কি তোমার খেয়াল, নীলা? সময় মোটেই নেই, আমাদের এখনই যেতে হবে। আমি ট্যাক্সি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে তোমায় নিতে এসেছি। শীগগির চল।" এই কথা ব'লে আশীষ তার হাত ধরতে যেতেই নীলা তার স্পর্শ থেকে যেন নিজেকে বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে এসে আশীষের একটু দূরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

তার পর স্বচ্ছ নীল চোখ দুটি তুলে নীলা বলল—"তুমি ফিরে যাও, আশীষ, আমার যাওয়া হবে না।" একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলল—"তুমি চ'লে যাবার পর থেকে দু'দিন দু'রাত ঘুমোইনি, আকুল হ'য়ে ভগবানকে ডেকেছি পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে। আমার অভাগিনী মা ও তাঁর চেয়েও ভাগ্যহীন আমার বাবার কথা কেবলই ভেবেছি। বাবার যা একখানা অস্পষ্ট ফোটো আছে, তা থেকে তাঁর আকৃতি কতকটা কল্পনা করতে পেরেছি। শুনেছি যে তাঁরই শান্ত নীল চোখ নাকি আমি পেয়েছি। কিন্তু আমার মাকে যে কল্পনাও করতে পারি না! তিনি নাকি অসামান্য সুন্দরী ছিলেন। হয়ত তাঁরই রূপের সামান্য কিছু আমি পেয়েছি।···কিন্তু তাঁদের মুখ ভাবতে গেলে কেবল তোমারই মুখ মনে পড়ে। তোমার চোখ দুটির নীরব মিনতি ভরা দৃষ্টি সব সময়েই যেন আমি অনুভব করি। এ আমার কি করলে তুমি, আশীষ? ভগবানের রাজ্যে কেন এমন হয়? যদি এ অভাগিনীকে ভালবাসলে তাহ'লে তুমিও কেন আমারই মত নামগোত্রহীন অভাগা হ'য়ে জন্মালে না? আর না হ'লে আমিই বা তোমার উপযুক্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মালাম না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর নেই।···অনেক কেঁদেছি, অনেক ভেবেছি। এক দিকে তোমার ঐ মিনতি ভরা সজল চোখ, আর সেই সঙ্গে জগতের যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু প্রেয়—আর অন্য দিকে শুধু কঠোর কর্তব্য—যাতে প্রাণ নেই, রস নেই! কিন্তু তবু—তবুও, আশীষ, আমার পথ ঠিক ক'রে নিয়েছি। নীরস প্রাণহীন কঠোর কর্তব্যের পথেই আমা চলতে হবে—আর চলতে হবে একা! তুমি আমার সহায় হও আশীষ, তুমি আমাকে সাহস দাও, প্রেরণা দাও। এ কঠোর পথের কঠোরতা একমাত্র তুমিই কমাতে পার।···আমি সন্ন্যাসিনী হয়ে মানুষের সেবা করাকেই জীবনের ব্রত ক'রে নিয়েছি। তারই সঙ্গে আমার পৈত্রিক ধর্মও নিয়েছি। তুমি ত জ্ঞানী, আশীষ, তুমি ত জান যে, মূলে সব ধর্মই এক।··· তুমি দুঃখ কোরো না। তুমি পুরুষ মানুষ, সমস্ত পৃথিবী তোমাদের কর্মক্ষেত্র। এ অভাগিনীকে ভুলে যাও, আশীষ তোমার প্রাণের সবটুকু দুঃখ-কষ্ট আমি যেন নিয়ে যেতে পারি তুমি সুখী হও। আমাকে আশীর্বাদ কর, আশীষ, যেন আমার স্বেচ্ছায় নেওয়া এই ব্রত প্রাণ দিয়ে পালন করতে পারি। জীবনে তোমাকে না পেলেও তোমার ভালবাসার উপযুক্ত যেন হ'তে পারি···"

শিশুর মত অসহায় ভাবে কেঁদে উঠে আশীষ বলল—"এ কি করলে তুমি, নীলা? মানুষের হৃদয়ের মধ্যেও কি ভগবান নেই যে, আমার এই আকুল ভালাবাসা উপেক্ষা ক'রে, আমার হৃদয়কে পায়ে ক'রে মাড়িয়ে চূরমার ক'রে দিয়ে নিজেকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করলে?···তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, নীলা! যা কর্তব্য বুঝেছ, তুমি তাই করেছ। তবে তোমাকে ভুলে যেতে আমায় অনুরোধ কোরো না। জীবন থাকতে তা পারব না।···থাক তোমার কঠিন পথকে আরও কঠিন করব না। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, ভগবান তোমায় শক্তি দিন, সাহস দিন, তোমার ব্রত সফল হোক।···বিদায়···"

ঢং-ঢং ক'রে গির্জ্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। · নীলা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"বিদায়, আশীষ, প্রার্থনার সময় হয়েছে।"

তার পর যেমন এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দ ছায়ামূর্তির মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অকারণে

এলা বসু

আমার সারা ভুবনখানি ভরে আছে গানে গানে
আমি যে কান পেতে তাই শুনি বসে অকারণে।
যেখানে ঐ বেণুর শাখায়
কাণাকাণি পাতায় পাতায়
অলস প্রহর মর্ম্মরি যায় ক্লান্ত চরণে
আমি যে কান পেতে তাই শুনি বসে অকারণে।

হঠাৎ যখন মেঘ ঘনায় ঐ ঈশান কোণে
আধেক আলো আধেক ছায়া ঢাকে নয়নে
গভীর তার উদার বাণী
সজল হাওয়া বহে আনি
ভিজে মাটির গন্ধ লাগে আমার খোলা বাতায়নে
আমি যে কান পেতে তাই শুনি বসে অকারণে।

কুসুমগুলি ফোটে, তারা ঝরে পড়ে আপন মনে
বহু দূরে ঘুঘু কোথায় ডাকে মৃদু গুঞ্জরণে।
নদীর পারে ওঠে হাওয়া
এপার হ'তে ওপার ধাওয়া
অনেক দিনের ব্যাকুলতা যেন তারা বয়ে আনে
আমি যে কান পেতে তাই শুনি বসে অকারণে।

তুলি ও রঙ

মিচেল জর্জেস্ মিচেল

অনুবাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

["মঁ পারনাশ"—বাংলায় বাম তীর।—পারীর এই মহল্লায় খেয়ালী শিল্পীদের প্রসিদ্ধ আড্ডা। তীব্র অভাব ও অনটনের মধ্যেও দুর্দমনীয় সাহস ও দুরন্ত আবেগে দিনের পর দিন চলেছে তাঁদের তুলি ও রঙের সাধনা। হব্রাউস্কী, কিস্লিং ওকিঙ্ক, কিকি, ম্যান রে, পিকাসো ষ্ট্রাভিনসকি, ইসাডোরা ডানকান প্রভৃতি খ্যাত ও অখ্যাতদের মিছিল "মঁ পারনাশে"। প্রখ্যাত ফরাসী লেখক "মিচেল জর্জেস্ মিচেলে"র যুগান্তকারী উপন্যাস "LES MONTPARNOS"—অনুবাদক।]

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মোদকল্লো, হাত-পা ছড়িয়ে শরীরটা মেলে দিয়েছে। শীর্ণ অথচ পেশীবহুল দেহে জড়িয়ে আছে পাতলা দেহবাস, সার্টের বিস্তীর্ণ ফাঁকের ভেতর বুকের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে।

ঘন আর কালো নরম চুলে ভরা মাথাটি কাৎ হয়ে আছে, কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত সমগ্র অংশ নৈশ আকাশের আলোয় পরিপ্লুত। গভীর ঘুমে সে মগ্ন হয়ে আছে, বুকের উত্থান-পতন অতি দ্রুততালে হচ্ছে, কাঁধের পেশী তরঙ্গায়িত। নাসারন্ধ্র স্পন্দিত, ভ্রূযুগল বেদনা-কুঞ্চিত, সারা দেহ চাঁদের আলোয় কালো আর সবুজ দেখাচ্ছে।

হারিকট রুজ তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলে—"মোদক... মোদক..."

বুক, মুখ ও প্রশস্ত ললাটের স্বেদবিন্দুটুকু মুছিয়ে দিতে পর্যন্ত তার সাহস হয় না। ভাব-বাদী এই মানুষটি তার অন্তরের দেবতা। কথা বলা দূরে থাক, কোনো দিন তার কাছে আসতেও ওর সাহস হয়নি। উজ্জ্বল চোখ মেলে মোদক যখন ওর দিকে তাকায় তখন সে চোখ ফেরাতে পারে না। সারা কাফেটা ওর চার পাশে যেন নাতালের মত ঘুরছে মনে হ'ত।

মেয়েটিও ওর মতই ভাব-বাদী। দরিদ্র মুদির মেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে ওদের সঙ্গে ক্যানভাসে রঙ মাখাচ্ছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও সে রু ত্ব লা গেইটের থানার পাশের মুদীর দোকানটিতে মেঝে মুছতো। চিত্রশিল্পীরা যখন গৃহস্থালীর টুকিটাকি জিনিসপত্র বা গুঁড়ো রঙ কিনতে আসতেন তখন সে উত্তেজনায় কাঁপত।

এই রহস্য কি করে ওর মনে সঞ্চারিত হ'ল?

সরল, অকলংকচরিত্র এই মেয়েটি শৈশব থেকেই শিল্পীদের এক ভিন্ন গোত্রের মানুষ মনে করে এসেছে। এই সব চিত্রশিল্পীরা যখন দোকানে আসতেন তখন তার এতটুকুও ভয় হত না, বরং যাদের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটত তাদের চাইতেও অন্তরঙ্গ মনে হ'ত এই অনিয়মিত অতিথিদের। ওঁরা কেউ দোকানে এলেই গভীর ভাবালুতায় সে উৎপীড়িত হয়ে উঠত। তাঁরা যে পুরুষ মানুষ সেটা কারণ নয়, তাঁদের এই চপলতা, এই জীবন, ওরা পরিচিত জগতের সব কিছুর চাইতেও সুন্দর ও মহত্তর, এমনই একটা অস্পষ্ট ধারণা ওর মনে ছিল।

কখনও ক্যাসবাক্স নিয়ে বসতে হ'ত, কখনও বিক্রী করতে হ'ত গৃহস্থালীর তুচ্ছতম সামগ্রী। কখনও আবার খনিজ সাবানে ঘরের মেঝে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হয়েছে, তবু এই কঠিন গন্ডময় পরিবেশের ভিতর, বাপের কাছে কঠোর শাস্তি পেয়েও সে চিত্রকরদের জীবনী, মাইকেল এঞ্জেলো, সিজানের জীবন-কথা পড়েছে, কারণ সে ত' ওদেরই স্বগোত্র।

মার অনেক পরিশ্রম সে বাঁচিয়ে দিত, মাইনে-করা কেরাণী রাখার খরচ থেকে বাপকে বাঁচিয়েছে, তবু এই ছোট্ট দোকানটি থেকে এক-আধ ঘণ্টার জন্য যখন পালাত তখন বাপের নির্দয় প্রহারে জর্জরিত হয়ে অনশনে রাত কাটিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত।

যে দীর্ঘকাল ধরে প্রচারকের মুখে চার্চের কথা গোপনে শুনে আসছে, প্রথম

মডিগলিয়ানি (স্বহস্ত অঙ্কিত)

যেদিন সে গির্জায় এসে ঢোকে তখন তার পদক্ষেপ আতংক ও ভয়ে কুণ্ঠা-বিজড়িত। তেমনই শংকা ও সংশয় মনে নিয়ে সেও একদিন ল্যুভর মুজিয়মে গিয়েছিল, আর সেইদিনই তার প্রাণে ছবি আঁকার তীব্র বাসনা জাগে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ বা হৃদয় নিঙড়ে নেওয়ার চাইতেও এই ভাবাবেগ প্রবলতর।

এতদিন যে সব কথা সে পড়ে এসেছে, চতুর্দিকে তারই নিদর্শন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আঁকা ছবির অসংখ্য নমুনা। মেয়েটি ছবির কাছে এসে দাঁড়ায়, প্রতিটি ছবি স্পর্শ করতে পারে সে। ছবিগুলির সামনে একে একে এসে দাঁড়িয়ে সে বলে:

"মানুষ তুলি আর রঙ দিয়ে ক্যান্‌ভাসের ওপর এই কাণ্ড করেছে!"

আর একদিন আর এক অভিজ্ঞতা!

মেয়েটি দেখল এদিক ওদিকে অসংখ্য তরুণী ছোট ছোট টুলে বসেছে, হাতে তাদের রঙদানি (প্যালেট), বিখ্যাত ছবিগুলির নকল করছে তারা।

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে যায়, হাতের মুঠি দৃঢ়বদ্ধ হ'ল।

ওদের দোকানের সামনে দিয়ে উদ্দাম পার্টির লোভে যে সব ব্যাপিকা রমণী হালকা হাসির ফোয়ারা উড়িয়ে চলে যেত তাদের দেখে একদিনও ওর মনে ঈর্ষা জাগেনি, কিন্তু আজ, আজ এই চিত্র-মন্দিরে বসে যে সব বুর্জোয়া তরুণী ফ্রাগোনার, বা ভার্জিন মেরী কিংবা চারডিনের আঁকা পেঁয়াজের ছবি কপি করছে, তাদের দেখে এই অনাথা মেয়েটির মনে ঈর্ষা ফুটে ওঠে।

মুজিয়মের মেঝের ওপর ভারী জুতা পায়ে হেঁটে যেতে যেতে মেয়েটির চোখ জলে ভরে যায়। সে আকুল হয়ে কাঁদে।

অবশেষে যখন সংকল্প করল ওদের মত সে-ও ছবি আঁকবে তখনই চোখের জল থামল।

বাপ ওকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করেছে, বলত,—"বস্তীর মেয়েমানুষ,—পথের মেয়ে।"

অদ্ভুত আনন্দে সে এখন এ সব নির্যাতন সহ্য করছে। দিনকতক আগে ওর বড় বোন একজন ঝাড়ুওলার সঙ্গে পালিয়েছে, মেয়েটি মনে মনে ভাবে, বাবা-মা যদি ভাবে আমার সঙ্গে 'লোক' জুটেছে, ভাবুক, ওর গোপন কথা কাউকে জানাবে না। মজার কথা বাপ-মার এই সন্দেহের ফলে, ও প্রতিদিন বুলভার্দ দিয়ে মঁপারনাশের ছবি আঁকার স্কুলে পালিয়ে আসে, সেখানে শান্ত পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি আঁকা শেখানো হয়।

মা একরাত্রে বাবাকে বলছেন শোনা গেল—

"যা হবার তা হবেই, ভাঙা জিনিষ জোড়া যাবে না, এখন যদি ওকে আমরা বাধা দিই, ওর পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে যেতে না দিই, তাহলে ওর দিদি জিনের মত একদিন শিকল কেটে ও পালাবে। তখন মাইনে দিয়ে একটা কেরাণী রাখতে হবে, একটা দাসী চাই। তারা আমাদের সব চুরী করবে। যতক্ষণ না ঘা খেয়ে ফিরছে ততক্ষণ যা খুসী করতে দাও।"

মা আর্ধেক বুঝেছেন মাত্র, যাই হোক্ মেয়েটিকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে, এইটাই আসল কথা। এখন আর মার খেতে হয় না। সুনাম নষ্ট হয়েছে বটে, সেই বদনামকে আঁকড়ে ধরে ও এখন ছবি আঁকাতেই প্রাণ-মন সঁপে দিয়েছে। তবু কোনোদিন মনে লালসা জাগেনি। কেউ কোনোদিন প্রেম নিবেদন করতেও আসেনি। মূলতঃ সে পবিত্র আর পরিশ্রমী, একটি প্রাচীন কালো পোসাক পরে বেরিয়ে পড়ত, পায়ে থাকৃত কাঠকয়লাওলাদের মত জুতা। গ্রামের অর্থগৃধ্নু বাপ-মা এই গুরুভার জুতা ছেলেমেয়েদের পরতে দেয়।

মেয়েটি অনেক রাতে গভীর হতাশা নিয়ে বাড়ি ফেরে। ঠিকমত এনাটমিতে (শারীর-সংস্থান) হাত পাকাতে পারে না! অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন সহজে সূক্ষ্মভাবে লাইন টানে বা সতর্ক ভাবে আলো-ছায়া ফুটিয়ে তোলে, মেয়েটি তেমন পারে না। ওর সবই কেমন মোটা হয়ে যায়, মডেলের ছবির যেন ক্যারিকেচার (ব্যঙ্গচিত্র) এঁকে বসে।

তার পর, এক রাত্রে সে এই কাফেতে এসে পড়েছে, এইখানে সে শুনল কিছু না শেখাটাই তার পক্ষে সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে—কারণ শিল্পকর্ম এখন সবে গোড়া থেকে সুরু করতে হবে—স্বর্গীয় করুণার ফলেই ওর হাত এখনও একাদেমির বাঁধা-ধরা ড্রয়িং-এ অভ্যস্ত হয়নি।

একজন বৃদ্ধ মডেল তাকে ওখানে নিয়ে এসেছিল, সে রাতে স্কুলে ছবি রাখার অনুমতি মেলেনি, এই কাফেতেই ছবিগুলো রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যই আসা।

বৃদ্ধ মডেলের জন্য মেয়েটি এক পেয়ালা কফি-ক্রীম কিনে দেয়, ইনি তাঁর স্বদেশে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু আরো অনেকের মত এখানে বুভুক্ষার সাধনা করতে এসেছেন।

টেবলের চার পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে উনি মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দিলেন; পোর্টফোলিও বার করে মেয়েটির আঁকা ছবি সবাইকে দেখালেন—আর তাঁরা সবাই গভীর মনোযোগে ওর আঁকা ছবি দেখতে লাগলেন। এঁরা সবাই কৃতী শিল্পী, কাফের চতুর্দিকে তাঁদের আঁকা ছবি টাঙানো।

মলিনবর্ণ বিরাট আকৃতির জনৈক উদ্ধত ব্যক্তিকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছিল—তাঁকে কে একজন বলল:

"মোদরুল্লো, ছবিগুলো দেখবে নাকি?"

মোদরুল্লো ছবিগুলি তীক্ষ্ণভাবে দেখলেন, তারপর সহসা

মেয়েটির মুখের ওপর তাঁর চোখ পড়ল। তিনি বিচলিত হলেন, তারপর চলে গেলেন।

বাকী সবাই মিলে ছবি সম্পর্কে তর্ক করতে থাকেন। টেবলে কনুই রেখে মেয়েটি সব শোনে। মেয়েটি শুনলো এঁদের মুখে সগর্বে উচ্চারিত হ'ল, কত অপরিচিত চিত্রশিল্পীদের নাম, তাঁরা এঁদের বন্ধু বা গুরুস্থানীয়। সুদৃশ্য রীতিগত ছবি যা বাঁধাধরা ছকে আঁকা হয়, যা বিদ্যালয়ের স্বীকৃত পদ্ধতি, তার হাত থেকে ওঁরা মুক্তি চান, নতুন করে সম্পূর্ণ নতুন ধারায় তাঁরা অঙ্কনরীতির পুনর্গঠন করবেন।

স্বস্তির জন্য এই কাফেতে সে আবার এল। পূর্ব রাত্রে যে টেবলে বসেছিল সেই টেবলে এসেই বসল। তৎক্ষণাৎ তার আসন ঠিক হয়ে গেল। সেইদিন সে এদের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও নিদারুণ দুর্দশার কথা শুনলো। এদের ছবি ও জীবন সম্বন্ধে সে কৌতূহলী।

এক রাত্রে সে ফকীরের কাছে গিয়ে বসল। ফকীর, বরাবরই, যারা জানে আর যারা জানে না, তাদের সকলের কাছেই তার ইতিহাস বলে যায়। লোকটি লম্বা, গায়ের হাড় চওড়া, সমাহিত ভঙ্গী, পরিচ্ছন্নতার কোনো ধার ধারে না। অনেক ব্রাহ্মণ যেমন স্থির হয়ে বসে থাকেন, অনাহারে দিন কাটান, বিনয়ের অবতার এই নিরভিমানী ব্যক্তিটি তেমনই মাসের পর মাস পোষাক বদ্‌লানোর প্রয়োজন বোধ করেন না।

তিনি নাকি জন্মান্তরে পর্যায়ক্রমে সুইডিস রাজকুমার, রুশীয় সম্রাজ্ঞী, এবং আরো কয়েকটি ছোটখাটো রাজারাজড়া ছিলেন। রুশদেশীয় মরমীয়া বা ভারতাগত নতুন মানুষরা সর্বদাই তাঁকে ঘিরে থাকত, তারা কেউ সাংবাদিক, কেউ বা বিপ্লবী। তিনি তাঁদের কাছে পারিসীয় জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন, ধীর এবং সুচিন্তিত কথা।

ফুল-কাটা পোষাক-পরা ভায়োলেটাক্ষী ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গে মেয়েটি কখনও বসত, তাদের কেউ সারাদিন ধরে জামা সেলাই করেছে আর কাপড় কেচেছে, অপরা স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন, এর ঘর দোওয়ায় বোঝাই, ওর মোজা কদর্য।

কিংবা ডিম্বাকৃতি বিশাল চোখওলা ইহুদী মেয়েটির পাশে বসত, তার ঠোঁট দুটিও যেন ক্ষুর'মত তীক্ষ্ণ। ইনি অত্যন্ত উদ্দাম ভঙ্গীতে মদ্যপান করতেন। অন্ধকারেও এই মেয়েটির চোখ দুটির কালো আঁখি তারা জ্বল জ্বল করত। ভেলভেটের খাপ থেকে যেন বহুমূল্য মণি ঝক্ ঝক্ করছে।

পরদিন মুদির দোকানের মেয়েটি গউচো বুট-পরা লে স্যুয়েজের কাহিনী শুনলো। ইনি এগারবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন, যা পয়সা করেছেন তাতে ছবি আঁকতে পারবেন, এখন মেক্সিকোয় একটা শিল্পীদের কলোনী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন।

কারো না কারো দুঃখের কাহিনীও শুনত। একটি মেয়ের নিদারুণ অভাব, সে প্রাচীন সৌখীন ছিটের একটা লুপ্ত গোপন-তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। সিল্ক আর পশমের ওপর কিউব আঁকার চেষ্টাও করছে। মেয়েটি অনশনে এমন এক কারু-শিল্পের কথা চিন্তা করছে তা এমনই ব্যয়সাধ্য যে দু'শো বছরের ভেতরও তার উপযুক্ত অর্থ সে সংগ্রহ করতে পারবে না।

একটি রাশিয়ান মেয়ে কোনো গ্রন্থকারের কয়েকটি উপন্যাস অনুবাদ করে দিয়েছেন, লেখক টাকা পেলে তবে তাঁর সহযোগীকে টাকা দেবেন।

ইংরাজ মেয়েটির পায়ে পম্প স্যু, কিন্তু মোজা নেই। দুটি মার্কিণ মেয়ের সঙ্গে কোথায় দাসীদের ঘরে থাকে, আর ক্যানভাস আর রঙের খরচ জোগানোর জন্য মাষ্টারীও করে।

শত শত নর-নারী ষ্টুডিয়ো বা হাসপাতাল যাওয়া-আসার পথে, অনশন আর সাফল্যের ভিতর—এই কাফেটিকে একমাত্র বিরাম-স্থান হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ওদিকে আবার অধিকতর ভাগ্যবতীর দল আছে: কানে মরকত খচিত কানফুল; ভেতরের ঘরে মার্কিণ মেয়েরা সামুদ্রিক শুক্তি, সাম্পেন আর পিঁয়াজের ঝোল খায়। যে সব মডেলরা ছবির জন্য বসার দরুণ পয়সা পায় তারাও মদ্যপান করে আর মহিলা চিত্রশিল্পীদের দিকে অবজ্ঞা ভরে তাকায়। কেউ কখনও কারো কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী নয়।

যাই হোক, গ্রুয়ার্ভের এই মেয়েটি প্রথম যেদিন দেখল একজন প্রকৃতই অনশনে আছে তখন সে বাড়ি ফিরে গিয়ে পকেটভর্তি করে কিডনি বিন্ (মুগকলাই) নিয়ে এল। দোকানের পিছনের গুদামের থলি থেকে সে এগুলি সংগ্রহ করেছিল। যখনই কেউ ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হ'ত তখনই এই মুদির মেয়ে তাকে কিছু মুগকলাই দিত। এই তার সম্বল, তাই সে দান করত। এই জন্যই ওকে তারা হারিকট রুজ (মুগকলাই) বলে ডাকে, সে ডাক শ্লেষমিশ্রিত নয়, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। Citron Sisters, Japanese Lantern বা Queue de Singe (বানরের লেজ), প্রভৃতি কথাগুলির চাইতে এ কথাটি ঢের ভালো।

কয়েক সপ্তাহ ধরে হারিকট রুজ এইভাবে কাফেতেই আছে, অধীনস্থ সামন্তদের সর্দারের মত মোদরুল্লো, মহৎ মোদরুল্লো যখন ওর সঙ্গে কথা বললেন তখন ওর হৃদয় নেচে উঠল,—সবাই বলে মোদরুল্লোই ওদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ওর রাগ, ওর সংগ্রাম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তীব্র ক্রোধ প্রভৃতি বিষয়ে সকল কাহিনীই সে শুনেছে। এর তার ঘরে এই মানুষটির আঁকা দুচার খানি ক্যানভাসও সে দেখেছে; সে সব ভালো বোঝা যায় না, কিন্তু রঙ যেন কাচ-মণ্ডিত মাটির মত উজ্জ্বল।

আজ রাত্রে। মেয়েটি তার যা কিছু ছিল সবই নিয়ে এসেছে ওর কাছে, এখন ঠিক ঐ ভাবেই সে ঘুমিয়ে পড়ল—

মোদরুল্লোর পাশে হাঁটু দুটি রইলো, মাথাটি পাশে হেলানো, চুলের বিনুনী দুটি ঝুলছে, আর হাত দুটি সংযুক্ত।

চার

যখন মেয়েটির ঘুম ভাঙলো তখন ছাতের ছোট্ট 'আলশে'তে রবিরশ্মি এসে পড়েছে, সেখানকার শ্যামলিমা পাথরের গা থেকে সরে গেছে। মেয়েটি চুপচাপ পড়ে থাকে।

মোদরুল্লো উঠে পড়েছে, অগ্নিকুণ্ড থেকে কয়েকখণ্ড কাঠ-কয়লা তুলে নিয়ে দরজার শাদা গায়ে তার পোর্টরেট আঁকছে, জ্যামিতিক চিত্র নয়। সুন্দর সরল রেখায় আঁকা ছবি, যেন কম্পাস দিয়ে মেপে রেখাগুলি টানা হয়েছে। মোদরুল্লো ক্ষিপ্র গতিতে ছবি আঁকছে ডান হাত দিয়ে আর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মুছে মুছে 'সেড' সৃষ্টি করছে। অঙ্কনে শেষ স্পর্শের জন্য একটু কিছু রঙ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘরের চারপাশ দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

স্বভাবসিদ্ধ রাগের বশে মেঝের ওপর সজোরে পদাঘাত করে মোদরুল্লো। পায়ের তলার টালি গুঁড়ো হয়ে যায়। তখনই থেমে একমুঠো সুরকী হাতে তুলে নিয়ে ছবির কাজে লাগায়, প্রথমটা অতি সূক্ষ্ম প্রলেপ তারপর গালে আর ঠোঁটে মাতালের মত অকৃপণ হাতে রঙ লাগিয়ে যায়. এইবার ঠিক রঙটা পাওয়া গেছে।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে—"ঐ দেখ! একই রঙের তিনরকম প্রয়োগ।"

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। তখন মোদরুল্লো তার বাহুটি টেনে নিয়ে গভীরভাবে ওর চোখ দুটি দেখে। আর কোনো প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। অন্য কোনোভাবে প্রশ্ন করতে হবে না।

মেয়েটি বলল—"তুমি ত ভালোই জানো।"

"তাহ'লে তুমি আমার কমরেড, প্রকৃত সাথী। যতদিন আমরা বাঁচব, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়—।"

মেয়েটির চিন্তা কোনোদিন এতদূর যায়নি। তার মনে হ'ল চারদিক ঘূর্ণমান।

মোদরুল্লো বলে ওঠে—"বরো।"

আধা-পোষাক পরিহিত অবস্থায় দরজায় মাথাটি গলিয়ে উঁকি দেয় ব্বরৌসকী।

"চলে এস। এখনই কাজ সুরু করা যাক্।"

"এক মিনিট দাঁড়াও।"

"এখনই!"

পোল বেচারী কোনো রকমে জ্যাকেটটা টেনে নেয়, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সেটি পরতে থাকে।

মোদরুল্লো বলে:—"বরো, যেখানে খুসী আমাকে নিয়ে চলো, যে সব ছবিওয়ালার নাম করলে তাদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তির কাছে নিয়ে চলো। আমি কাজ চাই, যা কিছু দরকার সব করব। কিন্তু আমি কাজ করতে চাই, এই মেয়েটির জন্যই কাজ করতে চাই, তাহ'লেই ওকে আমার কাছে রাখতে পারবো। আর ওকে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই করতে দেব না, বুঝলে? এমন কি আমাদের জন্য রাঁধতেও বলবো না। একটা গৃহস্থালী দাসী করে রাখতে চাই না, এমন কি রক্ষিতা হিসাবেও নয়, সাধারণ স্ত্রীর মতও নয়, ও আমার কমরেড, প্রকৃত সঙ্গিনী।"

ওরা লুকসেমবার্গ পার হয়ে গেল, সূর্যালোকিত পত্রপুষ্পের বিলাসবহুল বর্ণাঢ্যতা। মোদরু সগর্বে চলেছে। লম্বা চুলগুলি উড়ে এসে কপালে ভেঙে পড়ছে। ব্বরৌসকী ওর সঙ্গে হাঁটায় পাল্লা দিতে পারছে না।

ব্বরো বলে ওঠে—"আমরা রু দ্য লা বোয়েতিতে যাবো। পল গুইলায়ুম তোমার প্রথম ছবিবিক্রেতা, সে কথা ভুললে চলবে না। ইদানী আমাদের গতিপথ সম্পর্কে সে সংবাদ রাখে না, তবে হয়ত সে বুঝবে এবং আমাদের সাহায্য করবে। তোমার কাজের বিনিময়ে হয়ত একটা মাসিক খরচের জন্য মাসোহারা দিতে পারে, জিনিষপত্র কেনার খরচও দেবে।"

"আমার এই অঞ্চলটা ভাল লাগে না। এখানে যে সব মানুষ দেখা যায় তাদেরও আমার পছন্দ হয় না। কিন্তু বেশ, আমি একটু সামলে নিলে ওকে আমার ছবি দিতে পারো। দেখছ—চাকরদের ঐ জনতা কেমন আমাদের পার হয়ে যাচ্ছে, আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে, আমরা ওদের মত হাঁটতে পারছি না তাই। তা বটে! আমাদের যে কাঁধে জোয়াল আর পায়ে শিকল নেই।" [ক্রমশঃ।

শুক্লা একাদশী

শর্ম্মিলা দেবী

তোমারে বিদায় দিতে, কি বেদন জাগে চিতে,
ভাষা নাহি প্রকাশিতে, ভাব নির্ঝর;
ঝরে পড়ে আঁখিনীরে, হৃদি কহে বারে বারে,
এস প্রিয় এস ফিরে, মম হৃদি 'পর।
এ মধু-জোছনা রাতে, তোমারি চলার পথে,
ফুটে ওঠে মোর ব্যথাভরা শতদল।
পথে যেতে একবার, ফিরে চেও পানে তার,
বিরহ-বেদনা ভারে সে যে টলমল।
মোর হৃদিব্যথা নিয়া, পিউ কাঁদে কাঁহা পিয়া,
ক্রন্দনে মুখরিত বন মর্ম্মর,
কুলে কুলে ওঠে কাঁদি, ভাদরের ভরা নদী
ব্যথার পবনে কেয়া কাঁপে থর-থর।

আজি শুক্লা একাদশী, দূরে কে বাজায় বাঁশি,
স্মৃতি কার আসে ভাসি, মন উদাসীন,
কে বিরহী আছ জাগি, নিদ্‌হারা কার লাগি?
বেহাগেতে কে বিবাগী, বাজালো রে বীণ!
রজনীগন্ধাগুলি কারে খোঁজে আঁখি মেলি,
কে গিয়াছে আসি বলি, আসিল না আর;
আমি তারি পাশে রই, চুপি চুপি তারে কই,
সারা নিশি জাগো সই, প্রতীক্ষায় কার?
যে লগন বহে যায়, ফিরে নাহি আসে হায়,
শুক্লা একাদশী ফিরে আসে বার বার!
যে পথিক গেছে চলি, আবার আসিব বলি,
সে তব জীবনে ফিরে আসিবে না আর।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

৪

চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী—এ নামটি আজকেই নয়, বহুকাল থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে সুপরিচিত। নামটা নিজেই যেন একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন—নামের দাবী ও মহিমা নিয়ে চন্দ্রাবতী যখন আবির্ভূত হলেন, তখন এদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের সম্পূর্ণ রূপটাই গেল পাল্টে। জনচিত্তে যে-শিল্পের তখনও তেমন কিছু আবেদন ছিল না, সে-শিল্প সন্দর্শনের জন্য সকলেই হয়ে উঠলো উতলা। সে যুগে চন্দ্রাবতীকেও কম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয় নি, কিন্তু শিল্পে যাঁর জন্মগত অধিকার, তাঁকে আটকে রাখে কে? এরূপ উদ্যম ও নির্ভীকতা ছিল বলেই অল্পকাল মধ্যে চন্দ্রাবতীর ভেতর দেখতে পেলুম আমরা একজন শ্রেষ্ঠ কুশলী শিল্পীকে। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের নিখুঁত ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন তাঁর নাম যে অগ্রভাগে স্থান পাবে, এ বিষয়ে আজ বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাঙ্গালার চলচ্চিত্র-শিল্প তুলনামূলক ভাবে যখন পিছিয়ে পড়ছে, দর্শকসমাজ যেখানে বাংলা ছবির পরিবর্ত্তে হিন্দী ও ইংরেজী ছবির দিকে ঝুঁকে পড়ছে দিন দিন—এ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে স্থির করলুম যাঁরা এ শিল্পকে একদিন রূপে-রসে প্রাণ ঢেলে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, তাঁদের একজনের মতামত এবারকার মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ করবো। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রাবতী দেবীর কথাই আমার মনের কোণে উঁকি মারলো, স্বীকার করছি।

* * * *

বিশেষ আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ। কোন প্রকার সংবাদ না দিয়েই সরাসরি যাত্রা করলুম চন্দ্রাবতী দেবীর গৃহ-উদ্দেশ্যে। দক্ষিণ কলকাতার একখানি সুদৃশ্য তিনতলা বাড়ী—ঠিকানা দেখেই আমি থেমে গেলুম। বাইরে কোন লোকজন দেখতে পেলুম না। কি করবো ভাবছি, এমনি সময় একজনকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সামনের এ গৃহটি চন্দ্রাবতী দেবীর গৃহ কিনা? লোকটি বললে, হাঁ, সোজা তিনতলায় উঠে যান। আমি কোন দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়লুম। একটি ছেলের হাতে পাঠিয়ে দিলুম আমার পরিচয়-পত্রখানি। আমাকে যে কক্ষে বসান হ'লো সেটি চন্দ্রাবতী দেবীর ষ্টাডি-ঘর। দেখে মনে হয় সত্যিই একজন শিল্পীর গৃহ। দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি টাঙ্গানো—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সেগুলো যেন ভরপুর; কয়েকটি আলমারিতে সারি সারি গ্রন্থ রয়েছে—বেশীর ভাগই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা। নামকরা ইংরেজী গ্রন্থকারদেরও বই দেখলুম বেশ কয়েকখানি।

সাদা পোষাকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশে চন্দ্রাবতী দেবী এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। দেখে স্পষ্টই বিশ্বাস হ'লো পর্দ্দার বাইরেও এঁরা আর দশ জনেরই মত। সৌজন্য ও ভদ্রতার একটুও ব্যতিক্রম নেই। জড়তার এতটুকু ভাব দেখলুম না। মনটা তাঁর খুসীতে ভরা।

আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা তাঁকে জানালুম বিশেষ একটা ভূমিকা না করেই। বললেন, বেশ ভাল, বলুন কি কি বিষয়ের অবতারণা করতে চান। আমি কালবিলম্ব না করে আমার নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নমালাটি বের করলুম। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'লো তার উত্তর একটির পর একটি।

চন্দ্রাবতী দেবী প্রথমেই বললেন, একথা ঠিক যে নির্ব্বাক্ যুগে নিজস্ব ছবি "পিয়ারী"তে আমি প্রথম অবতীর্ণ হই। কিন্তু চলচ্চিত্র-জগতে সত্যিকারের যোগদান বলতে আমার 'মীরাবাঈ'-এ নাম-ভূমিকায় অভিনয়। সে আজ থেকে ২০ বছর আগেকার কথা। মীরাবাঈ চরিত্রে রূপদান করে আমি তৃপ্তি পেয়েছি প্রচুর। তার পর অনেক ছবিতে অভিনয় করেছি—"দেবদাস", "প্রিয় বান্ধবী", "দুর্গেশনন্দিনী", "দুই পুরুষ", "দক্ষযজ্ঞ" প্রভৃতি। এ ছবিগুলোর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেও আমার আনন্দ কম হয়নি। তবে আমার মনে হয়, যত দিন যায়, লোক তার জীবন-পদ্ধতিতে গতানুগতিক হয়ে পড়ে। চলচ্চিত্র-শিল্পীদের ক্ষেত্রেও এর নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম হয় না।

চলচ্চিত্রে যোগদানের পর আপনি কি সাংসারিক জীবন যাপনে আগ্রহশীল?—প্রশ্ন ক'রলুম আমি। উত্তর হলো—জীবনে প্রথম আরম্ভের সময় অনেক বাধা-বিঘ্ন এসেছে, কিন্তু আজ আমি settled—পুত্র, কন্যা, স্বামী নিয়ে আজ আমি সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রথমটায় সমাজগত একটা সঙ্কোচের ভাব মনে এসেছিল কিন্তু সে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। বরাবরই আমি ছিলুম শিল্পের পূজারী। সে জন্য নানা বাধা-বিঘ্ন, ওজর-আপত্তির মধ্যেও আমি স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হই—এ শিল্পকলার মাঝেই আমার সিদ্ধিলাভ ঘটবে। মনের মত জিনিষ পেয়েছি বলেই আমি এগুতে পেরেছি।

ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তন এসেছে কি না—এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এলো—প্রথমটায় পরিবর্ত্তন কিছুটা এসেছিল কিন্তু এখন আমার ক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রশ্ন নেই। এই মাত্র বললুম, এখন আমি সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত। সুখী হয়তো হতে পারিনি কিন্তু শান্তিতেই আছি।

দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর একটা হিসেব দিতে গিয়ে চন্দ্রাবতী বললেন, অন্যান্য দশ জনের মতই আমি দৈনন্দিন জীবন যাপন করি। আমার বেলাতেও নতুন কোন বৈচিত্র্য নেই। যেদিন স্যুটিং থাকে না, সেদিন ছেলেমেয়ে নিয়েই সারা দিন কাটিয়ে দি। ছোট্ট একটি বাগান আছে আমার—সেখানেও কিছুকাল কাটাই। হবির (Hobby) কথা যা জিজ্ঞেস করছেন—"হবি" বলে আমার বিশেষ

কিছু নেই। সংসারের কাজকর্ম ও বাগান নিয়েই আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি। এসব ব্যাপারে অপর কারো সাহায্যের আমার প্রয়োজন হয় না।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত জানাতে গিয়ে তিনি বললেন, প্রত্যেক মানুষেরই নিজের চেহারা ও রূপের সঙ্গে পোষাকের মিল থাকা প্রয়োজন। রূপ জিনিষটা পরের উপর নির্ভর করে। অপর পাঁচ জনে যেটা ভাল বলে সে রকম পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাই উচিত। আমার ব্যক্তিগত কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সাদা পোষাকেই আমি লোকের কাছে প্রশংসা পাই। সে জন্য আমি সাদা পোষাকেরই পক্ষপাতী এবং আমি নিজে এ পছন্দও করি। হাল্কা পোষাকও চলতে পারে তবে সব ক্ষেত্রেই পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। প্রসাধন করা প্রত্যেক নারীরই উচিত আমি বলবো এবং এও বলবো, যাতে ভাল দেখায় তা করাই কর্ত্তব্য। পুঁথি-পুস্তক পড়াশুনো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো—বাংলা বই হিসেবে আমি জীবনচরিত পড়তেই বিশেষ ভালবাসি, যেমন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবনী। ইংরেজ গ্রন্থকার ও কবিদের মধ্যে সেক্সপিয়ার, মিলটন এবং অন্যান্য নাট্যকার যাঁরা সত্যিই ভাল "drama" লিখেছেন, তাঁদের রচনাবলী পড়তেও আমি ভালবাসি। এদিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাদি পাঠ করতে সকলের মত আমারও যে ভাল লাগে, আশা করি সে আর বলতে হবে না। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা মোটামুটি সব কয়টিই আমি পড়ি। 'মাসিক বসুমতী' পড়ারও আমার অভ্যাস আছে এবং পড়তে আমার ভালও লাগে। গল্প ও কবিতা এক সময়ে লিখতুম কিন্তু এখন সময়ের টানাটানিতে সে সব আর হয়ে ওঠে না।

প্রশ্ন করলুম চন্দ্রাবতী দেবীকে, আপনি কি ছবি দেখতে ভালবাসেন? উত্তর দিলেন তিনি সরাসরি, ভাল ছবি হলেই আমি দেখতে যাই—সে বাংলাই হোক, হিন্দীই হোক, আর ইংরেজীই হোক। আরও সহজ করে বলতে গেলে আমি বলবো, যে ছবি দেখলে মনের উপর ছায়াপাত হয়, এমন ছবি দেখতেই আমি ভালবাসি। যাতে সত্যিকারের অভিনয়-কুশলতা রয়েছে, তা আমায় আকৃষ্ট না করে পারে না—আবার বলবো, সে যে ভাষারই হোক। যে চিত্র-কাহিনীতে "drama" নেই, তা আমার কখনই ভাল লাগে না।

চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হ'লে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলে চললেন—এর জন্যে ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা ও রূপের সমাবেশ অবশ্য প্রয়োজন, আর প্রয়োজন চলচ্চিত্র সম্পর্কে নিখুঁত অভিজ্ঞতা। এ জন্য চাই নাচ-গান শিক্ষা, এক কথায় যাকে বলা চলে শিল্পিমন। বাঙ্গালী অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ লাইনে যোগদান সম্পর্কে আমি বলবো, লাইনটি খারাপ নয়, তবে যেকেউই এ লাইনে আসবেন, নিজের ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা নিয়ে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যাঁরা চলচ্চিত্রকে প্রকৃত আর্ট বা শিল্প হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন, তাঁদেরই এ লাইনে আসতে আহ্বান করবো।

বর্ত্তমানে বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধন কি প্রকারে হওয়া সম্ভব—প্রশ্ন করে মতামত জানতে চাইলুম শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবীর। বেশ

নিজগৃহে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী —আলোকচিত্র, মাসিক বসুমতী

স্পষ্টভাবে উত্তর করলেন তিনি—ভাল ছবি করতে হলেই প্রথমে চাই পয়সা। এখনকার ছবি দেখে মনে হয় এদেশে দারিদ্র্য এসে গেছে। ভাল ছবি করতে গেলে যে যে উপাদান দরকার তার মধ্যে—ভাল গল্প, অনুরূপ শিল্পী ও অভিজ্ঞ ডিরেক্টার—যাঁর ক্যামেরা-জ্ঞান, সুরজ্ঞান, ধৈর্য্য, রসবোধ, এক কথায় ছবি তুলতে যে যে গুণ না থাকলে নয়, সে সকল গুণ থাকবে। এ নিশ্চিত যে, কুশলী ও সম্পন্ন ডিরেক্টর দিয়ে ছবি তৈরীর চেষ্টা হলে শুধু বাংলা কেন, যে কোন ছবি ভাল হবে এবং সে প্রচেষ্টা কখনই ব্যর্থ হবে না।

অপর একটি প্রশ্ন-প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া অপরিহার্য্য। তাঁদের ওজন করে খাওয়া উচিত এবং সময় অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া সব কিছু করা উচিত। হলিউডে যেমন ঘোড়ায় চড়া, সন্তরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, এখানেও সেরূপ অনুশীলনের ব্যবস্থা প্রয়োজন। শিল্পীদের বিশেষ করে শরীরে যাতে fat না হয়ে যায়, সে দিকে সচেতন থাকতে হবে। আবশ্যক ক্ষেত্রে সে জন্যে চিকিৎসকদের পরামর্শানুযায়ী চলা প্রয়োজন।

বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি?—কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে চন্দ্রাবতী দেবী বললেন, সব ক্ষেত্রে করেন না—অবশ্য এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। ক্ষেত্রবিশেষে নাইট স্যুটিংএ স্বামীরা আপত্তি করেন বৈ কি! যদি দশটা-পাঁচটায় স্যুটিং হয়, তবে আমার মনে হয় কোন স্বামীরই আপত্তি থাকে না। প্রত্যেক স্বামীরই যাঁরা এ লাইনে এসেছেন এমন স্ত্রীকে বিশ্বাস করা উচিত। আমি তো বলবো, অভিনয়ে কোন স্বামীরই আপত্তি করা উচিত নয়—এটা তো বরং গর্ব্বের কথা।

এ লাইনে এসে অর্থের দিক দিয়ে আপনি কতটা সাফল্য অর্জ্জন করলেন, জিজ্ঞেস করলে তিনি স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন—এ লাইনে এসেছি প্রায় বিশ বছর। আর্থিক দিক থেকে সফলতার কথা কি বলবো? আমাদের কোন বাঁধা-ধরা আয় নেই। যখন কাজ থাকে তখন আয় ভালই হয় আর যখন কাজ থাকে না তখন আয়ের ঘর থাকে শূন্য। কেন, বুঝতেই পারছেন। তিনি এইখানেই থামলেন না—দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, শিল্পীদের আয় steady হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে কোন আর্টিষ্ট হয়তো খেতে পায়, কোন আর্টিষ্ট হয়তো খেতে পেলো না। মাসিক মাইনের ব্যবস্থা থাকলে এমনটি কখনও হবার নয়! নিজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি জানালেন—পূর্ব্বে আমি নিউ থিয়েটার্স-এ মাসিক মাইনেতে কাজ করতুম। প্রথমে দুশো টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, এ টাকায় সংসার চলে না। তবুও সেটা মেনে নিয়েছিলুম প্রথম আরম্ভ বলে—এমেচার শিল্পীর ভাতা মনে করে। অপর দিকে সে সময় টাকাটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না—উদ্দেশ্য ছিল যেমন করেই হোক এ শিল্পক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া। তারপর একদিন এলো যখন এই নিউ থিয়েটার্স থেকেই আমি দেড় হাজার টাকা মাইনে পেয়েছি ও নিয়েছি। এখন বাঁধা-ধরা কোথাও নেই, ব'লতে গেলে সব ছবিতেই এখন কাজ করি।

চিত্র-কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে কিছু বলবার আছে কি না, আমার এ হাল্কা প্রশ্নটির উত্তরে তিনি জোর-গলায় বললেন, না, নেই। পরিচালক, প্রযোজক বা অন্য যে কোন কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকেই আমি খুব ভাল ব্যবহার পেয়ে আসছি। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও একটু বললেন—এ লাইনে এসে নিজের আত্মসম্মানের দিকে সর্ব্বদাই আমার বিশেষ নজর রয়েছে। কোন অবস্থাতেই আমি নিজের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হ'তে দিইনি। সে জন্যই বোধ হয় আজও সকলের প্রীতি ও ভালবাসা আমার ক্ষেত্রে অটুট আছে।

আমার প্রশ্ন প্রায় শেষ হয়ে আসছে কিন্তু দেখলুম চন্দ্রাবতী দেবীর তখনও ক্লান্তিবোধ নেই। চলচ্চিত্র সম্পর্কে সাধারণ ভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করবার একটা আগ্রহ ফুটে উঠলো যেন তাঁর চোখে-মুখে। আমিও সুযোগ ছাড়লুম না—শুনতে সুরু করলুম তাঁর নিজস্ব ভাবধারা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলে চললেন—আমাদের দেশে সিনেমার জন্য ভাল কাহিনী প্রায়ই রচিত হয় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রমুখদের ন্যায় কাহিনীকার আজকাল যেন সুদুর্লভ হয়ে উঠেছে। আরও একটি কথা, যে কোন সার্থক চিত্রের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত কম মূলধন নিয়ে যাঁরা প্রযোজক হিসেবে নেমেছেন, তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য তাঁরা যদি একযোগে ছবি তোলেন, তবে বাংলা ছবির অগ্রগতির পথ সুগম হবে। তাঁরাও যেন সর্ব্বাগ্রে ভাল গল্প বা কাহিনী নির্ব্বাচনের বিষয়টি ভুলে না যান। এ শিল্পের মান উন্নয়নের জন্য আরও একটি জিনিষ প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে একটা নিবিড় সংযোগ ও সহানুভূতির ভাব রক্ষা। দেখা গেছে অনেক সময় ছোট কিছু জিনিষের অভাবে চিত্র-নির্ম্মাণের কাজ অযথা পিছিয়ে পড়েছে। সামান্য বেতনভুক্ কর্ম্মীদের উপর অনেক ক্ষেত্রেই নজর দেওয়া হয় না। অথচ চিত্রের সাফল্যের মূলে এদেরও অবদান অনস্বীকার্য্য। যে কোন চিত্রকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে হলে সুর ও সঙ্গীত উন্নত ধরণের নির্ব্বাচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে অনুকরণের কোন মূল্য নেই, সব কিছুই মৌলিক হওয়া চাই। শিল্পী-নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে দর্শকসমাজ তথা জনসাধারণের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়াও বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এ সম্পর্কে জনসাধারণ যদি উদ্যোগী হয়ে সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র মারফত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন তাহলে এ শিল্পের উন্নতির পক্ষে সহায়তা করা হবে—সে বলাই বাহুল্য। চলচ্চিত্র শিল্প আমার প্রাণের জিনিষ, সে জন্যই সুযোগ পেয়ে এতগুলো কথা বললুম।

চন্দ্রাবতী দেবী তখনও বলতে থাকেন, শিক্ষামূলক ছবি, বিশেষ করে ছোটদের উপযোগী ছবির এদেশে একান্ত অভাব রয়েছে। দর্শকদের মনের উপর উৎকৃষ্ট ছবির প্রভাব যথেষ্ট। প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ নির্দ্দেশ করে যদি ছবি নির্ম্মিত হয় তাহলে দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে তার ফলও হবে সুদূরপ্রসারী।

টকির টুকিটাকি

দেখা ছায়া ও কায়া

মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র আমাদের মুগ্ধ করেছে। তাদের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। যেমন মনোজ বসুর 'নবীন যাত্রা', অশোককুমারের 'পরিণীতা,' অমিয়

…চক্রবর্তীর 'পতিতা,' এম, জি, এম-এর 'ক্যুয়ো ভোডিস্' । কলকাতার …টকের মধ্যে শিশির-অহীন্দ্র সম্মেলনে অভিনীত রঘুবীর, …শাহান ও ধীরাজ ভট্টাচার্যের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ।

এম, পি-তে পরিবর্ত্তন

এম, পি-তে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে পরিবর্ত্তনের পালা চলেছে। …বলায় এন. টির পরেই এম. পির নাম। প্রতিষ্ঠানটি যাতে …শিক্ষিত ও অপোগণ্ড কর্ম্মচারীদের বৈঠকখানা হয়ে না ওঠে, …দিকে যে কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টিপাত করেছেন, শুনে আমাদের স্বস্তির …াস পড়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে নয়, বাঙলার ছায়াছবির বাজারে …অজ্ঞ, অপটু ও অশিক্ষিত আদার-ব্যাপারীদের মোড়লী করতে …দেখা যায় প্রচুর। মাসিক বসুমতী আশা রাখে, এম, পি উন্নততর রুচি ও জ্ঞানের পরিচয় দেবে ভবিষ্যতে। ভুলে গেলে চলবে না, বর্ত্তমান বাঙলা ছবির বাজার !

শুভযাত্রায়

আত্মনিয়োগ করেছেন পরিচালক চিত্ত বসু। প্রবোধ মজুমদার …চিত এই মঞ্চ-সফল নাটকটির আবেদন দর্শক-চিত্তে রয়েছে প্রচুর—…বি চিত্রায়ণ আশা করা যায় লোভনীয়ই হবে। বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি রূপশিল্পীকে এ ছবিতে দেখা যাবে। এর পরিবেশনা করছেন ছায়াবাণী লিমিটেড।

বৃত্রাসুর

জে. এম. বোস প্রোডাকসনের প্রথম পৌরাণিক মুখর-চিত্র। ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিয়োয় বিগত জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে সাড়ম্বরে এর মহরৎ-পর্ব সমাধা হয়েছে। বৃত্রাসুর-মহিষীরূপিণী শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর বিজয়-উল্লাসের একটি অভিব্যক্তি এই উপলক্ষে ক্যামেরায় গ্রহণ করা হয়। সমবেত সুধীজনের অনুমতি গ্রহণ করে বিশিষ্ট পরিচালক দেবকী বসু মহাশয় নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও পরিচালক-গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করেন। তাতে জানা যায়, বৃত্রাসুরের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নাট্যকার মন্মথ রায়। পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যাঁর স্কন্ধে তিনি চিত্র-সম্পাদক হিসাবে শুধু বাঙলা নয় সারা ভারতের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি হচ্ছেন অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জি। আর প্রযোজনায় যাঁর নাম লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে তিনিও সর্বভারতীয় কলাকুশলীদের অন্যতম। শব্দযন্ত্রী লোকেন বসু তিনি প্রযোজনার বন্ধুর বর্ত্মে শ্রীযুক্ত বসুর এই প্রথম পদার্পণ—তাঁর প্রয়াস সার্থক হোক, যাত্রা হোক নির্বিঘ্ন !

ওই দিনই

দেবকী বসু প্রযোজিত ও পরিচালিত 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' চিত্রটির স্যুটিং শুরু হয়েছে ক্যালকাটা মুভিটোনে। সম্মানিত অতিথি হিসাবে মহামান্য রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি মহোদয়ের উপস্থিতি সবিশেষ উল্লেখনীয় এ অনুষ্ঠানে। মহামান্য রাজ্যপাল

সমধিক উৎসাহে চিত্রগ্রহণ-পদ্ধতির খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করেন। চৈতন্যদেবের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত বসু দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করবেন এ আশা আমরা অনায়াসে করতে পারি।

সন্তানের কাছে কে বড়ো ?

মা না বাবা? 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' কিন্তু 'পিতুরপ্যধিকা মাতা'—তাই না তিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী! গর্ভধারিণীর বিন্দুমাত্র আশিস্ লাভ করলে পংগুও গিরি উল্লংঘনে সমর্থ হয়, কিন্তু ক'জন আমরা এই জ্বলন্ত সত্যকে স্বীকার করি? আশে-পাশে কতো জনকেই তো দেখতে পাই কী বিসদৃশ আচরণই না করে থাকে মায়ের সংগে। তারা অভাগা সন্দেহ নেই, মা তাদের করুণা করুন! রাধা ফিল্মস এমনই একটি কাহিনী অবলম্বনে বাঙলা ছবি তুলেছেন—'মায়ের আশীর্বাদ'! পরিচালনায় আছেন চন্দ্রশেখর বসু, বিভিন্ন চরিত্রায়ণে মলিনা দেবী, স্মৃতিরেখা, জহর গাঙুলী, বিপিন গুপ্ত, দীপক মুখার্জি, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি। এটি যে-কোনো মুহূর্তে মুক্তি পাবে রূপালি পর্দায়।

অন্তিম আবেদন

ফটো প্লে সিণ্ডিকেটের প্রথম প্রচেষ্টা। মায়াডোর-পরিচালক রঞ্জিত ব্যানার্জি মশাই কয়েক জন বিশিষ্ট কলাকুশলী সমন্বয়ে গড়ে তুলেছেন এই প্রতিষ্ঠানটি। নিজ নিজ বিভাগে সকলেরই পরিশ্রমের শেষ নেই—সবাই ছবিটিকে ত্রুটিহীন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এঁদের এই মনোভাব আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বাঙলা ছবির দুর্দিন এখনো আকাশ-বাতাস মন্থর করে রেখেছে, এখনো শতকরা ৯৭টি ছবি প্রসূতি-গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। কাজেই সাবধানতা যা-কিছু প্রথমেই অবলম্বন করা দরকার। 'আবেদন' এঁদের কাযকরী হোক, শুভকামনা জানাই।

স্বর্গতা প্রভা দেবীর সর্বশেষ চিত্র 'নাগরিক' ছবিটি শীঘ্র মুক্তিলাভ করছে

শেষকালে

দেহ-বিক্রয়! মানুষকে আজ কোথায় নেমে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে তা যদি সবাই ভেবে দেখতো! অভাব-অনটন আজন্ম সহচর ভারতের দুর্ভাগা জনসাধারণের—অক্টোপাশের মত আট হাতের বজ্রমুষ্টিতে শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত শোষণ করে নিয়েছে রক্তচোষা স্বাধীনতা। তাই তো অসহায় মানুষ ভুলে যাচ্ছে নীতিজ্ঞান প্রভৃতি স্বভাবদত্ত সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি! 'দেহ-বিক্রয়' বাণী-চিত্রে এই কথাই বলা হয়েছে।

বিমলা চিত্রপটের

প্রাথমিক প্রস্তুতি দ্রুতগতি সারা হয়ে এসেছে। এঁরা জানাচ্ছেন যে, এঁদের সাধ সীমাহীন হলেও সাধ্য খুবই সংকীর্ণ। তাই প্রথমেই 'কেউটে' ধরতে পারবেন না, 'হেলে' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। এ স্বীকারোক্তিতে আমরা প্রীত হয়েছি। বিজ্ঞাপনের এটা যুগ হলেও হাস্যকর ঘোষণা বিপরীত ফল দিয়ে থাকে। এঁরা যে তা আন্তরিকতার সংগে এড়িয়ে চলেছেন তার প্রমাণ আমরা পেলুম।

আদর্শ হিন্দু হোটেল

এবার টালিগঞ্জে ষ্টুডিয়োর অভ্যন্তরে খোলা হোলো। মঞ্চে যে হোটেল চালু হয়েছে পর্দায় তাকে রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন দিলীপ মুখার্জি। শুভ দিনক্ষণ দেখে বোর্ড টাঙানো হোলো, জন্মাষ্টমীতে হোলো শুভ-সূচনা।

হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা

যে কোনো জিনিসই ভয়াবহ! তথাকথিত অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সত্য দিনের আলোর মতোই ভাস্বর। প্রকৃত আভিজাত্যে যাঁরা অধিকারী তাঁরা কিন্তু নিজেদের প্রচ্ছন্ন রাখতেই সচেষ্ট। 'য়্যারিষ্টোক্রেসী' ছবিটিতে এই সত্যই পরিবেশন করা হয়েছে।

ঝড়

দিলীপ নাগের পরিচালনায় প্রবাহিত হবার অপেক্ষায় ক্যালকাটা মুভিটোনে ঝড়ের স্যুটিং সমাপ্ত-প্রায়।

বোম্বাইয়ে শেষ-রক্ষা অভিনয়

প্রগতিশীল বাঙ্গালী সমিতি বোম্বাইয়ের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। গত চার-পাঁচ মাসের মধ্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী, আন্তর্জাতিক শিশু-দিবস, নজরুল নিরাময় অনুষ্ঠান রবীন্দ্র মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করার পর গত ১৭ই আগষ্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "শেষ-রক্ষা" নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। প্রচণ্ড বর্ষা মধ্যেও দর্শনেচ্ছু শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের এত বেশী সমাগম হয় যে, স্থানাভাবে অসংখ্য দর্শক ফিরিয়া যান। নাট্য পরিচালনা করেন শ্রীদীপক মুখার্জি ও শ্রীগৌতম মুখার্জি সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীহেমন্ত মুখার্জি। পরিদর্শনায় থাকেন শ্রীকণী মজুমদার। অভিনয় করেন শ্রীমণি চ্যাটার্জি, শ্রীদীপক মুখার্জি, শ্রীগৌতম মুখার্জি, শ্রীসুদর্শন শর্মা, শ্রীবাণীকুমার ঘোষ, শ্রীমতী সীতা মুখার্জি, শ্রীমতী আভা চ্যাটার্জী, শ্রীমতী রুমা গাঙ্গুলী, শ্রীমতী গৌরী দেবী ও আরো অনেকে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ডাঃ মোসাদ্দেকের পতন—

ডাঃ মোসাদ্দেকের জয় যখন পূর্ণ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ঠিক সেই সময় গত ১৯শে আগষ্ট (১৯৫৩) রাজকীয় সৈন্যবাহিনী মোসাদ্দেক গবর্ণমেণ্টকে বিধ্বস্ত করায় পরাজয় শুধু ডাঃ মোসাদ্দেকেরই হয় নাই, ইরাণের জাতীয় আন্দোলনেরও চরম পরাজয় ঘটিয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র মধ্য-প্রাচীর দেশগুলিতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের সংগ্রামের উপরেও যে সুদূরপ্রসারী হইবে, সে-সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। ইরাণে রাজকীয় বাহিনীর জয় এবং জাতীয়তাবাদী মোসাদ্দেক গবর্ণমেণ্টের পরাজয়ে মধ্যপ্রাচীর দেশগুলিতে এই ধারণাই সৃষ্ট হইবে যে, শক্তিশালী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয়তাবাদীদের জয় লাভ করা অসম্ভব। কম্যুনিজমের ভয়ে ভীত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদিগণ ইরাণে মোসাদ্দেক গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা হইতে কোন শিক্ষালাভ করিবেন, কতখানি ভরসা করা কঠিন। এক সময়ে আয়াতুল্লা কাসানী, মিঃ হোসেন মাক্কী প্রভৃতি যাঁহারা ডাঃ মোসাদ্দেকের শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন, জাতীয় আন্দোলন সাফল্যের শেষ স্তরে আসিয়া যখন পৌঁছিয়াছিল, সেই সময়ে আন্দোলনের নেতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা জাতীয় আন্দোলনের পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মোসাদ্দেক গবর্ণমেণ্টকে যাঁহারা বিধ্বস্ত করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে আয়াতুল্লা কাসানী ও মিঃ মাক্কীকে নিরস্ত করা যে অত্যন্ত সহজ হইবে, এখন তাঁহারা হয়ত তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু এখন ইরাণের জাতীয় আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন উপায়ই আর নাই। হয় সময় হারাইয়া তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে, না হয় জাতীয়তাবাদের আবরণে তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদেরই সমর্থক ছিলেন। ইহার কোনটি ঠিক সে-কথা হয়ত নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু মোসাদ্দেক গবর্ণমেণ্টকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ইরাণের শাহ যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৫১ সালে ইরাণের তৈলশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পর হইতে শাহ-এর সহিত ডাঃ মোসাদ্দেকের বিরোধ তীব্রতর হইয়া উঠে। [illegible]ন শাহ-এর সমর্থক হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ডাঃ মোসাদ্দেককে সমর্থন করায় শাহ ডাঃ মোসাদ্দেকের সঙ্গে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বরং ডাঃ মোসাদ্দেকই ক্রমে ক্রমে শাহ-এর ক্ষমতাকে খর্ব্ব করিয়া তুলিতেছিলেন। ইরাণকে কম্যুনিজমের হাত হইতে রক্ষা করিতে ডাঃ মোসাদ্দেকই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এবং মার্কিণ তৈল কোম্পানী ইরাণের তৈলখনি ইজারা পাইবে এই আশায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ডাঃ মোসাদ্দেকের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বস্তুতঃ এরেবিয়ান আমেরিকান অয়েল কোম্পানী স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইরাণ যদি সর্ব্বোচ্চ দরে তৈল বিক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে তাঁহারা এ্যাংলো ইরাণীয়ান্ অয়েল কোম্পানী দখল করিবেন। তৈলখনি দখল করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন ইরাণের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উহার বিরোধিতা করায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ পুঁজিপতিরা ইরাণের তৈলখনির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে তো পারিলেনই না, অধিকন্তু উহার জন্য চেষ্টার ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের নীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া তৈল সমস্যা সমাধানের জন্য ইরাণের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, ইরাণ যদি কোন নিরপেক্ষ সালিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃটিশ তৈল কোম্পানীকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে আমেরিকা নগদ মূল্যে ইরাণের সমস্ত মজুত তৈল ক্রয় করিবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিরুদ্ধে ইরাণের জনমত এত প্রবল যে, ডাঃ মোসাদ্দেক উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস পান নাই। এই সময় হইতেই মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ডাঃ মোসাদ্দেকের বিরোধী হইয়া উঠেন, শাহ-এর প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট যে ডাঃ মোসাদ্দেকের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় প্রেঃ আইসেনহাওয়ার কর্তৃক ডাঃ মোসাদ্দেকের অর্থসাহায্যের আবেদন রূঢ় ভাষায় অগ্রাহ্য করার মধ্যে। তিনি অর্থসাহায্যের আবেদন অগ্রাহ্যই শুধু করেন নাই, বৃটেনের সহিত তৈল বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য চাপও দিয়াছেন। তাঁহার এই প্রত্যাখ্যানের অল্প কিছুদিন পরেই ২১শে জুলাই (১৯৫৩) যে মুক্তি-দিবস অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে তীব্র মার্কিণ-বিরোধিতার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইরাণের জনগণের দিক হইতে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের প্রত্যাখ্যান-পত্রের উহাই যে অলিখিত উত্তর, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের মোসাদ্দেক-বিরোধিতা যেমন সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতেছিল, তেমনি মার্কিণ সংবাদপত্রগুলিতে শাহকে সাহায্য করিবার ইঙ্গিতও করা হইতেছিল পরোক্ষ ভাবে। মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহে এইরূপ মন্তব্য করা হইতেছিল যে, ডাঃ মোসাদ্দেক

কার্য্যতঃ শাহকে বন্দিজীবন যাপন করিতে বাধ্য করিতেছেন। এই ইঙ্গিতের অর্থ অনুমান করা খুবই সহজ। শাহকে যদি স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার সুযোগ দিতে হয়, তাহা হইলে ডাঃ মোসাদ্দেককে অপসারিত করা আবশ্যক, ইহাই এই ইঙ্গিতের একমাত্র তাৎপর্য্য।

বাহিরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেমন শাহ্-এর অনুকূল হইয়া উঠিতেছিল তেমনি ভিতরেও ডাঃ মোসাদ্দেকের কয়েকজন শক্তিশালী সমর্থক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শাহ্-এর অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করিতেছিলেন। আয়াতুল্লা কাসানী তাঁহাদের মধ্যে এক জন। প্রধান মন্ত্রী রাজমারার হত্যাকাণ্ডের মূলে তাঁহারই হাত ছিল। ডাঃ মোসাদ্দেকের ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে শাহ গভাম এস সুলতানেকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলে তিনিই ২১শে জুলাই তারিখে তেহরাণে হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া গভাম গবর্ণমেন্টের পতন ঘটাইয়া ডাঃ মোসাদ্দেককে পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসাইয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, সৈন্যবাহিনীর উপর হইতে শাহ্-এর ক্ষমতা বিলোপ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতেও তিনি কম সাহায্য করেন নাই। কিন্তু ইহার পর হইতেই ডাঃ মোসাদ্দেকের সহিত তাঁহার বিরোধের সূত্রপাত হইল। কেন হইল, তাহা আশ্চর্য্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন সরকারী বিভাগগুলি হইতে ডাঃ মোসাদ্দেক দুর্নীতি দূর করিবার জন্য যে চেষ্টা করেন, তাহা লইয়াই বিরোধের উদ্ভব হয়। কাসানী এবং তাঁহার দল দুর্নীতির উর্দ্ধে, একথা স্বীকার করা যায় না। প্রকাশ্যে বিরোধটা রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। কাসানী ডাঃ মোসাদ্দেকের অধিকতর ক্ষমতা দাবীর বিরোধিতা করায় তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং কাসানী ডাঃ মোসাদ্দেকের বিরোধী হইয়া উঠেন। মিঃ হোসেন মাক্কীও কতকটা একই কারণে মোসাদ্দেকের বিরোধী হন। ডাঃ মোসাদ্দেকের আর একজন সমর্থক বাগাই একজন বড় ভূম্যধিকারী। ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা লইয়া ডাঃ মোসাদ্দেকের সহিত তাঁহার বিরোধ সৃষ্টি হয়। ইঁহারা যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট, ইতিপূর্ব্বে তাহার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ কারণেই হয়ত ডাঃ মোসাদ্দেকের বিরোধী হইয়া উঠেন, কিন্তু ফল সমানই দাঁড়াইয়াছিল। মোসাদ্দেকের বিরোধিতা করিয়া তাঁহারা শুধু জাতীয় আন্দোলনেই বিভেদ সৃষ্টি করেন নাই, ডাঃ মোসাদ্দেকের পতনের জন্য গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার ধ্বনি তুলিয়া তাঁহারা কার্য্যতঃ তাঁহাদের সাধারণ শত্রু পাশ্চাত্যে সাম্রাজ্যবাদীদের সহিতই হাত মিলাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা ডাঃ মোসাদ্দেকের এই সকল বিরোধীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ মোসাদ্দেক শাহকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এই অজুহাত তুলিয়া শাহ্-এর অনুকূলে গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫৩) তেহরাণে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহার উদ্যোক্তা ছিলেন আয়াতুল্লা কাসানী। কিন্তু ডাঃ মোসাদ্দেক একাই এই হাঙ্গামার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি বিরোধী মজলিশকে শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে মজলিশকে ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যেই রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

রেফারেণ্ডামের প্রাক্কালে গত জুলাই মাসের (১৯৫৩) শেষ সপ্তাহে শাহ্-এর ভগিনী রাজকুমারী আশরাফ হঠাৎ তাঁহার নির্ব্বাসন হইতে তেহরাণে ফিরিয়া আসেন। গত বৎসর ডাঃ মোসাদ্দেক তাঁহাকে বৃটিশ এজেন্ট বলিয়া ঘোষণা করেন। বিনা অনুমতিতে তেহরাণে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের মূলে যে গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাঃ মোসাদ্দেকের তখন এতই প্রভাব যে, শাহ তাঁহার ভগিনীর এই ভাবে ফিরিয়া আসার কঠোর নিন্দা করিয়া এবং অবিলম্বে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিয়া ইস্তাহার জারী করিতে বাধ্য হন। কিন্তু আশঙ্কা হয়, যে-উদ্দেশ্যে তিনি আসিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ করিয়াই তিনি ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার রেফারেণ্ডাম গ্রহণের ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রবিরোধী বলিয়াই শুধু অভিহিত করেন নাই, তিনি মোসাদ্দেক গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করিবার অভিযোগ উপস্থিত করিয়া শাসাইয়াছেন যে, কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। তাঁহার এই হুমকি কার্য্যে পরিণত করিতে ত্রুটি করা হয় নাই।

মজলিশ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রেফারেণ্ডামে ডাঃ মোসাদ্দেক বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া নূতন নির্ব্বাচনের জন্য ফরমান জারী করিতে শাহকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আগষ্ট মাসের প্রথম দিকেই শাহ্-এর সহিত চক্রান্ত করিতেছিলেন। রেফারেণ্ডামের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার সহিত সমস্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠনের কথাও ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ইহাতে বিপদ গণিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। রাশিয়ার সহিত ইরাণের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইলে ইরাণের তৈল বিক্রয়ের পথে কোন অসুবিধাই থাকিবে না, হয়ত রাশিয়ার সাহায্যে আবাদানের তৈল-কারখানা পুনরায় খোলা সম্ভব হইত। অবিলম্বে ইহা প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উপেক্ষা করিতে পারে নাই। আগষ্টের (১৯৫৩) প্রথম দিকে মার্কিণ জেনারেল Schwartzkopb শাহ্-এর সহিত গোপনে আলোচনা করেন। তিনি ইরাণ গবর্ণমেন্টের অজ্ঞাতসারেই তেহরাণে আসেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ইরাণস্থ মার্কিণ সামরিক মিশনের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তিনি শাহ্-এর সহিত কি চক্রান্ত করেন তাহা পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। মোসাদ্দেক গবর্ণমেন্টের সমর্থক সংবাদপত্র 'বখ্‌তার এমরুজ' মার্কিণ জেনারেল Schwartzkopb এবং শাহ্-এর মধ্যে আলোচনা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকা এবং বৃটিশ ডাঃ মোসাদ্দেককে বাগে আনিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিবার চক্রান্ত করিতেছিল। এই চক্রান্তের ফলেই ১৩ই আগষ্ট তারিখে (১৯৫৩) শাহ জেনারেল জাহেদিকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে গভাম এস্ সুলতানেকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করার অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জেঃ জাহেদিকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করার কোন অর্থই হইবে না, যদি ডাঃ মোসাদ্দেককে গ্রেফতার না করা হয়। সেই জন্যই গত ১৫ই আগষ্ট তারিখ রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় শাহ্-এর রাজকীয় বাহিনী ডাঃ মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করিবার জন্য তাঁহার

গৃহে উপস্থিত হয়। ডাঃ মোসাদ্দেকের কৌশলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঐ সময় শাহ এবং তাঁহার পত্নী কাস্পীয়ান হ্রদের উপকূলস্থিত রামসারে অবস্থান করিতেছিলেন। সামরিক 'কুপ' ব্যর্থ হওয়ায় শাহ পত্নী সহ বিমান-যোগে বাগদাদে চলিয়া যান এবং সেখান হইতে ইউরোপে গমন করেন। জেঃ জাহেদি ঐ সময় পার্ব্বত্য অঞ্চলে লুকাইয়া ছিলেন। সেখান হইতে তিনি শাহ কর্তৃক তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করার ফারমানের ফটো এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদদাতাকে প্রকাশের জন্য প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইরাণস্থ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ হেণ্ডারসন দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর তেহরাণে উপস্থিত হন এবং ডাঃ মোসাদ্দেককে জানান যে, শাহ-এর ফারমানের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার গবর্ণমেণ্টকে আইনসঙ্গত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না।

ডাঃ মোসাদ্দেক পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়াছিলেন বলিয়া ১৫ই আগষ্টের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৯শে আগষ্টের সামরিক অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করা তাঁহার শক্তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। কি ভাবে এই অভ্যুত্থানের আয়োজন করা হইয়াছিল, কি ভাবে এই অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ কিছুই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তবে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, বহু সামরিক অফিসার এবং সৈন্য শাহ-এর পক্ষে যোগদান করিয়াছিল বলিয়াই জেঃ জাহেদির পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইয়াছে। সেনাবাহিনী যেখানে মার্কিণ সামরিক মিশন দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছে, সেখানে অফিসার ও সৈন্যদের উপর আমেরিকার যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। সামরিক বিভাগ নামে ডাঃ মোসাদ্দেকের গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণে আসিলেও কার্য্যতঃ উহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীনেই ছিল। তা ছাড়া কতগুলি উপজাতীয়ের উপরে বৃটিশ-প্রভাব রহিয়াছে। শাহ এক উপজাতীয় সর্দ্দারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। সুতরাং উপজাতীয়রাও এই অভ্যুত্থানে সাহায্য করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না।

১৯শে আগষ্ট (১৯৫৩) মোসাদ্দেক গবর্ণমেণ্টকে উৎখাত করিয়া জেঃ জাহেদি নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। এই নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠনের সংবাদ রেডিও তেহরাণ মারফৎ ঘোষণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল দুই জন মার্কিণ সংবাদদাতাকে। নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর ইউরোপ হইতে শাহ তেহরাণে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেও বিলম্ব হয় নাই। চতুর্থ দফা কর্ম্মসূচী অনুসারে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট ইরাণ গবর্ণমেণ্টকে চলতি অর্থনৈতিক বৎসরে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ডলার সাহায্য দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তা ছাড়া জরুরী অর্থনৈতিক সাহায্য বাবদ দেওয়া হইবে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। মানবতার পরিচয় দেওয়ার জন্য এই বিপুল অর্থ আমেরিকা ইরাণকে খয়রাত করে নাই। ইহার জন্য ইরাণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হইবে। ইরাণ এবার পুরাপুরি ভাবে মার্কিণ ডলার-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ডাঃ মোসাদ্দেকের ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা বলা কঠিন। যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকার বা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইলেও

বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না। কাসানীর নাকি বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে। তিনি হয়ত বিশ্রাম লাভের জন্য নিভৃত স্থানে চলিয়া যাইবেন। তুদে পার্টিকে চরম নিষ্ঠুরতার সহিত দমন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯শে আগষ্ট তারিখে জাতীয় আন্দোলনের সমাধি রচিত হইয়া ইরাণের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আবার স্বাধীনতা-সূর্য্যের উদয় হইবে কি না, তাহা বলা কঠিন। জেঃ জাহেদি এবং শাহ্ ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করিবেন, তাহা এখনও কিছুই বুঝা যাইতেছে না। বিলাতের 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা ২১শে আগষ্ট তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীর পূর্ব্ব অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিলেই পুনরায় গণ-রোষ জাগ্রত হইবে এবং তাহার ফলে পুনরায় হয়ত ডাঃ মোসাদ্দেকের নীতিই জয়যুক্ত হইবে।" উক্ত পত্রিকার এই আশঙ্কা হয়ত একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ইরাণে যে-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কার্যতঃ সামরিক গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা মধ্য-প্রাচীর দেশগুলিতে সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই পক্ষপাতী। রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের হাতে ক্ষমতা থাকা আর সৈন্যবাহিনীর হাতে ক্ষমতা থাকার পার্থক্য সাধারণ মানুষও বুঝে। সেনাবাহিনী যদি সুশিক্ষিত হয়, তাহাদিগকে যদি আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত করা যায় এবং তাহাদের অসন্তুষ্টির যদি কোন কারণ না ঘটে, তাহা হইলে জনসাধারণের অসন্তোষ ও অভ্যুত্থানকে দমন করা কঠিন হয় না।

মরক্কোর সুলতান অপসারিত—

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট চুপি চুপি অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ উপায়ে মরক্কোতে ফরাসী আধিপত্যের শেষ কণ্টক সুলতান পঞ্চম সিদি মহম্মদকে অপসারিত করিয়া তাঁহার খুল্লতাত মৌলে মহম্মদ বেন আরাফাকে সুলতানের গদীতে বসাইয়াছেন। গদীতে বসিয়া নূতন সুলতান ফ্রান্সের সহিত মরক্কোর চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দান করিতে বিলম্ব করেন নাই। নূতন সুলতানকে গদীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর মরক্কোস্থ ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেল জেঃ Guillaume রাবাতস্থ 'টাইমস' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার নিকট বলিয়াছেন যে, প্রাক্তন সুলতান যে-স্বাধীনতা দাবী করিতেছিলেন, তাহা প্রদান করা হইলে মরক্কোতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইত। কারণ, উপজাতীয়েরা এই স্বাধীন গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিত না। বস্তুতঃ পাশা এবং উপজাতীয় সর্দ্দারদিগকে হাত করিয়াই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সুলতান পঞ্চম সিদি মহম্মদকে অপসারিত করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫২) ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইস্তিকলাল দলের ১৪০ জন নেতাকে গ্রেফতার করিয়া বন্দী করেন। ইহাতেও মরক্কোতে আধিপত্য রক্ষা সম্বন্ধে ফ্রান্স নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। ফ্রান্সের দৃষ্টিতে সুলতান পঞ্চম সিদি মহম্মদ এবং তাঁহার পুত্র ইস্তিকলাল দলের সত্যিকার নেতা। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ মনে করা খুব স্বাভাবিক। পঞ্চম সিদি মহম্মদ অনেক সময়েই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তথা ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেলের হুকুম মানিতে অস্বীকার করিতেন, এমনি ইস্তিকলাল দলের স্বায়ত্তশাসনের নিম্নতম দাবীর তিনিও একজন সমর্থক। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে অনেক সময়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত। কাজেই এমন একজন সুলতান তাঁহাদের প্রয়োজন —যিনি নির্ব্বিচারে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হুকুম তামিল করিবেন, স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া ফ্রান্সকে বিব্রত করিবেন না এবং জনগণের স্বাধীনতার দাবীকে দৃঢ়হস্তে দমন করিবেন। পরোক্ষ-ভাবে উপনিবেশ শাসনের এই সুবিধা প্রাক্তন সুলতানের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছিল না। কিন্তু তাঁহাকে অপসারিত করিবার একটা সূত্র চাই। এই সূত্রও সৃষ্টি করিলেন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিজেই।

সুলতান এবং পাশা ও উপজাতীয় সর্দ্দারদের মধ্যে একটা বিরোধ ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিরোধকে সযত্নে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইস্তিকলাল দলের জাতীয় আন্দোলনের ফলে এই বিরোধ কার্য্যকরী হইতেছিল না। ইস্তিকলাল দলকে দমন করিবার পর অবাঞ্ছিত সুলতানকে অপসারিত করার পথ অনেকটা সহজ হইয়া গেল। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার আশঙ্কায় সোজাসুজি তাঁহারা সুলতানকে অপসারিত করিতে পারেন নাই। প্রথমে সুলতানের উপর চাপ দিয়া তাঁহার শাসন-পরিচালন-ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা উজীর ও ডিরেক্টরদের পরিষদের উপর অর্পণ করিয়া এক ডিক্রি তাঁহার দ্বারা দস্তখত করিয়া লওয়া হয়। অতঃপর ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় ২৫০ জন পাশা এবং কাইদ সুলতানকে অপসারণের জন্য এক দরখাস্ত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন এবং মারাকেশের পাশা হুমকী দিতে থাকেন যে, তিনি জোর করিয়া সুলতানকে অপসারিত করিয়া গদী দখল করিবেন। প্রথমে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে পাশা এবং উপজাতীয় সর্দ্দাররা মিলিয়া সুলতান পঞ্চম সিদি মহম্মদকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার খুল্লতাত মৌলে মহম্মদ বেন আরাফাকে বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইহা ১৫ই আগষ্টের (১৯৫৩) ঘটনা। ইহার পর ২০শে আগষ্ট তারিখে সুলতানকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং মৌলে মহম্মদ বেন আরাফাকে নিযুক্ত করা হয় মরক্কোর সুলতান।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আরব-এশীয় দল মরক্কোর সুলতানকে অপসারিত করিতে ফ্রান্সের মতামতের কথা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা ব্যতীত তাঁহাদের করিবার কিছুই ছিল না। সুলতানকে অপসারিত করার পর বিষয়টি নিরাপত্তা-পরিষদে উত্থাপন করিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন। ফ্রান্স এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রস্তাবটি নিরাপত্তা-পরিষদের কর্ম্মসূচীভুক্ত হওয়ার জন্য যে সাতটি ভোট প্রয়োজন, উহার অনুকূলে তাহা হয় নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। ইহার কারণ বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মরক্কো-সমস্যা সম্পর্কে নিরাপত্তা-পরিষদে আলোচনা করিতে রাজী নয়। মরক্কোর সামরিক ঘাঁটিগুলি ফ্রান্স মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ইজারা দিয়াছে। কাজেই পৃথিবী হইতে কম্যুনিজমের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত মরক্কো ফ্রান্সের দখলে থাকা প্রয়োজন। ইস্তিকলাল দল এবং প্রাক্তন সুলতানের বিরুদ্ধেও কম্যুনিজম-প্রীতির অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা না দেওয়ার পক্ষে কম্যুনিজম একটা শক্তিশালী যুক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

বৃটেনের পক্ষেও ফ্রান্সকে সমর্থন করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। মালয়ে, কেনিয়ায়, নাইজেরিয়াতে, মধ্য-আফ্রিকায় বৃটেন অবাধে দমননীতি চালাইয়া যাইতেছে। মরক্কো সমস্যা যদি এবার নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৃটেনের উপনিবেশ মালয়, কেনিয়া প্রভৃতির সমস্যা লইয়াও নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার দাবী উপাপিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই জন্যই মরক্কো সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হওয়া সম্ভব হইল না।

কেনিয়ায় বৃটিশ শাসন—

কেনিয়ায় বৃটিশ দমন-নীতি বর্ত্তমানে কি ভাবে চলিতেছে, সে-সম্পর্কে কোন সংবাদই আমাদের দেশে প্রকাশিত হইতেছে না। মাউ মাউ সমস্যা সমাধানের জন্য যে নীতি গৃহীত হইয়াছে, তাহা মালয়ে গৃহীত নীতিরই কেনিয়া সংস্করণ মাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে কেনিয়ায় নূতন বাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। প্রায় ১ হাজার ৪ শত কিকুয়ুকে নৈরবি হইতে কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী আঠি নদীর তীরে কতকগুলি ক্যাম্পে আটক রাখা হইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ করা হইলেও বিচারের জন্য আদালতে উপস্থিত করা হইতেছে না। প্রমাণের অভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদিগকে গোঁড়া সন্ত্রাসবাদী বলিয়া মনে করা হইয়াছে তাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে অন্যত্র। ভূমিসংস্কারের একটা চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়াও প্রচার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিজের দেশের জমিগুলির অধিকাংশই যদি শ্বেতকায়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়, তাহা হইলে কিকুয়ুদের উত্তরাধিকার প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের জমির অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়।

গত ২৬শে আগষ্ট (১৯৫৩) কেনিয়ার ইউরোপীয়দের এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, এশিয়া হইতে লোক আর কেনিয়ায় বসবাস করিবার জন্য আসিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু আগামী পাঁচ বৎসরে ৩০ হাজার ইউরোপীয়কে বসবাসের উদ্দেশ্যে কেনিয়ায় আসিতে দেওয়া হইবে। এই ৩০ হাজার ইউরোপীয়দের জন্য জমির অভাব হইবে না। কারণ, কিকুয়ুদিগকে বঞ্চিত করিয়া শ্বেতকায়দের জন্য বহু জমি পতিত রাখা হইয়াছে। এই জমিতে ইউরোপীয়রা আসিয়া বাস করিবে এবং চাষ-আবাদ করিবে। কিন্তু জমি পাইবে না শুধু কিকুয়ুয়েরা। এই ভাবে এক দিকে দমন-নীতি চালাইয়া আর এক দিকে নূতন নূতন শ্বেতকায় আমদানি করিয়া কেনিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন মতে কেনিয়া অন্যতম একটি স্বাধীন দেশ!

কোরিয়া শান্তি-সম্মেলন—

কোরিয়া শান্তি-সম্মেলনে ভারতের স্থান হইল না। মিঃ ডালেস মার্কিণ লিজিয়নের সম্মুখে সেণ্ট লুই দিবস উপলক্ষে বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কোরিয়া-যুদ্ধে জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্য-দেশের সহিত সৈন্য প্রেরণ না করার মূল্য হিসাবেই কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলন হইতে ভারত বাদ পড়িয়াছে। ভারতকে বাদ দিবার ইহাও যে একটি কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, প্রধান কারণ ডাঃ সিংম্যান রীর আপত্তি। তিনি কোরিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনে

ভারতকে স্থান দেওয়ার ঘোর বিরোধী। হয়ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই তাহার বিরোধিতাকে শক্তিশালী করিবার জন্যই ভারতের বিরোধিতা করিবার জন্য ডা: সিংম্যান রীকে উস্কাইয়া দিয়াছিল। ইহা মনে করিবার প্রধান কারণ এই যে, রাজনৈতিক সম্মেলনে ভারতকে গ্রহণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিবার জন্য, এবং অন্তত: ভোট দানে বিরত থাকিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের উপর প্রবল চাপ দিয়াছিল। রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতকে গ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাহারা ভোট দিয়াছিলেন এবং কাহারা ভোটদানে বিরত ছিলেন তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে ভারতকে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল বৃটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড। রাজনৈতিক কমিটিতে গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে এ প্রস্তাবটি সম্পর্কে যখন ভোট গ্রহণ করা হইল তখন দেখা গেল, প্রস্তাবের পক্ষে হইয়াছে ২৭ ভোট এবং বিপক্ষে হইয়াছে ২১ ভোট এবং ১১টি রাষ্ট্র ভোট দিতে বিরত ছিলেন। প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হইতে হইলে উহার অনুকূলে অন্তত: দুই-তৃতীয়াংশ ভোট হওয়া প্রয়োজন। প্রস্তাবের পক্ষে ঐ পরিমাণ ভোট না হওয়ায় উহা গৃহীত হইয়াও কার্য্যত: অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। সাধারণ পরিষদে ভোটের ফল যে অনুরূপ হইতে তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। কারণ সাধারণ পরিষদের যাঁহারা সদস্য তাঁহাদের সকলকে লইয়াই গঠিত হইয়াছে রাজনৈতিক কমিটি। সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে ভারতের পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করা হয় এবং প্রস্তাবের উত্থাপয়িতাদের পক্ষ হইতে নিউজীল্যাণ্ড প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন।

কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে ভারতকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কমিটিতে নিম্নলিখিত ২১টি দেশ ভোট দিয়াছিল :—বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, চীন, কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, কিউবা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়াডর, এল সালভাডর, গ্রীস, হাইটি, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া, পাকিস্তান, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে এবং ভেনেজুয়েলা।

নিম্নলিখিত ১১টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল :—আর্জেণ্টিনা, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, আইসল্যাণ্ড, ইস্রাইল, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, তুরস্ক এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা।

ল্যাটিন আমেরিকার ১৪টি দেশ একযোগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতকে গ্রহণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রাজিল প্রথমে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াও আমেরিকার চাপে ভারতের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। এশিয়ার যে-সকল দেশ ভারতকে গ্রহণের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে তন্মধ্যে কুয়োমিণ্টাং চীনের কথা কিছু না বলাই ভাল। করাচী হইতে নির্দ্দেশ পাইয়া পাকিস্তানও ভারতের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই যে করাচী হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে আমরা অনুমান করিতে পারি। পাকিস্তানের এই ভোটটি আমেরিকার নিকট হইতে খাদ্য-সাহায্য পাওয়ার মূল্য হইলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। এশিয়ার চারিটি দেশ ইস্রাইল, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন এবং তুরস্ক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার জন্যই যে ভোট দানে বিরত ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অন্যান্য ভোট সম্পর্কে কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সকল দেশ কোরিয়া যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে তাহারাই শুধু রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবে। তাহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক কমিটিতে এবং সাধারণ পরিষদে ১৫টি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবই দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবের সমর্থক। এই প্রস্তাবে কোরিয়া যুদ্ধে যে-সকল দেশ সৈন্যপ্রেরণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই শুধু রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলন যে রাজনৈতিক পানমুনজমে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তাহাই চায়। রাজনৈতিক সম্মেলনে রাশিয়ার যোগদান সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সর্ত্ত আরোপ করিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট পক্ষ যদি চায় তবে রাশিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করিতে পারিবে। রুশ প্রতিনিধি ম: ভিসিনস্কী এই সর্ত্তের বিরোধিতা করিয়া ব্যর্থকাম হন। রাশিয়ার প্রস্তাবটি ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক সম্মেলনে রাশিয়ার যোগদান সংক্রান্ত সর্ত্ত-কণ্টকিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ-কোরিয়া প্রস্তাব করিয়াছিল যে, ভারত যদি কম্যুনিষ্ট পক্ষের মনোনয়ন পাইয়া রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করে, তবে তাহার কোন আপত্তি নাই!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের অনুরোধেই কোরীয় শান্তি সম্মেলনে ভারতকে গ্রহণের প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হইয়াছে। সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীভি· কে· কৃষ্ণমেনন ঘোষণা করেন যে, উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে জোর চাপ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক সম্মেলনে ভারতকে গ্রহণের প্রস্তাব লইয়া সমস্যা দেখা দেয় তাহা তিনি চান না এবং এই কারণেই প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হইলেই তিনি আনন্দিত হইবেন। অতঃপর প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হয়। প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত না হইলেও ভোটের ফল রাজনৈতিক কমিটির ভোটের ফল হইতে স্বতন্ত্র হইত তাহা অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। অর্থাৎ প্রস্তাব গৃহীত হইলেও ফল হইত হারিয়া যাওয়া। কিন্তু তাই বলিয়া ভারত প্রস্তাবটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করিল কেন, তাহা সত্যই রহস্যময় ব্যাপার! শ্রীমেনন বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের পক্ষ হইতে ভারতের উপর কোন চাপ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রস্তাবটি প্রত্যাহারের পূর্ব্বদিন রাত্রে বৃটিশ প্রতিনিধি গ্ল্যাডউইন জেব এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য মুখপাত্রও মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ হেনরী ক্যাবট লজ সাধারণ পরিষদের সভাপতি মিঃ পিয়ার্সনের সহিত এক সম্মেলনে মিলিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমেননও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কোরীয় সম্মেলনে ভারতকে গ্রহণের প্রশ্ন লইয়াই এ সম্মেলনে আলোচনা হয়। সম্মেলনের ফলাফল জানা না গেলেও ভারতকে লইয়া ইঙ্গ-মার্কিণ মতবিরোধ আর যাহাতে বেশী দূর না গড়ায়, তাহার জন্য প্রস্তাবটি
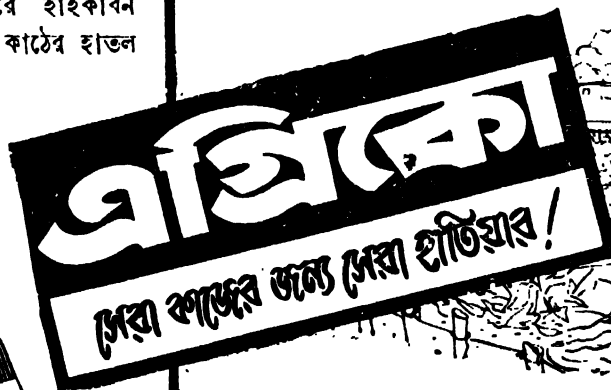
প্রত্যাহারের জন্য ভারতের উপর চাপ দেওয়া হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

ভারত প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করায় মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ লজ এত খুশী হইয়াছেন যে, মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া শ্রীমেননকে 'মহান্ জাতির মহান্ নেতার প্রতিনিধি' বলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "It is a kind of spirit which gives us hope for the future." অর্থাৎ 'এই মনোভাব আমাদিগকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করিয়াছে।' কোরীয় শান্তি-সম্মেলনে মহান্ জাতিকে গ্রহণের বিরোধিতা করিয়া এবং তাহাতে সাফল্য লাভ করিবার পর মিঃ লজ ভারতের যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে কাটা ঘায়ে নুণের ছিটাই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে-ভাবে কোরীয় রাজনৈতিক সম্মেলন গঠিত হইয়াছে তাহাতে উহার পরিণাম কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা অপেক্ষা বহু গুণে গুরুতর।

শ্রীমেনন প্রস্তাব প্রত্যাহারের কারণ বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, "যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উপযুক্ত পরিবেশ রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই ভারত তাহার নাম প্রত্যাহার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।" কিন্তু শ্রীমেননই কি ইতিপূর্ব্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে স্মরণ করাইয়া দেন নাই—প্রতিনিধিত্ব শুধু সশস্ত্র দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে শান্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট হইবে? ভারতের নাম প্রত্যাহার করায় শান্তির সম্ভাবনা সত্যই বৃদ্ধি পাইল বলিয়াই কি তিনি মনে করেন? তবে ভারতের উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে খুব খুশী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোরীয় শান্তি-সম্মেলনে একদিকে থাকিবেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে-সকল সদস্য কোরিয়া যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিনিধিরা, অপর পক্ষে থাকিবেন কম্যুনিষ্ট দেশগুলির প্রতিনিধিরা। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা পর্য্যন্ত ২৭শে আগষ্ট তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে উহার ফল ভাল হইবে না।...কোরিয়াতে আক্রমণ প্রতিরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু বিরোধের কারণ এখনও দূর হয় নাই। ফলে যুদ্ধের আশঙ্কা এখনও রহিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেই শান্তিপ্রতিষ্ঠার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি কেবল একটি যুধ্যমান পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বৃহত্তর নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে অনেক বিলম্ব হইবে; বিশেষতঃ যদি কোরীয় সম্মেলন ব্যর্থ হয়।" কোরীয় শান্তি সম্মেলন যে ব্যর্থ হইবে, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সিংম্যান রী বলিতেছেন, কোরীয় সম্মেলন ব্যর্থ হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়টাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ডাঃ রী শান্তি-সম্মেলন ব্যর্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

সমগ্র কোরিয়ায় ডাঃ রীর এবং চীনে চিয়াং কাইশেকের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কম্যুনিজমের অগ্রগতি রোধ হইয়াছে বলিয়া মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট মনে করিবে না। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার আর সম্ভাবনা থাকিবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তর-কোরিয়া যাহা রক্ষা করিতে পারিয়াছে শান্তি সম্মেলনে তাহাই তাহারা ডাঃ রীর হাতে তুলিয়া দিবে ইহা আশা করা অসম্ভব। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি চায় যে, ডাঃ রীর অধীনেই অখণ্ড কোরিয়া গঠন করিতে হইবে, তাহা হইলে উত্তর-কোরিয়াও দাবী করিতে পারে যে, উত্তর-কোরিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনেই অখণ্ড কোরিয়া গঠন করিতে হইবে। এই অবস্থায় সম্মেলন ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অবশ্য অখণ্ড কোরিয়া গঠনের জন্য গণভোট গ্রহণের প্রস্তাবও উত্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু কাহার নেতৃত্বে গণভোট পরিচালিত হইবে? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে একটি যুযুধান পক্ষের প্রতিনিধিতে পরিণত করিয়াছে। কাজেই নিরপেক্ষতার বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করিবার কোন অধিকার তাহার থাকিতে পারে না। এই অবস্থায় শান্তি সম্মেলনের উপর ভরসা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু উহার ব্যর্থতার পরিণাম যদি তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম হয়, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সাধারণ নির্ব্বাচন—

গত ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) তারিখে অনুষ্ঠিত পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সাধারণ নির্ব্বাচনে ডাঃ এডেন্যুয়েরের ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন পার্টির একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া জয়লাভ অপ্রত্যাশিত ছিল বলিয়া মনে করিবার যেমন কোন কারণ নাই, তেমনি প্রকৃতপক্ষে ইহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জয় লাভ ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর ভোটদাতারা শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন হইলেও নির্ব্বাচন স্বাধীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এ কথাও বলা যায় না। এই অভিযোগ যে শুধু সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী হইতেই করা হইয়াছে তাহা নয়। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলও এই অভিযোগ করিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা যে এই নির্ব্বাচনের ফলাফল নির্দ্ধারিত হয় নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মার্কিণ বাহিনী এখনও পশ্চিম-জার্ম্মাণীর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে, নির্ব্বাচনের ব্যাপারে এই সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না। নির্ব্বাচনের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডুলেস এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ডাঃ এডেন্যুয়েরের কোয়ালিশন দলের পরাজয় ঘটিলে জার্ম্মাণীর সর্ব্বনাশ হইবে। ইহা যে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সাধারণ নির্ব্বাচনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ইটালীর নির্ব্বাচনেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু ইটালীর নির্ব্বাচনের ফলাফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সিগনর ডি গ্যাসপারির পক্ষ কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীতেও অনুরূপ অবস্থা যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোন চেষ্টাই বাকী রাখে নাই। তা ছাড়া ফ্রান্স ও ইটালীর ন্যায় শাসক পার্টি যাহাতে অধিক সংখ্যায় আসন দখল করিতে পারে তদনুযায়ী করিয়া পশ্চিম-জার্ম্মাণীতেও নির্ব্বাচন আইন সংশোধন করা হইয়াছে। স্বয়ং এডেন্যুয়েরও হীন পন্থা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। বনের আদালত তাঁহার উপর এই নির্দ্দেশ জারী করিয়াছিলেন যে, সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতাদিগকে কম্যুনিষ্টরা ঘুষ দিয়াছে, এইরূপ প্রচার-কার্য্য তিনি করিতে পারিবেন না।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীর পার্লামেণ্টের মোট ৪৮৭টি আসনের মধ্যে ডাঃ এডেন্যুয়েরের ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দল ২৪৪টি আসন দখল করিয়াছে। এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেও উহা মাত্র একটি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার

বিষয় যে, বিগত নির্ব্বাচন অপেক্ষা এই নির্ব্বাচনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন বেশী সংখ্যক আসন দখল করিয়াছে। সোশ্যাল ডেমোক্রাট পার্টি দখল করিয়াছে ১৫০টি আসন। তা ছাড়া ফ্রি ডেমোক্রাট দল ৪৮টি, জার্ম্মাণ পার্টি ১৫টি, রিফিউজি ব্লক ২৭টি এবং সেণ্টার পার্টি ৩টি আসন দখল করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি, নিও নাৎসী, রাইস পার্টি, বেভেরিয়ান পার্টি এবং অল জার্ম্মাণ পার্টি একটি আসনও দখল করিতে পারে নাই। ডাঃ এডেন্যায়ুরকে যে পূর্ব্বের ন্যায় কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টই গঠন করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রশ্ন লইয়া এই সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিনি জয়লাভ করিয়াছেন তাহাই বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের প্রশ্ন লইয়াই এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করণ এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ কর্ত্তৃক রাশিয়ার উপর চাপ প্রদানই ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের উপায়, ডাঃ এডেন্যায়ুর এই নীতির সমর্থক। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছুক, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা পুনরস্ত্রসজ্জার সমর্থক নহেন। ডাঃ এডেন্যায়ুর জয়লাভ করায় ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে তাঁহার নীতিই জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের সম্ভাবনা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে রাশিয়ার সর্ব্বশেষ প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া এই নির্ব্বাচনে কি ভাবে হইয়াছে, তাহা অনুমান করা খুব সহজ নয়। গত জুলাই মাসে (১৯৫৩) ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের সম্মেলনে সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার প্রশ্ন আলোচনার জন্য এক সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। তদনুসারে রাশিয়াকে যে আমন্ত্রণ করা হয় রাশিয়া তাহা সর্ত্তাধীনে গ্রহণ করে। রাশিয়া দাবী করে যে, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য আলোচনা ঐ সম্মেলনের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং এই সম্মেলনে কম্যুনিষ্ট চীনের যোগদানও একান্ত প্রয়োজন। অতঃপর ৮ই আগষ্ট (১৯৫৩) মঃ ম্যালেনকভ সুপ্রীম সোভিয়েটে বক্তৃতায় জার্ম্মাণীকে নিউট্রেলাইজ করিবার দাবী করেন এবং তিনি আরও জানান যে, সোভিয়েট রাশিয়াও হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিয়াছে। ইহার পরই গত ১৬ই আগষ্ট ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের জন্য রাশিয়া যে নূতন প্রস্তাব করে, তাহাতে পশ্চিমী শক্তিবর্গও আশ্চর্য্যবোধ না করিয়া পারেন নাই। উহাতে ছয় মাসের মধ্যে জার্ম্মাণী সম্পর্কে শান্তি-সম্মেলন আরম্ভ করিবার এবং ইতিমধ্যে অস্থায়ী নিখিল জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং সমগ্র জার্ম্মাণীতে স্বাধীন নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার কয়েক দিন পরেই ২০শে আগষ্ট রাশিয়া ঘোষণা করে যে, সে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে।

রাশিয়া চায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন করিতে। জার্ম্মাণীকে নিউট্রেলাইজড রাখিতে হইবে ইহাই ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনে রাশিয়ার সর্ত্ত। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট তথা ডাঃ এডেন্যায়ুর চান পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিয়া এবং ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর চাপ দিয়া ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন করিতে হইবে। রাশিয়ার প্রস্তাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাজী হইবে না। ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র জার্ম্মাণীর পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে যোগদান রাশিয়া সমর্থন করিবে না। কাজেই কবে এবং কি ভাবে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠিত হইবে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

-সাহিত্য পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

ভাব ও ছন্দ—শ্রীসজনীকান্ত দাস। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য আড়াই টাকা।

কলকাতা কাল্‌চার—কালপেঁচা। বিহার সাহিত্য ভবন লিমিটেড, ২৫।২, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪। মূল্য চার টাকা আট আনা।

মহাভারতী—শ্রীমন্মথ রায়। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

আঁখিতে রহ গো—শ্রীআশীষ গুপ্ত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

নিশ্চেতন মন—শোভা দুই। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

পরাভূত দেবতা—অনুবাদক শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত। প্রাচী প্রকাশনী, ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মাও সে তুঙ—শ্রীসুপ্রকাশ রায়। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

সুন্দরবনে সাত বৎসর—শ্রীভুবনমোহন রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিটি বুক সোসাইটী, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

রথচক্র—শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা

নয়াচীনে যা দেখেছি—শ্রীমঞ্জুশ্রী দেবী। প্রগতি প্রকাশনী, ২, পাম প্লেস্, কলিকাতা-১৯। মূল্য এক টাকা চার আনা।

ইতিহাসের নাটক—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য বারো আনা।

অনেক স্বর্গ—শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দেড় টাকা।

মহারাজা নন্দকুমার—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য এক টাকা।

মনুসংহিতায় বিবাহ—শ্রীঅমলকুমার রায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দেড় টাকা।

কলিযুগের গল্প—শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী। প্রগতি প্রকাশনী, ১৫।২, জমির লেন, কলিকাতা-১৯। মূল্য দুই টাকা।

সময় ও সাহিত্য—শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভাতের হাঁড়িতে, পূজার কাপড়ে, চায়ের পেয়ালায় !

"গোদের উপর আবার বিষফোঁড়া গজাইয়াছে। সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ হইতে এক দল প্রতিনিধি আমাদের ডালহৌসীর প্রসিদ্ধ মন্ত্রী-ব্যারাকে ডাঃ রায় ও কৃষ্যাদ্য-মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা আবদার ধরেন—রেশনে পচা বর্ম্মী চাউল বিতরণ চলিবে না ; রেশনে সাত আনা দরে ভাল চাউল ও অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে ১২৲ টাকা মণ দরে তণ্ডুল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রীপ্রফুল্ল সেন নাকি বিদেশে কেনা চাউলের দরের যুক্তিতে ঐ পচা বর্ম্মী চাউল কোন গতিকে চক্ষু মুদিয়া গলাধঃকরণ করার সৎপরামর্শ দিয়াছেন। সত্যই তো ! হেমন্ত বাবু ও সুরেশ বাবু প্রভৃতির কি মাথা খারাপ হইয়াছে ? ডাঃ রায় ও শ্রীপ্রফুল্লের কি জমিদারী আছে যে, তালুক মুলুক বিকাইয়া ভাল চাল সস্তা দরে যোগাইবেন ? বামপন্থী নেতারা সদা-পরিকল্পনা-ব্যস্ত মন্ত্রীদের প্রতি এত বাম ও নির্দ্দয় হইলে চলিবে কেন ? পচা ও কাঁকরমণি চাউল খাইয়া তো মানুষ বাঁচে, দু' দিন না হয় আমাশয়ে ভুগিবে। তাহাতে উপবাসই পথ্য, সুতরাং সরকারের ও দুঃস্থ গৃহস্থের ডবল লাভ ;...সরকারের পচা রেশন বাঁচিল এবং গৃহস্থের শূন্য পকেটে হাত পড়িল না। দার্জ্জিলিং-এর চা-শ্রমিকদেরও মাথা নাকি খারাপ হইয়াছে। তাহারা বেতন ১৲ টাকা ৬ পাইয়ের জায়গায় ২৲ টাকা ৫ আনা ১ পাই চায় এবং ১৭।৹ টাকা মণের চাউলের বদলে নাকি ১৩৲ টাকা ৪ আনা দরের চাউল খাইবার আবদার ধরিয়াছে। এক বৎসর ধরিয়া বন্ধ ৬টি চা-বাগানের শ্রমিকরা নাকি চায়ের পাতা তুলিয়া হাতে তৈয়ারী করিয়া বাজারে ছাড়িতেছে। তাই তাহাদের পিছনে পুলিস লাগিয়াছে। অধিক চা-বাগানে ধর্ম্মঘট, লক-আউট, পুলিস মোতায়েন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব পর্ব্বই হইয়া চুকিয়াছে। ভাতের হাঁড়িতে, পূজার কাপড়ে, চায়ের পেয়ালায়... সর্ব্বত্র সাম্যবাদগন্ধী তুফান। এখন উপায় ? আমাদের বিশ্বাস, যত নষ্টের গোড়া গোটা কয়েক প্রতিরোধ কমিটির ঐ চাই সুরেশবাবু ও হেমন্ত ভায়াই। হাতের কাছে নয়াচীন ও মস্কো নাই, আছেন উঁহারাই। উঁহাদের ধরিয়া মোটা ভাতা ও আটক-বৃত্তি দিয়া লালবাজারী বস্তায় ভরা হউক। আর কেহ তাহা হইলে লোক ক্ষেপাইবে না। ডাঃ রাধাবিনোদ পালের মত আর যে দু'-এক জন এখনও আছেন, তাঁহাদের তোয়াজ করিয়া কংগ্রেসী টিকিটে খাড়া করিয়া দিলেই চলিবে। 'Everything is fair in love and war'—'প্রেম ও যুদ্ধঘটিত 'ব্যাপারে সবই বৈধ'।"

—দৈনিক বসুমতী।

নয়াদিল্লীর জাতীয় ষ্টেডিয়ামে বাঁদর নাচ

"নয়াদিল্লীর জাতীয় ষ্টেডিয়ামে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের অধিনায়কত্বে পার্লামেণ্টের সদস্যগণের দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। ইহা খেলাধূলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। দর্শকগণ 'মজা' দেখিবার আশায় খেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। দুই দিন আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলা দেখিয়া তাঁহারা 'মজা' সম্পর্কে হতাশ হইয়াছেন। খেয়াল-খুসীর খেলা একেবারে রীতিমত খেলা হইয়াছিল। অবশ্য তাহাতে হর্ষ-কৌতুকেরও অভাব হয় নাই। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে জওহরলালজী ব্যাট করিয়াছেন, বল দিয়াছেন এবং দর্শনীয় ভাবে একটি ক্যাচ ধরিয়া নিজ মন্ত্রীদপ্তরের একজন উপমন্ত্রীকে আউট করিয়া দিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী নেহরু ও কম্যুনিষ্ট নেতা গোপালন একসঙ্গে খেলিয়া সকলের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। গোপালন একটি বল বাউণ্ডারীতে পাঠাইলে খেলা আরও জমিয়া উঠে। সর্দার সুজিত সিং মাজিথিয়া প্রথম দিনের কৃতিত্ব দ্বারা সকলকে তাক্ লাগাইয়া দেন এবং পরদিন এক রানে আউট হইয়া ক্রিকেটের প্রবাদোক্ত বিস্ময় অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভোপালপুর প্রথম দিন সকলকে হতাশ করিয়া পরদিন করতালি লাভ করেন। শ্রীযুত হারীন চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতায় বেতার ভাষ্য প্রচার করিয়া শ্রোতার আসর জমাইয়াছিলেন। যাঁহারা খেলা দেখিবার জন্য টিকেট কিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের আপশোষ করিতে হয় নাই। দর্শকগণ খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের টাকা উশুল হইয়াছে। একমাত্র ডাঃ রাধাকৃষ্ণনকে অন্ততঃ এক ওভার খেলিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি হাসিয়াই বলিয়াছেন, "বাঁদর নাচার মধ্যে আমি নাই।" —যুগান্তর।

তমলুকের পথ

"পশ্চিমবাংলার দারিদ্র্যক্লিষ্ট কৃষক সমাজের চরম দুঃসময়ের দুইটি মাস সম্মুখে হাঁ করিয়া আছে। সংসারের শেষ সম্বল, এমন কি ঋণ করার শেষ সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত জমিতে ঢালিয়া নূতন ফসলের আশায় বুক বাঁধিয়া থাকার এই দুইটি মাস। আবাদে আগাছার আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া নূতন ফসলের উন্মেষ ও সৃষ্টির জন্য চাই মেহনৎ ও টাকা। বছরের শেষ প্রান্তে ঘরে খোরাক থাকা কৃষকের সংখ্যাল্পতা স্বয়ং সরকারেরও অজানা নহে। তাঁহাদের সকলের জন্যই চাই দু'মুঠা খাদ্য। সরকারকেই জোগাইতে হইবে এই খাদ্য ও অর্থ। কিন্তু কৃষকদের প্রতি যথাসম্ভব বঞ্চনা এবং শহরবাসীর জন্য রেশন হ্রাস, বেশি দর প্রভৃতি বিষচক্রের আবর্ত্তে জড়াইয়া ক্রমে খাদ্য দিবার

সরকারী দায়িত্বকে পুরাপুরি ভাবে গুটাইয়া ফেলাই মন্ত্রীদের বিঘোষিত নীতি। কৃষকদের প্রতি বঞ্চনার কথা মন্ত্রীরা জোর-গলাতেই প্রচার করিয়া থাকেন। রেশনে পৌনে ষোল টাকায় চাউল দিয়া যে-সরকার নিজেই দেশবাসীর ক্রয়-ক্ষমতার একটি মান নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারাই গ্রামে ২৫৲ টাকা চাউলের হিসাব দেখাইয়া এখন খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, তাঁহাদের নির্লজ্জতার সীমা কোথায়? কংগ্রেসী সরকারের সর্ব্বত্র প্রসারমান এই খাদ্য-অস্বীকারের নীতিকেই আঘাতের পর আঘাতে গুঁড়া করিয়া দিয়া জনসাধারণের প্রাণধারণের লড়াইকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। তমলুকের মানুষ দেখাইয়াছেন সেই পথ। গ্রাম ও শহরের সুদৃঢ় গণশক্তি শাসকদের আসন কাঁপাইয়া তুলিয়া অগ্রসর হইবে সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে। তমলুক পথ দেখাইয়াছে। মেদিনীপুরের বীর কৃষক ভাই-বোনকে অভিনন্দন জানাইবেন সারা দেশ। তমলুকের আলো ছড়াইয়া পড়িবে প্রতিটি গ্রাম ও শহরে। রাজধানী কলিকাতার মন্ত্রীদের দপ্তর কাঁপাইয়া দিবে পশ্চিমবাংলার মানুষ। খাদ্য দিতে অস্বীকার করিয়া যদি আঁকড়াইয়া থাকার বর্ব্বর যুগের অবসান ঘটাইবে।"

—স্বাধীনতা।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জন্ম-স্মৃতি-বার্ষিকী

"আমাকে লিখতে হচ্ছে অসুস্থ শরীর নিয়ে। কারণ আমাকে নাকি সভাপতি করেছে রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার পরিচালক সমিতির। হাসি আসে, এত জ্ঞানী-গুণী থাকতে আমাকে সভাপতি করার কথা বিবেচনা করে। বোধ হয় ছোট ছোট ছেলে আর যুবক সদস্যদের মধ্যে বয়সে বড় বলেই। সাত-আট বছর থেকে চেষ্টা করছি রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি উৎসবকে জোরাল করে তুলতে। আট-দশ জনের বেশী লোক সভাতে উপস্থিত দেখি না। দুঃখ হতো এত বড় মানুষের তাঁর নিজের দেশে এই সম্মান দেখে। তখনই মনে হতো দীপের নিচেই অন্ধকার। ক্রমশঃ একটা মানুষের মত মানুষের সাহচর্য্যে এলাম। তাঁর পরিচয়ে এসে বুঝলাম রামেন্দ্র-সুন্দরকে বোঝবার মানুষের অভাব হয়নি। আমি লিখলাম মানুষ "রামেন্দ্রসুন্দর;" তিনি কেমন ভাবে চলাফেরা করতেন, কথা কইতেন, বাড়ীর মানুষ কেমন ভাবে তাঁকে নিয়ে আনন্দ করতেন, এই সব কথা। তিনি সানন্দে তাঁর সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ 'মাসিক বসুমতী'তে ছাপলেন ঐ সব কথা। সেই প্রাণতোষ বাবুকে আমন্ত্রণ জানালাম এবার রামেন্দ্র জন্ম-স্মৃতি বার্ষিকীতে আসবার জন্য। সানন্দে গ্রহণ করলেন আমন্ত্রণ। শত কাজ ফেলে তাঁর উপস্থিতিতে সারা গ্রামে উৎসাহের বন্যা দেখা গেল। এর আগে তিনি একবার এসেছিলেন দেড় দিনের জন্য। তখন দেখেছিলাম, আমাদের ঘরের রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি উদ্ধার করতে রত থাকতে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখন আচার্য্য দেবের নিজের বাড়ী নূতন বাড়ীতে, কখন বা তাঁর কন্যার ভবন বাঘডাঙায়, লিপ্ত রয়েছেন ভূগর্ভ থেকে স্মৃতি উদ্ধারে। দেখে বুঝলাম জ্ঞানীর কাছে রামেন্দ্রসুন্দরের শাশ্বত আসনের সমাদর করবার মতো মানুষের অভাব হয়নি।"—অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

—কান্দী-বান্ধব।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন

"গত ১৮ই আগষ্ট প্রায় ৮ বৎসর পরে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন হইয়া গেল। পুরুলিয়া নাগরিক সঙ্ঘের প্রার্থী ও মনোনীত শ্রীসুকুমার মুখার্জ্জি উকীল, শ্রীদ্বারিকানাথ ব্যানার্জি উকীল, এবং শ্রীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জি উকীল যথাক্রমে চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা ইঁহাদের অভিনন্দিত করিতেছি। মানভূম জিলার বিহার সরকারের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী নীতি যতগুলি কুকীর্ত্তি করিয়াছে ও করিতেছে ইহার মধ্যে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নির্বাচন ও কর্মকর্তা নির্বাচনের ব্যাপার লইয়া স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যাহা করিয়াছেন—তাহা আর একটি কুকীর্ত্তি। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে সহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি সম্বন্ধে সহরবাসী যে সমস্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পণ করিবে সে সম্বন্ধে বিহার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কোন প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু দেখা গেল তাহা নয়। প্রথমত, নির্বাচনের সময়েই একটা চেষ্টা চলিতে লাগিল যে, সরকারের তাঁবেদাররা যাহাতে নির্বাচিত হন। কংগ্রেস এই নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করাইতে সাহস পায় নাই। যাহা হউক, সরকারী তাঁবেদাররা খুব কম সংখ্যায় দু'-এক জন নির্ব্বাচনে স্থান করিয়া লইল। অতঃপর প্রচেষ্টা
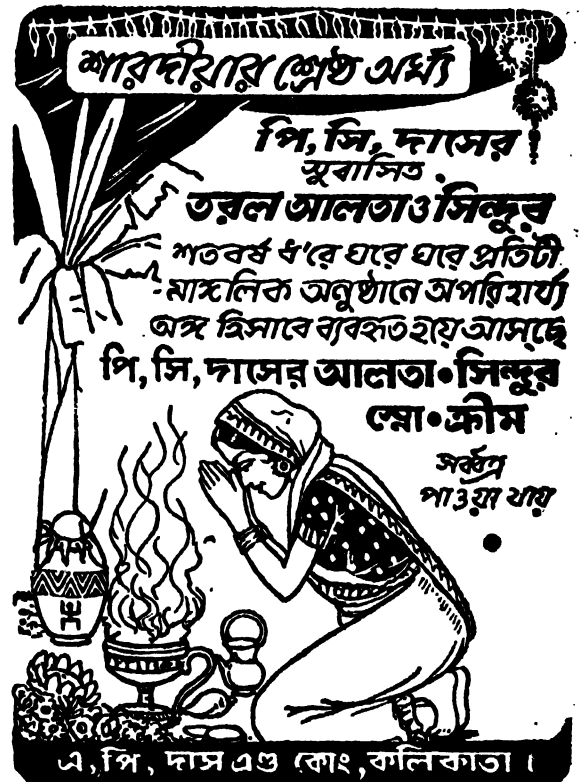
চলিল বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন ব্যাপারে কি করিতে পারা যায়। বত্রিশ জন নির্ব্বাচিত কমিশনারদের মধ্যে প্রায় উনিশ জনই নাগরিক সংঘ বা তাহার সহিত যুক্ত। সুতরাং পুরুলিয়ার জনৈক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচিত কমিশনারকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করাইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে দলপুষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। নির্ব্বাচনের পরে আট মাস যাবৎ সরকার কমিশনার মনোনয়ন করিলেন না। আট মাস পরে আট জনের সরকারী মনোনয়ন যখন প্রকাশিত হইল, তখন সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে কোন দিক দিয়াই কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ কেবল মাত্র হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের ধারক, বাহক ও বিশ্বস্ত পোষকদেরই সরকারী মনোনয়ন দিয়া পাল্লা ভারী করিবার চেষ্টা হইল।" —মুক্তি (পুরুলিয়া)।

"Physician, heal thyself."—New Testament

"উত্তর কলিকাতার পথে সরীর ধাক্কায় আহত এবং চিকিৎসার্থ মেডিক্যাল কলেজে প্রেরিত মহম্মদ দাউদের মৃত্যুর পর যে ময়না তদন্ত হয়, তাহাতে তাহার তলপেটে ১২ ইঞ্চি লম্বা ও ১০ ইঞ্চি চওড়া একখানি তোয়ালে পাওয়া যায়। রোগীর পেটে এই তোয়ালে প্রাপ্তির পর তাহার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে স্বভাবতঃই বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি হইয়াছিল। করোণারের তদন্ত ও রায়ে সেই কৌতূহল অনেকটা চরিতার্থ হইয়াছে। করোণারের জুরিগণ রায় দিয়াছেন,—যকৃৎ ফাটিয়া যাওয়ার পর তাহাতে পচন ধরিয়া যাওয়াই মহম্মদ দাউদের মৃত্যুর আসল কারণ। তবে তাহার তলপেটে তোয়ালের অবস্থিতি দ্বারা যে পচনের সহায়তা হইয়াছে, একথাও জুরিগণ স্বীকার করিয়াছেন। রোগীর তলপেটে তোয়ালে কি করিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন মেডিক্যাল কলেজের অস্ত্রবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক মহাশয়। তাড়াহুড়ার মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল বলিয়া ভুলে উক্ত তোয়ালেখানি রোগীর তলপেটের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছিল, ইহাই তাঁহার কৈফিয়ৎ। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, ডাক্তারেরাও মানুষ এবং মানুষ মাত্রেরই ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকে। একথা অবশ্যই সত্য। তবু আমরা বলিতে চাই যে, মানুষের জীবন লইয়া যাঁহাদের কারবার, সেই ডাক্তারগণের ভুলচুক বাঞ্ছনীয় নহে,—বিশেষ করিয়া বড় রকমের অস্ত্রোপচারের বেলায় অসতর্কতা ও অনবধানতাজনিত ভুলভ্রান্তি আমার্জনীয়।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

বধূসুলভ লজ্জা

"আমাদের অরুণ গুহের বিনয়ের সীমা নাই। কাউন্সিল অফ ষ্টেটে এক প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটি মন্ত্রী বলিয়াছেন যে ভারত সরকারের জনৈক অতি উচ্চস্তরের টেকনিকাল যোগ্যতা-সম্পন্ন কর্ম্মচারী সুইচ ঘড়ি সহ হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ এই সব ঘড়ি পাচারের ব্যবসার কথা গবর্ণমেন্টের কানে আসিয়াছিল। অফিসারটিকে পদচ্যুত করা হইতেছে। ব্যাপার গুরুতর সন্দেহ নাই। অত বড় কর্ম্মচারী তিনটা ঘড়ির জন্য ডিসমিস হওয়া কি সোজা কথা? সদস্যেরা তাঁর নাম জানিতে চাহিলেন। জানিতে চাওয়া স্বাভাবিক। একটু আগে আর এক বিভাগের ডেপুটি মন্ত্রী দাতার সাসপেণ্ডেড পাঁচ জন আই-সি-এস, আই-পি-এসের নাম করিয়া গিয়াছেন। অরুণ গুহ তো আর দাতার নহেন। বধূসুলভ সলজ্জ ভাবে চোখ নীচু করিয়া তিনি শুধু কহিলেন—নাম উচ্চারণ করিতে পারি না।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

দুর্ভিক্ষ, কৈ এলো না!

"চালের দর কমেছে। বলবেন তা কি হয় মশাই! এখন দর যে বাড়ার কথা। কত আর বাড়বে বলুন? এদিকে আউস বাজারে দেখা দিয়েছে, আমনের সম্ভাবনাও ভাল। দুর্ভিক্ষ আসছে আসছে শোনাই গেল, এল না শেষ পর্য্যন্ত। আর কিসের আশায় ধরে রাখা যায়—কাজেই চালের দর পড়তির মুখে।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

শিক্ষায় মুর্শিদাবাদ সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর

"প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিলে দেখা যায়, গ্রন্থাগারের সংখ্যার দিক দিয়া জঙ্গীপুর মহকুমার অবস্থা তেমন আশাপ্রদ না হইলেও একেবারে হতাশ হইবার মত কিছু নহে। ইহাদিগের অধিকাংশই দুই-পাঁচ বৎসরের মাত্র হইলেও কিছু কিছু বেশ পুরাতন, এমন কি দুটি-একটি গ্রন্থাকারের রজত বা সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপনের সময় হইয়াছে শোনা যায়। তবে সেইরূপ সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পুস্তক তথা সভ্য-সংখ্যার স্বল্পতা দর্শনে মনে মাত্র আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাকেই একমাত্র সম্পদরূপে ধরিয়া লইয়া ইহাদিগের কর্তৃপক্ষেরা তৃপ্তি তথা গৌরববোধ করিতে চাহিয়াছেন; নহিলে এরূপ হইবে কেন? প্রতিষ্ঠার দিন হইতে মাসে একখানি করিয়া পুস্তক সংগৃহীত হইলেও ত এক-একটি গ্রন্থাগারে কম-বেশী পাঁচ সহস্র পুস্তক সঞ্চিত হইতে পারিত। একদা যে সব উৎসাহী ও অনুরাগী মানুষদের অধ্যবসায় ও যত্নে দেশের এই সব অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ দেশের যুবক সমাজের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের ফলে তাহাদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয় তাঁহারা বেদনা বোধ করিতেছেন। মুর্শিদাবাদ আজ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর জেলা, তাই মনে হয়, আমাদের জেলার অধিবাসী বিশেষ তরুণ সমাজকে সমধিক যত্ন ও অনুরাগ লইয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তোলার দায়িত্ব লইতে হইবে। তবে যাহা হয় নাই তাহার জন্য আপশোষ না করিয়া যাহা করিতে পারা যায় তাহা সম্বন্ধে উপযুক্ত নির্দ্দেশ ও উপদেশ লইয়া তাঁহারা আজ কর্মে ব্রতী হউন, আমরা শুধু তাহাই কামনা করিব।"

—ভারতী (মুর্শিদাবাদ)।

খাদি

"সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ খাদি জনপ্রিয় করিবার জন্য স[illegible] ডাকিয়াছেন। এবারে তিনি যেন বাস্তব স্তরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কাটুনি ও তাঁতিদিগকে সাহায্য করিতে। তিনি [illegible] বলিয়াছেন, যাহারা উপবাস বা বেকার থাক[illegible] সাহায্য খাওয়াইতে পরাইতে হয় তাহাদিগকে ঐ পথে কিছু দান করি[illegible] দোষ কি! খাদি প্রস্তুত করিলে পেট পুরা ভরে না—অত[illegible] বেশী লোক সেদিক যায় না—যাহাদের আর কোনও আয়ের পথ ন[illegible] অথচ কাজ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা আছে তাহাদিগকে বে[illegible]

বসাইয়া খোরপোষ না দিয়া কাজের মধ্যে সাহায্য দিলেই ভাল হয়। এবং সমস্ত স্বাধীন দেশেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়াই আমরা শুনিয়া থাকি। আর ভিক্ষার অপেক্ষা এই পথে স্বাবলম্বী হইলে জাতীয় আত্মসম্মানও রক্ষা পায়।" —নিশান (কলিকাতা)।

ইজারা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত

"রামপুরহাট সহরে গান্ধী পার্কে একটি দীঘি আছে। এই দীঘি বর্ত্তমানে পৌরসভার রক্ষাধীনে রহিয়াছে। বৎসরে যে কয় মাস ছিপে মৎস্য ধরিবার মরশুম থাকে সেই কয় মাসে পৌরসভা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে মৎস্য ধরিবার পারমিট দিয়া বৎসরে আন্দাজ ১০০৲ হইতে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় করেন, এবং প্রতি বৎসর মৎস্য উৎপন্ন করিবার ব্যয়ও আন্দাজ ১০০৲ টাকা। সুতরাং ইহাতে আয় অপেক্ষা লোকসানের মাত্রাই অধিক। তাহা ছাড়া পার্কের জন্য একজন মালি রাখিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে পার্কের অবস্থাও বিশেষ উন্নত নহে। অথচ এই স্থানটিই হইল রামপুরহাটবাসীর একমাত্র আকর্ষণীয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় স্থান। সম্প্রতি পৌর-সভাপতি পার্কের দীঘি স্বল্পমেয়াদী ইজারা দিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করায় জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের মতে ৪।৫ বৎসর ইজারা দিয়া যদি বাৎসরিক কম পক্ষে ৭০০৲।৮০০৲ টাকা পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানে পৌরসভার যে আর্থিক অবস্থা তাহাতে এরূপ ইজারা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। তবে এই বন্দোবস্তের ফলে যাহা লাভ হইবে তাহা পার্কের উন্নতির জন্য পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। অবশ্য মৎস্য ধরিবার যাঁহাদের শখ আছে, তাঁহারা একটু ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক সময় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতেও হয় এবং এই সহরের লোকো ট্যাঙ্কেও এরূপ পারমিটের ব্যবস্থা রহিয়াছে।"

—রাঢ়-দীপিকা (রামপুরহাট)।

সকলের বন্ধু কারো বন্ধু নয়

স্বাধীন দেশ! স্বাধীন মানুষ! অধীন নহে তো কারো—
বিদেশীদের তেল দাও কেন কপালে কি আছে আরো।
উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে পরের অধীন যারা—
যে অধীন ছিল, সে অধীনই আছে, স্বাধীন হয়নি তারা।
বিদেশী কোম্পানি যাহা মনে করে করাইতে করে বাধ্য।
তাহাদের "হাঁ"য়ে "না" বল তোমরা এমন নাহি তো সাধ্য।
দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করো গরীবে দেখাও তেজ—
কমনওয়েলথ হাতের মুঠোয় ধরিয়া রেখেছে লেজ।
যেই টান দিবে, হইবে হাজির, সেলাম জানাবে গিয়ে,
যা বলিবে ওরা তখনি করিবে, যা চাহিবে তাই দিয়ে!
এ গালে চুমো, ও গালে চুমো ভুলাতে দুয়ের মন,
নিজ স্বার্থ ছাড়া, জানে না উহারা কারো বন্ধু ওঁরা নন।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ।

কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে

"বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি চাকুরী লাভে অক্ষম হইয়া কোন মতে সামান্য সামান্য ব্যবসার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। তাহারা চাকুরী চায় না। ব্যবসার দ্বারাই তাহারা বাঁচিতে চায়। কিন্তু টাকা ছাড়া কোন ব্যবসাই সম্ভব নয়। টাকার জন্য তাহাদের টাকাওয়ালা মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহার ফলে সুদ ও আসলে ব্যবসার মুনাফা ওঠে মহাজনের ঘরে এবং দরিদ্র বাঙ্গালী ব্যবসার নামে করে মহাজনের দালালী। নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াও যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিষয়টি অনুসন্ধান করেন তবে ব্যবসায় অর্থ পাওয়ার ভীষণ অবস্থাটা উপলব্ধি করিতে পারেন। কৌতূহল বলিতেছি এই জন্য যে, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর করিবার সত্যিকার বাসনা থাকিলে শিক্ষক নিয়োগ অপেক্ষা এই দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িত সর্ব্বাগ্রে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা যাহারা করে ব্যাঙ্ক তাঁহাদের ঋণ দেয় না। ঋণ দেয় মহাজন। ব্যবসায়ী ঋণে সুদের কোন হার নির্দ্দিষ্ট নাই। এরূপ অবস্থায় প্রতি জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণদানের ব্যবস্থা করিলে ব্যবসার লাভ সরকারী সুদ দিয়াও কিছুটা তাহারা পাইত এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ব্যবসায় অনুপ্রাণিত হইত। ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠান গঠন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ নহে। সময় থাকিতে মানুষের সত্যিকার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিতে সরকারকে অনুরোধ করি। তাহাতে দেশ গড়িয়া উঠিতে পারে, অন্যথায় আপনা হইতেই কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিও না

"কংগ্রেসের লোকেরা ভয়ানক অসুবিধায় পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে পরস্পরের সমালোচনা, নিন্দা ও গালাগালি করিতে হয় বিবিধ কারণে:—(ক) কংগ্রেসের শাসন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ মন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রভৃতির কাজের কৈফিয়ৎ চাহিলে জনসাধারণের নিকট তারস্বরে তাঁহাদের নিন্দা করিয়া নিজেদের

হুগলী, বালীতে দধীচি বৃত্তীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-দিনে মৃতের মর্ম্মরমূর্ত্তিতে পুষ্পাঘ্য দিচ্ছেন সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু। চিত্রটি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গৃহীত।

পৃষ্ঠরক্ষা করিতে হয়। (খ) যাঁহারা মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এম, এল,এ নিদানপক্ষে কোন উপদেষ্টা সমিতিতেও প্রবেশ করিতে পারেন নাই, অথবা প্রবেশ করিয়াও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে সুবিধাজনক আসনে উপবিষ্ট সহকর্মীদের বিরুদ্ধে নিন্দা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতে এবং তাঁহাদের হাঁড়ির খবর প্রকাশ করিয়া দিয়া লোকচক্ষে হেয় করার চেষ্টা করিতে হয়। (গ) পরস্পর বিবদমান উপদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে জব্দ করিয়া কোণঠাসা করিবার জন্য উভয় পক্ষকেই সুযোগের সন্ধানে থাকিতে হয়। সম্প্রতি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলবন্ত মেহতা সকলকে জানাইয়াছেন, প্রকাশ্যে কোন সমালোচনা করা চলিবে না, এবং শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত সংশ্লিষ্টদের নিন্দাবাদ বরদাস্ত করা হইবে না। অধিকাংশ নোংরামিই পারস্পরিক বিবাদের ফলে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সুতরাং ঐ ভাবে লোক-হাসাহাসি না করিয়া বড়কর্তাদের জানাইতে হইবে।"

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

"খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশান যেন অবাধেই চলছে আজকাল। সম্প্রতি আসানসোলে দালদার মধ্যে গোবর ভরে বিক্রী করার অপরাধে জনৈক বিক্রেতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে মানুষের জঘন্য মনোবৃত্তির দিকটা প্রকট হতে হতে আজ কাঁপিয়ে তুলেছে দিগ্বিদিক। বাস্তবিক, প্রাণধারণের বস্তুকে যারা এমনি করে বিষাক্ত করে তোলে, তারা শুধু ব্যক্তির নয়, সমাজের শত্রু। আমাদের দেশে জানি না, পাশ্চাত্য দেশে এই সব অপরাধীরা রেহাই পায় না কোন দিন। এদের অপমৃত্যু কামনা করছি আজ সর্ব্বান্তঃকরণে।"

—বঙ্গবাণী (আসানসোল)।

ইহাদের কি অভিভাবক নাই ?

"জামসেদপুরের সিনেমা হাউসগুলির পাশ দিয়া গেলে সর্ব্বদাই টিকেট-ঘরের সামনে সিনেমা দর্শনেচ্ছুক জনতার লাইন চোখে পড়ে। ভাল করিয়া দেখিলে নজরে পড়ে যে ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ চোদ্দ আনাই অপরিণতবয়স্ক কিশোর। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভাবার ছাত্র। সিনেমার টিকেটের জন্য দুই-তিন ঘণ্টা লাইন দেওয়া তো সামান্য কথা, সময় সময় সাত-আট ঘণ্টা এই সকল ছাত্রকে সিনেমা দেখিবার জন্য ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে দেখা যায়। সিনেমা রাজ্য সম্বন্ধে যাঁহারা বিন্দুমাত্র খোঁজ রাখেন তাঁহারাই জানেন যে বোম্বাই-মার্কা আদিরসাত্মক সিনেমা দেখিবার জন্যই এই সকল কিশোরের দল ভীড় করে। সিনেমার নায়ক-নায়িকার অবাস্তব কথোপকথন এবং সিনেমা মারফত এক অদ্ভুত দেশ ও সমাজের চিত্র দেখিয়া এই সকল সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের যে কিরূপ ক্ষতি হইতেছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। সারা দুনিয়ায় যেন প্রেম ছড়াইয়া আছে এবং পথে পথে যেন প্রেমিক-প্রেমিকার ছড়াছড়ি —শুধু সুযোগ মত তাহাদের সহিত পরিচয় ঘটানর দেরী। এই মনোভাব এই সকল বোম্বাই-মার্কা সিনেমা দেখিয়া কিশোর-কিশোরীদের মনে শিকড় গাড়িতেছে। ফলে আমাদের নৈতিক ও সমাজ যে কি ভীষণ ভাবে দূষিত হইতেছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। দেশের ভবিষ্যৎ কিশোর-কিশোরীরা সিনেমার নায়ক-নায়িকা প্যাটার্ণে গড়িয়া উঠিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমাদের শুধু মনে হয় যে, এই সকল কিশোর-কিশোরীদের কি অভিভাবক নাই, না তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে ?"

—নবজাগরণ (জামসেদপুর)।

স্কীমের ভবিষ্যৎ

"সরকারী স্কীমের ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১১৫০ সালে তেলকারের বিলের জল নিকাশের জন্য চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুইটি ক্যানেল কাটানো হয়। কিন্তু কোনও স্লুইস্ গেট নির্ম্মিত হয় নাই। বিলের জল নিকাশের ফলে হাজার হাজার বিঘা আবাদযোগ্য জমি পাওয়া যাইবে আশা করা গিয়াছিল এবং সেই আশা অবশেষে সত্যে পরিণত হইয়াছে। বাড়িতে বাড়িতে এই বৎসর তেলকার বিল এলাকায় ৮০০০০ বিঘায় জলো ধান্যের চাষ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এবারে মোর-দ্বারকা-বাবলার প্রচণ্ড বন্যার জল বিপরীতগামী হইয়া উক্ত খাল দিয়া তেলকারের বিলে যেভাবে প্রবেশ করিতে থাকে তাহাতে মনে হয়, আশী হাজার বিঘার ফসল বাঁচানো যাইবে না। খালের স্লুইস গেট থাকিলে এই বিপরীত ফল ফলিত না। গ্রামবাসিগণ স্থানীয় খাল বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারের শরণাপন্ন হইল বটে, কিন্তু তিনি আইন মোতাবেক কাজ করা ব্যতীত এই বিপদ হইতে আশু উদ্ধারের পথ দেখাইতে পারিলেন না। সুতরাং গ্রামবাসিগণ মরিয়া হইয়া ফসল বাঁচাইতে খালের মুখে বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। কাজটি বে-আইনী হইল বটে তবে ৮০০০০ বিঘার ফসল বাঁচাইতে অন্য উপায় ছিল না। এক্ষণে বাঁধ দেওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের ভাগ্যে কি হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। চার লাখ টাকার খালে যদি ৫০০০০ টাকার স্লুইস গেইট থাকিত তাহা হইলে জল নিকাশের খাল দিয়া বানের জল প্রবেশ করিত না। সরকারী বিভাগ যে এই ভাবে ঘোড়ার নালের জন্য ঘোড়া হারাইতে অভ্যস্ত তাহা কে বুঝাইয়া দেয় ?"

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

শোক-সংবাদ

সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ও কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীকৃষ্ণদাস সরকার গত বৃহস্পতিবার ১০ই সেপ্টেম্বর ৩১ বৎসর বয়সে ঢাকুরিয়া নাজিরবাগানস্থ তাঁহার বাটীতে এক কন্যা, তিন পুত্র ও বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে রাখিয়া অকস্মাৎ লোকান্তরিত হন। শ্রীযুক্ত সরকার বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণেতা ও ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ৺রায়বাহাদুর বিহারীলাল সরকারের মধ্যম পুত্র ও আলিপুর আদালতের জনপ্রিয় উকীল শ্রীসরসীলাল সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। আধুনিক কালের ভারতবর্ষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক-ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার রচনাবলী তাঁহাকে একটি স্থায়ী আসন দান করিতে পারে। তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স-এর সভ্য ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রথম খণ্ড

ষষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন
১৩৬০

৩২শ
বর্ষ

(স্থাপিত ১৩২১)

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "এখানকার (দক্ষিণেশ্বরের) কুকুর বেড়াল পর্য্যন্ত ধন্য হয়ে গেল। দ্যাখ্ না মায়ের প্রসাদ খাচ্ছে, গঙ্গা দর্শন করছে, গঙ্গাজল খাচ্ছে, মন্দিরের চারিদিকে যাওয়া আসা করছে।"

দক্ষিণেশ্বরে একটি কুকুর ছিল, যাকে ঠাকুর "কাপ্তেন" নামে ডাকতেন। ভবতারিণীর মন্দিরের সমুখের চাতালে কুকুরটি ব'সে থাকতো। ঠাকুরের আহ্বানে সাড়া দিতো, তাঁর পায়ে গড়াগড়ি দিতো। আর ঠাকুর তাকে লুচি-সন্দেশ খাওয়াতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। "দেখ, এত যে কুকুর রয়েছে, কই কেউ তো মায়ের সামনে বসে না। গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর মত কই কাকেও তো দেখিনি। কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে, ওর পূর্ব্বজন্মের সংস্কার [illegible] এখানে এসে করছে, ধন্য হয়ে গেল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার বিচার কর আর যাই বল তবু তাঁর onderএ (under কথাটি অনড়ার বলতেন) আমরা আছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়। শিবপূজা করলে শিবের সত্তা পায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যখন যে কোন দেব-দেবীর গান গাইবি, আগে চোখের সামনে তাঁকে দাঁড় করাবি, তাঁকে শুনাচ্ছিস্ মনে করে তন্ময় হয়ে গাইবি। লোককে শুনাচ্ছিস কখনও ভাববি না, তা হ'লে লজ্জা আসবেনি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী কারুর অনিষ্ট করতে পারে না ; বালকের মত হয়ে যায়। বাহিরে হয়তো দেখায় রাগ, অহঙ্কার আছে, কিন্তু বস্তুত জ্ঞানীর ও-সব কিছু থাকে না। বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য রয়েছে, সব ফেলে কাশী চলে গেল। বালকের যেমন আট থাকে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ভগবানের লীলাখেলা, মায়া এ সব বোঝবার যো নেই। যেটা সম্ভব, সেটা তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। আবার যেটা অসম্ভব, সেটা তাঁর ইচ্ছায় সম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো দুই

কেন এত ঈর্ষা? ঈশ্বরকে স্মরণ করো। কেন এত পরশ্রীকাতরতা? ঈশ্বরের শ্রী দেখ। কেন মিথ্যা আত্মস্ফীতি? সব দু দিনের।

'সব দু দিনের।' বললেন ঠাকুর: 'তালগাছই সত্য, তার ফল-হওয়া আর ফল-খসা দু দিনের।'

রাখালেরও মাঝে-মাঝে হিংসে হয়। সে বালকের হিংসে। ভালোবাসার অভিমান। গাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে যাবে বলে উসখুস করে। যদি আর কাউকে ডেকে নেন ঠাকুর, হিংসেয় জ্বলে যায়। যদি বলেন, যাই, কলকাতায় গিয়ে ছোকরাদের একটু দেখে আসি, রাগে ঝলসে ওঠে, 'ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে যে আপনি যাবেন?'

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এসেই বা রাখালের কী হচ্ছে? কই এখনো তো লাগল না কৃপার মলয় হাওয়া! তবে কি আমি পাঁকাটি? আমি কি অপদার্থ? আমার মধ্যে কি এতটুকুও সার নেই? কোথায় তবে সেই চন্দনগন্ধ?

জপে বসেছিল নাটমন্দিরে, বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। এত প্রেম এত কৃপা পেয়েও যার কিছু হয়না, তার মুখ দেখিয়ে কাজ নেই। উঠতেই পড়ে গেল ঠাকুরের সামনে।

'কি রে, এরই মধ্যে উঠে পড়লি?'

'আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'কেন, কি হল?'

রাখাল মাথা হেঁট করে রইল।

'কি রে, মুখখানি অত ম্লান কেন? বল আমাকে।'

বলতে হলনা। বুঝতে পারলেন ঠাকুর। বললেন, 'হাঁ কর।'

হাঁ করতেই জিভ টেনে ধরলেন রাখালের। আঙুল দিয়ে তিনটে রেখা টেনে দিলেন। কি যেন মন্ত্র পড়লেন নিচু গলায়। বললেন, 'যা, এখন বোস গে।'

রাখালের মন হাল্কা হয়ে গেল। মুখ ভরে উঠল খুশিতে।

শুধু তাই না, ঠাকুর এক দিন তাকে টেনে আনলেন ভবতারিণীর সামনে। 'কপালে কারণের ফোঁটা দিয়ে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দিলেন। শিখিয়ে দিলেন আসন আর মুদ্রা। শিখিয়ে দিলেন ষটচক্র। সোপান-পরম্পরা।'

আর রাখালকে পায় কে!

কৃপা আর কাকে বলে! মেঘ নেই জল ঝরে পড়ল। হলকর্ষণ নেই শস্য এল মাটি ফুঁড়ে। এমনি করেই আসে দয়ার দক্ষিণ হাওয়া! চাইতে না জানলেও এসে পড়ে। মনের বায়ুমণ্ডলে একটি উত্তপ্ত শূন্যতা সৃষ্টি হলেই বাতাসের আলোড়ন জাগে।

কৃপাস্পর্শে সাধনার দীপ্তি ফুটছে চেহারায়। কণ্ঠস্বরে মমতাময় মাধুরী।

'আহা, রাখালের স্বভাবটি আজকাল কেমন হয়েছে! দেখ দেখ ঠোঁট নড়ে—' বলছেন ঠাকুর ভক্তদের, 'অন্তরে নামজপ করছে কিনা!'

তারপর বললেন, 'কোথায় আমার সেবা করবে, তা নয়, আমাকেই এখন তাকে জল দিতে হয়।'

'কি করছিস রে বাবুরাম?' ঠাকুর ডাক দিলেন: 'এদিকে একটু আয় না।'

পান সাজছে বাবুরাম। বললে, 'পান সাজছি।'

'রেখে দে তোর পান সাজা।' বিরক্ত হলেন ঠাকুর। 'শুনে যা।'

শোন্। গুরুসেবাই সাধনাঙ্গ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 'ভক্তি কি গাছের ফল রে বাবা পেড়ে খাবি?' বলছেন ঠাকুর: 'সেবা ছাড়া প্রেম নেই। সেবা ছাড়া ভক্তি নেই।'

নিজে-নিজেই পান সাজেন কখনো। ঘর ঝাঁট দেন। মালীর কাজ করেন।

'ওরে, ও মালী, ঐ গোলাপ ফুলটা তুলে দে তো—' একজন সত্যি-সত্যি সেদিন বললে ঠাকুরকে।

যা কাপড় পরেন! আর যেমন ভাবে পরেন! একটা মালী বলে ভাববে তা আর আশ্চর্য কি। বলামাত্রই ঠাকুর ফুলটি তুলে দিয়ে দিলেন লোকটাকে। খুশি হয়ে চলে গেল।

কিছু দিন পরে জানতে পারল সেই মালীই শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন লজ্জায়-অনুতাপে মাটির সঙ্গে তার মিশে যেতে শুধু বাকি। দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখা করল ঠাকুরের সঙ্গে। কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'সেদিন [illegible]কেই ফুল তুলতে বলেছিলাম—'

'তা কী হয়েছে!' অমলিন কণ্ঠে বললেন ঠাকুর, 'কেউ সাহায্য চাইলে তাকে তা দিতে হয়।'

ঠিক লোককেই তো বলেছিল ফুল তুলতে। মালী ছাড়া আর কি! আগাছার জঙ্গলকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করছেন। প্রার্থীকে ঠিক পৌঁছে দিচ্ছেন কৃপার প্রফুল্ল ফুল।

পঞ্চবটীর উত্তরে লোহার তারের বেড়া। তারই ওপারে ঝাউতলা। ঝাউতলার দিকে যেতে ঠাকুর পড়ে গেলেন বেড়ার উপর। হাতের একখানা হাড় সরে গেল।

তাই দেখে রাখালের মনোবেদনার অন্ত নেই। যাঁর শরীররক্ষা করার কথা তার, তাঁকেই সে ফেলে দিলে! সেই তো ফেলে দিয়েছে! তা ছাড়া আবার কি। যদি সঙ্গে-সঙ্গে থাকত, চোখে-চোখে রাখত, ঘটত না এমন অঘটন। তার দোষেই এই দুর্দশা।

ধিক্কারে মন ভরে গিয়েছে রাখালের। ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'তোর দোষ কি। তুই থাকলেও তোকে তো নিতুমনা ঝাউতলা।'

অপূর্ব মমতায় উথলে উঠলেন। বললেন, 'দেখিস তুই যেন পড়িস নে। যেন ঠকিস নে মান করে।'

কত লোক আসছে কত দিক থেকে। পাছে ঠাকুরের হাত-ভাঙা দেখে কেউ কিছু ভুল বোঝে তারই জন্যে রাখাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় হাতখানি। ঠাকুরের হাত ভেঙেছে এ যেন তার নিজের কলঙ্ক।

'কেন অমন ঢাকাঢাকি করিস?' বিরক্ত হন ঠাকুর। 'মা যে অবস্থায় রেখেছেন সেই অবস্থায় থাকতে দে। লোকে নিন্দে করে তো আমাকে করবে! বলবে নিজের একখানা হাত সামলাতে পারেননা সে আবার কেমনতরো কি!'

মধু ডাক্তার এসেছে তাকে পর্যন্ত লুকোনো! আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি সব বলছে তাকে রাখাল। ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন ঘরের থেকে: 'কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙে গেছে।'

যন্ত্রণায় অধীর হয়ে একে-ওকে হাত দেখান ঠাকুর। রাখাল শুধু চটে। বলে, 'এ কি বাড়াবাড়ি! তা হলে এখান থেকে চলে যাই আমি।'

ওরে স্বভাবের যন্ত্রণায় কাঁদতে দে আমাকে। যন্ত্রণার মধ্যে কান্নাটাই আনন্দ। আমার কান্না দেখে লোকে যদি একটু কাঁদে সেটুকুও আমার উপশম।

এখান থেকে যাবি তো যা। পরেই আবার মাকে বলেন, 'কোথায় যাবে, কোথায় যাবে জ্বলতে পুড়তে!'

ভাবনয়নে দেখলেন মা যেন সরিয়ে নিচ্ছেন রাখালকে। অমনি ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন, 'মা, ওকে হৃদের মত সরাস নি। ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না, তাই কখনো-কখনো অভিমান করে—ও চলে গেলে কাকে নিয়ে থাকব!'

আরো একটি ছেলের জন্যে কাঁদেন বসে বসে। সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, গৌরবর্ণ, নাম নারান। স্কুলে পড়ে। তাকে নিজের হাতে খাওয়াবার জন্যে ব্যাকুল ঠাকুর। তার মাঝেই দেখেন সেই নারায়ণকে।

'মশায়, আপনার গান হবে না?'

প্রশ্নের এই তো ছিরি। তবু যেহেতু নারান বলেছে, নারান গান শুনতে চেয়েছে, ঠাকুর গান ধরলেন। 'অহরহ নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখ-রাশি গেলনা—এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবেনা—'

বলরামের বাড়িতে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে, ভাব-বিভোর হয়ে, টলতে-টলতে। পাছে পড়ে যান, নারান হাত ধরতে গেল। বিরক্ত হলেন ঠাকুর, নারানের হাত ছুঁড়ে দিলেন। পরে, পাছে ব্যথা পায়, অযতন হয়েছে ভাবে, তাই সস্নেহে বললেন, 'হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে। আমি আপনি-আপনি চলে যাব।'

বলরামের বাড়িতে সেদিন এসেছে নারান।

'বোস কাছে এসে বোস। কাল যাস ওখানে। গিয়ে সেখানে খাবি, কেমন?'

কে নারান? তার পুরো নাম বা পদবীও কেউ জানেনা। তবু তার প্রতি কি সঢালা স্নেহ!

কথামত এসেছে নারান। ছোট খাটটির উপর বসিয়েছেন পাশটিতে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। বললেন, জল খাবি? জল খাওয়াচ্ছেন নিজের হাতে।

এখানে আসে বলে বাড়ির লোকে মারে ছেলেটাকে। তাই কানের কাছে মুখ এনে স্নেহভরা স্বরে বললেন, 'একটা চামড়ার জামা কর, মারলে বেশি লাগবেনা।'

কীর্তন শুনেছেন ঠাকুর, নারান এসে উপস্থিত। তাকে দেখে চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুই আবার কেন এসেছিস এখানে? অত মেরেছে তোকে সেদিন তোর বাড়ির লোক, আবার এসেছিস?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নারান।

কোথায় তবে যাব? প্রহারের পর কোথায় তবে উপশম! প্রখর রৌদ্রের পর কোথায় তবে পাদপচ্ছায়া। সংসার-রাক্ষস আমাকে হরণ করে রেখেছে, আরামময় রাম এসে আমাকে উদ্ধার করবেন বলে। প্রহারেই

তো আমি দৃঢ় হব বলিষ্ঠ হব, আমার সমস্ত কলুষ ক্ষয় হয়ে যাবে। প্রহার তো তোমারই উপহার। তুমিই হানো তুমিই টানো তুমিই আনো তোমার কোলের কাছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে! সকল আত্মীয়ের চেয়েও তুমি আমার আপনার।

ঠাকুরের ঘরের দিকে চলে গেল নারান। বাবুরামকে ঠাকুর বললেন, 'যা, ওকে কিছু খেতে দে।'

কীর্তনে সমাধিস্থ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু মন বসলনা। হঠাৎ উঠে পড়লেন। ঘরে ঢুকে নিজের হাতে খাওয়াতে লাগলেন নারানকে।

'আজ নারানকে দেখলুম!' রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলছেন ঠাকুর। ভাবাবেশে কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বললে মাষ্টার, 'চোখ দুটি জলে ভেজা। মুখ দেখে কান্না পায়।'

'আহা, ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়!' কান্নায় ঠাকুরের গলাও ভিজে উঠল: 'এখানে আসে বলে ওকে বাড়িতে মারে। ওর হয়ে বলে এমন বুঝি কেউ নেই। কুব্জা তোমায় কু বোঝায়। রাই-পক্ষে বোঝায় এমন কেউ নেই।'

'আপনিই বোঝাবেন।'

'দেখ ওর খুব সত্তা। নইলে কীর্তন শুনতে-শুনতে উঠে যাই! ওর টানে কীর্তন ছেড়ে উঠে যেতে হল ঘরের মধ্যে। কীর্তন ফেলে উঠে গেছি এমনিটি আর হয়নি কখনো।'

কীর্তনের চেয়েও ক্রন্দন যে তোমাকে বেশি টানে। কীর্তন হচ্ছে গুণকথন, যশোবর্ণন আর ক্রন্দন হচ্ছে বেদন-নিবেদন। তুমি আমাকে কাঁদাচ্ছ এইই তো তোমার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাই ক্রন্দনই শ্রেষ্ঠ কীর্তন।

'কিন্তু ওকে যখন জিগগেস করলাম, কেমন আছিস? ও এক কথায় বললে, আনন্দে আছি।'

তাই তো আর ওর ভয় নেই। প্রহারের প্রত্যক্ষ ভয়কেও উপেক্ষা করতে পেরেছে। জর্জর হয়েও অবসন্ন হয়নি। ধুলোতে শয়ন নিয়েও ভাবছে ঈশ্বরের কোলে মার কোলে শুয়ে আছি। আনন্দে থাকা মানে ধুলোকেও ব্রজরেণু মনে করা। নারানের সেই অবস্থা। কিশোর বালক কিন্তু বিশ্বাসের নিষ্কম্প বর্তিকা। বরিষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। যন্ত্রণাকে নিয়ে এসেছে জয়ধ্বনিতে।

মাষ্টারকে বললেন, 'তুমি কিছু কিনে-টিনে মাঝে-মাঝে খাইও ওকে। আচ্ছা, ওকে একবার ওর ইস্কুলে গিয়ে দেখতে পাই?'

'কেন, আমার বাসায় না-হয় ওকে ডেকে আনব। সেখানে চলুন।

'না, না, একটা ভাব আছে। ওকে ওর স্বভাবে দেখতে চাই। তা ছাড়া, দেখে আসতুম আরো কেউ ছোকরা আছে নাকি—'

বলেই আবার নারানে ফিরে এলেন। বললেন গদগদ হয়ে, 'আহা, নাউএর ডোলটা ভালো—তান-পুরো বেশ বাজবে। আমায় বলে, আপনি সবই।'

এইটিই তো চরম ভালোবাসার কথা। তুমি আমার সব। তারই জন্যে তো তোমাকে ছেড়ে পালাবার পথ পাইনা। দূরে-দূরান্তরে এমন জায়গা নেই যেখানে তুমি নেই। এমন শূন্যতা ভাবা যায়না যা তুমি-ছাড়া। সব হারিয়েও দেখি তোমাকে হারাতে পারিনি।

'ওরে বাবুরাম, একবার নারানের বাড়িতে যা না—' নারানের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন ঠাকুর।

কিন্তু বাড়িতে যেতে ভয় পাছে ওর বাবা খেপে ওঠেন, তেড়ে আসেন লাঠি নিয়ে।

'এক কাজ কর। হাতে করে একখানা ইংরাজি বই নিয়ে যা। তা হলে তার বাবা আর কিছু বলবেনা।'

কিন্তু তার মা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কার টানে ছেলে এমন ঘরছাড়া, মার-ঘেঁচড়া, তাকে একবার দেখে আসি নিজের চোখে। পারি তো শুনিয়ে আসি দুটো কঠিন কথা। নিজের পাগলামি নিয়ে আছ থাকো, পরের ছেলেকে পাগল করা কেন?

কিন্তু এসেই তার চোখ ডুবে গেল অমৃত-অঞ্জনে। এ কে অপরূপ! একে দেখে আমিই মুগ্ধ হচ্ছি, আমার নারান তো ছেলেমানুষ! যে সরল সে তো ডুবেই যাবে এ সরলতার সমুদ্রে!

'মা, আমার নারানকে বেশি পীড়ন কোরোনা।' বললেন তাকে ঠাকুর 'ভগবানের দিকে যদি ওর মন যায়, ওর মনটিকে দুমড়ে দিও না।'

ঈশ্বর পুত্রের চেয়েও প্রিয়। সেই মুহূর্তে মনে হল নারানের মার। ঈশ্বরকেই সব চেয়ে আমরা বেশি ঠকাই। সংসারে সব চেয়ে যেটা অল্পমূল্য, যা খোয়া গেলে বঞ্চিত মনে হয় না নিজেকে সেইটিই ঈশ্বরকে নিবেদন করি। কাকে-ঠোকরানো ফলটাই সাজাই এনে পূজার থালায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নারানের মার মনে হল এমন প্রিয়তম যে পুত্র তাও সম্ভব দিয়ে দেওয়া যায় ঈশ্বরকে।

[ক্রমশঃ

বাঙ্গালার পট

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার আবির্ভাব যেমন নব্যবঙ্গে বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়াছিল—পুরাতন সংস্কার মাত্রই কুসংস্কার, তেমনই বাঙ্গালার পট কেবল সৌন্দর্য্যহীনই নহে, পরন্তু বিশ্রী—সুতরাং ত্যাজ্য। অথচ এই পটই বহুকাল এ দেশে চিত্রশিল্পের অভিব্যক্তি-পরিচায়ক। কেন তাহা দীর্ঘকাল আদর লাভ করিয়া আসিয়াছিল এবং য়ুরোপের চিত্রের আমদানীর পরেও আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই।

বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক কনওয়ে তাঁহার 'শিল্পরাজ্য' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, কোন চিত্রকর তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দে বাস করিতে পারেন না, কোন ভাস্কর তাঁহার রচিত মূর্ত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা যে চিত্র অঙ্কিত করেন বা যে মূর্ত্তি নির্ম্মিত করেন, তাহা তাঁহাদিগেরই ভাবে ভাবুক দর্শকদিগের মনোরঞ্জন ও প্রশংসা অর্জনের আশায় ও আগ্রহে কাজ করেন :

"Dimly in the background of their mind throughout their work they must have some ideal recepient in view, an ideal recepient the counterpart of themselves, capable of fully perceiving the beauty it is their aim to render, capable of thrilling responsive to the thrill of conception that they themselves experienced."

এই সত্য উপলব্ধি করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী পটুয়া চিত্রকর—পুরুষপরম্পরাগত শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন করিয়া যে সকল পট অঙ্কিত করিত—সে সকল পটে যে বর্ণলেপ দিত—যে সকল ভাব বিকশিত করিবার চেষ্টা করিত—সে সকল তাহার দেশের দর্শকদিগের চিত্তরঞ্জন করিবে মনে করিয়াই করিত; সে বিশ্বাস করিত, সে যে ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তুলিকা ধরিয়াছিল, তাহার পটের দর্শকগণ সেই ভাবেরই ভাবুক হইবে। কবি যেমন তাঁহার রচনায় ঈপ্সিত ভাব ফুটাইয়া তুলেন—পাঠ করিলে পাঠক ক্রোধের বিকম্পন, আনন্দের উচ্ছ্বাস, লজ্জার বিকুণ্ঠন, ঘৃণার বিকুঞ্চন, দ্বিধার বিচলিত ভাব, বিষাদের ম্লানভাব অনুভব করেন—চিত্রকর তেমনই সেই সকল ভাব তাঁহার চিত্রে সপ্রকাশ করেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন পট, রাজপুতানার ও কাংড়ার প্রাচীন পটের এবং অজন্তার গুহামন্দিরের চিত্রের মতই, ভাবের অভিব্যক্তি। তাহার দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা, ভাবের অভিব্যক্তি।

এই স্থানেই য়ুরোপীয় চিত্রকলার সহিত বাঙ্গালার চিত্রকলার প্রভেদ; য়ুরোপীয় চিত্র বাস্তবের অনুসরণ করিতে আপনার সকল শক্তি প্রযুক্ত করিয়াছে; বাঙ্গালার পটে শিল্প ভাবের অভিব্যক্তিতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সেই জন্যই বাঙ্গালার পট শিল্পীর অজ্ঞতার বা অক্ষমতার পরিচায়ক মনে করিলে পট-শিল্পের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিয়া ভুল করা হইবে। বাঙ্গালী শিল্পী শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিরাট অজ্ঞতা লইয়া কাজ করিতেন—এ ধারণা ভ্রান্ত এবং সেই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিলে কেবল যে শিল্পীর সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে, তাহাই

কৃষ্ণলীলা পট (মেদিনীপুর) : ১৯শ খৃষ্টাব্দ

নহে, পরন্তু শিল্পের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাহার রসাস্বাদন করিয়া আনন্দ সম্ভোগও অসম্ভব হইবে।

বাঙ্গালী শিল্পী যে শারীর সৌন্দর্য্য বিকশিত করিতে পারিত না, এ কথা যাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প যে তাঁহাদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে পারে, তাহা সহজেই বলা যায়। যে বাস্তবানুসারিতা য়ুরোপীয় শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহার পরিচয় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পে পাওয়া যায়। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল। কলিকাতায় সেই প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প বিদেশী দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে সকলে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম জীবনের বহু পরিচয় এমন ভাবে দেখান হইয়াছিল যে, বিদেশীরা মুগ্ধ হইয়া বহু পুতুল কিনিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার পরে, বোধ হয় অন্ততঃ ২৫ বৎসর কাল,
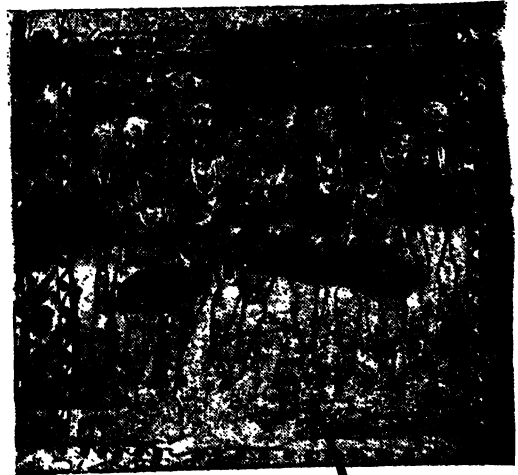
চৈতন্যদেবের কীর্ত্তন পট (বর্দ্ধমান) ১১শ খৃষ্টাব্দ

বিদেশে সে সকলের চাহিদা ছিল। এখনও কলিকাতায় মিউজিয়মে সেরূপ পুতুল রক্ষিত আছে। শত বর্ষ পূর্ব্বেও কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ মানুষের প্রতিমূর্ত্তি গঠনে সিদ্ধহস্ত ছিল। তাহারা মৃত্তিকায় মূর্ত্তি গঠিত করিত এবং তাহা অগ্নিদগ্ধ হইলে কিরূপ সঙ্কুচিত হইবে সে সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞানহেতু সেগুলি এমন ভাবে গঠিত করিত যে, পুড়িবার পর সেগুলি স্বভাবানুযায়ী হইত। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত সেইরূপ একটি মূর্ত্তি লেখকের গৃহে সযত্নে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তাহা লেখকের পিতার আবক্ষ মূর্ত্তি।

প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক জর্জ্জ বার্ডউড বলিয়াছেন, "The patient Hindu handicraftsman's dexterity is a second nature, developed from father to son, working for generations at the same processes and manipulations."

অর্থাৎ ধৈর্য্যসম্পন্ন হিন্দুশিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য পুরুষপরম্পরায় একই প্রকারে পরিচালিত হইয়া স্বভাবেই পরিণত হয়।

এ বিষয়ে উড়িষ্যার মধুসূদন দাশ মহাশয়ের অভিমত বিশেষ মূল্যবান। তিনি বর্ণভেদের সমর্থনে বলিয়াছিলেন, এক এক বর্ণের লোক এক এক ব্যবসা অবলম্বন ও তাহার অনুশীলন করায় তাহাতে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করে—উড়িষ্যার স্বর্ণকার-বালক জিহ্বায় রাখিয়া স্বর্ণের বা রৌপ্যের তারের স্থূলত্ব যেভাবে নির্দ্ধারিত করিতে পারে অন্য লোক নিক্তিতে ওজন করিয়াও তাহা পারে না।

বাঙ্গালায় প্রস্তর সুলভ নহে। কিন্তু কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা তাহাদিগের মূর্ত্তি-গঠন-নৈপুণ্য পরে প্রস্তরে প্রযুক্ত করিতে পারিয়াছে

কালী (কালীঘাটের পট)
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নীত হইয়াছিল

—এখন আর মর্ম্মরমূর্ত্তির জন্য বাঙ্গালাকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। বাঙ্গালায় যে ভাস্করের অভাব ছিল না, তাহার প্রমাণ পুরাতন দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্ষোদিত বলিয়া অভিজ্ঞদিগের দ্বারা বিবেচিত এক একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য সকলকে মুগ্ধ করে।

ইহার সহিত বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির তুলনা করিলে বাঙ্গালার শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য সপ্রকাশ হয়।

বাঙ্গালী মৃৎশিল্পীর পুত্তলের সহিত লক্ষ্ণৌ নগরের পুত্তলের তুলনা করিলে বাঙ্গালার মৃৎশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়।

বাঙ্গালী শিল্পী যে স্বভাবানুগ মূর্ত্তি গঠিত করিতে পারে, তাহা ধ্যানবর্ণিত দেবদেবীর মূর্ত্তি রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। সে বিষয়ে "দেবীমুখ" বাঙ্গালী শিল্পীর অসাধারণত্বের পরিচায়ক। এমন কি ধ্যান অনুসারে চতুর্ভুজ ও দশভুজা রচনায়ও সে স্বাভাবিকের সহিত কল্পিতের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিতে পারিয়াছে।

বাঙ্গালী স্বর্ণকার পত্র ও পুষ্প আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করে।

বাঙ্গালী তন্তুবায় কাপড়ের পাড় করিতে স্বভাবের অনুকরণ করে।

এমন কি বাঙ্গালী নারীরা কাপড়ে "সূচের কাজে," কি কাঁথার নক্সায়ও স্বভাবের অনুকরণ করিয়া থাকেন।

এই অবস্থায় বাঙ্গালার চিত্রকর যে অজ্ঞতা বা অক্ষমতাহেতু পটে স্বাভাবিক রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই, এমন মনে করা অসঙ্গত। ভাবের বিকাশ করাই পট অঙ্কনের উদ্দেশ্য।

রাজনৈতিক কারণে দেশে যখন অরাজকতার মত অবস্থা ঘটে, দেশে যখন ধন প্রাণ মান নিরাপদ থাকে না, যখন দেশে শান্তির স্থান বিশৃঙ্খলা গ্রহণ করে, তখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাতে শিল্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। মুসলমান শাসনের পতন সময়ে বাঙ্গালায় সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। মারাট্টাদিগের লুণ্ঠন, সিরাজদ্দৌলার মত উচ্ছৃঙ্খল শাসকের অত্যাচার দেশে শোচনীয় অবস্থা ঘটাইয়াছিল। সেই অবস্থার সুযোগ লইয়া ইংরেজ শোষণ হইতে শাসন আরম্ভ করে। তখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়—তাহার পরিচয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সে সময় বাঙ্গালার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন—বাঙ্গালা ব্যতীত "কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা ; কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়, উইমাটী খায়, বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল, কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই—সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই,—ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই—পেট চিরে ছেলে বার করে?" তখন বাঙ্গালার অবস্থা—"মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

এ অবস্থা কখন শিল্পের অনুকূল হইতে পারে না। বাঙ্গালার অনেক শিল্প ছিল—সেই অবস্থায় অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

সেই অবস্থার পরে—শিল্প যখন অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়াছে, অর্থাৎ যখন তাহা নামশেষ নহে—অধঃপতিত, তখন "কালীঘাটের পট" দেখিয়া যাঁহারা বাঙ্গালার পটের নিন্দা করেন,

তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না—শিল্পজ্ঞানেরও পরিচয় পাই না।

শিল্প যখন নকল—মৌলিকতাবর্জ্জিত, তখন তাহাকে প্রকৃত শিল্প বলা যায় না। সেই জন্য কালীঘাটের যে পটে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরিঘটিত ব্যাপারে প্রতারিত স্বামী নবীন কর্ত্তৃক বিশ্বাসহন্ত্রী স্ত্রী এলোকেশীকে হত্যা শিল্প-চাতুর্য্য প্রকাশের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, সে পট বাঙ্গালার নিজস্ব পট নহে। তাহা বিদেশ হইতে আমদানী নিকৃষ্ট-স্তরের—অলিওগ্রাফ জাতীয়—অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার বিরোধী চিত্রের সহিত বাঙ্গালীর নিকৃষ্ট জাতীয় পটের সম্মিলনে সৃষ্ট বর্ণসঙ্কর। তাহা বাঙ্গালার পট নহে। তবে কতকগুলি বিদেশী বাঙ্গালার চিত্রশিল্পের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করিয়া বাঙ্গালীকে হেয় করিবার অভিপ্রায়ে সেইগুলিকেই বাঙ্গালার পট বলিয়া থাকেন।

বিজ্ঞবর কার্লাইল বলিয়াছেন, ললিতকলা যখনই সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই তাহা যদি মৃত না হয়—তবে উন্মাদ।

আর হুইশলার বলিয়াছেন, অনেক সময় চিত্রের প্রশংসা করিয়া বলা হয়, তাহাতে আন্তরিক শ্রম সপ্রকাশ; কিন্তু যে চিত্র সম্বন্ধে তাহা বলা যায়, সে চিত্র অসম্পূর্ণ, সুতরাং প্রদর্শনের অযোগ্য।

অর্থাৎ শিল্পী তাঁহার সৃষ্টিতে তাঁহার সাফল্যের আনন্দকিরণ বিকীর্ণ করিবেন—তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বলিয়া মনে হইবে। নহিলে শিল্পীর চেষ্টা ব্যর্থ।

বাঙ্গালীর শিল্পানুরাগ সর্ব্বত্র সপ্রকাশ। উৎসবে বাঙ্গালী মহিলারা গৃহে যে আলিপনা দেন, তাহাতে শিল্পীর মৌলিক কল্পনা রূপ গ্রহণ করে। বাঙ্গালী মহিলা শীত-নিবারণ জন্য পুরাতন বস্ত্রে যে কন্থা করেন—তাহাতেও নানা সূচের কাজ সময় সময় বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর শিল্পের পরিচয় দেয়। বাঙ্গালী কুম্ভকার হাঁড়ী কলস প্রস্তুত করিলে তাহার উপর রেখা টানিয়া দেয়—হয়ত কাণায় নক্সা-কাজ করে। বাঙ্গালী কর্ম্মকার কাটারী বা খাঁড়া প্রস্তুত করিলে তাহাতে হয়ত নক্সা—অন্ততঃ একটি চক্ষু করিয়া দেয়। যাঁহারা পল্লীগ্রামে খড়ের ঘর লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—কড়ীকাঠে দেবদেবীর বা পক্ষীর বা ফুলের প্রতিকৃতি খোদিত বা চিত্রিত থাকে।

বাস্তবিক শিল্প কেবল নৈপুণ্য-পরিচালনা নহে, নৈপুণ্য পরিচালনার দ্বারা আনন্দলাভ ও আনন্দদানই শিল্পের উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালার পটশিল্প সেই নৈপুণ্যে সমুজ্জ্বল। ভাবের অভিব্যক্তিই তাহার উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালার পটশিল্প যখন অধঃপতিত হইয়া "কালীঘাটের পটে" পরিণতিলাভ করিয়াছিল, তখন বাঙ্গালায় শিল্পীরা তাহাকে নূতন রূপ প্রদান করেন। সেই সকল শিল্পী য়ুরোপের চিত্রকলার সহিত পরিচিত হইয়া যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা বিপ্লবদ্যোতক। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলেই দিল্লী হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের অধীন বিভিন্ন জাতির শিল্প দেখা গিয়াছিল। প্রাচীতে বৌদ্ধগণ গ্রীক শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া যে নূতন শিল্পাদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা প্রথমে চীনে—তাহার পরে চীন হইতে জাপানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল—আজিও তাহা লুপ্ত হয় নাই।

বাঙ্গালার পটে যাঁহারা পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহারা অনেকে য়ুরোপীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় শিল্পের সহিতও পরিচিত ছিলেন। অন্নদাপ্রসাদ বাগচী প্রমুখ বাঙ্গালী চিত্রকরগণ—এক দিকে যেমন য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে "প্রতিকৃতি" অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তেমনই আবার দশমহাবিদ্যার, সতীর শব স্কন্ধে মহাদেবের, দুর্গার—চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন—সে সকল চিত্র লিথোগ্রাফে রঙ্গীন চিত্ররূপে "আর্ট ষ্টুডিয়ো" নামক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে য়ুরোপীয় প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে প্রভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়াছিল, বাঙ্গালায় নহে—বোম্বাই প্রদেশে রবি বর্ম্মার পৌরাণিক চিত্রে।

এই সময় এ দেশের চিত্রশিল্পীরা য়ুরোপের শিল্পীদিগের চিত্রের সহিত পরিচিত হইতে থাকেন এবং র‍্যাফেল হইতে টার্ণার ও লেটন পর্য্যন্ত বহু শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'ন। কলিকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়েও য়ুরোপীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। বোধ হয় শশিকুমার হেশ প্রথম চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ ইটালীতে গমন করেন। তাঁহার পরে হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) ফ্রান্সে গিয়াছিলেন—চিত্রবিদ্যার অনুশীলনজন্যও বটে, বোমা প্রস্তুত করিতে শিখিবার জন্যও বটে। তাহার পরে অতুল বসু প্রমুখ চিত্রকররা য়ুরোপে গিয়াছেন—কেহ কেহ তথায় আদর লাভও করিয়া আসিয়াছেন।

ইতোমধ্যে শিল্পী হ্যাভেল কলিকাতায় সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লক, জবিন্স, গিলার্ডি প্রভৃতির পন্থা বর্জ্জন করেন এবং নবজাত উৎসাহের আধিক্যে তাঁহাদিগের সংগৃহীত বিদেশী চিত্রের প্রতিলিপি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের চিত্রশালা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সেরূপ চিত্র রাজেন্দ্র মল্লিকের গৃহে, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সংগ্রহশালায় ও অন্য কাহারও কাহারও গৃহে রক্ষিত ছিল।
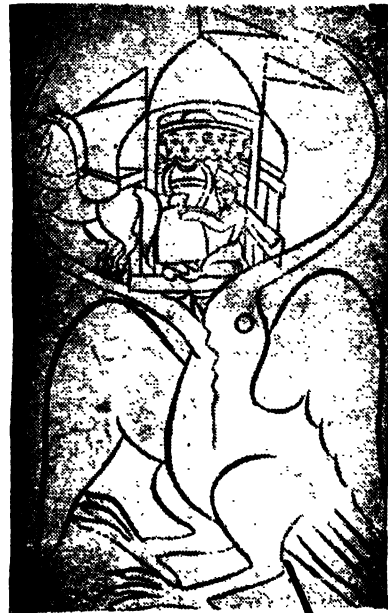
জটায়ু ও রাবণ (কালীঘাটের পট) ১৯শ খৃষ্টাব্দ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালার পট সম্বন্ধে আমরা তাহা বলিতে পারি—

"এখানে (ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়) সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্ব্বণ' চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে 'পৌষপার্ব্বণে' যে একটা সুখ আছে 'বৃত্রসংহারে' তাহা নাই। পিঠা পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। * * * যাহা মা'র প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে।"

সেই কারণে বাঙ্গালার পট সংগ্রহের সার্থকতা আছে। উৎকৃষ্ট পট যত্ন করিয়া রাখিতে হইবে। সেরূপ পট নানা কারণে ইতোমধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বাঙ্গালীর রুচি-পরিবর্ত্তনে অনাদর অবশ্য তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। আর কারণ, বাঙ্গালার জলবায়ু। বাঙ্গালার জলবায়ুতে কাগজ, তালপত্র প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প দিনে নষ্ট হইয়া যায়—বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়—কাগজ ও তালপত্র দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় না। বাঙ্গালী শিল্পী সেই জন্য স্থায়িত্ব লাভের চেষ্টায় কাগজে সেঁকো-মিশান বর্ণ ব্যবহার করিয়া কীটের উপদ্রব দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—বার্ণিসের পরিবর্ত্তে বেলের আঠা দিয়া আর্দ্রতার আক্রমণ প্রহত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই জন্যই এখনও পুঁথিতে চিত্র ও পট চেষ্টা করিলে সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহের প্রয়োজন আছে।

গণেশ। (মুর্শিদাবাদের চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত)

পটের পুনঃপ্রবর্ত্তন না করিলেও পটে যেরূপে ভাব প্রকাশের দিকেই অধিক মনোযোগ প্রদত্ত হইত সেরূপ ভাবে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির নবভাবে প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার আদর্শ—জাপানী বা চীনা চিত্র নহে—বাঙ্গালার পট। পটে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন-প্রভাব লক্ষিত হইয়াছে অবনীন্দ্রনাথের ও তাঁহার সহকর্মীদিগের চিত্রে। অবনীন্দ্রনাথ যে চিত্রপদ্ধতির প্রবর্ত্তক তাহা দেশে আদর লাভ করিবার পূর্ব্বেই জাপানে আদৃত হইয়াছিল এবং জাপানের 'কোকা' পত্রে তাঁহার চিত্রের বিবরণ ও প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। এ দেশে তাহা আদৃত হইতে বিলম্ব ঘটার কারণ দেশের লোক তখন পটের বৈশিষ্ট্য ভুলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদিগের কথায় বলিয়াছেন, তাঁহারা বিলাতী পণ্ডিত হইতে বিলাতী কুকু[র] বিদেশী সকলেরই ভক্ত সেই দলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং অনেকে[র] বিশ্বাস, যাহা কিছু নূতন তাহাই অস্পৃশ্য।

সে যাহাই হউক, অবনীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতির উদ্ভাবক ও প্রচার[ক] তাহাতে বাঙ্গালার পটের মূল উদ্দেশ্য গৃহীত হইয়াছে। কি[ন্তু] তাহা এখনও অবনতির সম্ভাবনামুক্ত হয় নাই—কারণ, তাহা এখন নূতন। সম্রাট আকবরের সময়ে ভারতীয় ও সারাসিনিক স্থাপত্যে সম্মিলনে যে ইন্দো-সারাসিনিক স্থাপত্যের উদ্ভব হয়, তাহা আকব[র] ও জাহাঙ্গীরের পরে শিল্পরসিক সম্রাট শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতা[য়] বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরে—শাহজাহানের শিল্পপ্রিয়তার সংযম ও মৌলিকতায় বঞ্চি[ত] হইয়া অযোধ্যায় নবাবদিগের গৃহাদিতে অবনতির পথে অগ্রস[র] হইয়াছিল।

অবনীন্দ্রনাথের পদ্ধতিকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবা[র] উপায়—বাঙ্গালার পুরাতন উৎকৃষ্ট পট অধ্যয়ন এবং অবনীন্দ্রনাথে[র] ও নন্দলাল বসুর চিত্রিত চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা। কার[ণ] শিল্পে স্বতঃস্ফূর্ত্তির পরেই প্রয়োজন—constant purificatio[n] by comparison with the best examples an[d] models.

সেই কারণে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল প্রমুখ ব্যক্তিদিগের প্রতি[নিধি] চিত্রের সংগ্রহ সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

আর বাঙ্গালার—সেকালের বাঙ্গালার—উৎকৃষ্ট পট বাঙ্গাল[ার] নানা স্থান হইতে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষা ক[রা] জাতির কর্ত্তব্য।

চিত্রকর কিরূপ যত্নে ও চেষ্টায় তাঁহার কল্পনাকে রূপ দান করে[ন] তাহার পরিচয় লণ্ডনে বিখ্যাত শিল্পী লর্ড লেটন তাঁহার যে[...] জাতিকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রসিদ্ধ চিত্রগু[লির] প্রথম পরিকল্পনা হইতে নানারূপ পরিবর্তনের পর শেষ চি[ত্রে] পরিকল্পনা—ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার পটশিল্পী আজ অজ্ঞাত—তাঁহাদিগের পটের ক্রমবিকাশ বুঝিবার উপায় [ও] নাই। তাঁহাদিগের নামও আজ বিস্মৃতিগর্ভগত। কিন্তু তাঁহাদি[গের] পট সংগৃহীত হইলে যে বাঙ্গালার পটশিল্পের ক্রমবিকাশ বুঝি[বার] সুযোগ পাওয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

বাঙ্গালার কোন কোন মন্দিরেও চিত্র পাওয়া যা[য়]। গুপ্তিপাড়ায় বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরেও তাহার প্রমাণ আছে। সে স[ব] অজন্তার গুহামন্দিরের চিত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে না।

কিন্তু সে সকলও অধ্যয়ন করিবার মত এবং সে সকলের প্রতিলিপি সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

পটের কথায় আর একপ্রকার চিত্রের কথা বলিতে হয়—সে চিত্র পুঁথিতে দেখা যায়। বাঙ্গালার পুঁথি যে মুসলমান ধনীদিগের পুঁথির চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় অনেক পুঁথিতেও উল্লেখযোগ্য চিত্তাকর্ষক ছবি পাওয়া যায়। সে সকলে কেবল যে শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়, তাহাই নহে—মন্দির-গাত্রে ঢালাই ইষ্টকে যেমন সমসাময়িক রীতির ও প্রথার পরিচয় থাকে তেমনই সেই সকল চিত্রেও সমসাময়িক সামাজিক প্রথাদি বুঝিতে পারা যায়।

বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে এখনও বাঙ্গালার পুরাতন উৎকৃষ্ট পট পাওয়া যায়, তাহা অনেকে জানেন। সে সকল যাহাতে অযত্নে নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পট উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশেও আছে এবং সে সকল স্থানে পশ্চিমবঙ্গের মত দুষ্প্রাপ্য হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার কারণ, বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য, শিল্প, আচার, ব্যবহার এমন কি বেশও আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মনরো যখন বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা এত অল্প আসবাব ব্যবহার করে এবং এত সুলভ স্বদেশী দ্রব্যেই তাহাদিগের অভাব দূর হয় যে, ভারতে ইংলণ্ডের পণ্য অধিক বিকাইবে না, তখন তিনি এ দেশে দ্রুত পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতে পারেন নাই। সে পরিবর্ত্তন এত দ্রুত যে আয়ার্লণ্ডে "বয়কট" শব্দ সৃষ্ট হইবারও পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছিলেন—আমাদিগের ধর্ম্ম অনুষ্ঠানেও যেভাবে বিদেশী পণ্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে স্বদেশী শিল্পের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, সুতরাং আমাদিগের পক্ষে বিলাতী পণ্য ব্যবহার না করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়া প্রয়োজন। আর "হিন্দুমেলায়" মনোমোহন বসুর গান গীত হইয়াছিল—

"অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল
কেমনে হরিল, কেহ না জানিল
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন!
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
সারশস্য গ্রাসে যাহা ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভুষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন!
তাঁতী কর্ম্মকার করে হাহাকার
সুতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার,
দেশী অস্ত্র বস্ত্র বিকায় নাকো আর
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!"—ইত্যাদি।

যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ (উত্তরকালে সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন নবীনচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রাখে ম্যাঞ্চেষ্টার;
লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল
ক্রমে লিভারপুলে লবণ তাহার!"

সেই অবস্থায় যদি বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী শিল্পের অনাদর হইয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

এই রুচিবিকার হইতে বাঙ্গালীকে যাঁহারা রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা স্মরণীয়। আমরা য়ুরোপীয় চিত্রের নিন্দা করি না—প্রশংসাই করি। আমাদিগের দেশে বহু শিল্পী—বাঙ্গালায় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় হইতে অতুল বসু পর্য্যন্ত যেভাবে য়ুরোপীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য লইয়া স্বদেশী ভাব-বিকাশে প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বাঙ্গালার পট সম্বন্ধে আমরা তাহাই বলিব—"যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে।"

কালীঘাটের পট সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে একটি কথা বলা হয় নাই। এই সকল পট বহু দিন সমাজের দোষ ত্রুটি—অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত ভাবে দেখাইয়া সে সকলের সংশোধনে সহায় হইয়াছিল। তাহাও সে সকলের উপযোগিতা বলিতে হয়। সে সকল পটও কালের গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে! ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে 'পাঞ্চ' প্রমুখ পত্রে যেরূপ ব্যঙ্গচিত্র অনেক স্থলে সমাজের দুর্নীতি ও অসঙ্গতিতে কশাঘাত করে, এ দেশে কালীঘাটের পট সেইরূপ কাজ করিয়াছে। তখন এ দেশে সংবাদপত্রে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ প্রায়ই হইত না। পরে 'মধ্যস্থ', 'হালিসহর পত্রিকা' প্রভৃতিতে সেই জাতীয় চিত্র প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। সেই হিসাবে কালীঘাটের পটের যে উপযোগিতা ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। *

---

* পটগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত। মিউজিয়মের সৌজন্যে প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল।

টিয়ে

নন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য

টুকটুকে লালঠোঁট টিয়ারা এসেছে দল নিয়ে,
জানালায় মুখ রেখে ভাবছ কি পৌষের বিকেলে;
পাকা টম্যাটোর ক্ষেতে ক'টি রাঙা ফল ঠুকরিয়ে—
যে ক'টা সবুজ পাখী ছিল সব উড়ে গেল নীলের নিখিলে—
এখন নির্জীব ক্ষেত—স্তব্ধ স্থির পাতাও নড়ে না,
গাছপালা কাগজের ছবি,
মনে হয় নাকি বল মনোনীতা, ম্লান হ'লে উঠানের কোণার করবী—
দিন যেন ছোট হয়, আমাদের আনন্দের পাখী, তাড়াতাড়ি ফিরে যায়
যায় নাকি, অনিচ্ছুক ডানা নেড়ে ডালে-পালে ঘুমের বাসায়।
রাত্রির নদীর তীরে তুমি, আর আমি এই পথের বিমুগ্ধ তমাল
আশ্চর্য্য স্বপ্নের টিয়ে ডানায় গুটিয়ে ঠোঁট ভেবে রাখে
তোমারই তনুর সকাল

অমল মিত্র

শাস্ত্র বলে, সত্যের রূপ বদল নেই, রং-বদল নেই। সে চির জ্যোতির্ময়। এই জ্যোতির ওপর পড়ে আবরণ, পড়ে আভরণ, লাগে সংস্কারের ছোঁয়া আর অভ্যাসের স্পর্শ। এমনি করেই বিভেদের আকার নেয় সে, বাঁধা পড়ে বৈষম্যের ছোট ছোট খুপরীতে। এক রূপকে শত রূপে দেখি। 'আমি'-'তুমি'র সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে গুণী তপশ্চরণে বসেন, সবার আগে এই বিভেদ স্খলনের ঢেউ লাগে তাঁর ভেতরে ও বাইরে। কর্মযোগী সেই স্থিরবুদ্ধি মানুষের সকল আবরণ আভরণ এবং সংস্কারের শিকলগুলি আপনি খসে পড়ে যেতে থাকে কখন। সেই অন্তরস্পর্শী রূপের কাছে আমি-তুমির ভেদাভেদ ঘুচে যায়। দেশকালপাত্রের ব্যবধানও যায় চলে। স্বামী বিবেকানন্দকে তাই সাগরপারের মানুষেরা বলতে পেরেছে, এস ভাই, মন্ত্র দাও! শ্বেতাঙ্গিনী নিবেদিতাকে সাদরে ডেকে আমরা বলেছি, তুমি তো আমাদেরই বোন। বিশ্ববরেণ্য যাঁরা তাঁরা বিশ্বেরই সম্পদ—কোন দেশের নয়, কোন জাতির নয়। এই কাহিনী রচনার উপলক্ষে মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভেতর দিয়ে নতুন চোখে চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি যে মানুষটির, তিনি হলেন মেজর জেনারেল চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট। দেশবাসী আপন করে নেবার জন্যে যাঁকে নামের নামাবলী পরিয়েছে 'হিন্দু' ষ্টুয়ার্ট।

ভূমিকার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে, সৈনিক বিভাগের পদস্থ এক কর্মচারীর বিষয় লিখতে বসিনি। দেড়শো

দরদী অনুরাগীর বিষয় কিছু বলব। প্রসঙ্গতঃ তাঁর কর্মজীবনের বিষয় দু'-এক কথা বলি। কটন লিখেছেন, নাম শুনে অনেকেই তাঁকে স্কটল্যাণ্ডদেশীয় বলে ভুল করেন, কিন্তু আসলে তিনি আইরিশ। ১৭৫৮ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম হয়। পিতা টমাস্ স্মাইথ ছিলেন ডাবলিনের অধিবাসী। সেদিনের এক প্রথিতযশা মানুষ তাঁর ছোট ভাই জন্ প্রেণ্ডার গাষ্ট। পরে যিনি ভাইকাউণ্ট উপাধি-ভূষিত ভাইকাউণ্ট গোর্ট নামে সুপরিচিত। চার্লস ছাড়া আরো দুটি ছেলে ছিল স্মাইথের—টমাস্ ষ্টুয়ার্ট এবং জন্ ষ্টুয়ার্ট। একমাত্র কন্যা এলিজার বিবাহ হয়েছিল ক্যাপ্টেন বার্কারের সঙ্গে।

"হিন্দু ষ্টুয়ার্টের" সমাধি-মন্দির। সাউথ পার্ক স্ট্রীট সমাধিক্ষেত্র—কলিকাতা

আয়ার্ল্যাণ্ডেই চার্লসের ছেলেবেলা কাটল। প্রথম বিদ্যাশিক্ষা সেখানেই গণ্ডীবদ্ধ। ১৭৭৭ সালে কোম্পানীর অধীনে এক চাকুরী মিলল, সৈনিক বিভাগে। ৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি ভারতাভিমুখে যাত্রা করলেন 'ইউরোপা' জাহাজে। বয়স তখন মাত্র উনিশ। পৌছলেন এদেশে। ১৭৭৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী নতুন কাজে যোগ দিলেন। মাত্র ন'মাসের মধ্যেই পেলেন লেফ্‌টন্যাণ্টের পদ। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৪ পর্য্যন্ত 'ফার্ষ্ট বেঙ্গল ইয়োরোপীয়ান রেজিমেন্ট'এর কোয়ার্টার-মাষ্টারের কাজে নিযুক্ত থেকে ১৭৯৫ সালের শেষে ক্যাপ্টেন পর্য্যায়ভুক্ত হলেন। ১৭৯৮ সালে দেখি মেজর চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট 'বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যানট্রি' পরিচালনা করছেন। নতুন বছরের প্রথম দিনে ১৮০৪ সালে তাঁর লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হ'ল। পুরোনো দিনের নথিপত্রে দেখা যায়, বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই 'টেনথ এ্যাণ্ড ফিফটিনথ নেটিভ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি' পরিচালনা করে দীর্ঘকালের জন্য ছুটি নিলেন চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট। ১৮০৪ সাল থেকে ১৮০৯ সাল পর্য্যন্ত স্বদেশে কাটিয়ে ফিরলেন আবার এদেশে। এর পর কর্মজীবন তাঁর আরো উন্নতমুখী। শেষ পর্য্যন্ত ১৮১৯ সাল থেকে ১৮২২ সাল পর্য্যন্ত সগর 'ফিল্ড ফোর্স'-এর ভার গ্রহণ করেন তিনি। মেজর জেনারেল হয়েছেন তখন। সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসরের ওপর এই ভাবে অপরিসীম খ্যাতি ও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে অবসর গ্রহণ করলেন চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট। কলকাতাতেই চৌরঙ্গীর এক বাড়ীতে বসবাস সুরু করলেন। এই গেল মোটামুটি তাঁর কর্মজীবনের ইতিহাস।

আমাদের কিন্তু আকৃষ্ট করে তাঁর জীবনের আর একটা দিক। এদেশের সব কিছুই তিনি ভালবেসেছিলেন। বিশেষ করে এখানকার শিল্পকলা। উনিশ শতকের গোড়ায় এই বিদেশী মানুষটি বিরাট এক শিল্প-সংগ্রহশালা গড়ে তুললেন তাঁর চৌরঙ্গীর বাড়ীতে। সেদিনের সংবাদপত্র তাঁর এই চৌরঙ্গীর বাড়ীটির নাম দিলে 'মিউজিয়াম'। তখনও কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ভাবী-কালের গহ্বরে। একমাত্র এশিয়াটিক সোসাইটির অদম্য উৎসাহী সভ্যেরা সেদিন ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন-গুলি কিছু কিছু সংগ্রহ করছিলেন। অবাক লাগে, সেদিনের সেই অনাদৃত শিল্পযুগে তাঁর মনসিজ শিল্পী-মনের কথা ভেবে। বিহার এবং উড়িষ্যা থেকে নানা দেব-দেবীর প্রস্তর-মূর্ত্তি, প্রাচীন পট, অস্ত্রশস্ত্র, অপূর্ব সংগৃহীত হ'ল। দূর-দূরান্তরে তিনি হানা দিলেন এই সংগ্রহের তাগিদে। হয়ত, সন্ধান পেলেন পালযুগের এক অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির। চেষ্টা চলল সেটিকে সংগ্রহ করবার। হ'লও সংগ্রহ। খবর এল যক্ষরাজ কুবেরের নিখুঁত একটি মূর্ত্তির। ধনপতি যক্ষ, ডান হাতে আম্রফল, বাঁ হাতে ধরে আছেন এক নেউলের গলদেশ পায়ের তলায় মোহরের ঘড়া—অর্দ্ধ-নিমীলিত ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি। এমন মূর্ত্তিটি সংগ্রহ না করা পর্য্যন্ত কি স্থির থাকতে পারেন চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট। অতএব সংগৃহীত হল সেটিও। সকল হিন্দুরই প্রাণের জিনিষ হর-পার্বতীর বিবাহ-স্মৃতি। কালিদাসের কুমারসম্ভব কল্পনা-প্রসূত অমর শিল্প কারু—উমার বাঁয়ে শিব, মাঝখানে অগ্নিহোত্রী ব্রহ্মা, তলায় বাজনদারের দল। তাও সংগ্রহ করলেন। পালযুগের বামন অবতার, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির বহু বিস্মৃতিকামী মূর্ত্তিও সংগ্রহ করলেন ভারতীয় শিল্প আহরণের চিরনবীন পুরোহিত। তাঁর সংগ্রহশালার চতুর্ভূজা দুর্গা, সূর্য্য মূর্ত্তি, বুদ্ধ মূর্ত্তি, তারা মূর্ত্তি সব-কিছুই আজও শিল্প-রসিকদের অমৃতের খোরাক যোগায়। আমরা সেদিন দেশের শিল্পকলার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। বিদেশীর ছবি ও মর্ম্মর মূর্ত্তি দিয়ে সাজানো হ'ত আমাদের বাসগৃহ। অথচ তখনও দেশের শিল্পী ও তাদের শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। গ্রামে গ্রামে পটুয়ারা তখনও আঁকছে অদ্ভুত পট, কালীঘাটের পটুয়ারাও পূর্ণোদ্যমী। কিন্তু দেশের ধনী সম্প্রদায়ের কাছে সে সব শিল্প-সম্ভার প্রায় মূল্যহীন, অপাঙ্‌ক্তেয়। বিদেশী ইংরেজ ঐ যুগেই আমাদের বহু শিল্পীকে ডাকল। আঁকাল তাদের দিয়ে নানা উদ্ভিদের ছবি। আজও

বোটানিক্যাল গার্ডেন্সে সযত্নে রক্ষিত অখ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা জীবন্ত ছবিগুলি দেখলে চোখ জুড়োয়। ষ্টুয়ার্টের চৌরঙ্গীর বাড়ীর সংগ্রহশালাটি সকলেরই দেখবার সুযোগ ছিল। গৃহস্বামী উপস্থিত থাকলে পরম উৎসাহের সঙ্গেই আগন্তুকদের দেখাতেন সেটি। তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন কৌতূহলী দর্শক উপস্থিত হলে তাঁকেও ফিরে যেতে হ'ত না। ঢালাও হুকুম ছিল ভৃত্যদের ওপর সযত্নে সংগ্রহশালাটি দেখাবার। বিচিত্র সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলতে তাঁকে দুর্নামের বোঝাও ঘাড়ে করতে হয়েছে কম নয়। যেমন, ধর্মযাজক জন্ চেম্বারলেন ভারতের বহু স্থান পর্যটন করেছিলেন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছলেন তিনি বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে। ১৮১৭ সালে ২০শে নভেম্বর তাঁর দিন-পঞ্জিকায় লিখেছিলেন, দেখা হ'ল সেখানে এক পূজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে। শুনলেন তাঁর কাছে সে গ্রামের লক্ষ্মী মূর্তির অপহরণ-কাহিনী। অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্তি। আনাগোনা সুরু হ'ল এক ইংরেজের ঐ ব্রাহ্মণের কাছে। চাই তাঁর মূর্তিটি। বহু টাকার লোভ দেখালেন। ব্রাহ্মণ জানালেন আশপাশের সবাই নিত্য পূজা করেন বিগ্রহটিকে, দূরদূরান্তর থেকে বহু লোকই আসে সেখানে পূজা দিতে। অতএব সেটি হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। ইংরেজটি কিন্তু কোন কথাই শুনলেন না। জানালেন, নিত্য পূজা পাবে বিগ্রহটি তাঁরও ঘরে। এমন কি নিয়ে গেলেন সেই পূজারীটিকে আপন বজরায়। সেখানে দেখা গেল দু'টি ব্রাহ্মণ গণেশ, ভৈরব, তুলসী প্রভৃতি নানা দেব-দেবীর পূজায় ব্যস্ত। এতেও মন টলল না বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের পূজারীর। বিগ্রহ সমর্পণে রাজী হলেন না। সেই রাত্রিতেই কিন্তু চুরি হয়ে গেল বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের লক্ষ্মী মূর্তি। আর ইংরেজটির বজরাও উধাও হ'ল। তার পর থেকে সকল ইংরেজকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন পূজারী ব্রাহ্মণ। সব শুনে জন্ চেম্বারলেন কিন্তু বুঝেছিলেন, মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্ট ছাড়া এ আর কারো কাজ নয়।

এদেশের প্রচলিত পৌরাণিক গল্প উপাখ্যান সব কিছুই ষ্টুয়ার্টের নখদর্পণে ছিল। তাই তাঁর মৃত্যুর পর সেদিনের ইণ্ডিয়া গেজেট দুঃখ করে লিখল, এদেশীয়দের সঙ্গে আদান-প্রদানে যে গভীর জ্ঞান তিনি অর্জন করলেন জগৎকে তা দিয়ে গেলে এক বিস্ময়কর বস্তুই হ'ত। এখানকার আচার-ব্যবহার রীতি-নীতিও ছিল তাঁর জানা। অক্লান্ত পরিশ্রমী ছাত্রের মত শিক্ষা করেছিলেন এদেশের ভাষা। দেশের লোকের প্রতি তাঁর ভালবাসাও ছিল অপরিসীম। তাদের সব কিছুই, এমন কি তাদের ধর্মের প্রতি, তাদের সংস্কারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও আগ্রহ ছিল এমনই যে, 'হিন্দু' ষ্টুয়ার্ট নামে পরিচিতি লাভ করলেন তিনি। শোনা যায়, প্রতিদিন পায়ে হেঁটে উড ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে যেতেন গঙ্গাস্নানে। প্রাচীন কাল থেকে এই গঙ্গাস্নানের নানা ব্যাখ্যাই আমরা শুনে আসছি। আধ্যাত্মিক থেকে বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা পর্যন্ত। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর এই নৈমিত্তিক স্নান-সমারোহ আধ্যাত্মিকতা-প্রসূত।

ষ্টুয়ার্টের চরিত্রের আর একটি দিকের বিষয় কিছু না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ হবে। সদাপ্রফুল্ল অমায়িক এই মানুষটির দানশীলতার কথাও মৃত্যুর পরে গোপন রইল না। কোন দিন কেউ ফেরেনি তাঁর দরজা থেকে। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন প্রায় এক শত নিরন্নের অন্ন জুগিয়েছিলেন উদার-প্রাণ এই মানুষটি বহু বছর ধরে।

তার পর হঠাৎ একদিন এত বড় শিল্প-পূজারীর নশ্বর প্রাণের ওপর নেমে এলো মহানির্বাণের যবনিকা। সত্তর বছর বয়সেও তাঁর স্বাস্থ্য ছিল অটুট। তাই এই বয়সের মৃত্যুটাও ছিল যেন অপ্রত্যাশিত। মাত্র কয়েক দিনের রোগে ১৮২৮ সালে ১লা এপ্রিল তারিখে সেই চৌরঙ্গীর বাড়ীতে তিনি চির নিদ্রাভিভূত হলেন। মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু শতাব্দীর সেতু ডিঙ্গিয়ে তাঁর সৃজন-কাকলী কানে আসে। ৭ই এপ্রিলের ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকা সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় বিলাপে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করল। তাই থেকেই জানতে পারি, বৃদ্ধ ষ্টুয়ার্ট ২৭ সালে শীতকালে দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দেরী হয়ে গেল। কারণ তাঁর অতিপ্রিয় সংগ্রহশালাটি ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

ধর্মযাজক (রেভারেণ্ড জে· আর· হেণ্ডারসন) তাঁদের দেশীয় প্রথায় সাউথ পার্ক ষ্ট্রীটের সিমেট্রিতে সমাধি দিলেন তাঁর মরদেহের। কিন্তু সে সমাধির সামনে এসে দাঁড়ালে মনের অন্দরমহলে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসে। আজীবন তাঁর দেহের অনুমজ্জায় সঞ্চারিত হয়েছে, অঙ্কুরিত হয়েছে প্রাচ্যের আচার, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা। আর মরণের পরেও এই তাঁর অপরূপ প্রাচ্য-প্রতীক সমাধি-মন্দির। মাথায় শিব, দু'ধারে হিন্দু-মন্দির, এক পাশে গঙ্গা, অপর পাশে যমুনা, মাঝখানে প্রস্ফুটিত পদ্ম। সত্যিই কি ছিলেন তিনি মনে-প্রাণে খৃষ্টান? না কি ওটা বিধাতার সৃষ্টির ভুল!

কিন্তু, এই অমর গুণীর প্রাণের সংগ্রহশালাটির পরিণাম আমাদের কাছে বড় বেদনা-করুণ। দু'বছরের মধ্যেই দেখি (১৮৩০), ক্রাইষ্টির নীলাম-ঘরে তার ডাক উঠেছে। কিনলেন জেমস্ ব্রীজ। কিন্তু তাঁর বংশধরেরা এটি বিক্রী করে দিতে চাইলেন (১৮৭২)। আবার নীলামের মহড়া। কিন্তু কোথায় তখন ভারতীয় শিল্পের দরদী মানুষ? সমস্ত নীলামে একটি মাত্র লোক এগিয়ে এলেন মূল্যের ভিক্ষামুষ্টি নিয়ে। তিনি বৃটিশ মিউজিয়ামের স্যার ডব্লিউ ফ্র্যাঙ্কস্। সুমতি হ'ল ব্রীজের বংশধরদের, বিক্রী করলেন না। দান করলেন সেই শিল্পসম্ভার বৃটিশ মিউজিয়ামে। প্রসঙ্গত বলি, ১৯৩৪ সালে দেশবরেণ্য পুরাতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ যখন ওদেশে, ষ্টুয়ার্টের সংগ্রহশালাটি তাঁকে দেখবার জন্য অনুরোধ করলেন বৃটিশ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষেরা। মুগ্ধ হলেন প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাটি দেখে। 'মিডিয়েভাল ইণ্ডিয়ান স্কাল্পটার' বইতে তাঁরা লিপিবদ্ধও করে গেলেন অনেক কিছুই।

বস্তুতান্ত্রিক দুনিয়ায় আজ দেখি শিল্পের নামে চলেছে বস্তু-ছটার পালিশ আর লোক-দেখান সংগ্রহের আতিশয্য। সেখানে প্রাণ হয়তো আছে কিন্তু আছে কি সেই প্রাণের আকুতি? কিন্তু তবু বলব, যে কারণেই হোক্ বিশ্বের দরবারে ভারতীয় শিল্প এবং শিল্প-সংগ্রহ-শালার আসন উত্তরোত্তর সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এমন দিনে শিল্পী মায়ের ওই দরদী সন্তানটির স্মৃতি-তর্পণ আমাদের শিল্প-অঙ্গনের দেউল-দ্বারে কি প্রদীপ হয়ে জ্বলবে না?

মেনকার খেদ

[পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে]

শ্রীশান্তি পাল

রাণী কেঁদে কেঁদে ফিরে করাঘাত হানে শিরে—জলে ভাসে বুক,
বলে,—গৌরী কচি মেয়ে ভাঙড়ের ঘরে যেয়ে পাবে বড় দুখ্!
বড় সাধ ছিল মনে নিমন্ত্রিয়া রাজগণে কন্যা দান করি,
বিড়ম্বিল বিধি আজ ইথে কত পাই লাজ সেই সবে স্মরি'।
নারদের শুনে কথা মর্ম মাঝে পাই ব্যথা অন্ত নাহি তার,
অন্ন-বস্ত্র নাহি জুটে সদাকাল সিদ্ধি ঘুঁটে ভিক্ষা-পাত্র সার।
কুচনীর ঘরে 'জন' ঘাটে শুনি অনুখন
ভূত সঙ্গে ক'রে,
চিতা-ভস্ম মাখে গায় নাহি কোন লাজ তায়
নাগ-পৈতা পরে!
শিরে শোভে জটাজুট কণ্ঠে ধরে কালকূট
ঢেউ খেলে জটে—
গঙ্গা সেথা কলকলে তরঙ্গিয়া টলমলে
পড়ে কটিতটে।
কভু হন দিগম্বর চিরবাস বাঘাম্বর ভরে ত্রিভুবন,
সবে নিন্দে ঘরে বরে উমা মা'রে কা'র করে করি সমর্পণ!
কহে কবি শান্তি পাল সংসারের এহি হাল কি বিচিত্র গতি,
ভাবে লোক মনে এক আর হ'য়ে ওঠে দেখ সবি যে নিয়তি!

শিবের বিয়ে

ঝাঁ গুড় গুড় বাদ্যি বাজে আজ কে শিবের বে'
নন্দী পরায় গরদ-চেলী গায়ে হলুদ দে'।
সাজন হ'ল মন্দ সে নয়, বৃষয় চ'ড়ে বর
ঢুলুকি চালে চলল ভোলা গিরিরাজের ঘর।
সভার মাঝে ব'স্তে বিভু উঠ্‌ল কলরোল—
লাগ্ রে গো উক্তরে গেল পাত্র এবার তোল্।
কন্যা আনো ছান্‌লাতলায়, ও এয়োরা ধর্,
আসরখানি জাঁকিয়ে ওলো উলুধ্বনি কর্।

রাজার পুরুত মন্ত্র পড়ে, আগুন আগে থোয়,
হোমের মুখে প'ড়তে হবিঃ চক্ষু জ্বলে ধোঁয়।
বরণ করে পাঁচ-এয়োতি সাতটি মেরে পাক,
ভূত-প্রেত সব উঠল নেচে—উঠল বেজে ঢাক।
দান দিল নগ গাড়ু-বাটা, বিদেয় ক'ল ভাট,
বাটি, ঘটি, কলসী দিল—সোনায়-মোড়া খাট।
তাহার সাথে দিলেন রাজা গৌরী মেয়ে দান,
মা-মেনকা মুষড়ে প'লেন ব্যথায় ম্রিয়মান।

পঞ্চ-গ্রাসীর আসন 'পরে পাত্রী বসে যেই,
সবাই যেন খুঁজে পেল ঠাট্টা হাসির খেই।
কেউ বলে,—কি ভুবন-ভোলা ভোলানাথের রূপ,
শিবার সাথে কই বেমানান?—রা কেড়ো না চুপ!
কেউ বা বলে,—কান্তি হেরি ভ্রান্তি হ'ল দূর,
চন্দ্রকোটি খেলছে ভালে উজলি' তিন পুর!
কেউ বলে,—ও ভস্ম না রে, রজত-মাখা গা,
পদ্মবনে শেওলা ঢাকা ঢালি-বকের ছা!
কেউ বা ডাকে ঘরকে চল, খেলতে হবে 'জো',
সাত সখিতে বায়না ধরে কনেয় কোলে থো।
বাসি-বিয়ের সময় হ'ল খরচা ধু'য়ে নে'
শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে খেলিতে কড়ি দে'।
বর করে গো পিট্‌পিটানি ঢালতে মাথায় জল,
উমার সীঁথের সিঁদুর ধুতে হর হ'ল চঞ্চল!

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বিতীয় প্রবাহ

দশম তরঙ্গ

"শুরু হইয়া শেষ হইল"

১৩৩৫ সনের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী'-প্রেসের দীর্ঘকালের ম্যানেজার ও মুদ্রাকর অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় নিজে স্বতন্ত্র ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন। তিনি সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম-প্রচারক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের অনুজ ছিলেন। 'প্রবাসী' যখন ব্রাহ্মমিশন প্রেসে ছাপা হইত তখন তিনিই ছিলেন উক্ত প্রেসের ম্যানেজার। 'প্রবাসী' স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অনুগামী হইয়া গোড়া হইতেই নূতন প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার মত অমায়িক মিষ্ট স্বভাবের লোক ছাপাখানা-লাইনেও আমি কম দেখিয়াছি। ম্যানেজারের পদ শূন্য থাকিতে পারে, কিন্তু মুদ্রাকরের পদ আইনত শূন্য থাকিতে পারে না। হাতের কাছে আর কাহাকেও না পাইয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় সরাসরি আমাকেই ওই পদে বহাল করিলেন। রাতারাতি সহ-সম্পাদক-পদ হইতে মুদ্রাকর-পদে উন্নীত হইলাম অর্থাৎ আমার পঞ্চাশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। মাসিক ৯৫৲ টাকা হইতে এক ধাক্কায় ১৪৫৲। এই আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিল বলিয়াই ওখানে টিকিয়া গেলাম, নতুবা সহ-সম্পাদকের একঘেয়ে রুটিনমাফিক কাজে আমার দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, পালাই-পালাই করিতে-ছিলাম। তখন সম্পাদকীয় বিভাগে আমার উপর-ওয়ালা ছিলেন পাঁচ জন: স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহকারী চতুষ্টয়—শ্রীঅশ্বিনীকুমার ঘোষ, শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এবং শ্রীপ্রভাত সান্যাল। ইঁহাদের মধ্যে জীবিতেরা কেহই আর 'প্রবাসী'র সহিত যুক্ত নহেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পর 'প্রবাসী'র দীর্ঘস্থায়ী সহ-সম্পাদকের ট্র্যাডিশন ভঙ্গ হইয়াছিল। এই ট্র্যাডিশন পুনঃস্থাপন করিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। আমি পদান্তরিত হইবার অত্যল্পকালমধ্যে সম্পাদকীয় বিভাগে বিপর্যয় উপস্থিত হয়; প্যারীমোহন বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় যান শ্রীরাজশেখর বসুর সহায়তায় বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রচার-সচিব হইয়া; প্রভাত সান্যাল ই, বি, রেলের কি একটা খুব উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্পাদকীয় বিভাগ অচল হইবার উপক্রম। তখন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং অধুনা 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার) চেষ্টায় ও আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতার কোনও বিদেশী সওদাগরী আপিসের ষ্টেনোগ্রাফার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী বাংলা দুই পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে আগমন করেন ১৯২৯ সনের জানুয়ারি মাসে। কেদারনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ উভয়েই তখন ১৪ নং পার্সিবাগান লেনের বসুভ্রাতৃগণের (শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর) "উৎকেন্দ্র-সমিতি"র নিয়মিত সভ্য এবং সেই বাবদেই পরস্পর পরিচিত। ব্রজেন্দ্রনাথ তখনই নানা প্রসিদ্ধ ইংরেজী-বাংলা মাসিকপত্রে গবেষণা-মূলক ইংরেজী বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন এবং আচার্য যদুনাথ ও পরশুরামের বইয়ের নিখুঁত প্রুফ দেখিয়া প্রুফসংশোধনবিশারদ বলিয়া তাঁহার নামডাক হইয়াছে। সুতরাং সহ-সম্পাদক হিসাবে তিনি দুর্লভ সংগ্রহ। কৃতিত্ব কেদারনাথের। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলকে সংগ্রহ করার কৃতিত্ব আমার। সুদূর বরিশালের এই দরিদ্র যুবকটি পাঠ্যাবস্থাতেই এমন বিপন্ন হন যে, চাকুরী ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার আবেদনে প্রথম দিনেই আমার মন ভিজিয়াছিল। আমি তাঁহাকে ছাপাখানার প্রুফরীডার-পদে বহাল করিয়াছিলাম ১৯২৮ সালের শেষে। তিনি নিজের যত্নে ও একনিষ্ঠ সাধনায় ধাপে ধাপে উন্নতি করিয়া গবেষণার ক্ষেত্রে নাম করিয়াছেন এবং আজিও কৃতিত্বের সহিত 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ'য়ের সহ-সম্পাদকত্ব করিতেছেন। বৎসর কাল পূর্বে ব্রজেন্দ্রনাথ চাকুরি করিতে করিতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নূতন বন্দোবস্তে আমার যাহাই হউক, 'শনিবারের চিঠি'র খুব সুবিধা হইল। মিষ্টভাষী অবিনাশচন্দ্রের

প্রেসের বিলের তাগাদা মাঝে মাঝে এতই মর্মান্তিক হইয়া উঠিত যে, ভাবিতাম ছাড়িয়া-ছুড়িয়া পালাই। তিনি চাকুরি ছাড়িবার মুখে এই তাগাদা চরমে উঠিয়াছিল। তখন 'শনিবারের চিঠি' ছাপা-বাবদ প্রেসে বেশ কিছু ধার হইয়াছিল। খোদ কর্তার কাছে 'প্রবাসী' আপিসের ম্যানেজার এবং কর্তার সাক্ষাৎ-শ্যালক শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই এই সূত্রে অনুযোগ করিতেন। ইহার মধ্যে আর একটা কথা ছিল। 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে মালিকপুত্র অশোক ও কর্মচারী সজনীকান্তের ঘনিষ্ঠতা আপিস এবং সম্পাদকীয় বিভাগের কেহই বড় একটা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। আমি যতদিন 'প্রবাসী'তে ছিলাম, এই বিরাগ অন্তঃশীলা ফল্গুর মত প্রবহমান ছিল। বড় মামা সত্যকিঙ্কর সর্বদাই জাহির করিতেন যে, 'শনিবারের চিঠি' 'প্রবাসী'র সর্বনাশ করিতেছে। ছোট মামা গৌরীকিঙ্কর (তিনিও আপিসভুক্ত) প্রথমে এই দলে ছিলেন। পরে আমি তাঁহাকে 'শনিবারের চিঠি'র অংশকালীন ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া উপরির লোভে বশ করিয়াছিলাম।

আমি ছাপাখানার ম্যানেজার হইবামাত্রই বড় মামা দেখিলেন, ভক্ষকই রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। দুই-দশ দিনের মধ্যেই সত্যকিঙ্কর মন কথা ভগিনীপতিকে নিবেদন করিলেন যাহা সত্য নহে। ফলে মুদ্রাকর-জীবনের এক সপ্তাহের মধ্যে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ (২১ মে, ১৯২৮) সোমবার সকালে ছাপাখানায় ঢুকিয়াই একেবারে প্রিভি কাউন্সিল হইতে এক ক্রুদ্ধ আদেশ পাইলাম :

"2-1, Townshend Road.
Bhawanipur, Calcutta.
21st May, 1928

"কল্যাণীয়েষু,

প্রিয় সজনীকান্ত, সত্যকিঙ্করের মুখে শুনিলাম, তুমি বলিয়াছ, প্রবাসী আফিসের সহিত 'শনিবারের চিঠি' amalgamated হইয়াছে। আমার অজ্ঞাতে ইহা হইতে পারে না। আমি ইহাতে একেবারেই সম্মত নহি জানিবে। এরূপ বন্দোবস্ত না করিলে যদি তোমাদের কাগজ না চলে, তাহা হইলে উহা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিও। প্রেসের সহিত উহার account শোধ আছে কিনা, দেখিবে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

"শুভাকাঙ্ক্ষী" পাঠও ছিল না। বুঝিলাম, অবস্থা সঙ্গীন। প্রথম দিককার অনুযোগ মিথ্যা, সুতরাং জবাব ছিল। কিন্তু শেষের অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত পংক্তিটি মারাত্মক রকম সত্য। অশোক চট্টোপাধ্যায় অথবা আর কাহারও সহিত পরামর্শেরও সময় ছিল না, কর্তা সঙ্গে সঙ্গে জবাব চাহিয়াছেন। আমার যাবতীয় ডিপ্লোমেটিক বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া একটি জবাব মুসাবিদা করিলাম। প্রথম অভিযোগের উত্তরে লিখিলাম, "বাহিরের আর পাঁচটা কাজ যেমন হইয়া থাকে 'শনিবারের চিঠি'ও প্রবাসী প্রেসে সেই ভাবে ছাপা হয়। বাহিরের অন্য কাজের সহিত আপনি যেমন সম্পর্করহিত, 'শনিবারের চিঠি'র বেলাতেও তাই। তবে আপনি যদি মনে করেন ইহাতে আপত্তিকর রচনাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি বলিলেই ইহার মুদ্রণ অন্য ছাপাখানায় স্থানান্তরিত করিব। আমাকে যদি জানাইবার অসুবিধা হয় আমি খুড়দাকে [অশোক] বলিব, তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, একটি বাহিরের পার্টির সহিত প্রেসের যেরূপ বন্দোবস্ত 'শনিবারের চিঠি'র সহিতও তদ্রূপ, তাহার অধিক নহে। আপনার সহিত ইহার যে কোনও সম্পর্ক নাই, সে কথা আমরা আমাদের পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপিত করিয়াছি দেখিয়া থাকিবেন।" হিসাব ব্যাপারে যাহা লিখিলাম, তাহার মোদ্দা কথাটা এই যে, 'শনিবারের চিঠি' গরীব এবং আমাদের শখের জিনিস। ঠিক সময়ে টাকা না দিলেও ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। যদি কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় এই কারণে বলি, ইহার জন্য আমার বেতন জামিন রহিল।

পিওন পত্র লইয়া টাউনশেণ্ড রোডে চলিয়া গেল। বিকালে ছুটি হইবার পূর্বেই জবাব পাইলাম—

"কল্যাণীয়েষু

সত্য শনিবারের চিঠির বন্দোবস্ত ভুল বুঝিয়াছিল। যেরূপ বন্দোবস্তের কথা তুমি লিখিয়াছ, তাহাতে আমার আপত্তি নাই ; এবং তাহা করিবার জন্য খুড়র আমাকে জিজ্ঞাসা করিবারও দরকার নাই। তোমরা তোমাদের কাগজে লিখিয়াছ যে, উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই, এবং আমিও লোককে তাহাই বলি ; এইজন্য আমি amalgamationএ আপত্তি

করিয়াছিলাম। কারণ, আমি উহা supervise করিতে চাই না, পারিবও না।

প্রেসের টাকা দিতে অল্প-স্বল্প বিলম্ব বাহিরের অন্য কাজেরও হয়।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

আসলে স্নেহপরায়ণ পিতা পুত্রদের যেমন অতিশয় ভালবাসিতেন তেমনি ভয়ও করিতেন। পাছে এই ব্যাপার লইয়া অশোক আঘাত পান এই কারণে তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গ চাপা দিলেন, আর উঠিতে দিলেন না। মামলা সূত্রপাতেই মিটিয়া গেল এবং 'শনিবারের চিঠি' আরও বৎসরাধিককাল 'প্রবাসী' প্রেসের আশ্রয়েই রহিয়া গেল। সে আশ্রয় ঘুচাইলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কেমন করিয়া তাহা পরে বলিতেছি।

নূতন বিরাগের পোড়াপত্তন হইল বৈশাখেই। সম্পাদক নীরদচন্দ্র একটি বেনামী প্রবন্ধ লিখিলেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—পেন্সিল ড্রয়িং—", "তাঁহার 'কালি-কলমের পেশা'র পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে।" প্রবন্ধটি মোটের উপর নিরীহ অথচ উচ্চাঙ্গের রচনা। লেখক প্রমথ চৌধুরী ও মানুষ প্রমথ চৌধুরীর রচনা ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক এমন সরস লেখা আর প্রকাশিত হয় নাই। নীরদচন্দ্র লেখক ও মানুষের সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রভূত জ্ঞান ও মুন্সীয়ানা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ ব্যাজস্তুতিমূলক হইতে বাধ্য। হইয়াছিলও তাহাই। ফলে চিন্তালেশহীন বঙ্গীয় বিদগ্ধ-মহলে বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইল। তাহার ফেনপুঞ্জ রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। ইহা স্বাভাবিক, শুধু জামাতা হিসাবে নয়, বন্ধু ও ভাষায় তখন সমানধর্মী বলিয়া চৌধুরী মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ-সমীহ করিতেন। লোকপরম্পরায় তাঁহার ক্ষোভ যে ক্রমশঃ ক্রোধে পরিণত হইতেছে তাহা জানিতে লাগিলাম।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ লইয়া যে গোলযোগ শুরু হইয়াছিল, ১৩৩৫ সালের বৈশাখে নীরদচন্দ্রের এই প্রবন্ধও অনুরূপ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রমথবাবুর জীবন একটা ট্র্যাজেডি। প্রমথবাবু "পলিটিক্স, ইকনমিকস, শিক্ষা, সমাজ, হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ইত্যাদি যে কোন একটা অথবা সবকটা নিয়ে অতি গম্ভীর ও অতি রাগত ভাবে নানারূপ প্রভুসম্মত বাণী ঘোষণা" করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি নয়। তাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডি ইহাই যে এই বৈদগ্ধ্য-বর্জ্জিত বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করার ফলে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার অতি তুচ্ছ রসিকতাকেও লোকে একটা গুরু-গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া ভুল করিয়া বসে। আমরা বিষবৃক্ষের ফলের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু বিষবৃক্ষে কি ফুল ফুটে না? প্রমথবাবু বৈদগ্ধ্য-বিষবৃক্ষের ফুল। যে সমাজ তাঁহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিত সে সমাজ আর নাই। যে সমাজ কোনো অবস্থাতেই তাঁহাকে লেখক, দার্শনিক, পণ্ডিত, যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া ভ্রম করিয়া তাঁহাকে মনে কষ্ট দিত না, সে সমাজ আজ কোথায়? ......বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। প্রমথবাবুর স্বধর্ম্মী ধর্ম্ম-অর্থ-কামশাস্ত্রজ্ঞ পাটলিপুত্রকদের ধূলি আজ ধরণীর ধূলির সঙ্গে মিশিয়া দিকে দিকে উড়িতেছে। তাই যে বিদগ্ধচূড়ামণি, নগর ও উজ্জয়িনী, বিদিশা ও কৌশাম্বীর গৌরব ও মুকুটমণি হইতে পারিত, সে অদৃষ্টের ফেরে "ফিলিষ্টিন"-শাসিত কলিকাতা-সহরে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্য বোঝা বহিতেছে।

এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আলোচনা ও কটূক্তির ঝড় উঠিল, একসঙ্গে পঞ্চাশটা তোপ এদিকে ওদিকে সেদিকে গর্জিয়া উঠিল। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রমুখ মহাপণ্ডিতেরাও রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের উচ্চাসন হইতে আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপ করিলেন। আমরা সংখ্যালঘু, আমাদের অক্ষৌহিণীতে মাত্র দুই পদাতিক, সম্পাদক নীরদচন্দ্র এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক সজনীকান্ত। আমরা এই সকল আক্রমণকারীর সম্মুখীন না হইয়া একটু তির্যক পথ ধরিলাম। এইরূপ করিবার সঙ্গত কারণ প্রতিপক্ষই জোগাইয়াছিলেন। প্রথমে এই কয়েকটি সাময়িক পত্র রণদামামায় ঘা দিলেন—'ফরোয়ার্ড', 'বাংলার কথা', 'আত্মশক্তি', 'নবযুগ', 'কালিকলম', 'নাচঘর'। ইঁহারা কেহই সরাসরি জবাব দিলেন না। 'বাংলার কথা,' বলিলেন, প্রবন্ধলেখক "অতিশয় কৃশ" সুতরাং তাহার রুচি নীচ হওয়াই স্বাভাবিক; 'আত্মশক্তি' বলিলেন, লেখক "অতিশয় বেঁটে" হওয়াতেই এইরূপ ঘটিয়াছে; 'নবযুগ' বলিলেন, লেখক উন্মাদরোগগ্রস্ত এবং অকারণে "রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়"; বাপ তুলিতেও ইঁহারা দ্বিধা করিলেন

না।* এই বিপুল "বদজবান"কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমরা খোদ প্রমথ চৌধুরীকে শরজর্জরিত করাই সাব্যস্ত করিলাম। জ্যৈষ্ঠে আমি লিখিলাম, "বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দান"—তাঁহার 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর যাবতীয় দুর্বলতা বিশ্লেষণ ও "প্যারডি" করিয়া দেখাইলাম। বলা বাহুল্য, প্রশংসাস্থলে সবিনয়ে বলা হইলেও লেখাটিতে যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ও ইয়ার্কির অসম্মান ছিল। তবে আমার বিশ্বাস, কাব্যহিসাবে 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর অসার্থকতা কথঞ্চিৎ প্রকট করিতে পারিয়াছিলাম। চৌধুরী মহাশয়ের আদর্শে রচিত আমার দুইখানি সনেট সর্বাধিক আঘাত হানিয়াছিল এবং সে সময় মুখে মুখে চলিয়াও গিয়াছিল। এই যুগের পাঠকদের কাছে সেই জোড়া সনেট পুনরায় নিবেদন করিতেছি ঃ

বালীগঞ্জ

সার্থক ধরেছ নাম ওগো বালীগঞ্জ।
বারিধির বেলা নহ তবু ভালা নীল।
তাই বুঝি পথে পথে উড়ে গাং চিল—
মৎস্য-লোভে এক ঠ্যাঙ্গে বসে যেন খঞ্জ।
মধুরে বহিছে হেথা সদাই প্রভঞ্জ,
মনে নাই, বুকে নাই, ঘরে নাই খিল ;
ধনে মানী সকলেই, উচ্চকুলশীল—
তোমাতে যে বাসা বাঁধে হৃদি তার রঞ্জ।

সানি পার্ক, রেনী পার্ক, লাভলক প্লেস—
নিশাশেষে প্রেয়সীর যেন কণ্ঠাশ্লেষ।
দিক্-দৌড়া মাঠে তব ঘোড়ার টহল,
'বয়'-বাবুর্চিরা চুলে দেয়ালে হেলিয়ে,—
তুমি এই নগরীর বেগম-মহল,
সবে ডাক অভিসারে নয়ন খেলিয়ে।

বেগুন

আলু নহ, কচু নহ, তুমি যে বেগুন।
লজ্জায় বেগুনী বুঝি কালো তব দেহ!
পোড়ায়ে কাঠের আঁচে সাথে তিল-স্নেহ
নুন আর লঙ্কা, তুমি নহ ত বে-গুণ।
বৃক্ষমাঝে মূল্যবান যেমন সেগুন,
আনাজেতে তুমি তথা ; গরীবের গেহ
আলো করি ঝোলো যেন বিভু-"অনুস্নেহ"—
সীমাহীন বারিধির কোরাল-লেগুন।†

ভাজিতে, অম্বলে, ঝোলে কিম্বা নিমসঙ্গে
বসন্তের* রঙ্গ ভাঙ্গ অপাঙ্গ ভ্রূভঙ্গে।
বেসনলেপিত অঙ্গে ভাজি হ'য়ে তৈলে
সুরা-সহযোগে তুমি ফাউলের বাবা,
গরীবের চলে না ক' তুমি সখা নহিলে,
হিন্দুর প্রয়াগ তুমি, মুসলিমের কাবা॥

জ্যৈষ্ঠে নীরদচন্দ্রও আরও মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—জের"। স্পষ্টত বলিয়া ফেলিলেন ঃ

প্রমথবাবুর যে বৈশিষ্ট্য সকলের আগে লোকের চোখে পড়ে, সেটা তাঁহার রচনার গুণ অথবা দোষ নয়, তাঁহার টেম্পারামেন্টের বিশেষত্ব। তাঁহার সকল রচনাতেই এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখিতে পাই। এই মার্কা-মারা বিশেষত্বের একটা সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ আছে তাহা আমরা মানি। সমাজবিশেষে ইহার প্রয়োজনীয়তাও আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের দেশে, আমাদের কালে, প্রমথবাবুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের এই উগ্র ও অবিরত আত্মপ্রকাশ ও তাঁহার ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল ফ্রিভোলিটি—শিক্ষা, সাহিত্য ও "কালচারে"র পক্ষে একটা গুরুতর অনিষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ও-পক্ষে গালাগালির বন্যা প্রবলতর হইল। আমরাও সংযত থাকিতে পারিলাম না। আক্রমণে আক্রমণে আমাদের সরস চিত্তও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেটা আমাদের অপরাধ সন্দেহ নাই। আষাঢ়ে [ডক্টর] বটকৃষ্ণ ঘোষের সাহায্য লইয়া আমি লিখিলাম "পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী" প্রবন্ধ, পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড ; ইহাতে তাঁহার সংস্কৃত-পাণ্ডিত্যের যে কতখানি অভাব তাহা দেখাইলাম। হাল্‌কা ইয়ার্কি এবারে গভীর অসম্ভ্রম হইয়া উঠিল। ফলে আমরা আমাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক বহু বিদগ্ধজনের বিরাগভাজন হইলাম। রবীন্দ্রনাথ "নটরাজ" ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। "প্রমথ চৌধুরী" ব্যাপারে তাঁহার ক্ষুব্ধতা ক্রোধে পরিণত হইল। তাঁহার ক্রোধ আমাদের ক্ষতির কারণ হইতে বিলম্ব হইল না।

এই কলহ-কচকচির মধ্যে একা মোহিতলাল বাংলা-সাহিত্যবিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধ ও আলোচনা দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিলেন। শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র ও আমার নিছক দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সমালোচনা-মূলক ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ারও দাঁড়িপাল্লার দক্ষিণ দিক সামাল দিয়া চলিতেছিল। বস্তুত সে সময়ে আমাদের

* পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল যাঁহাদের আয়ত্তে আছে তাঁহারা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি দেখিতে পারেন : 'বাংলার কথা' ২২শে বৈশাখ, ১৩৩৫ ; 'Forward' May 13, 1928 ; 'আত্মশক্তি.' ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫।

† .Coral Lagoon.

* মা শীতলা।

কলমে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের যেন বান ডাকিয়াছিল, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনামূলক হওয়াতে অনেকের প্রশংসালাভ করিয়াছিল। বনবিহারীবাবুর "সাম্য" কবিতাটি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বহু সভায় এই কবিতার আবৃত্তি হইয়াছে, বহু রসিক ইহা মুখস্থ করিয়াছেন। প্রথম স্তবকটি এই :

হিষ্টলজির পাতায় না কি মিললো প্রমাণ,
বর্তমানের Womanরা সব Man-এর সমান।
কাজেই স্ত্রীরা ফেললো ছেঁটে ঘাড়ের রেঁায়া,
দু' নাক দিয়ে ছাড়লো চুরুট-বিড়ির ধোঁয়া,
ভোট কুড়ালো, ফুঁড়লো কলেজ।
তেল পুড়ালো চুঁড়লো নলেজ।
লিখলো নভেল, লিখলো নভেল,—লিখলো নভেল।
চেনাই কঠিন নর কি নারী, আসলি না ভেল।

শিল্পী শ্রীহরিপদ রায়ের অপরূপ চিত্র লেখাটিকে আরও চমকপ্রদ করিয়াছিল। "বিচিত্রা" ভবনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভার আমার রচিত কবিতার ক্যাপশনসহ যে "চিপোর্ট" (চিত্র+রিপোর্ট) বৈশাখে বাহির হইল তাহাও হরিপদ রায়ের কার্টুন-কেরামতির বিশিষ্ট নিদর্শন। বস্তুত তিনি কার্টুন-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কমার্শিয়াল আর্টের ক্ষেত্রে চলিয়া যাওয়াতে বাংলা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সেদিনের যুগাবনতিকে ব্যঙ্গ করিয়া আমার "সোনার পাথরবাটি" (বৈশাখ, ১৩৩৫) কবিতাটি এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, পরে কাজী নজরুল ইসলাম ইহাতে সুরযোজনা করিয়া স্বয়ং কলিকাতা বেতার-আসরে গাহিয়াছিলেন। অংশত তাহা এই :

হায় রে—
"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা!"—
বারি নাই একবিন্দু তবু পূর্ণ ঘড়া।
মন নাই মনস্তত্ত্ব যায় গড়াগড়ি,
মাথা নাই মগজের বহরেতে মরি।
পৌরুষ নাহিক আছে দর্প পুরুষের,
বিদ্যা নাই পেটে তবু ফোয়ারা বাক্যের
নিত্য উৎসারিত হয় হাটে মাঠে বাটে,
যে গরু দেয় না দুধ মরি তার চাটে।
হায় রে। * * *

হায় রে—
যে গুটি পাকিল পুন কাঁচিয়া তা যায়,
ধর্ম এসে ঠেকিয়াছে গোবর-গাদায়!
বোমা কেঁচে হ'ল কালী-পূজার আতস,
প্রেমে প'ড়ে বিপ্লবীর বিষম ধাধস।
পূজার মণ্ডপ হ'ল গাঁজার আসর,
রাষ্ট্রে ধর্মে ভুতো ক্ষেন্তি জাগিছে বাসর।
পড়িছে দশের পিঠে বেটনের গুঁতা,
হোটেলে বোতল শুঁকে নেতাদের ছুতা—

হায় রে!

আমাদের এই মানসিক অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া একটা হদিস বাৎলাইতে অধ্যাপক রঙীন হালদার 'শনিবারের চিঠি'র আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বন্ধুবর গোপাল হালদারের সুবাদে আমাদেরও দাদা, 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতে শুভানুধ্যায়ী ও সমর্থক। তিনি আজও যেমন তখনও তেমনি পাটনা বি. এন. কলেজের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। সেখান হইতেই আমাদের অকুণ্ঠিত তারিফ করিতেন। "আর্ট ও মনোবিকলন" মতে অতি-আধুনিক লেখকদের অন্তরগহনের কামনারহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করিলেন। জ্যৈষ্ঠের প্রথম প্রবন্ধরূপে ইহা প্রকাশিত হইল। সোরগোল পড়িয়া গেল। কে লিখিল, কে লিখিল—প্রশ্ন চারিদিক হইতে উত্থিত হইল। গিরীন্দ্রশেখর আমাদের সমর্থক ছিলেন, তাঁহাকে দায়ী করা গেল না কারণ লেখক গিরীন্দ্রশেখরের "মনো-ব্যাকরণ" সংজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথের "মনোবিকলন" সংজ্ঞা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মনোবিকলনগত সমর্থন পাইয়া আমাদের জোর বাড়িল। অধ্যাপক হালদারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আজও পর্যন্ত বাতিল হইয়া ইতিহাসের কুক্ষিগত হয় নাই। সুতরাং তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে—

আজকাল বাঙলা মাসিক সাহিত্যে সাইকো-অ্যানালিসিসের নামে যা চলিতেছে তা দেখিলে মনে হয়, অশিক্ষিতপটুত্ব আর যেখানেই চলুক বিজ্ঞানে চলে না। আচার্য্য ফ্রয়েড যদি বাঙলা পড়িতে পারিতেন, তবে বোধ হয় তিনি পুস্তকপ্রণয়ন বন্ধ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন।···আজকালকার নবীন সাহিত্যিকের দল ফুল-ফলের সঙ্গে সারের কোনো প্রভেদ নাই বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা পড়িলে মনে হয়, মানুষ সজ্ঞানে কামোপহত হইয়াই ঘুরিয়া মরিতেছে। মনোবিকলনের মতে মানুষের বহু চিন্তা, বহু ইচ্ছা অ-জ্ঞানের যৌন-এষণা-দ্বারা নিয়মিত হয় সন্দেহ নাই; এবং ইহা মানসিক নিয়তিরই (psychical determinism) অন্তর্গত। অ-জ্ঞানের যৌন ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইলেই যে সকল চিন্তা, সকল ক্রিয়াজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যৌনতার দিকে ধাবিত হইবে—তা নয়। সুতরাং, পৌরুষ-কামোন্মাদের (Satyriasis) ও নারীর-কামোন্মাদের

(nymphomania) চিত্র আঁকিয়া যদি কেহ বলেন, ফ্রয়েডের মতে এই-ই আসল মানুষের চিত্র তবে সেই সত্যান্বেষী মনোবিদ্‌কে অপমানই করা হইবে।…ফ্রয়েড কখনও "কামকে জীবনের কাম্য বস্তু" বলেন নাই, এবং আধুনিক সাহিত্যের এই যৌন অতিবেদনের (sexual hyperaesthesia) সহিত ফ্রয়েডের মনোবিকলনের কোনো সম্পর্ক নাই।

মোটের উপর, এবার আমরা আটঘাট বাঁধিয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম, ক্ষুরধার শাণিত ব্যঙ্গের তরবার পাণ্ডিত্যের খাপে মুড়িয়া শুধু যুদ্ধজয় নয়, বিপক্ষকে তাক লাগাইবারও বাসনা জন্মিয়াছিল। এই ব্যাপারে শুধু একাধিক বঙ্গীয় পণ্ডিতই আমাদের সাহায্য করেন নাই, বিদেশী মহাপণ্ডিতদের কোটেশন সংগ্রহও বড় কম করি নাই। কিন্তু এই সাফাই সংগ্রহ আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। শুধু প্রতিপক্ষের কোটেশন-লাঞ্ছিত উত্তেজনাই আমাদিগকে স্বধর্মভ্রষ্ট করিয়াছিল। আমাদের সম্পাদক নীরদচন্দ্র তখন কোটেশন-প্রয়োগে অদ্বিতীয় ছিলেন একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। লারস্‌ফকো-প্যাস্কাল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত তাঁহার নখাগ্রে ছিল। সুতরাং কোটেশন-সংগ্রামে প্রতিপক্ষকে অচিরাৎ হটিতে হইল; নিছক ব্যঙ্গের দিক দিয়া অশোক চট্টোপাধ্যায়ও এ বিদ্যায় কম পারদর্শী ছিলেন না। আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই কোটেশন-কণ্টকিত পাণ্ডিত্যযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যে এই পর্বেই শেষ হইয়াছে, নিতান্ত টেক্‌নিক্যাল প্রবন্ধ ছাড়া কেহ বড় একটা কোটেশন ব্যবহার করেন না। সাধারণ জনপ্রিয় প্রবন্ধে বিদেশী বা স্বদেশী পণ্ডিতদের নজিরও আজকাল দৃষ্টিকটু বিবেচিত হয়, বড় একটা দেখা যায় না; আমাদের ব্যঙ্গে চূড়ান্ত প্রয়োগের দ্বারা এই পদ্ধতির প্রায় জীবনান্ত ঘটাইয়াছিলাম।

চুম্বনের ব্যাকরণ

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

চুম্বন-ব্যাকরণে প্রথমেই পানি নি?
তার পরই সমাসীন হওয়া বুঝি? জানিনি,
বহুশব্দ-বোধ রয়ে গেছে তার পর!
আমার কি আমার না—প্রশ্নের থাপ পর?
যদি হয় কুমারী সে, তবে কপিরাইটের
বাধা নেই, ছেপে যাও যতো খুসি চাই ফের।
(সর্ব স্বত্ব যদি হয় সংরক্ষিত,
চুম্বন-মুদ্রণে এগুবে না নিশ্চিত।)
বহুশব্দ-পাঠ চুকলেই তো তখন
দুজনের সম্মুখে সন্ধির প্রকরণ?
দুটি স্বরসন্ধির ফন্দিতে বন্দী
একটি বোবা খবর, কিসের অভিসন্ধি!

তার পরই তো সমাস? বিষম ও অন্ধ
সম আশ দুজনার? রয়েছেই দ্বন্দ্ব,
বহুব্রীহিও আছে, কর্মধারয়ও ফের।
ও মধ্যপদলোপী সেই তৎপুরুষের
নিজস্ব প্রকরণ; তদ্ধিত প্রত্যয়;
প্র পরা অপ সং—অগুণতি অব্যয়!

উপসর্গ যে কতো আসে তার পিঠপিঠ!
(একশোটা পাট্‌কেল ছুঁড়লে একটি ইট।)

তবু যে উন্মুখর দুটি স্বরবর্ণ
মূক হয়, সন্ধির দ্বারা নিষ্পন্ন
হয়ে থাকে, কভু হয় বা সমাসবদ্ধ.
বিশেষণ নেই তার! বিশেষ্য পদ তো।
('প্রপার্' না সব ঠাঁই, তবুও তা 'কমন্'।)
উভলিঙ্গই ভাই! সর্বদা দ্বিবচন।

চুম্বন কী শব্দ? হলে নিঃশব্দও,
যুক্তাক্ষরে স্বরে-ব্যঞ্জনে লব্ধ ও।
অর্থের ডোরে বাঁধা। (কিম্বা অনর্থেই!
অধর আঙুর মিঠে, টক্ সে যে ধরতেই!
কাটান্-ছাড়ান্ নেই, গাঁটছড়াবন্দী
ধরা পড়ে কখনো বা অধরের সন্ধি!)
তাহলেও চুমু ভাই, এমন কি মন্দ?
থাক্ না বহুব্রীহি—থাকুক্ না দ্বন্দ্ব?
ভবে যায় সবেতেই পরম উপেক্ষা,
কি সে র জন্যে তারো পরমুখাপেক্ষা?

.(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

বললেন স্বামী, "রাক্ষুসে মেয়ে পেটে ধ'রেচো, ও আমাদিকে না খেয়ে ছাড়বে ?"

চার বছরের মেয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো মাটীতে পড়ে। আমি দেখলাম অভিমানের একটা দলা। মা অভিমান ভাঙাতে গায়ে হাত দিতেই ছটকে বেরিয়ে এলো আমার কাছে। আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে। নূতন মানুষ দেখে থমকে দাঁড়ালো। ঘাড় তখনও বেঁকে। স্ত্রীকে ডাকলাম "একটা কমলা নিয়ে এসো ত ?" একটা গোটা কমলা পেয়ে মুহূর্তে আমার সংগে সন্ধি করলো "বাবা ভাল না। দাদু, তুমি ভালো। বাবার কাছে আর যাবো না। সে গু !" অদৃশ্য বাবার উদ্দেশ্যে থুথু পর্য্যন্ত দিলো।

বললাম, "তুমি আসবে, কতো খাবার দেবো। ঘরে তোমার দিদি আছে, যাও।" দিদির কাছে মেয়ে পেলো প্রসাদী জিভে গজা দুটো দু'হাতে। এসে বললো, "আমার এই দাদু-দিদিই ভাল। তাদের কাছে আর যাবো না।"

কেন কি জানি বৈকালে ভ্রমণের সময় বার হ'লো স্বামি-স্ত্রী আর ক্ষুদে দিদিটি আমাদেরই সংগে। প্রশ্ন করলেন আমার স্ত্রীকে—"মা, আপনারা কত দিন থাকবেন ?" "পাঁচ-সাত দিন হবে বোধ হয়। তোমরা কত দিন থাকবে ?" "মনে করেছিলাম তিন দিন থেকেই যাবো। এখন মনে করচি আপনারা যত দিন থাকবেন আমরাও থাকবো। বাবুকে বলে দিচ্ছি সাত দিনের ছুটি নিতে।"

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "কেন ?"

উত্তর হারিয়ে গেল মেয়েটির। ঢোক গিলে বললেন নবাগতা, "এমনিই।" চোখে-মুখে দীপ্তি দেখে বুঝলাম মেয়েটির অসাধারণত্ব কিছু আছে। একবার যা দেখে, ভোলে না। নূতন যা কিছু দেখছে যেন গিলে খাচ্ছে।

মেয়েদের কথা হয় দশ হাত দূরে দূরে। ভাবচে আমরা তাদের কথায় নেই।

"তোমার নাম কি ?"

"ভবানী।"

"তোমার ঐ একটি মেয়ে ?"

"একটা ছেলে হ'য়েছিল দেড় বছরের, তাকে বাঁচাতে পারিনি ! টাকার অভাবে আর চিকিৎসাই করাতে পারিনি মা !" দীর্ঘনিশ্বাস একটা বেরিয়ে এলো পাঁজরা ভেঙে।

কথা ফিরিয়ে নেবার জন্যে স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, "ভবানী ! আর ছেলে-পুলে হয়নি ত ?" কাঁদনের স্বরে বলে চললো মেয়েটি, "গরীবের ঘরে জন্ম হওয়া ভগবানের একটা অভিশাপ। মা, আপনারা বুঝবেন না— যখনিই জানলাম দারিদ্র্য বাড়াবার জন্ম আমার ভেতর এসেছেন এক জন, তখন থেকেই ভয়ে আমার হাত-পা সিঁদিয়ে গেল। কি

মধ্যবিত্ত

এগার বছর আগের কথা। তখন আমরা পুরীধামে। স্ত্রী ও একজন চাকর সাথে রয়েচে। সকাল সাড়ে ছ'টার সময় দেখলাম হোটেলের ঠাকুর-চাকর-কর্মচারীদের হুলুস্থুল লাগলো ষ্টেশন যাবার। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম—যাত্রী সংগ্রহ ক'রতে।

তখন সাতটার কিছু বেশী হবে ; কলকাতার গাড়ী আসার সময় হয়েচে। রিকসা এসে দাঁড়ালো ; বাবু, তাঁর স্ত্রী আর সঙ্গে চার-পাঁচ বছরের কন্যা। ঠাকুর রিকসার সঙ্গে দৌড়ে আসতে পারেনি। কর্তৃপক্ষ ভেবে জিজ্ঞেস করলেন বাবু, "এ হোটেলে ভাল ঘর পাওয়া যাবে ?"

"ঘর ত খালি রয়েচে, নিশ্চয় পাবেন।"

"কোন ঘরের কত ভাড়া আমাকে দেখিয়ে বলে দিন ?" বললাম, "আমি আপনারই মত একজন। ম্যানেজারকে জিজ্ঞেসা করুন।" নমস্কার করে গেলেন ম্যানেজার বাবুর কাছে। ম্যানেজার বাবু এসে বেশ হাসিমুখে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন আমার পাশের ঘর। ব্যবধান মধ্যে কেবল বারান্দা। সকলের বসার একটা স্থান। কমন-রুম বললেও হয়। কারণ সমুদ্রের নর্ত্তন-গর্জ্জন-লীলা দেখা যায় এখান থেকেই। তবুও বাইরের পাখনাওয়ালা ঘরের বাবুদের অনুমতি নিয়ে বসে এখানে।

অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিটি খুঁটিনাটি। পরিচ্ছন্ন ঘর ভাল করে ঝেড়ে নিলো নিজের ঝাঁটা বের করে বেডিংএর ভেতর থেকে। গরম জল আনতে হুকুম করলো ক্ষুদ্র গিন্নিটি। ভাবলাম অম্বলের অসুখ আছে বোধ হয় কারও। গরম জল আসতেই দেখি ঘরের মেঝে থেকে আরম্ভ ক'রে চায়ের সেট সব ধুয়ে ফেললেন গরম জল দিয়ে। বেডিংএ বাঁধা বিছানা বাইরের দড়িতে টানিয়ে দিলেন। মুগ্ধ হ'লাম কাজ দেখে মেয়েটির।

দু'কাপ চা, দু'টুকরো করে রুটী দিয়ে গেল বয়। মেয়েটি তখুনি নিজের একটা ছোট্ট কাপ বের করে একটুখানি চা ঢেলে দিয়ে একখানি রুটী দিলো ক্ষুদ্র মেয়েটিকে। সে বায়না ধ'রলো "আমি বড় কাপে খাবো।" বুঝলাম কন্যার মায়ের আপত্তি নেই। পারছে না কেবল তার স্বামীর ভয়ে। জোর-গলায় ধমক দিয়ে

খাওয়াব তাকে? একটু দুধও কিনবার সংস্থান নেই। আমাকে টেনে যে চুষবে তাও দুধ নাই; সত্যি বলচি। গোটা রাত কেঁদে কেঁদে অবশ হয়ে পড়ে থাকে। মা, দুঃখের কথা কি বলবো, বিষ আফিঙ খাওয়ায়ে অজ্ঞান করে রাখি। না হলে একখানা ভাঁড়ার-ঘরে কারও আর থাকা হয় না। তাই আগন্তুককে বিদায় দিয়েচি আসার আগেই। কতো কেঁদে ভগবানকে বলেচি—হে ঠাকুর, খাওয়া-পরবার স্থান যেখানে আছে সেখানে পাঠিয়ে দাও। মা, আমার খুব পাপ হয়েচে নাকি?"

অনুভব করলাম, তিনি উত্তর কিছু খুঁজে পেলেন না।

সন্ধ্যার পর মন্দির থেকে এসে সমুদ্রের ধারে বসলাম। তখনও চন্দ্র ওঠেনি। বিদ্যুতের আলোর ক্ষীণ রেখা পড়েচে বালুর উপর। অশান্ত পাগলা মনকে শান্তি দেবার বিচিত্র খেলায় মত্ত সমুদ্র।

"মা, বাবাকে বলুন না ওকে একবার ডাকতে। রাত-দিন কেবল ভাবেন ঘরে বসে। অত চিন্তা করলে যে মাথা খারাপ হয়ে যাবে; বলে দিন বাবাকে যেন না বলেন, আমি ডাকতে পাঠিয়েছি।"

হাসি এলো আপন মনেই। জোরে ডাকলাম, 'বাবু সাহেব—ও বাবু সাহেব!' এসে হাজির হীরেন বাবু। "আমায় ডাকচেন?" "আপনি ঘরে একলাটি চুপ করে বসে ছিলেন কেন? আচ্ছা লোক ত? এই সময় ঘরে থাকে কেউ? কেমন সুন্দর বলুন ত সমুদ্র?"

গম্ভীর হয়ে বললেন হীরেন বাবু, "আমাদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির অবসর নেই। আমরা মানুষ না পশু তারই বিচার বর্ত্তমান পৃথিবীতে হয়নি।"

বললাম, "আপনি কি কাজ করেন?"

"দুনিয়াতে যার চেয়ে ছোট কাজ আর নেই। পঁচাত্তর টাকা মাহিনা পাই। রেলওয়েতে।"

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে হেসে বললাম, "পঁচাত্তর টাকারও কম মাহিনা পৃথিবীতে আছে কি না সংবাদ রাখেন কি?"

"অনেক আছে, তবে আমার অবস্থা শুনলে তাজ্জব হ'য়ে যাবেন।"

"একটু বলুনই না শুনি।"

দুঃখে-ভরা হীরেন বাবু বলতে লাগলেন, "বিষয় সম্পত্তির মধ্যে একখান বাড়ী পুঁজি। অভিভাবকের মধ্যে একমাত্র বৌদি আর দাদা, তাঁদের একপাল ছেলে। হঠাৎ গ্রামে প্রচার হয়ে গেল, রামচন্দ্র আবার ফিরে এসেছেন এই ঘোর কলিযুগে। লক্ষ্মণ শুনলো তার বিবাহের জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত অগ্রজ। হিতৈষী গ্রামের সকলের সমক্ষে অগ্রজকে সে জানাল, 'আমি অক্ষম, আমার বিবাহের প্রয়োজন নেই। বংশরক্ষা অগ্রজের যা হয়েচে তাতে কোটি কোটি পুরুষের পিণ্ডদানের দুর্ভাবনা থাকবে না।' কিন্তু শোনে কে সে-কথা! অগত্যা বুঝলাম আমার হিত না করে ছাড়বেন না হিতৈষীরা। দুঃখের কথা কি বলবো, কন্যার পিতা-মাতাও উপবাসী ছারপোকার মত বসে আছেন। শুনচি না কি শাস্ত্রে আছে কন্যার বিবাহ না দিতে পারলে জাতিপাত হয়। তা ছাড়া উপলব্ধি করিয়ে দেবার মহাপুরুষেরও অভাব নেই পাড়াগাঁয়ে। তাঁদেরই বা কি দোষ দেবো? শেষে জানতে পারলাম রামচন্দ্র দাদা আমার দেশের একমাত্র ভূসম্পত্তি আড়াই বিঘা জমি বিক্রয় কবলা নিজের নামে করে এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করলেন। বাড়ীখানা শুদ্ধ লিখে নিলেন নিজের নামে।"

জিজ্ঞেসা করলাম, "লিখে দিলেন কেন?"

অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ থেকে বললেন হীরেন বাবু, "আপনি দশচক্রে ভগবানও ভূত হয় শোনেননি কি? আমার হিতৈষীরা বুঝতে লাগলেন, তোমার দাদা যা করলেন কলিতে কেউ করে না।" কলির শ্রেষ্ঠ পুরুষ রয়ে গেলেন বাড়ীতেই। আমি বৌ নিয়ে চলে এলাম চাকরীর স্থানে। চাকরী কি শুনবেন?—ট্রেণ এলেই জল দান করা। সে চাকরীও আবার স্থায়ী না—কানাঘুষায় জানতে পারলাম। শ্বশুরকে কিছু করে না দিতে পারলে তিনি অনাহারে মারা যাবেন। বিরাট কর্ত্তব্য আমার ঘাড়ে আছে। অসহায় ভাবে নিবেদন পেলাম—এত দিন মারা যাননি কেন তিনি? এই কন্যাটিই তাঁর আহারের সংস্থান ক'রতেন। তখন বললাম আমি, কন্যাটিও ত জীবিত আছে এখনও। তখন সব অশান্তির সমাধান করলেন আমার স্ত্রী। তিনি বললেন, তুমি কিছু ভেবো না। বাবার যা খরচ লাগে আমি দেবো। আমি ভেবে কূল পাই না। আমার স্ত্রী কেমন ধারা উপায় করে বাবাকে খাওয়াবেন। আমার দুর্ভাবনার শান্তি হলো যখন জানতে পারলাম—বিড়ি বেঁধে, কাগজের ঠোঙা বিক্রি করে খাওয়াচ্ছে জন্মদাতা পিতাকে। দুঃখও হলো তখুনিই এমনি হতভাগা আমি স্বামিত্ব বরণ করবার আগে একবার চিন্তাও করলাম না অতি-আবশ্যকীয় ক্ষমতা আছে কিনা আমার। শেষ কথা শুনে আপনারাও হাসবেন। ন'-দশ বছরের উপর বিবাহ হয়েচে আমার। বাড়ী, ঘর-দোর-এর সংগে বিবাহ হওয়ার পরই সম্বন্ধ চুকে গেছে। হঠাৎ দিন তিন-চার হলো চিঠি পেলাম বাড়ীর। দাদা লিখছেন, ভাই! তোমার বৌদির অবস্থা সংকটাপন্ন। বোধ হয় এই রোগেই তার শেষ। আমি যথাসর্ব্বস্ব বিক্রি করে তাতেও পেরে উঠলাম না। দেশের আত্মীয়-স্বজন সকলেরই মত—তোমার ওখানে গিয়ে চিকিৎসা করান। তোমার বাসায় শুনছি দু'খানা ঘর, তাতেই রান্না-করা, থাকা। সেই জন্য সব ছেলেপুলে নিয়ে উঠলে তোমার অসুবিধা হবে। সেই জন্য কোলেরটা আর অবিবাহিত বড় মেয়ে দুটোকে নিয়ে যাবো। তাদের মায়ের সেবা না হলে হবে না। গ্রামের সকলেই বলছেন—শেষটায় তোমার বৌদি দেখে যেতে চান মেয়ে দুটোর বিয়ে তুমি দিয়ে দিয়েছো। আমার বলার কিছুই নাই; এটা অবশ্য তোমার কর্ত্তব্য। স্ত্রীকে চিঠিটা দেখালাম। তিনি বললেন—লিখে দাও আমরা পুরী যাচ্ছি। আপনারা বাসা দেখুন। আমরা পুরী দেখতে আসিনি। বাবা! আনন্দ করতেও আসিনি। পলাতক আসামী আমরা!"

"পৃথিবীতে মাত্র দু'টি জাতি আছে। প্রথম, তারা যাদের আছে এবং দ্বিতীয় তারা যাদের নেই।"

—সার্ভানটিশ

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সন্দেশ—মিষ্টান্নবিশেষ, সমাচার, বিবরণ, বিজ্ঞাপন।
সন্দেহ—সংশয়, বিচিকিৎসা, দ্বৈধ।
সন্দেহকল্প—অনির্ণয়, দ্বিধা।
সন্ধান—অন্বেষণ, চেষ্টা, শরযোজনা।
সন্ধি—উভয়ের মেলন, সংযোগ, গ্রন্থি।
সন্ধ্যা—সায়ংকাল, প্রদোষ, যুগসন্ধি।
সন্নাহ—সজ্জা, পরিধানকরণ, কবচাবরণ।
সন্নিকট—নিকট, সমীপ, অন্তিক, উপেত।
সন্নিকর্ষ—নৈকট্য, সামীপ্য, আকর্ষণ।
সন্নিকৃষ্ট—আকর্ষিত, সংলগ্ন, নিকটস্থ।
সন্নিপাত—ত্রিদোষ জন্য বিকার।
সন্নিবিষ্ট—নিবিষ্টচিত্ত, প্রবিষ্ট, উত্যুক্ত।
সন্নিবেশ—প্রবেশ, আবেশ, সামীপ্য।
সন্নিহিত—নিকটবর্ত্তী, উপেত, অন্তিকগত।
সন্ন্যাস—চতুর্থাশ্রম, তপস্যা, ঔদাস্যভাব।
সন্ন্যাসী—চতুর্থাশ্রমী, দণ্ডী, গৃহত্যাগী।
সপক্ষ—অনুকূল, সহায়, পক্ষবিশিষ্ট।
সপত্নী—পতির অন্য স্ত্রী, সতীন, সতা।
সপদি—তৎক্ষণাৎ, সদ্যঃ, ঝটিতি।
সপিণ্ড—সপ্তম পুরুষাবধি জ্ঞাতি।
সপিণ্ডীকরণ—প্রেতত্বনাশক শ্রাদ্ধ।
সপ্ত—সপ্তম, সাত, সংখ্যা-বিশেষ।
সপ্ততি—সত্তর সংখ্যা।
সপ্তপদীগমন—বিবাহান্ত দম্পতীর গমন।
সপ্তমী—সপ্তা, সপ্ত তিথি, সাত দিন।
সপ্তর্ষি—মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মুনি।
সপ্তাস্র—সপ্তকোণ, সাতকোণা।
সপ্তাহ—সপ্তা, সাত দিন।
সপ্রতিভ—অক্ষুব্ধ, বুদ্ধিমান, চতুর।
সপ্রমাণ—সাব্যস্ত, প্রমাণলব্ধ, স্থিরীকৃত।
সফল—সার্থক, ফলবান, সিদ্ধার্থ, কৃতার্থ।
সব—সর্ব্ব, সকল, সমুদায়, তাবৎ।
সবর্ণ—সমানবর্ণ, সমজাতি, সগোত্র।
সবল—বলবান, তেজস্বী, শক্তিমান।
সবিশেষ—বিশেষযুক্ত, বিস্তারিত।
সভর্তৃকা—সধবা, স্বামিবিশিষ্টা, সপতিকা।
সভা—সমাজ, সমারোহস্থান, পরিষদ।
সভাপতি—প্রধান সভ্য, সভাধ্যক্ষ।
সভাসৎ—সভ্য, সভাস্থ, পণ্ডিতাদি, মন্ত্রী।
সভাস্থ—সভাস্থিত, সভাতে বর্ত্তমান।
সভ্য—সভারঞ্জক, সাধু, ভদ্র, সামাজিক।
সম—সদৃশ, তুল্য, ন্যায়, সমান, তুল্যাকার
সমগ্র—সকল, সমস্ত, সমুদায়, তাবৎ।
সমজ—তুল্যজ, সমানজ, গবাদির সমূহ।
সমঞ্জস—অবিরোধ, নির্ব্বিবাদ, সমন্বয়।
সমতা—সমভাব, সাম্য।
সমদর্শী—তুল্যজ্ঞানী, অপক্ষপাতী।
সমন্ত—সীমা, অন্ত, শেষ, অঞ্চল।
সমন্ততঃ—চারি দিক, সর্ব্বতোভাবে।
সমবায়—সম্বন্ধ, মেল, যোগ, সঞ্চয়।
সমবেত—সংগৃহীত, সঞ্চিত, সামিল।
সমভিব্যাহার—সাহিত্য, সঙ্গ, মিত্রতা।
সময়—কাল, অবকাশ, প্রতিজ্ঞা, পণ।
সময়শিরে—উপযুক্ত সময়ে, শুভযোগে।
সময়োচিত—কালোপযুক্ত, যথাকাল।
সমর—যুদ্ধ, বিগ্রহ, আহব, সংগ্রাম।
সমর্থ—পারগ, বলবান, ক্ষমতাপন্ন।
সমর্পণ—সোঁপণ, প্রদান, গচ্ছান, অর্পণ।
সমসমকাল—তৎতৎকাল, প্রাক্কাল।
সমসূত্রপাত—সমানরূপে সূত্রবিন্যাস।
সমসরল—আদ্যন্ত সমান, অবক্র, সোজা।
সমস্যা—পদ্যের পূরণার্থ একদেশ কথন।
সমা—বৎসর, হায়ন, বর্ষ, অব্দ, সম্বৎসর।
সমাংশী—তুল্যভাগী, সমভাগী।
সমাংসমীনা—প্রতি বর্ষে প্রসবিনী গো।
সমাখ্যা—এক নাম, সম নাম, স্বনাম।
সমাগত—আগত, আযাত, উপস্থিত।
সমাগম—আগমন, উপস্থিতি, ঘটা।
সমাজ—সভা, বহু প্রামাণিকের বাসস্থান।
সমাদর—সম্মান, মর্য্যাদা, আদর, সম্ভ্রম।
সমাধা—নিষ্পত্তি, সমাপ্তি, নির্ব্বাহ।
সমাধি—ধ্যান, ঈশ্বরে মনঃসংযোগ।
সমাপন—নিষ্পাদন, মিটান, সমাপ্তি।
সমাপ্ত—নিষ্পন্ন, সাঙ্গ, শেষ, সমাধা।
সমাবর্ত্তন—বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহাগমন।
সমারোহ—ঘটা, আড়ম্বর, সমৃদ্ধি।
সমাস—দুই তিন পদের এক পদ করণ।
সমাহার—সংক্ষেপ, সংগ্রহ, সংশ্লেষ।
সমাহিত—সমাধান, ধীর, যোগাবিষ্ট।
সমিধ—যজ্ঞকাষ্ঠ, যজ্ঞইন্ধন, অরণি।
সমীক্ষ—সাঙ্খ্যদর্শন, অবলোকন, বিতর্ক।

[ক্রমশঃ]

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

[মহারাণী, নদীয়া]

'সে আজ অনেক দিন আগের কথা। লিটন তখন বাংলার গভর্ণর। পর্দা-পার্টি বসেছে লিটনের বাড়ীতে। লেডী লিটন নিমন্ত্রণ করেছেন আমাকে। যেতেই হবে। তখন ইংরেজকে চটালে চলে না। জ্যাকসনের চেষ্টায় জমিদারী কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ থেকে আমার হাতে এসেছে সবে। নিমন্ত্রণে গেলাম। লেডী লিটন খাবারের টেবিল সাজিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন আমাকে। দেখে তো আমার চক্ষুস্থির! এঁদের এখানে খেতে হবে! অসম্ভব! বললাম, আমার শরীর বড্ড খারাপ। পেটের গোলমাল হয়েছে ভাই। লেডী লিটন ছাড়লেন না। বললেন, এক কাপ চা শুধু। আমি তাতেও নারাজ। লেডী লিটন বললেন, আচ্ছা বসুন, আমি এখুনি আসছি। আমি তাঁর হাত এড়াতে পেরেছি ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। এমন সময় গেলাসে বেলের সরবৎ হাতে লেডী লিটনের আবির্ভাব। বললেন, পেটের গোলমাল হয়েছে। বেলের সরবৎ খান। বুঝুন ব্যাপারখানা একবার। মাথায় বুদ্ধি আর খেলে না। শেষকালে বললাম, ওই সঙ্গে ঠাণ্ডাও যে লেগেছে। তারপর দুজনেই হাসতে লাগলাম।

'আমার কথা আর কি লিখবেন বলুন! প্রাচীন রাজবংশের মেয়ে, কুলবধূও রাজবংশের। বাইরে বেরোনো-টাকে চিরকালই এড়িয়ে এসেছি। তবু জীবনে অমনি দুটো-একটা ঘটনা আছে বৈ কি।'

দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মহারাজ মারা যান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমস্ত এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে চলে যায়। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে গিয়ে এষ্টেটের অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে। তখন মহারাণী নিজে তখনকার গভর্ণর জ্যাকসনের কাছে জানান যে এষ্টেট তাঁকে দেওয়া হোক। জ্যাকসন জানান যে, একমাত্র তাঁকেই এষ্টেট পরিচালনা করতে দেওয়া যেতে পারে। তখন রাজকুমার ক্ষৌণীশের বয়স মাত্র দু' বছর। সেই থেকে দীর্ঘ উনিশ বছর নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি জমিদারী চালিয়ে এসেছেন।

'ওঃ, একবার কি হোল জানেন? আমাদের কৃষ্ণনগরের চক্‌বাড়ীতে মুসলমানেরা আসতো মহরম খেলতে বহু দিন থেকেই। লীগ আমলে তারা বলে বোসলো, এ-বাড়ী তাদের কারবালা, ধর্মস্থান। সুতরাং আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমরাও বাড়ী ছাড়বো না। এক দিন অস্ত্রশস্ত্র মশাল হাতে নিয়ে প্রায় সাতশো-আটশো মুসলমান এসে বাড়ীতে চড়াও হোল। আমি বাইরের মহলে গিয়ে বললাম, এ-বাড়ী আমার স্বামীর, শ্বশুরের।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, পূর্ব্বের চিত্র

আমাকে না মেরে এ-বাড়ীর পবিত্রতা কেউ নষ্ট করতে পারবে না। আমি যাব বাইরে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছিলেন সেখানে। সে কথা শুনে বললেন, সে কি মা! আপনি কেন, আমিই বাইরে যাচ্ছি। কি সব দিনই না গেছে!

'আমার জীবনে আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি বাবা! তোমরা আগ্রহ করে শুনছো তাইতেই যদি খানিকটা কমে। স্বামী মারা গেলেন অল্প বয়সে, জামাই মারা গেলেন কিছু দিনের মধ্যেই। নাবালক ছেলে আর জমিদারী আমাকে বড় করতে হয়েছে এক-সঙ্গে এই চিকের আড়ালে বসে বসেই।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার সঙ্গে যে সব বড় বড় মনীষীদের দেখা হয়েছে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।'

'বড় দুঃখ মনে আছে বাবা! চিত্তরঞ্জন তাঁর রসা রোডের বাড়ীতে আমার নিজের হাতের রান্না খেতে চেয়েছিলেন গত হবার ঠিক দু'দিন আগে। তা আর তাঁকে খাওয়াতে পারলাম না। তিনি আমাকে বৌঠান বলতেন। বাড়ীতে তো শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই এসেছেন। পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে ছিলাম কয়েক দিন। অরবিন্দর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। Motherএর সঙ্গেও কথা হয়েছে। তা ছাড়া ইন্দিরা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী ইত্যাদির সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ পরিচয়।'

মুঙ্গেরে করণচৌরা প্যালেসে যাঁর জন্ম, দশ বৎসর বয়স থেকে নদীয়ার রাজবাড়ীতে যাঁকে জীবনের প্রতিটি দিন অবিরাম কাজের মধ্যে কাটাতে হয়েছে, আশ্চর্য্য লাগে তখনই যখন ভাবি যে রাত তিনটের পর জেগে জেগে তিনি লিখেছেন দু'খানি উপন্যাস, বহু কবিতা।

হিন্দু কোড বিল প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'আমরা বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলাম বাবা! একালে কিন্তু সুখ বড় কম। দুটো কালই তো দেখলাম। যাই বল, ও সব ভাল না, এই বুঝি।'

জমিদারী-প্রথার বিলোপ প্রসঙ্গে বললেন, 'আমার লেখা বই বেশী বিক্রি করতে পারিনি। কারণ আজকের যুগের মত জমিদারদের বিরুদ্ধে লিখতে পারিনি। আর একালের বিয়ে দেখাতে পারিনি। আমার মায়েরা জমিদার, বাবা জমিদার, স্বামী জমিদার, জমিদারী আমার রক্তে রক্তে মিশে আছে। কি করে তার বিরুদ্ধে কথা বোলবো বাবা!'

বিদায় নেবার আগে বললেন, 'তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি বাবা! তোমরা যা করছো বাংলা দেশে এ-কাজ তো আর কেউ করেনি আগে। জয়যুক্ত হও।'

কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী সাহেব বাড়ীতে নেই। বসে বসে তাঁর ছেলের সঙ্গে কথা বলছি। একথা-সেকথা নানান কথার পর একখানা চিঠি লিখে রেখে উঠি-উঠি এমনি মনে ভাবছি, এমন সময় দেখলাম বড় রাস্তা দিয়ে কাজী সাহেব আসছেন ঢোলা একটা জামা গায়ে। মাথায় বড় বড় চুল অযত্নবর্দ্ধিত একটা অলস ভঙ্গীতে পেছনে ফেরানো রয়েছে। উঠে পড়েছিলাম, আবার বসলাম।

সব শুনে-টুনে বললেন, 'উদ্দেশ্য সাধু। নির্বাচন কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট। আমায় নেবার কারণটা কি? আর কাকে নিয়েছো? বয়স তো আমার এখনো তেমন বেশী হয়নি। মোটে সাতান্নো।'

খানিকটা এমনি কথাবার্তা হবার পর শুরু হোল আসল কথা। মোটা গম্ভীর স্বর, তার সঙ্গে প্রখর ব্যক্তিত্ব মিশিয়ে লম্বা-চওড়া মানুষটিকে কেমন যেন রহস্যময় বোধ হয়।

'আমার কথা কি বলবো বুঝতে পারছি না। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ীর ছেলে। মানুষ হয়েছি নদীনালার দেশে। একটু ডানপিটে ছিলামই। আমাদের সময় প্রাণটা এমনি করে মরে যায়নি একেবারে। স্কুলে বরাবর ভাল ছেলে বলে খ্যাতি পেয়ে এসেছি। জন্মেছিলাম মামার বাড়ী কুষ্টিয়ায় কিন্তু লেখাপড়া শুরু করেছি ঢাকায়। জীবনে স্কুল বদল করেছি অনেক। কলেজ বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। বরাবর প্রেসিডেন্সীর ছাত্র।

'কলেজে পড়তে পড়তেই আমার প্রথম উপন্যাস "নদীবক্ষে" প্রকাশিত হোল। কলেজে সহপাঠী ছিলেন ভারী মজার মজার সব লোক। সুভাষচন্দ্র, শশাঙ্কমোহন সেন, প্রমথ সরকার ইত্যাদি অনেকে। প্রমথর সঙ্গে পরীক্ষায় প্রায়ই পাড়াপাড়ি চলেছে।

কাজী আবদুল ওদুদ

'এই সময় আমার প্রথম প্রবন্ধ ছাপা হোল "মুসলিম ভারতে।" এই প্রবন্ধের দুটি কথা প্রমথ চৌধুরী মশায়ের খুব ভাল লাগে। সে কথা দুটি হোল, দুটি ইংরাজী শব্দের অনুবাদ। Sentimentalismএর বাংলা আমি করি ভাববিলাসিতা। আর Socialismএর বাংলা করি সমূহতন্ত্র।

'সাহিত্যিক-জীবনে শরৎচন্দ্রের বহু অকুণ্ঠ প্রশংসা আমাকে উৎসাহিত করেছে। রবীন্দ্রনাথকে তো আমি এক রকম গুরুর মতই দেখি। তাছাড়া রঁলা, গ্যেটে ও মহম্মদের প্রভাব আমার জীবনে অনেক ভাবে কাজ করেছে। গ্যেটের উপর আমি বই লিখেছি, মহম্মদের উপর লিখবার চেষ্টা করছি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক কাজ করেছি, শেষ জীবনে আর একটা বড় কাজ করবার ইচ্ছা রয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা ভারী মজার। রবীন্দ্রনাথের উপর লিখলেন এক প্রবন্ধ। সে অনেক কাল আগের কথা। তখন "গীতাঞ্জলী" সবে শেষ হয়েছে। কবির উপর বিশেষ কোন ভাল লেখা নেই। প্রবন্ধ পড়ে ডাক পড়লো কাজী সাহেবের রবীন্দ্রনাথের কাছে। দেখা হতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এত লোক আসে শান্তিনিকেতনে তুমি কেন আসো না কাজী?'

বিশ বছর তিনি অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা কলেজে। মাত্র দু'-বছর হোল তিনি সে কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন। এম, এ পাশ করে ল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছেন। এমন সময় ডাক এলো অধ্যাপনার। ঢাকায় নতুন কলেজ হচ্ছে— সেখানে লোক চাই। দীনেশচন্দ্র সেন তখনও বেঁচে। কাজী সাহেবের লেখা পড়েছেন। যেচে

ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'কাজ করবে তো যাও ঢাকায়। তারা বাংলার জন্ম লোক চাইছে। ট্রেপেলটন্ সাহেবের কাছে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।' হোল অধ্যাপকের চাকরী। হাসতে হাসতে কাজী সাহেব বললেন, 'দেশে অবশ্য তখন এত কাজের অভাব ছিল না।'

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর স্ত্রীর প্রেরণা অনেক কাজ করেছে। 'আমার স্ত্রী ছিলেন মনসর্বস্ব মানুষ। আমি ছিলাম কাজ নিয়ে। মিলটা হয়েছিল ভালোই। বাংলা সাহিত্যে আমার যে কথাটা আমি বার বার বলতে চেয়েছি সেটা হোল, "বুদ্ধির মুক্তি।" এ ভাবটা ওর কাছ থেকে পাওয়া নয়। ওর কাছ থেকে পেয়েছি একটা গোটা মন। যার জন্যই সাহিত্যে ওকথা জোর করে বলতে পেরেছি।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজাম বক্তৃতা দেবার জন্ম অনুরোধ করেছেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর দান অসামান্য।

"ভাব আর প্রেম", তাঁরই ভাষায়, এ দুটির অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটে গেছে কাজী আবদুল ওদুদের মধ্যে।

মাসিক বসুমতী বহু দিন ধরে তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে আসছেন।

ডাঃ সুবোধ মিত্র

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। চারিদিক থেকে নানা জাতের পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ প্রতিটি মুহূর্ত্ত গুণছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর সকলে। রাত বারোটায় ডাক্তার বাবু বলে গেছেন, 'রোগী আর বাঁচানো যাবে না।' যমে-মানুষে ক'দিন ধরে কি টানাটানিই না গেছে! এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধে মানুষই হেরে গেছে নিঃসন্দেহে।

সাথে একখানা দর্শনের খোলা বই হাতে ঠিক অমনি এক পরিবেশের মধ্যে ডাক্তার সুবোধ মিত্রের জন্ম। হাসতে হাসতে বললেন ডাক্তার মিত্র তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে। সৌম্যদর্শন, সদাই হাসিখুসী মানুষটির কাছে গিয়েই হঠাৎ যেন মনে হয়, খুব একজন নিকট-আত্মীয়ের কাছে এসে পড়েছি। আমার কথা শুনে বললেন, 'রোগীকে কোন 'প্যাথি'ই সারাতে পারে না। 'এ্যালোপাথী' বলুন, 'হোমিওপ্যাথী' বলুন, 'রেডিওপ্যাথী' বলুন—কেউ না, যদি না সেই সঙ্গে থাকে 'সিম্প্যাথী'। এই 'সিমপ্যাথীই ডাক্তারের সব চেয়ে বড় ওষুধ। তাই আমরা সদাই এমনি করে হাসতে পারি।

'হাঁ, যা বলছিলাম, ছোট বেলা থেকেই আমি একটু ভাবুক প্রকৃতির। কলেজে পড়বার সময় ইচ্ছা ছিল দর্শন পড়ে অধ্যাপনা কোরবো। কিন্তু আমার চোখের সামনে আমার এক প্রিয়জনের অসহায় মৃত্যুর দৃশ্য দেখে হঠাৎ আমার মনে হোল, না, দর্শন পড়ে তো এদের বাঁচানো যাবে না। আমাকে হতে হবে ডাক্তার। খুব বড় ডাক্তার। বাইরে থেকে শিখে আসতে হবে অনেক কিছু। দেশের মানুষের মৃত্যু তাতেও হয়তো কমবে না কিন্তু তবুও এমনি অসহায় মৃত্যুর হাত থেকে তো তাদের রেহাই দেওয়া যাবে।

'তারপরের ইতিহাস সোজা। কলকাতা থেকে এম. বি. পাশ করলাম। করে গেলাম জার্মাণীতে। বার্লিন থেকে হয়ে এলাম এম. ডি আর এডিনবরা থেকে এফ. আর. সি. এস। বার্লিনে তখনও হিটলার বসেননি রাজাসনে। সমস্ত জার্মাণী জুড়ে একটা অরাজকতা চলেছে। প্রতি মিনিটে পাউণ্ডের দাম পড়ে যাচ্ছে। সকালে একখানা পাউণ্ড নিয়ে বিকেলে সেটা একখানা Scrap paper হয়ে গেল। তখন বার্লিনে রয়েছেন ডাঃ শচীন সর্বাধিকারী, ডাঃ পঞ্চানন বসু, ডাঃ ভূপেন দত্ত ইত্যাদি অনেকেই। সেটা এই ১৯২৪-২৫ সাল হবে। এ যাত্রায় তিন বছর ছিলাম জার্মাণীতে।

ডাঃ সুবোধ মিত্র

এই সময় জার্মাণী থেকে ফেরার পথে প্যারিসে প্রফেসার লেভির বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে তখন অনেক বিষয়ে কথা হোল। কথার আঁচে বুঝলাম, দেশের এই মানুষটি শুধু কবি নন, দেশ থেকে দেশান্তরে ভারতের সভ্যতার আলোটিকে বয়ে নিয়ে চলেছেন।

'প্রথমে দেশে ফিরে এসে কিছু দিন কাজ করলাম আমার পুরোনো কলেজ আর. জি. কর মেডিকেলে। তার পরেই এলাম চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। আর সেই থেকেই রয়ে গেছি। আমার উন্নতি অবনতি সব-কিছুই এখন সেবাসদনের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। আজকে সেবাসদন যে পৃথিবীর বড় বড় Maternity Homeগুলির মধ্যে অন্যতম সেইটিই আমার জীবনের পুরস্কার।'

মধ্যে ১৯৩১ সালে প্যারিসে ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগ দিয়েছেন। তার পর দীর্ঘ ১৬ বৎসর তাঁর কেটেছে কলকাতার সেবাসদনকে নিয়ে।

১৯৪৭ সালে আবার এলো বিদেশের আহ্বান। ইংল্যাণ্ড, আয়ার্লণ্ড, ষ্টকহলম, সুইডেন এবং আমেরিকার বড় বড় সহরে নানা রকম জটিল operation দেখিয়ে তিনি ভারতের সুনাম বাড়িয়ে দেশে ফিরলেন এবার।

'আমেরিকাকে ১৯৪৭ সালে দেখে অবাক হয়েছি। এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল অথচ কোথাও তার এতটুকু চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ইংল্যাণ্ডকেও দেখলাম সেই সঙ্গে। ভাঙাচোরা, কড়া রেশনিং, জিনিষপত্র কিছুই পাওয়া যায় না। সমস্ত লোকের মনোবল যেন ভেঙ্গে পড়েছে।'

লণ্ডনের গায়নাকোলজিকাল্ কংগ্রেসে ১৯৪৯ সালে তিনি এক বক্তৃতা দেন ভারতের পক্ষ থেকে।

'এ সময় লণ্ডনের অবস্থা কিছুটা ভাল। সেখান থেকে গেলাম আমেরিকায়। সেটা বোধ হয় ১৯৫০ সাল হবে। সঙ্গে স্ত্রী আর মেয়ে। খুব ঘুরেছি এবার আমেরিকায়। তার সঙ্গে বক্তৃতা করেছি বিভিন্ন সহরে। তারপর নরওয়ে, সুইডেন হয়ে ফিরে এলাম দেশে।

'১৯৫২ সাল। আবার ডাক এলো 'মিউনিক' থেকে। এবার লণ্ডনের অবস্থা দেখলাম অনেক ভাল। তবু কড়া রেশনিং আছেই।'

জরুরী অপারেশন রয়েছে ডাঃ মিত্রের। সদাই কর্ম্মব্যস্ত মানুষটি কাজই যেন ভালবাসেন। কি করে যে এত কাজে ডুবে থাকেন ভাবা যায় না!

'প্রসবের পর মা যখন শিশুটিকে কোলে করে সেবাসদন ছেড়ে চলে যান তখন আর পরিশ্রমটুকু গায় লাগে না। কাজের আনন্দ তো সর্বান্তর।'

তাঁর মত লোকেরও সখ আছে—সময় নেই যদিও একটুও। সময় পেলেই দর্শনের বই খুলে বসেন। সেই পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে। কিংবা হয়তো টেনিসের র‍্যাকেট্‌টা হাতে বেরিয়ে পড়েন।

বিদায় নিয়ে চলে আসবার আগে বললেন, 'কি করে যাবেন? মিছিল বেরিয়েছে মস্ত বড়, ট্রাম-বাস তো চলছে না বোধ হয়। চালটা কিছুদিন রেশনে বড্ড খারাপ দিচ্ছে, তাই না? চলুন আমি সেবাসদনে যাচ্ছি, আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দি।'

মাসিক বসুমতীর তিনি এক জন নিয়মিত গ্রাহক।

শ্রীদেবকীকুমার বসু

চলচ্চিত্র-জগতে দেবকী বসুর নাম কারও অজানা নেই। পরিচালকের জন্মগত অধিকার নিয়ে তিনি এ শিল্পের সাধনা করে চলছেন, বহু দিন। তাই দিন ঠিক করে একদিন বেরিয়ে পড়লুম।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। লেকের কাছাকাছি দেবকী বাবুর বাড়ী। আমি জেনে নিয়েছিলুম। বাড়ীতে ঢুকতেই খবর পেলুম যে তিনি অসুস্থ। কিছুক্ষণ বাদেই আমায় নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর শোবার ঘরে। আমাকে বস্‌তে বলেই তিনি বললেন, মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসেই শরীর অপটু হয়ে পড়েছে। ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে বসে আমার ব্যক্তিগত জীবন আর চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করবো কিন্তু সে হয়ে উঠছে না বলে দুঃখিত।

আমিও তাঁকে এ অবস্থায় বিরক্ত করতে চাইলুম না। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আমার বক্তব্য তাঁকে জানিয়ে এলুম। বললেন আমায় তিনি—এরই মাঝে উত্তর যথাসম্ভব আমি তৈরী করে রাখবো।

দিন তিনেক বাদেই সত্যি সত্যিই দেখলুম দেবকী বাবুর উত্তর সব লেখা হয়ে আছে। সাক্ষাৎ আলোচনা হ'লে যেটা হোত এক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হ'লো বটে, কিন্তু উত্তরগুলো দেখে আমার মনে হ'লো আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছুই বাদ যায়নি।

আমার প্রশ্ন ছিল—আপনি এ পর্য্যন্ত কতগুলো ছবির পরিচালনা করেছেন এবং কোন ছবির পরিচালনায় সব চাইতে আনন্দ পেয়েছেন ও কেন পেয়েছেন? শ্রীবসুর উত্তর হ'লো—আমি প্রায় ২৪।২৫খানা ছবি করেছি। তার মধ্যে "মীরাবাঈ" ছবি করতে মনে সব চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম। তবে যদি "ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গণনার মধ্যে ধরা হয়, তা হ'লে এ ছবিটি তৈরী ক'রতে আমি সব চেয়ে আনন্দ পাচ্ছি। ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজের যোগ যতখানি বেশী মনে হয় দর্শকের মত চিত্র-পরিচালকও সেই সেই ছবিতে 'প্রায়' ততখানি আনন্দ পান।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? উত্তর দিলেন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায়—সাহিত্যের সঙ্গে সমান আসনে বসবার যোগ্যতা আজও হয়নি চলচ্চিত্রের। হয়তো কোন দিন হবেও না। তবু সমাজ-জীবনে সাহিত্যের যে স্থান, চলচ্চিত্রেরও সেই স্থান হওয়া উচিত।

পরিচালক হিসেবে আপনি কিরূপ ধরণের ছবির আকাঙ্ক্ষা করেন এবং চলতি ছবিগুলো সম্পর্কে আপনার কোন বিশেষ বক্তব্য আছে কি?—এই ছিল আমার পরবর্তী প্রশ্ন। উত্তর এলো দেবকী বাবুর—যে সব ছবি সমাজের ও ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ নিয়ে আসে আমার মতে সেগুলোই ভাল ছবি। শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কিন্তু যা কল্যাণময়ী নয় তা সত্যিকার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রতে পারে না। অকল্যাণ নিয়ে যে সৌন্দর্য্য জেগে ওঠে সেখানে মানুষে মানুষে বিরোধ হয়, শিক্ষা সেখানে থেমে যায়।

প্রশ্ন ছিল আমার তরফ থেকে—যে কোন চিত্রের সার্থকতার জন্য আপনি কি কি উপাদান অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য মনে করেন? শ্রীবসু অল্প কথায় জানালেন—চিত্র নির্ম্মাণের জন্যে (১) ভাল কাহিনী ও চিত্রনাট্য। (২) সুষ্ঠু কলাকৌশল এবং (৩) সুনিপুণ অভিনয়ের একান্ত প্রয়োজন। এগুলোর যোগাযোগে চিত্র সার্থক হয়।

এবারে জান্‌তে চেয়েছিলুম—এ দেশে যে ধরণের ছবি চলছে, রুচি ও প্রয়োজনের দিক থেকে সেগুলো প্রগতিমুখী বলে কি আপনি মনে করেন? দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব এলো দেবকী বাবুর—প্রগতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধারণা আছে বলে মনে হয় আমার। আমি মনে করি যা মানুষের মঙ্গল আনে তা-ই সত্যিকার প্রগতি। শুধু পরিবর্তনই প্রগতি নয়। ছবি সম্বন্ধেও এ কথাই বলা চলে।

বর্তমান যুগে কি প্রকারের ছবি তৈরী হ'লে জনসাধারণ তা গ্রহণ করবে বলে আপনার মনে হয়?—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে পরিচালক শ্রীবসু এই অভিমত প্রকাশ করেন—জনসাধারণ কি ছবি কি ভাবে গ্রহণ করে তা ভাববার চেষ্টা সকলের মত আমিও করি। কিন্তু তা নিশ্চয় করে বলবার যোগ্যতা বোধ হয় কারুরই নেই। চিত্র-নির্ম্মাতার পক্ষে তাঁর নিজের আদর্শ-পথে চলাই একমাত্র প[illegible] এবং সাফল্য নির্ভর করে ততখানি—যতখানি সে-আদর্শের সঙ্গে জনতার আদর্শের যো[illegible] আছে। অবশ্য সে আদর্শকে রূপ দেবা[র] মত কাহিনী, কলাকৌশল ও অভিনয়-নৈপুণ্য থাকা চাই-ই সে ছবির মধ্যে।

শ্রীদেবকীকুমার বসু

আমার সর্বশেষ প্রশ্ন বাস্তব জীবনের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগ-সূত্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন কি? উত্তর এলো
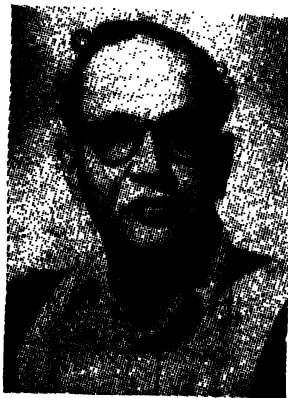
ইচ্ছার স্রোত

(অপ্রকাশিত)

শিবনাথ শাস্ত্রী

তোমার ইচ্ছার স্রোত জগতে যেতেছে বয়ে,
সে স্রোতে যে গা ভাসায় সেই যায় পার হ'য়ে।
ওই স্রোত নরনারী রেখেছে সবারে ঘিরে,
রাখে নাশে, পালে ত্রাসে, ডোবায় সুস্নিগ্ধ নীরে।
ওই স্রোত দিবা-রাতি জড় জীব নাহি জানে,
স্তুতি নিন্দা কাম ক্রোধ রাজা প্রজা নাহি মানে।
জড়রাজ্যে ওই স্রোত দুর্জ্জয় শকতি ধরে,
লীলা, হেলা খেলা করে কোটি যুগ-যুগান্তরে।
তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি গড়ে ভাঙ্গে তারে ভূকম্পনে
সাগরে নগর গড়ে, ভাঙ্গে তারে পরক্ষণে।
ওই স্রোত নরে দেখে ক্রীড়ার পুত্তলি প্রায়,
পুণ্যে রাখে পাপে নাশে, মুখ পানে নাহি চায়।
নরের চাতুরী যত মাকড়সার জাল সম,
ছিঁড়িয়া ভাসায়ে লয়, নাহি মানে শত শ্রম।
নিম পুতে আম খেতে যে জন প্রয়াসী হয়,
ওই স্রোত তার মুখে লবণাম্বু পূরে লয়।

কাজে পাপী, মুখে সাধু, যে জন কিনিতে চায়,
স্রোত তার আশা-দুর্গ ভাসায়ে লইয়া যায়।
সবলতা, দুর্ব্বলতা, উঠা আর পড়া হয়,
কি ভাবে দিয়েছে ফাঁকি লোকে তারে চিনে লয়।
সে ভাবে সৌরভে পুরি, আশে-পাশে আছে যারা,
রাখ, রাখ, বলে নাকে কাপড় দিতেছে তারা।
ওই নদী যথা কাষ্ঠে আনিয়া চড়াতে ফেলে,
সদর্পে বহিয়া যায়, সেই কাষ্ঠে অবহেলে।
তেমনি ও ইচ্ছা-স্রোত সেজনে দুর্ব্বল করি,
জীবন-বালুকা পার্শ্বে ফেলে যায় পরিহরি।
তাই বলি হ'তে চাহ, নাহি চাহ দেখাবারে,
অদৃশ্য মাপের কাঠি মাপিতেছে যে তোমারে,
নিজ মনে পাঁচ হাত, ভেবে কেন ভুলে রও?
সে কঠিন মাপে তুমি দু'হাতের অধিক নও।
যখন সে ভাবে আমি, সিংহ সম বল ধরি,
তখন পাপের স্মৃতি দেয় তারে কাবু করি।

আছে সব, কিছু নাই, বল বুদ্ধি অন্তর্দ্ধান,
মুখ কুকুরের মত, সাহসেতে হীন প্রাণ।
পদে পদে এই শিক্ষা এ জীবনটা আর কার,
রাখে থাকি, দিলে পাই, পাপের নাহি নিস্তার।
তুমি গো ঘিরিয়া আছ, তুমি গো জাগিয়া রও,
পাপেতে ফেরাও মুখ, পুণ্যে কোলে তুলে লও।
জানি না বুঝি না সব চিনি না নিকট দূর,
ঐ স্রোতে গা ভাসাই, লও মোরে ব্রহ্মপুর।

কটক;
১৯০৭, ১৪ই নভেম্বর।

…দেবকী বাবুর লেখনী-মুখে—বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র নিশ্চয়ই থাকবে ছবির, নইলে দর্শক কেন নেবে সে ছবি। তবে বাস্তব মানে যদি মাত্র যা ঘটছে তাই ধরা হয় তা হলে দর্শক তাও না নিতে পারে। ফটোগ্রাফ মাত্র হলে "art" হ'বে না। বাস্তবকে সমষ্টির মঙ্গলের দিক দেখতে হবে তবে তা "art" হবে, কল্যাণের হবে। আবার এ কথাও সত্যি যে, বাস্তব বাদ দিয়ে শুধু আদর্শ বা শুধু ভাব-বস্তুরও কোন মূল্য নেই। এ রকম কোন আদর্শ থাকাই উচিত নয় যা বাস্তবকে বাদ দিয়ে চলে। বাস্তব-বর্জ্জিত যে চিন্তাধারা বা কাহিনী তা দিবাস্বপ্ন মাত্র।

—আশীষ বসু সংগৃহীত।

হজরৎ মহম্মদ

শ্রীআভা বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৭১ খৃষ্টাব্দ ১০ই নভেম্বর। এই দিনে যুগাবতার মহাপুরুষ মহম্মদের জন্ম হয় মক্কা নগরে। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র। তাঁর পিতার নাম আবদুল, মাতার নাম আমিনা। তাঁরা ছিলেন হাসেম বংশজাত। হাসেম-বংশ কুরেশ-বংশের একটি শাখা। আরব জাতির আদিপুরুষ ইসমাইল এই কুরেশ-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুরেশরা জ্ঞানে, গুণে ও অর্থে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। শুধু তাই নয়, তাঁরা কাবার (আরবদের সাধারণ প্রাচীন উপাসনা-স্থান) নিকটে বাস করতেন এবং সেখানকার পরিচালনার ভার ও কর্তৃত্ব তাঁদের হাতেই ন্যস্ত ছিল; আর সে ক্ষমতা তাঁরা পুরুষানুক্রমে ভোগ করতেন। আরবদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মস্থানের ওপর কর্তৃত্ব থাকাতে তাঁরা আরব জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হয়ে উঠেছিলেন।

মহম্মদ যখন শিশু তখন তাঁর বাবা ও মা দু'জনেই মারা যান। কাবার প্রধান পুরোহিত আবদুল মতলিব্ ছিলেন তাঁর ঠাকুরদা। তিনি মহম্মদকে লালন-পালন করতে লাগলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহম্মদ তাঁর ছোট কাকা আবু তালিবের আশ্রয়ে রইলেন। কাকার সঙ্গে তিনি অনেক দেশ বেড়িয়েছিলেন। সমুদ্রযাত্রাও করেছিলেন—জাহাজে চেপে সুরিয়া, দামাস্কাস্, বাগদাদ ও বসরায় গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণের ফলে তিনি অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। শুধু ভ্রমণ নয়, ঐ সময়ে তিনি বিদ্যাশিক্ষা, যুদ্ধবিদ্যা ও অশ্বচালনা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

মক্কা মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ। লক্ষ লক্ষ যাত্রী সারা বছর ধরে পুণ্যলোভে সেখানে যান। পথে মরুভূমি পড়ে এবং সেখানে ডাকাতের খুব উপদ্রব—সুযোগ ও সুবিধা পেলেই তারা অসহায় যাত্রীদের মেরে-ধরে তাদের সমস্ত টাকাকড়ি কেড়ে নিত। তীর্থযাত্রীদের দুঃখ ও কষ্টের সীমা থাকত না। অসহায় যাত্রীদের জন্য মহম্মদের হৃদয় কেঁদে উঠল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বৎসর। সেই অল্প বয়সেই তিনি এক দল সাহসী লোক নিয়ে ডাকাতদের যে সমস্ত আড্ডা ছিল সেখানে গিয়ে হানা দিলেন; যাত্রীদের পথ সুগম হ'ল। এই ডাকাত-দমনের সময় তাঁকে এত বেশী কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে তাঁর বিশ্রামের দরকার হয়ে পড়ে। সে জন্য তিনি এক নির্জ্জন স্থানে বাস করতে লাগলেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের ধ্যান, ধারণা, পূজা ও শাস্ত্রপাঠে মগ্ন হয়ে রইলেন। আরবেরা পৌত্তলিক ছিল এবং ধর্ম্মের নামে বহু অন্যায় কাজ করত, এ জন্য তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন যেন তিনি ঐ সব অন্যায় কাজ নিবারণ করতে পারেন ও যে ধর্ম্মপালন করলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায় সে ধর্ম্ম যেন তাঁর দেশবাসীদের বোঝাতে পারেন। এই ভাবে কিছু দিন কেটে গেল। যখন তাঁর পঁচিশ বৎসর বয়স, সেই সময় খদিজা নামে এক বিধবা যুবতীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ঐ মহিলা রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন, ঐশ্বর্য্যও ছিল তাঁর প্রচুর। কিছু দিন বাদে দু'জনের বিবাহ হ'ল। সংসার কিন্তু মহম্মদকে আবদ্ধ রাখতে পারল না।

মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ; ভগবান তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তিনি কি তুচ্ছ সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন? বিবাহের পর পনের বৎসর, হয় তিনি পাহাড়ের গুহার ভেতর ঈশ্বরের ধ্যানে ডুবে থাকতেন, নয় ত সুরিয়া বা আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন। পরিব্রাজকরূপে যখন বেড়াতেন, যেখানে যেতেন সেখানকার সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর নিতেন অর্থাৎ সেখানে লোকেরা কি ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাদের সমাজ, সংস্কার, রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহার সব কিছুই জেনে নিতেন। এই সময়ে তিনি ইহুদি খৃষ্টান অনেক ধার্ম্মিক ও পাণ্ডিতের সংস্রবে এসেছিলেন যাঁরা তাঁর মহান্ বাণী ও ভগবানের প্রতি মুগ্ধ হয়ে সকলে একবাক্যে তাঁকে মহাপুরুষ বলে স্বীকার করেছিলেন।

এর পর এল ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁর নিজ মত ব্যক্ত করার সময়। প্রথমে তিনি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তাঁর উপদেশ প্রকাশ করলেন। তাঁর স্ত্রী খদিজা বেগম, বরক্, আবুবেকর, আলীবিন আবু এবং আরও অনেকে তাঁর উপদেশ শুনে মুগ্ধ হলেন ও তিনি যে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ সে বিষয়ে তাঁদের কোন সন্দেহ রইল না। তিন বছর ধরে আস্তে আস্তে তাঁর মতাবলম্বীর দল বাড়তে লাগল। তার পর তিনি যখন বুঝলেন যে, সর্ব্বসাধারণকে তাঁর উপদেশ জানাবার সময় হয়েছে তখন হাসেম-বংশীয় যত গণ্যমান্য লোক ছিলেন তাঁদের এক দিন নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। ঐ নিমন্ত্রণ-সভায় তিনি বললেন—"ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। আপনারা যে বহু দেব-দেবীর পূজা করেন সেটা মহা ভুল। আপনারা যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম পালন করেন সেও সত্য নয়, কারণ, ঈশ্বরের কোন রূপ নেই—তিনি নিরাকার। আপনারা প্রচলিত ধর্ম্ম ছেড়ে সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন; একমাত্র সেই পরম দয়ালু ঈশ্বরের আরাধনা করুন, তাহ'লে ইহলোকে শান্তি ও মুক্তি পাবেন।" তাঁরা কেউ তাঁর উপদেশ মত কাজ করতে রাজী হলেন না; অনেকে তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না আর যাঁরা বিশ্বাস করলেন তাঁরা প্রচলিত ধর্ম্মমত ত্যাগ করা বিধেয় নয় ভাবলেন। তিনি সাধারণকে বোঝাবার জন্য সভা ডেকে ঐ মর্ম্মে এক বক্তৃতা দিলেন। তাতেও কোন ফল হ'ল না। প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধমত হওয়ায় সাধারণ লোকেরা তাঁকে ছিঃ ছিঃ করতে লাগল ও তাঁকে নানা প্রকারে অপদস্থ করার চেষ্টা করল। কেবল আলি নামক এক বালক তাঁর চরণে আশ্রয় নিল। ঐ সমস্ত নিন্দা-অপমান মহম্মদ গ্রাহ্য করলেন না। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকে ঐ মত প্রকাশ করতে তাঁকে বারণ করলেন। মহম্মদ তাঁদের উত্তর দিলেন—"আমি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছি; যদি কেউ চন্দ্র ও সূর্য্যকে তাদের কক্ষচ্যুত করতে চায়, তা কি পারে?" সামনে তাঁর দুস্তর বাধা, সহায় কেবল মুষ্টিমেয় লোক, তবু সঙ্কল্পে তিনি অটুট রইলেন। দিনের পর দিন মক্কার প্রকাশ্য স্থানে, তিনি যে ধর্ম্ম সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন সে সত্য নির্ভয়ে প্রচার করতে লাগলেন। পরিবর্ত্তে পেলেন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, উপহাস—তবুও তিনি অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁর কাজ করে যেতে লাগলেন। এ সময়ে তিনি এক জন মহা গুণী

লোককে আকৃষ্ট করেন ও তাঁর সাহায্য পান। এঁর নাম লেবিদ, তিনি ছিলেন মহাকবি। ইনি মহম্মদের ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে পেরে সর্ব্বসাধারণকে সেই কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। দু'জনের সমবেত চেষ্টায় কিছু ফল হ'ল। অল্পে অল্পে লোকে প্রচলিত ধর্ম্ম ছেড়ে মহম্মদের শরণ নিল।

খদিজা দেবীর এই সময়ে মৃত্যু হয়। আবুবেকরের কন্যা আয়েষাকে মহম্মদ বিবাহ করেন। তাঁর শ্বশুরের চেষ্টায় আবুবৈদা, হমজা, ওসমান, উমার প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত প্রধান বা শেখ মহম্মদের ধর্ম্মমত স্বীকার করে নিলেন। এর পর ১২ বছর তাঁর ধর্ম্মমত খুব আস্তে আস্তে প্রসার হতে লাগল। তাঁর কয়েক জন অনুচর অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করতে না পেরে অ্যাবিসিনিয়াতে পালাতে বাধ্য হলেন। তার পরই তাঁর দলের দারুণ দুঃসময় উপস্থিত হ'ল। মক্কার লোক ঠিক করল মহম্মদকে হত্যা করবে। সে খবর পেয়ে তিনি ছদ্মবেশে থাবর নগরে চলে গেলেন। পরে ঐ নগরের নাম হয় মেদিনা। ঐ ঘটনা ঘটে ১৭ই জুলাই তারিখে, ৬২২ খৃষ্টাব্দে। সেদিন থেকেই হিজরা অব্দ প্রচলিত হয়। মেদিনার অধিবাসীরা সানন্দে তাঁকে স্থান দিল ও নিজেরা ধন্য হ'ল। তারা শীঘ্রই তাঁর ধর্ম্মমত মেনে নিল; শুধু তাই নয়, মক্কা থেকে যে-সব তীর্থযাত্রী মেদিনায় আসত, তারা তাদের কাছে তখন ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করতে লাগল। কিছু দিন বাদে তারা সমবেত হয়ে মহম্মদের কাছে গিয়ে বললে,—"হজরত, আপনি যদি বোঝেন যে বলপূর্ব্বক আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করা দরকার, আমাদের প্রার্থনা, আপনি তাই করুন। আমরা আমাদের যথাশক্তি সাহায্য করতে প্রস্তুত।" মহম্মদও ভাবছিলেন, কি করা যায় ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে—যদি বলপ্রয়োগ করেন, তাহ'লে অনেক রক্তপাত ও বহু লোকক্ষয় হবে। দয়ালু হৃদয় তিনি ঐ কথা ভেবেই হয়ত বিরত ছিলেন। যখন দেখলেন, মেদিনার লোকেরা স্বেচ্ছায় তাঁকে সাহায্য করতে এসেছে তখন বুঝতে পারলেন যে, করুণাময় ঈশ্বরের অভিপ্রায় ঐ কাজ করা। আর কোন সন্দেহ বা দ্বিধা রইল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের বললেন যে, পৌত্তলিক ধর্ম্ম যারা মানে তাদের জোর করে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করান উচিত, তবে তোমাদেরও প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, যত দিন পর্য্যন্ত আরব জাতি এই সত্য ধর্ম্ম স্বীকার না করে তত দিন পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধ হতে নিরস্ত হবে না। তারা সেই মত প্রতিজ্ঞা করল।

এদিকে কুরেশ জাতির অধিপতি সোফিয়ান খবর পেলেন যে, মহম্মদ যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তিনি তখনই এক হাজার সৈন্য সহ মেদিনার অভিমুখে যাত্রা করলেন। মেদিনা থেকে ১০ মাইল দূরে বেদর নামে এক পাহাড়ের গুহায় মাত্র তিনশ' সৈন্য সহ মহম্মদ তাঁর অপেক্ষা করে থাকলেন। সোফিয়ান যেই যেখানে উপস্থিত হলেন, তিনি আক্রমণ করলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধ হওয়ার পর শত্রুসৈন্যরা সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত হ'ল। সোফিয়ান আবার তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে মহম্মদের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। এ যুদ্ধ হ'ল ওহদ্ নামে এক পাহাড়ের কাছে। এখানে মহম্মদ আহত হ'ন ও তাঁর সৈন্যরা পরাজিত হয়। তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধ হয় মেদিনায়, শত্রুপক্ষ দশ দিন সহর অবরোধ করেছিল কিন্তু আলীর শৌর্য্য ও পরাক্রমে সোফিয়ান সন্ধি করতে বাধ্য হ'ন। সন্ধির ফলে এই স্থির হ'ল যে, উভয় পক্ষ দশ বৎসরের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। ঐ দশ বছরের মধ্যে মহম্মদ বৈনকাও, কোরৈধা, নধির, দৈকর প্রভৃতি ইহুদি জাতিকে পরাস্ত ক'রে তাদের স্বধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। এ রকম ভাবে সমস্ত জাতিকে দমন করাতে তাঁর যশ ও শক্তির খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মক্কায় কুরেশরা সন্ধি ভঙ্গ করাতে মহম্মদ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন। মক্কা বিনা বাধায় দখল করলেন। যারা এক দিন মক্কা থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তারাই তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করল এবং তাঁর ধর্ম্ম পালন করবে অঙ্গীকার করল। তাঁর অদ্বৈতবাদ মত এত দিনের চেষ্টার পর, এত যুদ্ধ ও এত রক্তপাতের পর আরব দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। যারা তাঁর ও তাঁর অনুচরদের প্রতি অত্যাচার করেছিল তারা তাঁর শরণাপন্ন হ'ল; তিনি তাদের ক্ষমা করলেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি নিয়তির মত নিষ্ঠুর হ'লেন। যারা তাঁর ধর্ম্মগ্রহণে রাজী হ'ল না তাদের তিনি কিছুতেই ক্ষমা করলেন না—তাদের দেশ থেকে দূর ক'রে দিলেন। আর পৌত্তলিক ধর্ম্মের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত তিনি বিনষ্ট করলেন। পরিবর্ত্তে, একটি অতি সুন্দর মসৃজিদ তৈরী করে দিলেন—যেখানে ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ,—সকলে একসঙ্গে একই সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারবে। সেই অবধি ঐ স্থান মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। এখন মক্কায় যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের আজীবন কামনার বস্তু। হিন্দুর যেমন বারাণসী, মুসলমানদের তেমনি মক্কা।

মক্কা জয়ের পর সমস্ত আরব জাতিরা এসে একে একে মহম্মদের অধীনতা স্বীকার করলেন ও তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাজারাও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক রাজ্য তিনি জয় করে নিলেন ও অনেক রাজা স্বেচ্ছায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। এইরূপে স্বীয় ধর্ম্মমত ও রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি শেষ একবার মক্কায় গেলেন। সেখান থেকে ফিরে মেদিনাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুই সপ্তাহ জ্বর ভোগ করার পর ৮ই জুন, ৬৩২ খৃঃ আল্লা তাঁকে তাঁর শান্তিময় কোলে তুলে নিলেন।

মহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম মুসলিম ধর্ম্ম। মুসলমানদের ধর্ম্মপুস্তকের নাম কোরাণ—মহম্মদ তার রচয়িতা। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোরাণে সুন্দর ও বিশদ ভাবে লেখা আছে। মুসলিম ধর্ম্মের সার মর্ম্ম হ'ল,—"ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; তিনি নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও পরম দয়ালু। তাঁর নিত্য উপাসনা করাই হ'ল শ্রেষ্ঠ সাধনা ও একান্ত কর্ত্তব্য। তিনিই জগতের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা। তাঁরই ইচ্ছায় মানুষের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়। দ্যুলোকে, ভূলোকে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে যা-কিছু যেখানে আছে সবারই নিয়ন্তা তিনি।" কোরাণে ধর্ম্ম বিষয়ে আরও অনেক কিছু লেখা আছে; সে সব লিখলে এ প্রবন্ধ বড় হয়ে যাবে, কাজেই আমরা এই বলে শেষ করি,—"লা, ইলাহা ইল্লিল্লা মোহম্মদ রসুল।" অর্থাৎ 'ঈশ্বর এক ব্যতীত দ্বিতীয় নেই এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত'।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

মেছুয়া থানায় এই দিন কর্ম্মব্যস্ততার যেন পরিশেষ নেই। সারা রাত্রি ধরে কাজকর্ম্ম চলেছে; ভোর রাত্রেও কর্ত্তব্যকর্ম্মের শেষ নেই। এক-এক জন অফসার দলবল সহ এক-এক দিকে বার হয়ে যাচ্ছেন এবং কিছু পরে কয়েকটা বাড়ী তল্লাস করে কয়েক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে পুনরায় তাঁরা থানায় ফিরে আসছেন। অফসারদের প্রত্যেকেরই থানাবাড়ীর উপরতলায় বসবাসের জন্ম নির্দিষ্ট কোয়ার্টার আছে, কিন্তু তাঁদের কেউই আজ সারা দিনরাত্রে একটি ক্ষণের জন্মও উপরে উঠতে পাবেননি। রহমান সাহেব, ইউসুফ সাহেব, শৈলেন বাবু, ধীরেন বাবু সকলে সারা দিনরাত্রি ছুটোছুটি করে একে একে সকলেই থানায় ফিরে এসেছেন। বড়বাবু নরেন বাবু তখন পর্য্যন্ত আসর জমিয়ে নিজের অফিসে বসে ছিলেন। বন্দীকৃত সন্দেহভাজন আসামীদের ধমকাধমকি ও জিজ্ঞাসাবাদ করে সকলেই পরিশ্রান্ত। ইতিমধ্যে বার দুই পুলিশের বড় ও ছোট সাহেব থানায় এসে সংবাদ নিয়ে গিয়েছেন। খুন তিনটির সামান্ম কিনারাও এতক্ষণে না করতে পেরে থানার প্রত্যেক অফসারই বিক্ষুব্ধ।

নরেন বাবুর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাব আজ আর তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। শান্তির সময়ে যে অভিজাত্য-গরবী নরেন বাবু দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির ছিলেন, আপৎকালে তিনি অতীব শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। থানার নিম্নতম শাস্ত্রীর সঙ্গেও তিনি আজ পরামর্শে বিমুখ নন। একদিনের একটি ঘটনা থানার সমস্ত আবহাওয়ার যেন এক আমূল পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। উপস্থিত সকলকে সমান ভাবে আপ্যায়িত করে তাদের সঙ্গে তিনি কথাবার্ত্তা বলছিলেন। পাশের ঘরে তরিতরকারী সহ দুইটি খিচুড়ীর হাঁড়ী বসানো। টেবিলের কাগজপত্র সরিয়ে সেখানে সারি সারি খাবারের প্লেট সাজানো রয়েছে। সামান্ম একজন ইনফরমার বা হিতৈষী জনসাধারণ হতে সুরু করে সিপাহী, জমাদার এবং অফসার সকলে একত্রে সুযোগ ও সুবিধা মত এইখানেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিচ্ছে। মামলা সম্পর্কে ধৃত আসামীদের কাউকে, কাউকেও আয়ত্তে

কিন্তু এত কাণ্ডকারখানা করেও কাদের দ্বারা এই তিন-তিনটে খুন সমাধা হলো তার সামান্ম মাত্র একটা প্রমাণও এ যাবৎ সংগৃহীত হলো না।

'তাই তো হে,' রহমন সাহেব,' চিন্তিত মনে নরেন বাবু বললেন, 'কাল হতে শহরে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র এই খুন কয়টি সম্বন্ধে হৈচৈ সুরু করে দেবে অথচ জনসাধারণের অবগতির জন্ম একটা মাত্র আশার সংবাদও আমরা তাদের দিতে পারছি না! বহু চোর-বদমায়েসদের তো গ্রেপ্তার করে আনা হলো কিন্তু কাউর কাছ হতে একটা খবরও তো পাওয়া গেলো না। তদন্তের ব্যাপারে অন্ততঃ কিছুটা অগ্রসর হতে না পারলে তো হেড কোয়ার্টারে বড়ো কর্ত্তারাও এইবার চেঁচামেচি সুরু করে দেবেন। বেহারী বাবুর দল বোধ হয় এইবার সত্য সত্যই আমাকে পর্য্যন্ত বে-ইজ্জত করে দিতে পারলো। এই থানায় এসে এই রকম বিপদে পড়তে হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

'আমার মতে স্যার' রহমান সাহেব উত্তর করলেন, 'যখোন বুঝতেই পারা যাচ্ছে এসব বিহারী বাবুর চক্রান্তের ফল তখোন সরাসরি তাকে গ্রেপ্তার করলে ক্ষতি কি? এ ছাড়া তার বাড়ীটাও তো এখুনি তল্লাস করা দরকার ছিল। এর মধ্যে হাওড়ার বাদশা মিয়াও আছে মনে হয়। সে নিজে না থাকুক তার লোকজনের এতে হাত আছে। ওদের দু'জনের সম্পর্ক যে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই-এর মত তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ওদের দু'জনেকেই এক্ষুনি এই মামলায় গ্রেপ্তার করে ফেলুন। দু'জনাকে হাতকড়ি দিয়ে পথে ঘুরিয়ে বে-ইজ্জত করলে দেখবেন, সাহস পেয়ে বহু লোক এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে আসবে। কিন্তু ওরা মুক্ত অবস্থায় থেকে গেলে ভয়ে কেউই পুলিশের ত্রিসীমানাতেও আসতে চাইবে না।'

'হুঁ হুঁ' ম্লান হাসি এসে নরেন বাবু উত্তর দিলেন, 'ও কথা আমিও যে ভাবিনি তা' নয়। কিন্তু প্রমাণ না পেলে ওদের গ্রেপ্তার করার অসুবিধা আছে। গ্রেপ্তার করা মাত্র ওরা অভিযোগ-মুখর হয়ে আদালতে দরখাস্ত করবে। আদালতও জানতে চাইবেন ওদের বিরুদ্ধে মামলার কি প্রমাণ আছে। এ ছাড়া নিম্ন আদালতে সুবিধা না হলে ওরা উচ্চ আদালতেরও শরণাপন্ন হতে পারে। শাসনতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়ই একপ্রকার হয় না। এর ফলে দু'-এক ঘণ্টার মধ্যে তারা জামিনে মুক্ত হয়ে আরও উৎপাত সুরু করে দেবে। কৃতকর্ম্মের জন্ম যেটুকু ভয়-ডর এদের এখনও আছে তখন তা'ও আর থাকবে না। এদের সংগঠন যেমনি অতীব শক্তিশালী তেমনি সমাজে এদের প্রভাবও যথেষ্ট। উপযুক্ত প্রমাণ না দিলে এদের ব্যাপারে আমাদের বড়ো কর্ত্তাদেরই বিশ্বাস করানো কঠিন হবে, আদালতকে বিশ্বাস করানো তো দূরের কথা। মাঝ থেকে আমাদের কীল খেয়ে কীল চুরি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সেই জন্যে আমি প্রথমে এদের দলের নীচের দিকের লোকদের খুঁজে খুঁজে গ্রেপ্তার করা সমীচীন মনে করেছি। আশা ছিল একজনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে এদের নেতার কীর্ত্তি কথা প্রকাশ করে দেবে, কিন্তু এখোন তো দেখছি সে গুড়ে বালি। কিন্তু প্রণব বাবু এখনোও ফিরলো না কেন? তার আবার কোনও বিপদ ঘটলো না তো? তবে রামদিনের মত একজন সাচ্চা লোক তার সঙ্গে আছে, এই যা।'

প্রেরিত হয়েছে, প্রণব বাবুর দলটি ছিল তার মধ্যে অন্যতম। সকলেই একে একে ফিরে এলেন, ফিরলেন না শুধু প্রণব বাবু এবং তাঁর লোকজন। প্রণব বাবুর বেপরোয়া স্বভাবের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা একটু চিন্তিত হবেনই। এমন সময় সহসা প্রণব ও রতন বাবু দলবল সহ রহস্যময়ী তন্দ্রা দেবীকে সঙ্গে করে থানায় প্রবেশ করলেন। থানার উপস্থিত জুনিয়ার অফসাররা তাঁকে দেখে সমস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, 'প্রণব বাবু! প্রণব বাবু!'

প্রণব বাবুর তাদের অভিবাদন গ্রহণ করবার মতন মনের অবস্থা ছিল না। তিনি তন্দ্রা দেবীকে নরেন বাবুর কাছে পেশ করে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা তাড়াতাড়ি তাঁকে জানিয়ে দিলেন। প্রণব বাবুর কাহিনী শুনে সকলে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কারও বাকস্ফুরণ পর্য্যন্ত হলো না। ধীর ভাবে সকল কথা শুনে নরেন বাবু বললেন, 'তাই তো হে! বিষয় তো দেখছি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে, এরা তা'হলে ভৈরব বাবু ও বাদশা মিয়ার সাহায্যপুষ্ট একটা তৃতীয় অপ-দল। তোমাদের কতো বার বলেছি, এই সকল অলস প্রকৃতির ভিখিরীরা কেউই সোজা লোক নয়, মাঝে মাঝে এদের মধ্যেও ধর-পাকোড় চালিয়ে যাও। তোমরা তা বিশ্বাস না করে 'আহা, বেচারা গরীব', ইত্যাদি কতো কথাই না বলেছ। এখোন তোমরা বুঝছো তো, এরা সব এক-একটি কি সাংঘাতিক চিজ। তবে মুস্কিল হচ্ছে কি জানো, একটা ঘটনা ঘটলে ভয়ে কেউই মুখ খোলে না। ঘটনাস্থলে একটা সাক্ষী পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সকলেরই ভয়—সাক্ষী দেওয়া মানে এক্কেবারে শেষ হওয়া। এই রকম বিভীষিকা সৃষ্টি করা কেবল এদের দ্বারাই সম্ভব। তা' বলে আমাদের হতাশ হলে চলবে না! কিন্তু তোমার এই চন্দ্রা দেবী সত্য কথা বলছে কি? এঁর সম্বন্ধে রতন বাবু কি বলেন? খুকুরাণীর বাড়ী একে দেখেছিলেন কখনও?'

'ওর নাম চন্দ্রা নয়, ওর নাম তন্দ্রা—তন্দ্রা,' বার চারেক আমি ওকে খুকুর ওখানে দেখেছি,' রতন বাবু এগিয়ে এসে উত্তর করলেন, 'এক্কেবারে যে ও সব মিথ্যে বলছে, তা' আমার মনে হয় না। তবে ও কি উদ্দেশ্যে খুকুর কাছে আসতো এবং ওর সঙ্গে খুকুর প্রকৃত সম্পর্ক কি তা' আমি বলতে পারি না। ও খুকুর ওখানে আসতো-যেতো এই পর্য্যন্ত। এ সম্বন্ধে খুকুকে আমি কখনও প্রশ্ন করিনি।'

'হুঁ, বুঝেছি! আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো,' প্রত্যুত্তরে নরেন বাবু বললেন, 'কতো দিন আগে আপনি ওকে খুকুদের ওখানে প্রথম দেখেছেন?' 'ওকে স্যার, খুকুর বাড়ীতে আমি প্রথম দেখি,' রতন বাবু উত্তর করলেন, 'আজ হতে মাস তিন আগে, তার পরও কয়েক বার ও সেখানে এসেছে। খুকুর সঙ্গে নিভৃতে সে কি সব কথা বলতো তা' ওই জানে। ওকে আমার খুকুর খুউব বাধ্য মনে হতো, তাই ওকে এক্কেবারে অবিশ্বাস করতে মন চায় না।'

'তা'হলে ওকে বিশ্বাস করা যেতে পারে,' নরেন বাবু প্রত্যুত্তর করলেন, 'আচ্ছা, ডাকো তা'হলে ওকে এখানে। হাঁ, আরও একটা কথা আছে, অপেক্ষা করো, বলছি;' এর পর একটু ভেবে নিয়ে নরেন বাবু বললেন, 'এইবার ধীরেন বাবুকে একটা কায দেবো। বেচারা সারা রাত খেটেছে, এখুনিই ওকে আবার কাযে পাঠাতে লজ্জা হয়, কিন্তু উপায় কি, লোকজনের অভাব! তা' একটু কষ্ট করুন ধীরেন বাবু, কি আর করবেন বলুন। কতো বার কর্তৃপক্ষকে বলেছি আর একজন অফসার এখানে বাহাল করুন, কিন্তু শুনছেন কৈ তাঁরা। বেশী বেশী বললে আবার বলেন, লোক কি আমরা তৈরী করবো। যাক ও সব কথা এখোন। ধীরেন বাবু, আপনি একবার চট করে ক্যাম্বেল হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের সামনে রামদিনের একটা জবানবন্দী লিখে নিয়ে আসুন তো! আর যদি প্রয়োজন হয় তো একজন হাকিম এনে তাঁকে দিয়ে ওর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখিয়ে নেবেন, বুঝলেন?'

'আচ্ছা স্যার,' একটা হাই তুলে সম্মতি জানিয়ে ধীরেন বাবু বললেন, 'আমরা তবু একটু আগে ফিরেছি। প্রণবদা তো এখুনি সবে মাত্র ফিরলেন। তা'ও কতো কাণ্ডোকারখানার পর। কষ্টো তো আমাদের সাথে সাথেই আছে। তাতে আর করা যাবে কি? আমিই যাবো আখুন, আমি তা'হলে উঠে পড়লাম স্যার!'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে ধীরেন বাবু বার হয়ে যাওয়া মাত্র থানার একজন সহ-দারোগা হুকুম মতো বড়বাবু নরেন বাবুর কাছে তন্দ্রা দেবীকে পেশ করে বলে উঠলো, 'এইমাত্র হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এলো, রামদিনের দেহে গ্যাঙ্গরীন ফর্ম করছে, বাঁচা এখোন ওর পক্ষে কঠিন। যে কোনও মুহূর্তে ও মারা যেতে পারে। এখুনি 'ওর একটা বিবৃতি গ্রহণের জন্য ডাক্তাররা আমাদের খবর দিচ্ছে।' তন্দ্রা দেবীর সামনেই থানার সহ-দারোগা এই দুঃসংবাদ বড়বাবুকে দিচ্ছিল। ধীর ভাবে তার কথাগুলো শুনে তন্দ্রা দেবী বলে উঠলেন, 'আমি আগেই বলেছি ও বাঁচবে না। যে ছুরীতে ও আহত হয়েছে, তাতে বিষ মাখানো ছিল। আপনাদের উচিত ছিল ডাক্তারকে এ কথা অচিরে জানিয়ে দেওয়া। তাঁরা হয়তো কোনও একটা ওষুধের আশু ইনজেক্‌সন দিয়ে তাকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারতেন, আপনারা আমাকে অবিশ্বাস করে একজন নির্দ্দোষ মানুষের জীবনহানি ঘটালেন, এখোনও বলছি, আমাকে বিশ্বাস করুন, অন্যথায় আপনারা একজন মহাপ্রাণা নারীরও অনন্ত নরক-যন্ত্রণার কারণ হবেন। অন্ততঃ সাময়িক ভাবে আমাকে মুক্তি দিন, আমি খুকুরাণীর বর্ত্তমান আবাসের খবর এখুনি এনে দেবো। আমাকে একবার মাত্র আমার স্বামীর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে দিন, তা' না হলে—'

'তা' না হলে হবে কি? তোমার স্বামীকে এখানে এনে দিতে হবে?' নরেন বাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'বদমায়েস মেয়েলোক কোথাকার, ডাকাতের বৌ! লজ্জা করে না?' 'না বড়বাবু! লজ্জা আমার একটুও করে না। বরং আপনার কথায় আমি সম্মানিত মনে করলাম; তন্দ্রা দেবী ধীর-স্থির স্বরে উত্তর করলো, 'আপনি তো আমাকে একজনের বৌ বলে স্বীকার করে নিলেন।' প্রণব বাবু কিন্তু আমাকে এইটুকু সম্মান দিতেও রাজী হননি। আমার স্বামীকে এখানে এনে দিতে আমি একবারও কাউকে বলিনি, বলবোও না। তাকে আপনাদের পক্ষে এখানে জীবন্ত ধরে আনা অসম্ভব; তবে যদি মৃত অবস্থায় তাকে এখানে আনতে পারেন, সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যে মিথ্যা চক্রান্ত তাকে পুলিশে ধরাবার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে, সেই চক্রান্ত সে বারে বারে ব্যর্থ করে দেবে; অন্ততঃ পুলিশের কাছে সে একদিনের জন্যও ধরা দেবে না। এই একটি মাত্র কারণে সে বিহারী বাবু, বাদশা মিয়া ও সেই

সঙ্গে আপন মনিব বড়ো সর্দারকে সাহায্য করে এবং প্রয়োজন মত তাদের সাহায্য নিয়েও থাকে। কার্য্য উদ্ধারের জন্ম যতো দিন না সে পৃথক স্বকীয় একটা দল সৃষ্টি করতে পারবে, ততো দিন এই সব প্রকৃত দস্যুদের সঙ্গে মিতালি করা ছাড়া তার আর গত্যন্তরই বা কি? আমার প্রিয়তম স্বামীর মতো আমারও মনে মনে সেই একই প্রতিজ্ঞা। যে কারণে আমার স্বামী প্রতিটি মুহূর্ত্তে ডান হাতে ছুরী ও বাঁ হাতে বিষের শিশি নিয়ে ঘোরাফিরা করে, সেই একটি মাত্র কারণের জন্ম সে প্রণব বাবুর নিকট ধরা দিতে কোনও ক্রমেই রাজী হতে পারেনি। আমি প্রণব বাবুকে ইতি-মধ্যেই সকল কথা খুলে বলে দিয়েছি। নূতন করে আর তা' আপনাকে জানাতে চাই না, যদি ইচ্ছে হয় তো ওঁর কাছে আপনি সকল কথা শুনে নেবেন। তবে এতো দিন যে এতো সব জেনে ও বুঝেও আমি চুপ করে স্বামীর সঙ্গে বাস করেছি, তার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ, আমাদের যে ব্যক্তি এই পথে নামিয়ে এনেছে, সেই মিথ্যাচারী ধনী লম্পটের ওপর এখনও আমরা প্রতিশোধ নিতে পারিনি, বাইরে থেকে সে এখনও বহু অসহায়া নারীর ওপর জঘন্য অত্যাচার আপনাদের চক্ষের সামনেই চালিয়ে যাচ্ছে অর্থ ও লোকবলের জোরে। তার উপর নিদারুণ প্রতিশোধ নিতে হলে আমাদের পূর্ব্ব-উল্লেখিত দস্যুদল দুটির সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ইতিপূর্ব্বে বারে বারে আমরা এই জন্মে তাদের সাহায্য ভিক্ষাও করেছি, কিন্তু তারা সেই লম্পটের কাছ হতে অর্থ প্রাপ্ত হয়ে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে, কখনও কখনও বারে বারে তারা তাঁকে অর্থের বিনি-ময়ে নানা অপকার্য্যে সহায়তাও করেছে। কিন্তু আমরা এই সব দস্যু-দলের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী বা ওতঃপ্রোত ভাবে ইতিমধ্যেই জড়িয়ে পড়েছি যে, তাদের ত্যাগ করে চলে আসা মানে আপনাদের খপ্পরে এসে পড়া। শুনে রাখুন, আপনাদের বন্ধু লম্পট ধনী ব্যক্তিটির নাম। তাঁর নাম বাবু প্রাণধন মল্লিক, এ তল্লাটের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি।'

'এঁ্যা! বাবু প্রাণধন মল্লিক! কি বলছো তুমি?' আঁতকে উঠে নরেন বাবু বললেন, 'ভদ্রলোক কিন্তু আমার কাছে বরাবরই রহস্যময়। শুনলেন তো প্রণব বাবু, পৃথিবীতে আশ্চর্য্য কিছুই নয়। ম্যান লিভস্ টু লার্ন, এঁ্যা। আমি কিন্তু এঁর সম্পর্কে বরাবরই সন্দেহ করে এসেছি, আপনারা কিন্তু বলেছেন, না না, তা'ও কি হতে পারে না'কি? তা'হলে ইনিই হচ্ছেন বিহারী বাবুর ফাইনিয়ানসার। শুনেছিলাম বটে একজন ধনী লোকের অর্থ ও সামর্থ্য এঁদের পিছনে আছে, তা'হলে কি ইনিই তিনি নাকি? কিন্তু এ কি সত্য কথা বললো? আচ্ছা, দেখা তো যাক্, সবই তদন্তসাপেক্ষ। যদি এর কথা সত্য হয় তা'হলে প্রাণধন বাবুরও রেহাই নেই।'

'ওর কথা একেবারে মিথ্যে তা' আমার মনে হয় না,' প্রত্যুত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'সম্প্রতি আমিও প্রাণধন বাবু সম্পর্কে এইরূপ দু'একটা কথা শুনেছি। ভোর রাত্রে দেশবালী মেয়েরা গান গাইতে গাইতে যখন গঙ্গাস্নানে যায়, তখন এই ব্যক্তি সহসা একজনকে রাজপথ হতে টেনে নিয়ে পথিপার্শ্বের একটি খালি বাড়ীতে এনে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করে। প্রতি ভোর রাত্রেই নাকি এই অঞ্চলে এই রকম একটা ঘটনা ঘটে থাকে। এই সকল মেয়েরা এবং তাদের অভিভাবকরা লোকলজ্জা বশতঃ এই সকল ঘটনা বেমালুম চেপে তো গিয়েছেনই, এমন কি এই বিষয় কেউ জানতে পারলে উৎকোচ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করা হয়েছে; কিন্তু বাবু প্রাণধন মল্লিকের মতো একজন ধনী ও মানী ব্যক্তির নামে এই সব কথা আমি বিশ্বাসই বা করি কি করে! তাই এসব কথা আপ-নাকে আজও পর্য্যন্ত আমরা জানাইনি। এ ছাড়া এই সব জমীদার ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের বহু শত্রুও তো থাকে, তাদের পক্ষে এঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যে বদনাম রটানোও অসম্ভব নয়, কিন্তু আজকে তন্দ্রা তাঁর সম্পর্কে আমার সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে। তাই আজ এই সব কথা আপনাকে সাহস করে আমি নিবেদন করলাম।'

'এঁ্যা বলো কি। কিন্তু প্রণব', নরেন বাবু প্রত্যুত্তর করলেন, এ সব আমাকে ইতিপূর্ব্বেই জানানো উচিত ছিল। এ সব কথা এতো দিন আমাকে না বলে তুমি অন্যায় করেছো, তাই বলি মেয়েদের গঙ্গাস্নানের ভিড়িক সহসা এমন ভাবে কমে গেল কেন? এখন হতে স্নানে যাবার পথে আমাদের ভোর রাত্রে বে-উর্দ্দীতে ওয়াচ মোতায়েন করতে হবে। এখোন একজন বুড়ো জমাদারকে বলো একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ ঘোড়গাড়ী করে তন্দ্রাকে নারী-আটক-আশ্রমে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসুক। তুমি ইতিমধ্যে ঐখানকার মহিলা অধ্যক্ষের কাছে টেলিফোন করে দাও যাতে এর সঙ্গে বার হতে কেউ এসে দেখা-সাক্ষাৎ না করে যেতে পারে, বুঝলে, হাঁ, ওদের সঙ্গে কোনও সশস্ত্র সিপাহী পাঠিয়ো না, কেবল মাত্র একজন বুড়া জমাদার সাদা পোষাকে ওকে এখান হতে নিয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে কোনও রকম সতর্কতা অবলম্বনে আমি অনিচ্ছুক। কেন, তা আমাকে কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস করো না। আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এই সম্পর্কে একটি মতলব মনে মনে এঁচে নিয়েছি, তাই এই রকম এক ব্যবস্থা অবলম্বন আমি করলাম।' প্রণব বাবু নরেন বাবুর উপদেশ মত তন্দ্রা দেবীকে একজন বৃদ্ধ বে-উর্দ্দী জমাদারের সঙ্গে ভাড়াটিয়া ঘোড়গাড়ীতে মহিলা-আটক-আবাসের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দিয়ে নরেন বাবুর নিকট ফিরে এলেন।

কেবল আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে মাত্র, তাঁরা দু'জনে মামলা সম্পর্কীয় বিষয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় কাদা-ধূলা মেখে উস্কখুস্ক চুলে বৃদ্ধ জমাদার তাঁদের আফিসে এসে হাউ হাউ করে কাঁদতে সুরু করে দিলে। তাকে এই ভাবে একাকী ফিরে আসতে দেখে প্রণব বাবু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু নরেন বাবু এতে একটু মাত্রও আশ্চর্য্য না হয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'কেয়া রে বুঢ্ঢা, বদমাস লোক উনকো ছিন লিয়া তো?'

'হাঁ, হুজুর,' কাঁদতে কাঁদতে জমাদার উত্তর করলো, 'ছুটো ট্যাক্সী করকে গুণ্ডা লোক আ'কে মোকো ঘির লিয়া, আউর এক আদমি মোকো থাপ্পড় দেকে গিরায় ভি দিয়া। ইস্ সময়কো অন্দর জানানা খুদ উতারকে উনলোককো সাথ ট্যাক্সী পর চড় গয়া। ইধারমে গোলমাল দেখকে গাড়োয়ান ভী ডরসে গাড়ী লেকে ভগ গয়া।'

'হাঁ, হাঁ, ঠিক হায়, তুম আভি 'হাসপাতাল যাও', এই কথা ব'লে জমাদারকে 'সান্ত্বনা দিয়ে তাকে হাসপাতাল পাঠানোর বন্দোবস্ত করে নরেন বাবু প্রণব বাবুকে বললেন, 'এই রকম একটা হরণ-পর্ব্ব যে সমাধা হবে তা' আমি জানতাম, শুধু তাই নয় এই রকম এক হরণ হোক তা' আমি অন্তরের সঙ্গে কামনাও করেছিলাম। তোমার এই তন্দ্রা এতোক্ষণে তার স্বামীর সঙ্গে এমন এক জায়গায় আশ্রয় নেবে, যেখানে খুকুরাণীকে গুণ্ডারা আটকে রেখেছে। আমার বিশ্বাস, ওদের এই আড্ডায় তন্দ্রার উপস্থিতি খুকুরাণীকে নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বর থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।' [ক্রমশঃ।

—যাহা ছিলেন

কলসী-কাঁখে
—ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(তৃতীয় পুরস্কার)

—যা হইয়াছেন

—দিব্যেন্দু রায় চৌধুরী
(প্রথম পুরস্কার)

গাগরী-ভরণে
—শি, সু, বসু

বেদেনী ?

—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
(সান্ত্বনা পুরস্কার)

আমায় চেন কি ?
—শ্যামল দত্ত

এক না দুই ?
—গোবিন্দলাল দাস

যন্ত্র ও যন্ত্রী
—হিমাংশু দাস
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

—বিশেষ

???

মাসিক বসুমতীর সর্ব্বজনপ্রিয় আলোকচিত্র বিভাগটিতে বাঙালী আলোকচিত্রশিল্পীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রথমেই স্বীকার করা হচ্ছে। মাসিক বসুমতীর দূরের এবং নিকটের সেই বন্ধুগণকে জানানো হচ্ছে যে বর্ত্তমান সংখ্যা থেকে উক্ত বিভাগটিতে কিছু রদবদল করা হবে,-যেজন্য আপনাদের সাহায্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মাসিক বসুমতীর দপ্তরে প্রচুর সংখ্যক, অর্থাৎ হাজার হাজার বিভিন্ন বিষয়ের আলোকচিত্র জমে ওঠার দরুণ আমরা আগামী দুই সংখ্যায় কোন প্রতিযোগিতা আহ্বান না করতে মনস্থ করেছি। কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে প্রতি সংখ্যায় বিচিত্র আলোকচিত্র-পরিকল্পনা লাভে আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা যে বিমুগ্ধ হবেন এরূপ আশা আমাদের আছে। অধিক কথার প্রয়োজন নেই, চোখে দেখলেই তাঁদের চক্ষু সার্থক হবে।

আগামী

পৌষ থেকে

ত্রিকূট মন্দির —অবনী মতিলাল
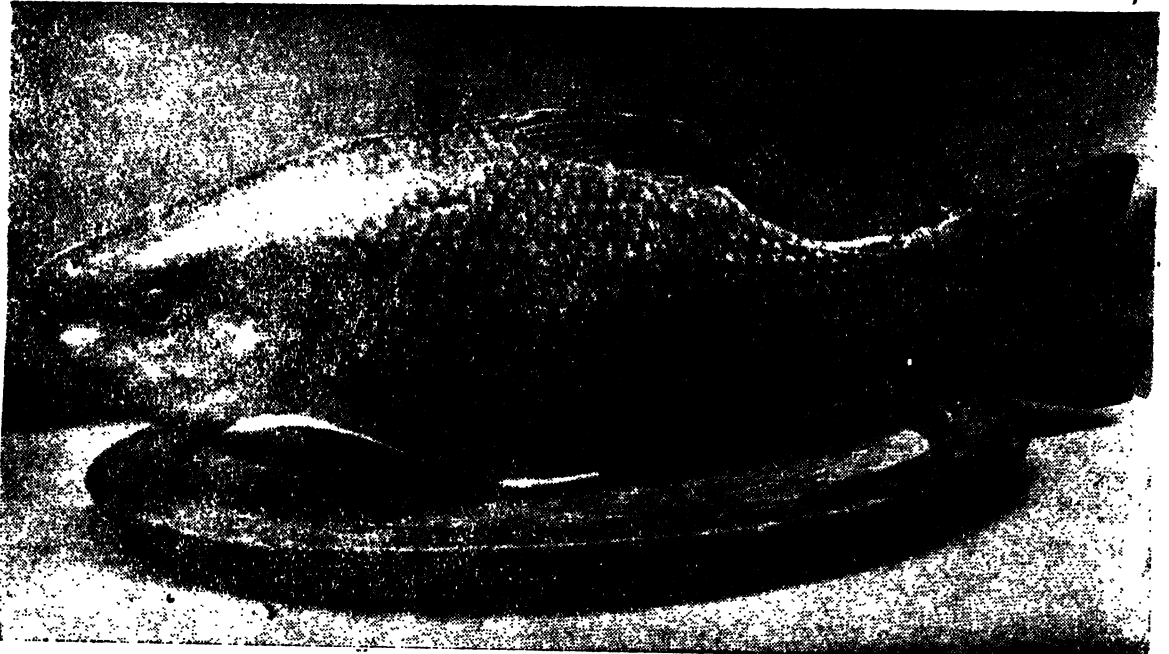
সত্যি ? না সত্যি না ? —ক্ষুদিরাম মাইতি

তুলি ও রঙ

মিচেল জর্জেস্ মিচেল

অনুবাদক

ভবানী মুখোপাধ্যায়

ৎবরো প্রথমেই তরুণ চিত্র-ব্যবসায়ীর দোকানে যায়। পলে গুইলায়ুম সেখানে নেই।

"চলো বরং পাশের দোকানে যাই।"

ওরা দুজনে 'ব্লসমসে' গিয়ে ঢুকল। একটি লোক অত্যন্ত উদ্ধত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল, মোদরুল্লোর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

লোকটি বলে ওঠে—"আমি মঁসিয়ে ব্লসমসের সেক্রেটারী ও ষ্টুয়ার্ড।"

ওঃ! তাই লোকটা এখানে এসে বসেছে, এখন কতদিন এই-খানে থাকবে কে জানে! এই ধামাধরা লোকটাকে ওরা দুজনেই জানে, ওদের অনেক অনিষ্ট সে করেছে। নদীর বাম তীর থেকে মনমাতারের প্রান্তদেশ পর্যন্ত সবাই ওকে হাড়ে হাড়ে চেনে।

সালমন এই ব্যক্তিটির চরিত্র একাধিক উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। চিত্রকর-কলোনীর প্রায় সকলেই কোনো না কোনো সময় তাকে দূর করে রাস্তায় তাড়িয়ে দিয়েছে, হয় ভাঁড়ার থেকে চুরীর অপরাধে কিংবা রোষ্ট পুড়িয়ে নষ্ট করেছে বলে।

অদ্ভুত চরিত্র! কোনোদিন দেখা যাবে গোঁফ আছে, পরদিন চকচকে কামানো গাল—এক সপ্তাহ পরে ঝাঁটার মত গোঁফ, দিন কতক পরেই একেবারে চার্লি চ্যাপলীন ছাঁচ। তার পরই 'মটন চপ'—সর্বদাই বহুরূপীর মত রঙ বদলাচ্ছে। লোকটা পুলিসের ভয়ে যে এই কাণ্ড করে তা নয়, বিগত সপ্তাহে যে ভাবে জীবিকা অর্জন করেছে তারই লজ্জা সে এই ভাবে ঢাকে। সব কাজেরই সে দালাল আর ফোর্ড়ে—এই যুগের প্রায় সব লেখক ও চিত্রকরের রাঁধুনী, ছোকরা চাকর প্রভৃতি সব কাজই সে করেছে। রীতিমত সম্ভ্রান্ত উপাধি হিসাবে নিজেকে বলে 'সেক্রেটারী'—অথচ অতি সাধারণ বানানটাও জানা নেই। শিল্পীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে সব তোষামোদে তুষ্ট হয় সে তারই বেসাতি করে। সে কাউকে খুব উচ্চ প্রশংসা করবে আবার অন্য ব্যক্তিকে নিন্দা করবে। একটা পুরানো ট্রাউজারের লোভে প্রশংসার বান ডাকাবে। কাফেতে অপরিচিত নতুন লোকদের কাছে এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে যে সবাই ওকে ব্যঙ্গ করে ডাকে "লর্ড ক্র্যাকট", এই ছদ্ম উপাধির সুযোগে সে ইংরাজী ঢঙ-এ কথা উচ্চারণ করে। মনিবদের উপহার দেওয়া জুতো ওর পায়ে ভীষণ বড় হয়, ওর পা ছোট তাই মেয়েদের পরিত্যক্ত জুতো পায়ে দেয়। এত সব কাণ্ড কিন্তু মেয়েদের মন ভোলাবার চেষ্টার কোনো বাধা নেই। তারা ওর মেকী উপাধির প্রেমে পড়ে। তাদের বাড়ি ও নিজেই নিমন্ত্রণ চেয়ে নেয়। চুরী করা ফুলের বোকে জামায় লাগিয়ে ধার করা দস্তানা হাতে নিয়ে হাজির হয়। কেউ যদি ওকে ধরিয়ে না দেয় তাহ'লে ও বেশ নিরাপদে বেরিয়ে আসে ডিনারের টেবল থেকে, যে সব ষ্টুডিওতে কাজ করেছে তারই ঘনিষ্ঠ কাহিনী শোনায় সবাইকে। কিন্তু কেউ না কেউ এসে এই প্রহসনের অবসান ঘটাত, তাকে বেরিয়ে যেতে হুকুম দিত। তখন আমাদের লর্ড সাহেব অবশ্যম্ভাবী অবস্থা মেনে নিয়ে সহসা একটা জরুরী এনগেজমেন্টের কথা মনে পড়েছে বলে উঠে পড়ে। ফিরে এসে গৃহকর্ত্রীর কাছে পথ-খরচটা চেয়ে নেয়। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে ডেজার্ট আর কফি খেয়ে তবে বিদায় নেয়।

করুণাপ্রার্থী মানুষকে পদস্থরা যে চোখে দেখে থাকেন সেই ভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত ও অভব্য কণ্ঠে সে বলে উঠে—"কি চাই আপনাদের?"

মোদরুল্লো তীক্ষ্ণ গলায় বললে—"আমরা চাই, তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

দালাল কাঁধ নেড়ে স্রাগ করে বসে পড়ে।

ৎবরোসকী বলে—"আমরা মঁসিয়ে ব্লসমসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।"

ৎবরোসকীকে টেনে নিয়ে মোদরুল্লো বলে—"না, আমরা ঐ হতভাগার উপস্থিতিতে আমাদের দুর্দশার কথা শোনাতে পারবো না ব্লসমসকে। অন্য কোথাও চলো। যখন যা কিছু হুকুম হবে তাই করতেই রাজী, তখন মনিবটাও পছন্দ করে নেব।"

সংস্বভাব পেরী সেরোঁর দোকানে গিয়ে তার জন্য ওরা আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করল, তারপর রু দ্য লা বাউমে লেওনসে রোজেনবার্গের দোকানে গিয়ে শুনল তিনি সন্ধ্যার আগে ফিরছেন না। তখন গেল বেরনহীমের সঙ্গে দেখা করতে, তিনি আর একদিন আসতে বললেন।

মোদরুল্লো আবার বলে—"না, কাজ কোথায় পাবো সে বিচারে প্রয়োজন নেই, মোট কথা কাজটা এখনই পাওয়া চাই।"

ওরা আফতালীয়েনের দোকানে গেল।

আফতালীয়েন বেঁটে রুমানীয়ান। প্রথম যখন প্যারীতে এসেছিল তখন পথে পথে সিলকের মোজা ফেরী করত, বিশেষ করে লা রোতন্দের মডেলদের কাছে, পথচারী ও ভ্রাম্যমান পরিদর্শকদের কাছেই সওদা বেচত। যখন ও প্রথম শোনে এ সংসারে 'আঁকাছবি'

নামক একটি পদার্থ আছে তখন যদি বিস্মিত হয়ে থাকে, যখন আবিষ্কার করল সেই ছবি আবার দামে বিক্রী হয় তখন সে হতভম্ব হয়ে গিছল। কয়েকখানা ছবি কিনে দু'চার শো (ফরাসী মুদ্রা) লাভ হওয়ার পর হোসিয়ারী ফেরী কবার কাজ ছেড়ে দিল। পিছনের লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে রান্নাঘরে সিলকের মোজা না বিক্রী করে সে এখন ধনীর প্রাসাদে লিফটে উঠে ছবি বিক্রী সুরু করল।

প্রথমটা লোকে করুণা করে কিনত সাহায্য করার বাসনা মনে নিয়ে, পরে চড়া দামে ফটকাবাজারী করার লোভ তাদেরও পেয়ে বসল।

আফতালীয়েনের তৈলাক্ত চুলে পুরানো জামা-কাপড়ওলার দোকানে কেনা এক ডাবরা হ্যাট, মলিন সার্টের কলারে একটি নেকটাই বাঁধা, তার আবার লাইনিং বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু ধনী ক্রেতাদের বাড়ি ছবি বেচতে গিয়ে সে মুরুব্বির মতো শিল্পীদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভরে বলে:

"ওরা আমাদের সংসারের লোক নয় মোটেই।"

ভার্জিলিয় ভাবাবেগ, বনভূমির ছন্দ, দেহ-বর্ণের কোমলতা, কোনো শিল্পীর উদগ্র কামলালসা আর কারো ভাবালুতা, আলোর নিগূঢ় রূপ, রঙের ইন্দ্রিয়সুখকর প্রয়োগ প্রভৃতি চিত্রশিল্পীদের মুখনিঃসৃত নানাবিধ বাণী এখান-ওখানে শুনে ঐ হোৎকা লোকটি যখন বিজ্ঞের মত প্রয়োগ করত তখন তা শুনে বিস্মিত হ'তে হয়।

চতুর মনস্তত্ত্ববিদ্‌ এই আফতালীয়েন, অতি সহজেই সে বুঝেছিল যে-কোনো অ-ব্যবসায়ী ক্রেতা এই সব আধুনিকদের আঁকা অতি-সাধারণ একখানি ক্যানভাস্‌ একবার কিনেছেন তাঁর দফা সারা। আধুনিক ছবি যেন কোকেন, এক টিপ নিয়ে কেমন লাগে দেখেছ কি ব্যস, অমনই পাকা নেশাখোর হয়ে পড়বে। যে-এমেচার ক্রেতা গুইলায়ুমিনকে অতি-প্রগতিশীল মনে করে কিনেছিলেন তিনি ইতিমধ্যেই তার ছবি একপাশে ফেলে উদ্দাম রাশিয়ান শিল্পীর ছবি কিনছেন, গতকালের ছবি আজকের ছবির কাছে পিছিয়ে পড়ছে।

আধুনিক ছবি বোঝাতে আফতালায়েনের কৃতিত্ব অসীম।

...মঁসিয়ে, কিউবিজম একটা ধোঁয়া নয়। স্বাভাবিক নিয়মে এই সব যৌক্তিক আন্দোলন যুক্তিপূর্ণ কালেই বারে বারে এসেছে। সব আন্দোলনকেই তার প্রথম অবস্থায় মানুষ ভুল বোঝে। এও সেই ভুল বোঝা। ক্রমে মানুষের মনের বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্তন ঘটে। একথা ত' আর আমাকে বলতে পারবেন না যে পৃথিবী জুড়ে একটা বিরাট সমাজ ভুল করে আসছে! বলুন? সে কথা বলতে পারেন?

রোমান্টিক যুগের পর এসেছে ইমপ্রেসনইজম, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে—তার যুগান্তকারী আবেদন উচ্চারিত না হয়ে লক্ষিত হয়েছে দেবস্না, মানার্ণ, রুদ মনে প্রভৃতির ছবিতে সূক্ষ্ম বৈষম্য। কিন্তু ইমপ্রেসনিষ্ট গোষ্ঠীর খুঁটিনাটির দিকে নজর না দিয়ে এই ভাবে সাদাসিদে ধরনের চিত্রাঙ্কন-প্রণালী অল্পকালের ভিতরই ছেলেভুলানো মেঠাইএর মত তুচ্ছতায় পরিণত হয়েছে। পরবর্তী কাল তাই বিদ্রোহের এক প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো।

যারা 'রক্ষণশীল' তাঁরা অবশ্য চিরকাল পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে, তারই বিরোধী।

সামান্য কিউব থেকে জ্যামিতিক, বীজগনিতিক, সংবর্গমানিক, ছবি আঁকা সুরু হয়েছে। ত্রৈরাশিক, সংযুক্ত সমকোণী, জ্যামিতিক সহজজ্ঞান, তারপর সরলতা প্রভৃতি বিষয়ে ওদের কথা যদি শোনেন। ললিত-কলারসিকদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ওরা চায় প্রকৃত রঙ— দারিদ্র্যকে ওরা গৌরবমণ্ডিত করে—বর্ণ ও বিষয়ে—মেকি বিলাসের বিরোধে এই ওদের প্রতিক্রিয়া।"

"কিন্তু চিত্রশিল্পীরা সংবাদপত্রের অংশ, কাঠের টুকরো, কাচ বা ইষ্টকখণ্ড গঁদ দিয়ে ছবির গায়ে আটকে দেয় কেন?"

"ইমপ্রেসনইজমের অন্যতম আবিষ্কার ছিল: বস্তুর নিজস্ব সূক্ষ্ম বৈষম্য নেই, ওরা আলো আর পরিবেশ থেকে এক অসীম সূক্ষ্মতা লাভ করে। পরিবেশটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যারা আসল কিউবিষ্ট তারা হল ইমপ্রেসনইজমের শত্রু—ইমপ্রেসনিষ্টদের কোথায় ত্রুটি তা দেখাবার জন্যই কিউবিষ্টরা ছবির গায়ে কাঠ, কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু এঁটে দেখায়। বস্তুর প্রকৃত রঙ ছবির মান বাড়ায়। এও দেখা যাচ্ছে বেশী দিন থাকে না। কিন্তু এই সব থেকেই আসবে অপূর্ব প্লাসটিক রেনেসাঁর সূচনা হবে। এই অবস্থান্তর যুগ অতি-স্বল্পকালস্থায়ী—এই যুগের নমুনাও ক্রমশঃ দুর্লভ হবে, তখন এর দাম হবে অভাবনীয়। তাই খ্যাতনামা শিল্পীর আঁকা এই ক্যানভাস্‌ যার মধ্যে সব কিছুই প্রতিফলিত—আপনাকে মাত্র কয়েক শো ফ্রাঁর বিনিময়ে দিয়ে দেব—তবে এখনই দামের কথা নয়, অনুগ্রহ করে ও-কথার দরকার নেই, দশ বছরে, দশ কেন পাঁচ বছরেই ওর যা দাম হবে—আঃ!"

যে-সব চিত্রকরের ছবি আফতালীয়েন ফেরী করে তাদের রহস্য ও জানে—তাদের সম্বন্ধে গণ্ডা গণ্ডা কাহিনী বলতে পারে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন নির্লজ্জের মত উদঘাটিত করে, তাদের দারিদ্র্য প্রভৃতি অতিরঞ্জিত করে বলে:

"এই যে সুতিন,—এ কালের একজন বরিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ শিল্পী— সে নিজে কিন্তু কিছু জানে না। আহা বেচারা! ওকে কি কখনো লা রোতন্দের সামনে পায়চারী করতে দেখেননি? ভেতরে ঢোকার সাহস নেই! ও রাশিয়া থেকে এসেছে, ফ্রান্সে এসেছে বলে ভারী খুসী। এখানে বেঞ্চে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারে, পুলিস এসে গলা ধাক্কা দেবে না। আমি ওকে একদিন জ্যাকেট কিনে দিয়েছিলাম, যে কখনও ব্লাউজ পরেনি তার জন্য জ্যাকেট! তবে শুধু ঐ কথাটাই বা কেন বলি? এই দেখুন না—কখনও সাহস করে হ্যাট পরেনি। অবশ্য প্রতিদিনই কিছু আপনি জারের মত পোষাক পরতে পারেন না। এই ক্যানভাসটা দেখুন দেখি। জানেন কি ভাবে ও আঁকে? গ্রামে চলে যায়, সেখানে খাদের ভিতর শূয়ার যেমন থাকে সেই ভাবে থাকবে। ভোর তিনটেয় উঠে কুড়ি কিলোমিটার (দূরত্বের ফরাসী মান, প্রায় ৮ মাইল) হাঁটবে, কাঁধে থাকবে ভারী এক বোঝা,—ল্যাণ্ডস্কেপ খোঁজার জন্যই এই অভিযান, তারপর স্কেচ ক'রে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়বে, খেতে পর্যন্ত ভুলে যায়। তার আগে অবশ্য ষ্ট্রেচার থেকে ক্যানভ্যাসটা খুলে নিয়ে আগের দিনের ছবির ওপর চাপিয়ে রাখে। জানেন মঁসিয়ে প্রায় দু বছর ধরে ওকে আমি মাসোহারা দিয়ে আসছি। অথচ আমাকে ও একটাও ক্যানভাস দেয়নি। যখন ওকে তাড়াবার বন্দোবস্ত করতে গেছি তখন দেখি ওর ঘরে প্রায় তিনশ ক্যানভ্যাস্‌ একের উপর একটি

করে চাপিয়ে রেখেছে। এই দু বছর ঘরের একটিও জানলা খোলেনি পাছে ছবি খারাপ হয়ে যায় এই ভয়।

আমি যখন ওর জন্য খাবার আনতে গেছি ও করেছে কি সমস্ত ছবির স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বলে কিনা ওগুলো আর পছন্দ হয় না। ওর ভীষণ লড়াই করে কয়েকখানি মাত্র আমি বাঁচাতে পেরেছিলাম।

এই ক'খানা মাংসের ছবি দেখুন, মাংসের ছবি ও খুব ভালো আঁকে। কখন ওর ছবি সব চেয়ে ভালো খোলে জানেন যখন ও ক্ষিধেয় আকুল হয়। ওর ঐ ভয়ংকর চোয়াল ত' দেখেন নি। করে কি জানেন এক টুক্‌রো কাঁচা মাংস কেনে। দুদিন সেইটে সামনে রেখে উপোস করে থাকে। তারপর ছবি আঁকতে সুরু করে।

দেখুন, এই লালের মধ্যে একটা নরখাদকের উদগ্র লালসা ফুটে উঠেছে, দেখছেন ত'? টেবলের ঢাকা, টেবল দেখুন—এ সব জিনিষ ওর কোনোদিন নেই। ও হাঁটুতে কাগজের ঠোঙা রেখে খায়। দাঁত দিয়ে কামড়ে খায় আর বোতল থেকেই চুমুক দেয়, গ্লাস নেই। দেখুন, কি লালসায় রঙে ও খাবার ছুরি আর কাঁটা এঁকেছে। ক্যানভাসে ঐ মাংসখণ্ড দেখুন। বার-তের দিন রাখার পর পচে অখাদ্য হয়ে গেছে। রেমব্রাণ্ড কোনোদিন এ রকম পেরেছে? ছবিটা আপনাকে দিতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু এটা নিজের জন্য রাখতে চাই। দু হাজার ফ্রাঁ বেশী হ'ল?

ও যখন আমার বাড়ি আসে আমি ওকে চৌকাঠ পেরতে দিই না, ওর জন্যই এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে, হতভাগা, রাশিয়ান হাজার ফ্রাঁ থেকে এক সু'র প্রভেদ জানে না বলেন, কিন্তু সত্যি যদি ও পাগলা রাশিয়ান মরমীয়াই হবে তবে আমার কাছে ঐ রকম একটা ক্যানভাসের জন্য দশ-বারো হাজার ফ্রাঁ চাইবে কেন বলুন?"

যে সব বড় বড় শিল্পীর কোনো নমুনাই ওর কাছে নেই তাদের সম্বন্ধে কি অশ্রদ্ধেয় উক্তি

"পিকাসো,—সেই হামবাগটা—"

ব্যক্তিগত ভাবে যাদের একটু ভয় করে তাদের সম্পর্কে উক্তিটা একটু সতর্ক—

"ডেরাইন,—মঁসিয়ে, ওর কথা আর বল্‌বেন না। আমার মুখ থেকে একটি কথাও পাবেন না ওর সম্বন্ধে। এই যা দেখাচ্ছি এর কাছে ডেরিয়ান···?"

এখন ওর নিজের দোকান হয়েছে। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! যে ব্যাধি বিস্তারে ও সহায়ক ছিল এখন নিজেই সেই ব্যাধিতে জড়িয়ে পড়েছে।

গবেলিনে যে ছোট্ট বাসা নিয়ে ওরা স্বামি-স্ত্রী আর পাঁচটি ছেলে-মেয়ে থাকে সেখানে একরাশ ছবি জড়ো করে রেখেছে যার মায়া কিছুতেই কাটাতে পারে না। সে ছবি ও ছাড়বে না।

স্ত্রীকে বলেছে ওগুলো বেশী দামে বেচার তালে আছে, আসলে কিন্তু ঐ সব ছবি ওর নয়নরঞ্জন করে।

এমনই অবস্থা ছিল যখন মোজা ফেরি করত, পকেটে কয়েকটা নমুনা রেখে দিত, তার সিল্ক-মসৃণ স্পর্শ ওর প্রাণে একটা ইন্দ্রিয়সুখ এনে দিত, সেগুলি বিক্রী করতে পারতো না।

বিক্রীর চাইতে কেনার আর্ট ওর বেশী দোরস্ত ছিল। কোন সময় কোন শিল্পী গভীর হতাশায় কাতর হবে তার দিনক্ষণ সে অতি নির্ভুল ভাবে গণনা করতে পারত।

কয়েকটি চিত্রশিল্পীকে ও মাসিক মাহিনা দিয়ে রেখেছিল, বিনিময়ে তাদের সমস্ত কাজ ওই পেত।

সন্ধানে থাকৃত যাদের সহজে মেলে না তাদের, মাঝে মাঝে বিশ্রী ভুল করে বসৃত, কাউকে অনেক দিন মোটা মাইনেয় রেখে হঠাৎ তাড়িয়ে দিত, কাউকে আবার তেমনই হঠাৎ গ্রহণ করত।

এত সব বলা সত্ত্বেও ওর একটা অল্প ধারণা ছিল অধিকাংশ কিউবিষ্ট চিত্রকরের (বিশেষত: যারা তার বেতনভূক) কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

অসহিষ্ণু হয়ে আফতালীয়েন প্রতীক্ষায় থাকে কেউ যদি এমন ছবি আঁকে যার মধ্যে বৈপ্লবিক ধারা কিঞ্চিৎ কম, তাহলে সে তাকে এই সব উন্মাদ শিল্পীদের মাঝে বোমার মত ছুঁড়ে দিতে পারে।

মোদরুল্লো ও ৎবরোসকীকে দোকানের দিকে আসৃতে দেখে এই চতুর বৃদ্ধ ফেরিওলার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে উঠলো।

পোলীস ৎবরো কথা সুরু করে।

আফতালীয়েন বাধা দিয়ে বলে, "জানি, জানি! মঁসিয়ে কেমন ছবি আঁকেন আমি জানি। চমৎকার কাজ, সুন্দর ড্রয়িং। কিন্তু দুঃখ এই, এই সব ছবি বিক্রী হবে অনেক অনেক বছর পরে, তখন অবশ্য অন্য ছবির চেয়ে অনেক চড়া দাম পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে আমাকে বাড়িভাড়া দিতে হয় তার ওপর মাসিক বৃত্তিও অনেককে দিতে হয়।"

মোদরুল্লো বলে:—"না, এমন ছবি আঁকবো না যা বিক্রী হবে না। যা তুমি বিক্রী করবে না। যদি দরকার হয়, আমি কোনো চুক্তি না করেই কাজ করতে রাজী। যা তোমার খুসী হয় আমাকে দিয়ো তাও আমি আগাম চাই না, শুধু ক্যানভাস, একটা ব্রাস আর তিনটি রঙের টিউব কেনার টাকা দাও। একটা কালো, একটা সুবর্ণ-গৈরিক, আর একটা শাদা রঙ চাই। তারপর তুমি দেখতে পাবে। আমার মডেল আছে। ভেবে দেখ সীয়েনার সীমঁ মারতিনি, সানো ডি পিয়েত্রো—কিংবা সান ডমেনিকোর আঁদ্রেয়া ভান্নীর আঁকা যে সব "ভার্জিন" দেখেছ, তেমনই এক কুমারী আমার মডেল, পোড়ামাটির রঙ তার গায়ে, শুভ্রশুচি দেহ-সৌষ্ঠব, সারা দেহ যেন একটি রেখা, একটি ছন্দ, একটি সুর, একটি যুক্তি যেন এক আদর্শ গড়ে তুলেছে—"

"তা আমি আপনাকে পরখ করে দেখতে রাজী। প্রতিদিন দশ ফ্রাঁ দেব, যদি অবশ্য সেদিনের আঁকা ছবি আমার মনে ধরে।"

"বেশ!"

"কিন্তু একটা কথা! আপনার সাধুতায় আমার অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার মেজাজে আমার সন্দেহ আছে। দেখুন, জীবনে আমাদের একটু গুরুত্ব দিতে হয়, লঘুতার স্থান নেই। আপনি আমার এখানেই কাজ করুন এই আমার বাসনা।"

"কোথায়?"

"আসুন, দেখেই যান বরং।"

ওরা নীচে চলে গেল। ফেরীওলা এখানে মধ্যাহ্ন-ভোজ সারে।

একটি ছোট্ট টেবলে বিগত দিনের ভুক্তাবশেষ উচ্ছিষ্ট তখনও পড়ে আছে। দেয়ালে পুরাতন পোষাক জড়ো করা আছে। ঘরের কোণে একটা ঝাঁটা, কয়েকটা পালকের ঝাড়ন পড়ে আছে।

এমন কি পোল ৎবরোসকীও বিদ্রোহ করে।

"এইখানে ওঁকে কাজ করাতে চাও?"

মোদক্লো বলে ওঠে—"যত শীঘ্র সম্ভব এইখানেই কাজ করব। অন্ততঃ ঐ নোংরা রাস্তাটা আর দেখতে হবে না। ঐ লোহার ঝাঁঝরি দিয়ে যা আলো আসছে ঐ যথেষ্ট। যাক্, কাজ সুরু করি।"

বেচারী মোদরু এই বলে গায়ের জ্যাকেট খুলে ফেলে।

আফতালীয়েন ওর জন্য একটা পনের সেনটিমিটর (এক সেনটিমিটর প্রায় ⅖ ইঞ্চি পরিমিত ফরাসী দেশীয় দৈর্ঘ্যের মাপ বিশেষ) ক্যানভাস, দুটি ব্রাস, কয়েকটি রঙের টিউব নিয়ে এল। আর ৎবরোসকী তার বিদায় সম্ভাষণ "আচ্ছা, পরে দেখা করব খন" কথার কোনো উত্তর পায় না মোদরুর কাছে। মোদক্লো তার কাজে লেগে গেছে, পরমানন্দে ও গভীর উৎসাহে সে কাজে মেতেছে। সে মুখ ওর প্রিয়তমার, সেই মুখ আঁকতে কাঠকয়লা আর সুরকির গুঁড়ো ছাড়া আর কিছুই মেলেনি সেই দিনই সকালে।

টিউব থেকে চওড়া ঘন পেণ্ট নির্গত হয়, কোনো প্রাথমিক ড্রয়িং না করেই সোজাসুজি রঙটাই ক্যানভাসে দিতে চায় মোদক্লো। কিন্তু সীয়েনার সেই সব শিল্পগুরুর কথা মনে পড়ল, এই কিছুক্ষণ আগেই সে তাঁদের স্মরণ করেছে। স্বপ্ন দেখে মোদরু। এই পূতিগন্ধময় অন্ধকূপে—যেখানে সামান্য রবিরশ্মি একটি মাত্র রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে, সেইখানে পোড়াসোনার মাটিওলা প্রাচীন সহর আমব্রিয়ার কথা স্মরণ করে। নিয়ে আসে তার বিস্ফোরক আবহাওয়া, প্রবল আবেগভরা আলো যা প্রাণে আনে উৎসাহ আর উত্তেজনা। সমগ্র লাল সহর, লাল ছাত, ছোট্ট চৌকোণা গম্বুজ, লাল সামরিক প্রাচীর—প্রকাণ্ড শাদা গির্জা—যেন কাটা ঘায়ে শাদা ব্যাণ্ডেজ, উজ্জ্বল আকাশ, আর সেই উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে—জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে এক আদিম ভার্জিনের জ্যোতির্ময়ী মুখ। এই মুখের কাছে ওর হাত পৌঁছায়—সেই হাতে ব্রাসটা ধরা রয়েছে, আর আনন্দের আবেগে যেন ওর হৃদয়ের দুকূল ভেঙে পড়ছে।

"বাঃ, বাহবা—এর মধ্যেই ফাঁকী সুরু হল।"

আফতালীয়েন একটা ছিপিহীন বোতল আর একটা গ্লাস টেবলে রেখে ওপরতলায় দোকান-ঘরে চলে গেল।

কম্পিত হস্তে মোদক্লো সেদিকে এগিয়ে যায়। তিন তারা মার্কা উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি। প্রথম বিপথগমন।

মোদরু বোতলটা হাতে তুলে নেয়। এক মুহূর্তের জন্য সেটা নাড়ে, তারপর একটু ইতস্ততঃ করে ভয়ংকর ভঙ্গীতে দেওয়ালে ছুঁড়ে দেয়—বোতলটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়।

মোদরু হাসল, চীৎকার করল, লাফাল, নাচল—এক বিরাট বিশ্ব যেন সে জয় করেছে, বিজয়ীর দীপ্ত উল্লাসে তার মুখ উদ্ভাসিত।

[ক্রমশঃ।

'ডাক্তার'দের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা ও পরিসংখ্যা

বৈদ্য, অর্থাৎ যাঁদের কাজকর্ম্ম ও কারবারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে খল, তাঁদের সংখ্যা বাঙলা তথা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে দিন দিন বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে অতি উচ্চ হারে। পৃথিবীতে ব্যাধি এবং ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা অপেক্ষা হয়তো একদিন বৈদ্যদের সংখ্যাই বেশী হয়ে যাবে। কেন, তাই বলি শুনুন। পৃথিবীর অন্যতম সভ্য এবং স্বাধীন দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদ্যদের সংখ্যার বর্দ্ধিত হার জানলে সেই তুলনায় অন্যান্য দেশ সম্পর্কে ধারণা করা এমন কিছু কষ্টকর হবে না। আমেরিকায় বর্ত্তমানে ডাক্তার আছেন সর্ব্বসমেত ২১৫,০০০ জন। তন্মধ্যে ১৫০,০০০ জনের "প্রাইভেট প্র্যাকটিশ"। কম-বেশী ৭,০০০ জন ভেষজশাস্ত্রের গবেষণা এবং শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী। হাসপাতালের কাজে এবং সঙ্গে যুক্ত আছেন ২৯,০০০ জন। প্রায় ৮,০০০ জন অবসর গ্রহণ ক'রে ব'সে আছেন বার্দ্ধক্যের সীমানায় পৌঁছে, আর ২১,০০০ জন সরকারী চাকরীতে বহাল আছেন।

এই তো গেল বিদেশের কথা। শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছরে কম-বেশী ৩০০ জন থেকে ৫০০ জন 'ডাক্তার' উপাধি পান। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বৈদ্যদের সংখ্যা ও অন্যান্য হিসাব যদি কারও জানা থাকে তিনি কি লিখে জানাবেন মাসিক বসুমতীর কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাকে?

সৌন্দর্যের
সার্থক প্রতিনিধি...
সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের
সার্থক প্রতিনিধি তার শিল্প-সৃষ্টি।
শিল্পের ভাষা সর্বজনীন, সহজ ও সুন্দর।
তার আবেদন তাই স্থান ও কালের সীমা
অতিক্রম করে নিখিল-মানবের মর্মলোকে।
তেমনি রূপ-সৃষ্টিতে শতাব্দীর গৌরব-দৃপ্ত

হলওয়েল বর্ণিত ভারতের কথা

অনুবাদক—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

৪

মিষ্টার ফ্রেজার তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বলেছেন যে, সম্রাট স্বয়ং এই সৈন্যবাহিনীতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ফ্রেজার সাহেবের এ কথা ঠিক নয়। এটি একটি সর্বজনবিদিত সত্য, যে-বিলাসের অলস সুখশয্যায় তিনি নিমজ্জিত থাকতেন তা থেকে জাগ্রত হ'য়ে কোনো দিনই হারেমের বাইরে উঠে আসেন নি।* তাছাড়া সম্রাটের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে লালকুঁয়ার ঘণ্টায় ঘণ্টায় শত্রুপক্ষের পরাজয়ের সংবাদ দিয়ে দিয়ে সম্রাটের চিত্তকে ও-পথ থেকেই নিবৃত্ত করে রেখেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সম্রাটকে যুদ্ধ-ব্যাপারে মন দিতেই হয়েছিল—কিন্তু তখন আর কোনো উপায় নেই। যাক, এখন পূর্ব কথায় ফিরে আসা যাক।

দু'পক্ষই দীর্ঘকাল সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল—এই সম্বন্ধে ইজুদ্দিন ও গোকুলদাস খাঁনের শৌর্য ও বীরত্বের আশ্চর্য কাহিনী শোনা যায়। অবশ্য ফরুখশায়ার এবং সৈয়দ হোসেন আলি খাঁর বীরত্ব সম্বন্ধের অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু ওস্তাদের মার মারলেন সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ, যাঁর বীরত্বে শেষ পর্যন্ত ফরুখশায়ারের দলই জয়লাভ করল। উজির জুলফিকার খাঁকে নিজের সৈন্যদল নিয়ে সরে দাঁড়াতে দেখে সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ স্বীয় সৈন্যদলের গতিমুখ পরিবর্ত্তিত ক'রে ইজুদ্দিনের সৈন্যব্যূহকে পাশ থেকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করলেন। ইজুদ্দিন সম্মুখ-ভাগেও সৈয়দ হোসেন আলি খাঁর সৈন্যদল দ্বারা পীড়িত হচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে বীর কোকলতাস খাঁর মৃত্যুর ও সঙ্গে সঙ্গে ফরুখশায়ার কর্তৃক তাঁর সৈন্যদলের দক্ষিণ ব্যূহের পরাজয়ের সংবাদে ইজুদ্দিনের সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল। ইজুদ্দিন নিজে কোনো রকমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন। তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হ'য়ে দ্রুতগতি অশ্বের সাহায্য নিয়ে দিল্লীতে তাঁর পিতার কাছে পৌঁছবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন।

ফরুখশায়ার বুদ্ধিমানের মত আদেশ দিলেন, কেউ যেন পলাতক সৈন্যদলের পশ্চাদনুসরণ না করে। এই দয়া প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্রাটের সৈন্যদলের মধ্যে কয়েকটি গুপ্তচরও পাঠিয়ে দিলেন যাতে ফরুখশায়ারের প্রতি তাদের আনুকূল্য সম্ভব হয়। ফলে প্রত্যেকটি সৈন্য সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করে ফরুখশায়ারের দলে যোগ দিল। কিন্তু ফরুখশায়ারের অভিযানের এই সন্তোষজনক পরিণতি ও বিজয়গৌরবের আনন্দ-উৎসব সৈয়দ হোসেন আলি খাঁর অনুপস্থিতি ও মৃত্যুসংবাদে যেন ঝিমিয়ে পড়ল।

হায় হ্রস্বদৃষ্টিসম্পন্ন মানব! যার অনুপস্থিতি ও মৃত্যুসংবাদে তুমি শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলে, তুমি কি সে সময়ে জানতে পেরেছিলে যে তাঁর হাতে অচিরেই তোমার মৃত্যু ঘটবে!

ফরুখশায়ার পুরস্কার ঘোষণা করলেন—মৃতদেহের অন্বেষণ চলল। অবশেষে সৈয়দ হোসেন আলি খাঁর দেহ মৃতস্তূপের মধ্য থেকে পাওয়া গেল। তখনও তাঁর দেহে প্রাণের লক্ষণ ছিল—শুশ্রূষায় তিনি বেঁচে উঠলেন।

উজির জুলফিকার খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ভীরুতা, অন্য কারণ ছিল কোকলতাস খাঁর সঙ্গে যুক্ত সেনাধিনায়কত্বের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ (এই ধরণের সংযোগের ফলে অনেক বড় বড় কর্মপদ্ধতি নিষ্ফল হ'য়ে গেছে)। জুলফিকার খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে দিল্লীর দিকেই অগ্রসর হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই ভাগ্যহীন ইজুদ্দিনও যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সম্রাট-পিতার ভাগ্য সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় রইল না।

যাই হোক, শহর রক্ষার জন্যে কিছু সৈন্য তোলবার দুর্বল প্রচেষ্টা চলল কিন্তু ফরুখশায়ারের অতর্কিত আগমনে সমস্ত আশাই নির্মূল হ'ল। বিনা প্রতিরোধে ফরুখশায়ারের হাতে তাঁর কাকা—সম্রাট জাহান্দার শা ধরা পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা কেটে ফেলা হ'ল এবং তাঁর ধড়টা হাতীর ওপর চড়িয়ে শহর শুদ্ধ ঘুরিয়ে আনা হ'ল। উজির জুলফিকার খাঁর পা সেই হাতীরই ল্যাজের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, ফলে ঘসড়াতে ঘসড়াতে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল।* যে কোনো অপরাধীর পক্ষেও এই প্রকারের

---

* কিন্তু ইতিহাস বলে যে সম্রাট বেগম সহ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন এবং পরে যথারীতি সেখান থেকে পলায়ন করেছিলেন। —অনুবাদক

* জুলফিকার খাঁ দিল্লীতে ফিরে এসেই শহরের জনকয়েক মাতব্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন যে, শহরের চারদিকে প্রাকার তৈরি ক'রে তাঁরা ফরুখশায়ারের সৈন্যদলের দিল্লীপ্রবেশে বাধা দেবেন। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ পিতা আসাদ খাঁ—যিনি দিল্লী রাজসরকারে কাজ ক'রে ক'রে ঝুনো হ'য়ে গিয়েছিলেন—তিনি বললেন, যখন এক লক্ষ লোক এবং রাজ্যের অন্যান্য বড় বড় ওমরাহেরা মিলে ফরুখশায়ারের সৈন্যকে হারাতে পারেনি তখন দিল্লীর কয়েকজন গুণ্ডা মিলে তাদের প্রতিরোধ করতে কি ক'রে সমর্থ হবে! কিন্তু জুলফিকার খাঁ মনে মনে জানতেন যে, ফরুখশায়ার একবার তাঁকে ধরতে পারলে প্রাণে না মেরে ছাড়বেন না, কারণ বাহাদুর শা'র ছেলেরা যখন সিংহাসন অধিকারের জন্য পরস্পরের মধ্যে হানাহানি করছিলেন তখন জুলফিকার খাঁ ফরুখশায়ারের পিতা আজিম-উস্-শানের দলে না গিয়ে জাহান্দার শা'র দলে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়াও আজিম-উস্-শানের সঙ্গে জুলফিকারের শত্রুতা ছিল—কেউ কারুকে দেখতে পারতেন না। এই জন্য জুলফিকার খাঁ দিল্লীতে পৌঁছেই একটা কিছু করবার জন্য ছটফট করছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন সম্রাট দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দিল্লীতে একেবারে আসাদ খাঁর বাড়ীতেই এসে উপস্থিত হলেন। চতুর আসাদ খাঁ তখুনি সম্রাটকে গ্রেপ্তার ক'রে স্থির করলেন যে, জাহান্দার শা'কে ফরুখশায়ারের হাতে এই ভাবে নির্বিবাদে তুলে দিতে পারলেই তিনি জুলফিকারের পূর্বকৃত অপরাধ নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন। কিন্তু জুলফিকার খাঁ তাঁর পিতার এই মত সমর্থন করলেন না। তিনি সম্রাটকে নিয়ে মুলতান, কাবুল কিংবা দক্ষিণে পলায়ন করবার

মৃত্যুদণ্ড অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অসম্মানজনক ব'লে মনে করা হ'ত। কিন্তু যখন মনে হয়, জুলফিকার খাঁ নিজের ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হ'য়ে সম্রাটের স্বার্থ ও মন্ত্রীর কর্তব্য বিস্মৃত হ'য়েছিলেন তখন মনে হয় তাঁর পাপের পুরো শাস্তি তিনি পান নি। কেউ তাঁর মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করে নি, কারণ উজিরপদে নিযুক্ত হবার পর যে কু-শাসন তিনি চালিয়েছিলেন তাতে সকলের ঘৃণাই অর্জন করেছিলেন।

আলস্য ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার ফলে মৌজুদ্দিন জাহান্দার শা এই ভাবেই মৃত্যুর কবলে নিপতিত হলেন। বিনা প্রতিরোধে মহম্মদ ফরুখশায়ার হিন্দুস্থানের সম্রাট ব'লে বিঘোষিত হলেন। যাঁরা তাঁকে সিংহাসন লাভের জন্য সাহায্য করেছিলেন তাঁদের পুরস্কৃত করাই হ'ল তাঁর প্রথম কাজ। সৈয়দ আবদাল্লা খাঁ উজিররূপে নিযুক্ত হলেন, সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ হলেন বক্সী বা প্রধান কোষাধ্যক্ষ—তাঁর পদবীও হ'ল এমির্ অল্ ওমরাহ্ (অর্থাৎ রাজার রাজা)—ইনি দাক্ষিণাত্যের শাসনভারও পেয়ে গেলেন।

প্রস্তাব করলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁকে পিতার মতই গ্রহণ করতে হ'ল। আসাদ খাঁ সম্রাটকে বন্দী ক'রে ফরুখশায়ারকে সংবাদ পাঠালেন এবং পরে তাঁকে কেল্লায় পাঠিয়ে নজরবন্দী ক'রে রাখবার ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে ফরুখশায়ার ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হ'তে হ'তে দিল্লীর কিছু দূরে তাঁর শিবির স্থাপনা করলেন। মাসখানেক পরে আসাদ খাঁ তাঁর পুত্র জুলফিকারকে নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। শিবিরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর এক অশুভ সূচনা অনুভব করে জুলফিকার খাঁ পিতাকে বললেন যে, তিনি কাল এসে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু আসাদ খাঁ তাঁকে নিরস্ত ক'রে সম্রাটকে সংবাদ দিলেন। সম্রাট পিতা-পুত্র উভয়কে মহাসমাদরে গ্রহণ ক'রে আসাদ খাঁকে তখনকার মত তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে জুলফিকার খাঁকে শিবিরে রেখে দিলেন। ইতিমধ্যে সম্রাট জুলফিকার খাঁকে বললেন, তাঁর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কবর দর্শন ক'রে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি যেন সেখানে অপেক্ষা করেন। কারণ জুলফিকার খাঁর সঙ্গে তাঁর রাজ্যপরিচালন সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ আছে। সম্রাট চ'লে যাবার একটু পরেই জুলফিকার খাঁর জন্য কিছু আহার্য বস্তু এসে পৌছল। কিন্তু সে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে এই ভয়ে জুলফিকার গ্রহণ করতে ইতস্তত করছেন দেখে খাজা আসিম নামক সম্রাটের একজন কর্মচারী তাঁকে বললেন—আপনি নির্ভয়ে এই আহার্য গ্রহণ করতে পারেন। আসুন আমরা দু'জনেই খাই। এই বলে খাজা আসিম আগেই সেই খাদ্য গ্রহণ করলেন। জুলফিকার খেতে আরম্ভ করা মাত্রই খাজা আসিম বললেন—চলুন আমরা পাশের ঘরে যাই, কারণ এটা বিচার-গৃহ, এখানে ব'সে খাওয়া সমীচীন হবে না। এর পরে জুলফিকার এবং খাজা আসিম উঠে পাশের ঘরে ঢোকা মাত্রই দুই শত অস্ত্র ও ঢালধারী লোক তাঁকে ঘিরে ফেলল। তাঁর পর অনেক বায়নাক্কা সুরু হ'ল—ফরুখশায়ার জুলফিকারকে প্রশ্ন ক'রে পাঠাতে লাগলেন—তুমি অমুক সময় অমুক কাজ করেছিলে কেন—ইত্যাদি। জুলফিকার প্রতি-প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে যখন স্থির বুঝলেন যে, ফরুখশায়ার তাঁকে হত্যা করবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন, তখন তিনি সম্রাটকে গালাগালি ও অভিসম্পাত দিয়ে ব'লে পাঠালেন যে—তুমি যদি আমাকে হত্যা করতে চাও তো হত্যা করতে পার। এ-সব কথা-কাটাকাটির আর প্রয়োজন নেই। এই কথা বলা মাত্র ইলচিন্ বেগ প্রমুখ আরো কতগুলি কোয়ালমাক ক্রীতদাস তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়ে মাটিতে পেড়ে ফেললে এবং ঢাল বাঁধার চর্মরজ্জু তাঁর গলায় বেঁধে শ্বাসরোধ করতে লাগল। আরো কয়েক জন তাঁর পাঁজরায় লাথি মারতে লাগল। এই ভাবে তাঁকে হত্যা ক'রে মৃত্যু সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হবার জন্য তাঁর শরীরের নানান্ জায়গায় ছোরা বিদ্ধ করা হ'ল। তার পরে মৃতদেহের পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আম-দরবারের সামনে ফেলে রাখা হ'ল।

এই সময়ে ভূতপূর্ব সম্রাট জাহান্দার শা দিল্লীর কেল্লায় বন্দিভাবে জীবন যাপন করছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে লালকুঁয়ারকে থাকতে দেওয়ার হুকুম দিলেও তাঁর পায়ে শেকল দিয়ে রাখা হ'য়েছিল। জুলফিকার খাঁকে হত্যা করেই ফরুখশায়ার স্থির করলেন এই সঙ্গে জাহান্দার শাকেও শেষ ক'রে ফেলাই সুবিবেচনার কাজ। জুলফিকার খাঁকে হত্যা করা হ'য়েছিল বিকেল নাগাদ। তিনি তখুনি জাহান্দার শা-কে হত্যা করবার জন্য হুকুম ও লোক পাঠিয়ে দিলেন। যখন হত্যাকারীরা জাহান্দার শাকে যে ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল সেই ঘরে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করল, তখন লালকুঁয়ার চীৎকার ক'রে সম্রাটকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু হত্যাকারীরা জোর ক'রে লালকুঁয়ারকে সম্রাটের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে হিঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। তার পরে ভূতপূর্ব সম্রাটকে গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে মারবার চেষ্টা করা হ'ল। তাতেও তাঁর মৃত্যু হচ্ছে না দেখে কয়েক জনে মিলে তাঁর শরীরের মারাত্মক জায়গায় পায়ের ভারী জুতো দিয়ে লাথি মেরে মেরে শেষ ক'রে দিল। কিন্তু এতেও তারা সন্তুষ্ট না হ'য়ে তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলল। সন্ধ্যা উতরে যাবার কিছু পরে ভূতপূর্ব সম্রাটের মুণ্ড একটি থালায় করে এবং সেই সঙ্গে তাঁর দেহ ফরুখশায়ারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সম্রাট ফরুখশায়ারের তাঁবুর সম্মুখে সারা রাত্রি জাহান্দার শা ও জুলফিকার খাঁর মৃতদেহ প'ড়ে রইল। পরের দিন ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৭১৩ তারিখে ফরুখশায়ার মহাসমারোহে শোভাযাত্রা ক'রে দিল্লীতে প্রবেশ করলেন। নতুন সম্রাটের হাতীর এক শত গজ পেছনে আরেকটা হাতীতে ব'সে একটা লোক, তার হাতে লম্বা বাঁশের ওপর বিদ্ধ ভূতপূর্ব সম্রাটের মাথা শোভাযাত্রার শোভাবর্ধন করতে লাগল। আরেকটা হাতী তাঁর ধড়টা বহন ক'রে পিছু পিছু চলতে লাগল। তারই পেছনে আরেকটা হাতীর পায়ে জুলফিকার খাঁর মৃতদেহ বাঁধা—সম্রাট প্রাসাদে ঢুকে গেলেন। প্রাসাদের দিল্লী-দরজার সামনে ভূতপূর্ব সম্রাটের ও তাঁর উজিরের মৃতদেহ প'ড়ে রইল। দুই দিন পরে তাঁদের মৃতদেহ কবরস্থ করবার হুকুম দেওয়া হ'ল। জাহান্দার শা কবরস্থ হলেন হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরের প্রাঙ্গণে এবং জুলফিকার খাঁর দেহ কবরস্থ করা হল শেখ আতাউল্লার দরগার পাশে—জাহান্দার শা এবং জুলফিকার খাঁর হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিবরণ মোটামুটি এই।—অনুবাদক

অন্যান্য ওম্‌রাহেরা যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদেরও উপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত করা হ'ল।

ফরুখশায়ারের রাজ্যকাল সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে আমরা নিহত সম্রাট জাহান্দার—(যাঁর জীবনচরিত হতভাগ্য ও উচ্ছৃঙ্খল রোম্যান্ সম্রাট মার্কাস এ্যান্টোনিয়াসের সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয়) তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই।

তাঁর পিতা শা'আলম মনে করতেন—পারস্য-সীমান্তে বেলুচিদের (Boluccais) যে ভয়াবহ আক্রমণ একটা বাস্তবিক ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য একমাত্র মুয়াজ্জমেরই আছে। সুতরাং সাম্রাজ্যের বাছা বাছা সৈন্য একত্র ক'রে তাঁর অধীনেই মহাবিক্রম বেলুচিদের বিরুদ্ধে পাঠান হ'ত। ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর যুদ্ধ ক'রে এবং অনেকগুলিতে জয়লাভ ক'রে মুয়াজ্জম প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছিলেন। এই সময়ে একটি যুদ্ধে শত্রুরা যখন দুর্ভেদ্য ঘন বনের পেছনে শিবির গেড়ে আক্রমণের অসম্ভাবিতায় নিঃশঙ্ক হ'য়ে বাস করছিল, মুয়াজ্জম তলোয়ার হাতে বন কেটে তাদের শিবির আক্রমণ করলেন এবং সেদিনকার আক্রমণে শত্রুপক্ষের এক জনও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারল না।

যে মুহূর্তে তাঁর সম্রাট-পিতার কাছে এই ঘটনার বিবরণ এসে পৌঁছল সেই মুহূর্তে তিনি যুবরাজকে "যুদ্ধ-বীর" (Prince of the Hatchets) উপাধিতে ভূষিত করলেন। সেই থেকে রাজবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই সম্মানজনক উপাধি দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হ'য়ে গেল।

সিংহাসন আরোহণ করার পূর্বে চরিত্র-মাধুর্যের আকর্ষণে সাম্রাজ্য-শুদ্ধ লোকের কাছে তিনি দেবতা হ'য়ে উঠেছিলেন। এতে কিন্তু তাঁর সম্রাট-পিতা ঈর্ষান্বিত হ'য়ে পড়লেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও প্রভাবকে খর্ব করবার জন্য তিনি দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আজিমকে (যিনি ফরুখশায়ারের পিতা ছিলেন) কিছু শক্তি ও পদমর্যাদা দান করলেন, যার ফলে পিতা শা'আলমের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উত্তরাধিকারিত্বের ন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে তিনি সময় মত দাঁড়াতে সমর্থ হ'য়েছিলেন—কি ভাবে, সে কথা আগেই বলেছি। মোট কথা, তিনি যদি তাঁর অন্য দুই ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন এবং প্রাচ্যের ক্লিওপেট্রা লালকুঁয়ারের সম্মোহিনী শক্তি থেকে মুক্ত থাকতেন তাহ'লে হয়তো তিনি কিছু পরিমাণে চারিত্র্যদীপ্তি রেখে যেতে পারতেন এবং সেটা যশের ক্ষেত্রে তাঁর ঠাকুরদা আওরঙ্গজেবের চেয়েও অনেক বেশি সম্মানজনক হ'ত।

সেলিমগড়ের দুর্গে রাজবন্দিনী হিসাবে চিরজীবনের জন্য লালকুঁয়ার নির্বাসিত হলেন।* তাঁর নীচ আত্মীয়বর্গ—যাঁরা অতি বিশস্ত পদে উন্নীত হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে সম্রাট কেটে ফেললেন এবং বাকি সকলকে পদচ্যুত করলেন।

ফরুখশায়ার রাজমুকুট লাভ করার পর সাম্রাজ্যে যেন শান্তি ফিরে এল, কিন্তু তাঁর শোচনীয় দুর্ভাগ্যের জন্য এই শান্তি বেশি দিন অব্যাহত হ'য়ে থাকতে পারেনি। তাঁর রাজ্যকালে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব দিন দিন বাড়তে লাগল এবং সম্রাটের পদমর্যাদা, পোষাকও নামমাত্রে পর্যবসিত হ'ল। কেন না, রাজ্যের বড় বড় পদে ইচ্ছামত তাঁরাই লোকনিয়োগ করতে লাগলেন। তাঁরা প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করলেন এবং সাধারণের অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে লাগলেন। এই ভাবে তাঁরা রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নিজেদের মুঠোর মধ্যে এনে ফেললেন। এঁদের মধ্যে জনকতক লোক ছাড়া প্রায় সকলেই আপন আপন স্বার্থে মগ্ন ছিলেন।

নিজের ঘৃণ্য পরাধীন অবস্থা অচিরকালের মধ্যেই ফরুখশায়ার মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের বীরত্ব ও বন্ধুত্বের কাছে তিনি যে কতখানি ঋণী, তা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু করবার চিন্তা না ক'রে তিনি এই সব অপমান ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য ক'রে যেতে লাগলেন। কারণ তিনি জানতেন যে—যে-রাজমুকুট সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের ইচ্ছার ওপরেই সে মুকুট এখনো তাঁর মাথায় রয়েছে। তাছাড়া, সম্মানজনক বলেই হোক বা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলেই হোক, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আনুকূল্য ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় তাঁর ছিল না, কারণ যথেচ্ছাচরিত শাসন-ব্যবস্থায় তাঁরাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং এই শক্তিকে তিনি ভয় ক'রে চলতেন।

[ক্রমশঃ।

* লালকুঁয়ারকে সোহাগপুরায় পাঠানো হয়েছিল। নিহত সম্রাট ও সম্রাটপুত্রদের পরিজনদের মধ্যে যদি কেউ সংসারে বীতরাগিণী হয়ে নির্জনে জীবন যাপন করতে চাইতেন তাঁদের এই সোহাগপুরে পাঠান হ'ত। এঁরা রাজসরকার থেকে মাসোহারা পেতেন। সোহাগপুরের অন্য নাম ছিল—রেণ্ডী-খানা। এই সব দুর্ভাগা নারীদের আবাসের নাম সোহাগপুর দেওয়া যে কতখানি নিষ্ঠুর মনোভাবের পরিচায়ক—সেটা সহৃদয় পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন।

—অনুবাদক

বাঙলার রবিন হুড্ কে?

বাঙলা দেশে একজন 'রবিন হুড' ছিলেন, যাঁর নাম আমরা অনেকে ভুলেও করি না। ভুলেও করি না মানে ভুল হয়ে যাওয়া নয়, আমরা সেই বাঙালী রবিন হুডের নামই কখনও হয়তো শুনিনি। সেই রবিন হুডের ইতিকথা মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাকে শোনানো হচ্ছে। তখন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি অঞ্চল কম্পিত হয়ে উঠতো একজন মুসলমানের নামে। তাঁর নাম দিলাল খাঁ। তিনি ছিলেন দস্যু-সর্দার। ১৬৩৯ অব্দে দিলাল উপঢৌকনে তুষ্ট করেছিলেন শাহ সুজাকে। দিলালের সেনা ছিল, দুর্গ ছিল, অস্ত্রশস্ত্র ছিল। বাহুবলের সঙ্গে লোকবল ছিল।

যারা ক্ষুধার্ত্ত, যারা বিত্তহীন, যারা অসহায়, তাদের বন্ধু ছিলেন দিলাল। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিলিয়ে দিতেন দরিদ্র জনসাধারণকে। দুঃখীর দুঃখ চোখে দেখতে পারতেন না, যাদের আছে অতিরিক্ত, তাদের অর্থ আত্মসাৎ ক'রে দান করতেন যাদের নেই তাদের।

শেষ-জীবনে দিলাল মোগল-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১২ জন অনুচর সহ বন্দী অবস্থায় ঢাকায় অতিবাহিত ক'রে ছিলেন। এখনও নোয়াখালিতে দিলাল খাঁর নাম করলে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে!

একটি শিকার কাহিনী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

নির্ম্মল মানুষটি ভাল। স্বভাবটাও নির্ম্মল, হাসিটিও নির্ম্মল, লেখাপড়াতেও তার যথেষ্ট খ্যাতি, টাকাও অঢেল—আর চাই কি? নির্ম্মলের সখও প্রচুর—কিন্তু সেই সখের একটা বিশিষ্ট দিক আছে। নতুন গাড়ী, নতুন রাইফেল, নতুন পোষাক—ব্যাঘ্র-নিধন-যজ্ঞে কোন ত্রুটিই সে রাখেনি—এমন কি তার নতুন গাড়ীতে একটা Powerful Search lightও fit করে নিয়েছে। তাকে শিকার করতেই হবে একটা বাঘ।—কিন্তু—

রাত্রে স্বপ্ন দেখে বাঘের,—দিনে গল্প করে বাঘের—বন্ধু-বান্ধবের কাছে, বাঘ মেরে চচ্চড়ী বানা'তে নির্ম্মলের বেশ একটা পুলক লাগে। তাকে দূরে দেখলেই আমাকে পালিয়ে যেতে হোত; কারণ দেখা হলেই সেদিনকার মত আমার নাওয়া-খাওয়ার দফা একেবারে গয়া!

বছর পনেরো আগের কথা। কার্ত্তিক মাস। আমার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। মানুষের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে, যখন কোনো কিছুই তার কর্ম্মশক্তিকে বাধা দিতে পারে না—যে সময় লোহার শেকল ছিঁড়ে বাইরে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়—হাতছানি দেয় আগামী কালের রঙীন স্বপ্ন—সেই জীবনেই আবার এমন একটা দিন আসে, যখন মনে হয়, সে স্বপ্ন যেন কোথায় চ'লে গেল,—সে শক্তির স্ফুলিঙ্গ যেন নিবে গিয়েছে—জীবনের উন্মাদনা যেন পেছনে ফেলে এসেছি—সোজা হ'য়ে আর পৃথিবীর বুকে দাঁড়াতেও পারি না—জীবনটা যেন একটা দুর্ব্বিষহ ভার—দ্রুত লয়ে নেমে চলেছে মহানির্ব্বাণের পথে—মৃত্যুর দিকে। মৃত্যুটা কী সেই চিরানন্দলোকে মিশিয়ে যাওয়ার অগ্রদূত!

এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে আমার জীবনটা এসে যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। "Polysythemia অর্থাৎ রক্ত-কণিকা-বৃদ্ধি রোগে আমার জীবনীশক্তি যেন নিঃশেষ হ'তে চলেছে। এ রোগটির বিশেষত্ব এই যে, পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে এমন এক-আধটা রোগী মেলে। আর সেই রোগটাই যখন আমার স্কন্ধে এসে চাপলো—তখন নিজেকে ভাগ্যবান বলতে হবে বৈ কি!"

যা হোক, আমার মন ও শরীরের যখন এই অবস্থা, আমার শরীর হ'তে ঘটি-ঘটি রক্ত মোক্ষণের পর বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বায়ু পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করলেন! এদিকে আমার পূজনীয় পিতৃদেবের শরীরের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। তাই আমি তাঁকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে রাজী নই। তিনি স্বয়ং একদিন আমাকে কাছে ডেকে ভাল করে বুঝিয়ে বললেন, "তুমি চেঞ্জে না গেলে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাব—শেষ বয়সে আমায় দুঃখ দিয়ে লাভ কি?"

দেখলাম, টপ্ টপ্ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ ধরে পিতা-পুত্রের অশ্রু-বিনিময়ের পর, তাঁর কথায় আমি বাধ্য হ'য়ে রাজী হলাম। তাঁকে বললাম—"তবে তাই হোক্, আপনার বৌমা সেবা-যত্নের জন্য এখানেই থাকবে—মেয়েদের নিয়ে আমি যাব।"

ওদিকে আমার পিতামহ মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ, পুত্র ও পৌত্রের এই শারীরিক বিপর্য্যয়ে যেন ভেঙ্গে পড়েছেন। তিনি বাবার শরীরের ভাবগতিক ভাল নয় জেনেও স্বেচ্ছায় আমাকে হাজারীবাগে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন। আমিও কন্যাদের নিয়ে রওনা হলাম। আমার প্রতি বিশেষ নজর রাখবার জন্য, যাতে আমার খাওয়া-দাওয়ার কোনও অনিয়ম না হয়, সে বিষয়ে মেয়েরা তাদের মায়ের কাছে খুঁটিনাটি সব জেনে নিয়েছিল। সদলবলে হাজারীবাগ এসে পৌঁছুলাম। মেয়েরাই মা হয়ে আমার তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছে—আমি এখন তাদের হাতে বন্দী। ইচ্ছামত এক পা'ও চলবার উপায় নেই। একটু ব্যতিক্রম হ'লেই তাদের কাছে ধমক খেতে হয়। বায়ু পরিবর্ত্তনে এলে কি হবে? দেহটা নিয়ে এসেছি বটে—মনটা ত' বাবার কাছেই পড়ে আছে! এমন কি দৈনন্দিন পূজায় বসেও আমি মন স্থির করতে পারি না—এ আমার কী হোল? পিতৃদেবকে যেরূপ দেখে এসেছিলাম—ঠিক সেই রকম আছেন—এই সংবাদ প্রত্যহ পাই! এই সব কারণে মনের এমনি অবস্থা যে রাঁচীতে পাগলা গারদে বুঝি ঠাঁই নিতে হয়!

যেখানেই আমি যেতাম, লগেজের মত আমার "রাইফেল" ও "ডাক্‌গান্" সঙ্গেই থাকতো। একদিন বন্দুক খুলে নাড়াচাড়া করে তুলে দেখছি—যেন আমি আর তুলতে পারি না—এ কী হোল? আমাকেও কী শেষটায় অর্জ্জুনের মত গাণ্ডীব ত্যাগ করতে হবে! তাকে আদর করে বললাম, "বন্ধু, চিরসঙ্গী আমার, তোমাকে অনেক দিন শার্দ্দূল, বন্য বরাহের রক্তপান করাইনি—তুমি বহু দিন উপবাসী—তাই বুঝি এমন মলিন হ'য়ে আছো?—আজ আমিও তোমারই মত জীর্ণ, খিন্ন হ'য়ে পড়ে আছি।"

বারান্দায় বসে বসে এই সব আবোল-তাবোল কত কী ভাবছি। এমন সময় আমার শিশু দৌহিত্র টলতে টলতে এসে কাছে দাঁড়ালো। হাতে তার একটা মেম সাহেবের ছবি। তার কলকথায় সে যে কী আমায় বলতে চায়—তার সেই ভাষা পাঠ করা আমার অসাধ্য। তাকে সেই ছবিটা দেখিয়ে বললাম, "একে তুমি বিয়ে করবে নাকি? তা' বেশ। যখন ক'নে তোমার গলায় মালা দেবে সেই ছাঁদনাতলায় আমি হাজির হব। তুমি আমায় দেখতে পাবে না—আমি তোমায় আড়াল থেকে দেখব।"

এমন সময় বাড়ীর নীচে মোটরের হর্ণ অসংখ্য শঙ্খধ্বনির মত বেজে উঠলো—আর তার সঙ্গে মহা হট্টগোল। উঠে দেখি, আমাদের সেই চির পরিচিত নির্ম্মল, তার নির্ম্মল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে—সঙ্গে তার স্ত্রী। নির্ম্মলের মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল—"আমায় খবর না দিয়ে পালিয়ে এলেও তোমার নিস্তার নেই—আমি পশ্চাদ্ধাবন করে কলকাতা থেকে সটান মোটর চালিয়ে তোমার কাছে হাজির।" বলেই আর একটা non-stop হাসি।

তদুত্তরে একটা ম্লান হাসি বুঝি আমার মুখেও ফুটে উঠলো—তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "তুমি তো এলে, কিন্তু কার কাছে?—

দেখছো ত—এই আমার শরীর!—ফেলিয়া এসেছি আমি জীবন পশ্চাতে।"

"রেখে দাও তোমার কাব্য। যাকে পশ্চাতে ফেলে আসা যায়—তাকেই আবার হিঁচড়ে আগেও টেনে আনা যায়।"

তার সেই নতুন মোটরে শিকারের সাজ-সরঞ্জাম আর উচ্ছল প্রাণশক্তি নিয়ে যখন সে আমার সামনে দাঁড়ালো, তখন বিদ্যুতের মত আমার মনেও সেই ফেলে-আসা জীবনের ঝলকটা একবার দেখা দিয়েই লুকিয়ে গেল!

কন্যাদের মুখ গম্ভীর—ঘোরতর আপত্তি—নির্ম্মলকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলে, "এই শরীর নিয়ে বাবার শিকারে যাওয়া চলবে না—সেটা আগেই বলে রাখছি!" তারা আমার বন্দুক রাইফেল একটা ঘরে তালা বন্ধ করে চাবিটা তাদের কাছে রেখে দিলে।

এমন সময় ডাক-পিওন চিঠি দিয়ে গেল—বাবার অবস্থা একটু ভালর দিকে। মন একটু হালকা। মেয়েদের বললাম, "নির্ম্মল যখন কষ্ট করে এত দূর পাড়ি দিয়ে এয়েছে, তখন যাই না কেন ওদের সঙ্গে একবার হাজারীবাগের রাস্তায়—বাঘ-টাগ অনেক কিছু বেরোয়—" কোনো যুক্তিই তাদের শ্রবণযোগ্য নয়—এ যেন বিচারকের কঠোর আদেশ—হাকিম টলে ত' হুকুম টলে না।

ইত্যবসরে আমার ও নির্ম্মলের মধ্যে একটা চাপা কথার ইঙ্গিত চোখে-চোখে বিনিময় হ'য়ে গেল। তার পর স্নানাহার পর্ব্ব। ভোজনান্তে একটু সজাগ বিশ্রাম,—তারই ফাঁকে গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠকে আমাদের শিকার-অভিযানের প্ল্যান হোল বটে, কিন্তু আমার ভেতরে তখনও 'যাওয়া না যাওয়ার' মল্লযুদ্ধ চলেছে। কলকাতা থেকেই নির্ম্মল তার পরিচিত একটি লোককে টেলিগ্রামে ঠিক করে রেখেছিল—সে মোটরচালক এবং জঙ্গলের গাইড—একাধারে দুটো গুণই তার আছে। আসবার পথে তাকেও যে তুলে নেওয়া হ'য়েছে—এ কথাও সে আমায় জানিয়ে দিলে। শেষটায় ঠিক হ'ল, খানিক আগেই আমি খালি হাত-পায়ে যথারীতি সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়ে যাব—আর নির্ম্মল শিকারের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তার মোটরে আমায় নির্দ্দিষ্ট স্থান হ'তে তুলে নেবে।

কিন্তু সেই সন্ধ্যা আর আসে না। বারে বারে ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে দেখি—সেও কি আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত! বহু দিন পরে এই পালিয়ে শিকারে যাওয়ার ফন্দিটা মন্দ লাগছিল না। আমার প্রথম জীবনে গুরুজনদের লুকিয়ে শিকারে যাওয়ার কথা আগেও লিখেছি। আজ এই বয়সে আমার মেয়েদের কাছেও সেই প্রথম জীবনের পুনরাবৃত্তি করতে হবে—এই কথাটা ভেবে নিজের মনেই হাসি এল। আবার এ-ও মনে হোল আমার দেহে সেই প্রাণ আছে বটে, কিন্তু তার বিকাশ কোথায়?—শিকারে গিয়ে রাত্রি জাগরণের পরিশ্রম কি আর এই জীর্ণ দেহ সহ্য করতে পারবে?

আমার মধ্যে যখন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চ'লেছে, কুহকিনী সন্ধ্যা এসে হাতছানি দিয়ে আমায় পথে নামিয়ে দিলে। মেয়েদের ডেকে বললাম—"আজ ওরা সব এসেছে—আমাদের অতিথি—তোমরা সব দেখাশোনা কর—আমি আর্দ্দালীকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।"

তারাও ঘাড় নেড়ে সায় দিলে—আমিও বেরিয়ে গেলাম।

আমি সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে কত আকাশ-পাতাল ভাবছি। আমার দেহের শোচনীয় হালচাল দেখেও আমার শিকার-প্রবৃত্তিকে আমি "কেয়াবাৎ" না দিয়ে থাকতে পারলাম না। যাই হোক, সেই বহু-প্রতীক্ষিত মুহূর্ত্ত এসে পড়লো—অদূরে হর্ণধ্বনির সঙ্গে নির্ম্মল সহাস্যে উদীয়মান। আমিও লক্ষীছেলের মত গাড়ীতে উঠে তার পাশেই চেপে বসলাম। আর্দ্দালীকে বেশ করে রিহার্সাল দিয়ে দিলাম যে নির্ম্মল আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে সেটা যেন বাড়ীতে জানিয়ে দেওয়া হয়। দেখলাম, আর্দ্দালীর চোখেও যেন একটা অনুযোগের ভাষা—ভাবগতিক বুঝে নির্ম্মল অবিলম্বে মোটরটা উড়িয়ে দিলে। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ভেদ করে তানুয়া-ভালুয়ার পথে মোটর ছুটে চলেছে—কোথাও বা ধানের ক্ষেত, কোথাও বা ছোট্ট গ্রাম, কোথাও বা জঙ্গল—ডাইনে-বাঁয়ে ফেলে আমাদের মোটর গন্তব্য পথে এগিয়ে চলে।

নির্ম্মলের স্ত্রী শ্রীমতী রাকাও সঙ্গে এসেছেন—তাঁর স্বামীর ব্যাঘ্রনিধনের বীরত্ব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করবেন বলে। আমাদের সারথি প্রথম ব্যাঘ্র শিকারের অভিযাত্রী নির্ম্মলকে মুরুব্বির মত ভারিক্কি চালে উপদেশ দিয়ে চলেছে—কত বড় বড় সাহেব-সুবো রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র তার বাণ্ডিলে পকেটস্থ হ'য়ে আছে—আর কে কি বলেছে—কে কত টাকা ইনাম দিয়েছে, তারও একটা ইঙ্গিত দিতেও সে কসুর করেনি, পরিশেষে সে এই মন্তব্য দিয়ে ছেদ টানলে, "যদি আপনাকে পেত্থম বাঘ শিকার কোরিয়ে দি'—তা হোলে হামার একঠো সুনার মিডিল্ দিতে হোবে।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নির্ম্মল বলে উঠল—"সোনার মেডেল কেন—হীরের মেডেল দেব।"

আপত্তি জানিয়ে, মাথা দুলিয়ে, রাকা দেবী ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "সব তাতেই তোমার আদিখ্যেতা—কা'কে কি যে বল—তার মাথামুণ্ডু নেই।" গাইডকে বুঝিয়ে বললেন, "ও-সব কথায় কান দিও না বাপু—যা' দেবার আমি নিজের হাতেই তোমায় বখশিস্ দেব।"

"ঠিক আছে, মাইজী" বলে সে মনের আনন্দে পঞ্চাশ মাইল বেগে মোটর ছুটিয়ে দিলে।

ইতিমধ্যে রাকা দেবী স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "ওগো, মনে আছে তো আমার সেই কথাটা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—সেটা কি আর ভোলবার যো আছে?—আমিও যে একজন অংশীদার!"

কথাটা যে কী, সেটা প্রশ্ন করে জেনে নেবার প্রবল ইচ্ছা হ'লেও আমি চুপ করেই ছিলাম।

তানুয়া-ভালুয়ার জঙ্গলে ঢুকবার মুখেই দেখি, পথের পাশেই একটা জায়গায় তিন-চারটে তাঁবু পড়েছে। দূর থেকে রোসনাই এসে আমাদের চোখে ঠিকরে পড়লো! ভাবছি এখানে—এই জঙ্গল কেটে সহর বসালো কে? মোটর কাছে এসে থামতেই দেখি বহু মূল্যবান পরিচ্ছদে সেপাই দারোয়ান চাপরাসী সব ঘোরাঘুরি করছে—চোখে-মুখে একটা সন্ত্রস্ত ভাব। তাদের ঝকঝকে চাপরাস আর চকমকে তরবারি যেন আমাদের বলতে চায়, "দাঁড়াও পথিকবর, আমাদের দেখেই শুধু চমকে যেও না—আমাদের মালিকদের দেখলে একেবারে থ' ব'নে যাবে—দেখবে, ভেতরে কী চীজ!"

নির্ম্মলকে বললাম, "এখানে সার্কাস হচ্ছে নাকি। মানুষ নেই, জন নেই, অথচ—"

নির্ম্মল আমার অসমাপ্ত কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিলে, "নেমে দেখাই যাক না—আর তা' ছাড়া, টিফিন কেরিয়ার ত' সঙ্গেই আছে—এখানেই দক্ষিণ হস্তের পর্ব্বটাও সেরে নেওয়া যাক, কি বল?"

"মন্দ কি।" বলে আমরা সবাই নেমে পড়লাম।

চারি দিকে ডে-লাইট জেলে রাত্রির অন্ধকারকে যেন তারা অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিয়েছে। আমরা কিছু দূর এগিয়ে তাঁবুর কাছে অগ্রসর হ'তেই এক জন আমার দিকে লক্ষ্য করে চেয়ে রইল—যেন সে তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে চায় না। তার পর কাছে এসে, "Hallo Kumar, আপনি—এখানে—এ সময়—কেমন করে—জানতে পারি কি?"

আমিও সহাস্যে উত্তর দিলাম, "ঐ একই প্রশ্ন আপনার সম্বন্ধেও যে আমার জিজ্ঞাস্য।"

"আমি এখন পাটের দালালী ছেড়ে দিয়েছি—ও সবে আর কিস্যু হোল না।"

"তবে কি করা হয়?"

"আজকে উড়িষ্যার জনৈক মহারাজা এখানে শিকারে এসেছেন—His Highnessএর হুকুমে কলকাতা থেকে একটা dancing party এনেছি—আমিই chief organiser of the whole show. ভেতরে খুব নাচগান চলছে—আসুন না, মহারাজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'—He will be to glad to meet you."

"তা' হ'লে পাটের দালালী ছেড়ে এই সবের দালাল ব'নে গিয়েছেন বুঝি?"

"কী যে বলেন?—আর লজ্জা দেবেন না—"

নির্ম্মল তার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে, কিঞ্চিৎ কেশে বললে, "চলই না, একটু দেখা যাক—মন্দ কি।"

রাকা দেবী ভয়ানক রূপে দাঁড়ালেন—কণ্ঠে পঞ্চমের সুর চড়িয়ে বললেন, "নাঃ, ওর মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।"

সেই ভদ্রলোকটি তাঁর একজন সহকারীর উপর তাঁবুর ভেতরে সমস্ত ব্যবস্থা করবার নির্দ্দেশ দিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমরাও ইতিমধ্যে নৈশ-ভোজ সেরে নিলাম।

ভদ্রলোকটি বেশ ঝুনো নারকেল—দন্তপংক্তি বিকশিত করে, খুব কায়দার সঙ্গে আমাদের অনুরোধ করলেন, "একবার তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখুন না—এই যে এখানে এসে দাঁড়ান—তাহ'লেই সব দেখতে পাবেন—কেমন show আর কী রকম organiseটা করেছি—হেঃ—হেঃ—হেঃ।"

আমরা তিন জোড়া চোখ নিয়ে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি, "His Highness" অগণিত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যেন ইন্দ্রসভায় সমাসীন—সম্মুখে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভার দল নৃত্য করে চলেছে—আর তার ফাঁকে ফাঁকে স-পারিষদ মহারাজার সোমরস পান—স্থানে অস্থানে অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে "বহুৎ আচ্ছা"—"কেয়াবাৎ" আর মাঝে মাঝে বীভৎস'রস—ইয়ার-বন্ধুদের বঙ্কিম ঠামে নর্ত্তন কূর্দ্দন আর কারো বা তাণ্ডব নৃত্য।

নির্ম্মল বুঝি এই আজব কাণ্ডকারখানায় ডুবে গিয়েছিল—তাকে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "আর দেখে কি হবে? এবার চলো—"

সেই ভদ্রলোকটি আপ্যায়িত করে বললেন, "দেখলেন, কী রকম Grand show! আমার এই কার্ডটা রাখুন—যদি আপনাদের কোনও বিয়ে উৎসবে দরকার হয়—দয়া করে একটা intimation দিলে আর কিস্যু ভাবতে হবে না।"

—"ভাবনা আছে বৈ কি যেহেতু intimationটা এজন্মে কি পরজন্মে পাবেন, তা' বলা যায় না"—এই বলেই আমরা সটান গিয়ে মোটরে উঠলাম।

নির্ম্মল এতক্ষণ নীরব। সে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, "এই করেই এরা বেশ জীবনটা কাটিয়ে দেয়।"

রাকা দেবী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "যাও না, অমনি করেই জীবনটা কাটাও—বাধা দিচ্ছে কে?"

নির্ম্মল তাড়া খেয়েই একটু গম্ভীর। সামলে নিয়ে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে, উত্তর দিলে "তাই বলছি না কি? আমার কিন্তু বেদুইনের জীবনটাই বড্ড ভাল লাগে—এ-জঙ্গলে সে-জঙ্গলে—এখান থেকে সেখানে—"

তার কথাটা লুফে নিয়ে উত্তর দিলাম, "অর্থাৎ অনিশ্চিতের পেছনে ছুটে যাওয়ার মধ্যে একটা মাদকতা আছে, এই তো?"

আর উত্তর এলো না।

আবার বললাম, "এই যে জীবনটা দেখে এলে, ওদের প্রতি আমার করুণাই হয়—ওতে লোভনীয় কিছু নেই।"

রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। রাস্তার দু'ধারে ঘন জঙ্গল—কোনো মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। গাইড মোটর চালাচ্ছে—আমি ও নির্ম্মল সামনের আসনে পাশাপাশি বসে আছি। মাঝে মাঝে যেন তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি। হঠাৎ একটা ধাক্কায় চেয়ে দেখি, আমাদের গাড়ী থেমে গিয়েছে—নির্ম্মল পাশের কাচ তুলতে ব্যস্ত—কী জানি বাঘটা যদি ঝাঁপিয়ে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়। তার কণ্ঠে একটা চাপা আওয়াজ—"ঐ যে বাঘ!"

পশ্চাতে গভীর নিদ্রায় অচেতন রাকা দেবীকে ঠেলে তুলেই তার কণ্ঠে আবার একটা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো—"হুঁসিয়ার"!"

রাকা দেবী ধড়মড় করে উঠেই চোখ কচলে দেখতে পেলেন, পথের পাশেই একটা বাঘ—হাঁড়ির মত মুখটা পথের উপর রেখে—তার অর্দ্ধেক শরীরটা জঙ্গলের দিকে বিছিয়ে দিয়েছে। তার পরই রাকা দেবীর শিবনেত্র—আর ইষ্টমন্ত্র জপ!

নির্ম্মল যেন কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পাবে না—একবার বন্দুকটা তোলে, আবার নামায়, আবার আধ-খোলা কাচের ফাঁক দিয়ে বনেটের উপর রাখে। আবার গাইডকেও বারে বারে তাগাদা দেয়—"আর একটু এগিয়ে চল।"

গাইড আপত্তি জানিয়ে বলে, "আর এগিয়ে গেলে যে বাঘের ঘাড়েই পড়তে হবে।" এই বলেই খুব বিরক্তির সঙ্গে সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়।

প্রায় পনেরো গজের মধ্যে বাঘ—নির্ম্মল আবার বন্দুক ওঠায়—তার পরেই বলে, "না—না, মোটরটা বাঘের একটু বাঁ পাশ দিয়ে যাও।"

কাজেই আবার ষ্টার্ট। ইতিমধ্যে বাঘটা তার সুখ-নিদ্রা ভাঙে

করে খুব বিরক্তির সঙ্গে যেন উঠে দাঁড়ালো। নির্ম্মলের আবার সেই কসরৎ—বন্দুক ওঠায় আর নামায়।—তার ফলে, আমাদের চোখের সামনে রাস্তা পার হয়ে, বেশ হেলে দুলে, সোজা সে নীচের জঙ্গলে নেমে গেল। যাবার সময় একটা বিরাট হাই তুলে যেন বলে গেল, "খুব হ'য়েছে—আর ইয়ার্কি করে না— যাও!"

যতই সভ্য জগতের মানুষ হই না কেন, এটা যেন সহ্যের বাইরে। যে কাণ্ডটা হ'য়ে গেল, কোনো শিকারীই তা' বরদাস্ত করতে পারে না।—আমার ইচ্ছে হচ্ছিল—থাঁ করে বন্দুকটা নির্ম্মলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে "সট্" করে দিই—কারণ বাঘটা যে অবস্থায় ছিল, একটা পাঁচ বছরের শিশুও বোধ হয় তাকে শেষ করে দিতো। নির্ম্মলের নাকের ডগায় একটি বজ্রমুষ্টি তুলে বললাম—"তোমায় ক'সে একটা ঘুসি দিতে ইচ্ছে হয়।"

আমার কথা শেষ না হতেই গাইড বলে উঠল, "বাবুজী, হামিই আপনাকে একা/একান্ত 'সনার মিডিল' দিবে—হামাকে আর দিতে হবে না।"

নির্ম্মলের মুখ গম্ভীর, বোঝা গেল, এই মন্তব্যে তার মেজাজ একশ' বিশ ডিগ্রী চড়ে গিয়েছে। তার দিকে একবার চোখ দুটো পাকিয়ে সে থেমে গেল। রাকা দেবীও সখেদে বললেন, "জানি, তোমার হাতে মারা বাঘের চামড়ায় এ জন্মে আমার শ্লীপার তৈরী হবে না—"

এই কথায় নির্ম্মলের মুখে কোনও বিকার দেখা গিয়েছিল বলে ইতিহাসে লেখে না। সে সপ্রতিভের মত উত্তর দিলে: "আহা হা, তোমার ফরমাসের কথা ভাবতেই যে আমার সময় কেটে গেল।"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "কি রকম?"

—"রকমটা শুনলে না?—ওই যে আসবার সময় উনি মনে পড়িয়ে দিলেন—আর আমিও বাঘের চামড়া দিয়ে ওঁর জুতো তৈরী করবার চিন্তায় মশগুল হ'য়ে গেলাম—সেই জন্যেই তো একটু সময় নিচ্ছিলাম—যাতে গুলী খেয়ে বাঘটা আর এক পা'ও না নড়তে পারে।"

উত্তর দিলাম, "তা' হলে এবারের মত আর জুতোটা পায়ে পরা হোল না—পিঠেই পড়লো।"

অক্ষম, পঙ্গু হয়ে এই দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে কতখানি মর্ম্মান্তিক, তা' ভগবান জানেন—আমার শিকারী-জীবনের প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া একে আর কি বল্‌ব! বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠেছে—"বললাম, এত বড় বাঘ জীবনে কখনো পাইনি—আর ভবিষ্যতেও আশা রাখি না। হাজারীবাগের নামটাই তুমি ডুবিয়ে দিলে—হাজারটা বাঘ মরে থাক—এমন হাতের পাঁচ শিকারটাও ছেড়ে দিলে। ঢের হয়েছে—এখন বাড়ী চল।

গাইডেরও মন-মেজাজ ভাল নেই। তোড়জোড় দেখে তার ধারণা হয়েছিল—বাবু একটা বড়দরের শিকারী!—তার ভাগ্যে এবার নিশ্চয়ই একটা মোটা রকমের প্রাপ্তিযোগ—তার উপর সোনার মেডেল! সে মুখ বিকৃত করে গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো।

আমি নির্ম্মলকে বললাম, "তুমি কৃপা করে পশ্চাদ্‌ভাগে বোসো—আর আমাকেও সহজ ভাবে বসতে দাও।"

সে অবিলম্বে তার রাইফেলটা আমার হাতে তুলে দিয়ে পেছনের 'সীটে' এসে বসল। রাকা দেবী বাঁকা হয়ে তার স্কন্ধে মাথাটা এলিয়ে দিলেন। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

ড্রাইভার আমায় বললে, "আপনি যদি বলেন ত' কাট্ কাম্ সাড়ি জঙ্গলে যাই—সেখানে কিছু শিকার মিলতে পারে। শুনছি নাকি দু'-চার দিন থেকে সেখানেও বাঘের অত্যাচার বেড়েছে।"

নির্ম্মল সোৎসাহে আবার যেন জেগে উঠলো—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল—।"

রাত্রি প্রায় দুটো। কাট কাম্ সাড়ির কাছে আসতেই একটা কি যেন আমাদের সামনে দিয়ে তড়িদ্বেগে বেরিয়ে গেল, আর তার পেছনেই একটা চিতে বাঘ—ঠিক আমাদের সামনে—মোটরের তীব্র আলোকে তার চোখে ধাঁধাঁ লেগেছিল। তাই একটু থমকে দাঁড়াতেই আমি তীরের মত সোজা হ'য়ে বসলাম—আমার হাতে রাইফেলটা গর্জ্জন করে উঠল। আমিই বন্দুক তুলেছিলাম কি বন্দুকই আমার হাতটাকে তুলে ধরেছিল—ঠিক বুঝতে পারিনি—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে যেন মনে হোল, আমার ধমনীতে নেমে এসেছে সেই হারানো দিনের রক্তপ্রবাহ—আমার চোখে জেগে উঠেছে একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা—সর্ব্বাঙ্গে কে যেন এনে দিয়েছে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ।

রাইফেলের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মোটরটাও থেমে গেল।

"বাপস্"—"মা গো"—কড়া-মিঠে দুটো তীক্ষ্ণ সুর উঠে গভীর অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে গেল। নির্ম্মল ও রাকা দেবী দু'জনেই ধড়মড় করে উঠে বসতেই আমি পেছন ফিরে সহাস্যে বললাম, "তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত করলাম নাকি?"

ততক্ষণে আমাদের অভিজ্ঞ সারথি গাড়ীটা ছুটিয়ে নিয়ে মৃত বাঘটির পাশে দাঁড় করালে। নির্ম্মল গাড়ীর মধ্যে বসেই ভাল করে দেখে নিলে বাঘটা সত্যি পঞ্চত্ব পেয়েছে কিনা। ইতিমধ্যে ড্রাইভার নেমে গিয়ে বাঘের লেজ ধরে টানাটানি সুরু করে দিয়েছে। রাকা দেবী প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন আর নির্ম্মল—অ মায় একটা কুর্ণিশ ঠুকে, তার 'সীট' হ'তে স্রেফ ডগলাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কসের কায়দায় লম্ফ প্রদান। ছুটে বাঘের কাছে গিয়ে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে, তার উপর গড়াগড়ি দিয়ে সে একটু সাব্যস্ত হ'ল—লাভের অঙ্কে দেখা গেল, রক্তে তার সমস্ত পোষাকটা লালে লাল। সেখান থেকে চীৎকার করে রাকা দেবীকে জানিয়ে দিলে, "তোমার জুতো তৈরীর problem solved! এবার সখ মিট্‌লো ত?"

আমিও সহাস্যে নির্ম্মলকে টিপ্পনী কাট্‌লাম, "হ্যাঁ ভাই, তোমাদের সখ মিটলো বটে, কিন্তু তোমার পাঁয়তারা দেখে আমার shock লেগেছে।"

এরই মাঝে রাকা দেবী ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন, "না, না— এই বাঘ-ছালে জুতো হবে না—এটি দিয়ে বাবার আহ্নিকের আসন করবো।"

"বেশ, তাই হবে, কুমারকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে কালই আমরা আবার শিকারে "পালামৌ" পালিয়ে যাব। নিজের হাতে বাঘ মেরে তোমার শ্রীচরণের জুতো তৈরী করে তবে ছাড়বো।"

রাকা দেবী ঝাঁকা দিয়ে বলেন, "ওসব ফাঁকা আওয়াজে আর ভুলছি না—"

শরীর দুর্ব্বল—ক্ষণিকের উত্তেজনা এসে আমাকে আরও যেন অবসন্ন করে তুলেছে। নির্ম্মলকে বললাম, "তাই বেয়ো ভাই

রাজকুমারবাবু, এখন দোহাই তোমার, শীগগির বাড়ী পৌঁছে দাও—দেহ যে আর চলতে চায় না!"

ড্রাইভার আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তার সামনের সোনা-বাঁধানো দাঁত বের করে দাঁড়ালো। তার পিঠ চাপড়ে বললাম, "সারথি, তোমার রথ চালাও—আর দেরী কোরো না।"

সকলে মিলে বহু কষ্টে বাঘটাকে গাড়ীর মাডগার্ডে তোলা হ'ল। এমন কি রাকা দেবীকেও হাত লাগাতে হয়েছিল। তার পর, তাকে বেশ করে বেঁধে নিয়ে ড্রাইভার মোটর ছুটিয়ে দিলে।

ফিরবার পথে, বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত নির্ম্মলের মুখে আবার সেই বাঘের বক্তৃতা। বাড়ীর দরজায় গাড়ী এসে যখন থামলো—তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। সদীর্ঘ নিশ্বাসে বললাম: "এবার মেয়েদের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব?"

তদুত্তরে নির্ম্মল সান্ত্বনা দিলে, "সে ভার আমার—ভয় নেই।"

"ভরসাও নেই" বলে নেমে পড়লাম। দেখলাম, মেয়েরা চারি দিকে চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করছে। সব জিনিষপত্র গোছানো—যেন কোথায় যেতে হবে। আমার কন্যা অনুজা ছুটে এসে একটা টেলিগ্রাম দেখিয়ে বললে, "দাদুর অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি আপনাকে দেখতে চান।"

বুকটা ধড়াস্ করে উঠলো। পায়ের তলা থেকে পৃথিবী যেন সরে গেল!

নিজের গাড়ীটাও হাজারীবাগে ছিল। আমার সেক্রেটারী লালগোলায় রওনা হওয়ার কথা 'তার' করে দিলেন। নির্ম্মলকে বললাম, "আর পালামৌ গিয়ে কাজ নেই—চল, আমাদের কলকাতায় পৌঁছে দেবে। ঝি-চাকরেরা জিনিষপত্র নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেণে রওনা হবে।"

অগহায়ণ মাস—শীতের কনকনে ঠাণ্ডা যেন গায়ে এসে সূচের মত ফুটছে। ক্লান্ত অবসন্ন মন—কেমন করে যে এত দূর এলাম, কিছুই জানি না।

রাণাঘাটে এসে ট্রেণের কামরায় লুটিয়ে পড়লাম। তীব্র বাঁশীর আওয়াজ যেন আর্ত্তনাদ করে তীরের মত বুকে এসে বিঁধলো—যেন কোন অজানা আশঙ্কা'র ছুরিকাঘাত! কে যেন ভেঙ্গে আমায় চুরমার করে দিতে চায়! ট্রেণ ছেড়ে দিলে—হঠাৎ কী জানি মনে হল—বাবাও বুঝি ছেড়ে গেলেন!

হাজারীবাগে রওনা হবার পূর্ব্বে, বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আসবার সময়, তিনি বার বার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়েছিলেন—তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়েছিল। আমার শারীরিক অবস্থা দেখে পিতৃদেবের খুবই চিন্তা হয়েছিল আমাকে তিনি রেখে যেতে পারবেন কি না—তাই আমার মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে এই প্রশ্নই কেবল জেগে উঠতে থাকে—তবে কি তিনি সেদিন তাঁর পুত্রকে শেষ আশীর্ব্বাদ করেছিলেন? আর কি দেখা পাব না?

লালগোলা ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে গাড়ী না থামতেই আমি লাফিয়ে নেমে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা কেমন?"

সবাই নীরব। এক জন এগিয়ে এসে বললে, "আপনারই অপেক্ষায় এখনও মহারাজকুমারের দেহ পুকুরের ধারে রাখা আছে।"

একটা মর্ম্মভেদী অস্ফুট স্বর বুক মুচড়ে যেন বেরিয়ে এল—বাবা নেই!

মেয়েরা কেঁদে উঠলো।

টলতে টলতে গিয়ে গাড়ীতে এলিয়ে পড়লাম। রাজবাড়ীর ভেতর দিয়ে পুকুরের ধারে যেতে হয়। দেখি আমার পিতামহ, মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ, আমার পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রনারায়ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে বসে আছেন—যেন বজ্রাহত! যাঁকে তাঁর রেখে যাবার কথা—তিনিই আজ তাঁকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন! পুত্রহারা বৃদ্ধের উদাস শূন্য দৃষ্টি আকাশের দিকে চেয়ে আছে—কা'কে যেন সে দেখতে চায়—তা'কে যেন সে খুঁজে পায় না! উপরে চেয়ে সেই অদৃশ্য মহাশক্তিকে আহ্বান করে ব্যথাহত চিত্তে কী যেন বলতে চায়—অথচ পারে না।

মোটর একটু থামতেই আমায় দেখে তাঁর রুদ্ধবেদনা যেন ফেটে বেরিয়ে এলো—তিনি হাত-ইসারায় পুকুরের ধারে যাবার ইঙ্গিত করলেন। সেখানে পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য নর-নারী তাঁকে ঘিরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত দেহ পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত—কীর্ত্তনের সুরে যেন বুক-ভাঙ্গা কান্নার ঢেউ ব'য়ে চলেছে। আমি নেমে সেই প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন—মৃত্যুর ছোঁয়া লেগে তিনি যেন আরো সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছেন। তাঁর দিব্য-আননে স্বর্গীয় হাসিটুকু যেন এখনও লেগে আছে! চকিতে মনে হোল, মা যেন তাঁর পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে—বাবাকে বুঝি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন!—মাথা ঘুরে গেল—তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

* * * *

কতক্ষণ ছিলাম, জানি না। কে যেন আমায় টেনে তুললে।

নিবেদিতা-প্রশস্তি

অনুরাধা দত্ত

মানবের হিতে আপনারে তুমি দিয়েছ যে বলিদান,
তোমাতে নীরব দুরূহ সাধনা লভিয়াছে তার মান।
তুমি ঝরা ফুল বিজন কাননে
তুমি দীপারতি দেবতা-চরণে,
সকলের অগোচরে সঁপিয়াছ আপনার প্রিয় প্রাণ।

আহুতির মাঝে পেয়েছ যা ছিল এ জীবনে পাইবার
বেদনার মাঝে লভেছ শকতি হাসিমুখে, সহিবার।
ভগিনীর মত করেছ যে সেবা
অনাথ আতুর দীনজন যে'বা,
ঘুচালে সবার মনের তিমির গাহি আলোকের গান।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

বিনয় ঘোষ

[অনুবাদ]

১১

কলবার্টের কাছে লিখিত পত্র (৫)

একথা ঠিক অবশ্য যে মোগল বাদশাহ প্রত্যেক প্রদেশে একজন ক'রে 'ওয়াকেনবীশ'(১) পাঠান। তাঁদের একমাত্র কাজ হ'ল যেখানে যা ঘটবে তা ঠিকভাবে যথাসময়ে বাদশাহকে জানানো। কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় যে এই ওয়াকেনবীশদের মতান্তর ও মনোমালিন্য হয় এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে বিরোধও দেখা দেয় কদর্যভাবে। সুতরাং প্রজাদের কোনদিক থেকেই নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ নেই, এবং প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার অভিযোগ ইত্যাদি সম্রাটের কর্ণগোচর হওয়াও সম্ভব নয়।

হিন্দুস্থানে 'গবর্ণমেণ্ট' বিক্রী হয় অবশ্য, কিন্তু তুরস্কের মতন অতটা প্রকাশ্যে হয় না এবং ঘন ঘন হয় না। "প্রকাশ্যে" বিক্রীর কথা বললাম এই জন্য যে প্রাদেশিক গবর্ণর বা সুবাদাররা যেরকম মূল্যবান উপঢৌকন ও ভেট পাঠান নিয়মিতভাবে সম্রাটের কাছে, তাতে একটা প্রদেশের শাসনাধিকার সত্যই কেনা যেতে পারে। ভেটের মূল্য প্রায় প্রদেশের ক্রয়মূল্যের সমান হয়ে ওঠে। হিন্দুস্থানে একই লোক দীর্ঘকাল গবর্ণর থাকেন, তুরস্কের মতন ঘন ঘন বদলি হন না এবং দীর্ঘকালের স্থায়ী সুবাদাররা প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে তবু কিছুটা নজর দেন, যা নতুন গবর্ণররা লোভের বশবর্তী হয়ে একেবারেই দেন না। স্থায়ী সুবাদাররা কতকটা নিজেদের স্বার্থেও কিছুটা সংযত ব্যবহার করতে বাধ্য হন। কারণ তাঁরা জানেন যে যথেচ্ছাচার করলে প্রজারা উৎপীড়িত হয়ে অন্য রাজার রাজ্যে গিয়ে বসবাস করবে এবং তাতে তাঁরই ক্ষতি হবে। হিন্দুস্থানে এরকম প্রায় হয়ে থাকে।

পারস্যেও এরকম প্রকাশ্যে বা ঘন ঘন গবর্ণমেণ্ট বেচাকেনা হয় না। বংশানুক্রমেও সেখানে অনেকে গবর্ণর হন। তার ফলে পারস্যের সাধারণ লোকের অবস্থা অনেক বেশী উন্নত দেখা যায়। পারসীরা তুর্কীদের চেয়ে অনেক বেশী অমায়িক এবং বিদ্যার প্রতি তাদের অনুরাগও আছে।

কিন্তু তুরস্ক, পারস্য ও হিন্দুস্থান, এই তিনটি দেশের সম্রাটদের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বা ভূসম্পত্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নেই দেখা যায়। এইদিক দিয়ে এই তিনটি দেশের সাদৃশ্য আছে মনে হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করার অর্থ সবরকম সামাজিক অগ্রগতির পথ বন্ধ করা। এই মারাত্মক ভুলের জন্য এই দেশগুলিকে একদিন অনুতাপ করতে হবে এবং তখন তারা বুঝতে পারবে এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে তাদের কি অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যে-দেশের শাসকরা স্বীকার করেন না, সে-দেশের অগ্রগতির কোন আশা নেই—অত্যাচার, অবনতি ও চরম দুঃখদুর্দশার নরককুণ্ডে তার ধ্বংস অনিবার্য।

প্রায়ই মনে হয় আমার, এই সব দেশবাসীর তুলনায় আমরা কত সুখী! আমাদের দেশের সম্রাটরা সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক নন। তা যদি হ'ত তাহ'লে আমরা এত সুন্দর দেশ, এত সব বড় বড় শহর নগর, এত সব সুখী পরিবার গ'ড়ে তুলতে পারতাম

---

(১) "ওয়াকী" কথার অর্থ 'ঘটনা' বা সংবাদ'। 'ওয়াকীনবীশ' অর্থে যিনি ঘটনার খোঁজ রাখেন, হিসাব রাখেন। উইলসনের অভিধানে "ওয়াকীনবীশ" সম্বন্ধে এই বিবরণ দেওয়া হয়েছে:

"A remembrancer, a recorder of events ; an officer on the royal establishment under the Moguls, who kept a record of the various orders issued by, and transactions connected with, the sovereign, in the revenue department : an officer of this denomination was also attached to the Nazim or provincial governor, who reported to the principal remembrancer at the court the particular revenue transactions of the province : any communicator of official inteligence." —Wilson's Glossary.

ওয়াকীনবীশ বাদশাহের সমস্ত হুকুম লিখে নেন, বাদশাহের রোজনামচা লিখে থাকেন, বাদশাহের কাছে রোজ যেসব আবেদন অভিযোগ উপস্থিত হয় তার হিসাব রাখেন। এছাড়া বাদশাহের পানাহারের ব্যবস্থা, তাঁর হারামে যাবার ব্যবস্থা, দরগাখাসে যাবার ব্যবস্থা, শীকারের উদ্‌যোগ করেন, এবং নজর, ফরমান, হুকুম ইত্যাদির হিসাব রাখেন। রাষ্ট্রের ভিতরের ও বাইরের বিবরণপত্র পাঠ করা, কোন্ দেশে কার সঙ্গে কি ভাবে সন্ধি হ'ল তার স্মারকলিপি লিখে রাখা, রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি ঘটল তার বিবরণ রাখা, এইসব হ'ল ওয়াকীনবীশের কাজ। ওয়াকীনবীশ প্রতিদিন একটি রোজনামা লিখে এনে বাদশাহকে পড়ে শোনান এবং বাদশাহ মঞ্জুর করলে তাতে মোহর দিয়ে দস্তখত করেন। এই দস্তখতী কাগজকে 'ইয়াদদস্ত' বা 'স্মারকলিপি' 'যোরকেওয়ার' বলে। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে গৃহীত)।

। এত লোকসংখ্যাও বাড়ত না, এত ফসলও ফলত না আমাদের দেশে। সম্পত্তির অধিকার যদি আমাদের না থাকত, তাহ'লে ইয়োরোপের সম্রাটদেরও সঞ্চিত ধনরত্ন থাকত প্রচুর এবং তাঁদের প্রতি প্রজাসাধারণের এরকম আনুগত্যবোধও থাকত না। রাজারা প্রত্যেকে একাকী মরুভূমিতে রাজত্ব করতেন—বৈরাগী সন্ন্যাসী ও জন-অধ্যুষিত মরুভূমিতে।

এশিয়ার সম্রাটরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তাঁদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এত বেশী উদ্ধত ও অন্ধ যে তাঁরা রাজকীয় শক্তিকে ঐশ্বরিক শক্তির চেয়েও স্বেচ্ছাচারী মনে করেন এবং সবকিছু ভোগ-দখল করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির নিয়মে সর্বস্ব হারাতে বাধ্য হন। তাঁদের টাকাপয়সা সংগ্রহের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, আদায় করার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ব্যর্থ হন। আজ যদি আমাদের দেশেও ঐরকম সম্রাট থাকতেন এবং দেশের ধনসম্পত্তির উপর তাঁর একচেটে অধিকার থাকত তাহ'লে আমাদের দেশে ধনী লোকের সংখ্যা এরকম বৃদ্ধি পেত না এবং ব্যবসায়ী ও কারিগরদেরও এত উন্নতি হ'ত না। প্যারিস, লিওঁ, তুলু, রুয়ের মতন এমন সুন্দর সুন্দর শহরও গ'ড়ে উঠত না আমাদের দেশে। এত নগর ও গ্রামের অস্তিত্বও থাকত না। এত সুন্দর সব ঘরবাড়ী তৈরী করা বা পাহাড়পর্বতে ও উপত্যকায় এত যত্ন ও মেহনত ক'রে প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলানো, এসব কিছুই সম্ভব হ'ত না। তাছাড়া, আমাদের দেশের শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব রাষ্ট্র উপার্জন করে, তাই বা কোথা থেকে করা সম্ভব হ'ত? এই রাজস্ব থেকে রাজা ও প্রজা উভয়েই উপকৃত হন। সম্পত্তির অধিকার না থাকলে এই অগ্রগতির পথ বন্ধ হয়ে যেত। দেশের এই সমৃদ্ধ রূপ বদলে যেত তাহ'লে। এই বিচিত্র প্রাণৈশ্বর্য দেশ থেকে লোপ পেয়ে যেত। আমাদের বড় বড় নগরগুলি মানুষের বাসযোগ্য থাকত না, নরকের মতন কদর্য ও বিষাক্ত হয়ে উঠতো। কোন্ কালে সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ত, তার পরিবেশ নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ জীবনের বীজাণুতে কলুষিত হয়ে যেত, কোন লোকালয়ের চিহ্ন কোথাও থাকত না। আজ যে পাহাড়ী জমিতে আবাদ ক'রে আমরা সোনা ফলাচ্ছি তা আর সম্ভব হ'ত না তখন। সোনার বদলে, ফসলের বদলে কীটপতঙ্গ, বনজঙ্গল, কাঁটাগাছ ও বন্যজন্তুর জন্ম হ'ত সেখানে। পর্যটকদের জন্য এরকম সুন্দর বন্দোবস্ত আমরা করতে পারতাম না। প্যারিস ও লিওঁর মধ্যবর্তী পথে যেসব পান্থনিবাস আজ বিদেশী ও এদেশী পর্যটকদের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠছে, সেসব কতকগুলি কুৎসিত ক্যারাভান সরাইয়ে পরিণত হ'ত হয়ত এবং পর্যটকরা স্থান থেকে স্থানান্তরে যাযাবরের মতন মালপত্তর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হ'ত। এশিয়ার ক্যারাভান সরাইগুলিকে একএকটি গোলাঘর বললেও ভুল হয় না। শত শত পথযাত্রী ও দেশযাত্রীরা তার মধ্যে তাদের ঘোড়া, উট ও খচ্চর-গর্দভ সহ একত্রে বাস করে। সে এক বিচিত্র জীবন! মানুষ ও পশুর দল যে এইভাবে মিলেমিশে দিনযাপন করতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। গ্রীষ্মকালে নিদারুণ উত্তাপের জন্য ক্যারাভান সরাইয়ে বাস করা যায় না, অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয় গরমে। শীতকালেও কেবল জন্তুজানোয়ারের ঘৃণ্য সাহচর্যের উত্তাপেই যাত্রীদের কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে হয়।

কিন্তু হিন্দুস্থান ছাড়াও এমন দু'একটি দেশ আছে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করা সত্ত্বেও দেশের শ্রীবৃদ্ধির কোন বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তার জন্য খুব বেশী দূর হিন্দুস্থান পর্যন্ত যাবার দরকার নেই, কাছেই ইতালীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ইতালীতেও সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার বিধিসম্মত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতালী ক্রমে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে। এত বড় সাম্রাজ্য ইতালীর এবং এত সমৃদ্ধ সব দেশ সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে বিনা চাষবাসেও তাদের উর্বরতাশক্তি নষ্ট হবে না। এরকম যার সাম্রাজ্য তার অবশ্য উন্নতির পথে কোন অন্তরায় না থাকাই উচিত। তার শক্তি ও ঐশ্বর্য তো থাকবেই। কিন্তু এইদিক দিয়ে বিচার করলে তুরস্কের সামর্থ্য ও সম্পদ যে কত অল্প তা বলা যায় না। অথচ তুরস্কের প্রাকৃতিক সম্পদ অতুলনীয়। তুরস্কের সম্পত্তির অধিকার যদি আজ থাকত, সেখানকার মাটিতে যদি প্রচুর ফসল ফলত এবং বহু লোকজনের বাস হ'ত, তাহ'লেও সেখানে আগেকার মতন সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব হ'ত না। কনষ্টানটিনোপোলের মতন শহরে পাঁচ-ছ হাজারের মতন সৈন্যসংখ্যা নিয়ে একটা বাহিনী গড়তে এখন প্রায় তিন মাস সময় লাগে। তার কারণ কি? দেশের লোকের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, লোকশূন্য হয়ে গেছে দেশ এই নীতির জন্য। তুরস্কের সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র আমি নিজে ভ্রমণ ক'রে স্বচক্ষে দেখেছি তার চরম দুরবস্থা। কল্পনা করা যায় না তার ভয়াবহতা। যেখানে গেছি সেখানে দেখেছি ধ্বংসের চিহ্ন, ক্ষয়ের চিহ্ন, মৃত্যু হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার চিহ্ন। কোন প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। লোকালয় প্রায় জনশূন্য। তুরস্কের একটা বড় সম্পদ হ'ল, চতুর্দিক থেকে বন্দী ক'রে আনা খৃষ্টান ক্রীতদাসের দল। কিন্তু কেবল ক্রীতদাসের মেহনতে কি হবে? যদি আরও কিছুকাল তুরস্কের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী রাজত্ব করেন, তাহ'লে তুরস্কের নিশ্চিত ধ্বংস সম্বন্ধে আমি জোরগলায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। কোন সম্ভাবনা নেই তুরস্কের মতন দেশের উন্নতির ও অগ্রগতির। পুনরুজ্জীবনের কোন আশা নেই তার। আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় তুরস্কের পতন অবশ্যম্ভাবী, যদিও এখন মনে হয় যেন এই দুর্বলতাই তুরস্কের জীবনীশক্তি যোগাচ্ছে। কারণ এখন আর এমন কোন গবর্ণর নেই তুরস্কে যিনি কোন কিছু পরিকল্পনা কার্যকরী করার মতন অর্থের সংস্থান করতে পারেন, এবং করলেও তার জন্য যে লোকবল প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে পারেন। দেশকে বাঁচিয়ে রাখার, সাম্রাজ্য রক্ষা করার এ এক বিচিত্র পদ্ধতি! দেখা যায় না কোথাও। তুরস্ক তার নিজের মধ্যেই ধ্বংসের বীজ বহন ক'রে চলেছে। লোকসাধারণের মধ্যে সমস্ত রকমের আন্দোলনের স্পন্দন বন্ধ করতে গিয়ে তুরস্ক কতটা সেই পেগুর কুখ্যাত রাজার মতন আচরণ করছে বলা চলে (২)। পেগুর রাজা তাঁর রাজ্যরক্ষার জন্য রাজ্যের প্রায় অর্ধেক

---

(২) বার্নিয়েরের নিজের পাণ্ডুলিপিতে "Brama" কথাটি আছে। ফার্ডিনাণ্ড মেণ্ডেজ পিণ্টো ১৫৪২—৪৫ সালে পেগু ভ্রমণ করেন এবং তদানীন্তন পেগুর রাজাকে তিনি "Bramaa" ব'লে বর্ণনা করেছেন। পেগুর এই সম্রাট ১৫৯৩ সালে তাঁর অনেক রাজভক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন, অকথ্য

প্রজাকে দুর্ভিক্ষে ও অনাহারের মধ্যে মেরে ফেলেছিলেন, সারা দেশটাকে জঙ্গলে পরিণত করেছিলেন এবং দীর্ঘকালের জন্য চাষবাসের কোন সুযোগ পর্যন্ত দেননি প্রজাদের। তাতেও তিনি কৃতকার্য হননি। রাজ্যকে ভাগ করা হ'ল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য এমন কথা আমি বলছি না যে হঠাৎ কয়েকদিনের মধ্যেই তুরস্কের পতন হবে এবং তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তা হয়ত যাবে না, কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিও এমন শক্তিশালী নয় যে তুরস্কের বিরুদ্ধে তারা সামরিক অভিযান করতে পারবে। আত্মরক্ষা করবারও শক্তি নেই তাদের, বিদেশীর সাহায্য ভিন্ন। এইদিক দিয়ে তুরস্কের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার কোন আশঙ্কা নেই। কারণ বিদেশী রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের প্রতিবেশী শত্রুদের সন্দেহের চোখে দেখে এবং প্রয়োজনে বা বিপদে-আপদে কোন সাহায্যই তারা করবে না। নিজের দুর্বলতায়, নিজের শক্তি অপচয়ের দোষে, নিজের অদূরদর্শিতা ও কুনীতির জন্য তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে।

আপনি হয়ত ভাবতে পারেন যে প্রাচ্যদেশে সাধারণ লোক সুবিচারের জন্য আইনের সাহায্য নিতে পারবে না কেন? কেন তারা উজীর (১) বা প্রধান মন্ত্রী ও সম্রাটের কাছে তাদের অভিযোগ আবেদন নিবেদন করতে পারবে না? বাধা কোথায়? বিচারের কোন বিধানই যে নেই সেখানে তা তো নয়! স্বীকার করি, আছে। আইনকানুন, বিধিবিধান কিছুই যে এশিয়াতে নেই তা নয়, আছে এবং এও স্বীকার করি যে সুষ্ঠুভাবে সেই সব বিধান মেনে চললে ও প্রয়োগ করলে এশিয়া পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে কম উপভোগ্য হবে না, বসবাসের দিক থেকে। কিন্তু শুধু ভাল ভাল বিধান থাকলেই তো হয় না, এবং মনে মনে সদিচ্ছা থাকলেও কোন লাভ নেই। কার্যক্ষেত্রে যথাসময়ে সেগুলি প্রয়োগ করা দরকার এবং তার সাহায্য নেওয়ার সুযোগ দেওয়াও প্রয়োজন। তা যদি না করা হয় বা না দেওয়া হয়, তাহ'লে হাজার বিধান থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচারের কোন আশা নেই।

প্রাদেশিক গবর্ণর বা সুবাদাররা অন্যায় করেন, অত্যাচার করেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করেন পদে পদে, কিন্তু সেই একই উজীর ও একই সম্রাট কি তাঁদের প্রত্যেক বার ঐ পদে নিয়োগ করেন না? সুবাদাররা কি তাঁদেরই মনোনীত ব্যক্তি নন? এই সম্রাট ও উজীরই হলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ন্যায়-অন্যায়ের প্রধান বিচারক। অত্যাচারী শাসনকর্তা ছাড়া অন্য কোন প্রকৃতির লোক নিয়োগ করার সাধ্য নেই তাঁদের। তার কারণ, হয় সম্রাট, না হয় তাঁর উজীর রাজ্যটিকে একরকম বিক্রী ক'রে দেন বলা চলে। যিনি বেশী উপঢৌকন দেন, ভেট পাঠান, প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁকেই তাঁরা নিয়োগ করেন। আর যদিও স্বীকার করা যায় যে তাঁরা অভিযোগ শুনতে রাজী আছেন, তাহ'লেও কোন দরিদ্র চাষী বা অসহায় কারিগরের পক্ষে অত দূরে রাজধানীতে গিয়ে বিচারের জন্য হাজির হওয়া সম্ভব নয়। শত শত মাইল দূরে রাজধানীতে যাওয়ার খরচ যোগাবে কে তাদের? পায়ে হেঁটে যে যাবে তারা, তারও উপায় নেই, কারণ শেষ পর্যন্ত সশরীরে পৌঁছবে কিনা তা বলা যায় না। পথে হয়ত খুনে চোরডাকাতের হাতেই তাদের প্রাণটা যাবে। পথেঘাটে প্রায় এরকম ঘটে থাকে হিন্দুস্থানে। যদিও বা কোনরকমে গিয়ে রাজধানীতে পৌঁছয়, সেখানে গিয়ে দেখবে তার পৌঁছনোর আগেই, যাঁর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ তিনি নিজে সম্রাটের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা [illegible] করেছেন এবং তাঁর বিবৃতির মধ্যে আসল সত্যকে যতদূর বিকৃত করা সম্ভবপর, তাও তিনি করতে কুণ্ঠিত হননি। তার [illegible] আর তার পক্ষে কোন আবেদন বা অভিযোগ করাও যা, না করাও তাই। মোটকথা, সুবাদারই সর্বময় কর্তা। তিনিই হর্তাকর্তা বিধাতা। বিচারক, আদালত, আইন সভা, খাজনা আদায় নির্ধারণ ইত্যাদি সর্বব্যাপারের সর্বময় অধীশ্বর। এই শ্রেণীর লোভী ও অত্যাচারী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে একজন পারসী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে সুবাদাররা শুকনো বালি থেকে তেল নিঙড়ে বার করেন। কথাটা মিথ্যা নয়। স্ত্রীপুত্র ক্রীতদাস রক্ষিতা মোসাহেবদের নিয়ে সুবাদারদের যে বিশাল পোষ্যসংখ্যা, তাতে তাঁদের নিজের উপার্জিত অর্থে চলে না।

অত্যাচার করেন সাধারণ প্রজাদের উপর এবং ভয়ে দেশের লোকজন দেশত্যাগ করে। বার্ণিয়ের বোধ হয় এই ঘটনারই উল্লেখ করেছেন।

(১) 'উজীর' হলেন মোগলযুগের "প্রধান মন্ত্রী"। এই পদমর্যাদার সঙ্গে অবশ্য বিশেষ কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের সম্পর্ক নেই। সাধারণতঃ রাজস্ববিভাগের প্রধান ব'লে গণ্য হতেন এবং তখন তাঁকে "দেওয়ান" বলা হ'ত। দেওয়ান মাত্রই অবশ্য 'উজীর' ছিলেন না, বিশেষ ক'রে হিন্দু দেওয়ানদের 'উজীর' বলা হ'ত না। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে প্রধান মন্ত্রীকে বলা হ'ল 'উকিল' (Wakil) এবং অর্থমন্ত্রীকে বলা হ'ত 'উজীর' (Wazir)।

পণ্ডিতরা "উজীর" কথার উৎপত্তি পহলবী শব্দ "বিচির" (সংস্কৃত 'বিচার'-?) থেকে হয়েছে মনে করেন, মানে যিনি বিচারক। প্রথমযুগের খলিফাদের শাসনকালে "সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে" বলা হ'ত 'কাতিব' বা লেখক। আব্বাসিদ্‌রা পারসীদের কাছে শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকদিক থেকে ঋণী এবং তারাই প্রথম 'উজীর' কথাটি ব্যবহার করেন। ক্রমে উজীর পত্রলেখক থেকে ট্রেজারীর প্রধান হন এবং আবেদন-নিবেদনের বিচারক হয়ে ওঠেন। অটোমান তুর্কীদের রাজত্বকালে প্রায় 'সাতজন' উজীর ছিলেন। "As a rule, wazir in later times was simply a title of the high officials" (Encylopaedia of Islam, V, 1135)

"উজীর" সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন : "Originally, the wazir was the highest officer of the revenue department, and in the natural course of events control over the other departments gradually passed into his hands. It was only when the king was incompetent, a pleasure-seeker or a minor, that the wazir controlled the army also......It was only under the degenerate descendants of Aurangzib that the wazirs became virtual rulers of the state, like the Mayors of the Palace in mediaeval France." (Jadunath Sarkar : Mughal Administration পৃঃ ২০-২১)

যদি কেউ বলেন যে আমাদের দেশের সম্রাটেরও তো জমিদারী আছে এবং সেই জমিদারীতে চাষবাস হয় ভালভাবে, যথেষ্ট লোকজন বাস করে, তাহ'লে তার উত্তরে আমি বলব: যে-রাজ্যের রাজা অন্যান্য আরও অনেকের মতন জাতীয় ভূসম্পত্তির সামান্য একাংশের মালিক, তাঁর সঙ্গে, যিনি সমস্ত সম্পত্তির মালিক, প্রতি কাঠা জমির—এমন কোন সম্রাটের তুলনা হতে পারে না। ফ্রান্সে এমন সুন্দর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যে সম্রাট নিজেই তা সর্বপ্রথম মান্য ক'রে চলেন। তিনি যে ভূসম্পত্তির মালিক, সেখানেও তিনি সম্রাট ব'লে আইনকানুন অমান্য ক'রে মালিকানা খাটাতে পারেন না। তাঁর জমিদারীর প্রত্যেকটি লোকের আইন-আদালতের সাহায্য নেবার ন্যায্য অধিকার আছে এবং প্রত্যেক চাষী ও কারিগরের অন্যায়ের প্রতিকার করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এশিয়ায় তা নেই। এশিয়ায় দুর্বল ও অসহায়ের কোন আশ্রয় নেই। অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করার কোন পন্থা বা সুযোগ নেই তাদের। একজন অত্যাচারী শাসকের চাবুক ও মর্জিই সেখানে একমাত্র ন্যায়দণ্ড, তার উপরে আর কিছু নেই।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, এইরকম এশিয়ার মতন একজন রাজার বা শাসনকর্তার একনায়কত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সুবিধাও আছে অনেক। সেখানে আইনজীবী উকিলের সংখ্যা অল্প, মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও বেশী নয়। সামান্য যা হয়, তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যায়। বিলম্বিত বিচারের চেয়ে দ্রুত বিচার অনেক ভাল। দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমা যেকোন রাষ্ট্রের পক্ষে যে মারাত্মক ক্ষতিকর, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং রাজার কর্তব্য এই ধরনের মামলা মোকদ্দমার দ্রুত নিষ্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা। একথা আমি স্বীকার করি। একথাও ঠিক যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যদি কেড়ে নেওয়া যায় তাহ'লে আইন-আদালত বা মামলা মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাটও অনেক ক'মে যায়। 'আমার' 'তোমার' এই অধিকার যদি হরণ ক'রে নেওয়া যায় একবার, তাহ'লে মামলার সমস্যাও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়, বিশেষ ক'রে দীর্ঘকালস্থায়ী জটিল মামলার কোন চিহ্নই থাকে না। সম্রাট যেসব ম্যাজিষ্ট্রেট বা হাকিম নিয়োগ করেন, তাঁদের অধিকাংশেরই তাহ'লে আর কোন কাজ থাকে না এবং অসংখ্য আইনব্যবসায়ীরও আর কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একথাও ঠিক যে এইভাবে যদি মামলা-মোকদ্দমার ব্যাধির চিকিৎসা করতে হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়ে যদি সমাজকে মামলামুক্ত করতে হয়, তাহ'লে ব্যাধির তুলনায় প্রতিষেধক অনেক বেশী ক্ষতিকর হবে। সে ক্ষতির কোন খতিয়ান করা সম্ভব হবে না। হাকিমের বদলে আমাদের সম্রাট নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসকদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে এবং সেই নির্ভরতা যে কি ভয়াবহ তা আগে বলেছি। এশিয়ায় সুবিচার ব'লে যদি কোন পদার্থ থাকে তাহ'লে তা একমাত্র দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কারণ সেক্ষেত্রে কোন পক্ষই মিথ্যা সাক্ষীসাবুদ পয়সা দিয়ে কিনে হাকিমকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। দুইপক্ষই সমান দরিদ্র ও অসহায় ব'লে হাকিম অনেকটা নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন বিচারের আশা নেই। মিথ্যা জাল সাক্ষী পয়সা দিয়ে ধনীর পক্ষে কেনা সম্ভবপর এবং এরকম সাক্ষী সেখানে যথেষ্টই পাওয়া যায় সস্তায়। দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি এসব কথা বলছি। নানাদিক থেকে খোঁজ ক'রে, নানাজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমি এই সব তথ্য অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি। শুধু হিন্দুস্থানের লোক নয়, সেখানকার ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী, রাজদূত, কনসাল, দোভাষী প্রভৃতি সকলের মতামত যাচাই ক'রে গ্রহণ করেছি প্রত্যেকটি তথ্য। আমার এই বিবরণের সঙ্গে, আমি জানি, অন্যান্য অনেক পর্যটকের বিবরণ মিলবে না। তাঁরা হয়ত কোন শহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কাজীর সামনে দু'জন অপোগণ্ড লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। দেখেছেন হয়ত, হাকিম তাদের 'মুসালিহ বাবা' (শান্তিতে থাকো, বাবা) ব'লে বিদায় দিচ্ছেন। দুইপক্ষের কোন একপক্ষেরও যদি ঘুষ দেবার ক্ষমতা না থাকে এবং দুইপক্ষই যদি সমান দরিদ্র হয়, তাহ'লেই অনেক সময় কাজীরা এইরকম বিচারই ক'রে থাকেন। "শান্তিতে থাকো, বাবা" ব'লে তাদের জলদি বিদায় ক'রে দেন। অন্যান্য পর্যটকরা এইরকম কাজীর বিচার দেখে বাইরে থেকে হতবাক হয়ে গেছেন, ভেবেছেন এরকম সুন্দর বিচার আর হয় না! বিচার তো বিচার, কাজীর বিচার! কিন্তু ভিতরে তাঁরা একেবারেই তলিয়ে দেখেননি। যদি দেখতেন, তাহ'লে দেখতে পেতেন কাজীর বিচার সত্যই কি! দুইপক্ষের মধ্যে একপক্ষের যদি দু'টো টাকা কাজীর হাতে গুঁজে দেবার সাধ্য থাকত, তাহ'লেই কাজীর বিচার অন্যরকম হয়ে যেত। 'শান্তিতে থাকো, বাবা' ব'লে তখন তিনি আর দুইপক্ষকেই বিদায় ক'রে দিতেন না। বেশ ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধ'রে বিচার করতেন এবং যেপক্ষ 'কিছু' দিয়েছে, মিথ্যা সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করেছে, সেই পক্ষেরই সমর্থনে তিনি রায় দিতেন।

অবশেষে এই কথা ব'লে আমি এই পত্র শেষ করতে চাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হরণ করার অর্থ হ'ল অন্যায়, অত্যাচার দাসত্ব, অবিচার, ভিক্ষাবৃত্তি ও বর্বরতার পথ পরিষ্কার করা। জমিতে আবাদ ক'রে ফসল ফলাবে না মানুষ তাহ'লে এবং পরিত্যক্ত মরুভূমিতে পরিণত হবে দেশ। সমাজের সর্বনাশের পথ, রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হবে। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হ'ল মানুষের একমাত্র আশাভরসা প্রেরণা, যাতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানুষ তার মেহনতের ফলভোগ করবে নিজে, এবং সেই ভোগের অধিকার দিয়ে যাবে তার বংশধরদের, এই হ'ল মানুষের কামনা। এই কামনা চরিতার্থ হয় ব'লেই মানুষের হাতে পৃথিবীর রূপ বদলে যায়, সুন্দর হয়ে ওঠে পৃথিবী। যেকোন দেশের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, যেখানে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়নি সেখানে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবং যেদেশে এই পবিত্র অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত সেদেশ ক্রমে শ্রীহীন হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাদুস্পর্শেই পৃথিবীর পরিবর্তন হয়, নতুন রূপ ধারণ করে পুরনো পৃথিবী।

[কলবার্টের কাছে লিখিত পত্র এইখানেই শেষ হ'ল। মোগলযুগের দুই প্রধান শহর "দিল্লী ও আগ্রার" সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক জাঁ'দ ভেয়াবের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, আগামী সংখ্যা থেকে তার অনুবাদ প্রকাশিত হবে।—অনুবাদক]

[ক্রমশঃ]

শ্রীমতী লিজেল্ রেমঁ

দ্বাবিংশ অধ্যায়

'জয় মা কালী'

সুরেন্দ্রনাথ একদিন নিবেদিতাকে বললেন, 'মূর্তিপূজাই যদি করতে হয়, এই বাংলায় কালীমূর্তি পূজা কেন?' নিবেদিতা ঘাড় বাঁকিয়ে জবাব দেন, 'আমি মূর্তিপূজা করি না। কালী যেমন আমার বুকে তেমনি তোমার বুকেও আছেন। এ অস্বীকার করা চলে না। এতে এত আপত্তির কী দেখছ?'

এই প্রথম নিবেদিতা সরাসরি স্বীকার করলেন যে মহাশক্তির প্রতীককে তিনি অন্তরে 'আমার' বলে গ্রহণ করেছেন। ব্রাহ্ম বন্ধুটি প্রশ্ন না করলে তিনি হয়ত নিজেকে যাচাই করে দেখতেন না, বা শুরু থেকে আজ অবধি কতটা পথ এগিয়ে এসেছেন তা-ও হয়তো মাপতে যেতেন না। স্বামীজি কখনও তাঁকে এ ধরণের আত্মবিশ্লেষণ করতে বলেননি। সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হওয়াতেই অমন করে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবের পর্দা সরে গেল। তবুও এ পুরোপুরি কবুল জবাব নয়। কিন্তু নিজেকে খুঁটিয়ে বিচার করতে গিয়ে নিবেদিতা আবিষ্কার করলেন, কেমন করে নিষ্ঠাবতী এক প্রোটেষ্টাণ্ট তিলে-তিলে পৌত্তলিক হয়ে উঠেছে। কেন যে বিশ্ব-জননী কালীর নাম বিশ্বশক্তির মূর্ত প্রতীকরূপে তাঁর অন্তরে রণিত হচ্ছে তা-ও তাঁর অজানা রইল না। মহাশক্তিকে কল্পনা করা হয়েছে দেবীরূপে, তিনি আছেন প্রাণনের মূলে। এ যে বিজ্ঞান-সিদ্ধ কল্পনা।

অবশ্য এমন সামঞ্জস্য প্রথমে দুষ্কর হয়েছে, অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে মনকে,—কারণ নিবেদিতা চিত্তের রূপান্তরকে মাপতেন বুদ্ধি দিয়ে, ওরই 'পরে তাঁর একান্ত নির্ভর। নিপুণ চাতুরীর সঙ্গে বুদ্ধি কিন্তু পরাজয় মেনে নিল এ ক্ষেত্রে, সমস্যার কোনও সমাধান যুগিয়ে দিল না। শেষ পর্যন্ত সত্য দৃষ্টিকে আবৃত করেছিল যে-বাধা তা সরে গেল। নিবেদিতা বুঝলেন, মায়ের সান্নিধ্য পেতে হলে নির্ভর করতে হবে শুধু সহজ জ্ঞানের 'পরে, সব যুক্তি-তর্ক বাতিল করতে হবে।

এতে অনেক সময় লেগেছিল। অমরনাথ থেকে ফেরবার সঙ্গে-সঙ্গেই মানসিক সংঘাত শুরু হয়েছিল, নিবেদিতা তাতে খুশীই ছিলেন। ছোট ছেলের যেমন করে বর্ণপরিচয় হয় তেমনি করে নিবেদিতা কালীপুজার মন্ত্র আর অনুষ্ঠানগুলো শিখতে লাগলেন, আর দিন-দিন শক্তি-সাধনার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ক্রমে তিনি বুঝলেন, কেন ভারতবর্ষে লোকে যা-কিছু করে সবই ধর্মের নামে করে। বৈজ্ঞানিকের মত সে-গুলোর বিভাগ করা হয়েছে। তার পরে যে-কোনও বাসনার স্বরূপ বিচার করে সহজেই বার করা যায়, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে আমার স্থান কোথায়। —(১ই মার্চ ১৮৯৯এর চিঠি)। ধ্যানের নিভৃতিতে বসে এমনি করে নিবেদিতা নিজেকে চিরে-চিরে দেখেছেন, তাঁর গোপনে লালিত কামনার আবরণ হঠাৎ ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে। দেবতার প্রসাদ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাঁকে, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তার প্রতিরোধ করেন। 'না, না, এখনও নয়'...বলে মিনতি জানান। আচমকা কেন এই পিছিয়ে যাওয়া? বন্ধন যে এখনও আছে, সবার উপরে গুরুভক্তির বন্ধন, আত্ম-সমর্পণের রাখী। তাঁকে হারানোর ভয় আলোর আগমনীকে রুখে দাঁড়ায়। শূন্যে ঝাঁপ দিতে সাহস পান না নিবেদিতা। প্রাণ যখন থরথরিয়ে কাঁপে, কী গভীর বিষাদ যে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে! বুদ্ধি চায় যুক্তিকে আঁকড়ে ধরতে, সান্ত্বনা দেবার মত আর একটি প্রশস্ত হৃদয় খুঁজে না পেয়ে হৃদয় যায় মুষড়ে! খৃষ্টের সঞ্জীবন স্পর্শ পাবার আগে শবাস্তরণে ঢাকা ছিল কবর-শায়ী ল্যাজারাস। এসব প্রাণান্তক ভাবনা যেন মৃত্যু-মূর্চ্ছিত মনকে তেমনি ছেয়ে রাখে।

মায়ের কাছে যাবার কথা সঙ্কেতে বলেন গুরু, কিন্তু কই সে রহস্য-ছাওয়া পথ? তিনি শুধু বলেন, 'নিজেকে সঁপে দাও তাঁর কাছে।' জীবন-মরণ সমস্যার সামনে গুরু দাঁড় করিয়েছেন নিবেদিতাকে। খাঁটি সাধু সদানন্দ আছেন পাশে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার মনের যোগ নাই। গুরু তাঁকে নিয়ে এসেছেন কালীর সম্মুখে, কিন্তু কেমন করে তাঁর বিপুল শক্তিকে অনুভব করবেন তার কোনও উপায়ই শিখিয়ে দেননি।—

যেদিন নিবেদিতা নিজেকে সঁপে দিয়েছেন দেবতার পায়ে, সেদিন থেকে বেশ বুঝেছেন, তাঁকে একাই চলতে হবে। ব্রহ্মচর্য্যের দেউলে ঢুকেছেন এক রন্ধ্র-পথে; তাঁর আশা-বাসনা আজও যে নির্জিত নয়, এখনও যে তারা বিভ্রান্ত করে তাঁকে সে বিষয়ে—তিনি খুবই সচেতন। তার পর হোমাগ্নিতে তাদের আহুতি দিয়ে আপনাকে নির্মল মনে করেছেন নিবেদিতা। ঐ বহ্নিশিখায় পুড়ে গেছে তাঁর যত পাপ আর অহংএর যত জঞ্জাল। শুধু আছে দেবতার প্রতি শুদ্ধ ভালবাসা। সেই পরম লগ্নে, একেবারে সর্বহারা হয়ে নিবেদিতা আপন অন্তরে অনুভব করলেন মহাকালীর চিন্ময় অস্তিত্ব। নিখিল মানবের ধাত্রী তিনি, বামাবর্ত আর দক্ষিণাবর্ত দিন আর রাত্রি দুই-ই তাঁর নিত্যস্বরূপ, দুয়ে মিলিয়ে তিনি। শক্তি-উপাসিকা নিবেদিতা একটি জিনিসই শুধু চান, সত্তার গভীরে অনুভব করবেন তাঁর প্রাণ-স্পন্দন। নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে ডাকেন মাকে, 'জয় মা কালী', জয় মা কালী।' ঐ তাঁর মন্ত্র।

নিবেদিতার এই অগ্রাভিযানের দিকে খরদৃষ্টি বিবেকানন্দের। যখন বুঝলেন নিবেদিতা শক্তি লাভ করেছেন, তখন পরীক্ষায় ফেললেন

কালী। নিজের ভাষায় তাঁকে প্রকাশ কর।' বিদেশী খৃষ্টান হয়ে করতে হবে মা কালীর বিশ্লেষণ, তাতে আবার ধর্মান্ধ জনসাধারণের মনকে খুশী করা চাই, খুশী করা চাই উত্তরপথিক গুরু আর ব্রাহ্মসমাজের পাণ্ডাদের। এই প্রথম কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে নিবেদিতাকে। মনে ভাবেন, 'কি বলতে যাচ্ছি? মাগো, দেখো যেন একেবারে ভুলে না যাই।' অ্যালবার্ট হলে ব্যবস্থা হল, বক্তৃতার বিষয় যে 'কালীপূজা' তা-ও ঘোষণা করা হয়ে গেল। নিবেদিতা দিন গোনেন, 'আর এক সপ্তাহ, আর দু'দিন········।' তাঁর বক্তব্য লিখে গুরুর সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করেন। যখন মনে সংশয় হয়, যে 'অভয়-বাণীটি' উদ্ধৃত করবেন ঠিক করেছেন সেটি মনে মনে আওড়িয়ে যান, 'বৎস, আমায় খুশী করবার জন্য বেশী কিছু জানতে হয় না। শুধু প্রাণ দিয়ে আমায় ভালবাস, তবেই হবে······'

নিবেদিতা জানতেন ব্রাহ্ম-বন্ধুরা ওৎ পেতে আছেন—কালীপূজার যে ভাল আর মন্দ দুটো দিকই আছে এই ধরণের কথাটি একবার বললেই হয়! কিন্তু নিবেদিতা তো মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান না। তাঁর ভাষণ হবে দেবতার পায়ে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। অদ্বৈতের অভিযাত্রিণী নিখিল প্রকৃতির মর্মবাণীকে তিনি বুঝতে পেরেছেন, সেই কৃতজ্ঞতাই এই অর্ঘ্যের উপচার। উত্তরায়ণের পথে হিন্দু এগিয়ে চলেছে বিশ্বাত্মভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। অহন্তা বর্জন করে নিজেকে শুচিশুভ্র করে তোলাই তার জীবনব্রত। জন্ম-জন্মান্তরের সরণি বেয়ে আবর্তিত হয়ে চলে তার অক্লান্ত অধ্যবসায়। নিজেকে সে একবার হারায়, আবার ফিরে পায়। দেবতার প্রসাদে সকলই সম্ভব, সেই পূজার সর্বোত্তম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে সে, সৃষ্টি করেছে অপরূপ যজ্ঞবিধি, সযত্নে নির্বাচিত পশুর বলিদানে। পশু-জন্মের ভিতর দিয়ে সেও এসেছে, এসেছে দেবতার বলি হয়ে। অবশেষে তার সত্তা আত্মাহুতির অনির্বাণ শিখায় দগ্ধ হয়ে অগ্নিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চিন্মাত্রে হয়েছে রূপান্তরিত···মঞ্চে যখন উঠে দাঁড়ালেন, নিবেদিতার মনে তখন এমনি সব ভাবনার বিদ্যুৎ।

হলে তিল ধারণের স্থান নাই। আস্তে কথা বলেন নিবেদিতা, নিজের কথা নিজেই কান পেতে শোনেন। বলা শেষ হলে জনতা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল, শুরু হল দীর্ঘ বিতর্ক। কিন্তু নিবেদিতা তখন ক্লান্ত। মনে-মনে ভাবছেন, 'এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! মাকে যে যার মত ধারণা করে, তারই রহস্যার্থের বিবৃতি দিয়েছি এদের কাছে—ওরা তাতেই এত খুশী। আমাদের বীজসত্তা উদ্ভিন্ন হয় তাঁরই শক্তিতে, দিনে-দিনে পরিণত হয় পরম পূর্ণতায়—সেকথাই বলেছি আমি। ওদের ভাব দেখে মনে হয়, যে-অপশক্তি বিষে ওদের প্রাণকে জরিয়ে দেয় আজ নিজের থেকে আলাদা করে তাকে দেখতে পেয়েই ওদের তৃপ্তি! ঐ অপশক্তির এবার বিচার চলে, তাকে গাল দেওয়া চলে। কিন্তু মা, মাগো, তুমি যে সকল অভীপ্সার মূলে, তুমি যে "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে" মা! তুমি যে অপরাজিতা, আধারের সকল মালিন্যের মার্জনে শুদ্ধ কর তাকে। তুমি নির্মম নির্দয়, যে-প্রেম তোমারই প্রাপ্য আর কাউকে তার ভাগ দিতে তুমি রাজী নও। যে-বলি তুমি চাও, কাপুরুষের মত তা দিতে অস্বীকার করে পিছিয়ে যায় যে, তার সর্বনাশ কর তুমি। তোমায় সর্বেশ্বরী বলে করতে চাও, তারই হৃৎপিণ্ড দলিত কর, তোমার কল্যাণ-হস্তের স্পর্শে ঘোচাও সকল মালিন্য। ঐ জবার মালায় আবৃত করেছে তোমার রক্তক্লিন্ন হৃদয়-ক্ষত, তোমার বাহুপাশের মদিরতাকে কে জানে! প্রলয় মেঘে লুপ্ত ধরিত্রী, দিশ্ ভয়ে কম্পমান···ঐ নূতন উষার আভাস নিয়ে বরাভয় হস্তে মা এলেন, "প্রলয়খান" ছায়াবীথীর 'পরে আবার ফুটল আলো।'

দেখলেন গুরু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সরলা ঘোষালের সঙ্গে কথা বলছেন। বললেন, 'চমৎকার বলেছ, মার্গট'। সমালোচনাগুলো গাড়িতে যাওয়ার সময়ের জন্য তোলা রইল। নিবেদিতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, বার বার বলছেন, 'কেবল ক্ষতিই করেছি আমার কিছু না বলাই ভাল ছিল। কী যে বলেছি এখন মনে করতে পারছি না···'

ঠাকুর পরিবারের আগমন প্রতীক্ষা করেন নিবেদিতা, তাঁদের সমালোচনার অপেক্ষায় থাকেন। সমালোচনা কঠোর হল। নিবেদিতা লেখেন, 'আমাকে আক্রমণ করা হচ্ছে। লোকে এইটা দেখছে না যে কেউ ব্যবসাদারী মতলবে কিছু বলেনি। কালীপূজার কারবার চালু করা হচ্ছে এর পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিকে হাতানোর জন্য—এও নয়। কালী যা তার জন্যেই তাঁকে পূজা করি। তিনি ভগবতী, ভগবানের নামের মত তাঁর রূপের কল্পনাও আছে, সে-কল্পনার শক্তিও আছে—এও তাই। কোনও প্রয়োজনে কিংবা ভালবেসে কেউ যদি তোমার নাম ধরে ডাকে তুমি সাড়া দাও, দেবতার কালী নামটিও তাই। আমাদের যেমন ডাকার মন্ত্র হল, "দিব্যধামবাসী হে পিতা!" তেমনি "মা কালী!" ব্রাহ্মবন্ধুরা বললেন, 'তোমার ভাষণটি চমৎকার। ওতে আমাদের বুদ্ধি তৃপ্ত হয়েছে, আবার সাধারণ শ্রোতা যারা শুধু প্রাণের সংস্কার বশেই সাড়া দেয়, তারাও খুশী হয়েছে! কিন্তু বাস্তব জীবনে তোমার কালী আসলে কি বলতে পার?'—(৯ই মার্চ ১৮৯৯-এর চিঠি)।

নিবেদিতা তাঁদের কি বলে বোঝাবেন? যাঁরা মাকে উপলব্ধি করবার জন্য শক্তি-সাধনায় ব্রতী হয়েছে তারাও তো বলতে পারবে না মা কি। যাঁরা তার পৌরোহিত্য করেন তাঁরাও যে নীরিহ।

এর মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। কালীঘাটের প্রধান পুরোহিত বাগবাজারে এসে নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানালেন, ২৮শে মে রবিবার মায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁকে কিছু বলতে হবে। নিবেদিতার পক্ষে কালীমন্দিরে ভাষণ দেওয়া আর প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মকে মেনে নেওয়া একই কথা। দুটি শক্তিস্রোত নিবেদিতাকে ঘিরে বইত,—এক সদা সক্রিয় তাঁর কর্মযোগী গুরু আর অচলা শক্তি-স্বরূপিণী সারদা দেবী, একই তত্ত্বের দুটো দিক। তাঁদের ভাবের উত্তরাধিকার যে নিবেদিতা পেয়েছেন, এই বক্তৃতায় প্রকাশ্যে তা প্রচারিত হবে। আর মায়েরই পায়ের তলায় বিদেশিনীর মুখে শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হলে মা যে সত্যিই নিখিল-জননী তা-ও প্রমাণিত হবে।

মে মাসের অসহ্য গরম। বক্তৃতার আগের দু'দিন নিবেদিতা কোনও কাজ করতে পারেননি বললেই চলে। ২৮শে সকালে বিবেকানন্দ তাঁকে দেখতে এলেন। নিবেদিতা লিখছেন, 'কি বলব না বলব ভাবতে গিয়ে মনটা দমে যাচ্ছিল। স্বামীজি এসে আমায় উদ্ধার করলেন। একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে তিনি

আস্তে আস্তে তুলে ধরলেন আমার সামনে—আমাকে সাহস দেবার জন্য। মায়ের মুখোমুখি দাঁড়ানো, সে যে কঠিন কাজ······

'আচার্য সেদিন বললেন, "এই কালী আর তাঁর যত কিছু কাণ্ডকারখানাকে কী অশ্রদ্ধাই না করতাম! আমি তাঁকে স্বীকার করিনি, ছ'টি বছর লড়াই করেছি। পরমহংসদেব আমায় উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পায়, তবুও এতদিন যুঝেছি। জান তো মানুষটাকে ভালবাসতাম, তাতে আমার সুবিধা হয়েছিল। জানতাম এমন খাঁটি লোক আর কখনও দেখিনি বা দেখব না, আর জানতাম তিনি আমায় যেমন ভালবাসেন আমার বাপ-মারও তেমন ভালবাসার সাধ্য নাই···কিন্তু তখনও তিনি যে কি বিরাট তা বুঝতে পারিনি। বুঝেছি পরে। যখন আত্মসমর্পণ করলাম তখন······"

'স্বামিজি, কিসে আপনার প্রতিকূলতা গেল বলবেন না আমায়?'

'সে কথা আমার সঙ্গেই ছাই হয়ে যাবে······ভয়ানক দুরবস্থায় পড়েছিলাম এই সময়টাতে, মা দেখলেন এই সুযোগে আমায় গোলাম বানাতে হবে। হ্যা, ঠিক এই তাঁর মুখের কথা! 'গোলাম বানাব তোমায়!' ঠাকুর আমায় তাঁর পায়ে সঁপে দিলেন······আশ্চর্য, এর পরে তিনি আর মোটে ৬'বছর বেঁচেছিলেন, আর তার বেশির ভাগই অসুখে ভুগেছেন। মাত্র ছ'টি মাস তাঁর শরীরটা ভাল ছিল, ভাবভাবে বালক ছিল। গুরু নানকও এমনি ছিলেন জানো, তিনিও তাঁর শক্তি-সঞ্চারের জন্য একটি শিষ্য খুঁজে বেড়াতেন······তাকে পেলে তবে তিনি দেহ ছাড়তে পারলেন······'

আত্মহারা হয়ে স্বামীজি বলে যান, 'কোনও সন্দেহ নাই, মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দেহ আশ্রয় করে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। দেখ মার্গট, ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এক বিরাট শক্তি আছেন যিনি আপনাকে "নারী" ভাবনা করেন, তিনিই কালী—এ আমি বিশ্বাস না করে পারি না। আবার ব্রহ্মকেও বিশ্বাস করি······ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই এও······অসংখ্য কোষের সমবায়ে দেহ গড়ে উঠে, তৈরী হয় একটা মানুষ, অগণ্য মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে উৎপন্ন হয় এক চেতনা। সর্বত্রই বহুর মধ্যে এক। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, আবার তিনিই বহু দেবতা······এক-এক সময় কী যন্ত্রণা যে দেন মা! তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলি, কাল যদি আমায় এই-এই না দাও, আমি তোমায় দূর করে শুধু ব্রহ্মের কথা বলে বেড়াব······সে সব জিনিস কিন্তু ঠিক-ঠিক পেয়ে যাই······(নিবেদিতার নোট আর The Master as I saw Him পৃঃ ২০, ৮৯)

বলতে-বলতে স্বামীজি খুব দীন ভাবে বলেন, 'কালীঘাটের পুরোহিতরা তোমার ভাষণের সময় আমায় সভাপতি করতে চেয়েছে, কিন্তু আমি যাব না···আমি আমার আবেগ সামলাতে পারব না। আমাদের পরিবারে বহু পুরুষ ধরে আমরা শাক্ত, কালীঘাটের প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। ও-মাটিতে যে বলির রক্ত তাও পুণ্যময়।···তোমার ভাষণ সম্বন্ধে কড়া কতগুলো নিয়ম করে দিয়েছি। আসরে কোন চেয়ার থাকবে না। প্রত্যেককে তোমার পায়ের তলায় মাটিতে বসতে হবে। জুতো বা টুপি ছেড়ে রাখতে হবে। জনকয়েক নিমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে তুমি থাকবে সিঁড়ির উপরে।'

যাবার সময় বিবেকানন্দ শিষ্যাকে আশীর্বাদ করে গেলেন। চৌকাঠ পার হতে গিয়ে নীচু হয়ে হঠাৎ ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, 'মায়ের কথা যে বলে সেই-ই ধন্য···তাঁর নিত্য দাসী হও।'

নিবেদিতা খালি পায়ে কালীঘাটে চললেন। স্বামী সদানন্দ সঙ্গে আছেন। দীর্ঘ পথ। মন্দিরের চার দিকে ভিখারীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভক্ত যাত্রীদের মন গলাতে চায়, ভিক্ষাপাত্রটা ঠন-ঠন করে বাজায়। পুরোহিতেরা ওদের দিনে একবার খেতে দেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে বাঁশপাতায় ছাওয়া বিরাট চালা, তার মধ্যে নানা রঙের ছড়াছড়ি—নীল, গোলাপী, বেগনী, সিন্দুরে রঙের নানা ফুলের রক্তরাগে মহাকালীর বিজয়-কেতন উড়ছে যেন।

পূজার্থীরা লাল চেলী বা তসর পরে প্রাঙ্গণে বসে আছে, কেউ-কেউ মণ্ডপের সিঁড়িতেও বসেছে।

নিবেদিতা সবার উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'আজ বিকালে আমরা যেখানে মিলেছি, মায়ের যত মন্দির আছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে পবিত্র। বহু যুগ ধরে পুণ্যাত্মারা অন্তরের পিপাসা নিয়ে এখানে এসেছেন, নিবেদন করেছেন তাঁদের আর্তি তাঁদের কৃতজ্ঞতা, অন্তকালে স্মরণ করেছেন মাকে। আমরা এখানে মায়ের পূজা করতে এসেছি এই কথাটি যেন না ভুলি।'

ভক্তদের প্রাণ আকুল করে নিবেদিতা মাকে জানান সকৃতজ্ঞ অন্তরের প্রণতি, সর্বদেশের সর্বতন্ত্রে ঈশ্বরের মাতৃমূর্তি কল্পনার কাহিনী বলে যান। 'যত দিন আমরা অশক্ত, তত দিন মায়ের নামে সব জ্বালা জুড়ায়, হৃদয়-ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ে। এ-অধ্যায় যখন শেষ হয় তখন দেববাঞ্ছিত অস্ত্রাহুতিতে ধন্য হয়েছে বলে গোটা জীবনটাই যেন ছন্দোময় উল্লাসে ভরে ওঠে। মনে হয়, আধ্যাত্মিকতা আর আভিজাত্যের গর্বের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। ধর্মের আসন জনসাধারণেরই হৃদয়-গুহায়। ধর্মকে মার্জ্জিত রূপ দেওয়া মানেই তাকে বীর্যহীন করা। প্রত্যেকে তার খোরাক পাবে ধর্মে, এবে না···সুতরাং দেবোপাসনার রহস্যার্থ যদি আকাশচারীও হয়, তার প্রতিষ্ঠা কিন্তু হওয়া চাই মাটির বুকেই···দ্বৈতবাদ যেদিন থাকবে না, ভগবানের ভগবত্তাও নয়, সেই দূর ভবিষ্যতে হয়তো এর অন্যথা ঘটতে পারে—আজ নয়। শবরূপী দেবতার বুকেই আনন্দময়ী মায়ের চিন্ময় নৃত্য-বিলাস···' (কালীপূজা—কালীঘাটের মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ হতে)

দিন কয়েক পরে নিবেদিতা তাঁর এক বন্ধুকে বলেন, 'কালী সম্বন্ধে একটা নতুন ভাব মনে জেগেছে···মায়ের পদতলে শায়িত শিবের ঢুলু ঢুলু চোখ দুটি মায়ের দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছে কি করে তাই দেখছিলাম। কালী ঐ সদাশিবের দৃষ্টির সৃষ্টি। নিজেকে আড়ালে রেখে সাক্ষীরূপে তিনি দেখছেন দেবশক্তিকে···শিবই কালী, কালীই শিব। মানুষের মন বিপুল শক্তিতে কাজ করে চলেছে, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে দেবতার এই রূপে—এই কি সত্য? অর্থাৎ মানুষই কি দেবতাকে সৃষ্টি করে? তাই ভাবি···বিশ্বের রহস্য কোন্ লাস্যময়ীর লীলাচাতুরীর হাল্কা ওড়নায় ঢাকা!' (২৮শে মে, ১৮৯৯এর চিঠি)

ধ্যান করতে গিয়ে একটা কূল-ছাপানো পূর্ণতার অনুভবে নিবেদিতার মন ভরে ওঠে। 'মা, মা আমি তোমার দাসী, তোমায় তুষ্ট করবার মত কিছুই জানি না। প্রাণ ঢেলে তোমায় ভালবাসি শুধু···'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—নারায়ণী দেবী।

মাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীসারদামণির পত্র—শ্রীমকে লিখিত

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

চিরজিবেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ পরে আপনার ডাক্ জোগে কুশল সমাচার পাইয়া সকল জ্ঞাত হইলাম আর আপনি ও অপরাপর সকলের জ্বর হইয়াছিল এক্ষণে কি প্রকার আছেন ও চারু কেমন আছে এবং ছোট মেয়েটি কেমন আছে ও তাহাকে জত্ন করিবেন আর আমার পেটের অসুকটা হইয়াছিল এক্ষনে ভগবান কৃপায় সারিয়াছি কোন অসুক আর নাই আর অভয়ের পত্র পাইয়াছি তাহাকে আমার আশিব্বাদ দিবেন আর অভয় মা রাধুর বৌমার জ্বর হইয়াছিল তাহা এক্ষনে—মাতা ঠাকুরাণী ভাল আছেন ও আমার আশিব্বাদ। আপুনি ও ছেলেরা ও বধুমাতাকে দিইবেন এবং চারু পথ্য পাইয়াছে কিনা লিখিবেন আর কাইক মঙ্গল তোমাদের কুশল সংবাদ সব্বদা লিখিবেন ইতি ১লা কার্ত্তিক

আশীব্বাদ পত্র
তোমাদের মাতাঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীকালী সহায়

তাং ২৯ শ্রাবন
(Post-date 15 Aug 95)

চিরজিবেষু

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন জ্ঞাদৌ বিশেষ পরে বাবাজীবন তোমাকে এত দিন পত্র লিখিতে পারি না কারণ বরদার বিবাহর জনঝাটে। আপুমি টাকা পাঠাইয়াছিলেন। টাকা অনেকদিন পাইয়াছি। কিন্তু টাকার সংবাদ লিখিতে সময় পাই নাই এবং .বাড়ি সকলকার কুশল সংবাদ লিখিবেন। এবং খুঁকীটি কেমন আছে। তাহার সংবাদ দিইবেন। আমী শারিরীক ভাল আছি। তোমাদের কুশল বার্ত্তা লিখিবেন। আর এখানে বৃষ্টি হয় না অভয়কে বলিবেন যে ইহারা··· ২রা তাং রওনা হইবেক এখানকার কাইক মঙ্গল আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন এবং ভক্তদের কুশল·লিখিবেন ইতি ১৩০২ সালের মঙ্গলবার

তোমার মা
(1896)

শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী

শ্রীশ্রীহরি

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বাবাজীবন তুমি যে দশ টাকা পাঠাইয়াছিলে ঐ টাকা পাইয়াছি এতো দিন পত্র দিইতে বিলম্ব হইল ৺রি সরসতী পুজা শ্রীমান সরৎচন্দ্রের হাতের ব্যাথা ভাল হইয়াছে কি না লিখিবে আমি কামারপুকুরে আছি ৺সর শিবরাত্রি অবধি থাকিবার ইচ্ছা আছে তাহার পর যেখানে থাকিব লিখিব অভয় উহার কেমন থাকে লিখিবে নটি চারু বউমা সকলের কুশল লিখিব আমি ভাল আছি তুমি কেমন থাকো লিখিবে ইতি ১১রই মাঘ

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

১৪ই শ্রাবণ
(Post-date 31st July 1894)

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন জ্ঞাদৌ বিশেষ পরে আপনার প্রেরিত ডাক যোগে মনিওডার কো: ১০৲ দশ টাকা পাইয়াছি আর গোদির বিবাহর কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অকাল বসত রাখিতেছেন কন্যাদায়ে কালাকাল্যাদি জদ্যপি পাত্র পান তাহা হইলে বিবাহ দিইবেন যেহেতু কন্যের বয় প্রাপ্ত হইয়াছে এইজন্য কালাকালের প্রয়োজন নাই আর অভয়কে বলিবেন যে রামলাল কি তার হাতে একখানি পঞ্জিকা পাঠাইয়াছিলেন কিনা সে পঞ্জিকাখানি কোথায় উত্তর লিখিবেন।

আমার আশীর্ব্বাদ
মা

শ্রীশ্রীকালী সহা

৩১শে শ্রাবণ

চিরজীবেষু

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ পরে আপনার আজ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আর আমি যখন ঝামাপুখুর যাইব তখন আমি আপনাকে পত্র লিখিব। আর বাড়ীর সকলে আপাততঃ ভাল আছে আর শ্রীমান অভয়কে বলিবেন যে ইহারা রো

হয় ২রা রওনা হইবে। ৩রা তং অভয় যেন বাসায় উপস্থিত থাকে। আপনি পয়সা ধারের কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান যেন আপনাকে কখন কাহারও নিকট পয়সা ধার করিতে না হয়। আমি এই ভগবানকে বলি যে তোমার খুব উপায় হয় আমার এই ইচ্ছা। আর রাখাল কেমন থাকেন আমাকে সংবাদ লিখিবেন। আমি কাল আপনাকে একটা পোষ্টকার্ট লিখিয়াছি বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন। আর কৃষ্ণকুমারী ও আপনার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কেমন আছেন ও তাহাদের কুশল সংবাদ লিখিবেন। আর খোকাদের বাড়ীর কুশল পাই নাই—আর এঁড়েদহের তারক কেমন আছেন ও তাহাদের বাড়ীর কুশল লিখিবেন।

সংকীর্ত্তনের কথা শুনিয়া খুব খুসী হইলাম আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন এখানকার কাইক মঙ্গল তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিবেন। আমি ভাল আছি কিন্তু বাড়ীর প্রায় সকলের অসুক। বৌমায়ের কথা লিখিয়াছেন—কিন্তু তিনি তাহাকে খুব ভাল বাসিয়াছেন। উনি খুব ভাল।

আশীর্ব্বাদিকা
মাতাঠাকুরাণী

জয় রামকৃষ্ণ
Postal Date. 26.11.95

কল্যাণবরেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ

তোমার প্রেরিত ১০৲ টাকা পাইলাম। মধুপুরে তোমার ছেলেরা কে কেমন আছে কি খবর পাইলে লিখিবে আর জয়রামবাটীতে আমার মাকে একটি পত্র লিখিবে। আমি এখন কামারপুকুরে আছি। অভয় কেমন লিখিবে। আমি কায়িক কুশলে আছি। গোলাপের জ্বর হইয়াছিল ভাল হইয়াছে এবং সত্বর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। লক্ষ্মী ভাল আছেন। জ্ঞাপন ইতি তাং ৯ই অগ্রহায়ণ

তোমার মা

পুঃ জয়রামবাটীর সকলে ভাল আছে।

অক্ষয় মাষ্টারের প্রণাম জানিবেন। যে বিষয়গুলি অর্থাৎ ঠাকুরের যে কথাগুলি বলিবার জন্য বাছিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বাছিয়া রাখিবেন॥

৺রাম

পরে বাবাজীবন তোমার এক পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। আর তুমি যে আগড়পাড়াতে ছিলে শুনে সুখী হইলাম কারণ তথায় বেশ গঙ্গার ধার অতি নির্জ্জন এবং তথায় গীতাদি পাঠ করিতেন শুনিয়া সাতিশয় সুখী হইলাম। বৌমা শারিরীক কেমন আছে আর শ্রীমান অভয় এখান হইতে আগামী মাসের ৩রা তং রওনা হইবে। অভয়ের বিষয় যেখানে পড়িলে ভাল হয় করিবেন। আমি শারিরীক ভাল আছি। তোমাদের কুশলাদি সর্ব্বদা লিখিবে। আমার আশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে জ্ঞাত হইবা। আর এখানে গত শনিবার প্রায় ১০।১২ মিনিট কাল ধরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, অনেক ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, তোমাদের কুশলাদি লিখিবেন।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতা

রোঁমা রোঁলার পত্র—শ্রীমকে লিখিত

ভিলেনিউভ (ভঁাদ) ভিলা ওলগা,
২৮শে মার্চ ১৯২৮

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী অশোকানন্দ সমীপেষু,—

প্রায় একমাস হ'ল, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী রচনার পবিত্র কাজে হাত দিয়েছি, এই নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত আছি।

এই কাজের মধ্যে এক জায়গায় আমাকে একটা সমস্যা বা সংশয়ের সম্মুখীন হতে হবে, আদেশ হয়ত সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি, সংক্ষেপেই সারতে চাই এবং আমার অনুরোধ, আপনিও আপনার মহামূল্য সময় বেশী নষ্ট না করে সংক্ষেপেই উত্তর দেবেন।

(১) ডি, জি, মুখার্জ্জির "শিবানন" নামক পুস্তকে (পৃঃ ১০০ হইতে) শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে; "ধ্যানধারণা" নামক শ্রীগুরুদেবের পবিত্র জীবনীতে গল্পটার মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায় বটে কিন্তু গল্পটী যথাযতঃ পাইনি।

এই গল্পটী কি সত্যি মনে হয়? (একটা কথা লিখছি, গোপন রাখবেন আশা করি) মোটের উপর মুখার্জ্জির এই বইটা নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছি। কথাশিল্পের দিক থেকে অনেক জায়গায় বইটী চমৎকার হয়েছে! অনেক জায়গায় সত্যিই তথ্যপূর্ণ। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে বইটাকে অকাট্য প্রামাণিক বলে কতটা মানা যায়? আমার মনে হয়, শিল্পী গল্পটাকে অতিরঞ্জিত করেছেন। আমিও শিল্পী (বৃত্তিতে ঐতিহাসিকও বটে),—আমাকেও অন্তরের এই স্বাভাবিক বৃত্তির নিবৃত্তির জন্যে কষ্ট করতে হয়; আমার কল্পনা যতবার সুরে সুরে পাখা মেলে উড়ে যেতে চায় ততবার তাকে সংযত করবার জন্যে আমার বিশেষ বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুখার্জ্জি কি স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং রামকৃষ্ণের অন্যান্য মহাপ্রাণ শিষ্যদের মুখ থেকে এসব তত্ত্ব পাননি?

(২) বিবেকানন্দ তাঁর "মায়া ও মুক্তি" নামক বাণীতে (২য় খণ্ড পৃ ১১০—১১২৭) শ্রীরাধার একটী গভীর আবেশমাখা প্রাণ থেকে একটা অদ্ভুত গল্প দিয়েছেন:—

শ্রীরাধা কৃষ্ণের জন্য জল আনতে গিয়ে (কালো জল দেখে) মুগ্ধ গেলেন; জল আনা তাঁর হ'ল না। কি চমৎকার গল্পটী আমার অন্তরের অন্তস্থল স্পর্শ করেছে। বিবেকানন্দ কোথায় পেলেন এ গল্প, তাঁর সারা জীবনের সাধনায়?

(৩) কলকাতার ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কি এখন জীবিত আছেন? আপনি আমাকে শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ঠিকানা যেমন পাঠিয়েছিলেন, এনার ঠিকানাটাও কি পাঠাতে পারেন? শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এনার মত যাঁদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল, আমি তাঁদের সংস্পর্শে আসতে চাই। এনার মত প্রভাববান লোকই আমাকে

অধিকতর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে দিতে পারবেন যাতে আমিও আমার লেখার ভিতর দিয়ে ইউরোপবাসীদের সেই সব জানাতে পারব।

মনে হয়, রচনাকালে যদি কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, আগামী অক্টোবরেই আমার কাজটা শেষ হবে (কিন্তু আমি তাড়াতাড়ির কোন চেষ্টাই করব না)। যাই হোক, আমার পাণ্ডুলিপি শেষ হলে, "ফ্রেঞ্চ রিভিউ"কে প্রকাশের জন্যে যেমন এর এক প্রস্থ পাঠাব, আপনাকেও সঙ্গে সঙ্গে এক প্রস্থ পাঠাব, এমন ব্যবস্থা করব যাতে দু জায়গা থেকে এককালীন প্রকাশ হতে পারে। সমগ্র ভারতেই (ভারতের বাইরে নয়) এই প্রণয়ন প্রকাশ করবার স্বাধীনতা রইল আপনার।

যাই হ'ক, আপনাকে আমার জানান উচিৎ যে, আমার গভীর স্নেহের পাত্র, যুবক বন্ধু, ডাঃ কালীদাস নাগ (মডার্ণ রিভিউ এবং প্রবাসীর সম্পাদক ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা) আমার ভাবী পুস্তকটি তাঁর বাংলা পত্রিকায় মুদ্রণের ইচ্ছা আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আমি সম্মতি দিইনি, কারণ, ইতিপূর্ব্বেই আপনি এটা আপনার জন্যে রাখবার কথা আমাকে বলেছেন। তবে আপনি নিজেই দেখবেন, অন্ততঃ আংশিকভাবে এই পুস্তকের কতকগুলি অধ্যায় প্রকাশ করবার জন্যে তাঁর সঙ্গে আপনার মতের মিল হতে পারে কি না।

অনুনয় করছি আমাকে বিশ্বাস করুন, আপনার প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তি আছে। ইতি—

ভবদীয়
রোঁমা রোঁলা

স্বামী শিবানন্দকে লিখিত

ভিলা ওলগা, ভিলেনিউভ (ভোঁদ)
সুইজারল্যাণ্ড, ২১শে মার্চ্চ ১৯২৮

শ্রদ্ধেয় স্বামী শিবানন্দ সমীপেষু,—

গত ডিসেম্বর মাসে আপনার সুদীর্ঘ পত্র পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। ধন্যবাদ প্রেরণ করতে দেরী হ'ল, তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার পত্রের বহুমূল্য স্মৃতি-বিজড়িত ভাবগর্ভ তথ্যগুলি পড়ে আমি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেছি। আমি যে পুস্তক রচনা করেছি, তাতে ঐগুলো খুবই কাজে লাগবে। এই রচনায় যে যথেষ্ট বিলম্ব হচ্ছে সে শুধু আমার অন্যান্য কাজও শেষ করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে বলেই নয়, এর চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করাও প্রয়োজন। কিন্তু, এখন আমি উৎসুক হয়েছি, এবার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লেখায় হাত দিতে পারব। আমি একটু বিলম্বিত লয়েই চলেছি, কারণ তাতে ভাল করে বুঝে লিখতে পারব। আমি আমার চোখের সামনে দেখছি এই দুটি মহৎ জীবন (গুরু এবং তাঁর অনুপ্রাণিত শিষ্য),—যেন একটা বিরাট নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে তার ক্রমবর্দ্ধমান আয়তন নিয়ে অবিরামগতি সাগরের দিকে ছুটে চলেছে। এর যেন শেষ নেই; আকাশের মেঘ শুষে নিচ্ছে সাগরের জল, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নদীর উৎপত্তিস্থানে যোগান দেবার জন্যে।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী শিবানন্দ, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ

পুনশ্চ :—বড়ই আক্ষেপ রইল যে স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের" সুন্দর জীবনের মাত্র দুটি খণ্ড (ইংরাজিতে) প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি, তাঁর পাণ্ডুলিপিতে আরও লেখবার জন্য অন্ততঃ কিছু তথ্য তিনি রেখে গেছেন।

গুরুদেবের অন্তরঙ্গ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কথোপকথনচ্ছলে সাক্ষিস্বরূপ এক মহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব।

শ্রীমকে লিখিত স্বামী শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা

Mylapore
9. 10. 10.

My dear Master Mahasaya,

গত কল্য The Gospel of Sriji প্রেসে দেওয়া হইয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যেই আপনাকে form proof পাঠান হইবে। আপনার অভিপ্রায় অনুসারে Biblical forms of verbsগুলি যথাযথ পরিবর্ত্তন করিয়া দিব। আমরা এক্ষণে ১০০০ পুস্তকই মুদ্রিত করিব। কারণ, পুস্তক জমিলে বাঁধাই খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এ বৎসর (1910) সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আপনাকে ৫০ copy পাঠাইতে আশা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া additional matter যত শীঘ্র পারেন পাঠাইবেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় অতি ধীরে ধীরে একটু একটু বল পাইতেছি। খুব সাবধানেই আছি।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শরীর কিরূপ? শুনিতেছি, তিনি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার পর কোঠার যাত্রা করিবেন। মঠস্থ মহাত্মাগণের সমাচার কি? শ্রীযুক্ত বাবুরাম ৺কাশীধামে ভাল আছেন, তাঁহার পত্রে জানিলাম। সেখানে শান্তিরাম গিয়া অসুখে পড়িয়াছে। বোধ হয় এতদিন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পূর্ণও শীঘ্র ৺কাশীতে আসিবে, শুনিলাম।

আপনি অনুগ্রহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের ছবি ও আর আর যা ছবি আছে, তাহা·········ছেলেকে আমায় দিতে বলিবেন। আমি চাইলে হয়তো নাও দিতে পারে।

এখানে বর্ষাকাল। এদেশে বর্ষাকাল। এদেশে দু'বার বর্ষা হয়। একবার যখন আমাদের দেশে বর্ষা সেই সময়, সেটা তত বেশী নয়। এর পর আর একটা এই সময়, এইটিই এখানকার প্রকৃত বর্ষা। শীত বড় একটা নাই, এখন হইতে চার-পাঁচ মাস এখানকার জলবায়ু খুব ভাল। তার পর বিপরীত গরম। ছয় মাস বড়ই কষ্ট হয়।

আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অচলা ভক্তি হয়। আপনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আমাদের অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবেন।

বসন্তরও অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবেন! শ্রীশ্রীমার আশীর্ব্বাদে তাহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। খুব পরিশ্রম করিতেছে। আজকাল তাহার বক্তৃতা দিবার শক্তি বেশ হইয়াছে। ছয় মাস Bostonএ এবং ছয় মাস Washingtonএ কার্য্য করে। আপনি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবেন এবং সকল ভক্তকে জানাবেন।

ইতি—
Your affly

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষকে লিখিত প্রমথ চৌধুরীর পত্র

1, Bright Street, Ballygange.

৭।৩।১৭

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি ও সেই সঙ্গে মাসিক তিনখানি পেলুম। কদিন থেকে আমি যে অসুখে ভুগছি তার বিশেষ অসুবিধাটুকুই এই যে তার দরুন কলম ধরাই মুস্কিল। তবু পত্রপাঠ তার উত্তর দিতে বসেছি—কেন না এই অসুখের কৃপায় আমার এখন অবসর আছে। সব সময় আমার চিঠি লেখবারও সময় থাকে না।

"ব্রজবেণু" সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ পড়লুম। তর্কের মুখে আলোচ্য বিষয়টি এত ফলাও হয়ে উঠেছে, যে তার সম্যক বিচার করতে হলে অন্ততঃ তিন চারটি প্রবন্ধ লেখা দরকার। তবে যতদূর সংক্ষেপে পারি এই বাদানুবাদ সম্বন্ধে আমার মত জানাচ্ছি!

আপনার প্রবন্ধের প্রধান গুণ, তার স্পষ্টবাদিতা। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। বহুকাল পূর্ব্বে আমি জয়দেব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি। তাতে আমি এই কথা বলি, যে তাঁর কবিতা দেহ-সর্ব্বস্ব। তখন আমার অল্পবয়েস, সুতরাং উক্ত প্রবন্ধে আমার মত অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করি। সে মত যে আমি অদ্যাবধি পরিবর্ত্তন করিনি তার প্রমাণ আমার জয়দেবের উপর সনেটে দেখতে পাবেন। জয়দেবের কবিতার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, এমন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির যে অন্যমত হতে পারে এও আমার ধারণার বহির্ভূত। আর এ বিষয়ে আমরা এ যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই যে একমত তার প্রমাণ, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যে আমরা তার নগ্নতা চাপা দিতে চাই। ও সব হচ্ছে আমাদের নিজের মনভোলানো কথা। আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে ও জিনিষ কাব্য হিসেবে অচল তাই মুখে বলি তা রূপক। জয়দেব যদি সত্যসত্যই জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন রাধাকৃষ্ণ দেহের নামে বেনামি করে থাকেন—তাহলে এতদিনে ও কবিতার উপর আত্মার দাবী তামাদি হয়ে গেছে। কিন্তু জয়দেব দেহ বস্তুটাকে আত্মার রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন এরূপ অনুমান করবার কোনও বৈধ কারণ নেই। গীত-গোবিন্দের মূল হচ্ছে ভাগবতের রাসলীলাধ্যায়। সেই অধ্যায়টি পাঠ করলেই দেখতে পাবেন যে—ব্রজলীলার কথা শুনে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভগবানের অবতার কি কারণে এমন পার্থিব কার্য্য করেন। শুকদেব উত্তরে কোনরূপে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে এই মাত্র বলেন যে—যে ব্যক্তির "ঐশ্বর্য্য" আছে তাঁর চরিত্র এতই বিচিত্র যে তাঁর কার্য্যকলাপ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। শুকদেব ব্রজলীলা ব্যাপারটা যে iiterally নিয়েছিলেন, তার প্রমাণ—তাঁর মতে উক্ত লীলা মানুষের পক্ষে অনুকরণ করবার বস্তু ত নয়ই বরং ও ব্যাপার স্মরণ করাতেও পাপ আছে। আসল কথা এই যে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের আসঙ্গলিপ্সাই রাধাকৃষ্ণের নামে বেনামি করা হয়েছে।

আপনার প্রবন্ধ নিয়ে সমালোচকেরা যে কেন এতটা উতলা হয়ে উঠেছেন তা বুঝতে পারলুম না। যদি ব্রজবেণুর পরিচয় পত্রে কখনই ও প্রবন্ধ লিখতেন না? কেন না sex love যে কবিতার বিষয় হতে পারে এ-কথা যখন কেউ অস্বীকার করে না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনিও করেন না। পৃথিবীর অধিকাংশ কবিতাই ত প্রেমমূলক তবে স্ত্রী-পুরুষের একের প্রতি অপরের টানটাকে সসীম অসীমের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ বলায় একটু বেশী বলা হয়। কেন না এ ক্ষেত্রে উভয়েই সমান সীমাবদ্ধ এবং উভয়েরি পতন চৌদ্দপোয়া। নবীন কবিরা যদি এই মামুলি ব্যাপারের মধ্যে একটা "অনন্ত ও চিরন্তন" তথ্য দেখতে চান তাহলে অন্তত এ যুগে তাঁদের দৃষ্টি রক্ত-মাংসের সীমায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না। অব্যক্তের প্রতি ব্যক্তের অভিসার যে কবির প্রতিপাদ্য বিষয়—তাঁকে এ যুগে ব্যক্ত অর্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুঝতে হবে। এবং অব্যক্তকে ব্যক্তের ভিতর আমাদের খুঁজতে হবে—অর্থাৎ বিশ্বরূপের মধ্যেই অরূপ অথবা স্বরূপের সাক্ষাৎলাভ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। সুতরাং তাঁর কবিতায় এদেশের—একালের যুগধর্ম্মই ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে আপনি যা বলেছেন আমি তা সম্পূ গ্রাহ্য করি। তবে আপনি বোধ হয় এ কথা বলতে চান না যে—সকল কবিকেই দুনিয়াটাকে রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে দেখতে হবে। নিজের চোখ দিয়ে যিনি বিশ্বটাকে দেখতে না পারেন তিনি—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক যা খুসি তাই হতে পারেন কিন্তু কবি নন। Theism থেকে সুরু করে ATheism পর্য্যন্ত যত রকম 'ism' আছে, সবই কাব্যের উপাদান হ'তে পারে যদি সে 'ism' কবির নিজস্ব হয়। এবং তার প্রকাশের ভিতর গভীর আনন্দ কি বেদনার পরিচয় থাকে। তবে এ কথা খুব ঠিক যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনটাকে এ যুগে দেহের গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রেখে আমাদের মনের তৃপ্তি হয় না। Sex loveএর স্পষ্টাস্পষ্টি বর্ণনাও তেমন অরুচিকর নয়; যেমন ঐ জিনিসের আত্মার ছদ্মবেশ ধারণ। এ বিষয়ে যা সত্যকথা তা আপনি বলে দিয়েছেন! বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা যে সব রসের সাক্ষাৎ পাই, যথা বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি সে সবই হচ্ছে মানুষ মাত্রেরই জানা জিনিষ, আর সেই সুপরিচিত মনোভাবগুলির—সুললিত ভাষায় প্রকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। যদি আমাদের আটপৌরে হৃদয়বৃত্তিগুলি আধ্যাত্মিক হয় তাহলে অবশ্য জয়দেব থেকে দাশরথি রায় পর্য্যন্ত সকল কবিই সমান আধ্যাত্মিক। আর যদি আত্মা অর্থে আমাদের সাংসারিক মনের অতিরিক্ত কোনও বস্তু বোঝায় তাহলে ও-সব কবির লেখায় আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নেই। ও-শ্রেণীর কবিতা পড়ে যাঁদের হৃদয়-মন উল্লসিত হয়ে উঠে তাঁদের, আমি কোনই দোষ দেই নে! কেন না যা নিতান্ত human তা humauityকে আকৃষ্ট করবেই। তবে গেরস্ত মনোভাবই যে মানুষের মনের একমাত্র সম্বল তা নয়—যাকে আমরা spiritual বলি, তাও মানুষেরই মনোভাব—অতএব তাও human—তবে তা সকলের মনোভাব নয় বলে তাকে abstraction বলে উড়িয়ে দেবার প্রবৃত্তি সহজ মানুষের মনে সহজেই আসে। আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদই হচ্ছে পুরোপুরি spirirual,—সুতরাং উপনিষদের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—সুতরাং বৈদান্তিক মনোভাব অনেকের কাছে অবজ্ঞার পদার্থ। এ ত হবারই কথা। সম্ভবতঃ এই জন্যেই

হোক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় যে বলেছেন যে, "বৈষ্ণবরা উপনিষদকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না"—এ কথা শুনে বড়ই আশ্চর্য্য হলুম। সম্ভবতঃ তিনি 'বৈষ্ণব' নয় বোষ্টমের কাছ থেকে উদ্ধার করেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে এ জ্ঞান শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই আছে যে বেদান্তই হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল দর্শন। রামানুজ, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতিরা বেদান্তের জগদ্বিখ্যাত টীকাকার। আর ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৈষ্ণবই হচ্ছে হয় বল্লভাচার্য্য, নয় রামানুজ-পন্থী। এ বিষয়ে বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মও একঘরে নয়, আমি "বেদান্ত মানি কিন্তু আচার্য্যকে মানি নে" এ কথা সার্ব্বভৌমকে স্বয়ং চৈতন্যদেব বলেন। এখানে বেদান্ত অর্থে উপনিষদ এবং আচার্য্যের অর্থ শঙ্কর। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ শুধু চৈতন্য নন—এ ভূভারতের কোনও বৈষ্ণবগুরু কস্মিন্ কালেও মানেননি; কেননা তাঁদের মতে অদ্বৈতবাদ আসলে প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। চৈতন্যদেবের মতে ছান্দোগ্য উপনিষদের—'তত্ত্বমসি' এই বচনটি সমগ্র উপনিষদের সকল কথার বিরোধী। এবং ঐ একটি বচনের উপর শঙ্কর তাঁর সমস্ত ভাষ্য খাড়া করেছেন। যে মতে জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদ ভ্রমাত্মক, সে মতের উপর কোনও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতবাদের বিরোধী হওয়ার অর্থ উপনিষদের বিরোধী হওয়া নয়। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এই তিন মতের উপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের তিনটি শাখা প্রতিষ্ঠিত এবং এই সকল মতেরই মূল হচ্ছে উপনিষদ। সম্ভবতঃ কৃষ্ণবিহারী বাবু দ্বৈতবাদ অর্থে বোঝেন সাংখ্যমত—যার মূল কথা হচ্ছে পুরুষ-প্রকৃতির ঐকান্তিক প্রভেদ। তান্ত্রিক ধর্ম্ম অবশ্য এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তান্ত্রিকদের ধর্ম্ম-সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে পুরুষ প্রকৃতির মিলন। "যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ যত্র নারী তত্র গৌরী।"—এ হচ্ছে তান্ত্রিক মত—বৈষ্ণব মত নয়!

তবে কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃতি নিয়ে সাধনার কথা যে নেই, তা নয়। অন্ততঃ সহজিয়া মতটা ঐ তান্ত্রিক মতেরই রূপান্তর। চিন্তাদাস সহজিয়া ছিলেন—এই কথাটা মনে রাখলে আমরা অনেক পদাবলীর ভিতরকার কথা সহজেই বুঝতে পারব। কিন্তু খাঁটি বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই। তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে মানুষের হাতে কেন সহজেই প্রকৃতি পুরুষ হয়ে ওঠে, তা বোঝা কঠিন নয়—আমাদের প্রবৃত্তিই আমাদেরও ভুল করায়। দেখতে দেখতে অনেকখানি লিখে ফেললুম—এখন থামা দরকার।

আমি 'ব্রজবেণু' পড়িনি—সুতরাং সে বইয়ে কি আছে না আছে আমি জানি নে। সুতরাং উক্ত কবিতা পুস্তক সম্বন্ধে আপনার মতামত সঙ্গত কি অসঙ্গত বলিতে পারি। তবে আপনার সমালোচকদের কথা হতেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, উক্ত কাব্যের সঙ্গে তার পরিচয়পত্রের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। তাই যদি হয়, তাহলে আপনার প্রবন্ধ নিয়ে এত গোলযোগ করা হচ্ছে কেন বুঝতে পারলুম না। স্বাক্ষর শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
গরিফা, পোঃ—২৪ পরগণা।

খেদ নাই

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার পত্র বিশ্বভুবনে সকল দেশেতে ছড়ায়ে রাজে
ভারত বাহিরে কিন্তু কোথাও কখনো যাইনি স্বদেশ ত্যজে।
ইয়োর য়্যামেরিকা, মরু য়্যাফ্রিকা, পর্বতমালা সাগর-তীর
মনোলোভা কত জনপদ শত, Nile ও Effel বা Vladimir,
Rio জ্যানাইরো Mississippi তীরও হয়নি কখনো জীবনে দেখা
দক্ষিণ সুমেরু দেখিতে কেমন, Ilopangoর তটের রেখা।

নিউ ইয়র্কের হট্টগোল আর Moscowর Bell কেমন বাজে
Nicobar দ্বীপ বন্দে কেমনে চন্দ্রিমা রাতে মধুর সাঁঝে
দূর ব্রহ্মের উচ্চ Pagoda মস্তক তুলি উচ্চ শির,
Pyramid শোভে মিশর ভূমেতে, শয়ান রাশায় Lenin বীর।
আমি ভ্রমিয়াছি স্বদেশের ভূমে দেখেছি পুরীর সাগর-তট,
হিমালয়ের হিম কন্দর, সাঁওতাল-ভূমে উচ্চ বট।

মহান্ তীর্থ বারাণসী আর বৃন্দাবনের নীল যমুনা
প্রিয়ার সমাধি হাসে আগ্রায়, ইন্দ্রপ্রস্থে কার আনাগোনা।
সোনার বাঙলা দুঃখেতে ভরা গোলাভরা ধান নাইকো আজ
অভাগা জনের ক্রন্দনে সেথা ভরিয়াছে হেরি প্রভাত-সাঁঝ;
সামগান উঠি একদা যেথায় আত্মীয় মানি দেবতাগণে
এই ভারতেই জ্ঞানের সাধনা চরম বিকাশি জেগেছে মনে
প্রাচুর্যে ভরা সেদিন জীবন সম্পদ ছিল সকল ঘরে
বিশ্বজনের ঈর্ষা জেগেছে সব হেরি এই ভারত 'পরে
জনমঙ্গল শঙ্খধ্বনি বেজেছে সেদিন মাঙ্গলিকে
পুনরাগমন সেদিনের হেথা যাচি, ডাকি প্রভু সে কারুণিকে।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্ভুত এই কেশিয়াড়ী গ্রামটি। এর ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি করুণ। পরিধি ছ' বর্গ-মাইল হবে। এককালে ঘন বসতি ছিল। জটাধর সেনাপতির বাবা ছিলেন এই গ্রামের ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে নাকি জলপান করতো। প্রশস্ত হাট, তখন সপ্তাহে বসতো তিন দিন। হাটের দিকের সুবিশাল দীঘিতে গদাধর জমিদার অসংখ্য পোনা ছাড়তেন। পশ্চিম দিকের বট গাছটার নীচে ছিল হিন্দুস্থানী পাহারাওয়াল'র আখড়া। মাছ পাহারা দিত সে রাত্রিকালে সাত ব্যাটারীর টর্চ্চ জ্বালিয়ে। গদাধরের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ চলতো আর সাঁওতাল ও উড়িয়া প্রজাদের অন্ততঃ হাজারখানা পাতা পড়তো। গদাধর নিজে যেমন দাঁড়িয়ে থেকে ওদের সমাদর করে খাওয়াতেন, তেমনি সালের খাজনা একটি পয়সা বাকি পড়লে বা জমির ধান একটি সের কম হলে খড়ম নিয়ে ধেয়ে আসতেন দোতলা থেকে। রক্তারক্তি কাণ্ড একটা হতোই বকেয়া খাজনা বা ধানের ব্যবস্থা না করলে। অথচ পুলিশ এতে নাক গলাতো না। গদাধরের দপ্তরখানার ফরাসে বসে টিনের পর টিন উড়ে যেত আর সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোও সব হয়ে যেত হাওয়া!

তার পর চাকা ঘুরতে লাগলো সেদিন থেকে যেদিন ম্যালেরিয়ার মশা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে ডিম ছাড়তে সুরু করলো। মড়ক লাগলো ম্যালেরিয়ার। গদাধর সেনাপতি স্বয়ং মাস কয়েক লড়াই করে অবশেষে ধরাশায়ী হলেন চিরদিনের মত। প্রজাদের বাড়ীতে বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো। ভয়ে আতঙ্কে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় করে প্রজারা গ্রাম ছেড়ে পালাতে সুরু করলো দলে দলে। বিরাট দীঘিতে কচুরী পানা দেখা দিল। হাটে আর বেচাকেনা নেই। তিন দিন থেকে এখন হাট এসে ঠেকেছে দু'দিনে। সেনাপতির বাড়ীর নাটমন্দিরে কেঁদো আর চামচিকের রাজত্ব, দোলমঞ্চে জঙ্গল, সিংহ-দরজার পাট খসে পড়ে গেছে।···স্যানিটারী ইনসপেক্টর প্রেমতোষ সেনের কাছ থেকে কেশিয়াড়ী গ্রামের এই মর্ম্মন্তুদ ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় ট্রের ওপর চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো ভৃত্য। বিকেল তখন গোটা চারেক হবে, সুতরাং চা ও খাবারে আপত্তি থাকবার কোনো কারণ নেই। প্রেমতোষ কিন্তু বক্তৃতার সুযোগ পেয়ে তখনো বলে যাচ্ছেন: বর্ত্তমান অবস্থা হচ্ছে এই গ্রামে মৃত্যুর হার জন্মের চেয়ে বেশী অর্থাৎ যে হারে লোক মরছে, বছর দশেক পর এ গাঁয়ে থাকবে শুধু বাঁশ-ঝোপ আর কাঁটা গাছ।

জিজ্ঞেস করলাম: কিন্তু ম্যালেরিয়া তাড়াবার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট কী করছেন?

চেষ্টার তো ক্রটি নেই। আমাদের যথাসাধ্য আমরা করছি।

চা খেতে-খেতে নানা রকম আলাপ-আলোচনা হতে লাগলো। আমার দেশ কোথায়, বাড়ীতে কে কে আছেন, কবে গ্রেপ্তার হয়েছি ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে এক সময় রাজনৈতিক প্রসঙ্গে এসে পড়লাম। প্রেমতোষ বললেন: যাই বলুন দ্বিজেন বাবু, ভুটো সাহেব মেরে দেশ স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। কংগ্রেসের 'স্বদেশী পথ' নির্দ্দেশ আমার খুব পছন্দ হয়। ওদের মালপত্র বয়কট করলেই ব্যাটারা ভাতে মরবে। তখন না পালিয়ে পথ থাকবে না।

কংগ্রেস ও বিপ্লবীদের মতবাদ নিয়ে এঁর সঙ্গে কী আর তর্ক করবো! ছোরাছুরি বা খুন-জখমের কথা শুনলে সাধারণ মানুষ আঁৎকে উঠবেই। কিন্তু কী করে বোঝাবো এদের যে, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। অস্ত্রোপচার যেখানে অপরিহার্য্য, সেখানে মিকশ্চারের ফাঁকা প্রবোধ কার্য্যকরী হবে কী করে? আর্জ্জির আঘাতে কাউকে কাবু করতে পারা গেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।······

অকস্মাৎ প্রেমতোষ বাবু জিজ্ঞেস করলেন: রয়েল সার্কাস দেখতে যাননি দ্বিজেন বাবু?

চমকে উঠলাম। এ প্রশ্ন কেন? ক্ষীরোদ বাবুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই সার্কাস প্রায় রোজই দেখেছি আমি। স্যানিটারী ইনসপেক্টারকে দেখিনি সেখানে। পাল্টা প্রশ্ন করলাম: কেন, আপনি দেখেননি?

না, ভাই। আমি গিয়েছিলাম সদরে। অনেকগুলো Adulteration-এর মামলা ছিল।—বলে লোকটি মৃদু মৃদু হেসে বলতে লাগলেন: আর দারোগা বাবুও তো ছিলেন না। কাজে কাজেই থানা তো আপনারই ছিল, কী বলেন?

কী রকম?

প্রেমতোষ বললেন: রকম আর কি! দারোগা বাবু না থাকলে কে আর আপনাকে বাধা দেবে বলুন? কেন বাধা দিতে যাবে? তা ভালোই করেছেন দ্বিজেন বাবু! এখানে সার্কাস হবে আর আপনি তা দেখতে পাবেন না, এ আমার ভালো লাগে না। কিন্তু কেমন সার্কাস বলুন তো? দেখবার মত তো?

বললাম যে, একেবারে গ্রাম্য নয়। তবে প্রায় খেলাই balancing-এর খেলা। টাকা-পয়সা বোধ হয় তেমন পায়নি, কারণ দেখা গেল সবই বিনে পয়সায় দেখবার গ্রাহক। সার্কাসের গল্প হতে-হতে প্রেমতোষ আরও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বসলো যে, জটাধর সেনাপতির তাসের আড্ডায় আমি যাই কিনা, সেখানকার অপূর্ব্ব পান ও দামী সিগারেট আমার ভাগ্যে জুটেছে কিনা। আফিম-ভেণ্ডার গোপাল রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে কিনা, প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মাষ্টার নীলরতন জানা কেমন লোক, কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী কবে আসছেন ইত্যাদি। এমনি ভাবে প্রেমতোষের প্রশ্নের জবাব দিতে-দিতে অকস্মাৎ মনে খট্‌কা বেধে গেল, লোকটির ঔৎসুক্য এত বেশী কেন? কারণ কী?

সতর্ক হতে যাবো, এমন সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। চেয়ে দেখি, মাথার ওপর ঝোলানো রয়েছে পেতলের একটি মাঝারী আকারের ঘণ্টা, যেমনটি থাকে মন্দির-প্রবেশদ্বারে—দর্শনেচ্ছুরা ওটা বাজিয়ে দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। দেখলাম, দোলকটির সঙ্গে সরু দড়ি বাঁধা, আর তার অপর প্রান্ত বেড়ার ফাঁক দিয়ে অন্দরের দিকে চলে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম: ও কি, ঘণ্টা কিসের প্রেমতোষ বাবু?

সহাস্যে জবাব দিলেন প্রেমতোষ এবং সগর্ব্বে: হার একসেলেন্সি কলিং। অর্থাৎ প্রায় সময়ই এখানে এত লোকজন থাকেন যে,

শ্রীমতী প্রয়োজন হলে আমায় আর ডাকতেই পারেন না এখানে এসে। তাই ঘণ্টা করে দিয়েছি, দরকার হলেই দড়িতে টান দেন। —ভালো ব্যবস্থা হয়নি দ্বিজেন বাবু?

এবার উচ্চৈঃস্বরে না হেসে পারা গেল না। বললাম: আপনি একজন অফিসার। আপনি এমনিই ভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকবেন বেয়ারাকে। আর তা নয়, আপনাকেই তলব করবার জন্য এই ব্যবস্থা? যাঁরা থাকেন, সবাই বেশ উপভোগ করেন না এই ঘণ্টাধ্বনি?

প্রেমতোষ ছাগলের মতো হা-হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন: কিন্তু কেমন অরিজিন্যালিটি বলুন তো?—কিন্তু বসুন ভাই এক মিনিট, আসছি। আমার বড় সাহেব নয়, বড় মেমের আহ্বান কিনা—বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। থানায় একবার হাজিরা দিয়ে জানাতে হবে যে আমি বেঁচে আছি এবং পলায়ন করিনি। ক্ষীরোদ বাবু নেই, সুতরাং সময়ানুবর্ত্তিতার কড়াকড়িও নেই।

অবিনাশ বাবু দেখেই বললেন: আসুন, আসুন! রামভরসা সিং, ঐ চেয়ারখানা ডেটিনিউ বাবুকে এগিয়ে দাও!

বসলাম। ঘরে আর কেউ ছিল না। শুধু সুধীর এক পাশে বসে কী লিখছে। আর দরওয়াজা রামভরসা বারান্দায় একটু আড়ালে টুলের ওপর বসে পাহারায় রত। কিংবা বিড়ি টানছে। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে অবিনাশ বাবু বলতে লাগলেন: আপনাকে তো মশাই একান্তে আর পাওয়াই যায় না। আর আজকাল হরিমতীর আদর-যত্নে আমাদের কথা বোধ হয় আর মনেই পড়ে না, তাই না দ্বিজেন বাবু?

ভালো লাগলো না কথাটা! বললাম: আদর-যত্ন মানে? ঝি, মাসের শেষে পাঁচ টাকা মাইনে দিই, পেটের দায়ে খাটে, তার আবার আদরই বা কি, যত্নই বা কি?

হেঁ হেঁ শব্দ করে বিশ্রি ভাবে হেসে উঠলেন অবিনাশ বাবু। লক্ষ্য করলাম সুধীরের অধরেও হাসির ঝিলিক। ভালো লাগলো না এবং আরও খারাপ লাগতে লাগলো তখন, যখন অবিনাশ বাবু সবিস্তারে, সবিশ্বাসে টিকা ও টিপ্পনী সহযোগে শ্রীমতী হরিমতীর গৌরবোজ্জ্বল পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণনা সুরু করলেন! যৌবনে হরিমতী ছিল এ তল্লাটের ক্লিওপেট্রা! প্রসাদ বিতরণে কার্পণ্য ছিল না তার কোনো দিন এবং গদাধর সেনাপতি থেকে সুরু করে গোপাল রায় পর্য্যন্ত সবাই একাধিক বার হরিমতীর গৃহে পদার্পণ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছেন। তার পর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গ্রাম যেমন ছারখার হয়ে গেল, তেমনি দীর্ঘদিন স্থায়ী রোগে উর্ব্বশী হরিমতীর যৌবনের বিভা অকালে নিষ্প্রভ হয়ে এল। ফলে পসার গেল কমে।···তার পর এলেন দারোগা ক্ষীরোদ বাবু। ডুবুরির মতো রত্নটিকে খুঁজে নিতে তাঁর দেরী হলো না। এখন ক্ষীরোদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের সোল এজেন্সী নিয়েছে এই হরিমতী। অবিনাশ বাবু বললেন: আপনার এখানে চাকরি হওয়াতে বেশ সুবিধেই হয়েছে দারোগা বাবুর। অর্ডারগুলো তাড়াতাড়ি দেয়া যায় আর মালের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় সহজেই। কি বল সুধীর?

সুধীর টিপ্পনী কাটলো: তা—ডেটিনিউ বাবুকেও কোন্ দিন বঁড়শীতে গেঁথে ফেলবে কে জানে!

জিজ্ঞেস করলাম: এ্যাদ্দিন বলেননি কেন?

বলবো কি মশাই! আপনি তো এখন ক্ষীরোদ বাবুর কথাই বেদবাক্য মনে করেন। আমাদের মতো চুণোপুঁটি জমাদার আর সুধীরের মতো চ্যাংটাকি এল-সিকে তো আর চোখেই দেখতে পান না। কি বল সুধীর?—বলে অবিনাশ বাবু আবার হাসতে লাগলেন।

দরওয়াজা এসে একখানা আর্জ্জি জমাদারের হাতে দিয়ে জানালো, বাইরে দুটো মরদ আর দুটো মাগী এসেছে দেখা করতে।

উঠে পড়লাম। ঘরে এসে বিছানায় সটান শুয়ে পড়লাম। জানালার ঝাঁপ তোলা ছিল। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো আকাশ আর সেই টুকরোটুকুর মধ্যে আঁকা একখানি বেশ বড় চাঁদ। চাঁদের আলোয় চারি দিকের বাঁশ-ঝোপ ও জঙ্গলের শীর্ষদেশ আলোয় উদ্ভাসিত। দূরে কোথায় সাঁওতালদের মাদল বাজছে। থানার সীমানার বাইরে গোটা কয়েক ধানের ক্ষেতে চাঁদের আলো ঝিরঝির করে কাঁপছে। আমার বাগানে ফুটছে অজস্র বেলফুল ও রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ আর যুঁই। চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছে। এমনি চাঁদ যেন অনেক কাল দেখিনি আর এমনি ঝিরঝিরে হাওয়া এত মিষ্টি লাগেনি।···কতক্ষণ চুপ করে ছিলাম ও কখন চোখের পাতা জুড়ে এসেছিল জানি না, অকস্মাৎ হরিমতীর ডাকে চমক্ ভাঙলো।

দাদাবাবু, খাবার দিয়েছি।

রান্নাঘরে বসবার যথেষ্ট জায়গা থাকলেও হরিমতী এ-ঘরের মেঝেতেই আমার আসন পাততো। ও-ঘরের কালিঝুলির মধ্যে নাকি আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। মাটির মেঝে পরিপাটি করে নিকিয়ে নিয়ে আসন পেতে দিয়েছে। খাবার জলের গ্লাসটি একখানা রেকাবি দিয়ে ঢাকা, তার ওপর নুণ, লেবু ও কাঁচা লঙ্কা। থালার মাঝখানে ভাত, সযত্নে একেবারে নিখুঁত পাহাড়ের চূড়া তৈরী করা হয়েছে। আশে-পাশে কয়েক রকমের ব্যঞ্জন। আমি বসতে হরিমতী পাখাখানা হাতে তুলে নিল।

বললাম: হাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু সে শুনলো না। একটু পর বললো বেশ মিষ্টি করে: বাড়ীতে থাকলে মা হয়তো এমনি করে বসে-বসে খাওয়াতেন।

চুপ করে রইলাম। কথাটা মিথ্যে নয়। আমার খাবার সময় যেখানেই যে কাজেই থাকুন না কেন, মা ছুটে আসতেনই।···একটু পরে হরিমতী বোধ হয় আমার নীরবতায় সাহস সঞ্চয় করে মুচকি হেসে পাখা নাড়তে-নাড়তে বললো: আর বিয়ের পর হলে বৌদি এমনি করে—

বাধা দিলাম: যাও, তুমি খেয়ে নাও, রাত দশটা বেজে গেছে। বাড়ী যাবে না?

পাখা রেখে উঠলো হরিমতী, বললো: না বাবু। দারোগা বাবু নেই, মা ঠাকরুণের একা ভয় করে। সেখানে আজ থাকতে হবে।

হরিমতী বেরিয়ে গেল। মনে পড়লো অবিনাশ বাবুর কথা, সোল এজেন্সী নিয়েছে হরিমতী!···

আহার শেষ করে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, জলের ঘটি নিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হরিমতী। মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি তোয়ালে হাতে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হরিমতী। মুখ মুছে ঘরে এসে দেখি ভাজা·

মশলার ডিবে নিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হরিমতী। বিছানায় গা এলিয়ে দিতে গিয়ে দেখি সারা শয্যায় ছড়ানো অজস্র বেল ফুল ও রজনীগন্ধা।···

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসনকোসন মেজে কখন যে সে রান্নাঘরে তালা বন্ধ করে ফেলেছে, টেরও পাইনি। চুপ করে চোখ বুজেই শুয়েছিলাম। কতক্ষণ ছিলাম জানি নে। অকস্মাৎ মনে হলো কে যেন আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। টেবিলের ওপর স্তিমিত-করা আলোকেও বুঝতে দেরী হলো না যে সে আর কেউ নয়, হরিমতী।

ধমক দিলাম ; কী চাও ?

সে কিন্তু এতটুকুও ভয় পেলো না, বললো : না, দেখছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না। মশারিটা ফেলে দোব ?

না, আমিই নোব'খন ফেলে, তুমি যাও।

চলে যাবার সময় সে বার বার করে সাবধান করে দিয়ে গেল, মশারি শুধু ফেললেই চলবে না, ভালো করে গুঁজে নিতে হবে। কারণ এখানে সাপের উপদ্রব নাকি ভয়ানক বেশী। ফুলের গন্ধে খাটের পা বেয়ে বিছানায় উঠে পড়াও বিচিত্র নয়। আমার মাথার দিব্যি রইলো, দাদাবাবু!—বলে সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল!

কিন্তু আমার জন্য হরিমতীর আদর ও যত্ন, চিন্তা ও ভাবনা এবং অবশেষে মাথার দিব্যি দিয়ে যাওয়া—একটু বেশী মনে হয় নাকি? কোনো প্রভুর জন্যই কি কোনো ভৃত্য এতখানি ভেবে থাকে, না এতখানি করে থাকে? পাঁচ টাকার বিনিময়ে এ যে পাঁচশো টাকার সওদা? সুধীরের টিপ্পনী মনে পড়লো, অবশেষে ডেটিনিউ বাবুকেও না গেঁথে ফেলে বঁড়শীতে।···ঘিন-ঘিন করে উঠলো সারা শরীর! তখনই স্থির করে ফেললাম, কালই বিদায় করে দোব বেটিকে। রান্না করবো নিজের হাতেই, নইলে মুড়ি খেয়ে থাকবো। কিন্তু দরজায় খিল আঁটতে গিয়ে দেখি, পাশে দাঁড়িয়ে হরিমতী।

সত্যিই রেগে গেলাম : আবার তুমি! কী চাও? এই না চলে গেলে দারোগা বাবুর বাড়ীতে?

সীমাহীন বিনয় প্রকাশ করে জবাব দিল সে : হ্যাঁ বাবু, গিয়েছিলাম। আবার ফিরে আসতে হলো। মা ঠাকরুণ আপনাকে একবার যেতে বলেছেন এখনই।

চমকে উঠলাম : এ্যাঁ, বল কি? মা ঠাকরুণ, মানে ক্ষীরোদ বাবুর স্ত্রী? দূর, আমায় ডাকবেন কেন? তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেই, পরিচয় নেই। তার পর আজ নেই দারোগা বাবু। আর এখন রাত এগারোটা পার হয়ে গেছে।—যাও এখন।

হরিমতী তবু বললো : কিন্তু তিনি যে বললেন খুব বিশেষ দরকার। একবার চলুন না দাদাবাবু!

কেন ?

তা তো কিছুই বলে দেননি। শুধু বলে দিয়েছেন, বলিস্, খুব জরুরী।

জরুরী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলে হরিমতী আর অপেক্ষা না করে ঘরে ঢুকলো। টেবিলের ওপর ছিল বড় তালাটা আর বালিশের তলায় চাবী। নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। দরজায় তালা লাগাবে।

গুলিয়ে গেল মাথাটা। রাত দুপুরে অপরিচিত মহিলার জরুরী আহ্বান? কেন? কী প্রয়োজন তাঁর থাকতে পারে আমার সঙ্গে? দারোগার অনুপস্থিতিতে সে বাড়ীতে যাওয়া বিসদৃশ নয় কি? ঔৎসুক্য জেগেছে আমার মনে, কিন্তু সংকোচেরও কমতি নেই, এমন সময় হরিমতী আমার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে বললো : চলুন।

এক পা এক পা করে তাকে অনুসরণ করতে হলো। অবিনাশের শয়ন-কক্ষের জানালায় দৃষ্টিক্ষেপ করলাম, অন্ধকার! ইন্‌স্পেকশন বাংলোও অন্ধকার, তালা বন্ধ। ক্ষুদ্র মাঠ অতিক্রম করে এসে এ বাড়ীর দরজায় পৌঁছুলাম। হরিমতী আবার বললো : আসুন, দাদাবাবু!

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে একেবারে ক্ষীরোদ দারোগার শয়ন-কক্ষে এসে প্রবেশ করলাম কতকটা সম্মোহিতের মতো! অকস্মাৎ চমক ভাঙলো, যখন দেখলাম উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সুন্দরী যুবতী মাথা নুইয়ে আমায় প্রণাম করছে! পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সে বলে উঠলো : আসুন দাদা, বসুন!

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো!

দাদা!······

৫০

সত্যি, দাদা সম্বোধন করেই সুরু করলেন ক্ষীরোদ দারোগার স্ত্রী। বলতে লাগলেন তাঁর পারিবারিক ইতিহাস···দরিদ্র পরিবার, বৃদ্ধ পিতা বাতব্যাধিগ্রস্ত হলেও যশোহরে কোন্ গ্রাম্য মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে আজও টাঙ্গস টাঙ্গস করে হেডমাষ্টারী চালিয়ে যাচ্ছেন। করুণাপরবশ হয়ে নয়, স্কুল কমিটি অপরিহার্য্য বিবেচনা করেই এই বৃদ্ধকে কিছুতেই বিদায় দেবার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। কারণ ওঁর পরিত্যক্ত আসনে বসবার মত যোগ্য ব্যক্তি আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। গরীব মধ্যবিত্ত পরিবার। উপচে পড়ে না, চলে যায়। দিদির বিয়েতে ক্ষীরোদ বাবু আসেন অন্যতম বরযাত্রী হয়ে। চা ও জলখাবার পরিবেশনের ভার পড়ে বোনের ওপর। ক্ষীরোদ বাবু এঁকে পছন্দ করে বসেন। বৃদ্ধ বাতব্যাধিগ্রস্ত অসহায় শিক্ষক আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। দিদির বিয়ের আলপনা শুকোতে না-শুকোতেই সাত দিনের মধ্যেই বোনের বিয়ে হয়ে গেল। ক্ষীরোদ বাবু তখন মাত্র এল-সি।

পিতৃকুলের পরিচয় দেবার পর এবার মহিলাটি সুরু করলেন স্বামীর ইতিবৃত্ত। বাধা দিতে গেলাম, কারণ এতে আমার লাভ লোকসান কিছুই নেই, কোনো সম্পর্ক নেই। পারিবারিক কূটনৈতিক ক্লেদাক্ত পরিবেশের অনেক ঊর্দ্ধে বিচরণ করি আমরা। কাদায় বাস করি, কিন্তু গায়ে কাদা লাগে না! কিন্তু কোন বাধা মানলেন না তিনি। বেদনাহত কণ্ঠে বলতে লাগলেন : আপনাকে দেখতে অনেকটা আমার দাদার মতো। হরিমতীর কাছে শুনেছি দাদার মতোই আপনি সাদা ফুল খুব ভালোবাসেন। তাই দাদা বলেই ডেকেছি আপনাকে। হয়তো সেটা হয়েছে আমার স্পর্দ্ধা, আপনাদের মতো দেশের সুসন্তানের বোন হবার যোগ্য আমি নই।

মহিলাটির কণ্ঠ ভেঙে পড়লো। বললাম : না, না, ও কি বলছেন আপনি? আপনার যোগ্যতা আপনি কেন বিচার করবেন? সে ভার থাক্ আমার ওপর। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো?

একটু অপেক্ষা করুন, আসছি।—বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন

বারান্দায়। হরিমতী আমায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছি না। বোধ হয় তার খোঁজেই গেলেন। কিন্তু ভারী অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বাড়ীর কর্ত্তার অনুপস্থিতিতে গভীর রাত্রে তাঁর নিভৃত কক্ষে তাঁর যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে যতই বেদ বা উপনিষদ আলোচনা হোক না কেন, কখনও কেউ এর ভালো অর্থ করবে না। ক্ষীরোদ দারোগার কানে যাবেই সোল এজেন্ট হরিমতী মারফৎ, তার পর কে জানে ব্যাটা আমার নামে বিশ্রি একটা বদনাম দিয়ে ডায়েরী করেই ফেলবে কিনা—

উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ফিরে এলেন ক্ষীরোদ-গৃহিণী। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন: দেখে এলাম হরিমতী ঘুমিয়েছে কি না। ঘুমিয়েছে।—দাদা, এই মেয়েলোকটাই নষ্ট করলো আমার স্বামীকে। মফঃস্বলে গিয়ে যা করেন, তা তো আর চোখে দেখতে হয় না। কিন্তু ফিরে এলেও প্রায়ই এই বেটি ওঁকে নিয়ে যায় গভীর রাত্রে সাঁওতাল পাড়ায়।

প্রশ্ন করলাম: কখন?

রাত্রে। আপনার ওখানকার কাজ সেরে আপনি মনে করেন হরিমতী বুঝি লক্ষ্মী মেয়ের মতো তার বাড়ীতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ছাড়া যায় না।—দাদা, দেশের ও দশের উপকার করবার ব্রতই আপনারা গ্রহণ করেছেন জানি। আমার মতো নগণ্য বোনের একটা উপকার করবেন?

মহিলাটির কণ্ঠে অশ্রুসজল আবেগ। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারা কঠিন, নিদ্দয়তা মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম: কী উপকার বলুন তো?

তিনি বললেন: আপনি একটু জোর দিয়ে ওঁকে বলবেন এই সব নোংরা স্বভাব ছাড়বার জন্য? আপনাকে ভয় করেন উনি।

ভয়!—জিজ্ঞেস করলাম: ভয় করবেন কেন?

এবার হেসে ফেললেন মহিলাটি: উনি বলেন আপনারা নাকি কথায় কথায় রিভলভার চালান। শুধু উনি কেন, স্বয়ং গভর্ণমেণ্টও আপনাদের ভয় করে আর সেই জন্যই ধরে রেখেছে তারা।

বললাম: মিথ্যে বদনাম। এতে কান দেবেন না আপনি। আমার রিভলভার থাকলেও চুরি-করা রিভলভার, লুকোনো থাকে। আর দারোগা বাবর রিভলভার শোভা পায় তাঁর বেল্ট-এ। তার পর দুটো রাইফেল আছে থানায়।—সে কথা যাক্। কিন্তু ক্ষীরোদ বাবুকে আমি কী ভাবে বলবো?

যে ভাবে বললে কুপথ উনি ছেড়ে দেন, কুখাদ্য ছেড়ে দেন। আপনাকে বেশী আর কী বলবো? আপনি আমার দাদার মতো, দুঃখিনী বোনের জীবনটা যদি বাঁচিয়ে দিতে পারেন—

একটু পর চলে এলাম নিজের ঘরে। ভারী লাগছিলো মন!··· মশারির মধ্যে এসে গেছে চাঁদের আলো। বালিশের পাশেই অজস্র রজনীগন্ধা আর বেলফুল। সত্যিই, সাদা ফুল ভারী ভালবাসি আমি। হরিমতী ছড়িয়ে রেখে গেছে। ক্লিওপেট্রার রূপের দেয়ালী নিবে গেছে, কিন্তু মনের আগুন এখনো জ্বলছে গন-গন করে। তাই শীকার দেখলেই সে আগুনের শিখা লক-লক করে ওঠে। কিন্তু এ্যাসবেসটসের সাক্ষাৎ বোধ হয় পায়নি সে! এবার পেল। ···বেটিকে কালই বিদায় করে দিতে হবে।

কিন্তু ঘুম এলো না সহজে। দুঃখিনী বোনের কথা বার বার মনে হতে লাগলো। জীবনে এঁর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, এখান থেকে চলে যাবার পর সারা জীবনে দ্বিতীয় বার হয়তো দেখা হবে না। কিন্তু কতখানি দুঃখ পেলে যে এমনি নিতান্ত অজানা ও অনাত্মীয় লোককেই এঁরা পরম সুহৃদ বলে মনে করেন এবং তাঁর কাছেই ব্যর্থ জীবনের অশ্রুসজল ইতিহাস নিবেদন করে সকাতর সাহায্য প্রার্থনা করে বসেন, মর্ম্ম দিয়ে তা অনুভব করতে লাগলাম। হয়তো এঁর জীবনের শেষ আশার প্রদীপটুকুও নিবে গেছে মাতাল ও দুশ্চরিত্র স্বামীর নির্দ্দয় অত্যাচারে। নীরবে সইতে হচ্ছে অবমাননার কশাঘাত। তাই মজ্জমানের মতো তৃণখণ্ডকেই জাপটে ধরতে চেষ্টা করছেন বাঁচবার আশায়। কিন্তু আমি জানি, কাচের বাসনের মতো ভেঙে পড়বে এঁর সর্ব্ব প্রয়াস অপদার্থ স্বামীর উৎপীড়নে। কোনো পথ নেই রেহাই পাবার! ধূ-ধূ-করা দিগন্তপ্রসারী জীবন-মরুতে একটুখানি ওয়েসিসের সন্ধানে বাংলা দেশের এমনি কত দুঃখিনীই যে দিশেহারার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সর্ব্বহারা কত বোনই যে এমনি নিরুপায় ভাইয়ের পায়ের তলায় একটুখানি সান্ত্বনা খুঁজে মরছে, পারিবারিক লৌহ-যবনিকার অন্তরালে এমনি কত দীর্ঘশ্বাস ও আকুতিই যে গুমরে গুমরে মরছে, কে তার সংবাদ রাখে! পতি পরমগুরুর হিটলারী অনুশাসনের যূপকাষ্ঠে কত নিরীহ নারীই যে নীরবে আত্মোৎসর্গ করছে, সমাজের কল্যাণকামীদের তা জানবার আগ্রহ কোথায়?···

পরদিন ভোরেই হরিমতী এসে সতর্ক করে দিল আমায় পরম সুহৃদের মতো: বাবু, কাল রাতের খবর দারোগা বাবু যেন জানতে না পারেন। তাহলে মা ঠাকরুণের আর রক্ষে রাখবেন না। বড্ড বদরাগী লোক।

কথার জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। মনে-মনে বললাম: কী আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী রে! সতর্ক করে দিতে এসেছেন! অথচ জানি সবার আগে এই বেটিই গিয়ে লাগিয়ে আসবে ওর মালিকের কানে।

সার্ট গায়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, বাধা দিল হরিমতী: সে কি, কোথায় যাচ্ছেন দাদাবাবু, আমি যে চায়ের জল চাপিয়ে এলাম। পরোটা আর হালুয়া করে দি?

গম্ভীর মুখে জবাব দিলাম: বিনোদ বাবুর ওখানে চা খাবার নেমন্তন্ন আছে।

বিনোদ বাবুর ওখানে ষ্টোভে চা তৈরী হলো, সঙ্গে তেলমুড়ি। এমনি নিশ্চিন্ত অবসর, তাতে চা, সুতরাং চায়ের বাটিতে ঝড় উঠবেই। গত রাত্রের উপন্যাস বিবৃত করলাম। বিনোদ বাবুও বললেন হরিমতীকে তাড়িয়ে দিতে। ষ্টোভে ডিমের ডালনা আর ভাত তাঁর ওখানেই দু'বেলা বেশ চলে যেতে পারবে জানিয়ে দিলেন। একটা চাকরও মিলে যেতে পারে। অবিনাশ বাবুকে জানাতে বললেন। আলোচনায় স্যানিটারী ইনসপেক্টার প্রেমতোষও এসে পড়লো। বিনোদ বাবু অনেক দ্বিধা ও সংকোচ করে বললেন যে, ঐ ব্যাটাই দারোগার একমাত্র পরম নিষ্ঠাবান টিকটিকি। গাঁয়ের প্রত্যেকটি সংবাদ সম্রাট-সমীপে নিবেদন না করলে ব্যাটার পেটের ভাত হজম হয় না! বললেন: আপনাদের বলতেও ভয় করে দ্বিজেন বাবু, হয়তো বেচারাকে শেষ পর্য্যন্ত মেরেই বসবেন দু'ঘা।

ঘণ্টা খানেক পর বাসায় ফিরে দেখি শোবার ঘরে শেকল তোলা, রান্নাঘরেও। রামভরসা বললো যে, এইমাত্র দারোগা বাবু এসেছেন, হরিমতী তাঁর বাসায় গেছে।······নিশ্চয়ই বেটি সব জানিয়ে দিতে গেছে। এদিকে হরিমতী আর ওদিকে প্রেমতোষ। দুটিতে মিলে আমার কেশিয়াড়ীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে নাকি?······সুতরাং আর বিলম্ব করা চলে না, আসরে নেমে পড়তে হলো। শোবার ঘরে ও রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আবার। উনুনের ওপর তখন ডাল ফুটছিলো। যাক্, পুড়ে যাক্।

বিকেল পাঁচটায় থানায় ফিরে এসে আর দেখতে পেলাম না হরিমতীকে। দারোগাও কিছুই জানেন না, এমনি ভাব দেখালেন। আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম, সবই জানেন ক্ষীরোদ বাবু, সবই বুঝেছেন। অবিনাশ বাবুকে একটা চাকর সংগ্রহ করে দেবার অনুরোধ জানাতেই তিনি বললেন: নটবর নামে একটা ভালো ছেলেকে কাল থেকে লাগিয়ে দোব আপনার ওখানে। বয়স একটু কম। তাহলে কী হবে, কাজে খুব পাকা। আর চোর নয়। দুপুরটা যা হোক করে তো কেটেছে, এ রাতটা গরীবের বাড়ীতেই না-হয় দুটো ডাল-ভাত—

রাত হতে তখনো দেরী আছে। দুটো গেম ব্যাডমিণ্টন খেলে নেয়া যাবে। ডাক্তারখানার মাঠে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়। আমি এসেই এটা প্রবর্ত্তন করেছি। মাসে এক টাকা করে চাঁদা, র‍্যাকেট নিজের। ব্যাডমিণ্টন খেলায় বরাবর আমার সুনাম ছিল আর কোশিয়াড়ীতে এমনি ভাবে জমিয়ে তুলেছিলাম এই খেলার আড্ডা যে জটাধর সেনাপতিও উৎসাহী হয়ে মাঝে মাঝে খেলতে আসতেন। খেলার পর চলতো এন্তার পান ও সিগারেট, তার পর সন্ধ্যে হতেই তাস। ব্রিজ। রাত এগারোটা পর্য্যন্ত।

আজ কিন্তু মাঠে এসেই আমার মাথায় খুন চেপে গেল। প্রেমতোষ এসেছে, খেলছে সিঙ্গলস্ আও বিনোদ বাবুর সঙ্গে। খেলা ঘুচিয়ে দোব আজ!···নতুন করে দল গঠন হলো—আমি একা আর ওরা দু'জন। কা জানি কেন, আজ আর কেউ এলেন না। না জটাধর সেনাপতি, না গোপাল রায়, না সুধীর। ভালোই হলো, র‍্যাকেট আর ছাড়তে হলো না। দেখলাম, এই হচ্ছে সুযোগ! সন্ধ্যার পরই ক্ষীরোদ দারোগা যাচ্ছেন মফঃস্বলে আবার। থানায় তখন রাজত্ব করবেন অবিনাশ বাবু, অর্থাৎ পুর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে আমার পক্ষে। এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ!

নিরীহ বিনোদ বাবু প্রথমটা বুঝতেই পারেননি ব্যাপারটা। আমি ডাকলাম প্রেমতোষকে: প্রেমতোষ বাবু, পালাবেন না সাইকেলে করে—নামুন। আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

সাইকেলখানা ডাক্তারখানার বেড়াতে ঠেস দিয়ে রেখে এগিয়ে এলেন স্যানিটারী স্মার্ট বয়ের মতো।

কি, বলুন।

ভূমিকা করে কী হবে আর? তাই সোজাসুজি আসল কথা পাড়লাম। দেখা গেল, ঠিক জায়গায় ঘা পড়েছে। প্রথমটা তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, বক-ধার্ম্মিকের মতো ভালো ও সুন্দর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা সুরু করলেন, তার পর দ্বিতীয় বার ধমক খেয়ে তাঁর ওজস্বিনী ভাষা যেমন হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, তেমনি কণ্ঠেও যেন ঘড়-ঘড় করে উঠলো নিউমোনিয়ার শ্লেষ্মা। তৃতীয় বার ধমক দেবার পর প্রেমতোষ একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে পড়লো। আমার হাতে ধরে ক্ষমা চাইবার জন্য এগিয়ে আসতেই আমি কসে বসিয়ে দিলাম বাঁ গণ্ডে বেশ ভারী একটি চপেটাঘাত। সামলাতে না পেরে প্রেমতোষ মাটিতে পড়ে গেল। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো সে এবং ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে ইংরাজী ও বাংলা বুকনি ঝেড়ে যা বললো তার সারাংশ হচ্ছে যে, পরদিনই সে যাবে এস-ডি-ও'র কাছে, তাঁকে সব জানিয়ে গ্রেপ্তার করাবে আমায়, জেলে পাঠাবে আমায়। এমন কি, ফাঁসীও হয়ে যেতে পারে। আমার আর রক্ষে নেই, কারণ এত বড় একজন সরকারী অফিসার—

Shut up, you rascal! সরকারী অফিসার! চামচিকে আবার পাখী! জুতো মেরে তোর মুখ ভেঙে দোব!—বলে স্যাণ্ডেল নিয়ে ধাওয়া করতেই বিনোদ বাবু ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফেললেন আমায়: থামুন, দ্বিজেন বাবু, থামুন। রাগে আত্মহারা হবেন না।

আত্মহারা আদৌ হইনি। সরকারী ময়ূরপুচ্ছ এঁটে দাঁড়কাক আবার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ওজস্বিনী ভাষায়, তোবড়ানো গালে দু'ঘা পড়লেই ব্যাটার আসল কর্কশ স্বর কা-কা বেরিয়ে পড়তো। বিনোদ বাবুর জন্য হলো না। ভয় হলো তাঁর, পাছে রাগের মাথায় আমি একটা খুন-খারাবিই করে বসি। কারণ আমরা নাকি—

অনুমান তাঁর এতটুও মিথ্যে নয়। কিন্তু আত্মহারা হই নে আমরা কোনো দিন। ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে লোম্যান ও হড্‌সনকে গুলী করবার সময় আত্মহারা হয়ে পড়লে বিনয় বোসের গুলী তাঁদের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত আর ধরা পড়তেন তিনি। বন্ধুর মতো কথা বলতে বলতে শত্রুর মতো ছুরি চালিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই খাবার দোকানে বসে অর্ডার দোব: দেখি, দুটো রসোমালাই আর চারটে ফুলকপির সিঙ্গাড়া। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে সব অবস্থায় আমাদের এই নৃশংসতা শুধু দেশের জন্য। বন্দিনী মায়ের মুক্তির জন্যই আমরা ডাকাত, আমরা নরঘাতক!···

টিউবওয়েলের ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে সবে বারান্দায় উঠেছি, এমন সময় সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম, ধীর পাদক্ষেপে আমার বাসার দিকে এগিয়ে আসছেন স্বয়ং প্রেমতোষ সেন। তাঁর পশ্চাতে আসছেন বিনোদ বাবু, অবিনাশ বাবু।

বিস্মিত হলাম! মার খেয়ে শ্রীমান বাড়ী যায়নি দেখছি। স্থির করলাম, আবার সরকারী অফিসারের বক্তৃতা সুরু করলে এবার সত্যিই স্যাণ্ডেল ব্যবহার করবো। কিন্তু এসেই প্রেমতোষ একেবারে আমার পায়ে পড়ে আর কি!

দ্বিজেনদা, আমায় ক্ষমা করুন।

ক্ষমা? কিসের জন্য?

কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললো প্রেমতোষ: অনেক কটু কথা বলেছি। শপথ করছি, এস-ডি-ওর কাছে যাবোই না, থানাতেও আসবো না আর।—বলুন, ক্ষমা করলেন আমায়?

বুঝতে পারলাম না ব্যাপার কি? মার দিলাম আমি, আর ক্ষমা চাইবে প্রেমতোষ?···অকস্মাৎ চেয়ে দেখি, পেছনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন অবিনাশ বাবু, সুতরাং বুঝতে আর দেরী হলো

না যে, এ তাঁরই কারসাজি। বললাম: আচ্ছা যান, এবারটা কিছু বললাম না। কিন্তু জানবেন, আবার দারোগার কানে লাগালে আর কিন্তু ছেড়ে দোব না আমি। একটি মহিলা হয়তো বিধবা হবেন, কিন্তু আমাদের পথ পরিষ্কার হবে।

প্রেমতোষ এবার হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো: আপনার পায়ে পড়ি দ্বিজেনদা'!

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অকস্মাৎ একদিন সকাল বেলা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন সার্কেল ইনসপেক্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। হেসে বললেন: I have brought a very good news for you.

কী সংবাদ?—প্রশ্ন করলাম।

আনন্দোচ্ছাসিত কণ্ঠে জবাব দিলেন ইনসপেক্টার: Here is a transfer order for you to Dacca Jail—আমার বিশ্বাস, ওখানে পৌঁছেই পাবেন আর একখানা সরকারী আদেশ and that will be your release order!—তার পর বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞেস করলেন: কত দিন হলো আপনার?

হিসেব করে বললাম: তা চার বছর পুরো হলো।

এবার ছাড়া পাবেন।—ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষীর মতো বললেন যতীন বাবু: যান, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। আর যেন এ পথে আসবেন না।

মেদিনীপুর শহর থেকে চললাম দুটি সশস্ত্র গাড়োয়ালী সৈন্য ও একজন সহকারী দারোগা এসে গেছে। বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিলাম। দারোগা বাবু মফঃস্বলে ছিলেন। দেখা হলো না। রওনা হবার প্রাক্কালে থানার সবাই বাইরে এসে জড়ো হলেন। তাঁদের মধ্য দিয়ে অপেক্ষমান মোটর বাসে আরোহণ করবার সময় অকস্মাৎ দেখি অবিনাশ বাবুর চোখে অশ্রু আর বিনোদ বাবু কোঁচার খুঁটে চক্ষু মার্জ্জনা করছেন এক পাশে দাঁড়িয়ে। গোপাল রায় এসেছে, এসেছেন ডাক্তার, এসেছেন নীলরতন জানা আর এসেছেন স্বয়ং জটাধর সেনাপতি।

দু'খিলি মিঠে পান আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আর দুই অধরের ফাঁকে একটি সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে জটাধর বললেন: সামান্য ক'টা মাস, কিন্তু মনে থাকবে চিরকাল।—বাড়ী পৌঁছে চিঠি দিও হে একখানা।

হেসে বললাম: অবশ্য যদি বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারি।

বাস ছেড়ে দিল। যুক্তকরে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার সেরে আসনে সোজা হয়ে বসতে যাবো, এমন সময় দেখি দূরে দারোগার বাড়ীর দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার দুঃখিনী বোনটি। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চীৎকার করে বললাম: নমস্কার!

দেখলাম, নীরবে দু'খানি হাত যুক্ত হয়ে কপালে এসে ঠেকলো!···

বাস দ্রুতবেগে ছুটে চললো খড়গপুর ষ্টেশনের পথে ধুলো উড়িয়ে।

[ক্রমশঃ।

ইং রে

সংকলক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরী, বেলভেডিয়ার)

চা-এর জন্ম ; চীনদেশীয় উপকথা

৫১৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের এক রাজপুত্র এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কঠোর সন্ন্যাসব্রতী, তাঁর একমাত্র খাদ্য ফলমূল। দিনরাত্রি তিনি ঈশ্বরের আরাধনায় অতিবাহিত করেন। রাত্রিতেও তিনি ঘুমান না, কারণ তা হ'লে আরাধনার সময় নষ্ট হবে। ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা হবে না, এই তাঁর শপথ। এমনি করে কয়েক বছর বিনিদ্র দিনরাত কেটে গেল। অকস্মাৎ একদিন নিদ্রা রাজপুত্রকে অভিভূত করে ফেলল। সকাল বেলা ঘুম ভাঙল ; শপথ লঙ্ঘনের বেদনায় ক্ষুণ্ণ হয়ে চোখের পাতা দুটি কেটে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কারণ শপথ-ভঙ্গের মূলে তো এরাই। রাজপুত্রের চোখের পাতা দুটি মাটিতে পড়ে দু'টি ছোট গুল্মে পরিণত হলো। এই গুল্মের পাতাই চা।

—কলিকাতা গেজেট ; ২১শে জুন, ১৭৯৮।

কলকাতায় ঘোড়া ও গাড়ীর ভাড়া

ক্রিষ্টোফার ডেকসটারের গাড়ীখানা থেকে নিম্নলিখিত হারে গাড়ী ও ঘোড়া ভাড়া করা যেতে পারে :

			সিক্কা টাকা	আনা	পাই
১।	[illegible] জুড়ি	দৈনিক ভাড়া	২৪৲	-	-
	ঐ	মাসিক „	৩০০৲	-	-
২।	যাত্রীবাহী ডাকগাড়ী	দৈনিক „	১৬৲	-	-
	ঐ	মাসিক „	২০০৲	-	-
	ঐ ৬ মাসের চুক্তিতে				
		প্রতি মাসের „	১৫০৲	-	-
	ঐ ১ বছরের চুক্তিতে				
		প্রতি মাসের „	১৩৩৲	৫	৪
৩।	এক জোড়া ঘোড়া	দৈনিক „	১৬৲	-	-
	ঐ	মাসিক „	১৩০৲	-	-
	ঐ ৬ মাসের চুক্তিতে				
		প্রতি মাসের „	১১০৲	-	-
	ঐ ১ বছরের চুক্তিতে				
		প্রতি মাসের „	৯৬৲	-	-
৪।	বগি ও গাড়ী	দৈনিক „	৫৲	-	-
	ঐ	মাসিক „	১০০৲	-	-
	ঐ ৬ মাসের চুক্তিতে				
		প্রতি মাসের „	৮০৲	-	-
	বগি ও গাড়ী ১ বছরের চুক্তিতে				
		প্রতি মাসের „	৬৪৲	-	-

—কলিকাতা গেজেট ; ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮০১

অসাধারণ অত্যাচারের কাহিনী

গত সোমবার (২৩শে এপ্রিল, ১৮৩২) থেকে পুলিশ আপি[illegible] মিঃ ম্যাকমোহন একটি মামলার তদন্ত করছেন। এই মামলা[illegible] আসামী কানাইলাল ঠাকুর। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই [illegible] একটি চুরির ঘটনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সে গোপালল[illegible] ঠাকুরের তিন জন ভৃত্যের উপর পীড়ন করেছে। নিম্নলিখি[illegible] জবানবন্দি পাওয়া গেছে।

পদ্ম দাস শপথ করে বলেছে : আমি পাথুরিয়াঘাটার কানা[illegible] লাল ঠাকুরের বাড়ীতে থাকি এবং কাজ করি গোপাললাল ঠাকু[illegible] আমার মনিবের সোনা বাঁধানো হুঁকার খোল হারিয়ে যা[illegible] কানাইলাল ঠাকুর আমাকে এবং অন্য দু'জন চাকরকে চুরির [illegible] সন্দেহ করে গত শনিবার আমাদের উপর অত্যাচার করে স্বীকারো[illegible] আদায় করতে চেয়েছে। প্রথমে আমার পা এবং পিঠমোড়া [illegible] হাত বেঁধে দেহের সর্বত্র তপ্ত গুল প্রয়োগ করল ; তার [illegible] শরীরে ঘষে দিল বিছুটি ফল ও পাতা ; পা থেকে মাথা প[illegible] জ্বালা ধরে গেল। এর পর নাভির উপর একটা গুবরেপোকা রেখে মাটির সরা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো যাতে পোকাটা [illegible] যেতে না পারে। পোকা নাভির চারি পাশে তীব্র ভাবে দং[illegible] করতে লাগল। (এই পোকার দংশন অত্যন্ত জ্বালাকর [illegible] বিষাক্ত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। তার পর চাবুক [illegible] বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার সুরু হলো। সব শেষে জোর ক[illegible] বিষ্ঠা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো মুখে। কানাইলাল ঠাকুর চাবুক [illegible] লাঠি দিয়ে নিজে মেরেছে, অন্য শাস্তি তার আদেশে এবং [illegible] উপস্থিতিতে দেওয়া হয়েছে। বিছুটি দিয়েছে কানাইলাল ঠাকু[illegible] হরকরা গোপাল পাঁড়ে, গেটের সেপাই গুল দিয়েছে ; সেই সেপা[illegible] নাম আমি জানি না। রঘুনাথ সিং এবং অন্যান্য কয়েক জন ভৃ[illegible] আমাকে শাস্তি দেবার সময় উপস্থিত ছিল ; কিন্তু গোপাললা[illegible] ঠাকুর উপস্থিত ছিল না। সোমবার পুলিশ উদ্ধার করা না [illegible] আমি আটক ছিলাম। অপর দু'জনের অভিযোগ থেকে জেনে[illegible] যে তাদেরও আমার মতো পীড়ন করা হয়েছে ; কিন্তু আমি [illegible] দেখিনি, কারণ আমাদের পৃথক ভাবে আটক করে রাখা হয়েছিল।

নিত্যানন্দ শপথ করে বলল, আমি গোপাললাল ঠাকুরের কাজ করি। শুক্রবার রাত্রিতে আমার মনিবের একটা গড়গড়া চুরি যায়। শনিবার সকালে সন্দেহ বশতঃ আমাকে ধরে কানাইলাল ঠাকুরের বৈঠকখানার উল্টো দিকের একটা ঘরে নিয়ে আসামী রুলার দিয়ে আমাকে মেরেছে। এর পর বৈঠকখানার সামনে একটা খালি ঘরে নিয়ে হাত-পা বেঁধে আমাকে মাটিতে ফেলে কানাইলাল ঠাকুর বাঁশ ও চাবুক দিয়ে মারতে লাগল এবং চোরাই মাল বের করে দেবার জন্য হুকুম দিল। বিষণ সিং শরীরে যে উত্তপ্ত গুল দিয়েছে তার চিহ্ন এখনো রয়েছে। এমনি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেখে কানাইলাল চলে গেল; বলে গেল, যতক্ষণ আমি স্বীকার না করব ফিরে এসে সেই পর্যন্ত আমাকে প্রহার করবে। অপরাহ্ণে ফিরে এসে কানাইলাল আমাকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর আবার চাবুক দিয়ে মারতে সুরু করল। তারাচাঁদ এর পর মাখন ও লবণ শরীরে মাখিয়ে দিল। সন্ধ্যাবেলা জোড়াবাগান থানার চৌকিদাররা আমাকে নিচে নামিয়ে আনল। এদের উপস্থিতিতেই আমাকে উৎপীড়ন করা হয়েছে। রবিবার সকালে কানাইলাল ঠাকুর আবার প্রহার ও লাঞ্ছনা সুরু করল। সোমবার দুপুর পর্যন্ত এমনি ভাবে বন্দী থেকেছি; তার পর পুলিশের লোক এসে আমাকে উদ্ধার করে। প্রহার করবার আদেশ কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাল ঠাকুর উভয়েই দিয়েছে। যদিও গোপাললাল ঠাকুর প্রহারের সময় উপস্থিত ছিল তবু সে নিজের হাতে মারেনি।

বিশ্বনাথ দাস শপথ করে জবানবন্দি দিল যে, সে গোপাললাল ঠাকুরের কাজ করে। শুক্রবার রাত্রিতে সোনায় মোড়া হুঁকার খোলটি চুরি যাওয়ায় শনিবার সকাল থেকে আমার উপর অত্যাচার সুরু হয়। দু'দিন ধরে আমার উপর কানাইলাল ঠাকুর ক্রমাগত উৎপীড়ন করেছে। সোমবার কয়েক জন লোক এসে আমাকে বলল যে, চুরি স্বীকার না করলে যা শাস্তি পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপীড়ন করা হবে। ভয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল, আমি জানালা দিয়ে দোতলার ঘর থেকে লাফিয়ে পড়লাম। একজন দেশীয় এবং একজন সাহেব ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল আমার কিছুই হয়নি। তখন কানাইলাল ঠাকুর আবার লাথি ও লাঠি দিয়ে প্রহার আরম্ভ করল। তার পর বিছুটি প্রয়োগ ইত্যাদি উৎপীড়ন অন্য দু'জনের উপর যা করা হয়েছে আমার উপরও তা হলো। বিকেলে পুলিশের লোক এসে আমাকে উদ্ধার করে।

ডাক্তার সাক্ষ্য দিল যে, সে তিন জন অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করে তাদের দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছে।

এর পর নেওয়া হলো ছিদাম দাসের জবানবন্দি। সে বলল, গত সোমবার পর্যন্ত আমি হরলাল ঠাকুরের কাজ করতাম। সেদিনই আমি ঐ তিন জন অভিযোগকারীর উপর কিরূপ অত্যাচার চলছে তা জানিয়ে দরখাস্ত দিয়েছি। শনিবার সকালে শুনতে পেলাম যে একটি গড়াগড়া চুরি গেছে। একজন সাহেব অফিসারের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের থানাদার ও চৌকিদার চুরির তদন্ত করতে এসেছিল। পুলিশ চলে যাবার পর কানাইলাল ঠাকুর অভিযোগকারীদের তিন জনকে বেঁধে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য প্রহার করতে আরম্ভ করল। আমি নিজের কাজ করতে করতে প্রহারের শব্দ এবং কান্না শুনেছি একবার শুনতে পেলাম কয়েক জন বলছে, 'ওরা যদি দোষী হয় তাহ'লে পুলিশের হাতে দিন। আর মারলে ওরা হয়তো একেবারেই মরে যাবে।' কিন্তু এ কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। প্রহার চলতে লাগল। বিকেলে কানাইলাল ঠাকুরকে বলতে শুনলাম, 'এরা হয়ত গড়গড়া চুরি করেনি; কারণ দু'বার ওদের মেরেছি, তবু তো স্বীকার করছে না।' রাজকিশোর এর উত্তরে বলল, 'না, ওরাই নিয়েছে; আর একবার প্রহার করলেই ফল পাওয়া যাবে।' কানাইলাল বদ্ধ কালা, সুতরাং এই কথা শ্লেটেও লিখে দেওয়া হলো। তার পর আবার সুরু হলো অকথ্য অত্যাচার। নিজের চোখে তাদের যন্ত্রণা দেখেছি। সেদিনই বিকেলে মনিবকে গিয়ে বললাম, যেখানে এমন অন্যায় উৎপীড়ন চলতে পারে সেখানে কাজ করব না। কাজে ইস্তফা দিয়ে পুলিশের নিকট ওদের উদ্ধার করবার জন্য আবেদন করলাম।

পুলিশের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিয়েছে মিঃ ম্যাকান। চুরির খবর পেয়ে তদন্ত করতে গিয়ে জানা গেল যে তিনজন চাকরকে সন্দেহ করা হয়েছে; এবং বাড়ীর মালিক এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছে। এই অনুসন্ধানে বাধা না দিয়ে মিঃ ম্যাকান চলে এসেছিল। সোমবার পুলিশ আফিসে অভিযোগকারীদের উপরে অত্যাচার করবার সংবাদ পেয়ে ঠাকুর পরিবারকে আদেশ করা হয়েছে ওদের থানায় পাঠিয়ে দেবার জন্য।

মিঃ ম্যাকমোহন কাল সাক্ষীর অভাবে মামলা পরিচালনা করতে পারেননি। প্রায় সব সাক্ষী ঠাকুরদের ভৃত্য, সুতরাং তাদের সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি কিন্তু স্থির করেছেন যে আগামী অধিবেশনে আসামীকে আদালতে হাজির করিয়ে তার জবাব শোনা হবে।

—ক্যালকাটা কুরিয়ার, ২৮শে এপ্রিল, ১৮৩২

বেঙ্গল হরকরা থেকে উদ্ধৃত।

ভৃত্যবর্গের বেতন

যখন প্রয়োজনবোধে সরকার প্রত্যেক কর্মীর বেতন ও ভাতা হ্রাস করছেন তখন ভৃত্যবর্গ আমাদের নিকট কি রকম অসঙ্গতরূপে অধিক বেতন দাবী করছে আশা করি বোর্ড অব ডিরেক্টর্স সে বিষয়ে বিবেচনা করে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা অফিসারদের ব্যয়ভার লাঘব করতে সাহায্য করবেন। বেতনের নিম্নলিখিত তালিকাটি ১৭৫৯ সালে কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা হয়েছিল। জীবনযাত্রার ব্যয় যে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা ঐ তালিকার সঙ্গে বর্তমান বেতনের অতিশয় উচ্চ হার তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

বেতনের হার

	১৭৫৯ সাল	১৭৮৪ সাল		
খানসামা	৫৲	১০৲	থেকে	২৫৲
চোবদার	৫৲	৬৲	"	৮৲
প্রধান পাচক	৫৲	১৫৲	"	৩০৲
কোচম্যান	৫৲	১০৲	"	২০৲
প্রধান পরিচারিকা	৫৲	...	...	...
জমাদার	৪৲	৮৲	"	১৫৲
খিদমতগার	৩৲	৬৲	"	৮৲
পাচকের প্রথম সহকারী	৩৲	৬৲	"	১২৲
প্রধান বেয়ারা	৩৲	৬৲	"	১০৲

বেতনের হার

	১৭৫৯ সাল	১৭৮৫ সাল		
দ্বিতীয় পরিচারিকা	৩৲	...	...	...
পিয়ন	২৷৹	৪৲	"	৬৲
বেয়ারা	২৷৹	৪৲		
ধোবা সমগ্র পরিবারের জন্য	৩৲	১৫৲	"	২০৲
ঐ এক জনের জন্য	১৷৹	৬৲	"	৮৲
সইস	২৲	৫৲	"	৬৲
মশালচী	২৲	২৲	"	৪৲
দাড়ি কামাবার নাপিত	১৷৹	২৲	"	৪৲
চুল ছাঁটবার নাপিত	১৷৹	৬৲	"	১৬৲
বাড়ীর মালী	২৲	..	..	...
স্তন্যদাত্রী ধাত্রী	৪৲	১২৲	"	১৬৲
আয়া	৪৲	১২৲	"	১৬৲

—কলিকাতা গেজেট, ৩১শে মার্চ, ১৭৮৫।

উচিত বেতন

উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশের প্রায় ছয় মাস পরে 'নিউ করেসপণ্ডেন্ট' নাম দিয়ে এক ভদ্রলোক একটি চিঠি লেখেন। তাঁর বক্তব্য এই : হঠাৎ ভাতা হ্রাস করায় কোম্পানীর অফিসাররা তাদের ব্যয় সংকোচ করতে বাধ্য হয়েছে। এ দেশে ভৃত্যবর্গের বেতন দিতে আমাদের মোট আয়ের এক বৃহৎ অংশ চলে যায়। সুতরাং এদিকে খরচ কমাবার কথাটা ভাবতে হবে। অবশ্য বর্তমানে এখানে এমন অনেক ধনী ব্যক্তি আছেন যাঁদের ভৃত্যের বেতন কমাবার কথা না ভাবলেও চলে। কিন্তু আমাদের সকলের মধ্যে সহযোগিতা না থাকলে বেতন হ্রাস করা সম্ভব হবে না। কারণ তাহ'লে যেখানে একটু বেশি বেতন পাবে ভৃত্যরা সেখানেই ছুটে যাবে। অনেক সময় কোনো কারণ না দেখিয়ে এরা হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিয়ে মনিবকে বিপদে ফেলে যায়। এই অসুবিধা বন্ধ করবার জন্য একটি রেজিষ্টার আপিস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও ভেবে দেখা দরকার।

বর্তমানে বেতনের যে হার হওয়া উচিত তা বিশেষ বিবেচনার পর স্থির করা হয়েছে। আকস্মিক হ্রাসের দ্বারা ভৃত্যেরা যাতে আমাদের মতো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে কথা প্রস্তাবকের মনে ছিল। বর্তমানে বেতনের যে হার হওয়া উচিত তা এই :

	সিক্কা টাকা
খানসামা	৮৲ থেকে ১০৲
খিদমতগার	৪৲ " ৬৲
প্রধান বেয়ারা	৪৲
সাধারণ বেয়ারা	৩৲
মশালচী	৩৲
পাচক	৮৲ থেকে ১০৲
হরকরা	৪৲
দারোয়ান	৩৲
মেথর	৩৲
সইস	৪৲
ঘাস-কাটা মালী	৩৲
গরুর রাখাল "	৩৲
দর্জি	৫৲

—কলিকাতা গেজেট, ৬ই অক্টোবর, ১৭৮৫।

দেশী বনাম বিদেশী ভাষা

এক বৎসরের পরীক্ষা সমাপ্ত হলো। সাত কোটি লোক তাদের মাতৃভাষাকে সরকারী কার্যে ব্যবহার করবে অথবা তাদের উপর বিদেশী ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সময় এসেছে। এই পরিবর্তন সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিষয়ে য়ুরোপীয় কর্মচারীদের মতামত আমরা এখনো জানতে পারিনি। তবে একথা আমরা নিশ্চিত জানি যে, তাঁরা যদি জনমতের প্রতিধ্বনি করেন তাহ'লে আদালত থেকে ফারসী ভাষা চিরবিদায় গ্রহণ করবে। যদি তাঁরা বিদেশী ভাষার সাহায্যে সরকারী কাজ-কর্ম পরিচালনা করবার পুরাতন নীতি সুপারিশ করেন তাহ'লে আমরা বলব যে, ছ'শ বছর ধরে যে প্রথা চলে আসছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাত্র এক বছরের পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। যে অসুবিধার মধ্যে এক বছর পরীক্ষা করা হয়েছে তা ভেবে দেখলে পরীক্ষার সময় বাড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে। পরীক্ষামূলক পরিবর্তনটা এসেছে আকস্মিক, কোনো আয়োজন করা হয়নি সে জন্য। সরকারী কর্মচারীরা ফারসী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছে। সুতরাং তারা কিছুদিন সরকারী কাজে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতে অসুবিধা ভোগ করবে; আদালতে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ বাঙলা থেকে তৈরি করে নিতেও প্রথম একটু কষ্ট হবে। এই সব কারণগুলি কোনো কোনো য়ুরোপীয় অফিসার ফারসীকে চিরস্থায়ী করে রাখবার পক্ষে ব্যবহার করছেন। ব্যবহার করতে করতে বাঙলাও যে ফারসীর মতো সহজ ও সাবলীল হয়ে যাবে, একথা তাঁরা ভাবছেন না। তার উপর আদালতের আমলারা পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। সব কিছু রহস্যাবৃত করে রাখার মধ্যেই ছিল তাদের প্রভাব ও লাভের উৎস। বাঙলা ব্যবহৃত হলে আদালতের আইন-কানুন, কাজ-কর্ম সব রহস্যমুক্ত হয়ে যাবে। এত দিন এই সব বিদেশী ভাষার জন্য সাধারণ লোকের কাছে রহস্যাবৃত ছিল। জনপ্রিয় বাঙলা ভাষা ব্যবহারে আমলাদের অমত ছিল বলে সরকারী কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। য়ুরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে বাঙলা ভাষার জ্ঞান আছে খুব অল্প দু'-এক জনের। সুতরাং ভাষার পরিবর্তন তাদের কাছে আর একটি নতুন অসুবিধার সৃষ্টি করবে। এই এক বছর বাঙলা নিয়ে যে পরীক্ষা হলো তার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না; এমন একজন কোনো লোক নিযুক্ত করা হয়নি যে জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত করে দেশবাসীকে বাঙলা ভাষা ব্যবহারের জন্য উদ্দীপ্ত করতে পারে। ১৭৯৩ সাল থেকে গভর্ণমেণ্টের বাঙলা অনুবাদকের পদ কখনো খালি ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙলাকে নিয়ে যে বৎসর এমন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হলো সে বছরই এই পদটি ছিল শূন্য। যখন সরকারের বাঙলা অনুবাদকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তখনই দেশ তাঁর উপদেশ ও

সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলো। এই অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে স্থানীয় ভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা যদি সাফল্য লাভ না করে, প্রথম বৎসরেই যদি বাঙলা ফারসীর মতো ব্যবহারোপযোগী না হয়ে থাকে তাহ'লে পরিকল্পনাটি বাতিল করবার পূর্বে সফলতার পথে অন্তরায়গুলির কথা সতর্কতার সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন। যে পরিকল্পনা সার্থক হলে পরবর্তী কাল লাভবান হবে বলে আশা করা যায় তার জন্য দশ বছর ধরে পরীক্ষা করলেও অন্যায় হবে না। এই দশ বছরে য়ুরোপীয়ান অফিসাররা বাঙলা শিখে নেবে এবং যে-সব আমলাদের বাঙলার চেয়ে ফারসীর জ্ঞান বেশি তারা হয় অবসর গ্রহণ করবে কিংবা পরলোকগমন করবে; এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় ভাষাগুলি ব্যবহারের ফলে সাবলীল হয়ে আসবে। দেশীয় লোকদের কর্তব্য হবে স্থানীয় ভাষাগুলি যত্নের সঙ্গে শেখা এবং গভর্ণমেণ্ট বাঙলা-উর্দু গেজেটের সাহায্যে আইন-সম্পর্কিত শব্দগুলির তালিকা প্রচার করবেন; তার ফলে দেশের সর্বত্র এক বাক্যবিধি প্রচলিত হবে।

কোনো কোনো প্রবীণ সরকারী কর্মচারী ভাষা পরিবর্তনের যে বিরোধী, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কারণ পঁচিশ বছর ধরে ফারসী ব্যবহার করে ঐ ভাষাটা যেন মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। যে ভাষা ব্যবহার করতে লোক অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তাকে পরিবর্তন না করাই সর্বসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে,—এই হলো তাঁদের মত। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁদের অভিমত প্রাধান্য লাভ করবে না। এই মতের পশ্চাতে যুক্তি কিংবা অভিজ্ঞতার শিক্ষা নেই। যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝি যে, যে-ভাষা বহু দিন যাবৎ সরকারী সমর্থন লাভ করেও লোকের মনে স্থান পায়নি তার চেয়ে যে-ভাষা বহু শতাব্দীর উপেক্ষা সত্ত্বেও বেঁচে আছে, সেই ভাষার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা উচিত। অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, একটু অভ্যাস ও অধ্যবসায় দ্বারা মাতৃভাষা জীবনযাত্রার সকল এবং বিচিত্র প্রয়োজন মেটাতে পারে। জাতি যে-ভাষার মাধ্যমে নতুন নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করবে তার উন্নতির পরিকল্পনা স্থির না করলে সভ্যতার প্রথম ধাপেও উপস্থিত হওয়া যায় না। এক বছরের পরীক্ষার পর বাঙলা তুলে দিয়ে যদি পুনরায় ফারসীর প্রবর্তন করা হয়, তাহ'লে বাঙলায় সভ্যতার অগ্রগতি পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যাবে। পশ্চাদগমন ও অগ্রগমন—এই দু'য়ের কোনটিকে গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের খেয়াল-খুশির অবকাশ নেই। ভারতের সভ্যতাকে রক্ষা এবং প্রগতিশীল করতে হলে দেশীয় ভাষাগুলি উন্নত করতে হবে। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভাগ্যের বিধানে যদি আমাদের হাত থেকে এ দেশের রাজদণ্ড খসে পড়ে, তবু পশ্চাদপদ হলে চলবে না।

—ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৩১।

নরবলি

আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পেয়েছি যে গত রবিবার অমাবস্যার রাত্রিতে চীৎপুরের কালীমন্দিরে নরবলি হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর কাজটি রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে করা হয়েছে; কারা এর জন্য দায়ী তা এখনো জানা যায়নি। পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল মন্দিরের দরজা খোলা; যাকে বলি দেওয়া হয়েছে তার ধড়টি পড়ে আছে মন্দিরে প্রবেশ-পথের নিকটে এবং ছিন্ন মুণ্ডটি পাওয়া গেল মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের পদতলে। পূজার সময় দেবীকে বহুমূল্য নতুন বস্ত্রে এবং নতুন সোনা ও রূপার তৈরি নানা অলঙ্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এই প্রকার অনুষ্ঠানে শাস্ত্রানুযায়ী যে ধরণের বাসন-কোসন প্রয়োজন তা-ও মন্দিরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ছিল। এ সব থেকে অনুমান হয় যে, এই নরবলির পশ্চাতে কোন ধনী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির হাত আছে। যে হতভাগ্যকে বলি দেওয়া হয়েছে সে চণ্ডাল জাতির বলে মনে হয়। কালীর নিকট বলি দেবার জন্য এই জাতির লোকই প্রশস্ত। ফৌজদার মন্দিরের পূজারীকে গ্রেপ্তার করেছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সূত্র আবিষ্কৃত হয়নি।

—কলিকাতা গেজেট, ২৪শে এপ্রিল, ১৭৮৮।

ক্রমশঃ।

দুর্গাদাস সরকার

এইবার শেষ হোক : বন্ধ হোক অমিত বর্ষণ।
আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রে ব্যাঙেদের উন্মত্ত কোরাস
পৃথিবী শুনেছে ঢের। শুনেছে সমস্ত লোকজন
ঝাঁঝাব কলেব শব্দে বৃষ্টিপাত। দুরন্ত উচ্ছাস

বিরহী করেছে যদি অনুভব ভগ্ন তার ঘরে
বৃষ্টির সময়ে মগ্ন ছিল না সে বিরহ রভসে;
দু'হাতে তুলেছে জল মাটি থেকে ঘরের ভিতরে।
এ-যুগে কে বৃষ্টি চায় আষাঢ়েরো প্রথম দিবসে।

ভাদ্রের সংক্রান্তি শেষে আশ্বিনের কিছু রোদ এলে
তবেই হৃদয় কোনো—হোতে পারে কখনো চঞ্চল।
হে আশ্বিন, তুমি এসো সোনালি রোদের ডানা মেলে,
নিয়ে চলো অন্য দেশে যেখানেতে নেই বৃষ্টি জল।
হৃদয়-সেতার তবু স্তব্ধ কেন ঠিক নেই তারো,
এ-বৃষ্টি হোলেও দুঃখ, না হোলে যে দুঃখ বাড়ে আরো।

[উপন্যাস]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্তা

সৌমীর চা নিয়ে আসবার অপেক্ষায় নীরবে বসে রইল শমিত। ঘরের অভ্যন্তরটি আজও প্রায় সেই রাতের মতই। পাখাটা তেমনি মৃদু শব্দে ঘুরে চলেছে। জানালার গাঢ় নীল পরদাগুলো দুলছে বাতাসে। ধপ্‌ধপে বিছানায় অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে শুয়ে আছে মিত্রা। ঘরছড়ানো একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ—যে গন্ধ নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেলে অন্তরে আবেশ সৃষ্টি করে। শিয়রের কাছে টিপয়টার ওপর ওষুধপত্রের শিশি আর হরলিক্‌স-ওভালটিনের মাঝখানে ফুলদানি-ভরা রজনীগন্ধার গুচ্ছ। বাসি, তাই তার কিছু ঝরে পড়েছে টেবিলে, কিছু ফুটছে আবার নূতন করে। মনের চাঞ্চল্য শমিতকে বেশীক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতে দিল না। উঠে ওষুধের শিশি তুলে দেখল, পড়ল ভাঁজ-করা ব্যবস্থাপত্রগুলি। ঘরময় পায়চারি করে চলল দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখে। থমকে দাঁড়ালো মিত্রার কিশোরী বয়সের একটি ফটোর কাছে। কি ভীষণ রোগা ছিল ও! সমস্ত ছবিটার ভেতর শুধু ভেসে আছে দুটি বড় বড় চোখ। চিবুকের স্বল্প হাসিটা মনে করিয়ে দেয় মোনালিসার হাসি। আর এর পাশের ছবিখানা নিতান্ত শৈশবের। খাটো বেনিয়ান গায়, খালি পা, মাথার বড় চুল উড়ছে বাতাসে—দু'গাল ভরা হাসি নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শমিতের মনে হয়, মিত্রার মুখের শৈশবের এই ঝলমলে হাসি কৈশোরে এসে চিবুকে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ গেছে একেবারে ঝরে। এখনকার হাসি মিত্রা হাসে মুখে নয় চোখের কোণে। অন্তত শমিত তার চাইতে বেশী দেখেনি।

বিশেষ সময় নিল না, চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল সৌমী।

দু'পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে কাপটা হাতে তুলে নিয়ে ধন্যবাদ জানাল শমিত।

সৌমী বললো—'ধন্যবাদ তো আমি জানাব আপনাকে, দুপুরটা চোখ বুজতে পারব বলে।' তারপর মিত্রার দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর গ্লাস-ঢাকা মিশ্রির জলটা দেখিয়ে বললো—'এটা এক সময় খেয়ে নিয়ো মিত্রা! ফলের রস দেবার সময় হলে আবার আসব—এখন চললাম ভাই।'

সৌমী চলে গেলে শান্তিনিকেতনী মোড়াটা টেনে চায়ের পেয়ালা হাতে খাট ঘেঁসে বসল শমিত। কথা সুরু করতে প্রথমটায় যেন কথা খুঁজে পায় না সে। নীরবে চললো কাপে চুমুক দিয়ে। কারো সামনে এমন অভিভূত হয়ে পড়া এ তার ধারণার অতীত। এ যে দস্তুরমত ঘাবড়ে যাওয়া, হাসি পেল নিজেরই। হাত বাড়িয়ে মিত্রার চোখের ওপর থেকে ওর হাতটা নিজ হাতে তুলে নিয়ে বলল—'ঘরটাকে তো প্রায় রাত বানিয়েই রেখেছ, আবার চোখে হাত কেন?—আমার মুখ দেখবার ভয়ে?'

ঠিক এমনি একটা সময়ের সম্মুখীন যে তাকে আজ না হয় কাল হতেই হবে এ মিত্রা জানত। জানত ওকে একা পাওয়ার অপেক্ষায় সময় গুণছে শমিত। আর কথাটা মনে হলেই বুকের রক্ত আসতে চাইত হিম হয়ে। সেদিন রাতের দুর্বল শরীর, মোহাচ্ছন্ন মন নিয়ে ও কি এ জগতে ছিল? সমাজ, সংসার সব লীন হয়ে গিয়েছিল মন থেকে? কিন্তু এখন এর শেষ কোথায়? কোথায় এর ছেদ টানবে? শমিত যদি সে রাতের কথা নিয়ে ওর কাছে আর এসে না দাঁড়াত—ও বাঁচত।

হাতে সামান্য চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল শমিত,—'কি, এত কি ভাবছ শুনি?'

মুখের ওপর উড়ে-আসা চুলগুলো এক হাতে চেপে ধরে, আর একটি হাত শমিতের হাতের কঠিন মুঠোয় নেতিয়ে রেখে ঘামতে লাগল মিত্রা। নানা পদের মিশ্রিত পানীয়ের কড়া নেশার মতো কতগুলি সংমিশ্রিত অনুভূতি যেন ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আবহাওয়ার জড়তা ভাঙতে চাইল শমিত—'বাড়ীর আর সব মানুষ কোথায়?'

সহজ জিজ্ঞাসায় সহজ হয়ে উঠতে পেরে মিত্রাও হাঁফ ছাড়ল। কথাবার্তাটা সাধারণ সংবাদ-বিনিময় জাতীয় হলেই স্বস্তি পাবে ও। বললো—'দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে গেছেন।'

—'আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই?'

—'হ্যাঁ'।

—'বাঃ, বাড়ী খালি করে সবাই গেলেন পুজো দিতে। আর সাত দিন বাদে ঠিক সেই দিনটিতেই আমি বের হলাম বন্ধু-সম্মিলন করে ঘুরে বেড়াতে। তার পর এই ভর-দুপুরে বাড়ী ফেরবার মুখে, হঠাৎ খেয়ালে চলে এলাম তোমায় দেখতে। আর অমনি সৌমী দেবী সানন্দে তোমার অবসাদ বিনোদনের ভার আমার ওপর দিয়ে চলে গেলেন ঘুমোতে।—না, কোথায় বসে সত্য সত্যই যেন কে মনুষ্য-ভাগ্যের গল্পের জাল বুনে চলেছেন—অস্বীকার করবার উপায় রইল না।'

—'বুঝতে পারলাম, স্নান-খাওয়া হয়নি।'

—'এমন একটা সূক্ষ্ম সাহিত্য-সৃষ্টির ভেতর বৃথা কথা তুলে সময়ের অপচয় করলে, কাহিনীকার ক্ষুব্ধ হন।'

বিপন্ন হাসি হাসল মিত্রা—'কি করতে হবে?'

মিত্রার মুখের দিকে তাকালো শমিত। সে রাতের যে নমনীয় মিত্রা অনুরাগে মমতায় তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল, সে ব্যক্তি যেন আজকের মিত্রা নয়। এ মিত্রাকে ভয় করে তার। একটু হেসে বললে—'সে-দিনের ছেলেমানুষিটা মনে আছে?'

—'বড়দের ছেলেমানুষ হয়ে যাওয়া মানে নির্বোধ হয়ে ওঠা। ও ভুলে যাওয়াই ভালো।'

শমিত বললো,—সে'রাত্রির ঘটনাকে যে তুমি উড়িয়ে দিতে চাইবে—এ ভয় আমি না করেছি তা নয়। আর সে শঙ্কাতেই এ ক'দিন ধরে আমি স্বস্তি পাইনি, স্থির হতে পারিনি। তোমার অসুস্থ সময়ের মানসিক ভারসাম্য-হারানো চাঞ্চল্যকে—আবার তুমি

তোমার স্থির স্থৈর্য্যে ফিরিয়ে আনবে, বা আনতে চাইবে—আমি জানতাম। কিন্তু তোমাকে আমার চাই, মিত্রা!'

হাতের খালি কাপটা খাটের নীচে ঠেলে রেখে পকেট থেকে সিগারেটের কৌটোটা বের করল শমিত। একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটের চাপে ধরে, দেশলাইএর কাঠিটা জ্বালাতে গিয়ে থেমে জিজ্ঞাসা করল—'ধরাতে পারি?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো মিত্রা।

সিগারেট ধরিয়ে নীরবে ধোঁয়া ছেড়ে চলে শমিত। বন্ধ ঘরটা থেকে বেরুবার পথ করতে না পেরে, দু'-এক কুণ্ডলী ধোঁয়াই নাকের কাছে ঘুরে-ফিরে নিশ্বাসে অস্বস্তি আনে মিত্রার। বলে—'একটা জানালা খুলে দেবে?' দিয়ে নেবে?

খাটের তলাটার দিকে চায়ের কাপটা ঠিক কোথায় রেখেছে এক নজর দেখে নিয়ে হাতের সিগারেটটা তক্ষুনি সেটার ভেতর ফেলে দিল শমিত।

—'ফেলে দিলে যে!'

—'ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। তুমি আমার কথার জবাব দেও।'

—'কিছু জিজ্ঞাসা করনি তো?'

—'সে রাতের ঘটনাটিই আমার জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকবে,—এ আমার চাই। এ হলো আমার দিক্‌কার কথা। তোমার?'

মিত্রা মাথাটা তুলে আধ-শোয়া ভাবে হাতের উপর রাখল, মুখটা মুছল শাড়ীর আঁচল দিয়ে।—'দেখ' বলে কতটুকু সময় রইল চুপ করে। তার পর বললো 'একটুও প্রস্তুত ছিলাম না এমন একটা ঘটনার জন্য। আমার জীবনের চলতি গতিকে যে কি বিপর্য্যয়, কি ব্যতিক্রম—'

—'কি বিপ্লব, কি বিপর্য্যস্ততার মুখে এনে ফেলেছে—হলো। আর প্রয়োজন নেই।'

হাসল মিত্রা।—'সবগুলো শব্দ আমার অবস্থাটা বোঝাবার পক্ষে নিঃসন্দেহে উপযুক্ত।'

—'বুঝেছি। কিন্তু তার পর?'

—'ভেবে নিতে সময় চাই।'

—'এ কয় দিন মন্দ সময় পাওনি।'

—'চিন্তা-শক্তি এখন বিকল।'

—'কবে পর্য্যন্ত কল চালু হবে?' বলেই গা-ঝাড়া দিল শমিত। —'না, বাজে কথায় সময় নষ্ট নয়। আর ভাবাভাবির দরকার নেই। এত সব ঘটনা যখন তোমার ভেবে নেবার অপেক্ষায় বসে থাকেনি তখন এ জ্ঞানটুকু হওয়া উচিত যে, ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে জগতে কিছু ঘটে না—একেবারে কিছু ঘটে না। তবু দূরদর্শী হবার চেষ্টাটা মানুষের বিচক্ষণতার ভাণ মাত্র। আর সে ভাণটি এর পর থেকে আমি করব। অর্থাৎ তোমার চিন্তা এখন থেকে আমার।'

শমিতের এ কথার আর জবাব খুঁজে পায় না মিত্রা। একটু সময় চুপ করে থেকে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠস্বরে বলে—'কিন্তু দু-একটা কথা যে আমায় জানতেই হবে আগে। ফাঁকির খেলায় মন নেই, নিশ্চয়তা নেই যাতে, তাতে বড় অরুচি আর অশ্রদ্ধা।'

—'জিজ্ঞাসা কর।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের কৌটোটা বের করতে গিয়েও থেমে গেল শমিত।

—'তুমি নিশ্চয়ই এর আগে কাউকে ভালোবেসে থাকবে?'

—'না, এত দিন বাসিনি। বর্তমানে এক জনকে বেসেছি।'

মিত্রার মনে যে জিজ্ঞাসা এক মস্ত জিজ্ঞাসা, শমিত বুঝল সেটা। কিন্তু সংক্ষিপ্ত জবাবেই সে তার উত্তর শেষ করল। ও-সমস্ত কথার ভেতর ঢুকবার এখন প্রবৃত্তি নেই তার।

মিত্রা বললো—'এও কি সম্ভব, এ পর্য্যন্ত তুমি কোন মেয়েকে কখনো ভালোবাসনি?'

—'সম্ভব। তোমার কাছে কেন, জগতের কারো কাছে মিথ্যে বলবার মত মনের অবস্থা এখন আমার নেই। আমার জীবনে তুমিই প্রথম নারী, এমন কথা উচ্চারণও আমি করব না। কিন্তু কোন মেয়েকে এ ভাবে ভালোবাসা এই আমার প্রথম—বিশ্বাস কর।'

—'কাছে আসবার আগে কেউ জানতে চায়নি তাকে ভালোবাস কিনা—শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে কাছে টানছ কিনা?'

—'না।'

—'না!' মিত্রার যেন দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হয়। 'ভালোবাস কিনা জানে না, জানতে চায়ও না—তুমিও—না-না। ছিঃ ছিঃ!'

শমিত নিশ্চল হয়ে বসে রইল। ওর অন্তরাত্মা আজ মিত্রার এই 'ছিঃ ছিঃ'-র সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেকে ধিক্কৃত করে উঠতে চাইছিল। মনে হচ্ছিল, এ মেয়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা বুঝি আর তার নেই। বললো—'পুরোনো দিনের কথা তুলতে সাহস নেই। অনেক লজ্জার কথা রয়েছে সেখানে। দূরে সরিয়ে নেবে সে সব কথা তোমার। আমার অতীতকে নয়, এখনকার আমাকে গ্রহণ কর তুমি। তার পর তাকে তুমি গড়ে তোল তোমার মনের আনন্দ দিয়ে। আমার জীবনে আজকে সকলের চাইতে বড় সত্য—আমি তোমায় ভালোবাসি মিত্রা! এতে কোন ফাঁকি নেই।'

মিত্রার হাতটা তুলে নিয়ে শমিত নিজের চোখে চাপা দিল। ওর কণ্ঠে উত্তেজনা নেই, নেই তারুণ্যের প্রথম প্রণয়াবীর হৃদয়াবেগ। কিন্তু যা ছিল তা এ সবের বহু ঊর্দ্ধে।

দু'জনেই নীরব। নীরব মধ্যাহ্নের জনশূন্য পথটাও। শুধু মাঝে মাঝে ভেসে আসে এক-আধটা গাড়ী-চলার বা থামার শব্দ; ফেরিওলার ডাক, রিক্সার ঠুন্‌ঠুন্ মিঠে আওয়াজ। শমিত মিত্রার হাতটা নামিয়ে রেখে, উঠে গিয়ে মিশ্রির সরবতের গ্লাসটা এনে ধরল মিত্রার কাছে। বললো—'এর ভেতর তোমার এটা খাবার কথা ছিল।'

—গ্লাসটা শমিতের হাত থেকে নিয়ে মিত্রা কিন্তু সেটা আবার তারই দিকে বাড়িয়ে ধরল—'অতিথির তেষ্টা আগে মেটাতে হয়।'

—'ঠাণ্ডা সরবৎটা বর্তমানে আরামদায়কই হবে—কিন্তু তোমার প্রয়োজন আগে—আদ্দেক আদ্দেক হোক।'

মিত্রা টিপয়টার দিকে চোখ ফিরিয়ে ভাগ করার জন্য গ্লাস কিংবা পেয়ালা জাতীয় কিছু খোঁজে—'কিছু নেই। কিসে ভাগ করব?'

—'তুমি খেয়ে নাও।'

—'দূর। সে কি হয়?'

—'কেন?'

—'আমি রোগী, রোগীর মুখেরটা খেতে নেই?'

—'সে রাত্তের চাইতে বুঝি আজ তোমার অসুখ বেড়েছে ?'

—'না, তা বাড়েনি। কিন্তু সেদিন কি তুমি আমার আদ্দেক খাওয়া সরবৎ খেয়েছিলে ?'

অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে শমিত বললে—'না।'

মিত্রা ঠোঁট কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে।

হেসে উঠে হাত বাড়ালো শমিত—'আমি খেয়ে দিলে আপত্তি নেই তো তোমার ?'

নীরবে শমিতের দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিলো মিত্রা। আদ্দেকটা খেয়ে নির্বিকার চিত্তে বাকীটা তুলে দিল সে মিত্রার হাতে। তার পর ঘরের কোণ থেকে আরাম-কেদারাটা টেনে এনে মিত্রার খাটের সঙ্গে এক করে, পিঠ এলিয়ে শুয়ে পড়ল তাতে। হাত বাড়িয়ে মিত্রার মস্ত খোঁপাটা খুলে চুলগুলো দিয়ে মুখ ঢেকে বললো—'কথা নয় গান শোনো।'

চাপা-গলায় যে মুহূর্তে গেয়ে উঠল শমিত—'তুমি জান নাই, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে। আমি তোমারি সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরেরি বাঁধনে।'

সব কথা, সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব স্তব্ধ হয়ে গেল মিত্রার। সাপের সব শোনা যেমন বুকের অনুভূতিতে, মিত্রাও তেমনি যেন কান দিয়ে নয়, ওর বুকের অনুভূতির স্পর্শে সে গান শুনতে লাগল নিজেকে গানের পদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে। গান শেষে শমিত থামতেই, শমিতের একমাথা উসকো চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে মুঠো করে ধরে বলে উঠল মিত্রা—'না, থামবে না !'

গাইল শমিত একটা-দুটো নয়—একের পর এক। পাশের ঘরে কান উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে সৌমীরও। এত নিচু-গলায় শমিত গাইছিল সে, একটা ঘর পার হয়ে আসতেই বহু পদ তার হারিয়ে তবে তা এসে পৌঁছচ্ছিল সৌমীর কানে। কি জানি, এমন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে মাত্র এক জনের উদ্দেশ্যে গাওয়া গান এর চাইতে উঁচু-গলায় গাইলে বুঝি সমস্ত পরিবেশটাই আহত হত। কথা ছেড়ে গানের ভেতর দিয়ে শমিত যেন মিত্রাকে তার অব্যক্ত কথা সব চললো একে একে ব্যক্ত করে।

গাইল শমিত,—'জড়িয়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' গাইল—

'কেন মোর গানের ভেলায়,
এলে না প্রভাত বেলায়,
হলে না সুখের সাথী
জীবনের প্রথম বেলায়—'

মিত্রার মনে হলো, সে বুঝি পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে। যে জগতের কথা সে জানত না, চিনত না, আছে বলে বিশ্বাস করত না—কেউ বললে হাসত বিদ্রূপের হাসি—যেন তেমনি জায়গায় ওকে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গান শেষে মুখ তুলে হাসল শমিত। মুখটা ওর মিত্রার চুলের গরমে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বললো—'এবার বকশিশ ?'

গলা থেকে চিকন বিছেহারটা খুলে এনে শমিতের দিকে বাড়িয়ে দিল মিত্রা।

—'গলার হার ? একেবারে রাজরাণী ষ্টাইলে সভাগাইয়ের বকশিশ ! কিন্তু এটা দিয়ে করব কি আমি ?'

—'তবে কি দেবো ?'

—'অন্য কিছু দাও।'

—'কি দেব ?'

—'তোমার আংটিটা।' হাত পাতল শমিত।

হার দেওয়া যায়। কিন্তু আংটি দেওয়ার ভেতর থাকে অনেক কিছু দেওয়ার ইঙ্গিত—ইঙ্গিত শুধু নয়, স্বীকৃতি। মিত্রা মিনতি জানাল—'কিছুদিন সময় দাও ভেবে নিতে। আমি তো একা নই—আমার—' থেমে গেল মিত্রা।

—'বেশ ! তোমার ভাবা হ'লে ফলাফলটা আমায় জানিও।'

—'রাগ করলে ?'

—'কার ওপর ? তোমার ?' এবার হাসল শমিত ক্লান্ত হাসি। সমস্তটা দিন যে কয়েক কাপ চা'-এর ওপরে আছে, সে কথা ও ভুলে থাকলেও, যার ওপর উপবাসের অত্যাচারটা হচ্ছে সেই শরীর তো তা ভোলেনি। শ্রান্ত কণ্ঠে বললো—'সব যায়গায়ই জিতে এসেছি তাই তোমার কাছে হার ছাড়া আমার কোন দিনই কিছু জুটল না। জগতের নাকি এই নিয়ম। কোন কিছু ফেলা যায় না—তোলা থাকে আপন অদৃষ্টের জন্যে।—আজ উঠলাম।' উঠে দাঁড়ালো শমিত।

শমিত উঠে দাঁড়ালে ওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে আনল মিত্রা। ওর বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি বুঝি আর মিত্রাকে স্থির থাকতে দিল না। নীরবে হাতটা বাড়িয়ে দিল মিত্রা শমিতের দিকে।

সাগ্রহে সে হাত দু'হাতে তুলে নিয়ে শমিত ম্লান হেসে বললো—'কিছু বলবে ?'

—'না।'

—'তবে ?'

মিত্রার চরিত্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবার ভেঙ্গে চৌচির হয়ে কথাটা বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে—'বোস।'

এমনি সময় বহু পায়ের শব্দে দোতলার সিঁড়ি উঠল মুখরিত হয়ে। সবাই বুঝি ফিরে এলো পুজো দিয়ে। শমিত মিত্রার হাত ছেড়ে দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো দূরে সরে। ফলের রস হাতে ঘরে এসে ঢুকল সৌমী। মিত্রাকে রসটা ধরে দিয়ে শমিতের দিকে তাকিয়ে বললো—'আপনি দাঁড়িয়ে যে, বসুন !'

শমিত বললো—'এবার যাব আমি।'

—'সে কি হয় নাকি। আমি খাবার বানাচ্ছি—চা খেয়ে তবে যাবেন।'

হাত জোড় করল শমিত—'আর একদিন।'

শমিত চলে গেলে মামীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল মিত্রা। কিন্তু সৌমীর চোখে চোখ পড়তেই আনত দৃষ্টি নামিয়ে। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সৌমীর চোখে। চঞ্চল পায় দুড়-দুড় করে এসে ঘরে ঢুকল বাচ্চারা। সুমিত্রা এসে মেয়ের মাথায় ছোঁয়াল আশীর্ব্বাদ। মুখে দিল প্রসাদ। ছোটরা বর্ণনা করে চললো কলরব করে তাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। খুশীতে ঝলমল্ করে মুন্নী চোখ বড় বড় করে বললো—'ঠাকুর বলেছেন এবার আমার মা ভালো হয়ে যাবেন।'

কুমার এসে মার হাতে একটা বেলফুলের মালা তুলে দিয়ে বললো—'ইস্, তুই যেন ঠাকুরের কথা শুনেছিস ?'

—'গভীর জঙ্গল না হ'লে ঠাকুর আসেন না, তাঁর কথা শোনা যায় না।' ঘাড় বাঁকালো মুন্নী।

মুন্নীর বোকামিতে ছোটরা সব উঠে হাততালি দিয়ে হৈ-হৈ করে ওঠে—'জঙ্গল না হ'লে নাকি ঠাকুর আসেন না, তবে কেন আমরা মন্দিরে পুজো দিতে গেলাম ?'

মুন্নী ওদের দিকে বোকা চোখ করে তাকিয়ে থাকে। মিত্রা ধমক দেয়—'যথেষ্ট হয়েছে—আর হৈ হৈ করতে হবে না। দেখ মামী, কি চেহারা হয়েছে এক এক জনের। মাকে এত মানা করলাম ওদের নিয়ে যেতে। শীগ গির হাত-মুখ ধুয়ে খাইয়ে বিছানায় ঢোকাও সবগুলোকে।'

—'যা সব শান্ত আর বাধ্য ছেলে-মেয়ে! আমি ঢোকালাম আর ওরাও ঢুকল। চল চল।' সৌমী সবাইকে নিয়ে চলে গেলে গায়ের চাদরটা গলা পর্য্যন্ত টেনে অবসাদে চোখ বুজল মিত্রা। চোখ দু'টো যেন জ্বালা করছে! আবার জ্বর এলো নাকি? হাত দিয়ে কপালের তাপ পরীক্ষা করলো। না, রুগ্ন শরীরে এত কথা, এত উত্তেজনা—শ্রান্তি তো নামবেই! দুপুরের ঘটনাগুলো ছায়াছবির মত ভেসে চললো ওর বোজা চোখের ওপর দিয়ে। জীবনে প্রথম আবেগ ভরা ভালোবাসার কথা শোনা—এ ঘোর কাটিয়ে ওঠা!—সরল জীবন-যাত্রা উঠেছে জট বেঁধে। এ জট ও খুলবে কি করে? আর খুলতে চাইলেই কি খোলা যায়? একটি দিনের তরেও যার কাছে স্বামী-সুখ, সুখের মনে হয়নি—সমস্ত পুরুষ সম্বন্ধে যার মনে এসে গিয়েছিল নিদারুণ বিরাগ আর ঔদাসীন্য, মনে হয়েছিল এ মনোভাবের আর ব্যতিক্রম ঘটবে না কোন দিন—সেখানে এ কি আকর্ষণ! যদিও জনশূন্য মধ্যাহ্নে, নির্জন বর্ষা-ঝরা রাতে মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনায় ওকে দলিত ক্লিষ্ট করেছে, তবুও ভালোবাসার অজানা রহস্য পানে মন ওর ছোটেনি কোন দিন। জীবনের মহত্তম সার্থকতার পথ খুঁজে পাওয়ার জন্যই ছিল ওর জীবনের যত ব্যর্থতার হাহাকার। সে জীবন তো খুঁজে পেয়েছে। আজ কল্পনায় আপন জীবনের যে ছবি ও আঁকে, তা ওর শিল্পি-জীবন। নাম, যশ, খ্যাতি। ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ। এর ভেতর কেন এলো শমিত? এ ঘটনার এখানেই ইতি টেনে দেওয়া মঙ্গলের। ওর যুক্তি বুদ্ধি তাই বলে। কিন্তু আশ্চর্য্য! ভেতরে ভেতরে একটা চঞ্চল প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে রইল মিত্রা। কারু জন্য এমন ব্যাকুল প্রতীক্ষা—এও একটা অভিনব অনুভূতি ওর জীবনে। ভোর বেলা চোখ মেলেই মনে হয় সব নূতন, সব কিছুতেই জড়ানো রয়েছে একটা মস্ত আনন্দ-সুর, যে আনন্দ ওর চেহারার রোগ-পাণ্ডুরতার উপর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে দিল একটা কমনীয় স্নিগ্ধ লাবণ্য।

কিন্তু শমিত আর এলো না। রাণী এলো দু'দিন। হঠাৎ রাণীর ভেতর বড় রকমের একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করল মিত্রা। কেমন যেন বিষণ্ণ গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলে সে হেসে ওঠে। কিন্তু সে হাসি নিটোল নয়। বহু ফাঁকিতে ভরা থাকে যেন গালের নানা পাশ। ভাবে মিত্রা—তাকে লুকোবার মতো রাণীর কি-ই বা থাকতে পারে?

সেদিন সন্ধ্যায় খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়ে শুয়ে ছিল মিত্রা। মেঘের সঙ্গী হয়ে মন চলে গিয়েছিল দূর আকাশে। ঘন কালো ভারী মেঘ দানা বেঁধে স্থির হয়ে আছে আকাশের এক প্রান্তে। কানে তার গম্ভীর গুরু-গুরু ধ্বনি। অপর প্রান্তে ছুটোছুটি করে ফিরছে স্বচ্ছ মেঘ-স্তর। সন্ধ্যা-সূর্য্যের রক্তলাল আলোর দ্যুতি সে মেঘের আড়াল হতে বিচ্ছুরিত হয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর বুক, মানুষের মন। সেই অস্ত রবি-রশ্মি চুলে চিবুকে শয্যায় ছড়িয়ে পড়ে রাঙিয়ে তুলেছে মিত্রার অঙ্গ হতে হৃদয়ের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত। আর হৃদয়ের সে রঙটুকু যেন চুপি-চুপি বলছে—আমি ভালোবাসতে চাই ওর ইচ্ছে করছে ঐ পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র মেঘের মালা চুলে জড়িয়ে, কণ্ঠে দুলিয়ে, মেঘ-স্তরে পা ফেলে বৃষ্টির সঙ্গে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে নদীর বুকে। সব ভাসিয়ে নিজেও ভেসে চলে সমুদ্র-সঙ্গমে।

উঃ, কি ভীষণ ঝড় এসে গেল! মামীরা ছুটেছেন দরজা-জানালা বন্ধ করতে। এমন মাথা-কোটাকুটিও আরম্ভ করে হাওয়ার দমকে দরজা-জানালাগুলো! নিরীহ মানুষের হাতের ছোঁয়ায় অভ্যস্ত জীবনে—দুর্দ্দান্ত ঝড়ো হাওয়ার ঝাঁপিয়ে পড়া মাতামাতি বুঝি ওদের সহ্য হয় না। পরপুরুষ-হস্তে লাঞ্ছিতার মত নিজেকে ছিনিয়ে আনবার জন্যেই যেন ওদের এই মাথা-কোটাকুটি।···পরপুরুষ! কথাটা শুনতে কি বিশ্রী! কে পরপুরুষ, কেই বা আপন? কি তার বিচারের মাপকাঠি? বিয়ে?

ভিজে হাত মুছতে মুছতে সৌমী এসে বসল মিত্রার

পাশে।—'বাবাঃ, একেই বলে কাল-বৈশাখী! বৃষ্টিটুকু উড়িয়ে নিয়ে গেল তো বাতাসেই, শুধু ধূলোর ঝড়ে চোখ কচকচি সার!'

—'ধূলোর অপরাধ কি বল তো? বাতাস এসে ওকে উড়িয়ে দিল, আর তারি চলার পথে তোমার চোখ বাঁধা হলো—তাই না তোমা'র চোখে পড়ল সে। কার্য্য-কারণ যোগাযোগ না করে শুধু দোষারোপ করা মানুষের মন্দ স্বভাব।'

হাসলো সৌমীও। বললো—'না, কার্য্য-কারণ যোগাযোগ না করে ধূলোকে দুষে থাকলেও কথা দিচ্ছি, মানুষকে দুষব না।'

—'দুষবে না তো? আশেপাশের মানুষগুলোর অর্থাৎ প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা যাদের নিয়ে কাটাতে হয়, তাদের যদি নিতান্ত স্বাভাবিক বিবেচনা বোধটুকুও থাকে, তবে যে জীবনটা কত শান্তির হয়ে ওঠে, আমার মামী ক'টিকে দেখলেই তা বুঝতে পারি। কিন্তু কি অন্যায় দেখো, শিশু মায়ের কোলে দোল খায় আর ঘুমপাড়ানী গান শোনে—মামী এলো লাঠি নিয়ে। মামীদের কাছে যেন লাঠি-সোটার চাইতে ভালো অভ্যর্থনা কারু ভাগ্যে জোটে না! কি মিথ্যে অপবাদ গাঁথা! আজকালকার এমন মিষ্টি মিষ্টি সব আধুনিক মামীরা—না, এ যুগের ভাগ্নে-ভাগ্নীরা তাদের মামীদের এমন মিথ্যে অপবাদ সহ্য করবে না। হাসছ যে, দাঁড়াও, ভালো হয়ে উঠে নি—মামীদের উপর কবিতার পুরস্কার প্রতিযোগিতা ঘোষণ করব।'

সৌমী হেসে বললো—'তা করো। কিন্তু কি কথা বলবে যেন বলেছিলে?'

—'বলব।···ভাবছি কি জান? ভাবছি, যমরাজ তো দিব্য হিসাব জমিয়ে রেখে গেলেন। এখন মাঝে-মাঝেই যদি সম্ভাষণ করে এসে না দাঁড়ান।'

—'না, তা করবে না। শত হলেও রাজার জাত। সে পরিচয় সে তার যাওয়ার চেহারায় রেখে গেছে।'

ভ্রূ বাঁকালো মিত্রা—'কি ভাবে?'

সৌমী বললো—ঝোঁক হয়েছিল আমার সুন্দরী ভাগ্নীটির সঙ্গে ক'দিন কাটাতে। কিন্তু দেখ না, যাবার বেলা ছুঁড়ে ফেলে যাননি। তাঁর দু'দিনের মিতাকে কেমন জীবনের সঙ্গে নব-যৌবন উপহার দিয়ে গেছেন। কি সুন্দর যে তুমি হয়ে উঠেছ!'

হেসে উঠল মিত্রা—'জীবনের সঙ্গে নব-যৌবন! ভাষাটা যোগাড় করলে কোথা থেকে?' কিন্তু তক্ষুনি মুখের চামড়াটাকে যেন টেনে মিলিয়ে গম্ভীর করে, বিষাদাচ্ছন্ন মুখে বলে উঠল—'না বাঁচলেই মঙ্গল ছিল। ভালো লাগে না, ভালো লাগে না—কিচ্ছু ভালো লাগে না।'

মিত্রার পরিহাস ধরতে পারল না সৌমী। তার গলায় বেদনার আভাস ফুটে বেরুল। বললো—'আমরা তোমায় স্বাচ্ছন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি মাত্র। আনন্দ-সুখ তো দিতে পারিনে।—বিধবার দুঃখ ভাই—'

—'থাক্ মামী—' থামিয়ে দিল মিত্রা। তোমাদের ঐ 'বিধবা' কথাটাই আমার কাছে শত বছরের পচা গলিত শব্দ মনে হয়! ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেও ওটাকে।

[ক্রমশঃ।

বাঙ্গালীর আশ্বিন

শ্রীকামিনীকুমার রায়

আশ্বিন মাস বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে নানা দিক দিয়া একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই মাসে তাহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকৃত্য দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়। ইহা শুধু ধর্ম্মকৃত্য নয়,—তাহার সর্বপ্রধান জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসবের যাহা মুখ্য লক্ষণ,—জাতির সর্বসাধারণের ক্রিয়া-যোগ,—তাহা এই পূজায় বড় হইয়া দেখা দেয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেমন হোলি, দেওয়ালী, দশ-রা, গণপতি উৎসব, বাংলায়ও তেমনি দুর্গোৎসব! দুর্গাপূজা সকলে করে না, আবার একা-একাও কেহ ইহা সম্পন্ন করিতে পারে না; সমাজের সকল স্তরের লোকের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা এবং ক্রিয়া-যোগ হইতে ব্যক্তিগত পূজা ও সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। সংবৎসর নানা দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত করিলেও বাঙ্গালী আশ্বিনের এই কয়টা দিন একটু আমোদ-আহ্লাদে কাটাইতে, ভাল ভাবে থাকিতে খাইতে চেষ্টা করে। তখন তাহার ঘর-দ্বার পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে: ছেলেমেয়েরা নূতন কাপড়, নূতন জামা-জুতা পরে: গৃহস্থালার যাবতীয় জিনিসপত্র, বাসন-কোসন, ধামা-কুলা, ডেস্ক-বাক্স, চৌকি-আলমারি, দা-কুড়াল-খন্তা সমস্ত ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করা হয়। সর্ব্বত্র একটা অপূর্ব্ব সুন্দর শুচিতা, প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা যায়।

আশ্বিনে বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অপরূপ! তখন নির্মেঘ সুনীল আকাশ-তলে নদী-নালা স্বচ্ছ সলিলে কানায় কানায় পূর্ণ থাকে; মাঠে মাঠে সবুজ ধানের ক্ষেতে, নদীর চরে কাশবনে হিল্লোল জাগে, আলো-ছায়ার লুকাচুরি চলে; জলে পদ্ম, স্থলে সিউলি বকুল —প্রাণ-মাতানো সুগন্ধ ছড়ায়; বনে-উপবনে সরস সতেজ বৃক্ষলতায় প্রশান্তি বিরাজ করে। কবিসম্রাট অনবদ্য ভাষায় ও ছন্দে বাংলার শরতের যে-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

*   *   *   *

'মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত চরণে দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে হাসিছে নিখিল অবনী॥'

বাঙ্গালী প্রকৃতির এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে তাহার সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মকৃত্য ও জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসব সম্পন্ন করে; ইহার মধ্যে তাহার সমস্ত মন-প্রাণ, সাধ্য-সাধনা ঢালিয়া দেয়।

শহরে পাড়ায় পাড়ায় পূজা হয়; বহু থাকেন তাহার পৃষ্ঠপোষক। নামকরা ধনী-মানী আইন সভা পৌরসভার সদস্য কেহই বড় বাদ পড়েন না। কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়; সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সদস্যমণ্ডলী, হিসাব-পরীক্ষক প্রভৃতি যথারীতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাদের অধীনে থাকে সাধারণ কর্ম্মীবৃন্দ—কেষ্ট, বিষ্টু, মণ্টু, পিণ্টু, বাবলু, খোকন সকলে। উহাদের মধ্য হইতে আবার বিভিন্ন শাখা-সমিতিও গঠিত হয়। সে-সকল সমিতির কেহ ভার নেয় রূপসজ্জার, কেহ আলোকসজ্জার, কেহ মণ্ডপ নির্ম্মাণের, কেহ পূজোপকরণের, কেহ বা প্রতিমা গঠনের, কেহ বা চাঁদা আদায়ের। এইরূপে এক এক সমিতির উপর এক এক, কখনো বা একাধিক কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। প্রতিমার শিল্প-নৈপুণ্য এবং মণ্ডপ ও রূপসজ্জার দিকেই সকলের অধিক দৃষ্টি থাকে, ব্যয়ও হয় এই কয়টিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমোদ-প্রমোদের দিক দিয়াও কেহ কম যান না; কোন পাড়ায় উদ্যোক্তারা নিজেরাই থিয়েটারের দল করেন, পূজার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই রিহার্সেল আরম্ভ হয়। আবার কোন পাড়ায় বা সারা দেশ খুঁজিয়া সেরা গাইয়ে-বাজিয়ে আনা হয়, জলসার বিবরণ, প্রতিমার ছবি খবরের কাগজে উঠে। পূজা কমিটির গর্ব্বের সীমা থাকে না।

গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় পূজা হয় না; সকল গ্রামে হয়তো একটি দুইটি পূজা হয়। সেখানে এত সব সমিতির ও কর্ম্মকর্ত্তার বালাই নাই, সেখানে সমাজই সমিতি; সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সকলেই উহার সদস্য, কর্ম্মী। গ্রামের পূজা বারোয়ারিই হউক, কিংবা ব্যক্তিগতই হউক, গ্রামের লোকের পক্ষে উভয়ই প্রায় সমান; উভয় ক্ষেত্রেই পূজাটি, পূজা-বাড়ীটি সকলে আপনার করিয়া লয়! তাহাদের কাজকর্ম্ম, হাবভাব, ছুটাছুটি দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয়, পূজাটা যেন প্রত্যেকের। শহরে যেমন অর্থবল থাকিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পূজার যাবতীয় উপকরণ আনিয়া স্তূপীকৃত করা যায়, গ্রামে তেমন করা গেলেও, তেমনটি করা হয় না। সেখানে বহু দিন ধরিয়া বহু জনের সাহচর্যে একটি একটি করিয়া সংগ্রহের কাজ চলিতে থাকে; সকলের সহযোগিতায়, হৃদয়ের ও ক্রিয়ার যোগে সব কিছু সহজ হইয়া যায়। সকলে পূজা করে না, সকল গ্রামেও পূজা হয় না, কিন্তু পূজার আনন্দ উপভোগ করে সকলে। অযাচিত ভাবে কত গ্রাম হইতে কত লোক আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিমা দর্শন করে, প্রসাদ পায়। প্রসাদ বিতরণ গ্রামের পূজার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্বে তো 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্'ই ছিল সেখানকার পূজার সব চেয়ে বড় কথা। বর্ত্তমানে অবস্থার চাপে সকলই প্রায় গিয়াছে। তবু প্রতিমা দর্শন করিতে যাঁহারা আসেন, যত জনই আসেন, শূন্যমুখে ফিরিয়া যান না; কর্ম্মকর্ত্তা—গৃহকর্ত্তা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 'প্রসাদ কণিকা মাত্র' এই বিনয় বচন সহকারে প্রত্যেকের হাতে কিঞ্চিৎ তুলিয়া দেন, না দিতে পারিলে নিজকে প্রত্যবায়গ্রস্ত মনে করেন। পূজা করিয়া মায়ের প্রসাদ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার তাঁহার অধিকার নাই, হউক না সেই অভ্যাগত অনিমন্ত্রিত, ভিন্ন গ্রামের—ভিন্ন সমাজের। প্রসাদ তো আর কেহ ভূরি ভূরি চায় না,—এক টুকরা আখ, একটি বাতাসা পাইলেও তাহারা যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু শহরের পূজায় এই ভাবটি প্রায়ই দেখা যায় না, এখানে সামাজিকতা, লৌকিকতা বড় নাই। এখানে পাড়ার বাহিরে, পাড়াতেই বা কে কাহাকে চেনে, কে কাহাকে যত্ন করিয়া বসায়, আদর-আপ্যায়ন করিয়া 'প্রসাদ-কণিকা' গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে? পূজা করিয়াছি,—কত নামকরা শিল্পীর কি সুন্দর প্রতিমা। রূপ-সজ্জা, আলোক-সজ্জা কত বিচিত্র! এই সকল দেখ, দেখিয়া নীরবে চলিয়া যাও, ভিড় করিও না। অনেক ক্ষেত্রেই

মনোভাব এইরূপ। পল্লীর দুর্গোৎসব আনন্দঘন, প্রীতিঘন বৃহৎ এক সামাজিক সম্মেলন।

পল্লীগ্রামে বাঙ্গালীর সংসারে এই সময়ে অনেক আত্মীয়-কুটুম্বেরও সমাগম হয়; অনেকে অযাচিত ভাবে আসিয়াই উপস্থিত হন। শত দুঃখকষ্টে দিন অতিবাহিত করিলেও, ইহাদের আদর-আপ্যায়নের ব্যয়-ব্যবস্থাকে বাঙ্গালী অপব্যয় মনে করে না। দুঃখকষ্ট, অভাব-অস্বচ্ছলতা তো চিরদিনই আছে, থাকিবে, তাই বলিয়া কি জীবনভোর তাহারই জয়গান করিতে হইবে? বাঙ্গালীর প্রকৃতি সে-উপাদানে গঠিত নয়। ক্ষুধায় অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই। তাহার নয়নের আনন্দ, হৃদয়ের আনন্দ, গৃহের আনন্দ সন্তানদের প্রতি চাওয়া যায় না, তিলে তিলে তাহাদের জীবনীশক্তি শেষ হইয়া যাইতেছে; ধীশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কর্ম্মশক্তি হ্রাস পাইতেছে। পিতা-মাতা কোনওরূপ উচ্চ আদর্শ সন্তানদের সম্মুখে ধরিতে পারিতেছেন না, স্বভাবতঃই তাহারা দুর্বিনীত ও সংসার-সমাজের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছে; কখনো বা দুষ্কার্য্যে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! কে এই বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে? তবু বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব উৎসব-অনুষ্ঠানকে, তাহার সামাজিকতা লৌকিকতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে কই? জীবনের রিক্ত পাত্র এই সকলের আনন্দ-রসেই সে ভরিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

বাঙ্গালীর অনেক কিছু কৃত্য আশ্বিনের জন্য মুলতবী থাকে। পূজার সময় হইবে, পূজার সময় পাইবে, পূজার সময় করিব, পূজার সময় যাইব, পূজার সময় দেখিব—এইরূপ অনেক কিছু চাওয়া-পাওয়া, যাওয়া-করার ব্যাপার সে পূজার তথা আশ্বিনের দোহাই দিয়া রাখিয়া দেয়। দীর্ঘসূত্রতা ইহার কারণ নয়, অস্বচ্ছলতা—অপারগতা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে চিরকালই বেদনা দিয়া আসিতেছে। ছেলেমেয়ের সামান্যতম আবদার পূর্ণ করিতেও তাহাদের সামর্থ্যে কুলায় না। অভাব-অনটনের ফিরিস্তি গাহিয়া ছেলেমেয়েদের প্রবোধ দেওয়া যায় না; সংবৎসর কোনওরূপে শান্ত রাখিতে পারিলেও, পূজার সময় নূতন জামা-কাপড় চাই-ই। একখানা রঙীন জামা পাইলে, একখানা নূতন কাপড় পাইলে তাহাদের মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠে, টাকা আনায় তাহার বিচার করা চলে না। যে পিতা-মাতা সন্তানের মুখে এই হাসি ফুটাইতে না পারেন, বাস্তবিক তাঁহাদের দুঃখের সীমা থাকে না। পূজার আনন্দই তো ছেলেমেয়ের! অথচ কত অল্পেতে তাহাদের খুশী করা যায়!

"জানে না তা'রা সাঁতার দেওয়া, জানে না জাল-ফেলা।
ডুবারী ডুবে মুকুতা চেয়ে;
বণিক ধায় তরণী বেয়ে;
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে সাজায় বসি' ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তা'রা, জানে না জাল-ফেলা।"

অধিকাংশ বাঙ্গালী মাতা-পিতাই এইরূপ আশুতোষ ছেলেমেয়েদেরও তুষ্টি সাধন করিতে পারেন না। ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য প্রিয় পরিজন, প্রতিপাল্যগণ, ঝি-চাকর তাহারাও এই সময়ে গৃহস্বামীর নিকট নূতন জামা-কাপড়, পার্ব্বণী ইত্যাদি আশা করে। এই সময়ে সকলের অন্তর ছাপাইয়া উঠে কাহাকেও কিছু দেওয়ার আনন্দে। বাঙ্গালী গৃহস্থ এই আনন্দকে মুঠা-মুঠা করিয়া সকলের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়, দিতে চেষ্টা করে। কাহাকেও দেয় জামা, কাহাকেও শাড়ী, কাহাকেও প্রসাধন-সামগ্রী, কাহাকেও বা অন্য কিছু। কিছু না দিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। দাতা-গ্রহীতা উভয়েই এই আশ্বিনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতে থাকে।

চাকুরি, ব্যবসায়, অধ্যয়ন প্রভৃতি নানা কার্য্যব্যপদেশে বাঙ্গালী দূরে, প্রবাসে যায়। বৎসরের অন্য সময়ে না পারিলেও আশ্বিনে, পূজার পূর্ব্বে একবার বাড়ী আসিতে চেষ্টা করে। না আসিতে পারিলে তাহারাও যেমন দুঃখিত হয়, প্রিয়পরিজনদেরও অন্তর্বেদনার সীমা থাকে না। আশ্বিন প্রবাসী বাঙ্গালীকে চুম্বকের মত গৃহের দিকে কেবলই আকর্ষণ করিতে থাকে। বাক্সের অর্দ্ধেক ভরিয়া যায় চিঠিপত্রে, কত কি দ্রব্যের ফরমাস-ফর্দ্দে! সে ফরমাসের মধ্যে কখনো থাকে আদেশ, কখনো নির্দ্দেশ, কখনো অনুরোধ, কখনো বা দাবী। কত কি পোঁটলাপুঁটলি লইয়া প্রবাসী বাড়ী আসে, স্ত্রী-পুত্র পরিবার, আত্মীয়-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয়। প্রাণঢালা আদর-আপ্যায়নে, কুশল-মঙ্গলের প্রশ্নে বাঙ্গালীর কুটীর-প্রাঙ্গণ আনন্দ-মুখর হইয়া উঠে।

পূর্ববঙ্গের যাহারা সদ্য স্বগৃহ, স্বগ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছে, আশ্বিনের ডাক তাহাদের মর্ম্মে বড় করুণ সুরেই বাজে। তাহাদের আর বাড়ী যাওয়ার বালাই নাই, আছে শুধু স্মৃতির বেদনা। তাহাদের গৃহতল, অগণিত পূজার মণ্ডপ আজ শূন্য, অস্তিত্ব শূন্য, পূজার আঙ্গিনায় বন-জঙ্গল। উৎসবের বাঁশী যেখানে বাজিয়াছে, মিলনের সাদর সম্ভাষণ যেখানে রণিত অনুরণিত হইয়াছে, আজ সেখানে শৃগালের বিকট ধ্বনি! আশ্বিন আসে, আশ্বিন যায়, কিন্তু গ্রাম হইতে কেহ আর ডাকে না, কাহারো ফরমাস বহন করিয়া চিঠি আসে না, দাবীও কেহ করে না, অনুরোধও কেহ জানায় না; বাড়ী যাওয়ার আনন্দ হইতে দীর্ঘকাল তাহারা বঞ্চিত হইয়াই থাকিবে।

আশ্বিন মাসে পূজার পূর্বে বাঙ্গালী মাতা-পিতার চিত্তে আর একটি বাসনা অতি প্রবল আকারে দেখা দেয়,—কন্যাকে স্বামিগৃহ হইতে বৎসরে অন্ততঃ একটি বার পিত্রালয়ে আনিবার এই বাসনা! ইহা শুধু বাসনাই নহে, বাঙ্গালী হিন্দু ইহাকে কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করে। যাহারা এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন না, তাহারা দুর্ভাগা; সমাজ তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে ছাড়ে না। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কন্যার বিবাহ বড়ই বেদনাদায়ক। নির্দিষ্ট বয়সে, নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আমাদের কন্যাদের বিবাহ দিতে হয়, তাহার ব্যতিক্রম করিলেই চারি দিকে নিন্দাচর্চ্চার সীমা থাকে না। পুত্রের বিবাহে যেমন নানা দিক দেখিবার শুনিবার বুঝিবার পক্ষে অপেক্ষা করা যায়, কন্যার বিবাহে তেমন দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিবার শক্তি কোথায়? চারি দিকে যেরূপ তাণ্ডব-তাড়না, তাহাতে কন্যাটিকে কোনওরূপে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই যেন আমরা বাঁচি! কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক মাতা-পিতাই কন্যাকে বিবাহ দিয়া সংবৎসর তাহার আর কোনও তত্ত্ব লইতে পারেন না। সুযোগ-সুবিধার অভাব, অথবা আর্থিক অস্বচ্ছলতাই যে ইহার মুখ্য কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু স্নেহের পুত্তলিকে দূরে, পর-গৃহে পাঠাইয়া জনক-জননীর, বিশেষ করিয়া জননীর অন্তর্বেদনার সীমা থাকে না। সংসারের প্রতি কাজে, শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে সর্ব্বদা তিনি একটা শূন্যতা অনুভব করেন,

আনন্দে উন্মত্ত হাজার-লক্ষ মানুষের মন—সেই মনগুলো যেন নতুন সূর্যের রং মেখে চোখের উপরে নাচছে।

পিপলস্ পার্ক পিকিন-হোটেলের অনতিদূরে, হোটেলের এই একই রাস্তার উপর। ট্রাম-লাইন রাস্তার মাঝখান দিয়ে—দু'পাশে যথারীতি অপরাপর গাড়ি চলবার জায়গা। আজকে এ রাস্তায় গাড়ি যাওয়া মানা। বাস তাই ঘুরে ঘুরে অলিগলি দিয়ে চলল। একটা মানুষ দেখছি নে বিরস-মুখ, একটুকু জায়গা দেখছি নে সজ্জাবিহীন। ফুটপাথের উপর টুল পেতে বসে কয়েকটি বুড়াবুড়ি, আশেপাশে খেলা করছে বাচ্চারা। গাড়িতে বসিয়ে ঠেলছেও দু-তিনটিকে। বুড়োরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের—বাচ্চারাও দেখাদেখি হাত নাড়ে। আজকে বাড়িতে আছে শুধু এরাই—ভিড়ের মধ্যে তাল সামলাতে পারবে না। বুড়োরা এইখান থেকে লাউড-স্পীকারে উৎসব শুনবে আর বাচ্চার খবরদারি করবে।

পৌঁছলাম অবশেষে। পিছন দিকে এসেছি—নিষিদ্ধ-শহরের মাঝামাঝি। সান-ইয়াৎ-সেন পার্কে বাস রাখল। পায়ে হাঁটা এখান থেকে। মোটরগাড়ি আরও কিছুদূর এগিয়ে যাচ্ছে, মোটরওয়ালাদের কম হাঁটতে হবে।

পাথরে বাঁধানো প্রাচীন পথ। চলেছি তো চলেইছি। খানিক ডাইনে, খানিকটা বা বাঁয়ে। এগুতে এগুতে হঠাৎ পেছুতেও হচ্ছে দু-পাঁচ কদম। গোলকধাঁধা বিশেষ। রাজরাজড়ার ব্যাপার—ধরুন, পাঁচ-সাত শ' পুরস্ত্রী নিয়ে ঘরবসত। তাঁদের গতিবিধি আলাদা রকমের—নগণ্য সাধারণের মতো শাদামাটা সহজ পথে বেড়িয়ে সুখ হবে কেন?

মুশকিল এ যুগে আমাদের—পথ ভুল করে দেয়ালে ঘুঁড়ি খেতে হয়। মোড়ে মোড়ে তাই তীর-চিহ্ন দিয়ে পথ বাতলানো। তা ছাড়া লোকও রেখে দিয়েছে—সসম্ভ্রমে তারা গোলমেলে বাঁক পার করে দিচ্ছে। তিয়েন-আন-মেনের সামনে বাঁ-দিককার গ্যালারিতে আমাদের জায়গা—হঠাৎ এক সময় দেখি, তারই নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। উঠে পড়ুন, আর কি!

হেলতে দুলতে উপরে উঠেই যে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়বেন, সে জো নেই। দেখতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দশটা থেকে শুরু, এটা ঠিক আছে—শেষ কখন হবে, সঠিক তার হদিস পাইনে কেউ বলে একটা, কেউ পাঁচটা। পড়া-না-পারা ছাত্রের মতো অতক্ষণ ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকা। তা বেঞ্চিই বটে এক রকম—গ্যালারির উপরে থাকে-থাকে বেঞ্চির মতন কংক্রিটের ধাপ উঠে গেছে।

এদিকে এই আমরা। আর ডাইনের গ্যালারিতে আছেন শ্রমিক বীর, কৃষক-বীর; মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনারা; কোরিয়া যুদ্ধে হিম্মৎ দেখিয়ে ফিরেছেন যাঁরা। আর শহীদদের মা-বাবা, আত্মীয়জন। নিঃসীম জনসমুদ্র সামনে। কত মানুষ হবে। দশ লক্ষ? কোঠারিকার ছাত্র ভেগা একেবারে বসিয়ে দিল—এক লক্ষ নাকি! তুমুল তর্ক যাদের সালিশ মানি, তারা আবার নতুন এক এক সংখ্যা বলে। আবার জট পাকিয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে শেষটা মুলতুবি রাখা হল কালকের দিনের জন্যে। কাগজে কি বেরোয়, দেখা যাক। ছাপার অক্ষর তো মিছে কথা বলবে না!

তা আমিই জিতলাম। ডেইলি-নিউজ রিলিজে লিখল, পাঁচ লক্ষ। আমি বলেছিলাম দশ—প্রায় তো মিলে গেল, আবার কি!

কি সুন্দর আবহাওয়া যে আজকের! প্রসন্ন সোনালি রোদ আর সেই সঙ্গে হলদে-সাগরের স্নিগ্ধ বাতাস। যেদিকে তাকাই—পতাকা। দিগব্যাপ্ত পতাকার সমুদ্রে ঢেউ দিয়েছে বাতাসে। দুনিয়ার মানুষ আমরা পাশাপাশি—পাশের ইরানি ভদ্রলোক পরিচয় করছেন আমার সঙ্গে। কোথায় নিবাস, কি করা হয়, ছেলেমেয়ে ক'টি—ইত্যাকার প্রশ্ন। আমার গ্রামাঞ্চলে চাষীরা ভুঁয়ের আ'লে বসে হুঁকো টানতে টানতে পথিকজনকে ঠিক এমনি ভাবে ডেকে ডেকে শুধায়। এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, আবার দেখি, অস্ট্রেলিয়ান মহিলাটি। এমনি জমাটি আড্ডা এখানে-ওখানে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলছে। চলবে যতক্ষণ না নিচের ওঁরা শুরু করে দিচ্ছেন।

মুক্ত-চীনের বয়স আজ তিন বছর পুরল—এই তৃতীয় উৎসব। প্রতি উৎসবেই মনে রাখবার মতো কিছু ঘটেছে। পয়লা উৎসবে সারা চীন চুঁড়ে নিয়ে আসা হল পিছিয়ে-পড়া জাতগুলোর প্রতিনিধি। দু-চারটে নয়, বাট রকম আছে এই প্রকার। চীনের মানুষ হয়েও এতাবৎ তারা পরদেশির অধম হয়ে থাকত। খানা-পিনা আদর-আপ্যায়ন আমোদ-ফূর্তি হল তাদের সঙ্গে। সমঝে দেওয়া হল—ভায়ারা, গুহায় থাকো—ঝলসানো মাংস খাও আর সাতরঙা পোষাকই পরো, মোটের উপর কিন্তু তাবৎ চীনের মানুষ এক। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। এ পিছিয়ে থাকা আর ক'দিন? হাত ধরো দিকি—হ্যাঁ, হাতে হাত মিলিয়ে মনে মন মিলিয়ে এক হয়ে এসো মহাজাতি গড়তে লেগে যাই।

পরের বছর নানান দেশের মহামহোপাধ্যায়দের আহ্বান না হল—দেখে শুনে আশীর্বাদ করে যান দু-বছুরে নতুন-চীনকে। পুরানো আমলে কত যাতায়াত ছিল, তার পরে চীনের আপৎকালে বন্ধুত্বের পথে কাঁটা পড়ে গেল। আসুন আবার, আমরাও যাই আপনাদের ওখানে—আসা-যাওয়ায় তো মানুষের কুটুম্বিতা! এই শুভেচ্ছা-মিশনে ভারত থেকে সুন্দরলাল প্রভৃতি এবং পশ্চিম-বাংলার অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও নির্মল ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন।

আর এই তৃতীয় বারে এসেছি আমরা। নানান দেশের বহুত

মিছিল (নানা দেশের মহামানবদের ছবি ও পতাকার সমুদ্র)

গুণী-জ্ঞানী এবং ধনীরাও আছেন। আবার এমন মহাশয়েরাও আছেন, যাঁদের নামের একটা বিশেষণ বলতে গিয়ে—হাতড়ে হাতড়ে শেষটা মরীয়া হয়ে বলতে হয় লেখক। অথবা সমাজকর্মী। জীবনে কোন এক বয়সে একখানা কি প্রেমপত্র লেখেন নি—নিদেন পক্ষে এক পাতা জমাখরচ? তবে লেখক হলেন না কিসে? আর চাকরি করেন কিংবা রাজা-উজির মারেন—সমাজকে বাদ দিয়ে কোন-কিছু নয়। সমাজকর্মী বললে, অতএব, মিথ্যে পরিচয় দেওয়া হয় না।

চুপ, চুপ! দশটা বাজল—বিপুল উল্লাসধ্বনি লক্ষ-লক্ষ কণ্ঠে। আকাশ বুঝি বা ফেটে যায়! কেন—হঠাৎ কি হল রে বাপু? আমাদের পিছন দিকে প্রধান-ফটকের অলিন্দ। মাও-সে-তুং এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। সারা চীনের আনন্দ সাগর-তরঙ্গের মতো উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়ছে সেই অভিমুখে। তাদের মাও-তুচি! পাশে রয়েছেন সুন-চিন-লিং। তাঁর পাশে চু-তে, এবং সারবন্দি নতুন-চীনের নায়কেরা।

মিছিল শুরু। মিলিটারি ব্যাণ্ড। ঝকঝকে বাজনাগুলোয় রোদ পড়ে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। গুণতিতে এক হাজার। পায়োনিয়র ছেলে-মেয়ে—তারা বিশ হাজার, পরের দিন কাগজে পেলাম। চু-তে এর মধ্যে নিচে নেমে গেছেন কোন সময়—মোটর-বাইকে ভট-ভট আওয়াজ করে এসে আদেশ নিয়ে গেল তাঁর কাছ থেকে। সৈন্যরা মার্চ করছে—স্থল জল ও আকাশ-বাহিনী। অশ্বারোহীদল—ঘোড়ার পা পড়ছে তালে তালে; খটাখট খটাখট—চলেছে তো চলেইছে। চার ঘোড়ায় টানছে কামানের গাড়ি—দুজন করে চালক—জোড়া-ঘোড়া চালাচ্ছে প্রতি জনে সারিতে এমনি চারখানা করে গাড়ি, চারটে কামান। লরী-বোঝাই সাঁজোয়া বাহিনী আর বিমান-ধ্বংসী কামান। চলেছে রকেটবাহী আর কামান-টানা লরী—গড়-গড় করে রাস্তার উপর দিয়ে শত শত কামান টেনে নিয়ে চলেছে।

কামানের নাক উঁচিয়ে কালো কালো দৈত্যের মতো ট্যাঙ্ক চলেছে সগর্জ্জনে। মাথার উপরে প্লেনের মিছিল। আশ্চর্য বেগবান জেট-প্লেন চক্ষের পলকে দিগন্ত-পারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মোটর-সাইকেল চেপে যাচ্ছে নারী-সৈন্যের পুরো এক রেজিমেণ্ট।

মিছিলের পুরোভাগটা এমনি। ভদ্র-সন্তানের পিলে চমকে যায়। তারপরে বন্যা এলো বিচিত্র সাজসজ্জার, ফুলের, উল্লাসের এবং হাজার হাজার শান্তি-কবুতরের। বিদেশি দর্শক আমরা যে স্তব্ধ হয়ে দেখছি—নিতান্তই উপর-তলায় আছি এবং ঝাঁপিয়ে পড়বার সহজ কোন রাস্তা নেই বলে। হাজার হাজার মুখের হাসি নিয়ে যে আসছে পিছনে—মিলিটারি কামান-বন্দুক উঁচিয়ে আগে আগে তারই যেন সতর্ক পাহারা দিয়ে ফিরছে। মাথার উপরে প্লেনের ঝাঁক বুঝি দূরবীন কষে দেখে গেল, দুশমন কেউ ঘাপটি মেরে আছে কি না কোথাও।

সাদা পোশাক-পরা ভলণ্টিয়ার-দল—সঙ্গে ব্যাগপাইপ জাতীয় বাজনা। সোনার রঙের অতিকায় এক প্রতীক মাথায় তুলে ধরেছে। আসছে ফুলের তোড়া হাতে কলহাসিনী মেয়েরা—যে দিকে তাকাই ফুলের সমুদ্র। আবার আসে ভলণ্টিয়াররা পতাকা নিয়ে। কত রং আর কত রকম চেহারার পতাকা!

কি প্রকাণ্ড ছবি সান-ইয়াৎ-সেন ও মাও-সে-তুঙের! জনতা মাথায় নিয়ে চলেছে। অমন বিশাল মূর্তি মানুষের হয় কখনো? আমার আপনার চোখে অবাস্তব, কিন্তু চীনের কোটি কোটি নরনারীর কাছে সত্যি সত্যি এমনি বিরাট ওঁরা। সাধারণ মাপের মানুষের পাঁচ-ছ' গুণ বড় করে এঁকে শিল্পীর তবু তৃপ্তি নেই! ছবি আরও অনেক—কার্ল মার্কস, লেনিন, ষ্টালিন, চু-তে… এঁরা সকলে প্রমাণ সাইজের।

আর পার্কের প্রান্তে অনেক দূরে ঐ যে ফুলের বাগান এসে অবধি দেখছি—হঠাৎ তারা দুলতে লাগল। লাল ফুল, বেগুনি ফুল, হলদে ফুল, সবুজ ফুল, সাদা ফুল—ফুলে ফুলে কিন্তু মেশামেশি নেই। চৌকো চৌকো সমআয়তনের বাগান যেন আ'ল বেঁধে আলাদা করা। এ বড় তাজ্জব—বাগানগুলো, একের পিছনে অন্য, এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এদেরও মিছিল—ফুল-পাতা দুলিয়ে দুলিয়ে আসছে। লাল বাগান ধীরে ধীরে চলে গেল আমাদের গ্যালারি, তারপর নেতাদের অলিন্দের সামনে দিয়ে। এলো তার পিছে বেগুনি, এলো হলদে, এলো সবুজ, এলো সাদা… দক্ষিণের গ্যালারির পাশে গিয়ে আবার নিশ্চল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কি কাণ্ড করেছে দেখুন! ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েগুলোর এই কীর্তি। এতও জানে! কাগজের ফুল-পাতা-ডাল বানিয়েছে। সত্যিকার ফুল-পাতাও আছে—রং বাছাই করে তোড়া বাঁধা। পাঁচ শ' সাত শ' নিয়ে এক একটা দল,—একই রঙের ফুল-পাতা তারা ধরেছে মাথার উপর। আমরা উপর থেকে দেখছি। দেখতে পাচ্ছি, মানুষ নয়—শুধুই ফুল। কাছে এসে যখন মিছিল যাচ্ছে, তখনও সেই ফুল! স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল উৎসাহ-দীপ্ত নতুন-চীনের ছেলেমেয়ে—ফুলই তো ওরা! সুবিশাল পিপলস্ পার্কে কতক্ষণ ধরে রং-বেরঙের ফুল ছাড়া কিছু আর নেই…

আমার চোখে কিন্তু জল এলো। দোহাই পাঠকবর্গ, কথাটা ওদের কানে কদাপি যেন না যায়! এত সমাদরের অতিথি—কিন্তু মন খুলে হাসতে পারিনি সেদিন তাদের আনন্দে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছেছি। এর আগে শুনেছিলাম ঐ পিপলস্ পার্কের একটুখানি ইতিহাস। ১৯১৯ অব্দে প্রথম-মহাযুদ্ধের অন্তে

মিছিলের মধ্যে পায়রা উড়িয়ে দিয়েছে

রফা-নিষ্পত্তি হল—জাপানিরাও ভোগদখল করবে চীনভূমির এখানে-ওখানে। হেন উদার পরার্থপর প্রস্তাব ছাত্রদের বরদাস্ত হল না।' বেরিয়ে এলো তারা এইখানে—এই পার্কের উপর। এক টুকরা লাঠিও নেই, একেবারে খালি হাত—এদের উপর নির্ঝঞ্ঝাটে বীরত্ব প্রকাশ করা যায়। তাই করলেন কর্তারা—সৈন্য লেলিয়ে দিলেন মিছিলের উপর। ঠিক আমাদেরই জালিয়ানওয়ালাবাগ—আর ঐ একই সনের ব্যাপার। পার্কের মাটি ভিজে গেল ছাত্র-ছাত্রীর রক্তে। আজকে নতুন কালে, দেখ দেখ, তারা সব ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। সেই রক্তাক্ত ভূমির উপর আজকের ফুলবাগিচা! সেদিনের আর্তনাদ, শোন শোন, হাজার কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি! ক্যান্টনের পথে ওর্ডিন সেই যে বলেছিল, মৃত্যুর জন্য দুঃখ নেই, তারা যা চেয়েছিল, পাওয়া যাচ্ছে—পরবী মেয়েটার কথাগুলো মন ব্যাকুল করে তুলছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের আধুনিক চেহারাটা ভাবছি পিপল্‌স্ পার্কের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। ও-বছর অমৃতসরে দেখে এলাম। সারা বিকালটা বসে ছিলাম এক গাছের তলে। সে গাছে বুলেটের দাগ—সামনের বড় দেয়ালেও দাগ ঐ রকম। ডায়ারের এই কীর্তি চিহ্নগুলো পরিচায়ক-বোর্ড ঝুলিয়ে সযত্নে রাখা হয়েছে। সে আমলে ছিল একটামাত্র সুঁড়িপথ।—যার মুখ কামান বসিয়ে আটকে দিয়েছিল। এখন দরাজ ব্যাপার—একটা দিকের পাঁচিল উড়িয়ে রাস্তার সঙ্গে একশা করে দিয়েছে হিন্দু-মুসলমানে সেই বড় দাঙ্গার সময়টা। ডায়ারের কামান জাত-বিচার করেনি—আজাদির আমলে আমরাই এজাত-ওজাত করে বস্তি পুড়িয়েছি, পাঁচিল ভেঙেছি। পোড়ার দাগ, স্বচক্ষে দেখলাম, মোছে নি আজও। ডায়ারের চেয়ে আমাদের নিজ কীর্তি তবে কম হল কিসে? সেই এককালের শোকবিধুর পিপল্‌স্ পার্কে আজ এই মাতামাতি, আর আমাদের জালিয়ান-ওয়ালাবাগের প্রান্তে নিরীহ মানুষের পোড়া ভিটেগুলো সারি সারি শবদেহের মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল। হিংসার বিষে আরও কালো হয়ে এসেছি চীন থেকে—সত্যি বলছি, এত কালো এর আগে ছিলাম না।

দলের পর দল ধীর-পায়ে চলে—একটুকু থেমে দাঁড়ায় অলিন্দের
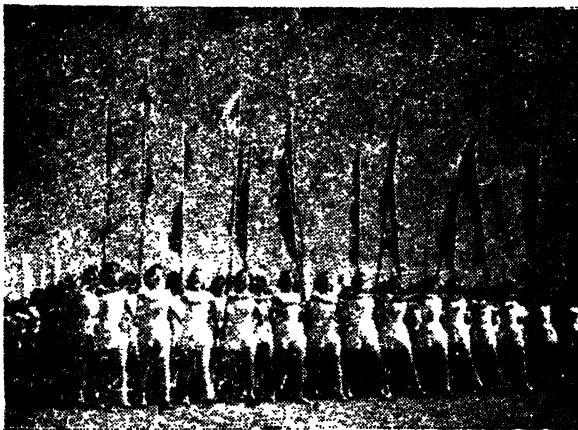
খেলোয়াড় তরুণীদের মিছিল

সামনে এসে। যেখানে আছেন মাও ও অপর মহানায়কেরা। হাত তুলে পতাকা নেড়ে কুসুমগুচ্ছ দুলিয়ে তাঁদের সম্ভাষণ জানায়। ফুটফুটে ঐ এক দল মেয়ে আসছে—চুলে সবুজ ফিতে, হাতে সবুজ পতাকা। আসছে পিচবোর্ডে-আঁকা শান্তির শ্বেত-কবুতর বয়ে নিয়ে… আরে, আরে—আকাশ ভরে গেল যে উড়ন্ত কবুতরে! আঁকা-ছবি কোন ম্যাজিকে পাখনা মেলে আকাশ ওড়ে? তামাম মানুষের দৃষ্টি এবার উপর দিকে। করেছে কি শুনুন—জ্যান্ত পায়রা এনেছে অনেকে কাপড়ের মধ্যে ঢেকেঢুকে। একটা-দুটো নয়—হাজার দু-হাজার। মাও-তুচির সামনে এনে ছেড়ে দিল। উড়ছে, উড়ছে—মুক্তির আনন্দে উড়তে উড়তে পায়রা দৃষ্টির সীমানা পার হয়ে গেল।

চলেছে ওরা বেলুন নিয়ে। উড়িয়ে দিল এক সঙ্গে নানা রঙের বেলুন—পায়রাগুলোরই মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে বেলুন উড়ছে। পায়োনিয়র দল—তাদের আবার নিজস্ব বাজনা। গুনতিতে নাকি সতের হাজার। কি উল্লাস, কি হাততালি, এরা যখন অলিন্দের সামনে মাও-র মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়াল।

একটা খোকা আর এক খুকু ছুটল ফুলের তোড়া নিয়ে। উঠেছে উপর তলায়—ফুল দিয়ে এলো তাদের মাও-তুচির হাতে। ফুল দিয়ে ফিরে আসার পর তবে সে দল নড়ল সেখান থেকে। পতাকা দিয়ে এলো আর এক দলের প্রতিনিধি। নিচের মাঠে তখন কি কলরব, আন্দাজ করে নিন। মিছিলে দলের পর দল চলেছে ফুল আর ছবির পায়রা নিয়ে, বেলুন আর জীবন্ত পায়রা উড়িয়ে। বেলুন ওড়াচ্ছে অবিকল আঙুরের থোলোর মতো করে, কত কি লেখা বেলুনে! ফুলের সমুদ্র—আনন্দের উন্মত্ত কল্লোল। দালান-কোঠা ভেঙে ফেলবে যে চেঁচানির ঠেলায়! কি বলছে—মানেটা একটু সমঝে দেবেন কেউ? জয় হোক সর্বজাতি আর সকল মানুষের, ব্যাপ্ত হোক বিশ্বভুবন জুড়ে নির্মল আনন্দ আর নিশ্চল শান্তি!

গ্যালারির স্বর্গধামে চড়ে ঢেঁকি এদিকে যথারীতি ধান ভেনে চলেছেন। সবাই মগ্ন হয়ে দেখছে, হাততালি দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—এ অধমেরই কেবল হাত-জোড়া। বাঁ-হাতে ছোট্ট খাতা, ডান হাতে কলম। আপনাদেরই আতঙ্কে। ছিটেফোঁটাও ভাণ্ডারে না নিয়ে তাবৎ আনন্দ একা-একা যদি হজম করতাম, আস্ত রাখতেন কি পাঠক-সজ্জনেরা? তবে ছিটেফোঁটা নিতান্তই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবস্থায় অধিক সঞ্চয় কি করে সম্ভবে?

সঙ্গ-জোটানো ইরানি বন্ধু হাসছেন আমার গতিক দেখে। সর্দার পৃথ্বী সিং এগিয়ে এসে বললেন, নিচে যাননি একবারও? রোদে দাঁড়িয়ে আধমরা হয়েছেন—জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসুন।' লেখা দু-দশ মিনিট মুলতুবি থাকুক—ভুবন রসাতলে যাবে না।

গ্যালারির নিচের তলায় সারবন্দি খোপ—উঠবার মুখে নজর করে এসেছি। তথায় চেয়ার-বেঞ্চি পাতা, সামনে টেবিল। টেবিলে গরম চা, ঠাণ্ডা মিনারল-ওয়াটার এবং ফলটা বিস্কুটটার বন্দোবস্ত আছে। যেমন আপনার অভিরুচি। চাই কি উপরে গ্যালারিতে আদৌ না গিয়ে সারাক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরে চা-সেবন এবং গুলতানি করতে পারেন। কথার কথা বলছি—অতদূর আয়েসি অবশ্য কেউ নেই কোন দলে। খররৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

নিতান্ত অপারগ হলে তবেই নিচে নামছে জিরোবার জন্য। এলেই বা লোকসান—আমার জন্য থেমে থাকবে না উৎসব। একটা দিনের পরম দুঃখে নেহাৎ দশটা মিনিটের অঙ্গহানি হবে তো! পারতপক্ষে কে যেতে চায় তবে আড়ালে?

রবিশঙ্কর মহারাজ, অধ্যাপক শুকলা ও উমাশঙ্কর যোশি নেমে আসছেন। মহৎ সঙ্গ ধরলাম। নিচে এসে দেখি, অধ্যাপক জৈন আর তাঁর আনন্দপ্রতিমা মেয়েটা। নানা দেশের আরও বহুতর ব্যক্তি—যোপের মধ্যে বাড়তি জায়গা বড় বেশি নেই।

চেয়ারে জাপটে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কই গো, গেল কোথায় ওরা? এই প্রথম দেখছি, পেজমন্তের লোকের অভাব। সামান্য ক'পাঁচ জন আছে—তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি মশায়, এদ্দিন রয়েছি—খাতির তাই কমে গেল নাকি? সেই চার ঘর-জামাইয়ের গল্পের মতো পয়লা কিস্তিতে হবিষে নয়—মানুষে টান ধরল নাকি?

উঁহু, ওদের দোষ নয়—সদয় হয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন পূর্বাহ্নে যাঁরা সব এখানে এসেছিলেন। সে কি কথা—উৎসব-দিনে আটকে থাকবে কেন এতজনা? যাও তোমরা—দেখে-শুনে বেড়াওগে। হাত-পা চোখ-কান আছে—আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করে নিতে পারব।

কেটলি-ভরা চা এলো বটে, কিন্তু পাত্রের অভাব। খেয়ে খেয়ে লোকে রেখে গেছে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অমনি পড়ে আছে। চক্রেশ তাড়াতাড়ি দুটো কাচের গ্লাস নিজ হাতে ধুয়ে নিয়ে এলো। যোশি বললেন, এঁকে দাও—বই লিখবেন। সকলের আগে দাও এঁকে, বইয়ে তোমার নাম থাকবে।

গম্ভীর মানুষ—ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে সায় দিলেন। অতএব সকলের আগে আমি পেলাম। আর এক গ্লাস পেল শ্রান্তক্লান্ত এক বুড়ো ইংরেজকে। চোঁ চোঁ করে সাহেব গরম চা সরবতের মতো গিলছে।

আবদারের সুরে হেসে মেয়েটি বলে, আপনার বই বেরুলে আমায় পাঠাবেন কিন্তু। অবিশ্যি যদি আমার নাম থাকে। নয় তো দেবেন না। নিজের নাম নেই, পরের একগাদা নাম পড়তে যাবো কি জন্যে?

কিন্তু তুমি তো বাংলা পড়তে জানো না। মিথ্যে করে যদি বলি, নাম আছে তোমার—

সে আমি শিখে নেবো এর মধ্যে। বইয়ে নিজের নাম পড়বার লোভে।

তা সত্যি। জলের মতো ইংরেজি ও হিন্দি বলে। চীনাও শিখছে, অল্পসল্প চীনা বলতে পারে এই তিন মাসের মধ্যে। চক্রেশের পক্ষে কঠিন নয় বাংলা শেখা।

বাপও বললেন, প্রবন্ধ বা বই যা-ই লেখেন, আমরা যেন

পিকিন ছেড়ে তাঁরা এখন বোম্বাইতে। তাগিদ এসে গেছে ইতিমধ্যে, কি লিখলেন?

আবার উপরে উঠে দেখি, মিছিলের ভিন্ন চেহারা। ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা চলেছে—নীল পোষাক, হাতে হাতে লাল পতাকা আর ফুল। তাদেরই এক বাজনার দল—পোশাক হল নীল প্যাণ্ট, সাদা জামা, কোমরে লাল কাপড় ঝুলানো। চলেছে রেলকর্মীরা, বিশাল এক ইঞ্জিন—পিচবোর্ড কিম্বা শোলায় তৈরি—তাদের কাঁধে। ইলেকট্রিক শ্রমিক—নতুন নতুন আবিষ্কারের নমুনা লোহার জালের ফ্রেমে আটকে নিয়ে চলেছে। এক দল চলেছে ইয়াংসি নদী আটকাবার যে পরিকল্পনা হচ্ছে তারই বিরাট নক্সা বয়ে নিয়ে। ছাপাখানার কর্মীরা নিয়ে চলেছে মাও-সে-তুঙের লেখা এক বই। এত বড় করে বানিয়েছে—একটা মানুষের পক্ষে সে বস্তু বয়ে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। দাঁড়িয়ে ছাড়া পড়া চলবে না; পাতা উল্টাবার জন্য আলাদা মানুষ ঠিক করে রাখতে হবে।

এমনি চলেছে—কত আর লিখব! এক বছরের মধ্যে তারা কি করেছে, বড় বড় হরপে তাই তুলে ধরেছে। চক্ষু মেলে দেখছে তাবৎ বিশ্ববাসী—কি বেগে এগিয়ে চলেছি, চেয়ে দেখ সকলে। নব্বই হাজার এমনি কর্মী—আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। ত্রিভুবন থোড়াই কেয়ার করে, চলনে এমন উদ্ধত ভঙ্গিমা!

আসে এবারে চাষীর দল। যেখানে লাঙল চষে সে এখন তাদের জমি। চাষীদের প্রাণে সকলের বড় যে সাধ, এত দিনে তাই মিটেছে। কত রকম কায়দায় ফসল ফলাচ্ছে। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বের করছেই বা কত! নমুনা দেখিয়ে যাচ্ছে সেই সব জিনিসের। রাক্কুসে কুমড়ো-শসা নিয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি, অত বড়—না মাটি দিয়ে বানানো কুমারের চাকে?

এবারে অফিস-কর্মচারী, ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ। শিল্পী ও

সাহিত্যিকরা। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির দল। বিজ্ঞান-ছাত্রদের চিনতে পারি অতিকায় এক মাইক্রোস্কোপ নিয়ে চলেছেন, তাই থেকে।

জনস্রোতের কি শেষ নেই? তাবৎ চীনদেশ যেন এসে জুটিয়েছে পিপল্‌স্‌ পার্কে। আর শৃঙ্খলা কেমন—লাইন ভাঙছে না কোন দিকে একটি মানুষ। কচি কচি ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে নেচে চলেছে মিছিল ঘিরে।

ছবি তুলছে নানান দিক থেকে। মোভি-ক্যামেরাও চলছে। পারবে কি বন্ধুরা মুক্তির এই রূপ ছবিতে গেঁথে রাখতে? আমার কলম তো হার মেনে গেল!

অপেরা-দল চলেছে মজার পোশাকে। গায়ক, বাদক আর ফিল্মের লোক। কোন শ্রেণীর কেউ আর বাদ নেই। গেরুয়া আলখেল্লায় চলেছেন বৌদ্ধ শ্রমণরা, সাদা টুপি মাথায় মুসলমানরা। চিত্রবিচিত্র সজ্জায় বিভিন্ন মাইনরিটি দল। এক বিপুল পৃথিবী বয়ে নিয়ে আসে—তার উপর বিরাট পায়রা পাখনা মেলে আছে। পৃথিবীর ঠিক সামনের দিকটায় আমাদের ভারতের মানচিত্র। পায়রার পাখা দুলছে চলার তালে তালে। পাখনার স্নিগ্ধ ছায়া সমস্ত এশিয়া অঞ্চলটা জুড়ে।

খেলোয়াড়েরা চলেছে—তরুণ আর তরুণীর দল। স্বাস্থ্য দেখে চোখ জুড়ায়—দৃষ্টি ফেরানো যায় না। মেয়েরা যাচ্ছে বিলকুল সাদা পোসাকে। ছেলেদের সাদা প্যাণ্ট সকলেরই—জামা হল দল হিসেবে লাল হলদে আর সবুজ। পতাকার রঙও আলাদা। এত হাজার আনন্দ-মূর্তি সমান তালে পা ফেলে রূপের লহর তুলে চলেছে। মাও হাত তুলে আদর জানাচ্ছেন এই ভাবী-চীনদের। মাওর মুখোমুখি এসে গতি শ্লথ হয়—কি করবে তারা বুঝি ভেবে পায় না, কত রকমে মনের উল্লাস পৌঁছে দেবে মাও-র কাছে!

ছুটোয় মিছিল শেষ—পুরোপুরি সাড়ে তিন ঘণ্টা। তারপরে মাও-সে-তুঙের উদ্দেশে কি আনন্দোচ্ছাস! সমুদ্রের আলোড়নের মতো—তার যেন শেষ নেই, সীমা নেই। আর বুঝে দেখুন ঐ নায়কবর্গের অবস্থা। বেঞ্চুত ঠেকলে আমাদের নিচের খোপ আছে—তথায় ছড়িয়ে বসুন এবং যৎকিঞ্চিৎ সেবা নিন। ওঁদের সে জো নেই—কড়া রোদে লক্ষ চক্ষুর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ! বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি, অলিন্দের ঠিক মাঝখানে মাও—নিশ্চল নিস্তব্ধ—পটে আঁকা ছবির মতন। কি ভাবছেন কবি মাও? সেই সমস্ত ছেলে-মেয়ে—পথের মাঝে যাদের হারিয়ে এসেছেন, আজকের আনন্দ-দিনে যারা নেই? কিম্বা সামনের দিনের আর এক মধুরতর স্বপ্ন—নতুন-চীন যেখানে গিয়ে পৌঁছবে? উৎসব-শেষে এবারে তিনি ছুটোছুটি করছেন এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত—হাত তুলে চারিদিককার অগণিত মানুষকে প্রতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

৬

হোটেলে ফিরে একেবারে গড়িয়ে পড়লাম। ধকল কম নয়—অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের পোষায়? ঘুমোই নি তা বলে—জেগে জেগেই দিবাস্বপ্ন!…মিছিল চলেছে বুঝি এখনো অফুরন্ত প্রবাহে—কলরোল কানে আসে। আহা, তাই হোক—এ আনন্দ না ফুরোয় যেন কোন কালে! মানুষে দুঃখ পায়, মানুষের চোখে জল আসে—আজকের এই ব্যাপার দে… আর কে বিশ্বাস করছে বলুন? পৃথিবী এমন গরিব নয় যে মানুষগুলোর পেটের ভাত জোগাতে পারে না, এত সঙ্কীর্ণ… যে বাসিন্দাদের জায়গা দিতে পারে না। কাজ করো আর ফূর্তি করো ভাই—কেন মিছে বাজে ঝামেলা?

সন্ধ্যার কাছাকাছি ইয়ং এলো।

ঐ মিছিলে শেষ হল না, রাত্তিরেও আছে।…আলো দেবে, বাজি পুড়বে, নাচবে গাইবে খেলবে ছেলেমেয়েরা। আপনাদের বাসে… ব্যবস্থা আছে, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—

তার মানে বাসে তুলে নিয়ে ভদ্রজন মাফিক স্থাপনা করা… গ্যালারির উপরে। খাতিরের অতিথি হয়ে উপর থেকে না… ইত্যাদি দেখে হাততালি দিয়ে ফিরে আসব সকালবেলার মতো। সেটা হচ্ছে না। ব্রজরাজ কিশোরের সঙ্গে যুক্তি আঁটলাম, হেঁটে বেড়াবো আমরা। হাঁটতে হাঁটতে মিশে যাবো উল্লসিত জনতার সঙ্গে। দুঃখী দেশের মানুষ—এ বস্তু আমাদের ধারণায় আসে না। ওদের সঙ্গে মেশামেশি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে ওদের মনের স্ফূর্তির একটুখানি ছোঁয়াচ নিয়ে দেশে ফিরব।

ইয়ং-এর সাড়া পেয়ে কাতরাচ্ছি, বিষম মাথা ধরেছে রে, ভাই—হ্যাঁ, দু-জনেরই। যন্ত্রণায় ছটফট করে এতক্ষণ পরে একটু বুজি… চোখ বুজেছেন—ওঁকে ডেকো না।

বিশ্রাম নেবার মোটারকম সদুপদেশ দিয়ে ইয়ং অগত্যা চলে গেল। দরজা ফাঁক করে করিডরের এদিক-ওদিক দেখে নিঃসন্দেহ হই। গেছে চলে সকলেই—সাততলা হোটেলবাড়িতে সব ঘর প্রায় ফাঁকা। এক শ' পাঁচ নম্বর রুমের দুই ষড়যন্ত্রী আমরা এইবার জামা-কাপড় পরে বেরুবার তোড়জোড় করছি।

পৌনে আটটা। হায়ে হাঁটা—অতএব বড় রাস্তা দিয়ে যেতে বাধা নেই। চতুর্দিক কি আলোয় সাজিয়েছে রে! আমাদের হোটেল-বাড়িটারই বা কি রূপ—লনে বেরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। এখন দাঁড়িয়ে থাকায় কোন মুশকিল নেই—ফাঁকা লন হা-হা করছে, সব গিয়ে জড় হয়েছে তিয়েন-আন-মেনে।

লাউড-স্পীকারে দ্রুত তালের বাজনা—ফ্লাস-লাইটের প্লাবন বইয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘন ঘন।। বুকের ভিতর নাচিয়ে তোলে। ঘরের মধ্যে কে আর থাকতে পারে—শহরের কোন বাড়ি… বুঝি একটা মানুষ নেই! বাচ্চা ছেলেমেয়ের হাত ধরে কোনটাকে বা কোলে-কাঁখে তুলে চলেছে বাপ-মায়েরা। একটা পুলিশের টিকি দেখতে পাই না—অথচ সবাই কেমন নিয়ম মেনে চলেছে, একটু… বেচাল নেই কোন দিকে।

শোঁ-শোঁ করে বাজি উঠছে আকাশে—লাল সবুজ হলদে তা… কাটছে। এক কনফারেন্সে ওদের ঔপন্যাসিক মাও-তুন বক্তৃতা করছিলেন, দেখ হে—বারুদ আমরাই আবিষ্কার করেছি, কিন্তু তা দিয়ে বানালাম শুধু আতশবাজি—বাজি দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিলাম। সেই বারুদ কামান-বন্দুকে পুরে মারণ-কার্যে লাগাল অন্য জাত। তাই সত্যি, তাবৎ বিশ্ব বাজির হাতে-খড়ি নিয়েছে চীনের কাছ থেকে। আদি আমল থেকে হালফিল অবধি বহুৎ রকমের বাজি তৈরি করেছে, তারই নমুনা ছাড়ছে মুহুর্মুহু। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মানুষজন ফুটপাথের উপর বসে পড়ে বাজি দেখছে।

বিপুল এই জনারণ্যের মধ্যে এতটুকু ময়লা কি এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করুন দিকি! দগ্ধাবশেষ সিগারেট হাতে নিয়ে ঘুরছি—খুঁজে পেতে আবর্জনার জায়গা না পাই তো শেষ অবধি পকেটে পুরে ফেলতে হবে। যত এগোচ্ছি, ভিড় এঁটে আসে। সকলে তাকাতাকি করে আমাদের দিকে—বিশেষ করে আমার পোশাকের প্রতি। এই হিমরাত্রিতে লম্বা ওভারকোট চাপিয়ে গা তো অনেকখানি ঢেকে দিয়েছি। বুকে ব্যাজ—কৌতূহলীদের চোখের উপর সগর্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াচ্ছি, পড়ে দেখ সোনার অক্ষরে কি লেখা! দেখছ কি—রবাহূত নই—বড়-কর্তাদের নিমন্ত্রণে সকালবেলা ঐ উর্ধ্বলোকে ছিলাম। ইচ্ছে করলে এখনো এক লহমায় উঠে বসতে পারি। দর্শন ও পঠন অন্তে নরনারী ঘাড় নেড়ে অভিনন্দন জানায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মজা পেয়ে গেছে—ঘিরে ধরছে আমাদের। কচি কচি হাত টেনে আচ্ছা করে মলে দিচ্ছি। কত খুশি! খিল-খিল করে হাসছে মুখের দিকে চেয়ে। বালখিল্যের আরও নতুন নতুন দল হাত বাড়াচ্ছে নিচের থেকে।

নাচছে এক-এক জায়গায়। মানুষ জমে গেছে—বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে দেখছে। নৌসৈন্যের সঙ্গে নাচছে মেয়েরা। বড় বড় মেয়ে—কলেজের ছাত্রী হয় তো! পবিত্র, নিষ্পাপ—মুখ আর হাসি দেখে, কণ্ঠের গান শুনে সাধ্য কি আপনি অন্য-কিছু বলেন। আনন্দের জায়গায় সকলে এক। এক মানুষ ও আর মানুষে তফাৎ আছে—কোন মূঢ় আজ বলবে হেন বাক্য? কানামাছি খেলছে এক জায়গায়। এমনি কত! কাছে এসে আলগোছে কাঁধে হাত রাখছে, কথা তো বুঝব না—নির্বাক্ ভালবাসা জানিয়ে যাচ্ছে এমনি করে। বিদেশি আমরা দু'জন নিঃসীম এই জনসমুদ্রে দুটো বারি-বিন্দুর মতো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছি।

অথচ পাঁচ-সাত বছর আগেকার খবর নিন—কেমন ছিল জায়গাটায়? গা ঘিন-ঘিন করবে। কালো-বাজারির চাঁদনিচক—ফটকা-জুয়ার আড্ডা। সন্ধ্যের পর নরক গুলজার—পৃথিবীর যত নোংরামি ও সামাজিক পাপের কথা জানা আছে, সমস্ত এই একটি জায়গায়। সে সব ভেঙে এখন চুরমার করে দিয়েছে, পা-বাঁকা পঙ্গু মেয়ে আর যন্ত্রবতী পণ্য মেয়ে নেই, খুনি বোম্বেটে নেই পিঠকুঁজো কুলিও নেই—নতুন মানুষ এরা।

একটা চক্রের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে হঠাৎ এগিয়ে এলো। হাত ধরে টানছে। একটু না-না করি। কিন্তু হাতের আর ভালবাসার টান—ঠেকাতে পারলাম না। নাচের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কি হাততালি! আমরা দু'জনেও হাততালি দিই। তার পরে, ও হরি! নাচতে বলছে তাদের সঙ্গে। আকারে-ইঙ্গিতে বলে, তবু বুঝতে আটকায় না। কিন্তু সাহসটা কি—আমরা কি দরের মানুষ, অবোধ ছেলেমেয়েরা ঠাহর পাচ্ছে না। না বুঝবে না—ঠাহর করাই বা কি করে? আবার দেখিয়ে দিচ্ছে কেমন কায়দায় নাচতে হয়। আসরের মধ্যেই নাচের ক্লাস। নৃত্য-গুরুর বয়স—তা বছর দশেক হবে বই কি! পরম গাম্ভীর্যে আনাড়ি ছাত্রদ্বয়কে হস্ত-পদ চালনার প্রণালী শিখাচ্ছে।

নেশা লেগে গেল। আহা, এই সুদূর দেশে এদের মধ্যে আবার একটা দিন কয়েকটা মুহূর্ত যাই না কেন ছেলেমানুষ হয়ে! কে দেখছে যে মহাবিজ্ঞ অমুক মহাশয় শিশুসুলভ চাপল্যে মত্ত হয়ে পড়েছেন? গিয়েই ফের ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়ব—কাল থেকে শান্তি-সম্মেলন—অনবসর কর্মপ্রবাহ, তাবৎ বিশ্বভুবনের জন্য দুশ্চিন্তা...তার মধ্যে কেউ খোঁজই পাবে না এক রাত্রের এই ক্ষণিক মতিবিভ্রম।

আমি নাচছি, নাচছেন ব্রজরাজ। ঢেঙা মানুষ তিনি, মাথায় চকচকে টাক—আর আমি কিঞ্চিৎ গায়ে-গতরে আছি। সিনেমা-ছবিতে লরেল-হার্ডিকে দেখে থাকেন, ধরে নিন তেমনি একটি জোড়া। বিলাতি পোশাক বলে ব্রজরাজের তবু কিছু বাঁচোয়া। আমার আবার একখানা হাত সতত কোঁচা ধারণ করে আছে। নাচের বাহার আন্দাজ করে নিলেন তো রসগ্রাহী পাঠক-সুজন? এতেই রক্ষা নেই—একের পর এক আসছে হাত ধরে এক একপাক নাচবার জন্য। বাজনা বাজছে, গাইছে সকলে। কি গান বুঝিনে—একই কথা বারম্বার আবৃত্তি করে যাচ্ছে। আমরাও করছি তাই। একটা ছোট মেয়ে—মাথায় লাল রিবন—তিড়িং করে এসে পড়ল আমাদের চক্রের মধ্যে। পঞ্চাশ আর পাঁচে হাত-ধরাধরি করে ঘুরঘুর করে নাচছি। সে তাজ্জব দেখলেন না চোখে—লেখা পড়ে কি মজা পাবেন! আবার ভুল বাতলে দেয়—অমন নয়, পা ফেল এমনি-এমনি করে। বেতালা হয়ে যাচ্ছে আরো স্বদেশস্থ আপনাদের স্মরণ পড়ে। হেন নৃত্যের পর আপনারা হলে কি কাণ্ডটা করতেন—টিটকারি না-ই দিলেন, হেসে ফেটে পড়তেন। অথবা মুখে কাপড় দিয়ে প্রাণপণে হাসি চাপতেন—সেইটে হত আরও মারাত্মক। আর এই বাচ্চার দল, দেখুন, ভারি ভদ্রলোক—মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আর আনন্দ জ্বলজ্বল করছে মুখের উপর।

এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম কতক্ষণ। আবার এক জায়গায় গ্রেপ্তার করে আসরে নিয়ে দাঁড় করাল—নাচতে হবে। অত ফেলনা নই বাপু, যে বললেই অমনি নাচতে লেগে যাবো। এখন মনে হচ্ছে, নেচেছিলাম নিশ্চয় উত্তম। দেখে তাক লেগে গেছে, তাই এমন ধারা পশার। এই মওকায় কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করব নাকি পিকিন অপেরা-দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে? সে অবশ্য পরের কথা।
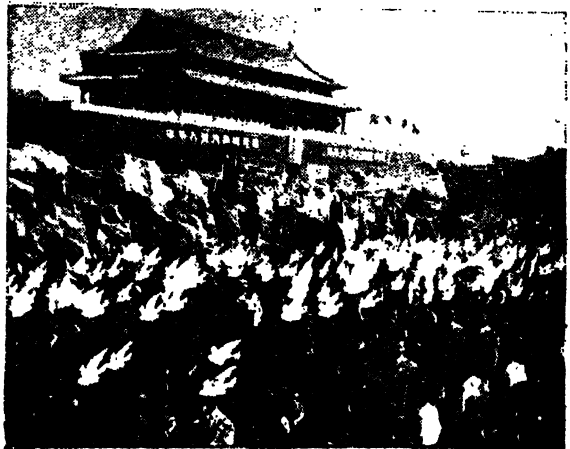
মিছিল (হাতে পিচবোর্ডের শান্তি-কবুতর)

আপাতত এক নাচনেই হাঁপিয়ে পড়েছি—প্রাণপক্ষী পঞ্জর-পিঞ্জরের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছেন। দু-হাত নেড়ে সোজা বেকবুল যাই। হবে না—কোন উপায় নেই। ওরাই আমাদের ঘিরে নাচে তখন। স্বপদে না নাচলেও হাততালি দিয়ে তাল রাখছি। তাল-মাত্রায় কেমন পরিপক্ক হয়ে গেছি এই আধ ঘণ্টাখানেকের ভিতর! বাজিতে বাজিতে ওদিকে আকাশে আগুন ধরাবার জোগাড়। চাঁদ হাসছে। নাক-ঢাকা পরে ঘুরছে অনেকেই—বারুদের বাতাসে নিশ্বাস নিলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে। এই স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য করেই এরা মরবে—আমরা নিরঙ্কুশ কেমন দেখুন দিকি!

রাত অনেক হয়েছে, উৎসবের তবু ক্ষান্তি নেই। ফিরে আসছি আনন্দোন্মাদ জনতার মধ্য দিয়ে। এ ছবি আর কোথাও কি দেখব! মানুষে মানুষে এমন মেলামেশি···নিশি রাত্রে একসঙ্গে গাইছে বড় বড় ছেলে আর মেয়ে, হাত ধরাধরি করে নাচছে—

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখলেন?

'স্বর্গীয় শান্তির দরজা' সামনে—এই তো স্বর্গধাম।

কি বলেন, স্বর্গ তো মানেই না এরা—

পাঁকের জীব আকাশের দিকে হাত বাড়ায়। স্বর্গের উল্লাস মাটিতে যারা আনছে, আর-এক স্বর্গ কি করবে তারা?

আরও খবর আসে ক্রমশ। ক্ষিতীশ গায়ক মানুষ—কাঁধে কাঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে; গাইতে গাইতে সে গলা ভেঙে ফিরল। রোহিণী ভাটে আর চক্রেশও পাগল হয়ে নেচে বেড়িয়েছেন। সবাই ফিরছেন হোটেলে। নেচেকুঁদে সব রাক্ষসের ক্ষুধা নিয়ে আসবে—ঘরে ঘরে তাই এক গাদা করে স্যাণ্ডউইচ আর কলা-আঙুর-আপেল দিয়ে গেছে। দেড়টা বেজে গেছে, রাস্তার বাজনা শুনতে পাচ্ছি এখনো। সারা রাত্রি আনন্দের এমনিতরো মচ্ছব চলবে নাকি?

এখন একটি চিন্তা। আজকের বৃত্তান্ত দেশে-ঘরে না পৌছায়। এমনি তো সভায় সভায় ধুল পরিমাণ—সাহিত্য-ব্যাপার আছে, চীনের কথা শোনাবারও বিস্তর হুকুম আসবে। কত আর অজুহাত রচনা করা যায় বলুন! নানা করেও হাজির হতে হবে বহু গুণীজনের সামনে। এর উপরে নাচের খবর চাউর হয়ে গেলে মারা পড়ব। পিকিন-রাস্তায় নেচে এসেছি—অতএব বক্তৃতান্তে সুনিশ্চিত নৃত্যের ফরমাস হবে। আমার শত্রু বাড়বে—পেশাদার নাচিয়েরা ভাববেন, চীন থেকে ফিরে এই বুঝি আবার এক নূতন লাইন ধরল।

তা আমিও সঙ্কল্প করেছি, সে নাচ কিছুতে দেখাবো না আপনাদের। রাগ করলে নাচার। বলবার কথা আছে—এনে দিন আমার সেই দেবশিশু নৃত্যসঙ্গী ও সঙ্গিনীদের। আর দশ বছুরে সেই নৃত্যগুরুকে—পা ফেলবার কায়দাগুলো যে বাতলে দেবে। আর সেই পিকিন-পথের রসিক দর্শককুল—মাধুরীময় দৃষ্টি দিয়ে যারা অভিনন্দন করবে। দিলখোলা খুশির প্রবাহ চতুর্দিকে, আকাশে পূর্ণচাঁদ, আলো আতশবাতি ও বাজনায় মর্ত্যলোকে ইন্দ্রপুরী। পারবেন জোটাতে এত সব? তবে রাজি আছি। নয় তো সেই আমার জীবনের প্রথম নাচ এবং সেই শেষ।

এইখানে একটু দাঁড়ি টানি। প্রথম পর্বের ইতি। কাল দোসরা অক্টোবর—মহাত্মাজীর জন্মদিন। প্রভাতে তাঁর স্মৃতি আরাধনা। রবিশঙ্কর মহারাজ পুরোধা। শান্তি-সম্মেলনের শুরু তার পরে। আমার চীনের কাহিনীর পরের অধ্যায়।

প্রায় একটানা প্রশংসা চলল এত দিন। নিজেরই লজ্জা করছে। নিছক ভালো ভালো বস্তু নিয়ে ধর্মব্যাখ্যা হতে পারে, কাহিনী জমে না। থাকত দেবাসুর অথবা সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব—আপনারা রোমাঞ্চিত কলেবরে পড়তেন। বুঝি—সমস্ত বুঝি। আর ভেবেছিলামও, দিই এক-আধটা কাল্পনিক ভিলেন ছেড়ে কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু সেই যে যাত্রা-মুখে কয়েকটি তরুণ বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম, নিজের চোখে-দেখা জিনিষ ও অন্তরের উপলব্ধি হুবহু লিখব—তাই কাল হয়েছে। মন্দ মানুষ তবে কি কুলো বাজিয়ে একেবারে দেশ-ছাড়া করেছে? এতখানি বিশ্বাস করি নে। সেই ভরসায় যথাসাধ্য খোঁজাখুঁজিও করেছি। কিন্তু তাঁরা এমন গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন যে কোন রকমে পাত্তা পাওয়া গেল না। অদৃষ্ট আমার—আর কি বলব! খোঁজ পেলে তো লেখা মজাদার করা যেত। চীনকে যাঁরা নখের উপর তুলে টিপে মারতে চান সেই মহদাশয়েরাও কিঞ্চিৎ স্ফূর্তি পেতেন।

প্রথম পর্ব শেষ

"লাল পল্টন" জিন্দাবাদ!

বাংলা ভাষায় "লাল পল্টন" শব্দটি কিছু কাল পূর্ব্বেও চালু ছিল। যদিও শব্দটির যথার্থ অর্থ যে কি, অনেকেই জানেন না। প্রথমেই জেনে রাখতে হবে "লাল পল্টন" ইংরাজ সৈন্যদের নাম আদপেই ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে একত্রে যারা রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্যে বাঙালীর অভাব ছিল না। ক্লাইভের ৩৯ সংখ্যক সৈন্যদল পরবর্ত্তী কালে "লাল পল্টন" নামে খ্যাত হয়। এই সৈন্যদলে অধিকাংশ বাঙালী ব্যতীত কিছু মাদ্রাজী সৈন্য ছিল। সেকালে "লাল পল্টন" "Primus in India" নামে পরিচিত হয়। ইংরাজ-প্রতিষ্ঠার উষায় "লাল পল্টনের" হৃদয়শোণিতেই শিলা-বিন্যাস ক'রে তাদের কীর্ত্তিসৌধ নির্ম্মিত হয়েছিল। Great battles of the British Army গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠায় আছে: "Praise was more particularly given to the 30th Regiment which still bears on its banners the name of "PLASSY" and the motto, Primus in India."

"লাল ফৌজ" শব্দটি অধুনা সুপ্রচলিত হওয়ায় উক্ত শব্দটি কল্পনায় আবির্ভূত হওয়ারও বহু পূর্ব্বে "লাল পল্টন" শব্দের তাৎপর্য্য বাঙালী মাত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য। "লাল পল্টন" জিন্দাবাদ!

ও, আর, সি, এল, লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।

বিসর্পিল

স্নাণু ভৌমিক

চৌমাথা—ছুটো রাস্তা এসে মিলেছে ঠিক যেন যোগচিহ্ন। এক পাশে একটা সিনেমা-হাউস। কি একটা হিন্দী ছবি দেখান হচ্ছে—তারই বড় বড় ছবি দেওয়ালে আটকান—যৌন আবেদন-পূর্ণ অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্ত্তি। এক পাশে একটা পানের দোকান—সামনেই একটা বেঞ্চ পেতে কতগুলি লোক বসে আছে—নিম্নশ্রেণীর অবাঙ্গালী। ওপাশে একটা শাদা বড় বাড়ী। রঙ্গীন ছাতা-হাতে একটি মেয়ে ব্যস্ত ভাবে এসে ঢুকলো—এপাশে একটি ওষুধের দোকান। সামনেই ট্রাম ষ্টপেজ—ট্রামটা এসে ঘচাং করে থামলো, আরও অনেকের সঙ্গে তপতীও নামলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত রাস্তা—কোথা দিয়ে কোথায় যাবে সে ঠিক বুঝে উঠতে না' পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো একটু। চারদিকে তাকিয়ে সে এমন একটি লোক দেখতে পেল না যাকে পথের কথা জিজ্ঞেস করা যায়। আর, রাস্তার মাঝখানে লোকের সঙ্গে কথা বলা, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্বন্ধে তার মনে একটু ভয়ও ছিল—ধীরে ধীরে সে রাস্তা দিয়ে এগুতে লাগলো—পাশে একটি দোকান—দেখে বাঙ্গালীর বলেই মনে হয়,—একটু ইতস্তত: করে সে ঢুকে পড়লো। দোকানে খরিদ্দারের ভিড় ছিল না, কাজেই সে ঢুকতে সব কয়েকটি সেলস্‌ম্যান একসঙ্গে এগিয়ে এলো। তপতীর মুখটা লাল হয়ে উঠলো। এরা ভেবেছে সে ক্রেতা, তাই এত খাতির। একটু থেমে-থেমে সে বললো, "আচ্ছা, পি থ্রি মিশন রো এক্সটেনসন্ কোথায় বলতে পারেন?"

এক কোণে একটি লোক বসেছিল—মাথায় টাক, সামনে খাতা খোলা—তিনি বললেন, "মিশন রো এই দিকে হবে, তবে পি থ্রি কোথায় হবে তা বলতে পারি না। হেঁটেই যান, খুব বেশী দূর নয়।"

তাঁর নির্দ্দেশ মত তপতী হাঁটতে লাগলো। পথ আর ফুরায় না—মাথার ওপর রৌদ্র-তাপ ক্রমেই বাড়ছে। তার মুখটা লাল হয়ে উঠলো। মাঝখানে চওড়া কালো পীচের রাস্তা। ছ'পাশে শাদা ফুটপাথ—বাস, গাড়ী, লোকজন যে যার মত আসছে-যাচ্ছে, কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। যেন সবাই নিজেদের আলাদা জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। যেন একটু অপেক্ষা করলেই পরম মুহূর্ত্ত চলে যাবে—তাই দ্রুততালে সবাই সেই পরম মুহূর্ত্তকে ধরবার চেষ্টা করছে।

পাশ দিয়ে একটি ছেলে যাচ্ছিল, হঠাৎ তপতী তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, "শুনছেন, মিশন রো-টা কোথায় বলতে পারেন?"

"মিশন রো? কত নম্বর।"

"তিন।"

"চলুন, আমিও ঐদিকে যাচ্ছি।"

ছ'জন পাশাপাশি হাঁটতে সুরু করলো—তপতীর ভয় ছিল ছেলেটি বোধ হয় তাকে কিছু বলবে—প্রশ্ন করবে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে। কিন্তু ছেলেটি একদম নীরব—তার উদাস দৃষ্টি অন্য দিকে—মনে হয়, সে কিছু ভাবতে ভাবতে চলছে। ক্ষণিকের এই পথ-সঙ্গিনীকে সে নিজের ছায়ার মতই মনে করছে। তপতী ছ'-একবার ছেলেটির দিকে তাকাল—তার অবাক লাগছে। বেশ কিছুটা যেয়ে হঠাৎ ছেলেটি বলে উঠলো, "এই হচ্ছে মিশন রো।"

"তিন নম্বরটা কোথায় হবে?"

একটা শাদা বাড়ী আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে সে বললো, "ঐ বাড়ীটা হবে মনে হচ্ছে।"

"আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ"—বলে তপতী মুখ ফেরাল। ছেলেটি শুনলো কিনা কে জানে, তবে তার মুখে স্বীকৃতির কোন চিহ্ন ফুটে উঠলো না।

দ্রুত-পায়ে হাঁটতে লাগলো সে। নীচে অনেক লেটার-বক্স—কি নাম যেন—ইণ্টারভিউ চিঠি পাওয়া পর্য্যন্ত সে এই নামটাই মনে মনে জপ করছে—সে-নাম কি সে ভুলে গেল—না, ভোলেনি, মনে ঠিক আছে, তবে এত আফিসের নামের গহন অরণ্যে সব যেন হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়। না, এই ত সাইনবোর্ড টাঙান রয়েছে—কালো বোর্ডের ওপর শাদা অক্ষরে লেখা—তিন তলায় অফিস—এতটা পথ হেঁটে এসে আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হবে—এদের কোন লিফ্‌ট নেই—

ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। সরু বারান্দা—তার পাশে এক-একটি ঘরে এক-একটি আফিস—পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছুটো-তিনটে টেবিল, কোনো টেবিলের ওপর একটা টাইপ-মেশিন, কোনটায় শুধু কাগজ আর কলিং-বেল। সিঁড়ি এসে তেতলায় মুখে শেষ হলো, তার বাঁ পাশে ঘরটা—সামনে বেঞ্চ পেতে দিয়েছে, অনেক মেয়ে ইতিমধ্যে জমেছে সেখানে—সবই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। একটিও বাঙ্গালী নেই—তপতীও এক ধারে বসে পড়লো। প্রকাণ্ড হল-ঘর—এধারে পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে দিয়েছে—কিন্তু তাতে কোন দরজা নেই—হলের ওপাশে আর একটি ঘর—মাঝখানে পুশিং-ডোর। হলে অনেক ছোট ছোট টেবিল পাতা, অধিকাংশই খালি—শুধু একটি টেবিলে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছু লিখছেন। ওধারে একটা টেবিলে ছোট একটি টাইপ-মেশিন—একটি এ্যাংলো মেয়ে দ্রুত ওধারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মেসিনে টুকটাক শব্দ তুলে টাইপ করে যেতে লাগলো। তার উঁচু হিলের খট্‌খট্ আর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়, সে নিজেকে আফিসের পক্ষে অত্যাবশক বলে মনে করছে।

এধারে পার্টিশনের আড়ালে ছ'জন লোক বসেছিল—একটা ছোট কালো প্লাষ্টিকের বোর্ডে শাদা হরফে লেখা—'রিসেপসানিষ্ট' ঐ টেবিলটার ওপর রয়েছে। তপতী এগিয়ে যেয়ে আলাপ জমাল। ওদের মাঝে একটি ছেলে ফিরিঙ্গী—তার সাথেই ইংরাজীতে কথা সুরু করলো তপতী। উত্তরে সে পাশের লোকটির দিকে তাকালো। জানালে যে, ইনি হচ্ছেন মালিকের ছোট ভাই; আর ইনি—শার্ট জামা আর ধুতি-পরা কালো লোকটি লাল ছোপ-ধরা দাঁত বের করে বললো, "আমি আংরেজী জানে না। তবে, বাংলা ভাল জানে।"

"ও বাবা—" তপতী মনে মনে ভাবলো, "এই তোমার ভাল জানার নমুনা!" বাইরে একটু মধুর হেসে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, এই কোম্পানীটা কিসের?"

"পেট্রোলের। ভারত সরকারের কাছ থেকে এরা পেট্রোল লাইসেন্স পেয়েছে—আর ভারতের যেখানে যেখানে উপযুক্ত মনে করবে পেট্রোলের পাম্প বসাবে।"

"আমাদের কত করে মাইনে দেওয়া হবে?"

"লোক বুঝে। ১০০৲ থেকে সুরু করে ৪০০৲ পর্য্যন্ত মাইনে আমরা দিতে রাজী আছি।"

"কে ঠিক করবেন?"

"জেনারেল ম্যানেজার।"

ওদিকে চাকরী-প্রার্থীদের ডাকাডাকি সুরু হয়ে গেছে—তপতী

...এর শেষে এসেছে, কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে বসে রইলো। ...য়ান এসে একজন একজন করে নাম ধরে ডাকতে ...লো। প্রথম যার পালা সে এক লাফে উঠে স্কার্টটা ঠিক করে খুব ...ভাবে চলে গেল। ফিরে এলো মুখটা কালো করে—সকলের ...মাখা দৃষ্টি নীরব ঔদাসীন্যে প্রত্যাখ্যান করে সে চলে গেল ... করে। একের পর এক নাম ডাকা চলতে লাগলো। ...সাড়া পড়ে গেল মেয়েদের মাঝে—সবারই হাতব্যাগ থেকে ...পাউডার, ছোট আয়না-চিরুনী। সবাইএর শেষে তপতীর ... পড়লো—দুরু-দুরু বুকে সে এগিয়ে গেল।

...টা বেশ বড়—এক দিকে সোফা সেট্ অপর দিকে একটা বড় ...—ওপাশে একটা ছোট টেবিল, চেয়ার—এক অংশ পার্টিশন ... দরজায় মোটা পর্দা ঝুলছে—ঠিক মাঝখানে বড় সেক্রেটারিয়েট ...—গদী আঁটা চেয়ারে বলিষ্ঠ, লম্বা একটি লোক—মাথায় চুল ...—চেহারা দেখে উত্তর-প্রদেশীয় বলে মনে হয়। লোকটি তপতীকে ... নির্দ্দেশ করলো, কিন্তু কোন প্রশ্ন করলো না—একদৃষ্টে ... আছে।—'এ কি রকম ইনটারভিউ'—তপতী ভাবতে ...। বেশীক্ষণ তাকে ভাবতে হলো না—প্রশ্নের পালা সুরু ... গেছে:

"আপনি কত টাকা মাইনে চান?"

"তিনশ' টাকা পেলে আমি খুসী হই।"

হাসতে লাগলো লোকটি—"নিজে খুসী হতে হলে অপরকেও ... করতে হয় তা জানেন?"

"আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো ভাল করে কাজ করতে।"

"কাজ? ও, হাঁ, কাজও করতে হবে বই কি?"

একটু অবাক হলো তপতী—কাজ করতেই সে এসেছে—অথচ ... এভাবে কথা বলছেন যেন কাজটাই গৌণ, এখানে থাকাটাই ...! কিন্তু, চাকরী সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই, তাই খটকা ...ও সে, চুপ করে রইলো হাসিমুখে।

"আচ্ছা"—ভদ্রলোক বললেন, "কাল থেকেই আসুন কেমন?"

"খুবই রাজী—তবে, কোনো চিঠি দেবেন না? যাকে নিয়োগপত্র ...?"

"সে সব কালই হবে।"

. পরদিন ঠিক সময়ে তপতী আফিসে গেল—চাকুরীপ্রার্থীদের মধ্যে ... দু'জনকে নেওয়া হয়েছিল—তারাও এসে বসেছিল। কথায় ... তপতী জানলো তাদের মাইনে একশো টাকা স্থির হয়েছে। ... মাইনের অঙ্কটা তপতী এদের বললো না—মনে বেশ একটু ...প্রসাদ অনুভব করলো। এ কথা সত্য যে, এই সব এ্যাংলো ...র চেয়ে বিদ্যা, বুদ্ধি, সব দিক দিয়েই সে শ্রেষ্ঠ এবং তার সম্মান ... রয়েছে। এতে সে খুব সুখীই হলো—মনটাও নরম হয়ে এলো।

...ফিস বসতে দেরী আছে দেখে তপতী হলের সামনে ঝোলান ...য় গিয়ে দাঁড়াল—লোক-চলাচল দেখতে অদ্ভুত ভাল লাগে ... লোকরা কত রকম ভঙ্গীতে যে হাঁটে—প্রত্যেকের নিজস্ব ... আছে হাঁটবার। হঠাৎ দেখতে পেল—দূর থেকে সারসের মত ... একটা লোক এগিয়ে আসছে, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী। ...টিকে এসে এই বাড়ীর গেট দিয়েই ঢুকতে দেখে একটু অবাক ... গেল তপতী। কিন্তু তার চেয়েও বেশী বিস্মিত হলো যখন তাকে এই আফিসেই ঢুকতে দেখলো—পরে জেনেছিল এর নাম হংসরাজ,—ম্যানেজার।

আফিস আর এখন ফাঁকা নয়, বরং একে সর্ব্বজাতিসমন্বয় পীঠস্থান বলা যেতে পারে। কোণের টেবিলটায় বসেছে একজন টাইপিষ্ট হিন্দুস্থানী, তার পাশে সেই বৃদ্ধ একাউণ্টাণ্ট। পাশের টেবিলটা ব্যবহার করছে সেই এ্যাংলো ছেলেটি—ডেসপ্যাচ ক্লার্ক, তার পাশে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে তপতীকে বসতে বলা হলো। তিনখানা টেবিল পাশাপাশি পাতা তিন জন টাইপিষ্ট। ওধারে একটা বড় টেবিলে সেই পাগড়ী-পরা পাঞ্জাবী। সেই-ই ওদের কাজ ভাগ করে দিল—কাজ কিছুই নেই—কতগুলি একই ধরণের চিঠি বিভিন্ন নামে পাঠাতে হবে—এক সাথে টাইপ করে পাঠিয়ে দিলেই চলে কিন্তু যেহেতু এতগুলি লোক রয়েছে এবং এদেরকে কাজ দিতেই হবে, সেই জন্যই যেন এক কাজ সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হলো করবার জন্য।

মেসিনটা শুধু খুলেছে—কাজ আরম্ভ করবে বলে—দারোয়ান এসে জানালো যে, সাহেব ডাকছেন। সবাই একবার তাকালো তপতীর দিকে—সবাইর চোখে একটা ঈর্ষ্যার ভাব—তার ঝাঁঝ যেন এসে গায়ে লাগে।

ভদ্রলোক তাকে সাদরে আহ্বান করলেন। তপতী লক্ষ্য করলো সাহেব তাকে তুমি করে বলছেন, কিন্তু কিছু মনে করলো না, কারণ সে বয়সে অনেক ছোট। ঘরের কোণে একটি ছোট টেবিল আর চেয়ার। সেইটে দেখিয়ে তিনি বললেন, "তুমি এইখানটায় বসবে। আর চিঠিপত্র যখন যা হবে ভুল সংশোধন করবে। চিঠি টাইপ তোমাকে করতে হবে না। হংসরাজকেও আমি তাই বলে দিয়েছি।"

হাতে কোন কাজ নেই, তাই চুপচাপ বসে রইলো সে—আর এক মুহূর্ত্ত চুপ করে বসলেই চলচ্চিত্রের ছবির মত একটার পর একটা অতীতের ছবি সামনে ভেসে আসে। প্রথমেই মনে পড়ে পদ্মার রূপালী ধারার কথা। শীতে সে বিশীর্ণা—সঙ্কুচিতা হয়ে উঠতো অবহেলিতা, অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বৃদ্ধা নারী! আবার বর্ষায় যৌবনে পরিপূর্ণা হয়ে ওঠে—হাস্যে, লাস্যে, কৌতুকে রঙ্গময়ী! নদীর পাশেই তপতীর ছোট্ট পড়ার ঘর—জানালা দিয়ে নদীর বুক অনেকটা দেখা যায়—নীচেই কতগুলি ফুলের গাছ—তাতে ফুটেছে ঝুমকো জবা, শাদা টগর, রঙ্গন ফুল। চুপ করে তাকিয়ে থাকতো একটি কিশোরী মেয়ের দুটো চোখ—তারুণ্যের সবুজে উজ্জ্বল, আশার আলোয় মধুর, ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্নে ভরা। হাতে একটা করে বই থাকতো—কখন বা কবিতার, কখন বা পড়ার। কিন্তু পড়া হয়ে উঠতো না—প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর যে কবিতা দীর্ঘায়িত হয়ে সামনে পড়ে আছে, তাকে দেখতে দেখতেই দিন কেটে যেত—আর স্বপ্নবিলাসী মন রচনা করে চলতো নিত্য-নূতন কাব্য। সে কাব্যে ছন্দ ছিল না—মিল ছিল না—ভাব ছিল না—প্রকাশ ছিল না—শুধু ছিল একটি চিরন্তনী নায়িকা আর একটি নায়ক। দূরে কাশ ফুলের মত শাদা পাল দেখা দিত—রঙ্গীন ছায়া পড়তো একটি কিশোরীর মনে—ঐ যে দূরে নৌকায় দেখা যাচ্ছে, বলিষ্ঠ গৌর নাম-না-জানা যুবক—হয়তো সে এসে থমকে দাঁড়াবে তপতীর সামনে—তার পর চারি চোখের যে অপূর্ব্ব মিলন তার সৌন্দর্য্যে ভরে উঠবে চারিদিক—নামহীন ফুলের গন্ধে, অজানা অনুভূতির মাদকতায়, চিরন্তন কাব্যের ছন্দোবদ্ধ সুরের মাধুর্য্যে। নিত্য-নতুন নায়ক রঙ্গভূমিতে আসতো—নায়িকা কিন্তু একই এবং অপরিবর্ত্তনীয়া।

সেদিন সকালে উদাস ভাবে সে বসেছিল—কিছুই ভাল লাগছিল না তার। নীচে ফুলগাছগুলি ভরে উঠেছে—একটা ঝুমকো জবার ডাল এসে পড়েছে তারই ঘরের মধ্যে। উঠে দাঁড়িয়ে সে তাই তুলতে গেল—কিন্তু পারলো না—আঁচল আটকে গেছে। ফিরে তাকিয়ে দেখল চেয়ারের সাথে তাঁর শাড়ীর আঁচল বাঁধা—আর রতন দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। তপতী ভ্রূটা বাঁকিয়ে একটু রাগ করতে গেল—কিন্তু হেসে ফেলল। রতন তাদের প্রতিবেশী অন্ধ গায়ক অনাথের ছেলে। তপতীর বাবা সুবোধ বাবু বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ও কলারসিক। নিজে সুর সৃষ্টি না করতে পারলেও সুরের আবেদন তাঁর প্রাণে ঝঙ্কারের সৃষ্টি করতো। লক্ষ্ণৌর এক অজ্ঞাত পথে অনাথ একতারা বাজিয়ে গান গাইছিল—গাড়ীতে যেতে যেতে সুবোধ বাবু থমকে গাড়ী থামালেন। তারপর তাকে তুলে নিয়ে গেলেন নিজেদের বাসায়—খবর নিয়ে জানলেন অনাথের শুধু একটি মাতৃহারা শিশু আছে, আর কেউ নেই। লক্ষ্ণৌ থেকে তাকে বাংলা দেশে নিয়ে এলেন, নিজের বাড়ীর পাশে খানিকটা জমি দিয়ে বসবাস করবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রতন ক্রমে বড় হলো, তপতীর থেকে সে দু'-এক বছরের বড়ই হবে। তার খেলার সাথী তপতী, কিন্তু ওর সাথে খেলবার চেয়ে ওর গান শুনতে বেশী ভালোবাসত। পিতার কাছ থেকে অপূর্ব্ব গলার অধিকারী হয়েছিল সে। শিশুসুলভ সেই কচি গলায় ঝঙ্কার দিয়ে যখন রতন গেয়ে যেত তখন পাড়ার সবাই এসে জুটতো সেখানে। পড়াশুনোও সে করছিল তপতীর সাথে সাথে আর পড়ায় ভালও ছিল খুব। এই ভাবে দুটি অসম পরিবেশের শিশু একই সাথে বড় হয়ে উঠেছিল। সেই রতন—তার শৈশবের সাথী আজ কোথায়?

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। দারোয়ান দুটো চিঠি নিয়ে এসেছে, চিঠি দুটো দেখে সে ফেরৎ দিল। আবার সেই ভাবনার সুতোর জাল—দেশবিভাগ হলো—পাকিস্তান, হিন্দুস্থান দুই ভাগে, তবু তপতীর বাবা আসতে চাননি। তাঁর ধারণা ছিল, যাদের সাথে এতকাল একই মাঠের শস্য, একই পুকুরের জল খেয়ে এসেছেন তারা আর যাই করুক না কেন তাঁদের প্রাণহানি করবে না—কিন্তু তাঁর তখন মনে আসেনি যে প্রাণের চেয়ে মান বড় এবং তাকে আঘাত করা খুবই সহজ।

সেদিনের ঘটনাটা যেন ছবির মত তপতীর চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। গ্রীষ্মের মনোরম সন্ধ্যাবেলায় সে তার প্রিয় দুধসাগর আম গাছটার তলায় দাঁড়িয়েছিল একা—কাছাকাছি কেউ ছিল না। অন্ধকার ঘন হয়ে এসে জমেছে, এমন সময় দূর থেকে দেখতে পেল রহিমুদ্দি শেখ আসছে। ওর মা ওকে মানা করে দিয়েছিলেন ওদের সাথে কথা বলতে—তাই সে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো কিন্তু ততক্ষণে রহিমুদ্দি ওর কাছে এসে পড়েছে—ডেকে বললো, "কি আমারে দেইখ্যা পালান জানি।"

"না, না।"—সলজ্জ ভাবে তপতী উত্তর করলো, "বাড়ী যাচ্ছিলুম। কাজ আছে।"

"কাজ থাকুক। একটু দাঁড়াইয়া যান।"—ও এসে তপতীর পাশে দাঁড়িয়েছে—"আপনারে একটা কথা কওনের জন্য পরাণডা আমার কেমন করে। আপনারে আমি ভালবাসি।"

চমকে উঠলো তপতী—শুধু কথায় নয় কাজেও। উপক্রমণিকার আগেই উপসংহার—রহিম ওর হাত ধরে ফেলেছে। কোন রকমে হাত ছাড়িয়ে সে দৌড়ে বাড়ী চলে গেল। বাড়ীতে সব কথা বললো কিন্তু মুখ বুজে চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি! বিপদের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রাত্রিবেলা তপতীর মাথার দিকের জানালা খোলা ছিল—গরমের দিন সে জানালা খোলা রেখেই শোয়। গভীর রাত্রে হঠাৎ সে জেগে উঠলো—দুটো কালো হাত জানালা দিয়ে তার বিছানার ওপর! চীৎকার করে বলে উঠলো সে, "মা, মা, দেখ কি?"—চেঁচিয়ে ওঠার সাথে সাথে হাত দুটো সরে গেল—ওর মা বললেন, "ও কিছু নয়।"—পরদিন থেকে কিন্তু গোপনে গোপনে দেশত্যাগের আয়োজন চলতে থাকে।

জমি-জমা যা ছিল, সবই প্রায় বিক্রী হলো, বাড়ীও বিক্রী হলো—তবে ঠিকমত দাম কিছুরই পাওয়া গেল না। সাহস করে সুবোধ বাবু ট্রেনে এলেন না, ঢাকায় গিয়ে প্লেনে করে এলেন।

কলকাতায় এসে বাড়ী খুঁজে পেতে কিছুদিন অসুবিধা হলেও শেষটা সেরা একটা বাড়ী খুঁজে পেলেন। এখানে এসেই তপতী আই-এ পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার পর তিন মাস একদম চুপচাপ বসে থাকা—ছোট একখানা ঘরে চুপ করে বসে থাকতে মন খারাপ হয়ে যায়। সে টাইপ-রাইটার স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেল।

এদিকে সুবোধ বাবুও চুপ করে বসে ছিলেন না; তাঁর শুধুই মনে হচ্ছিল বসে খেলে তাঁর সামান্য এই ক'টা টাকা ফুরিয়ে যাবে। বন্ধুদের পরামর্শে তিনি ব্যবসায়ে নামলেন। তার পরের ইতিহাস খুবই সরল ও সংক্ষিপ্ত। বাণিজ্য-লক্ষ্মী সবাইকে দয়া করেন না—তাঁকে পেতে হলে আগে তার পেঁচার সন্ধান পাওয়া প্রয়োজন। সে সন্ধান সুবোধ বাবু পাননি এবং তার ফলে ক্রমে ক্রমেই অবস্থার অবনতি হতে লাগলো। প্রথমেই বাড়ী বদল—আগে যে বাড়ীতে ওঁরা ছিলেন তার ভাড়া ছিল দেড়শো টাকা, এখন যেটায় উঠে এলেন এর ভাড়া ৪০৲। অবশ্য তপতীদের লোকও বেশী নয়। সুবোধ বাবু, স্ত্রী, তপতী আর একটি ছোট ছেলে নিখিল। ইতিমধ্যে তপতীর পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে—সে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। কিন্তু তাকে আর পড়াবার মত অবস্থা নেই সুবোধ বাবুর—নিখিলের পড়ার খরচ চালানোই দায় হয়ে উঠেছে। তপতী বাবা-মাকে কিছুই বললো না—পাশের বাড়ী থেকে কাগজ চেয়ে এনে নিয়মিত ভাবে 'কর্ম্মখালি' দেখতে লাগলো।—তারপর এই···

আত্মচিন্তায় ছেদ পড়লো। বড় সাহেব ঘরে ঢুকছেন—এতক্ষণ তিনি বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন।

"কি, একা একা কি ভাবছিলেন?"—হাসিমুখে তাকিয়ে তিনি বললেন।

চমকে উঠে তপতী বললো, "কিছু না।" তারপর টেবিলের কাছে যেয়ে ধীরে ধীরে বললো, "কি কাজ করবো?"

"এখন কি করবেন? দেখছেন না, টিফিনের টাইম হয়ে গেছে।"

ঘড়ির দিকে তাকাল তপতী—একটা বেজে তিরিশ মিনিট। সে চুপচাপ যেয়ে নিজের জায়গায় বসলো।

বড় সাহেব বললেন, "কি হলো। আপনি টিফিন খেলেন না?"

"টিফিন ত আনিনি। তাছাড়া, আমার খিদেও পায়নি।"

অলঙ্কারে রুচি ও সৌন্দর্য্যের পরিচয়
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল)
আমাদের পুরাতন শো-রুমের বিপরীত দিকে ফোন-এভিনিউ ১৭৬১ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস,
ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ: ১৫৯/১বি, রাসবিহারী এভিনিউ· কলিকাতা

"সে হয় না, আপনি আমার সাথে খাবেন চলুন।"

তপতীর সম্মতির অপেক্ষা না করেই তিনি তার বেয়ারাকে ডাকলেন। ঐ ঘরটাকেই পার্টিশন আর পর্দ্দা দিয়ে ছুটো করা হয়েছে। ওরই একটা ছোট কামরাটায় ওঁর থাকবার ঘর। বেয়ারা খাবার নিয়ে এলো। তপতীর খুব লজ্জা করছিল—ভয়ও করছিল খানিকটা। এই হাসিখুসী মুখের আড়ালে কোন্ কালো ছায়া লুকিয়ে আছে কে জানে?

পুরান যে টাইপিষ্ট তার নাম মিস ওয়েভ। সে বার বার ঘরে এসে নানা ভাবে নিজের কাজ দেখাবার চেষ্টা করছে কিন্তু সাহেব তাকে কোন পাত্তাই দিচ্ছেন না। একবার ত পরিষ্কার বললেন "দরকার ছাড়া কেন বার বার তুমি এ ঘরে আসছ?"

উত্তরে সে তপতীর দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল। এই ভাবে ছ'দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন আফিস ছুটির পর তপতী যেই বেরুতে যাবে সাহেব বললেন, "আপনি একটু দেরী করে যান, কাজ আছে।"

"কিন্তু" তপতী বললো, "ওরা যে সবাই চলে যাচ্ছে?"

"ওদের সবাইয়ের সাথে আপনার কি তুলনা? আপনি হলেন সেক্রেটারী।"

মালিকের সেই ভাই, যে সব সময় বাইরে বসে থাকে সেও ঘরে এসে ঢুকলো: "আপুনি আচ্ছা ভাবে বসে যান। এখোন আমরা সব একই।"

একটু ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবে তপতী বললো, "কি কাজ আছে বললেন?"

"বসুন, বসুন, বলছি—অত ব্যস্ত হলে কি চলে? চলুন, আজ সিনেমায় যাওয়া যাক্ না!"

অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাবে তপতী হতবাক্ হয়ে গেল। তবু ক্ষীণ বিদ্যুতের রেখার মত তার মনে এ সন্দেহ আগেই উপ্ত ছিল। হাসিখুসার আবরণের আড়ালে সেই কালো ছায়াটা যেন নড়ে উঠলো একবার। ঝুলির ভেতর থেকে কালো বেড়ালটা উঁকি দিচ্ছে। এই ঘৃণিত প্রস্তাবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তবু তপতী তা পরিপূর্ণ ভাবে অস্বীকার করতে পারলো না, সে অসহায় ভাবে একটা উপায় খুঁজে বেড়াতে লাগলো—একটা মুক্তির উপায়। যদি সে মুখের উপর 'না' বলে দেয় তবে হয়ত তার চাকুরী এখানেই শেষ। সে ছলনার আশ্রয় নিল। মিষ্টি হেসে বললো, "আজ ত বাড়ীতে বলে আসিনি, পরে একদিন যাওয়া যাবে, কেমন?"

"তাহলে ত মহা মুস্কিল। মিস্ ওয়েভ বলেছিল ওর বাড়াতে যেতে, তাকেও মানা করে দিলুম।"

অকৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে তপতী বললো, "যেতে বলেছিল—কেন···?"

মিলিত হাসির জোয়ারে কথাটা শেষ হতে পেল না।—"কেন?" সাহেব বললেন, "মেয়েরা কেন যেতে বলে আমরা জানি।"

মালিকের ছোট ভাই—নাম ঈশ্বরিলাল, বললো, "আজকে ওদের বহুৎ ঝগড়া হয়েছ—ওরা কে বোঝলেন!"—তপতীর দিকে তাকিয়ে বললো, "মিস্ ওয়েভ আর ঐ ছোকরাটা—ঝগড়া ত ওদের লেগেই আছে—আজকে আবার কি নিয়ে হলো?" বললেন জে: ম্যানেজার।

"তা জানে না, রূপেয়া-উপেয়া নিয়ে হবে কি।"

সেদিন তপতী মুক্তি পেল। পথে যেতে যেতে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করে তার নগ্নতা যেন তার সামনে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো। এই রকম একটা অদ্ভুত পরিবেশে এরা অভ্যস্ত—যে পরিবেশ প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে আফিসের বড়কর্ত্তার উপস্থিতি কোনো বিঘ্ন ঘটায় না, যে পরিবেশ অর্থের জন্ম নিজের রুচি, দেহ, এমন কি প্রেমকেও বলি দেয়। এই অবস্থার মাঝখানেই তাকে চলতে হবে—কালের ধাপে ধাপে গড়িয়ে সেও হয়ত এমনিই হয়ে যাবে—এতটুকু দ্বিধা, সঙ্কোচ, জড়তা ঘটবে না—নিজেকে চরম গ্লানির পথে নামিয়ে দিলেও। এই তার বিধিলিপি। না, না, সে তা পারবে না। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আহুতি দিয়ে তবে এই দুনিয়ার আলো-হাওয়া উপভোগ করতে হবে? তার চেয়ে মুছে যাক্ না পৃথিবী চোখের সামনে থেকে—অন্ধকূপে পতনের চেয়ে অন্ধকারই ভাল! কি লোভ আছে, কি দুর্ব্বার আকর্ষণ আছে এই পৃথিবীর? আত্মার হত্যার চেয়ে আত্মহত্যাই কি অধিকতর কাম্য নয়?

সরু গলি—দু'পাশে আবর্জ্জনা—বাস্তবে মহাকবির কল্পনা "কিনু গোয়ালার গলিকে"ও ছাড়িয়ে গেছে! ডাষ্টবিন থেকে দুর্গন্ধ উঠছে, বড় বড় মাছি ভন্‌ভন্ করে ঘুরছে চারিদিকে। মরচে-পড়া কড়াটা সে নাড়লো—ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো শিকল। এটা ফ্ল্যাট বাড়ী। এখনও জলের কল ও পায়খানা নিয়ে বাড়ীর আর পাঁচ জনের সাথে ইতর কলহে মাততে হয়নি।

খেতে বসে সে তার মাকে বললো, "আচ্ছা, আমি যদি চাকরী ছেড়ে দি, তবে কি রকম হয়?"

আশঙ্কায় মা'র মুখ নীল হয়ে গেল—"কেন, ওরা কিছু বলেছে না কি?"

"না, না,"—শুষ্ক মুখে হাসি টেনে এনে বললো তপতী, "এমনি বলছিলুম, তাহলে কি হয়?"

"কি আর হবে? ভগবান এক ভাবে চালিয়ে নেবেনই।"

তা জানে তপতী—এক ভাবে চলে যাবেই। তবে হয়ত এই বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে অন্ধকার এঁদো একখানা ঘরে থাকতে হবে—ছোট ভাইয়ের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে—মায়ের হাতের চুড়িগুলি একটার পর একটা রেশন আর বাজারের তলায় চাপা পড়ে যাবে। এতক্ষণ তপতী ভাবছিল তার জীবনটা শেষ হলেই বুঝি সব শেষ হয়ে যায়—কিন্তু তা ত নয়। তার ওপরে যে তারা নির্ভর করছে—যারা এই ধূলার ধরণীকে মধুময় বলে মনে করে—বাইরের আলোকে প্রিয়তম বলে বুক টেনে নেয়! এদের জন্যই তাকে বাঁচতে হবে তিলে তিলে নিজেকে উৎসর্গ করে! তার এই আত্মত্যাগের কথা কোনো ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে না কিন্তু সমাজের বুকে আঠারো বছরের তরুণীর এই বুকের রক্ত ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে জমে থাকবে—পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠবে তা—দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বইবে চারি দিকে—নয়নের অশ্রুবিন্দুর বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাবে দেশ! সে ত শুধু একা নয়—এমনি লক্ষ লক্ষ তরুণী বাংলার বুকে এমনি ভাবেই বেঁচে রয়েছে!

পরদিন আফিসে যাবার সময় সে তার মাকে বললো—"মা, আজ আমার আসতে দেরী হতে পারে।"

কণ্টিয়েণ্ট

প্রতিমা সেন

"দেখ, সুনীলকে আমি নেমন্তন্ন করব ভাবছি এ রোববারে। রাত্তিরেও এখানেই থাকতে বলব।" মিসেস্ রায় বললেন তাঁর স্বামীকে।

"ও", কাগজ থেকে মুখ না তুলেই উত্তর দিলেন মিষ্টার, "তা সে এখন ইলেক্‌শন নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত না?"

"সে তো ব্যস্তই—দেখছ না ক'দিনের মধ্যে এখানে আসবার পর্য্যন্ত সময় হচ্ছে না! ইলেক্‌শন ইলেক্‌শন করে একেবারেই ক্ষেপে গেছে ছেলেটা। পনেরো-ষোলো দিন থেকে পাগলের মত ঘুরছে রোদে, জলে, কাদায়; বক্তৃতা দিতে দিতে তো গলা ভেঙ্গেছে, নাওয়া-খাওয়াও মাথায় উঠেছে। চোখ লাল, চুল উস্কোখুস্কো—কি যে চেহারা হয়েছে! সে জন্যই তো বলছি—ওর এখন দরকার complete rest। রোববার সকালে আবার কোন পুজো-বাড়ীতে বক্তৃতা আছে। তা থাক—সেখান থেকেই সোজা চলে আসতে পারবে এখানে। আসুক, তারপর ওসব রাজনীতি আর হৈ-চৈএর কথা একেবারে ভাবতে দিচ্ছি না। ভাল কথা—বসবার ঘর থেকে গান্ধীজীর, নেতাজীর আর আরও দু'-একটা ছবি, যেটা যেটা দরকার মনে কর বোলো তো, বিশুয়া সরিয়ে রাখবে'খন, আর ধীরা"—বছর চোদ্দ বয়েসের ভাইঝির দিকে ফিরে বললেন মিসেস্ রায়, "তুইও কিন্তু কোন্ রংএর রিবন্ বাঁধবি চুলে একটু সাবধানে ভেবেচিন্তে বাঁধিস বাপু। লাল রং তো নয়ই, আর তিন রঙা যে বেরিয়েছে তোদের আজকাল, তাও নয়। গেরুয়া-টেরুয়াও না হয় নাই বাঁধলি।"

ধীরা আহত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে উত্তর দেয়—"উৎসবে-টুৎসবে কালো ভেলভেট ছাড়া অন্য রিবন্ আমি বাঁধি না।"

সুনীল ছেলেটি ছিল বেশ একটু গম্ভীর ধরণের—একটু যেন বুড়োটে গোছের। তাই তার রাজনৈতিক কাজকর্ম্মের মধ্যেও যেন শোকসভা শোকসভা ভাব ছিল একটা। কিন্তু এমনিতে উৎসাহী না হলেও এই ভোটের ব্যাপারে সে সত্যিই এত বেশী পরিশ্রম করছিল যে, একটু বিশ্রাম তার পক্ষে ভয়ানক দরকারী হয়ে পড়েছিল শারীরিক, মানসিক দু'দিক দিয়েই।

মিসেস্ রায় চিন্তিত ভাবে বললেন, "এদিকে আবার মাঝ-রাত্তির পর্য্যন্ত বসে বসেও নাকি বক্তৃতা তৈরী করে। যাক্ গে—এখানে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ না হয় একটু অন্যমনস্ক করে ভুলিয়ে রাখতে পারি। তার বেশী তো আর কিছু করতে পারি না।"

"দেখা যাক্"—বিড় বিড় করে বলে ধীরা।

* * * *

রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে, শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে আবার কাগজপত্র ছড়িয়ে নিয়ে সুনীল সবে বসেছে, মিনিট কুড়ি-পঁচিশও বোধ হয় যায়নি, হঠাৎ দুপ দাপ্ আওয়াজ শোনা গেল বারান্দায়, তারপরেই দরজার কড়া নড়ে উঠল ভয়ানক জোরে। খুলতে না খুলতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ধীরা ব্যস্তভাবে, হাঁফাতে হাঁফাতে, "নীলদা, অন্ততঃ আজকে রাত্তিরের মত এগুলোকে এখানে রাখতে পারবে?"

'এগুলো' অর্থাৎ একটা মোটাসোটা গিনিপিগ্ আর উজ্জ্বল রংএর সুন্দর একটা মোরগ।

জীবজন্তু সুনীল বেশ ভালই বাসত, আর বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক দিক থেকে পশুপালনের প্রয়োজনীয়তার ওপর একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধও লিখছিল; কিন্তু তাই বলে সে জীবগুলোকে একেবারে শোবার ঘরের সঙ্গী করতে বেচারীর রীতিমত আপত্তি ছিল। তাই খোলাখুলিই প্রশ্ন করল, "কিন্তু বাইরেতেই তো ওরা বেশী আরামে থাকবে!"

"'বাইরে' বলতে কিছু নেই এখন"—দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল ধীরা, "চারদিকে শুধু জল; রূপসী নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।"

"রূপসীতে বাঁধ আছে তা জানতাম না তো!" সুনীল বলে।

"এখন নেই—এখন জল। আমাদের এদিকটা আবার একটু বেশী নীচু, তাই চারদিক জলে ডুবে একটা দ্বীপের মত হয়ে গেছে।"

"এঃ! মারা-টারা যায়নি তো কেউ?"

"অনে—ক, আমাদের জানলার পাশ দিয়েই তো ভেসে যাচ্ছে কত। পাশের বাড়ীর ময়না-ঝির তো বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে তিনবার তিনজনকে দেখে চীৎকার করে উঠল তার বর বলে। বোধ হয় অনেক লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে; নয় ত ও বোধ হয় লোক চিনতে পারে না ঠিক ক'রে। অবশ্য এও হতে পারে যে একজন লোকই স্রোতের টানে ঘুরতে ঘুরতে বারে বারে ফিরে আসছে। ঠিক—এটা তো ভেবে দেখিনি—"

আইন সভার সদস্য-পদপ্রার্থীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠল; উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল সে, "তাহলে তো এক্ষুনি গিয়ে দেখা উচিত আমরা কি করতে পারি।"

ধীরা মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে উঠল, "কিচ্ছু পারি না। আমাদের এখানে একটাও নৌকো নেই, জল এত বেড়েছে যে কোথাও যাবারও উপায় নেই। পিসিমণি কিন্তু বার বার করে বলে দিয়েছে যে, তুমি যেন ঘর থেকে বার না হও, এমনিতেই তোমার ভীষণ খাটুনি যাচ্ছে। আর পিসিমণি বলেছে যে, তুমি এই গিনিপিগটাকে আর বাচ্চুকে রাখ তবে খুব ভাল হয়। ওদের বাড়ী-ঘর তো সব ভেসে গেছে। বাকী আর সাতটা মোরগকে আলাদা শোবার ঘরে রাখা হয়েছে, কিন্তু বাচ্চুর জায়গা হচ্ছে না। ওরা একসঙ্গে থাকলে এমন মারামারি সুরু করে! আর এই গিনিপিগটাকে তোমার বেশ ভালই লাগবে দেখো, ভারি মিষ্টি। তবে মেজাজটা একটু রাগী, ঠিক ওর মা'র মত—না থাক্, বেচারী মরে গেছে জলে ডুবে, এখন ওর নিন্দে করা উচিত না। ওকে সামলাতে কিন্তু একটু শক্ত হাতের দরকার। আমার ঘরেই রাখতাম কিন্তু সেখানে তো আবার আমার কুকুরটা রয়েছে। ও দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না রুমনির।"

"তা—এই—বাথরুমে থাকতে পারে না?" আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করে সুনীল।

"বাথরুম?" ভীষণ জোরে হেসে উঠল ধীরা, "বাথরুমে তো ভলান্টিয়াররা।"

"ভলান্টিয়ার?"

"হুঁ, জল একটু বাড়তে আরম্ভ করতেই জন পঁচিশেক এসেছিল

আমাদের উদ্ধার করতে, তার পর জল বাড়তে বাড়তে যখন বুক-জল হল তখন আমাদেরই গিয়ে উদ্ধার করতে হল তাদের সবাইকে। এখন তাদের সেঁক দেওয়া হচ্ছে পালা করে। পরবার জন্য শুকনো জামা-কাপড়ও দেওয়া হয়েছে। বারান্দাগুলোয় তাদের ভিজে জামা-কাপড় মেলে দেওয়া হয়েছে—ঠিক মনে হচ্ছে ধোপাখানা। দু'জন ছেলে কিন্তু নীলদা', তোমার নতুন ওভারকোটটা জড়িয়ে বসে আছে—ঐ যে পিসিমণির পছন্দমত করতে দিয়েছিলে যেটা, আজই এসেছে তৈরী হয়ে। কিছু মনে করনি তো?"

ভুরু কুঁচকে বিড়বিড় করতে থাকে সুনীল, "আনকোরা নতুন ওভারকোটটা!"

"আচ্ছা যাই—বাচ্চুর ওপর একটু নজর রেখো কিন্তু। কিন্তু বাচ্চুর একা-একা কি ভাল লাগবে? ওর বৌদের কাউকে নিয়ে এলে হত। বিবিকে ও সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, আনব নীলদা?"

কিন্তু এবার সুনীল সজোরে প্রতিবাদ করে উঠল। (বেচারী বিবি!) ধীরা আর কিছু না বলে ঘরের এক পাশে পাতা খাটের ওপরে বাচ্চুকে বসিয়ে, রুমনিকে অনেক আদর-টাদর করে বিদায় নিল।

দরজাটা বন্ধ করে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে, সুনীল আলোটা নিবিয়ে প্রায় ছুটেই গিয়ে উঠে বসল বিছানায়। রুমনি এতক্ষণ গিনিপিগসুলভ কৌতূহলের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে তার নতুন বাড়ী পরিদর্শন করছিল। আলোটা নিবতে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল খাটের পাশের রকিং চেয়ারটার গা ঘেঁষে। বাচ্চু এতক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে রুমনির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করছিল, এখন বোধ হয় মনে হল যে তারও কিছু একটা করা উচিত। ব্যস্, তক্ষুনি তিড়িং করে খাট থেকে মাটিতে, মাটি থেকে চেয়ারে; চেয়ারটা একটু দুলে উঠল। রুমনি একবার সুনীলের দিকে, আরেক বার বাচ্চুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মহা উৎসাহে চেয়ারের পায়ায় গা ঘষতে সুরু করল। তার দলন-মলনের চোটে চেয়ারটা দুলতে লাগল, রুমনি আরামে, খুসীতে নানা রকম অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে সজোরে গা ঘষে চলল নানা ভঙ্গীতে এঁকে-বেঁকে। এবার বাচ্চুও সুরু করল মৃদু স্বরে, "কঁক্, কঁক্, কঁঅক্।" দোলনটা সেও বেশ উপভোগ করছে বোঝা গেল। রাস্তার আলো এসে ঘরের মধ্যে পড়ায় সুনীলও এ দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হল না। চোদ্দ-পনের মিনিট ধরে অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে সে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তার পর চোখ বন্ধ করে দু'জনের গান শুনতে শুনতে এপাশ ওপাশ করল কয়েক বার, তারপর হঠাৎ উঠে বসে নীচু হয়ে রুমনিকে লক্ষ্য করে কয়েকটা চড় ছুঁড়ল। রুমনির দেখা গেল এই খেলাটা বেশ পছন্দ হয়ে গেল। সে-রকম গলা সাধতে সাধতেই সে এগিয়ে এল বিছানার দিকে।

সুনীল এবার বিছানা থেকে নেমে ঘরের কোণে রাখা লাঠিটা তুলে নিল হাতে। ঘরে যেটুকু আলো ছিল সেই যথেষ্ট। উদ্দেশ্যটা বুঝতে এবার আর কোন অসুবিধে হল না রুমনির; সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মেজাজ আত্মপ্রকাশ করল এমন ভয়ানক ভাবে যে, সুনীল পিছু হটে, এক লাফে ততক্ষণে বিছানায়। রুমনি বিজয়গর্ব্বে খানিক তর্জ্জন-গর্জ্জন করে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে গাত্রমর্দ্দনে মন দিল। নিজের দুঃখ ভুলবার জন্য সুনীল ময়না-ঝির দুঃখের কথা ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বেচারীর—বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল তার নতুন ওভারকোটটার দোমড়ানো কোঁচকানো চেহারা আর তাতে আশ্রিত দুটি অচেনা ছেলের মূর্ত্তি।

ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে রুমনি ঘুমিয়ে পড়ল। সুনীলও একই সঙ্গে দুঃখের আর স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজল। ঠিক ঘুমটা এসেছে, এমনি সময় কর্ত্তব্যজ্ঞান জেগে ওঠায় বাচ্চু গলা ছেড়ে ডেকে উঠল "কোঁ-ক্কর্-র্-র্ কোঁ-।" তারপর বিছানা ছেড়ে নেমে ঘরময় ঘুরতে সুরু করল। আলমারীর গায়ের আয়নার কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল; নিজের ছায়াটার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে রাগে গর্গর্ করতে করতে ঠোক্রাতে সুরু করল সেটাকে। অবোধ বাচ্চুর অভিভাবকত্বের গুরুভার এখন তার ওপর, কাজেই উঠে গিয়ে একটা বড় তোয়ালে দিয়ে আয়নাটাকে ঢেকে দিল সুনীল। খানিকক্ষণ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বাচ্চু, তার পর নতুন একটা খেলা আবিষ্কার করে উৎসাহিত হয়ে ঘুমন্ত রুমনির কাছে গিয়ে তাকে ঠোকরাতে সুরু করল। তার পরেই যে সুরু হল দ্বন্দ্বযুদ্ধ—সে অবর্ণনীয়। বাচ্চুর একটা মস্ত সুবিধে ছিল—যখনই দরকার বুঝছিল সে এক লাফে গিয়ে খাটে উঠে বসছিল। রুমনিও যে সে চেষ্টা একেবারে করেনি তা নয়, তবে ফল হল এই যে কয়েকটা ঠোক্কর আর গুঁতো খেয়ে তার মেজাজ গেল আরও বিগড়ে।

ভোর বেলাকার চা নিয়ে ঝিএর আগমন না হলে বোধ হয় অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চলত এ যুদ্ধ। কড়া নড়ে উঠতেই সুনীল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পা টিপে টিপে উল্টো দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে সে খুলে দিল দরজাটা। ঘরে ঢুকেই ঝি চেঁচিয়ে উঠল অকৃত্রিম বিস্ময়ে, "হেই ভগবান, এগুলো এখানে কেন গো দাদাবাবু?"

কেন?

দরজা খোলা পেয়েই রুমনি দিল ভোঁ দৌড়, আর বাচ্চু গম্ভীর ভাবে হেলতে দুলতে তাকে অনুসরণ করল।

"এই গো, ধীরা দিদিমণির কুকুর দেখতে পেলে একেবারে···"

বলতে বলতে ঝিও ছুটল তাদের পেছন পেছন।

সুনীল ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ পাথরের মত। তার মনে কি রকম যেন একটা······তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে পর্দ্দাটা তুলে বাইরে তাকাল,—ঝির্ঝির্ করে হাল্কা বৃষ্টি পড়ছে শুধু, তাছাড়া জলের চিহ্নমাত্র নেই কোনখানে।

* * * *

আধ ঘণ্টা পরে ধীরার সঙ্গে দেখা হল তাদের বাড়ীর বারান্দায়।

"তোমাকে এত মিথ্যেবাদী বলে ভাবতে আমার সত্যিই খারাপ লাগছে। কিন্তু খারাপ লাগলেও অনেক সময় অনেক কিছু আমাদের করতে হয় নিরুপায় হয়ে।" অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তিক্ত স্বরে বলল সুনীল।

ধীরা উত্তর দেয়, "সে যাই হোক, একটা গোটা রাত্তির তো তোমাকে ভুলিয়ে, অন্যমনস্ক করে রেখেছি, পলিটিক্স এর ধারে কাছেও ঘেঁসতে দিইনি।"

কথাটা অবশ্য নিদারুণ ভাবে সত্যি।

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ ফোঁওওস্ ক'রে ফণা তুলে দাঁড়ায় প্রকাণ্ড এক গোখরো সাপ। ফোঁস্ করে নয়—বলা চলে গর্জন ক'রে।

আর্তনাদ ক'রে ওঠে শমিতা, "উউ! মা গো!"

গোখরো সাপ ফণা তুলেছে মাটি থেকে এতখানি উঁচুতে। কী চওড়া ফণা! মাটির উপর এঁকেবেঁকে রয়েছে বাকি দেহটা—কী বিরাট লম্বা! জ্যোৎস্নার আলোয় চক্‌চক্ করছে মৃত্যুশীতল কালো রেখা। ফুলছে সাপ, দুলছে তার কালছত্র ফণা, গুমরাচ্ছে গোখরো।

ঘরের দরজার বাইরে চৌকাঠ ধ'রে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে শমিতা। পেছনে স'রে গিয়ে ঘরে ঢুকবে এমন ক্ষমতা নেই। কী এক অনুচ্চারিত অলঙ্ঘ্য আদেশে ঘরে ঢোকার মুখে অকস্মাৎ থুরে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাকে। মৃত্যুর মত বিকট ফণার দিকে সে তাকাতে পারছে না, অথচ সেদিক থেকে দৃষ্টিও পারছে না ফেরাতে। চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে সাপের অতি ক্ষুদ্র চোখ—আলপিনের ডগার মত। সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসে সেই সূক্ষ্মতম দৃষ্টির বিপুলতম কুটিলতায়, অথচ অপলক দৃষ্টিতে সেদিক চেয়ে আছে শমিতা। ক্ষমতা নেই দৃষ্টি ফেরাবার। ওইটুকু চোখের চাউনি দিয়ে শমিতার আয়ত আঁখির দৃষ্টিকে স্তম্ভিত করেছে সাপ, আকর্ষণ করছে শমিতার সমগ্র সত্তাকে নিশ্চিত মরণের দিকে।

ঘরের ভিতর শুয়ে পড়ছিল রূপেন। আর্তনাদ শুনে এক লাফে নেমে এসে দেখে, সাপের উদ্যত ফণার সামনে শমিতার নিশ্চল দুরবস্থা। ফিস্‌ফিস্ ক'রে উপদেশ দেয়, "পেছনে তাকিয়ো না, কোন দিকে চেয়ো না, নোড়োচোড়ো না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো—ভয় নেই, সাপ এক্ষুনি চ'লে যাবে, ভয় নেই, কিচ্ছু করবে না—ও বাড়িপাহারা সাপ।"

আর কোন দিকে চাইবার বা নড়বার ক্ষমতা থাকলে রূপেনের কোন উপদেশ-নির্দেশ মানত না শমিতা, ছুটে পালাত।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর, দিনের মত সংসারের পাট চুকিয়ে, শোবার ঘরে আসছিল শমিতা রান্নাঘর থেকে। বড় জা'এর শরীর খারাপ, তিনি আগেই গিয়ে শুয়ে পড়েছেন; ও-ঘরে বড়কর্তাও ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। সারা বাড়িতে সবাই ঘুমোচ্ছে—জেগে আছে শুধু শমিতার জন্যে রূপেন, আর জেগে আছে উদ্যত নাগের ছোবলের কাছে অসহায়া শমিতা। হেঁসেল তুলে, রান্নাঘরের দরজায় তালা দিয়ে, উঠোন পেরিয়ে, সবে শোবার ঘরের দরজায় পা দিয়েছে; হঠাৎ গর্জন শুনে ফিরে দেখে, সাপ।

সত্যি, কিছুই করে না সাপটি, কয়েক মুহূর্ত ফুঁসে ফুলে, আস্তে আস্তে ফণা গুটিয়ে, মাথা নামিয়ে, বিরাট লম্বা দেহটি আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে সোঁ-সোঁ ক'রে চ'লে যায়।

নিমেষে শমিতার সব অসাড়তা ছুটে যায়, খেয়াল থাকে না যে এ বাড়ির নতুন বউ সে, চেঁচিয়ে ওঠে, "লাঠি নিয়ে এসো—লাঠি নিয়ে এসো—"

পেছন থেকে রূপেন এসে তার মুখ চেপে ধরে, "করছ কী! দাদা জেগে যাবেন যে!"

হুঁশ হয় শমিতার। তার চোখের সামনে সাপটি উঠোন পেরিয়ে, রান্নাঘরের ছন্‌ছাতলা দিয়ে চ'লে যায় পেছনের বাগানের দিকে।

রূপেন শমিতাকে ধ'রে নিয়ে যায় ঘরের ভিতর। দরজা বন্ধ ক'রে এসে বসে বিছানার উপর। শমিতাও ব'সে থাকে বিহ্বল দৃষ্টিতে, খানিক পরে বলে, "এতক্ষণ ধ'রে গেল সাপটা পরিষ্কার উঠোনের ওপর দিয়ে, একটা লাঠি হ'লে—"

"খবরদার!" রূপেন সতর্ক করে, "কক্ষনো যেন অমন চেষ্টা কোরো না। বাড়িপাহারা সাপ—বাস্তুসাপ ও, কখনো কারো ক্ষতি করে না। কিন্তু ওর যদি ক্ষতি করতে যাও, ও ছাড়বে না—হাজার হ'লেও সাপ তো!"

"সাপ ব'লেই তো বলছি।" শমিতা বলে, "সাপ আবার বাড়িপাহারা!"

"তাই তো শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকে।" রূপেন বলে, "কত বার দেখেছি ওকে, প্রায়ই তো ঘোরে বাড়ির আনাচে-কানাচে।"

"মা গো!" শিউরে ওঠে শমিতা।

রূপেন বলে, "লাঠি দিয়ে মারাও যায় না অত বড় সাপ। মারলে ওই পাকা গায়ে লেগে ফিরে আসবে লাঠি। লাভের মধ্যে যে মারতে যাবে সেই মরবে ছোবল খেয়ে। গোখরো সাপ—জানো না তো! ও সাপকে ঘা মেরে যদি সাবাড় ক'রে ফেলতে পারে তো ভাল; কিন্তু তা যদি না পারে, তা হ'লে ঘা খেয়ে তখনকার মত হয়তো পালিয়ে যাবে, তার পরে, সারা মুলুক খুঁজে বেড়াবে তোমায়, যেখানে পাবে, যেমন ক'রে পারে, দংশন করবেই।"

জানে শমিতা। সে তো আর শহুরে মেয়ে নয়। প্রতিহিংসা নিতে গোখরো-কেউটের জুড়ি আর নেই।

শুয়ে পড়ে শমিতা, কিন্তু চোখ বুজতে পারে না; চোখ বুজলেই অন্ধকারে ভেসে ওঠে ভীষণ সেই কালমূর্তি।

চুপ ক'রে আছে রূপেন। শুয়ে পড়েছে সেও। টেবিলের উপর হ্যারিকেনের আলো নিবিয়ে দিতে হাত বাড়ায় সে, শমিতা বলে, "থাক্, নিবিয়ো না, কমিয়ে রাখ আলো।"

সারা দেহে-মনে অবসাদ বোধ করছে শমিতা, তাই চুপ ক'রে আছে; কিন্তু রূপেন কেন আর একটাও কথা বলছে না! ঘুমোয়নি সে, পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, অথচ কথা বলছে না। সে কথা বললে যে শমিতা একটু হালকা হ'তে পারে। রাগ করল নাকি? কেন?

শমিতা সাপ মারার কথা বলেছে ব'লে? এ কি একটা রাগের কারণ হ'তে পারে? তবে? কী যেন ভাবছে রূপেন। কী ভাবছে হঠাৎ এত?

এক সময়ে মৃদু স্বরে রূপেন বলে, "ঘুমোলে ?"

"না।" শমিতা সাড়া দেয়।

রূপেন বলে, "শুধু এই বাস্তুসাপ বা গোখরো সাপ ব'লেই নয়, কখনো যেন কোন সাপই মেরো না এ-বাড়িতে।"

"কেন ?" বিস্মিত ভাবে জানতে চায় শমিতা। অবশ্য, সাপ দেখলেই মারমুখী হ'য়ে ওঠার মত সাহস নেই শমিতার, কিন্তু আর কাউকে লাঠি নিয়ে আসতে উৎসাহ দেবার গলাও তো আছে। সাপের মত দুশমন জীবকে মারবার চেষ্টা না করার কী কারণ থাকতে পারে ?

রূপেন বলে, "শুধু এ-বাড়িতে নয়, এ-বাড়ির বউ যখন হয়েছ, কোথাও সাপ দেখলে মারবার চেষ্টা কোরো না—এতটুকু আঘাত করারও না।"

আরো বিস্মিত হয় শমিতা, "কেন বল তো ?"

মৃদু-গভীর কণ্ঠে রূপেন বলে, "সাপের অভিশাপ আছে আমাদের বংশের ওপর—মনসার অভিশাপ।"

"অভিশাপ !" স্ফুট হয় না শমিতার কণ্ঠ।

রূপেন বলে, "কবে আমাদের কোন্ পুরুষে, কে নাকি মনসা-পূজোর দিনে সাপ মেরেছিলেন—গর্ভিণী সাপিনী—সাপের পেটে ছিল বাচ্চা।"

"সাপের পেটে বাচ্চা হয় ?"

"জানি না।" রূপেন বলে, "শুনেছি কোন-কোন সাপের নাকি কখনো কখনো পেটের মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। সেই সাপেরও পেটে ছিল বাচ্চা। সাপটাকে যিনি মেরেছিলেন, তাঁরা নাকি ছিলেন সাত ভাই। এক বছরের মধ্যে—পরের বছর নাগ-সংক্রান্তি আসবার আগেই—একে একে ছ'ভাই-ই নাকি মারা যান সাপের কামড়ে। বাকি যিনি রইলেন, তাঁকে স্বপ্নে বললেন মা-মনসা, 'গর্ভিণী সাপিনী মেরেছিস নাগপুজোর দিনে—বংশে তোদের বাতি দিতে কেউ থাকত না, তবে ভাগ্যি ভাল তোর যে, সাপিনীর একটি বাচ্চা বেঁচেছে,—তাই তুই বেঁচে রইলি। এখন থেকে নাগের অভিশাপে তোদের কোন পুরুষে এক জনের বেশি পুরুষ-সন্তান বাঁচবে না।' এই ব'লে মনসা দেবী অন্তর্ধান হলেন।"

এ কী রূপকথা ! নিঃশব্দে শোনে শমিতা।

রূপেন বলে, "পরের বছর নাগপুজোর দিনে, আমাদের সেই পূর্বপুরুষ শোকার্ত মন নিয়েও যথাসাধ্য ঘটা ক'রে মনসাপুজো দিলেন। সারাদিন নিরম্বু উপোস ক'রে প'ড়ে রইলেন মনসার পায়ের তলায়। রাত্রে তাঁর ঘুমের মধ্যে দেবী আবার স্বপ্ন দিলেন, বললেন, 'তোর বংশে কোন দিন কেউ যেন কোন সাপের কোন অনিষ্ট না করে—তা হ'লেই আমার এ অভিশাপের খণ্ডন হবে।' সেই থেকে সাপের অনিষ্ট করা এ বংশে নিষিদ্ধ।"

"মনসা প্রসন্ন হলেন ?" শমিতা প্রশ্ন করে।

রূপেন বলে, "আজও তা জানা যায়নি। সেই থেকে প্রতি পুরুষে প্রতি বছর এ বংশে দুর্গাপুজোর চেয়েও ঘটা হয় মনসাপুজোয়, আর বাড়ির কর্তা সারাদিন উপোস ক'রে প'ড়ে থাকেন পুজোর মণ্ডপে। কিন্তু তার পরে আর মনসা কোন দিন স্বপ্ন দেননি।"

"সেই অভিশাপ ?"

"চলছে।" রূপেন বলে. "এক জনের বেশি পুরুষ-সন্তান বাঁচে না কোন পুরুষেই।"

"সত্যি ?"

"সত্যিই তো দেখছি !"

"কিন্তু তোমরা তো দু'ভাই," শমিতা বলে, "তোমার বাবা—ওঁরাও তো শুনেছি তিন ভাই ছিলেন।"

রূপেন বলে, "ঠাকুরদা—ওঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই। তা হ'লে হবে কী ? এক জন মারা গেছেন ছেলে বয়সে. দু'জন যৌবনে. এক জন

সুখের সংসার। বড় ভাই ভূপেন্দ্রনাথের বয়স হয়েছে প্রায় পাশের কাছাকাছি, স্বাস্থ্যটি নিটোল। ছেলে-মেয়ে হয়েছে ছ'টি, সব ক'টিই বেঁচে আছে এখনও—ভবিষ্যতের জন্তই ভয়। সংস্কৃত লেখাপড়া করেছেন তিনি প্রচুর, উপাধিও উত্তরণ করেছেন কয়েকটা। দশখানা গাঁয়ের লোকে মানে-গণে যথেষ্ট। চাষ-আবাদ আছে বিস্তর; পঞ্চাশ-ষাট বিঘে জমিতে শুধু ধানের চাষই হয়—আউশ আমন দোফসলা। আনুষঙ্গিক অন্যান্য চাষ-আবাদ তো আছেই। বাগান-ভরা ফল, পুকুর-ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা গোরু, গোলা-ভরা ধানে পরিপূর্ণ লক্ষ্মীর সংসার।

ভূপেন্দ্রই সংসার-গৃহস্থালী দেখেন! ছোট ভাই রূপেন্দ্রনাথের বয়স পঁচিশ পেরিয়েছে সবে। তাকে তিনি শহরে রেখে আধুনিক শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকতে দেবেন না তিনি—চাকরি করতে দেবেন না, বলেন, "ঘর-সংসার ফেলে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে বাইরে থাকবে কোন্ সুখের জন্যে? তার চেয়ে, আমি তো এত কাল চাষ-আবাদ করিয়েছি মান্ধাতার আমলের রীতিতে, তুমি বিজ্ঞান পড়েছ, আমাদের কৃষিতে তুমি বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা কর। তাতে বিঘে-পিছু ছ'মণ ক'রে দু'ফসলে চার মণ ধানই যদি বেশি আসে—আর সব ফসলের কথা ছেড়েই দাও—হিসেব ক'রে দেখ, চাকরির আয় পুষিয়ে যাবে।"

দু'ভাই রামলক্ষ্মণ আত্মা। দাদা বলতে রূপেনের চোখ বুজে আসে, ভাই বলতে ভূপেন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে স্নেহে-গৌরবে।

আড়ালে রূপেনকে জিজ্ঞেস করেন লতিকা, "হ্যাঁ, ঠাকুরপো, শমিকে মনসার শাপের কথা বলনি তো?"

রূপেন বলে, "এ-বাড়ির বউ যখন হয়েছে, একদিন জানতে পাবেই। আর কথাটা ব'লে ভয় দেখিয়ে রাখা ভাল, তা নইলে কবে আবার সাপ দেখলে লাঠি নিয়ে তাড়া করবে।"

"তা হ'লে বলেছ?" বউদি জানতে চান।

"বলেছি, বউদি।" রূপেন প্রশ্ন করে, "কেন বল তো?"

টগর গাছে শমিতার সাপ দেখার কথাটা জানিয়ে লতিকা বলেন, "সেই থেকে মুখ শুকিয়ে আছে মেয়েটার। তা, বলেছ যখন, খোঁচা-কোঁচা মারেনি নিশ্চয়ই।"

সহজ ভাবে হেসে-খেলেই সংসারের কাজে লেগে যেতে চায় শমিতা প্রতি দিনের মত আজও, কিন্তু পারে না, মন থাকে ভারি হয়ে। আচমকা সাপ দেখে, বেদিশে হয়েই সে আঘাত করেছে হাত দিয়ে, মনকে সান্ত্বনা দিতে চায় সে, জ্ঞানত কিছুতেই হাত বাড়াতে পারত না সাপের দিকে; তবু মনে হয় পাপ করেছে। পাপই যদি না হবে তো কথাটা লুকোল কেন সে?

আর-কোথাও পাপ নয় এটা—শুধু এ-বাড়িতেই পাপ!

কিন্তু সে যে এ বাড়িরই বধূ!

দূর! কী একটা কুসংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সে! নিজেকে সাহস দেয় শমিতা। বেশ করেছে, সাপকে আঘাত করেছে—আত্মরক্ষার জন্য। 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'—সংস্কৃত বাণীটি,

জানে সে। আত্মরক্ষা পুণ্যেরই কাজ। কে বলে সে পাপ করেছে?

কিন্তু কিছুতেই মানাতে পারে না মনকে। ভারি হয়েই থাকে মন। কাউকে বলতে পারলে মন হালকা হ'ত, কিন্তু উপায় নেই কাউকে বলার। রূপেনকে তো নয়ই; এতখানি শিক্ষা পাবার পরেও আজীবনের কুসংস্কার সে ছাড়তে পারেনি! শমিতার মনে হয়, সাপকে আঘাত করেছে—এ কথা এ-বাড়ির কেউ জানতে পেলে, দেখতে-না-দেখতে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড বেধে যাবে এখানে। সেটা যে কী ধরণের, কী চেহারার, তা ধারণাই করতে পারে না সে।

এক সময়ে শমিতার শুকনো মুখ লক্ষ্য ক'রে লতিকা বলেন, "কী রে, শমি, এখনো সাপের ভয় যায়নি তোমার মন থেকে? যা, ও-ঘরে গিয়ে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা কর গে খানিকক্ষণ।"

শমিতা হাসে, "ও মা, খেলা করব কী!"

"কেন, বুড়ি-ধাড়ি হয়ে গেছ তুমি যে খেলা করবে না?"

লতিকা বলেন, "না হয় রূপকথা বল গে ওদের, যাও।"

মনের বোঝাটা অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই নেমে যায় শমিতার মন থেকে। শুধু পুকুরঘাটে যাবার সময় টগর ফুলের গাছটির কাছে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায়, মনটা যেন কেমন ক'রে ওঠে। একটু থেমে, দু'-চার বার হাততালি দিয়ে, গাছটা ভাল ক'রে দেখে, ঘাটে নেমে যায়। সাপটাকে আর দেখা যায়নি কোন দিন সেখানে। এক চপেটাঘাতেই বোধ হয় শিক্ষা হয়ে গেছে তার! মনে মনে হাসি পায় শমিতার। লাউডগা সাপের প্রতিশোধ নেবার রোগও নিশ্চয়ই নেই; থাকলে, ইতিমধ্যে কি আর সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না তার!

কিন্তু ভয়টা আবার পেয়ে বসে শমিতাকে আরো কিছু দিন পরে এক দিন জ্বর হয় রূপেনের।

জ্বর আর কা'র না হয়? বিশেষ পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া, অল্প-স্বল্প হোক, আছেই। কিন্তু কাঁপিয়ে জ্বর আসেনি—ম্যালেরিয়া তো নয়। ডাক্তার বলেন, "ম্যালেরিয়া কাঁপ দিয়েই আসবে এমনই কী বাঁধাবাঁধি আছে?"

কিন্তু পাঁচ দিন যায়—ছ'দিন যায়—সাত দিন যায়—জ্বর আর ছাড়ে না। ডাক্তার এঁদের বহু কালের পারিবারিক চিকিৎসক, এঁদের মনসার শাপের বিবরণ জানেন তিনি। আশ্বাস দিয়ে বলেন, "অত্যাগী ম্যালেরিয়াও তো আছে। ভাববেন না আপনারা!"

ডাক্তার রক্ত নিয়ে যান, শহরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করান, রোগ ধরা পড়ে—টায়ফয়েড।

কেঁপে ওঠে শমিতার বুক। লাউডগা সাপটা ক'দিন ধ'রে উঁকিঝুঁকি মারছে তার মনে। যতই জ্বর ছাড়ছে না রূপেনের, ততই শমিতার আশঙ্কিত মনের সামনে সবুজ পাতার মত মাথাটি বাড়িয়ে, লাল ছুঁচলো চেরা জিভ লিকলিকায় সাপটা। টায়ফয়েড কথাটা শমিতার কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, সমস্ত সবুজ দেহটা নিয়ে কিলবিল ক'রে ওঠে সেই আহত ক্রুদ্ধ লাউডগা সাপ তার মনের মধ্যে—তার বুকের মধ্যে।

বিদ্ঘুটে সেই বাড়িপাহারা বাস্তুসাপটাও যেন ফণা তুলে ফুঁসে দাঁড়ায়!

তার পরে আরো দু'দিন দেখেছে শমিতা সেই গোখরো সাপটাকে। এক দিন বিকেলে পুকুরপাড় দিয়ে সোঁ-সোঁ ক'রে চ'লে যেতে দেখেছে তাকে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। ফণা তোলেনি, শমিতাকে বোধ হয় দেখতে পায়নি, আপন মনেই চ'লে গেছে এঁকেবেঁকে—ভিজে মাটির ওপর সুদীর্ঘ অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা রেখা কেটে।

আর-এক দিন—সেদিন নাগ-সংক্রান্তি, মনসাপূজার ঘটা চলেছে বাড়িতে। রূপেনের তিন দিদি এসেছেন সন্তান-সন্ততির বাহিনী নিয়ে। ভূপেন্দ্রের ছোট পর-পর তিন বোন—রূপেনের বড়। আত্মীয়-কুটুম্ব-পাড়াপড়শীতে ভিতরবাড়ি-বারবাড়িতে গিসগিস করছে লোক। সন্ধে হয়-হয়। পূজামণ্ডপে আরতির তোড়জোড় চলছে। মণ্ডপের কোণে পদ্মাসনে ধ্যানী বুদ্ধের মত ব'সে আছেন বড়কর্তা চোখ বুঁজে—সারা দিনের নিরম্বু উপবাসী। শমিতা সারা দিন ছোটদের সঙ্গে হৈ-হৈ করেছে। সবার আদরের ছোট বউ সে—তাকে বড়র গুরুত্ব কেউ দেয়নি, ছোটদের দলে বরং নেতৃত্ব করার একটা সুযোগ পেয়ে বেঁচেছে সে। সন্ধ্যের কাছাকাছি মণ্ডপের পেছনে একটু আড়ালে একা দাঁড়িয়ে সে সমারোহ দেখছে। হঠাৎ মৃদু সোঁ সোঁ শব্দ। শিউরে উঠে সে দেখতে পেল, লেবু গাছের ঝোপের আড়াল দিয়ে বাস্তুসাপটা চলেছে যেন গা-ঢাকা দিয়ে। এদিকে ছেলেপিলেদের কে বুঝি দুষ্টুমি ক'রে ঢাকে এক ঘা কাঠি মেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকী কেড়ে নিয়েছে কাঠি—ধমক শুনে তাও বুঝা গেল। ঢাকের এক ঘাএর ওই আওয়াজটি হতেই থমকে দাঁড়িয়ে ফোঁস্ ক'রে ফণা তুলল গোখরো; খানিক সেভাবে থেকে, যখন আর কোন আওয়াজ শুনতে পেল না তখন ফণা নামিয়ে আবার চ'লে গেল নিজের পথ ধ'রে।

সেই কালনাগও যেন আজ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে শমিতার মনে আতঙ্ক জাগিয়ে।

দু' সপ্তাহ কেটে যায়—জ্বর ছাড়ে না রূপেনের।

এত দিন সকলকে আশ্বাস দিয়েছেন ভূপেন্দ্র, দিনের মধ্যে দশ বার গিয়ে রোগীর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে জ্বর ছাড়ার প্রত্যাশিত দিনটি পেরিয়ে যেতে, তাঁরও মুখ যেন মলিন হয়ে ওঠে।

শনিবারে সকাল বেলা লতিকা বলেন শমিতাকে একান্তে ডেকে, "তোমার ভাসুর বলেছেন, আজ তুমি উপোস ক'রে থেকো, সন্ধে বেলা দুধ-কলা দেবে মা-মনসাকে।"

সারা দিন উপোস ক'রে, বিকেল বেলা দিদির সঙ্গে গিয়ে বার-বাড়ির বাস্তুতলা নিকিয়ে আসে শমিতা। সন্ধ্যে বেলা তাঁর সঙ্গে গিয়ে একটা পাথরবাটিতে ক'রে এক বাটি দুধ রাখে সেখানে, দুধের মধ্যে রাখে মর্তমান কলা খোসা ছাড়িয়ে। সাষ্টাঙ্গে সেখানে প্রণাম ক'রে মনে মনে শমিতা মাথা কোটে, "মা-মনসা, তোমায় অমান্য করি নে মা গো, অমান্য করি নে তোমার নাগিনী-সন্তানকে—প্রসন্ন হও, তোমার অভিশাপ তুলে নাও এ বংশের ওপর থেকে।

রাত্রে নাকি সাপ এসে দুধ-কলা খেয়ে যাবে। বাস্তুতলার জিওল গাছের গোড়ায় যে ঝোপ, তারই মধ্যে কোন্ গর্তে নাকি থাকে সেই বাড়িপাহারা বাস্তুসাপ। তাই বটে। নাগপূজোর সন্ধ্যেয় ওদিকেই যেতে দেখেছিল সাপটাকে শমিতা।

রাতের শেষে ভোর না হ'তে একাই ছুটে আসে শমিতা

বাস্তুতলায়, দেখে, পাথরবাটি কাত হয়ে প'ড়ে আছে, দুধে ভিজে আছে খানিকটা জায়গা, তারই উপর প'ড়ে আছে অস্পৃষ্ট কলা, ডাঁইপিঁপড়ের মহোৎসব লেগে গেছে—সাপে দুধ-কলা খায়নি।

ধড়াস্ ক'রে ওঠে শমিতার বুকের ভিতর। পড়ে যেতে যেতে সে হাতের কাছের নাগকেশর গাছের নিচু ডালটা ধ'রে টাল সামলায়। প্রশ্ন জাগে শমিতার সন্দিগ্ধ মনে, সাপে দুধ-কলা খায়, এ কি আসলে সত্যি? বাজে কথা।

বাজে কথা? খায় না সাপে দুধ? তাদের বাড়িতেই যে এক এক রাত্রে গোরুর বাঁট চুষে দুধ খেয়ে যায় সাপে! তবে? এ দুধ কেন খেল না? প্রত্যাখ্যান করেছে!

সাপে বাঁট চুষে গোরুর দুধ খেয়ে যায়, বাঁটে ঘা হয়ে যায়—সে নাকি সাপের দাঁতের! মিছে কথা। সাপের দাঁতের ঘা হলে গোরু বাঁচে কখনো? কিন্তু দুধ চুসতে গিয়ে তো আর গোরুর বাঁটে দংশন করে না সাপে। হয়তো দংশন করলেই বিষথলি থেকে বিষ বেরোয় সাপের, নইলে বেরোয় না।

সংশয়ে-সমাধানে দোলা খেতে খেতে অধীর হয়ে ওঠে শমিতার মন।

ইতিমধ্যে লতিকাও এসেছেন সেখানে। শমিতাকে ধ'রে নিয়ে যান তিনি বাড়িতে, বলেন, "সাপে দুধ খায়নি, তাই বা বুঝব কী করে? হয়তো সাপ আসবার আগেই আর-কিছুতে এসে উলটে ফেলেছে পাথরবাটি।"

কিন্তু লতিকার মুখ কালো হয়ে গেছে অকল্যাণের দুর্ভাবনায়। সাপে দুধ-কলা খায়নি—এ যে বড় অকল্যাণের লক্ষণ!

শমিতা তাড়াতাড়ি যায় রূপেনের কাছে। ঘুমুচ্ছে রূপেন। কাল প্রায় সারা রাতই ছটফট করেছে, ভোর বেলা এখন একটু ঘুমোচ্ছে। ভাসুর এসে দেখে যান—ঘুমোচ্ছে ভাই। খানিক পর-পরই এ-ঘরে আসেন তিনি ভাইকে দেখতে। মনে হয়, এ-ঘর থেকে যেতেন না তিনি, সারা দিন-রাত ভাইএর শিয়রের ধারে ব'সে থাকতেন—শুধু বউমা আছেন বলেই তাঁকে চ'লে যেতে হয়। ঘরে ঢুকবার আগে তিনি গলাখাঁকারি দেন, সেই শব্দ পেলেই শমিতা রূপেনের বিছানার উপর থেকে নেমে দূরে স'রে দাঁড়ায় ঘোমটা টেনে।

একবার এসে ভূপেন্দ্র বলেন, "তুমি বিছানা ছেড়ে নেমো না, মা, যেয়ো না এখান থেকে। রোগী সেবিকার অসহায় সন্তানের মত, আবার তুমি আমার কন্যার মত—তুমি আমার মা, আমি তোমার সন্তান, এখানে লজ্জা-সংকোচের তো কোন কারণ দেখি না। রূপেন ভাল হয়ে উঠুক—লজ্জা-সংকোচের সামাজিকতা তখন আবার মানা যাবে।"

বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায় শমিতা।

লতিকাকে একান্তে ডেকে ভূপেন্দ্র বলেন, "বউমাকে মাঝে মাঝে তোমার কাছে ডেকে এনো, সান্ত্বনা দিয়ো। ওইটুকুন মেয়ে, অষ্টপ্রহর রোগীর মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থাকলে, ওকেই যে শয্যা নিতে হবে।"

লতিকা বুঝতে পারেন, এ ছাড়াও আরো কথা আছে। নিজের হাতে ভাইএর শুশ্রূষা করতে না পেরে মন ছটফট করছে ভূপেন্দ্রের। লতিকা বলেন, "আমি তো বলি ওকে, কিন্তু ও যে রোগীর ঘর ছাড়তে চায় না, আর ঠাকুরপোও চায় শমিতাই সব সময় ওর কাছে থাকুক।"

ক্ষীণ একটি হাসির রেখা জেগে ওঠে লতিকার মুখে; তারই ছোঁয়া লেগে ভূপেন্দ্রের মুখে একটু করুণ হাসি ফুটেই আবার মিলিয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি অন্য দিকে চ'লে যান।

শমিতা শক্ত হয়। কেন এত দুর্বল হয়েছে তার মন? গেলো যে তার ছোট ভাইএর টায়ফয়েড হ'ল, বিয়াল্লিশ দিনে জ্বর ছাড়ল, তার বাপের বাড়িতে তো এমন উৎকণ্ঠা দেখা দেয়নি। চিকিৎসার এত ভাল ব্যবস্থাও তো করতে পারেননি তার বাবা। এখানে তো রূপেনের চিকিৎসা চলছে গোড়া থেকেই। গ্রামের ডাক্তারই ভাল ডাক্তার—অভিজ্ঞ এম-বি, রোজ সকাল-সন্ধ্যায় দেখছেন এসে রূপেনকে। তার উপরও, একটু দূরে—ষ্টেশনে আছেন আরো বড় এক ডাক্তার, তাঁকে ডাকা হয়েছে; তিনিও আসছেন এক দিন অন্তর। শহর থেকে আরো বড় ডাক্তারও আনা হচ্ছে কাল—কুড়ি টাকা ভিজিট আর যাতায়াত-ভাড়া দিয়ে। তবে কেন এত ভাবছে সবাই!"

কেন ভাবছে, তাও বুঝে শমিতা। এ-বাড়িতে যে-কোন পুরুষের কোন অসুখ-বিসুখ হ'লেই সারা বাড়ি জুড়ে নেমে আসে কালো ছায়া। মনসার অভিশাপ। একপুরুষে গুষ্টি। দু'ভাই না হয়ে যদি এখন থাকত শুধু এক ভাই, তা হ'লে কারো মুখেই দেখা দিত না দুর্ভাবনার রেখাটিও।

মনসার অভিশাপ! যত সব বাজে সংস্কার! এমন একটা বাজে ভাবনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কালি হয়ে উঠেছে শমিতাও! ছি!

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে লতিকা দেখতে পান, ঘাটের কাছে টগর গাছের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে শমিতা গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে। লতিকা গিয়ে তার মাথায় হাত রাখতেই সে চমকে ওঠে।

লতিকা বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "কী করছিস এখানে?"

না-না, কিছুই করছে না শমিতা, পুকুরঘাট থেকে উঠে আসবার সময় কেমন যেন হাঁটু ভেঙে প'ড়ে গেছে! লাউডগা সাপকে আগ্রহ করার কথা কাউকে বলতে পারে না শমিতা—এ-বাড়ির কাউকে না।

তৃতীয় সপ্তাহ কেটে যায়, তবু জ্বর ছাড়ে না।

ভূপেন্দ্র মানত করেন, চতুর্থ সপ্তাহে জ্বর ছাড়লে, মা-মনসার অকালপুজো দেবেন তিনি—যথাশক্তি আয়োজন করে।

মনসা আর মনসা—সাপ আর সাপ! শুনতে পারে না শমিতা। নিজেদের মনের দুর্বলতায় ইচ্ছে ক'রে এ-বাড়ির লোকে মনসার অভিশাপ ডেকে আনছে।

রূপেনের শরীর এমনিতেই ছিপছিপে, তিন সপ্তাহের অত্যাগী জ্বরে সে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে যেন। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। বড় অসহায় ভাবে তাকায়। শমিতার কান্না পায় দেখে। এত দিন যে-কথা মুখে আনেনি রূপেন, সে-কথাই জিজ্ঞেস করেছে সেদিন সকালে ডাক্তারকে—বড় করুণ কণ্ঠে, "ডাক্তার বাবু, আমি বাঁচব তো?"

এত দিনে সংশয় জেগেছে রূপেনেরই মনে।

সন্ধে বেলা ভূপেন একবার দেখে গেছেন। শিয়রের ধারের চৌকিতে ব'সে রূপেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন ব'সে ব'সে।

তিনি চ'লে যাবার পরে রূপেন বলেছে—কথা বলতে কষ্ট হয়, ক্ষীণ কণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছে শমিতাকে, "একপুরুষে গুষ্টিই যদি রাখবার ইচ্ছে হয় মা-মনসার, তবে যেন আমাকে নেন।"

শিউরে উঠেছে শমিতা, তাড়াতাড়ি হাতচাপা দিয়েছে রূপেনের মুখে, "ছিঃ, এ কী অলক্ষুণে কথা।"

করুণ একটু হাসি ফুটে উঠেছে রূপেনের পাণ্ডুর শীর্ণ মুখে, বলেছে, "আমি বেঁচে দাদা গেলে, সেটাই বুঝি সুলক্ষুণে কথা হবে?"

"সুলক্ষণ-অলক্ষণ কোন কথায়ই কাজ নেই—" শমিতা বলেছে, "তুমি চুপ কর তো। রোগা মানুষ—এত কথা বলতে নেই।"

কিন্তু শমিতার মনে হয়েছে,—হ্যাঁ, তাই হোক, এক জনকে যদি যেতেই হয়, তবে বড়কর্তাই যান। তাঁর বয়স হয়েছে, ভোগ করেছেন, এখন তাঁর ভোগবিরতির কাল এসেছে, তিনিই যান। রূপেন—রূপেনের জীবন তো সবে শুরু হ'ল, সে যাবে না—না-না-না!

অথচ সেই তো যেতে বসেছে! বুক হিম হয়ে আসে শমিতার।

বাইরে গলাখাঁকারি দিয়ে বড়কর্তা ঘরে আসেন। আঁতকে ওঠে শমিতা। রোগীর অসুবিধা হবে ব'লে টেবিলের উপর আলো খুব কমিয়ে রাখা হয়েছে। আবছা আলোয় কতকটা যেন ছায়া-মূর্তির মত এসে দাঁড়ালেন বড়কর্তা তাঁর সুস্থসবল শালপ্রাংশু দেহ নিয়ে—শমিতার মনে হয় যেন মূর্তিমান অকল্যাণের ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে রূপেনের শিয়রে।

ঘোমটার আড়ালে জ্ব'লে ওঠে শমিতার দু'চোখের দৃষ্টি। ঝাঁপিয়ে পড়ে সে যেন নখে দন্তে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে ওই ছায়াদানবকে। শক্ত ক'রে খাটের বাজু ধ'রে ঠক্‌ঠক ক'রে কাঁপে শমিতা। ওই তো সাপ! মা-মনসা—মা-মনসা জপ করছে অহোরাত্র, মনসার বরপুত্র ওই তো! ওর বিশাল দেহের মধ্যে প্রাণকে অক্ষয় ক'রে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিনে দিনে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে প্রাণ দিচ্ছে রূপেন!

ধক্-ধক্ ক'রে জ্বলে শমিতার দু'চোখের আগুন। বিরাট ছায়া-মূর্তি যেন ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে উঠছে, সেই ছায়া শিয়রের দিক থেকে ক্রমে আস্তৃত হচ্ছে রূপেনের অসহায় দেহের উপর।······ছেয়ে গেল—ছেয়ে গেল—রূপেনের সমস্ত দেহ যে ছেয়ে গেল সেই কালো ছায়ায়! সহসা দু'হাত বাড়িয়ে দেয় শমিতা রূপেনের দিকে—ও দুটি অক্ষম বাহু দিয়ে যেন রক্ষা করবে তার স্বামীকে ওই কালছায়ার গ্রাস থেকে।

কী হ'ল! ভূপেন্দ্র চমকে ওঠেন। চোখের নিমেষে অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে শমিতা দু'হাত বাড়িয়ে সামনে লুটিয়ে পড়ে—রূপেনের দেহের উপর।

"বড়-বউ—বড় বউ!" ব'লে চিৎকার ক'রে ওঠেন ভূপেন্দ্র। ছুটে আসে লতিকা। আচমকা এ ঘটনায় অধীর হয়ে ওঠে দুর্বল রোগী। পরুষ-তিরস্কার কণ্ঠে ভূপেন্দ্র বলেন লতিকাকে, "মেরে ফেলবে—তোমরা মেরে ফেলবে মেয়েটিকে। দিনে বিশ্রাম নেই, রাতে নিদ্রা নেই,—কত পারে ওইটুকু মেয়ে?"

পাখা নিয়ে ভূপেন্দ্র ব'সে রোগীর মাথায় হাওয়া করেন।

লতিকার শুশ্রূষায় সংজ্ঞা ফেরে শমিতার। তাকে ধরে নিয়ে তিনি অন্য জায়গায় শুইয়ে দেন।

হেঁশেলের পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে লতিকা এসে শুয়েছেন রাত্রে শমিতার কাছে। মায়ের কোলে ছোট মেয়েটির মত স্যাঙ্গাত ঘুমোয় শমিতা। ভোর হ'তে লতিকা উঠে যান সংসারের কাজে। খানিক পরে জাগে শমিতা। ধীরে ধীরে সে রোগীর ঘরের দোরে গিয়ে দাঁড়ায়, দেখে, স্বর্ণকান্তি ভূপেন্দ্র ভাইএর শিয়রে আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে আছেন ঋজুদেহে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত, তাঁর হাতের পাখা অবিরাম চলছে, মুখে তাঁর পরম স্নেহের দিব্য বিভা। রূপেন ঘুমোচ্ছে—যেন অভয় দেবতার কোলে মাথা রেখে নিঃশঙ্ক নিদ্রায় মগ্ন।

ধিক্কারে ভরে ওঠে শমিতার মন। ছি ছি, তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কী সব ভাবছিল কাল! ইচ্ছে হয় ওই দেবতার পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

ধীরে ধীরে নতমুখে চ'লে যায় শমিতা। সারা দিন সে আর বড়-একটা আসতে চায় না রোগীর কাছে; মনে হয়, দেবতা যত বেশি কাছে থাকবেন ততই আশিস্ সঞ্চারিত হবে রূপেনের দেহে।

বাগানের মধ্যে রোজই একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে দেয় চাকরে। সেদিন বিকেল বেলা, ওষুধজলে ফেলা ময়লাগুলো চিনেমাটির পাত্র থেকে সেই গর্তে ঢেলে, পাত্রটি আবার ভাল ক'রে ধুয়ে, গর্তে মাটি চাপা দিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে শমিতা—হঠাৎ তার পিঠের উপর কী-একটা থপ ক'রে পড়ে উপর থেকে, তার পর ছিটকে প'ড়ে যায় কয়েক হাত দূরে। চমকে উঠে শমিতা চেয়ে দেখে, চোখের নিমেষে কুণ্ডলী খুলে সরু লিকলিকে একটা উড়োবোড়া সাপ সোজা বেতের মত চ'লে যাচ্ছে, ল্যাজ থেকে তার মাথা পর্যন্ত সোনালির মাঝে মাঝে লম্বা কালো কাস্তে রেখা। গাছের মাথায় থাকে এরা অনেক সময়, সেখান থেকে কুণ্ডলী জড়িয়ে, লাফিয়ে পড়ে মাটিতে। কুণ্ডলী না পাকিয়ে সোজা সটান হয়েও পড়ে—যেন উড়ে নামছে নিচের দিকে; তাই ওদের নাম উড়োবোড়া।

নিশ্চল হয়ে চেয়ে থাকে শমিতা সাপটার দিকে।

সাপ আর সাপ! এ-বাড়ির গাছে সাপ, ঝোপে সাপ, আশে সাপ, পাশে সাপ, আনাচে-কানাচে সাপ, এ-বাড়ির জলে সাপ, মাটিতে সাপ, সাপিনীর অভিশাপে বিসাক্ত এ-বাড়ির বাতাস, নাগিনীর বিষে বিষে এ-বাড়ির আকাশ নীল! নাগপুরীতে বাস করছে শমিতা—নাগপুরীতে। এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে সে—ম'রে যাবে দৃশ্য সাপের অদৃশ্য বিষে। এখান থেকে যদি পালাতে পারত সে রূপেনকে নিয়ে, তা হ'লে সেও বাঁচত, রূপেনও বাঁচত।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। ঘরে তখনও আলো জ্বালা হয়নি। আবছা অন্ধকারে রোগীর শিয়রে ব'সে আছেন ভূপেন্দ্র ছায়ামূর্তির মত। দেখেই চমকে ওঠে শমিতা। সেদিনের সন্ধ্যার সেই ভয়াল ভাবনা আবার তাকে পেয়ে বসে। শঙ্কিত হয়ে ওঠে তার দু'চোখের দৃষ্টি। প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সে ধিক্কার দেয়—ছি ছি, কী ভাবছে সে! দেবতার মত ভাসুর, পিতার মত, কী ভাবছে সে তাঁর সম্বন্ধে! ছিঃ!

মাথা কি ঘুরছে শমিতার? পা কি টলছে? টলতে-টলতেই সে চ'লে যায় রান্নাঘরে দিদির কাছে।

চতুর্থ সপ্তাহের শেষেও জ্বর ছাড়ে না। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে

জোর নেই কারো। শহর থেকে বড় ডাক্তারকে আবার নিয়ে আসা হচ্ছে।

ভূপেন্দ্র যেন বেশিক্ষণ আর ব'সে থাকতে পারেন না ভাইএর কাছে। কিছুক্ষণ ব'সে থাকার পরই যেন চঞ্চল হয়ে উঠেন, দু'-চোখ ওঠে ছলছল ক'রে।

শমিতা যেন কলের পুতুলের মত হয়ে পড়েছে। মুখে কথা নেই, বার্তা নেই, চলাফেরায় যেন মানবীয় সত্তা নেই, যন্ত্রবলে যেন সে চলছে।

লতিকার সংসার উঠেছে বিশৃঙ্খল হয়ে। যখন-তখনই তিনি কাজ ফেলে চ'লে আসেন রোগীর ঘরে।

ছেলে-মেয়েরা মুখ ভারি ক'রে ব'সে থাকে এখানে-ওখানে, এ ওর মুখের দিকে চায় বড় বড় চোখে, খেলাধূলোয় তাদের মন বসে না।

চাকর-বাকরেরা চাষ-আবাদের কাজ সম্বন্ধে উপদেশ নিতে এসে, বড়কর্তার মুখের দিকে চেয়ে কিছুই আর বলতে পারে না, নিঃশব্দে নতমুখে চ'লে যায়—নিজেদের বুদ্ধিতে যা জোগায়, করে।

রোগী এত কাল নিঃসাড় হয়ে প'ড়ে থাকত, গত ক'দিন ধ'রে বড় ছটফট করছে, কারো কথা যেন বুঝতে পারে না, নিজের কথাও যেন বুঝিয়ে বলতে পারে না কাউকে ; সে যেন নিজের চেনা-জানা দুনিয়া থেকে অনেক দূরে স'রে গেছে।

সেদিন বিকেলে হঠাৎ লতিকা বড়ই রূঢ় হয়ে উঠেন। এমন কঠোর ভাষা আর কোন দিন শোনেনি শমিতা তাঁর মুখে। তার মুখের দিকে চেয়েই লতিকা বলেন, "কী তোর আক্কেল, বল দেখি শমি ? আয়নায় মুখ দেখাও কি ছেড়ে দিয়েছিস ? ছি ছি ছি !"

হতভম্ব শমিতার হাত ধ'রে তিনি নিয়ে যান তাকে নিজের ঘরে। কপালের সিঁদুরটিপ মুছে গিয়েছিল তার। নিজের সিঁদুরকৌটো খুলে সযত্নে, সস্নেহে তিনি বড় একটি টিপ এঁকে দেন তার কপালে, তার হাতের শাঁখায় সিঁদুরের দাগ কেটে দেন। শমিতাও কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে দিদির কপালের টকটকে লাল টিপের উপর পরিয়ে দেয়, তাঁর হাতের শাঁখায় সিঁদুর ছুঁইয়ে দেয়, দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে। লতিকা তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খান। ওই হচ্ছে রীতি।

অকস্মাৎ শমিতার দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে আসে। লতিকা তার মুখখানি নিজের বুকে চেপে ধরেন, পরম সান্ত্বনায় তাকে জড়িয়ে ধরেন বুকে।

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে শমিতার মুখখানি তুলে চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে দেখেন, সদ্য পরানো সিঁদুরটিপটি তার ছোট্ট কপাল জুড়ে লেপটে গেছে। অন্ধকার হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। তাড়াতাড়ি আঙুলের মাথায় শাড়ির পাড় জড়িয়ে, আবার গোল ক'রে দিতে যান চারি দিকে ছড়িয়ে-যাওয়া সিঁদুর মুছে। মুখ সরিয়ে নেয় শমিতা, বলে, "থাক্, দিদি, সিঁদুর আমার সারা কপাল জুড়ে থাকুক, আপনি আশীর্বাদ করুন।"

লতিকার চোখে জল দেখা দেয়, নিঃশব্দে তিনি হাত রাখেন শমিতার মাথায়।

লতিকার মুখের দিকে চেয়ে থাকে শমিতা—টকটক করছে তাঁর কপালে সিঁদুরটিপ, সিঁথেয় জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের রেখা, তাঁর মুখ [illegible] রক্ত দিয়ে জড়িয়ে আছে শাড়ির চওড়া লাল পাড়। ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠে শমিতার মুখ, ওই শাড়িতে ঘ'ষে গিয়েই তার কপালের সিঁদুর লেপটে যায়—ওই কপালের ওই সিঁথের সিঁদুর বজায় রাখবার জন্যই তো মুছে যেতে চলেছে তার নিজের কপালের সিঁদুর…

সহসা সবেগে মুখ ফিরিয়ে প্রায় ছুটে চ'লে যায় শমিতা সেখান থেকে। নিজের ঘরে গিয়েই আবার থমকে দাঁড়ায়। ভাসুর ব'সে আছেন রূপেনের পাশে। শমিতার মনে হয়, ওই বিরাট দেহ নিজেকে পুষ্ট করার জন্য—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চোখের দৃষ্টি দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে রূপেনের। তক্ষকের মত—তক্ষক সাপের মত চোখ দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে। মনসার বরপুত্র ও নিজেই।

ভাসুরের সামনেই শমিতা বেহায়ার মত ওঠে গেল রূপেনের বিছানায়। জ্বলন্ত চোখে সে বার বার তাকায় ভাসুরের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভূপেন্দ্র নেমে আসেন বিছানার উপর থেকে, চ'লে যান ঘর ছেড়ে। লতিকা এসে দাঁড়ান। হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায় শমিতা তাঁর দিকে।

দু'জনেই বুঝেন, শমিতা আর কাউকে থাকতে দিতে চায় না স্বামীর কাছে। করুক—সাধ মিটিয়ে সেবা ক'রে নিক। শুধু দূরে থেকে, আড়াল থেকে নজর রাখেন তাঁরা। রূপেন যদি সত্য সত্যই না বাঁচে তা হ'লে শমিতা যে পাগল হয়ে যাবে, তার আচরণে তারই পূর্বাভাস দেখতে পান তাঁরা।

মনসার ঘট পাতা থাকে বারো মাসই ঠাকুর-মণ্ডপে, সেখানে ছুটে গিয়ে, মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়েন ভূপেন্দ্র, ছটফট করেন বাণবিদ্ধ অসহায় প্রাণীর মত।

শমিতার বাবা-মা এসে দেখে গেছেন। শাশুড়িকে কত বার বলেছিল রূপেন কত যত্ন ক'রে, "আমাদের মা নেই, আপনি মা, ছেলের বাড়ি যাবেন না ? জামাইএর বাড়ি শাশুড়ি হয়ে যেতে বলছি না, ছেলের বাড়ি চলুন মা হয়ে।" শাশুড়ি আসেননি এত দিন, শাশুড়ির সংস্কার নিয়েই ছিলেন। আজ সেই রূপেনের বাড়ি এলেন তিনি, কিন্তু রূপেন কি তার অন্তর থেকে চেয়ে দেখতে পারল।

বড়দি, মেজদি, ছোড়দি একে একে এসে দেখে গেছেন। নিজেদের সংসার ছেড়ে থাকতে পারেননি কেউ, চোখের জল মুছতে মুছতে চ'লে গেছেন। বড়দি তাঁর এক মেয়েকে রেখে গেছেন মামিমা'র কাজকর্মে সাহায্য করার জন্যে।

দিনের পর দিন যায়, রাত যায়, শমিতার চোখে ঘুম নেই, তন্দ্রা পর্যন্ত নেই। শমিতার চোখে আগুন জ্বলে, দিনে দিনে প্রখরতর হয়ে ওঠে সেই আগুনের জ্বালা। মুখে কথা নেই, শুধু চোখ দিয়ে ঢালে শমিতা বিষের আগুন। সে আগুনের যদি প্রত্যক্ষ দাহন-শক্তি থাকত, তা হ'লে ভূপেন্দ্র এত দিনে পুড়ে খাক হয়ে যেতেন বুঝি।

করুণায় ভ'রে ওঠে লতিকা আর ভূপেন্দ্রের মন।

মণ্ডপে মনসার ঘটের কাছেই আজকাল ভূপেন্দ্রের প্রায় দিবা-রাত কাটে। কখনও মাথা ঠোকেন মেজেতে, কখনও অধীর ভাবে গড়াগড়ি দেন, কখনও যোগাসনে ব'সে থাকেন স্থির হয়ে—বুক ভেসে যায় চোখের জলের ধারায়।

একা লতিকাই আঁকড় ধ'রে রেখেছেন সংসার। এত বড় বিপদে লতিকা-মহাগহিণী মহামায়ার মত, স্থিরা, ধীরা, অটলা।

অবশেষে আসে পঞ্চম সপ্তাহের শেষ দিন। সকাল কাটে ছায়াচ্ছন্ন, মধ্যাহ্নের রোদে দ্যুতি নেই। দুপুরের পরে বিকেলের দিক কিন্তু হাসি ফোটে সারা বাড়িতে। প্রবল ঘাম হচ্ছে রূপেনের।

ঘাম হচ্ছে—জ্বর নামছে—জ্বর ছাড়ছে রূপেনের।

ঘামে ভিজে যাচ্ছে চাদর-কাঁথা-সুজনি। বার বার মুছিয়ে দিচ্ছে শমিতা। তার সারা মুখের পাংশুতা ছেয়ে জ্বলজ্বল করে আনন্দের আভা। চোখের দৃষ্টিতে নেমেছে কোমলতা। এক এক সময় আশঙ্কা হচ্ছে, জ্বর অনেকটা নেমে যদি আবার হু-হু ক'রে বেড়ে যায়? আবার আশা হচ্ছে, না না, আজকের ঘামের ধরনই আলাদা।

ভূপেন্দ্র আসেন, আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলেন, "জ্বর ছেড়ে যাবে আজ—জ্বর নামছে।"

ব'লেই আবার চ'লে যান মণ্ডপে। আবার খানিক পরে আসেন, আবার আনন্দ-বাণীটি শুনিয়ে আবার মণ্ডপের দিকে ছোটেন। শিশুর মত চঞ্চল হয়ে উঠেন তিনি।

হাসিমুখে বার বার আসেন লতিকা, উজ্জ্বল চোখে প্রতিবারই জানিয়ে যান, "জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।"

প্রতি বারই যুক্তকর ললাটে ঠেকান, "মা—মা—মা গো!"

রূপেনের জ্বর নামে। যত ঘাম হয়, জ্বর ততই নামে।

মাঝে মাঝেই থার্মোমিটার দেয় শমিতা। এত দিন একশ' ডিগ্রি ছেড়ে বড়-একটা নিচে নামত না জ্বর, আবার ঠেলে উঠত একশ'-চারের উপর—দিনের মধ্যে বার বারই উঠা-নামা করত অসম তালে। আজ নিরেনব্বুই এরও নিচে নেমে এসেছে জ্বর।

ক্রমে আটানব্বুই ছাড়িয়ে নেমে আসে।

আরো ঘাম হয়- আরো জ্বর ছাড়ে। ঘাম মুছে দেয় শমিতা।

সাতানব্বুই ছাড়িয়ে নেমে আসে জ্বর। আর থার্মোমিটার দিয়ে কী হবে!

ভূপেন্দ্র আসেন। থার্মোমিটারটা তাঁর সামনে রাখে শমিতা। সেটি তুলে তিনি জ্বর দেখেন এবং কাচের কাঠিটা এক রকম ছুঁড়ে দিয়েই, প্রায় একটা লাফ মেরেই চ'লে যান মণ্ডপের দিকে।

ধিক্কার নেমেছে শমিতার অন্তরে। এমন দেবতুল্য মানুষের কী অকল্যাণই না সে কামনা করেছে! ক্ষমা চাইবে সে—বড়কর্তা আর দিদির পায়ে ধ'রে সে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু যে অপরাধ সে করেছে—মৃত্যুকামনা করেছে ভাসুরের—বৈধব্য কামনা করেছে বড়জা-এর—সে অপরাধের কথা তো মুখ ফুটে বলা যাবে না কোন দিন কাউকে। সে অপরাধের জন্য নিজের কাছে সে নিজেই ছোট হয়ে রইল, নিজেরই বিচারে সে মনে মনে তিলে তিলে তার দণ্ডভোগ করবে চিরদিন। মনে মনে সে বলে, "ক্ষমা কর, দেবতা, ক্ষমা কর—তোমার দেব-মহিমায় দুর্বলা নারীর অপরাধ মুছে দাও।"
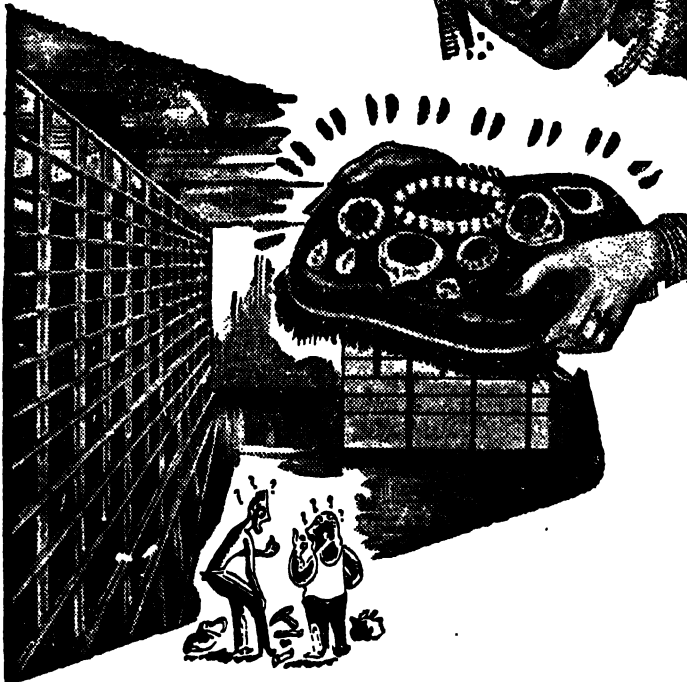
লতিকা আসেন, রূপেনের কপালে হাত রেখে বলেন, "আর কী! একটুও নেই আর জ্বর। ও ঠাকুরপো—ঠাকুরপো!"

দুর্বল চোখ মেলে তাকায় রূপেন, আবার দু'চোখ যেন আপনা থেকেই বুঁজে যায়।

লতিকা চপল কণ্ঠে ঠাট্টা করেন, "ভাত খাবে, ঠাকুরপো—মাছের অম্বল দিয়ে? কচি আমড়ার চাটনি খাবে?"

রূপেনের কংকালসার মুখে পাণ্ডুর একটু হাসি ফোটে, অস্ফুট দুর্বল কণ্ঠে বলে, "নিয়ে এস।"

"উঃ! বয়ে গেছে নিয়ে আসতে!" ছেলেমানুষের মত বলেন লতিকা, "নিয়ে আসব আর উনি নবাবের মত শুয়ে শুয়ে খাবেন! হেঁটে যাবে রান্নাঘরে—তবে না—"

সহসা সজল চোখে নেমে আসে শমিতা এবং কথা নেই বার্তা নেই, লতিকার পায়ে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকে মেঝের উপর। চোখের জলে ভিজে যায় তাঁর পা। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন তিনি, তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে বুকে তুলে নেন, "এ কী, শমি, পাগল হ'লি! চোখের জল ফেলতে হয় আজ? যা—যা, তুই ঠাকুরপোর কাছে বোস উঠে।"

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়-হয়।

নিশ্চিন্ত মনে সেই যে গেছেন ভূপেন্দ্র, তার পরে আর আসেননি। মণ্ডপে গিয়ে স্থিরচিত্তে যোগাসনে বসেছেন এবার। সন্ধ্যের মুখে লতিকারও কাজের অন্ত নেই, তিনিও আসতে পারেননি কিছুক্ষণের মধ্যে।

রূপেন ঘুমোচ্ছে। জ্বর ছেড়ে গেছে—আরামে ঘুমোচ্ছে রূপেন।

কিন্তু কেমন যেন নির্জীব হয়ে গেছে! গায়ে হাত দিয়ে দেখে, কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা। এতক্ষণ তবু মাঝে মাঝে একটু আঃ উঃ—একটু বা ছটফট করেছে, কিন্তু ক্রমেই যে একেবারে অনড় হয়ে এল! থার্মোমিটার দেয় শমিতা। রূপেনের শরীরে যেন সাবলীলতা নেই, কেমন যেন কাঠ-কাঠ হয়ে গেছে! থার্মোমিটারে দেখা গেল, জ্বর প্রায় পঁচানব্বই ডিগ্রিতে নেমে গেছে। ভালই তো, শমিতার মনে হয়, জ্বর যত নামে ততই তো ভাল।

থার্মোমিটার তুলে রেখে শমিতা চেয়ে দেখে, আধবোজা চোখে অনড় হয়ে শুয়ে আছে রূপেন। হাত ধ'রে নাড়া দেয় শমিতা, পা ধ'রে নাড় দেয়—সাড়া নেই! ভয়ে ভয়ে নাকের কাছে হাত নেয় শমিতা—নিশ্বাস কি পড়ছে? পড়ছে কি নিশ্বাস? কই—

এ কী!

শমিতার বুক ফেটে কান্নার স্বরে—আর্তনাদের স্বরে বেরিয়ে আসে, "এ কী!"

ছুটে আসেন লতিকা। ছুটে আসেন ভূপেন্দ্র, রূপেনের অবস্থা দেখে, তার কপালে হাত রেখে তিনি শিউরে উঠেন। নিজের কপাল চাপড়ে তিনি উন্মাদের মত ছোটেন। এ কী ভুল করলেন তিনি—এ কী ভুল করলেন—নিজে কেন এ সময়ে তার কাছে রইলেন না? নামতে নামতে যে বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনীয় জ্বরটুকুও নেমে যেতে বসেছে! জ্বর নামছে দেখে কেন তিনি ডাক্তারকে খবর দিলেন না! এ'যে হরিষে বিষাদ হ'ল—হরিষে বিষাদ!

বড়কর্তাকে এমন পাগলের মত ছুটতে কেউ দেখেনি কোন দিন। পথের লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে।

একেবারে ডাক্তারবাড়ি গিয়ে তিনি আছড়ে পড়েন।

সাঁ-সাঁ ক'রে বাতাসের বেগে সাইকেলে ছুটে আসেন ডাক্তার। রোগীর অবস্থা দেখে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেন। হিম হয়ে গেছে রোগী—আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তবু ভাল যে, লতিকা মাথা স্থির রেখে, আগুন ক'রে এনে, ভাগনীটির সাহায্যে রোগীর হাতে-পায়ে গরম সেঁক দিচ্ছেন।

শমিতা তো এক পাশে প'ড়ে শুধু কিড়-কিড় করছে আর ছটফট করছে।

ডাক্তার রোগীর হাতে চট্‌পট্ ইন্‌জেকশন ফুটিয়ে দেন, তার মুখে ওষুধ দেন ফোঁটা ফোঁটা। রোগীর হাতের কবজিতে নাড়ী ধ'রে ব'সে থাকেন ডাক্তার।

খানিক পরে—বেশ কয়েক মিনিট পরে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে ডাক্তারের মুখ। নাড়ীতে স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে। রোগীর বুকে হাত দিয়ে দেখেন—উত্তাপ ফিরেছে খানিকটা। স্টেথিসকোপ দিয়ে দেখেন—হৃৎপিণ্ডের অবস্থা আশাপ্রদ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন ডাক্তার, 'ভগবান!'

ঘুমোয় রোগী। ক্রমেই গাঢ় হয় ঘুম। সশব্দে তালে তালে নিশ্বাস পড়ে।

উঠে বসে শমিতা। আনন্দে বুঝি তারই হৃৎস্পন্দন যাবে বন্ধ হয়ে।

সহসা বাইরে অনেক কণ্ঠের কলরব ওঠে।

বড়কর্তাকে অনেকে মিলে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসেছে। ডাক্তারবাড়ীতে একটু দম নিয়ে, ভূপেন্দ্র যখন ব্যস্ত ভাবে বাড়ি ফিরছিলেন, খেয়াল ছিল না পথের দিকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে পথ দেখা যাচ্ছিল না ভাল—কাল বটের ঝোপের কাছে আসতেই কিসে কামড়েছে তাঁর পায়ের আঙুলে।

কিসে আর? মনসার অভিশাপ!

মেঝেতে আছড়ে প'ড়ে মাথা-কোটে শমিতা, "আমারই পাপে—ওগো, আমারই পাপে—আমারই মনের কুটিল ইচ্ছা সাপ হয়ে তাঁকে দংশন করেছে! মনসা—ওগো নিষ্ঠুর নাগিনী—"

মূর্ছিতা হয়ে পড়ে শমিতা। কাছে কেউ নেই। ভাগনী ছুটে গেছে কোলাহল শুনে সেদিকে। ডাক্তার তো সেখানে গেছেনই! লতিকা তো সবার আগেই ছুটে গেছেন।

অসাড়ে ঘুমোয় রোগী। ভালই। জেগে থাকলে 'হার্ট ফেল' করত।

"সেই ভাগ্যবান, যে ঠিক তার নিজের কাজে নিয়োগ হয়েছে।
আর অন্য কোন সৌভাগ্যের পেছনে সে যেন না দৌড়য়।"

—কার্লাইল

দরবারী কানেড়া

শ্রীবারি দেবী

ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ; পণ্ডিত শোভনলাল; মৈথিলী ভাষায় অপভ্রংশ, পণ্ডিত সোহনলাল। তাঁর পরিচয় নিয়ে প্রায়ই ঘোরতর বিতর্ক ওঠে ওস্তাদ-মহলে, মুসলমান ওস্তাদরা তাঁকে মুসলমান বলে দাবী করেন, আর হিন্দুরা বলেন তিনি খাঁটি হিন্দু ও ব্রাহ্মণ-সন্তান।

যাঁকে নিয়ে এত বিবাদ, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি সহাস্যে বলেন, 'আমি মানুষ, এই আমার একমাত্র পরিচয়, আমার কোনো জাতি, কুল, সমাজ বা সংস্কার কিছু নেই! এ দুনিয়া আমার ঘর-বাড়ী, সকল মানুষই আমার আপন জন।'

বাংলার কোনো রাজভবনে পণ্ডিত সোহনলাল এসেছেন; কুমার শশিকান্ত চৌধুরীর সাদর আমন্ত্রণে।

কুমার শশিকান্ত'র সুরমন্দির। ঘরের মেঝেতে মূল্যবান পার্শিয়ান গালিচে পাতা, তার ওপর কয়েকটি মখমলের তাকিয়া সাজানো রয়েছে। ঘরের ছাদ-সংলগ্ন ঝুলছে একটি রঙ্গিন বেলোয়ারী কাচের ঝাড়। তার আলোতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা রঙের আলোর ছটা। একটি রূপোর ধূপদানীতে জ্বলছিলো অনেকগুলি সুগন্ধি মহীশূর ধূপ, আরেকটি রূপোর পাত্র থেকে চূর্ণ চন্দনের হাল্কা নীলাভ ধোঁয়া উত্থিত হয়ে ঘরের বাতাসকে সুরভিত করে তুলছিলো। ঘরের মাঝে ছিল একটি বড় রূপোর ট্রে। তার ওপর একরাশ গোলাপ ফুলের বোকে, আর আতর-দানে রাখা হয়েছে, খস্, হেনা, দেলখোস, গোলাপী, নানা রকমের মূল্যবান আতর। কয়েকটি অর্দ্ধনগ্ন পাথরের আর ব্রোঞ্জের ষ্টাচু শোভাবর্দ্ধন করছিলো ঘরের কোণে কোণে। সুদৃশ্য লেসের পর্দ্দা ঝোড়ো হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে। রকমারী, বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, হারমোনিয়াম, সেতার, বেহালা, এস্রাজ, ম্যাণ্ডোলিন, সুরবাহার, সারোদ, গীটার প্রভৃতি ঘরের এদিক-ওদিক ছড়ানো রয়েছে।

বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়ে এসেছেন আসরে। সন্ধ্যা থেকে জমাট মজলিশ চলেছে। সে আসরে আছেন নিমন্ত্রিত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। নানা ধরণের শিল্প-পাগলের ভিড় জমেছে। মাঝে মাঝে আসছে সরবৎ, সোনালী তবক-মোড়া পান আর পানপাত্রে রঙ্গীন ফেনিল পানীয়।

তারা-খচিত গগনে যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হ'ল। সুরমন্দিরে প্রবেশ করলেন পণ্ডিত সোহনলাল।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ! ধপধপে শাদা মাথার চুল কাঁধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্বেতশুভ্র চাপদাড়ি; খাড়া টিকোলো নাক, আকর্ণ-বিস্তৃত দুটি জ্যোতির্ম্ময় চোখ থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে আলৌকিক জ্যোতিকণা! এত বয়সেও অদ্ভুত রকম জেল্লা রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর। প্রশস্ত-শুভ্র কপালে শ্বেতচন্দনের কোঁটা।

পরনে চোস্ত শাদা পায়জামা, শাদা মলমলের ঢিলা আলখাল্লা। মাথায় কাশ্মীরী কাজ-করা শাদা শাটিনের টুপি। মুসলমানী বেশভূষার সঙ্গে শ্বেত চন্দনের কোঁটাটি কেমন যেন অদ্ভুত লাগে! কুমার শশিকান্ত সাদর অভ্যর্থনায় বসালেন পণ্ডিতজীকে। বিনীত হাস্য ও নমস্কার বিনিময়ের মাঝে সভাস্থ সকলের সঙ্গে পরিচয়ের পালা শেষ হ'ল পণ্ডিতজীর।

তার পর সুমিষ্ট সরাবে গলা ভিজিয়ে, তানপুরাটিকে তুলে নিলেন নিজের কোলে। তানপুরার তারে মৃদু মৃদু ঘা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সুর শুনবেন কুমার সাহেব?

শশিকান্ত জবাব দিলেন,···"এমন ঘন ঘোর ঘটা শাওন রজনী" এমন সন্ধ্যায়, মেঘমল্লার শুনতে বাসনা হয়, পণ্ডিতজী!

মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন পণ্ডিত সোহনলাল। গুরুগম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে আলাপ ধরলেন মেঘমল্লার রাগের। সঙ্গত করতে লাগলেন তাঁর সহকারী।

কি অপূর্ব্ব দরদ-ভরা মরমী কণ্ঠস্বর! মোহময় সুরলহরী ঘরের বায়ুমণ্ডলে এনেছে সংঘাতময়ী বিদ্যুৎপ্রবাহ! প্রতিটি হৃদয়তন্ত্রীতে সে প্রবাহ তুলেছে অপূর্ব্ব বেদনামিশ্রিত পুলক শিহরণ। পণ্ডিতজী গাইছিলেন···

"প্রবল দল মেঘ ঝুক ঝুম য়া ভূম পর
উমড় ঘন ঘোর ঝড়ি ইন্দ্র লায়ো!"

পদটিকে সুরের ইন্দ্রজালের মাধ্যমে বার বার খেলাতে লাগলেন। স্তিমিত নেত্রযুগল তাঁর। শ্বেতশুভ্র কপালে দুটি নীল শিরা বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

স্তম্ভিত বিস্মিত ভাবে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলেন শশিকান্ত ও সভাস্থ অন্যান্য শ্রোতারা। এ কি মানব-কণ্ঠের গান! না কোন সুরলোকবাসী গন্ধর্ব্ব ইনি?

তাঁর দরদ-ভরা সুর-আবেদনে যেন মেঘলোকে জেগে উঠলো ···

প্রতিধ্বনি। গুরু-গুরু রবে দামামা বাজিয়ে মেঘদূতের দল এলো অভিনন্দন জানাতে। মুহুর্মুহু বজ্রপাত হতে লাগলো। সারা প্রাসাদ যেন থর-থর করে কেঁপে উঠছে, প্রাসাদ কেঁপে ওঠে ক্রুদ্ধ মেঘের ভৈরব গর্জ্জনে। রঙ্গীন কাচের ঝাড় সবেগে দুলে ওঠে। যেন প্রলয়-লীলা সুরু হয়েছে।

পণ্ডিতজীর সুর তখন পঞ্চমে উঠেছে। তিনি গাইছেন…

"তানসেনকে প্রভু তেরী গতি অদ্ভুত
সুরপতি অধীন হোয় শীষ নবায়ো।"

নানা ঢংএর গমক ও তান, লয়, মূর্চ্ছনার ভেতর সেই স্বর্গীয় সুরলহরী ঝঙ্কৃত হয়ে ধীরে ধীরে থেমে গেল!

কুমার শশিকান্ত পুলকাবেগে জড়িয়ে ধরলেন পণ্ডিতজীকে। পরস্পরের গভীর ভাব-বিনিময়ের পর হেঁট হয়ে পণ্ডিতজীর পদধূলি গ্রহণ করলেন শশিকান্ত।

—হাঁ, হাঁ, করেন কি? করেন কি? পণ্ডিতজী নত হয়ে বুকে তুলে নিলেন কুমারকে। সস্নেহে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—কুমার সাহেব! এত দরদী হৃদয় আপনার? আজ সুরসাধনা আমার সার্থক হ'ল ভাই! জীবনে বহু সম্মান, অর্থ, এ সব পেয়েছি; কিন্তু এমন ভালোবাসা…এ যে স্বর্গীয় বস্তু! এ পরম বস্তু লাভ করবার যোগ্যতা আমার ত কিছু নেই বন্ধু!

কুমার শশিকান্ত আবেগ-কম্পিত স্বরে বললেন, সুর-যাদুকর! বলুন, আমি কি দিতে পারি আপনাকে? কেমন করে দেব আপনার গানের মর্য্যাদা? একটা বিনীত অনুরোধ আমার …আপনাকে পেতে চাই আমার সঙ্গিরূপে, বন্ধুরূপে! আমার লালজীর মন্দিরে আপনি ভজন গাইবেন। বলুন পণ্ডিতজী, এ স্বপ্ন আমার সফল হতে পারে কি—না?

সভাশুদ্ধ সকলে নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে শুনছিলেন এই দুটি সুর-পাগল শিল্পীর ভাষণ। কি উত্তর দেন পণ্ডিতজী?—সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর জবাবের অপেক্ষা করছেন।

গভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে শশিকান্তর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন পণ্ডিতজী।…তার পর ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, আমায় ক্ষমা করুন কুমার সাহেব! আমি যাযাবর। কোথাও এক স্থানে বাস করা ঈশ্বর আমার নসীবে লেখেননি। আমার কোথাও ঘর নেই, আমি গান গেয়ে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াই, যেখানে নিয়ে যান আমার সুরলক্ষ্মী, আমি সেইখানে ছুটে যাই! আমার দেবতা মন্দিরে নেই কুমার সাহেব! কোথায় আছেন তাও জানি না।…আপনার এ দয়া আমার শেষ দিন অবধি স্মরণ থাকবে, এবার আমাকে বিদায় দিন! কাল সকালে যাত্রা করি আবার, মন বড় চঞ্চল হয়েছে কুমার সাহেব!

কুমার শশিকান্ত ধীর কণ্ঠে বললেন, তাই হবে পণ্ডিতজী! আপনি বিরাট, মহান্, আপনাকে ধরে রাখবার মত শক্তি আমার নেই বন্ধু!

গভীর রাত্রি। বাইরে অবিরাম বর্ষণ চলেছে। অপরূপ সঙ্গীত-লহরীর তরঙ্গাঘাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল শশিকান্তর। তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলেন শয্যার ওপর।

আর্ত্তনাদ দরবারী কানেড়া রাগিণীর মাঝে ঝরে পড়ছে! শশিকান্ত উঠে খোলা জানলার সামনে দাঁড়ালেন। ওস্তাদের ঘর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো নীলাভ আলোর ছটা। কান' পেতে শশিকান্ত গানের কথাগুলি শুনতে চেষ্টা করলেন। সুরের মাঝে জেগেছে প্রবল আকর্ষণ।

নিজের অজ্ঞাতে মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে শশিকান্ত কখন এসে দাঁড়িয়েছেন পণ্ডিতজীর ঘরের ভেতর। নিঃশব্দে উপবেশন করলেন দরজার পাশে।

বড় বড় ওস্তাদ গুণীনদের কাছে শুনেছেন শশিকান্ত।… দরবারী কানেড়ার সম্বন্ধে অদ্ভুত সব কথা। অশরীরীর আনাগোনা! জিন্ পরীরা উপস্থিত হয় নাকি ঐ মোহময় সুর-নির্ঝরিণীতে অবগাহন করবার জন্য। সর্ব্বশরীর তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পণ্ডিতজী অর্দ্ধশায়িত ভাবে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে তানপুরায় সুর দিচ্ছেন। কোন্ মহা ভাব-সাগরের অতল গভীরে ডুব দিয়েছেন তিনি। নিমীলিত নয়ন দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুকণা ঝরে পড়ছে। পণ্ডিত সোহনলাল গাইছিলেন—

ঘোর আঁধিয়ারা শাঙন রজনী
কাঁহা গৈ পিয়া মেরা, কঁহু মেবে সজনী।

গহীন আঁধার ভরা, নিদ্রাতুর শ্রাবণ নিশীথিনীর বুকে, সজল বাতাসের স্তরে স্তরে সেই অপূর্ব্ব মাদকতাময় সুরের মায়াজাল বিস্তারিত হতে লাগলো। সেই মোহময় সুরের পরশ লেগে, কুমার শশিকান্তের চোখ দুটি কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে; তিনি দরজায় হেলান দিয়ে ঘুমে ঢুলে পড়লেন।

হঠাৎ পণ্ডিতজীর ডাকে তিনি লজ্জিত ভাবে উঠে বসলেন। আহত স্বরে তিনি বললেন, এ কি কুমার সাহেব! আমি কি আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালাম? আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।

স্মিত হাস্যে কুমার বললেন, না পণ্ডিতজী! আপনি আজ অপূর্ব্ব সুর-সুধা পান করিয়েছেন আমাকে! আমি এমন গান যে জীবনে আর কখনও শুনিনি! পরে একটু থেমে বললেন, আচ্ছা ওস্তাদজী, একটা প্রশ্ন জাগছে আমার মনে, কিন্তু আপনাকে বলতে বড় সঙ্কোচ বোধ করছি।

যুক্তকরে পণ্ডিতজী বললেন, আদেশ করুন ভাই সাহেব!

শশিকান্ত মৃদু স্বরে বললেন, মনে হয় একটা গভীর বেদনা চাপা আছে আপনার অন্তরে। এ কি আমার কল্পনা? না, সত্য কিছু আছে আমার ধারণার মধ্যে?

মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বৃদ্ধের সৌম্য মুখমণ্ডল। সুরার আমেজে চোখ দুটি ঈষৎ বক্তিম বর্ণ।

কুমারের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন অল্পক্ষণ, তার পর বললেন, আপনার অনুমান সত্য বন্ধু! জীবনে পেয়েছিলাম এক অভাবনীয়ার স্বর্গীয় প্রেম। তার পর সে হারিয়ে গেছে। তাকে হারিয়ে আমি সর্ব্বহারা, ছন্নছাড়া। অনন্ত বেদনার বোঝা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি অলস্ত উল্কার মত। আপনার মত দরদী বন্ধুর কাছে সে কাহিনী বলতে আমার কোনো বাধা নেই! আমি জানি, আমার বেদনা যথার্থ উপলব্ধি করবার মত দিল্ আপনার আছে। আঁধার-ভরা মহাশূন্যের পানে ব্যথা-ভরা দৃষ্টি মেলে দিয়ে নিজের জীবন-কথা আরম্ভ করলেন পণ্ডিত সোহনলাল।

—সে কত দিন আগেকার কথা ঠিক হিসাবে আসে না কুমার সাহেব! তখন আমার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর হবে।···বেনারসে গোবিন্দ জিউএর নাটমন্দিরে গানের মজলিশ বসেছিল। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় ওস্তাদ এসে ঐ আসরে যোগদান করেছিলেন। আমার পালক-পিতা পণ্ডিত কুন্দনলাল মিশ্র সেকালের একজন নামকরা গাইয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম ঐ গানের জলসায়!

আমাদের ছিল ঘরোয়ানা শিক্ষা। বংশ-পরম্পরায় এই গানের ধারা আমাদের চলে আসছে। শুনেছি আকবর বাদসার সভায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ গান গাইতেন। বাদসার পাঞ্জা, শিরোপা, মোহর, আতরদান, পূর্ব্বপুরুষের সম্মান হিসাবে পাওয়া জিনিষগুলো ছিল বড় আদরের পিতাজীর কাছে। সেদিন গানের সভায় আমি গাইলাম···আজকের এই অভিশপ্ত গানখানি—দরবারী কানেড়া। গভীর রাত্রি। আমি যখন সুরের সাধনা করি কুমারজী, তখন আমার কোন বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না। সমস্ত শিরার মাঝে যেন বইতে থাকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। পাগল করে আমাকে··· যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি সে সময় সুরের খেলায় মত্ততা এনে দেয় আমাকে। চারি দিক থেকে বাহবা-ধ্বনি উঠতে লাগলো। শেষ হ'ল আমার গান।

আজ যেমন আপনি আমাকে আলিঙ্গন দিলেন কুমার সাহেব, সেদিন ঐ রকম একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার খানদানী বাবু জিতা রহো বেটা! কি দরদ-ভরা সুরেলা কণ্ঠ তোমার! আমার বড় সরম হ'ল, চুপ করে রইলাম। আমার পিতাজী মৃদু মৃদু হাসছিলেন, উঠে এসে সে বাবুজীকে সেলাম দিয়ে বললেন,—রাজাসাহেব! ও আমার লেড়কা। ওর গান আপনাকে খুস্ করেছে এ আমার পরম সৌভাগ্য। পরে বাবার কাছে জানলাম, তিনি উত্তর-ভারতের কোনো একজন ভূস্বামী,, রাজা উপাধি পেয়েছেন। পিতাজী কয়েক বার ওঁর নিমন্ত্রণে গান গাইতে ওঁর প্রাসাদে গেছেন। প্রাসাদে তাঁর অনেক ওস্তাদ গুণীন্ জনের আনাগোনা আছে। তিনি এসেছেন এমন একজন গাইয়ের সন্ধানে যে সর্ব্বদা তাঁর আসরে থাকবে, প্রতি প্রহরে শোনাবে তাঁকে সময়-উপযোগী রাগ-রাগিণী।

আমাকে তাঁর বড় পছন্দ লেগেছে, পিতাজীকে জানালেন আমাকে নিয়ে যেতে চান সঙ্গে করে। পিতাজী রাজি হলেন, তবে মনে বড় দুখ পেলেন আমাকে ছেড়ে দিতে। যাবার আগের দিন, রাত্রে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে কতক্ষণ যেন অস্ফুট ভাষায় কি বললেন। তার পর জল-ভরা চোখে বললেন,···তুমি আমার পালিত-পুত্র হলেও আমার একমাত্র স্নেহের ধন ও পরম বন্ধন ছিলে, তোমার একটা ভালো আশ্রয় মিলে গেল। আর আমার আজীবন সাধনার বস্তু তোমাকে দান করেছি। আমার শিক্ষা আজ সার্থক হয়েছে বেটা! তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ। আমি এবারে তীর্থভ্রমণে যাবো। যদি কখনও আঘাত পাও আমার কাছে ফিরে এস বেটা!

রাজপ্রাসাদে এসেছি; বাইরের মহলে একটি সুসজ্জিত ঘরে আমার বাসের বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রতি প্রহরে যখন নহবৎ বাজানো শেষ হয়, তখন আমাকে গাইতে হত সময়োপযোগী রাগ-রাগিণী। আর রাজা বাহাদুরের সান্ধ্য আসরে নিত্য যোগদান করতে হত। রাজাসাহেব ছিলেন একজন প্রকৃত গুণী ব্যক্তি। তিনিও স্বর-সাধনায় গভীর ভাবে মগ্ন ছিলেন।

প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। এর পরে এলো আমার জীবনে সেই মহা লগন। পণ্ডিতজী নীরব হলেন!···তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলতে লাগলেন, কুমার সাহেব! আজকের এই দরবারী কানেড়াখানি গাইছিলাম সেদিনের এমনি এক ঝড়-বাদল ভরা শাওন রাতে! গভীর রাত, গানের মাঝে যখন আত্মহারা হয়েছিলাম, হঠাৎ মনে হ'ল, একটি আবছায়া মূর্ত্তি যেন নড়াচড়া করছে ঘর-সংলগ্ন পাশের বারান্দায়। কে এত রাত্রে ওখানে? গানের মাঝে একটু লক্ষ্য রাখলাম ওখানে। কালো ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত এক রমণী-মূর্ত্তি বলে মনে হ'ল। খোলা চুল তার এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছিলো। হঠাৎ বিজলী খেলে গেলো আকাশে। সেই ক্ষণিকের আলোয় দেখলাম একটি স্থির বিজলী-শিখা বিরাজ করছেন ঐ বারান্দায়। কে এই রহস্যময়ী? আমি ত্বরিত পদে উঠে গেলাম বারান্দায়। অপরিচিতা একটু চমকে উঠে পালাতে গেলেন, আমি তাঁর ওড়নাটি তখন ধরে ফেলে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কে আপনি? আপনি কি স্বর্গের কিন্নরী? উত্তর এলো: না, আমি মানবী! আপনার গান শুনতে এসেছিলাম। এখন ছেড়ে দিন! ভৈরবী রাগিণীর সময় ছাদের মিনারে আমার দেখা পাবেন। তিনি

পরদিন প্রভাতে ভৈরবী রাগিণীর আলাপ ধরেছিলাম, মনে পড়লো সেই নিশীথিনীর কথা। আমার ঘরের পিছনে পুষ্পোদ্যান, তার পর আরম্ভ হয়েছে অন্দর-মহল। পাশাপাশি তিনটি মহল। দুটি উচ্চ মিনার ছিলো মহলের দু'দিকে। পরম বিস্ময়ে দেখি, সেই একটি মিনারের গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন মূর্ত্তিমতী ভৈরবী রাগিণী! শুভ্রবসন-পরিহিতা, গলায় মুক্তার মালা, কানে মুক্তার শ্বেত কুণ্ডল, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। বন্ধনমুক্ত কেশপাশ ছড়িয়ে পড়েছে মুখের আশে-পাশে। কি অপরূপ মূর্ত্তি! আমার গানের তাল কেটে গেল! আমি জগৎ ভুলে গিয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম সেই দিকে। তিনি সরে গেলেন। আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লজ্জায় নিজেকে শত ধিক্কার দিলাম। ক'দিন পরে অপরাহ্নে পুরবীর আলাপ ধরেছিলাম। গানের মাঝে চাইলাম মিনারের দিকে।···ওঃ, যেন আগুন জ্বলছে! রক্তাম্বরা, রক্তপ্রবালের আভরণে সজ্জিতা, সেই অপরূপা বিরাজ করছেন সেখানে। সূর্য্যাস্তের লাল আভা ঝলমল করছিল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। এবারে আমার গানের খেই হারায়নি! সমস্ত অন্তর ঢেলে দিলাম আমার গানে। আমার অন্তরের ব্যাকুল আবেদন সুরের মাঝে নিবেদন করলাম আমার সুরলক্ষ্মীর উদ্দেশে।

তার পর দেখেছি তাঁকে প্রতিদিন। দেখেছি নব নব রূপে? মল্লার রাগের সময় দেখেছি মেঘরঙা শাড়ী পরা, নীল অপরাজিতার মালা তাঁর গলায় দুলছে, কানে নীলকান্ত মণির কুণ্ডল। কে এই রহস্যময়ী? রাজা বাবুর পুত্রসন্তান ছিলো না, শুনেছি পুত্রলাভের জন্য তিনটি বিবাহ করেছেন। ছোট রাণীর একটি মাত্র কন্যা, নাম কস্তুরী। কস্তুরী জন্মাবার পরই তাঁর মা মারা যান। একজন ফরাসি গভর্ণেশ ছিলো তাঁর তত্ত্বাবধানের জন্য। এ সব খবর শুনেছিলাম রাজবাড়ীর মালাকর রামদাসের কাছে। সে প্রায়ই ফুল দিতে আসতো আমার ঘরে, আর দূরে বসে শুনতো আমার গান। তার পর নিজের সুখ-দুখের গল্প আরো নানা কথার মাঝে বলে যেত রাজ-পরিবারের কথা।

অন্দর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসতো বীণার ঝঙ্কার। সেটা খুব ভালো শোনা যেত গভীর রাত্রে। অমন অপরূপ ছন্দে কে বাজায় সকরুণ বীণা? বরষা বিদায় নিয়েছে। এসেছে শরতের সোনালী দিনগুলো। দীঘির জলে থরো-থরো কাঁপছে শ্বেত কমলদল, তার ওপর একটি ভোমরা ব্যাকুল গুঞ্জনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম সেই পদ্মিনীর কথা। রামদাস এসে মৃদু স্বরে ডাকলো, ওস্তাদজী! আমি ফিরে চাইলাম তার দিকে। সে চারি দিক একবার সতর্ক ভাবে দেখে নিয়ে আমার হাতে একটি ক্ষুদ্র লিপি দিলো। দুরু-দুরু বক্ষে লেখাটি পড়লাম। তাতে লেখা ছিল······"দরবারী কানেড়ার সময় আজ আমি আসবো।" রামদাস চলে গেছে। আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি? না—এই তো সেই স্বাক্ষরিত লিপিখানি! প্রতি ধমনীর মাঝে উষ্ণ রক্তের স্রোত দ্রুত তালে বয়ে গেলো, আমি কি করবো কিছু বোঝবার শক্তিও ছিল না তখন। রাত্রি দুটো বাজলো। কম্পিত হৃদয়ে দরবারী কানেড়ার আলাপ ধরলাম। অন্তরের সকল অনুরাগ ঢেলে দিলাম সুরধারার মাঝে। আমার সকল সত্তা উন্মুখ হয়ে রইলো সেই মহা লগ্নটির অপেক্ষায়। হঠাৎ অলঙ্কারের মৃদু আওয়াজে চেয়ে দেখি নীল কাচের আধারের ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো নীলাভ আলো, আর তার পাশে ধূপদানী থেকে অগুরু ধূপের ফিকে নীল ধোঁয়া এঁকে-বেঁকে বাতাসে মিশে যাচ্ছিলো, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন নীল-বসনা, নীলনয়না, আমার সুরলক্ষ্মী! হাতে গলায় হীরার আভরণ, কানে হীরার কুণ্ডল, আলোর আভায় ঝলমল করে জ্বলে উঠছিলো। আমি নির্ব্বাক বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম। তিনি কাছে এসে উপবেশন করলেন। তার পর মৃদু স্বরে বললেন, আমাকে দেখে ভয় পেয়েছেন নাকি? কথা বলছেন না যে—! আমার গলা শুকিয়ে উঠেছিল, শরীরে অদ্ভুত এক উত্তেজনা অনুভব করলাম। কম্পিত গলায় বললাম,—আপনি কে আমি জানি না, তবে মনে হয় সুরসাধনায় আজ আমি সিদ্ধিলাভ করলাম। সুরলক্ষ্মীর অভাবনীয় দর্শনলাভে আজ আমি ধন্য হলাম! আমি তাঁর অলক্তমণ্ডিত পাদপদ্মে আমার মাথা স্পর্শ করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম সেই পা দুখানি। তিনি শিউরে উঠলেন, ব্যস্ত ভাবে আমার হাত দুটি তুলে নিলেন তাঁর কোমল করপল্লবে! তার পর মধুর কণ্ঠে বললেন, ওস্তাদজী সোহনলাল! আপনার অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুধাপানে আমার অন্তর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আপনি পাগল করেছেন আমাকে, তাই আজ সকল বাধা উপেক্ষা করে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আমার নাম কস্তুরী বাঈ! রাজা উমাশঙ্করের কন্যা আমি। সুরের সাধনায় আমিও মগ্ন ছিলাম, সেই ধ্যানলোকে পেলাম আপনার দেখা!···আর কোনো কথা আজ আর মনে নেই কুমার সাহেব! রাত্রি শেষ

হয়ে এলো, নহবৎখানায় তখন ললিত রাগিণীর আলাপ সুরু হয়ে গেয়েছে। রাজকুমারী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন অন্দরে। কোন্ পুণ্যবলে এমন সুরলোকবাসিনীর অনুরাগ লাভ করলাম আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, শুধু এইটুকু অনুভব করলাম,—প্রেম-মন্দাকিনী-ধারার অমৃতস্রোতে ভেসে চলেছি আমরা দু'জন। দুটি অসম শ্রেণীর নর-নারী। রাজ-ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, সমাজ, সকল দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করে, সেই দুর্নিবার আকর্ষণের স্রোতে ভেসে গেলাম আমরা! কস্তুরী প্রতিদিন আসতো! নিত্য নব সজ্জার মাঝে হেরি তার অলৌকিক রূপমাধুরী। আমি তখন আর নগণ্য ওস্তাদজী নই। নিজেকে মনে হ'ত শাহানসা সম্রাট। মনে হ'ত এ দুনিয়ায় আমার মত ভাগ্যবান পুরুষ বোধ হয় আর কেউ নেই। একদিন দেখলাম কস্তুরীর বিষাদপূর্ণ ম্লান মুখ। ব্যথিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি হয়েছে কস্তুরী? এমন মেঘে-ঢাকা কেন আজ তোমার চাঁদ মুখখানি? কস্তুরীর চোখে জল। বলে, সর্ব্বনাশ আসছে সোহন! রামগড়ের রাজকুমারের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ের ঠিক করেছেন। কয়েক দিন পরেই তাঁরা আসছেন পাতিপত্র করে বিয়ের দিন স্থির করতে। বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠলো। সে ভাব দমন করে বললাম, সে ত ভালো কথাই; যোগ্য স্থানে যাবে তুমি; তুমি যে কোহিনূর কস্তুরী! রাজ-অন্তঃপুরই তোমার যোগ্য স্থান। কস্তুরী বিস্ফারিত, আশ্চর্য্য দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে রইলো। কি জ্বালা-ভরা সে চাউনি! তার পর রোষ ভরে বললো, এই তোমার উত্তর সোহন? তোমার প্রেম কি শুধু ছলনা মাত্র? এমন করে সর্ব্বনাশের মাঝে তুমি আমাকে ত্যাগ করবে? আর ধৈর্য্য ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না! আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে কাতর স্বরে বললাম, আমাকে ভুল বুঝো না কস্তুরী! তোমাকে ত্যাগ আমি করবো? হায় নারী, তুমি যে আমার কে, জানি না—শুধু জানি তুমি আমার আত্মা! বলো কস্তুরী, আমি কি করতে পারি বলো? কস্তুরী আমার হাত দুটি চেপে ধরে বলে,—চলো সোহন, আমরা এখান থেকে চলে যাই—কোনো দূর দেশে! যেখানে আমাদের মিলনের পথে নেই কণ্টক ছড়ানো, নেই সমাজের রক্তচক্ষু। চলো, আমরা সেখানে স্বর্গ রচনা করি। তুমি গান গাইবে, আমি বীণা বাজাবো। কি হবে রাজ-ঐশ্বর্য্যে? অন্তরে রয়েছে আমাদের প্রেম মহাঐশ্বর্য্য।

পণ্ডিতজী চুপ করলেন।

তার পর শশিকান্ত'র দিকে চেয়ে বললেন, বলুন কুমার সাহেব, কি অপরাধ করেছিলাম সেদিন আমরা? দুটি প্রেমমুগ্ধ আত্মা ব্যাকুল হয়ে চাইছে তাদের মিলন। সে প্রেম কি ভগবানের সৃষ্ট নয়? মানুষের হৃদয়ের দাবীর মূল্য বেশী—না, সমাজ সংস্কার লোকাচারের মূল্য বেশী? বলুন কুমারজী! সেদিন কি ভুল হয়েছিল আমাদের?

কুমার শশিকান্ত ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, না ওস্তাদজী, ভুল আপনি করেননি! তবে এ দুনিয়াটা বড় খারাপ জায়গা, হৃদয়ের দাম দেবার মত দিল্ মানুষের মাঝে খুব অল্পই আছে। এখন বলুন

বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে স্বপনপ্রসারী দৃষ্টি মেলে আবার নিজের কাহিনী বলতে থাকেন পণ্ডিত সোহনলাল:

তার পর স্থির হ'ল, আমরা চলে যাবো হিমালয়ের পাদদেশে কোনো এক পার্ব্বত্য গ্রামে। চারি দিকে চলেছে উৎসবের আয়োজন! রাজপ্রাসাদ আলো ও ফুল-পাতা দিয়ে সাজান হচ্ছে। নানা রকম আমোদ-প্রমোদের চলেছে বিচিত্র আয়োজন। দেশ-বিদেশ থেকে আসছে নাম-করা বাঈ; ওস্তাদ-গুণীদের দল; এরই মাঝে একদিন গভীর রাত্রে আমি ও কস্তুরী চলে গেলাম প্রাসাদ ত্যাগ করে। আমাদের পথপ্রদর্শক ও সাথীরূপে সঙ্গে রইলো রামদাস। পার্ব্বত্য বনভূমির মাঝে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে নিয়ে গেল রামদাস আমাদের। লতাপাতা-ফুলে ছাওয়া ছোট্ট দুখানি কাঠের ঘর। সেই ঘরে রচনা করলাম আমাদের স্বর্গলোক। বেহেস্ত কোথায় আছে জানি না কুমার সাহেব! কিন্তু আমার জীবনে পেয়েছিলাম তার দেখা। গ্রামের পাশেই পার্ব্বত্য ঝরণার কুলুকুলু ধ্বনি আমরা ঘরে বসেই শুনতে পেতাম। চারি ধারে পাইন, ইউক্যালিপ্‌টাসের ঘন জঙ্গল। অসংখ্য অর্কিড ও লতাগুল্মের মাঝে ফুটে আছে নানা বর্ণের ফুল। তার গন্ধে বাতাস ভরপুর হয়ে আছে! প্রকৃতি যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন অফুরন্ত সৌন্দর্য্যধারা ঐ বনভূমির মাঝে। যেন কোন নিপুণ শিল্পীর আঁকা একখানি রঙিন্ ছবি! মুক্ত জীবনের আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো কস্তুরী। উদ্দাম চঞ্চল লীলা-ভঙ্গিমায় নেচে চলে বন থেকে বনান্তরে। বুনো খরগোসের দল ভয় পেয়ে চকিত দৃষ্টি হেনে ছুটে পালায়! অজানা পাখীর দল ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়। ঝরণার জলের ধারে ছড়ানো ছিল বড় বড় উপলখণ্ড। সে বসতো সেখানে জলের স্রোতে পা ডুবিয়ে,—আমাকে বলতো গান ধর সোহন!···মূর্ত্তিমতী রাগিণী দেবীর চরণ-ছায়ে বসে এ দীন ভক্ত যখন ধরতো তার প্রাণ-ঢালা সুর-নিবেদন—সেই সুরের গভীর অতলে ডুবে যেতাম আমরা দু'জন। কে আমরা, কোথায় আছি সব ভুলে যেতাম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কিছুই ছিল না যেন তখন। পাশের জঙ্গল থেকে দু'জনে পেড়ে আনতাম পিচফল, ন্যাসপাতি, গুলাব। তার পর লতার জাল যেখানে বৃক্ষশাখায় জড়াজড়ি করে নিবিড় আঁধার রচনা করেছে, সেই লতামণ্ডপে গিয়ে বসতাম আমরা দু'জন! সেই ফল মাঝে মাঝে আহারের প্রয়োজন মেটাতো, আর তৃষ্ণায় ঝরণার জল। রামদাস মাঝে মাঝে ভুট্টা পুড়িয়ে নিয়ে আসতো, আর মৃদু তিরস্কার করে বলতো——ঘরে চলো দিদিভাই! দিন-রাত্তির গান, গল্পে, পেট ভরবে না। একবার গিয়ে ভালো করে খাওয়া-দাওয়া, ঘুম সেরে নিয়ে আবার আসবে এখানে, তা না হলে শরীরটা জখম হয়ে যাবে যে! কস্তুরী খিল্ খিল্ করে হেসে বলে,—"রাজভোগ ত অনেক খেয়েছি, এমন গাছ থেকে পেড়ে পাকা ফল তো খাইনি। দু'-চার দিন খেতে দাও না বুড়ো! রামদাস বিড়-বিড় করে বকৃতে বকৃতে চলে যায়।

কাঠ কুড়োতে আসতো পাহাড়ি ছেলে-মেয়েরা, তারা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখতো আমাদের। কখনও কখনও কাছে এগিয়ে এসে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতো। কিন্তু আমরা তখন স্বপ্ন-নগরের অধিবাসী, আর কারোর অনধিকার প্রবেশ ভালো লাগতো

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সান্‌লাইট
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝকঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT
SOAP

ঝিলমিল্ করতো, তখন দু'জনে ফিরে আসতাম আমাদের লতাপাতা ঘেরা ছোট্ট ঘরখানিতে। তার পর চলতো আমাদের সুরসাধনা। কখনও কস্তুরীর বীণায় ঝঙ্কৃত হত—ভূপালী, ইমন্-কল্যাণ। আমার কণ্ঠের সুরে—হাম্বীর, কেদারা, ছায়ানট। লতাপাতা-ফুলের বুকে সে সুর জাগাতো পুলক-শিহরণ। সে পুলক-সম্ভার ছড়িয়ে পড়তো আকাশে, বাতাসে, সীমা ছাড়িয়ে অসীমের মাঝে। রামদাস আমাদের পরিচর্য্যায় সদাই ব্যস্ত থাকতো, যেন এই তার পরম সুখ। তাকে দেখলে মনে পড়ে ত্রেতা যুগের রামদাস, বীরভক্ত হনুমানজীকে। এক নিমিষের মাঝে যেন এক মাস কেটে গেল। সহসা আমাদের ভাগ্যাকাশে এলো বিষাদের মেঘ ঘনিয়ে। ঝরণার পাশে একরাশ ফুল নিয়ে কস্তুরী সেদিন বসে মালা গাঁথছিলো, আর তার ইচ্ছায় আমি ধরেছিলাম ভূপালী রাগ···

"প্রথম মঞ্জন কর অঞ্জন দেত নৈন ঔর মাঁগ সিঁদুর,
স্তা-পর শীষ ফুল, গরে মুকুতমাল ভালটীক অঙ্গ চন্দন।
পহর নীল সারী, মুখকমল-পর, অলক শোহত
চতুর বনবারী আয় আড় নিরখত।"

হঠাৎ গানে পড়লো বাধা। রামদাস ছুটতে ছুটতে এলো, মুখ তার পাংশুবর্ণ। আমরা দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করি,—কি হয়েছে রামদাস? রামদাস শুষ্ক-কম্পিত গলায় বলে,—মহারাজ এসেছেন! এখানে তোমরা আছ, এ সংবাদ এ গ্রামের সর্দার তাঁকে গোপনে জানিয়েছে। ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম, গ্রামে নানা ধরণের লোকের আনাগোনা। এখন জলদি চল তোমরা। আমরা দু'জনে চমকে উঠলাম। পরক্ষণেই কস্তুরী উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে,—তোমার ভাবনার বা সঙ্কোচের কিছু নেই সোহন! আমরা অন্যায় করিনি,—এস আমার সঙ্গে। যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গেলাম কস্তুরীর সঙ্গে। সামনের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন রাজা বাহাদুর! আমি প্রণাম করে নতমস্তকে দাঁড়ালাম! তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন—তার পর চাপা গর্জ্জনে বললেন—শয়তান দস্যু! আমার রাজভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নটি তুমি চুরি করে এনে জঙ্গলে বসে ছিনিমিনি খেলছো?—এর উচিত শাস্তি তুমি পাবে। কস্তুরী ছুটে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। তার পর দৃপ্ত ভঙ্গিমায় তার পিতার দিকে চেয়ে বললো—বাবা! অযথা ওঁকে দোষারোপ করবেন না। আমি ওঁকে ভালোবেসেছিলাম, আমারই অনুরোধে উনি আর আমি চলে এসেছি এখানে—স্বাধীন মুক্ত জীবনের আনন্দলাভের জন্য। আপনি আমাকে শিশুকাল থেকে নানা শাস্ত্র-বিদ্যায়, শিল্পকলায়, সঙ্গীতে, সর্ব বিষয়ে পারদর্শিনী করে আমার মনের সকল সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিগুলোকে ফুটিয়ে তোলার সাহায্য করেছিলেন। সে জন্য আজ আমি মানুষের তৈরী করা বাঁধা-ধরা ছকে অর্থহীন নিরস জীবনযাত্রার মাঝে আত্মসমর্পণ করতে রাজি নই। আমার ভিতরের শিল্পিমন যাকে কামনা করেছে, তাকেই চেয়েছি আমার জীবনসাথীরূপে; এবং এতে আপনাদের সমর্থন পাবো না বলে আপনাদের না জানিয়ে প্রাণহীন রাজ-বিলাস ত্যাগ করে চলে এসেছি। স্নেহদুর্ব্বল রাজার অন্তর তাঁর কন্যাকে পেয়ে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো, দু'হাতে তিনি কস্তুরীকে টেনে নিলেন নিজের বুকে। কস্তুরী পিতার বুকে মুখ রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো। রাজা বাহাদুর সস্নেহে কন্যাকে বুকে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন—মা, তুমি যে আমার বংশের একমাত্র সন্তান। তোমার সন্তান হবে আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী—তোমার যেখানে বিবাহ স্থির হয়েছে, তাঁদের আসবার জন্য আমি নিমন্ত্রণ করেছিলাম। দেশ-বিদেশের আরো রাজা-জমিদাররা আসতেন এই উৎসবে। সে সব আপাততঃ স্থগিত রাখতে হয়েছে।—তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছ, এই কথা প্রচার করা হয়েছে। আমার সকল সম্মান যে ধূলিসাৎ হতে বসেছে মা! তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল্ কস্তুরী, আমার প্রাসাদ যে আঁধার হয়ে গেছে তোর বিহনে। কস্তুরী ধীরে ধীরে মুখ তুলে পিতার দিকে চাইলো! কি করুণ সে মুখচ্ছবি! শান্ত কণ্ঠে বললো,—বাবা, আপনার অসম্মান আমিও কিছু করিনি! এ বংশে স্বয়ম্বরা হবার প্রথাও আগে ছিল। আর কন্যা হরণ করে এনে বিবাহ আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা তো করে গেছেন। তবে আমাদের বেলায় সেটা কুলপ্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন হবে বাবা? আমাদের দু'জনকে যদি আপনার সঙ্গে যাবার অনুমতি দেন, তবেই যাবো। সেখানে গিয়ে যদি আপনি আমাদের কুলপ্রথা মত বিবাহ দেন, তবে আর তো কোনো গোলযোগ থাকে না বাবা! রাজ-ঐশ্বর্য্য আপনার যা আছে, তার ওপর আরেকটি রাজ-ঐশ্বর্য্যের কি প্রয়োজন হবে আমাদের? আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম কস্তুরীর কথাগুলো। রাজা বাহাদুর তির্য্যক দৃষ্টি মেলে দেখলেন আমাকে, মৃদু হাসি খেলে গেলো তাঁর ওষ্ঠাধরে। বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠে বললেন আমাকে—সোহন, তোমার বংশ-পরিচয় কি? তুমি ত পালিত পুত্র। তোমার পিতা-মাতার প্রকৃত কি পরিচয়? আমি নত মস্তকে জবাব দিলাম—আমি বাবার কাছে কোন দিন এ প্রশ্ন করিনি, এবং তিনিও কোন দিন জানাননি সে কথা। সে জন্য আমার বংশ-পরিচয় আমি জানি না! রাজা বাহাদুর গম্ভীর স্বরে কস্তুরীকে বললেন, তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম মা! সোহনের বংশ-পরিচয় যদি দোষযুক্ত না হয়, তবে তাকে জামাতারূপে গ্রহণ করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদিও এতে আমাকে অনেকের কাছে উপহাসাস্পদ হতে হবে, তথাপি তোমার জন্য সে সব আমি মেনে নেব। ···তার পর আমাকে বললেন, যাও সোহন, দক্ষিণ-ভারতে রঙ্গলালজীর মন্দিরে তোমার পিতা আছেন, সেখানে গিয়ে তোমার সঠিক বংশ-পরিচয় জেনে এস। আমি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললাম, আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। সেই দিনই কস্তুরীকে নিয়ে রাজা বাহাদুর চলে গেলেন। রামদাস গেল না, সে রইলো আমার পাশে, একমাত্র দরদী বন্ধুর মত। বিদায় বেলায় ঝরণার ধারে এসে দাঁড়ালো কস্তুরী। সেদিন শুক্লা একাদশী···রুপোলী আলোর ঝরণা যেন ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে বনভূমির মাঝে। কস্তুরী আমার হাতখানি চেপে ধরে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। তার সে অশ্রুভরা কাতর চাউনি আজো আমি ভুলতে পারিনি কুমার সাহেব! একটু হেসে সে বললো, আবার আমরা এখানে ফিরে আসবো

সোহন! আমার সারা অন্তর কেঁদে বলেছিলো, সেদিন আর আসবে না। মুখে হাসি টেনে বলেছিলাম—হ্যাঁ কস্তুরী, তোমার জন্যই আমি জন্ম-জন্মান্তর প্রতীক্ষা করবো! পরদিন আমি আর রামদাস রওনা হলাম দক্ষিণ-ভারতে! রঙ্গলালজীর মন্দিরে যখন পৌঁছোলাম, তখন সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়েছে মন্দিরে। আমার পিতা এক পাশে বসে ভজন গাইছিলেন! আমি রঙ্গলালজীর চরণে প্রণত হয়ে প্রাণের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করলাম,—ঠাকুর! আমার বংশ-পরিচয় যেন আমাদের মিলনের অন্তরায় না হয়। আরতির শেষে পিতার চরণে প্রণাম করে তাঁর পাশে উপবেশন করলাম! তিনি প্রথমে বিস্ময় ভরে আমার দিকে চাইলেন,—তার পর সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—এসেছ বেটা! রংলালজী তোমাকে এনে দিয়েছেন, মনটা ক'দিন বড় উতলা হচ্ছিলো তোমাকে দেখবার জন্য। কথা শেষে প্রদীপের আলোয় আমার মুখখানি তুলে ভালো করে দেখলেন!···দেখে বললেন, বেটা মনে হচ্ছে যেন একটা ঝড় চলেছে তোমার মনে? কি দুখ পেলে বেটা আমার কাছে বলো! আমি একটু নীরব থেকে বড় সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম: পিতাজী! আমার অপরাধ মাপ করবেন। বড় সমস্যা জেগেছে প্রাণে; আমার প্রকৃত পরিচয় কি? আমার পিতা-মাতার পরিচয় জানতে বড় বাসনা হয় গুরুজী! পিতাজীর প্রশান্ত বদনে গাঢ় বিষাদের ছায়া নেমে এলো। মৃদু স্বরে বললেন, সে কথা জানবার কি একান্ত প্রয়োজন ঘটেছে তোমার?···আমি বিনীত ভাবে বলি, হাঁ পিতাজী! আজ আমার জানতেই হবে সে কথা।

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে একবার রঙ্গলালজীর দিকে চেয়ে যেন অস্ফুট ভাষায় কি জানালেন···তার পর বলতে লাগলেন, প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।···বেনারসে একজন ধনী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এসেছিলেন, তাঁর নাম ছিলো সূর্য্যপ্রসাদ চৌধুরী। তাঁর একটি অনুপমা কন্যা ছিল। কৃষ্ণা দেবী নাম তার। অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী ছিল এই মেয়েটি। আমাকে তার পিতা নিযুক্ত করেছিলেন তাকে গান শেখাবার জন্য। আমি প্রত্যহ যেতাম, খুব খাতির ছিল সেখানে আমার। সূর্য্য বাবুর বেনারসী শাড়ীর ব্যবসা ছিলো। কৃষ্ণাকে সেতার শেখাতো একজন কাশ্মীরী মুসলমান ওস্তাদ, নাম রুস্তম আলী। কিছু দিন যাবৎ লক্ষ্য করছিলাম, ঐ ওস্তাদজীর ওপর যেন কৃষ্ণার গভীর অনুরাগ পড়েছে। কয়েক দিন শরীরটা ভারি খারাপ ছিল; গান শেখাতে যেতে পারিনি, হঠাৎ একদিন সূর্য্য বাবু পাগলের মত ছুটে এসে আমাকে বললেন: পণ্ডিতজী! সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, কৃষ্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না, আর রুস্তম আলীও নিখোঁজ হয়েছে। তিনি মাথা চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন ···হায়! হায়! আমার জাত, মান, সব গেল! আমি বললাম, অত উতলা হবেন না বাবুজি। ষ্টেশনে আগে চলুন খবর নিই। ষ্টেশনে আমার জানা লোক ছিল, এবং সে রুস্তমকেও চিনতো। তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল, রুস্তম কাল রাত্রে একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্ণৌ রওনা হয়েছে। আমি ও সূর্য্য বাবু সেই দিনই লক্ষ্ণৌ রওনা হলাম। তিন দিন পরে একটি মুসলমান বস্তি থেকে কৃষ্ণাকে পাওয়া গেল। রুস্তমকেও পাওয়া গেছিলো, কিন্তু সূর্য্য বাবু তাকে খুন করবার ভয় দেখাতে সে বস্তি ছেড়ে পালিয়ে যায়। কৃষ্ণাকে নিয়ে আমরা বেনারসে ফিরে এলাম। কয়েক মাস পরেই জানা গেল, কৃষ্ণার মা হওয়ার সম্ভাবনা। সূর্য্য বাবু প্রহরীবেষ্টিত করে রাখলেন অন্দর-মহল, কোনো বাইরের লোক যাওয়া বারণ। আমি শুধু যেতাম মাঝে মাঝে কৃষ্ণাকে দেখতে। যথাসময়ে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে।···গভীর রাত্রে সে ছেলেটিকে কাপড় জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এলো। তার কাতর অনুরোধে ছেলেটিকে গ্রহণ করলাম আমি! আমার স্ত্রীকে বললাম, একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা একে রেখে মারা গেছেন, আমাদেরও সন্তান ছিলো না, আমার স্ত্রী পরমানন্দে ছেলেটিকে গ্রহণ করলেন। এ ঘটনার দু'-চার দিন পরেই সূর্য্য বাবু সপরিবারে চলে গেলেন বেনারস ত্যাগ করে। তাঁদের আর কোনো খবর জানি না। সেই অবাঞ্ছিত পরিত্যক্ত শিশু আজকের তুমি সোহনলাল! তোমার পাঁচ বছর বয়সের সময় তোমার মা মারা গেলেন, সেই থেকে আমার সকল স্নেহ-মমতা দিয়ে আমি তোমাকে মানুষ করেছি। —তুমি তোমার বাবার মত কাশ্মিরী রূপ পেয়েছ; আর মায়ের অপূর্ব্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর লাভ করেছ।—ভেবেছিলাম কোন দিন জানাবো না তোমার পরিচয় তোমাকে। কিন্তু রংলালজীর ইচ্ছায় আজ তোমার সত্য পরিচয় জানাতেই হ'ল। পিতাজী নীরব হলেন! আমি ধীরে ধীরে উঠে গেলাম সেখান থেকে। আমার হৃদয়-রক্তে তিলে তিলে গড়া তিলোত্তমার আজ হয়ে গেল বিসর্জ্জন! রঙ্গলালজীর সামনে লুটিয়ে পড়লাম। এ কি অভিশপ্ত

জন্মের কলঙ্ক-তিলক আমার ললাটে এঁকে দিলে ঠাকুর? আমি ত কোন দিন চাইনি সে নন্দনের পারিজাতকে! কেন তাকে এনেছিলে আমার জীবনে? আবার নিষ্ঠুর হাতে কেন তাকে ছিনিয়ে নিলে? এখন এই লক্ষ্মীছাড়া ছন্নছাড়া দুর্ব্বিহ জীবনের বোঝা নিয়ে আমি কি করবো বলে দাও! বুক-ফাটা একটা আর্ত্ত স্বর বেরিয়ে আসতে চায়, আমি দু'হাতে চেপে কণ্ঠরোধ করলাম! রামদাসের কাছে পিতাজী সব শুনেছিলেন। তিন দিন কেটে গেছে। আমি মন্দিরের পাশের চত্বরে উত্থানশক্তিরহিত আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়েছিলাম। অশ্রুধারায় তর্পণ করছিলাম আমার ব্যর্থ-প্রেমপ্রতিমার উদ্দেশে। আর অন্তর ভেদ করে একটা উদ্ধত আবেদন ছুটেছিল বিশ্বপিতার দরবারে·····জন্মের জন্য কি আমি দায়ী? বুক-ভরা ভালোবাসা—অন্তরের শ্রেষ্ঠ দাবী সবই কি মিথ্যা হ'ল? শুধু সত্য হ'ল আমার অবাঞ্ছিত জন্মরহস্যটুকু?—কে দেবে এ প্রশ্নের উত্তর? তিন দিন পরে পিতাজী এসে পাশে বসলেন। মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে ডাকলেন, বেটা সোহন! আমি উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখলাম। রুদ্ধ বেদনার বাঁধ ভেঙে গেল, ক্ষুদ্র বালকের মত কাঁদতে লাগলাম তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে। কতক্ষণ পরে গাঢ় স্বরে তিনি বললেন—বেটা! এ দুনিয়ায় সব ঝুটা। যা দেখেছ, যা পেয়েছ, সে সব যেমন আজ মিছে হয়ে গেল, যা পেলে না বলে আজ ব্যথায় ভেঙে পড়েছ, সেও ত তেমনি মিথ্যা! এ দুনিয়ায় যা ঘটবার তা আপসে ঘটে যাবে। আমরা শুধু দেখতে দেখতে পাশ দিয়ে চলে যাবো—যেমন ছবি দেখতে দেখতে মানুষ চলে যায়। ওর মধ্যে ডুব দিতে নেই বেটা। প্রেম-ভালোবাসা, সুখ-দুখ, সব কিছু রংলালজীর চরণে দাও বেটা, ওহি মে পরাশান্তি মিল্ যাবে।

সাত দিন পরে মনের প্রচণ্ড ঝড় কিছুটা শান্ত ভাব ধারণ করলো। দুনিয়ার ওপর এলো প্রবল বিতৃষ্ণা। রামদাসকে বললাম,—তুমি আমার পিতৃমাতৃ-পরিচয় রাজা বাহাদুরকে জানিয়ে দিও। আর কস্তুরাকে বোলো যেন সে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে। অন্তরে জেগে উঠলো এক অনির্ব্বচনীয় মুক্তির আনন্দ। আমি এ জগতের কেউ নই; আমি হিন্দু, মুসলমান, কোনো গণ্ডীভুক্ত নই। আমার গৃহ নেই, জাত নেই, গোত্র-সমাজ-সংসার কোনো বন্ধনই আজ আর নেই আমার। শুধু একটি পরিচয় রইলো আমার,—আমি মানুষ। সেদিন গভীর রাত্রে একলা বেরিয়ে পড়লাম অনির্দ্দেশ যাত্রাপথে। তার পর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি কুমার সাহেব! যেখানে কোনো সুরসাধকের সন্ধান পাই ছুটে যাই; তাঁর পদতলে বসে গ্রহণ করি তাঁর সাধনা-লব্ধ সঙ্গীত-সুধা। পাহাড়-পর্ব্বতে, গভীর জঙ্গলে, কখনও তরঙ্গায়িত সাগর-কূলে বসে আমার সুরলক্ষ্মীর সাধনা করতে লাগলাম। দশ বছর আত্মগোপন করেছিলাম। তার পর আমার শেষ গুরু ওস্তাদ মাহারুন খাঁ সাহেবের সঙ্গে যখন মিলিত হই, তখন থেকে তাঁর আদেশে আবার গানের আসরে যোগদান করতে সুরু করি! আর গোপনে থাকা গেল না। এলো অগণিত কলারসিক জনের আমন্ত্রণ। বহু মুগ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসা, এলো অর্থ ও সম্মান। সবই পেলাম, শুধু অন্তরে যে তুষানল ধিকি-ধিকি আজো জ্বলছে—পেলাম না সেথায় একটু শান্তিবারি!

সোহনলাল চুপ করলেন। ব্যথাতুর দৃষ্টি তাঁর অসীমের পানে মেলে যেন কোন্ অসীমাকে অন্বেষণ করছেন।

কুমার শশিকান্তর দু'চোখে কখন অশ্রুধারা নেমেছিল, রুমালে তা মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করলেন—কস্তুরীর সঙ্গে তার পর আর আপনার দেখা হয়নি পণ্ডিতজী?

স্বপ্নলোক থেকে ফিরে এলেন সোহনলাল। একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,—না কুমার সাহেব, তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি! তবে এই ঘটনার প্রায় বিশ বছর পরে, এলাহাবাদে এক গানের জলসার নিমন্ত্রণ পেয়ে গান গাইতে গিয়েছিলাম। গভীর রাত, আমি দরবারী কানেড়ার এই অভিশপ্ত গানটি সেদিন গাইছিলাম। হঠাৎ নজর পড়লো, ঠিক সামনের সারিতে একজন বৃদ্ধ বসে আমার গানটি শুনে ঝরঝর করে কাঁদছেন! মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে ফেলছেন। ঠিক তাঁর পাশে মূল্যবান-পরিচ্ছদধারী একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলে বসে আছে। ও কে? দেখে চমকে উঠলাম। এ যে হুবহু কস্তুরীর মুখচ্ছবি! গানের মাঝে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। ভালো গান জমাতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি শেষ করলাম! আসর ছেড়ে বাইরে এসে মুক্ত হাওয়ায় একটু ভালো করে নিশ্বাস নিলাম। হঠাৎ কে এসে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরলো। চমকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে?······ভালো করে চেয়ে দেখলাম সে রামদাস। আমি আনন্দের আবেগে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম—রামদাস, তুমি এখনো আছ? বড় আনন্দ পেলাম আজ তোমাকে দেখে। রামদাস বিষাদ-ভরা গলায় বললে, হ্যাঁ ওস্তাদজী, আমি আজো আছি। রামগড়ের কুমারের সাথেই কস্তুরীর বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সে আর সে মেয়ে ছিল না ওস্তাদ, সে প্রাণহীন পাষাণে পরিণত হয়েছিল।···তার পর ছেলেটি জন্মাবার পরই সে স্বর্গে চলে গেছে সকল জ্বালা জুড়োবার জন্য। রাজা বাহাদুর বছর তিনেক হ'ল মারা গেছেন, এখন ঐ একরত্তি শিবরাত্রির সলতেটুকু জ্বলছে; আর সব জ্বালা ভোগ করবার জন্য আমি আজো আছি। দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে রামদাস বললে, ছেলেটিকে একবার দেখবে ওস্তাদ? বড় লোভ জাগলো প্রাণে, দেখি একবার সেই মুখের প্রতিচ্ছবিখানি!

পর মুহূর্ত্তে কে যেন ভেতর থেকে চাবুক মারলো!···না—না—আমার এ অভিশপ্ত সঙ্গ বা পরশ তাকে আর দেবো না! মুখে বললাম, না রামদাস, মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা আর নেই। আমি দূর থেকে তাকে আমার অন্তরের শুভ-কামনা জানাচ্ছি। সেই রাত্রেই এলাহাবাদ ত্যাগ করে পালিয়ে গেলাম।

* * * *

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ললিত রাগিণীর আলাপ সুরু হয়েছে নহবৎখানায়।

কুমার শশিকান্ত'র ব্যথিত বিমুগ্ধ হৃদয়ে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল পণ্ডিতজীর ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনীটি। কোন্ মহাভাব-সাগরে ডুব দিয়েছেন পণ্ডিত সোহনলাল? অলস তন্দ্রাভাবে মুদিত তাঁর ক্লান্ত নয়ন দুটি!

উজ্জ্বল পদ্মরাগমণির মত দু'ফোঁটা অশ্রু জ্বলছিলো তাঁর মুদিত দুটি আঁখির কোণে।

চায়ের সঙ্গে
চমৎকার!
KOLAY
THIN
ARROWROOT
BISCUIT
এরই মধ্যে
জনপ্রিয়তা
লাভ করেছে
কোলে
বিস্কুট
কোলে বিস্কুট কোম্পানী লিঃ
৩৬, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড — কলিকাতা-১
KOLAY
Kb
BISCUITS
বৈশিষ্ট্যের প্রতীক
K/O.P/B.1
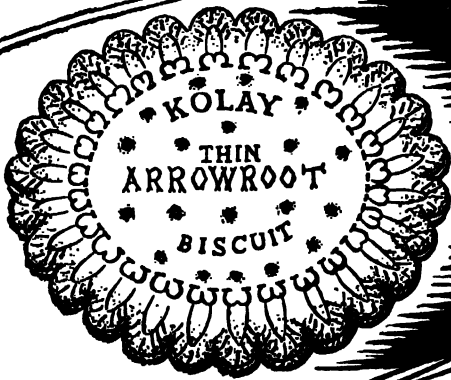
বারীন্দ্রনাথ দাশ

জুলাই পোনেরো

ধূসর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সকাল হোলো। ম্লান রোদ্দুর নামলো তালতলায়, জানালা খুলে গেল এ-বাড়ী ও-বাড়ী। কিন্তু কোনো দোকানের ঝাঁপ খুললো না ফুটপাথের পাশে। ফেরিওলার হাঁক শোনা গেল না রাস্তায়। ট্রাম-বাসের সাড়া এলো না দূরান্ত ধরমতলা থেকে।

গণদেবতার উদাত্ত আহ্বানে থম-থম করছে সারা সহর।

তক্তপোষের উপর বসে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে সকালবেলার প্রথম কাপ চা শেষ করলো অঘোরনাথ। তারপর উঠে পড়ে এগিয়ে গেল দেওয়ালের দিকে। ক্যালেণ্ডার ঝুলছিলো সেখানে। আগের দিনের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলল। দেখা দিলো নতুন তারিখের পাতা—জুলাই পোনেরো।

ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলো অঘোরনাথের বৌ মলিনা। জিজ্ঞেস করলো মুখ টিপে হেসে, "আজ অফিসে যাবে না?"

ঘাড় নাড়লো অঘোরনাথ। "না। আজ হরতাল।"

"যদি চাকরী যায়?" আবার মুখ টিপে হাসলো মলিনা।

"গেলে যাবে।"

"চাকরী গেলে আমায় খাওয়াবে কি?" মলিনা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো।

"চাকরী করেই বা তোমায় কি খাওয়াতে পারছি বলো।" অঘোরনাথ বলল।

হাসতে গিয়ে মলিনার চোখ দুটো জলে চিক-চিক করে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে লাগলো সে।

একটি আধপোড়া সিগারেট ধরিয়ে অঘোরনাথ বলল, "চাকরী যাওয়ার ভয় দু'বছর আগে করতাম। এখন আর করি না। যে ভাবে পাইকারী হারে ছাঁটাই চলছে তাতে কি আর এত ভয়ে ভয়ে থাকলে চলে? সমুদ্রে যার শয্যা তার আবার শিশিরে ভয়!"

"নাও, নাও, আর বক্তৃতা দিতে হবে না। আরেক কাপ চা খাবে নাকি বলো।"—বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মলিনা। তারপর চা তৈরী করতে করতে নিজের মনে খুব হেসে নিলো খানিকটা। মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণী অঘোরনাথের মুখে এ সব বুলি খুবই নতুন। এই তো সেদিনও যখন কি একটা ব্যাপারে হরতাল হয়েছিলো, অফিস যাওয়ার জন্যে রাস্তার মোড়ে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলো সে। তারপর অফিসের ব্যাপক ছাঁটাই দেখে, বেকার বন্ধুর বাড়ি অনশন দেখে, আর সেদিন ডেলহাউসি অঞ্চলে পুলিশের হাতে স্কুলের ছাত্রদের মারধোর খাওয়া দেখে তার মন বদলে গেছে এরই মধ্যেই।

অঘোরনাথকে চা দিয়ে ফিরে আসতে দেখে গায়ে শার্ট চড়িয়ে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করছে তার তেরো বছরের ছেলেটি।

"কোথায় যাচ্ছিস রে নন্তু?"

"রন্টুদের বাড়ি। রন্টুর সঙ্গে বেরুবো একবার। একটু ঘুরে দেখে আসি চারদিকের কি ব্যাপার-স্যাপার।"

"কোনো গোলমালের মধ্যে যাস্‌নে যেন।"

বেরিয়ে গেল নন্তু।

* * * *

রন্টুদের বাড়ি অঘোরনাথের বাড়ির পাশেই। এ-বাড়ির রান্নাঘর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় ও-বাড়ির শোয়ার ঘর। চাল বাছতে বাছতে মলিনা দেখলো রন্টুর বাবা চন্দ্রশেখর বাবু একটি তোরঙ্গ থেকে বহু ঘেঁটেঘুঁটে বার করলেন একটি পরিষ্কার কিন্তু পুরোনো শার্ট। শাদার উপর গাঢ় সবুজের বড়ো বড়ো চেক। দেখেই চেনা যায় খদ্দর বলে। এককালে খুব দেখা যেতো অনেকের গায়ে। সেটি গায়ে চড়ালেন চন্দ্রশেখর বাবু। কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে চন্দ্রশেখর বাবুর স্ত্রী জ্যোতির্ময়ী।

"কী দেখছো?" মলিনার পাশে এসে দাঁড়ালো অঘোরনাথ।

শার্টটি জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে।

"ভদ্রলোক পরিষ্কার শার্ট পরে আবার চললেন কোথায়?" অঘোরনাথ বলল। "চিরকাল তো নোংরা জামা-কাপড়েই দেখেছি। পাগলের খেয়াল!"

মলিনা চোখ তুলে তাকালো অঘোরনাথের দিকে। ও-বাড়ির খবর এ-বাড়ির জানা ছিলো কিছু কিছু। চন্দ্রশেখর বাবু একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। জ্যোতির্ময়ীই কোন একটি মেয়ে-স্কুলে মাষ্টারী করে সংসার চালান। দুই ছেলে। বড়ো ছেলে মণ্টু কলেজে পড়ে। ছোটো ছেলে রন্টু পড়ে স্কুলে, ক্লাস নাইনে, মলিনার ছেলে নন্তুর সঙ্গে।

"ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনেছো কোনো দিন?"—অঘোরনাথ বলল, "বেশ মজার মজার কথা বলেন সব সময়। সাইকলজিতে যাকে বলে স্প্লিট পার্সন্যালিটি, সেটাই হোলো ভদ্রলোকের মনের ব্যাধি। ওঁর নিজের আসল পরিচয় তিনি ভুলে গেছেন। কখনো নিজেকে ভাবেন লেনিন, কখনো ভাবেন গৌতম বুদ্ধ, কখনো কার্ল মার্কস। যাকে সামনে পান তাকেই ধরে বক্তৃতা, দুনিয়াটাকে কি ভাবে ভেঙে গড়বেন তারই ব্যাখ্যা। তাঁকে নিয়ে মাঝে মাঝে এমন মজা করে পাড়ার ছেলেরা!"—বলে হাসলো একচোট।

মলিনা হাসলো না। খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "ভদ্রলোক কেন পাগল হয়েছেন জানো?"

"সে কি করে জানবো?"

"কাল গেছলাম ওদের বাড়ি। জ্যোতিদি'র কাছে শুনলাম। খুব কম লোকেই জানে ব্যাপারটা। যারা জানতো অনেকেই ভুলে গেছে।"

"যাক গে। একজন পাগল কেন পাগল হোলো সে জেনে আমার কি লাভ?"

"জানলে আর হাসাহাসি করবে না ওঁকে নিয়ে," মলিনা বলল, "ভদ্রলোক এককালে ছিলেন কংগ্রেসের খুব বড়ো কর্মী। টেগার্ট সাহেবের আমলে টেরারিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সন্দেহ করে তাঁকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ ছিলো না যদিও, তবু কথা বার করবার জন্যে তাঁর উপর এমন মারধোর করা হয় যে তিনি পাগল হয়ে যান সেই থেকে।"

* * * *

দশটা প্রায় বেজে এলো। ঘরে মন টিকলো না অঘোরনাথের। গায়ে পাঞ্জাবী চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো। এসে দাঁড়ালো বড়ো রাস্তার উপর।

বেশ ভীড় দু'পাশের ফুটপাথে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ বসেছে। ট্রাম বার করেছে কর্তৃপক্ষ। অনেকক্ষণ পর পর খুব দ্রুত ছুটে যাচ্ছে আরোহীবিহীন ফাঁকা ট্রাম। কখনো বা দু'-একটি ষ্টেট-বাস। তাও একেবারে ফাঁকা। দোকানপাট সব বন্ধ। পথের পাশের গাছে গাছে কাকের কলরব ছাপিয়ে উঠেছে জনতার সানন্দ কোলাহল। মাঝে মাঝে ফ্ল্যাগ-আঁটা সাইকেলেবা মোটর-বাইকে চেপে টহল দিয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। কিছুই বলতে হচ্ছে না কাউকে। শান্তির আবেদন জানাতে হচ্ছে না একটি বারও। জনতা শান্তি বজায় রেখেছে নিজের থেকেই। হরতাল সফল করবার জন্যে আবেদন জানাতে দল বেঁধে বেরিয়েছিলো যে-সব কর্মীরা, তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জটলা পাকাচ্ছে পাড়ার ছেলেরা। লোকের ভীড়ে ভীড়ে আলোচনা হচ্ছে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির।

তেমনি একটি আলোচনায় যোগ দিয়েছিলো অঘোরনাথ। সব পাড়ারই লোক, সবাই চেনা। কি যেন তাদের বলছিলো অঘোরনাথ, কিন্তু হঠাৎ আলোচনা থেমে গেল। অঘোরনাথ মুখ ফিরিয়ে দেখলো একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চন্দ্রশেখর বাবু। গায়ে সেই ছেঁড়া খদ্দরের শার্ট। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চুল এলোমেলো।

একটু হাসি খেলে গেল অঘোরনাথের মুখে। পাগলটি আজ আবার কি ভাবছে নিজেকে—চেঙ্গিস্ খাঁন না গৌতম বুদ্ধ? হেসে কি যেন বলতে গেল অঘোরনাথ, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল মলিনার কথাগুলো মনে পড়তে! টেগার্ট সায়েবের আমলে মারধোর খেয়ে পাগল হয়ে গেছে এ লোকটি?

কিন্তু অন্য অনেকেই জানতো না চন্দ্রশেখর বাবুর ইতিহাস। তাই অন্যান্য দিনের মতো আজো হাসিতে মুখ ভরিয়ে দু'-এক জন জিজ্ঞেস করলো, "কী খবর চন্দ্রশেখর বাবু, দুনিয়াটা কি হতে চলেছে? দেশের কি অবস্থা হবে বলতে পারেন?"

অন্যান্য দিন এ কথাগুলো ছিলো চন্দ্রশেখর বাবুকে দিয়ে একটি ছোটখাটো বক্তৃতা দেওয়ানোর সিগন্যাল। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠতো বক্তৃতার প্লাবন। "কাকে কি জিজ্ঞেস করছেন?"—সুরু করলেন চন্দ্রশেখর বাবু, "আমায় চেনেন না আপনারা? আমি কার্ল মার্কস্। আমার ক্যাপিটাল বইটি পড়েননি? ওতে তো আমি বলেই দিয়েছি—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ কিন্তু কোনো সাড়া এলো না তাঁর কাছ থেকে। কারো দিকে তাকালেনই না। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আরো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলো।

চন্দ্রশেখর বাবুর স্তব্ধতা সবাইকে বিস্মিত করলো। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামালো না কেউ। ভীড়ের মধ্যে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা হোলো। চন্দ্রশেখর বাবু আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিলেন সেখান থেকে। পেছন থেকে একজন ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি যে আজ কোনো কথা না বলে চলে যাচ্ছেন? হোলো কি আপনার?"

ফিরে দাঁড়ালেন চন্দ্রশেখর বাবু। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কে?"

"আপনি?" দাঁত বার করে হাসলেন পাড়ার বুড়ো জনার্দন বাবু, "বলুন না আপনি কে?"

"মনে পড়ছে না," চন্দ্রশেখর বাবু বললেন, "অনেকক্ষণ ধরে ভাববার চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে আসছে না কিছুতেই। এই হরতাল, এই পুলিশ, এই আন্দোলন,—এ সব আগেও কোথায় যেন দেখেছি। আমিও যেন ছিলাম তার মধ্যে। কিন্তু আমি কে, সে কথা মনে পড়ছে না বলে কোথায় এ সব দেখেছি তাও মনে পড়ছে না। আপনারা কেউ বলতে পারেন আমি কে?"

দু'-এক জন বুড়োর মুখে হাসি খেলে গেল। কিন্তু কমবয়েসী যারা তাদের মুখে হাসি এলো না। চোখের দৃষ্টি তাদের কোমল হয়ে এলো। অঘোরনাথ আস্তে আস্তে বলল, "চলুন, বাড়ি যাই।"

ঘাড় নাড়লেন চন্দ্রশেখর বাবু, "না, পুলিশে আর মানুষে যখন সংঘর্ষ বেধেছে আমি তো তখন বাড়ি বসে থাকিনি। কিন্তু আমি কি করেছি তখন? সে কথাই যে কিছুতে মনে পড়ছে না।" হাসলেন একটু। "আপনারা জানেন না। এই রাস্তার পাথরগুলো জানে। ওই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গাছপালা ঘাসগুলো জানে। ওরা যদি কথা বলতে পারতো, আমায় এত ভেবে মরতে হোতো না।"

* * * *

"আজ ক'দিন ধরে ওঁর কি যেন হয়েছে।"—দুপুর বেলা জ্যোতির্ময়ী বলছিলেন মলিনাকে। রন্টু আর নন্তু খেতে এসেছিলো অনেক বেলায়। খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের আটকে রাখা যায়নি কিছুতেই। আবার বেরিয়ে গেল। নিজেদের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে এ-বাড়িতে এসে মলিনা শুনলো যে চন্দ্রশেখর বাবু সেই যে সকালে বেরিয়েছেন, ফেরেননি তখনো।

মলিনা বলল, "উনি বলছিলেন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বড় রাস্তার উপর। উনি বাড়ি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চন্দ্রশেখর বাবু এলেন না কিছুতেই। কোনো কথা না শুনে অন্য দিকে হেঁটে চলে গেলেন। এতক্ষণেও এলেন না, সত্যি ভাবনার কথা।"

হাসলেন জ্যোতির্ময়ী। বললেন, "আমি আর ভাবি না, ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি বহু দিন। আমার এই সংসারে কারোই কোনো দিন আসা-যাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই। এককালে উনি যখন কংগ্রেসের

কাজ করতেন তখন যে রকম, আজ পাগল হয়েও ঠিক সে রকমই। বড়ো ছেলেটিও পার্টির কাজ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত। ছোটো ছেলেটিও এখন একটু একটু করে এ সবের মধ্যে ভিড়তে শুরু করেছে। এ রকম হবেই। এ আটকানো যাবে না। ইতিহাসের নিয়ম। তাই ভাবি না। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। ওঁকে তো জানো। এত কথা বলতেন সব সময়ে। আজ ক'দিন হোলো একেবারে চুপচাপ। সেদিন বিকেল বেলা ঘুরতে ঘুরতে ডেলহাউসির দিকে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখলেন কচি কচি ছেলেদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ। তারপর বাড়ি ফিরে দেখেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রন্টু শুয়ে আছে। সেও ছিলো সেই ছাত্রদের প্রসেশানে। ব্যস, সেই যে গুম মেরে গেলেন, আর মুখে কথা নেই। পাগল মানুষ, পাগলামি আরো না বাড়ে, সেই আমার ভাবনা হয়েছে এখন।"

মলিনা বলল, "ছেলেটাকে আজ আবার বেরুতে দিলেন কেন? আমার ছেলেটাকেও যে আটকে রাখতে পারলাম না। এত বন্ধুত্ব ওদের মধ্যে। রন্টু যা ডানপিটে ছেলে। আবার যদি কোথাও পুলিশের হাতে মারধোর খায়?"

"পুলিশের হাতে মার খাওয়াটা আমার সংসারে নতুন নয় মলিনা," বললেন জ্যোতির্ময়ী, "আমার বাবা জেলে ছিলেন বহু দিন, আমার স্বামী তো পাগলই হয়ে গেলেন টেগার্ট সাহেবের আমলে পুলিশের হাতে মার খেয়ে। ওঁর কি অবস্থা হয়েছিলো, তা' যদি দেখতে।"

একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমি শুধু ভাবছি, ওঁর কি হোলো। এত গুম হয়ে গেলেন কেন? কি যেন ভাবছেন সব সময়।"

"এ সব দেখে আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে বোধ হয়," মলিনা বলল।

একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জ্যোতির্ময়ী বললেন, "না, সে হবার নয়। আগের দিনগুলো তাঁর একটুও মনে নেই। সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে।"

সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ। উঠে এলো বড় ছেলে মন্টু। বলল, "ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে মা, খেতে দাও। বেরুতে হবে এক্ষুনি।"

"সহরে গোলমাল কিছু হয়নি তো?"

"হয়নি? কালীঘাটে হয়েছে, ভবানীপুরে হয়েছে, যাদবপুরে গুলী চলেছে, মারাও গেছে দু'জন। এ রকম একটা আন্দোলন চলছে, গোলমাল হবে না?"

"তোমার বাবাকে দেখেছো মন্টু?"—মলিনা জিজ্ঞেস করলো।

"উনি তো আমার সঙ্গেই ফিরলেন। পথে দেখা হতে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। নিচের ঘরে বসে আছেন এখন। ওঁকে আজ আর বেরুতে দিও না মা। কোথায় কখন কি হয় বলা যায় না।"

* * * *

মঞ্জুর হাতঘড়িতে তিনটে।

"আমি উঠি এবার," মন্টু বলল। "অনেক কাজ আছে। একবার পার্টি অফিসে যেতে হবে। ময়দানের মিটিংএ যাওয়া-হবে না'! অন্য কাজ পড়েছে আমার উপর। সন্ধ্যে বেলা একবার বাড়ি হয়ে আবার বেরুতে হবে। রাত্তিরে ফিরতে পারবো না। তোমার এখানে আসবার সময় পাবো ভাবিনি। পথে পড়লো বলে টুক করে দেখা করে গেলাম। অমিতাকে বোলো আজ সন্ধ্যায় ওর ওখানে যেতে পারলাম না বলে খুব দুঃখিত। কাল-পরশু একদিন গিয়ে দেখা করে আসবো ওর সঙ্গে।"

এক নিঃশ্বাসে বলে গেল মন্টু। মঞ্জু চুপচাপ শুনলো। অমিতা আর মঞ্জু অনেক দিনের বন্ধু। অমিতার বিয়ে হচ্ছে মন্টুর বন্ধু প্রভাসের সঙ্গে। আজ পাকা দেখা। বছর খানেক আগেকার কথা মনে পড়লো মঞ্জুর। চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিলো মঞ্জু আর অমিতা। সেদিন গিয়েছিলো মন্টু আর প্রভাসও। সেখানে প্রথম আলাপ হোলো এ-দু'জনের সঙ্গে ও-দু'জনের। তারপর একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, সময় কাটানো, আর স্বপ্ন দেখা।—তাই অমিতা বলেছিলো পাকা দেখার দিন মঞ্জু আর মন্টুর আসা চাই-ই। কিন্তু কর্তব্যের ডাক মন্টুকে টেনে নিচ্ছে অন্য দিকে।

"অমিতা খুব রাগ করবে আমার উপর, না?" মন্টু জিজ্ঞেস করলো।

"রাগ আমি করতে দেবো কেন," বলল মঞ্জু।

মন্টু উঠে পড়লো। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। বলল, "মঞ্জু, একটা কথা বলব ভাবছিলাম। আমার রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শ আমাকে হয়তো অবাঞ্ছনীয় করে তুলছে তোমার গুরুজনদের কাছে। সুতরাং আমি যদি তোমার কাছ থেকে সরে যাই, তা'তে যদি তাঁরা খুসি হন, তা'হলে—"

মঞ্জু হাসলো একটুখানি। বলল, "যে পথ তুমি বেছে নিয়েছো, তা'তে যে আমার সমর্থন আছে, এটুকু কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?"

হাসিমুখে চুপ করে রইলো মন্টু। তারপর বলল, "আচ্ছা, আজ আসি।"

"সময় পেলেই এসো কিন্তু," মঞ্জু বলল।

* * * *

মেট্রোপলিটান বিল্ডিংএর ঘড়িতে চারটে বাজতে মিনিট পনেরো বাকি। দূরে মনুমেন্টের নীচে ভীড় জমে উঠেছে এরই মধ্যে। রাস্তাটা পেরুনোর জন্যে রন্টু আর নন্তু ফুটপাথ ছেড়ে পথে নামলো। আষাঢ় অপরাহ্নের স্নিগ্ধ রোদ্দুর এসে পড়লো তাদের মুখে।

নন্তু শেষ বারের মতো বলল, "মিটিংএ আজ না গেলে নয়?"

"তোর যদি ভয় করে তো তুই বাড়ি চলে যা," বলল রন্টু।

"না, ভয় নয়, তুই যেখানে যাবি সেখানে আমিও যেতে পারি।"

"আমার জন্যে?" রন্টু বলল, "তা হলে তোকে আসতে হবে না। যারা খেতে পাচ্ছে না, কাজ পাচ্ছে না, তোর আমার মতো হাজার হাজার ছেলে যারা পড়াশুনো করতে পারছে না, তাদের জন্যে যদি মিটিংএ এসে আমাদের দল ভারি করতে চাস তো আয়। তা নইলে বাড়ি চলে যা।"

নন্তু এগিয়ে চলল রন্টুর পাশে পাশে। কিছুক্ষণ পরে বলল, "আর কিছু নয়, শুধু মা বলছিলেন গোলমালের-মধ্যে না যেতে। আজ ভাবগতিক যা' দেখছি—"

রন্টু একগাল হাসলো। বলল, "ভাখ, আজ এ সব যা দেখছিস এ এমন এক ধরণের গোলমাল যা বাইরে এসে তার মুখোমুখি না দাঁড়ালে সে তোর বাড়ি খুঁজে বাড়ির ভিতর গিয়ে তোর ঘাড়ে নিজের থেকেই চেপে বসবে। আর এ সব কি দেখছিস, সামনে যা আসছে, তার তুলনায় এ সব তো ছেলেখেলা।"

ফুটপাথ ছেড়ে সবুজ ঘাসের উপর পা বাড়ালো ওরা দু'জন—আশেপাশের অগুণতি আরো অনেকের মতো।

* * * *

সন্ধ্যে হয়নি তখনো। সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম করে উঠে এলো মণ্টু।

"মা, মা, কি এনেছি দেখ।" বেরিয়ে এলেন জ্যোতির্ময়ী।

"ফেরার পথে দেখলাম বাজার বসেছে শেয়ালদা'য়। একজন মাছ বেচছে। এই ইলিশ মাছটি নিয়ে এলাম। আমি বেরুবো সাতটায়। আমায় চট করে দু'-এক টুকরো ভেজে দিতে পারবে? আঃ, কী অদ্ভুত সাকসেসফুল হয়েছে আজকের হরতাল। আমি বাত্রিরে ফিরবো না। পার্টির কাজে নানা জায়গায় ঘুরতে হবে আজ সারা রাত। ফিরবো কাল দুপুরে। সরষে বাঁটা দিয়ে রেঁধে রেখো, কেমন? কাল এসে খাবো। চৌবাচ্চায় জল আছে তো? দেখি, চানটা সেরে নি চট করে।"

কাপড় ছেড়ে সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়ালো মণ্টু।

"এ কি, বাবা বেরুচ্ছেন কোথায়? বাবা, তুমি আজ আর নাই বা বেরুলে। মা, বাবাকে বলো না। বাবা! বাবা!

কারো কথা কানে ঢুকলো না চন্দ্রশেখর বাবুর। চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। গায়ে সেই দু'-এক জায়গায় ছিঁড়ে-যাওয়া সবুজ চেক খদ্দরের পুরোনো শার্ট। বহু পুরোনো শার্ট সেটি। তুলে রাখা ছিলো কি একটা কারণে। আজ সেটাই বার করে পরেছেন কি জানি কেন।

* * * *

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। অন্ধকার নেমেছে পথের দু'পাশে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলটা থমথম করছে রাস্তার বাতিগুলোর মিনমিনে আলোয়। পথে লোকজন আছে যদিও, তবু ফুটপাথের উপর তাদের ছায়াগুলো বড়ো বেশী চঞ্চল, বড়ো বেশী দ্রুত।

একটি জনতাময় শোভাযাত্রার দূরাগত শ্লোগান ধ্বনি শোনা গেল। সেটি জোরালো হয়ে এগিয়ে এলো ক্রমশঃ। একটি সুশৃঙ্খল জনতার ঢেউ ধরমতলা থেকে মোড় ফিরে এসে ঢুকলো ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন চন্দ্রশেখর বাবু। অবচেতন মনের রুদ্ধ কপাটে শোনা গেল অস্পষ্ট স্মৃতির উদ্দাম করাঘাত। শিরায় শিরায় রক্তের গতি তীব্র হয়ে উঠলো। কবে? কোথায়? কখন তিনি দেখছিলেন ঠিক এমনিতরো গণদেবতার দুর্বার অভিযান, তাতে অংশ নিয়েছিলেন নিজেই। মনে পড়তে পড়তেও মনে পড়ছে না কিছুতেই। ভাবতে ভাবতে ফুলে উঠলো কপালের শিরাগুলো, আগুন জ্বলে উঠলো মনের ভিতরে।

জনতা এগিয়ে এলো, তাদের পুরোভাগ প্রদেশ কংগ্রেসের পুরোনো আফিস ঘরটির সামনে। হঠাৎ তীব্র বিস্ফোরণের আওয়াজ যেন গুঁড়িয়ে দিলো চন্দ্রশেখর বাবুর বিস্মৃতির তালা আঁটা মনের দরজাটি, আর ইট-পাটকেল সোডার বোতলের বর্ষণ নামলো চারদিকে। দুমদাম করে টিয়ার শেল ফাটার আওয়াজ হোলো। আর লাঠি হাতে পুলিশ তেড়ে গেল জনতার দিকে। দু'পা এগিয়ে গেলেন চন্দ্রশেখর বাবু। আশেপাশে ত্রস্ত জনতার ছোটাছুটি। কিন্তু দু'হাতে চোখ রগড়াচ্ছে ও কে?—"রণ্টু!" চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রশেখর বাবু, আর পর-মুহূর্তেই একটি তীব্র লাঠির আঘাত এসে পড়লো মাথায়, তারপর আরো কয়েকটা, তারপর আরো অনেক। পাশেই ছিলো আধো-ভরাট ডাষ্টবিন। তারই মধ্যে পড়ে গেলেন চন্দ্রশেখর বাবু।

* * * *

ভীড়ের ধাক্কায় রণ্টুর কাছ থেকে ছিটকে পড়েছিলো নন্তু। কোনো রকমে সামলে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। কোথায় গেল রণ্ট? একটু পরেই দেখতে পেলো তাকে। পুলিশের লাঠি পড়ছে তার উপর।

"রণ্টু!"

ছুটে যেতে গিয়ে নন্তু বাধা পেলো। দেখলো একটি লোক তার হাত ধরে টানছে। সে বল্ল, "ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? পালাও এখান থেকে। এক্ষুনি পুলিশের হাতে পড়বে।"

কোনো উত্তর না দিয়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো নন্তু, তার পর এগুলো এক পা। ততক্ষণ পুলিশ এক হ্যাঁচকা টানে রণ্টুকে তুলে ফেলেছে ভ্যানের ভিতর। ভ্যান ছেড়ে দিলো সঙ্গে সঙ্গে। বহু কণ্ঠের চাপা শ্লোগান ভেসে এলো ভ্যানের ভিতর থেকে।

পুলিশ তেড়ে আসছে এদিকে। নন্তু দৌড় দিলো ওয়েলেসলির দিকে।

* * * *

চন্দ্রশেখর বাবু চোখ খুলে যখন উঠে বসলেন তখন দেওয়ালের ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। "কোথায় এলাম আমি?" মাথাটা অত্যন্ত হাল্কা মনে হচ্ছে, যদিও বেশ ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। তাকিয়ে দেখলেন। অপরিচিত মুখ দু'-তিনটে।

"চিন্তিত হবেন না," একটি মেয়ে বল্ল, "খুব বেশী আঘাত লাগেনি আপনার। আমরা একটু পরেই আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ায় ব্যবস্থা করবো।"

"আমি এখানে কি করে এলাম?"

গাড়িতে চেপে এরা কয় জনা যাচ্ছিলো ওয়েলেসলির দিকে। হঠাৎ আটকে যায় গোলমালের মধ্যে। যেখানে গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো তারই কাছে একটি ডাষ্টবিনের মধ্যে এঁকে পড়ে যেতে দেখে দু'জন নেমে গিয়ে তাঁকে তুলে আনে। তার পর গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য দিক দিয়ে চলে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যায়নি অন্য গোলমাল হতে

পায়ে বলে। বাড়িতে ডাক্তার ডেকে ড্রেসিং করিয়ে দিয়েছেন। আঘাত কিছু গুরুতর নয়। জ্ঞান হারিয়েছিলেন শক্ পেয়ে।

"পুলিশ আমায় মারছিলো, না?" বললেন চন্দ্রশেখর বাবু, "টেগার্ট সাহেবের অত্যাচার তো অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

টেগার্ট সায়েব? এরা এর-ওর মুখের দিকে তাকালো।

"সার জন এণ্ডারসন দার্জিলিং থেকে ফেরার কথা ছিলো, ফিরেছে?"

"সার জন এণ্ডারসন? এরা ভাবলো লোকটার মাথা খারাপ না কি? না মার খেয়ে মাথা খারাপ হোলো?"

"আপনি কবেকার কথা বলছেন?" মেয়েটি বলল, "ওঁরা তো এখন আর নেই। ও-সব বছর পোনেরো আগেকার কথা।"

"বছর পোনেরো? আরে আজ সকালেই তো টেগার্ট সায়েব আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করলো—"

লোকটা কি রিপ ভ্যান উইনকল নাকি, ভাবলো সবাই।

হঠাৎ কি মনে হোলো মেয়েটির। টেগার্ট সায়েবের আমলে পুলিশের হাতে মার খেয়ে পাগল হয়ে যাওয়ার একটা কাহিনী তার জানা ছিলো।

"আপনি কোথায় থাকেন বলুন তো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

ঠিকানা বললেন চন্দ্রশেখর বাবু। বললেন বেশ সুস্থ, প্রকৃতিস্থ মানুষের মতো।

"ও! আপনি মণ্টুর বাবা? আমার তাই যেন মনে হচ্ছিলো।"

"তুমি চেন নাকি মণ্টুকে? তুমি কে, চিনলুম না তো!"

"আমায় আপনি চিনবেন না। আমার নাম মঞ্জু।"

* * * *

"তুমি বড্ডো দেরী করে ফেললে, মা," মণ্টু বলল, "আমার সাতটায় বেরিয়ে পড়ার কথা, এখন আটটা প্রায় বাজে।"

"দাঁড়া না বাবা, তুই ইলিসের ঝোল খেতে ভালোবাসিস, তাই করে ফেললাম চট করে। নে, আসনটা পেতে বোস," বললেন জ্যোতির্ময়ী।

মুখ ভার করে বসে পড়লো মণ্টু। রাত ন'টায় ইউনিয়ানের মিটিং আছে। যেতে হবে সেই সালখে। এতো দেরী করিয়ে দিলো।

ছেলেকে খেতে দিয়ে একবার বাইরের ঘরে এলেন তিনি।

"মাসীমা!"

হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে এসে ঢুকলো নন্তু। ওর মুখ দেখে হঠাৎ দুরু দুরু করে উঠলো জ্যোতির্ময়ীর বুক, ও একা! তারপর সামলে নিলেন হঠাৎ। নন্তুও তো ছেলেমানুষ। ওর কাছে দুর্বলতা দেখালে সেও তো দুর্বল হয়ে পড়বে। জোর করে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে রে!"

"রণ্টুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।"

"ও, এই।" খুব সহজ হবার চেষ্টা করলেন জ্যোতির্ময়ী, "তাইতেই তোর মুখ এ রকম শুকিয়ে গেছে? আমি ভাবলুম বুঝি বা অন্য কিছু। যা, গামছাটা নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে দিকি। মুখ তো শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। শোন, মণ্টুকে কিছু বলিস না। ও বেরুচ্ছে। বেরুনোর মুখে শুনলে মন খারাপ করে ওর।"

"কিন্তু রণ্টুর কি হবে?"

"সে যা হোক হবে'খন। ও তো একা যায়নি। অনেকেই গেছে। কাল যে করে হোক খবর নেবো'খন। যা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।"

রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন মণ্টুর খাওয়া হয়ে গেছে। বললেন, "সে কি, এরই মধ্যে উঠে পড়লি যে, ভাত দিই আর দুটো?"

উঠে পড়লো মণ্টু। আঁচিয়ে নিয়ে বেরুনোর মুখে বলল, "রণ্টুটা এখনো ফিরলো না কেন? রাত হোলো যে।"

"কে জানে কোথায় বসে গল্প করছে। এসে পড়বে'খন একটু পরে," বললেন জ্যোতির্ময়ী।

মণ্টু কাবলীর ভেতর পা' ঢুকিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

আর একটু পরেই একটি গাড়ি এসে দাঁড়ালো দোড়-গোড়ায়।

"কি দেখছো, জ্যোতি," হেসে বললে চন্দ্রশেখর বাবু, "মাথায় একটু চোট লেগেছে, এমন কিছু নয়।"

কথা শুনে অবাক হলেন জ্যোতির্ময়ী, ওঁর কথাগুলো যে অবিশ্বাস্য রকম স্বাভাবিক। কিন্তু···

এক পাশে ডেকে নিয়ে মঞ্জু ব্যাপারটা খুলে বলল জ্যোতির্ময়ীকে। এতক্ষণ পরে প্রথম জলে টলটল করে উঠলো জ্যোতির্ময়ীর চোখ দুটো।

"আচ্ছা, রণ্টু···" বলতে সুরু করলেন চন্দ্রশেখর বাবু।

"রণ্টুর জন্যে ভেবো না। ও এসে পড়বে একটু পরে। তুমি শুয়ে পড়ো।"

"কিন্তু আমি যে ওয়েলিংটনে রণ্টুকে দেখলাম।"

"ও নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছে সেখান থেকে," বললেন জ্যোতির্ময়ী।

মঞ্জুরা চলে গেল। চন্দ্রশেখর বাবুকে শুইয়ে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী নন্তুকে নিয়ে এসে বসালেন রান্নাঘরে। বললেন, "আজ এখানেই মাছ ভাত দুটো খেয়ে নে। আমি তোর মাকে খবর পাঠাচ্ছি যে তুই এখানে খাচ্ছিস।"

ভাতের থালা বেড়ে দিলেন নন্তুর সামনে। রণ্টুর জন্যে রাখা মাছ সবই তুলে দিলেন নন্তুর পাতে, রণ্টুর মতো নন্তুও বড়ো ভালোবাসে সরষেবাটা দিয়ে রাঁধা ইলিশ মাছ। দেখলেন মাছ মুখে তুলতে গিয়ে একবার থেমে গেল নন্তু, আনমনা হয়ে গেল একটুখানি। চোখের জল চোখে চেপে মুখ টিপে হেসে জোতির্ময়ী বললেন, "বন্ধুর কথা ভাবছিস বুঝি।" নন্তু কিছু বলল না। "তুই কি গাধা রে! পুলিশে ধরে নিয়ে গেলে কেউ এত ভাবে? ওর জন্যে ভাবিস না। ওকে কালই ছেড়ে দেবে ওরা।"

নন্তু খেতে লাগলো চুপচাপ। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকালেন জ্যোতির্ময়ী। বাইরের আকাশে এক ঝাঁক তারা ঝিলমিল করছে। অনেক দিন আগেকার কথা মনে পড়লো। রণ্টু যখন খুব ছোটো, সে বলতো, "জানো মা, আমি আগে তারা ছিলুম। ওদের মধ্যে থেকে খসে টুপ করে তোমার কোলে এসে পড়েছি," বলে একটি ঝলমলে তারা দেখিয়ে দিলো।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন জ্যোতির্ময়ী। ঝলমলে তারাটি দপ দপ করে জ্বলছে আকাশের বুকে। আস্তে আস্তে ভেসে এলো এক টুকরো মেঘ, ঢেকে দিলো তারাটি, তারপর আবার ভেসে চলে গেল। ঝলমল করতে লাগলো তারাটি অন্যান্য তারাগুলোর মাঝখানে, ঠিক জোতির্ময়ীর চোখ দুটোর মতো।
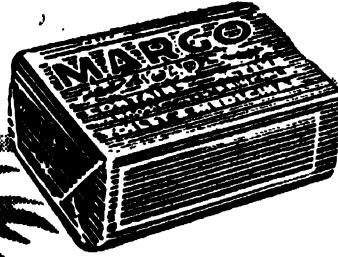
MARGO
BHRINGOL
MAHA BHRINGARAJ OIL
CHEMICAL
Tuhina
রূপরচনায় ক্যালকেমিকোর কয়েকটী অনুপম প্রসাধনী
মার্গো সোপ —ক্লোরোফিলসহ নিমের সুগন্ধি প্রসাধন সাবান ব্যবহারে দেহ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়।
ভৃঙ্গল —সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল। নিয়মিত ব্যবহারে কেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়; মাথা ঠাণ্ডা রাখে।
রেণুকা —পুষ্প সুরভিময় রূপ চূর্ণ। ব্যবহারে মুখশ্রী ও দেহশ্রী লাবণ্যময় হয়।
তুহিনা —প্রাকৃতিক রুক্ষতা হইতে গাত্র-চর্ম্মকে রক্ষা করিয়া কোমল ও মসৃণ রাখে।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

শম্বুক

কালকের দিনের ছায়া—আজকের দিনের আলোয়—রেখায় রেখায় রেখে চলেছেন—সুধী ঐতিহাসিকেরা বহু আয়াসে। জগতে অগণিত ইতিহাসের সৃষ্টি প্রতি পলকে। তাই এত আয়াসেও বহু ইতিহাসই রয়ে গেল অলিখিত। এ কাহিনী সেই অলিখিতেরই এক ছিটে।

রাজা লোভাদিত্যের ব্যসনে উত্যক্ত হ'য়ে রাজাকে নির্ব্বাসন দিয়ে দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। কৌশলী উৎসাহীরা শাসনভার গ্রহণ করলেন সুকৌশলে। দেশবাসী শুনে পরিতৃপ্ত হলো—রাজা-বিহীন দেশে অন্ত্যজ, উচ্চ, ও প্রজা শব্দ অবান্তর। আজ হ'তে সকল প্রাণীর অধিকারই সমান—এবং জীবন সাধারণ। দেশবাসীর প্রাণে আশ্বাসের নিঃশ্বাস মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠছিল কিন্তু পুষ্পিত হবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হ'লো নিরাশার শুষ্ক বায়ুর আন্দোলনে।

সুচতুর পাচকশ্রেণীর মতই শাসকমণ্ডলী যখন গৃহস্থকে প্রতারণা ক'রে নিজ ও নিজের আশ্রিত পরিজনের পুষ্টিসাধনে মন দিলেন তখন বঞ্চিতেরা শূন্য পাত্রের দিকে নিরুপায়ের দৃষ্টি মেলে অনুভব করলো—এক পাচক বিদায় দিয়ে অপর পাচক নিযুক্ত করলেই যেমন সুখাহারের নিশ্চয়তা মেলে না—তেমনই এক পালন-ব্যবস্থা বিসর্জ্জিত হয়ে অপর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হলেই স্বৈরাচার বা দুরাচারের উপশম হয় না। ক্ষমতা—আসব, স্বৈরাচার—মত্ততা, দুরাচার—ব্যাধি। এক হ'তে অপরের ক্রিয়ার উগ্রতা ক্রমবর্দ্ধমান। এ সত্য যখন উপলব্ধি হ'লো তখন এই কথাটাই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো—পাচক কৌশলী হলেও সুপক্ব পরিমিত আহার পরিবেশনের সদইচ্ছা একান্তই পাচকের সততার উপর নির্ভর করে। এ হ'লো ইতিহাসের বড় দিক্‌কার কথা—হয়ত লেখা হবে বিস্তৃত বিবরণে পাঠশালার পাঠ্য হিসেবে কোন দিন। এ কাহিনীর বিষয়বস্তু সে বড় দিককার বড় কথায় নয়—এ সেই ছোট দিকের স্বল্প ছায়া—যা সহজেই রয়ে যায় ঐতিহাসিকদের নজর এড়িয়ে।

নবনিযুক্ত নগররক্ষী মহামতি রাজারাম দেশপালকের তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের শ্যালক। নগররক্ষীর দায়িত্বের মাপে নব নগররক্ষীর বয়স ও কার্য্যক্ষমতা নগণ্য অনুভব করলেও নগরের সাধারণ রাজারামকে পেয়ে খুসী হ'লো। পূর্ব্বতন নগররক্ষী এবং অপরাপর দেশপ্রধানদের মাপে রাজারামের চক্ষু দুইটি বড় বড়—ছাতির মাপ প্রশস্ত—মুখের রেখাগুলি স্পষ্ট।

বাসুদেব সরকারের বৃত্তিভোগী ধোপা। বাসুদেবের স্বভাব নিরীহ, আচরণ শান্ত—বাসুদেবের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলতে চাইলে আহত সারমেয়ের মত কুঁ কুঁ করে অর্দ্ধ পথেই থেমে আসে। লম্বা লিক্‌লিকে দেহ, ল্যাকপেকে ঠ্যাংএর 'পরে হাঁটতে গেলে। দুলে দুলে সামনে পিছনে ঝুঁকতে থাকে—পেটের দিকে চাইলে মনে হয়—পেটের আস্তরণটুকুর সঙ্গে পিঠের হাড়ের সৌহার্দ্দ্য অবিচ্ছেদ্য! বাসুদেবের সংসার ততোধিক নিরীহ হাড়-জিলজিলে নড়বড়ে গাধা প্যাঙ্গা; ছোট-খাট খড়খড়ে, ছিপ ছিপে দেহ, ঝর্‌ঝরে খোলা মুখ রাধী; আর ধারাল খোলা তলোয়ারের মত ঝক্‌ঝকে তর্‌তরে মেয়ে পার্ব্বতীকে নিয়ে।

সরকারের বাঁধা বৃত্তির সমাজে একটা স্থান আছে—সে হিসেবে বাসুদেবের সমাজে বাসুদেবের স্থান হয়ত ছিল শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু রাধী বলে সে স্থানের সৌধ যে প্রতিপত্তি তার অনেকখানিই বল্মীকে ঢেকেছে তার নিরীহ স্বভাবের গুণে। বাসুদেব সরকারের বিস্তৃত ধোলাইয়ের ভার তুলে নিয়েছে তার কৌশলী হাতে—সে আজ পঁচিশ বছর। এক বছর বাসুদেবের আওতায় কত গাধা এলো, সুপুষ্ট হ'লো। শেষ পর্য্যন্ত প্যাঙ্গা হেন গাধা জুটলো এসে—হয়ত বরাত বদলে। প্যাঙ্গার শক্তি কম, বুদ্ধির অভাব হয়ত তার চেয়েও বেশী, কিন্তু তবু প্যাঙ্গাকে বাসুদেব ভালবাসে প্যাঙ্গার নিরীহ স্বভাবের গুণে। নড়বড়ে চলনে বাসুদেবের হাতের ঠেলা খেতে খেতে ঠুক্ ঠুক্ ক'রে ভোর বেলায় এক রাশ কাপড়ের বোঝা বয়ে নিয়ে যায় প্যাঙ্গা—সামনের পানাপচা পুকুর-ঘাটটায়। গ্রীষ্মের রোদে কট্‌কটে, বর্ষার জলে স্যাঁতসেঁতে পুকুর-ঘাটের ঐ এক ফালি জমিটুকুতে একটা খুঁটোয় বাঁধা হ'য়ে দু-কুটো শুকনো ঘাস চিবোতে চিবোতে আধো-বোঁজা চোখে প্যাঙ্গা ঝিমোয় সারাটা

দিন। সন্ধ্যা নামলে আবার ধোয়া কাপড়ের বোঝা পিঠে—শান্ত পিঙ্গপিঙ্গে ঠ্যাং ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে বাসুদেবের হাতের ঠেলা খেতে খেতে ঘরে ফেরে। এই হয়ে আসছে আজ কত দিন একই নিয়মে। গাধাটার এই নিরুদ্‌বিগ্ন নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপ্রিয়তা ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় খুসী হ'য়ে বাসুদেব গাধাটার নামকরণ করলে প্যাঙ্গা।

শুভাদৃষ্ট যখন আসে তখন বিনা মেঘেও নাকি বারিপাত হয়—প্যাঙ্গার অদৃষ্ট ভিজলো সেদিন বিনা মেঘে। নবাগত নগররক্ষী সেদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে প্যাঙ্গাকে দেখলেন কাপড়ের বোঝা নিয়ে পুকুর-ঘাটে যেতে। পরদিন রাজারাম উষ্ণ হ'য়ে হাঁক ছাড়লেন তরুণ তক্‌মার চক্‌চকানীর মাত্রায় সুর এঁটে। এ দেশে এমন গাধার পিঠে বোঝা চাপাতে সাহস করে কে? তলব লাগাও! সে তলবের ঝন্‌ঝনে ঝঙ্কার শুনে বাসুদেবের বুকের সরু সরু হাড়গুলো হুড়মুড় ক'রে কাঁপতে থাকে। লিক্‌লিকে পা দু'খানা ল্যাকপ্যাক ক'রে লতিয়ে লতিয়ে এসে হাজির হয় বাসুদেব। বাসুদেবকে সামনে পেয়ে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়ে—তক্‌মায় ঘষা পালিশ-করা বুকে একটু যেন জলের ছিটে পড়ে রাজারামের—উঁচু গ্রামে বাঁধা গরম সুরটা ঈষৎ ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। নরম সুরে বলেন—"আহা, ওটা তোমার গাধা? অবলা জীব বলতে জানে না বলেই প্রাপ্য খাদ্য থেকে বঞ্চিত করছ ওকে? ঘাড়ে চাপাচ্ছ দায়িত্ব, যা ওর সাধ্য নয়! এ রাজ্যে ওর পেটেরও যে একটা নিশ্চিত প্রাপ্য আছে, পরিশ্রমের একটা শান্তি আছে সেটা তো ভুললে চলে না। আজকের দেশের নীতিতে বাঁচবার দাবী, আয়েসের দাবী, সকলের সমান। যেমন তুমি, আমি, তেমনই ঐ অবলা গাধা—আমরা ভ্রাতৃত্বের দাবীতে এক পরিবারে বাস করি। কারো পাওনা থেকে বঞ্চিত করে নিজের ডবল পাওনার আশা নিয়ে সাধারণতন্ত্রের আওতায় বাস করা চলে না—সে তো তোমার অজানা নয়। দেশ-প্রধানরা সাধারণতন্ত্রের সমানাধিকারের আদর্শ ও নীতি নিয়ত প্রচার করছেন আ-পাতাল বিমানস্পর্শী বজ্ররবে—যাতে কীটাদি থেকে উড়ন্ত পক্ষী পর্য্যন্ত এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারে।"

বাসুদেব রাজারামের কণ্ঠে সহানুভূতির আভাসে শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় গ'লে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে বহু আয়াসে এক নিশ্বাসে বলে ফেলে—"সে তো যথার্থ কথা প্রভু! তবে গরীবের সামান্য আয়, নিজেরাই পাইনে পুরো পেট—তাই গাধাটার সামান্য ছোলার সংস্থান—সে আর চেষ্টা-সাধ্যেও পেরে উঠিনে। চারটে প্রাণীর আহার—এই দুর্দ্দিনে।"

বাসুদেবের কুঁ-কুঁ স্বর কুক্‌ কুক্‌ ক'রে অর্দ্ধ পথে থেমে আসে। রাজারামের সিক্ত বুক শুকিয়ে আসে নিমেষে! শক্ত মুখ আরক্ত ক'রে বলেন—"তোমাদের মত লোভীর মুখে এমনি ভাষাই, শুনছি নিয়ত! তোমাদের দুঃখ ঘোচবার নয়—নইলে সরকারের বৃত্তি যা পাচ্ছ, সে জনসাধারণের চোখে প্রয়োজনাতিরিক্ত। সরকারের এই দরাজ হাতে বৃত্তি বণ্টনের ফলে বৃত্তিভোগীদের দিকে তাকিয়ে সাধারণের বুকে বিদ্বেষের কালো ধোঁয়া ফুলে উঠছে ক্রমে ক্রমে। সে কথা যাক্‌। তোমার বৃত্তির সঙ্গে তোমার ঐ গাধাটার বৃত্তিও হিসেবে মাপা আছে। ও অবলা, তোমার দিকে চেয়ে দায়িত্ব ও জীবনের বোঝা বয়ে চলেছে। ওর পাওনা থেকে ওকে বঞ্চিত ক'রে সবটুকু নিজের বলেই বুঝে নেবে সে আমি হ'তে দিতে পারিনে—হতে দেব না। যে যার ন্যায্যটুকু যাতে বুঝে পায় সে দিকে নজর রাখবার দায়িত্ব দিয়ে প্রধানরা আমায় নিযুক্ত করেছেন সাধারণের কাজে। কাল থেকে গাধাটাকে ছেড়ে দেবে এই রক্ষী ময়দানে, আর সকাল-সন্ধ্যায় ছোলা দেবে সেরের ওজনে। এ কানুন জেনেই পালন করবে। যে আদেশ করলাম বিদায়ের পরেও স্মরণ রেখো।"

রাজারাম তাঁর পরিপুষ্ট দেহ তুলে, প্রশস্ত বুক প্রশস্ততর ক'রে উঠে দাঁড়ান আসন ছেড়ে। বাসুদেব মন নেতিয়ে ঠ্যাং বাড়িয়ে বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে। বাইরের কালবৈশাখী বলতে থাকে ভন্‌ভনিয়ে—আশ্চর্য্য! এমন উচুঁতে ব'সে এত নীচু পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম নজর! দেখা যায়নি এমন নীতি এর পূর্ব্বকালে! বাসুদেবের চোখ সজল হ'য়ে আসে।

রাজারামের কাজে-কথায় বিবাদ হলো না এ ক্ষেত্রে। সকাল-সন্ধ্যা যাওয়া-আসার পথে গাধাটার প্রতি নজর ফেলতে ভুল হয় না। হ্যাঁ, গাধাটার দ্রুত পরিবর্ত্তন চোখে লাগে! ল্যাজের গুচ্ছটা ভারী হ'য়ে চক্‌চক্‌ করছে! মৃতের মধ্যে জেগেছে বাঁচার লক্ষণ! আত্মপ্রসাদে রাজারামের বুকের রক্তে ঢেউ লেগে স্ফীত হয়ে ওঠে। সাধারণের জীবনের দায়িত্ব—! কর্ত্তব্যপরায়ণতার আনন্দ—! এমনিতর অনেক কথা খেলে যায় মনে।

সেদিন ভোরের আলো ফুটতেই এক বোঝা কাপড় ব'য়ে এনে ঢেলে দেয় বাসুদেবের ঘরের মেঝেয়—নগররক্ষী রাজারামের গৃহভৃত্য প্রনগররক্ষী রামচতুর। একমুখ হাসি ঝলকে বলে—"বড় তাড়া নিয়ে এলাম তাই নিজেই ব'য়ে। প্রভু রাজারামের গৃহ ভরেছে আত্মীয়-পরিজনে, এ পরিচ্ছদ সেই দূরাগত আত্মীয় পরিজনেরই, দিতে হবে আজ সন্ধ্যায়। ধোলাই চাই প্রথম থাকের সে কথা তোমায় বলা অবান্তর তবু বলা রইলো। সময়ের নড়চড় না হয়—সেইটেই প্রভুর বিশেষ হুকুম।" যাবার পথে পা বাড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে করুণার হাসির ছোঁয়াচ দিয়ে বলে রামচতুর—"আজকাল তোমার শরীরগতিক ভাল দেখছিনে মনে হচ্ছে! পেটের চামড়া আর মোটে চোখে পড়ে না যেন।"

বাসুদেবের মুখে নিরুপায়ের মলিন হাসি ফুটে ওঠে, কুঁকুঁ ভাবে বলে—"হুঁ, রাধীও ঝঙ্কার তোলে, কি করি, গাধাটার খরচ বেড়েছে!" লিঙ্গলিঙ্গে ঘাড়ে ধোয়া কাপড়ের ভারী মোট চাপিয়ে বাসুদেব রাজারামের প্রাসাদে পৌছয় সন্ধ্যা নামবার কিছু আগেই। রামচতুর যাচাই ক'রে নেয় এক নম্বরের ধোলাই প্রত্যেকটি গুণে গুণে। কাপড় গুণে দিয়ে নমস্কার জানিয়ে বহু চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় ক'রে সন্ত্রস্ত চোখ তুলে, ধুক্‌ধুকে মৃত নিঃশ্বাস টেনে, ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে বলে ফ্যালে বাসুদেব,—"এমন ধোলাই, প্রভুর দয়ায় প্রসাদ মিলবে না কিছু?"

রামচতুর ঠোঁটে আঙুল চেপে—বিস্ময় ও বিরক্তির সংমিশ্রণে একটা শব্দ তোলে এহিস্‌! "চাক্‌রীর মায়া ঘুচিয়ে দিয়েছিস্‌ নাকি মন থেকে?"

রাজারামের বাগানে নেমে সন্ধ্যার আধো-আলোয় দেখা বিভীষণ বন্ধুর সাথে। বিভীষণের উচ্চতর পদ মিলেছে আজ কদিন হ'লো—একটা ভোজ পাওনা সেই সূত্রে। বাসুদেব এগিয়ে

আসে মনে আহ্লাদ ভ'রে। বিভীষণ পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে যায় এগিয়ে রাজারামের গাড়ীবারান্দার মুখে, ব্রস্ত হাতে ঢেকে নেয় গায়ের চাদরে বাহুর আড়ালে কি একটা চক্‌চকে জিনিষ! বাসুদেবের ভোঁতা চোখ সে চক্‌চকানীর আঘাতে আহত হ'য়ে ঢ'লে পড়ে!

রাজারামের হয়ত প্যাজার খেয়ালটা ঝিমিয়ে আসছিল ক'দিনে—সে দিন কর্ম্মহীন অলসতায় ঝিমন্ত খেয়ালটা আবার চমকে উঠ্‌লো খচখচিয়ে। তাই তো, গাধাটা নেই তো কোথাও ময়দানে? দরবারে ফিরে তলব লাগান বাসুদেবকে—"গাধাটার খবর কি? মলো নাকি অনাহারে?"

বাসুদেব মরিয়া হয়ে উঠেছে। মনে মনে গাধাটার উদ্ধতন সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত নিপাতের প্রার্থনা জানিয়ে কুঁকুঁ স্বরে বলে—"গাধা মরবে আমি বাঁচতে? আমাদের বস্তির ঠাকুরদা বলে—ভগবানের দয়া হ'লে খোঁড়াও পর্ব্বত পার হয়—আজকালের দিনে ভগবানের দয়া কে চেনে? আজকের দিনে ভগবান বলতে লোকে বোঝে আপনাদেরই। আপনাদের দয়ার 'পরেই লোকের মরা-বাঁচা—আপনার চোখের তলায় যে জীব আশ্রয় পেল মরণের ভয় তার বিদায় নিয়েছে—আজ সে খোঁড়া পায়ে রাজ্য জয় করতে পারে।"

বাসুদেবের ভাষায় রাজারামের স্বর উষ্ণ হ'য়ে ওঠে। আরক্ত তেরছা চোখে চেয়ে বলেন—"কিন্তু দেখ ছিনে তো গাধাটাকে ক'দিন থেকে?"

রাজারামের আরক্ত নেত্রের দিকে না চেয়েই বাসুদেবের ক্ষণিক উত্তেজনাটুকু প্রায় ক্ষয়ে আসে। স্বভাব-কুণ্ঠিত স্বর কুণ্ঠিততর ক'রে কুঁক্‌ কুঁক্‌ শব্দে বলে—"আজ্ঞে বলতে সঙ্কোচ হয় তবুও করে—কিন্তু মিছে আমি বলিনে প্রভু, তাই প্রার্থনা করি প্রশ্নের উত্তর থেকে আমায় রেহাই দিন।"

রাজারাম বাসুদেবের অবনত কুণ্ঠিত ভাবে খুসী হয়ে উচ্চ কণ্ঠ নীচে এনে বলেন—"সে তো হয় না বাসুদেব! অবলা জীব, আমি না দেখলে আমার 'পরে ন্যস্ত কর্ত্তব্যে ফাঁক থেকে যায়। বলতে তোমায় হবে, গাধাটার তুমি করলে কি?"

বাসুদেবের ক্ষীণ কণ্ঠ শঙ্কায় অধিকতর কাঁপতে থাকে। থেমে থেমে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলে,—"প্রভু, সত্যি পথে থেকে সত্যি ক'য়ে আজকের নিয়মে পেটের দুঃখ ঘোচে না—বাঁচবার আয়েস জোটে না সে কারু অজানা নয়; কিন্তু জীবনের সুরুতে মিথ্যের চাষ না হ'লে জীবনের শেষে ফল ওঠে না ঘরে। সত্যকে ভালবাসার পাগলামীতে অচিরে আধপেটা ভাতও খোয়াব জানি, তবু মিথ্যের পথ নিতে পারিনে। রাধী বলে—এ আমার ভীরু মনের দুর্ব্বলতা—হয়ত তাই।" বাসুদেবের লিক্‌লিকে ঠ্যাং দু'খানা রুদ্ধ উত্তেজনায় লতপত ক'রে দুলতে থাকে—কুঁকুঁ গলার স্বর হঠাৎ কিঁ কিঁ ক'রে উচ্চ হ'য়ে বেজে ওঠে অশিক্ষিত হাতের বেহালার মত। "তবে পাথরেও ঘষতে ঘষতে নাকি ধার ওঠে—আমারও ভয় ঘুচে আসছে ধীরে ধীরে—গাধাটাকে দিইনে আসতে এদিক পানে। ভগবানের দয়ায় খোঁড়ার ঠ্যাং গজায় কি না জানিনে, কিন্তু প্রধানদের দয়ায় যে ল্যাজ বাড়ে-এক রাত্রের ব্যবধানে সে জানলাম প্যাজার ল্যাজের গুচ্ছ দেখে! রক্ষী-ময়দানের স্নেহঘাস খেয়ে আর পরাক্রান্ত প্যাজার সেবার প্রশ্রয়ের ছোলা ধ্বংস ক'রে প্যাজার ল্যাজের গুচ্ছ বেড়ে উঠেছে অত্যধিক অহঙ্কারে। সেই সঙ্গে অষ্টমে চড়েছে স্বৈরাচারের ঝ্যাঁকো স্বর! ঝিমন্ত চোখে মত্ততার আগুন ছুটছে! রক্ষীদের নিলজ্জ নিঃশ্বাস নাক নিয়ে উপেক্ষার লাথির অভ্যাসটা নকল করেছে আশ্চর্য্য অনুকরণে! একখানা পরিচ্ছদের দায়িত্বের বোঝাও আর পিঠে পাততে দেয় না। সামনের পা উঁচু করে উল্টে 'ফেলে আশ্চর্য্য কায়দায়! শাসন-তাড়ন তো দূরের কথা, ল্যাজের আগাটুকু স্পর্শ করে সাধ্য কার! ও স্পষ্টই বুঝেছে—আজ ও আপনার একটি অভয় সহায় করে, আমার সহস্র আয়াস উপেক্ষা করে অনায়াসেই ঘাস খেতে পারবে। শুধু কি তাই! আজ বলতে ব'সে ভ'য়ে থামলে প্রাণ বাঁচবে না জানি। আমার অমন মেয়ে পার্ব্বতী, এদিকে কাছে-পাশে অমন মেয়ে চোখে পড়ে না ব'লে এলো সবাই। সেই মেয়ের আজ ধাত বদ্‌লেছে! সবাই বলছে সে ঐ রক্ষী-ময়দানে গাধাটাকে ছোলা দিতে এসে ময়দানের হাওয়া লেগে।"

রাজারামের মনে কৌতুকের হাওয়ায় উষ্ণ তাপটুকু ঝরে পড়ে, চাপা ঠোঁটে এক ফোঁটা হাসির আভাষ ফুটিয়ে বলেন—"সেটা কি রকম?"

বাসুদেবের কিঁ-কিঁ স্বর আবার কিঁকুকিঁকুতে নেমে আসে বেদনায় সজল হ'য়ে—"পার্ব্বতীর আমার যেমন তেজ তেমনি বুদ্ধি—ঠিক ওর মায়ের মত, জিভের ধার কিছু খর কিন্তু মন দরদে নরম। বাপ-মায়ের অবাধ্য ছিল না এত দিন—সে পার্ব্বতী আর তেমনটি নেই! মেয়ের বিয়ে ঠিক করলাম প্রহরী জানকীবল্লভের সাথে, অনেক আশায়। জানকী আমারই স্বজাতি, বুদ্ধির বলে জাত-ব্যবসা ফেলে রাজার হাতিয়ার হাতে তুলে নিতে পেরেছে। মেয়ের আমার ভদ্দর চাল-চলন ভেবে দেখে রাধী বললে—মেয়ে দেব জানকীর ঘরে—নোংরা ধোঁয়ার ভাগ্য এড়িয়ে ভদ্দর হ'য়ে বাঁচবে। তাতে পার্ব্বতী আজ ঘাড় বেঁকিয়ে বলে কি না—জানকীর তক্‌মা-আঁটা ভদ্দরতায় আমার লোভ নেই—জানকী উল্টো জলের মাছ।—বিয়ে যদি করতেই হয়—সে বিয়ের বর সাজবে রঘুরাজ।"

রাজারাম আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন—যাক্‌, সাধারণতন্ত্রের আলোর তেজ আছে—ধোপার ঘরেও অন্ধকার আব্‌ছা হ'য়ে আসছে। এমন আলোর স্পর্শ পেয়েছে যে পার্ব্বতী, তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগে। রাজারাম তরুণ, তরুণীর অন্তরের ভাষা অনুমান ক'রে তার মন টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে। ভিজে-গলায় বলেন—"বিয়ে তো তোমার নয় বাসুদেব, বিয়ে তোমার পার্ব্বতীর—সেই নয় নিক না বেছে তার প্রাণ যাকে যোগ্য বলে চিনেছে?"

বাসুদেব বিস্ময়ে ছোট চোখ টান ক'রে ফোঁস ক'রে বড় নিঃশ্বাস টেনে বলে—"বলেন কি প্রভু! অল্প বয়সের ছন্নমনে প্রাণ ছোট-বড়র মাপ চেনে নাকি? জানকী সরকারের সোয়ারী সে হ'লো ছোট, আর যোগ্য হ'লো রঘুরাজ! যে দিনের বেলায় গাধার চামড়া কেনে—আর রাতে ঘোরে ফাঁদের ধান্দায়—দু'দিন যদি থাকে খোলা আলোয়—চার দিন হয়ত থাকবে গারদের আড়ালে! জানকীর পাশে রঘুরাজের তুলনা?"

বাসুদেবের সরকারী সোয়ারীদের পরে ভক্তি দেখে রাজারামের ছাতি আরেকটু ফুটে ওঠে—তক্‌মার ভারী পাথরটা জলে থক্‌থক্‌

সি. কে. সেনের আর একটি
অনবদ্য সৃষ্টি
পুষ্পগন্ধে সুরভিত
ক্যাস্টর অয়েল
বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

করতে থাকে বালুপাথরের ঘষা কাদার মত। গদগদ ভাবে বলেন—"দিও তোমার পার্ব্বতীকে পাঠিয়ে আমার কাছে, দেখবো বলে-কয়ে—আমার হুকুম বলেই যদি তোমার মতে মত দেয়।"

পার্ব্বতী এসে দাঁড়ায় সকালের চকমকে রোদে—ওর কাল চোখের তরতরে দৃষ্টি মেলে চকচকে শ্যামল মুখ সুচিক্কণ গ্রীবায় হেলিয়ে, চঞ্চল ঋজু দেহ শক্ত সোজা ক'রে—সতেজ ভঙ্গিতে। রাজারামের গোছান প্রশ্নগুলো এলিয়ে যায় ওর দিকে চোখ তুলে, একটু থেমে আবার গুছিয়ে নরম সুরে বলেন—"তোমার বাবা নালিশ জানাতে এসেছিল পার্ব্বতি! ডেকে পাঠাতে হলো সেই কারণেই।"

পার্ব্বতীর পাতলা চাপা ঠোঁটের কোণে তেরছা হাসি খেলে যায়, গ্রীবা উঁচু ক'রে স্পষ্ট চোখে চেয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে বলে—"নালিশ নয়, দুঃখ! আমার বাবা নালিশ জানাতে জানে না।"

রাজারাম চেয়ে থাকেন প্রশংসার দৃষ্টি মেলে পার্ব্বতীর 'পরে—প্রশ্ন বা উত্তর কোন্‌টা করবেন মনে পড়ে না সহজ হ'য়ে। এক সময় মনে হয়, পার্ব্বতীর ঠোঁটে টুল্‌টুল্ করছে এক ফোঁটা বিদ্রূপের হাসি! সম্বিৎ পেয়ে চোখ নত করে গাঢ় কণ্ঠে বলেন রাজারাম—"তুমি নাকি বিয়ে করবে জাত ভেঙ্গে—সমাজ ভাসিয়ে?"

পার্ব্বতীর সেই অবোধ্য বিদ্রূপের হাসিটুকু যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটু নীরব থেকে—মিষ্টি গলায় খর ঝঙ্কার তুলে বলে—"এ সব কথা বাপ-মেয়ের ঘরোয়া কথা, এ নিয়ে আপনার মাথার শিরায় টান পড়লো কেন তা আপনিই জানেন—হয়ত আজকালের কর্ম্মসচিবদের কাজের চেয়ে অকাজের অবসর বেশী। সে যাক্, বলতেই যদি ডেকে থাকেন—আপনার শোনবার সাহসে ধাক্কা যদি না লাগে, বলতে আমার বাধবে না। কথা সত্যি, বাবাকে বলেছি—পরের ঘর যদি করতেই হয়, জানকীর চেয়ে রঘুর ঘর বাঞ্ছনীয়। আশ্রয় যদি হয়—সবল আশ্রয়ের দিকে হাত বাড়ান বুদ্ধির কাজ। সমাজ আমি ভাসাতে চাইনে,—সমাজ ভেসে চলেছে বিলাসের উন্মত্ত ঢেউয়ে। জাতের পতন আমার গায়ে লাগে; কিন্তু যে জাত ভেঙ্গে ধূলোয় মিশিয়ে যাচ্ছে স্বেচ্ছাচারের উন্মত্ত নৃত্যের আঘাতে আঘাতে, তাকে ধরে রাখবার সাধ্য তো আমার নেই। বাবা জাতের খবর খুঁজে দুঃখ পায়—বাবার পুরোনো চোখের সংস্কারে। বাবা বুঝতে চায় না বাবার জাত আজ দুনিয়ায় নেই। বাবার জাতের মানুষ না রঘু, না জানকী। আজকের দিনের জাত, সমাজ, সব এক রংএর কলাই,—মাপের যা তারতম্য! আজকের দিনের বাঁধন-হারা সমাজে না আছে মানুষের জাত, না আছে বিয়ের জাত। আজ, মানুষের জাত বাঁধা পড়েছে অর্থের বিকৃত প্রকাশে—আর বিয়ের জাত উঠেছে বিলাসের নিলামে। সেই বিলাসের বিয়ের বর সাজবার যোগ্যতা রঘুর তুলনায় জানকীর নেই। জানকীর পেট ভরছে আপনাদের মত লোকের পায়ের ধূলো চেটে—ক'নের কানে সোনা দোলাবার সম্বল তার নেই।"

রাজারামের তকমার ছুঁচলো দিক্‌টা উঁচিয়ে ওঠে, কণ্ঠে বিরক্তি ঢেলে বলেন—"জিহ্বায় তোমার আবরণ নেই পার্ব্বতি! প্রশ্রয়ের শাণে তোমার জিহ্বায় যে ধার উঠেছে, একদিন মরণ হয়ত আসবে তোমার ঐ শাণিত জিহ্বাকে আশ্রয় ক'রেই।"

পার্ব্বতী তার পাতলা ঠোঁট তাচ্ছিল্যে স্ফুরিত ক'রে বলে—"মরণের ভয় আমাদের নেই প্রভু! মরণ পর্য্যন্ত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় করে দিতে ভয় পায়—মরণও এদিনে তেল-মাখা চিনে রেখেছে; মৃত্যু সৌধবাসীকে সহজে নিমন্ত্রণ জানায়—কুঁড়ে ঘরের প্রতি দৃষ্টি তার ময়লা গাড়ীর প্রতি সরকারের মনোযোগের মত—অবসর মত গাড়ী বোঝাই ক'রে নদীতে নিয়ে ফেলে। তাই মরণের ভয় কেটেছে আমাদের বহু দিন, আর তা ছাড়া যেচে বলতে আমি আসিনি—ডেকে আপনি শুনতে চেয়েছেন—স্পষ্ট কথা বলায় ও শোনায় সমান সাহসের প্রয়োজন। সে সাহস আমার আছে বলেই হয়ত অপরের ভয় আমি বুঝিনে। শোনার সাহস আছে মনে করে যদি ডেকে থাকেন—এখন শোনবার সাহস হারিয়েছেন বলে বিদায় না দেওয়া পর্য্যন্ত বলতে আমায় হবেই।"

রাজারামের তকমার ধার খচখচ্ ক'রে বিঁধতে থাকে—কিন্তু এ মেয়েকে শাসন করা চলে কোন হাতিয়ার সম্বল ক'রে সেইটেই হাতড়ে মেলে না নিজের মাঝে। পার্ব্বতীর ভাবে ভরা অপূর্ব্ব স্ফুরিত মুখের পরে চেয়ে থাকেন—বিহ্বল দৃষ্টি মেলে নীরবে।

পার্ব্বতী বলে চলে—"বাবা সরকারের নোংরা ধুয়ে জীবন কাটালো বিনা নালিশে। যারা সরকারের পরিচ্ছদ নোংরা ক'রে চলেছে দ্বিধা-সঙ্কোচ ঘুচিয়ে, তাদের জাতের সঙ্গে বাবার জাতের মিল ভাবতে আমি পারিনে। বাবা সে-কালের মানুষ, একালের মানুষের জাত চেনবার মত ছুঁচলো দৃষ্টি বাবার নেই। সেকালের সহজ চোখ রয়েছে বিশ্বাসে ভোঁতা হয়ে। তাই জাত খুঁজে বেড়ায়—প্রাণ খুঁজে বেড়ায়। প্রাণ আজ বিদায় নিয়েছে জগত থেকে আত্মসম্মানের দায়ে—পশুত্বের দাপাদাপির তাড়নে। আর জাত গড়েছে দুই থাকে—এক বঞ্চিতের জাত, আর এক লোভীর জাত। বঞ্চিতের জাত আমার বাবার জাত, জীবন দিয়ে নোংরা ধুয়ে চলেছে আশার নিঃশ্বাস সম্বল ক'রে। অপর জাত আপনাদের জাত। শুভ্র পরিচ্ছদের সৌভাগ্যকে তুচ্ছ ক'রে—নোংরা মাখিয়ে স্বেচ্ছাচারের কাদায় আত্মপ্রসাদের পদক্ষেপে চলেছেন ছাপ রেখে। তাই বাবাকে বলি—আজ জাত খুঁজছো কোথায়? রঘু, জানকী, সবাই যে আজ এক জাতের মানুষ। গায়ের পোষাক খুলে সূর্য্যের সত্য আলোর তলায় এসে দাঁড়ালে আমি দেখি, আজকের মানুষের সবার ছায়াই এক ছায়া। আপনার ভাই-ভগিনীপতি থেকে আরম্ভ ক'রে আপনার অধীনস্থ রামরতন, রামচতুর, সীতাপতি, রাঘবরতন, জানকীবল্লভ, কৌশল্যানন্দন, বিভীষণবন্ধু, আপনার ঊর্দ্ধতন রাবণদমন, তাড়কাশমন, সমুদ্রতাড়ন, হনুমানজীবন—সকলেরই শব্দ আলাদা, অর্থ এক। আজ সীতাভজন আর হনুমানপালন—সবাই রয়েছে ক্ষমতার আসরে উন্মত্ত হ'য়ে—স্বার্থের পিপাসায় অপরের বুকের রক্তপানে ওদের রুচি সমান। ন্যায়, অন্যায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধি সকলেরই আজ বুক ছেড়ে কণ্ঠে ফেনায়িত হ'য়ে উঠেছে। তারই বুদবুদ্ উড়ে বেড়ায় অপরের গায়ে অবাঞ্ছিত ঠেলা দিয়ে। নিজের বুকে আর এক বিন্দু ধরে রাখবার সাধনা নেই কারো। আমার বাবার কণ্ঠ বন্ধ হ'য়ে আছে ন্যায়-অন্যায়ের বুদ্ধির পাথর বুকে নিয়ে, চোখ রয়েছে সত্যের রংএ ঘোলা হ'য়ে। তাই বাবা রঘুর রাতের ফাঁদ দেখে ভয় পায়। দিনের বেলা সেই ফাঁদের লাভের ভাগে জানকীর পেছন দিয়ে হাত বাড়ান চোখে পড়ে না। আমি বলি—রঘুর সাহস আছে—রাতের অন্ধকারে জানের ভয় না ক'রে সমাজের বুক ছিঁড়ে যে সম্পদ আনে, দিনের স্পষ্ট আলোর সেই সম্পদের ফাঁদে গাধা টেনে এনে কোতল

করে। জানকীর সে সাহস নেই কিন্তু লোভ আছে—তাই ঈর্ষা ভরা মন নিয়ে শঙ্কায় বুক কুঁকড়ে পরের বীর্য্যের ভাগ খায়—তকমার আড়ালে প্রাণ লুকিয়ে। যে জানকী নিজে হাত পেতে আছে পরের প্রসাদের ছিটে-কোঁটার আশায়, তার ঘরে গিয়ে আমি আবার হাত পাতবো কোন লজ্জায়!"

পার্ব্বতীর শাণিত জিহ্বা আন্দোলনের ঝলকে ঝলকে রাজারামের বুকে রক্ত মুখে উঠে আসে। মনে হয়, নিজেকে সবলে সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন—পর্দ্দিত রজকিনীর এখানেই থামা কর্ত্তব্য। কঠিনতম কি একটা বলবার চেষ্টায় রাজারাম একবার নড়ে-চড়ে বসেন—কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত কি একটা শব্দ এসে ফিরে গিয়ে বুকের মধ্যে ধক্-ধক্ করতে থাকে পুর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত তালে। অশিক্ষিত রজকিনীর অনুভূতিতে শিক্ষিত সতেজ মুখের দীপ্তি মনোরম! সাহসে শাণিত জিহ্বার ধার আশ্চর্য্য! সুগঠিত দেহের অনমনীয় ভঙ্গি অপূর্ব্ব! রাজারাম এক সময়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে অনুভব করেন—সেই অকথিত কঠিনতম শব্দ যেটা বুকের কাছ থেকে উঠে বার বার কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত এসে পিণ্ডের আকারে যন্ত্রণা দিয়ে ঘুরছে—সেটা ঐ কথাগুলিরই ছায়া-সমষ্টি!

অনুভূতিতে নিপীড়িত যে রক্ত পার্ব্বতীর জিহ্বায় ধারা পায়—সে ধারায় রাজারামের মুগ্ধ দৃষ্টি রাঙ্গা হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে। পার্ব্বতী তখনও বলে চলেছে—"তাই বাবাকে বলেছি, তোমার পার্ব্বতীর মন, মন দিয়ে কোন এমন মন মিলবে না এদিনে, বাকি রইলো যে বিয়ে—সে, বিয়ের ঘর। জানকীর ঘরের চেয়ে রঘুর ঘর মাপে বড়, রঘুর জাতের আর কাজের মাঝে আড়াল নেই। ওর গতি-বিধি চেনা যায় চোখ বুঁজে, ওর সঙ্গে বাস করা সহজ। জানকী জাতে রজক, কাজে ভক্ষক! গলায় ঝুলছে তক্‌মার রক্ষাকবচ! ওর সঙ্গে বাস করতে হ'লে—চোখের 'পরে চশমা এঁটেও সোয়াস্তি মিলবে না।"

রাজারাম এতক্ষণে গলার সেই অস্থির পিণ্ডটাকে গিলতে পেরে নিঃশ্বাস ফেলে বিষাদ হেসে বলেন—"কিন্তু হঠাৎই যদি একদিন কর্ম্মফলে রঘুরাজকে বাধ্য হ'য়ে গারদে আশ্রয় নিতে হয় তখন তোমার এই চোখ বোঁজা সোয়াস্তির আশা থাকবে কোথায় পার্ব্বতী?"

পার্ব্বতী একবার যেন একটু চমকে ওঠে তার পরই সেই তেরছা হাসিটুকু চমক্ দিয়ে যায় বিদ্যুতের রেখায় ঠোঁটের কাঁকে। ঘাড় ফিরিয়ে আকাশের 'পরে চোখ মেলে বলে—'আজকের সাধারণতন্ত্রে ভিন্ন লোকের তরে ভিন্ন কানুন। আজ আপনি, আর জানকী, এক ঘরে বসে এক লাঠিতে একই ইঁদুর মারলে জানকীর গারদ বাস, আপনার খেতাব লাভ। তেমনি গাঁয়ের ঠাকুদ্দা যদি রঘুর পাশে শুয়ে রাত কাটায়, তাকে গারদের বাইরে হয়ত আর দেখবে না কেউ—কিন্তু রঘু কর্ম্মফলে সাজা নেবে—এ বিশ্বাস করিনে। কর্ম্মফলও এদিনে সোনা দিয়ে কেনা যায়। রঘুর রোজগার সে তো নিক্তিতে মাপা রোজগার নয়। ওর আ-মাপা রোজগার—ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে দিলে গারদ ওর কেনা হয়ে থাকবে। আপনারা ওর জাত-ভাই, সোনার ছেকল ও যদি আপনাদের হাতে তুলে দেয়—লোহার ছেকল ওর পায় দিতে আপনাদের হাত উঠবে না এ আমি নিশ্চয় জানি।"

রাজারাম নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—"বুঝছি, সাধারণতন্ত্রে তোমার আস্থা নেই পার্ব্বতি?"

"তন্ত্রে আস্থা থাকতেই হবে—কারণ সকল তন্ত্রের মূলমন্ত্রই যে এক। রাজতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, অসাধারণতন্ত্র—সকল তন্ত্রের মূলমন্ত্র—জনসেবা। কিন্তু দুঃখ এই, তন্ত্র হাতে পড়লে তন্ত্রধারক মন্ত্র ভুলে যায়—নিজেরা হ'য়ে পড়ে স্বার্থের যন্ত্র। নতুন সন্ন্যাসী আসেন নববিধান নিয়ে—প্রথমটা কানে তালা লাগে—চোখেও লাগে ধাঁধাঁর ঘোর—কিন্তু গুরু হ'য়ে ব'সলে গোবরের তলায় বিধানের পুঁথি ইঁদুরে কাটে।"

পার্ব্বতীর তেরছা হাসিটুকু মিলিয়ে আসে, ধীরে ধীরে মুখের রেখায় ফুটে ওঠে বদ্ধ অব্যক্ত একটা বেদনার ভাষা—কণ্ঠস্বর ভেসে আসে বুঝি আকাশের ওপার থেকে—থেমে থেমে বলে,—"বস্তিতে, পথে-ঘাটে শুনি, এক সময়ে রাজত্ব করেছিলেন রাজা রাম। সে এক রামের সত্যপালনের কাহিনী, যুগ-যুগ পার হয়ে আজও মানুষে বুকে লেখা হ'য়ে আছে সোনার আঁচড়ে! শুনে ভাবি—আজ যে বহু ভ্রষ্ট রামের রাজত্ব চলেছে, সে কাহিনীও তো লেখা হবে? হয়ত লেখা হবে অনেক কথায়—সাদা কাগজের বুকে কাল কালির আঁচড়ে। আর পরের কালের যুগ-যুগের মানুষ—চোখ বুলিয়ে জানবে সেই কালোয় আঁকা আমার যুগের ইতিহাস কুঞ্চিত নাকের নিঃশ্বাস নিয়ে! কোথায় সে রাম—! যে এই লোভী রাক্ষসদের হাত থেকে আর্ত্ত দুর্গতদের নিস্তার করে নিজের নীল চক্ষু মায়ের পায়ে উৎসর্গ করে বলবে—'শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে। সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে'।"

পার্ব্বতীর ছোট দুটি চোখে টল্-টল্ করে দুলতে থাকে এক ফোঁটা জল। রাজারাম মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেন—বিষমুখী রজকিনীর ঐ এক ফোঁটা চোখের জলে পরিস্ফুট হ'য়ে দুলছে—জানা—তবু—না-চেনা, অনেক সত্য!

[উপন্যাস]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তের

বাইশ-তেইশ বৎসর বয়েসের একজন সুশ্রী সুবেশা মহিলা শতদল বাবুকে কিছু রক্তলাল গোলাপ ও এক বাক্স মিষ্টি—কড়া পাকের সন্দেশ সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। চোখে তাঁর কালো লেন্সের চশমা ছিল অর্থাৎ সুস্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মহিলা যেই হোন না কেন, তিনি তার মুখখানির স্পষ্ট পরিচয়টা দিতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু তার চাইতেও মারাত্মক ব্যাপার তাঁর দেওয়া মিষ্টি খেয়েই শতদল অসুস্থ হ'য়ে পড়ল এবং সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাঃ চ্যাটার্জী এসে পড়ায় কোন মতে শতদলকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। মরফিন পয়েজনিং কেস। শতদলকে মিষ্টির সঙ্গে মরফিন দিয়ে কৌশলে তাহ'লে হত্যা করারই চেষ্টা করা হয়েছিল। আবার শতদলের প্রাণহরণের প্রচেষ্টা এবং এবারে ডাঃ চ্যাটার্জী ঠিক সময়ে শতদলের অসুস্থতার সংবাদ না পেলে তাকে হয়ত বাঁচানই যেত না। পরিকল্পনাটিও চমৎকারই বলতে হবে: মিষ্টির সঙ্গে বিষ প্রয়োগ। কিন্তু কে সেই ভদ্রমহিলা?

'ভাল কথা, মিস্ মিত্র! ভদ্রমহিলা তাঁর নাম বলেননি?—' আমিই প্রশ্ন করি।

'না। নাম ত কিছু তিনি বলেননি, তবে একটা মুখ-আঁটা নীল খামে চিঠি দিয়েছিলেন ঐ সঙ্গে শতদল বাবুর নাম উপরে লেখা। চিঠিটা দিয়ে বলেছিলেন ঐ চিঠিটা দিলেই সব তিনি বুঝতে পারবেন। আমি সেই চিঠি, ফুল ও মিষ্টির বাক্সটা এনে উপরের ইনচার্জ নার্স মিসেস্ মহান্তির হাতে দিই।—'

'ও তাহ'লে মিসেস মহান্তিই তখন উপরে ডিউটিতে ছিলেন?—' কথাটা বলে কিরীটি মিস্ মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে: 'মিসেস্ মহান্তি কি এখন এখানে উপস্থিত আছেন? তাঁকে একটি [illegible] করে যদি এই ঘরে ডেকে আনেন মিস্ মিত্র!'

'মণিকার এখন off duty বলেও বোধ হয় নার্সিং হোমেই আছে। দেখছি, যদি না বাইরে গিয়ে থাকে ত পাঠিয়ে দিচ্ছি।—'

মিস্ মিত্র ঘর হতে বের হ'য়ে গেলেন।

কিরীটি চেয়ারের 'পরে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সম্মুখের টেবিলের উপর থেকে একটা কাচের কাগজ-চাপা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। চোখের দৃষ্টি স্তিমিত। অন্যমনা।

বুঝতে পারলাম, কোন একটা বিশেষ চিন্তা ঐ মুহূর্তে তার মনের অবগহনে আলোড়ন তুলেছে। কোন একটা সূত্রকে সে ধরবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তাই তার দেহে ও মনে একটা শিথিল নিষ্ক্রিয়তা।

শতদলকে কেন্দ্র করে একটা দুর্বোধ্য রহস্য ক্রমেই জটিল হ'য়ে উঠ ছিল—সীতার আকস্মিক রহস্যজনক মৃত্যু সেটাকে আরো জট পাকিয়ে তুলেছে।

ঘটনাগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে একান্ত ভাবেই বিচ্ছিন্ন। শতদলকে হত্যা-প্রচেষ্টার সঙ্গে সীতাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করবার কি এমন কার্য-কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। হত্যার মোটিভ। শতদলকে হত্যা করবার তবু একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু সীতা নিহত হলো কেন? কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে তার হত্যার সঙ্গে। তবে কি দুটো ব্যাপারের সঙ্গে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই? শতদলকে হত্যা-প্রচেষ্টা ও সীতাকে হত্যা করা একের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্যের উদ্দেশ্যের কোন সংস্পর্শ নেই? ঘটনাচক্রে একটির সঙ্গে অন্যটি জড়িয়ে গিয়েছে মাত্র!

বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজার ভারী নীল রংয়ের পর্দাটা তুলে কক্ষে প্রবেশ করল ৩০।৩২ বৎসরের একটি নার্স।

'ডক্টর চ্যাটার্জী, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?—'

'মিসেস্ মহান্তি! হাঁ, আসুন। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি মিঃ রায়—উনিই আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চান!—' ডাঃ চ্যাটার্জীই মিসেস্ মহান্তিকে আহ্বান জানালেন।

মুখের দিকে চেয়ে কেবল মাত্র মুখাবয়ব থেকে মিসেস্ মহান্তির বয়স নিরূপণ করা কষ্ট। বেশ গোলগাল স্থূল চেহারা—চোখে-মুখে একটা সরল নিরীহ বোকা-বোকা ভাব।

মিসেস্ মহান্তি ডাঃ চ্যাটার্জীর কথায় কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়েই বারেকের জন্য দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

'মিসেস্ মহান্তি, আপনিই ত আজ উপরে ডিউটিতে ছিলেন?—'

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন মিসেস্ মহান্তি।

'কেবিনে শতদল বাবু হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লে আপনিই বোধ হয় ডক্টর চ্যাটার্জীকে সংবাদ পাঠান?'

'হাঁ। সে সময় আমি ঘরেই ছিলাম!'—মৃদু কণ্ঠে জবাব এলো।

কিরীটি হঠাৎ সোজা হ'য়ে বসল: 'আপনি সেই সময় শতদল বাবুর কেবিনের মধ্যেই উপস্থিত ছিলেন?'

'হাঁ!—'

'আগে থাকতেই আপনি কেবিনের মধ্যে ছিলেন, না ঠিক ঐ সময়টিতে গিয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন?—'

'ওঁর সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। সরলা আমাকে কিছু গোলাপ ফুল, একটা চিঠি ও এক বাক্স মিষ্টি এনে দেয় শতদল বাবুকে দেবার

ন্ত্র। সেগুলো নিয়ে কেবিনে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু উনি আমাকে কথায় কথায় আটকে রেখেছিলেন।—'

'আপনার সামনেই তাহ'লে শতদল বাবু মিষ্টি খান!—'

'হাঁ!—'

'মিসেস্ মহান্তি যদি কিছু মনে না করেন ত in details আজকের ঘটনাটা আমাকে খুলে বলুন!—'

'জিনিষগুলো নিয়ে শতদল বাবুর কেবিনে ঢুকতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, ওগুলো কি? আমি জিনিষগুলো তাঁর হাতে দিয়ে সব বললাম। তার পর বেরিয়ে আসতে যাবো শতদল বাবু আমাকে ডেকে বললেন, সিষ্টার, ঐ ভাসে এই ফুলগুলো একটু সাজিয়ে দিন না please। ভাসের ফুল যা ছিল সেগুলো তুলে নিয়ে গোলাপ ফুলগুলো তাতে সাজিয়ে দিচ্ছিলাম যখন, শতদল বাবু সে সময় চিঠিটা পড়ছিলেন। তার পরই মিষ্টির বাক্সটা খুলে বললেন, how lovely। কড়া পাকের সন্দেশ। বলতে বলতেই গোটা দুই সন্দেশ মুখে পুরে দিলেন। এবং আমাকে বললেন এক গ্লাস জল দিতে। ঘরের কোণায় কুঁজোতে জল ছিল। গ্লাসে জল ভরে তাঁর সামনে নিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, শতদল বাবুর সমস্ত চোখে-মুখে যেন একটা আতঙ্ক। কোন মতে ঢোঁক গিলতে গিলতে বললেন: সিষ্টার, শীগ্‌গির ডক্টর চ্যাটার্জীকে খবর দিন। আমি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি। Quick। যান—। সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রায় ছুটে গিয়ে ডক্টর চ্যাটার্জীকে ডেকে আনি।'

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিরীটি নিশ্চল ভাবে বসে মিসেস্ মহান্তি বর্ণিত কাহিনী শুনছিল, হঠাৎ যেন তার নিশ্চল দেহটা একটা বিদ্যুৎ-স্পর্শে সজাগ প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠলো। কিরীটির ক্ষণপূর্বের স্তিমিত চোখের তারা দু'টো যেন আচম্‌কা বিদ্যুৎ-শিখার মত জ্বলে উঠলো। ঝক্ ঝক্ করে উঠলো ধারালো ছুরির ফলার মত। কিরীটির ঐ দৃষ্টিকে আমি চিনি। সহসা উপবিষ্ট কিরীটি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করে। দু'-চার মিনিট কেটে গেল একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে। ঘরের আমরা বাকী তিন জন নির্বাক্ হ'য়ে আছি। আমি আর ডক্টর চ্যাটার্জী উপবিষ্ট। মিসেস্ মহান্তি আমাদের সামনেই দণ্ডায়মান।

হঠাৎ আবার কিরীটিই ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে: 'ডক্টর, এবারে আমরা শতদল বাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?'

'হাঁ। নিশ্চয়ই, চলুন!—'

সকলে আমরা কেবিনে এসে প্রবেশ করলাম।

চক্ষু দুটি মুদ্রিত। শতদল বাবু শয্যার 'পরে শুয়ে ছিলেন। আমাদের পদশব্দে চোখ মেলে তাকালেন। ডাঃ চ্যাটার্জীই সর্বপ্রথমে এগিয়ে গিয়ে শতদলের পাল্‌স্‌টা দেখলেন: 'এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন ত শতদল বাবু?'

'হাঁ, ধন্যবাদ!—' অতঃপর কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: 'আপনি কখন এলেন মিঃ রায়?'

'এই ত কিছুক্ষণ হলো!—'

'ডক্টর চ্যাটার্জীর মুখে সব শুনেছেন বোধ হয়! There was another attempt!'—স্মিত কণ্ঠে শতদল বললেন।

'হাঁ। শুনলাম। ভয় পাবেন না মিঃ বোস। This is last!'—কিরীটির কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা দৃঢ়তা।

আর কারো কানে সেটুকু না ধরা পড়লেও আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সেটা ফাঁকি দিতে পারে না।

'সত্যি'। ভাবতেই পারিনি সন্দেশের মধ্যে—'

শতদলকে বাধা দিয়ে কিরীটি বললে : 'কে আপনাকে ফুল ও মিষ্টি পাঠিয়েছিল শতদল বাবু?'

'সত্যি কথা বলতে কি, মিঃ রায়, এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে সেইটাই ভাবছিলাম। আপনিও তাকে চেনেন। রাণু—'

বজ্রের মতই যেন দু' অক্ষর নামটি আমার কর্ণে ধ্বনিত হলো : 'রাণু!'

কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেও কম বিস্মিত হয়নি। এবং কণ্ঠস্বরেও তার সে বিস্ময়টুকু ধ্বনিত হয়ে উঠলো : 'রাণু দেবী?'

'হাঁ!—এই দেখুন না চিঠি'—বলে শয্যার আশেপাশে চিঠিটা খুঁজতে থাকে শতদল : 'চিঠি! চিঠিটা গেল কোথায়?'

মিসেস্ মহান্তি এমন সময় এগিয়ে এলেন এবং বালিশের তলা থেকে নীল খাম-সমেত খোলা চিঠিটা বের করে শতদলের হাতে তুলে দিলেন : 'এই যে।'

কিরীটি চিঠিটা শতদলের হাত থেকে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল। আমিও আরো এগিয়ে গেলাম। নীল রংয়ের পুরু লেটার-পেপারে রয়েল ব্লু কালিতে লেখা চিঠি।

মুক্তোর মত ঝরঝরে পরিষ্কার হাতের গোটা গোটা অক্ষর। এবং হাতের লেখা দেখলে কোন পুরুষের নয়, মেয়ের বলেই মনে হয়। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

শতদল,

একান্ত ইচ্ছা থাকলেও তোমার সঙ্গে দেখা করবার উপায় নেই। কড়া হুকুম কিরীটি রায়ের। নার্সিং হোমে প্রবেশ নিষেধ, তুমি রক্তগোলাপ ভালবাস তাই কিছু রক্তগোলাপ ও তোমার বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের প্রিয় কড়া পাকের সন্দেশ পাঠালাম। ভালবাসা নিও।

"রাণু"

চিঠিটা পড়ে ভাঁজ করতে করতে কিরীটি শতদলের দিকে তাকিয়ে বললে : 'চিঠিটা আমার কাছে থাক শতদল বাবু!'

'বেশ।—'

কিরীটি চিঠিটা জামার পকেটে রেখে দিল : 'চলুন ডাক্তার। ওঁকে আমাদের বিশ্রাম দেওয়াই প্রয়োজন। উনি বিশ্রাম করুন।'

আমরা সকলে ঘর থেকে বের হ'য়ে এলাম।

ডাক্তারের কাছে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ কিরীটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে : 'তুই এগো সুব্রত, আমি ডাক্তারকে একটা কথা বলে আসি।'

কিরীটি আবার উপরে চলে গেল। মিনিট পনের বাদে কিরীটি ফিরে এলো।

* * * * *

হোটেলে ফিরে এলাম। ডাক্তারের টমটমই আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

কিরীটির পকেটে যে নীল লেটার প্যাডের কাগজে লেখা চিঠিটা ছিল আমার মনের মধ্যে সবটুকুই সেটাই অধিকার করেছিল। চিঠিটা সম্পর্কে কিরীটি আর কোন উচ্চবাচ্য না করলেও আমি কিন্তু চিঠিটার কথা কোন মতেই ভুলতে পারছিলাম না। আশা করেছিলাম, হোটেলে ফিরেই কিরীটি রাণুকে ডেকে নিশ্চয়ই চিঠিটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কিন্তু কিরীটি সে দিক দিয়েই গেল না। সোজা ঘরে ঢুকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমি বাইরের বারান্দায় একটা আরাম-কেদারার উপরে গা এলিয়ে দিলাম।

শীতের ঘনায়মান সন্ধ্যায় চারি দিক অস্পষ্ট। একটানা সমুদ্র-গর্জন দূরের সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্য হ'তে কানে এসে প্রবেশ করছে। ইতিমধ্যেই হোটেলের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে।

কতক্ষণ অন্ধকারে চেয়ারটার 'পরে বসেছিলাম মনে নেই, হঠাৎ রাণুর কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গল।

'কে, সুব্রত বাবু নাকি?—'

'কে, ও মিস্ মিত্র!—'

'অন্ধকারে চুপটি করে বসে আছেন যে!—'

'না। এমনিই—বসুন!—'

রাণু পাশের চেয়ারটায় বসল।

'উঃ, আজ অনেক ঘুরেছি। একা একা বেড়াতে যাবো বলে আপনাদের খুঁজতে এসেছিলাম। বেয়ারাটা বললে বিকালের দিকে টমটম করে আপনি আর মিঃ রায় শহরের দিকে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছিলেন?—' রাণু জিজ্ঞাসা করে।

'ডক্টর চ্যাটার্জীর নার্সিং হোম—'

'শতদল কেমন আছে? বেচারা একটু সামলাতে পেরেছে কি?—'

'হাঁ!—' অদম্য কৌতূহলটাকে আর নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম : 'আপনি ত আজ ফুল আর মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন রাণু দেবী শতদল বাবুকে—'

'হাঁ! পেয়েছে!—'

শান্ত কণ্ঠে উচ্চারিত রাণুর কথাটা যেন মুহূর্তে একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে আমাকে একেবারে বিবশ করে দিল। কয়েক মুহূর্ত আমার যেন বাক্যস্ফূর্তি হলো না। আমি বোবা হয়ে গিয়েছি। অন্ধকারেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম রাণুর মুখের দিকে কিন্তু অন্ধকারে রাণুর মুখখানা অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত মনে হয়।

'আপনিই তাহ'লে শতদল বাবুকে আজ ফুল আর মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন?—'

'হাঁ। কিন্তু কেন বলুন ত!—' উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত কণ্ঠে রাণু প্রশ্ন করে।

'সেই সন্দেশ—খেয়ে শতদল বাবু হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন!—'

'বলেন কি!—'

'হাঁ! ডক্টর চ্যাটার্জীর ধারণা সেই সন্দেশের মধ্যে মরফিন ছিল!—'

'মরফিন! কি বলছেন যা-তা সুব্রত বাবু!—'

'বললাম ত, ডাক্তারের তাই বিশ্বাস। সন্দেশ আপনি কি নিজে হাতে কিনেছিলেন?—'

'না!—'

'তবে ?—'

'সন্দেশ হোটেলের বেয়ারাকে দিয়ে কিনিয়ে আনিয়েছিলাম।—'

'আর ফুলগুলো ?—' অকস্মাৎ কিরীটির কণ্ঠস্বর শুনে আমি ও রাণু দু'জনাই যুগপৎ পশ্চাতের অন্ধকারে ফিরে তাকালাম।

ইতিমধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কখন যে কিরীটি পশ্চাতের অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে এবং আমাদের পরস্পরের কথোপকথন শুনেছে, তার বিন্দুমাত্রও টের পাইনি। কয়েকটা মুহূর্ত আমরা দু'জনেই চুপ করে থাকি। কিরীটি দ্বিতীয় বার আবার প্রশ্ন করে: 'আর গোলাপ ফুলগুলো ?'

'ওগুলোও শরৎ বাবুর মেয়ে মিস্ কবিতা গুহ পাঠিয়েছিলেন।—'

'মিস্ গুহ! মানে সে রাত্রে নিরালায় যাঁর সঙ্গে আলাপ হলো ?—' কিরীটিই প্রশ্ন করে।

'হাঁ।—'

'কবিতা গুহর সঙ্গে কি শতদল বাবুর পূর্ব-পরিচয় ছিল ?—'

'কবিতা আমাদের ক্লাশ-ফ্রেণ্ড। শতদলের সঙ্গে কবিতার আমাদের বাড়িতেই আলাপ হয়।—'

'হুঁ।—'

পরের দিন প্রত্যুষে আমি ও কিরীটি রাণুকে সঙ্গে নিয়ে কবিতাদের বাসায় গেলাম।

কবিতা ভিতরে ছিল। রাণুকে পাঠান হলো তাকে ডেকে আনবার জন্য। কিরীটি অবশ্য রাণুকে নিষেধ করে দিয়েছিল পূর্বাহ্ণে কবিতাকে কোন কথা না বলতে।

একটু পরেই রাণুর সঙ্গে কবিতা বাইরের ঘরে এলো। শরৎ উকিল ঐ সময় বাসায় না থাকায় আমাদের কথাবার্তা বলবার বিশেষ সুবিধাই হলো।

দু'-চারটে মামুলী কথাবার্তার পর কিরীটি ফুলের প্রসঙ্গে এলো।

'আপনি কাল শতদল বাবুকে নার্সিং হোমে গোলাপ ফুল পাঠিয়েছিলেন কবিতা দেবী ?—'

'হাঁ। হাসপাতাল থেকে শতদল বাবুর কাছ হ'তে কাল সকালে একজন লোক এসে বললে, শতদল বাবু কিছু ফুল পাঠাতে বলেছেন—আমাদের বাগানের গোলাপ। এ-ও সে বলেছিল ফুলগুলো যেন আমি রাণুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই, তাই—'

'আশ্চর্য্য! লোকটা কি রকম দেখতে বল ত কবিতা ?—' কথাটা বললে রাণু।

'এখানকার স্থানীয় লোক বলেই মনে হয়। বোধ হয় নার্সিং হোমেই কাজ করে।—' কবিতা জবাব দেয়: 'কালো ঢ্যাংগা লম্বা মত। একটু খুঁড়িয়ে চলে।'

'Exactly। সেই লোকটা কাল সকালে আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করে বলে, শতদল কিছু কড়া পাকের সন্দেশ তাকে পাঠাতে বলেছেন।—' কথাগুলো বললে রাণু।

এবারে কথা বললে কিরীটি রাণু ও কবিতা দু'জনকেই সম্বোধন করে, 'তাহ'লে আপনারা দু'জনেই সেই লোকটির মুখে সংবাদ পেয়েই ফুল আর মিষ্টি নার্সিং-হোমে পাঠিয়েছিলেন ?—'

'হাঁ।—' দু'জনেই একসঙ্গে জবাব দেয়।

বলাই বাহুল্য, অতঃপর শরৎ উকিলের বাসা থেকে সোজা আমরা রাণুকে নিয়েই নার্সিং হোমে গেলাম। এবং ডাক্তার চ্যাটার্জীকে সব বলে কিরীটি ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলে কবিতা ও রাণু বর্ণিত ঐ ধরণের বা চেহারার কোন লোক নার্সিং হোমে আছে কিনা ?

ডাক্তার শুনে ত বিস্মিত: 'কই ও-ধরণের চেহারার কোন লোকই ত আমার এখানে কাজ করে না! চার জন সুইপার, দু'জন দরোয়ান ও দু'জন কুক্।' তাদের ডাকা হলো কিন্তু রাণু বললে, ওদের মধ্যে কেউ নয়।

কিরীটি আর আমি তখন শতদলের সঙ্গে দেখা করলাম।

তাকে প্রশ্ন করায় সে যেন বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেল। বললে: 'সে কি! সন্দেশ কড়া পাকের আমি খেতে ভালবাসি সত্য এবং লাল গোলাপও আমার খুব প্রিয় কিন্তু মনের অবস্থা কয় দিন ধরে আমার এমন চলছে যে, ও-সব তুচ্ছ কথা ভাববারই অবকাশ পাইনি।'

নার্সিং হোম হ'তে বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

সত্যি কথা বলতে গেলে মনের মধ্যে কিছুটা হতাশা ও ঘনীভূত একটা বিস্ময় নিয়েই।

হোটেলে আমাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে, তা বুঝতে পারিনি। হোটেলের বারান্দায় উঠতেই দেখি, থানার দারোগা রসময় ঘোষাল আমাদের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে বসে আছেন। আমাদের দেখেই রসময় বললেন: 'এই যে কিরীটি বাবু? কোথায় ছিলেন। কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।'

'ব্যাপার কি ?—' কিরীটি প্রশ্ন করে।

'কাল রাত্রে যে নিরালায় চোর এসেছিল।—'

'নিরালায় চোর এসেছিল ?—'

'হাঁ।' ষ্টুডিও-ঘরের তালা ভেঙ্গে চোর ঢুকেছিল।—'

কিরীটি কথাটা শুনে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চম্‌কে ওঠে: 'কি বললেন, ষ্টুডিও ঘরে চোর ঢুকেছিল ?'

'হাঁ।—'

'কিছু চুরি গিয়েছে জানেন ?—'

'তা ত' বলতে পারি না, তবে অবিনাশের হাত দিয়ে হরবিলাস ঘোষ একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। এই সেই চিঠি—'

রসময় ঘোষাল একটা চিঠি কিরীটির দিকে এগিয়ে দিলেন।

[ক্রমশঃ।

"মানুষের জীবনে দু'টি বিয়োগান্ত দুঃখ আছে। প্রথম, মনের মানুষকে পাওয়া এবং দ্বিতীয়, না পাওয়া।"

—জর্জ বার্ণার্ড শ

ডি. এচ. লরেন্স

মোরেল আর জেরি রেষ্টউড-এ ফিরে এল ; মনের বোঝা অনেকখানি কমে গেল তাদের। এবার আর এমন ভয় নেই যে রেলগাড়ীতে চড়ে কোথাও যেতে হবে, কাজেই শেষ বেলার ফুর্ত্তিটা জমিয়ে যাওয়াই উচিত। পথিকরা বাড়ীর কাছে ফিরে এলে তাদের যেমন মনে আনন্দ জাগে, তেমনি উল্লাস নিয়ে তারা দু'জনে গিয়ে ঢুকল 'নেলসন'-এর মদের দোকানে।···

পরের দিন থেকে কাজ। সে কথা ভেবে দোকানের সবাই একটুখানি দমে গেছে। তাছাড়া টাকা-পয়সা প্রায় সবারই খরচ হয়ে গেছে। কেউ কেউ এখনই বিষণ্ণ মনে ফিরে যাচ্ছে, কালকে আবার ভোর বেলায় উঠতে হবে। যাবার সময় করুণ সুরে গান ধরেছে তারা ; তাই শুনে মিসেস্ মোরেল ঘরে ঢুকে গেলেন। ন'টা বাজল···তারপর দশটা। তবু মাণিকজোড় দুটি তখনও ফিরে এল না। পাশেরই কোন বাড়ীর চৌকাঠে শুয়ে একটা লোক মদের নেশায় টেনে টেনে সুর ধরেছে : 'ওগো জ্যোতির্ম্ময় প্রভু, দেখাও মোরে পথ'—। প্রার্থনার গান···শুনে মিসেস মোরেলের গা জ্বালা করে। মদ খেলেই যেন ওদের ভক্তি উথলে ওঠে! আচ্ছা, না হয় মদের ঝোঁকে দুটো প্রেমের গানই গাইলি, তাই ব'লে প্রার্থনার সুন্দর গানগুলো নিয়ে টানাটানি কেন?

রান্নাঘরে সেদ্ধ হপ্-শাকের গন্ধ। বীয়ার তৈরি করা হচ্ছে। একটা কালি-পড়া সস্‌প্যান থেকে ধোঁয়া উঠছে ধীরে ধীরে। মিসেস মোরেল একটা পাত্র থেকে এক তাল চিনি নিয়ে ফেলে দিলেন সস্‌প্যান্‌টাতে। তারপর ঐ তরল পদার্থটা ছেঁকে রাখতে গেলেন।

ঠিক এই সময় মোরেল এসে হাজির। নেলসনের দোকানে খুব আমোদ ক'রে এসেছে, কিন্তু বাড়ি আসতে-না-আসতেই বিগড়ে গেছে তার মেজাজ। কেমন যেন শরীরে যন্ত্রণা লাগছে ; সেই যে দুপুর বেলা মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল, তারপর থেকেই শরীরটা জুত নেই। বাড়ির কাছে এসে একটু বিবেকের দংশনও বোধ হয় অনুভব করল মনে মনে। কেন যে এত রাগ হতে লাগল, ঠিক বুঝতে পারল না। বাগানের কটকটা খুলতে না পেরে এক লাথি মেরে তার খিলটা ভেঙে ফেললে। মিসেস মোরেল যখন সস্‌প্যান থেকে বীয়ারটা ঢেলে রাখছিলেন, সেই মুহুর্ত্তেই সে এসে ঘরে ঢুকল। একটু টুলতে টুলতে এসে দাঁড়াল রান্নার টেবিলটার গা ঘেঁষে, তাতে ঐ তরল পদার্থটা ঝাঁকুনি লেগে খানিকটা চলকে পড়ল। মিসেস্ মোরেল চমকে উঠলেন। গলার সুর চড়িয়ে বললেন, 'কী সর্ব্বনাশ, মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে তুমি?'

—'কী হয়ে? কী বললে তুমি?' ব'লে মোরেল খেঁকিয়ে উঠল। তার মাথার টুপিটা নিচু হয়ে চোখ দুটোকে ঢেকে রেখেছে।

হঠাৎ মিসেস্ মোরেলের সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে গেল। 'বলো, বলো তুমি মদ খেয়ে আসো নি?' চীৎকার করে উঠলেন তিনি। সস্‌প্যানটা নিচে নামিয়ে তাতে চিনি মেশাতে লাগলেন। মোরেল দু'হাত দিয়ে ভর রাখলে টেবিলের উপর, তারপর মুখ তুলে ভালো করে চাইলে তাঁর দিকে।

'হ্যাঁ, মদ খেয়ে আসো নি! বললেই হ'ল আর কি?' সে ভেংচি কেটে বললে, 'তোমার মত জঘন্য মেয়েছেলে ছাড়া এমন কথা আর কেউ ভাবতে পারত না।'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অন্য কিছুর বেলাতে টাকা নেই, কিন্তু মদ খাবার বেলায় দিব্যি টাকা এসে জোটে।'

—'চুপ কর। আজকে মাত্র দু'শিলিংও আমি খরচ করিনি।'

—'ও, এক পয়সা খরচ না করেই তুমি দিব্যি ভরপুর হয়ে এসেছ।' ক্রমশঃ তাঁর মেজাজ চড়তে লাগল। তিনি বললেন, 'আর যদি তুমি তোমার ঐ প্রাণের বন্ধু জেরির ঘাড় ভেঙে মদ খেয়ে এসে থাকো, তা'হলে তাকে বোলো সে যেন তার ছেলেমেয়েদের দিকে একটু নজর দেয়। বেচারিদের দেখবার লোক দরকার।'

—'ডাহা মিছে কথা বলো না বলছি। তুমি চুপ করবে কিনা শুনি?' দু'জনেই মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে উঠল। পরস্পরকে তারা ঘৃণা করে, এখন এইটেই একমাত্র সত্য তাদের জীবনে, দু'জনে মারমুখো হয়ে উঠল একেবারে। মিসেস মোরেল রাগে দিশাহারা হয়ে গেলেন আর তাঁর স্বামীও। অবশেষে স্বামী তাঁকে মিথ্যেবাদী বলে গাল দিলে। উত্তেজনায় মিসেস মোরেলের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল। মুখ তুলে বললেন, 'না— মিথ্যেবাদী তুমি আমাকে বলতে পার না। মিথ্যেবাদী তুমি নিজে— তোমার মত এমন জঘন্য মিথ্যেবাদী পৃথিবীতে নেই!'

টেবিলের উপর ঘুষি মেরে মোরেল গর্জ্জে উঠল : 'তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি—তুমি—তুমি!'

মিসেস মোরেল হাত দুটি মুঠো করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি একেবারে নরক করে তুলেছ বাড়িটাকে।'

'বটে, তা বেশ—তা'হলে বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে—এ বাড়ি আমার। যাও বেরিয়ে।' এর পর আরও চীৎকার করে বলতে লাগল, 'টাকা রোজগার করি আমি, তুমি নয়। বাড়ি আমার, তোমার নয়। যাও বেরিয়ে, বিদেয়-হও!'···

নিজের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে চোখ ফেটে জল এলো তাঁর। বললেন, 'তাই যেতুম।···হ্যাঁ, অনেক দিন আগেই চলে যেতুম—শুধু এই ছেলেমেয়ে দুটোর জন্তে।···যখন একটা শুধু কোলে ছিল তখন কেন চলে যাইনি?···কী দুর্ব্বুদ্ধিই হয়েছিল আমার!' ব'লে চোখ মুছে রাগে কাঁপতে কাঁপতে আবার বললেন, 'ভেবেছ তোমার জন্তে আমি রয়ে গেছি! না, তোমার জন্তে এক মুহূর্ত্তও আমার এ বাড়িতে থাকবার প্রবৃত্তি নেই।'

—'তবে যাও' রাগে অন্ধ হয়ে মোরেল চীৎকার করে উঠল, 'যাও বলছি।'···

—'না।' ঘুরে এসে সামনে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন দৃপ্তকণ্ঠে, 'না তুমি যা চাইবে, তাই হবে, তোমার খেয়াল-খুশি মতে চলতে হবে আমায়?···ছেলেমেয়ে দুটো রয়েছে, ওদের দেখতে হবে। আমাকেই দেখতে হবে।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'যেমন কপাল আমার। তোমার হাতে ও দুটোকে ফেলে দিয়ে যাব।'···

মোরেল ঘুষি পাকিয়ে তুললে। তার গলা যেন কাঠ হয়ে আসছে, চীৎকার করে বলে উঠলো, 'যাও। বেরিয়ে যাও বলছি।'··· নিজের স্ত্রীকেই আজ তার কেমন যেন ভয় করছে।

শান্ত সুরে জবাব দিলেন মিসেস মোরেল, 'চলে যেতে পারলে ভালোই হ'ত, খুশি হতাম আমি।···ওগো মহাপ্রভু, তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম।'···

মোরেল এগিয়ে গেল। তার গৌরবরণ মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। এগিয়ে এসে জোরে সে স্ত্রীর হাত চেপে ধরলে। ভয়ে বিহ্বল মিসেস মোরেল আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, চেষ্টা করলেন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল মোরেল, এবার যেন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বাইরের দরজার দিকে তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল। তারপর ঘর থেকে তাঁকে বের করে দিয়ে খিল এঁটে দিল সশব্দে। আবার গিয়ে ঢুকল সে রান্নাঘরে। ঢুকে একটা লম্বা চেয়ারের উপর ধপ ক'রে বসে পড়ল। তার সমস্ত রক্ত তখন মাথায় চড়ে গেছে। কিছুক্ষণ সে দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ব'সে রইল। আস্তে আস্তে তার তন্দ্রা এল—খানিকটা ক্লান্তিতে এবং খানিকটা নেশার ঝোঁকে সে গভীর নিদ্রার মধ্যে ডুবে গেল।

তখন মাথার উপরে চাঁদ উঠেছে। আগষ্ট মাসের মনোরম জ্যোৎস্না। বুক ফেটে যাচ্ছে মিসেস মোরেলের—জ্যোৎস্না যেন তাঁর গায়ে এসে বিঁধছে। তাঁর তেতে-ওঠা মনে যেন কাঁপন জাগিয়ে তুলেছে বাইরের এই হিমেল রাত আর আকাশ-ধোয়া জ্যোৎস্না। একান্ত নিরুপায়ের মত, অসহায়ের মত তিনি তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। দূরে রুবর্বে গাছের বড়ো বড়ো পাতাগুলো চাঁদের আলোয় ঝকমক ক'রে উঠছে। আস্তে আস্তে একটু শান্ত হ'ল তার প্রাণ—প্রাণ ভ'রে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। বাগানের রাস্তা ধরে হেঁটে চললেন ধীরে ধীরে, তখনও তাঁর সারা অঙ্গ যেন কাঁপছে। দেহের মধ্যে আগন্তুক শিশুর সাড়া পাচ্ছেন যেন। অনেকক্ষণ অবধি মন স্থির করতে পারলেন না, থেকে থেকে শুধু ওই কথাই মনে পড়ে, এক মুহূর্ত্তের কথা আবার যেন কানে এসে বাজতে থাকে, আর বুকে বেঁধে তপ্ত লৌহশলাকার মত। বার বার, বহু বার, শুধু ঐ কথাই মনে পড়তে লাগল আর দুঃখের আগুনে পুড়তে লাগলেন মিসেস মোরেল। অবশেষে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। এই আধ ঘণ্টা কাল তিনি যেন বিকারের রুগীর মত আশপাশের কথা সব ভুলে গিয়েছিলেন। এবার চেতনা ফিরে আসতেই মনে হ'ল এই নিশুতি রাত্রির কথা। ভয়ে তিনি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। ঘুরতে ঘুরতে কখন তিনি পাশের বাগানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার দেখলেন লম্বা দেয়ালটার নিচে ঝোপের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, সেইখানে পায়চারি করছেন তিনি। ছোট এক ফালি বাগান, কাঁটার ঝোপ দিয়ে ঘিরে দুই ব্লকের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে তারই এক পাশে বাগানটি তৈরি করা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি মিসেস মোরেল পাশের বাগান থেকে চলে এলেন সামনের বাগানে। এখানে জ্যোৎস্না যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সেই জ্যোৎস্নার অকূল-পাথারে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর সামনে আকাশ থেকে চাঁদের আলো যেন গলে গলে পড়ছে, সামনের পাহাড়গুলো থেকে জ্যোৎস্না ছিটকে এসে এদিককার বাড়ীগুলোকে আলোকিত করে তুলেছে। চারিদিকের আলো যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এখানে এসে উত্তেজনায় তাঁর আবার শ্বাসরোধ হতে লাগল, কান্নায় বুক ভরে উঠল, নিজের মনে মনেই বলতে লাগলেন, 'কী যন্ত্রণা! কী ভীষণ যন্ত্রণা!'

হঠাৎ কেমন চমকে উঠলেন তিনি। মনে হ'ল, তাঁর আশে-পাশে কিসের যেন সাড়া পাচ্ছেন। যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে জাগ্রত করলেন তিনি, চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন কেন তার এমন ভয় ভয় করছে। দূরে চাঁদের আলোয় স্থলপদ্মের গাছগুলো দুলছে, চারিদিকের বাতাস তার সুগন্ধে ভরপুর। ক্রমশঃ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন মিসেস মোরেল, জোরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হাত দিয়ে স্থলপদ্মের বড়ো বড়ো পাপড়িগুলো স্পর্শ করলেন, তার পর ভয়ে কেঁপে উঠলেন। মনে হ'ল, যেন চাঁদের আলোতে ফুলের গাছগুলো ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। একটা সাদা ফুলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন, কিন্তু চাঁদের আলোতে সোনালী রেণুগুলো চোখেই পড়ল না। নিচু হয়ে ফুলের মধ্যে খুঁজে দেখলেন, রেণুগুলো দেখা যাচ্ছে যেন ধূসর রঙের। গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুলের গন্ধ অনেকটা যেন টেনে নিলেন তিনি,—ফুলের গন্ধে তাঁর সারা শরীর আচ্ছন্ন হয়ে এল।

বাগানের ফটকটার উপর ভর দিয়ে খানিকক্ষণ তিনি বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। সব কিছু যেন তিনি ভুলে গেছেন, এমন কি নিজের মনের ভাবনাগুলো অবধি যেন বোধগম্য হচ্ছে না তাঁর। গন্ধ যেমন হাল্‌কা বাতাসে মিশে যায়, ঠিক তেমনি তাঁর সমস্ত সত্তা যেন এই আলোয়, এই বাতাসে মিশে গেছে। একটু শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, আর ওই জঠরের শিশুটা—এ ছাড়া নিজের সম্বন্ধে আর কোন চেতনা তাঁর রইল না। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিজে, তাঁর অন্তরের সন্তান, সব কিছু যেন এই জ্যোৎস্নার সমুদ্রে মিশে গেল, ডুবে গেল। এই পাহাড়, এই স্থলপদ্মের ঝাড়, এই জ্যোৎস্নামাখা বাড়িগুলো,—সব কিছু একসঙ্গে মিশে যেন একটা তন্দ্রার সমুদ্রে তরঙ্গের মত দুলছে।

আবার একটু একটু করে তাঁর চেতনা ফিরে আসতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ঘুম পেতে লাগল তাঁর। বিবশার মত চার দিকে তাকিয়ে দেখলেন—সাদা ফ্লক্সের (Phlox) ঝাড়গুলোকে মনে হচ্ছে যেন একটা ঝোপের উপর তুলো ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, একটা পতঙ্গ তার উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাগানের মধ্যে চলে গেল। ওটা কোন দিকে গেল লক্ষ্য করতে গিয়েই তিনি সজাগ হয়ে উঠলেন। ফ্লক্স-এর ঝাঁঝাল গন্ধেও তাঁর লুপ্ত শক্তি ফিরে আসতে লাগল। আবার তিনি বাগানের রাস্তা ধরে ফিরে চললেন, চলতে চলতে আবার একটু থমকে দাঁড়ালেন সাদা গোলাপের ঝোপটার পাশে। পরিষ্কার মিষ্টি গন্ধ। হা'ত দিয়ে সাদা পাপড়িগুলো একটু স্পর্শ করলেন তিনি। এই সজীব সুগন্ধ, এই কোমল শীতল পুষ্পদলের স্পর্শ—সব কিছু মিলে তাঁর মনে হতে লাগল তিনি যেন সূর্য্যালোক

আর প্রভাতের সাড়া পাচ্ছেন। এই ফুলগুলো তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু এখন ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে, বড়ো ক্লান্ত তিনি। বাইরে রহস্যময়ী রাত্রি—তার মধ্যে নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়।

চারিদিকে নিঝুম নিঃশব্দ। ছেলেমেয়েদের ঘুম এত চেঁচামেচিতেও ভাঙেনি—অথবা ভেঙে থাকলেও আবার তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। তিন মাইল দূরে রেলের রাস্তা, সেখান দিয়ে একটা ট্রেন গর্জন করে চলে গেল, সারা উপত্যকা জুড়ে তারই প্রতিধ্বনি। যতদূর চোখ যায়, শুধু রাত্রির রূপ, যেন অনন্ত দেশ জুড়ে রাত্রি তার আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। রহস্যের মত লাগে। আবার এই রূপালী-ধূসর রাত্রির বুক চিরে কত ধরণের অস্পষ্ট, অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে—একটু দূরে কেঠো-পোকার শব্দ, চলে-যাওয়া ট্রেনের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, অথবা দূর থেকে ভেসে-আসা মানুষের গলার স্বর।

একটু শান্ত হয়েছিল তাঁর বুক—আবার কি এক অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে ধুক-ধুক করতে লাগল। তাড়াতাড়ি তিনি পাশের বাগান পেরিয়ে বাড়ির পেছনে চলে গেলেন। দরজা তখনও খিল-আঁটা। আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিলেন তিনি, একটু অপেক্ষা করে আবার ঘা দিলেন। জোরে ঘা দেওয়া ঠিক হবে না—ছেলেমেয়েরা যদি জেগে ওঠে, কিম্বা প্রতিবেশীরা? কিন্তু তাঁর স্বামীর ঘুমও ত' সহজে ভাঙবার নয়। ঘরের ভিতরে যাবার জন্যে তাঁর মন ছটফট করতে লাগল। দরজার হাতলটার উপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরে বেশ শীত পড়েছে; যদি তাঁর ঠাণ্ডা লেগে যায়···বিশেষ করে এই অবস্থায়! তাড়াতাড়িতে গায়ের চাদরটা ভালো ক'রে জড়িয়ে নিয়ে মাথা আর হাত দুটি ঢোকালেন। আবার পাশের বাগানে গিয়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন, দেখলেন জানালার নিচে টেবিলের উপর হাত আর মাথা গুঁজে রেখে স্বামী অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার হাব-ভাব দেখে মিসেস মোরেলের মনে হতে লাগল সব ছেড়ে কোন দিকে চলে যান। দেখলেন, ঘরের আলোটা তামাটে রঙের হয়ে এসেছে, প্রদীপটা নিশ্চয়ই নিবে এলো। জানালার উপর হাত দিয়ে ঘা দিতে লাগলেন তিনি। জোরে, আরও জোরে। এক একবার ইচ্ছে হ'ল জানালার কাচ ভেঙে ফেলেন। কিন্তু মোরেলের ঘুম তবু ভাঙল না।

সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল। ক্লান্তিতে এবং ঠাণ্ডা দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেও, মিসেস মোরেলের সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। যে সন্তানটি এখনও জন্ম নেয়নি, তার জন্যেই বেশী করে ভাবনা হতে লাগল তাঁর—কী করে একটু গরম রাখবেন তাকে ভেবে পেলেন না। কয়লা রাখবার ছোট কুঠরীটিতে একটা পুরোন কম্বল ছিল, এর আগের দিন ছেঁড়া কাপড় নিতে একটা লোক এসেছিল, তাকে দেখাতে গিয়েই বাইরে এনেছিলেন কম্বলটা। কোন মতে কাঁধের উপর দিয়ে সেইটাকেই জড়িয়ে নিলেন। ময়লা হলেও, জিনিসটা গরম।··· তারপর আবার বাগানের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। মাঝে মাঝে এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দেন, জোরে ঘা দেন জানালার কাঠে, আর মনে মনে ভাবেন, আর কিছু না হোক, যে রকম অদ্ভুত ভাবে শুয়ে আছে লোকটা, কিছুক্ষণ পরে আপনা থেকেই সে জেগে উঠবে।

এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। আবার অনেকক্ষণ ধরে তিনি জানালায় ঘা দিতে লাগলেন। ক্রমশঃ তার শব্দ গিয়ে মোরেলের কানে প্রবেশ করতে লাগল। তখন তিনি নিরাশ হয়ে ঘা দেওয়া বন্ধ করেছেন, হঠাৎ দেখলেন একটু নড়ে-চড়ে উঠেছে মোরেল, তারপর মুখ তুলে চারিদিকে চাইল। তার নিজের শোবার কষ্টই তাকে জাগিয়ে তুলেছে। মিসেস মোরেল আবার ঘন ঘন নাড়া দিতে লাগলেন জানালা ধরে। এবার মোরেল ধড়মড় করে উঠে পড়ল। বাইরে থেকে দেখা গেল সে হাত দুটো মুঠো করে বড় বড় চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছে। ভয় তার একটুও নেই। বিশটা চোর এলেও, সে নির্ভয়ে এগিয়ে যাবে। বিহ্বলের মত সে চারিদিকে চাইতে চাইতে একটা বিপদের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি হ'ল।

—'দরজা খোল, ওয়াল্টার', মিসেস মোরেল বললেন। তাঁর গলার সুরে বিন্দুমাত্রও আবেগ নেই।

মোরেলের হাতের মুঠো খসে পড়ল। কী সে করেছে, এবার তার চৈতন্য হ'ল। বিরক্তি এল তার, কিন্তু তবু নিজের অন্যায় স্বীকার করতে পারলে না,—শুধু মাথাটা আপনা-আপনি নুয়ে এল। মিসেস মোরেল বাইরে থেকে দেখতে পেলেন, সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলল। ঘরের ক্ষীণ আলোতে অভ্যস্ত তার চোখ, বাইরের অবাধ চাঁদের আলো সহ্য করতে পারলে না। তাড়াতাড়ি সে পেছনে হটে গেল।

মিসেস মোরেল যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন শুধু দেখতে পেলেন স্বামী যেন তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। তাড়াতাড়িতে গলাবন্ধের বোতাম ছিঁড়ে ফেলে রেখেই সে পালিয়ে গেছে! তার আচরণে মিসেস মোরেলের রাগ বাড়ল বই কমল না।

গৃহের উষ্ণতায় ফিরে এসে নিজেকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা করলেন তিনি। ক্লান্তিতে আগের কথা কিছুই আর মনে ছিল না। ঘরের কাজ যা যা বাকি ছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলো সেরে ফেলতে লাগলেন। স্বামীর সকাল বেলার খাবার সাজিয়ে রাখলেন, খনির নিচে নিয়ে যাবার বোতলটা ধুয়ে রাখলেন, পরনের কোট আর জুতো-জোড়া রাখলেন আগুনের পাশে। তারপর একটা রুমাল, ব্যাগ আর দুটো আপেল বের করে রাখলেন তার জন্যে। আগুনটা খুঁচিয়ে জ্বালালেন আবার; জ্বালিয়ে উপরে গেলেন শোবার জন্য। মোরেল তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। ঘুমের মধ্যে তার ক্ষীণ ভ্রূদুটি কুঁচকে রয়েছে, যেন জীবনের সমস্ত বিরক্তি আর জ্বালার বহিঃপ্রকাশ। তার গালের রেখাগুলো আর তার বাঁকানো মুখ যেন বলছে, 'সাবধান, তুমি যেই হও না কেন, তোমার কোন তোয়াক্কা আমি রাখি না। আমার যা খুশি, আমি তাই করব।'

মিসেস মোরেল তাকে ভালো করেই জেনে রেখেছেন। তার দিকে তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন তাঁর নেই। তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন বড়ো আয়নাটার সামনে। ব্রুচটা খুলতে গিয়ে দেখলেন তাঁর সমস্ত মুখ জুড়ে হলুদের ছোপ! স্থলপদ্মের রেণুগুলো লেগেছে তাঁর মুখে। ক্ষীণ হাসির রেখা খেলে গেল তাঁর ঠোঁটে। তাড়াতাড়ি পদ্মরেণুগুলো মুছে ফেললেন মুখ থেকে, অবশেষে গিয়ে আশ্রয় নিলেন শয্যায়। কিছুক্ষণ অবধি তাঁর মন ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—আগুনের ফুলকি যেমন ছিটকে আসতে থাকে, তেমনি অবাধ্য ভাবনাগুলো আসতে লাগল তাঁর মন থেকে। অবশেষে এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনও তাঁর স্বামীর ঘুম ভাঙেনি—নেশার ঝোঁকে আরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে অঘোরে ঘুমোতে লাগল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক :—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য

রোজকার ধূলোময়লার
রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন
লাইফবয়ের
ফেনার আবরণে
যতোই কেন হুঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধূলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফ্‌বয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।
লাইফ্‌বয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধূলোময়লার বীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয় সাবান
দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা
L. 230-50 BG

ছোটদের আসর

শান্তিনিকেতন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীসাধনা কর

রবীন্দ্রনাথ অনেক লেখাই লিখেছেন এ-বাড়িতে বসে। মহর্ষি-দেবের ব্রহ্মসাধনা এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা এ-বাড়িতে পরিপুষ্ট হয়েছে। একত্রিশ বছর বয়সে কবির শান্তিনিকেতন বাস সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীতে আছে "'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটির পরিপূরক হইতেছে 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা'—মাস দেড় পরে বোলপুরে রচিত। কবিতা তিনটি পর-পর পড়িলে উহাদের মধ্যে একটি মিলনসূত্র সহজেই পাঠকের চোখে পড়িবে। দারুণ গ্রীষ্মে সপরিবারে বোলপুরে আসিলেন ; এখন কবির বয়স একত্রিশ ; তাঁহারা থাকেন 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতল বাড়িতে।...এই সময়কার কতকগুলি পত্র আছে 'ছিন্নপত্রে'র মধ্যে, অধুনা প্রকাশিত আরও কতকগুলি পত্রে।...

সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক গদ্য লেখা প্রচুর লিখিতে হয় সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এবার শান্তিনিকেতনে বাসকালে যে কয়েকটি কবিতা লিখিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি রূপকথারই অনুক্রমণ।"

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লেখেন "আমরা ও তোমরা," "হিং টিং ছট" ও তার পরদিন "পরশপাথর"—বিখ্যাত কবিতাটি। নাটকের প্লটও তাঁর এ সময় মাথায় ঘুরছিল।

মহর্ষিদেব যেমন লোকালয়ের কলরব ত্যাগ ক'রে এখানে চলে আসতেন রবীন্দ্রনাথও অনেক সময় তাই করতেন। প্রথম কন্যাকে মজঃফরপুর স্বামিগৃহে রেখে তাঁর মন ভারাক্রান্ত ছিল, শান্তিনিকেতনের বাড়িতে চলে এলেন,—"আজ শান্তিনিকেতনে এসে শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েছি। মাঝে মাঝে এ রকম আসা যে কত দরকার তা না এলে দূর থেকে কল্পনা করা যায় না।"

—(চিঠিপত্র ১ম খণ্ড, ৩৪ নং)

"১৩০৮ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হল, তখনও কেবল এই কুঠিবাড়ি 'শান্তিনিকেতন', ব্রহ্মমন্দির এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য একখানি একতলা বাড়ি ছিল। লাইব্রেরীর বাড়িতে পরিণত হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' গৃহে বাস করছেন, সেটি আশ্রমের অতিথিশালাও; তাই মৃণালিনী দেবী ও অন্যান্য সন্তানদের কবি শান্তিনিকেতন আনিতে পারিলেন না, তখন একমাত্র অতিথিশালা ছাড়া আর কোনো থাকিবার মতো বাড়ি ছিল না। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে' ছাত্র-অধ্যাপকরা কোনো মতে থাকিতেন।"

—(র-জী, ২য় খণ্ড পৃ ৩৮)

১৩০৯ সালে "গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে মৃণালিনী দেবী পুত্রকন্যাদের লইয়া আসিয়া অতিথিশালায় উঠিলেন, তখন আর কোনো বাড়িই ছিল না বাসের উপযোগী।"—(র-জী, ২য় খণ্ড পৃ ৬০)

এবারই মৃণালিনী দেবীর এখানে শেষবারের মতো আসা। মাস তিনেক ছিলেন, অসুস্থ হয়ে ভাদ্র মাসে চলে যান। তিনিও এই একটি মাত্র বাড়িতেই বাস করে গেছেন। 'নূতন বাড়ি' তাঁদের বাসের জন্য তৈরী হচ্ছিল, অগ্রাণ মাসে তিনি মারা গেলেন ; স্ত্রীর শ্রাদ্ধ-কার্য সম্পন্ন করে রবীন্দ্রনাথ অবিলম্বে ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। ছেলেমেয়েরা 'নূতন বাড়ি'-তে গিয়ে থাকলেন, সঙ্গে রইলেন দূর-সম্পর্কীয়া রাজলক্ষ্মী দেবী। রবীন্দ্রনাথ তখনো সেই 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতল গৃহে রইলেন। স্ত্রীর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটিতে কবির পত্নীবিয়োগের দিনগুলি কাটছে; যথাবিধি তিনি অন্যান্য কাজকর্ম এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য লিখছেন ছোট গল্প "আর লিখলেন কতকগুলি কবিতা যেগুলি 'স্মরণ' ও 'উৎসর্গ'-এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে।" (র-জী, ২ খণ্ড পৃ ৭২)

এই গৃহের স্মৃতিই কি সেদিন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ব্যথার আঘাত হেনে লিখিয়েছিল "আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই"। ('স্মরণ') এ সময় অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা মনোকষ্টের মধ্য দিয়ে কবির দিন অতিবাহিত হয়েছে। আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য নানা রকম দুশ্চিন্তা স্ত্রীবিয়োগে মানসিক কষ্ট, সংসারে দারুণ অর্থাভাব, এরই মধ্যে মধ্যম কন্যা রেণুকা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে এর কিছুকাল মধ্যেই তরুণ কবি ও সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। তাঁর সাহচর্য কবির পক্ষে খুবই সময়োপযোগী হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই বাড়ি ছেড়ে আশ্রমের অন্য বাড়িতে যান ১৯০৬ সালে। "দ্বিপেন্দ্রনাথ আসিয়া শান্তিনিকেতন অতিথিশালা অধিকার করিলেন। সেইখানে তিনি প্রায় ষোলো বৎসর ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তাঁহার পুত্রকন্যাদের জন্য একখানি খড়ো বাড়ি ('নূতন বাড়ি') নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারই পাশে নিজে থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র এক কামরার একখানি দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করাইলেন। ইহা এখন 'দেহলি' নামে পরিচিত।"

—(র-জী, ২ খ পৃ ১১)

অর্থাৎ ১৯০৬ সালের আগে অবধি শান্তিনিকেতনে কবির লেখা সব এই শান্তিনিকেতন গৃহে বসেই লিখিত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি গেলেন বটে, কিন্তু বারে বারেই এই অতিথিশালাতেই তিনি এসে বাস করতেন। নোবেল প্রাইজ নেবার পর সেবারও বিদেশ ঘুরে এসে অতিথিশালায় বাস করেছিলেন "কবি শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার দ্বিতলে আছেন—চারদিক নিস্তব্ধ, বিদ্যালয়ে ছুটি, পুরাত

হয় তাঁর গানের ধারা খুলে যায়, গীতিমাল্যের অন্তর্গত অনেকগুলি গান তিনি লেখেন। এ বাড়িটিতে বাস করবার সময়ে এই ঋতুর শেষেই তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার সংবাদ এসে পৌঁছায়। অনেক দিন পর্যন্ত এই বাড়িটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে। একেবারে শেষ বয়সে উত্তরায়ণের বাড়ি তৈরী হলে সেটাই কবির স্থায়ী আবাসস্থল হয়। নয় তো দেখা যায় স্কুলের কুটিবাড়ি এবং আশ্রমের অন্যান্য বাড়ি তৈরী হয়েছে, তিনিও থাকছেন সে সবে, আবার মাঝে মাঝেই এসে অতিথিশালার দ্বিতলে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। এই গৃহেই সেই যুগে গণ্যমান্য অতিথিদের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, নানা রকম আলোচনা হয়েছে। এণ্ড্রুস, মহাত্মাজি এবং রবীন্দ্রনাথের এ গৃহে সাক্ষাৎকার এবং আলাপ-আলোচনা হয়েছিল; অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত 'ত্রয়ী' নামক বিখ্যাত ছবি সে স্মৃতি বহন করছে। পিয়ার্সন সাহেব প্রথমে এসে এই বাড়িতেই কিছুদিন অতিথি ছিলেন। রবীন্দ্র-জীবনীতে আছে "মনে আছে অজিতকুমার অতিথিশালার দ্বিতলে গীতাঞ্জলির গান একটির পর একটি গাহিয়া যাইতেছেন—পিয়ার্সন শুনিতেছেন, কি, ধ্যানমগ্ন আছেন বুঝা যাইতেছে না।"

এই বাড়িটি রবীন্দ্রনাথের অনেক সুখের স্মৃতি অনেক ব্যথার গীতির নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবু এ-বাড়িটিতেই সাধক মহর্ষিদেব এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই পেতেন মহা শান্তি। এই বাড়িটির পূব-দক্ষিণ কোণে একটি উঁচু মাটির ঢিবি ছিল; রবীন্দ্রনাথ "আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা" প্রবন্ধে লিখছেন, "আমার মনে পড়ে, সকাল বেলা সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি (মহর্ষিদেব) ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ের উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়।" মহর্ষিদেবের এই ধ্যানের ধারাটি রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' গৃহে বাসকালে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যূষে এই উঁচু ঢিবিটির উপর এসে বসতেন, নীরব হয়ে দেখতেন পূব-দিগন্তে সূর্যোদয়। কালে এই ঢিবিটির উপরে মাটির একটি লম্বা ঘর হয়; তার নাম ছিল "বাগান বাড়ি।" এই বাড়িটিতেই এসে থেকেছিলেন গান্ধীজি ও ফিনিক্স স্কুলের মণ্ডলী, পরে মুনী জিন বিজয়জীর জৈনমণ্ডলী। তারও পরে এটি "সংস্কার সমিতি"র আবাসিক শিক্ষাগার হয়ে নাম পায় "সংস্কার-ভবন।"

'শান্তিনিকেতন' বাড়িটিও অনেক দিন ধরে আশ্রমের অতিথিশালা (guest house) নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে ছিল, বছরে বছরে, দিনে দিনে, প্রতি উৎসবে কত শত লোক অতিথি হয়ে স্থান পেয়েছেন এখানে। সেই প্রথম দিনের শান্তিনিকেতন দিনে দিনে বৃহৎ শান্তিনিকেতনে পরিবর্তিত হয়েছে, কত তার রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু 'শান্তিনিকেতন' গৃহটি সবার জন্যে ছিল উন্মুক্ত। এত অতিথি সমাগম হতে লাগল, এ অতিথিশালায়ও স্থান সঙ্কুলান হয়ে উঠল না, তৈরী করতে হল নূতন অতিথিশালা। বর্তমানে 'শান্তিনিকেতন' গৃহ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাভবন (Post Graduate Department)। উপরের ঘরে ঘরে অধ্যাপকগণ নিমগ্ন থাকেন পুঁথিপত্রে; বারান্দায় বারান্দায় দেশী-বিদেশী বিদ্যার্থীর দল, জ্ঞান অর্জনে থাকেন লিপ্ত; নীচের ঘরে ক্লাস হয়। সাধনা করবার জন্যেই একদিন নির্মিত হয়েছিল এ-গৃহ, মহাসাধক পিতাপুত্রের সাধনায় [illegible] দেশী-বিদেশী বিদ্যার্থী সাধকদল এসে তাঁদের জ্ঞানসাধনায় উজ্জ্বল করবেন এ গৃহ, লাভ করবেন "সত্যাত্ম প্রাণারামং মনআনন্দং।"

খামখেয়ালী ছড়া

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ওল্ খাওয়ার জের

সাঁতরাগাছির ওল্ খেয়েছেন সাতকড়িলাল সাঁতরা
চুলকানি হায় ধর্‌লো গলায়, রইলো না তার মাত্রা।
"পাথর খেয়েও হজম করি" এই ছিলো তার গর্ব্ব
সাঁতরাগাছির ওলের ঠেলায় এবার হলো খর্ব্ব।
জল খেলেই জানেন গলা ধর্‌বে আরো জোর যে
চেঁচান তবু "তেষ্টাতে বুক ফাট্‌ছে আহা মোর যে।"
হনহনিয়ে এলেন ছুটে শুনে তাহার কান্না
ডাক্তারীতে হাত-পাকানো কৃতান্তলাল মান্না,
বার করে পিল্ হোমিওপ্যাথির বলেন "এটি গিললে
এপার ওপার একটা যাহোক্ হবেই হবে হিল্লে।"
এলেন ধেয়ে হেমাঙ্গ সেন হাড়-পাকানো বদ্যি;
বলেন হেসে "হোমিওপ্যাথি? একেবারে রদ্দি।
কণ্ঠশুদ্ধি পাচন দেবো, খেলে তা একবার যে
এই জীবনে কখ্‌খনো না ধরবে গলা আর যে।"
শান্ত পিসি বলেন শুনে "শোন্ রে বাছা ছোট্‌কা।
সবার সেরা ওষুধ পাবি আমার কাছে টোট্‌কা।
শ্যাওড়া গাছের মূলের সাথে শুক্‌নো বটের ছাল্ রে
আজ্‌কে বেটে গিল্‌লিস যদি, সারবে গলা কাল রে।"
ভয় পেয়ে কয় সাতকড়িলাল দুচোখ করে হল্‌দি
"সবুর করা সইবে না তো সারতে যে চাই জল্‌দি।
গলাধরার জ্বালা আমার কম্‌ছে না তো, বাড়্‌ছে।
এত আমার সাধের গলা তার দফা যে সার্‌ছে!
কোথায় গেলি মক্ষিরাণী, ওরে আমার নাতনী!
আয় খাওয়াবি দাদুরে তোর রাম-তেঁতুলের চাট্‌নী।"
ডাক শুনে তাঁর ছুটে এসে বলেন তাঁহার ছোড়দি
"গলায় যে তোর হয়নি কিছু, হয়েছে তোর সর্দ্দি।
যা খেয়েছিস্ গাজর সেটা, নয় তা মোটেই ওল্ তো!
ভুল ভেবে তুই আছিস ব'সে পাকিয়ে ভারী গোল্ তো!"
গলার জ্বালা থাম্‌লো বটে, সাঁতরা তবু খাপ্পা
"খাইয়ে গাজর আমায় কেন দিলে ওলের ধাপ্পা?"

গবু দত্তের পাগ্‌লামী

আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সুমুখেতে দুটি হাত বাড়িয়ে
গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়ে, বিড়্‌বিড়্ করে গবু দত্ত।
মাঝে মাঝে হয়ে যেন অন্ধ, ভাবে কবিতার কি বা ছন্দ,
নাকে যেন পেয়ে কার গন্ধ, কিসের নেশায় হয় মত্ত।
বলে "হলো রাত্রি নিঝুম্ রে, চোক্ষে নামুক তোর ঘুম রে,
থামা তোর হল্লার ধুম রে, বন্ধ করে দে তোর ধুপধাপ।

ঐ শোন ঘড়িটার টিক্‌টিক্‌, আকাশে তারার দেখ ঝিক্‌মিক্‌,
বলে তারা আরে ছি ছি, ধিক্‌ ধিক্‌, এখনো ঘুমোস নি কি
চুপচাপ ?
ভয় নেই ভয় নেই ভাই রে, দুষ্টুমি মোর মনে নাই রে,
আমি তোর মন্দ কি চাই রে ? চাইনে রে দিতে আমি ধাপ্পা
আমি যে যে গবুরাম দত্ত যাহা কিছু কই তাই সত্য,
যদি না মানিস্‌ এই তত্ত্ব, চট্‌ করে হবো তবে খাপ্পা।"

দূরদর্শী হোঁদারাম

দুই চোখে কষে দুই দূরবীণ এঁটে
পথ দিয়ে হোঁদারাম চলে হেঁটে হেঁটে ;
কাছাকাছি কোনো কিছু দেখে নাকো চোখে ;
তাই দেখে মজা পায় দু'পাশের লোকে।
ঠিক তার বাঁয়ে বাঁয়ে যদি চলে হাতী
জানিবে না হোঁদারাম কেবা তার সাথী ;
অথবা ডাইনে তার যদি থাকে গাধা
পড়িবে না চোখে তার দূরবীণ-বাঁধা।
হোঁদারাম বলে "ওরে ভাই বহু দূর
তোর সুরে মোর প্রাণ সদা ভরপুর।
নেহাৎ তুচ্ছ মানি যা কিছু নিকট,
মোর কাছে সবি তারা বিশ্রী বিকট।
দূরের পিয়াসী ভাই আমি চঞ্চল
বলি তাই "দূর-পানে ওরে মন চল্‌।"
কাছাকাছি ছিল এক মোটা নর্দ্দমা,
গাদা গাদা জল-কাদা ছিলো তাতে জমা ;
দূরে চেয়ে যেতে যেতে তাইতে হঠাৎ
দূর-চোখো হোঁদারাম হোলো চিৎপাৎ।

হাবুরাম দর্জি

বাবুরাম গঞ্জের হাবুরাম দর্জি
থেকে থেকে অদ্ভূত হয় তার মর্জি,
রেগে মেগে ফেলে রেখে সেলায়ের কল রে
বলে ওঠে "দুত্তোর, সেলায়ে কি ফল রে ?
ঢিলে ঢালা পাছে হয় পাছে হয় আট সাঁট্‌,
কত তাই মাপজোক্‌, হুঁসিয়ার ছাঁটকাট্‌,
বুক মাপো, হাত মাপো, মাপো হ্যানো ত্যানো রে,
মাপ ছাড়া দুনিয়ায় কিছু নাই য্যানো রে।
আরে মোলো মিছে কেন এত সব ঝঞ্ঝাট ?
খেয়ালের ঝাঁটা দিয়ে দিয়ে ফেলি মন ঝাঁট।"
এই বলে আনমনে ছাতে গিয়ে গায় রে
"দখিনের হাওয়া তুই উত্তরে আয় রে !
আয় নিয়ে সাথে তোর গোলাপের গন্ধ,
জানি তুই দিল্‌-খোলা, লোক নস্‌ মন্দ।
ওরে ভাই তাল গাছ, মাথা তোর দোলা তুই
কাঁচি আর কাপড়ের কথা মোরে ভোলা তুই।
ভারি মজা তোর ভাই খোলা মাঠে রাতদিন।"
এই বলে হাত তুলে হাবু নাচে ধিন ধিন।

বন্দে মাতরম্‌

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

উদ্ভিদ ও মানুষ

উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করি আমরা প্রাণের রস,
তাই তো আমরা চিরদিন ওই উদ্ভিদ-পরবশ।
উদ্ভিদ দেয় খাদ্য মোদের, উদ্ভিদ দেয় বাস ;
ও দুটি বস্তু মানুষের তাই গোড়াকার ইতিহাস।
ও দুটি বস্তু আগে চাই, পরে আর আর যত কিছু ;
সভ্য মানুষ আজো দেখো তাই ছুটিছে ওদের পিছু।
সাগরে ভেসেছি, আকাশে উড়েছি, তবু মোরা চাই মাটি,
মাটির ফসল লাগিয়া মোদের মারামারি, কাটাকাটি।
উত্তরাপথে প্রচুর অন্ন, দক্ষিণে দেহবাস ;
ভারতবর্ষ জোগায় মোদেরে ওই দুটি বারো মাস।
পাঞ্জাবে রুটি, বাংলায় ভাত ওই ভূভাগের দান ;
শুষ্ক মাটিতে জন্মে যে গম, ভিজা মাটি দেয় ধান।
পোড়া কালো মাটি দক্ষিণ ভাগে, সেখানে প্রচুর তুলা
জোগায় মোদের দেহের বস্ত্র, সে কথা যায় না ভুলা।
শস্য যদিও সেখানে প্রচুর পশ্চিমে পুবে ফলে
প্রধানত তবু ও-দেশ তুলার এই কথা লোকে বলে।
পশ্চিমে তার নারিকেল সারি পুব দিকে তালিবন
মাঝখানে তার কাপাস-শিমুল অগণন, অগণন।
"গোদাবরী-তটে আছে এক তরু শিমুল বিশালভার"—
এ কথা নহে কো গল্পের কথা, পাবেও প্রমাণ তার।
অন্ন-বস্ত্র দুই মিলে হেথা, ভারতে অভাব নাই,
সোনা-রূপা-লোহা কত কি যে ধাতু মাটির তলায় পাই।
সোনার এ দেশ ভারতবর্ষ শুধু শোনা কথা নহে,
আকাশে বাতাসে সোনা ভাসে এর মাটিতেও সোনা বহে।
এমন দেশ কি শুনেছ তোমরা অন্য কোথাও আছে
ছয় ঋতু যার বারো মাস ধরে ফসল ফলায় গাছে ?
এ-ভারত যেন শ্রেষ্ঠ নমুনা বিধাতার সৃষ্টির,
মোট কথা সংক্ষিপ্ত সার এ সসাগরা পৃথিবীর।

আত্মিক অভিন্নতা

ভৌগোলিকের ভাগেতে ভারত দেখিলে এতক্ষণ,
এত ভাগ তবু অভিন্ন এক এ দেশ চিরন্তন।
চারিদিকে এর প্রাকৃতিক সীমা এক করি বাঁধে একে,
সহসা ইহার নাহি আশঙ্কা বহিঃশত্রু থেকে।
এক দিকে এর দুর্গপ্রাচীর ওই হিমালয় গিরি,
আর তিন দিকে সাগরের জল তিন দিক আছে ঘিরি।
পৃথিবীর মাঝে নাহি কোন দেশ এমন সুরক্ষিত,
সম্পদে যার বিদেশীর লোভ চিরদিন জাগরিত।
হিমালয় এর চির বিস্ময় হিমালয় এর প্রাণ ;
সারাটি আর্যাবর্তে করিছে চিরদিন জলদান।
জলবায়ু এর এ-গিরিই সদা করিছে নিয়ন্ত্রণ,
দাক্ষিণাত্যে আর্যাবর্ত্তে এই দিল বন্ধন।

মাঝখানে এর বিন্ধ্য পাহাড় নহে কো উচ্চশির
দুই খণ্ডের ঐক্য সেহেতু অনড়, অচল, স্থির।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ

ভিন্ন হলেও এশিয়ার থেকে ছিন্ন এ দেশ নয়,
স্থলপথে এর দুইটি রন্ধ্রে আগম-নিগম হয়।
খাইবার পাস্ বোলান পাসের শুনেছ তো আগে নাম,
ও-দুটি পথেই শত্রুরা আসি করে গেছে সংগ্রাম।
ইরাণী-তুরাণী-মোগল-পাঠান-শক-হুন-বাহ্লীক
ও-দুটি পথেই ঢুকেছে তাহারা ভারতবর্ষে ঠিক।
কিন্তু এ দেশে আসার উপায় ছিল না সহজ সাধা;
খাইবার পাস ধরি এলে হতো পঞ্চনদের বাধা।
আবার যাহারা বোলান পাসের পথটা ধরিত সরু
বুকেতে তাদের বেধে যেতো ঠিক রাজপুতানার মরু।
দিল্লীই ছিল প্রবেশের পথ ভারতের অন্তরে
দিল্লীর দ্বার ভাঙিতে নারিলে ফিরে যেতে হতো ঘরে।
সেকালে সকল শহর থাকিত দুর্গপ্রাচীরে ঘেরা
দ্বারে দ্বারে দ্বাররক্ষীর দল করিত যে ঘুরা-ফেরা।
এখনো দেখিতে পাইবে সেখানে সে-সব দ্বারের চিন্
তোমাদের মাঝে যদি কেহ যাও দিল্লীতে কোনদিন।
মোগল-পাঠান দিল্লী শহর গড়েছিল সেইখানে
আরাবলি যেথা শেষ হয়ে গিয়ে চায় মরুভূমি পানে।
আর্যদিগের ইন্দ্রপ্রস্থ তারো ছিল এই স্থান,
কত যে যুগের সভ্যতা বহি দিল্লী বর্তমান।
এখানে প্রথম শস্য-শ্যামল সমভূমি যায় দেখা,
এখানেই তাই কত যে জাতির ইতিহাস হলো লেখা।
দিল্লীর উপকণ্ঠে আজিও পড়ে আছে প্রান্তর,
যুগে যুগে হোথা হয়ে গেছে মহা সংগ্রাম বিস্তর।
কুরুক্ষেত্র, পাণিপথ ভূমি কিংবা থানেশ্বর
প্রায় ছিল সবে কাছাকাছি হয়ে তাহারা পরস্পর।
ভারতবর্ষে দক্ষিণাপথে পশ্চিম কূলে তার
জলপথে এলে মিলিয়া যাইত বন্দর গুটি চার।
উপরে কাঁপিত ভৃগুকচ্ছ ও সুরপারগের শির,
নীচেতে কোচিন আর কালিকট দেখা দিত গম্ভীর।
ওই সব পথে পর্তুগীজেরা আর সে ওলন্দাজ
ঢুকেছিল আগে, আর পরে হেথা ফরাসীরা ইংরাজ।
ভারতমাতার হৃদয় উদার, এখানে সবার যে স্থান,
ভালোবেসে যারা রয়ে গেল তারা পেয়ে গেছে সম্মান।
পাশাপাশি তাই করে বাস সব ভারতেরি সন্তান—
শক-হুন আর মোগল-পাঠান-পারসিক-খৃষ্টান।

জননী জন্মভূমি

বিরাট বিশাল হিমালয়-শিরে উড়ে যার কুন্তল,
জলধি যাহার বন্দনা গাহি লুটায় চরণতল,
এই সেই দেশ ভারতবর্ষ মোদের জন্মভূমি
যার স্নেহ-ছায়ে খেলি মোরা সদা যার কোলে পড়ি ঘুমি।
পশ্চিমে পূর্বে প্রসারিত করে যেবা ধরে বরাভয়,
বক্ষে যাহার অমৃতধারার গঙ্গা-যমুনা বয়;
দৃষ্টি যাহার কল্যাণময়, মিষ্ট মুখের বাণী
মহামানবের মহাজীবনের সঙ্কেত দিল আনি,
এই সেই দেশ জননী মোদের; নত কর সবে শির,
করি জোড়হাত করো প্রণিপাত গাহ জয় জননীর।
আদিকাল হতে কল্পে কল্পে বিধাতাপুরুষ যার
ধনভাণ্ডার পূর্ণ করেছে আর জ্ঞানভাণ্ডার;
যার সন্তান আর্যঋষিরা গাহিল জীবন-বেদ—
স্রষ্টার সাথে সৃষ্ট অভিন্ নাহি কোন ভেদাভেদ;
বাল্মীকি ঋষি রচি রামায়ণ রেখে গেছে অক্ষয়
রাজার ধর্মে প্রজার ধর্মে মিলিত সমন্বয়;
বেদব্যাসের অমর লেখনী দিল নব সংহিতা
মানবের লাগি ভগবান-মুখ-নিঃসৃত বাণী গীতা,
মহাভারতের মহান্ জীবন যাহাতে পাইবে ধৃতি;
মানবে তুলিবে দেবতার স্তরে দেবতা-মানবে প্রীতি।
ভুলে গেছি যবে পরম সত্য ভুলেছিনু একেবারে
বাহির হইতে নিষ্ঠুর ঘাত হানা দিয়ে গেছে দ্বারে।
নিদ্রা ছুটিলে ফিরে চেয়ে দেখি উদয়-আকাশ-তলে
নবরূপে নব রক্তিম রাগে নূতন সূর্য জ্বলে!
কত দিক থেকে কত জীবনের এসেছিল কত ধারা,
দেখি তারা সব ভারতের মহা জলধির জলে হারা!
জননীর মুখে হাসি হেরি হোক অন্তর নির্ভয়,
বলো দাদু, বলো দিদিমণি সব জয়তু ভারত জয়!

সমাপ্ত

ঈসপের গল্প

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী

একজন কৃষকের একটি গাধা ছিল। গাধাটি বহু দিন তাহার মনিবের কাজ প্রশংসার সহিত করিবার পরে বৃদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন সে আর কোন কাজ করিতে পারিত না।

কৃষক অকর্মণ্য গাধাকে বিক্রয় করিয়া তাহার ভরণ-পোষণের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে মনস্থ করিল।

তদনুসারে কৃষক তাহার পুত্র ও গাধাকে লইয়া দূরবর্তী এক হাটে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। কাহাকে বিক্রয় করিবে প্রথমতঃ তাহা জানা যায় নাই।

পুত্র বা গাধা কাহার মূল্য অধিক পাওয়া যাইবে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে কৃষক অগ্রসর হইতে লাগিল।

কৃষক চিন্তা করিল,—গাধা বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার নিকটে শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে মনোরম বক্তৃতা করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। শ্রমিক গাধার শ্রমশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। বরং যুবক পুত্রের নিকটে এখনও অনেক আশা আছে, বিগড়াইয়া না গেলে অনেক কিছুই লাভ হইতে পারে। ইহা চিন্তা করিয়া কৃষকের হঠাৎ পুত্রস্নেহের প্রাবল্য ঘটিল। কৃষক তাহার পুত্রকে বলিল, —"আর হাঁটিয়া কষ্ট করিতে হইবে না, গাধার পিঠে উঠিয়া পড়।"

পুত্র বলিল, "তুমি কি করিবে? তুমি কি গাধার ন্যায় হাঁটিয়াই যাইবে?"

কৃষক বলিল,—"আমার হাঁটার কি শেষ আছে? সেই কোন্ সকালে, জীবন-পথে হাঁটা শুরু করিয়াছি—আজিও তাহার শেষ হইল না। আরো কত কাল হাঁটিতে হইবে কে বলিতে পারে? তুই উঠিয়া পড়।"

পুত্র গাধায় চাপিল আর তর্ক করিল না; আধ্যাত্মিক কথা সে ভাল বুঝিতে পারে না। গাধাটি প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না। মনে মনে বলিল,—"শেষ চাপা চাপিয়া লও, আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা সকলেই জানে। হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হয়। স্বাধীন চিন্তা করিবার স্বাধীনতাও আমাদের নাই—আমরা যে গাধা! মনিবের ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা—তাহাতে আমাদের মতামতের প্রশ্ন ওঠে না; ক্ষমতা-অক্ষমতার প্রশ্নও অবান্তর।"

গাধা তাহার মনিবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মনিব-পুত্রকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিল।

কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর তাহাদের সহিত এক দল বৃদ্ধের দেখা হইল। বৃদ্ধেরা সকলেই একমত হইয়া বলিল,—"কলিকাল!"

কলিকাল পড়িয়াছে বলিয়া বহু পূর্ব্বেই একটি গুজব রটিয়াছিল—সুতরাং কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল না।

একজন বৃদ্ধ বলিল,—"কলিকাল না হইলে বৃদ্ধ পিতা হাঁটিয়া চলিবেন আর যুবক পুত্র দিব্য নবাবের ন্যায় গাধায় চড়িয়া যাইবেন কেন?"

অপর একজন বৃদ্ধ বলিল,—"কালে কালে কতই দেখিব। আজকাল দেখিতেছি পুত্রেরাই পিতা হইবার সাধনায় লাগিয়াছে। তাহারা পিতাকে আর শ্রদ্ধা করে না।"

অপর একজন বলিল,—"উহারা যে পিতা-পুত্র তাহা তোমাকে কে বলিল? বৃদ্ধটি ভৃত্য হইলেই বা আটকায় কে?"

অপরে বলিল,—"পিতা-পিতা চেহারা দেখিয়া বুঝিয়াছি যে বৃদ্ধটি পিতা। তাহা ভিন্ন আরো একটি কারণ আছে,—একই ছিটের জামা উহারা গায়ে দিয়াছে। সাধারণতঃ প্রভু-ভৃত্যে সেরূপ করে না। কিন্তু এত গবেষণায় কাজ নাই—প্রশ্ন করিলেই সব জ্ঞাত হওয়া যাইবে।"—ইহা বলিয়া উক্ত বৃদ্ধটি অগ্রসর হইয়া গাধারূঢ় পুত্রকে প্রশ্ন করিল,—"যুবক, ইনি কি তোমার পিতা?"

পুত্র বলিল,—"আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন, উনিই আমার পিতা।"

বৃদ্ধটি বলিল,—"তাহা হইলে আমার অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। জগতের পিতাগণ আজ এই অসুবিধাই ভোগ করিতেছেন,—জগৎ-পিতার অবস্থাও খুব মনোরম নয়।"

বৃদ্ধ কৃষক আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"জগৎপিতা সম্বন্ধে আপনারা কি বলিতেছেন, বাধা না থাকিলে আমাকে বলিতে পারেন। আমার পুত্র জগৎপিতা সম্বন্ধে ততটা ওয়াকিবহাল নহে।"

বৃদ্ধটি বলিল,—"বলিবার কিছু নাই। আজকাল ইহাই হইতেছে,—সক্ষম পুত্র মহানন্দে গাধায় চড়িয়া চলিতেছে আর অক্ষম বৃদ্ধ পিতারা হাঁটিয়া মরিতেছে। ভাবিতেছি, ইহার পরে পিতাদের ভাগ্যে আরো কত কি আছে।"

বৃদ্ধ কৃষক বলিল,—"ইহার পরে আর কিছু নাই। এই পর্য্যন্তই আমার হাঁটার কষ্টের কথা লেখা আছে।—এই দেখুন—" ইহা বলিয়া কৃষক তাহার পুত্রকে বলিল,—"এবারে তুমি হাঁটিয়া চল, আমি গাধারূঢ় হই,—দেখিতেছ জনমত তোমার স্বপক্ষে নয়। জনমত মান্য করিয়া চলিলে শেষ অধ্যায়ে সুখে থাকিবে।"

এবারেও গাধা কিছুই বলিল না, তাহার মুখে-চোখে শুধু 'যাহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন' ভাব ফুটিয়া উঠিল।

তাহারা আরো কিছু দূর অগ্রসর হইল।

হাটের পথে মাত্র বৃদ্ধদেরই গেল এমন নয়, সে মহাপথে সকলেই চলিতেছে,—বৃদ্ধ, যুবক, বালক-বালিকা সকলেই।

এবারে তাহাদের দেখা হইল এক দল যুবক-যুবতীর সঙ্গে। এক জন যুবতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া তাহার সঙ্গিনীকে বলিল,—"অবিকল আমার শ্বশুরের মত স্বার্থপর ও নির্লজ্জ। বৃদ্ধ হইয়া মরিতে বসিয়াছেন, তবু আরাম ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রাণাধিক পুত্র হাঁটিয়া মরিতেছে সেদিকে বৃদ্ধের দৃষ্টি নাই। আমার শ্বশুরেরও ঐ অবস্থা। দুধের বাটিটা তাঁহার চাই-ই, অন্য কেহ না পাইলেও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই। কলিকাল আর কাহাকে বলে!"

ইহারাও কলিকাল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে একজন বলিষ্ঠ তরুণ অগ্রসর হইয়া কৃষককে প্রশ্ন করিল,—"মহাশয়, আপনার পুত্রকে হাঁটাইয়া আপনি স্বয়ং আরামে যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছেন না? এত দীর্ঘ পথ হাঁটিলে তরুণেরা হার্টফেল করিতে পারে সে ধারণাও কি আপনার নাই?—অথচ এই তরুণেরাই দেশের ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যতের আশা। ঐ দেখুন, তরুণীরা আপনাকে দেখিয়া উপহাস করিতেছেন।"

কৃষক বলিল,—"আমাকে তিরস্কার করিবেন না, আমি পূর্ব্বেই লজ্জিত হইয়াছিলাম। তদনুসারে আমি পুত্রকে গাধারূঢ় করিয়া হাঁটিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কিছু পূর্ব্বে এক দল বৃদ্ধের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাঁহারা আমার হাঁটা সমর্থন করেন নাই। সেই জনমতের চাপে পড়িয়া আমি পুত্রকে নামাইয়া সেই আসন স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি।"

যুবক বলিল,—"সেই বৃদ্ধেরা কোন্ পন্থী তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। দুই-এক জনের নাম বলিতে পারিলেও আমরা তাহাদের দেখিয়া লইতাম। তাহারা যে দেশের ভবিষ্যৎ চাহে না তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। দেশের ভবিষ্যৎগুলিকে বাঁচাইয়া রাখাই বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, তাহা আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে।"

কৃষক বলিল,—"আমি তাহা স্বীকার করি, কিন্তু জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করিবার শক্তি আমার নাই।"

যুবক বলিল,—"আপনি কি নিখিল-বিশ্ব-তরুণ-সঙ্ঘের মতকে জনমত বলিয়া স্বীকার করেন না?"

কৃষক বলিল,—"অবশ্যই করি। আমি নিখিল ঘেঁটুগাছি নাইলেন তরুণ সঙ্ঘকেও ভয় করিয়া থাকি। এই ভয় হইতেই ভক্তির উদয় হয়, সুতরাং আপনাদের প্রতি আমার ভক্তিরও অন্ত নাই। কিন্তু বৃদ্ধদের মতকেই বা অবহেলা করি কোন্ যুক্তিতে? ইহা আমার নিকটে একটি মহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।"

এই সময়ে প্রথমোক্ত তরুণী অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আপনারা

উভয়েই গাধায় আরোহণ করুন, তাহাতে উভয় দলের সহিত একটি রফা বা চুক্তি করা হইবে। কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না।"

কৃষক বলিল,—"কিন্তু চাপাধিক্যে গাধার কি দশা হইবে?"

তখন যুবকটি বলিল,—"মহিলাদের কথায় তর্ক করিবেন না, তাহার ফল শুভ হইবে না স্মরণ রাখিবেন। গাধা মঙ্গল-সমিতি এখনও কোথায়ও-সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এই ফাঁকে আপনারা উভয়ে গাধারূঢ় হোন— আমরা নয়ন ভরিয়া সে দৃশ্য দর্শন করি।"

তাহারা উভয়ে গাধায় আরোহণ করিল। এবারেও গাধা প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিল না,—মনে মনে বলিল,—গাধার জীবনে যে কত সহ্য করিতে হয় তাহা একমাত্র গাধা ভিন্ন অপর কেহ বুঝিবে না। বিধাতা যদি গাধা হইতেন তাহা হইলে হয়ত আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিত। গাধা যত দিন না মানুষ হয় তত দিন আমাকে কষ্টভোগ করিতেই হইবে।"

তাহারা চলিতে লাগিল।

এবারে যে-দলটির সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল সে দলটি তত্ত্ব-কথায় বড়ই মজবুত। পশুদের স্বার্থরক্ষাকারী হিসাবে তাঁহাদের নাম আছে। অনেক গাধার শ্রমের মুনাফা লইয়া তাঁহারা আজ বিত্তশালী। সুতরাং পশুক্লেশ সহ্য করিতে তাঁহারা নারাজ। ইঁহারা মানুষকে পশুশ্রেণীতে নামাইয়া পশুদের ক্লেশ অনেকটা ভাগাভাগি করিয়া দিয়াছেন।

ইঁহারা সকলেই কৃষককে তিরস্কার করিলেন, কৃষকের ভীমরতি ধরিয়াছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন এবং উপদেশ দিলেন যে এবারে ঐ হতভাগ্য পশুকে তোমাদের বহন করিয়া লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।

কৃষকের জনমত সম্বন্ধে যথেষ্ট দুর্ব্বলতা ছিল, সুতরাং সে আর দ্বিরুক্তি করিল না। এই দুর্জ্জন-মতটিও সে গ্রাহ্য করিয়া লইল এবং রজ্জু দ্বারা গাধার হস্তপদ বদ্ধ করিয়া একখানি বাঁশের সাহায্যে পিতাপুত্রে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

গাধা এবারেও প্রকাশ করিয়া কিছুই বলিল না। মনে মনে বলিল,—"চিরজীবন তো হস্তপদ বদ্ধ অবস্থাতেই কাটাইয়াছি। স্বাধীন ভাবে কিছুই করিতে পারি নাই। আমাদের শ্রমের অন্ন অপরে সুখী হইয়া খাইয়াছে। আমরা শুধু—'অট্টালিকা নাহি মোর নাহি দাস-দাসী; ক্ষতি নাই, নহি মোরা সে-সুখ প্রয়াসী—' মুখস্থ করিয়া কাল কাটাইয়াছি। অপরের বোঝা বহিয়াই কাল কাটাইলাম কিন্তু এখন আবার একি দেখিতেছি!! আমার বোঝা অপরে বহন করিবে ইহা তো বিধাতার অভিপ্রেত নয়। বুঝিতেছি গাধা-জীবনের শেষ হইতে চলিয়াছে। গাধারাই সকলের ভার বহন করে; গাধার ভার অপরে বহন করা নিয়মবিরুদ্ধ। ইহা তো চলিতে পারে না!"

চলিলও না। শিশুপাল পিছনে লাগিল। তাহারা দোলন-চাঁপা দেখিয়াছে, নাগরদোলা দেখিয়াছে কিন্তু দোলন-গাধা দেখে নাই।...তাহারা শিশু-সুলভ উৎসাহে এবং চীৎকারে মাতামাতি করিতে লাগিল। কৃষক তখন গাধাকে বহন করিয়া একটি গ্রাম্য সাঁকোর উপরে উঠিয়াছে। কাঁধে ভারী বোঝা, প্রতি মুহূর্ত্তে পদস্খলন হইবার আশঙ্কা, তদুপরি শিশুপালের উৎকট চীৎকারে বৃদ্ধ ক্রোধ ও বিরক্তিতে কাঁপিতে লাগিল।

শিশুপালের কোলাহলে গাধারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে ভাবিল,—"এই তো অবসর। বৃদ্ধ কৃষক টলটলায়মান সাঁকোর উপরে নিজেকে রক্ষা করিতেই ব্যস্ত, আমাকে আবদ্ধ রাখিবার শক্তি তাহার আর নাই।" গাধা এইবার তাহার মুক্তির জন্য ছটফট করিতে লাগিল। ইহাই গাধার প্রথম এবং শেষ মুক্তি-সংগ্রাম। কৃষকের কাঁধের বাঁশ ভাঙিয়া গাধা এবারে মুক্তি-সংগ্রামে জয়ী হইল।

গাধা হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় জলে পড়িবার কিছুক্ষণ পরে ত্রাণ-কর্ত্তাকে দেখিতে পাইয়া বলিল; "প্রভু, আমি আসিয়াছি, আমাকে ত্রাণ করুন। প্রার্থনা করি, আপনি সকল গাধাকে একই সঙ্গে ত্রাণ করিয়া তাহাদের দুর্বিসহ জীবনে শান্তি প্রদান করুন।" গাধাটি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল না।

ত্রাণকর্ত্তা বলিলেন,—"তুমি গাধার মতই কথা বলিয়াছ। একই সঙ্গে সমগ্র গাধা-শ্রেণী বিলুপ্ত হইলে অন্য শ্রেণী কাহার মস্তকে কাঁটাল ভাঙিবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? কাঁটাল ভাঙিবার জন্য গাধা-শ্রেণী না থাকিলে তাহারা উহা আমারই মস্তকে ভাঙিতে পারে। অতএব বৎস গাধা, তুমি নিজে বাঁচিয়া গিয়াছ ইহাতেই সন্তুষ্ট থাক।"

এদিকে কৃষক এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল যে, 'হায়, আমি সকলের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া আমার প্রিয় গাধাটিকে হারাইলাম। সকলকে সন্তুষ্ট করা কাহারও সাধ্য নহে।"

এবারে পুত্র মুখ খুলিল,—সে বলিল,—"পিতা, আপনি কিরূপ কথা বলিতেছেন? আমাদের কাহিনী হইতে আমি তো ইহাই উপলব্ধি করিলাম যে, স্বার্থত্যাগ করিলে জগতের সকলকেই সন্তুষ্ট করা যায়। আমরা বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী প্রভৃতি সকল দলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছি, শিশুদেরও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছি। অকর্মণ্য গাধার বিনিময়েই ইহা সম্ভব হইয়াছে। বৃহৎ স্বার্থত্যাগ করিলে জগতের সকলকেই সন্তুষ্ট করা যায়।"

কৃষক ভাবিল,—"এই মরিয়াছে! উহাকে একবার স্বার্থত্যাগে পাইয়া বসিলে আমার ভিটামাটি উচ্ছন্ন যাইতে বিলম্ব হইবে না। 'সকলকে সন্তুষ্ট করা যায় না',—এই কাহিনীর ইহাই তো নীতি,—ইহার উল্টা কথা আবার আসিল কোথা হইতে?—ঈশপ সাহেবকে ধরিয়া জোর প্রচার করিতে হইবে দেখিতেছি—" তাহার পর প্রকাশ্যে বলিল,—"বৎস, গাধা গিয়াছে তাহাতে দুঃখ নাই,—কিন্তু গাধা হারাইয়া আমরা যে নীতির সমস্যায় পড়িয়াছি তাহা সামান্য নহে। এই সমস্যার সমাধান একমাত্র ঈশপ সাহেবই করিতে পারেন। আমি তাঁহার নিকটেই চলিলাম, তুমি এই স্থলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।"

কৃষক চলিয়া গেল। পুত্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

জানা গেল যে, ঈশপ সাহেব তাঁহার মতামতটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবেন। তাড়াহুড়া করিয়া কোন মত প্রকাশ করা ঠিক হইবে না। তিনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

বিকাল বেলা শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছিল অরুণা। গরীবের মেয়ে সে, এমন নিকর্ম্মা হয়ে কোন দিনও থাকে নাই, সব সময়ই ছোট সংসারটির পেছনে খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত থাকত। এই

এমন আশাতীত সৌভাগ্য আশা করে নাই অরুণা। অরুণার বাবা সতীনাথ বাবুই কি করেছিলেন? হঠাৎ মা-মরা মেয়েটার এমন সৌভাগ্য হবে, এ তাঁর আশার বাইরেই ছিল। তবে রূপ ছিল তাঁর মেয়ের। স্কুল-কলেজে পড়াতে পারেন নাই বটে, কিন্তু শিক্ষা দিয়েছিলেন নিজে যত্ন করে। ঘরে গৃহিণী নাই, মেয়েটাও যদি দিবসের অধিকাংশ সময় বাইরে থাকে তবে তাঁর মত অকর্ম্মণ্য মানুষের চলেই বা কি করে? তা ছাড়া পয়সার অভাবও ছিল না তা নয়। কিন্তু এখন ত একলাই থাকতে হয়। অরুণা বলেছিল, কেন বাবা আমাকে পর করে দিলে? এখন তোমায় দেখবে কে? সতীনাথ হেসে বলেছিলেন, সে ঠিক চলে যাবে মা, তুই ত সুখী হ।

সুখী কি হয়েছিল অরুণা? অরুণা ভাবে আর দু'চোখ ভরে জল আসে। বাবার কথা প্রথম প্রথম ভেবে অস্থির হয়ে উঠত অরুণা, কিন্তু এখন বাবার কথাও চাপা পড়ে গেছে অন্য এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকার আড়ালে। বিয়ের পর যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী এলো অরুণা, খুসীই হয়েছিল ভবেশের ঐশ্বর্য্য দেখে, আর তার সুন্দর স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে। রূপও ছিল ভবেশের। কিন্তু আজ কিছু দিন হলো এ ঐশ্বর্য্য, বাড়ী-ঘর, স্বামি-সংসার সব বিতৃষ্ণায় কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছে, যেন উগরে ফেলতে পারলেই বাঁচে। অরুণার ভাবান্তর দেখে ভবেশ প্রস্তাব করেছিল বাবার কাছে যাবার, কিন্তু অরুণা রাজি হয় নাই। বাবা যদি তার ভাবান্তরের কারণ জানতে চান, তবে ত আর মিথ্যা বলা যাবে না? তার চেয়ে চোখের আড়ালে থাকাই ভাল।

নিরবচ্ছিন্ন অবসর যেন তার মনকে আরো পীড়া দিচ্ছে। কাজে-কর্ম্মে থাকলেও মনটা যা-তা ভাববার সময় পায় না।

হঠাৎ পদশব্দে ফিরে দেখে, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকছে ভবেশ। অরুণাকে দেখে বলে, সারা দিন মুখ গোমড়া করে থাক কেন? যাক গে, তাড়াতাড়ি পোষাকগুলো ঠিক কর আমার, এখুনি আবার যেতে হবে। আমি আসছি বাথরুম থেকে।

ঝড়ের বেগে চলে যায় ভবেশ, ফিরেও আসে তাড়াতাড়ি। অরুণার বের-করা দামী স্যুট পরে, সমস্ত বিলাসযুক্ত ও ব্যয়সাধ্য প্রসাধন শেষ করে বেরিয়ে যাবার মুখে বলে, কাল তোমাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়, আজ থেকে নোটিশ দিচ্ছি, বুঝলে? আর মুখখানা একটু হাসিখুসী করে রেখ।

সবিস্ময়ে বলে অরুণা, আমাকে? কোথায়?

সে-কথার আর উত্তর দেওয়া হয়ে উঠে না, ঝড়ের মত নেমে যায় ভবেশ। মিনিট খানেক পরে অরুণা শুনতে পায় ভবেশের গাড়ীর শব্দ।

আবার নতুন এক ভয়ের সঞ্চার হয় অরুণার মনে। আজ-কাল স্বামীকে সে রীতিমত ভয় করে। যে লোক লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা করতে পারে, সে কি না করতে পারে? তা ছাড়া বিরাট ব্যবসাদার, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ, অরুণা কখনও মিশতে পারে তাদের সঙ্গে? অবশ্য ব্যবসা যে কি বিষয়ে তা অরুণা জানে না। কেবল ঔষধের একখানি বেশ বড় দোকান আছে, তাই জানে, আর বাবার কাছে শুনেছে, এ ছাড়া আরও নাকি অনেক রকম ব্যবসা করে। বাবা সাদাসিদে মানুষ, খুঁটিয়ে জানবার দরকার বোধ করেন নাই।

এক সময় ঝি এসে বলে, বৌমা, তুমি এমন চুপটি করে বসে আছ, আর আমি দেখ খাবার নিয়ে ঠায় বসে, এই আসে এই আসে করে। বামুনদিদি বললে, তোমাকে শুধতে খাবে নাকি।

অরুণা বলে, আজ আর খিদে নেই হারুর মা, তোমরা খেয়ে নাও গে।

ঝি সবিস্ময়ে বলে, ওমা সে কি কথা! দুপুরে ত দু'গাল ভাত খেয়েছ কি খাওনি, এখন যদি আবার জলখাবারও না খাও তো শরীর থাকবে কি করে? তোমার

শ্রীমতী রেণুকা চট্টোপাধ্যায়

আপনার ঘর, শাশুড়ী-ননদ নেই, দেখে-শুনে খাবে দাবে, এমন করে কি চোক বুজে বসে থাকে ? নাও ওঠ, চল, বাবু আমাদের বকবেন, বলবেন তোরা পুরনো লোক, দেখে-শুনে খাওয়াতে পারিস্ না ? ও বৌমা, না হয় হেথায় এনে দিচ্ছি।

অরুণা ব্যস্ত হয়ে বলে, না, না, এখানে আনতে হবে না, আমি আজ খেতে পারব না, কাল থেকে ঠিক খাব। বাবু জিজ্ঞাসা করলে বলো, আমার খিদে নেই তাই খাইনি।

খেতে যে অরুণা কিছুতেই পারে না, যখনই মনে হয়, কি কদর্য্য উপায়ে এই খাদ্যবস্তুর দাম সংগৃহীত হচ্ছে, তখনই সমস্ত খাবার ইচ্ছা চলে যায়। গলা দিয়ে নামতেই চায় না।

এই ঝিটি তার নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অরুণাকে খানিকটা বুঝতে পেরেছিল কিন্তু কারণ জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যে হাসি-খুসী উজ্জ্বল মানুষটি বিয়ের পর এ-বাড়ীতে এসেছিল, সে আজ আর নেই, এ যেন অন্য মানুষ। মনের মধ্যে কোথাও যে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল, তা যেন ঝিটি অনুভব করতে পারত। সেই জন্য সহানুভূতিও ছিল খানিকটা কিন্তু এত টাকা-পয়সা, এমন রূপবান স্বামী থাকতে আবার নাকি কিছু দুঃখু থাকে মেয়েমানুষের ? কে জানে ? ওরা ভদ্দর নোক !

রাত্রি বারটা হবে। অরুণা বোধ করি ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ তীব্র ইলেকট্রিক হর্ণের শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসল। ভবেশ এসেছে, তারই গাড়ীর হর্ণ। উঠে বসে অরুণা, কিন্তু কাজ তার কিছু নেই, ওর নিজেরই তিন-চারটে চাকর আছে সেবা-যত্ন করবার জন্য, ওরাই খেতে দেয়, কাপড়-চোপড় ছাড়ান, জুতা খোলা, হাত-মুখ ধোবার পর তোয়ালে এগিয়ে দেওয়া সব কিছু করে। কিছুই করতে হয় না অরুণার। এ ত আর তার বাবা নয় যে কোথা থেকে এলে অরুণাই সব করবে ? আঃ, সে যেন বড় শান্তিই ছিল ! আর এই ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয় মনে।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘরে এসে দেখে ভবেশ, বিছানার উপর চুপ করে বসে আছে অরুণা। ভবেশ বলে, এখনো বসে আছ যে ? আচ্ছা, ঘুমলেই ত পার, আমার কত কাজ জান ত, এ-রকম রাত হয়েই থাকে। খেয়েছ ত আজ ?

না, খিদে ছিল না।

রোজ রোজ খিদে না হওয়া ত-ভাল নয়, নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে অসুখ-বিসুখ করেছে, ডাক্তার দেখাতে হয়।

না, না, ডাক্তার কি হবে, ও এমনিই সেরে যাবে।

হঠাৎ কি যেন ভবেশের মনে পড়ে যায়, কলিং-বেল টেপে, একটি চাকর এসে দাঁড়ায় পর্দার ও-পাশে, ভবেশ বলে, শোন্, ভেতরে আয় ! চাকরটি ভেতরে আসে, ভবেশ বলে, কাপড় ছাড়বার ঘরে কোটের পকেটে একটা লাল বাক্স আছে, নিয়ে আয় ত।

বাক্সটি একটি লাল রংয়ের ভেলভেট কেস। ভিতরে কিছু অলঙ্কার আছে বলেই মনে হয় অরুণার। বাক্সটি সামনে খুলে ধরে বলে ভবেশ, দেখ কি এনেছি তোমার জন্যে। অরুণা চেয়ে দেখে দুটি হীরার ফুল, আধুনিক ডিজাইনের। মুখ তুলে বলে, অনেক ত আছে, আবার কেন আনলে ? ভবেশ মনে মনে ভাবে, গরীবের মেয়ে, এত ত একসঙ্গে চোখে দেখেনি, তাই বোধ হয় নিতে ইতস্ততঃ করছে। বলে, নাও, ধর। অনেক থাকলেই বা, সে সব তো পুরানো হয়ে গেছে, এটা কেমন নূতন ধরণের।

আস্তে আস্তে অরুণা বলে, কত দাম ?

ভবেশ কৌতুক করে বলে, বল ত ? দেখি তোমার আইডিয়াটা একবার।

অরুণা কুণ্ঠিত হয়ে বলে, আমি কি করে বলব ?

ভবেশ হেসে হেসে বলে, খুব বেশী নয়, হাজার খানেক হবে। আজ ভারি লাভ হয়ে গেল অরুণা, তাই ভাবলাম তোমার প'রেই বোধ হয় হলো, সেই জন্য এটা কিনে আনলাম। প'রলে যা দেখাবে তোমায়। এমন রূপ ত আর কারুর নেই। মোটা মোটা ভাটিয়া আর মাড়োয়ারীদের মেয়েগুলো পরে, কি বিশ্রী যে দেখায় !

হঠাৎ অরুণা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কিসের ব্যবসা তোমার ?

ভবেশ একটু ইতস্ততঃ করে, পরে বেশ সপ্রতিভ হয়ে বলে, ওষুধের দোকান ত, কেন তুমি জান না ?

ওটা ত জানি, আরও নাকি অনেক রকম ব্যবসা আছে তোমার। সবাই বলে, মাণিক নাকি খাস চাকর তোমার ঐ সব ব্যাপারের। গোপন সব কারবার করে। ব্যবসায় আবার গোপনতা কি ?

প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে ভবেশ, বলে, কে বলেছে এ-কথা শুনি ?

অরুণা স্তব্ধ হয়ে যায়, এমন ভয়ঙ্কর রাগের মূর্ত্তি কখনও দেখে নাই সে। চিরদিন শান্ত, ধীর, সংযমী সন্ন্যাসীর মত বাবার কাছে মানুষ। ভয়ে ভয়ে বলে, কেউ ত বলেনি, চাকরেরা বলাবলি করছিল, আমি শুনে ফেলেছি।

ভবেশ আর কিছু বলে না, শুধু একটা হুঁ বলে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। মনে মনে ভাবে, মাণিককে ডেকে বেশ করে ধমকে দিতে হবে, এমন সব কথা নিয়ে প্রকাশ্যে আলাপ-আলোচনা করে ! এদের সম্বন্ধে কোন ভয় নেই ভবেশের, কারণ বাবুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে যে কি শাস্তি তা ওরা জানে। ভয় অরুণাকে নিয়ে। অরুণাকে ভাল করে চিনতে না পারলেও ভবেশ এটুকু বুঝেছিল যে, ও যদি জানতে পারে কি ভাবে কোথা থেকে পয়সা আসছে, তবে শুধু ঘৃণাই করবে না ওকে, বিপন্নও হতে হবে হয়ত। এই সব আদর্শবাদী মেয়েদের বিশ্বাস নেই। ভবেশ বুদ্ধিমান লোক, সে ভাবের উপর চলে না, কাজেই অরুণার উপর রাগ না দেখিয়ে খোসামোদের পথ ধরেছে। আজ তাই এই হীরার ফুলের উপহার। গরীবের মেয়ের চোখে ও মনে একেবারে যাতে ধাঁধা লেগে যায় সেই চেষ্টা। কিন্তু গোড়াতেই যখন অরুণার অনাগ্রহ ও উদাসীনতায় ধাক্কা খেয়ে প্রথম চালটা বেচাল হয়ে পড়ল, তখন ভারি বিরক্ত হলো ভবেশ। এই জন্যে কি রূপ দেখে বিয়ে করেছিল, এক পয়সা না নিয়ে ? গরীবের মেয়ে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে যাবে, আর লোভের তলায় চাপা পড়ে যাবে অন্য সব হৃদয়বৃত্তিগুলি, এই না ? রূপটা তার ভীষণ দরকার ব্যবসায়ের জীবনে, রূপবতী স্ত্রীর চেয়ে বড় ভেট ত আর কিছু হয় না। কিন্তু ভুল করেছিল ভবেশ, গরীবের ঘরে অভাবের মধ্যে জন্মালেই যে মনটা গরীব হয়ে যায় না, তা ভাবে নাই। মন যার মানসিক সম্পদে পূর্ণ বাইরের সম্পদ তাকে কতখানি ভোলাতে সক্ষম ?

কিন্তু হটবার ছেলে নয় ভবেশ, বিশেষ অত রূপ যখন অরুণার

তখন তা কাজে লাগাতেই হবে। যেমন করেই হোক। মনে মনে ভাবে ভবেশ, ব্যবসায়ে জোচ্চুরি ধাপ্পাবাজি কে না করে, যার বুদ্ধি থাকে সেই করে, সত্যযুগের যুধিষ্ঠির সেজে কে আর বসে আছে? খাবে, পরবে, পার্টিতে পার্টিতে মজা লুঠবে, তা নয় ঘোড়া-রোগে ধরেছে! মিসেস্ 'কর' অত করে সাধলেন, ওঁর মেয়েটার জন্তে, করলেই হতো। আগে থেকেই এক্সপার্ট ছিল, বেশ হতো, তা না, আমারও যেমন গেরো, রূপ দেখে ভুলে গেলাম।

আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। রাত্রে মোটে ঘুম হয় নাই, এই সব নানা এলোমেলো চিন্তায় কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে রাতটা কেটে গেছে। তা যাক, তবুও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে ভবেশ। বেশ খুসী মনেই অরুণার কাছে এসে বসল। অত সকালেই অরুণা স্নান সেরে নিয়েছিল, লাল রংয়ের একখানি ধনেখালি শাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ, আর পিঠের উপর একরাশ চুল নিতম্ব ছাড়িয়ে লুটিয়ে পড়েছে, ফর্সা তন্বী চেহারা, একেবারে কল্যাণী মূর্ত্তি। ভবেশের মত লোকও যেন একটু থতিয়ে গেল। একটু পরেই যা বলবার ছিল তা না বলে বলল, চল বাগানে যাই, আজ ওখানেই চা খাব, কি বল? কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়! হাতখানি ধরে বলে, কেন যে মন খারাপ করে থাক তা বুঝি না, ঐ তোমার বড় দোষ। চল।

অরুণা স্নেহ-স্বরে বিচলিত হয়, মনে মনে ভাবে, অনুমান বই ত নয়, সত্যি নাও ত হতে পারে, এমন সুন্দর মানুষটা কি অমন তুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে? মৃদু হেসে বলে, চল।

আজ সারা দিন আর ভবেশ বেরোয় না। অরুণার খুসী মনটাকে বজায় রাখবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যায়। আজ প্রয়োজনও ছিল, সন্ধ্যায় মিঃ করের ওখানে পার্টি আছে, সেখানে আজ অরুণাকে নিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন, তা না হলে একটা মস্ত দাঁও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা হয়-হয়, অরুণা ঘরের সুমুখের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, ভবেশ এসে পিঠে হাত রাখল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকায় অরুণা, ভবেশ বলে, এইবার কাপড়-চোপড় পরে নাও।

অরুণা বিস্ময়ে বলে, কেন?

বা রে, এরি মধ্যে ভুলে বসে আছ? কাল বললাম না তোমায়, এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

অরুণা ব্যস্ত হয়ে বলে, কোথায়?

হেসে বলে ভবেশ, চল না, আমার বন্ধু-বান্ধবরা তোমায় দেখেনি, তাই আজ এক বন্ধুর বাড়ী পার্টি আছে, সেখানে নিয়ে যাবো।

কেন? বৌভাতে ত সবাই এসেছিল।

তখন কি আর অত ভাল করে দেখেছে? আর তা'ছাড়া আলাপ ত হয়নি। আমারও ত তোমাকে নিয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। সামাগু আব্দারের সুরে কথাগুলো শেষ করে ভবেশ।

অরুণা কুণ্ঠিত হয়ে বলে, কিন্তু তারা কত বড়লোক!

হেসে বলে ভবেশ, আর তুমিই বা কি কম?

কুণ্ঠিত হয়ে বলে অরুণা, কিন্তু মেশা ত অভ্যাস নেই, নিয়ে গিয়ে লজ্জায় পড়বে।

"ওটা বাজে কথা, না অভ্যাস থাকলেও লজ্জায় পড়বার মেয়ে নও তুমি।

কিছুক্ষণ পরে যখন সাজসজ্জা করে এসে দাঁড়ালো অরুণা, ভারি খুসী হল ভবেশ, বলল, বাঃ, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়! শোনো, কয়েকটা কথা বলে রাখি। যেখানে যাচ্ছ সেখানে যে বন্ধুরা আসবেন তাঁদের যেন অমর্য্যাদা করো না। যদি কেউ বলেন, চলুন মিসেস্ চৌধুরি, একটু সিনেমায় যাই কি বেড়িয়ে আসি, তাতে যেন আপত্তি করো না; হয়ত আমি না-ও যেতে পারি, আমাকে হয়ত ঐরূপ অনুরোধ করলে কেউ তার সঙ্গে ত যেতে হবে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় অরুণা, একটু পরে বলে, বেড়াতে যাবো? চিনি না জানি না?

আহা-হা, তুমি না চিনলেই বা, আমি ত চিনি।

কিন্তু লোকের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে আবার অন্ত জায়গায় বেড়াতে যায় নাকি কেউ?

কেন যাবে না, বড় বড় ফ্যাসানেব্‌ল্ সার্কেলে ত মেশোনি, কি ভাবে আমোদ-আহ্লাদ করে তারা তা ত জান না। যদি কেউ প্রস্তাব করে ত ব যেন তার অসম্মান করো না।

শঙ্কিতা অরুণা বলে, তবে তুমি যাও, আমি যাব না। নিয়ে যাবার অর্থ যেন অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে অরুণার চোখে।

যাবে না? যাবে না কেন? অসহ্য রাগের প্রকাশ কোন মতে চেপে রাখে ভবেশ।

শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে অরুণা, আমাকে নিয়ে গেলে তোমার কিছু সুবিধা হবে না বলেই যাব না।

তার মানে? তুমি কি বলতে চাইছ?

মুহূর্ত্তের জন্ত অসহ্য অপমানে অরুণার চোখ দুটি জলে উঠে কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, আমার বাবা গরীব, কিন্তু মানুষ, আর সেই মানুষেরই মেয়ে আমি।

কথা শেষ করে অরুণা বাইরে যাবার জন্ত দরজার দিকে অগ্রসর হয়, মুহূর্ত্তে দুই হাতে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে ভবেশ, আর আমি বুঝি অ-মানুষের ছেলে?

ধীরে ধীরে অরুণার মুখে ঘৃণার ছাপ ফুটে ওঠে, বলে, অ-মানুষের ছেলে কি না জানি না, কিন্তু নিজে যে তুমি মানুষ নও তা জানতে পেরেছি।

হঠাৎ এত বড় সত্য কথাটা অরুণার মুখে শুনে ভবেশ যেন একটু থতিয়ে গেল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড রাগে বলে ফেলল, জান, আমি তোমাকে খুন করতে পারি?

নির্ব্বিকার অরুণা বলে, খুব স্বাভাবিক তোমার পক্ষে, হয়ত অভ্যাসও আছে। তবে এ-ও জেন, খুন শুধু অ-মানুষেই করে না, মানুষেও করে কল্যাণের জন্ত।

বিস্ময়ে বলে ভবেশ, মানুষে করে? তার মানে তুমিও করবে নাকি আমাকে?

হতে পারে।

এবার ভবেশ হো-হো করে হেসে উঠে বলে, তোমার গায়ে জোর কতটুকু? একখানা হাত যদি ধরি ছাড়াতে পারবে না।

অরুণা বলে, সব সময়ই যে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয় তা নয়, কোন রকম শক্তি প্রয়োগ না করেও খুন করা যায়।

চট্ করে মনে পড়ে যায় ভবেশের, তাই ত, বিনা শক্তি প্রয়োগেও ত খুন করা যায়, আর সে ত তার নকল ঔষধগুলো বাজারে চালিয়ে
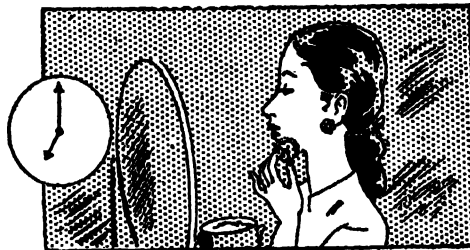
তাই করছে। তবে কি অরুণা সে সব জানতে পেরেছে? তবু মনে জোর এনে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, তুমি ত তাহলে মস্ত বড় মানুষের মেয়ে, তোমার মহামানুষ বাবাটি বুঝি স্বামিহত্যার শিক্ষা দিয়ে এসেছেন এত দিন?

নিশ্চয়, অন্যায়কারীকে হত্যা করায় পাপ নেই, সে স্বামীই হোক আর পুত্রই হোক। এই বলিষ্ঠ মতবাদই তিনি শিখিয়েছেন আমায়। আমার হয়ত ক্ষতি হবে, কিন্তু যেখানে বহু লোকের উপকার হবে সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতি লাভেরই সমান।

ভবেশের আর সাহস হয় না অরুণাকে ঘাঁটাবার, মনের রাগ মনে চেপেই দ্রুতপদে চলে যায়।

এই বিবাদ-বিসম্বাদ ঘৃণা-বিতৃষ্ণা নিয়েও অরুণার বিবাহিত জীবনের এক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। অরুণাও পারে নাই তার জীবন থেকে ভবেশকে আলাদা করে রাখতে। যে লোকটার ছায়া মাড়াতে ঘৃণা বোধ হয়, তার কাছেও আত্মদান করতে হয়েছে অরুণাকে। স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগের ইচ্ছে যে হয়নি তা নয়, তবে বাবাকে আঘাত দেবার কল্পনাও করতে পারে না অরুণা। সে ত শুধু মেয়েই ছিল না তাঁর, মায়ের মত সংসারের সমস্ত অশান্তি থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখত। আজ এই দীর্ঘকালব্যাপী মনোমালিন্যের বাষ্পটুকুও জানতে দেয় নাই অরুণা তার বাবাকে।

কিছু দিন হলো একটি ছেলে হয়েছে অরুণার। এত দুঃখ-অশান্তির মধ্যেও খানিকটা শান্তি যেন পেয়েছে অরুণা। ভয়ও যে না হয়েছে তা নয়, ছেলে যদি বাবার মত মনোবৃত্তি পায় তবে ত আর দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকবে না। অমন একটা হৃদয়হীন টাকা-সর্ব্বস্ব ছেলের মা হবে অরুণা, এ-কথা ভাবতে ও শিউরে ওঠে।

এই শিশুটিকে লক্ষ্য করেই ওদের মধ্যে সাময়িক মিলনের একটা সেতু যেন গড়ে উঠেছিল। এইটিকে কেন্দ্র করেই দু'-একটা কথা-বার্ত্তা যা চলত। এই ভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। সারাক্ষণ ছেলেটির সব কাজ ঝি-চাকর থাকা সত্ত্বেও অরুণা নিজেই করে। এই কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে মনকে শান্ত রাখবার চেষ্টা চলত।

হঠাৎ একদিন ছেলে বেড়িয়ে ফিরলে, অরুণা কোলে নিয়ে চমকে উঠল, গাটা যেন গরম-গরম লাগছে। নিজে কিছু বোঝে না, একা মানুষ হয়েছে, বুদ্ধি হয়ে মাকেও দেখে নাই, বা কোন ছোট ভাইবোনও ছিল না। ভয়ে ভয়ে বাড়ীর পুরান ঝি বুড়ো হারুর মার ডাক পড়ে। অরুণা ব্যস্ত হয়ে বলে, দেখ ত হারুর মা, খোকার গাটা কেমন যেন গরম নয়?

হারুর মা গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করে বলে, তাই ত বউমা, জ্বর বলেই ত ঠেকছে। বোধ হয় ভেতরে ভেতরে সর্দ্দি হয়ে থাকবে, তা ছোট ছেলেদের অমন হয়, ভয় কিছু নেই।

অরুণা কিন্তু ভয়ে ব্যাকুল হয়ে বলে, তা হলে কি করব?

হারুর মা আশ্বাস দিয়ে বলে, বাবু আসুন, আর একটু দেখ বাড়ে নাকি, ভয় কি? আমাদের ঘরে হলে সেক তাপ মালিস চলত, যদি সর্দ্দি হতো তবে ভাল হয়ে যেত।

অরুণা কথা বলে না, ছেলে কোলে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। অনেক রাতে ভবেশ ফেরে, ফিরে অরুণাকে ও-রকম ভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বলে কি হয়েছে?

অরুণা বলে, খোকার খুব জ্বর হয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে ভবেশ ছেলের গায়ে হাত রাখে, বলে, সত্যিই ত এ যে খুব জ্বর। আমি ডাক্তার ডাকতে চললাম। ঝড়ের বেগে ভবেশ চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তার এসে বলেন, এখুনি পেনিসিলিন দিতে হবে। ভবেশ নিজেই ছোট গাড়ী নিয়ে, নিজের ঔষধের দোকানে প্রথম যায়। কিন্তু দোকানের কর্ম্মচারী জানায় খাঁটি পেনিসিলিন আর একটাও নেই। সব রেশান হয়ে গেছে। তখনই আবার ছোটে ভবেশ, কিন্তু সব দোকানেই ওদের কোম্পানির তৈরি নকল পেনিসিলিন। আজ হঠাৎ মনে হয় দুটো কারখানায় এত ঔষধও তৈরী করতে পারে? যা কোন দিন হয়নি তাই হয়, সমস্ত কারখানা, কর্ম্মচারী, ঔষধের শিশিগুলির উপর পর্য্যন্ত প্রচণ্ড রাগ হতে থাকে। ভবেশের আত্মবিস্মৃত, স্নেহশূন্য কঠিন মন বোধ করি জীবনে প্রথম এই এক কোঁটা শিশুর কাছে কোমলতার স্পর্শ পেয়েছিল। একান্ত অসহায় এই জীবটাই প্রথম তার প্রশস্ত বুকের উপর নিতান্ত নির্ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অসহায় একটা জড় মাংসপিণ্ড যে ভবেশের বলিষ্ঠ, কঠিন, স্বার্থপূর্ণ মনের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে তা তার জানা ছিল না। মাঝে মাঝে ভারি আশ্চর্য্য হচ্ছিল ভবেশ, এই এক কোঁটা জীবন বাঁচাবার জন্য যখন সে অস্থির ভাবে ছুটোছুটি করছিল।

কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করবার পর কোন মতে একটি খাঁটি জিনিষ পাওয়া গেল। ভবেশ যেন চেনে, কিন্তু জনসাধারণ ত নির্ব্বিচারে সেই নকল কিনেই দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যবহার করে। অনেক সময় ডাক্তারও ধরতে পারে না। যাই হোক, সেটা নিয়ে যখন ভবেশ বাড়ী ফিরল, অবস্থা তখন সঙ্গীন। অরুণা একেবারে কেঁদে ফেলল, বলল, এত দেরী করে আনলে?

ভবেশ ব্যাকুল হয়ে বলে, কি করব অরুণা, সব—সব নকল, একটাও খাঁটি ছিল না, অনেক খুঁজে এই একটা পেলাম। অরুণা নকল ওষুধের কথা শুনেই শক্ত কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মানুষের মত ছেলে কোলে করে বসে রইল। আর একটা কথাও বলল না, মনে মনে ভাবল, ভবেশের পাপের শাস্তি ওকেও ভোগ করতে হবে আর প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে ঐ এক কোঁটা রক্তের ডেলা।

খাঁটি ঔষধের অভাবে ছেলেটিকে আর বাঁচিয়ে রাখা গেল না। শক্ত পাথরের মত অরুণা, কঠিন পাণ্ডুর মুখ, মনটা যেন চলতে চলতে অকস্মাৎ বিশ্রী ভাবে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে, সেখানে দুঃখ-সুখের অথবা অন্য কোন অনুভূতির স্পন্দন মাত্র নেই। কিন্তু ভবেশ বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, তার এতদিনের শুষ্ক মরুজীবনে এ যে নূতন সরস শ্যামলতার আস্বাদন! আজ সে প্রথম উপলব্ধি করল টাকা ছাড়াও অন্য বস্তু সংসারে আছে, যার অভাবে হৃদয় অশান্ত হয়ে ওঠে। কবে কোন শিশু-বয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে যে ভাবে মানুষ হয়ে নিজের অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও কূটবুদ্ধির বলে এত ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েছিল, তা ধাপ্পাবাজি বা জোচ্চুরি করেই হোক, তার ভেতর সুখ-সাচ্ছন্দ্য, বিলাস-ব্যসন, আরাম-আয়েস, প্রভুত্ব-অহমিকা প্রচুর ছিল, ছিল না একবিন্দু স্নেহ, যার কণা মাত্র কোন দিন আস্বাদন করেনি ভবেশ। স্নেহ ত কেবল পাওয়াতেই আনন্দ নয়, দেওয়াতেও প্রচুর আনন্দ। আজ ভবেশের হৃদয় ওর অলক্ষ্যেই এই আনন্দ আহরণ করছিল ঐ এক কোঁটা শিশুকে আশ্রয় করে।

শীঘ্র তা যে মৃত্যুতাপে এ ভাবে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, এ ন্থা ওর মন একেবারেই করে নাই। তাই এই আঘাতে এক র্ব ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা-কড়ি, অরুণার রূপরাশি সব যেন মিথ্যা গেল ভবেশের কাছে। ছুটে গিয়ে অরুণার হাত দুটি ধরে . অরুণা, এ কি হলো ?

অরুণা ধীরে ধীরে বলে, আঘাত করলেই যে আঘাত ফিরে পেতে এ সত্য কি তোমার জানা নেই ? কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ নিয়েছ ঃ ওষুধগুলি তৈরী করে। মানুষের জীবন নিয়ে তুমি খেলা ছ, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচায় সেই ওষুধের সঙ্গে ভেজাল ায়ে সমগ্র মানব সমাজকে প্রতারণা করেছ, এর শাস্তি ত মাকে ভোগ করতেই হবে। আমি প্রস্তুতই ছিলাম, তাই ব্যাকুল নি। ভালই হয়েছে, যদি সত্যই আঘাত পেয়ে থাক তবে ও-পথে যেয়ো না আমি অনুরোধ করছি। তোমার এই পাপের । তাকে তিল তিল করে অমানুষ হয়ে যেতে দেখতাম, সে পর চেয়ে এ ভালই হয়েছে। তখন মা হয়ে সন্তানের : কামনা করতাম। আর এর মধুর স্মৃতি যত দিন বাঁচব মনে । বাঁচিয়ে রাখব।

ভবেশ বিস্ময়ে বলে, মা হয়ে তুমি মৃত্যু কামনা করতে ?

নিশ্চয়, আমি যে মা, আমি যে তার জীবনে কল্যাণময়ী। ই ত মৃত্যুতে তার শান্তি কামনা করতাম। বেঁচে থেকে নিজের ত্মার, নিজের চৈতন্যরূপ ঈশ্বরের তিলে তিলে মৃত্যু ঘটানর চেয়ে কবারে মরে যাওয়া ঢের বেশী কল্যাণকর।

ভবেশ চুপ করে শোনে, মনে মনে ভাবে, সত্যই কি এ পাপ ? ত্যই কি আমি অ-মানুষ ? এই যে টাকা-পয়সা, বাড়ী-ঘর, রূপ-স্বাস্থ্য, জ্ঞ-শক্তি—এর কি কোনও মূল্য নেই ? একটি সামান্য মেয়ের াছেও কি এ সবের চেয়ে হৃদয়ের, মনুষ্যত্বের মূল্যই বেশী ? অর্থ, প, স্বাস্থ্য এর কি কোনও প্রলোভন নেই ? এত দিনের পরিশ্রমে ত কূট বুদ্ধির চালে উপার্জ্জন করা যে বহু কাম্য অর্থ, তার া কোনই প্রয়োজন নেই ? একটি দীর্ঘশ্বাস তার মনের সমস্ত স্থা, দুঃখের বাষ্প বহন করে যেন বেরিয়ে আসে।

নিশ্বাসের শব্দে ভবেশের দিকে চোখ তুলে তাকায় অরুণা। র চোখের দিকে ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ দুটি রেখে বলে ভবেশ, তুমি ক সত্যই চাও না অরুণা, এই ঐশ্বর্য্য ?

স্বামীর বিষাদক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে বড় মায়া হয় অরুণার, ীরে ধীরে কোমল স্বরে বলে, ঐশ্বর্য্য নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু এ ভাবে য়, সৎভাবে।

ভবেশ দুঃখের ম্লান হাসি হেসে বলে, কিন্তু সৎভাবে কি এত য় অরুণা ? জাল-জোচ্চুরি না করলে ত ব্যবসায়ে এ রকম প্রচুর উন্নতি এত অল্প সময়ে করা সম্ভব নয় ?

অরুণা ক্লান্ত স্বরে বলে, কিন্তু এই ঐশ্বর্য্য ত আজ তোমায় শান্তি দিতে পারছে না, যার জন্য তুমি তোমার মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে অ-মানুষ সেজেছ।

উদাস ক্লান্ত দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করে কতকটা যেন আপন মনেই বলে চলে ভবেশ, কিন্তু অরুণা, এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য যেদিন চলে যাবে, সেদিন সমস্ত সামাজিক সম্মানও চলে যাবে, কেউ চিনবে না, জানবে না, আত্মীয়-বন্ধু বলতে কেউ থাকবে না।

অরুণা কতকটা যেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় বলে, যার ভিত্তি মিথ্যার উপর, সে ত একদিন যাবেই। কেউ ত তোমাকে সম্মান করে না, করে তোমার ঐশ্বর্য্যকে, তার ত কোনও মূল্য নেই। মনে মনে সবাই ঘৃণা করে জেন।

শেষের কথা কয়টি বোধ করি ওর কানে যায় না। মনে পড়ে কত দুঃখ, দুর্দ্দশা, অত্যাচার, ঘৃণা, অবহেলা ও দারিদ্র্য-তাড়িত হয়ে কি অবস্থার মধ্যেই না শৈশব, কৈশোর কেটেছে, তার পর কত বাধা, কত বিপদ, কত ভয় উদ্বেগ ধাপে ধাপে পার হয়ে এসে এত দিনের আশা মিটেছে, কিন্তু কোন ত মূল্য নেই এর। অরুণার কথাই ত সত্য, কই, অর্থের বিনিময়ে তো পারলাম না বাঁচাতে একবিন্দু প্রাণ ? ভবেশের মুখে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে, আপন মনে বলে, এই সম্মান, যশ, বড় বড় লোকের বন্ধুত্ব, টাকা-পয়সা, বাড়ী-ঘর দাস-দাসী ছেড়ে বাঁচব ত ?

ভবেশের উদাস, ব্যথাতুর, অনুতপ্ত মুখ যেন অরুণাকে পীড়া দিতে থাকে, কোমল স্নেহপূর্ণ স্বরে বলে, নিশ্চয়, তখনই ত ঠিক বাঁচবে, বাঁচা ত কেবল মিথ্যা মান সম্মান, যথেচ্ছ ভোগ-বিলাস ও আহার-বিহারের মধ্যেই নয়। সত্যকার বাঁচা মনের উন্নতিতে।

অনেকক্ষণ কি ভাবে ভবেশ, শেষে বলে, আচ্ছা তাই হবে, অরুণা, তাই হবে, মানুষের মতই একবার বাঁচতে চেষ্টা করে দেখব।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে অরুণা, নিশ্চয় পারবে, তোমার ভেতর যে আত্মশক্তি রয়েছে সেই তোমাকে সাহায্য করবে।

ট্রেন

ভেরা পানোভা

দ্বিতীয় পর্ব্ব

প্রভাত—পুব থেকে পশ্চিমে

প্রথম বারের যাত্রার কথা মনে করে 'হসপিটাল ট্রেনে'র প্রত্যেকেই ভাবতে লাগলো কি করে সম্ভব হোলো এটা ? এই সামান্য জিনিষটাই কারো মাথায় এলো না ? খোলা প্লাটফর্ম্মের উপর ট্রেনটা এমন প্রকাশ্য ভাবে দাঁড়িয়েছিলো যে, অনেক দূরের বোমারু প্লেনগুলোও সহজেই দেখতে পারে। আর ওরা তখন কিনা ট্রেনের ভিতর বসে দরজা-জানলা বন্ধ করে 'ব্লাকআউট' করছিলো ? শুধু তাই ? ট্রেনটাকেই তো ওদের সব চেয়ে নিরাপদ বলে মনে হোয়েছিলো—যারা ষ্ট্রেচারগুলো নিয়ে শহরে রোগীদের আনতে গিয়েছিলো, তারা তো মনে হোয়েছিলো অসম সাহসীর মত একেবারে মৃত্যুর মুখেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। অবশ্য এ সব চিন্তা ওদের মাথায় এলো যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে অনেকটা দূরে চলে আসার পর।

—"ঈস্ ভাবো তো কাণ্ডখানা ! ট্রেনের বাইরে থাকাতে আমরা কিনা ভেবেছিলাম 'এ যাত্রা আর রক্ষে নেই। অথচ ঐটাই দেখছি বুদ্ধিমানের কাজ হোয়েছিলো—" জুলিয়া ডিমিট্রিয়েভ্নাকে ডেকে সুপ্রাগভ বলেন। সারা ট্রেনের মধ্যে ঐ জুলিয়ার সঙ্গেই যা ক্লোরার একটু কথাবার্ত্তা চলে। কিন্তু ফাইনা উঠলো রেগে, 'কাঁহাতক আর এই একঘেয়ে কথা ভালো লাগে ?' মুখে অবশ্য কিছু বললে না আর……

ফাইনা আর জুলিয়া এখন একটা কামরাতেই থাকে। অবশ্য ফাইনার থাকা উচিত অলগার সঙ্গে। অলগা মিখেলোভনা হোলো সহকারী ডাক্তার। মেট্রন আর তার কাজ তো অনেকটা একই। সমস্ত কঠিন আর জটিল কেসগুলোর ভার ছিলো অলগার উপর, আর ফাইনার রোগীরা সবই সামান্য আহত সৈনিক। কাজটা দু'জনারই এক—কিন্তু হলে হবে কি? এক মুহূর্ত্তও ওদের দু'জনার বনতো না। অলগা হোলো চুপচাপ, লাজুক আর—ফাইনার ঐ উজ্জ্বল চাপল্য ও দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। মেট্রনের পক্ষে ছেলেদের পিছনে অত বেশী ঘোরাটা অলগার কাছে অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ লাগতো। কথায় বলে 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'—অকারণেই অলগা সব সময় ফাইনার খুঁত ধরে বেড়াতো—সামান্য ক্রটিও ওর চোখ এড়াতো না। সকালে যে দশ মিনিটের মিটিংটা হোতো কাজকর্ম্মের আলোচনার জন্যে, সেখানে ফাইনার ভুল-ক্রটিগুলো জাহির করে ওকে সবার সামনে অপদস্থ করার লোভ অলগা সামলাতে পারতো না।—নেহাৎই তুচ্ছ ব্যাপার—হয়তো দু'জন গলার অসুখের রোগী ট্রেনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কিম্বা যে রোগীর খাওয়া-দাওয়া রীতিমত বাঁধাধরা, সে হয়তো কোনো ষ্টেশনে বাঁধাকপির তরকারী কিনে খেয়েছে। এরা সব ফাইনার তত্ত্বাবধানে—তাই অলগার তীক্ষ্ণ স্বর সব কিছু ছাপিয়ে উঠতো ফাইনার এই সব মারাত্মক ক্রটির প্রকাশ করে দিতে। আর ফাইনা? সমস্ত মুখটা ওর লাল হোয়ে উঠতো—ভারী হোয়ে আসতো নিঃশ্বাস। এটা ঠিকই যে ওরা দু'জন ঘুরে বেড়িয়েছিলো আর পাঁচ নম্বর গাড়ীর লেফটানাণ্ট রোগীটি বাঁধাকপির তরকারী কিনে খেয়েছিলো—পরে বমি করতে সুরু করেছিলো। অবশ্য ফাইনাকে যে এ সবের জন্যেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে সেটাও জানা কথা।

অলগার তো আর কোনো হাঙ্গামা নেই। মোটে এক'শ পঁচিশটি রোগী আছে ওর তত্ত্বাবধানে। তার মধ্যে সবাই তো প্রায় বড় বড় অপারেশনের রোগী। বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা আছে তাদের, এমন কি পাছে পড়ে যায় বলে পাশে নেট লাগানো। সারাক্ষণই তো তারা নির্জ্জীবের মত পড়ে থাকে, ট্রেনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করা কিম্বা পাজামা পরেই কোনো ষ্টেশনে নেমে বাঁধাকপি কি ভদকা কিনে খাবার ক্ষমতাই তো ওদের নেই।

অথচ ফাইনার? প্রায় তিনশ'টি রোগীর ভার ওর উপর। যেই না ডিনার শেষ হবে অমনি সুরু হবে চিকিৎসা—কার মাসাজ, কার স্নান, কার ইলেকট্রিক চিকিৎসা—একেবারে মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়। সেই ভোর থেকে রাত অবধি, নার্স আর সিষ্টারদের অনবরত ছুটোছুটি করতে, আর সব চেয়ে বেশী পরিশ্রম করতে হয় ফাইনাকে। এর উপর প্রত্যেকটির উপর চোখ রাখা, কে অখাদ্য খেল, কে কি অন্যায় করলে—হায় ভগবান, এরা তো পক্ষাঘাতের রুগী নয়—স্বাস্থ্যবান তরুণ সৈনিকের দল, একটু-আধটু আহত হলেও প্রাণপ্রাচুর্য্যে চঞ্চল। প্রথমটা যখন যন্ত্রণা ছিলো, আহত অঙ্গের বেদনায় ওরা গোঙাতো, চ্যাঁচাতো, ভয়ে মরে থাকতো, যদি অক্ষম হোয়ে পড়ে, যদি কোনো অঙ্গ বাদ দিতে হয়! কিন্তু একটু ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ফিরে পায় স্বাভাবিক তারুণ্যের চাঞ্চল্য। ঠাট্টা, তামাসা, নানা রকম মজার গল্প, নার্সদের সঙ্গে রসিকতা, গান—কি নয়? সব একেবারে স্বাভাবিক পূর্ণতায় চঞ্চল, এমন কি ফিরে যেতে চায় যুদ্ধক্ষেত্রে···আর সেই সব ছেলেদের তুমি যদি গোমড়া মুখ করে বলো—'কমরেড, ভদকাটা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর, ওটা খেও না'—ওদের উচ্চ কণ্ঠের হাসির স্রোতে ভেসে যাবে তোমার কথা,—'ভদকা? ক্ষতিকর? দেখো বেশী নয়, এই এক'শ গ্রাম ভদকা, স্রেফ এক চুমুকে—যা-কিছু অসুখ-বিসুখ একেবারে সাফ'—বলো তুমি, এর পর আর কি বলা চলে? ঠিকই বলেছে ওরা—ঠিক···

এই তো হোলো রাশিয়ান ছেলে। ফাইনা নিজে রাশিয়ান মেয়ে, ও বোঝে এই সব, ও বোঝে এই ছেলেদের···'জীবন সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণাই নেই', অলগার সম্বন্ধে নিঃশব্দে বসে এই কথাই ভাবে ফাইনা। প্রতিবাদে মুখর হোয়ে ওঠে না একটি বারও। ও ভাবে,···চুপচাপ বসে শোনে আর ভাবে,···তোমার আর কি, আহত সৈনিক শুয়ে শুয়ে গোঙাতে থাকে—'জল, এক ফোঁটা জল দাও'—তুমি অমনি করুণার অবতার হোয়ে তার সামনে জল নিয়ে এসে দাঁড়াও···কিন্তু করুণাময়ী, ব্যাপারটা এত সহজ সব জায়গায় নয়, এমনও ঘটে যে হয়তো এক গ্লাস ওষুধ ছিটিয়ে দিলে তোমার সারা মুখে। সহ্য করতে হবে হাসিমুখে, মুখটা মুছে ফেলে নতুন করে ওষুধ এনে খাওয়াতে হবে—কারণ এদের নার্ভ দুর্ব্বল, একটুতেই উত্তেজিত হোয়ে ওঠে, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে এরা দেখেছে চোখের সামনে, এদের সামনে হোতে হবে ধৈর্য্যের প্রতীক। অনেক বুঝিয়ে, অনেক ধৈর্য্য ধরে শান্ত করতে হবে—হয়তো তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত এক জন রোগীকে বহুক্ষণ ধরে শান্ত করে ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছো—সেই সময় আর এক জন নেমে গেলো ষ্টেশনে। বলো, কোন দিক সামলাবে···?

ফাইনা কিন্তু মনে মনেই ভাবছিলো এ সব। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রের নিয়মগুলো মানতে হবে বৈ কি, তা ছাড়া কমাণ্ডাণ্ট আছেন, কমিশার আছেন, তাঁদের মধ্যে ফাইনার কি সব সময় নিজের মতামত জোরজার করে প্রকাশ করা উচিত?···

কিন্তু জুলিয়ার কাছ থেকে ফাইনা পেলো অপ্রত্যাশিত ভাবে সমর্থন। একদিন জুলিয়া বললে,—"ঐ সহকারী ডাক্তারটি কোথাও মানিয়ে চলতে পারে না—"

—"কেন তোমার মনে হোলো বল তো?"—ফাইনার মুখ উজ্জ্বল।

—"ওর সারা জীবনটাই কেটেছে ছোটোখাটো তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে। সামান্য জিনিষ নিয়েই ও সব সময় মাথা ঘামায়। বড় বড় জিনিষ ওর ধারণাতেও আসে না—"

ফাইনা অবাক হোয়ে যায়—"কিছু মনে কোরো না জুলিয়া, কিন্তু তোমার জীবনও তো ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়েই···"

—"কিন্তু সেগুলিও আমার কর্ত্তব্য"—মাঝপথেই থামিয়ে দেয় জুলিয়া,—"অপারেশনের সময় খুব সামান্য ক্রটিতেই মারাত্মক ফল দেখা দেয়। কিন্তু তাই বলে ডাক্তার কি নার্সদের রোগীর ছোটোখাটো তুচ্ছ ব্যাপারগুলোতে অত নজর দেওয়া উচিত নয়! আমাদের ঐ সহকারী ডাক্তারটি পরে বড় জোর এই কাটা-ছেঁড়া, কি ইনফ্লুয়েঞ্জার ডাক্তার হোয়ে দাঁড়াবে—তার বেশী কিছুতেই না। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ওর দ্বারা হবে না। সাধারণ যে সব ছোটোখাটো অসুখ-বিসুখ মানুষের লেগেই থাকে, ও সেই সবেরই চিকিৎসা করতে পারবে—"

—"আর আমি ?"—ফাইনা প্রশ্ন করে।

জুলিয়া তাক্ষ দৃষ্টিতে ফাইনার দিকে চায়—ওর মাথার একরাশ ঢেউখেলানো চুলের বাহার থেকে পায়ের সৌখীন অথচ ছেঁড়া জুতোটা অবধি দেখে নেয়।—"তুমি বিজ্ঞানের দিকেই নাম করবে। তোমার মধ্যে সে সম্ভাবনা আছে। নাম তুমি করবে, অবশ্য যদি আর পাঁচটা দিকে মন না দাও—"

গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ফাইনা জড়িয়ে ধরলে জুলিয়াকে। ওর ইচ্ছে হোলো চুমো খেতে, কিন্তু কি ভেবে থেমে গেলো।

—"ঠিক্ বলেছো, ভীষণ ভাবে ঠিক বলেছো তুমি"—ফাইনা বলে ওঠে।

তার পরই অফিসের জন্য ঘর খালি করবার সময় যখন সিষ্টারদের দু'জন করে একটা কামরাতে থাকার ব্যবস্থা হোলো, তখন দেখা গেলো জুলিয়া নিজেই উঠে এসেছে ফাইনার ঘরে। আর ফাইনা খুসাই হোয়ে উঠলো এতে।

* * * *

'হসপিটাল ট্রেন'টা এখন আর যুদ্ধ-সীমান্তের দিকে যাচ্ছে না। সেখানে যাবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ছোটো ছোটো ট্রেনের। একটু ভালো বন্দোবস্ত যেগুলির সেগুলিকে বলা হচ্ছে অস্থায়ী 'হসপিটাল ট্রেন'—সেগুলির কাজ সীমান্ত থেকে আহত সৈন্যদের ফিল্ড হাসপাতালে নিয়ে আসা। আর 'হসপিটাল ট্রেন'টা এখন হোয়েছে স্পেশাল ট্রেন—এই স্পেশাল ট্রেনের কাজ হোলো আহতদের একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাজার মাইল দূরে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া। যুদ্ধ-সীমান্তে যাতায়াতের পক্ষে এগুলি অনাবশ্যক ব্যয়বহুল। এই স্পেশাল ট্রেন তো সোজা ভাষায় একটা চলন্ত হাসপাতাল বিশেষ। যেমনি আরামের, আর তেমনি সুন্দর বন্দোবস্ত। ক্লোভ আর টিখভিন এই দুটি যুদ্ধ-সীমান্তে যাবার পর থেকে এটাকে স্পেশাল ট্রেন করে দেওয়া হোলো।

এতে অনেকে খুসীই হোলো—শান্তিপ্রিয় লোকেরা এত দিন যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিশাহারা হোয়ে পড়েছিলো—সারাক্ষণ বোমার নীচে কি আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা যায়? কিন্তু অনেকেই এতে খুসী হবার বদলে দুঃখিতই হোলো। নিঝভেটস্কি হোলো দুঃখিত, জুলিয়া হোলো হতাশ আর ফাইনা পেলো আঘাত।

আর দানিলভ পড়লো দোটানায়।

এক দিকে ট্রেনটাকে ও সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলো, ওর রীতিমত গর্ব্ব ছিলো এটা। তাই মনের গভীরতম সত্তায় খুসী হোয়ে উঠলো—শত্রুপক্ষের করাল গ্রাস থেকে এমন সুন্দর ট্রেনটাকে বাঁচানো গেলো দেখে। কিন্তু ওর চেতনা উঠলো ক্ষুব্ধ হোয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেকে এত দূরে সরিয়ে নিতে। ওর মনে হোলো, কে যেন একপাশে ঠেলে দেওয়া হোলো—পটাপেঙ্কোর উপর রাগে জ্বলে উঠলো ওর মন, ইচ্ছে হোলো তাকে খুন করে ফেলতে—কেন দানিলভকে সে এই কাজে পাঠালো? ওর সে সময়কার রক্তচক্ষু দেখে নার্সেরাও ভয় পেতো। বেশ কিছু দিন সময় লাগলো দানিলভের স্থির হোতে।

জার্ম্মানদের মস্কো থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। লেনিনগ্রাদ তার অবরোধের প্রথম শীতকালটাও কাটিয়ে উঠলো। দানিলভ উদ্গ্রীব হোয়ে উঠলো গ্রীষ্মের সময়টা কি হয়। এই সময় জার্ম্মানরা নতুন করে আক্রমণ সুরু করলে—এবার কিউবান, ককেশাস অঞ্চলের দিক থেকে এগোনো সুরু তোলো—আর এই দিকে দানিলভ নিষ্ফল আক্রোশে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হোয়ে উঠলো।

ইভাক্যুয়েশন দপ্তরের কাছে বদলী হবার জন্য আবেদন জানালে দানিলভ—কোনো উত্তরই এলো না। পটাপেঙ্কোর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি দিলে ওকে যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কাজে পাঠাবার জন্য—কোনো উত্তরই এলো না। শেষকালে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যুদ্ধ বিভাগে অবধি লিখলে।

এদিকে ট্রেনের যে কামরাটি 'শ্লোভে'তে পুড়ে গিয়েছিলো বোমার আগুনে সেটাকে কিরভে সারাবার জন্য আনা হোলো। কিন্তু রেলওয়ের লোকেরা সারাতে আপত্তি জানালো—তাদের এখন লোকের অভাব, কাজ নেবে কি করে? কারখানাগুলোতে শ্রমিকেরা সবাই তো যুদ্ধে গেছে, কাজ চালাচ্ছে একেবারে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা··· দানিলভ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করলে ওরা নিজেরাই নিজেদের ঐ কামরাটা সারিয়ে নেবে। অমনি একটা ছোটোখাটো ব্রিগেড তৈরী হোলো, গাড়ীর কারখানার ফোরম্যান প্রটাসভ হোলো তাদের নেতা—যোগ দিলে ক্রাভটসভ, সুখোয়দভ, মেডভিদিয়েভ, কস্তাসিন, নিঝভেটস্কি, গরিমুকিন, বোগেচাক—কে নয়? ডাক্তারদের দল ছাড়া? এমন কি দানিলভও নিজের বাবার কাছে শেখা বিদ্যের পুঁজিটুকু নিয়ে লেগে গেলো ক্রাভ্ট্সভের সহকর্ম্মী হয়ে। মেয়েরাও লাগলো জিনিষপত্র নিয়ে আসা, পরিষ্কার করা, গাড়ী রং করা ইত্যাদি কাজগুলোতে। এপ্রিলের ছ'টি মাত্র দিন লাগলো ওদের সব কাজ শেষ হতে।

সব চেয়ে বেশী খুসী হোলো দানিলভ। গাড়ীখানার দামের জন্যে নয়—যে ট্রেনটার ভার ওদের হাতে দেওয়া হোয়েছিলো তার একটুও শত্রুর হাতে হারাতে হোলো না—কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, ট্রেনের প্রত্যেকটি লোকই ওর অনুভূতিটা যেন ভাগ করে নিলে। নতুন সারানো গাড়ীখানার দিকে কি খুসীর সঙ্গেই না চাইতে লাগলো সবাই। বিশেষ করে প্রটাসভ প্লাটফর্মের উপর দুই পা ফাঁক করে, ভুঁড়িটি এগিয়ে কোমরে হাত দিয়ে যখন তারিফ করার ভঙ্গীতে দাঁড়ালো, তখন ওর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফের ভিতর থেকেও চোখ দুটো যেন আনন্দে জ্বলছিলো।

এমন সুন্দর ভাবে কাজটা হওয়ার জন্য ওরা একটা ছোটোখাটো উৎসব অনুষ্ঠান করলে। ক্রাভটসভ পর্য্যন্ত সেদিন ফিটফাট হোয়ে সেজেগুজে এলো। অবশ্য ওর প্রশংসটাও সেদিন খুবই করা হ'লো। দানিলভ তো অবাক, ঐ কাটখোট্টা, পাঁড়মাতাল লোকটা যে আবার প্রশংসা শুনে মেয়েদের মত লজ্জায় সঙ্কুচিত হোয়ে পড়তে পারে, এ ওর ধারণাও ছিলো না।···কিন্তু ঐ সময়টুকুই, পরদিন সকালে আবার যে-কে সেই—গোঁয়ার কাটখোট্টা ক্রাভটসভ।

ট্রেনটা নিয়ে দানিলভের ভাবনার অন্ত নেই। এখন ওর মনে অনেক কিছু করবার আছে—পড়ে আছে আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ। হিসেব সুরু হোলো সোবলকে নিয়ে। দেখা গেলো আহতদের নিয়ে আসা, পাঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদিতে মোটে দশ দিনের বেশী সময় লাগে না—বাকী সময়টা ওদের হাতে কাজ থাকে না বললেই চলে, শুধু চুপচাপ জানলা দিয়ে দেখা, কিম্বা গল্পগুজব করা···

জুলিয়ার মত হোলো এ সময়টা পড়া-শোনা করা উচিত। ঠিক কথা, কিন্তু অবসর সময়ে লেখাপড়া করবার জন্মে তো ওরা আসেনি ···কাজ করতে হবে···কাজ চাই···

এক দিন অন্য একটা 'হসপিটাল ট্রেনে'র পাশেই ওদের ট্রেনটা এসে থামলো। জানলা দিয়ে দেখা গেলো সেই ট্রেনের নার্সেরা বসে বসে সেলাই করছে, হাসছে, গল্প করছে। এমন কি, ষ্টাফ ট্রেনেতেও দু'-তিন জন মিলে সার্টের হাতা গুটিয়ে বিলিয়ার্ড খেলায় মত্ত। আশ্চর্য্য! দানিলভ ক্ষুব্ধ মনে ভাবে—কি ওরা! কামরার মাঝখানের পার্টিশান অবধি সরিয়ে ফেলেছে বিলিয়ার্ডের টেবিল পাতবার জন্মে!

ট্রেন দুটোর মাঝখান দিয়ে ট্রেন মেরামতীর একটা 'ছোট্টো দল' ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেলো। একেবারে ছেলেমানুষ সব কয়টা—দু'টি মেয়েও রয়েছে; পুরুষদের তেলচিটে চামড়ার কোট পরা—এই বাচ্ছা ছেলেমেয়েগুলো ট্রেন মেরামত করছে?—দানিলভ ভাবে,—আর ঐ জোয়ান জোয়ান, বয়স্ক পুরুষেরা নিষ্কর্ম্মার মত বসে বসে বিলিয়ার্ড খেলায় মত্ত! আচ্ছা, আমরা যদি নিজেদের ট্রেনের কোনো গাড়ী খারাপ হলে সারাতে পারি, তাহলে অন্য কোথাও কিছু খারাপ হলেও তো আমরা সেটা ঠিক করতে পারি? আমাদের ভিতর তো সব রকম ব্যাপারেই দক্ষ লোক রয়েছে। আর তাই বলে কি এও দেখতে হবে যে আমরা যে কাজটা পারছি না বলে হাল ছেড়ে বসে থাকবো ঐ বাচ্ছাগুলো এসে সেটা করে দেবে? দানিলভ আবার হিসাব করতে বসে—আচ্ছা, প্রত্যেকটা 'হসপিটাল ট্রেনে'ই যদি একটা করে এই রকম 'মেরামতী দল' থাকে তবে কত সুবিধা হয়! আমাদের কোথাও অপেক্ষা করতে হয় না—ষ্টপেজ অনেক কমে যায়। আমাদের আনাগোনা আরও ঢের বেশী বার চলতে পারে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কমাণ্ডাণ্টের মত নিয়ে পরের দিনের মিটিংয়েই দানিলভ এই প্রশ্ন তুললে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা পেলো।

—"আমার কিন্তু একটা বিষয়ে রীতিমত সন্দেহ আছে"—সুপ্রোগভের গলা শোনা গেলো—"এটা ঠিক মত করা হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি। তাছাড়া আমাদের লোকদের উপর কাজের চাপটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে নাকি? যখন ট্রেন-ভর্ত্তি আহতদের আনা হয়, তখন যে কী অসম্ভব খাটুনি পড়ে সে তো সবারই জানা। মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে বৈ কি! যখন খালি ট্রেনগুলো তাদের আনবার জন্মে যায়—সেই সময়টুকুই যা-একটু বিশ্রাম জোটে। আমার তো মনে হয়, বিষয়টা নিয়ে কমরেডদের ভালো করে ভেবে দেখা উচিত।"

দানিলভ অবাক্—ওর চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় বড় হোয়ে গেছে, মুখটা হাঁ হোয়ে গেছে। ব্যাপার কি? সুপ্রোগভ? সেই মুখচোরা লাজুক ডাক্তার আজ সামনাসামনি তার বিরুদ্ধে তর্ক তুলছে? স্বপ্ন নাকি? কী রকম ধীরে ধীরে অথচ স্পষ্ট ভাবে বলে গেলো। প্রত্যেকটা লোক মন দিয়ে শুনলে কথাগুলো। ঐ তো ডাক্তার বেলভ চেয়ারে স্থির হোয়ে বসে হাতের কাগজে কি সব লিখে যাচ্ছেন—মোটা-ঁইডা হাতের তালুতে মাথাটি রেখে বিষণ্ণ মুখ করে বসে আছে—ভাবছে বোধ হয় অন্যায় রকমে কি খাটুনিটাই ওকে দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া হয়েছে।···দানিলভের আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিলো সুপ্রোগভের এই পরিবর্ত্তন। কিন্তু সুপ্রোগভ সম্বন্ধে ওর কোনো দিনই কোনো আগ্রহ ছিল না বলেই এটা লক্ষ্যও করেনি। এটা ঘটেছে 'ফ্রোভ' থেকে ফেরার পর। 'ফ্রোভ' থেকে সুপ্রোগভ হঠাৎ কেমন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে উঠেছিলো—না, শুধু নাক, গলা আর কানের ডাক্তার সে নয়—সে হোলো যুদ্ধের ডাক্তার, রীতিমত ঐতিহাসিক যুদ্ধে সে সক্রিয় অংশ নিয়েছে—শুধু তাই?—মিথ্যে গর্ব্ব করে বলা নয়—রীতিমত বীরের মতনই ব্যবহার করেনি সে?···

মনে মনে সুপ্রোগভ আহত হয়েছিলো বৈ কি যে, সবাই তাকে উপেক্ষা করে। সেদিনের অনুষ্ঠানে সামান্য কতকগুলো পাইপ সারানো নিয়ে সবাই ক্রাভটসভের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোয়ে উঠলো—আর ফ্রোভের পথে সে যে বীরত্ব দেখালো সেটা বুঝি কিছু নয়। তাই এবার সুপ্রোগভ নিজেই উঠে-পড়ে লাগলো নিজেকে জাহির করতে। ওরও যে মিটিংএ একটা অংশ আছে, ওরও যে বলার কিছু থাকতে পারে—লোকে যে ওর কথাও শোনে এটা জানানো দরকার। প্রথমটা বলতে ওর জড়তা-সঙ্কোচ এসেছিলো বৈ কি! কিন্তু দানিলভের চোখে বিদ্যুৎ খেলতে দেখে···প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় যেন বেরিয়ে এলো কথাগুলো—কাটিয়ে উঠলো বৈকি! ঐ তো ডাক্তার বেলভ মাথা নাড়ছেন সায় দিয়ে, গভীর চিন্তাগ্রস্ত মুখ জুলিয়ার—যদিও তাতেও বেচারার মুখটা একটুও ভালো দেখাচ্ছে না। দানিলভ নিঃশব্দে বসে রইল। ও সবার কথাই শুনতে চায়।—সুপ্রোগভের মন্তব্য যেন জলে ঢিল ফেলার মত। ছড়িয়ে পড়লো বৃত্তগুলো। আবার ফিরে এলো।

—"একটা লক্ষ্য কর যে মেরামতের ব্যাপারটা আমাদের সাধারণ মিটিংয়েতেই তোলা হোয়েছে"—প্রটাসভ বলে উঠলো,—"যদি এটা আমাদের কাজের নিয়মাবলীর মধ্যে থাকতো তবে তো কোনো মিটিংয়ের দরকার হোতো না এটা নিয়ে। একটা আদেশ আসতো, তাতেই কাজ হোতো। কিন্তু সেখানে এমন কোনো নিয়ম নেই যে 'হসপিটাল ট্রেনের' কর্মীরা সারাক্ষণ ট্রেনের তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে ট্রেন সারাবে—একটু বিশ্রাম পাবে না—এ সব হোলো রেলওয়ের কাজ, আমি নিজে এক জন রেলওয়ের কর্ম্মচারী, আমি জানি এ সব।"

দানিলভ চুপ। উঠে দাঁড়ালো গরিমৃকিন, অসন্তোষে ভরা ওর কণ্ঠস্বর।

—"কিন্তু মুখ বুজে ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে আমরা বাধ্য কমরেড। যদি নেতার আদেশ হয়, গরিমৃকিন ট্রেনের তলায় শুয়ে পড়, বিনা প্রতিবাদেই আমি শুয়ে পড়বো। যদি আমার উপর পায়খানার ঘর রঙ করার আদেশ হয়, এক মুহূর্ত্তও আমি দ্বিধা করবো না, সে আমাদের নিয়মাবলীতে লেখা থাক আর নাই থাক। আমাদের একমাত্র কাজ হোলো আদেশ পালন করা—"

এবার সুখোয়দভের পালা, হাঁপানীর টানে ধীরে ধীরে বল্লে:

—"কমরেড কমিশার, কমরেড গরিমকিন কিম্বা প্রটাসভের কথা আমি তুলছি না—ওদের কথার কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। আজ যে প্রশ্ন তুমি মিটিংএ তুলেছো, আমার মনে হয় সেটা খুবই ন্যায্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা আর দেশের ভালো-মন্দ যেখানে নির্ভর করছে সেখানে ওদের কথায় কান দেবার কোনো দরকার নেই।"

ক্রাভটসভ হঠাৎ প্রটাসভের দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠলো,—

"আমরা যদি নিজেদের কাজ ছাড়াও অন্য কাজ করতে পারি তবে কেন করবো না শুনি ? আমরা না করলে করবে কে ?"

প্রটাসভ মুখটা ফিরিয়ে নিলে, বিকৃত হোয়ে উঠেছে মুখটা, যেন মনে হচ্ছে সজোরে কেউ চড় মেরেছে ওর গালে।—"তুমি শুধু পারো ঘুমোতে আর ভদকা খেতে···নিষ্কর্মার ঢেঁকি···" দানিলভ উঠে দাঁড়ালো।

"কমরেডস্"—দানিলভের দৃষ্টিটা চকিতে সুপ্রাগভের মুখের উপর পড়লো, "তোমরা আমার কথার আসল মানেটা কেউ বুঝতে পারোনি। আমি চিকিৎসা-কেন্দ্রের কর্ম্মীদের মেরামতী লোক হোতে বলিনি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম—আমাদের মধ্যে যারা মেরামতের কাজে দক্ষ তাদের নিয়ে একটা স্থায়ী ইউনিট্ গড়তে। আর যদি আমাদের চিকিৎসাবিদ্‌দের মধ্যে কেউ কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন খুসীমত, তাতে ক্ষতি আছে কিছু ? যখন খালি ট্রেনটা আহতদের আনতে যায় তখন তো দিনের পর দিন কোনো কাজই থাকে না। কমরেড, তোমরা কি ভাবো, সেই সময় নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিলে আহতদের সেবার কোনো ত্রুটি ঘটবে ? সত্যিই কি তাই ভাবো ?"—দানিলভের সংশয়হীন, সতেজ কণ্ঠস্বর। যেন স্থির জানে—কি উত্তর আসবে এর পর।

সব চেয়ে আগে চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েরা—"না, না, মোটেই তা ভাবি না"—জুলিয়ার মুখে দেখা গেল স্বস্তির চিহ্ন। ডাক্তার বেলভ চেয়ারটিতে নড়ে-চড়ে বসলেন—একটা স্বাচ্ছন্দের ভাব ফুটে উঠলো ওঁর চেহারায়। বিনা প্রতিবাদে সহজেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হোয়ে গেলো প্রস্তাবটা।

কিন্তু সেই দিন থেকে সুপ্রাগভের দিকে চোখ রাখলে দানিলভ। নিজের মনে মনে অনেক প্রশ্ন করেও জবাব পায়নি এত দিন। শেষে বুঝলে,—সুপ্রাগভ খ্যাতিমান হোতে চাইছে, চাইছে পাঁচ জনের কাছে একটু স্তুতি একটু খ্যাতি। এক দিন দানিলভ দেখলে, সুপ্রাগভ আহতদের মধ্যে বসে গল্প বলছে আর লোকেরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

দানিলভ ভাবলে মাঝে-মাঝে ওদের দু'-একটা অভিনয় কি কিছু দেখতে দিলে মন্দ হয় না। আর সুপ্রাগভ ? হ্যাঁ, নিজের কোটরে মুখ গুঁজে বসে থাকার চেয়েও লোকগুলোকে একটু আমোদ দেওয়া অনেক ভালো।

আর এক দিন দানিলভ ভীষণ রেগে গেলো একটা ব্যাপারে। ট্রেনটা তখন আবার 'কীরভ'এ থেমেছে—খালি ট্রেন—আহতদের আনতে যাবার পথে তখন। 'কীরভ'এ অল্পক্ষণের জন্যই থেমেছিল, ট্রেনটা যখন ছাড়ার আদেশ এলো তখন দেখা গেল—একটিও নার্স ট্রেনে নেই। সুপ্রাগভ নিজের খুসীমত সবাইকে সিনেমা যেতে অনুমতি দিয়েছে। তিন ঘণ্টা পেছিয়ে গেলো যাবার সময়। প্রধানকে ডেকে সুপ্রাগভকে শাসিয়ে দেবার কথা জানালে দানিলভ, কিন্তু কোমলহৃদয় ডাঃ বেলভ কিছু বলতে রাজী হলেন না।

—"বুঝলে কি না, ও তো লোকগুলোকে একটু ফূর্ত্তি দিতেই চেয়েছে—" অপরপক্ষ সমর্থনের সুর ডাক্তারের গলায়—"ওদের, এই বয়সে তো নাচ, গান, সিনেমা—এ সব খোলা হাওয়া-বাতাসের মতই দরকার। হয়তো ও বেচারা জানতো না যে এত শীগগির ট্রেন ছাড়বে। ওকে একটু বুঝিয়ে বললেই হবে, কি বল ?"

দানিলভের আর ওঁর সঙ্গে কথা বাড়াবার ইচ্ছে হোলো না, সোজা চলে এলো সুপ্রাগভের কামরায়,—"দেখো ডাক্তার, যদি তুমি আর কখনও কোনো বিষয়ে ওদের অনুমতি দাও আমাকে বা ডাঃ বেলভকে না জানিয়ে, তবে তোমাকে অন্য ইউনিটে বদলী করা হবে—আর খুব প্রীতিপ্রদ ভাবে যে ব্যাপারটা করা হবে তা ভেবো না। বদলী করা তো হবেই—মনে রেখো, তাই নিয়ে বেশ খানিকটা অপ্রীতিকর ব্যাপার করতেও ছাড়বো না। বুঝেছো ?"

সুপ্রাগভ শুনলো, নিঃশব্দে বইয়ের পাতা থেকে চোখ দুটি তুলে শুনলো। দানিলভ বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। শূন্যদৃষ্টিতে সেই গতিপথের দিকে চেয়ে রইলো সুপ্রাগভ। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শান্তা বসু।

বেহিসাব

পুষ্প দেবী

উঃ, কি বকতেই পারে ছেলেটা ? সত্যি নিমুকে নিয়ে আর পারি না। সকাল বেলা তরকারির ঝুড়ি নিয়ে সবে বসেছি, এমন সময় নিমু বাবুর আবির্ভাব। বেশ চিন্তাযুক্ত মুখ, যেন রীতিমত গম্ভীর। এসেই বলে, "সকাল বেলা তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসে গেছেন ? আচ্ছা মাসীমা, আপনি বেগবাগান যাবেন, বেগবাগান ?"

বুঝলুম, কথাটা নতুন কারুর কাছ থেকে শেখা হয়েছে। আমি বলি, "না নিমু, বেগবাগানে আমি যাব না।"

নিমু বলে, "তবে কেষ্টনগরে চলুন, সেখানে খুব মজা।" কেষ্টনগরে নিমুর পিসীমার বাড়ী। নিমু বলে চলে, "শুনুন, প্রথমে ট্রেণ ও বাসে উঠবেন কিন্তু ধারে বসবেন না যেন, তাহলেই পড়ে যাবেন।"

আমি বলি, "ট্রেণ ও বাস তো আমি চিনি না নিমু?"

তবু নিমু ধৈর্য্য হারায় না, বলে, "লালমুখো বাস যেগুলো? আচ্ছা দরকার নেই, তার চেয়ে রিচি রোডে চলুন, কিন্তু থাক্, রিচি রোড অনেক দূর, তার চেয়ে বরং দিল্লী চলুন, কাছে হবে।"

হাজরা রোডের থেকে সুদূর রিচি রোডের চেয়ে দিল্লী যাওয়া ঢের সহজ, কাজেই শেষে তাই সাব্যস্ত হয়। হঠাৎ তরকারির ঝুড়ির দিকে চেয়ে খুব নিরীক্ষণভরে দেখে নিমু বলে ওঠে, "আচ্ছা মাসীমা, আমার মাফলারটা আছে নাকি ওর মধ্যে? কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।"

আমি হাসি চেপে বলি, "কি রংএর মাফলার তোমার?"

—নিমু অনেক ভেবে বলে, "ঐ যে নীল না হলদে, কী যে বলে?"

আবার গল্প চলে—"জানেন মাসীমা, ছোটদি ভায়ের কি কাণ্ড?"

নিমুর কাণ্ডের অভাব হয় না, কিছু না কিছু কাণ্ড তার ভাণ্ডারে সর্ব্বদাই সঞ্চিত থাকে। হয় ছোটদি ভায়ের কাণ্ড, নয়তো রাস্তার মারামারি। মোটের মাথায় যা বলে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তে।

পরের দিন উনি খেতে বসেছেন, এমন সময় নিমু বাবুর আবির্ভাব। ওঁকে বাঁ হাতে জল খেতে দেখে দেখে নিমু ধমকে ওঠে—বলে, "ছিঃ মেসো মশাই, বাঁ হাতটা ধুয়ে ফেলুন। এঁটো করলেন তো?"

ওঁকে তাড়াতাড়ি হাত ধুতে হয়। তার পর উনি বলেন, "দেখেছো তোমার মাসীমার কাণ্ড? আমায় ঠিক জামায়ের মত করে খেতে দিয়েছেন।"

নিমু বলে, "ধেৎ, জামাইরা বুঝি ভাত খায়? তারা শুদ্ধু পোলাউ খায়, শুদ্ধু পোলাউ। আর, উঃ, কী ভীষণ ঝাল খেতে পারে তারা, সে কক্ষনো আপনি খেতে পারবেন না। আমি তো অত ঝাল খেতে পারি না, তাই মা রোজ একটু একটু করে ঝাল আমায় মিশিয়ে দেয়, আমায় অভ্যেস করতে হবে তো? আমিও তো জামাই হব? আপনি পারেন অত ঝাল খেতে?"

আমি বলি, "আচ্ছা নিমু, তুমি আমাদের আপনি বলো কেন?"

অম্লান বদনে নিমু বলে, "অপরদের তুমি বলতে নেই, নিজের লোকদের তুমি বললে দোষ হয় না, তুইও বলা যায়।"

আমি বলি, "তা তো যায় কিন্তু আমি তো তোমায় আপনি বলি না মেস মশাইও বলেন না, তার কি হবে?"

নিমুর এবার হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। বলে, "আঃ, আপনি সব গুলিয়ে দিলেন।"

বাঁধন ছেঁড়ার গান

শ্রীমঞ্জুশ্রী সরকার

বরষার স্রোতে ভেসে-আসা বীজ পল্লীর নদী-পাড়ে
নতুন মাটির আশ্রয়ে ক্রমে বাড়ে,
অজানা দেশের অজানা আকাশে ছড়ায় নতুন শাখা,
অজানা পাখীরা নতুন কুলায় ঝাপটায় বসি পাখা।
প্রভাত-রবির সোনালী আলোর ধারা
চির পুরাতন পৃথিবীর সাথে নব-নব পরিচয়—
জাগাইয়া তোলে হৃদয়ে তাহার অফুরান্ বিস্ময়।
তাই এ পৃথিবীটিরে
নতুন প্রাণের অভিনন্দন জানায় সে ফিরে ফিরে।

"এক দিন দেখি নতুন পৃথিবী আর তো নতুন নয়,
বেড়ে গেছে সঞ্চয়;
চারি দিকে মোর পুরানো জনের চির পুরাতন ভীড়,
কোথা হ'তে যেন কত পাখী এসে বেঁধেছে তাদের নীড়।
শেষ হয়ে গেলে খেলা
নীড় ছেড়ে যায় যে পাখী সন্ধ্যা বেলা,
রাতের আঁধারে কি জানি কিসের তরে
সে পাখীর লাগি মনটি কেমন করে।
ঝড়ের নিশীথে শতেক পাগল যখন অট্টহাসে,
আপন শিশুরে বক্ষে লইয়া পক্ষি-জননী ত্রাসে—
বসিয়া প্রহর গ'ণে;
উদ্বেগ মোর মনে।"

"বরষার স্রোতে নদী-ভরা কূলে-কূলে
নতুন ধানের সঞ্চয় লয়ে তরী যবে পাল তুলে
ধীরে-ধীরে ভেসে যায়,
ঘর-ছাড়া চাষী ব্যাকুল দু'চোখে দূর দিগন্তে চায়;
বেদনা মিশানো তাহার চোখের সোনালী স্বপন মায়া,
জানি না কেন যে আমার হৃদয়ে ফেলে তার গাঢ় ছায়া।"

"স্বপ্ন টুটেছে বুঝি,
খরস্রোত ঐ দু'হাত তুলিয়া কাহারে বেড়ায় খুঁজি?
পুরানো মাটিতে ভাঙ্গন ধরেছে কাঁপন জেগেছে মূলে,
প্রলয় দোলায় দেহ উঠিয়াছে দুলে;
আমার প্রাণের শিকড় ছেঁড়ার লগন এসেছে কাছে,
শোনো গো সবাই কিছু কহিবার আছে,—
যারা এক দিন আপনার হয়ে মোর কাছে এসেছিলে
দু'হাত ভরিয়া বারে-বারে বহু দিলে,
সেদিন শুধুই নিছক খেলার ছলে
যা-কিছু পেয়েছি সঞ্চয় ক'রে রেখেছি কৌতূহলে;
ভেবেছিনু গেছে চুকে,
আজ দেখি তারা আসন পেতেছে আমার সারাটি বুকে।
তাই, বেদনায় হাহাকারে
বিদায়-বেলায় হৃদয় আমার ভরে ওঠে বারে-বারে।"

"শেষে মনে পড়ে একটি জনারে সে যে বড় প্রিয়জন,
দেখা হ'ল না যে তাই বুঝি আজ কেঁদে ওঠে সারা মন।"

"এ গাঁয়ের মেয়ে আজি কোন্ ভিন্ গাঁয়ে
আম্র বেণুর ছায়ে
নতুন করিয়া পেতেছে আজিকে আপনার নিজ ঘর,
সেদিন আমার আপনার ছিলে, আজ হয়ে গেছ পর।
যদি কোন দিন এ ঘাটে ফিরিয়া তোমার আঁখির কোণে,
দু'ফোঁটা অশ্রু জমে ওঠে তবে মনে কোরো অকারণে।"

:খনো চাপা দিয়ে রাখবেন না—

কাশি হচ্ছে বিপদের সঙ্কেত। কাশি হলেই বুঝবেন, গলা ও ফুসফুসের কোমল অংশে প্রদাহ হয়েছে, শ্লেষ্মা জমেছে। কাশি চাপা দিয়ে রাখা ভালো নয়—এর কারণ দূর করাই উচিত।

সিরোলিন 'রচি' ঠিক মূল থেকে রোগের প্রতীকার করে। এর জীবাণুনাশক ক্রিয়াতে প্রদাহ ও জীবাণুর সংক্রমণ [দূ]র হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা বেরিয়ে [য]াওয়ার সাহায্য হয়। কোন মাদক পদার্থ দিয়ে কাশি চাপা না রেখে, কাশি হওয়ার মূলে যে কারণ [থ]াকে তাকেই সিরোলিন ক্রমে ক্রমে দূরীভূত করে। সিরোলিন-এ এমন কি এফিড্রিনও থাকে না।

সিরোলিন শরীর সবল রাখে

সিরোলিন শরীর সবল রাখে, ক্ষুধা বাড়ায়, পারপাকক্রিয়া উন্নত করে এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে যুঝবার ক্ষমতা গড়ে তোলে। কাশি সারাবার জন্য এই পরীক্ষিত পারিবারিক ওষুধটির ওপর লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে অটল বিশ্বাস রয়েছে। আপনার বাড়ীতেও এক শিশি সব সময়ই রাখবেন।

ROCHE

VB 8399

লবকুমার বসু

ফুটবল

কলকাতার ফুটবল ষ্টেডিয়ামের বিষয় আজ দু'-এক কথা বলব। ফুটবল খেলার দর্শকদের বহু দিনের আশা বোধ হয় পূর্ণতা লাভ করতে চলেছে। রাজ্য-সরকার ষ্টেডিয়াম নির্মাণে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন।

ষ্টেডিয়ামের অভাবে জনপ্রিয় এই খেলাটির দর্শকদের যে কি নিদারুণ কষ্টভোগ করতে হয় তা কারও কাছে অবিদিত নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে ত কথাই নেই। একদিন কি দু'দিন আগে থেকেই তাঁদের চেষ্টা শুরু হয় প্রবেশপত্র সংগ্রহ করবার। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার আকাশভাঙ্গা জল সব কিছুই তাঁদের ওপর দিয়ে চলে যায়। কঠোর ও নির্মম মাউণ্টেড পুলিশদের ব্যাটনের গুঁতো ও ঘোড়ার ধাক্কার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এত পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করেও, অধিকাংশের ভাগ্যেই প্রবেশপত্র জোটে না। শেষ পর্য্যন্ত যাঁরা মাঠে ঢুকতে পারেন তাঁদের সংখ্যা—বিফলমনোরথ হ'য়ে যাঁরা ফিরে আসেন—তাঁদের সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। বহু দিন ধরেই তাই ষ্টেডিয়ামের কথা সকলে বলে আসছেন। এত দিন পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে—কৃপাদৃষ্টি! এদিকে আর এক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। রাজ্য-সরকার ইডেন গার্ডেনের রঞ্জী ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামেই ক্রিকেট ও ফুটবলের 'কম্পোজিট' ষ্টেডিয়াম গড়বার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বিখ্যাত এই ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট গ্রাউণ্ড। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনও বটে। শতাধিক বৎসরের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বহন করে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নির্দ্দেশ হ'ল, এই মাঠে ক্রিকেটের সঙ্গে অন্যান্য খেলার এবং বিশেষ করে ফুটবলের জন্যে ষ্টেডিয়াম গড়তে হবে। এতে ভারতের, এমন কি পৃথিবীরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট গ্রাউণ্ড বলে যে খ্যাতি তার রয়েছে, তা যে অনেকাংশেই খর্ব্ব ও বিনষ্ট হবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ঐতিহ্যের কথা ছেড়ে দিলেও ইডেন গার্ডেনের মাটিতে কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম হওয়া সম্ভব নয়। ফুটবল মরসুমের পর ক্রিকেট মরসুম শুরু হবার আগে পর্য্যন্ত যে সময়টুকু থাকে, তারই মধ্যে ক্রিকেট 'পিচ' ঠিক করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রায় ছ'মাস কাল বুট পরে ফুটবল খেলার পর সে মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত করে তোলা, এ দেশের নরম মাটিতে সম্ভব নয়। কোন ক্রমে দাঁড় করালেও সে মাঠে 'টেষ্ট' খেলা চলবে না। কিছু দিন আগে, ইংলণ্ড যাবার পথে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন ক্রিকেট মাঠে ফুটবল মরসুমে ফুটবল খেলাও হয়ে থাকে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার মাটি আর এ দেশের মাটি যে সমান নয়, এ কথা ভুললে চলবে না। তা ছাড়া আমাদের জলবায়ুও ও-দেশের থেকে পৃথক্। তাই সে ব্যবস্থা এ দেশে সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। ক্রিকেট-জগতের বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় যাঁরা এ মাঠে খেলেছেন, এবং আরও অনেকেও এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। সেই জন্যে ভাল ক'রে সব দিক চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। নইলে শুধু অর্থব্যয় ও পণ্ডশ্রমই হবে এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়ত দেখা যাবে নতুন ব্যবস্থা সমীচীন হয়নি। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্রিকেট মাঠটিরই ক্ষতি হবে। তবে শোনা যাচ্ছে, কেল্লার কর্ত্তৃপক্ষেরা নাকি ফুটবল ষ্টেডিয়ামের জন্যে ময়দানে তাঁদের এলাকার কিছু অংশ ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন। তা যদি হয় তো খুবই ভাল। তবে ভয় এখানকার অগণিত সংখ্যক ফুটবল দর্শকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্য্যন্ত "লাল ফিতার" নীচে চাপা পড়ে না যায়।

* * * *

কলকাতায় সন্তোষ ট্রফীর খেলা শেষ হ'য়ে গেছে। গত বছর মহীশূরের কাছে পরাজিত হ'য়ে বাংলা দলের জয়যাত্রার গতি রুদ্ধ হয়েছিল। এ বছরে সেই মহীশূর দলকে হারিয়ে তারা তাদের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে। ১৯৪১ সালে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই বাংলা দল ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। এ বছর তারা মহীশূরকে পরাজিত করে তাদের দশম অভিযানে সপ্তম বারের মত সাফল্য লাভ করল।

এ দেশে ফুটবল খেলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হ'ল এ বছর। বাধ্যতামূলক ভাবে কয়েকটি প্রতিযোগিতায় বুট পরে খেলার রীতি প্রচলিত হয়েছে। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় বুট পরে না খেলার দরুণই নাকি ভারতীয় দল সাফল্য লাভ করতে পারে না, অনেকে বলেন। তাই এ, আই, এফ, এফ, এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। আমাদের আই, এফ, এ, কর্ত্তৃপক্ষেরা কিন্তু নতুন এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা খেলোয়াড়দের বুট পরে খেলা অভ্যাস করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেননি। তাই তার ফলভোগ করতে হয়েছে বাংলা দলকে এ বছরের সন্তোষ ট্রফীতে। এতগুলি খেলায় তাদের 'ড্র' করতে বোধ হয় আর কোন বছর হয়নি। অধিকাংশ খেলোয়াড়েরই বুট পরে খেলায় অনভ্যস্ততা এর অন্যতম প্রধান কারণ। খেলোয়াড় নির্ব্বাচনেও আই, এফ, এ-কে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে এই একই কারণে।

যাই হোক, এ বছরে কয়েকটি দল (যদিও খুব নামজাদা নয়) উন্নত প্রণালীর খেলা দেখিয়ে সকলকে বিস্মিত করেছে। তাদের মধ্যে বিহার দলের নাম উল্লেখযোগ্য। বহু অলিম্পিক খেলোয়াড় নিয়ে পুষ্ট বাংলা দলকে তারা দু'দিন ড্র করতে বাধ্য করে এবং শেষ পর্য্যন্ত তৃতীয় দিনে একমাত্র ভাগ্যদোষেই, মনে হয়, তাঁরা পরাজিত হয়। অন্যান্য বছরের তুলনায় বাংলা দল যেরূপ নিকৃষ্ট ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য এ বছর দেখিয়েছে তাতে সকলেই নিরাশ হয়েছেন। তাদের খেলার মান যদি উন্নত করার ব্যবস্থা না হয়, তাহলে ফুটবলে তাদের একাধিপত্য যে শীঘ্রই বিনষ্ট হবে তা নিঃসন্দেহ।

* * * *

আই, এফ, এ, পরিচালিত লীগের খেলা ইতিপূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হয়েছে। গত বছর আই, এফ, এর অমার্জ্জনীয় ত্রুটিবশতই শীল্ড খেলার কোন মীমাংসা হয়নি। এবার তার ওপর আবার রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। কলকাতায় ১৪৪ ধারা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বেশ কিছু দিন লীগের খেলা বন্ধ থাকে। শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল খেলা সমাপ্ত হবে না বলে অমীমাংসিত ভাবেই লীগ খেলা শেষ হয়েছে।

আই, এফ, এ, শীল্ডের খেলায়ও নানা গোলযোগ দেখা দেয়। প্রতি বছর ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ খেলা শেষ হওয়ার কথা; কারণ ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের ফুটবল মরসুম শেষ হয়ে যায়। এ বছর তারিখ গেল পিছিয়ে। ৩০শে সেপ্টেম্বর শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ করবার দিন নির্দ্দিষ্ট হল। এর অন্যতম প্রধান কারণ, ইউরোপ-সফর-রত ইষ্টবেঙ্গল দলকে শীল্ড খেলায় সুযোগ দেওয়া। মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলকে বাদ দিয়ে কলকাতার ফুটবল খেলা যেন কল্পনাও করা যায় না। শুধু তাই নয়, তারা না খেললে আই, এফ, এরও অর্থাগম হওয়া সম্ভব নয়। ইষ্টবেঙ্গল দল শীল্ডের প্রথম ম্যাচ খেলে ১৫ই সেপ্টেম্বর নাগাদ। সেমি ফাইনালে উঠে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ দলের সঙ্গে তাদের খেলা পড়ে। ইতিপূর্ব্বে আই, সি, এল, দল কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানকে এবং সেমি ফাইনালে জামসেদপুরকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। এই প্রথম বহিরাগত অসামরিক এক দল ফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব অর্জ্জন করল। ২১শে তারিখের ফাইনাল খেলা অমীমাংসিত ভাবেই শেষ হল এবং ৩০শে তারিখে হরতাল থাকায় ১লা অক্টোবর আবার ঐ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তার পর ২রা এবং ৩রা তারিখে খেলেও শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত ভাবেই শীল্ড খেলা শেষ হ'ল। আই, সি, এল, দল রোভার্স কাপে যোগদান করবার জন্ম বোম্বাই যাত্রা করল। ৩রা তারিখের খেলায় পাকিস্তানের নিয়াজ আলি ও ফকৃরী ইষ্টবেঙ্গলের তরফে খেলায় আই, সি, এল দল আই, এফ, এর নিকট প্রতিবাদ জানায়। পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের বিনা অনুমতিতে ভারতে খেলার জন্ম আগেই নিয়াজ আলি ও ফকৃরীকে পাকিস্তান সাসপেণ্ড করেছিল। আন্তর্জ্জাতিক নিয়মানুসারে কোন দেশের খেলোয়াড়কে যদি সাসপেণ্ড করা হয়—তা সে যে কোন কারণেই হোক না কেন—অন্য দেশেও তার খেলার পথ বন্ধ হয়। সেই কারণেই আই, এফ, এ, এই খেলোয়াড়দের, পাকিস্তানের বিনা অনুমতিতে বা তাদের ওপর বাধা-নিষেধ তুলে না নেওয়া পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গলকে খেলাতে মানা করেন। বড়ই লজ্জার ও দুঃখের কথা যে, ইষ্টবেঙ্গলের মত প্রখ্যাত দল মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অনুমতি পাওয়া গেছে বলে জানায়। আই, সি, এল, দল প্রতিবাদ করায় তাদের পাকিস্তানের অনুমতি-পত্র দাখিল করতে বলা হলে তারা অসমর্থ হয়। তখন আই, এফ, এ, টুর্ণামেণ্ট কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, খেলোয়াড় দুটিকে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এবং ইষ্টবেঙ্গল দলকে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সাসপেণ্ড করা হোক। প্রতিবাদকারী ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ দলেরই শীল্ড পাওয়া উচিত, এ সিদ্ধান্তও তাঁরা গ্রহণ করেন। জানি না, শেষ পর্য্যন্ত এ সিদ্ধান্ত সহজে ও বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হবে কিনা।

ক্রিকেট

এ দেশের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ বছরটি স্মরণীয়। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের রজত-জয়ন্তী উৎসব প্রতিপালিত হবে। সেই উপলক্ষে ইংলণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত এক কমনওয়েলথ দল এ দেশে এসে পৌঁছেছে। দলটি খুবই শক্তিশালী। সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন তাঁদের খেলা দেখবার জন্ম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ একটি সুন্দর ও শক্তিশালী দলকে ভারতে আনার ব্যবস্থা করার জন্ম সকল ক্রীড়ামোদীই শ্রীপঙ্কজ গুপ্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন, আশা করি।

প্রচ্ছদপট

বিগত যুগের বাঙলা ও বাঙালীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশেছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ। বাঙালীর শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতিকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়ার মহান্ ব্রতে কয়েক জন কৃতী ইংরাজ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সকল ইংরাজদের মধ্যে কেউ ছিলেন শিক্ষক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ শিল্পী। তখনকার কয়েক জন খ্যাতিমান্ ইংরাজ শিল্পী বাঙলা তথা ভারতবর্ষের তদানীন্তন আলেখ্য অঙ্কিত করেছিলেন। প্রচ্ছদের চিত্রটিতে এইচ, বোর্ণ নামক ইংরাজ শিল্পী হিন্দু রমণীদের জলে প্রদীপ ভাসানোর পবিত্র পর্ব্ব অঙ্কিত করেছেন। চিত্রটি বর্ত্তমানে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য।

ছায়াছবির গতি-প্রকৃতি

(পরিচালকের দৃষ্টিতে)

রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

পরিচালক শ্রীমধু বসু

চৌরঙ্গী রোডের কাছাকাছি একটি নামকরা হোটেল। ঠিকানা জেনে নিয়েছিলুম আগেই যে, বিখ্যাত পরিচালক শ্রীমধু বসু এরই একটি কামরা নিয়ে আছেন। খবর করে এরই মাঝে একদিন হাজির হলুম সেখানে, তাঁর শিল্প-সাধনার উৎস-স্থলে। ভেবেছিলুম এত বড় পরিচালক—যাঁর নাম-ডাক শুধু বাংলায়ই নয় ভারতের সীমারেখাও ছাপিয়ে গেছে, তাঁকে দেখবো' হয়তো একটু অন্য ভাবে অর্থাৎ নিছক আপনার আমার মত নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাঁকে দেখতে পেলুম সাদাসিধে পোষাক-পরা নিতান্ত একজন সাধারণ মানুষ—অহঙ্কার ও আড়ম্বরের কিছুমাত্র ছাপ নেই তাঁর ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে। না দেখলে হয়তো তাঁর সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় ভুলই থেকে যেত আমার।

শ্রীমধু বসু

পারস্পরিক পরিচয় শেষ হ'লেই সুরু হয় কাজের কথা। আমার প্রশ্ন আর তাঁর উত্তর। আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীবসু সোৎসাহে বললেন, ১৯২৮ সাল থেকে আমি ছবি তৈরীর কাজ হাতে নিই। এর ভিতর বহু ছবিই আমি তৈরী করেছি; যেমন—"আলিবাবা", "সেলিমা" (উর্দ্দু), "অভিনয়", "কুমকুম" (বাংলা ও হিন্দী), "রাজনর্ত্তকী" (বাংলা, হিন্দী ও উর্দ্দু), "মিনাক্ষী" (বাংলা ও হিন্দী) "মাইকেল" প্রভৃতি। পরিচালক হিসেবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বলবো, "রাজনর্ত্তকী" ছবিখানি পরিচালনায় আমি সব চাইতে বেশী আনন্দ পেয়েছি। কেন পেয়েছি, সে বলতে গেলে অনেক কথা। এই বলেই তিনি আর একটি প্রশ্নের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, প্রত্যেক ছবি নির্ম্মাণের জন্যেই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা প্রয়োজন। ছবি ভাল করতে হ'লে অন্ততঃ চার মাস সময় দিতেই হবে। কারণ যাঁরা এ শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের পক্ষে মাসে গড়পড়তা দশ-বার দিনের বেশী কাজ করা সম্ভব নয়। ভাল ছবির জন্যে আরও যে দুটি জিনিষ অপরিহার্য্য, সে হচ্ছে গল্প এবং সেই গল্পটাকে যে রূপ দেয়। এই যে-দুটি জিনিষ নিয়ে ছবি গড়তে হবে আজ সেগুলোই সর্ব্বত্র উপেক্ষিত হচ্ছে।

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়?—প্রশ্ন করলুম আমি। শ্রীবসু স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিয়ে বললেন, চলচ্চিত্র যদি ভাল হয় তবে সমাজকে সব কিছু দিতে পারে। এই শিল্পের মাধ্যমে সুদূর প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া চলে। বিশেষ করে আমি মহাপুরুষদের জীবনী-সম্বলিত চিত্রের উপর জোর দিতে চাই। সমাজ-জীবনের উপর এর দুরন্ত প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ মনীষীদের জীবনালেখ্য চিত্রে রূপায়িত হলে সমাজের মধ্যে তার শিক্ষাগত মূল্য অবশ্যই ফুটে উঠবে। খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ছবিতে যখন অশ্লীলতাকে (vulgarity) স্থান দেওয়া হয় তখন জাতির মান নুয়ে যায়—বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা যখন সেগুলো দেখে। চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, শ্রীবসু বলে চলেন, তাহ'লে স্পষ্টই আমি বলবো ব্যবসা ছাড়াও এ ক্ষেত্রে একটা আদর্শবাদ আছে যার প্রতি প্রত্যেক প্রযোজক ও পরিচালকের নজর রাখতে হবে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রুশিয়া অনেক কিছু সংস্কার করেছে। এ দেশেও যে তা না হতে পারে তা নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে চলচ্চিত্র মানুষকে ভালও করতে পারে, খারাপও ক'রতে পারে। ভাল বই মানুষের চিত্তকে বড় করে কিন্তু তা কিনে পড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে হয়ে ওঠে না। অথচ একটা ভাল বই যদি চিত্রে রূপায়িত হয়, সামান্য মূল্যেই যে কেউ আনন্দের ফাঁকে তার সম্পূর্ণ সার গ্রহণ করতে পারে। পরিচালক বসু বলতে থাকেন, এইমাত্র বললুম ছায়াছবির সাফল্যের জন্য শুধু ব্যবসায়ের দিকে নজর রাখলেই চলবে না। আদর্শবাদের উপরও জোর দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমি যুদ্ধকালীন শোচনীয় পরিস্থিতির উল্লেখ করবো। সে সময়ে এ দেশের ছায়াছবিতে 'সস্তা' জিনিষ প্রাধান্য পায়। লোকের হাতে যুদ্ধের কৃপায় অজস্র টাকা এসেছিল। কেউ কেউ রাতারাতি সেই টাকাকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ করে নেওয়ার জন্য চিত্র নির্ম্মাণের পথ বেছে নেন। আদর্শবাদের কোন বালাই তাঁদের অনেকেরই ছিল না। তাঁরা ভেবেছিলেন, দুর্ব্বল গল্প ও সামান্য শিল্পজ্ঞানের পুঁজি নিয়ে জনকতক নামকরা তারকার সমাবেশ করতে পারলেই বুঝি সব হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তাঁরা ছবির পর ছবি তৈরী করে বাজার

প্রাং করবার প্রয়াস পান। ফলে ছায়াছবির মান আপনি নুয়ে পড়লো অনেকখানি। অপর দিকে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের অর্থের যোগান গেল কমে—ছায়াছবি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর তেমনটি চললো না। এখন সস্তা ছবির দিক থেকে রুচি ফিরেছে। ভাল ছবি না হলে এখনকার দিনে সস্তায় বাজীমাৎ করা সম্ভব নয়। এটা অত্যন্ত আশার কথা, আমি বলবো।

পরিচালক হিসেবে আপনি কিরূপ ধরণের ছবির আকাঙ্ক্ষা করেন, আমার এ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে জবাব এলো—আমার জীবনে গুরুগম্ভীর নাটক (heavy drama)-এর একটা বিশেষ আবেদন রয়েছে। যেখানে সত্যিকারের "drama" দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ যেখানে উত্থান-পতনের সমন্বয় বিদ্যমান, সেখানেই আমার সত্যিকারের আনন্দ। চলতি ছবিগুলো সম্পর্কে আমি বলবো, এগুলোর গল্পের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ততখানি বোধ করি দেওয়া হয়নি বা হচ্ছে না। তবে একটা ভালর দিক এই যে—ক্রমশঃ এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে যাতে ইচ্ছে করলেই খারাপ ছবি করা চলবে না। জনসাধারণ পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক সচেতন—তারা ভাল জিনিষ চায়—আনন্দের সঙ্গে আদর্শেরও দাবী করে। প্রযোজকগণও যে জনসাধারণের এ-মনের খবর জেনেছেন সেটাও ভাল ছবি নির্ম্মাণের পথ নিশ্চিত করে তুলছে—এ আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। গত ৮।১০ বছর মানুষের যে একটা নেশা ছিল যেমন করেই হোক সেটা কেটে গেছে। আজ শুধু বাংলায়ই নয়, বোম্বাইয়েও চিত্রজগতে এ সত্যিটা উপলব্ধি হয়েছে যে, আর ধোঁকা দেওয়া চলবে না। চিত্রের সার্থকতার জন্য অপরিহার্য্য উপাদান কি যদি জিজ্ঞেস করেন, শ্রীবসু বলে চলেন, তবে আমি আবারও বলবো—প্রথম গল্প, দ্বিতীয় পরিচালনা। শিল্পীদের ন্যায় চিত্র নির্ম্মাণ বিভাগের প্রত্যেকটি অঙ্গের গুরুত্বই অনস্বীকার্য্য। মোট কথা, চিত্রের সাফল্যের জন্য সব কিছুরই সমন্বয় থাকা চাই। আর একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ হচ্ছে দৃশ্যাবলী সংযোজনা। দুঃখের বিষয়, সেটা আজ বিশেষ ভাবে অবহেলিত হচ্ছে।

প্রশ্ন করলুম আমি, বর্ত্তমান যুগে কি প্রকারের ছবি তৈরী হলে জনসাধারণ তা গ্রহণ করবে বলে আপনার মনে হয়? শ্রীবসু উত্তর করলেন অত্যন্ত সহজ ভাবে—যে ছবি কৌতূহল মেটাতে পারে সে ছবিই মানুষ গ্রহণ করবে সে তো জানা কথা। তবে মানুষের হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য ছবিতে আনন্দদানের দিক তো থাকবেই, তা ছাড়া পরিচ্ছন্নতাও না থাকলে নয়। দর্শকরা আজকাল বিশেষ সমালোচক। কাজেই একটা কোন ছবি হলেই যে তা চলবে তার নিশ্চয়তা নেই। পশ্চিমী অনুকরণে ঢালা ভাবধারার ছবি দেশের উপযোগী হবে না। বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যে ছবি রূপায়িত হবে অর্থাৎ যে ছবির চরিত্র প্রত্যেকেরই মনে হবে নিতান্ত পরিচিত, সে-জাতীয় ছবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনীগুলো ছবিতে সর্ব্বজনীন মর্য্যাদা লাভ করেছে। কাহিনীর দুর্ব্বলতাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছবির ব্যর্থতার মূল কারণ।

শ্রীবসু এখানেই থামলেন না। লক্ষ্য করলুম, আরও বলবার জন্য তাঁর ভেতর আবেগ এসেছে। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বললেন—চলচ্চিত্রকে আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি হতে হবে। এর মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধানের পথ দেখিয়ে দিতে হবে আমাদের। সে জন্যেই বিশেষ ভাবে বিদেশী ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সস্তা অনুকরণের বিরুদ্ধে আমি মত প্রকাশ করলুম। অবশ্য এ কথা আমার বক্তব্য নয় যে, বিদেশের ভাল জিনিষটাও আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। বিদেশী ছবিতে সাধারণতঃ যা দেখতে পাওয়া যায়, যেমন নৈশ ক্লাব, ভোজসভা প্রভৃতির চটকদারী আমাদের দেশের দর্শকদের মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। প্রগতিশীল তার সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টির ছাপ যে ছবিতে না থাকবে সে ছবি এ দেশে হবে অচল।

এ ভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল আমাদের মধ্যে আলোচনা চললো। মুগ্ধ হয়ে গেলুম আমি শ্রীবসুর শিল্পকলার ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প নিজস্ব মর্য্যাদা ও ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে উঠুক, এ দাবীর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখলুম তাঁর প্রত্যেকটি কথায়—তাঁর চোখে ও মুখে। বুঝলুম, তাঁর আরও অনেক বলার ছিল কিন্তু এখানেই কথা শেষ করে আমি যখন ফিরলুম তখন এটাই বার বার মনে হ'লো শ্রীমধু বসু—সত্যিই এমন একজন চিত্র পরিচালক যাঁর বুঝি তুলনা হয় না।

দেখা ছবি

শ্রীরমেন চৌধুরী

নবীন যাত্রা—আজকের বাংলা 'জলছবি'র ভিড়ের মাঝে নবীন যাত্রা প্রকৃতই ছবি-পদ-বাচ্য, এটা বলতে বাধা নেই। কতকগুলো Sex appealing shot হয়তো এতে নেই, নাচে নাম্বা গানেরও ব্যবহার এঁরা করেননি, কিন্তু তবু এ ছবি আপামর জনসাধারণের সুখ্যাতি অর্জন করেছে। পয়সা পাওয়া—অর্থাৎ বাজারে ছবি চালু হওয়া নিছক ভাগ্যের ব্যাপার, কাজেই ও-দিকটা আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই।

নবীন যাত্রার কাহিনী রচিত হয়েছে যাত্রাদলের ছেলে অমূল্যকে নিয়ে। তাঁতীপাড়ার ডাকসাইটে জমিদার বাড়িতে যাত্রা করতে এলো অমূল্য তার দলের সংগে। সেখানে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনার মধ্যে দিয়ে জমিদার-গৃহিণী ইন্দ্রাণীর সম্মুখীন হোলো। প্রথম দর্শনে মৃত পুত্রকে মনে পড়ে যায় ইন্দ্রাণীর—অমূল্যর মাঝে রয়েছে তাঁর বুক-খালি-করে-যাওয়া ছেলের সাদৃশ্য। তাই অনাথ অমূল্যকে রেখে দিতে চান তাঁর কাছে। যাত্রার দলের ছেলের এ সমাদরে সন্দেহ

'বৃত্রাসুর' চিত্রে 'শুভমুহূর্ত শট'

জাগে, হয় ভর। তবু আশার আলো দেখতে পায়, বহু দিনের বাসনা সে নিজে খুলবে দল, করবে নায়িকার পার্ট। কাজেই জমিদার-গিন্নীর কাছ থেকে টাকা পাবার স্বপ্ন দেখে থেকে যায় জমিদার-বাড়িতে। তাঁতীপাড়ার আর এক দিকে ওই জমিদারের যে পতিত জমি পড়েছিলো, তাকে মানুষের বাসের উপযোগী করে তুলতে এবং সেখানে গাঁয়ের লোকজনকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়তে স্বদেশী যুগের নির্মল খুলেছে আস্তানা। একদিন জমিদার-বাড়ির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় আত্মগোপন করতে এলো অমূল্য সেখানে। এসেছিলো পথ ভুলেই, কিন্তু পথ ভুল করে এসে এতো দিনে মানুষ হবার পথের দেখা পেল অমূল্য। জমিদার-বাড়িতে তাকে মানুষ করবার জন্তে যে চেষ্টা চলছিল তাতে আন্তরিকতা ছিলো নিশ্চয়, কিন্তু পদ্ধতিটা ছিলো অতি পুরাতন। তাতে লেখাপড়া শেখার চেয়ে না-শেখার সম্ভাবনা ছিলো বিস্তর। আর নির্মলদা'র আশ্রমে খেলাধুলার মাঝে কতো অনায়াসে শেখা যায় লেখাপড়া! শেষে দেখা গেল প্রকৃত মানুষ হয়েছে ওই অমূল্য—জমিদারের ছেলে প্রভৃতি তার অনেক সমবয়স্ক সাথীরা তার পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় নবাগত সমরকুমারের—কতো সহজে অমূল্যের চরিত্রটিকে এই কিশোর অভিনেতা প্রাণবন্ত করে তুলেছে তা না দেখলে অনুমান করা যাবে না। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে ভবিষ্যতে শক্তিমান্ শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে এ নিঃসন্দেহে।

বৌঠাকুরাণীর হাট—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' শেষ পর্য্যন্ত পর্দ্দায় রূপায়িত হয়েছে পরিচালক-অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্রের তত্ত্বাবধানে। বহুজন-অভিনীত চিত্র বাঙলায় খুব বেশী হয় না। দেবকী বসুর চন্দ্রশেখরের পরে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' দেখলাম। ছবি কেমন হয়েছে প্রশ্ন করলে আমরা বলবো ছবি বেশ ভালই হয়েছে। কেন না, যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ, যথা—পাহাড়ী, নীতিশ, উত্তমকুমার, নরেশচন্দ্র, শম্ভু মিত্র, প্রীতি মজুমদার, পদ্মা, মঞ্জু ও রমা দেবী প্রভৃতি সত্যিই সু-অভিনয় করেছেন। আলোকচিত্র, শব্দ, শিল্প-পরিকল্পনাও চমৎকার হয়েছে। বহুজন-অভিনীত অর্থাৎ "হাজার এক জনের" একত্র সম্মেলনের ছবি বিদেশে বর্ত্তমানে দস্তুরমত বাজার রাখছে, যার প্রমাণ—'কুয়ো ভেডিস', সালোম', 'স্যামসন এণ্ড ডেলাইলা', 'হ্যামলেট'। এই ধরণের ছবিতে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়, যেজন্য হয়তো দরিদ্র পশ্চিম-বাঙলায় পাঁচ বছরেও এমন একটি চিত্র গৃহীত হয় না। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' চিত্রের সাফল্য আরও অনেক বেশী হ'তে পারতো যদি ছবিটির প্রচার-পরিকল্পনা হ'ত ছবি অনুযায়ী। "হাজার এক জনে"র ছবির প্রচারের কায়দাই আলাদা—যাকে আয়ত্ত করতে হয় খানদানি কসরতে। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র প্রচার-ধারায় অনায়াসে শিল্পবোধের পরিচয় দেওয়া যেতো। আরেকটি কথা, কবিগুরুর বহু ব্যবহৃত গানগুলিকে ছবির যেখানে-সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়াটা কি একান্তই অন্যায় হয়নি? মূল বইয়ের স্থান, কাল এবং পাত্র-পাত্রীদের আমলে যে এমন অপূর্ব্ব ও আধুনিক বাঙলা ভাষার গান গাওয়া হ'ত তা আমাদের অজ্ঞাত ছিল এত দিন। বিশ্বভারতীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ কোন্ জ্ঞানে বিষয়টি অনুমোদন করলেন কে জানে! রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই বাধা দিতেন।

—পুস্তক-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

বিপ্লবের পদচিহ্ন—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

চীন দেখে এলাম (১ম পর্ব্ব)—শ্রীমনোজ বসু। বেঙ্গল পাব্লিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

কথা-রামায়ণ—শ্রীসীতারাম দাস ওঁকারনাথ। প্রকাশক—শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মূল্য তিন টাকা।

ব্রহ্মবিদ্যা-সাধন বা প্রাণ-উপাসনা (প্রথম খণ্ড)—শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক—শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ সরস্বতী। মূল্য আড়াই টাকা।

ছোটদের ডক্টর জেকীল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড—শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত। মূল রচনা—আর, এল ষ্টিভেনসন। শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

ত্রিবেণী—শ্রীঅমূল্য গঙ্গোপাধ্যায় (অনুবাদক)। ত্রিবেণী প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

যুগমানব লোকনাথ—শ্রীনরেশচন্দ্র রায়। প্রকাশক—এন, জি, ব্যানার্জ্জী, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

সামবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্র—শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী। গীতা-চক্র, ১২ নং হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য পাঁচ সিকা।

ভিক্ষাপাত্র—শ্রীরমেশচন্দ্র দে। প্রকাশক—সদাশ্রী মন্দির, ১৫বি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য তিন টাকা।

চীনে মাটি—সন্তোষকুমার ঘোষ। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

সহজ রাজযোগ সাধন প্রণালী—স্বামী আত্মানন্দ তীর্থ। যোগাচার্য্য আশ্রম, পোঃ ত্রিবেণী, জেলা হুগলী। মূল্য আড়াই টাকা।

সমিধ—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। নমামি প্রকাশ মন্দির, ৮।২ গোপ লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

শাখা প্রশাখা (২য় খণ্ড)—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। ১৩এ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

তুলি—শ্রীসুকুমার চৌধুরী ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। মায়া গ্রন্থাগার, কদমকুঁয়া, পাটনা। মূল্য দুই টাকা।

ভোরের বকুল (স্বরলিপি)—কথা: রমেন চৌধুরী; সুর: কালোবরণ। প্রকাশক মহুয়া, ৩ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বৃটিশ গায়না—

মালয়ে যখন বৃটিশ শাসক কর্তৃক স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের কাজ অব্যাহত ভাবে চলিতেছিল, যখন কেনিয়ায় বৃটিশ শাসকের নৃশংস দমন-নীতি হিংস্রতায় উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় গত এপ্রিল মাসে (১৯৫৩) বৃটিশ গায়নায় নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন উপলক্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক-সচিব মিঃ অলিভার লিটিলটন সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ গায়নায় খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হইয়াছে।' কিন্তু কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই অক্টোবর (১৯৫৩) মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বিশ্ববাসী অবাক হইয়া শুনিতে পাইল, বৃটিশ গায়নার জন্য শুধু জ্রেমেইকা হইতেই বৃটিশ সৈন্য তলপ করা হয় নাই, তিনটি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ ৭ই অক্টোবর রাত্রে বৃটিশ গায়নার উপকূলে রাজধানী জর্জ্জ টাউনের নিকটে পৌঁছিয়া নোঙ্গর ফেলিয়াছে এবং বিমানবাহী উড়ো জাহাজে করিয়া দুই ব্যাটেলিয়ন বৃটিশ সৈন্যও বৃটিশ গায়নায় প্রেরিত হইয়াছে। বৃটিশ গায়নায় কি ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস পর্য্যন্ত বিশ্ববাসী পায় নাই, যখন সতর্ক গোপনতার অন্তরালে এই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল, তখনও উহার সামান্য বিবরণটুকু পর্য্যন্ত বিশ্ববাসীকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। কাহার বিরুদ্ধে, কোন্ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র দমনের জন্য এই সামরিক ব্যবস্থা? আমাদের এত দিন ধারণা ছিল, আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য যখন সশস্ত্র ষড়যন্ত্র হয় তখনই উহা দমনের জন্য গ্রহণ করা হয় সামরিক ব্যবস্থা। কিন্তু ৬ই অক্টোবর বৃটিশ ঔপনিবেশিক অফিস হইতে এ সম্পর্কে যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়, তাহাতে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিবার পরিবর্ত্তে উহাকে গোপন রাখিবারই প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতেই বৃটিশ গায়নায় নৈরাশ্য এবং উদ্বেগজনক অবস্থা চলিতেছে। আরও বলা হইয়াছে, "ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কম্যুনিষ্ট এবং মন্ত্রীদের মধ্যে তাহাদের কয়েক জন সহকর্ম্মীর চক্রান্ত এই উপনিবেশের মঙ্গল ও সুশাসন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।" কিরূপে বৃটিশ গায়নার মঙ্গল ও সুশাসন বিপন্ন হইয়া পড়িল সে-সম্পর্কে ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যদি বিনা বাধায় এই অবস্থা চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন কোন অংশে পরিচিত ধরণের কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে পারে। অতঃপর ৯ই অক্টোবর (১৯৫৩) বৃটিশ গায়নার গবর্ণর স্যার আলফ্রেড সেভেজ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া ডাঃ জগান গবর্ণমেণ্টকে বরখাস্ত করেন।

জনগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোটে নির্ব্বাচিত, আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, গণতন্ত্রের ইতিহাসে এরূপ কথা আর শোনা যায় নাই। গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে উৎখাত করার দৃষ্টান্তও এই প্রথম। গত এপ্রিল মাসে (১৯৫৩) নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণ নির্ব্বাচনে ডাঃ চেদ্দি জগান এবং তাঁহার মার্কিণ পত্নী জেনেট জগান কর্তৃক গঠিত পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া নিম্নতন পরিষদ লেজিস্লেটিভ এসেম্বলীর ২৪টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসনই দখল করিতে সমর্থ হয়। ডাঃ জগান এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই এসেম্বলীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ডাঃ জগানের প্রধান মন্ত্রিত্বে। জনগণের আস্থাভাজন, তাহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত এই গবর্ণমেণ্ট কাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, কি উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে, তাহা এখন পর্য্যন্তও সাধারণ মানুষের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়াই রহিয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বৃটিশ ঔপনিবেশিক মন্ত্রী মিঃ লিটিলটন যাহা বলিয়াছেন, গণতন্ত্রের ইতিহাসে তাহা সত্যই এক অভূতপূর্ব্ব মতবাদ। গত ৯ই অক্টোবর বৃটিশ রক্ষণশীল দলের সম্মেলনে তিনি বলিয়াছেন, "The Government is not willing, to allow a Communist State to be organized within the commonwealth." অর্থাৎ '(বৃটিশ) গবর্ণমেণ্ট কমনওয়েলথের মধ্যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গঠিত হইতে দিতে ইচ্ছুক নহেন।' ডাঃ জগানের গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গায়েনায় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন কি না, এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা না করিয়াই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কমনওয়েলথের মধ্যে কি ধরণের রাষ্ট্র থাকিতে পারিবে এবং কি ধরণের রাষ্ট্র থাকিতে পারিবে না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার অধিকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে কে দিয়াছে? কমনওয়েলথের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য একটি রাষ্ট্র মাত্র। উহার অন্তর্গত অন্যান্য রাষ্ট্রে কিরূপ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন অধিকার বৃটিশ যুক্তরাজ্যের একার থাকিতে পারে না। কমনওয়েলথের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র একমত হইয়াই শুধু উহা স্থির করিতে পারে। যদি কোন রাষ্ট্র তাহাতে রাজী না হয়, তবে কমনওয়েলথের বাহিরে চলিয়া যাওয়া রোধ করিবার অধিকারও কাহার থাকিতে পারে না। মিঃ লিটিলটনের উল্লিখিত উক্তি শুনিয়া মনে হয়, কমনওয়েলথকে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য বলিয়াই মনে করেন এবং কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে বৃটেনের অধীন দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কমনওয়েলথ

বৃটিশ সাম্রাজ্যের নূতন নামকরণ ছাড়া আর কিছুই যে নয়, তাঁহার এই উক্তি হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তাঁহার এই উক্তি হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, কম্যুনিজমের ভয় যত দিন পৃথিবীতে থাকিবে, তত দিন কোন বৃটিশ উপনিবেশকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে না।

বৃটিশ গায়নার গবর্ণর স্যার আলফ্রেড সেভেজ ৯ই অক্টোবর (১৯৫৩) জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং ডাঃ জগান-গবর্ণমেণ্টকে বরখাস্ত করিয়া বেতারযোগে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদিগকে কার্য্যতঃ কম্যুনিষ্ট বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী ডাঃ জগান, তাঁহার পত্নী জেনেট জগান, পিপল্‌স প্রগ্রেসিভ পার্টির সেক্রেটারী মিঃ য়োরী ওয়েষ্টম্যান এবং মিঃ সিডনী কিং প্রধান পাণ্ডা, তাঁহারা বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন, বিশ্ব যুব ফেডারেশন, বিশ্ব শান্তি পরিষদ এবং আন্তর্জ্জাতিক গণতন্ত্রী নারী ফেডারেশনের সহিত বিশেষ ভাবে সংযুক্ত। তাঁহারা বৃটিশ গায়নায় মস্কোর প্রভাবাধীনে টোটেলিটেরীয়ান রাষ্ট্র গঠন করিতে এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তি হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, ডাঃ জগান, তাঁহার মন্ত্রিসভার সহযোগীরা এবং তাঁহার পত্নী বৃটিশ গায়নায় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য ডাঃ জগান-গবর্ণমেণ্টকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ডাঃ জগান এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিযোগ সত্য কি না তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। অনেক বৃটিশ সংবাদপত্রও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট অভিযোগের অন্তরালে প্রকৃত কারণ বিশেষ কিছু রহিয়াছে। ডাঃ জগান এবং তাঁহার দলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা যদি সত্য বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয়, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

জনগণই সার্ব্বভৌম শক্তির অধিকারী, ইহাই গণতন্ত্রের স্বীকৃত মূল নীতি। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এই সার্ব্বভৌম শক্তির রক্ষাকবচ। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, স্বাধীন ভাবে ভোটদানে অধিকার রক্ষা করিয়াই গণতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রবাদীরা এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যেখানে কম্যুনিজমের প্রতিপত্তি, সেখানে জনগণ স্বাধীন ভাবে ভোট দিয়া গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে পারে না। যদি তাঁহাদের এই নীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বৃটিশ গায়নায় জনগণ কর্ত্তৃক স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচিত গবর্ণমেণ্টকে বরখাস্ত করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্টদের পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। বৃটিশ গায়নার জনগণের হাতে যদি সামরিক শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাহারাই গণতন্ত্রবিরোধী কার্য্য করিবার অভিযোগে বৃটেনকেই কমনওয়েলথ হইতে বাহির করিয়া দিত। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রবাদীরা অবশ্য বলিতে পারেন যে, বৃটিশ গায়নার জনগণ ভোট দিয়া কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া নিজেদের স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়াছে। এই জন্যই তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গায়নার কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে বরখাস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা যে এই যুক্তিই প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এখানে গণতন্ত্র সম্বন্ধে এমন কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেগুলির উত্তর দিতে অসমর্থ। প্রথম প্রশ্ন এই যে, জনসাধারণ যদি স্বাধীন ভাবে ভোট দিবার অধিকার পায় তাহা হইলে তাহারা স্বেচ্ছায় কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতে পারে কি না? এই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবার অধিকার স্বাধীন জনগণের আছে কি না? যদি তাহারা কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতে কিম্বা স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় কি; কে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবে? যদি অপর কোন রাষ্ট্রের এই অধিকার থাকে, তবে সেই রাষ্ট্রের গুণাবলী কি হইবে এবং তাহাকে কিরূপ রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যাইবে? এই সকল প্রশ্ন বাদ দিয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যাইতে পারে না।

জনগণ যদি স্বেচ্ছায় কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতে পারে, কিম্বা নিজেদের স্বাধীনতা বিকাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে আর গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার রক্ষক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রবাদীরা অবশ্যই বলিতে পারেন যে, জনগণ কখনই স্বেচ্ছায় কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতে পারে না; তবে তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারে অথবা কম্যুনিষ্টদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতে পারে। ডাঃ জগান স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা কম্যুনিষ্ট নহেন। বৃটিশ শ্রমিক-নেতা এবং প্রাক্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী মনে করেন যে, ডাঃ জগান প্রভৃতি হয় কম্যুনিষ্ট, না হয় কম্যুনিষ্টদের দ্বারা বিভ্রান্ত। কিন্তু বৃটিশ গায়নার জনগণ যদি স্বেচ্ছায়ই হউক আর নিজেদের অজ্ঞাতসারেই হউক কিম্বা কম্যুনিষ্টদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াই হউক, কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া থাকে তবে তাহার প্রতিকার করিবার অধিকার কাহার? আরও একটি প্রশ্ন এই যে, তাহারা সত্যই কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণই বা কে করিবে? এই প্রশ্ন দুইটির উত্তরে বলিতে হয়, এই দুইটি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটি super nation বা অতি-জাতির অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। এই সুপার নেশ্যান বা অতি-জাতির লক্ষণ কি কি, তাহা আলোচনা করিবার স্থান আমরা এখানে পাইব না। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীতে এইরূপ সুপার নেশ্যানের দাবীদার কয়েকটি রাষ্ট্র আমরা দেখিতে পাইতেছি। তাহাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। তাহার পরে স্থান বৃটেনের। বৃটেনের পরেই ফ্রান্সের স্থান। তাহারাই নির্দ্ধারণ করিতেছে কোন দেশের জনগণ কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া নিজেদের স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়াছে কি না এবং তাহারাই এইরূপ জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার মহৎ ব্রত গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ সুপার নেশ্যান বা অতি-জাতি যে আসলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের একটা নব রূপ, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ, কখন কোন্ দেশের জনগণ স্বেচ্ছায় কিম্বা অজ্ঞাতসারে অথবা কম্যুনিষ্টদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া কম্যুনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই গণতন্ত্র এবং জনগণের কল্যাণের জন্য এই অতি-জাতি বা সুপার নেশ্যানের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিতে

হইবে। ইহা ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্ত সাম্রাজ্যবাদ আজ গণতন্ত্রের রক্ষক সাজিয়াছে। এই স্থপায় নেশ্যানের অনুমোদিত গবর্ণমেন্ট গঠন করিলেই শুধু জনগণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতে পারিবে। অপর কোন রাষ্ট্র যদি কোন স্বাধীন দেশের জনগণের উপর এই সর্ত আরোপ করে, তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বৃটিশ গায়নার জনগণের নির্ব্বাচিত গবর্ণমেন্টকে বরখাস্ত করিয়া এবং শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই পরিচয় দিয়াছেন।

গণতন্ত্র ফাঁকা বুলি নয়, আকাশেও ভাসিয়া বেড়ায় না। প্রত্যেক দেশের বাস্তব অবস্থার সহিত উহার নিবিড় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, জনগণের কল্যাণ উহার লক্ষ্য। বৃটিশ গায়নার জনগণের প্রকৃত অবস্থা কি এবং কি জন্ত তাহারা জগান-দম্পতীর পিপলস্‌ প্রগ্রেসিভ পার্টির হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছে তাহা যেমন জানা দরকার, তেমনি বৃটিশ গায়নার কল্যাণ কামনার অন্তরালে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কি উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহারও সন্ধান করা প্রয়োজন। পিপলস্‌ প্রগ্রেসিভ পার্টি ব্যতীত বৃটিশ গায়নায় আরও তিনটি রাজনৈতিক দল আছে। এই তিনটি রাজনৈতিক দলের নাম :—বৃটিশ গায়না ফার্ম্মার্স এণ্ড ওয়ার্কাস পলিটিক্যাল পার্টি, নেশন্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং ইউনাইটেড ফার্ম্মার্স এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি। শেষোক্ত পার্টি দুইটি কম্যুনিষ্টবিরোধী। ইহা ব্যতীত তাহাদের অন্যান্য লক্ষ্য একান্ত অস্পষ্ট। প্রথমোক্ত পার্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এই কথাই বলা চলে। পিপলস্‌ প্রগ্রেসিভ পার্টির উদ্দেশ্য গায়নার স্বাধীনতা অর্জন এবং আয়সঙ্গত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা চান সমস্ত শিল্পকে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করিতে। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস এবং আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের ফেডারেশন গঠনও এই পার্টির অন্যতম লক্ষ্য। ওয়াডিংটন কমিটির সুপারিশ অনুসারে বৃটিশ গায়নাকে যে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে, তাহা কতকটা ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসন-সংস্কারের মত এবং কতকটা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের মত। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে পিপলস্‌ প্রগ্রেসিভ পার্টি গায়নার পূর্ণ স্বাধীনতা, গবর্ণরের সংরক্ষিত ক্ষমতা এবং উচ্চতন পরিষদের বিলোপ, মন্ত্রীদের অধিকতর বর্দ্ধিত ক্ষমতা, প্রধান প্রধান শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং গৃহনির্ম্মাণের বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করেন। ইহাতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভীত হইয়া উঠিবেন ইহা খুব স্বাভাবিক। বৃটিশ গায়না খুবই দরিদ্র দেশ। কিন্তু উহা চিনি-সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত। উহার প্রধান শিল্প চিনি, বক্সাইট এবং এলুমিনিয়ম। গত ১৫ বৎসরে ১ কোটি ১৫ লক্ষ পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন এই উপনিবেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহাই বৃটিশ গায়নায় বৃটেনের আধিপত্য রক্ষার একমাত্র কারণ তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ,

উহা Imperial strategy বা সাম্রাজ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। বৃটেনের সহিত চুক্তি অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই উপনিবেশে একটি বিমানঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। 'সাণ্ডে টাইমস্' পত্রিকার রাজনৈতিক কলামিষ্ট "Scrutator' লিখিয়াছেন যে, আটলান্টিক দেশগুলির রক্ষা-ব্যবস্থায় বৃটিশ গায়নার গুরুত্ব খুব বেশী। সুতরাং ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, বৃটিশ গায়নার কল্যাণ ও সুশাসন বজায় রাখিবার জন্ত নয়, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বার্থরক্ষায় জন্ত জনগণের নির্ব্বাচিত গবর্ণমেন্টকে বরখাস্ত করিয়া শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখা হইয়াছে।

ডাঃ জগান লণ্ডনে গিয়াছেন বৃটিশ গায়নার প্রকৃত অবস্থা বৃটেনের জনগণকে বুঝাইবার জন্ত। বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতাদের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জগান-গবর্ণমেণ্টকে কেন বরখাস্ত করিয়াছে তাহার কারণ বিবৃত করিয়া একটি শ্বেতপত্রও প্রকাশ করা হইয়াছে। বৃটিশ কমন্স সভায় বৃটিশ গায়নায় বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কার্য্য অনুমোদন করিয়া প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। ডাঃ জগান এবং পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টির অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার পর মিঃ এটলী কমন্স সভায় বিতর্কের সময় বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গায়নার মন্ত্রীরা যে চরম বুদ্ধি-হীনতার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহারা হয় কম্যুনিষ্ট, না হয় কম্যুনিষ্টদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন তাঁহার এই ধারণা পরিবর্তন করিবার কোন কারণ তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার এই উক্তিতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। বৃটিশ সমাজতন্ত্রের স্বরূপ মালয়ে অনেক পূর্ব্বেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বৃটিশ গায়নায় তাঁহারা অনুরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতেন। ডাঃ জগান বিলাতে প্রচারকার্য্য চালাইয়া বৃটিশ গায়নার জন্ত স্বাধীনতা লইয়া আসিতে পারিবেন, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য।

ত্রিয়েস্ত সমস্যা—

গত ৮ই অক্টোবর (১৯৫৩) বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারী ভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে, ত্রিয়েস্তের 'ক' অঞ্চল হইতে তাহারা তাহাদের সৈন্ত সরাইয়া লইবে এবং ঐ অঞ্চল ইটালীর হাতে অর্পণ করিবে। কাহারও সহিত কোন আলোচনা না করিয়াই বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং এই ব্যাপারে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একমত হইতে কোন বাধা হয় নাই। ইটালী শান্তিচুক্তিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী রাশিয়া বৃটিশ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। মার্শাল টিটো হুমকী দিয়াছেন, ইটালীর সৈন্ত যদি ত্রিয়েস্তের 'ক' অঞ্চলে প্রবেশ করে তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ইতিমধ্যে ত্রিয়েস্তের 'খ' অঞ্চলে যুগোশ্লাভ সৈন্ত সমাবেশ করা হইয়াছে। ইটালীও ত্রিয়েস্তের 'ক' অঞ্চলের সন্নিকটে আল্‌পাইন সৈন্ত সমাবেশ করিয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ত্রিয়েস্ত ছিল অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে ত্রিয়েস্তকে মুক্ত করিবার জন্ত যুগোশ্লাভিয়া প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। ত্রিয়েস্তের অধিবাসীদিগকে ইটালীয় বানাইতে ফ্যাসিষ্ট ইটালী কম চেষ্টা করে করে নাই। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ত্রিয়েস্তে সহর এবং বন্দরে ইটালীয়ের সংখ্যা বেশী হইতে পারে। কিন্তু উহা ব্যতীত ত্রিয়েস্তের সমগ্র অধিবাসীই স্লোভানী। অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়া এবং ত্রিয়েস্তের অধিবাসীরা একই জাতির লোক। তাছাড়া অর্থনৈতিক দিক হইতেও ত্রিয়েস্তের উপর যুগোশ্লাভিয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে। ১৯৪৭ সালে ইটালীর সহিত সম্পাদিত শান্তিচুক্তিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছিগিরির অধীনে ত্রিয়েস্ত অঞ্চল লইয়া একটি স্বাধীন অঞ্চল গঠনের কথা আছে। ত্রিয়েস্ত লইয়া যুগোশ্লাভিয়া এবং ইটালীর মধ্যে তীব্র বিরোধের মীমাংসা এই পথেই হইবে বলিয়া বৃহৎ শক্তিবর্গ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী শক্তিবর্গের ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৯৪৮ সালে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স সমগ্র ত্রিয়েস্ত অঞ্চল ইটালীকে দিবার প্রস্তাব করেন। তখন যুগোশ্লাভিয়া ছিল রুশ ব্লকের অন্তর্গত। কিন্তু টিটো-কমিনফর্ম বিরোধের ফলে ১৯৪৯ সালে যুগোশ্লাভিয়া রুশ-শিবিরের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরে যোগদান করায় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ তখন যুগোশ্লাভিয়া এবং ইটালী উভয় দেশকেই আপোষ আলোচনা দ্বারা ত্রিয়েস্ত সমস্যা সমাধান করিবার উপদেশ দেয়। কিন্তু উহাতে বিরোধের তীব্রতাই শুধু বৃদ্ধি পায়। অবশেষে বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ত্রিয়েস্তের 'ক' অঞ্চলকে ইটালীকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অবশ্য 'খ' অঞ্চলটি যুগোশ্লাভিয়াই পাইবে। বৃটেন ও আমেরিকা হয়ত মনে করিয়াছে যে, যুগোশ্লাভিয়া তাহাদের দলে যোগ দেওয়ায় ত্রিয়েস্ত হইতে তাহাকে একেবারে বঞ্চিত করা উচিত হইবে না। কিন্তু তাহাদের এই প্রস্তাব দ্বারা সন্ধির সর্ত্ত খেলাপ করা হইয়াছে।

ত্রিয়েস্ত সমস্যা সমাধানের জন্ত বৃটেন ও আমেরিকা এক গোলটেবিল বৈঠকে যুগোশ্লাভিয়া ও ইটালীর সহিত মিলিত হইতে রাজী আছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু এই আলোচনা হইবে ত্রিয়েস্তের 'ক' অঞ্চল ইটালীকে দেওয়া হইবে, এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। মার্শাল টিটো এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 'ক' অঞ্চলটি ইটালীকে দেওয়া হইবে, এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে গোলটেবিল বৈঠক হওয়ার কোন সার্থকতা নাই। কারণ, উক্ত প্রস্তাবকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইটালীর সৈন্ত 'ক' অঞ্চলে প্রবেশ করিলে যুগোশ্লাভিয়া বাধা দিবে, ইটালী ইহাকে যুগোশ্লাভিয়ার শূন্যগর্ভ আস্ফালন বলিয়া মনে করিতে পারে। ত্রিয়েস্ত লইয়া ইটালী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা অমূলক হইতে পারে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ শেষ প্রস্তাব দ্বারা ত্রিয়েস্তের সমস্যা সমাধান হইবে না, বরং অশান্তি আরও তীব্র হইয়া উঠিবে।

স্পেন-মার্কিণ চুক্তি—

কিছু দিন পূর্ব্বে স্পেন-মার্কিণ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত না হইলেও চতুঃশক্তি সম্মেলনের প্রয়াসের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা অবশ্যই বিবেচনা করা আবশ্যক। এই চুক্তির জন্য আলোচনা দীর্ঘ দিন ধরিয়াই চলিতেছিল। মার্কিণ এডমিরাল শেরম্যান ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে মাদ্রিদে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় হইতেই এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়া বাস্তব পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং গত প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছেদে

এই চুক্তির জন্ত আলোচনা চলিতেছিল। সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় বিষয় সম্পর্কেই চুক্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু চুক্তিতে সামরিক দিকটার উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে বেশী। সামরিক চুক্তিটা যেমন খুব ব্যাপক, তেমনি খুব সুস্পষ্ট। এই চুক্তি দ্বারা স্পেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কতকগুলি নৌঘাঁটি ও বিমানঘাঁটি প্রদান করিয়াছে। এই সকল ঘাঁটির নাম যদিও প্রকাশ করা হয় নাই, তথাপি ঘাঁটিগুলির পরিচয় একেবারে গোপন নাই। যে সকল বিমানঘাঁটি দেওয়া হইয়াছে সেগুলির মধ্যে আছে বার্সেলোনা, মাদ্রিদ এবং সেভাইলের বিমানঘাঁটি। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী কার্টেগ এবং আটলাণ্টিকের উপকূলস্থ কাদিজ নৌঘাঁটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ঘাঁটির সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। চুক্তি অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে দিবে ২২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। তন্মধ্যে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার নৌ-বন্দরগুলির উন্নয়ন এবং স্পেনের দেশরক্ষা শক্তিকে শক্তিশালী করিবার জন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্ত ব্যয় করা হইবে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।

বর্ত্তমানে এই চুক্তি ১০ বৎসরের জন্ত সম্পাদিত হইয়াছে। অতঃপর প্রতি দফায় পাঁচ বৎসর করিয়া দুই দফায় এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা চলিবে। প্রথমেই দশ বৎসরের জন্ত এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই সময়ের মধ্যে স্পেনের সামরিক ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে। চুক্তিতে এমন সব সর্ত্ত আছে যাহার ফলে স্পেনের অর্থনীতির উপর মার্কিণ খবরদারীও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই চুক্তির সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে এই চুক্তির উপর তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নে এই চুক্তির প্রতিক্রিয়া যে অত্যন্ত তীব্র হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 'প্রাভদা' ইহাকে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সমগ্র আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পেন-মার্কিণ চুক্তি বিবেচনা করিলে 'প্রাভদা'র এই আশঙ্কাকে উপেক্ষা করা যায় না।

রাশিয়ার সহিত মীমাংসার প্রয়াস—

রাশিয়ার চারি দিকে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির জন্তই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনের স্থান হইতেছে না। কোরিয়ার শান্তি সম্মেলন যাহাতে বানচাল হইয়া যায় তাহার ষোল আনা ব্যবস্থা করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হুমকী দিতেছে যে, অতঃপর কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ঐ যুদ্ধ আর কোরিয়ার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বৃহৎ চতুঃশক্তি সম্মেলনের যে চেষ্টা চলিয়াছে এবং রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তির যে কথা উঠিয়াছে সে-সম্বন্ধে বিবেচনা করা আবশ্যক। সুইজারল্যাণ্ডের লুগানো সহরে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৫ই অক্টোবর তারিখে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের জন্ত গত ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার নিকট আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করে। রাশিয়া এই আমন্ত্রণ-পত্রের উত্তর প্রদান করে ২৮শে সেপ্টেম্বর। রাশিয়ার এই উত্তরে সম্মেলনের স্থান ও সময়ের বিষয় উপেক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু উহার কার্য্যসূচী পরিবর্দ্ধিত করিয়া আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের তিক্ততা হ্রাস করিবার প্রস্তাবও আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী করা হইয়াছে। রাশিয়া ইহাও প্রস্তাব করিয়াছে যে, এই সম্মেলনে যোগদানের জন্ত কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাইকেও আমন্ত্রণ করিতে হইবে। অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্বন্ধে রাশিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, সাধারণ কূটনৈতিক পন্থায় উহার সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। জার্ম্মাণী সম্পর্কে রাশিয়া তাহার পূর্ব্বের আপত্তিই পুনরায় উত্থাপন করিয়াছে। পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া রাশিয়া কেন এইরূপ উত্তর প্রদান করিল এবং উত্তর দিতে এত বিলম্বই বা কেন হইল, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। কোরিয়ার ঘটনাবলীর অগ্রগতি কি ভাবে অগ্রসর হয় তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে রাশিয়ার পক্ষে উল্লিখিত আমন্ত্রণের উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। কোরিয়ায় সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই রাশিয়া যে উল্লিখিত উত্তর দিয়াছে তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। রাশিয়ার উত্তর পাওয়ার পর অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিবগণ এক সম্মেলনে সমবেত হন। এই সম্মেলনের ফলে তাঁহারা রাশিয়ার নিকট আর একখানি পত্র দেন। এই পত্র ১৮ই অক্টোবর (১৯৫৩) সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

রাশিয়ার নিকট উল্লিখিত পত্রে নবেম্বর মাসে চতুঃশক্তি সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়া জানান হইয়াছে যে, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের স্থায়ী সমাধানের জন্ত জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আবশ্যক। পঞ্চশক্তি সম্মেলন সম্বন্ধে রাশিয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে এই পত্রে জানান হইয়াছে যে, এইরূপ সম্মেলনের জন্ত তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তবে তাঁহারা মনে করেন যে, এইরূপ সম্মেলনে সুফল পাইতে হইলে প্রত্যক্ষ ভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা কোরীয় শান্তি সম্মেলনের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই পত্র দ্বারা যে রাশিয়ার দাবী পূরণ করা হয় নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে চতুঃশক্তি সম্মেলনের বিরোধী ছিল। গত ১১ই মে (১৯৫০) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল অবিলম্বে প্রধান শক্তিবর্গের মধ্যে উচ্চ স্তরে সম্মেলন হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় জুলাই মাসে (১৯৫৩) ওয়াশিংটন বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাশিয়াকে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়াকে প্রশ্ন আলোচনার জন্ত এক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করা হয়। রাশিয়া আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্ত আলোচনা ঐ সম্মেলনের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিবার এবং কম্যুনিষ্ট চীনকে ঐ সম্মেলনে আমন্ত্রণ করিবার সর্ত্তে ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। অতঃপর ১৬ই আগষ্ট ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের জন্ত রাশিয়া এক নূতন প্রস্তাব করে। ইতিপূর্ব্বে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর ২রা সেপ্টেম্বর বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করে। রাশিয়া এই পত্রের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে ১লা অক্টোবর তারিখে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার মিঃ ভিসেনস্কিকে জানান যে, আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে আশ্বাস দেওয়ার পরিকল্পনা

সম্পর্কে মার্কিণ রাষ্ট্রবিভাগ বিবেচনা করিতেছেন। ৫ই অক্টোবর সেনেটর নোল্যাণ্ড বলেন যে, রাশিয়া যদি পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এষ্টোনিয়ায় স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন হইতে দিতে রাজী না হয়, তাহা হইলে আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার তিনি বিরোধিতা করিবেন। ৬ই অক্টোবর মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডুলেস এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, রাশিয়ার সহিত প্রস্তাবিত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স বিবেচনা করিতেছেন। আমেরিকা হঠাৎ রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিতে উৎসাহী হওয়ার তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কোরিয়া শান্তি-সম্মেলন ব্যর্থ হইলে কোরিয়া-যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করিবার হুমকীর মধ্যে রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিবার উদ্দেশ্য কি, রাশিয়া সে-কথা না ভাবিয়া পারে না। রুশ-চীন চুক্তি অনুযায়ী চীন আক্রান্ত হইলে রাশিয়া তাহাকে সাহায্য করিবে। কোরিয়া যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করিয়া যদি চীনকে আক্রমণ করা হয়, তাহা হইলে রাশিয়া যাহাতে চীনকে সাহায্য করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে অনাক্রমণ চুক্তির কথা উঠিয়াছে কিনা, এই প্রশ্ন একেবারে উপেক্ষার বিষয় নয়। রুশ আক্রমণের ধুয়া তুলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের সহিত অনেকগুলি চুক্তি করিয়াছে। উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি তাহার অন্যতম। রাশিয়ার যে-সকল মিত্র দেশ আছে সেগুলিকে রুশবিরোধী করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হইতেছে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায়, সমগ্র পৃথিবীতে রাশিয়া মিত্রহীন হওয়ার পর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হইবে। রাশিয়ার সহিত মীমাংসার চেষ্টা এই জন্যই ব্যর্থ হইতেছে। ভবিষ্যতেও সাফল্য লাভ করিবে, সে-সম্বন্ধেও কোন ভরসা নাই। কোরিয়ায় শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টার সাফল্যের উপর ভবিষ্যৎ শান্তি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে এ কথা সত্য। কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির পর হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অপ্রকাশিত নাই।

নিরপেক্ষ কমিশনের কর্ত্তব্যে বাধা—

কোরিয়ায় নিউট্রাল নেশানস্ রিপার্ট্রিয়েশন কমিশন এবং ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীর কাজ খুব সহজ হইবে, এতখানি দুরাশা কেহই করে নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে যে কিরূপ বিপুল সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে, আমাদের পক্ষে তাহা কল্পনা করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য চীনা ও উত্তর-কোরীয় বন্দীদিগকে কমুনিষ্ট-বিরোধী করিবার জন্য প্রচারকার্য্য এবং বলপ্রয়োগ করিবার কথা যে আমরা শুনি নাই, তাহা নয়। কোজে বন্দীশিবিরে যুদ্ধবন্দী হত্যার কাহিনীও আমরা শুনিয়াছি। যুদ্ধবিরতি হওয়া যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সিংম্যান রীর অভিপ্রেত ছিল না, ইহাও জানা কথা। যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংম্যান রী ২৭ হাজার বন্দীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তথাপি অনেকের মনেই আশা হইয়াছিল যে, ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনী এবং নিরপেক্ষ কমিশন বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও অনিচ্ছুক বন্দীদের সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে। এই আশা যে কতখানি দুরাশা তাহা ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। অনিচ্ছুক বন্দীদের সমস্যা সমাধান ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীকেই লক্ষ্যস্থল করা হইয়াছে।

অনিচ্ছুক বন্দীদিগকে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি লইয়া প্রথমেই নিরপেক্ষ কমিশন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমন্বয়কের মধ্যে মতভেদ সৃষ্ট হয়। মতভেদকে খুব গুরুতর মনে করা যাইত না, যদি যুদ্ধবন্দীরা হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা না করিত। চীনা ও উত্তর-কোরীয় বন্দীরা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এ কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। আমরা শুনিতাম যে, কমুনিষ্টরাই খুব উগ্র প্রকৃতির। যুদ্ধবন্দীরা কমুনিষ্ট-বিরোধী হওয়ার পরেও তাহাদের কমুনিষ্ট-সুলভ উগ্রতা প্রকাশের কারণ কি? প্রথম হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় ১লা অক্টোবর—বন্দীরা যখন একযোগে শিবির ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা করে। ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বাহিনীকে গুলীবর্ষণ করিয়া বন্দীদের শিবির ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া যাওয়া রোধ করিতে হয়। হাঙ্গামার উৎপত্তি-স্থল যুদ্ধবন্দীদের হাসপাতাল। নিরপেক্ষ কমিশনের ডাক্তার প্রতিনিধি দল বন্দী রোগীদিগকে পরিদর্শন করিতে গেলে তাহারা পোল এবং চেক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আপত্তি করে এবং তাহাদিগকে গালাগালি করিতে তো থাকেই, তাহাদের প্রতি লোষ্ট্রও নিক্ষেপ করে। প্রতিনিধিরা নিরাপদ স্থানে চলিয়া যান এবং ভারতীয় সৈন্যরা বন্দী রোগীদের নিকট হইতে ইটপাটকেল কাড়িয়া লয়। হাসপাতালে যখন এই ঘটনা ঘটিতেছিল তখন ৫৩ নং কম্পাউণ্ডের বন্দীরা শিবির ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। গুলীবর্ষণ করিয়া তাহাদের বাহির হইয়া যাওয়া রোধ করিতে হয়। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে তাহার পরদিন ২রা অক্টোবর তারিখে। চীনা-বন্দীরা কম্পাউণ্ডের গেট ভাঙ্গিয়া কম্পাউণ্ড-কমাণ্ডার মেজর বালীকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। এই ব্যাপারেও শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থা ঘটে যে গুলীবর্ষণ না করিয়া আর উপায় থাকে না। একটি চীনা-বন্দী ক্ষুরের ফলক দিয়া গলা কাটিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মেজর বালী যখন এই বন্দীটি সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন তখন উল্লিখিত হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। উক্ত বন্দীটি পরে বলিয়াছে যে, "আমি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক এ কথা ভারতীয় ডাক্তারদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু তাঁহাদের দোভাষীর কাজ যে-ব্যক্তিটি করিতেছিল সে একজন কুয়োমিণ্টাং এজেণ্ট। এই অবস্থায় আমি বুদ্ধি হারাইয়া ক্ষুর দিয়া কব্জিতে এবং গলায় আঘাত করি। আমার এই আশা ছিল, ইহাতে ডাক্তারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহারা আমাকে কম্পাউণ্ডের বাহিরে লইয়া গিয়া দেশে পাঠাইয়া দিবেন।" ভারতীয় ডাক্তারগণ উক্ত বন্দীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় বাধা দিয়া তাহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করেন। পাঁচজন কুয়োমিণ্টাং এজেণ্ট ষ্ট্রেচার বহনে সাহায্য করে এবং যে লোকটি দোভাষীর কাজ করিতেছিল সে প্রধান কুয়োমিণ্টাং এজেণ্টকে সংবাদ দেয়। পরবর্ত্তী ঘটনা সম্পর্কে উক্ত বন্দীটি বলে, "মুহূর্ত্তের মধ্যে কম্পাউণ্ডস্থিত কুয়োমিণ্টাং লোকেরা হুইসল দিলে তাহাদের দলবল একত্রিত হয় এবং বন্দীদিগকে কাঁটা তারের বেড়া ভাঙ্গিয়া ভারতীয়দিগকে আক্রমণ করিতে বাধ্য করে। ঐ সময় আমি প্রধান কুয়োমিণ্টাং এজেণ্টকে 'রাইফেল কাড়িয়া লও।' ভারতীয়দের রাইফেল কাড়িয়া লও' বলিয়া চীৎকার করিতে শুনিয়াছি। ভারতীয় সৈন্যরা গুলীবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে

পর আমাকে মুক্ত করা হয়।" এই চীনা-বন্দীটির নাম চ্যাং-শি-ছিং। তাহার এই বিবরণ হইতে কিরূপে ভারতীয় সৈন্যদিগকে গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য করা হয় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বন্দীশিবিরের ভিতরের অবস্থাও ইহার মধ্যে সুপরিস্ফুট।

নিরপেক্ষ কমিশনের চেয়ারম্যান লে: জেনারেল থিমায়া ব্রি: জেনারেল হ্যামব্লিনের নিকট যে পত্র লিখেন তাহাতেও নিরপেক্ষ কমিশনের কাজ কি ভাবে ব্যর্থ করার চেষ্টা হইতেছে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ বন্দীদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে। বন্দীদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, ১০ দিন পরে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে, কিন্তু চুক্তির সর্তানুসারে ১২০ দিন পরে তাহাদের মুক্তিলাভ করার কথা। বন্দীদিগকে জানানো হইয়াছে বন্দিদশা শেষ হওয়ার পর তাহারা ফরমোসায় যাইবে। কিন্তু চুক্তির সর্তানুযায়ী যে-কোন নিরপেক্ষ দেশে যাওয়ার অধিকার তাহাদের আছে। বন্দীদের ... বহু পুস্তিকা ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। বন্দীদের কাছে একটি লিফলেট পাওয়া গিয়াছে, তাহার এক পিঠে ভারতীয় পতাকা অঙ্কিত আছে এবং ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি এবং আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত রহিয়াছে। বন্দীশিবিরগুলি যে কুয়োমিন্টাং এবং ডাঃ সিংম্যান রীর এজেন্টের দ্বারা ভরপুর, তাহা মুক্ত-বন্দীদের বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এজেন্টদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আসা তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক। এ পর্য্যন্ত মাত্র ১২৫০ জন বন্দী মুক্ত হইয়া আসিতে পারিয়াছে। বন্দীরা যাহাতে দেশে ফিরিয়া যাইতে না চায় সে জন্য তাহাদের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে, হত্যা করিবার ভয় দেখানো হইতেছে, এমন কি হত্যা পর্য্যন্তও করা হইয়াছে। বন্দীরা 'ব্যাখ্যা-স্থলে' যাইতে রাজী নহে বলিয়া যে ধুয়া উঠিয়াছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ ইহার মধ্যেই প্রকাশ। জনৈক মুক্ত-বন্দী বলিয়াছে যে, কি ভাবে 'ব্যাখ্যা-ব্যবস্থা' বানচাল করিতে হইবে সে-সম্পর্কে গুপ্ত এজেন্টরা সিউল হইতে রেডিও যোগে দিনে চারি বার নির্দ্দেশ পাইয়া থাকে। আর একজন মুক্ত কোরীয়-বন্দী সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছে যে, জি-৪৮ কম্পাউণ্ডের কম্পাউণ্ড কমাণ্ডার বন্দীদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছে, ভারতীয় সৈন্যরা কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিলে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইতে হইবে। এই ভাবে বন্দী-শিবিরে ভীতির রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া 'ব্যাখ্যা-ব্যবস্থাকে' বানচাল করার চেষ্টা চলিতেছে। আর এক দিকে বন্দীদিগকে জোর করিয়া 'ব্যাখ্যা-স্থলে' উপস্থিত করা হইবে কি না, তাহা লইয়া নিরপেক্ষ কমিশনের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। চেক এবং পোলিশ প্রতিনিধিরা বন্দীদিগকে জোর করিয়া 'ব্যাখ্যা-স্থলে' উপস্থিত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু সুইডিশ, সুইস এবং ভারতীয় প্রতিনিধিরা উহার বিরোধী। ইহা ব্যতীত আর একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে, বন্দীরা যদি একযোগে শিবির ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে বাধা দেওয়া হইবে কি না। বাধা দিতে গেলে বহু বন্দী হতাহত হইতে পারে, ইহা অবশ্য উপেক্ষার বিষয় নয়। কিন্তু কোজে বন্দীশিবিরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বহু সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করিয়াছে, এ কথাও আমরা ভুলিতে পারি না।

আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত অবস্থা যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে বুঝা যায়, নিরপেক্ষ কমিশনের পক্ষে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করার কোন আশাই আর নাই। ... কার্য্যসূচীকে ... দাবী করিয়াছে যে, উত্তর-কোরীয় ও চীনা-বন্দী ... করিবার ... যাইতে রাজী নহে। তাহাদের এই দাবী সত্য ন... ইহা ... পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই গঠিত হইয়াছে নিরপেক্ষ কমিশন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কুয়োমিন্টাং এবং ডাঃ রীর এজেন্টগণ বন্দীশিবিরে এমন ভীতির অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে যে, বন্দীরা আর 'ব্যাখ্যা-স্থলে' যাইতে রাজী নহে। নিরপেক্ষ কমিশনের অধিকাংশ সদস্যই বন্দীদিগকে জোর করিয়া 'ব্যাখ্যা-স্থানে' লইয়া যাওয়ার বিরোধী। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জেদই বহাল থাকিবে। ইহাতে যুদ্ধবিরতি চুক্তির একটি বিশেষ অংশকেই বানচাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে গত ২৬শে অক্টোবর (১৯৫৩) শান্তিনগরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে কোরিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মেলনের আরম্ভেই বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই কোরীয় শান্তি-সম্মেলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আশা করিবার কিছু নাই।

মরক্কোর স্বাধীনতার দাবীর সমাধি—

মরক্কোকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা দিবার জন্য এশীয়-আফ্রিকান্ কয়েকটি দেশ যে-প্রস্তাব উথাপন করিয়াছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে উক্ত প্রস্তাবটি ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। বলিভিয়া যে-প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিল তাহা আসলে গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫২) সাধারণ পরিষদে গৃহীত ল্যাটিন আমেরিকার প্রস্তাবের অনুরূপ। মরক্কো এবং ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যেই ল্যাটিন আমেরিকার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেন, এই প্রস্তাবে মরক্কোতে ফ্রান্সকে যাহা খুসী তাহাই করিবার ঢালা অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যতঃ ফ্রান্স মরক্কোতে তদনুসারেই কাজ করিয়াছে। অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ উপায়ে জাতীয়তাবাদ এবং মরক্কোর স্বাধীনতার সমর্থক সুলতানকে অপসারিত করিয়া জো-হুকুম এক ব্যক্তিকে সুলতান করা হইয়াছে এবং সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া মানুষের প্রাথমিক অধিকার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করা হইয়াছে। নির্য্যাতন নগ্ন মূর্ত্তিতেই চলিতেছে। ল্যাটিন আমেরিকার প্রস্তাবের ইহাই হইয়াছে পরিণাম।

ভারত বলিভিয়ার প্রস্তাবের উপর এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপন করে। এই সংশোধন প্রস্তাবটি মূল প্রস্তাবের অনেকটা রূপান্তর যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে মরক্কোকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য তাহাতে পূরণ হইতে পারে না। বোধ হয়, এই জন্যই ভারতের সংশোধন প্রস্তাবটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উহার ফলে মরক্কোর স্বায়ত্ত-শাসন পাওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ উপস্থিত হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ফ্রান্স তাহার সাম্রাজ্য কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা তাহার সমর্থক। সামরিক ঘাঁটি হিসাবে মরক্কোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। ইহা মরক্কোকে স্বাধীনতা না দিবার অনিচ্ছাকে আরও দুর্ভেদ্য করিয়াছে।

বিজয়ার পণ

"যুগ আসে, যুগ যায়। বার বার মানব-জীবনের এই অমর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। অসুর-কবলিতা গণলক্ষ্মীকে র করিতে কত না সাগরে কতই না শিলা ভাসে, বিজয়ার রণোৎ-পুলকিত মানুষ অসুর-পুরীতে আগুন লাগাইয়া দীপান্বিতা সাজায়। শ্মীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াও কিন্তু মানুষ ধরিত্রীর কন্যাকে কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না, অগ্নিশিখার ধ্রী আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া কোন্ দুর্গম পাতালে হিতা হন। মানুষের জয়-পরাজয়ের গণলক্ষ্মীর আবাহন-র্জনের এই চিরন্তন মহাকাব্য যুগে যুগে সুর-অসুরের তাজা রক্তে র অক্ষরে গড়া লেখনীতে বার বার লিখিত হইয়া চলিয়াছে। শেষ নাই, শেষ হইলে বুঝি কাহিনী ফুরাইয়া যায়—কাঁদিতে-ইতে, নর-বানরের কল্যাণে সুরাসুর মুণ্ডের বিজয়স্তম্ভ সাজাইতে হইলে শ্রীরামচন্দ্র আর আসিবেন না। দশমুণ্ড রাবণেরই তাহা বৈকুণ্ঠ বিজয় সম্পূর্ণ হইয়া যায়। তাহা তো হইবার নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জুড়িয়া আবার দেখ ধরিত্রীকে পীড়িত করিতে বম্ হস্তে অসুর—দশমুণ্ড অসুর উঠিয়াছে। তাহার দাপটে লোক আজ সন্তপ্ত। তোমরা কি করিবে? দুর্গতিহরার অকাল নের মঙ্গলঘট আবার আর একবার সাজাইবে না? ১০৮ পদ্মে সুরাসুরবন্দিতা জগল্লক্ষ্মীর রাঙা পা দু'খানি চর্চিত করিবে ? মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের আঁখিপদ্ম উপাড়িয়া নীলপদ্মের ১০৮ পূর্ণ করিবে না? মানুষের জীবন মহাকাব্যে অপহৃতা গণলক্ষ্মী রের আয়োজন সফল ও সার্থক করিবে না?" —দৈনিক বসুমতী।

বিপদগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের আবার বিপদ

"নিখিল ভারত উদ্বাস্তু সমিতির সভাপতি ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী রত গবর্ণমেণ্টকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, এই রের মধ্যে ভারতের সকল উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন কার্য যদি রাঙ্গ-কররূপে সমাপ্ত করা না হয় তবে আশী লক্ষ উদ্বাস্তু নিজেদের তা সমাধানের জন্য প্রবল অথচ অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করিতে য হইবে। র টাঁগদোয়ানী বলিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের ত, উদ্বা ও পু. ...নের জন্য এখনই এক শত কোটি টাকা পৃথক্ রা রাখিয়া কাজ ...রম্ভ করা। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট উদ্বাস্তু-কে অধিকতর সাহায্যদানের পরিবর্তে যে ঋণ ইতিমধ্যে দেওয়া ছে, বিপন্ন ও অক্ষম উদ্বাস্তুদিগের নিকট হইতে সেই ঋণগুলি ...দার জন্য কড়া কড়া আইন পাশ করিতেছেন। ...য়ানী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কার্য দ্রুততর করিবার জন্য যে ...ইয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক। সরকারী ঋণ গ্রহণকারী উদ্বাস্তুরা অসমর্থ হইলে তাহাদের ঘটিবাটি ক্রোক করিয়া ঋণ আদায়ের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট অথবা কোন রাজ্য-গবর্ণমেণ্ট যদি কঠোর আইন পাশ করেন, তাহার ফলে আর্থিক বিপদগ্রস্ত উদ্বাস্তুরা আরও বিপন্ন হইবে।" —যুগান্তর।

ঘোড়দৌড়ের তদন্ত

"ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া এক বৎসরের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন মিঃ ডি সি ড্রাইভার এবং সভ্য হইয়াছেন শ্রীযুত শঙ্করদাস বাঁড়ুয্যে ও মিঃ কে পি টমাস। কমিটি তাঁহার কর্তব্য যথারীতি পালন করিবেন, ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতেছি। কিন্তু কমিটির বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে যে, ঘোড়দৌড় লইয়া বস্তুতঃ যে সমস্যা, তাহার পটভূমিতে কমিটির তদন্তাধীন বিষয়ের পরিধি বড়ই সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। বাজি রাখিয়া ঘোড়দৌড় বা রেস খেলা অতি কুখ্যাত ব্যসন। এই ব্যসনে কত লোক যে সর্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবু এই অনিষ্টকর রেস খেলা আইন মোতাবেক এক প্রকার অবাধেই পরিচালিত হইতেছে। ইহা একেবারে বন্ধ ও লোপের ব্যবস্থা হইলেই অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বুঝি ততটা সম্ভব নয়। তাহা হইলেও বাজি রাখিয়া ঘোড়দৌড়কে যথাসম্ভব সংযত ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা আবশ্যক।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ধামাধরা প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি ?

"প্রজা পার্টির নেতৃত্বের একাংশের অতীত কার্য্যাবলীর কথা বাদ দিলেও এ কথা তাহারা মনে না করিয়া পারে নাই যে, যে-সোশ্যালিষ্ট পার্টির সহিত তাঁহারা মিশিয়াছেন সেই সোশ্যালিষ্ট নেতৃত্বের প্রধান ভূমিকা হইল এশিয়ার পরাধীন জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধীদের সহিত মিতালী করা। তবুও কংগ্রেসী শাসনে নিষ্পেষিত জনগণ আশা করিয়াছিলেন এবং এখনও আশা করে যে, দেশব্যাপী ও বাংলাব্যাপী ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামের প্রসার এবং তাহাতে প্রজা-সোশ্যালিষ্ট সভ্যদের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া প্রজা-পার্টির প্রতিশ্রুত কংগ্রেসবিরোধী প্রগতিশীল ভূমিকাই দৃঢ়তর হইবে। এখন প্রশ্ন হইল—প্রজা-সোশ্যালিষ্ট নেতৃত্বের কার্য্যকলাপের ফলে জনগণের সেই আশা কী ভ্রান্ত প্রমাণিত হইবে? অন্ধ, উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রঃ সোঃ পার্টির নেতৃত্বের কংগ্রেসের সহিত আপোষের নানারূপ প্রচেষ্টার নিদর্শন দেখিয়াও পশ্চিম-বাংলার বামপন্থিগণ সেদিনও কলিকাতায় একটি উপনির্বাচনে বাংলার প্রজা-

সোঃ পার্টির বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া উক্ত পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন করিয়া কংগ্রেসবিরোধী প্রগতিপন্থীদের পক্ষে নির্বাচন সফল করিয়াছেন। পশ্চিম-বাংলায় কংগ্রেসের গণ-বিরোধী কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামে বামপন্থীদের সহিত প্রোঃ সোঃ পার্টি সাহচর্য্য দেওয়ায়, বাংলার জনমত কিরূপে তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন তাহা লক্ষ্যণীয়। সুতরাং অন্ধ্রে যাহা ঘটিতেছে জনসাধারণের মধ্যে তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, বাংলার প্রঃ সোঃ পার্টির সভ্যদের তাহা ভাবিতে হইবে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিয়া—অন্ধ্র কংগ্রেসবিরোধী প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা কায়েমের সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া পুনঃ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের কার্য্যে প্রজা-সোশ্যালিষ্ট নেতৃত্বের প্রচেষ্টা যদি ব্যাহত না হয় তাহা হইলে ইহাতে শুধু সমগ্র দেশের গণ-আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না—প্রজা-সোশ্যালিষ্ট পার্টিও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" —নূতন পত্রিকা (বর্দ্ধমান)।

লেভী প্রথা বিলোপে আশঙ্কা নাই

"ধান্য লেভী উঠিয়া যাওয়ায় অনেকে চঞ্চল হইয়াছেন। কোন কোন চাষী আশঙ্কা করিতেছেন ধান্যের মূল্য পড়িয়া যাইবে। ধানের যে দর হইয়াছিল তাহা কল্পনার অতীত। ধানের দাম আর ১৪৲ টাকা মণ হইবে না নিশ্চয়, কিন্তু ৭।৮৲ টাকার নীচেও নামিতে পারে না। যে জিনিষ উৎপন্ন কম হয় তাহার দাম বাজারের চাহিদা মধ্যেই বাড়ে। চাউলের চাহিদা থাকিবেই সুতরাং চাষীর আশঙ্কার কারণ নাই। আজও সিউড়ীতে মোটা চাউলের দর ২০।০ টাকা। চাষীর ব্যবসাবুদ্ধি হইলে সে ন্যায্য দামই পাইবে।" —বীরভূম বাণী।

বাঙ্গালী কি দোষ করিল?

"আসামে বাঙ্গালী বিতাড়নের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে, সরকারী চাকুরীতে যে সমস্ত বাঙ্গালীদের সাময়িক ভাবে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল, তাহাদের নানা অজুহাতে ছাঁটাই করা হইতেছে। নানা প্রকার অজুহাতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চালু অজুহাত হইতেছে বাঙ্গালীদের নিকট ডোমিসাইল্‌ড সার্টিফিকেট দাবী করা।" —ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)।

ডাকাতির প্রতিকার চাই

"বাংলা-উড়িষ্যার সীমান্তবর্ত্তী আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—মেদিনীপুর সীমান্তবর্ত্তী বালেশ্বর জেলায় মাহাদিয়া গ্রামের এক বড় অলঙ্কার-ব্যবসায়ী মহাজনের গৃহে গত ২৬শে ভাদ্র গভীর রাত্রে সশস্ত্র এক দল ডাকাত দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহস্বামীকে ও মহিলাদের বিশেষ ভাবে আহত করিয়া যথাসর্ব্বস্ব ডাকাতি করিয়া লইয়া গিয়াছে। মহিলাদের আর্ত্তনাদে পার্শ্ববর্তী লোকজন আসিয়া পড়ায় বামাল সমেত ডাকাতরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে দুই দলে বিভক্ত হইয়া রামনগর ও এগরা থানার এলাকার দিকে পলায়ন করে। প্রকাশ, গৃহস্বামী নাকি ডাকাত দলের অনেককে চিনিতে পারিয়াছেন। বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্তবর্ত্তী স্থানে প্রায় প্রত্যহই চুরি-ডাকাতিতে সীমান্তবাসী জনগণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। উড়িষ্যা পুলিসের সহযোগিতায় রামনগর ও এগরার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ তৎপর হইয়া তদন্তকার্য্য চালাইলে মনে হয় এই ডাকাতের দল ধরা পড়িতে পারে। গৃহস্বামীর জীবন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রহিয়াছে। আমরা সত্বর এই ডাকাতির প্রতিকার প্রার্থনা করি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে।"

—নারায়ণ (কাঁথি)।

ডাঃ রায়ের ... ও চীনা-বন্দী

"সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের শম্বুকগতি সম্বন্ধে ... কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ... খাস দপ্তরে সে সব তুচ্ছ কথা গ্রাহ্য করেন কি ... নাই। ৩।৪ মাস পূর্ব্বে তমলুক এ. জি. ... ওয়ার্ড বা আইসোলেসন ওয়ার্ডের টিউবওয়েল ... লিখিয়াছিলাম। আজও তাহার মেরামত ... বৎসর যাবৎ তমলুক সরকারী প্রভিন্সিয়াল হাস... ওয়ার্ডের ছাদ ভগ্নজীর্ণ হইতে হইতে বিপজ্জনক ... বৎসর তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অ... মেরামত করিবার বা খুলিবার কোন লক্ষণ না... সময়ই এই হাসপাতালের টিউবওয়েলটি খ... মেডিক্যাল অফিসারের তাগিদে নলকূপ বিভ... আসিয়া সেই যে পাম্পটি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে ... হইয়া গেল তাহার আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই ... বহাইয়া আনিয়া কোনক্রমে হাসপাতালের কাজ ... অলস কর্ম্মতৎপরতাহীন ডাইরেক্টরদের জন্যই স... আস্থা উড়িয়া যাইতেছে না কি?"

জাতীয়তাবাদী সংবাদ...

"শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-রহস্য তদন্তের উপর ... নেহেরু ধমক দিয়াছেন, হোম-মিনিষ্টার কাটজু ... চড় মারিয়া দাবীর হিঁচকাঁদুনেগিরি থামাইয়া ... লোকের মাতামাতি চুপ হইয়াছে। ... ভাবপ্রবণতা ছাড়া যে কিছুই নয়, এই কথা ... দেশবাসীকে শোনাইয়া দিয়াছেন। সংবাদে শে... আবদুল্লা ব্যক্তিগত ভাবে এ বিষয়ে ... জানাইয়াছিলেন—বিধান রায় বিদেশ হইতে ... সন্ধানের জন্য কাশ্মীর-যাত্রার সঙ্কল্প প্রকাশ ক... রক্তচক্ষুর কাছে বিধান রায় 'আপন প্রাণ ... করিয়া প্রাকারান্তরে 'তদন্তের দরকার নাই ... ডিগবাজি খাইয়াছেন। খেলোয়াড় বিধান ... জাগায় নাই। অতুল্য ঘোষের এক চক্ষু ক... ভাল নয় বুঝিয়া নাম-সাক্ষী করিয়া চিঠি ... জানাইয়া বোধ হয় গোপনে সেই পত্র ... এক চক্ষুর দৃষ্টি যে এক দিকেই নিবদ্ধ থা... হইবার কিছু নাই। কিন্তু বিস্ময় জা... লোকের আচরণ দেখিয়া, বাংলার জাতীয় ... সংবাদপত্র সমূহের ব্যবহার দেখিয়া।"

বিনা টিকিটের যা...

"দেশ স্বাধীন হইবার পর রেলওয়ে ... হইয়াছেন দেখিতেছি। আমাদের নিক... ইষ্টার্ণ রেলওয়ের তালিত ষ্টেশন হইতে বর্দ্ধ... শ্রেণীর প্রাত্যহিক টিকিট গত ৬ মাস ... ২০১২৫ জনের জন্য ষ্টেশন-মাষ্টার কাগজে...

ও বন্ধ করিয়া ইন্টার ক্লাসের টিকিট কিনিতে বাধ্য করা হয়। ... জনসাধারণকে দৈনিক এক আনা হিসাবে ... হয়। টিকিটের রসিদ লিখিতে দেরী হওয়ার জন্য কোন যাত্রী ট্রেণে উঠিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট ... হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ভাড়া আদায় করা হয়। গত ... প্রকাশিত বর্দ্ধমান রাজ কলেজের ছাত্রগণের অভিযোগে ... ছাত্রদের কনসেসন মাসিক টিকিটের জন্য নির্দ্ধারিত ফরম না ... বহু ছাত্র-ছাত্রীর মাসিক টিকিট কাটা হয় নাই। আমরা ... রেল কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন করিতেছি।"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতেছে

"...গ্রেস তাহার জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলিতেছে। অন্য ...শের কথা বলিতে পারি না, বাংলা দেশে এ কথা কঠোর সত্য। সকল সমস্যার সমাধানে অক্ষমতাই কি তাহার কারণ নহে? ...র কংগ্রেসকর্ম্মীরাও এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। ... করিতে তাঁহাদের বাধিতেছে—কোথায় বাধিতেছে ...—তথাকথিত 'প্রেষ্টিজে' না স্বার্থে? বাংলা দেশে ...গ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাস আজ এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে কোন যুক্তিতর্ক দিয়া ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া ... করি না। পথে-ঘাটে, আলাপ-আলোচনায়, সভা-সমিতিতে ...গ্রেসকর্ম্মীদিগের নিকট এই রূঢ় সত্য কি প্রতিভাত হইয়া ...তেছে না?"

—বঙ্গবাণী (আসানসোল)।

মনে থাকলে হয়!

"গত ২৪শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর সংসদ ভবনের হল-ঘরে বিভিন্ন ...জ্যের কৃষি ও সমবায় বিভাগের মন্ত্রিগণের এক সম্মেলনের উদ্বোধন ...রিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেন,—কোট, নেকটাই, কলার প্রভৃতি ...রাজী পোষাক, কর্ত্তৃপক্ষ ও কৃষকদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর-...রূপ। ...গবেষণা ও পরিকল্পনার মত কৃষি গবেষণাও পরিষদ ... অফিস-ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, গ্রাম্য কৃষকদের কাছে পৌঁছায় ...। এই সম্মেলনের সকল আলোচনাই নিষ্ফল হইবে, যদি পল্লী ...ঞ্চলের কৃষকদের নিকট এই সকল আলোচনার ফলাফল না পৌঁছায়। ...হরুজী এই ছয় বৎসর এমনি বিফলে কাটাইয়া এত দিনে মন্ত্রীদের ... আমলাগণের সঙ্গে কৃষকদের কোন যোগাযোগ নাই দেখিয়া ... হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের এই দরদের কোন ... অবসরে কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ... ধূলোর মত উড়িয়া গিয়াছে, যাঁহারা এই টাকা ...কে খাওয়াইয়াছেন, তাঁহারা এখনও ছাট, ... পরিয়া সসম্মানে বিরাজ করিতেছেন বেদাগ। মন্ত্রী ... পর্য্যন্ত কেহই সাধারণ লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ...ত পারেন না। কারণ দেশে শতকরা ৮৫ জন নিরক্ষর, বাকি ... মন্ত্রী ও আমলারা একাংশ। এঁরা সাধারণের ... নিজেরা নিজেদের জানেন যে, তাঁহারা সব ...কেই তাঁদের জানে, এঁদের অন্যায় কাজের প্রতি-... নিজেরই নিজের হাতে ইহাদের রোগের ঔষধ, পাচন বা মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করে সেই স্তরে উচ্চতম গোলামের সপ্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া জেলের কয়েদীর মত প্রহরীবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করেন। খুদে হুজুরেরা বেতনভোগী গোলাম হইয়া সাহেবের পোষাকে গোলামী ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া কদর বাড়ান। জহরলালজী সময় সময় যে এই সব গলদ ধরিয়াও পরে আবার ভুলিয়া যান, এই যা দুঃখ। মন্ত্রী ও আমলা তাঁহার দুর্ব্বলতা বেশ জানেন—তিনি যতই ফতোয়া দিবেন—বিফলে যাইবে। ফৌজদারী অপরাধ মাফি তামাদী হয় না, বার বার উপর টাকা অপব্যয়ের সন্দেহ হয়, তাহাদের ধরিয়া নাজেহাল করিতে লাগুন, দেখিবেন সাধারণের চাকর চাকর হইয়া কাজ করিবে, গোলামগিরির গরমী ছুটিয়া যাইবে দুঃখ আমাদের, পণ্ডিতজীর সব সময় সব মনে থাকে না।"

—জঙ্গিপুর সংবাদ

বাতুলতা

"১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ বিলটি না কি জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হইয়াছে। ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ আইনের সহিত প্রস্তাবিত আইনের পার্থক্য কি আমাদের জানিয়া রাখা উচিত। ২ জন নরনারীর মধ্যে কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস নাই, এইরূপ হইলে, ১৮৭২ সালের আইন অনুসারে যে কেহ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। উভয়েই ঘোষণা করিবে যে, তাহারা হিন্দুও নহে, মুসলমান বা ক্রিশ্চানও নহে। এক্ষণে যে বিবাহ বিল উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ ঘোষণা করিবার প্রয়োজন হইবে না। হিন্দু নারী অনায়াসেই মুসলমানকে বিবাহ করিবে। ক্রিশ্চান নারীও যে কোন ধর্ম্মীকে বিবাহ করিতে পারিবে। সন্তানের জন্ম হইলে কে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহা পিতা-মাতাকে স্বীকার করিলেই চলিবে। এই আইন হিন্দুধর্ম্মের পরিপন্থী। আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে সম-জাতীয়তা সৃষ্টি না হইয়া সাম্প্রদায়িকতাই প্রশ্রয় পাইবে। হিন্দু সমাজের মধ্যে যে শৃঙ্খলা, তাহা ভঙ্গ করার পক্ষে এই বিধান অতিশয় মারাত্মক। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া দেখি, মহিলা সভ্যারাই এই বিলের সমর্থন করিয়াছেন। নারীগণ যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে বিবাহ করিতে পারিবেন—এইরূপ উল্লাসই কি তাঁহাদের চিত্তকে এই বিল সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? এইরূপ যদি হয়, তাহা হইলে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'—এই গীতার বাণী ব্যর্থ করার আয়োজনই এই বিলে হইয়াছে মনে করিতে হইবে। আমরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছি জাতিকে অসাম্প্রদায়িক করার নীতি শ্রেয়ঃ নহে। যদি খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, তখন সকল সম্প্রদায়কেই সে বুকে তুলিয়া লইতে পারে। হিন্দু নারীর মুসলমান অথবা ক্রিশ্চান পতি হইলেই এবং পত্নী হিন্দু বলিয়া আর পতি মুসলমান বা ক্রিশ্চান বলিয়া পরিচয় দিলেই যে জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বাঁধ লুপ্ত হইবে—এমন ধারণা করা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক। হিন্দু হিন্দু থাকিবে, মুসলমান বা ক্রিশ্চানও স্ব স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত থাকুক না—সকলকে লইয়া ভারতের বৃহত্তর সমাজ-সংগঠনই বাঞ্ছনীয়। হিন্দু নারীর গর্ভে অথবা হিন্দু পুরুষের ঔরসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্তান জন্মিলে, সম্প্রদায়-ভেদ তাহাতে দূর না হইয়া, ইহারাও আবার একটি অভিনব সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবে। সম্প্রদায় দোষের নহে, সাম্প্রদায়িক...

দোষের। এ দেশের উপনিষৎ 'ঈশা বাস্তমিদং' বলিয়া ঘোষণা করে—সবই ঈশ্বরের বাসগৃহ, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক ও ক্রিশ্চান হউক সকলকেই সে ভালবাসিবে। ইহাই যথার্থ সাম্প্রদায়িকতার গর্ব্ব দূর করার অব্যর্থ বিধান। এইরূপ শিক্ষা দিবার লোক সৃষ্টি না করিয়া, ভারতে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার প্রচেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।" —নবসঙ্ঘ (চন্দননগর)।

অপব্যবহার

"সহরের সরকারী ও বেসরকারী যানবাহনগুলির যেভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সম্প্রতি আমাদের দপ্তরে আসিয়াছে। এই সব যানবাহনগুলির পেট্রোল খরচ হইতে ড্রাইভারের মাহিনা পর্য্যন্ত সমস্তই দরিদ্র জনসাধারণের পকেট কাটিয়া যোগান হয়। একটু নজর দিলে দেখা যায়, এই সব গাড়ীগুলিতে করিয়া কেবল ক্ষমতায় আসীন সরকারী ও বেসরকারী ভাগ্যবানেরা নহেন—তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, ভাগিনেয়ী এমন কি তাহাদের অনুগৃহীত জনেরা পর্য্যন্ত হাট-বাজার স্কুল-কলেজ মার্কেটিং, নিমন্ত্রণ-রক্ষা, বান্ধবী-সন্দর্শনে যাওয়া প্রভৃতি প্রতিদিনের কাজকর্ম্ম সারিয়া থাকেন। নিম্নে কোন্ ভাগ্যবানে কোন্ গাড়ী ব্যবহার করেন তাহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল:

(১) W. G. U. 409, দিয়াবাড়ী টি কোম্পানী।
(২) W. G. U. 407, কমলা টি কোম্পানী।
(৩) W. G. U. 296, ইষ্টার্ণ টি কোম্পানী।
(৪) W. G. U. 404, সারদা টি কোম্পানী।

১, ২, ৩ ও ৪এ বর্ণিত গাড়ী সহরের প্রভাবশালী (?) চা-মালিক কংগ্রেসী মনোনীত এম, পি, শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের নিজ ও অনুগৃহীত জনের ব্যবহারে লাগে।

(৫) W. G. U. 138, কোহিনূর টি কোং, শ্রীরামানন্দ দাগার ব্যবহারে লাগে।

(৬) W. G. U. 328. দেবপাড়া টি কোং, শ্রীবিরাজ ব্যানার্জীর ব্যবহারে লাগে।

(৭) W. G. U. ? গোপালপুর টি কোং, শ্রীবীরেন ঘোষের ব্যবহারে লাগে।

(৮) W. B. P. 1695, D. I. G.র ভাগিনেয়ীর ব্যবহারে লাগে।

(৯) W. B. P. 1230 S. P.র কন্যা এই গাড়ীতে স্কুল ও অন্যান্য স্থানে যাইয়া থাকেন।

(১০) W. G. V. 1582. "ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভ্যান", এই ভ্যানে এজেন্ট স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ সিনেমা হইতে আরম্ভ করিয়া হাটবাজার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

(১১) W. B. D. 3959, ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের গাড়ী। এই ভ্যানে স্কুল ইনসপেকটরের বাড়ীর মহিলাদের সহরের সর্ব্বত্র ঘুরিতে দেখা যায়।

(১২) W. C. U. 434. মেরীভিউ টি কোং জীপ, শ্রীরামানন্দ দাগার ব্যবহারে লাগে।" —স্পষ্ট কথা (জলপাইগুড়ি)।

হেগে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃ[illegible]

জয়পুর মহারাজার কলেজের ইতিহাসের [illegible] চৌধুরী হেগে ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ [illegible] আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও তুলনামূলক সরকার সম্বন্ধে

উচ্চ-মানের পড়াশুনার জন্য নেদারল্যাণ্ডস ইউনিভার্সিটীজ [illegible] হইতে বৃত্তি পাইয়াছেন। শ্রীচৌধুরী বৃত্তি পাইয়া উচ্চশি[illegible] হেগ গমন করিয়াছেন।

শোক-সংবাদ

সুপরিচিতা শিক্ষাব্রতী বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব [illegible] শ্রীমতী তটিনী দাস ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন ক[illegible] কিছু দিন যাবৎ তিনি রক্তচাপাধিক্য ব্যাধিতে ভুগিতে[illegible] শ্রীমতী দাস ১৯৩২ সালে বেথুন কলেজের দর্শন ও [illegible] অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। তিনি বেথুন স্কুল ও বেথুন [illegible] ছাত্রী ছিলেন। ১৯৩৪ সালের ২রা জানুয়ারী তিনি বেথুন [illegible] অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ১৭ বৎসর কাল বেথুনে [illegible] অধ্যক্ষা থাকিয়া তিনি শিক্ষাব্রতী হিসাবে দেশের সে[illegible] গিয়াছেন। ১৯৫০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সরো[illegible] দাস, তিন পুত্র এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার প্রবীণ বিশিষ্ট ম্যালেরিয়া-বিশেষজ্ঞ ও [illegible] রায় ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, বি বাহাদুর [illegible] আক্রান্ত হইয়া ১৬ই অক্টোবর পরলোক গমন করে[illegible] তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি [illegible] আবিষ্কার করেন এবং বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া [illegible] জন্য আজীবন পরিশ্রম করেন। সেণ্ট্রাল [illegible] ম্যালেরিয়া সোসাইটি লিঃ এবং বেঙ্গল কো-অপারেটিভ [illegible] এসোসিয়েশন লিঃ এই দুইটি [illegible]

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক